চার আনার বেশি গাড়িভাড়া দেবে না। কিন্তু বেণী সার সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে ফিরতে যত রাত্তই হোক, তিন টাকা চার আনা দিলেই গাড়োয়ান আর গোলমাল করবে না। নইলে, দেরি হতে দেখলেই গাড়োয়ান কেবল চলো, চলো, ক'রে দিক্ করে। কিন্তু গেলেই কি তক্ষুনি-তক্ষুনি ফেরা যায়? যদুর মা এসেছে, সে কত ভালোবাসে, তার সঙ্গে দুটো কথা না কয়েই বা আসি কি করে? কিন্তু এখন বাড়তি টাকা একটা কে দেয়!

একদিন যদুকে বললেন সরাসরি: 'হ্যাঁ হে, এত টাকা করেছ, এখনো টাকার লোভ গেল না?'

'দেখ ছোট ভটচাজ,' বললে যদু মল্লিক, 'ও লোভ যাবার নয়। তুমি যেমন ভগবানের লোভ ছাড়তে পারো না, তেমনি বিষয়ী লোকও ছাড়তে পারে না টাকার লোভ। আর কেনই বা ছাড়বে? তুমি ভগবানের প্রেমের জন্যে পাগল, আমি তাঁর ঐশ্বর্যের জন্যে পাগল! আচ্ছা, বলো দিকিনি টাকা কি তাঁর ঐশ্বর্য নয়?'

ঠাকুরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'যদি এটা ঠিক বুঝে থাকো টাকাটা তোমার নিজের ঐশ্বর্য নয়, ভগবানের ঐশ্বর্য, তাহলে আর তোমার ভাবনা কি গো! কিন্তু এ কথা তুমি সরল ভাবে বলছ, না, চালাকি করে বলছ?'

'সে কথা তুমিই জানো। তোমার কাছ থেকে কি মনের কথা লুকোনো যায়?'

কিন্তু যাই বলো, ও সব মোসাহেবগুলোকে রেখেছ কেন?

'ভদ্দরলোকের ছেলে, ভিক্ষে করতে পারে না, কিছু পাবার আশায় এখানে পড়ে থাকে। ওদের বঞ্চিত করলে ওরা যায় কোথায়?'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশলে ক্ষতি হতে পারে।'

'দেখ ছোট ভটচাজ, বিষয়-আশয় রাখতে গেলে অমন লোকের দরকার আছে।'

আবার বিষয়-আশয়। চঞ্চল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'সবই তো ইহকালের জন্যে সংগ্রহ করছ, ও পারের জন্যে কি জোগাড়যন্ত্র করলে?'

'ও পারের কাণ্ডারী তো তুমি। শেষের দিনে শুনে স্থির থ... সেই আশায়ই তো শেষ ...পের দুঃখে কেঁদেছিলেন আকুল হয়ে।

শিবনাথকে বাড়ির থেকে বের করে দিয়েছে বাপ। চলো যদু মল্লিকের বাড়ি।

তার মা ঠাকুরকে কাছে বসে খাওয়ান আর কাঁদেন। তাঁর বাৎসল্য-রস।

গাড়িতে উঠলেন ঠাকুর। সঙ্গে লাটু, হাতে ঠাকুরের বেটুয়া আর গামছা। আর হয়তো অতুল-কৃষ্ণ গিরিশ ঘোষের ভাই।

কৌতূহলী হয়ে এটা ওটা দেখছেন ঠাকুর আর শিশুর মত জিগগেস করছেন লাটুকে।

বরানগরের বাজার ছাড়িয়ে চলেছেন এখন মতি-ঝিলের পাশ দিয়ে। ডাইনে একটা মদের দোকান, ডাক্তারখানা, চালের আড়ত, ঘোড়ার আস্তাবল। তার দক্ষিণে সর্বমঙ্গলা আর চিত্তেশ্বরীর মন্দির।

মদের দোকানে মদ খাচ্ছে মাতালেরা আর খুব হল্লা করছে। কেউ-কেউ বা গান ধরেছে স্ফূর্তিতে। কেউ-কেউ বা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে স্খলিত পায়ে। সব চেয়ে মজার, দোকানের যে মালিক, সে নির্লিপ্ত হয়ে দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে চেয়ে। দোকানের চাকর... করছে বেচাকেনা। এ সবে মালিকের যেন আঁট নেই। কপালে মস্ত এক সিঁদুরের ফোঁটা কেটে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

যার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সে বুঝি ঘরের সমুখ দিয়ে চলে যাবে। আনমনে চলে যাবে। হয়তো একবার ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করবে না।

মদ-বেচা শুঁড়ি, তার আবার আবদার! কিন্তু ঠাকুর তো মদ দেখেন না, ঠাকুর মন দেখেন। জীবিকা দেখেন না, জীবন দেখেন। দোকানের মদের ভাণ্ড আমার পূর্ণ থাকতে পারে কিন্তু অন্তরে করুণার কুম্ভটি আমার শূন্য।

ঠাকুরকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে প্রণাম করল দোকানি।

ঠাকুরের চোখ পড়ল দোকানের দিকে। তরল-অনল-উচ্ছল মাতালদের দিকে। তাদের বিহ্বল মাতামাতির দিকে। এ কি! ঠাকুরও যে মুহূর্তে বিভোর হয়ে গেলেন নেশায়। তাঁর গা-হাত-পা টলতে লাগল, এড়িয়ে গেল কথা। এ কি! ঠাকুরও মদ খেয়েছেন নাকি? কখন খেলেন?

মদ দেখে কারণের কথা মনে পড়েছে ঠাকুরের—আনন্দ... কথা। কারণানন্দ ... পড়েছে সুরাহা হল না।

মদের নাম হরিরসমদিরা। এ মদের নাম সুরা নয় সুধা। এ মদের নেশাও দুর্মদ।

শুধু তাই নয়, চলতি গাড়ির পা-দানিতে এক পা রেখে মাতালের মত নাচতে সুরু করলেন ঠাকুর। হাত নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগলেন চেঁচিয়ে: 'বা, বেশ হচ্ছে, খুব হচ্ছে, বা, বা, বা।'

এ কি, পড়ে যাবেন যে! চলতি গাড়ি থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে অতুল ধরতে গেল ঠাকুরকে, হাত বাড়িয়ে টানতে গেল ভিতরে। লাটু বাধা দিয়ে বললে, 'পড়ে যাবেন না, ভয় নেই। নিজে হতেই সামলাবেন—'

আড়ষ্ট হয়ে রইল অতুল। বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। নিজে হতেই সামলাবেন! কে জানে। পড়ে গেলেই তো সর্বনাশ। আর নয়, পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে আর কখনো যাব না এক গাড়িতে। দিব্যি সহজ মানুষের মত কথাবার্তা বলছিলেন, হঠাৎ কোথাকার কতগুলো মাতাল দেখে মত্ত হয়ে গেলেন। এ কখনো শুনিনি।

শুনিনি তো ঠিক, কিন্তু দেখছি স্বচক্ষে। কারণী-ভূতকে দেখে কারণশরীরে অকারণ আনন্দ!

গাড়ি ছাড়িয়ে গেল শুঁড়িখানা। ঠাকুর স্থির হয়ে বসলেন এসে ভিতরে। স্বাভাবিক সহজ সুরে বললেন, 'ঐ সর্বমঙ্গলা। বড় জাগ্রত। প্রণাম করো।' নিজেই প্রণাম করলেন সর্বাগ্রে।

মদ খেয়ে টং হয়েছে গিরিশ। এমন মাতাল, বেশ্যাও তখন দরজা খুলে দিতে নারাজ। হঠাৎ কি হল, দক্ষিণেশ্বরের কথা মনে পড়ে গেল আচমকা। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে নিয়ে উঠে বসল। চলো দক্ষিণেশ্বর। সেখানে এমন একজন আছেন যিনি দরজা কখনো বন্ধ করেন না।

রাত নিশুতি। মন্দিরের ফটক কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

তা হোক, তবু কোথাও যদি জায়গা থাকে, সে দক্ষিণেশ্বর। কলকাতার উত্তরে, কিন্তু আসলে দক্ষিণ।

যা ভেবেছিল, ফটক বন্ধ। চার পাশ অন্ধকার। নিস্পন্দ।

কিন্তু যিনি ঘুমান না, আর্ত জনের অন্ধ জনের কান্না শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে

'ঠাকুর! ঠাকুর!' চীৎকার করে ডাকতে লাগল গিরিশ।

কে, গিরিশ না? সেই নোটো নেচো গিরিশ! নির্জন নিঃসঙ্গ অন্ধকারে আমাকে ডাকছে কাতর প্রাণে! আমি কি থাকতে পারি স্থির হয়ে?

বাইরে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর। ফটক খোলালেন। মাতাল গিরিশের হাত ধরলেন আনন্দে। মদ খেয়েছিস তো কি, আমিও মদ খেয়েছি। সুরাপান করি না রে, সুধা খাই রে কুতূহলে। আমারে মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে। বলে গিরিশের হাত ধরে হরিনাম করতে করতে নাচতে লাগলেন ঠাকুর।

স্বভাব আর ছাড়তে পারে না গিরিশ। সে দিন আবার মাতাল হয়ে এসেছে গাড়িতে করে।

কি করেই বা ছাড়বে? গল্প করলেন ঠাকুর: 'বর্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া গাই-গরুর কাছে যাচ্ছে। জিগগেস করলুম, এ কী হল? তখন গাড়োয়ান বললে, মশায়, এ বেশি বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায়নি। একটা বাটিতে যদি রশুন গোলা হয়, রশুনের গন্ধ কি যায়? বাবুই গাছে কি আম হয়?'

ঠাকুরও তেমনি তাঁর স্বভাব ছাড়তে পারেন কই? তাঁর অযাচিত করুণার স্বভাব।

ওরে গিরিশ এসেছে। নিজেই এগিয়ে গিয়ে আদর করে ধরে নিয়ে এলেন। মাতাল বলে প্রত্যাখ্যান করলেন না।

লাটুকে বললেন, 'যা তো, দ্যাখ তো গাড়িতে কিছু আছে কিনা।'

লাটু গিয়ে দেখে মদের বোতল পড়ে আছে। আর গ্লাশ আছে কাঁচের। ঠাকুরের হুকুম, নিয়ে চলল গ্লাশ-বোতল। ভক্তরা যারা দেখল হেসে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'রেখে দে তোর কাছে। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব?'

মদের মধ্য দিয়েই ওর মুক্তি আসবে। শেষ-কালে আর মদ থাকবে না, থাকবে মাদকতা। ক্রোধ থাকবে না থাকবে তেজ। কাম থাকবে না থাকবে প্রেম। লোভ থাকবে

গিরিশ বললে, 'আমার আস্ত বোতলের নেশাটাই মাটি করে দিলে।'

'যদি পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবই জানতুম', গিরিশ আপশোষ করেছিল, 'তবে আরো কিছু পাপ করে নিতুম সখ মিটিয়ে।'

সে বার লছমনঝোলায় শরৎ-মহারাজ আর হরি-মহারাজ খুব ভাঙ খেয়েছে। নেশা করে শুধু ঠাকুরের কথাই কইতে লাগল। কইতে-কইতে চোখ শাদা হয়ে গেল, নেশার লেশমাত্র রইল না।

বাকি রাতটুকু তোমার কথাই কইতে দাও। এই ব্যাধির রাত, বিকারের রাত কেটে যাক। তোমার কথায় জাগুক একবার সেই আরোগ্যের সুপ্রভাত।

সাতাশ

'আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে?' মাষ্টার মশাইকে জিগগেস করলেন ঠাকুর। 'আমার দেখতে বড় সাধ হয়।'

বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে মাষ্টারি করেন, একদিন কথাটা পাড়লেন গিয়ে মাষ্টার মশাই। বিদ্যাসাগর জিগগেস করলেন, 'কেমনতরো পরমহংস হে? গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন নাকি?'

'না, লালপেড়ে কাপড় পরেন। গায়ে জামা, পায়ে বার্নিশ-করা চটিজুতো। রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন একটি ঘরে, তক্তপোশের উপর সামান্য বিছানা, তাতেই শোন, মশারি খাটান। দেখতে অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু এমন আশ্চর্য লোক আর দেখা যায় না। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না সংসারে।'

বটে? খুশি হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'শনিবার চারটের সময় নিয়ে এস।

গাড়ি করে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। সঙ্গে মাষ্টার, ভবনাথ আর হাজরা।

আহা, ভবনাথ কেমন সরল! বিয়ে করে এসে আমায় বলছে, আমার স্ত্রীর উপর এত স্নেহ হচ্ছে কেন? তা, স্ত্রীর উপর ভালোবাসা হবে না? এটিই [illegible]

শুনে স্থির থ কতে পারেননি বিদ্যাসাগর বাপের দুঃখে কেঁদেছিলেন আকুল হয়ে।

শিবনাথকে বাড়ির থেকে বের করে দিয়েছে বাপ। ভালো করে খাওয়াবার শক্তি নেই, বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, পয়সা নেই মেরামত করার—ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না, ছেলের পৈতে দিতে পারে না—এর কাছে আট আনা ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে—

বিদ্যারূপিণী স্ত্রীই যথার্থ সহধর্মিণী। এক হাতে সংসারের কাজ করে, আরেক হাতে স্বামীর হাত ধরে নিয়ে চলে ঈশ্বরের পথে।

আর হাজরা?

অনেক জপতপ করে, মন পড়ে আছে বাড়িতে, স্ত্রী-ছেলে জমি-জমার উপর। তাই ভিতরে-ভিতরে দালালিও করে। টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকে, লম্বা-লম্বা কথা শোনায়, বলে, রাখাল-টাখাল যা সব দেখছ, জপতপ করতে পারে না, হো-হো করে ঘুরে বেড়ায়।

'যদি কেউ পর্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর সাধনা করে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে বিষয়ে মন, কামকাঞ্চনে মন, সে লোককে বলি ধিক। আর যার কামকাঞ্চনে মন নেই, খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য।'

পোল পার হয়ে শ্যামবাজার হয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পড়েছে গাড়ি। এই বাদুড়বাগানের কাছে এসে গেলাম। মুহূর্তে ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের।

এই রামমোহন রায়ের বাগান বাড়ি।

রামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখন ও সব আর ভালো লাগছে না।'

এখন শুধু বিদ্যাসাগর। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, প্রেম, জ্ঞান—যা শুধু ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। সেই বিদ্যার সমুদ্র।

দোতলা, ইংরেজ-পছন্দ বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, পশ্চিম ধারে ফটক। পাঁচিল থেকে নিচের ঘর পর্যন্ত ফুলের কেয়ারি। বিদ্যাসাগর উপরে থাকেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই উত্তরে একটি কামরা, তার পূবে হল-ঘর। হল-ঘরের পূব প্রান্তে টেবিল-চেয়ার। সেইখানে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে কাজ করেন বিদ্যাসাগর। হল-ঘরের দক্ষিণে বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরি। সে আরেক বিরাট শেষসমুদ্র। পাশেই নিভৃত শোবার-ঘর।

আশ্রয় [illegible] শুরুর সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। সুরাহা হল না।

গাড়ি থেকে নামলেন রামকৃষ্ণ। গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে ধুতি, আঁচলটি কাঁধের উপর ফেলা। পায়ে বার্নিশ-করা চটি জুতো। উঠোন পেরিয়ে যেতে-যেতে জিগগেস করলেন মাষ্টারকে, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষে হবে না?'

'আপনার কিছুতে দোষ হবে না।' বললে মাষ্টার। 'আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।'

নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর। বালককে বোঝালে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, তেমনি।

হল-ঘরে না বসে উত্তরের কামরায় বসেছেন বিদ্যাসাগর। বয়স আন্দাজ বাষট্টি। রামকৃষ্ণের থেকে ষোল-সতেরো বছরের বড়। খর্বাকৃতি, মাথাটি প্রকাণ্ড, চার পাশ উড়িয়াদের মতো কামানো। পরনে শাদা থান কাপড়, গায়ে হাত-কাটা ফ্লানেলের জামা, গলায় পৈতে দেখা যাচ্ছে, পায়ে ঠনঠনের চটি জুতো। বাঁধানো দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

রামকৃষ্ণ ঘরে ঢুকতেই বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। যে টেবিল সামনে রেখে দক্ষিণাস্য হয়ে বসে ছিলেন বিদ্যাসাগর, তার পুব পাশে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। বাঁ হাতখানি টেবিলের উপর। যেন সংলগ্ন হয়ে আছেন বিদ্যাসাগরে। একদৃষ্টে তাকে দেখছেন আর হাসছেন ভাবাবেশে।

ভাবাবেশ সংবরণ করবার জন্যে মাঝে-মাঝে বলছেন রামকৃষ্ণ, 'জল খাব।' 'জল খাব।'

দেখতে-দেখতে ভিড় হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। পিছনে একটা পিঠ-তোলা বেঞ্চি ছিল, তাতে বসলেন রামকৃষ্ণ। সেখানে একটি ছেলে ব'সে। বিদ্যাসাগরের কাছে ভিক্ষে করতে এসেছে, পড়া-শোনার খরচ চলে না। তার থেকে সরে বসলেন ঠাকুর। বললেন, 'মা, এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি। তোমার অবিদ্যার সংসার। এ অবিদ্যার ছেলে।'

আর এ ছেলেটি? সামনে-বসা আরেকটি ছেলেকে নির্দেশ করলেন বিদ্যাসাগর।

'এ ছেলেটি যেন অন্তঃসার ফল্গু নদী। উপরে বালি, কিন্তু একটু খুঁড়লেই জল দেখতে পাবে ভিতরে।'

মাষ্টারকে জিগগেস করলেন, 'কিছু খাবার দিলে ইনি খাবেন কি?'

'আজ্ঞে আনুন না।' বললে মাষ্টার।

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন বাড়ির মধ্যে। একথালা মিষ্টি নিয়ে এলেন। বললেন, 'এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে।'

মিষ্টিমুখ করলেন রামকৃষ্ণ। ভবনাথ আর হাজরাও কিছু অংশ পেল। মাষ্টারের বেলায় বিদ্যাসাগর বললেন, ও তো ঘরের ছেলে। ওর জন্যে আটকাবে না।

মিষ্টিমুখের পর বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে বললেন রামকৃষ্ণ, 'আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখলুম!'

বিদ্যাসাগর হেসে জবাব দিলেন, 'তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।'

'না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি যে ক্ষীরসমুদ্র।'

এক ঘর লোক। কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে। কথার রসগ্রহণ করে হাসছে সবাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর চুপ।

'তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম।' বলছেন রামকৃষ্ণ, 'সত্ত্বগুণ হয় দয়া থেকে। শুকদেবাদি লোক-শিক্ষার জন্যে দয়া রেখেছিলেন। তোমার বিদ্যাদান অন্নদান—সেও ঐ দয়া থেকে। নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে ঐতেই ভগবান-লাভ। কেউ করে নামের জন্যে, পুণ্যের জন্যে, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর তোমার হচ্ছে দয়ার থেকে, দয়ার জন্যে। তাই তুমি তো সিদ্ধ গো!'

'আমি সিদ্ধ?' চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। 'আমি আবার ভগবানের জন্যে সাধন করলুম কবে?'

রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'আলু-পটল সিদ্ধ হলে কী হয়? নরম হয়। তুমিও তো তেমনি নরম হয়ে গেছ। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। তোমার এত দয়া, তুমি নও তো আর কে সিদ্ধ?'

[illegible] লোভ থাক[illegible]

সমাজপরিত্যক্ত হয়ে বাস করছে নিরালায়। একটা হিন্দু চাকর পর্যন্ত জোটেনি। থাকবার মধ্যে আছে সতীর্থ বন্ধু শিবনাথ আর মহাপ্রাণ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরই পুরোত জোগাড় করে দিয়েছেন বিয়ের, নিমন্ত্রিতদের খাওয়াবার খরচ দিয়েছেন, নববধূকে দিয়েছেন মূল্যবান উপহার।

যোগেনের বাড়িতে প্রায়ই আসেন বিদ্যাসাগর। মজার-মজার গল্প বলে হাসিয়ে যায় সবাইকে। বিষাদভার লাঘব করেন। কঠোর ব্রতোদযাপনের প্রতিজ্ঞাতে ধার জোগান।

সে দিন এসে দেখেন, শিবনাথের কোলে সুশ্রী একটি মেয়ে।

'কে এই মেয়ে?'

'নাপিতদের মেয়ে। আমাদের পাড়াতেই থাকে। দাদা বলে আমাকে।'

'বা, বেশ মেয়েটি তো?' একটু আদর করতে হাত বাড়ালেন বিদ্যাসাগর।

'কিন্তু জানেন কি?' কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল শিবনাথের: 'ও বিধবা।'

বিধবা? যেন বাজ পড়ল ঘরের মধ্যে। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন বিদ্যাসাগর। যন্ত্রণায় মুদ্রিত করলেন দু চোখ। শিবনাথ দেখতে পেল, বড়-বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

হঠাৎ দু বাহু বাড়িয়ে অবোলা শিশুটাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

শিবনাথ বললে, ওকে ফের বিয়ে দেবার জন্যে ওর মাকে বোঝাচ্ছি ক দিন থেকে।

'কিছু ভাবতে হবে না। ওকে আগে বেথুন ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। খরচ-পত্র যা লাগে সব আমি দেব। তার পর একদিন পালকি ভাড়া করে ওকে আর ওর মাকে পাঠিয়ে দিও আমার বাড়িতে, আমার মার কাছে।'

বিদ্যাসাগর কি সিদ্ধ নয়?

শিবনাথ যখন ব্রাহ্ম হয়, তখন তার বাবা কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে, 'মানুষ যেমন যমকে ছেলে দেয়, তেমনি আমি কেশবকে ছেলে দিয়েছি।'

শুনে স্থির থকতে পারেননি বিদ্যাসাগর। বাপের দুঃখে কেঁদেছিলেন আকুল হয়ে।

শিবনাথকে বাড়ির থেকে বের করে দিয়েছে বাপ। ত্যাজ্যপুত্র করেছে। স্ত্রী আর ছোট্ট একটি মেয়ে নিয়ে আলাদা বাসা করে আছে কায়ক্লেশে। স্কলারশিপের টাকা কটিই ভরসা।

পথে-ঘাটে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে-মাঝে। মুখ ফিরিয়ে নেন না বিদ্যাসাগর। বরং মুখ বাড়িয়ে গলা নামিয়ে জিগগেস করেন আলগোছে, 'হ্যাঁ রে, কেমন করে চলে?'

শুধু বাপের কষ্টেই কাঁদেন না, ছেলের কষ্টেও কাঁদেন।

প্রায়ই খোঁজ নিতে আসেন। এটা-ওটা পরামর্শ দেন। শিবনাথ যদি কখনো অর্থ সাহায্য চেয়ে বসে, বোধ হয় তারই জন্যে নীরবে অপেক্ষা করেন।

কত ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসেন শিবনাথকে। যখনই তাদের বাড়ি যান, দু আঙুলের চিমটেতে শিবনাথের ভুঁড়ির মাংস টেনে ধরেন। ওটাই তাঁর আদরের চেহারা। সে আদরের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় শিবনাথ। কিন্তু বিদ্যাসাগর ঠিক তাকে ধরে আনেন। তার ভুঁড়িতে চিমটি না কাটতে পেলে বিদ্যাসাগরের শান্তি নেই।

তখন তো বাপে-ছেলে একসঙ্গে ছিল। এখন ছেলে একা, বাপ একা। দুয়ের দুখেই কাঁদেন বিদ্যাসাগর। একবার এ বাড়ি যান, আরেক বার ও বাড়ি।

কাঁদবার আগে পর্যন্তই বিচার। একবার কান্না এসে গেলে বিচার ধুয়ে যায়।

বিদ্যাসাগরের কাছে কত লোক এসে গাল পাড়ে, শিবনাথকে। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছে বলেই সবাইর রাগ।

কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেন, 'যাই ও করুক, ফেলতে পারব না ওকে। যাই বলো, ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।'

সেই শিবনাথের ঘরে আরেক জন তার বন্ধু এসেছে। বন্ধুটিও শিবনাথের মত সমাজদ্রোহী, বিধবা বিয়ে করেছে, আর শিবনাথের মতই পিতৃ-পরিত্যক্ত। খুব ধনী বাপের ছেলে, এখন একেবারে দুরবস্থার চরম। তার উপর রোগ হয়েছে মারাত্মক। বিধবা-বিয়ে ঘটাতে হাত ছিল শিবনাথের, তাই এখন ত্যাগ করতে পারল না বন্ধুকে। সপুত্রকলত্র আশ্রয় দিল। ডাক্তার ডাকাল। কিন্তু কিছুই সুরাহা হল না।

তখন বন্ধু বললে, বাবাকে একটা খবর দাও। তিনি ক্ষমা না করলে আর সারব না আমি।

তার বাবার সঙ্গে পরিচয় নেই শিবনাথের। কি করে তাঁকে ধরে! নিজে গেলে হয়তো উলটো ফল হবে। বন্ধুর অন্তিম কামনা পূর্ণ হবে না।

তখন অগতির গতি, বিদ্যাসাগরকে গিয়ে ধরল শিবনাথ। বিদ্যাসাগর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'জানো ও ছোকরার চরিত্র? ওর সব অতীত কীর্তি?'

সব জানে শিবনাথ। মুখ বুজে হেঁট হয়ে রইল। বুঝল, বৃথা, আশালতা দগ্ধ হয়ে গেল সূর্যতেজে।

'ওকে সাহায্য করবে না আর কিছু! উলটে ওকে চাবকে দেওয়া উচিত।'

সেই বিরাট আননের উপর ক্রোধের রুদ্ররঙ্গ দেখতে লাগল শিবনাথ।

নিরুপায়ের মত প্রণাম করল বিদ্যাসাগরকে। চলে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করতে পারলাম না।'

মহামানুষটি নড়ে উঠলেন। ধমক দিলেন শিবনাথকে। 'বোস। আমি তোকে চলে যেতে বলেছি? হ্যাঁ, সেই কাল সকালের আগে তো আর কিছু হবে না? যা, কাল সকালেই নিয়ে যাব তার বাপকে। আর, শোন, দাঁড়া, এই কটা টাকা নিয়ে যা।' শিবনাথের হাতে কটা টাকা গুঁজে দিলেন বিদ্যাসাগর: 'তুই একা কদ্দিন চালাবি? এই নে। দেখিস ওর স্ত্রী আর সন্তান যেন কষ্টে না পড়ে।'

বলো, সিদ্ধ কি নয় বিদ্যাসাগর?

যে মাতৃভক্ত সে কি সাধক নয়? মা বলেছেন ভাইয়ের বিয়েতে হাজির হতে, যেমন করেই হোক, দামোদর সাঁতরেই চলে গেলেন। তার পর মা যখন চলে গেলেন, বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেলেন নির্জনে। আর কিছুর জন্যে নয়, মার জন্যে কাঁদতে বুক ভরে।

পরের জন্যে যে কাঁদে সে তো পরমের জন্যেই কাঁদে। পরই তো পরম। পরেশও যে, পরমেশও সে-ই। ব্রহ্মই তো পরব্রহ্ম। ব্রহ্মের জন্যে যে কাঁদে সেই তো সিদ্ধ।

বিদ্যাসাগর বললেন রামকৃষ্ণকে, 'কিন্তু জানেন তো, কলাইবাটা সেদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।'

'তুমি তেমনি নও গো। তুমি দরকচা-পড়া পণ্ডিত নও। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তার নজর ভাগাড়ের দিকে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, এদিকে কামকাঞ্চনে আসক্তি, তারা শকুনির মতই পচা মড়া খুঁজছে। তুমি সে রকম নও। বিদ্যার ঐশ্বর্য—দয়া ভক্তি বৈরাগ্য খুঁজছ। তুমি সিদ্ধ নও তো কে সিদ্ধ?'

এক জ্ঞানময় পুরুষ দেখছেন এক আনন্দময় পুরুষকে। [ক্রমশঃ।

আপনি কি জানেন?

১। ইংরাজ কর্তৃক ভারতবর্ষে কবে এবং কোথায় প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়?

২। প্রেমে প'ড়ে বা প্রেম ক'রে সমগ্র দুনিয়ায় কয়েক জন বিখ্যাত নারী রাজনীতি এবং রাজত্ব ক'রে গেছেন। সেই নারীদের নাম কি?

৩। "মৌন হ'য়ে থাকা সুখানুভূতির মধ্যে চরমতম।" কথাটি কে বলেছিলেন?

৪। দিবারাত্রে নেপোলিয়ন নিদ্রা যেতেন কতক্ষণ?

৫। বুদ্ধি এবং প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশ হয় মানুষের কত বয়সে?

৬। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস বা ভারত-ভবনের প্রথম গ্রন্থাগারিক (Librarian) কে ছিলেন?

৭। সম্রাট শাহজাহান কি সঙ্গীত রচনা করতেন এবং গাইতেন?

৮। "দেশপ্রেম যদি পাপ হয়, আমি অবশ্যই এক জন পাপী।" কোন্ বাঙালী ব'লেছিলেন?

৯। "সাধারণতঃ প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করে দুর্ব্বলচিত্তের লোক।" কার উক্তি?

১০। জনৈক বাঙালী যিনি শুধু কবি ছিলেন না, যিনি ৩৪টি বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় কবিতা রচনা করতেন এবং অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন, তিনি কে?

[১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

পায়চারিতে শ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক দৃষ্টি স্থির করি
ময়লা জলের ট্যাঙ্কের উপর চড়ি
একটি হৃদয় জয়ের তরে করি বিষম ধ্যান
হারায় চেতন হারায় সকল জ্ঞান।
ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে আঁধার
ছোট বড় যায় না বোঝা লাল কি কালো পাড়,
যায় না বোঝা, তবু তাকাই
অন্ধকারের আড়ালেতে ইসারা তার যদি একটু পাই
চক্ষু টাটায় দৃষ্টি নাহি চলে,
ভুলি আশার ছলে
তবু দেখি আঁধার ঠেলে ঠেলে
ঐটুকু মোর চরম আরাম আমি মেসের ছেলে।"

আমার রচনাশক্তির নিদর্শন হিসাবে এই উদ্ধৃতি নয়, মেস-হস্টেলবাসী কলিকাতার ছাত্র-সমাজের তৎকালীন রমণীয়তাবিহীন রুক্ষ-মরুতৃষ্ণার পরিচয় ইহাতে আছে। ছাদে উঠিয়া এই বৈকালিক মরীচিকা দর্শন তাহাদের অকারণ বিলাস ছিল না, বুভুক্ষিতের নিদারুণ হাহাকার ইহার মধ্যে ধ্বনিত হইত। তাহারা সত্যসত্যই এক ক্লেশকর অবস্থায় "হুলো"দের অতৃপ্ত হুলাহুলির মধ্যে কাল কাটাইত। সহশিক্ষার স্নিগ্ধতার সুযোগপ্রাপ্ত এ যুগের সৌভাগ্যশালীরা আমাদের সে যুগের আশ্রমপীড়ার বেদনার পরিমাণ বুঝিবেন না। স্কুল-কলেজ পথ-ঘাট পার্ক-লেকের নয়নমনবিহারের অবাধ অধিকারের মধ্যে "ছাদ-বিহার" তাঁহাদের কাছে বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইবে।

আমার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে একে একে মেসের অনেকের আইবুড়ো অপবাদ ঘুচিতে লাগিল এবং ১৩৩০, ৪ঠা আষাঢ়ের পর দু মাসের মধ্যেই শুষ্ক রুক্ষ-তপ্ত পরিবেশই ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ ও সরস হইয়া উঠিল। আমার সহবাসী (রুম-মেট) প্রফুল্লেরও বিবাহ হইল শ্যামবাজার অঞ্চলে। তাহার শ্বশুরবাড়ি-যাত্রার দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিক পর্ব উপলক্ষ্যে প্রত্যহ সন্ধ্যায়

একাদশ তরঙ্গ

নিরুপায় অবতরণ (Forced landing)

তথাপি তখনও বিজ্ঞানের আশ্রয় ত্যাগ করিলাম না, একরকম বুড়ি ছুঁইয়া জীবনের লুকাচুরি খেলায় যত রকমের অনাচার সম্ভব সকলই করিতে লাগিলাম। বন্ধু শৈলজারঞ্জন মজুমদার (অধুনা শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতাচার্য) নারীসুলভ মধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিতেন, নিত্যসঙ্গী অজিতনারায়ণ চৌধুরী বাঁশের বাঁশীতে সেই গান বাজাইতেন আর আমি সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ালোকে ছাদের ময়লা জলের ট্যাঙ্কের উপর চড়িয়া পশ্চিম দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া "সুদূরের পিয়াসী" হইয়া বসিয়া থাকিতাম; শহরের ধূলিধূম্রজালের মধ্যে ক্লান্ত রক্তাভ সূর্য কখন যে অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িতেন জানিতেও পারিতাম না, অন্ধকারে ও শিশিরে চারিদিক কালো ও আর্দ্র হইয়া একটা দুশ্ছেদ্য আবরণ রচনা করিয়া আমার দৈনন্দিন কঠিন কর্তব্য হইতে আমাকে সস্নেহে আড়াল করিয়া রাখিত, উৎকল-নন্দন পাচকপ্রভুর কাংস্য কণ্ঠে যখন খাওয়ার ঘণ্টা নিনাদিত হইত, তখন নামিয়া আসিতাম। যদিও সদ্য-বিবাহিত, তবু তখনও আইবুড়োর আবেশ ও অভ্যাস কাটে নাই। এই অবস্থাতেই "ছাদ-বিহার" কবিতা লিখিয়াছিলাম, ইহাতে মেসের বন্ধু সকলেরই নাম ছিল, পরে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র নবম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইয়া মেসে, পাড়ায় এবং কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। দীর্ঘ কবিতা, গোড়া ও শেষটুকু উদ্ধার করিতেছি, সমগ্র কবিতাটি আমার 'অঙ্গুষ্ঠে' আছে ঃ

"বিকেল হ'লেই ছাদ আমারে ক'ষে যে দেয় টান,
কত প্রেমের "ওজোন"-বাতাস বয় সেথা উজান;
থাক্‌তে নারি ঘরে
তাড়াহুড়ো ক'রে
যাহোক কিছু মুড়ি-চিঁড়ে না চিবিয়ে গিলে
(মেসের) জনকয়েকে মিলে
ছাতে ছুটি বেহুঁস হয়ে যেন
মৌতাতেরি সময় হ'লে কালাচাঁদের প্রিয় ভক্ত হেন।
পরস্পরের অগোচরে হেথাহোথা দৃষ্টিবাণ হানি,
মনের কোণে দুষ্ট আশা করে কানাকানি
একটা মাছও পড়বে নাকি জালে ?
এদিক-ওদিক দেখা ত যায় পালে পালে
পঞ্চ হতে পঞ্চাশৎ পার—

*　*　*

আমরাও মাতিয়া উঠিতাম। গালো মুখের ব্রণসঙ্কুল কলঙ্ক মুক্ত হইবার চেষ্টায় রোজ-একে শিশি হ্যাজেলিন স্নো খরচ হইত, সাবানও লাগিত একাধিক। প্রফুল্লকে সাজ'ইয়া-গুছ'ইয়া পরিপাটি করিয়া অভিসারে পাঠাইবার কাজে আমরা এমনি ব্যস্ত হইয়া থাকিতাম যে, ছাদের সিঁড়িতে দেখিতে দেখিতে শ্যাওলা পড়িল; প্রফুল্লের এসেন্স-স্নোয়ের গন্ধ মরিতে না মরিতেই বন্ধু রমেশচন্দ্র সেনের (বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজের কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক) ইহলৌকিক সদ্গতি করিবার জন্য আমরা সদলবলে ট্রেন, ষ্টীমার ও নৌকাযোগে বরিশাল ঝালাকাঠি হইয়া কুলকাঠিতে উপস্থিত হইলাম।

আমি আবাল্য উত্তরবঙ্গে মানুষ। প্রধানত পূর্ববঙ্গের "কলোনি" হইলেও বরেন্দ্রভূমের নিজস্ব বিশেষত্বে উত্তরবঙ্গ পূর্ববঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই। রমেশের বিবাহে প্রথম পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়া পূর্ববঙ্গের বিশেষত্ব প্রণিধান করিলাম। তাহার পর অসংখ্য বার যাতায়াত করিয়াছি, নানা বন্ধু ও বান্ধবীর মধ্যস্থতায় ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে, কিন্তু সেই ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে প্রথম সন্দর্শনেই যে নিবিড় প্রেম উপজিয়াছিল তাহার ঘোর আর কাটাইতে পারি নাই। সন্ধানী আলোক ফেলিয়া নিশীথ অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ষ্টীমার চলিয়াছে। নদীবক্ষে সততসঞ্চরমাণ কচুরিপানাগুলি ঢেউয়ের আঘাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে—তীব্র আলোকে সে দৃশ্য অপরূপ লাগিয়াছিল। ভোরের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে শৈবালাকীর্ণ জলস্রোতের মোহ কাটিয়া গিয়া নদীর দুই তীরে দিগ্‌বলয় পর্যন্ত বিস্তৃত নারিকেল-গুবাক জাতীয় তরুশ্রেণীর ঋজু দীর্ঘায়ত সমারোহ জাগিল,—কালিদাস সম্ভবত 'রঘুবংশে' ইহাকেই "তমালতালীবনরাজিনীলা" বলিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ খালপথে নৌকাযোগে যখন কুলকাঠি গিয়া পৌঁছিলাম, পূর্ববঙ্গের মহিমা তখনই প্রথম আমার প্রত্যক্ষ গোচর হইল। ওই জলকাদা-পিচ্ছিল অরণ্যের মাঝখানে মানুষ যে অত সহজে অমন সুখে বাস করিতে পারে তাহা এই ভাবে না দেখিলে আমার প্রত্যয় হইত না। মানুষগুলা সজীব ও কষ্টসহিষ্ণু, প্রতিনিয়ত বিরূপ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া সব কিছু সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের আলস্য ও অবসাদ হইতে আসিয়া সে দৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর ঠেকিল। যে ডাব কাটিয়া আমাদের প্রাথমিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইল তাহা আকারে যেমন অতিকায় তাহার আভ্যন্তরীণ সলিল পরিমাণে তেমনি পর্যাপ্ত। সেই সর্বপ্রথম কাছিমের ডিম খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। যাহারা ছিন্নমূল হইয়া এই স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সর্বনাশা ক্ষতির পরিমাণ আমি অন্তত কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারি। তাহা অপূরণীয় এবং তাহার স্মৃতি হৃদয়বিদারক।

কিন্তু এই রম্য সজল বনভূমি হইতে সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মেস হইতে শ্যামবাজারে শ্বশুরালয়ে সুচিকিৎসার্থ নীত হইলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর ছয় বৎসর কাল যে পরিবেশের মধ্যে প্রধানত বাস করিতে-ছিলাম, তাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। অসার সংসারে একমাত্র সার শ্বশুরমন্দিরে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিদিশাশুড়ী ও শ্যালিকা-শ্যালক সম্প্রদায়ের (সংখ্যায় অনেকগুলি) সেবায় এমন একটা নূতন বাদশাহীর পরিচয় পাইলাম যেখান হইতে পুরাতন মেসে প্রত্যাবর্তন আর সহজ ছিল না। আমার মতিগতিই কেমন যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। পাস করিতে হইবে, পাস করিয়া অচিরাৎ উপার্জনক্ষম হওয়াও প্রয়োজন, অবিমিশ্র আরামের মধ্যে এই বোধটুকু খোঁচার মত জাগিয়া রহিল। এই কালে একটি মাত্র সৎকার্য করিয়া-ছিলাম তাহা সাহিত্য-বিষয়ক;—জর্জ সেণ্টস্‌বেরির সুবৃহৎ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসখানি বিশেষ যত্নে আয়ত্ত করিয়াছিলাম, বইখানি কোনও এম-এ পরীক্ষার্থী বন্ধুর কৃপায় সংগ্রহ হইয়াছিল। পরে ইহা অতিশয় কাজে লাগিয়াছিল।

ছয় নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেসে না ফিরিবার অজুহাত মনে মনে খুঁজিতেছিলাম, শেষ পর্যন্ত ফিরিতেই হইল—কিন্তু অল্পকালের জন্য। একাসনী (single seated) ঘর না হইলে পরীক্ষার পড়া করা সম্ভব নয় ইহাই অবিরত প্রচার করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত ২৭নং বাদুড়বাগান লেনের সাতমিশেলী মেসে (প্রধানত চাকুরিজীবীদের) তেতলার একটি সিঙ্গেল সীটেড ঘরে লটবহর লইয়া উপস্থিত হইলাম।—১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। তেতলায় নূতন সংযোজিত নয়খানি পাশাপাশি

সঙ্কীর্ণ একাসনী ঘর। ইহারই একটিতে কবি মোহিতলালের সাময়িক আশ্রম ছিল, আর একটিতে থাকিতেন বিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে যুগের সর্বোত্তম ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র রায়। কিছুকালের মধ্যেই তিনি সেখানেই নিজের ঠিকুজি বিচার করিতে করিতে পটাসিয়াম সায়ানাইড যোগে আপন বহুমূল্য জীবনকে প্রায় সূত্রপাতেই খণ্ডিত করিয়া বাংলা দেশেরও সমূহ ক্ষতি করেন। তাঁহার মত অসাধারণ প্রতিভার সংস্পর্শে আমি কমই আসিয়াছি। আমি এবং আমার স্কটিশচার্চ কলেজের সহপাঠী, তখন বিজ্ঞান কলেজের অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রির কৃতী ছাত্র যোগেন্দ্রমোহন সাহা উভয়ে এই বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত ভক্ত ছিলাম। এই আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুর পরে একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত আপার সার্কুলার রোডে হাত ধরাধরি করিয়া পায়চারি করিতে করিতে দুজনেই খুব কাঁদিয়াছিলাম, মনে আছে। যোগেন্দ্রমোহন শুগার টেক্‌নলজিতে পৃথিবীজোড়া নাম কিনিয়া অনেক নূতন আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করিয়া শ্রদ্ধেয়ের যথার্থ স্মৃতিতর্পণ করিতেছে, আমিও আত্মস্মৃতি মন্থনের অবকাশে সেই পথভ্রান্ত প্রতিভাধরকে স্মরণ করিয়া আজ ধন্য হইলাম।

সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেসটি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে একটি আদর্শ স্থান ছিল। ইহাকে সাহিত্যের প্রথম শিক্ষার্থীর "হেয়ার হিন্দু স্কুল" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোহিতলালের উল্লেখ করিয়াছি, তেতলার আর এক ঘরে থাকিতেন বেথুন কলেজের গণিতাধ্যাপক প্রসিদ্ধ পরেশচন্দ্র সেনের পুত্র শিক্ষাবিদ্ যতীশচন্দ্র সেন; তিনি নিজে সাহিত্যরসিক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঘরে সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের সমাগম হইত। এখানেই নিয়মিত আসিতেন কবি ও কবিরাজ জীবনময় রায় এবং ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের পুত্র অস্থির প্রতিভাবান লেখক যোগানন্দ দাস। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমৃদ্ধ আমার আশ্চর্য স্মৃতিভাণ্ডারের খবর কেমন করিয়া একদিন শেষোক্ত দুইজন পাইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানেই শেষ পর্যন্ত আমার বিজ্ঞানের কাল হইল।

আমি যে কবিতা লিখি সে খবরও তাঁহাদের অজ্ঞাত রহিল না। পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। স্বভাবত স্নেহশীল জীবনময় রায় অচিরাৎ আমার জীবনদা হইলেন। যোগানন্দ আত্মসমাহিত গম্ভীর পুরুষ, তাঁহার সহিত যথেষ্ট মাখামাখি হইল বটে কিন্তু "আপনি"র ব্যবধান আজিও ঘুচিল না। যদিও আমি তাঁহাকে সেই সময় হইতেই দাদা বলিয়া আসিতেছি। সেখানেই আর এক ঘরে ছিলেন অগিলভি হস্টেলে আমার সাহিত্যসাধনার উৎসাহদাতা, গোড়ায় কবিতা-গল্প এবং শেষে অর্থনৈতিক প্রবন্ধ-লেখক সুধানলিনীকান্ত দে, এখন নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সচিব সুধাকান্ত দে। তিনি আমার পূর্ব-পরিচিত, প্রথমে তাঁহার ঘরেই আড্ডা জমিত। পরে যতীশচন্দ্রের ঘরেও প্রবেশাধিকার পাইলাম, প্রধানত সাহিত্য বিষয়ক মজলিশ বসিতে লাগিল। নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়া যথাবিহিত পরীক্ষায় বসার সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইতে লাগিল।

আমি যে কবিতা লিখি এবং রবীন্দ্রনাথকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছি—এই সংবাদ অচিরকাল মধ্যে মোহিতলালের কর্ণগোচর হইল। তিনি আপনাতে আপনি মত্ত দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ, আমাকে ডাকিয়া আলাপ করিবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। অভিমানে আঘাত লাগিল। একটু দমিয়া গেলাম। কিন্তু হাল ছাড়িলাম না। সুকৌশলে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবেশ করিবার কালেও এই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরে সে কাহিনী বলিতেছি।

বস্তুত, মোহিতলাল সম্পর্কে তখন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানিতাম না। তিনি কবিতা লেখেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার ঘরে আগত ব্যক্তিদের সুললিত উচ্চকণ্ঠে তাহা পড়িয়া শোনান এইটুকুই জানা ছিল, বুঝিতে পারিতাম তাঁহারা ভক্তজন, কেহই সাহিত্যিক নহেন। সংবাদ পাইলাম কিছুদিন পূর্বে (১৯২২ ফেব্রুয়ারি) 'স্বপন-পসারী' নামক তাঁহার একখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে পাওয়া যায়। পাঁচ সিকা পয়সা কষ্টে যোগাড় করিয়া এক খণ্ড 'স্বপন-পসারী' সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। রাত্রে বইখানি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া "পুরূরবা" কবিতাটি বাছিয়া লইলাম। পরদিন অতি প্রত্যুষে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলাম।

কানে পৈতা তুলিয়া একটা নীল ডোরাকাটা লুঙ্গি পরিহিত নগ্নগাত্র কৃষ্ণকায় মোহিতলাল দাঁতন

মুখে এবং বদনা হাতে প্রত্যুষেই আমার দ্বার-আঙ্গিনা পার হইয়া যাইতেন। খুব যে সুদৃশ্য বোধ হইত তাহা নয়, তবু সহিয়া গিয়াছিল। শীতকালে একটা মোটা ঢিলাঢালা গেঞ্জী গায়ে চড়িত। সেদিন তাঁহার দরজায় তালা বন্ধ করিবার শব্দ কানে আসা মাত্রই আমি প্রস্তুত হইলাম। উচ্চৈঃস্বরে "পুরূরবা"-পাঠ শুরু হইল। সেই স্বল্প ব্যবধান পার হইতে হইতে মোহিতলাল সম্ভবত "পরিস্থিতি"টা ঠিক ঠাহর করিতে পারিলেন না, একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি যখন ফিরিলেন আমার পাঠ তখন জমিয়া উঠিয়াছে। তিনি সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বদনাটি বারান্দায় নামাইয়া রাখিলেন—আড়চোখে সকলই দেখিলাম, কিন্তু পড়া থামাইলাম না। মহাদেবের পরাজয় হইয়াছিল, মোহিতলালেরও পরাজয় ঘটিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া চৌকাঠের উপর বসিতে বসিতে বলিলেন, ও, "পুরূরবা" পড়ছেন বুঝি! আমি তখন "বালারুণ-রক্তরাগে অম্লায়মান্" বলিয়া পাঠ সাঙ্গ করিতেছি। বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, চমৎকার। বলিলেন, আপনার পড়া ভালই কিন্তু একটু দোষ আছে।—বলিয়া নিজেই বইখানা টানিয়া লইয়া দীর্ঘ কবিতাটি আদ্যন্ত পড়িয়া দিলেন, চৌকাঠ দখল করিয়া তিনি স্বয়ং বসিয়া আছেন, বাহিরে বারান্দায় ভিড় জমিয়া গেল। সাঙ্গ হইলে সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, আপনিও নাকি কবিতা লেখেন, শোনা যাবে একদিন। বলিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, শুনিলাম রবীন্দ্রনাথকে নাকি আপনি গুলে খেয়েছেন, এদিকে পড়েন তো এম-এস-সি! সামলান কি ক'রে?

সত্যই আর সামলাইতে পারিতেছিলাম না। এই মেসের পরিবেশ ছিল প্রধানত সাহিত্যিক; এক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র রায়, তিনিও অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন। তিনিও সাহিত্যরসিক ছিলেন, দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ে সরস প্রবন্ধও দুই-চারিটি লিখিয়াছিলেন কিন্তু মূলেই আমার বিজ্ঞানের "ঘর" নয় তো আমি কি করিব? যত দিন যাইতে লাগিল আরও অনিশ্চিতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলাম। এই "অনিশ্চিত" অবস্থার কথা তখনই একটি কবিতায় বিবৃত করিয়াছিলামঃ

"নানা পথের মাঝে ওগো কোন্‌টি আমার পথ,
আজো আমি ঠাহর নাহি পাই;
দিশাহারা হেথায় এসে—থাম্‌ল জীবন-রথ,
কোনোদিকেই কূলকিনারা নাই।
মনের মাঝে আঁকা আছে কাম্য ভুবনখানা,
সেথায় পাতি আসনখানি মোর,
সে দেশ কোথাও আছে কি না সঠিক নাহি জানা
তাই তো দ্বিধায় ভয়ে হই যে ভোর।
হারিয়ে দিশে নানান্ দিশে ব্যাকুল হ'য়ে ধাই
নানান্ বাধায় আসি আবার ফিরে,
অনিশ্চিতের মাঝখানে আজ সুনিশ্চিতে চাই;
কান্না জাগে বুকটি আমার চিরে।
দূরের বাঁশি শুনি কানে ডাকে মধুর সুরে,
পথের কিছু না পাই ঠিকানা যে,
অন্ধ আমি ঠুকছি মাথা গোলক-ধাঁধায় ঘুরে
দূরের বাঁশি মর্মে তবু বাজে।..."

ভগবান আমার সহায় হইলেন। ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ ও কঠিন ব্যাধিব্যপদেশে মাসিক বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে—এই সংবাদ বাবাকে জানাইয়াছিলাম। শেষ কয়েক মাসের বেতন কলেজে দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু পরীক্ষার মোটা ফীও দেয় হইয়াছে। একটি পোষ্টকার্ডের "পুনশ্চে" সবিনয়ে তাঁহার নিকট বাকি মাহিনা ও ফী অবিলম্বে প্রেরণ করার কথা নিবেদন করিলাম। আমাদের সংসারে তখন "ডায়ার্কি" চলিতেছে, পিতার নির্বূঢ় মালিকানা স্বত্বে সদ্য-উপার্জনশীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তাবলেপ পড়িয়াছে, বাবাও সুবিধামত রাশ ছাড়িয়া কিছু কিছু বোঝা বড়দার স্কন্ধে চাপাইতেছেন। দ্বন্দ্বও যে না বাধিতেছে তাহা নয়। বাবা অক্ষমতার অজুহাতে আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া বড়দার দরবারে বিষয়টি "রেফার" করিতে বলিলেন। বিরক্তির সঙ্গে তাহাই করিলাম। সেখান হইতে অবিলম্বে প্রার্থিত জবাব আসিল—আমার হাত খালি, পুনরায় বাবার শরণাপন্ন হও। আমার পরীক্ষা না-দেওয়ার মতলব হাশিল হইল। কপট ক্রোধে বাবাকে জানাইলাম, আমি পরীক্ষা দিব না এবং অতঃপর আমার মাসিক বরাদ্দ আমাকে পাঠানোর দায় হইতে আপনাকে অব্যাহতি দিলাম। নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করিয়া লইব। তিনি যেন ক্ষমা করেন। বাবা বা বড়দার নিকট হইতে নিয়মিত অর্থাগমের সেই শেষ। পরীক্ষার হাত হইতে এই ছলে বাঁচিতে গিয়া আমি স্বেচ্ছায় কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইলাম।

এরোপ্লেনে একক বিমানচারী ব্যক্তির পেট্রলের

তহবিল অকস্মাৎ শূন্যে ফুরাইয়া আসিলে তাহাকে বাধ্য হইয়া নিরুপায় ভাবে অবতরণ করিতে হয়—সেই অবস্থায় যেখানেই আসিয়া প্লেন ভূমি স্পর্শ করুক—তাহাকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেই হয়। আমারও পেট্রল ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সম্বল ছিল এম-এস-সির মূল্যবান বইগুলি। লক্ষ্য ছিল সাহিত্যসেবা ; কিন্তু কোথায় "বাধ্যতামূলক" অবতরণ ঘটিবে তাহা আন্দাজ করা কঠিন ছিল। কঠিন ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রথমেই একটা রূঢ় ধাক্কা খাইলাম, দেখিলাম এতদিনের আশ্রয়, প্লেনখানি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেছে—নিজে অক্ষত আছি। তাহারই ভগ্নাবশেষগুলি অর্থাৎ পাঠ্য বইগুলি বেচিয়া জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

এই অসহায় অনিশ্চিত অবস্থায় মনের মধ্যে কি বিপর্যয় ঘটিল জানি না, কলমের ডগায় ব্যঙ্গ কবিতার বাণ ডাকিল। কামস্কাটকীয় ছন্দ রচনার ছলে কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী"কে ব্যঙ্গ করিয়া একদিন "ব্যাঙ" লিখিয়া ফেলিলাম এবং প্রত্যহই একাধিক কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। আমার জীবনে এই রকমই ঘটে, পরে মায়ের কঠিন অসুখের কালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ব্যঙ্গগল্প "হসন্ত তরফদার" লিখিয়াছিলাম—অশোক চট্টোপাধ্যায় তাহার কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করিয়া ভাবকুমার কাঞ্জিলালের লেখা বলিয়া 'প্রবাসী'তে ছাপিয়াছিলেন। আমার বেনাম ছিল ভাবকুমার প্রধান, তাঁহার ছিল মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল—দুইয়ের সংযোগে ভাবকুমার কাঞ্জিলাল। আরও পরে যেদিন নিতান্ত সহায়সম্পদহীন বিপন্ন অবস্থায় 'প্রবাসী'র চাকুরিতে ইস্তফা দিই ঠিক সেই দিনই (১৯৩১, ৭ই অক্টোবর) 'শনিবারের চিঠি'র সদ্যস্থাপিত ছাপাখানার ভাঙা তক্তায় বসিয়া "বিবাহের চেয়ে বড়ো" নামক একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়াছিলাম।

একদিন প্রাতে আমার ঘরে বেশ ঘটা করিয়া বসিয়া দুই-চারিজন বন্ধুর নিকট কামস্কাটকীয় ছন্দ এবং বিশেষ জোর দিয়া "আমি ব্যাঙ" পাঠ করিতেছি, মোহিতলাল ধীরে ধীরে আমার দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই "পুরূরবা" পাঠের পর তাঁহার আর এই অধীনের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ হয় নাই—কবিতা শোনা তো দূরের কথা। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম তিনি তখন নজরুল ইসলামের প্রতি অপ্রসন্ন তাই বিদ্রোহের "প্যারডি" কানে প্রবেশ করিতেই আত্মবিস্মৃত ভাবে আমার ঘরে চলিয়া আসিয়াছেন। সমগ্র কবিতাটি আবার তাঁহাকে শুনাইতে হইল। তিনি আমাকে আশাতীত রূপ তারিফ করিলেন, এবং মেঝেয় পাতা শতরঞ্চিতে বসিয়া আমার অন্যান্য রচনাও শুনিতে চাহিলেন। সেই দিনই সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত পূর্বে উল্লিখিত "বকুলবনের পথে" তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই কবিতা আপনি এতদিন ফে'লে রেখেছেন, ছাপিয়ে দিন, ছাপিয়ে দিন। তাঁহার সেই আদেশের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে সেই কবিতা খণ্ডিত ভাবে এই বৎসরের শারদীয়া সংখ্যা 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

মোহিতলালের সার্টিফিকেট পাইয়া আমি অকূল পাথারের সমূহ বিপদের মধ্যে যেন কূল পাইলাম। ধীরে ধীরে আমার লক্ষ্য ও গম্যস্থল যেন নির্দিষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। আরও শুভ যোগাযোগ ঘটিতে বিলম্ব হইল না। এই সময় যোগানন্দ দাসের মুখে প্রায়ই একটি নূতন পত্রিকার আশু প্রকাশ সম্ভাবনার কথা শুনিতাম। বিলাত হইতে সদ্যপ্রত্যাবৃত্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল হইয়াছে—তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। উইট, হিউমার ও স্যাটায়ার রচনায় তাঁহার অসাধারণ স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল—পরে তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে তাহা বুঝিয়াছিলাম। এই বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি বাংলা দেশে আমি দেখি নাই। এ দেশের হাসিব্যঙ্গকারদের রুচি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নগামী, অশোক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শিক্ষিত মার্জিতরুচি রসিক, কাহাকেও "বিলো দি বেল্ট হিট" করিতে হইলে নিভৃতে একান্ত অন্তরঙ্গ মহলেই তাহা করিতেন। যাহা হউক, গুরুগম্ভীর 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় তাঁহার এই রস-রসিকতা চরিতার্থ হইবার উপায় ছিল না বলিয়া তিনি পত্রান্তর প্রকাশের সঙ্কল্প করিতেছিলেন। কারণও ঘটিয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রবর্তিত স্বরাজ্য দলের রাজনীতি চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করে নাই। 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" প্রবীণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তর্কশাস্ত্রসম্মত যুক্তি প্রয়োগে

যে চেষ্টা করিতেন, তরুণ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের তাহা মনঃপূত হইত না। সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র উদ্ভব অনিবার্য হইল।

পরে জানিয়াছিলাম, একদা সন্ধ্যার আবছায়া-অন্ধকারে হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া চানাচুর-চিনাবাদাম চিবাইতে চিবাইতে 'শনিবারের চিঠি'র নাম ও নীতি পরিকল্পিত হয়। অশোক চট্টোপাধ্যায়ই প্রধান, সঙ্গে ছিলেন যোগানন্দ দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধীরকুমার চৌধুরী ও বর্তমানে প্রাদেশিক সিভিল সার্বিসের প্রভাকর দাস। আমি তখন সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেন মেসের সঙ্কীর্ণ কোটরে ক্ষুৎপিপাসাতুর অসহায় অবস্থায় চিঁহি চিঁহি করিতেছি, পাখায় জোর পাইলে কোন্ গগনে উড্ডীন হইব তাহাও নিজে জানি না।

ব্যঙ্গরচনায় হাত পাকাইতেছিলাম, সুতরাং একটি ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশিত হইবে জানিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম, কে বা কাহারা তাহা প্রকাশ করিবে তাহা জানা আমার পক্ষে অনাবশ্যক ছিল। যোগানন্দ দাস আসিতেন যাইতেন, আমি বাপের বাড়ির দেশের কোন লোক শ্বশুরবাড়িতে বেড়াইতে আসিলে সদ্য-বিবাহিতা বধূ বাপের বাড়ির খবর শুনিবার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, সেই ব্যাকুলতা লইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতাম। আমার মনের বিরহকাতর অবস্থা যোগানন্দদা বুঝিতেন না, কাটা কাটা কঠিন জবাব দিয়া তিনি আমাকে নিরস্ত ও নিরাশ করিতেন। তাঁহার ভাবখানা সর্বদাই এইরূপ ছিল, সে-সব অতি গোপনীয় গুহ্য কথা, তুমি বিজ্ঞানের আদার ব্যাপারী, সাহিত্যের জাহাজের খবরে তোমার প্রয়োজন কি? তাঁহার নিকট হইতে কোনদিন কোন কথাই আদায় করিতে পারি নাই—এই ক্ষোভ আমার এখনও যায় নাই।

কিন্তু স্নেহাশ্রয় বিস্তার করিয়া আপন তপ্ত পক্ষপুটে আমাকে আশ্রয় দিলেন জীবনময় রায়। তিনি সর্বপ্রকারে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়াই ছিলেন। আমার মাসিক অর্থাগমে ছেদ ঘটিয়াছে সে সংবাদ তিনি জানিতেন, এম-এস-সির পাঠ্যপুস্তক দামে ও ওজনে ভারী হইলেও পরিমাণে অফুরন্ত নয়; সুতরাং আমার কূপোদক ধীরে ধীরে কাদায় আসিয়া ঠেকিতেছিল, দৈনিক জীবনযাত্রা ক্রমশ ঘোলাটে হইয়া আসিতেছিল।

একটি প্রশ্ন স্বতই বুদ্ধিমান পাঠকের মনে জাগিবে এখানেই যাহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন। এই নিদারুণ অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্যে কলিকাতাবাসী শ্বশুর মহাশয়ের গৃহে আমি আশ্রয় লইলাম না কেন? সত্য বটে তিনি কলিকাতাতেই স্থায়িভাবে সপরিবারে বসবাস করিতেছিলেন, এবং একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীও ছিলেন। তাঁহার ঘাড়ের উপর একবার চাপিতে পারিলে তাঁহার দ্বারাই আমার তদানীন্তন ও ভবিষ্যৎ আর্থিক যাবতীয় বেদনার উপশম অচিরাৎ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। আদি লর্ড সিংহের সহিত সম্পর্কের দরুন কলিকাতার প্রতিষ্ঠাপন্ন মহলে তাঁহার প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু আমার অভিমানে বাধিল। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, একান্ত আত্মনির্ভরশীল ও সক্ষম না হইয়া স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য শ্বশুরবাড়িমুখো হইব না। অনুরোধ-উপরোধ সবিনয়ে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। আজ নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, সেদিন উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই জামাই-বারিকের আস্তাবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার অকালমৃত্যু ঘটে নাই। ভগবান আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

আমি তখনও মেসে খাই দাই এবং আড্ডা দিয়া বেড়াই, আমার চাকুরির খোঁজে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান স্নেহময় জীবনময়; এই সময়ে মোহিতলালের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিলাম। আমার খাতাখানি যতই ব্যঙ্গ-কবিতায় বোঝাই হইতে লাগিল, তিনিও ততই খাতা-বগলে আমাকে লইয়া পরিচিত মহলে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমটা গিয়া আমার পরিচয়-পর্বটা শেষ করিলেই আমি দম দেওয়া ঘড়ির মতন বাজিতে থাকিতাম—কাজী নজরুলের প্যারডিটাই বেশি বাজাইতে হইত। একদিন মেসের তেতলার বারান্দাতেই তিনি একটি গানের মজলিসের আয়োজন করিলেন, হাস্যরসিক নলিনীকান্ত সরকার হাসির গান গাহিবেন চন্দ্রগ্রহণের দিন কবিরাজ জীবনকালী রায়ের ঘরে তাঁহাকে তবলা বাজাইতে দেখিয়াছিলাম, তিনি যে স্বয়ং গান গাহিতে পারেন আবার হাসির গান রচনা করিতেও পারেন তাহা দেখিয়া ও জানিয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। তাঁহার সহিত সহজেই পরিচয় ঘটিল এবং সে পরিচয় কখনও একদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অথচ আমরা দুই জনেই

পরস্পারের নাকের কাছে বহুবার আগুন লইয়া মহরম খেলিয়াছি। ইহার কারণ, এমন বন্ধুবৎসল অথচ নির্বিরোধী মানুষ কদাচিৎ মেলে। নজরুল এবং দিলীপকুমার উভয়েই তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, অথচ আমি এই দুই জনকেই কম আঘাত হানি নাই। ইহাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নাই ইহার কারণ, নলিনীদা গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলেন আমার ব্যঙ্গ কখনই ঈর্ষা (malice) প্রণোদিত ছিল না। সাহিত্য-সংস্কারে আঘাত লাগিলে লেখার দ্বারাই যথাসাধ্য আঘাত করিতাম, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনও দিনই সেই বিবাদকে টানিয়া আনি নাই।

সেই হাসির গানের আসরেই আমার বন্ধু ও সহকর্মী সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বয়সে আমার অপেক্ষা চার-পাঁচ বছরের ছোট হইলেও তখনই লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া সওদাগরী আপিসে কেরানিগিরি করিতেন। মোহিতলালের প্রত্যক্ষ ছাত্র না হইলেও ছাত্রের বন্ধু হিসাবে তিনি মোহিতলালকে গুরুর মত সমীহ ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন এবং তাঁহার প্রতি ছাত্রের মত সস্নেহ ও সকর্তৃত্ব ব্যবহার করিতে করিতে মোহিতলালও ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি ছাত্র নন। সুবলচন্দ্র স্কুলজীবন হইতেই সাহিত্যিক-ঘেঁষা ছিলেন, প্রসব না করিয়াই গোপালের মা হইয়াছিলেন। তাঁহার এঁচোড়পক্কতার (অবশ্য সাহিত্য ব্যাপারে), বহু কাহিনী পাঁচজনকে শুনাইবার মত। নিতান্ত কাঁচা বয়সেই দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার সাহিত্যসঙ্গী ছিলেন, আমার সঙ্গে পরিচয়ের সময় তিনি মোহিতলালকে নিত্য সঙ্গদান করিতেছিলেন। মজলিশে পাঁচজনকে "এণ্টারটেন" করিবার মত বিবিধ গুণ তাঁহাতে ছিল, ভাল ম্যাজিক দেখাইতে পারিতেন, মিমিক্রি বা কণ্ঠানুকৃতিতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা যে গুণের জন্য তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য-সমাজে পরিচিত হইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়া শেষ পর্যন্ত একজন প্রবীণ ঔপন্যাসিকের বৈবাহিক পদে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহা হইতেছে তাঁহার নিরলস অকুণ্ঠ সেবা ও সাহচর্যের ক্ষমতা। আমাদের সুবলচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্ধের নড়ি হইয়া পড়াতে অনেকের হিংসা উদ্রিক্ত হইয়াছে।

জীবনদার কৃপায় সর্বপ্রথম শ্যামবাজারে একটি ট্যুইশানি জুটিল, মাসিক বেতন কুড়ি টাকা, ছাত্রটি আই-এস-সি পড়ে। তিন মাস যাইতে না যাইতে জীবনদা ঝামাপুকুরে আরও একজোড়া ছাত্র জুটাইয়া দিলেন, ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার্থী, বেতন একুনে পঁচিশ। পঁয়তাল্লিশ টাকায় রাজার হালে চলিবার কথা, কারণ তখনও সিগারেট ধরি নাই। কিন্তু জীবনদা চেষ্টা করিলে কি হইবে? ভাগ্য মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। তিন মাস পরে একদিন শ্যামবাজারের ছাত্রটির পিতা দোতলার বারান্দায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া নীচে দণ্ডায়মান আমাকে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ম্যাষ্টার, ছেলে কেমন পড়ছে? পরে জানিয়াছিলাম ভদ্রলোক আমাকে অপমান করিবার জন্য প্রশ্ন করেন নাই, তাঁহার ওইসাই বদন, কিন্তু আমার চট করিয়া রাগ হইয়া গেল। তর তর করিয়া সিঁড়ি বহিয়া তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে অভদ্র অসভ্য প্রভৃতি গালাগালি দিয়া তেমনই দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম। আর পড়াইতে গেলাম না। অর্থাৎ আমার আয়ের পারা চট্ করিয়া পঁয়তাল্লিশ হইতে পঁচিশে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবনদা একবার মাথা চুলকাইলেন, একটু বকিলেন এবং শেষ পর্যন্ত 'কুছ পরোয়া নাই' বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিলেন।

ঠিক এই সময়ে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই শনিবার ১০ই শ্রাবণ ১৩৩১ সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। সম্পাদক ও মুদ্রাকর—যোগানন্দ দাস। ৯১নং আপার সার্কুলার রোড প্রবাসী প্রেসে মুদ্রিত এবং ১০৫নং আপার সার্কুলার রোড—ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের ঠিকানা হইতে প্রকাশিত।

উত্তর

১। কলিকাতা মহামেডান কলেজ বা কলিকাতা মাদ্রাসা।
২। রুশ দেশের ক্যাথারিন্; ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ; সুইডেনের রাণী খৃশ্চিনা; ইংলণ্ডের রাণী বেশ্।
৩। উইলিয়াম সেক্সপিয়র।
৪। সাড়ে চার ঘণ্টা।
৫। পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে।
৬। স্যর চার্ল'স উইলকিন্স (১৭৪৯(?)—১৮৩৮)।
৭। হ্যাঁ। স্যর যদুনাথ সরকারের বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলনের বক্তৃতায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়।
৮। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।
৯। ডাঃ জনসন।
১০। হরিনাথ দে।

আকাশ-পাতাল

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কালো মসলিনের শাড়ী হ'লে কি হবে অঙ্গে অঙ্গে যেন বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

দামী-দামী জড়োয়া গয়না কাঁটার মত বিঁধছে যেন যেখানে-সেখানে। মুকুটের জন্যই কি না কে জানে, কপালের দুই তীর টিপ-টিপ করছে কতক্ষণ ধ'রে? যতক্ষণ শুনেছে ঐ দীর্ঘাঙ্গী বৌটির মুখে দু'টি মাত্র কথা, মুসলমান বাইজী। পায়ের তলায় ভূমি যেন কাঁপছে। চোখে ঝাপসা দেখছে রাজেশ্বরী। বুকের ঠিক মধ্যিখানে দুরু-দুরু করছে। উৎসবে গিয়ে কোথায় খুশী মনে ফিরে আসবে, রাজেশ্বরী ফিরলো ভগ্ন-হৃদয়ে। সকল আশা আর আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে। কখনও স্তব্ধ হয়ে যায় হতাশায়, কখনও ইচ্ছা হয় ডাক ছেড়ে কাঁদে, কখনও মনে হয় একটা তীক্ষ্ণধার ছোরা জোগাড় ক'রে সকলের অলক্ষ্যে গিয়ে ধীরে-ধীরে বসিয়ে দেয় বুকে। খেতে ব'সে কিছু কি মুখে তুলেছে রাজেশ্বরী! কিছু কি দাঁতে কেটেছে! পঙক্তি ভোজনে ব'সে উঠে পড়তে পারেনি অসামাজিকতা হওয়ার লজ্জায়, নয়তো কখন উঠে প'ড়তো রাজেশ্বরী। ব'সেই উঠে প'ড়তো। নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে, যারা আদর আপ্যায়িত করলে না. বরং কুকথা বর্ষালে কানে, টিটকারী দিলে, চিপটেন কাটলে, তাদের দেওয়া খাদ্য কখনও মুখে তোলা যায়! খেতে ব'সে কান দুটো আগুনে ঝলসে উঠছিল যেন। ঘামছিল রাজেশ্বরী। ভেতরের জামাটা বোধ হয় ভিজে গেছে ঘামে। বাড়ী ফিরে কোথায় বেশভূষা ছেড়ে স্বস্তি পাবে ক্ষণেকের জন্য, পূর্ণশশী হাজির হয়েছেন কাঁদতে-কাঁদতে!

খাস-মহলে অর্থাৎ রাজেশ্বরীর ঘরে পৌছতে পূর্ণশশী চোখের জল আঁচলে মুছে বললেন,—পোষাক-আষাক, গয়না-টয়না ছাড়ো আগে তুমি। বিশ্রাম নাও। ধীরে-সুস্থে কথা হবে। আমাকে কিন্তু ভাই রক্ষা করতে হবে বিপদ থেকে!

রাজেশ্বরী বললে,—অপেক্ষা করুন। ঝিয়েদের ডাকি, গয়নাগুলো খুলে দেবে! কিন্তু কি হয়েছে কি বলুন তো?

পূর্ণশশী ফুঁপিয়ে উঠলেন মুহূর্তের জন্য। বললেন,—বললাম তো, ধীরে-সুস্থে বলবো। এসো আমিই খুলে দিই গয়নাগুলো।

লজ্জা বোধ করে যেন রাজেশ্বরী। বলে,—আসুক না ঝিয়েরা। আমি ওদের ডাকছি। আজকে থাকবেন আমার কাছে? রাত বেশ হয়েছে, নাই বা গেলেন দিদি!

পূর্ণশশী বললেন,—উপায় তো নেই ভাই। ঘরে ছেলে-মেয়ে দুটো আছে। তাদের খাইয়ে এলে থাকতাম। তুমি এসো দেখি, গয়নাগুলো একে-একে খুলে দিই। রাখবে কোথায়? বাক্স-টাক্স যা হয় কিছু না হ'লে—

রাজেশ্বরীর কোমরে ঝুলছিল একটা রুমাল। বাঙলার রেশমের রঙীন আর বিচিত্র। বললে,—আপাতত এই রুমালটায় বেঁধে রাখি। কাল তুলবো গয়নার বাক্সে।

মুহূর্ত কয়েক ভেবে বললেন পূর্ণশশী,—না বৌ, তুমি গয়নার বাক্সতেই রাখো। রুমালে বেঁধে রাখলে ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় আছে। মুকুট-টুকুট কি রুমালে বেঁধে রাখা যায়!

সত্যি কথা বলেছেন পূর্ণশশী।

রাজেশ্বরী গত্যন্তর না দেখে দেরাজ খুলতে উদ্যোগী হয়। বলে,—চাবি তো দিদি নেই এখানে। আছে এলোকেশীর কাছে। এলোই তোলাপাড়া ক'রেছে গয়নার বাক্স। অপেক্ষা করুন, আমি ডাকি এলোকেশীকে। সামান্য দেরী হ'লে ক্ষতি হবে না তো আপনার?

পূর্ণশশী জানলার বাইরে আকাশে চোখ রেখে বললেন,—তবে ভাই খুব বেশী দেরী হ'লে ছেলে-মেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়বে। এমন অভ্যেস হয়েছে যে, ঘুমিয়ে পড়লে কার বাপের সাধ্যি যে তোলে! ঘুম ভাঙ্গায়!

—না না, বেশী দেরী হবে না। আমি ডাকছি ওদের। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রাজেশ্বরী। ঘরের সমুখের দালান থেকে ডাকে,—এলো, ও এলো! কমনে গেলে বল' তো? আমি এলাম আর দেখা নেই তোমার?

কোথা থেকে সাড়া দেয় এলোকেশী। গলা ছেড়ে বলে,—যাই লো যাই। জানবো কেমনে যে এসে গেছো তুমি! যাবো আর কোথায় বল'? যম দয়া না করলে যাওয়ার জায়গা কোথায়?

এলোকেশী কিয়ৎক্ষণের মধ্যে গজরাতে গরজাতে এসে দেখা দেয়। ঘুম-ঘুম চোখে। আসে হাঁফাতে-হাঁফাতে।

রাজেশ্বরী তাকে দেখেই জ্বলে ওঠে যেন। বলে,—খুব কথা হয়েছে দেখছি! যাও না বিদেয় হয়ে। কে তোমাকে থাকতে বলেছে? থেকে তো আমাকে উদ্ধার ক'রে দিচ্ছো!

—আগ করছিস কেন তুই? ডাকতেই তো হাজিরা দিয়েছি। এলোকেশী কথা বলে কেমন যেন বিষাদের সুরে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে! শহরে থাকলে কি হবে এলোকেশীর আকৃতি এবং প্রকৃতি যেমন গ্রাম্য ছিল তেমনিই আছে। রাজেশ্বরীর কথায় কখনও এলোকেশী পায়নি ক্রোধের আভাষ। মেয়ের কথা শুনে এলোকেশী বেশ বিস্মিত হয়!

[১৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তপ্রসঙ্গ

(মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর অপ্রকাশিত 'ডায়েরী' অবলম্বনে)

অনিল গুপ্ত

১

আজ শনিবার ২০শে মার্চ্চ ১৮৮৬ খৃঃ। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও মহাপ্রভুর জন্মদিন। ভক্তগণ অনেকেই আসিয়াছেন। ঠাকুরের অসুখ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। ভক্তদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবার কোনই ত্রুটি নাই। গিরিশ, মাষ্টার ও দেবেন্দ্র কাশীপুর উদ্যানবাটীর উপরের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর নরেন্দ্র ও রাখালের সহিত কথা কহিতেছেন। আনন্দময় ও সহাস্যবদন। এত অসুখ কত কষ্ট কিন্তু তাঁর কোনই ভ্রুক্ষেপ নাই। ভক্তদের কতই ভুলাইয়া রাখিয়াছেন ও তাহাদের সঙ্গে কত আনন্দ করিতেছেন। গিরিশ, মাষ্টার ও দেবেন্দ্র ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিলেন ও তাঁর শ্রীচরণে আবির দিলেন। ভক্তবৎসল ঠাকুরও কৃপা করিয়া তাহাদের বুকে ও মাথায় আবির দিলেন। ঠাকুরের আজ আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটি গান গাহিতে বলিলেন।

নরেন্দ্র গাহিলেন—

কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে।
রাধা নাম বেড়াই সেধে।

নরেন্দ্র গানটি মত্তগজ ছন্দে গাহিলেন এবং অনুরাগের দোলায় গজগতিতে, সকলের হৃদয় দোলাইয়া আকাশে বাতাসে মিশিয়া গেল।

ঠাকুর গানটির প্রথম দুই ছত্র বলিতে বলিতে ভাবস্থ হইলেন। চক্ষু নিমেষহীন, দেহ স্থির। একি! ঠাকুর কি শ্রীকৃষ্ণের ভাবে লীন হইলেন!

ঠাকুরের এই দৈবভাবাবস্থা দেখিতে দেখিতে মাষ্টারের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত ও সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইল। বার বার চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলে রাম বাবুর স্ত্রী আসিয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আবির দিলেন ও প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

গিরিশ ও নরেন্দ্র মাষ্টারকে আবির দিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলেন।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—মাষ্টারকে ফেলে ভাল করে আবির লাগিয়ে দাও।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর থাক থাক, অনেক দিন পরে এসেছে।

মাষ্টার এই সময় পালাবার উপক্রম করিলে গিরিশ তাঁহার গায় ও মুখে ভাল ভাবে ফাগ লাগাইয়া দিলেন। পরে গিরিশ, নরেন্দ্র, রাখাল ও দেবেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন।

ঠাকুর পুনঃ পুনঃ মাষ্টারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বালকের ন্যায় হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন ও হঠাৎ উঠিয়া মাষ্টারের মুখ মুছাইয়া দিয়া পুনরায় নিজাসনে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় যন্ত্রণা···দেখ, আবার ভাবি কারুর তো কিছু অনিষ্ট করি নাই। এই মুখে ছোট বেলা থেকে কত এলাচ, লবঙ্গ খেলুম, কত লোকে কত আদর-যত্ন করলো, কত ভালবাসলো। আবার কত ঈশ্বরীয় নাম হলো, আর এখন দেখ এই পুঁজ-রক্ত আর এই যন্ত্রণা! আবার মাকে বলি, "মা! তোমাকে অনেক মুখ খারাপ করে বলিছি বলেই কি এই শাস্তি! কিন্তু মা, সেও তো তুমিই করিয়েছ, "আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী"!

এই বলিতে বলিতে ঠাকুর গান ধরিলেন—

"জোয়ারের জলে উজিয়ে যাব।
ভাসিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।"

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার বলিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় যন্ত্রণা আর শরীর রাখতে ইচ্ছা নাই। আর দেখ, কিছু খেতে পারছি না।

মাষ্টার মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যিনি ভক্তসঙ্গে এত আনন্দ ও আত্মভোলা বালকের ন্যায় হো-হো করিয়া হাসিতেছিলেন, এ কি সকলকে দেখাইবার জন্য ছল মাত্র! একেই বলে বুঝি লীলা! "কে বুঝিবে লীলা তব।"

মাষ্টার—এত যন্ত্রণাটা যাতে না হয়, আপনি ইচ্ছা করলে তো সবই পারেন। গিরিশ বাবু বল্লেন—

"আপনি যে রোগ দেখাচ্ছেন তা কি আমি (গিরিশ) বুঝতে পারি না, আপনি ইচ্ছা করলেই এ রোগ থেকে মুক্ত হতে পারেন। আপনি ভুলালে আমি (গিরিশ) ভুলি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—মনে করলে পারি কিন্তু আর ইচ্ছা নাই। তবে তোমাদের দেখে বড় আহ্লাদ হয় তাই এখনও এত কষ্টভোগ। মাঝে বেশ কমে এসেছিল কিন্তু সব অবতার অবতার করে বাড়িয়ে দিলে। জান তো, ছদ্মবেশী রাজাকে রাজা রাজা করলে সে রাজা হয় আর পালিয়ে যায়। আর দেহত্যাগ কেন? সরল উদার পাছে সবাইকে উদ্ধার করে।

মাষ্টার—হাঁ, তাহলে সংসার ছেড়ে দিয়ে সব আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ ছো না, সব ছেড়ে-ছেড়ে আসছে।

মাষ্টার—তা নয়। ওরা তো এসেছে। আর সবাই যদি সংসার ছাড়ে তবে এ খেলা হয় কই? আপনি এক দিন বলেছিলেন, "সবাই যদি বুড়ি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা আর চলে না আর বুড়িও রাগ করে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছ। তোমাদের কোন ভয় নাই, খুব আনন্দ হবে। একপুরুষ খুব জোরে কাটবে—যেমন বাপ মোলে তার ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, সেই রকম।

মাষ্টার—সব্বাইয়ের বড় কষ্ট হবে। কি নিয়ে থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও তো একবার হবেই।

মাষ্টার—কেন? কেউ কেউ আগে যেতে পারে। যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা অপ্রকট হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার বিরহ সহ্য করতে না পেরে তার পার্ষদগণের মধ্যে স্বরূপদামোদর অত্যল্প কাল পরে ও গদাধর পণ্ডিত তীব্র বিরহানলে মুহ্যমান হয়ে ৫।৭ দিনের মধ্যে মায়ার জগৎ পরিত্যাগ করে লীলার জগতে প্রবেশ কল্লেন। সেই-ই তো অপ্রাপঞ্চ ধাম যেখানে ঈশ্বর নিত্য বিরাজমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—তোমায় তো বলেছি। অপ্রকট হবার সময় এসেছে। তোমাদের কোন ভয় নাই। একপুরুষ খুব জোরে কাটবে। তোমাদের কাজ শেষ না হ'লে তো নয়।

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ঠাকুর কি সকলের জন্ম নির্দ্ধারিত কাজ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন তাই আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিতেছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—সবাই কি টের (অবতার) পেয়েছে।

মাষ্টার—অনেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে, কে?

মাষ্টার—গিরিশ, নরেন্দ্র, নৃত্য, দেবেন্দ্র প্রভৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নৃত্য কি বলে?

মাষ্টার—একটা লীলা হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্র প্রভৃতি কি বলে? পূর্ণ না অংশ?

মাষ্টার—পূর্ণ! নরেন্দ্র আপনাকে সেদিন বলেছিল, "আপনার ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা সব এখানকারই অংশ।

মাষ্টার—তা বুঝেছি কিন্তু এখনও তৃপ্তি হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তৃপ্তি কখনও হবে না। জড় পদার্থে তৃপ্তি আসে। আত্মার রামত্ব অতৃপ্ত।

মাষ্টার—প্রথম দিনে যা ছিল মনের অবস্থা ও আগ্রহ আজও তাই কিছুই তৃপ্তি হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরে তৃপ্তি হয় না। যেমন মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য দান করে কখনও তৃপ্তি পান না আর শ্রীকৃষ্ণের মা যশোদার স্তন্য পান করেও স্তন্যপান পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। মা যশোদার স্তন্যদান ও শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যপান অসীম। উভয়ের এই স্তন্যদান ও স্তন্যপান আজও অতৃপ্ত রয়েছে। মা যশোদার স্তন্য জড় পদার্থ নয়। তার পরিপূর্ণ বাৎসল্য প্রেমের ভিন্ন প্রকাশ, কাজেই চিৎ পদার্থ। চিৎ পদার্থে তৃপ্তি কখনও আসে না। এই অতৃপ্তিই চিৎ পদার্থের তৃপ্তি।

তোমায় আর এক কথা বলি শোন—নরেন্দ্রের মা আছে, সব ছেড়ে এসেছে এটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ*, এ কথা তুমি নরেন্দ্রকে কখনও বলবে না। তুমি জানবে, নরেন্দ্র আমার মাথার শিরোমণি, সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক জন, ওর কথা আলাদা। ও নিজেকে জানবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছে, ও যে কে তা জানতে পারলে আর দেহ রাখবে না। অতএব জানবে, ওর ভিতর কিছু আছে। আজ তোমায় এ-সব খুব গুপ্ত কথা বললাম, তুমি ওদের বোলো না।

ঠাকুরের খাইবার জন্য কিঞ্চিৎ সুজির পায়স আনা হইলে মাষ্টারকে বলিলেন, "আর কেন, খেয়ে কি হবে? কিছুই হজম হচ্ছে না।"

কথাগুলি এমন করুণ ভাবে বলিলেন, কাহার না হৃদয় বিগলিত হয়!

মাষ্টার ঠাকুরের করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি শুনিয়া ব্যথিত হৃদয়ে আসন্ন বিপদের কথা ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে কাঁদিয়া উঠিলেন, "কি নিয়ে থাকব প্রাণবল্লভ!" নিমেষহীন নয়নে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে)—তুমি অত কাতর হয়ো না আর অত ভেবো না, মনে বল করো।

২

আজ ৬ই এপ্রিল ১৮৮৬ খৃঃ। মাষ্টার বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে আসিয়াছেন। বৈকাল চার ঘটিকায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিলেন। এখানে আসিয়া প্রথমে বেলতলায় ধ্যান ও পঞ্চবটী প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে বসিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ও বহু স্মৃতি-বিজড়িত ঘরে ধ্যানে বসিলেন।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় মাষ্টার দ্বাদশ শিবমন্দির ও রাধাশ্যামের মন্দিরে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রী৺ভবতারিণীর মন্দিরে আরতি দেখিলেন। ঠাকুরের অসুখ বৃদ্ধির জন্য মাষ্টার বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে আজ আসিয়াছেন মায়ের নিকট প্রাণের ব্যথিত প্রার্থনা জানাতে, "মা তোমার ছেলের জন্য আমি আর কি বলবো, তুমি তো সবই জান মা! মা! তুমি আর অত যন্ত্রণা দিও না!"

মাষ্টার দক্ষিণেশ্বর হইতে কাশীপুরে আসিলেন, সঙ্গে আনিয়াছেন ঠাকুরের জন্য মায়ের প্রসাদ। মাষ্টার দ্বিতলের হল-ঘরে আসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া মেঝেতে বসিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে নিকটে মাদুরের উপর বসিতে অনুজ্ঞা করিলেন। মাষ্টার ঠাকুরকে মায়ের প্রসাদ দিলেন। ভক্তবৎসল ঠাকুর আনীত প্রসাদ চক্ষে, বুকে ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন ও মাষ্টারকে অন্যত্র রাখিবার জন্য দিলেন ও বলিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—এত দিন আস নাই কেন?

মাষ্টার—একটু অসুখ ছিল। আর (ইতস্তত করিতে করিতে) বাড়ীতে একটু অশান্তি ও গোলমাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কে?

মাষ্টার—পরিবার আবার মাঝে-মাঝে ক্ষেপ ছেন। আফিম-বটিকা নিয়ে বড়ই হাঙ্গামা করছেন। বড় অশান্তি, ছেলেদের দিকে মন নাই। যদি ছেলেদের দিকে একটু মন হয় ও শান্ত ভাব আসে, আমি নিশ্চিন্ত হই। এখানে এলে বেশ ভাল থাকে। আবার বলে, আপনাকে মাঝে-মাঝে সম্মুখে দেখে। সেদিন বড় দুঃখ করে বলছিল, বলরাম বাবুর স্ত্রীর উপর কৃপা হয়েছে, আমার উপর হয় নাই। বড় ভাবিত হয়ে বললে, 'শান্তি নাই, শান্তি নাই।' আমি এখানে না এলে রাগ, আবার সেখানে না গেলেও রাগ। সেদিন আপনার অসুখ খুব বেড়েছে স্বপন দেখে কান্না, 'ওগো, তোমার কাছে গিয়ে যে আমার সব যন্ত্রণা গিয়েছিল*।' আর ঐ গানটি সর্ব্বদাই বলেন—

কোথা আছ গো শঙ্করী,
পড়ে ঘোর দায়, ডাকি গো তোমায়,
বন্ধন জ্বালায় প্রাণেতে মরি।

বাইয়ের ঝোঁকও খুব। কখনও খুব ভাল আবার কখন গোলমাল।

---

* Diaryর ধারে শ্রীম'র কর্ত্তব্য-পালনের note আছে—"I have come to fulfil, not to destroy.

* মাষ্টারের পুত্রের কাল হওয়ায় নিকুঞ্জ দেবী উন্মাদিনী প্রায় হইয়াছিলেন। এই সময় ঠাকুর তাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া শান্ত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চৈত্র মাসে ঢাক বেজে উঠলে যেখানে যে পাগল আছে ক্ষেপে উঠে। তোমার স্ত্রী খুব ভাল, তার ভিতর-বার এক। কেমন ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। উহুঁ! পুত্রশোক ঠেলে দেয়।

মাষ্টার—আত্মহত্যার কথায় বলে, ল্যাঙটাও তো গিছলো। এখানকার কথা সব শোনা হয় তবে আমার বাধ্য নয়, আপন মনে যা ইচ্ছা তাই করেন। গত কাল রামরসায়ন শুনতে নিয়ে গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ! এখানে পাঠিয়ে দিও, কিছু দিন থাকবে।

মাষ্টার—বলি কিছু দিন গিয়ে কাশীপুরে থাকো, ছেলেদের আমরা লোক-জন রেখে এক মাস সামলাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলে?

মাষ্টার—ইচ্ছা হয়, তবে কোলে ছোট ছেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খাবে এসে।

মাষ্টার—আমি···

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, সে ও তুমি।

মাষ্টার—কাল আসবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন ও মাষ্টারকে পাখা করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যন্ত্রণা উপশম হইলে ঠাকুর আবার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—গুরু শরীর রক্ষার কবচ দিলেন তা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম বলেই বা এই যন্ত্রণা। অত ঘৃণা করা কি ভাল?

মাষ্টার—আপনার খুব কষ্ট কিন্তু অনেকের খুব উপকার হলো, সংসার-যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা-বোধ নাই। আপনার এক-এক দিন রাতে কি যন্ত্রণাই গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার ভাবি সব তিনিই।

মাষ্টার—আপনি বলেছিলেন এর ভিতর দুটি, প্রথম ভক্ত ও দ্বিতীয় যন্ত্রী হয়ে পিছনে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেমন আরসী ও সূর্য্য। আচ্ছা আরসীতে প্রতিবিম্ব এটি কি?

মাষ্টার—এটি ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের গায়ে চাপড় মারিয়া)—হাঁ, ঠিক। আর আরসী ভাঙ্গলে?

মাষ্টার—যা আছে তাই-ই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঐগুলি ধারণা চাই। আচ্ছা আর রোগ?

মাষ্টার—যেখানে মানুষ রূপ সেইখানেই এক-এক প্রকার কষ্ট। আপনি বলেছিলেন, 'দেহের অসুখ, তা হবে পঞ্চভূতের দেহ।' কলিকালে এত কষ্ট, লোকেরা ভয় পায়। মা'র মূর্ত্তি বাহ্যতঃ ভয়ঙ্করী, কিন্তু ভক্ত জানে তিনি আদ্যাশক্তি। কলির জীবকে ভরষা দিবার জন্যই পরব্রহ্মের এই মূর্ত্তিতে আবির্ভাব। তাঁর শরণাগত জীবের প্রতি অসুরগণের অত্যাচারের প্রতিকার করিতে গিয়া মা ক্ষেপিয়া যান। বিশ্বের সৃষ্টি পাছে লোপ পায় তাই ভয়ার্ত্ত জীবকে জানাইতেছেন, আমি পরব্রহ্ম আদ্যাশক্তি, আমি আছি তোমাদের পিছনে, তোমাদের ভয় কি?

'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' সূক্ষ্ম বিচারে বোঝা যায়, একটা ভয়ঙ্কর শত্রুকে তাড়াইতে হইলে আর একটা তদপেক্ষা ভয়ঙ্করের প্রয়োজন, তাই মা অভয়া হইয়াও ভীষণা, এ ভীষণত্ব অভক্তের চক্ষে প্রতিভাত হয়, ভক্তের চক্ষে নয়। সাধক রামপ্রসাদের গানে আছে—

আঁধারে মা ভয় করি না।
আঁধার আমার লাগে ভাল॥
আঁধার দেখে মনে পড়ে।
শ্যামা মা মোর এমনি কাল॥

বাঘিনী অপর সকলের কাছে ভীষণা বটে কিন্তু নিজ শাবকের কাছে রক্ষাকর্ত্রী, অভয়া, স্নেহময়ী জননী। আপনি সেদিন বললেন, 'অত কষ্ট, ভিতর থেকে হাসি যেন বলছে আমি আছি এ-সব যন্ত্রণাতে ভুল না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাস্য করিতে করিতে)—এতে কি লোকশিক্ষা হবে?

মাষ্টার—আপনার আবির্ভাবই লোকশিক্ষার জন্য। রামরসায়নের 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' প্রসঙ্গ পাঠ হয়েছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থায় হনুমান বিস্মিত হয়ে প্রভু রামচন্দ্রের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাল, 'প্রভু, এ বুদ্ধি কে দিলে? একবার তোমার নাম করলেই সর্ব্বজীব উদ্ধার হয়ে যায়, এখন নামী হয়ে এ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কেন?' উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বললেন, 'অবতারের উদ্দেশ্যই লোকশিক্ষা।' হনুমান স্তব্ধ হল। আমার এখন কেবল সেই দেশ (কামারপুকুর) মনে পড়ছে। দেখছি যেন সব ঝক্-ঝক্ করছে—রাস্তা, পথ, ঘাট, সমস্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কি আনুড়ের কথা বলছ?

মাষ্টার—কোথায় যেতে যেতে ১১ বৎসর বয়সের সময় যে ভাব হয়েছিল, সে কি ব্যাওয়াইয়ে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, আনুড়ে।

মাষ্টার—ওদিকে কেন যাচ্ছিলেন, কোন নিমন্ত্রণে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, বিশালাক্ষী দেখতে।

মাষ্টার—আবার আনুড়ের ঐদিকে হৃদয় মুখুয্যের সঙ্গে কোথায় যেতে-যেতে মুড়কী খাবার ইচ্ছা হয়েছিল। হৃদয় বলেছিল, 'মামা, আর জ্বালিও না, এখানে কোথায় মুড়কী পাব'? আর আপনি বলেছিলেন, 'তবে ঐ দেখ কে আসছে?' পরে এক জন নারী-মূর্ত্তি আপনাকে প্রণাম করে মুড়কী দিয়ে গেলেন। সেই সব জায়গা বড় দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু তখন সব জায়গা জানতাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন থাক। একটু ভাল হই, তোমায় নিয়ে যাব।

মাষ্টার—কোথায় বেরুলেই ঐদিক (কামারপুকুর) পানে মন টানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের কাছে একটু কাগজ ও পেন্সিল চাহিলেন। মাষ্টার উহা ঠাকুরের হাতে দিলেন। ঠাকুর কাগজের উপর 'টোটার গোপীনাথ' লিখিলেন ও বলিলেন।

"হরিশ বলেছিল সমুদ্রের ধারে টোটার গোপীনাথ দেখে আচ্ছন্ন (ঘুম নয়) হয়েছিল, আর ঐ ভাবে দেখলে যেন গোপীনাথ বলছে, 'আমি এক রূপে পরমহংস হয়ে রয়েছি'।" ঠাকুর এই কথা বলিয়া মাষ্টারকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ইহা কি সত্য? তোমার কি মনে হয়?"

মাষ্টার—সত্যই মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)—হরিশকে একবার জিজ্ঞাসা করো।

মাষ্টার ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। বিদায় কালে ঠাকুর পুনরায় মাষ্টারকে বলিলেন—"তোমায় যে গোপীনাথের কথা বললাম তা কি সত্য, তোমার কি মনে হয়? একবার হরিশকে জিজ্ঞাসা করবে।

মাষ্টার নিচে শশীকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, "এদিকে আসুন আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

শশী—কিছু কি serious কথা আছে।

মাষ্টার—না, এমন কিছু নয়। তবে সেদিন যে আপনার ভাইদের কথা বলেছিলেন তাতে মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে।

শশী—আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম।

মাষ্টার—তাদের কর্ম্মের কথা বলেছিলাম কিন্তু এখন হওয়ার তেমন গোচ দেখছি না। তবে ৩।৪টা স্কুলে নাম লিখিয়ে রাখলে হলেও হতে পারে।

শশী—আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

মাষ্টার—আর একটা কথা, আপনার ভাইদের কিছু দেবার ইচ্ছা করছে তাদের খাবার জন্য। আপনি পরে রোজগার করলে আমায় ফিরিয়ে দেবেন।

শশী—আচ্ছা, তা দিন।

মাষ্টার—এই পাঁচ টাকা, তবে আপনি money order করে পাঠিয়ে দেবেন।

শশী (টাকা হাতে লইতেই সর্পদষ্টের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে)—আমি কোথায় money order দেবো।

মাষ্টার— কেন, বরাহনগরে······

শশী—না, আমি তা পারবো না। টাকা হাতে করে আমার ভয় হচ্ছে। উহ্, এ রকম আমার কখনও হয় নাই।

মাষ্টার—এঃ! তবে কি আপনার দ্বারা আমার কিছু হয় না?

শশী—উহ্, আপনাকে পর্য্যন্ত আমার ভয় হচ্ছে। এই কথা বলিয়া শশী টাকাগুলি ফেলিয়া মাষ্টারের কাছ হইতে কিয়ৎ দূ[রে] একাকী দাঁড়াইলেন।

মাষ্টার—আমার addressটা জেনে, ঠাকুরের কাছে গি[য়ে] তাঁর মত নিয়ে টাকাটা পাঠালেই হতো।

মাষ্টার এই ব্যাপারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পুকুরের এক নিভৃ[ত] স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"মা, যদি দর্প কিছু ছিল, আজ চূর্ণ হয়ে গেল। মা, আমি তো কোন কামনা করে দিই নাই। তবে ওকে না জানিয়ে একেবারে দেশে money order পাঠালেই হতো।

"মা, এইবার শিখলুম উপযাচক হয়ে কারুকে দিতে যাব না কেউ চায় তো দেবো নিষ্কাম ভাবে। তা না হলে বড় জ্বালা।

"আর যদি পারি পারতপক্ষে নিজের হাত দিয়ে দেবো না পরের মারফত দেবো।

"আর মা, তুমি জানবে, জানাবার জন্য আদৌ নয়। তবে লোকের প্রয়োজনীয়তা ও স্বভাবের উন্মুখতা দেখে দেবো।

"আর মা, মনে করেছিলুম নরেন্দ্রকে কর্ম্ম জুটিয়ে দেবার চেষ্টা করবো, এখন আর তাও করা হবে না। নিজে উপযাচক হয়ে দেবো না, তোমার ইচ্ছা না জানলে নয়।

"মা, লজ্জা নিবারণ করো, বড় ভয়, পাছে শশী আমি উপরে যাবা মাত্র চেঁচিয়ে ওঠে ও শ্রীপরমহংসদেব বিরক্ত হন ও আমাকে অপরাধী করেন।

"মা, যদি অপরাধ হয়ে থাকে ক্ষমা করো। কিন্তু মা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমার কি অপরাধ।"

"গুরুদেব, এ কি তোমার অপূর্ব্ব লীলা, আজ আবার আমার আত্মাভিমান যদি কিছু ছিল চূর্ণ করলে। আর বুঝিয়ে দিলে—

নাহং দেহঃ জন্মমৃত্যু কুতো মে।
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে।
নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে।
নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে।"

প্রচ্ছদপট

সন্ন্যাস গ্রহণান্তে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তীর্থ-পর্য্যটনের উদ্দেশ্যে নীলাচলে আগমন করেন। সেইখানে কিছু দিন থাকিয়া পুনরায় তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হন। দ্বাদশ বর্ষ এই ভাবে ভারতের তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া তিরোধানের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত নীলাচলে কাশী মিশ্রের গম্ভীরা-গৃহে থাকেন। এই গৃহ বর্ত্তমানে রাধাকান্তের মন্দির নামে পরিচিত। এই গম্ভীরা-গৃহে মহাপ্রভুর ব্যবহৃত পাদুকা, কমণ্ডলু ও কন্থা রক্ষিত আছে। এই কন্থাটি পূর্ব্বে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। তাহার ফলে যাত্রী এবং ভক্তগণ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের স্পর্শপূত এই কন্থার অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়া নিজেদের পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেন, কিন্তু ইহাতে জাতির এই মহামূল্য সম্পদটি অচিরেই বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা যায়। সেই জন্য বর্ত্তমানে এই কন্থাটিকে কাচের বাক্সের মধ্যে শীল করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যবহৃত পাদুকা, কমণ্ডলু ও কন্থার আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। আলোকচিত্রটি শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত।

রোমাঁ রোলাঁ ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিষয়ে ফরাসী ভাষায় রোমাঁ রোলাঁর লেখা জীবনী আজ বিশ্ববিখ্যাত। সেই গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহেন্দ্রনাথও উক্ত বৈদেশিককে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করতে উৎসাহী হন। রোলাঁ এবং মহেন্দ্রনাথের মধ্যে পত্র মারফৎ যে সকল আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, সেই সকল বহুমূল্য তথ্য এই সঙ্গে প্রকাশিত পত্রদ্বয়পাঠে পাঠক-পাঠিকা জ্ঞাত হবেন। পত্র দু'টি এ যাবৎ কুত্রাপি প্রকাশিত হয়নি। পত্র দু'খানি তর্জ্জমা করেছেন ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়।—সম্পাদক]

রোমাঁ রোলাঁর পত্র

ভিলেনিউও (ভাঁদ) সুইজারল্যাণ্ড
গ্রাম—ওলগা
১০ই অক্টোবর, ১৯২৮ সাল।

শ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় সমীপেষু—*

আপনি হয়ত রামকৃষ্ণ মিশনে শুনে থাকবেন, আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় লেখবার সঙ্কল্প করেছি। পাশ্চাত্য লেখকের পক্ষে এটা ধৃষ্টতা মাত্র, সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাকে এই কাজে উদ্‌বুদ্ধ করেছে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আর প্রগাঢ় ভক্তি।

আপনার বহু প্রশংসিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-র উপর আমার মধুর শ্রদ্ধা আছে এবং আমি তাঁর কাছে বহু ঋণী। আপনার শ্রীগুরুর সরলতা-মাখা যে সব বাণী আমাদের পাঠিয়েছেন, তা পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। যদি বলেন ত আমার জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। সকলে বলে থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ পড়াশুনা করেন নি, তিনি নাকি নিরক্ষর ছিলেন বললেই হয় এবং মুখে-মুখেই তাঁর যতটুকু শিক্ষা হয়েছিল। অবশ্য ভারতীয়ের কাছে এ কথা জোর করে বোঝাতে হয় না, কারণ তিনি নিজেই জানেন এই মুখে মুখে শিক্ষাটা কি। কিন্তু কোন ইউরোপীয় এ-বিষয়ে কল্পনাও করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণের দিক থেকে এই শিক্ষা কি বিষয়ভুক্ত ছিল? সে কি বড়-বড় প্রাচীন ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা এবং বাংলার প্রচলিত কাব্যগীতি নিয়ে? এই শেষোক্ত বিষয় জানবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ। শৈশবে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কোন বিশিষ্ট রচয়িতার কবিতা ও গান ভাল লাগত? বালককৃষ্ণের সেই সব রাখালিয়া গীতি, শ্রীরাধার প্রেমগীতি—এগুলির রচয়িতারা কি সকলেই প্রখ্যাত কবি ছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কোন ধর্ম্মমূলক নাটকের অভিনেতা হয়েছেন বা অভিনয় দেখেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল কবির গাথাগুলি গাইতেন, আপনি আপনার 'কথামৃত'তে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদের নাম প্রায়ই দেখতে পাই, কবীরের নামও দু'-তিন বার পেয়েছি। এঁদের দু'জনেরেই জানি; কিন্তু প্রেমদাস, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র, বোধচরিত, (বুদ্ধচরিত?), এঁরা কা'রা? এঁরা কোন যুগের মানুষ?

১। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে উদ্‌ধৃত ঈশ্বরের পবিত্র নাম ও তাঁহার শক্তি-শীর্ষক নাম-গানটি কার রচনা? (The Gospel প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬৫, ১২৫, ১২৯, ১৯৩)।

২। সুপরিচিত রাধার গানটি কার রচনা? (The Gospel প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮২)।

৩। গোপীদের কীর্ত্তন-গানটি কার রচনা? (The Gospel ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯)।

৪। The Gospel প্রথম খণ্ডের ২৯৬ পৃষ্ঠায় এবং ২য় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত 'যন্ত্র' সম্বন্ধে গানটি আমার বেশ ভাল লেগেছে, এটি কি বাংলাদেশে সুবিদিত?

৫। কথামৃততে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মত বাংলার বড়-বড় প্রাচীন কবির নাম পাইনি। শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাঁদের জানতেন না? আমার মনে হয় তাঁরা ভগবৎ-প্রেমানুভূতির অপূর্ব্ব নিদর্শন; শ্রীরামকৃষ্ণের তাঁদের উপর খুবই দরদ থাকা সঙ্গত; কারণ, এই অনুভূতিই ভক্তিযোগের সাধনায় সব চেয়ে বড় পাওয়া—সিদ্ধিলাভ। (বিশেষ দ্রষ্টব্য চণ্ডীদাসের পদাবলী)।

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি কি ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে?

ঐতিহাসিক তত্ত্বের দিক থেকে একটি জিজ্ঞাসা আছে। আপনি কি জানেন কবে (মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হয়েছিল? স্বামী অশোকানন্দ প্রথমে বলেছিলেন, ইং ১৮৬৯ কি ১৮৭০ সালে, পরে, আর এক দিন বললেন, ১৮৬৩ সালে। শেষোক্ত তারিখটি আমার বিচারে কুসঙ্গত বলে মনে হয়; কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের এই সময়টা আত্মোপলব্ধির সাধনায় এমন-ভাবে রত ছিলেন যে, তাঁর পক্ষে তখন লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে

যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু জীবনে ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রগুলি সব সময় খাটে না, তাই এ-সম্বন্ধে আপনার কাছে সঠিক জানতে পারব আশা করছি। আপনার নিজস্ব স্মরণশক্তির হিংসা করতে ইচ্ছা হয়। যাই হোক্, হে বন্ধু শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের নামে আমার শ্রদ্ধা ও সৌভ্রাত্রের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

রোমাঁ রোলাঁ।

অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী :—

১। কতকগুলি গান (বিশেষত: যেগুলি নরেন গাইতেন) কি ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত?

২। শ্রীরামকৃষ্ণের উপর শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্বন্ধে কখন কখন শোনা যায়। সেই প্রভাব তাঁর উপর কেমন করে এল? কার দ্বারা এল? গিরিশচন্দ্রের কোন কোন রচনায় কি শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে কিছু লেখা হয়নি?

আপনার পাণ্ডিত্য ও অনুকম্পার সুযোগ নিলুম বলে পুনশ্চ ক্ষমা চাইছি।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর পত্র

শ্রীগুরুদেব

৫০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ২৮ নবেম্বর ১৯২৮

প্রীতিভাজনেষু—

মসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ, আপনার সাদর সম্ভাষণের অনুগ্রহ লাভ করেছি, আপনার পবিত্র বাণীও আমাদের কাছে পৌঁচেছে; আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ। আপনার এই বাণী, আমাদের প্রেমময় শ্রীগুরুর জ্যোতির্ম্ময় মধুর সরল হাসিমাখা মুখচ্ছবির ধ্যানে আমাদের নিমজ্জিত করে দিয়েছে।

আপনি যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন, পরমেশ্বর আপনার সহায় হোন প্রার্থনা করি। আধ্যাত্মিক ও সুধী সমাজকে আপনি জানাতে চান কেমন করে এই মানবাবতার তাঁর নিজের জীবনাদর্শ দিয়ে শিখিয়েছেন জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে, জীবনের সমস্ত সংশয় ছিন্ন করতে; আপনি সকলকে জানাতে চান, কি রকম আত্মীয়তা ছিল তাঁর মানবতার সঙ্গে—তথা ভারতের সঙ্গে এবং তাঁর সুনিকট শিষ্যদের সঙ্গে।

আমার সাদর সম্ভাষণ নিজ গুণে জানবেন এবং আপনার পরিবারস্থ সকলকে ও বন্ধুবর্গকে জানাবেন, যাঁরা বিভুপদে পরম শান্তিলাভ করেছেন তাঁদেরও আমি এই সুযোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে মুদ্রিতাক্ষরে, আপনার কয়েকটি চমৎকার (আগ্রহজনক) প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করেছি। নমস্কার গ্রহণ করুন ইতি

ভবদীয় অনুরাগরক্ত
প্রভুর কৃপায়—
'ম'

আধ্যাত্মিক ও সুধী সমাজকে আপনি জানাতে চান,...আপনি জানতে চেয়েছেন,—শ্রীরামকৃষ্ণের এই মুখে-মুখে শিক্ষা কি বিষয়ভুক্ত ছিল।

শ্রীগুরুদেব বলতেন, যীশু, চৈতন্য বা রামকৃষ্ণ শিক্ষা-সাধনার (মৌখিক শিক্ষা কিম্বা বই পড়া সাধনা) ফল নয়। আপনি ঠিকই বলেছেন (প্রবুদ্ধ ভারত, এপ্রিল ১৯২৮)। একোঽহং বহু স্যাম। সেই একেশ্বর পরব্রহ্ম তাঁর পূর্ণ অস্তিত্ব সমগ্র মানব-সমাজের ভিতর ছড়িয়ে দিয়ে বহু রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন...তিনি কখন জাগ্রত, কখন বা সুষুপ্ত।

অবতার হচ্ছেন সেই পরব্রহ্মের পূর্ণতম প্রকাশ। অবতারের মুখনিঃসৃত বাণী মাত্রই প্রত্যাদিষ্ট,—শ্রীগুরুদেব বলতেন,—এই বাণী পরাৎপরা জগদম্বার বাণী; এই সব উপদেশ আমার নিজের নয়, যিনি আমাকে ইহলোকে পাঠিয়েছেন (John VII), তাঁর বাণীই বেদ, তাঁর বাণীই বোধরূপী আত্মার প্রকাশ।

মন্দিরে (চার্চ্চ) সমবেত মনীষীরাও ত সেদিন পরম আশ্চর্য্যের সঙ্গে বলেছিলেন,—"এই কি সেই সূত্রধর জোসেফের ছেলে? লেখা-পড়া কিছুই শেখেনি কিন্তু এমন জ্ঞানগর্ভ কথা আর কোথাও শুনিনি।" যীশু তখন মাত্র বার বছরের ছেলে।

ইউরোপীয়েরা এই নিরক্ষর বালক যীশুর বিষয় সম্পূর্ণরূপেই অবগত আছেন।

শ্রীগুরুদেবও তাঁর ভক্ত শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি যখন এগার বছরের, তখনি তিনি সমাধি অবস্থায় ঈশ্বরকে দেখেছেন। সেই সময়ে তিনি আমুড়ের পথে তাঁর মা এবং অন্যান্য যাত্রিণীর সঙ্গে কোনও দেবমন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন।

তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি (উপনিষদ)। তাঁকে জানলে আর সবই যানা যায়।

যীশুও তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন,—শুদ্ধাত্মারাই ধন্য; কারণ তাঁরা ঈশ্বরের দর্শন পাবেন।

ঈশ্বরদর্শন, এ কি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব না যোগের দ্বারা? (পঞ্চ বিষয়ে আসক্তিশূন্য হয়ে ধ্যান-ধারণা দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই যোগ) অবতারেরা অনুভূতি-সম্পন্ন, তাই তাঁরা সবই জানতেন:— 'শুদ্ধ সত্তা' হওয়া অর্থাৎ কাম-প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন (Kant), তবে ভগবদ্দর্শন হবার সম্ভাবনা। অবতারেরা নিত্যসিদ্ধ, সদা শুদ্ধচিত্ত; তাঁরা সর্ব্বদাই ঈশ্বরকে দেখতে পান। যীশু কি বলেননি—হে পিতঃ তুমি আমাকে কামজয়ী করেছ, যাতে আমি প্রার্থীদের জীবনে অমৃতত্ব এনে দিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণও ঐ কথাই বলেছেন; ঈশ্বরলিপ্সুদের তিনি শিখিয়েছেন ইন্দ্রিয়, বিষয়ভোগ, ধন, খ্যাতি, সম্মান, উপাধি, কামিনী-কাঞ্চনজনিত ইন্দ্রিয়সুখ—এই সকলের আসক্তি ত্যাগ করতে।

অবতারেরা জেনেছেন, ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের ভিতরে ও বাইরে সর্ব্ব দিকে সর্ব্ব বিষয়ে পরিব্যাপ্ত; তাঁরা দ্রষ্টা। ট্রাম-গাড়ীর ছাদের উপরকার দণ্ডটি মাথার উপরকার বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে যুক্ত হলেই গাড়ী চলতে আরম্ভ করে, যেন প্রাণ পায়, তার ভিতরে-বাইরে আলোয় আলো হয়ে ওঠে।

স্বভাবতই এই সব অবতারদের নিত্য ঈশ্বরদর্শন হেতু শিশুকাল থেকেই যে দৈবীশক্তি দেখা যায়, তা আমাদের ধারণা করা শক্ত। কিন্তু "হোরেশিও, তোমার দর্শনশাস্ত্র যতটা চিন্তা করতে পারে, স্বর্গে-মর্ত্তে তার চেয়ে অনেক বেশীই রয়েছে।" যীশুও ত বলেছেন, "হে পিতঃ, তুমি ধন্য, কেন না এই সব বিষয় তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাছ থেকে গোপন রেখেছ, অথচ শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ।"

(Mathew ch. II. Verse 25)। সত্যই এ-রকম অবতারের সংস্পর্শে আসা তাঁর শিষ্যদের পক্ষে একটা পরম সৌভাগ্য; দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তাঁরা যীশুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘ হলে কি হবে—পাঁচ বছর তাদের জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়।

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় ইউরোপ আজ বহু বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র হিসেবেও যীশুকে ধারণা করবার তার সময় নেই। "মার্থা, মার্থা! তুমি অনেক দিক থেকে ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু এর মধ্যে একটা জিনিসই প্রয়োজন এবং নিত্য (স্থায়ী), আর সেইটা মেরীই বেছে নিয়েছে।"

যীশুর ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্যে ভূরি-ভূরি ইতিহাসের নজীর দেখিয়ে আর সমালোচনা করেই ইউরোপ খুশী। অবতারদের সম্বন্ধে এ সব একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এবং নিষ্ফল। যিনি মহাযোগী, যিনি অবতার, কেবল মাত্র তিনিই অপর মহাযোগী বা অবতারকে জানতে পারেন এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপ বুঝতে পারেন; সংসারের খুঁটিনাটির আসক্তি নিয়ে ঐতিহাসিকেরা এ সব তত্ত্ব কিছুই বুঝতে পারেন না। সেদিন সেই যোগীকে লোকে বুঝতে পারেনি, কারণ তিনি ত জনসাধারণের কাছে তাঁর শক্তি প্রকাশ করেননি। তিনি বলেছিলেন,—"অল্প হলেও উপযুক্ত শিষ্য মেলা চাই।" কি আর বলব—যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগীই দেহত্যাগ করলেন। অন্যের স্বার্থাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার অপরাধে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

অতএব, শ্রীগুরুদেব যে তাঁর পারিপার্শ্বিক শিক্ষা (কৃষ্টির) আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন, এ কথা সত্য নয়, তিনি নিজেও তাঁর শিষ্যদের তাই বলেছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে এবং যীশুর সম্বন্ধে এমনও নির্দ্দেশ করেছেন যে, তাঁদের জীবন-তরুতে ফল (ঈশ্বরোপলব্ধি) ধরেছিল আগে, ফুল হল পরে। সাধনা, শিক্ষা (কৃষ্টি), ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম (আপ্রাণ চেষ্টা) শিক্ষা-দীক্ষার গুরু—কাব্যগীতি-শাস্ত্র, ধর্ম্মগ্রন্থ, তাঁদের এ সব কেবল লোকশিক্ষার্থে ধর্ম্মাচরণের লীলামাত্র। John the Baptistও যীশুকে বলেছিলেন, "আপনার কাছে আমার দীক্ষার প্রয়োজন ছিল, তাই আপনাকে আসতে হয়েছে আমার কাছে।" যীশুও কি তার উত্তরে বলেননি,—"সেই কথাই মেনে নেওয়া যাক, কারণ এইরূপে আমাদের পক্ষে উপযুক্তই হবে ধর্ম্মাচরণ করে লোকদের শিক্ষা দেওয়া। (Mathew III 15)।

শ্রীরামকৃষ্ণকেও ঐ রকম, জগদম্বা নির্দ্দেশ দেন ঐ সব সাধন আরাধন ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান, কৃচ্ছ্রসাধন, সেই সব অপূর্ব্ব প্রার্থনা ও ধ্যান-ধারণার ভিতর দিয়ে ঘুরে আসতে;—সে সব শুধু ভবিষ্যতের ধর্ম্মোৎসাহীদের ঈশ্বরোপলব্ধির পথ দেখাবার জন্যে। এই সব, জগদম্বা 'মাইলষ্টোন' স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করেছেন,—লক্ষ্যে পৌঁছতে আগ্রহী, ভবিষ্যতের যাত্রীদের জন্যে।

স্বামী বিবেকানন্দের তত্ত্বাবধানে রামকৃষ্ণ মিশন নিঃস্বার্থ ত্যাগধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কার্য্যসূচী প্রস্তুত করেছেন, তার এই মহৎ লক্ষ্য রয়েছে; যেমন, চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়-সুখে আসক্তিশূন্য হয়ে কাজ করা—যার থেকে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়; কিন্তু এর চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরোপলব্ধি। শ্রীগুরু বার বার বলেছেন, এই নিষ্কাম কর্ম্ম নিত্যজীবন লাভ করবার উপায় মাত্র, কিন্তু জীবনের লক্ষ্য হবে ব্রহ্মদর্শন। যীশুও ঐ রকম বলেছেন,—"ধন্য তারা, যাদের অন্তর শুদ্ধ, তারাই ঈশ্বরের দর্শন পাবে।" নিষ্কাম কর্ম্ম থেকে আসবে বিশুদ্ধতা আর এই চিত্তশুদ্ধি হলেই ব্রহ্মোপলব্ধি হবে। তাই বলছি, এই রকম কাজ উপায় মাত্র আর লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মোপলব্ধি।

মহাত্মা গান্ধির দেশের কাজও ঐ রকম নিষ্কাম, স্বার্থহীন। এর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্মের পার্থক্য এই যে, মিশন কথায় ও কাজে সমান স্পষ্ট করে প্রকাশ করে—(১) এর সমাজসেবার কাজ ইন্দ্রিয়সুখে অনাসক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং (২) তার জন্যে এর কাজ ব্রহ্মলাভের, ব্রহ্মোপলব্ধির, ব্রহ্মদর্শনের উপায় মাত্র। মনে হয়, মহাত্মা কথায় এত স্পষ্ট করে বলেননি, কিন্তু লক্ষ্য একই, স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ থাকুক আর নাই থাকুক।

আবার দেখুন, প্রভাত-রবিরশ্মি বিশ্বপ্রকৃতিকে স্বর্ণবর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত করে দেয়। শ্রীগুরু বলেছেন, অবতারও তেমনি,—ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যক্তিত্ব, স্থান, স্বদেশ, যত-কিছু পারিপার্শ্বিকের উপর তাঁর প্রভাব, একটা মায়ামন্ত্র বিস্তার করেন। তিনি বিশ্লেষণ করেন, পুনর্নির্দ্দেশ করেন জীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব্বতন অবতারেরা জীবন যাপন করে গেছেন; এঁদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ধর্ম্মগ্রন্থ বা কবি-কাহিনীতে গাঁথা হয়ে রয়েছে। তিনিই অবতীর্ণ হন যুগে-যুগে পূর্ব্বতন অবতারদের জীবনের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে দেখাবার জন্যে; তিনিই দিব্য বিশ্লেষক। "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম" (গীতা)—"হে পুরুষোত্তম, একমাত্র তুমিই তোমাকে (আত্মাকে) জান।" (আত্মোপলব্ধি হেতু)।

যিনি অবতার তাঁকে ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে কিছুই শিখতে হয় না, তাঁর গুরুদীক্ষারও প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরোপলব্ধি হওয়ায় সহজেই তিনি ঐ সমস্ত তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা করতে পারেন। যীশু নিয়ম-শৃঙ্খলা ও অবতারদের বাণীর তাৎপর্য্য দেখিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, কোরান এ সবের এবং খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারদের বাণীর তাৎপর্য্য সরল ভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্যে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, নরলীলায় তাঁর জীবন-তরুতে প্রথমেই ফল ধরেছিল, ফুল ফুটল পরে।

আত্মোপলব্ধির পরেই জগদম্বা শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে বহু লোককে সমর্পণ করলেন, ধর্ম্মগ্রন্থ এনে দিলেন, বহু গীতি-কবিতা এনে দিলেন। এই সমস্তই তিনি তাঁর অলৌকিক পাত্রে গালিয়ে খাদ বাদ দিয়ে একেবারে খাঁটি সোনা করে নিলেন, জগদম্বারই আদেশে;—এক দিকে তিনি সাম্প্রদায়িকতা, অসহনশীলতা এবং যা কিছু বেসুরো, সব ঠেলে ফেলে দিলেন, অন্য দিকে তিনি মানব-সমাজকে তাঁর দুটি (অমোঘ) বাণী শোনালেন,—(১) ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর বাণী শোনা যায়, তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করা যায়, এবং (২) সকল ধর্ম্মমতের লক্ষ্য একই,—ব্রহ্মোপলব্ধি; আমরা আত্মোপলব্ধির জন্যে, ব্রহ্মোপলব্ধির জন্যে, তাঁকে পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে—ব্যাকুল হয়ে অনুক্ষণ তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাব।

অর্থ, সম্মান, উপাধি, ইন্দ্রিয়সুখ,—এ সবের পরিধির মধ্যে জগদম্বা কি শ্রীগুরুদেবকে রাখেননি? কিন্তু যিনি অবতার, তিনি কি এ সবে মুগ্ধ হন? কখনই না, কোনটাতেই তিনি অভিভূত হবেন না। লোভ দেখান সত্ত্বেও যীশু শয়তানের দান প্রত্যাখ্যান করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। শ্রীগুরুর কাছেও জগদম্বা এই সব সিদ্ধি বা

অলৌকিক ক্ষমতার অসারতা প্রতিপন্ন করে তাঁকে এদিক থেকে বিমুখ করেছিলেন। যীশুও বলেছিলেন,—"মানুষ সব হীনমতি দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে যাচ্ছে, তাই তারা অবতারের লক্ষণ মেলাতে চায়, অলৌকিকত্ব দেখতে চায়। কিন্তু নিউ টেষ্টামেণ্টের বাণী হচ্ছে প্রেমের বাণী; আর সেই প্রেমই হল জীবনের একমাত্র প্রয়োজনীয়,—ঈশ্বরের প্রতি বিশুদ্ধ নির্দোষ প্রেম কোন প্রতিদান চায় না,—কামিনী-কাঞ্চন, ক্ষমতা, যশ যত-কিছু পার্থিব প্রতিপত্তি, অর্থাৎ মানুষ এ জগতে যা-কিছু খুঁটিনাটি পাবার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, তার কোনটাতেই এঁর আসক্তি নেই।"

সেই রকম শ্রীগুরুও আমাদের শিখিয়েছেন,—সাধারণ লোকে পারিপার্শ্বিকের দ্বারা চালিত, কিন্তু অবতার এই পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অবতার বা ঈশ্বরের পুত্র "ভগবানের রাজ্য পরিদর্শনের জন্য "খোজা" হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

আপনার কৌতূহলপূর্ণ বাকি প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে দেরী হয়ে গেল, তার জন্যে ক্ষমা করবেন।

(ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎকার :—

সেটি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের কথা, আমি স্বামী অশোকানন্দকে তাই বলেছি, কারণ শ্রীগুরুদেব আমাদের বলেছিলেন,—এই সাক্ষাৎকারের সময় তিনি দেখেছেন কেশব আদি সমাজের বেদীর উপর বসে আছেন। এখন, কেশব ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি আদি সমাজের আচার্য্য নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আদি সমাজ ছেড়ে চলে যান। সুতরাং ঐ ঘটনাটি নিশ্চিত ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ঘটেছিল। ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীগুরু সখিভাবে সাধনা করতেন; এই সাধনায় তিনি জগদম্বার পরিচারিকারূপে সাড়ী-টাড়ী পরে নারী সেজে তাঁর সামনে এবং প্রেমের যুগলমূর্ত্তি রাধা-কৃষ্ণের সামনেও নৃত্য করতেন আর গান গাইতেন। ঘটনাবহুল এই দু'বছর তিনি দিব্য প্রেমে একেবারে মেতে উঠতেন,—তাঁর শরীরে পুলক সঞ্চার হত। এই সময় এক-এক দিনে বহু বার তাঁর সমাধি হত।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সাধনায় রত ছিলেন, অর্থাৎ আপনার ভাষায়, তিনি আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মন্দিরের কাছাকাছি যখন রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত নিয়ে পণ্ডিতদের পাঠ বা গান হত তিনি প্রায়ই আগ্রহের সঙ্গে শুনতে যেতেন। বিষয়াসক্তদের সঙ্গ তিনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন এবং ভগবৎ-কথা—একমাত্র ভগবৎ-কথা শুনতেই তাঁর আগ্রহ ছিল।

(খ) গিরিশের নাটক :—

যত দূর জানি, ঐগুলোর ইংরেজিতে অনুবাদ হয়নি। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে অর্থাৎ শ্রীগুরুর দেহরক্ষার প্রায় দু'বছর আগে তাঁর সঙ্গে গিরিশের যোগাযোগ হয়। শ্রীগুরু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যলীলা, দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, বৃষকেতু এই সব নাটকের অভিনয় দেখেন। এগুলো গিরিশেরই লেখা।

(গ) বুদ্ধচরিত অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনী, কোন কবির নাম নয়, গিরিশেরই একখানি নাটকের নাম।

(ঘ) প্রেমদাস, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র, কবীর এবং কুবীর :—

প্রেমদাস—কেশবের শিষ্য ৺ত্রৈলোক্য সান্ন্যালই পরে প্রেমদাস নাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করবার। শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব সমাধির অবস্থা, জগদম্বার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, অলৌকিক মাতৃপ্রেমে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমে, চৈতন্যপ্রেমে মত্ত হয়ে তিনি যখন নৃত্য করছেন, গান গাইছেন, তাঁর সেই ভাব,—এ সমস্ত চক্ষুগোচর করে প্রেমদাস ধন্য হয়েছেন। তাঁর লেখা কতকগুলো গান শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

কমলাকান্ত—ইনি একজন ঈশ্বরভক্ত (প্রেমিক) পণ্ডিত ছিলেন; প্রায় ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইনি বর্দ্ধমান মহারাজের সভাপণ্ডিত হয়েছিলেন (মহারাজের সভাস্থ বিদ্বৎমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন)। তাঁর রচিত গানগুলি শ্যামা-বিষয়ক।

নরেশচন্দ্র—শুনতে পাই, তিনি নবদ্বীপের রাজ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক জন ভগবৎ-প্রেমিক গীতকার ছিলেন; তাঁর গানগুলির অধিকাংশই শ্যামাবিষয়ক। শুনেছি, উনবিংশ শতাব্দের গোড়ার দিকে তাঁর নামযশ হয়েছিল।

কবীর ও কুবীর—কবীর দাক্ষিণাত্যের রামানন্দের প্রখ্যাত শিষ্য।

কুবীর—ইনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী সন্ন্যাসী;—মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দের গোড়ার দিকে এঁর নামযশ ছিল। ইঁহার রচিত কতকগুলি প্রচলিত গানের ভিতর দিয়ে ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

(ঙ) জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস এবং অন্যান্য বৈষ্ণব কবির গান :—এই সব গানের সঙ্গে শ্রীগুরুর খুবই পরিচয় ছিল। ভবিষ্যতে কথামৃতের যে-সব খণ্ড ইংরেজিতে প্রকাশিত হবে তাতে ঐ গানগুলো কিছু-কিছু দেওয়া থাকবে। শ্রীগুরু গোপীদের পুলক ও প্রেমের বিষয়ের গান শুনলেই প্রায়ই সমাধিস্থ হয়ে যেতেন।

গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি "যাত্রাওয়ালাদের" অভিনয় ব্যাপারে এঁদের কতকগুলো গান সংযোজিত দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ সব গানও ভাল রকমই জানতেন।

(চ) "সুবিখ্যাত রাধার গান :—"সখি, সে বন কত দূর" (কথামৃত, ১ম ভাগ, ১৪ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭)। মনে হয়, এই গানটি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, এই সব বৈষ্ণব কবির গান থেকে যাত্রার অভিনয়ে রূপান্তরিত করে লাগান হয়েছে।

(ছ) "ভগবানের পবিত্র নাম ও তাঁর শক্তি" (১) "সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী" (১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৪)। (২) "শ্যামা মা কি কল করেছে" (৫ম ভাগ, পৃঃ ১২৭)—জগদম্বা-বিষয়ক এই দুটি গান গাওয়া হয় "চণ্ডীতে" (জগদম্বাভক্ত কালকেতু শ্রীমন্ত প্রভৃতিকে নিয়ে যাঁর বিচিত্র লীলা)।

(Cowel এর ইংরেজিতে অনূদিত কবিকঙ্কনের চণ্ডী দ্রষ্টব্য)

গান দুটির রচয়িতার খোঁজ নিয়ে আপনাকে পরে জানাব। আপনি বুঝতেই পারছেন, জগদম্বার তৈরী এই যন্ত্রের অর্থ এই দেহ। আপনি দেখবেন, "যন্ত্র" নামক গীতটি স্বেচ্ছাচারিতার মূলে আঘাত করেছে। যন্ত্রের গানটি শ্রীগুরুর মুখে তাঁর অপূর্ব্ব ভাবধারার সঙ্গে গীত হওয়ায় সমস্ত বাঙ্গলা দেশে সুপরিচিত হয়েছে; এর আগে অতি অল্প লোকেই এই গানটি জানত।

(জ) গোপীদের গান, "রে মাধবী আমার মাধব দে" (৩য় ভাগ, পৃ: ১৬৩)। এই গানটিও যাত্রার অভিনয়ের জন্যে বৈষ্ণব কবিতা থেকে নেওয়া। এখানে যাত্রা খুব জনপ্রিয়,—শ্রোতার ভীড় হয় খুব।

(ঝ) শ্রীরামকৃষ্ণ ও যাত্রাভিনয়:—

শ্রীগুরু বলতেন, তিনি এই রকম যাত্রা শুনতেন খুব (যাত্রার নাটকাভিনয়ে গানের প্রাধান্য থাকে)।

বাল্যকালে অধিকারীর বিশেষ অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের (যোগীরাজ) ভূমিকায়ও অভিনয় করেছেন; যাঁর শিব সাজবার কথা ছিল তিনি আসেননি বা তাঁর অসুখ করেছিল। মাত্র এই একবারই শ্রীগুরুকে অভিনেতা হিসাবে দেখা গিয়েছিল। অভিনয় করতে করতে তাঁর একেবারে সমাধি হয়ে গিয়েছিল; লোকে ভেবেছিল, তিনি শেষ হয়ে গেলেন, যাত্রাভিনয় বন্ধ হবার যোগাড়।

(ঞ) ব্রহ্মসঙ্গীত:—শ্রীগুরুর সামনে যে সব গান গাওয়া হত, তার কতকগুলো ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের রচনা; যেমন "চিদাকাশে হোলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।" (কথামৃত ২য় ভাগ, পৃ: ৮)।

এই গানটি এবং গানের পদে নাম উল্লেখ করে প্রেমদাসের রচিত আরও কয়েকটি গান শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত, কেন না, কেশব ও তাঁর শিষ্যেরা মাঝে-মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন আর শ্রীগুরুর অপূর্ব্ব অদ্ভুত সমাধির অবস্থা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যেতেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে শ্রীগুরুর সঙ্গে নরেনের (বিবেকানন্দের) প্রথম দেখা হয়েছিল; তার আগে, বালক নরেন ব্রাহ্মসমাজের সভায় যোগ দিতেন।

"সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে" (কথামৃত ১ম ভাগ, পৃ: ১৬৩), ব্রাহ্মসমাজের এই গানটিও নরেন যখন গাইতেন, শ্রীগুরুকে সমাধিস্থ করে দিত।

(ট) গিরিশের নাটকের প্রভাব:—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শ্রীগুরু স্বর্গারোহণ করেন। তার দেড় বছর আগে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি গিরিশের "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় দেখেন। এই বৎসরই "চৈতন্যলীলা" প্রথম অভিনীত হয়েছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ কিংবা আগে থেকে দেখা যায়, শ্রীগুরু চৈতন্যের উন্মত্ত পুলকিত প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন; "চৈতন্যলীলা" নাটকের আবির্ভাব ত তার ২৬ বছর পরে।

(ঠ) চৈতন্যের প্রভাব:—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকেই জগদম্বার প্রতি, রাধা-কৃষ্ণের প্রতি, রামচন্দ্রের প্রতি, চৈতন্যাবতারের প্রতি শ্রীগুরুর পুলকযুক্ত প্রেম তাঁকে উন্মত্ত করে দিত, আর তিনি এই দীর্ঘ কাল ধরে গান করেছেন, নৃত্য করেছেন, এমন কি বহির্জ্ঞান-শূন্য হয়ে কত বার তিনি সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছেন।

শ্রীগুরুর জীবনী,—তাঁর গভীর প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ, তাঁর পুলকযুক্ত প্রেম, চৈতন্যের অলৌকিক প্রেম বা রাধার কৃষ্ণপ্রেমের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করেছে; তাঁর আগে লোকে ঐ প্রেমের তত্ত্ব বুঝতেই পারত না।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯ বছরের বালক; প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীগুরু তাঁকে বললেন,—"নবদ্বীপের গৌরাঙ্গের (চৈতন্যের) কথা শুনেছিস্? জানিস্, আমিই পূর্ব্বজন্মে গৌরাঙ্গ ছিলুম।" বালক নরেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন,—তিনি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। তিনি তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে উন্মাদ মনে করেছিলেন; একটু পরে আমাদেরও বলেছিলেন,—"লোকটা পাগল!"

শ্রীগুরু আমাদেরও বলেছিলেন,—"যে রাম সেই শ্রীকৃষ্ণ, সেই যীশু, সেই চৈতন্য, সেই আবার এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ।"

যীশুও ত বলেছিলেন,—"এব্রাহামের আগেও আমি ছিলাম, এখনও আমি রয়েছি" (John, ch 9)। তিনি এও বলেছিলেন,—"এই মতবাদ আমার নিজের নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর।" (John, ch 7).

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।"

—'আমরা দু'জনেই অতীতে বহু বার জন্মগ্রহণ করেছি; তফাৎ এই যে, আমার সব ক'টিই মনে আছে, তোমার মনে নেই (গীতা)।'

যাই হ'ক, সেদিন ষ্ট্রাটফোর্ডের কবি ঠিক কথাই বলেছিলেন,—"দর্শনশাস্ত্রের কল্পনার বাইরে বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে আরও কত জিনিষ রয়েছে!" গ্রীক সভ্যতা, রোমের সভ্যতা, ভারতের ষড়্‌দর্শন,—এ সমস্তর যেন আর ওজন নেই। যত দিন না ঈশ্বরের অবতার এগুলোর মধ্যে নতুন জীবন, নতুন রক্ত সঞ্চারিত করেন, তত দিন এগুলো মূক কঙ্কালসার হয়ে, পণ্ডিতদের বিতণ্ডার বিষয়ীভূক্ত শুধু একটা প্রাণহীন যন্ত্রের মতন পড়ে থাকে।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, চিন্ময়ী জগদম্বা শ্রীগুরুদেবকে শুধু তাঁর প্রকৃতি ও ত্রিগুণের বিস্তারই নয়—তাঁর অলৌকিক দিব্য সত্তাও দেখিয়েছিলেন; রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—শুধু এই সব ঈশ্বরের অবতারদের সম্বন্ধেই নয়, তাঁর নিজের সম্বন্ধেও শ্রীগুরুকে উপলব্ধি দিয়েছিলেন যে, তিনিই নিত্যসত্তা মায়াতীতা ইন্দ্রিয়াতীতা জ্যোতির্ম্ময়ী আদিভূতা সনাতনী ব্রহ্মস্বরূপা, তিনিই বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম। এনাকেই উপলব্ধি করেছিলেন অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যে—যে মহাসমাধিতে লীলায়িত, প্রকৃতির বশীভূত, মায়ায় আবদ্ধ ক্ষুদ্র "অহম" তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (দ্রষ্টব্য: The Gospel, ১৯২৪, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: ৮৬—১২৭)।

প্রীতি নমস্কার জানবেন। ইতি

শ্রীগুরুকরুণাশ্রিত
"ম"

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

রচন—গ্রন্থ প্রস্তুত করণ, ভণন, কল্পন।

রচনা—বিন্যাস, গ্রন্থন করা, সাজানো।

রচিত—কৃত, প্রস্তুত, গঠিত, নির্ম্মিত।

রজঃ—ধূলি, পুষ্পরেণু, ঋতু, রজোগুণ।

রজক—ধোবা, ধোপা, বস্ত্রক্ষালনজীবি জাতি।

রজত—রূপা, রৌপ্য, হস্তিদন্ত।

রজনী—(যামিনী দেখ)।

রজনীকর—নিশাপতি, চন্দ্র, সোম।

রজনীমুখ—প্রদোষ কাল, সূর্য্যাস্ত কাল।

রজঃস্বলা—সরজস্কা, মুগ্ধা, ঋতুমতী স্ত্রী।

রজ্জু—দড়ী, রসী, কাছী, কচড়া, ডোর।

রঞ্জক—প্রীতিজনক, তুষ্টিকর, মনোহর।

রঞ্জন—হর্ষজনক, ভাবোত্থাপক, রঙ্গ করা।

রটনা—কথা, জনরব, প্রচার।

রটিত—কথিত, প্রচারিত।

রণ—যুদ্ধ, সংগ্রাম, আহব।

রণসিংহা—যুদ্ধোপযুক্ত শঙ্খ, রণবাদ্য।

রণ্ডা—বাঁঝী, বিধবা, রাঁড়।

রত—আসক্ত, পরায়ণ, আবিষ্ট, যুক্ত।

রতি—স্ত্রীসংসর্গ, বিষয়সুখভোগ।

রতিপতি—কামদেব, কন্দর্প, মদন।

রত্তি—রত্তিকা, গুঞ্জা, কুঁচ।

রত্ন—মণি ও মুক্তাদি।

রত্নকন্দল—প্রবাল, পলা, পান্না, মুঙ্গা।

রত্নগর্ভ—রত্নোদর, রত্নাকর, সমুদ্র।

রত্নগর্ভা—পৃথিবী, সৎপুত্র-প্রসবা স্ত্রী।

রত্নাকর—সমুদ্র, মণির আকর।

রত্নাবলী—গ্রথিত হার, রত্নমালা।

রথ—স্যন্দন, চক্রযুক্ত যানবিশেষ।

রথযাত্রা—রথগমন, রথচলন, রথ টানা।

রথাঙ্গ—চক্র, রথের অবয়ব।

রথ্যা—প্রশস্ত পথ, রাজপথ, বর্ত্ম, মার্গ।

রদ—রদন, দন্ত, দাঁত, দশন, বিষাণ।

রন্ধন—অন্নাদি পাক করণ, সিদ্ধ করণ।

রন্ধনশালা—পাকগৃহ, রন্ধন-ঘর, রসুই-ঘর।

রন্ধ্র—বিবর, ছিদ্র, গহ্বর, কুহর, ফাঁক।

রব—ধ্বনি, নাদ, শব্দ, জনশ্রুতি।

রবাহুত—অনিমন্ত্রিত, অনাহুত, রেয়ো।

রবি—সূর্য্য, দিবাকর, দিনপতি, ভাস্কর।

রবিখণ্ড—সূর্য্যকরোজ্জলে পক্ক খাদ্য।

রবিবার—সূর্য্যবার, সপ্তাহের প্রথম দিন।

রমণ—সুখভোগ, ক্রীড়া, সুরতব্যাপার।

রমণী—রমণা, উপপত্নী, ভার্য্যা, স্ত্রী।

রমণীয়—রম্য, সুন্দর, প্রিয়, মনোহর।

রমা—লক্ষ্মী, কমলা, বিষ্ণুর পত্নী।

রম্ভা—কদলী, স্বর্গের বেশ্যাবিশেষ।

রশ্মি—কিরণ, অংশু, ভানু, ময়ূখ।

রস—বীর্য্য, জলাদি দ্রবদ্রব্য।

রসকাপর—রসকর্পূর, পারা, পারদ, চপলা ধাতু।

রসগর্ভ—হিঙ্গুল, অঞ্জনবিশেষ।

রসজ—রুধির, জলজ কীট।

রসজ্ঞ—স্বাদভেদবেত্তা, রসিক, উত্তম কবি, ভাবক, বিদ্রূপী।

রসজ্ঞা—রসনা, জিহ্বা, জিব, জীভ, রসেন্দ্রিয়।

রসবাত—গ্রন্থিস্থিতবায়ুরোগ, বাতরোগ।

রসসিদ্ধ—রসায়নবিদ্যাবেত্তা।

রসা—আর্দ্র, রসবৎ, পৃথিবী, রজ্জু।

রসাঞ্জন—কজ্জলবিশেষ।

রসাতল—পাতাল।

রসান—আর্দ্র করণ, ভিজান, সাঁতলান।

রসানি—ক্লেদ, পুঁজ, পূয, ক্ষতজ, আর্দ্রতা।

রসায়ন—বিষঘটিত ঔষধি, রসসিদ্ধি।

রসাল—রসযুক্ত, সুস্বাদু, আম্র।

রসাহ্ব—সর্জ্জরস, ধুনা, বৃক, যক্ষধূপ।

রসুন—লশুন, কন্দবিশেষ, অরিষ্ট।

রহন—নিবর্ত্ত হওন, তিষ্ঠন, থাকন।

রহস্য—পরিহাস, কৌতুক, আমোদ।

রহিত—হীন, শূন্য, বর্জ্জিত, নিবারিত।

রাঁড়—রণ্ডা, বিধবা, স্বামিরহিতা স্ত্রীলোক।

রাই—সর্ষপবিশেষ, সরিষা, রাজিকা।

রাং—রাঙ্গ, ধাতুবিশেষ, রঙ্গ, বর্ণ।

রাকা—পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণিমা, পৌর্ণমাসী।

রাখাল—গোমেষাদি রক্ষক, গোপাল।

রাগ—ক্রোধ, অনুরাগ, রক্তবর্ণ, গীতধ্বনি।

রাগত—রাগাল, কোপান্বিত, ক্রুদ্ধ।

রাগাল—ক্রোধাপন্ন, রাগান্বিত, ক্রোধী, রাগী।

রাগিণী—গান, ভেদ, তান।

রাঙতা—রাংতা, মুড়িবার রাঙ্গ-পত্র।

রাঙা—রক্তবর্ণ, রক্তিমাকার।

রাঙাণ—রঙ দেওন, বিচিত্র।

রাজ—ইষ্টক-গৃহ-গাঁথক, স্থপতি, থই।

রাজতা—রাজত্ব, রাজতী, রাজপদ।

[ক্রমশঃ

১

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে টমাস ডানিয়েল ও উইলিয়ম ডানিয়েল—শিল্পিযুগল ভারতবর্ষে আসিয়া বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সে সকলের প্রতিলিপি ইংলণ্ডে প্রকাশিত এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। তাঁহাদিগের অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে সে সময়ের কলিকাতার কয়খানি চিত্র আছে। এসপ্লানেডের একাংশ, চীৎপুর রোড, কাউন্সিল হাউস, রাইটার্স বিল্ডিং—এই সকলে কলিকাতার তৎকালীন যান-বাহনের পরিচয় পাওয়া যায়। যান-বাহন নানারূপ ছিল এবং আজ আর সে সকল প্রায় চলিত নাই। কলিকাতার রাজপথে হস্তী, উষ্ট্র, রথের মত গোযান—এ সকল এখন "গল্প-কথা" হইয়াছে। অশ্বারোহীও আর প্রায় দেখা যায় না। গোযান আছে—তবে তাহা মাল বহনের জন্ত ব্যবহৃত। পাল্কী বহু দিন আত্মরক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারও আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিতেছে।

সেকালে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

হস্তীর ব্যবহার ভারতবর্ষে বহু দিন পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। যুদ্ধ হইতে গুরুভার দ্রব্য বহন—নানা কার্য্যে হস্তীর ব্যবহার ছিল। ব্রহ্মে এখনও গুরুভার কাষ্ঠ স্থানান্তরিত করিবার কার্য্যে হস্তী ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় পথ যে সকল স্থান দুর্গম সে সকল স্থানে ও শিকারের প্রয়োজনে হস্তীর ব্যবহার এখনও আছে। তাহা সম্ভ্রমের পরিচায়ক বলিয়াও বিবেচিত হইত। কলিকাতার মত সহরে তাহার ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল না। বোধ হয়, মফঃস্বল হইতে সময় সময় কলিকাতায় হস্তী আসিত। পূর্ব্ববঙ্গে জঙ্গলে হস্তী পাওয়া যাইত—আসামে তাহার অভাব ছিল না—এখনও নাই। খরস্রোতা পদ্মার ওপারে, পশ্চিম ও মধ্য-বঙ্গে হস্তী সাধারণতঃ "হরিহর সত্রের মেলা" (রেলষ্টেশন শোনপুর) হইতে আনা হইত। এই মেলায় এত লোকসমাগম হইত যে, শোনপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ম নাকি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম্ম। পুষ্করের মেলায় যেমন উট তেমনই "হরিহর সত্রের" মেলায় হাতীর ক্রয়-বিক্রয় সমধিক হইত।
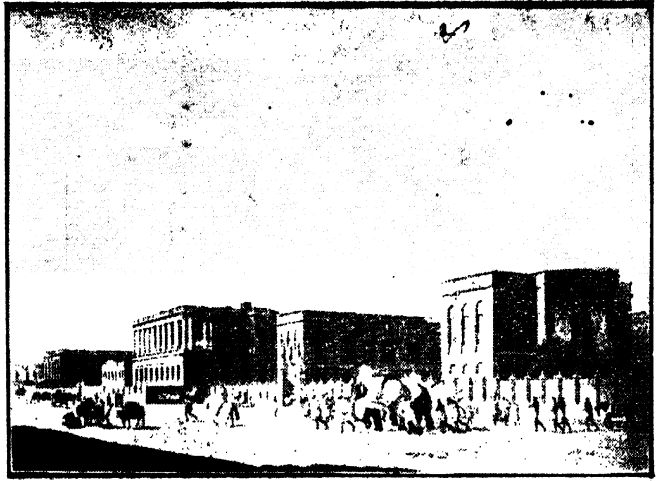
হাতীর পরে "কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ" উটের উল্লেখ করিতে হয়। ইহাকে "মরুভূমির তরণী" বলা হয়। মরুপ্রধান স্থানে ইহা যানবাহনরূপে ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী। কলিকাতায় ইহার ব্যবহার প্রয়োজন হইত না, সাধারণও ছিল না। তবে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেও—বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ রচনার পূর্ব্বে—রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া পর্য্যন্ত গতায়াতে উটের "ডাকগাড়ী" ছিল। উটগুলি নিম্বপত্র প্রিয় খাদ্যরূপে ভোজন করিত।

ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ী

পূর্ব্বে যে সকল চিত্রের উল্লেখ করিয়াছি, সে সকলে যে সকল অশ্ব চিত্রিত, সে সকল সবল ও পুষ্ট—আরোহী পৃষ্ঠে লইয়া যাইতেছে।

কলিকাতায় প্রথম বিলাতী গাড়ী—চৌঘুড়ী

সেকালে চৌরঙ্গীর একাংশ

প্রণয়িনী ছিল। তিনি নিশীথে প্রণয়িনীর নিকট যাইতেন; লোক-নিন্দার ভয়ে গাড়ীর চাকায় রবার-চাদর মুড়িয়া দিতেন। তাহা হইতে গাড়ীতে রবার টায়ার লাগাইবার উপায় হয়।

ধনীরা যেমন উৎকৃষ্ট ঘোড়া আমদানী করিতেন ও উৎকৃষ্ট গাড়ী ব্যবহার করিতেন, তেমনই অনেকের গাড়ী ও ঘোড়া উভয়ের, অবস্থা শোচনীয় ছিল। রাজনারায়ণ বসুর সময়ে যাহা "একাল" ছিল, তাহার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"এক্ষণে বাবুয়ানা চালচলন সাধারণ ও মোটা চালচলন বিরল। এক্ষণে কি ভদ্র, কি ইতর লোক, উপার্জ্জনশীল হইলেই গাড়ী পাল্‌কি ব্যতীত এক পাও চলিতে পারে না।" এই মন্তব্যের টীকায় তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"এক্ষণকার বাবুরা অতি কৃপাযোগ্য গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করিবেন, তথাপি হাঁটিয়া পথ চলিবেন না। একজন বাবু বগি করিয়া যাইতে-ছিলেন, তাঁহার বাড়ী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়ীখানি মন্থর-গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেকচাঁদ ঠাকুরের পক্ষিরাজের বংশ। • বেতো ঘোড়ার বাবা। সপাসপ চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, 'শিরোমণি মহাশয়! আমার গাড়ীতে আসুন।' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বাবু! আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমাকে শীঘ্র বাড়ীতে যাইতে হইবে'।"

কোন ব্যঙ্গরসিক সেইরূপ গাড়ী সম্বন্ধে একটি গল্প রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্ভুজ চট্টোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে ব্যবহারাজীব ছিলেন। এক দিন আদালতের কোন ইংরেজ জজ—ওয়েলার জুড়ীতে টানা গাড়ীতে আদালতে যাইবার পথে দেখেন অতি ক্ষুদ্র কৃপাযোগ্য দুইটি ঘোড়া একখানি গাড়ী টানিয়া মন্থর গতিতে চলিতেছে। গাড়ীতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া জজ আপনার গাড়ী থামাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ঘোড়া, চ্যাটার্জ্জী?" চট্টোপাধ্যায় সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বলিলেন, "কাণ্ট্রি হর্স" অর্থাৎ দেশী ঘোড়া। প্রশ্ন হইল, "ইহারা কি খায়?" উত্তর হইল, "ভেজিটেবল পিলিংস"—অর্থাৎ কুটনার খোসা। জজ তাঁহার সহিসদিগকে তাঁহার ঘোড়ার টিফিনের ছোলা-ভিজা চট্টোপাধ্যায়ের ঘোড়াকে দিতে বলিলেন। সে ঘোড়া দুইটি তাহা দেখিয়া আনন্দে চিঁ—হিঁ। চিঁ—হিঁ! রব করিয়া লাফাইতে গিয়া পড়িয়া গেল ও তাহাদিগের অশ্বলীলা শেষ হইল।

ধনীদিগের জন্য আরব হইতে যেমন অষ্ট্রেলিয়া হইতেও তেমনই ঘোড়া আমদানী হইত।

তখনও ঘোড়ার গাড়ীর চলন অধিক ছিল না। না থাকিবার কারণ, উপযুক্ত পথের অভাব। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মোরাশ জোকাই বলিয়াছেন, পথ যে স্থানে ভাল নহে, তথায় কর্দ্দমাক্ত পথে গাড়ীতে চড়া অপেক্ষা হাঁটিয়া যাওয়াই সুবিধাজনক; কারণ, গাড়ী মানুষের দেহের তুলনায় গুরুভার এবং মানুষের দুই পদ চালান যত সহজ, গাড়ীর চারিখানি চাকা টানা তত সহজ নহে।

কলিকাতার পথে তখন বিহারের এক্কাগাড়ীও ছিল না। "পঞ্চানন্দের" এক্কার বর্ণনা—

"বিঘোরে বিহারে চড়িনু এক্কা
লাগে— ধুবধাব তায় বিষম ধাক্কা।
* * * *
কিবা বাঁকা দুটি বাঁশ শোভে দুই পাশ
মাঝখানে তার সকলি ফক্কা;
দেয় পাতালতা দিয়ে আসন গড়িয়ে
ছেঁড়ে যদি পথে অমনি অক্কা।"
—ইত্যাদি।

"কলিকাতায় পাকা রাস্তা নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন হইতে থাকে—অফিস জুয়ান, ব্রাউনবেরী, ফিটন, টমটম, ক্রহাম, বগী, ল্যাণ্ডো, ল্যাণ্ডোলেট, সারাব্যাঙ্ক প্রভৃতি।

কলিকাতায় কয়টি ইংরেজ কোম্পানী গাড়ী নির্ম্মাণের জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। সে সকলের মধ্যে ষ্টুয়ার্টের ও ডাইকের কারখানার খ্যাতি অধিক ছিল—মিলটনের খ্যাতি তাহার পরে। অল্প দিনের মধ্যেই ঐ সকল কারখানায় শিক্ষিত দেশীয় কারিগরদিগকে লইয়া বাঙ্গালীরাও কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙ্গালীদিগের কারখানা প্রায় সবই ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। প্রথমে ঘোড়ার গাড়ীর চাকায় লোহার হাল থাকিত—রবার টায়ার অনেক পরে প্রচলিত হয়। ইহার উৎপত্তি কৌতুকাবহ। ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের পত্নী [illegible] হইলেও তাঁহার এক

রাজনারায়ণ বসুর পরবর্ত্তী কালের বিষয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কলিকাতা [illegible]' [illegible]—

"তখন তো ট্রামগাড়ী হয় নাই, কাজেই যাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া যাইতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে তিন উপায়ে গতায়াত করিতে হইত—ঘরের গাড়ী, ঠিকা গাড়ী অথবা পাল্কী। তখন ঠিকা গাড়ী ও পাল্কীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। তখন বড়লোকদের অর্থাৎ ধনীদের ধনবত্তা দেখাইবার অন্যতম প্রধান উপায় ছিল—সকালে সুদৃশ্য জুড়ি অথবা চৌঘুড়ি বা ছয়ঘুড়ি আটঘুড়ি পর্য্যন্ত সুদৃশ্য ল্যাণ্ডোতে যুতিয়া সহরের দেশীয় পল্লীর মধ্যে নিজে হাঁকাইয়া বেড়ানো ও দুর্গন্ধ বায়ুসেবন এবং একটা সুদৃশ্য ঘোড়া জুতিয়া 'পাল্কী গাড়ী' বা 'আফিস ব্রাউনবেরি' গাড়ীতে চড়িয়া স্কুলে বা আফিসে যাতায়াত। বৈকালে ধনী বাবুরা আবার সুদৃশ্য ওয়েলার জুড়ি যুতিয়া ল্যাণ্ডো, ফিটন বা অন্য কোন প্রকার মাথা-খোলা গাড়ীতে গঙ্গার ধারের রাস্তায় 'হাওয়া খাইয়া' পরে, বিলাতী ব্যাণ্ড বুঝুন বা নাই বুঝুন, ইডেন গার্ডেনের ধারে গাড়ী রাখিয়া তাহাতেই বাজনা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতেন। * * * গোরার ভয়ে বাবুরা ইডেন গার্ডেনের অন্ততঃ সম্মুখের দিকে নামিতে সাহস করিতেন না—ধুতি-চাদর পরিয়া নামিলেই হয় গোরাদের হাতে, আর না হয় তো ইংরাজ কনষ্টেবলের হাতে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতে হইত।"

গঙ্গার ধারে খোলা গাড়ীতে 'হাওয়া খাওয়া' লইয়া শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রইস ও রাইয়ত' পত্রে দীননাথ বসু মল্লিকের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দীননাথের পুত্রগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

যাহাতে বাঙ্গালীরা ও দরিদ্র য়ুরোপীয়রা ইডেন গার্ডেনে প্রবেশ করিতে না পারে সেই জন্য এক কালে কলিকাতার য়ুরোপীয় পুলিস কমিশনার নিয়ম করিয়াছিলেন, কেহ বিনা ছাড়ে তথায় যাইতে পারিবে না। সেই নিয়ম বে-আইনী মনে করিয়া কলিকাতার ও হাইকোর্টের কোন বড় ব্যারিষ্টার ছাড় না লইয়া তথায় প্রবেশ করেন। পুলিস কমিশনার বাধ্য হইয়া পরদিনই তাঁহার ঐ আদেশ প্রত্যাহার করেন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছেন :—

"বাবুদের দৌলতে সেকালে কত রকমেরই গাড়ী যে বিলাত হইতে আমদানী হইত, তাহার ইয়ত্তা ছিল না—ল্যাণ্ডো, ফিটন, বগি, ল্যাণ্ডোলেট, দশফুকার, ব্রাউনবেরি, ব্যারুষ ইত্যাদি। উচ্চ দরের ডাক্তার বা জজ প্রভৃতি, যাঁহারা আপনাদের গাম্ভীর্য্য-গৌরব বাহিরে বজায় রাখিতে প্রচলিত রীতি অনুসারে বাধ্য হইতেন—ভিতরে তাঁহারা যতই কেন মদ-মাতাল বা হল্লাবাজ হৌন না—তাঁহারাই সাধারণতঃ ক্রহাম গাড়ী ব্যবহার করিতেন। ক্রহাম গাড়ীর আরোহীদিগকে দেখিলে সকলের মনে একটা মহা 'সমীহ' ভাব জাগিয়া উঠিত—মনে হইত, না জানি, আরোহী হাইকোর্টের কোন্ জজ বা মেডিকেল কলেজের কোন্ বড় ডাক্তার।"

আবার :—

"গাড়ীঘোড়ার ভিতর দিয়া সেকালের বড়লোকদের বড়মানুষী দেখাইবার বেশ একটা মজার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহারা নিজেরা, বিশেষতঃ তাঁহাদের ছেলেপিলেরা, স্কুলে বা আফিসে হয় ঘরের গাড়ীতে যাইতেন, আর কোন কারণে কোন দিন ঘরের গাড়ী ব্যবহারের অসুবিধা হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকা গাড়ীতে চড়িতেন না, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেই চড়িতেন। * * সে সময়ে প্রথম শ্রেণীর ঠিকা গাড়ীর নামও কেহ জানিত না।"

এক এক স্থানে ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইয়া আরোহী সংগ্রহ করিত। ধর্ম্মতলার মোড়ে—যে স্থানে এখন যাত্রীদিগের জন্য একটি আশ্রয়গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় যেমন, বিডন স্কোয়ারের মোড়ে তেমনই বহু ঠিকা গাড়ী থাকিত এবং চালকরা "শেয়ারের যাত্রীর" জন্য চীৎকার করিত—"ভবানীপুর—ভবানীপুর—৪ পয়সা," অথবা "খিদিরপুর—খিদিরপুর—৬ পয়সা।" অথবা "কাশীপুর—কাশীপুর—৪ পয়সা! শেয়ারের গাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীর জন্য আরোহীদিগকে অনেক সময় অপেক্ষা করিতে হইত। অবশ্য প্রায় সকল গাড়ীতেই আরোহীর সংখ্যা—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা অধিক লওয়া হইত। পুলিস নিবারণ করিত না; কারণ, পুলিসের সহিত সে জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করা হইত। বিশেষ মহিলারা যখন কালীঘাটে বা গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তখন এক গাড়ীতে কত লোক যাইতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কোন কোন লোকের অফিস, আদালত, কলেজ, প্রভৃতি কর্ম্মস্থলে গতায়াতের মাসিক হিসাবে গাড়ী ভাড়া করা থাকিত। কতকগুলি ইংরেজ কোম্পানীর ভাল গাড়ী ও ভাল ঘোড়া সরবরাহ করিবার আড়গড়া ছিল—কুক কোম্পানী, হার্ট ব্রাদার্স, ভেলাণ্ট কোম্পানী, ব্রাউন কোম্পানী, মিলটন কোম্পানী প্রভৃতি। ইহারা ঘোড়া বিক্রয়ও করিত। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের যে অংশ চাঁদনী হইতে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত—তাহাতেই অনেকগুলি আড়গড়া ছিল। হাইকোর্টের জজরা প্রায় সকলেই আড়গড়ার গাড়ী-ঘোড়া ব্যবহার করিতেন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সে নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। কোন কোন ডাক্তার এবং অধিকাংশ য়ুরোপীয় দালাল আড়গড়ার গাড়ী-ঘোড়া ব্যবহার করিতেন—আপনারা গাড়ী-ঘোড়া রাখার "হাঙ্গামা" করিতেন না।

য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণে কয় জন বাঙ্গালীও আড়গড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অধিকাংশই সে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করেন নাই। বোধ হয়, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহারা বিদেশ হইতে অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে ঘোড়া আমদানী ও বিক্রয় করিতেন না। য়ুরোপীয় কোম্পানীগুলি তাহা করিতেন এবং গাড়ী-ঘোড়া ভাড়া দেওয়া তাঁহাদিগের অনেকেরই "উপরি কারবার" বা side-business ছিল। আড়গড়ার নূতন ঘোড়া ব্যবহার্য্য করিবার জন্য "ব্রেক করা" অর্থাৎ "ভাঙ্গা" এক বিষম বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। বহু চেষ্টায় ও কষ্টে সেগুলিকে আরোহী লইবার বা গাড়ী টানিবার মত শিক্ষিত করা হইত।
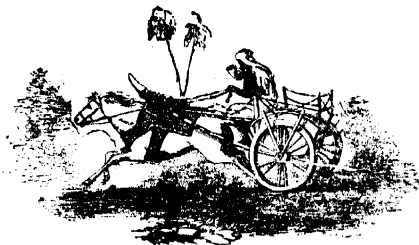
ডাকগাড়ী

ব্যায়াম বা সখ হিসাবে অশ্বারোহণ অনেক য়ুরোপীয় পুরুষ ও মহিলা করিতেন। সেকালে বাঙ্গালী সমাজেও পুরুষরা সকালে গড়ের মাঠে বা অন্যত্র ঘোড়ায় চড়িতেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রথমে দিগম্বর মিত্রের পুত্র ও বহু দিন পরে পাথুরিয়াঘাটার রমানাথ ঘোষের পুত্র অশ্ব হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। উত্তর-কলিকাতায় অর্থাৎ দেশীয় পল্লীতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যারিষ্টার দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও কিরণচন্দ্র বসু এবং হাটখোলার রায়-পরিবারের যোগেন্দ্রনাথ, যদুনাথ ও রমেন্দ্রনাথ খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসর সেই অভ্যাস রাখিয়াছিলেন।

সেকালে ধনীরা কেহ কেহ প্রাতঃকালে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত বা গঙ্গার তীরে যাইতেন। ঘোড়ার গাড়ী পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত—তাহাতে তাঁহারা প্রত্যাগমন করিতেন।

ক্রমে কলিকাতার কতকগুলি পথে প্রথমে ঘোড়া-টানা ট্রাম ও পরে বিদ্যুৎ-চালিত ট্রাম চলিতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্মতলার মোড় হইতে খিদিরপুর পর্য্যন্ত ট্রাম কিছু দিন ষ্টীম এঞ্জিনে চলিয়াছিল।

ক্রমে পরিবর্ত্তন হয় এবং ঘোড়ায়-টানা গাড়ীর স্থান মোটর গাড়ী গ্রহণ করে; তাহার পরে যাত্রিবাহী বাস প্রচলিত হয়।

ঘোড়ার ও ঘোড়ার গাড়ীর কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে কয়টি কথা বলিব।

স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন, তাঁহার মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন প্রথম বোম্বাই হইতে সস্ত্রীক বাড়ীতে আসিলেন, তখন "ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া" বাড়ীতে "শোকাভিনয়" হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—"বৌঠাকরুণকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকেও ঘোড়ায় চড়াইয়াছিলেন—প্রথমে শিলাইদহে—টাট্টু ঘোড়ায়, তাহার পরে কলিকাতায় "বেশ মেজাজি ঘোড়ায়।"—এক দিন সেই ঘোড়া "আমাকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে যেখানে সে দানা খেত।"

দূরে যাইতে হইলে ঘোড়ার "ডাক" বসান হইত; অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট দূরবর্ত্তী স্থানে ঘোড়া বদল করা হইত। বড়লাট যখন চৌঘুড়ীতে কলিকাতা হইতে বারাকপুরে যাইতেন, তখন মধ্যপথে আগরপাড়ায় ঘোড়া বদল হইত। সে গাড়ী—যখন চলিত তখন লোককে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বিউগল বাজান হইত। সাহিত্য পরিষদ যখন শ্যামপুকুরের মোড়ে ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত, তখন তাহার গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য আমরা অর্থসংগ্রহ করিতে যাইতাম। ভবানীপুর, বালীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যাইবার দিন সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ঘোড়ার "ডাক" বসাইতেন। তিনি এক জুড়ীতে বরাহনগর হইতে আসিতেন; আর দুইটি ঘোড়া পূর্ব্বেই পরিষদের সম্মুখে আনিয়া রাখা হইত; তথায় ঘোড়া বদল করা হইত।

মহিলাদিগের গঙ্গাস্নানে বা কালীঘাটে যাইবার সময় গাড়ীতে ভীড়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিতেন, পূর্ব্বে গাড়ী হিসাবে থিয়েটারের "পাশ" দেওয়া হইত; যথা—"অমৃত বাবুর বাড়ী—এক গাড়ী।" গাড়ী আসিয়া থিয়েটারের দ্বারে দাঁড়াইলে যখন তাহার রুদ্ধদ্বার মুক্ত করা হইত, তখন অনেক সময় দুই তিন জন আরোহিণী ছিটকাইয়া পড়িয়া যাইতেন—গাড়ীতে যাত্রীর এত বাহুল্যও থাকিত!

২

অশ্বযুক্ত যানের মধ্যে, বোধ হয়, এক্কাই এ দেশে প্রথম স্বদেশী যান। কিন্তু কলিকাতায় ইহার প্রচলন ছিল না বলিলেই হয়। ডানিয়েলদ্বয়ের অঙ্কিত চিত্রে যে "রথ" গোযান দেখা যায় তাহাও সময় সময় অশ্বযুক্ত হইত। কিন্তু কলিকাতায় তাহা বড় দেখা যায় নাই। মাদ্রাজে একই প্রকার যানে গো ও অশ্ব যুক্ত করা হয়—একই যান গো ও অশ্ব ভেদে "ব্যাণ্ডি" ও "ঝটকা" হয়।

কলিকাতায় য়ুরোপীয়ানরা—বিশেষ য়ুরোপীয় মহিলারা অপরাহ্ণে ঘোড়ার গাড়ীতে গঙ্গার ধারে "হাওয়া খাইতে" যাইতেন। গাড়ীগুলি য়ুরোপীয় আদর্শের—অনেক সময় য়ুরোপ হইতে আমদানী। টমাস হলরয়েড নামক এক জন য়ুরোপীয় "জেনোবিয়া" জাহাজে ইংলণ্ড হইতে "লণ্ডন অ্যাণ্ড ব্রাইটন" ঘোড়ার গাড়ী আমদানী করিয়াছিলেন। তাহা যখন কলিকাতার রাস্তার বাহির হয়, তখনও তাহার চাকায় ইংলণ্ডের কর্দমলেপ ছিল। গাড়ীতে ৪টি ঘোড়া যুতিয়া যখন তাহা গড়ের দিকে চালান হইত, তখন লোক সবিস্ময়ে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহা দেখিত।

বিচারক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা "বেরুশ" গাড়ীতে গঙ্গার ধারে যাইতেন—য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী ও আর্ম্মেনীয়ানরাও তাহাই করিতেন। এমন কি ২০ বা ২৫ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী তরুণরাও মখমলের জামা পরিয়া জরীর কাজ-করা টুপী মাথায় দিয়া ঐরূপ গাড়ীতে যাইতেন। অকৃতদার ব্যবসায়ী বা দালাল ব্রুহাম গাড়ীই অধিক ব্যবহার করিতেন। যাঁহারা অপরাহ্ণে গাড়ীতে গঙ্গার ধারে যাইতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দেও লাল পাগড়ীপরা মাড়বারী ত দেখা যাইতই, পরন্তু পার্শী টুপীপরা পার্শীও দেখা যাইত। সে সময় কলিকাতায় যে নানা জাতীয় লোক ব্যবসা ব্যপদেশে আসিতেন ও থাকিতেন

পাল্কী গাড়ী
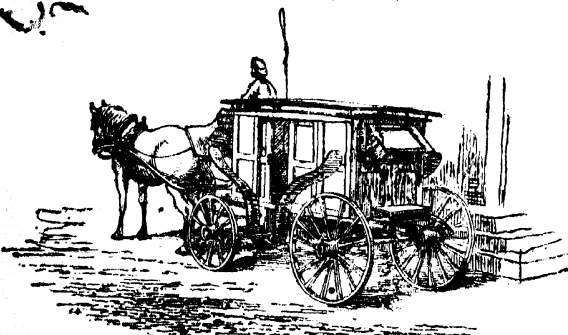
তাঁহাদিগের মধ্যে পার্শীরাও উল্লেখযোগ্য। অগ্নির উপাসক পার্শীরা শব দাহও করেন না প্রোথিতও করেন না—উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে পক্ষীর দ্বারা ভক্ষিত হইবার জন্য রক্ষা করেন। বেলিয়াঘাটায় কলিকাতার পার্শীদিগের ঐরূপ "শ্মশান" আছে—ইংরেজরা তাহাকে Tower of Silence বলিতেন। এই পার্শী-সম্প্রদায় মুসলমানদিগের দ্বারা ধর্ম্মান্তরিত হইবার ভয়ে ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইঁহারা যে স্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানেই—ইহুদীদিগের ধর্ম্মমন্দির "সিনাগগের" মত—অগ্নির মন্দির করিতেন। সে কালের কোন ইংরেজ লেখক (গ্রাণ্ট) লিখিয়াছেন, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ফিরিঙ্গী ও পর্টুগিজরা নানারূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া সঞ্চিত অর্থে গঙ্গাতীরে গাড়ীতে সান্ধ্য ভ্রমণে আসিত। বাঙ্গালী তরুণরা য়ুরোপীয় বেশে তেজী ঘোড়ায় চড়িয়া আসিত এবং বৃদ্ধ ভারতীয়রা গাড়ীতেই আসিতেন।

কলিকাতায় তখন "পাল্কী গাড়ীর" যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তাহা এক ঘোড়ার হইলে তাহার এক জন এবং যুড়ী হইলে দুই জন সহিস থাকিত।

"ব্রাউনবেরী" গাড়ীর উৎপত্তি সম্বন্ধে গল্প আছে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতার উড়িয়া পাল্কী বাহকরা ধর্ম্মঘট করে, তখন লোকের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। কারণ, তখন পাল্কীর ব্যবহার অত্যন্ত অধিক ছিল। সেই সময় কলিকাতায় ব্রাউন্‌লো নামক এক জন য়ুরোপীয় ছিলেন। পাল্কীর অভাবে কি উপায়ে আফিসে যাইবেন ভাবিয়া তিনি তাঁহার পাল্কীতে চারিখানি চাকা লাগাইয়া দুইটি দণ্ড যুক্ত করিয়া একটি ঘোড়া যুতিয়া সেই অভিনব যানেই অফিসে গিয়াছিলেন। সেই যান "ব্রাউনবেরী" নামে পরিচিত হয়। ক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা পাল্কী-বেহারাদিগের ধর্ম্মঘট অবসানের অন্যতম প্রধান কারণ।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান ব্রাউনবেরী গাড়ী ব্রাউনলোর উদ্ভাবিত গাড়ীর ক্রমবিবর্ত্তন ফল।

পাল্কী-গাড়ীর নামেই তাঁহার উদ্ভব পরিচয় সপ্রকাশ। ইহার চারিখানি চাকাই একরূপ অর্থাৎ সম্মুখের চাকা ছোট নহে। ইহা চারিখানি চাকার উপর বসান—একখানি পাল্কী। ইহা প্রয়োজন মত ঘোড়া যুতিয়া বা ঠেলিয়া চালান যাইত; আবার প্রয়োজন হইলেই পাল্কীখানি চাকার উপর হইতে তুলিয়া মানুষের বাহ্য যানে পরিণত করা যাইত। তখন তাহাতে তাহাদিগের ব্যবহারার্থ দুই দিকে দণ্ড সন্নিবিষ্ট করা হইত।

টমটম বা ডগবার্ট অপেক্ষা বোগী গাড়ীর প্রচলন অধিক ছিল। বোগী গাড়ীর উপরে যে চাকা থাকিত, এ দেশের দারুণ রৌদ্রের জন্য তাহা অপরিহার্য্য। ইংলণ্ডেও পরে ঐ নাম প্রচলিত হয়।

আর এক প্রকার ঘোড়ার গাড়ীর নাম—কেরাঞ্চী। হেমচন্দ্রের কবিতায়ও ইহার উল্লেখ আছে। ইহা ইংলণ্ডের পুরাতন ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর অনুকরণ। ইহাতে দুইটি অশ্ব ব্যবহৃত হইত।

অধিকাংশ অশ্বই—ইংলণ্ডের অশ্বের মত, কেবল জই খাইতে পায় না। তবে ইংলণ্ড হইতে আনীত ঘোড়দৌড়ের বা শিকারের জন্য ব্যবহৃত বা সখের ঘোড়া আহার্য্যের অর্দ্ধাংশ জই পাইত। কারণ এ দেশে জই অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যবান। এক জন শস্য সরবরাহকারীর সে সময়ে লিখিত পত্রে ঘোড়ার জন্য জই না পাঠাইবার কারণ যেরূপে বিবৃত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত পত্র হইতে বুঝা যাইবে—

Sair—I am Wright to say that the Price of oats ar verry der 2 Rs. per mound Therefore I dint Send the oats

Your most objently Servant
Soorgecomar Shaw.

বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক জনসন তাঁহার অভিধানে জই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—জই এক প্রকার দ্রব্য—ইংলণ্ডে ঘোড়া ও স্কটলণ্ডে মানুষ ইহা খাইয়া থাকে।

আরবে, তুরস্কে, পারস্যে ও আফগানিস্থানে যব, যবের বিচালী ও কাঁচা ঘাস ঘোড়াকে খাদ্যরূপে প্রদান করা হয়। ব্রহ্ম হইতে পূর্ব্বেও টাট্টু (ছোট) ঘোড়া আমদানী হইত। তথায় ঘোড়াকে ধান ও ঘাস খাইতে দেওয়া প্রথা। কলিকাতায় ঘোড়াকে ছোলা দেওয়াই রীতি ছিল। বিদেশী অশ্ব কয় দিনেই ছোলা খাইতে অভ্যস্ত হইত। কারণ, ইহার গন্ধ জইএর গন্ধ অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ। ছোলা জই অপেক্ষা পুষ্টিকর। কলিকাতার রাজপথে ছোলাভাজা বিক্রীত হইত—ফেরিওয়ালা হাঁকিত—"চানা জোর গরম।" প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় ছোলা গড়ে এক টাকা দুই আনায় বিক্রীত হইত—সুজন্মার বৎসর ১৪ আনা মণ দরেও ছোলা পাওয়া যাইত। ভাল ছোলা পাটনা হইতে আমদানী হইত। দিনে ৩ বার ভূষীর সহিত মিশাইয়া ছোলা ঘোড়াকে খাইতে দিবার রীতি তখনও ছিল।

কথিত আছে, সম্রাট শাহজাহান পুত্র ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া ২টি মাত্র খাদ্য-শস্যে জীবন ধারণ করিবার ব্যবস্থায় বলিয়াছিলেন, তিনি ছোলা (চানা) ও চাউল ব্যবহার করিবেন। তাঁহার রন্ধনকারী ঐ দ্বিবিধ শস্যের নিত্য-নূতন খাদ্য এক বৎসর ১০ দিন তাঁহাকে দিয়াছিল।

বিদেশ হইতে নীত ঘোড়ার খাদ্য সম্বন্ধে একটি গল্প এই স্থানে বলিব। লর্ড কার্জ্জনের দিল্লী দরবারের সময় ধনীদিগের নূতন অশ্বের প্রয়োজন হইবে জানিয়া কয় জন ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে ভাল ভাল ঘোড়া আমদানী করিয়া "ব্রেক" করিয়া চড়া দামে বিক্রয় করিয়াছিলেন। আমাদিগের পরিচিত কোন ভদ্রলোক সেইরূপ ২টি ঘোড়া কিনিয়াছিলেন। ঘোড়া কিছুতেই দানা (ছোলা) খাইতে চাহে না দেখিয়া তিনি কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারেন, সে ঘোড়া যে স্থান হইতে আমদানী করা হইয়াছিল, তথায় অশ্বকে জই খাইতে দেওয়া হয়। বাধ্য হইয়া তিনি কিছু দিন ঘোড়া ২টিকে জই খাইতে দিয়া বিক্রয় করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

শত বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় ঘাসিয়াড়ার মাসিক বেতন ৩ বা ৪ টাকা ছিল। তখন শুধু দুর্ব্বাঘাস টাকায় এক শত হইতে দেড় শত আঁটি পাওয়া যাইত।

তখন কলিকাতায় নানারূপ অশ্ব দেখা যাইত।

এক কালে ভারতবর্ষে পারস্য হইতে ঘোড়ার আমদানী হইত—কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখা যায়:—

"দীর্ঘোষ্মী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডপেষু
নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ বনায়ুদেশ্যাঃ।
বক্ত্রোষ্মণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি
লেহ্যানি সৈন্ধবশিলাশকলানি বাহাঃ।

অর্থাৎ

"পটগৃহে বাঁধা পারসিক অশ্বদল
জাগিয়া উঠিল তব, সরোজ-নয়ন,
সম্মুখে নির্ম্মল লেহ্য সৈন্ধব-লবণ
মুখের মারুতে তাহা করিছে শ্যামল।"

পারস্য দেশ হইতে কিরূপ অশ্ব নীত হইত বলিতে পারি না। আরব হইতে যে উৎকৃষ্ট অশ্ব আমদানী হইত, তাহা কলিকাতায় আমরাও সৌখিন ব্যক্তিদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি।

আরবী অশ্বের মূল্য অধিক থাকায় সকলে তাহা ব্যবহার করিতে পারিত না। কোন বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার যখন মফঃস্বলে একটি বড় "কাজের" জন্য ছিলেন, তখন ইংরেজ একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার তাহা পরিদর্শন করিতে গমন করেন। পথে একটি আরবী ঘোড়া দেখিয়া একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারেন, উহা "এঞ্জিনিয়ার বাবুর"। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি "এঞ্জিনিয়ার বাবুকে" বলেন—"আপনি আরবী ঘোড়া কিনিয়াছেন। আপনি পদত্যাগ করিবেন, কি আমি আপনার কার্য্য সম্বন্ধে সন্ধান করিব?" অর্থাৎ অসদুপায় ব্যতীত আরবী ঘোড়া কিনিবার মত অর্থার্জ্জন হইতে পারে না। "এঞ্জিনিয়ার বাবু" পদত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পরে কলিকাতায় আসিয়া তিনি বেসরকারী ভাবে কাজ করিতে থাকেন। তিনি সমাজে সুপরিচিতও হইয়াছিলেন।

ইহাকে দেখিয়াছি, আরবরা ঘোড়া রৌদ্রে চরিতে দেয়—ঘোড়ার পৃষ্ঠে একখানি মোটা কম্বল থাকে যে, সূর্য্যের রশ্মি মেরুদণ্ডে না লাগিতে পারে। অবশ্য সে দেশে মরুভূমিতে ঘাস জন্মে না বলিলেই হয়। সুতরাং চরিয়া ঘোড়া যে অধিক কিছু খাইতে পায় না, তাহা বলা বাহুল্য।

ইংলণ্ড হইতেও ঘোড়া আমদানী হইত—ইংরেজদিগের মত ধনী বাঙ্গালীরাও তাহা ব্যবহার করিতেন। লর্ড মেও শিকার ভালবাসিতেন। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে শিকারের জন্য ঘোড়া আনিয়াছিলেন। একবার চুয়াডাঙ্গায় শিকারে যাইবার পথে নদী পার হইবার সময় তাঁহার ঘোড়া খেয়া নৌকায় "ভড়কিয়া" জলে লাফ দিয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া ৬ সপ্তাহের মধ্যে লর্ড মেও খেয়া নৌকার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে কলিকাতায় ঘোড়া আমদানী পরে আরম্ভ হয়।

ব্রহ্ম তখন স্বাধীন দেশ ছিল। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত ভারতের ব্যবসা—বিশেষ সেগুন কাষ্ঠের ব্যবসা ছিল। বাঙ্গালী লালচাঁদ মিত্র দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রথম ব্রহ্ম হইতে কলিকাতায় সেগুন কাঠ আমদানী করিতেন। তাঁহার নামে "লালচাঁদ" মার্কা কাঠ বহু দিন পরিচিত ছিল। ব্রহ্ম হইতে যে কলিকাতায়ও ঘোড়া আমদানী হইত, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঘোড়াগুলি ছোট হইলেও অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সুদৃশ্য।

দেশী ঘোড়া নানারূপ ছিল। বাঙ্গালার ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া হইতে পশ্চিমা বড় ঘোড়া কলিকাতায় আমদানী হইত। ভাড়া গাড়ীতে ছোট ও বড় নানারূপ ঘোড়া ব্যবহৃত হইত। পশ্চিমা ঘোড়ার আমদানী প্রধানতঃ "হরিহর ছত্রের" (শোনপুর) মেলা হইতে হইত। সে সকলের মধ্যে অনেক ঘোড়া যেমন সুন্দর তেমনই পরিশ্রমী। কোন কোন ইংরেজ বলিয়াছেন বটে, দেশী ঘোড়া লাথি ছুঁড়ে ও কামড়ায়; কিন্তু সে কথা সত্য নহে—যে সকল ঘোড়া দুষ্ট সে সকল নিয়ম নহে—নিয়মের ব্যতিক্রম।

সে কালে পাঠ্যপুস্তকে আরবী ঘোড়ার প্রভুভক্তির গল্প পাঠ করিয়াছিলাম। দেশী ঘোড়ার প্রভুপ্রীতিও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

সে কালে কলিকাতায় ঘোড়ার ব্যবহার অধিক ছিল—কলিকাতার রাস্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার সংখ্যাও বাড়িয়াছিল। ঘোড়া ধনীর বিলাসের নিদর্শন ও মধ্যবিত্তের প্রয়োজনীয় ছিল।

তখন কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক অর্থাৎ চিঠিপত্র যাইত—পথে ঘোড়া বদল করা হইত এবং সেই জন্য ঘোড়া বদল করিয়া যাওয়াকে ঘোড়ার ডাক বসান বলা হইত। এখন আর ঘোড়ার গাড়ীতে পত্রাদি যায় না; কিন্তু 'ডাক' রহিয়া গিয়াছে—তাহা পত্রাদির জন্যও যেমন, বাহন পরিবর্ত্তনের জন্যও তেমনই ব্যবহৃত হয়। পত্রাদি এখন আর ট্রেণেও যায় না—বিমানে যাইতেছে। বিজ্ঞান দূরত্ব নিঃশেষ করিয়াছে।

সে কালের কলিকাতার যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে কালের কলিকাতার যান-বাহনেরও তেমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মোটর লরীর সহিত প্রতিযোগিতায় যেমন গরুর গাড়ী ও মহিষের গাড়ী লোপ পাইতেছে, তেমনই মোটর যানের ব্যবহার-বৃদ্ধিতে ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন কমিতেছে। প্রাচীন কলিকাতার রাজপথে "অমনিবাস" গাড়ী ঘোড়ায় টানিত; এখন মোটর বাস তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এমন কি ঘোড়ায়-টানা ট্রাম আর নাই—বিদ্যুৎ-চালিত ট্রাম চলিতেছে; কিন্তু হয়ত আর কিছু দিন পরে—লণ্ডনে যেমন হইয়াছে তেমনই—মোটর বাস ট্রামের স্থানও অধিকার করিবে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ভারতে গোযান এখনও পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে—তবে তাহার স্থান অন্য যান দ্রুত অধিকার করিতেছে। ঘোড়ার গাড়ী নানারূপ বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এখনও কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া সঙ্কুচিত অবস্থায় কতকগুলি স্থানে রহিয়াছে। নূতন নূতন যান বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি করিয়া অগ্রসর হইতেছে। কলিকাতার পথে আর পুরাতন আমলের যান-বাহন নাই। কেবল যাত্রী পূর্ব্ববৎ—তাহাতে পরিবর্ত্তন দেখা যায় না—কেবল যাত্রীদিগের বেশ আর পূর্ব্ববৎ নাই। তাহাও বিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে।

কলিকাতার গঙ্গাতে যে সব যান পূর্ব্বে দেখা যাইত, সে সকলের কথা আমরা পরে বলিব। সে সকলেও পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে।

আকাশ দেখা জানলা

(প্রথম পুরস্কার)

—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিযোগিতা

বৃক্ষ-বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অন্ততঃ পক্ষে দুই সহস্রাধিক আলোকচিত্র পাওয়া যাওয়ায় বাধ্য হইয়া আগামী সংখ্যাতেও বৃক্ষ-বিষয়ক চিত্র মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইতেছি। ইতিমধ্যে, অর্থাৎ আগামী ২২শে অগ্রহায়ণের মধ্যে বৃক্ষ-বিষয়ের চিত্র যদি কেহ দিতে অভিলাষী হন, পাঠাইতে পারেন।

আকাশ-মুখী
—বীথিকা সরকার

কোথায় আকাশ ?

(দ্বিতীয় পুরস্কার)
—অবনী মতিলাল

একটি সুখী পরিবার
—দে'জ পলিফটো ষ্টুডিও

আকাশ কত উঁচু ?
(তৃতীয় পুরস্কার)
—মদন বোস

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা দেবীর শেষ শয্যার পার্শ্বে বাঙালী অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণ।

ক্ষণপ্রভা

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

পূতাস্থির সম্মুখে কাম্বোডিয়া প্রাসাদ-নৃত্য
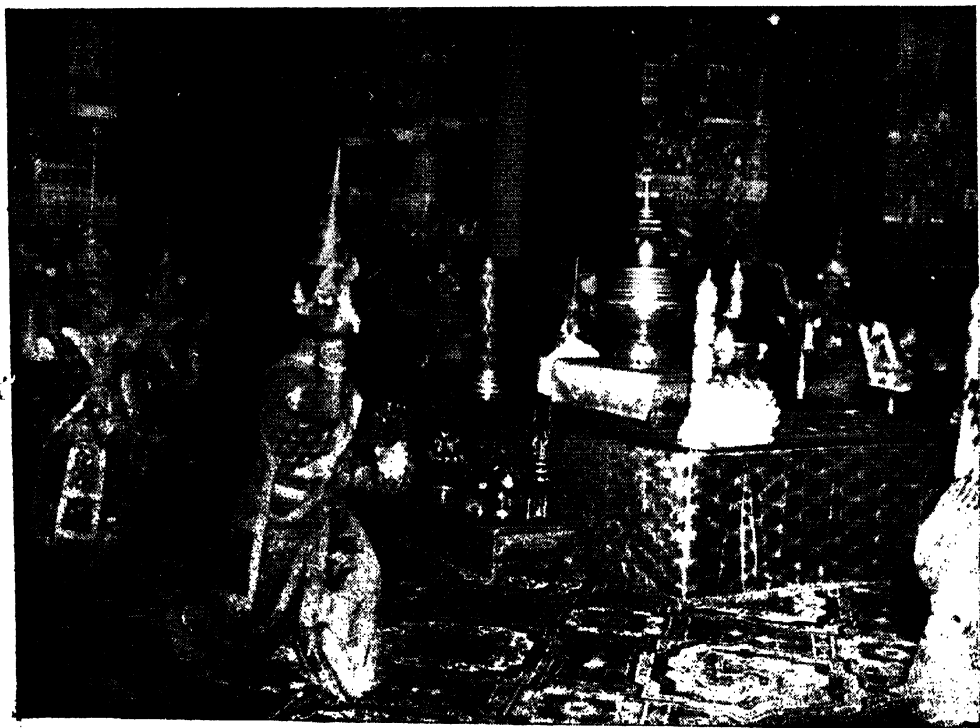
ভ্রমণবিরতি

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছেলেবেলায় দেশভ্রমণের সখ ছিল ষোল আনা, কিন্তু পকেটে এক আনাও ছিল না। সম্বলের মধ্যে ছিল একখানা য়্যাটলাস। সেখানার সবটা ছিল আমার নখদর্পণে। য়্যাটলাস খুলে বসে আমি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো দিগ্বিজয় করে আসতুম। বড় হয়ে অনেক দেশ বেড়িয়েছি, দেশভ্রমণের সাধ ষোল আনা না হোক পাঁচ আনা মিটেছে। বাকী এগারো আনাও কে জানে কবে মিটবে! কিন্তু ততঃ কিম্!

ততঃ কিম্ শুনে আপনারা হয়তো অবাক্ হবেন। আমিও এক কালে হতবাক্ হতুম যদি কেউ বলত, কী হবে এত দেশ বেড়িয়ে। গণেশ তাঁর জননীর চতুর্দিক পরিক্রমা করে বিশ্বপরিক্রমার ফল পেয়েছিলেন। কার্ত্তিক সারা জগৎ ঘুরে নিছে হয়রান হলেন। যা ঘরে বসেই পাওয়া যায় তার জন্যে কে-ই বা যায় বাইরে টো-টো করতে! এ ধরণের কথা শুনলে কেবল যে হতবাক্ হতুম তাই নয়, হতাশ হতুম এ দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে বিদেশীরা আসছে এ দেশে বাণিজ্য করতে, এ দেশের ধন-দৌলৎ লুঠ করতে, ঘরে বসেই যদি এমন মিলত তবে কেন তারা এতদূর আসত? আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাই কি একদা সাত সমুদ্রে সপ্ত ডিঙা ভাসাননি? ধরণীর ঐশ্বর্য্য হরণ করে আনেননি?

ততঃ কিমকে তখনকার দিনে আমি উপহাস করেছি, ধিক্কার দিয়েছি তারুণ্যের অভাব বলে। কিন্তু আমার নিজেরই মন এখন প্রশ্ন করছে, ততঃ কিম্? ততঃ কিম্? ততঃ কিম্? তবে কি আমার নিজেরই তারুণ্যের অভাব ঘটল? বয়স বাড়তে বাড়তে চল্লিশ পার হয়েছে, পাকা চুল দেখা দিয়েছে মাথায়। জরার জয়ধ্বজা শীর্ষে বহন করে আমিও কি এখন গণেশের মতো স্থবির হয়েছি?

তা নয়। ইংরেজীতে বলে, ফার্ষ্ট থিঙ্গস ফার্ষ্ট। প্রথম কাজটি প্রথমে। যতক্ষণ না প্রথম কাজটি শেষ হয়েছে ততক্ষণ দ্বিতীয় কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রথম কাজ দেশকে স্বাধীন করা। এর জন্য তাঁকে সমস্ত ক্ষণ ভারতবর্ষেই থাকতে হচ্ছে। নানা দেশের আমন্ত্রণ তিনি বার বার প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন। গত পঁচিশ বছরে তিনি একবার মাত্র বিদেশে গেছলেন রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সে স্বাধীনতার দাবী পেশ করতে। স্বাস্থ্যের জন্যে সিংহলে যাওয়াটা বাদ দিচ্ছি। অথচ এই গান্ধীই এক কালে ভারতের বাইরে সারাটা যৌবন অতিপাত করেছেন। তখন তাঁর হাতের কাজ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা। সে কাজ শেষ না করে অন্য কাজ হাতে নিলে অন্যায় করতেন।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমি যে কাজ হাতে নিয়েছি সেটি শেষ না করে আমার ছুটি নেই। সেই কাজটির খাতিরে আমাকে আপাতত সমস্ত যৌবন অতিবাহিত করতে হবে। আমার কর্মক্ষেত্র বাংলা দেশ। কারণ আমি বাঙালী সাহিত্যিক। এখন আর আমি প্রবাসী বাঙালী নই। মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তনের জন্যে আমি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাব, ভারতের বাইরেও যেতে পারি। কিন্তু মন পড়ে থাকবে এখানে। এই বাংলা দেশে। কারণ এ যে আমার কর্মক্ষেত্র। আমার সাহিত্যের কাজ আমার প্রথম কর্ম। সাহিত্যের মধ্যে একটা সহিতের ভাব আছে। সকলের সহিত একাত্ম না হলে সাহিত্য হয় না। কী করে একাত্ম হব, যদি একত্র না থাকি। বাংলার সাহিত্যিককে তাই বাঙালীর সঙ্গে একত্র বাস করে একাত্ম হতে হবে। সেই জন্যে আমাকে দীর্ঘকাল দেশভ্রমণের আশা ত্যাগ করতে হবে।

১৯৪৫

•

কবিয়ালের দম্ভ

"যদি আমি গান ধরি, আর পীনে ঢুলী ঢোল বাজায়, তাহা হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ মাত করিয়া ফেলিতে পারি।" —হরু ঠাকুর

ব্রজেন্দ্রনাথ

· শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে বাংলা দেশের সাহিত্যাকাশ থেকে আর একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হোলো। কয়েক বছর থেকে তিনি চোখের অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলেন কিন্তু অস্ত্র করার পর ধীরে-ধীরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসছিল, ইতিমধ্যে পূজার কিছু দিন পূর্বে সাংঘাতিক করোনারি থম্বসিস্ রোগে আক্রান্ত হন। কয়েক দিন ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তিনি প্রায় সেরে উঠেছিলেন। এমন সময় মহাষ্টমীর দিন তিনি পুনরায় আক্রান্ত হন। এবারকার আক্রমণ আর তিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। গত ৩রা অক্টোবর শুক্রবার রাত্রে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ব্রজেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে সময় অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মশায়ের মাণিকতলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে একটি বড় সাহিত্যিক-আড্ডা বসত। এ আড্ডায় ছোট, বড় বাংলা দেশের অনেক সাহিত্যিকই নিয়মিত হাজিরা দিতেন। এ জায়গাকে শুধু সাহিত্যিকদেরই আড্ডা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে, কারণ এখানে সাহিত্যিক, অসাহিত্যিক, নানা রকম বাতিকগ্রস্ত, আধা-পাগল, পুরো পাগল, সাধু, সংসারে অনাসক্ত, বৈষ্ণব ভক্ত প্রভৃতি অনেক রকম লোকই ত্ব-বেলা আসতেন আড্ডা দিতে। সকাল বেলা এগারোটা আর রাত্রে প্রায় একটা-দেড়টা অবধি আড্ডা দিয়ে যে যার বাড়ী ফিরে যেতেন। এতগুলি ভিন্ন-ভাবাপন্ন লোক ত্ব-বেলা একত্রিত হোলে সেখানে ঝগড়া, তর্ক ইত্যাদি যে চলবে তা বলাই বাহুল্য কিন্তু তার জন্য আমাদের মনান্তর কখনো কারো সঙ্গে হোতো না—এই ছিল সেই আড্ডার মাধুর্য।

এই আড্ডায় ব্রজেনের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। তখন আমাদের যে বয়েস সে বয়েসে সমবয়সীদের সঙ্গে ভাবই হ'য়ে থাকে—আলাপ-পরিচয়, জানা-শোনা এ সব হয় পরের বয়সে।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় অমূল্য বাবুর Edward Institution উঠে গেছে, তাঁর অমূল্য গ্রন্থাগার আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে, তাঁর সম্পাদিত 'বাণী' মাসিক পত্রিকাটিও উঠে গেছে। এই সব দুর্দৈবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপই কি-না জানি না, তাঁর বাড়ীর আড্ডাটির আয়তন হয়েছে চতুর্গুণ। বিভিন্ন ধরণের, প্রকৃতির ও উপজীবিকার লোক সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত্রে সেখানে আসত-যেত—সকলে সকলকে চিনতও না। কিন্তু ব্রজেনের বিশেষত্ব ছিল যে, সে প্রায় সকলকেই চিনত এবং তাকেও চিনত সকলে।

ব্রজেন আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট ছিল। অর্থাৎ সে সময় তার বয়স ছিল প্রায় কুড়ি। সেই বয়সেই সে ছিল আমাদের চেয়ে সকল বিষয়ে উন্নত। আমরা তখন হবু সাহিত্যিক, বড় বড় সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলা-মেশা করছি মাত্র কিন্তু ব্রজেনের লিখিত পুস্তক তখন ছাপা হয়ে গিয়েছে। বড় বড় সাহিত্যিকরা প্রায় সবাই ব্রজেনকে চেনেন। এরও আগে সে কবি গিরীন্দ্রমোহিনী সম্পাদিত 'জাহ্নবী' ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'বাণী' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। 'জাহ্নবী' বা 'বাণী' কোন পত্রিকার জন্য ঠিক মনে পড়ছে না, সে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাছে কবিতার জন্য তাগাদা করতে যেত। তাগাদার ঠেলায় কবি শেষকালে 'ব্রজেন ডাকাত' নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখে তাকে দিয়েছিলেন। সেই বয়সেই তার বিবাহ হ'য়ে গিয়েছিল এবং J. B. Norton কোম্পানীতে Shorthand Typist এর কাজ করত।

সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গেলে যে সকল গুণ মানুষের থাকা দরকার তার অধিকাংশই ব্রজেনের ছিল। সেই বয়সেই ব্রজেনের চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে আমি অবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম। শুধু তাই নয়, অন্যায়ের প্রতি, অসত্যের প্রতি তার একটা সহজাত বিরূপতা ছিল। সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে সে হেঁটে আফিসে যেত। সেখানে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা অবধি হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে হেঁটে ফিরত। পথে এ প্রেস ও প্রেসে প্রুফ দেখা, লোকজনের সঙ্গে দেখা করা, বইপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করা চলত। তার পর সন্ধ্যে সাতটা, সাড়ে সাতটার সময় বগলে এক গাদা বই, কাগজপত্র নিয়ে হন্তদন্ত হ'য়ে আড্ডায় এসে উপস্থিত হোতো। আড্ডায় হাসি, ঠাট্টা, মস্করা ও নানান বাজে কথা চলত—সচরাচর আড্ডায় যা হ'য়ে থাকে। ব্রজেন কিন্তু এসেই হয় অমূল্য বাবুর সঙ্গে কিংবা অন্য কারুর সঙ্গে একেবারে কাজের কথা সুরু ক'রে দিত। বড় বড় নামজাদা ইতিহাসের বই, অর্থাৎ আইন-ই-আকবরী, সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণ, তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি, বেভারিজ, ভিনসেন্ট স্মিথ, রিশ ডেভিস্ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা সুরু ক'রে দিত। তখন তার একখানা বই, বোধ হয় 'বেগম সমরু'র ইংরিজি তর্জমা হচ্ছিল। আমরা তার সমবয়সী ছিলুম কিন্তু সে আমাদের সঙ্গেও ফষ্টিনাষ্টি বিশেষ করত না।

আড্ডায় সব বয়সেরই লোক আসা-যাওয়া করতেন। অতিবৃদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে বালক অবধি। বয়স্ক লোকেরা থাকলে আমাদের সিগারেট খাওয়ার অসুবিধা হোতো বলে মাঝে মাঝে আড্ডা থেকে উঠে আমি বাইরের উঠোনে এসে সিগারেট খেতুম। আমাকে উঠতে দেখলেই ব্রজেন বুঝতে পারত আর সেও সঙ্গে সঙ্গে এসে সিগারেট ধরাত। (ব্রজেন পরে সিগারেট ছেড়ে দিয়ে সিগার ধরেছিল) বাইরের উঠোনে অন্ধকারে বসে বসে আমরা সিগারেট টানতুম কিন্তু তখনও সে কাজের কথা চালিয়ে যেত। এ বইটা শেষ হ'য়ে গেলে, সে কি লিখবে—কোন কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করব বলেছেন ইত্যাদি কথা গড় গড় ক'রে বলতে থাকত। তার এই স্মৃতিকথা লিখতে লিখতে অতীতের সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ছে, আর ভাবছি অদৃষ্টের কি পরিহাস!

ব্রজেন্দ্রনাথের উৎসাহ, উদ্যম, পরিশ্রম করবার শক্তি ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা ছিল অসাধারণ। প্রায় বালক বয়সেই সে পিতৃমাতৃহীন হয়েছিল। অভাবের তাড়নায় পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে তাকে রোজগারের চেষ্টায় মন দিতে হয়েছিল। সে যদি লেখাপড়া করবার সুযোগ পেত তা হোলে হাইকোর্টের জজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হওয়া তার পক্ষে খুব বড় কথা ছিল না।

সাহিত্য-সাধনার প্রথম অবস্থায় সে মোগল-যুগের ইতিহাস নিয়ে সুরু করেছিল গবেষণা। তারই ফলে বেগম সমরু, বাংলার বেগম প্রভৃতি ছোট ছোট বই লেখা হয়েছিল। কিন্তু কিছু দিন এই দিকে কাজ করবার পরই সে বুঝতে পারলে যে মোগল-যুগের ঐতিহাসিক গবেষণা করতে হোলে উর্দ্দু, ফারসী, মারহাট্টি এবং ইংরেজী ছাড়াও একটি কিংবা দুটি ইউরোপীয় ভাষায় দখল থাকা দরকার। ব্রজেন যে চরিত্রের লোক ছিল তার পক্ষে এই সব ভাষা শিখতে লেগে যাওয়া কিছুই বিচিত্র ছিল না। কিন্তু সে ছিল পরের চাকর—ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য যে পরিমাণ সময় নিজের হাতে থাকা দরকার তা তো তার ছিলই না, তা ছাড়া সংসারে ছিল সে একেবারে একা। বাড়ীর চাল-ডাল, তেল-নুণ কেনা থেকে আরম্ভ করে ডাক্তার ডাকা অবধি সব কাজই তাকে নিজেকেই করতে হোতো। এই জন্যই সে মোগল-যুগ থেকে সরে অন্য পথে নিজের প্রতিভাকে বিস্তার করেছিল। এ বিষয়ে স্যার যদুনাথ সরকার তাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন এবং ব্রজেন তাঁরই প্রদর্শিত পথে চলতে আরম্ভ করেছিল। ঐতিহাসিক হিসাবে এবং মানুষ হিসাবেও ব্রজেন স্যার যদুনাথকে আদর্শ বলে মেনেছিল।

ঐতিহাসিক গবেষণার এই নতুন রাস্তায় পা দিয়ে ব্রজেনের প্রতিভা যেন আরও খুলে গেল। সে একাধারে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি আপিসের চাকরী, তার মধ্যেই ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরী ও রেকর্ড-অফিসে পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটা, নানা পত্রিকায় ইংরেজী ও বাংলায় প্রবন্ধ লেখা, সাহিত্য-পরিষদের কাজ করা—চালিয়ে যেতে লাগল। এর ওপরে পড়াশোনা করা, স্যার যদুনাথের বইয়ের প্রুফ দেখা ও নিজের সংসারের কাজ তো আছেই। এই রকম কয়েক বছর সে হৈ-হৈ ক'রে চালিয়ে দিলে কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনেরও একটা সীমা আছে। দিন-রাত্রি এই রকম খেটে-খেটে ব্রজেন্দ্র দুরন্ত সায়াটিকা রোগে আক্রান্ত হ'য়ে একেবারে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়ল।

ব্রজেনের নিকট-আত্মীয় বিশেষ কেউ ছিল কি না জানি না। থাকলেও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তার খুবই কম ছিল। কিন্তু আত্মীয় না থাকলেও স্বজনের অভাব তার ছিল না। সে যখন যেখানে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করত, তার চরিত্রগুণে সকলেই তাকে ভালবাসত। এই সময়টাতে সে সুসাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসু মশায়দের পার্শীবাগানের বাড়ীতে আড্ডা দিত ও তাঁদের সঙ্গে তার একটা হৃদয়ের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে তার চিকিৎসার অভাব হোলো না। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মশায় তার চিকিৎসা করতে লাগলেন। সায়াটিকা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি, এবং বহু দিন ভোগায়। ব্রজেনকেও অনেক দিন শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকতে হয়েছিল। অসুখের সময় আমি তাকে প্রায়ই দেখতে যেতুম। সে সময় ব্রজেন মাঝে মাঝে আমায় বলত—old man, যদি ভাই এবার বেঁচে উঠি তা হোলে ও চাকরি আর করব না। প্রতিদিন ছয়-সাত ঘণ্টা টুলে বসে টাইপ ক'রে ক'রেই আমার এই ব্যাধি হয়েছে।

ভগবান ব্রজেনের মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন। কারণ, আর তাকে সওদাগরী আপিসে চাকরী করতে হয়নি। রোগ থেকে ওঠার পরেই 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকা থেকে তার কাজের প্রস্তাব আসতেই সে তা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলে।

'প্রবাসী' অপিসের কাজ নেওয়ার পর তার অবসর অপেক্ষাকৃত বেড়ে গেল। সে মন-প্রাণ দিয়ে তার গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগল। এইখানে কাজ করতে করতেই সে তার বিখ্যাত অমর গ্রন্থরাজি—সংবাদপত্রের ইতিহাস, নাট্যশালার ইতিহাস, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা প্রভৃতি প্রকাশ করে। এই বইগুলি বাংলা সাহিত্যে অমর হ'য়ে থাকবে।

ব্রজেনের জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল অত্যন্ত সরল ও নিরাড়ম্বর। আহার করত সে নিরামিষ, পরত ছোট ধুতি, আগে কোট গায়ে দিত, ইদানীং পাঞ্জাবী পরতে দেখেছি কিন্তু তাকে পাঞ্জাবী না বলে পিরান বললেই চলে। আমরা কত দিন তাকে এই নিয়ে ঠাট্টা করেছি, কিন্তু সে সব কথা সে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনত না।

সত্যের প্রতি ছিল তার অবিচল অনুরাগ, বাংলা সাহিত্য ও তার নিজের কাজের প্রতি তার যা নিষ্ঠা দেখেছি তা দুর্লভ। এই নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতাই তাকে যশের মন্দিরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন সে লঘুমনে বিনা ঋণে ইহসংসার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে। জীবিতাবস্থায় আমি অনেক বার তাকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানিয়েছি, আজ তার মৃত্যুর পরও তাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

ভারতচন্দ্রের ভাষাজ্ঞান

বাং ১১১৯ সালে বর্দ্ধমান জেলায় অন্তর্গত ভূরসুট পরগণায় নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র ভরদ্বাজ গোত্রে, মুখটিবংশে জাত ভারতচন্দ্র পারস্য, হিন্দি, সংস্কৃত, বাঙলা, উড়িয়া এবং উর্দ্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

মানুষ রামেন্দ্রসুন্দর

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

খুব ছোট বয়স তখন রামেন্দ্রসুন্দরের, সাত কি আট। সংগে প'ড়তেন জেমো ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলের হেড-পণ্ডিত মহাশয়ের ভাই শশী। নতুন বাড়ীতেই খেয়ে-দেয়ে থাকতেন। একই মাষ্টারের কাছে প'ড়তেন। গৃহশিক্ষক খুশী শশীর উপর এই জন্য যে, সে বই নিয়ে ব'সে থাকে আগে থেকেই। ধ'রে আনতে হ'ত রামকে। তা' ছাড়া বাড়ীর লোকদেরও খুশী ধরে না শশীর উপর। মাষ্টার চলে গেলেও সে একাকী পড়তো রাত এগারোটা-বারোটা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগের পড়া। রামেন্দ্রসুন্দরের মা, ছোটমা দুঃখিত হ'য়ে ব'লতেন—"আমাদের বাড়ীর ছেলেরা কেউ অমন হয় না।" রামেন্দ্র সাড়ে সাতটা বাজতে দেয় না, চোখ লুটিয়ে আসে ঘুমে। এক ঘুম পরে উঠে দেখেন বাড়ীর লোকেরা, শশী যথানিয়মে প'ড়েই চলেছে। তা-ও পরীক্ষার সময় নয়! শাসন ক'রে ব'লতেন মায়েরা—"রাম, তুই শশীর দেখে একটু পড়তে চেষ্টা কর্।" চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। সেই সাড়ে সাতটায় চোখ লুটিয়ে আসে রামের। অপারগ হ'য়ে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে থাকতে হ'ল এক বছর। বাৎসরিক পরীক্ষায় দেখা গেল, রাম পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে, আর ফেল হয়েছে শশী। বাড়ীর সকলে সিদ্ধান্ত ক'রলেন—এ মাষ্টারদের পক্ষপাতিত্বের ফল। আমাদেরই ইস্কুল, পণ্ডিত মহাশয়রাও আমাদের চেনা, খুশী করবার জন্য ছেলের বাবা, ছোটবাবাকে—তাঁদের এই কীর্ত্তি! না হ'লে শশী কখনো ফেল হয়, আর না প'ড়ে পাস করলো অমন ভালো ভাবে আমাদের রাম!

তার পরের বছরও দেখা গেল পাঠনিরত শশীকে ফেল হ'তে। ফেল হ'য়ে অধ্যবসায় আরও বেড়ে গেল শশীর। রাম অল্প সময়ের মধ্যে ইস্কুলের পড়া সমাপ্ত ক'রে রামায়ণ, মহাভারত প'ড়তেন, আর ঐ দুখানা অত বড় বড় বই শেষ ক'রে ফেললেন এক বছরেই। অত অল্প বয়সে বাড়তি বই পড়ার আগ্রহ দেখে খুশী হ'তেন না বাড়ীর মেয়েরা। তাঁরা ব'লতেন—"পড়ার বই পড়বি না, কেবল বাজে বই প'ড়ে সময় নষ্ট করা!" দেখা গেল সেবারও প্রথম হ'য়ে পাস করলেন রাম, আর শশী থেকে গেল পাকা হ'য়ে ভাল ভাবে পাস করবার জন্য। এবারও সন্দেহ যায় না মায়েদের। কিন্তু রামেন্দ্রর বাবা, ছোটবাবা বুঝলেন শাপভ্রষ্ট হ'য়ে এ ছেলে জন্ম নিয়েছে আমাদের নূতন বাড়ীতে!

আরও একটু আগেকার কথা। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ প'ড়ছেন শিশু রামেন্দ্রসুন্দর। বর্ণপরিচয় শেষ ক'রে বানান পড়তে আরম্ভ ক'রেছেন সবে মাত্র। ক, খ, গ সবেরই উচ্চারণ অকারান্ত, কিন্তু 'ম'র উচ্চারণে অ বিকৃত ভাবে উচ্চারিত হয়। ফলে 'ম' 'মো'এ পরিণত হয়। বানান পড়বার সময় শিশু পড়চে—মো, র, মূর্ধণ্য ণ, মোরণ। গৃহশিক্ষক বললেন, মোরণ নয় মরণ। শিশু রামেন্দ্র বললেন, তা' কেমন ক'রে হয়, মো-র-ণ মোরণ হবে না? গৃহশিক্ষক ধমক দিয়ে বালকের কৌতূহলের অবসান ঘটালেন। যুক্তি নাই, ব'ললেন—'না, যা বলছি শোন ওটার উচ্চারণ,—মরণ। অতৃপ্ত কৌতূহলে মেনে নিতে হ'ল শিক্ষকের আদেশকেই বড় বলে। সেদিন কে ভেবেছিল, প্রতিভার স্ফুরণ রয়েছে এই জিজ্ঞাসার মধ্যে?

প্রায়ই গল্প হ'ত সতীর্থদের সাথে রামেন্দ্র বাবুর—আমার শ্বশুর ভাই রাজা, তাঁকে দেখলেই তোরা বুঝবি সত্যিই রাজা কি না। পঁচথুপির সতীর্থ শশী বাবু। তিনি ব'লতেন সকলের কাছে—"আমরা তখন কান্দী স্কুলে পড়ি। কান্দীর রাজারা রাসের সময় আনলেন ক'লকাতা থেকে বেঙ্গল থিয়েটার। মানুষ শুনবে কি থিয়েটার! লোকের কী কোলাহল! শোনবার উপায় নাই কিছু। কান্দী-বাঘডাঙার রাজারা, স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত। কেউ থামাতে পারেন না হট্টগোল: হঠাৎ জেমোর রাজার আসা শুনেই সব গোলমাল চুপ। আমরা সেই প্রথম দেখলাম জেমোর রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে। সত্যই রাজা বটে, কি সুন্দর চেহারা!

সতীর্থরা জেদ ধরলো—"তোর শ্বশুর এলে যেন খবর পাই।"

এক দিন রামেন্দ্র বাবুর বাসার চাকর কলেজে এসে খবর দিল—"রাজা আপনার বাসায় এসেছেন।"

অবিনাশ বাবু, জানকী বাবুও সঙ্গ নিলেন। রাজা একখান ঘরের অর্ধাংশ পরদা দিয়ে পৃথক্ রেখেছেন নিজের জন্য। বড় আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়। ছেলের দল ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলো গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মানুষটির দিকে চেয়ে। আপনা থেকে মাথা লুটিয়ে পড়লো ছেলের দলের। প্রথম নিজের জামাতার মাথায় হাত না দিয়ে স্নেহাশীর্ব্বাদ করলেন অন্য ছেলেদের। বুদ্ধিমান ছেলেদের হৃদয়ে সেটা অঙ্কিত হয়েছিল চিরদিনের তরে।

রামেন্দ্র বাবুর বয়স তখন ষোল কি সতেরো। ভগিনীপতি পূর্ণেন্দুনারায়ণ ও শরদিন্দুনারায়ণের সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন। সেই এক বারই কাশী যাওয়া। তা' ছাড়া তীর্থের মধ্যে গয়া আর পুরী ছাড়া আর কোথাও যাননি।

কাশীতে তাঁদের খুব ক্ষিদে লাগতো বলে রাস্তায় আসবার সময় প্রচুর লুচি-সন্দেশ সঙ্গে নিয়েছিলেন ট্রেণে। আশ্চর্য্য, মোগলসরাই ষ্টেশনে এসে ক্ষিধে লাগল সবারই। ইচ্ছা হ'ল টিফিন-কেরিয়ার খোলার। কিন্তু ভোটে ঠিক হ'ল, এর পর বহু রাস্তা আছে, এখন থেকে খুললে তখন সব খাবে কি? স্থির হ'ল দু-পয়সার ক'রে ছোলা-ভাজা নিয়ে মুখে দেওয়া যাক্। আর যায় কোথা, বাড়ী পর্য্যন্ত এক গেলাস জল মুখে দেওয়ারও কারও ইচ্ছা হ'ল না। রামেন্দ্র বাবু ব'ললেন—"ঘোড়ার খাবার খেলে, গাড়ী টেনে নিয়ে আসতে হ'ত, গাড়ীতে বসে এলে ক্ষিদে হবে কেন?"

তিনি তীর্থে যাওয়া কারও পছন্দ ক'রতেন না। এক বার চঞ্চলা দেবী বাবাকে চিঠি লিখলেন—"বাবা, আমার ছোট মামা ও মামীমা কাশীধাম যাবেন, আমি তাঁদের সাথে যাব। আপনি অনুমতি দেন।"

উত্তর এলো সাফ জবাবে। জয়গোপাল চঞ্চলা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সে তখন ক'লকাতায়। এক মাস রোগভোগের পর একটু সুস্থ।

কোনও মতে বাঁচান হইয়াছে। এখন তোমার তীর্থ যাইবার সময় নয়। কাশীর বিশ্বনাথ, তিলভাণ্ডেশ্বর এবং কালভৈরব, এই তিন জন চিরকালই আছেন এবং থাকিবেন। তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। সময়ে তুমি তাঁহাদিগকে বহাল তবিয়তে দেখিতে যাইবে। তোমার বাবা একবার মাত্র ষোল বৎসর বয়সে কাশীধাম দর্শন করিয়াছে। তা-ও তিন রাত্রির জন্য মাত্র। অতএব তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই।"

বাবার উত্তর পেয়ে সব চুপচাপ।

একবার শান্তিপুরের ওখানে বোট লাগলে, বাবাকে ব'ললাম—"বাবা, আমরা শান্তিপুরের ঠাকুর দেখতে যাব।" বাবার উত্তরও মুখস্থ। "তোমরা চোখ বুজে নূতন বাড়ীর রাধাগোবিন্দকে দর্শন করো, তা' হ'লেই সব ঠাকুর দেখা হবে।"

বোট থেকে নামতেই দিলেন না কাউকে। রামেন্দ্র বাবু ভালবাসতেন না ঠাকুর দেখা, আর তীর্থে ঘোরা লোকদের। ব'লতেন "সব তামাসা দেখার বাতিকে ফেরে।"

নৌকাতে রামেন্দ্র বাবু সপরিবারে ব'সে আছেন। এক দিন ঝড়-বৃষ্টিতে নৌকা খুব দুলতে লাগলো। ছয় বৎসরের দৌহিত্র বিজয়-গোপাল ভরসা দিয়ে তার নানাকে বলতে লাগলো—"ভয় নাই নানা, আমি আছি।" নৌকার দোলা বন্ধ হ'য়ে উঠল হাসির দোলা। ঐ ছ বছরের ছেলের সাহস দেওয়ার কথা ক'লকাতা এসে অধ্যাপক ললিত বাবুকে বলতেই তিনি ব'ললেন, "বয়েসে বাপের বড়।" বাস্ আর যায় কোথা! সেই দিন থেকে বিজয়ের নাম হ'য়ে গেল 'বয়েসে বাপের বড়'।

রামেন্দ্র বাবু সোহাগ ক'রে ছেলেপুলের আর একটা ক'রে আদরের নাম রাখতে ভালবাসতেন। যেমন—অমলেন্দু, অজয়েন্দু, বিজয়েন্দুর পরিবর্ত্তে তিনি নাম রাখলেন তেজবাহাদুর, জংবাহাদুর ও টিকেন্দ্রজিৎ। এই সব নাম আবার তাঁর বইয়েও ছাপা হ'য়ে গেল। কারও নাম রাখলেন 'গিনিপিগ', কারও বা 'রুপি'। এই সব দেখে ছোট ভগিনীপতি বরদেন্দুনারায়ণ ব'ললেন—"রাম বাবু, আমাদের বাড়ীর ছেলে ক'টার নাম নষ্ট করছো কেন? নূতন বাড়ীর ছেলেদের নাম ত প্রায় সবই ঠিক আছে। সে কী হাসি রামেন্দ্র বাবুর! ব'ললেন, "ছোট হুজুর ত ঠিক ধ'রেছে।"

দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন, বামুন-চাকররা কেউ-ই বাড়ীতে নেই। অধ্যাপক ক্ষেত্র বাবু এসে হাজির। অসময়ে আসতে দেখে প্রশ্ন ক'রলেন রামেন্দ্র বাবু—"খাওয়া হয়েচে?" নেতিবাচক উত্তর শুনে ব্যস্ত ভাবে স্ত্রীর কাছে গিয়ে ব'ললেন, "ক্ষেত্র এখুনি খাবে, সে বাড়ী থেকে খেয়ে আসবার সময় পায়নি।"

স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী ব'ললেন, "এক জন কেন, পাঁচ জনের খাবার এখনি দিতে পারি, কিন্তু কেউই যে নেই, নিয়ে যাবে কে?" ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললেন রামেন্দ্র বাবু, "কেন, আমি?"

কেমন যেন খটকা লাগলো স্ত্রীর। অগত্যা নিরুপায় হ'য়ে ব'ললেন, "বেশ, নিয়ে যাও।" সিঁড়ি নামতে গিয়েই শব্দ উঠলো—ঝনন্ ঝন্। স্ত্রী দু-চার সিঁড়ি নেমেই দেখেন যা' সন্দেহ ক'রেছিলেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে। চেতন করিয়ে দিয়ে ব'ললেন,—"চল, ভয় নাই, বেঁচেচি ত এখনও পাঁচ জন ভদ্রলোকের খাবার দিতে পারবো।" থালি, রেকাবি, বাটি গুছিয়ে নিয়ে ব'ললেন ইন্দুপ্রভা দেবী—"চল, আমিই দিয়ে আসি সদর-ঘরে। দরজাটা একটু লাগিয়ে দাও।"

ক্ষেত্র বাবু প্রশ্ন করলেন, "বামুন নেই, আমার খাবার আনলে কে?"

"কেন, আমাকে বিশ্বাস হয় না বুঝি?" আঙুল দিয়ে কাপড় দেখিয়ে ব'ললেন হাসতে হাসতে, "কানে যে আওয়াজ গিয়েচে!" হাসির রোল উঠলো।

"ব'ললেই হ'ত আগেই ব্রাহ্মণীকে, আপনার কাপড় নষ্ট হ'ত না।"

চন্দ্র বাবু দেশের ডাক্তার। রামেন্দ্র বাবুর বাবা, ছোটবাবা, শ্বশুর মহাশয়দের গৃহ-চিকিৎসক। সেই ডাক্তার বাবু দুপুরের ট্রেণে রামেন্দ্র বাবুর ক'লকাতার বাসায় এসে হাজির। অভ্যর্থনা ক'রে বসিয়ে রামেন্দ্র বাবু অন্দরে গিয়ে ব'ললেন, "শুনেছ, চন্দ্র বাবু ডাক্তার এসেছেন?"

চির-পরিচিত বাবাদের ডাক্তার এসেছেন আমাদের বাড়ীতে, খুশী ধরে না ইন্দুপ্রভা দেবীর। "তা'তে কি, তুমি ভয় পাচ্ছো কেন?"

"ভয় পাইনি আমি, তবে জেমো-কান্দী নয়; ছেলেদের-আমাদের সব দুধটা তাঁর জন্য রেখো, বলতে এসেছি।"

বিস্ময়-আকুল চোখ তুলে প্রশ্ন ক'রলেন স্ত্রী—"কতটা দুধ রাখতে হবে?"

"আমাদের এ কয় বাটি ত বটেই, তা' ছাড়া পার ত আরও আড়াই সের। ওঁরা ত আজকালকার ডাক্তার ভদ্রলোকদের মত ভিটামিন খেয়ে বেঁচে নেই?"

কখন কখন রামেন্দ্র বাবুকে স্নেহের অত্যাচার সহ্য করতে হ'ত। এক দিন অসময়ে পাড়ার বিপিন মণ্ডল এসে হাজির তাঁর ক'লকাতার বাসায়। রামেন্দ্র বাবু প্রশ্ন ক'রলেন,—"এখন ত ট্রেণের সময় নয়!"

"এই ত পায়ে পায়ে আসছি বড় বাবু। আমি হেঁটে আসছি।" চমকে উঠে প্রশ্ন ক'রলেন—"ক'দিন লাগলো?" মণ্ডল বললো—"ক'দিন আবার, দু'দিন আর এই আজকের ক' ঘণ্টা।"

বিস্ময় ছাড়িয়ে গেল বড় বাবুর—"তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল কেন মণ্ডল?"

"এই, আপনার একটা খারাপ খবর পেয়ে ট্রেণ-ফেল আর মনে পড়লো না, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।"

"আমার কি মন্দ খবর পেয়েছিলে মণ্ডল?"

মণ্ডল আর বলতে চায় না। অনেক বলা-কওয়ার পর জানতে পারলেন বড় বাবু—'আপনার মাথা না কি এক লাখ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে গরমেণ্ট, ঘি বের ক'রে দেখবে কি আছে মগজে। আমি গেজেট পড়তে না পারলেও ভাল লোকের কাছে শুনেছি, গেজেটে এ খবর বেরিয়েছে।"

আর থাকতে পারলেন না বড় বাবু। কোনও মতে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে কিছুক্ষণ থাকলেন সেখানে; তার পর শোধ নিলেন

মানুষ রামেন্দ্রসুন্দর

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

খুব ছোট বয়স তখন রামেন্দ্রসুন্দরের, সাত কি আট। সংগে প'ড়তেন জেমো ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলের হেড-পণ্ডিত মহাশয়ের ভাই শশী। নতুন বাড়ীতেই খেয়ে-দেয়ে থাকতেন। একই মাষ্টারের কাছে প'ড়তেন। গৃহশিক্ষক খুশী শশীর উপর এই জন্য যে, সে বই নিয়ে ব'সে থাকে আগে থেকেই। ধ'রে আনতে হ'ত রামকে। তা' ছাড়া বাড়ীর লোকদেরও খুশী ধরে না শশীর উপর। মাষ্টার চলে গেলেও সে একাকী পড়তো রাত এগারোটা-বারোটা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগের পড়া। রামেন্দ্রসুন্দরের মা, ছোটমা দুঃখিত হ'য়ে ব'লতেন—"আমাদের বাড়ীর ছেলেরা কেউ অমন হয় না।" রামেন্দ্র সাড়ে সাতটা বাজতে দেয় না, চোখ লুটিয়ে আসে ঘুমে। এক ঘুম পরে উঠে দেখেন বাড়ীর লোকেরা, শশী যথানিয়মে প'ড়েই চলেছে। তা-ও পরীক্ষার সময় নয়! শাসন ক'রে ব'লতেন মায়েরা—"রাম, তুই শশীর দেখে একটু পড়তে চেষ্টা কর্।" চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। সেই সাড়ে সাতটায় চোখ লুটিয়ে আসে রামের। অপারগ হ'য়ে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে থাকতে হ'ল এক বছর। বাৎসরিক পরীক্ষায় দেখা গেল, রাম পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে, আর ফেল হয়েছে শশী। বাড়ীর সকলে সিদ্ধান্ত ক'রলেন—এ মাষ্টারদের পক্ষপাতিত্বের ফল। আমাদেরই ইস্কুল, পণ্ডিত মহাশয়রাও আমাদের চেনা, খুশী করবার জন্য ছেলের বাবা, ছোটবাবাকে—তাঁদের এই কীর্ত্তি! না হ'লে শশী কখনো ফেল হয়, আর না প'ড়ে পাস করলো অমন ভালো ভাবে আমাদের রাম!

তার পরের বছরও দেখা গেল পাঠনিরত শশীকে ফেল হ'তে। ফেল হ'য়ে অধ্যবসায় আরও বেড়ে গেল শশীর। রাম অল্প সময়ের মধ্যে ইস্কুলের পড়া সমাপ্ত ক'রে রামায়ণ, মহাভারত প'ড়তেন, আর ঐ দুখানা অত বড় বড় বই শেষ ক'রে ফেললেন এক বছরেই। অত অল্প বয়সে বাড়তি বই পড়ার আগ্রহ দেখে খুশী হ'তেন না বাড়ীর মেয়েরা। তাঁরা ব'লতেন—"পড়ার বই পড়বি না, কেবল বাজে বই প'ড়ে সময় নষ্ট করা!" দেখা গেল সেবারও প্রথম হ'য়ে পাস করলেন রাম, আর শশী থেকে গেল পাকা হ'য়ে ভাল ভাবে পাস করবার জন্য। এবারও সন্দেহ যায় না মায়েদের। কিন্তু রামেন্দ্রর বাবা, ছোটবাবা বুঝলেন শাপভ্রষ্ট হ'য়ে এ ছেলে জন্ম নিয়েছে আমাদের নূতন বাড়ীতে।

আরও একটু আগেকার কথা। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ প'ড়ছেন শিশু রামেন্দ্রসুন্দর। বর্ণপরিচয় শেষ ক'রে বানান পড়তে আরম্ভ ক'রেছেন সবে মাত্র। ক, খ, গ সবেরই উচ্চারণ অকারান্ত, কিন্তু 'ম'র উচ্চারণে অ বিকৃত ভাবে উচ্চারিত হয়। ফলে 'ম' 'মো'এ পরিণত হয়। বানান পড়বার সময় শিশু পড়চে—মো, র, মূর্ধণ্য ণ, মোরণ। গৃহশিক্ষক বললেন, মোরণ নয় মরণ। শিশু রামেন্দ্র বললেন, তা' কেমন ক'রে হয়, মো-র-ণ মোরণ হবে না? গৃহশিক্ষক ধমক দিয়ে বালকের কৌতূহলের অবসান ঘটালেন। যুক্তি নাই, ব'ললেন—'না, যা বলছি শোন ওটার উচ্চারণ,—মরণ'। অতৃপ্ত কৌতূহলে মেনে নিতে হ'ল শিক্ষকের আদেশকেই বড় বলে। সেদিন কে ভেবেছিল, প্রতিভার সূচনা রয়েচে এই জিজ্ঞাসার মধ্যে?

প্রায়ই গল্প হ'ত সতীর্থদের সাথে রামেন্দ্র বাবুর—আমার শ্বশুর ভাই রাজা, তাঁকে দেখলেই তোরা বুঝবি সত্যিই রাজা কি না। পঁচথুপির সতীর্থ শশী বাবু। তিনি ব'লতেন সকলের কাছে—"আমরা তখন কান্দী স্কুলে পড়ি। কান্দীর রাজারা রাসের সময় আনলেন ক'লকাতা থেকে বেঙ্গল থিয়েটার। মানুস শুনবে কি থিয়েটার! লোকের কী কোলাহল! শোনবার উপায় নাই কিছু। কান্দী-বাঘডাঙার রাজারা, স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত। কেউ থামাতে পারেন না হট্টগোল: হঠাৎ জেমোর রাজার আসা শুনেই সব গোলমাল চুপ। আমরা সেই প্রথম দেখলাম জেমোর রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে। সত্যই রাজা বটে, কি সুন্দর চেহারা!

সতীর্থরা জেদ ধরলো—"তোর শ্বশুর এলে যেন খবর পাই।"

এক দিন রামেন্দ্র বাবুর বাসার চাকর কলেজে এসে খবর দিল—"রাজা আপনার বাসায় এসেছেন।"

অবিনাশ বাবু, জানকী বাবুও সঙ্গ নিলেন। রাজা একখান ঘরের অর্দ্ধাংশ পরদা দিয়ে পৃথক্ রেখেছেন নিজের জন্য। বড় আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়। ছেলের দল ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলো গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মানুষটির দিকে চেয়ে। আপনা থেকে মাথা লুটিয়ে পড়লো ছেলের দলের। প্রথম নিজের জামাতার মাথায় হাত দিয়ে স্নেহাশীর্ব্বাদ করলেন অন্য ছেলেদের। বুদ্ধিমান ছেলেদের হৃদয়ে সেটা অঙ্কিত হয়েছিল চিরদিনের তরে।

রামেন্দ্র বাবুর বয়স তখন ষোল কি সতেরো। ভগিনীপতি পূর্ণেন্দুনারায়ণ ও শরদিন্দুনারায়ণের সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন। সেই এক বারই কাশী যাওয়া। তা' ছাড়া তীর্থের মধ্যে গয়া আর পুরী ছাড়া আর কোথাও যাননি।

কাশীতে তাঁদের খুব ক্ষিদে লাগতো বলে রাস্তায় আসবার সময় প্রচুর লুচি-সন্দেশ সঙ্গে নিয়েছিলেন ট্রেণে। আশ্চর্য্য, মোগলসরাই ষ্টেশনে এসে ক্ষিধে লাগল সবারই। ইচ্ছা হ'ল টিফিন-কেরিয়ার খোলার। কিন্তু ভোটে ঠিক হ'ল, এর পর বহু রাস্তা আছে, এখন থেকে খুললে তখন সব খাবে কি? স্থির হ'ল দু-পয়সার ক'রে ছোলা-ভাজা নিয়ে মুখে দেওয়া যাক্। আর যায় কোথা, বাড়ী পর্য্যন্ত এক গেলাস জল মুখে দেওয়ারও কারও ইচ্ছা হ'ল না। রামেন্দ্র বাবু ব'ললেন—"ঘোড়ার খাবার খেলে, গাড়ী টেনে নিয়ে আসতে হ'ত, গাড়ীতে বসে এলে ক্ষিদে হবে কেন?"

তিনি তীর্থে যাওয়া কারও পছন্দ ক'রতেন না। এক বার চঞ্চলা দেবী বাবাকে চিঠি লিখলেন—"বাবা, আমার ছোট মামা ও মামীমা কাশীধাম যাবেন, আমি তাঁদের সাথে যাব। আপনি অনুমতি দেন।"

উত্তর এলো সাফ জবাবে। জয়গোপাল চঞ্চলা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সে তখন ক'লকাতায়। এক মাস রোগভোগের পর একটু সুস্থ। তাই রামেন্দ্র বাবু লিখলেন কন্যাকে—"তোমার পুত্র সিপাহীটিকে

কোনও মতে বাঁচান হইয়াছে। এখন তোমার তীর্থ যাইবার সময় নয়। কাশীর বিশ্বনাথ, তিলভাণ্ডেশ্বর এবং কালভৈরব, এই তিন জন চিরকালই আছেন এবং থাকিবেন। তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। সময়ে তুমি তাঁহাদিগকে বহাল তবিয়তে দেখিতে যাইবে। তোমার বাবা একবার মাত্র ষোল বৎসর বয়সে কাশীধাম দর্শন করিয়াছে। তা'ও তিন রাত্রির জন্য মাত্র। অতএব তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই।"

বাবার উত্তর পেয়ে সব চুপচাপ।

একবার শান্তিপুরের ওখানে বোট লাগলে, বাবাকে ব'ললাম—"বাবা, আমরা শান্তিপুরের ঠাকুর দেখতে যাব।" বাবার উত্তরও মুখস্থ। "তোমরা চোখ বুজে নূতন বাড়ীর রাধাগোবিন্দকে দর্শন করো, তা' হ'লেই সব ঠাকুর দেখা হবে।"

বোট থেকে নামতেই দিলেন না কাউকে। রামেন্দ্র বাবু ভাল বাসতেন না ঠাকুর দেখা, আর তীর্থে ঘোরা লোকদের। ব'লতেন "সব তামাসা দেখার বাতিকে ফেরে।"

নৌকাতে রামেন্দ্র বাবু সপরিবারে ব'সে আছেন। এক দিন ঝড়-বৃষ্টিতে নৌকা খুব দুলতে লাগলো। ছয় বৎসরের দৌহিত্র বিজয়-গোপাল ভরসা দিয়ে তার নানাকে বলতে লাগলো—"ভয় নাই নানা, আমি আছি।" নৌকার দোলা বন্ধ হ'য়ে উঠল হাসির দোলা। ঐ ছ বছরের ছেলের সাহস দেওয়ার কথা ক'লকাতা এসে অধ্যাপক ললিত বাবুকে বলতেই তিনি ব'ললেন, "বয়েসে বাপের বড়।" বাস্ আর যায় কোথা! সেই দিন থেকে বিজয়ের নাম হ'য়ে গেল 'বয়েসে বাপের বড়'।

রামেন্দ্র বাবু সোহাগ ক'রে ছেলেপুলের আর একটা ক'রে আদরের নাম রাখতে ভালবাসতেন। যেমন—অমলেন্দু, অজয়েন্দু, বিজয়েন্দুর পরিবর্ত্তে তিনি নাম রাখলেন তেজবাহাদুর, জংবাহাদুর ও টিকেন্দ্রজিৎ। এই সব নাম আবার তাঁর বইয়েও ছাপা হ'য়ে গেল। কারও নাম রাখলেন 'গিনিপিগ', কারও বা 'রুপি'। এই সব দেখে ছোট ভগিনীপতি বরদেন্দুনারায়ণ ব'ললেন—"রাম বাবু, আমাদের বাড়ীর ছেলে ক'টার নাম নষ্ট করছো কেন? নূতন বাড়ীর ছেলেদের নাম ত প্রায় সবই ঠিক আছে। সে কী হাসি রামেন্দ্র বাবুর! ব'ললেন, "ছোট হুজুর ত ঠিক ধ'রেছে।"

দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন, বামুন-চাকররা কেউ-ই বাড়ীতে নেই। অধ্যাপক ক্ষেত্র বাবু এসে হাজির। অসময়ে আসতে দেখে প্রশ্ন ক'রলেন রামেন্দ্র বাবু—"খাওয়া হয়েছে?" নেতিবাচক উত্তর শুনে ব্যস্ত ভাবে স্ত্রীর কাছে গিয়ে ব'ললেন, "ক্ষেত্র এখুনি খাবে, সে বাড়ী থেকে খেয়ে আসবার সময় পায়নি।"

স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী ব'ললেন, "এক জন কেন, পাঁচ জনের খাবার এখনি দিতে পারি, কিন্তু কেউই যে নেই, নিয়ে যাবে কে?" ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললেন রামেন্দ্র বাবু, "কেন, আমি?"

কেমন যেন খটকা লাগলো স্ত্রীর। অগত্যা নিরুপায় হ'য়ে ব'ললেন, "বেশ, নিয়ে যাও।" সিঁড়ি নামতে গিয়েই শব্দ উঠলো—ঝনন্ ঝন্। স্ত্রী দু-চার সিঁড়ি নেমেই দেখেন বা' সন্দেহ ক'রেছিলেন একটুও ভুল না। ঝোলে-ডালে কোঁচা-কাপড় মাখা। নির্জীব পাথরের মত দাঁড়িয়ে। চেতন করিয়ে দিয়ে ব'ললেন,—"চল, ভয় নাই. বেঁচে ত এখনও পাঁচ জন ভদ্রলোকের খাবার দিতে পারবো।" থালি, রেকাবি, বাটি গুছিয়ে নিয়ে ব'ললেন ইন্দুপ্রভা দেবী—"চল, আমিই দিয়ে আসি সদর-ঘরে। দরজাটা একটু লাগিয়ে দাও।"

ক্ষেত্র বাবু প্রশ্ন করলেন, "বামুন নেই, আমার খাবার আনলে কে?"

"কেন, আমাকে বিশ্বাস হয় না বুঝি?" আঙুল দিয়ে কাপড় দেখিয়ে ব'ললেন হাসতে হাসতে, "কানে যে আওয়াজ গিয়েছে।" হাসির রোল উঠলো।

"ব'ললেই হ'ত আগেই ব্রাহ্মণীকে, আপনার কাপড় নষ্ট হ'ত না।"

চন্দ্র বাবু দেশের ডাক্তার। রামেন্দ্র বাবুর বাবা, ছোটবাবা, শ্বশুর মহাশয়দের গৃহ-চিকিৎসক। সেই ডাক্তার বাবু দুপুরের ট্রেণে রামেন্দ্র বাবুর ক'লকাতার বাসায় এসে হাজির। অভ্যর্থনা ক'রে বসিয়ে রামেন্দ্র বাবু অন্দরে গিয়ে ব'ললেন, "শুনেছ, চন্দ্র বাবু ডাক্তার এসেছেন?"

চির-পরিচিত বাবাদের ডাক্তার এসেছেন আমাদের বাড়ীতে, খুশী ধরে না ইন্দুপ্রভা দেবীর। "তা'তে কি, তুমি ভয় পাচ্ছো কেন?"

"ভয় পাইনি আমি, তবে জেমো-কান্দী নয়; ছেলেদের-আমাদের সব দুধটা তাঁর জন্য রেখো, বলতে এসেছি।"

বিস্ময়-আকুল চোখ তুলে প্রশ্ন ক'রলেন স্ত্রী—"কতটা দুধ রাখতে হবে?"

"আমাদের এ কয় বাটি ত বটেই. তা' ছাড়া পার ত আরও আড়াই সের। ওঁরা ত আজকালকার ডাক্তার ভদ্রলোকদের মত ভিটামিন খেয়ে বেঁচে নেই?"

কখন কখন রামেন্দ্র বাবুকে স্নেহের অত্যাচার সহ্য করতে হ'ত। এক দিন অসময়ে পাড়ার বিপিন মণ্ডল এসে হাজির তাঁর ক'লকাতার বাসায়। রামেন্দ্র বাবু প্রশ্ন ক'রলেন,—"এখন ত ট্রেণের সময় নয়!"

"এই ত পায়ে পায়ে আসছি বড় বাবু। আমি হেঁটে আসছি।" চমকে উঠে প্রশ্ন ক'রলেন—"ক'দিন লাগলো?" মণ্ডল বললো—"ক'দিন আবার, দু'দিন আর এই আজকের ক' ঘণ্টা।"

বিস্ময় ছাড়িয়ে গেল বড় বাবুর—"তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল কেন মণ্ডল?"

"এই, আপনার একটা খারাপ খবর পেয়ে ট্রেণ-ফেল আর মনে পড়লো না, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।"

"আমার কি মন্দ খবর পেয়েছিলে মণ্ডল?"

মণ্ডল আর বলতে চায় না। অনেক বলা-কওয়ার পর জানতে পারলেন বড় বাবু—'আপনার মাথা না কি এক লাখ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে গরমেণ্ট, ঘি বের ক'রে দেখবে কি আছে মগজে। আমি গেজেট পড়তে না পারলেও ভাল লোকের কাছে শুনেছি, গেজেটে এ খবর বেরিয়েছে।"

আর থাকতে পারলেন না বড় বাবু। কোনও মতে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে কিছুক্ষণ থাকলেন সেখানে; তার পর শোধ নিলেন অন্দরবাটীতে গিয়ে।

৬ নং উইলিয়ামস লেনের বাসায় এক দিন দেশের বনিয়াদি জমিদার গোপী বাবু এসে হাজির। রামেন্দ্র বাবুকে ডেকে পাঠালেন, তিনি এখনই যেন উপর থেকে নেমে এসে দেখা করেন। ভৃত্যকে রামেন্দ্র বাবু ব'ললেন—"কোথায় বাড়ী, কি নাম জিজ্ঞাসা ক'রে আয়।"

সে কথার জবাব না দিয়ে তিনি ব'লে পাঠালেন, "রাম বাবুকে আসতে বল, তা' হ'লেই তিনি জানতে পারবেন।" অগত্যা কী করেন, আসতে হ'ল আলস্য ত্যাগ ক'রে রামেন্দ্র বাবুকে। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এক জন দেশের, তাঁকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

গোপী বাবু ব'ললেন—"রাম, আমি খুব জরুরি কাজ নিয়ে এসেছি, তোমাকে শুনে একটা বিহিত ব্যবস্থা ক'রতে হবে।"

রামেন্দ্র বাবু ব'ললেন—"আপনার খাওয়া-দাওয়া হোক, তার পর শুনে ব্যবস্থা করবো।"

"আরে রাম, এ ত আমারই ঘরের বাড়ী, যখন যা' দরকার হবে আনিয়ে নেবো। তুমি কিছু চিন্তা ক'রো না, বিশ্রাম করগে, যাও।"

কী করেন? অগত্যা যেতে হ'ল বড় বাবুকে। উপরে উঠেই দেখেন, চাঁদির রেকাবিতে রকমারি ফল, দু-একটা ঘরের তৈরী সন্দেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবুর চাকর। গ্রহণ করতে হ'ল চক্ষুলজ্জার খাতিরে। নিচে নামতেই গোপী বাবু ব'ললেন ব্যগ্র হ'য়ে রামেন্দ্র বাবুকে, "তোমার অবসরই হয় না রাম, কেবলই ভদ্রলোক, কেবলই ভদ্রলোক। আমার কথাটা শুনে নাও, খুব জরুরি কাজ।"

খুব জরুরি কাজ শুনে রাম বাবু ঘরে ব'সলেন কিছুক্ষণ। অবসর পেলেন না গোপী বাবু। বাক্স খুলে নিজের জিনিস-পত্র সব গোছগাছ ক'রে রাখতে ব্যস্ত তিনি। একটা বালিশের খোলে দু'দিন ত শয়ন করা যায় না। এই ধারা নানা কাজ তাঁর। যদিও এই সব কাজ করবার জন্য নির্দ্দিষ্ট একটা চাকর রয়েচে। রামেন্দ্র বাবু অপেক্ষা ক'রে বুঝলেন, কাজের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সব সময় বলা চলে না। তিনি চলে গেলেন অগত্যা তখনকার মত।

এক দিন শুভক্ষণ বুঝে গুরুতর কাজের কথা পাড়তে যাবেন বড় বাবু, পাঁচকড়ি বাবু এসে হাজির। তাঁর চীৎকারে বাড়ী সরগরম হ'য়ে উঠলো।

গোপী বাবু ব'ললেন—"রাম, তোমার কাছে কেবলই ভদ্রলোক, কাজের কথা বলবার সময়ই পাই না।"

চলে গেলেন গোপী বাবু তখনকার মত।

সত্যকার শুভ দিন উপস্থিত হ'ল। রামেন্দ্র বাবু কাজের কথা শুনে হতভম্ব। কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না।

"রাম, গুরুতর কাজের কথা নিয়ে এসেছি, তোমাকে বাপু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমার অবস্থা এখন তেমন নেই, সে ত তুমি জান। আমি মনে করেছি, জেমো-বাঘডাঙ্গার রাজাদের কাছ থেকে হিজলের জমি সব বন্দোবস্ত ক'রে নেব। তা' প্রায় চল্লিশ হাজার বিঘে হবে, কী বল রাম? সেইখানেই পাকা বাড়ী ক'রে থাকবো বুঝলে? বিরাট আকারের চাষ আরম্ভ করবো। তা ছাড়া দু-চার হাজার গাই-গরু, মহিষ রেখে ডেয়ারি একটা করবারও ইচ্ছা আছে। এ সব করতে গেলেও টাকার দরকার। কী বল রাম? সেই জন্য কয়েক ভরি সোনা-চাঁদি নিয়ে এসেচি তোমার কাছে।"

বিস্ময়াকুল চোখ তুলে প্রশ্ন ক'রলেন বড় বাবু—"লক্ষ লক্ষ টাকার কল্পনা বাবু সাহেবের, কয়েক ভরিতে কি হবে?"

লম্বা হেসে ব'ললেন,—"সেই জন্যই ত তোমার কাছে আসা রাম! অনেকে বলে ডবল ক'রে দেবো। আমার বিশ্বাস হয় না বাবা, কি জানি কোন্ জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়ে সব খোওয়া যাবে। ঠিক ক'রলাম আমাদের জানা ছেলে রাম, মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক। সে নিশ্চয়ই আমার বিশ ভরিকে চল্লিশ ভরি ক'রে দিতে পারবে। তাকে আবার আশী ভরি; সেই আশী ভরিকে আবার একশো ষাট ভরি। এমনি ক'রে, দু-চার লাখ ভরি করতে আমার রামের আর কদ্দিন লাগবে?"

মুস্কিলে প'ড়লেন বড়বাবু, আশাহত হ'লে মানুষ ত আর বাঁচবে না ভেবে। গম্ভীর হ'য়ে হাসি চেপে ব'ললেন,—"এ গুরুতর কাজ, দু'চার বছর না ভেবে ত আপনাকে ঠিক উত্তর দিতে পারবো না?"

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গোপী বাবু বুকে জড়িয়ে ধ'রলেন রামেন্দ্র বাবুকে, ব'ললেন,—"এই ত ছেলের মত কথা বাবা, দু-চার বছর না ভাবলে কি এত বড় কাজ হয়?"

দু-চার বছরের মধ্যেই সকল কাজের নিয়ামক টেনে নিলেন গোপী বাবুকে নিজের কাছেই।

রামেন্দ্র বাবু কলেজে যেতেন কিছু কাল ধ'রে লালগোলার মহারাজার রবার-টায়ার লাগানো জুড়ি-গাড়ী চ'ড়ে। তখন মহারাজার পৌত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকতেন মহারাজার ঠিক-করা বাসায় তাঁরই কাছে। গাড়ী খারাপ হওয়ায় মেরামত করতে দেওয়া হয়েছে সাত দিন আগে। খেয়ালই নেই রামেন্দ্রসুন্দরের! বাজে ভাড়াটে গাড়ীতে যেতে যেতে হঠাৎ প্রশ্ন ক'রলেন এক দিন যেন ঘুম ভেঙে—"মহারাজার গাড়ীর চাকায় রবার নেই না কি? এত শব্দ কেন?"

জামাতা শীতল বাবু সেদিন পাশেই ছিলেন। —"বাবা, সে গাড়ী ত সাত দিন হ'ল মেরামত করতে দেওয়া হয়েছে।" প্রকৃত তথ্য জানতে পেরে প'ড়লেন আকাশ থেকে।

শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না রামেন্দ্র বাবুর। গরমের ছুটিতে জেমো এসেছেন। বাড়ীতে না থেকে জেমোরই এক প্রান্তে জগৎপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে নিরালায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীরা বসে গল্প ক'রছেন। এমন সময় খবরের কাগজ এল। কাগজ পড়তে পড়তে বিমর্ষ হয়ে প'ড়লেন রামেন্দ্র বাবু। স্ত্রী জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"তুমি অমন হ'লে কেন? কী আছে আজ কাগজে?" নিজেকে সামলে নিয়ে ব'ললেন বড় বাবু, "দেশের সেরা লোক এক জন মারা গেলেন।" সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন —সেরা মানুষ ডি, এল, রায়। তখন স্ত্রীর মুখও বিবর্ণ হ'য়ে গেছে আর এক জন সেরা মানুষের অন্তর্ধানের ভয়ে। অনুভূতি দ্বারা বুঝতে পেরে রামেন্দ্র বাবু বললেন—"উনি ত পণ্ডিত নন গো—যে বাঁচবেন অনেক দিন, তারা মরতে মরতেও ছ-মাস ললাট ভোগ করে। কেমন ঠিক কি না তোমরাই বল?"

আবহাওয়া অনেকটা স্বাভাবিক হ'ল।

রামেন্দ্র বাবুকে তাঁর মা, ছোটমা প্রায়ই অবহিত ক'রে ব'লতেন —"তোর নাতিদের এক বার কিছু বল না। তারা রাত-দিন কেবল খেলা করবে?" হাসতেন মাত্র কথা না বলে। বেশী বলতে গেলে উত্তর দিতেন "বলে কিছু হয় না মা, আপনি বুঝবে বয়স

হ'লে।" কখন কখনও ব'লতেন, "এই দেখ রাম, চাকর-বাকর তোমার আস্কারায় মাথায় উঠেছে! কিছু না বললে চলে? ওরা কাজ কিছুই করছে না।"

তিনি শুনেই যেতেন মাত্র, প্রতিকার করবার চেষ্টা দেখা যেত না। এক দিন স্ত্রী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, "বাড়ী কেমন-ধারা অপরিষ্কার হ'য়ে আছে দেখ। চাকরদের মাইনে-খোরাক দিচ্ছ না? তুমি ব'সে কেবল দেখবে?"

চাকরদের কিছু না বলে তিনি নিজেই ঝাঁটা ধরলেন বাড়ী পরিষ্কার করতে। বাড়ীর লোক তাজ্জব বনে গেল শাসনের রকম দেখে। চাকররা ভয়ে অস্থির; কিছু ব'লবেন ভেবে। তার পর থেকে কিন্তু এক দিনও বাড়ী অপরিষ্কার থাকেনি।

তখন গ্রীষ্মের ছুটিতে রামেন্দ্র বাবু জেমোতে। হঠাৎ ক'লকাতা থেকে জুরির ডাক এল। রামেন্দ্র বাবু গেলেন মহাবীর ঠাকুর আর পুরাতন চাকর হরিকে সঙ্গে নিয়ে। মায়েরা বিশেষ ক'রে বলে দিলেন হরিকে। তুই যেন রামের খাবারের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবি। সে ত মানুষ নয় যা' দেবে তাই খাবে। হরি দেখলো, সত্যিই মায়েরা যা' বলেছেন একটুও ভুল নয়। তিন দিন আসা হয়েছে ক'লকাতায়; দাল নুণে বিষ হ'য়ে পুড়ে যাচ্ছে। বাবু কিছুই বলেন না। অগত্যা বলতে হ'ল হরিকেই। "বাবু কি খাচ্ছেন হুঁস আছে?" সেদিনও সেই রকম নুণে-পোড়া দাল। মুখে কিছু কথা না বলে বাটিশুদ্ধ দাল ঢেলে দিলেন মহাবীরের পায়ে। আশ্চর্য্য! সেই দিন থেকে নুণ-ঝাল সব সমান।

বড় কন্যা চঞ্চলা দেবী ছেলেদের নিয়ে ক'লকাতার বাসায় আছেন। গোয়ালা জেনে গিয়েছে বাবু যখন কিছু বলেন না, তখন এ বাড়ীতে ইচ্ছা মত জল দেওয়া চলে দুধে। কন্যা বলেন—"বাবাকে যত জল-দেওয়া দুধই দেওয়া হোক্ তিনি পান ক'রে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বলেন, আঃ..." সে দিন গোয়ালা সামনেই ছিল দুধের কেঁড়ে নিয়ে। রামেন্দ্র বাবু কেঁড়ের দুধ একটুখানি ঢেলে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন অধিকাংশই জল। তখন কেঁড়ে-শুদ্ধ দুধ ঢেলে দিলেন গোয়ালার মাথায়। বাড়ীর সকলেই হকচকিয়ে উঠলো বিচার দেখে। গোয়ালাকে ব'ললেন রামেন্দ্র বাবু—"এত ভাল দুধ শিবের মাথায় দিতে হয় ঘোষ!"

সে দিন থেকে ঘোষ বিচার ক'রে জল দিত দুধে।

পূজার ছুটিতে রামেন্দ্র বাবু বাড়ীতে আছেন জেনে খোষবাসপুরের জমিদার নীলকান্ত বাবু নিমন্ত্রণ ক'রলেন তাঁকে নিজের প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে। সাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে গেলেন খোষবাসপুর। সেখানে অনেক স্বজাতির বাস। তাঁদের সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে গেলেন নীলকান্ত বাবুর অন্দরে আহার করতে। কিন্তু আশ্চর্য্য, নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার দেখা নেই প্রথম থেকেই! আহারের আয়োজন দেখে হতবাক্ রামেন্দ্র বাবু! খুব বড় একখান থালিতে ভগবানের ভোগ দেওয়ার মত প্রচুর অন্ন! পনর-বিশ জনের আহার হয় কমপক্ষে। সেই অনুযায়ী ভাজা-ভুজি ও অন্যান্য তরকারী। খুশী হ'য়ে ব'সলেন রামেন্দ্র বাবু আহার করতে। পাশে দেখেন পাঁচ-পোওয়া আন্দাজ গাওয়া-ঘি রাখা আছে শ্রীভগবানের ভোগের জন্য। সবই আশ্চর্য্য ঠেকলো তাঁর কাছে। বুঝলেন, ভগবানকে আমরা যেমন দিই প্রাচুর্য্য দেখাবার জন্য, এ-ও তেমনি কিছু মনে ক'রে আমাকে দেওয়া। যাই হোক, সাধ্য মত চেষ্টা ক'রে হাত-মুখ ধুলেন তিনি। দেখলেন, কর্ম্মকর্ত্তা নীলকান্ত বাবু দাঁড়িয়ে র'য়েছেন সেই পরিমাণ কাটা সুপারি একটা থালিতে নিয়ে। আপ্যায়ন ক'রে ব'ললেন, নীলকান্ত বাবু—"সুপ্যারি ল্যিবেন?" রামেন্দ্র বাবু বুঝলেন ভদ্রলোকের সাহস হয়নি কেন এতক্ষণ কাছে আসার। বাড়ী এসে সকলকে শুনিয়ে বলেন সেই ভাষার অনুকরণ ক'রে—"সুপ্যারি ল্যিবেন?" গ্রামের নাম হাজার বার বলেও আশা মেটে না বড় বাবুর। 'খোষ—বাস—পুর' মানে বুঝিয়ে পরিহাস ক'রে বলেন, "সাধে আমাদের মত ঘর-স্বজাতি, খোষ ক'রে বাস করতে গিয়েছে ঐ পুরে?" হাততালি দিয়ে বলেন 'খোষ—বাস—পুর'।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অধ্যাপক মক্ষমূলরের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ

মক্ষমূলরের প্রতিভা কেবল ভাষাতত্ত্বেই আবদ্ধ ছিল না; ভাষাতত্ত্বের পরিধি ছাড়াইয়া অন্যান্য শাখাতেও তিনি যে সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া পণ্ডিতসমাজে সময়ে সময়ে তুমুল আন্দোলন ঘটিয়া গিয়াছে। ভাষাগত সম্পর্কের মূলে জাতিগত সম্পর্ক বিদ্যমান, এই হিসাবে ভাষাবিজ্ঞান অর্থাৎ philology মানব-বিজ্ঞানের বা anthropologyর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু মানবের মধ্যে শোণিত-সম্পর্কের নির্ণয় প্রকৃতপক্ষে জীবতত্ত্বের বিষয়। তোমার সহিত আমার শোণিতগত সম্বন্ধ আছে কি না, উভয়ের কথিত ভাষা ধরিয়া বিচার করিতে গেলে অনেক সময় এ বিষয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কিন্তু উভয়ের শরীরগত সাদৃশ্য, উভয়ের গায়ের রঙ, মাথার চুল, হাতের গঠন, চোখের চাহনি প্রভৃতি ধরিয়া বিচার করিতে গেলে সিদ্ধান্ত অনেকটা নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

৩০

কিন্তু গ্রামে তো শুধু 'একটি চৌকিদারই নেই। হয়তো এমনি ভাবে প্রকাশ্যে সরকারী হুকুম, তামিল করবার উৎকট 'উৎসাহ একা তমিজদ্দীরই ছিল এবং নিশ্চিত ভাবে বোঝা গেল, জীবনে সে আর এমনি ভাবে আমাদের পথে বাধার সৃষ্টি করতে সাহস করবে না। কিন্তু এমনি ধূর্ত্ত আরও আছে, যারা গোপনে এক টুকরো সংবাদ সংগ্রহ করে রং-চং দিয়ে, ফুল-লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে, ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করে থাকে ঢাকা শহরের আই-বি পুলিশ-সুপার গ্র্যাসবি সাহেবের শ্রীপাদপদ্মে! তার পর আরো আছে কিছু সংখ্যক আধুনিক যুধিষ্ঠির, যাঁরা জীবনের প্রতি পদে অসংখ্য অসত্যের প্রশ্রয় দিলেও আই-বি বা দারোগার কাছে হয়ে ওঠেন একেবারে সত্যের অবতার, যাঁরা 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' উচ্চারণেও নারাজ। ঠগ বাছতে গিয়ে কি শেষটায় গ্রামই উজোড় করে দিতে হবে?

সুতরাং সর্ব্ব ক্ষেত্রেই কেরোসিন তেল প্রযোজ্য নয়, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে বসে শান্ত মনে নীতি নির্ণয় করা গেল। চরগুলোর তালিকা প্রস্তুত করে তাদের ওপর চরবৃত্তি করবার জন্য নিয়োগ করা হলো কিছু ছেলেকে, কিছু ছেলে আমাদের গ্রামের চতুর্দ্দিকের সীমানার ওপর রাখতে লাগলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সীমান্তরক্ষীর মতো, সন্দেহজনক আগন্তুক কেউ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলেই এদের অদৃশ্য লগ্-বুকে তা নোট করা হতো এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হতো, তৃতীয় এক দল যুক্তিবাদী তার্কিক ছেলেকে নিয়োগ করা হলো এই সব আধুনিক যুধিষ্ঠিরদের তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করে যুক্তির খড়্গাঘাতে এদের একে-একে ধরাশায়ী করবার জন্য! এই সব আয়ুধের কোনো-টাই যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় বা যেখানেই লক্ষ্যভেদে এরা অসমর্থ, সেখানেই শুধু স্থির হলো প্রয়োগ করা হবে কড়া দাওয়াই!

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, তমিজদ্দী আমাদের গ্রামের আদি অধিবাসীদের এক জন আর আমাদের গ্রামের শতকরা আশী জনই মুসলমান। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যও তখন জমির কারিগর। সুতরাং এই ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক কালো রং লাগিয়ে একেবারে বিকট করে তোলার কাজে কতকগুলো গুণ্ডাশ্রেণীর লোক আত্মনিয়োগ করলো। আমি কিন্তু এ সব থোড়াই গ্রাহ্য করে চলতাম আর যারা আমার আশে-পাশে চলা-ফেরা করতো আমারই ছায়ার মত, তারাও মর্ম্ম দিয়ে জানতো:

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?···

এক দিন সকাল বেলাই এসে হাজির বছিরদ্দী। ওর ছইওয়ালা একমাল্লাই নৌকো সবাই চেনে। সারা বর্ষাকালই অর্থাৎ আষাঢ় মাস থেকে সুরু করে একেবারে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ঐ বিশেষ নৌকোখানা যে সময়ে ও অসময়ে অসংখ্য বার গাঙ্গুলী-বাড়ীর ঘাটে এসে ভিড়বে, পাড়ার ও গ্রামের সবাই তা দেখে থাকে। কিন্তু কোথায় সে গেল আমায় নিয়ে, কোন্ গ্রামে, কার বাড়ীতে, সেখানে কি-কি কাজ হলো, এ কথা—ব্যাটাকে ফাঁসীতে লটকে দিলে জিভ বেরিয়ে পড়বে সত্য, অথচ কথা যে বেরুবে না একটিও—এ আমি নিশ্চিত ভাবে জানি, যেমন করে জানি আমার নিজেকে!···

মা ঘাটে গিয়েছিলেন কী কাজে। দক্ষিণের কোঠায় বসে আমি কী একখানা বই পড়ছিলাম, শুনতে পেলাম মার কণ্ঠ: কি, এই সকালেই আবার কোথায় যাওয়া হবে?

বছিরদ্দী অশেষ বিনয় প্রকাশ করে বললো: না না জ্যাঠাইমা, যাওনের লইগা না। দাদার লগে আইছি একটু জরুরী কথা কইতে।

মা বললেন: যা, দক্ষিণের কোঠায় আছে। কিন্তু তুই জেনে রাখ বাছা, এবার তোকেও ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ!

মূর্খ মুসলমান জবাব দিল: তা জ্যাঠাইমা, দাদাগোর মতন লোকে যদি জেলে-জেলেই জীবনটা কাটাইতে পারে, তা'হলে আমাগোর মতন চাষাভূষার জীবনের কী আর দাম? কী হইবো আর এই জীবনটা গেলে?

মা হেসে বললেন: তোকেও দেখছি পটিয়ে ফেলেছে।

বছিরদ্দী আমার কাছে এসে যা বললো হাত-পা নেড়ে ও ফিস্-ফিস্ করে, তা এই: তমিজদ্দী জমির কারিগরের সহায়তায় সারা গ্রামে প্রচার করে বেরিয়েছে যে, হিন্দুরা মুসলমানদের এই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। তাই সেদিন চৌকিদারের ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। আর এই দুষ্কার্য্যের পশ্চাতে যে গাঙ্গুলী-বাড়ীর কর্ত্তাই আছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং—

বছিরদ্দী বললো: সেদিন রহিম শ্যাখ আর আকবর খলিফা জুইতা লইয়া ওৎ পাইতা বইসা আছিল ম্যাস্বর সাহেবের বাড়ীর পচ্চিমে। আপনি গেছিলেন না থানায় হাজিরা দিতে। ঐ পথে ফিরলেই ওরা জুইতা দিয়া আপনারে গাইথা ফালাইয়া একেবারে আইড়ল বিলে যাইয়া ভাসাইয়া দিয়া আসবো, এই আছিল ওগো মতলব।

তার পর?

বছিরদ্দী দুই হাত একত্রে কপালে ঠেকিয়ে বললো: খোদায় যারে রাখবো, তারে মারবো কোন্ শালা? আপনি সেদিন নাকি আগে গেছিলেন বীরতারার দিকে, তাই ওরা লাগুড় পায় নাই। পাথইরা বাড়ী হইয়া ঢুকছেন গেরামে।

বললাম: কিন্তু রোজই তো আর বীরতারা যাবো না, লাগুড় যদি এক দিন পেয়ে যায়?

হ: কর্ত্তা, কি যে বলেন!—বলে বছিরদ্দী ফোকলা মুখ অবজ্ঞার হাসিতে উদ্ভাসিত করে তুললো।

তার পর বিজ্ঞের মতো বললো: আমিও কইয়া দিছি ওগো— যাইস্, কর্ত্তার গায়ে হতে তোলতে যাইস্। খালি হাত দেখস্ দেইখা, কর্ত্তার কোমরে থাকে একখান পিস্তল! গোটা দশেক তো আগে ধুপ্পুর ধুপ্পুর পইড়া যাবি, তার পর যদি পাস্ তার লাগুড়!

প্রশ্ন করলাম: পিস্তল!

বছিরদ্দী মহা উৎসাহে জবাব দিল: হ, কমু না? শালারা করবো কি? থানায় যাইবো? কউক যাইয়া বড় দারোগার কাছে। তল্লাসী কইরা পাইলে তো?—আবার তার ফোকলা মুখে হাসি দেখা গেল।

বললাম: তুই ব্যাটা আস্ত গাধা। পিস্তল দেখেছিস কখনো আমার কাছে? তবে না-দেখে বলিল কেন যে, আমার পিস্তল আছে? ওরা থানায় জানিয়ে দিলে আমায় আবার গ্রেপ্তার করে তো নিয়ে যেতে

পারে, কয়েক মাস মুন্সীগঞ্জের হাজতেও তো রেখে দিতে পারে! —ব্যাটা পাতী নেড়ে!

বছিরদ্দী লজ্জা পেয়ে গেছে। বাহাদুরী নেবার জন্য সে যে গাল-গল্প ছেড়েছে, তা যে ফিরে এসে তীর হয়ে আমারই বুকে বিঁধতে পারে, তা আদৌ ভাবতে পারেনি সে।

সত্যিই সে পাতি নেড়ে, সরল বোকা মুসলমান।

সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জ্জর এ যুগের মন নিয়ে বিচার করলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয় যে, সে যুগে এমনি নাঙ্গা ভাষায় কথা বলেও কী করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন থাকতো অক্ষুন্ন! অথচ সে যুগে মন ছিল সংকীর্ণ, চিন্তার সরীসৃপ বেলোয়ারী কাঁচের রঙীন গণ্ডীর মধ্যেই ঘোরা-ফেরা করতো। ব্রাহ্মণের বিধবা মুসলমানের ছায়া পর্য্যন্ত ছুঁতেন না। প্রজারা এসে দপ্তরে বসতো নীচু টুলে, পৃথক কল্কেতে নিজের হাতে তামাক সেজে খেত, পুজো-পার্ব্বণে মুসলমান ছেলে-মেয়েরা নতুন জামা পরে দেউড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে সমারোহ দেখতো।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সে যুগেই আবার দেখা গেছে মুসলমান লাঠিয়াল হিন্দু জমিদারের জন্য প্রাণ দিয়েছে, সে যুগেই আকবর সর্দ্দার রমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য লাঠীর আঘাত মাথা পেতে নিয়েছে, রহিম ও রমেশের এমনি সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বই সে যুগের সমাজকে গড়ে তুলেছে, তার বনিয়াদ করে তুলেছে দৃঢ়, তাকে শক্তিমান করে তুলেছে!···

আর আজ আচারে ও বিচারে আমরা যেখানে জাতিভেদের সংকীর্ণতার শেষটুকুও নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়েছি, অগ্রগামী চিন্তাধারায় আলোকিত মন নিয়ে আমরা যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণের আলোচনা করছি, সেখানে কেন এত মনোমালিন্য, কেন এত হানাহানি? শুধু সম্প্রদায় বা বসতি নয়, দেশগত পার্থক্যের গণ্ডীও ভেঙে ফেলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে সখ্যতার আলিঙ্গনে বাঁধবার উদ্যোগ করতে গিয়ে কেন আজ দেখতে পাই ক্ষুদ্র স্বার্থের বীভৎস রূপ, কেন আজ হিংসায় মন আমাদের হয়ে উঠেছে কালো!···

আসল কথা, সে যুগে ছিল বাহ্যিক ব্যবধানের মধ্য দিয়ে অন্তরের যোগাযোগ, প্রাণের দেবতাকেই সে যুগে সম্মান দেখানো হতো। আর এ যুগের যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের সীমাহীন সতর্ক ও সপ্রতিভ করে দিয়ে আবেগের শেষ বিন্দুটুকুও শুকিয়ে দিয়েছে। তাই সম্প্রীতি আমাদের আলঙ্কারিক শব্দবিন্যাসে মুখর, অন্তঃসলিলা প্রেম-ফল্গুর উৎস সেখানে শুষ্ক! Dialectic materialism এর পূজারী আমরা, অন্তরের আবেগকে করি তাচ্ছিল্য! ছক-কাটা ধারা-উপধারায় কণ্টকিত চুক্তিপত্রের আক্ষরিক স্বর্ণপিঞ্জরে বন্দী আমাদের মন, পান থেকে চূণ খসে পড়া সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ, অথচ অভিমানের তরঙ্গাঘাতে কোথায়-যে বন্ধনের ভিত্তি চাপের পর চাপ ভেঙে পড়ছে, সে সম্পর্কে একেবারে উদাসীন!···কিন্তু যাক্ গে, সে কথা।

বিক্রমপুরে বর্ষাকাল মানে যে কী, তা তাঁরাই জানেন, যাঁরা সেখানকার অধিবাসী। চতুর্দ্দিক শুধু জলে জলাকার নয়, মাঝে-মাঝে সে জলের গভীরতা আঠারো থেকে বিশ ফুট পর্য্যন্ত হবে। আমাদের গ্রাম একেবারে আড়িয়ল বিলের প্রান্তে হওয়াতে সেখানে জল এত বেশী হয়ে থাকে যে, পুরো বর্ষার সময় প্রায় প্রতি বৎসরই জল একেবারে যে উঠোন পর্য্যন্ত উঠে আসে, তাই নয়, ঘরের মধ্যেও প্রবেশ করে। তখন এক ঘর থেকে অপর ঘরে যাবার জন্য বাঁশের সাঁকো তৈরী করা হয়। উঠোনে হয়তো ছোট-ছোট মাছের দল মনের খুশীতে ছুটোছুটি করে এবং সূক্ষ্ম জাল দিয়ে কিছু-কিছু ধরাও যায়। কিন্তু সর্ব্বত্র জলে ডুবে যাবার ফলে বিছে, সোঁপোকা, আরশুলা, ইন্দুর, ব্যাঙ এবং সাপগুলো এসে আশ্রয় খোঁজে একেবারে ঘরের মধ্যে, হয়তো খাটের তলায়, হয়তো কুলুঙ্গির মধ্যে, হয়তো বালিশের পাশে! এবং প্রায়ই এই সব সাপ বিষধর হয়ে থাকে। যেগুলো বিষহীন, ফণাহীন, তুর-তুর করে জলে ঘুরে বেড়ায় ছোট-ছোট মাছ ধরে গলাধঃকরণ করবার প্রত্যাশায় এবং ডাঙ্গায় হানা দেয় পোকা-মাকড় কিংবা ক্ষুদ্রাকার একটি ভেকের সন্ধানে, সেই সাপগুলো প্রায়ই খুব স্মার্ট, কর্ম্মঠ। তাই এরা কখনো বেশী ক্ষণ একই স্থানে থাকে না। রাত্রের অন্ধকারে সন্তর্পণে এসে হয়তো আপনার তরিতরকারী রাখবার ডালাটির নীচেই একটু নিঃশ্বাস ফেলছে, এমন সময় ভোর হয়ে গেল। আপনার ভোরের তাগিদ থাকলেও সে বেচারার হয়তো সবে তন্দ্রা আসছিল, সুতরাং বিরক্ত বোধ তার হবেই। তাই যেই আপনি ডালাটি তুললেন, অমনি হকচকিয়ে উঠে সে প্রথমটা মাথা তুলে বিক্ষোভ প্রকাশের চেষ্টা করলো। কিন্তু হায়, ফণা নেই আর নেই দাঁতের গোড়ায় বিষের থলে! সুতরাং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা ব্যতীত পথ কোথায়? তবে হাঁ, কোনো-কোনটি আবার মরীয়া হয়ে উঠে হয়তো অকস্মাৎ আপনার পায়ের আঙ্গুলটিই গপ্ করে কামড়ে ধরলো যেমন করে ওরা ব্যাঙ ধরে বা ইঁদুরের বাচ্চা ধরে ফেলে। অবশ্য এতে বিশেষ কিছুই হয় না, সামান্য একটু ক্ষত ব্যতীত।

বিষধর সাপগুলোর কথা পৃথক। তারা বনিয়াদী পরিবারের বড় কর্ত্তার মতো গদাইলস্করী চালে চলে, সামান্য খুঁটিনাটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। সহ্য করবার শক্তি এদের প্রশংসনীয়, ডিস্‌পেপসিয়া রোগীর মতো মেজাজ এদের আদৌ খিটখিটে নয়। ফলে যা হয়, তাই হয়েছে। আপনার খুনসুটি, আপনার সুড়সুড়ি আপনার দুটো-একটা খোঁচাখুচিও এরা বিনা প্রতিবাদে হজম করবে অনেক ক্ষণ। তার পর প্রথমটা দু'-একবার নিঃশ্বাসের ঝড় তুলে জানাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। তাতেও যদি ফল না হয়, তা'হলেই তারা হাতে তুলে নেয় হাতিয়ার। কিন্তু কোনো ক্রমে একবারটি যদি এঁরা এদের অধর ছুঁইয়ে দেয় আপনার হাতে বা পায়ে বা শরীরের যে-কোনো স্থানে, ব্যস, তা'হলেই সুরু হয়ে যাবে তার বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া, যার মারাত্মক জের কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে, কেউ তা বলতে পারে না!

বর্ষাকালে বিক্রমপুরে সর্পাঘাতে কিছু লোক প্রতি বৎসরেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেও বিক্রমপুরবাসী গোখরো, শঙ্খিনী, কোবরা, দারাস্, ঘনে প্রভৃতি বিষাক্ত সাপগুলিকে দেখে অন্ততঃ আতঙ্কে যে মূর্চ্ছা যায় না, তা সত্যি।

বর্ষার জলে ডুবে-যাওয়া গাছের যে অংশ জলের ওপরে থাকে, সাপ প্রায়ই আশ্রয় নেয় সেই সব গাছের কোটরে বা শাখায়। রাত্রে এমনি কোনো গাছে নৌকো বেঁধে রাখলে কখনো-কখনো সাপ গাছ ছেড়ে এসে নিরাপদ ও উৎকৃষ্ট আশ্রয় খোঁজে নৌকোর পাটাতনের নীচে।···

সাপের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে কী করে বার কয়েক সাপের হাতে আমি পড়েছিলাম এবং প্রতি বারই রক্ষা পেয়েছিলাম কোন ক্রমে। হয়তো ভাগ্যের জোরে। তবে কোনো বারই বর্ষাকালে সাপের কবলে পড়তে হয়নি আমায়।

এক বারের কথা বলছি। সেটা চৈত্র মাস হবে, বিক্রমপুরে তখনো বর্ষার জল প্রবেশ করেনি। আমাদের গ্রামের ফুটবল খেলবার ছোট মাঠটি ছিল আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে শ'-তিনেক গজ দূরে।

এক দিন বিকেলে ঐ মাঠে খেলাধূলার পর সুশীল আর আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ী গেলাম না। আমার সঙ্গে ছিল কর্ণার্জ্জুন নাটকখানা আর তখন গ্রামে কর্ণার্জ্জুন নাটকাভিনয়ের তোড়জোড় চলছে। সবাই একে-একে চলে গেলেও আমি ঘাসের ওপর আধ-শোয়া অবস্থায় সুর করে নাটকখানা পাঠ করা সুরু করলাম, সুশীল সম্মুখে বসে অভিনিবেশ সহকারে তা শুনতে লাগলো।

পাঠ যখন বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় মনে হলো আমার কোমরের কাছে কী যেন এসে অত্যন্ত মৃদু ভাবে স্পর্শ করলো। প্রথমটা ভাবলাম সুশীল বোধ হয় আমার হান্টারটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে, তাই লেগে গেছে অসাবধানতায়। আবার কর্ণের অংশ সুর করে পাঠ সুরু করলাম।

তখন চারি দিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। পুব দিকের মাঝি-বাড়ীতে দুটো-একটা আলোও জ্বলে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে তার আভা। একটু পরই মজুমদার-বাড়ীতে কর্ণার্জ্জুন নাটকের মহলা সুরু হবে উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। কর্ণের ভূমিকায় আমাকেই নামতে হবে। সুশীলের কোনো ভূমিকা নেই। ষ্টেজে দাঁড়ালে তার পা কাঁপে, গলা শুকিয়ে যায়, সমস্ত কথাই ভুলে যায়, স্মারকের এক বর্ণও তার কানে প্রবেশ করে না। তাই সে উৎসাহী কর্মী মাত্র। বিশেষ করে আমার অভিনয়ের সে এক জন অন্ধ স্তাবক। বহু বার সে আমায় পরামর্শ দিয়েছে কলকাতায় গিয়ে কোনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করবার।

অকস্মাৎ অনুভব করলাম, সুশীল আমার হান্টারটা আমার কোমরের ওপর দিয়ে বুকের ওপর ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু কেন? সম্মুখে তাকিয়ে দেখি আমার সেই হান্টারটা তো আমার সুমুখেই ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে। তবে? বুকের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখি একটা প্রকাণ্ড সাপ আমার গা বেয়ে উঠছে।

তৎক্ষণাৎ একটা পালটু খেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। সুশীল ও আমি কয়েক হাত দূরে সরে এসে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলাম সেই আবছা অন্ধকারে বিষধর সর্পটি বিরাট ফণা উচ্চে তুলে দোল খাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ফোঁসফোসানি!

সুশীল বললো: গোখরো সাপ। টেরই পায়নি যে, কোনো মানুষ। তোকে এক টুকরো কাঠ মনে করে ওটা বেয়ে উঠছিল ওপরে।—ইস্, কামড়ালে বাঁধবার জায়গাও থাকতো না রে। একেবারে বুকের পাঁজরায়!

দেখলাম, সাপটা খানিক ক্ষণ ফোঁস-ফোঁস করে ক্রোধ প্রকাশ করলো, তার'পর'ফণা নামিয়ে এঁকে-বেঁকে ঢুকলো গিয়ে পাশের ঝোপে।

এমনি আরো কয়েক বার। প্রতি বারই এমনি, কানের পাশ দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে যে, শেষ পর্যন্ত সাপের ভয় আমার আর ছিল না। কেন যেন আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বিধাতা সর্পাঘাতে মৃত্যু আমার জন্য বোধ হয় ব্যবস্থা করেননি।

৩১

মাণিকের মৃত্যুতে আমার দক্ষিণ হস্ত ভেঙে যাবার পর তা জোড়া দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম প্রাণপণ করে। যেখান থেকে যাকে পেতাম, তার মধ্যেই খুঁজে বেড়াতাম আমার হারানো মাণিককে! ইন্দু সরকার মারফৎ নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হলো এবং রীতিমত সেখান থেকে লোক যাতায়াত সুরু করলো আমাদের এখানে। বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কোনো-না-কোনো সূত্রে প্রবেশ করতে সমর্থ হলাম, প্রায় প্রত্যেক স্কুলেও। প্রায় প্রতি দিনই সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বা গভীর রাত্রে গ্রামের সবাই নিদ্রামগ্ন হলে বছিরদ্দীর একমাল্লাই নৌকোখানা সন্তর্পণে এসে ভিড়তো আমাদের দক্ষিণ দিকের ঘাটে। জানালায় সাংকেতিক টোকা পড়লেই উঠে পড়তাম আমি। প্রস্তুত হয়ে নিয়ে পাশের ঘর থেকে চুপি-চুপি ডেকে তুলতাম ফুলবৌদিকে। ফুলদা কিংবা তিনি উঠে দরজা বন্ধ করে দিতেন আর আমি এসে উঠতাম নৌকোয়। ফুলদাকেই শুধু জানিয়ে যেতাম গন্তব্য স্থানের কথা। কারণ জরুরী অবস্থায় যাতে অনায়াসে আমার কাছে তিনি যেতে পারেন, তার পথ খোলা রাখা দরকার ছিল।

সারা রাত কাজ করে ভোর হবার পূর্ব্বেই আবার বছিরদ্দির নৌকো এসে আমায় নামিয়ে দিয়ে যেত। টের পেতেন ফুলবৌদি ও ফুলদা। কারণ তাঁরাই দিতেন দরজা খুলে। যেখানে গেছি, সেখানেই খুঁজেছি মাণিককে। ভাঙা হাত জোড়া দেবার চেষ্টা করেছি।

আশা যখন প্রায় চির দিনের জন্য ত্যাগ করছিলাম, এমন সময় পেলাম এক নতুন মাণিককে। আজ তার কথা মনে পড়ে। স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা নেই যে, সে সময় মাণিকের অভাবটা পূর্ণ করে দিয়েছিল একা সুবোধ চক্রবর্ত্তী; তন্তর গ্রামের সুবোধ চক্রবর্ত্তী।

তার প্রতি আমার যে আদেশ যখনি দেয়া হয়েছে, তখনই সে বিনা প্রতিবাদে, বিনা বাক্যে তা সমাধান করেছে এবং তা সুষ্ঠু ভাবে। তাকে বলেছিলাম প্রতি রবিবার একটি করে নতুন ছেলে নিয়ে আসতে আমার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বেকার কাজগুলো নিঁখুত ভাবে শেষ করে সত্যিই প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর সে একটি করে ছেলে নিয়ে আসতো। এমনি নিয়ম সে পালন করে চলেছিল অনেক কাল, বোধ হয় পুরো দেড় বৎসর। তার পর আরও বৃহত্তর প্রয়োজনের তাগিদে সুবোধকে আত্মনিয়োগ করতে হয়।

আজ সুবোধ কোথায় আছে জানিনে। রাজনীতি আর করে কি না, তাও জানিনে; এমন কি, বেঁচে আছে কি না, সে সংবাদও সঠিক রাখিনে। কিন্তু গর্ব্বভরে আজ স্মরণ করি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মারফৎ তার দেশসেবার কথা। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত, বেয়াল্লিশের আন্দোলন সুরু হবার প্রাক্কালে গ্রেপ্তার করে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সবাইকে যখন নিরাপত্তা বন্দীরূপে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ রাখা হয়েছে, সেই সময় একা এই সুবোধ চক্রবর্ত্তীই পলাতক ভাবে বাংলা, বিহার ও আসামে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের যে সব গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলে এবং ভারতের

স্বাধীনতা-আন্দোলনে সেই সব সংগঠন কী ভাবে যোগদান করে, ফাঁসীর ঝুঁকি নিয়ে কী ভাবে তারা মিত্রশক্তির পরাক্রমশালী গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আরাকানের পথে সংগ্রামরত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের সেই অমর কাহিনী আজও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। নেতাজীর ভারত ত্যাগের সঙ্গে এই বি-ভি বিশেষ ভাবে জড়িত, আফগানিস্থানের সীমান্ত পার করে দিয়ে আসবার পরও নেতাজীর সরাসরি যোগাযোগ ছিল এই বি-ভির সঙ্গে তত দিন, যত দিন না জার্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করে বসে, তার পর আবার এই যোগসূত্র স্থাপিত হয় নেতাজী সিঙ্গাপুরে আসবার পর।

কী ভাবে স্থাপিত হয়, কী ভাবে বি-ভির কর্ম্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, অলিখিত সেই ইতিহাস আমি জানি। আমার পরবর্ত্তী গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করবার সংকল্প আছে।

কিন্তু একা সুবোধ সে যুগে কতখানি করেছিল পলাতক ভাবে পুলিশের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করে, তার খানিকটে আভাস দেবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারছি না। আমার আত্ম-স্মৃতির সঙ্গে সুবোধের ইতিবৃত্ত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। আমার সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের বিষয় এই যে, এই সুবোধ চক্রবর্ত্তীকে আমিই নিয়ে আসি প্রথম বিপ্লবীর দলে।

সেটা ১৯৩০ সাল। জ্যৈষ্ঠ মাস। বিক্রমপুরে তখনো বর্ষার জল প্রবেশ করেনি। ছোট ভাই রঙ্গলালকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম বেড়াতে ইছাপুরা গ্রামে ফুলবৌদির বাপের বাড়ীতে। গরীব হলেও এই পরিবারটির আদর-যত্নের মধ্যে পাওয়া যেত অন্তরের স্পর্শ, তাই মাঝে-মাঝে যেতাম সেখানে। অবশ্য প্রমোদ-ভ্রমণে নয়, সংগঠনের অভিসন্ধি নিয়ে। বিক্রমপুরে ইছাপুরা বৃহৎ গ্রামগুলির অন্যতম। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষিত ও সচেতন। সচেতন শুধু দেশের সংবাদ রাখবার বেলায় নয় অথবা সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনার ক্ষেত্রে নয়, নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধেই এঁরা অত্যধিক সচেতন বলে ঐ গ্রামের অধিবাসীরাই বলতেন। ফলে সূঁচ হয়ে এই গ্রামে প্রবেশের সুযোগও পারছিলাম না সৃষ্টি করে নিতে। চেষ্টা চলছিল শুধু।

মনে পড়ে সেদিন দুপুর বেলা রান্না-ঘরে রণু আর আমি পাশাপাশি খেতে বসেছি আর ফুলবৌদি করছেন পরিবেশন। নানা রকম কথা-বার্ত্তার মধ্যে অকস্মাৎ রণু বললো যে, নাটকে স্ত্রী-ভূমিকার জন্ম আর ভাবতে হবে না। স্ত্রী-ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করতে পারে, এমনি ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। নাম মনু, তন্তর গ্রামে বাড়ী।

আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, ওকে এক দিন সংবাদ দিয়ে কেয়টখালিতে নিয়ে আসতে। রণু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: আজ সে এই গ্রামেই এসেছে কিন্তু দাদা। ডেকে আনবো?

প্রশ্ন করলাম: এখানে, কেন? রণু জবাব দিল: আজ যে এখানে নিখিল বঙ্গ পোষ্টাল সম্মেলন না কি একটা সম্মেলন হবে, তাতে মিশরকুমারী নাটক অভিনয় হবে। মনু সেই নাটকে মায়ার ভূমিকায় নামবে।

বললাম ডেকে আনতে।

বিকেলের দিকে অনেক খোঁজাখুজি করে রণু ধরে নিয়ে এল মনুকে। দেখলাম বছর পনেরো বয়স হতে পারে। গায়ের রং ফরসা বলা যায় না, স্বাস্থ্যও তেমন ভালো নয়; কিন্তু সর্ব্ব অবয়বে যেমন আছে একটা লালিত্য, তেমনি বুদ্ধির ছাপ। ভালোই লাগলো।

আলাপ করলাম। জানা গেল, ইছাপুরা গ্রামে সে আরও অনেক বার নাটকাভিনয় করেছে। প্রতি বারই সুখ্যাতি হয়েছে তার। সিংপাড়া হাই স্কুলে ক্লাশ এইট-এ পড়ে।

প্রথম দিনের আলাপ হলো একান্ত ব্যক্তিগত…বাপ, মা, ভাই, বোনের কথা, আর্থিক অবস্থার কথা, সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা, ম্যাট্রিক পাশ করে সে কী করতে চায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা।

এক দিন কেয়টখালী আমাদের বাড়ীতে আসতে বলে দিলাম ছেলেটিকে। সে ফস্ করে প্রশ্ন করে বসলো: কেন?

বললাম: আমরাও একটা নাটক শীগ্গিরই করবো, তাতে তোমায় একটা পার্ট দোব।

প্রশ্ন করলো সুবোধ: পারবো কিনা না দেখেই পার্ট দেবেন কেন?

এই কেন-র জবাব এড়িয়ে গেলাম কৌশলে। শুধু নাটকের নায়িকা করবার জন্যই যে তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি না, এর পশ্চাতে আছে একটি বৈপ্লবিক পরিকল্পনা, আদৌ প্রকাশ করলাম না তা।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুবোধ চক্রবর্ত্তী এল আমাদের বাড়ীতে। অল্প দিনের মধ্যেই সে ধরা দিল এবং একেবারে আমাদের পরিবারেরই এক জন হয়ে পড়লো মা, বাবা, বৌদিরা সবার সঙ্গে মিলে-মিশে।

কাজের উৎসাহ দেখেছি তার একেবারে সীমা-পরিসীমাহীন। এমনি অত্যন্ত সরল ও হাসিখুশী হলে কি হবে, কাজের বেলায় তাকে দেখেছি কঠোরতম সিরিয়াস্ কর্মী ও সংগঠক।

১৯৪১ সালে সে ছিল ঢাকা জেলা ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক। মেজর সত্য গুপ্ত প্রমুখ বি-ভির প্রায় সবাইকেই তখন গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তা বন্দীরূপে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ঢাকা শহরে ফরোয়ার্ড ব্লক অফিসে হানা দেবার পূর্ব্ব ক্ষণে সুবোধ গা ঢাকা দিল এবং পুলিশের হুলিয়া প্রথমটা অত্যন্ত জোরালো থাকে জেনে সে সোজা চলে গেল আসামে। সেখানে বন্ধু জ্যোতিলালের সাহচর্য্যে একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তার মারফৎ জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার সুযোগ গ্রহণ করে সুবোধ যুদ্ধবিরোধী সংগঠন সুরু করে দেয়। সেখান থেকে সে আসে ময়মনসিংহে, সেখান থেকে ঢাকায়, বিক্রমপুরে, ফরিদপুরে এবং অবশেষে বিহারেও গিয়ে সে হাজির হয়।

এদিকে বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের পলাতক এই নেতার জন্ম গভর্ণমেণ্ট পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। নেতাজী তখন ভারত ত্যাগ করেছেন। কেন করেছেন, তা দেশের মধ্যে যাঁরা জানতেন, তার মধ্যে সত্যরঞ্জন বক্সীও এক জন। কিন্তু বাইরে কেউ নেই, নিরাপত্তা বন্দীর শৃঙ্খল গভর্ণমেণ্ট সবাইকে পরিয়ে দিয়েছেন। অতএব বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের সর্ব্বময় কাজের ভার স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে সুবোধ চক্রবর্ত্তীর ওপর।

দ্বিধাহীন ভাবে বলবো এবং জোর গলায় বলবো, সুবোধ সে দায়িত্ব প্রাণপণে পালনের চেষ্টা করেছে। এখানে কতখানি কৃতকার্য্য সে হয়েছিল, সে বিচার নয়, এখানে উল্লেখযোগ্য, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার এগিয়ে আসার সাহস। ওজর দেখিয়ে অনায়াসে সরে পড়তে পারতো সে! কৈফিয়ৎ তলব করবার জন্য বাইরে কেউ ছিল না। কিন্তু সে যে সেই জগতের ছেলে, যারা দায়িত্বের মূল্য দেয় নিজেদের জীবনের চাইতে বেশী।

বাংলা, বিহার ও আসামের বিভিন্ন স্থানে পলাতক ভাবে ঘুরে বেড়াতো সে এবং প্রত্যেক শহরে পৌঁছেই সে সেখানকার পুলিশ সুপারের নামে একখানা চ্যালেঞ্জ-পোষ্টকার্ড ছেড়ে দিত: হ্যালো মিঃ সুপার, আমি আজ এই শহরে এসেছি। যদি পার, গ্রেপ্তার করো।

এমনি ভাবে চ্যালেঞ্জ করে ঘুরতে ঘুরতে সে অকস্মাৎ ধরা পড়ে যায় ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে। বিক্রমপুরে বর্ষার জল প্রবেশ করলেও তা তখনো মাঠ-ঘাট ডুবিয়ে দেয়নি। সাহেবী পোষাক পরে সুবোধ যাচ্ছিল লৌহজং ষ্টেশনে। নৌকোর মধ্যে পোষাক পরেই সে শুয়ে রয়েছে। মাথার কাছে একটি টিনের সুটকেশ। তার ওপর স্তূপীকৃত কাগজ-পত্র ও তার ওপর একটি দেশলাই।

তখন সবে ভোরের আলো পূবের আকাশ দ্যুতিময় করে তুলেছে। গাছে-গাছে সদ্য-জাগা পাখীর কিচির-মিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। দু'-ধারে উঁচু খালের মধ্যে দিয়ে সুবোধের নৌকো এগিয়ে চলেছে। এসে পড়েছে কিন্তু সে একটি মারাত্মক স্থানে। শ্রীনগর থানার দক্ষিণের খালের বাঁকটা ঘুরতেই একেবারে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মুখে পড়ে গেল থানার দারোগার নৌকো। দারোগা তাকে ভালো করে লক্ষ্যই করেনি, করলেও হয়তো তৎক্ষণাৎ সাহেবটিকে চিনতে পারতো না। কিন্তু সঙ্গে ছিল মতি দফাদার। সুবোধদের তন্তর গ্রামের দফাদার। শৈশব কাল থেকে তাকে সে চেনে। সে হঠাৎ বলে উঠলো: আরে, মনু বাবু না?

দারোগা প্রশ্ন করলো: মনু বাবু কে রে?

আমাগো গেরামের—বলে সে আরো কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু দারোগা বাধা দিয়ে চীৎকার করে উঠলো: আরে, মনু মানে সুবোধ বাবু, সুবোধ চক্রবর্ত্তী? তন্তরের সুবোধ চক্রবর্ত্তী? এই মাঝি, সাবধান! আমাদের নৌকোর সঙ্গে লাগা নৌকো, তা নইলে তোকে আজ আস্ত খেয়ে ফেলবো।

তার প্রয়োজন ছিল না। খাল তখনো এতখানি সংকীর্ণ যে, দারোগার নৌকোর সঙ্গে গা ঠোকাঠুকি না করে সুবোধের বেরিয়ে যাবার উপায় ছিল না। গ্রেপ্তার অবধারিত জেনে সে তৎক্ষণাৎ দেশলাইয়ের কাঠি জেলে কাগজ-পত্র পুড়িয়ে ফেলে দিল এবং সহাস্যে ছইয়ের বাইরে এসে কোটটা গায়ে দিতে দিতে বললো: হ্যালো হারাণ বাবু, এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলেন?

হারাণ দারোগা খুব হুঁসিয়ার ব্যক্তি। তিনিও রিভলভার-আঁটা বেল্টটা কোমরে জড়াতে জড়াতে হেসেই জবাব দিলেন: আর বলবেন না দুর্ভোগের কথা। হলদিয়ায় ডাকাতি হবার সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলাম। সারাটি রাত থাকলাম ওৎ পেতে জেগে বসে। কোথায়, ডাকাতের নাম-গন্ধ নেই! সারাটি রাত অনর্থক জেগে এলাম একটা ভুয়ো সংবাদের ওপর। তার পর সুবোধের নৌকোয় লাফিয়ে পড়ে সুবোধের কাঁধে সস্নেহে একখানা হাত রেখে সহাস্যে বললেন: তবু যা হোক, আপনাকে পেয়ে পরিশ্রমটা সার্থক হলো বলা যায়। শালা আই-বি'রা বার-বার এসে ধমকে যায় আমাদের যে, আপনি নাকি বিক্রমপুরেই ঘোরা-ফেরা করেন, অথচ আমরা ধরতে পারিনে।

সুবোধ হেসে বললো: তা আমায় আই-বি যে খুঁজছে, সে কথাটা একবার একটু কষ্ট করে জানিয়ে দিলেই তো আমি নিজে গিয়ে ঢাকায় হাজির হতাম ওদের অফিসে। পালিয়ে বেড়াবার প্রয়োজন কী বলুন?

সে আমি জানি।—বলে বিজ্ঞের মত হেসে উঠলেন দারোগা বাবু। বললেন: চলুন, থানায় যাই।

সবাই থানায় এসে উঠলো। বারান্দায় সশস্ত্র এক জন প্রহরী বুটের আওয়াজ তুলে দারোগাকে স্যালুট করলো। ঘরে প্রবেশ প্রবেশ করে ফাইলপত্র টেবিলের ওপর রেখে দারোগা বললেন: সুবোধ বাবু, Please excuse me, সারাটি রাত এক মিনিট ঘুমোতে পারিনি। আপনি একটু বসুন, আমি চোখ-মুখ ধুয়ে আসছি। এখুনি আসবো। কেমন?

অত্যন্ত সহজ ভাবে বললো সুবোধ: কিন্তু আমার সুটকেশ ও আমার দেহতল্লাসীর বিদঘুটে কাজটি সেরে গেলেই ভালো হতো না কি? তা'হলে আমিও এই বিদেশী পোষাক ছেড়ে ধুতি পরতে পারতাম।

তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠলেন দারোগা, আরে রেখে দিন তল্লাসী! কাগজ-পত্র যা ছিল তা তো দেখলাম চোখের সমুখেই পুড়িয়ে ফেললেন। আর কিছু নেই। থাকলে তার সদ্গতি না করে পুলিশের হাতে ধরা দেবার পাত্র অন্ততঃ তন্তর গ্রামের সুবোধ চক্রবর্ত্তী যে নয়, এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে।—আসছি, Please don't mind—

হারাণ দারোগা সহাস্যে গৃহাভিমুখে চলে গেলেন। সুবোধও হাসলো মনে-মনে। তার পকেটে তখন একটি গুলি-ভরা ছ'-ঘরা রিভলভার!...

সেদিন শ্রীনগরের হাটের দিন। সকালেই হাট বেশ জমে যায়। ঘরের মধ্যে বসে পেছনের জানালা দিয়েই দেখা যাচ্ছে কত লোক যাচ্ছে আনাচ-তরকারি নিয়ে, দুধ, মাছ নিয়ে আর কত লোক যাচ্ছে সওদা করতে। দূরে খালের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, সেখানে নৌকার পর নৌকো এসে থামছে আর নামছে হয় ব্যবসাদার, নয় খরিদ্দার।

বাইরের বন্দুকধারী সিপাইটা নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় এক জন দফাদারের সঙ্গে কথা বলছে। আজ বুঝি ওদের হাজিরা-দিবস। তাই দলে-দলে থানা-প্রাঙ্গণে এসে জমায়েৎ হচ্ছে দফাদার আর চৌকিদার। গ্রাম্য সরকারী চাকুরে, জানে না এরা যে, তাদেরই মহামান্য সরকার একেবারে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন এমন একটি ব্যক্তির গ্রেপ্তারের জন্য, গত দু'-বছর যাবৎ যে তাদের ফাঁকি দিয়ে সফর করে বেড়াচ্ছিল সারা বাংলা দেশ, বিহার ও আসামে এবং শান্ত-শিষ্ট সুবোধ বালকের মতো এখন যে বসে আছে তাদেরই সম্মুখে।

কিন্তু সুবোধ বালকের মতো বিনা প্রতিবাদে ধরা দেবে সুবোধ চক্রবর্ত্তী? হারাণ দারোগা চা ও জলখাবার খেয়ে এসে টেবিলে বসে একটি কলমের আঁচড়েই তৈরী করবে পুরো পাঁচ হাজার টাকার বিল? সুড়্-সুড় করে ঢুকবে সে হাজতে? কিন্তু রিভলভার? এত ক্ষণ ভদ্রতা করলেও হাজতে ঢোকাবার পূর্ব্বে নামমাত্র দেহতল্লাসী করতে গিয়েই তো বেরিয়ে পড়বে তা। সুবোধ বালকের মতো তুলে দেবে এই অমূল্য আগ্নেয়াস্ত্রটি হারাণ দারোগার হাতে?

বন্দুকধারী সিপাইটি দরজার কাছে নিশ্চিন্ত মনে পায়চারী করছে। মাঝে-মাঝে চৌকিদার বা দফাদারের সঙ্গে মিঠে দু'-একটা কথাও বলছে ও হাসছে। সেই একঘেয়ে 'দরওয়াজার' ভূমিকাতেই অভিনয় করছে বলে কাজে তার সতর্কতা বা সন্ত্রস্ততা আদৌ টের পাওয়া যাচ্ছে না। উৎসাহেরও অভাব মনে হয়।

রিভলভারের একটি গুলীতেই সিপাইটাকে ধরাশায়ী করা যায়! কিন্তু যে শব্দ হবে, তাতে ব্যারাকের সিপাইগুলো সহজেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলবে এবং চৌকিদাররাও, পথচারীরাও...তাতে কয়েকটা খুন

করা যাবে, পলায়নের পথ সুগম হবে না। যতখানি সম্ভব, নীরবে কাজ হাসিল করাই উচিত।···হারাণ দারোগা মুখ ধুতে গেছে প্রায় দশ মিনিট। ফিরে আসবার সময় হয়ে এল। ফিরে আসবার পূর্ব্বেই যা করবার করতে হবে···এলে আর হবে না।···দেয়াল-ঘড়ির দোলকটা টিক্-টিক্ করছে, থানার কক্ষ একেবারে নির্জ্জন···হাটের কোলাহল বেড়ে চলেছে···সিপাইটা বন্দুক ভর করে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে মতি দফাদারের সঙ্গে···ব্যারাকের সিপাইরা বোধ হয় তাস খেলা সুরু করেছে···শোনা যাচ্ছে—আঠারো? আছি···বিশ? আছি···বাইশ? পাস্ এ্যাণ্ড ডাবল্···ডিকলেয়ার···

—অকস্মাৎ সশস্ত্র সিপাইটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে বারান্দা থেকে রেলিং টপকে একেবারে প্রাঙ্গণে লাফিয়ে পড়লো সুবোধ। প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল চৌকিদার ও দফাদারের দল। কিন্তু তার-এক ঘুষিতে মতি দফাদারের নাক ফেটে গিয়ে যখন রক্তের ধারা নামলো তার ঠোঁট বেয়ে, তখনই তারা বুঝতে পারলো আসল ব্যাপারটা। ডিকলেয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যারাক থেকে লাফিয়ে পড়লো জনকতক সাদা পোষাকধারী সিপাই! ছুটলো হাটের দিকে প্রাণপণে, সঙ্গে যোগদান করলো চৌকিদার ও দফাদারের দল।

সুবোধ তত ক্ষণে একেবারে হাটের ভিড়ে এসে মিশে গেছে। তা'হলেও নিশ্চিন্তে গা ঢাকা দেওয়া যাবে না এখানে। পেছনের দল 'চোর' 'চোর' করে চীৎকার করছে। এখনই এসে পড়বে হাটে। অতগুলো লোক ঠিক ধরে ফেলবে তাকে, সাহেবী পোষাক-পরা পলাতক আসামীকে।

অকস্মাৎ সুবোধও হল্লা সুরু করলো 'চোর' 'চোর' বলে, সঙ্গে-সঙ্গে আরও কণ্ঠ এসে যোগদান করলো: চোর, চোর!

সুবোধ বলে উঠলো: কোথায় যাচ্ছেন মশাই? ঐ দিকে গেছে ব্যাটা পকেট মেরে। ঐ দিকে, ঐ বাবুদের বাড়ীর দিকে।—ঐ দিকে ধাওয়া করুন, শালা আর যাবে কদ্দূর? শালা চোর—

সবাই ছুটলো বাবুদের বাড়ীর দিকে।

শালা চোর কিন্তু তত ক্ষণে এসে হাজির পুব দিকে খালের পাড়ে। বহু নৌকো বাঁধা রয়েছে লগিতে। কোনোটাতে কেউ আছে, কোনোটা শূন্য। অত্যন্ত শান্ত মনে দড়ি খুলে নিয়ে সুবোধ উঠে পড়লো একখানা ছোট নৌকোয়। প্রাণপণে বৈঠা চালাতে লাগলো।

বাবুদের বাড়ীর দিকে ধাওয়া করেছিল যারা শালা চোরকে গ্রেপ্তার করতে, কনেষ্টবল, চৌকিদার ও দফাদারের দল এসে পড়তেই সে ভুল ভাঙলো তাদের এবং বুঝতে আদৌ দেরী হলো না যে, সাহেবী পোষাক-পরা যে লোকটি চোরের সন্ধানে যেতে বলেছিল পশ্চিম দিকে, সে-ই সেই চোর, গেছে পুব দিকের খালে।

—প্রাণপণে বেয়ে চলেছে সুবোধ। হাটে এত ক্ষণে নিশ্চয়ই জানা-জানি হয়ে গেছে, হল্লা সুরু হয়েছে, হুলিয়া বেরিয়ে পড়েছে, হারাণ দারোগা হয়তো রিভলভার ছেড়ে রাইফেল নিয়েই নৌকো ভাসিয়েছেন ···জ্যান্ত না পারলেও, অন্ততঃ লাস নিয়ে গ্র্যাসবি সাহেবের শ্রীচরণে নিবেদন করতে পারলেও···কিন্তু ও কি, পেছনে দূরে দেখা যাচ্ছে একখানা বড় নৌকো, ছুটে আসছে তার দিকে, একটা লাল পাগড়ীও দেখা যাচ্ছে।—ঐ তারা আসছে, কথাও এক-আধটা শোনা যাচ্ছে যেন···

কত ক্ষণ আর পারবে সুবোধ। সে একা, আর ওরা অন্ততঃ একাধিক। গলা শুকিয়ে আসছে তার, সর্ব্ব শরীরে তীব্র ব্যথা··· জলের মধ্যে বৈঠা আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে তোলা ভারী কষ্টকর! কিন্তু সংজ্ঞা হারিয়ে পাটাতনের ওপর বা জলের মধ্যে পড়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত সে চালাবেই এই চেষ্টা।

পশ্চাতের নৌকো শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। মধ্যেকার ব্যবধান প্রতি সেকেণ্ডে কমে আসছে···ওদের উল্লাসধ্বনি স্পষ্ট কানে আসছে···সুবোধ একবার হাত দিয়ে অনুভব করলো—হ্যাঁ, ঠিক আছে। ধরা যদি দিতেই হয়, তা'হলে অন্ততঃ ছ'-জনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় করে দিয়ে তার পর···

অকস্মাৎ চমকে উঠলো সুবোধ। অদূরে একখানা ছোট নৌকোর মাঝি চীৎকার করে উঠলো: ডর নাই, ডর নাই কর্ত্তা। আসেন, ফাল্ দিয়ে আসেন আমার নৌকায়। বৈঠাটা লইয়া আসেন। কলিমদ্দী বাইচা থাকতে ধরবো আপনারে? অখনো মরি নাই—

বলতে বলতে লোকটা একেবারে সুবোধের নৌকোর গায়ে নৌকো লাগিয়ে দিল। কে এ? কী করা যায়? মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে যদি পুলিশেরই হাতে তুলে দেয়?···কিন্তু ভাববার অবসর নেই, এক-একটি মুহূর্ত্ত—

লাফিয়ে পড়লো সুবোধ কলিমদ্দীর ছোট নৌকায়। কলিমদ্দী উৎসাহ দিল: ন্যান, মারেন তো কয়ডা থ্যাও ঠাকুর ঠাকুর কইরা। শালাগো কলিমদ্দীর কবজির জোর দেই দেখাইয়া ন্যান্—

মিথ্যে কথা বলেনি মুসলমান মাঝি। তীর বেগে ছুটে চললো নৌকো ষোলঘর বাজারের দিকে। পশ্চাতের নৌকো এবার ধীরে-ধীরে আরও পেছিয়ে পড়তে লাগলো। আর শোনা যায় না ওদের আনন্দ-কলরব, লাল পাগড়ী আর দেখা যায় না।

ষোলঘর বাজারে শ্রান্তদেহে অবতরণ করে সুবোধ কলিমদ্দীর হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিতেই সে এক গাল হেসে বলে উঠলো: চিনলেন না কর্ত্তা আমারে?

চমকে উঠলো সুবোধ: না তো। মনে তো পড়ছে না—

ভুইলা গেছেন।—কলিমদ্দী হেসে বলতে লাগলো: হ, দুই বার কি তিন বার গেছি আপনারে লইয়া কেয়টখালী গাঙুলী বাড়ীতে। ক্যান, এই তো সেই বার গেছিলাম দুপইর রাত্তিরে বীরতারার মজুমদার বাড়ীর কারে জানি লইয়া—

ও—মনে পড়েছে সুবোধের। তার মনে না থাকলেও কলিমদ্দী ভোলেনি তাকে। কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেলো না সুবোধ। আরোও একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বললো: তুমিই ভাই বাঁচিয়েছ আমায়। নইলে একা সাধ্যি ছিল না আমার। ধরা পড়ে যেতাম।

কলিমদ্দী বিজ্ঞের মতো হেসে বললো: হ, হ, বুঝছি, বুঝছি। স্বদেশীগো পলাইয়াই বেড়াইতে হয়। লাগুড় পাইলে পুলিশ ছাড়বো ক্যান্? কিন্তু আমি নৌকা বাই আউজগা তিরিশ বচ্ছর। আমার লগে তোরা শালারা পারবি ক্যান রে? যাউক, তবু তো পারছি আপনারে বাঁচাইতে। স্যালাম, কর্ত্তা, স্যালাম।

প্রত্যুত্তরে স্যালাম জানানোই ইচ্ছে ছিল সুবোধের। অবজ্ঞাত এমনি কত লোক যে কত ভাবে বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সে যুগের বিপ্লব-আন্দোলনকে, কোথাও লেখা নেই তার ইতিহাস। অপরিচয়ের কুজ্ঝটিকার পুরু আস্তরণে চির দিনের জন্য এরা সমাধিস্থ, দৃশ্যমান জগতের স্মৃতিপট থেকে অবলুপ্ত!···মনে-মনে অসংখ্য প্রণাম জানালো সুবোধ নিরক্ষর এই গ্রাম্য মুসলমানকে! বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সকে সেদিন কতখানি সাহায্য করেছিল এই দরিদ্র মাঝি, তা প্রকাশের ভাষা আজও সৃষ্টি হয়নি! [ক্রমশঃ।

সাহিত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ব্রজনাথ দত্ত—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫৫ বঙ্গ বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন কাইগ্রামে সুবর্ণবণিক বংশে। মৃত্যু—১৩০৮ বঙ্গ ৩০এ চৈত্র। পিতা—রাধামোহন দত্ত। মাতা—ইচ্ছাময়ী। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদ শহরে বাস। ইনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। গ্রন্থ—ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গোসাঁইএর লীলা—ভক্তি ও ভক্ত (১৯০১), ভাবামৃত (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১৯০৯ খৃঃ)।

ব্রজনাথ দাস—গ্রন্থকার। নিবাস—হুগলী। গ্রন্থ—সন্ধি-সংগ্রহ (হুগলী, ১৮৬৭)।

ব্রজনাথ বন্ধু—সাহিত্যিক। সম্পাদক—আক্কেল গুড়ুম (সাপ্তাহিক, দ্বিভাষিক পত্রিকা, ১৮৪৭), হিন্দুবন্ধু (১৮৪৭)।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবদ্বীপে। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধব-বিবাহের প্রচলনের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া মহারাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ইনি শেষ জীবনে চৈতন্যের মতানুবর্তী হইয়া এক হরিসভা স্থাপন (১২৭৫ বঙ্গ) এবং গৌরাঙ্গ-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বঙ্গদেশে আদি 'হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা'। গ্রন্থ—চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন—স্মার্ত পণ্ডিত। সম্পাদক—(ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী সহ)—আর্যবিদ্যাসুধানিধি (মাসিক, ১২৮৫), ব্যবস্থা-সংগ্রহ (১৮৭৯)।

ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উদ্ভিদ-শিক্ষা, ভূগোল (অনুবাদ)।

ব্রজনাথ ভট্ট—বৃত্তিকার। ১৭শ শতাব্দী। ইনি শুদ্ধদ্বৈতবাদী ছিলেন। গ্রন্থ—মরীচিকা (অনুভাষ্যের বৃত্তি)।

ব্রজবল্লভ রায়, কবিরাজ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সুবোধিনী (সাপ্তাহিক, ১২৯৭)।

ব্রজমোহন চক্রবর্তী—কবি ও সাহিত্যিক। গ্রন্থ—বৈরাগ্যশতক (১৮৫৪ খৃঃ), নীতিশতক। সম্পাদক—কৌস্তুভকিরণ (মাসিক, ১৮৬৯), সংবাদ-রত্নাবলী (১৮৪৫)।

ব্রজমোহন দাশ—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০৪ বঙ্গ হাওড়া জেলায় শালিখায়। মৃত্যু—১৩৫০ বঙ্গ ৭ই আশ্বিন। ইনি হাওড়া-শালিখা গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সম্পাদক। সম্পাদিত গ্রন্থ—জলধর-কথা, আহরিকা, মাধুকরী।

ব্রজমোহন মজুমদার—গ্রন্থকার। জন্ম—১৭৮৪ খৃঃ (আনু)। মৃত্যু—১৮২১ খৃঃ ৬ই এপ্রিল। পিতা—রাধাচরণ মজুমদার। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক এবং ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী। গ্রন্থ—ব্রাহ্মপৌত্তলিক সম্বাদ (১৮২০ খৃঃ)।

ব্রজমোহন রায়—পাঁচালীকার ও যাত্রাপালা-রচয়িতা। জন্ম—১২৩৮ বঙ্গ হুগলী জিরাট্-বলাগড়ের নিকট তেঁতুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে। মৃত্যু—১২৮৩ বঙ্গ। পিতা—রামলোচন রায়। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া সামান্য চাকুরী গ্রহণ। অবসর সময়ে সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ইহার চর্চা। উচ্চ সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি-লাভ। কর্ম—মহাজনের গদীতে মুহুরী (মালদহ), আবগারী বিভাগে নাজীরের কর্ম। পাঁচালীগান রচনা ও কর্মত্যাগ। পাঁচালী দল ও যাত্রার দল গঠন (১২৭৯)। গ্রন্থ—যাত্রার পালা—অভিমন্যু বধ, রামাভিষেক, তারকাসুর বধ, সাবিত্রী-সত্যবান, শতস্কন্ধ রাবণ-বধ, দানব-বিজয়, কংস-বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, লক্ষ্মণ-বর্জন ; পাঁচালী গান—শিব-বিবাহ, আগমনী, বিজয়া, ভগবতীগঙ্গ বিবাদ, কাশীখণ্ড, রামলীলা, রাম বনবাস, গোষ্ঠলীলা, কলঙ্ক- ভঞ্জন, মান-ভঞ্জন, দানখণ্ড, অক্রূর-সংবাদ, মথুরা-লীলা, নন্দবিদায়, প্রভাস-চরিত, সুভদ্র -হরণ, গৌরাঙ্গ-চরিত, ঋতুসংহার, অকাল-বর্ণন, বিরহ, ইয়ংবেঙ্গল, কুলীনের কীর্তি, বাবুদের কীর্তি, '৭১ সালের ঝড়, দ্বিতীয় ঝড়, রাণীর বর্ণনা, ডিউক আগমন, ইনকম্ ট্যাক্স, প্লেগ, থেউড়।

ব্রজমোহন সিংহ—সাময়িকপত্রসেবী। ইনি 'প্রভাকর' পত্রের অন্যতম লেখক। সম্পাদক—সংবাদ-রত্নাকর (১৮৩০)।

ব্রজলাল সেন—কবি। জন্ম—চট্টগ্রামের আনোয়ারার প্রসিদ্ধ সেন বংশে। গ্রন্থ—চণ্ডীমঙ্গল।

ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী—নাট্যকার। জন্ম—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঞাগ্রামে। ইনি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর খুল্ল-পিতামহ। গ্রন্থ—মাধবসুলোচনা (নাটক), স্বর্ণসিন্দুরসিংহ (প্রহসন)।

ব্রজসুন্দর মিত্র—ঐতিহাসিক। জন্ম—১২২৭ বঙ্গ ২৪এ আষাঢ় ঢাকা। মৃত্যু—১২৮২ বঙ্গ ৪ঠা পৌষ। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় ঢাকা ও কলিকাতায় কিছুকাল অধ্যয়ন। কর্ম—ঢাকায় সামান্য কেরাণী। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, পরে সর্ভে ডেপুটী কলেক্টর। বহু বিদ্যালয় স্থাপন ও স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সামান্য হইলেও অধ্যবসায় বলে ইতিহাস, দর্শন, পারস্য ভাষা শিক্ষা। অন্যতম প্রবর্তক—মনোরঞ্জিকা, 'ঢাকা প্রকাশ' (পত্রিকা)। গ্রন্থ—চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ (১৮৬৯ খৃঃ)।

ব্রজসুন্দর রায়—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১২৭১ বঙ্গ (আনু) শ্রীহট্ট জেলার বাণিয়াচঙ্গ গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৬ বঙ্গ। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। কর্ম—শিক্ষক, রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়। অধ্যাপক, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, অধ্যক্ষ, শিলং কটন কলেজ। গ্রন্থ—কবিতাকুসুম মালা, ১ম (১৮৭২ খৃঃ)। সম্পাদক—Indian Messenger (ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র)।

ব্রজসুন্দর সান্যাল—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—মুসলমান বৈষ্ণবকবির আজগুবি গল্প, চণ্ডীদাস-চরিত। সম্পাদক—উৎসা (পত্রিকা, ১৩০৭-১৩১০)।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—গ্রন্থকার ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্। জন্ম—১৮৮১ খৃঃ (২৯এ বৈশাখ) ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর জমীদার-বংশে। উদ্যানবিদ্যা বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা। অনুবাদ-গ্রন্থ—সঙ্গীত পারিজাত, রাগবিরোধ, সঙ্গীত-রত্নাকর।

ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গোপী-উপাসনা (১৭২৪ খৃঃ)

ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—চিকিৎসক। জন্ম—চন্দননগর। শিক্ষা—এম, বি। কর্ম—চিকিৎসা-ব্যবসায়। গ্রন্থ—স্বাস্থ্যতত্ত্ব

২ খণ্ড, Shilong & its Environs. সম্পাদক—স্বাস্থ্য (মাসিক, ১৩২৯—৩৮)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯৮ বঙ্গ ৫ই আশ্বিন হুগলী জেলার বালীতে কাঠগড়া লেনস্থ পৈতৃক বাটীতে। মৃত্যু—১৩৫৯ বঙ্গ ১৭ই আশ্বিন কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগেছিয়ায়। পিতা—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—ব্যাণ্ডেলের ইংরেজি-বাংলা মাইনার স্কুল, চুঁচুড়া ইউনাইটেড ফ্রীচার্চ ইনষ্টিটিউসন। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় প্রতিকূল অবস্থার চাপে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় টাইপরাইটিং শিক্ষা। অবসর-সময়ে ইতিহাস ও সাহিত্য-গ্রন্থ পাঠ। কর্ম্ম—বিভিন্ন অফিসে সর্টহ্যাণ্ড টাইপিষ্টের কর্ম (১৯০৮—১৯২৮), প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর সহকারী-সম্পাদক (১৯২৯)। প্রথম রচনা প্রকাশ 'স্বপ্ন প্রসঙ্গ' (জাহ্নবী, ১৩১৬)। ইহার পরে ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবৃত্ত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ রচনা। গ্রন্থ—বাঙ্গলার বেগম (১৩১৯), Begams of Bengal (১৯১৫), নূরজহান (১৩২৩), বেগম সমরু (১৩২৪), মোগলযুগে স্ত্রীশিক্ষা (১৩২৬), মোগল বিদুষী (১৩২৬), জহান-আরা (১৩২৭), রাজা-বাদশা (১৩২৮), রণডঙ্কা (১৩২৯), দিল্লীশ্বরী (১৩৩০), কেল্লা ফতে (১৩৩১), Begam Samru (১৯২৫), Raja Rammohan Roy's Mission to England (১৯২৬), Dawn of New India (১৯২৭), শিবাজী মহারাজ (১৩৩৫), বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ (১৩৩৮), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম (১৩৩৯), ২য় (১৯৪০), ৩য় (১৯৪২), বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৩৪০), দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১৩৪২), বাংলা সাময়িক পত্র (১৩৪৬), সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (১৩৪৬—৫৭), রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয় (১৩৪৯), Bengali Stage (১৯৪৩), মহারাণা প্রতাপসিংহ (১৩৪৯), বঙ্গীয় নাট্যশালা (১৩৫০), বাংলা সাময়িক সাহিত্য (১৩৫১), শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী (১৩৫৪), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (১৩৫৫), পরিষৎ-পরিচয় (১৩৫৬), শ্রীসজনীকান্ত দাস (১৩৫৭), শরৎ-পরিচয় (১৩৫৭); বঙ্গসাহিত্যে নারী (ঐ), সাময়িক পত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী (ঐ), সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (সজনীকান্ত দাস সহ, ১৩৫৯); সম্পাদিত গ্রন্থ (সজনীকান্ত দাস সহ)—দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী, মধুসূদন গ্রন্থাবলী, রামমোহন গ্রন্থাবলী, দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী, শকুন্তলা, বাংলার কবি ও কাব্যমালা।

ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—A manual of Arithmatic in Bengali (১৮৬৭)।

ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। শিক্ষা—বি, এ। গ্রন্থ—বিধির বিধান, নিয়তির চক্র।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—দার্শনিক। জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর, কলিকাতা। মৃত্যু—১৯৩৮ খৃঃ ২রা ডিসেম্বর। শিক্ষা—এম, এ, (১৮৮৪), পি. এইচ. ডি., ডি. এস. সি। কর্ম্ম—কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৯৬), মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। রোমের ইণ্টার ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্ট্যালিষ্টস্-এর উদ্বোধক। ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নাইট উপাধি লাভ। গ্রন্থ—Positive Science of the Hindus.

ব্রজেশচন্দ্র সিংহ—সংবাদপত্রসেবী। শিক্ষা—বি. এ., বি. এল। আইন-ব্যবসায়ী। সম্পাদক—দিনাজপুর পত্রিকা (মাসিক, ১২৯২)।

ব্রহ্ম গুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—৫৯৮ খৃঃ মূলস্থানে (মুলতানে)। পিতা—বিষ্ণু। ইনি "ব্রহ্মসিদ্ধান্তে"র (অঙ্কশাস্ত্রের গ্রন্থ) পুনঃ সংস্করণ করেন (৬২৮ খৃঃ)। গ্রন্থ—খণ্ডখাদ্য (করণগ্রন্থ)।

ব্রহ্মচরণ চক্রবর্ত্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পদ্যসার, ১ম (১৮৬৮)।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী ও রাজনীতিবিদ্। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি খন্নানে। মৃত্যু—১৯০৭ খৃঃ ২৭এ অক্টোবর ক্যাম্বেল হাসপাতালে। পূর্ব নাম—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা—রাধাকুমারী দেবী। শিক্ষা—হুগলী ব্যাঙ্কস্ স্কুল, প্রবেশিকা (হুগলী কলেজিয়েট স্কুল, ১৮৭৬), এফ. এ (মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন, ১৮৭৭ খৃঃ), ভাটপাড়ায় সংস্কৃত শিক্ষা। পাঠ্যাবস্থায় জুলুযুদ্ধে যোগদানের জন্য আবেদন ও অকৃতকার্য। গোয়ালিয়র রাজ্যে পলায়ন—পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন, কেশব সেনের শিষ্যত্ব ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ (১৮৮৭), হায়দরাবাদে ব্রাহ্ম শিক্ষাব্রতীর কর্ম। সিন্ধু দেশে গমন, উক্ত সময়ে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ও মিশনারী ব্রত গ্রহণ (১৮৮৪), কঙ্কর্ড ক্লাব স্থাপনা, 'কঙ্কর্ড' পত্রিকা প্রকাশ। ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ ও বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা। বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ ও দেশসেবায় যোগদান। করাচীতে প্লেগের রোগীদের সেবা (১৮৯৭), শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা (১৯০১)। রাজনীতি-আন্দোলনে যোগদান ও রাজ-রোষে পতিত। গ্রন্থ—বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি (১৩১৩), ব্রহ্মামৃত ১ম (১৩১৬, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত), সমাজতত্ত্ব (১৩১৭), আমার ভারত-উদ্ধার (১৩৩১), পালপার্বণ ১৩৩১। সম্পাদক—সন্ধ্যা (দৈনিক, ১৩১১ বঙ্গ, ১লা পৌষ), স্বরাজ (সাপ্তাহিক, ১৩১৪, ২৬এ ফাল্গুন), Sophia (মাসিক), The Twentieth Century (১৯০১), Phoenix (করাচি, দৈনিক), Herman (করাচি, পত্রিকা)।

ব্রহ্মমোহন মল্লিক—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩২ খৃঃ ৬ই জুন কলিকাতা। মৃত্যু—১৯১৯ খৃঃ জুন কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস—হুগলী শহরের ঘুঁটেবাজার পল্লী। শিক্ষা—প্রেসিডেন্সী কলেজ। কর্ম—বাঁকুড়ার ডেপুটি ইন্সেপক্টর (১৮৫৬), সহ-ইন্সেপক্টর (১৮৭৭), স্কুল-ইন্সেপক্টর। অবসর গ্রহণ (১৮৯২)। গ্রন্থ—বাঙ্গালা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ভূ-বৃত্তান্ত, সমতালিক ত্রিকোণমিতি (১৮৭২), Life of Ranjit Sing.

ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সতরঞ্চ (Chess, ১৮৭১), দোঁহাবলী (১৮৭২)।

ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী—দার্শনিক পণ্ডিত। ১৭শ শতাব্দী। গ্রন্থ—লঘুচন্দ্রিকা (অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা, ১৮৯৩ খৃঃ মুদ্রিত), রত্নাবলী, সূত্রমুক্তাবলী।

ব্রাহ্মণ বোধা—কবি। জন্ম—১৭৪৬ খৃঃ। কাব্যগ্রন্থ—বিরহবারিষ, উপ্‌কনাথ।

ব্রাণ উল্লা—মুসলমান গ্রন্থকার। জন্ম—উত্তরবঙ্গ। গ্রন্থ—কেয়ামত নামা।

ভক্তরাম দাস—কবি। জন্ম—চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রামে (আনু)। গ্রন্থ—গোকুলমঙ্গল।

ভক্তিদাস—বৈষ্ণব কবি। গ্রন্থ—বৈষ্ণবামৃত।

ভক্তিলতা ঘোষ—শিশু-সাহিত্যিকা। গ্রন্থ—দুর্গেশনন্দিনী, দেবীচৌধুরাণী।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। পূর্ব নাম—কেদারনাথ দত্ত। জন্ম—১৮৩৮ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর উলা গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৯১৪ খৃঃ। পিতা—হাটখোলা দত্তবংশের কালিকাপ্রসাদ দত্ত। বাল্যকালে সুপণ্ডিত কাশীপ্রসাদ ঘোষের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা। শিক্ষা—কৃষ্ণনগর কলেজ, হিন্দু কলেজ। অল্পবয়সে সুন্দর কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেন। কর্ম—উড়িষ্যা, কিছু দিন চুয়াডাঙ্গার জজসাহেবের হেড ক্লার্ক, ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি-কালেক্টর (১৮৬৬—১৮৯৪ বিভিন্ন অঞ্চলে)—। এই সময়ে সর্বদা ইনি সদ্‌গ্রন্থ রচনা করেন। কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য-প্রেস স্থাপনা ও ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ। ভক্তিবিনোদ উপাধিলাভ (১৮৮৫)। 'সজ্জনতোষিণী' মাসিক প্রকাশ (১৮৮১), ইনি উর্দু, ফার্সী, ওড়িয়া, সংস্কৃত, ইংরেজি, লাটিন প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। সংসার-ত্যাগ (১৯০৮)। ইনি বহু সৎকার্য এবং বৈষ্ণব-সমাজের উন্নতি সাধন করেন। গ্রন্থ—The Poriade (ইং-কাব্য ১ম, ১৮৫৭, ২য়, ১৮৫৮), হরিকথা (কবিতা, ১৮৫০), আত্মশক্তি ও শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ (১৮৫১), Maths of Orissa (১৮৬০), বিজনগ্রাম (কাব্য, ১৮৬৩), সন্ন্যাসী (ঐ), বলিদে-রেজিস্ত্রী (উর্দু, ১৮৬৬), প্রেমপ্রদীপ (উপ), গর্ভস্তোত্র ব্যাখ্যা (১৮৭০), দত্ত-কৌস্তভম্ (১৮৭৪), দত্তবংশ-মালা (১৮৭৬), বৌদ্ধবিজয়কাব্যম্ (১৮৭৮), শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (১৮৮০), কল্যাণকল্পতরু (১৮৮১), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সটীক, ১৮৮৬), শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (ঐ), বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমালা (১৮৮৮), শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (১৮৯০), শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (১৮৯২), তত্ত্ববিবেক (১৮৯৩), শারঙ্গতি (ঐ), শোকশতন (ঐ), জৈবধর্ম (ঐ) হরিনাম চিন্তামণি (কবিতা, ১৯০০), ভজনরহস্য (১৯০২), Our wants (১৮৬৩), Speeches on Gautom (১৮৬৬), Speech on Bhagawat (১৮৬৯), Reflection (১৮৭১). সম্পাদিত গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তত্ত্বসূত্র, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ব্রহ্ম-সংহিতা, শ্রীকল্যাণকল্পতরু, শ্রীভজনামৃতম্, সংকল্পকল্পদ্রুম, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, সৎক্রিয়াসারদীপিকা, প্রেমবিবর্ত। সম্পাদক—বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা।

ভগবচ্চরণ বিশারদ—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—হুগলী জেলার নিকট গৌরীভা গ্রামে বৈদ্যবংশে। নামান্তর—ভগবানচন্দ্র সেন। শিক্ষকতা, চুঁচুড়া মহম্মদ মহসীন বিদ্যালয়, পণ্ডিত, হুগলী কলেজ। গ্রন্থ—মুগ্ধবোধ, সাধুভাষার ব্যাকরণ (১৮৪০)।

ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭৩ খৃঃ মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার ধাপাগ্রামে। মৃত্যু—১৯৩৭ খৃঃ। গ্রন্থ—হিন্দুক্রিয়াকল্পদ্রুম, ৩ খণ্ড, বিবাহদর্পণ, সূর্যপূজা, শান্তিপদ্ধতি।

ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—জ্ঞানদীপিকা (১৮৪০), সমাচার-চন্দ্রিকা (১৮৫৩)।

ভগবতীচরণ চক্রবর্তী—কবি। সম্পাদক—দুঃখিনী (মাসিক, ঢাকা, ১২৮৬, কবিতাময়ী পত্রিকা)।

ভগবতীচরণ প্রধান—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৬ বঙ্গ মেদিনীপুর জেলায় সুতাহাটা থানার বৈষ্ণবচক গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গ। নিবাস—দেভোগ, মেদিনীপুর। পিতা—বিষ্ণুপ্রসাদ প্রধান। মাতা—জানকী। গ্রন্থ—আর্যপ্রভা (১৩১৮), ব্রাহ্মণ-সংহিতা (১৯০৫), মহিষাদল রাজবংশ (১৩০৪), মাহিষ্য-কৈবর্ত-জাতি (১৮৮৫), মাধব মেলা, জাতিকুসুম।

ভগবতীচরণ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—The duty of England to India (কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা—১৮৭০)।

ভগবতীচরণ জ্যোতির্ভূষণ—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—সামুদ্রিক দর্পণ।

ভগবানচন্দ্র দত্ত—অনুবাদক। গ্রন্থ—ইয়োরোপে তিন বৎসর (১৮৭৩)।

ভগবান দীন—হিন্দী সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ কাশীধামে। গ্রন্থ—রুশ পর জাপানকা ক্যা বিজয় হুয়া, ধরম ঔর বিজ্ঞান, বীর প্রতাপ, বীর বালক, বীর ছত্রানী, ভক্ত ভবানী। সম্পাদক—লক্ষ্মী (কাশী)।

ভগীরথ দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চৈতন্য-সংহিতা।

ভগীরথ দ্বিজ—পদকর্তা। পিতা—কংসারি পণ্ডিত। গ্রন্থ—তুলসীচিত্র, পদাবলী।

ভগীরথ বন্ধু—কবি। গ্রন্থ—চৈতন্য-সঙ্গীত (চৈতন্য-জীবনী)।

ভট্টনারায়ণ—কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ। আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম। গ্রন্থ—বেণীসংহার (নাটক)।

ভট্টোজি দীক্ষিত—বৃত্তিকার। ১৬-১৭শ শতাব্দী। পিতা—লক্ষ্মীধর সূরি। ইনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদান্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শাহ্‌জহানের সভায় 'রসগঙ্গাধর' প্রণেতা জগন্নাথের সহিত বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থ—সিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রৌঢ়-মনোরমা (টীকা), শব্দকৌস্তুভ, তত্ত্বকৌস্তুভ, আহ্নিককারিকা, অশৌচনির্ণয়, তিথিনির্ণয়, ধাতুপাঠ, মাসনির্ণয়, লিঙ্গানুশাসন সূত্রবৃত্তি।

ভবদেব ভট্ট—স্মৃতিপণ্ডিত। ১২শ শতাব্দী রাঢ়দেশে সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে। পিতা—গোবর্ধন গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি প্রথমে রাজা হরিবর্মদেবের শ্রীকরণাধিপ (secretary), পরে বিশ্রাম-সচিব। গ্রন্থ—দশকর্মপদ্ধতি, তৌতাতিতমততিলক, প্রায়শ্চিত্ত- প্রকরণ।

ভবদেব ভট্ট—ভাষ্যকার। জন্ম—মিথিলা। পিতা—কৃষ্ণদেব ভট্ট। 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিলাভ। গ্রন্থ—পাতঞ্জলসূত্রভাষ্য।

ভবভূতি (শ্রীকণ্ঠ)—নাট্যকার। জন্ম—৭-৮ শতাব্দী বিদর্ভ রাজ্যের (বেরার) অন্তর্গত পদ্মাবতী নগরে ব্রাহ্মণবংশে। পিতা—নীলকণ্ঠ। মাতা—জাতুকর্ণী। রাজা যশোবর্মার (৭৩১), মতান্তরে কাশীনরেশ ললিতাদিত্যের সভাপণ্ডিত। ইনি মীমাংসা-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। গ্রন্থ—মালতীমাধব, মহাবীর-চরিত, উত্তররাম-চরিত।

ভবভূতি ভট্টাচার্য—শিক্ষাব্রতী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—১৮৯০ খৃঃ ভাটপাড়ায়। পিতা—হৃষিকেশ শাস্ত্রী। শিক্ষা—এম. এ (১৯১৪); 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ। অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ। ইনি বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ইঁহারই সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'Vedic Selection' প্রকাশিত হয়। ইনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃতে সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেন। সম্পাদিত গ্রন্থ—সামবেদ-সংহিতা (সটীক)। সম্পাদক—বিদ্যোদয় (১৯১৪-১৯২২), ব্রাহ্মণ।

ভবসিন্ধু দত্ত—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। জন্ম—১২৭৫ বঙ্গ মেদিনীপুর জেলার পাহাড়িপুর স্থানে। মৃত্যু—১৩৪৯ বঙ্গ। শিক্ষাব্রতী। গ্রন্থ—ছত্রপতি শিবাজী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভবানন্দ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ঘুঘুচরিত্র।

ভবানন্দ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

ভবানন্দ, দীন—কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা। জন্ম—পূর্ব-মৈমনসিংহ বা কুমিল্লা। গ্রন্থ—হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, লক্ষ্মণবিজয়।

ভবানন্দ দ্বিজ—পদকর্ত্তা। জন্ম—চট্টগ্রাম (আনু)। পিতা—শিবানন্দ। গ্রন্থ—হরিবংশ, কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা, বৈষ্ণবপদাবলী।

ভবানীচরণ ঘোষ—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—হেমেন্দ্রলাল, উৎপলা, পরিণয়কাহিনী, সরমার সুখ, উপকথা।

ভবানী চট্টোপাধ্যায়—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—জ্ঞানদীপিকা (সংবাদপত্র, ১৮৪০)।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। ছদ্মনাম—প্রমথ শর্ম্মা। জন্ম—১১৯৪ বঙ্গ আষাঢ় পরগনা উখ্ড়ার অন্তর্বর্তী নারায়ণপুরে। মৃত্যু—১২৫৪ বঙ্গ ১ই ফাল্গুন। পিতা—রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় (টাকশালের কর্মচারী)। নিবাস—কলুটোলা। শিক্ষা—সেকালের প্রথানুযায়ী ফার্সী, সংস্কৃত ও ইংরেজি। কর্ম—ডাকেট কোম্পানীর কার্যালয়ে (১৮০৩); পরে উক্ত হৌসের মুৎছুদ্দী, হুগলী কালেক্টরের খাজাঞ্চী, ইংলিসম্যান কাগজের সম্পাদকের অধীনে, কলিকাতা ট্যাক্স-অফিসের দেওয়ান ও Hickey Ballie & Coর বেনিয়ানী। ইনি রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। ধর্মসভা স্থাপন (১৮৩০ খৃঃ, ১৭ই জানুয়ারি), সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন। গ্রন্থ—কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), হিতোপদেশ (১৮২৩), নববাবুবিলাস (১৮২৫), দূতীবিলাস (১৮২৫), নববিবিবিলাস (১৮৩১), শ্রীশ্রীগয়াতীর্থবিস্তার (১৮৩১), আশ্চর্য উপাখ্যান (১৮৩৪), পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা (১৮৪৪); সম্পাদিত গ্রন্থ—হাস্যার্ণব, শ্রীমদ্ভাগবত (১৮৩০), প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক (১৮৩৩), মনুসংহিতা, উনবিংশ সংহিতা (ঐ), শ্রীভগবদ্গীতা (১৮৩৫), রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, নব্যস্মৃতি; সম্পাদক ও পরিচালক—সম্বাদকৌমুদী (সাপ্তাহিক, ১৮২১ খৃঃ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি), সমাচারচন্দ্রিকা (সাপ্তাহিক, ১৮২২ খৃঃ ৫ই মার্চ), খৃষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (১৮২২)।

ভবানী দাস—কবি। জন্ম—নবদ্বীপ। পিতা—বামনদেব (মতান্তরে যাদব বন্দ্যোপাধ্যায়)। মাতা—যশোদা। গ্রন্থ—রামস্বর্গারোহণ।

ভবানী দাস ঘোষ—কবি। জন্ম—পাণ্ডুয়া গ্রামে। গ্রন্থ—গজেন্দ্রমোক্ষণ, রাধাকৃষ্ণ বিদায় (১১৬৬ বঙ্গ), দান-নৌকাখণ্ড (ঐ)।

ভবানী দাস—কবি। গ্রন্থ—লক্ষ্মণবিজয় (রাজা জয়চন্দ্রের আদেশে রচিত), ময়নামতীর গান।

ভবানী নাথ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পারিজাত-হরণ।

ভবানী পণ্ডিত—কবি। জন্ম—ত্রিপুরার পণ্ডিত উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-বংশে। ইনি রাজা জয়চন্দ্রের সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—রামাভিষেক বা লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়, ব্রহ্মপুরাণ।

ভবানীপ্রসাদ কর রায়—অন্ধ কবি। জন্ম—বৈদ্যবংশে। পিতা—নবকৃষ্ণ রায়। মুখে মুখে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও কবিতা রচনা। গ্রন্থ—দুর্গামঙ্গল (পদ্যানুবাদ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)।

ভবানীপ্রসাদ দত্ত—কবি। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ অন্তর্গত লাখাই পরগনার দত্তবংশে। গ্রন্থ—দত্তবংশাবলী বা চক্রপাণি-দত্তের বংশবিবরণ (কাব্যেতিহাস)।

ভবানী মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম—১৩১৬ বঙ্গ ৭ই পৌষ। পিতা—কমলহরি মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—সেণ্ট ষ্টীফেন্স কলেজ। কর্ম—ভারত সরকারের রেলওয়ে বিভাগে। ছদ্মনাম—শঙ্করাচার্য। গ্রন্থ—উপন্যাস—স্বর্গ হইতে বিদায় (১৯৪০), কালোরাত (১৯৪৪), একাকিনী নায়িকা (১৯৪৫), অগ্নিরথের সারথি (১৯৮৯); গল্প—নির্জন গৃহকোণ (১৯৪১), যথাপূর্বং (১৯৪৪), সেই মেয়েটি (১৯৫২); অনুবাদ—বিপ্লবী যৌবন (১৯৪০), ওয়ান ওয়ার্ল্ড (১৯৪৫), মাদার রাশিয়া (১৯৪৯), ক্ষুরস্য ধারা (১৯৫০); সম্পাদক—বিশ্ববার্ত্তা (১৯২৪—২৫), পাততাড়ি (১৯২৯—৩০), Delhi Herald (১৯২৮—২৯), দীপালী (১৯৩৩—৪০), বাতায়ন (১৯৩০—৪০), পূর্ণিমা (১৯৪৫—৪৭), পৌষালী (১৯৪৬), বার্ষিক হসন্তিকা (১৯৪৫—৪৯), Manson miscellany (১৯৪৭)।

ভবানীশঙ্কর দাস—সংস্কৃতজ্ঞ কবি। জন্ম—ছলহরা গ্রামে কায়স্থবংশে। গ্রন্থ—জাগরণ বা চণ্ডীকাব্য (১৭৮৯ খৃঃ)।

ভবানীসিন্ধু দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভবানী সেন—শিক্ষাব্রতী। ফ্রী চার্চ ইনষ্টিটিউসনের বাংলা ভাষার শিক্ষক। গ্রন্থ—বর্ণপদক (অভিধান)।

ভরত পণ্ডিত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রহ্লাদ-চরিত্র, লক্ষ্মী-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—২৪-পরগনার লাঙ্গলবেড়িয়া নামক গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ-বংশে। মৃত্যু—১৮৭৮ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর। কর্ম—বর্ধমান, সায়ণ প্রভৃতির জজকোর্টের পণ্ডিত (১৮৩০—৩৯), অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮৪০—১৮৭২)। গ্রন্থ—বিষ্ণাদিশতক (১২৬৪), দত্তকমীমাংসা (সটীক, ১৮৫৭), দত্তকচন্দ্রিকা (ঐ, ১৮৫৭), মনুসংহিতা (বঙ্গানুবাদসহ, ১৯২৩ সং), দত্তকশিরোমণিঃ (১৮৬৭), স্মৃতিচন্দ্রিকা (১৮৭০), চতুর্বর্গচিন্তামণি, ১ম (১৯৩৪ সং), ২য় (১৮৭৮); সম্পাদিত গ্রন্থ—দায়ভাগ (সটীক, ১৯০৭ সং)।

ভরত মল্লিক—টীকাকার। ১৭৫৮ শকাব্দে বর্তমান। পিতা—গৌরাঙ্গ মল্লিক। টীকাগ্রন্থ—মুগ্ধবোধ, ভট্টিকাব্য, কিরাতার্জুনীয়, নলোদয়, কুমারসম্ভব, উপসর্গবৃত্তি, দ্রুতবোধ ব্যাকরণ।

ভর্তৃহরি—আলঙ্কারিক পণ্ডিত ও কবি। নামান্তর—ভট্টস্বামী, ভর্তৃস্বামী। ৭ম শতাব্দী। পিতা—শ্রীস্বামী। গুজরাত কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত বল্লভীপুরে রাজা শ্রীধরসেনের আশ্রয়ে প্রতিপালিত। গ্রন্থ—বাক্যপ্রদীপ, ভট্টিকাব্য (রাবণ-বধ মহাকাব্য)।

ভর্তৃহরি মালবেশ্বর—কবি। ৬-৭ শতাব্দী। পিতা—গন্ধর্বসেন। ইনি মালবান্তর্গত উজ্জয়িনীর রাজা। স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতায় বিরক্তি হেতু রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া চুণার পর্বতে সমাধিস্থ হন। চুণারে ইঁহার সমাধিস্থান রক্ষিত আছে। ইঁহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ। গ্রন্থ—শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক, বাক্যপ্রদীপ (টীকা)।

ভর্তৃযজ্ঞ—ভাষ্যকার। ইনি কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক। গ্রন্থ—মনুসংহিতার ভাষ্য।

ভাগবতচরণ—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—জ্ঞানদীপিকা (সংবাদপত্র, ১৮৪০)।

ভাগবতচন্দ্র বিশারদ—শিক্ষাব্রতী। গ্রন্থ—সুখবোধ ব্যাকরণ (১৮৫৯—৬৩ খৃঃ)।

ভাগবত দাস ঘোষ—কবি। জন্ম—বীরভূম জেলার অন্তর্গত জয়মুল পরগনার মধ্য উলুন্দী গ্রামে গোপ-বংশে। পিতা—কেনারাম ঘোষ। গ্রন্থ—গঙ্গাস্তব (১২০৯ বঙ্গ)।

ভাগবতাচার্য—কবি। প্রকৃত নাম—পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র। জন্ম—কলিকাতা বরাহনগরে। মহাপ্রভুর সমসাময়িক। রঘুনাথের বরাহনগরের আশ্রমে মহাপ্রভু তিন দিন বাস করেন এবং ইঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতাচার্য উপাধি দান করেন। গ্রন্থ—কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ, ১৫২৮ খৃঃ, আনু)

ভানুদত্ত মিশ্র আচার্য—আলঙ্কারিক। জন্ম—১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গঙ্গাতীরবর্তী বিদেহের অন্তর্গত। পিতা—গণেশ্বর বা গুণেশ্বর। গ্রন্থ—রসতরঙ্গিণী, রসমঞ্জরী (অলঙ্কার-গ্রন্থ)।

ভানুদাস—কবি। জন্ম—শ্রীহট্ট। গ্রন্থ—পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল।

ভাণ্ডারকার, স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল—পুরাতত্ত্ববিদ্। জন্ম—১৮৩৭ খৃঃ। মৃত্যু—১৯২৫ খৃঃ। পিতা—স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার। শিক্ষা—এম. এ, এল. এল. ডি, পি. এইচ. ডি (গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৮৫)। কর্ম—শিক্ষকতা, পরে অধ্যাপক, এলফিনষ্টোন কলেজ (১৮৬৮), ডেকান কলেজ, পুণা। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া ভিয়েনা কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৮৮৬), ভাইস চ্যান্সেলর (বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়), কে. সি. আই. ই উপাধি লাভ (১৮৮৭)। ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সর্বাধ্যক্ষ। গ্রন্থ—Early History of the Deccan, Vaishnavism, catalogues of sansk. Mss. ৬ খণ্ড।

ভাতখণ্ডে, বিষ্ণুনারায়ণ—সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্। জন্ম—১৮৬০ খৃঃ বোম্বাইএর বালকেশ্বর নামক স্থানে। মৃত্যু ১৯৩৬ খৃঃ। শিক্ষা—বি. এ (১৮৮৩), আইন-পরীক্ষা (১৮৮৭)। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত-প্রতিভার বিকাশ। আইন-ব্যবসায়—করাচী। ইনি উন্নত ধরণের সঙ্গীতধারার ও স্বরলিপির প্রবর্তক। গ্রন্থ—অষ্টোত্তর শততাললক্ষণম্, অভিনবতালমঞ্জরী।

ভামহ—কবি। জন্ম—৭ম শতাব্দী। পিতা—রক্রিল গোমিল। ইনি কাশ্মীরবাসী পণ্ডিত ছিলেন। কেহ বলেন ইনি বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থ—কাব্যালঙ্কার।

ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আর্যনারী (১৯০১)।

ভারত ভট্টাচার্য—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—সম্বাদ-কাব্য-রত্নাকর (সাপ্তাহিক, ১৮৪৭, ১৬ই জুন)।

ভারতচন্দ্র মজুমদার—কবি ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ, যাত্রী (কাব্য)।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—কবি। জন্ম—১১১৯ বঙ্গ হুগলী জেলার অন্তর্গত (পূর্বে বর্ধমান) হাওড়ার অদূরবর্তী আমতার নিকট ভুরসুট পরগনার মধ্যে পেঁড়ো (পেঁড়ো-বসন্তপুর) গ্রামে। মৃত্যু—১১৬৭ বঙ্গ। পিতা—রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইঁহাদের উপাধি—মুখোপাধ্যায়। বর্ধমানাধিপতি ইঁহার পৈতৃক ভূসম্পত্তি কোন কারণে বাজেয়াপ্ত করায় ইনি মাতুলালয়ে (মণ্ডলঘাট-পরগনার অন্তর্গত গাজিপুরের নিকট নওয়াপাড়া) আশ্রয় গ্রহণ এবং এই স্থানে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ ও হুগ্লী-দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময় রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় বর্ধমান-রাজার অনুমত্যনুসারে পেঁড়োয় বাসকালীন ভারতচন্দ্র পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পিতৃ-সন্নিধানে আগমন করেন। পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ইনি বর্ধমানে প্রেরিত কিন্তু দুষ্টলোকের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। অতঃপর ইনি পলায়নপূর্বক মহারাষ্ট্রীদিগের আশ্রয় গ্রহণ ও কটকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ভাগবতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন, সন্ন্যাসীর বেশে বৃন্দাবনযাত্রা, ও পথে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে আত্মীয়-স্বজনের চেষ্টায় গৃহাশ্রমে পুনরাগমন করেন। ফরাসডাঙ্গার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দ্বারা ইনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচিত হওয়ায়, ৪০৲ টাকা বেতনে রাজসভাসদ নিযুক্ত হন। মহারাজ ইঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি দর্শনে রায় গুণাকর উপাধি দান ও মূলাজোড়ে নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি বাংলার প্রাচীন কবিগণের মধ্যে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন কবি। ভাষা, ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে ইঁহার দক্ষতা অসাধারণ। ইনিই সর্বপ্রথমে বাংলা পদ্যে বহুবিধ সংস্কৃত ছন্দ ও অদ্ভুত কৌশলের প্রয়োগ করেন। ইনি বহু হিন্দী, পার্শী ও সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন। গ্রন্থ—সত্যপীরের কথা, (১১৩৪ বঙ্গ), অন্নদামঙ্গল—(ক) অন্নদামঙ্গল, (খ) বিদ্যাসুন্দর (প্রথম মুদ্রিত—১৮২১ খৃঃ), (গ) মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, নাগাষ্টকম্, চণ্ডীনাটক, গঙ্গাষ্টকম্।

ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাঃ)—চিকিৎসক। গ্রন্থ—চিকিৎসাঙ্কুর (১৮৭১)।

ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আর্যনারী (১৯০১)।

ভারতচন্দ্র সরকার—কবি। কাব্যগ্রন্থ—মদনভস্ম (১২৭৩)।

ভারতী তীর্থ—সন্ন্যাসী। নামান্তর—আনন্দভারতী তীর্থ। ১৪শ শতাব্দী। ইনি শৃঙ্গগিরির বা শৃঙ্গেরীর মঠের মঠাধীশ এবং মাধবাচার্যের গুরু। গ্রন্থ—বৈয়াসিক-ন্যায়মালা, দৃগ্দৃশ্যবিবেক, পঞ্চদশী (বিদ্যারণ্য মুনি সহ)।

ভারবি—সংস্কৃত কবি। নামান্তর—শতপুষ্প। ৫-৬ষ্ঠ শতাব্দী (?) কেহ বলেন ইঁহার বাস কাঞ্চনমগরে। গ্রন্থ—কিরাতার্জুনীয়ম্ (কাব্য)।

ভাবগণেশ—গ্রন্থকার। নামান্তর—ভাবগণেশ দীক্ষিত ১৬—১৭শ শতাব্দী। পিতা—ভাববিশ্বনাথ। ইনি বিজ্ঞানভিক্ষুর প্রধান শিষ্য। গ্রন্থ—সাংখ্য-তত্ত্বপ্রদীপিকা।

ভাস—প্রাচীন কবি। ২-৩য় শতাব্দী (মতান্তরে—৫ম শতাব্দী)। ইনি কালিদাসের পূর্ববর্তী ও অশ্বঘোষের পরবর্তী। নামান্তর বা উপাধি—ধাবক। কাব্যজগতে ইঁহার 'স্বপ্নবাসবদত্তা' অতুলনীয়। গ্রন্থ—চারু দত্ত বা দরিদ্র চারু দত্ত ; স্বপ্নবাসবদত্তা, ঊরুভঙ্গ, পঞ্চরাত্র, কর্ণভার, দূতঘটোৎকচ, দূতকাব্য, বালচরিত, প্রসিদ্ধ যৌগন্ধরায়ণ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

১৯০২ সালে মেদিনীপুরে যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার কর্ম্মচাঞ্চল্য এত দিনে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিপ্লবের পীঠস্থান মেদিনীপুরে ১৯০২ সালের পুর্ব্বেও ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু ও তৎপরবর্ত্তী কোন কোন স্বদেশ-হিতৈষীর উদ্যোগে কয়েক বার গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয় কিন্তু তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। সে সময় স্বাদেশিকতার ভাব বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্ম-পরিবার—বিশেষ করিয়া রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই স্বদেশী ব্রত তাঁহার পিতৃব্য হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে বিশেষ ভাবেই লাভ করেন। ১৯০২ সালে বিপ্লবী সমিতির কার্য্যোপলক্ষে মেদিনীপুরে গিয়া অরবিন্দ যে কয় জনকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, তন্মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অন্যতম।

দীক্ষা-গ্রহণান্তে মেদিনীপুর মিঞাবাজারের এক বাড়ী লইয়া কুস্তির একটা আখড়া খোলা হয়। সেখানে বিপ্লবীদের লাঠিখেলা, অসিশিক্ষা, সাইকেল-অভ্যাস, অশ্বারোহণ, বক্সিং ও বন্দুক-চালনার শিক্ষা হইতে থাকে। অশ্বারোহণ শিক্ষার জন্য একটি অশ্বও ক্রয় করা হয়। সমিতির পক্ষ হইতে রহিম নামে এক লাঠিয়ালকে লাঠি, তরবারি প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তে, শহরের অনতিদূরে চারি দিক ঘেরা একটি নীচু জায়গা ছিল। রাস্তার জন্য কাঁকর তুলিয়া লওয়ায় ঐ স্থানটি গোপনে চাঁদমারি শিক্ষা করিবার পক্ষে বড়ই সুবিধা-জনক হইয়া উঠে।

এই সমিতির উদ্বোধনের দিন ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত থাকেন এবং যুবক সভ্যদের বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন। সত্যেন্দ্রনাথই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা। ইহার কিছু কাল পরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে তিনি যোগদান করেন। এই শাখার মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ডের আসামী বলিয়া দণ্ডিত ক্ষুদিরাম বসু প্রথম বিপ্লবী হিসাবে ধরা পড়েন। সত্যেন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র সেন মেদিনীপুরের দলের লোক হইয়াও কলিকাতার মানিকতলা বাগান তল্লাসীর সময় তথায় উপস্থিত থাকাতে ধরা পড়েন। রংপুর শাখার কর্ত্তা ছিলেন ঈশান চক্রবর্ত্তী; বগুড়া শাখার নেতা হন যতীন্দ্রনাথ রায়। ইনিই প্রফুল্ল চাকীকে আবিষ্কার করেন। কটক শাখার নেতা ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বেদান্তবাগীশ) ও সহকারী ছিলেন বিশ্বনাথ কর। উড়িষ্যার প্রধান নেতা মধুসূদন রাও ছিলেন ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষক।

যুগান্তর ভিন্ন অন্য দলগুলিও বৈপ্লবিক কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল এবং অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিল, তাহার প্রমাণ সমসাময়িক ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় মুসলিম বিরোধিতা উগ্র হইয়া যখন ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর ও ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে দাঙ্গা বাধে, তখন আত্মোন্নতি সমিতির বিপিন গাঙ্গুলী চাঁদপুরে গুলী চালনার দায়ে এবং উক্ত দলের ইন্দ্রনাথ নন্দী জামালপুরে রিভলবার সমেত ধরা পড়েন।

এই সময় পুর্ব্ববঙ্গের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত লোকদের সাহায্য-কল্পে অরবিন্দ ২০০৲ টাকা দিয়া ইন্দ্রনাথ নন্দীকে জামালপুরে প্রেরণ করেন। ইন্দ্রনাথের সহিত সুধীর সরকার, নরেন বসু, শিশির ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, প্রভাস দে, হরিশ সিকদার প্রভৃতি আরও ছয় জন উক্ত দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে গমন করেন। প্রভাস ও হরিশ ময়মনসিংহ সহরেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইন্দ্রনাথ অপর কয়েক জন সঙ্গিসহ গুলী-চালনার দায়ে রিভলবার সমেত গেপ্তার হন। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ ১৮ বার গুলীবর্ষণ করেন। জামালপুর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডাক্তার বিপ্লবী দলের লোক ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় মামলা খারিজ হইয়া যায়, পুলিশ সেই সময় ২৭ জন লোককে দাঁড় করাইয়াও identify করিতে পারিল না। তাঁহারা সকলেই মুক্তিলাভ করেন।

১৯০৭-৮ সালে বিপ্লবিগণ গুপ্তহত্যার চেষ্টায় অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠেন। নির্য্যাতনকারী রাজপুরুষদের দণ্ড বিধান করাই ছিল এই সকল প্রচেষ্টার মূল। ১৯০৮ সালের ৩০শে আগষ্ট এ-সম্পর্কে তাঁহার স্ত্রীর নিকট এক পত্রে অরবিন্দের উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার তৃতীয় পাগলামি এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি; ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?"

বাংলার লেঃ গবর্ণরকে হত্যার চেষ্টায় ১৯০৭ সালে বাংলা দেশেই সর্ব্বপ্রথম বোমার আবির্ভাব হয়। তাহার পুর্ব্বে ১৯০৬ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া একাধিক বার বিপ্লবীরা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের—বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ-আসামের অত্যাচারী গবর্ণর ফুলারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

১৯০৭ সালে যুগান্তরী দলের নেতারা স্থির করেন, বাংলার ছোট লাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারকে বধ করিতে হইবে। কারণ তিনি লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ-বিভাগ প্রয়াসের পিছনে অন্যতম প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। বিজয়া দশমীর পর দিন অরবিন্দের আদেশে যুগান্তর দলের অন্যতম কর্ম্মী যতীন্দ্রনাথ বসু প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে লইয়া ছোট লাটকে বধ করিবার জন্য দার্জ্জিলিং সহরে গমন করেন। প্রফুল্ল তখন মুরারিপুকুরের বাগানে থাকিত। দার্জ্জিলিং গিয়া যতীন্দ্রনাথ অবসর-প্রাপ্ত আই. সি. এস চারুচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে উঠেন। প্রফুল্ল রহিল অন্য স্থলে। কয়েক দিন চেষ্টা করার পর তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে, সেখানে ছোটলাটকে মারা সম্ভব নয়। বেশ সুরক্ষিত ভাবেই ছোট লাট চলা-ফেরা করেন। তাঁহার যাতায়াতের সময় নিকটে সশস্ত্র প্রহরী ব্যতীত অন্য লোকের যাওয়ার কোনও সুযোগ-সুবিধা নাই। তাঁহারা উভয়েই বিফল-মনোরথ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

বোমার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া ছোটলাটকে

হত্যার সক্রিয় চেষ্টা হয় প্রথম ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে। এই প্রথম অভিযাত্রী দলের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার, উল্লাস ও বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন্দ্র গোস্বামী। কিন্তু চন্দননগরে পৌঁছাইয়া ঠিক হয় যে, উল্লাস একাকী লাইনের উপর বোমা পাতিবে। ছোট লাট এণ্ড্রু ফ্রেজার তখন রাঁচি যাইতেছিলেন। স্পেশ্যাল ট্রেণ আসিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া উল্লাস পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত স্থানে যখন বোমা স্থাপন করিবেন, তখন সহসা সেই স্থানে কতকগুলি লোক আসিয়া পড়াতে উল্লাস আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। এমন সময় ট্রেণ আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া বোমাস্থাপন না করিতে পারিয়া সেই লাইনের উপর কয়েকটি কার্ত্তুজ রাখিয়া তিনি সরিয়া আসেন। সশব্দে সামান্য একটু বিস্ফোরণ হয় কিন্তু ট্রেণের কোনই ক্ষতি হয় না।

তাহার অল্প কয়েক দিন পরে আবার ছোট লাটের ট্রেণ ধ্বংস করিবার মতলবে উল্লাস, বারীন্দ্র, বিভূতি সরকার ও প্রফুল্ল চাকী চন্দননগর ও মানকুণ্ডুর মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বোমা স্থাপন করেন। তাঁহারা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, সেই দিন ছোট লাট ঐ পথে আসিবেন। কিন্তু লাটসাহেব ঐ পথে না আসায় এ যাত্রাও তাঁহারা বিফল হন।

৬ই ডিসেম্বর ছোট লাটকে তৃতীয় বার হত্যা-প্রচেষ্টার বর্ণনা-প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার এক বিবৃতিতে বলেন, "তৃতীয় বার ছোটলাটকে হত্যার চেষ্টায় আমরা খড়গপুর যাই। চন্দননগরের দ্বিতীয় বারের যাত্রার সঙ্গী তিন জনও গমন করিয়াছিলেন। আমরা বেলা দশটার সময়ে ট্রেণ হইতে খড়গপুরে অবতরণ করি। বৈকালে আর একটি ট্রেণে চড়িয়া আমরা নারায়ণগড় অভিমুখে যাত্রা করি। সেখানে রেল-লাইন বরাবর যে সড়ক গিয়াছে, সেই সড়কের ধারে আমরা অপেক্ষা করিতে থাকি, রাত্রি হইলে অন্ধকারের সুযোগ লইয়া আমরা লাইনে আসিয়া রাত নয়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। নারায়ণগড় হইতে খড়গপুর অভিমুখে এই স্থান এক মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের সঙ্গে একটি ঢাকনি-দেওয়া লৌহ-পাত্রে ছয় পাউণ্ড ডিনামাইট ভর্ত্তি-করা একটি মাইন ছিল। পিক্রিক অ্যাসিড ও অন্যান্য বিস্ফোরক দিয়া তৈয়ারী ফিউজ উহাতে আঁটা ছিল। উহা একটি কাগজের চোঙে রক্ষিত ছিল এবং তাহার সহিত একটি সীসার নল সংযুক্ত ছিল। নলটি বেশী বড় হওয়াতে, উহার একটি টুকরা আমরা কাটিয়া ফেলিয়া দিই। আমাদের সহিত মোমবাতির একটি লণ্ঠন ছিল। অন্য কতকগুলি দ্রব্য একটি কাগজের মোড়কে ছিল এবং আমাদের সঙ্গে কতকগুলি 'ইংলিশম্যান'ও 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাও ছিল। ফিউজটি এই কাগজগুলির মধ্যে আনা হইয়াছিল বলিয়া কাগজগুলিতে পিক্রিক অ্যাসিডের দাগ লাগিয়াছিল। একটি কার্ডবোর্ড-নির্ম্মিত জুতার বাক্সও আমরা সেইখানে রাখিয়া আসি। ফিউজের জন্য প্রয়োজনীয় তুলা ওই বাক্সে আনিয়াছিলাম। লাইনের নীচে একটি ঝোপের মধ্যে বসিয়া আমরা কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করি। রাত্রি এগারোটা হইতে বারোটার মধ্যে আমরা মাইনটি পাতি, তাহার পর আমি নারায়ণগড় হইয়া একাকী রাত্রের শেষ যাত্রিবাহী ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। আমি সঙ্গীদের দুই জনকে সেখানে ট্রেণ আসিবার কিছু পূর্ব্বে ফিউজ লাগাইবার জন্য রাখিয়া আসি। তাহারা পরে বলে যে, মাইন পাতিবার পর সেই স্থান হইতে দেড় মাইল পথ অতিক্রান্ত হইবার পর, তাহারা ভীষণ আওয়াজ শুনিতে পায়।"

এই বিস্ফোরণের ফলে গাড়ীর কিছু ক্ষতি হইলেও লাটসাহেব অক্ষত থাকেন।

সেদিন অমাবস্যার রাত্রি ছিল। মেদিনীপুর যাইতে হইলে রেলওয়ে-ক্রসিং পার হইতে হয়। সেখানে এক জন পয়েণ্টস্ম্যান ছিল বলিয়া তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য মাইন পাতিবার পর প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকার আঁকা-বাঁকা পথে ধান-ক্ষেতের ভিতর দিয়া মেদিনীপুরে তাহার পরের দিন পৌঁছিলেন। সেই দিন মেদিনীপুর জেলা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের দিন। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেই সময় খড়গপুরে এক জন মারাঠী রেল-কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার সহিত বিপ্লবী দলের যোগ ছিল। তাঁহার নিকট হইতে ছোট লাটের আসা-যাওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। এই ব্যাপারে পুলিশ মিথ্যা মামলা সাজাইয়া কয়েক জন রেলওয়ে মজুরকে কারাগারে প্রেরণ করে।

এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে ৭ই নভেম্বর ১৯০৮ সালে এণ্ড্রু ফ্রেজারকে কলিকাতায় ওভারটুন হলে এক জনসভায় রিভালবারের গুলীতে বধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, আক্রমণকারী যুবক জিতেন্দ্রনাথ রায় এক জন কলেজের ছাত্র। পর পর তিন বার রিভলবারের ঘোড়া (Trigger) টানা সত্ত্বেও গুলী বাহির হইল না, কারণ অস্ত্রটি খারাপ ছিল। যুবক যখন এই ভাবে রিভলবারের ঘোড়া টানিয়া গুলী ছুঁড়িতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন ছোটলাটের পার্শ্বোপবিষ্ট বর্দ্ধমানের মহারাজা পরলোকগত স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব তাহাকে ধরিয়া ফেলেন। বিচারে যুবকের দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছিল।

নারায়ণগড়ে ছোট লাটকে হত্যার চেষ্টা করার ১৬।১৭ দিন পরে ২৩শে ডিসেম্বর গোয়ালন্দ ষ্টেশনে ঢাকার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট বি. সি. এলেনকে গুলী করা হয়। কিন্তু দিবালোকে গোয়ালন্দ ষ্টেশনের মত একটা জনবহুল স্থানে এক জন ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী করিয়া অনায়াসে পলাইয়া যাইতে পারে, এরূপ লোক বাংলায় আছে দেখিয়া বাঙ্গালী বিস্মিত হইল। এলেন সাহেব সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াও বাঁচিয়া যান। ইহার পরই কুষ্টিয়াতে পাদ্রী হিকেন বোথাম সাহেবের উপর গুলী চলিল। এই দুই ঘটনার দায়িত্ব যুগান্তর দল অস্বীকার করেন।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চন্দননগরে একটি স্বদেশী-সভার আয়োজন চলিতেছিল, ফরাসী সরকার সেই সভা বন্ধ করিয়া দেন। চন্দননগর ফরাসী-শাসিত অঞ্চল বলিয়া তথায় কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বিপ্লবীরা সহজে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিলেন। কিন্তু চন্দননগরের মেয়র মঁসিয়ে তার্দ্দিভ্যাল এক নূতন আদেশ জারী করিয়া সেই পথ বন্ধ করিয়া দেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল হেমচন্দ্র দাসের তৈয়ারী বোমা লইয়া বারীন্দ্র, ইন্দুভূষণ রায় ও নরেন্দ্র গোস্বামী মেয়রকে হত্যার উদ্দেশ্যে চন্দননগর গমন করেন। মেয়র তাঁহার পত্নীর সহিত রাত্রে যখন আহারে রত ছিলেন, তখন জানালা দিয়া ইন্দুভূষণ বোমা নিক্ষেপ করে। বোমার কাজ ঠিক মত হয় নাই। সম্ভবতঃ পিক্রিক অ্যাসিড ভাল ছিল না।

নবজাগ্রত জাতির অগ্রগতির প্রতিরোধ করার জন্য বৈদেশিক স্বৈরাচারী শাসকবর্গের অনুসৃত নিগ্রহনীতির প্রয়োগ বাংলার সর্ব্বত্র পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। তৎকালে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি

ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ইংরাজ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী কিংসফোর্ড। সেই সময় বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর,' 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' ও ইংরাজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' বাংলার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মুক্তির বাণী প্রচার করিতেছিল। এই সকল সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এই সমুদয় মামলার বিচার হয়।

কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে যে সকল রাজনৈতিক মামলার বিচার হইয়াছিল তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল যোড়শবর্ষীয় বালক সুশীলকুমার সেনের মামলা। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এক দিন রাজনৈতিক মামলার আদালত-গৃহে কলিকাতার ছাত্র ও যুবকগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তখন পুলিশ ও উপস্থিত জনতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। বালক সুশীলকুমার এক জন অশ্বারোহী সশস্ত্র ইংরাজ পুলিশ কর্ম্মচারীর অশ্বের উপর লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে ঘুষি মারিয়াছিল। ইংরাজ বিচারক কিংসফোর্ড পরাধীন ভারতের একটা বালকের এই বীরোচিত সাহস ও পৌরুষকে অমার্জ্জনীয় স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে করিলেন। ২২শে আগষ্ট বিচারে সুশীলের প্রতি ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ হইল। কিংসফোর্ড বেত্রদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আন্দোলনকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁহার আদালতের বাহিরে প্রকাশ্য স্থানে ত্রিকোণাকার একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। হাত-পা বাঁধিয়া সুশীলকে বেত্রাঘাত করায় সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

এই বর্বরোচিত দণ্ডাজ্ঞার পর 'সন্ধ্যা' পত্রিকা কিংসফোর্ডকে 'কসাই কাজী কিংফর্দ' বলিয়া উল্লেখ করিত। সুশীলের সাহসের প্রশংসা করিয়া 'সন্ধ্যা' লিখিয়াছিল—'সুশীলের তুড়ি লাফ, ফিরিঙ্গী বলে বাপ বাপ'। সুশীল ও তাঁহার অগ্রজ বীরেন সেন যুগান্তর বিপ্লবী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রাজনৈতিক মামলাগুলির বিচার শেষ হইয়া যাওয়ার পর কিংসফোর্ডকে বাংলার বাহিরে নিরাপদ স্থানে বদলী করা হয়। বিহারের মজঃফরপুর সহরে তিনি জিলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইলেন। যুগান্তর বিপ্লবী দলের নায়ক-মণ্ডলী—অরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক ও চারু দত্ত মহাশয়ের আদেশে এই অত্যাচারী জজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দুঃসাহসিক কার্য্যের প্রথম ভার পড়ে পরেশ মৌলিকের উপর।

পরেশ মৌলিক আরদালীর বেশে একটা মোটা আইন বইএর ভিতর বোমা ভরিয়া বিশেষ চতুরতার সহিত কিংসফোর্ডের গার্ডেনরীচের বাংলোতে চাপরাশীর নিকট দিয়া আসেন। পরেশ চাপরাশীর সহিত পান-বিড়ি সহযোগে নানা গল্প করিয়া তাহার হাতে বইটা দিয়া কিংসফোর্ডের টেবিলের উপর রাখার ব্যবস্থা করেন। বইটার প্যাকিংএর উপর যথারীতি কিংসফোর্ডের নাম লেখা ছিল। পুস্তকের কভার না কাটিয়া ভিতরে পাতা গোল করিয়া কাটিয়া তাহাতে বোমা স্থাপন করিয়া ভাল ভাবে প্যাক করা হয়। বোমার সঙ্গে একটি স্প্রীং দিয়া কভারের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কভারের বাঁধন খোলার সঙ্গে সঙ্গে স্প্রীংএর জোরে উহা কতকটা লাফাইয়া উঠিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটিবে। পুস্তকটি লইয়া যাইবার সময় আরদালী বলে, "বহুত ভারী হ্যায়"। পরেশ হাসিতে হাসিতে বলে "এসব বাবা বড় বড় লোকের বই, আমরা ও-সবের কি বুঝি?"

কিংসফোর্ড মনে করেন যে, পুস্তকটি পূর্ব্বে কেহ হয়তো লইয়া গিয়াছিল তাই ফেরত দিয়া গিয়াছে। তিনি অন্যান্য পুস্তকের সহিত বই-বোমাটিকে সযত্নে বাক্সবন্দী করিয়া মজঃফরপুরে পাঠাইয়া দেন।

আলিপুর বোমার মামলায় বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তির পর, পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেব বিপ্লবিগণের কার্য্যাবলী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান এবং মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড সাহেবকে 'তার' করিয়া উক্ত প্যাকিং-বাক্সে হাত দিতে নিষেধ করেন। বোমাটিকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ মিঃ এলারসন সাহেবকে মজঃফরপুরে পাঠাইয়া দেন এবং তিনি বাক্সটিকে বহু ক্ষণ জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া বোমার সক্রিয়তা নষ্ট করিয়া দেন।

কিংসফোর্ডের মৃত্যু না ঘটাতে কর্ত্তব্য স্থির করার জন্য এক বৈঠক বসে এবং তাহাতে অরবিন্দ ও চারু দত্তের নির্দ্দেশে ঠিক হয় যে, মজঃফরপুরে বিপ্লবী প্রেরণ করিয়া কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে হইবে। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্রের সুপারিশে ক্ষুদিরাম বসুকে বারীন্দ্রের প্রিয় অনুচর প্রফুল্ল চাকীর সহিত এই কার্য্যের জন্য মজঃফরপুরে প্রেরণ করা স্থির হয়। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম কেহ কাহাকেও চিনিত না। ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর হইতে আনিয়া প্রফুল্লকে দেখাইয়া বলা হয়, 'ইঁহার নাম দীনেশচন্দ্র রায়, বাঁকুড়ার এক জন কর্ম্মী' এবং ক্ষুদিরামকে, হরেন সরকার নামে প্রফুল্লের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। সাবধানতার জন্যই এইরূপ করা হয়। যদি কেহ কোন কার্য্যে ধরা পড়ে এবং পুলিশের অত্যাচারে স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সে প্রকৃত কথা বলিতে পারিবে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও হইত।

কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমার এক বিবৃতিতে বলেন, "জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি দমনে কিংসফোর্ড যে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন, তাহার শাস্তি দিবার জন্য প্রফুল্ল চাকী চঞ্চল হইয়া উঠে এবং মজঃফরপুরে গমন করিয়া বোমার আঘাতে কিংসফোর্ডের জীবনান্ত চাহে। তাঁহার মৃত্যু দেশের লোকেরও অভিপ্রেত ছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। উহাই দেশের দাবী। হেমচন্দ্র ও উল্লাসকর এই বোমা ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে প্রস্তুত করে। একটি কাঠের হাতলযুক্ত টীনের আধারে এই ডিনামাইট বোমাটি ছিল। আমি ও উপেন্দ্র স্থির করি যে, এই কাজের ভার দেওয়া হইবে প্রফুল্ল চাকীকে: হেমচন্দ্রের সুপারিশে মেদিনীপুরের ক্ষুদিরামকে তাহার সঙ্গী হইতে দেওয়া হয়। আমি দুই জনকে দুইটি রিভলবার দিয়াছিলাম, কারণ ধরা পড়িবার উপক্রম হইলে, তাহারা ধরা না দিয়া আত্মহত্যা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। ক্ষুদিরাম আমাদের দলের লোক ছিল না এবং সে মাণিকতলা বাগান কিংবা গোপীমোহন দত্ত লেনের ব্যাপার জানিত না। সে হেমচন্দ্রের নিকটে তাঁহার বাসস্থানে থাকিত। আমি প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া মুরারিপুকুর হইতে গোপীমোহন দত্ত লেনে যাই এবং সেখানে প্রফুল্ল একটি ক্যানভাস-নির্ম্মিত ব্যাগে বোমা ও রিভলবার ভরিয়া লয়।"

মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে পৌঁছায় এবং মহাত্মা ওয়ার্ড এষ্টেটের ধর্ম্মশালায় দীনেশচন্দ্র রায় ও দুর্গাদাস সেনের নাম লইয়া উঠেন।

উহারা মজঃফরপুরে আসিয়া কিংসফোর্ডের আবাস-স্থল পর্য্যবেক্ষণ করার পর দীনেশ (প্রফুল্ল চাকী) 'মুকুদাদা' নামে বারীন্দ্রকে অভিহিত করিয়া মাণিকতলায় এক পত্র লিখে: "আমরা নিরাপদে এখানে পৌঁছিয়াছি কিন্তু পথে দুর্গাদাসের পকেটে যে টাকা ছিল

তাহা খোয়া গিয়াছে। কিছু টাকা পাঠাবেন। আমরা বরকে এখনও দেখি নাই কিন্তু তাহার বাড়ী ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছি। বরের বাড়ী মন্দ নহে। আমি পরে আপনাকে সবিশেষ জানাইব। নিম্ন ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন। টাকা পাঠাইবার সময় আমাদের ওখানকার ঠিকানা দিবেন না, ভুল ঠিকানা দিবেন।"

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম কয়েক দিন ধর্ম্মশালায় থাকিয়া সহরের পথ-ঘাট চিনিয়া লইলেন। কিংসফোর্ডের গতিবিধিও তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তাঁহার বাংলোর নিকটেই ইউরোপীয়ান ক্লাব অবস্থিত। কিংসফোর্ড সাহেব প্রতি সন্ধ্যায় ক্লাবে যাইতেন এবং অধিক রাত্রিতে বাংলোতে ফিরিতেন। ক্লাব বাংলোর নিকটবর্ত্তী হইলেও তিনি তাঁহার ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া ক্লাবে যাতায়াত করিতেন। মজঃফরপুরের উকিল মিঃ কেনেডিরও একই রকম ঘোড়ার গাড়ী ছিল। তিনিও ক্লাবের মেম্বার ছিলেন এবং নিজের গাড়ীতে করিয়া স্ত্রী ও কন্যা সহ ক্লাবে যাতায়াত করিতেন।

বোমা নিক্ষেপের ঘটনার ৮।১০ দিন পূর্ব্বে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়াছিল যে, কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইবে। কলিকাতা হইতে গোয়েন্দা পুলিশ কিংসফোর্ডকে সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মে সতর্ক করিয়া পাঠাইলেন।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অবিস্মরণীয় দিন। অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকারে ইউরোপীয়ান ক্লাবের প্রবেশদ্বারে দুই জন বাঙ্গালী যুবক বোমা, রিভলবার লইয়া সংগোপনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় মিঃ কেনেডির পত্নী ও কন্যা তাঁহাদের ফিটন গাড়ীতে করিয়া ক্লাব হইতে বাড়ীতে ফিরিতেছিলেন। উহাই কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ী মনে করিয়া ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করিলেন। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে বোমা বিস্ফোরিত হইল। গাড়ীর একাংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। আরোহিণী মিসেস্ কেনেডি ও তাঁহার কন্যা মারাত্মক ভাবে আহত হইলেন; সহিসও আহত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আঘাত গুরুতর হয় নাই। মহিলা দুই জন আঘাতের ফলে মারা গেলেন।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপের অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থল হইতে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা রেলের রাস্তা ধরিয়া পায়ে হাঁটিয়া রওনা হইলেন সমস্তিপুরের দিকে। মজঃফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী ওয়াইনী নামক ষ্টেশনের (বর্ত্তমানে পুশা রোড ষ্টেশন) নিকটে পৌঁছিলে রাত্রি প্রভাত হইল। পয়লা মে শুক্রবার এই স্থানে শিবপ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং নামক দুই জন কনেষ্টবল কর্ত্তৃক ক্ষুদিরাম ধৃত হইলেন।

ক্ষুদিরাম ধৃত হইবার পর নিকটস্থ আমবাগানের আশ্রয় হইতে প্রফুল্ল সমস্তিপুরের দিকে রওনা হইলেন। বোমা নিক্ষেপের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ নানা দিকে সাদা পোষাকে কয়েক জন পুলিশ কর্ম্মচারী ও কনেষ্টবলকে অপরাধী ধরিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অনেক ষ্টেশনে জরুরী তার করিয়া নির্দ্দেশ প্রেরিত হইয়াছিল।

মজঃফরপুর হইতে সমস্তিপুরের দূরত্ব ৩২ মাইল। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় প্রফুল্ল সমস্তিপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রেল-কর্ম্মচারীদের বাসভবনের সংলগ্ন মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার কালে এক জন বাঙ্গালী রেল-কর্ম্মচারীর দৃষ্টি পড়িল পথচারী বাঙ্গালী যুবকের উপর। পূর্ব্বদিন রাত্রিতেই মজঃফরপুরের ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে সমস্তিপুরে সেই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। যুবকের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল, যুবকটি পলাতক বিপ্লবী। তিনি তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া সারা দিন লুকাইয়া রাখেন এবং স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিয়া দেন। নূতন জামা-কাপড় ও জুতা কিনিয়া তাঁহার পোষাক পরিবর্ত্তন করা হইল। রাত্রির গাড়ীতে (১লা মে) কলিকাতার টিকিট কিনিয়া ভদ্রলোক তাঁহাকে ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

সেই কামরাতেই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন পুলিশ সাব-ইনস্পেকটার কলিকাতায় যাইতেছিল। নন্দলাল পূর্ব্বদিন বোমা নিক্ষেপের ঘটনার রাত্রিতে মজঃফরপুরে ছিল এবং ঘটনার সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়া আসিয়াছিল। প্রফুল্লর আচরণে ও কথা-বার্ত্তায় ও নূতন পোষাকে, দারোগা নন্দলালের সন্দেহ জন্মে এবং নানা ছলে তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে চেষ্টা করে। প্রফুল্ল তাহার সান্নিধ্য এড়াইবার জন্য অন্য গাড়ীতে চলিয়া যান।

মোকামায় পুলিশের কর্ত্তা আর্মষ্ট্রং সাহেবের অনুমতি লইয়া নন্দলাল প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিতে আসিলে বীর যুবক প্রফুল্ল কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া নিমেষের মধ্যে রিভলবার বাহির করিয়া নন্দলালকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িল। নন্দলাল মাথা নীচু করিয়া সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। প্রফুল্ল পুলিশের হস্তে ধরা দিবার পূর্ব্বেই গুলীর আঘাতে আত্মহত্যা করিলেন। এই ঘটনার এক মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ দিয়া উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"তখন পুলিশ ওকে ঘিরিয়া ফেলিলে প্রফুল্ল এক বার নিজের কপালে আর এক বার বুকে গুলী করিয়া প্লাটফর্মে পড়িয়া গেল। বাংলার এই প্রথম বীর পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিল। পুলিশ মৃত প্রফুল্লর ফটো তুলিয়া লইল। শুনিয়াছি, ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার ছিন্ন মুণ্ড মজঃফরপুর লইয়া আসিয়াছিল। বিচারকালে প্রফুল্লর সেই অবস্থার ফটো আমি দেখিয়াছি। কপালের ঊর্দ্ধ দিকে একটি ও বাঁদিকের বুকের উপর দিকে একটি গুলী প্রবেশের চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, কি অমিত বীর্য্য ও মনের বল থাকিলে মানুষ নিজের শরীরে দুই বার গুলী লাগাইতে পারে! কি প্রশস্ত নিটোল ললাট ছিল প্রফুল্লর! আর বক্ষোদেশ কি উন্নত ও বিস্তৃত! বাঙ্গালী হইয়া এই প্রথম দেখিলাম বাঙালী বীরের প্রকৃত মূর্ত্তি।"

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে শোণিতরেখায় মহাকালের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার মুক্তি-যজ্ঞে আত্মবলিদান করিয়া প্রফুল্ল অমরত্বের মর্য্যাদা লাভ করেন।

নরহত্যার অপরাধে—বিচারে প্রফুল্লর সতীর্থ ক্ষুদিরামের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। ক্ষুদিরাম নির্ভীক ভাবে অপরাধ স্বীকার করিল এবং প্রাথমিক তদন্তে অথবা সেসন আদালতে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিল না। জেলা জজ কার্ণডাফ সাহেব ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড দিয়া হাইকোর্টের অনুমোদনার্থ প্রেরণ করেন। যদিও ক্ষুদিরামের স্বীকারোক্তি ছাড়া হত্যা সম্পর্কে কোন প্রমাণ ছিল না, তথাপি হাইকোর্ট রায় বহাল রাখিলেন।

১১ই আগষ্ট প্রাতে মজঃফরপুর কারাগারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। শান্ত ও নির্বিকার চিত্তে সে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে। বিংশ শতকে বাঙলা দেশে ক্ষুদিরামই সর্ব্বপ্রথম ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া জাতিকে মৃত্যুভয়াতীত হইতে শিখাইয়াছে। [ক্রমশঃ।

বিবাহে লোকাচার ও মেয়েলী সঙ্গীত

শ্রীকামিনীকুমার রায়

পল্লী-বাংলার হিন্দু-সমাজে বিবাহ উপলক্ষে যে-সকল লোকাচার পালিত হয় বা এক কালে হইত, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহার একটি ধারাবাহিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। এই সকল আচার-বিধি সর্ব্বত্র এক নহে, স্থান ও সমাজ-ভেদে বিভিন্ন। পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে সধবা স্ত্রীলোকেরা সময়োপযোগী গীত গাহেন এবং উলুধ্বনি দেন। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ গীত ও উলুধ্বনি কদাচিৎ শুনা যায়; এখানে বর্ত্তমানে শঙ্খধ্বনির প্রথাই অধিক প্রচলিত। আমি আমার বক্তব্যকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য কোন কোন লোকাচারের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের, বিশেষতঃ ময়মনসিংহের দুই একটি মেয়েলী সঙ্গীত আমার পূর্ব্বগামীদের সংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। কাহারো একার পক্ষে সমগ্র বাংলার সমস্ত আচার-পদ্ধতি যথাযথ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৌধ গড়িবার কাজ অগ্রসর হইতে পারে।

পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন

আজকাল আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিই; কিন্তু দেখা যায়, হিন্দুর সামাজিক জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বিবাহে এই স্বাধীনতা এখনো সর্ব্বজন-কাম্য হইয়া উঠে নাই। অধিকাংশ স্থলেই ঘটক, পিতা-মাতা বা কোনও আত্মীয়-বান্ধব বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। এই প্রথা ভাল কি মন্দ বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিচার করিবার অবকাশ নাই। তবে এইমাত্র বলিব, ছোটরা যাহাই মনে করুক, সংসার-ক্ষেত্রে তাহাদের অপেক্ষা বড়দের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বেশী। সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন অসুখ-অশান্তির হউক, ইহা কোন পিতা-মাতাই কামনা করেন না। তাই যত দূর সম্ভব নানা দিক্ বিচার-বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা পুত্র-কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাদের চিন্তা-চেষ্টার অবধি থাকে না, স্বেচ্ছায় তাঁহারা এক অতি গুরু দায়িত্ব-ভার আপনাদের স্কন্ধে তুলিয়া লন। কত দিক তাঁহারা দেখেন! যাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে যাইতেছেন, অথবা যাহাকে বধূরূপে গৃহে তুলিয়া লইতে চাহিতেছেন,—তাহার রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, বংশমর্য্যাদা, আচার-ব্যবহার—কত কিছু তাঁহারা দেখেন! বংশে কোনও অপবাদ আছে কি না, বংশ কৌলিক পীড়া-মুক্ত কিনা, সমাজ-সংশ্রব উত্তম কিনা, প্রভৃতি অনেক কিছু তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিতে হয়। তাহাতেও তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না; কোষ্ঠীপত্র দেখেন, প্রস্তাবিত বিবাহের শুভাশুভ নিরূপণে নানা প্রক্রিয়ার, আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমাদের সমাজে যে বয়সে, যেরূপ অবস্থায়, যেরূপ পরিবেশের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহাতে স্বাধীন-মনোনয়নের ক্ষেত্রে ছোটদের বিভ্রান্ত হওয়া বিচিত্র নয়। বড়রা এই বিভ্রান্তি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া সংসার-সমাজে শান্তি ও কল্যাণের ধারাই অব্যাহত রাখিতে চান। সেকালে পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনে পিতা-মাতা যে কত দিক বিবেচনা করিতেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা' হইতে এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। হীরাধর ছিলেন এক জন বিশেষ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি; তাঁহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। কন্যার নাম 'মলুয়া', নানা স্থান হইতে তাহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে; কিন্তু পিতার কোন ঘর-বরই পছন্দ হইতেছে না। পাত্রটি যদি ভাল পাওয়া যায়, তাহার বংশ ভাল হয় না, বংশ হইলে অবস্থা হয় না,—আবার বংশ, পাত্র এবং অবস্থা ভাল হইলেও কোনও কৌলিক পীড়ার কথা শুনা যায়। নিম্নোদ্ধৃত অংশটি কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দুর পিতৃ-হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে।—

> "মাঘ মাসে করমি (ঘটক) আইল হীরাধরের বাড়ী।
> একে একে দেখে বাপে সম্বন্ধ বিচারি।
> চম্পাতলায় সোনাধর এক পুত্র তার।
> দেখিতে সুন্দর পুত্র কাত্তিককুমার।
> আড়ায় পুড়ায় তাঁর আছয়ে জমীন।
> হীরাধর কয় বংশে সেও অকুলীন।
> আর এক করমি আইল দীঘলহাটী হইতে।
> ধনে জনে সেও ভাল সকল কথা কইতে।
> ঘরের ভাত খায় সে যে গোয়াইল ভরা গরু।
> কাঠাতে মাপিয়া তোলে ধান চাউল সরু।
> বাপের নাই সে উঠে মন হইল বিষম লেঠা।
> ঘর-বর পছন্দ হইল বংশে আছে খুটা।
> উত্তরে সুসঙ্গ হইতে আইল আরও ঘর।
> অবস্থা বেবস্থা তার অতিশয় সুন্দর।
> ধানে চাউলে মহাজন চাইর পুত্র তার।
> এক এক পুত্র যেমন তার দেব অবতার।
> ঘাটে বান্ধা দৌড়ের নাও পছন্দ বাহার।
> লড়াই করিতে আছে চাইর গোটা ষাঁড়।
> ভাত ফালাইয়া ভাত খায় চিন্তা ভাবনা নাই।
> মহারোগীর বংশ বল্যা কন্যা দিতে নাই।"

শেষে চাঁদবিনোদের সঙ্গে 'মলুয়া'র বিবাহের কথা হইল। তাহার রূপ, গুণ দুই-ই আছে; বংশও তাহার কুলীনের এবং এই বংশের কোনও অপবাদ নাই, কৌলিক পীড়ায়ও কেহ এই বংশে মরে নাই। কিন্তু তাহাতেই বা কি? সকল থাকিতেও চাঁদবিনোদের অবস্থা নাই, সে নিতান্ত দরিদ্র; দারিদ্রের ঘরে কন্যা দেওয়া যায় না। তাই পিতা ভাবিতেছেন:—

> "এক চিন্তা করে বাপে শিরে হাত দিয়া।
> কেমন কইরা এমন ঘরে কন্যা দিবাম বিয়া।
> এক কাঠা ভুঁই নাই খলা পাতিবারে।
> কেমন কইরা বিয়া দিবাম কন্যা এই ঘরে।
> একখানি ভাঙ্গা ঘর চালে নাই ছানি।
> কেমনে খাইব (রে) কন্যা উছিলায় পানি।
> বাপের দুলাল কন্যা দুঃখ নাহি জানে।
> পাঁচ ভাইয়ের বইন এত না সইব (রে) পরাণে।

এক মুষ্টি ধান নাই লক্ষ্মী পূজার তরে।
কি খাইয়া থাকব কন্যা দরিদ্রের ঘরে।
পাটের শাড়ী পিন্ধ্যা কন্যা সুখ নাহি পায়।
হেন ঘরে কন্যা দিতে মন না জোয়ায়।"

অবশ্য সেদিন গিয়াছে ; এখন আর সকল দিক বিবেচনা করিবার অবকাশ নাই। কোনওরূপে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই পিতা-মাতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন।

পাকা-দেখা

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে উহাকে পাকা রূপ দিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে যে মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠিত হয়, স্থান ও সমাজ-ভেদে তাহা 'পাকা-দেখা,' 'আশীর্বাদ,' 'মঙ্গলাচরণ,' 'লগ্নপত্র,' 'পত্রকরণ,' 'পাটিপত্র' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার নিয়মপ্রণালীও সর্বত্র এক নহে। সাধারণত পশ্চিমবঙ্গে বরপক্ষীয় কোনও ব্যক্তি (বরের গুরুস্থানীয়) পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া কন্যার বাড়ী যান। প্রথমে পুরোহিত স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া কন্যার মস্তকে ধান্য-দূর্বা স্থাপন করেন এবং কপালে চন্দনের টিপ পরাইয়া দেন ; তখন বরপক্ষীয় ব্যক্তি টাকা, গিনি কিংবা কোনও স্বর্ণালঙ্কার দিয়া কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। শঙ্খধ্বনিতে সেই সময় অন্তঃপুর মুখরিত হইয়া উঠে। অতঃপর পুরোহিত একখণ্ড কাগজে লালকালিতে বর-কন্যার নাম, বিবাহের দিন, লগ্ন ইত্যাদি লেখেন এবং বরপক্ষীয় ব্যক্তি উহা স্বাক্ষর করিয়া কন্যার পিতা বা অভিভাবকের হস্তে অর্পণ করেন। বিক্রমপুরে যে 'পাটিপত্র' হয়, তাহা পাত্রপক্ষের বাড়ীতে বসিয়া দুই খণ্ড কাগজে লিখিত হয় এবং তাহাতে কোন্ পক্ষ প্রধান কি কি অলঙ্কার ও দানসামগ্রী দিবেন, তাহারও উল্লেখ থাকে এবং উভয় পক্ষই লিপি দুইটিতে স্বাক্ষর করেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলে 'লগ্নপত্র' লেখা হইলে কন্যাপক্ষের পুরোহিত উহাতে পাঁচটি কি সাতটি সিন্দূরের ফোঁটা দেন এবং ধান্য-দূর্বা স্থাপন করেন। বরপক্ষের পুরোহিত ঐ পত্রখানি গ্রহণ করিয়া সঙ্গীয় ভৃত্যকে তাহা বুঝাইয়া দেন। এই উপলক্ষে উপস্থিত সকলের মধ্যে পান ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ময়মনসিংহের 'লগ্নপত্রের' একটি মেয়েলি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত হইল—

"ভাগ্যবতী জামাইর বাপ পণ্ডিত পাঠাইছে
সোহাগিনী কন্যার বাপের বাড়ী রে
দেও কন্যার বাপ বিবাহের কবুল।
আছে তোমার বেটী রে, আছে তোমার ভাইস্তি রে (ভাইঝি)
দেও কন্যার বাপ বিবাহের কবুল।
এরে (ইহা) শুইন্যা কন্যার বাপ পণ্ডিত ডাকিল রে
পণ্ডিত ডাইক্যা লেইখ্যা দিল তার বেটীর বিয়া রে।
বইস্যা আছে জামাইর বাপ দরবার করিয়া
পত্র পড়িয়া দেখে তার বেটার বিয়া।"

ছেলে-ভুলানো ছড়ায় আমরা 'গুণবতী ভাই' কথাটি পাইয়াছিলাম, এখানে 'ভাগ্যবতী জামাই'র বাপকে দেখিলাম। 'ভাগ্যবতী,' 'সোহাগিনী,' 'দেও কন্যার বাপ বিবাহের কবুল' কথাগুলির ভিতর দিয়া নারী-হৃদয়ের সহজ-স্বচ্ছন্দ স্নেহ-কোমলতার ধারাই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে।

'লগ্নপত্র' বা 'পাটিপত্র' লিখিবার প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে এবং সকল সমাজে ইহা প্রচলিতও নহে। সাধারণ পল্লী-সমাজে দেখা যায়, বিবাহের প্রস্তাবে উভয় পক্ষ সম্মত হইলে বরপক্ষ হইতে এক শুভদিনে কন্যাপক্ষের বাড়ীতে শাঁখা-সিন্দুর, বস্ত্র, সাধ্যমত কোনও অলঙ্কার, পান-সুপারি, মিষ্টি, দধি, মৎস্য প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এয়োরা গীত ও উলুধ্বনির মধ্যে উঠানে আলপনা-যুক্ত স্থানে ঐগুলি বরণ করিয়া লন। কন্যাকর্ত্তা পূর্ব্বাহ্ণেই সমাজের গণ্যমান্য সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। যথাসময়ে তাঁহারা উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে 'সম্বন্ধের' যাবতীয় তথ্য এবং পান-মিষ্টি পরিবেশন করা হয়। এইরূপেই 'মঙ্গলাচরণ' অনুষ্ঠান শেষ হয়। বিবাহের দিন, লগ্ন কখনো বা এই সময়েই স্থির হয়, কখনো বা পরে পত্রযোগে বা লোক দ্বারা জানানো হয়।

আসামের কোথাও কোথাও বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইলে বরপক্ষ হইতে কয়েক জন মহিলাকে কন্যার বাড়ীতে পাঠানো হয় ; তাঁহারা যাইয়া কন্যাকে একটি আংটি পরাইয়া আসেন। ইহাই তাঁহাদের 'পাকা-দেখা',—তদ্দেশীয় নাম 'আঙ্গঠি পিন্ধোয়া।'

পশ্চিমবঙ্গে শুধু বরপক্ষ হইতে কন্যাকে নয়, কন্যাপক্ষ হইতেও বরকে কোনও সোনার জিনিষ বা টাকা-গিনি দিয়া আশীর্ব্বাদ করা হয়।

পানখিল

ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্ব্বোক্ত 'আশীর্ব্বাদ' বা 'লগ্নপত্রের' পর কোন এক শুভদিনে সমাজের এয়োগণ একত্র হইয়া 'পানখিল', 'পানখিলি' বা 'পানভাঙ্গানি' নামে এক আচার পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রচলন নাই। 'পাকা-দেখা'র পরও অনেক সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায় ; হয়তো তজ্জন্যই পাকা-দেখা ও বিবাহের মধ্যবর্ত্তী সময়ে সে-সম্বন্ধকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা হইতেই পানখিল প্রক্রিয়ার উদ্ভব! সকলে মিলিয়া পানে খিলি দেওয়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে,—উপস্থিত বিবাহ-প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের সমবেত শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা। এয়োগণকে পূর্ব্বেই যথারীতি নিমন্ত্রণ করিয়া আসা হয়। তাঁহারা আসিয়া কেহ আল্পনা দেন, কেহ মঙ্গলঘট বসান, কেহ বা ধূপ-দীপ জ্বালেন। তার পর সকলে বসিয়া এক-একটি গোটা পান হাতে লন এবং উহাতে খিলি দেন ; সঙ্গে সঙ্গে হাস্য-পরিহাস, আমোদ-আহ্লাদ ও গীত চলিতে থাকে। প্রথমে বরের বাড়ীতে এবং পরে কন্যার বাড়ীতে এই আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মেয়েলী সঙ্গীত ইহার একটি বিশেষ অঙ্গ। কি ধরণের গীত গাওয়া হয় এখানে তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত হইল :

"আইজ রাণী হরষিত মনে, লক্ষ্মণরে পাঠাইয়া দিলা দুর্গার কারণে।
যোড় হস্ত কইর্যা লক্ষ্মণ নিমন্ত্রণ করে, যাইতে হবে দুর্গা মাগো,
শ্রীরামের উৎসবে (তোমায় যাইতে হবে)।
আইজ রাণী হরষিত মনে, ভরতরে পাঠাইয়া দিলা গঙ্গার কারণে।
যোড় হস্ত কইর্যা ভরত নিমন্ত্রণ করে, যাইতে হবে গঙ্গা মাগো,
শ্রীরামের উৎসবে (তোমায় যাইতে হবে)।"

সঙ্গীতটির সর্ব্বাংশ উল্লেখ করিলাম না ; ইহাতে এইরূপে পদ্মা, কালী, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেব-বধূগণের নিমন্ত্রণের কথা বলা হইয়াছে। রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ-উৎসবে নিমন্ত্রিতা হইয়া যথাদিনে দেবীরা শুধু নিজেরাই আসেন নাই, সহচরীদেরও সঙ্গে লইয়া, স্ব-স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া মহাসমারোহে আসিয়াছেন, গানেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে :—

"কইর্‌য়া সিংহরথে আরোহণ, দুর্গা কল্লেন গমন
যাইব অযোধ্যা ভবন, রাণী কৌশল্যার মনবাঞ্ছা পুরাইতে
সহচরী গো, তোরা কে যাইবি গো, শ্রীরামের উৎসব দেখিতে।
কইর্‌য়া মকরেতে আরোহণ, গঙ্গা কল্লেন গমন
যাইব অযোধ্যা ভবন, রাণী কৌশল্যার মনবাঞ্ছা পুরাইতে
সহচরী গো, তোরা কে যাইবি গো, শ্রীরামের উৎসব দেখিতে।
কইর্‌য়া হংসরথে আরোহণ, পদ্মা কল্লেন গমন
যাইব অযোধ্যা ভবন, রাণী কৌশল্যার মনবাঞ্ছা পুরাইতে
সহচরী গো, তোরা কে যাইবি গো, শ্রীরামের উৎসব দেখিতে।"

* * * *

দেবীরা আসিয়াই 'পানখিল' অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। অন্তঃপুরে উঠানের অনেকখানি জায়গা নিকানো হইয়াছে। লক্ষ্মী তাহার উপর আলপনা আঁকিলেন, গঙ্গা মঙ্গলঘট বসাইলেন, পদ্মা দীপ জ্বালিলেন, কালী উলুধ্বনি দিলেন, দুর্গা মূল কাজটি করিলেন—তাঁহার হাতে পানের খিলি পড়িল। সময়োপযোগী আর একটি গীত এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"আয়গণে (এয়োগণে) ডাকাইয়া, উঠানখানি লেপাইয়া (নিকানো)
লক্ষ্মী আইসা দিলাইন আলিপন।
লক্ষ্মী দিলাইন্ আলিপন, গঙ্গা আইতে কতক্ষণ (রাম রে)
গঙ্গা আইসা বসাইল মঙ্গলঘট।
গঙ্গা বসাইল মঙ্গলঘট, পদ্মা আইতে কতক্ষণ (রাম রে)
পদ্মা আইসা জ্বালাইন্ ঘিয়ের বাতি।
পদ্মা জ্বালাইন ঘিয়ের বাতি, কালী আইতে কতক্ষণ (রাম রে)
কালী আইসা দিলাইন জোকার (উলুধ্বনি)।
কালী আইসা দিলাইন জোকার, দুর্গা আইতে কতক্ষণ (রাম রে)
দুর্গা আইসা দিলাইন পানখিল।"

এইরূপ গীত-জোকারের ভিতর দিয়া 'পানখিল' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং গৃহকর্ত্রী সকলকে পান-সুপারি ও মিষ্টি দিয়া আপ্যায়িত করেন। সকলে তখন গৃহকর্ত্রীর প্রশংসাসূচক আর দুই-একটি গীত গাহিয়া বিদায় হন।

পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল অঞ্চলে 'পানখিল' প্রথার প্রচলন আছে, সে সকল অঞ্চলে, পল্লীগ্রামে পানখিলের পর হইতেই বিবাহ-বাড়ীতে উৎসবের ধুম পড়িয়া যায়। প্রতিদিন অপরাহ্নে সমাজের এয়োগণ সমবেত হইয়া গীত গাহেন এবং আমোদ-আহ্লাদ করেন। আর একটি নিয়ম এই যে, ঐ দিন হইতে বিবাহ-সংক্রান্ত যাহা কিছু বাড়ীতে আসুক, আসা মাত্রই উলুধ্বনি দেওয়া হয় ; কখনো কখনো দ্রব্য-সামগ্রীতে সিন্দুরের ফোঁটা দিতেও দেখা যায়। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কয়দিন যে সকল সঙ্গীত গাওয়া হয়, তাহাদের বিষয়বস্তু হইতেছে প্রধানতঃ—রামসীতার জন্ম ও বিবাহ, রাম কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ এবং জনকরাজার কন্যা-সম্প্রদান, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের গৃহে উমার জন্ম, শিবকে পাইবার জন্য উমার তপস্যা, শিবের সহিত উমার বিবাহ, সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ এবং এইরূপ আরও বহু দাম্পত্য আদর্শমূলক পৌরাণিক কথা ও কাহিনী। সাধারণত রাম, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি সম্পর্কে গানগুলি বরের এবং সীতা, সাবিত্রী, দুর্গা সম্পর্কে গানগুলি কন্যার বাড়ীতে গাওয়া হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনে এবং অবস্থার চাপে বর্ত্তমানে অবশ্য এই সকল সঙ্গীত আর তেমন শুনা যায় না, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো একেবারেই যাইবে না। এই সকল গান সেকালে অনভিজ্ঞ দুইটি প্রাণীকে নূতন সংসারে প্রবেশের পথে যেমন দিত উৎসাহ-আনন্দ, তেমনি দিত উপদেশ। শুনিয়া শুনিয়া বর-কন্যার হৃদয়ে একটা পবিত্র ভাব জাগিত, একটা উচ্চ আদর্শের তাহারা সন্ধান পাইত।

নানা দেবতার পূজা

বিবাহের পূর্ব্বদিন ময়মনসিংহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এককালে বর-কন্যার মঙ্গল কামনা করিয়া নানা দেব-দেবীর পূজা করা হইত। এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পল্লীগ্রামে আর কিছু হউক বা না হউক শ্যামাপূজা হইয়া থাকে এবং পল্লী-সমাজ হইতে প্রথমেই শ্রীশ্রীশ্যামা-পূজার এবং পরে বিবাহের উল্লেখ করিয়া উভয় অনুষ্ঠানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। যেমন মেয়েলী সঙ্গীতে, তেমনি পল্লী-কাব্যেও সেকালের বিবাহকালীন পূজা-অর্চ্চনার প্রমাণ পাওয়া যায় :—

কমলার বিবাহে—

"বিধিমত হইল কত দেবতা পূজন।
বনদুর্গা একাচুরা খেলা কীর্ত্তন॥
জোড় পাঠা দিয়া বলি শ্যামা পূজা করে।
মইষ দিয়া পূজা দিল দেবী ডরাইরে।"

চন্দ্রাবতীর বিবাহে—

"পূজিল শঙ্করে আগে দেব অনাদি।
অন্তরে যাহার নাম রাখিয়াছে বাঁধি॥
একে একে কৈল পূজা যত দেব আর।
শ্যামাপূজা একাচুরা বনদুর্গা মার॥
অধিবাস হইল শুভ বিয়ার পূর্ব্বদিনে।
ক্রিয়াকাণ্ড আদি যত হইল সুবিধানে।"

'একাচুরা' গ্রাম্য দেবতাবিশেষ ; ইঁহার ধ্যান হইতে মনে হয়, ইনি মহাদেবেরই রূপান্তর। 'ডরাই' মনসাদেবীরই কোনও সহচরী,—অনেকের মুখে 'ডরাই বিষহরী' নামটি শুনা যায়। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে রাজবংশীদের বাড়ীতে এককালে বিবাহোপলক্ষে 'বিষহরী' দেবীর পূজা হইত। 'বনদুর্গা'কে অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই পূজা করা হয়। সকল পূজা-অর্চ্চনারই উদ্দেশ্য—বর-কন্যার বিবাহিত জীবন সুখের হউক, তাহাদের যাত্রাপথে কোনও বাধা-বিপত্তি না আসুক।

অধিবাস ও তৈলকাপড়

বিবাহের পূর্ব্বদিন প্রথম রাত্রে অধিবাস। এই উপলক্ষে একটি বরণডালা (কুলা) ধান্য, দূর্ব্বা, মহী, চন্দন, হরিদ্রা, ফল, পুষ্প, ঘৃত,

দধি, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, শঙ্খ, চামর, গোরোচনা প্রভৃতি দ্রব্যে সাজানো হয় এবং পৃথক্‌ একটি পাত্রে আতপ চাউল ও মাষকলাই বাটিয়া তদ্দ্বারা 'শ্রী'র মতো একটি দ্রব্য তৈয়ার করিয়া রাখা হয়। পুরোহিত আসিয়া বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে চন্দনের টিপ পরাইয়া দেন এবং বরণডালার মঙ্গলদ্রব্যগুলি একটি একটি করিয়া বরের কি কন্যার কপালে ছোঁয়ান; সমস্ত ছোঁয়াইয়া গোটা বরণডালাটা এবং 'শ্রী'র পাত্রটাও একবার তাহাদের মাথায় ঠেকান হয়। অতঃপর একগোছা দূর্ব্বা তৈল-হরিদ্রাসিক্ত নূতন কার্পাস সূত্রে বরের দক্ষিণ ও কন্যার বাম হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে 'মঙ্গলসূত্র' বলে। পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও কোথাও বিবাহের দিন অপরাহ্নে বর-কন্যার স্নান-কামানোর পর এইরূপ সূত্র ও দূর্ব্বা বাঁধার প্রথা আছে। এইগুলি পূর্ব্ব হইতেই বরণডালায় সজ্জিত করিয়া রাখা হয়।

পূর্ব্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে এই দিন বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে অধিবাসের তত্ত্ব পাঠানো হয়; পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে ইহাকে 'তৈল-কাপড়' এবং কামরূপে 'তেলর ভার' বলিতে শুনা যায়। পাত্রপক্ষীয় কয়েক জন বাহক ভারে করিয়া তৈল, তাম্বূল, সুপারি, সিন্দুর, বস্ত্র, অলঙ্কার, দধি, সন্দেশ, মৎস্য প্রভৃতি কন্যার বাড়ীতে লইয়া যায়। অনেক স্থলে তাহাদের সঙ্গে ঢোলদার, কাঁসিদার, এবং অন্য বাদ্যকরও থাকে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এয়োরা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর ধান্য-দূর্ব্বা স্থাপন করেন এবং সিঁদুরের কৌটা দিয়া সময়োপযোগী গীত গাহেন। একটি গীত এখানে উদ্ধৃত হইল:—

"রামের মা কৌশল্যা রাণী বুলে তোরা আয়।
তৈলকাপড় আর্ঘিবার শুভ সময় বইয়া যায়॥
যাইতে ঐব (হইবে) মিথিলাতে জনক রাজার বাড়ী।
সেইখানে হইব (হইবে) বিয়া তাহার কুমারী॥
পন্থে আছে বিঘ্ন ভয় চোর-দস্যুর থানা।
শুরুয় না বসিতে পাটে করুক রওয়ানা॥
আর্ঘিয়া পুছিয়া তোমরা কর আশীর্ব্বাদ।
পূরুক মনের বাঞ্ছা কৌশল্যার সাধ॥"

* * * *

পূর্ব্বে অনেক সময় এই সকল তত্ত্বসামগ্রী চোর-দস্যুরা হরণ করিয়া লইয়া যাইত, তাই যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করা হইত। কন্যাপক্ষ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেন, তত্ত্ব আসিয়া পৌছিলে চারিদিকে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। তৎসময়ের একটি মেয়েলী সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত হইল। সঙ্গীতটি অতিরঞ্জিত মনে হইবে। কিন্তু সেকালে ধনী-মানী বাঙ্গালীরা বিবাহাদির তত্ত্ব এই ভাবেই পাঠাইতেন, এই ভাবেই তাঁহারা স্ব-সমাজে এবং ভিন্ন-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। সঙ্গীতটি এই:—

"আনন্দে মাতিল সর্ব্ব পুরী
চল রঙ্গ দেখি সহচরী।
মৎস্য আইছে ভারে ভারে, জালুয়া সহকারে
ঝাঁকায় ঝাঁকায় পূর্ণ করি,
তৈল কাপড় আইসাছে ঋষির (জনকের) বাড়ী।
দধি আইছে ভারে ভারে, গোয়ালা সহকারে
ভাণ্ডে ভাণ্ডে আছে সারি সারি
তৈল কাপড় আইসাছে ঋষির বাড়ী।
শঙ্খ আইছে ভারে ভারে শঙ্খারু সহকারে
দেইখা ভুলে ঝিয়ারী বহুরী
তৈল কাপড় আইসাছে ঋষির বাড়ী।"

* * *

এইরূপে সিন্দুর, শাড়ী, পান, সুপারি, তৈল প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর নাম ও পরিমাণ প্রচার করিয়া গীত গাওয়া হয়।

চোরপানি

বিবাহের দিন অতি প্রত্যূষে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে কন্যার বাড়ীতে 'চোরপানি' নামে জল তোলার একটি স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়।

"নিশি পোহাল রে কোকিলা করে রাও,
নিশি পোহাইয়া যাও।
উঠ উঠ কন্যার মা, কত নিদ্রা যাও
চোরপানি ভইরা আইসা দধিচিড়া খাও।"

ভোর না হইতে এয়োরা এই গানটি গাহেন এবং কন্যার মাতা ও পিতাকে সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ কোনও পুষ্করিণী বা নদীতে জল তুলিতে যান। পিতার হস্তে থাকে একটি খাঁড়া বা অন্য কোনও লৌহাস্ত্র এবং মাতার কক্ষে থাকে কলসী। অপর একটা মাটীর হাঁড়িও অপর এক জন এয়ো বহন করেন। কন্যার মাতা কি পিতা জীবিত না থাকিলে অন্য কোনও স্বামি-স্ত্রী এই আচারে সহযোগিতা করেন। জলে নামিয়া স্বামী খাঁড়া দিয়া জলের উপর যোগ-চিহ্নের মতো কাটেন এবং স্ত্রী সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কলসী ভরিয়া লন; সধবাটিও তাঁহার হাঁড়ি ভরেন। বাড়ীতে আসিয়া কলসীতে পাঁচটি ফল ও এক ছড়া মালা রাখিয়া নূতন কাপড়ে উহার মুখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের পর রাত্রিতে স্ত্রী-আচারের সময় বর অতি সন্তর্পণে উহার মুখ খোলে এবং এয়োদের আদেশ মতো ঐ সকল ফল ও মালা একটি একটি করিয়া উঠায়। এয়োগণ তখন জিজ্ঞাসা করেন, 'এটা কি?' বর হয়ত যথার্থই উত্তর দেয়, কিন্তু এয়োরা উহার ভিন্ন অর্থ করেন, হাস্য-পরিহাসে গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এইরূপে ফল উঠানো নাকি ভাবী সন্তান লাভের দ্যোতক। বর কলসীর মুখটি অতি সন্তর্পণে খোলে, কারণ উহাতে কি আছে তাহার জানা নাই; বিশেষতঃ এয়োরা তখন তাহাকে ঘেরিয়া যেরূপ হাসি-তামাসা করিতে থাকে, তাহাতে তাহার সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে ময়মনসিংহে একটি গল্প-কথাও প্রচলিত আছে: একদা কেহ ঠাট্টা করিয়া 'চোরপানি'র কলসীতে একটি ব্যাং রাখিয়া দেয়; ব্যাংএর লোভে এক সাপ গিয়া তাহাতে প্রবেশ করে এবং বিবাহের রাত্রে ঐরূপ স্ত্রী-আচার করিবার সময় বর উহার দংশনে প্রাণ হারায়। সেই হইতেই নাকি কলসীটি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। লৌহস্পর্শে জল পরিশুদ্ধ হয়, কাহারো মতে অপদেবতা বিতাড়িত হয়,—তাই খাঁড়া কি অন্য কোন লৌহে জল কাটিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।' এবিষয়ে আমরা বিস্তৃত ভাবে পরে বলিব।

কলসী ভরিয়া আনা ছাড়া, পৃথক ভাবে অপর একটি হাঁড়িও

ভরিয়া আনিবার প্রথা সর্ব্বত্র নাই। যেখানে এই প্রথা আছে, সেখানে কন্যা ঐ হাঁড়ির জল একটা রেক্ বা কুন্‌কেতে করিয়া তোলে এবং ঢালে, তখন অপরে জিজ্ঞাসা করে, 'কি করিতেছ?' সে সসঙ্কোচে উত্তর দেয়, 'শ্বশুর বাড়ীর সকলের সোহাগ মাপিতেছি'। ইহাকে বলে সোহাগ-জল মাপা।

দধিমঙ্গল

চোরপানি ভরিয়া আসিয়া কন্যার মাতা কন্যা ও এয়োস্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া দধি-চিড়া খান এবং কন্যার কপালে দধি ও চন্দনের ফোঁটা দেন। কোথাও ফোঁটার পরিবর্ত্তে দধি-চন্দন-মিশ্রিত জল একটি পান দ্বারা কন্যার শরীরে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। এই আচারের সাধারণ নাম 'দধিমঙ্গল।' বিবাহ করিতে বর যখন কন্যা-গৃহে যাত্রা করে, তখনো তাহার কপালে দধি ও চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়, উহারও নাম 'দধিমঙ্গল।' দধি একটি প্রধান মাঙ্গলিক দ্রব্য। কোথাও কোথাও শুধু কন্যার বাড়ীতেই নয়, বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে বরের বাড়ীতেও বরকে লইয়া দধি-চিড়া খাইবার এবং বরের কপালে তখন দধি-চন্দনের ফোঁটা দিবার প্রথা আছে। এখানে সময়োপযোগী একটি গান উদ্ধৃত হইল :—

"নিশি ভোর হল গো এক্ষণে।
ভোর হল নিশি, অস্ত গেল শশী
রাম লয়ে তোরা বসে যা ভোজনে।
আন দধি আন চিড়া ছানার সন্দেশ ক্ষীরা
রাম লয়ে তোরা বসে যা ভোজনে।"

বলা বাহুল্য, গানটি যখন কন্যার বাড়ীতে হয়, তখন রামের স্থলে 'সীতা' বলা হয়।

নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ

বিবাহের দিন পূর্ব্বাহ্ণে নিষ্ঠাবান অনেক হিন্দুই পরলোকগত পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, প্রভৃতি শুভকার্য্যেও ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই শ্রাদ্ধকে অভ্যুদয় বা সমৃদ্ধি এবং কল্যাণের কারণ বিবেচনা করা হয় বলিয়া ইহাকে 'আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ,' 'নান্দীমুখ' বা 'বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ' বলে। সাধারণতঃ বর-কন্যার পিতা বা বংশের কেহ পুরোহিতের মধ্যস্থতায় ইহা সম্পন্ন করেন। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের সঙ্গে প্রথমে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা এবং বসুধারা-প্রদান করা হয়। এই কৃত্যগুলি যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়, এইগুলিতে স্ত্রী-আচার অতি সামান্য। নান্দীমুখ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের চাউল বাড়ীর এবং পাড়ার এয়োরা নিজেরা ঢেঁকিতে ভানিয়া তৈয়ার করেন; এই ধান-ভানাকে বলে 'বৃদ্ধির বাড়া'।

এয়োরা উলুধ্বনির মধ্যে ঢেঁকি চালাইতে আরম্ভ করেন এবং গান ধরেন :—

"সুমন্ত্রের বাণী শুনে রাজরাণী।
বলিলেন তখনি কৌশল্যা গো রাণী॥
আন এয়োগণ যত ছানার সন্দেশ তত।
তৈল সিন্দুর দিয়ে ধান্য ভানে রাণী।"

* * *

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের সময়ে এয়োরা কোথাও 'তৈল পাক করা' নামে একটি স্ত্রী-আচার পালন করেন। পাঁচ জন এয়ো একত্রে একটি কোদাল ধরিয়া একযোগে মাটী তুলিয়া আনেন এবং উনানের তিনটি ইটা (ঝিঁক) তৈয়ার করেন। তার পর উহার উপর ছোট একটি মাটীর হাঁড়ি বসাইয়া উহাতে পাঁচ জনে একত্রে একটি পান ও কলার মাজপাতার ভিতর দিয়া তৈল ঢালিয়া দেন এবং উহা জ্বাল করেন। মেতি দিয়া এই তৈল সুগন্ধি করা হয় এবং গাত্র-হরিদ্রার সময় বর ও কন্যার শরীরে ইহা ছিটাইয়া দেওয়া হয়। নান্দীমুখের সময় তৈল জ্বাল দিবার প্রথা পল্লী-কাব্যেও বিবৃত হইয়াছে :—

"আভ্যদিক (আভ্যুদয়িক) করে বাপে মণ্ডপে বসিয়া।
তার মাটী কাটে যত সধবা মিলিয়া॥
সেই না মাটীতে ইটা তৈয়ার করিয়া।
পঞ্চ নারী মিলি দিল তৈল জ্বাল দিয়া॥"

সমাজ-ভেদে প্রথা এই যে, বরের বাড়ীর গন্ধ-তৈল কন্যার বাড়ীতে পাঠাইতে হয় এবং বর সেই তৈলে নিজের পায়ের আঙ্গুল ছোঁয়াইয়া দেয়, উহা কন্যার গায় ছিটানো হয়।

'নান্দীমুখ' অনুষ্ঠানের একটি মেয়েলী সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"তোরা উলু দে লো সখিগণ, নান্দীমুখে বইসাছে রাজন (ধুয়া)।
প্রাতঃস্নান কইয়া রাজা করিলেন আগমন
হেনকালে আইলেন বশিষ্ঠ তপোধন।
যেই ঘরে শুভকার্য্য বইসা করিবেন রাজন
বিচিত্র আলিপন দিলা যত সখিগণ।
শুভকার্য্যে মহারাজ বসিলেন সেইক্ষণ
ঘৃত দিয়া পঞ্চবাতি জ্বাইলা দিল সখিগণ।
আচমন কইরা আগে পড়িলা স্বস্তিবাচন
তীর্থ আবাহন করি করিলা অর্ঘ্য স্থাপন।
সঙ্কল্প পড়িয়া পঞ্চদেবতা দিক্‌পালগণ
একে একে ভক্তিভরে পূজিলা রাজা তখন।
(ষোড়শ মাতৃকা পূজা করি আগে সমাপন
বসুর ধারা দিতে উঠে হইয়া হরষিত মন।
মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ কইরা রাজা নিরূপণ
একে একে চৌদ্দ পুর্ষের নাম করে উচ্চারণ।"

সঙ্গীতটিতে অনুষ্ঠানের সুন্দর একটি চিত্র ফোটাইয়া তোলা হইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, কত হাজার বছরের পুরাতন কথা ইহা আমাদের স্মরণ-পথে আনিয়া দেয়! কবে কোন্ যুগে রাম-সীতার বিবাহ হইয়াছিল, হিন্দুগণ আজও তাঁহাদের পুত্র-কন্যার বিবাহে সে-কথা স্মরণ করিয়া উল্লসিত হন, সে-আদর্শে আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করেন।

[ক্রমশঃ।

কঠোপনিষদ

চিত্রিতা দেবী

দ্বিতীয় বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষংসিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥১

শ্রেয় আর প্রেয় দ্বিধাবিভক্ত পথে,
বাঁধে মানুষেরে ঘিরে।
শ্রেয়কে যে বরে, তারি কল্যাণ,
প্রেয়কে যে বরে, সে,
পরার্থ হতে বিচ্যুত হয়ে,
ভোগসুখে রয় মগ্ন ॥১

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য-বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো-যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥২

শ্রেয় আর প্রেয় একসাথে মিলে,
রহে মানবের চিতে।
ধীমান তাদের চিনিয়া জানিয়া,
পৃথক্ করেন নিজে।
ধীর যিনি, তিনি শ্রেয়রে বরিয়া লন।
অল্পবুদ্ধি, গৃহসুখ তরে,
প্রেয়রে বরণ করে ॥২

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান-
ভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥৩

প্রিয় ধন নিয়ে বার বার আমি,
তোমারে লুব্ধ করেছি;
তুমি তাহাদের দেখে শুনে,
ত্যাগ করেছ,
সুখ-সম্পদ্ ধনে-জনে ঘেরা।
যে পথে, মানুষ মজে,
তুমি নিজেই সে পথ ছেড়েছ ॥৩

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥৪

অবিদ্যা আর বিদ্যা, এ দুই চলে
বিরুদ্ধ ফলে,
তুমিই সত্য বিদ্যাভিলাষী,
ভোগে নাহি তব মন ॥৪

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৫

অবিদ্যাঘেরা অন্ধকারের মধ্যে
নিজেই থেকে,
আপনারে যে বা বড় পণ্ডিত মানে,
অন্ধচালিত অন্ধের মত,
বাঁকাচোরা পথে পথে,
কেবলি সে জন,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে ॥৫

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী

আসক্ত মন, বালকের মত,
ধনমোহে যারা মুগ্ধ,
এ দৃশ্যমান্ লোক ছাড়া যারা
আর কিছু কভু বোঝে না।
মৃত্যুর পরে কি আছে তাহার,
আভাস তারা তো পায় না।
একেই চরম ভেবে তারা তাই,
বার বার ধেয়ে আসে,
আমারি আলয়ে, আমারি অধীনে,

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥৭

বহু লোকে তাঁরে হয়ত কখনো,
শুনতেও কভু পায় না,
শোনে যারা হায়, তারাও তাঁহারে,
হয়ত বুঝিতে নারে।
বিরল সে জন, যে তাঁরে বুঝাতে পারে,
অতি সুনিপুণ কেহ বা
কখনো, তাঁহারে চিত্তে লভে ॥৭

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো
বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্
হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥৮

প্রাকৃত যে জন, শত উপদেশে,
তাঁহারে বুঝাতে নারে।
চিন্তার জাল বহুবিকল্পে তাঁহারে ধরিতে চায়,
অভেদদর্শী মুক্ত পুরুষ, যদি বলে,
তাঁর বাণী,
সব সংশয় হয় তবে অবসান।
বুদ্ধির ছল বিভিন্নরূপে প্রমাণ করিতে চায়,
তবুও তাঁহার সূক্ষ্ম মহিমা,
কখনো ধরিতে নারে।
তর্কের দ্বারা তাঁরে নাহি
পাওয়া যায় ॥৮

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৯

প্রিয়তম, তুমি যে এষণা নিয়ে এসেছ,
আমার কাছে।
সে নহে তর্কলভ্যা।
তার্কিক নয় যে আছে কেবল
শুদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডারী,
তাঁরি উপদেশে, শুধু তাঁরে জানা যায়।
তোমারি মতন জিজ্ঞাসু যেন,
আমাদের কাছে আসে ॥৯

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥১০

ফলরূপা এই ধনসম্পদ, অনিত্য তাহা জানি,
অনিত্য দিয়ে, কে পারে লভিতে ধ্রুব।
জেনে-শুনে তবু, অগ্নিসহায়ে,
এই যমপদ পেয়েছি ॥১০

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥১১

কামনার যত শ্রেষ্ঠ সে ধন,
সৎকর্ম্মের ফল,
যার তরে লোকে করে প্রার্থনা
সেই সুবিপুল প্রতিষ্ঠা।
সবার পূজ্য, সেই সুমহৎ
অভীক স্বর্গ আশা,
ধীর ভাবে দেখে করিয়াছ তুমি ত্যাগ ॥১১

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥১২

দুর্লভ আর দুর্জ্ঞেয় যিনি হৃদয়-গুহায় স্থিত
যিনি শরীরের কোষে কোষে অনুবিষ্ট।
চির-সনাতন জ্যোতির্ম্ময়েরে,
আত্মযোগের দ্বারা,
দর্শন করে, হর্ষ ও শোক
সুধী নিজে করে তুচ্ছ ॥১২

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥ ১৩

গুরুর নিকটে এ জ্ঞান শুনিয়া,
যে লভে ইহারে চিতে,
দেহাদি হইতে ইহারে পৃথক্ ক'রে,
যে দেখে ইহার আনন্দরূপ,
আত্মসত্তা মাঝে
সে মগ্ন মগ্ন চির আনন্দধামে
নচিকেতা তরে ব্রহ্মের দ্বার
মুক্ত হয়েছে জানি ॥ ১৩

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ
কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ
পশ্যসি, তদ্বদ ॥ ১৪

(নচিকেতা বললেন)
—শাস্ত্রিক আর সামাজিক,
এই যত কিছু আছে কর্ম,
আমাদের কাছে এই যত সব,
অধর্ম আর ধর্ম
এই সকলের হইতে পৃথক্,
ত্রিকাল অতীত, সেই যে পরম সত্য
চির সনাতন, সেই যারে তুমি দেখছ,
তাঁর কথা মোরে বল ॥ ১৪

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—
ওমিত্যেতৎ ॥ ১৫

(যম—)
সব বেদ মিলে, একসাথে যাঁরে,
ঘোষণা করিতে চায়,
সব তপস্যা, সব সুকর্মরাশি,
যাঁরে লভিবার পথ,
যাঁহার আশায়, দেহরে শাসন করে,
ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, ঋষি।
সকলের সেই একটিমাত্র চরম কাম্য ধন,
তাঁহারি বিষয়ে সংক্ষেপে বলি শোন,
—তিনি ওঙ্কারনামা ॥ ১৫

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো
যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ ১৬

কার্য্য এবং পরমব্রহ্ম, দুই ওঙ্কাররূপী,
যেরূপে ইচ্ছা ধ্যান করে তাঁকে,
যার যা কাম্য লভে ॥ ১৬

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং
পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে
মহীয়তে ॥ ১৭

কামনার যাহা শেষ পরিণতি,
সেও ওঙ্কার সাধনা।
সবার অতীত চির অক্ষয় অজ অমৃত ব্রহ্ম,
ইহাই তাঁহারও সাধনা
ইহারই সাধক পুজ্য ব্রহ্মলোকে ॥ ১৭

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮

সুধী—জানে তাই
ব্রহ্মের কোনো জন্ম-মৃত্যু নাই,
কোন কারণের এ নয় কার্য্য,
এ নয় কারণ নিজে,
শরীর ধ্বংস করিলেও কেহ,
ইহারে মারিতে নারে,
চিরসনাতন নিত্য-নবীন,
শাশ্বত এই সত্য ॥ ১৮

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি
ন হন্যতে ॥ ১৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্ ।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ * ॥ ২০

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো
যাতি সর্বতঃ ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো
জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্ ।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো
ন শোচতি ॥ ২২

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥২৩

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো
নাসমাহিতঃ ।
নাশান্তমানসো বাঽপি
প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥২৪

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত
ওদনঃ ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥২৫

হন্তাও হত অজ্ঞতা বশে,
মনে করে,
তারা মারছে এবং মরছে,
জানে না,
আত্মা মরে না অথবা মারে না ॥ ১৯
অণু হতে অণীয়ান্,
মহৎ হইতে মহীয়ান্,
গোপন গুহায় নিহিত রয়েছে,
জীবের আত্মপ্রাণ,
নিষ্কাম তার শুচিবুদ্ধিতে,
প্রসন্ন মনমাঝে,
বীতশোক হয়ে দেখেছে,
তাঁহার অপার মহিমা রাজে ॥ ২০
চিত্তে আসীন তবু মনোময়
বহুধা ধাবিত মন,
শায়িত জনের স্বপ্ন-মাঝারে,
বিচিত্র গতি লন,
দুঃখ ও সুখ এক সাথে মাখা,
স্বয়ং স্বপ্রকাশ,
অবিনাশী সেই আত্মারে আর
মোরা ছাড়া কেবা জানবে ॥ ২১
শরীর-মাঝারে, অশরীরী
সেই আত্মা,
বিনাশধর্মী জগতের মাঝে
সেই তো নিত্যরূপা ।
সব চরাচর ব্যাপ্ত মহৎ,
সেই সুবিপুল সত্য,
আপনার মাঝে দেখিয়া, জানিয়া,
ধীর হন শোকমুক্ত ॥ ২২
প্রবচন আর শ্রবণ অথবা
কেবল মেধার বলে ।
তাঁরে নাহি পাওয়া যায়,
তিনি যাঁরে নিজে আপনি বরিয়া লন ।
তারি কাছে তাঁর স্বরূপ মুক্ত হয় ।
ধন্য সে জন তাঁরে অন্তরে লভে ॥২৩
পাপাচারী, যে বা ইন্দ্রিয়ভোগলুব্ধ ।
একাগ্র নয় চিত্ত যাহার ।
ফলকামনায় চঞ্চল,
কোন জ্ঞান দ্বারা সে তাঁরে
লভিতে নারে ॥২৪
ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় আদি
সকলে যাঁহার খাদ্য ।
মৃত্যু মাত্র কেবল উপকরণ
কে আর তাঁহারে এরূপে জানিতে
পারে ॥২৫ [ক্রমশঃ

* অকাম ব্যক্তির ধাতু অর্থাৎ দেহধারণকারী মন প্রভৃতি করণ-বর্গ নির্মল হয় । কামনারাহিত্য হেতু সেই প্রসন্ন নির্মল অন্তঃকরণে, সেই অণুতম মহত্তমের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় ।

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষাব্রতী

নতুন শহরে কেউ ওকে চেনে না। একলা বসে মার্গারেট ওর বিচ্ছেদ-বেদনার কথা ভাবে। ও আবার পড়াশোনা আরম্ভ করল। সেই সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পাওয়ার একটি তাগিদ অনুভব করল মনে। ঠিক করে ফেলল, মাকে আর চাকরি করতে দেবে না। তাঁকে ওর কাছে আসবার জন্য ডেকে পাঠাল মার্গারেট।

ঝুঁকিটা বড় কম নয়! ভরসার কথা এই, এক বছরের বেশী হল মে-ও টিচারি করছে, মার্গারেট তার সাহায্য পাবে। খানকয়েক চিঠি লেখালেখির পর মাস তিনেকের মধ্যেই মেরী নোবল লিভারপুলে চলে এলেন। মে ওখানে কাজ করে, তাই রিচমণ্ড পড়ে লিভারপুল কলেজে। মাত্র বারো মাইল পাড়ি দিলেই সপ্তাহে দুটি দিন মা-বোনের সঙ্গে কাটাতে পারে মার্গারেট। কত দিন পর সবাই আবার একত্র হল!

শিক্ষয়িত্রী হিসাবে চারটি বছর কেটে গেছে। পঞ্চম বছরে মার্গারেটের মনে অন্যান্য শিক্ষাপদ্ধতির সম্পর্কে কৌতূহল জাগলো। তাইতে পেষ্টালোটসি আর ফ্রোবেলের কথা ও জানতে পারল। সুইজারল্যাণ্ডে পেষ্টালোটসি (১৮ শ শতাব্দী) আর জার্মেনিতে ফ্রোবেল (১৯ শ শতাব্দী) শিশু মনস্তত্ত্বকে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। এঁরাই শিল্প-বিজ্ঞানে 'প্রগতিবাদে'র জনক; ওর সামনে জাগল যেন একটা নতুন জগৎ। নব শিক্ষার এই দুই বিখ্যাত পুরোধা ওকে যেন পথ দেখিয়ে দিলেন। এত দিন বৃথাই বয়স্ক ছাত্রীদের নিয়ে যে-চেষ্টা ও করছিল, আসলে তা সফল হতে পারে যদি কচি-কচি ছেলে-মেয়েদের উপর প্রয়োগ করলে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষটা ভাল করে লক্ষ্য করা যায়। এ-বিষয়ে ওর সহযোগিতা করতে পারে, আশে-পাশে এমনতর শিক্ষাব্রতীদের খুঁজে বার না করা পর্যন্ত ওর সোয়াস্তি নাই। যে কয় জন ইংরেজ শিক্ষায় এই নববিধান চালু করেছেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করে ও তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা-পদ্ধতিগুলো মিলিয়ে দেখে যাচাই করবার কাজে মার্গারেট নেমে পড়ল। ওর সমীক্ষার প্রথম বিষয় হল শিশুর বাল্যজীবন। কেমন করে সে-জীবন ফুটে উঠছে, কী তাদের মনের দ্বন্দ্ব, ইস্কুলে বা বাড়িতে তাদের বুদ্ধির ঝোঁক কোন দিকে—ওইগুলো ও লক্ষ্য করে। লিভারপুলে আরও জনকয়েক এ-বিষয়ে অনুরাগী পণ্ডিতকে ও খুঁজে বার করল, তাঁরা ভয়ে ভয়ে এই নতুন পদ্ধতিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। এই ভাবে লজম্যানদের সঙ্গে ওর জানাশোনা হল, তাঁদের মারফতে বেশ কিছু দিন পর আলাপ হল মিসেস ডিঃ লীউএর সঙ্গে। এই ডাচ মহিলা ছিলেন ফ্রোবেলের শিষ্যা।

নতুন শিক্ষাপদ্ধতির সন্ধান পেয়ে মার্গারেট আত্মবিশ্লেষণ শুরু করে দিল। ওর শিশু-মনের প্রথম উন্মায় কী সব ভাব জাগত, স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে তা ও বার করতে চায়।···হ্যালিফাক্সের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে পাপের ভয়···আয়র্ল্যাণ্ডের কথায় মনে জাগে দুঃসাহসী কত কল্পনার ছবি ···সেই সঙ্গে মনে পড়ে বাবার কথা, তাঁর সেই অদম্য তেজ। পিছন পানে তাকিয়ে নতুন করে মার্গারেট আবিষ্কার করে—শৈশবের অকারণ অশ্রুতে স্নেহ পাওয়ার কী অবুঝ আকাঙ্ক্ষা ওর, ওর কত গোপন দুর্বলতা, আবার হঠাৎ-উছলে-ওঠা উৎসাহ···সবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখন। এমনি করে নিজেকে পরখ করার ফলে জানতে বাকী রইল না ওর অন্তরে অন্তরে যে স্বাধীনতার দাবি তার স্বরূপ কী। এ-জিনিসটির কতখানি দাম, তা এ-যাবৎ ও কষে দেখেনি। এবার বুঝল, ওর সমস্ত সত্তা ঐ মুক্তির আলোতেই ভাস্বর। ওর চার পাশে মা-বোন বা পঠন-পাঠন নিয়ে যে-পরিবেশটি ও গড়ে তুলেছে তার সবখানিই ঐ মুক্ত প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরা। নতুন করে মনের ভারসাম্য যেন ও ফিরে পেল।

শুধু লজ্‌ম্যানদের সঙ্গেই ওর এই সব কথা প্রাণ খুলে আলোচনা করা চলে। আর বলা চলে বোনটিকে,—এ-সব অভিজ্ঞতা শোনবার আগ্রহ জেগেছে তার।···লজ্‌ম্যানরা অক্লান্ত কর্মী, তাঁরা তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতিকে পরখ করবার জন্য নিজেদের ফ্ল্যাটেই একটা ছোট্ট ক্লাস খুলে বসেছেন। অবসর সময়ে মার্গারেট ওখানেই প্রথম প্রথম ফ্রোবেল পদ্ধতি যাচাই করে দেখত কচি-কচি কতগুলি বাচ্চা নিয়ে। এইখানেই অনেক তরুণ লেখকের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়, তাঁরা ভাবে-চিন্তায় ভাবীকালের অগ্রদূত। দেখতে দেখতে এঁদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব জমে গেল, তাঁরা মার্গারেটকে নিয়ে গেলেন তাঁদের 'গুড সানডে ক্লাবে'। এক দল নাগরিক ওখানকার নৈষ্ঠিক সভ্য; তাঁদের দাবী মত ক্লাবের প্রকাণ্ড হলে কোনও সুচিন্তিত বিষয়ে ভাষণ দেওয়া হয়, হয়তো কোনও লেখকের অপ্রকাশিত রচনা হতে কিছু পড়ে শোনান হয়। মার্গারেট আর মে ক্লাবের উৎসাহী সভ্য হয়ে উঠল। ক্লাবে যেতে অনেকটা পথ। ওরা কিন্তু হাত-ধরাধরি করে ঝড়-জলের দাপট হাসির হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে জোর-কদমে এই পথটা পাড়ি দেয়, পা ফেলার তালে তাল মিলিয়ে পালা করে দুজনে কবিতা আবৃত্তি করে চলে। এমনি করে বাসের যে পয়সাটা বাঁচে, তাই দিয়ে একটা চায়ের জমাট আসর বসায়। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে সাহিত্যালোচনা চলে।

এই তরুণ লেখক-গোষ্ঠীর উৎসাহে মার্গারেট আবার কলম ধরল; যদি তাঁদের কাজে লাগে, এই ভেবে ওদের পারিবারিক ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাগুলোর বিবরণ লিখতে শুরু করল। একটার পর একটা ঘটনা মনে করতে গিয়ে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ওর কল্পনা যেন উদ্দাম হয়ে চলে যায় আয়র্ল্যাণ্ডে, নিজেকে মনে হয় তারই একটা প্রত্যঙ্গ। এ-বিষয়ে মা ওকে উৎসাহ দিতেন খুব, মেয়ের লেখার ক্ষমতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। নোবল, নীলান, হ্যামিল্টন আর মারড়ফদের কথা মনে করতে গিয়ে তাঁর পুরানো

দিনের আবেগ প্রাণ পেয়ে আবার বেঁচে ওঠে। মার্গারেট তাঁকে কেবলই প্রশ্ন করে,…'আমার দিদিমা কেমন ছিলেন? তাঁর কথা বল…।' মা বলেন,—'ওঃ! তিনি ছিলেন দুরন্ত মেয়ে, কোনও বিপদকে বিপদ বলে গণ্যই করতেন না।…যখন নেহাৎ ছোটটি, তাঁর বাবা তাঁকে চৌমাথার মোড়ে পাহারায় রেখে গেছেন এক দল বিদ্রোহীর পিছু-পিছু ধাওয়া করতে। একটুও কিন্তু ভয় পাননি তিনি…'

'এলিজাবেথ নীলাস' নাম দিয়ে এই গল্পগুলি লিখত মার্গারেট… পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এরই মধ্যে একটা নিবিড় একাত্মতা বোধ করত ও। আগ্রহী শ্রোতাদের সামনে এক রবিবার দুটি গল্প ও পড়ল। এই ওর প্রথম রসোত্তীর্ণ রচনা। বাড়ির সবাই, লজ্‌ম্যানরা আর অন্যান্য বন্ধুরা এই উপলক্ষ্যে একসঙ্গে জড়ো হয়েছিলেন।

সার্থক কর্মে পুরো দুটি বছর কাটল। এক দিন মিসেস ডি-লীউ জিজ্ঞেস করলেন, লণ্ডনে নতুন ধরণের একটা স্কুল খোলায় মার্গারেট তাঁকে সাহায্য করবে কি না। ওর জীবনে এ একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ, এই সূত্র ধরে কত অফুরন্ত কাজের সম্ভাবনা দেখা দেবে! মার্গারেট এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না; মিসেস ডি-লীউ আগে লণ্ডনে গেলেন, ইতিমধ্যে ও চেষ্টারে ওর কাজের মেয়াদটুকু শেষ করল। মে-ও তার চাকরি ছেড়ে দিল। ওদিকে রিচমণ্ড আর বেট ট্রাঙ্ক-স্যুটকেশ গোছাতে লেগে গেল যাত্রার আয়োজনে। মেরী ভগবানকে মনে-মনে ডাকেন…'মেয়ে যেন তাঁর বিজয়িনী হয় নতুন কাজে।' তার পর এক দিন সবাই মার্গারেটের পিছু-পিছু মহানন্দে লিভারপুল ছেড়ে চলল।

উইম্বল্‌ডনের ছোট্ট স্কুলটি হল মার্গারেটের নিত্যকারের আনন্দের খোরাক। জীবনে এই প্রথম এমন কাজ পেল, যার মাঝে নিজেকে ও ফুটিয়ে তুলতে পারে। বলতে গেলে ও যেন একেবারে বদলে গেল। কর্মজীবনে এগিয়ে যেতে-যেতে যে-সব বিধি-নিষেধের ছোঁয়াচ ওর স্বভাবে লেগেছে, সেগুলো ও একেবারে ঝেড়ে ফেলল। এত কাল ভবিষ্যুক্ত মাষ্টারণী সেজে ছাত্রীদের পুঁথিগত বিদ্যা গেলানোই ছিল ওর কর্তব্য; তার বদলে ও আজ হয়েছে সত্যিকারের শিক্ষয়িত্রী, শিশুদের ও হাত ধরে পায়ে-পায়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিত্য-নতুন বিস্ময়ে-ভরা এই জগতের মাঝখানে। নবীন আশা আর বিশ্বাসে ঝলমল এই শিশুপ্রাণগুলিকে গড়ে তোলাই আজ মার্গারেটের ব্রত।

পঞ্চাশটি কি তারও বেশী ছেলে-মেয়ে…চার থেকে ছয়ের মধ্যে হবে বয়স…ওর চার পাশে খেলে বেড়ায়, অন্তরের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ওদের কোরক-সত্তা দল মেলে ওদের চাল-চলনে। বিধি-নিষেধের বাঁধনে ওরা বাঁধা নয়, তাই মুক্তির আনন্দে ঝলমলে ওরা, সরল আর প্রাণচঞ্চল। এখানকার নরম মাটিতে, আত্মশাসনের উপযুক্ত বিধান সংস্কার বশে ওরা আপনিই গড়ে নেয়।

এমন খেলা বাতলিয়ে দেয় মার্গারেট যে, যারা চটপটে তারা মিনমিনেগুলোকেও ধরে আনে খেলতে, এমন সব গল্প বলে যে, সবচাইতে বেয়াড়া ছেলেগুলোও মন দিয়ে না শুনে পারে না। মার্গারেট লক্ষ্য করে কারও মাঝে আছে স্থপতির সহজ সংস্কার,—হাতের কাছে যা পায়, কাঠি, পাথর, মাটির ডেলা কি ডালপালা, তাই দিয়ে কিছু গড়ে তুলছে; কারও ঝোঁক গণিতে,—সংখ্যা জানে না তবু মাপজোখ আর হিসাব নিয়েই আছে; আবার কেউ ভাবুক আর কল্পনাবিলাসী—পাখির গানে বা ফুলের শোভায় তাদের মনে দোলা লাগে। নতুন যেটুকু যে আবিষ্কার করছে, তাই দিয়েই তার মন বাঁধবার মন্ত্র জানে মার্গারেট। নিজেকেও ওদেরই এক জন করে তোলে, তার পর অজান্তে জীবনের যে সূত্র ধরেছে, তার হাতে তা গুছিয়ে তুলে দেয়।…শিশুরা বিজয়-গর্বে বেপরোয়া হয়ে এগিয়ে চলেছে, যেন এক-একজন এক-একটি ধুরন্ধর; আরেকটি কুশলী হাত যে অলক্ষ্যে তাদের চালিয়ে নিচ্ছে, সেটা ঘুণাক্ষরেও তারা বুঝতে পারছে না।

স্কুলের কাজে খুব বেশী সময় যায় না। কাজেই মার্গারেট পড়াশোনায় মন দিল, আর লণ্ডনে 'আধুনিক শিক্ষা সমিতি'র প্রধান কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগ রেখে চলল। ওদের সম্মেলনগুলিতে প্রায়ই মার্গারেট কিছু-না-কিছু বলত। ওর মূল বক্তব্য, শিশু যাতে নিঃসঙ্কোচে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, তার জন্য তাকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে। ওর মতে শিশুর সবচাইতে বড় শত্রু হচ্ছে অতিবৎসল বাপ-মা—সন্তানকে যাঁরা আঁচলে গেরো দিয়ে রাখতে চান; আর শত্রু তাদের প্রথম শিক্ষকেরা, যারা শিশুর স্বভাবের ঝোঁক কোন্ দিকে তা বোঝবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে নিজের মন-গড়া জীবনাদর্শ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। ওর মতামতগুলো কিছু ঝাঁঝালো। কিন্তু সেগুলো যে প্রামাণিক এমন দাবী ও সহজে করত না…অনেক দিন ধরে তন্ন-তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখার পর তবেই ও কোনও একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করত। কাজেই সেগুলো হত ওজনে-ভারী খাঁটি জিনিস, শুধু ফাঁকা আওয়াজ নয়!

মার্গারেটের ল্যাবরেটরি ওর ক্লাস-ঘরে। কিন্তু লেখাপড়ার জন্য যে নির্জন নিরিবিলি পরিবেশটি দরকার, সেটি মেলে বাড়িতে। ওর নিজের ঘরে জানলার ধারটিতে ডেস্ক আর বইগুলি যত্ন করে সাজিয়েছে।…মা আর মে ওর এই স্বাচ্ছন্দ্যকে একটুও খণ্ডিত করতে চায় না, কিন্তু দিদির অবসরকালটুকুর 'পরে রিচমণ্ডের নির্বিবাদ দাবী আটকায় কে? কাজেই ছুটি থাকলেই দিদিকে পাকড়ে ভাইটি রাজধানীর বুকে একটা লম্বা চক্কর দিয়ে আসে, আর যদি 'হেন্‌রী দি এইট্‌থ'-এ আর্ভিং-কে বা 'টুএল্‌ফ্‌থ নাইট'-এ ভায়োলার ভূমিকায় এ্যাডা রেহান-কে দেখা গেল তো আরও ভালো। দিদি বড় ভাব-বিলাসী বলে রিচমণ্ড মাঝে-মাঝে খোঁচা দিত (১)। অবশ্য এর মূলে ছিল শিক্ষাজীবন এবং সমসাময়িক সাহিত্যের প্রভাব। অথচ এই ভাবুক দিদিটির কল্যাণেই কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সেই শেক্সপীয়রের সমস্ত নাট্যাংশ ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, দুজনে পালা করে ওগুলো আবৃত্তি করে যেত সময়-সময়। বছরের পর বছর গ্রীষ্মের সারা ছুটিটা ওকে কমেডি ও হিষ্ট্রির গল্পগুলো মুখে-মুখে শোনাত মার্গারেট। দাদু হ্যামিল্টন যদি নিউ টেষ্টামেন্ট বা বুক্ অব এক্লেজিয়াষ্টস্ পড়তে দিলেন ওকে, দিদি দিল হ্যামলেট আর জুলিয়াস সিজার। গ্যালারিতে ঠেসাঠেসি করে বসে আত্মহারা হয়ে যায় দুজন, অভিনয় দেখতে দেখতে, বিরামের সময়টা দুজনে শেক্সপীয়রের আলোচনা শুরু করে;

(১) কথাটা কিন্তু সত্যি; পরবর্তী কালেও সিষ্টার নিবেদিতার কথায়-কাজে সব-কিছুতেই একটা করুণরসাশ্রিত নাটকীয় আবেগ ফুটে উঠত। তাঁকে ঠিক-ঠিক বুঝতে হলে এটা খেয়াল না করলে চলবে না।

মার্গারেটের পছন্দ 'ম্যাকবেথ' কিংবা 'কিং লীয়র'; রিচমণ্ডের ভাল লাগে' টুএলফথ্ নাইট। ফরাসী সমালোচকদের শেক্সপীয়র-যুগের গুরু-গম্ভীর সমালোচনা ও গোগ্রাসে গিলত যেন। কোন্ ছবি দেখতে হবে সেটা নির্বাচনের পালা এক-এক বার এক-এক জনের, তবে শেক্সপীয়রের কোনও নাটকই ওরা বাদ দিত না।

লিভারপুলের বন্ধুদের মারফৎ বাঁটিদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে মার্গারেটের আলাপ। ওর অবসর বিনোদনের আরেকটা উপায় এদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা (২)। এই আইরিশ তরুণ দুটি যেন ওর সহোদর, এমনি একটা অনাবিল প্রীতি ছিল ওদের মধ্যে। মার্গারেট বড়টির নাম দিয়েছিল 'কবি'। টমাস হার্ডি তখন 'জুড দি অবস্কিওর লিখেছেন; বাজারে তা নিয়ে সমালোচনার অন্ত নাই বটে, তবুও তিনি তখন খ্যাতির চূড়ায়। তাঁকে কেন্দ্র করে জনকয়েক ঔপন্যাসিকের ছোট্ট একটা দল গড়ে উঠেছে। 'কবি' ওকে সেই দলের মক্ষিরাণী করে তুললেন। ছোট ভাই অক্‌টেভিয়াস্ ছিলেন সাংবাদিক, 'উইম্বলডন নিউজে'র সম্পাদক। পত্রিকাটি ইংল্যাণ্ডে ইতস্তত: ছড়ানো আইরিশ সমিতিগুলির মুখপত্র। অক্‌টেভিয়াস তাঁর পত্রিকায় মার্গারেটের লেখা বুয়র-যুদ্ধ-সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন।···এই সব প্রবন্ধে ওর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারে নতুন। তাছাড়া 'ডেলী নিউজ' এবং 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকাতেও ও মাঝে-মাঝে লিখত রাজনীতি নিয়ে। এই উপলক্ষ্যে সম্পাদক ষ্টেড সাহেবের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়। বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা 'রিসার্চে'ও ওর প্রবন্ধ ছাপা হত। লণ্ডনে আসার কয়েক হপ্তা পরেই 'ফ্রী আয়র্লাণ্ড' নামে বিদ্রোহী সম্প্রদায়ে ও যোগ দেয়। এরা তখন হোমরুলের জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে। মাস দুই পরে এদের সান্ধ্য-সমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে ও বক্তৃতা শুরু করল, আর সেই সঙ্গে দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে বিদ্রোহ-কেন্দ্র সংগঠন করতে লেগে গেল।

এক দিন বিকালে প্রিন্স পিটার ক্রপট্‌কিন এলেন ওদের সঙ্গে আলাপ করতে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা মার্গারেটের অনেক দিনের। স্বদেশ হতে নির্বাসন-দণ্ড পাওয়াতেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র, তার উপর বহু বৎসর কারাবাস করেছেন উনি। মানুষটি নম্রস্বভাব, নির্লিপ্ত গোছের। কিন্তু বিদ্রোহীদের উপর তাঁর অসম্ভব প্রভাব। তাঁর বিপ্লববাদ নিছক আদর্শ-বিলাস নয়; যারা তাঁকে মেনে চলত, তাদের নির্বিচার বিশ্বাসে বহু বিধি-বিধানও গ্রহণ করতে হত তাঁর কাছ থেকে। যথার্থ নেতৃত্বের আদর্শ আশ্চর্য ভাবে রূপ পেয়েছিল তাঁর মধ্যে। যে-কোনও সমস্যাকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, আর সেই সঙ্গে অনুচরদের মনে তার 'পরে পূর্ণ বিশ্বাসের ভাবটি জাগিয়ে তোলার সামর্থ্য তাঁর ছিল। নেতার যদি এ-শক্তি না থাকে তাহলে দলের লোকেরা নেতাকে দু-পায়ে মাড়িয়ে যে-যার ব্যক্তিগত ঈপ্সাকেই সফল করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, ফলে যে-কোনও আদর্শের সমাধি ঘটে। মার্গারেট তাঁর মাঝে যেন নিজের বাপকে ফিরে পেল। কাজ শুরু করবার আগেই বাবা চলে গেছেন, আজ তাঁর কর্তব্য ও সম্পূর্ণ করবে। ক্রপট্‌কিনের সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা দরকার।···

একবার যাওয়ার পর, প্রায়ই ও ইলিংএ যেতে শুরু করল। লণ্ডনের শহরতলীতে যে-সব শিল্পাঞ্চল, তারই একটা হতভাগা শহর ওই ছোট্ট ইলিং। ক্রপট্‌কিন সস্ত্রীক ওখানে থাকতেন। এক টুকরো পোড়ো বাগানের মধ্যে তাঁদের বাড়ি, অসাধারণ কিছুই নাই। খাওয়ার ঘরে জীর্ণ অয়েলক্লথ-মোড়া টেবিলটিই ক্রপট্‌কিনের ডেস্ক।···ওই স্বল্পোত্তপ্ত ঠাণ্ডা ঘরে বসেই এই নির্বাসিত বিদ্রোহীর যত কিছু লেখাপড়া। ১৮৯৫ সনের দারুণ শীত, ইংল্যাণ্ড তখন একটা কঠিন আর্থনীতিক সঙ্কটের মাঝে। শত-শত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, হাজারে-হাজারে শ্রমিক তাদের ক্ষুধার অন্ন দাবী করে বিরাট শোভাযাত্রায় জড়ো হয়েছে। তারা আবেদন করে ক্রপট্‌কিনের কাছে, তাঁর সাহায্য চায়। ওদিকে ঠিক তখনই পুঁজিবাদীরা তাঁর পরামর্শ চাইছেন কী-কী সুযোগ-সুবিধা দিলে সংঘাতটা আর প্রচণ্ড না হয়। এ-আন্দোলনের সঙ্গে ক্রপট্‌কিনের পূর্বাপর যোগ রয়েছে, তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে তিনি খেটে চলেন। অসাধারণ কর্মক্ষম মানুষ—যদিও তিপ্পান্ন বছরেই তাঁকে বুড়ো মনে হত দেখলে। স্বদেশের কথা উঠলে সব সময়ে বলতেন, 'রাশিয়া তোমাদের কাছে হবে তথ্যবহুল গবেষণার বস্তু শুধু; কেন না, লক্ষ্য এক হলেও স্বাধীনতার যাত্রাপথ সকলের এক নয়। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক জাতি নিজস্ব প্রেরণা নিয়ে আলাদা-আলাদা পথ কেটে চলে, এতেই তাদের ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়। স্বাভাবিক বিবর্তনই যখন দ্রুততর গতিতে ঘটে, তাকে বলে বিপ্লব। ওটা ভুঁইফোঁড় কিছু নয় একথা ভুললে চলবে না।' তাঁর মুখের এই কথাগুলো নিয়েই মার্গারেট সাধারণত: ওর আইরিশ বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করত। ক্রপট্‌কিন ছিলেন এ বিষয়ে তার গুরু।

১৮৯৫ এর শেষাশেষি মিসেস ডি-লীউএর সঙ্গে মার্গারেটের ছাড়াছাড়ি হল (৩)। উইম্বলডনের আরেক অঞ্চলে মার্গারেট 'রাস্কিন স্কুল' খুলল। এটি শুধু শিশুদের জন্য নয়, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে চান, তেমন বয়স্কদেরও এখানে প্রবেশাধিকার রইল। স্কুলটার নাম হয়ে গেল অল্প দিনেই। বহু নামজাদা শিক্ষকের সহযোগিতা পেল মার্গারেট···এঁদের মধ্যে ছিলেন এবেনজার কুক্। শিশুদের ছবি-আঁকিয়ে ছিলেন তিনি, লণ্ডনে তখন তাঁর খুব নাম-ডাক। কুক্ বলতেন, 'শিশুরা হল সহজ-শিল্পী'। ওরা নিজেরা এ-বিষয়ে সচেতন নয় বটে, কিন্তু লিখতে-পড়তে শেখানোরও আগে ওদের রং আর রেখার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত।' মিঃ কুক্ এ নিয়ে তখন গবেষণা করছেন। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে লোকের আগ্রহের অন্ত ছিল না। এ নিয়ে বহু আলোচনাও চলছিল বিদগ্ধ-সমাজে। তাঁর কাছেই মার্গারেটের চিত্রবিজ্ঞানে দীক্ষা হয়েছিল।

---

(২) রিচমণ্ড নোবল্ একটা চিঠিতে লিখেছেন···'অল্প বয়সে দিদির বিদগ্ধ-সমাজের প্রতি একটা অনুরাগ ছিল। যেখানে যাবে সেইখানেই একটা-না-একটা সাহিত্য-সভা জমে উঠবে।'

(৩) ১৮৯৯ সনে চিকাগোতে আবার তাঁর সঙ্গে মার্গারেটের দেখা হয়। মার্গারেট তখন তাঁকে তার সঙ্গে ভারতবর্ষে যেতে বলে—নতুন ধরণের একটা আদর্শ বিদ্যালয় খোলবার জন্য।

সেই জোরেই পরবর্তী কালে ছবির বিষয়বস্তুর নিরিখ ও সমাবেশ নিয়ে হিন্দু চিত্র-শিল্পীদের সঙ্গে নানা কথা বলা সম্ভব হয়েছিল।

লেডি রিপন মিঃ কুকের এক জন বন্ধু। মার্গারেটের কথা মিঃ কুক্এর কাছে বলার পর তাঁরই মারফৎ ওদের আলাপ হয়। লেডি রিপনের 'সেলুনে' মার্গারেটের আসা-যাওয়া শুরু হল। ওখানে শিল্প ও সাহিত্য আলোচনা হত নিয়মিত। প্রথমে আসরটি ছিল নেহাৎ ছোট; কিন্তু 'সেণ্ট জেমস্ গেজেটে'র সম্পাদক আর ম্যাক্‌নীল আর মার্গারেটের চেষ্টায় অল্প দিনেই ওটি বিখ্যাত 'সিসেম ক্লাবে' পরিণত হল। ডোভার ষ্ট্রীটের স্বনামধন্য পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত এই সাহিত্য-সমিতির ভবিষ্যৎ-গরিমা সম্বন্ধে কারও সংশয় ছিল না। বার্ণাড-শ, হাক্সলী প্রমুখ নামজাদা লেখক ও বৈজ্ঞানিকরা এখানকার চা ও ভোজের নিয়মিত আসরে উৎসাহ ভরে যোগ দিতেন। এমনই এক সম্মেলনে মার্গারেটের দেখা হয় লেডি ইসাবেল মার্গসনের সঙ্গে। তাঁরও শিশু-শিক্ষার নানা সমস্যা সম্বন্ধে খুব আগ্রহ।

'সিসেম ক্লাবে'র যত কীর্তি-কলাপের মূলে ছিল মার্গারেটের হাত, ও ছিল ক্লাবের বক্তা এবং সেক্রেটারি। বক্তৃতার বিষয় হত 'শিশু-মনস্তত্ত্ব'—আর 'নারীর অধিকার।' আর ম্যাকনীল ওকে যত দূর পারেন সাহায্য করতেন। তিনিও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের লোক, আলষ্টারের কর্মী। তবে ম্যাক্‌নীল ছিলেন গোঁড়া ইউনিয়নিষ্ট, কাজেই রাজনীতির দিক থেকে মার্গারেটের বিরোধী পক্ষ। মার্গারেট ছিল তখনকার দিনের আইরিশ জাতীয়তাবাদী। বন্ধুদের চকিত করে মাঝে-মাঝে রাজনীতি নিয়ে দুজনের তুমুল তর্ক বেধে যেত। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে তর্কাতর্কি করলেও কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না তাদের মধ্যে। ঝগড়ার সময় ওদের লক্ষ্য থাকত তর্কের বিষয়বস্তুর 'পরে; সুতরাং এই নৈর্ব্যক্তিক উত্তেজনার পর কাণ্ডটা মনে করে দুজনেরই হাসাহাসি করতে বাধত না। প্রকাশ্যে একটা ভীষণ বাগযুদ্ধের দুদিন পর মার্গারেটের এক ভাষণে ম্যাক্‌নীল সভাপতি হয়ে ওর পক্ষ-সমর্থনে গলদ্‌ঘর্ম হলেন!

ওই বয়সেই মার্গারেট বিজয়িনী হয়েছে সব ক্ষেত্রে—স্কুলে, সমাজ-জীবনে ওর প্রতিষ্ঠার অন্ত নাই, ওর বন্ধু-সৌভাগ্যে সকলেরই ঈর্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু অন্তরের নিভৃতে নির্মম পরাজয়ের বেদনা ওকে বইতে হল। আঠারোটি মাস কেটেছে প্রেমের স্বপ্নে। মনে-মনে সুখের নীড়টি রচেছে কত সন্তর্পণে। ভাগ্যকে বিশ্বাস নাই, তাই প্রথমটায় ছিল ভীরু হৃদয়ের দুরু-দুরু। তার পর উদ্বেল বিশ্বাস আর বিপুল নির্ভরতায় ভাবী সুখকে ও নিশ্চিন্ত বলেই আঁকড়ে ধরেছিল। মেরী তাঁর এই নতুন সন্তানটিকে সংসারে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য তৈরী হলেন। ভবিষ্যতের জন্য কত না প্রস্তুতি, কত না কল্পনা! বিয়ের দিনটি পর্য্যন্ত প্রায় ঠিক। এমন সময় এল অতর্কিত বজ্রাঘাত। মার্গারেটের চেয়েও প্রবলতর দাবি নিয়ে এগিয়ে এল আরেকটি মেয়ে।

বাইরে অক্ষুণ্ণ আত্মগর্বে মার্গারেট এ পরাজয় মেনে নিল, কিন্তু অন্তর বেদনায় অসাড় হয়ে গেল। আবার যেন ওর জীবন ছিন্নসূত্র একখানি মালার মত বিস্রস্ত হয়ে গেল, সুখের স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হল নিয়তির নিঃশব্দ আঘাতে। ঘর বাঁধার আশা আর তো রইল না জীবনে,—সন্তানের জননী সে হবে না, পাবে না মনের কথার কোনও দোসর, হাতে হাত রেখে দেবতার কাছে প্রার্থনা করবে একসঙ্গে—এমন সাথী তার মিলবে না। নিজেকে কী ভয়ানক একা যে লাগে! হঠাৎ মনে পড়ে যায়—হ্যালিফাক্সের মিস কলিন্সের কথা। তাঁর তপস্বিনীর কালো পোষাকের তলায় লুকানো আছে—স্নেহ-করুণ একখানি কোমল হৃদয়। মার্গারেট চলে গেল হ্যালিফাক্সে··· মিস কলিন্স পুরো একটি সপ্তাহ ওকে নিজের কাছে রাখলেন। সব লজ্জা ভুলে তাঁর বুকে মার্গারেট তার নষ্ট নীড়ের তরে আকুল হয়ে কাঁদল, শিশুর মত নালিশ জানাল। মনের মাঝে প্রথম ফুঁসে উঠল একটা বিদ্রোহ; তার পর ও মাথা পেতে সব মেনে নিল, আবার আত্মস্থ হল।

মনের শান্তি ফিরে পেয়ে মার্গারেট লণ্ডনে ফিরে এল। বান্ধবী বলেছেন, 'এই গভীর আঘাতে অন্তরে জ্যোতির উৎস খুলে যাবে, চিত্ত প্রশান্ত হলেই সেই দিব্যজ্যোতির অনির্বচনীয় প্রসাদ সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে তুমি!'

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম সাক্ষাৎ

যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে মার্গারেট ওর কাজ-কর্ম আরম্ভ করল।

আশে-পাশে যারা আছে তারা কেউ সন্দেহ মাত্র করতে পারল না যে, অধ্যাত্ম-জীবনে হঠাৎ ও কী ভয়ানক নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে! ঈশ্বর-নির্ভরতা ওর একান্ত প্রয়োজন যখন, ঠিক তখনই ও তা হতে বঞ্চিত হল। মনে যে স্নিগ্ধ, অটল আশ্বাসের ভাবটি অনুভব করত আগে, এখন তার জায়গায় এল একটা নির্মম কঠিন সঙ্কল্প···যেমন করে হ'ক, সত্য লাভ করতেই হবে। কিন্তু সে সত্যের স্বরূপ কী? মার্গারেট অত দুর্বল নয় যে, আধ্যাত্মিক নির্বেদে ও বেশী দিন ডুবে থাকবে। অবশ্য ওর শ্রান্ত আকূতিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এমন কোনও উপায়ও আপাততঃ হাতের কাছে নাই। তবু হা-হুতাশ করা ওর ধাত নয়। এমনটি আর একবারও হয়েছে। জীবনটা যেন অনিশ্চয়তার আবছায়াতে কেটেছে। এখনও তেমনি করেই দিনগুলো ও দুহাতে ঠেলে চলে, ওর বিশ্বাসের জোর আর প্রতিদিনের বাস্তব-জীবন—দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য নাই যেন। তবু দিন কাটে, ও মেনে নেয় সব কিছু। জীবনের যেটা বহিরঙ্গ—সেখানে ওর কাজ-কর্ম, সামাজিক লেন-দেন, রাজনৈতিক বন্ধুদের সান্নিধ্য···এই ২৯ বছর বয়সে যা ও পেয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট গর্ব করা চলে। কিন্তু অন্তরের শূন্যতা যে ভরবার নয়, রিক্ত হৃদয়ে এক অশ্রান্ত হাহাকার, 'শূন্য মন্দির মোর'!

অথচ, ধর্ম ছাড়া মার্গারেট বাঁচতে পারে না, ও-যে তার চাই-ই! এ আকাঙ্ক্ষা ওর সহজাত, জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই যে হ্যালিফাক্সে ওর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, 'কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ' আজ পর্য্যন্ত তার মনোমত উত্তর কারও কাছে পায়নি। ওর সকল জিজ্ঞাসার মূলে ঐ প্রশ্নই বড় হয়ে রয়েছে আজও। ঈশ্বর আছেন কি নাই, সে-রহস্যের এই তো কুঞ্চিকা। মার্গারেটের সহজ বুদ্ধিতে এ নিয়ে কোনও সংশয় নাই(৪)। কিন্তু পরমপুরুষের বিধানে আর

(৪) দু'বছর পরে এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে লণ্ডনে নিবেদিতা শ্রোতাদের ভাগবত থেকে শুনিয়েছিলেন, 'যিনি এই

মানুষের আইনে আপোষ রফা করতে গিয়ে এবং চার্চ আর সমাজের অগুণতি জোড়াতালিতে ধর্মের যে বিকার সৃষ্টি হয়েছে, বাস্তব-জীবনে তাতে ওর সে-বিশ্বাস কেবলই নাড়া খায়। ও নিজেও সমাজের এক জন, তাকে তো এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু নিজের কাছে নিজে ও খাঁটি থাকবেই। তাই, ওই বিশ্বাসের নিরিখে ওর জীবনাদর্শকে বার-বার ও যাচাই করে। তার ফলটা ওর পক্ষে সব সময় বড় সুবিধার হয় না। হয়তো একান্ত ভাবে কোনও অধ্যাত্ম-ভাবনাকে ও আঁকড়ে ধরল, কিন্তু কিছু দিন পরেই তার খুঁত বেরুল, তাকে বর্জন করতে হল। বার বার এমনি হয়। তবু সংশয়ে ও টলেনি কখনও। অনেক সঙ্কট-মুহূর্তে জীবনের অর্ঘ্য দিয়ে বিশ্বস্রষ্টাকে অর্চনা করা ওর পক্ষে অসম্ভব হয়েছে, তখনও আস্তিক্য বুদ্ধি ওর যায়নি। প্রার্থনা ওর খুব সহজ, 'ধ্যানের আদর্শ জীবনে যেন রূপ পায়।' মার্গারেট ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তিনি আছেন, সত্যরূপে, নিখিল বিশ্বে সে-সত্য স্পন্দিত হ'চ্ছে; মানুষ সে-কথা জানে না হয়তো, কিন্তু তাতে কী?

এমনি বন্ধুর পথে একা চলতে চলতে মার্গারেট আশাভঙ্গের বেদনা পেয়েছে বার বার, সন্দেহ নাই। তার ফলে আস্তে-আস্তে ধর্ম সম্বন্ধে ওর মনে এক ধরণের সংশয়বাদ জেগে উঠল, যদিও তার মধ্যে নাস্তিক্যের লেশমাত্র ছিল না। কারণ, আভাসে ও বুঝতে পারে, ও যা ধরতে চাইছে তারও ওপারে কিছু আছে; সে-জিনিস এখনও ওর নাগালের বাইরে কিন্তু ও না জানলেও ওর এই সত্যের তপস্যার চরম ফল তাই-ই। অন্তরের সহজ বিশ্বাস এমনি করে পথের বাধা কাটিয়ে ওকে দিনে-দিনে এগিয়ে নিয়ে চলে।···অ্যাংগ্লিকান চার্চের 'ফ্রি থিঙ্কার' সম্প্রদায়ের নেতার সঙ্গে আলাপ হয়ে মুহূর্তের জন্য ওর মনে হয়েছিল, এত দিনে লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান মিলল বুঝি। কিন্তু এখানেও পরমত-অসহিষ্ণুতার দেয়ালে দেয়ালে ওকে ধাক্কা খেতে হল শেষ পর্যন্ত। গোঁড়ামিতেই যে মানুষের সত্যদৃষ্টি আবিল হয়ে ওঠে···এ জগতে সত্য কোথায় (৫)?'

মাত্র জনকয়েক বন্ধু জানতেন মার্গারেটের অধ্যাত্মজীবনের কতখানি দাম। এঁদের মধ্যে এবেনজার কুক্ এক জন। এক দিন চিত্রবিদ্যার পাঠ দিতে এসে তিনি ওকে বললেন, 'লেডি ইসাবেল মার্গসন তাঁর বাড়িতে কয়েক জন বন্ধুকে যেতে বলেছেন, এক জন হিন্দু সন্ন্যাসী কিছু বলবেন ওখানে—তুমি যাবে (৬)?'

নিতান্ত কৌতূহল বশে এই আচমকা আমন্ত্রণ স্বীকার করে মার্গারেট। সন্ন্যাসীটির সম্বন্ধে নানা কথাই বলাবলি হচ্ছে···কে উনি? 'সিসেম ক্লাবে'র জনকয়েক সভ্য, বিশেষ করে মিঃ ষ্টার্ডি ও হেনরিয়েটা মুলার আমেরিকার যুক্তরাজ্যে তাঁর অসামান্য সাফল্য, সাধু হিসাবে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি ইত্যাদি নিয়ে এত বিশদ বিবরণ দিলেন যে, সে-সব শুনে একটা মতামত খাড়া করা শক্ত। মিঃ ষ্টার্ডি ভারতবর্ষে অনেক ঘুরেছেন, উনি ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার করে দিতে পারেন হয়তো? কিন্তু তিনি চুপচাপ রইলেন। কেবল এটুকু জানা গেল, সাধুটি তাঁর বাড়িতেই থাকবেন।

সে-দিনটিতে ওর যাতে অবসর থাকে সে ব্যবস্থা করল মার্গারেট। লেডি মার্গসনের ড্রয়িংরুমে সেদিন পর্দাগুলো সব টানা, ঘরে ঢুকেই মার্গারেট কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করে। ও এসেছে প্রায় সবার শেষে। প্রথমেই যে খালি চেয়ারটা চোখে পড়ল, রেশমের স্কার্ট গুটিয়ে সন্তর্পণে তাতে বসতে গিয়ে ওর মনে হল, সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে।···ঘরে অন্তত জনপনেরো লোক—সবাই চুপ।···ধূপের চড়া সুগন্ধ বাতাসে মিশছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী হয়ে। পুরো মাপের গেরুয়া-আলখাল্লা আর খুনখারাপি রঙের কোমরবন্ধ-পরা স্বামী বিবেকানন্দ—বসলেন ঠিক মার্গারেটের মুখোমুখি। দীর্ঘ সুগঠিত শরীর, প্রসন্ন গাম্ভীর্যের একটা হিল্লোল তাঁকে ঘিরে···ও লক্ষ্য করে। প্রশান্ত আত্মসমাহিত পুরুষ, চার পাশে কী চলছে সেদিকে যেন খেয়ালই নাই। পিছনের কুণ্ডে আগুন জ্বলছে, তার পটভূমিকায় ওঁর ছবিটি। লেডি ইসাবেল যখন একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'স্বামীজী, আমাদের বন্ধুরা সবাই এসেছেন,' তখন কেমন একটু মিষ্টি হাসলেন তিনি। দরজাটা টেনে দেওয়া হল, পর্দা পড়ল। সব নিঝুম, শোনা গেল সন্ন্যাসীর সুরেলা কণ্ঠে প্রার্থনার মন্ত্র—'শিব শিব নমঃ শিবায়'।

অনেকক্ষণ ধরে বললেন তিনি। বলার ভঙ্গিটি শান্ত, কণ্ঠস্বর পর্দায়-পর্দায় ওঠে-নামে যেন। মাঝে-মাঝে এক-আধটা সংস্কৃত শ্লোক বলে অনুবাদ করেন চমৎকার ইংরেজিতে। আলোর মন্ত্রের সঙ্গে এদের পরিচয় করাতে যেন অসীম আনন্দ তাঁর। কেউ যদি কোনও প্রশ্নও করে, উত্তর দেন সহজ ভাষায়; দু-একটি কবি-সুলভ উপমা প্রয়োগ করেন—প্রাচ্যের মাধুরী ছলকে ওঠে সে-সব কথায়··· কুয়াশা-মলিন শরতের দিনে যেন হানা দেয় এক ঝলক আতপ্ত দক্ষিণ হাওয়া! আগাগোড়া তাঁর ভাষণে একটা সব-জড়ানো আত্মীয়তার সুর।

মুগ্ধ আগ্রহে মার্গারেট শুনে যায়। ওর প্রবল ইচ্ছাশক্তি, ওর শাণিত বিচারবুদ্ধি সব-কিছুকে পরাস্ত করে একটা রঙছুট-পরিপূর্ণ শূন্যতা যেন চিত্তকে আচ্ছন্ন করে। এ কোন্ অভিনব শক্তি অভিভূত করছে ওকে?···আভাসে বোঝে, কোন্ অদৃষ্টপূর্ব উদার দিগন্তের বৈপুল্যে মন ওর পাখা মেলছে। লোকটি কুহকী; মত ভক্তি-বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারেন বটে! কোন্ মন্ত্রে দেবতার বোধন হয়, উনি তা জানেন। পূর্ণ আত্মজ্ঞানী যাঁরা, উনি কি তাঁদেরই এক জন তবে? শুনতে পাই, ঘন অরণ্যে বন্য পশুদের সঙ্গে অটুট সৌহার্দ্যে বাস করেন তপোনিষ্ঠ যোগীরা, উনিও তেমনি এক জন না কি?

উনি বলছেন, 'মানুষ ভাবে, তাকে ছাড়া ভগবানের চলে না, কিন্তু অনন্তস্বরূপ কী দিতে পারে মানুষ?···আঁধারের মাঝে যে হাতখানি এগিয়ে আসে আমাদের পানে, সে তো আমাদেরই হাত···অনন্তের স্বপন-পসারী আমরা···সান্তের স্বপ্নে বিহ্বল···'

'মানুষ কী চায়? সুখও নয়, দুঃখও নয়,···মুক্তি, শুধু মুক্তি চাই, আমাদের সমস্ত তপস্যা শুধু অবন্ধন মুক্তির তপস্যা'···

বিশ্বের অধিষ্ঠান, যিনি এই বিশ্বের উৎপত্তিস্বরূপ, যাঁর দ্বারা এ বিশ্ব সৃষ্ট এবং যিনি স্বয়ং বিশ্বরূপ আবার যিনি পরাৎপর, আমি সেই স্বয়ম্ভুর শরণ নিলাম।' —অষ্টম স্কন্ধ, তৃঃ অঃ, তৃঃ শ্লোক

(৫) এসব খুঁটিনাটি খবর রিচমণ্ড নোবলের কাছে পাওয়া। মার্গারেট তাকে সব কথাই বলত।

(৬) ১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তিন মাস লণ্ডনে ছিলেন।

চমৎকার কথা এ-সব, নিপুণ ছন্দে গাঁথা একখানি বাণীর মালা যেন! বুদ্ধির চাতুরী দেখিয়ে এলোমেলো কতগুলো কল্পনা ছড়িয়ে দেওয়া নয়,···শ্রোতার চিত্ত সুপর্ণের মত উড়ে যায় অনন্ত আকাশে, এমনি এ-সব কথার জোর! আপনাকে সবাই যেন আজ নতুন চোখে দেখতে পেল। আদুরে ছেলে আকাশের চাঁদ-সূয্যি চাই বলে বায়না ধরে হাতের কাছে দামী খেলনা ঠেলে ফেলে···তেমনি অবুঝ বিস্ময়ে এদেরও মন কী দেখে আজ হারিয়ে ফেলেছে আপনাকে, যেতে চাইছে প্রাত্যহিকের ওপারে···

নিজের অনিচ্ছাতেও মন ভেসে চলে মার্গারেটের, অনুভব করে গভীর নিবিড় শান্তি, সংশয়-বুদ্ধির অবিরাম দ্বন্দ্বের মাঝে মুহূর্তের বিরতি যেন। কিন্তু সেইসঙ্গে আবার একটা প্রতিক্রিয়া। এটা ওর স্বভাবগত।

স্বামী বিবেকানন্দের বলা যখন শেষ হল, কয়েকটি মহিলা সন্ন্যাসীর মতবাদে মৌলিকত্ব কিছুই নাই বলে বিরুদ্ধ মন্তব্য করলেন; ওর মনে হল, ও-ত তাদের দলে। সেদিন মার্গারেট একটা প্রশ্নও তোলেনি আসরে। মনে যাই হোক, কাউকেই ও কিছু বলল না তখন···বিদেশী সাধু যে বার্তা এনেছেন তা নিয়ে মার্গারেটকে একলা ভেবে দেখতে হবে, এখন কিছু বলা নয়।

দিনকয়েক পরে লণ্ডনের সবগুলো দৈনিক এই হিন্দু যোগীর সম্বন্ধে মুখর হয়ে উঠল। তাঁকে তুলনা করা হল ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে, বুদ্ধ নতুন করে এসেছেন প্রতীচ্যের হৃদয়-ক্ষতে প্রলেপ দিতে। সদানন্দ পুরুষ,—শিশুর মত সরল আর পবিত্র; অথচ পাণ্ডিত্যে আর জ্ঞানে আচার্য হবার যোগ্যতা রাখেন।···কত কথা ছড়ায় তাঁর নামে, তিনি কিন্তু অচল-অটল। লণ্ডনে আসার তিন হপ্তা পরেই, একটিবার দেখবে বলে লোকের ঠেলাঠেলি তাঁর দুয়ারে, আমন্ত্রণের পর আমন্ত্রণ, সংবর্ধনার কী ঘটা! আমেরিকায় তাঁর সেই দিগ্বিজয়ের গল্প সবার মুখে-মুখে।

দু-বছর আগে ভারত ছেড়েছেন বিবেকানন্দ। শুধু জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রেরণায়, গুরুর কাছে পাওয়া জ্ঞানৈশ্বর্যের পুঁজি নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন চিকাগো ধর্ম-মহাসভায়। তাঁর মুখে উচ্চারিত হল ভারতের বাণী,—সর্বধর্মের প্রসূতি যে হিন্দুধর্ম, তারই তিনি বার্তাবহ। তাঁর অতুলন বাগ্মিতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দিকে-দিকে।

সভায় তাঁর পালা এল যখন, হাজার-হাজার লোকের দৃষ্টি ফিরল তাঁর দিকে। বক্তৃতা তৈরী করে আনেননি তিনি, কী যে বলবেন তার একটা স্পষ্ট ধারণাও তাঁর নাই। কিন্তু পলকের মধ্যে কী হয়ে গেল···ঐ সহস্র-সহস্র নির্নিমেষ দৃষ্টির ব্যাকুল প্রত্যাশায় তিনি দেখলেন তাঁরই অগণিত ভাই-বোনকে···যে বিপুল ঐশ্বর্য ন্যস্ত আছে তাঁর কাছে, সেই পিতৃরিক্থের শরিক ওরা···ওরা চায় সেই 'একমেবাদ্বিতীয়মে'র জ্ঞান।···অমনি তাঁর ব্যাকুল চিত্তাবেগ বিদ্যুৎবিসর্পে সঞ্চারিত হল হৃদয়ে-হৃদয়ে···অন্তরের অন্তঃস্থল হতে উৎসারিত হল তাঁরই কথা, যিনি অদ্বৈতম্···অথচ সহস্র বিভূতিতে তাঁর উপাসনা···সহস্র প্রতীকে একই সত্যের প্রকাশ···নিখিল ধর্মের গভীরে একই তো আকৃতি!

অ-খৃষ্টান এক সাধু, যে মানুষে-মানুষে ভেদের কথা বলে না, বলে না অন্যের দোষ-গুণ ভাল-মন্দের কথা, যে শুধু অন্তরে অনুভব করে নিখিলের চিরন্তন অভীপ্সা ক্ষান্তি আর শান্তির তরে!···নিজের বুক-ভরা ভালবাসায় ঢেউ তোলে সবার বুকে!···তাঁর মতের উদারতায় এবং পূর্ব-পক্ষের খণ্ডন-নৈপুণ্যে দর্শকমণ্ডলী সত্যি-সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চিকাগো আসার পর স্বামীজিকে দারুণ দুরবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁকে পোষবার মত কোনও চার্চ বা সম্প্রদায় ছিল না··· সঙ্গের সামান্য টাকাও দেখতে-না-দেখতে উবে গেল। কিন্তু এবার আচম্বিতে তাঁর রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে।···মুগ্ধ জনতা তাঁকে দেবতার মত পূজা করে, শহরে-শহরে তাঁকে নিয়ে টানাটানি ···সবাই তাঁর কথা শুনতে চায়। স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন বিজয়ী। কিন্তু ভাগ্যের এই চকিত পরিবর্তনে দারিদ্র্যব্রত ক্ষুণ্ণ হল না তাঁর, তাঁর স্বাধীনতা রইল অবারিত, একটুও ম্লান হল না তাঁর বাণীর দীপ্তি। একটা জড়বাদী পরমত-অসহিষ্ণু অর্বাচীন সমাজ তাঁর জন্য যত ফাঁদ পেতেছিল, সত্যের বলে তার প্রত্যেকটিই তিনি ছিন্ন করলেন অনায়াসে। এদের কাছে কোন নবধর্ম বা কোন বিশেষ আচার্যের বাণী প্রচার করতে তো তিনি আসেননি···তিনি নিয়ে এসেছেন আত্মার মুক্তির মন্ত্র, দারিদ্র্যলক্ষণ আধ্যাত্মিকতা যে দেশে জীবনের বাস্তব সত্য, এ সেই ভারতের সুচিরসঞ্চিত অজেয় সম্পদ···

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের শত্রু-মিত্র দুই-ই অনেক জুটল, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তাঁর চারপাশে তখনই জনকয়েক শিষ্যও জুটে গেল। ঈশ্বরের বাণী প্রচার করবেন মানুষের ঘরে-ঘরে—এ যৌবন-স্বপ্ন তাঁর সফল হয়েছে; এবার বিবেকানন্দ হয়েছেন কুশলী দিশারী। যে-কটি প্রাণ নিজেদের সঁপে দিয়েছে তাঁর কাছে, গুরুরূপে তাদের অন্তরে শুধু বৈরাগ্যের আগুন জ্বালিয়ে দিলেই চলবে না; উৎসর্গের জীবনে কী যে মধু, তার স্বাদ ত পাওয়াতে হবে ওদের। বিবেকানন্দ আর একাই খাটছেন না। ১৮৯৫ সনের গ্রীষ্মে লণ্ডনে আসবার আগেই, একটি নারী একটি পুরুষ—দুটি শিষ্যকে সন্ন্যাস দিয়েছেন তিনি, পাঁচ জনকে দিয়েছেন ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা। এরাই ভবিষ্যতে মুক্তির বীজ বপন করবে দেশে-দেশে।

লেডি ইসাবেলের ওখানে প্রথম সাক্ষাতের পর, মার্গারেট আরও দুটো ভাষণ শুনেছে স্বামীজির। কিন্তু লেডি ইসাবেল যে-সব ঘরোয়া সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন, ওর বেশী আগ্রহ সেগুলোতেই। এর একটাও যাতে বাদ না পড়ে, তার জন্য মার্গারেট তার দিন-সূচীই একদম বদলে ফেলল। যে নিরানন্দ অবসাদে ওর দম আটকে আসে, যে সংশয়-বুদ্ধি কোন মতেই এড়াতে না পেরে সবার সামনে খোলাখুলি প্রকাশ করে ফেলে, স্বামীজির কথা শুনতে-শুনতে সেই সব মানসিক গ্লানির হাত থেকে ও যেন ক্রমে-ক্রমে রেহাই পায়।

এদিকে বিবেকানন্দ দেখলেন, তাঁর শ্রোতাগুলি সব বাছাই-করা, এদের সামলানো বড় শক্ত। এফ. ডি. মরিসের লেখা ঢের পড়েছে মার্গারেট,—তাই ও মনটা কেবল সতর্ক রাখে যাতে চট করে সে কাবু না হয়ে পড়ে। ওর বন্ধু-বান্ধবেরা আবার মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের 'পরেই তাঁদের যুক্তি-বিশ্বাসগুলোকে খাড়া করতে চান। ব্যাপারটা জটিল হলেও এ বুদ্ধির খেলা খেলতে বিবেকানন্দের আপত্তি নাই। প্রতিপক্ষের বুদ্ধির দৌড়টা এঁচে নিয়ে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুরু করেন তিনি। স্বভাবতই বেদান্তের মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, এক জায়গায় এসে তা সহজেই অন্যান্য দর্শনের

সঙ্কীর্ণতাকে ছাপিয়ে ওঠে ; বিবেকানন্দ ধীরে-ধীরে সেইটিই শ্রোতার সামনে স্পষ্ট করে তোলেন। পাশ্চাত্যের মনোবিশ্লেষণকে ভিত্তি করে প্রতিটি আলোচনা চলে। বিশেষ করে এই ধারাতেই আলোচনাকে চালিয়ে নেবার বাহাদুরিটুকু মার্গারেটের। তাঁকে নানা রকম কূট প্রশ্ন করে ও, তিনি যে-সব দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করছেন সেগুলো ধরেই ও তার শাণিত জিজ্ঞাসা চালায়।

মার্গারেটের মনের অবস্থা কী বিবেকানন্দ তা ভাল করেই বুঝেছিলেন। এই অবিশ্বাসী মনোভাব নিয়ে নিজে কি তিনি কম ভুগেছেন! সংশয়ীর কী যে যন্ত্রণা! মনে হয় অন্তর যেন অন্ধ কারায় মাথা ঠুকছে, আশার একটি ক্ষীণ রেখাও কোথাও নাই। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া যে কত শক্ত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তা তিনি ভাল করেই জানেন। এ-পথে প্রতি পদক্ষেপে কেবল বেদনা, অথচ তাই আবার হয় চরিত্র-গঠনের নতুন উপাদান। বুদ্ধির বড়াই নিয়ে সব কিছু যাচাই করে দেখতে চায় মন। একটা নতুন যুক্তি পেলেই তাকে আঁকড়ে ধরে, নতুন কথার উপমান খোঁজে। রামকৃষ্ণের ভালবাসায় আত্মহারা হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বার আগে এমনি সংশয়-দোলায় দুলেছেন বিবেকানন্দও। মার্গারেট এখনও যুঝছে, এখনও পথের সন্ধান পায়নি। পরম কুশলীর মত সন্ন্যাসী মার্গারেটের নবোন্মেষিত সংবিৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন ; ওদের সহজবোধ্য হয় যাতে, তার জন্য 'বিশ্বাস' কথাটার পরিবর্তে 'আত্মোপলব্ধি' কথাটা ব্যবহার করেন। পাশ্চাত্য-মনের কাছে 'গুরু-বেদান্ত-বাক্যেষু বিশ্বাসঃ' উক্তিটা দুর্বোধ বই কি! অধ্যাত্মজীবনের স্তরগুলো পর পর কী ভাবে সাজানো তার বিশদ বিবরণ দিয়ে যান।···এর শুরু হয় চার্চ বা সম্প্রদায়ের আওতায় নৈষ্ঠিক জীবন দিয়ে, আর শেষ হয় গুরুর মাঝে পাওয়া পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে। 'সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে জন্মানো ভাল, কিন্তু ওর মাঝে মরলেই সর্বনাশ।'

···তার পর বলেন, 'সব বাঁধন ছিঁড়ে বৈরাগ্যের আলোয় উত্তরায়ণের যাত্রী যে, কী তার আনন্দ! আবার কাউকে কোথাও আঁকড়ে না ধরে বিশ্বজগৎকে যে ভালবেসেছে, কিংবা নির্বিরোধে তাঁর ইচ্ছার বাহন হয়ে কর্মের সাধনা যে করে চলেছে, তারই-বা কী আনন্দ! জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—এই তিনটি সনাতন সাধনা··· যুগে-যুগে মানুষ এতেই দেবতাকে জেনেছে নিবিড় করে।'

এ-মুক্তি, এ-স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যে কত বড় জিনিস সেটুকু মার্গারেট আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু ওর জানা যত রকম সাধনা, তার চাইতেও কৃচ্ছ্রসংযমে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করলে তবেই এ-স্বাতন্ত্র্য মিলবে, এ ও ভাবতেই পারে না যে! এ-সব আলোচনা শুনতে-শুনতে ও যেন কোন্ অচেনা রাজ্যে পথ হারিয়ে ফেলে, কোন দিশাই তার চোখে পড়ে না। শ্রোতাদের এক-এক জনের এক-এক মত। সব শুনে ওদের মনে সমন্বয়ের ভাবটি আনবার জন্য বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেন গীতার বাণী···'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।' এক দিন শ্রোতাদের ধ্যানের বিষয় হিসাবে বললেন 'আত্মার' কথা—দেহ ও মনের যে অধীশ্বর। মনও নয়, অহংও নয়, তবে এ আত্মা কী? মার্গারেট উত্তর খুঁজে পায় না। বিবেকানন্দ এ নিয়ে ভেবে

দেখতে সময় দিলেন ওকে, ও নিজে বুঝুক।···তিনি জানেন, নিজের বুদ্ধির পরেই ওর একান্ত নির্ভর। আর মার্গারেট? এই সাধুটির সম্বন্ধে মনকে সর্বদা ও উদ্যত রেখেছে, ওর স্বাতন্ত্র্য যেন কারও প্রভাবে আচ্ছন্ন না নয়।···তবু ওর এতদিনের পোষা প্রত্যক্ষবাদের ধারণাগুলো খুবই যে নাড়া খেয়েছে, এ তো স্বীকার করতেই হবে।

আলোচনার আসরগুলো এমন সুন্দর জমে উঠল যে, বৈঠকের সভ্যরা অনুরোধ করে বসলেন, নিউইয়র্কে যাবার আগে স্বামীজি যেন সাধারণ সভায় এক দিন কিছু বলেন। বিবেকানন্দ রাজী হলেন। পিকাডেলির প্রিন্স হলে, সেদিন বিকালে লণ্ডনের গুণী-জ্ঞানীরা সমবেত হয়েছেন। সন্ন্যাসী তাঁর শ্রোতাদের প্রথম সম্ভাষণ করলেন এক তীক্ষ্ণ প্রশ্নের খোঁচা দিয়ে: 'তোমাদের কলকব্জা, ছাপাখানায় যা না হয়েছে, তার চাইতে খৃষ্ট বা বুদ্ধের কয়েকটা কথায় মানব-সমাজে ঢের বেশী উপকার হয়নি কি? পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নির্লজ্জ অনুদারতা, নিষ্ঠুর যুদ্ধপিপাসা, আর নিদারুণ অর্থলোভ।···এ-সভ্যতাকে স্বীকার করতে গেলে যে মূল্য দিতে হয়, শান্তিপ্রিয় হিন্দু কোনও দিন তা দেবে বলে কি তোমরা আশা কর?' ভিড়ের মধ্যে থেকে মার্গারেট একান্ত মনে স্বামীজির বক্তব্য শুনে চলে।···এর বেশ কিছু দিন পর এক কৌতূহলী সাংবাদিককে উনি বলছিলেন, 'আমি কোনও গুপ্তবিদ্যা সমিতির পক্ষ থেকে মন্ত্র-তন্ত্রের কুহক দেখাতে আসিনি, আর ও-সবে কারও মঙ্গল হয় বলেও বিশ্বাস করি না। সত্য স্বপ্রকাশ, দিনের আলোয় প্যাঁচায় মত মুখ লুকায় না সে, সবাই তাকে যাচাই করে নিতে পারে।'··· এই সত্যকেই না মার্গারেট এত কাল খুঁজে ফিরেছে। তবে কি এ-সত্যের মুখ উনি অপাবৃত করবেন ওর কাছে? নিজের অধ্যাত্ম-অনুভবগুলো চিরে চিরে বিচার করবার অধিকারটা কোনমতেই যেন ওর হাত থেকে ফস্‌কে না যায়, সেই ভয়ে সব সময় ও হুঁশিয়ার থাকে, তর্ক করে প্রাণপণে। কিন্তু ঐ দার্শনিক আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকেই কতবার কল্পনায় ও চকিত আভাস পেয়েছে সেই পরমলগ্নের, যা ওর যুক্তি-বুদ্ধির সকল দাবি মিটিয়ে দিয়েছে অনিমেষে।

মার্গারেট বেশ বুঝতে পারে, বিবেকানন্দ ওকে এমন কতকগুলো ভূমার সন্ধান দিয়েছেন যেখান হতে অন্তরের গহনে ঝাঁপ দিয়ে অনেক সন্ধানী প্রশ্নই নিজের মনকে করা চলে। এতদিন পরে এমন ধর্মের খোঁজ ও পেয়েছে, যার ভিত্তি, তত্ত্বসংখ্যান ও সাধনপদ্ধতি সব-কিছুরই বৈজ্ঞানিক সমালোচনা করা যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মারফৎ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এ-ধর্মে অসম্ভব নয়। মানুষের যা-কিছু মহান, যা-কিছু উদার এর বনিয়াদ গড়ে উঠেছে তারই 'পরে। এ-ধর্ম গ্রহণ করার অর্থ পাপের ভারে নুয়ে পড়ে কারও দাসত্ব স্বীকার করা নয়, অগ্র্যবুদ্ধির স্বারাজ্যসিদ্ধিই এর লক্ষ্য। মার্গারেট যখন বেশ পরিষ্কার ভাবে এ-ধর্মের লক্ষণগুলো খুঁটিয়ে বুঝে নিল, তখন থেকে ও বিবেকানন্দকে 'আচার্যদেব' বলে ডাকতে শুরু করল, নিজেকে স্বীকার করল তাঁর শিষ্যা বলে। ওর বুদ্ধি যে কোথাও এবার মাথা নুইয়েছে, ওর মুখে এই সম্বোধনটিই তার প্রমাণ। মার্গারেট বুঝতে পেরেছে, বিবেকানন্দের জীবনে সত্যই সর্বস্ব; তাঁর সত্যানুরাগ দেশকাল-পাত্রের গণ্ডিতে বাঁধা পড়েনি। এতটুকু সত্যের আভাসও যেখানে ফোটে, সেখানেই তিনি তার পূজারী।

এই প্রথম দর্শন এবং ওর জীবনের 'পরে তার বিপ্লবী প্রভাবের কথা স্মরণ করে ১৯০৪ সনে মার্গারেট কলকাতা থেকে লিখেছিলেন, 'মনে কর সে-সময় উনি যদি লণ্ডনে না আসতেন! এ-জীবনটাই তাহলে একটা কন্দকাটা স্বপ্ন হয়ে থাকত। কিন্তু আমি জানতাম কারও ডাক শুনতেই পাব। তার জন্য একটা নিরন্তর প্রতীক্ষা আমার ছিল, ডাক এল সত্যিই। যদি অভিজ্ঞতা বেশী থাকত, হয়তো সংশয় হত, জীবনে শুভ লগ্ন এলেও মেনে নেওয়া হয়তো শক্ত হত। আমার ভাগ্য ভাল, আমি কিছুই জানতাম না। তাই দোটানার যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে গেছি।···ভিতরে আমার আগুন জ্বলত, কিন্তু প্রকাশের ভাষা ছিল না। এমন কত দিন হয়েছে, কলম হাতে নিয়ে বসেছি অন্তরের দাহকে রূপ দেব বলে—কিন্তু কথা জোটেনি। আর আজ আমার কথা বলে যেন শেষ করতে পারি না। দুনিয়ায় আমি যেমন আমার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি—আমার দুনিয়াও আমারই অপেক্ষায় তৈরি হয়ে বসে ছিল যেন। এবার তীর এসে লেগেছে ধনুকের ছিলায়।···কিন্তু স্বামীজি যদি না আসতেন আমার জীবনে? যদি হিমালয়-শিখরে ধ্যানে ডুবে থাকতেন? অন্ততঃ আমার কথা বলতে পারি···আমি ত এখানে আসতে পারতাম না···(৭)

তাঁর জীবনে সূর্যের মত যাঁর উদয় হয়েছিল, সেই আচার্য্যের কাছে মার্গারেট চিরদিন তাঁর ঋণ স্বীকার করে এসেছেন।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী

(৭) মিস ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠি, ২৬শে জুলাই, ১৯০৪।

ঢাকার সুতা

"পূর্ব্বে ঢাকা জিলায় সকল জাতি এবং সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সুতাকাটা প্রচলিত ছিল। ১৮ থেকে ৩০ বছরের বয়স পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকগণই সব চেয়ে ভাল সুতা কাটতো। মাত্র এক টাকা ওজনের তুলায় চার মাইল বা ততোধিক দীর্ঘ সুতাও সেই সময়ে প্রস্তুত হ'ত।"

—জেমস্ টেলার

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

দ্বিতীয় পর্যায়

পাঁচ বৎসর পর

১

টেলসন ব্যাঙ্ক যেন আদিম গুহা। যেমন ছোট তেমনি নোঙরা। খরিদ্দারের অসুবিধার অন্ত নেই। আর এই অসুবিধাগুলিই ছিল ব্যাঙ্কের মালিকদের গর্বের। তাদের ধারণা, ঝকঝকে সম্ভ্রান্ত চেহারা হ'লে টেলসন ব্যাঙ্কের ইজ্জত কমবে। ব্যবসা কমবে। খরিদ্দারের যত অসুবিধাই ঘটুক না কেন টেলসন ব্যাঙ্কের মালিকরা বরং ছেলেদের ত্যাজ্যপুত্র করবে, তবু ব্যাঙ্কের শ্রী ফেরাবে না কিছুতেই।

বাইরে থেকে দেখতে এক রকম। কিন্তু যে-কেউ সেই গহ্বরে প্রবেশ করবে তার দম বন্ধ হয়ে আসবে। কাউণ্টার পেরিয়ে ভিতরের ঘরটিতে ঢুকলে চোখে আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন জীর্ণ আসবাবের গন্ধে ভারী পচা বাতাস যেন বুকের উপর জগদ্দলের মত চেপে বসে।

আর এখানকার নিয়মও অদ্ভুত! বাইরের কাউণ্টারে যারা বসে তারা যেন পৃথিবীর মতই প্রাচীন। ভাবলেশহীন তাদের মুখ পাথরের তৈরী মনে হয়। টেলসন ব্যাঙ্কে অল্পবয়সী কেউ ঢুকলে দীর্ঘ দিন তাকে লোক-লোচনের অন্তরালে ভিতরে বসে কাজ করতে হয়। দিনে-দিনে সেই মৃত্যুর মত নিঝুম পুরীতে রুদ্ধ বাতাসের আবহাওয়ায় তার ভিতরকার মানুষটি কখন বদলে যায়। টাকা নোট গহনা আর পরের দলিল-পত্র নেড়ে-নেড়ে পাথর হয়ে যায় তারও মুখ-চোখ। তখন সে বাইরে আসে।

এমনি করে টেলসন ব্যাঙ্কের ট্রাডিশান বরাবর চলে।

সে-যুগে মৃত্যুদণ্ড ছিল স্নানাহারের মতই নিত্য ঘটনা। টেলসন ব্যাঙ্কের কৃতিত্বও সে ব্যাপারে কম ছিল না। প্রকৃতি মৃত্যুর পথে সব-কিছু সমস্যার সমাধান করে। আইনেরই বা অপরাধ কি? যে জালিয়াৎ তার কপালে মৃত্যুদণ্ড। মিথ্যা দলিল করার অপরাধে মৃত্যু। টাকা-পয়সার দলিলের সামান্যতম জোচ্চুরি যে করবে তার আর বাঁচবার উপায় নেই। এই সব কারণে একা টেলসন ব্যাঙ্কই যে কত লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

ব্যাঙ্কের ভিতরের আবহাওয়ার মত মানুষগুলিও যেন অনড়। শুধু বার-দরজার বাইরে যে লোকটি ফাই-ফরমাস খাটে সেই কিছু নড়া-চড়া করে। বাকী সময় বসে থাকে চুপচাপ, পাথরের মত। যখন কোথাও কাজে যায় ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে যায় নিজের জায়গায়। চেহারায় হাবভাবে ছেলেটিও যেন বাপের ছায়া।

এমনি এক দিন মার্চের ঝড়ো সকালে বাপ ও ছেলেতে ঘাঁটি আগলে বসেছিল। ফ্লীট ষ্ট্রীটের লোক-চলাচল সুরু হয়ে গিয়েছে রীতিমত। ছেলেটি চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে-করতে সেই দিকে তাকিয়ে সব দেখছিল।

এমন সময় ভিতর থেকে সাড়া এল—'দরওয়াজা!'

ছেলেটি বাপের দিকে তাকিয়ে বললে—'যাও বাবা। আজ সকাল বেলাই ডাক পড়েছে।'

২

ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই ব্যাঙ্কের এক বুড়ো কর্মচারী বললে—'পুরোনো বেলীর বাড়ী চেনো তো জেরী?'

বেশ ভারিক্কী চালে জেরী জবাব দিল—'চিনি বই কি।'

—'বা:। আর মিঃ লরীকে?'

—'তাকে চিনি না আবার? খুব চিনি। বেলী-বাড়ীরই বরং সব চিনি না বলতে পারি। ভদ্রলোক ও-সবের অত খবর কে রাখছে বলুন না!'

—'তা বেশ। এখন এক কাজ করো দিকিনি। যেখান দিয়ে সাক্ষীরা আদালতে ঢোকে সেখানকার প্রহরীকে এই চিঠিটুকু দেখাবে। মিঃ লরীর চিঠি। তাকে দেখালেই প্রহরী তোমায় ভেতরে ঢুকতে দেবে।'

—'আদালতের ভেতরে?'

—'হ্যাঁ! আদালতের ভেতরে বই কি।'

বারেকের জন্য জেরীর দুটি চোখের মণি যেন কাছ-বরাবর হয়ে এল। কি যেন বলাবলি করলে সে দুটিতে।

—'আদালতে অপেক্ষা করব, না, চলে আসব আমি?'

—'আগে সবটুকু শোনো। চিঠি দেখাবার পর ভিতরে ঢুকে তুমি মিঃ লরীর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করবে। তিনি তোমায় দেখলে, সেখানে অপেক্ষা করতে থাকবে যতক্ষণ না তোমায় ডেকে কিছু জানিয়ে দেন।'

—'এই আমার কাজ বলছেন?'

—'এক জন লোক তাঁর হাতের কাছে থাকা দরকার। তুমি তাঁকে জানিয়ে দেবে যে, তুমি রইলে তাঁর দরকারে।'

চিঠিটি ভাঁজ হয়ে তার হাতে আসার পর জেরী আর একবার বললে—'আজ সকালের দিকেই বোধ হয় জালিয়াতির মামলা উঠবে?'

—'জালিয়াতি নয় বিশ্বাসঘাতকতা!'

—'তার শাস্তিও বড়ো বিশ্রী। বড়ো বিশ্রী দেখতে-শুনতে।'

সেই প্রাচীন মুখে চশমার অন্তরালবর্তী দুটি তীক্ষ্ণ চোখে যেন রাজ্যের বিস্ময় উদ্যত হয়ে উঠতে দেখল জেরী।

—'তা বললে কি হয়? আইন যা, তা তো হবেই।'

—'লোক মারা ব্যাপারটাই ত জঘন্য। তার উপর আইনের নামে মানুষকে কেটে কুটি-কুটি করা—ভাবলে যেন কি রকম হয়।'

—'মোটেই জঘন্য নয়'—বৃদ্ধ জবাব দিল—'আইনের নিন্দা করো না, বুঝলে। নিজের সাবধান নিজেও হও। নিজের বুক আর মুখ সামলে চলো।'

জেরী জবাবে বললে—'ঠাণ্ডায় সব জমে ভারী হয়ে আছে স্যার! কি কষ্টে যে রুটি রোজগার করি তা তো আপনার অজানা নয়?'

—'জানি সবই। তার আর কি করা যাবে বলো? নানা লোক নানা রকমে করে খাচ্ছে। কারুর বা একটু কষ্টে, কারুর বা কিছু আরামে। এই যে চিঠি। দেরী করো না মোটে।'

চিঠি হাতে নিয়ে জেরী বিদায় নিলে।

সেকালে ফাঁস' হোত টাইবার্ণে। নিউগেটের বার-রাস্তার তাই কোন দুর্নাম রটেনি তখনো। কিন্তু জেলখানা ছিল নরক। যত রকম নোংরামি ব্যভিচার রোগের আড্ডা এই সব

জেলখানা। কয়েদীদের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব রোগ ছড়িয়ে পড়ত আদালত অবধি। কত বার এমনও হয়েছে যে, কয়েদীদের ছড়ানো রোগে তাদের ফাঁসীর আগেই বিচারকের নিজের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে গেছে। বেলী-বাড়ীকে লোকে পরলোকের ফটক বলেই জানে। এখান থেকে যে কত জন ওপারে চলে গেছে তার হিসেব-নিকেশ নেই। কত রকম গাড়ী করে কয়েদীরা যায় এখান থেকে মাইল আড়াই পথ। সেখানকার ফাঁসী-কাঠেরই বা কত ঘটা! চাবুক মারার ব্যবস্থারই বা রকম-ফের কত!

সেই জেলখানা আর আদালতের উঠোন পেরিয়ে জেরী নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে গেল ভিড় ঠেলে-ঠেলে। শেষ অবধি সাক্ষীদের কাঠগড়ার দরজার প্রহরীর হাতে পৌঁছে দিল চিঠিখানি। আদালতে শাস্তির জায়গায় সর্বত্র ঠাসাঠাসি মানুষের ভিড়। যত লোক থিয়েটারে সংয়ের আড্ডায় ভিড় করে, তার চেয়ে বোধ করি এখানে কোন অংশে কম নয় ভিড়! বেলী-বাড়ীর সব ক'টি দরজাতেই তাই নিয়ত প্রহরী। কেবল একটি সদর দরজা নিত্য খোলা থাকে। সে-পথ দিয়ে চোর জোচ্চোর খুনীরা সমাজ থেকে সোজা এখানে এসে ওঠে। তার পর বিচার। তার পর সোজা ফাঁসীতে—না হয় অন্য কোন সাজায়।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত হ'ল। সেই স্বল্প উদ্‌ঘাটিত পথে কায়ক্লেশে ভিতরে প্রবেশ করল জেরী।

স্থির হয়ে বসে পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করলে সে—'এখন কি চলছে?'

—'এখোনা কিছু আরম্ভ হয়নি।'

—'আগে কি হবে?'

—'সেই রাজদ্রোহের মামলা।'

—'অর্থাৎ সেই চোখের ওপর পোড়ানো, চোখ ঝলসানো, কিমা করা তো?'

লোকটি যেন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জবাব দিলে—'হ্যাঁ গো। প্রথমে ফাঁসীতে লটকিয়ে দেবে। জিভ বেরোবার আগেই নামিয়ে নিয়ে তার চোখের সামনেই তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটবে। তার পর পেটের মাল-মসলা বের করে ঝলসিয়ে পোড়াবে। সব দেখবে লোকটা তোয়াজ করে। তার পর শেষ অঙ্কে কুচ করে গলাটা কেটে নেবে। শাস্তিটা মন্দ বাতলায়নি, কি বল?'

—'আগে অপরাধী সাব্যস্ত হ'লে তবে তো?'

—'সে ভাবনা নেই বন্ধু! অপরাধী সাব্যস্ত হয়েই আছে।'

এতক্ষণে মিঃ লরী তাকে দেখেছেন। মাথা নেড়ে তাকে অপেক্ষা করতে ইংগিত করে আবার বসলেন। মিঃ লরীর বিপরীতে এক ভদ্রলোক মাথায় পরচুলার রাশ পরে রাশভারী হয়ে বসে আছেন। তাঁর চাল-চলন লক্ষ্য করতে লাগল জেরী। লোকটি অবিরত কি যেন খুঁজছেন আদালত-ঘরের ছাদের দিকে। দুটি হাত প্যাণ্টের পকেটে ঢোকান। যেন নিরালম্ব ভাব।

এতক্ষণে জজ এলেন। মুহূর্তে উদ্বেগ-মুখর জনসমুদ্র নিস্তরঙ্গ বোবা হয়ে গেল। দু'জন প্রহরী এনে কাঠগড়ায়' দাঁড় করিয়ে দিল আসামীকে।

যে লোকটি নিরন্তর আদালতের ছাদে কি যেন অন্বেষণ করছিলেন, তিনি ভিন্ন আর সকলেই আসামীর দিকে তাকাল। যেন এক দমক ঝড়ের মত, এক ঝলক আগুনের মত, যেন এক রাশ জলোচ্ছ্বাসের মত সমস্ত জনতার নিশ্বাস গিয়ে পড়ল তার উপর। থামের অন্তরাল থেকে, ঘরের কোণ থেকে, সর্বত্র থেকে তীক্ষ্ণ কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করতে লাগল। মানুষটির শরীরের প্রত্যেকটি বিন্দু চিনে নেবার জন্য যেন মুহূর্তে একটা সাজ-সাজ রব পড়ে গেল চারি দিকে।

বছর পঁচিশ বয়স। কালো চোখ। সুশ্রী সুঠাম তরুণ যুবা। দুটি গালে রৌদ্রের তাম্রাভা। সমস্ত অবয়বে নিখুঁত সজ্জনতা। গাঢ় ধূসর বর্ণের সাজ সর্বাঙ্গে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যথাসাধ্য সৌজন্যের সঙ্গে লোকটি জজকে অভিবাদন করে দাঁড়াল। আজকের পরিবেশে তার মনের ভিতর যত ঝড়ই উঠুক না কেন, তার কপোলের তাম্রাভার ভিতর দিয়ে এমন একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল, যা দেখে এটুকু বুঝতে বিলম্ব ঘটে না যে, মানুষটির ভিতরে একটি হার-না-মানা সূর্য-আত্মা সদা জাগরূক হয়ে আছে।

যে দৃষ্টিতে আজ জনতা তাকে গিলছিল, তার মধ্যে মহৎ কারুণ্যের কোন উপলক্ষ ছিল না। বরং লোকটির অপরাধের গুরুত্ব যদি কম হোত, যদি আসন্ন শাস্তির পরিমাণ হ্রাস হবার কোন কারণ ঘটত, তবেই সমবেত জনতার আশাভঙ্গের অন্ত থাকত না। এমন সুন্দর একটি নবীন যুবক-দেহ কি ভাবে অস্ত্রে চাবুকে দড়িতে আগুনে মুহূর্তে-মুহূর্তে বিদলিত বিগলিত হবে, তারই উজ্জ্বল প্রত্যাশায় লোকে ধৈর্য ধারণ করে রয়েছে। মানুষের মধ্যে যে আদিম পিশাচ আজও মরেনি, তারই সুস্পষ্ট সদম্ভ আবির্ভাব যেন আজকের এই উত্তেজিত জনতার মধ্যে।

চুপ চুপ! ফালতু আদমি একদম চুপ!

আসামী চার্ল'স ডার্নি। গত কাল রাজদ্রোহের অপরাধ অস্বীকার করেছে আসামী চার্ল'স ডার্নি। আমাদের মহামান্য ইংরেজ সরকারের সৈন্য-সামন্ত ও সামরিক প্রস্তুতির খবর বিশ্বাসঘাতক আসামী নানা ছলে-কৌশলে বিদেশী ফরাসী-রাজের গোপন দপ্তরে পৌঁছে দিয়েছে বহু দিন ধরে। এই কাজের জন্য নানা ভাবে নানা সময়ে সে এদেশ থেকে ফরাসী দেশে পাড়ি দিয়েছে ক্যানেল পেরিয়ে। সেই গুরুতর রাজদ্রোহিতার অপরাধে ধৃত আসামী ডার্নি আজ তার চরম বিচারের সম্মুখীন হয়েছে।

আইনের শত-সহস্র কূট জালের বিস্তারের মধ্যে মূল কথাটি এইটুকুই উদ্ধার করতে পারলে জেরী। এবার এটর্ণী জেনারেলের বক্তৃতা।

যে মানুষটির দেহের সদ্‌গতির কত মধুর কল্পনা লোকের মনে-মনে ফিরছিল, সেই আসামী চার্ল'স ডার্নি কিন্তু আশ্চর্য গাম্ভীর্য বজায় রেখে আদালতের কার্যধারা নীরব প্রশান্তির সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল। তার চারি পাশে আদালতের মেঝেয় নানা ওষধি ভিনিগার ছড়ানো, যাতে আসামীর রোগ কোন ভাবে চারি দিকে না সংক্রামিত হতে পারে।

একবার মাত্র মুখ ঘোরাতেই আসামীর দুটি চক্ষু স্থির নিবদ্ধ হয়ে গেল। তার সেই ভাবান্তর লক্ষ্য করা মাত্রই সমস্ত আদালতের চোখ ঠিকরে পড়ল আসামীর দৃষ্টি অনুসরণ করে দুটি নারী-পুরুষের উপর।

দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে বসা একটি বছর কুড়ির মেয়ে তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে বসেছিল। লোকটির চুল যেন ধবল গিরি। সমস্ত

মুখে কি এক প্রগাঢ়তা যা অনির্বচনীয়। সে প্রগাঢ়তা কর্মে নয়, মর্মে। যতক্ষণ মানুষটি মৌন হয়ে বসেছিলেন, তাঁর সব-কিছুর মধ্যে যেন জীর্ণতা প্রকাশ পাচ্ছিল। এখন কন্যার সঙ্গে কথা কইছেন, মুখের সেই নিস্তরঙ্গ গাঢ়তা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এখন দেখে মনে হয়, যেন মানুষটির জীবনের অপরাহ্ণ বেলা এখনো অনেক দূর—সায়াহ্নের প্রশ্নই ওঠে না।

পিতার একখানি হাতের উপর নিজের কোমল করতল রেখে মেয়েটি অবাঙ্‌ময়ী হয়ে বসে আছে। অপরাধীর প্রতি গভীর করুণায় যেন তার মন আর্দ্র হয়ে উঠেছে, সারা মুখে সেই স্নিগ্ধতা। আসামীর ভয়াবহ পরিণতির আশংকায় সন্ত্রস্ত হয়ে সে বাপের খুব কাছ ঘেঁসে বসে আছে। এই দুটি পিতা-পুত্রীর দিকে তাকিয়ে জনতার মুখে একটি মাত্র প্রশ্ন—'কারা ওরা ?'

এক মুখ থেকে আর এক মুখে। এমনি করে জেরী অবধি সেই প্রশ্ন ও উত্তর কানাকানি হয়ে এল।

—'কারা ?'

—'সাক্ষী।'

—'কোন্ পক্ষে ?'

—'বিপক্ষে।'

—'কার বিপক্ষে ?'

—'আসামীর।'

এত ক্ষণ পরে জজ স্থির হয়ে আসনে বসলেন। তাকালেন আসামীর দিকে।

এটর্ণী জেনারেল বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন আসামীর দিকে, যাকে নির্বিঘ্নে ফাঁসীতে লটকিয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর।

৩

বয়স কম হলেও লোকটি যে রাজবিরোধী চক্রান্তে পাকা, সে কথা জুরীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে এটর্ণী জেনারেল বললেন যে, মৃত্যুই এই গুরুতর অপরাধের শাস্তি। এই ধরণের কাজের দায়িত্ব নিয়ে লোকটি বহু দিন ধরে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যাতায়াত করে আসছে। অথচ সে অপরাধ অস্বীকার করে তার গতিবিধির কোন সদ্‌যুক্তিও প্রদর্শন করতে পারেনি। কেবল জীবন ধারণের প্রয়োজনে লোকটি যদি এই দেশদ্রোহিতায় লিপ্ত থাকত (ভগবৎ কৃপায় যা বাস্তব নয়), তবে কোন দিনই এই গোপন চক্রান্ত হয়ত প্রকাশ হয়ে পড়ত না। ইংলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মী পরম কৃপাভরে এক জন নির্ভীক সত্যবাদী রাজ-প্রজার মারফৎ আসামীর এই জঘন্য গুপ্ত চক্রান্তকে চীফ সেক্রেটারীর কাছে প্রকাশিত করে দিয়েছেন। সেই পরম দেশভক্তকে আমরা এখুনি দেখতে পাব। মানুষটি তার কর্তব্য পালনে যে মহান্ নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। আসামীর বন্ধু ছিলেন তিনি। কোন এক দুর্লভ মুহূর্তে বন্ধুর এই নোংরা কাজ সম্বন্ধে তিনি অবহিত হন। তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। দেশ-জননীর পবিত্র বেদীমূলে তিনি বন্ধুত্বকে বলিদান দিয়ে এই হীন রাষ্ট্রদ্রোহিতার চরম সমাপ্তি ঘটাতে মনস্থ করেন। প্রাচীন গ্রীক বা রোমের মত নাগরিকত্বের যদি মহিমময় পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকত আমাদের রাষ্ট্রে, তবে এই সজ্জন সেই পুরস্কারের নিরঙ্কুশ অধিকারী হতেন সন্দেহ নেই। কবিরা যথার্থ ই বলেন যে, ধর্মাচার বৃত্তি সংক্রামক। এক জন অন্য জনকে উদ্‌বুদ্ধ করে। এ কথা আরও সত্য দেশ-ধর্ম সম্বন্ধে। আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন সেই দেশভক্ত এই বিষয়ে আসামীর ভৃত্যকেও অনুপ্রাণিত করেন এবং তারই সাহায্যে আসামীর যাবতীয় কাগজ-পত্র তল্লাসী করেন। এটর্ণী জেনারেল ব্যক্তিগত ভাবে এই ভৃত্যটিকে নিজের পিতা-মাতার অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাভাজন বিবেচনা করেন এবং তার বিশ্বাস যে, মাননীয় জুরীরাও তাঁকে সেই প্রকার শ্রদ্ধার্হ বিবেচনা করবেন। এই দুই সত্যবাদী নির্ভীক্ দেশভক্তের সাক্ষ্য এবং তল্লাসীতে প্রাপ্ত কাগজ-পত্র—যা কোর্টে এখনি দাখিল করা হবে, তা দেখে মাননীয় জুরীদের বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না যে, আসামী মাননীয় সম্রাটের সামরিক গুপ্ত তথ্যের যাবতীয় সংবাদ বিদেশী শত্রু-রাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছে দিত। এই প্রথম বারই নয়, ইতিপূর্বে কত দিন ধরে যে আসামী এই বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছে তা ঈশ্বরই জানেন। যদিও এই দলিলগুলি আসামীর নিজের হাতের লেখা কি না, তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তার দ্বারা আসামীর অপরাধের গুরুত্বের কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না—তা আপনারা স্বীকার করবেন। বরং এর দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, আসামী আপন হীন ষড়যন্ত্রের কাজে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করত। ষড়যন্ত্রের কৌশলে সে পাকা শিল্পী। আমেরিকানদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধ লাগার পনেরো দিনের মধ্যেই আসামী এই চক্রান্তে লিপ্ত হয়। সে আজ পাঁচ বছর পূর্বেকার ঘটনা। এই সকল ঘটনা ও তথ্য বিবেচনা করে জ্ঞানী ও দেশভক্ত জুরী মহোদয়গণ অবশ্যই আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে দ্বিধা করবেন না। যত দিন না ঐ দেশদ্রোহীর মাথা নিতে পারছি, আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব না। আমরা পারব না, আমাদের স্ত্রী-পুত্রেরা পারবে না, আমাদের নিম্নতম চতুর্দশ পুরুষ পারবে না। ঈশ্বরের নামে, দেশের নামে এবং সংসারের যাবতীয় পবিত্র বস্তুর নামে এটর্ণি জেনারেল দিব্য করলেন।

এটর্ণী জেনারেলের বক্তৃতার পর আদালতে যেন এক ঝাঁক নীল মাছি ভন্-ভন্ করতে লাগল। যাবতীয় লোক আসামীর কি পরিণতি ঘটবে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

এমন সময় সাক্ষীর কাঠগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন দেশভক্ত। আবার নিরন্ধ্র নৈঃশব্দ নামল চারি দিকে।

সাক্ষীর জেরা সুরু হ'ল। ভদ্রলোক। নাম জন বারসাদ। তাঁর বক্তব্য শেষ হ'লে সাক্ষী আদালত থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন সদম্ভে, এমন সময় মিঃ লরীর পাশের এক জন উইগ-পরা ভদ্রলোক সাক্ষীকে জেরা করার জন্য বিচারকের কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল।

—'আপনি নিজে কোন দিন গুপ্তচরের কাজ করেছেন ?'

—'কখনো না। ও-রকম হীন কাজ করাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।'

—'তবে জীবিকা চলে কিসে ?'

—'সম্পত্তির আয় আছে।'

—'সম্পত্তি কোথায় ?'

—'তা এখন স্মরণ হচ্ছে না।'

—'কিসের সম্পত্তি? ব্যবসা জাতীয় কোন জিনিষ? কার কাছ থেকে পেয়েছেন?'

—'উত্তরাধিকারসূত্রেই পাওয়া বটে।'

—'কার কাছ থেকে?'

—'দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সম্পত্তি।'

—'দূর মানে কত দূর?'

—'তা দূর হবে বই কি, বেশ দূর।'

—'কোন দিন জেলে ছিলেন?'

—'কখনো না।'

—'ধার করেও কখনো না?'

—'সে কথা উঠছে কেন?'

—'ধার করে কখনো জেলে গেছেন কি না স্পষ্ট স্বীকার করুন। বলুন কখনো যাননি জেলে?'

—'হাঁ, গিয়েছি।'

—'ক'বার?'

—'দু'-তিন বার হবে বোধ হয়।'

—'পাঁচ-ছ' বার নয় তো?'

—'তাও হতে পারে।'

—'সামাজিক পরিচয় কি আপনার?'

—'সাধারণ ভদ্রলোক।'

—'কখনো কারুর বুটের লাথি খেয়েছেন?'

—'হতেও পারে।'

—'প্রায়ই লাথি খান?'

—'না।'

—'কখনো কেউ লাথি মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়েছিল?'

—'কখনো না। একবার সিঁড়ির মাথায় এক জন লাথি মেরেছিল বটে, কিন্তু নীচে গড়িয়ে পড়েছিলাম নিজের ইচ্ছাতেই।'

—'জুয়ায় জোচ্চুরী করার জন্মই কি লাথি খেয়েছিলেন?'

—'মাতাল বজ্জাতটা তাই বলেছিল বটে, কিন্তু সে বেবাক মিথ্যে।'

—'ডাহা মিথ্যে কথা?'

—'মিথ্যে বই কি।'

—'জুয়ায় কখনো জোচ্চুরী করেননি?'

—'ভদ্রলোক যা করে তার বেশী কোন দিন করিনি, শপথ করছি।'

—'আসামীর কাছে কখনো টাকা ধার করেছিলেন?'

—'করেছিলাম।'

—'কখনো ধার শোধ করেছেন?'

—'না।'

—'আসামীর সঙ্গে আপনি যে বন্ধুত্ব করেছিলেন সে কি তার পয়সায় পানাহারের বাসনায়?'

—'না।'

—'ঐ কাগজপত্রগুলোই আসামীর কাছে দেখেছিলেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'ও সম্বন্ধে আর কিছু জানেন?'

—'না।'

—'যদি কেউ বলে ও-গুলো আপনিই জোগাড় করেছিলেন?'

—'আমি? আমি নয়।'

—'সাক্ষী দিয়ে কিছু পাবার আশা আছে?'

—'না।'

—'লোককে জালে ফেলবার জন্যে সরকারের কাছে মাস-মাহিনা বা ঐ রকম কিছু পান নাকি?'

—'কখনো না।'

—'অন্য কিছু মতলব আছে এর পেছনে?'

—'না।'

—'শপথ করছেন তো?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'নিছক দেশপ্রেমের তাগিদেই সাক্ষী দিতে এসেছেন? অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই?'

—'কিছু মাত্র না।'

তার পর আসামীর ভৃত্যের সাক্ষ্য।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

প্রথম উচ্ছ্বাস

রাজবাহন-চরিত

চতুর্দ্দশ ভুবনের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে বিস্ময়ে বিকশিত হয়ে উঠল অবন্তিসুন্দরীর দুটি আঁখি। অধরের প্রান্তদেশে হাস্যের তরঙ্গ এঁকে সুন্দরী বললেন—

"প্রিয়, আজ আমার মিটল—কানের ভিতর দিয়ে কথা-শোনার সুখ। তোমার প্রসাদেই ভেসে এল এই সুখ। মনের অন্ধকারটিকে মুছে দিয়ে গেল তোমারই দান—এই জ্ঞানের প্রদীপ। সেদিন মনে মনে ভেবেছিলুম, কেমন করে তোমাকে পাব। আজ সেই পাওয়া সফল হল; তোমার পদ্মপায়ের সেবার ভিতর দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেল। এখন ভাবছি, তোমার প্রসন্নতার থালায় কি উপকরণ সাজিয়ে এবার আমি প্রত্যুপকার করব নিজের। কি-ই বা এমন রয়েছে যা করবার রয়েছে বাকি। নেই, তাই বা কেমন করে বলি? কোথাও না কোথাও, আমারও ত একটু প্রভুত্ব থাকতে পারে। নয় কি? এই দেখ না, তোমার এই ঠোঁট দুটি সরস্বতীর মুখগ্রহণ করতে করতে শুকিয়ে গেছে;—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ ঠোঁট দুটিকে আমাকে দিয়ে মিটি খাওয়াতে কি পারবে? পারবে কি আমাকে দিয়ে তোমার লক্ষ্মীলাঞ্ছিত বক্ষঃদেশটিকে আলিঙ্গন করাতে,—ঐ তোমার ঐ বক্ষ?"

এই কথা বলতে বলতে অবন্তিসুন্দরীর স্তনতট প্রিয়তমের বক্ষ-বিস্তৃতিতে লীন হয়ে পড়ল,—বর্ষার আকাশে যেমন করে ঢলে পড়ে গুরুভার পয়োধর। উল্লাসে নৃত্য করে উঠল রূঢ়রাগরূষিত দুটি চক্ষু—প্রৌঢ় কদলীর যেন মুকুল-ফোটা ছবি। কুসুমের চন্দ্রকচিত্রিত ময়ূরের পেখমের মত উতলা হয়ে উঠল অবন্তিসুন্দরীর ভ্রমর-ব্যাকুল কেশকলাপ। গাঢ়ভাবে, অধীরভাবে অবন্তিসুন্দরী বারম্বার চুম্বন করতে লাগলেন কান্তের অধরমণি।—কদম্বের নবপ্রসূনের মত মত চিকচিকে, থরথরে, অরুণরঙের পরাগ-ধরা অধরমণি! ধীরে ধীরে স্ফুরিত হল রাগপ্রবৃত্তি, এবং অবসানে ঘটে গেল রতিপ্রবন্ধ;—অতিমাত্র চিত্র উপচারে শীকর (রম্য)।

রতির অবসানে সুরতক্লান্ত হয়ে বর এবং বধূ যখন গভীর সুখ-সুপ্তিতে মগ্ন, তখন তাঁরা দুজনেই স্বপ্ন দেখলেন। দেখতে পেলেন—একটি রাজহংস দাঁড়িয়ে আছে, তার পা দুটি মৃণালের নিগড় দিয়ে বাঁধা। বৃদ্ধ রাজহংসের স্বপ্ন দেখা অশুভ। দুজনেই একসঙ্গে শয্যায় উঠে বসলেন। উঠতেই দেখা গেল রাজবাহনের চরণযুগলকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে রয়েছে একখানি রজতশৃঙ্খল;—যেন চরণ দুটিকে পদ্ম ভেবে, চাঁদ তাঁকে বেঁধেছে জ্যোৎস্নার রজ্জু দিয়ে।

ব্যাপার দেখেই—এ কি হল—কিছুই বুঝতে না পেরে মুক্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন রাজকন্যা, পরিত্রাস-বিহ্বলা।

কন্যার ক্রন্দনে জেগে উঠল কন্যান্তঃপুর; আগুন লাগলে, দানায় পেলে—হঠাৎ যেমন করে কাঁপতে কাঁপতে জেগে ওঠে লোক। ভুল হয়ে গেল, পৌর্ব্বাপর্য্য। কে তখন বিচার করে টানতে পারে মর্য্যাদার সীমারেখা? কে বলো, তখন মেনে চলতে পারে রহস্যরক্ষার বিধান?

মাটিতে যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল কন্যান্তঃপুর। অন্তঃপুরের অজস্র কণ্ঠে সহস্র চীৎকার। আবৃত হল অন্তঃপুরের কপোলতল অশ্রুস্রোতের গুণ্ঠনে।

"কি হল, কি হল" বলে চীৎকার করতে করতে অবরোধ-প্রবেশের বাধা না মেনেই, হঠাৎ অবন্তিসুন্দরীর শয়নকক্ষে অন্তর্বংশিক পুরুষেরা উপস্থিত হয়ে গেল এবং হাজার চোখে দেখতে পেল তদবস্থ রাজবাহনকে। কি করবে, কি আর বলবে! মূঢ় হয়ে গেল।

অন্তঃপুরে ব্যভিচার।—অসম্ভব! নিগ্রহ করতে হাত তুলল, কিন্তু শেষে কোনক্রমে নিজেদের সামলিয়ে নিলে এবং তখনই দৌড়িয়ে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করে দিলে চণ্ডবর্ম্মার পদপ্রান্তে।

ছুটে এলেন চণ্ডবর্ম্মা, ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি। অগ্নিক্ষরা তাঁর দৃষ্টি। চিনতে পারলেন রাজবাহনকে।

"এ বেটা সেই। সেই পাপ বালচন্দ্রিকার স্বামী সেই বেটা পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু! এই বালচন্দ্রিকাটার জন্যেই আমার ছোট ভাইয়ের প্রাণ গেছে। সেই বিদিশি বেণের বেটা, ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে

কাঁপণকোলা, সেই পুষ্পোদ্ভবটারই তো এ বেটা বন্ধু। দাঁড়াও দেখাচ্ছি, রূপের বড্ড গরম হয়েছে, বিত্তের বড্ড অভিমান। ধর্ম্মের কঞ্চুক পরে কুহক দেখানো বার করছি। হাড় পাপী, লম্পট অশ্বব্রাহ্মণ কোথাকার! আর এই সুন্দরীটিই না আমার মত পুরুষসিংহকে অবমাননা করেছিলেন! এখন এই বেটাতেই মন সঁপেছেন। সুন্দরী কুলপাংসনীটি আজ চোখ জুড়িয়ে দেখতে পাবেন—শূলের উপর বসে রয়েছেন তাঁর পতি।"

এই রকম ভাবতে ভাবতে, বকতে বকতে, ভীষণ ভ্রূকুটীতে ললাটখানি কুঞ্চিত করে, যমের মত কর্কশ, হাতে কালো লোহার দণ্ড—রাজকুমারের পদ্মহাতখানিকে পাকড় করে জোরে টান দিলেন চণ্ডবর্ম্মা।

নিরুপায় এখন রাজবাহন। তাঁর স্বভাবধীর মন বললে, "সহিষ্ণুতাই সর্ব্বপৌরুষের অতিভূমি। দৈবী আপদ এলে উপায় কি? সইতেই হবে। সহিষ্ণুতাই এখন একমাত্র প্রতিক্রিয়া।"

মুখ বললে—"হে স্মর, তুমি স্মরণ কোরো। হে হংসগামিনি, তুমি স্মরণে রেখো সেই বৃদ্ধ রাজহংসের কথা। সহ্য করে তোমাকে যাপন করতে হবে দুটি মাস।"

ইঙ্গিতে এই কথাটুকু প্রাণ-পরিত্যাগ-রাগিণী প্রাণসমা অবন্তিসুন্দরীকে জানিয়ে, রাজবাহন স্বীকার করলেন চণ্ডবর্ম্মার বশ্যতা।

'রাজবাহনের প্রাণদণ্ড হবে'—এই খবর পৌঁছতে দেরী হল না মহাদেবী এবং মালবেন্দ্রের নিকটে। তাঁরা প্রাণহত্যায় বাধা দিলেন। রাজবাহন একে জামাতা, তার উপর, বলতেই হবে তাঁর রূপ এবং আকার এঁদের মনে সঞ্চারিত করেছিল পক্ষপাতিত্ব। তাঁরা প্রচার করে দিলেন, রাজবাহনের প্রাণদণ্ড হলে তাঁদেরও ত্যাগ করতে হবে প্রাণ। কিন্তু মহাদেবী এবং মালবেন্দ্র তখন রাজ্যের প্রভু নন, তাই তাঁরা এই আপদটিকে চিরস্থায়ী ভাবে উত্তরণ করতে পারলেন না।

চণ্ডশীল চণ্ডবর্ম্মা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। রাজরাজগিরিতে তপস্যা করেছিলেন দর্পসার, তাঁর কাছে চণ্ডবর্ম্মা সমস্ত খবর পাঠিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকুটুম্ব পুষ্পোদ্ভবের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, তাঁদের নিক্ষেপ করলেন কারাগারে।

কিশোর সিংহের মত রাজবাহনের জন্যে কিন্তু ব্যবস্থা হল অন্যপ্রকার। নির্ম্মিত হল দারুপিঞ্জর। এবং তার মধ্যে বন্দী রইলেন রাজবাহন। কয়েকদিন পরে চণ্ডবর্ম্মা অঙ্গাভিযান করলেন—অঙ্গরাজ কন্যা সম্প্রদান করেননি, অপমান করেছেন, তাঁর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে। দারুপিঞ্জরাবদ্ধ রাজবাহনও সেই অভিযানের সাথী হয়ে চললেন। কষ্টের সীমা ছিল না তাঁর। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তাঁর একটি সুখ ছিল—কেশকলাপের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল যে (কালিন্দীদত্ত) চূড়ামণি, তারই প্রভাবে তাঁর ক্ষুৎপিপাসাদি বেদনা-বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে রইল।

চণ্ডবর্ম্মার বলভরে কেঁপে উঠল চম্পানগরী; এল অবরোধ। কিন্তু চম্পেশ্বর সিংহবর্ম্মা—সিংহের মতন তাঁরও অসহ্য বিক্রম—তিনি চম্পানগরীর প্রাকার ভেদ করে সৈন্যসমাবেশ নিয়ে আক্রমণ করলেন চণ্ডবর্ম্মাকে—বপুষ্মান যেন মহাদর্প। ঐ দর্পই হল তাঁর কাল। পূর্ব্বেই তিনি সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে দূতব্রাত পাঠিয়েছিলেন ধরণীপতিদের নিকটে। তাঁরা আসছেন,—এই শুভ সংবাদ পেয়েও তাঁর বিলম্ব সইল না, কারও কথা মানলেন না, প্রতিবল গ্রহণ করে দর্পভরে লাফিয়ে পড়লেন বিপুল সংগ্রামে। ক্ষীণবল হয়ে তাঁকে পরাস্ত হতে হল। শেষে একদিন হাতীর পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে অমানুষিক বিক্রম দেখিয়ে চণ্ডবর্ম্মা বন্দী করলেন প্রহরণভিন্নবর্ম্মা সিংহবর্ম্মাকে। সিংহবর্ম্মার কন্যা প্রসিদ্ধা 'অম্বালিকা'র উপরে ঢলে পড়েছিল চণ্ডবর্ম্মার মাত্রা-হারা অভিলাষ; তাই দয়া করে, ভাবী শ্বশুর সিংহবর্ম্মার প্রাণটুকুই দেহ থেকে বিযুক্ত করে দিলেন না। তার পরে কী যে তাঁর মতি হল;—সিংহবর্ম্মাকে আরোগ্য করিয়ে রাখিয়ে দিলেন কারাগৃহে এবং ঘোষণা করে দিলেন গণকসঙ্ঘের গণনা,—"অদ্যই রাত্রিশেষে রাজকুমারী অম্বালিকা বিবাহনীয়া।"

কৌতুক-মঙ্গল বিবাহোৎসব আরম্ভ হয়েছে, এমন সময় "এণজঙ্ঘ" নামক জঙ্ঘাকরিক মহারাজ দর্পসারের প্রতি-সন্দেশ বহন করে 'এক-পিঙ্গল' পর্ব্বত থেকে চণ্ডবর্ম্মার নিকটে চম্পানগরীতে এসে পৌঁছল। আদেশপত্রে লেখা ছিল;

"মূঢ়, কন্যান্তঃপুর-দূষকের উপর কৃপার অবসর থাকে না। মালবেন্দ্র নিশ্চয়ই চরম বার্দ্ধক্যে এসে পৌঁচেছেন, মান অপমানের জ্ঞান নিশ্চয়ই তাঁর লুপ্ত হয়ে গেছে, সেইজন্যেই তিনি দুশ্চরিত্রা দুহিতার পক্ষপাতী হয়ে এমন প্রলাপ বকতে পারেন; তাই বলে চণ্ডবর্ম্মা, তোমাকে কি তাঁর এই পরামর্শ মেনে চলতে হবে? অবিলম্বে সেই কামোন্মত্তকে চিত্রবধ করে, তার মৃত্যুবার্ত্তা পাঠিয়ে আমাকে সুখী কোরো। এবং সেই দুষ্টা কন্যাকে ও তার অনুজ 'কীর্ত্তিসার'কে শৃঙ্খলবদ্ধ করে চারকে (কারাগার) নিরুদ্ধ কোরে রেখো।"

চণ্ডবর্ম্মা তখনই তাঁর পার্শ্বচরকে আদেশ দিলেন—

"প্রাতঃকালে রাজভবনের দ্বারে দুরাত্মা সেই অন্তঃপুর-দূষকটাকে নিয়ে আসবে। আর সেই সময়ে গজরাজ চণ্ডপোতকে যেন সাজসজ্জা পরিয়ে নিয়ে আসা হয়। বিবাহকৃত্য সমাপ্ত করে আমি হস্তীতে আরোহণ করে সেই অনার্য্যশীলকে হস্তীর পদতলের ক্রীড়নক করব। তার পরে সেই হস্তীতেই অধিরূঢ় হয়ে সিংহবর্ম্মার সাহায্যের জন্য যে সব রাজন্যকেরা আসছে, তাদের ধনরত্ন সমেত আটক করব।"

পরের দিন সবেমাত্র তখন ভোর হয়েছে—উষারাগ—রাজপুত্রকে নিয়ে আসা হল রাজাঙ্গনে। চণ্ডপোতকেও রক্ষীরা নিয়ে এল; তার গণ্ড দুটি বেয়ে তখন মদধারা ঝরছে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সহসা রাজবাহনের অঙ্ঘ্রিযুগল থেকে খসে পড়ে গেল রজতশৃঙ্খল। দেখতে দেখতে শৃঙ্খলটির বদল হয়ে গেল চেহারা। —রজতশৃঙ্খল হল চন্দ্রলেখার মত সুন্দরচ্ছবি একটি অপ্সরা। রাজবাহনকে প্রদক্ষিণ করে করপদ্মে অঞ্জলি রচনা করে অপ্সরা বললে—

"দেব, আমাকে দান করুন আপনার অনুগ্রহ-সিক্ত চিত্ত। আমি সোমরশ্মিসম্ভবা সুরসুন্দরী—আমার নাম 'সুরতমঞ্জরী'। একদা আমি ভেসে চলেছিলুম আকাশ-পথে—এমন সময় আমার মুখখানিকে পদ্ম ভেবে একটি পদ্মলোভী মুগ্ধ কলহংস আমাকে আক্রমণ করে। তাকে বাধা দিতে যাই। আর আমার কণ্ঠ থেকে খুলে পড়ে যায় মুক্তার নহর।

...বীর দিকে পড়তে থাকে। সেই সময়ে হিমাচলের এক সরোবরে জলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় অবগাহন স্নান করছিলেন। যেই মাথা ...ছেন, অমনি পড়বি ত পড়, সেই মুক্তার নহর তাঁরই পলিত ...কে শুভ্রতর কোরে মাথার উপর পড়ল। ক্রুদ্ধ হয়ে মহর্ষি ...কে শাপ দিলেন,—

'পাপিনি, লোহ-জাতিতে পতিত হ। যেন তারই মত তোর ...ন্য না হয়।'

অনেক কষ্টে তাঁকে প্রসন্ন করি। তখন তিনি বলেন, 'বেশ, ...জবাহনের পাদপদ্মে দুটি মাস তোমাকে শিকল হয়ে থাকতে হবে, ...ে নিস্তার পাবে। যাও, ইন্দ্রিয়ের শক্তি পরিক্ষীণ হবে না।'

কি যে পাপ করেছিলুম জানি না।—রূপোর শিকল হয়ে গেলুম। ...কুবংশীয় রাজা 'বেগবানের' পৌত্র 'মানসবেগের' পুত্র বিদ্যাধর ...রশেখর' আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে 'শঙ্করগিরি'তে চলে এলেন। তাঁর ...ছেই ছিলুম। এদিকে হলো কি;—বৎসরাজ-বংশবর্দ্ধন বর্ত্তমান ...দ্যাধরচক্রবর্ত্তী 'নরবাহনদত্ত'—যাঁর সঙ্গে পিতা মানসবেগের শত্রুতা ...ল,—তাঁর অনর্থ ঘটাবার বাসনায় বীরশেখর তপস্যারত মহারাজ ...র্পসারের সঙ্গে স্থাপন করলেন মিত্রতা। দর্পসার তাঁকে প্রতিশ্রুতি ...ন—ভগিনী অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে বীরশেখরের বিবাহ দেবেন।

সেদিন আকাশ জুড়ে তখন ছড়িয়ে পড়েছে চন্দ্রের মোহিনী। ...রশেখরের মনে হল—'অবন্তিসুন্দরীকে একবার দেখে আসি,— ...নোরথসমাসীনা আমার প্রিয়তমা অবন্তিসুন্দরীকে'। ভাবতে ভাবতে ...লস অবশ হয়ে এল ইন্দ্রিয়। থাকতে পারলেন না। প্রবেশ ...রলেন ইন্দ্রমন্দিরদ্যুতি কুমারীপুরে। বিদ্যাধর বীরশেখর তিরস্করিণী ...দ্যার বলে বিস্মিত ক্রোধের মধ্য দিয়ে দেখতে পান—

আপনার কোলের কাছে শুয়ে রয়েছেন অবন্তিসুন্দরী, এলিয়ে ...ড়েছে তাঁর সুরতক্লান্ত অঙ্গ; ভাষার মধু ঝরিয়ে আলাপ করে ...লেছেন আপনি ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের,—ফিরিয়ে দিয়ে ফিরে ...চ্ছেন ভালবাসা। সীমা হারালো বীরশেখরের ক্রোধ। উপযুক্ত ...াস্তি দেবার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। তার পরে যখন ...াপনারা দুজনে গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে গভীর সুখসুপ্তিতে মগ্ন, তখন ...জতশৃঙ্খল-স্বরূপিণী আমাকে আপনার দুটি পায়ে বেঁধে দিয়ে ...ীরশেখর তীব্র রোষে সরভসে কুমারীপুর থেকে বেরিয়ে আসেন। ...জ হে দেব, অবসন্ন হয়েছে অভিশাপ, অতীত হয়েছে মাসদ্বয় এবং ...ঙ্গে সঙ্গে আপনার পারতন্ত্র্য। এখন প্রসন্ন হয়ে আমাকে যথাদেশ করুন।" এই বলে সুরতমঞ্জরী রাজবাহনকে প্রণাম করল। 'অবন্তিসুন্দরীকে এই বার্ত্তাই দিয়ে আপনি আশ্বস্ত করুন"—এই বলে রাজবাহন বিদায় দিলেন সুরতমঞ্জরীকে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বধ্যভূমির চতুর্দ্দিকে হঠাৎ উঠল বিকট ধ্বনি। "হত হয়েছে, হত হয়েছে, চণ্ডবর্ম্মা হত হয়েছে।"

পরক্ষণেই ঘোষণা হল, "সিংহবর্ম্মার দুহিতা অম্বালিকার পাণিস্পর্শ করবার উদ্দেশ্যে চণ্ডবর্ম্মা যেই প্রসারিত করেছেন তাঁর বাহু, অমনি কোথা হতে একটি অদ্ভুতকর্ম্মা তস্কর এসে, তাঁর বাহু আকর্ষণ করে, নখরাস্ত্রের প্রহারে তাঁকে হত্যা করেছে। সাবধান! রাজমন্দিরে বিছিয়ে গেছে শত শত শব। সেই তস্কর নির্ভয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!"

শ্রুতিমাত্র রাজবাহন মত্তহস্তীর শিরোদেশ থেকে মাহুতকে বিদূরিত করে দিলেন; এবং হস্তীতে আরোহণ করেই অতিবেগে ধাবিত হলেন রাজভবনের অভিমুখে। মত্তহস্তী দৌড়ে আসছে, পথ ছেড়ে পলায়ন করল জনতা। রাজভবনে উপস্থিত হয়ে রাজবাহন মেঘমন্দ্র কণ্ঠে হাঁকলেন—

"কোথায় সেই মহাপুরুষ, যিনি মানুষের অসাধ্য এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করেছেন? আসুন, তিনি বেরিয়ে আসুন, আরোহণ করুন আমার এই মত্তহস্তীতে। নির্ভয়ে তিনি আসুন, আমার নিকটে এলে দেব বা দানব তাঁকে গ্রহণ করতে পারবে না।"

রাজবাহনের বাণী শুনে সেই মহাপুরুষটি তখন আহ্লাদিত চিত্তে বেরিয়ে এলেন। সংজ্ঞা-সঙ্কুচিত হস্তীর গাত্র বেয়ে ত্বরিত-আরোহণ করা মাত্র রাজবাহন তাঁকে চিনতে পারলেন। "একি, প্রিয় সখা অপহারবর্ম্মা যে!"

বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে, আলিঙ্গন করে বসিয়ে নিলেন সম্মুখে। পিছন থেকে বাহুর বেষ্টনী দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে রইলেন। কিন্তু সে ক্ষণিক। অপহারবর্ম্মার উপর তখন সৈন্যরা হানছে বাণ, ছুঁড়ছে কণপ (লৌহস্তম্ভ), কর্পণ (কুটিলাগ্র সরাব), প্রাস, মারছে পট্টিশ, মুষল, তোমর। কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধ করতে লাগলেন অপহারবর্ম্মা। নৃশংস সেই সৈন্য-সংহার! মাটিতে বিছিয়ে যেতে লাগল শত্রুর শব। এমন সময় রাজবাহন দেখতে পেলেন অন্য আর একদল সৈন্য, অভিধাবন করে এসে মৃত চণ্ডবর্ম্মার সৈন্যদের ঘেরাও করে ফেলল।

ক্ষণকাল পরেই দেখা গেল,—কর্ণিকার ফুলের মত গৌরবর্ণ, কুরুবিন্দ ফুলের মত চুলের রং, টানা টানা স্নিগ্ধ নীল চোখ, পট্টবাস অঙ্গে, কটিতটে রত্নমেখর, কৃশ কোমর, স্থূল বক্ষ—একটি পুরুষ অদ্ভুত হস্তনৈপুণ্য দেখিয়ে বাণ ছুঁড়তে ছুঁড়তে এবং শত্রুধ্বংস করতে করতে এগিয়ে আসছে। চরণাঙ্গুষ্ঠের নিষ্ঠুর ঘর্ষণে হস্তীর কর্ণমূল তাড়িত করে, নিকটে এসে "ইনিই নিশ্চয় দেব রাজবাহন"—পূর্ব্বাদেশ মত এই বিচার করে, কৃতাঞ্জলি প্রণাম করল রাজবাহনকে। তার পরে অপহারবর্ম্মার দিকে দৃষ্টিনিবেশ করে বলল, "সখে, তোমার আদিষ্ট পথ অবলম্বন করে অঙ্গরাজের সহায়তার জন্যে রাজন্যদের উপস্থিত করিয়েছি। স্ত্রীলোক এবং শিশুদের বাদ দিয়ে হত-বিধ্বস্ত করতে এঁরা আর কিছু বাকি রাখেননি। এখন আমার কি কর্ত্তব্য বলে দাও।"

অপহারবর্ম্মা সানন্দে বললেন—"দেব, এই আজ্ঞাকারের প্রতি দৃষ্টিদান করে অনুগৃহীত করুন। এ আমার অভিন্ন-হৃদয় 'ধনমিত্র'। এখন অনুমতি দিন—ধনমিত্র নিজে গিয়ে অঙ্গরাজকে বন্ধন থেকে মুক্ত করুক, বিচ্ছিন্ন কোশবাহন একত্র করে রাজন্যদের আপ্যায়িত করে একান্তে সুখোপবেশন করুক।"

রাজবাহনের অনুমতি অনুসারে ধনমিত্র বিদায় নিল।

নগরের বহির্ভাগে বিরাট একটি রোহিনদ্রুমের ছায়ায় রাজবাহন ও অপহারবর্ম্মা চণ্ডপোতকের পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। পাটের কাপড়ের মত সেখানে গঙ্গার বালিয়াড়ীর রঙ। দুজনের ভারী মিষ্টি লাগতে লাগল গঙ্গার ঢেউ-ছোঁয়া আর্দ্র বাতাস। কিছুক্ষণ বিশ্রাম

করেছেন—এমন সময় ধনমিত্র উপস্থিত হয়ে প্রণাম করল।—তাঁর সঙ্গে এসেছেন উপহারবর্ম্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, এবং বিশ্রুত :—এসেছেন মৈথিল প্রহারবর্ম্মা, কাশীপতি কামপাল,—এসেছেন চম্পেশ্বর সিংহবর্ম্মা।

আনন্দ-শরের যেন খোঁচা খেয়ে লাফিয়ে উঠলেন রাজবাহন।

"এও কি সম্ভব! আমার সমস্ত মিত্রগণ একেবারে একসঙ্গে!"

এ যে একেবারে সূর্য্যোদয়!

পীড়িত আলিঙ্গনের উৎসব চলল ক্ষণকাল।

তার পরে সুহৃদ্ অপহারবর্ম্মা রাজবাহনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিথিলেশ্বরের, কাশীপতির এবং চম্পেশ্বরের। তাঁদের অভিনন্দন জানালেন রাজবাহন। পিতৃতুল্য তাঁরাও করলেন আশীর্ব্বাদ।

তার পর বন্ধুদের মধ্যে আরম্ভ হল প্রীতির সংলাপ, সংকথা। রাজবাহন প্রিয় বয়স্যদের কাছে হাস্য বর্ণনা করলেন নিজের, সোমদত্তের এবং পুষ্পোদ্ভবের কীর্ত্তিকাহিনী। স্থির হল—অন্য সকলে নিজের নিজের বৃত্তান্ত জানাবে—একে একে পরে।

প্রথমেই অপহারবর্ম্মা আরম্ভ করলেন তাঁর কাহিনী।

ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে রাজবাহনচরিতং নাম প্রথম উচ্ছ্বাসঃ।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

অপহারবর্ম্মা চরিত

হে দেব, ব্রাহ্মণের উপকার করবার উদ্দেশ্যে আপনি অসুরবিবর পাতালের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতে নেমে গেলেন। আমরা, আপনার মিত্রেরা, তখন স্থির করলুম, আপনাকে খুঁজে বার করতেই হবে। চারিদিকে আমরা অন্বেষণ-ব্যগ্র হয়ে পড়ি। আমিও পা দিয়ে মাটি মাড়াতে মাড়াতে এগিয়ে চলতে লাগলুম। শেষে একদা উপস্থিত হই অঙ্গদেশের গঙ্গাতটে—চম্পানগরীর ঠিক বাইরে। সেখানে দেখি, কয়েকজন লোক জটলা পাকিয়ে এক জায়গায় বসে আলাপে-সংলাপে মত্ত হয়ে উঠেছে। তাদের মুখে জানতে পাই 'মরীচি' নামে কোনো এক মহর্ষি নিকটেই আশ্রম রচনা করে রয়েছেন। অদ্ভুত তাঁর তপঃপ্রভাব, দিব্য চক্ষুর তিনি অধিকারী। মন বললে—"ওঁর কাছে যাও, রাজকুমার কোন্ পথে গেছেন উনিই নিশ্চয় বলে দিতে পারবেন।"

সেই আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলুম। আশ্রমে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল একটি অল্পবয়স আমগাছের ছায়ায় জনৈক উদ্বিগ্নবর্ণ তাপস বসে রয়েছেন—কেমন যেন উদ্বিগ্ন-উদ্বিগ্ন ভাব, আর সেই উদ্বিগ্নতার জন্যেই দেহের রংটাও বোধ হয় ফিকে হ'য়ে গেছে। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন; আমিও আতিথ্যলাভ করে ক্ষণকাল বিশ্রাম করলুম। তার পরে সেই তাপসকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি বলতে পারেন ভগবান মরীচি কোথায় আছেন? আমার একটি বন্ধু প্রসঙ্গে পড়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে; সে যে কোন পথে গেছে, মহর্ষির কাছ থেকে সেই খবরটি জানবার বাসনা রাখি। শুনেছি তাঁর আশ্চর্য্য জ্ঞান-বৈভব।"

আমার কথা শুনে তাপসটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, গাঢ় গরম নিশ্বাস। তার পরে ধীরে ধীরে বললেন—

"হ্যাঁ, ছিলেন বটে এই আশ্রমে সেই রকমের একটি মুনি। কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা বড় শোচনীয়।

একদিন এই আশ্রমে তিনি বসে আছেন, এমন সময় আশ্রমে দৌড়তে দৌড়তে প্রবেশ করে প্রসিদ্ধা বারাঙ্গনা যুবতী "কামমঞ্জরী।" অঙ্গপুরীর যৌবন-পাখী-ধরার সে যেন ফাঁদ-পাতা জাল। পয়োধরের উপরে তারার মত ফুল কেটে কেটে চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা টপ টপ্ করে পড়ছে। সর্ব্বহারার যেন প্রতিমা। মরীচি মুনির পায়ের কাছে সে লুটিয়ে পড়ল, ফাঁপা-ফাঁপা এলো চুলে ছেয়ে রইল মাটি। অবাক কাণ্ড! এক মুহূর্ত্ত যায়নি,—প্রবেশ করল তার মা, তার আপ্তবর্গ, কামমঞ্জরীর কাছে ভিক্ষা করতে করতে—দয়া। তারাও হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে।

মরীচি আর কি করবেন! দয়াপরবশ হয়ে গণিকাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কারণ কি তোমার এতবড় দুঃখের, এতবড় আর্ত্তির?" মুনির বাণীতে ছিল বৃষ্টিভেজা মহিমা।

লজ্জায় যেন নুয়ে পড়ে, বিষাদে যেন অবশ হয়ে, আবার গৌরবে যেন মাঝে মাঝে স্ফীত হয়ে গণিকা তাঁকে বললে,—"ভগবন, আমি আর ঐহিক সুখের আধার হয়ে থাকতে চাই না। আমার হৃদয়ে জেগেছে পারত্রিক (উষ্মিক) কল্যাণের কামনা। শুনেছি আর্ত্তদের উপর অনুগ্রহ করাই আপনার সম্পৎ। এখন থেকে ভগবানের শ্রীচরণই আমার শরণ হল।"

কিন্তু গণিকার জননী তখন আরম্ভ করে দিয়েছে ঘটা করে নমস্কার। পাকা চুলের জটায় তার হাতের অঞ্জলি একবার ছুঁচ্ছে, আবার পরেই ছুঁচ্ছে মাটি। হাত উঠছে আর পড়ছে। বলতে লাগল;—

"ভগবন, আপনার দাসীটা যা বলছে তাতে বোঝায়, সব দোষটাই যেন আমার। আমার দোষটা কোনখানে হল? একবার শুনুন, বিচার করে দেখুন। আমি ওকে বলেছি—এবং সে বলার অধিকার গণিকামাতার থাকে,—'নিজের ব্যবসা ভুলো না, কাজ গুছিয়ে নাও'। আমি গণিকার মা। কন্যার উপর মায়ের কি কোনো অধিকার নেই? নিশ্চয়ই আছে, দেশ-কালও বলে—আছে।

দুহিতার জন্মদিন থেকে আরম্ভ করে—বলি,—কে দেয় তাকে হলুদ মাখিয়ে, তেল মালিশ কোরে। দেহের ব্যবসাতে আমাকেই ত দেখতে হয় তার দেহের কাজ। খাওয়া-দাওয়া ঠিক করে দেয় কে? রোগ-তাপ দূর করে কে? জৌলুষ, জোর, রং এবং মেধা বাড়িয়ে, কে করে তার শরীরের ভরণ-পোষণ? পাঁচ বছরের পর থেকে বাপ বলতে কে ছিল—তাই জানেন না। আবার এখন বলে কিনা মায়ের কোনো অধিকার নেই!

জন্মদিন একটা পুণ্যদিন—সেদিনে পূজা-পাঠ করিয়ে তার পরে দিয়েছিলুম উৎসব। সাঙ্গ অনঙ্গ বিদ্যার পাঠ আমিই দেওয়াই। আমিই ওকে শেখাই কেমন করে নাচতে হয়, গাইতে হয়; বাজাতে, নাট্য করতে, ছবি আঁকতে, যাকে বলে স্বাদ নিতে, আমিই শেখাই; গন্ধ-ফুল তুলে এনে ঘর-সাজানোর বিদ্যা আমার কাছেই ওর পাওয়া। লিপি-জ্ঞানই বলুন, আর বচন-কৌশলই বলুন, সে-ও আমার বিনয়নেই হল। এখন ব্যাকরণ, ন্যায় এবং জ্যোতিষে ওর ভাসা-ভাসা জ্ঞান হয়েছে, আর জীবিকা-উপার্জ্জনের বিদ্যায়, ক্রীড়া-কৌশলে, সজীব এবং

নির্জ্জীব দ্যূতকলায় ও একেবারে পাকা হয়ে উঠেছে। বৈশ্বাসিক লোক মারফত ওকে শিখিয়েছি রতিবিজ্ঞার অভ্যন্তরকলা। শিখিয়েছিলুম বলেই ত ও এখন যাত্রা-উৎসবে ওসব প্রকাশ হতে পারে অপূর্ব্ব প্রসাধনে অলঙ্কার-বিভূষিতা হয়ে। ও যখন ফোলা-ফাঁপা ঢিলে-ঢালা পরিচ্ছদ পরে দাঁড়ায়, তখন চক্ষুধরদের চেয়ে দেখতেই হয়। শিক্ষক রেখে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত করতে পর্য্যন্ত ওকে শিখিয়েছি। ঐ কামমঞ্জরীর জন্যে কী যে না করেছি তা জানি না। শিল্পবিত্তকদের (প্রসিদ্ধ কলাবিৎ) আনুকূল্যে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছি ওর যশঃ; কার্ত্তান্তিক (লক্ষণজ্ঞ)দের দিয়ে ঘোষণা করিয়েছি ওর কল্যাণ-লক্ষণ; নাগরিক পুরুষদের সমবায়ে সমবায়ে পীঠমর্দ্দ, বিট, বিদূষক, ভিক্ষুকীদের মুখ দিয়ে ওর রূপ, ওর শীল, ওর মাধুর্য্যের প্রস্তাবনা;—সে ত আমারই করা। এখন বলে কিনা, এত যে করেছে, সেই মায়ের—মেয়ের উপর কোনো অধিকার নেই!

তরুণদের চোখ ত সেঁটে থাকবেই, কিন্তু মূল্যটি আদায় করতে—এই মা। আবার মানুষ ঠিক করে দিতে—সেই মা; রাগান্ধ বা উন্মাদিত মানুষটি স্বাধীন কি না জানতে হবে, তার রূপ, বয়স, অর্থশক্তি আছে কি না, সে প্রতারক কি না, তার হাত দরাজ কি না, শিল্পমাধুর্য্যের অধিকারী কি না সব খোঁজ নিতে —সেই মা। আবার মানুষটি হয়ত খুব গুণবান্ বটে কিন্তু অস্বতন্ত্র, অনেক কষ্ট করে সেই হেন শিকার ধরতে—সেই মা। অস্বতন্ত্র নাবালকের সঙ্গে গান্ধর্ব্ব মতে মিলন ঘটিয়ে তার গুরুজনদের কাছ থেকে শুল্ক হরণ করা, কামস্বীকৃত অর্থ আদায় করতে শেষ পর্য্যন্ত বিচারশালায় যাওয়া, তাতেও সেই মা! কত রকমের কাজ! প্রেমিকের জন্যে দুহিতা আমার একচারিণী-ব্রত যাপন করবেন—করিয়ে দে তার অনুষ্ঠান; নিত্য-নৈমিত্তিক প্রীতিদানের বাহুল্যে প্রেমিক তার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছে, বিচিত্র উপায় অবলম্বন করে মা চুরি করবে তার বাকি ধনটুকু! প্রেমের লোভী কিন্তু খরচে কৃপণ—(মা-গঙ্গা) এমন লোককে বাড়ী ছাড়া করা মায়ের কাজ; প্রতিবেশীকে দিয়ে কার্পণ্যের অপবাদ দিইয়ে প্রেমিকের অর্থ-ত্যাগশক্তিটিকে সন্ধুক্ষিত করা—মায়ের কাজ; নি-কড়ি থলি, প্রেমিক এসেছেন,—তাকে বাক্যের ঝাঁটাপি দিয়ে কাটা, তার নিন্দে রটানো, দুহিতাকে তার কাছে যেতে না দেওয়া, তার লজ্জায় গঞ্জনা দেওয়া, ছুতোনাতা করে তাকে অপমান করা, শেষ পর্য্যন্ত রাস্তায় বার করে দেওয়া—মায়ের কাজ। আবার যখন রাজার মত অনিন্দ্য আঢ্য নাগরিকেরা আসবেন, কী তাঁদের হুকুম করার ঘটা—তখন, যাও, বস গিয়ে তাঁদের সঙ্গে, এঁরা অর্থও করতে পারেন, অনর্থও করতে পারেন—তাই বিচার করতে করতে তাঁদের সঙ্গে কন্যার মিলনের বিধিব্যবস্থা করে দাও। কত কাজ!

কিন্তু প্রেমিকের উপর গণিকার পক্ষ থেকে ঢলে পড়াটা একেবারেই সাজে না। হোক না কেন সে উপভোগ্য প্রেমিক-রতন। যদি ঢলে পড়ে, সেখানে মাতার বা পিতামহীর শাসন নিশ্চয়ই চলে। এই ত হল বিধি। ব্রহ্মার দিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু কামমঞ্জরীর ব্যবস্থা হয়েছে অন্য রকমের। নিজের ধর্ম্ম, জীবিকা, ভুলে গেল। কোথা থেকে হঠাৎ এল এক আগন্তুক বিপ্র যুবক, রূপ-মাত্র তার ধন, অমনি আমার মেয়েটি নিজেই খরচ করতে লেগে গেল—. দেখতে দেখতে তিন মাস মিলনেই কাটিয়ে দিলে। আমি তাকে বললুম—ব্রাহ্মণটার কাছ থেকে কিছু অর্থ নে,—একেবারে টেই খুন। নিজের কুটুম্বদের দূর করে দিলে।—আমি তাকে মানা করে বললুম, দেখ্, এ তোর ভাল বুদ্ধি নয়, এতে ভাল হবে না—ব্যস, মেয়ে আমার চললেন বনবাসে।

ভগবন, এই আমার সেই মেয়ে,—'কামমঞ্জরী'। একেবারে দৃঢ় পণ করে বসে আছে। আর এদিকে চেয়ে দেখুন,—এই দেখুন সেই সব কুটুম্বেরা, এদের আর অন্য গতি নেই, না খেতে পেয়ে এরা মরবে।" এই বলতে বলতে কাঁদতে লাগল মা। অনুকম্পা হল তাপসের। মরীচি মুনি তখন বারাঙ্গনাকে বললেন,—

"ভদ্রে, বনবাস একটি দুঃখের খনি। তার ফল মোক্ষ অথবা স্বর্গ। ঐ দুটির মধ্যে প্রথমটিকে পাওয়ার পথ হচ্ছে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। প্রায়ই দেখা যায় জ্ঞানের পথ বড় দুরূহ। দ্বিতীয়টিকে পাওয়া সকলের পক্ষেই সহজ, যদি তারা কুল-ধর্ম্ম মেনে জীবনের পথে চলে। তাই বলছি, মোক্ষের চিন্তা তুমি ছেড়ে দাও, ওর আরম্ভ থেকেই তুমি অশক্যা হবে—তোমার মা যা বলছেন তাই কর।"

কামমঞ্জরী তখন বললে—"ভগবানের পাদমূলে আমার যখন শরণ নেওয়া হল না, তখন হিরণ্যরেতাই এই দীন-হীনার শরণ্য হলেন।"—

মরীচি মুনি তখন মানিনীর মরণচিন্তা লক্ষ্য কোরে ধ্যান করে গণিকামাতাকে বললেন, "সম্প্রতি ঘরে ফিরে যাও, কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর। তোমার মেয়েটি সুকুমারী। চিরটা কাল সুখই কেবল ভোগ করে এসেছে। দু-চার দিনের অরণ্যবাসে উদ্ব্যস্ত হয়ে আত্মস্থ হবে। আমিও বারম্বার ওকে বোঝাব।"

কামমঞ্জরীর মা এবং স্বজনবর্গ নগরীতে ফিরে গেল।

গণিকা ধীরে ধীরে আশ্রমধর্ম্ম পালন করতে লাগল।

তার ভক্তির মধ্যে লঘুতার লেশও দেখা গেল না; অঙ্গে দিল একখানি ধৌত শুভ্র বাস এবং ধৌত শুভ্র উত্তরীয়। শরীর-সংস্কারেও তেমন যেন অত্যাদর নেই।

আলবাল পূর্ণ করে ছোট ছোট বনতরুতে, চারাগাছে জল দিত, দেবতাপূজার ফুল তুলত, কামশাসন মহাদেবের জন্য গন্ধমাল্যের রচনা করে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে নৃত্য-গীত এবং বাদ্যের প্রকাশন করে অনেক বিকল্প পূজা-পাঠ করত।

মরীচি ঋষির নিকটে বসে অধ্যাত্মবাদ ও ত্রিবর্গসম্বন্ধী কথা নিয়ে সংলাপের আনুকূল্যে কামমঞ্জরী খুব অল্পদিনের মধ্যেই অনুরঞ্জিত করে তুলল মহর্ষির মন।

একদা এই রকমের অনুরঞ্জিত হয়ে রয়েছে মহর্ষির মন, এবং তাঁরা দুজনে রয়েছেন নিভৃতে, এমন সময় কামমঞ্জরী তাঁকে উপলক্ষ্য করে বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, "লোকেরা কি মূঢ়? ধর্ম্ম দিয়ে অর্থ আর কামকে কি কেউ কবে দেখে? ধর্ম্ম দিয়ে কি গণনা করা চলে অর্থ আর কামকে?"

মরীচি তখন প্রশ্ন করলেন—

"সুকন্যা, তোমার মতে অর্থ আর কামের চেয়ে ধর্ম্ম কতগুণ বড়?"

লজ্জামধুর হল কামমঞ্জরীর ভাষণ—

"আশ্চর্য্য, আমার মত একটি সাধারণীর কাছ থেকে আপনার মত

মহর্ষি ত্রিবর্গের লাভালাভ বিষয়ে জ্ঞান পেতে চায়? আপনার এই প্রেরণা প্রকারান্তরে দাসীকে অনুগ্রহ দেখানো নয় কি? যখন প্রশ্নই করেছেন তখন উত্তর দেবার চেষ্টা করি। এ কথা নিশ্চয়—যে, ধর্ম্ম না থাকলে অর্থ আর কামের উৎপত্তি হয় না। ধর্ম্ম যখন অর্থ-কামের অপেক্ষা রাখে না, তখন সেই ধর্ম্ম প্রসব করে কেবল মাত্র নিবৃত্তি-সুখ, সেই ধর্ম্মে সাধ্য হচ্ছে একমাত্র আত্ম-তত্ত্বের সমাধান। অর্থ এবং কামের মত বাহ্য সাধন-বস্তুর অত্যন্ত অধীন হয়ে পড়ে না ধর্ম্ম। যাঁরা তত্ত্বদর্শন করেন তাঁরা উপবৃংহিত করেছেন—

'অর্থ এবং কামকে যেমন করেই না অনুষ্ঠান কর, তারা ধর্ম্মকে বাধা দিতে পারে না। বাধা দিলেও ধর্ম্ম অল্পপ্রতিসমাহিত হয়েই অর্থ-কামের দোষকে নিধন করে দেয়, এবং প্রভূত শ্রেয়ের হয় পরিপন্থী। সেই জন্যেই দেখা যায়—পিতামহ ব্রহ্মার তিলোত্তমার প্রতি অভিলাষ, ভবানীপতির সহস্র সহস্র মুনিভার্য্যাকে সংদূষণ, পদ্মনাভ বিষ্ণুর ষোড়শ-সহস্র অন্তঃপুরবিহার, নিজের দুহিতার উপরও প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রণয়বৃত্তি, ইন্দ্রের অহল্যাজারতা, চন্দ্রের গুরু-তল্পগমন—সূর্য্যের বড়বা-লঙ্ঘন, বৃহস্পতির উতথ্যের ভার্য্যাকে অভিসরণ, অনিলের সিংহিণীসমাগম, পরাশরের দাশকন্যা-দূষণ, পরাশর-পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভ্রাতৃবধূ-সম্ভোগ, এবং অত্রিমুনির মৃগীসমাগম।'

অমরেরাও অনেক ব্যাপারে অসুরদের জেনে-শুনেই ঠকিয়েছেন কিন্তু তাতে তাঁদের ধর্ম্মহানি ঘটেনি। মন যদি ধর্ম্মপূত হয়, আকাশের মত তাতে ধুলো লাগে না। সেই জন্যেই আমার মনে হয় অর্থ এবং কাম, ধর্ম্মের একশ ভাগেরও এক ভাগকে স্পর্শ করতে পারে না।"

কামমঞ্জরীর মুখে এই সব কথা শুনে মরীচির কেমন যেন ভাবান্তর হল। অনুরাগ, ইচ্ছাবৃত্তি বৃদ্ধি পেল। তিনি বললেন—

"বিলাসিনি, ঠিকই তুমি দেখেছ। তত্ত্বদর্শীরা যে ধর্ম্মকে অনুসরণ করেন, বিষয়ভোগ সেই ধর্ম্মকে নষ্ট করতে পারে না। কিন্তু আমার জন্ম থেকেই অর্থ এবং কাম ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞ। আমি অর্থ এবং কামকে জানতে চাই, কি তাদের স্বরূপ, কেমন তাদের পরিজন-পরিবার, কিই বা তাদের ফল।"

গণিকা তখন বললে,—

"অর্থের আত্মরূপ হচ্ছে অর্জ্জন, বর্দ্ধন এবং রক্ষণ; কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, সন্ধি, বিগ্রহ ইত্যাদি এর পরিবার; এবং এর ফল হচ্ছে তীর্থে তীর্থে ঘুরে, সৎপাত্রে অর্থ-দান।

কাম কিন্তু বিষয়াসক্তচিত্ত স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে একটি অতিশয় সুখস্পর্শ-বিশেষ। এর পরিবার,—জগতের যাবতীয় রমণীয় ও উজ্জ্বল বস্তু। এর ফল আবার,—পরম একটি আহ্লাদ, প্রত্যক্ষ সুখ। এই আহ্লাদের জন্ম হয় আলিঙ্গন, চুম্বন, পেষণ, মন্থন থেকে; এই পরশটিও সুমধুর। মনে হয় যেন সার্থক হয়ে গেছি। এর অনুভূতি কেবল নিজের মধ্য দিয়ে। এই সুখটুকু পাবার আকাঙ্ক্ষায় বিশিষ্ট বিশিষ্ট মানুষও কি যে না করে বসেন জানি না! তাঁরা কষ্ট সহ্য করেন, তপস্যা করেন, মহাদানে সর্ব্বস্ব খোয়ান। এই সুখটুকুর জন্যেই ব্যক্তির বিরাজন কত হয়, জীবন কত সমুজ্জ্বলতর।"

এই সুনিভৃত আলাপনের পরে নিয়তিই প্রবল হল;—না, রমণীর চাতুর্য্যই জয়ী হল;—না, ঋষি-বুদ্ধির বিভ্রমই ঘটল—জানি না, কিন্তু মরীচির অনাদর ঘটল নিজের তপশ্চরণে। তিনি ভালবেসে ফেললেন। তাঁর মিলন হল কামমঞ্জরীর সঙ্গে। অনেক দূর গড়াল এই বিহার। মরীচির যেন লোপ পেয়ে গেল বুদ্ধিবৃত্তি। শেষে একদা তাঁকে প্রবহণে চড়িয়ে কামমঞ্জরী উদার-শোভা রাজবীথি দিয়ে ফিরে চলে গেল নিজের ভবনে চম্পানগরীতে। ঘোষণা করিয়ে দিলে, "আগামী কাল কামোৎসব হবে।"

মহর্ষি মরীচির কিন্তু তখন লোপ পেয়ে গেছে বুদ্ধিবৃত্তি, হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান।

পরের দিন যখন মরীচিকে স্নান করিয়ে চন্দন মাখানো হল, তাঁর মাথায় পরানো হল বকুল ফুলের বিনোদমাল্য, তখনও পর্য্যন্ত তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর কেবল মনে হতে লাগল—"কামোৎসবে প্রণয়ীর কৃত্য তিনি করছেন।" হাত-পা মেলে, নিজের কাজ নিজে করবার মত সাধারণী প্রেরণাও তাঁর ছিল না। কামমঞ্জরীর ক্ষণিক অদর্শনও তাঁর অসহ্য, তাঁকে বিহ্বল করে দেয়।

তার পরে কামমঞ্জরী এল। প্রকাণ্ড সমৃদ্ধ রাজপথ দিয়ে যখন কামমঞ্জরী মরীচি ঋষিকে উৎসব-সমাজে নিয়ে গেল, তখন ঋষির বুঝি আনন্দ আর ধরে না। অপূর্ব্ব সুখের বাতাসে তাঁর হৃদয়খানি দুলছে। নৃপতি ছিলেন উৎসব-সমাজের উপবন-প্রান্তে। তাঁর চতুর্দ্দিকে এক শত যুবতী। কামমঞ্জরী ঋষি মরীচিকে নিয়ে সেইখানে এল। ব্যাপার দেখে মৃদু-মন্দ হেসে উঠলেন মহারাজ। তার পরে বললেন—

"ভদ্রে, ভগবানকে নিয়ে এইখানেই আসন পরিগ্রহ কর।" কামমঞ্জরী মহারাজকে সবিভ্রম প্রণাম করে মৃদু হেসে সেইখানেই বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরেই একটি বরনারী (উত্তমাঙ্গনা) গাত্রোত্থান করে রাজার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "দেব, কামমঞ্জরী আমাকে জিতে নিয়েছে। কথা দিয়েছিলুম। সেই কথামত আজ থেকে আপনার সমক্ষেই আমি কামমঞ্জরীর দাসীবৃত্তি স্বীকার করে নিলুম।"

চতুর্দ্দিকে উৎসব-আমোদীদের মধ্যে জেগে উঠল বিস্ময়, হর্ষ, কলরব এবং কোলাহল।

কামমঞ্জরীকে মহারাজ হৃষ্টচিত্তে অনুগ্রহদানের বিধান করলেন—মহার্ঘ অলঙ্কার এবং পরিবর্হ। পৌর-বারাঙ্গনাদের জনতা লক্ষমুখী হয়ে উঠল প্রশংসায়। বাড়ীতে ফিরে না গিয়ে কামমঞ্জরী তখন ঋষিকে বললে—

"ভগবন, এই নিন্ আমার অঞ্জলিবদ্ধ বিদায়-প্রণাম। আপনার দাসী চিরদিনের জন্যে অনুগৃহীত হয়ে গেছে। নিজের স্বার্থের জন্যে তাকে এই রকমের আচরণ করতে হয়েছিল।"

ঋষির আবার প্রণয়! সে প্রণয়ে যেন ভেঙে পড়ল মেঘ-চমকানো বজ্র। স্তম্ভিত-বিস্ময়ে ঋষি বললেন, "প্রিয়ে, এ আবার কি হয়ে গেল? কোথা থেকে এল তোমার এ ঔদাসীন্য? বাতাসে মিলিয়ে গেল কি আমার উপর তোমার অসাধারণ অনুরাগ?"

কামমঞ্জরীর রাঙা ঠোঁটের মৃদু হাস্যভঙ্গি তখন বললে—

"মহারাজের সমক্ষে যে বিদুষীটি আমার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে, তার এবং আমার মধ্যে একদিন হয়েছিল, যাকে বলে সংঘর্ষ। হেসে বলেছিল 'মহর্ষি মরীচির ডাঁটা ভাঙতে পারিস্, তবে বুঝব তোকে।" আমি বলেছিলুম, 'বেশ, যদি পারি তবে তুই দাসী হবি।' ও বলেছিল, 'তাই'। মহর্ষি, আপনার কৃপায়, অনুগ্রহে, সেই প্রতিজ্ঞা আমার সফল হয়েছে।"

মরীচির মন ভেঙে পড়ল।—হায় হায়, কে যেন তাকে আসন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেছে! হঠাৎ মনে হল কি ভুলপথেই না চলেছে তাঁর বুদ্ধি? চোখ ভরে, মন ভরে নেমে এল পশ্চাৎতাপ অনুশোচনা। কাম-রাজত্বের এই যে দেখা যায় বিরাট গৃহখানি, এর নীচে কি মাটি নেই, রয়েছে কেবল শূন্যতা?

"মহাভাগ, কামবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে যে মুনিকে দিন কাটাতে হয়েছে—আমিই সেই মরীচি। আজও আমার মধ্য দিয়ে প্রণয় এবং অনুরাগের নদী শীর্ণকলেবরে বয়ে চলেছে। কিন্তু আমি সুখী, সেই বারাঙ্গনা আমাকে আজ বৈরাগ্যের পদে উন্নীত করে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, অতি শীঘ্রই আমার আত্মা সাধন-ক্ষম হয়ে উঠবে। আপনার অভীপ্সা তখন আমি মেটাতে পারবো। আমার অনুরোধ, কয়েক দিন আপনি অপেক্ষা করুন এই অঙ্গপুরী চম্পানগরীতে।"

সখা, এমন সময় অস্তমিত ঋষি-বাণীর সঙ্গে সঙ্গে ঘনিয়ে এল সূর্য্যাস্ত। ফুর-ফুর করে জ্বলতে লাগলো ক্লান্ত রবির অবসন্ন অনুরাগ,—যেন বলল, "ওগো সন্ধ্যা, তোমার তমিস্রার স্পর্শ আমায় দিও না।" ভাষণটির বৈরাগ্য যেন সঙ্কুচিত করে দিয়ে যায় পদ্মফুলের অরণ্যকে।

মুনির অনুশাসন মত সন্ধ্যা-বন্দনা সাঙ্গ করে অনুরূপ কথাবার্ত্তা এবং সুখসুপ্তির মধ্য দিয়ে সেই রাত্রি আমার কাটে। তার পরে রাত্রিশেষে যখন পূর্ব্বপর্ব্বতের সানুদেশে কল্পদ্রুমের নতুন পাতার মত ফুটে উঠল দাবকল্প অরুণকিরণের ছটা, তখন ঋষি মরীচিকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে ধরলুম চম্পানগরীতে যাবার রাজপথ। চলতে চলতে দেখতে পেলেম রাস্তার পাশেই একটি ক্ষপণকদের বিহার। বিহারটির বাইরেই রক্তাশোকের গাছ। জায়গাটি নির্জ্জন, তবে জনৈক ক্ষপণক সেখানে বসে রয়েছে। এমন কুশ্রী তার চেহারা, যে কি বলব। তার কুশ্রীতাই আমাকে যেন টেনে নিয়ে গেল তার কাছে। কৃপণবর্ণ, মনে কিসের যেন গভীর ব্যথা, আচার-নিয়ম বহুদিন পালন করেনি। চোখে পড়ল, তার বুকের উপর চোখের জলের মলিন পঙ্ক। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলুম,

"মহাশয়, আমি বুঝতে পারছি না; তপস্যার মধ্যে ক্রন্দন কেমন করে স্থান পায়? যদি অসুবিধা না হয় তা হলে এই রহস্যটি সমাধান করে দিন। আপনার শোকের কারণটি আমাকে বলুন।"

লোকটি তখন বললে—"সৌম্য, শুনুন। এই চম্পানগরীতে 'নিধিপালিত' নামীয় এক শ্রেষ্ঠী থাকেন, আমি তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র 'বসুপালিত'। কিন্তু এখানে আমাকে সবাই "বিরূপক" বলে ডাকে। কেন যে, বোধ হয় বুঝতে পারছেন। আমার মত কুশ্রী পুরুষ ভূভারতে বুঝি আর নেই। আবার এই চম্পানগরীতেই আর একটি পুরুষ আছেন—"সুন্দরক" তার নাম। সত্যিই সে সুন্দর। রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর, কলা-বিদ্যায় সুন্দর, কিন্তু ধনৈশ্বর্য্যে সে অতিপুষ্ট নয়, অসুন্দর। আপনি বোধ হয় জানেন প্রতিনগরেই একদল ধূর্ত্ত থাকে, যারা ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে নিজেদের পেট ভরায়।—যাদের বলে 'বৈরোপজীবি।' আমার অর্থ এবং সুন্দরকের দৈহিক কান্তিকে নিমিত্ত করে, তারা সফল হল শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে। সেও ঘটল আবার উৎসব-সমাজে। অপমানের পর অপমান। কড়া কথার উত্তরে কড়া কথা! শেষে সেই পৌরধূর্ত্তেরা আমাদের দুজনকে কোনো রকমে থামিয়ে দিয়ে বলে,—

'পৌরুষের মূল!—ও সে বস্তুও নয়, বিত্তও নয়। তাকেই আমরা পুরুষ বলে মানতে রাজি আছি যার যৌবন-প্রার্থিনী হবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গণিকা। বেশ, এই আমাদের চম্পানগরীতে ঐ ত রয়েছে যুবতীদের মুকুটমণি কামমঞ্জরী। সে যাকে কামনা করে বরণ করে নেবে সেই হরণ করবে সৌভাগ্য-পতাকা।'

তখন আমরা দুজনেই দূত প্রেরণ করি কামমঞ্জরীর কাছে। আমার দূতই সফল হল। খবর এল, আমিই কামমঞ্জরীর মন্মথোন্মাদনার খনি। তার পরে একদা আমি এবং সুন্দরক বসে রয়েছি, উৎসব-সমাজে প্রবেশ করল কামমঞ্জরী। তার কটাক্ষের প্রান্তে নীলপদ্মের সঙ্কিত মহিমা। আমার অঙ্গে এসে লাগল সেই কটাক্ষের নীলিমা। আর সুন্দরকের সুন্দর মুখখানি লজ্জায়, ক্ষোভে নীচু হয়ে গেল। তখনই বুঝেছিলুম কী সুখ ছড়িয়ে দিয়ে যায় সৌভাগ্য।

মহাশয়, দেখতে দেখতে কামমঞ্জরী আমার ঈশ্বরী হয়ে উঠল। আমার সর্ব্বস্ব তার পায়ের তলায়, আমার গৃহ তার করায়ত্ত, আমার জ্ঞাতিবর্গ তার সেবাদাস, আমার দেহ তার অঙ্কলীন, আমার প্রাণ তার মুঠোর মধ্যে। প্রথমে বুঝিনি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এসব ক্ষেত্রে যা হয় তাই হল আমার। আমার—বলতে যখন আর কিছু রইল না, তখন আমি নিজেই নিজের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে গেলুম। সর্ব্বহারা কৌপীন-সম্বল। রাস্তার লোকেদের ঠোঁট থেকে একটা সার্থক উপহাসের ঢেউ আমার গায়ে এসে ধাক্কা মারতে লাগল। সইতে পারলুম না, অসহ্য হল পৌরবৃদ্ধদের ধিক্কার।

জৈনায়তনে এসে উঠলুম। জনৈক মুনি আমাকে উপদেশ দেন—'মোক্ষমার্গ নাও, গৃহহীনদের এই বেশই ভাল।' কৌপীন ত্যাগ করে বৈরাগীর বেশ নিলুম। কিন্তু তাও সহ্য হল না। সমস্ত দেহের চামড়ার উপর সেই জমাট ময়লার পাঁক—সহ্য হল না। এই জৈনধর্ম্মে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে উপড়িয়ে ফেলতে হয় মাথার এবং গায়ের চুল। উঃ, সে কি ব্যথা,—সহ্য হল না। আর সব চেয়ে বড় কষ্ট, ক্ষিদে পেলেও খাবার নেই, পিপাসা পেলেও ঠোঁটে জল ঠেকাতে পাবে না;—আর পারলুম না। স্নান নেই, আসন নেই, শয়ন নেই, ভোজন নেই,—নতুন-ধরা হাতীর মত নিষ্পীড়িত একটা যন্ত্রণায় উদ্বেজিত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত ভাবতে বসেছি—

'আমি দ্বিজাতি বৈশ্য। পাষণ্ডদের পথে চলা আমার স্বধর্ম্ম নয়। আমার পূর্ব্বজেরা চলতেন শ্রুতিস্মৃতিবিহিত পথ ধরে। কিন্তু কি কপালই না আমার! অঙ্গে একটা ভদ্র পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত

মহর্ষি ত্রিবর্গের লাভালাভ বিষয়ে জ্ঞান পেতে চায়? আপনার এই প্রেরণা প্রকারান্তরে দাসীকে অনুগ্রহ দেখানো নয় কি? যখন প্রশ্নই করেছেন তখন উত্তর দেবার চেষ্টা করি। এ কথা নিশ্চয়—যে, ধর্ম্ম না থাকলে অর্থ আর কামের উৎপত্তি হয় না। ধর্ম্ম যখন অর্থ-কামের অপেক্ষা রাখে না, তখন সেই ধর্ম্ম প্রসব করে কেবল মাত্র নিবৃত্তি-সুখ, সেই ধর্ম্মে সাধ্য হচ্ছে একমাত্র আত্ম-তত্ত্বের সমাধান। অর্থ এবং কামের মত বাহ্য সাধন-বস্তুর অত্যন্ত অধীন হয়ে পড়ে না ধর্ম্ম। যাঁরা তত্ত্বদর্শন করেন তাঁরা উপবৃংহিত করেছেন—

'অর্থ এবং কামকে যেমন করেই না অনুষ্ঠান কর, তারা ধর্ম্মকে বাধা দিতে পারে না। বাধা দিলেও ধর্ম্ম অল্পপ্রতিসমাহিত হয়েই অর্থ-কামের দোষকে নিধন করে দেয়, এবং প্রভূত শ্রেয়ের হয় পরিপন্থী। সেই জন্যেই দেখা যায়—পিতামহ ব্রহ্মার তিলোত্তমার প্রতি অভিলাষ, ভবানীপতির সহস্র সহস্র মুনিভার্য্যাকে সংদূষণ, পদ্মনাভ বিষ্ণুর ষোড়শ-সহস্র অন্তঃপুরবিহার, নিজের দুহিতার উপরও প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রণয়বৃত্তি, ইন্দ্রের অহল্যাজারতা, চন্দ্রের গুরু-তল্পগমন—সূর্য্যের বড়বা-লঙ্ঘন, বৃহস্পতির উতথ্যের ভার্য্যাকে অভিসরণ, অনিলের সিংহিণীসমাগম, পরাশরের দাশকন্যা-দূষণ, পরাশর-পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভ্রাতৃবধূ-সম্ভোগ, এবং অত্রিমুনির মৃগীসমাগম।'

অমরেরাও অনেক ব্যাপারে অসুরদের জেনে-শুনেই ঠকিয়েছেন কিন্তু তাতে তাঁদের ধর্ম্মহানি ঘটেনি। মন যদি ধর্ম্মপূত হয়, আকাশের মত তাতে ধূলো লাগে না। সেই জন্যেই আমার মনে হয় অর্থ এবং কাম, ধর্ম্মের একশ ভাগেরও এক ভাগকে স্পর্শ করতে পারে না।"

কামমঞ্জরীর মুখে এই সব কথা শুনে মরীচির কেমন যেন ভাবান্তর হল। অনুরাগ, ইচ্ছাবৃত্তি বৃদ্ধি পেল। তিনি বললেন—

"বিলাসিনি, ঠিকই তুমি দেখেছ। তত্ত্বদর্শীরা যে ধর্ম্মকে অনুসরণ করেন, বিষয়ভোগ সেই ধর্ম্মকে নষ্ট করতে পারে না। কিন্তু আমার জন্ম থেকেই অর্থ এবং কাম ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞ। আমি অর্থ এবং কামকে জানতে চাই, কি তাদের স্বরূপ, কেমন তাদের পরিজন-পরিবার, কিই বা তাদের ফল।"

গণিকা তখন বললে,—

"অর্থের আত্মরূপ হচ্ছে অর্জ্জন, বর্দ্ধন এবং রক্ষণ; কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, সন্ধি, বিগ্রহ ইত্যাদি এর পরিবার; এবং এর ফল হচ্ছে তীর্থে তীর্থে ঘুরে, সৎপাত্রে অর্থ-দান।

কাম কিন্তু বিষয়াসক্তচিত্ত স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে একটি অতিশয় সুখস্পর্শ-বিশেষ। এর পরিবার,—জগতের যাবতীয় রমণীয় ও উজ্জ্বল বস্তু। এর ফল আবার,—পরম একটি আহ্লাদ, প্রত্যক্ষ সুখ। এই আহ্লাদের জন্ম হয় আলিঙ্গন, চুম্বন, পেষণ, মন্থন থেকে; এই স্মরণটিও সুমধুর। মনে হয় যেন সার্থক হয়ে গেছি। এর অনুভূতি কেবল নিজের মধ্য দিয়ে। এই সুখটুকু পাবার আকাঙ্ক্ষায় বিশিষ্ট বিশিষ্ট মানুষও কি যে না করে বসেন জানি না। তাঁরা কষ্ট সহ্য করেন, তপস্যা করেন, মহাদানে সর্ব্বস্ব খোয়ান। এই সুখটুকুর জন্যেই ঘটেছে নিদারুণ কত যুদ্ধ, ভীষণ কত সমুদ্রলঙ্ঘন।"

এই সুনিভৃত আলাপনের পরে নিয়তিই প্রবল হল;—না, রমণীর চাতুর্য্যই জয়ী হল;—না, ঋষি-বুদ্ধির বিভ্রমই ঘটল—জানি না, কিন্তু মরীচির অনাদর ঘটল নিজের তপশ্চরণে। তিনি ভালবেসে ফেললেন। তাঁর মিলন হল কামমঞ্জরীর সঙ্গে। অনেক দূর গড়াল এই বিহার। মরীচির যেন লোপ পেয়ে গেল বুদ্ধিবৃত্তি। শেষে একদা তাঁকে প্রবহণে চড়িয়ে কামমঞ্জরী উদার-শোভা রাজবীথি দিয়ে ফিরে চলে গেল নিজের ভবনে চম্পানগরীতে। ঘোষণা করিয়ে দিলে, "আগামী কাল কামোৎসব হবে।"

মহর্ষি মরীচির কিন্তু তখন লোপ পেয়ে গেছে বুদ্ধিবৃত্তি, হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান।

পরের দিন যখন মরীচিকে স্নান করিয়ে চন্দন মাখানো হল, তাঁর মাথায় পরানো হল বকুল ফুলের বিনোদমাল্য, তখনও পর্য্যন্ত তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর কেবল মনে হতে লাগল—"কামোৎসবে প্রণয়ীর কৃত্য তিনি করছেন।" হাত-পা মেলে, নিজের কাজ নিজে করবার মত সাধারণী প্রেরণাও তাঁর ছিল না। কামমঞ্জরীর ক্ষণিক অদর্শনও তাঁর অসহ্য, তাঁকে বিহ্বল করে দেয়।

তার পরে কামমঞ্জরী এল। প্রকাণ্ড সমৃদ্ধ রাজপথ দিয়ে যখন কামমঞ্জরী মরীচি ঋষিকে উৎসব-সমাজে নিয়ে গেল, তখন ঋষির বুঝি আনন্দ আর ধরে না। অপূর্ব্ব সুখের বাতাসে তাঁর হৃদয়খানি দুলছে। নৃপতি ছিলেন উৎসব-সমাজের উপবন-প্রান্তে। তাঁর চতুর্দ্দিকে এক শত যুবতী। কামমঞ্জরী ঋষি মরীচিকে নিয়ে সেইখানে এল। ব্যাপার দেখে মৃদু-মন্দ হেসে উঠলেন মহারাজ। তার পরে বললেন—

"ভদ্রে, ভগবানকে নিয়ে এইখানেই আসন পরিগ্রহ কর।" কামমঞ্জরী মহারাজকে সবিভ্রম প্রণাম করে মৃদু হেসে সেইখানেই বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরেই একটি বরনারী (উত্তমাঙ্গনা) গাত্রোত্থান করে রাজার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "দেব, কামমঞ্জরী আমাকে জিতে নিয়েছে। কথা দিয়েছিলুম। সেই কথামত আজ থেকে আপনার সমক্ষেই আমি কামমঞ্জরীর দাসীবৃত্তি স্বীকার করে নিলুম।"

চতুর্দ্দিকে উৎসব-আমোদীদের মধ্যে জেগে উঠল বিস্ময়, হর্ষ, কলরব এবং কোলাহল।

কামমঞ্জরীকে মহারাজ হৃষ্টচিত্তে অনুগ্রহদানের বিধান করলেন—মহার্ঘ অলঙ্কার এবং পরিবর্হ। পৌর-বারাঙ্গনাদের জনতা লক্ষমুখী হয়ে উঠল প্রশংসায়। বাড়ীতে ফিরে না গিয়ে কামমঞ্জরী তখন ঋষিকে বললে—

"ভগবন, এই নিন্ আমার অঞ্জলিবদ্ধ বিদায়-প্রণাম। আপনার দাসী চিরদিনের জন্যে অনুগৃহীত হয়ে গেছে। নিজের স্বার্থের জন্যে তাকে এই রকমের আচরণ করতে হয়েছিল।"

ঋষির আবার প্রণয়! সে প্রণয়ে যেন ভেঙে পড়ল মেঘ-চমকানো বজ্র। স্তম্ভিত-বিস্ময়ে ঋষি বললেন, "প্রিয়ে, এ আবার কি হয়ে গেল? কোথা থেকে এল তোমার এ ঔদাসীন্য? বাতাসে মিলিয়ে গেল কি আমার উপর তোমার অসাধারণ অনুরাগ?"

কামমঞ্জরীর রাঙা ঠোঁটের মৃদু হাস্যভঙ্গি তখন বললে—

"মহারাজের সমক্ষে যে বিদূষীটি আমার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে, তার এবং আমার মধ্যে একদিন হয়েছিল, যাকে বলে সংঘর্ষ। হেসে বলেছিল 'মহর্ষি মরীচির ডাঁটা ভাঙতে পারিস্, তবে বুঝব তোকে।' আমি বলেছিলুম, 'বেশ, যদি পারি তবে তুই দাসী হবি।' ও বলেছিল, 'তাই'। মহর্ষি, আপনার কৃপায়, অনুগ্রহে, সেই প্রতিজ্ঞা আমার সফল হয়েছে।"

মরীচির মন ভেঙে পড়ল।—হায় হায়, কে যেন তাকে আসন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেছে! হঠাৎ মনে হল কি দুষ্পথেই না চলেছে তাঁর বুদ্ধি? চোখ ভরে, মন ভরে নেমে এল পশ্চাৎতাপ অনুশোচনা। কাম-রাজত্বের এই যে দেখা যায় বিরাট গৃহখানি, এর নীচে কি মাটি নেই, রয়েছে কেবল শূন্যতা?

"মহাভাগ, কামবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে যে মুনিকে দিন কাটাতে হয়েছে—আমিই সেই মরীচি। আজও আমার মধ্য দিয়ে প্রণয় এবং অনুরাগের নদী শীর্ণকলেবরে বয়ে চলেছে। কিন্তু আমি সুখী, সেই বারাঙ্গনা আমাকে আজ বৈরাগ্যের পদে উন্নীত করে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, অতি শীঘ্রই আমার আত্মা সাধন-ক্ষম হয়ে উঠবে। আপনার অভীপ্সা তখন আমি মেটাতে পারবো। আমার অনুরোধ, কয়েক দিন আপনি অপেক্ষা করুন এই অঙ্গপুরী চম্পানগরীতে।"

সখা, এমন সময় অস্তমিত ঋষি-বাণীর সঙ্গে সঙ্গে ঘনিয়ে এল সূর্য্যাস্ত। ফুর-ফুর করে জ্বলতে লাগলো ক্লান্ত রবির অবসন্ন অনুরাগ,—যেন বলল, "ওগো সন্ধ্যা, তোমার তমিস্রার স্পর্শ আমায় দিও না।" ভাষণটির বৈরাগ্য যেন সঙ্কুচিত করে দিয়ে যায় পদ্মফুলের অরণ্যকে।

মুনির অনুশাসন মত সন্ধ্যা-বন্দনা সাঙ্গ করে অনুরূপ কথাবার্তা এবং সুখসুপ্তির মধ্য দিয়ে সেই রাত্রি আমার কাটে। তার পরে রাত্রিশেষে যখন পূর্ব্বপর্ব্বতের সানুদেশে কল্পদ্রুমের নতুন পাতার মত ফুটে উঠল দাবকল্প অরুণকিরণের ছটা, তখন ঋষি মরীচিকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে ধরলুম চম্পানগরীতে যাবার রাজপথ। চলতে চলতে দেখতে পেলেম রাস্তার পাশেই একটি ক্ষপণকদের বিহার। বিহারটির বাইরেই রক্তাশোকের গাছ। জায়গাটি নির্জ্জন, তবে জনৈক ক্ষপণক সেখানে বসে রয়েছে। এমন কুশ্রী তার চেহারা, যে কি বলব। তার কুশ্রীতাই আমাকে যেন টেনে নিয়ে গেল তার কাছে। কৃপণবর্ণ, মনে কিসের যেন গভীর ব্যথা, আচার-নিয়ম বহুদিন পালন করেনি। চোখে পড়ল, তার বুকের উপর চোখের জলের মলিন পঙ্ক। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলুম,

"মহাশয়, আমি বুঝতে পারছি না; তপস্যার মধ্যে ক্রন্দন কেমন করে স্থান পায়? যদি অসুবিধা না হয় তা হলে এই রহস্যটি সমাধান করে দিন। আপনার শোকের কারণটি আমাকে বলুন।"

লোকটি তখন বললে—"সৌম্য, শুনুন। এই চম্পানগরীতে 'নিধিপালিত' নামীয় এক শ্রেষ্ঠী থাকেন, আমি তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র 'বসুপালিত'। কিন্তু এখানে আমাকে সবাই "বিরূপক" বলে ডাকে। কেন যে, বোধ হয় বুঝতে পারছেন। আমার মত কুশ্রী পুরুষ ভূভারতে বুঝি আর নেই। আবার এই চম্পানগরীতেই আর একটি পুরুষ আছেন—"সুন্দরক" তার নাম। সত্যিই সে সুন্দর। রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর, কলা-বিদ্যায় সুন্দর, কিন্তু ধনৈশ্বর্য্যে সে অতিপুষ্ট নয়, অসুন্দর। আপনি বোধ হয় জানেন প্রতিনগরেই একদল ধূর্ত্ত থাকে, যারা ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে নিজেদের পেট ভরায়।—যাদের বলে 'বৈরোপজীবি।' আমার অর্থ এবং সুন্দরকের দৈহিক কান্তিকে নিমিত্ত করে, তারা সফল হল শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে। সেও ঘটল আবার উৎসব-সমাজে। অপমানের পর অপমান। কড়া কথার উত্তরে কড়া কথা! শেষে সেই পৌরধূর্ত্তেরা আমাদের দুজনকে কোনো রকমে থামিয়ে দিয়ে বলে,—

'পৌরুষের মূল!—ও সে বপুও নয়, বিত্তও নয়। তাকেই আমরা পুরুষ বলে মানতে রাজি আছি যার যৌবন-প্রার্থিনী হবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গণিকা। বেশ, এই আমাদের চম্পানগরীতে ঐ ত রয়েছে যুবতীদের মুকুটমণি কামমঞ্জরী। সে যাকে কামনা করে বরণ করে নেবে সেই হরণ করবে সৌভাগ্য-পতাকা।'

তখন আমরা দুজনেই দূত প্রেরণ করি কামমঞ্জরীর কাছে। আমার দূতই সফল হল। খবর এল, আমিই কামমঞ্জরীর মন্মথোন্মাদনার খনি। তার পরে একদা আমি এবং সুন্দরক বসে রয়েছি, উৎসব-সমাজে প্রবেশ করল কামমঞ্জরী। তার কটাক্ষের প্রান্তে নীলপদ্মের সঞ্চিত মহিমা। আমার অঙ্গে এসে লাগল সেই কটাক্ষের নীলিমা। আর সুন্দরকের সুন্দর মুখখানি লজ্জায়, ক্ষোভে নীচু হয়ে গেল। তখনই বুঝেছিলুম কী সুখ ছড়িয়ে দিয়ে যায় সৌভাগ্য!

মহাশয়, দেখতে দেখতে কামমঞ্জরী আমার ঈশ্বরী হয়ে উঠল। আমার সর্ব্বস্ব তার পায়ের তলায়, আমার গৃহ তার করায়ত্ত, আমার জ্ঞাতিবর্গ তার সেবাদাস, আমার দেহ তার অঙ্কলীন, আমার প্রাণ তার মুঠোর মধ্যে। প্রথমে বুঝিনি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এসব ক্ষেত্রে যা হয় তাই হল আমার। আমার—বলতে যখন আর কিছু রইল না, তখন আমি নিজেই নিজের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে গেলুম। সর্ব্বহারা কৌপীন-সম্বল। রাস্তার লোকেদের ঠোঁট থেকে একটা সার্থক উপহাসের ঢেউ আমার গায়ে এসে ধাক্কা মারতে লাগল। সইতে পারলুম না, অসহ্য হল পৌরবৃদ্ধদের ধিক্কার।

জৈনায়তনে এসে উঠলুম। জনৈক মুনি আমাকে উপদেশ দেন—'মোক্ষমার্গ নাও, গৃহহীনদের এই বেশই ভাল।' কৌপীন ত্যাগ করে বৈরাগীর বেশ নিলুম। কিন্তু তাও সহ্য হল না। সমস্ত দেহের চামড়ার উপর সেই জমাট ময়লার পাঁক—সহ্য হল না। এই জৈনধর্ম্মে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে উপড়িয়ে ফেলতে হয় মাথার এবং গায়ের চুল। উঃ, সে কি ব্যথা,—সহ্য হল না। আর সব চেয়ে বড় কষ্ট, ক্ষিদে পেলেও খাবার নেই, পিপাসা পেলেও ঠোঁটে জল ঠেকাতে পাবে না;—আর পারলুম না। স্থান নেই, আসন নেই, শয়ন নেই, ভোজন নেই,—নতুন-ধরা হাতীর মত নিষ্পীড়িত একটা যন্ত্রণায় উদ্বেজিত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত ভাবতে বসেছি—

'আমি দ্বিজাতি বৈশ্য। পাষণ্ডদের পথে চলা আমার স্বধর্ম্ম নয়। আমার পূর্ব্বজেরা চলতেন শ্রুতিস্মৃতিবিহিত পথ ধরে। কিন্তু কি কপালই না আমার! অঙ্গে একটা ভদ্র পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত

আজ নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের নিন্দা শুনে শুনে বোধ হয় নরকও আমার পক্ষে সুখের আস্থান হবে না। নিজেকে প্রতারণা করে, অধর্ম্মের পথে চলে, কী ফল পাব? তার চেয়ে নিজের ধর্ম্মপথেই চলা একরকম ভাল।' মহাশয়, তাই এই জনহীন স্থানে বসে কাঁদছি। এই রক্তাশোকের নীচে শোক নেই, কাঁদছি, আর মনে মনে বিচার করে দেখছি কী নষ্ট পথেই না চলেছি! এই পথ আমাকে কাঁদাল।"

বসুপালিতের ইতিহাস শুনে আমার মধ্যে খেলে গেল একটা অনুকম্পার বিদ্যুৎ। বললুম, "ভদ্র, আমাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু আমার অনুরোধ, কিছুকাল এখানে আপনাকে থাকতেই হবে। আমি নিজে সব ঠিক করে দেব। সেই বারাঙ্গনা কামমঞ্জরীকে আপনার কাছে ধন এবং প্রাণ নিয়ে আসতেই হবে। আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। উপায় আছে, অনেক উপায় আছে।"

রক্তাশোকের তলদেশ ত্যাগ করে বিরূপক উঠল, আমিও উঠলুম। সামান্য আশ্বাস প্রাণে যে কতখানি বল আনে, তা বুঝতে পারলুম।

চম্পানগরীতে প্রবেশ করি দুজনে। আলাপ হয় জনতার সঙ্গে। কথাবার্ত্তায় সংগ্রহ করি—নগরীটি সমৃদ্ধ, পূর্ণ; অর্থশালী বহু সেখানে রয়েছেন কিন্তু তাঁরা বড় লোভী আর বেজায় কৃপণ। আমি বিচার করে স্থির করলুম, কৃপণদের প্রকৃতিস্থ করতে হলে একটি মাত্র উপায় অবলম্বন করতে হয়—কর্ণীসুতের পথ, অর্থাৎ চুরি। তাই ক'রে বসুপালিতের একটা ব্যবস্থা করে দেব।

নগরীতে ঠিক ঠিকানা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে জুটে গেলুম দ্যূত-সভায় অক্ষধূর্ত্তদের সমাগমে। হ্যাঁ, দেখলুম বটে সেখানে পঁচিশ রকমের দ্যূতক্রীড়া। কী কৌশল! আর সেই অক্ষভূমি! ছকের উপর কী অদ্ভুত তাদের হাতসাফাই! দান ফেলার ঠিক আগে কত রকমের গঞ্জনা-ভরা বাক্য, মান-অপমান, জীবনটা যেন কিছুই নয়—এমনিতর ভাব, কতরকমের কূটকর্ম্মা চাল।

কিন্তু অক্ষভূমিতে সভিকরা প্রবল। তাদের ব্যবহারে তাদের উপর সকলের বিশ্বাস অটুট। তারা খাটাতে পারছিল তাদের যুক্তি, ন্যায়, বল এবং প্রগলভ প্রতাপ, তারা আদায় করছিল স্বীকৃত অর্থ। যারা জিতছিল, যারা বলী, তাদের জন্যে তাদের মুখে নিত্য মিষ্টভাষা, যারা দুর্ব্বল, তারা মরছিল ভর্ৎসনা আর গঞ্জনা খেয়ে।

দ্যূতক্রীড়ায় পক্ষরচনার নৈপুণ্য, অনেক রকমের প্রলোভনের দর্শানী, এক-এক দান খেলার এক-এক রকম পণ-ভেদের বর্ণনা, আবার পণ-বিভাগের সময় সভিকদের ঔদার্য্য দেখতে দেখতে তৃপ্তিই পেতে লাগলুম। আর এই সবের মধ্যে গ্রাম্য অশ্লীল ভাষার ছুটেছে ফোয়ারা।

ডোরা-কাটা ছকের উপর একজন খেলুড়ে ভুল করে দান ফেলেছিল। আমি হেসে ফেলেছিলুম। আমার হাসি দেখে প্রতিদ্বন্দ্বী জুয়োড়ে জ্বলে উঠল, রাগে তামার মত চোখ করে আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে বললে, "হাসির ছল কেটে আমাকে শেখানো হচ্ছে পাশা কি করে দানতে হয়? আয় বেটা ছোকরা, অশিক্ষিত কোথাকার, আয়। ভারী বিচক্ষণ হয়েছিস—খেল্ না দেখি একটা দান।"

দ্যূতাধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে খেলা সুরু হল। ফলে হল—

আমার জিৎ, একেবারে যোলহাজার দীনার। সভিক এবং সভ্যদের মধ্যে আট হাজার ভাগ করে দিলুম। নিজে স্বীকার করে নিলুম আট হাজার দীনার। উঠে পড়লুম।

পথ দিয়ে চলেছি, সকলের মুখে প্রশংসা, বাণী বেরুচ্ছে আনন্দের। সভিকের অনুরোধ ঠেলতে পারলুম না। তাঁর গৃহে স্বীকার করতে হলো আতিথ্য। অত্যুদার উপচারে উদর-পূর্ত্তি করলুম। যার সঙ্গে খেলে এই দ্যূত-সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—তার নাম 'বিমর্দ্দক।' সে আমার বন্ধু হয়ে গেল। মুহূর্ত্তে হয়ে উঠল বিশ্বাসের পাত্র, একেবারে দ্বিতীয় হৃদয়।

সেই বিমর্দ্দকের মুখ থেকে আমি জানতে পারি, অবধারণ করি নগর-সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য,—সারতঃ, কর্ম্মতঃ এবং শীলতঃ। তার পর যখন রাত্রি নামল—ধূর্জ্জটির কণ্ঠের মত কৃষ্ণনীল রাত্রি, নীল রঙের একটি উত্তরীয় জড়িয়ে নিলুম নিজের অঙ্গে, কোমরে বাঁধলুম তীক্ষ্ণ একটি কৌক্ষেয়ক (করবাল), আর সঙ্গে নিলুম ফণিমুখ (সুড়ঙ্গসাধন), কাকলী (কাতুরী) সংদশক (সাঁড়াশী), পুরুষশীর্ষক (পুরুষশীর্ষ-প্রতিকৃতি কাঠের মাথা) যোগবর্ত্তিকা (অপায়াঞ্জন), মানসূত্র (ওজনদড়ি), কর্কটক (রেঞ্চ), রজ্জু, দীপভাজন, ভ্রমর (তুরপুণ), করণ্ডক (দীপনির্ব্বাণ-শলভভাণ্ড) প্রভৃতি অনেক উপকরণ। বেরিয়ে পড়লুম।

জনৈক লুব্ধেশ্বর ডাকসাইটে কৃপণের বাড়ীতে সিঁধ কেটে, জালিকাজের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলুম অন্তর্গৃহের প্রবৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপারখানা কি। তার পরে নিজের বাড়ীতে ঢুকতে হলে যেমন নিশ্চিন্ত আরামে প্রবেশ করা যায়, তেমনি হল লুব্ধেশ্বরের গৃহে আমার ব্যথাহীন প্রবেশ, ধনরত্ন, সার-পদার্থের সংগ্রহণ এবং সর্ব্বশেষে সুষ্ঠু প্রস্থান।

রাজবীথি দিয়ে দ্রুতপদে চলেছি, পুঞ্জ-পুঞ্জ নীল মেঘের মত নিবিড়-ঘন অন্ধকার, এমন সময় হঠাৎ সন্নিকটেই একটা আলোর চমকানি দেখে থেমে গেলুম। ও মা, এ যে মেঘের বুকে বিদ্যুতের হাসি! অবাক কাণ্ড, এত রাত্রে যুবতী! অঙ্গের অলঙ্কার আঁধারেও যেন আলো কাটছে! নিঃশঙ্ক ঘুরে বেড়াচ্ছে! নগরের চৌর্য্য-রোষিতা ইনি কি তবে নগরদেবতা?

থাকতে পারলুম না, বলে উঠলুম, "কে তুমি, কোথায় চলেছ?" সদয় উক্তি সত্ত্বেও যুবতী কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল, মুখ দিয়ে কথা বেরতে লাগল, থরথর করে কেঁপে কেঁপে। বললে—

"আর্য্য, এই নগরীতে, 'কুবেরদত্ত' রয়েছেন, বৈশ্যবর্য্য। তাঁরই আমি কন্যা। আমি জন্মাবার পরেই আমার পিতা বাক্যদান করেন যে,—এই নগরীরই এক ধনিক সন্তান 'ধনমিত্রের' আমি ভার্য্যা হব। তার পরে ধনমিত্রের বাপ-মা মারা যান। তাঁর হৃদয় বড় উদার। সংসারে দরিদ্র হয়ে যে কেউ বেঁচে থাকবে এ তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাই অর্থ দান করে দরিদ্রদের দুঃখ দূর করতে করতে এখন তিনি নিজে দরিদ্র হয়ে পড়েছেন—লোকে তাঁকে 'উদারক' বলে। অনেক কিছু বলে আনন্দে ডাকে। কিন্তু আমার পিতা দেখলেন—আমি তরুণী, একজন নির্ধনের হাতে গিয়ে পড়ব—না তা হবে না, তাই শ্রেষ্ঠী অতিধনী 'অর্থপতি'র হাতে আমাকে সমর্পণ করবেন স্থির করে ফেললেন। সেই অমঙ্গল

ঘটনাটি কাল প্রভাতে ঘটবে। তাই দুঃখের সেই প্রভাত আসবার আগেই আমি তাঁর গৃহে চলেছি,—চলেছি উদারকের গৃহে—তিনি আমাকে সঙ্কেত দিয়েছেন। বঞ্চনা করেছি স্বজনদের। ছোটবেলা থেকে এই পথে কত হয়েছে আমার আসা-যাওয়া, আর আজ চলেছি অভিসারে। দেব মন্মথ আমাকে পথ দেখাবেন। তাই বলছি আমাকে ছেড়ে দাও, আমার রত্ন, ধনভাণ্ড, সব নিয়ে নাও, শুধু আমাকে যেতে দাও।"

এই বলে রত্নপাত্র আমায় সমর্পণ করে দিল তরুণী। আমার চিত্ত দ্রব হয়ে গেল। আমি বললুম, "সাধ্বি, তুমি এস। আমিই তোমাকে পৌঁছে দেব তোমার প্রিয়তমের কাছে।" আশ্বস্ত করে তরুণীটিকে সঙ্গে নিয়ে দু'চার পা মাত্র এগিয়েছি, এমন সময় দেখি, হঠাৎ আমাদের উপর এসে পড়েছে একদল নাগরিক প্রহরী। দীপিকার আলোকে কোথায় লোপ পেল অভিভার অন্ধকার। আবার তাদের হাতে যষ্টি, কৃপাণ। তরুণীটি ত তখন কাঁপছে। আমি তাকে বললুম, "ভদ্রে ; কোন ভয় কোরো না। আমার হাতেও রয়েছে তরবার। কঠোর পথে না গিয়ে মৃদু পথে যাওয়াই এক্ষেত্রে মঙ্গল। দেখ এই আমি পথে শুয়ে পড়ছি, যেন সাপে কামড়েছে এমনিতর ভাণ করে। তুমি এদের বোলো, 'আজ রাত্রে আমরা এই নগরীতে এসেছি, আমার নায়ককে ফণাধর সাপে কামড়েছে, ঐ সভাগৃহের কোণে। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ মন্ত্রতন্ত্র জানেন, তা হলে দয়া করে এঁর প্রাণদান করুন, আমি অনাথা।"

মুহূর্তেই তরুণীটি বুঝে নিলে গত্যন্তর নেই। অভিনয় করে সে তৎক্ষণাৎ চোখ ভরিয়ে ফেলল জলে, কণ্ঠস্বরে আনল গদ্‌গদ্ কম্পন। সারা অঙ্গে সে কী থরথরানি! এক পা দু'পা করে এগিয়ে গিয়ে—যেমন বলেছিলুম তেমনিটি তাদের কাছে খুলে বললে। আমিও তেমনিই শুয়ে রয়েছি পথের ধারে—সাপের বিষে যেন সর্ব্ব ক্রিয়া বন্ধ। প্রহরীদের মধ্যে জনৈক নরেন্দ্রাভিমানী আমার কাছে এলেন। হস্তদীপের আলোয় মুদ্রা, তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যানাদির অনেক প্রকরণ করলেন। শেষে অকৃতার্থ হয়ে বললেন, "নাঃ, বেটাকে কালসাপে দংশেছে। দেখছ না, নীল হয়ে গেছে ধড়, চোখ খোলে না, গায়ের গরম ঠাণ্ডা। শোক করে আর কি করবেন ? কাল সকালে সৎকারের ব্যবস্থা করা যাবে। দৈবকে কি কেউ লঙ্ঘাতে পারে হে।"

এই বলে অন্য প্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

পথশয্যা থেকে গাত্রোত্থান করে তরুণীটিকে সঙ্গে নিয়ে উদারকের গৃহে এসে উপস্থিত হলুম। বললুম, "আমাকে জনৈক তস্কর বলেই জানবেন। এই তরুণীটি অভিসারে এসেছিলেন—ওঁর একমাত্র সহায় ছিল আপনার-প্রতি-ধাওয়া ওঁর মন। ব্যাপার শুনে মনে একটু দয়া হল, তাই আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলুম। এই নিন ওঁর রত্নভূষণ।"

এই বলে সেই ঝকমকে আঁধার-তাড়ানো অলঙ্কারগুলি উদারকের হাতে সমর্পণ করে দিলুম। উদারক সেগুলিকে গ্রহণ করলেন। তাঁর মুখে এবং চোখে খেলে গেল লজ্জা, হর্ষ এবং সম্ভ্রম। আমাকে বললেন—

"আর্য্য, আজ রাত্রে যেমন আমার প্রেয়সীটিকে দান করে গেলেন আমার হাতে, তেমনি আবার হরণ করে নিয়ে চললেন আমার মুখের ভাষা।"

এ ক্ষেত্রে কী যে বলব জানি না, কারণ আপনি যা করেছেন তা সত্যিই এত অদ্ভুত !

যদি বলি,—যা করেছেন তা আপনার শীলতা বা ব্যবসার বিরুদ্ধ, অদ্ভুত, অন্য কেউ পূর্ব্বে কখনও এমনটি করেনি, তাহলে কি বস্তুশক্তির নিত্যধর্ম্মের প্রতিবাদ করা হবে না ?

যদি বলি,—লোভ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষগুলো আপনার মধ্যে নেই, আজ আপনার মধ্যে উন্মীলিত দেখতে পাচ্ছি সাধুতা,—তাহলে কি জন্মান্তরীণ সাধুতা এবং সদ্‌বৃত্তিগুলিকে অবহেলা করা হয় না ? দেখলুম বটে ঔদার্য্যের স্বরূপ,—আপনার অনুমোদন না নিয়ে সে কথা বলাও আমার পক্ষে সাজে না।

যদি বলি,—দাসজনকে কিনে নিয়েছেন সুকৃতির দাক্ষিণ্যে—সে বলা সত্যিই অসার অনর্থক। আপনার প্রজ্ঞাকে অপমান করা হবে, যদি বলি আপনি আমাকে খুব জোরের সঙ্গে কিনে নিয়েছেন।

যদি বলি,—প্রিয়দানের প্রতিদানে এই রয়েছে আমার শরীর, এটি নিন—তা হলে বলতে হয়—প্রিয়াকে যদি না পেতুম তা হলে আপনার কাছ থেকেই লাভ করতুম আমার নিধনোন্মুখ দেহ। তাই বলছি, এখন আমার এই বলাই ভালো—'চিরদাস বলে আমাকে স্বীকার করে নিন।' উদারক আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

মাটি থেকে উদারককে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলুম। বললুম, "ভদ্র, এখন কি করবে স্থির করেছ ?"

সে বললে, "পিতার অনুমতি না নিয়ে, প্রিয়াকে বিবাহ করে আমার পক্ষে চম্পানগরীতে বাস করা বা জীবন ধারণ করা অসম্ভব। তাই ভাবছি, আজই রাত্রে আমরা দুজনে এই দেশ ছেড়ে চলে যাব। আর আমিই বা কি স্থির করব,—আপনি যা বলবেন তাই হবে।"

আমি তখন বললুম "বেশ ভালো কথা। স্বদেশ ছেড়ে দেশান্তরী হব, এরকম সিদ্ধান্ত করা বুদ্ধিমান পুরুষের সাজে না। তার উপর তোমার তরুণীটি অতি সুকুমারী, কষ্ট পাবে, কান্তার-পথ সঙ্কট-সঙ্কুল। দেশত্যাগের চিন্তা অনর্থক,—জ্ঞানের শৈথিল্য প্রকাশ পায়। এই চম্পানগরীতেই তোমাকে সুখে থাকতে হবে তোমার প্রেয়সীর সঙ্গে। এস, এখন আমরা দুজনে ওকে সঙ্গে নিয়ে ওর গৃহে যাই।"

উদারক কোনো কথা বললে না। রমণীটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলুম তার গৃহে। তার পরে তাকেই চর বানিয়ে ঘরের খবর জেনে নিয়ে আমরা দুজনে কুবেরদত্তের সর্ব্বস্ব চুরি করলুম।—চুরির সাক্ষ্য-স্বরূপ মাটির ভাঁড়গুলোই শুধু পড়ে রইল তার ঘরে।

কুবেরদত্তের বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটি জায়গায় চোরাই সামগ্রীগুলি রেখে, সবেমাত্র আমরা পথ ধরেছি, এমন সময় দেখি অন্য একদল নগর-রক্ষী আসছে। পথের ধারেই ছিল একটি মত্তহস্তী। তার মাহুতকে নীচে ঠেলে ফেলে হাতীর পিঠে আমরা চড়ে বসলুম। গ্রৈবেয়ের (কণ্ঠরজ্জু) মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে জোর করে ওঠাতেই, সেই পাগলা হাতী মাটিতে-পড়ে-যাওয়া মাহুতের বুকের উপর পা চড়িয়ে দাঁত দিয়ে তার পেট চিরে অন্ত্রবল্লী বার করেই সামনে

দেখতে পেল সেই রক্ষীদের দল। রুদ্ররূপ দেখে রক্ষিদল অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষে। আমরা দুজনে তখন সেই মত্তহস্তীর পিঠে চেপেই ধ্বংস করে দিলুম অর্থপতির গৃহ। তার পরে একটি জীর্ণোদ্যানে প্রবেশ করে বৃক্ষশাখা অবলম্বন করে হাতীর পিঠ থেকে নেমে পড়ি। রাত্রেই নিজেদের বাড়ীতে ফিরে আসি এবং স্নান করে দুজনেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যাই।

রাত্রির পরে প্রভাত এল। সে এক বিপুল সকাল! আমার মন ভরে রয়েছে খুশীতে। তাই বোধ হয় দেখলুম সূর্য্য উঠছে, কল্পদ্রুমের স্বর্ণপত্রের মত আপীড় পাটল তার রং, উদয়াচলের শৃঙ্গটি যেন পদ্মরাগমণি দিয়ে গড়া। খুশী মনে জেগে উঠলুম। মুখ-হাত ধুয়ে সমাধা করলুম প্রাতঃকালোচিত মঙ্গলবিধি। হঠাৎ প্রাণ উপচিয়ে হাসি পেল। গত কাল রাত্রে কি-ই-বা-না না করা গেছে! নিশ্চয়ই, চম্পানগরী এতক্ষণে আলোড়িত হয়ে উঠেছে আমাদের তুমুল তাস্করিক চাপল্যে। বেরিয়ে পড়লুম দুজনে। বিচরণ করতে করতে শুনতে পেলুম—বর-বধূর গৃহে ভীষণ হাহাকার কোলাহল। শেষ পর্য্যন্ত নিয়মমত যা হয় তাই হল; সমস্তই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অর্থদান করে অর্থপতি কুবেরদত্তকে আশ্বস্ত করল এবং স্থির হল এক মাস পরে 'কুলপালিকা'র বিবাহ হবে।

তার পরে একদিন উদারক ধনমিত্রকে ডেকে শিক্ষা দিলুম—

"সখে মুষড়ো না, লেগে পড়, ওঠ। ঐ যে একান্তে রয়েছে একটি চর্ম্মরত্নভস্ত্রিকা—ঐটিকে নিয়ে অঙ্গরাজের সভায় গিয়ে উপস্থিত হও। বোলো—'মহারাজ, বহুকোটি অর্থের ঈশ্বর বসুমিত্রের আমি একমাত্র পুত্র ধনমিত্র। সর্ব্বস্ব দান করে আমি আজ দরিদ্র হয়ে পড়েছি, লোকে আমায় অবজ্ঞা করে। কুবেরদত্তের কন্যা কুলপালিকার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে—এই বাক্যের আদান-প্রদান ছিল শিশুকাল থেকেই, কিন্তু আজ আমি দরিদ্র বলে কুবেরদত্ত নিজের দুহিতাকে সমর্পণ করছে শ্রেষ্ঠী অর্থপতির হাতে। তাই আমি গৃহত্যাগ করে দুঃখে জীবনের অসারতা উপলব্ধি করে চলে যাই নগরপ্রান্তের এক জীর্ণোদ্যানে। আকাঙ্ক্ষা ছিল জীবন বিসর্জ্জন দেব। তীক্ষ্ণধার একটি অস্ত্র কণ্ঠে লাগিয়ে জীবন বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছি এমন সময় অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হন এক জটাধর পুরুষ। আমাকে নিবারণ করে বলেন—'এই সাহসের তোমার মূল কোথায়?' আমি বললুম, 'দারিদ্র্য—অবজ্ঞার সহোদর ভাইবন্ধু।' দয়ার্দ্রচিত্তে আমাকে অনুগ্রহ করে তিনি বললেন, 'বৎস, তুমি অত্যন্ত মূঢ়। আত্মহত্যার চেয়ে পাপ আর কিছু নেই। আত্মা দিয়ে আত্মাকে বিনাশ না করেই, যারা জ্ঞানী তারা মুক্তি পায়। ধনার্জ্জনের অনেক উপায় রয়েছে। কিন্তু কাঁধ থেকে গলা একবার নেমে গেলে, প্রাণ ফিরে পাবার আর কোনো উপায়ই থাকে না। ছিঃ ছিঃ, এমন কাজ কি কেউ করে? দেখ, আমি মন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। লক্ষগ্রাহিণী এই চর্ম্মরত্নভস্ত্রিকা আমার তৈরী। কামরূপে যখন আমি ছিলুম—কামপ্রদ এই মন্ত্রের প্রসাদেই আমি প্রজা পালন করেছি। কিন্তু এখন আমার দেহটিকে অধিকার করেছে কূটজরা,—তার সমস্ত মাৎসর্য্য নিয়ে। দেখলুম এই দেশটি বড় মনোরম, স্বর্গের পরশ-লাগা দেশ, ভূমিস্বর্গ; তাই চলে এসেছি এখানে। বেশ, এটাকে তুমিই নিয়ে যাও, আমার আর প্রয়োজন নাই ওতে। ঐ চর্ম্মরত্নভস্ত্রিকাকে আমি-ছাড়া কোন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী বা শ্রেষ্ঠা গণিকাই দোহন করতে পারবে। অন্য কেউ নয়। এইটিই এর খ্যাতি। কিন্তু শ্রেষ্ঠী বা গণিকার কর্ত্তব্য হচ্ছে, অন্যায় করে যদি তারা অর্থ নিয়ে থাকে, সেটা প্রথমেই প্রত্যর্পণ করা; এবং ন্যায়ার্জ্জিত অর্থ দেব-ব্রাহ্মণে বিতরণ করে দেওয়া। আমার বাক্যের অনুসরণ করে যদি ব্যবহার হয় তা হলে দেখতে পাবে এই চর্ম্মভস্ত্রিকা দেবতার মত এই পুণ্যদেশে—প্রতিদিন প্রভাতে পূজার্চ্চনা লাভ করে প্রতীত হবে সুবর্ণপূর্ণা হয়ে। এই হচ্ছে এর কল্পনা।'—

বিস্ময়ে আমার অঞ্জলি বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রণামে। সেই জটাধর পুরুষ এই চর্ম্মভস্ত্রিকাটিকে আমায় দান করেই মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এক পর্ব্বতগুহায়। মহারাজ, এই সেই চর্ম্মরত্নভস্ত্রিকা! মহারাজকে অ-নিবেদন করে চিরদিন অ-জীবন-সম থাকতে হবে, তাই শ্রদ্ধায় নত হয়ে এটিকে এনেছি। এখন মহারাজের যা আদেশ, তা সংগ্রাহ্য।'

দেখো ধনমিত্র, রাজা তখন নিশ্চয়ই বলবেন, 'ভদ্র, আমি প্রীত হয়েছি, যাও, যথেচ্ছ উপভোগ কর।'

তখন ধনমিত্র তুমি বলবে—'মহারাজ একটি অনুগ্রহ চাই, এটিকে কেউ চুরি করতে না পারে তারই ব্যবস্থা করে দিন।'

দেখো, মহারাজ নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা করে দেবেন। তার পরে তুমি নিজের ঘরে ফিরে এসে অর্থত্যাগ করে প্রতিদিন এই চর্ম্মভস্ত্রিকার পূজার্চ্চনা করবে। এবং রাত্রের চৌর্য্যলব্ধ অর্থে এটিকে পূর্ণ করে প্রভাতে সকলকে দেখিয়ে দেবে। তখন দেখো কি হয়!

কুবেরদত্ত বদলে যাবে। অর্থলোভী সে। অর্থপতিকে তৃণের মত জ্ঞান করবে। স্বয়ং তোমার সামনে তার কন্যাকে নিয়ে এসে হাজির হবে। ওদিকে অর্থপতি ক্রোধান্ধ হয়ে দাম্ভিকতা দেখাবে অর্থের। তখন আমাদের কর্ত্তব্য চিত্র-উপায়ে তাকে কৌপীন-শেষ করা। কোনো ভয় নেই। এর সঙ্গে হবে কি জানো? নিজেদের এই চৌর্য্যবৃত্তি সুপ্রচ্ছন্ন থেকে যাবে।"

দিন যায়। একদা নগরে রটনা হল যে কামমঞ্জরীর কনিষ্ঠা ভগিনী রাগমঞ্জরী পঞ্চবীরগোষ্ঠে সঙ্গীতক অনুষ্ঠান করবেন। গভীর সমাদর নিয়ে নাগরজন সেখানে উপস্থিত হতে লাগলেন। আমিও ধনমিত্রের সঙ্গে গোষ্ঠে পৌঁছে গেলুম। আরম্ভ হয়ে গেল রাগমঞ্জরীর নৃত্য।

কি আশ্চর্য্য! একি! আমার মনখানিই যে দ্বিতীয় রঙ্গপীঠ হয়ে উঠেছে! নৃত্যপরা রাগমঞ্জরীর নয়নকটাক্ষ যেন সেই মানস-রঙ্গপীঠের হল নীলপদ্ম-আঁকা চন্দ্রাতপ, আর তথায় সুবিপুল তেজে সমুদিত হলেন পঞ্চশর, ভাবরসের সামগ্র্য নিয়ে। টন্‌টন্ করে উঠল আমার হৃদয়ের গ্রন্থি। মনে হল—রাগমঞ্জরী যেন নগর-দেবী,—নগর-তস্করদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, আর আমাকে যেন বাঁধছেন নীলপদ্মপল্লবের মত শ্যামল লীলাকটাক্ষের শৃঙ্খল দিয়ে। নাচ যখন শেষ হয়-হয়, তখন তাকে দেখতে হল ভারী সুন্দর, সিঞ্জিতাভশোভিনী। হায় হায়, আমারি দিকে কেন বারম্বার ছুটে আসছে তার সখী-অজানা কটাক্ষ!—আহা, সে কি বিলাসে, না

অভিলাষে, না সে অকস্মাৎ ! বিভ্রমের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূলতার সে কি সুন্দরী আরেচিত-শ্রী। কী ছন্দ ! কুন্দ-দাঁতের চন্দ্রিকা-ছড়ানো সে কি মন্দ-মন্দ হাস্য ! তার পরে রাগমঞ্জরী ধীরে ধীরে পঞ্চবীরগোষ্ঠ থেকে চলে গেল।—তার পিছনে পিছনে যেন ধেয়ে গেল রসিক সুজনদের নয়ন এবং মন।

দুর্নিবার উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে আসি। দূর হয়ে গিয়েছিল আহারের স্পৃহা। মাথায় শূলবেদনার স্পর্শ লেগেছে, এই ভাণ করে মুক্ত অবয়বে শুয়ে পড়লুম আমার সঙ্গিনী-হীন পালঙ্কে। কিন্তু ধনমিত্র আমাকে ধরে ফেললে। সে একেবারে মদনশাস্ত্রে অতিনিষ্ণাত কি না, তাই। আমার পাশে বসে রহস্য-কথা বলতে লাগল—

"সখা, তোমার মন যাতে চলেছে সেই গণিকা-কন্যা আজ সত্যিই ধন্যা। আমিও ভাল করে দেখেছি তার ভাববৃত্তি। এই বলে রাখলুম তোমাকে—পঞ্চশর তাকেও অচিরাৎ শরশয্যায় শুইয়ে ছাড়বেন। যেখানে দুপক্ষের একই দশা, সেখানে মিলন ঘটানো কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু আমি শুনেছি সেই গণিকা-কন্যা নাকি স্বধর্ম্ম পালন না করে উল্টো পথে চলে এবং উদার ভদ্রভাবে বলে—

'আমি গুণশুল্কা, ধনশুল্কা নই। বিবাহ না করলে আমি তুলতে দেব না যৌবনপুষ্প।'

এই তার নিদারুণ পণ। তাকে বারণ করে করে হার মেনে গেছে তার ভগিনী কামমঞ্জরী আর তার মা 'মাধবসেনা'। শেষ পর্য্যন্ত তারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজার কাছে নাকি দৌড়য়। বলে—

'দেব, আপনার দাসী রাগমঞ্জরী তার রূপানুরূপ শীল এবং শিল্প-কৌশল নিয়ে একদিন আমাদের সকলের মনোরথ পূর্ণ করবে—এই ছিল আমাদের মহতী আশা। সে আজ মূলচ্ছিন্না হয়ে নিজের কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে চায়—অর্থ চায় না,—বলে বেড়ায় 'গুণীর কাছে নিজের যৌবন সঁপে দেব। কুলস্ত্রীদের মত সতী হয়ে থাকব'। এখন দেবপাদের আদেশে রাগমঞ্জরী যদি প্রকৃতিস্থা হয় তা হলেই মঙ্গল।'

রাজার আদেশ এল, অনুরোধ এল, কিন্তু রাগমঞ্জরী মানল না সেই অনুশাসন। তখন তার ভগিনী এবং মা আবার দৌড়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজাকে বলে—

'আমাদের বিনা অনুমতিতে যদি কোনো ভুজঙ্গনায়ক রাগমঞ্জরীকে প্রতারিত করে তা হলে—মহারাজের এই আদেশ হোক, সেই নায়ককে তস্করের মত হত্যা করা হবে।'

সখা, এই ত এখন অবস্থা। ধনরত্ন না পেলে স্বজনেরা অনুমতি দেবে না। আবার যে নায়ক ধনরত্ন নিয়ে যাবে তাকেও বরণ করবে না রাগমঞ্জরী। এইখানেই ত এল ভাবনার কথা !"

সব শুনে আমি বললুম "বন্ধু, এতে এতো ভাবনার কি আছে ? রাগমঞ্জরীকে ভোলাব গুণ দিয়ে, আর তার স্বজনদের ডোবাব অর্থ দিয়ে।"

এদিকে খবর পাওয়া গেল—কামমঞ্জরীর প্রধানা দূতী হচ্ছে "ধর্ম্মরক্ষিতা"। সে আবার শাক্যভিক্ষুকী। তাকে তুষ্ট করতে আমাদের বেগ পেতে হল না। চীবর, পিণ্ডদান প্রভৃতির উপঢৌকনেই কাজ আদায় হয়ে গেল। তাকে দিয়ে বন্ধকীমাতা মাধবসেনার কাছে পণবন্ধ-সম্বন্ধে প্রস্তাব পাঠালুম। গোপনে বললুম, "উদারকের গৃহ থেকে চৌর্য্যেই হোক, আর যে করেই হোক্ তোমার গৃহে এসে পৌঁছবে চর্ম্মরত্নভস্ত্রকা—কিন্তু তার প্রতিদানে চাই রাগমঞ্জরী।"

বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে মাধবসেনা রাজী হয়ে গেল। তার পরে একদিন রাত্রে কামমঞ্জরীর গৃহে,—পৌঁছে দিয়ে এলুম রত্নভস্ত্রিকাটিকে। বলাই বাহুল্য, আমার গুণের উদার ক্রীড়ায় উন্মাদিতা হয়ে উঠলো রাগমঞ্জরী, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই আমার বাম হাতের মধ্যে এসে সুখী হল তার দক্ষিণ হাত।

যে রাত্রে কামমঞ্জরীর গৃহে চর্ম্মরত্নখানি পৌঁছয় তার আগের দিনে একটি ঘটনা আমি ঘটিয়ে দিয়েছিলুম। সেটি হচ্ছে এই।—

কার্য্যান্তরের উপলক্ষ্য করে আমি নগরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সুজনদের আহ্বান করেছিলুম। তাঁদের সামনেই আমার চর বিমর্দ্দককে লাগিয়ে দিয়েছিলুম ধনমিত্রকে তর্জ্জন-গর্জ্জন করে অপমান করতে। নাগরিকেরা জানতেন বিমর্দ্দক অর্থপতির বন্ধু। কপট অভিনয় করে ধনমিত্র তাকে বলে,—'ভদ্র, পরের হয়ে আমাকে কেন অপমান করতে এসেছেন ? আমার ত মনেই পড়ে না আপনার আমি কোন অপকার করেছি।' কিন্তু বিমর্দ্দক গলা ফাটিয়ে বলে, 'সোনার গরমে পা পড়ে না ; তাই পরের বাক্‌দত্তা ভার্য্যাকে নিজের করে নিতে দ্বিধা হয় না, তাও আবার মেয়ের বাপকে ধন জুগিয়ে ! আবার বলছেন, কি অপকার করেছি ? জেনে রাখবেন বন্ধু এমনি হওয়া যায় না। আমি বিমর্দ্দক, অর্থপতির প্রাণখানা নিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিছু বুঝি না আমি, না ? বন্ধুর জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি, আর প্রাণ নিতেও পারি, এমন কি ব্রহ্মহত্যাও করতে পারি। চর্ম্মরত্নের ঐ হাপরটার অহঙ্কার গায়ে একেবারে দাহজ্বরের মত ছড়িয়ে পড়েছে, না ? জেনে রেখো একটা রাত্তির যদি জাগি তা হলে এর প্রতিকার আমি করতে পারি।' যখন বিমর্দ্দক এই সব বলছিল তখন পৌর-মুখ্যেরা রেগে উঠে তাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

চর্ম্মরত্নভস্ত্রিকার অন্তর্ধানের পরেই কৃত্রিম-আর্ত্তি জানিয়ে ধনমিত্র এই ঘটনাটি মহারাজের নিকট নিবেদন করে দিলে। মহারাজ আহ্বান করলেন অর্থপতিকে। একান্তে তাকে নিয়ে গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন, "অঙ্গ, বিমর্দ্দক বলে তোমার কি কেউ আছে ?"

অর্থপতিও এমন মূঢ়, সে বলে ফেললে, 'দেব, সে আমার পরম মিত্র ; তাকে কি আপনার কোনও প্রয়োজন আছে ?" মহারাজ বললেন, 'তাকে এখানে নিয়ে আসতে পার ?' 'নিশ্চয়, নিশ্চয় পারি।' এই বলে অর্থপতি চলে আসে।

তার পরে বিমর্দ্দকের জন্যে কি অনুসন্ধান !—নিজের বাড়ীতে নেই, গণিকার বাড়ীতে নেই, দ্যূতসভায় নেই, এমন কি শুঁড়ির দোকানেও সে নেই। তন্ন-তন্ন করে খোঁজ চলল। কিন্তু তাকে তখন খুঁজে বার করবে কে ? আমি তাকে রাজকুমার, অভিজ্ঞান-চিহ্ন দিয়ে আপনার খোঁজে উজ্জয়িনীতে সেই দিনই পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। শেষ পর্য্যন্ত বিমর্দ্দককে যখন খুঁজে পেল না অর্থপতি, তখন সে বুঝতে পারল যে বিমর্দ্দকের অপরাধ তারি গায়ে এসে লাগছে। বেচারী ভয় পেয়ে গেল, তার মস্তিষ্ক-বিভ্রম হল। সে বললে, 'সে চর্ম্মরত্নভস্ত্রিকার

কিছু জানে না।'. কিন্তু ধনমিত্র পৌরমুখ্যদের নিয়ে গিয়ে মহারাজের সামনে সাক্ষ্য দিয়ে দিলে। কুপিত হয়ে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন—'অর্থপতিকে শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখো।'

এই ঘটনার কিছু দিন পরে কামমঞ্জরী স্থির করল চর্ম্মরত্নটিকে দোহন করতে হবে—জটাধর পুরুষ যেমন আদেশ করেছিলেন ঠিক সেই মত। সেই জন্যে একদা ক্ষপণীভূত বিরূপকের কাছে উপস্থিত হয়ে নিভৃতে সে ফিরিয়ে দিয়ে এল তার সমস্ত সম্পত্তি—যা কিছু নিয়েছিল, অপহরণ করেছিল, দোহন করেছিল, সব। অনেক অনুনয়, অনেক শপথ করে যখন কামমঞ্জরী ফিরে এল তখন বিরূপক জৈনগ্রন্থির মূলকর্ত্তন করে আমার কাছে দৌড়ে এল। কি তার আনন্দ! কুলধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়ে যেন সে প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

কয়েক দিন যেতে না যেতেই কামমঞ্জরী নিজেরও সর্ব্বস্ব দান করে বসল। রইল মাত্র—রন্ধন-চুল্লী। তার হৃদয়ের তখন একমাত্র কামনা—কেমন করে সে চর্ম্মরত্নভস্ত্রিকাটিকে দোহন করবে—কেমন করে হবে তার অভ্যুদয়? অভ্যুদয়!

এদিকে আমি ধনমিত্রকে পুনর্ব্বার পাঠিয়ে দিলুম মহারাজের সকাশে। গোপনে সে মহারাজকে নিবেদন করে বললে,

'দেব, ঐ যে গণিকা রয়েছে—কামমঞ্জরী যার নাম—লোকে যাকে রহস্য করে বলে 'লোভমঞ্জরী'—আজ দেখলুম সে নির্বিচারে তার সর্ব্বস্ব দান করছে—এমন কি শিল নোড়া উদূখল পর্য্যন্ত। আমার কেমন জানি, মহারাজ, সন্দেহ হয়েছে। ঐ চামড়ার হাপরটি বোধ হয় ওর কাছেই আছে। ঐ জন্যেই বোধ হয় এত ওর দান। জটাধর বলেছিলেন—'শ্রেষ্ঠী বা শ্রেষ্ঠা গণিকাই ঐ রত্নভস্ত্রিকাটিকে দোহন করতে পারবে, অন্যের সাধ্য নয়।' সেই জন্যেই আমার এই সন্দেহ। তাকে এবং তার মাকে যদি মহারাজ আহ্বান করেন, তা হলে মঙ্গল হয় সকলের।'

রাজ-আহ্বান যখন কামমঞ্জরীর কাছে এসে পৌছল—তখন তার সমগ্রতায় প্রকাশ পেল একটা ব্যথিত-বর্ণ। আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে সে সকল কথা বললে। আমি তখন বলি, "আর্য্যে, তোমার সর্ব্বস্ব দান প্রকাশ হয়ে গেছে, তাই বোধ হয় মহারাজের এই আশঙ্কা, সন্দেহ—তোমার ডাক পড়েছে। তিনি যদি বারম্বার আমাকে প্রশ্ন করতে থাকেন তখন আমাকে—অন্য গতি নেই বলে—হয়ত সব স্বীকার করতে হবে। তার পর সংশয়হীন চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—আমার ভাবী চিত্রবধ। যদি মরি, তা হলে তোমার ভগিনীও মরবে, তোমাকেও চিরদিন নিঃস্ব হয়েই কাটাতে হবে। দেখো, তার চেয়ে ভালো ঐ রত্নভস্ত্রিকাটিকে ধনমিত্রের ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে আসা। ঐ চামড়ার আপদটাকে বিদায় করলে সব অনর্থের শান্তি হয়। বল—এখন কি করি।"

কামমঞ্জরী ও তার মা কেঁদে উঠল—বললে—

'আমাদের লোভ আর বালিশতার জন্যই সমস্ত রহস্য ফাঁস হয়ে গেল। দেখুন, রাজা যদি পীড়াপীড়ি করেন, যন্ত্রণা দেন—তাহলে একবার, দুবার, তিনবার, না হয় চারবার, কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গোপন করে রাখলুম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, আপনিই ভস্ত্রিকাটিকে আমাদের কাছে 'এনে' দিয়েছিলেন। আপনাকে যদি ধরিয়ে দিই তা হলে স্বজনকুটুম্ব নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে।—তবে অন্য এক উপায় রয়েছে। ঐ অর্থপতি। তার গায়ে অপযশ রূঢ়ভাবে লেগেই রয়েছে। অঙ্গপুরের সকলেই জানে, এটা প্রসিদ্ধি যে, আমাদের এখানে সেই কীনাশ লোভীটার খুব বেশী গতিবিধি ছিল। ঐ অর্থপতিই আমাদের রত্নের হাপরটা দিয়েছে,—ঐ বলা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় দেখছি না। ওতেই আমাদের বাঁচোয়া।'

এই স্থির করে কামমঞ্জরী ও মাধবসেনা মহারাজের সভায় গিয়ে উপস্থিত হল। মহারাজ তাদের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আনলেন তখন তারা উত্তর দিল, 'বারাঙ্গনাদের মধ্যে এই ন্যায়ধর্ম্ম প্রচলিত রয়েছে যে, বেশ্যাকুলদাতাদের প্রতারণা করা নিষিদ্ধ।" কিন্তু কুপিত হয়ে উঠলেন মহারাজ। তাদের বহু অস্বীকার সত্ত্বেও মহারাজ শেষে বললেন, 'সমস্ত নায়কেরাই যে ন্যায়ার্জ্জিত অর্থ নিয়েই বারাঙ্গনাদের মন্দিরে যাতায়াত করে, এ হতে পারে না। যদি সেই তস্করের নাম-ধাম স্বীকার না করো, তা হলে তোমাদের মত দগ্ধ-বঞ্চকীদের শাস্তি হচ্ছে কর্ণ-নাসিকা ছেদন, বা তার চেয়ে বীভৎস কোনো শাস্তি।'

কামমঞ্জরী ও মাধবসেনা তখন স্বীকার করলে এবং বেচারী হতভাগ্য অর্থপতিকে তখনই শৃঙ্খলিত করা হল তস্করত্বের অপরাধে। বিচারে অর্থপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু ধনমিত্র করজোড়ে মিনতি করে মহারাজকে বললে—'আর্য্য, মৌর্য্যদের প্রদত্ত একটি বর রয়েছে—এই প্রণালীর অপরাধে বণিকদের যেন প্রাণনাশ করা না হয়। দয়া করুন, সর্ব্বস্বহীন করে ওকে নির্ব্বাসনে দিন, কিন্তু প্রাণে মারবেন না।'

মহারাজ গ্রাহ্য করলেন ধনমিত্রের আবেদন। চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল ধনমিত্রের কীর্ত্তি-প্রশংসা, মহারাজও প্রীত হলেন। সমস্ত পৌরজনদের সমক্ষে নির্ব্বাসিত হল অর্থমত্ত অর্থপতি একবস্ত্রে। চর্ম্মরত্নের মৃগতৃষ্ণিকায় কামমঞ্জরী সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিল। এখন ধনমিত্রের প্রার্থনামত মহারাজ অর্থপতির কিছু বিত্ত কামমঞ্জরীকে অনুকম্পা ভরে দান করে দিলেন।

তার পরে একদা শুভদিন দেখে কুলপালিকার সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল ধনমিত্রের। এইরকম করে যখন সিদ্ধ হয়ে গেল আমার সংকল্প, তখন আমি রাগমঞ্জরীর গৃহখানি পূর্ণ করতে লেগে গেলুম হেমে এবং রত্নে।

এর পরে আমি তস্করত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাই, চম্পানগরীতে। যারা লুব্ধ এবং সমৃদ্ধ, তাদের মধ্যে কেউ-ই চৌর্য্য-মোক্ষ পেল না। হাতে নারিকেলের মালা নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে অনেককে পথে বেরুতে হল, ভিক্ষা করতে যেতে হল সেই সব ভিক্ষুকদের ঘরে যারা আমার প্রদত্ত চৌর্য্যধনে বিত্তশালী হয়েছে। কিন্তু অতিনিপুণ হলেও একদিন না একদিন মানুষকে পেতেই হয় নিয়তি-লিখিত একখানি পত্র। রাজকুমার, আমার কপালেও তাই ঘটল। সেই পত্র একদা আমি পেলুম বিচিত্র উপায়ে।

সেদিন হয়েছে কি, রাগমঞ্জরীর প্রণয়কোপ কিছুতেই আর শান্ত হতে চায় না। শেষে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর শান্তি সংস্থাপন করে তাকে মদিরা পান করালুম। ভালবেসে মুখের মধ্যে

সে মদিরা গ্রহণ করে, আর আমার মুখে ঢেলে দিতে থাকে তার গণ্ডূষ। একটু একটু ক'রে মদিরার স্বাদ নিতে নিতে আমার নেশা ধরে গেল। নিদারুণ নেশা! সবাই জানে, নেশার মাহাত্ম্য; মাতাল হলেও মাতালেরা উচিত কাজই করে, কিন্তু তাদের পথের উদ্দেশ থাকে না। আমার মাথার মধ্যে পূর্ব্ব থেকেই ঘুরছিল তাস্করী কলা, তার উপর ঘনিয়েছে কুবৃত্তি-দায়িনী শর্ব্বরী;—মদিরার স্পর্শে হঠাৎ ভ্রান্ত হয়ে পড়লুম; মুহূর্ত্তেই স্থির করে ফেললুম—"আজ এই রাত্রেই—ইন্দ্রনীলমণির মত শর্ব্বরীতেই আমি একলাই, সমস্ত নগরখানাকে নির্ধন করে ফেলব।—বুঝেছিস্ রাগমঞ্জরী, একলাই! তোর এই সামান্য ঘরখানাতে কি তখন ধরাতে পারবি, সারা নগরখানার রত্ন আর ঐশ্বর্য্য?"

প্রিয়তমা প্রণামাঞ্জলি রচনা করলে, হাজার শপথ করলে, কিন্তু উদ্দাম মাতালকে বোঝান শক্ত। তাই পাগলা হাতী যেমন হঠাৎ জোর দিয়ে পায়ের শিকল ফাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় আলান থেকে, তেমনি আমি পথে বেরিয়ে পড়লুম—মত্ত হস্তে এক মুক্ত অসি। রাগমঞ্জরীর ধাত্রী 'শৃগালিকা' আমাকে অনুসরণ করলে। কিছু পথ যেতে না যেতেই দেখতে পেলুম নগররক্ষীরা আমার পিছু নিয়েছে। কিন্তু ভয়-ডর তখন সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। এগিয়ে এসে তারা আমাকে ধরে ফেললে, তস্কর বলে আঘাত করতে লাগল; তখনও আমার বিশেষ রাগ হয়নি। মনে হল, এরা বুঝি আমার সঙ্গে খেলা করছে। তার পরে হঠাৎ কী যে ঘটে গেল জানি না। বোধ হয় হঠাৎ এসেছিল এক চণ্ডক্রোধ; নেশায় এবং প্রহারে আমার হাত অবশ হয়ে পড়ল, অবশ হাত থেকে পড়তে পড়তে বোধ হয় আমার তলোয়ারখানা দু'একটি রক্ষীকে হত্যা করে ফেললে। পথের উপর যখন ঘুরে পড়ে যাই, ঠিক তার আগেই মনে হল তামার মত আমার চোখের ভিতরে আগুনের ঘূর্ণী লেগেছে। চীৎকার করতে করতে শৃগালিকা আমার কাছে দৌড়ে এল। শত্রুরক্ষীগুলো তখন আমাকে বেঁধে ফেলেছে।

আপদ্ ছুটিয়ে দেয় মদের নেশা। হঠাৎ আমার জ্ঞান ফিরে এল; সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা। ভাবলুম, "উঃ, নেশায় আমাকে কি বিপদেই না ফেলেছে! নগরময় সকলেই জানে ধনমিত্র আমার বন্ধু, রাগমঞ্জরী আমার ভার্য্যা। আমার এই পাপ তাদের স্পর্শ করবে। কাল নিশ্চয়ই তারাও নিগ্রহ ভোগ করবে। এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে এমন কিছু করা, যাতে করে তারা প্রথমে রক্ষা পায়। তারা রক্ষা পেলে, আমাকে রক্ষা করার পথ তারাই বার করবে।"

এই স্থির করে শৃগালিকাকে চীৎকার দিয়ে বললুম, "দূর হ বুড়ী কোথাকার, চর্ম্মরত্ন পেয়ে মত্ত হয়ে উঠেছিল ধনমিত্র। সে বেটা আমার কপট মিত্র। আমার পরম শত্রু। রূপোর লোভ দেখিয়ে সে বেটা আমার রাগমঞ্জরীকে লুটেছে। দগ্ধ-গণিকা সে বেটী। সে মরে গেছে, সে মরে গেছে। চর্ম্মরত্ন চুরি করেছি, গণিকাটাকেও সর্ব্বস্বান্ত করেছি, এখন যায় যদি যায়, যাক্ প্রাণ, দুঃখু নেই জীবনে।"

শৃগালিকা পরম ধূর্ত্তা। আমার কথা ও বলার ভঙ্গি থেকে সে সব বুঝতে পারলে। কাঁদতে কাঁদতে, প্রণাম করতে করতে, নগররক্ষীদের সামনে এসে ভিক্ষা চাইল, বললে 'ভদ্র, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন; এর কাছে আমাকে দয়া করে জেনে নিতে দিন ও কোথায় রেখেছে আমাদের রাগমঞ্জরীর চুরি-করা ধন।' অনুমতি পেয়ে আমার কাছে এসে বললে "সৌম্য, আমরা আপনার চিরদাসী, আমাদের এই প্রথম ক্ষমা করুন। হ্যাঁ ঠিক বটে, আপনার ভার্য্যাকে নিয়ে ধনমিত্র এমন কাণ্ডটা করেছে, সে বেটাই আপনার শত্রু। কিন্তু আমার অনুরোধ, ক্ষমা করুন রাগমঞ্জরীকে। জানেন ত, রূপ বেচে যারা বাঁচে, তাদের মজ্জাগত হয়ে থাকে ধনরত্নে স্পৃহা। তার বসন-ভূষণ কোথায় রেখেছেন আমাকে বলতেই হবে।' এই বলে শৃগালিকা আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। দয়া দেখিয়ে আমি তাকে চীৎকার করে বললুম 'বেশ, আমি ত চলেছি মৃত্যুর হাত ধরে, কি হবে আর এখন হতভাগিনীর শত্রুতা করে!' এই কথা বলে শৃগালিকার যথা-করণীয় সব শিক্ষা দিয়ে দিলুম। 'চিরজীব হও, ভগবান তোমার ভাল করবেন, অঙ্গরাজ তোমার পৌরুষে প্রীত হয়ে তোমাকে মুক্তি দেবেন। এই সব ভদ্রলোকেরা তোমায় দয়া করবেন।' এই সব বলতে বলতে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল শৃগালিকা। আরক্ষিক নায়কের আদেশ মত আমাকে তখন রক্ষীরা ধরে এনে চারকে (হাজত) বন্ধ করে রাখল।

তার পরদিন সকাল হতেই নাগরিক (কারাপতি)—'কান্তক' চারকে এসে উপস্থিত। পিতার মৃত্যুর পরেই সে মহারাজের নিকট থেকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারুণ্য-মদ যেন ফেটে পড়ছে তার দৃপ্ততর অঙ্গ হতে। দেখেই মনে হল লোকটা অনতিপক্ক, তবে নিজেকে যেন সৌভাগ্যবান এবং একটি সুন্দর পুরুষ বলে মনে মনে বৃথা গর্ব্ব রাখে। এসে আমাকে কিছু ভর্ৎসনা করে বললে, 'যদি ধনমিত্রের চর্ম্মরত্ন না ফিরিয়ে দিস্, অথবা নাগরিকদের লুঠ-করা ধন না ফিরিয়ে দিস্, তা হলে প্রথমে আঠার রকমের শাস্তি ভোগ করতে হবে তোকে; অন্তে দেখবি মৃত্যু-মুখ।'

আমি একটু মৃদুমন্দ হাস্য করে বললুম, "সৌম্য, জন্মের প্রথম দিন থেকে যা কিছু চুরি করেছি সব ফিরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ঐ মিত্রমুখো ধনমিত্র—সে আমার শত্রু, অর্থপতির সে ভার্য্যা-চোর, সে ফিরে পাবে না তার চর্ম্মরত্ন। সম্পূর্ণ দুরাশা। তার জন্যে যদি আমাকে অযুত যাতনাও সইতে হয়, তাতেও রাজি আছি। এই আমার দৃঢ়পণ শপথ।"

এর পরে কয়েক দিন অতিবাহিত হল; চলতে লাগল কান্তকের সান্ত্বন, তর্জ্জন, গর্জ্জন। প্রশ্নের বিরাম নেই, উত্তরেরও বিরাম নেই। কারাগার সুরা-সম্পর্কহীন। আমি কিছুদিনের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম।

একদিন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, দিনান্তের রংখানি হয়েছে ভগবান্ অচ্যুতের গেরুয়াবরণ বসনখানির মত, এমন সময় দেখি শৃগালিকা উপস্থিত হয়েছে কারাগারে। অনুচরেরা দূরে ছিল, তাই কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে, আদর করলে। সাজে-সজ্জায় বেশ উজ্জ্বলতা এবং মুখখানিতেও হর্ষমাখা বর্ণ। বললে—

···আর্য্য, আর ভয় নেই। ফল ধরেছে এবার সুনীতি। আপনার আদেশ মত আমি ধনমিত্রকে গিয়ে বলি···আপনার বন্ধু বিপদের মধ্য থেকে বলে পাঠিয়েছেন—"আমি আজ বেশ্যা সংসর্গের সুলভ পান-দোষের অপরাধে বন্ধ হয়েছি, তুমি আজই রাজার নিকটে উপস্থিত হয়ে বোলো;—'হে দেব, আপনার প্রসাদে কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থপতির চুরি ধরা পড়ে এবং আমি চর্ম্মরত্নটি ফিরে পাই! ফিরে

পাওয়ার পরে, রাগমঞ্জরীর স্বামী একজন অক্ষধূর্ত্ত—কলাবিদ্যায়, কবিত্বে, লোকবার্ত্তায় বিচক্ষণ—তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। সেই সূত্রে বস্ত্র-আভরণ ইত্যাদি প্রায়ই আমি পাঠাতুম তার ভার্য্যার কাছে। কিন্তু সে আমাকে কেন জানি সন্দেহের চোখে দেখল, আমার বন্ধুত্বের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে সেই খল, ধূর্ত্ত, নীচ, আমার উপর কুপিত হয়ে আমার চর্ম্মরত্ন এবং রাগমঞ্জরীর আভরণ-পেটিকা চুরি করেছে। চুরির আশায় পুনর্বার রাত্রে সে পথে পথে ঘুরছিল এমন সময় নাগরিক পুরুষেরা তাকে বন্দী করে। তারি খোঁজে ফিরছিল রাগমঞ্জরীর পরিচারিকা! তাকে ধরা পড়তে দেখে পরিচারিকা তার পায়ে কেঁদে পড়ে। পূর্ব্বপ্রণয়ের অনুবর্ত্তী হয়ে সেই লোকটি আভরণ পেটিকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে বলে দিয়েছে পরিচারিকাকে। এখন আমার চর্ম্মরত্নটি যাতে সে আমাকে ফিরিয়ে দেয় মহারাজের অনুগ্রহেই সে ব্যবস্থার সম্ভব হতে পারে।' দেখো, এই রকম নিবেদনের পর মহারাজ আমার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখবেন এবং সান্ত্বনা লাভ করে যাতে তোমাকে আমি চর্ম্মরত্নটি ফিরিয়ে দিই তার যথেষ্ট প্রচেষ্টা করবেন। সেই প্রচেষ্টাই হবে আমাদের পথ্য।"

এই কথা বলাতেই ধনমিত্র সব বুঝে ফেললেন, তাড়াহুড়ো না কোরে যেমন বলেছিলেন নিঃশঙ্কচিত্তে সম্পন্ন করলেন কর্ত্তব্য। রাগমঞ্জরীকে আপনার অনুভাব বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমি তার কাছ থেকে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী গ্রহণ করে আপনার আদেশ মতই উপঢৌকনাদি পাঠিয়ে রাজনন্দিনী 'অম্বালিকার' ধাত্রী 'মঙ্গলিকা'র সঙ্গে প্রীতিপরিচয় ঘটিয়ে নিই। মঙ্গলিকা দ্রব হয় এবং তার সূত্র ধরেই আমি সংক্রামিত করি রাগমঞ্জরী ও অম্বালিকার মধ্যে একটি সুন্দর সখীত্ব। অহরহঃ নতুন নতুন কাপড়, ফল, স্নেহ-শ্রদ্ধার উপঢৌকন নিয়ে আমি রাজপ্রাসাদে যেতে লাগলুম; এবং নানান রকমের কথার অবতারণা করে রাজকন্যা অম্বালিকার চিত্তখানি হরণ করে নিতে আমার দেরী হল না। পাত্রী হয়ে উঠলুম তাঁর পরম প্রসন্নতার।

তার পরে একদিন হয়েছে কি, রাজকন্যা এবং আমরা প্রাসাদের শিখরে বসে আছি; এমন সময় দেখি, কান্তক কন্যাপুরের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, কি জানি কেন, কিসের কারণে বিচরণ করছে। তাকে দেখেই মাথায় এল বুদ্ধি। রাজকুমারীর কর্ণকুবলয়টি ঠিকই পরা ছিল কানে, কিন্তু স্রস্ত হয়ে পড়ে যাচ্ছে—এই ভাণ করে, সেটিকে ঠিক করে দিতে গিয়ে মাটিতে ফেলে দিলুম। ধূলো লেগেছে আর ত কানে পরা চলবে না,—এই বাহানায় আমি ছাদ থেকে কুক্কুর-কপোতদের শাসন করবার ছলনায় কান্তকের গায়ে ছুঁড়ে মারি সেই পদ্মটিকে। ফুলের ঘায়ে কান্তক উপর দিকে মুখ তুলে চায় আর আমার হাসি দেখে হেসে ফেলে। রাজকুমারীও হেসে ফেলেন। বেচারী কান্তক! ধন্য বলে মনে করতে লাগল নিজেকে। এবং আমিও সেই ক্ষেত্রে এমন চাতুর্য্যের সৃষ্টি করি যাতে কান্তকের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মে যায় যে, রাজদুহিতার এই হাসিখানির মূলে রয়েছে কান্তকের উপরে তাঁর গভীর ভালবাসা। মনসিজ ত ফুলের ধনুকে গুণ টেনেই আছেন সর্ব্বদা, কান্তককে বিঁধতে আর কতক্ষণ! কিন্তু কান্তক বুঝল না,—ফুলবাণ নয়, সেদিন বিষবাণ তাকে বিঁধেছে। মোহ-গ্রস্তের মত সেদিন কোনক্রমে টলতে টলতে সে সেখান থেকে চলে যায়।

সন্ধ্যা বেলায় আমি করলুম কি;—রাজকন্যা অম্বালিকা নিজের অঙ্গুরীয়ের শীল-মোহর দিয়ে তাম্বুল-বস্ত্র পটবাসগর্ভ যে বঙ্গেরিকা (বেতের ঝাঁপিটি) রাগমঞ্জরীকে দেবার জন্যে আমার হাতে দিয়ে পাঠাচ্ছিলেন—সেটি একটি বালিকাকে দিয়ে প্রথমে কান্তকের গৃহে দিলুম পাঠিয়ে; আর তার কিছুক্ষণ পরে আমিও উপস্থিত হলুম কান্তকের গৃহে।

আমাকে পেয়ে সে যেন খুশীতে ফেটে পড়তে লাগল। তার অগাধ কামনার সাগরে আমি যেন তারণকর্ত্রী তরণী। রাজকুমারীর অবস্থার ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হচ্ছে, নিদারুণ অসহ্য হয়ে উঠেছে তাঁর বিরহ,—আমার মুখে এই সব কথা শুনে দুর্ম্মতি প্রায় যেন উন্মাদ হয়ে উঠল। আমারি মুখোচ্ছিষ্ট তাম্বুল, আমারি অনুলেপন, নির্ম্মাল্য এবং আমারি গায়ের মলিনাংশুক রাজকুমারী-প্রেরিত বলে তাকে খাওয়ালুম, পরালুম, দিলুম। ফিরে তার কাছ থেকে আদায় করলুম উপহার। ধনরত্নগুলি রেখে দিয়ে আর সব ফেলে দিলুম পথে।

পরের দিন। মন্মথের আগুনে প্রজ্বলন্ত আজ কান্তক। একান্তে তাকে আহ্বান করে মন্ত্রণার ইন্ধন জুগিয়ে বললুম, 'দেখুন আর্য্য, মিলে যাচ্ছে আপনার সঙ্গে সব লক্ষণগুলো। এক জ্যোতিষী, আমারি প্রতিবেশী, সে গণনা করে আমাকে হঠাৎ বলেছে,—'কান্তকের হাতেই রাজ্যভার পড়বে। লক্ষণ দেখে তাই বলেই মনে হয়।' দেখুন, আমারও মন তাই বলছে। তা না হলে রাজকুমারী হঠাৎ বা কেন আপনাকে ভালবেসে ফেলবেন? মহারাজেরও পুত্র নেই, ঐ এক কন্যা। রাজকুমারীর সঙ্গে আপনার মিলন হয়েছে শুনে নিশ্চয়ই খুব ক্রুদ্ধ হবেন; না হওয়াই আশ্চর্য্য; কিন্তু এও ঠিক যে, পাছে কন্যা আত্ম-হত্যা করে সেই ভয়ে তিনি আপনাকে উৎসন্নে দিতে পারবেন না। বরং আমার মনে হয়, ক্ষমা করবেন। এবং শেষ পর্য্যন্ত যৌবরাজ্যে আপনাকে অভিষিক্ত করবেন। জ্যোতিষীর ঐ কথার এই অর্থ না হয়েই যায় না। আর আপনি চেষ্টাই বা করে দেখবেন না কেন?

যদি কুমারীপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার উপায় না জানেন তা হলে বলে দিচ্ছি শুনুন। রাজকন্যার আরাম-প্রাকারের ভিত্তি কারাগারের ভিত্তি থেকে মাত্র তিন বিঘৎ দূরে। সেই পথটুকু সুড়ঙ্গ খনন করালেই নিশ্চিন্ত। নিশ্চয়ই আপনার কারাগারে হস্তবান্ (শিক্ষিতহস্ত) একটা না একটা চোর পাওয়া যাবে, যে বেটা প্রলোভনে পড়ে আপনাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। আর,—উপবনে একবার প্রবেশ করতে পারলে আপনি ত আমাদের হাতেই এসে পড়লেন। তখন আর ভয় কি? সখীরা সকলেই বড্ড ভালবাসে রাজকুমারীকে, তারা এ রহস্য কেউ ভাঙতে পারবে না।'

কান্তক বললে, 'ভদ্রে, ভাল বলেছ। হ্যাঁ, কারাগারে এক বেটা চোর রয়েছে, সগর রাজার ছেলেদের মত সে খনন-বিদ্যায় একেবারে ধুরন্ধর। সে বেটাকে যদি হাত করা যায় তা হলে নিমেষে সিদ্ধ হবে সাধনা।' 'সে লোকটা কে, আর তাকে হাত করাই বা যাবে না কেন?'—এই প্রশ্ন করাতে কান্তক বললে, 'সেই ধনমিত্রের চর্ম্মরত্নটাকে যে বেটা চুরি করেছিল সেই বেটার কথা বলছি। সেই এক পারতে পারে। সেই বেটাকে দিয়ে সুড়ঙ্গটা খোঁড়াতে হলে বলতে হবে—দেখ, কাজ শেষ হলে তোকে ছেড়ে দেবো। কিন্তু কাজ ফুরোলেই আবার বেটাকে শিকলি পরিয়ে মহারাজের কাছে নিবেদন করলেই চলবে—বেটা পালিয়েছিল, ধৃষ্টতা দেখুন। মহারাজ, চর্ম্মরত্নের সন্ধান না দিয়েই আবার আমার হাত থেকেই কি না পালায়!" দেখো, শৃগালিকা, তখন ওর চিত্রবধের আদেশ হবে।'

'তবে আর কি! স্বার্থও সাধন হবে, রহস্যও গোপন থাকবে'—

এই কথা বলাতে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে উঠেছে কান্তক। ...প্রলোভন দেখিয়ে আপনাকে ভোলাবার জন্যে আমাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এখন দাঁড়িয়ে আছে কারাগারের বাইরে। সব কথা ত শুনলেন, এখন কি করা উচিত চিন্তা করে দেখুন।'...

আনন্দে লাফিয়ে উঠল আমার আত্মা। অল্প কথায় বললুম "বেশ, তাকে এখানে নিয়ে এস।"

কান্তক প্রবেশ করে শপথ করলে—'তোমাকে মুক্তি দেব' এবং আমিও শপথ করলুম 'তোমার রহস্য ভেদ করব না।' আমার শৃঙ্খল খুলে গেল। স্নান ভোজন অঙ্গপ্রসাধন ইত্যাদি সমাপন করে কারাগারের নিত্য-অন্ধকার ভিত্তি-কোণে গিয়ে প্রবেশ করলুম। উরগাস্য যন্ত্রের আনুকূল্যে সুড়ঙ্গপথ নির্ম্মাণ করতে আমার বিশেষ বিলম্ব হল না। তার পর মনে মনে ভাবলুম,—

"কান্তক বেটা স্থির করেই রেখেছে কার্য্যোদ্ধার হলেই আমাকে বধ করবে। আমি যদি তাকে এখন হত্যা করি তা হলে দোষ আমার লাগবে না; নিশ্চয়ই না; কারণ মিথ্যার শপথ চলে না।"

দেখতে দেখতে কান্তক এসে উপস্থিত হল। হাতে তার লৌহ-শৃঙ্খল। আমাকে বাঁধবার জন্যে যেই হাত বাড়িয়েছে অমনি আমি তার বুকে পদাঘাত করে তাকে মাটিতে ফেলে দিলুম এবং পরমুহূর্ত্তেই তারি অসিধেনুখানি ছিনিয়ে নিয়ে তারই মস্তক পৃথক করে দিলুম দেহ থেকে। শৃগালিকাকে ডেকে বললুম, "ভদ্রে, এখন আমাকে বল, কন্যাপুরের ঠিক কোথায় সংস্থান, সন্নিবেশ। আমার এত বড় প্রয়াস কি বিফলে যাবে? না, তা হবে না। কন্যাপুর থেকে যা পারি চুরি করে তবে এই কারাগার থেকে আমি বেরব।"

শৃগালিকা আমাকে পথ দেখাল কন্যাপুরের। কন্যাপুরের অভ্যন্তরে তখন জ্বলছিল স্নিগ্ধদ্যুতি কয়েকটি মণি-প্রদীপ। সারাদিন ক্রীড়াবিহার করে শ্রান্ত হয়ে এদিকে ওদিকে সুখে ঘুমিয়ে পড়েছে পরিজনেরা। হংসতুলগর্ভকোমল উপাধানশালী একটি বৃহৎ পর্য্যঙ্ক মাঝখানে আছে দাঁড়িয়ে। সিংহাকার হাতীর দাঁতের পায়ায় মহামূল্য স্থূলরত্ন জ্বলছে। পর্য্যঙ্কের পর্য্যন্তে ফুলের পরাগ। ভুর ভুর করে উঠছে গন্ধ।

সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে ঘরের মধ্যে মাথা তুলতেই প্রথমে চোখ নামল দুখানি চরণের উপর। দক্ষিণ চরণের সুন্দর তলদেশের উপর ভর রেখে বাম চরণের মনোহরণ পাতাখানি পড়ে রয়েছে। আর একটু মাথা তুলতেই দেখি—আহা, ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে খোলা পায়ের একজোড়া তুলতুলে গোছ। মাথা আপনিই উঠতে লাগলো আর তার সঙ্গে দেখতে পেলুম—

জঙ্ঘাদুটি পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে,
কোমল দুটি জানুর অল্প-কুঞ্চিত রেখা,
কিঞ্চিৎ-বেল্লিত উরুদণ্ড যুগ,
নিতম্বের উপরে স্রস্তমুক্ত একখানি ভুজলতার লালিত্য;
অন্য বাহুখানি—
ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উত্তানিত কর-পল্লবের মধ্যে ধরে রয়েছে
সুন্দর শিরোভাগ।

সুপ্তির রাজত্বে নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়িয়ে উঠে দেখলুম—

আভুগ্ন শ্রোণীমণ্ডল, ক্ষীণতর তার কটি;
চীনাংশুকের অধোবাস দেহটিকে জড়িয়ে ধরেছে সুনিবিড় শ্লেষে,
অতি মৃদু নিঃশ্বাসে কেঁপে উঠছে কঠোর কুড্মল,
লীলাভরে এলিয়ে পড়েছে গ্রীবা,
গ্রীবার হেমসূত্রে গাঁথা রয়েছে পদ্মরাগ;
একটি কান চাপা, অর্দ্ধেক দেখা যাচ্ছে কুন্তল—
আর একটি কান স্পষ্ট, উপরে ভাসা,—তার কুণ্ডলের
কর্ণিকা থেকে ভাঙা-ভাঙা ফাঁপা-ফাঁপা চুলগুলোর উপর
ছড়িয়ে পড়েছে কিরণের পিঙ্গল পরাগ।
হ্যাঁ, অধরের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বটে মুখের অতিরাঙা
ভিতরখানি, তবে মুখের লাবণ্যে পরাস্ত হয়ে যেন
কিছুটা ম্লান হয়ে রয়েছে;
ওপাশের গালের নীচে হাতখানির মায়া,—
নবকল্পনা যেন কর্ণাবতংসের;
আর, উপর-গালের আয়নায় বিতানপত্রের পড়েছে ছায়া,
—ছায়াটি যেন ফুটফুটে নতুন-ফোটা তিল।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এত সৌন্দর্য্য দেখবার তখন আমার সময় কোথায়? তবু চোখ সরে যেতে চায় না। দেখছে—

সেই ঘুমন্ত চোখে,—নীলপদ্মের মুদ্রিত মহিমা,
নিশ্চল ভুরুর জয়পতাকা কাঁপছে না;
চন্দনের তিলকখানি সামান্য শিথিল হয়ে পড়েছে—
শ্রমজলের পুলকে;
আর মুখের উপর, হাল্কা হাওয়ায় দুলছে অলকের লতা।

রাজনন্দিনী অম্বালিকা শয্যার শুভ্রতায় একপাশ ফিরে শুয়ে রয়েছেন,—বিশ্রব্ধপ্রসুপ্তা,—শরতের শুভ্র মেঘের কোলে যেন সৌদামিনীর স্বপ্ন!

তাঁকে দেখতে দেখতেই, আমার সর্ব্বাঙ্গ থিরথির করে কাঁপতে লাগল; তাস্করীকলার ব্যবহারে কেমন যেন এলো নিঃস্পৃহতা; চুরি করতে এসেছিলুম, মনে হল নিজেই যেন চুরি হয়ে গেছি। মূঢ়ের মত সেখানে স্থির দাঁড়িয়ে রইলুম! হঠাৎ মনের মধ্যে তর্ক উঠল,—"যদি এই অনিন্দ্যরূপিণীকে নিজের করতে না পারি তা হলে নিশ্চয়ই বসন্ত-বন্ধু আমাকে প্রাণ ধরতে দেবেন না। কিন্তু ওকে স্পর্শ করা ত বিপদ, আচমকা জেগে উঠে যদি চীৎকার কোরে ওঠে তা হলে আমার মনোরথে পড়বে বজ্র। আমিই হব বাধা।"

তখন এক কাজ করলুম। নাগদণ্ড থেকে নির্য্যাসকল্কবর্ণিত হিঙ্গুলরক্তপট্টিকা ফলকখানিকে নামিয়ে নিলুম এবং মণিভাণ্ড থেকে বর্ণবর্ত্তিকা। সেই ফলকে একখানি ছবি আঁকলুম—যেমন করে সে শুয়েছিল তেমনি, আর তার পায়ের কাছে বদ্ধাঞ্জলি—আমি। এঁকে, তাতে আর্য্যাছন্দে লিখে দিলুম,—

"অঞ্জলি রচনা ক'রে এই দাস একটি গূঢ় কথা বলছে;—
ঘুমিয়ে থাক—আমার সঙ্গে,—মিলনমঙ্গল-খিন্নার মতই,—
—এ যেন না হয়—না হয়।"

হৈম-পেটিকা থেকে সুবাসিত নাগবল্লী-পাতায়, কর্পূর এবং সুগন্ধ খদিরসার দিয়ে খিলি বেঁধে আরাম করে তাম্বূল সেবা করলুম।

আল্‌তার মত লাল তাম্বূলের রস,—নিঙড়ে বার করে চূণের দেয়ালের উপর এঁকে দিলুম একজোড়া চক্রবাক্। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে অঙ্গুরীয় বিনিময় করে সুড়ঙ্গ-পথে বেরিয়ে এলুম। পুনর্বার ফিরে যাই কারাগারে।

সেখানে বন্দী ছিল জনৈক নাগরিক-শ্রেষ্ঠ। 'সিংহ-ঘোষ' তার নাম। তার সঙ্গে মিত্রতা পাতিয়ে, সব কথা ব্যক্ত করে শেষে বললুম—"দেখ ভাই, কান্তক বেটা ত মরেছে, তুমি এখন মহারাজের কাছে রহস্যটি উদ্‌ঘাটন করে দাও, মোক্ষ পাবে।"

তাকে উপদেশ দিয়ে শৃগালিকার সঙ্গে কারাগার পরিত্যাগ করি। কিন্তু এমনি কপাল! রাজপথ দিয়ে চলেছি এমন সময় নগররক্ষীরা আমাকে এসে ধরলে। ভাবলুম, দৌড়ে যদি পালাই তা হলে এরা আমাকে ধরতে পারবে না, তবে বেচারী শৃগালিকার বিপদ্ ঘটবে। টপ করে তাই বুদ্ধি স্থির করে পাগল সেজে যাই। রক্ষীদের কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে, কনুই দুটো নিজের পিঠের দিকে ঠেলে দিয়ে বললুম, "ও মশায়রা, মশায়রা, আমি চোর, বেঁধে ফেলুন আমাকে, বেঁধে ফেলুন—তোমরা বাপু বোঝ না, আমাকেই বাঁধতে হয়, বুড়ো-হাবড়াকে নয়।"

শৃগালিকা বুঝে নিলে ব্যাপারখানা কোন্ দিকে গড়িয়েছে। সে তখন তাদের প্রণাম করে বললে, 'ও ভাল মানুষেরা, আমার এই ছেলেটির মাথা খারাপ হয়েছিল। চিকিৎসা করিয়ে বাড়ী আনি। এই কাল পর্য্যন্ত ভালই ছিল, প্রকৃতিস্থ ছিল। তাই আমি ওর শিকল খুলে দিয়ে ওকে স্নান করাই, তেল-চন্দন মাখাই, পাট ভেঙে একজোড়া কাপড় পরাই, পরমান্ন মুখে দিই। তার পর বেশ আনন্দে ওকে ছেড়ে দিই। আজ আবার এই মাঝরাত্রে ওকে দেবতায় ভর করেছে, চেঁচাচ্ছে—"বেটা কান্তককে খুন করব, রাজার মেয়েকে বিয়ে করব—।" কী যে পাগলামি বুঝতে পারি না বাপু। ও পথ দিয়ে ছুটেছে আমিও ছুটেছি। এখন দয়া করে আমার ছেলেটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে আমাকে দিন।'

যখন সে কাঁদতে কাঁদতে এই কথা বলছে ততক্ষণে আমি—

"ওরে বেটি বুড়ী, আমি দেবতা মাতরিশ্বা, আমায় আবার পৃথিবীতে বাঁধবে কে? ও কাকগুলোর কর্ম্ম নয়, গরুড় পাখীকে ঠোকরানো।"—এই বলতে বলতে পা চালিয়ে অন্তর্ধান। রক্ষীরা তখন শৃগালিকাকে কদর্থ করে বললে—"তুমিই বাপু পাগল, পাগলকে পাগল না ভেবে যে ছেড়ে দেয়, সেই পাগল। ও বেটাকে এখন বাঁধবে কে?"

তারা চলে গেল, শৃগালিকাও আমার অনুসরণ করল। কামমঞ্জরীর গৃহে ফিরে এসে দেখি—সে বেচারী বহুদিনের বিরহে বিহ্বল হয়ে গেছে। তাকে সমাশ্বস্ত করে রাত্রি কাটিয়ে দিলুম। রাত্রি কি আর কাটে! পরের দিন প্রত্যুষে উদারক আমার কাছে এল।

এমন সময় একদা জানতে পারলুম—

ভগবান মরীচি মুনি বারাঙ্গনাজনিত যে কৃচ্ছসাধনে রত ছিলেন, সেই সাধনার অবসান ঘটেছে। প্রখর তপস্যার প্রভাবে তিনি ফিরে পেয়েছেন তাঁর দিব্যচক্ষু। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে রাজকুমার,—আমি জানতে পারি, এবম্ভূতপ্রকার আপনার দেখা পাব।

এদিকে সিংহ-ঘোষ কান্তকের অপচার সম্বন্ধে সবিশেষ নিবেদন করেছিল মহারাজের নিকটে। মহারাজ প্রসন্ন হয়ে তাকে মুক্তি দিলেন এবং তাকেই নিযুক্ত করলেন কান্তকের পদে। সিংহ-ঘোষের দাক্ষিণ্যে আমি বহুবার সুড়ঙ্গপথে কন্যাপুরে প্রবেশ করবার সুযোগ পাই এবং শৃগালিকার দৌত্যে এবং ভাষণে মুগ্ধা রাজকন্যা অম্বালিকার সঙ্গে আমার মিলন ঘটে।

সেই সময়ে চণ্ডবর্ম্মা অবরোধ করেন অঙ্গরাজ সিংহবর্ম্মার রাজধানী। সিংহবর্ম্মার দুহিতা অম্বালিকাকে প্রার্থনা করেছিলেন চণ্ডবর্ম্মা, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে পারগ্রামিক বিধি অবলম্বন করে আক্রমণ করলেন অঙ্গরাজ্য। অঙ্গরাজ তখন সামন্তনৃপদের সাহায্যের অপেক্ষা না করেই নিজেই রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু সৈন্যবল কৃশ থাকাতে প্রচণ্ড যুদ্ধ সত্ত্বেও ভিন্নবর্ম্মা হয়ে বন্দী হলেন। বিবাহের উদ্দেশ্যে অম্বালিকাকে অঙ্গরাজভবনে বলপূর্ব্বক ধরে নিয়ে আসেন চণ্ডবর্ম্মা এবং প্রচার করে দেন, 'রাত্রি অবসানে বিবাহবিধি অনুষ্ঠিত হবে।'

ধনমিত্রের গৃহে উপস্থিত হয়ে বিবাহের জন্য মঙ্গল-প্রতিসর (লাল সুতো) হাতে বাঁধতে বাঁধতে আমি বললুম, "সখা, অঙ্গরাজকে সাহায্য করবার জন্য শীঘ্রই এসে পড়বেন রাজমণ্ডল। অত্যন্ত গোপনে পৌরবৃদ্ধদের সঙ্গে নিয়ে তুমি যাও, তাঁদের দ্রুত বরণ করে নিয়ে এস। এই আমি বলে রাখছি, তুমি ফিরে এসে দেখতে পাবে—ছিন্নশির হয়ে শত্রু পড়ে রয়েছে ধরাপৃষ্ঠে।"

ধনমিত্র বিদায় নিলে। আমি অগ্রসর হলুম সেই ক্ষীণায়ুঃ চণ্ডবর্ম্মার প্রাসাদের দিকে। সেখানকার সকলে তখন উৎসবে মত্ত। চলেছে বিবাহের বিপুল উদ্যোগ। আসছে, যাচ্ছে বহু লোক। সেই ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ অলক্ষ্যশক্তিক হয়ে মঙ্গলপাঠকদের সঙ্গে অন্তঃপুরে হল আমার প্রবেশ! উপস্থিত হয়েই দেখি, আথর্ব্বন বিধিতে অগ্নিসাক্ষ্য করে অম্বালিকার পাণি-পল্লব সমর্পণ করছেন পুরোহিত এবং চণ্ডবর্ম্মা বাহুদণ্ড প্রসারণ করে গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সেই পাণি। আর বিলম্ব নয়। চণ্ডবর্ম্মার বাহুদণ্ডটিকে আকর্ষণ করে তার বুকের মধ্যে তৎক্ষণাৎ বসিয়ে দিলুম শাণিত ছুরিকা। সাঙ্গোপাঙ্গেরা চিড়বিড় করে লাফিয়ে এল, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটাকে যমমন্দিরে পাঠাতে কষ্ট পেতে হল না। হতবিধ্বস্ত সেই গৃহে যখন অসিহস্তে বিচরণ করতে লাগলুম তখন সকলে ভয় পেয়ে পালাল। তখন আমায় পায় কে?—কোমলা মধুরগাত্রী বিশাললোচনাকে হাত ধরে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করতে করতে গর্ভগৃহে প্রবেশ করলুম। প্রবেশ করছি ঠিক এমনি সময়ে নতুন মেঘের গর্জ্জনের মত আপনার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে লাগল, আমি অনুগৃহীত হয়ে গেলুম।"

অপহারবর্ম্মার কাহিনী শুনে হেসে ফেললেন রাজকুমার রাজবাহন। বললেন, "কঠোরতায় তুমি স্তেয়শাস্ত্রকর্ত্তা কর্ণীসুতকেও অতিক্রম করে গেছ।"

তার পরে উপহারবর্ম্মার দিকে ফিরে বললেন, "এইবার তোমার কাহিনী শোনবার পালা।" প্রণাম করে, মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে উপহারবর্ম্মা বলতে লাগল—'

ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে
অপহারবর্ম্মচরিতং নাম দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসঃ ॥ [ক্রমশঃ।
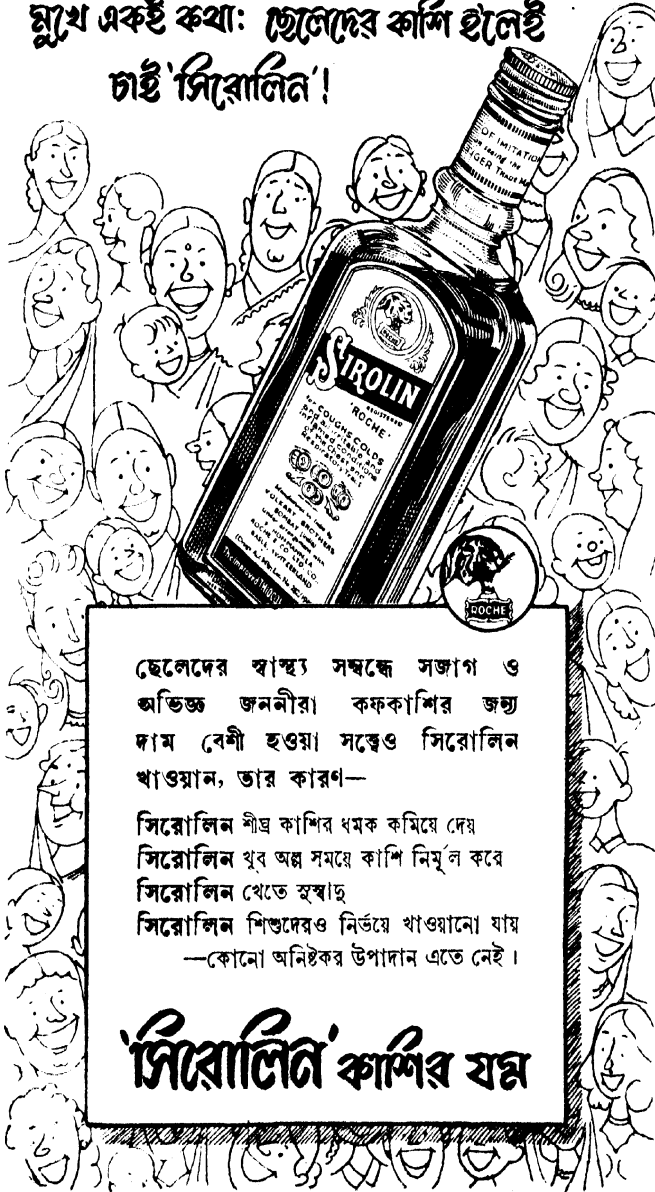
বছরের পর বছর... এদেশের হাজারো মায়ের
মুখে একই কথা: ছেলেদের কাশি হলেই
চাই 'সিরোলিন'!
SIROLIN
'ROCHE'
ROCHE
ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ ও অভিজ্ঞ জননীরা কফকাশির জন্য দাম বেশী হওয়া সত্ত্বেও সিরোলিন খাওয়ান, তার কারণ—
সিরোলিন শীঘ্র কাশির ধমক কমিয়ে দেয়
সিরোলিন খুব অল্প সময়ে কাশি নির্মূল করে
সিরোলিন খেতে সুস্বাদু
সিরোলিন শিশুদেরও নির্ভয়ে খাওয়ানো যায়
—কোনো অনিষ্টকর উপাদান এতে নেই।
'সিরোলিন' কাশির যম

(উপন্যাস)

সুলেখা দাশগুপ্তা

মিত্রা! মিত্রা কে?

সত্যিই তো, মিত্রা কে! আত্মকাহিনী লিখবার মতো কথা ও কাহিনীর সমাবেশ কি ওর জীবনে হয়েছে?

হয়নি।

কথা যেটুকু জমেছে বাল্যের প্রগল্‌ভতা ছাড়িয়ে তা এগোয়নি; আর কাহিনী—সে তো কৈশোর চাঞ্চল্যের সীমা পার হতে না হতেই গিয়েছিল তার সর্ব-সাবলীল গতিবেগ নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে।

মা এতটুকুন এক ছোট্ট মেয়ে ওকে নিয়ে অকাল বৈধব্যে চোখের জলে ভেসে বাপের ঘরে এসেছিলেন।

চার ভাইয়ের একমাত্র বোন ওর মা—সুমিত্রা। আর তারই একমাত্র অবলম্বন ঐ একরত্তি মেয়ের কণা। সমস্তটা পরিবার সজাগ চোখ-কান নিয়ে উন্মুখ হয়ে থাকতো ওদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে।

বধূ-বরণ করে ঘরে তুলে দিদিমা বলতেন,

'আমার সুমিত্রা আর তার ঐ দুধের শিশুটাকে ভালোবেসো, যত্ন করো। আর কিছু চাইবো না।'

বাবা এসে জানতে চাইতেন,

'বৌদি পছন্দ হলো তো সুমি'মা? তোমার পছন্দই যে সব গো···'

বাসরঘরে কনেকে শুনতে হতো:

'বাড়ীতে রয়েছে একটি দুঃখী বোন। বিয়ের পর থেকেই চোখের জল ফেলে কাটছে তার জীবন। আমরা শুধু সুমিত্রার চোখের জলের সামনে বাঁধ তৈরী করে রাখছি। কিন্তু সে তো বালির বাঁধ—সতর্ক খেয়ালে চলতে হয়। সবাই আমরা তাই চলি। আজ থেকে তুমিও তো আমাদের এক জন হলে। তোমার কাছেও এই আশা করবো কিন্তু।···'

এমনি অপরিসীম আদর-যত্ন-আগ্রহের ভিতর রাণীর মতো কেটেছে ওর মায়ের বৈধব্য-জীবন। আর ও নিজেও প্রতিপালিত হয়েছে—যেন সোহাগিনী রাজকন্যা! মামারা ডাকতেন, 'সুমিত্রা দি সেকেণ্ড।' দাদু ডাকতেন, রাজকন্যা মিত্রাদেবী। দিদিমা ডাকতেন কত নামে—তা আজ তার মনেও পড়ে না।

মা'র বুকে শুয়ে দিদিমার কোলে পা তুলে দিয়ে আব্দারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে মামাদের পর্য্যন্ত তুলেছে ব্যতিব্যস্ত করে।···'জল দেও না রাঙা মামা—না, চাকরের হাতে খাবো না, তুমি দেবে।···বড় মামা বলো না একটা গল্প। ভূতের? না ভালোবাসি না আমি ও-সব ভূতের।···মানুষের গল্প বলো, আর বলো রাজপুত্র-রাজকন্যার।···আজকে আর রাজপুত্র-রাজকন্যার কথা নেই, সব ভিখিরীর!' উঠে বসে মিত্রা, 'কেমন করে হল সব পথের ভিখিরী? ডাইনীর মায়ায়, দেবতার অভিশাপে? আবার তো সব ফিরে পাবে ডাইনীকে মেরে?—নয় তো দেবতার শাপমুক্ত হয়ে।···আচ্ছা, সে যা হয় তখন হবে। এখন তো গল্প শোনাও আমাকে···'

'ছোট মামাটা যেন কি! খালি বেরোনো আর বেরোনো! কোথায় যায় এত বল তো? দাঁড়াও দেখাচ্ছি আজ থেকে শুধু বাইরে থাকা—। পরীক্ষা পাশ দিয়েছেন—রাজা হয়ে গেছেন!'

'সেজ মামা···এখনো বাড়ী ফেরেননি। আর কখন ফিরবে? কি কাজ এতো বুঝি না বাপু!···'

বল্‌তো কখনো বুড়োমানষী মুরুব্বিয়ানায়, কখনো অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে।

বাড়ীর আর দুটি মামাতো বোনের চাইতে ওর আধিপত্য যে অনেক বেশী, মুখে-চোখে সে দেমাক ফুটিয়ে সমস্ত বাড়ী ঘুর-ঘুর করে বেড়াতো ও—আট বছরের মিত্রা।

কাটছিল দিন। চমৎকার!—যার তুলনা আজ আর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু সুখের চাকা বুঝি ঘোরে তাড়াতাড়ি।···অতর্কিতে একদিন কোথা দিয়ে কতকগুলো অমঙ্গল এসে একসঙ্গে দরজায় কড়া নাড়া দিয়ে দাঁড়ালো। ঢুকলো ভিতরে। দিয়ে গেল ওদের সুখী পরিবারটিকে দুমড়ে-মুচড়ে তছনছ করে। দাদু মারা গেলেন সিঁড়ি দিয়ে পড়ে। সেজ মামা সাত দিনের জ্বরে। মেয়ের মাথার সিঁদুর মুছে যাওয়ার পরই দিদিমার মন গিয়েছিল ভেঙ্গে। এবার নিলেন শয্যা।···সমস্ত বাড়ীটার ছন্নছাড়া উদাসীন ভাব ভুলিয়ে দিল ছেলেমানুষদের ছেলেমানুষী। ভুললো ছোটরা আবদার, অভিমান আর খেলা।—চুপচাপ খেয়ে আসে···বারান্দার এ-কোণে সে-কোণে বসে ঢোলে, তার পর এক সময় উঠে গিয়ে মাথার ছোট-ছোট বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে। তদারক করবার থাকে না কেউ।

মা'র সমস্ত শূন্য করে দিয়ে গিয়েছিলেন দাদুই। এত দিন সঙ্গে নিয়ে খেয়েছেন। পড়েছেন—পত্রিকা-উপন্যাস। করেছেন আলাপ-আলোচনা—কত কি! বাপ আর মেয়ে তো নয়—ছিল যেন দুটি বন্ধু। সেই বাপের অভাবে মা'র সব শূন্য তো মনে হবেই!

শুকিয়ে উঠতে লাগল সুমিত্রা।

মূল-ছেঁড়া লতার মত। সর্বদাই কেমন-ধারা ভীত-সন্ত্রস্ত ত্রাস। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।···

মিত্রার ছোট্ট বুকে কাঁপুনি এনে দেয় মা'র চোখের ঐ চাওয়া।··· কেউ জোরে কথা বললে অমন চমকে ওঠে কেন মা? কেন ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়ায় হতজ্ঞান উদ্‌ভ্রান্তের মতো? করুণ সুরে গান টানে নিচু গলায়···তার পর বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। উঃ, সে কি কান্না! আড়ালে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠে চোখ মুছে চলতো ও নিজেও।···

মা কেন এত কাঁদে···ওরই বা কেন পায় এমন ভীষণ কান্না? কেন বসে না খেলায় মন? কেন ভালো লাগে না সঙ্গি-সাথী?···ছোট দুটি হাতে মুখ রেখে বসে-বসে ভাবতো মিত্রা—বারো বছরের মিত্রা!

সময়ের হাতের ধীর সান্ত্বনায় দুঃসময়ের ঘোর কাটিয়ে আবার সংসারটা উঠতে লাগলো জেগে। ফিরে আসতে লাগলো মানুষগুলোর

মনের স্থৈর্য্য। অন্ধকার রাতের অস্পষ্ট প্রথম উষার মত মৃদু হাসি, অমুচ্চ কণ্ঠে শান্ত গল্প, একটু আনন্দ-কৌতুক ঝিল্‌মিল করে উঁকি দেয় এ-ঘরে সে-ঘরে। দিদিমাও বিছানা ছেড়ে মন দিতে চেষ্টা করেন সংসারের শত কাজে।

কিন্তু সুমিত্রা?

ওর পরিবর্তন নেই কেন? কেন ও কান্না-হাসির এতগুলো দিন পার হয়ে এসে আজও কারণ-অকারণ, সময়-অসময়ের ধারা মেনে চলছে না?

শঙ্কিত হয়ে উঠলো সবাই।

বেরিয়ে পড়লেন বড় মামা, দিদিমা ও মাকে নিয়ে। ঘুরলেন কত-শত জায়গা। দেখালেন কত নিত্য-নতুন স্থান—পরিবেশের নূতনত্বে মুছে দিতে চাইলেন পুরোনো দিনের স্মৃতি।

কিন্তু জল-হাওয়ার পরিবর্তন হলো অনেক। হলো না ওর আর পরিবর্তন।

কথা সে বলতো কমই। এখন বলেই না। কেউ বলতে এলে বিরক্ত হয়। হাসে—খুবই হাসে। কথায় কথায় গড়িয়ে পড়ে হেসে। আবার যখন কাঁদে সে যে কি কাতর, করুণ কান্না, দেখে নিতান্ত অজানা মানুষের বুক ভেঙ্গেও বুঝি কান্না আসতে চাইবে।···এমন অবিকৃত। কে বুঝবে সুমিত্রা অপ্রকৃতিস্থা!

মিত্রার ভয় করতো, আতঙ্ক লাগতো বুকে। দূরে-দূরে সরে বেড়াতো ও মা'র কাছ থেকে।···

এমন একটা ভয়ঙ্কর সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার আগে, সব চাইতে বড় প্রয়োজন মনের প্রস্তুতি। ধৈর্য্য আর শক্তিধারণের মানসিক সেই প্রস্তুতির প্রয়োজনে, কিছু-নয় কিছু-নয়ের চোখে ধুলো-দেওয়া কালাতিবাহন আর যখন চলে না, দিদিমা ডেকে পাঠালেন তিন ছেলেকে।

'কি মা?' বড় ছেলে বিমল ঘরে ঢুকলো।

'কিরণ আর অরুণ এলো না?'

'আসছে।'

'হঠাৎ সবাইকে এমন জোর তলব কেন?' বসতে বসতে জানতে চাইলো বিমল।

'বলছি, দাঁড়াও—ওরা আসুক।'

এল কিরণ আর অরুণ। তারাও জানতে চাইলো, 'কি ব্যাপার?'

'মিত্রার বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজ করবে তিন ভাই। এ কথাটাই বলতে ডেকেছি। ব্যাপার কিছু নয়।'

'এ-ও যদি ব্যাপার না হয় তো ব্যাপার কাকে বলে?'

চমকে উঠেছিল মামারা।

বড় মামা বিমল রেগে উঠলো, 'এ কি কথা বলছো মা? ঐটুকু মেয়ে! পরীক্ষার বছর সামনে! ওর বিয়ের কথা মনে ওঠে কি করে?'

'উঠেছে।—ঠেকেই মনে উঠেছে বিমল!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেন ছেলেদের, 'মুখের কথা ফেলতেই তো আর সম্বন্ধ জুটে যাচ্ছে না। পড়ছে পড়ুক। তোমরা একটি ভালো ছেলের সন্ধানে থাকো। যখন মনমতো মিলবে, তখন তো বিয়ে?'

রাঙা মামা কিরণ জিজ্ঞাসা করে, 'ব্যস্ত হওয়ার কারণটা কি মা? আমাদের উপর পারছো না নির্ভর করতে? বেঁচে থাকতে বিয়ে দিয়ে যেতে চাও? ওর চাইতে দু-কুড়ি বয়স বেশী, আমরা আইবুড়ো বসে আছি। আর ঐ শিশু মেয়েটা যাবে শ্বশুর-ঘর করতে। ভাবতে পারছো কি করে তুমি এমন কথা?'

ছোট মামা অরুণ সংক্ষিপ্ত মতামত জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে জানায়, 'অসম্ভব।—তুমি কি পাগল হয়েছো মা?'

বৃদ্ধ বয়সের শীর্ণ চিবুক কুঁচকে রেখাময় হয়ে কেঁপে উঠলো থর-থরিয়ে। একটু সময় নিয়ে নিজেকে শান্ত করলেন মা। তার পর বলেন, 'দেখছো না বোনের অবস্থা? বুঝতে পারো না কিছু? এখনও সময় আছে। সবাই ভাবে দুঃখী মানুষ,—কাঁদে। কিন্তু যদি এমনি ধারা চলতেই থাকে কিংবা দাঁড়ায় বাড়াবাড়িতে,—তখন? কে ঘরের বউ করে নিতে চাইবে তোমাদের মিত্রাকে? মা যার—' কম্পিত ঠোঁট কথার ভারে ভেঙ্গে পড়লো, কেঁদে উঠলেন তিনি আকুল হয়ে।

চোখের কোণের জোলো লাল ভাবটাকে প্রশ্রয় দিল না ভাইরা। শুধু কিছুটা সময় কাটলো নীরবে।···

'এতোগুলো দুর্দৈব একসঙ্গে, তাই সামলে উঠতে পারছে না মা।—দেখো এ কিছু নয়।···আর মিতু হয়েছে কবে। তখন তো ওর মা অসুস্থ ছিল না? তুমি ও-সবে অহেতুক ভয়-ভাবনা ছাড় মা। সব ঠিক হয়ে যাবে।' বললে কিরণ।

'যাবেই তো।' কিরণের কথার সমর্থন জানায় অরুণ।

বিমল চুপচাপ উঠে গেল। নরম মনের মানুষ। আর পারছে না সহজ গলায় কথা কইতে।

কিরণ আর অরুণও মাকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'এ অনুরোধ আর করো না মা! এ সম্ভব নয়।'

কিন্তু মা চুপ করলেও বোন ছাড়লো না।

বেশ ছিল সুমিত্রা নিজের মনে। কথাটা কানে যেতেই রোখ চেপে গেল যেন। ভাইদের পিছন-পিছন ঘুরে বেড়ায় আর বলে, 'বেরোচ্ছ নাকি দাদা? খোঁজ নিয়ে এসো না, বৌদির দাদা যে ছেলেটির কথা বলেছিলেন।'

ফিরবার সময় হলে থাকে বসে দরজা জুড়ে। চোখ বড়-বড় করে জানতে চায়, 'গিয়েছিলে? কেমন দেখলে, এগুলো কিছু?'···

বাড়ীতে কেউ এলেই তাকে ধরে বসবে সুমিত্রা। 'মেয়ের জন্ত একটি ভালো ছেলে খুঁজে দাও না ভাই!'···তার পর জানাবে যাওয়ার মুখে কেঁদে ফুঁপিয়ে হাত জড়িয়ে ধরে মিনতি।···

অবশেষে উঠলো এক দিন ভাইদের উপর দুর্দান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, 'বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে নেই তোমাদের। তা স্পষ্ট বললেই তো পারো। নইলে কেন এটা নয় ওটা নয় করে সব সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিচ্ছ? দেখে যেতে পর্য্যন্ত দিচ্ছ না মেয়েকে! কেন—কেন—কেন—' কেঁদে উঠলো সুমিত্রা প্রথমে কোঁপানো কান্নায়। তার পর তার গুমরানো কান্নার শব্দে মুহ্যমান হয়ে রইলো বাড়ীটা সমস্ত রাত।

অবশেষে প্রায় বাধ্য হয়েই ভাইরা মন দিলো, মিত্রার জন্ত পাত্র দেখায়। বিয়ে যখন স্থির হলো, ওর বয়স তখন বড় জোর চোদ্দ। ম্যাট্রিক শেষ দু' বোন মনের সুখে মাত্র বই-খাতা সরিয়ে গল্পে মাতবে।

দিদিমা বললেন, 'এই ভালো হলো।'

মামারা রইলেন নির্বিকার মুখে, যে যার হাতের বই পত্রিকার দিকে চোখ পেতে বসে।

আর সুমিত্রা—সুমিত্রা উঠলো আনন্দে মেতে। আর উঠতে লাগলো যেন আশ্চর্য রকম প্রকৃতিস্থ হয়ে।

কিন্তু ছুটে এসেছিল মিত্রা বড় মামী নীলিমার কাছে, 'কার বিয়ে হচ্ছে শুনি? আমার!' ঠোঁট বাঁকালো—'আমার বিয়ে আমি জানি না! ওদিকেও নিশ্চয় যার বিয়ে সেই জানে না। কি চমৎকার! তবে আর আমাদের দরকার কি? যারা সব ঠিক করেছে তারাই বিয়ে করে আসুক গিয়ে।'···

মামাতো বোন গীতা, গায়ত্রী হেসে উঠলো: 'বিয়ে করবি না তো সেদিন গিয়েছিলি কেন, ওই বুড়োকে প্রণাম করতে?'

ক্রুদ্ধা সার্পিণীর মত ফুঁসে উঠলো মিত্রা: 'জানি আমি? আমায় বললে দাদু হয়—প্রণাম করে যাও।'

মামীমা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'চমৎকার ছেলে। কত বড়লোক ওরা। বাড়ী আছে, গাড়ী আছে'—

'আরতির টুকটুকে লালপেড়ে শাড়ী। আঁচলেতে বেঁধে আনে জমি বাড়ী গাড়ী।' 'আরতির লাল পেড়ে শাড়ী পরেছিলি নাকি রে মিত্রা?'—গায়ত্রীর ঠাট্টায় কেঁদে ফেলেছিল। 'গায়ত্রী ছোট বুঝলাম, কিন্তু গীতা? গীতার হবে না কেন? একা কেন আমার হবে? আমরা দু'-জন তো সমান। এ তোমাদের ফন্দী,—তাড়াতে চাও আমাকে।'···

কিন্তু মা যখন ডেকে আদর করলেন, গালে গাল পেতে চোখে জল ঝরিয়ে বোঝাতে বসলেন, মায়ের চেহারা আর কথার সঙ্গতিতে নেচে উঠলো ওর মন: মা সুস্থ হয়ে উঠছেন, ওর বিয়ে হলে হয়তো আরও সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর নইলে···ভাবতে পারে না মিত্রা। তার চাইতে যা হয় হোক।

এত দিন ভয় আর অস্বস্তিতে যেতে পারেনি ও মা'র কাছে। সেদিন আনন্দ-শান্তিতে মাথা রেখেছিল মায়ের বুকে।···

আজ মনে হয়,—ওর বিয়ের চরম লাভ হয়েছিল বুঝি সেটাই—আর কিছু নয়।

বিয়ে স্থির হয়ে গেল মিত্রার কলকাতার এক বনেদী ব্যবসায়ী পরিবারে।

কত-কি'র ব্যবসা এরা করে—জানে শুধু এরাই। ইংরেজী বর্ণমালার এইচ অক্ষরটার মত মস্ত দু'-মহলা বাড়ী। দু'-বাড়ীর মাঝখানে দু'-সার একতলা দালানের ছাদ। বাড়ীতে পূজো হয়। তাই আছে নাটমন্দির আর পুজো-দালান। অতিথি-অভ্যাগতের ভীড় লেগেই থাকে, তাই আছে তাদের জন্যও একেবারে ভিন্ন সুখপ্রদ ব্যবস্থা। বহু নিকট ও দূর-সম্পর্কীয় আশ্রিত আত্মীয়-কুটুম্ব—কেউ অবহেলা অনাদর কাকে বলে জানতো না। চার ভাই এই বাড়ী আর ব্যবসার মালিক। শ্যামকান্ত, যদুকান্ত, শশীকান্ত, রমাকান্ত। কালের গুণতিতে অকালে গত হয়েছেন তিন ভাই। ছেলেরা বাপের ব্যবসা হাতে তুলে নিয়েছে। কাঁচা হাতে নয়, শক্ত হাতেই। এখন এই সংসার-মালার গ্রন্থি-সূতো সেজ কর্তা। এই গ্রন্থিটি ছিঁড়ে গেলেই সমস্ত পরিবারটা খসে ছড়িয়ে পড়বে যে যার হয়ে। এখনও যার-যার তার-তার। সব বুঝ-ব্যবস্থা নিজমতো। তবু শেষ পর্য্যন্ত একবার—একবার আসতে হয় বৈ কি, সেজকর্তার কাছে। যেমন বিয়ের সম্বন্ধ হতে দিনস্থির পর্য্যন্ত চলে না-এসেও: কিন্তু নিমন্ত্রণ-পত্রের নিচের স্বাক্ষরটি হওয়া চাই শশীকান্তর নামে। যত দিন বেঁচে আছেন—এই নিয়ম।

দু'-মহলা বাড়ীর উত্তরাংশে থাকে বড় আর মেজ তরফ। আর দক্ষিণাংশে থাকে সেজ এবং ছোট তরফ। সেজ আর ছোট দু'-ভাই এর মধ্যে মনের মিল ছিল বেশী। তাই হয়তো সেজ গিন্নী শৈলনন্দিনী আর ছোট গিন্নী স্বর্ণময়ীর মধ্যেও হৃদ্যতাপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক একটা গড়ে উঠেছিল। রমাকান্তের মৃত্যুর পর নির্ভর করতেন স্বর্ণময়ী সব কাজেই শশীকান্তর উপর। ছোট ভাই রমাকান্ত বড় দু'-ছেলের বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন নিজেই। তৃতীয় ছেলে নীলাকান্তর জন্য মিত্রাকে পাত্রী ঠিক করে—পাকা কথা দিয়ে এলেন শশীকান্ত। বলে এলেন, 'বড় পছন্দ হয়েছে বিমল বাবু আপনাদের ভাগনীটিকে। বাড়ীর মেয়েরা এসে দেখে যাবে অবশ্য একবার। তবে সে-সব কিছুর জন্য আটকাবে না।'

দেওয়া-থোওয়ার কথা তুলতেই বাধা দিলেন, 'ওসব কথাই তুলবেন না মশাই। যা দেবেন আপনাদের মেয়েকেই দেবেন। ফর্দ্দ করতে বসে ঘেমে মরবো বুঝি আমি? বোকা ভাবছেন আমায়?' হাসলেন তিনি—মজলিসি হাসি।

শশীকান্ত ভালো-ভালো কথাই শুধু যে বলেন তা নয়, ব্যক্তিটিও নির্ঝঞ্ঝাট ভালো মানুষ। বিদ্বান, বুদ্ধিমান। যৌবনে ছিল অনেক বাই। এখন সঙ্গী—ঘুম, গড়গড়া, বই আর অতীতের সুখস্বপ্ন!

বাড়ী এসে স্ত্রীকে বললেন, 'পরমাসুন্দরী কন্যা গো! আর অবস্থা যা মনে হলো, তাতে রাজকন্যাই বলতে পারো।'

এটা বাড়ানো কথা। মিত্রাদের বাড়ী তিনি কোন ঐশ্বর্য্যের জাঁক দেখে আসেননি। কিন্তু এ না বললে মেয়েদের মন উঠবে না। সেজ কর্তা জানেন। কিন্তু মিত্রাকে চোখে ভালো লেগেছে। বললেন, 'সব ঠিক করেই এসেছি, এখন তোমরা গিয়ে এক দিন দেখে এসো।'

'সব ঠিক ক'রে এলে কি গো? অলঙ্কার, আসবাবপত্র, বরাভরণ, সব আমাদের যে ফর্দ আছে সেই মত রাজি হয়েছে তো? দেখিয়েছিলে ফর্দখানা?'

শৈলনন্দিনী স্মরণ করিয়ে দিতে ফিরিস্তিখানার কথা শশীকান্তের স্মরণে এল। বুক-পকেটে থেকেও কি অসম্ভব রকম চুপ করেছিল কাগজের টুকরোটা! কথাটা চেপে গেলেন। বললেন ভ্রূকুঞ্চিত করে, 'আমাদের ইচ্ছেটা কেন ওদের ঘাড়ে চাপাতে যাব? ওরা ওদের মেয়েকে দেবে—দেবে ওদের খুশী মত। কেউ কি ঘরের মেয়েকে ঠকায়? আর তাই যারা ঠকাতে চায় তাদের সঙ্গে দর-কষাকষিতে নামবে এই শর্মা? আমার দ্বারা সে-সব হবে না। করতে হয় তোমরা করো।'···

চাকর এসে তামাক রেখে গেছে। জামা-কাপড় ছেড়ে বর্মী সিল্ক লুঙ্গীটা পরে আরাম-কেদারায় বসলেন। কসে কয়েকটা জোর টান দিলেন গড়গড়ায়, 'চাইতে যাবো কেন শুনি? অভাব আছে কিসের? আসবাব? রাখবে কোথায়? অলঙ্কার? ছোট গিন্নীর সিন্দুক খুললে ক'মেয়ের গা-ঢাকা গয়না বেরুবে?'

দরজার আড়ালে দাঁড়ানো স্বর্ণময়ী হাতের ইঙ্গিতে সেজ গিন্নীকে কাছে টেনে বললেন, 'ওঁর যখন এত পছন্দ হয়েছে তখন এখানেই হোক।···'

চোখে চশমা এঁটে পঞ্জিকা খুলে বসলেন সেজ কর্তা। শুভদিনের মাহেন্দ্র-যোগের খোঁজে উল্টে চললেন পাতার পর পাতা। পয়লা অগ্রহায়ণ—চমৎকার দিন শুভবিবাহের। মুখের 'হ্যাঁ'র সঙ্গে-সঙ্গে মন তৈরী হতে সময় লাগে না।

বিয়ে-বিয়ে ভাবটা বেশ পেয়ে বসেছিল মিত্রাকে। গীতা গায়ত্রীর সাথে বিভোর হয়েছিল কৈশোর-কল্পনায়। কিন্তু দধি-মঙ্গল রাতে যখন বেজে উঠেছিল সানাই, ওর দু'-চোখ ভরে উঠেছিল অশ্রুতে।··· সানাইতে যে তানই ধরুক—বেহাগ, ভৈরো বা ইমন, সবই কি শোনায় করুণ? আনন্দ-আগমনী সুরও কি ও-বাঁশীর গলায় কাঁদে? অন্ততঃ মিত্রার তো তাই মনে হয়।

সুমিত্রা বিয়ের রাতে সাজানো মেয়েকে নিজে বসে থেকে। দেখলো এ-ভাবে সে-ভাবে। দেখলো কত রকমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। এগিয়ে দিয়ে এল সবার সাথে বাসর-ঘরের দোর পর্য্যন্ত। সকৌতুকে সম্ভাব্য রুচিতে মেয়েকে গুছিয়ে বলে দিলো কত কথা।···

অপূর্ণ জীবন বুঝি আজ তার সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

'আর হাসিও না ঠাকুরঝি! মেয়েকে শেষে বলেই দেবে—কালকে এসে সব বলিস আমায়!' নীলিমা বলে।

মা'র আনন্দ-উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে চেয়ে প্রসন্ন মনে মিত্রা প্রবেশ করেছিল বাসরঘরে। লগ্ন ছিল অনেক রাতে। ভোর প্রায় হয়-হয়···হাসি-ঠাটায় বাসর-ঘর জমাবার উৎসাহ ছিল না কারোর।

সুন্দর লাগছিল মিত্রাকে। অপূর্ব সুন্দর!

শ্বেত চন্দনের কোঁটা কপাল ঘিরে। মাঝখানে ছোট্ট কুমকুমের ফোঁটা। কালো চুলের মস্ত খোঁপাটি জড়িয়ে সাদা বেল ফুলের মালা। সোনালী বুটির ঘন-সবুজ ওড়না দিয়ে ঢাকা সেই বেলফুল শুদ্ধ খোঁপাটি। টুকটুকে লাল বেনারসী সরু কোমরটি ঘুরে পিঠের উপর দিয়ে সামনা আঁচলে বুকে আঁচল বিছিয়ে। সদ্য গড়িয়ে আসা অলঙ্কারের পালিশ ছড়াচ্ছে দ্যুতি। হাতে সোনার হাত-পদ্ম, যেন দেবী লক্ষ্মী। কিন্তু সে প্রতিমার দেহলাবণ্য যেন গলানো মোম—এখনও সর্ব অঙ্গের মোম দৃঢ় ভঙ্গিমায় জমে ওঠেনি—কাঁচা। সময় না দিলে প্রতিমা পরিণত হবে মোম-পিণ্ডে।···

সানাইয়ের সকরুণ সুর মুছে গেছে মন হতে। অন্তর-ইন্দ্রিয় দানা বেঁধে উঠেছে···ইংরেজী বাজনার সুরে-সুরে। চোখে ভেসে আছে অপ্রকৃতিস্থ মা'র আজকের প্রকৃতিস্থ চেহারা। দুঃখিনী মায়ের সুখী মুখ। তাই সেও সুখী—।

সুখী মিত্রা চাইলো চেয়ারে উপবিষ্ট নীলাকান্তের দিকে।

ভীষণ গল্প করতে ইচ্ছে করছে। ঠিক যে ভাবে কথা বলে গীতা গায়ত্রীর সাথে; বলে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে। এক মুখে সহস্র কথা। আনন্দ-কলকলে বলে যাবে ও, ওর মায়ের গল্প। শুধু মায়ের গল্প। শুধুই মায়ের। আর কারোর কথা আজ নয়। ওর মা বড় ভালো। একমাথা দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে ভগবান ওর মায়ের মাথায়। কিন্তু শক্তি দেননি সে দুঃখের বোঝা সহ্য করবার। কত ভালো ওর মা। বড় ভালো।···ও-রকম ডাব ডাব চেহারা করে বসে আছে কেন রে! তবে চেহারা মন্দ নয় নীলাকান্তের। চন্দনের ফোঁটায় ভালোই মানিয়েছে। হাসি পেল মিত্রার। কথা বলবে না নাকি নীলাকান্ত। অপাঙ্গে চাইলো ড্রেসিং টেবিলটার দিকে। হ্যাঁ ঠিক, লজেন্সের শিশিটা ওখানেই আছে, দু'-একটা মুখে পুরে দিলে কেমন হয়? তার পর লজেন্স চুষতে চুষতে পা দুলিয়ে কথা। নাঃ, লোকটা নিশ্চয়ই বোবা বোকা দুই-ই। ছোট মামা হলে এতক্ষণে মাথায় 'চিউইং গাম' আটকিয়ে ভুতের গল্প তুলে ঘরময় দৌড়-ঝাঁপ করিয়ে ছাড়তো ওকে। কি করা যায়! আর চোখ তুলে চাইতে সাহস নেই, নীলাকান্তের দৃষ্টির স্পর্শ অনুভবে আসছে।

'তোমার নাম কি?' কাছে এগিয়ে এল নীলাকান্ত।

বাঃ, আমার নাম যেন জানে না! আমি ওর নাম জানি কি করে? কি গল্পের ছিরি! কথা খুঁজে পেল না বুঝি!

'কি চুপ করে যে? ঘুম পেয়েছে বুঝি খুব? বাতি নিবিয়ে দেবো!'

ঝট্ করে নীলাকান্ত হাত বাড়িয়ে দিল বাতি নিবিয়ে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বাধা দেবার সময় পেল না—হরিণ-শিশু তখন বাঘের মুখে। [ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার মূল কারণ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে কি কারণে স্থাপিত হয়? কেবল মাত্র দেশ অধিকার এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করাই তখন ইংরাজদের উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার মূল কারণ,—বিলাতে হঠাৎ মরিচের দর অত্যন্ত চ'ড়ে যায়। মরিচের দর ৩ শিলিং থেকে ৬ শিলিং ৮ পেন্স বৃদ্ধি পাওয়ায় ইং ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে এক সভা হয়। উক্ত সভাতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠনের প্রথম কথা ওঠে। বিলাতের ব্যবসায়িগণ প্রথম ৩০,১৩৩ পাউণ্ড চাঁদা তুলে তৎকালীন রাণী এলিজাবেথের নিকট থেকে ১৫ বছরের জন্য ভারতবর্ষে ব্যবসা করবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম অংশী ছিল ১২৫ জন এবং মূলধন ছিল ৯০,০০০ পাউণ্ড। ইং ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ঐ টাকা ৪,০০,০০০ পাউণ্ডে পরিণত হয়। দেড়শো বছর কোম্পানী ব্যবসা-কার্য্যে লিপ্ত থেকে কুঠী রক্ষা ব্যপদেশে অস্ত্রধারণ ক'রে প্রায় পঁচিশ বছরের মধ্যে হিমালয় থেকে কুমারিকা এবং পেশোয়ার থেকে শ্যামদেশ পর্য্যন্ত বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়।

আমার প্রথম গল্প

প্রেমচাঁদ

তখন আমার বয়স ছিল মাত্র তের। হিন্দি কিছুই জানতাম না তখন। কিন্তু উর্দ্দু উপন্যাসের প্রতি আমার ছিল এক গাঢ় অনুরাগ। তখনকার দিনে নাম-করা ঔপন্যাসিকের মধ্যে মৌলানা সর্দ্দার, পণ্ডিত রতননাথ সরসার, মির্জ্জা রুস্‌য়া এবং হারদই-এর মৌলানা মহম্মদ আলির নাম করা যেতে পারে। যখন তাঁদের লেখা কোন বই আমার হাতে এসে পড়ত, তখন আমি স্কুলের কথা যেতাম ভুলে এবং শেষ না করা পর্য্যন্ত একটানা পড়ে যেতাম পাতার পর পাতা। তখনকার দিনে রেনল্ডের উপন্যাসের ছিল খুব চাহিদা। অতি দ্রুতগতিতে ছাপা হতো তার উর্দ্দু অনুবাদ এবং দেখতে-না-দেখতে বিক্রী হয়ে যেত গরম কেকের মত। এইগুলি ছিল আমার খুব প্রিয়। বিখ্যাত কবি হজরত রিয়াস্ 'হারাম-সারা' নাম দিয়ে রেনল্ডের একখানি উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন। কিছু দিন হলো সেই কবির দেহাবসান ঘটেছে। মৌলানা আজাদ হোসেন অনুবাদ করেছিলেন রেনল্ডের আর একখানি উপন্যাস যার নামকরণ করেছিলেন 'সখা' বা 'তিলাসুমি ফানুস্'। তিনি ছিলেন তখনকার দিনের লাক্ষ্ণৌ সাপ্তাহিক 'আউধ পাঞ্চ'এর সম্পাদক। ভারতে হাস্যরসিক হিসেবে আজও তিনি অমর। এই সব পুস্তকগুলি একের পর এক আমি পড়ে যেতাম। যদিও রতননাথ সরসারের সকল পুস্তক আমি শেষ করে উঠতে পারিনি, কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি সবই আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল এই সময়ের মধ্যে।

আমার বাবা তখন বাস করতেন গোরখপুরে। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের মিসনারী স্কুলে ঐ শ্রেণীকে বলা হতো থার্ড-ষ্ট্যাণ্ডার্ড। রেটিতে এক বই-বিক্রেতা ছিল। নাম ছিল তার বুধিলাল। আমি খুব ঘন-ঘন যেতাম ওর দোকানে এবং ওর পুস্তকের ভাণ্ডার হতে একের পর এক উপন্যাস পড়ে চলতাম। কিন্তু ওর দোকানে সারা দিন বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠত না। তাই স্কুলে যাওয়ার সময় ওর নিকট হতে কিছু ইংরাজী পুস্তকের নোটবই সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। সেইগুলি বিক্রী করতাম আমাদের স্কুলের ছেলেদের মাঝে। পরিশ্রমের মূল্য হিসেবে ঐ বই-বিক্রেতা আমাকে উপন্যাসগুলি বাড়ীতে নিয়ে যেতে দিত। যখন ঐ দোকানটির সকল উপন্যাস আমার পড়া শেষ হয়ে গেল, তখন আমি পুরাণের উর্দ্দু অনুবাদ পড়া শুরু করলাম। নওয়াল কিশোর প্রেস হতে এইগুলি ছাপা হয়েছিল। 'তিলাসৃমি—হোসরুবার'ও কয়েক খণ্ড পড়ে শেষ করেছিলাম তখন। 'তিলাসৃমি-হোসরুবা' হচ্ছে কাল্পনিক গল্পের এক বৃহদাকৃতি পুস্তক। সেই সময় 'তিলাসৃমি-হোসরুবা'র সতের খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রত্যেক খণ্ডে কম করেও দুই হাজারের ওপর পাতা ছিল। এই সতের খণ্ড ছাড়া পরে বিভিন্ন সময়ে আরও কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলিও আমি পড়ে শেষ করেছিলাম। এইগুলি হতে সহজেই এক জন বুঝতে পারে লেখকের কল্পনা ছিল কত প্রশস্ত। কথিত আছে, আকবরকে আনন্দ দানের জন্য এই গল্পগুলি মৌলানা ফৈজী কর্তৃক পার্সিয়ান ভাষায় লেখা হয়েছিল। এর সত্যতা কতটুকু, তা নিয়ে অবশ্য কেউ আলোচনা করে না। বোধ হয়, আর কোন ভাষাতে এমন পাহাড়-প্রমাণ কাজ আর নেই। বাস্তবিকই এ হচ্ছে এক বিদ্যাকল্পদ্রুম (এনসাইক্লোপিডিয়া)। যদি কোন ব্যক্তি তার জীবনের ষাট বছর ধরে এইগুলির প্রতিলিপি করে চলে তবুও সে শেষ করে উঠতে পারবে না। তাহলে কি ধরণের ছিল সেই রচনা?

সেই সময় আমার এক দূর-সম্পর্কের খুড়ো আমাদের ওখানে এসে থাকতেন মাঝে-মাঝে। যৌবন যদিও তাঁর কেটে গিয়েছে কিন্তু এখনও তিনি অবিবাহিত। তাঁর একখানি বাড়ী এবং ছোট একটি জমিদারী ছিল। স্ত্রী না থাকার দরুন ঐ সব জিনিষের কোন মূল্য ছিল না তাঁর নিকট। বলতে কি, ঐ সব পার্থিব জিনিসের প্রতি তাঁর আদৌ আসক্তি ছিল না। সুতরাং তিনি আত্মীয়দের বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রত্যেক স্থানেই আশা প্রকাশ করতেন, কেউ হয়ত তাঁর জন্যে যা-হোক এক জনকে জুটিয়ে দেবে। এর জন্য এক শত কিংবা দুই শত টাকাও তিনি খরচ করতে রাজী ছিলেন। খুবই আশ্চর্য্য লাগে তাঁর পালোয়ানের মত চোহারা, বড়-বড় গোঁফ এবং গমের মত রঙ থাকতেও বিয়ে হয়নি এত দিন। শনের পাতা দিয়ে তামাক টানতে তাঁর ছিল খুব সখ। তাই তাঁর চক্ষু দুটিও সকল সময় হয়ে থাকত রক্তজবা। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন তাঁর নিজের মতে। প্রত্যেক দিনই শিব ঠাকুরকে জল দিয়ে দিতেন নৈবেদ্য এবং মাছ অথবা মুর্গি কিছুই ভক্ষণ করতেন না তিনি।

ফলে দাঁড়ালো অবিবাহিত লোকেরা মাঝে-মাঝে যেরূপ করে বসে, তিনিও সেইরূপ করে বসলেন। বিদ্ধ হলেন কিউপিডের তীরে। এক চামার স্ত্রীলোকের আঁখি হতে গুলী অর্থাৎ দৃষ্টি এসে তাঁকে বিদ্ধ করল। সেই চামার স্ত্রীলোকটি তাঁর বাড়ীতে খুটে দিত, বলদগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংসারের অন্যান্য ছোটখাট কাজ করত। সে ছিল যুবতী এবং উগ্রস্বভাবা। ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের যেমন হাব-ভাব—সেই হাব-ভাব নিয়ে সকল সময় হাসত মিট্-মিট্ করে। অদ্ভুত আপ্যায়ন করবার ক্ষমতা ছিল তার। যেন একটি শূয়োর সৌন্দর্য্যের আদর্শকে উৎকর্ষ করতে চায়! কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে তিনি তার প্রতি ক্রমাগত ঢলে-পড়া শুরু করলেন। তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পারলে স্ত্রীলোকটি—কারণ সে এক জন অতি সোজা ধরণের স্ত্রীলোক ছিল না। সে তাঁর সঙ্গে ভালবাসার ছেনালী করা শুরু করলে। চুলে বেশী করে তেল মাখা আরম্ভ করলে—অবশ্য তিলের তেল। চোখে কাজল দেওয়া শুরু করলে এবং ঠোঁটে রঙ মাখালে। তার সকল কাজের মধ্যে এক ঢলা-ঢলা ভাব এসে মাথা-চাড়া দিলে। কোন-কোন সময় সে হয়ত বাড়ীতে একটু উঁকি মেরে চলে যেত অথবা হয়ত কোন সন্ধ্যায় খুড়োর প্রতি এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই প্রস্থান করত। ফলে দাঁড়ালো খুড়োকেই বলদগুলিকে দেখাশুনার ভার নিতে হলো এবং বাড়ীর অন্যান্য কাজ-কর্ম্মও করতে হতো। খুড়ো মনে করতেন তার কাঁদে পড়া অসহ্য। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে তাঁর প্রাণে প্রেম হয়ে উঠল পুঞ্জীভূত। সামাজিক প্রথানুযায়ী হোলী উৎসবে তিনি তাকে কিছু উপহার দিতেন কিন্তু এ-বছর দিলেন এক দামী সাড়ী, অবশ্য নিজের কাজ হাসিল করবার জন্য—প্রায় চার গুণ তার মূল্য। শেষ পর্য্যন্ত এত দূর গড়াল যে, সেই চাকরাণীটি বাড়ীর কর্ত্রী হয়ে দাঁড়ালো।

এক দিন সন্ধ্যায় পঞ্চায়েতের সভা ডাকলো চামারেরা। সমৃদ্ধিশালী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমার সেই আত্মীয় খুড়োটিকে ওরা ভয় পেলে না। ওদের আরও অসন্তুষ্টির কারণ পিতার সঙ্গে পুত্রের হৃদয়গ্রাহী বৈষম্য। পিতার এমন স্বভাব ছিল যে, জীবনে কোন পরস্ত্রীর মুখদর্শন করেননি তিনি (যদিও সর্ব্বৈব মিথ্যা), কিন্তু

তাঁর পুত্র! নীচু-জাতের স্ত্রী এবং কন্যাদের প্রতি নির্লজ্জ ভাবে চেয়ে থাকতে তাঁর বাধে না। ওরা অনুভব করলে প্ররোচনা দিয়ে কোন কাজ হাসিল হবে না। ফলে হয়ত এক ভয়ঙ্কর অবস্থা করে তুলবেন তিনি। তাই ওরা ঠিক করলে এক ঘায়ে সব ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করবে। এমন ভাল রকমের শিক্ষা দেবে যে, সারা জীবন মনে থাকবে তাঁর। সম্মানকে বাঁচানোর কৈফিয়ৎ একমাত্র রক্ত দিয়ে শোধা যায় সত্যি, কিন্তু শাস্তির দ্বারা কিছু পরিমাণে লাঘব করা যায়। পরের দিন সন্ধ্যায় ঝি চম্পা এল তাঁর গৃহে এবং ভেতর হতে দরজা দিলে বন্ধ করে।

চামারের দল—যারা এই সুযোগটির প্রতীক্ষায় ছিল, বাইরে হতে দরজায় ধাক্কা দেওয়া শুরু করলে। প্রথমে তিনি ভাবলেন, কোন ভাড়াটে হয়ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এবং সাড়া না পেয়ে চলে যাবে। কিন্তু যখন তিনি এক দল লোকের গোলমাল শুনতে পেলেন তখন বাস্তবিকই হতবাক্ হয়ে পড়লেন। দরজায় যেখানে তালা লাগানো থাকে, সেইখানকার ফুটো হতে দেখলেন প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন চামার লাঠি দিয়ে দরজা ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে। কি করা যায় এখন? পালানোর কোন উপায় নেই—চম্পাকে কোন স্থানে লুকিয়ে রাখাও সম্ভবপর নয়। অনুভব করলেন সত্যিই তিনি বিপদে পড়েছেন। ভাবতেই পারেননি তাঁর প্রিয়া এত শীঘ্র এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে তুলবে। জানতে পারলে নিশ্চয় তিনি নিজের অন্তঃকরণটিকে তার হাতে সঁপে দিতে সতর্ক হতেন। ওদিক হতে চম্পা তাঁকে ব্যঙ্গ করা শুরু করলে, "তুমি হার মেন না কর্ত্তাবাবু। তোমার নয়, আমারই সম্মান কলঙ্কিত হয়েছে। আমার লোকেরা জ্যান্ত রাখবে না আমায়। হাত জোড় করে অনুরোধ করছি আর দরজা বন্ধ করে রেখ না। একটু ধৈর্য্য ধরে থাক। ঠিকই সাজা হয়েছে তোমার, কারণ নিজের মুখে নিজেই তুমি কালি লেপেছ।"

বেচারী খুড়ো! এই রকম ফাঁদে আর কখনও পড়েননি তিনি। এই খেলাতে যদি তাঁর জায়গায় থাকত এক জন ওস্তাদ, তাহলে সে নিশ্চয় এক শত এক জন উপযুক্ত লোকের হাত হতে এই সঙ্কটাবস্থা হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারতো। কিন্তু তিনি হয়ে পড়লেন দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য। তাই উঠোনে দাঁড়িয়ে ধর্ম্মগ্রন্থ আওড়ানো শুরু করলেন!

দরজার বাইরে চেঁচামেচি বেড়েই চলেছে ক্রমাগত—সারা গ্রামের লোক এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। ব্রাহ্মণ, ঠাকুর, কায়স্থ সবাই এসেছে। মজা দেখতে এসেছে তারা। কিন্তু তারা অপরাধীকে লুকিয়ে রাখতে চায়। এক জন স্ত্রীলোক এবং এক জন পুরুষকে এক নির্জ্জন গৃহে বন্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করার চাইতে মজা এবং উত্তেজনার ব্যাপার আর কি থাকতে পারে! পুরুষটি উচ্চবংশীয় বা নীচু জাতীয় যা-ই হোক না কেন, জনসাধারণ তাকে ক্ষমা করতে পারে না। তাই ডাকা হলো ছুতোর মিস্ত্রিকে—দরজা হলো ভাঙ্গা। খুড়োকে খুঁজে পাওয়া গেল এক খড়ের গাদার মধ্যে। উঠোনে দাঁড়িয়ে চম্পা কাঁদছে—দরজা ভাঙ্গবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে উঠে দাঁড়িয়েছে। কেউ কোন কথা বললে না তার সঙ্গে। কিন্তু খুড়োর অবস্থা কি! তিনি ভাল করেই জেনে রেখেছিলেন পালানোর কোন রাস্তা নেই তাঁর সম্মুখে। তাই যে কোন শাস্তি ভোগ করবার জন্য তিনি ছিলেন প্রস্তুত। তাঁর নিকট সেই শাস্তি ছিল প্রতিহিংসার শাস্তি। যার হাতে যা অস্ত্র ছিল—ছাতি, লাঠি, জুতো, কিল, লাথি—তাই দিয়ে তাঁকে প্রহার করতে শুরু করলে। সহ্য করতে পারলেন না খুড়ো, মূর্চ্ছা গেলেন। মারা গিয়েছেন এই ভেবে ওরা প্রস্থান করলে। কিন্তু যাবার সময় যুক্তি প্রদর্শন করতে ছাড়লে না, যদি তিনি বেঁচেও থাকেন এই গ্রামে তিনি আর বাস করতে পারবেন না, কারণ তাঁর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে যাবে ইতিমধ্যেই।

এই দুর্ঘটনার খবর আমার নিকট এক উড়ো খবর হয়ে উপস্থিত। খুব সুখভোগ করলাম সেই খবর শুনে। গ্রামবাসীদের হাতে খুড়োর সেই প্রহারের দৃশ্য যখনই আমার মনে দানা বেঁধে উঠতে লাগল, তখনই আমি প্রাণ খুলে হাসতে শুরু করলাম। তিনি কিছু তেঁতুল গুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে এক পানীয় তৈরী করলেন। চিকিৎসাস্বরূপ পান করলেন সেই পানীয়। এবং যখন নড়তে-চড়তে একটু সমর্থ হলেন তখন এলেন আমাদের ওখানে। ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমাদের সহরে তাঁর নিজের গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতি মারপিট করবার অভিযোগে মামলা দায়ের করতে চান।

যদি তিনি কোন প্রকার অনুতাপ বা নম্রতা দেখাতেন তাহলে হয়ত তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারতাম আমি। কিন্তু তিনি নিজেকে পূর্ব্বের চাইতে আরও বেশী গর্বিত অনুভব করা শুরু করলেন। ভয় দেখালেন আমাকে আমার খেলা এবং উপন্যাসের প্রতি আসক্তির কথা বলে দেবেন বাবাকে। যেন তিনি ভ্রূকুটীর দ্বারা আমাকে ভয় দেখাতে চান! তাঁর নিকট হতে এইরূপ প্রত্যাশা করি না আমি। কারণ বর্ত্তমানে আমার হাতে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আরও বেশী মাল-মশলা মজুত আছে।

অবশেষে এক দিন আমার খুড়োর প্রতি যা ঘটেছিল তাই নিয়ে এক নাটক লিখে বসলাম। বন্ধুদের পড়ে শোনালাম সেই নাটক। হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। তাদের সেই হাসি আমাকে দিল উৎসাহ। একটি প্রতিলিপি তৈরী করলাম সেই নাটকের এবং স্কুলে যাবার সময় রেখে গেলাম খুড়োর বালিশের তলায়। খুবই উদ্বিগ্ন রইলাম নাটক পড়ে খুড়োর মন্তব্য শোনার জন্য।

সেই দিন আমার মন পড়ে রইল স্কুলের বাইরে—বাড়ীতে। স্কুলের ছুটি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ীতে এলাম। কিন্তু বালিশের নিকট যেতে আমার কেমন খট্‌কা লাগল। ভয় পেলাম খুড়োর নিকট হতে অত্যন্ত প্রহারের আশঙ্কায়। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি ছিলাম খুব নিশ্চিন্ত—এক চড়ের বেশী আমায় মারতে সক্ষম হবেন না খুড়ো—কারণ আমি সেই ধরণের ছেলে নয় যারা শুয়ে-শুয়ে মার খেয়ে চলে।

কিন্তু এ কি! খুড়ো কোথায়? খুড়ো তো তাঁর সেই কুটীরে নেই—যে কুটীরে তিনি বেশীর ভাগ সময় বিশ্রাম নিতেন। তিনি কি বাড়ীর ভেতরে গিয়েছেন? উঁকি মারলাম তাঁর ঘরে—কিন্তু নিস্তব্ধ সেই ঘর। জুতো, কাপড়-চোপড় এবং তাঁর বোঁচকা কিছুই নেই সেই ঘরে। বাড়ীর সকলকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এক দরকারী কাজ আছে এই অজুহাত দেখিয়ে খুড়ো কিছু না-খেয়েই চলে গিয়েছেন। তন্ন-তন্ন করে খুঁজলাম আমার সেই নাটকটি—আমার প্রথম রচনাটি। কিন্তু কোথাও পেলাম না খুঁজে। জানি না, আমার সেই প্রথম রচনাটি খুড়ো অগ্নিদেবকে সমর্পণ করেছিলেন কি না অথবা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বর্গে!
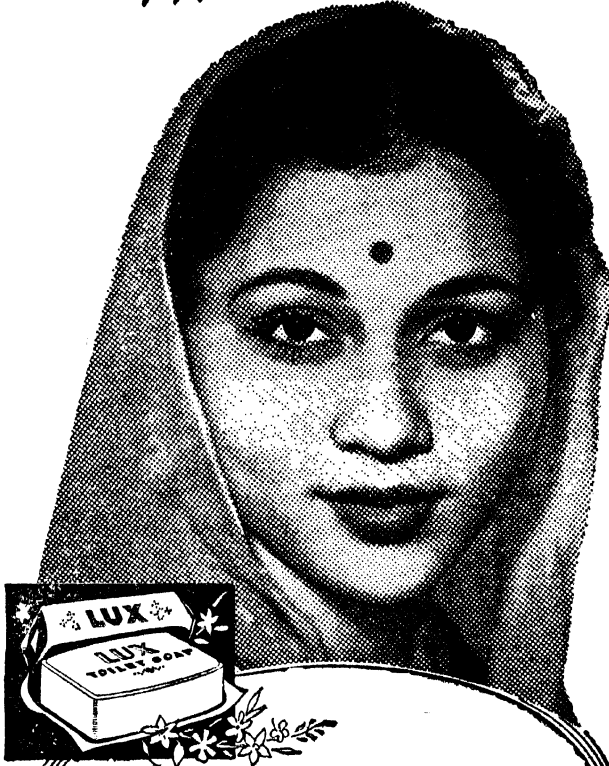
অনুবাদ—অরুণ বোস।

কুমারী

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

বাঙালীর বাড়ীর কুমারী মেয়ের সাধারণতঃ যে বয়সে বিয়ে হয় আমার সে বয়স অনেক দিন উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, আমার বিয়ে তখনও হয়নি। না হওয়ার বিশেষ কারণও ছিল। মুখশ্রী সুন্দর হ'লেও আমার রঙটা তেমন ছিল না; আর আমার বাবারও শুভ্র রজতখণ্ডের অভাব ছিল। অতএব আমার বিয়ে কি ক'রে হ'তে পারে বলুন? তাই আমায় জীবনভোর কুমারীই থাকতে হ'ল।

আমাদের অবস্থা ভাল না হ'লেও পাশের বাড়ীর সুভদ্রা অগাধ ধনীর একমাত্র কন্যা হ'য়েও আমায় সত্যিই খুব ভালবাসতো। ছেলেবেলা থেকে গান শেখার আমার বড় একটা বাতিক ছিল। সুভদ্রাকে যখন তার গানের দিদিমণি গান শেখাতে আসতেন, আমি নিয়মিত তার পাশেই বসে থাকতাম; আর একমনে তা শুনতাম। তার পর দিদিমণি চলে গেলে আমরা উভয়ে গানের চর্চ্চা করতাম। আর এই ক'রে আমার গান শেখার বেশ একটু সুবিধা হ'য়ে গিয়েছিল। বড়গোছের ওস্তাদ না হ'তে পারলেও গান আমি ভালই শিখেছিলাম। ভগবান আমার রূপ না দিলেও সুকণ্ঠ দিয়েছিলেন, এ কৃতজ্ঞতা আমায় স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু সুকণ্ঠ নিয়ে কোন্ যুবক তা ধুয়ে-ধুয়ে খাবে বলুন? সুকণ্ঠের গান তারা তো দুটো টাকা খরচ করলেই শুনতে পায়। তবে তারা সুকণ্ঠী ব'লে কটা চামড়া নয় এমন মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে কোন্ দুঃখে। তাও যদি মেয়ের বাবার টাকা থাকতো, সঙ্গে বেশ কিছু সোনা, রূপো, কাঁসা, পেতল, টাকাকড়ি নিয়ে আসতো তো এক কথা। কিন্তু সে গুড়েও বালি! তা হ'লে তেমন কুমারীটিকে অনুগ্রহ করার কার এত গরজ পড়েছে বলুন তো?

যুবকেরা যত কুৎসিতই হোক্ স্ত্রী তাদের সুন্দরী হওয়া চাই-ই। এক পক্ষ রূপের বাজারে একেবারে দেউলিয়া হ'লেও রূপসীকে বিয়ে করার যেন তার জন্মগত অধিকার আছে। সেখানে তাকে প্রশ্ন করার বা লজ্জা দেবার কেউই নেই। নাকটা চেপ্টা হ'য়ে বসে গেছে, ওপরের ঠোঁটটা জন্মাবধি কাটার জন্য গোঁফটা (যদি কেউ রাখেন) দুই প্রস্থে ভাগ হ'য়ে গেছে, চক্ষু হয়তো অত্যাচারের জন্য কোটরগত হ'য়ে গেছে, শীর্ণকায়, ঠেলে দিলে পড়ে যাবে তবুও তিনি নিজেকে সুপুরুষই ভেবে থাকেন, আর শ্রেষ্ঠ রূপসীকে বিয়ে করার জন্য তিনি বা তাঁর অভিভাবকেরা দৈনিক পত্রিকায় স্বর্গের অপ্সরী প্রাপ্তির বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। বামন হ'লে নাকি চাঁদের দিকে হাত বাড়াতে নেই। কিন্তু এঁদের কিছুতেই বাধে না। নাক-কাটার কান কাটার ভয় থাকে। কানকাটার নাক হারানোর আশঙ্কা থাকে। কিন্তু নাক-কান দুই কাটা কা'কে পরোয়া করবে বলুন তো?

মেয়েদের হৃদয় ব'লে তো কিছুই নেই। কাজেই তাদের তরফ হ'তে পছন্দ-অপছন্দের কোন কথাই উঠতে পারে না। বিবাহ-যোগ্যা কন্যার সামনে যে রকম পাত্রকেই ধরে দেওয়া হোক, তাকে তা গ্রহণ করতে হ'বে—টুঁ শব্দ করার জো নেই। তাকে চোখ বুজে কুইনিন্ গেলার মতই তা গিলতে হবে। অসম্মতি প্রকাশের বিন্দুমাত্র অবসর না থাকলেও তবু তাদেরই বলা হবে ঢেঁটা, লজ্জাহীন। আরও কত কি!

সবার কথা ছেড়ে দিয়ে আমি আমার নিজের কথাই বলি। আমি বিমাতার সংসারে মানুষ হয়েছিলাম। তাই জীবনে আদর, যত্ন, আশ্বাস কত যে পেয়েছিলাম তা আর নেই বা বললাম। অনুমান আপনারা যা ক'রে নেবেন তা কম বই বেশী হবে না।

কত বার কত পুরুষের সম্মুখে আমাকে সাজ-সজ্জা ক'রে বেরুতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যত বারই তারা অপছন্দ ক'রে গেছে তত বারই আমার ও আমার স্বর্গতা মাতার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের নিষ্ঠুর তিক্ত সমালোচনা করা হয়েছে সামারই সম্মুখে—আমাকে আঘাত করার জন্যে। আমার বিমাতার চক্ষুলজ্জা বা অন্তর-বিধুনিতে অস্পষ্টতা আছে ব'লে এত বড় অপবাদ বুঝি তাঁর শত্রুরাও দিতে পারতো না।

আমার ব্যর্থ জীবনের ধিক্কার ও শূন্যতার মাঝে সুভদ্রাই ছিল আমার একমাত্র সান্ত্বনা। কত দিন মনের দুঃখে না খেয়ে কাটিয়েছি। ভদ্রা জানতে পেরে আমায় কত ছল ক'রে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে। কত দিন কত কেঁদেছি। ভদ্রা আমার চোখ মুছিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে। যখন অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত তখন আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছি। ভদ্রা আমায় কত বুঝিয়েছে, কত আশার বাণী শুনিয়েছে। ভদ্রা সস্নেহে আমার হাতটি তার হাতের মধ্যে ধ'রে কত বলেছে, "ছন্দা, সব মেয়েই যে স্ত্রী হবার জন্যে, মা হবার জন্যে জন্মেছে তা তো নয়। যদি কোন পুরুষ তাকে বিয়ে করে গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তাই ব'লে তাকে মরতে হবে কেন? সে কি স্ত্রী ও মা হওয়া ছাড়া জগতের আর কোনও কাজে আসতে পারে না? এত বড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আর কোন জায়গাতেই তার স্থান নেই,—তার কাজ নেই? হাজার প্রয়োজন আছে তার, ছন্দা! আত্মহত্যা ক'রে মরে সারা মেয়ে-জাতের মুখে কালি মাখিয়ে দিতে নেই, ছন্দা!" এমনি তার যুক্তি, এমনি তার উৎসাহের কথা আমার বাঁচার আকাঙ্ক্ষাকে সজাগ ক'রে দিত। আমি মনকে শক্ত ক'রে বেঁধে নিতাম। বিমাতার সকল তিরস্কার, সকল লাঞ্ছনাকে ফুলহার বলে গলায় জড়িয়ে নিতে পারতাম।

আমার সাত বছর বয়সের সময় আমার মা স্বর্গে যান। কাজেই মায়ের মুখ, মায়ের কথা, মাতৃস্নেহের নিবিড় মধুর স্বাদ এখনও আমার কিছু-কিছু মনে আছে। তার পর আজ বার বছর ধ'রে সৎমা'র সংসারে অসুরের মত সমানে খেটে এসেছি, কিন্তু একটা দিনের জন্যও তাঁর আশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত পাইনি—দূরে থাক কাজের তারিফ করা। সহ্য ক'রে ক'রে আমারও এমনি হয়ে গেছল যে, সৎমায়ের নিন্দা-স্তুতির অপেক্ষা না করে মান-অভিমান বা মনঃকষ্টের কিছুমাত্র অবসর না দিয়ে ঠিক কলের পুতুলের মত সংসারের যা-কিছু সবই আমি মুখ বুজে করে যেতাম। মা উঠতেন সকালে বিছানা থেকে আটটার সময়। বাবা আপিসে বেরুতেন দশটার মধ্যে। কাজেই মা'র ওঠার আগেই আমার রান্না-ঘর নিকানো, বাসন মাজা, জল তোলা, মসলা বাটা, কুটনো কোটা থেকে প্রায় সব কাজই সেরে রাখতে হ'ত। মা রান্না-ঘরে ঢুকে দু'-একটা তরকারি রাঁধতেন আর আমার কাজের কোথায় সামান্য একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তাই খুঁজে বেড়াতেন।

দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করলে সব পুরুষেরই আমার বাবার মত

পরিবর্ত্তন হয় কি-না, তা সময়ে সময়ে আমি ভাবতাম। আমার সুখ-অসুখ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন কোনটার দিকেই তাঁর নজর ছিল না। সমাজের নিয়ম অনুসারে যাকে-তাকে ধ'রে অন্ততঃ একটা দ্বিতীয় পক্ষ, কি তৃতীয় পক্ষের ঘাটের মড়ার সঙ্গেও যে আমার বিয়ে দেওয়া দরকার তা আমার বাবা বোধ হয় ভাবতেন না। সংসারে বিনা মাইনের এক জন চাকরাণীর দরকার ব'লে সংমাও ভুলেও সে-কথা বাবার কানে তুলতেন না। আমার জীবন এই ভাবেই কাটত। আশ্চর্য্য হ'তাম, হোক্ সংমা, তবু মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের জন্মে ব্যথা পেত না, সহানুভূতিটুকু পর্য্যন্ত অনুভব করত না!

সংমা'র নিয়মিত দুপুরে পাড়া বেড়ান অভ্যাস ছিল। এই সময়েই হপ্তায় দু'দিন সুভদ্রার গান শেখানোর দিদিমণি আসতেন। তাই আমি গান শেখার কিছুটা সময় পেতাম। দুপুর বেলা সংমা বাড়ী না থাকলে পাড়ার আর একটি আধাবয়সী পাড়াশুদ্ধ,র মাসী বামা কখনো-কখনো আমাদের বাড়ী আসতো। সে আমার দুঃখ দেখে বড় সহানুভূতি প্রকাশ করত, বলত, "ছন্দা, তোমার অমন সুন্দর গলা, অমন সুন্দর মুখশ্রী, তুমি সিনেমায় যোগ দাও। অনেক টাকা পাবে, অনেক আরামে ও আনন্দে দিন কাটাতে পারবে।"

বামা মাসীর এ-কথা আমি সময়ে সময়ে ভাবতাম। বামার প্রথম জীবনের কালীমাখা ইতিহাস আজও যায়নি। এখন সে একটি সিনেমা ঘরে মেয়েদের গেটে টিকিট নেওয়ার কাজ করে। সিনেমার অনেকের সঙ্গেই তার আলাপ। কাজেই এ কাজে হয়তো তার কিছু হাত আছে ব'লে আমি মনে করতাম। আমি সিনেমা অভিনেত্রী হ'তে রাজী হ'লে বামা যে তা ক'রে দিতে পারবে এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু বিশ্বাস ছিল না আমার নিজের উপর। আমি গৃহস্থের বাড়ীর মেয়ে, অভিনয় করার কোনও ধারণাই আমার নেই। আমি আবার সিনেমা অভিনেত্রী হব কেমন ক'রে?

বামা মাসী আমায় যুক্তি দেখাত, "বাছা, জলে না নাবলে কে কবে সাঁতার শিখেছে বল তো? কুঁদের মুখে পড়লে তখন আর টেড়া-ব্যাঁকা কিছু থাকে না। আর গৃহস্থের মেয়ে বলছ? আজকাল যত গৃহস্থের মেয়েরাই তো বেশী ক'রে সিনেমা-অভিনেত্রী হচ্ছে।"

মানুষের একটা দুর্ব্বলতা আছে। প্রত্যেক মানুষই চায় কেউ এক জন অন্ততঃ তার প্রশংসা করে। তাই হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রেও যখন সংমা'র বা বাবার মুখে কোন দিন একটি রাম বিষ্ণু উৎসাহের কথাও শুনতে পেতাম না, তখন মনে খুবই কষ্ট পেতাম। তার ওপর সংমা যখন আবার অকারণে কাজের ত্রুটি বার ক'রে ঝঙ্কার দিয়ে মারমুখী হয়ে আসতেন, তখনই মনে হ'ত বাড়ী হ'তে কোথাও চলে যাই বা আত্মহত্যা করি। আত্মহত্যা মহাপাপ! সুভদ্রাও তার বিরুদ্ধে আমায় অনেক বোঝাত তা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে কোথাও চলে যাবার যে কখনো-কখনো তীব্র ইচ্ছা হ'ত তা কিন্তু আমি ভদ্রাকেও কোন দিন জানতে দিইনি। বামা মাসী যখন মাঝে-মাঝে এসে গান ভাল জানি, মুখশ্রী পরিষ্কার ব'লে সিনেমা-অভিনেত্রী হওয়ার কথা আমায় বলতো, মনের মধ্যে বেরিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষাটা রুদ্র মূর্ত্তি ধ'রে উঠলেও সে ভাব আমি বামার কাছেও গোপন রাখতাম।

অনেক সময় ভেবেছি, যে-সব মেয়েরা সিনেমায় যায় তাদের নাম-যশ কত দূর-দূর দেশ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কেমন ছবির মত বাড়ী, প্রকাণ্ড দামী-দামী মোটর গাড়ী, দাস-দাসী, সাজ-সজ্জা, ভোগ-ঐশ্বর্য্য। কোনটারই অভাব হয় না। মনে হয় সত্যই বুঝি তাদের থেকে সুখী আর কেউ না। তারা তো সবই পায়। তাদের অভাব কিসের? লোকে বলে তারা সমাজ পায় না। নেই বা পেল সমাজ, তাতে তাদের ক্ষতি কি? তাদের অর্থ মান পেতে তাই ব'লে তো কোন বাধা হয় না। আমার মত যে-সব মেয়ে সমাজের মুখ চেয়ে পড়ে আছে, সমাজ তাদের কি উপকার করছে? সমাজ তাদের কতটুকু দুঃখ লাঘব করছে? সমাজ কি কেবল শাসনদণ্ড উঁচিয়ে চোখই রাঙাবে চিরকাল? আর তার করার কিছু নেই? কার সমাজ? গরীবের জন্য সমাজ বলে কিছু আছে কি? পাণ থেকে চুণটুকু খসে গেলেই যারা শাসন করতে পারে, স্নেহ করতে পারে না, সে সমাজ কার জন্যে? তাকে শ্রদ্ধা কে করবে? কত দিন করবে? সমাজকে আঁকড়ে পড়ে এ দুঃখ, এ নির্য্যাতন কেন ভোগ করব আমি? বামা মাসী যখন মাঝে-মাঝে এসে আমার সিনেমা-অভিনেত্রী হওয়ার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বলে যেত, আমি অবসর সময়ে এই ভাবে কত দিন কত চিন্তা করেছি। আকাশ-পাতাল ভেবে-ভেবে কিছুই কূল-কিনারা ঠিক করতে পারিনে। বুঝতে পারছি সমাজ-ব্যবস্থা শিথিল হয়ে গেছে, ভেঙে পড়েছে। তবু যেন কেমন একটা মায়া আছে। কোথায় যেন মনের কোণে একটা দরদ আছে। এত দুঃখেও সমাজকে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। হয়তো কেউ এটাকে সংস্কার বলতে পারে। সংস্কার হয়তো হ'তেও পারে। তবু আর্য্য ঋষির এই সমাজের ওপর থেকে মমত্ববোধ মন থেকে যেতে চায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ব অনেক সময় স্থির করে নিয়েও আবার স্থির হয়ে বসেই থাকি—বেরোনো আমার হয় না।

বিমাতার সংসারে আদর-যত্ন না পেলেও বয়স হ'তে ক্রমেই দেখতে পেলাম, গায়ে পড়ে আদর-যত্ন করার লোকের আমার অভাব হচ্ছে না। পাড়ার যে-সব ছেলেরা আমাদের বাড়ীর মধ্যে আসা-যাওয়া করত তাদের কেউ-কেউ আমায় চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে যেত। আমার দিক থেকে জবাব না পেলেও এমন চিঠি আমি প্রায়ই পেতাম। চিঠি পেয়ে কখনো হাসতাম, কখনো ভাবতাম। এদের মধ্যে একটি ছেলে, হয় তার সাহস খুব বেশী, নয় সে সত্যিই আমায় খুব ভালবেসে ফেলেছিল, এক দিন দুপুরে একেবারে সরাসরি আমার কাছে এসে বললে, "ছন্দা, তোমায় কতগুলি চিঠি দিয়েছি বল তো? ডাকে দিই নে যে বলবে পাওনি। এক রকম হাতে-হাতেই, গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে গেছি। তুমি তেমনি ভাবে আমায় একটি চিঠিও তো দিতে পারতে? সময় না পেলে দু'-লাইনও তো লিখতে পারতে? তুমি কি আমার অন্তর বুঝতে পারছ না? আরও কি আমায় পরীক্ষা দিতে হবে?..."

এমনি আরও হয়তো কতক্ষণ ধরে বকে যেত কে জানে! আমি বললাম, "থামুন। খালি ঘর পেয়ে একেবারে পেটটাও খালি করে ফেললেন যে! তা ছাড়া আপনি যে-সব কথা বলছেন, এর একটাও তো নতুন কথা নয়। আপনার যে-সব লম্বা লম্বা চিঠি পেয়েছি তাতেও তো এই কথাগুলোই আরো ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে, রাঙিয়ে লিখেছেন। আর এ-কথাও আপনি জানেন যে, আমার বয়সের কুমারী মেয়ের শুধু আপনার মত এক জন যুবকেরই চিঠি পাওয়া সম্ভব নয়। আমি আরও অনেক চিঠি পেয়েছি, পেয়ে থাকি। কিন্তু আশ্চর্য্য, শচীন বাবু, আপনাদের সকলের চিঠির সুর প্রায় একই। ভাব-ভাষাও অনেকখানি এক বললেও চলে। অর্থাৎ চিঠিগুলি পড়ে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, আপনার বয়সের সকলেই আমায় প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন। সকলেই আমায় চান। আর আমাকে না পেলে আপনাদের জীবন বিশুষ্ক মরুভূমি এবং সে তুচ্ছ জীবন মুহূর্ত্তেই শেষ করার জন্যে আফিং, পটাসিয়াম্ সায়নাইড, গাছ হ'তে ঝুলে পড়ার দড়ি বা জলে ডুবে মরার কলসী কিছুরই অভাব হবে না। কিন্তু শচীন বাবু, আপনার দুর্জ্জয় সাহসও আছে এ-কথা নিশ্চয়ই আমায় স্বীকার করতে হবে। তাই আপনার কাছেই আমিও আমার মনের কথা আজ খুলে বলব।"

দেখলাম, আমার কথা শুনে শচীন যেন কতকটা আশান্বিত হয়েছে। আর একটু কাছ ঘেঁসে এসে প্রায় আমার হাত ধ'রে ফেলার উপক্রম ক'রে বললে, "চল ছন্দা, তা হ'লে আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমার এত দিনের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলি।"

আমি বললাম, "তা তো করবেন। স্বপ্ন সার্থক ক'রে তুলতে বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু শচীন বাবু, সামাজিক নিয়মে এ প্রস্তাব আমার বাবা-মা'র কাছে আপনাকে করতে হবে। আমায় বিয়ে করতে হবে। স্বপ্ন সার্থক করতে পারবেন শচীন বাবু?"

এক মুহূর্ত্তে শচীনের মুখটা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। এত যে খৈ-ফোটার মত বাছা-বাছা কথা বলছিল সে, সেগুলো যেন তার জিভের মধ্যে কেমন জড়িয়ে যেতে লাগল। আর বসে থাকতে না পেরে সে সুমুখের দরজা দিয়ে হাওয়ার মত সোজা বেরিয়ে গেল।

এই বয়সের গোপন প্রেম-নিবেদন একাধিক জনের কাছে শুনেছি। লজ্জার কথা ক'টিই বা আপনাদের বল্‌ব! স্ত্রী ব'লে প্রকাশ্যে গ্রহণ করার সাহস নেই অথচ গোপনে সর্ব্বনাশ করার মনোবৃত্তি অনেকেরই আছে। স্ত্রী-পুত্রকে ভরণ-পোষণ করার দায়িত্ব ও সামর্থ্যের কথা না ভেবে এমনি স্বপ্ন অনেক যুবকই দেখে থাকে। আর এই একই ভুলে অনেক কুমারীও তাদের জীবনকে নষ্ট ক'রে ফেলে। আমি তাদের কথাই বার বার ক'রে ভাবতাম।

এর পরই আমার জীবনে একটা আকস্মিক ও অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। পাড়ায় কলেরা হল। ভীষণ মারাত্মক কলেরা। দু'-চার জন ক'রে মরতেও সুরু হ'ল। আমাদের বাড়ীতেও কলেরা দেখা দিল। বাবা আপিস থেকে এসে কয়েক বার বাহ্যে-বমি করার পর রাত্রি প্রায় একটার সময় মারা গেলেন। মা-ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। থেকে গেল আমার কাছে দুটি ছোট-ছোট ভাই আর একটি তের-চোদ্দ বছরের বোন। এদের সম্পূর্ণ দেখা-শোনার ভার পড়ল আমারই ওপর। আমি দুনিয়া অন্ধকার দেখলাম, কি ক'রে এদের খাওয়াবো, পরাবো, মানুষ করবো—তাই ভেবে।

সাহায্য করার মত দূর-আত্মীয়ও আমাদের কেউ ছিল না। থাকলেও তাঁরা কতখানি আগ্রহ নিয়ে আমাদের অভয় দিতে এগিয়ে আসতেন জানি না। তবে আমার সামান্য অভিজ্ঞতা হ'তে আমি এটা ভালই জানতাম যে, দুঃখীর আত্মীয় বড় কেউ থাকে না। আত্মীয়তা দেখাবার জন্যে কেউ বড় আসেও না।

দুঃখের দরিয়ায় ভগবান যাদের ফেলেন তাদের কিনারা পাওয়ার

একটা উপায়ও তিনি সেই সঙ্গে ক'রে রাখেন। আমার একমাত্র উপায় ছিল ভদ্রা। কিন্তু তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ক'বছর আগে। আমার এই বিপদের সময় ভদ্রা ছিল তার শ্বশুরবাড়ীতে। খবর পেয়ে স্বামীকে সঙ্গে ক'রে আমাদের সান্ত্বনা দিতে এল। প্রায় এক মাস থেকে তারাই স্বামি-স্ত্রী আমাদের সব-কিছুরই ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল।

প্রথমে বাড়ীটার প্রায় সবটাতেই ভাড়াটে বসিয়ে দিল ওরা। ভাই-বোনেদের নিয়ে থাকার জন্যে কেবল রইল আমাদের একটা বড় ঘর, আর তার একটু বারাণ্ডা—যেখানে বসে আমি রান্না করতাম। তার পর আমার ক'টি গানের টিউসন্ করে দিল ভদ্রা ও তার স্বামী। বাড়ী-ভাড়া ও গান শেখানোর আয় হ'তে কোন রকমে আমি সংসার চালিয়ে যেতে লাগলাম ভাই-বোনেদের নিয়ে। যখনই আমি কোন দায়ে পড়েছি ভদ্রা আমায় নানান্ ছলে সাহায্য করেছে। এমনি ক'রেও আমার জীবনের খানিকটা কেটে গেল। দিন তো কারুর জন্য অপেক্ষা করে না; কাজেই আমারও দুঃখের দিনগুলি ধীরে ধীরে কেটে যেতেই লাগল। দেখতে-দেখতে পঁচিশ বছর চলে গেল।

বোন মালতীর বিয়ে হয়েছিল ভাল ঘরেই। এ বিয়ের ভদ্রাই পাত্র জোগাড় করে দিয়েছিল তার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে তার এক দেওরের সঙ্গে। গরীব ব'লে তাঁরা এক পয়সাও আমাদের কাছে নেননি। মালতী তার ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেশ সুখেই আছে। অমল ভাই দুটির মধ্যে বড়। তারও বিয়ে দিয়েছি। তার একটি খোকা। অমল বি-এ পাশ ক'রে মারচেণ্ট আপিসে এখন একটি ভাল চাকরি করছে। ছোট ভাই কমল এম-এ পড়ছে। বাড়ীর মধ্যের ভাড়াটেদের সব উঠিয়ে দিয়েছি। কেবল নীচে রাস্তার ওপর ক'টা দোকান-ঘরে আজও ভাড়াটে আছে। এরা বাবার আমল হ'তেই ছিল, আজও আছে।

যিনি দুঃখ দিয়েছিলেন তাঁরই কৃপায় সংসার আমার বেশ সুখে-আনন্দে চলে যাচ্ছে। সময়-সময় এখন আমি ভাবি—ভগবান আমায় কত সুখীই করেছেন! এক দিন সুন্দরী নয় ব'লে আমায় কেউ বিয়ে করতে চায়নি। তাই আত্মহত্যা করার মৎলব করেছিলাম। আজ সে-কথা ভেবে মনে-মনে লজ্জা পাই। ভাবি, আমারও তো কাজ ছিল। আত্মহত্যা করলে কত বড় অমার্জ্জনীয় অপরাধ করতাম ভগবানের কাছে! আজ আমার নাই কি? আমার ভাই, আমার বোন, আমার ভাইএর ছেলে, বোনের ছেলে-মেয়ে—আজ আমার চেয়ে সুখী কে?

দেশসেবা

শ্রীমতী সুষমা দেবী

"চুপ কর, বেণু, কাঁদে না, ছি, লক্ষ্মীটি! এক্ষুনি আসবে।"

আড়াই বছরের বেণু দিদির ফ্রকটা টেনে ধ'রে আধ-আধ স্বরে কাঁদতে-কাঁদতে বলল—"না, দিদি, তুমি আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল। আমার পেট ব্যথা করছে।"

টুনী উনানের উপর ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে চালগুলি তা'তে ঢেলে দিয়ে হাঁড়ির মুখে কাঁসিটা চাপা দিয়ে দিল। তার পর রেগে বলল—"বাবা, বাবা! আমি আর পারি না, বেণু! কাদিস্নি, লক্ষ্মীটি, চুপ কর। রাত-দিন মা'র এমনি ক'রে বাইরে-বাইরে ঘোরা! কে যে কি করে তার ঠিক নেই। ঝিটা শুদ্ধ এ বেলা আসেনি। এতক্ষণ ধ'রে বাসন মেজে রান্না-ঘর ধুয়ে তবে উনানে আঁচ দিলাম। তা তোকে কোলে নোব কখন?" বেণুকে কোলে নিয়ে টুনী ছোট অন্ধকার চুণ-বালি-খসা রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের খালি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ধোঁয়াতে চোখ দু'টি তার লাল হ'য়ে উঠেছে। দিদির কোলে চড়েও বেণু গলার স্বর আরও উঁচুতে তুলে বায়না আরম্ভ করল।

তাদের বাবা মোহিত বাবু মাত্র একটু আগেই অফিস থেকে ফিরে লুঙ্গী প'রে ধুতিটি কাচতে গিয়েছিলেন, পরের দিন আবার সেইটি প'রেই ত অফিস যেতে হবে। কাচা কাপড়টি নিয়ে এসে তিনি রেলিংএর উপর মেলে দিচ্ছিলেন। ছেলের কান্না শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"বেণু কেন কাঁদছে, টুনী? তোর মা কোথায় গেল?"

বারো বছর বয়স হ'লে কি হবে, টুনী কথা কয় বাইশ বছরের মেয়ের মত। রাগত স্বরে সে জবাব দিল—"কাঁদবে না? মা সেই দুপুর বেলা কখন ও-বাড়ীর মাসীমার সঙ্গে মোটরে করে বেরিয়ে গেছে, কোথায় কোন্ ক্যাম্পের কাজে। এত বেলা হ'য়ে গেল এখনও ফিরল না। আমি বেণুকে দেখব, না রান্না করব, বাবা? তার ওপর আবার ইস্কুলের পড়া না হ'লে দিদিমণিদের কাছে বকুনি খেতে হবে। এ বেলা দিগমের মা শুদ্ধু আসেনি। আবার বেণু বলছে, পেট ব্যথা করছে।"

মোহিত বাবুর সারা মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। গজগজ করতে করতে তিনি বললেন—"গরিবের ঘোড়া রোগে ধরেছে! ঘরের কাজ, কচি ছেলে ফেলে উনি গেছেন দেশের কাজ করতে! পইপই ক'রে মানা করলেও কথা কানে নেয় না!" ভিজা ধুতি মেলে দিয়ে তিনি টুনীকে বললেন—"একটু চা করতে পারবি, মা?"

"কেন পারব না, বাবা? তুমি একবার বেণুকে ভুলিয়ে নাও, নইলে ও আমায় কিছু করতে দেবে না।"

মোহিত বাবু নীচে এসে ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—"পেট ব্যথা করছে কেন, বেণু? চুরি ক'রে কিছু খেয়েচিস্? কি খেয়েচিস্ ঠিক ক'রে বল্ ত?"

বাবার কথা শুনতে পেয়ে টুনী রান্না-ঘর থেকে বলে উঠল—"পেট ব্যথা করবে না! ইস্কুল থেকে ফিরে দেখি—ও নর্দামার ধারে সকড়িগুলো খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে! মা ত পাশের বাড়ীর সেই ময়রাদের মেয়েটার কাছে বেণুকে রেখে দিয়ে চলে গেছে। তার ত ওকে দেখতে ব'য়ে গেছে—ব'সে ব'সে নিজের মনে ঘুঁটি খেলছে।

টুনী চা তৈরি ক'রে তার সঙ্গে ছোট রেকাবিতে চারখানি হাতে-গড়া আটার রুটি আর একটু গুড় মোহিত বাবুর সামনে এনে দিল। তিনি কোনও কথা না ব'লে চা ও খাবার খেয়ে বেণুকে কাঁধে ক'রে উপরে উঠে গেলেন।

টুনী ভাতের ফেন গালছিল। হাঁড়ির মুখের ঢাকাটা হঠাৎ কি রকম ক'রে স'রে গিয়ে খানিকটা ফুটন্ত ফেন গলগল্ ক'রে তার দু'টি হাতের উপর এসে পড়ল। ভাতের হাঁড়িটা কোনও রকমে উপুড় ক'রে দিয়েই যন্ত্রণাতে চিৎকার করতে-করতে সে রান্না-ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে সামনের রকে ধড়াস ক'রে শুয়ে পড়ল।

বেণুকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বড়ি খাইয়ে মোহিত বাবু সেই মাত্র উপরের ঘরের কোলে ছাদে মাদুর পেতে সংসারের হিসাবপত্র নিয়ে বসেছিলেন। মেয়ের রান্নার শব্দে ব্যস্ত হয়ে তিনি বেণুর হাত ধরে প্রায় ছুটতে-ছুটতেই নীচে গেলেন। সেখানে গিয়ে টুনীর অবস্থা দেখে তিনি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। তার হাত দু'টি পুড়ে চামড়া কুঁচকে জড় হ'য়ে গেছে। সমস্ত জায়গাটা লাল দগ দগ করছে। আর মেয়ে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদছে। প্রথমটা ভাবনায় তিনি যেন দিশাহারা হ'য়ে পড়লেন। তার পর বেণুকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি খানিকটা নারকেল তেলের সঙ্গে চুণ মিলিয়ে পোড়ার জায়গাগুলিতে দিয়ে দিলেন। তবুও যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে না দেখে তিনি টুনীকে কোলে ক'রে উপরে নিয়ে গিয়ে ছাদে মাদুরের উপর শুইয়ে দিলেন। তার পর বেণুকে নিয়ে বাইরে রাস্তার মোড়ের উপর ডিস্পেনসারি থেকে সেখানকার ডাক্তার বাবুকে দেখিয়ে এলেন। তাঁর ব্যবস্থা মত মলম এনে মেয়ের হাতে লাগিয়ে দিলেন ও খাবার ওষুধ তাকে খাইয়ে দিলেন। টুনী একটু শান্ত হ'লে মোহিত বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁ রে টুনু, তোর দাদা এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি? সে হতভাগা গেছে কোথায়?"

টুনী বলল—"দাদাও এসেছিল, বাবা! খাবার খেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। তার ফিরতে এখনও অনেক দেরী। সে ত সকাল-সকাল ফেরে না?"

খানিক পরে টুনীর একটু তন্দ্রার মত এল। ক্লান্ত হয়ে মোহিত বাবুও মেয়ের পাশে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। স্ত্রীর উপর রাগে-বিতৃষ্ণায় তাঁর সমস্ত মনটা যেন কি রকম করতে লাগল। তিনি মনে-মনে বললেন—আজ রাত্তিরে আর কারও খাবার দরকার নেই, সবাই উপোস ক'রেই মরুক! মা যাদের ঘর-সংসার ভুলে বাইরের কাজ নিয়েই মেতে থাকে, তাদের কোনও কিছু চাই না।···বেণুকে দেখে তিনি কিছুক্ষণ পরে উঠে বসলেন, ভাবলেন—কচি বাচ্ছাটারও তা হ'লে আজ রাত্তিরে কিছু খাওয়া হবে না? তিনি থাকতে পারলেন না, বেণুকে নিয়ে আবার নীচে নেমে এলেন। আজেবাজে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে তাকে বারান্দায় বসিয়ে রেখে তিনি রান্না-ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন—সমস্ত জিনিষ গুছিয়ে নিয়ে পাকা গিন্নীর মতই টুনী রান্না করতে বসেছিল। থালায় আনাজ কেটে রেখেছে, মশলা, জল, তেল, নুণ, সব জিনিষই গোছান। দেখে মেয়ের উপর মমতায় তাঁর অন্তরটা ভ'রে উঠল। তিনি রান্না করতে বসলেন।

রান্না করতে তিনি অনেক বছর আগেই শিখেছিলেন। এটা তাঁর কাছে নতুন নয়। স্ত্রীর যখনই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই অনেক দিন ধ'রে তাঁকেই এ-সব করতে হয়, এখন না হয় বড় হ'য়ে টুনী শিখেছে। আগে-আগে এমন কত দিন হয়েছে, তিনি রান্না ক'রে নিজে খেয়ে, ছেলেদের জন্য খাবার গুছিয়ে রেখে স্ত্রীকে খাইয়ে তার পর অফিস গেছেন। না করলেই বা চলবে কেন? অবস্থা ত সে রকম নয়! সওদাগরী অফিসে চাকরি ক'রে মাত্র দেড়শ' টাকা পান—মাগ্গী ভাতা, বোনাস, সব নিয়ে দু'শ'টাক টাকা হয়। এই মাত্র সম্বল ক'রে আজকালকার বাজারে মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে তাঁকে চালাতে হয়। গলির মধ্যে দেড় কাঠা জমির উপর জরাজীর্ণ বাড়ীখানি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি। এ ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

ক্রমশঃ অন্ধকার হ'য়ে এল। মোহিত বাবু রান্না শেষ ক'রে বারান্দার তাকের উপর থেকে কেরোসিনের লণ্ঠন তিনটি নামিয়ে জ্বালতে বসলেন। এমন সময়ে জুতার শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে এল?" "আজ্ঞে, আমি, বাবা" ব'লে বিভাস এগিয়ে এল। তাকে দেখে মোহিত বাবু যেন ক্ষেপে গেলেন, বললেন—"নবাব-পুত্তুরের কোথা যাওয়া হয়েছিল? রাত দুপুরে বাড়ী ফেরা হচ্ছে! সংসারের ওপর ত দেখি এতটুকুও টান নেই, যেন হোটেলে বাস করছে! খালি ফুর্তি! 'বাপ'-বেটা চোখ বুঝলে তখন বুঝবে, চোখে সর্ষে-ফুল দেখবে! কোনও উপকারে কি নেই?···অমন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভাইটা মাটিতে প'ড়ে ঘুমোচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? যাও না, ওপরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে এস।" বিভাস বেণুকে কোলে নিয়ে উপরে উঠে গেল।

গরমে মোহিত বাবুর সারা অঙ্গ ঘেমে জল ঝরতে লাগল। সমস্ত দিন অফিসের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর অনেক দিনের অনভ্যস্ত গৃহকর্মে যেন তিনি বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। দুধ গরম ক'রে টুনীকে খাইয়ে এসে বেণুকে নিয়ে খাওয়াতে বসলেন। তার খাওয়া শেষ হ'লে বিভাসের ভাত বেড়ে তাকে খেতে ডাকলেন। তার পর নিজেদের দু'-জনের ভাত-তরকারি হাঁড়িতে রেখে দিয়ে উপরে এলেন ও বিছানা ক'রে ছেলে-মেয়েকে শুইয়ে নিজেও তাদের পাশে শুয়ে পড়লেন।

সামনের বাড়ীর ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে ন'টা বেজে গেল, তবুও শ্রীলতার দেখা নেই। মোহিত বাবু উৎকণ্ঠায় উঠে বসলেন, ভাবলেন—কোন বিপদ হ'ল না ত! কই, কোনও দিন ত এত দেরী হয় না? তিনি ঘরে থাকতে পারলেন না, উঠে গিয়ে সামনের ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। নীচের ঘরে বিভাস পড়ছিল, তখনও আলো জ্বলছে দেখা গেল। মোহিত বাবু উপর থেকে তাকে ডাকলেন। তার কোনও সাড়া না পেয়ে নীচে নেমে বাইরের ঘরে গিয়ে দেখলেন—বই খোলা রয়েছে, সামনে লণ্ঠন জ্বলছে আর বিভাস তক্তাপোষের উপর সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখে তাঁর মায়া হ'ল, বিভাসের গায়ে হাত দিয়ে ডেকে বললেন—"যাও, ওপরে গিয়ে শুয়ে পড় গে।" ধড়মড় ক'রে উঠে সামনে বাবাকে দেখে সে ভয়ে যেন সিটিয়ে উঠল, তার পর বই বন্ধ ক'রে উপরে শুতে গেল।

বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে মোহিত বাবু উপরে উঠে আসতেই রাস্তায় মোটরের শব্দ পেলেন, জীপ গাড়ীর হর্ণ। তার পরই বাড়ীর দরজায় ধাক্কা। প্রথমটা তিনি ভাবলেন দরজা খুলবেনই না, কিন্তু রাত দুপুরে পাড়ার লোকেরা কি মনে করবে ভেবে নীচে নেমে গেলেন। বাইরের দরজাটি খুলে দিয়েই তিনি আবার পা চালিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে শ্রীলতা উপরে না গিয়ে সোজা রান্না-ঘরে ঢুকল। তার পর ভাত বেড়ে খেয়ে রান্না-ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে উপরে উঠল। অত রাত্রে স্বামীকে ছাদে পায়চারি করতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—"এখনও ঘুমোওনি যে? অন্য দিন ত এমন সময়ে তোমার অর্দ্ধেক রাত্তির! যা গরম পড়েছে, তাতে ঘুম হবেই বা কি করে? গাছের পাতা শুদ্ধ নড়ছে না।···তোমার পানগুলো সব শেষ করেছ, না দু'-একটা আছে? থাকে ত একটা দাও খাই। বড্ড ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল ব'লে বেশী খেয়ে ফেলেছি। এখন একটা পান না হ'লে আর চলছে না।···টুনীটার কাজ দিন-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে—যত বড় হচ্ছে, আগোছালোর একশেষ হচ্ছে। আর আন্দাজও কি তেমনি! আমার জন্যে দু'জনের মত ভাত-তরকারি রেখেছে। তেতে-পুড়ে এসে যে এক দিন দু'টি বাড়া ভাত পাব, তারও উপায় নেই। পাণটা শুদ্ধ রাখতে ভুলে গেছে—জানে যে আমি কিমাম খাই, পাণ না পেলে কষ্ট হয়!"

মোহিত বাবু প্রথমে ভেবেছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে কোনও কথা বলবেন না। কিন্তু ঘোর স্বার্থপরতায় ভর্তি তার এতগুলো কথা শুনে চুপ করে থাকতে পারলেন না, শ্লেষপূর্ণ স্বরে বললেন—"তোমার বাবার বড়ই ভুল হয়েছিল, শ্রীলতা, তোমাকে আমার মত দীন-দরিদ্রের ঘরে দেওয়া! তোমার যদি সত্যিই বাড়া ভাত খাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তা হ'লে আমায় এবার চুরি আরম্ভ করতে হবে। আর না হয় ত বড়লোক বান্ধবীকে ধ'রে মোটা মাইনের একটা কাজ জোগাড় ক'রে তোমায় নিতে হবে। আজকাল বিদ্যে-বুদ্ধির ত বিশেষ দরকার নেই। আসল দরকার হ'ল বড় মানুষের পায়ে তেল দেওয়া। সেটা তুমি বোধ হয় ভাল ক'রেই পারবে।···কচি বারো বছরের মেয়েটার বুকের ওপর পা দিয়ে মাড়িয়ে যেতে তোমার লজ্জা করে না? তুমি না টুনীর মা?"

শ্রীলতা বলল—"তোমার আজ হ'ল কি? অত রাগের কি আছে? একটু না হয় দেরী হ'য়েই গেছে। আজ কাজের জন্যে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। মাধবীদির সঙ্গে গেছি, সে না ফিরলে ত আর আমি একলা ফিরতে পারি না? তাতে দোষটা কি হয়েছে? আমি কি ফূর্ত্তি করতে গিয়েছিলাম? এত যে বাস্তুহারা বাড়ী-ঘর ছেড়ে আশ্রয়ের আশায় এখানে পালিয়ে আসছে, তাদের দেখা কি আমাদের উচিত নয়?"

মোহিত বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—"তোমার কথা আর আমার শোনবার ইচ্ছে নেই, প্রবৃত্তিও নেই। যা করেছ, বেশ করেছ; তোমার যা'ইচ্ছে হয় ক'রে বেড়াও গে যাও। আমি ও-বিষয়ে কিছু বলতে চাই না।"

ঘরের ভিতর থেকে টুনীর কাতরানির শব্দ পেয়ে শ্রীলতা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে গেল, স্বামীর কথার কোনও উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, মোহিত বাবু একই ভাবে ছাদে পায়চারি করছেন। তাঁর কাছে গিয়ে শ্রীলতা অপরাধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল—"টুনুর হাত দু'টো কি ক'রে এমন পুড়ে গেল?"

মোহিত বাবু শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"তোমার সে-সব জানবার দরকার কি? এই একটু আগেই ত ওকে গালাগালি করছিলে, তোমার ভাত বেড়ে রাখেনি বলে!···হাত দু'টো হয়ত জন্মের মত দাগী হ'য়ে যাবে। হিন্দুর মেয়ে, বিয়ে দেওয়া মুস্কিল হবে। একেই ত আমার অর্থবল নেই, আর মেয়ের রূপও নেই।···তাই বলি শ্রীলতা, তুমি মাধবী দেবীর সমান নও। তিনি বড়লোকের স্ত্রী। সকাল থেকে রাত্তির অবধি দেশের কাজ ক'রে বাইরে-বাইরে বেড়ালে তাঁর কোনও ক্ষতি হবে না, তাঁর সংসার, ছেলেপিলে দেখবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু তোমার সংসার আর গরিবের ছেলে মেয়ে দেখবার জন্যে কে আছে, বল? বারো বছরের মেয়ে আর পঁয়তাল্লিশ বছরের অকালবৃদ্ধ স্বামী! এই ত? এদেরই দিয়ে যতটা পার করিয়ে নিয়ে তুমি উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা ঘোচাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছ! কিন্তু তোমার দুর্দশা কে ঘোচায়, সেটা ত একবার ভাবছ না? আড়াই বছরের ছেলেটা নর্দমার ময়লা খুঁটে খায়—দেখার অভাবে। বড় ছেলেটা পড়াশোনা না করে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। বারো বছরের মেয়েটা ইস্কুল থেকে ফিরে হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে বসে। আর তোমার দরিদ্র স্বামী আছে—তোমাদের সব দিক সামলে বেড়াবার জন্যে!··· আমার মত গরিবের সংসারে আর তোমায় মানায় না শ্রীলতা! আমার সংসার, ছেলে-মেয়ে আমি নিজেই দেখব। তুমি বরং যাতে তোমার নিজের সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা ও সেই সঙ্গে দেশের কাজ করতে পার, তার জন্যে তোমার বান্ধবীকে ব'লে বন্দোবস্ত ক'রে নাও গে!" —এই কথা ব'লে মোহিত বাবু ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকালে যথাসময়ে শ্রীলতা স্বামীকে চা দিতে এল। মোহিত বাবু সেদিকে না চেয়ে বাজারের থলেটা নিয়ে দরজার দিকে এগোতে সে দরজার সামনে হাত দিয়ে তাঁর পথ আটকে বলল—"কাল রাত্তির থেকে উপোস ক'রে আছ, জলস্পর্শ করনি। আগে চা খাও, তার পর বাজার যেও। আমি তোমার জন্যে ক'খানা রুটি সেঁকে রেখেছি, নিয়ে আসছি।"

মোহিত বাবু কোনও উত্তর না দিয়ে জোর ক'রে বেরিয়ে গেলেন। বাজার ক'রে ফিরে টুনুর জ্বর দেখে আবার ডিস্পেনসারিতে ডাক্তারের কাছে গেলেন। তার সেদিনকার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করিয়ে তার পর স্নান করতে কলতলাতে গেলেন।

শ্রীলতার রান্না প্রায় হ'য়ে গিয়েছিল। স্নান শেষ ক'রে মোহিত বাবু আসবার আগেই সে তাড়াতাড়ি পিঁড়ি পেতে তাঁর খাবার জায়গা ক'রে ভাত বেড়ে এনে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি কিন্তু অফিসের কাপড় প'রে ভাত না খেয়েই সোজা বেরিয়ে গেলেন। অভিমানে শ্রীলতার কণ্ঠে কান্না ঠেলে এল। স্বামীর বাড়া-ভাতের থালা রান্না-ঘরের এক পাশে রেখে দিয়ে সে সংসারের বাকী কাজ করতে লাগল। দুপুর বেলা খেতে ব'সে অভুক্ত স্বামীর কথা ভাবতে-ভাবতে ভাত যেন তার গলা দিয়ে নামছিল না। কোনও রকম ক'রে জল দিয়ে দু'-চার গাল গিলে সে উপরে উঠে গেল। টুনীর গায়ে হাত দিয়ে দেখল তার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তার পাশে শুয়ে বেণু ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়ের গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে শ্রীলতা জিজ্ঞাসা করল—"কিছু খাবি টুনী?"

সে বলল, "আমায় কি খেতে দেবে, মা?"

শ্রীলতা উত্তর দিল—"দুধ-বার্লি, নয়ত দু'টি শুকনো মুড়ি, এ ছাড়া আর কি খেতে দোব?"

টুনী বলল—"না, মা, আমি ও-সব খাব না। আমায় বিস্কুট

দাও, সেই সেবার বেণুর অসুখের সময়ে বাবা যে রকম এনেছিল—সেই রকম।"

শ্রীলতা বলল—"বেশ, তোমার বাবু আসুন, আমি বিস্কুট এনে দিতে বলব।"

মেয়ের পাশে ব'সে ব'সে শ্রীলতার তন্দ্রা এসে গেল, সে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ মোটরের হর্ণের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। অনবরত জীপের হর্ণ বাজান সত্ত্বেও যখন শ্রীলতা বাড়ী থেকে বেরোল না, তখন বিরক্তি-ভরা মুখে মাধবী এসে দেখা দিল, বলল—"কই শ্রী, এখনও বের হ'লে না? এত দেরী কিসের? তাড়াতাড়ি চ'লে এস।"

শ্রীলতা নীচে তার কাছে গিয়ে বলল—"আজ আমার যাওয়া হবে না, ভাই!" তার পর পূর্ব্বের দিনের বৃত্তান্ত, টুনুর হাত পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি, সব তাকে জানাল। বলল—"আমার স্বামী খুবই রাগ ক'রে আছেন, কাল থেকে জলস্পর্শ করেননি। আজ না, খেয়েই অফিস গেছেন। আজ আমি যেতে পারব না মাধবী-দি কিছু মনে কোরো না।"

শ্রীলতার কথা শুনে মাধবী তীব্র ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠল—"ঐ ক'রেই ত আমাদের বাঙালীর মেয়েগুলো মরে! কেন, বিয়ে করেছি ব'লে কি আমরা চোরের দায়ে ধরা পড়েছি নাকি? যেন বিনা বেতনের দাসী, যা তাঁদের মরজি হবে আমাদের তাই মেনে চলতে হবে! পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্য জাত এ রকম ব্যবহার করে না। তুমি খবরদার ওঁর কাছে নরম হোয়ো না, শ্রীলতা! এত দিন ধ'রে তোমায় যা-কিছু শেখাচ্ছি, সেটা সমস্ত পণ্ড কোরো না। পরাধীন হ'য়ে আর প'ড়ে থাকতে রাজি হোয়ো না। ঘর-সংসার ত সকলেরই আছে, কিন্তু দেশের আহ্বানে ক'টা মেয়ে তোমার মত সাড়া দেয়? এরই মধ্যে চার দিকে তোমার কি রকম নাম হয়েছে! আমাকে ডেকে অনেকে তোমার কাজের সুখ্যাতি করেছেন।...আজ টুনীর জ্বরটা বেশী রয়েছে বলছ, আজ না হয় যেও না। কিন্তু এর পরে যেদিন আসব, সেদিন তোমায় যেতেই হবে"—ব'লে মাধবী এসেন্স ও পাউডারের সুগন্ধ ছড়াতে-ছড়াতে বেরিয়ে গেল। সৌখীনতার চরম নিদর্শন—তার সাজ-সজ্জার দিকে শ্রীলতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল!

টুনীর হাত পুড়ে যাবার পর চার দিন কেটে গেছে, কিন্তু তার জ্বর তবুও ছাড়েনি, যদিও আগের চেয়ে অনেক কমেছে। শরীর এখনও খুব খারাপ ও দুর্ব্বল হ'য়ে আছে। দুপুর বেলা সংসারের কাজ শেষ ক'রে শ্রীলতা উপরে এসে বেণুর পাশে শুয়ে পড়ল। টুনী আজ ঝোল ও রুটি খেয়েছে। মোহিত বাবুর রাগ পড়েছে। তিনি স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করছেন, খাওয়া-দাওয়া করছেন।

আজ আবার ক'দিন পরে যথাসময়ে রাস্তায় জীপের হর্ণ বেজে উঠল। শ্রীলতা শুনেও উঠল না, শুয়েই রইল। কিন্তু মনে-মনে সে ভয় পেল, ভাবল—হয়ত মাধবীদি' এখনি এসে উপস্থিত হবেন। সে ভাবতে লাগল, তার জীবনে সত্যি কি আর ছিল? এতগুলি বৎসর এই ভাঙা বাড়ীটির গণ্ডীর মধ্যেই তার কেটে গেছে—বাইরের জগতের সংস্পর্শ বলতে গেলে তার জীবনে কোনও দিন লাগেনি। সংসার দেখা আর ছেলে মানুষ করাই এত দিন তার জীবনের একমাত্র জিনিষ ছিল। মাধবীদি'ই তার প্রথম চোখ ফুটিয়েছেন। সামনের বড় বাড়ীটা কিনে যেদিন ওঁরা উঠে এলেন, সেই দিনই একটা আকস্মিক খেয়ালের বশে চিরকালের গণ্ডী পেরিয়ে শ্রীলতা গিয়েছিল তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে। প্রথম-প্রথম তাঁদের ঐশ্বর্য দেখে তার নিজেকে অত্যন্ত দীন-হীন ব'লে মনে হ'ত, নিজেদের অবস্থার কথা মনে হ'লে তার লজ্জা আসত। মাধবীর সঙ্গে সে ভাল ক'রে মিশতে পারত না। কিন্তু মাধবী বস্তিতে-বস্তিতে সমাজসেবার কাজে ঘুরে বেড়াতেন, অজ্ঞ অশিক্ষিতা মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের মানুষ করবার চেষ্টা করতেন। তাই তিনি শ্রীলতাকে নিয়েও উঠে-প'ড়ে লেগেছিলেন।

"শ্রীলতা, তোমায় নিয়ে আর পারি না! এখনও হয়নি? আর কতক্ষণ এই রকম ক'রে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব?"

ঘর থেকে উঠে বারান্দায় এসে সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে শ্রীলতা জবাব দিল—"কি ক'রে যাব, মাধবীদি'? টুনীর জ্বর যে এখনও ছাড়েনি, যদিও একটু কমেছে। তা ছাড়া বেণুকে দেখবার কেউ নেই। নেহাৎ ছোট ছেলে, ওকে একলা ফেলে যেতে সাহস হচ্ছে না। উনিও তা হ'লে রাগ করবেন।"

"থামাও তোমার 'উনি'র কথা! আজ ত শনিবার, তোমার 'উনি' সকাল-সকালই বাড়ী ফিরবেন। তা ছাড়া আমাকেও আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, সিনেমার টিকিট কেনা হ'য়ে গেছে, সাড়ে পাঁচটার 'শো'তে আমায় যেতেই হবে। কেন, টুনীর জ্বর ত আজ বেশী নেই। ওকেই ব'লে যাও বেণুকে একটু দেখবে। চলে এস, আর দেরী কোরো না। অন্য দিন কি ক'রে বেণুকে

রেখে যাও যে আজ এত আপত্তি করছ ?”—ব’লে মাধবী হাতঘড়ির দিকে চাইল।

শ্রীলতা ম্লানমুখে উত্তর দিল—“অন্য দিন আর কাউকে ওর কাছে বসিয়ে যাই। আজ এত বেলায় এখন আর কাকে পাব, মাধবীদি’ ?” তার পর আগ্রহ প্রকাশ ক’রে বলল—“তুমি যদি ভাই তোমার কোন ঝি-চাকরকে বল, আমার স্বামী অফিস থেকে না-ফেরা পর্যন্ত তারা কেউ এসে বেণুকে একটু দেখে, তা হ’লে আর কোনও গোলযোগ হয় না।”

“তা হ’লেই হয়েছে! তারা সবাই এখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে আছে। কে এসে তোমার ছেলে দেখবে, ভাই ? তা ছাড়া আমার ছেলেপিলেদের দেখতে হবে ত ? পিণ্টুটা যা দুরন্ত হয়েছে বলবার নয়!…ও কি, অমন হাঁ ক’রে দাঁড়িয়ে কেন ? আর সময় নষ্ট না ক’রে তাড়াতাড়ি চ’লে এস দেখি !”

শ্রীলতা ঘরে ফিরে গিয়ে টুনুর গায়ে হাত দিয়ে দেখল—তার গা-টা যেন আবার বেশী গরম লাগছে। বুকটা তার ছাঁৎ ক’রে উঠল। তবুও বেণুকে দেখবার জন্যে টুনীকে ব’লে সে তাড়াতাড়ি চুল বেঁধে কাপড় ছাড়তে গেল। অল্পক্ষণ পরেই পরিষ্কার হ’য়ে পায়ে স্লিপার দিয়ে বগলে পুরান চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে সে নীচে নেমে গেল। মাধবীর সঙ্গে সে গিয়ে উঠে বসতেই জীপ ছেড়ে দিল। জনবহুল রাস্তার দু’পাশে নানা রকম ছবি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দেখতে-দেখতে তারা চলল। বাইরের মুক্ত হাওয়া এসে তাদের কেশ-বেশ ধ’রে যেন নাড়া দিতে লাগল। শ্রীলতা ঘর-সংসার সব ভুলে গেল।

ঘণ্টা চারেক পরে যখন শ্রীলতা ফিরল, তখন তাদের বাড়ীর সামনেটা পুলিশ, মোটর ও লোকজনে ভ’রে গেছে। মাধবীর জীপ হর্ণ বাজাতে-বাজাতে পথ খালি ক’রে ধীরে-ধীরে এসে শ্রীলতাদের বাড়ীর সামনে থামল। শ্রীলতা দেখল—বাইরের দরজা হাট ক’রে খোলা, বাড়ীর ভিতরে পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে। অজানা আশঙ্কায় তার বুকটা কেঁপে উঠল। জীপ থেকে নেমে দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে সরু গলিটা পার হ’য়ে উঠানের সামনে এসে দেখল—রকের উপর তার স্বামী আর টুনী অজ্ঞানের মত প’ড়ে আছে। বিভাস দু’হাতে মুখ গুঁজে বসে কাঁদছে। আর উঠানের উপর বেণুর ছোট্ট দেহটি তাল পাকিয়ে প’ড়ে আছে, রক্তে উঠান লালে লাল !

দেশলাই

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

“দেশলাই হবে ?”

প্রশ্ন শুনে চমকে গিয়েছিলাম প্রথমটা, বুঝতেই পারিনি এতক্ষণ আরেক জন বসে রয়েছে আমার সঙ্গে একই বেঞ্চিতে। ভালো করে নজর করতে ফিকে আবছায়া মতন যেন দেখতে পেলাম এবার। পাড়াগেঁয়ে রেল-ষ্টেশনে কেরোসিনের বরাদ্দ সামান্যই—মাষ্টার বাবুর বাড়ির প্রয়োজন মিটিয়ে যেটুকু তার অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে টিকিট-ঘরের সামনে নিয়মরক্ষা হয়—আলো হয় না। চতুর্দ্দিকের অজস্র অন্ধকারের মাঝখানে ভয়ে প্রাণ যেন টিম্-টিম্ করতে থাকে বাতির শিখাটির। জমাট অন্ধকার যতটুকু তরল হয়—তার শত গুণ বুঝি তাতে ভয়াবহ হয়ে ওঠে জায়গাটা। তার ছোঁয়াচ বাঁচাতে, আধ ঘণ্টা আগে ষ্টেশন-মাষ্টারের নির্দেশ হাতড়ে-হাতড়ে কি করে সে অন্ধকারে এই বেঞ্চটা আবিষ্কার করেছিলাম তা আমিই জানি। বেঞ্চে যে আর কেউ রয়েছে লক্ষ্য হয়নি তখন, বসে থাকতে-থাকতেও কেউ এসেছে বলেও টের পাইনি। কলকাতার ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থেকে অসংখ্য মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে অজস্র হাত-পা চালিয়েছি আধ ঘণ্টা কিন্তু পাশ থেকে একটি আওয়াজও তার পাইনি। চতুর্দ্দিকে থৈ-থৈ করছে অন্ধকার—কেরোসিনের বাতি থেকে অনেক উজ্জ্বল আকাশে শুধু বুঝি গুটি কয়েক তারা। আশ্চর্য সন্ত্রস্ত একটা নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিকে—আওয়াজ নেই ঝিঁঝিঁর, মশাগুলি পর্য্যন্ত যেন বোবা! নিরন্ধ্র, নিস্তব্ধ যায়গায় নিজের নিশ্বাসের শব্দ কানে এসেছে কিন্তু তারও সামান্যতম আওয়াজ পাইনি পাশ থেকে।

হঠাৎ প্রশ্ন শুনে তাই চমকে ওঠবারই কথা—এবং পাশে একটি মানুষকে পেয়ে আশ্বস্ত হবারও। পকেট থেকে দেশলাই বার করে অন্ধকারে এগিয়ে ধরলাম, সঙ্গে সঙ্গে বললাম, “এই যে দেশলাই !”

পাশের লোকটির দৃষ্টি অনেক প্রখর আমার চেয়ে। আমার মুখ দিয়ে কথা বার হবার আগেই অনায়াসে দেশলাই তুলে নিল হাত থেকে। তার পর কিছুক্ষণ উসখুস করে বললে, “ঐ যাঃ ! বিড়ির বাণ্ডিলটা ফেলে এসেছি—হবে নাকি একটা আপনার কাছে ?”

বিড়ি আমি খাই না, বললাম, “না—”

“সিগারেট ?

সিগারেট ছিল—সমস্ত দিনের অবশিষ্ট দুটি মাত্র। এখনো দু’ঘণ্টা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে বলে মায়া করে খাইনি এতক্ষণ, সবে একটা ধরাবো-ধরাবো ভাবছিল। কি করব ভেবে পেলাম না। বেশি থাকলে হয়ত গল্প করে সময় কাটাবার জন্য দিয়ে ফেলতাম একটা, কিন্তু যা রয়েছে তা যক্ষের ধন—দেওয়া চলে না।

আমায় চুপচাপ দেখে আবার বলে উঠল লোকটা, “দিন, একটা সিগারেটই দিন—বহু দিন খাইনি !”

কিন্তু—কিন্তু করে উত্তর করলাম, “এখানে সিগারেট পাওয়া যাবে কোথাও ?”

“এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে সিগারেট কোথায় পাবেন ? বিড়ি পাওয়া যেতে পারে—তাও হাটের ধারে পরাণের দোকানে ! কলকাতায় যাবেন ত—তা পরের জংশনেই পাবেন সিগারেট—”

বার করলাম সিগারেট। ভেবে দেখলাম যে সিগারেট খেতে হলে এ-অবস্থায় একে দিয়েই খেতে হয়—না হলে খাওয়া আর হয় না। পকেটে সিগারেট নিয়ে ঢেকুর তোলার কোনো মানে হয় না।

প্যাকেট বার করতেই অন্ধকারের মধ্যে একটা তুলে নিল লোকটি। অন্যটা আমি বার করবার আগেই ফস্ করে জ্বলে উঠল দেশলাই। সিগারেট ধরাবার জন্য জ্বলন্ত কাঠিটা মুখের কাছে নিতেই তার মুখখানা চকিতে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে আঁৎকে উঠলাম

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা.১২

আমি। হাত থেকে পড়ে গেল সিগারেটের প্যাকেট। তার গলা শুনে সত্যিকার-কেন চমকে ছিলাম বুঝতে পারলাম।

পনেরো বছরে চেহারা অনেক পালটেছে কিন্তু নিশাকরের চেহারা ভোলবার নয়, তার উপর কপালের কাটা দাগ—চকিতে মনে পড়িয়ে দিল পনেরো বছর আগের অনেকগুলি ঘটনা। চিনতে পারলাম নিশাকরকে। অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ের অজ্ঞাত গণ্ড রেল-ষ্টেশনে এ ভাবে তাকে কোন দিন ফের আবিষ্কার করব ভাবিনি।

সিগারেট ধরিয়ে নিশাকর জলন্ত কাঠিটা এগিয়ে ধরল আমার দিকে। পড়ে-যাওয়া প্যাকেটটা খোঁজবার অছিলায় তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে পায়ের কাছে হাতড়াতে লাগলাম।

"কি হল ?" ব্যস্ত হয়ে উঠল নিশাকর।

"প্যাকেটটা পড়ে গিয়েছে—" মুখ না তুলেই বললাম আমি। জ্বলন্ত কাঠিটা নীচু করে ধরতে গেল নিশাকর। প্যাকেট পড়েছিল আমার পায়ের নীচেই। স্পর্শ পেয়েছিলাম আগেই—কাঠিটা নিবে যেতেই সেটা উদ্ধার করে মাথা তুলে উঠে বসলাম। আরেকটা কাঠি জ্বালাতে গেল নিশাকর, বাধা দিয়ে উঠলাম আমি, অস্বাভাবিক স্বরে বললাম, "থাক—এখন খাবো না!"

নিশাকর বুঝতে পারল কি না জানি না। তবু সিগারেটের গোড়ার আগুনটা থেকে থেকে শুধু উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। টানা বা ধোঁয়া ছাড়ার আওয়াজ পেলাম না কখনো। কোনো কথাও নয় আর।

অন্ধকারে চুপচাপ বসে নিশাকরের কথা ভাবতে হঠাৎ যেন সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল আমার। ঠিক নিশাকরকেই যে দেখেছি সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ লাগল মনে। হয়ত নিশাকর নয়, নিশাকরের মতই চেহারা, কপালে কাটা দাগ আর কেউ! পথে চলতে এ-রকম ভুল কত হয় মানুষের। নিত্যকার চেনা মানুষ বলে নিতান্ত অপরিচিতকে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে। সারা দিনের পরিশ্রমের পর রাতের অন্ধকারে একটি দেশলাইয়ের কাঠিতে দেখে বিশ বছরের আগেকার চেনা লোক বলে ভুল করা যে-কোনো মানুষেরই সম্ভব। না হলে এই গণ্ড রেল-ষ্টেশনের ভাঙা বেঞ্চিতে বসে অপরিচিত লোকের কাছে বিড়ি চাওয়ার সঙ্গে যে-নিশাকরকে আমি চিনতাম তার পরিবেশের সঙ্গতি নেই কোথাও। দীর্ঘ পনেরো বছরের মধ্যে সম্ভাব্য সমস্ত অসম্ভব পরিবর্তন কল্পনা করেও যেন নিশাকরকে ভাবা যায় না এই চরিত্রে, অবস্থায় বা অধঃপতনে।

ইউনিভার্সিটিতেই নিশাকরের সঙ্গে প্রথম আলাপ আমার—তার আগে ও পড়ত সেণ্ট জেভিয়ার্সে আর আমি ছিলাম মফঃস্বল কলেজে। অর্থনীতির ছাত্র ছিলাম দু'জনে—আলাপের সূত্র ছিল সেটা, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার কারণ ছিল অন্য। অতিশয় অবস্থাপন্ন ছিলেন নিশাকরের বাপ—জমিদারীর সঙ্গে দু'চারটে মিলও ছিল তাঁর, আর একমাত্র সন্তান ছিল নিশাকর। আমার পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর হয়েছিল নিশাকরের দয়ায় তার পড়ার ঘর তাদের লাইব্রেরীতে ঢুকতে পেয়ে। কত দিন যে সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়েছি তাদের বাড়িতে, হিসাব করে আজ আর বলতে পারব না। নিশাকরকে বাড়িতে পেতাম খুব অল্প দিনই—রাজনীতি নিয়ে সে ব্যস্ত থাকত অষ্টপ্রহর—দেশের সর্বহারাদের উগ্রতম দরদী হয়ে ছাত্র ও ছাত্রোত্তর রাজনীতি নিয়ে সভা ও ধর্মঘট বা সেই সবেরই আয়োজন করে বেড়াতে স্নানাহারের সময় হত না তার। চমৎকার চেহারা—বিরাট প্রশস্ত কপাল, টিকলো নাক, গৌর বর্ণ—সব মিলিয়ে খদ্দরের পায়জামা ও পাঞ্জাবীতে মানাতো তাকে আশ্চর্য রকম। বক্তৃতায় জ্বালাও ছিল খুব। ইংরেজীতে না হলে বক্তৃতা খুলতো না। সেই সময়ে তার বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণে শ্রোতারা স্পষ্ট যেন দেখতে পেত ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের গণ্ডার-পুরু চামড়ায়। শুধু ছেলেদের নয়, ইউনিভার্সিটির মেয়ে-মহলেও আলোচনা হত নিশাকরকে নিয়ে—তার রাজনীতি থেকে চেহারাটাই বোধ হয় বেশি কারণ ছিল তার। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে সমস্ত ইউনিভার্সিটির মধ্যে বোধ হয় একমাত্র তারই ছিল একান্ত উৎসাহের অভাব। মেয়েরা সামনে এসে দাঁড়ালে কিম্বা কথা বললে অসম্ভব অস্বস্তি বোধ করত সে। রাজনীতি, সভা, ধর্মঘটে মাঝে-মাঝে আমাকেও টানবার চেষ্টা করত নিশাকর, কিন্তু নানান অছিলায় সেগুলি সযত্নে এড়িয়ে যেতাম আমি।

নিশাকরের বাবা তার একমাত্র সন্তানের দেশোদ্ধার ও সর্বহারাদের নিয়ে মাতামাতি দেখে যথেষ্ট মজা পেতেন প্রথম-প্রথম। তার পর যখন এক দিন খবর এল—বিষড়ের এক চটকলে ধর্মঘটের ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়েছে তাঁর ছেলে, সেদিন ফোনে কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে অনেক কথা চালাচালি করে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনবার পর রীতিমত গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন অনেক—কিন্তু মাতৃহারা একমাত্র সন্তানকে যথেষ্ট বোঝাবার আগেই হঠাৎ এক দিন তিনি মারা গেলেন হার্টফেল করে।

বাপের মৃত্যুর পর কলেজ ছেড়ে দিল নিশাকর। সামনে পরীক্ষা—সেটা দিতে তাকে অনেক অনুরোধ করলাম আমরা, কিন্তু পরীক্ষা দেবে কি সে—পারসেণ্টেজ দূরে থাক—এক লাইন পড়েনি দু'-বছরের মধ্যে।

আমরা পরীক্ষা দিয়ে উঠতে উঠতে বাপের জমিদারী, মিল-পত্তর—সব বেচে ফেলল নিশাকর, কি এক নূতন ব্যবসা পত্তনের ফিকিরে দিবা-রাত্র ঘুরতে লাগল ওর স্কুলের পুরনো বন্ধু স্বদেশী জেল-খাটা কে এক রামেশ্বরের সঙ্গে। ভাবলাম ভালই হল, রাজনীতির পোকা এত দিনে গিয়েছে বোধ হয় মাথা থেকে। কিন্তু পরে শুনলাম, পিতৃ-সম্পত্তির শেষ পাই-পয়সা দিয়ে নাকি শ্রমিকদের জন্ত ট্রাষ্ট খুলছে একটা—আর সেই জন্যই রামেশ্বরের সঙ্গে ঘোরাঘুরি।

এম-এ পরীক্ষার ফল বার হবার পর হঠাৎ এক দিন রাস্তায় নিশাকরের সঙ্গে দেখা। কখন সে বাড়ি থাকে, এক দিন যাবো আমি—ইত্যাদি বলতে হেসে উত্তর দিল, "বাড়ি বিক্রী করে ফেলেছি—"

বললাম, "সে কি? বাড়িটাও?"

অম্লান বদনে বললে, "হ্যাঁ! যত রাজ্যের আত্মীয়-স্বজন এসে বাড়িটা একেবারে নরক করে তুলেছিল। সম্পর্কের এক পিসীমা—তিনি ত আত্মীয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে তাঁর এক দেওরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে বসলেন আমার! তাই বেচে দিলাম বাড়িটা শেষ পর্যন্ত!"

"ব্যস্! সেই জন্য বাড়ি বেচে দিলে? পিসীমার দেওরঝিকে বিয়ে না করো—বিয়ে ত একটা করবেই। তা একটা করে ফেললেই ত পারতে—আর যাই হোক, উপযুক্ত পাত্রীর অভাব হত না নিশ্চয়ই তোমার!"

"বিয়ে !" আমার কথা শুনে ঠাট্টা করে উঠল নিশাকর, "মাসি-পিসীর চেয়ে তুমিও যে কিছু কম যাও না দেখছি ! বিয়েই যেন জীবনের চরম সার্থকতা !"

"একটা সার্থকতা ত বটেই !" আহত হয়ে বলে উঠলাম।

"যাদের কাছে—তারা একটা কেন দশটা বিয়ে করুক"—ঠোঁট উল্টে বললে নিশাকর, "আমার কাছে নয় তাই একটা কেন সিকিখানাও সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

কথা ঘুরিয়ে ফেললাম, বললাম, "তা আছো কোথায় ?"

"ভোজনং যত্র-তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে—"

"সেটাই বা আপাতত কোথায় ?"

"রামেশ্বরের বাড়িতে—"

"রামেশ্বর ? যার সঙ্গে ট্রাষ্ট পত্তন করেছ ?"

"হ্যাঁ—"

"তা সে ত তোমার মত বাউণ্ডুলে নয় ! বিয়ে-থা করেছে—ব্যবসা-পত্তরও ভালোই করছে—"

"আমার ব্যবসা ত ওরই সঙ্গে। আমি বাউণ্ডুলে বলে ঘুরে বেড়াই—ও সংসারী, তাই ঘরে ব্যবসা দেখে—"

তার পর ব্যস্ত হয়ে চলে গেল নিশাকর। আমার সঙ্গে সেই ওর শেষ দেখা। কপালে কাটা-দাগ তখনো ছিল না ওর—সেটা আরো ছ'-মাস পরের ব্যাপার।

বিদ্যাসাগর কলেজে তখন একটা 'লেকচারি' জুটেছে আমার। ভাইয়ের চাকরির চেষ্টায় এক দিন নিশাকরের সন্ধানে খোঁজ করে রামেশ্বরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম—যদি ওদের ব্যবসার মধ্যে কোনো কাজ করে দিতে পারে নিশাকর।

গিয়ে শুনলাম, নিশাকর আর থাকে না রামেশ্বরের কাছে। কোথায় থাকে জানে না রামেশ্বর। আসেও না আর রামেশ্বরের বাড়িতে। হ্যাঁ, ব্যবসায় এখনো আছে সে রামেশ্বরের সঙ্গে।

গম্ভীর মানুষ রামেশ্বর—বয়সে কিছু বড় আমাদের চেয়ে। বেশি কথা তাকে দিয়ে বলানো গেল না। আন্দাজ করলাম, রাজনৈতিক ব্যাপারে হয়ত গতিবিধি গোপন করে চলছে নিশাকর। তার পর ভাইয়ের চাকরি বাবদ ইউনিভার্সিটির আরেক ধনী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আরেক দিন—বাপের ব্যবসায় জাঁকিয়ে বসেছে সে।

তার সঙ্গে গল্প করতে করতে কথাচ্ছলেই নিশাকরের কথা উঠল। সে বললে, 'নিশাকরের কেলেঙ্কারীর খবর জানো না বুঝি ?'

"কেন ? কি হয়েছে ?" আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"শেষ কবে দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে ?" প্রশ্ন করল বন্ধুটি।

"ছ'-মাস—প্রায় আট মাস আগে—"

"তা হলে তুমি দেখতে পাওনি—এবার দেখা হলে দেখবে এত বড় একটা কাটা-দাগ ওর কপালে। ভাগ্য ভালো দু'-মাস ভুগে সবে ঘা শুকিয়েছে—না হলে মরতে বসেছিল হতভাগা !"

"কি হয়েছিল ?" শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"হবে আর কি ? সেই ইটারনাল স্ত্রীলোক। ওর ব্যবসার পার্টনার—ব্যবসা ত ওরই পয়সায়—আর ওয়ার্কি-পার্টনার যে রামেশ্বর তার বাড়িতেই ত থাকত—তার পর এক দিন রামেশ্বরের বৌয়ের গায়েই নাকি হাত দিয়েছিল নিশাকর। রামেশ্বরের বৌ নাকি

ভয়ানক সুন্দরী কিন্তু তেজী মেয়েও নাকি খুব। ওর কপালে তেলের বোতল ভেঙ্গে নাকি শিক্ষা দিয়েছে ওকে—"

"নিশাকর? বলো কি?" বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ। দেখা হলে জিগ্যেস করো—শুনবে'খন কোথায় পুলিশের লাঠিতে ফেটে গিয়েছিল কপাল। সবাইকে তাই বলছে নিশাকর—"

"হতেও পারে?"

"ছাই! আমার খবর খুব বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া হে! রামেশ্বরের বৌয়ের প্রাণের বন্ধু সম্পর্কে আমার বৌদি হয়—তার কাছেই শোনা—"

ভাইয়ের চাকরির কথা সেরে নিশাকরের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম সেদিন, কিছুতেই যেন নিশাকর সম্বন্ধে বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাটা।

কিন্তু সাত দিন বাদে যে খবর শুনলাম নিশাকর সম্বন্ধে তাতে আর বন্ধুটির কথা অবিশ্বাস করবার উপায় রইল না। এক দিন রাত বারোটায় রামেশ্বর এসে স্বয়ং হাজির আমার বাড়িতে। এসেই প্রশ্ন—নিশাকরের কোনো খবর জানি কি না আমি!

"না, জানি না"—আমি বললাম।

"জানলেও আপনি বলবেন না"—গম্ভীর ভাবে বললে রামেশ্বর, "কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে পুলিশে খবর দিতে চাই না আমি। আপনারা দশ জন বন্ধু আছেন তার—আপনারা চেষ্টা করলে এখনো চেপে দেওয়া যেতে পারে—"

"কিন্তু ব্যাপারটা কি?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"আপনি সত্যি জানেন না, না পরিহাস করছেন?" সন্দিগ্ধ ভাবে বলে উঠল রামেশ্বর।

"না—বিশ্বাস করুন। নিশাকরের সঙ্গে বহু দিন দেখাই হয়নি আমার—"

শুনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল রামেশ্বর—এ-অবস্থায় আমাকে বলা উচিত হবে কি না! তার পর বললে, "বলেই যাই—আজ না হলে কাল ত সব শুনবেনই। আমার স্ত্রী আজ পাঁচ দিন হল নিরুদ্দেশ আর সেটা যে নিশাকরের কাজ খুব ভালোই বুঝতে পারছি আমি। এখনো যদি আমার স্ত্রী ফিরে আসে ত কোনো গোলমাল হবে না আমি কথা দিচ্ছি—যেমন সম্পর্ক ছিল তেমনি থাকবে চলবে। আর না হলে পুলিশে আমি যাবো না বটে—কেন না তাতে কেলেঙ্কারী বাড়বে ছাড়া কমবে না—কিন্তু নিশাকর যেখানে পালিয়ে থাকুক ভারতবর্ষের—দিল্লী, পেশোয়ার যেখানে হোক—আজ হোক আর আজ থেকে দশ বছর পরেই হোক—পয়সা দিয়ে গুণ্ডা লাগিয়ে জীবন আর ওর রাখব না আমি। আমাদের ব্যবসার সমস্ত টাকাও যদি তাতে লাগে, তা হলেও—"

"ভারতবর্ষের বাইরেও ত যেতে পারে"—খবরের প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে উঠে আমি বললাম।

"না, ভারতবর্ষের বাইরে চট করে যেতে পারবে না—অত পয়সা কোথায় ওর কাছে—তা ছাড়া ওর যা পুলিশ-রিপোর্ট তাতে পাশপোর্ট পাওয়া অত সোজা হবে না। আপনার সঙ্গে দেখা হলে এই কথাগুলি ওকে বলে দেবেন। বলবেন, ওর সর্বস্ব এখন আমার হাতের ব্যবসায়—এমন করে নিজের ও পরের সর্বনাশ ও যেন না করে!"

রামেশ্বর চলে গেল। তার কথা নিশাকরকে পৌঁছে দেবার কিম্বা তাঁর বৌকে নিয়ে সত্যিই নিশাকর পালিয়েছে কি না জানবার কৌতূহল মেটাবার সুযোগ আর আমার হয়নি। নিশাকরের কপালের কাটা-দাগ দেখবারও নয়। তার পর গত পনেরো বছরে নিশাকরের সঙ্গে সে কৌতূহলও বিস্মৃতির কোন অতলে কবে চাপা পড়ে গিয়েছে আমার মনে। ইতিমধ্যে কলেজের গণ্ডী ছাড়িয়ে ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হয়েছি আমি। রামেশ্বরের খবর প্রায়শই পাই খবরের কাগজে। শ্রমিকদের জন্য সে ট্রাষ্ট আর হয়নি শেষ পর্যন্ত কিন্তু দিগ্বিজয়ী ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে রামেশ্বর—বিলেত-আমেরিকা করে বেড়াচ্ছে। বিয়ে সে আর করেনি, তবে জনশ্রুতি—লেকে বিরাট এক অট্টালিকা করে দিয়েছে এক রক্ষিতাকে। রামেশ্বরের খবরের সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায়-গোড়ায় নিশাকরের কথা মনে পড়ে যেত আমার। তার পর তাও না।

ঠং ঠং করে ঘণ্টা পড়ল। ট্রেন আসতে আর দেরি নেই। আমার পাশের লোকটি—হয়ত সে নিশাকরই—হঠাৎ জড় থেকে জীবন্ত হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল টিকিট-ঘরের দিকে। ফিরে এল একটু পরেই, এসে বললে, "কি মুস্কিল বলুন ত! নোটের চেঞ্জ নেই এদের কাছে। খুচরো টাকা হবে দুটো আপনার কাছে—সামনের জংশনেই ভাঙ্গিয়ে দিয়ে দেব—"

দুটো টাকা বার করে দিলাম কিম্বা হয়ত না দিয়ে পারলাম না। টাকা নিয়ে চলে যেতেই উঠে পড়লাম বেঞ্চি থেকে—সরে গেলাম ষ্টেশনের অন্য প্রান্তে। এখানে কি পরের জংশনে, নিশাকর বা যেই হোক—ওর সঙ্গে আর দেখা করতে চাই না আমি।

কিন্তু সরে আসবার বুঝি দরকার ছিল না কোনো। ট্রেন এসে পড়তে দূর থেকে তার উজ্জ্বল স্পটে আলোকিত ষ্টেশনের কোথাও দেখতে পেলাম না আর নিশাকরকে।

টিকেট-ঘরের দিকে এগোতেই ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হল। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে, "আরেক জন যাত্রী ছিলেন—তিনি কোথায় গেলেন?"

"আর যাত্রী ত কেউ নেই!" বিস্মিত কণ্ঠে বললেন ষ্টেশন-মাষ্টার, তার পর ব্যাপারটা যেন হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম হল তাঁর, "ওঃ, প্রফুল্ল পাগলার কথা বলছেন! ও রোজ আসে কলকাতা যাবে বলে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া আর হয় না ওর। কিছু নিয়ে গেছে নাকি আপনার?"

অবাক হয়ে বললাম, "তার মানে?"

"এই টিকিটের জন্য টাকাকড়ি! তা কত বার ভেবেছি ওকে ষ্টেশনে ঢুকতে দেব না আর, কিন্তু এসে এমন কান্নাকাটি করে যে না বলতে পারি না। মায়াও হয়—আগে দিব্য ভদ্রলোক ছিল—বৌ পালিয়ে যাবার পর থেকে নাকি এমন হয়ে গিয়েছে—"

"বৌ পালিয়েছে?"

"হ্যাঁ—তা আজ নাকি সাত বছর হল। আমার এখানে আসবার অনেক আগের ঘটনা। ভারী সুন্দরী বৌ ছিল বলে শুনেছি। পালিয়ে গিয়ে নাকি কলকাতায় বড়লোক রামেশ্বর চৌধুরীর রক্ষিতা হয়েছে—বাড়ি-গাড়ি কত কি হয়েছে তার! দোষও নেই, যা কষ্টে ছিল বলে শুনেছি। আর ও হতভাগাও সেই থেকে মাথা-খারাপ। বৌ খুঁজতে রোজ কলকাতায় যাচ্ছে—"

আরো কি যেন বললেন ষ্টেশন-মাষ্টার। কিন্তু তেড়ে-আসা ইঞ্জিনের আওয়াজে শুনতে পেলাম না।

শোনবার আর ছিলই বা কি?

ওয়াল্ট ডিস্‌নে

শ্রীঅনাদি মণ্ডল

যদি জিগ্যেস করি তোমাদের, মিকি মাউসের ছবি কে দেখনি হাত তোল ত? তা হোলে নিশ্চয়ই আমার জিগ্যেস করাই সার হবে, একটি হাতও উঁচুতে উঠবে না। শুধু তাই নয়, তোমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছো যারা মনে কর, ছবি মানেই হোল মিকি মাউস। এর কারণ হোলএই যে, ইংরিজীতে তৈরী হোলেও ইংরিজী-অজানা দর্শকদের বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয় না এই ছায়াছবি। সমগ্র বিশ্বের সব চেয়ে বেশী সংখ্যক ছেলে-মেয়ে যে ছায়াছবি দেখে এবং আগামী কালে দেখবে, তা হোল মিকি মাউসের কার্টুন।

এমন যে মিকি মাউস, তার স্রষ্টা হোলেন ওয়াল্ট ডিস্‌নে। বছর পঁচিশ আগে আমেরিকার ক্যান্‌সাস সহরে যদি জিগ্যেস করা হোত কোন পথচারীকে—হ্যাঁ মশাই, শুনেছি ওয়াল্ট ডিস্‌নের বাড়ী কাছাকাছি কোথাও, বলতে পারেন কোন্ জায়গাটায়? সঙ্গে-সঙ্গে বিরক্তির সঙ্গে উত্তর পাওয়া যেত—'না মশাই, জানি না। ওয়াল্ট ডিস্‌নে কী এমন হরিদাস রামদাস যে, তার বাড়ীটাও আমাদের চিনে রাখতে হবে? যত সব—'

ডিস্‌নের বাড়ী এই ক্যান্‌সাস সহরে।

আজ কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা বা এস্কিমোদের দেশেও জিগ্যেস করলে জানা যাবে—'ওঃ, ওয়াল্ট ডিস্‌নে? তাঁর ঠিকানা হোল R. K. O. Radio pictures, Hollywood.

অর্থাৎ, এক জন অতি সাধারণ অনামী ভদ্রলোক আজ সব চেয়ে জানা লোক হয়ে পড়েছেন। বৃটেনে তো বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের নামের তালিকায় ডিস্‌নের নাম উঠে গেছে ফটো ও জীবনী সহ।

মিকি মাউসের ছবি দেখা মজার। তাই না? তবে ওয়াল্ট ডিস্‌নের জীবন-কথা আরও মজার। শোন বলছি।

খুব ছোটবেলা থেকেই ডিস্‌নের ছবি আঁকার সখ। ড্রইং খাতা, হাতে লেখা খাতা, এমন কি অংকের খাতা পর্য্যন্ত ভরে উঠত বাঘ আর মাষ্টার মশাইএর অক্ষম মুখাবয়বে। পড়া-শুনা চুলোয় গেল, খালি ছবি, ছবি আর ছবি! ক্রমে সখ হোয়ে উঠল সাধনা। এক দিন ড্রইং খাতাটা বগলে করে ডিস্‌নে চললেন সহরের 'ক্যান্‌সাস সিটি ষ্টার' বলে এক পত্রিকা-অফিসে।

সম্পাদক মশাই ঠোঁটে চুরুট চেপে খাতার পাতাগুলো উল্টে গেলেন। চশমার ফাঁক দিয়ে ডিস্‌নের চেহারাটাও একবার লক্ষ্য করে নিলেন। তরুণ ডিস্‌নে সাহসে ভর করে বললেন—'কী স্যর, চলবে তো?'

সম্পাদক মশাই লম্বা এক নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—'দেখ ছোকরা, বাঁদরের লেজ আর মানুষের প্রতিভা 'গড' না দিলে পাওয়া যায় না। আমি সত্যি কথা বলতে দুঃখ পাচ্ছি কিন্তু বলব—'গড' তোমায় কৃপা করেননি।'

চোখের জল চেপে ডিস্‌নে পালিয়ে এলেন বাড়ীতে।

কিন্তু বাধা পেয়ে থেমে যাবার বান্দা ডিস্‌নে নন। বহু কষ্টে এক স্থানীয় গীর্জ্জের ছবি আঁকার কাজ তিনি পেলেন। ঘর ভাড়া করার মতো সামর্থ্য না থাকায় বাপের গাড়ী-বারান্দায় বসালেন ষ্টুডিও।

কাঠ-কুটো, ক্যানভাস, গ্রীজ আর গ্যাসোলিনের গুরু গন্ধের মধ্যে কাজ করতে খুব কষ্ট হোত ডিস্‌নের। মাঝে-মাঝে খুব বিরক্তি বোধ করতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তখন কি জানতেন, এইখানেই তিনি লক্ষ্মীর সন্ধান পাবেন!···ভাবী কালে হবেন লক্ষ্মীর বরপুত্র!

ঘরে কাজ করছেন আপন মনে, এমন সময় একটা খড়খড় শব্দে ঘুরে দেখেন একটা ইঁদুর দৌড়োদৌড়ি করছে। হ্যাঁ, একটা মাঝারী সাইজের ইঁদুর। কি খেয়াল গেল, ঘর থেকে খাবার নিয়ে এসে ইঁদুরটাকে খাওয়াতে লেগে গেলেন তিনি। ক্রমে ইঁদুরটারও ভয় কেটে গিয়ে ডিস্‌নের কাঁধে, গায়ে এমন কি ড্রইং-বোর্ডে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দেখে-দেখে ডিস্‌নের মাথায় এক আজব কল্পনার উদয় হোল।

তখন জীব-জন্তুর কার্টুন কিছু-কিছু বেরুতে আরম্ভ করেছে। ডিস্‌নে ভাবলেন, এই ইঁদুরটাকে ব্যবহার করলে কেমন হয়? একটা ইঁদুর আর তাঁর কাছে ইঁদুর মাত্র নয়। এ হোল শিশু-জগতের মনোরঞ্জনকারী যন্ত্র, আর ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি।

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ব্যাপারই আলাদা। তোমরা ইঁদুর দেখছ তো যত্র-তত্র, কই, এমন চিন্তা কী কখনও জেগেছে তোমাদের? কেটলিতে জল ফুটলে ঢাকনা-সব সময়ই ঢর্-ঢর করে নড়ে, তাই বলে জেমস্ ওয়াটের মতো কে ভেবেছ যে এই ভাবে ট্রেন তৈরী হতে পারে!

যাক, ডিস্‌নে হলিউডে গিয়ে একটা সিনেমা কোম্পানীর হয়ে কয়েকটা কার্টুন তৈরী করলেন, নাম দিলেন 'অসওয়াল্ড দি র‍্যাবিট'। কিন্তু সুবিধে হোল না বিশেষ। উপরন্তু ক্ষতি হোল বেশ কিছু। ডিস্‌নে পথে বসলেন।

তবু বসে পড়বার পাত্তর নন ডিস্‌নে। 'একবারে না পারিলে দেখ শত বার'—এই হোল তাঁর মূলমন্ত্র। তাঁর দিবা-রাত্রির চিন্তা হোল

কেমন করে তিনি সাফল্য লাভ করতে পারবেন। কচি বয়সে তিনি মা'র কাছে তিন শূয়োর আর বাঘের গল্প শুনেছিলেন। ভাবলেন, সেই গল্পটা কাজে লাগালে কেমন হয়? ডিস্‌নে তাঁর সহকারীদের মনের কথা জানালেন। সহকারীরা মাথা নেড়ে বলল—'ধ্যুৎ, এ আবার একটা গল্প না কী?'

ডিস্‌নে নাছোড়বান্দা। তাঁর স্থির বিশ্বাস, এ গল্প মার খাবার নয়। সহকারীদের আবার অনুরোধ করলেন—'দেখ না একবার চেষ্টা করে।'

সহকারীরা বিরক্ত মনে কাজে লাগলেন। সাধারণত মিকি মাউসের কাজে তিন মাস সময় লাগে। কিন্তু এ বেগার-ঠেলার কাজ দু'-মাসেই শেষ হয়ে গেল। ষ্টুডিও-ঘরের কেউ ভাবেননি যে ছবিটা কোন কাজের হবে। কিন্তু সারা দেশে তুফান উঠল এ নিয়ে।

ছেলে-মেয়েরা এমন ছবি পূর্ব্বে দেখেনি। তাই তারা হাজারে-হাজারে ভিড় করল সিনেমা-ঘরে। রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে গেল দেশে।

এর কিছু দিন পরে ডিস্‌নে 'স্নো হোয়াইট এণ্ড সেভেন্ ডোয়ার্ফ্‌স্' সৃষ্টি করলেন। এতে শুধু ছেলে-মেয়েরা নয়, ছেলে-মেয়েদের বাপ-মা'রাও ভিড় জমাল। এটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনপ্রিয় ছবি।

তোমরা হয়ত প্রশ্ন করবে, ডিস্‌নে ছবিগুলো কি ভাবে তৈরী করেন? অনেক সহকারী আছে ডিস্‌নের, কিন্তু সমস্ত কাজই প্রায় তিনি করে থাকেন নিজে। পর্দ্দার উপর ছবি আঁকতে হয় বিস্তর। সেগুলো বিশেষ ভাবে ডিস্‌নের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী তৈরী হয়। গল্প, ছবি, তার পরিকল্পনা—সমস্ত আসে ডিস্‌নের মাথা থেকে। সময় পেলেই ডিস্‌নে ছুটে যান জু গার্ডেনে, সেখানের বিচিত্র জীবজন্তু ও পক্ষীদের তিনি লক্ষ্য করেন গভীর মনোযোগের সহিত। কারণ এদেরই তিনি রূপায়িত করেন ফিল্মের মধ্যে। ফলে ডিস্‌নের একটা ছবি মানে তাঁর স্বপ্নের নিখুঁত প্রতিরূপ।

ডিস্‌নে ছবি করেছেন প্রায় শ'খানেক আর তার থেকে অর্থ পেয়েছেন অগুণতি। কিন্তু একটি পয়সাও জমিয়ে গায়ে শেওলা ধরার অবসর দেননি তিনি। নিত্য-নূতন পরিকল্পনায় মন তাঁর নিয়োজিত—Moneyও।

এমন কাজ-পাগল লোক দুনিয়ায় খুব কম।

গল্প হলেও সত্যি

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বিশাল ভারতের নানা তীর্থের মধ্যে কাশীও একটি তীর্থ, সে যুগে কাশী ছিল সমস্ত পণ্ডিতের মিলন-তীর্থ। ভারতের অন্য অন্য প্রদেশের প্রতিষ্ঠাবান জ্ঞানী ও সুধীরা শেষজীবনে সংসারের মায়াজাল কাটিয়ে কাশীধামে গিয়ে বাস করতেন এবং বিশ্বনাথের রাজ্যেই দেহত্যাগ করতেন। নানা দেশের নানা পণ্ডিতেরা আবার পরস্পর নানা বিষয়ে আলোচনা করেও প্রভূত আনন্দ পেতেন।—স্বামী ভাস্করানন্দ ছিলেন একজন নাম-করা সন্ন্যাসী, বহু বড়-বড় লোকে তাঁর প্রতি আস্থাবান ছিলেন ও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। স্বামীজী কাশীধামেই বাস করতেন।

সুদূর বাংলা দেশ থেকে একটি যুবক কাশীতে বেড়াতে গেছেন। যুবকটি গ্র্যাজুয়েট এবং আইনও পড়ছিলেন বটে, তবে অর্থাভাবে আইন পড়া তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল। এই যুবকটির অনেক দিন ধরেই ভাস্করানন্দজীর সঙ্গে আলাপ করার বাসনা ছিল। তাই এক দিন যুবকটি ভাস্করানন্দজীর কাশীর আশ্রমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে। যুবকটি প্রণাম করলে স্বামীজীও যথারীতি অভ্যর্থনা জানালেন, তার পর এ-কথা সে-কথার পর তার (যুবকটির) গুরুর নাম জিজ্ঞাসা করলেন। যুবকটিও নাম বললেন।

ভাস্করানন্দ বাঙালী জাতির উপর কি জানি কেন একটু অপ্রসন্ন ছিলেন। যখনই শুনলেন যে, ঐ বাঙালী যুবকটির গুরুও বাঙালী, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বাঙালী জাতির উপর ঘৃণাও পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। তিনি ব্যঙ্গমিশ্রিত ভাষায় বললেন, "তুম বাংগালী···কো চেলা হো!"

বাস্! আর যুবকটি সহ্য করতে পারলে না। ভাস্করানন্দের সমস্ত মহত্ত্ব সমস্ত প্রতিভা তার কাছে চাপা পড়ে গেল। ভাস্করানন্দ তার গুরুনিন্দা করেছেন, 'জাত তুলে কথা বলেছেন' এই কথাই বার বার তার মনে উদয় হতে লাগল। সে আর ভাস্করানন্দকে মানতে পারল না, সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁর (ভাস্করানন্দ) আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়ল আর যাবার সময় বলে গেল, "আপনি যত বড়ই সাধু হন না কেন, এখনো আপনি প্রাদেশিকতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি, আপনাকে তো উদার বলা যায় না, কোথায় আপনার ঔদার্য্য?"

কে জান এই সাহসী, গুরুভক্ত তরুণটি? ইনিই ঠাকুর পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সুযোগ্যতম শিষ্য জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দ।

শিশু-সাহিত্যে নজরুল

শ্রীআজহারউদ্দিন খান

রবীন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী—গানে, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে-নাটকে, প্রবন্ধে, এক কথায় সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে তিনি নিজের প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। এ হেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে দেখা সময়সাপেক্ষ ও প্রয়াসসাধ্য। এখানে শুধু বাংলা শিশু-সাহিত্যে নজরুল-প্রতিভার কি দান, শিশুগণকে তিনি কি ভাবে দেখেছেন এবং তাঁর হৃদয়ের কোন স্তরে শিশু স্থান পেয়েছে, শুধু এরই খানিকটা আভাস আমি এখানে দিতে চেষ্টা করবো। শিশু-সাহিত্যে নজরুলের জ্ঞানের পরিমাণ খুব বেশী না হলেও সাহিত্যের এই বিভাগটিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য কম নয়। বইয়ের সংখ্যা গণনায় নজরুলের রচনা একান্ত ভাবেই নগণ্য, মাত্র তিন-খানি আর সাময়িক পত্রিকায় কিছু রচনা ছড়িয়ে আছে, কিছু তাঁর বিভিন্ন কবিতার বই খুঁজলে পাওয়া যাবে। যিনি শিশু-সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যে ভরে দিতে পারতেন, তাঁর হাত থেকে আমরা পেয়েছি মুষ্টিভিক্ষা কিন্তু সাহিত্য-কর্ম্মে যে রসের মূল্য সব চেয়ে বেশী তার মাপকাঠিতে তাঁর সে-মুষ্টি স্বর্ণ-মুষ্টি। কারণ বলতে লজ্জা নেই, ইদানীং যাঁরা শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, সে-সাহিত্য শিশুদের উপযোগী নয়। চমক লাগানো প্রচ্ছদপট, উত্তেজনাপূর্ণ অধম জাতের সস্তা ডিটেকটিভ রোমাঞ্চকাহিনীর বাজে ও সুলভ

সংস্করণের প্লাবনে সে-সাহিত্য প্লাবিত ; এতে শিশু-মন সুন্দর ও রুচিপূর্ণ ভাবে গঠিত হয় না ; বরং বলা যায়, নির্মল শিশু-মনগুলোকে নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলছেন। শিশু-সাহিত্যে নজরুলের বৈশিষ্ট্য বোঝবার আগে বাংলা শিশু-সাহিত্যের ইতিহাস একটু জেনে নেওয়া দরকার।

যাদের লক্ষ্য করে দুনিয়া চলবে, তাদেরকে নিয়ে পৃথক্ করে সাহিত্যরচনার প্রয়োজন বাঙালী লেখকরা বিগত শতাব্দীতে অনুভব করেননি। ছেলে-মেয়েদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যেই বুড়োদের সঙ্গে তাদেরকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ; গদ্যে-পদ্যে উপদেশপূর্ণ পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মনোমোহন বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সেই এক সুর গেয়ে গেছেন। আনন্দ ও কৌতুকের সাহায্যে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন সেদিন তাঁরা অনুভব করেননি। কলমের লাঙলে শিশুদের মনের মাটি চষে ভাব ও ভাবনার ফসল উৎপাদন করলেন রবীন্দ্র যুগের লেখকরা। তাঁরাই উপলব্ধি করলেন, আজকের যারা শিশু, কাল তারাই হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। তাই স্ফুটনোন্মুখ কিশোর, বালক, শিশুদলের জীবনকে গড়ে তোলার জন্যে পৃথক্ সাহিত্যের প্রয়োজন। তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রীতিমত পরিকল্পনা গ্রহণ করে সমাজকে এগোতে হবে, জাতির চলমান ধারাকে সজীব রাখতে হলে এ করা ছাড়া নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এ পথে পূর্ণতর শক্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কবিগুরুর আগে উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সুকুমার রায়চৌধুরী এগোলেও তাঁরা অকুলীন বলে ত্যজ্য ছিলেন, কারণ শিশুদের জন্যে তখন যাঁরা লিখতেন তাঁদের প্রতি আমাদের কেমন যেন একটা ঘৃণার ভাব ছিল। যখন রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্যে কলম ধরলেন তখন আমাদের নাসিকাকুঞ্চনের মনোবৃত্তি কিছুটা হ্রাস পেল। শিশুদের সাহিত্যকে আমরা কৌলীন্যের কোঠায় তুললুম, রবীন্দ্রনাথকে দেখে আমরা শিশু-সাহিত্যিকদের মালা দিয়ে বরণ করে নিলুম। এই ভাবে শিশু-হৃদয়ের নিভৃততম কথার অভিব্যক্তি বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ হয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর,' 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' প্রভৃতি এই প্রয়াসের নিদর্শন। শিশু-চিত্তের নির্লিপ্ততা, অপার রহস্য সঞ্চার, সুদূরের জন্যে তার আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতি এবং রূপকথার সঙ্গে তার সংযোগ রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক মনোবৃত্তিতে স্নেহশীল প্রবীণের চোখ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টি থাকার জন্যে আমরা দেখতে পাই, যেখানে শিশু সামান্য জিনিষ চাইছে সেখানেও শিশুচিত্ত অসীমের আকাঙ্ক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথের শিশু-বিষয়ক কবিতাবলী সবগুলি শিশুদের বোধগম্য নয়, যদিও শিশুই সব কবিতার বিষয়—কতকগুলি কবিতা এমন দার্শনিক তত্ত্বে ঠাসা যে, এর অর্থ গ্রহণ শিশু কেন, শিশুর ঠাকুর্দাকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ-স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলাসি।—(জন্মকথা : শিশু)

অথবা—

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
যাব মা, তোর বুকে বয়ে
ধরতে আমায় পারবি নে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব মা, ঢেউ
জানতে আমায় পারবে না কেউ,
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।
... ...
পূজোর কাপড় হাতে করে
মাসি যদি শুধায় তোরে,
"খোকা তোমার কোথায় গেল চলে।"
বলিস—খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।—(বিদায় : শিশু)

কিংবা—

বৃষ্টি কোথায় লুকিয়ে বেড়ায়
উড়ো মেঘের দল হয়ে
সেই দেখা দেয় আর এক ধারায়
শ্রাবণ ধারার জল হয়ে।
আমি ভাবি চুপটি করে
মোর দশা হয় ঐ যদি।
কেই বা জানে আমিই আবার
আর একজনও হই যদি!
... ...
আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
দুই রকমের দুই খেলা,
একটা সে ঐ আকাশ-ওড়া,
আরেকটা এই ভুঁই-খেলা।
—(দুই আমি : শিশু ভোলানাথ)

এ সব কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব, পরিণত মনের চিন্তা ও উপলব্ধির ছাপ হৃদয়ঙ্গম করা অপরিণত-দৃষ্টি ছেলে-মেয়ের নাগালের বাইরে। যেখানে কবি শিশুদেরকে আনন্দ দেবার জন্যে যেমন'রবিবার', 'তাল-গাছ', 'মূর্খ', 'নদী' 'কাগজের নৌকা', 'বীরপুরুষ', 'খোকার বনবাস', 'ছড়ার ছবি'র কতকগুলো কবিতা, 'খাপছাড়া'র অনেক ছড়া, 'সে' বইয়ের 'গেছো বাবার কাহিনী', 'হাচিয়ান্দিয়ানি কুরুকুণা'র গল্প ইত্যাদি লিখেছেন, সেখানে শিশুরা অপ্রবুদ্ধ ভাবে কতকটা আনন্দ উপভোগ করে আর যেখানে কবি নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন আর আবেদন উঁচু গ্রামে বাঁধা, সেখানে শিশুর মন সাড়া দেয় না। তাই রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যকে ঠিক শিশুদের সাহিত্য বলা চলে না। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ শিশুদের সহজ কথায় ভোলাতে চেয়েছেন, শিশুদের প্রতি তাঁর সত্যিকারের দরদ ছিল, কিন্তু প্রতিভার প্রজ্ঞাশীলতার জন্যে তিনি তা সব সময় পারেননি। তাঁর অজান্তেই তাঁর শিশুসাহিত্য বড়দের সাহিত্য হয়ে পড়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথের দোষ নেই, যদি কেউ ধরেন তাহলে তাঁর প্রতিভার প্রতি তিনি অবিচারই করবেন।

নজরুল রবীন্দ্রনাথের মত তত্ত্বের গহন অরণ্যে প্রবেশ করে

শিশুতত্ত্ব আবিষ্কার করেননি। সাদা কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের শিশু যেমন রবীন্দ্রনাথ নিজেই, তেমনি নজরুলের শিশু নজরুল নিজেই। রবীন্দ্রনাথ যাকে স্নেহশীল প্রবীণের চোখ দিয়ে দেখেছেন, তাকে রূপায়িত করেছেন প্রবীণদের উপভোগ্য করেই। আর নজরুল শিশুর রকমারী কল্পনা, অবুঝ অনুভূতিগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে পরিবেশন করেছেন—যেগুলি শিশুদের বোধগম্য অথচ বয়স্ক পাঠকরা পড়ে কবির উচ্ছল যৌবন-ধারার পরিচয় পান। নজরুল আগাগোড়া চড়া গলার কবি বলেই শিশুদের কবিতার মধ্যেও তাঁর যৌবনের অস্থির মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে; তাই তাঁর শিশুবিষয়ক রচনাগুলি বয়স্কদেরকেও আনন্দ দেয়। তাছাড়া 'সে', 'মকুই', 'ছড়ার ছবি', 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প', 'ছেলেবেলা' সবই রবীন্দ্রনাথের পরিণত বার্দ্ধক্যের সময় রচিত। এগুলিতে প্রায় সর্বত্র তরল শব্দের আশ্রয় নিয়েও তিনি পরিণত মনের গভীরতা ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। আর নজরুলের শিশু-সাহিত্য সেই সময়কার রচনা—যে সময় নজরুল-প্রতিভা অন্তর্মুখী হয়নি; তাই সেই সময়কার রচনায় শিশু-মনের চঞ্চলতা, তরুণ-মনের উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে—যা শিশুদের মন সহজেই জয় করে নিতে পারে। তিনি রচনার মধ্যে বয়সকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন—এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

শিশুকে কেন্দ্র করে নজরুল যত কবিতা লিখেছেন তাদের উৎস হচ্ছে শিশুর প্রতি তাঁর হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা। শিশু সম্বন্ধে প্রত্যেকটি কথা যেন গভীর অনুরাগে রঞ্জিত, যেন শিশুর প্রাণের সঙ্গে তাঁর আজন্ম নাড়ীর সম্বন্ধ! এর কারণ খুঁজে দেখলে দেখা যাবে যে, তিনি শিশুর প্রাণ নিয়ে শিশুর প্রাণে প্রবেশ করেছেন। প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনায়, শিশুর সারল্যে তিনি ছোট-বড়-নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিশেছেন, নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার চেষ্টা করেননি কখনও, সৃষ্টির আভিজাত্য সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন ছিলেন না, কোন কূটবুদ্ধি তাঁকে কখনও আশ্রয় করেনি। তাঁর শিশু-সাহিত্য পড়ে আমার এই কথাই মনে হয় যে, তাঁর মানসিক পরিবেশে একটি সরল নিরভিমান সজ্ঞান শিশু ছিল বলেই শিশুর সরল সহজ মনের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি। বড়দের জন্যে নজরুল যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাতে যেমন অনেক ছেলেখেলার রূপ আছে, বিদ্রোহী জীবনদর্শনের পরিচয় আছে, তেমনি শিশুদের রচনার মধ্যেও তাঁর সেই বিভিন্ন রূপের প্রকাশ দেখতে পাই। অথচ আশ্চর্যের কথা, বড় ও ছোটদের মধ্যে কোথাও গোঁজামিলের চেষ্টা করেননি। বড়দের জন্যে তিনি বড়দের উপযোগী করে লিখেছেন আবার শিশুদের জন্যে শিশুদের উপযোগী করে লিখেছেন, তার সুর যেমন মধুর তেমনি মোলায়েম, কোথাও কোন খোঁচ নেই, শিশুর রসবোধ যাতে ব্যাহত হবে। বাংলা শিশু-সাহিত্যে নজরুলের বৈশিষ্ট্য ওইখানেই।

এইটুকুই তাঁর প্রতিভার সমগ্র পরিচয় নয়; শিশু-সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে দু'টো মত দেখা দিয়েছে। এক দল বলছেন, শিশু-মনের কাঁচা মাটি অতি সহজেই রূপ গ্রহণ করে বলে তাদের জন্যে কোন পেটেন্ট ছাঁচ পরিবেশনের বিপদ অনেক, তাই ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনায় কোন বিশিষ্ট আদর্শের সন্ধান, কোন বাঁধা-ধরা পথ দেখিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এই জন্যে শিশু-সাহিত্যে কল্পনাকে মুক্ত পক্ষে আকাশবিহারের সুযোগ দিতে হবে, কারণ কল্পনা-শক্তির বিকাশ মনের বিকাশের সব চেয়ে বেশি সহায়ক। এ মতের বিরোধিতা করে আর এক দল বলছেন, আজকের দিনের রূঢ় বাস্তবের আঘাতে জর্জরিত সমাজে আর নিছক কল্পনার মানস-বিলাস সম্ভব নয়, বাস্তব জীবনের কঠিন সংঘাতে নীল পাখীর স্বপ্ন দেখা পরিহাসেরই নামান্তর। কি কারণে সমাজ আজ ভাঙনের মুখে, মুষ্টিমেয় কয়েক জন পায়ের ওপর পা দিয়ে জীবন কাটাবে আর অধিকাংশ ডাষ্টবিনে ধুঁকে-ধুঁকে মরবে, মুষ্টিমেয়র কপালে সুখ, অধিকাংশের কপালে দুঃখ—ভগবানের রাজ্যে এ বিভেদ কেন, জীবনের দুঃখ, দুঃখের মূল ও দুঃখের প্রতীকার—এ সবই তাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, সোজাসুজি ভাবে চিনিয়ে দিতে হবে প্রকৃত কল্যাণের পথ। ছেলেবেলা থেকে সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে কল্যাণের পথে তারা ছুটবে, মন উদ্বুদ্ধ হবে কল্যাণের আদর্শে। নজরুলের শিশু-বিষয়ক রচনাবলিতে এই দু'-দলের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এক দিকে যেমন কল্পনাকে শিশু-মনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে মনে করেছেন, আবার অন্য দিকে আনন্দ দেবার নামে অবাস্তব উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে সব সময়েই বাস্তবের রকমারি ভালো-মন্দ ফসল কুড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের জীবনকে বৃহত্তর কিছুর দিকে এগিয়ে দিয়েছেন, তাদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, সত্যকে উপলব্ধি করার ইঙ্গিত দিয়েছেন, আর উদারতা, সাহস এবং সহজ অথচ বলিষ্ঠ জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করেছেন। বড়দের সাহিত্যের মত শিশু-সাহিত্যেও এই ধরণের ওজোগুণসম্পন্ন কবিতার ভিৎ পত্তন করেন নজরুল। বাংলা কাহিনী-কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও পথের ইঙ্গিতও রয়েছে এ সব কবিতার মধ্যে। বর্ত্তমানে বয়স্কদের মত শিশু-সাহিত্যের মধ্যে সমাজের ক্লেদ, মালিন্য প্রভৃতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে শিশু-মনকে উদ্বুদ্ধ করার যে প্রয়াস চলেছে তার থেকেই বোঝা যায়, নজরুলের লেখার প্রভাব আমাদের শিশু-সাহিত্যের ওপর কতটা পড়েছিল।

ছেলে-মেয়েদের অভিনয়োপযোগী 'পুতুলের বিয়ে' নামক নাটিকায় কমলির চীনে পুতুল ডালিমকুমারের সঙ্গে ইলির মেম পুতুল ও বেগমের জাপানী পুতুলের বিবাহ ব্যাপারটিকে নানা ঘটনার সমাবেশে এমন ভাবে রচনা করা হয়েছে, যেটি শিশুদের কল্পনাশক্তির স্ফূর্ত্তি ও পূর্ত্তি ঘটাবার পক্ষে সহায়ক। যতটা সম্ভব নিছক কল্পনাকে বাদ দিয়ে বাস্তব ঘটনাকে বজায় রাখা যায় নজরুল সর্বত্রই তারই চেষ্টা করেছেন। এই নাটিকায় নামতা পাঠ কবিতাটি তার উদাহরণ। ছোটবেলায় ছেলেদের নামতা পাঠে ভুল হলে অভিভাবকরা মার-ধোর করেন। এর থেকে শিশুর মনে জেগেছে—

আমি যদি বাবা হতুম, বাবা হতো খোকা,
না হলে তার নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা।

[ক্রমশঃ।

কালো কোকিল

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

কোকিলের কথা মনেতে এলেই মনটা একটা দারুণ ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে না? দেখ, কী মিষ্টি তার সুর অথচ কী কদর্য্য তার চেহারা, উপরন্তু নিজের মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত

ভগবান দেয়নি তাকে। ডিম পাড়বে তাও কাকের বাসায়। কেন রে বাপু? যার গানের সুর জগতের শ্রেষ্ঠ ভাবুক আর কবিদের পাগল করে তোলে, ঋতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋতু যার নিত্য সহচর, তার সুন্দর হওয়াই তো বাঞ্চনীয়। কোকিল নিজে হবে সুন্দর, তার বাসা হবে আরও সুন্দর এইটেই ত স্বাভাবিক, কিন্তু তা করেননি বিধাতা, তাই মনে হয়, বিধাতার এই সৃষ্টির মাঝেই একটা কিছু গোলমাল রয়ে গিয়েছে, তা নইলে কোন্ দুঃখে তিনি এ রকম একটা বেখাপ্পা সৃষ্টি কোরতে যাবেন?

নিশ্চয়ই আছে। আমি জানি। আর কেউ জানে না। এখন শোন সেই কাহিনী। চুপি-চুপি তোমাদের কেবল ব'লে রাখি। যাতে ক'রে তোমরা অপরকে এই প্রশ্ন করে এর উত্তর দিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারো।

সে অনেক দিনের কথা, ইতিহাস তার কোনও খোঁজ রাখে না, পুরাণেও তার কোন খবর পাবে না, কেবল আমি জানি। কেমন ক'রে, তা নাই বা জানলে? তোমাদের বলছি এইটেই ত তার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের আর দরকার কি? সে অনেক দিনের কথা। ভগবান তাঁর জগৎ সৃষ্টি করেছেন আর তাঁর এই জগৎকে উপভোগ করবার জন্য সৃষ্টি করছেন যক্ষ, রক্ষ, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ও মানুষকে। এ ছাড়া তিনি আর একটা জাত সৃষ্টি করেছিলেন নাম তার কিন্নর, তারা চেহারায় ঠিক মানুষের মতন দেখতে। কিন্তু আরও সুন্দর, আরও সুদর্শন, কেবল প্রভেদের মধ্যে তাদের পিঠে ছিল দুটো চমৎকার পাখা, মস্ত ঈগল পাখীর মত। তার উপর ভর ক'রে তারা আকাশের উপর উড়ে বেড়াতো। আর মাঝে-মাঝে এই পৃথিবীর উপর নেমে আসতো কোথা থেকে কে জানে! আবার খেয়াল মত নীল আকাশের সাথে মিশে যেতো এই পাখা দুটির উপর ভর ক'রে। তাদের আর একটা গুণ ছিল। পৃথিবীতে তাদের মত সুকণ্ঠ বুঝি আর কেউ ছিল না। সোনালী পাখার উপর ভর ক'রে গোধূলির ম্লান আলোতে, অস্তরবির শেষ স্নিগ্ধ আলোটুকু অঙ্গে মেখে এই কিন্নরের দল যখন গান গাইতে-গাইতে আকাশে ভেসে বেড়াতো, তখন পৃথিবীর সব লোক বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকতো সেই সঞ্চরমান গায়কের দিকে। দেখা যেতো না তাদের সর্বাঙ্গ। শুধু দেখা যেতো সেইটুকু—যেটুকু সূর্য্যের আলোতে ঝক্‌মক্ করতো, মনে হোতো, পৃথিবীর সব চেয়ে মধুর তারের যন্ত্রগুলো বুঝি একসঙ্গে ঝঙ্কার তুলে আকাশ-পথে একটা গানের বন্যা সৃষ্টি ক'রে চলেছে। এমনি মধুর ছিল তাদের কণ্ঠ···এমনি ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করতো তাদের কণ্ঠস্বর!

আবার এই কিন্নরদের মধ্যে আর একটা জাত ছিল, তাদের বলা হোতো কো-কিন্নর। এরা দেখতে ছিল সব চেয়ে সুন্দর আর সব চেয়ে মধুর ছিল এদের কণ্ঠ। এরা গানের মোহ সৃষ্টি ক'রে বৎসরের পর বৎসর ধরে মানুষকে ভুলিয়ে রেখে দিতে পারতো—পৃথিবীর কথা, আত্মীয়-পরিজনদের কথা, তাদের স্নেহ-মমতার কথা। কিন্তু মনটি ছিল এদের পাথরের চেয়েও কঠিন আর মৃত্যুর চেয়েও নিষ্ঠুর। নির্মম ছিল এদের আনন্দ উপভোগের রীতি। বেদনায় কেউ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলে, যন্ত্রণায় কেউ কুঁকড়ে উঠলে তারা আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে বেড়াতো তার চতুর্দ্দিকে আর খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে তার ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে তুলতো; আর সে যতই অস্থির হোতো, তারা ততই আনন্দে হেসে উঠতো। তাদের সুকণ্ঠ ছিল তাদের এই নির্মমতার মস্ত সহায়, একসঙ্গে তারা হয়ত দল বেঁধে এক জায়গায় গেল, সবার অলক্ষ্যে গাছের ডালে, ঘন পাতার আড়ালে, পাহাড়ের অন্তরালে ব'সে তারা আরম্ভ করলো গান, তার মিষ্টি সুর বাতাসে ভেসে এসে হয়তো বাজলো কারো কানে, অবাক্-মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে সেই দিকে চেয়ে—যেদিক থেকে ভেসে আসছে সেই গানের প্লাবন। সম্বিৎ নেই তার। এমনি সময়ে কো-কিন্নরদের এক জন হয়ত হঠাৎ উড়ে এসে তার ঘাড়টা দিল মুচড়ে নিঃশব্দে,—আর্ত্তনাদ ক'রে মাটিতে পড়ে সে ছট্‌ফট্ করতে লাগল, আর তার যন্ত্রণা দেখে আনন্দে হেসে উঠলো এই নিষ্ঠুর কো-কিন্নরদের দল···। এই রকম কত-শত অত্যাচারই যে তারা ক'রে বেড়াতো পৃথিবীময় তার লেখা-জোখা কিছু নেই। মানুষ তাদের ভয়ে শিউরে থাকতো, অথচ এমনি তাদের কণ্ঠের যাদু যে, একবার তারা গান আরম্ভ করলে হতবাক্ না হয়ে থাকতে পারতো না কেউই···আর তারাও তাদের নিষ্ঠুর উল্লাসের সবটুকু পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করে নিতো মানুষের যন্ত্রণার বিনিময়ে।

কত যুগ যে এই ভাবে গেল, তার ঠিকানা বলতে পারব না। এক দিন সূর্য্য সবে মাত্র পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, এমন সময় এলো তারা চারি দিক থেকে একটা পাহাড়-ঘেরা মনোরম উপত্যকায়। পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য মুখ লুকিয়েছে, তার বিদায় বেলার আলোটুকু কচি সবুজ ঘাসের উপর পড়ে একটা অপূর্ব্ব রঙের সৃষ্টি করছে, আলো-আঁধারের রহস্য ঘনিয়ে আসছে ছোট্ট উপত্যকাটুকুর বুকে। আঁধার নামছে দেখে এক দল ছেলে হয়তো ধরাধরি করে, হুড়োহুড়ি ক'রে বাড়ী ফিরে যাবার আয়োজন করছিল। তাদের আনন্দ-কাকলিতে নিস্তব্ধ উপত্যকাটুকু মুখর হ'য়ে উঠেছিল। কচি-কচি ছেলেদের দেব-শিশুর মত পবিত্র মুখ, মাথায় কোঁকড়ান চুলের সোনালী ঝুঁটি, অনাবৃত উপরের অঙ্গ, পরনে গাছের বাকল। শিশুদের এই প্রাণ-খোলা আনন্দ সহ্য হোলো না সেই নিষ্ঠুর কো-কিন্নরদের। পাহাড়ের আড়ালে বসে তারা আরম্ভ কোরলো গান···। মনে হোলো, সেই মুহূর্ত্তে যেন জগতের সমস্ত রূপ বদলে গেল। একটা সুরের বন্যা যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে ছুটে গেল দিকে-দিকে। পাহাড়, বন, তৃণশ্যাম প্রান্তর, নীলাকাশ, অস্তসূর্য্যের ম্লান আলো সব যেন মিলিয়ে গেল দৃষ্টির নাগাল থেকে অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন ক'রে। শুধু জেগে রইলো সঙ্গীতের একটা ঝঙ্কার—হাত দিয়ে যাকে অনুভব করা যায়।

ফিরে যেতে যেতে ছেলেরা থমকে দাঁড়ালো—উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে দেখলো সেই দিকে—যে দিক হো'তে ভেসে আসছিলো সেই সঙ্গীতের অমৃতধারা। স্তব্ধ হ'য়ে তারা সেই অমৃতধারা পান করতে লাগলো কান পেতে, ধীরে-ধীরে অন্ধকার নেমে এলো সেই ছোট্ট উপত্যকার বুকে। আকাশে জ্বলে উঠলো কোটি তারার প্রদীপ—অন্ধকারের বুক চিরে সেই সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করলো বিশ্বে এক অপূর্ব রহস্য। বাপ-মা'র আদরের দুলালরা ভুলে গেল তাদের ঘরে ফেরার কথা—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রার কথা। পাষাণ-মূর্ত্তির মত ছেলের দল সঙ্গীতমুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা তাদের বুকে এনে দিল একটা অপূর্ব আবেশ! সঙ্গীতের গতি যতই হোতে লাগলো দ্রুততর তাদের বুকে ততই জেগে উঠলো একটা অজানা দোলা। তারা স্থির থাকতে

পারলো না আর। একটা অচিন্ত্য আকর্ষণে ধীরে-ধীরে তারা এগিয়ে চললো পাহাড়ের দিকে।

সহসা বিপরীত দিকে জেগে উঠলো একটা আর্ত্তনাদ বহু কণ্ঠের। সঙ্গীতের ছন্দ হোলো আরও দ্রুততর। বালকের দল আরও দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হোলো পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে। আর্ত্তনাদের করুণ স্বর আরও করুণ ভাবে বেজে উঠলো সেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনাকে ঢাকা দিয়ে। একবার বুঝি ছেলেরা তাকিয়ে দেখলো পিছন পানে—আবার তারা মিলিয়ে গেল দূর পাহাড়ের গায়ে, মানুষের নাগালের বাইরে। সহসা একসঙ্গে থেমে গেল সেই ঐক্যতান। এক মুহূর্ত্ত সমস্ত পৃথিবী শ্মশানের মত নিস্তব্ধ! তার পরেই বুক-ফাটা শব্দে ভেঙ্গে পড়লো সেই উপত্যকার বুকে অনেকগুলি দেহ, ফুলে-ফুলে উঠলো দারুণ মর্ম্মযাতনায় তাদের বুক···। দেহগুলি এই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের বাপ-মা'র। হঠাৎ নীলাকাশ উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো পাহাড়ের আড়াল থেকে একটা নিদারুণ অট্টহাসিতে।

পুত্রহারা বাপ-মা'র হৃদয়ের বেদনাকে উপহাস ক'রে হেসে উঠলো এই নিষ্ঠুর কো-কিন্নরের দল। আছড়ে পড়লো বেদনার্ত্ত বাপ-মা'র দল তাদের পায়ে। জোড় হাতে তারা অনুনয়ের সুরে চিৎকার ক'রে উঠলো—"কো-কিন, কো-কিন, ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও আমাদের বুকের নিধি, আমাদের নাড়ী-ছেঁড়া ধন।" আবার উঠলো তুমুল হাসির রোল কো-কিন্নরদের কণ্ঠে। আবার বুক-ফাটা সুরে ভেঙ্গে পড়লো বাপ-মা'র কণ্ঠ—"কো-কিন, কো-কিন, দয়া কর, দয়া কর, ফিরিয়ে দাও আমাদের হারানো মাণিক।" কিন্তু কে করবে দয়া? নিষ্ঠুর কো-কিন্নরদের দল? তারা জবাব দিল আবার তাদের উপহাসের উচ্চ রোলে···। দুর্জ্জয় ক্ষোভে, অপমানে, ক্রোধে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো এক বৃদ্ধা, বুক চাপড়ে নীলাকাশের দিকে শুধু একবার তাকিয়ে নিয়ে বলতে লাগলো—"হে বিধাতা, আমার এই বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র নয়ন-পুত্তলিকে বিনা অপরাধে যারা হরণ ক'রে নিলো, বহু মায়ের কোল শূন্য ক'রে, মানুষের হৃদয়ের বস্তু নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেললো, তাদের তুমি কোনও দিন ক্ষমা কোরো না। তোমাকে যদি আমি কোন দিন ভক্তিভরে ডেকে থাকি, তা হোলে এই মহা পাতকীরা হ'য়ে থাক্ জগতের সব চেয়ে অভাগা। ওদের মনের কালি মেখে অঙ্গ হ'য়ে যাক্ কালিমায়, আর স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত হ'য়ে ওরা যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াক্, ওদের নিজস্ব বাসা যেন না থাকে। ওদের ঐ মধুর কণ্ঠ যেন সবাই ভুল ক'রে আনন্দের সঙ্গীত ব'লে—পুত্রহারার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ব'লে কেউ যেন সমবেদনাও জানাতে না পারে!"—এই বলতে-বলতে সেই বৃদ্ধা সেই যে কাঁপতে-কাঁপতে মাটীতে প'ড়ে গেল আর উঠলো না···তার পর?

তার পর বুঝেছো নিশ্চয়ই—ঐ কো-কিন্নরদের দলই কোকিলের দল···আর কেন তারা বিধাতার রাজ্যে এত অভাগা? সেই বুড়ির শাপেই আজ তারা যাযাবর। নিজেদের মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত তারা পায়নি বিধাতার কাছ থেকে। পুত্র-পালনের আশ্রয়টুকু পর্য্যন্ত নেই ওদের···আর কু—কু ক'রে নিচু পর্দ্দা থেকে উঁচু পর্দ্দাতে যখন ডেকে উঠে তাতে থাকে না আনন্দের সুর—থাকে স্নেহ-হারানোর আকুলতা···থাকে মর্ম্মস্পর্শী যাতনা···।

দেশবন্ধু

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোগের প্রাচুর্য্যে ঘেরা জীবন যাহার
অকস্মাৎ দেখা পেনু কী মূর্তি তাহার!
সর্বস্ব তেয়াগি তার বাহিরিল যবে
সঁপিল দেশের কাজে আপনারে ভবে।
কলিযুগে দাতাকর্ণ, বরি' কারাগার,
সহিল দেশের তরে কত লাঞ্ছনার
অসংখ্য পীড়ন-জ্বালা দেশ-মুক্তি তরে
বিদেশী বন্ধন ছেদি, ভারত মাঝারে
দরদী হৃদয় যার কবি, কৃতী, সুধী
চিত্তরঞ্জন নাম করুণা-অম্বুধি
সর্বত্যাগী সেই জনে স্মরি আমি আজ,
দেশবন্ধুরূপে যেবা জাগে দেশ মাঝ।

রাত্রি

দানিলভ

[Vera Panova যুদ্ধ-পরবর্ত্তী বিখ্যাত রুশ-সাহিত্যিকদের অন্যতমা। তাঁর তিনটি বিখ্যাত নাটকের মধ্যে The Pirozhkov Family নামে নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। লেখিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস 'The Train'। ১৯৪৬ সালে এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। গত যুদ্ধের পটভূমিকায় বইটি লেখা। এই প্রথম রচিত উপন্যাসেই Vera Panova বিশ্ববিখ্যাত Stalin Prize এক লক্ষ রুবল প্রাপ্ত হন। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস The Factoryও প্রকাশিত হয়েছে কিছু দিন আগে।]—অনুবাদিকা।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। দানিলভ উঠে পড়লো, জানলার সামনে এগিয়ে এসে ভারী পর্দ্দাটা সরিয়ে সার্সিটা নামিয়ে দিলে। নিঃশব্দে শক্ত কাঠের ফ্রেমটা সরে গেলো। ট্রেনের প্রত্যেকটি জিনিষই এমনি সুদৃঢ়, মসৃণ, তা ছাড়া মজবুত।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়লো। জ্যোৎস্না-ঢাকা স্তব্ধ রাতের কোলে ক্রমাগত পিছনে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশ আর প্রান্তর। আবহাওয়াটাই একটু কেমন যেন। এবার গরমটা পড়েছে অনেক দেরীতে; সারা দিন থাকে রোদের ঝলসানো তেজ, কিন্তু রাত্রির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই ঠাণ্ডা বাড়তে থাকে। খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে দানিলভ, হিমেল হাওয়ায় বুকের ভিতর অবধি শির্‌শির্ করে উঠলো। কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে আছে খেয়ালই নেই—সময়ের কোনো হিসেবই নেই ওর মনে।

এবার সরে এলো জানলার ধার থেকে। ব্রীচেস্‌টা পরে নিয়ে 'টপ বুট'টা পরতে গিয়ে দেখে সেই মোটা-সোটা আহ্লাদী মেয়েটা আবার তার নরম কার্পেটের চটীজোড়া সামনে গুছিয়ে রেখে দিয়েছে। চমৎকার মানাবে যা-হোক্—হাঁটু অবধি আঁট-সাঁট ব্রীচেসের নীচে নরম কার্পেটের চটী! দানিলভ মনে-মনে ভাবে, ওর স্বামী বেচারাকেও এমনি করে সঙ সাজতে হয় নাকি? বিচিত্র নয়! আর দেরী না করে নিখুঁত ভাবে পোষাকটা পরে চামড়ার বেল্ট এঁটে টুপী হাতে বেরিয়ে এলো কামরা থেকে। সৎদৃষ্টান্ত কিছুটা দেখানো দরকার বৈ কি,—চুলোয় যাক্ ঐ ট্রেন কমাণ্ডান্ট!

কামরাগুলির সামনে দিয়ে চলে গেছে লম্বা টানা করিডর—জানলার ভিতর থেকে আসছে ম্লান ফ্যাকাশে আলোর রেশ। বাইরের আকাশ আর দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর কেমন একটা ধূসর শূন্যতায় একাকার হোয়ে গেছে। ট্রেন কমাণ্ডান্ট ঘুমোচ্ছে নাকি? দানিলভ তার কামরাটার সামনে গিয়ে ধীরে-ধীরে দরজাটা একটু ফাঁক করে ভিতরে উঁকি মারলে। অনুমান ঠিকই—গভীর ঘুমে অচেতন, শুধু পাজামা আর মোজা পরা, কাপড়-জামা বিশৃঙ্খল, বুকের কাছে পা দুখানি কুঁকড়ে ঠিক ছোট্টো বাচ্চাদের মত ঘুমিয়ে আছে। হাত দুটিও জড়ো করে থুতনিতে চেপে রাখা—মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে প্রার্থনা করছে।

পাশের কামরার দরজাটা খুলে গেলো, সহকারী ডাক্তার সুপ্রাগভ বেরিয়ে এলো করিডরে, পরনে হাসপাতালের একটা নীল ড্রেসিং গাউন, পায়ে কার্পেটের চটী।

'ইভান ইগোরিচ, হোলো কি? তুমিও ঘুমোতে পারছো না?'

'না, না, আমি তো ঘুমিয়েছি।'

ইচ্ছে করেই দানিলভ মিথ্যে কথা বললো, সুপ্রাগভের সঙ্গে কোথাও এতটুকু মিল ওর সহ্য হয় না। যদি সুপ্রাগভের ঘুম না হোয়ে থাকে তবে দানিলভের নিশ্চয়ই ঘুম হওয়া উচিত—

'আমার তো বেশ ভালোই ঘুম হয়েছে, আর তোমার?'

'কি জানো, কোনো মতেই আমার ঘুম আসছে না। কি জানি নতুন পরিবেশের জন্যই হয়তো।'

'নতুন আবার কি? ট্রেনের ভিতরে আছো এই যা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু যাচ্ছি কোথায় আমরা?'—খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে সুপ্রাগভ। ভারী বিশ্রী লাগে ওর এই খিল্‌-খিল্ করে হাসা স্বভাবটা। এতটুকু রুচি যাদের আছে তারা হয় মুচকে হাসে, কিম্বা সুন্দর ভাবে ভদ্রভাবে হাসে।

'আমরা যুদ্ধ-সীমান্তে যাচ্ছি, কমরেড ডাক্তার'—নিজের বলিষ্ঠ, সুন্দর দেহের পাশে সুপ্রাগভের চেহারটা দানিলভ একটু তির্য্যক দৃষ্টিতে দেখে নিলে।

'মন ঠিক করে ফ্যালো ডাক্তার', দানিলভ থেমে-থেমে বলতে লাগলো, 'তোমার নিজের হাসপাতালে রোগী নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেয়ে এটা একটু ভিন্ন রকমের ব্যাপার, বুঝেছো?'

'তাহলে বেশ কঠিন ঠাঁইএর জন্য তৈরী হোতে হবে বল?'

'তুমি ভাবছো কি বল তো? সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের কোনো তফাৎ নেই? আলবৎ আছে।'

সুপ্রাগভের চোখ দুটোতে কেমন একটা মিইয়ে-পড়া ভাব। দানিলভের সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁতটার ওপর আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। সুপ্রাগভের মুখটা আবার কঠিন হয়ে এলো। অত্যন্ত তিক্ত স্বরে হঠাৎ বলে উঠলো, 'আমি সত্যিই বুঝতে পারি না—এই রকম ভাবে একটা ট্রেনকে সীমান্তে পাঠাবার কোনো মানে হয়!

শান্তা বসু

এটা তো জোর করে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া। ফাইনা তো বলে, প্রথম বিস্ফোরণেই জানলাগুলো গুঁড়িয়ে যাবে—'

'ফাইনা? ফাইনা কে?'

'কেন? ও তো হচ্ছে প্রধানা সিষ্টার।'

'তার নাম ফাইনা?'

চকিতে দানিলভের সমস্ত অনুভূতি জুড়ে ভেসে এলো অনেক কালের চেনা মিষ্টি গন্ধ, সন্ত-ভেজা এক রাশ এলানো চুলের হারিয়ে যাওয়া গন্ধ। নাঃ, কিছুতেই আর ভাববে না। কিন্তু কেন আবার মনে আসছে সে কথা? কত দিন হয়ে গেলো, হ্যাঁ, ঠিক বাইশ বছরই তো হলো—প্রধানা সিষ্টার—স্তবকে স্তবকে লুটিয়ে-পড়া কোঁকড়ানো চুলের গোছা। ফাইনা—বাস্তবিকই সে ফাইনা!

গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে সুপ্রাগভের খেদোক্তি শোনা গেলো: 'এটা স্রেফ জোর করে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দেওয়া।'

'তাহলে তোমার প্রস্তাবটা কি শোনা যাক্?'—দানিলভের মুখের পেশীগুলো কুঁচকে উঠলো। একটু লক্ষ্য করলেই সুপ্রাগভ দেখতে পেতো ওর চোখে আগুন জ্বলছে। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে সে তখন নিজের সিগারেটটা জ্বালাতেই ব্যস্ত, কিছুতেই জ্বলছে না কেন—নিশ্চয়ই ভালো ভাবে প্যাক্ করেনি।

'ফেরৎ পাঠাবে নাকি? বেশ তো, সেই সঙ্গে কাগানোভিচকে একটা তার করে দিলে কেমন হয় যে ট্রেনটা বোমার মুখে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের উপর একটু দয়া কর?'

সুপ্রাগভ বুঝলো যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে। ওর সমস্ত মনটা দমে গেলো। আর যাই হোক্, ও তো এক জন পুরুষ-নার্স নয়, ও হচ্ছে সৈন্যবিভাগের ডাক্তার।

'আমি কিছুই প্রস্তাব করছি না। তবে তোমার যেমন নিজের মত প্রকাশের অধিকার আছে, আমারও ঠিক তেমনি অধিকার আছে। আমিও তো মরতেই চলেছি।'

'তাই ভাবছো? তাতে হয়েছে কি? কিন্তু যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি…'

সিগারেটটা আবার নিবে গেছে, সেটাকে ঠোঁটে চেপে সুপ্রাগভ দানিলভকে লক্ষ্য করতে লাগলো। সে ততক্ষণে এগিয়ে চলে গেছে। সত্যিই কমিশারের সমস্ত চেহারাটার মধ্যেই প্রকৃত সৈনিকের মত একটা বলিষ্ঠ, দৃঢ় আর সম্ভ্রান্ত ছাপ আছে। ওই চেহারার পাশে ড্রেসিং গাউনে ঢাকা নিজেকে ভাবতেই ওর সারা মন কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠলো। এটা অবশ্য ওর নিজেরই দোষ, মোটেই উচিত হয়নি ব্যক্তিগত কথা টেনে আনা। অবশ্য ফাইনার সঙ্গে কিম্বা অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে হচ্ছে আলাদা কথা। কিন্তু কমিশারের সঙ্গে—না, কোনো মতেই নয়। এবার থেকে নিজেকে সব সময় সতর্ক রাখতে হবে।

সাধারণ কামরাগুলিতে ডান দিকের জানলাগুলি সব খোলা, কিন্তু বাতাসটা ভারী বিশ্রী। কামরাগুলির ভিতরে ইতিমধ্যেই বেশ একটা ঘরোয়া ভাব এসে গেছে। মেয়েদের শোবার বেঞ্চগুলির উপরে আয়না ঝোলানো।

ছোটো-ছোটো ফোটো, ভাগ্যচিহ্নের প্রতীক স্বরূপ ছোটো-খাটো জিনিষগুলি চতুর্দ্দিকে সাজানো। কিন্তু ঐ ছবিগুলো বোধ হয় আরশোলাদের ডিম-পাড়ার জায়গা হয়েছে—এদিকে একটু নজর রাখা দরকার। লেনা অগরোদিকোভা কামরার শেষ প্রান্তে একটা নীচের বেঞ্চে শুয়ে ঘুমোচ্ছে! ছোটো-খাটো মিষ্টি মেয়েটা, একটা কিশোর ছেলের মত। খুব কম কথা কয়, কিন্তু সব সময়ই দুষ্টুমির আভাস জেগে থাকে মুখখানিতে। ঘুমের মধ্যেও যেন কোন মজার কিছু দেখছে এমনি ভাবে হাসছে। ওরও মাথার কাছে একটা রঙদানী আকারের আয়না ঝুলছে—কিন্তু ছেলেরাও তো আয়না ব্যবহার করে। ওর ঠিক সামনেই আইয়া শুয়ে আছে, দীঘল হাত দুখানি দুপাশে এলানো, শোনা যাচ্ছে গভীর নিশ্বাসের শব্দ। আচ্ছা, এমন একটা অদ্ভুত নামও বাপ-মা রাখে? মেয়েগুলি সত্যিই ভালো—প্রত্যেকের পরনে ছেলেদের বোনা সার্ট কিম্বা সিঙ্গলেট্, শেমিজ কিম্বা রাত্রিবাস কারো অঙ্গে নেই।

প্রত্যেকটি কামরাই আহতদের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত। পুরু, নীল, মসৃণ কম্বলে ঢাকা বিছানাগুলি। বালিসগুলির উপর তিন কোণা করে তোয়ালের ঢাকা সাজানো। ষ্টেশনের কিম্বা ট্রেনের কামরাগুলোর যে একটা বিশেষ গন্ধ থাকে, তার সঙ্গে মিশেছে সালসার আর বার্নিশের গন্ধ। নতুন রঙ কিম্বা প্রতিষেধক ওষুধের তীব্র গন্ধেও তা চাপা থাকছে না। সাধারণ কামরাগুলি একটু শক্ত গোছের, তাইতে সামান্য ভাবে আহতদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি কামরায় আছে এক জন করে প্রহরী। দানিলভ যেই দরজাটা খুললো, এগিয়ে এলো এক আবছা মূর্ত্তি, হাতে রাইফেল, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। কামরার ভিতর ধূমপান নিষিদ্ধ। কিন্তু দানিলভ ইচ্ছে করেই না দেখার ভাণ করলো। মানুষ তো আর যন্ত্র নয়। সীমান্তের অভিমুখে চলেছে ট্রেনটা, চার পাশে বড়-বড় নিশানের মত করে লাগানো 'রেড-ক্রশে'র চিহ্ন। কিন্তু ট্রেনের একটি যাত্রীরও এ বিষয়ে কোনো অবাস্তব কল্পনা নেই যে, ঐ 'রেড-ক্রশের' চিহ্নগুলোর জন্যে তারা কোনো আক্রমণের হাত এড়িয়ে যাবে। বরং সবাই বেশ ভালো করেই জানে শত্রুপক্ষের আক্রমণের নিশানাই হবে ঐ বিশেষ চিহ্নগুলি।

নয় নম্বর কামরার ভার সুখয়দভের উপর। আঁট-সাঁট চওড়া কাঁধওলা মানুষটি, প্রকাণ্ড মাথাটা যেন ঘাড়ের অপেক্ষা না করেই কাঁধের উপর সেঁটে বসেছে। এক কমাণ্ডান্ট ছাড়া, ট্রেনের মধ্যে সব চেয়ে বৃদ্ধ। দানিলভ জানতো গৃহযুদ্ধের সময় সুখয়দভ এক জন সুদক্ষ সৈনিক ছিল, পরে আহত হয়ে ফিরে আসে। বাইশে জুন, হিটলারের সেই চরম বিশ্বাসঘাতকতার দিনেও ও আসে রিক্রুটিভ অফিসে নাম লেখাতে। কিন্তু স্বাস্থ্য আর বয়স দুই-ই গেছে ভেঙে, যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ক্ষমতা আর নেই, তাই ওকে এই 'রেড-ক্রশ' ট্রেনে পাঠানো হয়েছে। শান্তির সময় মস্কোর কয়লা-খনিতেই ও কাজ করতো, কয়লার মিহি গুঁড়োগুলো গভীর ভাবে বসে গেছে মুখের প্রত্যেকটি খাঁজে-খাঁজে, তাইতেই ওর শিশু-সুলভ নীল চোখ দুটোকে আরও বেশী জ্বলজ্বলে দেখায়।

সুখয়দভ জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলো, দানিলভকে দেখে এগিয়ে এলো না, শুধু ঘাড়টা একবারটি ফিরিয়ে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলে। দানিলভ ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। মানুষটাকে এখন একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে। খিটখিটে নয়, বদমেজাজী নয়—যেন শিকারের পিছন-পিছন তাড়া করা শিকারীর মত লাগছে।

'দেখতে পাচ্ছো ? ও-ই যে ঐখানে'—ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলে।

দূর-দিগন্তে ঘন বনের কালো রেখারও ওপারে একটা অস্পষ্ট কাঁপা আলোর আভাস। হঠাৎ অন্ধকারের বুক চিরে ঝলসে উঠলো সার্চলাইটের তীব্র আলো, আকাশের বুকের এক দিক থেকে আর এক দিকে ক্রমাগত ঘুরতে লাগলো, পাশ থেকে জ্বলে উঠলো আর একটা আলোর রেখা। দুটো আলোর সঞ্চরমান রেখা একবার মিলে গেলো, পরক্ষণেই আবার সরে গিয়ে আকাশের সেই অতল অন্ধকারে কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলো !

'ওটাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি'—সুখয়দ্‌ভের কণ্ঠস্বর দৃঢ়তায় ভরা—'তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছো ?'

'নাঃ, কিছুই শুনতে পাচ্ছি না তো—'

সুখয়দ্‌ভ খানিকক্ষণ চুপ করে শুনতে লাগলো। তার পর তামাকের থলিটা বের করে কাগজে পাকিয়ে সিগারেট তৈরী করতে লাগলো।

'ধূমপানের ইচ্ছা আছে ?'—দানিলভের দিকে থলিটা এগিয়ে দিলে।

'নাঃ, আমি ধূমপান করি না।'

'খুব ভালো, খুব ভালো তোমার পক্ষে', সুখয়দ্‌ভ বলেই চললো—'এতে সারা সকালটা তোমার কাশতে-কাশতে দম বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ যে-সব সৈনিকের এই অভ্যাসটা নেই, তাদের নির্ঝঞ্ঝাটে সময়টা কাটে, একটা বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তামাকের চিন্তাটুকু আর করতে হয় না। খবরদার ঐ অভ্যাসটি কোরো না, একবার ধরেছো কি শেষ হয়ে গেছো !'

দানিলভ হেসে ফেললো : 'আমি আটত্রিশটা বছর এই নেশাটার হাত এড়িয়ে গেছি। এখন আবার নতুন করে ধরবো বলে তো মনে হয় না—'

'বলো কি, তোমার আটত্রিশ বছর বয়স ?'—সুখয়দ্‌ভের দুই চোখে সরল বিস্ময়।

'এই বসন্ত কালে আটত্রিশ পূর্ণ হবে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দানিলভকে লক্ষ্য করতে-করতে সুখয়দ্‌ভ অন্যমনস্কের মতই বলে উঠলো, 'অনেক বয়স কম দেখায়, জোর ত্রিশ বছর দেওয়া যায়—আচ্ছা, খুব জোর হয়তো বত্রিশই ধর। বেশ স্বচ্ছন্দেই কেটে যাচ্ছে না ?'

'স্বচ্ছন্দে কিনা জানি না, তবে মোটামুটি ভালোই তো কাটলো।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ সুখয়দ্‌ভ বিচিত্র স্বরে বলে উঠলো, 'না, না, যুদ্ধে তুমি কিছুতেই মরতে পার না—'

জানলার পিছনে আবার আলো দুটো ঝলসে উঠলো, একটার উপর আর একটা আড়াআড়ি ভাবে মিললো, আবার নিবে গেলো। দানিলভের দৃঢ় ধারণা, যুদ্ধে ওর মৃত্যু হবে না। ওর জীবনটা এমন আকস্মিক ভাবে হোঁচট খেয়ে থেমে যাবে না। জীবনের সব কিছুই তো সবে সুরু হয়েছে, কিছুই তো শেষ করা হয়নি—মাত্র কিছুক্ষণের বিরতি ঘটেছে বলা যেতে পারে। হ্যাঁ, একটা জিনিষের শেষ হয়েছে বটে, ফাইনার সঙ্গে সমস্ত বোঝাপড়ার শেষ হয়ে গেছে। যদিও—কে জানে শয়তানের মনে কি আছে—আবার হয়তো এক দিন ফাইনার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে পারে। দেখবে হয়তো,—সামনে দাঁড়িয়ে তেমনিই ভঙ্গীতে, মাথাটা পিছনে ঈষৎ হেলানো, এলিয়ে পড়েছে সদ্য-ভেজা রাশ-রাশ নরম চুল···'ভাল্যা, কই আঁচড়ে দাও'··· বলে উঠলো—দূর কি ছেলেমানুষি চিন্তা, না, না, নিজের কাছেও স্বীকার করা যায় না এমন চিন্তা, অন্যের কাছে তো নয়ই।

সামান্য আহত রোগীদের জন্য যে গাড়ীখানা তার সঙ্গেই লাগানো 'ডিসপেন্সারী'-গাড়ীটা—মাত্র একখানা কামরা নিয়ে 'ডিসপেন্সারী', বাকী কামরাগুলি রোগীদের আহত ক্ষতস্থানে ড্রেস করানোর উপযোগী করে সাজানো। এই কামরাটি দানিলভের সব চেয়ে পছন্দ। প্রথমেই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এই তুষার-শুভ্র রঙের উপর নিকেলের ব্যবহারযোগ্য জিনিষগুলির ঝকঝকে সাদা পালিশ ; মসৃণ পালিশের ভারী পাল্লার দরজা, টেবিল-চেয়ারগুলি ভাঁজ করে পরিচ্ছন্ন ভাবে দেয়ালের গায়ে সরানো—সব মিলিয়ে দানিলভের মনটা বেশ খুশী হয়েছিলো, কারণ এমনি স্বচ্ছন্দ আরামের পরিবেশই ওর বেশী পছন্দ হয়। প্রথম দিনেই কম্পাউণ্ডারটি নতুন পালিশ-করা টেবিলের ওপর আয়োডিন ফেলে দিয়েছিলো। তাই দেখে দানিলভের মুখটা অসহ্য বিরক্তিতে সাদা হোয়ে উঠেছিলো। নার্স ক্লাভা কিন্তু কমিশারের এই পরিচ্ছন্নতার দাবী মেটাতে যথেষ্ট চেষ্টা করে। এখনও ক্লাভা ড্রেস করানোর ঘরে একটা টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাপড়ের টুকরোগুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে। মাথাটা ঝুঁকে থাকাতে রুমালের বন্ধনী এড়িয়েও ঘন লাল চুলের গুচ্ছ গুচ্ছ-ভাবে মুখের উপর এসে পড়েছে। জানলাগুলিতে পর্দা টানা—শুধু একটি ছোটো আলো জ্বলছে।

দানিলভ প্রশ্ন করলে—'কি কোরছো তুমি ?'

ক্লাভা ওর দিকে মুখটা ফেরালে ; ঘুম-জড়ানো, মমতা-ভরা মুখ, মাঝে-মাঝে তিলের দাগ। শ্রান্ত গলায় উত্তর দিলে : 'একটা ঢাকা।'

'ঢাকা ? আলোর জন্যে ?'

'না, মুখটায় লাগাবো বলে।'

'কিসের মুখে লাগাবে ?'

'ঝাব্রির'—তন্দ্রার ঘোরে উত্তরগুলোকে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু দানিলভ বুঝতে পারলো, আর মনে-মনে খুশীও হলো।

'ওঃ, তাহলে যখন ওগুলো কাজে লাগবে না তখন ঐ ঢাকনাগুলো তার মুখে টেনে দেবে যাতে বেশ সুন্দর দেখতে লাগে, তাই না ?'

'হ্যাঁ,' ক্লাভা জানালে, 'কিন্তু মুস্কিল এই যে এগুলো সবই মসলিনের টুকরো, নীল কিংবা গোলাপী সিল্ক হলে আরও ভালো হতো।'

'হ্যাঁ, সে কথা সত্যি, সিল্ক হলে সুন্দর হতো'—দানিলভ হাসতে-হাসতে বললে—'তবে ওসব তো পাওয়াই যাবে না ক্লাভা, তবে অস্ত্রোপচারের গজ খানিকটা নিয়ে যদি ধোয়ার জন্য যে নীল আছে তাতে রঙ করে নাও তো মন্দ হবে না।'

ওর মুখের দিকে চেয়ে বেশ নিঃসংশয়ে ক্লাভা এবার জানালে: 'আর যদি কোথাও থেকে খানিকটা লাল কালি যোগাড় করা যায়, তবে তাতে জল মিশিয়ে গোলাপী রঙও তৈরী করা যায়।'

দানিলভ কথা দিলে,—'প্রথমেই যে দোকান পাবো, সেখানেই আমরা লাল কালি কিনে নেবো।'

লাল চুলওয়ালা মেয়েটা ওর উৎসাহকে জাগিয়ে দিয়েছে। করিডর দিয়ে যেতে-যেতে দানিলভের মুখে হাসির মৃদু রেশ ভেসে গেলো।

অত্যন্ত গুরুতর ভাবে আহত রোগীদের গাড়ীখানায় কোনো পার্টিশন নেই, হাসপাতালের মতই খোলা, টানা, লম্বা ঘর। সাদা রঙ করা। তিনটে করে দোলনা-খাট, একটার উপর আর একটা করে ঝোলানো—এমনি দুপাশেই। তাছাড়া ঝোলানো বাসন-পত্র রাখার তাক। নির্ভুল ভাবেই হাসপাতালের পরিবেশ, কোনো তফাৎ নেই।

সংক্রামক রোগের জন্য নির্দিষ্ট গাড়ীখানা ট্রেনের একেবারে শেষ প্রান্তে। এটা সাধারণ গাড়ী—এর শেষ প্রান্তে বিজলী-ঘর—সমস্ত ট্রেনে বিদ্যুৎ সরবরাহের কেন্দ্র। এই গাড়ীটাকেই দানিলভ বিশেষ ভাবে তদন্ত করতে চায়। কেমন ভাবে যেন ওর দৃঢ় সন্দেহ হোলো, এখানে কিছু একটা গোলমাল আছে। এই গাড়ীতে কোনো প্রহরীরই সাক্ষাৎ মিললো না। বিজলী-ঘরের সামনে এসে দানিলভ এক মুহূর্তের জন্য থামলো, গাড়ীর চাকার কর্কশ আওয়াজকেও ছাপিয়ে উঠছে কথাবার্তার আওয়াজ, কিন্তু কথাগুলি বুঝতে পারা অসম্ভব। অবশ্য এটা ঠিকই যে এর চেয়ে অনেক বেশী গোলমালই ও আশা করেছিলো। দানিলভ হঠাৎ দরজাটা খুলে ফেললো। কেউ এদিকে নজরই করলে না এক গোরিমুস্কিন ছাড়া। এদিককার প্রহরীও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, অন্যেরা বসেই রইলো। প্রধান ইঞ্জিনীয়র ক্রাভট্সভ মুখের সিগারেটটা এক কোণ থেকে আর এক কোণে ঠেলে, সশব্দে একটা তাস টেবিলের উপর দিলে।

'এইবার, বাগে পেয়েছি—'

'উঁহু, চিরিতন হচ্ছে রঙ'—বলে প্রটাসভ হাতের তাসটা ফেললে। ওর তত্ত্বাবধানে আছে গাড়ী মেরামতের মিস্ত্রীরা। হঠাৎ তরুণ ইলেকট্রিসিয়ান নিঝভেট্স্কি অত্যন্ত অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো। ওরা চার জনই এক গোরিমুস্কিন ছাড়া রীতিমত সুদক্ষ কারিগর—সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার এদের নিয়ে চালানো। তাছাড়া ক্রাভট্সভ আবার স্বেচ্ছাসেবক।

'কমরেড কমিশার, তুমি বুঝি বোতলগুলোর খোঁজে এসেছো ? আর কষ্ট করে খুঁজে লাভ কি—সে—সব গেছে···' হাতটা দুলিয়ে দানিলভকে লক্ষ্য করে ক্রাভট্সভ বললে। ওর মুখখানা লাল হোয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি স্তিমিত।

দানিলভ মনে-মনে কি একটা চিন্তা করতে-করতে টুলের উপর গিয়ে বসলো। কেমন যেন চিন্তাকুল গম্ভীর হয়ে উঠেছে মুখটা, সবাই নিঃশব্দে ওকে লক্ষ্য করছে। দানিলভের পিছনের দিকে গোরিমুস্কিন অপরাধীর ভঙ্গীতে পা টিপে-টিপে উঠে বেরিয়ে গেলো খুব সাধানে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে। অন্তত: তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, মাথা ঘামাবার কিছু নেই। বাকী যে তিন জন, দানিলভ ওদের গ্রেপ্তার করতে পারে। আগের দিনেও ভলোগ দাতে লক্ষ্য করেছে, ওরা পাগলের মত দৌড়চ্ছে আর অস্পষ্ট ভাবে জড়িয়ে-জড়িয়ে কথা বলছে···গ্রেপ্তার তো সহজেই করা যায়। কিন্তু তার পর··· ?

নিঝভেট্স্কির ভীত, বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়েই দানিলভ বলে উঠলো: 'এসো, এক হাত খেলা যাক্, "বোকার ঘাড়ে বোঝা" খেলাটাই হোক্।'

রীতিমত পাকা খেলোয়াড়ের মতই দানিলভ এক দান খেললে। তাসের দিকে গভীর মনোযোগ, মুখটা ঈষৎ খোলা, সোনা বাঁধানো দাঁতটা চিক্-চিক্ করছে। শেষ অবধি জিতেও গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে: 'এমনি করেই খেলতে হয়। যথেষ্ট হয়েছে, না সকাল অবধি জুয়ো খেলা চলবে ?'

ক্রাভট্সভ আর প্রটাসভ গুম্ হোয়ে রইলো, একটা কথারও উত্তর দিলে না। নিঝভেট্স্কি ইতস্তত: করে বললে: 'নাঃ, আমি তা বলতে পারি না—আমার একটু ঘুমোলে ভালো হয়।'

দানিলভ বললে,—'বেশ তো, এসো তাহলে আমার সঙ্গে।'

করিডরের ভিতর দিয়ে ও চললো দানিলভের পিছন-পিছন। একটা ড্রেসিং গাউনের জন্য নিরাশ হয়ে খানিকটা দাঁড়ালো, কিন্তু দানিলভের সেদিকে দৃষ্টি নেই, একটি কথাও না বলে সোজা এগিয়ে গেলো—একবারও পিছন ফিরে চাইলে না। দরজাগুলি খুলতে-খুলতে ও এগিয়ে চলেছে আর নিঝভেট্স্কি পিছনে আসছে সেগুলি বন্ধ করতে-করতে। একটার পর একটা কামরা পেরিয়ে চলেছে, ট্রেনের চাকাগুলির কর্কশ আওয়াজও ক্রমেই যেন বাড়ছে। সমস্ত পৃথিবীটা নিবিড় অন্ধকারের কোলে মূর্চ্ছিতের মতো পড়ে আছে, আকাশের কোলে তারাগুলিও মিলিয়ে এলো—ভোরের আর দেরী নেই।

ডিস্পেন্সারীর কামরাতে ক্লাভা ঢাকাটা নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে। ঘুমের আমেজে নিশ্বাস গভীর হয়ে উঠছে। দানিলভ নিঝভেট্স্কিকে দেখালে:

'মেয়েটির কি রকম কল্পনাশক্তি দেখেছো—সব-কিছুই সুন্দর করে সাজাতে চায়। ওঃ—হ্যাঁ, শোনো, আমি এখানে কানে লাগিয়ে শোনা বেতার চাই। আহত সৈন্যরা যখন ড্রেস করবার জন্যে এ ঘরে এসে অপেক্ষা করবে, তখন বেশ শুনতে পারবে। তুমি করে দিতে পারবে রেডিওর ব্যবস্থা ?'

'নিশ্চয়ই'—অস্ফুট স্বর নিঝ্‌ভেট্‌স্কির।
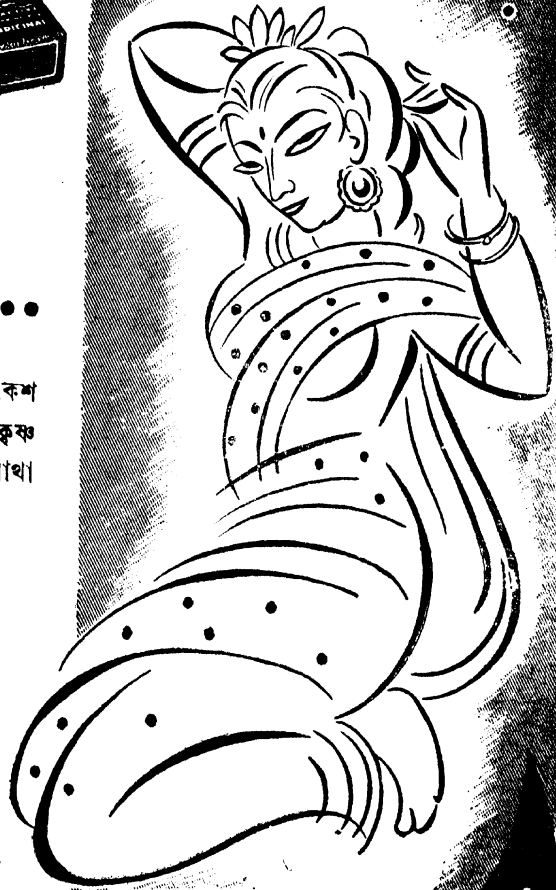
দানিলভ ওকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলো। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান চটপটে। আর ওর বেশভূষাতেও একটা চমৎকার পারিপাট্য আছে, সহজেই বোঝা যায় অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে—সৌখীনতাতেই অভ্যস্ত।

'তোমার ব্যাপারটা কি বল তো? তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কাজে নিলে না কেন?'

চকিতে নিঝ্‌ভেট্‌স্কির পা থেকে মাথা অবধি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো, কোনো মতে বললে: 'অর্শ আছে আমার।'

'যত বুড়োদের রোগ তুমি পেয়েছো?' দানিলভ আশ্চর্য্য হয়ে ওঠে!—'কিন্তু যুদ্ধে তুমি যোগ দিতে চেয়েছিলে?'

এবার উত্তেজিত হবার পালা নিঝ্‌ভেট্‌স্কির।

'আমি ছ'বছর 'মস্কো-ভ্লাডিভোষ্টক' লাইনে কাজ করেছি। আমি ওখানেই থাকতে পারতাম, কেউ আমার কিছুই করতে পারত না। আমি স্বেচ্ছায় এই 'হসপিটাল ট্রেনে' কাজ নিয়েছি। যাতে অন্ততঃপক্ষে কিছুটা...'

'কিন্তু এই 'হসপিটাল ট্রেন'গুলিতে নিয়মানুবর্তিতা তো ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের মতই কঠিন। বরং আমি এ বিষয়ে একটু কড়া হতেই চাই। যুদ্ধক্ষেত্রেও যে কাজের অনুমতি মেলে, আমাদের পক্ষে তাও বন্ধ। আমাদের হতে হবে দেবদূতের মতই মালিন্যহীন। হ্যাঁ, কেন জানো? আমরা হচ্ছি 'রেড-ক্রশের' সেবক আর সেবিকা।... ঐ ভদ্‌কা চুলোয় যাক ঐ মদ'—দানিলভ সংযত আবেগের সঙ্গে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলে চললো—'এই ট্রেনে শীগগিরই আর ওসবের চিহ্নও দেখতে পাবে না,—দেখে রেখো আমার এই কথা—'

মাত্র চোদ্দ দিন হলো যুদ্ধ বেধেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত বছর পার হোয়ে গেলো।

২২শে জুন। দিনটা ছিলো রবিবারের সকাল। অনেক দেরীতে সেদিন ঘুম ভাঙ্গলো দানিলভের। ভারী রাগ হলো ওর স্ত্রীর উপর, একটু আগে ডেকে দিতে পারেনি! সারা দিনটা আজ ছেলেকে নিয়ে কাটাবে—ইচ্ছে করে এই দিনটা সব চেয়ে দীর্ঘ হোক, যতটা সময় পারে ছোট্টো ছেলেটাকে নিয়ে আনন্দ আর উল্লাসে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু ওর স্ত্রীর একবারও মনে হলো না তাড়াতাড়ি জাগিয়ে দেবার কথাটা। এমনি করেই বুঝি এত আকাঙ্ক্ষার ছুটির দিনটা মাটী হবে।

ছেলেটা ইতিমধ্যেই খাটের উপর উঠে পড়ে বাবার হাঁটুতে চড়ে বসেছে। ছোট্টো-ছোট্টো করে চুল ছাঁটা কচি মাথাটা যেন ঠিক নরম ভেলভেটের মত। গায়ে সাদা জামা, পায়ে নীল মোজা। ঘরের মেঝেটা ধোয়া-মোছায় তক্‌-তক্ করছে,—তার উপর এসে পড়েছে সোনালী রোদ। সবে মাত্র গরম পড়া শুরু হয়েছে, ইতিমধ্যেই বাচ্ছাটার গাল দুটিতে পা দুটিতে রোদের তামাটে রঙ ধরেছে।

'বাবা, আমরা বেড়াতে যাবো তো?'

ছেলেকে কথা দিয়েছিলো সকালে উঠে দুজনে বেড়াতে যাবে—খুব ভোর বেলা উঠেই বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু দেরী হয়ে গেলো—একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু তার জন্য দায়ী আর কেউ নয়, ওর স্ত্রী ছাড়া—একবার ডাকতে পারতো তো?'

'নিশ্চয়ই যাবো, দাঁড়াও, একটু কিছু মুখে দিয়েই তক্ষুনি বেরিয়ে পড়বো কেমন?'

'ও কি, আবার তুমি দাঁত মাজবে কেন? তোমাকে তো আজ আর 'ট্রাষ্টে' যেতে হচ্ছে না?'

ওর স্ত্রীকে প্রাতরাশ তৈরী করতে দেখে, দানিলভ একটু বাগানের মধ্যে বেড়াতে এলো। মাত্র দুই বছর ধরে ওরা সহরে বাস করছে। একটা কৃষি-ব্যবসায় কেন্দ্রে দানিলভ হলো প্রধান পরিচালক। কিন্তু ওর স্ত্রী আজও সহরের আবহাওয়াতে অভ্যস্ত হয়নি, টাটকা শাকসব্জী দোকান থেকে কিনে খেতে ওর মন ওঠে না, নিজের হাতে ফসল ফলানোতেই ওর তৃপ্তি। সকালের আলোতে বাগানের ঘন সবুজ চারাগুলিকে দেখে দানিলভের মনটা খুসীতে ভরে উঠলো। ঘুরতে-ঘুরতে দেখলে টমাটো গাছগুলোতে ছোট্টো-ছোট্টো সবুজ ফল দেখা দিয়েছে। লেটুসগুলোও প্রায় তোলবার মত হয়ে এসেছে।

পিছনে-পিছনে কখন বাচ্ছা ছেলেটাও এসেছে, চারাগুলোর পাশে উঁচু হোয়ে বসে কচি গলায় অনর্গল প্রশ্ন করে যাচ্ছে—'বাবা, বল না বাবা, এখনও মূলো আছে? আরও অনেক অনেক মূলো?'

দানিলভের চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই মুহূর্তটুকু—একটুও ভোলেনি সে ছবির মত তার মনের পটে আঁকা আছে সে দৃশ্যখানি। মেঘলেশহীন ঘন নীল আকাশ, কচি-কচি সবুজ চারাগুলির উপর রোদের সোনালী আলো লুটিয়ে পড়ছে, চার দিকেই যেন খুশীর ঢেউ, তৃপ্তির আভাস। পাশেই ছোট্টো ছেলেটা পায়ের গোড়ালীতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বসে চারাগুলির উপর ঝুঁকে পড়েছে। এখনও কানে বাজছে সেই রিনরিনে মিষ্টি গলায়: 'বল না বাবা, এখনও মূলো আছে?'

তার ফেলে-আসা জীবনটার শেষ মুহূর্তের ছবি। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ছেলে, জড়িয়ে আছে রবিবারের অলস অবসর—মিশে আছে অনেক আমোদের, বনভোজনের অশেষ কল্পনা।

হঠাৎ ওর স্ত্রী ছুটে বেরিয়ে এলো বারান্দায়।

'ভান্যা, ভান্যা, যুদ্ধ লেগে গেলো, শীগ্‌গির শুনবে এসো, রেডিওতে মলোটভ ঘোষণা করছেন...'

রুদ্ধশ্বাসে ত্রস্ত পায়ে বাড়ীর দিকে ছুটলো দানিলভ।

[ক্রমশঃ

জলযাত্রা

৪

শ্রীশান্তা দেবী

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মচরিত থেকে আরম্ভ করে অনেক জায়গায় পড়েছি এবং অনেকের মুখে শুনেছি যে, ফরাসী দেশে আসতে হলে যে ইংলিশ চ্যানেল পার হতে হয় তার মত ভয়াবহ জিনিষ কম আছে। জাহাজে চড়বা মাত্র নাকি অন্নপ্রাশনের ভাত সব উঠে যায় এমনি উত্তাল তরঙ্গমালা সমুদ্রের। ভয়ে-ভয়ে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ভীড়ের পিছন-পিছন পাশপোর্ট হাতে ত জাহাজে উঠলাম। ছোট একটা জাহাজ, মনে হল সবটাই ডেক, মাঝে-মাঝে জলাকীর্ণ বেঞ্চি পাতা। অসংখ্য যাত্রীর অসংখ্য বাক্স ডেক্ক তার পদতলে সাজানো, দারুণ একটা ঠাণ্ডা এবং জোরালো হাওয়ায় সেখানে কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে। ভাবলাম, এখানে যদি কিছু হয় তবে কি মানুষের গায়ে বা জিনিষের উপর লোকে বমি

করবে? তবে দেখে আশ্বস্ত হলাম যে সবাই বেশ সানন্দে ঘুরছে-ফিরছে বা বসে আছে। খবর পেলাম, নীচে ঘর আছে এবং সেখানে অসুস্থ মানুষেরা শোয় বসে।

নীচে গিয়ে দেখলাম, জন কয়েক ইউরোপীয় মহিলা বিছানায় 'প্রাণ যায়—প্রাণ যায়' মুখ করে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। জাহাজটা বিশেষ কিছু দুলছিল না, মাঝে-মাঝে একটু গা-ঝাড়া দিচ্ছিল মাত্র। এর চেয়ে আমাদের বঙ্গোপসাগরের জাহাজ অনেক কসরৎ করে। তাতে ত দিক্‌চক্রবাল প্রভৃতি মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করে মর্ত্ত্য থেকে স্বর্গ এবং স্বর্গ থেকে পাতালে চলে যায় মনে হয়। আমরা কিউ দিয়ে পাশপোর্টে ছাপ দেওয়াতে না দেওয়াতে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সের একটা জীর্ণ বন্দরে চলে এলাম। তার পর খানিক ট্রেণে চড়েই প্যারিস।

ট্রেণে আসতে-আসতে দেখে খুশী হলাম যে, আমাদের ভারতবর্ষের মত ফ্রান্সেও পানা পুকুর ডোবা আর ঝোপ-ঝাড় কিছু-কিছু আছে। ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য এর চেয়ে অনেক সাজানো। কোনো জায়গা দেখে সেখানে মনে হত না যে, মানুষ এটাকে মেজে-ঘষে কেটে-ছেঁটে সাজিয়ে রাখেনি। ফ্রান্সের ট্রেণ এবং সাধারণ ষ্টেশনগুলোও আমাদের দেশের মত কালি-ধূলো-মাখা, ময়লা রঙের। ভাবলাম, একটা দরিদ্র দেশ দেখব এবার।

বিকেলে প্যারিসের ষ্টেশনে পৌঁছে সত্যিই তাই মনে হল। কালো মত একটা ষ্টেশন, Liverpool বা London এর ষ্টেশনের মত লোকের ভীড় নেই, চার ধার চক্‌চক্ করছে না। একটু দুঃখিত মুখ করে embassyর গাড়ী চড়ে হোটেলে এলাম। পথের ধারের বাড়ীগুলোর architecture পুরানো ধরণের। তাতে একটু ভরসা পেলাম।

হোটেলে এসেই মনে হল এদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও কায়দা-কানুন জ্ঞান আছে। ছোট্ট হোটেল, কিন্তু চার ধার বড়-বড় আয়নায় মোড়া, নিজের ছায়া কোন্‌টা আর স্বয়ং কোন্‌টা বার বার ভুল হয়। হোটেলের কর্ত্তা ইংরাজী বেশ বলেন, এবং দু'মণী বাক্সও অনায়াসে টেনে ঘরে নিয়ে এলেন। আমাদের কিছু ছুঁতে দিলেন না, সবই নিজে করলেন। ছোট একটা lift আছে, তাতে মানুষের চেয়ে জিনিষই বেশী ওঠে। ঘরগুলির আসবাবে রুচিজ্ঞান আছে। ছেঁড়া চাদর বা ভাঙা বাতি কোথাও নেই। প্রতি ঘরে আলাদা-আলাদা টেলিফোন এবং প্রতি ঘরের সঙ্গে আলাদা স্নানের ঘর। ইংলণ্ডে যে দুটি বাড়ীতে ছিলাম, তাদের সারা বাড়ীতে একটা স্নানের ঘর। বাতিগুলো যেমন-তেমন করে cord দিয়ে ঝোলানো।

কোকো আর রুটি খেয়ে রাত ৯টার সময় প্যারিসের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে বেরোলাম। একটু আগে যে কালো ময়লা ষ্টেশনে নেমে ভীড়ের অভাব দেখে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম, সে স্মৃতিটা কোথায় তলিয়ে গেল। বিখ্যাত Avenue Deschamp Elysees এর রাস্তা। আলোয়-আলোয় ঝলমল করছে। পথে যতখানি হাঁটলাম দু'ধারে একবিন্দু স্থান খালি নয়, সর্ব্বত্র গাড়ী দাঁড়িয়ে। এক জায়গায় এত গাড়ী কোনো দিন দেখিনি। আমাদের দেশ হলে বলতাম চার-পাঁচটা [illegible] বাড়ীর বিবাহ-উৎসব একত্রে চলেছে। থিয়েটার, Bank, C[illegible], Bar, গাড়ীর দোকান, কাপড়, গয়না আর সুগন্ধি (scen[illegible] দ্রব্যের দোকান কত বিচিত্র করে যে সাজিয়েছে, তার ঠিক নেই। Airways এর বিজ্ঞাপনে এরোপ্লেনের মডেলে ভিতর পর্য্যন্ত দেখাচ্ছে। মানুষকে আকর্ষণ করবার ফন্দি যত রকম হতে পারে সব এদের জানা আছে। নানা দেশের ছবি ঘরে-ঘরে যাচ্ছে পথিককে দেশ-ভ্রমণে ডাক দেবার জন্য। সুবিস্তীর্ণ এভিনিউটির এক দিকে নেপোলিয়নের Triumphal Arch, অন্য দিকটা আরও চওড়া হয়ে দু'ধারে বাগানের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। এত চওড়া রাস্তা, দু'সারি গাছের মধ্য দিয়ে অথচ ব্যবসাদারী সব দোকানপাট সমেত, বড় দেখা যায় না। যিনি এই রাস্তার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর ক্ষমতা সামান্য নয়। দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির পর যখন পথের দু'ধার বাগান হয়ে গিয়েছে, ঘন পত্রবহুল সারি-সারি গাছের গুঁড়ির তলা দিয়ে ঘাসের জমি ও ফুলের কেয়ারির আশে-পাশে মানুষ, গাড়ী, ছেলেপিলে ঘুরছে—তখন মনে হচ্ছে আর একটা কোন স্বপ্নলোকে এলাম! কাছে-কাছে ধাবমান অশ্বারোহী প্রভৃতির মূর্ত্তি-সমন্বিত সুন্দর সব বাড়ী। কি সেগুলি জানি না। দেখতে সত্যই সত্যিই সুন্দর। কিন্তু আমার আশা ও কল্পনা বোধ হয় অনেক বড় ছিল। কোনোখানেই মনে হচ্ছে না যে আশাতীত কিছু দেখলাম। কেবলি মনে হয়, আমাদের দেশ এমন করা কিছু শক্ত নয়।

Seine নদীর উপর দিয়ে সারি-সারি সেতু। আমরা একটা পার হয়ে ঈফেল টাওয়ার দেখতে গেলাম। সেটা অদ্ভুত বড় জিনিষ। তৈরী করতেই দু'বছর লেগেছিল। lift করে বা সিঁড়ি দিয়েও চড়া যায়। দোতলায় Lift করে উঠতে আধ ঘণ্টা কিউ করে

দাঁড়াতে হল। দোতলার উপর দোকান, কাফে, বাগান এবং আরও অনেক ব্যবস্থা আছে। সেখান থেকে সারা সহরের সীমানা পর্ব্বতমালা বেষ্টিত দেখা যাচ্ছে। এরোপ্লেনে চড়লে এর চেয়ে ভাল দেখাবে না, তবে আরও ছোট দেখাবে পার্থিব জগৎকে।

এ দেশের মেয়েদের এবং ছেলেদেরও মোটের উপর চেহারা ভাল। খাঁটি ফরাসী চেহারা কোন্‌টা ঠিক বলতে পারি না। তবে আমার যতটা মনে হয়, খুব পাতলা ঠোঁট এবং খুব চাঁছা সরু নাক এদের বিশেষত্ব। সরু ছাড়া একটু মোটাও যাদের নাক, তাদেরও সকলেরই মুখের পক্ষে নাকটা একটু বেশী বড়। একটু সামনে এগিয়ে আছে। এক সময় আমাদের বাড়ীতে কলকাতায় এক জন ফরাসী মহিলা অতিথি ছিলেন। এঁদের অনেককেই দেখে মনে হয় যেন সেই মহিলার মাসতুতো বোন।

আমাদের দেশে যত বিদেশী লোক যায়, এ দেশে তত হয়ত আসে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেদের একটা গুণ আছে যে, কারুর দিকেই তারা দশ মিনিট ধরে তাকিয়ে থাকে না। নূতন রকম লোক দেখলে একবার তাকিয়ে দেখে যে-যার কাজে চলে যায়, অন্তত ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা। এখানে রাস্তায়-ঘাটে সর্ব্বত্র লোকে আমাদের দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকে যেন আমরা মানুষ নই, হয় কোনো curiosity অথবা অন্য কোনো জীব। আমরা মেয়েরা ভারতীয় পোষাক পরি বলে এটা আরও বেশী হয়। সবাই স্মিত হাস্যে ঝুঁকে পড়ে আমাদের দেখে, চোখে চোখ পড়লে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না, বা মুখ ফেরায় না। আমরা চেনা লোক দেখলে বা বিবাহের মিছিল যাচ্ছে দেখলে যেমন সহাস্যে তাকিয়ে দেখি, এরা তেমনি করে আমাদের মেয়েদের দেখে। বড়-বড় দামী গাড়ীর আরোহীরাও এই ভাবে দেখে। রাত্রে অসভ্য লোকেরা একটু ডাকাডাকিও করে।

এ দেশের মেয়েদের দেখে মনে হয় না ইংলণ্ডের মত অত মেয়ে খেটে খায়। কারণ এখানে সবাই আর একটু সাজ-সজ্জা করে হাঙ্কা ব্যাগ নিয়ে ঘুরছে দেখি। তবে সকাল বেলা খাবারের দোকানে বড়-বড় ব্যাগ হাতে খাবার কিনতে গৃহিণীরা খুব ভীড় করে। ছোট মেয়ে বেশী নয়, অধিকাংশই বয়স্কা। মাছ, দুধ, তরকারি, রুটি সবই মেয়েরা বিক্রী করে এবং হিসাব করে পয়সা নিয়ে রসিদ দেয়। ঘোড়ার গাড়ী হাঁকাতেও মেয়েকে দেখেছি।

এখানের Tube Railway অর্থাৎ মাটির তলার রেলগাড়ী লণ্ডনের চেয়ে ময়লা এবং বেঞ্চে গদি নেই, অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণীতে। Bus Londonএর তুলনায় অনেক কম, মানুষ বেশীর ভাগ মোটর গাড়ী, Cycle এবং পায়ের সাহায্যেই চলছে দেখি অন্তত মাটির উপরে। পথে ঘোড়ায়-টানা ফিটনের মত গাড়ী কিছু-কিছু দেখি যা Londonএ একটাও দেখিনি।

[ক্রমশঃ।

গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

৺কৈলাসবাসিনী দেবী

উই ১২৬৫ শাল কার্তিক মাশে ১৩ তারিকে বৃহস্পতি বারে বাবুর কর্ম্ম জায়। তাহাতে কতো দুঃখিত হইলাম তাহা লিকিবার আবশ্যক নাই। বড় হয় জখন মানুষ, তাহা জে কি করে হয় তাহা জানিতে পারে না। কিন্তু জখন ছোটো হয় তাহা ভাল করে জান্তে পারে। কিন্তু আমার স্বামির লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইলো। এই বচর আস্বিন মাশে আকাশে ধুমকেতু উঠে, আশ্বিন মাসে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। ১৭ কার্তিকে ইংরাজি ১ তারিকে নবেম্বর মাসে ভারতভূমি খাসে হয়। সোমবার কোম্পানির ইজারা গেল, কোম্পানি বাহাদুর নাম গেল। আর আমার স্বামির রায় রায় বাহাদুর নাম গেলো,—৪ দিন অন্তর। কোম্পানির রাজত্ব একশো বচর আর একবচর চার মাশ ছেল। আমার স্বামি বড় দুঃখিত হইলেন মিনি দোষে ছাড়ালে। আমি বলিলাম কেন দুঃখিত হও, চির কাল কিছুই নয়। দেকো ডিল্লির বাদশার কি হল, তাঁকে যে লোহার পিঞ্জরা করে বিলাতে পাঠালে, তিনিও তো কতো সুকে ছেলেন! তোমার বাড়ি আছে ঘর আছে, খাবার ঠিক আছে। তোমার অদিক ছেলে নাই। এক কন্যা তাহারো বিবাহ দেছ। জাকে দেছ, তার ভার তুমি পারো ভাল না পারো তাতেও তোমার কোন ক্ষেতি নাই। আর আমি তোমাকে কোন কষ্ট দেবো না। এখানে থাকিতে জদি কষ্ট বোধ হয় না হয় কোন দেশে জাবো। সামান্যভাবে থাকিবো, নির্জ্জনে জগদিশ্বরকে ডাকিবো, তাহাতে পরম পদ পাইবো, এ সামান্য পদের জন্যে দুঃখিত কেন হও। আমাকে এত শিল্প কর্ম্ম শিখায়েছ তাহা নয় কাযে নাগিবে। বাবু বললেন, তোমার কথাতে আমার বড় সাহস হল। আমি জতখোন থাকিবো এ পৃথিবিতে ততখোন তোমায় কোন কেলেশ দিবো না। আমি জদি রাস্তাতে পাতোর ভাঙ্গি তবু তোমায় কষ্ট দেবো না। কিন্তু আমি পরম আমোদিত হইলাম তোমার সাহস দেকে। আমি আমার জন্যে কখন দুঃখিত হই নাই। কেবল পাছে তোমার কোন কষ্ট হয় তাহা আমি কেমন করে দেকিবো। তোমার কথাতে জানিলাম যে তুমি আমার কর্তে সাহসি, আমার কর্তে বুদ্ধিমান, আমার কর্তে তোমার সহ্য গুণ বেশী আছে। ইহাতে আমার সকল কষ্ট গেলো। সাল ১২৬৮ ১০ চইত্র ইং ২২ মার্চ্চ শনিবারে রাত্র ১১টার সময় আমার একটি দৌহিত্র সন্তান হইল*। তাহাতে পরম আহ্লাদিত হইলাম। জগৎ-পিতাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিতেছি। আজ যে আমি কি সুকি হইলাম তাহা বলিতে পারি না। আর খোকাটির তার মার চেহারা অনেক হইয়াছে, ইহাতে আমি আরো সুকি হইয়াছি। আমার পুত্রশোক অনেক নিবারণ হইয়াছে। আজ জদিও আমার জামাতাকে পুত্রের ন্যায় ভাবি। আর মনে করি আমার দুইটি হইয়াছেল, এখন সেই দুইটি। তার কর্ত্তে এতে মন আরো সুকি হইল তার কারণ আমার খোকার শরিরের ভাব এর গায়ে অনেক আচে। তাহাতে আমার বড় ভালবাসা হইল। আমি কতো দিন খালি কোলে ছিলাম কোলে মনের মতন ধোন পাইয়া পরম আলাদিত হইলাম। বাবু বড় ছেলে ভালবাশেন কিন্তু আমাকে কখন বলেন না। তার কারণ পাচে আমি মনে কোন দুঃখু করি, পাচে আমার পুত্রশোক পরবোল হয়। এ জন্যে বলতেন জাহাই আছে তাই ভাল। বড় ২ লোকের, হয় এক কন্যা হয়, নয় এক পুত্র হয়, অধিক প্রায় হয় না। একদিন বলেছেলেন আমার ছোটো ছেলে নে শুইতে ইচ্ছা হয়। আমি বলেছিলুম জে বিবাহ করো তা হলে ছেলে হবে। তাতে তিনি বলেন শে ছেলেতে কি হবে, তোমার গর্ব্ভসংশ হলে তাকে আপনার

* নাম—শরৎচন্দ্র।

শুক্‌নো হাওয়ায়...
বা জোলো হাওয়ায়...
Erasmic
HIMALAYA BOUQUET SNOW
আপনি যেখানেই থাকুন...
হিমালয় বুকে স্নো
ব্যবহার করুন

ছেলে বোধ হবে কেন ? তাহাতে আমি বলেছিলাম তবে চুপ করে থাকো. কুমদের ছেলে তোক কাচে শোবে। আজ তাই হইয়াছে। আমাকে বল্লেন ছেলে নে আমার কাছে শোও আমার শেই শাদ আজ পরিপূর্ণ হোক। এই ছেলে আঁতুড় অবধি আমাদের কাচে থাকে. আমাদের ছেলে জেন ॥ ১২৭১ এই শালে ১৭ ভাদ্ররে আমার একটি দউত্তুরি (দৌহিত্রী)* হয় আমাবশ্য তিথিতে বৃহস্পতিবারে ॥ ১২৭৩ এই সালে ১৬ ফাল্গুন অষ্টমি তিথিতে আরেকটি দুউতুরি হয় বুদবারে হয়† ॥ ১২৭৫ এই সালে আমার দ্বিতীয় দউত্তুর (দৌহিত্র)‡ হয় ৮ মাগ বুধবার ভিস্ম অষ্টমি রাত্র ৫টার সময় ॥ এই ১২৭৬ বৈশাক মাশে আমার বড় নাতিনী জায়। জে'তে আমি কতো দুঃখিত হইলাম তাহা কহা জায় না। আমি শর্ব্বদা অশুক থাকি। একদিন আমার ভগ্নি বল্লেন আমরা কাশি জাবো আমি বলিলাম শেখানে কদিন থাকিবে। তিনি বল্লেন ১০ কিম্বা ১২ দিন। তাহাতে আমি বলিলাম আমার বড় জেতে ইচ্ছা করে. আমি তো বেশি দিন থাকিতে পারিব না. এই শঙ্গে হলে ভাল হয় আমি বাবুকে বলি. তিনি কি বলেন. জদি জাইতে বলেন তা হলে আমিও জাব। রাত্র বাবুকে বলাতে তিনি বলেন জদি শেজো দিদী জান তাহাতে পাটাতে পারি, আর বেশি দিন হবে না. আচ্ছা যেও। কিন্তু দেরি করো না। আমি বলিলাম জে দেরি হবে না. তাইতো জেতে চাইতেছি। তার পরদিন যাওয়া। খোকাকে অনেক পুতুল ও টাকা দিলুম। আর বলিলাম অনেক খেল্লা আনিবো। শে এখন ৭ বচরের। খেল্লা বড় ভাল বাশে তাহাতে আর কিছু বল্লে না। কেবল বল্লে কদিন হইবে, আমি বলিলাম ১০ দিন, সে বলে আচ্ছা যাও। আমি দাদা বাবুর কাচে থাব, কাচে থাকিবো। আমার কুমুদ বল্লে জাও কিন্তু আমার জামাতা বল্লেন জাওয়া হবে না। এখন বড় ভিড়। আমি বলিলাম বাছা তুমি আর বাধা দিও না, কতো করে বাবুকে আর খোকাকে রাজি করিয়াছি। আমি একবার ওদিক দেকিবো—আমার বড় শাদ হইয়াছে। তাহাতে তিনী বলেন শরত [বড় দৌহিত্র] তুই আজ বাড়ি থাক, তুই কাঁদিলে মা জেতে পারিবেন না। তাহাতে খোকা বল্লে আমি কাঁদবো না। মা আমার জন্যে অনেক খেল্লা আনিবে. আমি মাকে জেতে দেব। তিনি আর কি কারবেন, আমার জাওয়া হল. হাবোড়াতে সন্ধে ব্যেলা পৌচাই ॥ এই সালে কাশি জাই ১২৭১। আমার জামাতা জাহা বলেছেলেন তাই হইল। একাগারে নোকে নোকারণ্য। একেবারে ইষ্টেশেন ঘর পুরে গেচে। আমাদের শঙ্গে লক্ষ্মীমান বলে একটি মেয়ে জান। তাঁর ভাই শেই ইষ্টেসেনে কর্ম্ম করেন। তিনি আমাদের ভাল ঘরে বশালেন। তিনি অনেক চেষ্টা কল্লেন পাসের জন্যে কোনমতে পাইলেন না। শেদিন জে কি ভিড় তাহা বলা জায় না। মাগ মাসের ৪ তারিক জতো রাজা কলিকাতাতে জমা হইয়াছেন। ডিউক এশেচেন বলে তারা শোদন কতোক ২ জাবেন। লক্ষিমনীর ভায়ের নাম শ্রীউমাচরণ। তিনি বল্লেন আর এখানে কি হবে, আমার বাশাতে সব চল। তাহাতে আমার বাড়িতে আশিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাঁরা বল্লেন ফিরে গেলে শকলে হাসিবে। কেউ বলিবে পরসাদ দাও, কেউ বলিবে কেমন দেকিলে। কাল জাওয়া হবে তায় কি। কাযে ২ জাইলাম। আমাদের জাঁরা রাকিতে গেছেলেন তাঁরা ফিরে এলেন। আমরা তিন চার গাড়ি বোঝাই হএ তাঁর বাশাতে অতিথ হইলাম। তিনি বড় ভদ্রনোক। আমাদের খুব আদোর কল্লেন আমার স্বামিকে শকলেই জানেন. আমার জে ননদের শঙ্গে গিছিল তিনি খুব মান্য নোক। আর.শব তাঁর মামি তাঁর বোন তাঁর শাশুড়ি আর আমাদের নোকশকল আছে। শেই দিন লাক্ষিমনির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। ওই দলের মধ্যে তিনিই শর্ব্ব কিন্তু একটু বাচাল। তাহার এই দোশ জদি না থাকিতো তা হলে বড় চমৎকার নক হতেন। তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি বড় ভাল আর মন বড় ভাল। তিনি জদি নব্য বাবুদের হাতে পড়তেন, তা হলে অদ্বিতীয় স্ত্রীলোক হতেন। কিন্তু কপালক্রমে প্রাচীন স্বামির হাতে পড়েছিলেন। এক্ষণে তিনি বিধোবা। তাঁর একটি পুত্র সন্তান ৬ মাশের নে বিধবা হন। কিন্তু নেকাপড়াতে খুব উৎশাহ। আর খুব সভ্য। তাঁতে আমাতে অনেকখোন হাতে বশে বহিলাম. আর ভাল কথা হতে নাগিল। আর সকলে ঘরে বশে রাহলেন. মাঘ মাশ প্রাচীনদের বড় ভয়, তাঁরা হিম নাগালেন না। শেদিন শুকুলে পক্ষের তেরাদশি, খুব আলো। আবার সে বাড়িটি গঙ্গার ধারে। আমাদের খুব আরাম হল। শারা রাত্র ঘুম হল না। শবাই ছেলে ছেড়ে জাওয়া গেছে, গোলেমালে শে রাত্র কেটে গেল। বাশার বাবুরা আরেক বাড়িতে গে শুইলেন। শে বাশাতে দুটি মাত্র ঘর আমরাই যোড়া করে রহিলাম। কিন্তু তাঁরা বলে গেলেন জে, আমরা রাত্রে তিনটের সময় আসিব তোমরা তয়ের থাকিবে, তা না হলে গাড়ি পাবে না। তাই হল, ভোরের গাড়িতে ওঠা হল। এক টেরেনে জেতে হল। তা না হলে গেরোণে নাওয়া হয় না। সেদিন চতুর্দশি. তার পরদিন গেরণ, একদিন হাবোড়াতে গেল। কিন্তু ভিড় জে তাহা বলা বাহুল্য। কেন না ডিউক জাচ্চেন, আবার দুইটি যোগ—কাশিতে গেরণ আর পইরাগে কুম্ভের মেলা। তাহাতে জে কি কাণ্ড তাহা বলা যায় না। আমরা ডিউকের পেছন ২ জাইতে লাগিলাম। তাঁর গাড়ি শাটিন ও মকমলে মুড়িয়াছে, ঝাড় ও দেলগিরি দেছে, আর সকল ইষ্টেশেন আলোময় হইয়াছে। সব গেঁদার মালা দেছে, তাহাতে বড় শোভা হইআচে। আমরা জখন কাশি পৌচাই তখন রাত্র ৮টা কি ৯টা। আমরা নৌকাতে পার হতে লাগিলাম। আর ক্রশি (?) দে ডিউক পার হতে লাগিলেন। একে পূর্ণিমার রাত্র তাহাতে আলোয় আলোময় আহা কি শোভা। জেন শারি শারি দিপমালা। শুনিয়াছিলুম জে সোনার কাশি, তাহা আজ যথার্থ হইয়াছে। আহা গঙ্গার মাঝখানে জখন নৌকা গেল, তখন দেকিতে কি চমৎকার হইল। একতোলা থেকে তিনতোলা চারতোলা ওবদি আলো দেছে। আর জরির শাড়িতে নিশান দেছে। আর নানান রকমের আলো দেছে। রংবিরংয়ের আলো কেয়ারি করে দেছে আর মালা গেঁতে দেছে। এ আলো কলিকাতায় অনেক দেছেল কিন্তু গঙ্গায় আলো বড় চমৎকার। তাহা আগে দেকে আমি মনে করেছিলাম জে রেলে বশে আমার গা ঘুরচে তাইতে বুঝি এমন দেকিতেছি, কিম্বা তারার ছায়া

---

* নাম—জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী ; পাঁচ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হয়।

† নাম—সুরবালা। পরে অতুলচন্দ্র ঘোষের পত্নী ও মন্মথনাথ ঘোষের মাতা।

‡ নাম—সতীশচন্দ্র

বুঝি জলে পড়িয়াছে। কিন্তু জখন জলে নাইতে নাবিলাম তখন ধরে দেকি শোলার ফুল তার নিচাতে কি দেছে উপরে তেল দে আলো দেছে। আর মনিকনিকার ঘাটে বজোরা বাঁধা রহিয়াছে, তাহা শাটিনে মুড়া, মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে গোছ ২, তাহা বিলতি কি শাঁচ্ছা তাহা বলিতে পারিনে। তাহাতে ডিউক বসে নায়া দেকিবেন। উপরে জরির চন্দ্রতোপ দেছে যাহাতে নানান রকম কাজ রহিয়াছে। আমরা স্নান করে বিশ্বেশ্বর দেকে বাসাতে গেলুম। কিন্‌চিত্‌ আহার করে শুইলাম। দুই দিন বসে এক নৌকেনে জাওয়া. রাতে নাওয়া তায় মাঘ মাশ. একাবারে শিতে কষ্টে মৃতের ন্যায় হইলাম। কত করে তার পরদিন উটিলাম॥ শেখানে ৪ দিন থেকে পইরাগে (প্রয়াগে) জাই। শেখানে শকলে কল্পবাসে থাকেন। আমাতে লক্ষিমনীতে বাশাতে থাকি। আমাদের দুই জোনে বড় ভাব আমরা শব্বদা এক ঠাই খাওয়া এক ঠাই শোওয়া. আর গল্প-শল্প হইতো। শেই সময় মৃনালিনী * নতুন পড়া হইয়াছেল। কখন গিরিজায়ার বিছানা জলে ফেলা. কখন মনরমার ঘাটে চুল শুকান. এই কথা আমাদের শব্বোদা হইতো। আর শকালে ঘাটে গে ঠাকুর দেকা হইতো। কিন্তু তিনি এক ২ বার আপনার কেরামত ছাড়িতেন না ব্রাহ্মিকা বলে ডাক কর্তেন। কিন্তু জখন ইষ্টি কবচ পূজা কর্তেন তখন আমাদের পূজা হয়ে যেত. তবু তাঁর হতো না। আমি বড় রাগ করিতাম জে আমাদের সবায়ের হল. আর ব্রাহ্মিকার জ্বালাতে শীতে মলুম একি আপদ, এর জে ইষ্টি কবচ পূজা হয় না. তাহাতে তিনি হাশিতেন॥

আমি জখন তাঁকে বকিতাম তখন তিনি হাশিতেন। জানিতেন জে আমি তামাশা করি। কিন্তু এই দুঃখ্ জে তিনি কোন সৎ বিদ্বানের হাতে পড়েন নাই। জেমন এক একটা বিচি অমনি পড়ে গাচ হয়—হয়ে তাহাতে অনেক ফল হয় এও তাই হইয়াছে। আমাদের জে হওয়া তাহা অনেক যত্নে মাটির পাট করে জল দে হওয়া, কিছু আশ্চর্য্য নয়। আমার মন জেমন উব্বরা, তখন অমন লোকের হাতে পড়িছি, এমন করে শিক্ষা দেছেন, তন্ন তন্ন করে বুঝায়ে দেছেন, তাহা শুনে নিতান্ত মুর্খ্যেও জ্ঞান হয়। কেন হিন্দুরা এই সব নিয়ম সৃজ্জন করেছেন. তাহার মাহাত্ম্য আছে। একটি নিয়ম লিখি। একাদশিটি ষেটি ছোটো ঘরে নাই. কেবল ভদ্র ঘরে কেন? তার কারণ শরিরে কষ্ট দিতে বিধবাদের তেজ কামবে তা হলে সতীত্ব অনায়াশে থাকিবে, একাহারে নানান কষ্ট করিবে। বেশ বিলাষ করিবে না, তার কারণ আছে। তা হলে কেউ চেয়ে দেকিবে না। জদি বল সধবারা স্বামি ভিন্ন কি আর কারুর কাচে জায় না? জায়, তাদের বলিতে কারুর সাহস হয় না। খালিঘরে জেতে শবার শাহস হয়। এখানে বিধবাদের সব বারন করিআছে. সতীত্বের কর্তে ধর্ম্ম জগতে নাই। দেখ পুরানে কোরানে বাইবেলে সবেতে সতীত্বের মান্য। জেখানে ভারতবরষে পুনু বিবাহ চলিত নাই কাজে ২ এই নিয়ম চলিত হইআছে। জদি সতীত্ব রাকিতে পারে তাহলে ধর্ম্ম রাকা হল। এ নিয়মে ধর্ম্ম জয় না ও থাকেও না। সতীত্ব স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। সতীত্ব মান্য. সতীত্ব হচ্ছে আশল ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম থাকিবে বলে এই কষ্ট বিধান হইয়াছে। অনেক পাপ না দেকালে নোকে মানিবে কেন। মদ্য মাংস খাওয়া বারন কেন? আমাদের এই দেশ বড় গরম খেলে অশুক হয়। এই রকম জাহা ২ বারন তার কারন আছে। বিজ্ঞ লোকে ঠিক করে নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করেছেন। আর তাঁরা জানতেন একমেবাদ্বিতীয় ওঁ জেনেও পুতুল পুজার সৃজ্জন করেন, তার কারণ এই, নির্বোধ বানর মানুষ অনেক আছেন তারা ক্রমে নাস্তিক হইতে নাগিল। তারা বলিতো জাঁর হাত নাই পা নাই নিরাকার তিনি আমাদের কি করিবেন, এই শকলে বুঝিতে নাগিল। তাইতে নানান মূর্ত্তি দেবতা সৃজ্জন হইল, পুজাদির বিধান হইল। কিন্তু জারা শকল ধর্ম্ম পাঠ করেচেন তাঁরা এক রকম নির্ণয় করেচেন। কিন্তু যথার্থ নিরনয় কেউ কর্তে পারে নাই। কিন্তু এখনকার ছোঁড়াগুনর কাণ্ড দেকে তাহাদের উপরে ঘৃণা হয়। তাঁরা এক জগদিশ্বর মানিবেন আর মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা অপহরন জাল এইগুলি অনায়াসে করিবেন। আর নোকের কাছে বলিবেন, ওরা নাস্তিক একদিন সমাজে জেতে দেক নাই। তারা সমাজের কুলাংগার হইয়াছে বলে জতো ভদ্রলোক সমাজ পরিত্যাগ করিআছে। শে সকল নোকের কর্ত্তেও জাঁরা পুতুল পুজা করেন তাঁদের সংগতি হবে। কেন না জথার্থ ধর্ম্মে জাঁরা থাকেন তাকে ধর্ম্ম বলা যায়, এক জগদিশ্বর মানুন আর পুতুল পুজাই

* বঙ্কিমচন্দ্রের।

করুন। যথার্থ ধর্ম্মো বলে, সেই পরম পিতার হুকুম রাকা। তাঁর নিয়ম রাকিলেই তাঁর আরাধোনা করা হয়। তাঁর নিয়মের বিপরিত কাজও করে সমাজে গেলে কি হবে। তাহার একটি সামান্য কারন তোমাকে বুঝায়ে দিই। আমি তোমাকে বারন করিলাম যে তুমি ছাতে জেও না, তুমি জদি না যাও তা হলে আমি কতো সন্তুষ্ট হইবো, আমার সেবা করো আর না করো। আর জদি আমার কথা না শুনে ছাতে যাও তাহাতে আমার কতো রাগ হবে, তুমি হাজার আরাধোনা কল্লেও আমার রাগ জাবে না। কিন্তু আমার কথা শুনলে আমি সন্তুষ্ট হইব, তাহাতে আরাধোনা করো আর না কর। তেমনি তাঁর নিয়ম রাকিলে তাঁকে মান্য করা হয়, ভয় করা হল ভক্তি করা হইল। তাঁর নিয়ম মিথ্যা কথা কবে না, নোককে অনর্থক কটু কথা বলিবে না, গুরুনোককে মান্য করিবে, বয়সের ছোট জারা তাদের সন্তানতুল্য দেকিবে, অকপট বন্ধু হইবে, কারুর মনের কথা কাকেও বলিবে না। এক জোনের কথা জদি এক জোনকে বল, তা হলে শেও বিশ্বাস করিবে না, মনে মনে করিবে এর স্বভাব এই রকম॥ নানান উপদেশ দেন, আমার কাচে শর্ব্বোদা থাকেন, কিন্তু ফালতো কথাতে কাটান না। জ্ঞানের কথা, আইনের কথা, সকল দেশের শব ভাল কথা। আমার কাচে বশে কাগচ পড়েন, আমাকে শব বুঝায়ে দেন, জত বই পড়েন তাহা বুঝায়ে দেন। আমিও শুনিতে বড় ভালবাশি, মনের শহিত শুনি। আর আমি যে তাঁর কথা গুলি ভালবাশি তাহা তিনি জানেন। আহা আমার লক্ষি মনিকে জদি কেউ এরকম করে বুঝায়ে দিতেন, তাহলে তিনি বঙ্গভুমি উজ্জ্বল কর্ত্তেন তার কোন সন্দ নাই। তাঁকে আমি মনে ২ ভালবাশি তাহা তিনি জানেন। আমাকে ছাড়া থাকেন না আমিও তাঁকে ছাড়া থাকি না! আমাদের তীর্থ করা শেষ হইল, বাড়ি আশিলাম।

১২৭৭ এই শালে ৭ মাঘ শনিবার অরুণ উদয় সপ্তমিতে আমার আরেকটি দউত্তুর * হইল। এই ছেলেটির আমার ছেলের মতন অনেক আদোল হইয়াছে। এ জন্য বাবু একে বড় ভাল বাসেন, আমিও বড় ভাল বাশি। এইটি আমার তৃতীয় দউত্তুর॥

* * * *

সন ১২৭০ সালে শ্রাবোন মাশে ৬ তারিকে মঙ্গলবার আমার স্বামি কুচবিহার জান সেখানকার রাজা নে জান। ৪০০ টাকা মাহিনা বলে। ১০০০ হাজার টাকা পথ খরচ পাটায়ে দেন। বাবু এক মঙ্গলবার ছাড়েন আরেক মঙ্গলবার পথে থাকেন। ফিরে মঙ্গলবার সেখানে পৌছান। তারি চার দিন বাদে শুক্রবার মহারাজা প্রাণ পরিত্যাগ করেন। আহা আমাদের ভুপালের অতি নব্য বয়েশ, তাঁর ২২ কি ২৩ বৎসর বয়েশ! আহা কি দুঃকু, কি পরিতাপ, তিনি অকালে কালের হাতে পতিত হলেন। রাত্র ১১। টার শমায় জখন তিনি পরলোকে গমন করেন, তখন তাঁর ২ পুত্র এক কন্যা। প্রধানা রানির কন্যা আর দুই রানির দুই পুত্র। জদি এক রানি হতো তা হলে তিনটি সন্তান সন্ততি হইতো না। কন্যাটি তিন বৎশরের, পুত্র একটি দুই বৎশরের, আরেকটি ১০ মাসের। সেই কনিষ্ট পুত্র রাজা হলেন। আশ্বিন মাশে আমার স্বামি এলেন ৬ তারিকে। তাঁকে ওকালতি কর্ম্ম দেন। ১০০ শো টাকা মাহিনা দেন। আশা শোটা দুই জোনের ১৩ টাকা মাহিনা আর এক জোন কেরানির ১২ টাকা।

সন ১২৭১ সালে এই শালে ভাদ্র মাসে ১৮ তারিকে আমার একটি দৌহিত্রি* হয় বৃহস্পতিবারে। এই সালে আশ্বিন মাসে পূজার পঞ্চমির দিন বড় ঝড় হয়।

* * * *

এই ১২৮০ জষ্টি মাশের ২৪ শনিবারে আমার আরেকটি দৌহিত্র† হইল। এখন আমি শামবাজারে। বাবুর বড় অশুক হইয়াছে এ জন্যে আমরা শকলে এখানে আশিয়াছি, ২৩ তারিকে বৈকালে আশি। ২৪ তারিকে খোকা হয়। শ্রীশ্রীজগত পিতার কৃপাতে এই দায়ে থেকে মুক্তি হইলাম। এখন বাবু ভাল হইলে তবে শকল শুক হয়। আমি জেমন এখানে আশিয়াছি শব ছেড়ে, দশ মাশের পোয়াতি নে কতো কষ্ট করে, আমার জেন এই কষ্ট জগতপিতা সার্থক করেন। বাবুর অশুক হইয়াছে ফাগুন মাশের সংক্রান্তি দিন। এই পর্য্যন্ত ভাল করে ভাল হন নাই। আমি ফাগুন মাশ অবদি মরে আছি। দুইটি ভাবনাতে আমার শরির জর ২ হইতেছে। একটি দায়ে থেকে উদ্ধার হইলাম। আর আহা শকল বিপদ থেকে কবে মুক্তি হইবে, এমন দিন আমার কবে হইবে, তা হলে আমি কতো শুকি হইব। এমন দিন কি আমার হইবে, তাহা জগদিশ্বর জানেন আমি কেমন করে জানিব। এই চার মাশের মধ্যে আজ ঘণ্টা দুই শুকি হইলাম। আবার ঘরে এশে বাবুকে দেকে আমার শে শুক জাইল। আমি খাচ্চি ও কথা কচ্চি, হাশির কথা পড়িলে হাসিতেছি কিন্তু আমাতে আমি নাই। কি করে জে রাত্র দিন জাচ্চে তাহা আমি জানিতে পারি না। হে পাঠক ও পাঠিকাগণ আজ আমার বই শেষ হইল। আজ আমার জিবোন শেষ হইল। আজ শ্রাবোন মাসের ২৪ তারিক শুক্লপক্ষের তেরোদশি, আজ বুদবার আজ ঝুলন জাত্রা রাত্র ১১ ঘণ্টার শময়ে আমি ঐহিকের সুখে জলাঞ্জলি দিলুম। আমার জিবন থাকিতেও মৃত্যু হইল। শকল সুকের শেষ করিলাম কাসি মিত্রের ঘাটে। আমি শামবাজারে গিয়েছিলাম—সুখের ব্রতো উদ্যাপন করিতে। আমি কি পায়ান, আবার আমি কেমন করে বাগানে আশিলাম, তাহা আমি জান্তে পারি নাই। আমি শেখান থেকে বিধবা নাম নে আশিলাম। এই নামটি আমার কানে এলে বুকে জেন বজ্রাঘাত বোধ হয়। হায় জগৎপিতা, এ কি নাম দিলে, এ নাম নে ভারতে কতো দিন থাকিব? এ যাতনা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমার এই নাম জেন শিঘ্র মাটিতে মিশায়। হায় হায় একি ভয়ানক নাম—শব্দ শুনিলে জেন হৃৎকম্প হয়।

* কিরণচন্দ্র।

* পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী।

† প্রফুল্লচন্দ্র।

[এইখানে ডায়রী সমাপ্ত, কিন্তু একটি পরিশিষ্ট আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।]

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

১

পৃথিবী ভ্রমণের দুর্নিবার বাসনা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি দেশ ছেড়ে। ফিলিস্তিন ও মিশর ঘুরে ইচ্ছা হ'ল লোহিত সাগরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত কি আছে দেখতে হবে। তাই প্রায় একবছর কায়রোয় থাকার পর আবার বেরিয়ে পড়লাম এবং বত্রিশ ঘণ্টা পথচলার পর সুয়েজে পৌঁছলাম। সুয়েজ থেকে নৌকা ক'রে সাগরতীরের কোল ঘেঁসে ঘেঁসে এলাম জিদ্দা বন্দরে। মক্কা থেকে বেশী দূর নয়, মাত্র আধবেলার পথ। বে আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন এবং আমিও ভেবেছিলাম যে নিশ্চিন্তে এখানে চলাফেরা করতে পারব। কিন্তু শেস পর্যন্ত মহম্মদের এই পুণ্যতীর্থে পা বাড়াতে আমার ভয় হ'ল। শুনলাম, খৃষ্টানদের সেখানে যাবার অধিকার নেই। অবশ্য এ অধিকার শুধু স্বাধীন খৃষ্টানদের নেই, ক্রীতদাসদের আছে। সুতরাং প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আটক থেকে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দেশভ্রমণের নেশা পেয়ে বসেছে আমাকে, মুসাফির আমি, আমার বিশ্রাম নেই। ছোট একখানি বজরায় উঠে যাত্রা করলাম, এবারে বাসনা হ'ল হাব্‌সীদের রাজ্য দেখার। কিন্তু শুনলাম, সেখানেও কোন ক্যাথলিক খৃষ্টানের যাওয়া নিরাপদ নয়। কয়েকজন পর্তুগীজ পাদ্রীকে তারা নাকি একেবারে কেটে ফেলেছে। গ্রীক বা আর্মেনীয়ানের ছদ্মবেশে অবশ্য যাওয়া যেত, কিন্তু তাও ভরসা হ'ল না। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম হিন্দুস্থানেই যাব। একখানি ভারতীয় বজরায় উঠে পড়লাম এবং বাইশদিন পর সুরাটে পৌঁছলাম। মোগল বাদশাহ তখন হিন্দুস্থানের সম্রাট(১)।

হিন্দুস্থানে এসে দেখলাম, ভারতসম্রাট শাজাহান তখন রাজত্ব করছেন। শাজাহান হলেন জাহাঙ্গীরের পুত্র এবং আকবর বাদ্‌শাহের পৌত্র। তিনি হুমায়ুনের প্রপৌত্র এবং তৈমুরের বংশধর, সেই বিখ্যাত

সাম্রাজ্ঞী মমতাজ

আমীর তৈমুর, যাঁকে আমরা "তৈমুর লং" বা খোঁড়া তৈমুর ব'লে জানি। তৈমুর ও চেঙ্গিস খাঁর সংমিশ্রিত বংশধরদেরই "মোগল" বলা হয়। এই মোগলরাই এখন হিন্দুদের (Indous) হিন্দুস্থানে (Indoustan) রাজত্ব করেন। কিন্তু মোগলবংশীয়রাই যে সমস্ত রাজকীয় সম্মান ও রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার একচেটে অধিকারী, তা নয়। রাষ্ট্রিক বা সামরিক কোন বিভাগেই মোগলদের একচেটিয়া আধিপত্য নেই। অন্যান্য জাতির লোকেরাও অনেকে এইসব পদে বহাল আছেন, যেমন পার্সী, আরবী ও তুর্কীরা। "মোগল" বলতে তৈমুরবংশীয়দেরই বোঝায় না। যে কোনো ইসলামধর্মী বিদেশী শ্বেতাঙ্গকে "মোগল" বলা হয়ে থাকে। কেবল ইয়োরোপীয় খৃষ্টানদের বলা হয় "ফিরিঙ্গী" (Franguis), এবং হিন্দুদের বলা হয় "জেণ্টিল" (Gentil)(২)। হিন্দুদের গায়ের রং একটু কালো।

হিন্দুস্থানে পৌঁছে শুনলাম, সম্রাট শাজাহান রীতিমত বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর বয়স তখন প্রায় সত্তর বছর এবং

---

(১) বার্ণিয়ের ১৬৫৮ সালের শেষে কিংবা ১৬৫৯ সালের গোড়ার দিকে সুরাটে পৌঁছান। ভারতের সম্রাট তখন শাজাহান।

(২) "ফিরিঙ্গী" কথা ফারসী "ফরঙ্গী" থেকে এসেছে। মুসলমান আমলে যে কোন ইউরোপবাসী শ্বেতাঙ্গকে "ফিরিঙ্গী" বলা হ'ত। "জেণ্টিল" কথা পর্তুগীজ "Gentio" (জেন্টিয়ো) থেকে এসেছে এবং তার থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয় স্ল্যাং "Gentoo" (জেণ্টু) কথার উৎপত্তি। ইংরেজযুগের প্রথম দিকে সাহেবরা সাধারণতঃ "হিন্দুদেরই "জেণ্টু" বলতেন এবং মুসলমানদের বলতেন "Moors" (মুর—Moros থেকে Moors)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত ইংরেজদের লেখা ভারতীয় ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে এই "Gentoo" ও "Moor" শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায়—অর্থ হ'ল "হিন্দু" ও "মুসলমান"।

সম্রাট শাজাহান

তিনি চার পুত্র ও তুই কন্যার পিতা(৩)। তিনি তাঁর পুত্রদের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন এবং নিজে প্রায় বৎসরাধিক কাল কঠিন পীড়ায় ভুগছেন। তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে ব'লে সকলে মনে করেন। পিতার আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা ক'রে পুত্রদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। দুঃখে নয়, সিংহাসনলোভে। দিল্লীর রাজসিংহাসনে কে বসবেন, বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবেন কে, তাই নিয়ে লোভ, হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠেছে গৃহযুদ্ধের মধ্যে। শুনলাম, প্রায় পাঁচ বছর ধ'রে নাকি গৃহযুদ্ধ চলছে, সিংহাসনলোভে ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ।

এই গৃহযুদ্ধের কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের আমার সুযোগ হয়েছিল। এখানে তা বর্ণনা করবার ইচ্ছা আছে (৪)। প্রায় আট বছর আমি মোগল দরবারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম চিকিৎসক হিসেবে। এই চিকিৎসকের চাকরি নিতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ আমার আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় চোরডাকাতের উপদ্রবে আমার যা কিছু সম্বল ছিল সব প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া সুরাট থেকে মোগল-সাম্রাজ্যের অন্যতম নগরী আগ্রা ও দিল্লীতে পৌছতে আমার প্রায় সাত সপ্তাহকাল সময় লেগেছে এবং তাতে আমার বাকি যেটুকু সম্বল ছিল, চুরিচামারি লুটপাটের পর, তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। দিল্লীশ্বরের কাছে দিল্লীতে যখন পৌছলাম তখন আমি পথের ফকির প্রায়। বাধ্য হয়ে চাকরি নিতে হ'ল, রাজপরিবারের চিকিৎসকের চাকরি, বাঁধা মাইনেতে। পরে আর একজন বিখ্যাত ওমরাহ ও বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তির অধীনেও এই চাকরি করি (৫)।

মোগল বাদ্‌শাহ শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম দারা বা "ডেরিয়াস"; দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুলতান সুজা বা "বীর রাজকুমার"; তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব বা "সিংহাসনের শোভা"; কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বা "সার্থক কামনা"। কন্যা বেগম সাহেবা হলেন প্রধানা রাজকুমারী এবং রৌশনআরা বেগম, বা আলোককুমারী। এই ধরনের নামকরণ করা হ'ল এদেশের রাজবংশের ধারা। যেন শাজাহানের স্ত্রীর নাম "তাজমহল" (মমতাজ), অর্থাৎ বিবিমহলের তাজস্বরূপ শ্রেষ্ঠা মহিষী। মমতাজের রূপ ছিল অতুলনীয় এবং তাজমহল নামে তাঁর যে স্মৃতিসৌধ আছে তা সারা তুনিয়ার এক বিস্ময়কর কীর্তি। মিশরের পিরামিড আমি দেখেছি, কিন্তু আমার মনে হয় হিন্দুস্থানের তাজমহলের তুলনায় মিশরের পিরামিড পাথরের অবিন্যস্ত স্তূপ ছাড়া কিছু নয়। যা বলছিলাম। রাজবংশের কুমার কুমারী বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের এরকম নামকরণের কারণ কি? ইয়োরোপের মতন তাঁদের "অমুক স্থানের লর্ড" উপাধিতে ভূষিত করা হয় না কেন? আমার মনে হয়, তার প্রধান কারণ হ'ল, ইয়োরোপের লর্ডরা যেমন ভূমির স্বত্বাধিকারী হতে পারেন, হিন্দুস্থানের রাজকুমার বা ওমরাহরা তা হ'তে পারেন না। সম্রাটই হলেন হিন্দুস্থানের সমস্ত ভূমি বা ভূসম্পত্তির মালিক, সুতরাং 'আর্ল,' 'মার্কুইস,' 'ডিউক,' 'লর্ড,' এই জাতীয় উপাধি হিন্দুস্থানে দেখা যায় না। সম্রাট নিজে ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী ব'লে, তিনি তাঁর অধিকার বা স্বত্ব অন্যদের দান করেন, উপহার দেন, অথবা ভাতা বা বেতন হিসেবে দেন (৬)।

জ্যেষ্ঠপুত্র দারার যথেষ্ট সদ্‌গুণ ছিল। কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায়, আচার-ব্যবহারে তাঁর মতন ভদ্র ও শিষ্ট আর কোন রাজকুমার ছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত বেশী উচ্চধারণা ছিল। তিনি ভাবতেন, তাঁর মতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর কেউ নেই আশেপাশে এবং কোন ব্যাপারে যে কারও সঙ্গে সলাপরামর্শ করা যেতে পারে, তা তিনি মনে করতেন না। এই হামবড়াই ভাবের জন্য তাঁকে কোন উপদেশ বা পরামর্শ দিতে কেউ সাহস করতেন না। এইভাবে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের পর্যন্ত অপ্রীতিভাজন হয়ে উঠেছিলেন। সিংহাসনলোভে তাঁর ভাইদের গোপন চক্রান্তের কথা তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকে জানলেও, তাঁর এই উদ্ধত স্বভাবের জন্য কেউ তাঁকে কিছু জানাতে সাহস করেনি। আত্মম্ভরিতাই শুধু তাঁর চরিত্রের প্রধান দোষ নয়, তিনি

(৩) শাজাহান ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বার্ণিয়ের যখন ভারতে এসে পৌছান তখন তাঁর বয়স ৬৫ কি ৬৬ বছর হবে। শাজাহানের কন্যা চারটি, দু'টি নয়। বার্ণিয়ের শুধু জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

(৪) কিন্তু তা সম্পূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদ করার আমার ইচ্ছা নেই। কারণ গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিবরণ অনুবাদ করলে আসল 'ইতিহাস' জানার কৌতূহল মিটবে ব'লে আমার মনে হয় না। এই সময়কার বহু ইতিহাস-গ্রামক "ঘটনাপঞ্জীর" মধ্যে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে, যাঁরা এ-বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী তাঁরা তা পড়তে পারেন। তার জন্য বার্ণিয়েরের বিবরণ পড়ার, অনুবাদাকারে, কোন প্রয়োজন নেই, কারণ মোগল-যুগের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কোন পরিচয় তার মধ্যে পাওয়া যাবে না।

(৫) এই বিখ্যাত ব্যক্তি একজন পার্সী ব্যবসায়ী, নাম মহম্মদ সফী বা মুল্লা সফী। ১৬৪৬ সালে তিনি সুরাট আসেন এবং সেখান থেকে সম্রাট শাজাহান্ তাঁকে সাক্ষাতের জন্য তলব করেন। তাঁর উপর প্রীত হয়ে সম্রাট তাঁকে তিনহাজারী মনসবদারীতে সম্মানিত করেন, "বক্‌শীর" পদে নিয়োগ করেন এবং "দানিশমন্দ খাঁ" (পণ্ডিত বীর) উপাধি দেন। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে তাঁর আরও পদোন্নতি হয় এবং তিনি শাহজাহাবাদের (দিল্লীর) সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৭০ সালে দিল্লীতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

(৬) ইয়োরোপ ও ভারতের "ভূমিস্বত্বের" (Proprietorship of Soil) পার্থক্য সম্বন্ধে বার্ণিয়েরের এই মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

অত্যন্ত বদমেজাজী। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি যাকে যা খুশী বলতে এতটুকু ইতস্তত করেন না, হোমরাচোমরা ওমরাহদেরও না। কথায় কথায় তিনি সকলকে অপমান করেন, গালাগাল করেন, যদিও ক্রোধ তাঁর স্ফুলিঙ্গের মতন দপ ক'রে জ্বলে উঠে খপ ক'রে নিবেও যায়। মুসলমান হিসেবে তিনি নিজ ধর্মের ক্রিয়াকর্ম সবই করতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কোনও ধর্মগোঁড়ামি ছিল না। তিনি হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দুর মতন মিশতেন, খৃষ্টানদের সঙ্গে খৃষ্টানের মতন। তাঁর আশেপাশে সব সময় হিন্দু পণ্ডিত ও শাস্ত্রকাররা থাকতেন (Gentile Doctors, or Pendets) এবং তাঁদের বৃত্তিদানেও তিনি কার্পণ্য করতেন না। এই কারণে অনেকে তাঁকে কাফের মনে করত। কিন্তু সে কথা পরে বলব, হিন্দুস্থানের ধর্মানুষ্ঠান নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন। জেসুইট ফাদারদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ খাতির ছিল। শোনা যায়, রেভারেণ্ড ফাদার বজির উপর তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তাঁর মতামত তিনি নাকি শ্রদ্ধাভরে শুনতেন(৭)। একদল লোক বলতেন যে দারা কোন ধর্মেই বিশ্বাস করেন না, সব ধর্মের প্রতিই তিনি কৌতূহলবশে আগ্রহ দেখান কেবল এবং মজা করার জন্য সকলের সঙ্গে মেশেন। কেউ কেউ বলেন যে সবটাই হ'ল তাঁর রাজনৈতিক মতলববাজি, কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তিনি সুবিধামত হিন্দুপ্রীতি ও খৃষ্টানপ্রীতি দেখান। গোলন্দাজবাহিনীতে খৃষ্টানদের সংখ্যা তখন বেশী ছিল ব'লে তিনি তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ বজায় রাখতেন, কারণ তাতে সামরিক ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যেত। হিন্দুপ্রীতি দেখাতেন দেশীয় নৃপতিদের ক্ষেত্রে, যাঁরা অধিকাংশই হিন্দু, এবং রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে বা বিদ্রোহে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ভিন্ন সার্থক হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলেও, দারার এই ধর্ম-উদারতার কৌশল খুব বেশী কাজে লাগেনি এবং তাতে তাঁর কোন উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হয়নি। পরন্তু তাঁর ছোট ভাই ঔরঙ্গজীব তাঁর এই ভণ্ডামীর সুযোগ নিয়ে তাঁকে 'কাফের' ও ধর্মদ্রোহী পাষণ্ড প্রতিপন্ন ক'রে, তাঁর শিরশ্ছেদন করতে পেরেছেন স্বচ্ছন্দে। সে কাহিনী পরে বলব।

সুলতান সুজার চরিত্রের সঙ্গে দারার অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও, তিনি আরও বেশী হিসেবী, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারেও অনেক বেশী মার্জিত ছিলেন। ষড়যন্ত্র করতে সুজার মতন ওস্তাদ আর কেউ ছিলেন না। নানারকম উপহার, পুরস্কার ইত্যাদি দিয়ে তিনি গোপনে ওমরাহদের হাত করতেন এবং যে কোন ষড়যন্ত্রে তাঁদের হাতের পুতুল ক'রে তুলতেন। এইভাবে তিনি যশোবন্ত সিংহের (Jessomseingue) মতন বড় বড় হিন্দু রাজাদের পর্যন্ত নিজের দলে এনেছিলেন। কিন্তু তাঁরও চরিত্রের একটি মারাত্মক দোষ ছিল। ইন্দ্রিয়াসক্তি তাঁর এত প্রবল ছিল যে তিনি তাঁর ক্রীতদাস ছিলেন বলা যায়। স্ত্রীলোক পরিবেষ্টিত হয়ে থাকলে তাঁর কোন চেতনাই থাকত না। সারাদিন, সারারাত তিনি নাচগান পান হল্লার মধ্যে বিভোর হয়ে কাটিয়ে দিতে পারতেন; অন্য কোন বিষয়ে কোন কাণ্ডজ্ঞানই থাকত না। তাঁর মোসাহেবদের তিনি দামী দামী খিলাৎ দিতেন এবং তাঁদের তনখা খুশী মতন, নিজের মর্জি মতন, বাড়াতেন কমাতেন। সুতরাং কোন ওমরাহের পক্ষেই তাঁর জীবনের দৈনন্দিন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার উপায় ছিল না। অন্ততঃ স্বার্থের খাতিরেও তাঁদের সুলতান সুজার সঙ্গে প্রমোদসমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিতে হ'ত। তার ফলে তাঁর রাজ্যের অবস্থাও তেমনি শোচনীয় হ'ল। প্রজাদের দুঃখদুর্দশা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল এবং অভাব অভিযোগ জানাবার, বা আবেদন নিবেদন করবার কোন উপায় রইল না। কার কাছে কি জানাবে তারা? সুজা ও তাঁর ওমরাহরা দিনরাত মদ ও মেয়েলোক নিয়ে মশগুল।

সুলতান সুজা পার্সীদের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, তুর্কীদের নয়। ইসলামধর্ম বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, "গুলিস্তানের" কবি সেখ সাদির মতে বাহাত্তর সম্প্রদায়ে। তার মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ই প্রধান—তুর্কীপন্থী ও পার্সীপন্থী। তুর্কীরা মনে করেন, তাঁরাই মহম্মদের প্রকৃত বংশধর এবং পার্সীরা বিধর্মী কাফের। আবার পার্সীরা মনে করেন, তাঁদের আচরিত ধর্মই আসল ইসলামধর্ম, তুর্কীদের নয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব ও শত্রুতা অত্যন্ত তীব্র। সুলতান সুজার পার্সীপন্থী বা "সিয়া" সম্প্রদায়ভুক্ত হবার কারণ হ'ল রাজনৈতিক। যেহেতু মোগল-সাম্রাজ্যের অধিকাংশ আমীর ওমরাহ 'সিয়া' সম্প্রদায়ের মুসলমান এবং মোগল দরবারে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তিও বেশী, সেইজন্য সুজাও সিয়াপন্থী, কারণ তাতে ওমরাহদের দিয়ে তাঁর কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা অনেক বেশী।

রৌশনআরা বেগম

(৭) কাত্রু (Catrou) তাঁর "History of the Mogul Dynasty in India" (প্যারিস, ১৭১৫) নামক গ্রন্থে দারা শিকোর এই পাদরি-প্রীতির আরও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ভেনিসীয় পর্যটক মনুচ্চির (Signor Manucci) সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেই কাত্রু এই বই লিখেছেন। মনুচ্চি দীর্ঘদিন দিল্লী ও আগ্রার রাজদরবারে চিকিৎসক ছিলেন এবং দারার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাত্রু লিখেছেন: "দারা যখন থেকে কর্তৃত্ব করা শুরু করলেন, তখন থেকেই তাঁর অহংকার ও অপরের প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাব দেখা দিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহেব মাত্র তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জেসুইট ফাদারদের উপর দারার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। বিশেষ ক'রে একজনের উপর, তাঁর নাম ফাদার বজি। এই ফাদারটির প্রচণ্ড প্রভাব ছিল দারার উপর। এত বেশী প্রভাব যে দারা সিংহাসন লাভ করলে হয়ত সেই সঙ্গে খৃষ্টানরাও হিন্দুস্থানের রাজা হয়ে বসতেন।"

ঔরঙ্গজীব ভিন্ন প্রকৃতির। জ্যেষ্ঠ দারা শিকোর মতন তাঁর বাইরের চরিত্রে কোন মাজাঘষা চাকচিক্য নেই, কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধি অসাধারণ। বন্ধুবান্ধব আমলা অমাত্য নির্বাচনে তিনি অত্যন্ত হুঁশিয়ার ছিলেন এবং এমন কাউকে কোনদিন আমল দিতেন না যার দ্বারা তাঁর নিজের কার্যসিদ্ধি হবার কোন আশা নেই। সেই-ভাবেই তিনি পদমর্যাদা পুরস্কারাদি বিতরণ করতেন। কতবার তিনি রাজদরবারে এবং ভাইদের কাছে ধনদৌলত, রাজৈশ্বর্যাদির প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত বীতরাগ ও বৈরাগ্যের ভান করেছেন এবং গোপনে সিংহাসন অধিকারের ষড়যন্ত্র করেছেন, তার ঠিক নেই। ছলাকলা ও কূটবুদ্ধিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলেন না। যখন তিনি দক্ষিণাপথের সুবাদার হলেন, তখনও তিনি সকলের কাছে বলতেন যে প্রাদেশিক সুবাদারীতে তিনি খুশী নন, তাঁর দিল্ চায় ফকির (Fakire) হতে, দরবেশ (Dervche) হতে। সুবাদারীর ঝকমারি তাঁর পোষায় না, তাঁর বিবাগী মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না। দানধ্যান, দয়াদাক্ষিণ্য ক'রে খোদাতাল্লার কাছে প্রার্থনা ক'রে তিনি তাঁর জীবনের দিনগুলো শান্তিতে কাটাতে চান। অথচ তাঁর জীবন ঠিক এর উল্টো পথ ও নীতি ধ'রে চলেছে আগাগোড়া। একটার পর একটা চক্রান্ত না ক'রে তিনি যেন স্বস্তিতে থাকতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সেই চক্রান্তের উপরে এমন একটা বৈরাগ্যের মুখোস লাগানো থাকত যে একমাত্র দারা ছাড়া বোধ হয় আর কেউ তাঁর ভয়ঙ্কর দুরভিসন্ধির কথা জানতেন না। বাইরের বেশটা ফকির দরবেশের আলখাল্লা, ভেতরের মনটা কুচক্রী মতলববাজের। এই হলেন ঔরঙ্গজীব, সম্রাট শাজাহানের তৃতীয় পুত্র। ঔরঙ্গজীবের প্রকৃতি সম্বন্ধে শাজাহানেরও উচ্চধারণা ছিল। দারা সেইজন্য তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে প্রায় বলতেন যে তাঁর সব ভাইয়ের মধ্যে ঐ 'নমাজী' (যিনি অত্যধিক নমাজ পড়েন) ভাই, ঐ গোঁড়া মুসলমানটাকে নিয়েই তাঁর দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশী।

অন্যান্য ভাইদের তুলনায় কনিষ্ঠ মুরাদ ছিলেন সবচেয়ে বুদ্ধিহীন। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল আমোদপ্রমোদ বিলাসব্যসন। তাতেই তিনি চব্বিশঘণ্টা মশগুল হয়ে থাকতেন। এমনিতে অবশ্য তিনি উদারপ্রকৃতির ও ভদ্র ছিলেন। তিনি প্রায় গর্ব ক'রে বলতেন যে,

দারা শিকো ও তাঁর পুত্র

কোন রাজনৈতিক চক্রান্তের তিনি ধার ধারেন না এবং গোপন চক্রান্ত তিনি ঘৃণা করেন, কারণ ওটা কাপুরুষের ধর্ম, বীরের ধর্ম নয়। তাঁর ধর্ম বীরের ধর্ম, তাঁর নীতি বীরের নীতি, তলোয়ার ও বলপরীক্ষার প্রকাশ্য নীতি। মুরাদ অবশ্য সাহসী ছিলেন খুব। কিন্তু সাহস তাঁর যথেষ্ট থাকলেও, বুদ্ধি বিশেষ ছিল না। মুরাদের যতটা সাহস ছিল, তার এতটুকু যদি বুদ্ধি থাকত, তাহলে বলা যায় না, হয়ত তিনিই বাকি তিন ভাইকে সরিয়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হিন্দুস্থানের সম্রাট হ'য়ে বসতেন।

শাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগমসাহেবা অসাধারণ সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। সম্রাট তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তাঁদের এই প্রীতির সম্পর্ক নিয়ে রাজদরবারে ওমরাহ-মহলে নানা-রকমের কানাঘুষা গুজব পর্যন্ত রটেছিল (৮)। শেষ পর্যন্ত সম্রাট নিজে মোল্লাদের ডেকে ব্যাপারটার বিচার ক'রে একটা ফয়সালা করতে বলেছিলেন। মোল্লারা নাকি বলেছিলেন যে কন্যার সঙ্গে সম্রাটের এই সম্পর্ক রাখার অধিকার ন্যায়সঙ্গত, কারণ যে বৃক্ষ তিনি নিজে রোপণ করেছেন তার ফল আস্বাদনের অধিকারও তাঁর আছে। এই কন্যার উপর শাজাহানের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তিনিই পিতার সমস্ত দায়িত্ব বহন করতেন। শাজাহান যা আহার করতেন তা তাঁর তত্ত্বাবধানেই তৈরী করা হত, অন্যের তৈরী খাদ্য তিনি কখনও খেতেন না। এইজন্য মোগল দরবারে সম্রাটের এই কন্যার প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল অসাধারণ। সম্রাটের সঙ্গে তিনি ছায়ার মতন থাকতেন, তাঁর আমোদপ্রমোদ, হাসিঠাট্টায় যোগ দিতেন, এবং কোন গুরুতর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার সময় কন্যার মতামতেরও যথেষ্ট মূল্য দিতেন পিতা। বেগম সাহেবার ব্যক্তিগত ধনদৌলতও প্রচুর ছিল। কারণ তিনি সম্রাটের কাছ থেকে মোটা ভাতা ও উপহার তো পেতেনই, ওমরাহ আমলা অমাত্যরাও যাতে তাঁর নেকনজরে থাকেন তার জন্য সর্বদাই তাঁকে নানারকম উপঢৌকন দিয়ে খুশী করার চেষ্টা করতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা যে সম্রাটের প্রীতিলাভে সমর্থ হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ তাঁর ভগিনীর সহানুভূতি। দারা সবসময় এই ভগিনীর মন যুগিয়ে চলতেন এবং এমন কথাও নাকি বলতেন যে তিনি যদি সম্রাট হতে পারেন তাহলে বেগম সাহেবাকে বিবাহের অনুমতি দেবেন। অনেকে হয়ত এই কথা শুনে ভাববেন যে বিবাহের প্রতিশ্রুতি আবার এমন কি ব্যাপার! কিন্তু হিন্দুস্থানের রাজবংশের কাহিনী যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে রাজকন্যার বিবাহের এই প্রতিশ্রুতি দানের তাৎপর্য সহজেই ধরা পড়বে। রাজকুমারীদের সহজে বিবাহ দেওয়া হ'ত না, কারণ পাছে জামাইরাও রাজ্যলোভী হয়ে ওঠেন, সেইজন্য। রাজকন্যার বিবাহ কোন রাজপুত্রের সঙ্গেই দিতে হবে এবং রাজপুত্রের পক্ষে রাজ্যলোভী হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং রাজকুমারীদের বিবাহ হিন্দুস্থানে একটা কঠিন সমস্যার মতন।

(৮) ভ্যালেন্টিন ও কাত্রুও এই গুজবের কথা উল্লেখ করেছেন। কাত্রু লিখেছেন: "বেগম সাহেবা শুধু যে সুন্দরী ছিলেন তা নয়, ছলাকলায় ও বুদ্ধিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। পিতা শাজাহানের প্রতি তাঁর এত দুর্বলতা ছিল এবং সম্রাট শাজাহানও এত বেশী মাত্রায় তাঁর কন্যার প্রতি প্রীতির উচ্ছ্বাস দেখাতেন, যে বাইরে, তাই নিয়ে রীতিমত জল্পনা-কল্পনা চলত। মনে হয়, সমস্ত ব্যাপারটাই ভিত্তিহীন গুজব মাত্র এবং ওমরাহদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত অপপ্রচার।"

অস্বস্তিকর দিনগুলি...

রাজকুমারী বেগম সাহেবার প্রণয়কাহিনী যা শোনা যায় তার মধ্যে দু'টি কাহিনী আমি এখানে উল্লেখ করব। কেউ যেন ভাববেন না যে অকারণে আমি রোমান্স বা রূপকথা রচনা করতে বসেছি। যা আমি লিখছি তা সব ইতিহাসের ঘটনা এবং আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল, হিন্দুস্থানবাসীর আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সম্বন্ধে যা আমি স্বচক্ষে দেখেছি ও স্বকর্ণে শুনেছি, তাই কোনরকমে অতিরঞ্জিত না ক'রে বর্ণনা করা। প্রথমেই বলি, ইয়োরোপে প্রেম করা যত সহজ, এশিয়ায় তত সহজ নয়। ইয়োরোপের প্রেমিক প্রেমিকারা অনেকটা নির্ভয়ে প্রণয়ের দুঃসাহসিক পথে অভিযান করতে পারেন, কিন্তু এশিয়ায় পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা আছে। ফ্রান্সে প্রেম করা হ'ল মজার ব্যাপার। ফরাসীরা হেসে, হৈ হল্লা ক'রে হাততালি দিয়ে প্রেম উড়িয়ে দিতে পারে, এবং হাসির মতনই প্রেম সেখানে ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এদেশে (এশিয়ায় ও হিন্দুস্থানে) প্রেম একটা ভয়াবহ ব্যাপার, প্রেম একবার করলে আর রেহাই নেই, তার শোচনীয় মর্মান্তিক ফলাফল ভোগ করতেই হবে। এইজন্য এশিয়াতিক প্রেমের পরিণতি সাধারণতঃ ট্র্যাজিক।

বেগম সাহেবা সর্বদাই প্রায় অন্দরমহলে বন্দী হয়ে থাকতেন এবং পরিচারিকারা তাঁকে ঘিরে থাকত। বাইরের কোন ব্যক্তি সেখানে প্রবেশের অনুমতি পেতেন না। একজন ভাগ্যক্রমে পেয়েছিলেন এবং তিনি যে খুব উচ্চবংশজাত কেউ তা নন, সাধারণ একজন অমায়িক ভদ্রলোক। পরিচারিকারা সব সময় বেগম সাহেবাকে চোখে চোখে রাখতেন, তাদের চোখ এড়িয়ে কিছু করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং কন্যার প্রণয়কাহিনীর খবর সম্রাটের কাছে ঠিক পৌঁছল। হঠাৎ একদিন সম্রাট অতর্কিতে এসে তাঁর কন্যার গোপন কক্ষে এমন এক অপ্রত্যাশিত সময় ঢুকে পড়লেন, যে বেগম সাহেবার প্রণয়ী কোন দিশা না পেয়ে পাশের স্নানঘরের গরম জলের টবের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। সম্রাট এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝতে পারেননি। কন্যার সঙ্গে ব'সে ব'সে নানাবিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। শেষকালে, একথা সেকথার পর, কথার

সুলতান সুজা

মোড় ঘুরিয়ে হঠাৎ তিনি বললেন যে বেগম সাহেবার গায়ের রং আগের চেয়ে ময়লা হয়ে গেছে এবং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তিনি শরীরের তেমন তোয়াজ করেন না, প্রসাধন করেন না। এই কথা ব'লেই সম্রাট হুকুম দিলেন খোজাদের গোসলখানা খুলে দিতে এবং টবের জল গরম করার জন্য আগুন ধরিয়ে দিতে। আগুন ধরানো হ'ল, গোসলখানায় টবের জল টগবগ ক'রে ফুটতে লাগল এবং তার মধ্যে বেগম সাহেবার হতভাগ্য প্রেমিকও সিদ্ধ হ'তে লাগল। সম্রাট শাজাহান চুপ ক'রে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলেন। খোজারা যখন বললে যে তার শেষ হয়ে গেছে তখন তিনি গম্ভীরভাবে কন্যার কক্ষ ত্যাগ ক'রে উঠে গেলেন। এইভাবে বেগমসাহেবার প্রেমের পরিণতি হ'ল, ফুটন্ত গরম জলে সিদ্ধ হয়ে প্রেমিকের মৃত্যুতে।

বেগমসাহেবার দ্বিতীয় প্রেমকাহিনীর পরিণতিও করুণ। এইবার বেগমসাহেবা একজন উচ্চবংশজাত সুদর্শন পার্সী যুবককে পছন্দ ক'রে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত খানসামা (Kane-Saman) নিযুক্ত করলেন, নাম নজরখাঁ। ঔরঙ্গজীবের পিতৃব্য সায়েস্তা খাঁ এই যুবকটিকে নাকি বিশেষ স্নেহ করতেন এবং সম্রাটের কাছে বেগমসাহেবার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাবও নাকি তিনি করেছিলেন। সম্রাট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর কন্যার সঙ্গে এই পার্সী যুবকের যে গোপন প্রণয়সম্পর্ক আছে তা সম্রাট বুঝতে পেরেছিলেন। একদিন সম্রাট দরবারে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন। যুবকটি আসতেই তিনি আমীর ওমরাহদের সামনেই তাকে হাসিমুখে একটি পান দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। আপ্যায়নে নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে যুবক নজরখাঁর বুক তখন ফুলে উঠলো। তিনি মহানন্দে শাজাহানের হাতে দেওয়া সুগন্ধি পান চিবোতে লাগলেন। উপস্থিত কেউ ভাবতে পারেননি যে পানের মধ্যে বিষ আছে এবং সম্রাট তা নিজ হাতে নজরখাঁকে খেতে দিয়েছেন। পান খেয়ে ঠোঁট লাল ক'রে নজরখাঁ মনের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, বেগম সাহেবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে, নিজের পাল্‌কিতে (Paleky) (১) গিয়ে উঠলেন। পানের ক্রিয়া পাল্‌কির মধ্যেই হ'ল, আর তাঁকে নামতে হ'ল না। প্রেমের পান খেয়ে বেগমসাহেবার দ্বিতীয় প্রেমিকের প্রেমলীলা ও ভবলীলা দুইই সাঙ্গ হ'ল।

রৌশনআরা বেগম জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতন সুন্দরী বা বুদ্ধিমতী ছিলেন না। তা না হলেও, ভোগবিলাসী তিনিও কম ছিলেন না। রৌশনআরা ছিলেন ঔরঙ্গজীবের অনুরাগী এবং প্রকাশ্যেই তিনি দারা ও বেগমসাহেবার শত্রুতা ও বিরোধিতা করতেন। সেইজন্য তিনি খুব বেশী ব্যক্তিগত ধনদৌলত সঞ্চয় করতে পারেননি এবং রাজকার্যেও তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অন্তঃপুরে থেকে তিনি অনেক গোপন পরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের খবর পেতেন এবং তার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে ঔরঙ্গজীবকে হুঁশিয়ার ক'রে দিতেন।*

[ক্রমশঃ।

---

(১) বাংলা "পাল্‌কি" কথা সংস্কৃত "পল্যঙ্ক" থেকে এসেছে। পর্তুগীজরা বলতেন "Palanchino", ইংরেজরা "Palanquin".

* প্রকাশিত চিত্রগুলি ভারতীয় রেখাঙ্কন থেকে এনগ্রেভ্‌ করা চিত্র।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

রাত্রি দশ ঘটিকা বহুক্ষণ বেজে গিয়েছে, প্রণব বাবু তখনও পর্য্যন্ত নিবিষ্ট মনে স্মারকলিপি লিখছিলেন। কল্যকার ভয়াবহ ঘটনার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ করতে-করতে তিনি আরও বহু বিষয় ভাবছিলেন। মধ্যে-মধ্যে তাঁর কলমের গতি অকারণে স্তিমিত হয়ে আসছিল। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁর মানসপটে ফুটে উঠছিল একটি জ্বলজ্বলে সুন্দর মুখ। লেখার থেই বা সূত্র অসাবধানতা বশতঃ তিনি বারে বারে হারিয়ে ফেলছিলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে পরিশেষে হাতের কলম নামিয়ে টেবিলে এক পাশে রাখা টেলিফোন যন্ত্রটির দিকে প্রলুব্ধ নয়নে তাকালেন।

প্রণব বাবু ভাবছিলেন, টেলিফোনের হ্যাণ্ডেলটি তুলে এখুনিই ঐ যন্ত্রটির সদ্ব্যবহার করবেন কি না, এমন সময় এক ব্যক্তি দরজার পর্দা ঠেলে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভিতরে আসতে পারি, স্যার?' একই সঙ্গে বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করে প্রণব বাবু বলতে যাচ্ছিলেন—কে আপনি! এই সময়? কিন্তু লোকটির প্রতি লক্ষ্য পড়া মাত্র তিনি সামলে নিয়ে বললেন, 'আরে, কান্তি বাবু! আপনি? আসুন আসুন, আপনাকে ডেকেছিলাম। বড্ড দরকার আপনাকে।'

কান্তি বাবু সপরিবারে রামবাগানে মাঠের পিছন দিকে বাস করেন। ভদ্র গৃহস্থ-সন্তান তিনি, একটা দোকানের মালিকও; ইচ্ছা করে তিনি বেশ্যা-পল্লীতে এসে বাসা ভাড়া করেননি, এই অঞ্চলে তাঁর বহু পুরুষের বাস। বেশ্যা-পল্লী বরং ধীরে-ধীরে তাঁদের বাড়ীর নিকট এগিয়ে এসেছে। কিন্তু পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করে অন্যত্র উঠে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আবাল্য রূপজীবিনীদের সহিত পাশাপাশি বসবাস করায় এইখানকার সকল কদর্য্যতা তাঁদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। এইখানকার বাসিন্দাদের কারও-কারও সঙ্গে প্রতিবেশিসুলভ বন্ধুত্বও যে তাঁর গড়ে উঠেনি তাও নয়। ভদ্রলোকের বাড়ীর দরজায় একটি পিজবোর্ডের প্ল্যাকার্ড আঁটা আছে। এবং ঐ প্ল্যাকার্ডে নীল কালী দিয়ে লেখা আছে 'ভদ্রলোকের বাড়ী'। এই লিপিকাটুকু রক্ষা-কবচের মত এই গৃহস্থ-বাড়ীটিকে দুর্দ্দান্ত মাতাল এবং নিশাচরদের হামলা হতে রক্ষা করে থাকে।

কান্তি বাবু এই অঞ্চলের ভালো-মন্দ প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, এইখানকার প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনা তাঁর কর্ণগোচর হয়ে থাকে। এই কারণে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রণব বাবু তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এ-কথা ও-কথা বহু কথা কান্তি বাবু শুনিয়ে দিলেন কিন্তু ঐদিনকার ঘটনা সম্পর্কে একটা সংবাদও তিনি দিতে পারলেন না। পরিশেষে একটু আম্‌তা-আম্‌তা করে তিনি বললেন—'কিছু মনে যদি না করেন তো একটা কথা বলি।' সন্দিগ্ধ ভাবে কিছুক্ষণ কান্তি বাবুর দিকে চেয়ে থেকে প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কথা? বলুন না।'

'অভয় দেন তো বলি, রাগ করবেন না কিন্তু', কান্তি বাবু উত্তর করলেন, 'এই আমাদের পাড়ার একটা মেয়ে আপনাকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছে। যতক্ষণ আপনি ঐখানে রোঁদ দেন, ততক্ষণ মেয়েটা অনিমেষ নয়নে চিকের ফাঁকে মুখ রেখে আপনাকে দেখে। তার পর আপনি মোড় ঘুরে আমাদের বাড়ীর দিকে এলে মেয়েটা তাদের বাড়ীর পিছনের জানালায় এসে দাঁড়ায়। এর পর আপনি আমাদের পাড়া ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লে মেয়েটা তাদের বাড়ীর ছাদে উঠে আপনাকে দেখতে থাকে।'

স্থির হয়ে প্রণব বাবু গিলে-গিলে কান্তি বাবুর বক্তব্যটুকু শুনে নিলেন। লজ্জায় তাঁর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠছিল। এই মেয়েটি যে কে হতে পারে, তা বুঝতে প্রণব বাবুর বাকী থাকেনি। কোনও মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলে ছেলে-বুড়ো সকলেই কম-বেশী খুশী হয়ে উঠে। প্রণব বাবুও যে কিছুটা আত্মতৃপ্তি লাভ না করলেন তা'ও নয়, কিন্তু তা তিনি করলেন মাত্র ক্ষণিকের জন্য। ব্যাপার যে এত দূর গড়াতে পারে প্রণব বাবুরও তা ধারণার বাইরে ছিল। তাঁর ভয় হলো, পাছে এই ব্যাপারে বিনা দোষে তাঁকে বদনামের ভাগী হতে হয়।

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে কৃত্রিম কোপের সঙ্গে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'কি সব বাজে কথা বলছেন। আমাকে চেনেন না তাহলে আপনি।' প্রণব বাবুকে বিরক্ত হতে দেখে কান্তি বাবু লজ্জিত হয়ে আম্‌তা-আম্‌তা করে প্রত্যুত্তর করলেন, 'না, না, আমি কি ও-কথা বলছি। আপনি হচ্ছেন দেবচরিত্র লোক। আমাদের পাড়ার সকলেই এ কথা স্বীকার করে। যা-কিছু বজ্জাতি, তা ঐ ছুঁড়ীটার। আপনি এত জানবেনই বা কি করে।'

'হুঁ', দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখাতে পারেন আমাকে? কোন্ বাড়ীটা বলুন তো?'

'হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই দেখাতে পারি', আশ্বস্ত হয়ে কান্তি বাবু বললেন, 'মাঠের বাম দিককার ঐ কোণের বাড়ীটা। সমস্ত দোতলা বাড়ীটাতে ওরাই থাকে, কোনও ভাড়াটে-টাড়াটে ওদের ওখানে নেই। একটা টেলিফোনও আছে,···ফোনের নম্বরও জানি বড়বাজার·····। কিন্তু যাই বলুন স্যার, দেখতে মেয়েটা ভারী চমৎকার! গলাটাও ওর খুব মিষ্টি। শুনেছি, মাষ্টার রেখে একটু-একটু লেখা-পড়াও করে।'

'আবার বাজে বকছেন আপনি', প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'দেখছি আপনিই তার প্রেমে পড়েছেন!' 'কি যে বলেন স্যার আপনি! আমাদের কি সেই কপাল নাকি?' সপ্রতিভ ভাবে কান্তি বাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'ছাদের ধারে-কাছে দাঁড়ালেই মেয়েটা ঘরের জানলা বন্ধ করে দেয়। মেয়েটার শোবার ঘরে একটা মস্ত বড় রবি ঠাকুরের ছবি টাঙানো আছে। ভারী চমৎকার ঐ ছবিটা, তাই তাকিয়ে দেখি; কিন্তু বেটা মনে করে বুঝি তাকেই দেখছি। যত সব

বজ্জাতী আর কি? যাক্ গে যাক্, স্যার, কিছু মনে করবেন না! আমি তাহলে চলি।'

কান্তি বাবু বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলে প্রণব হেঁকে উঠলেন, 'দরওজ্জা-আ!' 'জী হুজুর' বলে দরোজার সিপাহী এগিয়ে এলে প্রণব বাবু হুকুম করলেন, 'হাম ডাইরী লিখতা হ্যায়। ভিতরমে কোহী কো মাত ঘুঁসনে দেও।' 'জো হুকুম' বলে সিপাহী কক্ষের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। প্রণব বাবু চেয়ে দেখলেন দরজা দু'টো কাপে-কাপে বসেছে। নিশ্চিন্ত হয়ে প্রণব বাবু এইবার টেলিফোনের রিসিভার তুলে বললেন, বড়বাজার······! ফোনের ওপারে সোফায় বসে খুকুরাণী কিছু বুনছিল। তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে সে উত্তর দিল, 'ইয়েস, কে বলছেন? কাকে চান, বলুন!'

প্রণব বাবু বহু কথা শুনতে ও শোনাতে চেয়েছিলেন, খুকুরাণীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় হৃদয় তখনও ভরপুর। কিন্তু খুকুরাণীর গলার স্বর কানে যাওয়া মাত্র তিনি যেন একটু ভড়কে গেলেন। সহসা তাঁর মনে হলো, এ কি করছেন তিনি! শেষে এক জন বারবনিতার সঙ্গে তিনি আলাপ করবেন, তা'ও লোকচক্ষুর অন্তরালে, গোপনে। একটু আম্‌তা-আমতা করে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'কত নম্বর থেকে বলছেন? কি বললেন, বড়বাজার······! ওঃ ভুল, নম্বরে কনেকসন দিয়েছে। আচ্ছা, ছেড়ে দিন আপনি। আমি অন্য এক নম্বর চেয়েছিলাম।'

'না না, ভুল নম্বর হবে কেন?' ফোনের ওপার হতে খুকুরাণী উত্তর করলো, 'আপনি ঠিক নম্বরেই ফোন করেছেন। কে কথা বলছেন? থানা থেকে তো? ওঃ আপনি? দাদা বুঝি! আপনাকে প্রতিটি ক্ষণেই ফোন করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও সারা দিন এই ফোনের কাছেই আমি বসে আছি। ওঃ বাবাঃ! গত রাত্রের ঘটনা যা শুনলাম, তাতে এখনও গা'য় কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঐ ঘটনার পর আপনাকে রাস্তায় দেখলাম, কিন্তু তখনও আমি সব কথা শুনিনি। কোনও আঘাত লাগেনি তো দাদা?'

বারে বারে 'দাদা' শব্দটি খুকুরাণীকে উচ্চারণ করতে শুনে প্রণব বাবু হতবাক্ হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'কে আপনার দাদা? আমি? আমাকে দাদা বলবার অধিকার তোমাকে কে দিলে?' ভাবের আতিশয্যে খুকুরাণী এক নিশ্বাসে বহু কথা বলে ফেলেছিল। এইবার সে একটু সপ্রতিভ হয়ে উত্তর করলো, 'কেন দাদা! আমি কি আপনার ছোট বোন হতে পারি না?'

খুকুরাণীর উত্তরের মধ্যে ধৃষ্টতা ছিল না, তাতে ছিল পরিপূর্ণ প্রীতি ও আন্তরিকতা। তার এই মর্মস্পর্শী কাতর প্রার্থনা প্রণব বাবুকে মোহিত করে দিল। রূপজীবিনীদের বিরুদ্ধে তাঁর আবাল্য সংস্কার নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আত্মবিস্মৃত হয়ে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'তুমি! তুমি আমার বোন হবে? খুউ-ব ভালো কথা। কিন্তু বোন আমার আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকবে, আর যত রাজ্যির কুকুর এসে তাকে চেটে-চেটে চলে যাবে, তা কোন্ ভাই সহ্য করতে পারে বল তো?'

বহুক্ষণ টেলিফোনের ওপার থেকে কোনও উত্তর এল না। কিছুক্ষণ বৃথা অপেক্ষা করে প্রণব বাবু বলতে যাচ্ছিলেন,' হ্যালোও!' এমন সময় ওপার হতে কোঁপানো কান্নার আওয়াজ শুনে তিনি

অবাক হয়ে গেলেন। বেশ বোঝা গেল, খুকুরাণী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। খুকুরাণীর কান্নার মধ্যেও কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। প্রণব বাবুর মনে হলো, ওপারের মেয়েটা যেন তাঁর কত আপনার জন!

'এ কি, তুমি কাঁদছো নাকি?' সান্ত্বনার সুরে প্রণব বাবু বললেন, 'আচ্ছা, আর আমি তোমাকে কিছু বলবো না।' 'না না না, দাদা! নিশ্চয়ই তা আপনি বলবেন', আবেগের সহিত খুকুরাণী উত্তর করলো, 'আপনি তো মিথ্যে কথা বলেননি। কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি দাদা, এ আঁস্তাকুঁড় থেকে আমি বেরিয়ে আসবো। আমি ভালো হবো—আমি ভালো হবো। কিছু দিন ধরে অহরহঃ এই চিন্তাই আমি করছি। কিন্তু এ বড়ো বিষম স্থান! এখানে মেয়েরা আসে এক জনকে অবলম্বন করে। তেমনি এখান হতে বের হতে হলেও এক জনের সাহায্যের প্রয়োজন। আমি এমন এক জনকেও পাচ্ছি না যাকে অবলম্বন করে এখান হতে বার হয়ে আসতে পারি।'

'তোমার জীবনের সব কথা বলবে', একটু কিন্তু-কিন্তু করে প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে ভালো করে জানতে ইচ্ছে করছে। শুধু এই জন্যে আমি জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করলে না তো? আমার বিশ্বাস, তুমি এক দিন ভালো ঘরের মেয়ে ছিলে।'

'আমার গর্ভধারিণী মা তো তাই বলেন।' ম্লান হাসি হেসে খুকুরাণী উত্তর দিলে, 'এখানে আমি নিজে আসিনি, আমি এসেছি আমার মা'র সঙ্গে। শুনেছি, মা যখন আমাকে নিয়ে এখানে আসেন তখন আমার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর। ভালো ঘরের যা কিছু ভালো-ভালো কথা তা আমি মা'র মুখে শুনে-শুনে শিখেছি। তাই মা'র অদৃষ্টের ওপর রাগ করলেও মা'র ওপর কোনও দিনই রাগ করতে পারিনি। সেই দিন পর্য্যন্ত এই নরককুণ্ডে তিনিই আমাকে আগলে-আগলে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে তিনি আমার জন্যে দু'খানা বাড়ী ও কিছু অর্থ রেখে পরলোক গমন করেছেন। এই জন্য ভাত-কাপড়ের অভাব বিশেষ নেই, কিন্তু আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবে কে? থাক এখোন এ-সব কথা, আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়ে আপনার চমৎকার দিনটা না-ই বা নষ্ট করলুম! এখন আপনি দয়া করে একটু সাবধানে থাকবেন কি? সত্যি, আপনার জন্যে আমাদের বড় ভয় করে। নরেন বাবুর চেয়েও যেন আপনার ওপর ওদের রাগ বেশী। এইমাত্র শুনলাম, ওরা আপনাকে জব্দ করবার জন্যে এক নূতন ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা যে কি তা আমরা জানতে এখনও পারিনি। তবে আজই নাকি তা ওরা কার্য্যকরী করবে। যদি আপনার অন্য কোনও বিপদ ঘটে, তক্ষুনি তা আমাকে জানাবেন। তাহলে আমি আশু প্রতিকারের সন্ধান বলে দিতে পারবো। আপনাদের চেয়েও ভালো সন্ধানী চর আপনার মঙ্গলের জন্য আমরা নিয়োগ করেছি, বুঝলেন?'

খুকুরাণীর প্রতিটি কথা প্রণব বাবুর নিকট আকাশ-বাণীর মত শোনালো। এ রকম আকাশ-বাণী তাঁকে আর কে-ই বা শোনাতে পারতো? মুগ্ধ হয়ে গিলে-গিলে প্রণব বাবু খুকুরাণীর অভয়-বাণী শুনছিলেন, এমন সময় বন্ধ দরজার ওপার থেকে বাজখাঁই গলায় দরজার সিপাহী হেঁকে উঠল, 'হুজুর, বড়ি বাবু সেলাম দিয়া। উনকো আফিসমে জলদী আইয়ে। এক ভারি মামলা আ'গয়া।'

প্রণব বাবুর জন্য নির্দ্দিষ্ট আফিস-ঘরের পার্শ্বেই নরেন বাবুর আফিস-ঘর। 'জরুরী কাজ পড়ে গেছে এখন আসি' বলে প্রণব বাবু টেলিফোনের রিসিভার সশব্দে নামিয়ে রেখে বড়বাবুর ঘরে এসে দেখলেন, পরিচিত ও অপরিচিত বহু ব্যক্তি সেইখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রণব বাবুর আফিস-ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় এতক্ষণ এত হট্টগোল তাঁর শ্রুতিগোচর হতে পারেনি। প্রণব বাবুকে দেখা মাত্র উৎফুল্ল হয়ে নরেন বাবু বললেন, 'এইবার প্রণব, বিহারী বাবুকে আমরা কাবে পেয়েছি। বাছাধনের এবার আর রক্ষে নেই। ফরিয়াদী এক জন পেয়েছি এবার। এই ভদ্রলোকের অভিযোগ শোনো।'

সম্মুখের একখানি চেয়ারে এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চুপ করে বসে ঝিমোচ্ছিলেন। তিনি এইবার উঠে প্রণব বাবুর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে বললেন, 'সর্ব্বনাশ হয়ে গেল বাবু, মান-ইজ্জত সব গেল। এক্ষুনি যদি তাকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাহলে তাকে অন্য কোথায়ও পাচার করে দেবে। আমার বিয়েওয়ালা সোমত্ত মেয়ে বাবু, জামাই জানতে পারবার আগে যদি ফিরিয়ে আনতে পারেন, তা না হলে সব বৃথা হয়ে যাবে বাবু—সব বৃথা হয়ে যাবে!'

দুই হাতে ধরে আগন্তুক ভদ্রলোককে চেয়ারের উপর পুনরায় বসিয়ে দিয়ে প্রণব বাবু নরেন বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু ব্যাপার কি স্যার? এঁর মেয়ে ওদের খপ্পরে পড়লো কি করে?' ভদ্রলোকের অভিযোগ নরেন বাবু ইতিমধ্যেই লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। লিখিত বিবৃতিটি প্রণব বাবুর দিকে সম্প্রসারিত করে নরেন বাবু বললেন, 'এইটি পড়ে দেখ না। সব-কিছু লিখে নিয়েছি। লেখালেখির কাজ সব শেষ। এখন আর দেরী করো না। বিলম্ব করলে মেয়েটাকে সরিয়ে দেবে। মতিরাম একটুও মিথ্যা বলেনি। ওদের দল সুগঠিত ও সাংঘাতিক। তোমার জন্যে আমি থানায় অপেক্ষা করবো। প্রয়োজন হলে শীগ্‌গির করে খবর পাঠিও।'

নরেন বাবুর আদেশে এক দল সান্ত্রী গেটের নিকট প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। প্রণব বাবু পিস্তলে গুলী ক'টা ভরে নিয়ে আগন্তুক ভদ্রলোককে বললেন, 'আসুন।' এবং তার পর সদলবলে ত্বরিত গতিতে তাঁরা থানা হতে দ্রুত বার হয়ে গেলেন।

[ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মণ-বন্দনা

"শতবর্ষবয়স্ক ভূমিপ (ক্ষত্রিয়) অপেক্ষা দশমবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণতনয় অধিকতর পূজ্য ও অধিকতর সম্মানিত।" —শ্রীমৎ মনু

শ্রীরমেন চৌধুরী

ষ্টুডিয়ো-পরিচিতি

ক্যালকাটা মুভিটোন

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিয়ো টালিগঞ্জের অপরাপর পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর আসরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ১৯৪৫ সালে। ম্যানেজিং এজেন্টস বোস ব্রাদার্স। পরিচালক-মণ্ডলীতে কানন দেবী প্রমুখ কয়েক জন আছেন। বিশিষ্ট শব্দযন্ত্রী বাণী দত্ত মশাই চীফ টেকনিসিয়ান্ ও ম্যানেজাররূপে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন ৪৫ সাল থেকে এই বছরের জুন পর্যন্ত। মিঃ মিত্র ছিলেন ষ্টুডিয়ো সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। সাত বছরের মধ্যে এখানে ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের ছবি উঠেছে অনেক—তার মধ্যে 'মাইকেল মধুসূদন', 'জিঘাংসা', 'বরযাত্রী', 'স্বামী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'শেষ বেশ', 'ফুলওয়াড়ী', 'সহসা', 'আবুহোসেন', 'মালঞ্চ', 'মিলনেকো দিন' বিশেষণের অপেক্ষা করে না। শেষের দুখানি মুক্তি পায়নি, তার মধ্যে 'মালঞ্চ' অবিলম্বে রূপালি পর্দায় প্রতিফলিত হবে। মিঃ মিত্রের আকস্মিক লোকান্তরগমনে কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেম দ্বার রুদ্ধ করতে, কিন্তু যশস্বী শব্দযন্ত্রী লোকেন বসু ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় এগিয়ে এলেন গুরুদায়িত্ব গ্রহণে। বোস-মুখার্জী কোম্পানীর সৃষ্টি তখনই অর্থাৎ গত জুলাই মাসে। এঁরা তত্ত্বাবধায়ক। কথাটি উচ্চারণ সহজে করা গেলেও আসলে কিন্তু অত আয়াসবিহীন কর্ম নয়। দীর্ঘদিন ধরে বহু ষ্টুডিয়োয় তো ঘুরছি, অভিজ্ঞতা আছে আমার বাঙলার ছায়াছবির রাজ্যের। যেটি একান্ত দুর্লভ আমাদের দেশে, সেই নিয়মানুবর্তিতার উপস্থিতি বহু জায়গায় দেখতে পাইনি। আচার-ব্যবহার—এটিও বড় কম আকর্ষণীয় বস্তু নয়। আনন্দের সংগে স্বীকার করছি, এঁদের অমায়িক আচরণ অপরিসীম তৃপ্তি দিয়েছে আমায়। শুধু এই কারণেই জয়যাত্রা এঁদের অব্যাহত থাকবে। মানুষ চায় ভালো ব্যবহার, সজ্জন-সংগ।

নব ব্যবস্থাপনার সংগে-সংগে সংখ্যাতীত প্রতিষ্ঠান এসেছেন এবং আসছেন ছবি তোলবার জন্যে। তার মধ্যে উদয়ন পিকচার্সের 'কবি চন্দ্রাবতী', চিত্রভাবতীর 'ভোর হ'য়ে এলো' অনতিবিলম্বে মুক্তি পাবে। এ ছাড়া সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বাঁশের কেল্লা' চিত্রের শেষের কিছুটা অংশ এখানে তোলা হয়েছে—এটিরও প্রদর্শনের বেশি দেরি নেই। এই ছবি তিনখানির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এঁরা সবিশেষ আশাবাদী, ক্ষয়িষ্ণু বাঙলা ছায়াছবির সুনাম বর্ধিত হবে এগুলির সহায়তায়।

এ ছাড়া 'জনতা ইন্সাফ মাঙ্তি হ্যায়', 'উল্কান', দেবকী বসুর 'পথিক' ও সুনীল মজুমদারের 'প্রশ্ন' তোলা হচ্ছে ও হবে। নরেশ মিত্র মশাই 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এখানেই তুলবেন স্থির হয়ে গেছে। অপেক্ষারত আছেন আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান—কর্তৃপক্ষ তাঁদের চিত্র গ্রহণের সময় দিতে পারলেই সেগুলিরও প্রস্তুতি শুরু হবে।

ফ্লোর আছে ক্যালকাটা মুভিটোনে দুটি বিরাট আয়তন। এত বড়ো ফ্লোর ইন্দ্রপুরীতে একটি মাত্র আছে। যন্ত্রপাতি সব কিছুই অতি আধুনিক। বাগান-পুকুর-সমন্বিত মাঝারি আকারের ষ্টুডিয়ো-গৃহটি দর্শনীয় হ'য়ে ওঠবার অপেক্ষায়। অবিশ্যি নির্জনতার দিক থেকে মনোরম—সে কথা শুরুতেই বলেছি।

কর্মীদের মধ্যে আছেন পুরোভাগে শব্দযন্ত্রী লোকেন বসু, সহকারী শ্রীতপন ঘোষ। চিত্রশিল্পী কেষ্ট মুখার্জি, সহকারী শ্রীগৌরাচাঁদ মল্লিক, শিল্প-নির্দেশক শ্রীশিবপদ ভৌমিক। ম্যানেজমেণ্টে শ্রীহিমাংশু মুখার্জিকে সাহায্য করেছেন শ্রীনন্দদুলাল মজুমদার।

কলা-কুশলী

শিল্প-নির্দেশক ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিভার রত্নাকর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার। সাহিত্য, কলা, ধর্মতত্ত্ব—এক কথায় ভারতীয় কৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগে দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে এই ঠাকুর-বংশের দান অকৃপণ ধারায় বর্ষিত হয়েছে এবং হচ্ছে, আর তারি কল্যাণে বাঙলা তথা সমুদয় ভারতভূমি আজ জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভে সমর্থ। এক 'কবির সেরা রবি'র আলোতেই তো সারা বিশ্ব আলোকিত। কিন্তু রবি অস্তমিত হ'লেও এই স্মরণীয় ও বরণীয় বংশে প্রতিভাধর সন্তানের উপস্থিতির অভাব হয়নি আজো। স্বনামধন্য শিল্প-নির্দেশক ব্রতীন্দ্রনাথ সেই সত্য প্রতিপন্ন করেন অতি অনায়াসে।

'আয়েগা আনেওয়ালা' গানটিকে ভোলেননি নিশ্চয়ই আপনারা! না, তা সম্ভবও নয়—এর মধ্যে এই অসাধারণ লোক-প্রিয় গান স্মরণের পট থেকে অন্তর্ধান করতে পারে না! এখনো বাতাসে ছড়িয়ে আছে, বম্বে টকিজের অবিস্মরণীয় ছবি 'মহলে'র Record-breaking গানটির সুর-রেণু—তার সাফল্যের কেতন উড়িয়ে! এই 'মহলের' দৃশ্যপট-পটুয়া হচ্ছেন ব্রতীন্দ্রনাথ! কিন্তু ক'জন জানে এই সমাচার? লোক-লোচনের আড়ালের মানুষদের খবর মনে রাখার মত অবকাশ নেই, ইচ্ছা নেই, প্রয়োজনও নেই তো আমাদের। কাজেই জানানো কথার ধ্বনি করতে হচ্ছে আবার—ব্রতীন্দ্রনাথ 'মহলে'র যশস্বী শিল্প-নির্দেশক। তাঁর পরিকল্পিত দৃশ্য-সজ্জায় মণ্ডিত হয়েছে ওই ছবিটি।

আমার সামনে বসে আছেন আপন-ভোলা মানুষটি। সিগারেট ধূম-উদ্গিরণ করে চলেছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কি যেন ভাবছেন। বোধ হয়, অতীতের রঙে-রাঙা দিনগুলি আবার এসে হানা দিয়েছে এই জাত-শিল্পীটির মনের আনাচে-কানাচে—ধরা দিতে বাধ্য হয়েছেন ব্রতীন্দ্রনাথ স্মৃতির মায়া-ডোরে।—শুধু নিজেই ডুব দিলেন না ফেলে-আসা দিনের গহীন গাঙে, সংগে-সংগে আমায় নিয়ে

আমাদের নিবেদন
চন্দ্রলেখা-য়
রাজকুমারী
আমাদের নিবেদন
নিশান ও মঙ্গলায়
ভানুমতী
আমাদের নিবেদন
সংসার-এ
পুষ্পাবলী
আমাদের নিবেদন
মিঃ সম্পত-এ
পদ্মিনী
জেমিনী চিত্র
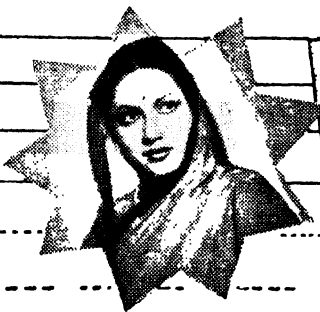
পেলেন আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগেকার সোনার দিনের পরিবেশের মাঝে। এক বারি-ঝরা সাঙন দিন ১১০৫ সালের—এই সময়ে (২৩শে শ্রাবণ) জন্ম নিলেন ব্রতীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। শোনা যায়, শ্রাবণ মাসের জাতকেরা যশের উচ্চশিখরে আরোহণ করেন—৺অরবিন্দ, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অগণিত দৃষ্টান্ত দেয়া চলে—এবং সেটা অনেকাংশে যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। ব্রতীন্দ্রনাথেরও পরিচয় আজ গোপন নেই।

যাই হোক, নব জাতক ক্রমেই বর্ধিত হ'তে থাকলো দাদামশাই (ঠাকুর্দা রবীন্দ্রনাথ), জ্যেঠামশাই (৺গগনেন্দ্রনাথ), কাকা (শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ) প্রভৃতির দুর্লভ সংস্পর্শে। শিশু বয়স থেকেই পরিবারের রীতি অনুযায়ী সংগীত ও শিল্পকলা চর্চা শুরু হয় ব্রতীন্দ্রনাথের। পিতা ৺সমরেন্দ্রনাথ উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করেন স্বভাব-শিল্পীর শিল্পের প্রতি সেই বয়সেই অনন্যসাধারণ অনুরাগ। এই সময়ে বিখ্যাত জাপানী শিল্পীরা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন; অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রকুল সর্বদা শিল্পানুশীলনে মগ্ন থাকতেন। বালক বয়সেই ইনি আচার্য নন্দলাল বসুর প্রিয় ছাত্র হ'য়ে ওঠেন। পারিবারিক শিক্ষায়তন 'বিচিত্রা'য় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বালককে সাহিত্য-পাঠে উৎসাহিত করেন। অল্প দিনেই ইনি পরিচিত-মহলে কবিতা আবৃত্তি করে সুনাম অর্জন করেন, চিত্রাংকনেও বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। এখানে বলা দরকার, ব্রতীন্দ্রনাথ কোনো দিনই কোনো বিদ্যালয়ে বা কলেজে শিক্ষালাভ করেননি।

জোড়াসাঁকো ভবনের বিখ্যাত অভিনয়গুলিতে ব্রতীন্দ্রনাথ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন বহু বার, অভিনয়ের চেয়ে মঞ্চসজ্জার কারিগরী আকর্ষণ করেছে তাঁকে বেশি। আর তারি প্রত্যক্ষ ফল পরবর্তী জীবনে তিনি আহরণে সমর্থ হয়েছেন। সেটা অভিজ্ঞতা। চলচ্চিত্রের শিল্প-নির্দেশনায় সফলকাম হবার মূলে প্রথম জীবনের আরব্ধ কর্মের দান বহুলাংশে বিদ্যমান।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পরসিকগোষ্ঠী পরিচালিত ভারতীয় প্রাচ্যকলা পরিষদের (Indian Society of Oriental Art-এর) সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন ব্রতীন্দ্রনাথ বহু বছর। শেষ সাত বছর পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদকরূপে এঁকে দেখা গেছে। এই সময়েই (সম্ভবত ১৯৩২ কি ৩৩ সনে) বন্ধুদের উৎসাহেই চলচ্চিত্রের জন্যে (ছবিটি শিশিরকুমারের চাণক্য) নকসা তৈরি করেন। তাঁর শিল্প-চাতুর্য ষ্টুডিয়ো-মহলে বিনা বাধায় সমাদৃত হয়।

শুরু হোলো—হ্যাঁ, তাই বলা চলে—নিয়মিত ভাবে এই কাজে আত্মনিয়োগ। ভগিনীপতি স্বর্গত মণিলাল গংগোপাধ্যায়ের যোগাযোগে এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার প্রভৃতির মঞ্চে প্রবর্তিত ধারার সংগে পরিচিত হবার সুযোগ হ'য়ে গেল ব্রতীন্দ্রনাথের। অবশ্য ভারতীয় প্রাচ্যকলা পরিষদে সংযুক্ত থাকা কালীনই বিদেশী ছায়াছবির জন্যে ভারতীয় ঢং-এ নানা তথ্য ও নকসা (ফরমাসী) পাঠাতে শুরু করেছিলেন এবং সেই সূত্রে বিখ্যাত পরিচালক ও প্রযোজক ম্যাকস্ রাইনহার্ড-এর সংগে পত্রালাপের মাধ্যমে নানা বিষয় আলোচনায় বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

দীর্ঘ বারো মাস পর দিল্লীর জগৎ টকিজের খ্যাতনামা পরিবেশক-প্রযোজক শেঠ জগৎনারায়ণ দিল্লীতে আহ্বান করলেন ব্রতীন্দ্রনাথকে ও অফিসের বিভিন্ন কাজের ভার ন্যস্ত করলেন এঁর ওপরে। চিত্র-ব্যবসায়ের অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয়ও তিনি এই সুযোগে অধিগত করেন।

কলকাতায় ফিরে ব্রতীন্দ্রনাথ পূর্ণভাবে বাণীচিত্রের প্রযোজনা ও শিল্প-নির্দেশনায় ব্রতী হলেন। জগৎ টকিজের পক্ষে প্রথম পাঞ্জাবী ছবি 'চাম্বে কি কলি' (চাঁপার কলি)র সমুদয় দায়িত্ব নিয়ে পরিচালক ফণি মজুমদারের সহায়তায় নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিয়োয় সমাপ্ত করেন। ৩৭ কি ৩৮ সালের ঘটনা এটা।

এর পর এঁকে রূপশিল্পীরূপে দেখতে পাওয়া গেল মুভি টেকনিকের 'অপরাধ' ছবিতে। শিল্প-নির্দেশনার ফাঁকে তাঁর এই প্রয়াস। তার পর 'কর্ণার্জুন'। তার পরের নাম-করা ছবি দেবকী বসুর 'রামানুজ'।

১৯৪৩ সালে আবার বোম্বাই। নীতীন বসুর unit-এ যোগ দিতে হোলো এবার। শ্রী ফিল্মসের কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থায় দ্বিরুক্তি করলেন না ব্রতীন্দ্রনাথ। এবারের স্থিতি দীর্ঘ আট বছরের। এই আট বছরে বোম্বায়ের অধিকাংশ ষ্টুডিয়োয় যোগ দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত ঠাকুর। তার মধ্যে রঞ্জিত, ফিল্মিস্তান, শ্রী সাউণ্ড, সেন্ট্রাল ষ্টুডিয়ো, জুপিটার, মিনার্ভা, লক্ষ্মী, মিনার্ভা, কারদার ও বম্বে টকিজের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে ৩০।৩৫খানি ছবিও ওঠে। ইদানিংকার অতি-কথিত ছবির ভেতর 'নৌকাডুবি', 'মিলন' (হিন্দি নৌকাডুবি), 'মজদুর', 'সমর' ও 'মশাল' (নীতীন বসু পরিচালিত সবগুলি) 'জাষ্টিস', 'দেবদাসী', 'আন্দোলন' (ফণি মজুমদার পরিচালিত) প্রভৃতি ছবির কথা চিত্রামোদীরা ভোলেননি নিশ্চয়। এ ছাড়া 'দূর চলে', 'আওয়ার ইণ্ডিয়া', 'হিন্দুস্থান হামারা' (পল জিল্‌স্ পরিচালিত), 'সাজন', 'মহাকবি কালিদাস' (হিন্দি)—এগুলিরও শিল্প-নির্দেশক ছিলেন ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইদানিং স্বাধীন ভাবে কাজ করা বন্ধ রেখে ইনি অশোককুমার ও প্রযোজক সাবক ভাচার সহযোগিতায় বম্বে টকিজের পুনর্গঠনে সহায়তা করবার জন্যে ফিল্মিস্তানের সংশ্রব ত্যাগ করে বম্বে টকিজে যোগ দেন। বম্বে টকিজের নতুন কালের সমুদয় মুখর চিত্রের সাফল্যের মূলে এঁর দান অনস্বীকার্য। চিত্র-সংগঠনের নানা দিকের কাজে ব্রতীন্দ্রনাথ এত দিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তারি সাহায্য পেয়েছে বম্বে টকিজ। এঁদের যুগান্তকারী 'মহল' সেই অলিখিত স্বাক্ষরই বহন করছে। অবশ্য শিল্প-নির্দেশনার স্বীকৃতি উল্লিখিত আছে।

কলকাতায় ফিরেছেন সার্থক শিল্পী ব্রতীন্দ্রনাথ আজ দুবছর। এই সময়ের সামান্য মুহূর্তটিও অপচয় করেননি। 'আনন্দমঠ' ও 'দত্তা'র শিল্প-নির্দেশনা আধুনিকতম কার্য এঁর। এখন রঙমহল রংগমঞ্চের Technical adviser হয়েছেন। ব্যবস্থাপনায় গুরু দায়িত্বের আংশিক ভার নিচ্ছেন বলে শুনলাম।

টকির টুকিটাকি

সেবা

বিজলী পিকচার্স ভাগ্যবান বলতে হবে—'সেবা' এঁদেরই প্রথম প্রচেষ্টা। প্রাথমিক কাজ সত্বর সমাপ্ত হবে। রূপায়ণে আছেন দীপ্তি রায়, গুরুদাস, শিবশংকর, নবাগত নির্মল ব্যানার্জি, কবিতা সরকার (রায়) প্রভৃতি। কালোবরণের সুর-সংগতি হবে এই ছবিটির বিশেষ আকর্ষণ। স্বাগত জানাই 'সেবা'কে।

ধ্রুব

মুক্তিপথে। রসিক পিকচার্স ঝড়ের বেগে স্যুটিং সমাধা করে এনেছেন। সম্পাদনাও শেষ হবো-হবো। পরিচালনায় আছেন চন্দ্রশেখর বসু, সুরশিল্পে বীরেন রায়, ক্যামেরায় বিভূতি চক্রবর্তী। বিমল ঘোষ রচনা করেছেন আখ্যায়িকা (পুরাণ অবলম্বনে)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে স্বর্গের উর্বশীর ভূমিকায় মর্তের উর্বশী ইন্দ্রাণী রহমন (মিস্ ইণ্ডিয়া)কে দেখা যাবে। নাম-ভূমিকায় বালক-নট শ্রীমান বিভুর অভিনয় অনবদ্য হ'য়েছে বলে প্রকাশ। এটি পরিবেশন করবেন চিত্র পরিবেশক লিমিটেড।

নিউ থিয়েটার্সের

নব প্রয়াস 'নবীন যাত্রার' যাত্রা শুরু হয়েছে চিত্রগ্রহণের পূরো দমে আজ কয়েক সপ্তাহ হোলো। সুবোধ মিত্র পরিচালনা করছেন, সংগীত পংকজ মল্লিকের। দ্বিভাষী এই ছবিটির উভয় সংস্করণে যথাক্রমে একটি বাঙালী ও একটি অবাঙালী নবাগতের দর্শন মিলবে।

ব্লাইণ্ড লেন

দেখতে পাওয়া যাবে স্বনামধন্য সাহিত্যিক-পরিচালক শৈলজানন্দের সহযোগিতায়। উদার উন্মুক্ত পথের মাঝে সবাই আজ দিশাহারা, এই সময় 'বন্ধ গলি' হয়তো চিত্রামোদী পথচারীর চিন্তা লাঘব করবে।

চিত্র ভারতীর

'ভোর হ'য়ে এলো' ছবির মাধ্যমে সেই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। আমার-আপনার জীবনের প্রতিচ্ছবি এই আগতপ্রায় বাণীচিত্রটিকে মহিমামণ্ডিত করেছে, সেই সংগে আছে শিল্পীদের সার্থক চরিত্রচিত্রণ। পরিবর্তন প্রভৃতি চিত্রখ্যাত সত্যেন বসু চিত্রটির পরিচালক।

জানাই প্রণতি

এইচ. এম. পি. সশ্রদ্ধ ভাবে নিবেদন করছেন। এঁদের প্রাথমিক কর্তব্যকর্ম শেষ হ'লেই বিশদ বিবরণ পত্রস্থ করা হবে।

উদয়ন পিকচার্সের

প্রযোজনায় ও হীরেন নাগের পরিচালনায় বাঙলার প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর দেখা পাওয়া যাবে রূপালি পর্দায়। একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এর আগে এই বিষয়বস্তুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন কিন্তু তার বেশি এগুতে তাঁরা পারেননি। সুখের কথা, বর্তমানে 'কবি চন্দ্রাবতী'র চিত্রগ্রহণ অনেকখানি হ'য়ে গেছে। অনুভা গুপ্তা, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, কানু বন্দ্যো, প্রণতি ঘোষ প্রভৃতির দর্শন মিলবে এতে। ক্যালকাটা মুভিটোনে গৃহীত হচ্ছে ছবিটি। নারায়ণ পিকচার্স করবেন পরিবেশনা।

সম্পৎ

অন্য সকল থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই ছবিতে যাঁর কাহিনী রয়েছে তিনি সব সময় হাসিখুশী। তাঁর কাছে ভয় করার মত কোন কঠিন কাজ নেই, আবার কাজ যতই তুচ্ছ হোক না কেন তিনি তা উপেক্ষা করেন না। মিষ্টিমুখ এবং মধুর আলাপের সাহায্যে তিনি স্বচ্ছন্দে মানুষের সমাজে চলে ফিরে বেড়ান। অনেকের কাছে তিনি একান্ত প্রিয়তম, অনেকে তাঁকে আবার এড়িয়েও চলে। তাঁর চরিত্র জটিলতায় ভরা। ছবিখানি ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি মুক্তিলাভ করবে।

ভল্গা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অঙ্গিরা উপাখ্যান

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

"তার জন্যেই ত আমাদের রাজপদের লোপ করতে হয়েছে। এ ব্যাপারটা করতে হয়েছিল মাঘব রাজার পরবর্তী এক রাজার জন্য। তিনি নিজে এক জন অসুররাজের মত হতে চেয়েছিলেন।"

"আর্য্য জাতির উপর নিজের খুশী মত প্রভুত্ব করতে?"

"হ্যাঁ, একা শুধু তিনি নন, তাঁর পরে আর এক জন অনুরূপ করতে চেয়েছিলেন এবং কয়েক জন আর্য্যকে তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধি করতে সহযোগিতা করতেও দেখা গিয়েছিল।"

"তাদের সহযোগিতা করতে?"

হ্যাঁ, তাঁদের নিজেদের পরিবার বা গোষ্ঠীর স্বার্থে। তার জন্যেই সৌবীররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, অতঃপর আর কাউকে রাজা করা হবে না। "ইন্দ্র" (রাজা) কথাটাতে আবার সেই দেবতাকেও বোঝায় যিনি বজ্র ধারণ করেন, তাতে করে মানুষের মনে আরও বেশী করে বিভ্রান্তি ঘটছিল।

"তাহলে ত বন্ধু, সৌবীররা ভাল কাজই করেছে।"

"কিন্তু কিছু লোক আবার গজিয়ে উঠেছে যারা আর্য্য নামকে কলঙ্কিত করছে, যারা অসুরদের সব কিছুকেই প্রশংসা করতে একটুও ক্লান্তিবোধ করছে না। অসুরদের অনেক কীর্তিই প্রশংসার্হ—আমি নিজেই তার প্রশংসা করি এবং সে সব আমাদের গ্রহণ করাও উচিত। আমরা তাদের যন্ত্রপাতি দেখেই আমাদের যন্ত্রপাতি তৈরী করেছি। তাদের গো-যান দেখেই ত আমাদের মাঘবরাজ তাঁর অশ্ব-রথের পরিকল্পনা করেছিলেন। এক জন ধানুকীর পক্ষে অশ্বপৃষ্ঠ অপেক্ষা রথের উপর বসে তীর চালনা করা অনেক বেশী সহজ; কারণ, সে যতগুলো খুশী তূণ নিজের কাছে রাখতে পারে এবং শত্রুর তীর থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বর্মের আচ্ছাদনও পেতে পারে। আমরা তাদের বর্শা, গদা প্রভৃতি থেকেও অস্ত্রপাতি সম্পর্কে অনেক শিক্ষা পেয়েছি। তাদের নগর-পরিকল্পনা থেকেও আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করেছি। তাদের কাছ থেকে সমুদ্র-পথে যাতায়াতের বিদ্যাও আমাদের শিখতে হবে, কারণ, তামা প্রভৃতি ধাতু, বহু রত্নাদি এবং অন্যান্য অনেক জিনিষই সমুদ্রপার থেকে আসে, বর্তমানে সমুদ্রপথে সমস্ত বাণিজ্যই অসুর বণিকদের একচেটিয়া। আমরা যদি তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই তাহলে আমাদের সমুদ্রযাত্রা করা শিখতেই হবে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও অসুরদের এমন অনেক প্রথা আছে যেগুলোকে আমাদের নিজেদের পক্ষে বিপদজনক মনে করতে হবে—যেমন লিঙ্গপূজা।

"কিন্তু কোন্ আর্য্য ঐ সব করতে যাবে?"

"একেবারে নিঃসন্দেহ হোয়ো না বন্ধু! অনেক আর্য্য ইতিমধ্যেই বলতে সুরু করেছে যে, আমাদেরও অসুরদের মত পুরোহিত প্রথার প্রবর্তন করতে হবে। বর্তমানে আমাদের সৈনিক, পুরোহিত, ব্যাপারী, কৃষক এবং কারিগরদের ভিতরে কোন পার্থক্য নাই, যে-কেউ যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে,—অন্য পক্ষে অসুররা প্রত্যেক বর্ণকে অন্যদের থেকে পৃথক্ করে রেখেছে। একবার যদি আর্য্যদের মধ্যে পুরোহিত প্রথা সৃষ্টি হয় তাহলে দেখবে, কয়েক বছরের মধ্যেই লিঙ্গপূজাও সুরু হয়ে গেছে। অসুর পুরোহিতেরা খুবই চতুর, আমাদের পুরোহিতেরাও লাভের লোভে অনুরূপ চতুরতা সুরু করবে।"

"সে ত এক অভিশাপ হবে তাহলে বরুণ?"

"গত দুই শতাব্দী ধরে অসুরদের সংস্পর্শে এসে আর্য্যদের মধ্যে বহু পাপ প্রবেশ করেছে। আমাদের বৃদ্ধেরা হতাশ হয়ে এ সব লক্ষ্য করেছেন। আমি অবশ্য নিরাশ হইনি। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি অতীতের মহান্ দিনগুলোর কথা আমাদের লোকেদের শেখানো যায় তাহলে তারা আর অধঃপতিত হবে না। শুনেছি, গান্ধার নগরে এক জন ঋষি, এক জন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁর নাম অঙ্গিরা। তিনি লোকদের শিক্ষা দেন, যাতে আর্য্যরা পুনরায় দৃঢ় ভাবে আর্য্য-পথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি আর্য্যদের যুদ্ধজয়ে আমার তরবারি ব্যবহার করেছি; এবার আর্য্য-জীবনযাত্রা-প্রণালী রক্ষার জন্য আমি কিছু করতে চাই।"

"এক আশ্চর্য্য মিলন ঘটল ত! আমিও ত চলেছি ঋষি অঙ্গিরার নিকট, তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য।"

"তাই নাকি! কিন্তু পাল, কই তুমি ত আমাকে পূর্বদেশে আর্য্যদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বললে না?"

"পূর্বদেশে তারা দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ছে। গান্ধার পার হয়ে যে ভূখণ্ড তা আমরা—মদ্ররা দখল করেছি! আরও পরবর্তী অঞ্চল দখল করেছে মল্লরা, এবং ক্রমশঃ কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি বংশ আরও ভূখণ্ড তাদের করতলগত করেছে।"

"আর্য্যরা তাহলে সেখানে সংখ্যায় অনেক?"

"না, খুব বেশী নয়! যত তারা এগিয়ে গেছে ততই অসুর এবং অন্যান্য সংখ্যাধিক জাতির মুখোমুখি তাদের হতে হয়েছে।"

"অন্য কি জাতি?"

"অসুরদের গায়ের রং হচ্ছে মাগুর মাছের বা তামার মত। পূর্বদেশে অন্য ধরণের লোক আছে—তাদের বলে কোল, তাদের গায়ের রং কোকিলের মত কালো। অধিকাংশ বন্য কোলদের অস্ত্র-শস্ত্র এখনও পাথরের তৈরী।"

"তাহলে ত মনে হয়, আর্য্যদের ঘোর যুদ্ধের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে?"

"কচিৎ বড় ধরণের সম্মুখ-যুদ্ধ হয়। আদিবাসীরা আমাদের ঘোড়সওয়ার দেখলেই পালিয়ে যায়—কিন্তু তারা রাত্রিকালে আমাদের তাঁবু আক্রমণ করে। এই জন্যে অনেক সময় ওদেরকে আমাদের রূঢ় শিক্ষা দিতে হয়েছে। ফলে অসুর এবং কোলদের

বহু গ্রাম এখন একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে। তারা এখন ক্রমেই পূবদিকে পালিয়ে গেছে।"

"তাহলে পাল, তোমাদের মধ্যে অসুরদের রীতি-নীতির প্রভাবে পড়বার বোধ হয় কোন আশঙ্কা নেই?"

"মদ্রদের মধ্যে ত নয়ই, মল্লদের মধ্যেও বোধ হয় নয়, তারও পূবদিকের অবস্থাটা আমি ঠিক জানি না। আমাদের ওদিকে অনার্য্যরা একমাত্র বলেই কোথাও কোথাও বেঁচে আছে।"

দুই বন্ধু এই ভাবে রাত্রি পর্য্যন্ত তাদের সংবাদ আদান-প্রদান করে চলল। আরও হয়ত বহুক্ষণ ধরে চলত—যদি না অতিথিশালার রক্ষক এসে তাদের খাবার কথা জিজ্ঞাসা করত। এই অতিথিশালাটি নির্মিত হয়েছিল পল্লীবাসীদের খরচে—পথিকদের, বিশেষ করে শ্বেত জাতির পথিকদের বিশ্রামের জন্য (সে কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য) —এবং যাদের কাছে আহার্য্য কিছু থাকত না, তাদের চালভাজা ও গোমাংসের যূসের ব্যবস্থা করা হত। কোন পথিকের কাছে খাদ্যবস্তু থাকলে তা সে অতিথিশালার রক্ষকের কাছে দিলে সে রান্না করে খাবার তৈরী করে দিত; আর তা না থাকলে সমতুল্য কিছু দিতে হত।

এই অতিথিশালাটি তার সোমারস এবং মদ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। বরুণ এবং পাল ভাজা গোমাংস এবং মদ্য একত্রে পানাহার করে তাদের বন্ধুত্বকে দৃঢ় করে নিল।

সিন্ধুনদের পূব-পারের গান্ধারদের মধ্যে অঙ্গিরা ঋষি শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন। পুষ্কলাবতীতে প্রথম বিপর্য্যয়ের পর অসুররা পশ্চাদপসরণ করতে সুরু করেছিল—তার পরপুরুষে কুনার নদীতীর থেকে গান্ধারদের একটি দল যখন আজ যেটা গান্ধার দেশ তার পশ্চিমাংশ আক্রমণ করেছিল, তখন অসুরদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তারাও এই অঞ্চল ছেড়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। মাত্র ত্রিশ বছর যেতে না যেতেই গান্ধার ও মদ্ররা সিন্ধুনদের পূব-পারের ভূখণ্ড আক্রমণ করল এবং সে দেশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। গান্ধাররা নিল সিন্ধু ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল এবং মদ্ররা নিল শতদ্রু ও ইরাবতীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল। এবং এই দুটি অঞ্চলই পরবর্ত্তী কালে এই দখলকারীদের নামে বহু-খ্যাত হয়েছিল।

অসুর ও আর্য্যদের মধ্যে এই আদি সংঘর্ষে উভয়েই অমানুষিক নৃশংসতার পাল্লা দিয়েছিল। তার ফলে গান্ধার দেশে একটিও অসুর অবশিষ্ট ছিল না, মদ্রদের দেশেও প্রায় কোন অসুরই অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই সীমান্তের অসুরদের প্রতিরোধ কমে এল এবং ফলে শত্রুরাও তাদের সাথে কম নৃশংস ব্যবহার করতে লাগল। শুধু তাই নয়, বরুণ যা বলেছিল সেই মতই, এই সীমান্তবাসীদের মধ্যে অনেকেই অসুর-অসভ্যতার অনেক কিছু সম্পর্কেই প্রশংসা করতে সুরু করল।

অঙ্গিরা অম্লাস উপত্যকা থেকে আগত আর্য্যদের ঐতিহ্য সম্পর্কে শুধু সুপ্রাজ্ঞ ছিলেন তাই নয়—আর্য্যরা যাতে তাদের রক্ত, বিশ্বাস এবং রীতিকলাপে বিশুদ্ধ থাকে তা দেখবার জন্যও তিনি বিশেষ উৎকণ্ঠ ছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি পশু-পালকদের মধ্যে অশ্বমাংস খাওয়া, যা ইদানীং যে-কোন কারণেই হোক অপ্রচলিত হয়ে এসেছিল, তা উৎসাহিত ও পুনঃপ্রবর্ত্তিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। আর্য্য-ঐতিহ্য এবং আর্য্য-শিক্ষায় তাঁর অস্ত্রশক্তি এবং যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ কুশলতা তাঁকে এমনি প্রথিতযশা করে তুলেছিল যে, দূরান্তরের আর্য্য বসতিগুলি থেকে আর্য্য যুবকেরা তাঁর কাছে আসত শিক্ষালাভের জন্য। কিন্তু তখনও কেউ জানত না যে, অঙ্গিরার রোপিত এই একটি বীজ এক দিন এক মহীরুহে অর্থাৎ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে—যে মহীরুহের ফল আহরণ করতে আর্য্যগাথার ভক্তেরা সহস্র সহস্র মাইল দূর থেকে এখানে এসে পৌঁছোবে।

অঙ্গিরার বয়স তখন পঁয়ষট্টি বৎসর—পলিতকেশ কটিলম্বিত শ্বেত উজ্জ্বল শ্মশ্রু এবং শান্ত, সৌম্য মুখমণ্ডল এই ঋষির আকৃতিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। সেদিন থেকে বহু শতাব্দী পরে কালি-কলম বা পাতার উপর লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল—তাই তাঁর সব শিক্ষাই প্রদত্ত হত মৌখিক ভাবে এবং তাঁর শিষ্যরা পুরাতন সঙ্গীত ও কাহিনী বার বার আবৃত্তি করে স্মরণ করে রাখত। যে-সমস্ত ছাত্ররা বহু দূর থেকে আসত তারা খাদ্যবস্ত সংগে আনতে পারত না। তাই অঙ্গিরাকেই ব্যবস্থা করতে হত এদের আহার ও গাত্রবস্ত্রের। এর জন্যে তাঁর নিজের জমি চায করার পরেও তিনি শিষ্যদের সহায়তায় জঙ্গলা জমি সাফ করে তাতে চাষ দিয়ে সারা বছরের উপযোগী যথেষ্ট গম উৎপাদনের ব্যবস্থা করতেন। তখন পর্য্যন্ত বাগিচা বা ফলের বাগান তৈরীর রেওয়াজ হয়নি, কিন্তু বছরের যে-সময়টিতে ফল পেকে উঠত তখন অঙ্গিরা তাঁর এক দল শিষ্যকে নিয়ে বনে গিয়ে সেগুলো আহরণ করে আনতেন। চাষের কাজে, বীজ বপনে এবং ফসল কাটার সময়ে, কিংবা ফুল, ফল বা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের সময়ে তারা অম্লাস বা সুবাত নদীর তীরে রচিত গানগুলো সমবেত ভাবে গাইত।

অঙ্গিরার অশ্বশালাও ছিল সারা গান্ধারের মধ্যে সব থেকে বড়। তিনি বহু দূর-দূরান্তরেও তাঁর শিষ্য ও পরিচিতদের শ্রেষ্ঠ ঘোটক এবং ঘোটকীর অনুসন্ধান করতে বলতেন এবং সেগুলো সংগ্রহ করে বংশবৃদ্ধি করাতেন এবং তাঁরই অশ্বশালা থেকে পরবর্ত্তী কালে বহুখ্যাত সিন্ধী ঘোটকশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়া হাজার-হাজার গোরু এবং মেষের মালিকও ছিলেন অঙ্গিরা। তাঁর শিষ্যদের জ্ঞানচর্চ্চার সাথে-সাথে কায়িক পরিশ্রমও করতে হত—ঋষি নিজেও মাঝে-মাঝে এ কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। কারণ, এ কাজ ছিল অপরিহার্য্য—এই পন্থায় ছাড়া সকলের খাদ্য ও বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল না। তক্ষশিলার পূব দিকের অধিকাংশ পাহাড়গুলোই ছিল সুজলা, উর্বর ও শস্যশ্যামলা। সেদিন বরুণ এবং পাল অঙ্গিরার উপস্থিতিতে এক দল যুবকের সাথে পশুচারণ-ভূমিতে কাজে লিপ্ত ছিল। তাঁর থেকে অনতিদূরে পরিচ্ছন্ন লোহিতাভ বৎসগুলি খেলা করে বেড়াচ্ছিল। ঋষি এবং তাঁর শিষ্যেরা ঘাসের উপর বসেছিলেন। অঙ্গিরার বাঁ হাতে ছিল একদলা পশম—অন্য হাতে একটা বড় কাঠের লাটাইতে তিনি পশমে পাক দিচ্ছিলেন। অন্য কয়েক জনেও পশম কাটতে ব্যস্ত ছিল। কেউ-কেউ পশমগুলো পিঁজছিলেন, কেউ বা হাত দিয়ে পশমগুলো সমান করে নিচ্ছিলেন। ঋষি অতীত ও বর্ত্তমানের বহু জিনিষের, আর্য্য ও অনার্য্য রীতি-নীতির এবং কোন্ ধরণের কারুকার্য্য গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌গুলো পরিত্যাজ্য, এই সব ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি বলছিলেন—"নব্য সব-কিছু পরিত্যাগ করতে হবে এবং অতীতের সব-কিছু আঁকড়ে থাকতে হবে—এ কথা বলা

নির্বুদ্ধিতা এবং কার্য্যক্ষেত্রেও তা অবাস্তব। অম্বাস উপত্যকার আর্য্যারা যখন পাথরের হাতিয়ারের জায়গায় তামার হাতিয়ারের কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁদের মধ্যেও অনেকেই এই নয়া সৃষ্ট বস্তুটি পছন্দ করতেন না।"

ঋষির প্রিয় শিষ্য বরুণ প্রশ্ন করল—"তাঁরা পাথরের অস্ত্রপাতি দিয়ে কি করে কাজ করতেন ?"

"আজ তামার অস্ত্রপাতি দিয়ে কাজ চলে—আগামী দিনে তামা থেকেও ধারালো কোনো জিনিষ আবিষ্কৃত হবে; তখনকার মানুষরাও আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করবে—আজকের মানুষেরা তামার অস্ত্রপাতি দিয়ে কি করে কাজ করত ? যে-সময়ে যে-হাতিয়ার পাওয়া যায়, তাই দিয়েই মানুষকে কাজ করতে হয়। যখন পাথরের কুঠার দিয়ে লড়াই হত, তখন উভয় পক্ষই এই হাতিয়ারে সজ্জিত থাকত। কিন্তু যে মুহূর্তে এক পক্ষ তামার হাতিয়ার আবিষ্কার করল, সেই মুহূর্তে অপর পক্ষকেও পাথরের অস্ত্রপাতি পরিত্যাগ করতে হল—অন্যথায় তারা এ জগতে জীবন ধারণের স্থানই দখলে রাখতে পারত না। তাই আমি বলছিলাম, শুধু মাত্র নতুন বলেই যে-কোন নব্য জিনিষ পরিত্যাগ করা বোকামি। আমি যদি নতুন সব কিছুরই বিরোধী হতাম তাহলে এমন সুন্দর অশ্ব-গবাদি সৃষ্টি করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হত। আমি দেখলাম যে, ভাল ঘোটক ও ভাল ঘোটকী হলে অশ্বশাবকও ভালো হয়—তাই আমি বেছে-বেছে এই প্রাণীগুলো সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলাম। আজ দেখ পঁয়ত্রিশ বছর পরে আমার পশুপাল কি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

"জমিতে জলসেচের একটা সুপদ্ধতি অসুররা গ্রহণ করেছিল। তারা খাল কেটে পাহাড়ী নদীগুলো থেকে জলধারা বয়ে নিয়ে যেত, আমরাও গান্ধারে সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করেছি। নগর-পরিকল্পনা এবং ভেষজ-বিদ্যায় তাদের অনেক মূল্যবান ধারণা ছিল—আমরা সেগুলোও গ্রহণ করেছি। খাদ্য, বস্ত্র বা আত্মরক্ষার ব্যাপারে যা-কিছু সুব্যবস্থা আমাদের নজরে আসে আমরা তাই গ্রহণ করব—সে ব্যবস্থা অতীতেরই হোক বা বর্ত্তমানেরই হোক, অথবা তার সৃষ্টি আর্য্যদের দ্বারাই হোক বা অনার্য্যদের দ্বারাই হোক। সুবাতে থাকতে বা তার আগে আর্য্যরা সূতী বস্ত্রের কথা শোনেইনি, কিন্তু গরমের দিনে আর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমরা সকলেই বর্ত্তমানে তা পরছি।

"কিন্তু আবার অনেক জিনিষ আছে যা আমাদের বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের মতে, অসুরদের ভিতর প্রচলিত লিঙ্গপূজা একটি ঘৃণ্য ব্যাপার। তাদের মধ্যে যে শ্রেণীভেদ আছে তা আমরা কখনও গ্রহণ করব না; কারণ, তা করলে দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলেও তুমি আর সমস্ত অধিবাসীকে অস্ত্রধারণ করতে বলতে পারবে না এবং জনসাধারণও নিজেদের উচ্চ-নীচ এই ভেদে ভিন্ন ভাবতে শুরু করবে। অসুরদের সাথে আমাদের রক্তের মিশ্রণ আমরা কখনও করব না, কারণ, তাতে করে আমরাও অসুরে পরিণত হবো, তাহলে আর্য্যদের মধ্যে বৃত্তি ও পেশা ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন উচ্চ-নীচ শ্রেণীর উদ্ভব হবে।"

পাল প্রশ্ন করল—"সমস্ত আর্য্যই কি অসুরদের সাথে বিবাহকে অন্যায় বলে মনে করে ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তারা সবাই এ ব্যাপারে সতর্ক নয়। এ রকম আর্য্য পুরুষ কি নেই যার সাথে অসুর বা কোল রমণীর সম্পর্ক আছে ?"

"হ্যাঁ, সীমান্ত দেশে সে রকম আছে। এবং আমাদের সৈনিকদের মধ্যে অসুরনগরীর বেশ্যাপল্লীতে যাওয়ার রেওয়াজটা আজকাল খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে।"

"তার ফল কি হবে ? বর্ণসঙ্কর হয়েই চলবে। আমাদের ঔরসজাত পুত্র-কন্যা অসুরদের মধ্যেই জন্মাতে থাকবে, এবং আমরা আর্য্যর অনিশ্চিততার ফলে বা বিপাক এড়াবার জন্য তাদের সন্তান বলেই গ্রহণ করব। তাহলে আর আমাদের রক্তের বিশুদ্ধতা কি থাকবে ? এই বিশুদ্ধতা রক্ষা করবার কাজে আমাদের স্ত্রী-পুরুষ সবাইকেই সচেতন থাকতে হবে। তা ছাড়া আমাদের দেশে দাসপ্রথা যাতে স্থান না পায় তা আমাদের দেখতে হবে; কারণ, রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার পথে এই প্রথার থেকে বিপজ্জনক আর কিছুই নেই। আমি এমন কথাও বলছি যে, আমাদের এটা দেখতে হবে যে আমাদের দেশে এক জনও অনার্য্য যেন স্থান না পায়।

"সব থেকে বড় বিপদ এবং সমস্ত সর্ব্বনাশের মূল হচ্ছে অসুরদের মধ্যে প্রচলিত রাজপ্রথা, এবং এর থেকেই পুরোহিত প্রথা জন্মেছে একটি শাখা হিসাবে। অসুর জনতার কোন স্বাধিকার নেই—তাদের রাজা যা নির্দেশ দেয় তা পালন করা তারা ধর্মীয় কর্ত্তব্য বলে মনে করে। তাদের পুরোহিতেরা শেখায় যে, গণ-জীবনের সব-কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় উর্দ্ধে ঈশ্বর এবং নিম্নে রাজার দ্বারা—সাধারণ মানুষের কিছু বলা বা করার স্বাধীনতা নেই। রাজাই এই পৃথিবীতে (তাদের কাছে) ঈশ্বর। আমি এ কথা শুনে খুবই সুখী হয়েছি যেশিবি, সৌবীররা রাজপ্রথার বিলোপ সাধন করেছে। অবশ্য আর্য্যদের মধ্যে রাজারা কোন দিনই অসুররাজের মত এত ক্ষমতাবান হয়নি। কারণ আর্য্যদের মধ্যে তারা শুধু শ্রেষ্ঠ বীর বলেই পরিগণিত হত এবং তার নিজের প্রভুত্ব স্থাপনের কোন অধিকারই ছিল না। তা সত্ত্বেও এই পদবটাই ছিল মারাত্মক, এরই আবরণে কেউ-কেউ আর্যদের মধ্যে অসুররাজের অনুরূপ প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিল।

"নিজস্ব জীবনযাত্রা প্রণালী অব্যাহত রাখতে হলে কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর রাজকীয় ক্ষমতা অর্পণ করা আর্য্যদের পক্ষে চলবে না। আর্য্যরা অসুর ধর্মকে অবশ্যই অপছন্দ করে; তাদের মধ্যে যেদিন রাজ-প্রথা জন্ম নেবে, সেদিনই অসুরদের মত পুরোহিত-প্রথাও তাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে; এবং তাহলেই আর্য্য জীবনযাত্রা প্রণালী অবসান হয়ে যাবে বলা চলে। জনতার স্বার্থ ক্ষুন্ন করে রাজা ভোগ-দখল করবে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তার পক্ষ সংগ্রহের জন্য সে পুরোহিতদের ঘুষ দিয়ে তার পক্ষে নেবে, আর রাজা ও পুরোহিতের মিলিত অত্যাচারে জনসাধারণ ক্রীতদাসে পরিণত হবে।

"পুরাতন আর্য্য জীবন-পদ্ধতিকে আমাদের দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে থাকতে হবে এবং আমাদের কোন শাখা যদি প্রলোভিত হয়ে তা থেকে সরে যায়, তাহলে তাদের আর্য্য সমাজ থেকে বাহিষ্কার করে দিতে হবে।"

৩

সৌবীর দেশের দক্ষিণাংশ থেকে (করাচীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চল) বরুণের কাছে নানা দুঃসংবাদ আসছিল। তা থেকে মনে হচ্ছিল যে, অসুরদের শেষ দুর্গ অধিকৃত হওয়ার পর থেকে আর্য্যদের নিজেদের মধ্যেই তীব্র মতভেদ চাড়া দিয়ে উঠছিল। একাধিক বার বরুণ সৌবীরদের সমস্যাটি নানা দিক দিয়ে তার গুরুর সাথে আলোচনা করেছিল। ঋষি অঙ্গিরা প্রায়ই বলতেন যে—যদিও এই বিরোধ প্রথম সুরু হয়েছে সৌবীর দেশে, কিন্তু এই বিরোধ ক্রমে সমস্ত আর্য্যভূমিতেই ছড়িয়ে পড়বে। প্রথম থেকেই আর্য্যরা সমষ্টির অধিকারকে ব্যষ্টির অধিকারের উচ্চে স্থান দিয়ে এসেছে, কিন্তু অসুরদের মধ্যেকার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন অনেক অনেক আর্য্য নেতাকে ক্ষমতালোভী ও আত্মসর্বস্ব করে তুলবার আশঙ্কা ছিল। এই দুই ভাবধারার সংঘাত ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং যে অঞ্চলে যত বেশী অসুর রয়ে গিয়েছিল, সেখানেই তত তীব্র এই সংঘাত সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল; কারণ, পরাজিত অসুররা আর্য্যদের মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ থেকে লাভবান হতে খুবই উদ্‌গ্রীব ছিল।

গান্ধার সহরে আট বছর অবস্থান করে বরুণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তনই মনস্থ করল—কারণ, সৌবীর নগর (বর্ত্তমান রোরি) থেকে আগত সংবাদ আরও বিপদজনক বলে প্রতীয়মান হল। ঋষির শিষ্যদের মধ্যে তার পুরাতনতম বন্ধু পাল, তার সহযাত্রী হল। গান্ধার সীমান্ত পার হয়ে তারা প্রবেশ করল সেই অঞ্চলে—যেখানে সিন্ধুনদ বয়ে চলেছে লবণাঞ্চলের ধার বেয়ে। লবণ-খনিতে যে সমস্ত ব্যাপারী ও শ্রমিক কাজ করছিল তারা অনেকেই ছিল অসুর, এর ফল আর্য্যদের মধ্যে খুবই খারাপ হচ্ছিল, তারা ইতিমধ্যে খুবই আরামপ্রিয় ও আলসে হয়ে উঠেছিল। অনার্য্যরা তাদের সব কাজ করে দিক—এই বাসনাই তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং অস্ত্রচালনা, অশ্বারোহণই যেন তাদের একমাত্র উপযুক্ত কাজ বলে তারা মনে করত। অনার্য্য ভূমিই তখন উর্বর ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল অসুরদের অনুরূপ আর্য্য-রাজপ্রথা প্রবর্তিত হবার। লবণ-পাহাড় পার হয়ে দুই বন্ধু সৌবীরের প্রথম সীমান্ত ঘাঁটিতে—যে জায়গাটায় বর্তমান মূলতান অবস্থিত, সেখানে তারা যে অবস্থা দেখল তা অপেক্ষাকৃত ভাল। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল আর্য্য—এটা তাদের পক্ষে প্রশংসারই ছিল, কারণ এখানকার প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও তারা এটা আর্য্য-ভূমিতেই পরিণত করেছিল। বরুণ ও পাল এই পথযাত্রা যখন করছিল তখন ছিল গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি—অবশ্য তাদের পথকষ্ট বহু পরিমাণে লাঘব হয়ে গিয়েছিল; কারণ, তারা সিন্ধুনদ বেয়ে নৌকায় চড়ে যাচ্ছিল। সৌবীর সহরের আবহাওয়াও ছিল অবর্ণনীয় ভাবে গরম, তাই কষ্টও তাদের হচ্ছিল।

আর্য্যরা তখন পর্য্যন্ত অক্ষর আবিষ্কার করতে পারেনি—তাই বরুণ মাঝে-মাঝে সৌবীরের পথিকদের মারফতে তার বন্ধুদের কাছে যে সংবাদ পাঠাতে পারত, তা কখনও সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারত না। বরুণের তাই প্রায়ই অসুরদের কথা এবং তাদের লিখন-পদ্ধতির কথা মনে পড়ত।

সৌবীর নগরে পৌঁছেই সে বুঝতে পারল যে, ঘটনা বহু দূর এগিয়ে গেছে। নগরের অভ্যন্তরে সুমিত্রের অর্থাৎ যে সেনাপতি শেষ অসুর-দুর্গ ধ্বংস করেছিল তার সমর্থক ছিল অল্পই, কিন্তু দক্ষিণ সৌবীরে বহু আর্য্য ছিল—যারা তার পক্ষাবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিল। অসুরদের শেষ পরাজয়ের সময় সুমিত্র সেই সহরের অধিবাসীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনুকম্পা দেখিয়েছিল, বরুণ তাকে এ জন্য খুব প্রশংসাও করেছিল। কিন্তু এখন তার চৈতন্য হল যে এটা ছিল সুমিত্রের চালাকি। সুমিত্র জানত যে অসুররা আর কোন দিনই আর্য্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সক্ষম হবে না, এবং এদের উপর অনুকম্পা দেখাবার ভিতর দিয়ে সে নিজের পক্ষে সমুদ্রপারের অসুরদের সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে পারবে।

সুমিত্র তখনও সমুদ্রতীরের অসুরনগরী দখল করেই ছিল এবং কাল্পনিক যুদ্ধের অজুহাতে সেখান থেকে ফিরে আসার কথা চিন্তা করতেও চাইত না। সুমিত্রের আসল মতলব সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ দলপতিদের সাথে বরুণ দেখা করতে আরম্ভ করল। তারা ভাবত যে, ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে কোন-কোন উচ্চতর নেতা সুমিত্রের বিরোধিতা করছে। কিন্তু সে নিজে যখন এই সব প্রধান ব্যক্তিদের সাথে দেখা করল, তখন তারা সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল এবং এ কথাও বলল যে, তারা নিজেরা যদিও সুমিত্রের কুমতলব পরিষ্কার ভাবে জ্ঞাত আছে—সাধারণ দেশবাসীর কাছে কিন্তু সেটা স্পষ্ট নেই, তারা এ ব্যাপারটা দেখে ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে।

অসুরনগরী আক্রমণের সময় বরুণ ছিল সুমিত্রের সহকারী সেনাপতি। ইতিমধ্যে যদিও নয় বছর কেটে গিয়েছিল, তবু লোকে তখনও তার বীরত্বের কথা পরম শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ রেখেছিল। তার নিজের মত এদের কাছে তুলে ধরার আগে বরুণ নিজে গিয়ে সুমিত্র সম্পর্কে সঠিক সংবাদ নিয়ে আসা মনস্থ করল। এই উদ্দেশ্যে সে ও তার বন্ধু দক্ষিণ সৌবীরগামী একটি নৌকোয় চড়ে রওনা হল। তারা নিজেদের গান্ধারদেশী বণিকের বেশে সুসজ্জিত করে নিল।

অসুরনগরীকে তখনও আর্য্য-নগরীর পরিবর্তে অসুরনগরীর মতই দেখছিল। সহরের ব্যবসায় অঞ্চলের পথ-ঘাট ছিল সমুদ্রযাত্রী অসুর বণিকদের প্রাসাদমালায় এবং নানা দেশের বাণিজ্যসম্ভারে পূর্ণ। বহু উচ্চ স্তরের অসুর-পরিবার সহরে তাদের পুরাতন অঞ্চলে পূর্বের মতই বসবাস করছিল এবং তাদের গৃহে তখনও দেখতে পাওয়া গেল যে, বিক্রয়ের জন্য শৃঙ্খলিত দাসেরা জমায়েৎ রয়েছে। বস্তুত, বরুণ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগল যে, বিজয়ী আর্য্যদের হল কি? সুমিত্র পুরাতন অসুর রাজপ্রাসাদে বাস করত। এক দিন বরুণ পালকে তার কাছে পাঠাল—গান্ধার-বণিকদের কাছ থেকে উপঢৌকন নিয়ে যাবার ছল করে। পাল ফিরে এসে বলল যে, একমাত্র তার গৌরবর্ণ এবং কটা চুল ছাড়া সুমিত্র নিজেকে পুরাদস্তুর অসুররাজে পরিণত করেছে। তার প্রাসাদ মোটেই এক জন আর্য্যনেতার অনাড়ম্বর গৃহের মত ছিল না—স্বর্ণ-রৌপ্যে ঝলমল অসুর-প্রাসাদকক্ষের মতই তা সাজানো। তার অনুগত সেনাপতিদের মধ্যেও সরল জীবনযাত্রার কোন চিহ্নই ছিল না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা দেখল যে—আর্য্যরা নৃত্য ও অসুর-রমণীদের সাথে মদ্যপানেই মত্ত হয়ে আছে। বহু আর্য্য-রমণী এসে তাদের স্বামীদের সাথে বাস করতে চাইত—কিন্তু তাদের নিবৃত্ত করে রাখতে অছিলার অভাব ছিল না।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

—সাহিত্য-পরিচয়—

বাঙলা প্রবাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)—ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে সম্পাদিত ও সঙ্কলিত। এ, মুখার্জ্জ এণ্ড সন্স কোং লিঃ, ২ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য কুড়ি টাকা।

সংস্কৃত না জেনে বাঙলা সাহিত্যে হস্তক্ষেপ করলে যে পদে পদে হোঁচট খেতে হয় তার প্রমাণ ভূরি ভূরি মিলছে সাম্প্রতিক সাহিত্যে। ভাব আছে, ভঙ্গীও আছে, অথচ শুধু মাত্র সংস্কৃত ভাষা আয়ত্তে না থাকার দরুন কয়েক জন বিশেষ পরিচিত সাহিত্যিককেও দেখা যাচ্ছে তাদের লেখা ক্রমে ক্রমে অপাঠ্য হ'তে চ'লেছে। আমাদের কথা বিশ্বাস না হয়, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা বিচার করালেই আমাদের উক্তি সত্যে পরিণত হবে, কথাটি হলফ ক'রে বলা যায়। কিন্তু পূর্ব্বে, অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্যের প্রথম যুগে এমনটি ছিল না। ভাষায় দক্ষতা না থাকলে সে যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে কেউ ক'ল্কে পেতো না। মাইকেল দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই বাঙলা ভাষাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার আগে সংস্কৃত ভাষা সত্যিকার রপ্ত ক'রেছিলেন, যেজন্য তাঁদের রচনা আজও আমাদের কাছে দুর্মূল্য হয়ে আছে। যাই হোক, আমরা নামজাদা সাহিত্যিকদের উপদেশ দিতে চাই না, কিন্তু উপরিউক্ত বিষয়টি অবহিত হ'লে তাঁদের পক্ষেই মঙ্গল। ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে পাকা সাহিত্যিক হয়েও খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের ব্যতিক্রম। কেন না, তিনি শুধু কবি, সমালোচক এবং গবেষক নন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁকে আদর্শ খাড়া ক'রে সাহিত্যিকরা এগিয়ে চললে ভাল বৈ মন্দ হবে না। পুস্তক সমালোচনা করতে গিয়ে ভালমন্দ বললে হয় কি, সাহিত্যিকরা ভীষণ চ'টে যান, সহ্য করতে পারেন না, যে কারণে মাসিক বসুমতীতে প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা বাতিল ক'রে দিয়ে কেবল মাত্র পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার ক'রেই আমরা খালাস হ'তে চাই। ডাঃ দের আলোচ্য "বাঙলা প্রবাদ" গ্রন্থটির যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা না ক'রে আর থাকতে পারলাম না এই জন্য যে, উক্ত গ্রন্থটি বাঙালী সমাজের অমূল্য "ডকুমেণ্ট"।

দেশবিদেশের প্রবাদ পাঠ করলে জানা যায় দেশের ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, ব্যাকরণ, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান। বাঙলা প্রবাদ পূর্ব্বেও প্রকাশিত হয়েছে আরও কয়েকটি। মিঃ মর্টনের "দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ", পাদরী লঙের "প্রবাদমালা", দ্বারকানাথ বসুর "প্রবাদ পুস্তক", কানাইলাল ঘোষালের "প্রবাদ সংগ্রহ", মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়ের "প্রবাদ পদ্মিনী" প্রভৃতি বাঙলা ভাষায় সঙ্কলিত হ'লেও ডাঃ দের "বাঙলা প্রবাদ" সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থে "Oxford Dictionary of English Proverbs" নামক বিখ্যাত প্রবাদ-অভিধানের সম্পাদন-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক আদর্শ অনুসৃত হয়েছে দেখে আমরা অতিশয় সুখী হয়েছি। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের তফাৎ এই যে, সঙ্কলক প্রবাদগুলি উদ্ধৃত করার সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত প্রবাদগুলি পর্য্যন্ত জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ সোজা কথা বলতে হ'লে বলতে হয়, প্রবাদগুলির usage (ব্যবহার) পর্য্যন্ত একত্র করেছেন। অনেকে মনে করবেন যে, গ্রন্থটির মূল্য অধিক ধার্য্য করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের গ্রন্থের দাম অন্য যে কোন দেশ হ'লে আরও অনেক অনেক বেশী ধার্য্য হ'তো। নিশ্চয়ই সংগ্রহটি আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছবে। সমালোচনার অপেক্ষা রাখবে না।

প্রাপ্তি স্বীকার

কথাগুচ্ছ (৩য় সংস্করণ)—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাত টাকা।

কাল-কল্লোল—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য চার টাকা আট আনা।

যৌবনের পিছল পথে—ডাঃ নীহার গুপ্ত। বেঙ্গল পাব্লিশার্স, ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

দূরভাষিণী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। ইণ্ডিয়ানা লিঃ, ২।১ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

রবি ঠাকুর—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। বীণা লাইব্রেরী, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার। মূল্য দেড় টাকা।

কবিতা—শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক। অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৩ নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

দ্বিধা—শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক। মার্ব্বেল প্যালেস, ৪৬ নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

অচুম্বিতা—শ্রীবিকাশ রায়। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

INDIAN CULTURE—Sree Mahendra Jayanti. Bharat Sanskriti Parisat; 80,6,c; Doctor Lane, Calcutta, Price Rs. Ten.

বীজাণু সংগ্রাম (একাঙ্কী নাটিকা)—শ্রীকালিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য। টালিগঞ্জ প্রেস, কলিকাতা-৩৩। মূল্য বারো আনা।

রবীন্দ্র-গীতা—শ্রীরামকানাই দেবশর্ম্মা। শ্রীমন্দির, ১৯১।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দু টাকা।

আর্য্য-জগৎ—শ্রীগণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন। বিবেকানন্দ বুক এজেন্সী, ৭১।২।এ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ধর্ম্ম ও তাহার স্বরূপ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তবিশারদ তুলসীবেড়িয়া, উদং, হাওড়া। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আইসেনহাওয়ারের জয়ের তাৎপর্য্য—

গত ৫ই নবেম্বর (১৯৫২) তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী মিঃ আইসেনহাওয়ার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং মার্কিণ কংগ্রেসের সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। এই নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া রিপাবলিকান দল বিশ বৎসর পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা লাভ করিল, ইহাই রিপাবলিকান দলের জয় এবং ডেমোক্রাটিক দলের পরাজয়ের একমাত্র তাৎপর্য্য নয়। পৃথিবীর বৃহত্তর অর্দ্ধাংশের উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আজ অপ্রতিহত প্রভাব, জাপান হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম-জার্ম্মাণী পর্য্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের বৃত্তাংশের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির কোন দেশেরই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন নীতি গ্রহণের ক্ষমতা নাই। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নির্ব্বাচনটা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার হইলেও আমেরিকার প্রভাবাধীন দেশগুলির পক্ষেও উহার গুরুত্ব খুব বেশী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা কার্য্যতঃ পৃথিবীর বৃহত্তর অর্দ্ধাংশের অধিবাসীদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাইয়াছেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশের উপরেও আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসী। কি ভাবে তাঁহারা পৃথিবীর বৃহত্তর অর্দ্ধাংশের অধিবাসীদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন, অপর অর্দ্ধাংশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কোন্ নীতি বা পন্থা গ্রহণ করা তাঁদের অভিপ্রায়, মিঃ আইসেনহাওয়ার এবং রিপাবলিকান দলকে বিজয়ী করিয়া তাহারই ইঙ্গিত তাঁহারা দিয়াছেন, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। মিঃ আইসেনহাওয়ারের জয় এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রাটিক দলের মনোনীত প্রার্থী মিঃ ষ্টিভেন্‌সনের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিলে এই ইঙ্গিতের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। মিঃ আইসেনহাওয়ার তথা রিপাবলিকান দলের জয়লাভ করার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারাও খুব কঠিন নয়।

ডেমোক্রাটিক দল একাদিক্রমে বিশ বৎসর ক্ষমতা ভোগ করিয়া আসিতেছে, সুতরাং রিপাবলিকান দলের হাতে ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক, ইহাই মিঃ আইসেনহাওয়ারের জয়লাভের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশ বৎসরেরও অধিক কাল একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা ভোগ করার দৃষ্টান্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে আছে। ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত চব্বিশ বৎসর কাল রিপাবলিকান দল ক্ষমতা ভোগ করিয়াছিল। এবার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল এক দিকে এক জন ব্যবহারজীবী এবং আর এক দিকে এক জন সৈনিকের মধ্যে। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের ব্যাপারে মার্কিণ ভোটারগণ ব্যবহারজীবী মিঃ ষ্টিভেন্‌সনকে প্রেসিডেণ্ট করিবেন, না সৈনিক মিঃ আইসেনহাওয়ারকে প্রেসিডেণ্ট করিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইয়াছিল, ইহা মনে করিলেও গুরুতর ভুল করা হইবে। প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুভারকে বাদ দিলে বরাবরই ব্যবহারজীবী ও সৈনিকের মধ্যেই প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে আরও আট জন সৈনিক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য ব্যবহারজীবী এবং সৈনিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। মিঃ আইসেনহাওয়ার অবশ্য এক জন আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সৈনিক। নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন। সে-তুলনায় ডেমোক্রাটিক দলের মনোনীত প্রার্থী মিঃ ষ্টিভেন্‌সনের কোন আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি নাই, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে কেহ তাঁহাকে পূর্ব্বে চিনিত না। ইহাই তাঁহার পরাজয় এবং মিঃ আইসেনহাওয়ারের জয়ের কারণ বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব। বরং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া এবং সামাজিক সমস্যাগুলির দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, অবস্থা ডেমোক্রাটিক দলেরই জয়লাভের অনুকূল ছিল। মিঃ আইসেনহাওয়ার ডেমোক্রাটিক দলের শাসন-পরিচালন ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগ উপস্থিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। শাসন-পরিচালন ব্যবস্থা হইতে দুর্নীতি দূর করিবার প্রতিশ্রুতি মার্কিণ ভোটারদিগকে, বিশেষতঃ দরিদ্র ভোটারদিগকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দরিদ্র ভোটারগণ ইহা ভাল করিয়াই জানে যে, কি ডেমোক্রাটিক দল কি রিপাবলিকান দল যে-দলই ক্ষমতা লাভ করুক না কেন, তাহাদিগকে শোষণ করিতে কেহই ত্রুটি করিবে না। আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ডেমোক্রাটিক পার্টির অনুকূল হইলেও পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নেই যে মিঃ আইসেনহাওয়ার জয়লাভ করিয়াছেন, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়।

মিঃ আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ ষ্টিভেন্‌সনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাজনৈতিক পণ্ডিতরা কে জয়লাভ করিবেন, সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করেন নাই। বস্তুতঃ কে জয়লাভ করিবেন সে-সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনুমান করা কঠিন হওয়ায় নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের তীব্রতা বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ ১৯৪৮ সালে মিঃ ট্রুম্যানের নির্ব্বাচন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হওয়ায় এই নির্ব্বাচনে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সকলেই সতর্ক না হইয়া পারেন নাই। ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় ভবিষ্যদ্বাণী করা আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। নির্ব্বাচনের ফলাফল
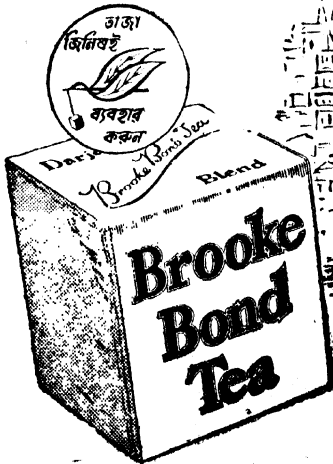
যে-কোন কিছু হওয়া যেখানে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় নাই সেখানে মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি, কম্যুনিজম নিরোধ, চীন হস্তচ্যুত হওয়া এবং কোরিয়া যুদ্ধের প্রশ্নেই যে নির্ব্বাচনের পাল্লা মিঃ আইসেনহাওয়ারের দিকে ঝুঁকিয়াছিল, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। কম্যুনিজম-নিরোধের ব্যাপারে রিপাবলিকান দল ও ডেমোক্র্যাটিক দলের মধ্যে নীতিগত দিক হইতে কোন পার্থক্য নাই। উভয় দলই কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধ করিতে সমান উৎসাহী। কিন্তু পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে পন্থা লইয়া। কম্যুনিজম নিরোধের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক গবর্ণমেণ্ট যে পন্থা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, রিপাবলিকান দলের দৃষ্টিতে তাহা কম্যুনিজম তোষণ-নীতি ছাড়া আর কিছু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। রিপাবলিকান দলের কেহ-কেহ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কম্যুনিজম নিরোধের প্রশ্নটিকে তীব্রতর করিয়াছে কোরিয়া যুদ্ধ। মিঃ আইসেনহাওয়ার নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যে কোরিয়া যুদ্ধ আমদানি করিয়াই বাজীমাৎ করিয়াছেন।

১৯৪৪ সালে এবং ১৯৪৮ সালে প্রেসিডেণ্ট ডিউই ছিলেন রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী। নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতির আমদানি করেন নাই। হয়ত ইহাই ছিল তাঁহার পরাজয়ের কারণ। কিন্তু মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি, বিশেষ করিয়া কোরিয়া যুদ্ধই মিঃ আইসেনহাওয়ারকে বিজয়ী করিয়াছে।

নির্ব্বাচনী বক্তৃতাগুলিতে রাশিয়া, কম্যুনিজম, কোরিয়া যুদ্ধ প্রভৃতি সম্পর্কে মিঃ আইসেনহাওয়ার যে সকল উক্তি করিয়াছেন, মার্কিণ ভোটারদের মনের উপর সেগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। এই উক্তিগুলির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য এশিয়াবাসীর বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। গত ২৫শে আগষ্ট (১৯৫২) এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "Our Government once and for all with cold finality must tell the Kremlin that we shall never recognize the slightest permanence of Russia's position in Eastern Europe and Asia." অর্থাৎ 'রাশিয়াকে চূড়ান্ত ভাবে এবং শেষ বারের মত আমাদের গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তার সহিত অবশ্যই জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, পূর্ব্ব-ইউরোপ এবং এশিয়ায় তাহার প্রভাবের বিন্দুমাত্র স্থায়িত্বও আমরা স্বীকার করিব না।' প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পররাষ্ট্র নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া গত ৮ই অক্টোবর তারিখে (১৯৫২) তিনি বলেন যে, রুশ-কপটতার পুনঃ পুনঃ পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও মিঃ ট্রুম্যান ১৯৪৮ সালে বলিয়াছিলেন, "I like old uncle Joe Stalin. He is a decent fellow." (বুড়ো খুড়ো জো ষ্টালিনকে আমার ভাল লাগে। তিনি ভারি ভাল মানুষ)। কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি আলোচনাকে তিনি 'সোভিয়েট ফাঁদ' (Soviet trap) বলিয়াই শুধু অভিহিত করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে, কম্যুনিজমের মানসিক কূটকৌশল কি ভাবে আমাদের রাজধানীতেও প্রবেশ করিয়াছে, এই যুদ্ধবিরতি আলোচনা তাহার আর একটি নিদর্শন। কোরিয়া যুদ্ধকে তিনি কি ভাবে নির্ব্বাচনে জয়লাভের শাণিত অস্ত্রে পরিণত করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোরিয়ার যুদ্ধ ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু উহা দুই বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া চলিতেছে এবং এই যুদ্ধে এ-পর্য্যন্ত বহু মার্কিণ সৈন্যের জীবন নষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। ২৪শে অক্টোবর ডেট্রয়েটে এক বক্তৃতায় মিঃ আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে, তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলে স্বয়ং কোরিয়ায় যাইবেন এবং সম্মানের সহিত কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন। শুধু তাই নয়, তিনি ইহাও প্রস্তাব করেন যে, কোরিয়া যুদ্ধে আরও বেশী সংখ্যায় দক্ষিণ-কোরীয় সৈন্য নিয়োজিত করিতে হইবে এবং মার্কিণ সৈন্যদিগকে রিজার্ভ রাখিতে এবং দেশে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মিঃ আইসেনহাওয়ার নির্ব্বাচনী এক বক্তৃতায় ইহাও বলিয়াছেন যে, "If there is a war, let Asians fight Asians." অর্থাৎ 'যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে এসিয়াবাসীকেই এশিয়াবাসীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।' তাঁহার এই সকল প্রতিশ্রুতি মার্কিণ ভোটারদের কাছে যে খুব লোভনীয় হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নূতন ভোটারদের সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। ইঁহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। তাঁহারা এক জন 'জাতীয় বীর যোদ্ধাকে (national hero) প্রেসিডেণ্ট করিতে চাহিবেন, ইহা অস্বাভাবিক না হইতেও পারে। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধে নিয়োজিত মার্কিণ সৈন্যদের জননী ও পত্নীরা যে মিঃ আইসেনহাওয়ারের প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চীন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় আমেরিকার যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব-ইউরোপেও রাশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-ইউরোপ, চীন ও উত্তর-কোরিয়াকে কম্যুনিজমের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার প্রতিশ্রুতি মিঃ আইসেনহাওয়ার দিয়াছেন। কম্যুনিজমের প্রভাব হইতে মুক্ত হইলেই ঐ দেশগুলি আমেরিকার প্রভাবাধীনে আসিবে। অথচ ইহার জন্য যুদ্ধ করিতে হইলে মার্কিণ সৈন্যদের যুদ্ধ করিতে হইবে না। বিশেষতঃ এশিয়ায় এশিয়াবাসীরাই এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মার্কিণ সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আর কিছু হইতে পারে না। ইহাই মিঃ আইসেনহাওয়ারের জয়লাভের প্রধান কারণ। অধিকাংশ মার্কিণ ভোটারের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় মিঃ আইসেনহাওয়ারের জয়ের এই কারণের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি যেরূপ বিপুল ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মিঃ আইসেনহাওয়ার মোট ৬ কোটি ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ১১৪টি পপুলার ভোট পাইয়াছেন। এত অধিক পপুলার ভোট পাইয়া আর কোন প্রেসিডেণ্ট এ-পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হন নাই। ১৯৩৬ সালে রুজভেল্ট ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৯৭টি পপুলার ভোট পাইয়াছিলেন। মিঃ আইসেনহাওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ ষ্টিভেনসন পাইয়াছেন ২ কোটি ৪২ লক্ষ ১৭ হাজার ২০৬টি পপুলার ভোট। মোট পপুলার ভোটের শতকরা ৫৫.৫ ভাগ পাইয়াছেন মিঃ আইসেনহাওয়ার। মিঃ আইসেনহাওয়ার ইলেক্টরেল ভোট পাইয়াছেন ৩০১টি এবং মিঃ ষ্টিভেনসন পাইয়াছেন ২১৭টি ইলেক্টরেল ভোট। ১৯৪৮ সালে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ৩০৩টি ইলেক্টরেল ভোট পাইয়াছিলেন। মিঃ আইসেনহাওয়ার বিপুল ভোটে জয়লাভ করিলেও সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা খুব সামান্য।

নিম্নে নূতন ও প্রাক্তন কংগ্রেসের তুলনামূলক তালিকা দেওয়া গেল :—

প্রতিনিধি পরিষদ—

	নূতন	প্রাক্তন
রিপাবলিকান দল	২১৮	২০২
ডেমোক্রাটিক দল	২০৫	২৫২

সিনেট—

	নূতন	প্রাক্তন
রিপাবলিকান দল	৪৯	৪৭
ডেমোক্রাটিক দল	৪৭	৪৯

এই সামান্য সংখ্যা-গরিষ্ঠতা রিপাবলিকান দলের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়, ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দক্ষিণী ডেমোক্রাট এবং রিপাবলিকান দলের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে আঁতাত ইতিপূর্ব্বেও প্রগতিমূলক আইন পাশ হওয়া নিরোধ করিয়াছে। মিঃ আইসেনহাওয়ারের শাসনকালেও যে অনুরূপ অবস্থাই ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মিঃ আইসেনহাওয়ার নিজেও প্রগতিপন্থী নহেন। সুতরাং প্রগতিমূলক আইনের প্রশ্নই হয়ত উঠিবে না।

মিঃ আইসেনহাওয়ার আগামী ২০শে জানুয়ারী (১৯৫৩) কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। কোরিয়া যুদ্ধ, কম্যুনিজম নিরোধ এবং রুশ-প্রভাবিত দেশগুলিকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি কি পন্থা গ্রহণ করিবেন, তাহা বিশ্ববাসী উৎকণ্ঠিত চিত্তে লক্ষ্য না করিয়া পারিবে না। তিনি স্বয়ং কোরিয়ায় গেলেই যে সম্মানের সহিত কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে পারিবেন, ইহা আশা করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যদি তিনি না পারেন, তবে ব্যর্থতার মধ্যেই সুরু হইবে তাঁহার শাসনকাল। অতঃপর চীনকে অবরোধ করিবার, মাঞ্চুরিয়ায় বোমাবর্ষণ করিবার এবং চিয়াং কাইশেককে চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে কি ? কোরিয়া হইতে তিনি মার্কিণ সৈন্য সরাইয়া আনিবার নির্দ্দেশ দিবেন কি ? মার্কিণ সৈন্যের স্থলে জাপ সৈন্য কোরিয়ায় যুদ্ধ করিবে কি ? এইরূপ অবস্থায় বৃটেন এবং আমেরিকার অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্র কি করিবে ? এই সকল প্রশ্ন প্রত্যেক এশিয়াবাসীর চিত্ত আলোড়িত করিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন সমস্ত দেশকে যদি মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে ভোট দিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে কি হইত, এই প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে না কি ? গত ৯ই নভেম্বর (১৯৫২) 'সাণ্ডে গ্রাফিক' পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, নব নির্ব্বাচিত মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার রাশিয়ার কোন উচ্চপদস্থ মন্ত্রী সম্ভবতঃ মলোটভের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পিকিংএ যাইতে রাজী আছেন। তাঁহার প্রস্তাবিত কোরিয়া পরিদর্শনের পর যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্যই নাকি এই সাক্ষাৎকারের অভিপ্রায় করা হইয়াছে। এই সংবাদ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু মিঃ আইসেনহাওয়ার কম্যুনিজম নিরোধের নীতিকে কোন্ পথে পরিচালিত করিবেন, সমগ্র বিশ্ব উৎকণ্ঠার সহিত তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারিবে না।

অশান্ত কেনিয়া—

আফ্রিকার জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে, বৃটিশ উপনিবেশ তথা আশ্রিত রাজ্য কেনিয়ার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের মধ্যেও তাহা প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেনিয়াবাসীদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে খুবই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা গত ২০শে অক্টোবর তারিখে (১৯৫২) কেনিয়ার বৃটিশ ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সমগ্র কেনিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা, মধ্য-প্রাচী হইতে বিমানযোগে বৃটিশ সৈন্য আমদানি এবং ব্যাপক দমন-নীতি চালানো হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই ধরণের বৃটিশ দমন-নীতির সহিত ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী আমরা বিশেষ ভাবেই পরিচিত। দমন-নীতি চালাইবার অজুহাতের মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। কেনিয়ায় মাউ মাউ সমিতির সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ দমনের জন্যই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া দমন-নীতি চালানো হইতেছে, এই অজুহাতে আমাদের বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কেনিয়ার মাউ মাউ আন্দোলন সম্পর্কে পৃথিবীর জনসাধারণ অতি সামান্যই জানে। বৃটিশ প্রচারকার্য্য এই আন্দোলন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে। গত চারি-পাঁচ বৎসর ধরিয়াই মাউ মাউ আন্দোলনের কথা আমরা বিশেষ ভাবে শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু কেনিয়ার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যেমন বিশেষ কিছুই জানি না, জানিবার উপায়ও যেমন আমাদের নাই, তেমনি মাউ মাউ আন্দোলন সম্পর্কে জানিবার অতি সামান্য সুযোগ-সুবিধাই আমরা পাইয়া থাকি।

কেনিয়াবাসীরা দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছে। প্রথমে তাহারা পূর্ব্ব-আফ্রিকা এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে অহিংস হইলেও ১৯২২ সালের ধর্ম্মঘটের পর উহাকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। ইহার পর তাহারা কি-কু-উ কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ইহা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের প্রারম্ভে এই প্রতিষ্ঠানটিকেও বে-আইনী ঘোষণা করা হয় এবং নেতাদিগকে হয় বন্দী করা হয়, না হয় নির্ব্বাসিত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র নেতা—যিনি বন্দী হন নাই, তিনি তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। তাঁহার নাম জোমো কেনিয়াত্তা। বর্ত্তমানে তিনি কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। উল্লিখিত দুইটি প্রতিষ্ঠানের একটিও সন্ত্রাসবাদী ছিল না। ন্যায়সঙ্গত যুক্তি এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয় যদি বিগলিত না হয়, তাহা হইলে আন্দোলনকারীরা সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। কিন্তু কেনিয়ায় বর্ত্তমানে যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, তাহাকে সন্ত্রাসবাদ না বলিয়া বিপ্লবের পূর্ব্বাভাষ বলিলেই ঠিক হয়। কেনিয়াস্থিত বৃটিশ ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, মাউ মাউ এসোসিয়েশন কি-কু-উ কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনেরই গুপ্ত সংস্করণ মাত্র। এই ধারণা হইতেই তাঁহারা জোমো কেনিয়াত্তাকে গ্রেফতার করিয়াছেন এবং তাহার ফলে কেনিয়াবাসীরা ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই।

বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে কেনিয়ার বর্ত্তমান বিক্ষুব্ধ অশান্ত অবস্থার কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, সহর অঞ্চলে অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং কি-কু-উ উপজাতির কতক অংশে সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্যকলাপ ক্রত বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃটিশ সংবাদপত্র সমূহের কথা এই যে, কেনিয়া আফ্রিকান্ ইউনিয়ন রাজনৈতিক অধিকার লাভ

করিবার জন্য প্রকাশ্যে আন্দোলন চালাইতেছে আর মাউ মাউ দল এই ক্ষমতা লাভ ত্বরান্বিত করিবার জন্য চালাইতেছে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ। বৃটিশ সংবাদপত্র হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, কেনিয়ার কাফ্রি (African) অধিবাসীদের অধিকাংশই এই অশান্ত অবস্থা দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। কেনিয়া যাত্রার পূর্ব্বে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ অলিভার লিটিলটন গত ২২শে অক্টোবর লণ্ডনে বলিয়াছেন যে, "কেনিয়ায় কাফ্রি (African) অধিবাসীর সংখ্যা ৫৫ লক্ষ। তন্মধ্যে মাত্র এক লক্ষ কাফ্রি মাউ মাউ গুপ্ত আন্দোলনে যোগ দিয়াছে। কেনিয়ার অধিকাংশ কাফ্রিই আইনানুগ। তাহারা মাউ মাউদের কার্য্যকলাপকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। এই মন্তব্য দ্বারা তিনি এই কথাই বিশ্ববাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কেনিয়ার অধিকাংশ কাফ্রি অধিবাসীই বৃটিশ শাসন এবং শোষণে পরম সুখে বাস করিতেছে, এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন তাহারা চায় না। কিন্তু কেনিয়ার যে পটভূমিতে বর্ত্তমান অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে বৃটিশ শোষণ ও শাসনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

কেনিয়ায় ইউরোপীয়দের সংখ্যা মাত্র ত্রিশ হাজার। কিছু সংখ্যক ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান এবং আরবও কেনিয়ায় বাস করে। কেনিয়ায় একটি আইন সভাও আছে। উহার ক্ষমতা অবশ্য খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতাবিশিষ্ট আইন সভাতেও ইউরোপীয় সদস্যের সংখ্যা ২৭ জন এবং চারি জন মাত্র কাফ্রি সদস্য। কাফ্রিদের কোন ভোটাধিকার না থাকায় এই চারি জন কাফ্রি সদস্যও গবর্ণর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া থাকেন। কেনিয়ায় ১২ জন সদস্য লইয়া একটি শাসন-পরিষদ আছে। এই শাসন-পরিষদই কেনিয়ার শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। শাসন-পরিষদে যে এক জন কাফ্রি সদস্য আছেন, তিনিও গবর্ণরের মনোনীত ব্যক্তি। কেনিয়া সম্পর্কে আইন প্রণয়নের বিশেষ ক্ষমতা বৃটিশ পার্লামেন্টের হাতে রহিয়াছে। নৈরবীর আশে-পাশে যে-সকল সুসমৃদ্ধ আবাদ আছে সেগুলির মালিক ইউরোপীয়েরা। কোন কফি-বাগানের মালিক হওয়ার অধিকার কাফ্রিদের নাই। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করিবার অধিকার হইতেও তাহারা বঞ্চিত। কেনিয়ায় বর্ণবৈষম্য দক্ষিণ-আফ্রিকা অপেক্ষা একটুকুও কম নয়। সরকারী উচ্চ পদগুলিতে শুধু ইউরোপীয়দেরই অধিকার আছে। ইমিগ্রেশন আইন এমন ভাবে পরিচালন করা হইয়া থাকে যে, শুধু শ্বেতকায়রাই কেনিয়ায় যাইয়া বসবাস করিবার অধিকার লাভ করে। এশিয়াবাসীদের বেলায় কঠোর ভাবে ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কাফ্রিরা এবং কেনিয়াস্থিত এশিয়াবাসীরা মিলিত হইয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভের জন্য সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের যে চেষ্টা করে নাই, তাহা নয়। কিন্তু কেনিয়ার বৃটিশ ঔপনিবেশিক গবর্ণমেন্ট ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সমস্যা সম্পর্কে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে গঠিত কমিটি অসাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী এবং single transferable ভোট-ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়দের কাছে ইহা ভাল লাগে নাই। তাহারা কতক ভারতীয় মুসলমানকে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা দাবী করিতে অনুপ্রাণিত করে এবং উক্ত কমিটির সুপারিশ সরাসরি অগ্রাহ্য করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানায়। অশ্বেতকায়দের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া খুব তাড়াতাড়ি এক আইন প্রণয়ন করিয়া ফেলেন। এই সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেনিয়ার অশান্ত অবস্থা আলোচনা করিলে বৃটিশ দমন-নীতির জন্য শুধু মাউ মাউ দলের সন্ত্রাসবাদকে দায়ী করা চলে না।

কেনিয়ায় জরুরী অবস্থা জারী হওয়ার দশ দিনের মধ্যে ৩ হাজার ৬ শত কাফ্রিকে গ্রেফতার করা হয়। ইহা হইতে কেনিয়ায় অশান্ত অবস্থার সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। কেনিয়ার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ লিটিলটন যেমন গিয়াছিলেন, তেমনি গিয়াছিলেন বৃটিশ পার্লামেন্টের দুই জন শ্রমিক সদস্য। তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন, সে-সম্পর্কে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বৃটিশ শ্রমিক-শাসনের আমলেও কেনিয়ার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। শ্রমিক গবর্ণমেন্টের ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ জেমস্ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, কেনিয়া আইন সভায় কাফ্রি সদস্যগণ আইন সভার বেসরকারী সদস্যদের অর্দ্ধেক করার জন্য দাবী করিয়াছেন। কিন্তু এই সামান্য দাবীও শ্রমিক গবর্ণমেন্ট পূরণ করিতে পারেন নাই। মিঃ লিটিলটন কেনিয়া পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কমন্স সভায় মাউ মাউদের সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপকে শুধু ভয়াবহ ও পশুজনোচিত নৃশংসতা বলিয়াই অভিহিত করেন নাই, আফ্রিকায় বৃটেনের বৃহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "Britain's great ambitions in Africa are not going to be turned aside by a band of terrorists. We are in the country to stay. We shall restore freedom from fear and we shall restore the Queen's peace." অর্থাৎ 'এক দল সন্ত্রাসবাদী দ্বারা আফ্রিকায় বৃটেনের বৃহৎ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জিত হইতে পারে না। ঐ দেশে আমরা থাকিবই। আমরা ভয় হইতে মুক্তি এবং রাণীর শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবই।' বৃটেনের সুবৃহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেনিয়ার কাফ্রিদিগকে চরম দুর্গতির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। বৃটিশ বেয়নেটের গুঁতোয় ৫০ লক্ষ কাফ্রির মধ্যে রাণীর শান্তিই প্রতিষ্ঠিত হইবে বটে! তাহার পরিণামে কেনিয়ার শ্বেতকায়গণ আধিপত্য হারাইবার ভয় হইতে মুক্ত হইবার আশা অবশ্যই করিতে পারে। মিঃ লিটিলটন জনকল্যাণকামী সাম্রাজ্যবাদের বড়াই করেন নাই, সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন মূর্ত্তিকেই প্রকটিত করিয়াছেন। কালের ইঙ্গিত তিনি বুঝিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতার দাবী আর কত দিন তাঁহারা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন?

কোরিয়া যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ—

কোরিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনায় যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহার অবসান ঘটাইতে পারিবে, ইহা আশা করা এখন পর্য্যন্তও দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমেই ইহা বলা প্রয়োজন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে উত্তর-কোরিয়ার সহিত যুদ্ধ চালানো হইতেছে। শান্তি আলোচনাও চলিতেছে উত্তর-কোরিয়া

স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য

সুস্থ-সবল ও কর্মঠ থাকতে হলে এমন পুষ্টিকর খাদ্য আপনার দরকার যা শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলির পুনর্গঠন করবে এবং দৈনন্দিন কাজে যে শক্তি ব্যয় হয় তাও ফিরিয়ে আনবে। খাদ্যের সঙ্গে বলবর্ধক উপাদানের সমন্বয়ে তৈরী স্কটস ইমালশন প্রতিদিনের পরিপূরক খাদ্য হিসেবে অতুলনীয়।

রোগ প্রতিরোধের জন্য

শরীর ভালো থাকলেও একটি অসুখের ঝটকাতেই অনেক-দিনের মতো অকর্মণ্য হয়ে পড়া বিচিত্র নয় — আর তাতে কাজকর্মেরও দারুণ ক্ষতি। অযথা ঝুঁকি না নিয়ে রোজ স্কটস ইমালশন খান এবং রোগ প্রতি-রোধ শক্তি বাড়িয়ে তুলুন। ডাক্তাররা ৭৯ বছর ধরে স্কট্‌স খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছেন।
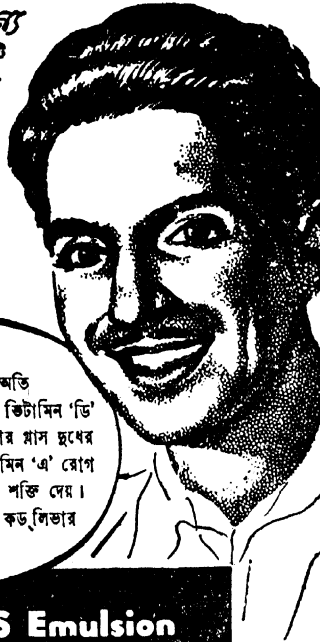
১. স্কট্‌স ইমালশন
খাঁটি কড্‌ লিভার অয়েল যা অতি
পুষ্টিকর ও বলবর্ধক প্রাকৃতিক খাদ্য। ভিটামিন 'ডি'
থাকায় অস্থি গঠনে এক চামচ স্কট্‌স চার গ্লাস দুধের
সমান শক্তিশালী! ২. আর এর ভিটামিন 'এ' রোগ
ও সংক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার শক্তি দেয়।
স্কট্‌স ইমালশন-এর চেয়ে সহজপাচ্য কড্‌ লিভার
অয়েল আর নেই।

SCOTT'S Emulsion

স্কট্‌স ইমালশন

প্রতি চামচে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়

পরিবেশক:

ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

কলিকাতা — বোম্বাই — মাদ্রাজ
কোচীন — নয়াদিল্লী — কানপুর

S.3436

ও চীনা কম্যুনিষ্টদের সহিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের। কিন্তু আসলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেনামীতে কোরিয়ায় যুদ্ধ চালাইতেছে এবং যুদ্ধবিরতির আলোচনাতেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বেনামদার মাত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কোরিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনায় অচল অবস্থা সমাধানের প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। গত ১৮ই অক্টোবর (১৯৫২) কোরিয়া যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্ব্বাধিনায়ক কোরিয়া যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কোরিয়া যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কার্য্যকলাপ এবং যুদ্ধবিরতি আলোচনা সম্পর্কে একটি বিশেষ রিপোর্ট প্রদান করা হইয়াছে। প্রায় তিন মাস ধরিয়া কোরিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনা স্থগিত রহিয়াছে। ষোল মাস পূর্ব্বে কোরিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধবিরতির একটি মাত্র বাধা রহিয়াছে। বস্তুতঃ যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের প্রশ্ন লইয়াই বর্ত্তমান অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আট মাস ধরিয়া এই সমস্যা লইয়া আলোচনা চলিলেও এখন পর্য্যন্ত সমাধানের কোন আশা দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধবন্দী বিনিময় সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোরিয়া যুদ্ধের সর্ব্বাধিনায়কের যে প্রস্তাব লইয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কোন সমাধান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সত্যই করিতে পারিবে কি?

কোরিয়া যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক তাঁহার রিপোর্টে যুদ্ধবিরতি আলোচনা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, কোরিয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া 'সম্মানজনক সর্ত্তে' যুদ্ধবিরতির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মিঃ একিসন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর-অধিনায়কের কোরিয়া যুদ্ধ এবং যুদ্ধবিরতি আলোচনা পরিচালন সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উপস্থিত করিয়াছেন। বৃটেন এবং আরও ১৯টি রাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। এই প্রস্তাবের মূল কথা হইল এই যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর-অধিনায়ক যুদ্ধবিরতির জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কম্যুনিষ্টরা তাহা গ্রহণ করিলেই কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি হইতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায় সম্মানজনক সর্ত্তে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করিতে। কম্যুনিষ্টরাই বা কেন যুদ্ধবিরতির জন্য সম্মানজনক সর্ত্ত দাবী করিবে না? রাশিয়ার পক্ষ হইতে কোরিয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠনের দাবী করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। যে-সকল পক্ষ কোরিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে এবং যাহারা লিপ্ত হয় নাই তাহাদের সহ অন্যান্য রাষ্ট্র লইয়া এই বিশেষ কমিশন গঠন করিতে হইবে। কাজেই উত্তর-কোরিয়া ও চীনকেও এই বিশেষ কমিশনে গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের ভাগ্য অনুমান করা কঠিন নয়। অপর দিকে কোরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতও একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। এক দিকে উত্তর-কোরিয়া, চীন এবং রাশিয়া এবং অপর দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য না হইলে ভারতের প্রস্তাবও কোন কাজেই আসিবে না। প্রস্তাবটি কিরূপ হইলে উত্তর-কোরিয়া ও চীনের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য ভারত উত্তর-কোরিয়া ও চীনের সহিত আলোচনা করিতেছে বলিয়া এক সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে ভারতের পক্ষ হইতে কিছু বলা না হইলেও ইহা নিঃসন্দেহ অনুমান করিতে পারা যায় যে, উত্তর-কোরিয়া ও চীনের মনোভাব না জানিয়া ভারতের পক্ষে কোরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা অর্থহীন।

যুদ্ধবিরতি চুক্তির পথে বর্ত্তমানে একমাত্র বাধা বন্দী-বিনিময়ের প্রশ্ন। এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বড় কম নয়। যুদ্ধবন্দীদিগকে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীতে পরিণত করিবার নজীর যদি সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। যে-সকল যুদ্ধবন্দী স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে রাজী নয়, তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য না করার মূলে মস্ত একটা মানবতার যুক্তি অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মানবতার যুক্তির মূলে আবার একটা আশঙ্কা রহিয়াছে যে, হাজার হাজার চীনা যুদ্ধবন্দী দেশে ফিরিয়া গেলেই চীন গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে পাইকারী ভাবে হত্যা করিবেন। এইরূপ আশঙ্কা করিবার সত্যই কোন কারণ আছে কি? কোন কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, ভবিষ্যতে বন্দী-বিনিময়ের সময়েও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে এবং কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই ইহা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আজ যদি উত্তর-কোরিয়া এবং চীন দাবী করে যে, মার্কিণ যুদ্ধবন্দীরা কম্যুনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করায় তাহারা আর দেশে ফিরিয়া যাইতে রাজী নয়, তাহা হইলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে?

ইন্দোনেশিয়া—

গত ১৭ই অক্টোবর (১৯৫২) ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্ত্তায় যে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হাঙ্গামা হইয়া গেল, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা কিছুই প্রকাশ পায় নাই। কেহ-কেহ মনে করেন, ইন্দোনেশিয়ার সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনের সহিত এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। বর্ত্তমানে ইন্দোনেশিয়ার মন্ত্রিসভা আটটি রাজনৈতিক দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। কিন্তু এই মন্ত্রিসভায় অদলীয় সদস্য আছেন তিন জন। তন্মধ্যে দেশরক্ষা সচিব জাকার্ত্তার সুলতান অন্যতম। তিনি পাশ্চাত্য ধরণে সুসংহত এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী গঠনের পক্ষপাতী। তাঁহার বিরোধীরা সৈন্যবাহিনীর এরূপ ছোট-ছোট ইউনিট গঠনের পক্ষপাতী—যাহা গেরিলা যুদ্ধ চালাইতে সমর্থ হইবে। দেশরক্ষা সচিবের বিরোধীরা জাতীয়তাবাদী দল দ্বারা পরিচালিত হইলেও মসজুমী পার্টি এবং সোশ্যালিষ্ট পার্টির কতক তাহাদের সমর্থক। কিন্তু এই বিরোধিতাই বিক্ষোভ প্রদর্শনের কারণ, এ কথা স্বীকার করা কঠিন। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের মূলে দারুল ইসলাম দলের হাত আছে, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। দারুল ইসলাম দলের সহিত মসজুমী দলের মূলতঃ নীতি-পার্থক্য খুব বেশী নয়। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ না থাকিলে মন্ত্রিসভার পতন পর্য্যন্ত ঘটিতে পারিত, এইরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করা হইয়াছে।

পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া মন্ত্রিসভার পতন রোধ করার ব্যবস্থা শুধু অল্প দিনের জন্যই চলিতে পারে। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের সহিত নূতন নির্ব্বাচনের দাবীও জড়িত আছে বলিয়া প্রকাশ। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ উইলোপো এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরের প্রথম দিকে সাধারণ নির্ব্বাচন হইতে

পারে। কিন্তু ডাঃ সোয়েকর্ণ তাহা মনে করেন না। তিনি বলিয়াছেন, ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত ডাচ-নিউগিনি সংযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে সাধারণ নির্ব্বাচন হইতে পারে না। নিউগিনি সম্পর্কে ডাচ মনোভাব যেরূপ তাহাতে ডাচ-নিউগিনি ইন্দোনেশিয়ার সহিত যুক্ত হওয়ার সাপক্ষে যদি সাধারণ নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা হয়, তবে নির্ব্বাচন যে কবে হইবে তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

জাকার্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা ডাচ হাই কমিশনারের আবাসের উপর উড্ডীয়মান ডাচ-পতাকা নামাইয়া টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী-দিগকে শান্ত করিবার জন্য এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, নিউগিনি ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত যুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিপ্লব সম্পূর্ণ হইবে না। কিন্তু কোন্ পথে যে আশ্বাস কার্য্যকরী করা হইবে তাহা অনুমান করা সহজ নয়। নিউগিনির উপর সার্ব্বভৌম অধিকার পরিত্যাগ না করিতে ডাচ গবর্ণমেণ্ট এ-পর্য্যন্ত অনমনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে সেই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী যুক্তিই প্রদর্শন করা হইতেছে। তাঁহাদের দাবী এই যে, নিউগিনির উপর কর্তৃত্ব করিতে তাঁহাদের আইনসঙ্গত এবং নৈতিক অধিকার রহিয়াছে এবং নিউগিনির অধিবাসীরা স্বাধীন ভাবে গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুতেই নিউগিনির কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিবেন না। উপনিবেশ থাকার যে একটা ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ মর্য্যাদা আছে ওলন্দাজরা স্বেচ্ছায় তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে, ইহা আশা করা অসম্ভব।

জাতিপুঞ্জ ও দক্ষিণ-আফ্রিকা—

গত ১১ই নবেম্বর (১৯৫২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে আরব-এশীয় দল কর্তৃক উত্থাপিত দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এইবার লইয়া ছয় বার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি সম্পর্কে ভারতের অভিযোগের আলোচনা হইল। আলোচ্য প্রস্তাবে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য তিন জন সদস্যের এক শুভেচ্ছা কমিশন গঠনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে এবং প্রস্তাবিত শুভেচ্ছা কমিশনের আলাপ-আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অঞ্চল বিভাগ আইনের (The Group Areas Act) প্রবর্ত্তন স্থগিত রাখিবার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত আরব-এশীয় দেশগুলি কর্তৃক এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়:—ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইরাক, লেবানন, লাইবেরিয়া, ফিলিপাইন, সৌদী আরব, সিরিয়া এবং ইয়েমেন। প্রস্তাবের যে অংশে দক্ষিণ-আফ্রিকা অঞ্চল বিভাগ আইন স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, উহা ভোটে দেওয়া হইলে পক্ষে ৩০ ভোট এবং বিপক্ষে ১২ ভোট হয়। ষোলটি রাষ্ট্র অনুপস্থিত ছিল। যাহারা প্রস্তাবের এই অংশের পক্ষে ভোট দিয়াছে তাহাদের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া এবং ইউক্রেন অন্যতম। নিম্নলিখিত দেশগুলি বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে:—আর্জ্জেণ্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, কলম্বিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, হল্যাণ্ড, লুক্সেমবুর্গ, নিউজীল্যাণ্ড, পেরু, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং বৃটিশ যুক্তরাজ্য। যে সকল দেশ অনুপস্থিত ছিল তন্মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, চিয়াং কাইশেকের চীন এবং তুরস্ক অন্যতম। নিম্নলিখিত দেশগুলি অনুপস্থিত ছিল:—ব্রাজিল, কানাডা, চিয়াং কাইশেকের চীন, কিউবা, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়াডর, আইসল্যাণ্ড, নিকারাগুয়া, প্যারাগুয়ে, তুরস্ক, নরওয়ে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে এবং ভেনেজুয়েলা। যে সকল দেশ অনুপস্থিত ছিল তাহাদের অনুপস্থিত থাকা হইতেই অঞ্চল বিভাগ আইন সম্পর্কে ঐ সকল দেশের মনোভাব পরোক্ষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রকাশ্য ভাবেই অঞ্চল বিভাগ আইন স্থগিত রাখার প্রস্তাবে বিরোধিতা করিয়াছে।

প্রস্তাবটি সমগ্র ভাবে ভোটে দেওয়া হইলে উহার পক্ষে ৪১টি ভোট হয় এবং একমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকাই উহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। কিন্তু ষোলটি রাষ্ট্র অনুপস্থিত ছিল ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র প্রস্তাবটির অনুকূলে ভোট দিয়াছে। সমগ্র ভাবে প্রস্তাবটির পক্ষে নিম্নলিখিত দেশগুলি ভোট দিয়াছে:—আফগানিস্থান, বোলিভিয়া, ব্রাজিল, ব্রহ্মদেশ, চাইলো, রাশিয়া, চিলি, চিয়াং কাইশেকের চীন, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, মিশর, এল সালভাডর, ইথিওপিয়া, গুয়াতেমালা, হাইটি, হণ্ডুরাস, আইসল্যাণ্ড, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইরাক, ইজরাইল, লেবানন, লাইবেরিয়া, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পাকিস্তান, পানামা, প্যারাগুয়ে,

ফিলিপাইন, পোল্যাণ্ড, সৌদী আরব, সুইডেন, সিরিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইউক্রেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, ইয়েমেন এবং যুগোশ্লাভিয়া। নিম্নলিখিত ষোলটি দেশ অনুপস্থিত ছিল :— আর্জ্জেণ্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, কানাডা, কলম্বিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়াডর, ফ্রান্স, গ্রীস, হল্যাণ্ড, লুক্সেমবুর্গ, নিউজীল্যাণ্ড, পেরু, তুরস্ক, বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং ভেনেজুয়েলা।

১৯৫০ সালের ৫ই জানুয়ারী এড হক্ রাজনৈতিক কমিটিতে এবং পরে সাধারণ পরিষদে দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, আলোচ্য প্রস্তাবে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবেও তিন জন সদস্যের এক কমিশন গঠনের কথা ছিল এবং আলোচনার জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে অঞ্চল বিভাগ আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে কমিশনের সদস্য নিয়োগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা এক জন সদস্য এবং ভারত ও পাকিস্তান মিলিয়া এক জন সদস্য মনোনীত করিবে। এই দুই জন মনোনীত সদস্য মিলিয়া তৃতীয় সদস্য মনোনীত করিবেন। তাঁহারা একমত হইতে না পারিলে সেক্রেটারী জেনারেল তৃতীয় সদস্য নিয়োগ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমান প্রস্তাবে সদস্য মনোনয়নের ভার সাধারণ পরিষদের সভাপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে এবং প্রস্তাবটি হয়ত গৃহীতও হইবে। কিন্তু উহার ফলাফল সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কেপটাউনে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু আলোচনার সময় ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দিগকে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বিদায় করা সম্পর্কেই আলোচনা করিতে উৎসুক, তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যবস্থা দূর করিতে রাজী নহেন। অঞ্চল বিভাগ আইন কার্য্যতঃ কার্য্যকরী করা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মালান গবর্ণমেণ্ট যে উহা স্থগিত রাখিবেন ইহা আশা করা অসম্ভব। এই প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা রাজী না হইলে তাহার সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাহাতে সম্ভব হয়, তাহার বিধান না করিয়া এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ আমাদের কাছে অর্থহীন বলিয়াই মনে হইতেছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য নীতির পরিণাম কি হইতে পারে, এ-সম্বন্ধে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এবং এশিয়ার দেশগুলি ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যমূলক আইনগুলির বিরুদ্ধে কাফ্রিদের এবং ভারতীয়দের যে মিলিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে কঠোর দমন-নীতি দ্বারা ধ্বংস করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত আন্দোলনের তীব্রতা তাহাতে একটুও হ্রাস পায় নাই। আন্দোলন বরং ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং সম্পূর্ণ অহিংস ভাবেই তাহা পরিচালিত হইতেছে। পোর্ট এলিজাবেথ, কিম্বার্লে এবং ইষ্ট-লণ্ডনে অবশ্য হাঙ্গামা হইয়াছে এবং হাঙ্গামার ফলে কয়েক জন শ্বেতকায় নিহত হইয়াছে ও কয়েক জন অশ্বেতকায়কে পুলিশ গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। কিন্তু এই হাঙ্গামা সম্পর্কে প্রাপ্ত পরস্পরবিরোধী বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মালান গবর্ণমেণ্টই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণত করিবার প্ররোচনা দিতেছেন। ইহার ফলে আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য অধিকতর কঠোর দমন-নীতি চালাইবার সুবিধা হয়ত হইবে, কিন্তু বর্ণবিরোধ সমগ্র আফ্রিকায় ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এই আশঙ্কায় একটুও উদ্বিগ্ন হন নাই! ইহার কারণ কি, তাহা প্রস্তাব-উত্থাপনকারী আরব-এশীয় দেশগুলির শাসকশ্রেণীর বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ধারণা, এশিয়া ও আফ্রিকায় যাহাই ঘটুক না কেন, এশিয়া ও আফ্রিকার অর্দ্ধ স্বাধীন দেশগুলির শাসকশ্রেণীর পূর্ণ সহযোগিতা তাহারা পাইবেই। এই জন্যই কি কোরিয়ায়, কি ইন্দোচীন ও মালয়ে, কি মরক্কো ও টিউনিশিয়ায়, কি দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাহারা সাম্রাজ্যবাদী নীতি কঠোর ভাবে প্রয়োগ করিতে একটুও দ্বিধা করিতেছে না। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা যখন বুঝিতে পারিবে যে, এশিয়া ও আফ্রিকার অর্দ্ধ-স্বাধীন দেশগুলির শাসকশ্রেণীর সহযোগিতা পাওয়ার আর সম্ভাবনা নাই, তখন তাহাদের চৈতন্যোদয় হইলেও হইতে পারে।

ইরাণ ও বৃটেন—

গত ১৬ই অক্টোবর (১৯৫২) ইরাণ বৃটেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। ঐ দিন ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেক বেতার-যোগে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার সঙ্গে তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে অধিকতর ত্যাগস্বীকার এবং সাফল্য লাভের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবারও অনুরোধ করিয়াছেন। তৈল-বিরোধের মীমাংসার জন্য ডাঃ মোসাদ্দেক যে পাল্টা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বৃটেন তাহা অগ্রাহ্য করার পর বৃটেনের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর বোধ হয় ছিল না। কিন্তু ইরাণের সমস্যার কোন সমাধানই ইহাতে যেমন হইবে না, তেমনি বৃটেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্তের মূলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব কতখানি আছে তাহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। কম্যুনিজম নিরোধের জন্য ইরাণের ভৌগোলিক এবং কূটনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্টই রহিয়াছে এবং ডাঃ মোসাদ্দেক কম্যুনিজম নিরোধ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কাজেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে ডাঃ মোসাদ্দেককে নেক-নজরেই দেখিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। বৃটেনের সহিত ইরাণের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই কূটনৈতিক জয় হয়, তাহা হইলে ইরাণ বৃটেনের তাঁবেদারী হইতে মুক্ত হইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারীতে বহাল হইল, এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায়।

আকাশ-পাতাল

[১৬ পৃষ্ঠার পর]

রাজেশ্বরী বললে,—শুধু হাজিরা দিলেই তো চলবে না। দেরাজের চাবি খুলে ক্যাশ-বাক্সটা দাও। গয়না-গাঁটি তুলতে হবে না ?

পূর্ণশশীও কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন। অসময়ে তাঁর উপস্থিতির জন্য কিছু বা লজ্জা বোধ করেন। এক পাশে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাজেশ্বরী ও এলোকেশীর গতিবিধি লক্ষ্য করেন। তিনিও উপলব্ধি ক'রেছেন, বৌ যেন আজ কেমন অন্য রূপ ধারণ ক'রেছে। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে, যার প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠছে রাজেশ্বরীর কথায়। হাবে-ভাবে! পূর্ণশশী বললেন,—আয় বৌ, আমি খুলে দিই গয়নাগুলো। এলোকেশী বাক্সে তুলুক।

হঠাৎ যেন অনুভব করে রাজেশ্বরী, সে এতক্ষণ কথা বলেছে বড্ড চড়া সুরে। বৌ-মানুষ হয়ে ক্রোধ প্রকাশ ক'রেছে বাইরের লোকের সমুখে। হঠাৎ কেমন যেন থ মেরে যায় রাজেশ্বরী। ঘরের মেঝেয় বিছানো গালচেয় ব'সে পড়ে। পূর্ণশশী অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে একেকটি অলঙ্কার খুলে এলোকেশীর হাতে দিতে থাকেন।

ঘরের কোণে গ্র্যাণ্ড-ফাদার্স ঘড়িটা সহসা জলতরঙ্গের ধ্বনি তোলে। পূর্ণশশী ঘাড় বেঁকিয়ে দেখেন ঘড়ির দিকে। রাত্রি কত হ'ল? পূর্ণশশীর গুণ্ঠন মাথা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই। কত চুল পূর্ণশশীর মাথায়! ঘন-কালো কেশ! কি অপূর্ব্ব খোঁপা! মাথাটা জুড়ে আছে যেন। কালো চুলের মধ্য থেকে চিক-চিক করছে রূপোর কাঁটা। খোঁপার ঠিক মধ্যস্থলে একটা চিরুণী। সোনায় বাঁধানো। চিরুণীতে লেখা আছে 'সাবিত্রী সমান হও'।

রাজেশ্বরী আচ্ছন্নের মত হয়ে আছে।

দেরাজের আয়নায় দেখছে পূর্ণশশীকে। যেন ইতোপূর্ব্বে কখনও নজরে পড়েনি পূর্ণশশীর এই কমনীয় কান্তি। আচ্ছন্নের মত চুপচাপ ব'সে থাকে রাজেশ্বরী। মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত দেখায় যেন তাকে। নড়ন-চড়ন নেই। চোখের কোলে কালিমা ফুটেছে। পূর্ণশশী মনে মনে ভাবেন, কি হয়েছে কি বৌটার? কেমন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। শেষ পর্য্যন্ত থাকতে না পেরে বললেন পূর্ণশশী,—বৌ, তোর কোন অশুক-বিশুক করেনি তো? হাত দুটো হিম হয়ে আছে, কেন বল্ তো? চোখের কোলে কালি পড়েছে দেখছি। মুখখানা শুকিয়ে গেছে যে!

পূর্ণশশী যে জানেন না, কত খুশী মনে গিয়েছিল সে বড়বাড়ীতে। গিয়ে যা শুনলো সে-কথা শুনলে রাজেশ্বরী কেন, যে-কোন নারীই যে দিশাহারা হয়ে পড়বে। স্বামীর নামে অপবাদ! সহ্য ক'রতে পারে কখনও কোন মেয়ে? রাজেশ্বরী কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠরোধ হয়ে যায়। আসল বিষয়টা ব্যক্ত করতে পারে না। অপমানিত বোধ করে, লজ্জা পায়। বলে,—না দিদি, কিছু তো নয়। দুপুরে পিসীমার ছেলেরা আর তাদের বন্ধু ক'জন খেলে, মিটতে না মিটতে নেমন্তন্ন যাওয়ার ধকলে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছে।

—তাই বল'। বললেন পূর্ণশশী।

বলতে বলতে পায়ের পাইজোর খুলতে যাবেন এমন সময়ে বাধা দেয় রাজেশ্বরী। বলে,—থাক্ দিদি, পায়ে হাত দেবেন না। আমিই খুলছি।

—তাতে কি হয়েছে? বললেন পূর্ণশশী। মৃদু হাসির সঙ্গে।

—না দিদি, না। আমাকে পাপের ভাগী করবেন না। বললে রাজেশ্বরী।—আপনি যে বয়োজ্যেষ্ঠ!

হাতের নোয়া আর ক'গাছা চুড়ি ছাড়া প্রায় সকল অলঙ্কার খুলে দিয়েছেন পূর্ণশশী। এতক্ষণে শরীরটা তবুও কিছুটা হালকা বোধ হয় রাজেশ্বরীর। অলঙ্কার তো নয়, যেন কাঁটার গয়না। মুখে হাসি আসে না, তবুও হাসতে হয়। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে রাজেশ্বরী,—এখন বলুন বিপদটা কি হ'ল?

দুঃখের ক্ষীণ হাসি দেখা দেয় পূর্ণশশীর মুখে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—জামা আর শাড়ীটাও বদ্‌লে নে না বৌ। লজ্জা করবে? এই আমি দু'হাতে চোখ বন্ধ ক'রে রাখছি। নয়তো বল, আমি ক' দণ্ডের জন্যে দালানে গিয়ে দাঁড়াই।

—না না। লজ্জা করবে না। চোখেও হাত চাপতে হবে না।

ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে বললে রাজেশ্বরী। উঠে প'ড়লো কথা বলতে বলতে।

এলোকেশীরও কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণশশী একেকটি অলঙ্কার খুলে দিয়েছেন আর এলোকেশী তুলেছে ক্যাশ-বাক্সে। এলোকেশী বললে—হ্যাঁ, শাড়ী আর জামা ছেড়ে দিদির সঙ্গে কথা কও। আমি এনে দিচ্ছি আটপৌরে পোষাক। চেঁচামেচি ক'র না যেন তুমি। যাবো আর আসবো। ঘরেই রেখেছিলাম। আজ শনিবার, ধোপা আসতে কাচতে দিয়ে দিয়েছি। ফর্সা শাড়ী আর জামা আছে চানের ঘরে।

রাজেশ্বরী লক্ষ্য করলো এলোকেশীর চোখে আর মুখে যেন দুঃখ ফুটে উঠেছে। দেখে রাজেশ্বরীর মনটাও ব্যাথিয়ে উঠলো সঙ্গে-সঙ্গে। ভাবলো, আহা ব্যাচারী! অযথা তাকে কড়া কথা বলা হয়েছে। বুড়ী মানুষ, মনে ব্যথা পেয়েছে কত।

যার দোষ নেই, যে কোন অন্যায় করে না, যার বিরোধ নেই কারও সঙ্গে, তেমন মানুষের মনে ব্যথা দিলে, তাকে তিরস্কার করলে সত্যিই হয়তো মায়া হয় মনে। রাজেশ্বরীও তাই হয়তো মনোকষ্ট পায়। কিন্তু এলোকেশী যদি জানতো কি শুনে এসেছে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে। 'মুসলমান

বাইজী', 'মুসলমান বাইজী'—কথা দুটি যত বার মনে পড়ছে তত বার বুকের মাধ্যখানটা দুরু-দুরু ক'রে উঠছে রাজেশ্বরীর। কানে তালা লেগে যাচ্ছে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। হাত আর পা অবশ হয়ে পড়ছে। পায়ের তলায় মাটি কেঁপে-কেঁপে উঠছে। চোখে ঝাপসা দেখছে। বিষ খেয়ে কিম্বা বুকে ছোরা চালিয়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। রাজেশ্বরী বললে,—দিদি, কে কোথায় বন্দুক ছুঁড়ছে বলুন তো?

পূর্ণশশী তো হতবাক্। কান খাড়া ক'রে খানিক শুনে বললেন,—কৈ, না তো বৌ। আমি তো শুনতে পাচ্ছি না। তুমি ভুল শুনছো।

—বৌদিদি আছো ঘরে?

ঘরের বাইরে থেকে কথা বললে অনন্তরাম। চমকে উঠলো যেন রাজেশ্বরী। থমকে থাকলো কয়েক মুহূর্ত্ত। পূর্ণশশী তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানলেন। রাজেশ্বরী বললে,—হ্যাঁ, আছি। কিছু বলছো অনন্ত?

—হ্যাঁ, বৌদিদি। বলছি যে, হুজুর বন্দুকের আলমারীর চাবিটা চাইছে। দেরাজের বাঁ দিকের টানায় একটা রূপোর কৌটয় আছে। বের ক'রে দিতে বললে।

কথাটা শুনে হতচকিত হয়ে গেল রাজেশ্বরী। বললে,—কেন অনন্ত? বন্দুকের আলমারীর চাবি কি হবে অনন্ত?

রাজেশ্বরী ব্যস্ত ও ব্যগ্র হয়ে উঠলো যেন। পূর্ণশশীও বিস্মিত হয়ে পড়লেন।

অনন্তরাম বললে,—বলছে যে সাফ করতে দেবে বন্দুক ক'টা।

—কেন অনন্ত? মিনতির সুরে বললে রাজেশ্বরী। বুকের ভেতরের দুরু-দুরু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে লাগলো।

ক্ষোভের হাসি হাসে অনন্তরাম। হতাশ-হাসি। কত কাল ধ'রে আছে অনন্তরাম। সেই কর্ত্তাদের আমল থেকে। এখনও ক্ষণে ক্ষণে অনন্তরামের চোখে ভেসে ওঠে স্বর্গগত মানুষ দুটিকে—কৃষ্ণচরণ আর কৃষ্ণকান্তকে। এক বৃন্তে দু'টি ফুলের মতই। গন্ধহীন সুদৃশ্য পুষ্প হ'লে কথা ছিল না। দুটি ফুলের রূপ আর গন্ধের আকর্ষণে কত লোক মুগ্ধ হয়ে যেতো। রূপে আর গুণে অতুলনীয় ছিলেন তাঁরা দুজনে। অতীত না দেখলে সহ্য করতে পারতো অনন্তরাম। সৎ না দেখলে অসৎকে চিনতে পারতো না। অতীতের সেই দেবতুল্য মানুষ দুটিকে মনে পড়লেই চোখ ফেটে জল আসে অনন্তরামের। ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। রাজেশ্বরীর কথার ধরণ শুনে হতাশ-হাসির সঙ্গে বললে অনন্তরাম,—ভয় নাই বৌদিদি। ভয় নাই। বন্দুকগুলো মধ্যে-মধ্যে সাফ না করলে মরচে ধ'রে যায় যে। জং ধ'রে যায়।

অসহায়ের মত ব্যথাতুর কণ্ঠে কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—এত রাত্রে সাফ না করলে চলবে না? হাত ফসকে যদি—

হেসে ফেললো অনন্তরাম। হাসতে হাসতেই বললে,—না না, টোটা ভর্ত্তি ক'রে কি সাফ করা যায়? তুমি দেখছি কিচ্ছু জানো না!

রাজেশ্বরী বললে,—তা এত রাত্রে বন্দুক পেড়ে না বসলে চলছে না? তুমি মানা কর' অনন্ত। বল' বৌদিদি বলছে যে, কালকে দিনের আলোয়—

—কি ব'লবো বল'! কথার মাঝেই কথা বললে অনন্তরাম।—আমি তো পৈ-পৈ ক'রে মানা ক'রেছিলাম। না শুনলে আমি কি করতে পারি বল'? কথায় বলে না, নাই কাজ তো খৈ ভাজ্! বলা হয়তো উচিত নয়, তবুও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় যে কথা! তুমি যখন বলছো, আমি গিয়ে বলি গে। শুনছি যে, পুণ্যের নিমন্ত্রণে গিয়ে খেয়ে আসে নাই।

—তোমাকে কে বললে অনন্ত?

—যে বলবার সেই বললে। বামুনদিকে ব'লে পাঠালে আমাকে দিয়ে। বললে অনন্তরাম গমনোদ্যত হয়ে।

—কি ব'লে পাঠালে? বল'ই না খোলসা ক'রে! রাজেশ্বরীর কথায় অদম্য ব্যগ্রতা। স্তব্ধ ও অপলক আঁখিপল্লব।

অনন্তরাম চ'লে যেতে-যেতে বললে,—বামুনদিকে বলতে বললে যে, খেয়ে আসি নাই। খানা তৈরী করতে বললে।

হতচেতনের মত কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। ঘরের দরজার একটা পাল্লা ধ'রে। ভাগ্যিস পাল্লাটা ধ'রেছিল, নয়তো নিশ্চয়ই আচমকা প'ড়ে যেতো রাজেশ্বরী। মুখ থুবড়ে প'ড়তো। অনন্তরাম যা ব'লে গেল, শুনে অনেক কথাই ভাবতে থাকে। ভাবে, বড়বাড়ীতে গিয়ে খাওয়ার কথা ব'লেছিল কৃষ্ণকিশোর। কি হ'ল কি! রাজেশ্বরী ভেবে যেন কূল-কিনারা খুঁজে পায় না।

—এই নাও জামা আর শাড়ী। বদলে নাও। পোষাক বদল ক'রে কথা কও দিদির সঙ্গে। এলোকেশী কথা বলে গম্ভীর বদনে। কেমন যেন বীতস্পৃহের মত।

এলোকেশীর কথা শুনে চমক ভাঙ্গে রাজেশ্বরীর।

জ্ঞান ফিরে পায় যেন। লক্ষ্য ক'রে দেখে এলোকেশীর মুখাবয়ব। জামা আর শাড়ীটা নিয়ে দরজায় অর্গল তুলে দিয়ে কালো মসলিনের জরিদার শাড়ীটা ছেড়ে ফেলে। কালো ভেলভেটের জামাটাও খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পালঙ্কে গিয়ে আছড়ে পড়ে জামাটা। এখন গায়ে শুধু কাঁচুলী আর শায়া।

পূর্ণশশী যেন আর থাকতে পারলেন না। বললেন,—কি চমৎকার গড়ন তোর বৌ! ঠিক পাথরের মূর্ত্তির মত। কুঁদে-কুঁদে তৈরী ক'রেছেন হয়তো বিধাতা।

ভাল লাগছে না শুনতে রূপের প্রশংসা। তবুও হাসলো রাজেশ্বরী। সলাজ হাসি। আটপৌরে জামা আর শাড়ীটা অতি দ্রুত গায়ে চাপালো। চাবির গোছাটা দেরাজের পাল্লা থেকে খুলে আঁচলে বেঁধে দরজার অর্গলটা খুলে দিয়ে বসলো গালচেয়। কৃত্রিম হেসে বললে,—বলুন যা বলছিলেন।

পূর্ণশশীও যেন চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেলেন যেন। বললেন,—উনি বিলাত যাচ্ছেন কয়েক দিনের মধ্যে। সামনের তেইশে জাহাজে উঠছেন।

খুশীর হাসি হাসলো রাজেশ্বরী। আন্তরিক খুশী-ভরা হাসি। বললে,—সত্যি? তা আমাকে কি করতে হবে হুকুম করুন। কাঁদলেন কেন?

দম নিয়ে বললেন পূর্ণশশী,—উনি তো যাচ্ছেন। ফিরতে তো সাড়ে চার মাস লাগবেই। কিন্তু আমি তো একা থাকতে পারি না ভাই! উনি ছাড়া অন্য কেউ পুরুষ নেই বাড়ীতে, তুমি তো জানো!

রাজেশ্বরী বললে,—হ্যাঁ।

পূর্ণশশী রাজেশ্বরীর হাত সস্নেহে ধ'রে বললেন,—শুধু হ্যাঁ বললে চলবে না ভাই! একটা উপায় বলতে হবে। বড়বাড়ীর বাবুদের কয়েক জন আমাদের সঙ্গে কি শত্রুতাই চালিয়েছে জানো না তো তুমি?

রাজেশ্বরী ঘাড় নাড়লে। বললে,—না। কিন্তু কেন? কি দোষ আপনাদের?

হতাশ-হাসি হাসলেন পূর্ণশশী। দুঃখপূর্ণ হাসি। বললেন,—তোমাদের পুরোহিত মশাইকে ডাকিয়ে জানিয়েছি। তিনি কিছু বলেননি? সে ভাই অনেক কিছু। উনি বিলেত যাচ্ছেন ব'লে পুরোহিত মশাইকে ডাকিয়েছিলুম প্রায়শ্চিত্তির করাতে। দিন-ক্ষণ দেখে দিতে।

রাজেশ্বরী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বলে,—পুরোহিত মশাই বলতে চেয়েছিলেন। সময় হ'ল না তখন যে। তাড়া ছিল।

পূর্ণশশী বললেন ফিস-ফিস কণ্ঠে,—সে ভাই অনেক কিছু। আমাকে উড়ো চিঠি দেয়। গয়না আর টাকার লোভ দেখায় চিঠিতে। আমাদের পেছনে গুণ্ডা লেলায়। আমাকে হরণ করবার ভয় দেখায়। শেষে কি বুড়ো বয়েসে মান-মর্য্যাদা খোয়াবো!

গালে হাত দেয় রাজেশ্বরী। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায় যেন। বলে,—সে কি কথা দিদি! আমি কি করতে পারি বলুন? যা হুকুম হবে ক'রবো।

পূর্ণশশী বললেন,—তা হ'লে বলি ভাই?

রাজেশ্বরী।—হ্যাঁ হ্যাঁ। যা হুকুম করবেন ক'রবো।

পূর্ণশশী চিন্তাকুল হয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত্ত। অনন্তরাম আবার ডাক দেয় দরজার বাইরে থেকে। বলে,—বৌদিদি আছো?

—হ্যাঁ আছি, অনন্ত। কিছু বলছো? ব্যগ্র চিতে ফিরে তাকায় রাজেশ্বরী। বললে,—বললে তুমি?

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ, বলেছি। রাজী হয়েছে বৌদিদি। বলছে যে, বেশ আজ থাক, রাত হয়েছে, কাল হবে।

—যাক্, বাঁচা গেল। বললে রাজেশ্বরী।

কথা মিটে গেছে তবুও অনন্তরাম তো কৈ চ'লে যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে।

পূর্ণশশী বললেন,—অনন্ত বোধ হয় আর কিছু বলছে। দাঁড়িয়ে আছে কেন? কিছু বলতে চায় যদি শুনে আয় বৌ। হয়তো আমার সামনে বলতে চায় না।

—আর কিছু বলছো অনন্ত? শুধোলে রাজেশ্বরী।

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ বৌদিদি। বলছিলাম যে, কালকের দিনটা আমাকে ছুটি দিতে হবে।

সহাস্যে বললে রাজেশ্বরী,—বেশ তো। ছুটি নিও তুমি। যাবে কোথায়?

অনন্তরাম পায়ের নখ মেঝেয় ঘষতে-ঘষতে বললে,—আমার কোন প্রয়োজন নাই। যেতে হবে তোমার মনোহরপুরের প্রজাদের সঙ্গে।

রাজেশ্বরী বললে,—কোথায় যাবে অনন্ত?

হয়তো পূর্ণশশী ঘরে ছিলেন ব'লে ঈষৎ লজ্জা পায় অনন্তরাম। লজ্জিত হয়েই বলে,—বল' কেন বৌদিদি! আমাকে দলপতি পাকড়েছে। গেঁয়ো ভূত তো, সাত-পুরুষে কিচ্ছু দেখে নাই। সঙ্গে যেতে হবে। কলকাতা শহর চসতে হবে। সঙ্গে গিয়ে দেখাতে হবে আলিপুরের চিড়িয়াখানা, মরা সোসাইটী, কালীঘাটের কালীর মন্দির, মনুমেণ্ট, হাইকোর্ট, শিবপুরের কোম্পানীর বাগান, ইডেন গার্ডেন। আর-আর যা আছে দেখবার, দেখাতে হবে। সঙ্গে গিয়ে আমার তো কত সুখ! রোদ্দুরে পোড়া আর ঘুরে-ঘুরে পায়ে বেদনা হবে, বেশ বুঝতে পারছি আমি।

হেসে ফেললো রাজেশ্বরী। পূর্ণশশীও হাসলেন। রাজেশ্বরী বললে,—ভাল কথা তো। আহা! গ্রামে থাকে, কলকাতা থেকে কত দূরে থাকে। দেখতে পায় না কখনও কিছু। বেশ তো, তুমি যেও। আমি তোমাকে ছুটি দিচ্ছি।

—ফিরতে কিন্তু দেরী হবে বৌদিদি। সূর্য্যোদয়ের আগেই অবিশ্যি যাত্রা ক'রবো ভেবেছি। বললে অনন্তরাম। বললে,—অবিশ্যি চেষ্টা ক'রবো যত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি।

—বেশ, বেশ, তুমি যেও। হুকুমের সুরে কথা বললে রাজেশ্বরী। হয়তো হঠাৎ মনে পড়তেই বললে,—বামুনদিকে ব'লে দিয়েছো তো খাবার তৈরীর কথা।

—তৎক্ষণাৎ ব'লে দিয়েছি বৌদিদি। বলবার সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে দিয়েছি। বললে অনন্তরাম।

—আচ্ছা, তুমি যাও। হুকুমের সুরে কথা বললে রাজেশ্বরী। বললে,—অনন্ত গাড়ী যেন আস্তাবলে তুলে না দেয়। রাত্রি অনেক হয়েছে। দিদিকে বাসায় পৌঁছে দিতে হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। জুড়ী অপেক্ষা করছে।

কথার শেষে বিদায় নেয় অনন্তরাম। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে বিদায় নেয়। বেশী কথা বলতে হয়নি বৌদিদিকে, যাকে বলে এক কথায় রাজি হয়ে গেছে বৌদিদি। যেতে-যেতে ভাবে অনন্তরাম, বৌদিদির মত মানুষ হয় না। যেন মাটির মানুষ! কত মিষ্টি কথা বৌদিদির! যতই হোক,

ঘরের মেয়ে তো নয়। শুধু হাতেও আসেনি, কত সম্পত্তির মালিক বৌদিদি। রূপে আর গুণে বৌদিদি অতুলনীয়।

—বলুন দিদি, যা বলছিলেন। বললে রাজেশ্বরী। সাগ্রহে।

পূর্ণশশী হয়তো কথাটা পাড়তে সঙ্কোচ বোধ করেন। ইতিউতি ভেবে বললেন,—আমাকে ভাই এই ক'মাস তোমার কাছে থাকতে দাও। আমার অনুরোধ। গত্যন্তর না দেখতে পেয়ে তোমাকেই বলতে হচ্ছে।

হেসে ফেললো রাজেশ্বরী। বললে,—এই কথা? নিশ্চয়ই থাকবেন আমাদের কাছে। যদ্দিন খুশী। এই কথা? বলতে এত বাধো-বাধো ঠেকছে আপনার?

পূর্ণশশী আন্তরিক খুশী হ'লেন। ভেবেছিলেন বৌ রাজী হবে না। যতই হোক, অন্য ঘরের মেয়ে। ওজর-আপত্তি তুলবে। রাজেশ্বরীর সম্মতি শুনে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। পূর্ণশশী বললেন,—থাকতুম বাপের বাড়ীতে গিয়ে। কিন্তু আমার বাপ-মা তো নেই। ভাইরা আছে ক'জন। তাদের বৌ আর ছেলেপুলে আছে। খুব যত্ন ক'রে রাখতো। কিন্তু ভাই, অন্যের ভার হয়ে থাকতে চাই না। ভিক্ষে ক'রে পথে-পথে গাছের তলায় থাকবো তবুও বাপের বাড়ীতে গিয়ে উঠবো না। তোমাদের শুভেচ্ছায় আমার তো অভাব কিছুর নেই! শুধু লোকবলেরই যা অভাব। তুমি তা হ'লে কথা দিলে তো ভাই?

রাজেশ্বরী হেসে ফেললে। বললে,—হ্যাঁ, কথা দিলাম। যেদিন খুশী চ'লে আসুন। যত তাড়াতাড়ি আসেন ততই ভাল। আমি তো কথা বলবার লোক খুঁজে পাই না। দম আটকে মরবার উপক্রম হয় থেকে-থেকে।

পূর্ণশশী রাজেশ্বরীর চিবুক স্পর্শ ক'রে চুমা খেয়ে উঠে পড়লেন। বললেন,—তা হ'লে আজ আমি আসি ভাই? তুমি শুধু কিশোরের সঙ্গে কথা ক'য়ে রেখো।

রাজেশ্বরীও উঠে পড়লো। বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। ওঁকে আমি রাজী করাবো। তা ছাড়া আপনি থাকবেন, তাতে কি আপত্তি হবে? মনে হয় না।

পূর্ণশশী খুশী মনে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চললেন সদরে। সেখানে গাড়ী অপেক্ষা করছে। দালান আর ঘর-দোর দেখতে দেখতে যেতে-যেতে অনেক দিন পূর্ব্বের অনুভূতি সহসা ফিরে আসে পূর্ণশশীর মনে। সেই যখন কৃষ্ণকান্ত জীবিত ছিলেন তখনকার মনোভাব। সাধু-প্রকৃতির সেই মানুষটি মনোমধ্যে জাগরূক হয় হঠাৎ কেন আজ! পূর্ব্বস্মৃতি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কত কথা আর কত বিষয় মনে প'ড়ে যায়। পূর্ণশশীর মনের সঙ্গোপনে জাগে একটি কথা—বিয়ে না হয় না-ই হয়েছে তাঁর সঙ্গে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত যদি বেঁচে থাকতেন।

কথাগুলি মনে হ'তেই বুকটা যেন ধড়াস্-ধড়াস্ করতে থাকে পূর্ণশশীর। দ্রুতপদে এগিয়ে চলেন তিনি। সিঁড়ি ভাঙেন যন্ত্রচালিতের মত! কৃষ্ণকান্তর জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো কেন হঠাৎ? কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বামীকে মনে প'ড়ে যায় পূর্ণশশীর। নিরীহ ও আত্মভোলা মানুষটি। কোন দোষ নেই। দিন নেই, রাত্রি নেই, পড়াশুনায় আত্ম-সমাহিত। যেন এক ঝড়ের দোলায় দুলতে-দুলতে গাড়ীতে উঠলেন পূর্ণশশী! সঙ্গে চললো অনন্তরাম। ফিস-ফিস শব্দে অনন্তরামকে বললেন,—আমার জন্যে ব্যাচারীরা কত কষ্ট পেয়েছে এই হিমের রাত্রে।

অনন্তরাম বললে,—না না, বৌদিদি। কি যে তুমি বল'!

চলন্ত গাড়ীর কোচবাক্সে উঠে বসলো অনন্তরাম। রাজেশ্বরীর মুখে সম্মতি পেয়ে খুশী হ'লেও বুকের মধ্যে কোথায় যেন আলোড়ন উঠেছে পূর্ণশশীর। কাঁটার মত খচ্-খচ্ বিঁধছে একেক সময়ে। গাড়ীর খড়খড়ির ফাঁক থেকে আকাশ দেখলেন পূর্ণশশী। দেখলেন হয়তো রাত্রি কত হয়েছে। কিছু দেখতে পেলেন না। কুয়াশায় ঢেকে আছে দিগ্বিদিক। দু'-একটা জ্বলজ্বলে তারা ক্বচিৎ দেখা যাচ্ছে কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে। পূর্ণশশী তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন। কাশীকিঙ্করের ইংলণ্ড গমনের সময়ে যাই হোক্ ভয়ে-ভয়ে থাকতে হবে না। রাজেশ্বরীর কাছে থাকবেন আর বাসায় কোন লোক থাকবে। চাবি দেওয়া থাকবে ঘরে-ঘরে। তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন পূর্ণশশী।

রাত্রির ফাঁকা পথ ধ'রে তড়িৎ গতিতে ছুটলো গাড়ী।

কুমুদিনী যদি থাকতেন আজ!

মনে মনে ভাবলেন পূর্ণশশী। কুমুদিনী থাকলে ভাবতে হ'তো কিছু? তিনি নিজে থেকেই বলতেন থাকবার কথা। কিন্তু কুমুদিনী কোথায় এখন! কাশীবাস করছেন ছেলের প্রতি অভিমান ক'রে।

যখন-তখন বক্ষঃস্থল ছাৎ-ছাৎ ক'রে ওঠে কুমুদিনীর।

যতই হোক গর্ভধারিণী। কত কষ্টে লালন-পালন ক'রেছেন ছেলেকে। জ্ঞাতিশত্রুদের কত কুটিল চক্রান্তকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে। পুত্র এবং পুত্রবধূকে শুধু মাত্র চোখের দেখা দেখতে মনটা হু-হু করতে থাকে কুমুদিনীর। গুমরে-গুমরে ওঠেন। ক্বচিৎ কখনও ইচ্ছা হয়, ছুটে চ'লে যান কলকাতায়। গিয়ে শুধু মাত্র চোখের দেখা দেখেন পুত্র ও পুত্রবধূকে। সেই ছেলে, যাকে জন্ম থেকে চোখের আড়াল করেননি কদাচ, একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে কখনও খোঁজ নেয় না! ক্ষোভ আর অভিমানের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছেন কুমুদিনী। লজ্জায় মুখ দেখাতে পর্য্যন্ত চান না পরিচিতদের কাছে।

পূর্ণশশীর মনে পড়ে কুমুদিনীকে।

তিনি থাকলে কিছু ভাবতে হ'তো? শুধু বলবার অপেক্ষা। মুখের কথা খসাতে না খসাতে সকল ব্যবস্থা হয়ে যেতো। বেশী কিছু বলতে হ'তো না। পূর্ণশশী ভাবেন, কুমুদিনী এখন কোথায়? কাশীতে আছেন কিন্তু কোথায় কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন কে জানে। কেমন আছেন জানেন শুধু ঈশ্বর।

কুমুদিনী প'ড়েছিলেন ভূকৈলাস রাজবংশজাত ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল বিরচিত কাশী-পরিক্রমা। প'ড়েছিলেন,—

প্রতি শুক্রবারে শুক্রেশ্বর নর সতত পূজিবে।
শনিবারে শনৈশ্চরেশ্বর যাত্রা বিধান করিবে॥

আজ শনিবার, যেজন্য কুমুদিনী নির্জ্জলা উপবাস ক'রে শনৈশ্চরেশ্বরের পূজার জন্য অপেক্ষা করছেন। মন্দির ভিড়াক্রান্ত। লোকজনের ভিড়ে কখনও পূজা করা যায়! কুমুদিনী প্রতীক্ষা করছেন, ভিড় কমুক। মাড়োয়ারী নারীদের ভিড়েই মন্দির ভর্ত্তি হয়ে আছে। চাতালের এক পাশে আর দাঁড়াতে না পেরে বসে প'ড়েছেন। উপবাসক্লান্ত শরীর বইছে না যেন আর। চুপচাপ ব'সে লক্ষ্য করছেন মাড়োয়ারী নারীদের বেশভূষা। কত লক্ষপতি ও কোটিপতির ঘরের বৌ আর মেয়ের দল। দল বেঁধে এসেছে। গুণ্ঠনবতী হ'লে কি হবে মধ্যাঙ্গ উন্মুক্তপ্রায় সকলের। অলঙ্কারগুলি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছেন কুমুদিনী। দেখছেন পায়ে বাঁকরি বা বেঁকি। বাঁকজোল বা বাঁকমল। নূপুর। ঝমর-ঝমর শব্দ উঠছে। দেখছেন আঙট আর ঘুঙুর। রত্নময় সোনার পৈছি। বাজুবন্দ। হীরার চিকা। মোহনমালা। উরুদেশে মুক্তামালার দোলনী। কানে ঢেড়ি আর ঝুমকো। মুক্তার নথ বা নোলক। চুনি, পান্না আর হীরার যেন ছড়াছড়ি। ঝলমল করছে। বেনারসী, শোষণী, নরুণসি, গোলাবী সোহা, গোলাপা রজমবঙ্গী, কিম্খিজি আর মট্‌দার শাড়ী-পরিহিতাদের ভিড় শুধু। জরির উড়ানি, ডুরিয়া দোদামি জামদানি ও গোটাদার বাপ্তান-ধারিণীদের যাওয়া-আসা।

অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরের নিকটেই শনৈশ্চরেশ্বরের মন্দির। সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর এখানে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, শনৈশ্চরেশ্বরের অর্চনা করলে মানুষ দেহান্তে কাশীলোকে সুখ-ভোগ করে। শনৈশ্চর শিবের শিরোভাগ রৌপ্যময় এবং নিম্নভাগ পুষ্পগুচ্ছে আবৃত।

কুমুদিনী চুপচাপ ব'সে নেই।

মনে-মনে তিনি ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন। একশো আট থেকে হাজার আট মন্ত্র-জপ হয়ে গেছে হয়তো। মধ্যে-মধ্যে চোখ দুটি মুদিত হয়ে যাচ্ছে। পরিধানে পট্টবস্ত্র আর গরদের চাদর। হাতে ধ'রে আছেন ফুলের সাজি। কুমুদিনীকে দেখলে এখন চেনা যায় না। শরীর কৃশ হয়ে গেছে। সেই রূপ আর নেই। শুভ্র রঙ ঝলসে গেছে যেন আগুনে। উপবাসে-উপবাসে দেহ ভেঙ্গে প'ড়েছে। আয়ত আঁখিযুগলের কোলে কালির প্রলেপ প'ড়েছে।

পুণ্যার্থীদের চিৎকার আর কলরোল। গগন-বিদারক ধ্বনি। মধ্যে-মধ্যে ঘণ্টা বাজে কোথাও কোথাও। দর্শনার্থীগণ হয়তো বাজায়। কত সহস্র দেব-দেবী আছেন বিশ্বনাথের চত্বরে। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। দীপের আলো জ্বলছে মন্দিরে। সেঁজুতি জ্বলছে। দেওয়ালগিরি জ্বলছে। বেলোয়ারী কাচের লণ্ঠন জ্বলছে। সত্যি কিনা কে জানে, হয়তো ভ্রম হচ্ছে—জ্বলন্ত আলোকরেখা প্রতিফলিত হওয়ায় দেব-দেবীদের বিস্ফারিত চোখের মণি কাঁপছে। দেব-দেবীগণ দেখছেন অপলক নেত্রে। দেখছেন যেন দর্শনার্থীদের মধ্যে কে পাপী আর কে পুণ্যবান। শিলাময় মূর্ত্তির জীবন্ত দৃষ্টি দেখে পাপীদের হৃদ্‌পিণ্ড কেঁপে উঠছে থরো-থরো।

হঠাৎ হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনিতে চমকে চমকে ওঠেন কুমুদিনী। উপবাসক্লান্ত দুর্ব্বল শরীর। ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে চেতনা হারিয়ে ফেলেন যেন। কোন সাড় থাকে না। চিৎকার আর কোলাহলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু উপায় কি! দেব-দেবী তো কারও একচেটিয়া নয়। যার ইচ্ছা হবে, আসবে। দেখবে। পূজা করবে যতক্ষণ খুশী। পূজা করতে করতে কেউ হাসবে, কেউ কাঁদবে। থেকে-থেকে অগুরু ধূপের গন্ধবাহী হাওয়া বইছে। গাঁদা ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যেন হাওয়ায়। বিরক্তিকর শব্দে মধ্যে-মধ্যে চোখ মেলে দেখছেন কুমুদিনী। মন্দিরের ভিড় কমতে কত দেরী আর। ভিড় যে ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়ে চ'লেছে। তা হোক, পুণ্যলাভ করতে হ'লে ধৈর্য্যধারণ করতেই হয়। কোন্ মন্দিরের আঙিনায় কোন ব্রাহ্মণ কি বেদ অধ্যয়ন করছেন। শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে কোথায়। ছন্দোবদ্ধ বেদমন্ত্রের শব্দ-ঝঙ্কারে কেমন যেন মোহ সৃষ্টি করছে। কুমুদিনী চোখ খুলতেই দেখছেন কিংখাব শাড়ীর ছড়াছড়ি। লাল, কমলা, জরদা এবং শুভ্র রঙের বুটিদার, বেলদার, জঙ্‌লা, মিনা, জালদার ও চসম ফুলের কিংখাব-পরিহিতা নারীদের জমায়েৎ হয়েছে। কিংখাবের শাড়ীর ভেতর থেকে ঝিলিক মারছে সাঙ্‌লা বা সাঙ্গী। অন্তর্বাস। ধনুকপাটা, কারচোব আর ফুলকারী শাড়ীও আছে। নারীদের সঙ্গে পুরুষ। পাগড়ী আর পায়জামা। ধুতির সঙ্গে চাদর।

—আইয়ে মাইজী, আইয়ে। দের মৎ করনা। থোড়া ভিড় আবি কম্‌তি হায়।

কুমুদিনী চমকে উঠলেন পাণ্ডাজীর কথা শুনে। পাণ্ডাজী ডাকছে। শীঘ্র যেতে বলছে। বলছে যে, ভিড় এখন কমেছে।

শনৈশ্চরেশ্বরের পাদমূলে সাজি উজাড় ক'রে দিলেন কুমুদিনী। কণ্ঠে অঞ্চল বেষ্টন ক'রে কত কথা বললেন। পুত্র এবং পুত্রবধূর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করলেন। পুরোহিত মন্ত্র বললে আর কুমুদিনী পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। কুমুদিনীর চোখ জলে ভ'রে যায়। ছেলেকে আর বৌকে মনে পড়ে তাঁর। হু-হু ক'রে জ্বলতে থাকে যেন সকল অঙ্গ। পাঁজরা ক'টা মোচড় দিয়ে ওঠে। মন্ত্র বলতে বলতে ক'বার পড়ে যেতে-যেতে টাল সামলে নেন। উপবাসক্লান্ত দুর্ব্বল শরীর যে! বিষ খেয়ে মৃত্যু হ'লে পাপ হয়, নয়তো কবে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতেন কুমুদিনী। সকল জ্বালা জুড়াতো। বিষ খাওয়ার উপায় নেই, সেই জন্যই কি তিনি উপবাসে-উপবাসে শরীরটাকে বিনষ্ট ক'রে ফেলছেন? আত্মহত্যা করছেন না বটে, আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছেন। কিন্তু ছেলেটা মায়ের মন

'লে কি ঘর-দোর ছেড়ে কাশীবাসী হ'তেন কুমুদিনী? কৃষ্ণকিশোরের অপকীর্ত্তির জন্য আত্ম-জনের কাছে মুখ দেখাবেন কোন্ লজ্জায়! একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে পর্য্যন্ত খোঁজ নেয় না?

কৃষ্ণকিশোর তখন ফিস্‌ফাস্ কথা বলছিল হেড-নায়েবের সঙ্গে।

কাছারীর দালানে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। কৃষ্ণকিশোর বলছিল,—নায়েব মশাই, কেউ জানবে না তো? জানলে বুঝবো যে আপনিই ব'লেছেন।

—কালীঘাটের কালীর দিব্যি গালছি হুজুর, জানলে আমাকে কেটে ফেলবেন। ডালকুত্তার মুখে লেলিয়ে দেবেন। যা শাস্তি দেবেন, মাথা-পেতে নেবো। আপত্তি ক'রবো না হুজুর। হেড-নায়েব কথা বলছে অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে। বলছে,—একটা কথা জেনে রাখবেন হুজুর, টাকার মালিক অন্য কেউ তো নয়! হুজুরের টাকা, হুজুর খরচা করবেন, কোন্ শালা কি বলবে হুজুর?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না না, বুঝতে পারছেন না কথাটা! অন্য কেউ জানলে তো ক্ষতি নেই কিছু, বৌ জানলেই মুশকিল!

হেড-নায়েব পলকের মধ্যে সহসা নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়লো। কৃষ্ণকিশোরের পায়ে হাত দিয়ে বললে,—হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে আপনি, পায়ে হাত দিয়ে বলছি হুজুর কাকপক্ষী পর্য্যন্ত জানতে পাবে না। জানলে আমার ধড়ে মাথা রাখবেন না। আমাকে যা শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেবো। আপত্তি ক'রবো না।

—আহা হা করেন কি নায়েব মশাই? ঠিক আছে, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। যে কেউ জানুক ক্ষতি নেই, বৌ যেন না জানে।

বৌ। রাজেশ্বরী।

পূর্ণশশীর বিদায়-গমনের সঙ্গে-সঙ্গে রাজেশ্বরী পালঙে আছড়ে প'ড়েছে। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লেগেছে ডুগরে-ডুগরে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। এলোকেশী মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে,—কি হয়েছে কি রাজো? এমন অঝোরে চোখের জল ফেলছিস কেন? বল্ না আমাকে।

কোন কথার জবাব পায়নি এলোকেশী।

রাজেশ্বরী শুধু মুখটা তুলে তাকিয়েছিল কয়েক বার বিহ্বলের মত। এলোকেশী দেখেছিল, রাজেশ্বরীর কেঁদে-কেঁদে ফুলে-ওঠা চোখ। সিঁদুরের মত রাঙা মুখ। চোখের দৃষ্টি স্থির। কিন্তু কথাটি বলেনি রাজেশ্বরী। শুধু কেঁদেছে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, ডুগরে-ডুগরে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়েছে রাজেশ্বরীর, স্বামীকে ডাকতে পাঠায়। স্পষ্টাস্পষ্টি জানায় যা শুনেছে! জিজ্ঞাসাবাদ করে।

কিন্তু অভিমানের আধিক্যে তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছে, না, রাজেশ্বরী কিছু বলবে না। ম'রে গেলেও বলবে না। যা ইচ্ছা হয় করুক। যা মন চায় করুক।

—বৌ, তোমাকে হুজুর ডাকছে। খেতে ব'সেছে। ডাকছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে বিনোদা। রাজেশ্বরীকে দেখে বিস্ময় সহকারে বললে,—কি হয়েছে বৌ? কোন অশুক-বিশুক ক'রেছে মনে হচ্ছে।

বালিশে চোখের জল মুছে বললে রাজেশ্বরী,—না বিনোদিদি। কিচ্ছু হয়নি। মাথাটা যা ধ'রেছে।

—তাই বল। বললে বিনোদা।

রাজেশ্বরী বললে,—তুমি বল' গে, যাচ্ছি আমি। কথা বলতে বলতে উঠে পড়লো।

বিনোদা ঘর থেকে চ'লে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি-ঘরে কি ঘণ্টা পড়তে থাকে! ঢং ঢং ঢং—

[ক্রমশঃ।

পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা কেন ?

"গত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় শতকরা পঞ্চাশ জন পরীক্ষার্থীই অকৃতকার্য্য হওয়ায় উহার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে দেশবাসীর মনে গভীর ঔৎসুক্য জাগিয়াছে। প্রধান পরীক্ষকগণ অকৃতকার্য্যতার কারণ সম্পর্কে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহার বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সভাপতি অনুমোদিত স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষকগণের নিকট পত্র দিয়াছেন। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ কি কি, এ সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে আমরা পাইব না। কিন্তু ভূগোল পরীক্ষায় কোন কোন পরীক্ষার্থীর উত্তরের দুই-একটি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া উহাকে অকৃতকার্যতার সাধারণ মাপকাঠিতে পরিণত করিলে ব্যাপারটা সত্যই হাস্যকর হইয়া উঠে। বিশেষত: আমাদের বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বাদ দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কথাও বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উর্দ্ধে বা অতীত, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বাপ-মা কিংবা অভিভাবকরা যেখানে অন্নচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, সেখানে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাহাদের হয় না। প্রাইভেট শিক্ষক রাখিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই। ছেলেদের রেশন আনা, বাজার করা প্রভৃতি অনেক কাজ না করিলে চলে না। সমাজ-ব্যবস্থার উর্দ্ধস্তরে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থাটা বুঝিতে পারেন না। তাই ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞানের অভাবের কথাটাই সহজে তাঁহাদের চোখে পড়ে। সেই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যার চাপ কিরূপ, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে বৈ কি। পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা যেখানে বেশী হয়, সেখানে নোটবুক, মেডইজি প্রভৃতি ছাড়া আর গত্যন্তর কি ? পাঠ্যতালিকা ছাত্রদের ফেল করিবার কারণ কতখানি, তাহা কে বলিবে ?" —দৈনিক বসুমতী।

ইহা অশোভন মনে হয়

"প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হয় যে, সম্মেলনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" রাখা হইবে। নামটি উপযোগী হইয়াছিল এবং এবারকার আসন্ন অধিবেশন সেই নামেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই, কারণ নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত সম্মেলনের অধিবেশনে গৃহীত হইলেও আইনগত বাধায় পরিবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। এই আইনগত বাধা কত দিনে দূর হইবে, তাহাই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এলাহাবাদের কেন্দ্রীয় অফিস হইতে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখিতেছি, 'এই উদ্দেশ্যে গত ৯ই নবেম্বর তথাকার এ্যাংলো-বেঙ্গলী কলেজে এক সভা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনো সিদ্ধান্ত হয় নাই; ২৩শে নবেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইয়াছে এবং যে সকল সদস্য এখনও 'প্রক্সি' পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে ২১শে নবেম্বরের মধ্যে উহা পাঠাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই অসুবিধা অতিক্রম করিবার কোনো উপায় কর্তৃপক্ষ করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কেবল কয়েকখানি 'প্রক্সি'র অভাবে নাম পরিবর্তন ঠেকিয়া থাকিবে, ইহা অশোভন মনে হয়।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

মোল্লার দৌড় ?

"কলিকাতা পৌরসভার কংগ্রেসী নায়কেরা বিপক্ষ দলের খোঁচায় শেষ পর্য্যন্ত রেশন দোকান হইতে নানা শ্রেণীর অখাদ্য চাউলের নমুনা সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্প্রতি ঠিকাদারি ইত্যাদির ব্যাপারে যে সব কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে এই নমুনা সংগ্রহের কথা শুনিয়া খুব কম লোকই আশান্বিত হইবে। সর্বোপরি, পৌরসভারূপ মোল্লার দৌড় তো রাইটার্স বিল্ডিং-এর মসজিদ পর্যন্ত। সম্প্রতি উপ-পৌরপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীকে খুশী করিতে গিয়া বিশেষ সফল হন নাই বলিয়া জনরব। সুতরাং চাউল লইয়া ধমকানি শুনিবার ঝুঁকি তিনি নিশ্চয়ই লইবেন না।" —লোকসেবক।

আমরা সাফল্য কামনা করি

"হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলনই আজ সরকারী জেদ এবং 'আজাদ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র উস্কানির মোক্ষম জবাব। পাসপোর্ট এবং তজ্জনিত যে সংকট সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অবসান ঘটাইবার ইহাই হইল প্রকৃষ্ট পথ। পাসপোর্টের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলিত আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে, আমরা তাহার সাফল্য কামনা করিতেছি। এই আন্দোলনকেই দিগ্‌দিগন্তে

ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন শুধু একটি বনগাঁয়ে নয়, দেশের সর্ব্বত্র—বিশেষ করিয়া সীমান্ত অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত কমিটি আর সমবেত প্রচেষ্টা। পাসপোর্ট প্রথা নাকচ, সংখ্যা-লঘিষ্ঠের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন—এই তিনটি মূল দাবির পিছনে অবিলম্বে বিপুল গণসমাবেশ অত্যন্ত জরুরী। এই পবিত্র কর্ত্তব্য পালনে দলমত-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিককেই আগাইয়া আসিতে হইবে।" —স্বাধীনতা।

সেকাল ও একাল

"হাবড়া ও আমডাঙার নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীবৃন্দের সভা করিবার জন্য ধারে-কাছে কোন জায়গা পাওয়া গেল না, আসিতে হইল প্রায় ২০ মাইল দূরে মধ্যমগ্রাম, কারণ সেখানে সভার উপ-মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের পৈত্রিক বাগানবাড়ী রহিয়াছে। লাটসাহেব আসিলেন, বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানের কৃপায় ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠা বাড়িল। "শিশির-কুঞ্জে" লাটসাহেবের পদধূলি পড়িল। বিশিষ্ট অতিথির সম্মানার্থে বাগানপার্টি দেওয়া আমাদের দেশের ধনীদের সনাতন প্রথা। আজকাল শুধু এই তফাৎ হইয়াছে আগে বাগানপার্টিতে বাই-খেমটার নাচের আয়োজন করা হইত, এখন নেতা ও কর্ম্মীদের নাচের ব্যবস্থা করিতে হয়! শ্রীমান তরুণকান্তি কর্ম্মঠ পুরুষ, বেশ খানকতক গাড়ী যোগাড় করিয়া মাতব্বর আমদানী করিয়াছিলেন মন্দ নয়।" —যুগবাণী।

নাগরিক কর্ত্তব্য

"মালিক এবং কর্মীর সম্বন্ধ যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হৃদ্যতাপূর্ণ হইয়াছে, এ কথার যুক্তিযুক্ততা প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে স্বীকার করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমানে অধিকাংশ শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই ভারতীয়রা পরিচালনা করেন। প্রাক-স্বাধীনতাযুগে যখন বিদেশীয়রা দেশ শাসন করিত তখন তাদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ পৃথক, তাহারা মনে করিত তাহারা প্রভু এবং কর্মীরা যেন ভৃত্য। কিন্তু আজ প্রজাতন্ত্রী ভারতে ঐ প্রশ্নের কথাই আসে না। দেশের উন্নতির জন্য এবং দেশসেবায় এখন প্রত্যেক ভারতীয়ই সম-অংশীদার। দাবী এবং অধিকারও আছে সকলের সমভাবে। কারণ আমাদের সংবিধানে বলা হইয়াছে যে—"রাষ্ট্র জনগণের জন্য, ইহা জনগণের এবং জনগণ দ্বারাই ইহা শাসিত হবে।" বিগত সাধারণ নির্বাচনেও আমরা দেখিয়াছি যে, ভারত তার নিজ সন্তান দ্বারাই এখন হইতে শাসিত হইবে। সুতরাং আমরা এখন নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই সমান কর্তব্য রহিয়াছে।" —যোগাযোগ।

ডাক বিভাগের গলতি

"ডাক বিভাগ ভারত সরকারের আয়ত্তাধীন। আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র মহকুমা সহর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর দুই পারে দুইটি সাব পোষ্ট অফিস পাইয়া নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিতাম। বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জের অধীন (১) নুরপুর (২) গনকর (৩) বারালা (৪) জরুর (৫) তাঁতিবিরল (৬) আহিরণ (৭) কানুপুর (৮) দফরপুর—এই ৮টি এবং জঙ্গিপুরের অধীনে (১) খামড়া (২) কলাবাগ (৩) তেখরী (৪) গিরিয়া (৫) দয়ারামপুর (৬) কুলগাছি (৭) কাশিয়াডাঙ্গা (৮) রামদেবপুর (৯) মিঠিপুর এই নয়টি মোট ১৭টি শাখা ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বিভাগীয় প্রশংসারই কথা। আমরা প্রত্যক্ষ করি, এ সব শাখা ডাকঘরের এবং জঙ্গিপুর সাব অফিসের ডাকের ব্যাগ একত্রিত হইয়া রঘুনাথগঞ্জ মোটর বাসের ছাদে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাক-ব্যাগ বোঝাই করিয়া জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের ট্রেণে রবিবার ব্যতীত প্রত্যহই যাতায়াত করার ব্যবস্থা আছে। ব্যাগগুলি এত বিশালাকার ধারণ করে যে একজন মেল-বাহকের পক্ষে ট্রেনের স্থিতিকালের স্বল্প সময়ের মধ্যে মোটর বাস হইতে লাইনে এবং লাইন হইতে মোটর বাসে আনা দুষ্কর হইয়া পড়ে। বিশাল ব্যাগ অনেক সময় ট্রেণের স্বল্পপরিসর দরজা দিয়া প্রবেশ করান অসম্ভব হইয়া উঠে। কোনও কোনও দিন রেলগাড়ী হইতে বাসে আনার সময় দেরী হইলেই, প্যাসেঞ্জারগণের তাগাদায় বাস ছাড়িয়া দিলে লাইট ট্রেণের জন্য যে মোটর বাস যায় তাহাতেই ডাক আনিতে হয়। ফলে ডাকের চিঠি পাইতে বিলম্ব হয়। রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরের কাজ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, মনি-অর্ডার বা রেজেষ্টারী করিতে গিয়া দেখা যায় কেরাণীবাবুর মাথা তোলার অবসর নাই। পিওন ও মেলবাহক দিয়া চিঠি সর্ট করাইতে হয়। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ডাকঘরের কাজ মিটে না।" —জঙ্গিপুর সংবাদ।

রামপুরহাটে পৌরসভার ভোটাভুটি

"যেদিন এই সহরে প্রথম পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হইবার আয়োজন হইয়াছিল তখন করদাতাগণকে এই কথাই দৃঢ়ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে, স্থানীয় রেলওয়ের সম্পত্তি হইতে যে রেট আদায় হইবে তাহার অঙ্ক বিরাট, এবং এই বিরাট অঙ্কই তাহাদের দেয় মিউনিসিপ্যাল রেট বৃদ্ধি হইতে দিবে না, এবং সেইরূপ ধারণা করিয়াই প্রথম কর ধার্য্য করাও হইয়াছিল। আজ যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, বর্ত্তমানে রেলওয়ে সম্পত্তি হইতে কোন রেট আদায় আইন-সঙ্গত নহে এবং অনেক লেখালেখি করিয়াও বর্ত্তমানে পৌরসভা এই কর আদায়ের কোন হদিস্ করিতেও পারেন নাই। সরকারী ঋণের বোঝাও আন্দাজ ৪৫০০০৲ টাকা এবং প্রথম দেয় কিস্তীও পরিশোধিত হয় নাই। পৌরসভার ধার্য্য কর অনেক ক্ষেত্রে করদাতাগণের বহন-শক্তির সীমাও অতিক্রম করিয়াছে। ব্যবসার উপর, গো-গাড়ীর উপর ইত্যাদি যত রকম ট্যাক্স আদায়ের কৌশল এবং উপায় আছে তাহার সবগুলিই বোধ হয় অবলম্বন করা হইয়াছে। সুতরাং ধার্য্য রেট অদূর ভবিষ্যতে কমিবারও কোন আশা নাই। ইহাও প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। পৌরসভার কর্ম্মচারীবাহিনী বৃদ্ধির পথে। অর্থাভাবে জনহিতকর কার্য্যের সূচনাও বন্ধ। তাহা ছাড়া এই ক্রমবর্দ্ধমান সহরে পৌরসভা উচ্ছেদ করাও একরূপ অসম্ভব, এবং তাহা আদৌ যুক্তিযুক্তও নহে। এই তো আমার পৌরসভার রূপ। তবে এই দিল্লীকা লাড্ডুর মোহে কেন এই বিরাট অভিযান? এই মুমূর্ষু পৌরসভায় প্রাণ সঞ্চার করিতে চাই শুধু এমন সভ্য যাঁহারা গঠনমূলক কর্ম্মে বিশ্বাসী। এই দলাদলিতে ক্ষত-বিক্ষত পৌরসভায় চাই এমন সভ্য, যাঁহারা সর্ব্বদল-সমন্বয়ে একটা কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম, যাঁহাদের প্রতি রামপুরহাটের করদাতাগণের আস্থা আছে,—যাঁহারা করদাতাগণের প্রভু নহেন, সেবক এবং যাঁহাদের কাছে অভিযোগ জ্ঞাপনে আমাদের লাঞ্ছিত হইবার আশা নাই—এক কথায় যাঁহারা আমাদেরই একজন।" —রাঢ় দীপিকা।

Self help is the best help

"কিন্তু এই আসন্ন ধ্বংসের সময়েও কেন্দ্রীয় সরকারের—প্রধান মন্ত্রীর একি নিষ্ক্রিয়তা! ইহা কি তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত? তিনি কি বাংলার ভৌগোলিক স্থিতিটুকুকেও সমূলে ধ্বংস করিতে চাহেন? তিনিই স্বীকার করিয়াছেন দিল্লী চুক্তি ব্যর্থ হইয়াছে। আজ তবে আবার চুক্তি, সভা, মিলিত বৈঠকের প্রশ্ন তোলেন কেন? আমরা এটুকু পরিচয় পাইয়াছি—Contradiction is thy name Nehru. বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সব কিছুতেই ঘূণ ধরিয়াছে। হঠাৎ একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে এই বিশাল ঐতিহ্যময় প্রদেশ। পাকিস্থান সরকারের নীতি—ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তা বাংলার মেরুদণ্ডে সমূলে আঘাত হানিয়াছে। বাংলার দিকে তাকাইবার আজ কেউ নাই। বাঙালীকে আজ আর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, বাঙালী কাহারও করুণার প্রার্থী হয় নাই। আর আজও হইবে না। "Self help is the best help." —উদয়ন।

অর্থনৈতিক অবরোধ

"গত কয়েক দিন ধরিয়া কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট দল ব্যতীত সমস্ত দলের নেতাগণ সমবেত কণ্ঠে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের দাবী জানাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে পাকিস্থানের জনসাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে এবং তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে, পাকিস্থান সরকারের কার্য্যকলাপের দরুণই তাহাদের এই দুর্ভোগ। পাকিস্থান যখনই কোন অর্থনৈতিক বিপর্যায়ের সম্মুখীন হইয়া বসে, তখনই নেহেরু সরকার নূতন প্যাক্ট করিয়া তাহাদের বৈতরণী পার করাইয়া দেন, ভারতের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া পাকিস্থান সরকার আবার নূতন করিয়া হিন্দু বিতাড়ন কার্য্যে লাগিয়া পড়েন। প্রেম ও শুভেচ্ছার পথ ধরিয়া আমরা বার বার কেবল যে ব্যর্থ হইয়াছি তাহাই নয়, আমরা প্রতারিতও হইয়াছি।" —নির্ভীক।

Qualified ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও

"নগাঁও বাস্তহারা সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ বাস্তহারা শিবিরে (Destitute Camp) একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিবার জন্য নোটিশ দিয়াছিলেন। বাস্তহারাদের মধ্যে উপযুক্ত দুই জন চিকিৎসক নাকি উক্ত চাকুরীর জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু বাস্তহারা শিবিরের জন্য বাস্তহারা Qualified ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্য একজনকে কেন নির্বাচিত করা হইল, তাহা পুনর্বসতি বিভাগ আমাদিগকে জানিতে দিবেন কি? বাস্তহারা বিভাগের কর্ত্তাদের পক্ষপাতিত্ব করা কি ন্যায়সঙ্গত?" —পূরবী।

বিনিয়ন্ত্রণ ও লেভী প্রথা

"পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেভী ব্যবস্থায় ধান্য সংগ্রহের সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ৩০ বিঘা জমির উৎপাদনকারী কৃষককে সরকারী নির্দ্দিষ্ট তাঁহার প্রয়োজন মত ধান্য মজুত রাখিয়া বাকী সমস্ত ধান্য সরকারী নির্দ্দেশে বিক্রয় করিবার রীতি গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতখানি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আবার নূতন করিয়া চিন্তা করিতে হইবে। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল সমূহে খাদ্য জোগাইবার জন্য সরকারের খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু বর্ত্তমান গৃহীত ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বিতীয় ভুলে পদক্ষেপ করিলেন বলিয়া আমরা আশঙ্কা বোধ করিতেছি। বিশেষ করিয়া এখানে আমরা বর্দ্ধমান জেলার কথাই বলিব। এই জেলার অধিকাংশ চাষীই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। ৩০ বিঘা বা ততোধিক জমির উৎপাদনকারীর সংখ্যাই বেশী হইবে। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার তাঁহাদের জমি ভাগজোতে বিলি করিয়া তাহার মুনাফা হইতে নিজেদের পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকেন। চাষী স্বীয় শ্রমে চাষ করিলে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, ভাগজোত চাষে যে তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া যায় না, অতি প্রাচীন প্রবাদ বাক্যেও তাহার স্বীকৃতি আছে।" —বর্দ্ধমানের কথা।

আসাম আবার জাগছে

"লাল চীন, মুক্ত তিব্বত আর সংগ্রামী বর্ম্মার কোলে নবীন আসাম। নাগা, মিকির, ডফলা, গারো ও আবর উপজাতিগুলি, হাজার হাজার চা-বাগানের শোষিত কুলি-মজুর আর লক্ষ লক্ষ অনুন্নত অসমীয়া চাষীর বাসভূমি আসাম। দরং, বেলতলা, গোয়ালপাড়া এবং লখীমপুর-শিবসাগরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রণভূমি আসাম। বহু দিনের পেছিয়ে পড়া উপেক্ষিত আসামের বুকে যখন ১৯৪৯-৫০ সালে সর্ব্বপ্রথম মুক্তিযুদ্ধের দামামা বেজে উঠে—পাহাড় ঘেরা আসামের কালো জঙ্গলের অবগুণ্ঠন খুলে সমাজ-বিপ্লবের পতাকাবাহী অসমীয়া মুক্তিযোদ্ধারা যখন দলে দলে অভিযান করে, সেদিন সমগ্র ভারত অবাক বিস্ময়ে গণমুক্তি সংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত আসামকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণবাহিনী সংগঠন এবং গণপঞ্চায়েৎ কায়েম ক'রে পুঁজিবাদী শোষণযন্ত্রকে চুরমার করে দিতে দলে দলে এগিয়ে এসেছিল আসামের দেশপ্রেমিক ছেলে-মেয়েরা। কংগ্রেস সরকার এই গণমুক্তির আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার সামরিক শক্তি নিয়োগ করে এবং ধনিক ও জমিদার সম্প্রদায় তাদের হস্তী, অর্থ প্রভৃতি দিয়ে কংগ্রেসী পশুশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করে। তার পর সুরু হয় কংগ্রেসী সরকারের বর্ব্বর প্রতিহিংসার পালা। শিবসাগর-বেলতলার গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ ক'রে নির্বিচারে জনসাধারণের উপর যে নির্ম্মম অত্যাচার চালায়, তার ক্ষত আজও শুকিয়ে যায়নি। সরকার তার সমস্ত প্রচারযন্ত্র নিয়ে বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে একতরফা কুৎসা রটনা ও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জনমতকে প্রভাবান্বিত করতে চেয়েছে। এই সরকারী হীন অপচেষ্টার প্রতিবাদে এ পর্য্যন্ত দেশের বামপন্থী দলগুলি যথোচিত এগিয়ে আসেননি। বামপন্থী দুর্ব্বল রাজনীতির এই ভীরুতা ক্রমশঃ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই আসামের গণপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বৈধ করা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্ত করার দাবী নিয়ে আসামের শত শত যুবক-যুবতী গ্রামে ও সহরে দুর্ব্বার গণআন্দোলন গ'ড়ে তুলছে।" —বর্দ্ধমানের ডাক।

মানভূমের লোকগণনায় সরকারী জালিয়াতি

"গত লোকগণনার ব্যাপারে ইহা বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, কংগ্রেসী রাজত্বে খাস মানভূমে কোন আইন-কানুন,

নিয়ম বা বিধি-বিধানের বালাই নাই—হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ/ প্রতিষ্ঠার জন্য যাহা খুসী করা চলে। কিন্তু মানভূমের ব্যাপারে উপর দিকেও কি করা হয় সেন্সাসের সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদটি তাহার একটি দিগ দর্শন। মানভূম জিলার লোকগণনা সম্বন্ধীয় হিসাবপত্রের কাগজ সম্বন্ধে বিভাগীয় ডেং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এমনি গোলমাল করিয়া ফেলে যে, তাহাকে সরাইতে হয়। ভারপ্রাপ্ত সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শুধু অন্য লোক দিয়াই নয় নিজের পারসনেল সেক্রেটারী অর্থাৎ একান্ত সচিব দিয়া কাগজপত্রের হিসাব করিতে গেলে দেখা যায় যে, একমাত্র মানভূম জিলার লোকগণনা সম্বন্ধীয় বহু কাগজ উধাও হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ধরা পড়িয়া যত দূর পারা গিয়াছে জালিয়াতির আরও কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। একমাত্র মানভূম জেলার লোকগণনার সম্বন্ধে গোলমাল ধরা পড়িবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের লোকগণনার ফলাফলের প্রকাশ বিলম্বিত হইয়া আছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মানভূমের লোকগণনার সম্বন্ধেই এইরূপ গোলমাল ধরা পড়িয়াছে। আমরা মনে করি, বিহারের মধ্যে বাংলাভাষী অঞ্চলগুলির লোকগণনার হিসাবপত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করা দরকার। ধলভূম সম্বন্ধেও অনুরূপ বহু অভিযোগ রহিয়াছে। সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে যাইতে পারে যে—বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের ব্যাপারে সর্ব্বত্রই এইরূপ কারচুপী করা হইয়াছে। এই অবস্থায় আমরা মনে করি যে, মানভূমের ও বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকগণনা নিরপেক্ষ ভাবে পুনরায় করা উচিত।" —মুক্তি।

রেশম ও তাঁতশিল্পের সঙ্কট

"বীরভূম জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ হইতে নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী ও তথ্য-সংগ্রাহক সাথী শশাঙ্কশেখর মণ্ডল জানাইয়াছেন যে—'বিগত যুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের পর থেকেই ভারতীয় রেশম শিল্পের দুর্দিন আরম্ভ হয়েছে। সেই দুরবস্থা আজ এমন চরম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, রেশমের তাঁতীরা অন্নাভাবে মৃত্যুপথযাত্রী। বিশেষতঃ রামপুরহাট মহকুমার বসোয়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের তাঁতীদের অবস্থা অবর্ণনীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই অঞ্চলে একজন তাঁতীর অনশনে মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপঞ্চানন শেঠ এম, এল, এ-দ্বয় সরকারকে দীর্ঘ দিন থেকে নানাভাবে তাঁতীদের দুর্দ্দশার কথা জানান সত্ত্বেও সরকার এ বিষয়ে লোক-দেখান ভাবে একবার খবর নেওয়া ব্যতীত সম্পূর্ণ নির্ম্মম ভাবে উদাসীন। সরকারের এই উদাসীনতার কারণ রেশম যেহেতু গরীব দেশবাসীর কাজে লাগে না, সাধারণতঃ ধনীরা ব্যবহার করে এবং বাংলা তথা ভারতীয় সরকার যেহেতু গরীবের সরকার সেই জন্যই নাকি এই উদাসীনতা! সত্যই দরিদ্রসখা ভারত সরকার প্রশংসার্হ। তবে বর্ত্তমানে গরীবের মা-বাপ (?) ভারত সরকার যদি একবার মুখ তুলে তাকান, দেখতে পাবেন যে রেশম আর বড়লোকে ঘৃণায় ব্যবহার কচ্ছে না, কারণ সূতার কাপড়ের চেয়ে তার দাম নাকি নীচে নেমে গেছে! কাজেই সরকার যদি এখন একবার তাঁতীদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাঁদিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে বোধ হয় বড়লোকের সরকার' বলে আর অপবাদ হবে না! আমাদের দাবী হল, সরকার এই সব রেশমের তাঁতীদিগকে সরকারী সাহায্য দানের জন্য অবিলম্বে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। এটি একান্ত কর্ত্তব্য'।" —বীরভূমের ডাক।

শোক-সংবাদ

ভারতের খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (৮৮) তাঁহার ঝাড়গ্রামস্থ বাসগৃহে গত ২৩শে কার্ত্তিক পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ শিল্পী যামিনী রায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। বসন্তরঞ্জন আজীবন সাহিত্য সেবা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক ও পুঁথি বিভাগের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামক অপূর্ব্ব পুঁথি আবিষ্কার তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্য। ১৩২৩ সালে উক্ত পুঁথির প্রথম সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। বসন্তরঞ্জন বাংলা রামায়ণের পুঁথির তালিকা প্রস্তুত করেন। পালি ভাষাতেও তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক আছে। বসন্তরঞ্জনের আদি বাস বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে। তিনি অমায়িক ও উদার প্রকৃতির মনীষী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা ভাষার যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবে না এবং বাংলার পুরাতন যুগের একটি যোগসূত্র ছিন্ন হইল। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

মঞ্চ ও ছায়াচিত্রের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা (৪৯) গত ৮ই নভেম্বর কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর সহিত অভিনয় করিয়া শ্রীমতী প্রভার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ আসে। শিশির বাবুই তাঁহার পথপ্রদর্শক ও গুরু। চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী প্রভা শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। 'সীতা' চরিত্রে তিনি যে শিল্প-মাধুর্য্য প্রদর্শন করেন তাহাতে তিনি সকলেরই প্রশংসাভাজন হন। সকল প্রকার চরিত্রের রূপদানে তাঁহার সমকক্ষ অভিনেত্রী বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিরল। তিনি যে সমস্ত নাটকে অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দের প্রশংসা লাভ করেন—তাহার মধ্যে 'নিষ্কৃতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'আলমগীর', 'ষোড়শী', 'পাষাণী', 'তপতী', 'শেষ রক্ষা', 'প্রফুল্ল', 'রমা', 'পণ্ডিত মশাই', "সেই তিমিরে" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিভাময়ী প্রভার অকালমৃত্যুতে রঙ্গমঞ্চের যে ক্ষতি হইল তাহার জন্য বাংলার নাট্যামোদী মাত্রেই মর্ম্মাহত।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অমল মিত্রের সৌজন্যে]

বাঁশুরিয়া

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয় খণ্ড]   [দ্বিতীয় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ

১৩৫৯

৩১শ বর্ষ

কথামৃত
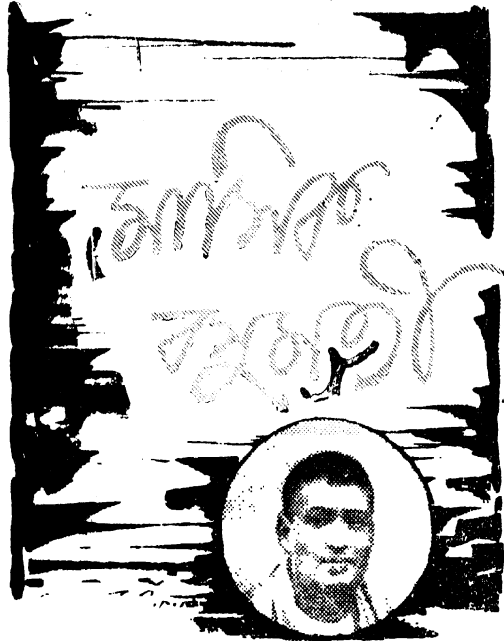
শ্রীশ্রীমা। "সর্ব্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে। আমি যখন আগে জয়রামবাটী ছিলুম, দিন-রাত কাজ করতুম। কোথাও কারো বাড়ী যেতুম না। গেলেই লোকে বলত, ওমা শ্যামার মেয়ের ক্ষ্যাপা জামাইয়ের সঙ্গে বে হয়েছে।"

একজন স্ত্রী-ভক্ত। "আমার পাঁচটি মেয়ে, মা, বে দিতে পারি নাই, বড়ই ভাবনায় আছি।"

শ্রীশ্রীমা। "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।"

শ্রীশ্রীমা। "যে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে সেই তাঁর (ঠাকুরের) দেখা পাবে।"

শ্রীশ্রীমা। "ওকি গো, মেয়েলোকের হাঁটুর কাপড় উঠবে কেন?" —বলেই কি একটি শ্লোক বললেন, তার মানেই হাঁটুর কাপড় উঠলেই মেয়েলোক উলঙ্গের সামিল।

শ্রীশ্রীমা। "মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয় মা, ভক্তিই সব। ঠাকুরের মাঝেই গুরু, ইষ্ট, সব পাবে।"

শ্রীশ্রীমা। "চন্দনে যেন খিচ না থাকে, ফুল বিল্বপত্র যেন পোকা-কাটা না হয়। পুজো বা পুজোর কাজের সময় যেন নিজের কোন অঙ্গে, চুলে বা কাপড়ে হাত না লাগে। একান্ত যত্নের সঙ্গে ঐ সব করা চাই। ভোগরাগ সব ঠিক সময়ে দিতে হয়।"

শ্রীশ্রীমা। "উচিত কথা গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয় না।"

শ্রীশ্রীমা। "দেখ মা, সকলেই বলে 'এ দুঃখ, ও দুঃখ—ভগবানকে এত ডাকলুম তবুও দুঃখ গেল না।' কিন্তু দুঃখই ত ভগবানের দান।"

শ্রীশ্রীমা। "মাছ খাবে। খাবার ভিতর আছে কি? মাছ খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে।"

শ্রীশ্রীমা। "কত সৌভাগ্য মা এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? আমার কথা কি বলবো মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম।"

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ-কথিত ঘটনাবলী

(মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অপ্রকাশিত ডায়েরী অবলম্বনে)

শ্রীঅনিল গুপ্ত

নিকুঞ্জ দেবী (মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী) দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীকে প্রায়ই দর্শন করিতে যাইতেন। কখন-কখন তিনি শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর সহিত রাত্রি যাপনও করিতেন। পুত্রশোকে যখন উন্মাদিনীপ্রায়, ঠাকুর বিশেষ ভাবিত হন ও তাহার যথাযথ ব্যবস্থাও করেন। তাঁরই আদেশে নিকুঞ্জ দেবী ঐ যাত্রায় কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর আশ্রয়ে বাস করেন। ঠাকুর ঐ সময়ে নিকুঞ্জ দেবীকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেন, আত্মহত্যা করিলে ফিরে-ফিরে এই দুঃখময় সংসারে আসিতে হয় এবং পাশে গঙ্গা থাকায় নিজেও সতর্ক থাকিতেন। ভক্তবৎসল কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবে তাঁহার স্নেহস্পর্শে ভক্ত-পরিবারটির হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করেন ও হৃদয়ের জ্বালা দূর করিয়া দেন। ঠাকুর যখন অসুস্থ হইয়া কাশীপুরে অবস্থান করেন নিকুঞ্জ দেবী ঠাকুরের অসুখ বৃদ্ধি স্বপনে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন—"ওগো, তোমার কাছে গিয়ে যে আমার সব জ্বালা গিয়েছিল!" এই উক্তিই ইহার পরিচায়ক। আহা! কি ছিল তাঁহার অশেষ করুণা!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর নিকুঞ্জ দেবী ১২৯৩ সাল, ১৫ই ভাদ্র শ্রীশ্রীমা'র সহিত তীর্থে গমন করেন। শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গিনী বলিতে নিকুঞ্জ দেবীই ছিলেন। প্রথমে দেওঘর দর্শনাদি করিয়া ৺কাশীধামে আসেন ও তিন দিন অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীমা'র সহিত নিকুঞ্জ দেবী বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিতে যাইতেন। এক দিন আরতি সমাপনান্তে শ্রীশ্রীমা'র শ্রীমুখে ও গণ্ডদেশে এক অপূর্ব্ব রক্তিম আভা দর্শন করেন ও সেই সময়েই শ্রীশ্রীমাকে দ্রুতগতিতে মন্দির হইতে বাসায় প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হন। পরে তিনি শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীমা বলেন, "ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।" নিকুঞ্জ দেবী শ্রীশ্রীমা'র এই সময়ে যে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করেন, তাহা সকলকেই বলেন। ৺কাশীধাম দর্শন করিয়া অযোধ্যায় এক দিন থাকিয়া বৃন্দাবনে আসেন। এখানে এক মাস কাল থাকিয়া নিকুঞ্জ দেবী ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। অতীব দুঃখের সহিত "মন্দ ভাগ্য" এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীমা'র শ্রীচরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দের সহিত কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। নিকুঞ্জ দেবী বলেন—বৃন্দাবনে অবস্থান কালে শ্রীশ্রীমা আবার হাতের বালা খুলিতে যান ও এই সময় ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দর্শন দিয়া বলেন, 'তুমি বালা খুল না, গৌরদাসীর কাছে বৈষ্ণবতন্ত্র জেনে নিও। কৃষ্ণ পতি যার, তার বিধবা হওয়া (বৈধব্য) নাই—সে চির সধবা।' পরে শ্রীশ্রীমা তৎকালীন তীর্থভ্রমণ সমাপনান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে নিকুঞ্জ দেবী প্রায়ই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেন। মাষ্টার মহাশয়ও ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া অশেষ সহায়হীন হইয়া পড়েন ও শ্রীশ্রীমাকে মধ্যে-মধ্যে নিজ বাটীতে আনিয়া সেবা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীও কয়েক বার মাষ্টার মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া কখনও পক্ষাধিক কাল, কখনও বা মাসাধিক কাল বাস করিয়া যাইতেন। ৺ঘট প্রতিষ্ঠা করিতে স্বপ্নাদিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীমা মাষ্টার মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া পূজা ও ৺ঘট স্থাপনার ব্যবস্থাও করেন। এই ঠাকুর-ঘরে শ্রীশ্রীমা কতই না পূজা, জপ ও ধ্যান করিয়াছেন!

নিকুঞ্জ দেবী যখনই মা'র সহিত মিলিত হইয়াছেন ও তাঁহার সহিত যে-সব কথা হইয়াছে, তাহার কিছু-কিছু মাষ্টার মহাশয়কে বলেন ও তিনি Diaryতে সেই সব কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই Diaryর উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীশ্রীমা'র শ্রীমুখ-কথিত ঘটনাবলী ইহাতে সন্নিবেশিত হইল।

নিকুঞ্জ দেবী—মা, সংসারে কেবল যন্ত্রণা আর অশান্তি। তোমার কাছে এলেই তপ্ত হৃদয়ে একমাত্র শান্তি আসে, আর তোমাকে মা বলে ডাকলে হৃদয় জুড়ায়!

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, তুমি ওঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখেছো, তোমার আর ভাবনা কি? তোমাকে উনি খুব ভাল বলতেন। তিনি তোমায় বলেছেন, 'মাষ্টারের স্ত্রী কি উদার, কেমন ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।' আর মা, তোমায় বলি শুন, এই সংসারে সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ আছেই, যার যখন সময়, ঠিক আসে, ভোগও করিয়ে নেয়। মনে জোর করতে হয় আর ঈশ্বরে মন রাখতে হয়। কেবল এমন অশান্তি-অশান্তি বলতে নাই!

নিকুঞ্জ দেবী—তোমার সঙ্গে কথা কইলেই মনে জোর আসে আর প্রাণ জুড়ায়। মা, তাই যখনই প্রাণটা হু-হু করে তোমার কাছেই আসবার জন্য ব্যাকুল হই।

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, আমার তখন ১৮।১৯ বৎসর বয়স হবে তখন ওঁর সঙ্গে শুতুম (১৮৭২ খৃঃ)। এক দিন বললেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কে?

শ্রীশ্রীমা—আমি তোমার সেবা করতে আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি?

শ্রীশ্রীমা—আমি তোমার সেবা করতে আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আমা বই আর কাউকে জান না?

শ্রীশ্রীমা—না, তিন সত্য।

"একদিন বললেন, 'ছেলে কি হবে? এই দেখছো সব মরছে।' তা আমি বললাম, 'সব কি যায়!'

"এক দিন খাবার সময় নুণ না থাকায় বলেছিলাম, নুণ নাই। তখন তিরস্কার করে বললেন, 'নেই কি? নেই শব্দ বলতে নাই। সব জোগাড় করে রাখতে হয়।'

"শ্বশুরবাড়ী বাসকালে রামলালের পিতাঠাকুর রাত্রে আমায় শুতে যেতে বলতেন আর উনি কেবল হাসতেন। সেই সময় একসঙ্গে শুতুম আর সারা রাত গল্পেই কেটে যেত। বলতেন—কেমন করে সংসারের কাজ করতে হয়, কেমন করে সকলকার সঙ্গে ব্যবহার

করতে হয়। আর জানতে হয়, ঈশ্বরই একমাত্র আপনার ও নিত্যবস্তু।

"কামারপুকুরে আমার মা আসাতে কত আদর-যত্ন করলেন আর বললেন, 'আপনি আচার তৈয়ার করে খাওয়ান!'

"জয়রামবাটীতে যখন ছিলাম তখন উনি এলেন। আমায় বললেন, 'সাজি মাটী দিয়ে পা-টা ধুয়ে দাও তো'। তা দেওয়াতে বাড়ীর অন্য মেয়েরা দেখে বলাবলি করতে লাগল, 'ওমা, সারদার কি গো, স্বামীর সঙ্গে কিছুই হ'লো না তবু দেখ...'

"শাশুড়ী যখন পুত্রশোকে * মুহ্যমান সেই সময় শাশুড়ীর কাছেই থাকতেন, কত বোঝাতেন। এক দিন প্রার্থনা করলেন, 'মা! আমি তোমার নামগুণ করবো আর মা যদি সদা-সর্ব্বদা শোক করে আর কাঁদে কেমন করে পারবো। তা ওর মন উলটে দাও মা।' শেষে তাই হ'ল, শাশুড়ী সব সময়ই ভাবে থাকতেন।

"শম্ভু মল্লিক থাকার জন্য একটি বাসাবাড়ী করে দিলে, তা বৌমা, সেখানে থাকতে মন চাইতো না। সে কথা বলতে তিনি হৃদয়কে বললেন, 'হৃদে, তবে তোর স্ত্রীকে আন।' হৃদুও বললে, 'আমার স্ত্রীর জন্য কি শম্ভু মল্লিক বাড়ী করে দিলে?'

"ওখানে তখন এক জন ব্রহ্মচারী থাকত, মনে বড় ভয় হতো যদি ওঁর কোন মন্দ করে, তাই ১০৲ টাকা দিতে গেলুম যাতে কোন মন্দ না করে। তা ঠিক টের পেয়েছেন, অমনি নবতে এসে বললেন, 'আমার মা আছে, কে মন্দ করবে?'

"রাম দত্ত প্রভৃতিকে এক দিন বললেন, 'দেখ, বড় ছেলে ছেলে করে, তোমরা একবার ·নবতে যাও, আর বলে এসো আমরাই আপনার ছেলে।'

"নৌকায় করে বালী হ'য়ে একসঙ্গে দেশে যাওয়া, পরস্পর প্রসাদ খাওয়া আর কত গান গাইলেন, আহা! সে কি ভাব! আবার বললেন, 'আমি জানি তুমি কে। কিন্তু এখন বলবো না।' আর এর (নিজের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) ভিতর সব আছে।

"শাশুড়ীর মৃত্যুর 13th Feb, 1877 সময় বলতে লাগলেন, 'মা গো, তুমি কে গো, তুমি আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলে। মা, এক রূপে এত দিন দেখলি এখন যেন দেখিস!'

"শাশুড়ীর মৃত্যুর পর এক দিন খাবার পূর্ব্বে বললেন, 'দাঁড়াও, আমি মা'র জন্য পঞ্চবটীতে একটু কেঁদে আসি।'

"হৃদুকে এক দিন বললেন, 'তুই শালা আঁবের থাক, তুই এ-ঘরে আসিসনি (শয়ন)। আমি তোকে গালাগাল দিই, তোরও রক্ত-মাংসের শরীর, তুইও দিস।'

"আমাকে ও আমার সঙ্গীদের দেখে বললেন, 'দেখ হৃদে, ওকে ছেড়ে দিতে আমার অবিশ্বাস হয় না, তবে লোকে কি বলবে।'

"বেতন ৭ টাকা সম্বন্ধে খাজাঞ্চীকে বললেন, 'যদি ওকে (শ্রীশ্রীমা) দাও তো দাও, তা না হ'লে গঙ্গার জলে ফেল, কি অতিথি-সেবায় দাও। যা ইচ্ছে ক'রো।'

"নবতে যখন থাকতুম সমস্ত দিন বসে এক দিন মালা গেঁথে বললাম, 'ওঁকে বলো পরতে হবে। তা মালা গলায় পরে গান গাইলেন—'ভূষণ বাকি কি আছে রে, জগচ্চন্দ্র হার পরেছি।'

"বাড়ী (জয়রামবাটী) যাবার সময় বার বার ওঁকে দেখতে যাওয়াতে হৃদুকে বললেন, 'একশো বার কি? যেতে বলো।'

"গোলাপ মাকে এক দিন বললেন, 'ওর সহ্যগুণ কত, ওকে নমস্কার'।"

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, সেবার যখন ৯ মাস আসিনি বড় কষ্ট হয়েছিল।

নিকুঞ্জদেবী—মা, তুমি দেবী! তুমি মা জিতেন্দ্রিয়!

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, ও কথা ব'লোনি, কি কপালে আছে কে জানে? কাশীপুরে যখন থাকতুম কত কি মনে উঠতো, তা ওঁর কাছে গিয়ে তবে শাস্তি হ'তো। কিন্তু নবতে যখন থাকতুম তখন অত কি হ'য়েছিল?

"এক দিন বললেন, 'তুমি আর লক্ষ্মী কে, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের বলবো না। তোমার ধার শোধবার জন্য আমি বাউল হব আর তোমাকে সঙ্গে লবো...হুকো...'

"লক্ষ্মীর একাদশী শুনে বললেন, 'আমি শাস্ত্রের পার, খুব খাবে। আর থান ধুতি, যেন রাক্ষুসে বেশ।'

"পঞ্চবটীতে সীতাকে দেখেছিলেন, হাতে ডায়মনকাটা বালা। সেই বালা দেখে আমায় সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন, এদিকে নিজে টাকা ছুঁতে পারতেন না।'

"ওঁর অসুখের সময় বললেন, 'ইচ্ছা হচ্ছে তোমার সঙ্গে আর কেউ থাকবে না, কেবল লাটু, রঞ্জিত রায়ের দীঘিতে গিয়ে মায়ের ভোগ দিই।'

'তোমার কত নাতি পুতী কিসের ভাবনা।'

"এক দিন ওঁকে বললাম, 'আমার ভাব-টাব তো কিছুই হ'লো না।' তা শুনে বললেন, 'আবার কি হবে, আবার কি কাপড় ফেলে ধেই-ধেই করে নাচতে হবে, তখন কাপড় সামলাবে কে?'

"দেহত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে বললেন, 'কৃপণ হওয়া ভাল তো লক্ষ্মীছাড়া হওয়া ভাল নয়।"

* ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীরামেশ্বর।

† 11th April, 1876

—আগামী সংখ্যায়—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দ্বাদশ তরঙ্গ

আশ্রয়-কোটর

যত কৃচ্ছ্রসাধনই করা যাক, মাসিক পঁচিশ টাকায় ঘরভাড়া সমেত দৈনিক খোরাক চলে না। এক বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম—ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ, তা সে শ্বশুরবাড়িতেই হউক বা বন্ধুবান্ধবদের কাছেই হউক। জীবনদা'র চেষ্টার বিরাম ছিল না। সন্ধ্যা-বেলায় ঘণ্টা খানেকের জন্য ঝামাপুকুরে পড়াইতে যাই, প্রায় বেকারই ছিলাম। প্রচুর লিখিয়া ও পড়িয়াও সময় কাটিতেছিল না। পরবর্তী জীবনে কি করিব তাহার ঝাপসা নীহারিকা মূর্তি মানস-আকাশে ভাসিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছিল। সে মূর্তি যে ছাপাখানার তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। প্রুফ দেখিতে শেখার তাগিদ স্বতঃই মনের মধ্যে জাগিতে লাগিল, সওদাগরী আপিস কেরানী-গিরির বা লেজার-রক্ষার নয়। মোহিতলাল তখন 'নব্যভারতে' ও 'ভারতী'তে নিয়মিত লিখিতেছেন। তাঁহার নিকট প্রুফ আসিত, তিনি একা বসিয়া বসিয়া দেখিতেন। সুযোগ অবহেলা করিলাম না। মোহিতবাবুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার কাপি-হোল্ডারের পদে বহাল হইয়া গেলাম; মাঝে মাঝে তাঁহার পড়া প্রুফ টানিয়া লইয়া চিহ্ন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে হইতে দুই-একটা খোদকারি করিয়াও আনন্দ পাইতে লাগিলাম।

ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারের একখানি খাম, উপরে সবুজকালিতে ছাপা চাবুকপ্রহাররত এক ভীম অথচ সুঠাম বীরমূর্তি—যোগানন্দ দাস তাঁহার ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া আমার নাকের সম্মুখে ধরিলেন। সময় প্রাতঃকাল হইলেও শ্রাবণের আকাশে মেঘ থমথম করিতেছিল, সদ্য-বর্ষণে আমার ঘরের সম্মুখের বারান্দা সিক্ত। উল্লাসে ছোঁ মারিয়া খামটি কাড়িয়া লইয়া মূল্যসংগ্রহে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম। খামে কাদাজল মাখামাখি হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আবরণ খুলিয়া ভিতরের বহুমূল্য বস্তুটিকে রক্ষা করিতে গিয়া প্রথম সন্দর্শন ঘটিল, প্রতিকূল অবস্থায় প্রথম সন্দর্শনেই নিবিড় প্রেম জন্মিল। এক আনা মূল্য দিয়া বস্তুটির মালিক হইলাম। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা। তারিখটাও স্পষ্ট মনে আছে ১১ই শ্রাবণ রবিবার, ১৩৩১—২৭ জুলাই ১৯২৪; প্রথম প্রকাশের ঠিক পরের দিন।

যোগানন্দ দাসের দাঁড়াইয়া বা বসিয়া আড্ডা দিবার সময় ছিল না, তিনি কাগজ বেচিতে ও বিলি করিতে বাহির হইয়াছেন। তিনি বিদায় লইতেই আমি গুরু গুরু মেঘগর্জনের মধ্যে বত্রিশপাতার চটি পত্রিকাখানি পড়িতে বসিলাম। মনে হইল, মেঘমেদুর অম্বরের তলে শ্যামবনভূমির মাঝখানে সেই প্রথম প্রিয়সম্ভাষণ শুনিলাম। কোন লেখাতেই যথাযথ নাম নাই, প্রত্যেকটি বেনামে লেখা—একমাত্র সম্পাদক যোগানন্দ দাসের কোনও লেখা থাকিলে তাহার লেখককে চিনি, বাকি সব অজ্ঞাত লেখক। কিন্তু হইলে কি হয়! মনে হইল সবই যেন আমার লেখা, আমি লিখিলেও ঠিক এমনই লিখিতাম। একটা অদ্ভুত আত্মীয়তা-রস অন্তরে সঞ্চারিত হইল, অকারণ পুলকে মন ভরিয়া গেল। প্রথমেই "মুখবন্ধে" পড়িলাম:

"আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। এমন কি উদ্দেশ্যহীনতাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য যদি কখনো আপনা-আপনি ফুটেও ওঠে, তা হ'লে আশা যে, তা আপনা-আপনি ঝরেও পড়বে। আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমাদের স্বভাবই আমাদের কখনো উদ্দেশ্যযুক্ত ও কখনো উদ্দেশ্যহীন করে' চালাবে। উদ্দেশ্যের বা উদ্দেশ্য-হীনতার খাতিরে আমরা নিজেদের বিসর্জ্জন দেব না। নিজেদের স্বভাব, জীবন ও আগ্রহের ক্রমবিকাশের পথ ধরে' চলতে চলতে আমাদের যা ভাল মনে হবে আমরা তারই অনুসরণ করব—কোন নির্দ্দিষ্ট 'পলিসি'র অনুসরণ করতে গিয়ে জীবন, স্বভাব ও চিরপরিবর্তনশীল হৃদয়াকাঙ্ক্ষাগুলিকে আড়ষ্ট ও প্রাণহীন করে' ফেলব না। এই যে আমাদের উদ্দেশ্য,—জগতে স্বাধীনতার প্রয়াস, এর ছায়া আমাদের সব কাজের উপর পড়বে।

"...ধর্ম্ম-জগতে আমরা কোন-কিছুকে সাধারণতঃ

অভ্রান্ত, চিরসত্য অথবা শেষ বলে' স্বীকার করব না। ...ভৌগোলিক ক্ষেত্রে যেমন দূর দেশকে মান্‌ব না—সময়ের ক্ষেত্রে তেমনি অতীতকে মান্‌ব না। দূর বা অতীত আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে আমাদের মধ্যে স্থান পেতে পারে, কিন্তু সে আমাদের মন জুগিয়ে—জোর করে' নয়।

"...অনেক রকম গোলমালই আমরা বাধাব, কিন্তু অলমতি বিস্তরেণ।"

বলা বাহুল্য, ইহা 'শনিবারের চিঠি'র ভগীরথ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের রচিত সিদ্ধান্ত। তিনি আজ পর্যন্ত ইহাতে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহার মূল সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় হয় নাই, অপরে ক্রোধে বা উত্তেজনার বশে উদ্দেশ্যমূলক হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তিনি বরাবর বৈদান্তিক নিষ্কাম নির্লিপ্ততা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন।

আর পলায়নী নিষ্ক্রিয় মনোবৃত্তি বরাবর বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন আদি সম্পাদক যোগানন্দ দাস। 'শনিবারের চিঠি'র প্রবর্তক-দলে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রচনাকুশলী, যেমন তাঁহার তীক্ষ্ণ ধী, তেমন তাঁহার বক্রোক্তি জ্ঞান, ছন্দজ্ঞান নিখুঁত। কিন্তু কোন কিছুকে আগ্রহ ও নিষ্ঠাসহকারে ধারণ করিবার শিবশক্তি তাঁহাতে ছিল না, যখনই বুঝিতেন তিনি কাজে লাগিতেছেন তখনই তিনি পলায়ন করিতেন। প্রতিভার এত বড় ব্যর্থতা আমার জীবনে আর দেখি নাই। প্রথম সংখ্যাতেই "প্রকাশ রায়" এই বেনামীতে যোগানন্দ দাসের "জীবন-দর্শন" প্রকাশিত হইয়াছিল। নীচের তের লাইনে তিনি যে আত্ম-কাহিনী সেদিন লিখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়—

"শুধু 'বেঁচে থাকার নাম কি জীবন?'—না।

"আমি যে বেঁচে থাকতে আরম্ভ করেছিলাম তার কৃতিত্বটা আমার ছিল না। সেখানে আমার বাবা-মার দায়িত্ব। তার পর তাঁদের লালনে আর তাড়নে পাঁচ-আর-দশে পনেরো বছর বেঁচেছি (শাস্ত্রমতে)। তার পর প্রাইভেট টিউটর, তার পর শ্বশুর-মশাই ও তাঁর সুপারিশে-পাওয়া চাক্‌রীর বড়-কর্ত্তারা আমাকে 'বাঁচিয়ে' রেখেছেন। বুড়ো বয়সে আমার দেড় গণ্ডা ছেলের শ্বশুরদের টাকা আমাকে বাঁচিয়েছে। আমার স্ত্রীরাও আমায় কম বাঁচায় নি। সত্যিই আমি বেঁচে গেলাম। জন্ম থেকে আরম্ভ করে' মৃত্যু পর্য্যন্ত আমি বেঁচেই চলেছি।

"কিন্তু এর মধ্যে জীবন কই? কোথাও নেই। কেন না, কোনদিনই তাকে জন্ম দিই নি। আমার বাবা ও মা আমারই জনক-জননী, আমার জীবনের ন'ন। তার একমাত্র জন্মদাতা আমি নিজে।"

নিজেকে ব্রহ্মচারী বানাইয়া যোগানন্দ দাস সে দিক দিয়াও "বাঁচিয়া" গিয়াছেন!

"মৌলা দোপেঁয়াজি" বেনামে হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "বিজ্ঞাপনী-সাহিত্যে" সেইদিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। উদ্দেশ্য বা দর্শনের বালাই তাঁহার ছিল না, তিনি ছিলেন নিছক হিউমারিষ্ট, নামকরা সার্কাস দলের অতি সক্ষম ক্লাউন, ঝালে ঝোলে অম্বলে সবেতেই আছেন কিন্তু কিছুতেই স্পেশিয়ালিষ্ট নন। "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে"র বিজ্ঞাপনকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি সেদিন লিখিয়াছিলেন:

"গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

"আবার গর্জ্জিয়া উঠিল, সারা বাংলা দেশ কেরামতী-সাহিত্য-মন্দিরের কামান-গর্জ্জনে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ দেখুন, পিল্ পিল্ করিয়া আবাল-বৃদ্ধবনিতা বাংলার সকল নরনারী কামান-গর্জ্জনে সচকিত হইয়া কেরামতী-সাহিত্য-মন্দিরের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে! কিন্তু এ কামান মানুষ মারিবার জন্য নহে—বিলাতী হিংস্র স্রাপ্‌নেল্ নহে, ইহা তাপিত হৃদয়ে শান্তি বারি বরিষণকারী জলদ-গোলা। বেদ-বিশারদ মহাপণ্ডিত প্যালারাম কাব্যতীর্থের 'চক্ষুবিক্রমণিকা' এই কামান!! ছেলে-মেয়ে কিম্বা যুবাবৃদ্ধকে উপহার দিবার এমন উপদেশ-পূর্ণ বই আর নাই। প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'কবুতরে'র সম্পাদক এই পুস্তক পাঠে বলেন, 'এই বইয়ের মধ্যে যুবক-যুবতীর চপল হাস্য-পরিহাস নাই, ঘটনা-বৈচিত্র্যের ম্যাজেন্টা রং নাই, বিরহী-বিরহিণীর চোখের জল নাই।'..."

বস্তুত, 'শনিবারের চিঠি' গোড়া হইতে কিছু কাল পর্যন্ত শিশুব্যবহার্য খর্বায়তন ত্রিচক্রযানই ছিল; আশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এই তিন চাকায় উচ্চাবচ অনেকেই ঠেলা মারিয়াছেন কিন্তু ভূমিস্পর্শ করিয়া ইঁহারা তিন জনই মাত্র ছিলেন।

আমি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলাম শেষ পৃষ্ঠার ইস্তাহার দৃষ্টে—

"লেখা চাই না। টাকা ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা..."

"লেখা চাই না" এমন দম্ভোক্তি ইতিপূর্ব্বে আর শুনি নাই। নিজে লিখিয়া থাকি, লেখা প্রকাশের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে তথাপি কথাটা ভাল লাগিল। আজ বলিতে বাধা নাই, 'শনিবারের চিঠি' যদি কোনও মন্ত্রবলে আজও পর্যন্ত টিকিয়া থাকে তাহা এই মন্ত্র—"লেখা চাই না।" আমাদের বলিবার কথা আছে, আমরা নিজেরা লিখিয়া অন্যকে শুনাইব, অন্যের কথা অন্যকে শুনাইবার জন্য আমাদের কাগজ নয়। আজকালক'র ছেলেরা নূতন পত্রিকাপ্রকাশে মনস্থ করিয়া যখন লেখার জন্য আমাদের দ্বারস্থ হয়, তখন তাহাদিগকে এই মন্ত্রটি শিখাইবার চেষ্টা করি। যাহারা শোনে তাহারা বাঁচে, যাহারা শোনে না তাহারা হীন উঞ্ছবৃত্তি করিতে করিতে শোচনীয় ভাবে মৃত্যু বরণ করে। শিশু-মৃত্যুর আবর্জনায় বাংলার সাময়িক-পত্রের প্রাঙ্গণ রুদ্ধ হইয়া আছে। সম্পাদক বা পরিচালকদের পরমুখাপেক্ষিতাই ইহাই কারণ। 'শনিবারের চিঠি'ই এ যুগে স্বাবলম্বিতার পথ দেখাইয়াছিল।

যাহা হউক, প্রথম সংখ্যাতেই তিন প্রধানের পরিচয় পাইলাম, দুইজনকে একেবারে না চিনিয়াই। ইহারা দীর্ঘকাল আমার সহযোগী ছিলেন এবং এখনও বন্ধু আছেন। পরে ইঁহাদের মুখে 'শনিবারের চিঠি'র সূত্রপাতের ইতিহাস যেরূপ শুনিয়াছিলাম ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে 'শনিবারের চিঠি'তেই ("নিবেদন"—পৌষ, ১৩৩৯) তাহা এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম :

"১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসের এক ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যায় উত্তর কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্বদক্ষিণ সীমান্তের এক বেঞ্চির উপর বসিয়া ভাজা চিনাবাদামের খোসা ছাড়াইয়া খাইতে খাইতে যাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে কল্পনারূপী 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম আবির্ভাব ঘটে··· কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি তখন সদ্য দেশে ফিরিয়াছেন। নূতন কিছু, অদ্ভুত কিছু করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল। বঙ্গদেশের সাহিত্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করিয়া শনিবারে শনিবারে একখানি চটি সাপ্তাহিক বাহির করিবার প্রস্তাব তিনিই করেন। 'শনিবারের চিঠি'র ইতিহাসে ইহার স্থান সর্ব্বপ্রথম ; ইহার নাম শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়।

"কল্পনাব্যাপারে ইঁহার সঙ্গী দুইজনও পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না—শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস সম্পাদক ও মুদাকর হইবেন স্থির হইয়া গেল ; শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় হইলেন কর্ম্মাধ্যক্ষ। বর্ষারজনীর অন্ধকার আকাশের তলে গ্যাসালোকিত হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে 'শনিবারের চিঠি' নাটকের 'প্রস্তাবনা'-পাঠ হইয়া গেল।

"১০ই শ্রাবণ প্রথম যবনিকা উঠিলে দেখা গেল এই ত্রয়ীর সঙ্গে আরও দুইজন আসিয়া জুটিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত প্রভাকর দাস। ইহার পর আরও অনেক জুটিয়াছেন এবং এমন সকল ব্যক্তি জুটিয়াছেন যাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইলে বাঙালী পাঠক বিস্মিত হইবেন কিন্তু তবু এই পঞ্চরত্নই প্রথম।

"শনিবারের চিঠি'র ভঙ্গী আমার ভাল লাগিয়াছিল—ইহাতে লিখিবার জন্য আমি উৎসুক হইলাম। সম্পাদক শ্রীযোগানন্দ দাসের সহিত মৌখিক পরিচয় ছিল, তাঁহার নিকট ঘুষ কবুল করিয়াও কৃতকার্য্য হইলাম না।"

ইহা মোটেই অত্যুক্তি নয়। যোগানন্দ দাসকে আমি সত্যসত্যই সেই নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে একটি লেখা ছাপাইবার জন্য দশ টাকা পর্যন্ত দিতে চাহিলাম। তিনি তাঁহার সেই স্ফীতনীয় হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িলেন। বুঝিলাম সহজ পথে কাজ হইবে না। কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম সংখ্যাতেই কাজী নজরুল ইসলামকে ব্যঙ্গ করিয়া "গাজী আব্বাস বিটকেল" এই নামে দুইটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল ; আমিও স্বাধীনভাবে "বিদ্রোহী"র কবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলাম। মনে মনে আঁচিয়া রাখিলাম এই বিটকেলী-পথই 'শনিবারের চিঠি'র সহিত আমার সংযোগের পথ।

এক সংখ্যা, দুই সংখ্যা, তিন সংখ্যা—পর পর পাঁচ সপ্তাহে পাঁচটি সংখ্যা বাহির হইল ; এক আনা হিসাবে পাঁচ আনা ব্যয় করিয়া সব কয়টিই স-খাম সংগ্রহ করিলাম এবং আয়ত্তও করিলাম ; ঢং-ঢাং ধরন-ধারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মজাই যেখানে মোদ্দা উদ্দেশ্য সেখানে বুঝিবার হাঙ্গামা নাই। মজাতে আমারও আসক্তি। মেসে নোটিশ পড়িয়াছে, তহবিল শূন্য, ডাইং ক্লীনিং হইতে কাপড়জামা ছাড়াইয়া আনিবারও সঙ্গতি নাই। জীবনদা একদিন

শুভ প্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন, চল, একটা মতলব ঠাউরাইয়াছি। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অনুগমন করিলাম। গলি পার হইয়াই সার্কুলার রোড, সার্কুলার রোড কোণাকুণি পার হইয়া রামমোহন রায় রোড, আট নম্বর বাড়ি। ভালই জানা ছিল—'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি।

তখন বেলা নয়টা বাজিয়াছে। দেউড়িতে দারোয়ান ছিল। জীবনদা অগ্রসর হইয়া ক্ষুতু-বাবুকে খবর দিতে বলিলেন। ক্ষুতুই যে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ডাকনাম তাহা তখনও জানা ছিল না। কিছুক্ষণ সঙ্কীর্ণ বারান্দায় অপেক্ষা করিবার পর রাত্রিবাসপরিহিত একজন সুশ্রী সবলকায় যুবকের দর্শন মিলিল। আমার সহিত মুখোমুখি হইবার পূর্বে জীবনদা তাঁহাকে সম্ভবত আমার পরিচয় ও আর্জি পেশ করিলেন। তারিখটা যত দূর মনে পড়ে, ৯ই ভাদ্র—আমার জন্মদিন। আমি একপাশে দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিলাম—হঠাৎ দক্ষিণ বাহুমূলে একটা রূঢ় আঘাত খাইয়া চমকাইয়া উঠিলাম। চিত্র বিচিত্র গাত্রবাস, সহসা মনে হইল রয়াল বেঙ্গল টাইগারের থাবা। ব্যাঘ্র মহারাজ বলিলেন, শরীরটা তো ভাল, শুনলাম কবিতা লেখেন, পাঞ্জা লড়তে পারেন কি? জীবনদা বলিবার পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম, ইনিই 'শনিবারের চিঠি'র ব্রহ্মা—অশোক চট্টোপাধ্যায়। এক মুহূর্তের দ্বিধা, সঙ্গে সঙ্গেই বলিলাম, পারি বইকি! বারান্দায় দাঁড়াইয়াই নিঃশব্দে পাঞ্জা লড়া হইল—জীবনদা কুতূহলী দর্শক। ডান হাতের লড়াইয়ে আমি হারিলাম, বাম হাতের যুদ্ধে অশোক চট্টোপাধ্যায়। উভয়েই ঘর্মাক্ত; অশোক চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, এর ওপরে আপনার কবিতা যদি ভাল হয় তাহলে আপনার ছবিশুদ্ধ 'প্রবাসী'তে ছাপিয়ে দেব। বলিবার অধিকার তাঁহার ছিল, তিনি তখন 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ'-এর সর্বময় কর্তা। বলিলেন, স্বাস্থ্যের সঙ্গে কবিতা এদেশে বেমানান। দেখা যাক, আজ সন্ধ্যায় 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় হাজির হবেন—'প্রবাসী' আপিসের দোতলায়। সঙ্গে লেখা নিয়ে যাবেন 'শনিবারের চিঠি'র জন্যে। আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলে জীবনদাকে আরও কিছু বলিলেন, অনুমানে বুঝিলাম আমার চাকুরি সংক্রান্ত। জীবনদা আমাকে বিশেষ কিছু বলিলেন না, শুধু নির্দেশ দিলেন সন্ধ্যার আড্ডায় "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ" যেন নিশ্চয়ই লইয়া যাই।

কিন্তু জীবনদার আমার উপর যত বিশ্বাসই থাকুক, আমি ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইব স্থির করিলাম। প্রথম চার সংখ্যায় কবিবর গাজী আব্বাস বিটকেলকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়া সম্ভবত বাড়াবাড়ির ভয়ে তাঁহাকে আসর হইতে সরাইবার জন্য 'শনিবারের চিঠি'র কর্তৃপক্ষ চতুর্থ সংখ্যার শেষে তাঁহাকে মহরমের গোঁয়ারায় অগ্নিদগ্ধ করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদেরই ধারা ধরিয়া একটি কবিতায় তাঁহাকে আবার "আবাহন" করিলাম। নাম লইলাম "ভাবকুমার প্রধান"। "প্রকাশের বেদনা," "ছাদবিহার" ও "কামস্কাটকীয় ছন্দে"র সঙ্গে সেটি লইয়া অতীব ভয় ও সঙ্কোচের সহিত ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডের দ্বিতলের একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে—'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় প্রবেশ করিলাম। ঘরটির মাঝখানে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তাহার কেন্দ্রস্থলে অশোক চট্টোপাধ্যায়, আশেপাশে—চেয়ারে টুলে বেতের সোফায় জানালার ধারিতে আট দশজন আড্ডাধারী বসিয়া, একসঙ্গে শিককাবাব-পরেটা ও সিগারেট চলিতেছে এবং কেহ কেহ 'শনিবারের চিঠি' খামে ভরিতেছেন। যোগানন্দ দাস এই দলে ছিলেন। আমিও আহূত হইলাম। খাওয়া-পর্ব চুকিলে আপনা হইতেই অনুভূত হইল খামে পত্রিকা ভরাটা একটা কম্পিটিশনের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা মজার খেলা যেন। ঘড়ি ধরিয়া দেখা গেল, ডাক্তার শরদিন্দু ঘোষাল ফার্ষ্ট হইলেন। পকেটে লেখাগুলি খোঁচাইতেছিল, আমি সুবিধা করিতে পারিলাম না। শেষে এক ফাঁকে মরীয়া হইয়া ভাঁজকরা লেখাগুলি অশোক চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে ডান পাশের দেরাজ খুলিয়া সেগুলি তাহার গহ্বরে প্রায় নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন গর্তে পড়ার আঘাত পাইলাম। আজ ঝুনা সম্পাদক হইয়া বুঝিতে পারি, এই আঘাত লেখক মাত্রকেই অনিবার্য ভাবে পাইতে হয়। বিচারকদের পক্ষে লেখকের মর্জিমত লেখা পড়িয়া দেখা কদাচিৎ সম্ভব হয়, ইহাকে সম্ভব করিতে হইলে সম্পাদক বা নির্বাচককে যতটা সদয় ও সহৃদয় হইতে হয় বর্তমান যুগে তাহা একান্ত দুর্লভ।

পরদিন যথাসময়ে হাজিরা দিবার জন্য হুকুম হইল, আমি রায়ের প্রতীক্ষায় মামলার আসামীর ব্যাকুলতা ও অস্বস্তি লইয়া কোন-প্রকারে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইয়া আপিসে বা আড্ডায় দর্শন দিলাম। নির্মম অশোক চট্টোপাধ্যায় যেন আবহাওয়া সংবাদ দিতেছেন এইরূপ উদাসীন ভাবে একবার মাত্র বলিলেন, আপনার লেখা মনোনীত হয়েছে। হ্যাঁ, আপনি প্রুফ দেখতে জানেন? বলিলাম, একটু একটু। ষষ্ঠ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ রূপে প্রকাশিত "খাঁটি" নামক একটি রচনার প্রুফ আমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায় চলিয়া গেলেন। আমি সর্বাগ্রে লেখকের নাম দেখিলাম—"বিনামা", কিন্তু পড়িতে পড়িতে লেখার ঢং ও বানানের কায়দা দেখিয়া অবিলম্বে বুঝিতে পারিলাম আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের লেখা। 'প্রবাসী'র নিয়মিত পাঠক আমি, তাঁহার ভঙ্গি আমার অপরিচিত ছিল না, বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রুফটি দেখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় খালি গায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি সপরিবারে তখন 'প্রবাসী' আপিসেরই একাংশে বসবাস করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ দাস আসিলেন এবং একটি ছোটখাট দলসহ অশোক চট্টোপাধ্যায়ও পুনরাভির্ভূত হইলেন। আসর জাঁকিয়া উঠিল। আমি বোকার মত অশোকবাবুকে বলিলাম, এ যে দেখছি যোগেশচন্দ্র রায়ের লেখা! অশোকে-যোগানন্দে-হেমন্তে চোখে-চোখে কথা হইয়া গেল, বুঝিলাম তাঁহারা আমার সাহিত্য-বুদ্ধির তারিফ করিলেন। প্রুফ কেমন দেখি সে পরীক্ষা লইলেন হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, দুই-চারিটা ভুল নিশ্চয়ই আমার অপটু দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তেমন মারাত্মক কিছু নয়। সেই রাত্রে সভাভঙ্গের পূর্বে আমি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে, 'প্রবাসী'র নয়, 'শনিবারের চিঠি'র নয়—অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী নিযুক্ত হইলাম; পুলিনবিহারী দাসের 'লাঠিখেলা ও অসি-শিক্ষা' পুস্তক মুদ্রণের ভার আমার উপর পড়িল। ভাষা সংশোধন করা, প্রুফ দেখা এবং প্রেস-ম্যানেজার অবিনাশচন্দ্র সরকারকে নিয়মিত তাগাদা দিয়া দ্রুত কার্যোদ্ধার করা—ইহাই হইল আমার বৈতনিক কাজ। অবৈতনিক কাজই বেশি, 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা, খামে চিঠি ভরা এবং প্রয়োজন হইলে প্রুফ দেখা। চারিটি লেখা আগাম দেওয়া ছিল, সুতরাং লেখার কাজ আপাতত নয়।

নিয়মিত আড্ডায় উপস্থিত হওয়ার অর্থই হইল ঝামাপুকুরের পঁচিশ টাকা বেতনের টিউশনিটি খোওয়া যাওয়া। গেলও। আবার সেই হরেদরে পঁচিশ। সুতরাং বিদায় সাতাশ নম্বর বাদুড় বাগান লেনের মেস, বিদায় মোহিতলাল প্রমুখ সাহিত্যগোষ্ঠী, বিদায় স্নেহপ্রবণ বঙ্কিমচন্দ্র রায়। কিন্তু যাই কোথায়? অগতির গতি জীবনময় রায় ছিলেন, তিনি আমাকে একরকম হাত ধরিয়াই ১০ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে লইয়া গেলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সদ্য-স্থাপিত বিশ্বভারতীর আপিস ও গ্রন্থালয়। চারতলার একটি অব্যবহৃত ক্ষুদ্র শৌচ-প্রকোষ্ঠে আমার স্থান হইল। আসবাবের মধ্যে সামান্য বিছানাপত্র, তাহা সেই খুপরিতে ফেলিয়া রাখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে সস্তা আহার্যের সন্ধান পাইয়াছিলাম, দৈনিক আহার্যের ব্যয় পাঁচ আনার বেশি লাগিত না। বাকিটা চায়ের দোকানে ব্যয় করিতাম।

বিশ্বভারতীর স্থানীয় কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সাঁতরা তখন নিদারুণ ফুস্‌ফুসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দশ নম্বরেই শয্যাশায়ী ছিলেন, বিশ্বভারতীর কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তাঁহার অনুমতি প্রয়োজন। জীবনদা পরদিন আমাকে লইয়া তাঁহার কাছে হাজির করিলেন। প্রশান্তবাবু বৈজ্ঞানিক লোক, যুক্তিবাদী —অকারণে কোনও কিছু করা বা হওয়াটা তাঁহার পছন্দ নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখার বিনিময়ে আমি সেখানে বাসের অধিকার পাইব ইহাই সাব্যস্ত হইল।

জীবনদা তখন ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে মাষ্টারির সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজী-হোমিওপ্যাথী-বায়োকেমিক-টোট্‌কা চিকিৎসায় হাত পাকাইতেছিলেন। হোমিওপ্যাথী-বায়োকেমিকে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শিষ্য, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পুস্তকও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। কিশোরীমোহন সাঁতরাকে তখন প্রসিদ্ধ অ্যালোপ্যাথী চিকিৎসকেরা জবাব দিয়াছিলেন। জীবনময় তাঁহাকে ব্রেক লাউয়ের রস খাওয়াইয়া সঞ্জীবিত করিবার শেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। পালা করিয়া রোগীর সেবা চলিতেছিল,

আমিও আসিয়া জুটিলাম। জীবনদা ছিলেন, যোগানন্দ দাস, যতীশচন্দ্র সেন নিয়মিত আসিতেন, আর আসিতেন হাবল সান্যাল নামে খ্যাত হিরণকুমার সান্যাল ও প্রভাস ঘোষ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক) ও শরদিন্দু ঘোষাল (পাটনার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক) এবং সুশান্তকুমার ঘোষাল (ট্রপিকাল স্কুল)। ইঁহাদের সকলের সহিত পরিচয় আমার জীবনকে নানা ভাবে সম্পন্ন করিয়াছে। একদিন রবীন্দ্রনাথ কিশোরীমোহনকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন, এখন-তখন অবস্থা। গুরু-শিষ্যের সেই মর্মান্তিক মিলন আমরা দেখিলাম, কিন্তু জীবনদার লাউ-রস অঘটন ঘট ইল। সাঁতরা মহাশয় সুস্থ সবল কর্মক্ষম হইয়া আবার বিশ্বভারতীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; অনেক বৎসর পরে অন্য ব্যাধিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

বিশ্বভারতী আপিসে আশ্রয় পাইয়া আমি নানা ভাবে উপকৃত হইলাম, আমার অব্যবস্থিত জীবন একটা বাঁধা রুটিনের খাতে পড়িল। দ্বিপ্রহরে 'লাঠিখেলা ও অসি-শিক্ষা'র ধকল সামলাইয়া সন্ধ্যায় আড্ডা ও আহারের ফাঁকে ফাঁকে 'শনিবারের চিঠি'র কাজ অবসর বিনোদন মাত্র ছিল। ১০ নং কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে রাত্রি নয়টা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কপি মিলাইয়া রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখিতাম। এখানেই ১২৯২ সালের 'বালক' হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ মিলাইয়া বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'রাজর্ষি' (জানুয়ারি, ১৯২৫) প্রকাশ করি। জীবনময় রায়ের সহযোগে ইহাই আমার সর্বপ্রথম পুস্তক-সম্পাদন। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথের সহিত এখানেই ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হয়।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র সপ্তম সংখ্যায় (ভাদ্র ২১, ১৩৩১) হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় লিখিত "সংবাদ-সাহিত্যে" একটি সংশোধন সাময়িক-পত্রে ছাপার অক্ষরে আমার প্রথম সাহিত্যিক "অবদান"। অষ্টম সংখ্যা (২৮ ভাদ্র) হইতে আমি রীতিমত লেখক। আমার প্রথম মুদ্রিত কবিতা "আবাহন" ইহাতেই প্রকাশিত হয়। আমার জীবনে কবিতাটির ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে বলিয়া কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"ওরে ভাই গাজিরে
কোথা তুই আজিরে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা!
কোথা গিয়ে নিরিবিলি
ঝোপে-ঝাপে ডুব দিলি
তুই যে রে কাব্যের গগনের সবিতা!...
দাবানল-বীণা আর
জহরের বাঁশীতে
শান্ত এদেশে ঝড় একলাই তুললি,
পুষ্পক দোলা দিয়া
মজালি যে কত হিয়া
ব্যথার দানেতে কত হৃদি-দ্বার খুললি..."

কিন্তু অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পোষ্ট-পাঞ্জা প্রতিশ্রুতি আমি ভুলি নাই। শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী তখন 'প্রবাসী'র রচনা-নির্বাচন-ভারপ্রাপ্তা। তাঁহার দরবারেও তিনটি গুরুগম্ভীর কবিতা প্রেরণ করিলাম। তিনি সেগুলি যথাসময়ে মনোনীত করিয়া সম্পাদকীয় বিভাগে পাঠাইলেন। সম্পাদকীয় বিভাগে তখন প্রধান হইতেছেন অশ্বিনীকুমার ঘোষ—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও প্রভাত সান্যাল তাঁহার সহযোগী। নির্বাচন-কর্ত্রীর কৃপালাভ করিলেও সম্পাদকীয় দলে কিছুতেই আমল পাইতেছিলাম না। ভাদ্র মাসেই কবিতা মনোনীত হইয়াছিল, কিন্তু ভাদ্র আশ্বিন দুই মাস চলিয়া গেল, লেখা আর প্রকাশ হয় না। ইতিমধ্যে একাদশ বা শারদীয় সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে (১৮ই আশ্বিন) আমার "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ" প্রকাশিত হইয়া বাংলা-সাহিত্য-সংসারে যথেষ্ট সোরগোল তুলিল; এই কবিতাই আমাকে প্রতিষ্ঠার পথে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিল, আমার আশ্রয়-কোটর শুধু রচিত হইল না, 'শনিবারের চিঠি'ও নবজন্ম পরিগ্রহ করিল। 'কল্লোল' পত্রিকা মারফৎ কাজী নজরুল ইসলামের সহিত সংঘর্ষ ঘটিল, মোহিতলাল আসিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র পলিটিক্সের ক্ষেত্র সাহিত্য অধিকার করিল। পরবর্তী প্রবাহে সেখান হইতেই কাহিনী আরম্ভ করিব।

প্রথম প্রবাহ সমাপ্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আটাশি

'ছেলেরা মেলায় যাবার বায়না ধরেছে', হেনরিয়েটা কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে ঘরে ঢুকে, 'কিন্তু হাতে মোটে আমার তিন ফ্রাঙ্ক—'

তখনকার হিসেবে দেড় টাকার কাছাকাছি।

মধুসূদন তাকাল একবার শূন্য চোখে। বললে, 'শুধু আজকের দিনটা অপেক্ষা করো।'

'কত দিন-রাতই তো গেল এমনি অপেক্ষা করে-করে। তুমি কি মনে করো তোমার দেশের লোক কেউ তোমাকে সাহায্য করবে?'

সে আশা ছেড়েছে মধুসূদন। সাহায্য দূরের কথা, পাওনা টাকাই পাঠাচ্ছে না সরিকেরা। এদিক-সেদিক করে চার হাজার টাকা পাওনা। একটি কপর্দকেরও দেখা নেই।

সরিক তো নয় কালসাপ। তাদের কথা ভাবছে না মধুসূদন। দেশে কত-কত মানী-গুণী। কত-কত টাকার আণ্ডিল। তাদের কথাও ভাবছে না। হেন লোক নেই যার সঙ্গে চেনাশোনা নেই মধুসূদনের। এক-এক করে মনে করতে লাগল মুখগুলো। একটা মুখও এমন নয় যে মন উন্মুখ হয়। বিত্তবান তো অনেক আছে, কিন্তু চিত্তবান কোথায়!

না, একজন বোধ হয় আছে।

একজন নয়, দুজন। একজন ঈশ্বর, আরেকজন ঠিক সেই ঈশ্বরের নিচেই।

তারই জন্যে অপেক্ষা করতে বলছে স্ত্রীকে।

এমনিতে অস্থিরমতি মধুসূদন, মুহূর্তের বশে কাজ করতে গিয়ে অনেক ভুল সে করেছে জীবনে, অনেক নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু এবার পরিত্রাতা খুঁজতে গিয়ে ভুল করেনি এতটুকু। এত দিনে একটি স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। অন্তত এই একবার।

'শুধু আজকের দিনটা—'

'কি আছে আজকে?'

'আজকে ডাক আসবার দিন। আজ ঠিক চিঠি আসবে। একটা শুভসংবাদ এসে যাবে কিছু।'

'যদি না আসে?'

'যদি না আসে!' চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগল মধুসূদন: 'তাহলে আমি সটান জেলখানায়, আর তোমরা, তুমি আর ছেলেমেয়েরা, কোনো একটা অনাথ-আশ্রমে।'

জামার হাতায় চোখ মুছল হেনরিয়েটা।

'কিন্তু, কান্নাটা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী নাও হতে পারে। কেননা টাকার জন্যে যাকে এবার লিখেছি—'

'কে সে?'

'সমস্ত বাংলা দেশে সে শুধু একজনই। আর্য ঋষির মত জ্ঞানী, ইংরেজের মত কর্মোৎসাহী আর বাঙালি মায়ের মত কোমলহৃদয়! এখানেও যদি না হয়! না, না, হতেই হবে, নিজে বিপন্ন হয়েও আসবে বিপদুদ্ধারে। আমি নদী-নালার কাছে যাইনি, গিয়েছি সমুদ্রের কাছে।

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

ঐ এলো বুঝি সেই সমুদ্রের মুক্ত হাওয়া! বাধাহীন স্বাধীনতার শুভ্রতা।

আদালতের বেলিফ। দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখল হেনরিয়েটা। ক্ষিপ্র হাতে ফের বন্ধ করে দিল। ক্রোক করবার মত আর নেই কোনো মালামাল। এবার হাতে-হাতে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। আবার নড়ে উঠল কড়া।

'কে?'

'চিঠি।'

উল্লাসে লাফিয়ে উঠল মধুসূদন। 'বলিনি, চিঠি আসবে দেশ থেকে?' ত্বরিত হাতে খুলে ফেলল দরজা। 'কোথাকার চিঠি?'

তোমাকে বলিনি। সাগরের মত প্রাণ।

বাঙালি মায়ের মত হৃদয়! আশ্চর্য, এমন আকাঙ্ক্ষাও ফলে মানুষের জীবনে! এই দেখ। পনেরো শ টাকার ড্রাফট পাঠিয়েছে বিদ্যাসাগর।

শুধু কি সেই একবার? আরো বহুবার টাকা পাঠালেন। জড়িয়ে পড়লেন ঋণজালে। শেষ পর্যন্ত ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়ে ছাড়লেন।

সেই মাইকেল দেশে ফিরছে এত দিনে। বিদ্যাসাগর তার জন্যে পছন্দসই বাড়ি ভাড়া করে রেখেছেন। বিলেত-ফেরতের মত উপযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন জিনিসে-আসবাবে। কিন্তু সে-বাড়িতে উঠল না মাইকেল। গেল স্পেন্স হোটেলে।

অবজ্ঞা দেখে অভিমান করলেন না বিদ্যাসাগর। নিজে থেকে আনতে গেলেন ডেকে।

এক কথায় ফিরিয়ে দিল মাইকেল। ঐ নেটিভ পাড়ায় ঐ নোংরা পরিবেশের মধ্যে সে থাকবে! বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে আসা ব্যর্থ করে দেবে এমন করে!

বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন বিদ্যাসাগর। শূন্য সাজানো বাড়ির দিকে তাকালেন শূন্য চোখে।

তবু কি সেই বাঙালি মায়ের হৃদয় শুষ্ক হয় কখনো? কত বাধা-বিপদ ফিরতে লাগল পদে-পদে —এমন কি, হাইকোর্টেই ঢুকতে পাচ্ছে না মাইকেল। চিরযোদ্ধা বিদ্যাসাগরের ডাক পড়ল। গাঁয়ের নামে যাঁর নাম—আর কে আছে অমন বীরসিংহ! হটিয়ে দিলেন সব বাধা-নিষেধ, ঢুকিয়ে দিলেন হাইকোর্টে।

কর্মে ঢুঢ়ু, শুধু মুখেই কৃতজ্ঞতা। শুধু চলচ্চিত্তের চলচিত্র। স্থিরদ্যুতি লক্ষ্য নয়, ধাবিত স্খলিত উল্কাপিণ্ড।

টাকার কথাটা একবার মনে করিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। টাকা? কত চাই? দুই-দশ-কুড়ি হাজার টাকা এই এসে পড়ছে হাতের মুঠোয়। মধুসূদনের জন্যে কত ধার হয়েছে বিদ্যাসাগরের?

মুখে শুধু বড়-বড় কথা। যত বহ্বাস্ফোট। হাতে টাকা এলে আর ধার শোধ নয়, নির্বিরোধ স্বেচ্ছাচার। ছন্দে যেমন অবন্ধন ব্যয়ে তেমনি উড়নচণ্ডী।

শুধু বিদ্যাসাগরেরই ঋণ বাড়ে। তাঁর সংস্কৃত প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি হয়ে যায়। তবু কি বাঙালি মায়ের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়, নীরস হয়?

বলো, এ কোন সাধনায় সিদ্ধ বিদ্যাসাগর? রামকৃষ্ণ কি আর ভুল বলেন?

এই মধুসূদনই রামকৃষ্ণের কাছে কটি কথা চেয়েছিল। শাস্তির কথা, আশ্বাসের কথা। মা-কালী রামকৃষ্ণের মুখ চেপে ধরেছিলেন, ধর্মত্যাগীর সঙ্গে বলতে দেননি কথা।

কিন্তু কথার চেয়ে গান বড়। ধর্মের চেয়ে বড় ঈশ্বরকরুণা।

সেই করুণায় বিগলিত হল রামকৃষ্ণ। করুণার ধারা নেমে এল সুরস্রোতে। কথা বলতে দিচ্ছেন না, কিন্তু গান তো কথা নয়, গান গাইতে দোষ কি। আর এ গান তো অন্যের রচনা, রামপ্রসাদের রচনা। রামকৃষ্ণ গান ধরল। আর, মধুসূদনের কৃতজ্ঞতা নেমে এল অশ্রুবর্ষণে।

আমি অমিত্রাক্ষর লিখি, কিন্তু হে অক্ষর, তুমি তো অমিত্র নও।

'তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি প্রবঞ্চক।' গর্জন করে উঠলেন বিদ্যাসাগর: 'ভদ্রলোকের ছেলে বলে এসে আমার সঙ্গে এই চাতুরীটা করলে?'

সামান্য একজন পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর। ভয়ে-দুঃখে দাঁড়িয়ে আছে বিমূঢ় হয়ে। কী যে অপরাধ করেছে বুঝতে পারছে না।

অপরাধের মধ্যে টাকা ধার নিয়েছিল বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। বিপদে না পড়ে কি আর কেউ কর্জ করে! আর, সে কী নিদারুণ বিপদ। ছ মাসের জেলের হুকুম হয়েছে, চাকরিরও দফা রফা। এখন হাইকোর্টে মোশন করতে হবে। মনোমোহন ঘোষকে ব্যারিষ্টার দেবার ইচ্ছে, কিন্তু তার সাতশো টাকা ফি। বাড়িতে লেখা হয়েছে, এখনো এসে পৌঁছয়নি টাকা।

সুতরাং মুরুব্বি ধরে চলো বিদ্যাসাগর। অনুপায়ের উপায়, অশরণের আশ্রয়।

'কি করতে হবে তাই বলো না।'

মনোমোহন ঘোষকে আপনি শুধু একটা চিঠি লিখে দিন যেন বিনা ফি-তে কাজটি করে দেয়। হ্যাঁ, আজকেই দিন মামলার। হপ্তা খানেকের মধ্যেই টাকা এসে যাবে বাড়ি থেকে, তখন দিয়ে দেব ঘোষ-সাহেবকে—নির্ঘাৎ দিয়ে দেব।

'বাড়ি কোথায়?'

নাটোর। পুলিশে চাকরি করে, বিরুদ্ধ দল

মিথ্যেমিথ্যি ফাঁসিয়ে দিয়েছে। জেলটা রদ করাতে না পারলে একটা পরিবার ছারেখারে যাবে। শুধু যদি একটা সুপারিশ লিখে দেন—

চুপচাপ কতক্ষণ ভাবলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'এ কর্ম আমার দ্বারা হবে না। এক পা জেলে এক পা বাইরে এমন লোকের টাকা বাকি রেখে কাজ করতে বলা অবিচার করা। মামলায় যদি হার হয়? জেলের হুকুম যদি বহাল থাকে? না বাপু, অসম্ভব, এমনটি পারব না কিছুতেই।'

তবে আমি যাই কোথা? শুনেছি যার কেউ নেই তার বিদ্যেসাগর আছে। যার বিদ্যেসাগরও নেই সে যাবে কোন দুয়ারে?

কাগজ-কলম টেনে নিলেন বিদ্যাসাগর। ঘস-ঘস করে লিখতে লাগলেন, মাই ডিয়ার ঘোষ—

হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এ কর্ম হবে না আমার দ্বারা। অন্যায় অনুরোধ করি কি করে?'

দারোগা কেঁদে ফেললে। বললে, 'তা হলে আমি জেলেই যাব?'

একটা তীর যেন এসে বিদ্ধ করল বিদ্যাসাগরকে। চোখের কোণ ভিজে উঠল। জানা ছিল, তবু ব্যাঙ্কের খাতা খুলে আরেকবার দেখলেন এক পয়সাও মজুত নেই। তবু, আশ্চর্য, একটা চেক কাটলেন। সাত শো টাকার চেক। বললেন, 'এই চেক নিয়ে গিয়ে ঘোষকে দাও। আর বলো, কাল সাড়ে এগারোটার আগে যেন ব্যাঙ্কে না পাঠায়। যে করে হোক আজকের দিনের মধ্যে সাত শো টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেব।'

হাইকোর্টে খালাস পেয়েছে দারোগা। ধার শোধ করতে টাকা নিয়ে এসেছে। এক আধলা কম নয়, পুরো সাত শো টাকা। সাত দিনের মধ্যে ধার শোধ দেবার কথা ছিল, চার দিনের দিনই পৌঁছে দিয়েছে টাকা। সহাস্য মুখে প্রণাম করে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎ এ কী বিস্ফোরণ! তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি প্রবঞ্চক, তুমি অভদ্র—

'তা ছাড়া আবার কি।' বিদ্যাসাগর তেমনি গরজাতে লাগলেন: 'তুমি না বলেছিলে তুমি পুলিশে কাজ করো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

—'মিথ্যে কথা। একশো বার মিথ্যে।'

'সে কি কথা? আপনি খোঁজ নিন, খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। সামান্য চাকরি, মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

'মিথ্যে ছাড়া আর কী বলব!' একটু যেন প্রশমিত হয়েছেন বিদ্যাসাগর। কণ্ঠস্বরে নির্জলা ক্রোধের পরিবর্তে এসেছে যেন একটু অভিমানের ঝাজ: 'এত দিনে কত লোক 'দেব' বলে টাকা নিয়ে আর দিল না। অপারগের কথা ছেড়ে দিই, কত সম্পন্ন বড়লোকও টাকা ধার নিয়ে মেরে দিলে। বন্ধু বান্ধবের তো কথাই নেই। যে দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে দেশের লোক হয়ে, শুধু তাই নয় পুলিশের দারোগা হয়ে, পুরোপুরি ফিরিয়ে দেবে, এ বিশ্বাস করি কি করে? তা ছাড়া সাত দিনের কড়ার করে চতুর্থ দিনে ফেরৎ দেবে এ কল্পনার অতীত। তবে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলব না তো কি! তোমার খালাস পাওয়া উচিত হয়নি। সাত দিনের কড়ারে টাকা নিয়ে চার দিনের দিন যে শোধ দেয় সে পুলিশের দারোগাগিরি করে জেলে যাবে না তো কে যাবে!'

কাউকে চিঠি লিখতে বসেই প্রথমে লেখেন: 'শ্রীহরিঃ শরণম্'। বাজে বা বেফাঁস কথা লেখবার লোক নন বিদ্যাসাগর। কিন্তু সংসারে বাস্তবচক্ষে যদি কারু শরণ নিয়ে থাকেন, তবে সে বাপ-মা। পাকপাড়া রাজবাড়ির হডসন সাহেবকে দিয়ে দুখানা ছবি করিয়ে নিয়েছেন—তাদের সামনে দিনারম্ভের প্রথম প্রণামটি না রেখে জলস্পর্শ করেন না বিদ্যাসাগর। ওই তাঁর হর-গৌরী। তাঁর রাম-সীতা। তাঁর লক্ষ্মী-নারায়ণ।

'পাকপাড়া রাজবাড়িতে ভালো এক সাহেব পোটো এসেছে, মা', ভগবতী দেবীকে বললেন বিদ্যাসাগর, 'ইচ্ছে করছে তোমার একখানা ছবি আঁকিয়ে নি।'

'দূর, আমার ছবি কী হবে! ছি ছি!' ভগবতী দেবী মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

'ছবি তো তোমার জন্যে নয়, ছবি আমার জন্যে। যখন যেখানে থাকি, সকাল-সন্ধে থাকবে আমার চোখের সামনে। প্রাণটা যখন কেমন করে উঠবে তখন একবার দেখব চোখ ভরে।'

রামকৃষ্ণের সেই কথা। যাকে দেখতে এসেছিস, চোখ মেলে চোখ ভরে দ্যাখ মা'র মুখখানি।

ঈশ্বরের মুখের আভাস যদি কোথাও থাকে তবে এই মা'র মুখ।

'না বাপু, সাহেবের সামনে বসে ছবি আঁকাতে পারবো না।' ভগবতী দেবী আবার পাশ কাটাতে চাইলেন।

'না, মা, সে খুব ভালো লোক, আমাকে খুব ভালোবাসে, তার সামনে বসতে দোষ নেই।'

একটু বোধ হয় নরম হলেন ভগবতী। বললেন, 'তা সে এখানে আসবে তো?'

'না মা, তোমাকে পাকপাড়ার রাজবাড়িতে গিয়ে বসতে হবে। সেখানে সে আড্ডা করেছে। সে আড্ডা ভেঙে এখানে আসতে গেলে ছবি হয়তো ভালো হবে না—'

পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন ভগবতী। বললেন, 'তোর যা ইচ্ছে তাই কর। নিন্দে হলে লোকে তো আর আমাকে নিন্দে করবে না, তোরই নিন্দে করবে। বলবে বিদ্যাসাগর মাকে পাকপাড়া ছবি তুলতে নিয়ে গেছে।'

লোকের নিন্দাকে বিদ্যাসাগর যেন কত ভয় করে! আগে মাতৃবন্দনা করব তায় লোকনিন্দা!

সেই মা'র মৃত্যুতে দশ দিক শূন্য হয়ে গেল বিদ্যাসাগরের। বালকের মত কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। মৃত্যুর সময় কাছে থাকতে পাননি, সেবা করতে পাননি, দুটো কথা শুনতে পাননি, এ দুঃখ রাখবার জায়গা নেই। নির্জনে চলে গেলেন, ফিরতে লাগলেন দীনহীনের মত। পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই, বেশে বাসে পরিচ্ছন্নতা নেই। থাকেন একাহারে, স্বপাকে নিরামিষ খেয়ে। নিতান্ত অসুস্থ হয়ে না পড়লে সাহায্য নেন না দিনময়ীর। কঠিন মেঝের উপর শুয়ে ঘুমোন। আর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তদগত চিত্তে মা'র গুণাবলীর ধ্যান করেন।

এমনি এক বছর। একটানা এক বছর।

কত বছর তার পর চলে গেছে। এক দিন কি কথায়-কথায় এক বন্ধু হঠাৎ তাঁর মা'র গুণের কথার উল্লেখ করলেন। যেই শোনা, কাতর কান্নায় ফেটে পড়লেন বিদ্যাসাগর।

বন্ধু তো অপ্রস্তুত। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত পীড়িত, দেখা করতে এসেছিলেন। কথাচ্ছলে উঠে পড়েছিল ভগবতী দেবীর প্রসঙ্গ। কিন্তু ফল এমন হবে অনুমান করতে পারেননি। এ যে একেবারে শোকসমুদ্র!

'এত কষ্ট দেব জানলে ও-কথা পাড়তুম না।'

'কষ্ট? তুমি আমাকে কষ্ট দিলে কোথায়? তুমি তো আমার বন্ধুর মত কাজ করলে। তোমার জন্যে আমার মায়ের কথা মনে পড়ল, মায়ের নামে দু ফোঁটা চোখের জল ফেললাম। এত দুর্দশা, সব সময়ে বাপ-মাকে স্মরণ করতে পারি কই?'

এই বিদ্যাসাগর। সাগরের তুলনা সাগর। 'সাগরং সাগরোপমঃ'।

এই মাতৃসাধক কি সিদ্ধ নয়? নয় কি তপঃপরায়ণ ঋষি?

রামকৃষ্ণ কী করতেন? যত দিন চন্দ্রমণি জীবিত ছিলেন, রোজ সকালে গিয়ে প্রণাম করে আসতেন। বৃন্দাবনে থেকে যাবেন ভেবেছিলেন মায়ের কথা মনে পড়তেই বৃন্দাবন ভেসে গেল। তার পর মা যখন গত হলেন তখন রামকৃষ্ণের সে কী কান্না!

রামকৃষ্ণের মন্ত্রই তো মা! মুখেই হোক আর মনেই হোক মাকে যে ডাকে সে তো ভগবতীকেই ডাকে। বিদ্যাসাগরের মা-ও তাই ভগবতী!

উননব্বই

'ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না।' বিদ্যাসাগরকে বলছেন রামকৃষ্ণ: 'সব শাস্ত্র-দর্শন এঁটো হয়ে গেছে। তার মানে মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল এঁটো হয়নি। সে ব্রহ্ম। সে অনুচ্ছিষ্ট।'

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। 'বা, এটি তো বেশ কথা! এ কথা তো কোথাও শুনিনি! একটি নতুন কথা শিখলাম আজ।'

ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।

একেবারে মুখের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়েছেন। ঘনিষ্ঠ আস্বাদের মধ্যে। রসনার রসাশ্রয়ে। কিন্তু সাধ্য নেই দন্তস্ফুট করো। মুখ খুলেছ কি উড়ে পালিয়েছে!

বাক্যের ব্যর্থ অলঙ্কারে ভাবস্বরূপের বন্দনা চললেও বর্ণনা চলে না। ভূষণ দিয়ে কি রূপের উদ্ঘাটন হয়?

'কিন্তু যারা ব্রহ্মজ্ঞানী?'

'তারা নুনের পুতুল। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। কত গভীর জল তার খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে কার খবর দেবে?'

মানুষ তো খুব বাহাদুর, তাই মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। সেই সে পিঁপড়ের গল্প। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আরেক দানা মুখে করে বাসার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে এবার এক সময় এসে গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব।

ব্রহ্ম তো নির্লিপ্ত, কিন্তু ভগবানটি কে ?

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। একজনেরই দু রকম পোশাক। বাড়িতে থাকার মত সাদাসিধে চেহারার একজন, আরেকজন বাইরে বেরুবার মত একটু ফিটফাট সাজগোজ। একজন গুণাতীত, আরেকজন গুণময়। একজন ষড়্ভাবশূন্য, আরেকজন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ।

আপনার কাকে বেশি পছন্দ, ব্রহ্মকে না ভগবানকে ?

ব্রহ্ম যেন গতসর্ব্বস্ব দেউলে। যেন নিষ্কিঞ্চন পথের ভিখিরি। চাল নেই চুলো নেই, যেন গাছ-তলায় আশ্রয়। যে বাবুর ঘর নেই দ্বার নেই, বিনি পয়সায় যে বিকিয়ে গেল, সে বাবু আর কিসের বাবু? ভগবান ষড়ৈশ্বর্যে প্রকাশমান। কত তাঁর প্রতাপ কত তাঁর প্রভুত্ব। তাঁর যদি ঐশ্বর্য না থাকত তা হলে কে মানত তাঁকে? আমার কিন্তু বাপু ব্রহ্মের চেয়ে ভগবানকে বেশি ভালো লাগে। ভগবান হচ্ছে রাজা, কিন্তু ব্রহ্ম হচ্ছে জমিহীন জমিদার।

'ঈশ্বর যদি সর্বভূতেই আছেন, তবে একজনকে বেশি শক্তি আরেকজনকে কম শক্তি দিয়েছেন এর মানে কি?'

যেমন আধার তেমনি শক্তির আয়তন। শক্তি আধারের নয়, শক্তি তাঁর। তিনিই বিকশিত হয়েছেন। যেমন দীপ তেমনি আলো। যেমন মাঠ তেমনি ফসল। যেমন কলসী তেমনি সরা।

সব তিনি। তোমাকে যখন কেউ মানে তখন জানবে তাঁকেই মানে। তোমাকে যে মানে তাতে তোমার শিং বেরিয়েছে দুটো?

শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নেই। তাঁকে জানবার জন্যেই বই পড়া, জনে-জনে জানাবার জন্যে নয়। পাণ্ডিত্য হচ্ছে ঢাকের বাদ্যি। পাড়া-পড়শীর ঘুম না ভাঙিয়ে ক্ষান্তি নেই। সারা গায়ে গয়না পরে একা-একা নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কে কবে শান্তি পায়। বাইরের লোককে দেখাবার জন্যে রাস্তায় ছোটে। নামের পেছনে পদবীর পুচ্ছ নাড়ে। নিজের কথাটি পরের কথার উদ্‌ধৃতির স্তূপে চাপা দেয়।

শুধু কোটেশন আর ফুটনোট। জানতে তো জেনেছি কিছুই নয়, তবু কতটা পড়েছি তার ফর্দ নাও। আমার বাক্যের বহরে যদি একটু অবাক হও। যেমন ঐশ্বর্য দেখিয়ে সূক্ষ্মভাবে চাই তোমাকে একটু ঈর্ষালু করতে। শুধু নিজেকে দেখানো। শুধু প্রাচীরপত্রে নিজের নামজারি।

যদি কাউকে জাহির করতে হয়, তাঁকে জাহির করো। যদি কাউকে সাব্যস্ত করতে হয় তাঁকে সাব্যস্ত করো।

'আমি ও আমার, এই দুটি অজ্ঞান। আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার বিদ্যা, আমার ঐশ্বর্য, এই যে ভাব এ হয় অজ্ঞান থেকে' বললেন রামকৃষ্ণ: 'আর, হে ঈশ্বর, তুমিই সব কর্তা, আর এ সব তোমার জিনিস—বাড়ি-ঘর, ধন-দৌলত, পুত্র-পরিবার, বন্ধু-বান্ধব—আমার বলতে কেউ কিছু নয়, সব তোমার—এইটিই জ্ঞানভাব।'

লোকে বুঝেও বোঝে না। ঘা খায়, আবার উঠে বসে অহঙ্কারের বেড়া মেরামত করে। সূর্য যে অস্তে চলেছে সেদিকে খেয়াল নেই। সারা দিন চলে শুধু এই মেরামতির টুকটাক। আত্মরতির ক্ষুদ্র-সংস্কার। দিন যায় দৈন্য আর যায় না। তার পর মৃত্যুর পর আবার খবরের কাগজে হেড-লাইন দিতে ছোটে। হোমরা-চোমরা কে-কে এসেছিল শ্রাদ্ধ খেতে তার ফিরিস্তি ঝাড়ে।

চাকরি থেকে পেনসন নিয়ে বাড়ি করে দরজার উপরে ছাড়া-চাকরির নেম-প্লেট ঝোলায়।

সন্ন্যাসী শুয়ে আছে লোহার কাঁটার উপর। সংসারী শুয়ে আছে অহঙ্কারের কণ্টকে।

বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, খুব আড়ম্বর করে বলে, এ বাগানটি আমাদের, এ পুকুরটি আমাদের। কিন্তু কোনো দোষ দেখে বাবু যদি তাকে ছাড়িয়ে দেন, তখন তাঁর আম কাঠের সিন্দুকটাও নিয়ে যাবার তার যোগ্যতা থাকে না। বাবুর দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।

হেসে উঠলেন বিদ্যাসাগর।

বদলি হবার সময় আদালতের ফার্নিচার ফেরৎ দাও। মায় দোয়াতদানটি পর্যন্ত।

ভগবান দুই কথায় হাসেন, বললেন আবার রামকৃষ্ণ। এক হাসেন, কবরেজ যখন রুগীর মাকে বলে, মা, ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভালো করে দেব। এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে, বাঁচাবে! আর হাসেন, দু ভাই যখন দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে, এ দিক আমার, ও দিক তোমার। এই বলে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, আর ওরা বলছে, এ জায়গা আমার!

'আচ্ছা, তোমার কী ভাব?' ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করলেন বিদ্যাসাগরকে।

মৃদু-মৃদু হাসছেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'সে এক দিন আপনাকে গিয়ে বলব আমি চুপি-চুপি।'

আমার পরোপকারের ভাব। পর মানে ভগবান, উপ মানে সমীপস্থ, আর কার মানে কার্য। আমি এমন কার্য করব যাতে মুহূর্তে ভগবানের সমীপস্থ হয়ে যাব। ভগবানকে কি করে আনন্দিত করব? এত যাঁর আছে তাঁকে আর আমি কী দিয়ে খুশি করতে পারি? তাঁকে খুশি করতে পারি শুধু পরের অশ্রু মুছিয়ে। আপনি বলছেন ভগবান হাসছেন। আমি তো দেখি অহর্নিশি কাঁদছেন তিনি। কাঁদছেন ঘরে-ঘরে, পথে-পথে। শৃঙ্খলে নিপীড়িত হয়ে কান্নার ভাষা হারিয়ে, শাসনের কারাগারের দেয়ালে মাথা ঠুকে-ঠুকে।

তিনিই সব এ ভাবটুকু থাকলেই হল। তাঁর জন্যেই সব করছি, নিজের নামযশের জন্যে নয়, গীতায় একেই বলেছে নিষ্কাম কর্ম। গীতায় এমনিতেও যা, ওলটালেও তাই। এমনিতে গীতা, ওলটালে তাগী। তাগী মানে ত্যাগী। ত্যজ ধাতুর উপর বিহিত প্রত্যয়ে তাগী-ও সিদ্ধ। মরা-মরা বলতে-বলতে যেমন রাম হয়েছিল তেমনি গীতা-গীতা বলতে-বলতে ত্যাগী হয়ে যাও। নিজের সমস্ত জ্ঞান-কর্ম বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর হাতে, একটা বৃহত্তম সত্তার উপলব্ধিতে, উৎসর্জন করো। এর জন্যে চাই বিশ্বাস। সংশয়ের ঝড়ের রাতে প্রত্যয়ের দীপবর্তি। এর হদিস পণ্ডিতের বিচারে নেই, আছে একটি নির্মলসরল বালকের বিশ্বাসে। ষড়দর্শনেও তাঁর দর্শন হয় না, দর্শন হয় শুধু বালকের পবিত্রতায়। সেই যে কথায় বলে না, স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হল আর হনুমান রামনামের বিশ্বাসের জোরে ডিঙিয়ে গেল এক লাফে।

'যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'তা হলে পাপই করুক আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নেই।'

শক্তিতে হয় না, ভক্তিতে হয়। একের পর এক গান ধরলেন রামকৃষ্ণ। সুরে-সুরে সুধার হ্রদ নেমে এল মর্ত্যধামে।

তত্ত্ব অতি সোজা। শুধু একটি ভালোবাসার তত্ত্ব। যাতে ঐ ভালোবাসাটি আসে তার জন্যেই তাঁকে মা বলা। মা বড় ভালোবাসার জিনিস।

বিদ্যাসাগরের চোখ ছলছল করে উঠল। এ কি আর বিদ্যাসাগরকে বোঝাতে হবে?

পূজা হোম যাগযজ্ঞ, ও-সব কিছুই নয়। আসল হচ্ছে ভালোবাসা। যদি একবার ভালোবাসা আসে তবে কী হবে ও-সব অনুষ্ঠানে? যদি ভালোবাসা হবে কী হবে আর বেশভূষায়? চোখে যদি জল আসে কাজলের রেখা ধুয়ে যায়।

'তুমি যে সব কর্ম করছ এ সব সৎকর্ম।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি আমি কর্তা এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো তা হলেই হল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে-করতেই ঈশ্বরে ভালোবাসা আসবে।'

একেক জনের একেক রকম পথ। কারু জ্ঞানে, কারু ভক্তিতে, কারু বা শুধু নিষ্কাম কর্মে। নিষ্কাম কর্মই নিয়ে যাবে মনস্কামের চরম তীর্থে।

'আমি বলছি, নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে ঈশ্বরপ্রেম। আর ভালোবাসা হলেই দর্শন। আর সব দর্শনে চোখাচোখি হয় না, ভালোবাসাতেই মুখচন্দ্রিকা। হ্যাঁ গো, দেখা যায় ঈশ্বরকে। তার সঙ্গে কথা কওয়া যায়। এই যেমন তোমাকে দেখছি চোখের উপর চোখ রেখে। এই যেমন কথা কচ্ছি তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে।'

রাত হচ্ছে, এবার উঠবেন রামকৃষ্ণ।

'যা সব বলছি তোমাকে তুমি সব জানো।' হাসলেন রামকৃষ্ণ: 'তবে খবর নেই। বরুণের ভাণ্ডারে কত-কি রত্ন আছে, বরুণ রাজার খবর নেই।'

'তা আপনি বলতে পারেন।' হাসলেন বিদ্যাসাগর।

'অন্তরে সোনা আছে, কিন্তু একটু মাটি চাপা পড়ে আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, তখন অন্য কর্ম কমে যাবে। শুধু খনন করবে সেই গহন অন্তর। ঐ দেখ না, গৃহস্থের বউর কত কর্ম, অন্তঃসত্ত্বা হলেই কর্ম কমে আসে। শেষে ছেলে হলে ছেলেটিকেই

নিয়ে থাকে, ওটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে। সংসারের কাজ আর শাশুড়ি করতে দেয় না।'

তাই শুধু এগোও। কর্মারণ্যে কুঠার হাতে করে কাঠ কাটতে বেরিয়েছ, কিন্তু শুধু চন্দন গাছ দেখেই থেমে যেও না। ঐ কুঠারে যে রুপোর খনি সোনার খনিও খুঁড়তে হবে। তবে থামছ কেন? এগোও, এগিয়ে যাও। মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার রয়েছে সামনে। অন্তরেই সেই আকর, অন্তরেই সেই রত্নাগার। থেমো না, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পোড়ো না—

এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা!

অনেক তোমার সম্ভাবনা। অনেক তোমার প্রতিশ্রুতি। তোমার মাত্রাহীন যাত্রা। তোমার সংক্রান্তিহীন দিনপঞ্জী। প্রতিদিনই তোমার জন্মদিন।

'সব জানো, তবে খবর নেই।'

'তা কখনো হয়?'

'হ্যাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম কি।' উঠলেন রামকৃষ্ণ। 'একবার যেয়ো বাগান দেখতে। রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।'

'যাবো বৈ কি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না?'

'আরে আমার কাছে যাবে কি? ছি ছি! বাগান দেখতে যাবে।'

'সে কি কথা!' একটু ক্ষুন্ন হলেন কি বিদ্যাসাগর? বললেন, 'ও কথা বলছেন কেন?'

'অরে, আমরা হচ্ছি জেলেডিঙি। খাল-বিলেও যেতে পারি, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু তুমি হচ্ছ জাহাজ, কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় হঠাৎ ঠেকে যায়—'

সকলে হেসে উঠল।

রামকৃষ্ণ টিপ্পনি কাটলেন: 'তবে এ সময় যেতে পারে জাহাজ।'

ইঙ্গিত বুঝে নিলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'হ্যাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে।'

নবানুরাগের বর্ষা। নবানুরাগের সময় মান-অপমান থাকে না, বিদ্যা-অবিদ্যা থাকে না, শুধু জলে জলময়। তখন প্রেমের নদী, প্রেমের হাওয়া, প্রেমের ময়ূরপঙ্খী। প্রেমের অঞ্জনে তখন বিশ্বময় নিরঞ্জন।

দাঁড়িয়ে মূল মন্ত্র জপ করছেন রামকৃষ্ণ। ভাবারূঢ় হয়েছেন। হয়তো বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করছেন মা'র কাছে।

ভক্ত সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন ধীরে-ধীরে। নিজের হাতের মধ্যে একটি ভক্তের হাত ধরা। আগে-আগে বাতি-হাতে চলেছেন বিদ্যাসাগর।

শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ। ষষ্ঠীর চাঁদ দেখা দেয়নি এখনো। বাগানে অন্ধকার। তার মধ্য দিয়ে বাতির একটি ক্ষীণ রেখা চলেছে ফটকের দিকে।

সেই ক্ষীণ রেখার পিছনেই জ্যোতিষ্মান দিনকর।

জগৎজোড়া অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি সেই আশার ক্ষীণ দ্যুতি? সেই আভাষের পিছনে নব ভাস্করের আবির্ভাব?

ফটকের সামনে কে একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ দাঁড়িয়ে। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। মাথায় পাগড়ি, দাড়িগোঁফ একমুখ। শিখ নাকি? অথচ পরনে ধুতি, পায়ে জুতো-মোজা। বাঙালি তো, গায়ে চাদর নেই কেন?

রামকৃষ্ণকে দেখামাত্রই পাগড়িশুদ্ধু মাথা পায়ে লুটিয়ে দিল।

'এ কি? তুমি? বলরাম? এত রাত্রে?'

'অনেকক্ষণ এসেছি। দাঁড়িয়েছিলাম এখানে।'

'সে কি? ভেতরে যাওনি কেন?'

'সবাই আপনার কথা শুনছেন, এর মধ্যে আমি গিয়ে কেন তালভঙ্গ করি?'

ঘরের মধ্যেই থাকি আর দরজার বাইরেই থাকি, আমি আছি আমার ভাবের ঘরের দরজা খুলে।

ঠাকুর গাড়িতে উঠলেন।

মাষ্টারের কানে-কানে বললেন বিদ্যাসাগর, 'গাড়িভাড়া দেব?'

'আজ্ঞে না, ও হয়ে গেছে।'

বিদ্যাসাগর প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। প্রত্যেকে, একে-একে।

গাড়ি চলল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু গাড়ির মধ্যে যিনি ব'সে তিনি চলেছেন কোথায়? তিনি চলেছেন জীবের ঘরে-ঘরে। কায়ে মনে আর বাক্যে একটি শুধু বাণী নিয়ে। সে বাণী ভালোবাসার বাণী। শুধু ভালোবাসো। ঈশ্বরকে ভালোবাসো। ঈশ্বরকে ভালোবাসলেই আর সকলকে ভালোবাসবে। এ জীবন পেয়েছ শুধু সেই ভালোবাসার আলো জ্বালাতে। গাঁথতে শুধু সেই একটি ভালোবাসার বরমালা।

[ক্রমশঃ।

আকাশ-পাতাল

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

ব্রাহ্মণী আয়োজন ক'রেছে কত !

রূপার থালার ধারে ধারে রূপার বাটি সাজিয়ে দিয়ে চ'লে যায় ব্রাহ্মণী। মুখ ফুটে খেতে চেয়েছে মালিক। সোল্লাসে রেঁধেছে কত খাদ্যদ্রব্য। ভেজেছে লুচি। এঁটো হাত ধুয়ে পাক-ঘরের দরজায় চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে দেখে খাওয়ার ঘরের দিকে। দেখে, মালিক কৈ খাচ্ছে না তো। সমুখে সাজানো থালা, চুপচাপ ব'সে আছে। ব্রাহ্মণী দেখতে পায়, লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পায়। মালিক খেতে ব'সেছে, কাছাকাছি জ্বলছে একটা অষ্টভুজাকৃতি বিলিতী লণ্ঠন। ঘরের মেঝেয় বসানো আছে তেলের লণ্ঠন। পরিচ্ছন্ন কাচ লণ্ঠনের, ঘর যেন আলোর আলো হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণী দেখছিল পাক-ঘরের দরজা থেকে, মালিক যেন ভাবনায় বিভোর হয়ে আছে। গুণ্ঠনে ঢাকা থাকে চোখের দৃষ্টি, কত দিন এত স্পষ্টাস্পষ্টি দেখেনি মালিককে। আড়াল থেকে চুরিয়ে দেখে ব্রাহ্মণী। দেখে আর চোখ ফেরাতে পারে না যেন। ব্রাহ্মণী দেখে, মালিকের ফর্সা রঙ, আয়ত চোখে চিন্তিত দৃষ্টি, ভেলভেটের মতই কালো গোঁফের রেখা, মাথায় সাহেবী টেরী। তবুও বেশ বদল ক'রে খেতে ব'সেছে মালিক। নিমন্ত্রণ-রক্ষা করতে যাওয়ার সময় যে-পোষাক ছিল, সেই বেশে দেখলে না-জানি ব্রাহ্মণীর চোখ কপালে উঠতো কি না। দেখতে দেখতে লজ্জা পায় ব্রাহ্মণী। কাঁচা-বয়েসী বিধবা ব্রাহ্মণী। লুকিয়ে দেখার লজ্জায় যেন মরমে ম'রে যায়। লজ্জায় দ্রবীভূত হয় মেয়েমানুষের মন, কিন্তু লজ্জার জ্বালা ধরে কেন ব্রাহ্মণীর বুকের অন্তস্তলে ? পলকের মধ্যে দরজা ত্যাগ ক'রে পাক-ঘরের ভেতরে ঢুকে প'ড়লো ব্রাহ্মণী। ছিঃ, বিধবাকে দেখতে আছে কখনও অন্য পুরুষকে ! ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হয়ে ! ব্রাহ্মণী উনোনের সামনে পিঁড়েয় ব'সে পড়ে যন্ত্রচালিতের মত। হাতে কোন কাজ নেই, তবুও জ্বলন্ত উনোনের সামনে অভ্যাস মত বসে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, দেখে উনোনে গমগমে আঁচ। লাল আগুন। চোখে-মুখে বুঝি বা আঁচ লাগে, উনোনের উষ্ণ আঁচ। থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে ব্রাহ্মণীর হাত আর পা। কৈ, কোন দিন তো এমনটি হয় না ? মনে-মনে হরিনাম জপতে থাকে ব্রাহ্মণী। ক্ষমা চায় দুঃখহারী হরির সমীপে। মুহূর্ত্তের মধ্যে অবশ হয়ে পড়ে দেহটা। অসাড় হয়ে পড়ে। আর মনে মনে হরিনাম জপতে থাকে। ব্রাহ্মণী ভাবে, আড়াল থেকে এই লুকিয়ে দেখা কেউ দেখলো না তো ? কিন্তু হরির দৃষ্টি কে এড়াবে ! তিনি তো দেখলেন। তাঁর কাছে কি কিছু লুকানো যায় ? তিনি যে লুকিয়ে থেকে দেখছেন সকল কিছু।

মূর্ত্তিমতী প্রতিমা এলো না কি !

খেতে-খেতে থালা থেকে মুখ তুলে তাকালো কৃষ্ণকিশোর। চোখ তুলে তাকালো। চুড়ির রিনি-রিনি শুনে না পদক্ষেপের শব্দে কে জানে, কৃষ্ণকিশোর অনুমানে বুঝেছিল যে দরজায় কার আবির্ভাব। চোখ তুলে দেখলো যেন মূর্ত্তিমতী প্রতিমা একটি। রূপৈশ্বর্য্যে টলমল করছে মূর্ত্তি, সালঙ্কারা মূর্ত্তি। প্রতিমার দীর্ঘ আঁখিযুগলে সজীব দৃষ্টি। যেন অধিক্ষণ তাকানো যায় না ঐ চোখে চোখ রেখে। কৃষ্ণকিশোর দেখলো মূর্ত্তির মুখে পূর্ব্বের মতই গাম্ভীর্য্য। চোখের দৃষ্টি কেমন আগের মতই স্থির এবং তীক্ষ্ণ। রাজেশ্বরী ধীর ও নম্র কণ্ঠে বললে,—ডাকছিলে ?

হঠাৎ কথা বলায় চমকে ওঠে যেন কৃষ্ণকিশোর। বলে,—হ্যাঁ। ঘুমিয়ে প'ড়েছিলে তুমি ?

রাজেশ্বরী বললে,—কৈ, না তো। আসতে কি দেরী হয়েছে ? ডেকে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই তো হাজির হয়েছি।

কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীর কথার ভাষা শুনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় বোধ করে। বলে,—হ্যাঁ, তা এসেছো। চোখ দু'টো ফুলে উঠেছে দেখে ভেবেছি যে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলে।

ক্ষণিকের জন্য দুঃখের হাসি দেখা দেয় রাজেশ্বরীর ওষ্ঠে। সামান্য হাসির সঙ্গে কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—পোড়া চোখ আবার ফুললো কেন কখন কে জানে !

রাজেশ্বরীর কথার কোন প্রত্যুত্তর দেয় না কৃষ্ণকিশোর। দু'-চার মুহূর্ত্ত দেখে চোখ নামিয়ে নেয় থালায়। রাজেশ্বরীর কথার ভাষাটা মনে হয় অশ্রুতপূর্ব্ব। অন্য এক রূপ ধারণ ক'রেছে যেন রাজেশ্বরী ! স্নিগ্ধ ও নম্র ভাবটা যেন বিলীন হয়ে গেছে আকৃতি থেকে। কৃষ্ণকিশোর ভেবে পায় না রাজেশ্বরীর রূপান্তরের কারণ। নিমন্ত্রণ থেকে ফিরতেই এই পরিবর্ত্তন চোখে প'ড়েছে—আকৃতি শুধু নয়, রাজেশ্বরীর প্রকৃতিও যেন পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে সামান্য ক'ঘণ্টার মধ্যেই। থেকে-থেকে গায়ে যেন বিষ ছড়াচ্ছে যে রাজেশ্বরীর ! অঙ্গে-অঙ্গে জ্বালা ধরছে। বুকের ভেতরটা ধড়াস-ধড়াস করছে যত বার মনে পড়ছে ঐ দু'টি কথা—মুসলমান বাইজী। রাজেশ্বরীর এত রূপ, তবুও কেন এই অবহেলা ! অসহ্য মনে হয় রাজেশ্বরীর। খাস-মহলে আয়নায় রূপের ডালি চোখে পড়লেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। চরম অভিমানে কেঁদেছে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছিল তো এতক্ষণ। হঠাৎ ডাক প'ড়লো তাই। কণ্ঠে কথা আসে তবুও মুখ ফুটে কিছু বলে না রাজেশ্বরী। মধ্যে-মধ্যে প্রবল ইচ্ছা হয়,

সাধ জাগে, স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞেস করবে কথাটা—মুসলমান বাইজীটি কে? কেন প্রয়োজন হ'ল মুসলমান বাইজীকে? কিন্তু বুক ফেটে যাচ্ছে তবুও কথা ফুটছে না মুখে। হাল ছেড়ে দেয় যেন রাজেশ্বরী, যা ইচ্ছা হয় করে যাক। কথাটি বলবে না সে। হ্যাঁ কিম্বা না, কোন কথাই বলবে না। কিন্তু দা-দেইজীদের কথা, মিথ্যা হ'তে পারে। সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, যা মন চায় করতে পারো, রাজেশ্বরী মুখ খুলছে না।

কৃষ্ণকিশোর তখন ভাবছিল, ঘড়ার টাকা গুনতে-গুনতে উঠে প'ড়েছে।

গহরজান যত টাকা চেয়েছিল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী টাকা আছে ঘড়ায়। বাড়তি টাকায় রাজেশ্বরীকে কোন গয়না গড়িয়ে দেওয়া যায় না! অন্ততঃ যে গয়নাটা কৃষ্ণকিশোর আত্মসাৎ ক'রেছিল সেই ধরণের একটা কিছু?

—দাঁড়িয়ে আছো কেন? ব'স না একটা পিঁড়ে টেনে। হঠাৎ কথা বললে কৃষ্ণকিশোর। খেতে-খেতেই বললে।

একান্ত অসহায়ের মত হাল ছেড়ে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী। চোখে শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল। মুখে গাম্ভীর্য্য। মোমের মত হাত দু'টি যুক্ত ক'রে পেছনে ধরা। কথা শুনে শিউরে উঠলো যেন রাজেশ্বরী। সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললে,—না, থাক্। বেশ আছি আমি।

কৃষ্ণকিশোর দেখে-শুনে থাকতে পারলো না যেন। বললে,—হঠাৎ তুমি এমন রূপ ধারণ করলে কেন?

নম্র কণ্ঠে কথা বলে রাজেশ্বরী। শুধোয়,—কেমন রূপ?

হাসতে চেষ্টা করে কৃষ্ণকিশোর, যদি রাজেশ্বরীর মুখে হাসি ফোটে। বললে,—এমন করাল রূপ?

উত্তর শুনে কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ থাকলো রাজেশ্বরী। ভাবলো, পাড়বে না কি কথাটা। করাল রূপ ধারণের সত্যি কারণটা। ভাবলো, না থাক; যা খুশী হয় করে যাক। বললে,—ঈশ্বর আমাকে হয়তো এমনটিই গ'ড়েছেন? আমি কি করতে পারি?

রাজেশ্বরীর কথার কোন জবাব খুঁজে পায় না কৃষ্ণকিশোর। লণ্ঠনের আলোয় বারেক দেখে রাজেশ্বরীর মুখটা। লক্ষ্য ক'রে দেখে। দেখতে পায়, রাজেশ্বরীর চোখ দু'টি ছল-ছল করছে না? কোথায় মুখে হাসি দেখতে পাবে, ভেবেছিল কৃষ্ণকিশোর, দেখলো কি না অশ্রুসিক্ত চোখ। বললে,—ঘুম পেয়েছে তোমার?

দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা রাজেশ্বরী। বললে,—কৈ, না তো। হিঁদুর ঘরের মেয়ে আমরা, স্বামী না খেলে যে আমাদের খেতে নেই, না ঘুমোলে যে আমাদের ঘুমোতে নেই।

বাইরে থেকে কে যেন ডাক দেয়।' ফিস-ফিস কথা। ডাকে,—বৌমা আছো?

রাজেশ্বরী বোঝে কে ডাকছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বলে,—কিছু বলছেন বামুনদিদি?

ব্রাহ্মণী ডাকছিল বাইরে থেকে। রাজেশ্বরী কাছে যেতেই বললে,—কিছু দেবো কিনা জিজ্ঞেস কর'না দিদি! লুচি দিই ক'খানা?

ঘরে ঢুকে ব্রাহ্মণীর কথার পুনরুক্তি করতেই কৃষ্ণকিশোর তৎক্ষণাৎ বললে,—কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। আকণ্ঠ হয়ে গেছে আমার।

কথা ক'টি বেশ জোর-গলাতেই বলেছে কৃষ্ণকিশোর, যা শুনে ব্রাহ্মণী চ'লে গেল পাক-ঘরে। হরিনাম জপ্‌তে জপ্‌তে গেল। এ কি হ'ল ব্রাহ্মণীর! মনে কেন জাগলো অসৎ ভাব? শাপ-শাপান্ত ক'রলো নিজেকে। মনে-মনে বললে,—রক্ষা কর রক্ষাকর্ত্তা। মন বদ্‌লে দাও হরি হে মধুসূদন!

রাজেশ্বরী কিছুটা কৌতূহল বশতই জিজ্ঞেস ক'রলো,—বড়-বাড়ীতে নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে খেয়ে এলে না কেন জিজ্ঞেস করতে পারি?

মুখে বিরক্তি প্রকাশ পায় কৃষ্ণকিশোরের। বলে,—নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে যারা অপমান করে তাদের বাড়ীতে খাওয়া যায় কখনও? তুমিই বল' না?

রাজেশ্বরী কথাগুলি শুনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়। বলে,—অপমান! কি অপমান করলে? কেন অপমান করলে?

কথা চেপে যেতে চায় কৃষ্ণকিশোর। বললে,—যাক্, দরকার নেই ও আলোচনায়। আমার চরিত্তির ভাল নয়, আমি ছেলে ভাল নই, ইত্যাদি বলাবলি করলে। যাক্ গে ও প্রসঙ্গ, এখন বল' দেখি শশী বৌদিদির বক্তব্য? কি বলতে চান তিনি? আমার চরিত্তির, আমার চরিত্তির! তুমি বল' না, কিছু অন্যায় করতে দেখেছো আমাকে?

রাজেশ্বরী কথা বলতে বোধ করি ইতস্তত করে। বলে,—কেউ অন্যায় করলে কি কাকেও দেখিয়ে করবে? আমি কোত্থেকে জানবো, তুমি কি করছো না করছো! তোমার শশী বৌদিদি বললেন—

কথা বলতে বলতে কথার মাঝপথে থেমে যায় রাজেশ্বরী। কেন কে জানে!

কৃষ্ণকিশোর কথার খেই ধরিয়ে দিয়ে বলে,—হ্যাঁ, কি বললেন শশী বৌদিদি?

রাজেশ্বরী বললে ধীরে-ধীরে বিনম্র সুরে,—দিদি বললেন, তোমাদের ঐ বড়বাড়ীর বাবুরা ওঁকে উত্যক্ত ক'রে মারছে! উড়ো চিঠি ছাড়ছে, গুণ্ডা লেলাচ্ছে, অপহরণ করাবার ভয় দেখাচ্ছে। দিদির স্বামী বিলেত যাচ্ছেন জানো তো? যে ক'দিন স্বামী না থাকেন সেই ক'দিনের জন্যে তোমার বাড়ীতে থাকতে চাইছেন যদি অবিশ্যি তোমার অনুমতি পাওয়া যায়! বাপের বাড়ী আছে দিদির, সেখানে দিদি যেতে চান না। সম্মানের হানি করতে চান না। আর এই ব্যবহার, তিনি তোমাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করেন ব'লেই।

—তুমি কি বললে? বললে কৃষ্ণকিশোর।

রাজেশ্বরী থমমত খায় যেন। বলে,—খুব অন্যায় ক'রে ফেলেছি। তোমার সঙ্গে কথা না ক'য়েই দিদিকে কথা দিয়ে দিয়েছি।

সামান্য হাসলো কৃষ্ণকিশোর। হাসতে হাসতেই বললে,—কি কথা দিয়েছো?

রাজেশ্বরী ভয়ে-ভয়ে বললে,—ব'লেছি যে, হ্যাঁ, এখানে যখন খুশী চ'লে আসুন। এখানেই থাকুন। দিদিও রাজী হয়েছেন। অন্যায় ক'রেছি?

কৃষ্ণকিশোর গেলাস তুলে জল খায় ঢক-ঢক। গেলাস রেখে বলে,—অন্যায়! কিছু অন্যায় নয়, মানুষ বিপদে পড়লে মানুষকে মানুষ যদি সাহায্য না করে তার চেয়ে অন্যায় আর কিছু নেই।

স্বস্তির শ্বাস ফেললো রাজেশ্বরী। বললে,—তবে দিদির স্বামীর যেতে এখনও কিছু দিন দেরী আছে। কি ভাগ্যি দিদির!

বড়বাড়ীর বাবুরা নিমন্ত্রন ক'রে ডেকে চারিত্রিক দোষ দিয়েছে শুনে ক্ষণেকের জন্য রাজেশ্বরীর মনে হয় মুসলমান বাইজীর কথাটাও হয়তো ভিত্তিহীন। কিন্তু তার প্রতি ঈশ্বরের কি এতটা করুণা হবে! যদি মিথ্যা হয় কথাটা তা হ'লে তো কথাই নেই। কিন্তু ভিত্তি না থাকলে কথা উঠবেই বা কেন?

—বন্দুকের আলমারীর চাবিটা চেয়ে পাঠালাম, দিলে না কেন? কথায় বেশ কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে শুধোলে কৃষ্ণকিশোর।

কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না রাজেশ্বরী। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বলে,—ভাবলাম যে রাত হয়ে গেছে, এখন বন্দুক নাড়াচাড়া করলে যদি কোন বিপদ-টিপদ হয়! বন্দুককে যে আমার ভীষণ ভয় করে। বন্দুক দেখলে বুক ধড়ফড় করতে থাকে।

—তাই বুঝি? বললে কৃষ্ণকিশোর।—তা তো জানা ছিল না। কিন্তু কাল চাবিটা দিও সকালেই। সাফ না করলে মরচে ধরে যাবে। কত দিন পরিষ্কার করা হয়নি বন্দুকগুলো। কথা বলতে-বলতে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর।

রাজেশ্বরী মিষ্ট কণ্ঠে বললে,—আঁচিয়ে ঘরে আসছো তো? আমি তবে ঘরে চলে যাই?

—হ্যাঁ। বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—তবে কাছারী থেকে ঘুরে আমি যাচ্ছি।

—কাছারী! এখন এত রাত্রে কাছারীতে কেন? শঙ্কিত কণ্ঠে বললে রাজেশ্বরী।—যেও, কাল সকালে যেও।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না, বিশেষ প্রয়োজন আছে। কাল কখন খাজনার টাকাটা দিতে যাওয়া হবে জিজ্ঞেসাবাদ ক'রে আসি। একটা ভাল সময় দেখে যেতে হবে তো।

রাজেশ্বরী বললে,—তোমাকেও যেতে হবে?

—যেতে হবে না! আমাকেই তো যেতে হবে। সাবালক হয়েছি আমি। মালিক না গেলে টাকা জমা নেবে'না। কথা বলতে-বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর।

খাস-মহলে চলেছিল রাজেশ্বরী।

ভগ্ন-হৃদয় আর ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছিল কেমন যেন আচ্ছন্নের মত। ভয়ে-ভয়ে। কে কোথায় আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, অন্ধকারে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চ'লেছিল। সামান্য কিছু দিনের পরিচয়ে যা যতটুকু জানা আছে, সেই ধারণাতেই ঘর আর চাতাল পেরিয়ে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। কি অবিচ্ছেদ্য অন্ধকার! যেদিকে তাকাও সেদিকে। আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না। কোথাও থেকে দেখা পাওয়া যায় আলোর রেখা, কোথায় হয়তো জ্বলছে বেল-লণ্ঠন। উঁকি-ঝুঁকি মারছে আলো। সেই আলো দেখে আরও ভয়-ভয় করছে। রাত্রির তামসিক অন্ধকার অসহ্য মনে হয় রাজেশ্বরীর। মনে-মনে বলে, ঈশ্বর, শেষ ক'রে দাও, রাত্রি—দিনের আলো ফোটাও। মুখে হাসি-মাখানো সূর্য্যকে পাঠাও, যার শুচিশুভ্র কান্তির ছটায় দিগ্বিদিক আলোকময় হয়ে উঠবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

বিনিদ্র রজনী যে বিলম্বে অতিক্রান্ত হয়। শেষ হ'তেই চায় না। রাজেশ্বরী যেন আর চলতে পারে না। টলতে-টলতে চলে আচ্ছন্নের মত। ট'লে প'ড়ে যেতে-যেতে টাল সামলে নেয়। আরেক ভাবনায় রাজেশ্বরী এখন আকুল হয়ে উঠেছে, বন্দুকের আলমারীর চাবি চাইলো যে! বন্দুককে ভীষণ ভয় করে রাজেশ্বরী। দেখা দূরের কথা, বন্দুকের নাম শুনলেই তার বুক ধড়ফড় করতে থাকে। এমনিতেই দিবা-রাত্রি বন্দুকের কাল্পনিক আওয়াজে অতিষ্ঠ হয়ে আছে রাজেশ্বরী। সেই কল্পনা কি সত্যে রূপান্তরিত হ'তে চ'ললো! ক্লান্ত পা দু'টি আর যেন চলতে চায় না। সিঁড়ি ভাঙ্গায় কত কষ্ট! কোন কায়িক পরিশ্রম নেই, তবুও ভেবে-ভেবে রাজেশ্বরীর দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছে। কোন কাজই করতে হয় না, তবুও পা যেন চলতে চায় না। চোখ দু'টি কি জলে ভ'রে গেছে! চোখে ঝাপসা দেখছে কেন রাজেশ্বরী তবে!

ঐ তো খাস-মহলের আলো দেখা যাচ্ছে না?

রাজেশ্বরী চোখে ভুল দেখছে না তো! আলেয়ার আলো নয় তো!

রাত্রি কত এখন কে জানে! কানে তালা লেগেছে, না সত্যিই ঝিঁঝিঁ ডাকছে। হাতের তালু ঘেমে উঠেছে রাজেশ্বরীর। হৃদ্‌গতি বেজে চ'লেছে দ্রুত। সিঁড়ির শেষে আলোর আভা দেখে প্রায় ছুটতে-ছুটতে খাস-মহলের দিকে এগোয় রাজেশ্বরী।

খাস-মহলের দরজার মুখে ব'সেছিল এলোকেশী। ঘর আগলে ব'সেছিল। বোধ করি ঢুলছিল ঘুমের জড়তায়। রাজেশ্বরীর পদশব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠলো। আচমকা দেখে প্রায় চিৎকার ক'রে উঠছিল আর কি রাজেশ্বরী। অনেক কষ্টে সামলে ব'লে উঠলো,—ও মা!

এলোকেশী ন'ড়ে-চ'ড়ে বসে। রাজেশ্বরী ততোধিক ভয় পায়। বলে,- তুমি কে এখানে? তুমি কে?

—আমি গো আমি। বললে এলোকেশী। হাসতে-হাসতে বললে,—শোন' কথা মেয়ের! আমি যে তোর এলোকেশী। ভয় পেয়েছিস বুঝি?

দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজেশ্বরীর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে রাজেশ্বরী,—থাক, ঢের হয়েছে, আর ন্যাকামি করতে হবে না তোমাকে!

এলোকেশী থতমত খেয়ে যায় যেন। বলে,—হ'ল কি মেয়ের! দোষটা কি করনু যে এত রোষ?

চক্ষু মুদিত ক'রে থাকে রাজেশ্বরী। কয়েক মুহূর্ত্ত। চোখ মেলে দেখে ইদিক-সিদিক। বলে,—ওখানে কে ও? চুপিসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে!

এলোকেশী উঠে প'ড়লো। বললে,—কে আবার দাঁইড়ে থাকবে! ওটা তো ঘড়াঞ্চি! কড়িকাঠের লণ্ঠন মুছতে এনেছিল তাঁবেদারেরা।

—তাই বল'। ছাঁৎ ক'রে উঠেছিল বুকের ভেতরটা। বললে রাজেশ্বরী। হাঁফাতে-হাঁফাতে বললে। কথার শেষে ঢুকলো খাস-মহলে। আলো দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। কিন্তু ঘরে ঢুকেও কি স্বস্তি আছে? আলো দেখেও?

দেরাজের আয়নায় স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখে ক্রোধের মাত্রা বর্দ্ধিত হ'তে থাকে উত্তরোত্তর। ইচ্ছা হয়, একটা ভারী কিছু ছুঁড়ে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেয় আয়নাটা। অন্যোপায় হয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। কিছু দেখা যায় না; শুধু দূরে-দূরে আলোকবিন্দু। জ্বলছে কাদের কাদের বাড়ীতে। আর অসীম আকাশে ছড়িয়ে আছে কয়েকটা নক্ষত্র। হিমার্ত্ত কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে। কোথায় মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে চাঁদ? না লুকিয়ে নেই, মধ্যাকাশে বিরাজ করছে ঘষা-কাচের মত স্তিমিতপ্রভ চাঁদ। তীরগতিতে একটা প্যাঁচা উড়ে গেল না? প্যাঁচা না অন্য কোন রাত্রিচর! হয়তো বাদুড়ই হবে। ঘরের কোণে গ্র্যাণ্ড-ফাদার্স ঘড়িটা হঠাৎ শব্দ তুললো জল-তরঙ্গের সুরে। বেশ লাগে শুনতে ঐ ঘড়িটার সুমিষ্ট আওয়াজ। সময়ের নিশানা। ক্ষণেকের জন্য রাজেশ্বরী তৃপ্তি পায় ঘড়ির শব্দ-ঝঙ্কারে। মনটা কোথায় উড়ে যায় ঐ শব্দ শুনে।

কিন্তু এতক্ষণ ধ'রে কি করছে কি কাছারীতে? রাজেশ্বরী ভাবে।

মিথ্যা কথা ব'লেছে কৃষ্ণকিশোর। ডাহা মিথ্যা কথা। কাছারীর ধারে-কাছেও নেই, ছিল বৈঠকখানায়। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত ক'রে, তবে যাবে খাস-মহলে। মিথ্যা কথা ব'লেছে রাজেশ্বরীর কাছে। খাজনার টাকা জমা দিতে যাওয়ার কথাটা। ঘড়া থেকে হাজার কুড়িক টাকা নিয়ে যাবে গহরজানকে দিতে। যাওয়ায় যাতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয় তাই ব'লেছে যত মনগড়া কথা। মালিক না গেলে টাকা জমা পড়বে না, ইত্যাদি। আর তাই বিশ্বাস ক'রেছে রাজেশ্বরী। অবিশ্বাস করবে কোত্থেকে! অনন্তরামকে পাঠিয়ে খোঁজ করিয়েছে পর্য্যন্ত হেড-নায়েবের কাছে। লুকিয়ে জেনেছে কথাটা সত্যি না মিথ্যা। শুনে অন্তর থেকে বিশ্বাস ক'রেছে।

থোক কুড়িটি হাজার টাকা, হাতে-হাতে পেয়ে না জানি কত খুশীই না হবে গহরজান। আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভ'রে যাবে গহরজানের অন্তঃকরণ। মনের সুখে বিয়ে দেবে ডালিমের, ঘটা ক'রে বিয়ে দেবে। ঢি-ঢি প'ড়ে যাবে না গরাণহাটার পল্লীতে! কত লোকের চোখ টাটাবে। চৌঘুড়ীতে চেপে বিয়ে করতে যাবে ডালিম। গ্যাসবাতির আলোয় গরাণহাটা হেসে উঠবে ক'টা দিনের জন্য! দিকে-দিকে সাড়া প'ড়ে যাবে। কত লোকের পাত পড়বে গহরজানের পোষা ডালিমের বিয়েতে। নাম ছড়িয়ে পড়বে শুধু গহরজানের নয়, গহরজানের—

মুখে মুখে শুনে জেনে যাবে কত শত সহস্র মানুষ, কে খরচা জোগালে।

গ্যাসবাতির আলোর সারি দেখে জেনে যাবে, চৌঘুড়ী আর ব্যাণ্ডের শব্দ শুনে জানবে গহরজানের পোষা ডালিমের বিয়েতে খরচা জুগিয়েছে কে। সানাই আর কাড়া-নাকাড়ার গগনবিদারক ধ্বনি পৌঁছবে কত দূরের মানুষের শ্রুতিপথে। আতসবাজী ফুটবে আকাশে। ছুটবে হাউই। ফাটবে তুবড়ী। জ্বলবে রঙমশাল—যার আলোয় রাত্রি দিন হয়ে যাবে। বারুদের গন্ধে খানিকের জন্য বিষাক্ত হয়ে উঠবে গরাণহাটার হাওয়া। পুড়বে কত পয়সা। লোকে জানবে না, গহরজানের পোষা ডালিমের বিয়েতে খরচা দিলে কে? নাম করবে কত কে। খাতির করবে কত লোক। সেলাম ঠুকবে না গহরজান? পোষা বাঁদীর মতই জরি-জড়ানো বিনুনি ঝুলিয়ে ঈষৎ নত হয়ে একাধিকসহস্র সেলাম ঠুকবে গহরজান। কেনা হয়ে থাকবে না গহরজান বাধ্যবাধকতায়! আজ্ঞাবহ দাসীর মত বশীভূত হয়ে থাকবে যে। চুক্তিপত্রে টিপসই দিয়ে কবুল করবে গহরজান, যত দিন যাবৎ বাঁচিয়া থাকিব তত দিন ধরিয়া একান্ত অনুগত দাসীর ন্যায় হুজুরের সঙ্গে-সঙ্গে থাকিব। বিনিময়ে হুজুরের নিকট হইতে শুধু প্রেম এবং খোরপোষ প্রার্থনা করিব।

হুজুর বৈঠকখানায়। ক'জন তাঁবেদার বাইরে অপেক্ষা করছিল সম্ভ্রমের সঙ্গে। কৃষ্ণকিশোর বলে,—কে আছে?

—হুকুম হুজুর। সাড়া দেয় তাঁবেদার।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—ডাকো হেড-নায়েবকে। বল, জরুরী কাজ আছে। দেরী হয় না যেন।

—যো হুকুম। হুকুম শুনেই ছুটলো তাঁবেদার।

হেড-নায়েব দিনের কাজ মিটিয়ে তামাকু খাওয়ার উদ্যোগে তখন লোক খুঁজছিলেন। কেউ যদি দু'টো টিকেয় আগুন ধরিয়ে দেয় কলকেয়। ফুঁ দিয়ে দেয়। ডাক শুনে আত্মারাম যেন

খাঁচা-ছাড়া হওয়ার উপক্রম হয় হেড-নায়েবের। কাছারীর দালানে একটা থামের পাশে কলকেটা নামিয়ে রেখে হন্তদন্ত হয়ে চললেন। বললেন,—অসময়ে ডাক পড়লো কেন কে জানে! ভালয় ভালয় ফিরতে পারলে বাঁচি।

প্রায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছেন হেড-নায়েব। কেশে ধ'রেছে পাক। জরা নামেনি বটে দেহে, তবে পূর্ব্বের তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। বেশী খাটা-খাটুনি ও চলা-ফেরা সহ্য হয় না। তবু দ্রুত চললেন তিনি। বৈঠকখানার দ্বারে পৌঁছে বললেন,—আজ্ঞা হোক্।

একটা তাকিয়ায় হেলে প'ড়েছিল কৃষ্ণকিশোর। হেড-নায়েবের কথা শুনে বললে,—বলছিলাম যে—

বলতে গিয়েও বলে না কৃষ্ণকিশোর। কথার মধ্যিখানে থেমে যায়। হেড-নায়েব ভয়ে-ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কি হুকুম হয় কে জানে! মৃদু হাসি হেসে বললে কৃষ্ণকিশোর,—মশায় তো মেয়ে-মানুষ নন। তবে অত দূরে কেন? প্রাইভেট কথা আছে যে!

—তাই বলুন হুজুর! বললেন হেড-নায়েব। —বলতে হয়!

কথা বলতে বলতে তিনি ঢুকলেন ঘরে। দরজার বাইরে খুলে রাখলেন তালতলার চটি।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—যা কথা ছিল, ঠিক আছে তো?

হেড-নায়েব বললেন,—কথা কারো বদ্‌লায় হুজুর? আমাকে কি তাই ঠাওরাচ্ছেন? অত ক'রে দিব্যি গাইলুম, শপথ করলুম, বিশ্বাস করছেন না হুজুর?

—তাই বলছি। বললে কৃষ্ণকিশোর। কথা বলতে বলতে উঠে প'ড়লো তাকিয়া ঠেলে। ফিস-ফিস বললে,—তবে ঐ কথাই থাকলো। আমি টাকা সমেত যাবো গাড়ীতে। মশায়ও সঙ্গে যাবেন। আদালতের কাছাকাছি গিয়ে জুড়ী ছেড়ে দেবো। দিয়ে একটা ভাড়াগাড়ীতে উঠে টাকা যেখানে দেওয়ার কথা সেখানে পৌঁছিয়ে দেবো। মশায় গাড়ীতে অপেক্ষা করবেন। বাড়ীতে ফিরে মশায়ের প্রাপ্য বকৃশিশ দেওয়া যাবে। কি বলেন?

—আমাকে আর লজ্জা দেবেন না হুজুর! বললেন হেড-নায়েব। হাতে হাত কচলাতে কচলাতে। বললেন,—কথার হের-ফের হ'লে হুজুর আমার নামে কুকুর পুষ—

—ছি ছি! বললে কৃষ্ণকিশোর। হেড-নায়েবের কথা শেষ হ'তে না দিয়েই বললে,—কি যে বলেন মশায়! যান, বিশ্রাম করুন গে। কাল বেলা বারোটার মধ্যে কিন্তু যাওয়া হবে। ভুল হয় না যেন!

—মুখস্থ ক'রে রাখবো হুজুর। স্মৃতিপটে লিখে রাখবো। বললেন হেড-নায়েব।

কৃষ্ণকিশোর চ'ললো খাস-মহলে।

তাঁবেদারের দল বৈঠকখানায় কুলুপ আঁটতে লাগলো আলো নিবিয়ে। একশো আট বাতির কাটা-কাচের ঝাড়-লণ্ঠন নয়, দেওয়ালে জ্বলছিল দেওয়াল-গিরি। হাতের ঝাপটায় আলো নিবিয়ে দেয় তাঁবেদার। দরজায় কুলুপ আঁটে।

শরৎ আর হেমন্তে পার্থক্য নেই ঋতুমধ্যে।

আকাশ থেকে হয়তো হিম পড়ছিল ঝির-ঝির। কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে রাত্রির আকাশ। ঘষা-কাচের মত সোনালী চাঁদের রেখা দেখা যায় শুধু। শুক্লপক্ষশেষের প্রায় অস্তমিত চাঁদ কুয়াশায় হারিয়ে যায় থেকে-থেকে। মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। হিমার্ত্ত হাওয়া বইতে থাকে মধ্যে মধ্যে। স্তব্ধ রাত্রিকে কাঁপিয়ে শুধু ঝিল্লীর ডাক চলতে থাকে। একটানা কোরাশ গানের মত।

—কোথায় গেলে?

হঠাৎ কথা শুনে শিউরে উঠলো যেন। ডাক শুনে চমকে উঠলো। জানলায় দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো আয়ত চোখ মেলে। বললে,—এই যে আমি।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—ঠাণ্ডা লাগবে যে! খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে আছো?

ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয় রাজেশ্বরীর। নাসিকামূল লাল কেন? চোখ কেন জলসিক্ত? কথা ভারী হয়ে উঠেছে কেন? ঠাণ্ডা লেগেছে না কাঁদছিল রাজেশ্বরী! চোখ দু'টো ফুলো-ফুলো। বললে,—এ পোড়া শরীলে ঠাণ্ডা লাগবে না। যা হয় একটা হ'লেও তো বুঝি! শেষ হয়ে যাই।

কৃষ্ণকিশোর বিস্মিত হয়ে যায় রাজেশ্বরীর মুখাকৃতি দেখে। কথা শুনে। মুখে আর কথায় এত গাম্ভীর্য্য কেন? রাজেশ্বরীর মতি-গতি বোঝা দায়। আশাহত ও বিষণ্ণ আকৃতি। মুখে হাসি নেই। মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেছে কোথায়!

কথা বলতে গিয়ে যদি কথার উত্তর শুনতে হয় সকল সময়ে বিরক্তিপূর্ণ, তা হ'লে তো কথা বলাই চলে না। কৃষ্ণকিশোর ক্ষুব্ধ চিত্তে ভাবে, সময় নেই অসময় নেই, রাজেশ্বরীর ভাবভঙ্গী হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয় কেন? ক্ষণেকের জন্য কৃষ্ণকিশোরের মুখেও দুঃখের ছায়া নামে। জানলা ছেড়ে পালঙের ব্যাটম ধ'রে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। ব্যাটমে গাল ঠেকিয়ে। যদি মিথ্যা হয় বড়বাড়ীর সেই দীর্ঘাঙ্গী বৌটির কথা, যদি বানানো কথা হয়, কৃষ্ণকিশোরের বিষাদমাখা মুখ দেখে মায়া হয় রাজেশ্বরীর। কিন্তু যদি সত্যি হয় মিথ্যা না হয়ে! সত্য আর মিথ্যার টানাপোড়েনে আর কাঁহাতক থাকবে রাজেশ্বরী! কত বার মনে হয়েছে, যা খুশী করুক, ফিরেও তাকাবে না রাজেশ্বরী। কিন্তু স্বামীর অধিকার যে ছাড়তে চায় না নারী জাতি! অন্ততঃ সহজে চায় না। ফিরে না তাকানোর ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে বলবতী হ'লেও অধিকারের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উদাস হয়ে থাকার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ছারখার হয়ে যায়।

দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে কৃষ্ণকিশোর,—দাঁড়িয়ে থাকবে? শুয়ে পড়'। লণ্ঠনটা নিভো আমিও শুয়ে প'ড়বো।

বড্ড ধকল গেছে দিনভোর। জহর আর পান্নাদের দলবল গেছে, অবেলায় খাওয়া হয়েছে, ব'সে ব'সে টাকা গুনেছি, নেমন্তন্ন রাখতে গেছি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

সত্যিই মায়া হয় রাজেশ্বরীর। কৃষ্ণকিশোরের মুখটা দেখে। ক্ষীণ কণ্ঠে বললে রাজেশ্বরী, তুমি শুয়ে পড়', আমি আলোটা—

রাজেশ্বরীর কথা শেষ হ'তে দেয় না কৃষ্ণকিশোর। বললে,—না, না, তুমি শোও। হাতে ছ্যাঁকা-ফ্যাকা লাগিয়ে ফেলবে শেষে। তুমি শুয়ে পড়'।

অগত্যা বাধ্য হয়ে পালঙে বসে রাজেশ্বরী ধীরে-ধীরে। শুয়ে পড়ে না, কোমরের তলায় বালিশ টেনে আধা-শোধা হয়ে থাকে।

ঘর অন্ধকার হয়ে যায় সহসা।

নিশুতি রাত্রির স্তব্ধতায় রাজেশ্বরী শুনতে পায় কৃষ্ণকিশোরের দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ। শব্দটা রাজেশ্বরীর বুকের ভেতরে গিয়ে বিঁধতে থাকে বুঝি। মায়া হয়, মমতা হয়। বড়বাড়ীর সেই দীর্ঘাঙ্গী বৌটির কথা তো হ'তে পারে শুধু কথা!

—শুলে না তুমি? জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর।

রাজেশ্বরীর মুখে কোন কথা নেই। কোন জবাব নেই।

কৃষ্ণকিশোর শায়িতা রাজেশ্বরীর বাম হাতটি মুঠোর মধ্যে ধরতেই রাজেশ্বরী তৎক্ষণাৎ কাছে এগিয়ে আসে। কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীকে টেনে নেয় বুকের কাছে। বুকে মুখ রেখে আচম্বিতে কাঁদতে থাকে রাজেশ্বরী। ডুগরে ডুগরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ফুলে-ফুলে। অঝোর ধারায় জল ঝরতে থাকে রাজেশ্বরীর চোখ থেকে।

কৃষ্ণকিশোর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে,—কাঁদছো তুমি? বৌ, কাঁদছ তুমি? কি হয়েছে বল' তো?

ক্রন্দনের বেগ সামলে রাজেশ্বরী বললে,—না, না। তুমি ঘুমিয়ে পড়'। তুমি ঘুমিয়ে পড়'। কত ক্লান্ত হয়ে আছো তুমি!

কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীকে আরও জোরে বক্ষে চেপে ধ'রলো। বললে,—কিন্তু তুমি কাঁদছো কেন না বললে ঘুমোই কোত্থেকে?

রাজেশ্বরী বললে,—ও কিছু নয়। ও কিছু নয়। তুমি ঘুমিয়ে পড়'। হঠাৎ কথার সুর বদলে যায় রাজেশ্বরীর। বলে,—আমাকে শুধু এইখানে থাকতে দিও। আমাকে শুধু—

—কোথায়? শুধোলে কৃষ্ণকিশোর।

—এইখানে, তোমার বুকে। বললে রাজেশ্বরী। বললে,— আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিও না তুমি। না, না, ওখানে নয়, ভুল ব'লেছি আমি। তোমার পায়ে আমাকে থাকতে দিও। আমি আর কিছু চাই না।

—ছি:, পায়ে থাকবে তুমি? তুমি বুকেই আছো, বুকেই থাকবে। বাহুর বেষ্টনে বেঁধে বললে কৃষ্ণকিশোর। মুখের কাছে রাজেশ্বরীর মুখটা টানলো।

ঘড়ি-ঘরে তখন ঘণ্টা পড়ছে ঢং-ঢং। রাত্রির নিশানা তরঙ্গায়িত হচ্ছে আকাশে।

[ক্রমশঃ।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শ্রীশ্রীমায়ের একটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। আগামী পৌষ হইতে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব পালিত হইতেছে। শ্রীশ্রীমায়ের আলোকচিত্রের নীচে ভগিনী নিবেদিতার একটি অপ্রকাশিত আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। শ্রীশ্রীমায়ের চিত্রটি শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দত্তের সৌজন্যে এবং ভগিনী নিবেদিতার চিত্রটি মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশ্য "নিবেদিতা" রচনার লেখিকা শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁর সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।

আভমত-পত্র

জাতীয়তা

['ডন সোসাইটীতে' প্রদত্ত নিবেদিতার জাতীয়তা বিষয়ক অভিমত]

জাতীয়তা বিষয়ে কিছু বলিবার পুর্ব্বে যাহা জাতীয়তা নহে এমন কতকগুলি বিষয়ের কথা বলিব। প্রথমে মনে রাখিতে হইবে, যে দেশে মতের ও ভাবের প্রভেদহেতু মানুষ পরস্পরকে আক্রমণ করে সে দেশে জাতীয়তা থাকিতে পারে না। যদি রাজনীতিক আন্দোলনকারীরা শিল্পের পুনর্জ্জন্মের সমর্থনকারীদিগকে নিন্দা করেন; যদি সমাজ-সংস্কারকগণ রক্ষণশীল হিন্দুদিগকে আক্রমণ করেন; যদি রক্ষণশীল হিন্দু হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারকারীদিগের সহিত যুদ্ধ করেন; যদি সাহিত্যিকরা শিক্ষকদিগের ও শিক্ষকরা সাহিত্যিকদিগের ত্রুটি দেখাইতে রত থাকেন—তবে যে সমাজে এই অবস্থা বিদ্যমান, স্বীকার করিতে হইবে, সে সমাজ জাতি-গঠনের প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করে নাই।

জাতীয়তা বলিতে কি বুঝায় এক কথায় আমি তাহা বুঝাইতে পারি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই যে, যদি কখন ভারতে জাতীয় জীবনের অরুণোদয় হয়, তবে তাহা কখনই পুর্ব্বোক্ত কোন উপায়ে হইবে না; পরন্তু ঐ সকল অনুষ্ঠান—ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে একযোগে—জাতির কল্যাণ-সাধন-প্রচেষ্টায়—কাজ করিলে তাহা হইবে। যত দিন সেই শুভ দিনের আবির্ভাব না হয়, তত দিন আমরা যেন পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া আমাদিগের উদ্যমের অপব্যয় না করি—দর্শকদিগের হাস্যাস্পদ না হই। আমরা যে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি কামনা করি, যেন সেই উদ্দেশ্যের জন্য উদ্যম সংরক্ষণ ও কেন্দ্রীভূত করিতে পারি। আমরা যেন একযোগে কাজ করিতে শিখি। আমি বলিতে পারি, কলিকাতাবাসী য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে ঈর্ষ্যা আছে—ভারতীয়দিগের মধ্যে তাহা নাই। কিন্তু য়ুরোপীয়দিগের পরস্পরের সম্বন্ধে সেই ঈর্ষ্যার কোন পরিচয় কি প্রকাশ পাইয়াছে? তাহারা বিদেশীদিগের নিকট আপনাদিগের ক্ষত গোপন রাখে, এবং সেই জন্যই একযোগে কাজ করিবার দৃষ্টান্ত দেখায়। ভারতীয়গণ ব্যক্তিগত আসক্তিতে প্রবল—তাহারা পিতার বা ভ্রাতার বা বন্ধুর জন্য আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে পারে। এই ভাব য়ুরোপীয়রা ভারতীয়দিগের নিকট শিখিতে পারে। আবার ভারতীয়দিগেরও য়ুরোপীয়দিগের নিকট শিক্ষা করিবার বিষয় আছে। দুই জন য়ুরোপীয় যদি পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্বিষ্ট থাকে, তথাপি তাহারা যে দলের বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য তাহার জন্য একযোগে কাজ করিতে পারে। আদর্শের জন্য আত্মবৃত্তিদমনের এই যে শিক্ষা, ইহা ভারতীয়দিগকে য়ুরোপীয়দিগের নিকট শিখিতে হইবে। কারণ, এই গুণ লাভ না করিলে—জাতীয়তার জন্য আবশ্যক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি-সাধন অসম্ভব।

যদি মনে করা যায়—বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিতে হইবে; তবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে এক বন্ধনে বদ্ধ করিতে হইবে। এই জন্য সঙ্কীর্ণ কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে হয়—নহিলে হিন্দু মুসলমানের আনন্দে বা দুঃখে সহানুভূতি অনুভব করিতে পারিবে না। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি প্রতিষ্ঠার পথে জাতিভেদ বিশেষ বাধা হয় না। যদি আমরা অন্তরে একই আদর্শে আকৃষ্ট হই, তবে আমরা একসঙ্গে আহার্য্যগ্রহণ করি বা না করি, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। মনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা মিলনের অন্তরায় হইতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তরায় অতিরঞ্জিত না করিয়া অবজ্ঞা করাই প্রয়োজন। কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন—হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ে প্রবল ও প্রকৃত ঘৃণা বিদ্যমান—আমি তাহা বিশ্বাস করি না! আমার বিশ্বাস, সমাজগত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথাদি ব্যতীত উভয় সম্প্রদায়ে আর সব বিভেদ অনায়াসে দূর করা যায়। কেবল হিন্দুদিগকে অগ্রণী হইতে হইবে। হিন্দুরা ধর্ম্ম্য ব্যাপারে মিলনের পথ দেখাইয়া আসিয়াছেন। হিন্দুরা নানা দেশের ও জাতির সাধু ও অবতারদিগের মহত্ত্ব তুলনা না করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুর পক্ষে এখন অন্যান্য দিকেও এই ভাব বিস্তৃত করিবার সময় আসিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে শিষ্টাচারের প্রয়োজনের কথা বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ে মুসলমানদিগের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। ইহা তুচ্ছ নহে—পরন্তু ইহার গুরুত্ব অসাধারণ; কারণ, শিষ্টাচার মানুষের চিত্তজয়ের অন্যতম প্রধান উপায়।

জাতীয়তা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বুঝা প্রয়োজন। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় জীবনের যে কোন বিভাগে প্রকৃত ও আন্তরিক কাজে পুরুষের ও নারীর জাতীয় ভাবের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগের ও ত্যাগস্বীকারের দ্বারা আন্তরিকতার পরিচয় দেন, তিনি যে উপায়েই কেন কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করুন না, তিনি আমাদিগের শ্রদ্ধাভাজন। কারণ, বিদ্যাসাগরে যেমন—রমেশচন্দ্র দত্তে বা গোপালকৃষ্ণ গোখলেতেও তেমনই জাতীয় আদর্শে একাগ্র নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।* প্রাচীন

---

* রমেশচন্দ্র দত্ত এ দেশে বৃটিশ সরকারের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে সেই সরকারের সহিত সহযোগ করিয়া

ভারতীয়গণ যে ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, সেই ভাব তাঁহাদিগের এই বর্ত্তমান বংশধরদিগের কার্য্যেও দেখা যায়—সে ভাব আদর্শের জন্ম নিষ্ঠা ও ত্যাগস্বীকার। আমি দেখিয়াছি, যখন তাঁহার সঙ্গীরা আনন্দোৎসবে মত্ত তখন রমেশচন্দ্র দিবারাত্রি—বিশ্রাম বর্জ্জন করিয়া —দেশের জন্ম পরিশ্রম করিতেছেন।

সুতরাং যাঁহারাই কেবল কথা না বলিয়া প্রকৃত কাজে রত, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। যদি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রভেদ করিতে হয়, তবে কর্ম্মীতে কর্ম্মীতে প্রভেদ না করিয়া বাকসর্ব্বস্বে ও কর্ম্মীতে প্রভেদ করাই সঙ্গত। কারণ, মানুষের কাজই প্রকৃত জাতীয় ভাবের পরিচয়।

এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে—কার্য্যে এই অত্যাসক্তি কি আমাদিগকে সংসারে অধিক জড়িত করিয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিকতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না? উত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করিব—আধ্যাত্মিকতা কি? যদি তোমরা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করিয়া দৈহিক প্রয়োজন ও অভাবের অনুভূতি বর্জ্জন করিতে পার ও ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হও—তবে আমার তোমাদিগকে শিখাইবার কিছুই নাই—বরং আমি তোমাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারি। কিন্তু তোমরা কি আহারের, আচ্ছাদনের ও বিবাহের প্রয়োজন অনুভব কর না? যদি তাহা অনুভব কর, তবে তোমরা যে আধ্যাত্মিকতার গর্ব্ব কর, তাহা হইতে বহু দূরস্থ। আমি সাধুদিগের আধ্যাত্মিকতা বুঝিতে পারি এবং বুঝিতে পারি বলিয়াই যখন চীৎপুর রোডের একটি মসজেদের সম্মুখ দিয়া গমন কালে তখন তথায় যে মুসলমান সাধু বাস করেন—রৌদ্র, শীত, ক্ষুধা সব উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া ভগবচ্চিন্তায় সময় অতিবাহিত করেন—তাঁহাকে নমস্কার করি। কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার স্বজনগণের জন্ম আহার্য্য, আশ্রয় ও পরিধেয় সংগ্রহে ব্যস্ত, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা কি তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। সেরূপ লোকের পক্ষে শারীরিক বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়—জাতির বা দেশের কল্যাণ-সাধন জন্ম কার্য্য করা।

আধ্যাত্মিকতায় নির্ব্বিঘ্নতা ও নিষ্ক্রিয়তার আরোপ ঘৃণ্য ভ্রান্তি। যে মিথ্যা আধ্যাত্মিকতা কষ্টকে ভয় করে ও নির্ব্বিঘ্নতার জন্ম ব্যাকুল হয়, যুবকগণের পক্ষে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ-চেষ্টা করা প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। ঋষিরা তাঁহাদিগের জীবনে ও কার্য্যে আধ্যাত্মিকতার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঘৃণ্য আরাম বা নির্ব্বিঘ্নতা লাভের জন্ম জীবনের সংগ্রাম হইতে কাপুরুষের পলায়নের আদর্শ নহে। তাঁহাদিগের তপস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলে এ বিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান হইবে। আমার শেষ কথা—আধ্যাত্মিকতার নামে ঘৃণ্য আরাম-সম্ভোগের চিন্তাকে মনে স্থান দিও না, পরস্পরের সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা বর্জ্জন করিও এবং জাতির কল্যাণকল্পে একযোগে কাজ করিও।

রাখী-বন্ধন উপলক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত নিবেদিতার পত্র

"বিগত ৩০শে আশ্বিন বহুসংখ্যক বাঙ্গালী পরিবারে রন্ধন হয় নাই। অনেকেই উপবাস ও "ফলাহার" করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, বালক বহুসংখ্যক বাঙ্গালী নগ্নপদে রাখী বাঁধিয়াছিলেন ও ভারতের নানা স্থানে ও বিদেশে রাখী পাঠাইয়াছিলেন। অনেক বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিগণের হস্তে রাখী বন্ধন করিয়াছিলেন। মহিলা ও বালিকাগণও বাড়ী-বাড়ী গিয়া রাখী বন্ধন করিয়াছিলেন। 'প্রবাসী'-সম্পাদক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারে ২৯শে আশ্বিন রাত্রে এবং ৩০শে আশ্বিন প্রাতে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। যাহাতে ধর্ম্মের উপর স্বদেশপ্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্ম এই পরিবারে প্রার্থনা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ভগিনী নিবেদিতা হিন্দুস্থানী ও প্রবাসী বাঙ্গালিগণকে দিবার জন্ম নিম্নলিখিত পত্র সহ কতকগুলি রাখী বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। অনেক বাঙ্গালী ছাত্র নগ্নপদে বিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন।"—১৩১২ বঙ্গাব্দ 'সঞ্জীবনীতে' প্রকাশিত সংবাদ।"*

"With the compliments of Sister Nivedita

"Today, being the 30th Aswin, 16th October, 1905, partition of the Bengali people is to be made by law.

"This day, then designed to be the date of our division, is henceforth yearly, to be set apart by us, for the deeper realisation of our national unity. Having been made, by this threat of division, overwhelmingly conscious of the essential oneness of the whole Indian Nation, the heart of Bengal goes out to all parts of our common Motherland.

"Thus to you, from us of Bengal, is sent today this thread of Rakhi-Bandhan, in token, not merely of the union of provinces and parts of provinces but of bond that knits us all, as children of one Motherland, together.

"Bande Mataram.

"To Principal Ramananda Chatterjee, Editor, 'Prabashi' Allahabad,

"For distribution amongst suitable persons."

জাতির কল্যাণ-সাধনে অবহিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই সমসাময়িক রাজনীতি ক্ষেত্রে—"মডারেট" বা মধ্যপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

* পত্রটি শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল ইংরাজীতে লিখিত চিঠির অনুবাদ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলাম না।—সম্পাদক।

শ্রীশ্রীমা কি ও কে?

"মা ঠাকুরাণী যে কি, তাহা একমাত্র স্বামিজী বুঝেছিলেন। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী, তাহা আর কেহ বুঝে না। আর কাকেই বা বলি। তাঁর দয়া বুঝতে গেলে অনেক তপস্যার দরকার।"

—স্বামী অদ্ভুতানন্দের সৎকথা হইতে

পঞ্চবটী (দক্ষিণেশ্বর) —রবীন লাহিড়ী

শ্যামলী (শান্তিনিকেতন) —সি. কে. রায়
(প্রথম পুরস্কার)
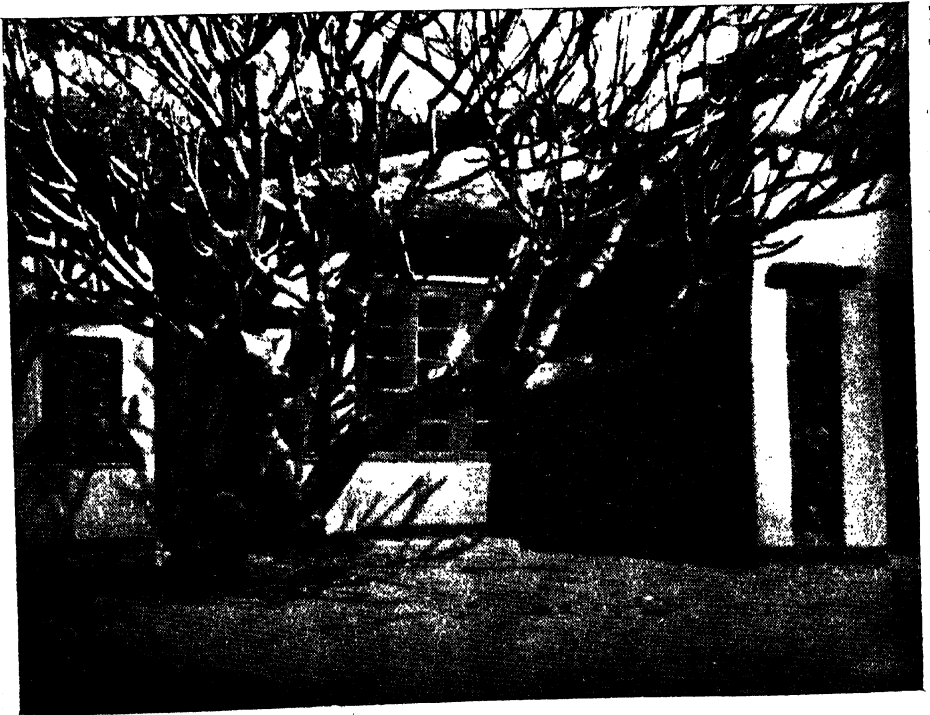
— আশীষ বসু
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

কাটাকুটি

হিজিবিজি
— স্মৃতিকুমার বসু

প্রতিযোগিতা

আগামী সংখ্যাতেও বৃক্ষ-বিষয়ক আলোকচিত্র মুদ্রিত হবে, কেন না বৃক্ষের প্রকাশযোগ্য প্রচুর আলোকচিত্র এখনও আমাদের দপ্তরে আছে।

দৃষ্টিকোণ

—অনুপম বসু
(তৃতীয় পুরস্কার)

উড়িষ্যার মন্দির
—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

জলকেলি
—অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

চীন দেখে এলাম
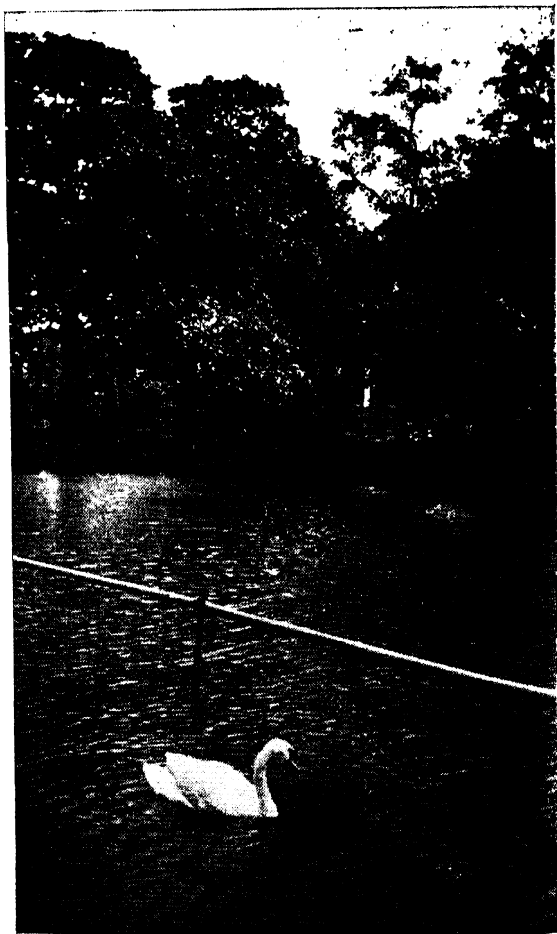
মনোজ বসু

দুই পুরানো পড়শি—মহাচীন আর বিশাল ভারত। হাজার হাজার বছর ধরে অচ্ছিন্ন সৌহার্দ্য। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে কত শতবার আমাদের গমনাগমন চলেছে! রণদুর্মদ সৈন্যবাহিনী নয়, প্রবীণ বিদগ্ধজন—হাতে জ্ঞানের মশাল, মুখে আনন্দ ও শান্তির পরম আশ্বাস। জ্ঞানগৌরবে দেদীপ্যমান আত্মসমাহিত সুপ্রাচীন দু'টি দেশ। নির্লোভ, আত্মসন্তুষ্ট।

ক্যাণ্টনে বুদ্ধ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে বটগাছ দেখলাম—শ্রমণ সগর্বে বললেন, ভারতবর্ষ থেকে এনে এ সব গাছ হাজার বছর আগে পোঁতা। আর বটগাছ শুধুই নয়—পুণ্য ও অহিংসার প্রতীক ঐ ভগবান বুদ্ধকে সর্ব সমর্পণ করে দেবতা জ্ঞানে তাঁরা পূজা করে আসছেন। হ্যাংচাউয়ে, শুনে এলাম, হ্রদ-পরিকীর্ণ একটা গোটা পাহাড়ই উড়ে এসেছে ভারত থেকে। সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ পিকিনে জমায়েত হয়েছিল। আদর আপ্যায়নের অবধি নেই—কিন্তু ভারতের খাতিরটাই যেন সব চেয়ে বেশি। ঠারেঠোরে এই কথাই প্রকট, আহা—তোমাদের কথা আলাদা, তোমরা হলে একেবারে আপনার লোক। হয়তো বা বাজারে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, সাধারণ লোক বিদেশির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—ভাষা জানি নে, কিন্তু সর্বাগ্রে একটি কথা রপ্ত করে নিয়েছিলাম—'ইন্দু' অর্থাৎ আমরা ভারতীয়। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জনতার মুখে উল্লাসের ঝিকিমিকি। মুহূর্তে তাদের হৃদয়ের মানুষ।

পিকিনের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অতি প্রাচীন আর বৃহত্তম। গ্রন্থাগারিক সহাস্য মুখে একটা জায়গায় এনে দাঁড় করালেন। ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন না, আর দোভাষী একটু দূরে ছিলেন সেই সময়টা। তবু মনোভাব বুঝতে আটকায় না। পরম যত্নে-রাখা অতি জীর্ণ এক পুঁথি—অক্ষর···দেবনাগরি নয়—বাংলাই। প্রাচীন বঙ্গাক্ষর। দোভাষী এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে।

পড়তে পারো? বলো তো কি লেখা আছে?

সে বিদ্যে নেই। তবু চিনতে পারি, এ আমারই আপনার জিনিষ—কত পাহাড়-সমুদ্র পার হয়ে এসে এদের মধ্যে পরম-সম্মানের স্থান নিয়ে আছে।

পাঁচ তারার আলোয় বিভাসিত নতুন-চীন চাক্ষুষ দেখে এলাম। স্থবিরত্বের খোলস ঝেড়ে ফেলেছে। চিরকালের বোঝা-বওয়া ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষগুলোর অপরূপ বীরমূর্তি! লোহার নাল-বাঁধা পঙ্গুপদ ছিল যে মেয়েগুলো—তাদের দাপাদাপিতে অস্থির আজ চীনের ভূমিতল।

নিমন্ত্রণটা এলো অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমাকে শান্তি-সম্মেলনের প্রতিনিধি করা হয়েছে। কেন হে বাপু? ভেবে-চিন্তে তো কোন গুণের হদিস পাইনে! রাজনীতির ধার ধারিনে, কোন দলে নেই। পড়ি এবং লিখি। যা সত্যি বলে মনে হয়, সেটাই লিখে প্রকাশ করি—কোন দাদার ধার ধারিনে যে যুক্তি-পরামর্শ করে রেখে-ঢেকে লিখতে হবে। এত সমস্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি যাবার জন্য তদ্বির-তাগাদা করছেন, তাঁদের ভিড় ঠেলে এ অভাজনের নাম ওঠে কেমন করে?

যে বন্ধুরা এসেছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরা যেতে পারছিনে—কিন্তু জানতে চাই সমস্ত কথা। যান আপনি—ফিরে এসে লিখবেন। সত্যি খবরগুলো পাবো, এই আমাদের প্রত্যাশা রইল।

তথাস্তু। মনে মনে ভারি লোভ ছিল—যে সব তাজ্জব কথা শুনি, কার না লোভ হয় বলুন। এই এক বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাই—আমার জীবনে বাসনার জিনিষগুলো কেমন আপনা-আপনি জুটে যায়। কত যে পেলাম, তার অবধি নেই।

১৮ই সেপ্টেম্বর রওনা হবার তারিখ। একেবারে দিনক্ষণ সাব্যস্ত করে দিল্লি থেকে ওঁরা প্যান-আমেরিকান প্লেনে জায়গা করে রেখেছেন। কিন্তু পাসপোর্ট-ভিসার ব্যাপার আছে—সরকারি ফাইলের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে এর মধ্যে? ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি চলেছে আমাদের। টেলিফোনে আর্তনাদ করছি, কি মশায়, যাওয়াটা পণ্ড করে দেবেন নাকি?

থানায় গিয়ে বললাম, এন্‌কোয়ারিটা তাড়াতাড়ি সমাধা করে দিন। খবর নিয়ে দেখুন, মনে এক মুখে আর নেই আমার। বই-টই পড়ার অভ্যাস এখনো যদি থাকে তো দেখবেন, কংগ্রেসের কথাই আছে অনেক বইয়ে—সেকালের সেই ত্যাগব্রতী সংগ্রামশীল কংগ্রেস।

খুব ভদ্রতা করলেন তাঁরা। ভরসা দিলেন, না না—আমাদের

রূপসী হংকং
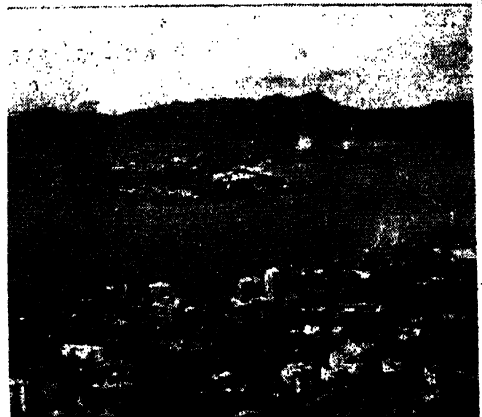
টাইগার প্যাগোডায় লেখক, নীলিমা দেবী ও পারেখ

এখানে আটকা পড়ে থাকবে না। কালকের মধ্যেই সেরে দিচ্ছি। তার পরে কপাল আপনার।

দিল্লি থেকে টেলিগ্রাম এলো, ভারত গবর্নমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গ কর্তাদের পাশপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জাঁদরেল এক সরকারি অফিসার—আমার পরম স্নেহভাজন তিনি—পাশপোর্ট হাতে নিয়ে এসে হাজির। আর তরুণ বন্ধুরা অস্থির করছিলেন—তাঁরাও ফোন করলেন, পেয়ে গেছেন পাশপোর্ট? এক্ষুণি তৈরি হন।

কিন্তু ওঠ বললেই বোঁচকা-কাঁধে বেরুব—অতখানি মুক্ত পুরুষ নই আমি। সবুর করো, দুটো-একটা দিন ফাঁক দাও। আঠারোই অন্ত কাউকে পাঠিয়ে দাও আমার জায়গায়।

তাই হল। ২১শে যাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা—মাঝে তিনটে দিন। একুশে রবিবার রাত্রিবেলা প্লেন ছাড়বে, টমাস কুক থেকে বলে দিল। এ নিয়েও বিভ্রাট হতে যাচ্ছিল। হেলথ সার্টিফিকেট ও ভিসা ইত্যাদির জন্য অশেষ হাঙ্গামা ও টানাপোড়েন চলল শনিবার (২০শে) সমস্তটা দিন ধরে। কি ভাগ্যে ঐ পথে একবার প্যান-আমেরিকান এয়ার-অফিসে গেলাম। জানা গেল, প্লেন ছাড়ছে সেই দিনই—রাত্রি সাড়ে-বারোটা, অতএব বিধান মতে তারিখটা একুশে হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রি দশটায় চৌরঙ্গি এয়ার-অফিসে হাজির হওয়া গেল। পাশপোর্ট দেখে-শুনে সাহেব ফিরিয়ে দিল।

আপনার যাওয়া হবে না।

অপরাধ?

হংকঙে নামবেন, তার ছাড়পত্র কই? এ তো দেখছি চীন ও গণ্ডা আজেবাজে দেশের নাম লিখে দিয়েছে। হংকং না হয়ে যাবেন কি করে?

কিন্তু অতগুলো টাকা গুণে নিয়ে টিকিট দিয়ে দিল—তারা একবার দেখল না?

টমাস কুক ভুল করতে পারে, আমরা পারিনে। পরশু সোমবারের দিন চেষ্টা করবেন—কিছু বাদ-সাদ দিয়ে ভাড়ার টাকা হয়তো ফেরত দেবে।

সাহেব মুখ ঘুরিয়ে পরের জনকে নিয়ে পড়ল।

আকাশ পথে আগেও ঘুরেছি, কিন্তু এমন মুশকিলে পড়িনি। লটবহর কাঁধে করে কোন লজ্জায় বাড়ি ফিরি এখন?

সাহেব!

দুঃখিত। আমাদের কিছু করবার নেই। হংকং লিখিয়ে নিয়ে এসো, তার পরে কথা শুনব।

নিশিরাত্রে পাশপোর্ট সংশোধনের জন্য কে জেগে রয়েছে কোনখানে? ব্যাপারটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল।

'কমনওয়েলথ কাণ্ট্রিস' বলে এই যে রয়েছে—হংকং নিশ্চয় এরই মধ্যে পড়ে যাবে।

সাহেব সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল।

আছে নাকি? কোথায়?

ঐ কথা ক'টা রবার-ষ্ট্যাম্পে ছাপা ছিল, বাকি সমস্ত হাতের লেখায়। কি না কি ছাপা আছে—পড়ে দেখেনি সেটা।

ঠিকই আছে তবে। বড় দুঃখিত।

তবে যে সাহেব ভুল হয় না তোমার?

সাহেব যেন শুনতেই পেল না আমার কথা। মাল ওজন করতে বলল লোককে। আমার অনেক বই নিয়ে যাচ্ছি পিকিন য়্যুনিভার্সিটিতে দেবো বলে। একটা প্যাকেট শাস্ত্রীর কাছে গছিয়ে দিলাম—তা সত্ত্বেও ওজন কিছু বেশি হল। কিন্তু সাহেব দৃকপাত করল না, আমার দিকে তাকালই না আর মুখ তুলে।

বাস এগারোটায় ওখান থেকে এরোড্রোমে রওনা হবে—হা হতোঽস্মি! প্লেনের নাকি খবর নেই। বারোটা বাজল, একটা বাজল—বসেই আছি, ঝিমুচ্ছি বসে বসে।

চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে অহরহ পরিভ্রমণ করে। আরও কিছু নতুন উপগ্রহ জুটেছে—তার মধ্যে পি. এ. এ. এবং বি. ও. এ. সি.-র প্লেনগুলি। চাঁদের মতো এদের গতিও সুনির্দিষ্ট—কোন কক্ষপথে কোথায় কখন উদয় হবে, টাইম-টেবলে ঘণ্টা-মিনিট ধরে ছাপা আছে। কি গোলযোগ ঘটেছে আজকে, প্লেন এসে পৌছচ্ছে না। নাঃ, ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনেক ভালো মানুষের চেয়ে—চাঁদের টাইম-টেবলে কখনো তো গোলমাল দেখিনে!

রাত প্রায় দুটো। ফোন বেজে উঠল। উঠুন—উঠে পড়ুন বাসে। খবর হয়েছে।

ঘনান্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। প্রবল ধারায় জল নামল এইবার। বন্ধ দরজা-জানলা কলকাতা শহরের রাস্তায় অসহায় আলোগুলো জলে ভিজতে লাগল। ঝড়-জল মাথায় করে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাস ছুটেছে।

ঘুমন্ত নগর-সীমান্তে সদাজাগ্রত দমদম। আকাশে উজ্জ্বল সতর্ক আলোর চোখ মেলে আহ্বান করছে আকাশচারী আগন্তুকদের। আসছে যাচ্ছে সমুদ্র-পর্বত দেশ-দেশান্তর পার হয়ে—দিন-রাত্রির মধ্যে তার আর বিরাম নেই। পৃথিবীটা এখানে অতি সঙ্কীর্ণ—আমেরিকা আর ইংলণ্ড নিতান্তই এপাড়া-ওপাড়া। দেয়ালে নানা দেশের পোষ্টার হাতছানি দিয়ে ডাকে। লাউড-স্পীকার যখন তখন বলে উঠছে, কায়রোর যাত্রীরা উঠুন এবার···চলে আসুন সিঙ্গাপুর···

দীর্ঘকায় শীর্ণদেহ এক বৃদ্ধ এলেন—কণ্ঠে মালার বোঝা, পিছনে অগণ্য লোক। ইনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে? খালি পা, গান্ধিটুপি মাথায়—তুষারশুভ্র খদ্দরের ধুতি-কোর্তা পরনে। পিকিনের বিষম শীত—এই সজ্জায় সেখানে টিকবেন ইনি কেমন করে?

এঁর সঙ্গে চলেছেন গুজরাট-বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক যশোবন্ত প্রাণশঙ্কর শুকলা এবং গুজরাটের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক উমাশঙ্কর যোশী। পরে একদিন তাঁদের কাছে সবিস্তারে শুনেছিলাম সত্তর বছরের এই বুড়া মানুষটির কথা। রবিশঙ্কর ব্যাস—গুজরাটের আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে মহারাজ নামে খ্যাত। গান্ধিজি তাঁকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন—তিনিও গান্ধিজির পরম অনুরাগী। জন-উন্নয়ন বিশেষ করে হরিজন সম্পর্কীয় কাজে নিবেদিতপ্রাণ। বল্লভভাই প্যাটেলের নামে ইস্কুল করেছেন।

মহারাজ শান্তি-সম্মেলনে যাচ্ছেন। পথের মধ্যেও লোকে কথা শুনতে চেয়েছে, তাই বক্তৃতা করতে করতে এসেছেন—কেন অতদূর শান্তি-সম্মেলনে যাচ্ছেন এই বয়সে! নিখিল পৃথিবীতে কখনো আর রক্তাক্ত সংগ্রাম হবে না—এই চেষ্টা হোক আজ সকল দেশে সর্ব মানুষের। গান্ধিজিরও এই বাণী। কলকাতা শহরেও গোটা দশেক সভায় বলতে হয়েছে মহারাজকে। সেকালের রাজা-মহারাজারাই সম্মান পাচ্ছেন, দেখতে পেলাম—কাষ্টমসের আড়গড়ার মধ্যে ঢুকেছেন, তখনো মালা দিচ্ছে ওদিক থেকে।

রাত্রির অন্ধকারে অবিরল বৃষ্টিজলের মধ্যে প্লেন সগর্জনে আকাশে উড়ল। অতিকায় ক্লিপার বিমান,—মেঘ ভেদ করে উঁচুতে, অনেক উঁচুতে চাঁদ-তারার এলাকায় টুঁ মেরে এঁরা ওড়েন। সাধারণ আর দশটা প্লেনের মতো মানুষের দৃষ্টি-সীমানার মধ্যে উড়ে বেড়ানো অপমানজনক এই জাতীয় প্লেনের কাছে। ঝড়জল দেখলে সেই স্তর ছাড়িয়ে আরও উপরে গিয়ে ওঠে, সেখানে গোলমাল বুঝলে নেমে এল হয়তো বা খানিকটা। আপদ-বিপদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে জঠর-অভ্যন্তরের মানুষ ও মালপত্র নিয়ে মহাব্যোমে দিনরাত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

তারা দেখা যায় কাচ দিয়ে—তারারা নিমীলিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। চোখ বুঁজে এল। হোষ্টেস এসে চেয়ার নামিয়ে সন্তর্পণে গায়ের উপর কম্বল ঢাকা দিয়ে গেল। চোখে না লাগে সেজন্য পাশের আলো নেবানো। মাঝখানের কয়েকটা আলো ক্ষীণ ভাবে জ্বলছে শুধু। ধরণীর অনেক ঊর্ধ্বে কত জনপদ অরণ্য পর্বত লঙ্ঘন করে রাত্রির শেষযামে গর্জন করতে করতে প্লেন ছুটেছে।...

ঘুম ভাঙল এক সময়। অলস চক্ষু মেলে পাশের কাচ দিয়ে তাকালাম। তখন উপলব্ধি হল, ঘরবাড়ি নয়—আকাশের উপরে শুয়ে শুয়ে চলেছি। খাড়া হয়ে বসলাম, চেয়ারটা দিলাম খাড়া করে। জানলা দিয়ে ভালো করে তাকাচ্ছি। ফর্সা হয়ে গেছে—সোনার রোদে ঝলমল করছে আকাশ। হাত-ঘড়িতে ছ'টা।

উঃ, কত উঁচুতে এখন! মেঘপুঞ্জের উপর দিয়ে উড়ছি! ঘুমুচ্ছে পরম শান্ত মেঘদল আরাম করে রোদে পিঠ দিয়ে। ছোট্ট খাতাখানায় লিখে রাখছি। তুলি দিয়ে এঁকে রাখবার মতো ছবিটা। সে হয়তো হোসেন সাহেব করছেন, আমার শক্তি নেই।

প্লেন নিচুতে নামছে। ভুবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ছুটছিলাম এতক্ষণ—ক্রমশ নদী আর খালের রেখা প্রকট হতে লাগল। হালকা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ—যেন পেঁজা-তুলো বিছিয়ে দিয়েছে আকাশ জুড়ে।

ব্যাঙ্ককে নামছি এবার। মাটি আরও স্পষ্ট হচ্ছে। সুদীর্ঘ সরল রেখার মতো সংখ্যাতীত খাল—দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বিসারিত। কয়েকটি মাত্র আঁকাবাঁকা—সেইগুলো নদী, মাটি কেটে বানানো নয়। পুরোপুরি জ্যামিতির দেশ। চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ—সমস্ত ভূমিতল যেন টানা-টানা রেখায় ভাগ করা। আমাদের গ্রাম্য ইস্কুলে কাঁদন-মাষ্টার মশায় জ্যামিতি শেখাতেন, ব্লাক-বোর্ডের উপর দাগ কেটে বোঝাতেন। উপর থেকে সারা দেশটা তেমনি ছক-কাটা দেখাচ্ছে।

অনেকেই জানলায় ঝুঁকে থাইল্যাণ্ড দেখছেন। শ্যাম নামে জেনে এসেছি এ দেশকে এতকাল—চারিদিকে সুশ্যামল রূপ—ঐ নামই আপনি মুখে এসে যায়। অজস্র ধানক্ষেত—শেষ নেই, সীমা নেই। মাঝে মাঝে ঝুপসি গাছপালা—সুশোভন, শ্রেণীবদ্ধ। কাত হয়েছে প্লেন—কোমরে বেল্ট বাঁধা, পড়ে যাবার ভয় নেই। নদী-নালা পথ-ঘাট ঘর-উঠোন—সমস্ত পৃথিবীটাই যেন কাত হয়ে পড়েছে এক দিকে। আরও নিচুতে নামছে প্লেন—খেলাঘরের মতো অগণিত ঘর-বাড়ি। না, আর লেখা চলবে না—ভূমিলগ্ন হল এবার...

শ্রীযুত উ—পাঁচটা ফ্যাক্টরির মালিক, তবুও নতুন-চীনের বিশিষ্টদের অন্যতম

দেখ কাণ্ড! ব্যাঙ্কক-এরোড্রোমের ঘড়িতে সাড়ে-আটটা বেজে রয়েছে। ঘড়িতে দম দেওয়া আমারও অভ্যাস নয়, প্রায়ই বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু সে হল একলা আমার ব্যাপার। এত লোকের আসা-যাওয়া এখানে—ছি-ছি, এইটুকু হুঁশ-জ্ঞান নেই! আমাকেও হার মানিয়ে গেল এরা!

না হে, ঠিকই আছে। সূর্যের পথ বেয়ে পুবের দিকে উজান চলেছি আমরা। আমার ভারতে সাতটা এখন—এ রাজ্যে সাতটা বাজিয়ে দিয়ে সূর্য পশ্চিমে ছুটেছে—দেড় ঘণ্টা আগে। চলেছি আমরা যে সব ঘণ্টা-মুহূর্ত অতীত হয়ে গেছে সেই অঞ্চলে। এমনি করে যদি যেতে থাকি! যেতে যেতে—ক্রমাগত গিয়ে পৌঁছব কি জীবনের অতীত দিনগুলোয়—কৈশোর ও বাল্যের পরম বিস্মৃতির মধ্যে যে মণি-মাণিক্যগুলো ফেলে এসেছি বহুবর্ষ আগে?

আজ সকালে অনেক মজুর এরোড্রোমে কাজ করছে, খোঁড়াখুঁড়ি চলছে চতুর্দিকে। ভাল রাস্তা হবে, নতুন আরও ঘর উঠবে—তারই আয়োজন। আমার গ্রামের বিলে রৌদ্র-বৃষ্টির মধ্যে চাষীরা যেমন টোকা মাথায় কাজ করে, মজুরদের মাথায় অবিকল সেই বস্তু। ফোটো তুলবেন না কেউ খবরদার—আগে থেকে বলে দিয়েছে। সত্যিই তো—কার কি মতলব, বলা যায় না। আর আমরা হলাম এক নম্বর দাগি আসামি—নতুন-চীনে চলেছি, কম্যুনিষ্টরা সেখানকার কর্তা। বললে কি হবে যে আমি লেখকমাত্র—রাজনীতিক নই। গল্প-উপন্যাসে ভেবে-চিন্তে মিথ্যে কথা লেখার অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু বেপরোয়া মিথ্যে বলতে বুক কাঁপে। তাই রাজনীতি ধাতে সইল না; রাজ্যপাট জুটল না, কলম পিশে খেতে হচ্ছে।

দেয়াল ঠেশ দিয়ে দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি, আর লিখছি একটু-আধটু। টিনের ঘর দূরে দূরে। এত গরম যে ঘাম ফুটেছে গায়ে। প্লেনের ভিতরে নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া—সেখানে কষ্ট হয় না।

ছবি মনে আসছে, নেতাজি যেদিন নামলেন এখানে। হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে এসেছিল বাইরের ঐ জায়গায়। আমরা ঘুণাক্ষরে জানতে পারিনি যে অনতিদূরে এত উৎসব-সমারোহ; আমাদের মুক্তির জন্য দেশি ফৌজ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলটা জুড়ে কুচ-কাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে! চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে এই বিমুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে সেই অতীত দৃশ্য মনে আনবার চেষ্টা করি।

পীক্ ট্রাম

কট-মট করে তাকাচ্ছে এরোড্রোমের এক অফিসার। পেন্সিলে যৎসামান্য দাগা বুলাচ্ছি—সেই জন্যেই নাকি? না-ও হতে পারে, মনের মিথ্যা সন্দেহ হয় তো! থাক গে, কাজ নেই এখন আর লিখে। এই রৌদ্রালোকিত দ্বীপময় মহা-ভারতের ছবি মনের পরতে আঁকা হয়ে রইল—আর কি প্রয়োজন?

বিশ্রামাদির পর প্লেনের খোপে ঢুকে পড়েছি আবার। নতুন যাত্রীও উঠল এখান থেকে, কয়েকটি মেয়ে-পুরুষ বিদায় দিতে এসেছে। রুমাল নাড়ছে তারা বেড়ার ওধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। একটা মেয়ে বড় সুন্দরী—বারম্বার চোখে রুমাল দিচ্ছে, কান্নায়-ভেজা করুণ চোখের দৃষ্টি। আমরাও সেই অভিনন্দন গ্রহণ করলাম নিজেদের মনে করে, কাচের এধারে তাদের উদ্দেশে রুমাল নাড়ছে আমাদেরও কেউ কেউ। প্লেন আবার আকাশে উঠে গেল।

অনেক বেলা—কিন্তু হাত-ঘড়িতে মাত্র সাতটা-পঞ্চাশ। ঘড়ি মেলাবো না এখন। আরও দূরে যাচ্ছি—হংকঙে সাড়ে-তিন ঘণ্টার তফাৎ ভারতের সঙ্গে। সেইখানেই একেবারে কাঁটা ঘুরাবো।

সিটের লাগোয়া একটুখানি টেবিল তৈরি করে নেবার ব্যবস্থা আছে। তার উপরে খাতা রেখে লিখে যাচ্ছি। পাশে পট্টনায়ক, উড়িষ্যার লোক—তিনিও লেখক। ওধারে মবলঙ্কর—তাঁর ব্যাগের উপর 'পার্লামেণ্টের মাননীয় স্পিকার' পরিচয় দেখে চমকে গিয়েছিলাম। পরে টের পেলাম, স্পিকারের ছেলে তিনি—বাপের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। মবলঙ্কর বারম্বার তাকাচ্ছেন আমার দিকে। অর্থাৎ, আকাশে উঠেও লেখা ছাড়ে না—কেমনতরো কলমবাজ হে? তাই বটে! দীনেশ সেন মশায়কে শ্মশানে নিয়ে দেখা গিয়েছিল, তর্জনী ও বুড়ো-আঙুলে কালির দাগ। দুটো দিন আগেও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে চাইনে। মবলঙ্করকে বললাম, সাদা কাগজে বিস্তর কালি মাখিয়েছি—মরবার কালেও কিছু তার কলঙ্কচিহ্ন নিয়ে যাবো, এইমাত্র কামনা।

মেঘ ভেদ করে ছুটেছি। বেলা দশটা তখন আমার ঘড়িতে। কত জনপদ কত পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে সমুদ্রের উপর এলাম। সুনীল প্রশান্ত মহাসাগর—এতটুকু বীচি-বিক্ষোভ নেই। অন্তত উপর থেকে দেখতে পাচ্ছিনে। পিকিন-হোটেলে খেতে খেতে আমাদেরই সহযাত্রী এক মহিলা এই সময়কার কথা বলেছিলেন, মা গো! সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন প্লেন যাচ্ছে, আমি তো ভয়ে কাঁটা! এখানে যদি পড়ে যায়, তবে আর ফিরে যেতে হবে না। আমি জবাব দিয়েছিলেম, তা ঠিক! ডাঙায় যদি প্লেন ভেঙে পড়ে, বেরিয়ে এসে কোন এক বাড়ি অতিথ হওয়া যেতো—কি বলেন?

ব্রেকফাষ্ট দিয়ে গেল। মহাব্যোমে ভাসতে ভাসতে আরাম করে গরম পরিচ খাচ্ছি। ভারি একটা অদ্ভুত কথা মনে আসে—কি মজা, ক্ষুধায় বিবর্ণ বিক্ষুব্ধ ধরিত্রী হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবে না আমাদের। কিম্বা বাজপাখির মতো পৃথিবী থেকে আরাম-আনন্দ ছোঁ মেরে নিয়ে নানান দেশের কয়েকটি বিচিত্র মানুষ শূন্যলোকে

সংসার রচনা করেছি। অদূরে একজোড়া মোটা সাহেব-মেম। মেমটিকে প্রথম দর্শনে লাবণ্য ও যৌবন-মতী মনে হয়েছিল। তখন বেলা আটটা। এখন সাড়ে-দশটায় কপালে বলিচিহ্ন প্রকট হয়েছে, রূপ-যৌবন ঝরে পড়ে গেছে। বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি একবার লাউঞ্জে গিয়ে ঘুরে এলো। একেবারে প্রস্ফুটযৌবনা—আগের চেয়েও চমকদার। ওদের লাবণ্য ভ্যানিটি-ব্যাগে কৌটো ভরতি প্রচ্ছন্ন থাকে। সাহেব আর মেম তু-জনেই, দেখছি, বাঁ হাতে কাজকর্ম করে। রাজযোটক আর কি! রাঙানো নখ মেম সাহেবের—সে আবার উ'খা জাতীয় এক বস্তুতে সাহেবের নখ ঘসে ঘসে সাফ করে দিচ্ছে। আর কি কাজ এখন ওদের ?

পাইলটের ঘর থেকে বার্তা এলো। প্লেন গতি বদলাবে এবার—চলছিল পূব-দক্ষিণে, এবার থেকে পূব-উত্তরে। নিচে তাকিয়ে দেখ, প্রবাল-দ্বীপপুঞ্জ। একটু নিচু দিয়েই চলেছে, যাতে সকলে দেখতে পায়। ঝুঁকে পড়েছি সকলে জানলা দিয়ে। সমুদ্র-জলের উপর বুঝি অজস্র মুক্তা ছড়িয়ে রেখেছে, রৌদ্রালোকে ঝিকমিক করছে। ঠিক নামই দিয়েছে—মুক্তা-দ্বীপপুঞ্জ।

চীন আর ভারত নিতান্ত পাড়াপড়শি। এবাড়ি-ওবাড়ির মাঝখানে একটুখানি পাঁচিল—হিমালয় পর্বত। প্রাচীনেরা সমুদ্র দিয়ে যেতেন, আবার এই পাঁচিল গলেও যাতায়াত করতেন। বৌদ্ধ শ্রমণরা এবং হুয়েন সাং, ফা-হিয়ান প্রভৃতির নখদর্পণে ছিল এই সোজা পথ। পশ্চিমি অক্টোপাসরা তার পর ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শত পাকে বেঁধে ফেলল—সোজা পথ একেবারে অগম্য হয়ে উঠল তখন থেকে। আর বন্ধ হল চিরকালের সহজ মেলামেশা। পাছে সকলে একজোট হয়, এই ভয়ে হয়তো। যুদ্ধের সময়টা সংক্ষিপ্ত পথ বেরিয়েছিল, আকাশ-পথে প্রায় ছ-ঘণ্টায় কলকাতা থেকে চীন পৌছানো যেত। রাস্তাও তৈরি হয়েছিল আসাম ও বর্মা হয়ে চীন অবধি। সে সব বাতিল। এখন বৃটিশ-এলাকা হংকং ঘুরে চীন যেতে হয়। যাওয়া উচিত সোজাসুজি উত্তরমুখো—কিন্তু আমরা যাই দক্ষিণ-পূর্বে, তার পর উত্তর-পূর্বে, এবং হংকং পৌছে পশ্চিমমুখো সেখান থেকে। অর্থাৎ, নাক দেখানো হচ্ছে কান ও মাথাটা বেড় দিয়ে।

হংকঙের কাছাকাছি একটু বিপদ। চারিদিক ঘনান্ধকার—দিন-তুপুরে অকস্মাৎ তুপুর-রাত্রি নেমেছে। প্লেন উঠছে, নামছে। ঝড়-বাদলের সঙ্গে লড়াই চলছে, ভিতর থেকে বুঝতে পারছি। গোত্তা মারছে ঝড়ের উপর, ঘূর্ণি-গর্তের মধ্যে পড়ে হু-হু করে নেমে যাচ্ছে এক-একবার। যাত্রীদের মুখ শুকনো। নামতে নামতে মাটিতে পড়ে যাবে নাকি এমনি ভাবে ? মাটিই বা কোথায়, সমুদ্র-জল। অনেক নিচুতে নেমে এসেছে এবার। সমুদ্রের প্রান্তসীমা দেখা দিয়েছে। পাহাড়—ধাপে ধাপে অগণ্য ঘর-বাড়ি, আকাশ-ছোঁওয়া বড় বড় প্রাসাদ। সমুদ্রের খাড়িতে সংখ্যাতীত নৌকা-জাহাজ, এপারে-ওপারে বিচিত্র জনপদ। হংকঙে এসে গেছে তবে। ঐ তো বিমানঘাঁটি। মানুষজন সুস্পষ্ট দেখছি, চলাফেরা করছে শহরের রাজপথে—আমরা নামতে পারছিনে বাতাসের গতিবেগে, শহরের উপরে চক্রাকারে ঘুরছি। মৃত্যুর পর নিরালম্ব প্রেতদলের মতো। প্লেন আবার উঁচুতে উঠে দূরে চলে গেল। আধ ঘণ্টারও বেশি এমনি লক্ষ্যহীন ঘুরে ঘুরে ফাঁক বুঝে এক সময় নেমে পড়ল।

ঠিক হংকং নয়, হংকঙের উল্টো পারে—কাই-তেক বিমানঘাঁটি। ঘড়িতে একটা। সাড়ে-তিন ঘণ্টা এগিয়ে সাড়ে-চার করে দিলাম।

কাষ্টমসের আড়গড়া পার হয়ে বেরুচ্ছি—

আসুন। ভারত থেকে আসছেন আপনারা ? ক'জন আজকে ? উঠে পড়ুন ঐ বাসে। প্যান-আমেরিকান এয়ার-টারমিন্যালে নিয়ে যাবে। আমরা থাকব সেখানে। পথে অসুবিধা হয়নি তো ? আচ্ছা, হোটেলে গিয়ে কথাবার্তা হবে।

কয়েকটি চীনা যুবক। ইংরেজিতে তাঁরা আপ্যায়ন করলেন। সিংহুয়া সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের লোক—হংকঙে অভ্যর্থনার ভার এঁদের উপর।

ছোট দ্বীপ হংকং। চীনের মূল-ভূখণ্ড আর দ্বীপের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। মাইল তুয়েক হবে বড় জোর। এপারের জায়গাটার আসল নাম কৌলুন। এখানেই আছি আমরা—কৌলুন হোটেলে।

এই কৌলুন—এবং চীনের মূল-ভূমির অংশ আরও মাইল পঞ্চাশ বৃটিশের দখলে। অবাধ-বন্দর হংকং—আমদানি জিনিষপত্রে ট্যাক্স লাগে না, তাই অকল্পিতরূপ সস্তা। কিন্তু নতুন কারো পক্ষে সুবিধা নেওয়া শক্ত। দোকানদারদের চক্ষুলজ্জার বালাই নেই—ডবল কি তারও বেশি দর তো হেঁকে বসল, তার পর কত কমাবে কমাও। এক নজর দেখেই তারা খদ্দেরের ধরন বুঝতে পারে। গায়ক ক্ষিতীশ বসু ছিলেন আমাদের দলে—তিনি এক ঘড়ি কিনলেন। ঘড়ির গায়ে দর সাঁটা আছে পয়ষট্টি ডলার—সম্ভ্রান্ত দোকান, সিকি পয়সাও নাকি ওর থেকে কম হবার জো নেই। সেই ঘড়ি শেষ অবধি রফা-নিষ্পত্তি হল একত্রিশ ডলারে। সকলেই জিনিষপত্র কিনেছি দরাদরি করে—তবু শেষ পর্যন্ত খুঁতখুঁতানি থেকে যায়, আরও হয়তো কমে পাওয়া যেত।

এই আন্তর্জাতিক বন্দরে হাজার রকম মানুষের আনাগোনা। যেখানে সেখানে বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে—পকেটমার সাবধান! খেয়া-ষ্টিমারে পার হব, ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করছি—কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, ব্যাগ সামাল করুন আগে। কৌলুন হোটেলের ম্যানেজার দন্তোক্তি করলেন, মণিব্যাগটা অমনি আলতো ভাবে রেখে খানিকক্ষণ ঘুরে আসুন তো রাস্তায়—তার পরেও ব্যাগ যদি আপনার থাকে, তবে বলব বিবম বাহাতুর।

শুধু কি ওঁরাই, দেশবিদেশের যত বেপরোয়া আর স্ফূর্তিবাজেরা এসে জোটে। আগে সাংহাইও ছিল এমনি—নতুন-চীন ঝেঁটিয়ে পরিচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই ময়লা আরো বেশি জমেছে এখানে। ভাল লোক যে নেই, তা বলিনে; কিন্তু পাপচক্ষে অধিক দেখতে পেলাম না। হৈ-হুল্লোড় চলছে অহোরাত্রি। মদ ভারি সস্তা এবং মালেও অতি চমৎকার—এমনটি নাকি ত্রিভুবনে আর নেই। আমি নিতান্তই 'ও-রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'—তাই হলপ করে কিছু বলতে পারব না। তবে রসিক জনের স্বমুখে শ্রবণ করেছি। আর পণ্য-মেয়েদের ভিড়ে দিনমানেই পথ চলা দায়। এটা স্বচক্ষে দেখা।

যাবার সময় একটা রাত্রি মাত্র, কিন্তু ফিরতি মুখে পাঁচ-পাঁচটা দিন এখানে কাটাতে হয়েছিল কলকাতার প্লেন না পাওয়ায়। সেই সময় আসল মূর্তি দেখেছি। পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছিলাম।

অথচ চীনভূমিতে চল্লিশ দিন কাটিয়ে এসেছি—বলুক না ওরা, আরও গিয়ে থাকতে রাজি আছি।

হংকঙের ব্যাপার আগে ভাগে তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছি। চীনের প্রোজ্জ্বল কাহিনী শেষ করে তখন এসব বলবার আর রুচি হবে না। আমেরিকান ডলার ভাঙিয়ে হাতে বিস্তর টাকা। সমস্ত নিঃশেষে খরচ করতে হবে, এই মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে পথে বেরিয়েছি। আমি, ক্ষিতীশ, প্রখ্যাত শিল্পপতি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী নীলিমা দেবী এবং মাদ্রাজের সিনেমা-ডিরেক্টর কৃষ্ণস্বামী। ঘোরাঘুরিই সার, কিছুই কেনা যাচ্ছে না—দর শুনে আঁৎকে উঠতে হয়।

বৈদ্যনাথ এমনি সময় আঙুল দেখালেন, ভারতীয় পতাকা উড়ছে। নির্ঘাৎ সেখানে ভারতের মানুষ থাকে। সওদার ব্যাপারে তাঁরা সাহায্য করবেন।

তাই বটে! একটা ব্যাঙ্ক—ঢুকেই পারেখ মশায়ের সঙ্গে আলাপ হল। অত্যন্ত ভদ্র ও সদাশয়। হংকঙের পথে-ঘাটে সহযাত্রী হয়ে আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছেন। একটি বাঙালিও আছেন—শ্রীযুত মিত্র। কিন্তু কি কারণে জানিনে, তাঁকে তেমন কাছাকাছি পাওয়া গেল না।

রূপসী হংকং। ষ্টার কোম্পানির খেয়া-ষ্টিমার অবিরত এপার-ওপার করছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটো ক্লাস—ষ্টিমার ঢুকবার পথও দুটো। প্রথম পথে ঠিক উপরে পৌঁছে যাবে, দ্বিতীয় পথে নিচের তলায়। ঢুকবার পথে ভাড়াটা দিয়ে যাও জানলার খোপে, তার পর জাহাজে চেপে বসো। বসবার আরামপ্রদ ব্যবস্থা। কত লোক যে পারাপার হচ্ছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। এ ছাড়া মোটর-লঞ্চ ও অন্যান্য খেয়ার ব্যবস্থা আছে এদিকে-সেদিকে। ইচ্ছে হলে মোটর-লঞ্চ নিয়ে বেরোও প্রমোদ-ভ্রমণে—ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া ঠিক করা আছে। পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় অসংখ্য অট্টালিকা। ট্রাম আছে সেই চূড়া অবধি পৌঁছবার—মোটরের পথও আছে। ট্রামে যাওয়াটা ভারি মজার। পারেখ সঙ্গী আছেন—তাঁর কথা মতো রাত্রিবেলা চলেছি। আলোকোজ্জ্বল এপার-ওপারের শহর ও সমুদ্র অপরূপ দেখাচ্ছে।

এই পিক-ট্রাম (Peak Tram) এক বিস্ময়কর শিল্পকীর্তি। জায়গায় জায়গায় রাস্তা একেবারে খাড়া উঠে গেছে—আমরা কাত হয়ে পড়েছি বেঞ্চিতে। পাতলা জামা গায়ে ছিল—পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে উপরে উঠে হি-হি করে শীতে কাঁপছি। কনকনে হাওয়া বইছে গিরি-চূড়ায়। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে দেখলাম। নেমে আবার উষ্ণলোকে এসে বাঁচি।

আর এক দ্রষ্টব্য স্থান টাইগার পার্ক। সেখানে বুদ্ধ-মন্দির আছে—টাইগার-প্যাগোডা নামে খ্যাত। প্রচুর বিভবশালী এক চীনা ব্যবসায়ীর কীর্তি, ভদ্রলোকের বাড়িও এই পার্কের মধ্যে। কাজ শেষ হয়নি, যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ চালাবেন এই তাঁর ইচ্ছা। প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে কাজ চলছে। শুনলাম, সিঙাপুরে তাঁর বড় ব্যবসা—সেখানেও অবিকল এই রকম আর একটা পার্ক তৈরি হয়েছে। বাঘ ড্রাগন—এসব অতি-পবিত্র চীন অঞ্চলে, বাঘের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেইজন্যে। পাহাড়ের উপর পাথর কেটে কেটে তৈরি। দেব-দেবীর মূর্তি—ওঁদের পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে আমাদের দেবতাদের আশ্চর্য রকম মিল। দেয়ালে দেয়ালে অসংখ্য ছবি—আর বিস্তর সদুপদেশ। জুয়াখেলা, আফিং-চরস খাওয়া ও গণিকা-সঙ্গের দোষ দেখানো হয়েছে ছবির মধ্য দিয়ে। নতুন-চীনে এসব পথের পথিক কেউ নেই আজকাল, হংকং বলেই ছবি দেখানোর প্রয়োজন হয়েছে। পাপ করলে মৃত্যুর পর কি রকম সাংঘাতিক নরকভোগ করতে হয়, নানা রকম বীভৎস মূর্তির মাধ্যমে তা-ও আছে। বাংলা দেশে পটুয়ারা পটের শেষ দিকে পাপের শাস্তি দেখায়—সেই ব্যাপার।

সওদা করতে গিয়ে এক চীনা দোকানদারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পিকিন থেকে ফিরছি শুনে বলল, তুমি কম্যুনিষ্ট?

না।

আচ্ছা, বলো তা হলে কি দেখে এলে—

পাঁচ-দশ মিনিটে বলবার বস্তু তো নয়! তবু বললাম দু-একটা কথা। হংকং আর আসল-চীনে কতটুকুই বা দূরত্ব! অথচ কিছুই মেলে না—আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তোমরা যেন চীনের মানুষ নও, এ আর একটা দেশ।

দোকানি বলল, বাছাই-করা কতকগুলো জিনিষ তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আসল কিছুই জানো না। লোকের ভারি কষ্ট, সব কিছু ওরা কেড়েকুড়ে নিচ্ছে।

গলায় আঙুল ঘুরিয়ে কাটবার ভঙ্গিতে বলল, টাকা-পয়সা থাকলেই সাবাড় করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে—

এসব নতুন নয়, দেশে থাকতেও এমন অনেক শুনেছি। অথচ শ্রীযুত উ-ইয়ুন-চু'র সঙ্গে একত্র বেড়ালাম, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া। পাঁচটা ফ্যাক্টরির মালিক অথচ নতুন-চীনের বিশিষ্টদের এক জন তিনি—অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য। এমন ধনী আরও অনেক আছেন, তবে বেপরোয়া মুনাফা করবার উপায় নেই—এই যা। কিন্তু শুনছে কে? প্রোপাগাণ্ডার বিচিত্র মহিমা—অতি নিখুঁত তার কারুকর্ম। কান ও মন এমন বিষিয়ে দেয় যে এত কাছে থেকেও সত্যি খবর এরা শুনতে পায় না।

আবেগে একটা কথা না বলে পারিনে। ঐ যে মেয়েগুলো সেজেগুজে রং মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দিন নেই রাত্রি নেই, শীত নেই বর্ষা নেই, নানান দেশের বদমায়েসেরা কয়েকটা ডলার ছুঁড়ে দিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ওদের নিয়ে—ওরা তোমার নিজের জাত নয়, চোখের উপর দেখছ তবু অপমান গায়ে বেঁধে না তোমাদের?

লোকটা জবাব দিল না, হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার মুখের দিকে আর তাকাবে না, বুঝতে পারছি। কি-ই বা আছে জবাব দেবার!···

কোন জন্মে আমি কোট-প্যান্টলুন পরিনে, এবারে চীনের বন্ধুরা এক গরম স্যুট উপহার দিয়েছে। বাক্সবন্দি ছিল জিনিষটা। হংকঙে এসে দু-দিন পরে সেটা পরলাম। পিকিনের অত শীত ধুতি-পাঞ্জাবি-আলোয়ানে কাটিয়ে দিয়েছি, আর হংকঙের প্রায় গরম আবহাওয়ায় ঐ ভারী উষ্ণ সজ্জা গায়ে চাপিয়ে সাহেব সাজবার প্রয়োজন হল।

বুদ্ধিটা ক্ষিতীশের। মাল ওজন করাতে গিয়েছিলাম এয়ার অফিসে। চক্ষু কপালে উঠল। ত্রিশ কিলোগ্রাম বেখরচায় নিয়ে যেতে পারব। সেটা বাদ দিয়েও এত ওজন উঠেছে যে অতিরিক্ত শ'দুয়েক টাকা মালের ভাড়া দিতে হবে। অনেক জিনিষ উপহার

পেয়েছি, আর অনেক কিনেছি ওঁদের উপহারের টাকায়। সাতটা বইয়ের প্যাকেট তবু ডাকযোগে পাঠিয়ে এসেছি পিকিন থেকে।

কমাও—যে উপায়ে যত দূর পার ওজন কমিয়ে ফেল। ক্ষিতীশ বলল, ধুতি-পাঞ্জাবির কি-ই বা ওজন—ঐ স্যুটে সজ্জিত হয়ে কাঁধে ওভারকোট চাপিয়ে প্লেনে উঠবেন, তাতে বিস্তর ওজন কমে যাবে।

চমৎকার যুক্তি। কিন্তু স্যুট পরা আগে ভাগে একটু রপ্ত করে নেবার দরকার। নতুন-চীনের সার্বজনীন পোষাক এই রকম—কাটছাঁট অবিকল তাই। আমিই বলেছিলাম, দেবে তো দাও তোমাদেরই মতন। পোষাক পরে তোমাদের এই বিপুল উদ্দীপনার ছোঁয়াচ যদি লাগে মনে!

সাজসজ্জা সমাপন করে বেরুনো গেল। হোটেলের লোকজন কেমন-কেমন চোখে আমার দিকে তাকায়। রাস্তায় পড়েছি সেখানেও তাই। ভালই তো, পোষাকের দৌলতেই না হয় হংকং শহরে একটু অসাধারণ হওয়া গেল!

ব্যাপার কিন্তু আরো কিঞ্চিৎ ঘোরালো। এয়ার-টার্মিনাসে প্লেনের খবরাখবর নিতে গিয়েছি। জাতে ইংরেজ কি ইয়াঙ্কি জানিনে—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মাও-সে তুঙের তুমি খুব বন্ধু বুঝি?

বিরক্ত হয়ে বললাম, নিশ্চয়। নতুন-চীন যে দেখবে, সে-ই তাঁর বন্ধু হয়ে যাবে।

সে কিছু বলল না আর, নিজের মনে কাজ করতে লাগল। এক চীনা কর্মচারী এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত দিল। আর এক জনকে কি বলছে আমার অবোধ্য ভাষায়। অবস্থাটা অপমানজনক মনে হল। কাঁধ থেকে সজোরে লোকটার হাত ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, কি বলতে চাও তুমি? গটমট করে বেরিয়ে এলাম।

প্যাং-টাক-সেং সিঙুয়া সাংবাদিক-দলের নেতৃস্থানীয়—হংকঙে ওঁদেরই তত্ত্বাবধানে আছি। তাকে ঘটনা বললাম। প্যাং গম্ভীর হল। বলে, ও-পোষাক খুলে রাখ—প্লেনে উঠবার সময় পোরো। তার আগে দরকার নেই। চারিদিকে কত শত্রু ঘুরছে, কত দেশের গুপ্তচর! বেশি প্রকট হয়ে কাজ নেই এ জায়গায়।

স্তব্ধ হয়ে রইল এক মুহূর্ত। তার পর ধীরে ধীরে বলে, হংকং আমাদের নয়। দেখ না, আমরাই কি রকম অতিথ-জনের মতো রয়েছি।

ভৌগোলিক হিসাবে এক বটে, হংকং তবু চীন নয়। আমাদের যেমন পণ্ডিচেরি বা গোয়া—উঁহু, এরও চেয়ে নিঃসম্পর্কিত। ১৯৫০ অব্দে বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছিল নতুন-চীনের নায়কদের মেরে ফেলবার জন্য। তার উদ্ভব শুনতে পেলাম এই জায়গাতেই। কোন মানুষ কি মতলবে ঘুরছে, কে বলবে? কোরিয়ার লড়াইয়ে চীনের ভলান্টিয়ারদের উপর বোমা মেরে সৈন্যেরা এইখানে হাত-পা মেলে বিশ্রাম নেয়। তার জন্য আরামপ্রদ ঘরবাড়ি ও নানাবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। কত মতবাদের খবরের কাগজ, খবরের জোগানদারই বা কত বিচিত্র ধরনের! হংকঙেরই এক কাগজে বেরিয়েছিল, পিকিঙের শান্তি-সম্মেলনটা কম্যুনিষ্টদের একটা হৈ-চৈ মাত্র—মলোটোভ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। খবর তৈরি করতে জানে বটে! চিরজন্ম তো গল্প-উপন্যাস লিখে গেলাম—কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি, এতদূর কল্পনার দৌড় আমাদের নেই।

হংকং চীন নয়—নতুন-চীনে পা ছোঁয়াবার আগেই টের পেয়েছিলাম। হোটেলে সেই একটা রাত কাটিয়ে গিয়েছিলাম—তখনই। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল, পট্টনায়ক পাশের শয্যায় বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন। চারতলার বারাণ্ডার অনেক নিচে পিচ-ঢালা ঝকঝকে রাস্তা। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম অনেকক্ষণ। ওপারে পাহাড়ের উপরে লাল নীল সাদা আলোর বিচিত্র মালা পরে হংকং শহর রূপের বিভায় বিশ্ব আর আনন্দ-পিয়াসী দূর-দূরান্তরের মানুষজনকে হাতছানি দিয়ে প্রলুব্ধ করছে।

মোটরের সুতীব্র হেডলাইট জ্বলে উঠল হঠাৎ। সেই আলোয় দেখলাম, বৃষ্টিস্নাত রাস্তার উপর সৈন্যেরা আর মেয়ে কতকগুলো। আর রিকশা ছুটোছুটি করছে শিকার ধরবার আশায়। রিকশাওয়ালারা জাতে চীনা, কালো হাফপ্যান্ট পরা—আলোয় ঝকমক করছে তাদের ফরসা গায়ের রং। অন্তরাত্মা অবধি কেঁপে ওঠে—নিশিরাত্রে মনে হল, শহর নয়, ভয়াল অরণ্য—ডোরা-কাটা বাঘের দল রক্ত-ক্ষুধায় ক্ষেপে উঠেছে। দরিদ্র সর্বরিক্ত হতভাগ্য মেয়েরা, আর লালসাদুর্বল কাপুরুষ যুবার দল। অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল নরনারীর উৎকট হাস্যধ্বনিতে আকাশব্যাপ্ত হাহাকার উঠছে যেন। প্রশান্ত মহাসমুদ্র-তীরে আলোঝলমল রূপসী হংকং নগরীর নিঃসহায় নিশীথ-ক্রন্দন।*

[ক্রমশঃ।

* প্রকাশিত চিত্র কয়খানি শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত।

স্বামি-স্ত্রী সম্পর্ক ?

সারদামণি দেবী।—আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।—যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সত্য দেখিতে পাই।

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

রাজত্ব—রাজ্য, রাজতা, কর্তৃত্ব, রাজতী।
রাজধানী—রাজবাসদেশ, রাজপুরী।
রাজনীতি—রাজ্যপরিচালন বিদ্যা, রাজধর্ম্ম।
রাজন্য—ক্ষত্রিয়, রাজবংশোদ্ভব।
রাজপুত—রজপুত, রাজকুমার, ক্ষত্রিয়।
রাজমাহষী—পাটরাণী, রাজার প্রধানা স্ত্রী।
রাজযক্ষ্মা—ক্ষয়কাশ, ক্ষয়রোগ।
রাজর্ষি—উত্তম ক্ষত্রিয়, মুনিবিশেষ।
রাজলক্ষ্মী—রাজশ্রী, রাজার সম্পত্তি।
রাজস্ব—কর, রাজার ভূম্যাদিতে লভ্য।
রাজহংস—বৃহৎ হংস, রাজহাঁস।
রাজা—নৃপতি, ভূপ, ভূপতি, ভূস্বামী, নরাধ্যক্ষ।
রাজাদেশ—রাজাজ্ঞা, রাজানুমতি।
রাজাধিরাজ—সম্রাট, চক্রবর্ত্তী, অধিরাজ।
রাজাবলি—রাজশ্রেণী, রাজসমূহ।
রাজী—শ্রেণী, আবলী, আনুপূর্ব্বী।
রাজীব—(পদ্ম দেখ).
রাজ্ঞী—রাণী, রাজস্ত্রী, রাজপত্নী।
রাজ্য—ভূপাধিকার, শাসিত দেশ, জনপদ।
রাঢ়—অশিষ্ট, মূঢ়, দেশবিশেষ।
রাঢ়ি—রাঢ়ীয়, রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ।
রাণা—ঘাটের সোপান, পইঠা, সিঁড়ী।
রাতারাতি—রাত্রিকালে, নিশীথে।
রাত্রি—(যামিনী দেখ)
রাত্রিচর—রাত্রে ভ্রমণকারী, রাক্ষস।
রাত্রিযোগ—নিশীথ কালে, প্রদোষ কালে।
রাত্র্যন্ধ—রাতকাণা।
রান্না—রন্ধন, পাককরণ।
রান্নাঘর—রন্ধনগৃহ, পাকশালা।
রাব—নিনাদ, শব্দ, চীৎকার, ধ্বনি।
রামদূত—হনুমান, পবননন্দন, বায়ুপুত্র।
রামধনুক—শক্রধনুঃ, গাণ্ডী, মেঘধনুক।
রামা—মনোরমা, স্ত্রী, সুন্দরী, মহিলা।
রায়—উপাধিবিশেষ, রাজকুমার।
রায়বাঘিনী—কার্ঠী, ব্যাপিকা, মুখরা।
রাশি—স্তূপ, পুঞ্জ, সঞ্চয়, মেষাদিদ্বাদশ।
রাশিচক্র—মেষাদি গ্রহের গমন-পথ।
রাশিনাম—কর্ম্ম সময়েতে বাচ্য নাম।
রাশীকৃত—স্তূপাকার, সঞ্চয়ীকৃত।
রাষ্ট্র—রাজ্য, দেশ, চক্র, অতিপ্রকাশিত।
রাস—স্ত্রীর সহিত বিহার, লীলা, বিলাস।
রাহু—স্বনামখ্যাত নবম গ্রহ, বিধুন্তুদ।
রাহুগ্রস্ত—চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ।
রাহুপীড়া—রাহুদর্শন, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ।
রিক্ত—শূন্য, হীন, শুদ্ধোদর, শূন্য ভাব।
রিক্থ—পৈতৃক ধন, সম্পত্তি, দায়।
রিক্থী—উত্তরাধিকারী, রিক্থগ্রাহী।
রিঙ্গন—স্খলন, পতন, ভ্রষ্ট হওন।
রিঞ্জন—হর্ষন, তোষণ, আনন্দিত হওন।
রিঠা—বস্ত্রক্ষালনযোগ্য ফলবিশেষ।
রিপু—শত্রু, অরি, বিপক্ষ।
রিষ্ট—অশুভ, অমঙ্গল, হানি, রিঠা।
রিষ্টি—অশুভ, ক্ষতি, অপচয়, অভাব।
রীঢ়ক—পৃষ্ঠদেশের অস্থি, মেরুদণ্ড।
রীতি—রীত, নিয়ম, ধারা, প্রণালী।
রুই—বল্মীক, উইপোকা, কীটবিশেষ।
রুক্ষ—উগ্র, রুখা, কঠিন, কটু, কর্কশ।
রুক্ষী—ক্রোধী, উগ্রশক্তিবিশিষ্ট, রাগী।
রুখ—ক্ষীণ, ক্লিষ্ট, শূন্য, শুষ্ক, অতৈল।
রুগ্ন—পীড়িত, রোগগ্রস্ত, ব্যাধিত।
রুচি—ভোজনেচ্ছা, স্পৃহা, প্রবৃত্তি।
রুচির—মনোহর, সুন্দর, মনোরম।
রুটী—গোধূম পিষ্টকবিশেষ, রোটী।
রুদ্ধ—বদ্ধ, বেষ্টিত, নিষিদ্ধ, নিবারিত।
রুদ্র—সূর্য্য, শিব, দেবাংশ, প্রচণ্ড।
রুদ্রাক্ষ—জপমালাযোগ্য দানা।
রুধির—রক্ত, শোণিত, লোহিত, অসৃক্।
রুয়া—চালের প্রস্থবাঁশ, ডালিম বীজ।
রুষ্ট—ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত, কোপশীল।
রূঢ়—অশিষ্ট, কটু, চলিত, বিদিত।
রূপ—আকার, মূর্ত্তি, প্রতিচ্ছায়া, মত।
রূপক—উপমাযুক্ত, দৃষ্টান্তযুক্ত।
রূপবন্ত—সুন্দর, সুরূপ।
রূপসী—রূপবতী, সুন্দরী, মনোহরা।
রূপা—রূপ্য, রৌপ্য, রজত, চাঁদী।
রেঁদা—কাষ্ঠপরিষ্কারক অস্ত্র।
রেখা—চিহ্ন, লেখা, ছিদ্র।
রেখাভূমি—ভূগোলের মধ্যস্থল।
রেণু—ধূলা, পরাগ, বালুকা, কণা।
রেতঃ—রেতস, বীর্য্য, শুক্র।
রেফ—রকার, রবর্ণ, অর্কফলা।
রেবতী—সপ্তবিংশতি নক্ষত্র।
রেয়ো—রবাহুত, অনাহুত, অনিমন্ত্রিত।
রেল—সমূহ, মেলা, অপর্য্যাপ্ত।
রোওন—রোপণ, পোত্তন, বপন।
রোয়া—লোম, তনুরুহ, অঙ্কুর।
রোকন—আটকান, নিবারণ, রোধন।

[ক্রমশঃ।

মানুষ রামেন্দ্রসুন্দর

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

শশী বাবুর বাড়ী ছিল পাঁচথুপি। তিনি রামেন্দ্র বাবুর সতীর্থ। শেষের দিকে তিনি বিপণের হেড মাষ্টার। তিনি পটলডাঙার বাসায় এক দিন ব'সে আছেন, এমন সময় রামেন্দ্র বাবুর ভাগিনেয়ী শক্তি দেবী এসে হাজির। ছ'-সাত বছর বয়স তখন তার। রামেন্দ্র বাবু ভাগিনেয়ীকে ডেকে চুপি-চুপি প্রশ্ন করলেন, "উনি কে বল্ তো?" সপ্রতিভ ভাগিনেয়ী তেমনি মামার গলা চেপে ধ'রে কানে-কানে ব'ললো—"বঙ্কিম বাবু।" আর যায় কোথা, হাসির ফোয়ারা ছুটলো। শশী বাবু হাসি থামিয়ে ব'ললেন, "ঠিকই ব'লেছে তোমার ভাগ্নী। এখন যে বঙ্কিম বাবুরই যুগ।"

বড় কন্যা চঞ্চলা দেবীর বয়স তখন আট বৎসর। এক ফটো দেখিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"এ কার ফটো বল্ দেখি?" শুভ্র সুবৃহৎ শ্মশ্রু, আর তেমনি ধারা শুভ্র পরিচ্ছদ-পরিহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটো দেখে ব'ললো—"বাবা, উনি খুব রাগী না কি?" খুশী ধরে না রামেন্দ্র বাবুর। পরবর্ত্তী কালে তিনি নিজেই লিখে গেছেন, "আমার কন্যার রাগী বলা মোটেই ভুল হয় নাই। মুনি-ঋষিরা যে রাগী হয় ইহা রামায়ণ-মহাভারত পাঠের অভিজ্ঞতা।" তখন বাঙলায় অগ্নিযুগের সময়। প্রায়ই দেখা হ'তো সার গুরুদাসের সঙ্গে সভা-সমিতিতে। সভা-সমিতিতে সার গুরুদাস জাতীয় সঙ্গীত পছন্দ ক'রতেন না। এ নিয়ে মতদ্বৈধতা হ'তো তাঁর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের। এক দিন রবীন্দ্রনাথের নাম শুনে বললেন দুঃখ ক'রে, "তোমরা ত একই স্কুলের ছাত্র গো।" হঠাৎ এক দিন রামেন্দ্রসুন্দরের বাসায় এসে ব'ললেন সার গুরুদাস—"দেশ আজ চাইছে জাতীয় সঙ্গীত, কাজেই আমারই ভুল ব'লতে হবে।"

রামেন্দ্র বাবু বাড়ীর ভিতর গিয়ে ব'ললেন, "অতি বড় বিদ্বান সাধু-প্রকৃতির লোক ব'লেই আজ নিজের ভুল স্বীকার ক'রলেন।"

এক দিন বড় কন্যা চঞ্চলা দেবী তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "বাবা, আপনার চেয়ে বড় পণ্ডিত কে?"

কন্যার কথা শুনে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন পিতা। বার বার জেদ করাতে ব'ললেন,—"কার বিদ্যা আমার চেয়ে কম? একটা ছুতোরের যে বিদ্যা আছে, আমার কি তা' আছে?"

"না না বাবা, সে বিদ্যার কথা ব'লছি নে, আপনাদের মত বই-কাগজ নিয়ে লেখাপড়া জানা পণ্ডিত—।"

মুখের কথা শেষ না হ'তেই ব'ললেন—"কেন, ব্রজেন্দ্র শীল।"

ব্রজেন্দ্র শীল সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের একটা প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ থেকেই গেল, প্রায়ই তিনি ব'লতেন—"অত বড় বিদ্যার জাহাজের কাছে আমরা কিছু আদায় ক'রে নিতে পারলাম না। দুর্ভাগ্য আমাদেরই।"

বিচিত্র প্রসঙ্গের একটা আলোচনা সম্পর্কে জানবার জন্য লিখে পাঠালেন ব্রজেন্দ্র শীলকে। চিঠি নিয়ে গেলেন সাহিত্য পরিষদের রামকমল বাবু। সকালের দিকে শীল মহাশয় অধ্যয়ন তপস্যায় মগ্ন থাকেন। কেউ সে সময় তাঁর কাছে যেতে পায় না, এমন কি বাড়ীর লোকেও। হঠাৎ ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে রামকমল বাবু অপ্রস্তুত। ঘরের ভিতর পায়চারি করেন এদিক-ওদিকে। মানুষের কোনও চেতনা নাই। তখন রামেন্দ্র বাবুর চিঠিখানা ফেলে দিলেন টেবিলের উপর শব্দ ক'রে। বিরক্ত শীল চমকে উঠে প্রশ্ন ক'রলেন, "কি কাজ আপনার?"

প্রশ্ন শুনে উত্তর দিলেন তাড়াহুড়া ক'রে, "আমি রামেন্দ্র বাবুর পত্রবাহক।"

চিঠি কিছুক্ষণ দেখে বললেন শীল মহাশয়—"উত্তর আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।"

রামেন্দ্র বাবু সব শুনে প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্য্যের ভাণে ব'ললেন—"তুমি তপস্বীর অসময়ে তপস্যা ভঙ্গ ক'রেছ, কি হ'তো জান?"

হেসে রামকমল ব'ললেন, "আমি রামচন্দ্রের দূত, আমার আবার কি হ'তো?"

সেই সময় গল্প ক'রলেন রামেন্দ্র বাবু, "শীল মহাশয় আমাদের বহরমপুর কলেজে কিছু দিন চাকরি ক'রেছিলেন। গার্জ্জেন হ'য়ে থাকতেন বাসায় তাঁর দাদা। ছেলের অন্নপ্রাশনে দেশশুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ ক'রে বই নিয়ে ব'সে আছেন লাইব্রেরীতে। কে জানে তার আয়োজন! দাদা ভদ্রলোকদের আগমনের বহর দেখে বুঝলেন এ সব ভায়ার কীর্ত্তি। সন্ধান ক'রে ভায়ার খোঁজ পান না। অবশেষে কোনও রকমে সন্ধান ক'রে গলায় কাপড় দিয়ে জানতে চাইলেন ভায়ার কাছে, আমি কত লোকের আয়োজন ক'রবো বল।"

রাম বাবুর গল্প শুনে রামকমল বাবু হেসে আটখান, এই ভেবে যে, এক জন জন্মান্ধ আর এক জন জন্মান্ধকে রাস্তার সন্ধান দিচ্ছেন।

একটা মিটিং-এ রামেন্দ্র বাবু মায়াপুরী পাঠ ক'রলেন। আগে থেকেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ব'লে রেখেছিলেন, "এটা 'সাহিত্যে' প্রকাশ ক'রবো। যেন আর কাউকে দেওয়া না হয়।"

সভায় প্রবন্ধ পাঠ শেষ হওয়া মাত্র শৈলেশ বাবু (বঙ্গদর্শন) তাঁর হাত থেকে এক রকম ছিনিয়ে নিলেন প্রবন্ধটা তাঁর কাগজে প্রকাশ করবার জন্য।

এর পর তিন মাস সমাজপতি বাক্যালাপ করেননি রামেন্দ্র বাবুর সঙ্গে। রাগ ভাঙাতে হ'লো তিন-তিনটে প্রবন্ধ সমাজপতির বাড়ী ব'য়ে দিয়ে এসে।

বিশ্বকোষ-রচয়িতা নগেন্দ্র বোস জেমো-কান্দী এসেছেন কায়স্থ-সভার কাজে। রামেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রতে বেরিয়ে এলেন বৈকালের দিকে। কান্দী থেকে জেমো আসতে তাঁর প্রায় ঘণ্টা তিনেক লেগেছিল। যাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ত্রিবেদী মশায়ের বাড়ী যাব কোন্ পথে?"—একই উত্তর পান 'জানি না।' অগত্যা আরম্ভ ক'রলেন "রামেন্দ্র বাবুর বাড়ী।" এতেও সেই একই উত্তর: "কেউ ত নেই এখানে ও-নামের।"

ভাগ্যক্রমে দেখা হ'লো বসন্তলাল বাজপেয়ী মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের পিসে মহাশয়। তিনি ব'ললেন—"আপনি

রামেন্দ্রের বন্ধু, ক'লকাতার লোক। ও যে আমাদের এখানে নতুন বাড়ীর বড় বাবু, অগত্যা রাম বাবু।"

নতুন বাড়ী এসে দেখা পেলেন বড় বাবুর। সে কি হাসি! ইন্দুপ্রভা দেবী ভূরিভোজন করালেন নিজের হাতে রেঁধে। নগেন্দ্র বাবু ব'ললেন—"আমি খপরের কাগজে দেবো এই ভোজন-ব্যাপারের সংবাদ।" হেসে ব'ললেন রামেন্দ্র বাবু—"কাগজে দিলে বহু বাজে লোক জুটবে খাবার জন্য। তার চেয়ে বিশ্বকোষে দিলে স্থায়ী হ'য়ে থাকবে।" সে কী হাসি সেদিনে।

কান্দী রাজ-স্কুলের শিক্ষক আর আমাদের গৃহ-শিক্ষক শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায় সে-বার ক'লকাতায় সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতি-বার্ষিকীতে সামান্য দু'-চার কথা ব'লেছিলেন ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্বন্ধে সভাপতি ছিলেন রায় জলধর সেন বাহাদুর। কার্য্যসূচী ছিল কেবল মাত্র কীর্ত্তন। কোনও বক্তৃতা হবার কথা ছিল না। কিন্তু শ্রীযুত রায় তাঁর বন্ধু রামকমল বাবুকে বলেন যে, তিনি সভায় কিছু ব'লতে চান। রামকমল বাবু সভাপতিকে জানালেন যে, ত্রিবেদী মশায়ের প্রতিবেশী, আত্মীয় ও শিষ্যস্থানীয় এক ভদ্রলোক জেমো-কান্দী থেকে এসেছেন। তিনি কিছু ব'লতে চান। সভাপতি মহাশয় কার্য্যসূচীর ব্যতিক্রম হ'লেও বলবার অনুমতি দিলেন। আমরাও উপস্থিত ছিলাম সেখানে।

তিনি যা ব'লেছিলেন সব কিছু মনে না থাকলেও দুটি ঘটনার কথা বেশ মনে আছে। তিনি ব'লেছিলেন—"আচার্য্য দেবের জন্মভূমি মুর্শিদাবাদে জেমো-কান্দী হ'লেও তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র এই ক'লকাতা। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে আপনারা জানেন আমাদের চেয়ে বরং বেশীই। তবে আমি আজ যে কথা ব'লবো তা' বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এ তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের কথা এবং আজকার দিনে বিশেষ অনুধাবনযোগ্যও বটে।

ত্রিবেদী মহাশয় তখন রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ। পূজার ছুটিতে বাড়ী এসেছেন। তাঁর কান্দী স্কুলের এক জন প্রাচীন শিক্ষক বঙ্ক বাবু অসুস্থ সংবাদ পেয়ে তিনি দেখতে গেলেন তাঁকে। বঙ্ক বাবু তখন অনেকটা সেরে উঠেছেন। খোড়ো ঘরের বারান্দায় একখানা মাদুর পেতে ব'সে আছেন। হঠাং রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখেই আনন্দাতিশয্যে ব'লে উঠলেন—"আরে, এসো, এসো রাম এসো।"

রামেন্দ্র বাবু তাঁর নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কেমন আছেন মাষ্টার মশায়।" ব'লেই ব'সে প'ড়লেন দাওয়াতে মৃত্তিকাসনেই। ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বঙ্ক বাবু ব'ললেন—"আঃ, ছি রাম, ও কি ক'রছ? মাদুরে উঠে ব'সো না, মাটিতে ব'সলে কেন বাবা?"

ত্রিবেদী মশায় ব'ললেন,—"বেশ আছি মাষ্টার মশাই, আপনি ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন?"

বঙ্ক বাবু ব'ললেন—"না ছি, মাটিতে কি বসে!" তখন ত্রিবেদী মশায় ব'ললেন—"মাষ্টার মশায়, যে আসনে আপনি ব'সে আছেন, ও যে আমার ব্যাসাসন, ওখানে আমার বসা কি উচিত?"

তাড়াতাড়ি ছেলেদের নাম ধ'রে বঙ্ক বাবু ডাকলেন, "ও শশী, রমা, ওরে শীগগির একখানা কম্বল কি' মাদুর এনে দে, রাম আমার মাদুরে ব'সবে না।"

আর এক দিনের কথা। কান্দী স্কুলের হেড মাষ্টার হরিমোহন সিংহ রামেন্দ্র বাবুর শিক্ষক। তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর। রামেন্দ্রসুন্দর তত্ত্ব ক'রতে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"কেমন আছেন মাষ্টার মশায়?" "বাবা, জ্বর তো তেমন বেশী নয়; মাজা থেকে পা দুটো বড্ড কামড়াচ্ছে।" শুনেই ত্রিবেদী মশায় তাড়াতাড়ি পা টিপতে সুরু ক'রলেন। ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললেন হেড মাষ্টার—"আহা, করো কি, করো কি, তুমি যে ব্রাহ্মণ!" ত্রিবেদী মশায় ব'ললেন—"মাষ্টার মশায়, এ ত ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কথা নয়। আপনি গুরু, আমি শিষ্য।" নির্ব্বাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন হরিমোহন বাবু ছাত্রের দিকে।

রামেন্দ্রসুন্দরের কন্যা চঞ্চলা দেবী, আমার মামাতো দিদি। তাঁর লেখা ডায়েরি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তার থেকে কিছু উদ্ধৃত ক'রলাম:

"বাবা যত সব ভাল বই, আমার পড়ার যোগ্য পাঠিয়ে দিতেন আমার কাছে। বইগুলো তিনি লেখকদের কাছ থেকেই পেতেন। কবিগুরুর নূতন বই ছাপান হ'লেই Presentation copy আসতো বাবার কাছে। পড়া হ'লেই সুন্দর কবিতাগুলো লাল পেন্সিলে দাগ কেটে পাঠিয়ে দিতেন আমার কাছে বাঘডাঙায়। পত্রে লিখতেন, বর্ষার সময় তুমি দেশে থাক। সেই সময় বইগুলো খই মুড়ির মত কে খেয়ে নেয়।

"বাবার বাসার পাশেই রজনী গুপ্তের বাসা। দোষের মধ্যে তিনি কানে একটু কম শুনতেন। এ নিয়ে আমাদের দলে ঠাট্টা ক'রলে বাবা অভদ্র ব'লে আমাদিকে তিরস্কার ক'রতেন। এইটাই সব চেয়ে বাবার বড় গালাগাল। হাতে ফোড়া হ'য়ে গুপ্ত মহাশয় মারা গেলে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে দেখেছি বাবাকে।

"বাঙ্লা ১৩১৭।১৮ সালে বাবা পার্শিবাগানের বাসায় থাকতেন। সেই বাড়ীর বড় বারান্দায় সাহিত্যিক আসর ব'সতো। তাতে যোগ দিতেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই সব সুধী সমাগমে হাস্যরোল উঠতো। আমরা ভাবতাম এই বুঝি স্বর্গ।

"এই সময় ক্ষেত্র বাবুকে বাবা বেদান্তের কথা বাঙলায় প্রবন্ধাকারে লিখবার জন্য অনুরোধ ক'রতেন। প্রথম দিকে ক্ষেত্র বাবু বাঙলাতে লেখা তাঁর অভ্যাস নাই ব'লে আপত্তি জানাতেন। বাবারও জেদ, লিখতেই হবে তাঁকে। ব'লতেন, যেটা ভাল ভাবেই জেনেছ, কেন তা প্রকাশ করবে না? শেষ পর্য্যন্ত রাজি হ'লেন ক্ষেত্র বাবু। লিখলেন "অভয়ের কথা"। বাবার কাছে প'ড়ে শুনাতেন। বাবা উৎসাহ খুবই দিতেন, কিন্তু ব'লতেন এক-এক বার জায়গায়-জায়গায় ভাষাটাকে আর একটু সরস ক'রতে। 'মানসী'তে প্রকাশিত হ'ল ক্রমশঃ "অভয়ের কথা"। তার পর পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হ'ল। তখন ক্ষেত্র বাবুও রসের উপলব্ধি পেয়েছেন। আরম্ভ ক'রলেন লিখতে "ঠাকুরাণীর কথা"। প্রবন্ধাকারে 'মানসী'তে ক্রমশঃ প্রকাশিত হ'তে লাগলো। সে বইখানা আর শেষ ক'রে যেতে পারেননি তিনি। জুতার কাঁটায় পায়ের তলায় হ'ল সামান্য ক্ষত। পরিশেষে সেই ক্ষতই হ'ল সাংঘাতিক। পচন সুরু ক'রলো আর তাতেই তাঁকে চ'লে যেতে হ'ল পরপারে। বাবা তাঁর মৃত্যুতে খুবই কাতর হ'য়েছিলেন।

"বাবা একবার কবিগুরুর আমন্ত্রণে বোলপুর গিয়েছিলেন থিয়েটার দেখতে। ফিরে এসে থিয়েটারের কথা কিছু বলেন না।

বলেন কেবল কবির খাবারের কথা। সকল রকম খাবার বাবাকে দিয়ে তিনি বসলেন শুধু এক বাটি জল নিয়ে।

"আমার ছেলে জয়গোপাল আর আমার বোনপো নির্ম্মল বিকেল থেকে বাড়ীতে নেই। বাড়ীর লোক ভেবে কূল পায় না! তখন সিনেমার যুগ নয় যে সেখানে যাবে। বাবাও শুনতে পেয়ে দৌহিত্রদের জন্য অস্থির। তিনি চাকরদের সঙ্গে তাদেরকে ইস্কুল পাঠান, আবার আনিয়েও নেন তাদেরই সঙ্গে। চাকররা বলে আমরা ত রেখে গিয়েছি বাড়ীতে। তবে গেল কোথায়? সন্ধ্যা নেমে গেছে, দুজনেই গুটিসুটি হয়ে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রলো। ছেলেদের বাবু-দা উপরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রতীক্ষায়। ব'ললেন, ওরা সেলুনে চুল ছাঁটতে গিয়েছিল। আশ্চর্য্য হলুম আমরা, বাবা দেখছি সেলুনের খপরও রাখেন!

"মেজ বাবু দুর্গাদাস বাবু কচিৎ কোনও দিন থিয়েটার শুনতে গেলে চাকরদিকে ব'লে রাখতেন, তোরা একটু সজাগ থাকবি। দরজায় একটু শব্দ ক'রলেই খুলে দিবি দরজা। বাবু-দা যেন জানতে না পারেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, একটু খুট ক'রলেই ব'লতেন সেই রাত্রি বারোটায়, তোর মেজো বাবা এবার থিয়েটার দেখে এলো রে! আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতাম এই আত্মভোলা মানুষের খুঁটিনাটি ব্যাপারেরও এ রকম হুঁস দেখে!

"পটলডাঙার বাসায় এক সময় কাঁকড়া বিছের খুব উপদ্রব হ'য়েছিল। বাবা পর্য্যন্ত সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকতেন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীটির ভয়ে। কেউ যদি এসে ব'লতো—এই দেখলাম, কোথায় স'রে গেল। আর যায় কোথা ঘরশুদ্ধ তোলপাড়! বাবা রাত্রে ঘুমিয়ে আছেন, পাশেই মায়ের বিছানা। তিনি কানের মাকড়ি খুলে রেখে নিদ্রিতা। হঠাৎ বালিশ টানতে গিয়ে বাবার গায়ে এসে ঠেকলো একপাটি মাকড়ি। আর যায় কোথা, মুহূর্ত্ত মধ্যে চটি জুতা তুলে নিয়ে মারতে লাগলেন। টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলে দিলেন বিছানার বাইরে। এত বড় কাণ্ড ক'রেছেন ব'লতে যাওয়ায় স্ত্রী ব'ললেন, স্বপ্ন দেখতে হবে না, তুমি ঘুমোও। সকালে উঠে স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী কানের মাকড়ি পান না একপাটি। পরে দেখতে পেলেন টুকরো অবস্থায় খাটের নিচে। শাশুড়ীকে ডেকে এনে দেখলেন, কাঁকড়া বিছে মারা দেখুন আপনার ছেলের। হাসিতে ভ'রে থাকলো বাড়ী এই নিয়ে কয়েক মাসই।

"সন্ধ্যার দিকে ছাদে ব'সলেই বাবার সেই এক কথা। আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে ব'লতেন, ঐ দেখ আকাশের ছোট-ছোট তারা। ওরা আসলে কিন্তু ছোট নয়। ওর এক-একটা আমাদের এই পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। আর ঐ যে দেখছো ছায়ার মত লম্বা আকাশ জোড়া, ওর নাম ছায়া-পথ। আর এক নাম স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী। ওরি পাশে দুটো শ্বান অর্থাৎ কুকুর ব'সে র'য়েছে। আকাশে ক'টা তারা দেখা যায় জান? আমরা লক্ষ-লক্ষ বলাতে হেসে ব'ললেন, না ছ' হাজার।

"এক এক সময় ব'লতেন, জ্বর কত উপকারী মানুষের শরীরের পক্ষে। আমরা বুঝি না, লড়াই ক'রবার জন্য ঐ তাপ। শ্বেত কণিকা রক্তের মধ্যে কত ভাগ আছে তা'ও বুঝিয়ে দিতেন। শ্বেত কেন বোঝা যায় না তা'ও বুঝিয়ে ব'লতেন।

"কখনও কখনও প্রশ্ন ক'রতেন মাটির উঠান ভাল, না পাকা? উত্তর শুনে হেসে ব'লতেন, না গো, মাটিরই ভাল। মাটির উঠান সব রোগের বিষ নষ্ট করবার ক্ষমতা রাখে। গোবর দিয়ে একবার নিকান দিলে নিত্য শুদ্ধ হ'য়ে যায়। মাটির হাঁড়ি বাদ দিয়ে যেমন এখন এনামেলে রোগ টেনে আনছে, এও তাই।

"আমার শাশুরীর নাম দুর্গাতারিণী দেবী। আমি তখন শ্বশুরবাড়ীতে বাঘডাঙায় আছি। বাবার চিঠি পেয়ে শাশুড়ীকে দেখালাম। চিঠি দেখে তাঁর খুসী ধরে না: 'মা চঞ্চলা, তোমার মেয়ে ঘি এখন আমাকে একবারে দেখতে পারছে না। কারণ আমি গিরিজারও বাবা। আমার মুখ দেখতে পর্য্যন্ত ওর ঘৃণা হ'চ্ছে। ব'লছে মুখ ভেঙে দেবো, আমার পানে তাকিও না। ব'সে ছড়া কাটছে আমার মুখের সামনে—শ্বশুরদের ঘরখানি বেতের ছাওনি, তাতে ব'সে পান খান দুর্গাতারিণী।' দুর্গাতারিণী তাঁর বৈবাহিকার নাম, তিনি খাটে ব'সে পানও খেতেন। সেই খুসীতেই বাবা চিঠি লিখলেন আমাকে।

"বেদ-বেদান্ত, আকাশ-নক্ষত্র জানা পণ্ডিত আমাদের ঘরে আছে। কে বোঝে সে কথা! কান্দীর রাজারাও বাবাকে মস্ত বড় পণ্ডিত আর জেমো-কান্দীরই ছেলে ব'লে আমরণ তাঁকে তাঁদের ইস্কুলের মেম্বার রেখেছিলেন। যদিও তিনি আসতে পারতেন না কোনও সভাতেই একবারও।

"কান্দী রাজ-ইস্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন মস্ত বড় পণ্ডিত রামতারণ শিরোমণি মশায়। শুনতে পাই, তাঁর মত পণ্ডিত বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর কিছু দিন এ-ও হেড পণ্ডিতের কাজ ক'রতে লাগলেন। কান্দীর রাজা শরৎচন্দ্র শিরোমণি মশায়ের আসনে বসবার মত উপযুক্ত লোক ঐ পদে নিয়োগ ক'রবার জন্য ভার দিলেন বাবাকে। তিনি ব'ললেন, এক জন ভাল পণ্ডিত দিতে হবে ওখানে। বাবা লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে, এক জন ভাল পণ্ডিত কান্দীর স্কুলের জন্য দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের পত্র নিয়ে বাবার কাছে এলেন রমেশচন্দ্র বেদান্তবিশারদ। শিরোমণি মশায়ের মত না হ'লেও ইনিও বেশ পণ্ডিত লোক। সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাকরণেই শুধু নয়, বেদান্তেও। আঠার-বিশ বছর কাজ ক'রেছিলেন বেদান্তবিশারদ কান্দীর স্কুলে।

"কথাপ্রসঙ্গে তিনি ব'লতেন, আঠার বছরের উপর বেদান্ত প'ড়ে আমি বুঝতেই পারিনি কি প'ড়লাম, আর কি আছে ওর মধ্যে। বুঝতাম গিয়ে রামেন্দ্র বাবুর কাছে। অগাধ সমুদ্রের তলে কত মণি-মাণিক্য, কত রত্ন, কত কোহিনুর যে লুকিয়ে আছে তা বোঝা যায় না। এ দেশের লোক আজও চিনতে পারলো না রামেন্দ্রসুন্দরকে। অনেক খটকার কথা তাঁকে জানিয়েছি আর তার উত্তরও পেতাম মনের মত। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখতাম তাঁকে। এই যে আপন-ভোলা মানুষ, দেখে ত কেউ বুঝতেই পারে না যে, একটা বিদ্যার জাহাজ সামনে র'য়েছে। তাঁর মুখ থেকে যখন শুনতাম বেদান্তের কথা, সব সংশয়ের নিরাস হ'য়ে যেত।

"আমি দেখতাম, বাবা বাড়ীতে থাকতে দিদিমারা বিধি নিতেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কি রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মশায়ের কাছে। ওঁদের কাছ থেকে শুনে সংশয়-সঙ্কুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রতেন দিদিমারা বাবাকে, তুই যে আমাদেরকে বোটে নিয়ে যেতে চাস, সেখানে যে

শূদ্র-ভদ্র সকলেই একই কাঠের উপর খায়। বাবা ব'লতেন, বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ আছে কে বলে মা তোমাদের? কখনও বা দিদিমাদের সন্দেহ জাগতো, মুসলমান গাড়োয়ানরা গাড়ীর উপর ব'সে ভাত-মাংস খেতে-খেতে আসে আর সেই গাড়ীতেই থাকে নানা রকম গোলদারি জিনিস বাজারের। সন্দেহ ভাঙিয়ে ব'লতেন বাবা, দাম দিয়ে জিনিস কিনলে কি আর কোনও দোষ থাকে মা? কখনও বা বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ কোনও জিনিস ভুলক্রমে মুখে দিয়ে ফেললে তাঁরা ভয়ে অস্থির হ'য়ে প'ড়তেন। পণ্ডিতরা বিধি দিতেন প্রায়শ্চিত্তের। বাবা ব'লতেন—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা,
যস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ।

এই পুণ্ডরীকের নাম নিলেই ত অন্তর-বাহির সব শুদ্ধ হয়ে যায়। সর্ব্বভারতীয় পণ্ডিত জুটে বাবাকে বিদ্যাসাগর উপাধি দিলেও দিদিমাদের সংশয় যায় না, কি জানি ইংরাজি জানা পণ্ডিত, যদি ভুলই করে!

"দুঃখ ক'রে বাবা বলতেন, নবশাখার ভিতর যে সব জাতি বারো বৎসরের উপর আমাদের সেবা ক'রে চ'লেছে নিষ্ঠার সঙ্গে শুদ্ধাচারে, তাদেরকেও অন্ন স্পর্শ করবার অধিকার দিতে সাহস রাখে না যারা, তারা সব কেমন ধারা ব্রাহ্মণ? তিনি প্রায়ই ব'লতেন, বিধি মানুষই তৈয়ার ক'রেছে। দরকার হ'লে বদল ক'রবে মানুষই এসে। হুকুম দিতেন বিধবাদের অপারক পক্ষে একাদশীর দিন একটু ফল-জল মুখে দেবার। কে শোনে তখন ইংরাজিনবিশ পণ্ডিত বাবার কথা!

"এক-এক দিন গল্প ক'রতেন ব'সে বাড়ীর সকলকে নিয়ে। 'রামায়ণ ভাল না মহাভারত?' বুদ্ধিমানরা উভয় কূল রক্ষা ক'রে ব'লতেন দুয়েই ভগবানের কথা আছে, দুই-ই ভাল। ছাড়বার পাত্র নন বাবা। প্রশ্ন ক'রতেন, তোমাদের ভাল লাগে কোন্ বইখানা বেশী? অগত্যা ব'লতাম কোনও রকমে ভয়ে-ভয়ে সসঙ্কোচে রা-মা-য়-ণ। তখন প্রশ্ন ক'রতেন, কেন বল দেখি? উত্তর আমাদের জুটতো না।

"বাবা ব'ললেন—'রাম যে আমাদেরই মতো মানুষ। তিনি যে পূর্ণব্রহ্ম তা তিনি নিজেই জানতেন না। সে জন্য শাস্ত্র ব'লেছে তিনি আত্ম-বিস্মৃত। জেনে-শুনে তিনি দুঃখের বোঝা ঘাড়ে নিলেন। আমরা যা পারি, সেই রকম কর্ত্তব্যই জগৎকে দেখিয়ে দেবার জন্য। পিতৃসত্য পালন, বন্ধু-বাৎসল্য; আর সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য রাজা হ'য়ে দেখিয়ে গেলেন। মানুষ তো ছার, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ কেউ রামের মত অত কাঁদেনি। ভারতের মাটিতে তাই রামায়ণের এত আদর।' চুপ ক'রতেই আমি ব'ললাম, বাবা, মহাভারতে অমন কিছু নাই? হেসে ব'ললেন, 'থাকবে না কেন! মহাভারতের পুরুষ ত আত্ম-বিস্মৃত নন আমাদের মত; তিনি স্বয়ং ভগবান। তিনি গীতা-রচয়িতা। পঞ্চম বর্ষ বয়সেই আট হাজার গোপিনীর সঙ্গে রাসমঞ্চে লীলা ক'রেছিলেন তিনি। এককালে গোবর্দ্ধন ধারণ ক'রেছিলেন। মহাভারতের মহাযুদ্ধ সৃষ্টি ক'রে ব'সে রইলেন চুপটি ক'রে অর্জ্জুনের রথে। মুখেও ব'ললেন, কাজেও দেখিয়ে দিলেন শোক-দুঃখের অতীত পুরুষকে। নিজের বংশ ধ্বংস হ'তে দেখে প্রতিকারের চেষ্টা ক'রলেন না একটুও। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ হ'য়েও মৃত্যুবরণ ক'রলেন এক অন্ত্যজ ব্যাধের বাণে। এই মানুষটিকে আমরা ভগবান ব'লতে পারি, পূজা ক'রতে পারি, কিন্তু আমাদেরই মত এক জন মানুষ ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারি কি?' শুনে তাঁর মা চন্দ্রকামিনী দেবী ব'ললেন—আমাদের রাম মানুষকে খুব বেশী ভালবাসে।

"কার্য্যক্ষেত্রে দেখতামও তাই। সন্ন্যাসীর বেশে ভগবানকে পেতে ইচ্ছুক এমন মানুষকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। ব'লতেন রাগ ক'রে, এরা পলাতক। একদিন আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, বাবা, আপনার ভূতের ভয় আছে? 'ভূত নাই তা' ভূতের ভয় লাগবে কেন?' বাবা, কিসের ভয় আপনার আছে, জিজ্ঞাসা করায় অনেকক্ষণ চুপ থেকে ব'ললেন—'প্রাণের চেয়েও মানের ভয় বেশী। আমি প্রত্যক্ষ ক'রেছি তারই গল্প শোন :—

"তখন আমার ক'লকাতার বাসায় প্রথম অভয়া এসেছে। তার তখনও বিয়ে হয়নি। অভয়া লালগোলার রাজা ধীরেন্দ্র-নারায়ণের মা। বাবাকে ব'ললো, মামা, আমি ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যাব। মা-ও ব'ললেন, নিয়ে চল না ওকে। এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন মা। অভয়া পরামর্শ মত ব'ললো, মামা, ব্যাণ্ড বাজনা শুনবো। এই ক'রতে একটু রাত হ'য়ে গেল। হঠাৎ এক সাহেবের বাবুর্চি আমাকে ব'ললো, বাবু, আপনারা এখানে ব'সে র'য়েছেন, আপনারা কি পাগল, গেট বন্ধ হ'লে আর কি বেরুতে পারবেন? বেশী মদ খেলে সাহেবদের কি জ্ঞান থাকে? সত্যিই সাহেবরা এসে তখন শেকহ্যাণ্ড ক'রতে চায় মেয়েদের কাছে। চৈতন্য হ'ল আমার, তখন গিয়ে দেখি গেট বন্ধ হ'য়ে গেছে। বাবুর্চি আমার পিছু ছাড়েনি। সে ব'ললো, বাবু আপনি গেট টপকাতে পারবেন? অসম্ভব বুঝে চুপ ক'রে রইলাম। স্ত্রী ব'ললেন, কেন পারবে না? আমরা নেমে ওঁকে নামিয়ে নেবো। হ'লও তাই; বাবুর্চিকে আমার ব্যাপারে অনেকটা সাহায্য ক'রতে হ'য়েছিল। বাবা ব'ললেন, আমি দিব্যচক্ষে দেখলাম, নিজের প্রাণের চেয়ে মান কত বেশী দামী। চঞ্চলা, তোর মনে নাই। ১৩০১ সালে আমরা মুঙ্গের গিয়েছিলাম চেঞ্জে। আমাদের বাসা হ'য়েছিল রাণী আন্নাকালীর বাড়ীর কাছেই। তোর মার, আমার, আমার সেজ ভাইয়ের শরীর সারলো। অনেক সাহিত্যিক বন্ধু আসতেন ব'লে আনন্দেই দিন কাটতো। হঠাৎ দৈব-বিড়ম্বনায় সেজ ভাইয়ের কলেরা হ'ল। বিদেশে ভাইকে নিয়ে আমি ভেবে অস্থির। বন্ধুরা তখন সব কর্পূরের মত উবে গেছে। ভাই দুর্গাদাসকে, আর ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারকে তার ক'রলাম আসবার জন্য। মজুমদার সাহেব গাড়ী ফেল ক'রে এলেন মালগাড়ীতে চেপে। ব'ললেন, বিদেশে আপনার বিপদ শুনে থাকতে পারি? দুর্গাদাসও এলো ছোট-মা'কে নিয়ে। শত চেষ্টা ক'রেও ডাক্তার বাবু বাঁচাতে পারলেন না রোগীকে। রাত আটটার সময় প্রাণত্যাগ ক'রলো রামকমল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট। বাহ্যজ্ঞান নাই আমার। কেমন ক'রে মৃতের ঠিক মত সৎকার হবে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে। ভেবে অস্থির। কোন রকমে আঠার বছরের ভাই দুর্গাদাস মৃতের সৎকার-ক্রিয়া শেষ ক'রলো। সে দিনও বুঝেছিলাম প্রাণের চেয়ে মান কত বেশী।

"শরীর তখন ভাল থাকছিল না বাবার, প্রায়ই বোটে বেড়াতে যেতেন গঙ্গার উপর। মাসাধিক কাল আছি আমরা সবাই গঙ্গার

উপর। তার মধ্যে একটা যোগে বাবাকে ব'ললাম, বাবা, পুজো হ'য়ে গেছে। আপনি ডাব, কলা আর পয়সা মা গঙ্গাকে দেন। বিস্মিত হয়ে বাবা ব'ললেন, গঙ্গায় পয়সা, ডাব, কলা ফেলে দেব? কেন? ব্রাহ্মণ তখনই প্রশ্ন ক'রলেন, আপনি কে? বাবা নিজের নাম ব'লতেই প্রণাম ক'রে ব্রাহ্মণ উধাও হ'লেন।

"বাবা শেষ বারের মত ক'লকাতায় যাবেন। ১৩২৬ সাল। মা জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রছেন আগেকার দিনেরই মত। মধ্যে-মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন সন্দেহ মেটাবার জন্য, তেঁতুল তু' মণ নেবো ত? হেসে বাবা বলেন, কেন নেবে না, থাকতে হ'লে খেতে হবে ত! বাড়ীর লোকের কেমন যেন ভয়-ভয় হয়, এত কথা বলেন কেন? তাঁর যেন সব লুকানো কথা উজাড় ক'রে দিতে চান।

"পিসীমাদেরকে ও আমাকে ডেকে ব'লতে লাগলেন, এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবো। ছোট বাবা (উপেন্দ্রসুন্দর) নিয়ে গেলেন আমাকে বহরমপুর। পরামর্শ হ'ল চার জন মাত্র ছাত্র একসঙ্গে যাবে। ভিড় বেশী করা হবে না। আমাদের রাঁধবার জন্য খুবিলাল তেওয়ারী মশায়কে সঙ্গে নেওয়া হ'ল। তাঁর রাঁধার গল্প শুনে আমার খুসী ধরে না। জিভে জল সঞ্চার হচ্ছিল ব'ললেও বোধ হয় অতিরঞ্জন হবে না। বেগুন ভর্ত্তা, আলু ভর্ত্তা হবে। পাতে প'ড়লে দেখলাম চিবাচবিত বেগুণ-পোড়া আর আলু-সিদ্ধ। ছোট বাবা বহরমপুর গিয়ে যে ছেলেকে অথবা তার গার্জ্জেনকে দেখতে পান, নিমন্ত্রণ ক'রে বসেন। শেষকালে দেখা গেল, সত্তর-আশীর কম এক দিনও হয় না নিমন্ত্রিতের সংখ্যা। তেওয়ারীজি বিরক্ত হয়ে বললেন, তু কি সব সহর নিমন্ত্রণ করবি? সে কি হাসি ছোট বাবার!"

শেষ বারে রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতা যাবার আগে ইন্দুপ্রভা দেবীর অন্তরাত্মা যেন তাঁকে কানে-কানে ব'ললো, রাম-হারা হ'য়ে থাকতে হবে এবার তোকে। তখন তিনি ব'ললেন মনের বল এনে স্বামীকে—"আমার কি করলে তুমি? কলকাতায় একখানা বাড়ী ক'রে গেলে না! সম্পত্তির কিছু ক'রে গেলে না। নাতিরা মা-মরা শিশু, খপর রাখো?"

সব ক'টা প্রশ্ন একের পর এক শুনে ব'ললেন, "এত দিন এক-সাথে সংসার ক'রে ঘর-কন্না, বাড়ী, বিষয় দেখার লোক আমাকে বুঝলে? তুমি শুধু রাজকন্যা নও তুমি রাজরাণী, তোমার আবার ভয় কি?"

অসহ্য গরম, বৃষ্টি নেই। মাঝের কলাপাতায় শুয়ে আছেন রামেন্দ্রসুন্দর। মানুষ প্রশ্ন করলেই বলেন হাসিমুখে, "আমি এখন শকুন্তলা হয়েছি গো!" বাড়ীর লোকে বুঝলেন এবার ক'লকাতা নিয়ে যাবার সময় হয়েছে। গুরু-বাড়ীতেই থাকেন। গুরু দেখা করতে এলেই এক কথা—"শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চনঃ। আপনার কৃপা কই গুরুদেব?"

"একটা কথা আজকাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাজকীয় শাসনে চারিদিকে আমাদিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে যখন হিন্দু রাজা হিন্দুরাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তখন আমাদের জাতীয় অবস্থা সমধিক উন্নত ছিল, অনেকে এ কথা অস্বীকার করেন না; অন্ততঃ হিন্দুজাতির পুরাবৃত্তের অভাবে এ কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক যতক্ষণ ইচ্ছা চালান যাইতে পারে। কিন্তু গত কয় শত বৎসরে আমাদের দুর্দ্দশার যে একশেষ ঘটিয়াছিল, এবং বর্ত্তমান কালে আমাদের সামাজিক জীবন সঙ্কটাপন্ন মুমূর্ষু অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা এক রকম সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। এই নবজীবনসঞ্চারের কয়েকটা বড়-বড় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা প্রধান লক্ষণ, আমাদের জাতীয় রুচির পরিবর্ত্তন ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ। বেহুলার নাচ দেখিয়া স্বর্গের দেবগণ যত দূর তৃপ্তিলাভ করিতেন, আমরা মর্ত্ত্যদেহ ধরিয়াও কোনরূপেই ততটা পারি না। এখন বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের হাতে মানব-জীবনের উৎকট সমস্যাগুলার আলোচনা কবিতাকারে দেখিতে চাই। দ্বিতীয় একটা লক্ষণ, আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপন এবং তৎসহকারে স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রয়াস।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এক শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে কলির প্রকোপ সহসা এত দূর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর পরমায়ুঃ একেবারেই পঁচানব্বই হইতে পঁয়ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ধর্ম্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটি একেবারে চিরদিনের মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের সামাজিক গগনের পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত হরিদশ্বগণের রশ্মিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইয়া দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না। বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয়সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিতে চাহি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বঙ্কিমের প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু আশা করি, নবীনচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের তুলিকা অক্ষয় হইয়া আমাদের চিত্তবিনোদনে ও সন্তাপহরণে নিযুক্ত থাকিবে।"

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নিবেদিতা

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিষ্যা

মার্গারেটের 'পরে অসামান্য প্রভাব পড়েছিল বিবেকানন্দের। তার মনে হ লাগল, এবার বাদ-বিতণ্ডার শেষ। নিজেকে শিষ্যা বলে স্বীকার করতে বাধা, এমনি ণা হয় মার্গারেটের। কোনও দিক থেকে উ যে এর জন্য চাপ দিচ্ছে তাকে, তা নয়। চ্ছায় সে নতি স্বীকার. করছে। কোনও জ আধা-খেঁচড়া করে রাখা তার স্বভাব নয়। ক্ষায় যাকে সত্য বলে জেনেছি, জীবনে তাকে গ্রহে বরণ করে নেব না—এমন ভীরু তো নয়।

বিবেকানন্দ নীরবে চেয়ে দেখেন।···ও সে তাঁকে দেখতে। তাঁর মুখে একান্ত হিতৈষীর চ টুকরো করুণ হাসি ; ঐ যেন দুজনের মোচন গ্রন্থি। ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর তেজোদৃপ্ত ভাবের জোরে দুঃসাহসীর মত তাঁর সামনে এসে প্রশ্ন করে। নিজের ব্যক্তিত্বকে ও খাটো রতে রাজী নয়। তিনিও কখনও মার্গারেটকে মার শিষ্যা বলে উল্লেখ করতেন না, জানতেন সময় এখনও আসেনি। কিন্তু ওর ভবিষ্যৎ ম্ভাবনা যে উজ্জ্বল সে কথা সপ্রশংসায় বলতে তাঁর ধত না। সঙ্কীর্ণ অহং-এর অন্তরালে, তিনি খেছিলেন ওর দীপ্ত স্বরূপ। ওর অন্তরৈশ্বর্যের বর ও নিজে রাখে না। ওর চরিত্রের আশ্চর্য বেগ, দুর্জ্ঞেয় পরম সত্যের প্রতি ওর সহজ শ্বাস, এগুলো তিনি তখনই ধরতে পেরেছিলেন। রতের কাজ করতে যেমন মেয়ে তাঁর দরকার, ঠিক তেমনটি। কিন্তু যে-ফল আপনি পরিণতি লাভ করছে তাকে নিয়ে তাঁর গর্ব করার কী আছে? ওর অন্তরে যে ভাবের বীজ পুষ্ট হচ্ছে, হয়তো তা একদিন তাঁর কাজে লাগবে এই পর্যন্ত।

১৮৯৫-এর নবেম্বরে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় চলে গেলেন। উনি চলে যাওয়াতে মার্গারেটের আফশোষ হল বটে, কিন্তু তেমনি একটা অপ্রত্যাশিত অবসরও মিলল যেন। ওঁর প্রভাব ওকে অহরহ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এইবার তা থেকে মুক্তি পেয়ে ও ভাল করে ভেবে দেখতে চায় নিজের অবস্থাটা। কী কী করতে হবে রীতিমত তার একটা খসড়া ছকে নিয়ে, স্বামীজি যে-ভাবে বলে দিয়েছেন সেই ভাবে তাঁর দার্শনিক ভাবধারাটা ও খুঁটিয়ে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। সে-বারের শীতকালটা ছিল মনোরম। ও কিন্তু সব আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে দিল, যাতে পড়বার প্রচুর সময় মেলে ওর। বসন্তে উনি ফিরে আসবেন—অধীর ভাবে তাঁর প্রতীক্ষা করে। এর মধ্যে কতখানি ও করেছে তা দেখিয়ে দেবে ওঁকে, এই ভেবে ভারী আনন্দ হয়।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বিবেকানন্দের বিপুল পাণ্ডিত্য ওর মন জয় করেছিল। দশ বছর পরে নিবেদিতা লিখেছিলেন—'তাঁর বাণীতে যুক্তির সঙ্গতি সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার জন্য খুব মন দিয়ে সে-সব বার বার পড়ে দেখেছি। কিন্তু স্বানুভবের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত, যে-বাণী তিনি দিতে এসেছিলেন তার যাথার্থ্য আমি অন্তরে-অন্তরে [illegible] পারিনি।'

পড়ার টেবিলে ইতিহাস আর বিজ্ঞানের বইয়ের সারি—তার মধ্যে মার্গারেট খুলে বসে গীতা আর বাইবেল, বুদ্ধ আর খৃষ্টের জীবনী। সেই সঙ্গে প্রধান-প্রধান উপনিষদগুলো। তখনকার দিনে ওগুলোর সব চেয়ে ভাল অনুবাদ মিঃ ষ্টার্ডি ওকে জোগাড় করে দিয়েছেন। স্বাধ্যায়-নিরত ছাত্রের মত ঐ সব বই তন্ময় হয়ে পড়ে যায়, একে-একে ওগুলো আয়ত্ত করে। নিজের মনে যে-সমস্যা ওঠে সেগুলো পরিষ্কার করবার জন্যে একরাশ প্রবন্ধ লিখে চলে। পৃথিবীর সুপ্রাচীন ধর্ম্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ মতবাদের উদার অঙ্গনে ঢুকতে গিয়ে যথেষ্ট সাবধান হয় ও মনে-মনে। প্রাচীন ইহুদীদের আর্তত্রাণের ধর্ম্ম মতের দিক থেকে নিতান্ত গোঁড়া ; তার চাইতে যথেষ্ট ঔদার্য এই হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের। ভক্তি-বিশ্বাসের ভূমিতে খৃষ্টধর্মের যে অচল প্রতিষ্ঠা, তাকে বহু দূর ছাড়িয়ে গেছে এরা। বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে মার্গারেট ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কিছু জানত কি না, এ-প্রশ্ন উঠতে পারে। আট বছর আগে ১৮৮৭ সনে 'নীলাস' এই ছদ্মনামে 'শিশু খৃষ্ট' বলে একটা প্রবন্ধ ও লেখে, "খৃষ্টের আনন্দবাদ" কথাটা শুনলে লোকে হাসবে। কিন্তু ভাবতে গেলে দেখি—কাঁটার মুকুটকে যশের কিরীট মনে করা, ন্যায় আর সত্যের আকুতি ও এষণায় পূর্ণানন্দের অবর্ণনীয় আস্বাদ পাওয়া—এ রহস্যের দীক্ষা তিনিই কি দেননি মানুষকে? তাঁর মধুর জীবনকাহিনী যতই পড়ি ততই প্রাচীন ভারতের বুদ্ধদেবের কথা মনে না করে পারি না। বহু শতাব্দী আগে তিনিও মারের পরীক্ষা আর প্রলোভন জয় করে লোকোত্তর পুরুষ বলে গণ্য হয়েছিলেন। মনে পড়ে সক্রেটিসের কথা ; তাঁর জীবনেও সেই কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সেই সঙ্গে মন-কেড়ে-নেওয়া নম্রতা আর মাধুর্য। বুদ্ধ আর সক্রেটিসকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু তাঁদের পুণ্য স্মৃতির আভাই কি এসে পড়েছিল খৃষ্টের শৈশব-কাহিনীতে, অথবা মানব-মনের একই উৎস হতে উদ্ভব বলেই তাঁদের স্বভাবে এত মিল কি না কে বলবে? দেখা যাচ্ছে, মার্গারেট ইতিপূর্বেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের কিছু-কিছু খবর রাখত।

সে যাক। একা এমনি পড়াশোনা করতে-করতে অনেক সময় ও যেন কোনও থেই পায় না, একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে মনটা যেন থমকে যায়। তখন ওর মনে পড়ত বিবেকানন্দের উপদেশ : 'নিজেকে কখনও অসহায় মনে কোরো না। মানুষের বুকে ভগবান কেমন করে থাকেন জান? বড় ঘরের পর্দানশীনা হিন্দু মেয়ের মত। আড়াল থেকে সব সে দেখে, কিন্তু সে যে আছে বাইরের কেউ তা জানতে পারে না। তেমনি করে তিনিও আছেন তোমার হৃদয়ে।' অন্তরেই সত্যস্বরূপের আসন পাতা, তবে কেন সে হার মানবে? আজও সে চেনে না তাঁকে, জানে না কী মন্ত্রে তাঁর পূজা করবে। তবু থেমে থাকলে তো চলবে না, তাঁকে চিনতে হবে।

যখন বিরুদ্ধ ভাবনায় বড় বেশী ছেঁকে ধরে, ও তখন কল্পনা করে, যে-ক'টি তরুণ ছাত্রের সঙ্গে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের পায়ের তলায় বসে উপদেশ নিতেন, ও যেন তাদেরই একজন।···তত্ত্বালোচনার জন্য ব্যগ্র ওরা, যার যা ধারণা বলে যায় গুরুর সামনে। করুণ হাস্যে তাদের প্রশ্রয় দেন তিনি, মনের কথা বলতে দেন। কিন্তু বেশীক্ষণ ও-সব শুনতে পারেন না, উঠে একটু দূরে হয়তো গঙ্গার ধারে চলে যান। সেইখান থেকে আশীর্বাদ করেন নীরবে···তাঁর অজানা নয় তো কিছুই! গভীর দীনতার সঙ্গে তাঁর সেই বাণী বার বার আবৃত্তি করল মার্গারেট, 'যেমন করে হ'ক তাঁকে ডাক, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। পিঁপড়ের পায়ের নূপুরও তাঁর কানে এড়ায় না। তোমার কথা কি তিনি শুনবেন না?' তারপর ও আর কিছু ভাবে না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

কিন্তু ধীরে-ধীরে ওর ভিতরে যে একটা সৌষম্যের, একটা শক্তির উৎস উছলে উঠছে তা ও বুঝতে পারে। ওর কথায়, ওর কাজে-কর্মে তার আভাস ফোটে। নিজের পরিবর্তন সম্বন্ধে ও সজাগ হয়ে ওঠে, আশ্বস্ত হয়,—বোঝে, ক্রমেই ও এগিয়ে চলেছে মহত্তর সত্যের পানে। দিনে-দিনে সেই পরম সত্যের দল মেলছে। যাত্রাপথের নানা বৈচিত্র্যে আর ভয় পায় না মার্গারেট। ওর স্খলন-পতন, ওর ভুল-ভ্রান্তি, আর থেকে-থেকে থমকে যাওয়া—সবই যেন কোন্ দেবমায়ার চাতুরী। যে-ধ্রুবজ্যোতির পানে ওর অভিসার তার প্রভা তো একটুও ম্লান হয় না এতে।

মার্গারেট আবিষ্কার করে মানুষের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। যেমন করেই হ'ক, মানুষ যদি চায়, পাপ আর দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে আপন শুদ্ধ স্বরূপকে কম-বেশী সে ফিরে পেতে পারে। মানুষের মাঝে এই অনন্ত শক্তির সম্ভাবনাকে ও সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে। বিশেষ করে ওর আইরিশ বন্ধুগোষ্ঠীর সঙ্গে যখন ও মেলামেশা করে, একটা গভীর আনন্দের দ্যুতি ঠিকরে পড়ে ওর অন্তর থেকে। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে ও কল্পনা করে, স্বামিজী আছেন দর্শকদের প্রথম সারিতে। তাঁর কাছে যে-সব ভাব পেয়েছে অনেক সময় সেইগুলিকে ও ভাষায় রূপ দেয়, যে-আগ্রহে ও নিজে সেগুলি আত্মসাৎ করেছে তাই নিয়েই সেগুলি সঞ্চারিত করতে চায় এদের মাঝে। 'রাজনীতির ক্ষেত্রেও মানুষ ক্রমে-ক্রমে নিজেকে বিস্ফারিত করবে। স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতার 'পরে তার কর্তব্য আছে···কর্তব্য আছে আপন গ্রাম-নগর-দেশের প্রতি···কর্তব্যের পরিধি ছাড়িয়ে যায় ক্রমেই। কিন্তু এ-সব ক্ষুদ্র স্বার্থ। যার জন্য এমনি করে প্রাণপাত করে মানুষ, তা তখনই লোকোত্তর হয়ে ওঠে যখন সে হয় বিশ্বের নাগরিক, বসুধা হয় তার কুটুম্বক, মানুষের সেবা করতে দেবতাকেই সে দেখে তার মাঝে। এমন মানুষ জগতকে তোলপাড় করতে পারে। তার সামান্য অহন্তা তখন লুপ্ত, সে তখন দেবাবিষ্ট।'

একটা সঙ্কট মুহূর্তে মার্গারেট এমনি সব কথা বলে চলেছে। ওর বন্ধু রোনাল্ড ম্যাক্‌নীল হোমরুল পার্টির প্রবল প্রতিপক্ষ। তিনি এইমাত্র পার্লামেন্টে এক জ্বালাময় ভাষণ দিয়েছেন। দেশময় হৈ-হৈ পড়ে গেছে। চারি দিকে গরম-গরম বকুনি আর শাসানির ধূম। খবরের কাগজগুলো সাংঘাতিক সব প্রবন্ধ বার করছে।···ম্যাক্‌নীলের পত্রিকায় প্রতিদিন আক্রমণাত্মক অসংখ্য লেখা বেরোয়, আক্রমণের হাত থেকে মার্গারেটও রেহাই পায় না। ওর দলের ও-ই মুখপাত্র। সিসেম ক্লাবের অনেকেই কমন্স সভার লোক, তাদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে দলের প্রসার করতে ও পেছোয় না।

এই সময় ১৮৯৬এর এপ্রিলে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন লণ্ডনে। এসে দেখলেন, মার্গারেট একেবারে বদলে গেছে। ওর ভিতরে এক শক্তিময়ী নারী স্বমহিমায় জেগে উঠেছে। ও যেন প্রতীক্ষা করছে কোন শুভ লগ্নের যখন তাঁকে বলতে পারবে, 'আচার্য, জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে আমি প্রস্তুত।'

বাস্তবিক, যে-সব মতবাদের সঙ্গে ওর সাম্প্রতিক পরিচয়, তার অনেকগুলিই ও হাতে-কলমে খাটিয়ে দেখেছে। আবার, নানা রকম প্রশ্ন তুলে স্বামীজির কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের মত যুক্তি ও প্রচুর সংগ্রহ করেছে, আশা করছে ওর স্বাধীন চিন্তার অধিকার ওকে ছাড়তে হবে না। স্বামীজির তো এর চাইতে আনন্দ আর কিছুতেই নাই। তর্ক করতে তিনিও কম পটু নন। মার্গারেট যে-পথ ধরে চলেছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সে-পথের সব খবরই তিনি রাখেন। গুরুর পায়ে আত্মসমর্পণ করবার আগে তিনি নিজেও কি দিনের পর দিন বাদানুবাদ করেননি তাঁর সঙ্গে? সংশয়াত্মা আর দুর্বিনীত ছিলেন তিনিও। গুরুর যুক্তি-তর্ক উড়িয়ে দিতে তাঁরই কি কম চেষ্টা ছিল? একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশাই, সত্যি কি আপনি ভগবানকে দেখেছেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ ডুবেছিলেন আপন ভাবে, চকিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে, আমি তাঁকে দেখেছি, ঠিক এই যেমন তোকে দেখছি তেমনি করে দেখেছি। তোর চাইতে আরও ভাল করে তাঁকে দেখেছি, যদি দেখতে চাস তোকেও দেখাতে পারি।'

যে-জ্বালায় স্বামীজি জ্বলেছেন, মার্গারেটের মনেও সেই জ্বালা, সেই এক প্রশ্ন। আপাতত ওর বুদ্ধিই সত্যের সন্ধানে কৌতূহলী। সে-সত্যের আছে একটা নিরুচ্ছাস অন্তর্ভেদী দীপ্তি—নাই রহস্যের আধ-আলো আধ-ছায়া; দেবতার সকল বিভূতিকে ঘিরে সে যেন পরম অদ্বৈতের একটা ছটা-মণ্ডল, প্রকৃতির হৃদয় হতে জ্যোতিঃশক্তির একটা নিত্য বিচ্ছুরণ। বিবেকানন্দ জানতেন, বুদ্ধির এ হঠকারিতার একদিন অবসান ঘটবে। সেদিন সব দ্বিধা দুহাতে ঠেলে, নিজেকে উজাড় করে দিয়ে মার্গারেট জানতে চাইবে সেই সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষকে। এই পরিণামের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করেন। মানুষ হিসাবে তিনি যে মার্গারেটের কাছে সত্যের মূর্ত বিগ্রহ হয়ে উঠেছেন, আপাতত এতেই তিনি খুশী। তাঁকেই দিশারী করে ও এগিয়ে চলুক সেই অনির্বাণ জ্যোতির পানে।

অবিচল নিষ্ঠায় তাঁর উপদেশ শুনে চলে মার্গারেট। সপ্তাহে চার বার স্বামীজি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বেদান্তদর্শনের আলোচনা করেন। তাঁর ঐকান্তিকতা দেখে মনে হয় যেন ভারতেই আছেন তিনি। শ্রোতাদের কয়েক জনের বুদ্ধির ক্ষুধা আর যুক্তির যুযুৎসা লক্ষ্য করে তিনি পরামুক্তির তিনটি সনাতন পথের মধ্যে জ্ঞানযোগের পথটিই বিশেষ করে ওদের সামনে ধরলেন। প্রতিবাদ করবার আগে-ভাগেই একদিন তিনি বললেন, 'ইউরোপের মুক্তি নির্ভর করছে কোনও যুক্তিসিদ্ধ ধর্মের 'পরে। জড়বাদীর কথা ঠিক,—এক বস্তুই আছে বিশ্বময়। তফাৎ এই, জড়বাদী তাকে বলেন জড়, আমি বলি চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর।' সূক্ষ্মতম অতীন্দ্রিয় ভাবগুলো কেমন করে ধারণায় আনতে হয় তার কৌশল জানেন তিনি। বুঝিয়ে বলেন, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের কী সম্বন্ধ, কতটুকু তার স্বাধীনতা,

কী তার অভীপ্সা, মহাশক্তির সঙ্গে কোথায় তার যোগ। বলতে-বলতে ভাবের জগৎকে হঠাৎ কথার কায়দায় নামিয়ে আনেন দৈনন্দিন জগতে। তাঁর মুখে বেদান্ত তখন হয়ে ওঠে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্যের ব্যঞ্জনায় সজীব, সামান্য আর বিশেষের মাঝে যোগাযোগটা আর ব্যবহারিক জীবনের নাগালের বাইরে থাকে না।

শুক্রবারটি রাখা হয়েছে প্রশ্নোত্তরের জন্য। প্রত্যেক দিন স্বামীজিকে দস্তুরমত জেরায় ফেলে মার্গারেট, অন্যেরা শোনে উন্মুখ আগ্রহে। ওর সুস্পষ্ট কণ্ঠে আসন্ন সংগ্রামের সূচনা—'কিছু মনে করবেন না স্বামীজি, আপনি যে বল্লেন…' শুরু হয় তুমুল তর্ক। দ্বিতীয় সারিতে, দক্ষিণ ঘেঁষে মার্গারেট বসে। অমনি সবার চোখে পড়ে ঐদিকে ওর চাইতে বয়সে কিছু বড় এক আমেরিকান মহিলার সঙ্গে এখানে ওর আলাপ হয়েছে, তাঁর পাশেই ও সব সময় বসে। ভদ্রমহিলার নাম জোসেফাইন ম্যাকলয়েড্; স্বামীজির সঙ্গে তাঁর বহু দিনের আলাপ। পয়সা-কড়ি ঢের আছে, মতটা উদার, চলা-ফেরায় খুবই স্বচ্ছন্দ। বিবেকানন্দকে আচার্য স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে উনি লণ্ডনে এসেছেন। মার্গারেটকে তাঁর মনে ধরেছে, প্রায়ই একখানা 'ক্যাব' ভাড়া করে ওকে উইম্বলডনে পৌঁছে দেন। পথে নানা বিষয়ে কথা হয়, দুজনেরই দর্শনালোচনায় সমান আগ্রহ। এমনি ভাবে এঁদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতার শুরু হল, আজীবন তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

স্বামীজির উপদেশের সব-কিছুই বড় সোজা নয়। পরে মার্গারেট বলত, 'প্রথম প্রথম লক্ষ্যবস্তু মনে হয় অনেক দূরে…যেন বিশ্বপ্রকৃতির অপর পারে। তাকে এতটুকু বিকৃত না করে তার মহিমা একটুও খাটো না করে কাছে পেতে হবে তাকে। কাছে আসতে-আসতে সেই আকাশের দেবতা হবেন "যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ।" তারপর সেই বিশ্বের দেবতাই হবেন এই দেহ-দেউলের ঠাকুর, তিনিই আবার জীবের জীবন। এমনি করে পৌঁছই সেই শেষের সত্যে। আরণ্যক ঋষিরা যাঁকে খুঁজেছেন জীবন ভোর, তিনি যে এই বুকের মাঝে… এইখানে। সোঽহম্…সোঽহম্…আমিই সেই।'

তখন কয়েক সপ্তাহ ধরে বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের মায়াবাদ বোঝাচ্ছিলেন। এই মায়াবাদ মার্গারেটের তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে একটা দুস্তর বাধা হয়ে উঠল। কিছুতেই ওটা আয়ত্ত হয় না, প্রায় হয়রান হয়ে পড়ল ও। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত নিজের মতো করে মায়াবাদকে এই বলে তরজমা করল, 'মায়া বলতে বোঝায় যেন এই-আছে এই-নাই একটা ঝলমলানি, সত্য-মিথ্যায় জট-পাকানো একটা রহস্য। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়-নির্ভর মনের মাধ্যমে তার সঙ্গে ঘটে আমাদের পরিচয়। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, "এই সব-কিছু ছেয়ে আছেন যিনি, তিনিই সেই।" মায়া আর ব্রহ্ম এই দুটি তত্ত্বের বন্ধনীর মাঝে ধরা পড়েছে হিন্দুর গোটা অধ্যাত্ম শাস্ত্রটা।'

সাধনার যত-কিছু প্রয়াস ও করেছে, জীবনে যতটুকু আত্মোপলব্ধি ওর হয়েছে, এই দর্শনের মাঝে পর-পর তার সকল স্তরের কথাই রয়েছে—মার্গারেট বুঝতে পারে। এত দিনের যত-কিছু সঙ্কট-সমস্যা আর অপ্রত্যাশিত যত শুভ যোগ সব মিলে তার জীবন যেন নতুন আলোর ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দার্শনিক তত্ত্বালোচনা ছাড়া যেগুলো ওর নিতান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা, সেগুলো নিয়ে এ-পর্যন্ত ও স্বামীজির সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি। এখন যেন সে-প্রসঙ্গ তোলা দরকার বলে ওর মনে হল। বিনা আড়ম্বরে বিশ্বস্ত হৃদয়ে ও তাঁকে সব কথা বলে। তার সমস্যাগুলো তিনি সমাধান করে দেবেন এমন আশা ও করে না, তিনি শুধু শিখিয়ে দেবেন কেমন করে মিথ্যা আসক্তি আর মমতার সংস্কার কাটিয়ে অহং-বর্জিত হয়ে সেগুলো ও বিশ্লেষণ করতে পারবে। যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে নিজের চার পাশে ও যে গণ্ডি রচেছিল একটা, সেটা নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা এই ওর প্রথম। নিজের শুদ্ধ-সত্তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় চায় ও। ও হয়তো ভাবতেও পারেনি কেমন করে বিবেকানন্দ ওকে অলক্ষিতে ভাবের রসদ যুগিয়েছেন, যার ফলে আজ দিগ ভ্রষ্ট মনের সংশয়-আঁধার পিছনে ফেলে ক্ষিপ্রগতিতে ও এগিয়ে চলেছে।

আরেকটা কাজ করল মার্গারেট; নিজের কাজ-কর্মের কথা বলল তাঁকে এত দিনে, সঙ্গে-সঙ্গে সাড়াও পেল। স্বামীজি হলেন আজন্ম সংস্কারক। কিন্তু তিনি ভাবুক, দেশের প্রতি তাঁর গভীর মমতা আর জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশায় প্রচণ্ড ক্ষোভ; এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে উঠতে পারেননি কোনও দিনই। বাড়িতে যখন ছিলেন, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা যে কী মর্মান্তিক সে অভিজ্ঞতা তাঁর তখনই হয়েছিল। মার্গারেটেরও এ অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু দারিদ্র্যের বাধাকে ও অনায়াসে কাটিয়ে উঠেছে। মানুষের জীবনে আরও যে-সব কঠিন সমস্যা আছে, ও এখন তা নিয়েই ভাবে। মার্গারেট স্বামীজির কাছে রেক্সহাম খনি-অঞ্চলে যে অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে, শ্রমিকদের যে জীবন ও দেখেছে, সেই সব গল্প করে। উনি উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। তারপর ওর জীবনের এই সমাজ-সেবার অধ্যায়টাকে লক্ষ্য করে কর্মযোগের ব্যাখ্যা করেন, কাজের ফলের উপর আমরা যতটা গুরুত্ব আরোপ করি, কাজটা শুধু করে যাওয়ার গুরুত্বও তার চেয়ে কম নয়। হিন্দুশাস্ত্র তো "মা ফলেষু কদাচন" বলে ফলটার কথা ভাবতেই নিষেধ করেছেন। 'উপায়টাই যেন লক্ষ্য' এই মনে করে প্রাণপণে ওকে নিখুঁত করে তুলতে হবে। এই মনোভাব নিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ তখন নিজের দেশে কাজ করবার পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু মার্গারেট কর্মের প্রতি দার্শনিকের এই দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক ধরতে পারে না। বিবেকানন্দ নিজের জাতির বীজসত্তার পরিণাম কী আর কেমন করেই বা তা ভিতরের জোরে ধীরে-ধীরে মাথা তুলবে এ নিয়ে অনেক ভেবেছেন, জাতিকে সার্থক করবার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নাই। এই আগ্রহ নিয়েই বিদেশী ইংরেজের সব-কিছু তিনি গভীর ভাবে লক্ষ্য করেন। মার্গারেটকেও এই পথেই চালাতে চান তিনি। স্বদেশের সমস্যাকে নতুন করে দেখুক মার্গারেট, এ-সমস্যা শুধু তার দেশের নয়, সকল মানুষের। এমনি করে দেখলেই না দিনে-দিনে দৃষ্টি উদার হবে, আসবে ব্যাপ্তিবোধ।

ওঁদের দুজনেরই দুজনকে দরকার—আচার্যের প্রয়োজন শিষ্যাকে আপন আদর্শের উপযোগী করে গড়া, শিষ্যার প্রয়োজন তার বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভাকে এক লক্ষ্যে একাগ্র করে তোলা। ইতিহাস-চর্চায় দুজনেরই সমান আগ্রহ। প্রাচীন ইতিহাসের বড়-বড় ঘটনাগুলো নিয়ে দুজনে আলোচনা করেন, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করে তা থেকে আহরণ করেন ভবিষ্য কর্মের সঞ্জীবনী।

অক্টেভিয়াস্ বীটির সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে 'ম্যাটসিনি' পড়ে মার্গারেট, কাজেই ও বসে জাতীয়তাবাদের কথা। স্বামীজি বলেন গণশিক্ষার কথা, কেমন করে মানুষ গড়তে হবে সেই কথা। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ দেখেছেন ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র্য—আর শোচনীয় অধঃপতন. সন্ন্যাসীর চোখে জল ঝরেছে মর্মন্তুদ বেদনায়। তাই সকলকে তিনি বলেন, 'স্বদেশকে ভালবাস, বোঝ, কী তার চাই!' এই অল্প ক'টি কথায় তাঁর গভীর মানব-প্রেম জমাট বেঁধেছে। ইংল্যাণ্ডে তাঁর আসা প্রয়োজন ছিল। যাদের তিনি এত দিন বিদ্বেষের চোখে দেখেছেন, সেই ইংরেজের সংস্পর্শে এসে দেখলেন তাদের কতগুলো গুণের তুলনা নাই —'গোলাম না হয়েও হুকুম তামিল করা যায় কী করে, সে-রহস্য ইংরেজের কাজেই শিখতে হয়। আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও যে আইন মানা চলে, এ-ও এদের শিক্ষা।'

যে-সব রাজনৈতিক সম্মেলনে মার্গারেট অংশ গ্রহণ করে কি আলাপ-আলোচনায় নেতৃত্ব করে, সে-সব জায়গায় স্বামীজিকে ও নিয়ে যায়। ওর স্থিরবুদ্ধিতে তাঁর চমক লাগে, মন দিয়ে শোনেন ওদের আলোচনা। ওর মতলব যে খাঁটি, তার মধ্যে যে ফাঁকি নাই তা তিনি বুঝতে পারেন। কিন্তু নিষ্কাম কর্মেই যে ওর ব্রতের সার্থকতা তা কি ও জানে? একদিন ওকে বললেন, গোঁয়ারের মত একটা বোমা ছুঁড়ে ফেলা এমন কিছু গৌরবের কাজ নয়। সবার মাঝে দাঁড়িয়ে যে বলতে পারে 'ভগবান ছাড়া আমার আর কোনও সম্বল নাই', তাকে বলি বাহাদুর। যে নারী বা পুরুষ জোর করে এ-কথা বলতে পারবে, মহাশক্তি তাদের হাল ধরবেন। আর তারাই যে-কোনও দেশকে সিদ্ধির পানে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কারণ তাদের চিত্তের বিদ্যুৎস্পর্শে মানুষের মাঝে দৈব-সম্পদের স্ফুরণ ঘটে। তিনি মার্গারেটকে আরও ধীর-স্থির, আরও বিচক্ষণ হতে বলেন। পাকাপাকি একটা কিছু করবার আগে অনেক দিন ভাবতে হয়। ওর নিজের কোনও অনিষ্ট না ঘটে, সেই জন্যেই এত জোরের সঙ্গে উনি এ-সব উপদেশ দিতেন। মার্গারেট বুঝতে পারে, নিজের অভিজ্ঞতার কথা ভেবেই উনি ওকে এমন সাবধান করছেন। ছাত্র-জীবনে যখন তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তখন এক দিকে যেমন কলেজের লেকচার শুনতেন, আর এক দিকে তেমনই শহরতলীতে একটা ইস্কুলে পড়াতে যেতেন। নিজেদের বাড়ির আঙিনায় পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের একত্র করে ভগবৎ-প্রসঙ্গ করতেন। কোনও দিন কথায়-কথায় এত উন্মাদনা জাগত যে, গভীর রাত পর্যন্ত সবাই মিলে কীর্তন করতেন। মার্গারেট যা-কিছু করছে, এ-সব কাজই এককালে তিনি করেছেন, কোনটাই বাদ দেননি। সুতরাং ওকে সব রকমেই চালিয়ে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

মার্গারেটের স্কুল দেখে আনন্দে তাঁর চোখে জল এল। একটু বিব্রত বোধ করে মার্গারেট। ও কী করেছে আর কী করতে চায় তাই নিয়ে উৎসাহভরে কথা বলে। সরল ভাবে স্বীকার করে 'এখনও পরীক্ষাই চলছে, একটা চরম সিদ্ধান্তে আজও পৌঁছাইনি। প্রতিদিনই একটা-না-একটা নতুন কিছু চোখে পড়ে। শিশুদের স্বাধীনতা দিয়েছি, কিন্তু সকলের মনের বাড় সমান হচ্ছে না'। কারও-কারও বুদ্ধির উন্মেষ হচ্ছে খুব ধীরে-ধীরে। সেটা আমারই দোষ—তাদের মনের জট কী করে ছাড়িয়ে দিতে হবে, বুঝে উঠতে পারি না। ছোট ছেলের মন, একটা পুরা দস্তর বিজ্ঞানবিশেষ।··· পুরোপুরি ফুটে ওঠবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। মনোবিকাশের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য, আমি ওদের সেইটাই দিতে চাই···।'

অস্ফুট কণ্ঠে বিবেকানন্দ বলে উঠলেন,—'আর আমার দেশের দীন-দরিদ্র অভাগা ছেলেরা, ঘোর অন্ধকারে ওরা ডুবে রয়েছে। এমনি শোচনীয় অবস্থা ওদের যে, ধনীর হাতে লাঞ্ছনা ভুগতে ওদের জন্ম—এই ওদের ধারণা। ব্যক্তিত্ববোধ জিনিসটা ওদের নাই বললেই চলে। ওদের দুঃখ কল্পনা করতে পার কি? আজ যদি প্রতি গ্রামে ওদের জন্য আমরা বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থাও করি, তবুও ওরা লেখাপড়া করতে পারবে না। পেটের ভাতের জন্য মাঠে-ঘাটে খাটতে বাধ্য ওরা, এমনি কঠোর ওদের দারিদ্র্য। কিন্তু সে তো দূরের কথা, আসলে আমাদের টাকাই নাই, আমরা বিদ্যাদান করব কি? মনে হয়, এ সমস্যা মেটবার নয়। আমি একটা সমাধানের কথা ভাবছি বহু দিন ধরে। "পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদই যাবেন পর্বতের কাছে।" গরিবের ছেলেরা যদি স্কুলে না আসতে পারে, স্কুলই যাবে তাদের কাছে···মাঠে কারখানায় সব জায়গায়···'

'স্বামীজি—' বলে, মার্গারেট তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে ইতস্তত করতে থাকে। একটু মৌন থাকে, গাল দুটি লাল হয়ে ওঠে। কথাটা পাড়াই শক্ত, কিন্তু পাড়তেই হবে। স্বামীজির বেদনায় হৃদয় বিচলিত হয়েছে ওর। তাঁর দেশহিতৈষণার এই বিপুল আবেগ অনুগামীদের মাঝেও সঞ্চারিত হ'ক। এতে প্রাণ জাগবে, কল্যাণ হবে সকলের—এটা মার্গারেট ভাল করেই বুঝেছে। অথচ একা স্বামীজি কিছুই করে উঠতে পারছেন না, কারণ তাঁর কোনও-কিছুরই স্থিরতা নাই; সংগঠন-শক্তির অভাবও আছে খানিকটা মার্গারেটের মতে। ইতিমধ্যেই ও তাঁকে কতকগুলো সঙ্কট পার হতে সাহায্য করেছে, সলা-পরামর্শ দিয়েছে। ও তো আরও হাজারো রকমে তাঁর সাহায্য করতে পারে। কেমন করে তাঁর কাজ গুছিয়ে দিতে হবে তা ও বেশ বুঝেছে। ওর নিজের জীবনে আজ কোনও বন্ধন নাই, প্রেমের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেছে চিরদিনের মত, ও তো সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে ও কি তাঁর ডান হাত হয়ে উঠতে পারে না, তাঁর কাজে নিজের জীবনকে বাঁধা দিতে পারে না তাঁর কাছে? ঠিক এই মনোভাব নিয়ে ওর স্কুলের বন্ধুদের অনেকেই এশিয়া বা আফ্রিকা-যাত্রী পাদ্রীদের বিয়ে করেছে ও জানে। 'তাই যদি ভগবানের ইচ্ছা, আমি আসব আপনার পাশে আপনার কাজে যোগ দেব, আমরা একসঙ্গে খাটব একই উদ্দেশ্য নিয়ে···'

এ-প্রস্তাবের পিছনে কতখানি আত্মত্যাগ রয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ তা ভাল করেই বুঝলেন। এমন কথা মার্গারেট বলতেই পারে। কিন্তু ওর সন্দেহ মাত্র হয়নি যে স্বামীজি সন্ন্যাস-ব্রত নিয়েছেন, কঠিন তার বিধি-বিধান। তিনি ওর কথা শুনে নতমস্তকে রইলেন বহুক্ষণ, তারপর বললেন, 'আমি সন্ন্যাসী।' আর কোনও ব্যক্তিগত কথাই হল না।

স্বামীজি বলতে লাগলেন, তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল দরিদ্রনারায়ণকে ভালবেসে তাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা, অনাথ-দীন-দরিদ্রের সেবাতেই ভগবানের সেবা করা। আবার খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, 'এ-অবস্থায় ওদেশে কত বাধা

ঠেলতে হবে সে-সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নাই। মানবপুত্র যিশুর মাথায় দিয়ে শোবার এক টুকরো পাথরও ছিল না; এই রমতা সন্ন্যাসীদেরও মাথার উপরে কোনও আচ্ছাদন নাই, সূর্যের আগুন-তাতে দিন ভোর তাদের পথ চলা। কিন্তু শুধু পথ চলার দিন আজ ফুরিয়েছে। আমার বিশ্বাস এমন দিন আসবে, যেদিন দল বেঁধে সন্ন্যাসীদের যেতে হবে গ্রামে-গ্রামে। সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে সন্ধ্যায় চাষীরা ফিরে আসবে ঘরে, তখন এরা তাদের কাছে গিয়ে বসবে, কথা বলবে। সন্ন্যাসীরা শুধু ধর্মের কথা বললে আর চলবে না—পাশ্চাত্য ভাষায় যাকে বলে 'শিক্ষা' সেই শিক্ষা দেওয়ার ভার নিতে হবে তাদের। এই নিরক্ষর অগণ্য চাষী-মজুরের চোখ ফোটানোই হবে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের কাজ। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে, বলতে হবে দেশের কথা, ম্যাজিক-লণ্ঠন দিয়ে শেখাতে হবে জ্যোতিষ ও ইতিহাস, বিদেশের জীবনযাত্রা কেমন তা তুলে ধরতে হবে ওদের চোখের সামনে।—সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর মানচিত্রে নানা দেশের ছবি দেখিয়ে সচেতন করে তুলবে তাদের বহির্জগৎ সম্বন্ধে। আমাদের কাজ হল এদের সামনে একটা বলিষ্ঠ নৈতিক আদর্শ তুলে ধরা, ওরা যে ছোট নয় এই আশ্বাস দিয়ে আত্মোন্নতির আশা জাগিয়ে তোলা ওদের মনে। তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। বাকীটা করবে তারা নিজেরা…'

গ্রীষ্মকালে জনকয়েক শিষ্য নিয়ে স্বামীজি তিন মাসের জন্য চলে গেলেন সুইজারল্যাণ্ড। মার্গারেট সেদিনের কথাগুলো প্রায়ই ভাবত। অক্টোবরে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন। হিন্দু তীর্থযাত্রী দেব-মন্দিরে যেতে স্তোত্র পড়ে,—ভাবে-ভোলা সন্ন্যাসীর কণ্ঠে থেকে-থেকে তারই গুঞ্জরণ। সুইজারল্যাণ্ডের পার্বত্য শোভায় তাঁর মাঝে জেগে উঠছে এক আত্মহারা ভক্ত, লণ্ডনে ফিরেও তার স্বপ্নের ঘোর যেন কাটতে চায় না। পর্বতাধিষ্ঠাত্রী কুমারী মেরীকে হিন্দু-মন্ত্রে অর্চনা করেছেন, তাঁর পূজা-বেদী ভরে দিয়েছেন ফুলের অর্ঘ্যে। সেভিয়ার-দম্পতী স্বামীজির সঙ্গে ছিলেন। এই সুইজারল্যাণ্ডেই তাঁরা প্রথম স্থির করেন, তাঁরা ভারতবর্ষে যাবেন। সুইস পর্বতমালার অপরূপ নিসর্গ শোভার মাঝে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখলেন, হিমালয়ের বুকে কুমায়ুন অঞ্চলে একটি মঠ হবে, সেইখানে পুব আর পশ্চিমের সাধকেরা একই ধরণে একত্রে কাজ করবে, ধ্যান-ধারণা করবে। এ তো স্বপ্ন নয় শুধু। প্রদীপ্ত বিশ্বাসে সেভিয়ার-দম্পতী এ স্বপ্নকে সত্য বলেই গ্রহণ করলেন। তাঁরা যাবেন হিমালয়ে, আশ্রম-জীবন যাপন করবেন। অন্যান্য শিষ্যরাও উৎসাহভরে যোগ দিলেন এ-পরিকল্পনায়। এঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় স্বামীজির স্টেনোগ্রাফার গুডউইন আর হেনরিয়েটা মুলারের। সেদিন এঁরা কায়মনোবাক্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন গুরুর কাজে।

এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়তে মার্গারেটেরও সাধ যায়। কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে গেলে কিছুই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। দূরের কথা ভাববার সময় কোথায়, স্বামীজির এখনকার কাজই যে ওকে আবিষ্ট করে রেখেছে। তাঁর সংসর্গের প্রতিটি মুহূর্ত ওকে নতুন করে গড়ে তুলছে। মার্গারেট এখন তাঁর সেক্রেটারি। সবিস্ময়ে ও লক্ষ্য করে, একসঙ্গে এক রাশ কাজ হাতে নিয়েছেন উনি, অথচ প্রত্যেকটার উপরই নজর রয়েছে, কোনটারই খেই হারিয়ে ফেলেননি। এক দিকে তাঁর অন্তর হতে উৎসারিত হচ্ছে অধ্যাত্ম-মন্দাকিনীর উচ্ছল তরঙ্গ…আর এক দিকে তাঁর কথায় চালে-চলনে সবার মনে জেগে ওঠে ভারতের প্রতি অকুণ্ঠ প্রীতি আর সমবেদনা। অসংখ্য ভাষণ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আর নানা সম্মেলনে যোগ দেওয়া তো আছেই, এরই মাঝে আবার বেদান্ত-দর্শনের তিনটি বিভিন্ন বিভাগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশের জন্য স্বামীজি তৈরী হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বিখ্যাত 'রাজযোগ' বইখানা প্রায় শেষ করে এনেছেন। তার প্রথম সংস্করণ এক মাসের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল। ক্লান্তি নাই তাঁর, উৎসাহ অসীম—কোনও কিছুতেই কর্মের স্রোতে ভাঁটা পড়তে দেন না। অভ্রান্তদর্শী নিপুণ-বুদ্ধি সহকর্মীদের পরিচালিত করছে সুকৌশলে, সহজ তাঁর নেতৃত্ব। অথচ গুরুকে স্মরণ করে কি গভীর দীনতা! কখনও বলেন—'সারা জীবনে আমি যা করব, তাঁর গৌরবের তুলনায় তা এক মুঠো ছাই।' বলেই বলেন, 'বিশ্বমানবের নবজীবনের উৎস তাঁরই মাঝে…' জাতিতে ক্ষত্রিয় তিনি, ক্ষত্রিয়ের মতই নির্ভীক ভাবে লড়েছেন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। আজ সর্বত্র অসাধারণ তাঁর সাফল্য। 'অনাসক্তি'র মন্ত্রকবচে তিনি সুরক্ষিত, তাঁর গৈরিক পতাকায় রয়েছে 'কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন' এই বাণীর সূচী লেখা। মার্গারেট যেন নতুন করে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। কী শক্তি ঠিকরে পড়ছে এই সন্ন্যাসীর সর্বাঙ্গ হতে। যে কাছে আসে তারই মাঝে আগুন ধরে যায়। মার্গারেটকেও তিনি বিদ্যুৎ করে তুলবেন এ আর আশ্চর্য কী!

একদিন বিকালের আসরটা বেশ জমে উঠেছে। কথা কইতে-কইতে হঠাৎ মার্গারেটের দিকে ফিরে স্বামীজি বলে উঠলেন, 'স্বদেশে স্ত্রী-শিক্ষার একটা পরিকল্পনা করছি, মনে হয় তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাব'; পরক্ষণেই অন্যান্য কথার ভিড়ে এই ঘনিষ্ঠ আমন্ত্রণের সুরটি হারিয়ে গেল। তাঁর একটি আদরের বোন শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছিল। সেই দিন থেকে দেশের মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভেবে অনেক স্বপ্নই তিনি দেখেছেন। কিন্তু জীবনে এই প্রথম তাদের কথা সবার সামনে বললেন বিবেকানন্দ। বোনের মৃত্যুতে যে আঘাত পেয়েছিলেন, তাতেই তাঁর দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল, বুঝেছিলেন এ দেশের মেয়েদের জন্য কী করা দরকার। তিনি বলে চললেন,—'ভারতবর্ষের হাজার-হাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করে আছে, পশ্চিমের একটি মেয়ে যদি পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য বোঝে, তাদের পথ দেখিয়ে দেয়, তারা মাথা তুলে সাড়া দেবে। অবরোধে রুদ্ধ হিন্দু মেয়ের অন্তর শিশুরই মত আধ-ফোটা, কিন্তু তার চরিত্রে আছে সবল বিশ্বাস আর অক্ষয় উৎসাহের অনুপম ঐশ্বর্য। ত্যাগ আর সহিষ্ণুতায় তাদের জীবন গড়া, আদর্শ রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুঝতে জানে তারা। এই গুণে সতীর তেজ আজও তাদের মাঝে অম্লান হয়ে জ্বলছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির বন্যায় একদিন ওদেশের গ্রামের কুটীর, কয়েদখানা আর পাহাড়-জঙ্গল হতে জনাকীর্ণ নগর পর্যন্ত সবই ভেসে যাবে—সারা দেশ জেগে উঠবে তাঁর নামে। সেদিন দেশের ডাকে সাড়া দেবার জন্য বহু কর্মী চাই—নারী-পুরুষ দুই-ই…'

এ-ডাক কান পেতে শোনে মার্গারেট, বুক দুলে ওঠে। কিন্তু তার মুখে ভাষা ফোটে না, শরীর অসাড় হয়ে যায়। কী এক অবোলা

যাতনা তাকে পেয়ে বসেছে। হঠাৎ যেন দেহে-মনে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে, মনে হয় আত্মীয়-বন্ধুদের সব বাঁধন ছিঁড়ে গেছে এক পলকে।' অসহনীয় একটা অনুত্তমে মন-প্রাণ যেন এলিয়ে পড়ে, কোনও উৎসাহ দেখানো আর সম্ভব হয় না। অজস্র কথা ভিড় করে আসে মাথায়, ওর কামনার স্বপ্নকে যেন আবছা করে দেয়। একটা কান্না ফুলে-ফুলে ওঠে বুকের মধ্যে।

এমনি অসংলগ্ন ভাবনায় কাটল কয়েকটা সপ্তাহ। তারপর হঠাৎ একদিন ওর মনের এই আবছায়ার মাঝে যেন একটা চিড় দেখা দিল। স্বামীজির সঙ্গ নেওয়া? হ্যাঁ, তাই তো! সে চায়, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কাজে সাহায্য করবে···কিন্তু একটা ভয়, স্বামীজির মতে সার্থক কর্মের অপরিহার্য অঙ্গ যে নিরাসক্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, তা কি ওর আছে? লণ্ডনের শহরতলির জন-কল্যাণ-প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বামীজিকে নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে কত দিন লক্ষ্য করেছে, ভাল-মন্দ কিছুই না বলে উনি কেবল কাজের নিছক প্রেরণাটাই দেখে যান, ফলাফল বা পরিণামের 'পরে একটুও গুরুত্ব দেন না। এ-নিরিখে ওর উৎসাহে যেন একটু ভাঁটা ধরে। এত দিন যা-কিছু ও করেছে—এমন-কি জনসেবার কাজ পর্যন্ত—সব-কিছুর গৌরবই যেন এই রূঢ় বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে। ক্রিশ্চান ধর্মের অনুশাসন মেনে ক্ষুধার্তকে খাদ্য আর বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিলাম; রোগীর সেবা করলাম; কিন্তু সেখানে গ্রহীতা কি কৃতজ্ঞতা বা বিদ্বেষ, বিদ্রোহ ইত্যাদি যে-কোনও ভাবের বাঁধনে দাতার সঙ্গে বাঁধা পড়ে না? কথাটা ভেবে মার্গারেট কোনও কূল পায়নি। অথচ সার্থক কর্মের উল্লাস আর ব্যর্থতায় নৈরাশ্যের বেদনা তাকে বিচলিত করলেও স্বামীজির কাছে এগুলোর কোনও মূল্যই নাই। কর্তার সঙ্গে কর্মের যে-যোগ, স্বামীজি থাকেন তার বাইরে—প্রত্যাশা বা প্রতিদানের কোনও দাবি না রেখে দুহাত ভরে দান করাই তাঁর ধর্ম।

নিষ্কাম কর্মযোগের যে-ব্যাখ্যা স্বামীজি দিয়েছেন, তার আদর্শে যাচাই করে দেখলে মার্গারেট যে আত্মোৎসর্গ করতে চায় তার কোনও মূল্যই নাই। কারণ, স্বামীজি বলেন, 'জগতের ভাল করা মানে আসলে নিজেরই ভাল করা।' মার্গারেট বুঝতে পারে, এত দিন ও ভুল পথে চলেছে। কিন্তু কিছু ঠিক করে উঠতেও পারে না। শেষ পর্যন্ত একটা ভাবই দানা বাঁধে মনের মধ্যে, 'স্বামীজির কাজ করতে হবে।' ওর কাছে তার অর্থ হল নিজেকে একেবারে মুছে ফেলা। তীব্র ঐকান্তিকতায় এই ভাবটা ও আঁকড়ে ধরল। ক্রিশ্চানেরও তো এই সব খোয়ানোর সাধনাই আসল।

ঠিক এই জিনিসটাই আবার বিবেকানন্দ চান না। নিজের ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে মন-বুদ্ধির সহজ প্রকাশকে যে খর্ব করছে, এমন শিষ্য দিয়ে তিনি করবেন কী? তিনি চান এমন মেয়ে যার অন্তর হতে ঠিকরে পড়ছে নিঃসীম মুক্তির উল্লাস, যার আত্মশক্তি শাণিত হয়েছে চরম মার্জনে। এমন মেয়ের অন্তর-সম্পদকেই না ভবিষ্যতের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়।

মার্গারেট যেদিন ঠিক বুঝতে পারল স্বামীজি ওর কাছে কী চান, সে-দিনটি ওর জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ, কিন্তু এই বোঝাটুকু বুঝে উঠতে. যে-ধকল ওকে সইতে হয়েছে, তারপর আর এ নিয়ে স্বামীজির সঙ্গে খোলাখুলি কথা কইবার শক্তি ওর নাই। হেনরিয়েটা মূলারকে ও ধরল ওর কথা বলার জন্যে। একদিন বিকালে স্বামীজি আর মার্গারেট দুজনেই অতিথি হয়েছেন হেনরিয়েটার বাড়িতে। হেনরিয়েটা জানালেন, স্বামীজির কাজে মার্গারেট তার জীবন উৎসর্গ করতে চায়!

বিবেকানন্দ একটুও আশ্চর্য হলেন বলে মনে হল না। কেবল বললেন, 'আমি আমার কথাই বলতে পারি। দেশের যে-কাজের ভার মাথায় নিয়েছি, তার জন্য দু'শো বার জন্ম নিতে আমি রাজী।'

সেদিন বিদায় নেবার সময় মার্গারেটকে তিনি বললেন,—'হ্যাঁ, ভারতবর্ষই তোমার আপন ঠাঁই। কিন্তু সে জন্য তোমায় প্রস্তুত হতে হবে তিলে-তিলে।'

১৮৯৬ সনের নবেম্বর মাস তখন।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের পথে

এর এক মাস পরে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে চললেন। সঙ্গে তাঁর শিষ্য-শিষ্যার ছোট্ট একটি দল। সবাই ভেবেছিল মার্গারেটও সঙ্গে যাবে। কিন্তু না, এ-পথে পা বাড়ানোর আগে আরও গভীর ভাবে সব কথা তলিয়ে ভাবতে হবে। একটা বছর তাইতে কাটল।

শেষের ক'টা সপ্তাহ কেটেছে একটা উন্মাদনায়। স্বামীজি তখন একটার পর একটা লেকচার দিয়ে চলেছেন ঝড়ের মত। নিজের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা সত্যকে বিচ্ছুরিত করবার জন্য একটা শক্তি যেন ভিতর থেকে ঠেলছে তাঁকে। যাবার আগে তাঁর জীবন-দর্শনকে উজাড় করে ঢেলে দিতে হবে এদের মাঝে। দেহে তিনি শ্রান্ত, কিন্তু মন চড়া সুরে বাঁধা। ইস্কুলের ছেলের মত দিন গুণছেন কতক্ষণে ছুটি পাব, অথচ অন্তরের সব ঐশ্বর্য বিলিয়ে চলেছেন অকাতরে। একটা বহ্নুচ্ছ্বাস ঠেলে উঠছে তাঁর ভিতর থেকে। না, কোন দার্শনিকের কথাই তিনি চূড়ান্ত বলে মানতে রাজী নন. ভাষ্যকাররা তাঁদের যে-যার মনের মত করে সূত্রের ব্যাখ্যা করে গেছেন। দর্শনের শেষ কথা আজও বলা হয়নি, হয়তো কখনও হবে না। কিন্তু তাঁর চোখে ভাসছে ভবিষ্যদর্শনের স্বপ্ন। তারই অনুকূলে হিন্দুধর্মের মূল সিদ্ধান্তগুলো যুক্তির ছাঁচে ঢালেন, বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাদের কষে দেখেন বেপরোয়া হয়ে। তাঁর মতে বিজ্ঞান আর হিন্দু-দর্শন একই জাতের জিনিস, কেউ কখনও এদের ইতি পায়নি, পাবেও না, আর শাস্ত্রের পুঁথি এ-দুয়েরই দুশমন।

বক্তৃতার সময় গুডউইন পাশে থেকে টুকে চলেছেন: 'সগুণ ঈশ্বরের কল্পনাটা নেহাৎ অযৌক্তিক। কিন্তু বেদান্ত বলছেন, মানুষের মনে নির্গুণের ধারণার চরম প্রকাশ ঐ সগুণে। সেদিক থেকে বিচার করলে ওটা যে যুক্তিসিদ্ধ শুধু তা নয়, ও-ছাড়া মানুষের চলেও না।' * এই সময় মিস ম্যাক্লয়েডকে লেখা এক চিঠিতে গুডউইন বলছেন,—'স্বামীজি একটা নতুন ধারা চালু করতে চাইছেন। তাঁর এখনকার বক্তৃতাগুলোর তুলনা নাই। শুদ্ধ বেদান্তের ভৈরব গর্জন শুনছি যেন তাঁর ভাষায়।' (২০শে নবেম্বর ১৮৯৬) এই সময় নিবেদিতাকে স্বামীজি বলছিলেন, 'প্রকৃতির সব রহস্যের ব্যাখ্যা তার বুক চিরেই বার করতে হয়, এই দিক দিয়ে বেদান্তে আর বিজ্ঞানে আশ্চর্য ঐক্য।

---

* চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থে ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। —রামতাপনী

দ্বৈতবাদী ধর্ম বা শাস্ত্র বাইরে হাতড়িয়ে মরে শুধু। প্রকৃতির তত্ত্ব খুঁজতে হবে তার নিজের মাঝে।'

স্বামীজির সঙ্গে শেষের দিকের এই আলোচনার প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর শিষ্যদের চোখের সামনে যেন নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছিল। কিন্তু মন্ত্রশক্তিতে তাদের আবিষ্ট করেই তিনি সরে দাঁড়ালেন। আর যেন তাঁর শক্তি নাই—তিনি ভেঙে পড়েছেন, নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছেন!

ধর্মের যে-আদর্শ আজ মার্গারেটের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, তাকে ও যাচাই করে দেখে একটা গভীর দায়িত্ববোধ নিয়ে। মার্গারেটের চরিত্রের সর্বত্র যে বলিষ্ঠতার ছাপ, এই আদর্শের মাঝেও তারই প্রতিচ্ছবি। ছয় মাস আগে স্বামীজি ওকে লিখেছিলেন, 'আমার জীবন-দর্শন কী, অল্প কয়েক কথায় তা বলতে পারি। মানুষ যে অমৃতের পুত্র, এই বাণী তাকে শোনাতে হবে, কী করে এ সত্যকে জীবনের প্রতি কর্মে ফুটিয়ে তোলা যায়, তার শিক্ষা দিতে হবে।

'সমস্ত জগৎ কুসংস্কারের শিকলে বাঁধা। আমি যে শুধু নির্যাতিতকেই করুণা করি তা নয়, যে নির্যাতন করে তার জন্যও আমার দুঃখ হয়। একটা কথা আমার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার—দুঃখের একমাত্র কারণ অবিদ্যা,—তা ছাড়া কিছুই নয়। জগৎকে কে দেখাবে আলোর পথ? প্রাচীন কালে যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গকে মানা হত বিশ্বের বিধান বলে; যাই বল না কেন, যুগ-যুগ ধরে এ বিধানই কায়েম থাকবে। পৃথিবীর যাঁরা বীর, যাঁরা মহাপ্রাণ, বার-বার তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করবেন "বহুজনসুখায় বহুজনহিতায় চ।" অনন্ত প্রেম ও করুণা নিয়ে এক বুদ্ধ নয়, শত-শত বুদ্ধকে আসতে হবে জগতের প্রয়োজনে।

'পৃথিবীর সব ধর্ম প্রাণহীন ভণ্ডামি শুধু। আজ পৃথিবীর প্রয়োজন চরিত্রবল। এমন মানুষ চাই, যাদের জীবন শুধু নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের একটা বহ্নিদহন। সেই প্রেমে তুচ্ছ মুখের কথায় সঞ্চারিত হবে বজ্রের তেজ।

'তুমি যে সংস্কার-মুক্ত এতে আমি নিঃসংশয়। তোমার গভীরে আছে জগৎকে টলিয়ে দেবার বীর্য।···এমনি আরও অনেকে আসবে। আমরা চাই উদ্দীপ্ত বাণী, দুর্ধর্ষ কর্মশক্তি। জাগো, জাগো, হে বিরাট! হাঁকো, হেঁকে চলো—ঘুমন্ত দেবতার ঘুম ভাঙুক, অন্তরের ঠাকুর সাড়া দিন তোমার হাঁকারে। জীবনে এ ছাড়া আর কী করার আছে? কোন বড় কাজ? আমি এগিয়ে চলেছি, আর কাজ গড়ে-উঠছে আমার পিছু-পিছু। আমি ছক কাটি না কোনও কালে। ছক আপনি কাটা হয়ে যায়, আপনি কাজ হয়—আমি শুধু বলে চলি, জাগো জাগো!'

স্বামীজি চলে যেতেই তাঁর বন্ধুদের দারুণ একটা অবসাদে চেপে ধরল। অধ্যাত্ম-জীবন নিয়ে একটা উৎসাহের ঢেউ খেলছিল সবার মনে, হঠাৎ যেন সেটা পড়ে গেল। মার্গারেট আর মিঃ ষ্টার্ডিকে দলের সংহতি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য উঠে-পড়ে লাগতে হল। শেষ পর্যন্ত এই আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাবটা কেটে গেল, স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে তাঁর জায়গায় গুরুভাই অভেদানন্দকে পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। অভেদানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে গড়া। তিনি লণ্ডনে এসে উইম্বলডনেই মার্গারেটের এক বন্ধুর বাসায় উঠলেন। মাস ছয়েক পরে বিবেকানন্দ আবার লণ্ডনে আসবেন এই রকম একটা আশা রইল।

একত্রে বসে ধ্যান-ধারণা আর সংস্কৃত মন্ত্রার্থ আলোচনার জন্য স্বামী অভেদানন্দের কাছে সপ্তাহে দুদিন এই সব ভারত-অনুরাগী বিদেশীরা মিলতেন এসে। কিন্তু বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই এ সম্মেলনগুলো সত্যি-সত্যি সার্থক হয়ে উঠল, তার পূর্বে উৎসাহের কিছু ঘাটতি ছিল বই কি! জনতার বিজয়-অভিনন্দনে নন্দিত হয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন কলকাতার পানে, তাঁর সতীর্থরা যখন তাঁদের গুরুর জন্মবার্ষিকীর জন্য তৈরী হচ্ছেন ঠিক সেই সময় বিবেকানন্দ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন—এই সব খুঁটিনাটি খবর লণ্ডনবাসী বন্ধুরা সাগ্রহে সংগ্রহ করেন। মাদ্রাজ তাঁকে অভ্যর্থনা করেছে জয়বাদ্যের মাঙ্গলিকে, তাঁর পায়ের তলায় নিবেদন করেছে অজস্র শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। অসংখ্য তোরণের সমারোহে সাজানো ধূপ-ধুনার সুরভি-আমোদিত পথে তাঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা করেছে সাধারণে। উচ্ছ্বাস-মুখর মানপত্রে কলকাতা তাঁকে জানিয়েছে স্বাগত সম্ভাষণ, প্রত্যুত্তরে তিনি উচ্চারণ করেছেন সার্বভৌম সত্যের মন্ত্রবাণী। এই সত্যের বার্তাবহ হয়েই তিনি পশ্চিমে গিয়েছিলেন, স্বদেশেও উন্মত্ত জনতার হৃদয় জয় করলেন এই বাণীতেই।

চার দিকে সেদিন যে উৎসাহ আর অনুরাগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ চাইলেন তাকে সত্ত-সত্ত কাজে লাগাতে। নিছক দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁর অন্তরঙ্গ সহচরেরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন, এঁদের জন্য একটা স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয় সবার আগে। তখন সন্ন্যাসীদের কেউ-কেউ কলকাতারই আশে-পাশে স্বাধীন ভাবে কাজ করছেন,—অন্যেরা পরিব্রাজক হয়ে ঘুরছেন কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় অবধি, দেউল হতে দেউলে ফিরছেন চিত্তশুদ্ধির সাধনায়। বিবেকানন্দের স্বপ্ন, এঁদের জন্য একটা মঠ হবে, কালে-দিনে সেটি হয়ে উঠবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়—অতীতের বৌদ্ধ-বিহারের মত। সেখানে এক দল তরুণ ব্রহ্মচারী অধ্যাত্ম-জীবনের দীক্ষা নিয়ে জ্ঞানের সাধনা করবে, আধুনিক জীবনের কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে কেমন করে ধ্যানযোগের জুড়ি মেলানো যায় তারই কৌশল শিখবে।

ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে ইতিপূর্বেই এ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। স্বামীজির সব চাইতে অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে, মিঃ ষ্টার্ডি তাঁর হাতে মোটা একটা টাকা দিয়েছেন এ বাবদ। লেকচার দিয়ে স্বামীজি যা পেয়েছিলেন এ টাকার অঙ্কটা তার দ্বিগুণ। স্বামীজির হাতে মোট জমেছিল চার হাজার পাউণ্ড; তাছাড়া আমেরিকার কয়েক জন শিষ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—ভাবী মঠের জন্য জায়গা পছন্দ করলেই তাঁরা অর্থসাহায্য করবেন। বিদেশের এই অকৃপণ সাহায্যের আশা কাজ শুরু করবার পক্ষে খুবই অনুকূল বটে,—কিন্তু হিন্দুস্থানে হিন্দুর জন্য যা তিনি করবেন নিঃস্বতম ভারতবাসীর খুদ-কুঁড়োর জোরেই অতি সাধারণ ভাবে তা প্রথমে চালু হোক, এই ছিল স্বামীজির ইচ্ছা। তবেই না শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য নামে পূব আর পশ্চিমের শুভার্থীরা একযোগে কাজ করে একসূত্রে বাঁধা পড়বে।

আসলে এই মঠের সূচনা হয়েছিল দশ বছর আগে, বরানগরের একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদেহী হওয়ার পর সন্ন্যাসীরা ওখানে সমবেত হয়েছিলেন। গেরুয়াধারী মুণ্ডিত-মস্তক এই সন্ন্যাসীরা স্বামী বিবেকানন্দকেই তাঁদের আচার্য ও প্রধান জেনে তাঁর নেতৃত্ব

স্বীকার করে নিয়েছিলেন তখনই। কী তীব্র উন্মাদনার দিনই গেছে সে-সব। জীবন-মৃত্যু তাঁদের কাছে সচ্চিদানন্দ লাভের পথে তুচ্ছ জঞ্জাল বই তো নয়। সমান আকৃতি নিয়ে তাঁরা ধ্যান করেছেন, জপ করেছেন, কীর্তন করেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের নামে বিভোর হয়ে নৃত্য করেছেন সবাই মিলে। নানা সাধন-পদ্ধতির অসংখ্য নিয়ম-সংযমে বিবেকানন্দ গড়ে তুলেছেন তাঁদের, জগদ্গুরুদের জীবন-কথায় তাঁদের মনকে ভাবিত রেখেছেন অনুক্ষণ। সঙ্ঘ-জীবনের প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক অনুরাগ বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের আদর্শে তীব্রতর হয়েছে, যিশুর পরম ত্যাগের আদর্শে তাঁরা গ্রহণ করেছেন সন্ন্যাসব্রত, রাম-সীতা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের আদর্শ চরমে গুরুর সঙ্গে পরম মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁদের। এর পরের পর্বে কম-বেশী সবারই মনে এল একক তীর্থ-ভ্রমণের ঝোঁক,—'চরৈবেতি' মন্ত্রে পরিব্রাজক জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন সবাই। কয়েক জন মাত্র পরমহংসদেবের স্মৃতিচিহ্নকে আগলাবার জন্য মঠে রইলেন।

পশ্চিম থেকে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ কুশলী নেতার মত এই সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের কিছু-কিছু সংস্কার করলেন, তারপর পশ্চিম থেকে যে-শিষ্যেরা এঁদের মাঝে কাজ করতে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ভাঙাই ছিল বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য, এই কাজটিতে সেই ভাঙনের প্রথম সূচনা হল। তাছাড়া সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সাধন-ভজন সম্বন্ধে গুরুভাইদের যে একটা আত্মকেন্দ্রিকতা ছিল, তাকে মানব-সেবার বৃহত্তর আদর্শে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল, কারণ পশ্চিম থেকে সদ্য তিনি ফিরে এসেছেন বিজয়ী বীরের মত; নিয়ে এসেছেন এক দুঃসাহসী পরিকল্পনা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় ভারতবর্ষে সাম্যপ্রতিষ্ঠা করবেন তিনি, জাতিভেদ আর সামাজিক বিধি-নিষেধের দোহাই দিয়ে ভারত যাদের এত দিন বিচ্ছিন্ন রেখেছে তাদের এক করবেন। তাঁকে ঠেকাবে কে? প্রথমে মুষ্টিমেয় অনুরাগী শিষ্য নিয়ে কাজ শুরু হল, কিন্তু দেখতে-না-দেখতে তা গণ্ডি ছাপিয়ে উঠল। স্বামীজির গৃহস্থ ভক্ত আর বন্ধুরাও সাড়া দিলেন। বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাড়িতে সবাই একত্র হলেন। কাজের ভিত্তি পাকা করতে হলে এমনিতর আনুকূল্য নিশ্চয় চাই: দুঃখ এই যে, যতখানি আনুকূল্য দরকার তা পাওয়া সহজ ছিল না। এ দূর-প্রসারী পরিকল্পনা যেন ভূমিকম্পে ভেঙে-পড়া সহরের বুকে একটা নতুন প্রাসাদ গড়ে তোলবার মত। শরীরের দিকে একটুও খেয়াল না রেখে স্বামীজি মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন এ-কাজে। ১৮৯৭এর ৫ই মে একখানা চিঠিতে মার্গারেটকে লিখলেন, 'এক-একটা সময় আসে যখন মানুষের মন একেবারে ভেঙে পড়ে—বিশেষতঃ, একটা আদর্শের পিছনে সারা জীবনে খেটে তাকে অংশত সার্থক করবার ক্ষীণ আশার মুখে হঠাৎ যদি মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ে। রোগের জন্য আমি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করি না,—শুধু এই আফশোষ, আমার আদর্শকে রূপ দেবার এতটুকু সুযোগও আজ পর্যন্ত পেলাম না। তুমি তো জান, মুশকিল হল টাকার অভাব। হিন্দুরা শোভাযাত্রা ইত্যাদি অনেক কিছুই করছে, কিন্তু তারা টাকা দিতে পারবে না। এ-দুনিয়ায় এক যা ভরসা পেয়েছিলাম ইংল্যাণ্ডে। সেখানে থাকতে ভেবেছিলাম, কলকাতায় অন্ততঃ প্রধান কর্মকেন্দ্রটা খোলার পক্ষে হাজার পাউণ্ডই যথেষ্ট, দশ-বারো বছর আগেকার কলকাতা সম্বন্ধে আমার যে-অভিজ্ঞতা তাই থেকেই এই হিসাব করেছিলাম। এখন সব-কিছুর দাম তিন-চার গুণ বেড়ে গেছে। অবশ্য কাজ আমি আরম্ভ করেছি কোনও মতে। একটা নড়বড়ে ছোট্ট পুরানো বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে তিন টাকায়, সেখানে প্রায় চব্বিশটি তরুণকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।'

চিঠি পেয়ে মার্গারেট বলে উঠল, 'মঠ তাহলে হয়েছে! জয় ভগবান!' সঙ্গে-সঙ্গে সংবাদটা ছড়িয়ে দিল, আর এই নতুন প্রতিষ্ঠান এবং পশ্চিমের শিষ্যদের মধ্যে ওই নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলল। ওখানকার শিষ্যেরা তখন বুঝতে চাইছেন প্রতিষ্ঠানের মর্মকথাটি কী। 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামের এই সঙ্ঘটির দুটো জিনিস হল প্রধান। প্রথমত, সঙ্ঘের কাছে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করতে হবে সবাইকে। স্বামীজি চেয়েছিলেন, এতে সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরা ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন হতে শিখবে, আর তাদের আত্ম-বিসর্জনের ভাবটিও পাকা হবে। দ্বিতীয় কথা হল, গৃহস্থ আর সাধুদের মধ্যে সহযোগিতা রক্ষা করা যাবে কী করে এই সমস্যার সমাধান করা। পশ্চিমে এককালে সেন্ট ফ্রান্সিস আর ক্যাথারিন অব্‌ সিয়েনা ঈশ্বরের করুণার কথা ঘরে-ঘরে প্রচার করেছেন আর সেই সঙ্গে অসীম ধৈর্যে ধনীর দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরেছেন সাহায্যের আশায়। বিংশ শতকে রামকৃষ্ণ মিশন ঠিক এই দুঃসাহসের কাজটাই আবার আরম্ভ করল। সন্ন্যাসীরা সহকর্মীদের নিয়ে হাসপাতাল-বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা এবং নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার কাজও করবেন ঠিক হল।

মঠের দপ্তরে আজও সেই মলাট-খসা এক্সারসাইজ বুকখানা আছে, যাতে একজন সাধু প্রতিষ্ঠানের প্রথম রিপোর্ট টুকে মার্গারেটকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, লণ্ডনের ভক্তদের সে ওটা পড়ে শোনাবে। পাণ্ডুলিপিটি দেখলে মনে দোলা লাগে। ওতে মঠের সাধুদের দৈনন্দিন জীবনের সব খুঁটিনাটি দেওয়া আছে; বাইরের কাজে পাঠানোর আগে কী ভাবে তাদের পরিপূর্ণ আত্ম-সংযম শেখানো হয়, সবই খোলাখুলি বোঝানো হয়েছে ঐ রিপোর্টে। মার্গারেট এদের দিনচর্যার নিয়মগুলো খুঁটিয়ে পড়ে, ব্রহ্মচারীদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনযাত্রাটা মিলিয়ে দেখে। এর থেকে নিজের ছন্নছাড়া চিন্তাগুলোকে কেমন করে সংহত করতে হয় তার একটা চমৎকার কৌশল শিখল ও, তাই দিয়ে মনকে বাগ মানাবার চেষ্টায় লেগে গেল। মঠের দিনচর্যা তৈরি করা হয়েছে অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে। খুব ভোরে উঠে, কাজে যাওয়ার আগে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধ্যান করতে হবে। কয়েক জন সকালের পূজার্চনা ইত্যাদি করবেন। সারা দিনের পঠন-পাঠনের মাঝে দুপুরের খাওয়া আর দু'ঘণ্টা বিশ্রামের একটা ছেদ। বিকালের সমবেত সাধু-ব্রহ্মচারীদের এক পণ্ডিত এসে পড়াবেন উপনিষদ, গীতা আর বাইবেল। মার্গারেট ভাবে,—ঐ লোকোত্তরের গবেষণার বদলে যদি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন আর সংসারের কাজ-কর্মকে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেই আমার দিনচর্যার সঙ্গে এঁদের জীবনযাত্রার কোন তফাৎ থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দের হাতে এই যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, অন্তরের ভীরু অভীপ্সাকে এই যে তিনি উদ্দীপ্ত করে তুলছেন ঐকান্তিক আত্মোৎসর্গের বহ্নিশিখায়, তার মাঝে মার্গারেটেরও একটা স্থান আছে বই কি!...আমি যদি ভারতবর্ষে

যাই, মঠের পরবর্তী রিপোর্টে একটি লাইন নতুন করে জুড়ে দেওয়া হবে—"মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলা হয়েছে।" কথাটা ভেবে ওর খুব একটা আনন্দ হয়।

স্বামীজির সঙ্গে ওর যে চিঠি-লেখালেখি হয় তাতে দুজনেরই কাজের কথা থাকে। ও তাঁকে লণ্ডনের শিষ্যমহলের খুঁটিয়ে খবর দেয়। 'পিতা নোহসি' বলি যে দেবতাকে, তাঁকে মানুষ ভেবে গোঁড়ামি করি ; আবার আত্মার চরম গতি সম্বন্ধেও সংশয়ের অন্ত নাই। ইউরোপের ভক্তিবাদ আর যুক্তিবাদ এই দোটানায় বিভ্রান্ত। কিন্তু বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়মে'র ভাবাদর্শে বুদ্ধি তৃপ্ত হয় এদের দুজনেরই—এ সোজা পথ। কী পরম শান্তি এ-ভাবনায়। এর আগে স্বামীজি যখন বলতেন, 'বল সোঽহম্, সোঽহম্' তখন বিনা যুক্তিতে ভাবটা বুঝতে গিয়ে প্রত্যেকেরই ধাঁধা লেগেছে। কিন্তু এখন যেন সব অভিজ্ঞতার মূলেই একটা যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে, আর কেন যে আগে এ-কথা বোঝা সহজ হয়নি তারও ব্যাখ্যা মিলছে। এত দিন তারা যা শুনেছে, সবই যেন তাদের জানা কথা, —কিন্তু তবুও কেন জানি তাদের মুখ ফোটেনি। আর আজ?

এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ ওকে আলমোড়া থেকে লেখেন (২০শে জুন ১৮৯৭)—'সোজাসুজিই বলি তোমায়। তোমার প্রত্যেকটা কথার দাম আছে আমার কাছে, প্রত্যেকটা চিঠিই হাজার বার সুস্বাগত। যখনই ইচ্ছা হবে, সুযোগ মিলবে, আমায় চিঠি লিখো। যা মনে হবে তাই লিখো, তোমার কোন কথাই ভুল বুঝব না, অবুঝ হয়ে উড়িয়ে দেব না। ওখানকার কাজের কোনও খবর কিন্তু আজও পাইনি। কেমন চলছে বলতে পার? আমায় নিয়ে যত উৎসবই হোক না, ভারতবর্ষ থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা রাখি না। বড় গরীব এরা!

'গাছতলায় থেকে কোন মতে দেহটাকে টিকিয়ে রেখে চলা—এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। ঠিক সেই ভাবেই এখানে কাজ শুরু করেছি। পরিকল্পনারও কিছু রদ-বদল হয়েছে। কয়েকটি ছেলেকে দুর্ভিক্ষ-অঞ্চলে কাজ করতে পাঠিয়েছি। ফল হয়েছে ভোজবাজির মত। আগেই জানতাম, এবার চাক্ষুষ দেখলাম। জগৎকে নিজের অনুকূলে পাওয়ার পথ হৃদয়ের ভিতর দিয়ে—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে'। সুতরাং আপাতত ঠিক করেছি, নিম্নশ্রেণীর নয় ভদ্রশ্রেণীর এক দল তরুণকেই গড়ে-পিটে তুলব।* নিম্নবর্ণের জন্য কিছু দিন সবুর করতে হবে। প্রথমে ভদ্র ছেলেদের একটা দল পাঠিয়ে দেশের সর্বত্র কাজের ভূমিকা রচতে হবে। দেশের অধ্যাত্ম-প্রগতির পথে এরা কুলি-মজুরের কাজ করে রাস্তা তো পরিষ্কার করুক, তারপর আসবে বড়-বড় সিদ্ধান্ত খাটানোর সময়, দর্শন-চর্চার অবসর।

'এক দল ছেলেকে শিখিয়ে তোলা হচ্ছে এর মধ্যেই ; তবে যে সামান্য আশ্রয়টুকু ভাড়া করে আমরা কাজ চালাচ্ছিলাম, সেদিনকার ভূমিকম্পে সে বাড়িটি গেছে। কিছু ভেবো না। নাই-বা থাকল একটা আশ্রয়, সব ঝামেলা ঠেলেই এ-কাজ করতে হবে···নেড়া মাথা, কম্বল সম্বল, আর যখন যা জোটে তাই খাওয়া—এই এখনকার হাল, কিন্তু এমন দিন থাকবে না, অবস্থার পরিবর্তন হবেই। আমরা মন-প্রাণ দিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি যে!

'এ দেশের লোকের ত্যাগ করবার মত বিশেষ কিছু নাই। এটা এক দিক দিয়ে সত্যি বটে। তবু ত্যাগ-বৈরাগ্য আমাদের রক্তে। আমার একটি শিক্ষানবিশ ছেলে একটা জেলার একসিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের পদ পেয়েছিল—এখানে ওটা দস্তুরমত বড় চাকরি। কিন্তু ছেলেটি কুটোর মত তা ছেড়ে এসেছে!'

চিঠির মধ্যে আবেদন-নিবেদন কিছুই নাই। তবু মার্গারেট এবং লণ্ডনের শিষ্যদের মনে হল এই বীরের কাজে সহযোগিতা করতে তাঁরা বাধ্য। মার্গারেট নিজেই উদ্যোগী হয়ে চাঁদা আদায়ের কাজে লেগে গেল। লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলিতে লিখল,—'এক অভিনব ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুর সমবায়ে গড়া এমন সঙ্ঘ বুদ্ধের পর থেকে আর হয়নি। মুক্তহস্তে দান করুন আপনারা। এক মাসের মধ্যে দশ হাজার লোককে দুর্ভিক্ষের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে এই সঙ্ঘ। এক মুঠো চালের বিনিময়ে একটা মানুষকে মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা যায়! আমাদের সাহায্য আজ নিতান্ত জরুরী।'

স্বামীজি লিখলেন, 'এখানে না এসে লণ্ডনে থাকলে তুমি আমাদের হয়ে ঢের বেশী কাজ করতে পারবে। নিরন্ন ভারতবাসীদের জন্য বিপুল আত্মত্যাগ তোমরা করলে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।' (২৩শে জুলাই ১৮৯৭)।

স্বামীজির কথা থেকে বোঝা গেল, মার্গারেটের অর্থ-সাহায্য তিনি গ্রহণ করলেন, কিন্তু ভারতে যাওয়ার জন্য দিন-দিন তার যে আগ্রহ বেড়েই চলেছে, সেটা বরং দমিয়েই দিচ্ছেন। এমনি চলল কিছু দিন। শেষ পর্যন্ত মার্গারেট এক রকম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জানতেই চাইল, 'আমি কি ভারতবর্ষের কোন কাজে লাগব, আপনি খোলাখুলি বলুন দেখি। আমি ওখানে যেতে চাই। কেমন করে নিজেকে ভরিয়ে তুলতে হয়, ভারতের কাছে সেই শিক্ষাই পেতে চাই।'

এই অপরূপ কথা ক'টির জন্যেই স্বামীজি এত দিন অপেক্ষায় ছিলেন। আজ মার্গারেট দাতা হওয়ার গর্ব ছেড়ে হাত পাততে শিখেছে। আর সে শেখাতে চায় না, শিখতে চায়। ধর্ম-প্রচারকের ঘরে ওর জন্ম—অস্বীকার করলে হবে কি, একটা প্রচ্ছন্ন ঔদ্ধত্য ওর মজ্জাগত। কিন্তু এত দিনে সেটা ভুলেছে মার্গারেট। আত্মীয়-পরিবারের কাছে ধর্ম সম্বন্ধে যে মনোভাব উত্তরাধিকারসূত্রে ওর পাওয়া, আজ আর তা পথের বাধা নয়। স্বামীজি ওর নিজের স্বভাবের হাত থেকেই ওকে বাঁচিয়েছেন। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তরে লিখলেন, —'কাল ষ্টার্ডির এক চিঠিতে জানলাম, এখানকার অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখবার জন্য ভারতে আসতে স্থির করে ফেলেছ।···তবে খোলাখুলিই বলি। ভারতবর্ষের জন্য যে-কাজ তুমি করবে, তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। পুরুষ নয়, সিংহিনীর মত শক্তিময়ী একটি নারী চাই। এ দেশের জন্য, বিশেষ করে এ দেশের মেয়েদের জন্য খাটতে হবে তাকে।

'ভারতবর্ষ—আজও মহীয়সী নারীকে সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্য দেশের কাছ থেকে এ-জিনিস তাদের ধার করে আনতে হবে। তোমার শিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানব-প্রেম, সংকল্পের দৃঢ়তা,—সব চেয়ে বড় কথা তোমার কেল্টিক রক্তের তেজ,—এই সব

* ১৮৯৭-এর ৪ঠা জুলাই আরেকটা চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'বুদ্ধের পর বোধ হয় এই প্রথম দেখা গেল, বামুনের ছেলেরা কলেরা রোগী পারিয়ার পাশে বসে সেবা করছে!'

আছে বলে এ দেশের জন্য যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই।

'তবু ভাববার আছে অনেক কিছু। এখানে এলে যে দারিদ্র্য, কুসংস্কার আর দাস-মনোবৃত্তি দেখতে পাবে, আজ তা কল্পনায়ও আনতে পারবে না। এখানে এসে তোমায় পড়তে হবে অর্ধ-নগ্ন জনসাধারণের মাঝখানে। তাদের ধারণা সব অদ্ভুত; তারা জাতিভেদ মানে, একসঙ্গে বসবাস করতে পারে না। সাদা চামড়ার মানুষকে তারা এড়িয়ে চলে—ভয়েও বটে, ঘৃণাতেও বটে। সাদা আদমীদেরও তারা চক্ষুশূল। আবার এদিকে শ্বেতকায়রা তোমাকে মনে করবেন মাথা-পাগলা,—তোমার প্রত্যেকটি চাল-চলন সংশয়ের চোখে লক্ষ্য করা হবে।

'এখানকার আবহাওয়া ভয়ানক গরম। বেশীর ভাগ জায়গায় শীতকালটা তোমাদের গ্রীষ্মকালের মতন। আর দক্ষিণ দেশে তো সব সময় আগুনের হল্কা বইছে যেন। শহরের বাইরে কোনও রকম ইউরোপীয়ান স্বাচ্ছন্দ্য পাবার উপায় নাই। এ সত্ত্বেও যদি এখানে আসতে সাহস কর, তোমায় স্বাগত সম্ভাষণ জানাই—একবার নয়, একশ' বার। আমার কথা যদি বল, অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি আমি নগণ্য লোক। তবু আমার যেটুকু প্রভাব আছে, তোমার পিছনে তার সবটুকুই আমি খরচ করব নিশ্চয়।

'ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে অবশ্যই ভাল করে ভেবে দেখবে। আর কাজে নামার পর, যদি ব্যর্থকাম হও কিংবা মন বিগড়ে যায়, আমার দিক থেকে আমি কথা দিচ্ছি, তুমি এ দেশের কাজ কর আর নাই কর, বৈদান্তিক হতে পার বা নাই-ই পার, আমরণ আমি তোমার পাশে থাকব। "মরদ কী বাত হাথীকা দাঁত" একটা কথা আছে। পুরুষের জবানের নড়চড় হয় না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। আবারও একটু সাবধান করে দিই, তোমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। ······র পক্ষচ্ছায়ার বা কারও আশ্রয়ের ভরসা করা চলবে না।' (২৯শে জুলাই ১৮৯৭)।

এ চিঠিটা মার্গারেটকে ঠিক যেন চাবকে দিল। বাইরে কথাটা গোপন রাখলেও, ইতিমধ্যেই ওর যাওয়া সম্বন্ধে ও মনস্থির করে ফেলেছে। পরের কয়েকটা মাস ও চিঠিপত্রের মারফৎ ভাল করে বুঝতে চাইল স্বামীজি কী মনোভাব নিয়ে কাজে নেমেছেন, যাতে ও ঠিক তাঁর মতনটি হতে পারে। ওর সব প্রশ্নেরই পুরো জবাব দিলেন তিনি। বিশেষ করে, ওকে দিয়ে যে-কাজ করিয়ে নিতে চাইছেন তার জন্য কী ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রয়োজন তারও একটা খসড়া দিলেন।

১৮৯৭এর ১লা অক্টোবর স্বামীজি লিখলেন—'এমন লোক আছে যাদের কেউ চালিয়ে নিলে খুব ভাল কাজ করতে পারে। সবাই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। কিন্তু যিনি শিশুর মত নেতৃত্ব করতে পারেন, তাঁকেই বলি আদর্শ নেতা। শিশু বলতে গেলে সবারই মুখ চেয়ে থাকে, অথচ বাড়ির রাজা সেই-ই। অন্ততঃ আমার মতে, সার্থক নেতৃত্বের রহস্য এই।···অনুভব করে অনেক-অনেক কিছুই, কিন্তু অল্প লোকেই তা প্রকাশ করতে পারে। ভালবাসা, দরদ বা সহানুভূতির ভাবটি প্রকাশ করার ক্ষমতা যার যত বেশী, সেই তত বেশী কোনও একটা আদর্শ পরের মনে চারিয়ে দিতে পারে···

'সব চাইতে মুশকিলের কথা এই: অনেককেই দেখলাম তাদের প্রায় সবটুকু ভালবাসাই আমাকে দিতে চায়। কিন্তু বিনিময়ে আমি তো আমার সবটুকু তাদের দিতে পারি না, তাহলে আমার কাজ সেই দিনই খতম হয়ে যাবে। অথচ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির ব্যাপ্তি যাদের আসেনি তারা কিন্তু এমন প্রতিদানের আশা রাখবেই। মানুষের প্রাণঢালা ভালবাসা যত পাই, ততই ভাল—নইলে কাজ চলবেই না। কিন্তু আমাকে থাকতে হবে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। তা না হলে ঝগড়া আর রেষারেষিতে সব ছারেখারে যাবে। যিনি নেতা তাঁকে নৈর্ব্যক্তিক ভূমিতে থাকতে হবে। তুমি যে এটা বোঝ তাতে আমার সন্দেহ নাই। নিজের প্রয়োজনে অন্যের ভক্তি-ভালবাসার সুযোগ নিয়ে কাজ আদায় করবে, তারপর আড়ালে মুচকি হাসবে এমন জানোয়ার হওয়ার কথা আমি বলছি না। আমি নিজে যা, তাই বলছি। অত্যন্ত গভীর ভাবে কাউকে ভালবাসতে পারি, কিন্তু যদি দরকার হয়, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" নিজের হৃৎপিণ্ড নিজের হাতে উপড়ে ফেলার শক্তি রাখি। পাগলের মত ভালবাসব, কিন্তু কোনও বন্ধন থাকবে না। ভালবাসার শক্তিতে জড় চিন্ময় হল। এই হল বেদান্তের সার কথা। একই আছেন বিশ্ব ভরে; অজ্ঞানী তাঁকে বলে জড়, জ্ঞানী বলেন ভগবান। জড়ের মাঝে তিলে-তিলে চৈতন্যের আবিষ্কার করেই না এগিয়ে চলেছে মানব-সভ্যতার ইতিহাস। যেখানে ব্যক্তি নাই সেখানেও ব্যক্তিকে দেখে অজ্ঞানী; আর জ্ঞানী ব্যক্তির মাঝে দেখেন নৈর্ব্যক্তিককে। সুখে-দুঃখে এই শিক্ষাই না পেয়ে চলেছি···অতিরিক্ত ভাবালুতায় কোনও কাজ হয় না। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি"—এই হল নীতি।'

চিঠিখানা নিয়ে মার্গারেট অনেক ভাবল। একটা উপদেশ স্বামীজি কেবল দেননি, অতীত জীবনটা পিছনে ফেলে কী করে ও এগিয়ে চলবে! মুক্তির পথে চলতে গেলে যত পিছুটান সবই তো ঝেড়ে ফেলতে হবে। পিছনে যা ফেলে এসেছে, তার কণাটুকুও তো সামনের সঙ্গে মেশানো চলবে না। নারী-হৃদয়ের আশাভঙ্গের এতটুকু বেদনাও তো এই আত্মনিবেদনের সঙ্গে জড়াতে সে পারবে না। আত্মোৎসর্গের যে আনন্দ তার আস্বাদ যত দিন ও না পেয়েছে, তত দিন স্বামীজি ওকে দূরে বসিয়ে রেখেছেন, কাছে টানেননি।

মাকে এ-খবরটা দিতেই মার্গারেটের যা একটু কষ্ট। কিন্তু মা জানতেন। মার্গারেট যে নীড়ের মায়া কাটিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, তা তাঁর বুঝতে বাকী ছিল না। মেয়ে তৈরি হচ্ছে দেবতার বিরাট কাজের জন্যে। মাও প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। দুটি হাত মেলে দিয়ে সেই ত্রিশ বছর আগের প্রার্থনাই বার বার আবৃত্তি করতেন তিনি, 'প্রভু, এই যদি তোমার ইচ্ছা—তবে তাই হ'ক, আমার মেয়েকে আমি তোমার পায়েই সঁপে দিলাম।' সেই সঙ্গে আর একটুখানি শুধু জুড়ে দিতেন—'ওর আর আমার, আমাদের দুজনেরই ভার তোমার 'পরে ঠাকুর।' কিন্তু এ-সব তাঁর মনেই লুকানো থাকত, কেন না তাঁর প্রশান্ত ত্যাগের শক্তির উৎস ছিল এই মৌনে।

যাওয়ার ব্যবস্থা করতে মার্গারেটের আরও কয়েক মাস লাগবে। অধ্যাত্ম-জীবনের আকর্ষণে দেবতার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করবার আগে জগতের প্রতি সংসারের প্রতি, যা-কিছু কর্তব্য সব শোধ করতে হবে—অন্তরঙ্গ শিষ্যদের এই শর্ত কবুল করিয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

ওকেও সেই শর্ত মানতে হবে যে! মার্গারেট হল বাড়ির মাথা, ও চলে গেলে সংসারের প্রধান আশ্রয়ই গেল। কুড়ি বছরের রিচ্‌মণ্ড আর দুই বোনে মিলে ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করে দীর্ঘকাল ধরে। রাস্কিন স্কুলের তখন পুরা মরশুম, ছাত্র জুটেছে অনেক। ওখানকার কাজটা মার্গারেট মেরীকে দিল।

মার্গারেটের বন্ধু-বান্ধবরা ভেবেছিলেন, নেহাৎই বিদেশ দেখবার মতলবে ও ভারতবর্ষে চলেছে তাই বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হননি কেউ-ই। কেবল মিঃ ষ্টার্ডি জানতেন, মার্গারেট নতুন জীবন আরম্ভ করতে যাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে বহু দিন ধরে পরামর্শ করেছে ও। এ-সব চিন্তায় ও এত তন্ময় হয়ে থাকত যে মিঃ ষ্টার্ডি ওকে ভারতে যাওয়ার জন্য উৎসাহই দিতেন। শেষ দেখা করতে গিয়ে নেল'হ্যামণ্ডকে ও সব খুলে বলল, এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথাও হল। পার্ক রোডের এই ছোট্ট বাড়িটি ওদের প্রাণখোলা বন্ধুত্বের নীরব সাক্ষী। ম্যাণ্টলপীসের উপর একটি স্ফিঙ্কস্ আজ মনে হয় মার্গারেটের এ যেন কত প্রিয়! মেরী আর অক্‌টেভিয়াস বৌটিকে যেন দেখে-শোনে নেল হ্যামণ্ড, মার্গারেট অনুরোধ জানাল। অক্‌টেভিয়াসের সঙ্গে দীর্ঘ আট বছরের বন্ধুত্ব! 'তোমরা দুজনে ওকে বিশেষ ভাবে আপন করে নেবে এই আমি চাই। সব সময়েই মনে হয়েছে, তোমাদের সঙ্গে ওর একটু ভাবের অভাব! কিন্তু ওর ভাল দিকটা তোমরা দেখবে এই আমার দাবি। ম্যার্টাসিনি পড়ে ওকে তার ভাষ্য হিসাবে দেখো। তাহলে বুঝবে, আসলে ও কত ভাল—দুর্বল আর নির্যাতিতের জন্যে ওর মনটা সর্বদাই আতুর হয়ে থাকে, বিশ্বমানবের প্রতি ওর কী গভীর ভালবাসা।'

মার্গারেটের যাওয়ার কথায় অক্‌টেভিয়াস একেবারে বেঁকে বসলেন। ওর যুক্তিগুলো শুনলেন, তারপর ঘরের মাঝে লম্বা-লম্বা পা ফেলে পায়চারি শুরু করলেন। একটু পরে পাইপ বার করে ধীরে-সুস্থে সেটি ধরান হল। তারপর মার্গারেটের পাশে বসে ঝাড়া একটি ঘণ্টা আগুনের কুণ্ডের পানে তাকিয়ে রইলেন—আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ। শেষে শান্ত স্বরে বললেন, 'তোমাকে বিদায় দিতে আমি ডকে আসব।'

যাওয়ার দিন কনকনে ঠাণ্ডা আর বৃষ্টি। যে-ক্যাবখানায় চড়ে ওরা টিল্‌বারিতে চলেছে তার খড়খড়িতে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ছাট। প্রত্যেকেরই ভিতরটা উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপছে। ওর মা-বোন, ভাই অক্‌টেভিয়াস বৌটি আর এবেনজার কুক্ বন্দরে দাঁড়িয়ে রইলেন, ধীরে-ধীরে জাহাজখানি কুয়াশার মাঝে একেবারে মিলিয়ে গেল। মা-বোন কাঁদতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ধরে ওঁরা দেখলেন, মার্গারেট দাঁড়িয়ে আছে ডেকের ওপর। মাথায় হ্যাট নাই, মুখখানিকে ঘিরে সোনালী চুলের রাশ! আশ্চর্য সুন্দর লাগছিল ওকে—কী প্রশান্ত, কী গম্ভীর! আর সে ওঁদের কেউ নয়। তবু ওর অফুরন্ত ভালবাসা যেন দেবতার আশীর্বাদের মত ঝরে পড়ছে ওদের 'পরে। ওর পিঙ্গল দৃষ্টি অপলকে খুঁজে ফিরছে কোন সুদূরের আলো—যার উদ্দেশে এই অভিসার!

হাতের মুঠোয় বিবেকানন্দের লেখা সেই চিঠিখানা,—"মরদ কী বাত, হাথী কা দাঁত", পুরুষের জবানের নড়চড় হয় না। আমরণ আমি তোমার পাশে থাকব, কথা দিচ্ছি তোমায়।' [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী

সেবাব্রতী ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পরপদানত ভারতেরই মত ইংরেজের অধীন আয়র্লণ্ডের যে দুহিতা স্বামী বিবেকানন্দের দীক্ষার ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পর্শে ভারতের ভগিনী নিবেদিতায় পরিণত হইয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ ও বহুমুখী মনীষার পরিচয়—অসমগ্র হইলেও—তাঁহার নানা রচনায় পাইয়া ভারতের নরনারী চিরদিন তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলেও তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের করুণা-স্নিগ্ধ সেবাব্রতের কথা অনেকেই অবগত নহেন। মনীষা অন্ধকারে আলোকবিকাশ করিয়া মানুষকে ধন্য ও আপনাকে সার্থক করে; সেবা যাহার বেদনার ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ—সে ব্যতীত অন্যের নিকট তাহার অনুভূতি সম্ভব হয় না। সেবা করুণার উৎস হইতে উদ্গত ও সহানুভূতিতে পুষ্ট হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নারীসমাজকে যে আদর্শ প্রদান জন্য এই আইরিশ কুমারীকে ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগের দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার সেবা-পরিচয় স্মরণ করিলে আমরা ধন্য হইতে পারি। সে পরিচয় আমরা নানা ক্ষেত্রে পাইয়াছি। সে সেবা অজ্ঞতায় দুর্ব্বল হয় নাই, উপেক্ষায় সঙ্কুচিত হয় নাই, প্রত্যাখ্যানে কুণ্ঠিত হয় নাই।

আজ আমরা ব্যাধির প্রকোপে যেমন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের আক্রমণে তেমনই তাঁহার সেবাব্রতের পরিচয় দিব।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন বোম্বাই সহরে প্লেগ দেখা দিয়া ক্রমে চারি দিকে বিস্তৃত হয়, তখন ইংরেজ শাসকরা প্লেগ দমনের জন্য যে সকল উগ্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাতে এবং সেই সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে নিযুক্ত য়ুরোপীয় সৈনিকদিগের অত্যাচারে বোম্বাই জর্জ্জরিত হয়। কলিকাতায় যখন প্লেগ দেখা দেয়, তখন বোম্বাই সহরে সংঘটিত অবস্থা স্মরণ করিয়া কলিকাতায় সন্ত্রাস-সঞ্চার হয়। দলে দলে লোক কলিকাতা হইতে পলাইতে থাকে—ব্যবসা-বাণিজ্য স্তম্ভিত হয়—লোক কি করিবে স্থির করিতে অক্ষম হয়। পর-বৎসর (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ) প্লেগ দেখা দিলে বাঙ্গালার ছোটলাট সার জন উডবার্ণ আশ্বাস দেন—সম্মতি ব্যতীত স্বামীকে স্ত্রীর নিকট হইতে বা স্ত্রীকে স্বামীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া হাসপাতালে দেওয়া হইবে না। এই আশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে প্লেগের রোগীর জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতে থাকে। কিন্তু চিকিৎসকের—বিশেষ শুশ্রূষাকারীর অভাবে সে আয়োজন ফলপ্রসূ হইতে পারিতেছিল না। বহু চিকিৎসক প্লেগাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করিতে দ্বিধা-বিচলিত হইয়াছিলেন এবং প্লেগগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করিতে যাইয়া প্লেগে ডক্টর অমূল্যচরণ বসুর মৃত্যুতে সে দ্বিধা বিবর্দ্ধিত হয়। ডক্টর রাধাগোবিন্দ কর প্রমুখ কয় জন চিকিৎসক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য পালন করিবার সম্বন্ধে বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করেন। ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পরে ডক্টর রাধাগোবিন্দ কর লিখিয়াছিলেন :—

"সেই সময় এক দিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগিপরিদর্শনান্তে গৃহে

ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারপথে ধূলিধূসর কাষ্ঠাসনে এক জন য়ুরোপীয়া মহিলা উপবিষ্টা! তাঁহার পরিধান গৈরিক বাস, গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা, আননে দিব্য দীপ্তি। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা। ইনি একটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগমন-প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই দিন প্রাতে বাগবাজারে কোন বস্তীতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। নিষ্ঠুর ব্যাধি পূর্ব্বেই শিশুকে মাতৃহীন করিয়াছিল। রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই ভগিনী নিবেদিতার আগমন। তাঁহার প্রতি কথায় ব্যাকুল করুণা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। আমি বলিলাম, রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বাগদী-বস্তীতে কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্য্যা সম্ভব তাহার আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম। অপরাহ্ণে পুনরায় রোগী দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে—সেই আর্দ্র জীর্ণ কুটীরে নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি—রাত্রির পর দিন তিনি স্বীয় আবাস ত্যাগ করিয়া সেই কুটীরে রোগীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ঘর পরিশোধিত করা প্রয়োজন—তিনি স্বয়ং একখানি ক্ষুদ্র মই লইয়া ঘর 'চূণকাম' করিতে লাগিলেন। ঔষধ-পথ্য সবই তিনি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও তাঁহার শুশ্রূষায় শৈথিল্য সঞ্চারিত হইল না। দুই দিন পরে মাতৃহীন শিশু এই করুণাময়ীর স্নেহস্নিগ্ধ অঙ্কে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

"এই সঙ্কট সময়ে বাগবাজার পল্লীর প্রতি বস্তীতে ভগিনী নিবেদিতার করুণাময়ী মূর্ত্তি লক্ষিত হইত। আপনার আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াও তিনি অপরকে সাহায্য করিতেন। এক বার এক জন রোগীর ঔষধ-পথ্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য দুগ্ধপান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অথচ তখন দুগ্ধ ও ফলমূলই তাঁহার আহার ছিল।"

ডক্টর রাধাগোবিন্দ কর যে বালকের কথা বলিয়াছেন, অবলা বসু তাঁহার ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। জ্বর-বিকারে বালক ভগিনী নিবেদিতাকেই তাহার জননী বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাঁহার অঙ্কেই তাহার মৃত্যু হয়।

১৯০৬-১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" (১৭৭০ খৃষ্টাব্দ) বাঙ্গালার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তাহার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সে চিত্র কোথাও অতিরঞ্জিত নহে। যাঁহারা সরকারের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, সে চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই—করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না—কারণ, সত্য যে সকল স্থানে কল্পিত অপেক্ষাও ভয়াবহ, দুর্ভিক্ষ সে সকলের অন্যতম। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" পরে বিহার ও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয়ের যে সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, বিহারে তাহা বড়লাট নর্থব্রুকের বিস্ময়কর চেষ্টায় সত্যে পরিণত হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু উড়িষ্যায় সরকারের ত্রুটিতে তাহা ভয়াবহ হইয়াছিল। খাস বাঙ্গালা বহু দিন দুর্ভিক্ষ ভোগ করে নাই। অর্থনীতিবিদ্রা বলেন, তাহার কারণ—বাঙ্গালার ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা; যাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, তাহার কারণ, বাঙ্গালার প্রাকৃতিক অবস্থা—বাঙ্গালা সুজলা সেই জন্য শস্য-শ্যামলা। পূর্ব্ববঙ্গে জলের প্রাচুর্য্য। ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন, এই অংশ প্রকৃতির দ্বারা সবুজ ও নীল বর্ণে রঞ্জিত—মাঠ ও বন, তালতরু, উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র—এ সব সবুজ, আর সব স্থান নীল নীল—নীল, উপরে আকাশ নীল—নিম্নে চারি দিকে স্নিগ্ধনীলপরিসর জল নীল। এই পূর্ব্ববঙ্গ উর্ব্বর—ইহার মধ্যেই বাঙ্গালার শস্য-সম্ভার সঞ্চিত; ইহাই বাঙ্গালায় অন্নপূর্ণার অন্নক্ষেত্র।

এই পূর্ব্ববঙ্গে যখন "অজন্মায়" শস্যহানি হইল, তখন বাঙ্গালার দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল। আবার বিপদ যেমন একাকী আসে না—তেমনই দুর্ভিক্ষের পরে প্লাবন আসিয়া বিপদ বিবর্দ্ধিত করিল।

সেই বিপদের বার্ত্তা যাঁহাদিগকে বিচলিত করিল—ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি বুঝিয়াছিলেন:—

"দুর্ভিক্ষ সামাজিক পক্ষাঘাত। যে সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে, তাহা এক বৎসর দুর্ভিক্ষে খণ্ড খণ্ড হইয়া বিনষ্ট হইতে পারে। কারণ, কোন স্থানে যখন সকল সম্প্রদায় দুঃস্থ হয়, তখন সমাজের সব বন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। * * * সামাজিক বিশৃঙ্খলা দুর্ভিক্ষের পরোক্ষ কিন্তু সুদূরপ্রসারী ফল। কারণ, দুর্ভিক্ষ কেবল ক্ষুধাই আনে না। দুর্ভিক্ষ এমন ক্ষুধার সৃষ্টি করে যে, যে স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে সাহায্য দান করা হয় নাই, এমন স্থান হইতে প্রত্যাগত এক জন লোক রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতেন না—তিনি যেন সর্ব্বদাই ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেন। এই ক্ষুধা ভয়াবহ। কিন্তু দুর্ভিক্ষে কেবল ক্ষুধাই সৃষ্ট হয় না। দুর্ভিক্ষ দারুণ দারিদ্র্য সৃষ্টি করে—বস্ত্রাভাব ঘটায়—রাত্রির অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালা অসম্ভব করে—গৃহের সংস্কার হয় না। দারিদ্র্যে দারিদ্র্য বাড়িয়া চলে। দারিদ্র্যের তাড়নায়—পালনের ব্যয় নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হয় এবং সেই জন্য ৮ আনা মূল্যেও দুগ্ধবতী গাভী কসাইকে বিক্রয় করা হয়—কসাই চর্ম্মের জন্য সেটি বধ করে। দুর্ভিক্ষের ফলে পর-বৎসরের জন্য রক্ষিত বীজধান খাইয়া ফেলা হয়—সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়। সমাজ-সম্বন্ধে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল, তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। সর্ব্বোপরি দুর্ভিক্ষ লোকক্ষয় করে।"

ইহা জানিয়া ভগিনী নিবেদিতা স্থির থাকিতে পারেন নাই—আপনার দেহের শক্তি ও আর্থিক সামর্থ্য উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া সেবা করিবার আগ্রহে দুর্ভিক্ষপীড়িত—বন্যাপ্লাবিত পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন।

তথায় তিনি যে অবস্থার বিবরণ শুনিয়াছিলেন ও যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা যেন কবির রচনা; তাহা করুণায় স্নিগ্ধ ও সহানুভূতিতে সঞ্জীবিত। যাঁহারা তাঁহার সাহায্যদান-কার্য্যে সহযোগিতা করিতে তাঁহার সঙ্গে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ডাক্তার। এক গৃহস্থের ঘরে যাইয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। এত লোক অনাহারে মূর্চ্ছিত! শিশুরা ভূমিতে পড়িয়া আছে, নড়িবার শক্তি নাই। মাতারা বিলাপ করিতেছে। সকলের পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র। সন্ধ্যার পরে ঘরে আলো ছিল না। রাত্রি ৮টা কি ৯টার সময় আমরা যে ঘরে প্রবেশ করিলাম তাহার প্রাঙ্গণে শিশুরা সংজ্ঞাহীন—দ্বারে মাতা—তাহার সঙ্গে শিশু। অন্ধকারে মাতার উপর পা পড়িল। তখন আমি দেশলাই

আসিলাম—অবস্থা দেখিতে পাইলাম। নিকটবর্তী কয়খানি গ্রামে স্ত্রীলোকরা বিবস্ত্রা—পাছে আমি দেখিতে পাই, সেই জন্য তাহারা অন্ধকারে সরিয়া গিয়াছিল। তিন-চারি জন সসন্তান নারীকে তাহাদিগের স্বামীরা ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে এক জন শুনিয়াছিল, সরকার কৃষকদিগকে ঋণ দিতেছেন। সে ঋণের জন্য আবেদন করিতে গিয়াছিল—নাজীরপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পিরোজপুরে তদপেক্ষা উচ্চ রাজকর্মচারী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সে চাউল আনিতে পারে নাই। কিন্তু সে পূর্ব তিন দিন গ্রামে ছিল না এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ঘরে খাদ্য ছিল না। সে যখন গৃহে ফিরিল, তখন পরিবারের সকলেই অনাহারজনিত দৌর্বল্যে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য। চিকিৎসকও সেই সময় তথায় উপস্থিত হ'ন। পরিবারস্থ সকলকে একটু সুস্থ করিতে অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। আর একটি ঘটনার বিবরণ :—

"এই সময়ে এক দিন প্রাতঃকালে আমি যখন জলার মধ্যে অবস্থিত একখানি গ্রামে উপনীত হইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম, কয় জন স্ত্রীলোক আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া অপক্ক শস্যশীর্ষ সংগ্রহ করিতেছে। আমি তাহাদিগকে নৌকায় কূলে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে তাহারা সে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিল না, বলিল—'আমরা উলঙ্গ'।"

ভগিনী নিবেদিতা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা দুঃখের, দারিদ্র্যের, দুর্দ্দশার চিত্র। সে সকল তিনি ভাষায় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণনায় যে সহানুভূতি ও করুণার পরিচয় সপ্রকাশ, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহার অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

সেই অবস্থায়ও তিনি এ দেশের নরনারীর—বিশেষ নারীর ধৈর্য্যের, শালীনতার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক এবং তাহাই মনুষ্য-সমাজের অলঙ্কার, তাহাতেই মানুষের গৌরব।

সঙ্গে সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা এ দেশের প্রচলিত প্রথার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ দেশে লোক পূর্ব্বে বর্ত্তমানের প্রয়োজন লইয়াই ব্যস্ত থাকিত না; তাহারা যেমন ইহলোকে ধ্যান-ধারণা-অনুষ্ঠানের দ্বারা পরলোকের জন্য পাথেয় ও প্রয়োজন সঞ্চয় করিত, তেমনই বিপদের জন্য ধান্যও সঞ্চয় করিয়া রাখিত। যদি কখন "অজন্মা" হয়, তবে সঞ্চিত শস্যে আপনার, আশ্রিতদিগের, শ্রমিকদিগের ও প্রতিবেশীদিগের অভাব অনুভূত হইবে না। সেই জন্যই কৃষকের গৃহে গোলা বা মরাই থাকিত; তাহাতে ধান্য সঞ্চিত হইত। সে প্রথার বিলোপ হইয়াছে। সে কথা ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালায় কথায় বলে—"কারও পৌষ মাস"—এই সময় ধান্য পাকিয়া উঠে—রাশি রাশি ধান্য সঞ্চিত হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে "বাঁউনি বাঁধা" প্রচলিত প্রথা—ধর্ম্মবিবেচনায় অনুষ্ঠিত হয়। তাহা কি, তাহা এখন অনেকে জানেন না। বৎসরে বাহান্ন সপ্তাহ; গোলায় বাহান্ন সপ্তাহের অর্থাৎ সারা বৎসরের আবশ্যক ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গোলার দ্বার বন্ধ করা হইত—"বাঁউনি বাঁধা" হইত। যদি সমগ্র বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য সঞ্চিত থাকে, তবে আর দুর্ভাবনার কারণ থাকে না; কোন বৎসর যদি "অজন্মা" হয়—তাহা হইলে সঞ্চয়ের জন্য দুর্ভিক্ষ দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়; অন্নাভাবে লোকক্ষয় হয় না। এই সঞ্চয়ের প্রয়োজন সর্ব্বত্র, বিশেষ কৃষিপ্রাণ দেশে কত অধিক তাহা এ দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যেমন সাধারণ লোকও তেমনই বুঝিতেন।

ভগিনী নিবেদিতা এই দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন—পাটের কথা। তিনি তাহা The Tragedy of Jute নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে পাটের গুরুত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। কিন্তু পাট চাষ যে বাঙ্গালায় ধান চাষের স্থান অধিকার করিতেছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাট চাষ বৃদ্ধির ফলে প্রদেশে খাদ্য-শস্যের অভাব ঘটিতেছে—লোককে খাদ্যের উপকরণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ইহাতে বিপদ অনিবার্য্য। আবার ধান চাষ কমিয়া যাওয়ায় সঞ্চয়ের অভাব ঘটিতেছে—এক বৎসর "অজন্মাতে"ই দিকে দিকে হাহাকার উঠিতেছে। ভগিনী নিবেদিতা—দীপালীর রাত্রিতে কলিকাতার একটি গলিতে দেখিয়াছিলেন—কতকগুলি পাটকাটি পুড়ান হইয়াছে। সঙ্গী বালক তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছিল—"এ অলক্ষ্মী পূজা। প্রথা এই যে, এই রাত্রিতে আমরা কোন কদর্য্য স্থানে পাটকাটি প্রভৃতি পুড়াইয়া 'অলক্ষ্মীর' পূজা করি।" শুনিয়া ভগিনী নিবেদিতা মন্তব্য করিয়াছিলেন, কত শতাব্দী কাল হিন্দুরা পাটকাটি অলক্ষ্মীর প্রতীক বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন।

"Strange predestination surely! through these several centuries has Hinduism been worshipping the Unluck under the symbol of jute sticks!"

হিন্দুরা জানিতেন, পাট অমঙ্গলের প্রতীক। কিন্তু যে দেশে ঘর প্রস্তুত প্রভৃতি নানা কাজের জন্য পাট প্রয়োজন, সে দেশে পাটের চাষ না করিলেও চলে না। সেই জন্য বিশ্বাসের সহিত প্রয়োজনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রত্যেক কৃষক বা গৃহী নিজ প্রয়োজনের মত সামান্য পরিমাণ পাট চাষ করিত। তাহার পরে বিদেশে পাটের ব্যবহারের জন্য লাভের আশায় পাট চাষ বাড়িয়াছে।

পাট কাটিয়া জলে পচাইয়া—আয়ার্লাণ্ডে ফ্লাক্সের মত—তাহার আঁশ সংগ্রহ করিতে হয়। তাহাতে জল দূষিত হয়—লোকের স্বাস্থ্যহানি হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে যে জমিতে লোকের খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইত, সেই জমিতে পাট চাষ হওয়ায় লোকের খাদ্যাভাব ঘটে; লোককে খাদ্যোপকরণের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতে হয়। যাঁহারা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অন্যতম মলকে বলিয়াছিলেন, যে দিন জার্ম্মাণীর কৃষিজ উপাদানে তাহার লোকের খাদ্য-প্রয়োজন পূর্ণ হইবে না, সেই দিন জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইবে—সে জন্য গোলাগুলীর অপেক্ষা রাখিতে হইবে না—অর্থাৎ সাম্রাজ্য খাদ্যাভাবে নষ্ট হইবে—যুদ্ধে নহে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষ কখনই শিল্পশূন্য ছিল না—তাহার শিল্পজ পণ্যই বিদেশী বণিকদিগকে ভারতের বাণিজ্য লইয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধে রত করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান ছিল। আর সেই জন্যই নিশ্চিন্ত হইয়া ভারতের মনীষীরা দর্শনের আলোচনায়—অধ্যাত্ম-সাধনায় অবহিত হইতে পারিতেন। তাহার পরে পরিবর্ত্তিত

অবস্থায় এ দেশে বিদেশীর প্রয়োজনে পাটের চাষ বৃদ্ধি, তিসীর চাষ, চা'র চাষ প্রভৃতি।

ভগিনী নিবেদিতা পাট চাষ উপলক্ষ করিয়া তাহাই বলিয়াছিলেন।

তিনি পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার প্রকোপ বিবেচনা করিয়া যে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচ্য :—

(১) সুদিনে দুর্দ্দিনের জন্য ধান্য (খাদ্যোপকরণ) সঞ্চয়ের প্রথার উপকারিতা ও প্রয়োজন;

(২) পাট চাষ বৃদ্ধিতে অর্থাগমের সুবিধা কিন্তু স্বাস্থ্যহানির ও অন্নাভাবের অনিবার্য্যতা;

(৩) সমাজ-সেবায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্যের সার্থকতা ও শক্তি।

এই শেষোক্ত বিষয়ে তিনি বরিশালে শিক্ষক অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর কার্য্যের কথা বলিয়াছেন। আর তিনি সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য্য ফল বর্ণনা করিয়াছেন—অসঙ্গত কর আদায়, স্বদেশী শিল্পের সর্ব্বনাশ, দুর্ভিক্ষ—এই সকলই পরাধীন জাতিকে শাসন ও শোষণের চিহ্ন। ইহার প্রতীকারোপায়ও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—জাতির সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধন ও প্রয়োগ। তাহার সম্মুখে সাম্রাজ্যবাদকে নত হইতে হয়।

"'Not our right, but our will!' if this cry were heard throughout the land? What could be said by the tax-gatherer then? What then? What then?"

ইহাই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার শেষ মন্তব্য। ইহাতেই তাঁহার রাজনীতিক মত সপ্রকাশ ও সুপ্রকাশ।

কিরূপ বিপদ, কিরূপ ভয়াবহ অবস্থা তুচ্ছ করিয়া সেবার আগ্রহে ভগিনী নিবেদিতা সে দিন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়—জল বাড়িয়াছে. ঘরের সিঁড়ি প্রায় সব জলে ডুবিয়া গিয়াছে—উপরে বসিয়া এক জন জলে ভাসমান—গৃহে প্রবেশোদ্যত সাপ তাড়াইতেছে।

কোথাও বা হাঁটুজল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। নৌকা কখন ডুবিবে, স্থির নাই।

চারি দিকে মৃত্যুর কালিমা।

আর তাহার মধ্যে করুণাময়ীরূপে ভগিনী নিবেদিতা—সেবাব্রতী।

এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই গুরু—স্বামী বিবেকানন্দ—শিষ্যাকে আনিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যদি সিদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে সে তাঁহার ভুলেও নহে—ভগিনী নিবেদিতার ত্রুটিতেও নহে। সে জন্য দায়ী আমরা—যাহারা আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছি—স্বার্থকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করিতেছি—স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা গ্রহণ করিবার ও ভগিনী নিবেদিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার যোগ্যতাও হারাইয়াছি।

বোধ হয়, ভগিনী নিবেদিতা জাতির অধঃপতন লক্ষ্য করিয়াই নারীদিগকে আবশ্যক শিক্ষা দিবার সঙ্কল্পে—সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী গৌরীর দেশে—আবার তাঁহাদিগের আদর্শ নারীসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নূতন পদ্ধতিতে নারীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—আদর্শ ভগিনী, পত্নী, জননী প্রস্তুত করিবার পরিত্যক্ত পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। সেই কার্য্যে সেবাব্রতের আগ্রহে আরম্ভ করিয়া জাতিকে তাহার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন।

কে বলিবে, তিনি বিদেশিনী? যে আদর্শ দেশের ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়া মনুষ্যত্বের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে দেশের বিচার বা বিভেদ থাকিতে পারে না।

ভগিনী নিবেদিতা সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—যাহাদিগের জন্য তাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

তিনি যে দেশমাতৃকাকে আপনার জননী মনে করিয়া তাঁহার সন্তানগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—যে দেশমাতৃকা তাঁহাকে আপনার অঙ্কে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে—ভারতে ভগিনী নিবেদিতার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ হউক; আর তাহার গৌরবালোকে আমরা ভক্তিসহকারে দেখি—সেবাব্রতী ভগিনী নিবেদিতার দেবীমূর্ত্তি।

আহা!

"তেল মাখতে মাখতে মা বললেন, "আহা, গিরীশ ঘোষের বোন আমাকে বড় ভালবাসত, বাড়ীতে যা রান্নাবান্না করত আমার জন্যে আগে রেখে—নিয়ে আসত। কত রকম রান্না করিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে নিয়ে এসে, বসে বসে আমাকে খাওয়াত। একদিন বলে কি, 'মা, দুখানা ইলিস মাছ ভাজা খাও না, তোমার আর দোষ কি?' আমি বললুম, 'তা কি হয় মা?' তার ভালবাসা মুখ দেখান ছিল না। বড় ঘরের বউ ছিল, টাকা পয়সা ছিল, সে সব পাঁচ জনে নিয়ে নষ্ট করলে। অতুল পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা খুলে বসল। তা ছাড়া এক বৎসর স্বামীর চিকিৎসায় অনেক টাকা ব্যয় করেছিল। শেষে মরবার সময় আমার জন্যে একশ টাকা লিখে দিয়ে গিয়েছিল। বেঁচে থাকতে হাতে করে দিতে লজ্জা বোধ করেছিল—কি বলে একশ টাকা দেয়। দেহ রাখবার পরে তার ভাই এসে আমাকে টাকাটা দিয়ে যায়। আহা! বোধনের দিন দুপুরে আমার সঙ্গে শেষ দেখা করে গেল। যতক্ষণ ছিল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। পূজার পরেই আমাদের কাশী যাওয়া হবে বলে সেদিন জিনিষপত্র গুছাতে এ-ঘর ও-ঘর করে একটু ব্যস্ত ছিলুম। যাবার সময় বললে, 'তবে আসি মা।' আমি অন্য মনস্ক হয়ে বললুম, 'হাঁ যাও।' বলতেই থপ থপ, করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সে যেতেই মনে হল, 'বললুম কি? "যাও" বললুম?' এমন ত আমি কাউকে 'বলিনে। আহা! আর এল না*। কেনই বা অমন কথা মুখ দিয়ে বেরুল।"

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে

* তিনি সেই দিন রাত্রেই হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। মা ঐ দিন বৈকালে মঠে পূজা দেখতে গিয়েছিলেন।

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

৩

বছর চারেক আগে সে আসামীর কাছে সরল মনে কাজ নিয়েছিল। একবার জাহাজে তার সঙ্গে আসামীর যখন দেখা হয় তখন আসামী তাকে একজন কাজের লোকের সন্ধান দিতে বলে। তার ফলেই সে আসামীর কাছে চাকরী নেয়। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আসামীর চাল-চলনে তার সন্দেহ ঘটতে থাকে। তখন থেকে সে তার কাগজ-পত্র কাপড়-চোপড় সব কিছুর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সুরু করে। এই ধরণের কাগজ ইতিপূর্বে বহু বার সে আসামীর কাছে দেখেছে। আসামীর টেবিলের ড্রয়ার থেকে এগুলির উদ্ধার করেছিল সে। টেবিলে সে আগে রাখেনি। এই ধরণের খসড়া ফরাসীদের কাছে দেখাতে বহু বার দেখেছে সে আসামীকে ক্যালে ও বোলোন দু'জায়গাতেই। ইংল্যাণ্ডকে সে ভালবাসে। স্বদেশের এই অহিত প্রাণ ধরে করতে পারবে না বলেই সে আসামীর গুপ্ত চক্রান্ত সব ফাঁস করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী সাক্ষীকে গত সাত বছর ধরে সে চেনে। তার মধ্যে কোন আচম্বিতের প্রশ্নই ওঠে না। সব পরিচয়ের মধ্যেই খানিকটা আচম্বিত থেকেই যায়। নিছক দেশপ্রেমের তাগিদে সেও সাক্ষী দিতে এসেছে। অন্য কোন অভিসন্ধি তার নেই।

সাক্ষী আসতেই সারা আদালতে আবার জনতার ভনভনানি সুরু হোল।

তার পর মিঃ লরির সাক্ষ্য।

—'আপনি টেলসন ব্যাঙ্কের কেরাণী?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'অমুক তারিখ শুক্রবার রাত্রিতে ব্যাঙ্কের কাজে আপনাকে লণ্ডন থেকে ডোভার অবধি ডাক-গাড়ীতে যেতে হয়েছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'ডাক-গাড়ীতে আর কোন যাত্রী ছিল?'

—'আরো দু'জন ছিলেন।'

—'তাঁরা রাত্রে পথেই নেমে পড়েছিলেন মনে আছে?'

—'তা আছে।'

—মিঃ লরি, আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন তো। সেই দু'জনের একজন উনি কিনা?'

—'সে আমি হলফ করে বলতে পারব না।'

—'সেই দু'জন যাত্রীর কারুর সঙ্গে আসামীর মিল আছে কি?'

—'দু'জনেই মুড়িশুড়ি দিয়ে ছিলেন। রাত ছিল অন্ধকার। সকলেই আমরা এত আত্মমগ্ন ছিলাম যে, সে-কথাও আমি হলফ করে বলতে পারব না।'

—'মিঃ লরি, আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধরুন, আসামী সেই দু'জন যাত্রীর মত মুড়িশুড়ি দিয়েছে, তাহলে অন্ধকারে উচ্চতায় তাকে কি তাদের একজনের মত মনে হতেও পারে?'

—'না।'

—'কিছুতেই তাকে এদের একজন মনে করতে পারেন না?'

—'হলেও হতে পারে অন্ততঃ এ-কথা বলতে আপনি রাজী আছেন?'

—'হতেও পারে। শুধু এ-কথা আমি আদালতকে জানিয়ে দিতে চাই যে, ডাকাতদের ভয়ে সে রাত্রে আমরা সবাই যে রকম ভয়কাতর হয়ে পড়েছিলাম, আসামীর মুখে-চোখে তেমন কোন সন্ত্রাসের লক্ষণও আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

—'মিঃ লরি, আপনি কখনো মেকী ভীরুতা দেখেছেন?'

—'দেখেছি বই কি।'

—'মিঃ লরি, আবার আসামীর দিকে চেয়ে দেখুন। আপনার জ্ঞানে একে আগে কখনো দেখেছেন কি?'

—'দেখেছি।'

—'কখন?'

—'কয়েক দিন বাদে আমি যখন ফ্রান্স থেকে ফিরছিলাম, ক্যালেতে আমি যে জাহাজে ফিরি আসামীও সেই জাহাজে ওঠে। আমরা একসঙ্গেই আসি।'

—'আসামী কখন জাহাজে উঠেছিল?'

—'মাঝ রাত্রের একটু পরে।'

—'নিশীথ রাত্রে? এমন অসময়ে জাহাজে বুঝি আসামী একাই ওঠে?'

—'ঘটনাচক্রে তাই বটে।'

—ঘটনাচক্রের কথা ছেড়ে দিন! সেই নিশীথ রাত্রে আসামীই একমাত্র যাত্রী ছিল কি না বলুন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আপনি কি একা ভ্রমণ করছিলেন, না সঙ্গে কেউ ছিল?'

—'দু'জন সহযাত্রী ছিলেন। একজন পুরুষ আর একজন নারী। তাঁরাও এখানে উপস্থিত আছেন।'

—'বটে। আসামীর সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হয়েছিল?'

—'ঝড়ো রাত। তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ দীর্ঘ সমুদ্রপথ। আমি প্রায় সোফায় শুয়েই কাটিয়েছিলাম।'

— মিস্ ম্যানেট?'

যে মেয়েটির দিকে পূর্বেই একবার সকলের দৃষ্টি পড়েছিল, সেই মেয়েটি আসন থেকে উঠে দাঁড়াতেই সকলের নজর ফিরে গিয়ে পড়ল তার উপর। মেয়ের হাত নিজের বাহুলগ্ন করে বৃদ্ধ পিতাও তাঁর আসনে উঠে দাঁড়ালেন।

—'মিস্ ম্যানেট, আসামীর দিকে চেয়ে দেখুন।'

একরাশ জনতার কুতূহলী চোখের সামনে যা হয়নি এতক্ষণে তাই হোল। ঐ অপূর্ব লাবণ্য-মমতা-ভরা দুটি স্নিগ্ধ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আসামীর ধৈর্য আর বাঁধ মানতে চাইলে না। সে আর এ মেয়েটি। মধ্যে মৃত্যুর ব্যবধান। তবু আদালত ভরা লোকের সামনে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টায় ছেলেটির দ্রুত নিশ্বাসের সঙ্গে ওষ্ঠ কাঁপতে লাগল থর-থর করে। মুখ থেকে রক্তের জোয়ার নেমে গেল।

আবার জনতার গুঞ্জন উঠল।

—'দেখুন তো, আসামীকে আগে কখনো দেখেছেন কি না?'

—'দেখেছি।'

—'কোথায়?'

—'এই মাত্র যে জাহাজের কথা হচ্ছিল সেই জাহাজে।'

—'আপনিই তবে?'

—'আমার দুর্ভাগ্য!'

জজ ধমক দিলেন।

—'যা প্রশ্ন করা হচ্ছে ঠিক-ঠিক তার উত্তর দেবে। বাচালতার দরকার নেই।'

—'আসামীর সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল কি?'

—'আজ্ঞে হাঁ।'

—'কি কথা হয়েছিল আদালতকে বলুন।'

নিরন্ধ্র নৈঃশব্দের মাঝে মেয়েটি সুরু করল তার কাহিনী।

—'ভদ্রলোক যখন জাহাজে এলেন—'

—'তুমি আসামীর কথা বলছ?' বিচারক ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তাহলে বল, আসামী।'

—'আসামী যখন জাহাজের ডেকে এলেন'—বাপের দিকে মমতার দৃষ্টি মেলে মেয়েটি বলল—'তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করেন যে আমার বাবা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুর্বল। সে রাত্রে আমরা চার জন ছাড়া আর কোন যাত্রী ছিল না জাহাজে। এই ঝড়-বাদলের হাত থেকে বাবাকে কি ভাবে নিরাপদে রাখব সে কথা ভেবে আমি অত্যন্ত কাতর হয়েছিলাম। উনি সে-সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনিই সে রাত্রে অযাচিত ভাবে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এই ভাবেই সূত্রপাত হয় আমাদের আলাপের।'

—'এক মিনিট। আসামী কি একা জাহাজে এসেছিল?'

—'না।'

—'ক'জন তার সঙ্গে ছিল?'

—'দু'জন ফরাসী ভদ্রলোক।'

—'তারা কি কিছু আলোচনা করেছিল নিজেদের মধ্যে?'

—'জাহাজ ছাড়া অবধি ওঁরা কথাবার্তা বলেন।'

—'এই কাগজপত্রের মত কিছু দিতে দেখেছিলে তুমি?'

—'দেখেছিলাম বটে কতকগুলি কাগজপত্র। কিন্তু কি কাগজপত্তর আমি জানি না।'

—'এই রকম?'

—'হলেও হতে পারে। আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ওঁরা কথাবার্তা বলছিলেন বটে, তবে কি বলছিলেন কিছুই শুনতে পাইনি আমি। শুধু লক্ষ্য করেছিলাম তাঁরা কাগজপত্রগুলি দেখছিলেন।'

—'আসামীর সঙ্গে আর কি কথা হয়েছিল?'

—'আসামী আমাদের সঙ্গে প্রাণখোলা কথা বলেছিলেন। হয়ত আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে তার মন করুণার্দ্র হয়ে উঠেছিল। তিনি আমাদের প্রতি যে স্নিগ্ধ-সদয় ব্যবহার করেছিলেন, আশা করি—' বলতে-বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি—'আজকে তাঁর ক্ষতি করে সে-দয়ার যেন প্রতিদান না দিতে হয় আমাকে।'

আবার গুনগুনানি।

—'আসামী আমাকে জানান যে ভারী একটি বিপজ্জনক গোপনীয় কাজে তিনি যাচ্ছেন। এতে বিপদের সম্ভাবনা থাকায় তিনি নাম ভাঁড়িয়েই চলেছেন। সেই কাজের তাগিদে তিনি কয়েক দিনের জন্য ফ্রান্সে গিয়েছিলেন—হয়ত কিছু কাল ধরে কয়েক দিন অন্তর-অন্তর তাঁকে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে পাড়ি দিতে হতে পারে।'

—'আমেরিকা সম্বন্ধে আসামী তোমাকে কোন কথা বলেছিল কি? ঠিক-ঠিক বলবে।'

—'কি ভাবে ঝগড়ার সূত্রপাত হয় সেইটাই তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর মতে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এ কলহে নামা অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা। ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন যে, জর্জ ওয়াশিংটন হয়ত বা ইতিহাসে তৃতীয় জর্জের মতই প্রাধান্য লাভ করবেন। অবশ্য এ-সব কথা সময় কাটানোর জন্য ঠাট্টার ছলেই তিনি বললেন। কোন দুরভিসন্ধি ছিল না তাঁর।'

যে গভীর আবেগ নিয়ে মেয়েটি সাক্ষ্য দিলে, তার আলোড়ন আদালতের বিচারক থেকে দর্শক-সাধারণ অবধি সকলের মনেই সাড়া জাগাল। বিশেষ করে ওয়াশিংটন সম্বন্ধে আসামীর মন্তব্য শুনে বিচারক একবার চকিত হয়ে তাকালেন মেয়েটির দিকে।

এ্যাটর্নী জেনারেল এবার বৃদ্ধকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করলেন।

—'মিঃ ম্যানেট, আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন তো! একে আগে আর কখনো দেখেছেন?'

—'মাত্র একবার। তিন কি সাড়ে তিন বছর আগে লণ্ডনে যখন সে আমার বাসায় এসেছিল।'

—'ডাক-জাহাজে ওই কি আপনার সহযাত্রী ছিল যার সঙ্গে আপনার মেয়ের আলাপ হয়েছিল?'

—'না।'

—'লোকটিকে সনাক্ত করতে না পারার আপনার বিশেষ কোন কারণ আছে?'

—'আছে'—নীচু গলায় বললেন তিনি।

—'বিনা বিচারে বিনা অভিযোগে নিজের দেশে দীর্ঘ কারাবাসের দুর্ভাগ্য হয়েছিল কি আপনার, মিঃ ম্যানেট?'

—'দী-র্ঘ কা রা-বা-স!' কথাটা এমন ভাবে বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করলেন তিনি যে, সবার হৃদয় স্পর্শ করল।

—'ঐ ঘটনার দিনই কি আপনি সদ্য মুক্তি পেয়েছিলেন?'

—'এরা তাই বলেছে আমাকে।'

—'আপনার কি কোন কথাই স্মরণ নেই?'

—'না। আমার মন শূন্য সাহারা। নিজের মেয়ের সঙ্গে আমার কি ভাবে যে পরিচয় ঘটে, কি করে সে আমায় লণ্ডনে নিয়ে আসে, কিছুই আমার মনে পড়ে না। মেয়েকে আমার চিনতে পারার স্মৃতিশক্তি যে ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেও তাঁর অসীম দয়া। নইলে আর কিছুই আমার মনে পড়ে না—সব কিছুর খেই হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

এ্যাটর্নী জেনারেল আসন নিতেই পিতা-পুত্রীও আসন নিলে।

পাঁচ বছর আগে নভেম্বরের এক শুক্রবার রাত্রে আসামী কয়েক জন ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে—যাদের কোনই পাত্তা পাওয়া যায়নি—ডোভারগামী জাহাজে উঠেছিল, সেই রাত্রেই সে এক জায়গায় অবতরণ করে এবং সেখান থেকে বারো মাইল বা তার কিছু বেশী দূর অতিক্রম করে একটি জাহাজঘাটা ও সেনা-ছাউনির খবরাদি সংগ্রহ করে। সেই সেনা-নগরীর একটি হোটেলের কফিখানায় আর একজন লোকের জন্য অপেক্ষা করছিল আসামী ঐ সময়ে। সে কথা প্রমাণ করার জন্য একজন সাক্ষীকে ডাকা হোল আসামীকে সনাক্ত করতে।

আসামী পক্ষের উকিল সাক্ষীকে জেরা করতে সুরু করলেন। জেরায় এইটুকু মাত্র জানা গেল সাক্ষী সেই দিন ভিন্ন আর কখনো আসামীকে দেখেনি। এই সময় পরচুলা-পরা যে ভদ্রলোকটি মিঃ লরির সম্মুখে বসে এতক্ষণ আদালতের কড়িকাঠের দিকে চেয়েছিলেন, তিনি ছোট একটি কাগজে কি দুটি-একটি কথা লিখে কাগজটি পাকিয়ে উকিলের কাছে ছুঁড়ে দিলেন। কাগজটি খুলে পড়তেই উকিলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি তাকালেন আসামীর দিকে।

—'আপনি ঠিক বলছেন আসামীই সেই লোক?'

সাক্ষী স্থির-নিশ্চিত এ-সম্বন্ধে।

—'আসামীর মত দেখতে আর কখনো কাউকে দেখেছেন কি?'

—'গরমিল হবার মত কাউকে দেখিনি।'

—'ভাল করে ঐ ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে দেখুন তো।'

যে ভদ্রলোক কাগজ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তাঁকে দেখিয়ে উকীল বললেন—'তার পর আসামীকেও দেখুন। দু'জনে কি একই রকম দেখতে?'

ভদ্রলোকের দিকে চোখ ফেরাতেই কেবল সাক্ষীই নয় আদালত শুদ্ধ লোক এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মহামান্য বিচারকের আদেশে ভদ্রলোক মাথার পরচুলা খুলে ফেলতে এই সাদৃশ্য আরো প্রকট হয়ে উঠল। জজ তখন সাক্ষীর উকিলকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তিনি কি এই ভদ্রলোককে অর্থাৎ মিঃ কার্টনকে জেরা করবেন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে?'

'—না, তার দরকার নেই।'

'—তাহলে সাক্ষী কা'কে সনাক্ত করতে চান আসামী বলে?'

এই নাটকীয় পরিণতিতে সাক্ষী, মামলা, ষড়যন্ত্র সব যেন এক ধাক্কায় মৃৎপাত্রের মত গুঁড়িয়ে গেল।

আসামী পক্ষের উকিল এবার জুরীদের নিকট মামলার সাওয়াল আরম্ভ করলেন। বললেন তিনি,—তথাকথিত দেশভক্ত ঐ বারসাদ ভাড়াটে গোয়েন্দা আর বিশ্বাসঘাতক ছাড়া কিছুই নয়। জুডাসের পর এত বড় জঘন্য চরিত্রের লোক আর দেখা যায়নি। এমন কি, লক্ষ্য করলে জুডাসের সঙ্গে লোকটির চেহারারও মিল দেখতে পাবেন জুরীগণ। আসামীর ধার্মিক ভৃত্যটিও এর বন্ধু ও সহযোগী হয়েছে আর এই দুই জালিয়াতে মিলে আসামীকে শিকার হিসেবে বেছে নিয়েছে। আসামী ফরাসী। পারিপারিক কারণে তাকে মাঝে-মাঝে চ্যানেল-পথে পাড়ি দিতে হয়। সে-পারিবারিক কারণ তার প্রিয়জনদের মুখ চেয়ে সে জীবন বিনিময়েও বলতে নারাজ। নির্মম জেরায় ঐ মেয়েটির মুখ থেকে আদালত যা খবর পেলেন তাতেও আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। জাতীয় স্বার্থের এই ধরণের জঘন্য ধুয়া তুলে এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করে সুলভ জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা যে-কোন গভর্ণমেন্টেরই দুর্বলতার পরিচায়ক। এ্যাটর্নী জেনারেল এ নিয়ে আতিশয্যের চূড়ান্ত করেছেন। অধিকন্তু অতি নীচ ও জঘন্য সাক্ষ্য প্রদান ছাড়া এই মামলায় সাক্ষীর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হয়নি।

এর পর এ্যাটর্নী জেনারেল সওয়াল আরম্ভ করলেন এবং বিরোধী পক্ষের উকীলকে তুলোধোনা করে বললেন, যে বারসাদ ও বন্দীর চাকর তিনি যা ভেবেছিলেন তার চেয়ে শত গুণে শ্রেষ্ঠ, আর বন্দী শত গুণ নিকৃষ্ট। এর পর স্বয়ং বিচারক অবতীর্ণ হলেন আসরে এবং আইনের ভাষায় আসামীর শোক-গাথা শোনালেন।

তার পর জুরীরা উঠে গেলেন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে।

কার্টন এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে কড়িকাঠ গুণছিলেন বটে, কিন্তু আপাততঃ নির্লিপ্ততা দেখালেও আদালতের প্রতিটি খুঁটিনাটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন তিনি। মেয়েটির মাথা বৃদ্ধ বাপের বুকে টলে পড়লে তিনিই প্রথম দেখতে পেলেন। সমুচ্চ কণ্ঠে তক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠলেন—'অফিসার, ধরুন। ওকে ধরাধরি করে বাইরে হাওয়ায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। দেখতে পাচ্ছেন না মেয়েটি পড়ে যাবে।'

বৃদ্ধ ও তার কন্যা আদালত-গৃহ ত্যাগ করলেন।

সন্ধ্যা আসন্ন। জুরীরা এখনও একমত হতে পারেননি। আরো দেরী হবে জেনে আদালত-কক্ষে আলো জেলে দেওয়া হোল। দর্শকেরা যে যার মত ঘুরে আসতে গেল। আসামীও এতক্ষণে কাঠগড়ার পিছনে সরে গিয়ে বসল।

বাপ ও মেয়ের সঙ্গে-সঙ্গে লরীও বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে জেরীকে নিকটে আসতে ইংগিত করলেন।

—'জেরী, তুমি বরং এই বেলা কিছু খেয়ে এস। আর কাছেই থেক। জুরীরা এলে রায় শুনতেই পাবে। তার পর কিন্তু এক মুহূর্ত দেরী করো না। যত তাড়াতাড়ি পারবে মামলার রায় ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিতে হবে। আর এ-কাজ তোমার চেয়ে তাড়াতাড়ি কেউ করতে পারবে না জানি। আমার অনেক আগেই পৌঁছে যাবে তুমি।'

কার্টন লরির বাহুতে স্পর্শ করে বললেন—'এখন কেমন আছে?'

—'ভারী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কোর্টের বাইরে গিয়ে এখন অনেক সুস্থ বোধ করছে।'

—'আসামীকেও তাই বলেছি আমি। আপনার মত ব্যাঙ্কের কর্মচারীর পক্ষে সকলের সামনে আসামীর সঙ্গে কথা বলা সমীচীন হবে না।'

এ কথা শুনে লরির মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

আসামীর কাঠগড়ার সম্মুখে এসে কার্টন ডাকলেন—'মিঃ ডার্নে?'

আসামী সোজাসুজি এগিয়ে এল।

—'মিস্ ম্যানেট কেমন আছে জানার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক তোমার পক্ষে। ভালই আছে সে।'

—'আমিই এর কারণ জেনে খুবই দুঃখিত। আমার হয়ে এ কথা বলবেন তাকে।'

—'বলব।'

কতক্ষণ ঘোরাঘুরির পর জেরী যখন ফিরল, দরজার কাছে পৌঁছতেই শুনতে পেল লরী তাকে ডাকছেন।

—'এই যে স্যার।'

ভিড়ের মধ্য দিয়ে লরী জেরীর হাতে একখানি কাগজ গুঁজে দিলেন।

—'খুব তাড়াতাড়ি।'

কাগজের উপর দ্রুতহস্তে লেখা—'বেকসুর খালাস।'

৪

আদালতের কক্ষ-প্রাঙ্গণ নির্জন হয়ে এসেছিল। কেবল অর্ধালোকিত বারান্দায় ডাক্তার ম্যানেট ও লুসি, মিঃ লরী ও আসামী পক্ষের কৌঁসলী ষ্ট্রিভার সদ্য-মুক্ত চার্লস ডার্ণেকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন।

একদিন স্তিমিত আলোয় দেখা প্যারিসের পাঁচ তলার গুদাম-ঘরের জুতা তৈরীর পাগলামীতে লিপ্ত ডাক্তারকে আজ আর চেনাই যায় না। কেবল এক এক সময় মর্মান্তিক স্মৃতি মনের ভিতরে অতীত বেদনাকে জাগিয়ে তোলে, তখন বহু দূরের এক পাষাণ কারা-প্রাচীরের নিষ্ঠুর ছায়া পড়ে সেই মুখে। মানুষটিকে তখন একান্ত অসহায় মনে হয়।

শুধু লুসি সেই যাদু জানে। মাঝের এই ক'টি বৎসরের মর্মান্তিকতাকে ছাপিয়ে দূর অতীতের মাধুরীর সঙ্গে বর্তমানের স্নিগ্ধতাকে এক স্বর্ণসূত্রে সে যেন গেঁথে রেখেছে। তার কণ্ঠের মধু, তার মুখের অনির্বচনীয় যাদু, তার হাতের মায়া পিতার অন্তরে নব জীবনের সঞ্চার করেছে।

লুসি ম্যানেটের হস্ত চুম্বন করে ডার্ণে তার কৃতজ্ঞতা জানাল। তার পর উকিল ষ্ট্রিভারের দিকে ফিরে তাঁকেও ধন্যবাদ দিল। ষ্ট্রিভারের বয়স ত্রিশের কিছু ওপরে, কিন্তু ইতিমধ্যেই পসার জামিয়েছেন চমৎকার! ওকালতী চালে আসামীর পরামর্শদাতা হিসেবে লরীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন—'আপনাকে যে সসম্মানে খালাস করে আনতে পেরেছি—'

—'আপনি আমাকে চির জীবনের মত কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করলেন।'

—'আপনার জন্য যথাসাধ্য করেছি। মানে অনেকেই যা করে থাকে।'

—'অনেকের চেয়ে বেশীই বলুন'—মন্তব্য করলেন লরি।

—'আপনিও তাই বলেন? আপনি সারাক্ষণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন, আপনি জানবেন বই কি। তাছাড়া আপনি ব্যবসাদার লোক।'

—'সে যাই হোক, আমার আবেদন আজকের মত সভা ভঙ্গ হোক। মিস্ লুসিকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্ছে। মিঃ ডার্ণের পক্ষেও সাংঘাতিক দিন গেছে। আমরাও ক্লান্ত।'

—'আপনি নিজের কথা বলুন। আমার এখনও হাতের কাজ বাকি। সারা রাত কাজ করতে হবে।'

ডার্ণের দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে ডাঃ ম্যানেট যেন নিথর হয়ে আছেন। অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণায় ভ্রূকুটি-কুটিল সে-মুখের চাহনি অন্তর্ভেদী। মনের ভাবনাগুলিও দিশেহারা।

বাবার হাতে হাত রেখে ডাকল লুসি—'বাবা?'

তিনি যেন ধীরে-ধীরে ভাবনার ছায়াগুলিকে গা-ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিলেন দূরে। তার পর মেয়ের দিকে তাকালেন।

—'বাড়ী যাবে?'

—'যাব মা'—দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বললেন তিনি।

গলির প্রায় সবগুলি আলোই নিবেছে। এবার আদালতের গেটও সশব্দে বন্ধ হোল। নিরানন্দ আদালত-প্রাঙ্গণ জনশূন্য। একটি ঘোড়ার গাড়ী ডেকে বাপ ও মেয়ে বিদায় নিল।

ষ্ট্রিভারও তাদের পিছনে ফেলে রেখে চলে গেলেন।

যে-লোকটি এতক্ষণ এই দলে যোগ দেননি, কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলেননি, যিনি ছায়া-ঘন দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিঃশব্দে, সবার পিছনে—এতক্ষণে তিনি এগিয়ে এলেন এবং যতক্ষণ না ঘোড়ার গাড়ীটি অদৃশ্য হোল তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে। তার পর ডার্ণে ও লরি রাস্তায় যেখানে দাঁড়িয়েছিল এগিয়ে এলেন সেখানে।

—'মিঃ লরি, ব্যবসাদার লোকেরা এবার মিঃ ডার্ণের সঙ্গে কথা বলতে পারবে?'

—'ব্যবসাদারের মন যখন ব্যবসা আর হৃদয়াবেগের মধ্যে দোলা খায়, তখন সেখানে যে কী লড়াই চলে জানলে আপনি আশ্চর্য হবেন মিঃ কার্টন।'

লরির মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, বললেন—'সে কথা তো ইতিপূর্বে উল্লেখ করলেন আপনি? ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে মন আমাদের নিজেদের নয়। নিজের চেয়ে অফিসের ভাল-মন্দের কথাই বেশী ভাবতে হয় আমাদের।'

—'তা জানি। সে আমার জানাই'—উদাসীন ভাবে মন্তব্য করলেন কার্টন—'মিছে বিব্রত হবেন না মিঃ লরি। সবার মত আপনিও যে সজ্জন লোক সন্দেহ নেই। বরং অনেকের চেয়েই ভাল, আমি বলব।'

লরি আর কথা বাড়ালেন না। অল্প পরেই চলে গেলেন টেলসন ব্যাঙ্কের দিকে।

কার্টনের মুখে সুরার গন্ধ—খুব প্রকৃতিস্থ ছিলেন না তিনি। ডার্ণেকে উদ্দেশ করে বললেন—'এক অদ্ভুত দৈব বিড়ম্বনায় আমরা দু'জনে মুখোমুখি হয়েছি। আজকের এই রাত নিশ্চয় অদ্ভুত ঠেকবে আপনার কাছে—নিজেরই প্রতিচ্ছায়া শান-বাঁধান রাস্তায় সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে কথা যাক্—বড়ো দুর্বল মনে হচ্ছে আপনাকে।'

—'দুর্বল। হ্যাঁ, দুর্বল বোধ করেছি বড্ড।'

—'কিছু খেয়ে শরীরটা তাজা করে নিন না কেন? ওই লোকগুলো যখন আপনাকে ইহলোক, না পরলোক কোন্ লোকের বাসিন্দা করবে ভেবে মাথা ফাটিয়ে ফেলছিল, আমি তখন কিছু খেয়ে নিয়েছি। চলুন, কাছে পিঠের একটা সরাইখানা দেখিয়ে দি'।'

এই বলে কার্টন ডার্ণের হাত ধরে ফ্লীট ষ্ট্রীটে নিয়ে এলেন। সেখান থেকে গলিপথে হোটেলে। একটি ছোট ঘরে আস্তানা নিলেন দু'জনে। সামান্য কিছু ছিমছাম আহার ও সুরা পানে হৃতশক্তি ফিরে পেলো ডার্ণে। কার্টন একই টেবিলে পোর্টের বোতল খুলে তার মুখোমুখি বসলেন। আজ সারা দিন ঝড় বয়ে গেছে শরীর ও মনের উপর দিয়ে। আর এখন তারই প্রতিলিপির সামনে বসে—সব কিছু মিলে একটা স্বপ্নের কুহেলী সৃষ্টি করেছে যেন। 'নিজেকে এতক্ষণে এই পৃথিবীরই লোক মনে হচ্ছে তো? আহা, সে চিন্তাও কত আনন্দের!' কেমন যেন তিক্ত কণ্ঠে বললেন কার্টন। তার পর বড়ো এক গ্লাস মদ ঢেলে বললেন—'আর আমি—এ সংসারকে ভুলতে পারলেই আমি বাঁচি। এ জগতে মদ ভিন্ন আর কোন কিছুতেই কোন আসক্তি নেই আমার। আমি তাকে চাই না। তারও আমায় দরকার নেই। আপনাতে-আমাতে, সত্যি বলতে কি, সেদিক দিয়ে কোন মিলই নেই। কিছুমাত্র নয়।'

—'খাওয়া তো হোল। আসুন, এবার কোন মনের মানুষের প্রীতি কামনায় তার স্বাস্থ্য পান করা যাক।'

—'মনের মানুষ? কিন্তু কাউকেই তো মনে পড়ছে না।'

—'তার নাম তো আপনার ঠোঁটের গোড়ায় লেগে আছে।'

—'লুসি ম্যানেটের কথা বলছেন?'

—'তারই কথা বলছি'—

সঙ্গীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কার্টন সুরার পাত্র তুললেন। তার পর গ্লাসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তার পিছনে। দেয়ালে আঘাত খেয়ে গ্লাসটা খান-খান হয়ে গেল। ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে আর একটা পাত্র আনতে বললেন।

—'অন্ধকার গাড়ীতে তুলে দেওয়ার পক্ষে মেয়েটি খাসা সুন্দরী বলতে হবে।'—নূতন পানপাত্রে মদ ঢালতে-ঢালতে বললেন কার্টন।

ডার্ণের কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

—'লুসি ম্যানেটের মত মেয়ে করুণা করবে, কাঁদবে—ভাবতে মন্দ লাগে না। ওর করুণা-মমতার জন্যে বুঝি বা প্রাণ-বিপর্যয়ও সহ্য হয়। কি বলেন আপনি? সত্যি নয়?'

ডার্ণে একটি কথারও উত্তর দিলে না।

—'আপনার মুখের কথায় কি যে খুশী হয়েছিল সে! অবশ্য ভাবে না দেখালেও, বুঝতে দেরী হয়নি আমার।'

এই ইংগিতে ডার্ণের মনে পড়ে গেল যে এই অপ্রিয় লোকটিই আজ স্বেচ্ছায় তাঁর সাহায্যেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—স্মরণ হতেই ডার্ণে তাঁকে ধন্যবাদ দিলে পরম কৃতজ্ঞতা ভরে।

—'আমি ধন্যবাদেরও প্রত্যাশী নই, কৃতিত্বেরও না'—উদাসীন উত্তর দিলেন কার্টন। —'কিছুই করবার ছিল না প্রথমতঃ এবং দ্বিতীয়তঃ, কেন করলাম নিজেও জানি না। মিঃ ডার্ণে, একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই।'

—'সানন্দে'—

—'বলুন তো, আপনাকে খুব একটা পছন্দ করে ফেলেছি এই কথাই কি বিশ্বাস করেন?'

—'সে কথা এখনো ভাবিনি'—একটু অপ্রসন্ন কণ্ঠে উত্তর দিল ডার্ণে।

—'ভেবে দেখুন না একবার।'

—'আপনার আচরণে তারই প্রকাশ বটে'—

—'আপনার বুদ্ধিবৃত্তির তারিফ করতে হয়—'

দাম মিটিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডার্ণে। শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় চাইতেই কার্টন উঠে দাঁড়িয়ে কেমন যেন বেপরোয়া কণ্ঠে বললেন—'একটা কথা! তুমি কি আমাকে মাতাল ভেবেছ?'

—'মনে তো হয় আপনি খুবই মদ খাচ্ছেন।'

—'মদ? তা খাচ্ছি বই কি?'

—'খুব বেশী পরিমাণেই খাচ্ছেন না কি?'

—'কিন্তু কারণটাও জানা উচিত। আমি এক সৃষ্টিছাড়া জীব, বন্ধু! সংসার আমায় স্নেহ করে না—আমিও কারুর স্নেহ চাই না।'

—'এ ভাল নয়। এমন করে নিজেকে নষ্ট করবেন না!'

—'কি জানি। হয়ত আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু নিজেকে একটু সাবধানে রাখবেন বন্ধু। বিদায়, শুভরাত্রি!'

নির্জন ঘরে সিডনী কার্টন আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজেকে কত চুলচেরা করে বিচার করলেন, বিশ্লেষণ করলেন। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে বললেন—'লোকটিকে সত্যিই কি ভালবেসেছ? নিজের চেহারার সঙ্গে যার এত মিল তাকেই কেন ভালবাসলে? নিজেকে ভালবাসার কি আছে তোমার? কি আছে বলো? কিছু যে নেই সে তো তোমার জানা। কি করেছ তুমি নিজের? কি হতে পারতে আর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ তাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বলেই কি এত ভালবাসা? লোকটার সঙ্গে জায়গা বদল করবে? বল না! খুলে বল না তোমার মনের কথা। লোকটাকে ঘৃণাই তো কর।'

ঝড়-লাগা মন মদে শান্ত হোল। তার পর এল প্রশান্ত ঘুম। হাতে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল মানুষটি। শুধু মাথার রাশীকৃত চুল টেবিলের উপর বিস্রস্ত হয়ে পড়ল। আর বাতির মোম গলে-গলে সেই চুলে জড়াতে লাগল।

৫

ডাক্তার ম্যানেটের বাড়ীটি সহরের ভারী নির্জন জায়গায়। মামলার পর চারটি মাস কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। স্মৃতির অতলে অবলুপ্ত হয়েছে সব। এখন ডাক্তারের সঙ্গে পরম হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে লরির। সহরের এই নির্জন পথপ্রান্তের গৃহটি হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের পরম প্রিয় আনন্দধাম।

রবিবারের এক প্রসন্ন বিকেলে লরী পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন ডাক্তারের বাড়ীর দিকে। সেই বিশেষ সুন্দর বিকেলটিতে লরী তিনটি কারণে হাঁটতে-হাঁটতে এলেন। মধুর অপরাহ্ণ আলোয় খাওয়ার আগে তিনি ডাক্তার ও তাঁর মেয়ে লুসির সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ান। যে-সব দিন বেড়াতে ভাল লাগে না, ডাক্তারের ঘরে বসে তাঁদের সঙ্গে গল্প করেন, বই পড়ে শোনান। এমনি ভাবে সারা দিন কাটে ওঁদের সাহচর্যে। আজ অবশ্য তার কোনটিই নয়। আজ নিজের মনে চিন্তার জট ছাড়াচ্ছিলেন তিনি। তাই হাঁটতে ভাল লাগছিল।

ডাক্তারেরা যেখানে বাস করেন তার মত নিভৃত-নিরালা পরিবেশ লণ্ডনে আর দুটি নেই। একটি বড় নির্জন বাড়ীর তিনটি ঘর নিয়ে থাকেন তাঁরা। পথের এই দিকটিতে রোদ আসে সকালের দিকে। নরম সোনালী মিষ্টি রোদ। দিন যত এগোয় ছায়া পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসে। তখন এই অঞ্চলটিকে মনে হয় যেন রৌদ্র-সমুদ্রের নিভৃত বন্দর। যেমন শান্ত তেমনি নির্ভরশীল আশ্রয়।

পুরোনো দিনের মত আবার রুগী দেখতে সুরু করেছেন ডাক্তার। যা অর্থাগম হয় তাতে পিতা-পুত্রীর বেশ চলে যায়। আপন চিন্তায় মশগুল হয়ে চলতে-চলতে লরী এক সময় দেখলেন ডাক্তারের সদর দরজায় কখন পৌছে গেছেন।

ডাক্তার ম্যানেট বাড়ী আছেন?

হয়ত আছেন।

লুসি বাড়ী আছে?

হয়ত আছে।

মিস্ প্রস?

সম্ভবতঃ ভিতরেই আছে।

—'এ বাড়ীতে আমি ঘরের লোকের মতই'—ভাবলেন লরি—'নিজেই উঠে যাই তার চেয়ে।'

বিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও প্রতিটি ঘরের সামান্য আসবাব-পত্রকে সুন্দর করে রচনা করে রেখেছে লুসি। নিজের ঘরটি ভরে আছে তার পাখী, ফুল, বই, ডেস্ক, টেবিল, রং-এর বাক্সে। দ্বিতীয় ঘরখানি রুগী দেখবার জন্য এবং খাওয়ার ঘর হিসেবেও ব্যবহার করেন ডাক্তার। তৃতীয় ঘরখানি ডাক্তারের শয়ন-কক্ষ। ঘরের এক কোণে দেখলেন লরি সেই পাঁচ-তলার গুদাম-ঘরের উপকরণ। একদিন যেখান থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন তাঁকে মৃত্যুলোক থেকে প্রাণলোকে। সঙ্গের সেই বেঞ্চি ও জুতো তৈরীর যন্ত্রপাতি সব যত্নে রাখা।

আপন মনে বললেন লরি—'ও-সব মর্মান্তিক স্মৃতি আঁকড়ে থেকে আর লাভ কি?'

—'আশ্চর্যের কি আছে এতে?'—অপ্রত্যাশিত পাল্টা প্রশ্নে যেন সচকিত হয়ে উঠলেন লরি।

তাকিয়ে দেখলেন সামনে মিস্ প্রস। ডোভারের হোটেলে একদা পরিচয় ঘটেছিল। তার পর দিনে-দিনে পরিচয় গাঢ় হয়েছে এই মহিলার সঙ্গে।

—'কেমন আছেন?'

—'ভালই। তুমি আছ কেমন?'

—'ভাল আর কই? মেয়েটিকে নিয়েই বড্ড মুশকিলে পড়েছি।'

—'কিসের মুশকিল?'

—'দিন-রাত লোক আসছে লুসির ভাল-মন্দের খবর নিতে।'

—'তাই নাকি।'

—'আমি আছি ওর সঙ্গে—মানে, ও আছে আমার সঙ্গে সেই দশ বছর থেকে। খরচা-পত্তর দেয়। সবই সত্যি। কিন্তু তাই বলে এ ধরণের অবাঞ্ছিত লোক-জনের রাত-দিন হামলা আমি সহ্য করতে পারব না। ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে দোবো না আমি যাকে-তাকে। একজনকে দেখলাম না যে ওর যোগ্য।'

সব মেয়ের মতই প্রসও যে অসূয়া-পরবশ মেয়ে তা জানেন লরি। কিন্তু তার হৃদয়ের গোপনে একটি নিষ্পাপ নিঃস্বার্থ নারীপ্রাণ আছে যে ভালবাসার ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে চায়। সৌন্দর্যের, সুরুচির, যৌবনের সৌভাগ্য নিয়ে যে মেয়ে জন্মায়নি, সে তার প্রিয় পাত্রটির মধ্যেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিছুতেই সে ভালবাসায় অংশীদার সহ্য করতে পারে না।

লরি আসন নিয়ে বসলেন—'একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব? আচ্ছা বল ত, ডাক্তার কি কখনো গল্পচ্ছলে তাঁর কারা-জীবনের স্মৃতির উল্লেখ করেন?'

—'না'—

—'তবুও ঐ বেঞ্চ যন্ত্রপাতি রেখে দিয়েছেন?'

—'মনে-মনে যে ভাবেন যা একেবারে বলা যায় না।'

—'বেশী ভাবেন?'

—'খুব বেশী।'

লরির দৃষ্টিতে চকিতে যেন একটু বিদ্যুৎ খেলে গেল—'বল তো মিস্ প্রস, নিজের কারা-জীবন সম্বন্ধে ডাক্তারের নিজের থিয়োরী কি? কার জন্য তাঁর এই নির্যাতন, কে তাঁর নির্যাতনকারী, এ সব কি তিনি জেনেছেন, না জানেন?'

—'লুসির কাছে যা শুনেছি'—

—'অর্থাৎ'—

—'তার ধারণা, ডাক্তার জানেন'—

—'এ সব কথা জিজ্ঞেস করলাম বলে রাগ কোরো না। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু ব্যবসাদার লোক—আদার ব্যাপারী'—

—'তাই নাকি?'

এ কথায় মিস্ প্রসের মন অনেকটা নরম হয়ে এল। বললে—'ডাক্তারের মনে সদা আতঙ্ক।'

—'আতঙ্ক?'

—'তা নয়। সেই মর্মান্তিক স্মৃতির আতঙ্ক। একবার আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল। সব সময় তাঁর ত্রাস আবার হয়ত স্মৃতি হারাবেন। তাই বোধ হয় ও-কথা তোলেন না পারতপক্ষে।'

মিস্ প্রসের বক্তব্যের গভীরতায় বিচলিত হলেন লরি। বললেন—'ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু সে-সব নিজের মনে চেপে রাখাও তো ভাল নয় তাঁর পক্ষে। এই দুশ্চিন্তাই তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।'

—'কিন্তু উপায় নেই'—মাথা নেড়ে বলল মিস্ প্রস—'এই স্মৃতির তন্ত্রীতে সামান্য আঘাত করার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যান। মাঝে-মাঝে গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তিনি ঘরময় পায়চারী সুরু করেন। তাঁর স্মৃতি জেলের নিভৃত সেলের মধ্যে পায়চারী করে যেন। সাড়া পেয়ে মেয়ে উঠে বাপের কাছে যায়। বাপের পাশে-পাশে থাকে। তাঁর সঙ্গে নিঃশব্দে পায়চারী করতে থাকে। ঘুণাক্ষরেও কোন কথা তোলে না। এক সময় ডাক্তারের মনের উত্তেজনা কমে আসে। মেয়ের নিঃশব্দ সঙ্গ ও ভালবাসার যাদুতে আবার যে-মানুষ সে-মানুষ হয়ে যান।'

কথাবার্তায় ছেদ পড়ল।

—'ওঁরা আসছেন'—বলে প্রস উঠে দাঁড়াল। 'এইবার মানুষের ভীড় দেখবেন।'

লরিও জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাপ ও মেয়ের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে সিঁড়িতে।

আজ গরম পড়েছে দুঃসহ। আহারের পর লুসির প্রস্তাব মত সবাই গিয়ে বসল খোলা-বাতাসে গাছের ছায়ায়। মৃদু স্বরে গল্প সুরু হোল। মাথার উপরে নিরালা গাছের মর্মর-ধ্বনি ডালে-পাতায়।

বাইরের মানুষ-জনের মধ্যে কেবল ডার্নে এল।

ডাঃ ম্যানেট সাদরে স্বাগতম্ জানালেন তাকে। লুসিও। শুধু তাকে দেখা মাত্রই প্রসের হঠাৎ গা ও মাথা-ব্যথা সুরু হোল। সে বিদায় নিয়ে সরে পড়ল।

ডাক্তারকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। এই সব সময় তাঁকে এত অল্পবয়সী দেখায় যে, বাপ ও মেয়ের চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। ডাক্তার আজকে সারা দিন নানা বিষয়ে কথা বলেছেন এবং অস্বাভাবিক সজীবতায়।

—'আচ্ছা ডাঃ ম্যানেট'—ডার্নে বলল—'টাওয়ারের সব কি দেখেছেন আপনি?'

—'লুসি আর আমি ওখানে গিয়েছি বটে তবে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে।'

—'আমি ওখানে গিয়েছি অন্য উদ্দেশ্যে। আমি যখন গিয়েছিলাম এক অদ্ভুত কাহিনী শুনেছিলাম ওখানকার।'

—'কি কাহিনী?'

—'মিস্ত্রীরা কাজ করতে-করতে একটা পাতাল-ঘরের সন্ধান পায়—যেটি বহু দিন আগে তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তার কথা ভুলে গিয়েছিল লোকে। ঘরটির ভিতরের দেয়ালটি কয়েদীদের দ্বারা খোদিত—তারিখ, নাম, অনুযোগ, অভিযোগ, প্রার্থনা, বাণী প্রভৃতি লিপিতে উৎকীর্ণ ছিল। দেয়ালের একটি কোণের পাথরে একজন কয়েদী—যে হয়ত পরে ফাঁসী গিয়েছে—তিনটি অক্ষর খোদিত করেছিল। কোন দুর্বল যন্ত্রে কম্পিত হস্তে তাড়াতাড়ি খোদাই করা তিনটি বর্ণ। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল শব্দ তিনটি বুঝি—ডি-আই-সি। কিন্তু পরে সতর্ক পরীক্ষায় প্রমাণিত হোল—শেষ শব্দটি 'সি' নয় 'জি'। কিন্তু ঐ তিনটি আদ্য অক্ষরযুক্ত কোন বন্দীর নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে বহু গবেষণার পর স্থির হোল, ঐগুলি কোন নামের আদ্যক্ষর নয়। পুরো কথা। 'ডিগ' মানে খোঁড়া। পরে ঐ স্থানের মেঝে খোঁড়া হয় এবং একটি পাথরের নীচে ছোট চামড়ার ব্যাগের ও পোড়া কাগজের ছাই পাওয়া যায়। সেই অজানা বন্দী কি লিখেছিল কোন দিনই তার মর্মোদ্ধার হয়নি।'

—'বাবা, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?'—উৎকণ্ঠিত মুখে বলল লুসি।

ডাঃ ম্যানেট হঠাৎ হাত মাথায় রেখে চমকে উঠলেন। তাঁর হাল-চাল ও মুখের চেহারা দেখে সবাই ভীত হয়ে পড়ল।

—'না না, ঠিক অসুস্থ নয়। বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে—তাই চমকে উঠেছিলাম। চল, ভিতরে যাওয়া যাক।'

প্রায় তখুনিই তিনি সামলে নিলেন নিজেকে। সত্যি-সত্যিই বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে—ডাক্তার ম্যানেট হাতের পিঠ দেখালেন। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। কিন্তু তিনি এই গল্প সম্বন্ধে কোন মন্তব্য বা ইংগিত—কিছুই করলেন না। কিন্তু ঘরে যেতে-যেতে আদালতের প্রাঙ্গণে যেমন দেখেছিলেন ডার্ণের উপর স্তম্ভিত ঠিক সেই বিশেষ দৃষ্টির চমক যেন আবার দেখতে পেলেন লরি ডাঃ ম্যানেটের চোখে।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ডাঃ ম্যানেট শুধরে নিলেন নিজেকে যে, সত্যিই চোখে কিছু দেখেছেন কি না সংশয় উপস্থিত হোল লরির।

চায়ের সময় উপস্থিত—মিস্ প্রস চা তৈরী করতে লাগল। এই সময় সিডনী কার্টন এসে দেখা দিলেন।

চা পান শেষ করে সবাই জানলার কাছে সরে এল। বাইরে রাত গাঢ় হয়ে এসেছে। লুসি বাবার পাশে বসল। ডার্ণে লুসির পাশে। কার্টন জানলায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালেন।

—'এখনও বৃষ্টি পড়ছে বড়-বড় ফোঁটায় কিন্তু সংখ্যায় অল্প'—বললেন ডাঃ ম্যানেট—'টিপ টিপ ঝরছে।'

—'কিন্তু ঝরছে ঠিক'—

তাঁরা খুব নীচু-গলায় কথা বলতে লাগলেন।

রাস্তায় হুড়োহুড়ি ব্যস্ততা—সবাই ঝড়-জলের আগে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছানোর জন্য ছুটোছুটি করছে।

ডার্ণে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনে বললে—'শত শত লোক রাস্তায়, তবু নির্জনতা।'

চলমান জনতার পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

হঠাৎ তুমুল ঝড়-জল ভেঙ্গে পড়ল। কড়-কড় বাজের গর্জন আর চোখ-ঝলসান বিদ্যুৎ-চমকানি। বজ্রনির্ঘোষ, অগ্নিবর্ষণ আর ধারাপাতের বিরাম রইল না। এমনি চলল মাঝ রাত পর্যন্ত—তার পর চাঁদ দেখা দিল আকাশে।

সেণ্ট পল্‌স গীর্জায় রাত একটার ঘণ্টা বাজল। লরিকে নিয়ে যাবার জন্য জেরী হাতে লণ্ঠন নিয়ে এসেছে।

—'কি বিশ্রী রাত! এ রকম রাতে কবর থেকে মৃতেরা উঠে আসে।' পথ চলতে-চলতে মন্তব্য করলেন লরি।

—'এমন রাত আমি কখনো দেখিনি স্যার—দেখতেও চাই নে'—উত্তর দিল জেরী।

—'শুভরাত্রি মিঃ ডার্ণে! এই রকম রাতে আবার কখনো সবাই একত্র মিলিত হব, এ সৌভাগ্য আর হবে কি না জানি না।'

হয়ত হবে। হয়ত চলবে আবার এমনি ধারা জনতার ছুটোছুটি—গর্জন। জনস্রোত ভেঙে পড়বে তাদের উপর দুর্বার মত্ততায়।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

বর্ষমান

সূর্য্যসিদ্ধান্ত—৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল।
আর্য্যসিদ্ধান্ত—৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ১৫ বিপল।
সিদ্ধান্তশিরোমণি—৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩০ পল, ২২ বিপল।
আধুনিক—৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ২২'১৮ পল।

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

মান্ধাতার মুল্লুকে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম পর্ব্ব

আজব জীব

প্রভাতী চায়ের পিয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের তারিখের দিকে তাকিয়ে কুমার বললে, "ওহে বিমল, আজ সকালেই মিঃ রোলাঁর আসবার কথা, মনে আছে তো?"

বিমল বললে, "হুঁ! কিন্তু দুনিয়ায় এত লোক থাকতে আমাদেরই তিনি খুঁজে তার করলেন কেন, সেইটেই বুঝতে পারছি না। টেলিফোনে আসল ব্যাপার তিনি ভাঙতে চাইলেন না, কিন্তু তাঁর কথাগুলো কেমন যেন রহস্যময় ব'লে বোধ হ'ল।"

খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে কুমার বললে, "বেশ, অপেক্ষা করা যাক্, মিঃ রোলাঁর আবির্ভাব হ'লেই সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

বিমল যেন আপন মনেই বললে, "রোলাঁ! নাম শুনে বোঝা যায়, ভদ্রলোক জাতে ফরাসী। আমরা তাঁকে চিনি না, কিন্তু তিনি আমাদের ঠিকানা জানলেন কেমন ক'রে?"

সিঁড়িতে হ'ল পায়ের শব্দ। একাধিক ব্যক্তির পায়ের শব্দ। তার পরে ঘরের ভিতরে বিনয় বাবু ও কমলের আবির্ভাব।

যাঁরা "মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন", "ময়নামতীর মায়াকানন", "হিমালয়ের ভয়ঙ্কর", "নীলসায়রের অচিনপুরে" ও "সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন" প্রভৃতি উপন্যাস পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে বিনয় বাবু ও কমলের নূতন পরিচয় দেবার দরকার নেই। এখানে কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বিনয় বাবু হচ্ছেন অদ্বিতীয়। লোকে তাঁকে মূর্ত্তিমান "সাইক্লোপিডিয়া" ব'লে মনে করে। কমল তাঁর পালিত পুত্র। বিমল ও কুমারের বহু দুঃসাহসিক অভিযানে কমলকে নিয়ে তিনি হয়েছেন তাদের সহযাত্রী। দলের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে বড় হচ্ছেন বিনয় বাবু এবং সব চেয়ে ছোট হচ্ছে কমল।

বিমল একটু বিস্মিত স্বরেই বললে, "সকাল বেলায় নিজের লাইব্রেরীর কোণ ছেড়ে আমাদের কাছে আপনি! ব্যাপার কি বিনয় বাবু? এ যে মহম্মদের কাছে পর্ব্বতের আগমন!"

বিনয় বাবু উৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "নতুন অভিযান, নতুন অভিযান!"

কুমার খবরের কাগজখানা ফেলে দিয়ে বিনয় বাবুর মুখের দিকে করলে সমুৎসুক দৃষ্টিপাত।

বিমল কৌতূহলী কণ্ঠে শুধোলে, "নতুন অভিযান? কাদের অভিযান?"

—"আমাদের।"

এমন সময়ে বিনয় বাবুর গলা পেয়ে রামহরি প্রবেশ ক'রে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

বিমল বললে, "আরো চা-টা নিয়ে এস রামহরি! বিনয় বাবু সুখবর এনেছেন।"

রামহরি হাসিমুখে বললে, "কি সুখবর গো বাবু? আমাদের খোকাবাবুর জন্যে কি খুকীবিবি আনবেন নাকি?"

বিনয় বাবু বললেন, "আমরা আবার নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়ব।"

রামহরির মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। সে বললে, "আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, অভিযান-টভিযানের মানে জানি না। তবে কথার ভাবে মনে হচ্ছে, আবার বুঝি সবাই মিলে হাঘরের মত দেশ-বিদেশে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াবে?"

বিমল মুখ টিপে হাসতে-হাসতে বললে, "বোধ হয় তাই রামহরি, বোধ হয় তাই! বিনয় বাবু বোধ হয় আমাদের কোন নতুন দেশ দেখাতে চান। তাই নয় কি বিনয় বাবু?"

—"প্রায় তাই বটে। অবশ্য তোমরা যদি রাজি হও।"

রামহরি বিরস কণ্ঠে বললে, "ত্রিভুবনে পাতাল ছাড়া কোন্ দেশটা দেখতে তোমরা বাকি রেখেছ খোকাবাবু? তবে কি এবারে তোমরা পাতালের দিকে ছুটে যাবে?"

বিমল বললে, "দেশের নামটা এখনো শুনিনি রামহরি! তবে নতুন অভিযানের কথা শুনেই আমার পা ছুটো-দৌড় মারবার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, বিনয় বাবু, আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চান?"

—"সে কথা যিনি বলবেন, তিনি এখনি এসে পড়বেন। আমি তাঁর অগ্রদূত মাত্র।"

কুমার বললে, "আপনি কি মিঃ রোলাঁর কথা বলছেন?"

—"ঠিক তাই।"

—"এইবারে বোঝা গেছে। তাহ'লে আপনার 'পরামর্শেই মিঃ রোলাঁ আমাদের এখানে আসতে চান?"

রামহরির দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বিনয় বাবু বললেন, "হ্যাঁ এক রকম তাই বটে।"

রামহরি বিরক্ত স্বরে বললে, "তাহ'লে খাল কেটে কুমীর আনছেন আপনিই? হ্যাঁ গো বিনয় বাবু, বুড়ো বয়সে কি ভীমরতিতে ধরল? সাধ ক'রে নিজেও ক্ষেপতে আর পরকেও ক্ষেপাতে চান? আসছেন আমাদের কোন্ সুমুন্দী, নিয়ে যেতে চান কোন্ যমের বাড়ী?"

কুমার বললে, "আচ্ছা রামহরি, কি বারেই আমরা তোমার কথা

কানে তুলি না, তবু কি বারেই আমরা কোথাও যাব শুনলেই তুমি এমন হুলুস্থুলু বাধিয়ে মিথ্যে মুখ ব্যথা কর কেন বল দেখি ?"

—"তোমাদের ভালোর জন্যেই বাপু, তোমাদের ভালোর জন্যেই। মাথার ওপর দিয়ে বারে বারে যে সব ফাঁড়া কেটে গিয়েছে, তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই জন্যেই মুখ ব্যথা ক'রে মরি, নিয়তিকে চিরদিন কি ফাঁকি দেওয়া যায় ?"

কমল খিল-খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললে, "তোমার যদি এতই প্রাণের ভয়, তাহ'লে তো আমাদের সঙ্গে না এলেও পারো ?"

রামহরি এক ধমক দিয়ে ব'লে উঠলো, "থামো, তোমাকে আর ফ্যাচ-ফ্যাচ করতে হবে না! কালকের ফচকে ছোঁড়া, আমাকে এসেচেন উপদেশ দিতে! খোকাবাবুকে এতটুকু বয়েস থেকে মানুষ ক'রে তুলেছি, ও হচ্ছে আমার সন্তানের মত। সন্তানকে যমের মুখে পাঠিয়ে কেউ যেন নিশ্চিন্তি হয়ে ঘরে ব'সে থাকতে পারে!"

বাড়ীর ভিতর থেকে ঘেউ-ঘেউ শব্দ শোনা গেল।

বিমল বললে, "ও রামহরি, তোমার আর এক সন্তান শান্তিভঙ্গ করতে চায় কেন ?"

রামহরি বললে, "কেন আর, ক্ষিদের চোটে। বাঘা দেখেছে তোমাদের জন্যে খাবার এনেছি, অথচ তাকে এখনো খুসি করা হয়নি।"

—"যাও যাও, বাঘাকে ঠাণ্ডা ক'রে এস।"

রামহরির প্রস্থান।

অল্পক্ষণ পরেই মিঃ রোলাঁ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। লম্বায়-চওড়ায় দশাসই চেহারা। চোখে চশমা, মুখে বিনয় বাবুর মত দাড়ী-গোঁফ এবং বয়সেও তাঁরই মত প্রৌঢ়, তবে দেহ এখনো যুবকের মতই বলিষ্ঠ। ভদ্রলোকের শান্তসৌম্য মুখ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিমল ও কুমার তাঁকে সাদরে সোফার উপরে বসিয়ে আবার চা, টোষ্ট ও ওমলেট প্রভৃতি আনবার জন্যে রামহরিকে আহ্বান করলে।

বিনয় বাবুর দিকে তাকিয়ে রোলাঁ শুধোলেন, "আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি আপনি এঁদের কাছে প্রকাশ করেছেন ?"

—"না, বিশেষ কিছুই বলিনি, সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছি মাত্র।"

বিমল সহাস্যে বললে, "কিন্তু সেই ইঙ্গিতটুকুই হয়েছে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। মিঃ রোলাঁ, আপনি যদি আমাদের কোন বিপদজনক অভিযানে যাত্রা করতে বলেন, তাহ'লে জানবেন আমরা বাইরে পা বাড়িয়েই আছি।"

রোলাঁ বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি যথাস্থানেই এসে পড়েছি।"

এমন সময়ে চায়ের ট্রে হাতে ক'রে রামহরির পুনঃপ্রবেশ। ট্রেখানা টেবিলের উপরে রেখে যাবার সময়ে সে রোলাঁর আপাদমস্তকের উপরে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দিয়ে গেল।

রোলাঁ বললেন, "গোড়ায় সংক্ষেপে নিজের কথা কিছু-কিছু বলি শুনুন। আমার নিবাস ফ্রান্সে। পৈতৃক সম্পত্তির প্রসাদে কোন দিন আমাকে জীবন-যুদ্ধে যোগ দিতে হয়নি। কিন্তু পায়ের উপরে পা দিয়ে নিষ্কর্মার মত ব'সে থাকা আমার ধাতে সয় না। আমার দুটি মাত্র সখ আছে—নানা দেশ দেখা আর নানা ভাষা শেখা। পৃথিবীর কত দেশেই যে বেড়িয়েছি—কখনো সহরে-সহরে, কখনো জঙ্গলে-জঙ্গলে, কখনো পাহাড়ে-পাহাড়ে, মরুভূমিতে, নির্জ্জন দ্বীপে। কখনো ভয় পেয়েছি, কখনো মোহিত হয়েছি, কখনো বিস্ময়ে অবাক্ মেনেছি। এই ভারতবর্ষও আমার পুরাতন বন্ধু, এবার নিয়ে এখানে আমার তিন বার আসা হ'ল। প্রথম বারে এসেছিলুম হিমালয়ের তুষারমানবদের দেখবার কৌতূহল নিয়ে, কিন্তু পদচিহ্ন ছাড়া তাদের আর কিছুই দেখতে পাইনি। দ্বিতীয় বার এসেছিলুম মহেঞ্জোদাড়ো আর হারাপ্পা দেখবার জন্যে, তাদের দেখে ভারতের প্রাচীন গৌরবের কথা ভেবে মন আমার শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এবারে এখানে এসেছি স্বাধীন ভারতকে দেখবার জন্যে। কিন্তু দেখছি দেশ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ স্বাধীন হ'তে পারেনি।" রোলাঁ কিছুক্ষণ নীরবে চা পান করতে লাগলেন।

বিমল বললে, "বললেন আপনার নানা ভাষা শেখবার সখ আছে। আমাদের বাংলা ভাষা বোধ হয় এখনো শেখেননি ?"

রোলাঁ অত্যন্ত শুদ্ধ বাংলায় বললেন, "বিলক্ষণ! যে ভাষার মর্য্যাদা বাড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সে ভাষা আবার শিখব না ?"

বিমল বললে, "কি আশ্চর্য্য, তবে আর আমরা ইংরেজীতে কথা কই কেন ? ও-ভাষা তো আপনারও নয়, আমাদেরও নয় ?"

রোলাঁ হাসতে-হাসতে বললেন, "বেশ, তবে আপনার মাতৃ-ভাষাতেই আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি রোজ আপনাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে কিছু-কিছু লেখাপড়া করি। সেইখানেই বিনয় বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেই পরিচয় ক্রমে পরিণত হয় বন্ধুত্বে। তাঁর মুখেই আপনাদের অদ্ভুত কীর্ত্তি-কাহিনী শুনি। তাই আজ আপনাদের কাছে এসেছি সাহায্য ভিক্ষা করতে।"

বিমল বললে, "কিন্তু আমরা কোন্ দিক দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?"

রোলাঁ বললেন, "একটু মন দিয়ে শুনুন, কারণ এইবারে আসল কথা সুরু হবে। আজ থেকে প্রায় পাঁচ বৎসর আগে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরের কাছে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। দেখা দেয় এক আজব জীব।"

—"আজব জীব ?"

—"হ্যাঁ, স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে উদ্ভটও বলতে পারেন।"

বিমলের মুখ দেখে বোধ হয়, সে যেন নিজের স্মৃতিসাগর মন্থন করছে মনে-মনে। হঠাৎ সে উঠে প'ড়ে পুস্তকাধারের ভিতর থেকে একখানা রীতিমত মোটা বই বার করলে। সেখানা হচ্ছে 'স্ক্র্যাপবুক'—খবরের কাগজ থেকে ছোট-বড় নানা অংশ কেটে নিয়ে গঁদ দিয়ে তার মধ্যে জুড়ে রাখা হয়েছে।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় থেমে বিমল বললে, "১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের সাতাশে অক্টোবর তারিখের 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় এই খবরটি বেরিয়েছিল—'প্যারিস নগর থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী মেলুন নামে গ্রামের বাসিন্দারা গত সপ্তাহকাল ধ'রে এক আজগবি জীবের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। জীবটাকে দেখতে গরিলার মত, তার গায়ে আছে রাঙা ওভারকোট এবং পায়ে আছে পাদুকা। ফরাসী সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশ, তাকে বন্দী করবার জন্যে খানা-তল্লাসকারীরা দলে-দলে দিকে-দিকে বেরিয়ে পড়েছে। জীবটাকে

সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করে এক দল শিশু, সে তখন অরণ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল দুলতে-দুলতে।' মিঃ রোলা, আপনি কি এই ঘটনার কথা বলতে চান?"

রোলা বললেন, "হ্যাঁ।"

[ক্রমশঃ।

শিশু-সাহিত্যে নজরুল

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

আজহারউদ্দীন খাঁন

নজরুল শিশু-মনের অন্তরতম অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তার বিচিত্র প্রবৃত্তিকে বিচিত্র রূপ দিয়েছেন। "সাত ভাই চম্পা" কবিতাগুচ্ছ এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রথম ভাই মাকে সম্বোধন করে বলছে—

— আমি হব সকাল-বেলার পাখী,
সবার আগে কুসুম-রাগে উঠব আমি ডাকি।
সুয্যি মামার জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
"হয়নি সকাল, ঘুমো এখন"—মা বলবেন রেগে।
বলব আমি, "আলিসে মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল—তাই ব'লে কি সকাল হবে নাকো?
আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা, রাত পোহাবে তবে।"
... ...
ফুলের বনে ফুল ফোটাব, অন্ধকারে আলো,
সুয্যি মামা বলবে উঠে, "খোকন, ছিলে ভালো?"
বলব, "মামা, কথা কওয়ার সময় নাইক আর,
তোমার আলোর রথ চালিয়ে ভাঙ ঘুমের দ্বার।"
রবির আগে চলব আমি ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে,
জাগবে সাগর, পাহাড়, নদী, ঘুমের ছেলে-মেয়ে।

চতুর্থ ভাইয়ের সঙ্কল্প হচ্ছে—

আমি সাগর পাড়ি দেব, আমি সওদাগর,
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।

'ঝিঙে ফুলে'র বর্ণনা রসসিঞ্চনে মনোরম—

: গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল—
ঝিঙে ফুল।
... ...
পউষের বেলা শেষ
পরি জাফরানী বেশ
মরা মাগনের দেশ
করে গেলে মশগুল—
ঝিঙে ফুল।
... ...
তুমি বল—'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মায়,
চাই না এ অলকায়—
ভাল এই পথ-ভুল!'
ঝিঙে ফুল। (ঝিঙে ফুল : ঝিঙে ফুল)

সাধ্য কি যে শিশু-পাঠক, এর ভাষা ও ছন্দের মোহ থেকে তার মনকে সরিয়ে নিয়ে যাবে!

'প্রভাতী' কবিতায় প্রভাতের কী সাবলীল শাশ্বত বর্ণনা যা ছেলেদের মনকে সহজেই স্পর্শ করে—

রবি মামা দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ
দারোয়ান গায় গান
শোনো ঐ, "রামা হৈ!"
ত্যজি নীড় ক'রে ভীড়
ওড়ে পাখী আকাশে,
এন্তার গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে
চুলবুল বুলবুল
শিশ, দেয় পুষ্পে,
এইবার এইবার
খুকুমণি উঠবে! (ঝিঙে ফুল)

এখানে কবির ভাষা যেন ভোর বেলার ফুলের মত সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে। ছোটদের মধ্যে কে আগে উঠেছে এ নিয়ে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি চলে, সে-কথাও কবি বিস্মৃত হননি—

উঠল ছুটল
ঐ খোকাখুকি সব,
"উঠেছে আগে কে"
ঐ শোন কলরব। (ঐ)

শিশু হচ্ছে ভগবানের পবিত্রতম সৃষ্টি। মানুষের দৈনন্দিন জীবন ওর আগমনে হয়ে ওঠে মুখরিত, তার প্রাণেও এনে দেয় স্বচ্ছ ও অনাবিল আনন্দ; তাই সংসারে নতুন শিশুর আবির্ভাব চিরকালই বহন করে আনে নতুনতর আনন্দ—'শিশু যাদুকর' কবিতায় এই কথাই সুন্দর ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে—

কোন্ রূপলোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।
... ...
ছোট তার মুঠি ভরি আনিলি মণি,
সোনার জিয়ন কাঠি, মায়ার ননী।
তোর সাথে ঘর ভরে এল ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হোল কি জানিস্ গুণ!—(ঝিঙে ফুল)

'মা', 'লিচু-চোর', 'খুকী ও কাঠবেড়ালী' প্রভৃতি সুন্দর কবিতা কে না পড়েছে, আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদেরই হয়ত মুখস্থ আছে। শিশুদের নিয়ে কবিতার মধ্যে তিনি খেলিয়েছেন, হাসিয়েছেন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে তারই পরিচয় পাওয়া যাবে—

অ-মা ! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং ?
থাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা—নাক ডেঙাডেং ড্যাং !
… … … …
দাদু বুঝি চীনাম্যান মা, নাম বুঝি চাংচু ?
তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চাপ্‌টা সুধাংশু !
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন !
অ-মা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং !
—(খাঁদু-দাদু)

সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এমনি পালোয়ান ;
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন মস্ত আলোয়ান !
—(খোকার বুদ্ধি)

একদিন না রাজা—
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা !
রাণী গেলেন তুলতে কলমী শাক্
বাজিয়ে বগল টাকডুমাডুম টাক্ ।
রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে
হাতীর মতন একটা বেড়াল বাচ্ছা শিকার করে ।
—(খোকার গল্প বলা)

দিইনি চিঠি আগে
তাইতে কি বোন্ রাগে ?
হচ্ছে যে তোর কষ্ট
বুঝতেছি খুব পষ্ট ।
তাই তো সদ্য সদ্য
লিখতেছি এই পদ্য ।
পেয়েছি তোমার পত্র,
যদিও তিন ছত্র,
যদিও তার অক্ষর
হাত পা যেন যক্ষর
পেট্‌টা কারুর চিপসে
পিঠটা কারুর চিপসে
এক একটা যা বানান
হাঁ করে কি জানান !
… … … …
মা মাসীমা'য় পেন্নাম
এখান হতেই করলাম ।
স্নেহাশিস্ এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা লস্ তা !
সাঙ্গ পদ্য সবিটা,
ইতি । তোদের কবি-দা ।—(চিঠি)

এই গেল তাঁর শিশু-প্রীতির এক রূপ। আর এক রূপ আছে—সাদা চোখ দিয়ে মাটির পৃথিবীকে দেখানোর রূপ। কিশোর-মনের মধ্য থেকে কবি গেয়ে উঠলেন—

থাকব না'ক বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে ।
দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে ।
—(দেখব এবার জগৎটাকে)

কিশোরদের মাঝেই শিশু-মন-জয়ী নজরুল দেখতে পেয়েছেন নতুন দিনের সোনালী সূর্য। এরাই সকল অনাচার-অবিচার পদদলিত করে সত্যিকারের আদর্শবাদী কর্মী হয়ে দেশ ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করবে। আগামী কালের সমাজ ও রাষ্ট্রের রঙ্গমঞ্চে আজকের যুব-সম্প্রদায় ও প্রবীণ দলের ভূমিকা তারাই অভিনয় করবে। এরা নিজেকে যতটা ছোট মনে করে, সত্যি এরা তত ছোট নয় ; এদেরই মধ্য থেকে লোকপাবন বুদ্ধ, মানবহিতৈষী অশোক, আকবর, বিপ্লবী লেনিন, কামাল, সুভাষ প্রভৃতি মনীষীরা বেরুতে পারেন। কবি তাই কিশোরদের প্রথম থেকেই উদ্‌বুদ্ধ করে তুলছেন এক মহান্ প্রেরণায়। এরা বয়সে ছোট বলে নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রথম থেকেই যেন বসে না পড়ে, তাদেরকে জীবনে বড় হতে হবে, বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে, মন দৃঢ় রাখতে হবে তাই কবির সেই জোরালো ডাক, বিরাটের জয় হোক, বৃহতের জয় হোক, মুছে যাক সকল বিভেদ, নিঃশেষ হয়ে যাক নিজেকে ছোট ভাবার সকল চিন্তা—

তোমরা ভাবিছ, আমরা বালক অথবা বালিকা কেহ,
আমি বলি—কেহ দেখনি আজিও তোমরা নিজের দেহ ।
তোমাদের মন-মায়া-দর্পণে দেখ যদি নিজ কায়া,
দেখিবে—তোমারই ঐ দেহে আছে সারা বিশ্বের ছায়া ।
তুমি ছোট নহ, ঐ সে ক্ষুদ্র দেহখানি তুমি নও,
নিজেরে দেখিলে—দেখিবে, তুমিই বিপুল বিরাট হও ।
* * * *
তুমিই সর্বশক্তি লভিয়া পূর্ণ হইতে পারো,
"আমি ছোট" এই ভাবো নিশিদিন, তাই সব কাজে হারো ।
দারোগা কেরাণী হবার ক্ষুদ্র সাধনা তোমার নহে,
তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান্ কহে !
বল ভগবানে, তুমি হতে চাও সর্ব-শক্তিমান্,
তুমি অনন্ত যশঃ খ্যাতি চাহ, চাহ অনন্ত প্রাণ ।
—(মায়া-মুকুর)

কর্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে সঁপে দেবার জন্যে কবি আজ ব্যাকুল হয়েছেন, জীবন-প্রান্তে শ্রান্ত মন, ক্লান্ত দেহ—

মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এস গুল্-মজলিসে
ঝরিবার আগে হেসে চলে যাব—তোমাদের সাথে মিশে ।
মোরা কীটে-খাওয়া ফুলদল, তবু সাধ ছিল মনে কত—
সাজাইতে ঐ মাটির দুনিয়া ফির্‌দৌসীর মত !
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর-কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিও, বেহেশ্‌ত এনো দুনিয়ার মহ্‌ফিলে ।
—(মোবারকবাদ : নতুন চাঁদ)

এমনি করেই প্রবীণ নবীনকে জায়গা ছেড়ে দেয়। শক্তির শেষ সীমায় এসে পেছনের লাভ-ক্ষতির হিসেব করে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে প্রবীণ—

ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনো বৃহতের অনুরাগ ।

শহীদি দর্জ্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি ·
চেয়েছি গোলামী, জাবর কেটেছি গোলাম-খানায় বসি ! (ঐ)

তাই এই গোলামীর অভিশাপ নবীনকে যেন অভিশপ্ত করে তুলতে না পারে—

তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা কর ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছোঁওয়া জীবনে না লাগে !(ঐ)

গোলামী থেকে মুক্ত হবার জন্যে মুকুলেরা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত না হয়—

গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জ্জা অনেক উর্দ্ধে, জেনো ;
চাপরাশির ঐ তকমার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো ! (ঐ)

যারা গোলামীর কাছে মাথা নত করবে সে-কিশোরদের ওপর কবির আস্থা নেই, তাদের ওপর যদি কাজের ভার দেওয়া হয় তাহলে—

গোলামের ফুল-দানীতে যদি এ মুকুলের ঠাঁই হয়,
আল্লার কৃপা-বঞ্চিত হব, পাব মোরা পরাজয় !
... ...
শুধু আর্শের আতর-দানীতে যাহাদের হয় ঠাঁই,
তোমাদের মহ্‌ফিলে আমি সেই মুকুলেরে চাই !
সেই মুকুলেরা এস মহ্‌ফিলে, বসাও ফুলের হাট,
এই বাঙলায় তোমরা আনিও মুক্তির আরফাত ! (ঐ)

বাঙলার ভবিষ্যৎ বাঙলার এই কিশোরেরা। কবি উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছেন তাদের নব শক্তিকে, তাদের ললাটে গৌরবের জয়টীকা পরিয়ে বলছেন—

ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী, এই অজ্ঞান ভোলো, ·
তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো !
তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি মহতো মহীয়ান্
জাগো দুর্বার, বিপুল, বিরাট, অমৃতের সন্তান !
—(মায়া-মুকুর)

নজরুল-শিশু-সাহিত্যের এই হচ্ছে প্রধান বাণী ! এই বাণীর আবর্ত্তনেই তাঁর শিশু-সাহিত্যের কেন্দ্রীভূত বস্তু আবর্ত্তিত।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

এই বছরের (১৮৫৭ ইং অব্দ) এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে নানা সাহেব লক্ষ্ণৌ থেকে কাল্পী, মীরাট, আম্বালা, দিল্লী প্রভৃতি পরিদর্শন ও সেই-সেই স্থানের সহযোগী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিঠুরে ফিরে এলেন। এই ভ্রমণকালে নানা ঝাঁসীতে গিয়ে রাণী লক্ষ্মীবাঈএর সঙ্গে দেখা করেছেন—এমন কোন কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। রাণী তখন একাগ্রচিত্তে মহাশক্তির আরাধনা করছেন তপস্বিনীর মত গভীর নিষ্ঠায়। নানা সম্ভবতঃ রাণীর সেই আরাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত করেন নাই। তিনি সে সময় ঝাঁসীতে উপস্থিত হলে সে খবর অপ্রকাশ থাকত না ; যেহেতু ঝাঁসীর শাসন-ব্যবস্থা তখন ইংরেজ সরকারের হাতে। কোনও প্রকারে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা, বিশেষতঃ এর উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধে কোন তথ্য ইংরেজ সরকার জ্ঞাত হবার সুযোগ না পান—এ সম্বন্ধে নানা সাহেব ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। সেই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি কাল্পী পরিদর্শনে এসেও কাল্পীর নিকটবর্ত্তী ঝাঁসীতে আসা সমীচীন মনে করেন নাই।

বিশেষ-বিশেষ স্থানগুলি পরিদর্শন করে নানা কি কলকাঠি টিপে দিয়ে গেলেন, তার কোন হদিশ পাওয়া গেল না বটে ; কিন্তু এর পরেই অভিনব এক গুজব রটে গেল দেশের সর্বত্র। বহু দিন থেকেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ রেজিমেণ্টের সেনাদের রাইফেলে ব্যবহার করবার জন্য নূতন রকমের এক টোটা আবিষ্কার-কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় সেই টোটা ব্যবহারযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত হতেই তার নামকরণ হলো—'দমদম টোটা'। সামরিক কর্তৃপক্ষ এই নূতন টোটা রেজিমেণ্টগুলিতে প্রচলনে যখন সচেষ্ট হয়েছেন, সেই সময় সিপাহী-মহলে প্রচারিত হলো যে, ইংরেজ সরকার ভারতীয় সিপাহীদিগকে খৃষ্টান করবার জন্য অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন। এই নূতন 'দমদম টোটা' সেই চেষ্টারই একটি অঙ্গ। গরু ও শূকরের চামড়া ও চর্বি দিয়ে এই টোটা এমন কায়দায় তৈরি করা হয়েছে যে, দাঁত দিয়ে এই টোটা কেটে বন্দুকে ভরতে হয়। এর ফলে, হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক, উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীকেই জাতিভ্রষ্ট হতে হবে—তখন সহজেই তারা খৃষ্টান হয়ে যাবে। একেই সিপাহীরা নানা কারণে সরকারের প্রতি প্রসন্ন ছিল না, এর উপর এই টোটার ব্যাপারে তারা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। খবরটা প্রায় একই সময় একসঙ্গে ইংরেজদের রেজিমেণ্টগুলির ভারতীয় সিপাহী-মহলে প্রচারিত হওয়ায় সর্বত্রই দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। অন্তঃসলিলার মত যে স্রোত বালুর ভিতরে চাপা ছিল, তা ফুটে বেরুবার উপক্রম করল, ধুমায়িত বহ্নির শিখা নির্গত হলো। আর এমনি নিয়তির নির্বন্ধ—বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রেজিমেণ্টের বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের মর্মবাণী—সারা ভারতের রাজধানী কলকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠবর্তী ব্যারাকপুরের ছাউনী থেকে বেঙ্গল আর্মীর ভারতীয় সিপাহীরাই সর্বাগ্রে অগ্নির অক্ষরে প্রকাশ করে দিল। নিশীথ রাতে ব্যারাকপুরের ইংরেজ অফিসারদের বাংলোর মধ্যে যখন নৃত্যোৎসব চলেছে, সেই সময় বাংলোর চালায় লাগল আগুন, উৎসব গেল ভেঙে—আর এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় বিস্মিত ইংরেজ অফিসারগণের অন্তরে প্রশ্ন জাগল—এমন দুঃসাহসিক কাজ করল কারা ? সেনাবারিকের চালায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া ত বড় সাধারণ কথা নয় ?

এই ঘটনার পরদিনই—ব্যারাকপুর থেকে একশ' মাইল তফাতে বহরমপুরে আর এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। বেঙ্গল আর্মীর ১১ নং রেজিমেণ্টকে ব্যারাকপুর থেকে বহরমপুরে নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষ সেখানকার প্যারেড ময়দানে পরীক্ষামূলক ভাবে সর্বপ্রথম 'দমদম বুলেট' ব্যবহার করতে দিলেন। কিন্তু ভারতীয় সিপাহীরা সে টোটা ব্যবহার করা দূরের কথা, স্পর্শ করতেও সম্মত হলেন না। এই রেজিমেণ্টের ইংরেজ অফিসার সিপাহীদের এ রকম অবাধ্যতায় আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতেই আপত্তিকারী সৈনিকরা অসঙ্কোচেই জানাল যে, সরকার তাদের প্রত্যেককে স্বধর্মচ্যুত করে খৃষ্টান করবার

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের
দৌলতে
SUNLIGHT
SOAP
Use Sunlight

মতলবে এই নূতন টোটার আমদানী করেছেন—গোরু-শূকরের চর্বি ও চামড়া দিয়ে এর মোড়ক তৈরী, দাঁত দিয়ে মোড়ক কেটে বন্দুকে টোটা লাগাতে হবে, সরকারের এই রকম বেইমানী তারা বরদাস্ত করবে না। ইংরেজ অফিসার এ অবস্থায় প্যারেডের মাঠ থেকে তাড়াতাড়ি বহরমপুর সেনানিবাসে গিয়ে সেনানায়ক কর্ণেল মিচেলকে ব্যাপারটা সব বললেন। তিনি কানাঘুষায় এর আগেই টোটা সংক্রান্ত গুজবের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু সেই টোটা পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার করবার সময় যে সিপাহীরা এ ভাবে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে সাহস করবে, তিনি এমন ধারণাও করেন নাই। যাই হোক, তিনি তখনি প্যারেডের মাঠে এসে মিলিটারী মেজাজে অবাধ্য সিপাহীদের ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করলেন; কিন্তু তার ফল হলো বিপরীত, প্যারেডের মাঠে সমবেত সমস্ত সিপাহী একসঙ্গে তখন রুখে দাঁড়াল; তারা নির্ভীক কণ্ঠে জানিয়ে দিল যে, জান দেবে তারা তবু এ টোটা স্পর্শ করবে না। কথার সঙ্গে-সঙ্গে সিপাহীদের মুখের ভাবও তখন বদলে গেল। বিচক্ষণ সেনানী মিচেল সশস্ত্র যোদ্ধাদের এই দৃষ্টি চিনতেন; তিনি তাদের মুখের ভঙ্গি ও চোখের দীপ্তি দেখে বুঝলেন যে, এরা এখন আর আগেকার সেই ক্রীতদাসের মত আজ্ঞাধীন নেটিভ নয়—এখন যেন প্রত্যেকেই আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। তিনি তখনি সেদিনের মত প্যারেড বন্ধ করে সিপাহীদের ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। সিপাহীরা ব্যারাকে গেলেও তাদের সন্দেহ দূর হলো না, তারাও তলে-তলে তৈরী হতে লাগল। এর পর কর্ণেল মিচেল কলকাতায় বহরমপুরের সিপাহীদের অবাধ্যতার খবর পাঠালেন। কলকাতার কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে শঙ্কিত হলেন। এ সময় কাছাকাছি কোথাও গোরা রেজিমেণ্ট ছিল না; সুতরাং সিপাহীরা যদি সহসা বিদ্রোহ উপস্থিত করে, তাহলে ব্যাপার খুবই সাংঘাতিক হয়ে উঠবে। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ রেঙ্গুন থেকে ৮৪ সংখ্যক গোরা রেজিমেণ্ট আনবার ব্যবস্থা করেই কর্ণেল মিচেলকে জানালেন, তিনি যেন এক সপ্তাহ পরে বহরমপুরের অবাধ্য সিপাহীদিগকে ব্যারাকপুরে ফিরিয়ে আনেন। এখানে তাদের প্রতি শাস্তির ব্যবস্থা হবে। কর্ণেল মিচেলই উক্ত সিপাহীদিগকে ব্যারাকপুর থেকে বহরমপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত তিনি এর পর সিপাহীদের প্যারেড বন্ধ করে দিলেন, সুতরাং 'দমদম টোটা' ব্যবহারের কথাটা চাপা পড়ে গেল।

লর্ড ক্যানিং এই সময় ভারতের গবর্ণর জেনারেল এবং হিয়ারসে প্রধান সেনাপতি। বড়লাট লর্ড ক্যানিং জেনারেল হিয়ারসের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বহরমপুর থেকে সিপাহী রেজিমেণ্ট ব্যারাকপুরে পৌঁছবার পূর্বেই বেথুনের গোরা রেজিমেণ্ট কলকাতা এসে উপস্থিত হবে। তখন তাঁদের প্রথম কাজ হবে ১৯ নং রেজিমেণ্টকে প্যারেডের মাঠে নিরস্ত্র করা। বহরমপুর থেকে ১৯ নং রেজিমেণ্ট ব্যারাকপুরের ছাউনীতে এসে পৌঁছবার পূর্বেই বর্মার গোরা সেনাদল এসে পড়ল। এর পর বহরমপুরের সিপাহীরা ব্যারাকপুরে আসবা মাত্রই তাদের মধ্যে সুকৌশলে এই খবরটা প্রচার করে দেওয়া হলো যে, কর্তৃপক্ষ বর্মা থেকে বিস্তর গোরা সৈন্য আনিয়েছেন—হুগলী নদীর উপরে সেনা-বোঝাই জাহাজগুলো টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। খবরটা ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ সেনানিবাসে সর্বত্র ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়ল। কানাঘুষায় এমন কথাও শোনা গেল যে, বহরমপুরে অবাধ্যতার জন্য ১৯ নং রেজিমেণ্টকে সরকার সম্ভবত নিরস্ত্র করবেন, হয়ত আরো কঠোর শাস্তিও দিতে পারেন। এই খবর ও কানাঘুষা শুনে ১৯ নং রেজিমেণ্টের সিপাহীরা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যেও নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলেছে, সেই সময় মঙ্গল পাঁড়ে নামে বেঙ্গল আর্মীর ৩৪ সংখ্যক সেনাদলের এক তরুণ সিপাহী বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি ব্যারাকপুরের ঘটনা সবিশেষ শুনেছিলেন, তার পর সেই সূত্রে কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থাকে অত্যন্ত আপত্তি ও অবমাননাকর মনে করে তাঁদের ব্যবস্থাবলম্বনের পূর্বেই এই অত্যাচারী বেইমান সরকারকে সায়েস্তা করবার উদ্দেশে ২৯শে মার্চ প্রত্যুষে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাঁর আবাস-কক্ষ থেকে বেরিয়ে ব্যারাকের প্রাঙ্গণে এসে সহকর্মী সিপাহীদের আহ্বান করলেন—'ভাই সব! ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বোঝাপড়ার দিন এসেছে, সবাই তোমরা হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে এসো।'

এই ভাবে আহ্বান করতে-করতে তিনি ভারতীয় ব্যাণ্ড বা রণবাদ্য বাদকদের আস্তানার সামনে গিয়ে তাদের উদ্দেশে তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন—'ভাই সব! তোমরাও দল বেঁধে বেরিয়ে এসো, ব্যাণ্ড বাজাও; সিপাহীদের মাতিয়ে দাও।'

কিন্তু এই আকস্মিক ব্যাপারে ব্যারাকের সিপাহীরা হকচকিয়ে গেল, ব্যাণ্ডওয়ালারাও বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, মনে-মনে তারা উত্তেজিত হলেও এ অবস্থায় মঙ্গল পাঁড়ের মত এক সাধারণ সিপাহীর কথায় তারা দলবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এলো না; দু'-চার জন সিপাহী ইতস্তত: ভাবে ব্যারাকের প্রাঙ্গণে এলেও তারা নীরবে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগল। এই সময় সার্জেণ্ট জেনারেল হগসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মঙ্গল পাঁড়েকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিলেন—যে কয় জন সিপাহী নীরবে বিক্ষিপ্ত ভাবে দাঁড়িয়েছিল প্রাঙ্গণে, তাদের উদ্দেশ করে। কিন্তু তারা মঙ্গল পাঁড়ের আহ্বানে যেমন উদাসীন ছিল, সাহেবের আজ্ঞা পালন সম্বন্ধেও তেমনি উদাসীন রইল। সাহেব তখন ক্রোধে ধৈর্যচ্যুত হয়ে তর্জন করতে-করতে নিজেই ছুটলেন মঙ্গল পাঁড়েকে শায়েস্তা করবার উদ্দেশে। কিন্তু মঙ্গল পাঁড়ের অস্ত্রাঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে সাহেবই ধরাশায়ী হলেন। এই সময় লেফটানাণ্ট ব্যগ সুসজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে প্যারেড গ্রাউণ্ডে আসছিলেন। তিনি দূর থেকে এ-দৃশ্য দেখেই পাঁড়ের দিকে ঘোড়া ছোটালেন। কিন্তু পাঁড়ের কাছে পৌঁছবার আগেই পাঁড়ের গুলীতে জখম হয়ে ঘোড়া আরোহীকে নিয়ে পড়ে গেল। মঙ্গল পাঁড়ে তখন সুযোগ পেয়ে ছুটলেন ধরাশায়ী সাহেবের দিকে। সাহেবও তাড়াতাড়ি উঠে পাঁড়েকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলী ছুঁড়লেন, কিন্তু সে গুলী হলো লক্ষ্যভ্রষ্ট। মঙ্গল পাঁড়ে তৎক্ষণাৎ তরবারি হস্তে ব্যগ সাহেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত করে আততায়ীর আক্রমণ প্রতিরোধে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু ক্ষিপ্রহস্ত মঙ্গল পাঁড়ের সুতীক্ষ্ণ তরবারি সাহেবের বাধা দানকে ব্যর্থ করে তাঁর বুকের উপর পড়ল, রক্তাপ্লুত দেহে ব্যগ সাহেব লুটিয়ে পড়লেন প্যারেডের মাঠে। এই সময় জনৈক কর্ণেল তফাৎ থেকে এই ব্যাপার দেখে মঙ্গল পাঁড়েকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সিপাহীদিগকে হুকুম দিলেন, কিন্তু সে হুকুমে কেউ কর্ণপাত

করল না, বরং একজন সিপাহী দৃঢ় কণ্ঠে বলল—"পাঁড়েজী ব্রাহ্মণ, আমরা ওঁকে গ্রেপ্তার করতে অক্ষম।" কর্ণেল তখন সেনাপতির আবাস-ভবনের দিকে ছুটলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে সেনাপতি হিয়ারসে তাঁর দুই পুত্র ও একদল গোরা সৈন্য নিয়ে ঘটনাস্থলেই আসছিলেন ; কর্ণেল হুইলার তাঁকে হগসন ও ব্যগ সাহেবের দুর্দশার কথা বললেন। মঙ্গল পাঁড়েও তখন উত্তেজিত ভাবে প্যারেডের মাঠে পদচারণা করতে-করতে তার সহযোগী সিপাহীদের পূর্বের মত আহ্বান করছিলেন। সেনাপতি হিয়ারসেকে দেখেই পাঁড়েজী হাতের তরবারি কোষবদ্ধ করে বন্দুক নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। ওদিকে সেনাপতি হিয়ারসের নির্দেশে গোরা সেনাদল মঙ্গল পাঁড়েকে ঘিরে ফেলল। তিনি ভেবেছিলেন এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখে অন্যান্য সিপাহীরাও তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেবে, সদলবলে তিনি গোরাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু এর পরও কোনও সিপাহী তাঁকে সাহায্য করতে এলো না দেখে, তিনি আর আক্রমণ বা আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে ফিরিঙ্গীদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মনাশই শ্রেয়: জ্ঞান করে বন্দুকের চোঙা নিজের বুকে লাগিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন। আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে আহত হয়ে মঙ্গল পাঁড়ে মাটির উপর পড়ে গেলেন। তখন তাঁর রক্তাপ্লুত দেহ হাসপাতালে পাঠান হলো।

এই ঘটনার পর বেঙ্গল আর্মীর ১৯ ও ৩৪ সংখ্যক সিপাহী দলের যে সকল কোম্পানী ব্যারাকপুরে ছিল তাদের নিরস্ত্রীকরণ করা হলো। ৮ই এপ্রিল তারিখে মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসী হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে এ খবর দাবানলের মত চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে বাঙলার বুকে বিপ্লবের যে বহ্নি প্রথম শিখা বিস্তার করেছিল, সেই শিখা দিকে-দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। ১০ই মে মীরাটের সিপাহীরা ইংরেজ সেনানায়ককে সংহার করে ব্যারাক পুড়িয়ে দিয়ে বিপ্লব ঘোষণা করল। দেখতে-দেখতে বিহার, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দী ও কানপুরে এই বিপ্লব-বহ্নির লেলিহান-শিখা পরিব্যাপ্ত হলো।

কিন্তু সহসা এই বিপ্লবের অকাল বোধনে নানা সাহেব প্রমুখ নেতৃবর্গ স্তম্ভিত হলেন ; তাঁদের সুচিন্তিত পরিকল্পনার দিনটি যে তিনটি মাস আগেই একটা ঘটনাকে উপলক্ষ করে এ ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তাঁরা সে ধারণা করেন নাই। কিন্তু প্রায় একই সঙ্গে দিকে-দিকে যখন আগুন জ্বলে উঠল, তখন তাঁরা বিজ্ঞের মত সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হলেন। এই সূত্রে সর্বসমক্ষে নানা সাহেবকেও মুখোস খুলে ফেলতে হলো ; সেও এক চমকপ্রদ ঘটনা!

১৮৫৭ অব্দের জুন মাস। চার দিকেই সিপাহী বিপ্লবের বহ্নি জ্বলন্ত শিখা বিস্তার করে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। কানপুর তখন সেনাবাহিনীর একটা বড় ঘাঁটি। জেনারেল স্যার হিউ হুইলার এখানে সেনা-বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ; কানপুরই তাঁর হেড কোয়ার্টার। ভারতীয় রেজিমেণ্টে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থেকে মাথার চুল পাকিয়েছেন ইনি—ভারতের বড়লাট লর্ড ক্যানিংয়ের সঙ্গেও এঁর খুব সদ্ভাব ও সম্প্রীতি। এমন দুর্যোগেও আত্মশক্তি এবং বৃটিশ জাতির প্রভাবের উপর স্যার হিউ হুইলারের গভীর আস্থা ; তিনি জানালেন—ফুৎকারে এই বিদ্রোহ-বহ্নি নিবিয়ে দেবেন, ভারতীয়দের সহায় করেই ভারতীয় বিপ্লবীদের সায়েস্তা করবেন।

কানপুর ছাউনীতে এসেই স্যার হিউ হুইলার নানা সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। নানার সঙ্গে আগে থেকেই তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন ; নানার বদান্যতা, জাঁকজমকপ্রিয়তার কাহিনী ও কানপুর ছাউনীর ইংরেজ নরনারীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার কথা তাঁর অবিদিত ছিল না। ছাউনীর সিপাহিবৃন্দ এবং এ অঞ্চলের বাসীন্দাদের উপর নানার প্রভাবের কথাও তিনি শুনেছিলেন। সুতরাং এই সঙ্কট-সময়ে নানাকেই তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি জেনে মনে-মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছিলেন। সেই সূত্রেই নানাকে আহ্বান।

নানা বুঝি এমনি একটা সুযোগের প্রতীক্ষাই করছিলেন। সুবিধাবাদী এই ইংরেজ জঙ্গী পুরুষটিকে তিনি হাড়ে-হাড়ে চিনতেন। ছাউনীর ইংরেজরা নানার সঙ্গে প্রীতিবদ্ধ জেনে স্যার হিউ হুইলারের ক্ষোভের কোন কারণ ছিল না, কিন্তু কানপুর-প্রবাসিনী ইংরেজ ললনারা নানার প্রতি আকৃষ্ট ও গুণমুগ্ধ জেনে তিনি মনে-মনে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করতেন। স্যার হিউ হুইলারের ধারণা, মেয়েদের মুখ থেকে ঘরের এমন অনেক গুপ্ত খবর বেরিয়ে আসে, বাইরের ভিন্‌দেশী লোকের কাছে সে সব কথা ফাঁস হওয়া উচিত নয়। অবশ্য, অভিজ্ঞতা-সূত্রেই স্যার হুইলার এই তথ্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ, ভারতীয় সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি নানা খবর জানবার উদ্দেশ্যে স্যার হুইলার সম্ভ্রান্ত-বংশীয় এক ভারতীয় ললনাকে বিবাহ করেছিলেন। অনেকেই জানতেন যে, সেনাপতি সাহেবের আসল হাতিয়ার হচ্ছেন তাঁর ভারতীয়া পত্নী এমা। পূর্বের নাম যাই থাক, বিবাহিত-জীবনে তিনি এমিলি নামেই পরিচিতা ছিলেন। এই জন্যে নানাও স্যার হিউ হুইলারের প্রতি প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও অন্তরে-অন্তরে গভীর বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

স্যার হিউ হুইলারের আহ্বান-পত্র পেয়েই নানা ছাউনীতে গিয়ে সাহেবকে সেলাম করে বললেন—'হঠাৎ অধীনের প্রতি সাহেবের এ অনুগ্রহ কেন? আহ্বানের উদ্দেশ্য জানাতে আজ্ঞা হোক।'

সাহেব তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে নানার করমর্দন করে পাশের আসনে বসিয়ে প্রথমেই নানা সাহেবের নিজের ও তাঁর পরিজনদের ভবিষ্যতের খবর নিয়ে তার পর আসল কথা পাড়লেন। হঠাৎ কিছুটা উষ্মার ভঙ্গিতে বললেন : খবর শুনেছেন ত, কতকগুলো মতলববাজ খারাপ লোক ঝুটমুট রেজিমেণ্টের সিপাহীদের বিগড়োতে আরম্ভ করছে। জায়গায়-জায়গায় অল্প-বিস্তর হাঙ্গামাও হচ্ছে। ঐ বদমাসগুলোকে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত ট্রেজারীর চার্জ এখন মিলিটারীর উপর পড়েছে। তাহলে বুঝতেই পারছেন, আমাকেও এখন কি রকম মুশকিলে পড়তে হয়েছে! এখন আপনি ত আমার মুশকিল আসান করেন।

নানা যেন আকাশ থেকে পড়লেন সাহেবের কথা শুনে ; তিনিও মুখে বিস্ময়ের ভঙ্গি ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : সে কি সাহেব! রেজিমেণ্টের অধিনায়ক হয়ে আপনি মুশকিলে পড়েছেন, আর সেই মুশকিল আসান করবার জন্যে এই অধীনকে তলপ করেছেন! এমন তাজ্জবের কথা ত কখনো শুনিনি!

সাহেব আম্‌তা-আম্‌তা করে বললেন : এখন ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন—লুণ্ঠতরাজের ভয়ে এই প্রভিন্সের বিভিন্ন ট্রেজারীর বিস্তর টাকা কানপুরের ট্রেজারীতে জমা হয়েছে ; যেহেতু, কানপুর সরকারের সব চেয়ে সুরক্ষিত ঘাঁটি। আমরা শুনিছি, আপনি খুব

হিসিবি মানুষ আছেন, আর আপনি ত জানেন, আমি হচ্ছি জঙ্গী মানুষ—আমার কাজ তলোয়ার নিয়ে। তাই কোম্পানীর এই সঙ্কটের সময় আমরা আপনার উপরেই মালখানা রক্ষার ভার দিতে চাই।

নানা এখন বিপন্নের মত মুখভঙ্গি করে সবিনয়ে বললেন: জানেন ত আমি কেরাণী—কলম চালাই, মুসাবিদা করি। এত বড় দায়িত্বের ভার আমি কি করে নিতে পারি?

স্যার হুইলার বললেন: আপনি পারবেন জেনেই এ ভার আপনাকে দিচ্ছি। কোম্পানীর এই বিপদের সময় আপনার কি উচিত নয় নানা ধুন্ধুপন্থজী, সর্বতোভাবে আমাদিগকে সাহায্য করা?

নানাও অভিনেতার মত কৃত্রিম ভঙ্গিতে পুনরায় আপত্তি তুললেন: ভার ত দিচ্ছেন, কিন্তু যদি কোন হাঙ্গামা বাধে, সমস্ত প্রদেশের টাকাকড়ি এখানকার মালখানায় মজুত আছে খবর পেয়ে সিপাহীরাই লুঠতরাজ করতে আসে, তখন কি করে আমি সামলাব?

হুইলার সাহেব এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি প্রদর্শন করলেন: সে ভয় এখানে বিলকুল নেই; বিদ্রোহীরা আপনার দেশবাসী ভাই আছে: আপনি মালখানার চার্জ নিয়েছেন এ খবর জানতে পারলেই তারা এর ত্রিসীমায়ও আসবে না। আমরা উত্তমরূপে বিবেচনা না করে কোন কাজ করি না।

নানাও এবার গম্ভীর ভাবে বললেন: উত্তম—আমি সম্মত হলাম।

স্যার হিউ হুইলার নিশ্চিন্ত হলেন; নানাও প্রসন্ন মনে ব্রহ্মাবর্তের প্রাসাদে ফিরে এসে বিশিষ্ট সঙ্গীদের বললেন: বিধাতার কি বিচিত্র বিচার দেখ! আমরা তাঁকে দেখি না, কিন্তু কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় না। নানা সাহেবের আর্জি ভারত-সরকার শোনেননি, বৃটিশ সরকার গ্রাহ্য করেননি, কিন্তু উপরের ঐ অদৃশ্য সরকার সময় বুঝেই করলেন তার অনুকূলে এই ডিক্রীজারী—যার ফলে স্যার হিউ হুইলার সুড়-সুড় করে ইংরেজ কোম্পানীর মালখানার চাবি এই ভাবে তুলে দিলেন!

সেই দিনই কানপুরে বিপ্লবের বহ্নি-রেখা ফুটে উঠল—রণোন্মত্ত সিপাহীদের তর্জনে সমগ্র সহর প্রকম্পিত হলো। সময় বুঝে নানা ধুন্ধুপন্থও স্যার হিউ হুইলারকে জানালেন: প্রয়োজন বুঝে আজ মুখের মুখোস খুলে ফেলেছি স্যার হিউ হুইলার! আমার পিতার মৃত্যুর পর যে আর্জি করেছিলাম আপনার কোম্পানীর কাছে, তা গ্রাহ্য হয় নাই, কিন্তু উপর থেকে সর্বদর্শী পরমেশ্বর আমার সে আর্জি করেছেন মঞ্জুর; তাই সুদে-আসলে পাওনা বুঝে নেবার জন্য কলম ছেড়ে ধরেছি তলোয়ার। সুতরাং আজ যে ভাবে মালখানার চাবী ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, সেই ভাবে হিন্দুস্থান ছেড়ে দিয়ে ইউরোপে পাড়ি দিতে বলুন আপনার কোম্পানীকে। ভারতবাসীর পক্ষ থেকে নানা ধুন্ধুপন্থের এই এখন মূল কথা—'ইংরেজ বেনিয়া, হিন্দুস্থান ছোড় দো!'

[ক্রমশঃ।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীরমু ঘোষ

মেঘলা আকাশ। দিনভোর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরে শাণিত ফলার মতো বিদ্যুৎ-রেখা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে—এমনই দুর্যোগ দিন! শেয়াল-কুকুরও নিজেদের আশ্রয় ছেড়ে পথে বের হয়নি।···এ হেন দুর্যোগের রাতে মায়ের আকুল আহ্বানে এক বালক দামোদরের তীরে উপস্থিত। যেমন করেই হোক, তাকে আজ গৃহে পৌঁছাতেই হবে!···প্রকৃতির দুর্যোগ ছাপিয়ে মায়ের আকুল আহ্বান যেন তার কানে বাজছে। কিন্তু বিরাট বাধা তার সম্মুখে। উত্তাল তরঙ্গসমাকুল দামোদর আজ দু'কূলপ্লাবী। তার অসীম জলরাশি দু'তীর গ্রাস করে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বালকের কিন্তু সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। তাকে যে আজ ওপারে যেতেই হবে। কিন্তু খেয়াঘাট শূন্য, নৌকার চিহ্নমাত্র নেই। বালক ছুটলো মাঝির সন্ধানে, কিন্তু শত অনুনয়, সহস্র প্রলোভনও মাঝিকে প্রলুব্ধ করতে পারলো না। বালক নিরুপায়। কিছুক্ষণ সে স্থির হয়ে ভাবলো—তারপর? তারপর—এ কি! এ উন্মাদ না কি? কি করছে এ বালক!

মরণজয়ী বালক দ্বিধাহীন ভাবে 'মা' 'মা' বলে দামোদরের কালো জলে ঝাঁপ দিল।

···কি সর্বনাশ! গেল, গেল—ঐ বুঝি ডুবলো! উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে সে কখনো ডুবছে, কখনো উঠছে···ভগবান! বালককে রক্ষা করো।

না, না; ঐ যে বালক ওপারে গিয়ে উঠেছে। মায়ের আশীর্বাদ মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে বর্মের মতো বালককে রক্ষা করেছে।

নিশীথ রাত্রি! ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। জনপ্রাণীও জেগে নেই। শুধু একটি বাড়ীতে জেগে আছেন এক মহীয়সী নারী। চোখে তাঁর বয়ে যাচ্ছে দরদর অশ্রু! প্রিয় সন্তান আজ এখনো বাড়ী পৌঁছাতে পারেনি!

হঠাৎ—"মা, মা, দোর খোল।"

উন্মাদিনীর মতো আলুথালু বেশে বেরিয়ে এসে তিনি বুকে চেপে ধরলেন তাঁর প্রিয় সন্তানকে, সাত রাজার ধন মাণিককে!

কে এই বালক?

বালকটি হলেন দেশপূজ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!

ব্রাহ্মণ-বন্দনা

"ব্রাহ্মণবর্গ জগতের গুরু, সুতরাং ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর আলোক ও মানবরূপে দেবতা।" —ভাগবতের মহর্ষি
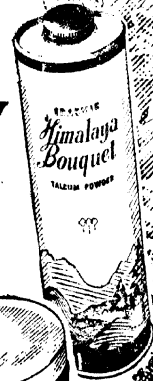
সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভাস্কর—ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম—জ্যোতির্ময় ঘোষ। শিক্ষা—এম. এ., পি. এইচ. ডি., এফ. এন. আই। কর্ম—অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সী-কলেজ। অবসর গ্রহণ (১৯৫১)। বিভিন্ন পত্রিকার লেখক। গ্রন্থ—লেখা, শুভশ্রী, মজলিশ, কথিকা, ভজহরি (গল্প), গণিতের ভিত্তি, A German Word-book, A French Word-book.

ভাস্করাচার্য—ভেদাভেদবাদী। জন্ম—৯ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের বিজ্জড়বিড় গ্রামে। পিতা—ত্রিবিক্রম। রাজা মিহিরভোজ কর্তৃক 'কবি চক্রবর্তী' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—বেদান্তভাষ্য।

ভাস্করাচার্য—গণিতাচার্য। ১২শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের বিজ্জড়বিড় গ্রামে। পিতা—মহেশ দৈবজ্ঞ। গণিত ও ভূগোলের বহু তথ্য আবিষ্কারক। গ্রন্থ—সিদ্ধান্ত-শিরোমণি।

ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী। শিক্ষা—বি. এ., বি. এস্. সি, বি. এল ; 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ। অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট। গ্রন্থ—অর্থকরী উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, The Economic Botany of India.

ভীমলোচন সান্যাল—অনুবাদক। গ্রন্থ—চাটুপুষ্পাঞ্জলি (রূপ-গোস্বামী কৃত—১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে অনূদিত)।

ভীমরাও শাস্ত্রী—সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্‌। গ্রন্থ—রাগশ্রেণী, সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি (স্বরলিপি)।

ভীমাচরণ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মণ্ডলবিলাপ (১৯০১)।

ভীমাপদ ঘোষ—শিশু-সাহিত্যিক। গ্রন্থ—এশিয়ার ছেলেমেয়ে, মণি-কাঞ্চন।

ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী—কবি। জন্ম—১৮৭২ খৃঃ অগস্ট। মৃত্যু—১৯৪০ খৃঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর সন্ন্যাস-রোগে। পিতা—শশধর রায় চৌধুরী। শিক্ষা—এম. এ., বি. এল। বাল্যকাল হইতেই কবি-প্রতিভার বিকাশ সূচিত হয়। জীবনের শেষ ভাগে ওকালতী ত্যাগ করিয়া সাহিত্য-সাধনায় নিযুক্ত। কাব্য-গ্রন্থ—মঞ্জীর (১৩১৭), গোধূলি (১৩৩৮), ছায়াপথ (১৩২০), রাকা (১৩২৩), গীতা (পদ্যানুবাদ, ১৩৪৩), চণ্ডী (ঐ, ১৩৪৯), সতী (১৩৩৪), মণিমালা (১৩৪৩), শিশির, পল্লীসমাধিগাথা (১৩১৮)। সম্পাদক—পল্লী-বাসী (মাসিক, ১৯১১—২০)।

ভুবনকৃষ্ণ মিত্র—কবি। কাব্যগ্রন্থ—অবকাশ-কাব্য-কুসুমহার (১৩১৩)।

ভুবনচন্দ্র কর—কৃষিতত্ত্ববিদ্‌। গ্রন্থ—কৃষিপ্রণালী (১৯০১)।

ভুবনচন্দ্র বিজলী—কবি। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার গোকুল-নগরে। মৃত্যু—১৩৫২ বঙ্গ। গ্রন্থ—গ্রন্থসায়র (১৩৫১)।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম—১২৪৯ বঙ্গ ৬ই শ্রাবণ, ২৪-পরগনা দক্ষিণ বারুইপুরের নিকট শাসন গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩২৩ বঙ্গ, ২রা শ্রাবণ। শিক্ষা—মিশনারী স্কুল। কর্ম—শিক্ষকতা, বারুইপুর স্কুল, অতঃপর সম্পাদকীয় বিভাগে—পরিদর্শক পত্রিকায়, সোমপ্রকাশে, সংবাদ-প্রভাকরে (১৮৬৮ ?)। গ্রন্থ—সমাজ-কুচিত্র (১৮৬৫), এই এক নূতন, আমার গুপ্তকথা অতি আশ্চর্য (১৮৭০-৭৩), তুমি কি আমার (নবন্যাস, ১৮৭৩-৭৭) মধুবিলাপ (কাব্য, ১৮৭৩), রহস্যমুকুর, ১ম (১৮৭৭), ২য় (১৮৭৮), চারুশীলা (উ, ১৮৮১), আমি রমণী (কাব্য, ১৮৮১), হীরাপ্রভা (উ, ১৮৮৩), আশাচপলা, ১ম (১৮৮৪), ২য় (১৮৮৫), ছোটবউ (উ, ১৮৮৫), ঠাকুরপো (প্রহ, ১৮৮৬), যাত্রা-বিলাস (নক্সা, ১২৯৩), তুমি কে ? (কাব্য, ১৮৮৭), আমার মহিষী (উ, ১২৯৪), বিলাতী গুপ্তকথা ২ খণ্ড ১৮৮৮—৮৯), কুঞ্জবালা, কাশ্মীর কুসুম (উ, ১২৯৭), বঙ্কিম বাবুর গুপ্তকথা (উ), ১ম (১৮৯০), ২য় (১৯৪৭ সংবত), কমলকুমারী ও রাজা সন্ন্যাসী (উ, ১৮৯১), স্বদেশবিলাস (সন্দর্ভ, ১৮৯৩), পারুল বা সেই কি তুমি ? (উ, ১৮৯৩), অগ্নিকুমার (১৩০০), আনন্দ-লহরী (১৩০১), মার্কিণ পুলিশ কমিশনার, ৪ খণ্ড (১৮৯৬), গুপ্তচর (১৮৯৮), মহাদেবের মাদুলী (ব্যঙ্গ রচনা), ঠাকুর বাড়ীর দপ্তর, ৪ খণ্ড (১৯০০), ধর্মরাজ (১৩০৭), রামকৃষ্ণ-চরিতামৃত (১৩০৮), রজতকুমারী (অনুবাদ, ১৯০২), আমিনাবাঈ (উ, ১৯০২), চন্দ্রমুখী (গ, ১৩০৯), সম্ভপ্ত শয়তান (অনুবাদ, ১৩১০) হরিদাসের গুপ্তকথা (১৩১০), বঙ্গরহস্য (নক্সা), ২ খণ্ড, (১৩১১), বাবু চোর (১৯০৬), সয়তানী (১৩১৩), সিপাহী বিদ্রোহ (১৩১৪), ভবের খেলা (১৩১৫), বিলাতী স্বর্ণবাঈ (১৩১৭), শ্রীমন্ত সওদাগর (১৯১২), লণ্ডন রহস্য, (১৯১২—১৪), সংসার-সাগর (১৯১২), প্রেমের বাজার (১৩১৯), বিলাতী ভূত (১৯১৫), জেলখানা (১৯১৯), ডিউক তারাচাঁদ (১৯২০), রাণী ইউজিনীর বৈঠক (অনুবাদ, ১৯২৪)। সম্পাদক—বিদূষক (মা, ১২৭৭), পূর্ণশশী (মা, ১২৮০), বসুমতী (১৩০৪—৫, ৬ই ফাল্গুন), জন্মভূমি (১৩০৭)।

ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—চিকিৎসক। ডি, এল, ডি। সম্পাদক—চিকিৎসা-সংগ্রহ (মা, ১২৭৬)। গ্রন্থ—রোগনাশক ২ খণ্ড (১৮৭২)।

ভুবনমোহন ঘোষ—কবি। গ্রন্থ—গান্ধারীবিলাপ (১৮৭০), পদ্যসার (১৮৭২)।

ভুবনমোহন দাশ—আইন-ব্যবসায়ী ও সুলেখক। জন্ম—১২৫১ বঙ্গ। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গ ৮ই আষাঢ় পুরুলিয়ায়। পিতা—কাশীশ্বর দাশ। খুল্লতাত জগবন্ধু দাশ ইঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। নিবাস—ঢাকা জেলার তেলীর বাগ। ইঁহার পুত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। শিক্ষা—ঢাকা কলেজ, এটর্নীশিপ পরীক্ষা। কর্ম—আইন-ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট। সমাজ-সংস্কারে ও রাজনৈতিক গভীর আন্দোলনে যোগদান। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। গ্রন্থ—A few thoughts on the Brahma Samaj (পুস্তিকা)। সম্পাদক—Bengal Public Opinion, Brahma Public Opinion.

ভুবনমোহন ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্যামাচরণ মুখার্জীর জীবনী (ইং, ১৮৬৩)।

ভুবনমোহন মাইতি—ধর্মপ্রচারক ও গ্রন্থকার। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ নামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী।

পূর্ব আশ্রম—মেদিনীপুর জেলার ছোট উদয়পুর। পিতা—ছকুরাম মাইতি। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, দৈনিক ঋষি, আমার ভ্রমণ, স্বামী বিজ্ঞানন্দ (১৩৫৪), কিশোর গীতা (১৩৫৭), শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ প্রসঙ্গ (১৩৫৮)।

ভুবনমোহন রায় চৌধুরী—আইনজ্ঞ ও কবি। জন্ম—১২৩০ বঙ্গ ২২এ আষাঢ় খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩০১ বঙ্গ আশ্বিন। পিতা—তারকনাথ রায় চৌধুরী। মাতা—ভগবতী দাসী। শিক্ষা—লণ্ডন মিশনারী স্কুল, আরবী ও ফার্সী শিক্ষা। কর্ম—ওকালতী, সদর দেওয়ানী আদালত (১২৪৭), হাইকোর্ট, পরে মুন্সেফ। ইনি সংস্কৃত ছন্দে বাংলা ভাষায় প্রায় ১৮৩ প্রকার শ্লোক রচনা করেন। ফার্সী ছন্দেও বহু শ্লোক রচনা। গ্রন্থ—ছন্দঃকুসুম (১২৭০), পাণ্ডব-চরিত-কাব্য (১২৮৩)।

ভুবনমোহন সরকার—চিকিৎসক ও সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—১৮৩৮ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারি কলিকাতায়। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ ১৩ই নভেম্বর। ইনি প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাঁহার নিকটই প্রতিপালিত। শিক্ষা—এল, এম, এস। কর্ম—চিকিৎসা-ব্যবসায় ও বহু জনহিতকর কার্যে রত। মাদক-নিবারণী সভার সম্পাদক (১৮৭৬), মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। গ্রন্থ—ডাক্তারবাবু (নাটক)। সম্পাদক—বঙ্গমহিলা (মাসিক, ১৮৭৫)।

ভুবনমোহিনী দেবী—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভুবনেশ্বর মিত্র—শাস্ত্রজ্ঞ গ্রন্থকার। জন্ম—১৯শ শতাব্দীর প্রথমাংশে মেদিনীপুর জেলার বিবিগঞ্জে। মৃত্যু—২০শ শতাব্দীর ২য় দশকে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ও সমাজ-সংস্কারক। গ্রন্থ—হিন্দুবিবাহ সমালোচনা, ১ম (১৮৭৫), ২য় (১৮৭৮), হিন্দুকন্যার বিবাহ-সংস্কার, বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি-তত্ত্ব, বিধবা বিবাহ (নিষেধ-বিষয়ক), মদিরা, কৃষ্ণাবতার রহস্য (১৯১৭)।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সংস্কারক। জন্ম—১৮২৭ খৃঃ ২২এ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা। মৃত্যু—১৮৯৪ খৃঃ ১৫ই মে কলিকাতা। পিতা—বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। শিক্ষা—সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ, জুনিয়ার বৃত্তি (১৮৪১), সিনিয়ার বৃত্তি (১৮৪২)। কর্ম—শিক্ষকতা, হিন্দু হিতার্থ বিদ্যালয়, সরকারী শিক্ষাবিভাগ (১৮৪৭—১৮৮৩)। স্থাপনা—চন্দননগর ও সম্পাদনা—শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার (মাসিক, ১২৭১), এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক, ১৮৫৬)। গ্রন্থ—শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৬), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ১ম (১৮৫৮), ২য় (১৮৫৯), পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৮৬২), ক্ষেত্রতত্ত্ব (১৮৫৯-৬০), রোমের ইতিহাস (১৮১৩), পুষ্পাঞ্জলি, ১ম (১৮৭৬), পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবন্ধ (১৩০১), বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম (১৩০২), ২য় (১৩১১), স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ৩য় (১৩১০। ১ম—রামগতি ন্যায়রত্ন; ২য়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। গ্রন্থ—ভারতীয় স্বাস্থ্য-বিদ্যা, রসজলনিধি, ৪ খণ্ড।

ভূধর চট্টোপাধ্যায়—শাস্ত্রজ্ঞ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, চণ্ডী, মনু, পঞ্চগীতা, বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য, প্রয়াগ-মাহাত্ম্য, মহানির্বাণতন্ত্র, দ্বারকা-মাহাত্ম্য, কলি-মাহাত্ম্য, চৈতন্যচরিতামৃত, ধর্মানুষ্ঠান, পঞ্চযোগ, স্তবমালা, শ্রীমদ্ভাগবত (মূল)। সম্পাদক—চিন্তা (সাপ্তাহিক, ১২৮৬)।

ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—মায়ামুক্তি, অলোকা, ভীমের প্রতিজ্ঞা, দুই ভাই।

ভূপতিনাথ দাস—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—ভারত-সঞ্জীবন (মাসিক, ১২৯৫)।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়—দেশসেবী। বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ। সম্পাদক—বেণু (মাসিক)।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—নৃতত্ত্ববিদ্ ও দেশসেবী। জন্ম—১৮৮০ খৃঃ কলিকাতা গৌরমোহন মুখার্জি লেনে। পিতা—বিশ্বনাথ দত্ত। ইনি স্বনামধন্য স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শিক্ষা—মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন। পাঠ্যাবস্থায় 'যুগান্তর' পত্র প্রকাশ (বারীন্দ্রনাথ ঘোষের সাহায্যে), কারাগারে দণ্ডিত। কারামুক্তির পর আমেরিকায় গমন, তথায় বি-এ (নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১২), এম-এ (রোড্‌স্ আইল্যাণ্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৩), পি-এইচ-ডি (চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়)। জর্মানি গমন (১৯১৪-) ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব-বিদ্যা অধ্যয়ন ও পি-এইচ-ডি (হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়), তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণের (১৯২৪) পর স্বদেশে প্রত্যাগমন। গ্রন্থ—অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, ২ খণ্ড, যুগ-সমস্যা, জাতি-সংগঠন, তরুণের অভিযান, যৌবনের সাধনা, আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা, ২য় খণ্ড।

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। ইনি বহু উপন্যাস, প্রহসন ও নাটক রচনা করেন। গ্রন্থ—ভূতের বিয়ে, গুরুঠাকুর, কেলোর কীর্তি, বেজায় রগড়, বিদ্যাধরী, ফুলশর, কলের পুতুল, কৃতান্তের বঙ্গদর্শন, জোর বরাত, যুগ-মাহাত্ম্য, নারীরাজ্যে, সৎসঙ্গ, উপেক্ষিতা, ক্ষত্রবীর, সাইন অফ দি ক্রশ, সদাগর, পেলারামের স্বদেশিকতা, বাঙ্গালী, সেকেন্দার শাহ, শাঁখের করাত, শঙ্খধ্বনি, দেশের ডাক, রত্নাকর, থিয়েটারের গুপ্তকথা, অভিনয় শিক্ষা, সখের বৌদি, চোর-বাগান, কণ্ঠহার, রণভেরী, শিবশক্তি, ডারবি টিকেট, ব্রহ্মতেজ।

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দীক্ষাগুরুতত্ত্ব, বিবদল, অভ্যাসযোগ, দীনচর্চ্চা, আত্মানুসন্ধান।

ভূরাম, শুভঙ্কর—গণিতশাস্ত্রবিদ্। জন্ম—বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর গ্রামে কায়স্থকুলে। গণিত-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রকাশে 'শুভঙ্কর' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—শুভঙ্করের আর্যা।

ভৈরবচন্দ্র আউচ—গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেয়াং বা আনোয়ারা। গ্রন্থ—ষড়ানন ব্রতকথা বা স্কন্দ-পুরাণোক্ত কার্ত্তিক-ব্রত-উক্ত গুয়া মেলানি (১৮৩৮ খৃঃ)।

ভৈরবচন্দ্র চট্টরাজ—যাত্রাপালা-রচয়িতা। জন্ম—১২৩৭ বঙ্গ চৈত্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়ের গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে। মৃত্যু—১৩১৩ বঙ্গ ২৮এ মাঘ সিউড়ি। পিতা—উদয়নারায়ণ চট্টরাজ। কর্ম—শিক্ষকতা, সিউড়ি বঙ্গবিদ্যালয়, সিউড়ি জেলা-স্কুল। চিকিৎসা-ব্যবসায়। সর্প-দংশনের চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত। বহু সঙ্গীত, যাত্রার পালা রচনা। গ্রন্থ—রাম বনবাস, ভক্ত-বিলাপ, বিজয়বসন্ত, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, মান, মাথর, রুক্মিণীহরণ, শ্রীমন্তের মশান, শুভঙ্করী।

ভৈরবনাথ কাব্যতীর্থ, তর্কবাচস্পতি—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১২৯০ বঙ্গ মেদিনীপুর জেলার এগরাথানার আলিঙ্গিরী গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৩ বঙ্গ। পিতা—ত্রিলোচন ভট্টাচার্য। বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা। গ্রন্থ—পুণ্যকথা, কিশোর-রচনা, ব্যাকরণ-কুসুম, সংস্কৃত কুসুমমালা।

ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীহট্ট। কর্ম—মোক্তারী, হবিগঞ্জ। গ্রন্থ—পদ্মপুরাণ।

ভৈরবচন্দ্র হালদার—যাত্রাপালা-রচয়িতা। জন্ম—হুগলী জেলায় সিঙ্গুর গ্রামে। ইঁহার রচিত পালা গোপাল উড়ে গান করিত। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া বীরসিংহ মল্লিক (মতান্তরে রাধামোহন সরকার) ইঁহার বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল গঠন করেন। মাত্র ৩ দিনের আসরের গানে গোপাল উড়ে (মল্লিকের ভৃত্য) গান আয়ত্ত করিয়া নিজ দল গঠন করেন। যাত্রাপালা—বিদ্যাসুন্দর।

ভৈরব দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উষা-রসার্ণব।

ভৈরব রক্ষিত—কাব্য-রচয়িতা। নামান্তর—রাধাচরণ রক্ষিত। জন্ম—চট্টগ্রামের জোয়ারা গ্রামে কায়স্থকুলে। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞ। আইন-ব্যবসায় (মুন্সেফ) গ্রন্থ—চণ্ডিকা-মঙ্গল-কাব্য।

ভোজরাজ বা ভোজদেব—মালবান্তর্গত ধারানগরের অধিপতি। জন্ম—১০-১১শ শতাব্দীতে ধারানগরে। পিতা—সিন্ধুলরাজ। মাতা—সাবিত্রী। ইনি শৌর্য-বীর্যে, প্রতাপ ও বিদ্যাবত্তায় সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহার স্ত্রী লীলাবতী ও কন্যা ভানুমতী উভয়েই বিদুষী ছিলেন। কথিত আছে, ইনি ইন্দ্রজাল-বিদ্যার উন্নতি করেন। গ্রন্থ—রাজমার্তণ্ড (যোগ), সরস্বতীকণ্ঠাভরণ (অলঙ্কার), আদিত্য-প্রতাপ সিদ্ধান্ত (জ্যো), রাজমৃগাঙ্ক (বৈদ্য), শব্দানুশাসন (ব্যাকরণ), ব্যবহারসমুচ্চয় (ধর্ম)।

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী—কবি ও নাট্যকার। ইনি বহু গীতাভিনয়, প্রহসন, নাটক প্রভৃতি রচনা করেন। গীতাভিনয় গ্রন্থ—কুবলাশ্ব, কালচক্র, পৃথিবী, পঞ্চনদ, আদিশূর, বিদ্যাবলী, জাহ্নবী, নরকাসুর, ধনুর্যজ্ঞ, দাক্ষিণাত্য, কৈকেয়ী, জগদ্ধাত্রী, যজ্ঞাহুতি; প্রহসন—ছিদ্র কলস, প্রাণে প্রাণে; নাটক—বাসুকি।

ভোলানাথ চক্রবর্তী—শিক্ষাব্রতী ও ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক। জন্ম—হাওড়া জেলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর। মেদিনীপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপক (১৮৫৫-১৮৯১ খৃঃ)। মেদিনীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য। গ্রন্থ—সাবিত্রীচরিত কাণ্ড (১৮৬৮), বঙ্গের সেই একদিন আর এই একদিন (১৮৭৬), ভারতের রোগ ও তাহার ঔষধ কি?

ভোলানাথ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। কবিরঞ্জন উপাধিলাভ। গ্রন্থ—সমাজ-রহস্য, শক্তিতত্ত্ব নিরূপণ।

ভোলানাথ চন্দ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮২২ খৃঃ কলিকাতা আহিরীটোলায়। মৃত্যু—১৯১০ খৃঃ। কর্ম—ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, হাওয়ার্ড হার্ডম্যান এণ্ড কোং-তে শিক্ষানবিশী, চিনির কলের এজেন্ট (১৮৪৫)। গ্রন্থ—রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিত, A Voice for the Commerce & Manufactures of India, Travels of Hindoo, ২ খণ্ড।

ভোলানাথ দাস—জীবনী-লেখক। গ্রন্থ—দুর্গাচরণ রক্ষিত।

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নানাবিধ বিলাস (ব্যঙ্গমূলক রচনা—১৮৫৫ খৃঃ)।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আপনার মুখ আপনি দেখ (হুতোমপেঁচার নক্সা প্রকাশিতের পর); সন্ন্যাসী উপাখ্যান (Pernell's Hermit-এর অনুবাদ—১৮৭০)। সম্পাদক—লোকলোচন-চন্দ্রিকা (মাসিক, ১৮৫৭), ভারতবর্ষীয় সভা (মাসিক, ১৮৫৭), বিজ্ঞাপনী (১৮৫৭)।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—কবি ও নাট্যকার। গ্রন্থ—মৈথিলী-মিলন (নাটক)।

ভোলানাথ সুর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সতীত্ব সুধা (গল্প, ১৮৫৫)।

ভোলানাথ সেন—সাহিত্যিক। প্রতিষ্ঠাতা—'রসরাজ' পত্র (১৮৩৮); সম্পাদক—বঙ্গদূত।

মঞ্জুশ্রী দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। স্বামী—অধ্যাপক ক্ষিতীশ-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদিকা—ঘরে বাইরে (মাসিক, ১৩৫৫), জয়া (মাসিক, ১৩৫৬)।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯৫ বঙ্গ ৪ঠা শ্রাবণ। মৃত্যু—১৩৩৫ বঙ্গ ২৩এ ফাল্গুন ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। পিতা—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় (বাগবাজার-নিবাসী)। প্রবেশিকা (ভবানীপুর সাউথ সুবারবন স্কুল)—টাইফয়েড রোগে চক্ষু নষ্ট হওয়ায় পরীক্ষায় অনুপস্থিত)। পরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার চেষ্টা। সিমলায় রাজস্ব-বিভাগে চাকুরী লাভ। কর্মত্যাগ করিয়া কলিকাতা আগমন ও শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা করুণা দেবীর পাণিগ্রহণ। কান্তিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোং-এর তত্ত্বাবধায়ক ও অংশীদার। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনা। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। এতদ্ব্যতীত নৃত্যকলা, অধ্যাত্ম-বিদ্যা (Psychic Research), সম্মোহন-বিদ্যা, লাঠিখেলা, অসি-চালনা প্রভৃতি শিক্ষা। গ্রন্থ—ভূতুড়ে কাণ্ড, জলছবি (১৩২৫), ঝুমঝুমি, জাপানি ফানুস (১৩১৫), ঝাঁপি (১৩১১), মনে মনে (উপ), মোমের ফুল, পাপড়ী, ভারতীয় বিদুষী (১৩১৬), ভাগ্যচক্র, কাযাহীনের কাহিনী, মহুয়া, খেয়ালের খেসারৎ, আলপনা, কল্পকথা, মুক্তার মুক্তি (গীতিনাট্য)। সম্পাদিত গ্রন্থ—কাদম্বরী, বেতালপঞ্চবিংশতি, যু-সঃ—ভারতী (১৩২২-১৩৩০)।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক, নাট্যকার ও কথাশিল্পী। জন্ম—১৮৮৬ খৃঃ অগস্ট (২৪-পরগনার মনিখালি-কৃষ্ণনগরে। স্বদেশী যুগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে শ্রীঅরবিন্দ-প্রবর্তিত জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ছাত্রজীবন হইতেই সাহিত্যচর্চা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে কর্ম। কাশীধামে স্থায়ী ভাবে বাস (১৯১৬) এবং তথায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ 'প্রবাসজ্যোতি' পত্রিকা প্রকাশ। পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৯৩২) ও সাহিত্য-সেবায় ব্রতী ও সাময়িক পত্রে কর্ম। বহু নাটক ও উপন্যাস রচনা। গ্রন্থ—বঙ্গে অরাজকতা (ইতিহাস, ছাত্রজীবনে রচনা), রুশ-জাপানের যুদ্ধ (ঐ), বারানসী, জাহাঙ্গীর, স্বয়ংসিদ্ধা, গোটামানুষ, কুমারী-সংসদ, ভুলের মাশুল, দুঃখের পাঁচালী, অদৃষ্টের ইতিহাস, মরু মাঝে

বারিধারা, ইনটেলিজেন্ট, হুইপ, পথে বাঘ, কে ও কী, যুগের যাত্রী, শ্রীমতী মুক্তি, আত্মসমর্পণ, অপরিচিতা, হিংসা ও অহিংসা, মুক্তিমণ্ডপ, অজানা-অতিথি, অবশেষে, দরিদ্রের দ'বী, নতুন বৌ, বাঙলা ও বাঙালী, পথের পরিচয়, নারীর রূপ, অপরাজিতা, মহাজাতি সংঘ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১৩৫৯)। নাটক—বাজীরাও (প্রথম নাটক, ১১১১), মাধবরাও, ব্রত-উদ্‌যাপন, মহামানব, অন্নপূর্ণা, বাসুদেব, ঝাঁসীর রাণী। গল্পদাদুরূপে ছোটদের সাহিত্য—ছোট থেকে বড়, মন্দ থেকে ভাল, গল্পদাদুর আসর, নির্বাসিতা রাজকন্যা, রূপকুমার, তোমাদের সুভাষ, বাংলা মায়ের শহীদ ছেলে, গল্পে ভারতীয় কংগ্রেস, মহাভারতের কথা, বাংলার দুলাল, রামধনু, বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশ দত্তের উপন্যাস সমূহ (শিশু সং)। সম্পাদক—রঙ্গমঞ্চ (১১১০), সাপ্তাহিক বসুমতী (১১৩২), সহ-সম্পাদক—দৈনিক চন্দ্রিকা (১১০৭), বসুমতী (১১০৮), নাট্যমন্দির, প্রবাসজ্যোতি (কাশীধাম)।

মণীন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রূপকাহিনী। অমর মরণ, রক্তরাঙা দিনে।

মণীন্দ্রনাথ নায়েক—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। বি-এস-সি। গ্রন্থ—অরবিন্দ মন্দিরে।

মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮৩ বঙ্গ ২৭এ মাঘ মেদিনীপুর জেলার কশাড়িয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫০ বঙ্গ ২২এ অগ্রহায়ণ। পিতা—পুরন্দর মণ্ডল। গ্রন্থ—বন্দে মাতরম্ লীলা (১১০৫), আর্য পৌণ্ড্রক (১৩১৭), বঙ্গীয় জনসংঘ (১৩৩০), আরতি (১৩৩১), বঙ্গে দিগিন্দ্রনারায়ণ (১৩৩৩), প্রায়শ্চিত্ত (১৩৩৫), ভবঘুরে (১৩৩৬), পল্লীকবি রসিকচন্দ্র (১৩৩৬)।

মণীন্দ্রমোহন বসু—শিক্ষাব্রতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথির রক্ষক। অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ইনি বাংলা সাহিত্যের বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। গ্রন্থ—দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম (১৩৩৫), ২য় (১৩৩৮), কৃষ্ণাচার্যের চর্যাপদ (সটীক), Post Chaitanya Sahitya Cult (১১৩০), The Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts ১ম (১১২৬), ২য় (১১২৮), ৩য় (১১৩০)।

মণীন্দ্রলাল বসু—সাহিত্যিক। ইনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—রমলা, মায়াপুরী, রক্তকমল, সোনার হরিণ, অজয়কুমার।

মণ্ডন মিশ্র—পূর্বমীমাংসক। জন্ম—৭-৮ ম শতাব্দী। নামান্তর—বিশ্বরূপ (উম্বেক)। ইনি কুমারিলের শিষ্য ও ভগিনীপতি। ইঁহার স্ত্রীর নাম—সরসবাণী বা ভারতী। ইনি শঙ্করাচার্যের নিকট পরাজিত হইয়া (এই বিচারে ভারতী দেবী মধ্যস্থা ছিলেন) সন্ন্যাসগ্রহণ ও সুরেশ্বরাচার্য্য নাম গ্রহণ। ইনি শৃঙ্গগিরি মঠের মঠাধীশ। গ্রন্থ—মণ্ডনকারিকা, ভাবনাবিবেক, বৃহদারণ্যকাদিবার্ত্তিক, নৈষ্কর্ম সিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি।

মতিলাল চট্টোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সর্বশুভকরী পত্রিকা (মাসিক, ১৮৫০ অগস্ট—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক প্রকাশিত)।

মতিলাল ঘোষ—সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—১২৫২ বঙ্গ যশোহর জেলার অমৃতবাজার গ্রামে। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গ। ভ্রাতা শিশিরকুমার ঘোষের সহযোগে নিজ গ্রামে বাংলায় অমৃতবাজার পত্রিকা (সাপ্তাহিক) প্রকাশ (১২৭৫ বঙ্গ)। অতঃপর কলিকাতায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ (১৮৬২ খৃঃ)। ইনি রাজনীতিজ্ঞ ও তেজস্বী ছিলেন। সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা।

মতিলাল ঘোষ—গীতিনাট্যকার। ইঁহার রচিত বহু পালা গীতাভিনয় হয়। গ্রন্থ—অভিমন্যুবধ, লক্ষ্মণবর্জন, পরশুরাম, প্রভাসমিলন।

মতিলাল চন্দ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভৈষজ্যসারসংগ্রহ (১৮৭৫)।

মতিলাল দাশ—গ্রন্থকার। এম. এ. বি. এল। সরকারী কর্মচারী। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কর্ম। বহু সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—বিরহশতক, দীপশিখা, চার্বাক, চিরন্তনী।

মতিলাল বসু—সাহিত্যিক। নোগাঁ-প্রবাসী বাঙালী আইনজীবী। সম্পাদক—সম্মিলন (সাপ্তাহিক, ১১১০)।

মতিলাল বসু—সাহিত্যিক। পিতা—নাট্যকার মনোমোহন বসু। ইনি বোসেস্ সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক—গান ও গল্প (পাক্ষিক, ১২৯৪)।

মতিলাল বিশ্বাস—গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলায় আমলাগুড়া গ্রামে। গ্রন্থ—বকদ্বীপ (ইতিহাস)।

মতিলাল মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাঙ্গালা পাঠ, অভিধান (১৮৫৫)।

মতিলাল রায়—কবি ও যাত্রাপালা-রচয়িতা। জন্ম—১২৪১ বঙ্গ বর্ধমান জেলায় ভাতশালা গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৫ বঙ্গ। পিতা—মনোহর রায়। শিক্ষা—গ্রাম্য বিদ্যালয়, নবদ্বীপ মিশন স্কুল, প্রবেশিকায় অকৃতকার্য (বারাসাত স্কুল)। কর্ম—জোড়াসাঁকো পুলিশ অফিস, চক বামুনগড়ের স্কুলের শিক্ষক, জেনারেল পোষ্ট অফিস। বাল্যকাল হইতেই কবিতা ও নাটক রচনা। 'প্রভাকর' পত্রের লেখক। নবদ্বীপে যাত্রার দল গঠন ও খ্যাতিলাভ। 'কবিরত্ন' (নবদ্বীপ হইতে), 'কাব্যকণ্ঠ' (ভাটপাড়া হইতে) উপাধিলাভ। গ্রন্থ—তরণীসেন বধ (১২৭৮), রামবনবাস, কালীয়দমন, ভরতমিলন, মহালীলা, সীতাহরণ, ভীষ্মের শরশয্যা, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, সীতা অন্বেষণ, ভরত আগমন, ব্রজলীলা, জগন্নাথ বা ক্ষেত্রধাম মাহাত্ম্য, রামপরিণয়, নূতন সুবচনী মাহাত্ম্য, পাণ্ডবনির্বাসন, লক্ষ্মণবর্জন, কর্ণবধ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ, রামরাজা, বিজয়চণ্ডী, চিন্তার চিন্তামণিলাভ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

মতিলাল রায়—সংগঠক ও সেবাব্রতী। জন্ম—১২৮৯ বঙ্গ ২২এ পৌষ ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর গ্রামে। পিতা—বিহারীলাল রায়। ইঁহারা চৌহান-বংশীয় ক্ষেত্রী রাজপুত। শিক্ষা—কলিকাতা ফ্রী চার্চ ইনস্টিটিউসন। কিশোর বয়স হইতেই ছোট ছোট ব্যবসায় ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ। সওদাগর অফিসে চাকুরী, এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় চাকুরী ত্যাগ (১১০৮) ও ব্যবসায় বৃত্তি অবলম্বন। বাল্যকাল হইতে বাঙলা ভাষা পাঠের প্রবৃত্তি আন্তরিক হওয়ায় জ্ঞান-স্পৃহা প্রবল হয়। ইনি সস্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্য লাভ (১১১০), 'প্রবর্ত'ক' পাক্ষিক পত্র প্রকাশ (১১১৪)। প্রতিষ্ঠা—সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায় (চন্দননগর), যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যামন্দির (১১২৩), প্রবর্ত'ক বিদ্যার্থিভবন (১১২১), প্রবর্ত'ক-সঙ্ঘ। রাজনৈতিক সংস্রবের ফলে বহু নির্যাতন ভোগ। অধ্যাত্মজীবনের ধর্ম, সেবা ও সংগঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ।

গ্রন্থ—ভারতলক্ষ্মী, সাধনা, আত্মসমর্পণযোগ, ভারতীর মন্দিরে চণ্ডীদাস, শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন, যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, নারীমঙ্গল, স্বদেশীযুগের স্মৃতি, ভারতীয় সঙ্ঘতত্ত্ব, উদ্বোধন, যুগবার্ত্তা, যৌগিক সাধনা, কর্ম্মের ধারা, লীলা, কানাইলাল, ব্রহ্মচর্য্য, অনশনে মহাত্মা, হিন্দুত্বের পুনরুত্থান, নারদীয় ভক্তিসূত্র, যুক্তবেণী, মুক্তিমন্ত্র, পতিব্রতা, যুগান্তর, জীবন-সঙ্গিনী, শতবর্ষের বাঙ্গালা, সতীহারা, Temple of Inspiration, Life's Partner. সম্পাদক—প্রবর্ত্তক (মাসিক)।

মথুরানাথ (দাস) গুহ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—দুর্জ্জয়-দমন-মহানবমী (পাক্ষিক, ১২৫৪ বঙ্গ। পরে মাসিক। ইহা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ও খৃষ্টানদের উপর আক্রোশ মিটাইবার জন্য প্রকাশিত হয়)।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৬শ শতাব্দী। পিতা—রাম তর্কবাগীশ। ইনি রঘুনাথ শিরোমণির শিষ্য। গ্রন্থ—দীধিতিটীকা মাথুরী, অর্থাপত্তিরহস্য, পক্ষতারহস্য, বিধিবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, শক্তিবাদরহস্য, শব্দরহস্য।

মথুরানাথ তর্কভূষণ—পণ্ডিত ও সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সুধাকর (সাপ্তাহিক, ১৮৬১)।

মথুরানাথ তর্করত্ন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কবিতামঞ্জরী (১৮৭৩), শব্দসন্দর্ভসিন্ধু ২ ভাগ (১৮৬৯), জীবন-বৃত্তান্ত (১৮৬৩)।

মথুরানাথ দত্ত—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—কলিকাতা পত্রিকা (মাসিক, ১৮৫৮, অগষ্ট)।

মথুরানাথ বর্মা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সংক্ষিপ্ত ভারত ইতিহাস (১৮৬১), The Mammalia (ঐ)। সম্পাদক—আর্যবোধক (মাসিক, ১২৭৯)।

মথুরামোহন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাক্যবিন্যাস (১৮৫৫)।

মথুরামোহন দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ (১৮১৯)।

মথুরামোহন বড়ুয়া—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলায় গৌহাটি। ভিক্টোরিয়া প্রেস স্থাপন। সম্পাদক—অসামবন্তি (দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক, ১৯০১), Advocate of Assam (সাপ্তাহিক, ১৯০৫—১৯১২)।

মদনগোপাল গোস্বামী—বৈষ্ণবগ্রন্থ অনুবাদক। জন্ম—শান্তিপুর। মৃত্যু—১৩০৯ বঙ্গ। ইনি ভাগবত-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। অনুবাদ-গ্রন্থ—লঘুভাগবতামৃত। সম্পাদিত গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মদন চান্দ—কবি। গ্রন্থ—শ্রীরাধিকার কলঙ্ক উদ্ধার।

মদন দত্ত—পাঁচালীকার। গ্রন্থ—মঙ্গলচণ্ডিকা।

মদন বর্মা—গীতিনাট্যকার। ইনি গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সঙ্গীতাচার্য। গীতিনাট্য—সতী কি কলঙ্কিনী (১৮৭৩ খৃঃ)।

মদন মাষ্টার—যাত্রাপালা-রচয়িতা। পূর্ণ নাম—মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় (বা বন্দ্যোপাধ্যায়?)। জন্ম—১২১১ বঙ্গ। মৃত্যু—১২৬৫ বঙ্গ। ফরাসডাঙ্গা ও পরে চুঁচুড়ায় শিক্ষকতা—এই নিমিত্ত মদন মাষ্টার বলিয়া পরিচিত। শিক্ষকতা করিবার সময় যাত্রার পালা রচনা—কর্মত্যাগ করিয়া ফরাসডাঙ্গায় যাত্রার দল গঠন ও প্রতিষ্ঠা লাভ। ইহার মৃত্যুর পর ইহার পুত্রবধূ দল পরিচালনা করেন—তখন উহা 'বৌ মাষ্টারের দল' নামে পরিচিত হয়। গ্রন্থ—দক্ষযজ্ঞ, সীতা-অন্বেষণ, প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, দুর্গামঙ্গল, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, রামবনবাস, হরিশ্চন্দ্র।

মদনমোহন গোস্বামী—সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—শান্তিপুর। মৃত্যু—১৩০৮ বঙ্গ (আনু)। অন্যতম সম্পাদক—পরিদর্শক (বাংলার প্রথম দৈনিকপত্র—১২৬৭ বঙ্গ বৈশাখ—১২৬৯ বঙ্গ মাঘ)।

মদনমোহন চৌধুরী—কবি। নিবাস—পুরুলিয়া। বি এল। গ্রন্থ—তুলসীদাসের রামায়ণের পদ্যানুবাদ।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—১২২২ বঙ্গ নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে। মৃত্যু—১২৬৪ বঙ্গ ফাল্গুন মুর্শিদাবাদে। পিতা—রামধন চট্টোপাধ্যায়। কর্ম—শিক্ষকতা, প্রথম পণ্ডিত, বারাসাত গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়, পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮৪৩-৪৫), কৃষ্ণনগর কলেজ (১৮৪৬), সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৮৪৬-৫০), জজ-পণ্ডিত, মুর্শিদাবাদ (১৮৫০), ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কান্দী। প্রতিষ্ঠাতা—সংস্কৃত যন্ত্র (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ)। পরিচালক—(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ)—সর্বশুভকরী (সংবাদপত্র)। ইনি সমাজ-সংস্কারক। গ্রন্থ—রসতরঙ্গিণী (১৮৩৪), বাসবদত্তা (১৮৩৬), শিশু-শিক্ষা (১—৩য় ১৮৪৯)। সম্পাদিত গ্রন্থ—খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্ (১৯০৫ সং), কবিকল্পদ্রুমঃ (ঐ), অনুমান-চিন্তামণিদীধিতি (ঐ), বৈয়াকরণভূষণসারঃ (১৯০৬ সং) আত্মতত্ত্ববিবেকঃ (ঐ), দশকুমারচরিতম্ (ঐ), কাদম্বরী (ঐ), মেঘদূতম্ (১৯০৭ সং), কুমারসম্ভবম্ (ঐ)।

মদনমোহন মিত্র—সংবাদপত্রসেবী। গ্রন্থ—পদ্যসোপান (১৮৭৪)। সম্পাদক—হালিশহর পত্রিকা (মাসিক, ১৮৭০ খৃঃ হালিশহর হইতে, পর বৎসর পাক্ষিক, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সাপ্তাহিক ইংরেজি ও বাংলা); আদর্শ (মাসিক, ১২৮৩)।

মদন রায়চৌধুরী—অনুবাদক। অনুবাদ গ্রন্থ—গোবিন্দ-লীলামৃত।

মদনানন্দ—কবি। গ্রন্থ—কলঙ্কভঞ্জন।

মধুকণ্ঠ দ্বিজ—পদকর্তা। গ্রন্থ—জগন্নাথমঙ্গল।

মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—রহস্যপাঁচালী, প্রবাদ-পদ্মিনী, ৩ খণ্ড, হেমোপাখ্যান।

মধুসূদন কিন্নর (কাণ)—পালারচয়িতা। জন্ম—১২২৫ বঙ্গ যশোহর জেলায় বনগ্রাম মহকুমায় সার্সা থানার উলুসিয়াই গ্রামে। নট জাতি। মৃত্যু—১২৭৫ বঙ্গ কৃষ্ণনগরে। পিতা—আনন্দ কাণ। জাতীয় ব্যবসায়—নৃত্যগীত। ইনি অল্প বয়সে সঙ্গীত রচনা, ঢপ-সঙ্গীত প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করেন। পালা—মান, মাথুর, অক্রুর-সংবাদ, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, কলঙ্কভঞ্জন।

মধুসূদন গুপ্ত—শিক্ষাব্রতী চিকিৎসক। অধ্যাপক, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ। গ্রন্থ—ভেষজ-বিধান (১৮৩৬ খৃঃ)।

মধুসূদন গোস্বামী—হিন্দী গ্রন্থকার। বৃন্দাবন-নিবাসী। গ্রন্থ—অশ্ববিদ্যা (হিন্দী), বাসন্তিক কুসুম (ঐ)।

মধুসূদন চন্দ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—একবার পড়িয়া দেখ (ঢাকা, ১৮৬৩)।

[ক্রমশঃ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

ছাড়া পেয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছিলো মিত্রা। দাঁড়িয়েছিলো এসে বড় বারান্দায়—অঘ্রাণের শীতেও ঘামে-ভেজা শরীর নিয়ে। অসমছন্দ নিশ্বাসে কাঁপছিলো বুক। ক্লান্ত ঘুমে বারান্দার এ-কোণে সে-কোণে ঘুমিয়ে আছে জড়ানো কলাপাতার পুলিন্দায় মাথা রেখে ঝি-চাকরেরা। কুকুরটা শুয়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে আঙিনায়। মানুষের সাড়া পেয়ে এগিয়ে আসছিলো থাবা বাড়িয়ে। মিত্রার দিকে চেয়ে চোখের শিকারী দৃষ্টি, পায়ের উদ্যত থাবা বুজে গিয়েছিলো ওর। মিত্রার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে চলেছিলো লেজ নেড়ে।··· অন্ধকার রাত। বাড়ীটার চার দিক ঘিরে আছে ঘন অন্ধকারে। শুধু উৎসব-বাড়ীর এখানে-সেখানের দু'-একটা বাতিতে ভেতরটাতে মানুষ-চেনা অস্পষ্ট আলো।

বেরিয়ে এসে অভ্যাসবশে পা বাড়িয়েছিলো মায়ের ঘরের দিকে··· কিন্তু থেমে গেল মিত্রা। না, ও-ঘরে নয়।

চলে আসছে—প্রশ্ন হলো, 'কে—?'

অসহায় ভাবে ঘুরে দাঁড়ালো মিত্রা। ভাঙ্গা কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব সহজ করে বললো, 'আমি মা।'

এগিয়ে এলেন মা।

'উঠে এসেছিস রে, কিছু চাই?'

'হ্যাঁ'—একটু ঢোক গিলে বললে মিত্রা, 'জল খাবো মা।'

সুমিত্রা মেয়েকে ঘরে এনে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে গ্লাসটা তার হাতে তুলে দেন।

'গণ্ডগোলে হৈ-হাঙ্গামায় ভুল হয়ে গেছে। তোমাদের ঘরে জল রাখা উচিত ছিল। এক গ্লাস নিয়ে যাও, যদি জামায়ের দরকার হয়'—তার পর কাছে এসে একটু হেসে সঙ্কোচ কাটিয়ে জানতে চান, 'আলাপ হলো? বেশ ছেলেটি—নয়?'

ঘাড় কাত করে মুখে সমর্থনের সলজ্জ হাসি টেনে আনলো মিত্রা। হ্যাঁ, অভিনয়—অভিনয়ই করলো ও। লজ্জার অভিনয়।

মা দাঁড়িয়ে।

এক-পা দু'-পা করে আবার ফিরে এসেছিলো ঘরে মিত্রা···

আশ্চর্য্য! এক রাত্রির ভিতর পা দুলিয়ে গল্প করা 'লজেন্স'-চোষা মেয়ে যেন পেকে বুড়িয়ে গেল। গ্রীষ্মের এক রাতে সবুজ রংএর কলা যেমন হলদে হয়ে পেকে ওঠে।

···ভাবছে—খালি ভাবছে, মা'র মনের শান্তি, স্বস্তি বজায় রাখতেই হবে। একটি সন্দেহের আঁচড়ও তাতে যেন না পড়ে। নইলে, সাধ্য ছিলো কার, নীলাকান্তর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ওকে অন্যত্র বওনা করে দিতে পারে।

মা, দিদিমা, মামীমা আকুল হয়ে কেঁদে বুকে জড়িয়ে রইলেন। চুমু খেলেন। মাথায় হাত বুলোলেন। ও রইলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। মোম-প্রতিমা নয়,—শক্ত মোমের দলা। দেখা করলো সবার সঙ্গে। মামীমাকে রাগত ভঙ্গীতে অভিমান জানালো,—'গায়ত্রী এলো না এখনও? তোমরা যেন কি! কেন দিলে ওকে আজ স্কুলে যেতে? পরীক্ষা ছিলো তো বয়েই গেছে।'

মামীমা কুণ্ঠিত স্বরে জবাব দেন, 'প্রথম হচ্ছে ক্লাসে। না গেলে—।' তার পর একটু হেসে বলেন, 'কেন, তোমার মনে নেই—নিজে কি কুরুক্ষেত্র বাধাতে পরীক্ষা দিতে মানা করলে? ছুটতে—অসুখ নিয়ে পর্য্যন্ত! আসবে এক্ষুনি।···ওই কি শাস্তিতে দিচ্ছে পরীক্ষা!'

তখনি প্রায় ছুটতে-ছুটতে এসে হাজির হলো গায়ত্রী। কাঁধ থেকে বইএর বোঝা মাটিতে ফেলে, এসে প্রায় জড়িয়ে ধরলো মিত্রাকে। দ্রুত আসার ফলে গাল দুটো লাল আর গরম হয়ে কাঁপছে···

মিত্রা দু'-বোনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ 'আসছি' বলে গিয়ে ঢুকলো বড় মামা বিমলের ঘরে।

বসেছিল বিমল স্তব্ধ হয়ে।

মিত্রার ভিতরের সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারলো না সে। সাধ ছিলো। হলো না। কেন হলো না? বিমল নিজে যদি বেঁকে দাঁড়াতো কার সাধ্য ছিল মিত্রার বিয়ে দেয়!···কিন্তু, ছিলো কি সেই বেঁকে দাঁড়াবার মনোবল? ছিলো না।

চতুর্দিকে মৃত্যু আর হতাশা।···বাবা চলে গেলেন। চলে গেলো ছোট ভাই। বোনের ভিতর দেখা দিলো মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ··· মনে চেপে বসলো বৈরাগ্য।···মানুষের হাত কতটুকু? যা ঘটবার নিজ গতিতেই তা একটার পর একটা ঘটে চলেছে। বিমল কি পেরেছে কোন ঘটনাকে নিজ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে বাঁধতে? তবে আর বৃথা চেষ্টা কেন?···হয়তো মিত্রা সুখীই হবে! আট বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিলো মায়ের। তিরিশ বছরের উপর তাঁরা দাম্পত্য-জীবন উপভোগ করে গেছেন নিবিড় বন্ধনে।···কুড়িতে বিয়ে হয়েছিলো সুমিত্রার···সুখ উঁকিটুকু দিয়েও তো দেখে গেলো না ওকে! তবে—? অ-দৃষ্ট! অর্থাৎ সবই না-দেখা আর না-বোঝার পালা। তবে আর বৃথা আকুলতা আর অস্থিরতা প্রকাশে লাভ?

কিন্তু আজ নেই মনের সেই নির্বিকার বৈরাগ্য ভাব। শেষ নেই নিজের উপর ক্ষোভ-বিরক্তির।···উপযুক্ত পাত্র। এই-চোখে-দেখা বিচারের উপযুক্ততা একটা জীবনের পক্ষে কতটুকু? আজ কেন নীলাকান্তের সঙ্গে আলাপ করে তার মন বলছে—মিত্রার সুখের বাতি নিবে গেল! কেন মনে হচ্ছে দু'জনের আনন্দ-সুখের চিন্তাধারা ভবিষ্যৎ জীবনে কোন দিনও এক খাতে বইবে না!···চশমার পুরু কাচটা কোঁচার খুঁটে মুছতে-মুছতে মিত্রার মাথায় হাত বুলিয়ে চলে বিমল।

মিত্রা কাঁদছিল।

'দাদু থাকলে কখনও তিনি এ হতে দিতেন না'—ফুঁপিয়ে ওঠে মিত্রা।···কত দিন দাদু বলেছেন—বিয়ে-টিয়ের কথা, মনের ধারে-কাছেও ঘেঁসতে দিও না রাজকুমারী মিত্রা। রূপে কন্দর্প আর ধনে ধনপতি হলেই রাজকুমার বলে ঘরে ডেকে এনে হাতে তুলে দেবো—এমন সুবিবেচ দাদু কিন্তু আমি নই। নিশ্চিত

মনে পড়া-শোনাটি করে চলো বড় মামাকে খুসী রেখে। বিমলের ঐ গুণটি চুরি করতে পারলে নজরানা মিলবে।···আর তোমরা এ কি করলে বড় মামা···?'

'বাবা বলতেন এ সব কথা! কই, আমায় বলিসনি তো এর আগে?'

'তুমি জানতে না দাদুর মত?' বিস্ময় প্রকাশ করে মিত্রা। 'নাই বা জানলে তাঁরটা। তোমার নিজের কি কোন মতামত ছিলো না?···মা'র বুদ্ধি সুস্থ নয়। দিদিমা বুড়ো মানুষ। আমার কথা তো ওঠেই না। তুমি কেন বাধা দিলে না' —ক্ষুব্ধ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মিত্রা।···'আমার ভালো একবারও ভাবলে না?'

'তোর ভালো ভাবিনি! বলিস কি!···আমার বিবেচনায় ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু শুভেচ্ছায় ফাঁকি ছিলো না।' একটু চুপ করে থেকে বললে, 'যে ভাবে আজ এসে জবাব চাইছো, কই এর আগে একবারও এ প্রশ্ন নিয়ে ছুটে আসনি তো? তাহ'লে হয়তো আমি—' আবার একটু থেমে বড় একটা নিশ্বাস টেনে বললো বিমল—'না, সে-সবও কিছু নয় রে মিতু—বৃথা দোষ দেওয়া। যা হবার তা এমনি ভাবেই হয়ে চলে।'

মিত্রা চুপ করে থাকে। সত্যি, সে তো এমন জোর অমত নিয়ে একবারও এসে বলেনি—বিয়ে বন্ধ করো মামা।···মনের কোণে ছিলো রূপকথার রাজপুত্রের মোহ। ছিলো আকর্ষণ। ছিলো না তো ভয়!

সে জানতো, ছবির চেহারা আর সুন্দর কান্তি নিয়ে আসবে বর। নিজ হাতে তুলে নেবে ওর হাত। বসে গল্প করবে কখনো নিজে, কখনো শুনবে ওর কোলে মাথা রেখে। বেল ফুলের মালা জড়িয়ে দেবে খোঁপায়। রজনীগন্ধার গুচ্ছ তুলে দেবে হাতে। পরীর মত আনন্দে পাখনা মেলে ঘুরে বেড়াবে দু'জনে—স্বর্গের নন্দনকাননে না হোক, মর্তের সমুদ্রপারে···পাহাড়ী ঝর্ণা আর জলপ্রপাতের ধারে-ধারে। চাঁদের আলো দূর করবে ওদের রাতের আঁধারের ভয়···

রূপকথার কল্পনাই তো ছিলো। আপত্তি করবে কেন মিত্রা? কেনই বা মনে করিয়ে দেবে দাদুর কথা? ওরই কি ছিলো নাকি মনে?···

তাড়া নিয়ে ঘরে এলো সুমিত্রা।

'সবাই তোমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। মঙ্গল-সময় বয়ে যাচ্ছে বর-কনে রওনা হবার। ওদের পুরুত ঠাকুর তাড়াতাড়ি করছেন। তোমরা দুটিতে করছো কি এখানে?' চাইলেন মেয়ের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে।

মিত্রা ঝলকে হেসে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'বলছিলাম মামাকে, দেও দেখি দু'খানা বই। কি আশ্চর্য্য, মনেই ছিলো না কত বই পেয়েছি। চলো—যাই।'

প্রচলিত অনুষ্ঠান-শেষে গুরুজনদের প্রণাম, ছোটদের কাছে বিদায় নিয়ে, নীলাকান্তের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে উঠে বসলো মিত্রা গাড়ীতে। বাজলো সানাই, শঙ্খ, উঠলো উলুধ্বনি।

সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে মুছে চলেছে চোখের জল। গায়ত্রী দাঁড়িয়ে আছে—কনভেন্ট স্কুলের সাদা জামার উপর ঘন-নীল স্কার্ট পরে। মাথার লাল ফিতেটা উড়ছে বাতাসে···'ডেনজার সিগন্যাল'—বিপদ-সংকেত কি?

পাশে দাঁড়িয়ে গীতা। সবে মাত্র দু'জনে কলেজে পড়ার স্বপ্ন গড়ছিলো। 'কলেজ' শব্দটা মনে হতেই বুকটা উঠলো কান্নায় মোচড় দিয়ে। নিজেকে শান্ত করলো মিত্রা অনেক কষ্টে।···দু'-বোন চোখের জলে ভাসছে।

গাড়ী ছুটে চললো।

হারিয়ে গেলো মা, বোন, দিদিমা, মামারা···আর দেখা যায় না কারোকে। এবার ছাড়িয়ে গেলো ওদের বাড়ীটাকেও···এ-বাড়ী সে-বাড়ী করে চললো পাড়া ছাড়িয়ে। পড়লো অন্য পথে—আর চেনে না ও। কান্নায় কেঁপে উঠলো মিত্রা!

···আছে না কি এক রকম যন্ত্র···মিত্রা শুনেছে, যাতে জীবন্ত হাঁস-মুরগী এক দিক দিয়ে ভরে দিলে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে চপ-কাটলেট হয়ে! মিত্রার মনে হয়, ওকে যেন আজ ঠিক তেমনি একটা যন্ত্রের ভেতর ধরে ঠেসে দিল সবাই।···

'বোসো বেশ ভালো করে গুছিয়ে গদিতে হেলান দিয়ে। অনেকটা পথ শ্যামবাজার। অমন গুটিসুটি মেরে বসে থাকলে কষ্ট হবে।' বললে নীলাকান্ত। বাচ্চাদের টেনে কাছে নিয়ে সহজ ভাবে বসবার স্থান করে দেয় সে মিত্রাকে।

একটা গাড়ীতে পিছনের দিকে আছে ওরা দু'জনে আর দুটি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে। সামনে আছে দু'জন। কে, মিত্রা পরিচয় জানে না।

মিত্রা সামান্য নড়ে-চড়ে বসলো ঠিক হয়ে।···ইট-সিমেন্টের দালান আর দালান। সবুজের চিহ্ন নেই···নেই কোন কোমলতা। শুধু সন্ধ্যার নরম স্পর্শ আর ধীর বাতাস যা সামান্য মধুরতা এনে দিচ্ছে।

···উঃ, গীতার মাথার ফিতের লালটা কি অসম্ভব টুকটুকে! আর বাতাসে উড়ছিলো যেন সাপের জিব।···কেমন আঁটসাট ঘননীল স্কার্ট পড়ে দাঁড়িয়েছিলো দু'জনে। যেন বাচ্চা মেয়ে! আর ও? ওর মাথায় একমাথা সিঁদুর! হাতে ডজন-ডজন চুড়ি, বালা, শাঁখা। গলায় হারের লহর। পরনে বারো হাতি বেনারসী। জবরজঙ্গ পোষাকে বসে আছে—জবুথবু জড় পদার্থ-বিশেষ!···এ কোথায় চলেছে সে?···গীতা-গায়ত্রীর বর্তমান চলছে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিতে। আর ওর সে প্রস্তুতির জন্য সময় দেওয়া সম্ভব হলো না কেন? কিন্তু মায়ের কথা মনে হতেই ওর এ-চিন্তায় ছেদ পড়ে। এ ঘটনার অনিবার্য্য কারণটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে মিত্রার চোখে।

পুরোনো দিনের বিরাট এক পরিবারের বধূ হয়ে নামছিলো এসে ছোট্ট মেয়ে মিত্রা।

বাড়ীটাতে কত লোক, কতখানা ঘর, কত জনই বা দাস-দাসী—বহু দিনই কেটে গেছে ওর দিশে করে উঠতে। বাড়ী নয় যেন গোলকধাঁধা। একবার দু'-তিন পাক এদিক-ওদিক করলে নিজের ঘর চিনে যাওয়াও দুঃসাধ্য ঠেকে।

তবে একান্নবর্তী পরিবারের বর্তমান একতাটা যে ঐ শুধু দু'বারের অন্নতেই এসে ঠেকেছে মিত্রা অল্প দিনেই সেটা ধরতে পারে। নইলে যার-যার সখ-আহ্লাদ সব ভিন্ন। ঘরে-ঘরে ইলেক্ট্রিক 'স্টোভ' আছে, আছে 'ফ্রীজ';—আনো, রাখো, খাও, রান্না করো, নিজ

খুসীমত। তবু অশান্তি লেগে আছে বৈ কি! কার ঘরে লোক এসে দু'দিন খেলো, রইলো কার মেয়ে বাপের ঘরে বেশী দিন,—কথা হয়। হবেই তো। ভাতের খরচটা যে সবার পকেটের। এ ছাড়াও আছে কত প্রকারের হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ, বিসংবাদ। পড়শীদের দুঃখে-সুখে সহানুভূতির যে সাড়াটুকু মেলে, এরা হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের মধ্যে সেই সমবেদনার ভাবটি পর্য্যন্ত। তবে 'একান্ন'র সুবিধার দিকও আছে। অন্তত: উপহারের পাটটা সবার নামে অর্থাৎ রায়-বাড়ীর নামে একটাতেই কাজ সারা যায়। এই দুর্দিনের বাজারে এটাও কম কথা নয়। কুড়ি টাকার একখানা শাড়ীর সবটা আর চার ভাগের এক ভাগ অনেক তফাৎ নিশ্চয়ই।

বর্ত্তমানের হাওয়া এসে এই সংসারের পালেও নানা ভাবে দোলা তুলেছে। এসেছে আশ্রিত-পালনে তাচ্ছিল্য। অসময়ের অতিথিতে বিরক্তি। আজকের যুগের ফাঁক আর ফাঁকিতে ভরে উঠেছে এদের আতিথেয়তা আর শরণাগত-পোষণ। বছর-ভরা অজস্র শাড়ী-কাপড়ের সম্ভারে ভরে ওঠে যার-যার ঘরের আয়নাওলা গদরেজের দু'-তিনটে আলমারী,—কাশীর বেনারসী, মাদ্রাজের বাঙ্গালোর সিল্ক, বিষ্ণুপুরের তাঁতের শাড়ী, ঢাকার ঢাকাই। সব দেশ এসে এক হয়ে গায়ে-গায়ে মিশে থাকে ঐ আলমারীতে। কিন্তু পূজো-পার্বণে? সব থাকে হাত গুটিয়ে। কিনতে গেলে এ-সময় সবাইকে দিতে হয়। আগের নিয়ম বর্ত্তমান কর্ত্তারা তুলে দিয়েছেন। বিয়ে, বৌভাত ইত্যাদি উৎসবে খাও, ফেলাও, ছড়াও নিজেরা আর নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। তাছাড়া আর নেমন্তন্নের পাট? বাদামভাজা, ডালমুট, সরবত। পিপাসা লাগলে ট্রে-হাতে ঘূর্ণায়মান তকমা-আঁটা বাবুর্চির হাত থেকে তুলে না নেও, কেউ জিজ্ঞাসা করতে আসছে না।···কোনটায় আইনের বাধা, কোনটা বাজার মন্দা—আসলে সবই এক—ফাঁকের ফাঁকি খোঁজা। মন নেই, মানুষও বুঝি নেই—আছে শুধু স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব জগৎ!

বাড়ীটার অন্তর্জগতের এই চেহারাটুকু জেনে অবধি মিত্রা সংসার সম্বন্ধে মুখ ঘুরিয়ে থাকতো। এত ঝামেলা ভালো লাগে না ওর। কিন্তু জীবনে নিজের ভালো-লাগাটাই তো একমাত্র কথা নয়। ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে। কিন্তু সবার সঙ্গে মৌখিক লোক-দেখানো কথা বলতে গেলেও চাই এক ঝুড়ি কথা! এত মিত্রা পারে না।···দাম্ভিক তো বলবেই ওকে।

নীলাকান্তের সঙ্গে ওর দেখা হয় সামান্যই। বিয়ের পরও তার জীবনের সারা দিনের কর্মপদ্ধতিটা পাল্টায়নি মোটেই। ব্যবসার কাজ-কর্মের সময়টুকু বাদ দিয়ে জানে সে—তাস আর আড্ডা। সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নীলাকান্তের বৈঠকখানা-ঘরে বসে সান্ধ্য-মজলিস। চলে তাস। যায় ট্রে-ভর্তি হয়ে-হয়ে চা আর খাবার। কাটে সন্ধ্যা। ···রাতে সিনেমা। তার পর বাড়ী। ঘরে ফেরে না এমন রাতও যায় মাঝে-মাঝে।

মা স্বর্ণময়ী সরল প্রকৃতির মানুষ। কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে সন্তান-বাৎসল্যে শুধু প্রশ্রয় দিয়েই চলেন। কিন্তু সেজগিন্নী শৈলনন্দিনী তা নন। বধূ-জীবনে শশীকান্তের যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক চোখের জল ফেলিয়েছে, দুঃখ দিয়েছে। আজকালকার ছেলেদের মধ্যেও ভ্রাতাদের যেয়াদবী আর স্ত্রীর প্রতি অবহেলা শৈলনন্দিনী সইতে পারেন না। ডেকে পাঠান নীলাকান্তকে। বলেন, 'খেলছো, বেড়াচ্ছো, গল্প করছো বন্ধুদের নিয়ে। ঘরে বউ রয়েছে, মনে করিয়ে দেবে কে শুনি? যাও, মিত্রাকে নিয়ে সিনেমায়—নয় তো বেড়াতে।'

হেসে নীলাকান্ত এসে ঢোকে ঘরে। বলে মিত্রার দিকে চেয়ে, 'যাবে নাকি সিনেমায়? যাও না দেখে এস। আমি টিকিট কাটিয়ে এনে দিচ্ছি। বৌদিরা দু'জন আর তুমি। উমা আর খুকুকেও নিয়ে নিও সঙ্গে। ওরা খুসী হবে। আর সেদিন তো জ্যাঠাইমাও বলেছিলেন—তা কখানা হলো?—'

হঠাৎ মিত্রার চোখের প্রশ্নটা আঁচ করলো নীলাকান্ত···'আমি!' অপ্রতিভ ভাবটা একটু থেমে কাটিয়ে উঠে বলে, 'আমার জন্যে যে রাত্রির টিকিট ওরা আগেই কেটে রেখেছে। আচ্ছা, আরেক দিন আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাব; কেমন লক্ষ্মীটি!'

কিন্তু আবার কোন দিন সেজগিন্নী কি মা মনে করিয়ে দিলে ব্যস্ত ভাবে হাতের তাস ফেলে উঠে এসেছে নীলাকান্ত। তেমনি হেসে সব চাইতে উচ্চ মূল্যের টিকিট কাটিয়ে এনেছে। সরকার মশায়কে সঙ্গে দিয়ে নানা সুব্যবস্থায় মিত্রাদের পাঠিয়ে দিয়েছে থিয়েটার কিংবা সিনেমায়। সঙ্গে না যাওয়ার দুঃখ ভুলে গেছে মিত্রা মঞ্চ বা পর্দার অভিনয়ে। মন উন্মুখ অভিনয়-প্রতিভা আর গল্পের দোষ-গুণ আলোচনা করা আগ্রহে।

কিন্তু প্রতীক্ষিত সময় কাটাতে কাটাতে—কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ও জানেও না! স্বামীর দেখা মেলেনি।

কাজ আর বন্ধুদের মাঝখানে ছিটকে যদি কোন একটু অবসর সময়ে বেরিয়ে পড়েছে, নীলাকান্ত দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারে পা তুলে বসে হাঁক দিয়ে ডেকে এনেছে সরকার মশাইকে। জিজ্ঞাসা করেছে তাঁর বাড়ীর খবর, দেশে ধান-চাল এবার কেমন হলো। আমন উঠবে বেশী—না আউশ।···ছেলেটি ভালো কি না। জামাইটি কেমন, রোজকার···ইত্যাদি।

অবসর-বিনোদন করেছে নীলাকান্ত।

আর ওর অবসর!

সেদিন মিত্রার ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো নীলাকান্ত। 'কি গল্প করবো আমি তোমার সঙ্গে?···আচ্ছা, পড়াশোনা হলো না বলে দুঃখ আছে, তাই করো না কেন? এক ঘরে গুম্ মেরে বসে থাকো—তেমন গল্প-সল্পও তো করো না কারো সঙ্গে।'

'কি ভাবে পড়বো?' জানতে চাইলো মিত্রা, 'কলেজে ভর্তি করে দেবে?' ম্যাট্রিক পাশ করেছিলো দু'জনেই ওবার।

'ওঃ বাব্বা! কলেজ-টলেজ নয়। এ-বাড়ীর বউ বই হাতে করে কলেজ যাচ্ছে—অপরের কথা বলবো কি আমারই যে হাসি পাচ্ছে।' সত্যি হেসেই ফেললো নীলাকান্ত।

হাসতে জানে নীলাকান্ত।

কথার আগে হাসে। মাত্র এইটুকুই। নইলে বুঝি সহ্য করা অসম্ভব ছিলো।

জিজ্ঞাসা করলো মিত্রা—'বাড়ীতে পড়াবে কে? তুমি?'

'আমি! কি যে বল! সে-বিদ্যে আমার ঘটে আছে নাকি? ফুটো ঘটিতে জল ভরার মস্ত পরীক্ষা দেওয়া আমাদের। 'ফুল্'

ছাড়তে না ছাড়তে পাত্র ঠন্‌ঠন্‌। বাড়ীতে মস্ত লাইব্রেরী। বই পড়।' সরে পড়লো নীলাকান্ত, এক-পা দু'-পা করে।

সেই লাইব্রেরী-ঘরেই ঢুকেছিল গিয়ে একদিন মিত্রা।

মস্ত একটি গোল ঘরে লাইব্রেরী। কাচের আলমারী-ভর্তি বই চার দিক ঘিরে। মাঝখানে বিরাট এক টেবিল মেহগনি কাঠের। চার ধারে চেয়ার কতকগুলো। ধূলি-ধূসরিত নয়—রোজকার ঝাড়-পোঁছে পরিচ্ছন্ন। যত্ন করে কে এ-বাড়ীতে লাইব্রেরীর?—না, যত্ন-টত্ন নয়, রোজকার বরাদ্দ কাজ করে যায় ঝি-চাকরে। কাজের ফাঁকি স্বর্ণময়ীর কাছে চলে না, তাই।···যত ইংরেজী মোটা-মোটা বপুর বই! বাংলা নেই নাকি? নিশ্চয় ও-দিকটায়। ঘুরে আলমারীর ধারে গিয়ে মাত্র টেনে বার করেছে একটা বই—হঠাৎ কোণের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো মিত্রা!

কে—কে এই ইজিচেয়ারে বই বুকে ঘুমিয়ে? ও যে এতক্ষণ দেখেইনি, ঘরে কেউ আছে!

ঠিক ঘুমিয়ে নয়, চোখ বুঁজে ছিলেন সেজ কর্তা।

অনেকক্ষণ একটানা পড়লে চোখ ক্লান্ত হয়। স্মৃতি ভুল করে। মনে হয় মাথায় ঢুকছে না কিছুই। পড়তে-পড়তে তাই দরকার হয় বিশ্রামের। চলছিলো তখন শশীকান্তর সেই বিরাম-মুহূর্ত।

শব্দ পেয়ে উঠে বসলেন।

'কে—মিত্রা? দেখিনি তো কোন দিন? কত দিন ভেবেছি, তুমি বই নিতে আস না কেন,—কেন ভেবেছি বলতে পারবো না। হয়তো তোমার মামাদের মুখে শুনেছিলাম, পড়তে তুমি ভালোবাসো —তা তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা, বোস।'

পাশের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন শশীকান্ত। কিন্তু মিত্রার তাঁর কাছে চেয়ারে বসার দ্বিধা ভাবটা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'ওসব কিছু নয়, বোস তুমি।'

মিত্রা সসঙ্কোচে বসলো।

'কি পড়তে ভালোবাসো তুমি? হাতে ওখানা কি বই—দেখি?' হেসে মিটি-মিটি চাইতে লাগলেন মিত্রার দিকে।

বধূজনোচিত গলায় বললো মিত্রা—'পড়তে ভালোবাসি সবই। তবে বিশেষ করে ভালোবাসি প্রবন্ধ, আর ভালোবাসি দূর-দেশের ভ্রমণ-কাহিনী। এটা আমি সবুজপত্র নিয়েছি জ্যাঠা মশায়।'

'সবুজপত্র!' উৎসাহে উঠে বসলেন সেজ কর্তা। 'রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা বই নয়? এ-বাড়ীতে এঘর-ওঘর ঘোরে যে দু'-একখানা বই, সে তো ঐ সব গোয়েন্দা-কাহিনী। তাও সবাই কি? খুলেও একবার দেখে না কেউ। সময় নাকি নেই। পরনিন্দা-পরচর্চ্চা করবার সময় আছে, ঝগড়ার সময় আছে, আছে গল্প করবার সময়···সময় নেই শুধু বই পড়বার!' তাচ্ছিল্যে-অবহেলায় হাত উল্টালেন, 'কিন্তু বইয়ের প্রতি আছে ভীষণ কড়া যত্ন। পড়তে দিয়ে সদ্ব্যবহার করবে, তাও এদের সহ্য হয় না।··· বড়লোকের বাড়ীতে বই থাকে লাইব্রেরী সাজানো। সেই প্রয়োজনেই একদিন এ-ঘরের জন্ম। আজও চলছে ঠিক তাই। আমিই যা দু'-একখানা বই টেনে নিয়ে শিয়রে রাখতাম। সময়ে-অসময়ে উল্টে-পাল্টে দেখতাম দু'-এক পাতা। খেয়াল ছিলো নানা—সময় পেতাম আর কই। কিন্তু ঝোঁকটা বোধ হয় ছিল চাপা। নইলে বুড়ো বয়সে পড়ছি কি করে? তুমি বই নাও। পড়। দরকার হলে এসো, দু'জনে আলোচনা-সমালোচনা করা যাবে।···বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে তো কেউ ভালোবাসে না! ফাঁকি দিয়ে কথা বলিয়ে নেব তোমায়। আর আমার সময় কাটবে চমৎকার!' হাসতে লাগলেন তিনি।

সেজ কর্তার নির্দেশ মত বই নাবিয়ে মিত্রা পড়ে গেলো। সেজ কর্তা তামাক টানতে-টানতে শুনলেন চোখ বুজে। চাকর এসে দু'বার কল্কে পাল্টে দিয়ে গেলো। ঝি এসে দিয়ে গেলো গ্লাস-ভর্তি ফলের রস।

···সেজ গিন্নী হেসে বললেন, 'একদিনে ছাত্রীকে এম্-এ পাশ করাবে নাকি গো?' বাড়ীর বৌ-মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়লো—এবার মনোমত ছাত্রী জুটলো বোধ হয়। সবাইকে ধরে-ধরে একবার চেষ্টা করেছেন তো!

মিত্রা মজে রইলো সেজ কর্তার কাছে বই নিয়ে। মা'র কাছে যাবার নামটিও করে না।—সুখ-শান্তির ছল-চাতুরী এত করতে হয় মা'র কাছে। ভালো লাগে না ওর। এই বেশ। ছাত্রীও যদি শ্রান্ত হয় মাষ্টার তো হয় না।

[ক্রমশঃ।

বিবাহে লোকাচার ও মেয়েলী সঙ্গীত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীকামিনীকুমার রায়

ক্ষৌরকার্য্য

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের অব্যবহিত পরে কিংবা সমকালে বরের বাড়ীতে বরের এবং কন্যার বাড়ীতে কন্যার স্নান-কামানোর আনন্দঘন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বর ও কন্যা নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া আল্পনা-যুক্ত পিঁড়িতে বসে এবং নাপিত তাহাদের ক্ষৌরকার্য্য করে। এই সময়ে এয়োগণ যে সকল গীত গাহেন, এখানে তাহার দুইটি উদ্ধৃত হইল।

কন্যার বাড়ীর একটি গীত :—

"ভাল কইর‍্যা কামাও নাপিত চন্দ্রমুখীরে।
আমার সীতার চন্দ্রনখ কামাও ধীরে ধীরে
বেলা করি বহুক্ষণ, আইল নাপিত নন্দন
আন ছত্র ধর ছত্র জানকীর শিরে
ভাল কইর‍্যা কামাও নাপিত চন্দ্রমুখীরে।"

মায়ের কাছে তাঁহার স্নেহের দুলালী আজ সীতা। চন্দ্রমুখী সে, নখও তাহার চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল, সে-নখ কর্ত্তন করিতে পাছে তাহার আঙুলে ব্যথা লাগে, তাই নাপিতকে ধীরে ধীরে কামাইতে বলা হইতেছে। প্রায় একই সময়ে বরের বাড়ীতেও বরের ক্ষৌর-কার্য্যোপলক্ষে এইরূপ গীত চলে। এখানে একটি উদ্ধৃত হইল :—

"দেখ দেখ কি আনন্দ অযোধ্যা ভবনে
কামাও নাপিত কামাও রামধনে।
চাউল কড়ি ছত্র ধরি, নাপিতের ছেলে করে খেউরী
বাম হাতে দর্পণ ধরি বইসাছে আসনে
কামাও নাপিত কামাও রামধনে।
ধোবায় ছুঁয়াইল ক্ষার, যত ইতি ব্যবহার
একে একে করে নারীগণে।
কামাও নাপিত কামাও রামধনে।
খেউরী কর্ম্ম হৈল সাঙ্গ, নারীগণ করে রঙ্গ
মুখচন্দ্র দৃষ্ট করি লজ্জা ইন্দ্র পায় মনে।"

বরকে এখানে 'রাম'রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। 'রামধনে' কথাটির ভিতর দিয়া মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-কোমলতার ধারাই উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে।

জল সহা

বর ও কন্যার ক্ষৌরকার্য্য ও নখ কর্ত্তনের পর এয়োস্ত্রীরা বরের বাড়ীতে বরকে ও কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে বিশেষ ঘটা করিয়া স্নান করান। এই স্নানের জল তাঁহারা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহকার্য্যকে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী অঞ্চলে 'জল সহা' (প্রার্থনা) বা 'জল সাধা' নামে অভিহিত করা হয়। বিবাহের দিন দ্বিপ্রহরে এয়োস্ত্রীরা বর ও কন্যার কপালে হলুদবাটা ছোঁয়াইয়া গাড়ু, ঘট ইত্যাদি লইয়া কোনও দেবালয়ে যান। যাইবার কালে নিকটস্থ জলাশয় হইতে জলপাত্রগুলি ভরিয়া লন এবং পথে জল ঢালিতে ঢালিতে অগ্রসর হন; শঙ্খধ্বনিতে তখন চারি দিক মুখরিত হইয়া উঠে; এককালে এই উপলক্ষে অনেক গানও গাওয়া হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তাহা কদাচিৎ শুনা যায়। দেব-মন্দিরে যাইয়া এয়োরা সেখানকার একজন এয়োকে (ব্রাহ্মণী হইলেই ভাল) আলতা-সিঁদুর পরাইয়া দেন এবং পাণ-সুপারি-মিষ্টি দিয়া আপ্যায়িত করেন। সেই এয়ো তখন তাঁহাদের ঘটে কয়েক বার জল ঢালিয়া দেন এবং তাঁহারা সেই ঘট লইয়া প্রতিবেশীদের বাড়ী-বাড়ী যান। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, নাপিত, মালাকার, কামার, কুমার এই নয় সম্প্রদায়ের বাড়ী হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনা হইত। এখন পাঁচ-সাত প্রতিবেশী বাড়ী হইতে মাত্র আনা হয়। 'জল সহা'র জল লইতে এয়োরা বাড়ীতে উপস্থিত হইলে গৃহকর্ত্রী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের ঘটে কতক জল ঢালিয়া দেন এবং তৎপরিবর্ত্তে পাণ-সুপারি ও মিষ্টি লাভ করেন। এইরূপে ঘটগুলি পূর্ণ করিয়া সকলে ফিরিয়া আসেন এবং সেই জলে বরের বাড়ীতে বরকে ও কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে উঠানের এক পার্শ্বে প্রোথিত এবং কার্পাস সূত্রে বেষ্টিত চারটি কলা গাছের মধ্যে শিলের (পূর্ব্ববঙ্গের পাটা) উপর বসাইয়া স্নান করান। 'বাসি-বিবাহে'র জন্য 'জল সহার' কিছুটা জল রাখিয়া দেওয়া হয়। স্নানের পর বর ও কন্যার যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম হস্তে তিন পেঁচ কার্পাস সূতা বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং বর রূপার কিংবা লোহার জাঁতি ও কন্যা কাজললতা ধারণ করে। এখানে পশ্চিমবঙ্গের 'জল সহার' একটি বহু-প্রচলিত মেয়েলী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল :—

"সই লো সই মকর গঙ্গাজল
আজ হবে কামিনীর বিয়ে
সইতে যাব জল।
উলু দিয়ে শাঁখ বাজায়ে
বরণডালা মাথায় লয়ে
জলের ঝারা হাতে করে
জল সইতে চল।"

জলভরা

পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ এবং আরও বহু অঞ্চলে বর-কন্যাকে স্নান করাইবার জন্য যে জল সংগ্রহ করিয়া আনা হয়, সেই অনুষ্ঠানকে 'জলভরা' বলে। এয়োস্ত্রীরা একত্র হইয়া গীত গাহেন এবং কলসী-ঘটী ইত্যাদি লইয়া জলের ঘাটে যান। বাদ্যকরেরা ঢোল, কাঁসি বাজাইয়া তাঁহাদের অনুগমন করে। সেখানে গিয়াও তাঁহারা বহুক্ষণ গান করেন এবং শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে জল ভরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। উঠানে একটি আলপনাযুক্ত স্থানে জলপূর্ণ ঘটগুলি সিন্দুরের কৌটা ও আম্রপল্লব দিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। অতঃপর বর ও কন্যাকে তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে নূতন বস্ত্র পরাইয়া (বস্ত্রটি ক্ষৌরকার্য্যের সময়ই পরানো হয়) আলপনাযুক্ত পিঁড়িতে আনিয়া বসানো হয় এবং সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে হলুদ ও মিলাবাটা মাখাইয়া সেই আনীত জলে স্নান করায়। সময়োপযোগী একটি গীত এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"তোরা আয় লো সকলে
আমার সীতানাথকে স্নান করাইবাম সুশীতল জলে।
খিলা আর হরিদ্রা বাটি, শীঘ্র কইর‍্যা আন সখি
আমার রামের অঙ্গে মাখি সকলে মিলে।
আম্রপল্লব দিয়া, ভৃঙ্গার ভরিয়া
রাখিয়া দিয়াছি সখি, ঐ ছায়াতলে
কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া, কর্পূর তাতে ছুয়া
গন্ধজলে ধোয়াইব আমার রাম-কমলে
চিকণ গামছা দিয়া দিব অঙ্গ মুছাইয়া
ফুটিবে চম্পক কলি হাতে পায়ে আঙ্গুলে
আমার সীতানাথকে স্নান করাইবাম সুশীতল জলে।"

এই গানটির ভিতর দিয়া পুত্র-গর্ব্বে গর্ব্বিতা মাতার স্নেহের ধারা উছলিয়া পড়িয়াছে! ছেলে আজ তাঁহার 'সীতানাথ', 'রাম-কমল'। বরকে কিরূপে স্নান করানো হয়, এখানে তাহাও উক্ত হইয়াছে। জলের ঘাটে যাইবার সময় এয়োস্ত্রীরা যে সকল গীত গাহেন তাহার অধিকাংশই আবার রাধা-কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ ও অভিসার-বিষয়ক। কবে কোন্ যুগে যমুনা-পুলিনে বাঁশী বাজিয়াছিল, সেই বাঁশীর শব্দে রাধা তথা গোপরমণীরা ঘরের বাহির হইয়াছিলেন! অথবা ইহা কবির মনোবীণার কথা ও সুরও হইতে পারে। কিন্তু জলে যাওয়ার নামে বঙ্গের কুলকামিনীরা আজও সেই বংশীধ্বনি অন্তর-কোণে শুনিতে পান, শুনিয়া আপন হারা হইয়া যান। 'জলভরা'র গীতগুলি বর-কন্যার হৃদয়ে এক মধুর আবেশ সৃষ্টি করে। কয়েকটি সময়োপযোগী গীত এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"সবে মিলি যাব মোরা, যমুনা-পুলিনে ত্বরা
কাঁখে নিব হীরার কলসী
শাড়ী পরব কিরণ শশী, জল ভরিয়া গৃহে আসি
স্নান করাব রামধনে।
দাঁড়াব কদম্বতলা, বাঁশী বাজায় বসনচোরা
শুনিয়া বংশীধ্বনি, আমরা সবে পাগলিনী
ধন্য হব নারীকুলে হরিগুণ গেয়ে মোরা।
যমুনা-পুলিনে বাজিছে বাঁশরী, মন কেমন করে শুন সহচরী
এস ত্বরা করি কক্ষেতে কলসী ধরি
কদম্বের মূলে হেরি সেই নব মুরারি
সুমধুর স্বরে বেণু বাজায়ে ডাকিছে কানু
কোথা বৃষভানুনন্দিনী কিশোরী।"

* * * *

"বাজে না বাজে না বাঁশী বাজে কেবল কালার গুণে
চল সখি দেইখ্যা আসি বাজে বাঁশী কোন্ বিপিনে
শুনিয়া বাঁশীর গান, অধৈর্য্য হইল প্রাণ
ধৈর্য্য না মানে আমার মনে
চল সখি দেইখ্যা আসি বাজে বাঁশী কোন্ বিপিনে
শুনিয়া কালার গান কেমন করে প্রাণ
চল সখি যমুনার পুলিনে
চল দেইখ্যা আসি বাজায় বাঁশী কোন্ বিপিনে।"

পশ্চিমবঙ্গে স্নানের পর-স্পর জাঁতি এবং কন্যা কাজললতা ধারণ করে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বহু সমাজে তখন বর-কন্যা উভয়ের হাতে পিতলের 'আরসি' ও কলার মাজ দেওয়া হয়। একটি হলুদ কাপড়ে সেগুলি জড়ানো থাকে। সাধারণতঃ ইহাকে 'মাজ-দর্পণ' বলা হয় এবং নাপিত উহা সরবরাহ করে। শ্রীহট্টে একটি লোহার পেরেক বা ভোঁতা কাটারির সঙ্গে ধুতুরার ডাল, কলার মাজ ইত্যাদি সাতটি দ্রব্য ধারণ করিতে দেখা যায়। ইহা সেখানে 'ধুতুরা কাটাইল' নামে পরিচিত। বিবাহের সময় যেমন মালা বদলের তেমনি এই 'মাজ-দর্পণ' বদলেরও প্রথা আছে।

গায়ে হলুদ

গাত্রহরিদ্রা বা গায়ে হলুদ বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার। বাংলা দেশে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, চূড়াকরণ প্রভৃতি শুভ কার্য্যোপলক্ষেও ছেলেদের হলুদ মাখাইয়া স্নান করানো হয়। বৈবাহিক গাত্রহরিদ্রা সর্ব্বত্র সর্ব্ব সমাজে একই দিনে একই নিয়মে সম্পন্ন হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে 'গায়ে হলুদ' নামটি খুব প্রচলিতও নহে। সেখানে বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বে বিশেষ ঘটা করিয়া 'হলুদ কোটা' করা হয় এবং সাধারণতঃ অধিবাসের দিন বা বিবাহের দিন ক্ষৌরকার্য্যের পর বর ও কন্যাকে হলুদ ও খিলা বাটা মাখাইয়া স্নান করান হয়। পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে বিবাহের দিনে অথবা তাহার দুই-একদিন পূর্ব্বে কোনও শুভ সময়ে বর-কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া থাকে। এয়োস্ত্রীরা বর ও কন্যাকে নূতন কাপড় পরাইয়া, আলপনাযুক্ত পিঁড়িতে বসাইয়া হলুদবাটা ও গন্ধ-তৈল মাখাইয়া স্নান করান। কন্যার বাড়ী অধিক দূর না হইলে এই উপলক্ষে বরের বাড়ী হইতে গায়ে হলুদের তত্ত্ব—বস্ত্রালঙ্কার, দধি, সন্দেশ, গন্ধ-তৈল, শাঁখা, লোহা, সিন্দুর, কাজললতা ইত্যাদি পাঠানো হয়। কোনও সমাজে আবার বরের গায়ে হলুদ না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যার গায়ে হলুদ হইবার প্রথা নাই। বরের বাড়ী হইতে বরের ব্যবহৃত হলুদের অবশিষ্টাংশ আসিয়া না পৌঁছা পর্য্যন্ত কন্যার গায়ে হলুদ হয় না। আসামের কোথাও কোথাও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের এবং বর-কন্যার ক্ষৌরকার্য্যের পর বর-কন্যাকে বাটা হলুদ ও মাষকলাই মাখাইয়া স্নান করানো হয়। আবার কোথাও হলুদ ও মাষকলাইর সঙ্গে 'মুথা' নামক এক প্রকার শিকড়ও বাটিয়া দেওয়া হয়। দেখা যাইতেছে, অন্য নিয়মের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, বর-কন্যার এই আনুষ্ঠানিক স্নানে সর্ব্বত্র সকল সমাজ হলুদবাটা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আইবড় ভাত

গায়ে হলুদের পর কোন কোন সমাজে কন্যার মাতা কন্যাকে নূতন বস্ত্র পরাইয়া বিবিধ উপকরণে পরিতোষ-ভোজন করান এবং বরের বাড়ী হইতে আগত দধি-সন্দেশাদিও পরিবেশন করেন। ইহাকে 'অব্যূঢ়ান্ন ভোজন' বা আইবড় ভাত খাওয়া বলা হয়।

যাঁহারা বর বা কন্যাকে হলুদ মাখান তাঁহাদিগকে দধি-চিড়া ভোজন করাইবার প্রথাও কোনও কোনও সমাজে প্রচলিত আছে।

সোহাগ মাগা

পূর্ব্ববঙ্গের বহু সমাজে বিবাহের দিন অপরাহ্নে কন্যার বাড়ীতে 'সোহাগ মাগা' নামক এক মনোজ্ঞ স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়। কন্যার মা কিংবা মাতৃস্থানীয়া কেহ আ কিংবা ননদ এবং অপর কয়েক জন

এয়োকে সঙ্গে লইয়া প্রতিবেশীদের গৃহে 'সোহাগ' মাগিতে যান। তাঁহার মাথায় থাকে একটি কুলা এবং উহাতে বিভিন্ন আধারে সজ্জিত মশলা ডাল চাল তৈল লবণ ইত্যাদি। জা বা ননদ কক্ষে একটি কলসী বহন করেন এবং তাঁহার অঞ্চলের সহিত কুলাবহনকারিণীর অঞ্চল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাদ্যকরেরা ঢোল ও কাঁসি বাজাইতে বাজাইতে তাঁহাদের অনুগমন করে; গীত ও উলুধ্বনির মধ্যে তাঁহারা এক-এক বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হন এবং গৃহদ্বারে কুলা নামাইয়া কুলার অগ্রভাগে মাটিতে একটি রেখা টানেন; অতঃপর দুইটি হাত অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে নাচাইয়া গুণচিহ্নের মতো একটির উপর আর একটি রাখিয়া সেই চিহ্নিত স্থান হইতে চিমটি কাটিয়া তিনবার মাটি তোলেন। গৃহকর্ত্রী তখন কুলায় যে পাত্রে যে জিনিষ সজ্জিত আছে সেই পাত্রে সেই জিনিষ অল্প-অল্প করিয়া দেন এবং সকলকে হাসিমুখে বিদায় করেন। এইরূপে প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে 'সোহাগ' মাগিয়া কন্যার মা কুলাটি মাথায় করিয়া নীরবে আপনার বাড়ী ফিরিয়া আসেন এবং আপনার মুখের পাণ কন্যার মুখে স্পর্শ করান। এইরূপে 'সোহাগ মাগা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এখানে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের 'সোহাগ মাগা'র একটি মেয়েলী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল:—

"শচী লক্ষ্মী সরস্বতী মেনকা সুন্দরী।
রতি তিলোত্তমা রম্ভা রামা বিদ্যাধরী।
মোহন বেশেতে সাজে নারীগণ যত।
সোহাগ মাগিতে চলে গাইয়া নানা গীত।
সিন্দুর কাজল লইল সোহাগের কারণ।
আদা হরিদ্রা জিরা খড়িকা লবণ।
সাবিত্রীর কাঁখে কলসী মেনকার মাথায় কুলা।
সোহাগ মাগিতে রাণী দেবপুরে গেলা।
এইরূপে চইল্যা যায় কালী-মা'র মন্দিরে।
সোহাগ দেও গো কালী-মা সোহাগ দেও আমারে।
দোয়ারের মাটি তুলে নখে চিমটিয়া।
সোহাগ দিলেন কালী কুলায় তুলিয়া।
এইমতে চইল্যা যায় প্রতি ঘর ঘর
তারপর চইল্যা যায় আপনার বাসর
মেনকার মুখের পাণ গৌরীরে দিয়া
গ্রন্থি মোচন করলো কুলা নামাইয়া।"

'জল সহা' এবং 'সোহাগ মাগা' দুইটি আচারই অতি মনোজ্ঞ। পুত্র ও কন্যার বিবাহে পাড়া-প্রতিবেশী সকলের সন্তোষ এবং শুভেচ্ছা কামনা করাই ইহাদের মূল উদ্দেশ্য। অনেকে বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে পঞ্চ তীর্থ বা দ্বাদশ তীর্থের জল দিয়া বিবাহ-সংস্কার সুসম্পন্ন হইত, 'জল সহা' এবং 'জলভরা'র ভিতর দিয়া তাহারই রেশ চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, 'সোহাগ মাগা'র ভিতর দিয়া কন্যাকে পরগৃহে পরহস্তে সমর্পণ করিবার প্রাক্কালে স্নেহাতুরা জননীর মনের বিষম অবস্থাটিই প্রকাশ পায়। তিনি কৌলীন্যের অহঙ্কার, অবস্থার অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার মুছিয়া ফেলিয়া আত্মীয়া-বান্ধবীদের লইয়া গলায় কাপড় জড়াইয়া, মাথায় কুলা তুলিয়া, খালি পায়ে প্রতিবেশিনীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান—তাহাদের সোহাগ—সন্তোষ কামনা করেন। তিনি মুখে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মন হয়তো কেবলই বলিতে থাকে—ওগো, আমার যে দুলালী এত দিন তোমাদের মধ্যে ছিল, কাজে-অকাজে এত দিন যে তোমাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া মারিয়াছে, আজ সে পরগৃহে যাইতেছে,—তোমরা তাহাকে আশীর্ব্বাদ কর, তোমাদের শুভেচ্ছা তাহার উপর বর্ষিত হউক, তাহার যাত্রাপথ শুভ হউক, তাহার জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়া উঠুক!

বরযাত্রা

বর্ত্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্যাপক্ষের আহ্বানে বর কন্যার বাড়ীতে আসিয়া বিবাহ করে। ইহাই শিষ্ট রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে দ্বিজাদি উচ্চবর্ণের পক্ষে 'ব্রাহ্মবিবাহকে' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কন্যাপক্ষ বেদবিদ্যায় সুপণ্ডিত, সদাচারী, অপ্রার্থক বরকে সসম্মানে আহ্বান করতঃ বস্ত্রালঙ্কারে অর্চ্চনা করিয়া যে কন্যা সম্প্রদান করিতেন, তাহাকেই 'ব্রাহ্মবিবাহ' বলা হইত। বরাহ্বানে কন্যাগৃহে বিবাহ-প্রথা সেই প্রাচীন স্মৃতিই বহন করিতেছে। কিন্তু আমরা কি দেখিতে পাই? বর যখন আসে, তখন একাকী আসে না, বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত হইয়া, শিরে টোপর পরিয়া মহাসমারোহে আসে। বাংলার বাহিরে কোনও-কোনও সমাজে বরকে ঘোড়ায় চড়িয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া যোদ্ধৃবেশে আসিতেও দেখা যায়। বরযাত্রা উপলক্ষে কখনো বিরাট শোভাযাত্রাও বাহির হয়। আমাদের শাস্ত্রে 'ব্রাহ্মবিবাহ' ছাড়া সেকালের আরও কয়েক প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে 'রাক্ষস বিবাহ' একটি। কন্যার অভিভাবকবর্গকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যা-হরণে বিবাহ করার রীতি সেকালে ভারতের কোনও-কোনও জাতি, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভীষ্ম কর্ত্তৃক কাশীরাজের দুহিতাত্রয় হরণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণী, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা এবং অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক ঊষা হরণ সেই 'রাক্ষস বিবাহের' রীতিরই সাক্ষ্য প্রদান করে। আজও বহু পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে বিবাহকালে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রর মধ্যে এক কৃত্রিম যুদ্ধের এবং শেষে কন্যাপক্ষের পরাজয় বরণের মনোজ্ঞ অভিনয় হইয়া থাকে; বাংলা দেশেও সকল সমাজে সর্ব্বত্র এখনো বর কন্যার বাড়ীতে যাইয়া বিবাহ করে না, কন্যাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। এই সেদিন পর্য্যন্তও পূর্ব্ববঙ্গে মৌলিক পাত্র কুলীন পাত্রীর বাড়ী বিবাহ করিতে যাইত না; কুলীন পাত্রী পূর্ব্বাহ্ণেই পাত্রের গ্রামে আসিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে উঠিত এবং বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র পাল্কী চড়িয়া আত্মীয়-স্বজন (বরযাত্র) লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে পাত্রীকে নিজের বাড়ীতে আনিত এবং বিবাহ করিত। কাজেই স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, বরাহ্বানে কন্যাগৃহে বিবাহ এবং মহাসমারোহে বরযাত্র-গমনের মধ্যে সেকালের 'ব্রাহ্মবিবাহ' এবং 'রাক্ষস বিবাহে'র দুইটি ধারা আসিয়া মিশিয়াছে।

বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ী অধিক দূর না হইলে সাধারণতঃ বিবাহের দিন অপরাহ্ণে কন্যার বাড়ী হইতে কন্যাকর্ত্তার প্রতিনিধি হিসাবে একজন যাইয়া বর ও বরযাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসে। অধিকাংশ স্থলেই যান-বাহনাদির ব্যয় কন্যাপক্ষই বহন করেন। এক সময়ে বরকেও কন্যার ন্যায় বিবিধ বসন-ভূষণে সাজাইয়া

দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী বরের মস্তকে শুধু মুকুট (শোলার তৈয়ারী টোপর), ললাটে চন্দনের ফোঁটা, কণ্ঠে ফুলের মালা এবং হস্তে মঙ্গলসূত্র, জাঁতি বা মাঙ্গ-দর্পণ দেখা যায়। আসামের কোথাও কোথাও বরের মস্তকে উষ্ণীষ পরাইবার এবং ললাটে বটের আটা ও সোহাগার ফোঁটা দিবারও প্রথা আছে। বহু সমাজে বরযাত্রদের মধ্যে বরের দুই-একজন অল্পবয়স্ক নিকট আত্মীয়—ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয় (মিতবর, নিতবর) থাকে এবং তাহারা পাল্কীতে, গাড়ীতে ও বিবাহ-সভায় বরের পার্শ্বে বসে।

বর-বরণ

বর কন্যার বাটীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র কলকোলাহলে এবং শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে চারি দিক মুখরিত হইয়া উঠে। কন্যাপক্ষ বর ও বরযাত্র সকলকে সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া এক-একটি ফুলের মালা পরাইয়া দেন। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট বিবাহ-সভায় যাইয়া বর ও বরযাত্রগণ সাড়ম্বরে উপবেশন করেন, তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নের সীমা থাকে না। বর কন্যার বাড়ীতে সেদিন সম্মানিত অতিথি। অতিথির সেবায় ভারতবাসী কখনো পরাঙ্মুখ হয় নাই। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, রুচিকর ও পুষ্টিকর স্নিগ্ধ পানীয়, সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন—অতিথির সেবায় সেকালে কিছুই বাদ পড়িত না।

'বর-বরণ' একটি বিশিষ্ট স্ত্রী-আচার। সর্ব্বত্র সকল সমাজে ইহা একইরূপে সম্পন্ন হয় না। পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও কোথাও বর বিবাহ-সভায় যাইবার মুখেই পুরস্ত্রীরা বরণডালায় (কুলা) সজ্জিত যাবতীয় মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা তাহাকে বরণ করেন। এই বরণ-প্রক্রিয়াটি দেখিবার মত! তাঁহারা বরণডালা হইতে এক-এক বারে দুই হাতে করিয়া দুইটি দ্রব্য লন এবং অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে হাত দুইটি নাচাইয়া সেগুলি বরের শরীরে ও মস্তকে ছোঁয়াইয়া দুই দিকে ফেলিয়া দেন। পশ্চিমবঙ্গে এই বর-বরণ সাধারণতঃ সম্প্রদানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ছাঁদনাতলায় (বিবাহ-স্থানে) সম্পন্ন হয়। কন্যাদাতা কর্ত্তৃক বরকে বস্ত্র ও উত্তরীয় দান করিয়া হাঁটুতে ধরিয়া বরণ করিবার পর পাঁচ জন কি সাত জন এয়োস্ত্রী বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করিতে-করিতে বরকে সাত বার প্রদক্ষিণ করেন এবং বরণডালায় পূর্ব্ব হইতে সজ্জিত বিবিধ মঙ্গলদ্রব্য দ্বারা তাহাকে বরণ করেন। অতঃপর আরও দুই-একটি স্ত্রী-আচার সম্পন্ন করিবার পর কন্যাকে বিবাহ-স্থানে আনা হয়।

বর ও বরযাত্র ভোজন

পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থলেই ভদ্রসমাজে বিবাহের দিন রাত্রিতে বর কন্যাপক্ষের বাড়ীতে কিছু আহার করেন না। নিজের বাড়ী হইতে আনীত খাদ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। শ্বশুরবাড়ীর অন্ন তাঁহাকে পরদিন প্রথম পরিবেশন করা হয়। অনেক স্থলে বরকে 'সিধা' দেওয়া হয়, তিনি পাচক দ্বারা রান্না করাইয়া তাহা খান। বরযাত্রীরা অবশ্য বিবাহের রাত্রেই আহারাদি করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে বর কন্যাযাত্র ও বরযাত্রদের সঙ্গে বিবাহ-রাত্রেই একত্রে বসিয়া ফলাহার করেন। [ক্রমশঃ।

মুখোমুখি

অমরেন্দ্র ঘোষ

পাশাপাশি চলতে-চলতে স্ত্রীলোকটি পিছিয়ে পড়ে।

'আঃ তুমি ভিজবে নাকি ? এ দুর্যোগেও তোমার লজ্জা !'

'ভেজার কি বা বাকি রয়েছে, যে না তোমার ছাতি !' স্ত্রীলোকটি এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু পুরুষটির পদক্ষেপের সংগে তাল রাখতে পারে না। সে আবার পিছিয়ে পড়ে। 'যাও, আমি ভিজে-ভিজেই যাব।'

'রাগ করলে অচলা ? তোমার যে সর্দি !'

সান্নিপাত হলেও অচলার উপায় নেই। সে কিছুতেই পারবে না অখিলের সংগে তালে-তালে পা মেলাতে।...

কই, অনেক চেষ্টা করেও তো পারল না আজ পর্যন্ত !

ওদের পিছন-পিছন একটা ঠেলাগাড়ী আসছে। তার ওপর সংসারী লটবহর পর্বতপ্রমাণ। সেগুলো ভিজে একশা হয়ে গেছে। দুর্যোগ কি একটু !

'ঔর কেতনা দূর বাবু ?'

'ঐ তো। ঐ যে বাড়ীখানা ওর পরই বোধ হয়।'

'এখনও বোধ হয়, বোধ করি বলছ। আচ্ছা মানুষ যা হক। বাড়ী ভাড়া করেছ, অথচ চিনতে পারছ না ? এই রাস্তা তো ? না একেবারে ঠিকে ভুল ?'

'না গো না, ঐ তো শিবমন্দিরটা।'

আরও নিকটে এগিয়ে এসে দেখা গেল, ওটা শিবমন্দির নয়—একটা মসজিদ। ভিতরে বাতিদানে বাতি জ্বলছে।

স্ত্রী অচলা মহা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হল ; ঠেলাওয়ালা অস্বীকার করল আর এগুতে।

অন্ধকারে আর রাস্তার বাতি জ্বলল না। হয়ত অত্যন্ত ঝড়-ঝাপটায় লাইন খারাপ হয়ে গেছে।

'আমি দিদির বাড়ী চললাম।'

এ টালা থেকে টালিগঞ্জ নয়। কালিঘাট থেকে টালিগঞ্জ। সামান্য মাইল দেড়েক পথ। সহর থেকে সহরেরই একটা পল্লী অঞ্চলে উঠে যেতে হচ্ছে। এর ভিতরই এই অনাসৃষ্টি !

যখন কালিঘাট থেকে রওনা দিয়েছিল, অচলার তখন সাজগোছটা পরিপাটি ছিল। মুখে একটু পাউডার, পায় স্যাণ্ডাল, চুলগুলো গোছগাছ। এখন কোথাই বা সিঁথি, কোথায়ই বা পাউডার! স্যাণ্ডাল উঠেছে হাতে ! কাপড়-চোপড় ভিজে জবজব করছে। গাল বেয়ে যে জল পড়ছে, তা নিছক বর্ষার জল নয়।

দুর্যোগের আভাস দেখেই অচলা বলেছিল, 'আজ কি এ বাসা না ছাড়লেই নয় ? দেখছ না, আকাশ মেঘে-মেঘে আচ্ছন্ন করেছে ?'

'যদি ও-বাসাটা ছাড়িয়ে যায়। এ-বাসায় তো তোমার ভিজে-ভিজে সর্দি হয়েছে। কত করে বললাম সারিয়ে দিতে। বলে কি না উঠে যান, তার পর সেরে দেব। ফিরে এলে ভাড়া লাগবে দেড়া।'

'তুমি অত অনুনয়-বিনয় না করে, উঠে যাওয়ার খরচা দিয়ে নিজে সারিয়ে নিলেই পারতে ?'

'সে কথাটা তো মন্দ বলনি, কিন্তু আমি যে দু'মাসের ভাড়া আগাম দিয়েছি ওখানে।'

'ভাল করেছ। একটা যে মানুষ আছি, কিছুই তো জিজ্ঞেস করবে না। ইচ্ছে করে কি জান ? বিষ খাই, নয়ত এক দিকে চলে যাই। এত কষ্টের পয়সা, কিন্তু তোমার হিসেব নেই মোটে।'

'তা হলে এক কাজ কর, এ বাড়ীতেই থাকা যাক। যে মাল ঠেলাগাড়ীতে চড়িয়েছি তা নাবাব নাকি ?'

'তুমি আমার মাথা খাও, এখন আমার সুমুখ থেকে যাও দেখি।'

চটপট একটু সেজে-গুজে অচলা বেরিয়ে এসেছে। আকাশে তখন মেঘ জমেছিল দ্বিগুণ। কিছু দূর আসতে না আসতেই তা ঘোর কালিবর্ণ ধারণ করল। অখিল জোর পায় হাঁটতে সুরু করল ঠেলার সংগে। অচলার গেল একটা স্যাণ্ডাল ছিঁড়ে।

ঠেলাওয়ালাকে থামিয়ে অখিল ছুটে এল। ভয়-সন্ত্রস্ত পথিকরা এদিক-ওদিক আশ্রয়ের জন্য ছুটছে। কেউ উঠবে ট্রামে, কেউ বাসে, কেউ বা দাঁড়াবে নিকটের গাড়ী-বারান্দায়। যে যার সুযোগ মত চেয়ে দেখছে ওদের কাণ্ড। অন্তত অচলার তাই মনে হয়।

'আমার হাতে বরং স্যাণ্ডেল-জোড়া দাও। অনভ্যাসের ঠোঁটায় কপাল চড়চড় করে! সারা বছরে তো পায় দেবে না, হঠাৎ একদিন।'

'তোমার কথা মত তো আমি চলব না—পার তো একটা রিক্সা ভাড়া কর। স্ত্রীলোকের জুতো ঘাড়ে করে টানার চেয়ে বরঞ্চ তাতে পৌরুষ বৃদ্ধি পাবে।'

পকেটে হাত দিয়ে অখিল বলে, 'এখন কি রিক্সা পাওয়া যাবে ?'

অচলাও ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে হেঁটে চলে। সে লজ্জায়-বিরক্তিতে ভিতরে-ভিতরে খাখ্ হয়ে যাচ্ছে।

তার ওপর পোল পেরিয়ে আসতে না আসতে না নেমেছে জল। সংগে-সংগে ঝাপটা বাতাস। পল্লী অঞ্চলের সরু রাস্তায় ঢুকে একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে অচলা। দ্বার-পথে, বাতায়ন-পথে কৌতুকোজ্জ্বল অগুণতি চোখ। এ সময় যে চোখগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকার কথা ছিল, সেগুলি একাগ্র হয়ে যেন উপভোগ করছে এই চরম দুর্ভোগ।

গল্পের সূত্রপাত এখানে নয়। সুরু হয়েছে বিয়ের রাত থেকে।

অচলার কল্পনা ছিল, বর হবে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে দুধারওয়ালা ছুরি। সর্বদাই ঝক্‌ঝক্ করছে। কিন্তু অখিল বিয়ের রাতটায়ই নিজেকে পরিচয় দিল একান্ত ভোঁতা বলে। সারা রাতটা বৃথা গত হল—সে একটা কথা পর্যন্ত বলল না অচলার সংগে। পাড়া-প্রতিবেশিনী যারা বাসর জাগতে এসেছিল, তারা ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় হল।

'বর কি হাবা নাকি ?'

মন্তব্য শুনে অচলা হেসেছিল, কিন্তু দগ্ধে পুড়ে গিয়েছিল তার অন্তর।

সকলে চলে যাওয়ার পর, সে মাথার ঘোমটাটা মুখের ওপর শক্ত করে টেনে দিয়ে ঘুমের ভাণ করে পড়ে ছিল। তার মনের ইচ্ছা যা-ই থাক, সে রইল আপাতত দৃষ্টিতে শক্ত হয়ে। ঘরে আলো জ্বালানই আছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যেতে লাগল নিয়মিত চক্রে।

গুটি দুই সম্বন্ধ এসেছিল। অখিল নাকি সাব্যস্ত হল তার মধ্যে উপযুক্ত। সে তার আফিসের খাটুনির পরও নাকি পার্ট-টাইম আর এক স্থানে কাজ করে। এত যে খাটে, তার হাতে মেয়ে পড়লে সুখীই হবে।

প্রতিবেশী রামগোপাল বলল, 'রজনী, এ-সম্বন্ধ তুমি করতে পার। ছেলে আমি দেখেছি। ফালতু কাপ্তেন নয়, পায়জামা

আর হাওয়াই সার্টের বাহার নেই। একেবারে সাদাসিধে। চুলগুলো পর্যন্ত ওলটায় না।'

অচলা মনে-মনে প্রশ্ন করেছিল, 'তবে কি মাথাটাও আঁচড়ায় না? ওমা কি ঘেন্নার কথা!'

ছোট বেলা সে মেনির সংগে খেলত না ঐ এক দোষে। তার মাথায় উকুন জন্মেছিল এক কাঁড়ি। নইলে মেনি দেখতে সুন্দরীই ছিল।

অচলার পিতা রজনীর আর পাঁচ জন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত অর্থাভাব। সে অখিলের দিকেই ঝুঁকল। যথাসম্ভব বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু অচলার বিয়ের রাতটা কাটল যে-ভাবে তা তার পিতা বুঝল না। পরদিন সকাল বেলা, অর্থাৎ বাসি-বিয়ের দিন সকলে বর-কন্যাকে ডেকে তুলল। বরকে বলল, 'প্রণাম কর গুরুজনদের।'

আর একজন বলল, 'না, না, তার আগে প্রণাম করতে হবে গৃহলক্ষ্মীকে। ঐ যে ঘোমটা দেওয়া রয়েছে।'

অচলা চোখ টিপে দিল। কিন্তু কে দেখে তার দিকে চেয়ে। অখিল ঠক করে প্রণাম করে বসল। মুখ তুলতেই দেখা গেল, এ আর কিছু নয় একখানা খ্যাংরা। গৃহলক্ষ্মীই বটে!

শালা-শালীরা হেসে উঠল। অচলা পালিয়ে গেল ছুটে।

তার পর এই দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে অখিলের সংগে অচলা সংসার করল বটে, কিন্তু কোন দিনই যেন সংগতি মিলিয়ে চলতে পারল না। টাকা-পয়সার স্বচ্ছলতা না থাকলেও ঠিক রেশন বাদ যায় না। পাউডারের কৌটা দু'মাস খালি থাকলেও, সিঁদুর বাড়ন্ত হয় না। অখিল আলসে নয়, বাবু নয়, অথচ অচলার চিত্ত জয় করতে সে পারে না।

'আবার যে তুমি একটা আড়াই টাকা দিয়ে ব্লাউজ আনলে?'

'দেখলাম, নতুন ডিজাইনে সুন্দর-সুন্দর সব ব্লাউজ বিক্রি হচ্ছে, দাম বেশ সস্তা, ভাল লাগল, নিয়ে এলাম। এবার পুজার সময় তো তোমাকে কিছু দিতে পারিনি।'

'তবু আমি খুব খুশি হতে পারলাম না। চোখে ভাল লাগলেই যে আগু-পিছু না ভেবে ছুটে যেতে হবে, এ কোনও কথা নয়। ভালর এক সুন্দরের সংসারে কি শেষ আছে? বিশেষ কথা কি তোমার শরীরটা কিছু দিন হয় খারাপ যাচ্ছে। উচিত ছিল গয়লার পাওনাটা শোধ করে দিয়ে, একপো করে দুধ রাখা।'

'বুঝলাম, তুমি আজ ব্লাউজটা গায় দিও।'

অচলা সেদিন সেটা গায় দেয়নি। তার পর কয়েকটা বছর কেটে গেছে।

কিন্তু আজ সে পরেছে সেই ব্লাউজটা। অসিতের সংগে সিনেমায় যাবে। 'কেমন দেখাচ্ছে?'

অখিল আজ হঠাৎ সকাল-সকাল বাসায় ফিরেছিল। অচলা কা'কে প্রশ্ন করেছিল অখিল বোঝেনি। সে জবাব দিল, 'বেশ!'

অচলার পিছু-পিছু অসিতও বেরিয়ে এল। অখিলকে দেখে ওরা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। অচলা পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'এত তাড়াতাড়ি যে?'

বগল থেকে ছাতাটা নামিয়ে রেখে অখিল বলল, 'বাবুরা ছুটি দিয়ে দিলে।'

অচলার পাংশু মুখ আরও পাংশু হয়ে গেল।

অনেক তর্কাতর্কির পর আর একটু এগিয়ে এল ওরা। বৃষ্টিও একটু কমল যেন। অখিল বলল, 'আমি ভুল করিনি। তবে অন্ধকারে, জলে, বাতাসে কেমন যেন বিদিক হয়ে গেছি। তোমার দিদির বাড়ী ভবানীপুর, তার চেয়ে নির্ঘাত এ বাসাটা কাছে।'

'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'একটু বিশ্বাস ও নির্ভর করতে শেখ। নইলে মিছেমিছিই কষ্ট পাবে?'

'কি সুখই না দিচ্ছ! রাজ্যিশুদ্ধ, মানুষ চেয়ে-চেয়ে সং দেখল।'

অখিল জবাব না দিয়ে একটু রাস্তার বাঁক ঘুরল। বাঁশঝাড় ও বট গাছের ভিতর দিয়ে পথ। ব্যাঙ ডাকছে নিকটের নালা-নর্দমা-পুকুরে। পোকা-মাকড়েরও ঘ্যানঘ্যানানি শোনা যাচ্ছে একটানা। ওপরে বাদুড়, পাশের জলায় একটা মর্মান্তিক আর্তনাদ। ক্ষুধার্ত সরীসৃপ নিশ্চয় শিকার ধরেছে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুতালোকে নালা-নর্দমার জলধারা ক্ষুরধার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আবার সেই মর্মান্তিক আর্তনাদ!

'ও মা গো! তুমি কি আমাকে এখন ফেলে পালাবে নাকি?'

অখিল কেমন যেন একটু হাসল। 'যা বলেছ অচলা!'

একটু পরেই গোটা কয়েক ভুতুড়ে বাড়ীর মত বাড়ী ছাড়িয়ে অখিল থামল। পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড একটা উঠান। সদর দরজা হাঁ-করা রয়েছে। ভিতরে সারি-সারি ঘর। টিনের ছাউনি। দূর থেকে যতটা খারাপ বলে বোধ হয়েছিল অচলার, নিকটে এসে তার আর তা মনে হল না। প্রায় প্রত্যেক ঘরে আলো জ্বলছে। বাড়ীটা নতুনই।

'ঐ দক্ষিণমুখো কোঠাটা আমাদের।'

প্রকাণ্ড সদর দরজাটার কাছে এসে অচলার মনে আতঙ্ক হল—কিসে যেন ওকে গিলে খাবে। এ নিতান্তই কুসংস্কার। অচলা ভিজে কাপড় সামলে অখিলের আবডালে আবডালে এগিয়ে এল।

একটি যুবক অভ্যর্থনা জানাল, 'আসুন বৌদি, এসো অখিলদা!'

অচলা একটি বার চেয়ে দেখল—এমন সুশ্রী মুখ তার এ-জীবনে নজরে পড়েছে কিনা সন্দেহ। সে আরও যেন অখিলের গায়ের সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

সুইসটা টিপে দেয় অসিত। 'এই যে আপনাদের ঘর।'

অসিত তেমন সুন্দর নয়। রঙটা ময়লাই কিন্তু বড় সুন্দর তার চোখ-জোড়া। তার ওপর গভীর ভ্রূরেখা যেন স্বপ্ন-কুহেলি বুলিয়ে দিয়েছে। একগাছি সরু শিকলের সংগে কয়েকটি চকচকে চাবি। সে এগিয়ে এসে ঘর খুলে দিল। অচলা ঝটিতি ঘরে প্রবেশ করল।

'অখিলদা, এত দেরী হল যে?'

'আর বল কেন, পরে শুনো—আগে ঠেলাওয়ালাকে বিদায় করে দিই। একটু সাহায্য করবে আমাকে?'

অসিত বলল, 'নিশ্চয়।' সে এগিয়ে গেল অখিলের সংগে।

অচলা সংকুচিত হয়ে ভাবে, আবার কিসে কি বলে ফেলে তার স্বামী।

জল ক্ষান্ত হয়েছে। ব্যারাকের মত প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রায় চিড়িয়াখানার সামিল। হরেক রকম ভাড়াটে—উড়িয়া, মাদ্রাজী, বাঙালী। নিকটেই দুটো কারখানা। ওখানেই পুরুষরা কাজ করে। কয়েক জন ধোপাও আছে কোণের ঘর দুটোয়। ছেলে-মেয়ে অসংখ্য। এদের সাজসজ্জা, হাসাহাসি দেখে পিত্ত জ্বলে গেল অচলার। আগের বাড়ীটায় চাল দিয়ে জল পড়ত, এখানে এদের সংগে কল-পাইখানা নিয়ে এঁটে উঠতে নাক এবং চোখ দিয়ে নিত্য জল গড়াবে অচলার। তার সর্দি আরোগ্য না হয়ে বরং স্থিতিশীল হয়ে বুকে বসবে। ও-বাসায় যারা ছিল তারা কেউ বড়লোক নয়, কিন্তু এমন জগাখিচুড়িও ছিল না।

অসিতের পরনে একটা ঢিলা পায়জামা, গায় একটা দামী পুলভার—দুটোই শাদা ধবধবে। এ লোকটি এখানে বাস করছে কি করে? অচলা কিছুই স্থির করতে পারে না। ওর সম্পূর্ণ পরিচয় জানার জন্য অচলার ভিতর একটা সহজাত কৌতূহল চরম হয়ে ওঠে। ওর কথা তো কোন দিন অখিল বলেনি? এক স্থানে কি চাকরী করে?

'বৌদি, এগুলো একটু ঠেলে সরিয়ে রাখুন। না, না, তার আগে ভিজে কাপড় বদলে আসুন। ঐ তো কলতলা। ওটা আমার এবং অখিলদার। ওর জন্য আমাকে আগে থেকে একশ' টাকা বেশি সেলামী দিতে হয়েছে।'

পূর্ব থেকে এ-সব বন্দোবস্ত করার অর্থ কি? অখিল কি এ টাকার ভাগ দিতে পারবে? তবে সুবিধা ভোগ করবে কি করে? একদিনের জন্য এ উদারতা গ্রহণ না করাই উচিত।

অসিত বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অচলা কাপড়ের ময়লা পুঁটলিটা খুলতেই পারছিল না। এগুলো যে অসিত কি করে হাতে করে বয়ে নিয়ে আসছে! কিনা তাদের বিছানাপত্তর!

'ব্যস, ঠেলাওয়ালা বিদায়—এইবার তাড়াতাড়ি কলতলা যান বৌদি। এই টর্চটা নিয়ে যান।'

হালকা ছোট্ট একটি সৌখিন জিনিষ। ভালই লাগল হাতে তুলে দিতে। একটু সুন্দর গন্ধ এল অসিতের গা দিয়ে। পর-মুহূর্তেই তা বোঁটকা হয়ে উঠল অখিলের আগমনে। শাড়ী-গামছা নিয়ে অচলা কলতলার দিকে চলে গেল।

'ওটা নয়, ওটা নয়, পাশেরটায় যান।'

অচলা তার কথায় কান দিল না।

রাত্রে অখিল বিছানায় গা দেওয়া মাত্র অচলা প্রশ্ন করল, 'ও কে? ওর কথা তো কখনও শুনিনি?'

'অসিতের কথা জিজ্ঞেস করছ? ওর সংগে আমি ইস্কুলে পড়তাম।'

'ঐ কচি ছেলের সংগে!'

'কচি নয়, ওর বয়েস হয়েছে। বার থেকে দেখে ওর কিছু বোঝা যায় না। একদিন অফিস-ফেরতা দেখা, ওই সংবাদ দিলে এ বাড়ীটার। তোমার পছন্দ হয়েছে তো?'

'হুঁ।'

'দেখ কোন অসুবিধা নেই। ঘরটা কেমন নতুন—ভাড়াও কিন্তু সে অনুপাতে বেশি নয়।'

'হুঁ।'

'কি ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি—ভাবছি, বড্ড ঘুম পেয়েছে আমার।'

'তা তো পাবেই।' একটু থেমে অখিল জিজ্ঞাসা করল, 'আলো নিবিয়ে দেব?'

'দাও।'

কিন্তু অখিল ঘুমিয়ে যাওয়ার পরও কেন যেন অচলা জেগে থাকে। হয়ত সর্দিটা তার প্রবল হয়েছে। সে কেবলই ছটফট করছে।

অসিত সুশ্রী, সদ্‌ব্যবহারী। কেন তাকে বোঝা যাবে না বাহির থেকে? অখিলের কথার এই অর্থ, না কোনই অর্থ নেই যাতে মানুষ অন্তত ফাঁফরে পড়ে? অনেক ভেবে-চিন্তেও কোন হদিশ করতে পারে না অচলা। তবে সে একটা ভয় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

মুখোমুখি দু'খানা ঘর।

ঘুম থেকে উঠেই অচলা দেখে যে একখানা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে অসিত কি যেন পড়ছে। একটা ছোকরা চাকর তাকে চা দিয়ে যায়।

অচলাকে উঠতে দেখে অসিত চট করে কাপটা নামিয়ে রাখে। 'গুড মর্ণিং বৌদি! আজ আবার ভুল করে ওদের কলতলা যাবেন না, এই চাবিটা নিন। বালতি সাবান সমস্তই আছে ওখানে।'

ভোর না হতেই এতখানি অনুগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকা নিতান্তই বিসদৃশ। যেন অসিতের রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। চোখের কোলে কেমন যেন কালো দাগ পড়েছে। অচলার অনুশোচনা হয়, রাত্রে সেলামীর ব্যাপারটা নিয়ে স্বামীর সংগে অন্তত একটু আলোচনা করা উচিত ছিল। এখন পর্যন্ত অখিলের ঘুম ভাঙেনি। তাকে ডেকে তোলাটাও তো ভাল দেখাবে না।

'ভাবছেন কি? এই চাবিটা নিন।'

'আমরা তো সেলামীর ভাগ দিতে পারব না?'

অসিত হেসে ওঠে। 'ছি: ছি: বৌদি···এ কি বললেন?'

অচলা চমকে ওঠে। এ হাসি কি মানুষের? তার সমস্ত প্রতিরোধের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তার স্বামী সেলামীর ভাগ দিতে পারুক কি না পারুক, সে চাবিটা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

ঘুম থেকে উঠে অখিল স্নান করে এল। তার অফিস আটটায়। খেতে বসলে অচলা জিজ্ঞাসা করল, 'কি, তুমিও কি অসিত বাবুর কলতলাটাই ব্যবহার করছ—সেলামীর কথা শুনেছ?'

'শুনেছি। কিন্তু তুমি কি করেছ?'

'বা রে আমি কি করব? আমি তো না-ই বলেছিলাম, জোর করে আমায় চাবি গছিয়ে দিলে।'

'ওর স্বভাবই ওই। ওকে বোঝানই কঠিন অচলা! ও যখন আছে, আমি সেলামী দি কি না দি, এক রকম চলে যাবে।'

'এত বড়লোক যে পাওনা টাকা ছেড়ে দেবে?'

'জানি নে। তবু এইটুকু জানি যে ওর ত্রিভুবনে কেউ নেই। ওর সংগী চাকরী আর বই। ঘরে ঢুকে দেখলেই টের পাবে।'

'বয়ে গেছে আমার পরের ঘরে ঢুকতে।'

অচলার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল অখিল। 'ও এম-এ পাশ করেছে। আমি ফেল করেছিলাম ম্যাট্রিক। তার পর

আর পড়াশুনা হয়ে ওঠেনি আমার। জানই তো, সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে শত ইচ্ছায়ও কিছু করা যায় না ?'

'তা ঠিক।' মুখে এ কথা বললেও অচলা মনে-মনে বিশ্বাস করতে পারে না। যার জোরে মানুষ এতগুলো পাশ করে, সেই মেধাটাই তার স্বামীর কম। সে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে।

'আচ্ছা, তোমার যখন সহপাঠী তখন তোমায় অখিলদা বলে কেন ?

'ক্লাশে আমার একটু দুর্নাম ছিল বয়েস বেশি বলে। দুর্নাম নয়, ঘটনাটাও সত্যি। ছোটবেলা যে আমার কি ভাবে কেটেছে অচলা ! ইস্কুলে ভর্তি হতে দেরী হয়ে গেল। তার রেশ তোমার কাছে এসে পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমাদের দু'জনার বয়সে কি একটু ব্যবধান ! সংসারে দাঁড়াতে-দাঁড়াতেই জীবনের আট আনা ক্ষয় হয়ে গেছে। তবু এখনও কি ঠিক মত দাঁড়াতে পেরেছি !' অখিল কেমন করে যেন অচলার দিকে তাকায়। তার খোঁচা-খোঁচা দাড়ির ভিতর কয়েকটি চক্‌চক্ করছে পেকে। মুখখানার হাড় ঠেলে উঠেছে ওপরের দিকে।

ঐ মুখ ও দৃষ্টির দিকে চেয়ে অচলার অন্তর ব্যথিত হয়ে ওঠে। অখিল সুন্দর থাক, কুৎসিত থাক, কি যত দূরই বেমানান হক—অচলা যেন স্বামীর বর্তমানেই শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে মরতে পারে !

অখিল তখনও বাড়ী ফেরেনি। যারা এক বেলা অফিস করে তারা অবশ্য ফিরে এসেছে। অসিতের গলা শোনা গেল তার কোঠায়। সন্ধ্যা হতে না হতে অচলা আলো জ্বালল। সংগে-সংগে মুখোমুখি ঘরে অসিতও টিপল সুইচ। যেন প্রচ্ছন্ন কোনও রংগ করল সে। অচলা লজ্জা পেল। মনে-মনে একটু কষ্ট না হয়েও পারল না। এবার মাইনে পেলে একটা পর্দা কিনতে হবে।

অচলা উনানে আঁচ দিয়ে চাল ধুতে গেল। সে ইচ্ছে করেই ও-ঘরের দিকে তাকাল না। দেখা হলে একটা কিছু তো বলতেই হবে। অন্তত একটু না হেসে তো উপায়ই নেই।

সামান্য ক'টি চাল। সে একটু ধীরে-ধীরে ধোয়। যতক্ষণ দৃষ্টির বাইরে থাকা যায় ততক্ষণই মংগল। ঘরে গিয়ে ওঠা মাত্রই হয়তো আলাপ জমাতে আসবে। অত বড় একটা শিক্ষিত লোক, তার সংগে একা-একা সে কি কথা বলবে !

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই অখিল আজ ফিরেছে। অচলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। 'নোংরা জুতো-জোড়া আর ঘরে আনছ কেন, বারান্দায় থাক।' অচলার গা রি-রি করে ওঠে।

'যদি চোরে নিয়ে যায় ?' অখিল সবিস্ময়ে বলে, 'নতুন বাড়ী !'

'কি না চিজ, চোরের চোখে আর ঘুম নেই তোমার জুতোর কথা ভেবে। ও-ঘরের তো কত দামী জিনিষ বাইরে পড়ে থাকে।'

'আচ্ছা, তবে বারান্দায়ই রাখি !'

কিছুক্ষণ বাদে অচলা বলে, 'ও কি মুখ-হাত ধুয়ে এলে, কিন্তু কাপড় তো ছাড়লে না ?'

অখিল এবার আর একটু বেশি বিস্মিত হয়। তার কাপড়ের যা পুঁজি তাতে বার বার বদলান অসম্ভব। এবং তাই তার অভ্যাসও নেই। 'কি পরব, আরখানা তো ভেজা, সেলাই করারও তো প্রয়োজন।'

'আমার এই শাড়ীখানা ফেরতা দিয়ে পরো। কাল কিন্তু দাড়িটা নিশ্চয় কামাবে। তোমার কি বিশ্রী লাগে না ?'

'লাগলেই বা উপায় কি—মাইনে তো পরশু পাব।'

'সে কথা শুনি নে। আমি বাজারের পয়সা বাঁচিয়ে একখানা ব্লেড এনে দেব কাল।'

'আমার যে অভ্যেস নেই অচলা, কেটে-কুটে যাবে।'

'আর পাঁচ জনের ভিতর থাকতে গেলে, তাদের মত অভ্যেস করতে হবে। কোন অজুহাত আমি শুনতে রাজি নই।'

'সকাল বেলা তাদের মত আমি সময় পাই কোথায় ?'

'করে নিতে হবে, তর্ক করলে চলবে না।'

'বেশ, তুমি যখন বলছ তাই হবে। এখন খেতে দাও, পেট পুড়ে যাচ্ছে।' ঘরের ভিতর পায়চারি করতে-করতে অখিল জিজ্ঞাসা করে, 'আজ বুঝি সারা দিন কলতলাতেই ছিলে, সব ধবধবে ফটফটে যে ? কিন্তু সর্দিটা কি তোমার সেরেছে ? এসব দুচার দিন পরে করলেও তো চলত। আবার যদি জ্বর-টর হয়ে পড়ে ?'

'একান্ত হয়ে পড়লে কি আর করা যাবে। আমাদের ভাগ্যে তো কখন ধোপাবাড়ী দেওয়া হবে না, তা বলে তো তোমার মত নোংরা বুকে করেও বসে থাকতে পারব না আমি।'

অখিল অযথা আর কথা বাড়ায় না। সে কেবল পায়চারি করে।

অচলা তাড়াতাড়ি রান্না-বাড়ার কাজ সারে। তবু নিত্যকার থেকে একটু দেরী হয়ে যায়। স্বামীর অবস্থা দেখে সে বিব্রত হয়ে আরও দ্রুত হাত চালায়।

'আজ কি কারুকে নেমন্তন্ন করেছ, দু'খানা পিঁড়ি যে ?'

অচলা লজ্জায় একেবারে ঝলকে ওঠে। 'কি করব, তোমার বন্ধু চাল পাঠিয়ে দিলে। বললে তার চাকরটা নাকি দুপুরের পর চম্পট দিয়েছে কি কি সব চুরি করে নিয়ে। কেমন করে অস্বীকার করি বল তো দুটি ভাত রেঁধে দিতে ? তার জন্যই তো আলুর দমটা রাঁধতে দেরী হল এ-বেলা।'

'অসিত, এসো ভাই, এসো, হয়ে গেছে।'

'বৌদি, চাকরটা উঠে গিয়ে অভিশাপে আশীর্বাদ হয়েছে। এমন রান্না শীগ্‌গিরও কপালে জোটেনি। হাট-বাজার হল না, এত সব রাঁধলেন কি করে ?'

অখিল বলল, 'মর্জি হলে উনি রাঁধেন ভাল—হাট-বাজারের দরকার হয় না। এক মুসুর ডাল দিয়েই কোন্ না তিন পদ রাঁধলেন।'

অচলা চোখ রাঙায়, 'তুমি খাও দেখি চুপ করে।'

অখিল চুপ করেই কয়েক গ্রাস ভাত খায়। 'না, সত্যি ভাল হয়েছে আলুর দমটা।'

'তা হলেও কি তোমার মুখ দিয়ে বার বার ও-কথাটা বলা শোভা পায় ? ভাল বলতে হলে বলব আমরা—কি বলেন বৌদি ?'

'বৌদি কি আর আমার স্বপক্ষে কিছু বলবেন ? বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে তুমি আরও যে চমক লাগিয়ে দিয়েছ ! এখন সর্দি থেকে সাংঘাতিক কিছু না হলে বাঁচি। তুমি কি একবারও আমার ঘরখানার দিকে চেয়ে দেখেছ ?'

অচলা যত দূর সম্ভব ঘরখানা পরিপাটি করে গুছিয়েছে। তবু

ছেঁড়া সাজ-সজ্জা নানা স্থান থেকে উঁকি মারছে। সবই যদি ছেঁড়া হয়, কি দিয়ে কি ঢাকে! অসিত মুখ তুলে চারি দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। যদি অচলার পক্ষে বিদ্যুতালোকটা নিবিয়ে দেওয়া সম্ভব হত! কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন কটমট করে অখিলের দিকে তাকায়!

'তোমাকে অনুকরণ করছেন!'

অচলার হাতের ঠেলায় অনুমানের অনেক বেশি ভাত পড়ে যায় অসিতের পাতে। 'এ কি বৌদি, দোষ করল এক জন, সাজা হল আর এক জনের?'

অখিল ও-কথায় কান না দিয়ে বলে যেতে লাগল, 'মানুষের রুচিবোধ ভাল, কিন্তু একুনে তো রোজগার করি মাত্র আশী টাকা!'

অচলা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে মাথার কাপড় ভাল করে মুখের ওপর টেনে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়া শেষ হয়। অসিত আঁচিয়ে এসে নিজের ঘরে না ঢুকে, এই কক্ষে কি যেন ভেবে প্রবেশ করে। 'আপনারা দু'জনেই আছেন, আমি একটা প্রস্তাব করব? ঠেকা যখন নিজের, তখন আমাকেই মুখ খুলে বলতে হচ্ছে। দেরী করলে কালই বিপদে পড়তে'হবে, তাই আজই বলছি। শুনুন বৌদি, আমি এখানে খেতে চাই—শোনো অখিলদা, আমি মাসে চল্লিশ টাকা দেব।'

সবিস্ময়ে অচলা মন্তব্য করে, 'অত টাকা কিসে লাগবে!' অচলা স্বামীর মুখের দিকে তাকায়।

'ও কি, কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারবেন না—যে যার আলাদা জবাব দিন। বৌদি, আপনাকে আগে জবাব দিতে হবে, কারণ পরিশ্রমটা আপনার হবে বেশি।'

'এ আর এমন একটা কি পরিশ্রম, তুমি কি বল?'

'না, না, অখিলদা কিছু বলতে পারবে না। আপনিই নিঃসংকোচে জবাব দিন।'

'খাবেন এখানে, ভালই তো—দুজনের জন্য যে রাঁধতে পারে, তিন জনের জন্তেও তার কষ্ট হবার কোনও কারণ নেই।'

'এখন অখিলদা কি বলো, ও টাকায় তো কুলাবে?'

অখিল হাসে। 'না কুলাবার কি আছে?'

অসিত নিজের ঘরে চলে যায়।

'দেখলে তো, ওর যা দরকার তা আদায় করে নিলে। না করার আর উপায় রইল?'

অচলা শুধু ছোট্ট একটি উত্তর দেয়, 'তা বটে।'

ভাত মুখে দিতে-দিতে অচলা বলে, 'টাকাটা কি বেশি হল না?'

'না গো, একটা তোলা ঝি না রাখলে তোমার কি করে চলবে?'

অচলা ভাবে, ঝি রাখবে, না আর কিছু! এবার সংসারের খরচ কিছু উদ্বৃত্ত করে তার দু'-একটা প্রয়োজনীয় প্রসাধন-সামগ্রী কি একটা ব্লাউজ অথবা শাড়ী-টাড়ী জুটবে।

পূর্বের ব্যবস্থানুযায়ী আর পর্দা কেনা হয় না—অখিল অথচ মাইনে পেয়েছে পুরোপুরিই। মুখোমুখি ঘর পরস্পরের দিকে আগের মতই চেয়ে থাকে।

অসিত অফিসে চলে যায়, চাবিটা ফেলে দিয়ে বৌদির কাছে।'

'আমি রাখতে পারব না, আপনার ঘরে কত কি দামী জিনিষ আছে।' অচলা আপত্তি করে। 'না, না, নিয়ে যান, নিয়ে যান।'

'কোনও সোনা-গয়না নেই, থাকলেও তেমন, কোনও ভয় নেই আপনাকে।' অসিত এমন করে তাকায় যে তার দৃষ্টি গিয়ে অচলার সর্বাংগে ছড়িয়ে পড়ে। 'আপনি অখিলদা'র স্ত্রী, আপনার কোন আপত্তিই আমি শুনতে রাজী নই। আপনি তো জানেন না, ছোট বেলা থেকে আমরা পরস্পরকে কত ভালবাসি।'

'হতে পারে, কিন্তু তাতে আমার কি?'

'কথাটা খুব যুক্তিযুক্ত হল না, ভেবে দেখবেন, এখন আফিস চললাম, দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

সত্যই সারা দিন ধরে একটা গ্লানি অনুভব করেছে অচলা। এমন একটা বেফাঁস বেমানান কথা তার বলা উচিত হয়নি। ছিঃ ছিঃ, কি ভেবে গেছে অসিত! সামান্ত একটা ব্যাপার, চাবিটা নীরবে রেখে দিলেই চলত। সন্ধ্যার সময় সে কি ক'রে যে অসিতকে মুখ দেখাবে!

দিনের কাজ-কর্ম শেষ করে সে আর চোখ বুঁজতে পারে না। একখানা বই-টই পেলে হত। অখিলের ঘরে সে-সব বালাই নেই। আছে ছেঁড়া কাঁথা, আর তা সেলাই করার জন্য সুঁচ। বিয়ের আগে পর্যন্ত সে নিয়ম মত পুঁথি-পুস্তক গাঁয়ের লাইব্রেরী থেকে এনে পড়েছে। বন্ধু-বান্ধবীদের সংগে আলাপ-আলোচনাও করেছে। কিন্তু যেমনি অখিলের হাতে পড়া, অমনি তার সব ঘুচে গেল। কেবল জোড়াতালি আর শিল-নোড়া। কি যে অদৃষ্ট করে সে জন্মেছিল! এত বড় সহরে এসে সে কি একটা দিনও অখিলকে নিয়ে সিনেমায় যেতে পেরেছে? কবে এক জোড়া স্যাণ্ডাল কিনে দিয়েছিল, তাই নিয়ে কিনা যখন-তখনই খোঁটা দেয়, 'অনভ্যাসের ফোঁটা···'

পয়সার অভাবেই যে সিনেমা দেখা হয়নি, তা নয়। অভাব মনের। বলে কিনা, 'সারা সপ্তাহ হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে আর আমার রবিবারটা নষ্ট করতে ইচ্ছা করে না। সিনেমাখোর বন্ধুদের মুখেই তো শুনি, এবারের পয়সাটা মাটি হয়েছে। অখাদ্য বই অখিলদা, অখাদ্য। তুমি যে দেখ না বেশ কর। সারা সহরের মধ্যে কোনটা যে ভাল বই বেছে নেওয়া দায়। সব্বাই গাঁটকাটা—হিন্দি বাঙালী কি ইংরেজি।'

'তা হলে এগুলো চলছে কি করে?'

'রেশনের অখাদ্য চাল খাও যেমন করে।'

'হুঁ। চুপ কর, তোমাকে আর বলব না কক্ষনো।'

'গাঁয়ের টপ, কীর্ত্তন, যাত্রা এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল অচলা, সহরে এসে আমাদের স্বাস্থ্য গেল, সম্ভ্রম গেল, যা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ তা-ও হয়েছে কনট্রোল। এক-একটা ছবি নাকি স্বামি-স্ত্রীতেও দেখা সম্ভব নয়।'

'বলি দাদা ঠাকুর, তবে দেশে ফিরে চল না! চাষ-আবাদ করবে, থাকবে মনের সুখে, এত ঝক্কি-ঝামালায় দরকার কি?'

'কি আছে যে দেশে ফিরে যাব? যদি তেমন সুযোগই থাকত তবে কি আর দিনে চোদ্দ ঘণ্টা খাটি? এ পরিশ্রম তুমি ধারণা করতে পারবে না অচলা! রেলের ইঞ্জিনও বিশ্রাম চায়।'

'তোমার মত সব্বাই অমন খাটে।'

'তা ঠিক।' বলে অখিল এক দিকে চলে গেছে।

চোখে জল আসার উপক্রম হয়েছে নব বিবাহিতা অচলার। এখন না হয় কতকটা সহ্য হয়েছে অচলার—হয়তো কিছু মায়াও জন্মেছে স্বামীর 'পর, কিন্তু তখন ছিল একেবারেই অসহ্য। অখিলকে দেখলেই গা জ্বলত।

সেদিন দুপুর বেলা নিজের জীবনের কয়েকটা পুরাতন পাতা উল্টেই সময় কেটে যায় অচলার। বাঃ রে, এর মধ্যেই সন্ধ্যে হল!

সন্ধ্যে ঠিক হয়নি। বেলা তলিয়ে গিয়েছিল দূরের বড় বাড়ীটার আবডালে। ছেলেদের কলরব শোনা যাচ্ছে চার দিকে। কোনও-কোনও ঘরে উনানে আঁচ পড়েছে। দু'-একটি করে ক্লান্ত-পরিশ্রমী মানুষ ফিরছে বাড়ী—যেমন হালের জোয়াল-ছাড়া বলদ ফেরে গোয়ালে। গৃহহীন, সমাজহীন মানুষের মতই অসংখ্য উদ্বাস্তু পাখি কিচির-মিচির করছে নিকটের একটা গাছকে কেন্দ্র করে। স্থায়ী বাসিন্দারা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছে না নবাগতদের পুনর্বাসন।

বাইরের রাস্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে আনে অচলা। পাখিগুলোর কলরব তার আর কানে যায় না। এর পরও তো অখিল আবার অন্য স্থানে যাবে। নতুন উদ্যমে তাকে আরম্ভ করতে হবে কাজ। অচলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার আগেই অসিত এসে বাড়ী ঢোকে। 'এই যে বৌদি, আপনার জন্য সামান্য ক'টা জিনিষ এনেছি। ধরুন তাড়াতাড়ি।'

পরিশ্রান্ত মানুষকে প্রত্যাখ্যান করা কি ভাল দেখায়? অচলা ক্লান্ত হাত বাড়িয়ে দেয়।

অসিতকে অচলা চা তৈরী করে দেওয়ার ফাঁকে বাণ্ডিলটা খুলে ফেলে। সুগন্ধি দামী তৈল এক শিশি, আলতা ও পাউডার।

'এতগুলো পয়সা নষ্ট করতে গেলেন কেন? এ আপনার ভারি অন্যায়।' অচলা লজ্জা ও আনন্দে কতটা রক্তিম হয়ে ওঠে, তা সে টের পায় না।

কিন্তু অসিত তা লক্ষ্য করে। হয়তো সে চায়ের স্বাদের সংগে চোখের সাধও মিটিয়ে নেয়। 'বৌদি, পয়সা দিয়ে করব কি? সংসারে আমার কে আছে? কাউকে তো ভালও বাসতে পারলাম না আজ পর্যন্ত।'

'এখন এক জনকে বিয়ে করুন—ভালবাসুন—আপশোষ মিটে যাবে।'

'কার বা গরু, কে দেয় ধোঁয়া ও হয় না বৌদি, হয় না।'

'হবে ঠাকুরপো, হবে, আমরা তো রয়েছি। আচ্ছা দাঁড়ান, আজই আফিস থেকে এলে বলছি।'

'না, না, দয়া করে ওসব বলবেন না অখিলদাকে। তার যে পছন্দ, শেষ কালে আমি আর কি মারা যাই!'

কথাটা বুকে বেঁধে অচলার। 'পছন্দ একেবারে মন্দ হলে কি এ ঘরে আমার আসার কোনও হেতু থাকত ঠাকুরপো? মুখে যা-ই বলি, মনে-মনে হিসেব করলে তো বুঝি, কিছুতেই কুলাতে পারেন না।'

অসিত একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। 'না, না, আমি ঠিক ও-ভাবে বলিনি। ঠাট্টাটাকে ঠাট্টার মত না ধরলেই তো মুস্কিল!'

'আমাকেই বা অত বোকা ঠাহর করছেন কেন?' অচলা হেসে বলে, 'চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

অসিত কাপটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। অচলা যায় গা ধুতে কলতলা।

ঘর্মাক্ত কলেবরে অখিল রাত ন'টায় বাড়ী ফেরে। চিরদিনই অচলার সাজ-সজ্জা অবস্থার তুলনায় ফিটফাট, আজ যেন একেবারে হা-হা করছে। মাথায় কাপড় নেই, খোঁপা জড়িয়ে একগাছা সুগন্ধি সাদা ফুলের মালা। তেলের এবং ফুলের গন্ধে আমোদিত হয়েছে ঘরখানা।

ঘামে-ভেজা জামাটা অখিল সসংকোচে দূরে টাঙিয়ে রেখে বলে, 'ফুল কোথায় পেলে, এমন সুগন্ধি তেল বা কে দিলে, সন্ধ্যে বেলা স্নান করেছ না কি?'

'না গো ভয় নেই, স্নান করিনি। কেবল চুলে একটু তেল মেখে মাথাটা ভিজে গামছা দিয়ে মুছেছি। কি করব, তোমার বন্ধু জিজ্ঞেসাবাদ না করেই এ সব এনে হাজির।' পা ও গালের দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে অচলা বলে, 'একটু যদি না পরি তবে কি ভাল দেখায়?' তার পর ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করে, 'মালাটা কেমন মানিয়েছে, তা তো বললে না?'

'সময় দিলে কই?'

'আমি তো জানি, না খোঁচালে তুমি হয়তো কাল আফিস চলে যেতে, মালা শুকিয়ে যেত খোঁপায়।'

'সে কথা একেবারে মিথ্যা নয়।'

'ও কি, হাতে তোমার কি? মোড়কটা দেখি?'

'না, না, এ আর দেখে করবে কি! একটা তেল ও পাউডার এনেছি আমার ভাগ্নীর জন্য।'

'ভাগ্নী? কই এত দিন তো তার কথা শুনিনি! তারা না পাটনায় থাকে।'

'কাল এখানে, মানে, চেতলা এসেছে।'

'মিথ্যা কথা।' অচলা বাণ্ডিলটা খুলে সস্তা জিনিষ দেখে দূরে ঠেলে রাখে। 'এ হতেই পারে না।'

'যদি বিশ্বাস না কর করব কি?' অখিল সমস্ত গুছিয়ে সযত্নে তুলে রাখে তাকের ওপর।

অতিরিক্ত খাটুনিতে এবং তুচ্ছ অত্যাচারে অচলার শরীরটা আবার একটু নরম হয়।

'বললাম একটা ঝি-টি রাখো, তা তো শুনবে না?'

'তোমারও তো শরীর খারাপ, এক জন তোলা-চাকর রাখ না! আপিস যাবে, বাজার করবে, আর দিন-রাত ছড়ি ঘোরাবে আমার ওপর।'

'দুঃখের বিষয়, সে চাকর কলকাতায় মেলে না।' অসিত এসে বলে, 'মিললেও বৌদির নিশ্চয় পছন্দ হবে না।'

তিন জনেই হেসে ওঠে।

হাসলে কি হবে, সেদিনই অসিত হঠাৎ বাসায় ফেরে, তখন বেলা প্রায় তিনটা। বাড়ীটা নীরব।

সংসারের কাজ-কর্ম সেরে, খেয়ে উঠতে-উঠতে অচলার দুটো আড়াইটা বাজে। তার পর সে আজ একটু গড়াগড়ি দিয়েছিল।

'চাবিটা বৌদি?'

'এই যে। এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন কেন আজ?'

ভারতের ঘরে ঘরে সমাদৃত
কাশির ওষুধ!
SIROLIN
'ROCHE'
ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক 'সিরোলিন'
ব্যবহারে অভ্যস্ত, কারণ—
সিরোলিন শীঘ্র কাশির ধমক কমিয়ে দেয়
সিরোলিন খুব অল্প সময়ে কাশি নির্মূল করে
সিরোলিন খেতে সুস্বাদু
সিরোলিন শিশুদেরও নির্ভয়ে খাওয়ানো যায়
—কোনো অনিষ্টকর উপাদান এতে নেই।
আপনার বাড়ীতে এক শিশি
'সিরোলিন' রাখবেন
VB 6614
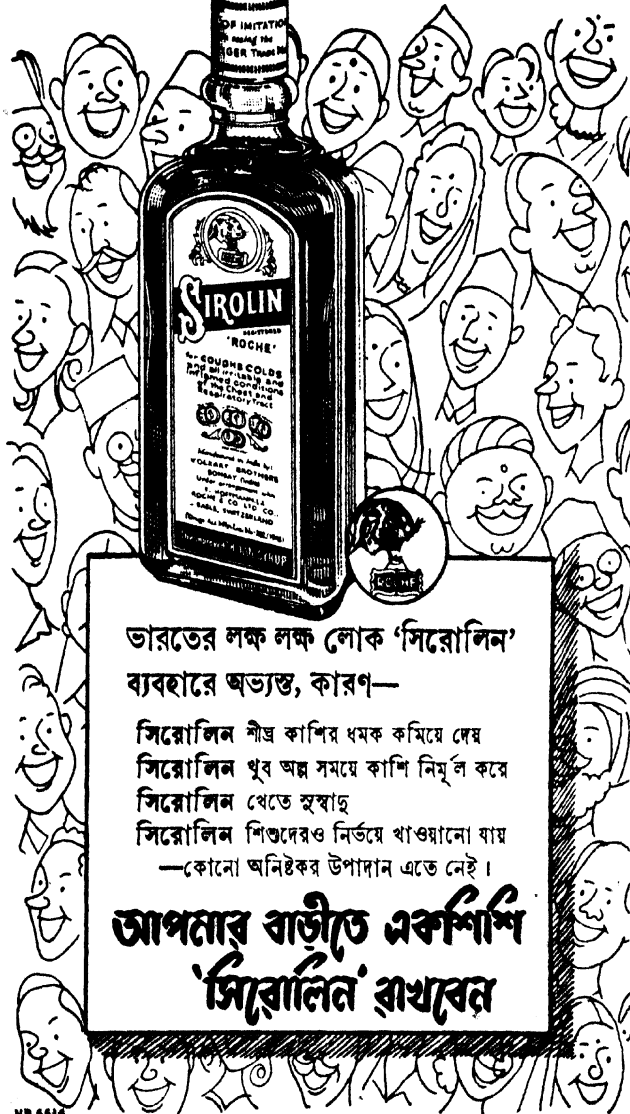
'এমনি।' বলে অসিত গিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে। অনেকক্ষণ আর বার হয় না। নিত্যকার মত রেডিওর শব্দও শোনা যায় না। অচলার মনে একটা তীব্র উৎকণ্ঠা জাগ্রত হয়। এত চঞ্চল মানুষ কি চুপ করে বসে থাকতে পারে! ঘর-দোর খোলা ফেলে রেখে কি সিনেমা দেখতে গেল না কি?

তা-ও তো নয়!

অচলা চুপি-চুপি এগিয়ে যায়। এক দিন স্বামীর কাছে জোর দিয়েই বলেছিল, এ-ঘরে সে ঢুকবে না। আজ তাকে ঢুকতে হয়। অসিত চুপ করে শুয়ে রয়েছে। চোখ দুটো তার ছল-ছল করছে। আজ স্নান করেনি অসিত। চুলগুলো রুক্ষ। নিশ্চয় কোন অসুখ করেছে। তবু অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে মানুষটাকে। সহানুভূতির চেয়েও কি শক্তিতে যেন দুর্বার আঘাত দেয় অচলার হৃৎপিণ্ডে। সে দ্বার-প্রান্তে থেমে পড়ে। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে?'

'জ্বর।'

আর একটু এগিয়ে এসে কপালে হাত দিতে হয় অচলাকে। 'সত্যিই তো।' সে তাড়াতাড়ি হাত তুলে নেয়, পাছে তার হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য অনুভব করে অসিত। ঘরের আসবাবের ওপর ধীরে-ধীরে চোখ বোলাতে থাকে অচলা। সমস্ত দেখে, অথচ কিছুই যেন তার মনে দাগ কাটে না। দুরন্ত গতিশীল ট্রেনের কামরায় সে যেন বসে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

একটু স্থির হয়ে অচলা জিজ্ঞাসা করে, 'জ্বর হল কি করে?'

'জানি নে। জানার উপায় থাকলে কি এত দূর গড়াতে পারত?'

কথাগুলি অচলার কাছে সহজ বলে মনে হয় না। অথচ সে অনায়াসে অসিতকে ত্যাগ করে চলেও যেতে পারে না। একটি-দুটি করে প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে হয়।

'অসুখ করেছে, সেরে যাবে, ভাবছেন কেন?'

'জ্বরের কথা ভেবে যে অস্থির হয়েছি, তাই বা বুঝলেন কি করে? যদি না-ও সারে তবু দুঃখ নেই। জীবনটা বড় তেতো লাগছে।'

'কেন বলুন তো?'

'বোঝা যায়, কিন্তু বোঝান যায় না। অনুভব করা যায়, কিন্তু অনুভব করান যায় না কারুকে, এই রহস্য!'

অচলা অনেক ভেবেও এ রহস্য ভেদ করতে পারে না। কি সুন্দর ঘরখানা, কি চমৎকার আসবাব-পত্র! ছবি, কেদারা, রেডিও—কোন্‌টার অভাব? ঘরের ভিতর ঢুকলেই প্রাণে রঙ লাগে। আলমারী দুটি সুদৃশ্য বই দিয়ে সাজান। যে-দিকে চাওয়া যায় মানুষের চোখ জুড়িয়ে যায়। সর্বোপরি রূপবান, তাদের তুলনায় বহু গুণে ধনবান এক যুবক এ-ঘরের অধীশ্বর। তার জীবন যদি তিক্ত হয়, ওরা ওদের ঐ পরিবেশে বেঁচে আছে কি করে?

অচলার মনটা হু-হু করে ওঠে। অসিতের নৈরাশ্য ও বিষাদ কি দূর করা যায় না? অচলা অসিতের স্বপ্নাতুর চোখের দিকে চেয়ে থাকে। অনেকক্ষণ এক ভাবে চেয়ে থাকাও সম্ভব নয় বলে মাঝে-মাঝে হাত বুলায় অসিতের কপালে। চুলগুলো দেয় গুছিয়ে। অসিত চুপ করে শুয়ে থাকে।

যে ঘরে অচলা ভেবেছিল ঢুকবে না, সে ঘর থেকে সে উঠতে পারে না।

অসিত উঠে রেডিওটায় একটু চাবি ঘুরিয়ে দেয়। ধীরে-ধীরে একটি গান ভেসে আসে। ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ঘরখানার চার দিকে অচলা মন্ত্রমুগ্ধের মত কান পেতে বসে থাকে। সে গানটা নির্দিষ্ট সময়ে থেমে যায়। আবার শোনা যায় আর একখানি।

এমনি ভাবে একটির পর একটি চলতে থাকে।

সন্ধ্যা বেলা শোনা যায় লাস্য-বিজড়িত এক কণ্ঠের আকুতি। গান তো নয়, যেন পূর্ণ আহুতি কামনা করছে কেউ।

অচলা নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে বসে থাকে। আলো জ্বালায় অসিত। অচলা উঠে চলে যায়। 'যাই, সন্ধ্যা হল।'

'ডালে এত নুণ দিয়েছে অচলা? আজ বুঝি মর্জি ছিল না, তাই···'

'রোজ-রোজ আর ভাল লাগে না একঘেয়ে কাজ।'

'উপায় কি অচলা, আমাদেরও অমনি হয়। কিন্তু আমরা কারুকে বলতে পারি নে।'

'সে কথা আমায় শুনিয়ে লাভ কি? যে বলতে পারবে না, সে মুখ বুঁজে মার খাবে।'

অখিল খাওয়ার দিকে মন দেয়, আজ সে বুঝতে পারে, অচলা আর যেচে ভাত দেবে না। সে চেয়ে নেয়।

'শান্তিটা মানুষের মনে। কেবল না বুঝে অস্থির হয়ে, অসময়ে কাঁটাল পাকাতে চাইলে আর পাকে না। যা আমার আপাতত পাওয়া সম্ভব নয়, তার জন্ম উন্মাদ হলে বর্তমানও যে নষ্ট হয় অচলা! অতএব সুখ এবং শান্তি শুধু মাত্র অভাব-বোধে নয়, আত্মতৃপ্তিতে।'

ঐ জন্যেই তোমার সংগে আমার বনে না—আর কোন দিন বনার আশাও নেই। তুমি হচ্ছ মান্ধাতার আমলের ঢেঁকি, তোমায় কিছু বোঝান যাবে না।'

'অতৃপ্তিটা স্ত্রীলোকের একটা রোগ। ও-রোগের একমাত্র ওষুধ একটি সন্তান। এত কাল বসে তা-ও হল না!'

তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে অচলা। কি বললে, সন্তান? শাঁখা-সিঁদূর দিয়ে ক্রীতদাসী করেও বুঝি আশ মেটেনি? এই আমি চললাম।'

অখিল চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোথায় যাচ্ছে অচলা? শাঁখা ভেঙে সিঁদূর মুছতে নাকি? শাঁখা-জোড়া একেবারে নতুন এনে দেওয়া হয়েছে!

মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে অখিল প্রায় মিনিট দশেক বসে থাকে। যা মনস্থ করে গেছে অচলা, অন্তত অখিল যা সত্য বলে ধরে নিয়েছে, সে কাজ সাংগ করতে তো এত সময়ের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়! অখিল উঠে দাঁড়ায়। দেখতে পায় যে মুখোমুখি ঘরে আলো জ্বলছে।

তবে কি অসিত সে আসার আগে খেয়ে যায়নি? খেয়ে গেলেও ঘুমায়নি? অচলা তো ও-ঘর কখনও মাড়ায় না?

'বার্লি খাচ্ছ যে অসিত, তোমার কি হয়েছে? অচলা তো আমাকে কিছু বলেনি?'

'বলে লাভ হবে কি? তুমি কি ডাক্তার? শুনলে তুমি হয়তো ভাত খেতেই বলতে।'

অসিত বলে, ভাত খেলেও দোষ হ'ত না। এমন একটা বেশি কিছু হয়নি। শরীরটা কেবল ম্যাজ-ম্যাজ করছে।'

'না, সাবধান হওয়া ভাল।'

'বৌদির সবই অতিরিক্ত। রুটি-লুচিও নয়, একেবারে বার্লি! এখন এক পালা ঝগড়া করে এলেন বুঝি?'

অখিল হেসে বলে, 'ও তো লেগেই আছে।' তার পরে সে অসিতের গায় হাত দিয়ে একেবারে গম্ভীর হয়ে যায়।

সংগে সংগে অসিতের মুখখানাও কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে।

অচলা বলে, 'তবে কি তুমি বলতে চাও ওঁর জ্বর হয়নি? এই যে দেখছি কপালটা তপ্ত?'

'কে বললে জ্বর হয়নি—তুমি তো আমার ওপর চটেই আছ? হাঃ হাঃ হাঃ!'

অখিল নিজের ঘরে ঘুরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

অসিতের সুস্থ হতে অল্প দিনই লাগে।

'আঃ, আপনি যা করলেন বৌদি!'

'এমন কিছু করিনি—এ মানুষের জন্ত মানুষেই করে।'

'আপনার সেবার বহর দেখে প্রলোভন হয় আরও কিছু দিন শুয়ে থাকতে।'

'তা আপনাকে থাকতেই হবে, মনে করেছেন যে কালই উঠে আফিস যাবেন, তা হচ্ছে না। আমার তো প্রথম ভয়ই হয়েছিল জ্বর আবার কোন্ পথে যায়! সে-বার আমার একটি ছোট ভাই মারা গেল টাইফয়েডে।'

'এখন আমার আর সে আশংকা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আপনার শরীরও তো ভাল যাচ্ছে না?'

অচলার অনুরোধেই অসিতকে কয়েক দিন ছুটি নিতে হয়। চলতে হয় নিয়ম-কানুন মেনে। সারা দিন সে বাড়ী থেকে বের হতে পারে না! উঠতে-বসতে অচলার নির্দেশ।

'বেশ ভাল লাগে আপনার শাসন।' চোখ-জোড়া স্বপ্নময় করে অসিত তাকায়। কিন্তু কত দিন এ ভাবে থাকতে হবে?'

'আর এক সপ্তাহ।'

'বড্ড যে সিনেমা দেখতে ইচ্ছা করছে। সেক্‌সপিয়রের অমর কাহিনী 'রোমিও জুলিয়েট' এসেছে চৈতালিতে।'

'সিনেমা? কি বই, ইংরেজী—আমরা তো বুঝব না। তা যাবেন তিনটার 'শো'তে। সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরবেন।'

'যাবেন আপনি? আমি সব বুঝিয়ে দেব। এমন ছবি আর হয় না বৌদি!'

'আপনার দাদা কি বলবেন! ওঁকে তো বলা হয়নি?'

অচলাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে অসিত বলে, 'ছবিটা মাত্র এক দিনের জন্ত এসেছে।'

'কি আর বলবেন—আমি যাব।'

'তবে প্রস্তুত হয়ে নিন।'

ভাত ছাড়া রাত্রির যাবতীয় রান্না দুপুর বেলাই শেষ করে অচলা। উনানটা সাজিয়ে রাখে। একটু দেরী হতে পারে বলে সুজি তৈরী করে রাখে স্বামীর জন্ত।

বেলা দুটো নাগাদ অসিত তাগাদা দেয়, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন।'

'এই যে আমার হল বলে! আপনার দাদা আসার আগেই তো ফিরব, ভয় কি! ভাত হতে একটু যদি দেরী হয়, খাবার তৈরী করে রেখে গেলাম।'

অচলার দেরী হচ্ছিল অখিলের দেওয়া সেই ব্লাউজটা খুঁজে বের করতে।

চৌকাঠ পেরিয়ে এসে সে অসিতকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখাচ্ছে?'

অখিল উত্তর দিল, 'বেশ!'

অসিত ও অচলা হতভম্ব হয়ে রইল।

'বাবুর এক ছেলে মারা গেছে, তাই তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দিলে—ভয় নেই, চাকরী যায়নি। ভাবলাম, বিকেলটা বাড়ী কাটিয়ে যাই। তা তোমরা সেজেগুজে কোথায় চলেছ?'

'তোমার খাবার তৈরী রয়েছে, একটু দয়া করে নিয়ে খেও। তুমি তো বললেও যাবে না, আমরা একটু সিনেমায় যাচ্ছি।'

'তা যাবে যাও, ভালই তো! তোমার কি জ্বর সেরেছে ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'কার্তিক মাস, হিম লাগিও না কিন্তু।'

অচলা ও অসিত যেন রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল উন্মুক্ত পথে। দু'জনেই শ্বাস টানল বুক ভরে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে অসিত বলল, 'বড় দেরী হয়ে গেছে।'

'আমার তো কোনও দোষ নেই ঠাকুরপো! ও এল, দুটো কথা কি না বলে পারি?'

'না, না, তা কি পারা সম্ভব? কিন্তু···'

দু'জনেই তাড়াতাড়ি হাঁটে। টিকিট না পেলে মুস্কিল। অচলা ভাবে, আবার স্যাণ্ডালটা এখন না বিদ্রোহ করে! তা হলে লজ্জায় মরে যেতে হবে। পদে-পদে গরীবের বাধা। অচলা অত্যন্ত দ্বিধার সংগে বলে, 'এগিয়ে একটা ট্যাক্সী করুন না?'

'অত টাকা তো সংগে নেই?'

অচলার কাছে নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলে ঠেকে। কিন্তু সে প্রতিবাদ করতে পারে না। সে মন্ত্রচালিতের মত হেঁটে চলে।

ওরা যখন বাড়ী ফিরে আসে, তখন অনুমানের চেয়ে রাত্রি বেশি হয়। একটা স্তব্ধতার ভাব নিয়ে অচলা ঘরে প্রবেশ করে। সে কাপড় ছেড়ে রাঁধতে যায়।

অখিল বলে, 'তোমার আর কষ্ট করতে হবে না—ভাত আমি রেঁধে রেখেছি।'

'আমি খাব না, তুমি খাও, শরীরটা আমার জ্বর-জ্বর করছে।'

'আমি খেয়েছি।'

'ভালই করেছ।'

গভীর রাত্রি! চার দিক অন্ধকার। অচলা অনবরত ছটফট করছে। কিছুতেই যেন সুস্থ হয়ে ঘুমাতে পারছে না।

'ও কি, তোমার হল কি?'

'আমার সারা শরীর কাঁপছে। আমাকে একটু জড়িয়ে ধরো।'

'জ্বর এল নাকি? আগেই বলেছিলাম একটু মাত্রা রেখে খাটতে।

'বুঝতে পারছি নে, বড্ড কম্প হচ্ছে। শক্ত করে জড়িয়ে ধরো আমায়।'

অখিল বিশ্বাস করতে পারে না অচলার এ আত্মসমর্পণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ঐকান্তিক অনুরোধ প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না। সে একটা চুম্বন করে বলে, "ভয় নেই, জ্বর নয়; বাতিক।'

অচলা একটু সুস্থ হলে অসিত জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন দেখলে ছবি?'

'একেবারে কদর্য। ঠাকুরপোর দোষ নেই—রোমিও জুলিয়েট দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দেরী হয়ে যাওয়ায় টিকিট পাওয়া গেল না। হাউস ফুল।'

'রোমিও জুলিয়েট বুঝতে কি করে?'

'বুঝিয়ে দিত।'

একটু হাসল অখিল। 'তার পর?'

এই প্রথম আমাকে নিয়ে গেছেন, শুধু-শুধু ফিরবেন—অন্য একটা সিনেমায় ঢুকলাম। তুমি হাসছ যে?'

এমনি। 'তার পর?'

'হিন্দী বই—আমারই সুবিধার জন্য বুঝিয়ে দিতে লাগলেন—একেবারে যাচ্ছে-তাই। নিতান্ত নোংরা।'

অখিল আবার একটু হাসল। 'বই অতটা নোংরা না-ও হতে পারে।'

অচলার মনে একটা সন্দেহ জাগ্রত হয়, তবু সে প্রতিবাদ করে, 'বলো কি—না, না, ঠাকুরপোও যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছিলেন।'

'আমি তো ছিলাম না—তোমার কথাই বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করে নিচ্ছি। যাক গে, ওর জন্য তুমি মন খারাপ করো না।' অখিল চুমো খেয়ে আবার অচলাকে গাঢ় আলিংগনে আবদ্ধ করে।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে অচলাকে এক প্রসূতি-সদনে দেখা যায়।

এক দিন, দু'দিন করে সাত দিন কাটে। অসিত একটি ফল নিয়েও দেখা করতে আসে না। সে নাকি ও-বাসা ছেড়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্যের অজুহাতে কাশ্মীর যাবে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

একজন আত্মহত্যা করিয়াছে।

আর একজনও বিষপান করিয়া আত্মহত্যারই চেষ্টা করিয়াছিল এবং এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে কি না তাই বা ঠিক কি!

বাচ্চুর সেই কান্নার শব্দটা এখানেও এত দূরে যেন পরেশ ডাক্তারের শ্রবণবিবরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে: ক্লান্ত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কান্নার শব্দটা।

একান্ত অসময়েই পরেশ ডাক্তারকে আজ এই রাত্রেও লাস-কাটা ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিতে হইয়াছে। নিস্তব্ধ স্থাণুর ন্যায় নির্বাক্ দাঁড়াইয়া পরেশ ডাক্তার লাস কাটিবার অপরিসর ক্লেদাক্ত রক্ত-মাখা শ্বেত-পাথরের টেবিলটার সম্মুখে।

স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে পরেশ সম্মুখেই টেবিলের উপরে শায়িতা প্রাণহীন নারী-দেহটার প্রতি।

পরিধানে সেই নীলাম্বরী জরীপাড় সাড়ীটিই। ব্লাউজটাও পরে নাই।

সিলিং হইতে ঝুলন্ত অনুজ্জ্বল কেরোসিন বাতির আলোয় অপরিসর ক্ষুদ্র ঘরটা যেন কি এক অবর্ণনীয় ভৌতিক স্তব্ধতায় থম্-থম্ করিতেছে!

সত্যিই কি রূপ!

তপ্তকাঞ্চননিভ গাত্রবর্ণ। আর সর্বোপরি মুখখানি সত্যিই বুঝি তুলনা হয় না।

পর্যাপ্ত কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশসম্ভার দুই পার্শ্বে বিপর্যস্ত হইয়া ছড়াইয়া আছে। নিশ্চয়ই গত সন্ধ্যায় কবরী রচনা করে নাই।

অথচ পরেশের মত আর কে জানে সম্মুখের ঐ বিচিত্ররূপ লাবণ্যময়ী রমণীর কি বিচিত্র কবরী-বিলাসই না ছিল!

নিত্য নতুন প্রতি সন্ধ্যায় নব-নব পরিকল্পনায় নব-নব ঢঙ্গে ঐ রমণী কবরী রচনা করিত নিজের। প্রতি সন্ধ্যায় কতখানি সময় ব্যয় করিত কবরী রচনার জন্য দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। এবং শুধু কবরীই নয়—ফুল, ফুলের মালা, সোনার প্রজাপতি ইত্যাদি দিয়া কবরী সাজাইত। অমন আকর্ণ-বিস্তৃত টানা-টানা দুটি পদ্ম-পলাশের ন্যায় আঁখি সূক্ষ্ম কাজলের কখনো বা সুর্মার টানে যেন ধনুর ন্যায় বঙ্কিম হইয়া উঠিত।

পরেশ ডাক্তার নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকে।

লাস-কাটা টেবিলটার পার্শ্বেই একটা ষ্ট্যাণ্ডের উপরে এনামেলের প্লেটের উপরে রক্ষিত লাস কাটিবার ছুরি কাঁচি ফরসেপস্ ক্রেনিয়োটম্ করাৎ হাতুড়ী ছেনী ইত্যাদি যন্ত্রপাতিগুলি আলোয় চক্-চক্ করিতেছে।

পরিধেয় নীলাম্বরী সাড়ীখানি বুধন ডোম এখনো খুলিয়া দিয়া যায় নাই। এখনি সে হয়ত আসিবে এবং নিষ্ঠুর কর্কশ হস্তে ঐ বরাঙ্গ হইতে কয়েকটা হেঁচকা টান দিয়া সাড়ীখানা খুলিয়া লইবে।

তার পর?

তার পর পরেশ সম্মুখস্থিত এনামেলের প্লেটের উপর হইতে ধারালো বড় ছুরিটা লইয়া নিষ্ঠুর নির্মম হস্তে গলনলীর নিম্নে সমূলে ছুরির তীক্ষ্ণ সূচাগ্র ফলাটা বসাইয়া দিয়া সজোরে এক টানে একেবারে উদর-নিম্নে বস্তির সংযোগস্থল পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিবে।

ময়না তদন্তের দ্বারা মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিতে হইবে যদিচ এ ক্ষেত্রে পরেশ ডাক্তারের মৃত্যুর কারণটা অজ্ঞাত নহে!

ক্যাঁচ করিয়া একটা অস্পষ্ট মৃদু শব্দে লাস-কাটা ঘরের দরজাটা খুলিয়া গেল। চমকাইয়া ফিরিয়া তাকাইল পরেশ।

খোলা দ্বার-পথে বাহিরের অন্ধকার-যুক্ত প্রান্তর হইতে শীত-রাত্রের এক ঝলক হিম-শীতল বায়ু কক্ষ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়া সিলিং হইতে ঝুলন্ত বাতির শিখাটা কাঁপাইয়া দিয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যেন কক্ষ মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল ডোম বুধন। একটা উগ্র ধেনোর গন্ধের কটু ঝাপটা পরেশের নাসা-রন্ধ্রে আসিয়া

10 Saridon
TRADE MARK
BRAND ANALGESIC TABLETS
Saridon
একটি টিউব সব সময়ই কাছে রাখবেন

প্রবেশ করিল। নিত্যকার সন্ধ্যার মত আজিও হয়ত এক হাঁড়ি তাড়ি গিলিয়াই বুধন আসিয়াছে।

বৃদ্ধ হইয়াছে লোকটা। শিরদাঁড়াটা বাঁকিয়া ধনুকের ন্যায় দেহের উপরিভাগটা যেন সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হাড়-সর্বস্ব লোল চর্মাবৃত শোনের দড়ির ন্যায় পাকান দেহটা। ক্রনিক্ ব্রংকাইটিসে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভুগিতেছে, প্রায় খ্যাং-খ্যাং করিয়া একটা মেটালিক শব্দ তুলিয়া কাসে হাসপাতালের খোলা বারান্দায় বসিয়া প্রায় অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত। ঘুমায় খুব কম সময়। অনেক রাত্রে বিশ্রী ঐ কাসির শব্দে পরেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কখনো-কখনো বা নিশীথ রাত্রির স্তব্ধ প্রহরে সম্মুখে হোয়াইট লেবেলের বোতল ও গ্লাসটা লইয়া পরেশ কখন অন্যমনস্ক হইয়া একাকী বসিয়া মধ্যে-মধ্যে গ্লাসে চুমুক দিতেছে, কত বার কাসির শব্দে চমকাইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য! সেই বুধন যেন এই মুহূর্তে কাসিতেও ভুলিয়া গিয়াছে।

বুধন আসিয়া লাস-কাটা টেবিলটার সামনে দাঁড়াইল এবং কোন প্রকার দ্বিধা মাত্রও যেন না করিয়া অভ্যস্ত ক্ষিপ্র হস্তে কয়েকটা হেঁচকা টান দিয়া মৃতার দেহ হইতে পরিধেয় নীলাম্বরী সাড়ীখানা খুলিয়া টানিয়া লইল। একান্ত অবহেলা ভরে তালগোল পাকাইয়া সাড়ীটা কক্ষের এক কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

অতঃপর আগাইয়া গিয়া সম্পূর্ণ নির্বসন স্থির দেহটা চিৎ করিয়া টেবিলটার উপরে সোজা করিয়া শোয়াইয়া দিল। সিলিং হইতে ঝুলন্ত বাতির আলো অনাবরণ দেহটার উপরে মুহূর্তে যেন একটা হিংস্র পাশবিক লালসায় ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বাহিরে কি ঝড় জাগিল নাকি!

লাস-কাটা ঘরের বন্ধ কাচের সার্সীটা অত কাঁপিতেছে কেন? ঝন্-ঝন্ একটা শব্দ হইতেছে।

বুধন ততক্ষণে তাহার কার্য সমাপ্ত করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে নিঃশব্দে। কি আশ্চর্য! বাহিরের বারান্দায় অন্ধকারে বুধন এখন বসিয়া থাকিবে কার্য না শেষ হওয়া পর্যন্ত; কিন্তু কই কাসিতেছে না ত!

পরেশ ডাক্তার আবার তাকাইল সম্মুখে টেবিলের উপরে শায়িতা মৃতদেহটার প্রতি।

কি অপূর্ব! কি সুঠাম কমনীয় ঢল-ঢল লাবণ্য!

পীনোন্নত নিটোল দুটি সুধাভাণ্ড যেন। শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা। কমনীয় পেলব নাতিদীর্ঘ দুটি চারু বাহু। ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত নিতম্ব। স্থূল জংঘা। দেহ ত নয়, যেন কামনা-সিন্ধু! মৃত্যু অভিশাপে বরফের ন্যায় স্থির জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। নিস্তরঙ্গ অচঞ্চল! আর ঢেউ জাগিবে না। পুরুষ-স্পর্শে আর ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইবে না, জাগিবে না কোন শিহরিত হিল্লোল।

মুদ্রিত কমলিনীর ন্যায় মুদ্রিত দুটি অক্ষিপল্লব।

পক্ক দাড়িম্বের ন্যায় সেই রক্তবর্ণ ওষ্ঠ গরলে নীল হইয়া গিয়াছে, তথাপি ওষ্ঠ-প্রান্তের সেই অবজ্ঞার কুঞ্চনটুকু যেন এখনো লীন হয় নাই! তেমনি আছে।

পরেশ ডাক্তারের মনে পড়ে: ঐ হিম-শীতল দেহ! ঐ কমনীয় লাবণ্য-সুষমাকে ঘিরিয়া কত কত বিনিদ্র রজনীর মুহূর্তগুলিই না তাহার ক্ষত-বিক্ষত বক্ষের মাঝে আজিও রক্ত-চিহ্নিত হইয়া আছে।

রাত্রির পর রাত্রি নিদ্রাহীন চোখের তারায় জাগাইয়াছে দুঃস্বপ্ন!

জয়ন্তী! জয়ন্তী—কেন তোমাকে সেদিন ঘরের মধ্যে পেয়েও হত্যা করিনি? তুমি এসেছিলে আমার ঘরে। অত্যন্ত তৃষিত ছিলে তুমি সে রাত্রে, না? ঘরের মধ্যে দেওয়াল-আলমারীতে আমার মরফিন হাইড্রোক্লোরের শিশিটা ছিল; জলের মধ্যে যদি শিশিটা উবুড় করে মিশিয়ে দিতাম। ঠিক এমনি করেই তুমি ঘুমিয়ে পড়তে। আর আমি···

কি নিষ্ঠুর পরিহাস! দীর্ঘ দিন ও রাত্রির স্বপ্নে প্রেমে সিঞ্চিত দেহখানির উপরেই পরেশ ডাক্তারকে আজ ছুরি চালাইতে হইবে।

না! না! না—

বাহিরে মূর্চ্ছাহত শীতের কন্‌কনে রাত্রি যেন কঁকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কে কাঁদে! জয়ন্তীর বাচ্চু কি এখনো কাঁদিতেছে নাকি!

বাচ্চু! সোনামণি! যাদু, কেঁদো না বাবা! রাত যে অনেক হলো, ঘুমাও সোনা।

আবার কান্নার শব্দ!

না! হাসপাতালের সেই ঘেয়ো কুকুরটা কাঁদিতেছে।

ইমার্জেন্সী রুমে কল্যাণেরই বা এতক্ষণ কি হইল কে জানে? সেই বেলা দশটা হইতে বারংবার ষ্টমাক পাম্প দিয়াও বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

হাত বাড়াইয়া পরেশ ডাক্তার পার্শ্বের ষ্ট্যাণ্ডের উপরে রক্ষিত এনামেলের প্লেট হইতে বড় ছুরিটা তুলিয়া লইল।

জয়ন্তীর স্বামি-নির্বাচনটা এত শীঘ্র তাহার অজ্ঞাতেই অকস্মাৎ একদিন পাকাপাকি হইয়া যাইবে ইহা যেন পরেশের চিন্তারও অতীত ছিল।

গরীব স্কুল-মাষ্টারের তিন পুত্র ও চারি কন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিল পরেশ। কোন মতে বৃত্তির টাকায় ছয় বৎসরের কোর্স ডাক্তারী পাশ করিয়াছে মাত্র। ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে অস্পষ্ট। আর জমিদার-তনয় কল্যাণ সোম অল্পশিক্ষিত এবং দেখিতে আবলুষ কাষ্ঠের ন্যায় কালো ও কুৎসিতই নয়—পরে অবশ্য জানা গিয়াছিল একটি পা নাকি একটু খুঁড়াইয়াও চলে। খঞ্জত্বের কথাটা বিবাহের পূর্বে জানা গেলেও ক্ষতি হয় নাই। জয়ন্তীর ভাবী স্বামীর নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তথাপি পরেশের পরাজয় ঘটিয়াছিল।

জয়ন্তীর পিতা সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—সদরে ওকালতী করিতেন কিন্তু তিনটি কন্যাই ছিল তাঁহার যাহাকে বলে অপূর্ব সুন্দরী। এবং তাহাদের মধ্যে আবার সর্বজ্যেষ্ঠা জয়ন্তীর রূপের যেন অবধি ছিল না। জয়ন্তীর দিকে তাকাইলে চক্ষু যেন ফেরান যাইত না। দুঃখীর ঘরে সে ইন্দ্রাণীর মত রূপ লইয়াই জন্মিয়াছিল। পাশাপাশি বাড়ি থাকার দরুণ পরেশ ও জয়ন্তীদের পরিবারের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট আলাপ ও সৌহার্দ গড়িয়া উঠিয়াছিল দীর্ঘ দিনে।

পরেশের চোখের সামনেই এক প্রকার বলিতে গেলে জয়ন্তীর রূপ কমলের ন্যায় ধীরে-ধীরে দলে-দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আর জয়ন্তী ও পরেশের মধ্যে ভালবাসাও কি ছিল না?

জয়ন্তী কি জানিত না তাহাকে দর্শন মাত্রেই পরেশের চোখের তারা দুইটি অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া ওঠে। এবং পরেশের হৃদয়ের

সংবাদ জয়ন্তীর যেমন জানা ছিল জয়ন্তীরও হৃদয়ের সংবাদ পরেশের অজানা ছিল না।

পরেশ ডাক্তারী পাশ করিয়া কোন একটি ছোট শহরে গিয়া প্র্যাকটিস শুরু করিবে এবং জয়ন্তী সেই দিন তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইবে এ কথাও ত বহু বার তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আলোচিত হইয়া গিয়াছিল। এমন কি, দুই পরিবারের কর্তৃস্থানীয়রাও দু'-চার বার ঐ কথা লইয়া আলোচনা যে করেন নাই এমনও ত নয়? কেবল পরেশের ফাইন্যাল পাশ করিবার জন্য যা অপেক্ষা।

সেই জয়ন্তীর বিবাহ-সংবাদটা যেদিন পরেশ পাইল তাহার ছোট বোনের মুখে, তাহারই মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তাহার ফাইন্যাল এম· বির পাশের সংবাদটা তার-যোগে গৃহে পৌঁছাইয়াছে।

পরেশ যেন সংবাদটা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধনীর পুত্রবধূ হইবে জয়ন্তী—পিতা তাহার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কেবল অর্থের মানদণ্ডে তাহার সকল যোগ্যতা ব্যর্থ হইয়া গেল কুৎসিত অশিক্ষিত ধনী জমীদার-তনয়ের কাছে। জয়ন্তীর পিতা পরেশের পিতার নিকট লজ্জা বা সংকোচের পরিবর্ত্তে বরং হাস্যোৎফুল্ল ভাবেই সংবাদটা দিয়াছিলেন।

দিন দুই বাদে সন্ধ্যার সময় পরেশের সহিত দুই বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী গলি-পথে জয়ন্তীর দেখা হইয়া গেল।

'জয়ন্তী—'

'আমাকে ডাকছিলে?'

'হাঁ। যা শুনছি সত্য?—শেষ পর্যন্ত এক খঞ্জের গলায় টাকার জন্য মালা দিচ্ছ?'

'কেন আপনি কি ভেবেছিলেন কথাটা মিথ্যা?'

কয়েক মুহূর্ত পরেশ স্থাণুর মতই নির্বাক্ দাঁড়াইয়া থাকে। বাক্য সরে না জিহ্বাগ্রে: 'জয়ন্তী! তুমি! তুমি শেষ পর্যন্ত ছিঃ! ঘৃণায়-লজ্জায় আমারই সর্বশরীর যে কুঞ্চিত হয়ে উঠছে। জানতাম না, সত্যিই জানতাম না এত ছোট এত নীচ মন তোমার—তোমরা মেয়েরা অর্থের জন্য—'

'পরেশদা, এ কিন্তু আপনার হিংসা!'

'হিংসা!'—সর্বাঙ্গ পরেশের যেন জ্বলিতেছিল। মেয়েটা বলে কি, হিংসা!

'তা নয় ত কি বলুন? কি সম্বল আছে আপনার, একটা এম· বি· ডিগ্রী, এই ত—আর কল্যাণ সোমের—'

'জয়ন্তী!'—তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠ পরেশের।

'তাছাড়া কি বলুন! বিবাহ করবেন কিন্তু খাওয়াবেন কি? তুলবেন ত নিয়ে গিয়ে সেই বাপ-পিতামহর সাবেক কুঁড়ে-ঘরে।'

'এত অহংকার ঐ রূপের?'

'কেনই বা হবে না। ইন্দ্রাণীর মতই রূপ আছে আমার এ কথা ত আপনিই কত বার বলেছেন? বলেছেন রাজার ঘরেই এ রূপ মানায়।'

যেন বোবা হইয়া গিয়াছে পরেশ।

'রূপ! ইন্দ্রাণীর মত রূপ! আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জান? থার্ড ইয়ারে যেমন ডিসেকসন করেছি তেমনি মরা-কাটা টেবিলের উপর ফেলে ধারালো একটা ছুরি দিয়ে তোমার ঐ নরম তুলতুলে গলা থেকে এক টান দিয়ে সব নাড়ী-ভুঁড়ি বের করে দিই—এ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিই ঐ ইন্দ্রাণীর মত রূপ।'

চমকাইয়া উঠিল পরেশ। হাত হইতে ছুরিটা মাটিতে পড়িয়া ঠং করিয়া একটা শব্দ তুলিল। সত্যি! একান্ত রাগের মাথায় সেদিন যে কথাটা সে উচ্চারণ করিয়াছিল মাত্র, তাহা যে এমনি করিয়া সত্য হইয়া দেখা দিবে কে জানিত!

খিল-খিল করিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসিয়া উঠিয়াছিল জয়ন্তী সেদিন।

ও কি। আজিও জয়ন্তী সেই দিনকার মতই হাসিতেছে নাকি!

'বেশ মনে থাকবে কথাটা তোমার। পথ ছাড় এখন বাড়ি যেতে হবে। রাত হলো।'

পথ ছাড়িয়া সড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল পরেশ।

জয়ন্তী যাইবার জন্য পা বাড়াইল এবং সহসা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া শঙ্খের ন্যায় গ্রীবাখানি বাঁকাইয়া কহিয়াছিল: 'নিমন্ত্রণ রইলো বিবাহের রাত্রে, আসা চাই কিন্তু—নইলে মনে বড় ব্যথা পাবো।'

চলিয়া গেল জয়ন্তী।

২

পরের দিন প্রত্যুষেই পরেশ কলিকাতায় চলিয়া যায়। আর দেখা হয় নাই জয়ন্তীর সহিত দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে।

বহু কষ্টে একটা গভর্ণমেন্টের স্কলারশিপ জোগাড় করিয়া এক মাসের মধ্যেই পরেশ বিলাতে পাড়ি দেয় এবং বিলাত হইতে উচ্চতর ডিগ্রী লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সরকারী চাকুরীতে যোগ দিল। ঘুরিতে-ঘুরিতে সরকারী চাকুরীতেই এই শহরে সে সরকারী ডাক্তার হইয়া আসিল।

পরেশ বিবাহ করে নাই। কোয়ার্টারে একাকীই থাকে। একটি কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড আছে, সেই সব তদারক করে।

সারাটা দিন সে ভূতের মতই খাটিত কিন্তু রাত্রে নয়টার পরে কোন মতেই তাহাকে কোন কাজের দোহাই দিয়াই বাড়ির বাহির করা যাইত না। হাজার মরণাপন্ন রোগী হইলেও সে কাহারও অনুরোধে কর্ণপাত করিত না। কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড নারাণ বাহিরে বন্ধ দরজার এধারে বসিয়া থাকিত প্রভুর নির্দ্দেশের অপেক্ষায়।

ছোট্ট একটা টেবিল—টেবিলের উপরে শাদা ঘেরাটোপ ঢাকা একটা টেবিল, ল্যাম্প মৃদু আলো বিকিরণ করিতেছে। হোয়াইট লেবেলের একটা বোতল, মাঝারী গোছের একটি কাচের গ্লাস। নিঃশব্দে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিয়া মধ্যে-মধ্যে গ্লাসটা তুলিয়া সুদীর্ঘ এক-একটা চুমুক দিত। রাত্রি বারটা সাড়ে-বারটা ত হইতই, কখনো-কখনো রাত্রি দুইটাও হইয়া যাইত।

নারাণ অপেক্ষা করিত।

এক সময় তার পর দুয়ার খুলিত পরেশ। কোন দিন সামান্য আহার হয়ত করিত, আবার কোন দিন হয়ত আহার্য বস্তু সামান্য একটু নাড়াচাড়া করিয়া একটু-আধটু মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িত। পিতা-মাতা, অন্যান্য ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ বা দেখা-শোনা না থাকিলেও নিয়মিত সে টাকা পাঠাইত পিতার নামে একটা মোটা অংকের।

নারাণ সদ্গোপের ছেলে, বহু কাল যাবৎ পরেশদের পরিবারের সঙ্গে আলাপ ছিল এবং বয়সও তাহার যথেষ্ট হইয়াছে।

নাম ধরিয়াই সে পরেশকে ডাকিত। পরেশ তাহাকে নারাণদা বলিয়াই ডাকিত।

সেই ছোট বেলা হইতেই নারাণ পরেশকে দেখিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে তাহার যেন সত্যিই অসহ্য ঠেকিত।

'পরেশ !—'

'কি ?'

'এমনি করে আর কত দিন চলবে ?—'

'কেন, কি হলো আবার ?—'

'রাতের পর রাত ঐ ছাইভস্মগুলো না গিললেই কি—'

'তুইও বুড়ো হলি নারাণদা। বাড়ী ফিরে যা। তোর একটা পেনসনের ব্যবস্থা আমিই করে দেবো !—'

নারাণ গজরাইতে থাকিত। 'হাঁ, আমিও চলে যাই আর তুমি সাপের পাঁচ পা দেখ !'

হয়ত আবার এক দিন পরেশই হাসিতে-হাসিতে প্রশ্ন করিত, 'কি নারাণদা, তোর যাওয়ার কি হলো ?'

'কেন ?—' ভ্রূকুটি করিয়া তাকাইত নারাণ পরেশের দিকে: 'আমি না গেলে সুবিধা হচ্ছে না, না ?—'

'না রে, তা নয়। অসুবিধা আমার কোন কিছুতেই হয় না !—'

'তোমার যে অসুবিধা কোন কিছুতেই হয় না তা কি আর আমি জানি না !—কিন্তু এ-ও আমি বলে দিচ্ছি এমনি করে চললে শেষ পর্যন্ত—'

কথাটা হাসিতে-হাসিতে পরেশই শেষ করে: 'অপঘাতে মৃত্যু হবে, কেমন ত ! তাতেই বা ক্ষতি কি !'

'তা বৈ কি।—' রাগে গর-গর করিতে-করিতে নারাণ চলিয়া যায়।

পরেশের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল জ্যোতির্ময়। পশ্চিমের কোন এক কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিল। কচিৎ কখনো মধ্যে-মধ্যে সে পরেশের ওখানে দু'-চার দিনের জন্য বেড়াইতে আসিত। সে-ই একবার বলিয়াছিল, "এমনি করে আর কত কাল কাটাবে লক্ষ্মীহীন হ'য়ে, একটি লক্ষ্মী ধরে আনো ঘরে—'

'বিবাহ !—'

'হাঁ। বল ত আমার জানা-শোনার মধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি—'

'রক্ষে কর ভাই ! অমন চপল অন্তঃসারশূন্য এক জনকে ঘরে এনে আর যাই হোক, সারা জীবনের জন্য একটা বেড়াজালের সৃষ্টি করতে বাসনা নেই কোন দিনও।—'

'ওটা তোমার ভুল, সব মেয়েই আর কিছু তোমার জয়ন্তী নয়।'

'না। তবে জয়ন্তী-গোত্রীয়ই !'—মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিত পরেশ।

'কিন্তু আমার কি মনে হয় জান ডাক্তার, জয়ন্তীকেও ঠিক তুমি হয়ত বুঝতে পারনি।'

'স্বাভাবিক। নারী-চরিত্র মাত্রেই যে দুর্জ্ঞেয়। দেবতারাই বোধগম্য হয় না, আমরা নরগণ ত কোন্ ছার ! যাক ভাই, যেতে দাও ও-সব পবিত্র কুলধ্বজা নারীকুলের কথা, অন্য কথা বলো।—'

বস্তুত নারী মাত্রের আলোচনাতেও যেন পরেশের ঘোরতর একটা বিতৃষ্ণা ছিল; এমন কি, কোন অল্পবয়েসী তরুণী রোগিণী হইলেও পরেশ ডাক্তার যেন একটা তাচ্ছিল্য লইয়াই কোনমতে দায়-সারা গোছের ভাবে পরীক্ষা করিত। অর্থের অভাব আজ আর নাই পরেশের। সে আজ ধনী।

ঐ জায়গায় আসিবার মাস আষ্টেক পরে। শহরে ত বটেই, শহরের আশ-পাশের দু'-দশ মাইলের মধ্যেও পরেশ ডাক্তারের হাতযশের কথা লোকের মুখে-মুখে ছড়াইয়া গিয়াছিল। অমন ডাক্তার নাকি হয় না। সাক্ষাৎ একেবারে ধন্বন্তরি। বহু দূর হইতে পরেশ ডাক্তারের নাম শুনিয়া রোগীরা পর্যন্ত তাহাকে দেখাইতে আসিত।

সেদিনও রাত্রে পরেশ ডাক্তার নিত্যকারের মত ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া হোয়াইট লেবেলের বোতলটি লইয়া বসিয়াছে। নারাণ দরজার বাহিরে নিঃশব্দে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। একটা ছোট মোটর গাড়ী পরেশ ডাক্তারের বাংলোর গেটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ী থামিবার শব্দে একটু বিস্মিত হইয়াই নারাণ সম্মুখের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইল। আশ্চর্য ! এত রাত্রে আবার কে আসিল ?

গাড়ী হইতে অবতরণ করিল সর্বাঙ্গ একটি শাদা চাদরে আবৃত এক নারীমূর্তি। মূর্তিটি এই দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ দেখা যায় না।

'ডাক্তার বাবু আছেন ?—'

'আছেন, কিন্তু রাত্রে ত নটার পর তিনি কোন রোগীও দেখেন না, কারো সঙ্গে দেখাও করেন না !—' নারাণ জবাব দিল।

'আমার বিশেষ প্রয়োজন, দেখা করতেই হবে; তাঁকে একটা সংবাদ দাও—'

'কোন লাভ হবে না তাতে। স্বয়ং লাট বাহাদুর এসে এই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও তিনি দেখা করবেন না। কাল সকালে আসবেন।'

'দেখা আমাকে করতেই হবে !'

'বললাম ত সম্ভব নয় !'

'কোন্ ঘরে তিনি আছেন ?'

'এই ঘরের মধ্যেই তিনিই আছেন, কিন্তু মিথ্যে আপনি চেষ্টা করছেন, দেখা তিনি করবেন না।"

নারীমূর্তি আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া বদ্ধ দুয়ারের দিকে আগাইয়া গেল দৃঢ় পদবিক্ষেপে। ত্রস্তপদে সশংকিত চিত্তে নারাণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইল: 'কি করছেন ?'

'সরে দাঁড়াও নারাণদা। ওর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে—'

চমকাইয়া দুই পা পিছাইয়া যায় নারাণ। 'নারাণদা' ! চেনে নাকি তাহাকে সম্মুখের ঐ নারী !

'কে ! কে তুমি ?' অস্ফুট কণ্ঠে নারাণ বলিয়া ওঠে।

নারাণের সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্তি বদ্ধ দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত হানিল।

গম্ভীর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল, 'কে ?—'

'দরজাটা একবার খুলুন ডাক্তার বাবু !' নারী জবাব দেয়।

অন্ধকারাবৃত আবছা স্মৃতির পৃষ্ঠায় যেন একটা আলোর ঝাপটা লাগিল। কার ! কার কণ্ঠস্বর !

স্বপ্ন ! না সত্য !

দুয়ার খুলিয়া দিল পরেশ এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই উন্মুক্ত দ্বারপথে অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দুই হস্তে দরজা ভেজাইয়া বন্ধ দরজার গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইল। নির্বাক্ স্তম্ভিত বিমূঢ় পরেশ।

'কে ?—'

দুই হাতে এতক্ষণে অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিল নারী।

ঘরের অনুজ্জ্বল আলোয় অনবগুণ্ঠিতা মুখখানির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই দুই পা যেন পিছাইয়া আসিল পরেশ : 'কে ? কে ?—'

'পরেশদা। আমি জয়ন্তী !—'

'জয়ন্তী! তুমি ?—'

'হাঁ আমি !—'

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর। যৌবন-সরসী যেন দুই কূল একেবারে ছাপাইয়া যাইতেছে। কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কি চমৎকার কবরীই না রচনা করিয়াছে আজ জয়ন্তী! নীলাম্বরী সাড়ীর অবগুণ্ঠন স্খলিত-চ্যুত শঙ্খের ন্যায় গ্রীবার তটদেশে যেন এলাইয়া আছে। গলায় বহু মূল্যবান রত্নহারের রক্তের মত লাল চুনিগুলি যেন ওর যৌবন-সরসীতে রক্তবিন্দুর ন্যায় ঝলমল করিতেছে।

'জয়ন্তী, তুমি ?—'

'হাঁ! বড় প্রয়োজনে তোমার কাছে আসতে হয়েছে পরেশদা !—'

'প্রয়োজন ?'—এক দিন যাহার মুখের কথায় পরেশ তাহার জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারিত সেই জয়ন্তী আজ প্রার্থী তাহার দুয়ারে! এক দিন যে রূপের গর্বে পরেশের কামনা-ভরা হৃদয়কে দুই পায়ে দলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ সে এই নিশীথে তাহারই দুয়ারে আসিয়া প্রার্থনা লইয়া দাঁড়াইয়াছে প্রয়োজনের।

'আমার স্বামীকে একটি বার দেখতে হবে তোমাকে !—'

'কিন্তু তার জন্ত সকালেও আমাকে কল দিলে পারতে। তুমি হয়ত জান না রাত্রে আমি রোগী কখনো দেখি না।'

মৃদু হাসিল জয়ন্তী : 'জানি বলেই ত এই রাত্রে আমাকে আসতে হলো।'

'কিন্তু—'

'একটি বার তোমাকে যেতে হবে পরেশদা! শুনেছি, তুমি নাকি মরা মানুষকেও বাঁচাতে পারো।'

'মরা মানুষকে বাঁচাতে পারি !'—অদ্ভুত হাসিতে পরেশের ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

'অনেক আশা নিয়ে এসেছি পরেশদা! একেবারে গাড়ী নিয়েই এসেছি, তোমাকে একবার আসতেই হবে।'

'ঠিকানা রেখে যাও। কাল সকালে যাবো—রাত্রে আমি রোগী দেখি না।'

'না পরেশদা। দিনের আলোয় নয়, এই রাত্রেই তোমাকে যেতে হবে !'

'বললাম ত। রাত্রে রোগী আমি দেখি না !'

'সেথ না জানি, কিন্তু আমি. জয়ন্তী, তোমাকে ডাকতে এসেছি। জয়ন্তীর ডাকও তুমি শুনবে না ?'

'সে জয়ন্তীও তুমি আর নও, সে পরেশও আমি নই—ঠিকানা রেখে যাও কাল যাবো !'

'উঁহুঁ! তোমাকে না নিয়ে আমি ফিরবো না। সারা রাত তাহ'লে এই ঘরেই বসে থাকবো।'

পরেশ ক্ষণকাল কি যেন ভাবিল। পরে কহিল, 'কোথায় থাক তুমি ?'

'এই শহরেরই প্রান্তে, নদীর ধারে যে বাগান-বাড়ীটা !'

'হুঁ। আচ্ছা চল !'

৩

সেই রাত্রেই জয়ন্তীর গাড়ীতে পরেশ জয়ন্তীর সঙ্গে তাহাদের বাড়িতে গেল।

একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ভূতের মতই চুপচাপ বসিয়াছিল একটা আরাম-কেদারায় জয়ন্তীর স্বামী কল্যাণ।

একটা হ্যারিকেন বাতি হাতে অগ্রে-অগ্রে জয়ন্তী আসিয়া কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

পদশব্দে সচকিত কল্যাণ প্রশ্ন করিল, 'কে ?'

'আমি জয়ন্তী! ডাক্তার অধিকারীকে নিয়ে এসেছি—'

'কেন! কেন ওঁকে মিথ্যে কষ্ট দিতে গেলে জয়ন্তী! এ রোগ ত আমার সারবার নয় ?'

হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোকে রোগগ্রস্ত জয়ন্তীর স্বামী কল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাতেই পরেশ চমকাইয়া ওঠে। উঃ! কি বীভৎস! এই জয়ন্তীর স্বামী! প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরেশ যাহার নিকট একদা হইয়াছিল পরাভূত! সমস্ত মুখাবয়ব ডুমো-ডুমো লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে যেন একটা সিংহের মুখ। খালি গা, সর্বাঙ্গে দাগা-দাগা রক্তাভ ঘা। হাত-পায়ের আংগুলগুলিরও সেই অবস্থা।

রোগ-নির্ণয়ে এতটুকু বিলম্ব হয় না পরেশ ডাক্তারের।

'কত দিন হলো এ রকম হয়েছে মিঃ সোম আপনার ?'— পরেশ প্রশ্ন করে।

'বছর চারেক হবে।—'

'তা ত মনে হয় না! অনেক দিনের রোগ এ!—' মৃদু কণ্ঠে পরেশ বলিল : 'চিকিৎসা হয়নি ?'

জবাব দিল জয়ন্তী : 'ঠিক নিয়মিত চিকিৎসা বলতে যা বোঝায় তা হয়নি ডাক্তার বাবু !'

চমকে একটি বার জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকাইল পরেশ।

হ্যারিকেনের আলোয় অদ্ভুত শান্ত মনে হয় ঐ সুন্দরীর পদ্মপলাশ সদৃশ আঁখি দুটি।

'প্রথম-প্রথম অনেক ডাক্তারকেই দেখান হয়েছে, সকলেই বলেছে একজিমা, ঔষধ দিলেই সেরে যাবে। এ্যালোপেথি হোমিওপ্যাথি কবিরাজী টোট্‌কা সবই করা হয়েছে, কিন্তু রোগ সারা ত দূরে থাক, ক্রমেই দেখা গেল রোগের বেগ বৃদ্ধিই হচ্ছে!—শেষ কালে খুব বাড়াবাড়ি হ'তে বছরখানেক হলো শহরের এই প্রকাণ্ড বাড়িটা কিনে আমরা এসে রয়েছি। ইদানিং আর কোন চিকিৎসাই উনি করাতে চান না।—' জয়ন্তী বলিল।

এবারে কিন্তু কথা বলিল কল্যাণ বাবুই, 'আমি জানি ডাক্তার অধিকারী, এ রোগ আমার সারবে না। কিন্তু জয়ন্তী আপনার নাম ডাক শুনে কিছুতেই শুনলে না।'

'ভয় কি! সেরে উঠবেন। আমি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তবে একটু বেশী সময় নেবে।'

বোধ করি সান্ত্বনাই দেয় পরেশ ডাক্তার। এবং জয়ন্তীর দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া বলে, 'চলুন মিসেস্ সোম, পাশের ঘরে—'

পার্শ্ববর্তী ঘরে আসিয়া দুই জনে প্রবেশ করিল।

ঘরের মধ্যে একটি দামী ক্রাডেলে একটি ফুল্লকুসুমবৎ বছর দুইয়েকের শিশু নিদ্রা যাইতেছিল, পরেশ সেই দিকে তাকাইতেই জয়ন্তী কহিল, 'আমার ছেলে বাচ্চু!—'

'বাড়িতে আর লোক-জন দেখছি না ত? কল্যাণ বাবুর দেখাশোনা কে করে?'

'কে আর করবে। আমিই করি। ওর ওই অবস্থা দেখলে কোন চাকরই ঘরে ঢুকতে চায় না।'

'কিন্তু স্বামীর সেবা করতে হলে তোমার বাচ্চুর দেখাশোনা ত তোমার করা চলতে পারে না জয়ন্তী!'

'কেন? রোগটা—'

'তোমার স্বামীর লেপ্রসী হয়েছে জয়ন্তী, ভিরুলেণ্ট টাইপ—'

'লেপ্রসী! মানে—'

'কুষ্ঠ।'

'কুষ্ঠ!—' একটা আর্ত চীৎকারের মতই যেন কথাটা উচ্চারিত হইল জয়ন্তীর কণ্ঠে: 'কিন্তু তোমার ভুল—ভুল হয়নি ত পরেশদা! আর একবার ভাল করে দেখ—'

'দেখতে আর হবে না জয়ন্তী! আমার ভুল হয়নি!' মৃদু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় পরেশ। একটা বিজাতীয় হিংসার আগুন জ্বলিতেছিল পরেশের বুকের মধ্যে।

জয়ন্তী যেন পাথরের মত স্তব্ধ অনড়।

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা বলে না। একটা শ্বাসরোধকারী মৃত্যুর ন্যায় হিম-শীতল স্তব্ধতা।

'বাচ্চুকে দেখাশোনা আমি করতে পারবো না? তবে—তবে কি—'

'হাঁ, এ রোগ বড় সাংঘাতিক। তাছাড়া আজ পর্যন্ত সঠিক ভাবে প্রমাণিত হয়নি কেমন করে কি ভাবে ঐ ভয়ংকর রোগ এক জনের দেহ হতে অন্যের দেহে সংক্রামিত হয়। তবে ডাক্তাররা বলেন, prolonged continuous close contact—দীর্ঘ দিন ধরে খুব কাছাকাছি একসঙ্গে থাকলে নাকি ঐ রোগ এক জনের দেহ হতে অন্যের দেহে সংক্রামিত হতে পারে।'

'তবে! তবে ত আমার এবং আমার বাচ্চুরও—'

'না। না—সব সময়ই যে—'

'তা হোক, তা হোক। তুমি—তুমি একবার আমার বাচ্চুকে আর একবার আমাকেও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ পরেশদা!'— আর্ত মিনতি-করুণ কণ্ঠে ভাঙ্গিয়া পড়িল যেন জয়ন্তী।

পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইল পরেশের। কিন্তু রোগের কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না।

বহু দিন বাদে সে রাত্রে পরেশের মদ স্পর্শ করিতেও যেন কেমন ঘৃণা বোধ হইল।

ঘুমাইয়াও পরেশ জয়ন্তীকে স্বপ্নে দেখিল।

জয়ন্তী কাঁদিতেছে। ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছে। পরেশের পায়ের নীচে পড়িয়া জয়ন্তী কাঁদিতেছে: সর্বাঙ্গে তাহার ভয়ঙ্কর কুষ্ঠ ব্যাধি।

কুষ্ঠ-রাহু তাহার ইন্দ্রাণীর ন্যায় রূপরাশিকে গ্রাস করিয়াছে।

দগ দগে কুৎসিত সব ঘা!

'আমাকে বাঁচাও পরেশদা। আমাকে বাঁচাও!—'

পরেশ নির্বিকার। পাষাণ!

'তুমি যা চাও তাই দেবো পরেশদা, আমাকে বাঁচাও!—'

'কি আজ আর আছে তোমার অবশিষ্ট জয়ন্তী! তুমি ফিরে যাও!—'

'প্রসন্ন হবে না তুমি আমার 'পরে? ফিরিয়ে দেবে?—'

'হাঁ! ফিরেই তোমাকে আজ যেতে হবে। মনে কর পাঁচ বছর আগেকার কথা! তোমার স্বামী মরতে চলেছে, তুমিও মরবে। তোমার এত সাধের বাচ্চু, সেও নিষ্কৃতি পাবে না!—'

'পরেশদা! পরেশদা! দয়া কর। দয়া কর!—'

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল পরেশের।

ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। ধড়ফড় করিয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল পরেশ।

৪

পরেশ জয়ন্তীর স্বামী কল্যাণের চিকিৎসা শুরু করিল।

নিয়মিত ভাবে হপ্তায় দুই দিন রাত্রে জয়ন্তীদের বাগান-বাড়িতে গিয়া পরেশ কল্যাণকে ইনজেকসন্ দিয়া আসিত।

আলোকের শিখা যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে পরেশকেও জয়ন্তী যেন তেমনিই নিরন্তর আকর্ষণ করিতে লাগিল। পরেশ ভাবিয়াছিল, এই পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে জয়ন্তীর আকর্ষণটা বোধ হয় মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দেখিল তাহা ভুল।

জয়ন্তীকে সে যে ভাবিত ঘৃণা করে এবং অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক মাত্রের দর্শনেই তাহার সমস্ত অন্তর যে বিতৃষ্ণায় কুঞ্চিত হইয়া ওঠে তাহাও নয়। সব ভুল। ব্যর্থতাই তাহার বিতৃষ্ণার হেতু। জয়ন্তীকে সে ঘৃণা ত করেই না আজিও চিন্তাতেও হৃদয় তাহার রতিরসে আপ্লুত হইয়া ওঠে। শিহরিত রোমাঞ্চিত হয় অঙ্গ।

কিন্তু জয়ন্তীর মনের মধ্যে সেই রাত্রি হইতেই যেন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন আসিয়াছে।

শঙ্কিত ব্যাকুল দৃষ্টি তাহার।

দিনের আলোয় দিনের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ বার সে নিজের সর্বদেহ খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখে। কখনো এমনি চোখে কখনো দর্পণে। দেখিবার চেষ্টা করে সে দেহের মধ্যে কোথায়ও কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না।

শুধু নিজের দেহই নয় বাচ্চুকেও সে কত বার যে দিনে ও রাত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখে তাহারও ইয়ত্তা নাই। স্বামীর সেবা সে এখনও করে বটে তবে যেন অতি সন্তর্পণে নিজেকে বাঁচাইয়া। স্বামীর ঘরে গেলেই কাপড় বদলায়। বার বার হাত সাবান ও' লোশন দিয়া ধোয়।

পরেশ আসিলেই জয়ন্তী একবার করিয়া নিজেকে ও বাচ্চুকে পরীক্ষা করায়।

ভয়া নিরুৎসুক কণ্ঠে বলে, 'বাঁচবো না। পরেশদা, ও রোগ

আমার দেহে এলে বাঁচবো না। ঘৃণায় সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। বলবে কুট। কুষ্ঠ! উঃ!—' দুই হাতে মুখ ঢাকে জয়ন্তী। সর্বাঙ্গ তাহার থর-থর করিয়া কাঁপিতে থাকে।

পরেশ এক দিন মাইক্রোসকোপে লেপরা ব্যাসিলি দেখিতে কেমন—দেখাইয়াছিল জয়ন্তীকে। কোষের মধ্যে সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সর্বনাশা রক্তের ন্যায় লাল কুষ্ঠের বীজগুলি, কি ভয়ঙ্কর তাহাদের প্রতাপ! কি বীভৎস কুৎসিত তাহার প্রকাশ!

চাঁপা ফুলের মতই রং জয়ন্তীর দেহের—মসৃণ ত্বক্। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে জয়ন্তী। পরেশ বলিয়াছিল, ঐ রোগের প্রথম প্রকাশ অনেক সময় নাকি একটা লালচে আভা নিয়া দেহে প্রকাশ পায়। আবার কখনো বা আমবাতের মত লাল হইয়া চাকা বাঁধিয়া ওঠে। কানের লতি মোটা হইয়া যায়।

কানে রক্ত-প্রবালের দুল ছিল, জয়ন্তী খুলিয়া ফেলিয়াছে। কখনো আবার নিদ্রার ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আঁতকাইয়া ওঠে।

কল্যাণের লিভারের মধ্যেও রোগ ছড়াইয়াছে: যন্ত্রণায় আজকাল সে গোঁঙায়। বিকৃত মুখ যন্ত্রণায় আরো বিকৃত হইয়া যায়। হাতে-পায়ের আংগুলের দগদগে ঘা হইতে দুর্গন্ধ ছড়ায়।

বুকের মধ্যে বাচ্চুকে জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপিয়া-ফুঁপিয়া কাঁদে জয়ন্তী।

কল্যাণ শুধায়: 'কি হয়েছে তোমার জয়ন্তী?'

'কই, কিছু ত না!—' চমকাইয়া উঠে জয়ন্তী নিজের অজ্ঞাতেই।

কিন্তু নির্মম ভাগ্যবিধাতা! নিষ্ঠুর।

সত্যই এক দিন জয়ন্তীর দেহে বুকের উপরে একটা লাল গোলাকার চক্রের ন্যায় প্যাচ দেখা গেল।

সন্ধ্যা বেলা নিয়মিত স্নানের পর দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতে করিতেই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করে জয়ন্তী।

সর্বনাশ! এ কি!

রক্তবর্ণের জড়ুল চিহ্নের মত। কই গতকালও ত সে লক্ষ্য করে নাই? বিষাক্ত কালনাগ তবে কি তাহার দেহেও দংশন হানিয়াছে? বিষাক্ত রক্তচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে তারও এই কুসুম-কোমল যৌবনমদির বিহ্বল দেহ! অতুলনীয় তাহার রূপ বিষাক্ত দংশনে বিষ-জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছে!

ক্রমে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বের চক্রচিহ্ন তাহার বড় হইবে। সমস্ত মুখখানা তাহার ডুমো-ডুমো হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিবে। স্বামীর মতই নাকটা বসিয়া যাইবে। সানুনাসিক কণ্ঠস্বর হইবে। চাঁপার কলির ন্যায় দুই হাতের দশ আংগুল চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল জয়ন্তী: এ কি! এ কি! একটা রক্তাভা যেন হাতের আংগুলগুলির মসৃণ ত্বক্ ভেদ করিয়া সর্বনাশা রোগের নিষ্ঠুর ইংগিত দিতেছে!

কুষ্ঠ! কুষ্ঠ!

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল জয়ন্তী।

তর সহিল না জয়ন্তীর। তক্ষুনি নিজে গ্যারাজ হইতে গাড়ী বাহির করিয়া ছুটিল পরেশের বাংলোয়। সারা দিনের কর্মক্লান্তির পর পরেশ তখন সবে স্নান সমাপনান্তে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছে। ঝড়ের গতিতে জয়ন্তী আলু-থালু বেশে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল: 'পরেশদা!'

'কে?—এ কি জয়ন্তী! কি ব্যাপার?' ঘুরিয়া দাঁড়ায় পরেশ।

'এই দেখ! দেখ আমার—আমারও বোধ হয় হয়েছে—' কাপড় খুলিয়া বক্ষের আবরণ সরাইয়া দিল জয়ন্তী!

'কি! কি হয়েছে?'

'কুষ্ঠ! কুট!' কান্নায় জয়ন্তীর কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া যেন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল।

পরেশ পরীক্ষা করিল জয়ন্তীকে। মুখ তাহার গম্ভীর হইয়া উঠিল।

'কি, কথা বলছো না কেন পরেশ দা?'

'ভয় নেই জয়ন্তী। ফার্স্ট ষ্টেজ, চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে! বোস।'

জয়ন্তীর সমস্ত উত্তেজনা, উদ্বেগ যেন মুহূর্তে শান্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাণহীন পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া থাকে জয়ন্তী! পাষাণী অহল্যা! গৌতমের অভিশাপে পাথর হইয়া গিয়াছে যেন!

'জয়ন্তী!' স্নিগ্ধ স্বরে ডাকে পরেশ।

অতি বিষণ্ণ একটুখানি হাসি জয়ন্তীর ওষ্ঠপ্রান্তে চকিতে দেখা দিয়াই মিলাইয়া যায়। কোন সাড়া দেয় না সে পরেশের ডাকে।

অনেকক্ষণ ঐ ভাবেই স্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হয়।

'আমি যাই!' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া জয়ন্তী সাড়ীর স্খলিত অঞ্চলটা গায়ে তুলিয়া দিয়া কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্যই বোধ করি পা বাড়ায়।

'জয়ন্তী!—'

'আজ আর তুমি এসো না পরেশদা—কাল! কাল সকালে এসো।'

জয়ন্তী চলিয়া গেল।

পরের দিন প্রত্যূষে জয়ন্তীদের বাড়ি গিয়া পরেশ দেখিল সব শেষ।

ইদানিং যন্ত্রণা উপশমের জন্য পরেশ কল্যাণের জন্য যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিল তীব্র বিষ, জয়ন্তী তাহাই বেশী পরিমাণে খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এবং অধিক রাত্রে পাশের ঘরে বাচ্চুর কান্নার শব্দ শুনিয়া কল্যাণ জয়ন্তীকে বার বার ডাকিয়াও কোন সাড়া না পাইয়া ও-ঘরে গিয়া দেখে—জ্ঞানহীনা জয়ন্তীর দেহ মেঝেতে পড়িয়া মুখ দিয়া ফেনা গড়াইতেছে। অর্ধেক ঔষধের শিশিটা তখনও পাশে পড়িয়া। বুঝিতে কিছুই কষ্ট হয় না কল্যাণের, সে-ও অতঃপর বাকী ঔষধটুকু খাইয়া আত্মহত্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। পরেশ এক জন মৃত ও অন্য জন প্রায়-মৃত অবস্থায় পাশাপাশি পড়িয়া আছে দেখিতে পাইয়াছিল, আর বাচ্চু কাঁদিতেছে: মা! মা! কিন্তু কে সাড়া দিবে?

পাগলের মতই পরেশ ডাক্তার মৃতদেহটার উপরে ছুরি চালাইতেছে।

শেষই যখন হইয়া গিয়াছে আর চিহ্ন মাত্রও এ-দেহের ও রাখিবে না। বিষ্ণুচক্রে যেমন সতীদেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল পরেশও তাহাই করিবে।

জয়ন্তী নাই—জয়ন্তী মরিয়াছে। কিন্তু কেন? কেন সে মরিবে? জয়ন্তী, আমারই দেখিবার ভুল! তোমার কুষ্ঠ হয় নাই! জয়ন্তী! কি এত রক্ত কোথা হইতে আসিল? উঃ! জয়ন্তীর এত রক্তও
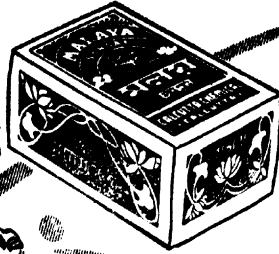
আকর্ষণীয় সৌন্দর্য্যের জন্য
ক্যালকেমিকোর
মলয় চন্দন সাবান
শরীর স্নিগ্ধ রাখে চন্দনের গন্ধে চিত্ত প্রসন্ন করে।
ক্যাষ্টরল ...
সুপরিশ্রুত মধুর সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল। ব্যবহারে চুল ঘন, চিকণ ও রেশমের মত মসৃণ হয়।
লাবণি স্নো ও ক্রীম
মুখের শ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে। দিনের প্রসাধনে স্নো ও রাত্রে ক্রীম ব্যবহার্য্য।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯
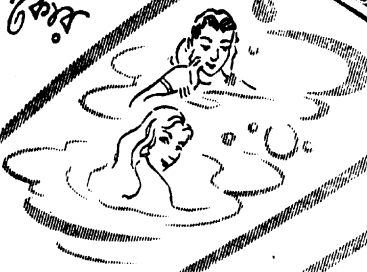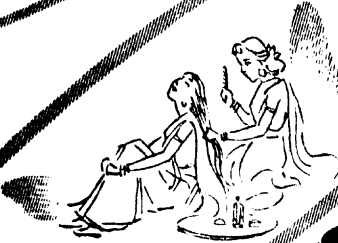
ছিল! খণ্ডিত-বিখণ্ডিত শোণিত-স্নাতা জয়ন্তী যেন নতুন করিয়া আজ আবার এই স্তব্ধ নিশীথে বিবাহের জন্য রক্ত-চেলিতে মণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছে। লাল! রক্ত লাল! রজনীগন্ধা নয়, রক্তকরবী। সন্ধ্যা-মালতী নয়, রক্তপলাশ। জয়ন্তী জাগো! কথা বল!

* * * *

পরের দিন সকালে বুধনের যখন নেশা টুটিল, লাস-কাটা ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। কি আশ্চর্য। ডাক্তার সাহেব সারা রাত্রি ধরিয়া কি এমন লাস কাটিতেছেন?

নেশাটা কাল বড় বেশী হইয়াছিল, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বুধন।

কিন্তু!

থমকাইয়া দাঁড়াইয়া যায় বুধন সন্ত ঘুমভাঙ্গা নেশাগ্রস্ত রক্ত চোখের বোবা দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে তাকাইয়া। খণ্ডিত-বিখণ্ডিত লাসটা টেবিলটার উপরে ছড়াইয়া আছে; আর—আর নীচে মেঝেতে যেন একখানি রক্তের চাদরের উপরে পড়িয়া আছে প্রলম্বিত রক্তাক্ত প্রাণহীন পরেশ ডাক্তারের নিষ্প্রাণ দেহটা। অসাবধানতা বশতঃ হাতের শিরা কাটিয়া যাওয়ায় অতিরিক্ত রক্তস্রাবেই পরেশ ডাক্তারের মৃত্যু ঘটিয়াছে! চাপ-চাপ রক্ত। নিশীথের রক্তপদ্ম ভোরের আলোয় শুকাইয়া কালো হইয়া গিয়াছে।

বুধন দাঁড়াইয়া রহিল।

ওদিকে ইমার্জেন্সী রুমে পরেশ ডাক্তারের এ্যাসিস্‌টেন্ট ডাঃ গৌতমের সারা রাত্রির আপ্রাণ চেষ্টায় কল্যাণ চোখ মেলিয়া তাকাইয়া ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল: 'আমি কোথায়?'

গৌতম কহিল: হাসপাতালে। 'বেশী কথা বলবেন না এখন!'

'জয়ন্তী! জয়ন্তী কেমন আছে জানেন ডাক্তার বাবু?—'

'ভাল আছে, আপনি চুপ করুন।'

'আর বাচ্চু? বাচ্চু একা বাড়িতে আছে—'

'ব্যস্ত হবেন না আপনি। সব ব্যবস্থা হবে, চুপ করুন!—'

ক্লান্তি ভরে কল্যাণ চক্ষু মুদিল।

সহসা এমন সময় লাস-কাটা ঘরের মধ্যে বুধন একটা আর্ত্ত তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠিয়া পরেশ ডাক্তারের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহটার উপরে জ্ঞান হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল।

স্মৃতি কথা

শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা

পাংলা ঠোঁটের কোণায় দৃঢ়সংকল্প আর ছোটো চোখে বিচিত্র বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বেঁটে রোগা ভক্তিন যেদিন প্রথম আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল, তার পরে এক যুগ কেটে গেছে। কিন্তু কেউ যখন এ-সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করে তখন সে চোখের পাতা নামিয়ে চোখের মণির অর্দ্ধেকটা ঢেকে ফেলে চিন্তিতের ভঙ্গীতে চিবুকটা একটু উপরে তুলে বিশ্বাস-ভরা স্বরে উত্তর দেয়—তা ভাই, তোমাদের পাঁচ জনকে আর কি বলব—এই ধর না, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরেই এঁর সঙ্গে আছি। এই হিসেবে আমার বয়স হয় পঁচাত্তর আর ওর বয়েস যে একশো পেরিয়ে যায়—সে দিকে ভক্তিনের কিন্তু খেয়ালই নেই। আর যদিই বা খেয়াল হয় তবুও আমার সঙ্গে যে সময়টা ও কাটিয়েছে তার থেকে এক রতি সময় ও কমাতে চাইবে না। আমার তো বিশ্বাস, আরো কয়েক বছর গেলে পর আমার সঙ্গে থাকার সময়টাকে টেনে সে একশো বছরে পৌঁছে দেবে, তাতে যতই না কেন দেড়শো বছরের অসম্ভব পরমায়ুর ভার আমাকে বইতে হোক।

সেবাধর্মে হনুমানজীর প্রতিদ্বন্দ্বী যে ভক্তিন, সে কোনো অঞ্জনার কন্যা না হয়ে এক অনামধন্যা গোপালিকার কন্যা হয়ে জন্মায়। তার নাম লছ্‌মিন অর্থাৎ লক্ষ্মী। কিন্তু যেমন আমার নামের বিরাটত্ব আমার নিজের পক্ষে দুর্বহ, সে-রকমই লক্ষ্মীর সমৃদ্ধি সে তার কপালের কুঞ্চিত রেখার মধ্যে বাঁধতে পারল না। এমনিতেই তো জীবনে প্রায় সকলকেই নিজের নিজের নামের বিরোধাভাস নিয়ে বাঁচতে হয়, কিন্তু ভক্তিন খুব বুদ্ধিমতী, কেন না, সে তার এই সমৃদ্ধিসূচক নাম কাউকে বলত না। কেবল যখন চাকরীর খোঁজে এসেছিল তখন সততার পরিচয় দেবার জন্য নিজের ইতিবৃত্তের সঙ্গে নামটি ও বলে দিয়েছিল—অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ প্রার্থনাও ছিল যে, আমি যেন এ-নাম ব্যবহার না করি। উপনাম রাখার প্রতিভা থাকলে যে সকলের আগে সেটা আমি নিজের ওপর প্রয়োগ করতাম—এ তথ্য সে গ্রাম্য স্ত্রীলোক, কী করেই বা জানবে—সে জন্য কণ্ঠীমালা দেখে যখন আমি তার নতুন নামকরণ করলাম, তখন ভক্তিনের মত কবিত্বহীন নাম পেয়েও সে খুসীতে গদগদ হয়ে উঠল।

ভক্তিনের জীবনের ইতিবৃত্ত না জেনে ওর স্বভাবের পুরোপুরি কেন আংশিক পরিচয় পাওয়াও শক্ত। সে ঐতিহাসিক ঝুঁসীর গ্রাম-প্রসিদ্ধ গোপালকবীরের একমাত্র কন্যা যে শুধু তাই নয়, বিমাতার স্নেহের যে কিম্বদন্তী আছে তারই ছায়ায় সে পালিত! পাঁচ বছর বয়সে তাকে হাঁড়িয়া গ্রামের এক সম্পন্ন গোয়ালার সব চেয়ে ছোট ছেলের বৌ করে দিয়ে পিতা তো শাস্ত্রের চেয়ে দু'পা এগিয়ে থাকার খ্যাতি অর্জন করলেন আর ন'বছরের যুবতী কন্যাকে দ্বিরাগমনে শ্বশুর-ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে বিমাতা অযাচিত ভাবে পরের ধন ফিরিয়ে দেবার পুণ্য সঞ্চয় করলেন।

পিতার অগাধ ভালবাসা ওর ওপরে থাকায় ঈর্ষ্যান্বিত আর সম্পত্তি-রক্ষায় সতর্ক বিমাতা স্বামীর মরণাত্মক রোগের খবর মেয়েকে তখনই পাঠালেন যখন রোগ মৃত্যুর সূচনায় পরিণত হয়েছে। কান্নাকাটির দুর্লক্ষণ থেকে বাঁচার জন্য শাশুড়ী ওকে কিছু বললেন না। 'অনেক দিন বাপের বাড়ী যাওনি—একবার গিয়ে দেখে এসো—' এই বলে ওকে সাজিয়ে-গুজিয়ে শাশুড়ী পাঠিয়ে দিলেন। এ-রকম অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ পেয়ে ওর পায়ে যে ডানা গজিয়েছিলো—গাঁয়ের প্রান্তে এসে সে ডানা যেন খসে গেল। 'হায় লছমিন, তুই এতক্ষণে এলি!' এ ধরণের অস্পষ্ট কথার পুনরাবৃত্তি আর শত সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি ওকে ঘর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে না ছিল পিতার চিহ্নের অবশেষ, না ছিল বিমাতার ব্যবহারে

শিষ্টাচারের লেশ। দুঃখে অসাড় দেহ নিয়ে সে অপমানে জলতে-জলতে ও বাড়ীতে জলটুকু পর্যন্ত মুখে না দিয়ে শ্বশুরবাড়ী ফিরে এলো। এখানে এসে শাশুড়ীকে কড়া কথা শুনিয়ে সে বিমাতার প্রতি ক্রোধ শান্ত করল, আর স্বামীর গায়ে গয়না ছুঁড়ে ফেলে সে পিতার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের মর্মব্যথা ব্যক্ত করল।

জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও সুখের চেয়ে দুঃখই বেশী ছিল। যখন সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ আর শালগ্রামের মত চ্যাপ্টা গোলাকার মুখওয়ালা প্রথম কন্যার আরো দুই সংস্করণ তৈরী করল, তখন শাশুড়ী আর বড় জায়েরা উপেক্ষার ভঙ্গীতে ঠোঁট বাঁকা করলেন। ওদের পক্ষে সেটা উচিতও ছিল; কেন না, শাশুড়ী তো তিন-তিনটি উপার্জনক্ষম পুত্রের বিধাত্রী হয়ে মোড়ায় অধিষ্ঠিত থেকে গ্রামে সম্মানিত বৃদ্ধার গৌরবময় পদ অধিকার করে বসে আছেন। আর দুই বড় জা ভুশণ্ডী কাকের মত কালো-কালো ক্রমবদ্ধ পুত্রসন্তানের সৃষ্টি করে এই পদের উমেদারি করছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ ছেড়ে চলার জন্য ছোট বৌকে অবশ্যই দণ্ড পেতে হবে।

বড়ো জায়েরা বসে-বসে পরনিন্দা করতেন। আর তাদের কালো-কালো ছেলেগুলো ধুলো ওড়াতো। ভক্তিন মাঠা তৈরী করা, কোটা, পেষা, রাঁধাবাড়া সমস্তই করত। ওর ছোটো-ছোটো মেয়েরা গোবর কুড়োতো, ঘুঁটে দিতো। বড়ো জায়েরা নিজেদের ভাতের ওপর সাদা ঝোলা গুড় রেখে তার ওপর ঘন দুধ ঢালত, নিজেদের ছেলেদের বলকতোলা দুধ খাওয়াতো। এদিকে ভক্তিন খেতে পেতো কাঠের বাটিতে করে কালো গুড়ের টুকরোর সঙ্গে একটু-খানি মাঠা আর ওর মেয়েরা ছোলা আর বাজরার ঘুগনি চিবোত।

এই দণ্ডবিধানের মধ্যে এমন কোনো ধারা ছিল না যাতে অচল টাকার টাঁকশালের মতো (কেবল মেয়ের জন্ম দেওয়াতে) পত্নীর প্রতি তার স্বামীর মন বিরূপ করা যায়। এত চুগলি শয়তানীর পরিণতি হ'ল এই যে, এতে স্বামীর পত্নীপ্রেম দিন-দিন বেড়েই চলল। বড়ো জায়েরা তো কথায় কথায় স্বামীদের কাছে দমাদ্দম মার খেতো, কিন্তু ওর স্বামী কখনো ওর গায়ে হাত তোলেনি। বড়লোক বাপের আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন মেয়েকে সে ঠিক চিনতে পেরেছিল। তাছাড়া পরিশ্রমী, তেজস্বিনী আর পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত পত্নীকে সে যে খুব ভালবাসত তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ওর ভালবাসার জোরেই ভক্তিন পরিবারের সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সবাইকে আচ্ছা জব্দ করল। সংসারের যাবতীয় কাজ ও নিজের হাতে করত, সেই জন্য গরু, মোষ, ক্ষেত, আম বাগানের গাছ—এ সব সম্বন্ধে ওর জ্ঞানই ছিল সব চেয়ে বেশী। বাইরে অসন্তোষ দেখিয়ে আর মনে-মনে পুলকিত হয়ে ভক্তিন বেছে-বেছে সব চেয়ে ভালো জিনিসগুলিই নিল; তাছাড়া পরিশ্রমী দম্পতির নিরন্তর প্রয়াসে সে সব জিনিসে সোনা-ফলাও স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

খুব ধুমধাম ক'রে তো বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলো। এমন সময় খেলাঘরে খেলছে এ রকম দুই মেয়ে আর নূতন গৃহস্থালীর সব ভার উনত্রিশ বছরের স্ত্রীর ওপর ছেড়ে স্বামী সংসার থেকে বিদায় নিল। মরবার সময় ওর বয়স ছত্রিশের কিছু বেশী ছিল, কিন্তু স্ত্রী ওকে এখনো বুড়ো বলে স্মরণ করে। ভক্তিন ভাবে, ও নিজে যখন বুড়ী হয়ে গেছে তখন স্বর্গে গিয়ে স্বামীও কি বুড়ো হয়নি? এখন ওকে বুড়ো না বললে যে ওকে অপমান করা হয়।

ভক্তিনের সবুজ ফসলে ভরা ক্ষেত, মোটাসোটা গরু, মোষ আর ফলে-ভরা গাছ দেখে ভাসুর আর ভাসুরপোদের লোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। ওদের পক্ষে এ সব জিনিস পাওয়া তবেই সম্ভব হয় যদি ভাইয়ের বৌ আবার বিয়ে করে। কিন্তু জন্ম থেকে খারাপ ভক্তিন ওদের ফাঁদে পা দিল না। রাগে দুম-দুম করে পা ফেলে উঠোন কাঁপিয়ে সে বলল—'আমি তো আর কুকুর-বেড়াল নই, আমার পোষায় তো আমি অন্যের ঘরে যাব, নয় তো তোমাদের পাঁচ জনের বুকের ওপর কাঁচা ছোলা ভাজব আর এখানেই রাজত্ব করব, সামলে থেকো।'

শ্বশুর, দাদাশ্বশুর আর তারও আগে কত পুরুষের উপার্জিত এ সব জায়গা-জমি কে জানে! ভক্তিন কিন্তু তার নিজের অংশ থেকে একটি ছুঁচের ডগার মতো জমিও ওদের দেবার মতো উদারতা দেখাল না। তাছাড়া, গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিল, কণ্ঠী গলায় দিল, ঘিয়ে চক্‌চকে চুলগুলো স্বামীর নামে বিসর্জন দিয়ে ওকে যে কিছুতেই টলানো যাবে না, তা বুঝিয়ে দিল। ভবিষ্যতে যাতে সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকে সেই জন্য ছোট দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তাদের শ্বশুড়বাড়ী পাঠিয়ে দিল। আর যে বড় জামাইকে ওর স্বামী নিজে পছন্দ করেছিল, তাকে ঘর-জামাই করে এনে রাখল। এ ভাবে তার জীবনের তৃতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হ'ল।

ভক্তিনের দুর্ভাগ্যও ওর চেয়ে কম জেদী ছিল না। কিশোরী থেকে যুবতী হতেই বড় মেয়ে বিধবা হ'ল। যে ভাসুরেরা এত কাল ভাইয়ের বৌয়ের কাছে আমল পায়নি, আর যে সব ভাসুরপোরা কাকীকে জব্দ করবে বলে দৃঢ়-সংকল্প করে আছে, তারা সবাই এত কালে আশার একটি ক্ষীণ রশ্মি দেখতে পেল।

বিধবা বোনের বিয়ের জন্য বড় জ্যাঠতুতো দাদা নিজের শালাকে আনিয়ে নিল। সে শালাটির একমাত্র কাজ ছিল তিতিরের লড়াই দেখা। দাদা মনে করল যে, এর সঙ্গে বোনের বিয়ে হ'লে সম্পত্তি নিজেদের হাতেই থাকবে। এদিকে ভক্তিনের মেয়েও কিন্তু মায়ের চেয়ে কম বুদ্ধিমতী ছিল না। সে জন্য বর ওর পছন্দ হ'ল না। বাইরের লোক ভগ্নীপতি হয়ে এলে দাদাদের পক্ষে একটু অসুবিধা হয়, তাই সেই প্রস্তাব চাপা পড়ে রইল। তখন দুই মা-মেয়েতে মিলে প্রাণপণে নিজেদের সম্পত্তির দেখাশোনা করতে লেগে গেল। আর 'গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল' হয়ে যে বরটি এসেছিল—তার সমর্থকেরা তাকে পতিত্বে অভিষিক্ত করার উপায় খুঁজতে লাগল।

একদিন মায়ের অনুপস্থিতিতে বর মশাই মেয়ের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তার পরে নিজের পক্ষের গাঁয়ের লোকদের ডাকতে লাগলেন। গয়লার মেয়ে যখন ডাকাত বরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে দরজা খুলল তখন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বড়ই সমস্যায় পড়ে গেল। যুবক বলল যে, মেয়েটি ওকে ডেকে নিয়ে গেছে আর যুবতী অনুরোধ করল যে, ওর মুখে যে পাঁচ আঙুলের দাগ রয়েছে তাতেই যেন ওরা নিমন্ত্রণের চিহ্ন দেখে নেয়। শেষ পর্যন্ত সুবিচারের জন্য পঞ্চায়েৎ বসল। সবাই মাথা নেড়ে-নেড়ে এ-বিষয়ে এই একমতই দিলেন যে, এ সমস্যার মূল কারণ হ'ল যে এটা কলিযুগ। আপিলহীন বিচার দাঁড়ালো এই রকম—দু'জনের মধ্যে হয় এক জন সত্যি বলেছে নয় তো দুজনেই মিথ্যে বলেছে,

কিন্তু যখন দু'জনেই এক ঘর থেকে বেরিয়েছে তখন ওরা স্বামি-স্ত্রী ভাবে বাস করলেই কলিযুগের দোষ কতকটা পরিমার্জন করা যায়। অপমানিত বালিকা দাঁতে ঠোঁট কেটে রক্ত বার করল আর মা অগ্নিদৃষ্টিতে সেই ঘাড়ে-পড়া জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। এই সম্বন্ধ কিছুমাত্র সুখের হ'ল না, কারণ জামাই এখন নিশ্চিন্ত হয়ে তিতিরের লড়াই দেখতে লাগল আর মেয়ে রাগে জ্বলতে থাকল। এত যত্ন করে ওরা যে সব গরু, মোষ, ক্ষেত, খামার করেছিল, সবই পারিবারিক বিদ্বেষে নষ্ট হয়ে গেল। সুখে থাকার কথা ছেড়ে দিয়ে নিয়মিত খাজনা আদায় করাও শক্ত হয়ে উঠল। শেষে একবার খাজনা না পৌঁছনতে জমিদার ভক্তিনকে ডাকিয়ে কড়া রোদে দাঁড় করিয়ে রাখল। এই অপমান তো ওর কর্মঠতার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় কলঙ্ক, তাই পরের দিনই ভক্তিন উপার্জনের চেষ্টায় সহরে এসে পড়ল।

মোটা ময়লা ধুতি দিয়ে ন্যাড়া মাথার সমস্তটুকু ঢেকে ফেলে কেবল মাত্র একটা কান বাইরে রাখল যেন শুধু সব রকম শব্দ শোনারই জন্য। এই ভাবে যখন ও আমার এখানে এসে সেবক-ধর্মে দীক্ষিত হ'ল, তখনই ওর জীবনের চতুর্থ আর সম্ভবতঃ অন্তিম পরিচ্ছেদের যে শুরু হ'ল তা শেষ হতে এখনো দেরী আছে।

ভক্তিনের বেশভূষায় গৃহস্থ আর বৈরাগীর সম্মিশ্রণ দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—'তুমি রাঁধতে জানো তো?' উত্তরে সে ওপরের ঠোঁট ঈষৎ সঙ্কুচিত করে নীচের ঠোঁট একটু এগিয়ে আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলল—'এ আবার কি এমন একটা বড় কথা হ'ল? রুটি গড়তে জানি, ডাল রাঁধতে পারি, শাক ভাজতে পারি—তবে আর বাকী রইল কী?'

পরের দিন ভোরে উঠে মাথায় কয়েক ঘটি জল ঢেলে আমার ধোয়া ধুতিখানা জলের ছিটে দিয়ে পবিত্র করে ও পরল। তার পর পুব দিকের সূর্য আর আমার দরজার পাশের অশ্বত্থ গাছ—এদের ও দু'ঘটি জল দিয়ে অভিনন্দিত করল। দু'মিনিট নাক টিপে জপ করার পর যখন কয়লার মোটা রেখা টেনে নিজের সাম্রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট করে রান্না-ঘরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন আমি বুঝে নিলাম যে, এ সেবকের সঙ্গে চলা কঠিন হবে। নিজের খাওয়া সম্বন্ধে নিতান্ত বীতরাগ হওয়া সত্ত্বেও আমি রন্ধন-বিদ্যার জন্য পরিবারে প্রখ্যাত আর অন্য পাক-কুশল ব্যক্তির রান্নার খুঁত না ধরে থাকতে পারি না। কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির জন্য প্রাণ দিতে পারে এবং কথায়-কথায় উপোস করে এমন লোকের কথা যখন স্মরণে এলো আর ভক্তিনের শঙ্কাকুল দৃষ্টির মধ্যে যে নিষেধ লুকানো ছিল তা অনুভব করলাম,—তখন সে কয়লার রেখা আমার কাছে লক্ষ্মণের ধনুকের রেখার মত দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠল। নিরুপায় হয়ে নিজের ঘরে বিছানায় পড়ে চোখের সামনে বই খুলে রান্না-ঘরের পিঁড়িতে আসীন যে অনধিকারী রয়েছে, তার কথা ভোলবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

খাবার সময় যখন নিজের জন্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্থান গ্রহণ করলাম, তখন ভক্তিন খুশী-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আত্মতুষ্টির মৃদু হাস্য করে আমার কাঁসার থালায় এক আঙুল পুরু গভীর কালো রঙে চিত্রিত চারখানা রুটি রেখে থালাখানার এক দিক উঁচু করে তাতে ঘন ডাল পরিবেশন করল। কিন্তু আমি যখন ওর উৎসাহের ওপর তুষারপাত করে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললাম—'এ সব কী রেঁধেছ?' তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

তার পর ও ব'লে চলল—রুটিগুলি অবশ্য ভালো করে সেঁকতে গিয়ে একটু কড়া হয়ে গেছে, কিন্তু ভালো হয়েছে। তরকারি তো ছিল তবে ডাল যখন রয়েছে তখন তার আর কী দরকার? রাতে ডাল না করে তরকারিই না হয় করে দেওয়া যাবে। দুধ, ঘি, আমি খেতে ভালোবাসি না, নয় তো সব ঠিক হয়ে যেত। এখন না হয় আমচুর আর লাল লঙ্কা বেটে চাটনী করে নেওয়া যাবে। তাতেও যদি না হয়তো গ্রাম থেকে গাঁঠরী বেঁধে যে গুড় এসেছে তার থেকেই কিছু দেবে না হয়। সহরের লোকেরা কি আর কিছু সোনার জিনিষ খায়? ও তো তাই বলে কিছু আনাড়িও নয়, নোংরাও নয়, ওর শ্বশুর, খুড়শ্বশুর, দিদিশাশুড়ী সবাই পাক-কুশলতার জন্য ওকে কত মৌখিক প্রমাণপত্র দিয়েছে।

ভক্তিনের সারগর্ভ বক্তৃতার ফল এই হ'ল যে মিষ্টি পছন্দ করি না বলে গুড় ছাড়া, আর ঘিয়ে অরুচি থাকায় শুধু ডাল দিয়ে একটা মোটা রুটি খেয়ে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পৌঁছলাম আর ন্যায়সূত্র পড়তে-পড়তে সহর আর গ্রাম্য জীবনের মধ্যে এই যে তফাৎ তার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলাম।

আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা অন্যদের থেকে আলাদা করার কারণ হ'ল যে, আমার স্বাস্থ্য দিন-দিন খারাপ হওয়াতে পরিবারের সকলেই আমার জন্য চিন্তিত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবস্থা এমনই হ'ল যে তাতে উপচারের প্রশ্নই সরে গেল। এই দেহাতী বৃদ্ধা জীবনযাত্রার সরলতার প্রতি আমাকে এতখানি জাগ্রত করে দিল যে, আমি সুবিধার কথা চিন্তা করা দূরে থাক, নিজের অসুবিধাগুলোও গোপন করতে লাগলাম।

তাছাড়া ভক্তিনের স্বভাব এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ও অন্যকে নিজের মনোমত করে গড়ে তুলতে চাইবে, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোনো রকম পরিবর্তনের কল্পনা করাও ওর পক্ষে অসম্ভব। এর জন্য আজ আমি নিজে অনেকটা দেহাতী হয়েছি কিন্তু সহরের হাওয়া ওকে স্পর্শও করেনি। রাত্তিরে তৈরী জোয়ারের হালুয়া সকালে মাঠা মিশিয়ে খেতে যে কতো ভালো লাগে, তিল-মিশানো বাজরার পিঠেও যে কত সুন্দর খেতে হয়, ভুট্টার সবুজ দানাগুলোকে ভেজে খিচুড়ি করলে যে কত সুস্বাদু হয়, সাদা মহুয়ার লপসী যে সংসারের সব রকম হালুয়াকে লজ্জা দিতে পারে—এ সব তথ্য ক্রিয়াত্মকরূপে সে আমাকে শেখাচ্ছে। কিন্তু এখানকার রসগোল্লারও এখনো ভক্তিনের দন্তহীন মুখে প্রবেশ লাভ করার সৌভাগ্য হয়নি! দিন-রাত রাগারাগি করেও ওকে এখনো সাফ ধুতি পরতে শেখাতে পারিনি—এদিকে আমার নিজের হাতে ধুয়ে শুকোতে দেওয়া কাপড় এনে পাট করার নামে তাকে আরো কুঁচকে রেখে দেয়। আমি ওকে আমার নিজের ভাষার অনেক রূপকথা কণ্ঠস্থ করিয়ে দিয়েছি কিন্তু ডাকলে পরে 'ওয়' না বলে 'জী' বলার শিষ্টাচারটুকুও এখনো ওকে শেখাতে পারিনি।

ভক্তিন বেশ ভালো—এ কথা বলা কঠিন, কারণ ওর মধ্যে দোষ-ত্রুটির অভাব নেই। ও তো সত্যবাদী হরিশ্চন্দ্র হতে পারবে না। আবার 'নরো বা কুঞ্জরো বা' বলায়ও ওর বিশ্বাস নেই। আমার যে সব টাকা-পয়সা এখানে-সেখানে পড়ে থাকে, তারা যে
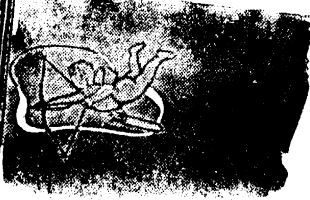
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
বিখ্যাত গিনিস্বর্ণের
অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
ব্রাঞ্চ হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ
১৫৯/১ বি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল)
আমাদের পুরাতন শো-রুমের বিপরীতদিকে ফোন- এভিন্যু ১৭৬১ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,
ব্রাঞ্চ—হিন্দুস্থান মার্ট, বালিগঞ্জ ফোন—পি. কে. ৪৪৬৬

ভাঁড়ার-ঘরের কোনো ছোট হাঁড়ির মধ্যে কি করে অন্তর্হিত হয়ে যায় এ রহস্যও ভক্তিনের জানা আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কেউ কোনো ইঙ্গিত করতেই ওকে শাস্ত্রার্থের জন্য এ ভাবে আহ্বান করে বসবে যার সম্মুখীন হওয়া কোনো তর্কশিরোমণির পক্ষেও সম্ভব নয়। এ ওর নিজের ঘর—টাকা-পয়সা এখানে-ওখানে পড়ে থাকলেও সেগুলোকে সামলে রাখে। একে কি চুরি বলে? ওর জীবনের পরম কর্তব্য আমাকে খুশী রাখা—যে কথায় আমার রাগ হতে পারে তাকে কিছু বদ্‌লে এদিক-ওদিক করে বলাকে কি মিথ্যা বলবে? এটুকু চুরি আর এটুকু মিথ্যা তো স্বয়ং ধর্মরাজের মধ্যেও আছে—নয় তো তিনি ভগবানকেই বা কি করে প্রসন্ন রাখেন আর সংসারটাকেই বা কি করে চালান!

শাস্ত্রের প্রশ্নের উত্তরও ভক্তিন নিজের সুবিধা মত বানিয়ে নেয়। মেয়েদের মাথা কামানো আমার ভালো লাগে না, তাই আমি ভক্তিনকে বাধা দিয়েছিলাম। অকুণ্ঠিত ভাবে সে উত্তর দিল যে, এ তো শাস্ত্রে লেখা আছে? কৌতূহলের বশে আমি জিজ্ঞেস করেই বসলাম যে, কি লেখা আছে। তৎক্ষণাৎ উত্তর হ'ল, 'তীরথ গয়ে মুঁড়ায়ে সিদ্ধ' অর্থাৎ তীর্থে গিয়ে মস্তক মুণ্ডন করলে তবে সিদ্ধ হয়। কোন্ শাস্ত্রে যে এই রহস্যময় সূত্র আছে এ কথা জানা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাই আমাকে হার মেনে চুপ করতে হ'ল আর ভক্তিনের চূড়াকর্ম প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এক দরিদ্র নাপিতের গঙ্গাজলে ধোয়া ক্ষুরে যথাবিধি নিষ্পন্ন হতে লাগল।

কিন্তু ও মূর্খ, বিদ্যা-বুদ্ধির মাহাত্ম্য বোঝে না—এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হয়। নিজের বিদ্যার অভাব ও আমার লেখাপড়ার গর্ব দিয়ে ভরিয়ে রাখে। একবার আমি যখন সব কর্মচারীদের কাছ থেকে টিপসইএর বদলে নামসই নেবার নিয়ম করলাম তখন ভক্তিন ভারী অসুবিধায় পড়ে গেল। কারণ একে তো পড়ার জন্য পরিশ্রম করা—এ ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাছাড়া গাড়োয়ান, ঝি—এদের সঙ্গে বসে পড়াশোনা করা ওর বার্দ্ধক্যের পক্ষে অপমানকর ছিল। তাই ও বলতে শুরু করল—আমার মালিক রাত-দিন বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন —এখন আমিও পড়তে লাগি যদি তো ঘর-গেরস্তী দেখে-শোনে কে?

শিক্ষক ও ছাত্র দু'য়েরই ওপর এই তর্কের এমন প্রভাব পড়ল যে, ভক্তিন ইন্সপেক্টরের মতো ক্লাসে ঘুরে-ঘুরে কাউকে আ ই লেখার ধরণ শেখাতে লাগল, আবার কারোর হাতের মন্থরতা, কারোর বুদ্ধির মন্দতা নিয়ে টিকা-টিপ্পনী করার অধিকারও পেয়ে গেল। ওকে তো টিপসই করে বেতন নিতে হয় না, তাই পড়াশোনা না করেই ও পড়ুয়াদের গুরু হয়ে বসল। নিজের তর্কই কেবল নয়, তর্কহীনতার জন্যও প্রমাণ বের করায় ও পটু। নিজেই নিজেকে মাহাত্ম্য দেবে বলে নিজের মনিবকে ও অসাধারণ বানাতে চাইতো, কিন্তু এর জন্যও তো প্রমাণ খুঁজে বার করা আবশ্যক।

একবার আমি পরীক্ষার খাতা ও ছবি নিয়ে যখন খুব ব্যস্ত ছিলাম তখন ভক্তিন সকলকে বলে চলল—ও বেচারী তো রাত-দিন কাজের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে থাকে। আর তোমরা সবাই বেশ ঘুরে বেড়াও। চলো, হাতে-হাতে একটু সাহায্য করবে। এ কথা সবাই জানে যে এ সব কাজে সাহায্য করা যায় না। তাই ওরা কোনো মতে নিজেদের অসামর্থ্য জানিয়ে ভক্তিনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো। বাস্, এই প্রমাণের আধার পেয়ে ওর সব অতিশয়োক্তিগুলি বিস্তার লাভ করতে লাগল। ওর মনিবের মতো কাজ কেউ জানে না, তাই তো ডাকলে পরেও কেউ সাহস করে এগোয় না।

কিন্তু ও স্বয়ং আমার কাজে কোনো সহায়তা করতে পারে না—এ কথা মেনে নেওয়া মানে হীনতা স্বীকার করা। তাই ও সব সময় দরজার কাছে বসে বার বার কাজ করে দেবার আগ্রহ দেখায়। কখনো পরীক্ষার খাতাগুলো বেঁধে, কখনো অসমাপ্ত ছবিখানা ঘরের কোণায় রেখে, কখনো রঙের পেয়ালা ধুয়ে, কখনো চাটাইখানা আঁচল দিয়ে ঝেড়ে ও যেমন ভাবে কাজে সাহায্য করে তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভক্তিন অন্য অনেক ব্যক্তির চেয়ে অধিক বুদ্ধিমতী। ও জানে যে, যেখানে অন্য কেউ আমাকে সাহায্য করার কল্পনাও করতে পারে না, সেখানে সে নিজের সেই ইচ্ছাটিকে কাজেও ফলিয়ে তুলতে পারে। সে জন্য যখনই আমার কোন বই প্রকাশিত হয় তখন ওর মুখে যে প্রসন্নতার আভা ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে তুলনা হয় একমাত্র সুইচ টিপলে বাল্‌বের ভিতরে লুকানো আলোর। বইটিকে বার বার ছুঁয়ে, চোখের কাছে নিয়ে গিয়ে, চার দিক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেন তার মধ্যে নিজের সহায়তার অংশটুকু খুঁজতে থাকে। তখন ওর দৃষ্টিতে যে আত্মতৃপ্তির ভাব ব্যক্ত হয়, তাতেই বোঝা যায় যে ওকে নিরাশ হতে হয় না। এটা অবশ্য স্বাভাবিক। কোনো ছবির শেষে কত ব্যস্ত হয়ে আমি যখন বার বার ডাকলেও খেতে যাই না, তখন একবার দইয়ের সরবত, একবার তুলসীপাতার রস দিয়ে চা করে এনে দিয়ে ও আমাকে ক্ষিধের কষ্ট কখনো সইতে দেয় না। সমস্ত দিনের কাজের পর একটু অবসর পেয়ে যখন আমি কোনো লেখা সমাপ্ত করতে কি কোনো ভাব নিয়ে ছন্দোবদ্ধ করতে বসি, তখন ছাত্রাবাসের আলো নিবে যায়, আমার হরিণী সোনা খাটের পায়ার কাছে ফরাসে বসে রোমন্থন করা থামিয়ে দেয়, কুকুর বসন্ত ছোট মোড়ায় শুয়ে থাবায় মুখ ঢেকে চোখ বুঁজে ফেলে আর বেড়াল গোধূলি আমার তাকিয়ায় সঙ্কুচিত হয়ে শুয়ে থাকে।

কিন্তু আমাকে রাত্রির নিস্তব্ধতায় একা ছাড়বে না ভেবে কোণায় সতরঞ্চির আসনে বসে ভক্তিন বিজলী বাতির তীব্রতায় চোখ পিট্‌পিট্ করতে-করতে প্রশান্ত ভাবে জেগে বসে থাকে। ও ঝিমোয়ও না, কারণ মাথা তুলতেই ওর ধোঁয়াটে দৃষ্টি আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে। যদি আমি আমার মাথার পাশে র‍্যাকের দিকে তাকাই তবে ও উঠে যে বইটা দরকার তার কি রঙ জানতে চায়; আমি যদি কলমটা রেখে দিই, ও কালি এনে দেয় আর আমি যদি সামনের কাগজ এক পাশে সরিয়ে দিই, তবে ও অন্য ফাইল হাতড়াতে থাকে।

অনেক রাতে শুয়েও আমি খুব তাড়াতাড়ি উঠি। আর ভক্তিনকে তো আমার আগেই জাগতে হয়, কারণ সোনা লাফালাফি করার জন্য অস্থির হয়ে বাইরে যেতে চায়, বসন্ত নিত্যকর্মের জন্য দরজা খোলাতে চায় আর গোধূলি পাখীদের ডাকে শিকারের আমন্ত্রণ পায়।

আমার ভ্রমণেরও একান্ত সাথী এই ভক্তিন। বদরী-কেদারের উঁচু-নীচু সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী রাস্তায় ও যেমন জেদ করে আমার আগে-আগে চলে, তেমনি গাঁয়ের ধুলো-ভরা পায়ে-চলা পথে আমার পেছনে থাকতে ভোলে না। যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো সময়ে, যেখানেই যাবার জন্যে প্রস্তুত হই না কেন, ভক্তিনকে ছায়ার মতো সঙ্গে পাই।

যুদ্ধকে দেশের সীমার মধ্যে বাড়তে দেখে যখন সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠল, তখন ভক্তিনের মেয়ে-জামাই, ওর নাতিকে নিয়ে এলো

ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে। কিন্তু অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়েও ওকে সঙ্গে নিতে পারল না। ও সবাইকে দেখে আসে, টাকা পাঠায়, কিন্তু ওদের সঙ্গে থাকার জন্য যে আমার সঙ্গ ছাড়া দরকার এ কথা সম্ভবত: ভক্তিনের জীবনের অন্ত পর্যন্ত ও স্বীকার করবে না।

গত বছর যুদ্ধের ভূত এসে যখন বীরত্বের স্থানে পলায়নবৃত্তি জাগিয়ে দিল, তখন ভক্তিন প্রথম বার সেবকের বিনীত ভাব নিয়ে আমাকে গাঁয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করতে এসেছিল। বলল—ও লাকড়ির মাচায় নিজের নতুন ধুতি বিছিয়ে আমার কাপড় রেখে দেবে, দেয়ালে পেরেক পুঁতে তার ওপর তক্তা রেখে আমার বই সাজিয়ে দেবে, খড়ের চাটাইয়ের ওপর আমার কম্বল পেতে ও আমার শোবার ব্যবস্থা করে দেবে, রঙ কালি—এ সব নতুন হাঁড়িতে সাজিয়ে রাখবে আর সমস্ত কাগজপত্র সিকেয় তুলে যথাবিধি গুছিয়ে রেখে দেবে।

এ প্রস্তাবের অবকাশ না দেবার জন্য আমি বলেছিলাম যে, ওখানে গিয়ে থাকার মতো টাকা আমার নেই। কিন্তু সে কথা বলার পরিণাম দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। পরম রহস্য উদ্‌ঘাটনের ভঙ্গীতে নিজের দন্তহীন মুখ আমার কানের কাছে এনে ধীরে-ধীরে বলল যে, ওর পাঁচ বিশ পাঁচ টাকা মাটিতে পোঁতা আছে। তার থেকেই ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। যখন সব ঠিক হয়ে যাবে তখন আবার এখানেই ফিরে আসব। ভক্তিনের কৃপণতার প্রমাণ পুঞ্জীভূত হয়ে পর্বতাকার ধারণ করেছে, কিন্তু এই উদারতার ডিনামাইট তাকে মুহূর্তে উড়িয়ে দিল। এই কয়েকটি টাকার বিশেষ কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু টাকার প্রতি ভক্তিনের অনুরাগ এতই বিখ্যাত ছিল যে, আমার জন্য তার এই ত্যাগ তাকে মহত্ত্বের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিল।

ভক্তিন আর আমার মধ্যে সেবক-স্বামীর সম্বন্ধ আছে এ কথা বলা কঠিন, কারণ এমন কোনো মনিব হয় না যে ইচ্ছা হ'লেও সেবককে ছাড়িয়ে দিতে পারে না, আবার এ রকম কোনো সেবকের কথাও শোনা যায়নি যে মনিবের কাছ থেকে চলে যাবার আদেশ পেয়েও অবজ্ঞার হাসি হাসে। ভক্তিনকে চাকর বলা ততখানিই অসঙ্গত—যতখানি অসঙ্গত ঘরের মধ্যে বার বার আসা-যাওয়া করে এমন যে আলো-ছায়া আর প্রাঙ্গণের গোলাপ আর আম গাছকে সেবক বলে মনে করা। ওদের যেমন এক রকম অস্তিত্ব আছে যাকে সার্থকতা দেবার জন্য ওরা আমাদের সুখ-দুঃখ দেয়; সে রকম ভক্তিনেরও একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে যা নিজের বিকাশের পরিচয় দেবার জন্যেই আমার জীবনকে ঘিরে রেখেছে। পরিবার আর পরিস্থিতির জন্য ওর স্বভাবের মধ্যে যে সব অসামঞ্জস্য উৎপন্ন হয়েছে, তার ভিতর থেকে স্নেহ আর সহানুভূতির আভাসও দেখা দেয়। এর জন্য ওর নিকট-সম্পর্কে এলেই ওর মধ্যে জীবনের সহজ মার্মিকতা পাওয়া যায়।

ছাত্রাবাসের মেয়েদের মধ্যে কেউ হয়তো চা করার জন্য রান্না-ঘরের কোণায় ঢুকে আছে, কেউ আবার দুধ জ্বাল দেবার জন্য হয়তো চৌকাঠের ওপর বসেই আছে, কেউ বা বাইরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য তৈরী খাবার চেখে দেখে তার স্বাদ বিবেচনা করছে। আমি বাইরে বেরোবা মাত্রই সব পাখীর মত যেন কোথায় উড়ে চলে যায় আবার আমি ভিতরে ঢুকতেই সবাই এসে যথাস্থানে বিরাজ করে। এদের আসায় যাতে কোনো বাধা না হয় সম্ভবত: সেই জন্যে ভক্তিন ওর দু'বেলার খাবার সকালেই তৈরী করে দেয়াল-আলমারীতে রেখে দেয় আর খাবার সময় রান্না-ঘরের একটা কোণা ধুয়ে নিয়ে শুচিতার সনাতন নিয়মের সঙ্গে চুক্তি করে নেয়।

আমার পরিচিত আর সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গেও ভক্তিন বিশেষ পরিচিত। কিন্তু ওদের প্রতি ভক্তিনের সম্মানের মাত্রা আমার প্রতি ওদের সম্মানের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। আর ওর সদ্ভাবও ওদের প্রতি আমার সদ্ভাব থেকেই নিশ্চিত হয়। এ ব্যাপারে ভক্তিনের সহজ বুদ্ধি দেখলে বিস্মিত হতে হয়। কাউকে আকার-প্রকার-বেশভূষার সাহায্যে মনে রাখে, আবার কাউকে নামের অপভ্রংশের সাহায্যে। কবি আর কবিতার সম্বন্ধে ওর জ্ঞান থাকলেও সে সব বিষয়ে ওর মনে কোনো সম্ভ্রমের ভাব নেই। কারোর লম্বা-লম্বা চুল, ব্যস্ত-সমস্ত ধরণ-ধারণ দেখে ও বলে ওঠে—ও বুঝি কবিতা লেখে? তখনি আবার অবজ্ঞার ভাবে বলে—তবে ও কিছুই করে না। ব্যাস্—গেয়ে-বাজিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু সকলের দুঃখই ওকে প্রভাবিত করে। বিদ্যার্থীদের মধ্যে কেউ যদি কারাগারের অতিথি হয় তবে সে খবর পেয়ে ভক্তিন ব্যথিত হয়ে কেবল বলতে থাকবে—এটুকুটুকু কড়ে আঙুলের সমান ছেলেদের আবার জেল—কলিযুগ তো চলেছে—এবারে প্রলয় হয়ে যাবে—ওদের মায়েদের কিন্তু এ নিয়ে বড়লাট পর্যন্ত লড়া উচিত।—সারা দিন এ সব কথা বলে-বলে সকলকে বিরক্ত করে তুলবে। বাপু (গান্ধীজী) থেকে শুরু করে সাধারণ লোক পর্যন্ত—সকলের প্রতি ভক্তিনের সহানুভূতি সমান।

ভক্তিনের সংস্কার এমন যে, ও কারাগারকে যমলোকের সমান ভয় পায়। উঁচু দেয়াল দেখলেই ও চোখ বুঁজে বেহুঁশ হয়ে যায়। ওর এই দুর্বলতা এমনই প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল যে, আমারও সেখানে যাবার সম্ভাবনা আছে—এ কথা বলে-বলে সবাই ওকে ক্ষ্যাপাতে সুরু করল। ও তাতে ভয় পায়নি বললে অসত্য বলা হবে। তবে আমার সঙ্গে থাকার মাহাত্ম্য ওর কাছে ভয়ের চেয়েও বড়ো। চুপচাপ আমাকে এসে জিজ্ঞেস করে ও—ক'খানা ধুতি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে, যাতে ওখানে গিয়ে আমাকে ওর জন্য লজ্জায় না পড়তে হয়। আর কী-কী জিনিস বেঁধে নিলে আমাকে ওখানে কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না—এও জানতে চায়। এ ধরণের যাত্রায় কারোর সঙ্গে যাবার অধিকার নেই—এ রকম আশ্বাসনের কোন মূল্যই ওর কাছে নেই। আমার জেলে না যাবার কল্পনাতে ও ততখানি প্রসন্ন হয় না, আমার সঙ্গে না যেতে পারার সম্ভাবনায় যতখানি মনে করে নিজেকে অপমানিত। এ রকম অন্যায় কী করে হ'তে পারে? 'যেখানে মনিব সেখানে চাকর'—মালিককে নিয়ে বন্দী করে রাখায় তত অন্যায় নেই কিন্তু একা চাকরকে মুক্ত রাখায় ভয়ানক অন্যায় হয়ে যায়। এ রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভক্তিনকে তো বড়লাট পর্যন্ত লড়তেই হবে। অন্য কারোর মা যদি না লড়ে থাকে তো থাকুক, কিন্তু ভক্তিনকে না বুঝলে চলবে না। এ রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবস্থা কল্পনায়ও দুর্লভ।

আমি প্রায়ই ভাবি যে, যেদিন সেই আমন্ত্রণ এসে পৌঁছবে যখন ধুতি সাফ করার কি জিনিস বাঁধবার অবকাশ থাকবে না, আমাকেও বাধা দেবার অধিকার কারোর থাকবে না, ভক্তিনকেও না, সেই চির বিদায়ের অন্তিম ক্ষণে এই গ্রাম্য বৃদ্ধা কি করবে আর আমিই বা কি বলব?

ভক্তিনের কাহিনী অসমাপ্ত রইল, তবে তাই বলে ওকে হারিয়ে এ কাহিনী সম্পূর্ণ করার ইচ্ছেও আমার নেই।

অনুবাদিকা—মলিনা রায় (শান্তিনিকেতন)।

কঠোপনিষদ

চিত্রিতা দেবী

তৃতীয় বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ ॥১

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥২

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৩

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং* স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥৪

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা,
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥৫

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি,
যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা
ইব সারথেঃ ॥৬

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৭

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥৮

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং
পদম্ ॥৯

কর্মফলের সুধাপান রত
যে ভোগী রয়েছে দেহে,
তারো অন্তরে, যে রয়েছে, চিরসাক্ষী,
তাহারা দুজনে ছায়া আলোকের ন্যায়,
চির বিবিক্ত, তবুও উভয়ে,
পরস্পারেরে জড়ায়ে রয়েছে নিত্য,
এই জেনো ঋষিবাক্য ॥১

যাজ্ঞিকদের সেতুরূপা,
সেই নাচিকেত অগ্নিরে,
জেনেছি আমরা হৃদয়ে,
ভবসাগরের অভয় বেলায়,
পার হতে যেবা চায়,
তার আরাধ্য পরব্রহ্মরে
বুঝিতে পেরেছি মোরা ॥২

আত্মারে যদি রথী মনে কর,
দেহ যেন তব রথ,
বুদ্ধি হউক সারথি তোমার
মনেরে বল্গা জেনো ॥৩

ইন্দ্রিয় যেন অশ্ব, জগৎ তাহারই তো গোচারণ।
মন ইন্দ্রিয় শরীর যুক্ত, আত্মাই ভোগকর্তা ॥৪

অশান্ত মনের সাথে
যে বুদ্ধি রহিয়াছে সদাযুক্ত,
তার ইন্দ্রিয় দুষ্ট ঘোড়ার মত,
নহে সারথির বশ্য ॥৫

শান্ত মনের সাথে যে বুদ্ধি,
সতত যুক্ত রয়
তার ইন্দ্রিয় সদা সংযত,
সারথির আজ্ঞায় ॥৬

ইন্দ্রিয়বশ অশান্ত চিতে
যে বুদ্ধি রয় মিলে,
সেই আত্মার কখনো মুক্তি নেই,
সংসার মাঝে চিরকাল তার চলে চির বিচরণ ॥৭

সংযতচিত শুচিপবিত্র, যে বুদ্ধি বিজ্ঞানী,
মুক্ত সে জন, জন্মমরণ দুঃখসাগর হতে ॥৮

বিবেকবুদ্ধি সারথি, যাহার, মনের বল্গা বশ।
সে লভে চরম বিষ্ণুচরণ* জগতের পরপার ॥৯

---

* বিষয়ান্—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, প্রভৃতি যে সমস্ত জাগতিক বিষয় সমূহের প্রতি চোখ, কান, নাসিকা প্রভৃতি অশ্বরূপ ইন্দ্রিয় সকল ধাবিত হয়, সেই বিষয়সমষ্টি, অর্থাৎ এই দৃশ্যমান শ্রুতিস্পর্শশীল জগৎ-সংসারই যেন ইন্দ্রিয়দের চারণভূমি।

* বিষ্ণোঃ পরমং পদম্—বিষ্ণু এখানে ব্যাপক অর্থে ব্রহ্ম। পদ অর্থে স্থান। বিষ্ণুপদপ্রাপ্ত হওয়া, আর বিষ্ণুর স্থান অথবা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া একই কথা। অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ
পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা
মহান্ পরঃ ॥১০

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা
সা পরা গতি ॥১১

এষ: সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা
ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া
সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥১২

যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্
যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ
তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥১৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য
বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া,
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥১৪

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তম্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৫

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং
সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে
মহীয়তে ॥১৬

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্
ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥১৭

ইন্দ্রিয় হতে বিষয় সূক্ষ্ম,
বিষয় হইতে মন,
মন হইতেও বুদ্ধি সূক্ষ্মতর।
বুদ্ধিরো চেয়ে গূঢ় সে
বিশ্বপ্রাণ ॥* ১০
বিরাট হইতে সে মায়া শ্রেষ্ঠ।
মায়া হতে শ্রেয়ঃ পুরুষ
তাঁর চেয়ে আর কিছু নেই বড়,
কিছু নেই অণুতর।
তিনিই শ্রেষ্ঠ তিনিই চরম গতি ॥১১
অবিদ্যা ঘেরা জীবের মাঝারে,
সে রয় গোপনে ঢাকা,
তাই তারে কেহ বুঝিতে বুঝাতে নারে,
শুধু একাগ্র বুদ্ধি সহায়ে,
কোন মনস্বী জন,
কখনো, কখনো তাঁরে অন্তরে লভে ॥১২
চঞ্চল যত বাক্যবিলাস,
মনে লীন কর তুমি,
মনকে করিও বিবেকবুদ্ধিময়,
বুদ্ধিরে লও স্বচ্ছ করিয়া
প্রাণচেতনায় তব।
সেথা হতে যাবে, আপনার টানে,
আপন আত্মমাঝে,
বিকারবিহীন, কার্য্যকারণহীন,
শান্ত স্তব্ধ সেই পরমাত্মাতে ॥১৩
ওঠো হে মানব, তমো ঘোর হতে
জাগো।
মহামানবের পাশে গিয়ে জানো তত্ত্ব।
কঠিন সে পথ, দুর্গম অতি, ক্ষুরের ধারার মত।
তবু সেই পথই সত্য, এই তো কবির বাণী ॥১৪
রূপরসগন্ধহীন, শব্দস্পর্শহীন,
অনাদি অনন্ত তিনি অক্ষয়শাশ্বত,
মহতেরও পার তিনি চিরন্তন ধ্রুব,
তাঁহারে জানিলে, জীব সে মৃত্যুমুক্ত ॥১৫
মৃত্যুব্যক্ত চির সনাতন, এই
নাচিকেত কাহিনী,
শুনিয়া কহিয়া, মেধাবী
মেধাবী আপনি পুজিত ব্রহ্মলোকে ॥১৬
সংযত চিতে, জ্ঞানীগুণীমাঝে, অথবা শ্রাদ্ধকালে।
যে জন এ বাণী শ্রবণ করান, পরম শ্রদ্ধাভরে।
সংকর্ম্মের অনন্ত ফলে, তিনি চির অধিকারী ॥১৭

[ক্রমশঃ।

* বিশ্বপ্রাণ—হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মপ্রসূত অণ্ড।—পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত আদিপ্রাণ ও জড়ের শক্তি। তাহারই আর এক নাম বিরাট।

॥ ইতি তৃতীয় বল্লী ॥

ভল্গা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অঙ্গিরা উপাখ্যানের শেষাংশ

সুমিত্র নিজেই বার বার তার স্ত্রীকে আসতে নিষেধ করে সংবাদ পাঠাচ্ছিল, কারণ, সে এক জন অসুর-পুরোহিতের কন্যার প্রেমে পড়েছিল, তা ছাড়া তার অন্দরমহলে অসংখ্য অসুর-যুবতীকে সে সংগ্রহ করে রেখেছিল। অনুরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা সুমিত্র তার অনুচরদেরও করতে দিয়েছে। যখন অন্যান্য আর্য্যরা বাইরে থেকে এখানে আসতে সুরু করেছিল, সুমিত্র তখন ক্রীতদাসদের দিয়ে তাদের হত্যা করিয়ে তাদের আসা বন্ধ করেছে—ফলে অনেকগুলো নরহত্যাও এখানে সংঘটিত হয়েছে।

প্রার্থিত সংবাদাদি সংগ্রহ করে বরুণ অলক্ষ্যেই এই স্থান ত্যাগ করে বন্ধুর সাথে সৌবীর নগরীতে ফিরে এল।

সে তখন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গিয়ে জানালো—সুমিত্র কেমন সুদৃঢ় ভাবে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেছে—আজ তার মোকাবিলা করতে হলে শুধু যে আর্য্য সৈনিকদের সাথে লড়তে হবে তাই নয়, অসুর-সৈন্যদের সাথেও যুঝতে হবে। কাজেই সব ব্যবস্থা দ্রুত করতে হবে এবং অবিলম্বে জনসাধারণকে বোঝাতে হবে যে, ঘটনা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বরুণ ভালো নৃত্যবিদ্ বলেও পরিচিত ছিল, তার কাছে বহু দিনের স্বামী অদর্শনের পর মেয়েরা যখন তাদের স্বামীদের কুকীর্তির কথা শুনল, তখন তারা তাকে পুরাপুরিই বিশ্বাস করল। এর পর কানে-কানে সব সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বরুণ এক জন কবিও ছিল। সে অসুর-কুহকিনীদের বিরুদ্ধে পরিত্যক্তা আর্য্যকন্যাদের দুঃখের কাহিনী এবং সুমিত্রের স্বার্থপর বিলাসী জীবনের কথা মৃগয়া-সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রচার করতে থাকল, আর তার গান দাবাগ্নির মত সারা সৌবীর উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়ল।

শেষে বরুণ কয়েক জন করে স্ত্রীকে তাদের বিশ্বাসঘাতক স্বামীদের কাছে পাঠাতে আরম্ভ করল। যখন তারা ঘৃণ্য ভাবে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে ফিরে আসতে লাগল, তখন স্বামীদের দুর্বৃত্তপনা আরও বেশী করে প্রমাণিত হতে থাকল। এর পর আদেশ পেয়েও সুমিত্র যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল না, তখন বরুণ তার জায়গায় সেনাপতি নির্বাচিত হল এবং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সে অসুর-নগরীর দিকে অগ্রসর হল।

বরুণের আগমনের সংবাদ পেয়ে সুমিত্রের অনুগামীদের মধ্যেও বিভেদ দেখা দিল—তাদের মধ্যে অনেকেই আসুরিক অভ্যাসে নিজেদের অধঃপতনের জন্য আন্তরিক ভাবে অনুতপ্ত হল। তার অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে সুমিত্রের আর যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা রইল না। অবশেষে সে বরুণের হাতে নগর পরিত্যাগ করে সৌবীর নগরে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জানালো।

এই ভাবে আর্য্যরা প্রথম অগ্নিপরীক্ষা পার হল। বরুণ অসুরদের উপর উৎপীড়ন করল না, কারণ তাদের আর বরুণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু আর্য্যদের অসুরদের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে সে সেখানে আর্য্যদের জন্য একটি স্বতন্ত্র নগরী প্রতিষ্ঠা করল এবং সেখানে সে ঋষি অঙ্গিরার কাছ থেকে শেখা নানা উপদেশ ও ভাবধারা বাস্তবে রূপ দিতে আরম্ভ করল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুদাস উপাখ্যান

স্থান—কুরুপাঞ্চাল—বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ
পাত্র—বৈদিক আর্য্য। কাল—খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল।

[১৪৪ পুরুষ আগেকার আর্য্যদের কাহিনী। সেই সময়ে আদি ঋষিরা—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং ভরদ্বাজ—ঋক্‌বেদের শ্লোকসমূহ রচনা করছিলেন এবং কুরু-পাঞ্চাল ভূমির আর্য্য রাজন্যবর্গ এই সমস্ত আর্য্য পুরোহিতদের সাহায্যে পুরাকালের গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূলে চূড়ান্ত ভাবে রূঢ়তম আঘাত হানছিলেন]

বসন্ত কাল শেষ হয়ে আসছিল। চন্দ্রভাগা নদীর তীরাঞ্চল জুড়ে বিস্তীর্ণ পাকা সোনালী গমের ক্ষেতে হাওয়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছিল—এদিকে-সেদিকে কিষাণ-কিষাণীর দল ক্ষেতের কাজের তালে-তালে গান গেয়ে চলছিল। ক্ষেতের যে সব জায়গায় ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল, সেখানকার নতুন গজানো ঘাসের জমিতে বাচ্চা সমেত মাদি ঘোড়াগুলোকে চরে খাবার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

চড়া রৌদ্রের মধ্যে এক জন পথিক এগিয়ে আসছিল সেদিকে শ্রান্ত পায়ে। কোমরে জড়ানো হাটু পর্য্যন্ত লম্বা বস্ত্রখণ্ডের উপরে পুরানো একটা আলখাল্লা ছিল তার গায়, মাথায় জীর্ণ কাপড়ের পাগড়ীর নীচ থেকে কটা চুলের জট পাকানো গোছাগুলো দেখা যাচ্ছিল আর হাতে ছিল তার বড় একটা লাঠি। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে আসছিল। সে পণ করে এগিয়ে চলছিল যে, সামনের সহরটাতে সে পৌছুবেই কিন্তু পথের পাশেই একটা সাধারণ জলকূপ এবং একটা শমীবৃক্ষ দেখে তার সব পণ যেন উবে গেল। সে পাগড়িটা খসিয়ে এবং পরনের বস্ত্রখণ্ড খুলে দুটো একত্রে বেঁধে একটা দিক জলের দিকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করল কিন্তু হাতে পেল না। শেষ পর্য্যন্ত সে নিকটবর্তী একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল—তার যেন মনে হতে লাগল যে, সে আর কোন দিন উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

ঠিক সেই সময়েই একটি তরুণী মেয়ে সেখানে এসে হাজির হল—তার এক কাঁধে একটা জলের থলি, অন্য কাঁধে একটা দড়ি এবং এক হাতে একটা চামড়ার কলস। পথিকের ফুরিয়ে-যাওয়া আশা যেন আবার একটু-একটু ফিরে এল। তরুণীটি জলকূপের কাছে এসে জলের থলিটা মাটিতে রাখল এবং কলসিটা সে যখন জলে ডোবাতে যাবে সেই সময়েই তার চোখ পড়ল পথিকের দিকে। পথিকের মুখের চেহারা হয়ে গিয়েছিল ফ্যাকাশে, ঠোঁট দুটো ফেটে গেছে, চোয়াল দুটো চুপসে, চোখ গেছে কোঠরে আর পা দুটো ধুলোয় জমাট হয়ে গেছে। এ সব সত্ত্বেও যৌবনের রূপরেখা তার চেহারার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

পথিক দেখল যুবতীর পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণ হলেও শালীনতাসম্পন্ন। মাথায় ছিল তার সোনালী চুলের উপর মেয়েদের শিরস্ত্রাণ, পরনে তার একটা কাঁচুলি, ঘাগরা ও শাল। রৌদ্রের তেজে তার মুখ রাঙা, বিন্দু-বিন্দু ঘাম তার কপালে ও ঠোঁটের উপরে চক্‌চক্ করছিল। এই অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের দিকে সে একবার তাকিয়ে দেখল, তার পর যখন সে প্রীতিপূর্ণ স্বরে যুবককে জিজ্ঞাসা করল—"মনে হচ্ছে ভাই তুমি খুবই তৃষ্ণার্ত!" তখন তার মুখে মন্দ্র রমণীসুলভ হাসির রেখা ফুটে উঠল এবং যুবকের অর্দ্ধেক তৃষ্ণা যেন এই মধুর স্বরে মিটে গেল।

পথিকের তখন মাথা ঘুরছিল। সে একবার চেষ্টা করল তার মাথাটা তুলতে, কিন্তু পারল না—সেই অবস্থায় সে জবাব দিল—"হ্যাঁ, আমি খুবই তৃষ্ণার্ত।"

"আমি তোমাকে জল দিচ্ছি।"

তার জলের ঘড়া যতক্ষণে ভর্ত্তি হয়ে এল, ততক্ষণে যুবকটিও খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারল এবং আস্তে-আস্তে হেঁটে এসে সে তার পাশে দাঁড়াল। তার শক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সুগঠিত দেহ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তার শরীর তখনও অসাধারণ বলধারণক্ষম। যুবতীটি তার জলের থলির সাথে ঝোলানো চামড়ার বাটিটি খুলে যুবকের হাতে দিল এবং ঘড়া থেকে তাতে জল ঢেলে দিল। যুবকটি প্রথমে এক ঢোক জল আস্তে-আস্তে গলাধঃকরণ করে তার পর বসে নিয়ে মাথা নীচু করে সমস্ত জলটাই এক চুমুকে খেয়ে ফেলল। পরক্ষণেই তার হাত থেকে বাটীটা ছিটকে পড়ে গেল এবং সে সুস্থ থাকার যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও পিছন দিকে টলে পড়ে গেল।

মেয়েটি এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে রইল—তার পরই যুবকটির নিষ্পন্দ চোখ দুটো দেখেই বুঝতে পারল যে, সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তার শিরস্ত্রাণটি জলে ভিজিয়ে সে যুবকের মুখে এবং কপালে চেপে দিতে আরম্ভ করল। একটু পরে যুবকের চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল এবং সে লজ্জিত ভাবে কুণ্ঠাভরে বলল—"তোমাকে বিব্রত করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।"

"না, না, আমি বিব্রত হইনি—আমি শুধু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তোমার কি হয়েছে?"

"কিছু হয়নি। আমার পেট ছিল একেবারেই খালি—সেই অবস্থায় ভীষণ তৃষ্ণার জন্য আমি বেশী জল খেয়ে ফেলেছিলাম। এখন সব ঠিক হয়ে আসছে।"

"তোমার পেট একেবারে খালি?"

যুবককে কথা বলার সময় না দিয়ে যুবতী দৌড়ে গিয়ে তার জিনিষপত্রের মধ্য থেকে এক কাপ দই, কিছু চালভাজা এবং মধু নিয়ে এল। যুবকের সলজ্জ ইতস্ততঃ দেখে সে জোর দিয়ে বলল—"কিছু মনে কোরো না। আমার তোমারই মত একটি ভাই ছিল—সে কয়েক বছর আগে ঘর ছেড়ে বিদেশে গেছে। তোমাকে এই সাহায্য করবার সময়ে আমার সেই হারানো ভাইয়ের কথাই মনে পড়ছে।"

যুবক তখন পাত্রটি হাতে নিল। যুবতী তার বাটিতে আরও খানিকটা জল ঢেলে দিল—তাতে চালভাজা ভিজিয়ে নিয়ে সে আস্তে-আস্তে খেতে আরম্ভ করল। তার খাওয়া হয়ে এলে তার মুখের শ্রান্তির চিহ্ন ক্রমে মুছে যেতে থাকল এবং একটা নির্বাক্ কৃতজ্ঞতার ছাপ তার মুখে ফুটে উঠল। সে ঠিক কি ভাবে কথাটা বলবে যখন ভাবছিল তখন মেয়েটি তার মনের কথা আঁচ করে নিয়েই যেন বলল—"অস্বস্তি বোধ করবার কোন কারণ নেই ভাই! তুমি, মনে হচ্ছে, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছ?"

"হ্যাঁ, পূব দিকে অনেক দূরের পাঞ্জাব দেশ থেকে আমি আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছিলে তুমি?"

"যে দিকেই হোক—নিরুদ্দেশে।"

"ঠিক এক্ষুণি কোথায় যাচ্ছিলে?"

"আমি কাজের খোঁজে চলেছিলাম—আমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা যাতে আমি করতে পারি।"

"তুমি ক্ষেতের কাজ করতে পছন্দ কর?"

"কেন না? আমি চাষ দিতে, বীজ বুনতে এবং ফসল কাটতে ও মাড়াই করতে জানি, গরু-ঘোড়ার রাখালি করতেও আমি জানি। আমি যথেষ্ট শক্তিও রাখি—শুধু এই মুহূর্তে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। কিছু পরেই আবার কঠোর শ্রম করবার মত বল ফিরে পাবো। তাছাড়া, এর আগে যেখানেই আমি কাজ করেছি আমার নিয়োগকর্তারা কোথাও অসন্তুষ্ট হননি।"

তাহলে আমার মনে হয়, আমার বাবা তোমাকে কাজ দিতে পারবেন। চলো আমার সাথে, আমার জলের ঘড়া ভর্তি হয়ে গেছে।"

যুবকটি জলের থলিটা বয়ে নিয়ে যাবার জন্ম খুবই আগ্রহ দেখালো—কিন্তু যুবতীটি দিল না। তাদের সামনে যে ক্ষেতটা ছিল তার মধ্যে একটা লাল রংএর তাঁবু দেখা গেল এবং তার কাছে দেখা গেল মেয়ে-পুরুষে মিলে প্রায় চল্লিশ জন লোক সেখানে বসে রয়েছে। এদের মধ্যে তার সঙ্গীর বাবা যে কোন্ লোকটি তা যুবক আন্দাজ করতে পারল না, কারণ সবারই সমান সাধারণ পোষাক পরনে, গায়ের রং এবং চুলের রং সবারই সমান সুন্দর এবং মুখের চেহারাও সবারই প্রাণবন্ত। মেয়েটি জলের ঘড়া এবং থলিটা সবার মাঝখানে বিছানো একটা চামড়ার চাদরের উপর রেখে এক জন প্রায় ষাট বছর বয়সের প্রবীণ, কিন্তু সুস্থ ও অটুট দেহসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলল—"বাবা, এই অপরিচিত মানুষটি কাজের খোঁজ করছে।"

"ক্ষেতের কাজ কি মা?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"তাহলে এখানেই সে কাজ করুক। আর সবাই যা পায় সেও তাই পাবে।"

আগন্তুক যুবকটি সবই শুনছিল। বৃদ্ধ তাকে ডেকে নিয়ে আবার তাঁর প্রস্তাবটি বললেন এবং যুবক রাজী হল।

"বেশ, এসো তাহলে। আমরা আমাদের মাধ্যাহ্নিক আহার সুরু করছি—তুমিও এতে অংশ নাও।"

"আপনার মেয়ে আমাকে কিছু চালভাজা দিয়েছিলেন, আমি তাই খেয়েছি, প্রভু।"

"প্রভু! ওসব কি আজে-বাজে বলছ? আমার নাম হচ্ছে 'জেতা'—মদ্রবংশের বিভুর পুত্র আমি। নাও, এখন যতটা ইচ্ছা হয় নাও, এখন যতটা ইচ্ছা হয় খাও এবং পান করো। অপলা, মা, ওকে কিছু ঘোড়ার দুধের দই দাও ত। গরমের দিনে ওটা খুব ভালো পানীয়, বুঝেছ বাছা! সন্ধ্যার সময় তোমার সাথে অন্যান্য কথাবার্তা বলব। এখন তোমার নামটি বল ত।"

"আমি পাঞ্চাল-বংশের, আমার নাম সুদাস।"

"সুদাস বোলো না! কথাটা হবে সুদা—"ভালো ফসলের দাতা"—তোমরা পুব দেশের লোকেরা কথাগুলো ঠিক ভাবে উচ্চারণ করতেও পারো না। যাক, তোমার দেশ তাহলে পাঞ্চাল? শোন অপলা, এই পুব দেশের লোকেরা সাধারণ ভাবেই একটু বেশী লাজুক। ওকে এখন ভালো করে খাওয়াও, যাতে সন্ধ্যার মধ্যেই ও কর্মক্ষম হয়ে উঠতে পারে।"

অপলার উপরোধে সুদাস আরও দু'-তিন বাটি ঘোড়ার দুধের দই এবং কয়েক টুকরো রুটি গলাধঃকরণ করল। গত দু'দিন তার পেটে কিছু পড়েনি—তাই তার ক্ষুধাবোধও যেন মরে গিয়েছিল।

সূর্য্যের তেজ কমে যাবার সাথে-সাথে সে আবার তার শরীরে বল ফিরে পেতে থাকল এবং সন্ধ্যার সময়কার কাজ শেষ হবার আগেই সে অন্যদের মধ্যে যারা সেরা তাদের সমকক্ষ ভাবেই কাজে চালাতে আরম্ভ করল। রাত্রি হয়ে আসার আগেই তারা বেশ কিছু দূরে যেখানে ফসল মাড়াইয়ের খামার ছিল সেখানে গেল। জেতার জমির পরিমাণ যে বেশ বেশী তা খামারে মাড়াই করার জন্য উপস্থিত দু'শোর বেশী লোক দেখেই বোঝা গেল। রাঁধুনীরা কুটীরগুলোর মধ্যে ব্যস্ত ছিল। একটা মোটা ষাঁড় সেদিন কাটা হয়েছিল এবং তার হাড়, নাড়িভুঁড়ি এবং কিছুটা মাংস সন্ধ্যা হবার ঘণ্টা তিনেক আগেই বড়-বড় কড়াইতে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাকী মাংসটা এক পাউণ্ড ওজনের সব খণ্ড করে লবণাক্ত জলে সিদ্ধ করা হচ্ছিল। এখানে এই ঘরবাড়ী-গুলোর পাশেই ছিল বড় একখণ্ড সমতল জমি, সেখানেই মাড়াইয়ের কাজ চলছিল। এই জমিটার কাছেই একটা সুন্দর জলকূপ এবং একটি পুকুর ছিল। স্ত্রী-পুরুষেরা দলে-দলে এই পুকুরে কেউ বা হাত-মুখ ধুতে, কেউ বা স্নান করতে জড় হয়েছিল।

অন্ধকার হয়ে এলে সবাই সারি দিয়ে বসল এবং প্রত্যেকের সামনেই রুটি, মাংস এবং পাত্রভর্তি মদ দেওয়া হল। সুদাসের লাজুকতার কথা মনে রেখে অপলা তাকে তার পাশেই বসিয়েছিল—প্রকৃত প্রস্তাবে সুদাসকে দেখে তার বিদেশস্থ ভাইয়ের কথাই বেশী করে মনে পড়ছিল। খাওয়ার পর নাচ-গান সুরু হল—সুদাস অবশ্য প্রথম দিনেই এদের সাথে যোগ দিতে পারল না, তবে ক্রমে সে এই দলটির প্রিয় গায়ক এবং নর্তক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

মাস দেড়েক ধরে ফসল কাটা, বওয়া এবং মাড়াই করা চলল—কিন্তু সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে সুদাস একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেল। তার বড়-বড় নীল চোখ দুটো সজীব হয়ে উঠল এবং তার কপোলেও স্বাভাবিক রক্তাভা ফুটে উঠল। চামড়ার নীচ থেকে এখন আর তার হাড় আর শিরাগুলো ফুটে বেরোত না। প্রথম সপ্তাহের শেষেই জেতা তাকে একপ্রস্থ নূতন পোষাকও উপহার দিয়েছিলেন।

ফসল মাড়াইয়ের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল—যারা কাজ করছিল তাদের মধ্যে জেতা, অপলা, ও সুদাস সমেত জনা ছয়েক ছাড়া বাকী সবাই-ই প্রায় ফসলে তাদের মজুরী নিয়ে চলে গিয়েছিল, এই সব লোকেদের নিজেদের জমির পরিমাণ ছিল খুব কম, তাই তারা নিজেদের ফসল কাটার পর জেতার জমিতে এসে কাজ করত।

এই মাস দেড়েকের মধ্যে জেতা এবং তার মেয়ে অপলা তাদের এই নবাগত তরুণ শ্রমিকটিকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতে পেরেছিল, তার মধুর ও প্রফুল্ল স্বভাব সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হয়েছিল। একদিন সন্ধ্যায় জেতা তার সাথে পুব দেশের মানুষদের কথা নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন—অপলা পাশে বসে সব শুনছিল।

জেতা বলছিলেন—"আমি পুব দেশে খুব বেশী দূর যাইনি—কিন্তু আমি তোমাদের পাঞ্চাল সহরে গিয়েছি, সেখানে শীতকালে আমি যেতাম ঘোড়া বিক্রী করতে।"

"সে দেশ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?"

"দেশটা ত খারাপ কিছু নয়, আমাদের মদ্র দেশের মতই ওধারটা সুরক্ষিত এবং সম্পন্ন, জমিজমাও সেখানে আমাদের এখানকার থেকেও বেশী সুফলা বলে মনে হত, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"রাগ কোরো না, সুদা, ওদেশে যেন মানুষ নেই।"

"মানুষ নেই—তাহলে সেখানে কি সব দেবতা বা দৈত্যরা থাকে?"

"আমি শুধু বলেছি যে তারা 'মানুষ' নয়।"

"আমি রাগ করব না, আপনি বলুন না কর্তা, আপনার এ রকম ধারণা কেন হল?"

"তুমি ত দেখেছ সুদা, আমার জমিতে প্রায় শ'দুয়েক স্ত্রী-পুরুষ কাজ করত, কেমন কি না?"

"হ্যাঁ।"

"তারা আমার জমিতে কাজ করে বা আমার মাইনে নেয়, তার জন্যে তুমি কখনও তাদের আমার কাছে হীন ভাবে তোষামোদ করতে দেখেছ?"

"না, তাদের ব্যবহার দেখে ত মনে হত তারা আপনারই পরিবারের লোক।"

"ঠিক, তারা ত সবাই-ই মানুষ, তারা আমার পরিবারের লোকের মতই ত এখানে থাকত। আমরা সবাই-ই একই মদ্র বংশের লোক। ঠিক এই ধরণের মনোভাবেরই অভাব আছে পূব দেশে। সেখানে মানুষের সম্পর্ক যেন প্রভু-ভৃত্যের মত, মানুষের মত নয়, ভ্রাতৃত্ববোধের কোন চিহ্নও সেখানে নেই।"

"আপনি যা বললেন, তা ঠিকই। চন্দ্রভাগা নদীর এপারে আমি এসেছি ঠিক তাই দেখতে যে—মনুষ্যত্ববোধ কাকে বলে, বিশেষ করে মদ্র দেশে আসার পর থেকে সেইটাই আমার লক্ষ্য রয়েছে। মানুষের মত মানুষদের মধ্যে বাস করতে পাওয়াটা ত আনন্দ, গর্ব ও সৌভাগ্যের কথা।"

"আমি যা বলেছি তাতে যে বাছা তুমি ক্ষুব্ধ হওনি তাতে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। সকলেই ত তার মাতৃভূমিকে ভালবাসে।"

"কিন্তু ভালবাসার পাত্রের ত্রুটি-দুর্বলতা সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকাও ঠিক নয়।"

"ওদেশে যখন আমি যেতাম তখন অনেক সময়ই এ সব কথা আমার মনে হত, এখানকার জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে এ ব্যাপারে আমি আলোচনাও করেছি। পাপ যে সেখানে কি করে ঢুকেছে তা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এর প্রতিবিধান যে কি তা আমি বুঝতে পারি না।"

"পাপ কি করে প্রবেশ করল?"

"পাঞ্চাল দেশ পাঞ্চাল-বংশের লোকেদেরই বাসস্থান হওয়া উচিত। কিন্তু ওখানকার অর্দ্ধেক মানুষই ত পাঞ্চাল-বংশের নয়!"

"হ্যাঁ, বাইরের অনেক লোক এসে ওখানে বসবাস করছে বটে।"

"আমি তাদের কথা বলছি না। আমি আদিবাসীদের কথাই মনে করে বলেছি। বর্তমানে যারা কারিগর, ব্যাপারী এবং বণিকের কাজ করে, তারা সকলেই পাঞ্চালরা ওদেশে পদার্পণ করার বহু আগের থেকেই বাস করত। তাদের গায়ের রং কি রকম তাও ত তুমি জানো।"

"পাঞ্চাল-বংশের লোকেদের গায়ের রং থেকে তা পৃথক্, তারা হয় কালো, না হয় তামাটে।"

"পাঞ্চাল-বংশের লোকেদের গায়ের রং কি মদ্রদের মত ফর্সা?"

"কম-বেশী ঐ রকম।"

"কম-বেশী, সেই ত কথা। তার মানে, অন্যের সাথে রক্তের মিশ্রণের ফলে গায়ের রংএর পরিবর্তন হচ্ছে। আমার ধারণা, যদি এখানকার মতই ওখানে শুধু আর্য্যরা বাস করত, তাহলে হয়ত ওখানকার জীবন মানুষের মতই হত। গায়ের রংএর পার্থক্যের ফলেই বোধ হয় দুই বর্ণের লোকদের জীবিকারও ইতর-বিশেষ হয়েছে।"

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন, উচ্চ-নীচের এবং প্রভু-ভৃত্যের এই ভেদাভেদ অনার্য্যদের মধ্যে—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাদের অসুর বলতেন, তাদের মধ্যে অতীতেও বর্তমান ছিল।"

"হ্যাঁ, কিন্তু পাঞ্চালেরা সবাই-ই ত ছিল আর্য্য। সবাই-ই একই বংশের, একই রক্ত-মাংসের লোক ছিল। তার পর ক্রমে তাদের মধ্যে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ অনুপ্রবেশ করে। তাদের রাজা দেবীদাস একবার কার কাছ থেকে ঘোড়া কিনছিলেন, আমাকে তার জন্যে তাঁর সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুগঠিত দেহসম্পন্ন গৌরবর্ণের যুবক ছিলেন তিনি, কিন্তু মাথায় তিনি পরেছিলেন লাল ও হলদে রংএর একটা ভারী মুকুট, তাঁর কান দুটো ছিল ছেঁদা করা এবং তাতে তিনি পরেছিলেন দুটো বড়-বড় কুণ্ডল; তাঁর আঙুলে এবং গলায় ছিল নানা ধরণের অলঙ্কার। তাঁকে দেখে তার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছিল। যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতই তাঁকে মনে হচ্ছিল। তাঁর স্ত্রীও সেখানে ছিলেন। তিনিও দেখলাম যে-কোন মদ্রকন্যার মতই সুন্দরী, কিন্তু বেচারী নানা রংএর অলঙ্কারের বোঝায় যেন নুয়ে পড়েছিলেন।"

সুদাসের বুক দুরু-দুরু করছিল। তার মনের চাঞ্চল্য যাতে মুখে প্রতিভাত না হয় তার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু না পেরে সে কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলল—"রাজা আপনার ঘোড়াগুলো নিলেন?"

"হাঁ, তিনি নিলেন এবং তার জন্যে ভালো মূল্যও দিলেন। কতটা সোনা—তা এখন আর আমার মনে নেই। কিন্তু পাঞ্চালরা এসে রাজার কাছে যেভাবে নতজানু হয়ে তাঁকে সেলাম করছিল এবং তাঁর কৃপাভিক্ষা করছিল, তা দেখে আমার গায়ে যেন জ্বর আসছিল। কোন মদ্র তার জীবনরক্ষার জন্যে হলেও ও-রকম করতে পারে না।'

"আপনাকে ত ও-রকম করতে হয়েছিল না?'

"আমাকে কেউ ও-রকম করতে বললে তার সাথে আমার হাতাহাতি হয়ে যেত। পূব দেশের রাজারা কেউ আমাদের ও-রকম হুকুম করতে ভরসা পায় না। তবে তাদের নিজেদের মধ্যে দেখলাম, ওটা যেন অভ্যস্ত রীতি।"

"কেন?"

"কেন তা তুমি জানতে চাও? সে এক বিরাট কাহিনী। পাঞ্চালেরা যখন পশ্চিম থেকে যমুনা-গঙ্গা এবং হিমালয়ের মধ্যবর্তী দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করল, তখন মদ্রদের মতই তারা একান্নবর্তী পরিবারের মতই সকলে বাস করত। তার পর অসুরদের সাথে ওরা মিশতে সুরু করে এবং তাদের অনুকরণে অনেক পাঞ্চালের মনে প্রধান, রাজা বা পুরোহিত হবার আশা তাদের উত্তেজিত করে।"

"কিন্তু তাদের এই দুরাশার মূল কোথায়?"

"তারা আরামের জন্য, নিজেরা কোন কাজ না করে অন্যের পরিশ্রমের উপর জীবনধারণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এই রাজা এবং পুরোহিতেরাই পাঞ্চালদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের আর মানুষের মত তারা বাস করতে দিতে চায় না।"

এই কথার পর কর্তা উঠে তাঁর নিজের কাজে চলে গেলেন।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বেতারের ঘোষণা শেষ হোলে, আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ রইলো না। সমস্ত ঘরটা জুড়ে নামলো একটা থম্‌থমে ভাব। দানিলভ মাথাটা তুললে,—আশ্চর্য্য, এক মুহূর্ত্তে সারা দুনিয়াটার রঙ বুঝি বদলে গেছে! সূর্য্যের আলোর রঙ বুঝি মুছে গেলো। তার স্ত্রীর মুখ, ছেলের মুখ সব—সবই যেন কেমন অন্য রকম লাগছে। কিছুক্ষণ আগে সেই হাসি আর আনন্দে ভরা মুহূর্ত্তটাকে মনে হচ্ছে যেন কত বছরের ফেলে আসা।

'বাবা, তাহলেও চলো, বেড়াতে নিয়ে চলো, যাবে না বাবা?'

মাত্র চার বছরের দুধের ছেলে।

'না'—সংক্ষিপ্ত উত্তর দানিলভের।

এইবার ছেলেটা কাঁদতে সুরু করে দিলে। সকাল থেকে কী উৎসাহ আর উত্তেজনা নিয়ে এতক্ষণ ঘুরছে···

সেদিন দানিলভ নিজের কাগজ-পত্রগুলো নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করলে। তার পর ওর বাবাকে একটা চিঠি লিখে, পোষ্ট-অফিসে গিয়ে বাবার নামে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিলে।

পুরানো চিঠিগুলোর মধ্যে একটা দোমড়ানো মোচড়ানো খাম বেরোলো, তার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা ফোটোর একটুখানি কোণ—দানিলভ বার কোরলে না সেটা, একবারটি চেয়েও না দেখে তাড়াতাড়ি ড্রয়ারের সব চেয়ে তলায় জিনিষপত্রের নীচে চাপা দিয়ে রেখে দিলে।

নিজের নোট-কেসের ভিতর পুরে নিলে ছেলের একটা ফোটো।

সেই রাতে ওর স্ত্রী কেঁদেছিলো—রাতের অন্ধকারে বালিসে মুখ গুঁজে নিঃশব্দ কান্না—যাতে দানিলভের ঘুম না ভাঙে। দানিলভ জেগেই ছিলো ঘুমের ভাণ করে।

একটু নড়া-চড়া করতেই ওর স্ত্রী লক্ষ্য করলে, কনুইএর উপর ভর দিয়ে মাথাটা তুলে স্বামীর মুখের দিকে চাইলে।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

'আচ্ছা, তুমি তো ছাড়া পেতে পারো?'

দানিলভ উল্টো দিকে পাশ ফিরে শুলে।

সকালে যখনই রেডিওতে ঘোষণা করা হোয়েছে—সব প্রশ্নের সমাধান তখনই হোয়ে গেছে। ভোর বেলা উঠেই ওকে যেতে হবে রিক্রুটিং অফিসে। ওর স্ত্রী? হ্যাঁ, স্ত্রীই বটে—না, কোনো কিছুই বলার নেই তার এ বিষয়ে। তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে একটা সচল গাড়ীর জখমী চাকার।

ভোর বেলাই দানিলভ পেয়ে গেলো ওর আহ্বান-পত্র—ডাক পড়েছে। যাক্‌, বাঁচা গেলো। কেউ আর বলতে পারবে না যে ও নিজেই জোরজার করে সামনে এগিয়েছে। তাকে ডাকা হোয়েছে। অতএব সেই কথাই ঠিক।

রিক্রুটিং অফিসে দানিলভকে পাঠানো হোলো পটাপেন্‌কোর কাছে। পুরানো বন্ধু ওর, একটা স্যানিটেরিয়ামের পরিচালক। একটা খালি টেবিলের সামনে সামরিক পোষাকে পটাপেন্‌কো বসে আছে, মাথার চুলগুলো ছাঁটা, বয়সটা অনেক কম দেখাচ্ছে। সারা সহরের লোক ওর চার পাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও এত লোক সবে মাত্র এসে ঢুকেছে, আর ঘরের সব কয়টা জানলাই খোলা, তবুও ঘরটা তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে আচ্ছন্ন হোয়ে আছে—প্রায় দম বন্ধ হোয়ে যাবার যোগাড়।

পটাপেন্‌কো তার উষ্ণ স্থূল হাতখানা বাড়িয়ে দানিলভকে কাছে টেনে নিলে, 'এই যে এসে গ্যাছো, কি, ছাড়া পাবার দাবী জানাতে তো?'

'না।'

'সত্যি? বেশ, বেশ, তাহলে একটু অপেক্ষা কর ভাই।'

অবশ্য দানিলভকে অপেক্ষা করতে বলার কোনোই দরকার ছিলো না, কারণ দানিলভের অনেক পরেও যারা এসেছে তাদের নিয়েই তখন পটাপেন্‌কো ব্যস্ত। তবে দানিলভ বুঝতে পারলে, আসলে তার সামনে বন্ধুটি একটু নিজেকে জাহির করতে চায়। তার বন্ধু দানিলভ এখনও নাগরিকের পোষাকে, আর সে—পটাপেন্‌কো একেবারে খাস সামরিক পরিচ্ছদে সামরিক কায়দায় বসে আছে। পাঁচ জন তার কাছে আসছে-যাচ্ছে পাঁচটা পরামর্শ নিতে, দস্তখত নিতে—বেশ একটু গর্ব্ব বোধ হয় বৈ কি! শেষে ডাকলো দানিলভকে, 'বোসো, তুমি কি সৈন্যদলে ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ'—পটাপেন্‌কো খশ-খশ করে নোট-বুকে লিখে যেতে লাগলো, 'শোনো তুমি একটা 'হসপিটাল ট্রেনে' কমিশার হিসাবে যাবে, থামো'—দানিলভের কাছে স্বভাবতঃই বাধা পাবার আশঙ্কাতে গোড়াতেই তাকে থামিয়ে দিলে,—'আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো, কিন্তু এই 'হসপিটাল ট্রেনে'র সব ভার তোমার উপর। এর সমস্ত লোক ঠিক করা, যাবতীয় বন্দোবস্তের দায়িত্ব নেওয়া সব কিছুই করতে হবে, আর তুমিই ঠিক পারবে, তুমি জানো এ সব।'

'না, আমি জানি না। তুমি জানো?'

'না'—পটাপেন্‌কো বলে ওঠে—'কিন্তু ইভান, তুমিই বলো সবাই কি সব কিছুই জেনে থাকে?'

'না'—দানিলভ স্বীকার করে।

দিনে দিনে আরও
পরিষ্কার আরও
সুন্দর ত্বক্
প্রত্যহ রেক্সোনা সাবান ব্যবহার
করুন। রেক্সোনার 'ক্যাডিল্' আপনার ত্বকের
নতুন স্বাস্থ্য ও লাবণ্য এনে দেবে।

Rexona

'এই যে, এই ছোটো পুস্তিকাটা নাও—এতে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে কি করতে হবে না-হবে সব লেখা আছে। তুমি নিজের পছন্দ মত লোক বেছে নাও—কেউ তার উপর কোনো কথাই বলবে না—তার সময়ও নেই আর।'

'ট্রেনে কমাণ্ডাণ্ট কে হোলো?'

'এখনও ঠিক হয়নি। এক জন উপযুক্ত লোক খুঁজে নিতে হবে। তুমি ততক্ষণ অন্য বন্দোবস্ত সব ঠিক করে ফ্যালো।'

'ট্রেনটা আছে কোথায়?'—দানিলভ জিজ্ঞাসা করে।

পটাপেন্‌কো হেসে ফ্যালে, 'ঠিক এই মুহূর্ত্তে কোনো ট্রেনই নেই, তার আবার কোথায়? এখন বোধ হয় মেরামতের কারখানায় পড়ে আছে। কিন্তু তুমি তোমার লোক-জনের ব্যবস্থা করে নাও ততক্ষণ।'

'আচ্ছা, সেই ভালো কথা'—এবার ওঠে পড়ে দানিলভ।

দরজার কাছে আসতেই গ্রিগরিয়েভের সঙ্গে ধাক্কা। ট্রাষ্ট, যেখানে ও কাজ করে, সেখানকার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হোলো গ্রিগরিয়েভ। হাঁফাতে-হাঁফাতে দানিলভের হাতে দিলে একটা অব্যাহতি-পত্র।

'এটা নিয়ে দেয়ালে সেঁটে দাও গে'—দানিলভ জানায়,—'আর মারকিউলভকে (ওর সহকারী) জানিয়ে দিও, আজ সন্ধ্যায় 'ট্রাষ্টে' আসতে। আমি ওকে কাজ বুঝিয়ে দেবো।'

কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যায় ও 'ট্রাষ্টে' যেতেই পারলে না। ছাব্বিশ তারিখের আগে ওর সঙ্গে মারকিউলভের দেখাই হোলো না—অবশ্য আগেই ওকে দানিলভের জায়গায় পরিচালকের পদে নিযুক্ত করা হোয়েছিলো।

ট্রেনের লোক ঠিক করার জন্য এই তিন দিন দানিলভকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হোলো। প্রচুর লোকের দরকার। এক জন সার্জ্জন, সহকারী ডাক্তার, অপারেশনের জন্য অভিজ্ঞ সিষ্টার, মেট্রন, নার্স, আর্দ্দালি, তাছাড়া কয়লার যোগানদার, বিজলী-ঘরের এঞ্জিনীয়র, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, পথ-প্রদর্শক, গাড়ী মেরামতের জন্য এক দল মিস্ত্রী··· অবশ্য দানিলভই যে একা এই সব যোগাড় করতে সারা সহর চষে বেড়াচ্ছে তা নয়,—কমপক্ষে প্রায় পঞ্চাশখানা 'হসপিটাল-ট্রেন'এর জন্য লোক যোগাড় করা চলছে। আর প্রত্যেকেই ভীষণ ব্যস্ত—নার্স, আর্দ্দালী ইত্যাদির খোঁজে।

উপযুক্ত লোক বাছাই করা সম্বন্ধে দানিলভের কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা আছে—যা অনেকের কাছেই একটু আশ্চর্য্য লাগে। যখন বাছাই করার প্রশ্ন ওঠে তখন—সহকারী ডাক্তার হিসাবে বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত, সহজ, অনাড়ম্বর আচার-ব্যবহার এমনি কোনো শহুরে ডাক্তার—যাকে দেখলেই নির্ভরযোগ্য মনে হয়। কিম্বা একটি নরম ভীরু প্রকৃতির তরুণী, যার কোনো গ্রামাঞ্চলে বছর দুই কাজের অভিজ্ঞতা আছে—খুব নিটোল স্বাস্থ্য নয়, বরং একটু ক্ষীণদেহা, এমনটি দেখলেই বিনা দ্বিধায় তাদের মনোনীত করে দানিলভ।

আবার যখন জুলিয়া ডিমিট্রিয়েভনা তার ক্ষীণ দৃষ্টি, ছুঁচোলো নাক আর কালো রঙ নিয়ে এসে আবেদন জানালে সিষ্টারের পদপ্রার্থিনী হিসাবে—তখনও তাকে দেখে আঁৎকে না উঠে মনে-মনে কৌতুকই অনুভব করেছিলো দানিলভ। প্রথম দৃষ্টিতেই ওর মনে হোয়েছিল এমনটিই ও চায়।

যুদ্ধ বিভাগের লোকদের মধ্য থেকেই আর্দ্দালি সংগ্রহ করা হোয়েছিলো। আর রেডক্রশ থেকে এক দল নার্সিংএ ট্রেনিং নেওয়া মেয়ে ওর কাছে পাঠানো হোয়েছিলো।

সারি-সারি ব্যারাক—সেখানে গিয়ে দানিলভের ঠিক মনে হোলো যেন কোনো ষ্টেশনের বিশ্রাম-ঘর। চার দিকে সুটকেশ, বাক্স, পুঁটলী ছড়ানো, তার উপর প্রচুর লোক বসে-বসে জটলা করছে। দানিলভ একবার চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'সৈন্য বিভাগের সহকারী ডাক্তার কেউ আছে? কোনো কম্পাউণ্ডার? কমরেডরা একটু মন দিয়ে শুনুন, কোনো কম্পাউণ্ডার···'

একটি ছোট্টো-খাট্ট মেয়ে এগিয়ে এলো কাছে। কিশোর বালকের মত মুখখানি, তাতে মিশে আছে কিছুটা দুষ্টুমি, কিছুটা গাম্ভীর্য্য—দুইএ মিলে ভারী কৌতুকময়ী দেখাচ্ছে। মেয়েটির পরনে একটি নীল সিঙ্গলেট।

'তুমি কম্পাউণ্ডার?'—দানিলভ প্রশ্ন করলে।

'না, আমি ব্যায়াম, শরীর-চর্চা এই সব শেখাই।'

'আমাদের ব্যায়াম-শিক্ষকের তো প্রয়োজন নেই।'

এইবার হেসে ফেলে মেয়েটি, 'তা জানি, আমি নার্স হোয়ে যেতে চাই।'

'তুমি তো তার উপযুক্ত নও, আমরা বেশ বলিষ্ঠ লোক চাই সে জন্য।'

মেয়েটি আবার হেসে ফেলে। পর-মুহূর্ত্তেই চক্ষের পলকে দানিলভকে হাঁটুর নীচে ধরে শূন্যে তুলে ধরে আবার নামিয়ে দেয়। যদিও এক মুহূর্ত্ত, তবুও তুলেছিল তো।

'মন্দ নয়—চলে যাবে'—দানিলভ জানায়।

সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, একটুও হাঁফাচ্ছে না।

'তোমার নাম কি?'

'লেনা অগ্রোদিনকোভা।'

সব চেয়ে মুস্কিল হোলো অভিজ্ঞ কারিগরদের যোগাড় করা। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী আর মেসিনের লোকদের নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। দানিলভের নাকের সামনে দিয়েই কয়েক জনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। সরবরাহ কেন্দ্র থেকে মেরামতি মিস্ত্রীদের ছাড়তেই চায় না। তারা দানিলভকে সোজা জানিয়ে দিলে, 'ওদের বাদ দিয়েই আপাততঃ চালিয়ে দাও, তোমাকে তো মেরামতের জন্য এখানে আসতেই হবে।'

আসল জিনিষটাই এখনও বাকী। ট্রেনটাই এখনও তার মেরামতের জায়গা থেকে আসেনি। প্রধান সার্জ্জন এসে সই দিলে তবে ছাড়বে। ডাক্তার সুপ্রোগভকে এ দায়িত্ব নিতে কিছুতেই রাজী করা গেলো না। তার এক কথা, 'কমরেড, আমি তো কর্ত্তা নই, আমি এক জন অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছাড়া কি?'

সুপ্রোগভ এদিকে ভারী বিনয়ী, প্রত্যেকের রসিকতায় হাসিমুখে যোগ দেয়। তাছাড়া ওর সিগারেট উপহারের চোটে লোকে অস্থির হোয়ে ওঠে। কিন্তু ওর ভিতরে যে একটা চাপা অস্বস্তি আছে সেটা বেশ বোঝা যায়—ওর 'বাইরের ঐ নম্র, শান্ত খোলোসটার আড়ালে চাপা রয়েছে একটা অস্থির চিন্তাগ্রস্ত মন।

রাত্রি বেলা দানিলভ বাড়ীতে খেতে এলো, রাতটাও কাটিয়ে যাবে। দরজার কাছে এগিয়ে এলো ওর স্ত্রী, ভয়ে, হতাশায় ভরা বিষণ্ণ মুখ।

একটি কথারও বিনিময় হোলো না। স্ত্রীকে বলবার মত কোনো বিষয়ই ও খুঁজে পেলে না। স্ত্রীও বুঝলে, স্বামীর সমস্ত মন জুড়ে আছে নতুন পাওয়া কাজ। 'সোহো'র বেলায় এমনি হোয়েছিলো, 'ট্রাষ্টে'র বেলাতেও তাই, আর আজও 'হসপিটাল-ট্রেন' নিয়ে সেই একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি। ঘরে ওর কোনো দিনই মন বসে না। সংসারের একমাত্র আকর্ষণ ওর ছেলে। ওর স্ত্রী নিঃশব্দেই ওকে খেতে দিলে, বিছানা তৈরী করে দিলে। এই তিন দিনের পরিশ্রমে শ্রান্তিতে দানিলভের মুখটা শুকিয়ে গেছে, বিশ্রী রকম রোগা, লম্বাটে দেখাচ্ছে মুখখানা।

রাতের অন্ধকারে মনের ব্যাকুলতা আর বাধা মানলো না। স্ত্রী ধীরে-ধীরে বললে, 'মারকিউলভ তো ছাড়া পেয়েছে। আরও অনেকে পেয়েছে, এমন কি গ্রিগরিয়েভ পর্য্যন্ত—'

'তাতে হোয়েছে কি ?—মনের সমস্ত রাগ চেপে, নীরস উত্তাপহীন স্বরে প্রশ্ন করে দানিলভ,—'তারা পেয়েছে, বেশ ভালো কথা, তার পর ? তার জন্যে কি কোরতে হবে শুনি ?'

'একটুও মায়া নেই, একটুও মমতা নেই তোমার। আমার জন্যে তো নয়ই, এমন কি ঐ কচি বাচ্ছা ভাস্থাস্কাটার জন্যেও নেই, কাউকেই তুমি ভালোবাস না।'

দানিলভ পিছন ফিরে শুলো, 'যথেষ্ট হোয়েছে, এবার ঘুমোতে দাও একটু।'

এই নতুন কাজটায় এমন ভাবে জড়িয়ে পড়ে ট্রাষ্টের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো দানিলভ। ছাব্বিশ তারিখে কয়েক ঘণ্টার অবসর মিলতে সোজা চললো 'ট্রাষ্টে'—মারকিউলভকে কাজগুলি বুঝিয়ে দিতে। সেই চিরপরিচিত রাস্তাটার মোড় ঘুরলো, দেখতে পেলো নোটিশ-বোর্ডটা—যাতে লেখা আছে সোনালী পাতা আঁকা অক্ষরে 'ষ্টেট ডেয়ারী ফার্ম ট্রাষ্ট'। লক্ষ্য করলো, বোর্ডের ডান দিকের নীচের কোণটায় ফাটার দাগটা তেমনি আছে—যেদিন প্রথম কাজে ঢুকেছিলো সেদিন থেকে ঐ একই রকম আছে। তার পর সেই চেনা সিঁড়ি, একটা নতুন মেসিনের আওয়াজ। ঐ যে বাঁ দিকের দরজাটা—কালো অয়েল-ক্লথ মোড়া···ওর নিজের ঘরের দরজা··· ওর নিজের ট্রাষ্ট !

মারকিউলভকে কাজ সব বুঝিয়ে দিয়ে দানিলভ সমস্ত অফিসটা ঘুরতে লাগলো। প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে বিদায়-সম্ভাষণ জানালে। বৃদ্ধা খাজাঞ্চি তো কেঁদেই আকুল। অন্যদের এই আন্তরিক দুঃখ জানানো দানিলভের ভালোই লাগছিলো দেখতে। বৃদ্ধার মুখখানা কান্নায় বিকৃত হোয়ে উঠেছিলো, বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, 'তাছাড়া শুনেছো, ওরা আমাদের গাড়ীখানাও নিয়ে নিয়েছে। মারকিউলভকে গ্রামে যেতে হ'লে ট্রেনে চড়ে যেতে হবে—উঃ, এ কী ভাবতে পারা যায় ?'

প্রত্যেকেই ওর চলে যাওয়াতে আন্তরিক দুঃখিত হোয়েছিলো এক মারকিউলভ ছাড়া। দানিলভেরও চোখ এড়ায়নি ওর মুখের উপচে-পড়া খুশীর ভাবটা। শুধু যে পরিচালকের আসনে বসতে পেরেছে বলেই এত খুশী তা' অবশ্য নয়—ঠিক সে ধরণের লোক ও নয়। আসলে আজ থেকে ও একেবারে স্বাধীন। নিজের ইচ্ছামত চলতে পারবে তাই···কিন্তু দানিলভ কি ওকে কোনো কাজে বাধা দিত ?

ট্রাষ্ট থেকে বেরিয়ে দানিলভ পটাপেন্‌কোর কাছে গেলো। দেখলে, এক জন প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধ লোক ওর পাশে দাঁড়িয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে কি বোঝাচ্ছে। পটাপেন্‌কো বললে, 'এই যে, এসো, তোমার সঙ্গে তোমার ট্রেন-কমাণ্ডাণ্টের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন ডাঃ বেলভ।'

দানিলভ কমাণ্ডাণ্টের দিকে চাইলে। চেহারাটা খুব চোখে লাগে না। বেঁটে-খাটো মানুষটা, রোগা, ছোট্টো মুখ, কোনো রকম বৈশিষ্ট্য নেই। এদিকে ট্রেন-কমাণ্ডাণ্ট—অথচ এখনও পর্য্যন্ত সামরিক পোষাক পরবারই সময় পাননি। পরনে নিখুঁত ট্রাউজার, পায়ে চক্‌চকে পালিশ-ঠিক্‌রানো জুতা !—কী সর্ব্বনাশ ! এমন লোককে নিয়ে ও কী যে করবে ভেবে পেল না ! কিন্তু বেশ পিঠ-চাপড়ানো স্বরেই বললে, 'কিছু ভাববেন না কমাণ্ডাণ্ট, আমরা বেশ নাম করেই বেরিয়ে যাবো।'

কমাণ্ডাণ্টের সঙ্গে একটা চামড়ার ছোটো স্যুটকেশ রয়েছে। তাতে এক জোড়া ফেল্টের জুতা আর একটা কেটলীও বাঁধা আছে। বেচারা সবে মাত্র লেনিনগ্রাদ থেকে এসে পৌঁছেচে। হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে অস্বাভাবিক উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠলো, 'যতই হোক, আর কিছুই আমাদের করতে হবে না—আমরা স্রেফ যাবো আর যুদ্ধ করবো।'

'আমরাও সবাই'—পটাপেন্‌কো মজা পেয়ে বলে উঠলো।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, সবাই একসঙ্গে।'

দানিলভ রাত্রে বাড়ীতে খাবার জন্য ওকে নিমন্ত্রণ জানালে। কমাণ্ডাণ্ট মহা উৎসাহে বাঁকা হাতে রবারের ম্যাকিণ্টশটা লম্বা করে ঝুলিয়ে মহা আড়ম্বরের ভঙ্গীতে নাচের কায়দায় পা ফেলতে-ফেলতে চললো। দানিলভ ওর ভারী স্যুটকেশটা নিজেই হাতে করে নিলে।

'আচ্ছা, আপনি এই ফেল্টের জুতো জোড়া এনেছেন কেন ? ঠিক জানেন, এগুলো নিতে দেবে কি না ?'

'বুঝলে কি না, আমি তো কোনো দিনই যুদ্ধে যাইনি, আর বুঝলে কি না, পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা বলে—কেউ বলে নিতে দেবে, কেউ বলে দেবে না। আর বুঝলে কি না, একটি মহিলা আবার বললেন ওখানে নাকি যথেষ্ট ফেল্টের জুতা পাওয়াই যায় না, কারা প্রথম পাবে বলা যায় না। অবশ্য এই চিকিৎসা বিভাগের লোকেরা তো নয়ই, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। তাই আমার স্ত্রীই ওটা বেঁধে দিলে—এই ধর, যদিই কাজে লেগে যায় বুঝলে কি না ? যেখানে হোক, রেখে দিলেই হোলো, তার জন্যে কিছু এসে-যাবে না, কি বল ?'

'নিশ্চয়ই না'—দানিলভ হেসে ফেলে।

খাবার টেবিলে বসে কমাণ্ডাণ্ট গোগ্রাসে খেয়ে যেতে লাগলো, সেই রকম প্রচুর পরিমাণে মদও চললো—আর চললো লেনিনগ্রাদের ভাস্কর্য্য নিয়ে অনর্গল বক্তৃতা—সমস্ত সময়টা দানিলভ শুধু ওর দিকে চেয়ে ভাবলে, 'তোমার মতন একটি আকাট নিয়ে আমরা যে কী করবো জানি না—'

পরদিন ভোরে দানিলভ এক জন ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়রের খোঁজে বেরোলো। আর কমাণ্ডাণ্ট গেলো ট্রেন মেরামতের কারখানায় সই দিয়ে ট্রেন নিয়ে আসতে। যাবার সময় বেশ খুশী-মনেই জানিয়ে গেলো, 'ষ্টেশনে একেবারে ট্রেনেতেই আমাকে পাবে।'

আগের দিন সন্ধ্যার এক জন ম্যানেজার দানিলভকে

জানিয়েছিলেন যে, তিনি এঞ্জিনীয়র ক্রাভট্‌সভকে ছাড়তে পারেন যদি সে নিজে রাজী হয়। ম্যানেজারের এই অতি উদারতায় দানিলভ ভোলেনি। সে ভদ্রলোক নিজেই ক্রাভট্‌সভের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাইছিলেন। লোকটা একটু অদ্ভুত ধরণের। দানিলভ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নে ওর সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিল। কিন্তু জবাবটাও ছিলো একটু ঘোরালো—ক্রাভট্‌সভ যথেষ্ট অভিজ্ঞ আর সুদক্ষ এঞ্জিনীয়র, ওর কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়, কিন্তু···সে যাক্, কার না এক-আধটা বিষয়ে একটু দুর্ব্বলতা থাকে, আমাদেরই কি নেই?

'খুব কি মদ খায় নাকি?'—দানিলভ প্রশ্ন করেছিলো।

'সে তো যে কেউই খেতে পারে'—এই হোলো উত্তর।

ক্রাভট্‌সভ তখন দুপুরের খাওয়া খাচ্ছিল। একটা বাক্সকে উল্টো করে তার উপর বসেছিলো—হাতে এক বোতল দুধ। লম্বা ধরণের মুখখানায় সন্ন্যাসীর মত কঠোর দৃঢ়তা আর বৈরাগ্যের ছাপ। এঞ্জিনের গরম ভাপে ভ্রূর চুলগুলি অবধি পাঁশুটে।

দানিলভ জিজ্ঞাসা করলে, 'কি ঠিক করলে, 'হসপিটাল-ট্রেনে' কাজ নেবে তো?'

ক্রাভট্‌সভ বোতলটা ঠক্ করে মেঝের উপর বসিয়ে, হাতের উল্টো পিঠে মুখটা মুছে ফেললে; বললে, 'ট্রেনেতে কি বলছো, ট্রেনের চাকার তলায় হোলেও কিছু এসে-যায় না। শুধু এখান থেকে আমায় বের করে নাও দেখি—আমি আর একটা দিনও এই গর্ত্তে কাটাতে চাই না।'

'কেন বলো তো?'—দানিলভের স্বর কোমল হোয়ে এলো—'তোমার কি এদের সঙ্গে বনছে না?'

'তুমিও জানো কমরেড কমিশার'—ক্রাভট্‌সভ্ বলে চলে—'পষ্টাপষ্টি হওয়াই ভালো। আমি তো ছেলেমানুষ নই। বুঝতে পারছো—?'

'নিশ্চয়ই'—দানিলভ বলে।

'আমি এই গোটা শহরের ডিজেল-কলের লোকেদের নিজের হাতে করে শিখিয়েছি। আমি মোটেই চাই না যে আজ 'যুবসঙ্ঘ' থেকে অল্পবয়সী ছোক্‌রারা আমার কাজ নিয়ে আমাকে বকাবকি করে—' বলতে-বলতে ক্রাভট্‌সভ উঠে দাঁড়ায়, ছোটো-ছোটো তেলা হাত দু'খানা চিট্‌চিটে লম্বা আবরণীর পকেটে ঢুকিয়ে দাঁড়ায়। 'দেয়ালের গায়ে আঁটা পত্রিকায় দেখ—ক্রাভট্‌সভ। সভা-সমিতিতে—ক্রাভট্‌সভ। কোনো অফিস সংক্রান্ত অনুযোগে—ক্রাভটসভ। আমি তোমাকে স্পষ্টই বলছি, ঢের হোয়েছে, আমার আর ওসব দরকার নেই। ওরা এই বলে চেঁচায় যে আমি নাকি কোন্ দিন মদ খেয়ে চাকার তলায় যাবো। আমি—চাকার তলায়?'—ক্রাভট্‌সভের মুখে ধূর্ত্ত হাসি খেলে গেলো—'কিন্তু তুমি একবার ওদের জিজ্ঞাসা কোরো—আমাদের বিদ্যুৎ-সরবরাহে কোন দিন কখনও এতটুকু ত্রুটি হোতে দেখেছে কি না? আচ্ছা দেখো তো, তোমার কি মনে হয় আমি এখন মদ খেয়েছি?'

'খুবই সামান্য একটু বোধ হয়—'

ক্রাভট্‌সভ মাথা নাড়লে,—'একটুখানি নয়, অনেকখানি, রীতিমত মদে ডুবে আছি বলতে পারো। দুপুরের খাবার পর ওরা আসে আমার নিশ্বাস শুঁকতে, আর তাই দিয়ে রাখুনী তাই বলে···এর চাইতে আমাকে নরকে শয়তানের কাছেও নিয়ে চলো কমরেড কমিশার! অবশ্য যদি আমাকে উপযুক্ত মনে কর।'

দু'জনে পরস্পরের দিকে চাইলে। দু'জনার চোখই আবেগহীন দৃঢ়তায় ভরা।

'আমি নেবো তোমাকে'—দানিলভ বললে।

ক্রাভট্‌সভকে ঠিক করে দানিলভ ষ্টেশনে গেলো। ছাই-রঙা জালের পিছনে নতুন ট্রেনটা ঝকঝক্ করছে—পনেরোটা ঘন সবুজ আর দু'খানা সাদা রঙের গাড়ী, রেডক্রসের চিহ্ন লাগানো। এক জন লাল ফৌজ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

কমাণ্ডাণ্ট ট্রেনের করিডোরে একগোছা চাবি ঝমঝম্ করতে-করতে বেড়াচ্ছে। মস্ত চাবির গোছাটা বাঁ হাতের কনুই থেকে ঝুলছে। জানলার ভিতর দিয়ে রোদ এসে পড়েছে—চার ধারে নতুন রঙের গন্ধ। কমাণ্ডাটের ঘামেতে তেলা মুখখানা খুশীতে কুঁচকে গেছে।

'দেখো'—বলে চাবির গোছা তুলে দানিলভকে দেখিয়ে বললে—'প্রতিটি হৃদয় আর প্রতিটি দরজার জন্য—'

'সব ঠিক আছে তো?'—দানিলভ জিজ্ঞাসা করে।

'মানে? তুমি ভাবছো কি? আমি এইমাত্র ট্রেনটা নিয়ে এলাম না?'

'আপনি নিজে প্রত্যেকটি জিনিষ পরীক্ষা করে নিয়েছেন তো?'

'আমি···তা কেন···হাঁ···নিশ্চয়ই।'

দানিলভের সন্ধানী দৃষ্টির সঙ্গে মিলতেই কমাণ্ডাণ্ট চোখ নামিয়ে নিলে।

অর্থাৎ কিছুই পরীক্ষা করেনি। ওকে চাবির গোছা দেওয়া হোয়েছে, একটা দলিলে সই করেছে, আর গাড়ীতে চড়ে বসেছে। এঞ্জিন জোড়বার পর যখন ট্রেনটা চলতে সুরু কোরেছিলো, তখন ওর ভারী ফূর্ত্তি হোয়েছিলো—সতেরোখানা গাড়ীর একমাত্র আরোহী ভেবে। ট্রেনটাকে যখন জালের পিছনে এনে রেখে এঞ্জিন খুলে নেওয়া হোলো, তখন থেকে ও করিডোরে পায়চারী করছে দানিলভের প্রতীক্ষায়। ইতিমধ্যেই কমিশারকে ওর ভালো লেগেছে।

দানিলভ প্রত্যেকটি জিনিষ নিজে পরীক্ষা করলে। সবই ঠিক ছিলো—বরং কয়েকটি জিনিষের প্রয়োজন প্রথমটায় বুঝতেই পারেনি। যেমন—রান্না-ঘরে একটা বড় দস্তার বাক্স দেখলে দুটো ভাগে ভাগ করা। উপরে তাক, আংটা ঝোলানো, কল লাগানো। ওটার কি প্রয়োজন অনেকক্ষণ ভেবেও ঠিক করতে না পেরে দানিলভ সোবোলকে ডাকলে। তার পর দু'জনার বুদ্ধিতে সাব্যস্ত হোলো ওটা বাসন ধোবার জন্য।

ক্রমেই লোক-জন সব এসে গেলো। লরী ভর্ত্তি হোয়ে আসতে লাগলো থলি, কাপড়, ওষুধ ইত্যাদি। দানিলভ আর সোবোল সব দেখে-শুনে রাখতে লাগলো। ব্যাণ্ডেজের প্যাকেট আর তুলোর বাণ্ডিল নিয়ে সিষ্টার জুলিয়া ডিমিট্রিয়েভনা ডিসপেন্সারীতে রাখতে গেলো। কম্পাউণ্ডারের হাত থেকে ছিটিয়ে পড়লো আয়োডিন নতুন পালিস-করা টেবিলের উপর। তখুনি জুলিয়া আর সে দু'জনাই সাদা আবরণী গায়ে দিয়ে, সাদা রুমালে মাথাটা বেঁধে এলো—প্রত্যেকেই বুঝলে যে আবরণী গায়ে না দিয়ে ডিসপেন্সারীতে যাওয়া অসম্ভব। কয়লার যোগানদাররা ষ্টোভগুলো পরীক্ষা করে কয়লা ভরতে লাগলো। আর মেয়েরা গুনগুন্ করে গান গাইতে-গাইতে বিছানা করায় ফাঁকে-ফাঁকে তরুণকান্তি সার্জ্জন সোগিয়াচকের
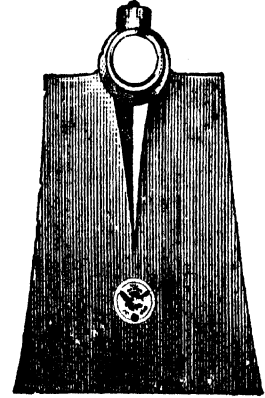
দিকে কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করতে লাগলো। স্বচ্ছন্দ, লঘুপায়ে এগিয়ে এলো লেনা, কাঁধের উপর একটা এক-মণি বস্তা চাপিয়ে।

দানিলভের আদেশ—চকোলেট, মাখম, জমানো দুধ আর চাল আলাদা চাবি দিয়ে বন্ধ রাখা হবে। দুপুরের খাওয়ার জন্য পরিজেরও ব্যবস্থা আছে।

যুদ্ধ-সীমান্তের দিকে এগিয়ে চললো 'হসপিটাল-ট্রেন'। ধীরে-ধীরে একটার পর একটা ষ্টেশন পেরিয়ে গেলো। কোথাও বা এক দিনের জন্য আটকে রইলো,—সৈন্যবাহী আর রসদবাহী ট্রেনগুলিকে পথ করে দিতে।

ষ্টেশনের প্লাটফর্মে লোকেরা ছুটোছুটি করে, বিদায়-সম্ভাষণ জানায়, হাসে, কাঁদে, জড়িয়ে ধরে, রুমাল নাড়তে থাকে···কিন্তু 'হসপিটাল-ট্রেন' যখন যায় তখন তার রেডক্রশের চিহ্ন, সাদা পরদা, এই সবের দিকে শান্ত বিষণ্ন গম্ভীর দৃষ্টিতে ওরা চেয়ে থাকে।

এক রাত্রিতে ট্রেনটা Pskovএর কাছাকাছি এসে গেলো। সমস্ত গাড়ীটা তদন্ত করার শেষে দানিলভ তখন ফিরছে। হঠাৎ একটা ভীষণ ঝাঁকানিতে ও একপাশে আছড়ে পড়লো, উপরের বার্থে মাথাটা সজোরে ঠুকে গেলো। চাকাগুলো কর্কশ শব্দ করে উঠলো—ট্রেনটা থেমে গেলো।

একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কি হোয়েছে?'

প্লাটফর্মে নেমে এসে দানিলভ প্রশ্ন করলে—'কি হোলো?'

টর্চ জ্বালিয়ে ট্রেনের ভিতর ঢুকতে-ঢুকতে কণ্ডাক্টার জবাব দিলে, 'লাল আলো জ্বলছে, রাস্তা বন্ধ—'

নিবিড় কালো অন্ধকারের বুক চিরে ঝলসে উঠলো সার্চ-লাইটের তীব্র আলো। নিকষ-কালো আকাশের অতল রহস্যের কোলে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ফিরতে লাগলো অনুসন্ধানী আলোর দ্যুতি।

বৃথাই অন্বেষণ! [ক্রমশঃ।

জলযাত্রা

শান্তা দেবী

সুইজারল্যাণ্ড

ফ্রান্সে—অর্থাৎ প্যারিসে—আমরা মাত্র এক সপ্তাহ ছিলাম। প্যারিস ছাড়া ফরাসী দেশে কেবল ভেয়ারসাই (Versailles)এ গিয়েছিলাম। সেখানে রাজপ্রাসাদে ঢুকতে মাথা-পিছু ১০০ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ৬ জনের প্রায় ৮৲ দিয়ে তবে ঢুকতে পেলাম। আমাদের দেশে কোনো রাজপ্রাসাদ দেখতে কেউ মাথা-পিছু দেড় টাকা দর্শনী নিচ্ছে ভাবতে পারি না। ইংলণ্ডে এই রকম দর্শনী নেবার রীতি বিশেষ নেই, কিন্তু ফ্রান্সে সর্বত্র। চিত্রশালা লুভারে (Louvre) রবিবারে দর্শনী নেয় না, শুক্রবারে আমরা দর্শনী দিয়ে ঢুকেছি। তবে মাথা-পিছু ৪০ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ আনা দশেক নিয়েছিল বোধ হয়। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে তাজমহল, দিল্লীর দেওয়ানী খাস প্রভৃতি এবং অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতিতেও যদি দর্শকদের কাছ থেকে কিছু দর্শনী নেওয়া হয় তাহলে গরীব দেশের একটা আয় হয়। ইউরোপের সর্বত্র দ্রষ্টব্য জায়গায় ছবির কার্ড এবং ছোট বই ও সুন্দর জিনিষের stall থাকে! সেই সব stallএ প্রত্যেক লোকই অল্প-বিস্তর কিছু-না-কিছু কেনে। আমরাও যদি এই রকম জিনিষ সাজিয়ে রাখি তাহলে বেশ আয় হতে পারে। আমাদের দেশে মন্দিরে পাণ্ডারা পয়সা আদায় করে বটে, তবে সে পয়সা সৎকাজে ব্যয় হয় না বলেই আমার ধারণা। পাণ্ডাদের পুঁজিতেই তা চলে যায়।

৪ঠা অগষ্ট আমরা প্যারিস ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা করলাম ট্রেনে। American Expressকে ভার দেওয়া হয়েছিল ট্রেণের টিকিট এবং হোটেলের ব্যবস্থা করে রাখতে; কাজেই ঠিক যে কত ভাড়া জানতে পারলাম না। ষ্টেশনে যেতে এবং মাল তোলাতে খরচ হয়ে গেল ২০৲ টাকা আন্দাজ! অথচ খুব যে দূর বা সঙ্গে অসংখ্য মাল, এমন নয়।

প্যারিস ষ্টেশন ছাড়বার একটু পর থেকেই ঘর-বাড়ী কমে যেতে লাগল। এর পর বড়-বড় জমি আর ঘন দীর্ঘ গাছের সারি। মনে হয়, মানুষ যেন কোথাও বাস করে না, শুধু গাছপালা আর ঘাস আছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত সমতল জমি; অনেক দূরে-দূরে ছোট্ট-ছোট্ট গ্রাম বা সহর। যতই সুইজারল্যাণ্ডের কাছে আসতে লাগলাম ততই বড়-বড় অরণ্য আর পাহাড়। এর পর সুরু হল টিকিট দেখা; Border landএর কাছে এলে পাঁচ মিনিট অন্তর ক্রমাগত টিকিট আর পাসপোর্ট দেখতে লোক আসতে লাগল। বোধ হয় পরে-পরে ৭।৮ জন এসে দেখে গেল। এইখান থেকে পাথুরে পাহাড় আর ঘন বন, দেখতে ভারী সুন্দর। অনেক জায়গায় খালের মত খাত দিয়ে জল চলেছে, জানি না, কাটা খাল কি স্বাভাবিক নদী! Europe, Americaর অনেক নদীই দু'ধারে এমন বাঁধানোর মত দেখতে যে দেখলে কাটা খাল মনে হয়। ওরা জলস্রোত ঠিক রাখবার জন্য পাড় ভাঙতে দেয় না। লাইন করে গাছ দিয়ে পাড় বেঁধে রাখে। রোদ উঠেছিল, খুব জোরালো। এত সুন্দর রোদের দেশ বলেই বোধ হয় এখানে রৌদ্র-চিকিৎসা হয়। শুনেছি, রোগীদের পথ ঘাট ট্রেণ বাড়ী সবই আলাদা। সাধারণ ঘর-বাড়ী যা দেখতে পাচ্ছিলাম ভারী ঝকঝকে তকতকে। এ দেশটা খুব পরিচ্ছন্ন আর মাজা-ঘসা।

প্রায় সন্ধ্যায় আমরা Bern ষ্টেশনে পৌছলাম। Embassy থেকে এক জন ভদ্রলোক গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন; তিনিই আমাদের হোটেলে পৌছে দিলেন। একটু বিশ্রাম করার পর এন্ সি মেহতার জামাতা ও কন্যার নিমন্ত্রণে তাঁদেরই গাড়ী আমাদের নিয়ে গেল। এঁদের বাড়ীতে অনেক দিন পরে নিরামিষ ভাত-ডাল-তরকারী খেয়ে বেশ ভাল লাগল। ওঁরা ভারতীয় আরও চার জনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তার মধ্যে তিন জন মহারাষ্ট্রের ও আর এক জন প্রবীণ ডাক্তার—গুজরাটী।

খাওয়া-দাওয়া গল্প-গাছার পর জামাতা মেহতা গাড়ী করে আমাদের জ্যোৎস্না রাতে অনেক ঘোরালেন। নদীর ধারে মাঠের পাশে স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল, প্রাকৃতিক দৃশ্য দার্জ্জিলিঙ কার্সিয়াং ধরণের। খুব সাজানো বটে, তবে দার্জ্জিলিঙের মত বিরাট রূপের ঐশ্বর্য্য বোধ হয় নেই। তবু জ্যোৎস্নায় বেশ স্বপ্নলোকের মত দেখাচ্ছিল। এখানেও নদীটি, দু'ধারে খালের মত বাঁধানো ধার দিয়ে গাড়ী দৌড়বার রাস্তা চলেছে। নদীর জলের তলায়

পাথরগুলি আমাদের থলভূমের নদী—খরস্রোতার মত, স্পষ্ট দেখা যায়। তবে এ নদীতে খরস্রোতার মত জলের তোড় চোখে পড়ল না, জল অতি ধীর-মন্থর গতিতে চলেছে।

পরদিন সকালে Bernএ একটা ভাল Museum দেখলাম। সেখানে চীনা, জাপানী, বালি, জাভা, বোর্ণিও, তুরস্ক এবং বলকানের অনেক সুন্দর-সুন্দর জিনিষ রয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডে পুরাকালে যে কাঠের ঘর করত এবং কাঠের আসবাব ব্যবহার করত তার পুরো ঘর সাজিয়ে রেখেছে ১৫০০ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এ দেশটা কাঠের প্রাচুর্য্যের দেশ, কাজেই কাঠের আসবাবগুলি চমৎকার। ঘরগুলি দেখলে সেইখানেই থাকতে ইচ্ছা করে বেশ খানিকক্ষণ। ভারতীয় পোষাক-পরা মেয়ে দেখলে ছবি তোলা এ সব দেশে খুব প্রচলন। এক দল ডচ ও ইংরেজ ছেলে-মেয়ে আমাদের দেখেই ছবি তুলতে আরম্ভ করল। অবশ্য আমাদের মত নিয়ে তুলল। এই সহরটাতে আর একটা Museum দেখলাম, তাতে পাহাড় চড়ার নানা রকম পোসাক, লাঠি, বাঁধবার দড়ি, Glacierএর নানা দৃশ্য, পার্ব্বত্য জীবজন্তু পাখী, প্রাচীন পোষাক ইত্যাদি আছে। নানা রকম পাথরও আছে। বুঝে দেখতে পারলে বরফের পাহাড়ে চড়া প্রভৃতির সব ঘরে বসে জানা যায়।

আমাদের এখানে বেশী দিন বাস হল না। জেনিভা যেতে হবে, কাজেই সেদিনই ট্রেণ ধরলাম। সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড় যেমন বিখ্যাত, হ্রদও তেমনি বা তদপেক্ষা বেশী বিখ্যাত। এবার ট্রেণে উঠেই প্রায় হ্রদ দেখা সুরু হল। কি বিরাট হ্রদ! দু'ধারে জলের পাশে-পাশে একেবারে কানা পর্য্যন্ত ঘর-বাড়ী, রাস্তা। দূরে Glacier-গলা পত্রহীন রুক্ষ পাহাড়ের পাথুরে চূড়াগুলি যেন কেউ মন্দিরের মত গড়ে দিয়েছে—ভারী সুন্দর লাগে, চোখ ফেরান যায় না। যতক্ষণে জেনিভা পৌঁছলাম ততক্ষণ সারা পথ হ্রদ দেখতে-দেখতেই এলাম। সন্ধ্যায় যে হোটেলে উঠলাম এসে, তার নাম হোটেল Pussie। ঠিক হ্রদের উপর, পথের ধারে হ্রদে বড়-বড় রাজহাঁস রাত্রি-দিন খেলা করছে। সারা দিন তাই চোখে পড়ত। আমাদের হোটেলের সামনে একটা সাঁকো, তার পাশে মনীষী Rousseauএর বিরাট মূর্ত্তি! সেই সাঁকো পার হয়ে অসংখ্য পদচারী, গাড়ী এবং বিশেষ করে Cycle সারাক্ষণ ঘুরছে; দুপুর রাত্রেও বিশ্রাম নেই। এটা International সহর বলে এখানে হোটেলের জানলায় দাঁড়িয়েই মাঝে-মাঝে শাড়ী-পরা মেয়েদের ঘুরতে দেখা যায়। আমাদের খাওয়া হয়নি বলে সন্ধ্যায় খাবারের সন্ধানে বার হচ্ছিলাম, এমন সময় পথের ধারে একটি ভদ্রমহিলা আমাদের ধরে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি তাঁকে দেখেই চিনেছিলাম। তিনি পরে নিজের পরিচয় দিলেন মিসেস্ রজনীকান্ত দাস বলে। তার পর তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। নাম শুনেই বললেন, "Oh, you are Ramananda Babu's daughter!" তিনি তাঁর স্বামীকে ডেকে আনলেন। তখন আমরা সবাই মিলে লেকের ধার দিয়ে হেঁটে একটা গাছতলায় চীনা-লণ্ঠন-জ্বালা হোটেলে খেতে বসলাম। সেখানে প্রতি গাছের তলাতেই দল বেঁধে লোক খেতে বসেছিল। একে পূর্ণিমা তার উপর চন্দ্রগ্রহণ! ঠাট্টা করে বললাম, "গঙ্গা ত নেই, চল জেনিভা হ্রদে একবার ডুব দিয়ে আসি।"

এখানে খাবার খরচ ভীষণ বেশী। একটু মাছভাজা আর ice cream ইত্যাদি দিয়ে পাঁচ জনের ডিনার খেতে প্রায় পাঁচ পাউণ্ড খরচ হয়ে যায়। গাছতলায় বসে-বসে আমরা অনেকক্ষণ গল্প করলাম। গরম কাপড় পরে যাইনি, রাত বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটু-একটু শীত করতে লাগল। তবু গাছতলার মায়া শীঘ্র কাটানো গেল না। অনেক রাত্রে বিচিত্র আলো-জ্বালা পথ দিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরলাম।

এ দেশে ক্যামেরা ও ঘড়ি প্রসিদ্ধ। সকালে উঠেই একটা ক্যামেরা আর একটা ঘড়ি কেনা হল। তার পর স্নানাদি সেরে Dr. & Mrs. Dasএর সঙ্গে United Nationsএর বিরাট বাড়ী ও বাগান দেখতে গেলাম। আয়নার মত ঝকঝকে মেঝে, বিরাট সব হল-ঘর। আমাদের দেশের লোকেরা কি রকম ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে ভুগছে আর ওষুধ নিচ্ছে, বড়-বড় করে তার ছবি রয়েছে। চোখে বড় খারাপ লাগল। বারো তলা বাড়ীর উপরে উঠে আমরা খেলাম। ছাদ থেকে Mont Blanc দূরে দেখা যায়। খাবার পর ডেলিগেটদের লেকচার-হল প্রভৃতি দেখলাম। খুব সুব্যবস্থা। সেদিন পাল-পাল ছোট ছেলে-মেয়ে United Nationsএর বাড়ী দেখতে এসেছিল। তারা ইতিহাস ও ভূগোলের ছাত্র-ছাত্রী। আমাদের দেখে ভূগোলের কিছু জ্ঞান তাদের বোধ হয় হল।

[ক্রমশঃ।

গৌরী মা

শ্রীনির্ম্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

"মানুষকে আমি বিয়ে করব না, মা। তেমন বরকেই বিয়ে করব যে কখন মরে না।"

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! নাম তাঁর মৃড়ানী। বিয়ে তিনি করবেন না, কিছুতেই না। বাপ-মা যোগাড়-যন্ত্র করেছেন, সব ঠিকঠাক। কিন্তু যাঁর বিয়ে তিনিই দিলেন সব মাটি করে। লগ্নের একটু আগে কোথায় সরে পড়লেন, কেউ পাত্তাই পায় না। আত্মীয়-স্বজন আর বাপ ত ভেবেই আকুল। মা কিন্তু জানতেন। মেয়ের রকম-সকম দেখে পালানোর সলা-পরামর্শটা তিনিই দিয়েছিলেন।

কেবল মাত্র কুলীনের ছেলে, এ ছাড়া আর কোন গুণ না থাকলেও তার সঙ্গে বিয়ে দিতেই হবে, তখনকার দিনের এই মনোভাবের ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা ছিলেন মৃড়ানী। আত্মীয়-স্বজনের মেয়েদের গুণহীন, বুড়ো ও বহুপত্নীক কুলীনের সঙ্গে বিয়ে হত। আর দুর্দ্দশাও হত তেমনি। তার ওপর অতি ছোটবেলা থেকেই তাঁর বৈরাগ্য। যে-বয়েসে সাধারণ লোক এর ভালমন্দ বিচার করতে পারে না, সেই বয়েসেই তিনি বিয়ের ওপর খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। বড় বোন বিপিনকালীর বয়েস সতের, তাঁর তের। দু'জনেরই বিয়ে হবার কথা ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এমনই গুণধর এক কুলীনের ছেলের সঙ্গে, যার রূপ-গুণের কথা বাদ দিলেও বয়েস ত্রিশ ছাড়িয়ে কোথায় চলে গেছে। বিপিনকালী কয়েক বছরের মধ্যেই হলেন বিধবা।

স্বামী বিবেকানন্দ একদা বলেছিলেন, "এত বড় দুনিয়াটা ঘুরে এলুম, কোথাও ত কথা কইতে ভাবতে হয়নি, কিন্তু 'দিদিমা'র কথার জবাব দিতে হিসেব করে কথা কইতে হয়।" এ হেন 'দিদিমা'র

পেট থেকে পড়লেন মৃড়ানী বাংলা ১২৫৭ সালের ৩রা ফাল্গুন।* বাপ পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও মা গিরিবালা দেবীর দুই ছেলে, পাঁচ মেয়ে,—নবকুমার, অবিনাশচন্দ্র, বিপিনকালী, মৃড়ানী, জগদ্ধাত্রী, ধীমহি ও ব্রজবালা। পার্বতীচরণের দেশ পশ্চিম-বাংলার হাওড়া জেলায় শিবপুরে। গিরিবালাদের নদীয়ায় রাণাঘাটে। কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে এঁরা থাকতেন। অবস্থা ভালই ছিল। গিরিবালা পার্বতীচরণের চতুর্থা স্ত্রী। প্রথম তিন জনের কোন ছেলেপুলে হয়নি।

খিদিরপুরে এক সদাগরী অফিসে পার্বতীচরণ কাজ করতেন। রোজ পুজো করে কপালে চন্দনশুদ্ধ অফিসে যেতেন। সাহেবের কাছ থেকে মাঝে-মাঝে এর জন্তে ঠাট্টা শুনতে হত। নির্ভীক ও নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ও-সব আমলেই আনতেন না।

গিরিবালা পরোপকারী ছিলেন। নানা ভাবে পরের উপকার করে বেড়াতেন। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরিজী ও ফারসী—এই চারটে ভাষা জানতেন। প্রথম দু'টি রীতিমত। বাংলায় লেখা তাঁর বহু স্তব ও ভগবদ্‌গীত এক দিকে পাণ্ডিত্য, আর এক দিকে ঈশ্বরানুরাগের পরিচয় দেয়। এদিকে আবার সুগায়িকা। পরমহংস রামকৃষ্ণকে অনেক সময় গান শুনিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। আবার সাধন-ভজনেও বেশ নিষ্ঠা। গিরিবালার লেখা শ্যামা, শিব ও যোগ সম্বন্ধে গান গাঁয়ের লোকে গেয়ে-গেয়ে বেড়াত।

ছোটবেলায় বেশ মোটা-সোটা মৃড়ানী যেখানে বসতেন সেখানেই থাকতেন। কেউ ঝগড়া বা মারামারি করলে প্রতিশোধ নিতে বা নালিশ করতে দেখা যেত না। মাছ-মাংস তাঁর দু'চোখের বিষ ছিল। স্কুলে পড়ার সময় 'ভাল মেয়ে' বলে পরিচিতা মৃড়ানী স্বভাবেও তাই-ই ছিলেন। অনর্গল বলে যেতে পারতেন দেব-দেবীর স্তব, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, মুগ্ধবোধ,—কি না?

নৌকো করে বেড়াবার সময় এক দিন তাঁর মনে হল, মেয়েরা যে গয়না পরে তাতে সুখ পায় কি না। হাতের সোনার বালা খুলে দাঁতে চিবিয়ে কোন স্বাদ পেলেন না। জলে দিলেন ফেলে।

কলকাতায় বৃন্দাবনের এক মহিলা এসেছিলেন। তাঁর উপাস্য নারায়ণ শিলা উপহার পেলেন ইনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই দামোদরের সেবা যথাযথ ভাবে পালন করে গিয়েছেন।

এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটি বাংলা ১২৭২ সালে পৌষ-সংক্রান্তির সময় গঙ্গাসাগর মেলায় গিয়েছিলেন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে। সেখানে দিলেন গা-ঢাকা। পালিয়ে গেলেন হরিদ্বার। হিমালয়ের যত তীর্থ ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে চলল সাধন-ভজন। মাথার চুল ছেঁটে-কেটে গায় ছাই-ভস্ম মেখে ভূতের মত থাকতেন। কখন পাহাড়ী, কখন পুরুষ, কখন পাগল—আত্মগোপনের কত চেষ্টাই না চলল। কথা পর্যন্ত বড় একটা বলতেন না। ধরা পড়বার ভয়ে এত সন্ত্রস্ত! তবুও দু'-এক বার আত্মীয়-স্বজনেরা ধরে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর তীব্র সংসারবিমুখতা তাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। রূপ কেড়ে নেওয়ার জন্তে ভগবানের কাছে কান্নাকাটি করতে থাকতেন। তবু কোন-কোন বদলোকের পাল্লায় পড়বার উপক্রম হয়েছিল। অসাধারণ তেজ ও মনোবলই সে সময় রক্ষা করেছে।

সব সময়েই স্বাধীন ভাবে চলতে অভ্যস্ত মৃড়ানী কোন-কোন সময় নিজের ইচ্ছেমত কোন জায়গায় থাকতে গিয়ে সঙ্গীদের হাতছাড়া করে ফেলতেন। তার ফলে কষ্ট ও দুর্ভোগের একশেষ হত। পথ ভুলে কত বার বনের মধ্যে চলে গেছেন, লোকালয় খুঁজে পাচ্ছেন না, হয়ত রাতই হয়ে গেল। এক দিন এমনি ভাবে একা-একা চলতে গিয়ে এক পাহাড়ে নদীর ওপর বরফে ঢাকা পোলের কাছে এলেন। যেই পা বাড়িয়েছেন, পোল ভেঙে খরস্রোতা নদীর জলে গেছেন পড়ে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার মত হয়ে ভেসে যেতে-যেতে বরফের এক বিরাট চাঁইতে এসে ঠেকলেন। তা ধরে কোন রকমে খাড়া উঁচু পাহাড়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোন গেল।

হিমালয়ের এই পাহাড়ে-জীবনে এবং অন্য জায়গায়ও তিনি অত্যন্ত তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করতেন বলে জানতে পারা গেছে। বুড়ো বয়েসেও রোজ লাখ খানেক জপ করা চাই-ই। ব্যাকুলতা ও আগ্রহ নিয়ে এমন তপস্যা করতে বসতেন যে, সূর্য কখন যে উঠত আর কখন ডুবত, খেয়ালই থাকত না। খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা বলে কিছু নেই। দেখতে পেলে কখন-সখন কেউ-কেউ খাওয়ার জন্তে কিছু দিয়ে যেত; না দিলে চেষ্টাও করতেন না। কখনও বা গাছের পাতা বা মোটা আলু সেদ্ধ খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। কাপড় না থাকায় গাছের ছাল পরেও কাটাতে হয়েছে। পাহাড়ের ওপর গান গাইছেন। একটা হরিণের বাচ্ছা কাছে এসে গা চাটছে। আদর করতে লাগলেন। চলে আসছেন, বাচ্ছা পিছু ছাড়ছে না।

দেশীয় রাজ্যের এক মন্দিরে। রাজা দেখা করতে আসলেন। তাঁর বাড়ীর খানিকটা থাকবার জন্তে ছেড়ে দিতে চাইছেন। মৃড়ানী রাজী হলেন না। রাজার ছেলেপুলে নেই। সাধু মা'র কাছে প্রার্থনা করলেন। মন্দিরের ঠাকুরকে দেখিয়ে উত্তর এল, "এর চেয়ে সুন্দর ছেলে আর পাবে না। একেই তনু-মন দিয়ে ভালবাস, তাতেই মনে শান্তি পাবে।"

কোন মন্দির বা সাধুর নাম শুনলেই ছুটে যেতেন। যে-সব সাধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বৃন্দাবনের জগন্নাথদাস, মুকুন্দদাস, মতিদাস, গাজীপুরের পওহারী বাবা, বারাণসীতে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, নবদ্বীপে চৈতন্তদাস, হিমালয়ে ভোলা গিরি প্রভৃতির নাম জানতে পারা গেছে।

একবার দক্ষিণ-ভারতে ঘুরছেন। এক মন্দিরের মোহন্ত এক গোয়ালার মেয়েকে বদ-মৎলবে নিজের বাড়ীতে আটকে রেখেছে। খবর পেয়ে ছুট। রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করে, বুঝিয়ে বলে, অনুসন্ধান করিয়ে মেয়েটিকে মুক্ত করে ও মোহন্তের শাস্তির ব্যবস্থা করে তবে শান্তি। আর একবার এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর ওপর অযথা অত্যাচার-অবিচার করছেন জানতে পেরে সেখানে গিয়ে হাজির এবং শেষ পর্যন্ত একটা সুরাহা করে তবে ছাড়লেন।

মৃড়ানীর অনেক নাম,—রুদ্রাণী, মাস্ত, মেজ, দামুর বৌ, গৌরামায়ী, গৌর মা, গৌরদাসী, গৌরীপুরী, গৌরী-আনন্দ, গৌরী মা। গায়ের রং গৌর ছিল বলে পাহাড়ীরা প্রথমে গৌরামায়ী বলে ডাকত। তার পর রামকৃষ্ণের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে গৌরী-আনন্দ বা গৌরীপুরী নাম হয়।

রামকৃষ্ণের প্রথম দীক্ষিতা শিষ্যা গৌরী মা যখন তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র পেলেন, তখন তাঁর (গৌরী মা'র) বয়েস ন'বছর।

---

* কেউ কেউ বলেন ১২৬৪তে।

তীর্থে-তীর্থে ঘুরে এসে বহু দিন পরে আবার যখন রামকৃষ্ণের সাথে দেখা হল, তখন একত্রিশ, বাংলা সন ১২৮৮র অগ্রহায়ণ কি পৌষ। রামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্তগণ প্রায় সকলেই তখন এসে গেছেন।

"ওগো ব্রহ্মময়ি, এক জন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও, এক জন সঙ্গিনী এল।"—গৌরী মাকে দেখিয়ে রামকৃষ্ণ তাঁর ঘরণীকে বললেন। সারদার হাতে স্বর্গ এল। লজ্জাবতী সারদা বেটাছেলের সামনে বেরুতে পারতেন না।

মৃড়ানী গৌরাঙ্গকে স্বামী বলে মনে করতে ভালবাসতেন। তাই অনেক সময় শ্বশুরবাড়ীর কথা উঠলে উত্তর হত নদীয়ায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী। আবার পথ চলতে-চলতে নিতাইএর মূর্ত্তি দেখতে পেলে মুখে এত বড় ঘোমটা,—ভাসুর যে!

তখন কলকাতায় বলরাম বসুর বাগবাজারের বাড়ীতে। হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে ছুটলেন। দেখতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে সেই প্রাণের ঠাকুরটিকে। প্রণাম করবার সময় মনে পড়ল খেয়ে-দেয়ে হাত-মুখ ধোওয়া হয়নি।

গৌরী মা চমৎকার গান করতে পারতেন। তা শুনে রামকৃষ্ণ সময়-সময় সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। আর রান্না করতেন উপাদেয়। রামকৃষ্ণকে কত জিনিষ রান্না করে খাইয়েছেন কত দিন। তাঁর জগা-খিচুড়ী ও চাটনী নাম-করা। চাল-ডাল উনুনে চড়িয়ে খানিক পরে আলুর কুচি, মূলোর ডাঁটা, কপির ফুল, নারকোল, কিসমিস, মিছরি, যা পেলেন হাতের কাছে সব দিলেন ফেলে হাঁড়িতে। এই হল তাঁর জগা-খিচুড়ী। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর রান্না খেয়ে বলেছিলেন, "গৌর মা, তুমি মরে গেলে তোমার ডান হাতখানা কেটে রেখে দেব। আমাদের যখন পেসাদ খেতে ইচ্ছে হবে, তোমার ঐ হাত আমাদের বেঁধে দেবে।"

দামুর বৌএর শরীর নেই ভাল। অন্য দিনের মত দামোদরের রাত্তিরের রান্না হল না। মাঝ রাতে তাঁর রান্না-ঘরে আলো জ্বলছে, লুচি ভাজা হচ্ছে। "এক ঘুমের পর কত্তা (অর্থাৎ দামোদর) বললেন, ক্ষিদে পেয়েছে। তাই এই ব্যবস্থা।" অদ্ভুত মানুষ আর অদ্ভুত তাঁর কত্তা!

রামকৃষ্ণ গৌরী মাকে বলতেন, "এ দেশে মায়েদের বড় দুঃখু, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।" আরও বলতেন, "এই টাউনে (কলকাতায়) বসে কাজ করতে হবে। সাধন-ভজন ঢের হয়েছে। এবার (গৌরী মা'র) এ তপস্যাপূত জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগবে। ওদের বড় কষ্ট।"

'জ্যান্ত জগদম্বা'দের সেবায় লেগে গেছেন গৌরী মা। এক দিন আশ্রমে (গৌরী মা প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রমে—বর্ত্তমান ঠিকানা, ২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলকাতা) মেয়েদের খাওয়ার কিছু নেই। ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরুলেন। সোজা গিয়ে এক বাড়ীতে উঠলেন। পরিষ্কার বললেন লজ্জা না করে, "স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন তাই আমিও সান্ন্যাসী। তবে অনেকগুলি মেয়েকে খেতে দিতে হয়। আজ আমার ঘরে কিছু নেই।"

পাঁচ বছরের এক বাঙালী বামুনের মেয়েকে নিয়ে গেলেন পুরী। জগন্নাথের সঙ্গে হবে বিয়ে। পাণ্ডা গোবিন্দ শৃঙ্গারীকে বললেন

ব্যবস্থা করতে। পুরীর রাজাকে জানান হল। রাজা ত অবাক্। মন্দিরের কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ নিয়ে লাগল গোলমাল। বসল বিচার-সভা, তর্কাতর্কি, হৈ-হৈ ব্যাপার! শেষ পর্যন্ত রাজাকে মত দিতে হল। মন্দিরের মণিকোঠায় রত্নবেদীতে মেয়েটির সঙ্গে জগন্নাথের হয়ে গেল বিয়ে। সম্প্রদান করলেন বাপের মত নিয়ে মেয়ের দিদিমা।

আচারনিষ্ঠ গৌরী মা বলতেন, "ঠাকুর (রামকৃষ্ণ) সন্তানদের (শিষ্যদের) মধ্যে অনেককে আচার-বিচার শিখিয়েছেন, অনেক বিধিনিষেধ মেনে চলতে বলেছেন। এমন কি, অশ্লেষা মঘা আর বিষ্যুদ্‌বারের বারবেলায় কোথাও যেতে বা নতুন কাজ আরম্ভ করতেও নিষেধ করতেন।"

আশ্রমের টাকা-পয়সার অভাব শুনে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "(আমেরিকায়) একবার ঘুরে এলে কত সুবিধে হত। তা উনি (গৌরী মা) গেলেন না জাত যাবে বলে।"

আশ্রমে টাকা-পয়সার দরকার। তার জন্যে একবার এক সাহায্য-সভার আয়োজন হয়েছিল। এক ভদ্রলোক জানালেন, একটি বড়লোক পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে রাজী। ঐ বড়লোকটি কি করে বড় হলেন জানতে পেরে গৌরী মা বললেন, "এ রকম টাকা পঞ্চাশ লক্ষ হলেও আমি তা গ্রহণ করব না।"

তাঁর আশ্রমে স্বদেশী যুগের আগে থেকেই তাঁত বসান হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এক দিন গিয়েছিলেন। আশ্রমের মেয়েরা একটি খদ্দরের কোট তাঁকে উপহার দিলেন। তাঁদের হাতে তৈরী। আচার্য বলতে লাগলেন আনন্দে, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

অসহযোগ-আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহায়তায় কলকাতার রসা রোডে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা। মহাত্মাজী জিগ্যেস করলেন, "জাতীয় দুরূহ সমস্যার কি করে সমাধান হতে পারে?" গৌরী মা বললেন, "ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকলে পথ যতই দুর্গম হোক্ না কেন, সিদ্ধি অনিবার্য।"

আশ্রমে গৌরী মা বড় গামছা পরে নীচের হল-ঘরে ঝাঁট-পাট দিচ্ছেন এক দিন। এক দল ভদ্রমহিলা আশ্রম দেখতে ও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বেমালুম আসল মানুষটিকে ঝি বলে মনে করে তাঁরা সেই ভাবে কথা কইতে লাগলেন।

সারদা দেবী বলতেন, "গৌরদাসী আশ্রমের মেয়েদের বড় সেবা করে। অসুখে-বিসুখে নিজ হাতে মেয়েদের গু-মুত পর্যন্ত পরিষ্কার করে।" কিন্তু কোন অবস্থায়ই সেবা তিনি কারো নেবেন না।

গৌরী মা বিধবাদের বিয়ের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর এক প্রিয় শিষ্য একদা এক বিধবাকে বিয়ে করায় বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

সাধু ভোলা গিরি একবার এক জনকে বলেছিলেন, "মাতাজী (গৌরী মা) যে কি কঠোর তপস্যা করেছেন, তা এখন কলকাতায় ঘরে বসে তোমরা ঠিক বুঝবে না। মাতাজীকে সাধারণ মানুষ মনে করো না।"

রামকৃষ্ণ বলতেন, "গৌরী মহা তপস্বিনী এবং মহা ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী। গৌরী হচ্ছে কৃপাসিদ্ধা গোপী, ব্রজের গোপী।"

রামকৃষ্ণের প্রয়াণের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে মেয়েদের উন্নতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে-করতে বাংলা ১৩৪৪ সালে ১৮ই ফাল্গুন সাতাশী বছর বয়েসে গৌরী মা দেহত্যাগ করে চলে গেলেন।

কেউ জীবনী লিখতে চাইলে গৌরী মা বলতেন, "আমি বেঁচে থাকতে তোমরা আমার জীবনী ছাপবে না। যদি ছাপ, তাহলে হুজুগে-লোকগুলো এসে আমাকে ভগবান্ করে তুলবে। আমি ভগবান্ হতে চাই না। আমি তাঁর দাসী মাত্র।"

গতযুগের একৈকা গৃহবধূর ডায়েরী

৺কৈলাসবাসিনী দেবী

(পরিশিষ্ট)

গত সংখ্যায় ৺কৈলাসবাসিনী দেবীর গতযুগে লিখিত যে ডায়েরী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সহিত লেখিকার সন ১২৬৫ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত জমা-খরচের হিসাব ও একটি গহনার ফর্দ পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত তুলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু হিসাবপত্রে সে-যুগের দ্রব্যাদির মূল্য সম্বন্ধে দু'একটি কৌতুককর তথ্য এখানে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ঘরের এই কয় মাসের খরচ হইতে দেখা যায় যে, খাওয়া-পরা, দুই জন চাকর, এক জন ঝি ও বসুই বামুনের মাহিনা ও লৌকিকতা প্রভৃতি লইয়া মাসে ২১৫৲ হইতে ২৫০৲ টাকা মাত্র খরচ হইত!

সন্দেশ /৩	২৲	বৈশাখ হইতে শ্রাবণ	
সন্দেশ /৮	৬৲	৪ মাসের নাপতিনীর	
ঠাকুরদের এক জোড়া		মাহিনা	১৲
সাদা ধুতি	২।০	কাষ্ঠ বিশ মণ	৫।৵০
ঘৃত /২০ সের	১২।০	বাবুর ও জামাই বাবুর	
মাসকাবারি দুধের দাম	৬।০	ভাল ধুতি	৬৲
পাঁচ জোড়া কাপড়	১০৲	মাসকাবারি সরু চাল	৩৲
সিঁথি-সাতপুকুর হইতে		বাবুর ও জামাই বাবুর	
খিদিরপুরের গাড়ি ভাড়া	২৵০	কামিজের জন্য এক থান	৬৲
বৈশাখ মাসের		সাতপো দুধের দাম	৵১৫
মাছ তরকারি মোট	১১৲	৩খানা গামছা	৷১০
জ্যৈষ্ঠ মাসের		বামুনের তিন মাসের	
মাছ তরকারি মোট	১৫৲	মাহিনা	৷০
আষাঢ় মাসের ঐ	১৬৲	ধোপার মাসের মাহিনা	৫৲
মাসের পান তামাক		চাঁপা ঝির তিন মাসের	
মোট ৫৲ হইতে ৬৲ টাকা		মাহিনা	৩৷০
ক্ষীর ৩ খানা /৬	২।৵১০	শিবু মালির এক মাসের	
দধি /৮	১।০	মাহিনা	২৲
তরমুজ ৩টা	।০	দিনের এক মাসের মাহিনা	১৲

গহনার ফর্দ—

সব সমেত আমার এই গহনা। পায়ে ঘুমুর দেয়া ছগাছা মল। কোমরে দুই ছড়া চন্দ্রগার আর গোট চারি শিকলি। হাতে বালা দমদম মিচরি তিন জোড়া, পিনখাড়ু তিন জোড়া, ঘোড়য়া পইচা হাতা হার জাল ও হাতের মুকুতা। হাতে চালদানা মরদানা লঙ্গ (লবঙ্গ)-কলি লঙ্গফুল নারিকেল ফুল মাদুলি সোণালি সোণার পইচা, বাউটি

ও হাত মাদুলি। উপর হাতে তাবিজ ও বাজু তাগা জসন ঝাঁপা ও নবোরত্ন। গলায় ডামন কাটা চিক ও জড়য়া চিক ও গোঁপ হার ও দড়ি হার ও হেসো হার, ন-নর গোলমালা সাত-নর দানা, পাঁচ নর পান হার, ন-নর মুকুতা, দো নর মুকুতা, মুকুতার কণ্টি ও আরেক ছড়া কণ্টি। কানে তিন জোড়া চউদানি, দু জোড়া কানবালা, মুকুতার গোচা ও কান, কর্ণফুল ঝোমকা। মাতায় সিঁতি ও ফুলকাটা ও গোট। গলার চাপ কলি ও ধুকধুক। ইহা ছাড়া তিনি কন্যাকে যে গহনা দিয়াছিলেন ও অন্যান্য গহনার ফর্দও রহিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল।

শ্রীমতি কুমুদিনিকে দিই পান হার ও কান ও কানবালা, মল ও পাজোর আর একটা নথ। আর ঝাপা গোঁপহার, দমদম বদল দিয়ে নেয়। জাল ও তাগা সাথে দিই। হাতের মুকুতা দাম দে নেয়। আটার ভরির গকরি অমনি নেয়। হিরের স্ত্রীকে মাথায় ফুল দিই, অমৃতর স্ত্রীকে এক যোড়া জড়োয়া পঁইচা দিই, প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের নাত বৌকে আরেক যোড়া দিই। আরেক যোড়া দিই আমার মেজ নাত বৌকে। সিঁতি দিই আমার বড় নাত বৌকে। আর দানা ভেঙ্গে বড় বৌর বালা হয় ৫ ভরির তিন আনা। আর আমার গলায় একছড়া বিচে হয়। আর মরদানা ও চালদানা ভেঙ্গে বারুণির দুই ভরির তাগা হয় আর বাইস জোপা অঙ্গরি হয়। আর রূপার তাগা ২০ গাচা হয় আর রূপার বালা সাত যোড়া হয়। আর হেস হার ভেঙ্গে ও একগাচা খাড়ু ভেঙ্গে শ্রীমান শরতচন্দ্রর গহনা দিই। আরেক গাচা খাড়ু ভেঙ্গে আমার বড় নাতিনিকে বোর গড়ায়ে দিই। মাতার গোট ভেঙ্গে হেস গড়ায়ে দিই। আর এক যোড়া খাড়ু গোল মালা ভেঙ্গে প্রমদার গহনা হয়। আর আমার শাশুড়ি জে চলিশ ভরির বাউটি দেন, তা থেকে পাচভরির সোনা নে কুমুদের তাগা হয়, আর পঁচিস ভরির চুড়ি গড়িতে দিই। হেম সেকরা নে গালায়। আরেক যোড়া চুড়ি গড়াই তাহা আমার একযোন রাঁধুনি বামন তার নাম শ্যামাচরণ মুকুয্যে নেয়, নিয়ে ক্ষয়কাস হয়ে মরে। আর প্রিয়নাথের স্ত্রী বালা ও তাবিচ বাঁধা দে নেয় একশত টাকা। সে একদিন বাপের বাড়ি জায়, তার বালা ও তাবিচ আমার ডামন কাটা চিক পরে, তাহা রুদ্র রায় ফাকি দে নেয়। জড়য়া চিক বলাই সিংহর বৌকে দিই। তিনি আমার বড় নাতবৌকে দেন এক ছড়া সেই রকম চিক আরো ছোটো ডায়মন কাটা। বাজু আমার মামাতো ভাজ পরতে নেন, তাহা আমাকে দিলেন না, ৫০৲ টাকা দে পাঠায়ে ছিলেন, তাহা আমি রাগ করে নিলেম না, তাহা আর পাইলাম না। তাবির যোড়া খানা সুরকে দিলাম আর বড় মুকুতার নথ সুরকে দিলাম। আরেকটা নথ আমার শাশুড়ি ঠাকুরানি গুরুপত্নিকে দেন। আরেকটা নথ আমি কুমুদিনিকে। আরেকটা নথ শেতোলা মাকে দিই। ডায়মন কাঁটা মাকড়ি দশটা মুক্তাদেয়া মাকড়ি দশটা ডায়মন কাটা মাকড়ি ভাজকে দিই। ভাজকে বের সময়ে হাত মাদুলি, সাথে চৌদানি দিই, দ্বিতিও বিবাহে ছগচা মল দিই, কন্যা হলে বোর দিই। আর মুক্তার মাকড়ি দুল নাতিনিদের দিই। দুইটা মাকড়ি গোঁসাইজির কন্যাকে দিই। শ্রীমতি সরজিনীকে চৌদানী দিই।

আমার গহনা পিতাঠাকুর দেন—হাতে চালদানা পলাকাটি মাদুলি ও পঁইচা ও বাউড়ি তাবিচ ও বাজু দানা কণ্ঠমালা, পায়ে ছগাচা মল ও পাঁইযোর গুকরি ও পথম ও চুটকি। কানে বোঁদা ও মাছ। কোমরে রূপার চন্দ্রোর হার ও গোট ও চাবি শিকলি। এই সকল আমার শাশুড়ি ঠাকুরাণি নেন তাঁর ভিক্ষা পুত্রের বৌকে দেন। আমাকে আশীভরির ঝুমুরদেয়া ছগাচা মল দেন। আশী ভরির খোটায়ে পাঁজর দেন। বালা ডামনকাটা পাড়িখাড়ু হাত-হার চালদানা নবঙ্গকলি বাউটি ৪০ ভরির, গোলমালা ১৪ ভরির, ১২ ভরির তাবিচ, পাঁচ ভরির ২ইখান বিলপত্রে বাজু গোপহার মুকুতার কণ্টি পানহার সিঁতি দোনর মুকুতা। ২৮ ভরির সোণার চন্দ্রহার কানবালা কর্ণফুল ঝুমকা চৌউদানি মুকুতার গোচা দুইটা ছোট ঝুমকা দুইটা ছোট ফুল দুইখানি পিপল পাত। আর সাথে হিরের পঁইচা। পিতা ঠাকুর সাথে দেন হাত মাদুলি ও হিরার কান ও কান-বালা। সাথে মাসশাশুড়ি দেন মরদানা। শাশুড়ি মাঝারি মুকুতার দুইটা নথ দেন। একটার মাঝে চুনি একটার মাঝে পারনা ও দুই যোড়া নথের দুইটা নোলক আমার পিতা দেন। তার পরে স্বামি দেন তাবিচের ঝাঁপা তাগা দুইখান ডামনকাটা বাজু এক ছড়া চন্দ্রহার এক ছড়া গোট এক ছড়া চাবি শিকলি একটা নথ ৩০০ শত টাকার মুকুতা ন-নর মুকুতা। হাতের মুকুতা, হাতের জাল দুই যোড়া পিন খাড়ু, বড় মুকুতার কণ্টি জড়য়া ও চিক ও ডামনকাটা চিক সাত নর দানা এক যোড়া ভাল চউদানি দুই ছড়া জড়য়া পঁইচা দুই খান ছোটো ডায়মনকাটা বাজু নবরত্ন চাঁপ কলি ভাল চউদানি এয়ারিন। আর ২ বাকি যত গহনা সকল সামি দেন। দড়ি হার ভাল ১০ ভরির গোঁপহার স্বামি দেন দম দম গকরি ডায়মনকাটা চুড়ি।

সমাপ্ত

তমসায়

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

সেদিন কী হ'লো, চোখে ঘুম আর এলো না কখনো
নিশুত রাত্রেও ; কোন নিশাচর বিহঙ্গের পাখার ঝাপটে
অন্ধকার কেঁপে গেল ; কুকুরের করুণ কান্নায়
রাত্রির নিস্তব্ধ সভা ভেঙে গেলে, কান্নাতুর পাখি
শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে ফিরে এল বটের কোটরে
ব্যর্থ পরিক্রমা শেষে ; ঝিঁঝি-ডাকা ঝাউয়ের শিয়রে
ছেঁড়া মেঘ ভেসে এল : মনে পড়ে গেল অনুরাধা
তোমার আবছা মুখ ; এলোমেলো চুলের সৌরভ
ধূসর রাত্রির রাজ্যে ভেসে এলো দমকা হাওয়ায়
স্মৃতির অরণ্য চিরে। মনে হলো তোমাকে আবার
হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় যেন,—এ-ই এত বছরের
ব্যবধান মুছে মুছে তোমার পায়ের দাগে দাগে
হৃদয়ে নিবিড় হলে! নক্ষত্রের ঘড়িতে এখন
দ্বিতীয় প্রহর বাজে ; হেমন্তের নতুন কুয়াশা
মাকড়সা জাল বোনে, মধ্য রাতে এ-জীবন শোনে
গির্জার ঘণ্টার ধ্বনি। কৈশোরের সাঁকো পার হ'য়ে
শেষ ট্রেণ চলে গেল ধ্বক্-ধ্বক্ হাঁপানো এঞ্জিনে—
আর সেই মনে-হওয়া বাতাসে ছড়ালো অনুরাধা।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

১৮

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে শিবপুরের ডাকাতি, চন্দননগরে মেয়রের গৃহে বোমা নিক্ষেপ এবং তাহার পরে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টায় পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ ভাবে সক্রিয় হইয়া উঠে। ১৯০৭ সালের প্রথম হইতেই পুলিশ এই ধরণের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের গুপ্ত প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আঁচ পাইয়াছিল। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ হইতে বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র ৩২ নং মুরারিপুকুর রোডের বাগান-বাড়' ও তাহাদের অন্যান্য থাকিবার স্থান—১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড, ৩২ নং স্কটস্ লেন, ৩৮।৪ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে পুলিশ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টায় ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার ও প্রফুল্ল চাকী আত্মঘাতী হওয়ার পরদিনই ১৯০৮ সালের ২রা মে বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবিগণের আশ্রম ও কর্ম্মকেন্দ্র মুরারিপুকুর রোডের বাগান-বাড়ী সশস্ত্র পুলিশ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও তল্লাসী হয়। পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া তিনটি রাইফেল, দুইটি বন্দুক, নয়টি রিভলবার, অনেক বোমা, পিকরিক অ্যাসিড ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ, টিন, তামা, জিঙ্কের পাত, হাপর এবং খোল প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি সমেত একটি ছোটখাট কারখানা আবিষ্কার করে। মুরারিপুকুরের বাগান ছাড়া যুগপৎ আরও কয়েক স্থানে খানাতল্লাস চলে। মুরারিপুকুর বাগান-বাড়ীতে নিম্নলিখিত ১৪ জন ধরা পড়েন :—

(১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—কলিকাতা। (২) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চন্দননগর। (৩) উল্লাসকর দত্ত—ব্রাহ্মণবেড়িয়া। (৪) ইন্দুভূষণ রায়—যশোহর। (৫) বিভূতিভূষণ সরকার—শান্তিপুর। (৬) নলিনীকান্ত গুপ্ত—রংপুর। (৭) শচীন্দ্রকুমার সেন—সোনারং। (৮) বিজয়কুমার নাগ—খুলনা। (৯) কুঞ্জলাল সাহা—কুষ্টিয়া। (১০) শিশিরকুমার ঘোষ—যশোহর। (১১) পরেশচন্দ্র মৌলিক—যশোহর। (১২) পূর্ণচন্দ্র সেন—ঘাঁটাল। (১৩) নরেন্দ্রনাথ বক্সী—রাজসাহী। (১৪) হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ—যশোহর।

১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাটী হইতে চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও শান্তিপুরের নিরাপদ রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও অরবিন্দ ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সেই সময় অরবিন্দ উক্ত বাড়ীতে বাস করিতেন। গ্রেপ্তারের সময় বৃটিশ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ক্রেগান অরবিন্দকে মাটিতে মাদুরের উপর শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বলেন, 'এক জন আই, সি, এস, পরীক্ষোত্তীর্ণ বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তি এইরূপে থাকিতে লজ্জা করে না?' এক পুলিশ সার্জ্জেণ্ট অরবিন্দের ভগিনী শ্রীমতী সরোজিনীর বুকের নিকট রিভলবার ধরিয়াছিল। অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া হাতকড়া দিয়া লইয়া যাইবার সময় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় পুলিশকে হাতকড়া খুলিয়া দিবার অনুরোধ করেন। পুলিশ অনুরোধ রক্ষা করে।

৩৮।৪ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট হইতে হেমচন্দ্র দাস, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ধরণীধর গুপ্ত, কালীগঞ্জের অশোকচন্দ্র নন্দী, বর্দ্ধমানের বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত ও নড়াইলের মতিলাল রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইহা ছাড়া ৩০।২ নং হ্যারিসন রোড, ১১ নং হ্যারিসন রোড, ২৩নং স্কটস্ লেন ও উল্লাসকরের পিতা দ্বিজদাস দত্তের শিবপুরের বাসাতেও পুলিশ হানা দেয়। প্রথম বাড়ীটি ছিল বিপ্লবীদের চিঠি-পত্র আসিবার গোপন ঠিকানা, এখানে সেই তারিখে কয়েকখানি চিঠি ধরা পড়ে।

বিপ্লবীদের নিকট হইতে যে সমস্ত চিঠি-পত্র ও কাগজ পাওয়া যায় তাহার দরুণ এবং পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে ক্রমশঃ ধরা পড়ে শ্রীরামপুরের হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, খুলনার সুধীরকুমার সরকার, যশোহরের বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মালদহের কৃষ্ণজীবন সান্যাল, শ্রীহট্টের তিন ভ্রাতা—হেমচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ও সুশীলচন্দ্র সেন এবং শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ৩রা মে দীনদয়াল বসু শ্যামবাজার ট্রাম-ডিপোতে গ্রেপ্তার হন। ৩রা মে মেদিনীপুরে গ্রেপ্তার হইলেন—জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র যোগজীবন ঘোষ, হারাধন মল্লিক জমিদারের বাটীর গৃহশিক্ষক শরৎচন্দ্র মিত্র।

বোমার মামলার তদন্তে যে সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া যায়, তাহার ফলে জুন মাসে পুলিশ দেবব্রত বসু, ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বালকৃষ্ণ হরি কানে, প্রভাসচন্দ্র দেব, চারুচন্দ্র রায় ও হরিদাস দত্তকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেয়।

ধৃত হইবার পর বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ, হৃষিকেশ, বিভূতি সরকার ও ইন্দুভূষণ রায় ৪ঠা মে আলিপুরের অস্থায়ী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লির নিকট স্বীকারোক্তি করেন। মিঃ বার্লি সেই বিবৃতি ফৌজদারী কার্য্যবিধির আইনের বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন। ইঁহারা স্বীকারোক্তির কারণ বর্ণনা করিয়া বলেন যে, নির্দ্দোষ লোক যেন অপরাধী বলিয়া লাঞ্ছিত না হয় এবং ভবিষ্যতে বিপ্লবপন্থীরা যেন সাবধান হইয়া কাজ করেন। তাঁহাদের অপর উদ্দেশ্য ছিল—এই প্রকার উক্তির দ্বারা দেশের মুক্তিকামী ছাত্র ও যুবকগণকে বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করা।

এই স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সেসন জজ মিঃ বীচক্রফট তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে, "They say it was to save the innocents, and if that were really their object, they deserve full credit for it.…Barin at any rate had little hope of escape, confession or no confession. Certainly in his case the confession was not prompted by any feeling of remorse, he glorified in what he had done. And neither of them had disclosed the full extent of the conspiracy or the names of other associates, except those

"আমার ত্বক্ সৌন্দর্য্যের জন্য
আমি লাক্স্ টয়লেট্ সাবানের ওপোর
নির্ভর করি"
অনুভা গুপ্তা বলেন
LUX
LUX TOILET SOAP
এই মনোরম সুগন্ধিযুক্ত শুভ্র
ও বিশুদ্ধ সাবানটিকে আপনার
ত্বককেও মনোরম ক'রে রাখতে দিন!
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
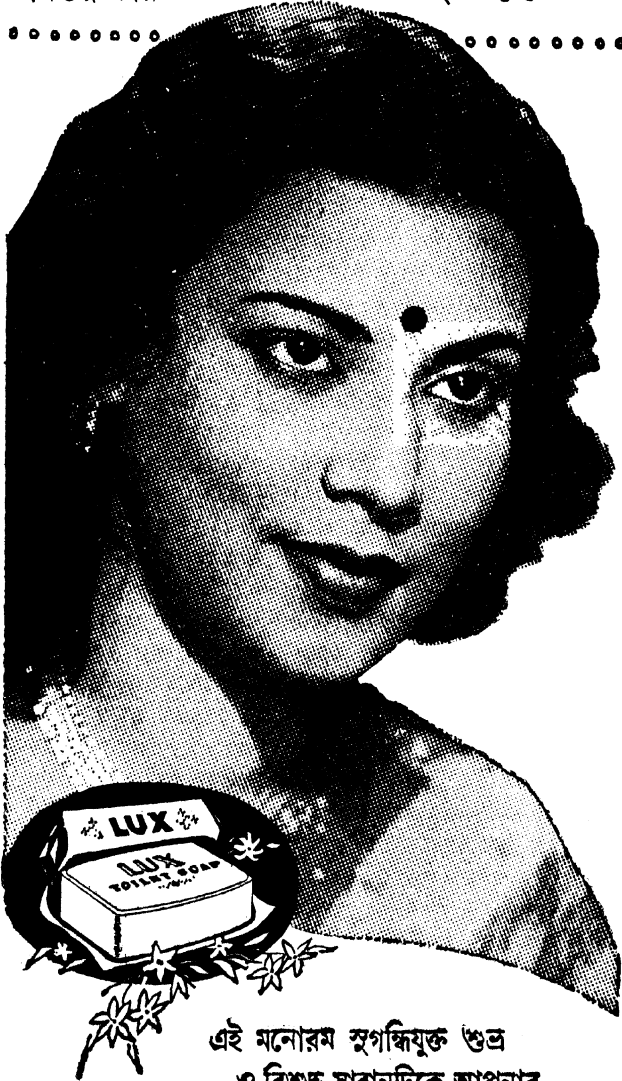
arrested with them. Not this concealment indicates depravity, rather the contrary."

বিচারকের এই সুস্পষ্ট অভিমত হইতেই এই স্বীকারোক্তির কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। বারীন্দ্র প্রভৃতির স্বীকারোক্তির ফলেই অরবিন্দ, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মুক্তিলাভ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা জানিয়া-শুনিয়াই ইঁহাদের সম্পর্ক গোপন রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অবর্তমানে যাঁহারা দল পরিচালনা করিবেন তাঁহাদেরও সম্পর্কে সকল সংবাদ ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া গিয়াছেন। তথাপি এই স্বীকারোক্তিগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে; কারণ, ইঁহাদের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ ছিল এমন বহু অজানা ঘটনাবলীর সন্ধান মিলে এই স্বীকারোক্তিগুলিতে।

স্বীকারোক্তি করার পূর্ব্বে প্রথম তদন্তকারী ইনস্পেকটার রামসদয় মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্র দাসের প্রদত্ত একটা মিথ্যা বিবৃতি দেখাইয়া বিবৃতি বাহির করে। উপেন্দ্রনাথ এই বিবৃতি সম্পর্কে বলেন যে, "ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাদিগকে দিদিশাশুড়ীর মত আদর-যত্ন করিয়া তুলিলেন। এক দিন একখণ্ড হাতে-লেখা কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া মহা উৎসাহে বলিলেন—'এই দেখ বাবা, হেমচন্দ্রের statement.' তিনি আমাদের যাহা শুনাইলেন তাহা একেবারেই তাঁহার মনগড়া। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে, সমস্ত ব্যাপারটা যে আমাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি বাহির করিবার জন্য অভিনয় মাত্র তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমরা দুই-একটা ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া সে রাত্রির জন্য নিষ্কৃতি পাইলাম।"

বারীন্দ্রকুমার তাঁহার স্বীকারোক্তিতে বলেন, "...এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি ঢাকা সহরে আমার অগ্রজ মনোমোহন ঘোষের নিকট গমন করি এবং সেই সময়েই ফার্স্ট আর্টস্ পড়িতে কলেজে প্রবেশ করি। তাহার পর লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া আমি বরোদা রাজ্যে আমার ভ্রাতা গাইকোয়াড় কলেজের অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষের নিকট গমন করি। সেখানে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠে মনোনিবেশ করি। তাহার পর রাষ্ট্রীয় প্রচারের জন্য আমি বাংলা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি। আমি জেলার পর জেলা ঘুরিয়া প্রচার চালাই এবং দিকে-দিকে ব্যায়ামশালা স্থাপন করি। সেখানে যুবকের দলকে আনিয়া রাষ্ট্রনীতি ও শরীরচর্চা শিক্ষা দেওয়া হইত। এই ভাবে দুই বৎসর কাল আমি প্রচারকার্য্য চালাই এবং এইরূপে বাংলার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি। ক্লান্ত ও পরাজিত মনে আমি বরোদায় প্রত্যাগমন করিয়া আরও নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা করিতে থাকি। এক বৎসর এরূপ ভাবে কাটাইয়া আমি নব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলা দেশে ফিরিয়া আসি। আমি হৃদয়ঙ্গম করি যে, শুধু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইলে সফল হওয়া যাইবে না, ইহাতে যে বিপদ আছে তাহার সম্মুখীন হইতে হইলে জাতিকে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিতে হইবে ও অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইলে আত্মিক বলে বলীয়ানও হইতে হইবে। সেজন্য ধর্ম্মশিক্ষা-কেন্দ্রের বিশেষ প্রয়োজন। ঠিক এই সময়ে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন প্রবল ভাবে বাংলা দেশে আত্মপ্রকাশ করে। আমি জনগণকে আমার পন্থায় শিক্ষিত করিবার আশায় লোক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম এবং যে সমস্ত লোক বর্ত্তমানে আমার সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহাদের এই জন্যই সংগ্রহ করি। আমার বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বর্ত্তমানে আমার সহিত ধৃত) এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (বর্ত্তমানে কারাগারে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী) সহযোগিতায় 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করি। দেড় বৎসর কাল ঐ পত্রিকা চালাইবার পর বর্ত্তমান পরিচালকগণের উপর উহা চালাইবার ভার অর্পণ করিয়া আমি 'যুগান্তর' ছাড়িয়া বিপ্লবী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই।

"১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিক হইতে ধরা পড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি চৌদ্দ-পনেরটি তরুণকে সংগ্রহ করিয়া দলভুক্ত করি এবং ইহাদের রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করি। সুদূর এক ভবিষ্যতে বিপ্লব ঘটাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা ধীরে-ধীরে স্বল্প কিছু অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকি। এ ভাবে এ পর্য্যন্ত আমরা এগারটি রিভলবার, চারটি রাইফেল ও একটি বন্দুক যোগাড় করিতে পারিয়াছি।

"যে সমস্ত যুবক আমার দলভুক্ত হইয়া বিপ্লবী-চক্রে যোগদান করেন, উল্লাসকর দত্ত তাঁহাদের অন্যতম। ঠিক কোন তারিখে তাঁহার প্রথম আগমন, তাহা স্মরণ না থাকিলেও এই বৎসরের (অর্থাৎ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের) প্রথম দিকেই তিনি আসেন। তিনি (উল্লাসকর) বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিস্ফোরক প্রস্তুত-প্রণালী আয়ত্ত করিয়াছেন এবং সেই বিদ্যা কার্য্যক্ষেত্রে লাগাইবার বাসনায় তিনি আমাদের দলে যোগদানে ইচ্ছুক। তাঁহার পিতার অজ্ঞাতসারে গোপনে নিজ আবাসে তিনি একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া বিস্ফোরক প্রস্তুত বিষয়ে চেষ্টায় রত থাকিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমি সেই পরীক্ষাগার নিজে দেখি নাই, তিনি এই সকল বিষয় আমাকে বলিয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমরা মুরারিপুকুরের বাগানে কারখানা স্থাপন করিয়া কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য ও বোমা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

ইত্যবসরে হেমচন্দ্র দাস তাঁহার পৈত্রিক বিষয়ের অংশবিশেষ বিক্রয় করিয়া—ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে যান্ত্রিক বিদ্যা—সম্ভব হইলে বিস্ফোরক প্রস্তুত-প্রণালী—শিক্ষা করিতে গমন করেন। হেমের নিবাস মেদিনীপুর জেলার কাঁশরইতে।

প্রঃ—তিনি কবে ফ্রান্সে গিয়াছিলেন?

উঃ—১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে।

প্রঃ—কবে তিনি ফিরিয়া আসেন?

উঃ—মাত্র তিন-চারি মাস পূর্ব্বে। তিনি ফিরিয়া আসিয়াই উল্লাসকরের সহিত বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক প্রস্তুত ব্যাপারে যোগদান করেন।

প্রঃ—তিনি কোথায় এই সমস্ত প্রস্তুত করিতেন?

উঃ—৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে এবং বাগবাজার অঞ্চলে গোপীমোহন দত্ত লেনে তিনি এই কার্য্যের জন্য যে বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে। পাঁচ-ছয় মাস পূর্ব্বে, যখন সংবাদ-পত্র দলন উদ্দেশ্যে বহু মামলা দায়ের হইয়া দণ্ডপ্রদান চলিতে থাকে, সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে আমরা এই সমস্ত বিস্ফোরক ব্যবহার করিবার কথা সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করি। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা যেখানেই কিছু চাহিতে যাইতাম, সেখানেই 'আমাদিগকে ইহা ব্যবহার করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইত। উহা জাতির অন্তরের বাণী

মনে করিয়া, আমরা উহাকে গ্রহণ করি এবং এ সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহিত হই। আমাদের প্রথম অভিযান হয় ফরাসী-চন্দননগরে, তখন ওই পথ দিয়া ছোটলাট 'বাহাদুর রাঁচি যাইতেছিলেন। উল্লাসকর দত্ত একটি ছোট ডিনামাইট মাইন এবং কতকগুলি ফিউজ ও ডিটোনেটার লইয়া চন্দননগরে গমন করেন ও লাটসাহেবের 'স্পেশ্যাল ট্রেণ' আসিবার পূর্ব্বে, উহা রেল-লাইনে পাতিবার মনস্থ করিয়া যখন স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন, ঠিক সেই সময় কয়েক জন লোক সেই স্থানে আসিয়া পড়ে। তিনি সরিয়া আসিয়া উহা দূরে অন্য স্থানে স্থাপন করিবার জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিতে ব্যস্ত, তখন সহসা ট্রেণটি আসিয়া পড়াতে তাড়াতাড়ি 'মাইন' স্থাপন সম্ভব হয় না। উল্লাসকর সে জন্য কয়েকটি কার্ত্তুজ রেল-লাইনে রাখিয়াই সরিয়া পড়েন। উহাতে সামান্য একটু বিস্ফোরণ হয়, কিন্তু ট্রেণের কোনই ক্ষতি হয় না।

প্রঃ—তুমি উহা কিরূপে জানিলে? তোমার এই বিবৃতি দিবার অধিকারই বা কি?

উঃ—আমিই তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমার, উল্লাস ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়াই সকল কার্য্যক্রম স্থির করা হইত। আমি উল্লাসের মুখে এই বিবরণ শুনিয়াছি। ইহার পর ছোটলাট যখন কটক হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন আমি আরও দুই জনকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় এইরূপ কাজের জন্য চন্দননগরে গমন করি;·············।

প্রঃ—বিস্ফোরণের জন্য তোমাদের সঙ্গে কি লইয়া গিয়াছিলে?

উঃ—একটি মাইন ও ফিউজ। আমরা অপেক্ষা করিতে থাকি কিন্তু লাটসাহেব ওই পথে আসেন নাই।

প্রঃ—তোমরা কি মাইন স্থাপন করিয়াছিলে? কোথায়?

উঃ—হাঁ, চন্দননগর ও মানকুণ্ডুর মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে। ট্রেণ আসিতে না দেখিয়া আমরা উহা তুলিয়া লই এবং চন্দননগরে আসিয়া খোঁজ লইয়া অবগত হই যে, লাটসাহেব এই পথে আসিতেছেন না। তৃতীয় বার এইরূপ কার্য্যের জন্য আমরা খড়গপুর যাই, চন্দননগরের দ্বিতীয় বারের যাত্রার সঙ্গী তিন জনই গমন করিয়াছিলাম।··· ইহার পর চন্দননগরে বোমা ফেলা হয়। হেমচন্দ্র দাস সেই বোমা প্রস্তুত করিয়াছিলেন·············। তাহার পর আর একটি ঘটনাই মাত্র উল্লেখযোগ্য; তাহা মজঃফরপুরের ঘটনা। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি দমনে কিংসফোর্ড সাহেব যে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন, তাহার শাস্তি দিবার জন্য প্রফুল্ল চাকী চঞ্চল হইয়া উঠে এবং মজঃফরপুরে গমন করিয়া বোমার আঘাতে কিংসফোর্ডের জীবনান্ত চাহে।·········আমি দু'জনকে দুইটি রিভলবার দিয়াছিলাম; কারণ ধরা পড়িবার উপক্রম হইলে, তাহারা ধরা না দিয়া আত্মহত্যা করিবার মনস্থ করিয়াছিল। ক্ষুদিরাম আমাদের দলের লোক ছিল না এবং সে মাণিকতলা বাগান কিংবা গোপীমোহন দত্ত লেনের ব্যাপার জানিত না। সে হেমচন্দ্রের নিকট থাকিত। আমি প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া মুরারিপুকুর হইতে গোপীমোহন দত্ত লেনে যাই এবং সেখানে প্রফুল্ল একটি ক্যানভাস-নির্ম্মিত ব্যাগে বোমা ও রিভলবার ভরিয়া লয়।

প্রঃ—কোথা হইতে তুমি রিভলবার পাইলে?

উঃ—তাহা প্রকাশ করিতে আমি সম্মত নহি। আমি প্রফুল্লকে হেমের বাড়ীতে লইয়া যাই এবং সেখান হইতে সে ক্ষুদিরামকে সঙ্গে লইয়া যায়।······'

প্রঃ—এই বৃহৎ আশ্রম-কেন্দ্র চলিত কেমন করিয়া?

উঃ—আমি নানা স্থান হইতে ইহাদের ভরণপোষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতাম।

প্রঃ—তোমরা কি অন্য কাহাকেও হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলে?

উঃ—আমরা ভাইসরয় ও কম্যাণ্ডার-ইন-চীফকে ধ্বংস করিবার বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সম্পর্কে কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হয় নাই। আমরা বিশ্বাস করি না যে, রাষ্ট্রনৈতিক হত্যার ফলে দেশ স্বাধীন হইবে।

প্রঃ—তবে এরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইলে কেন?

উঃ—জনসাধারণ উহা চাহে বলিয়া বিশ্বাস করি। এই সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিবার কারণ কি তাহাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া লউন। আমাদের দলের মধ্যে এই বিবৃতি দেওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, আমরা যেন অভিযোগ অস্বীকার করি, তাহাতে যে ফল হোক না কেন তাহা গ্রহণ করি। কিন্তু আমি ইনস্পেক্টার রামসদয় মুখার্জ্জীর কাছে মৌখিক ও লিখিত বিবরণ দিতে সম্মত করাইয়াছি। আমি মনে করি যে, নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্ষা করিবার জন্য উহা করণীয়; বিশেষতঃ যখন আমরা সকলে ধরা পড়িয়াছি এবং দেশে এখনও সন্ত্রাসমূলক কাজ চলিবার সম্ভাবনাও প্রচুর।"

দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক কয়েদী উল্লাসকর দত্ত ঐ একই দিনে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এল, বার্লির নিকট ইংরেজি ভাষায় এক বিবৃতি প্রদান করেন।

"আমার নাম উল্লাসকর দত্ত। আমার পিতার নাম দ্বিজদাস দত্ত। আমি জাতিতে বৈদ্য ও গো-পালন আমার পেশা। আমার নিবাস ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া থানার অন্তর্গত মৌজা কালীকচ্ছে। হাল সাকিম গ্রাম শিবপুর, হাওড়া।

প্রঃ—তুমি কি সূত্রে এই দলভুক্ত হইলে?

উঃ—'যুগান্তর' পত্রিকায় ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, একটি সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতি গঠনের আয়োজন হইতেছে। আমার এরূপ সমিতিভুক্ত হইবার মানসিক প্রবণতা থাকাতে আমি বারীন্দ্রের সন্ধান করিয়া দলভুক্ত হই।

প্রঃ—দলভুক্ত হইবার পূর্ব্বে তুমি কি করিতে?

উঃ—পূর্ব্ব হইতেই আমি বিস্ফোরক দ্রব্য নির্ম্মাণে রত ছিলাম। ···চন্দননগরে যে বোমা বিদারণ নিরর্থক হয়, আমি সেই ব্যাপারে উপস্থিত ছিলাম···ইহার পর খড়্গপুরের ঘটনা হয়। আমি সেখানে যাই নাই, বারীন, বিভূতি ও প্রফুল্ল চাকী গিয়াছিল। তাহারা অবশ্য একটি মাইন লইয়া যায়।

প্রঃ—উহা কে প্রস্তুত করিয়াছিল?

উঃ—আমি করিয়াছিলাম।

প্রঃ—কোথায়?

উঃ—গোয়াবাগান অঞ্চলে একটি গৃহে, গলির নাম আমার ঠিক স্মরণ নাই। এই বাড়ীটি আমরা ভাড়া লইয়াছিলাম, খুব সম্ভব বারীন বাবুই ভাড়া লইয়াছিলেন।

প্রঃ—মাইনটি কিরূপ ছিল ?

উঃ—উহা ঢালাই-করা লৌহনির্ম্মিত আধারে ডিনামাইটপূর্ণ মাইন ছিল, উহার মধ্যে পাঁচ পাউণ্ড ডিনামাইট ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। ফিউজটি পিক্রিক অ্যাসিড ও ক্লোরেট অফ পটাশ দিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল।···আমি ইহা জানাইয়া দিতে চাহি যে, নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আমি এই স্বীকারোক্তি করিতেছি।"

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক বিবৃতিতে বলেন—"যতক্ষণ কলিকাতায় থাকি, আমি ছেলেদিগকে অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিই। আমি তাহাদিগকে আমাদের দেশের অবস্থা ও স্বাধীনতা লাভের আবশ্যকতা শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি।

প্রঃ—কি করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে, তাহা কি শিক্ষা দেও ?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—স্বাধীনতা লাভের কি উপায় শিক্ষা দাও ?

উঃ—শিক্ষা দিই যে, আমাদের যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। দেশময় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের মত প্রচার করিতে হইবে, অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ঠিক সময় উপস্থিত হইলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।··· আমি এই সব কথা এ জন্ম বলিতেছি যে, নির্দ্দোষ লোক যেন শাস্তি না পায়। আর এই জন্ম বলিলাম যে, যাহারা এই কাজ চালাইবে তাহারা যেন অধিকতর সতর্কতার সহিত কাজ করিতে পারে।"

এই সম্পর্কে 'বোমার মামলার অন্যতম আসামী ইন্দ্রনাথ নন্দী বলেন,—"পুলিশ দ্বারা ধৃত হইবার পর, সকলেই কম-বেশী confession-রূপ statement দিয়াছিল। আমিও দিয়াছিলাম; আত্মরক্ষার ভাব সকলের মনেই জাগিত, ইহাতেই confession প্রদত্ত হইত। কেবল হেমদা বলিত যে, এই সব বিষয়ে একেবারে চুপ থাকাই বৈপ্লবিকের কর্ত্তব্য। পুলিশের সঙ্গে চালাকী চলে না। হেমদা কোন statement দিত না। হেমদা প্যারিস হইতে যে নূতন বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিল তাহা নেতারা গ্রহণ করেন নাই। বারীনদাও আমল দেন নাই, নিজের মতই বারীনদা চালাইতেন।"

বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তির পূর্ব্বে নারায়ণগড়ে ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা সম্পর্কে পুলিশ কয়েক জন রেলওয়ে মজুরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ সৃষ্টি করিয়া মামলা আনিয়াছিল। মেদিনীপুরের দায়রা জজের বিচারে ৫ জন মজুরের প্রতি ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। স্বীকারোক্তির পর হতভাগ্য মজুরেরা মুক্তি লাভ করে।

মাণিকতলা বোমার মামলা সম্পর্কে দুই জন সরকারী কর্ম্মচারী বিপ্লবী সন্দেহে পদচ্যুত হন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন পাবনার ভেরেঙ্গা গ্রামের অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অপর জন রংপুরের ঈশান চক্রবর্ত্তী, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্‌কার। অবিনাশচন্দ্র অস্থায়ী মুনসেফ-রূপে চাকুরী করিবার সময়ই বৈপ্লবিক দলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ১৯০৪—১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন, কিন্তু ১৯১৪-১৫ খৃঃ বাংলার বৈপ্লবিক দলের সহিত তিনি 'অন্তরীণ' হন। পরে তিনি আর এক-জন বৈপ্লবিক নেতা প্রভাসচন্দ্র দের সহযোগে "মহাজন এণ্ড ট্রেডিং ব্যাঙ্ক" স্থাপন করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে এই ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়।

এই সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—"চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বাদ দিয়া বাংলার ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। যখন দেশের লোক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিতে ভয় পাইত, তখন এই ধনাঢ্য ও উচ্চবংশের এবং উচ্চ রাজকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। একবার তিনি আমায় বলিয়াছিলেন—'আপনারা জানেন, আমার কত টাকা আছে? আপনারা কাজ করুন, আমি টাকা দেব।' এই কথা তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল দেশমাতৃকার কর্ম্মে উৎসর্গীকৃত জীবন। বর্ষীয়ান কর্ম্মীদের নিকট শুনিয়াছি, তিনি অন্ততঃ ৭০,০০০ হইতে ৮০,০০০ হাজার টাকা বৈপ্লবিক কর্ম্মে দান করিয়াছেন। শেষে নিঃস্ব ও কপর্দ্দকশূন্য শোচনীয় জীবন যাপন করিয়া এই জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান করেন।"

১৮ই মে (১৯০৮) আলিপুরে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লির নিকট মাণিকতলা বোমার মামলার প্রাথমিক তদন্তের শুনানী আরম্ভ হয় এবং ১৯শে আগষ্ট তাহা সমাপ্ত হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর বার্লি সাহেব বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু, হরিদাস দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়া বেকসুর খালাস দেন ও চারুচন্দ্র রায় ফরাসী চন্দননগরের অধিবাসী এবং সে জন্য ফরাসী প্রজা, বৃটিশ আদালতে তাঁহার বিচার করিবার এক্তেয়ার নাই বলিয়া খালাস পান।

ম্যাজিষ্ট্রেট ৩৭ জন আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া তাঁহাদিগকে দায়রা আদালতে বিচারার্থ সোপর্দ্দ করিলেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (১২১) (ক) ধারা, নরহত্যা (৩০২) ধারা, রাজদ্রোহ (১২৪) (ক) ধারা, বিনা পাশে (লাইসেন্সে) অস্ত্রাদি রাখা ইত্যাদি ধারায় আসামিগণ অভিযুক্ত হন। আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বীচক্রফটের আদালতে দুই জন এসেসরের সাহায্যে তাঁহাদের বিচার হয়। ১৯০৮ সনের ১৯শে অক্টোবর হইতে ১৯০৯ সনের ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত মামলার শুনানী চলে।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন, আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি, আর আসামিগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। সাহায্যকারীদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিষ্টার পি, মিত্র, ব্যারিষ্টার রজত রায়, ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জ্জী, নরেন্দ্রকুমার বসু, বিজয়কৃষ্ণ বসু ও সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি।

অরবিন্দের মেসো মহাশয় 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ও তাঁহার পুত্র সুকুমার মিত্র এবং অরবিন্দের সহোদরা শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ অন্যান্য সহৃদয় দেশহিতৈষী ব্যক্তির সহায়তায় মামলা পরিচালনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। সমস্ত আসামীর পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব ইঁহারা গ্রহণ করেন।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

চিৎপুর রোডের উপর একটা মাঠকোঠা, এই মাঠকোঠার পিছনে দ্বিতল পাকা বাড়ী। মাঠকোঠার ডান পাশে একটি অপরিসর গলি। গলিটি মোড় ঘুরে দ্বিতল বাড়ীর দুয়ারে এসে পৌঁছিয়েছে।

প্রণব বাবুর নেতৃত্বে পুলিশের দল ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে দ্বিতল বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেখলে, শক্ত সেগুন কাঠের কপাটদ্বয় ভিতর হতে বন্ধ রয়েছে। নীচে এবং উপরে কয়েকটি জানালাও আছে, কিন্তু সেইগুলিও আষ্টে-পিষ্টে বন্ধ দেখা যায়। চারি দিকে বিরাজ করছে নিঃসাড় নিস্তব্ধতা। ভিতরে কোনও জনপ্রাণী আছে বলেও মনে হয় না।

প্রণব বাবু সিপাহীদের একটি দলকে বাড়ীটা ঘিরে ফেলতে ব'লে অপহৃতা কন্যার পিতা হরেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঠিক জানেন আপনি, আপনার মেয়েকে এই বাড়ীতেই তাকে রেখেছে? আমার তো মনে হচ্ছে, বাড়ীটা পোড়ো বাড়ী। ভিতরে লোক-জন আছে বলে তো বোধ হচ্ছে না।'

'হাঁ বাবু, হাঁ, ভালো করে খবর নিয়ে তবে থানায় গিয়েছি ব্যস্ত ভাবে', হরেন্দ্র বাবু উত্তর করলেন, 'আর একটুও দেরী করবেন না। এক্ষুনি দরজা ভেঙে ফেলুন, তা' না হলে কোথা দিয়ে সরে পড়বে টেরও পাবেন না। বেশী দেরী করলে বিপদও আছে, বাবু! জানাজানি হবার আগে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ুন। ওদের অসাধ্য কায নেই। দল পাকাবার জন্তে সময় ওদের না দেওয়াই ভালো।'

হরেন্দ্র বাবুর উপদেশ যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রণব বাবু কয়েক বার হাঁক দিলেন, 'কে আছো বাড়ীতে? আমরা পুলিশ-থানা থেকে এসেছি। শীগ্রি দরজা খুলে দিন বলছি।' কিন্তু তাঁর সকল প্রচেষ্টা ও হাঁক-ডাক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হলো, ভিতর হতে কোনও সাড়া বা শব্দ এলো না। অগত্যায় প্রণব বাবুও তাঁর সঙ্গের সিপাহীদের হুকুম দিলেন, 'তোড় দেও কেয়ারী।'

প্রণব বাবুর হুকুম পাওয়া মাত্র, দুই জন জমাদার একত্রে বারে বারে বুটের লাথি দরজার উপর বসিয়ে দিলে, কিন্তু ভিতর হতে কোনও প্রতিবাদ এলো না, দরজার লৌহসম কপাটদ্বয়ের কোনও ক্ষতিও হলো না। কিন্তু দরজা খোলার জন্তে অধিক দেরী করাও বাঞ্ছনীয় নয়। অগত্যা হুকুম পেয়ে জমাদার রাম সিং নিকটের দোকান হতে দুইটা মোটা-মোটা দড়ি সংগ্রহ করে নিয়ে এলো। এর পর জমাদারের উপদেশ মত একজন সিপাহী দেওয়ালের খড়া ব'য়ে একতলার বারাণ্ডার উপর উঠে দড়ি দুইটা বারাণ্ডার রেলিঙে সাবধানে বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিলে। এর পর প্রথমে প্রণব বাবু এবং তার পর সিপাহী ও জমাদাররা সাবধানে দড়ি দুইটা ধরে বারাণ্ডার উপর একে-একে উঠে পড়লো।

একতলার বারাণ্ডাটা বাড়ীর দুই পাশ ঘিরে একটা উন্মুক্ত ছাদে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে। এই উন্মুক্ত ছাদের এক পাশ হতে দ্বিতলের ঘরের সারি, কিন্তু ওদেরও সব কয়টি দরজা ভিতর হতে বন্ধ দেখা যায়। প্রণব বাবু একে-একে প্রতিটি ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন, কিন্তু কোনটির ভিতর হতে একটি মাত্র শব্দও ফিরে এলো না। তবে কি বাড়ীর ভিতরে কোনও জনপ্রাণী নেই, প্রণব বাবু স্থিরচিত্তে কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন; তা' হলে বাহিরের দরজায় তালা নেই কেন? সহসা শোনা গেল একটা কান্নার শব্দ। উহা সশান্ত্রী প্রণব বাবুকে সচকিত করে দিলে। নিম্নতলের কোনো একটা ঘর হতে নারীকণ্ঠে কান্নার স্বর আসছিল। প্রণব বাবু ব্যস্ত হয়ে হুকুম দিলেন, 'রাম সিং, একটো কেয়ারী তোড় দেও জলদী।' হুকুমা পাওয়া মাত্র রাম সিং পুনর্বার তার বুটের লাথি সজোরে একটি দুয়ারের উপর বসিয়ে দিলে, আওয়াজ হলো দড়-দড়াম।

সৌভাগ্যক্রমে দ্বিতলের এই দরজার কপাট অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছিল। বার দুই বুটের আঘাতে দরজার একখানি কপাট ভেঙে দুমড়ে পড়লো এবং এই দুমড়ে-পড়া কপাটের ফাঁকে দেখা গেল নিম্নতল পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রশস্ত একটি লোহার সিঁড়ি।

প্রণব বাবু আর একটু মাত্রও দেরী না করে হাতের টর্চটি জ্বেলে তার আলোয় সিঁড়িটি আলোকিত করে ডান হাতে তাঁর গুলী-ভরা পিস্তলটি উঁচিয়ে ধরে হুকুম করলেন, 'আও জলদী মেরি পিছুনে,' এর পর আর ক্ষণমাত্র দেরী না করে প্রণব বাবু তর-তর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে চলছিলেন, পিছন-পিছন নেমে আসছিল সিপাহী-শান্ত্রীর দল। সহসা জমাদার রাম সিং ও হরি সিং, সঙ্গে-সঙ্গে সিপাহীরাও এবং তাদের সঙ্গে প্রণব বাবুও চীৎকার করে উঠলেন, ওরে বাপ রে, মর গয়া বাপস্।

প্রণব বাবু এতক্ষণে প্রায় সিঁড়ির নীচের ধাপে এসে পৌঁছিয়ে-ছিলেন। তিনি 'পুড়ে মলুম' ব'লে এক লাফে নীচের চাতালে হুমড়ি খেড়ে পড়লেন। তাঁর থুতনী কেটে রক্ত পড়ছিল, কিন্তু সেই দিকে তাঁর খেয়াল নেই। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে তিনি দেখলেন তার বাম হাতের চেটো এবং বাম পায়ের গোড়ালী দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে সিপাহী ও জমাদাররাও রেলিঙের ওপর দিয়ে টপকে নীচের মেঝের উপর একে-একে গড়িয়ে পড়েছে, তাদের সকলেরই দেহ, হাত এবং পা'র অংশবিশেষ পুড়ে গিয়েছে। অতি কষ্টে কাৎরাতে-কাৎরাতে তারা দাঁড়িয়ে উঠে ভাবছিল, ব্যাপারটি কি? ব্যাপার বুঝতে প্রণব বাবুর একটুও দেরী হয়নি, তিনি টর্চের আলো ঘুরিয়ে দেখলেন, সিঁড়ির রেলিঙে একটি লৌহ-দণ্ড ইলেকটিকের একটি নগ্ন তার দ্বারা যুক্ত করা রয়েছে।

সিপাহীদের মধ্যে কারও-কারও দেহের আঘাত ছিল অসামান্ত। তখনও পর্য্যন্ত তাদের কেউ কেউ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে থেকে-থেকে কাৎরে কেঁদে উঠছিল, এদের সকলেরই আশু চিকিৎসার

প্রয়োজন, তা ছাড়া এই আহত সিপাহীদের নিয়ে আর কার্য্যে অগ্রসর হওয়াও সমীচীন নয়। এদিকে নারীকণ্ঠের ক্রন্দন-ধ্বনি নীচের তলা থেকে আরও করুণ আরও সুস্পষ্টরূপে শোনা যাচ্ছে। এইরূপ অবস্থায় ঐ স্থান পরিত্যাগ করে চলে আসাও সম্ভব নয়।

সহসা প্রণব বাবুর লক্ষ্য পড়লো সিঁড়ির নীচে একটা কাঠের ভাঙা চেয়ার পড়ে রয়েছে। নিমেষে আপন কর্ত্তব্য ঠিক করে নিয়ে তিনি ইলেকট্রিকের নগ্ন তারটি কাঠের চেয়ারের সাহায্যে অপসারিত করে দিলেন। এবং তার পর টর্চ্চের আলোকের সাহায্যে ঐ সিঁড়ির সন্নিকটে বাড়ীর সদর দরজাটাও খুঁজে বার করে নিলেন। প্রণব বাবু মনস্থ করেছিলেন, সদর দরজা খুলে বাইরেকার সুস্থকায় সিপাহীদের ভিতরে ডেকে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আহত সিপাহীদের ও জমাদারকে অভয় দিয়ে প্রণব বাবু পরিকল্পনানুযায়ী সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসছিলেন, তাঁর পিছনে-পিছনে আহত সিপাহীরাও এগিয়ে আসছিল। এমন সময় পিছন দিক হতে কয়েক জন আহত সিপাহী তারস্বরে আর্ত্তনাদ করে উঠলো, 'ওরে বাপ রে, মর গয়া ভাই!' চমকে উঠে প্রণব বাবু পিছন ফিরে দেখলেন, তিনটি বড়-বড় ভীষণদর্শী কুকুর পিছন দিক হতে তাদের আক্রমণ করেছে। চীৎকার করে প্রণব বাবু হুকুম করলেন, 'রাম সিং, ডাণ্ডা লাগাও।' রাম সিংএর ডান হাতখানা ইতিপূর্ব্বেই জ্বলে গিয়েছে, যে কোনওক্রমে বাম হাতে একটা কুকুরকে ধরে শুইয়ে দিয়ে বুট দিয়ে তার গলাটা চেপে ধরলো, কিন্তু ততক্ষণে তার দেহের চার-পাঁচ জায়গায় কুকুরটা কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলে। প্রণব বাবু কোনও ক্রমে সদর দরজার খিলটা খুলে দিয়ে এগিয়ে এসে একটা কুকুরকে লক্ষ্য করে গুলী করলেন, গুড়ুম। কুকুরটা কেঁউ-কেঁউ করতে-করতে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো, কিন্তু এই সুযোগে তৃতীয় কুকুরটি আরও জন তিন সিপাহীকে সাঙ্ঘাতিকরূপে জখম করে দিলে। প্রণব বাবু এইবার সতর্কতার সঙ্গে তৃতীয় কুকুরটিকে গুলী করে তাকেও শেষ করে দিলেন, কুকুরটি তার করণীয় কার্য্য শেষ করে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলো।

ভিতর হতে সহকর্ম্মীদের আর্ত্তনাদ সদর দরজার ওপারে অপেক্ষমান সিপাহী-শান্ত্রীদেরও কর্ণগোচর হয়েছিল। তারা ভাবছিল, দড়ি ধরে তারাও ওপরে উঠে পড়বে কি না। এদের একজন সাত-পাঁচ ভেবে বন্ধ সদর দরজার ওপর একটা লাথিও বসিয়ে দিলে। সদর দরজার হুড়কো ও খিল প্রণব বাবু ইতিপূর্ব্বেই খুলে দিতে পেরেছিলেন, বাহিরের অপেক্ষমান সিপাহীদের আকস্মিক লাথির ঘায়ে সেটা সহজেই খুলে গেল। প্রণব বাবু এইবার দুয়ারের পাশে দেওয়ালে সংলগ্ন ইলেক্ট্রিকের মেইন সুইচ বন্ধ করে দিয়ে হুকুম করলেন, 'সব কই জলদী ভিতরমে আও।' প্রণব বাবুর আদেশ মত বাহিরে অপেক্ষমান জমাদার যদু সিং তারস্বরে হুইসিল ফুঁকে সকলকে প্রণব বাবুর এই নূতন আদেশ জানিয়ে দিলে। বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে যে সকল সিপাই পাহারা দিচ্ছিল, তারাও একে-একে বাড়ীর ভিতর এসে উপস্থিত হলো, এবং এর পর তাদের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর দৌড়ে ঢুকে পড়লেন অপহৃতা কন্যার পিতা হরেন্দ্র বাবুও।

এত গোলমালের মধ্যে বাড়ীর অন্দর মহল হতে ভেসে-আসা নারীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি একটু মাত্রও থামেনি। নারীকণ্ঠের ক্রন্দনের সুর হরেন্দ্র বাবুর কানে যাওয়া মাত্র তিনি ব্যাকুল হয়ে অনুযোগ করলেন, 'ওরে বাবা, ও বাবা! ঐ যে আমারই মেয়ের গলা। রক্ষে করো বাবারা, আর দেরী করো না। হয়তো ওকে কেটে মেরে পালাবে ওরা। এক্ষুনি ভিতরে চলো বাবা।'

আহত সিপাহী-জমাদার কয় জনকে দুইখানা ঘোড়াগাড়ী করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে বাকি কয়জন সিপাহী জমাদার এবং অপহৃতা কন্যার পিতা হরেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে করে প্রণব বাবু বাড়ীর অন্দর-মহল তন্ন-তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করলেন। ইতিমধ্যে দুই জন সিপাহী হুকুম মত বড় রাস্তার দোকান ও নিকটের মাঠকোঠা সমূহ হতে আরও কয়েকটি লণ্ঠন যোগাড় করে এনেছিল; কারণ ইলেকট্রিকের মেইন সুইচ পুনরায় চালু করা কেহই সমীচীন মনে করেনি। বাহির হতে আরও বহু লোকজনও উপস্থিত রক্ষীদের সাহায্যার্থে ডেকে আনা হয়েছিল। লণ্ঠন এবং টর্চ্চের আলোর সাহায্যে কক্ষ হতে কক্ষ তল্লাস করা হলো, কিন্তু ক্রন্দনরতা কন্যার ক্রন্দনের সুর পুনঃ পুনঃ শোনা গেলেও কন্যাটিকে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া গেল না।

সহসা প্রণব বাবুর লক্ষ্য পড়লো বাড়ীর শেষ সীমানায় একটি ছাদ-খোলা গোল ঘরের প্রতি। ঘরটির বহির্গাত্রে একটি লোহার মই সংলগ্ন দেখা যায়; কিন্তু তার কোনও দিকেই কোনও দরজা নেই। প্রণব বাবু লৌহ-মইটির নিকটে এসে দাঁড়ানো মাত্র বুঝতে পারলেন অপহৃতা কন্যাটিকে এই বদ্ধ গুহার মধ্যেই আটকে রেখে দুর্ব্বৃত্তরা কোনও সুড়ঙ্গ-পথে পলায়ন করেছে। কিন্তু এদিকে প্রণব বাবুর বাম হাত এমনই যন্ত্রণা-কাতর হয়ে উঠেছে যে, তাঁর পক্ষে মইএর সাহায্যে ওপরে ওঠা আর সম্ভব ছিল না। এত কাণ্ডের পর কোনও হতভাগ্য গরীব সিপাহীকে এতটা বিপদের ঝুঁকি নিতে বলতেও প্রণব বাবুর মন চাইল না। প্রণব বাবু কিছুটা চিন্তা করে গোটা দুই সাবল জোগাড় করে উপস্থিত সিপাহীদের দেওয়ালের গায়ে বাইরে হতে একটা গর্ত্ত করে ফেলতে হুকুম দিলেন।

অপহৃতা কন্যার পিতা হরেন্দ্র বাবু এতক্ষণ পাগলের মত হয়ে গোল ঘরটির চারি দিকে ঘোরাঘুরি করছিলেন, তিনি সহসা ফিরে এসে সকলকে জানিয়ে দিলেন, 'পেয়েছি খুঁজে, ঘরের একটা দরজা।' সকলে দৌড়ে এসে দেখলো, বহির্দেয়ালের একটি স্থানে দরজার আকারে চৌকা একটা দাগ। সত্য-সত্যই ওটা গোলাস্তারা ধরানো চুণকাম-করা কাঠের একটা দরজা ছিল। সকলে মিলে ধাক্কাধাক্কি করা মাত্র দরজাটা একপাক ঘুরে খুলে গেল। হৈ-হৈ করে সকলে আলোক সহ ওর মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখলেন, একটি প্রশস্ত সুড়ঙ্গ ঐ ঘর হতে বাইরের দিকে চলে গিয়েছে, এবং সেই সুড়ঙ্গের মুখে একটি ১৮ বা ১৭ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী বিবাহিতা কন্যা ক্রন্দনরতা অবস্থায় বসে রয়েছে। মাথায় তার টকটকে লাল সিঁদুর, কিন্তু পরনে ছিন্ন-ভিন্ন একটি জামা ও আধ ময়লা একটা কাপড়। হরেন্দ্র বাবুকে দেখা মাত্র 'বাবা গো' বলে হতভাগ্য কন্যাটি ছুটে এসে হরেন্দ্র বাবুকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো।

কন্যাকে কথঞ্চিৎরূপে শান্ত করে হরেন্দ্র বাবু প্রণব বাবুকে

বললেন, 'শীঘ্র বেরিয়ে চলুন বাবু। রাত্রে আর একটি ক্ষণও এখানে অপেক্ষা করবেন না।' ইতিমধ্যে যা ঘটে গিয়েছে তার পর অবিশ্বাস্য কিছুই ছিল না। প্রণব বাবু তাড়াতাড়ি কন্যাটিকে নিয়ে দল-বল সহ বড় রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। কন্যাটিকে যথা শীঘ্র থানায় এনে তার একটি বিবৃতি গ্রহণ করাও প্রয়োজন। উপযুক্ত একটি বিবৃতি কন্যাটির নিকট প্রাপ্ত হলে তবে বিহারী বাবুকে নারী অপহরণের অপরাধে এই রাত্রেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। সাফল্যের উল্লাসে প্রণব বাবু তড়িৎ-দগ্ধ হওন এবং কুকুর-দংশনজনিত সকল যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও একটা মাত্র বন্ধ ঘোড়াগাড়ী ব্যতীত অপর কোনও যান-বাহন খুঁজে পাওয়া গেল না।

কন্যাটিকে বন্ধ ঘোড়াগাড়ীটিতে তুলে দিয়ে প্রণব বাবু হরেন্দ্র বাবুকে বললেন, 'আপনিও উঠে পড়ুন এই গাড়ীটাতে। আর তো কোনও গাড়ী পাওয়া গেল না, ট্রামও তো এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আমরা সকলে হেঁটেই থানায় ফিরবো আধুন।' হাঁ হাঁ করে দুই পা পিছিয়ে এসে হরেন্দ্র বাবু বললেন, 'আজ্ঞে, সে কি কথা? আপনি যে সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত! ও তো আপনার ছোট বোনের মতো, আমার মেয়ে আপনারও মেয়ে। তাছাড়া ওর সঙ্গে আপনি নিজেই থাকা ভালো। সিপাহীরা আস্তে-আস্তে হেঁটে আসুক, আমি উপরে গাড়োয়ানের পাশে উঠে বসছি।'

প্রণব বাবু কিছুটা হরেন্দ্র বাবুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে, কিছুটা নিজে আহত হওয়ার কারণে কন্যা সহ ঐ গাড়ীতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরোহণ করলেন। যন্ত্রণা-কাতর হাতখানি গাড়ীর একটি জানালার উপর রেখে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে, এইবার কি তিনি করবেন তা ভাবছিলেন। সহসা কন্যাটি এগিয়ে এসে তার মাথাটা প্রণব বাবুর বুকের ভিতর গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করে দিলে। বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই সে মাথাটা তুলে নিলে না। এদিকে অনুরোধ-উপরোধের মধ্যেই গাড়ীখানা মেছুয়া থানার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। প্রণব বাবু তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়ে কন্যার পিতা হরেন্দ্র বাবুকে খুঁজলেন, কিন্তু গাড়ীর উপরে বা নিচে কোথায়ও তিনি তাঁকে খুঁজে পেলেন না। তা' হলে কি হরেন্দ্র বাবু গাড়ীর উপর আদপেই ওঠেননি? না, ইতিপূর্ব্বেই তিনি নেমে থানার ভিতর ঢুকে পড়লেন? প্রণব বাবু কন্যাটিকে নামিয়ে তাকে নিয়ে থানার ভিতর ঢুকে দেখলেন, তাঁদের বড়ো সাহেব গম্ভীর ভাবে থানায় বসে রয়েছেন এবং কন্যাটির পিতা করযোড়ে দাঁড়িয়ে অভিযোগ জানাচ্ছে। তাদের পার্শ্বে হতভম্ব ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন থানার বড় বাবু নরেন বাবু। এখানে-ওখানে জুনিয়ার অফিসাররাও ঘোরাফেরা করছেন, কিন্তু সকলেরই মনে বিস্ময়ের ছাপ ও উৎকণ্ঠা।

অপহৃতা কন্যাটি থানায় ঢুকে সোজা বড় সাহেবের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বললে, 'হুজুর' অপমানের ওপর অপমান আর সইতে পারি না। বাবাকে জোর করে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে উনিও আমার উপর অত্যাচার করলেন। আমার যা হবার তা ওখানেও হয়েছে, এখানেও; কিন্তু বাবাকে এমনি করে উনি মেরে নামিয়ে দিলেন।'

বড় সাহেবকে থানায় দেখে প্রণব বাবু মনে করেছিলেন, এই মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে খবর দিয়ে এখানে আনানো হয়েছে। সহসা উদ্ধার করে আনা কন্যাটিকে তাঁকেই দেখিয়ে এইরূপ বিশ্রী সাংঘাতিক অভিযোগ দায়ের করতে শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বিষয়টি উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হলেন কিন্তু তা তিনি পারলেন না, তাঁর মনে হলো, ধীরে-ধীরে মাটি তাঁর পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে।

সকল কথা শুনে বড় সাহেব মিঃ ব্যানার্জ্জি রক্তচক্ষু করে প্রণব বাবুর দিকে একবার তাকিয়ে বড় বাবু নরেন বাবুকে বললেন, 'হিয়ার ইউ আর! মেয়ের বাবার যা অভিযোগ মেয়ের অভিযোগও তো তাই। আচ্ছা, ডাকো এখোন ঘোড়গাড়ীর গাড়োয়ানকে। আমি নিজে সব তদন্ত করবো। এ্যাঁ, ডিসগ্রেসফুল!' বড় সাহেবের নির্দ্দেশ মত গাড়োয়ানকে ডেকে আনা হলে সেও হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে তোতা পাখীর মতো আউড়ে গেল, আমরা গরীব লোক, হুজুর! আমাদের কেন জড়ান, হুজুর! উনি ওনাকে ধাপ্পোড় মেরে নামিয়ে দিয়ে হুকুম করলেন, চালাও ইধার-উধার ঘুমাকে, জলদী মাৎ করো জলদীকা জরুরত নেহি। তা' পুলিশের লোক আপনারা, আপনাদের হুকুম মতো কায তো কোরতেই হবে, হুজুর!'

এতক্ষণে প্রণব বাবু ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে পৌছিয়েছিলেন। তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'এ সব ষড়যন্ত্র, আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত সাজানো। আমিও প্রমাণ করবো সব; আমি খোকা নই! গোল ঘরের দরজা কেউ আমরা খুঁজে পেলাম না, উনি খুঁজে পেলেন, তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার যে, স্থানটি ওঁর সুপরিচিত।'

'থামো থামো হে ছোকরা,' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রণব বাবুর চক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করে বড় সাহেব বললেন—"এসো, এধারে এগিয়ে এসো, তোমার সাদা পাঞ্জাবীর বুকের উপর সিঁদুরের দাগ কেন? ওর কি কৈফিয়ৎ আছে, জানাবে আমাকে, এ্যাঁ?'

এতক্ষণে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি পড়লো প্রণব বাবুর পরনের ধবধবে সাদা পাঞ্জাবীর ওপর। তাঁহার বক্ষের ওপর স্থানে-স্থানে উদ্ধার-করা কন্যাটির মাথার সিঁদূরের দাগ তখনও পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে লেগে আছে। প্রণব বাবু নিজেও একবার মাথা নিচু করে তাঁর বুকের উপরটা দেখে নিয়ে পুনরায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ওই শয়তান মেয়েটার কারসাজী! কাঁদতে-কাঁদতে মাথাটা আমার বুকের ওপর ঘুঁসটে দিলে এমন ভাবে, যেন ও কতো ভয় পেয়ে গিয়েছে।'

'পৃথিবীতে অবশ্য অসম্ভব কিছুই নয়,'—মৃদু হেসে বড় সাহেব মিঃ ব্যানার্জ্জী উত্তর করলেন, 'কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরূপে আমাকেও তো কর্ত্তব্য করতে হবে, এতো বড়ো একটা অভিযোগ, তার উপর এতো সাক্ষ্য-সাবুদ। প্রণব বাবুকে সাময়িক ভাবে কর্ম্ম হতে বরখাস্ত আমাকে করতেই হবে, একটু আটঘাট বেঁধে তবে এই সব কাযে হাত দিতে হয়। যদি বিহারী বাবু এর ভেতর থাকেন তো আরও সাংঘাতিক, ঐ চত্বরের একচ্ছত্র মালিক তিনি, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ওখানকার কি কেউ তোমাদের হয়ে সাক্ষ্য দেবে?'

প্রকৃত বিষয়টি থানার বড় বাবু, নরেন বাবুর বুঝতে বাকী থাকেনি। মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ ভেবে তিনি মিঃ ব্যানার্জ্জিকে অনুযোগ করে বললেন, 'বুঝতে যখন কিছুটা পেরেছেন স্যার, তখোন সাময়িক বরখাস্তের হুকুম আর নাই বা দিলেন। তা' ছাড়া প্রণব বাবু নিজেও তো বিশেষরূপে আহত। আমাদের দশ জন সিপাহী হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে, আমাদের দিককার

মামলাও কম সাংঘাতিক নয়। আমার তো ইচ্ছে করছে স্যার, ওদের সব ভেঙে চুরে পুড়িয়ে দিয়ে আসি।'

একটু কিন্তু-কিন্তু করে বড় সাহেব মিঃ ব্যানার্জি উত্তর করলেন, 'কিন্তু ওদের উকিল বলছে ওরা তোমাদের ডাকাত মনে করেছিল। চোর-ডাকাতের ভয়ে রাত্রে সিঁড়ি ওরা ইলেকট্রিফাইড করে রেখেছিল, কুকুরও। আর কুকুর তো পশু। তা' ছাড়া তোমরাও তো তল্লাসী পরোয়ানা নাওনি। এখোন বাকি রইলো এক নারী-হরণের মামলা। ও মামলাও টিকবে বলে তো মনে হয় না। আচ্ছা, এখোন তা' হলে আসি আমি। হাঁ, মেয়েটাকে ওর বাপের জিম্মায় ছেড়ে দাও। আমি নিজেই সব কিছু তদন্ত করাবো। আচ্ছা, গুড্ নাইট।'

বড় সাহেব মিঃ ব্যানার্জি বিদায় নিয়ে চলে গেলে, নরেন বাবু ক্ষুণ্ণ মনে প্রণব বাবুকে বললেন,—'আমার কি মনে হচ্ছে জানো? উনি তোমাকে সাসপেণ্ড করলেন না, সাসপেণ্ড করলেন আমাকে। আজকের এই অপমান শুধু তোমার নয়, আমারও। কিন্তু ধৈর্য্যহারা হলে চলবে না আমাদের। এখোন আমাদের খুঁজে বার করতে হবে ঐ মেয়েটার নাম, গোত্র, ও প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু তাদেরও যে আজকের মতো ঘরে ফিরে যেতে বড় সাহেব অনুমতি দিয়ে বসলেন! আর তদন্তও তো এখোন উনি নিজেই করবেন। আচ্ছা! আমরাও দেখবো।'

প্রণব বাবু কিন্তু নরেন বাবুর কথার কোনও প্রত্যুত্তর করলেন না। তাঁর বারে বারে মনে হচ্ছিল, হে ধরণি, তুমি দ্বিধা হও! তাঁর আজকার লজ্জা ও অপমান কি কেউ দূর করে দিতে পারবে? সহসা তাঁর মনে হলো, হাঁ হাঁ, পারবে, একজন হয়তো পারবে। তাড়াতাড়ি প্রণব বাবু তাঁর নিজের অফিস-ঘরে এসে ভিতর হতে অর্গল বন্ধ করে দিলেন! এবং তার পর টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে বললেন, 'হ্যালো। বড়বাজার * * *! কে? খুকুরাণী? হাঁ আমি! দাদা।' ফোনের ওপার হতে ব্যস্তভাবে খুকুরাণী উত্তর দিলে, 'কে দাদা! আরে, আপনাকে আমি ইতিমধ্যে দু-দু'বার ফোন করেছি, আপনার লোকেরা বললে, জরুরী কাযে বার হয়ে গিয়েছেন। এতোক্ষণ কি ভাবনাই যে আমার হচ্ছিল। শুনুন, একটা বিশ্রী ষড়যন্ত্র হয়েছে আপনাকে জব্দ করবার জন্তে। খবরটা একটু দেরীতে পেয়েছি, তাই আগে-ভাগে জানাতে পারিনি। খু-উ-ব সাবধানে থাকবেন, ভীষণ বিপদ হতে পারে আপনার। এবার আপনার মান-ইজ্জত ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে টানাটানি হবে।'

'ও-কথা বলা এখোন অবান্তর, বোন!' প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'বিপদ যা হবার, তা হয়ে গিয়েছে। এখোন যা করবার তুমি করো। আর ভাবতে পারছি না। চাকরী হয়তো আমি ছেড়ে দেবো, কিন্তু ইজ্জতের সঙ্গে। এখোন কয়েকটা খবর আমাকে সংগ্রহ করে দিতে হবে।'

'ও:-তা' হলে যা শুনেছি তাই-ই; সব কাজ তা' হলে এর মধ্যেই হাসিল করেছে ওরা।' ফোনের ওপার থেকে খুকুরাণী উত্তর দিলে, 'কিছু ভয় নেই দাদা! কার সাধ্য আপনার মাথা নোয়ায় আমি এখানে থাকতে। শুনুন, শুনে যান আমার কথা কোনও উত্তর না করে।'

খুকুরাণীর সঙ্গে মিনিট দশেক কথোপকথন করে প্রণব বাবু উৎফুল্ল হয়ে টেলিফোনের হ্যাণ্ডেলটা নামিয়ে রাখলেন এবং তার পর দ্রুতগতিতে দরজা খুলে বড় বাবুর অফিস-কক্ষে এসে নরেন বাবুকে বললেন, 'আর ভয় নেই, স্যার, পেয়ে গিয়েছি সব। এখোন বড় সাহেব যতো ইচ্ছে এনকোয়ারী করুন আমার ব্যাপারে।'

নরেন বাবু তখনও পর্য্যন্ত নিবিষ্ট মনে ভাবছিলেন, এর পর কি করা যাবে। প্রণব বাবুকে আনন্দমুখর হয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি হে? এতো শীঘ্র, কিন্তু ব্যাপার কি?' প্রণব বাবু উৎফুল্ল হয়ে উত্তর করলেন, 'সংবাদ ভালো। ঐ শয়তান মেয়েটা কে জানেন? ও হরেন্দ্র বাবুর মেয়ে নয়, তাঁর রক্ষিতা, তা' ছাড়া সে তিন-পুরুষের বেশ্যাও বটে। আর ঐ হরেন্দ্র বাবু হচ্ছেন বেহারী বাবুর মামাতো ভাই, তা ছাড়া তিনি তার একজন কর্ম্মচারীও বটে। ওদের নাম-ধাম-ঠিকানা সব আমি পেয়ে গিয়েছি, স্যার!'

এই অভাবনীয় সংবাদে নরেন বাবু একেবারে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন, মনে-মনে তিনি এইরূপই একটি সংবাদ-সংগ্রহের কল্পনা করছিলেন, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত এই কল্পনার ভিত্তি ছিল মাত্র অনুমানের উপর। এইরূপ অভাবনীয় ভাবে তাঁর কল্পনা বাস্তবে পরিণত হতে পারে, তা' তাঁর কল্পনারও বহির্ভূত ছিল। তিনি ত্বরিত গতিতে এগিয়ে এসে প্রণব বাবুকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সত্যি! এ কথা সত্যি! বলো প্রণব, বলো! এ সংবাদ সত্যি! উঃ, ভগবান তুমি—! পুলিশেরও ভগবান আছে।'

[ক্রমশঃ ।

——আগামী সংখ্যায়——

লোকমাতা নিবেদিতা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

উপহারবর্ম্মার চরিত

রাজকুমার, অন্যদের মতন আমিও সেদিন আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। একলা চলতে চলতে একদা পৌঁছলুম এসে বিদেহে। মিথিলায় প্রবেশ করেই দৃষ্টিতে পড়ল ছোট্ট একটি মঠ। বিশ্রাম ক'রব ভেবে মঠিকায় উপস্থিত হয়েছি, বেরিয়ে এলেন একটি বৃদ্ধা তাপসী। পা ধোবার জল দিলেন। অলিন্দ-ভূমিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলুম। হঠাৎ দেখি, সেই বৃদ্ধা সতৃষ্ণনয়নে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন, আর কাঁদছেন। ধারাকারে চোখের জল। "মা, তোমার এ কান্না কেন?"—এই জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন—

"আয়ুষ্মন, নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ,—মিথিলায় 'প্রহারবর্ম্মা' নামে এক রাজা ছিলেন। মগধরাজ রাজহংস তাঁর বৃহৎ-বন্ধু। 'বল' ও 'শম্বরের' মত এঁদের মধ্যে দেখা যেত অপ্রতিম বন্ধুত্ব। তাঁদের দুই মহিষী 'বসুমতী' ও 'প্রিয়ংবদা'। উভয়ের মধ্যে ছিল গাঢ় বন্ধু-সখী ভাব।

দেবী বসুমতীকে দেখবার জন্যে প্রহারবর্ম্মার সঙ্গে একদা প্রিয়ংবদা পুষ্পপুর-নগরে এসে উপস্থিত হলেন—কারণ বসুমতী তখন প্রথম গর্ভাভিনন্দিতা। উপস্থিত হবার পরেই এল দুঃসময়। মালবরাজের সঙ্গে মগধরাজের বাধল যুদ্ধ। যুদ্ধের ফল সাংঘাতিক। মগধরাজ কোথায়—খুঁজেও পাওয়া গেল না। মিথিলারাজ প্রহারবর্ম্মা অনেক সন্ধান, অনেক চেষ্টা করেও বিফলকাম হয়ে নিজের রাজত্বে ফিরে এলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'সংহারবর্ম্মা'র পুত্রেরা অর্থাৎ 'বিকটবর্ম্মা'রা' তখন তাঁর মিথিলারাজ্য দখল করে বসেছে।—এই জেনে সুহ্মপতির কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশায় তিনি অবগাহন করলেন কান্তার-পথে।

কিন্তু নিয়তি এমন, প্রহারবর্ম্মা আক্রান্ত হলেন সেই কান্তার-পথে। একদল লুণ্ঠন দস্যুর কবলে পড়ে সর্ব্বস্বান্ত হলেন প্রহারবর্ম্মা। আমার কোলে ছিল তাঁর ছোট্ট ছেলে। সব চেয়ে ছোটটি। তাকে নিয়ে একাকিনী আমি বনের মধ্যে পালিয়ে গেলুম। পালাব না—? বনচরদের শর আমাদের চারদিকে তখন বনবন্ করে ছুটছে।

নিয়তিতে কি করায় দেখুন। বাঘ এল, বাঘের নখ। আমাকে থাবলাতে আসে। আমার হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল ছোট্ট রাজকুমার। পড়ল গিয়ে একটা মরা মহিষের উদরের বাঁকে। আমাকে ছেড়ে বাঘ দৌড়ল সেই শিশুটার কচি-কচি মাংসের লোভে।

কিন্তু আবার সেই নিয়তি। বাঘ মরল। ইষুসন-যন্ত্র পাতা ছিল। যেই বাঘটা ছেলেটার উপর পড়ল অমনি ছুটে এল মারণ বাণ। বাঘ তো মরল।

কিন্তু আবার নিয়তি? ভিলেদের ছেলেরা এসে বাঘ আর কচি শিশুটাকে নিয়ে চলে গেল। চুরি, একেবারে চুরি!! জ্ঞান ফিরে আসতে, আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, একটি রাখাল ছেলে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কাটা ঘায়ের কত সেবাই না করলে, তার কুটীরে এসে আমি সুস্থ হলুম। কিন্তু মনের ক্ষত কি এতই সহজে মেটে! ভাবছি—কেমন করে মহারাজ প্রহারবর্ম্মার কাছে গিয়ে পৌঁছব—কি উপায় করব—একেবারে আমি অসহায়। ভাবছি।

এমন সময় আবার দেখুন নিয়তির খেলা:—আমারি মেয়ে 'পুষ্করিকা' সেখানে এসে উপস্থিত হল, সঙ্গে সমর্থ বয়সের একটি যুবক। অবাক হয়ে গেলুম। পুষ্করিকা কাঁদতে লাগল। কী কান্না! কান্না ব'লে কান্না! যাক্, কাঁদার অন্ত হল। তার মুখে শুনলুম, তার কোলে মহারাজ প্রহারবর্ম্মার যে দ্বিতীয় পুত্রটি ছিল সেও কিরাত সর্দ্দারের হাতে পড়েছে। তখন পুষ্করিকা ধীরে ধীরে আমাকে বলে—কেমন করে একটি বনচর এল, তার ক্ষত আরোগ্য করে দিলে, কেমন করে সে সুস্থ হল, সেই বনচর ভিল তাকে বিবাহ করতে চাইলে, তারপর নিচু জাতকে বিবাহ করব না বলে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ক্রুদ্ধ ভিল তাকে অরণ্যের মাঝখানে একেবারে একটা বাঘ-চর জমিতে কেমন করে ফেলে যায়—পুষ্করিকা নিজের মাথা কৃপাণ দিয়ে কাটতে গেল,—সব। তারপরে শুনলুম, এই যুবকটি এসে তার আত্মঘাতে বাধা দিয়েছে। আমি তখন যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কে?" সে বলে, "আমি মিথিলানাথের সেবক। কোনো বিশেষ কারণে আমার বিলম্ব ঘটে যায়, তাই তিনি যে পথে গেছেন সেই পথ অনুসরণ করে এখন আমি চলেছি।"

সব বুঝলুম। সেই যুবক এবং কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে, আর দুটি হারা পুত্রের ইতিহাস পাথেয় করে, দেবী প্রিয়ংবদা এবং দেব প্রহারবর্ম্মার কাছে আসি। আমাদের কথা শুনে তাঁদের কান পুড়ে গেল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংহারবর্ম্মার পুত্র বিকটবর্ম্মার বিরুদ্ধে পুনর্বার হল প্রহারবর্ম্মার হিংস্র অভিযান।

কিন্তু নিয়তি এমন, প্রহারবর্ম্মা হেরে যান, বন্দী হন, দেবী বসুমতীও বন্দী হলেন। এই দুর্দশায় আমার মনে হল আমার সারা গায়ে কে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি বৃদ্ধা। কি করতে পারি—কিছুই না। স্থির করলুম প্রব্রজ্যা নেব। নিলুম।

কিন্তু আমার মেয়ে পুষ্করিকা এসে সহ্য করতে পারল না কষ্ট। সে আশ্রয় নিয়েছে, সেবাদাসী হয়েছে 'কল্পসুন্দরীর,'—যিনি বিকটবর্ম্মার মহাদেবী, তাঁর। আমি বুড়ী হয়ে গেছি, কেবল বসে বসে ভাবি আর কাঁদি,—"সেই দুটি রাজকুমার কি এতদিনেও পূর্ণাঙ্গ হয়নি? যদি তারা আসে—এই বুড়ীর কাছে সব খবর পাবে। তা হলে মহারাজ প্রহারবর্ম্মার সিংহাসন-চোর ঐ জ্ঞাতিশত্রুগুলো নিপাত যায়।" এই বলে বৃদ্ধা তাপসী কাঁদতে লাগল।

ব্যাপার বুঝতে আমার বিলম্ব হল না। চোখ ফেটে ইন্দ্রদেবের ধারা নামল। তাপসীকে বললুম—"মা, তাই যদি হয়ে থাকে, তবে আশ্বস্ত হোন। মনে রাখবেন—একদিন একটি মুনির কাছে কোন জননী বিপদে পড়ে তাঁর তনয়কে রেখে গিয়েছিলেন, ভিক্ষা চেয়েছিলেন সেই ছেলেটির লালন-পালন। মুনি সেই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখেন, বাড়ান। সে এক বিরাট কাহিনী। ভণিতা করে লাভ নেই। সেই ছেলেই এই আমি। আমি যদি সেই বিকটবর্ম্মাকে আমার দুটো হাতের মধ্যে পাই তা হলে মরণালিঙ্গন কেমন করে দিতে হয় তা দেখিয়ে দেব। কিন্তু শুনেছি বিকটবর্ম্মার অনেকগুলো ভাই রয়েছে। পৌরবৃদ্ধেরা সেখানে বাধা। আর মিথিলায় আমাকে কেউ চেনে না। আমার পিতা এবং মাতা, তাঁরাও চিনতে পারবেন কি না সন্দেহ,—যদি না তাঁদের কেউ চিনিয়ে দেয় আমাকে। নিশ্চয়! এ কাজ আমাকে করতেই হবে, উদ্ধার হতেই হবে, উদ্ধারের পথ বার করতেই হবে আমাকে।"

আমার কথা শুনে সেই বৃদ্ধার তখন কী ক্রন্দন, কী আনন্দ! আমাকে একবার কোলে বসায়, একবার মাথা শোঁকে। যেন ক্ষীরধারার মত মাতৃস্তন থেকে উপচিয়ে পড়ছে আনন্দ। গদগদ স্বরে আমাকে বললে, "চিরজীবি হও, তোমার কল্যাণ হোক্। এতদিন পরে আজ প্রসন্ন হয়েছেন বিধাতা। বিদেহের প্রজারা আজ থেকেই আবার মহারাজ প্রহারবর্ম্মার অধীনতায় এসে বাঁচল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহুর বিক্ষেপে তুমিই আজ পার হয়ে গেলে শোকের এই অপার সাগর। দেবী প্রিয়ংবদার কি ভাগ্য!" এই সব বলতে বলতে আনন্দের নির্ভরতায় আমার জন্যে, সব বিধিব্যবস্থা করে দিলে। স্নান হল, পরিপাটি ভোজন হল। শুয়ে পড়লুম সেই রাত্রে মঠিকার একপ্রান্তে, কটশয্যায় (তৃণশয্যায়)।

চিন্তা এল—"কোনো ছল, কোনো কৌশল বা কোনো কাপট্য অবলম্বন না করে, অর্থসিদ্ধি অসম্ভব। তবে—স্ত্রীলোকেরাই কপটতার জন্মক্ষেত্র। তা হলে এক কাজ করা যাক্। বৃদ্ধার কাছ থেকেই রাজপ্রাসাদের সর্ব্ব সংবাদ জেনে নিয়ে কাপট্যের জালপথ ধরেই অগ্রসর হওয়া বিধেয়।"

এই সব চিন্তার মধ্য দিয়ে কখন যে অবসান ঘটে গেছে ত্রিযামার, তা চোখেই পড়েনি। তাই হঠাৎ আলো দেখে চমকে উঠলুম।

মহার্ণবে উন্মগ্ন ছিল যে সব সূর্য্যাশ্ব তারা যেন লাফিয়ে উঠে পড়ছে আকাশে; তাদের তপ্ত নিঃশ্বাস সহ্য করতে না পেরে বেগে পালিয়ে যাচ্ছে তিন প্রহরা রাত্রি; আর সূর্য্য উঠছেন গগনে। কিন্তু কেমন যেন মন্দপ্রতাপ। সমুদ্রগর্ভে এতক্ষণ বাস করে বোধ হয় জড়ীভূত হয়ে গিয়েছিল তাঁর অঙ্গ।

উঠে পড়লুম শয্যা ছেড়ে।

প্রাভাতিক বিধি সমাপন করে ধাত্রীমাতাকে বললুম "মা, বিকটবর্ম্মা একটা শঠ, প্রবঞ্চক, পামর। ওর অন্তঃপুরের খবর তুমি কি কিছু রাখ?"

বাক্যের তখনও অবসান হয়নি,—একটি অঙ্গনাকে দেখা গেল। তাকে দেখেই আনন্দে অশ্রুকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলে উঠল আমার ধাত্রী, "ঐ আমার মেয়ে এসেছে। ও পুষ্করিকে, দেখ এদিকে, কে এসেছে। আমাদের প্রভুর পুত্র। চণ্ডালের মত একেই আমি বনের মধ্যে হারিয়ে ফেলে চলে এসেছিলুম। এতদিনে সে ফিরে এসেছে।"

পুষ্করিকা অনেকক্ষণ কাঁদলে, তারপর শান্ত হল। পুষ্করিকা তখন তার মায়ের প্ররোচনায় শোনাতে লেগে গেল রাজার অন্তঃপুরের বৃত্তান্ত। শেষে বললে, "কুমার, কামরূপেশ্বর কলিন্দবর্ম্মার কন্যা,—কল্পসুন্দরী তাঁর নাম, তাঁর যেমন গুণ তেমনি অপ্সরা ভোলানো রূপ। তিনিই এখন তাঁর স্বামী বিকটবর্ম্মাকে অভিভূত করে রেখেছেন। অবরোধে অনেক রূপসী রয়েছেন কিন্তু কল্পসুন্দরীকে না হলে বিকটবর্ম্মার চলে না।"

আমি বললুম "দেখ, পুষ্করিকা, আমার কথামত তোমাকে চলতে হবে। আমার দান, গন্ধমাল্য উপচার নিয়ে তাঁর কাছে তোমাকে নিত্য যাতায়াত করতে হবে। বিকটবর্ম্মার তো ঐ চেহারা। অসমান দোষ দেখিয়ে, নিন্দা করে, কল্পসুন্দরীর মনের মধ্যে জন্মিয়ে দিতেই হবে তাঁর স্বামীর উপর দ্বেষ, অপ্রীতি। 'বাসবদত্তার মত মেয়েরা মনের মতন যোগ্য পতিই বেছে নিয়েছিলেন'—পুরাকালের সেই সব কাহিনী বর্ণনা করে তাঁর চিত্তটিকে ফিরিয়ে আনতে হবে—ক্রোধের পথে, অনুতাপের পথে। অবরোধের মধ্যে রাজা কোথায় কি দুষ্কৃতি করেছেন, কোথায় কোন্ গূঢ় বিলাস, ব্যভিচার, সেই সব ব্যবহারের সম্পূর্ণ সন্ধান নিয়ে কল্পসুন্দরীর কাছে প্রকাশ করে দিতে হবে তথ্য। বেড়ে যাবে তাঁর মান—নিষ্কারণ ক্রোধে।"

আরো বললুম, "দেখো ধাই-মা, ঐ এক কাজ ছাড়া তোমার আর এখন অন্য কোনো কাজ থাকবে না। সব সময়েই ঐ নৃপাঙ্গনাটিকে ঘিরে থাকতে হবে তোমায়, আর প্রত্যহ সেখানে যা যা ঘটবে আমাকে এসে জানাবে। দেখবে, আদেশ মত চললে মধুর ফলই ফলবে। অনপায়িনী ছায়ার মত কল্পসুন্দরীর সঙ্গে লেগে থেকো।" পুষ্করিকাকে সঙ্গে নিয়ে ধাত্রী-মা সেই মত কাজ করতে লেগে গেলেন।

কয়েক দিন পরেই ফিরে এল ধাত্রী-মা। বললে, "বাছা, কল্পসুন্দরীর শোচনীয় অবস্থা করে ছেড়েছি। তার দশা হয়েছে সেই

রকমের, যেমন হয় মাধবীলতার,—নিমপিচুমর্দকে জড়ালে। এখন কি করতে হবে বল।”

আমি তখন একখানি ফলকের উপর নিজের প্রতিকৃতি আঁকলুম। হাতে দিয়ে বললুম, “এই প্রতিকৃতিটি কল্পসুন্দরীর কাছে নিয়ে যাও। ছবিখানি ভাল করে সে দেখবেই, তারপর নিশ্চয়ই বলবে—‘সত্যি এই রকমের দেখতে, এমনধারা আকৃতির—সত্যিই কি কোনো পুরুষ আছে?’ তখন তাকে বোলো—‘যদি থাকে তা হলে কি হয়?’ উত্তর যেটি কানে শুনবে আমাকে এসে জানিও; খুব যত্ন করে শুনো।”

প্রতিকৃতি নিয়ে চলে গেল ধাত্রী-মা রাজকুলে। আমার হল চিন্তা-জ্বর, কণ্টক-শয্যা। যাক্, ফিরে এল ধাত্রী-মা—একান্তে বললে—

“কুমার, মত্ত-কাশিনী সুন্দরীকে তোমার চিত্রপটখানি দেখাই। দেখতে দেখতে তিনি বলতে লাগলেন—

‘শ্রী আছে শরীরে…এই চিত্রে আঁকা মানুষটির। সারা জগতে যেখানে পুষ্পধনুর আলোড়ন…সেখানে এতদিন এই সুন্দরটি লুকিয়ে ছিল কোথায়? ইনিই ত দেখছি পৃথিবীর পুষ্পায়ুধ। চিত্রটিও আবার বিচিত্র! এমন ছবি লিখতে পারে, এমন ত কাউকে এখানে দেখিনি। কে এঁকেছে, কে লিখেছে?’

আদর করে জোর করে বারম্বার আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমি মুচকি হেসে হেসে বলি—‘দেবি, ভালো প্রশ্নই করেছেন। ঠিকই বলেছেন;—বুঝি ভগবান মকরকেতুও এত সুন্দর নন। তবে পৃথিবীটা মস্ত বড়, ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। দৈবশক্তির কৃপায় কোথাও না কোথাও এমন রূপ থাকতেও তো পারে। অসম্ভব নয়। আচ্ছা মহাদেবি, একটি প্রশ্ন করি তোমাকে। এই রকমের রূপ নিয়ে, রূপের অনুরূপ শিল্পশীলবিদ্যাজ্ঞান-কৌশল নিয়ে, মহাকৌলিন্য নিয়ে, যদি কোনো প্রগল্ভযৌবন তোমার সামনে এসে হঠাৎ উপস্থিত হয়, তা হলে সে কি পাবে?’

কল্পসুন্দরী বললেন—

‘ওমা, তোমাকে আমি আর কত বলব! শরীর, হৃদয়, প্রাণ—এই সমস্ত। তবে ওগুলো অতি অল্প, দেবার মত নয়। পেলেও কিছু তাঁর পাওয়ার সুখ মিটবে না। তোমার এই কথাগুলো যদি আমাকে ঠকাবার জন্যে বলা হয়ে থাকে ত ভালো, আর যদি তা না হয় তা হলে, এঁকে এনে আমাকে দেখাও, ভিক্ষুক চক্ষু সার্থক হোক দ্রষ্টব্য দেখে; তোমার অনুগ্রহই সেখানে সম্বল।’

কল্পসুন্দরীর মনের ভাবটিতে আরো গভীর রেখাপাত করবার উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার বলি—‘আছে বটে একটি রাজার ছেলে। ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে তিনি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সেদিন বসন্তোৎসব হয়ে গেল—সখীদের নিয়ে এই ত সেদিন তুমি গিয়েছিলে নগরের উপবনে বিহার করতে। সেখানেই তিনি তোমাকে দেখেছেন—বিগ্রহিণী যেন রতিরাণী। দেখা মাত্রই শ্রীমদনের পাঁচটি বাণ লক্ষ্য ভেদ করে তাঁকে পেড়ে ফেলেছে—সেই তিনিই খুঁজে খুঁজে আমাকে বার করেছেন। যখন আমি দেখলুম যে তোমাদের দু'জনের রূপ অনুরূপ, অত দুর্লভ চেহারা, অসামান্য গুণ, তখনই আমি সাহস করে তাঁরি রচনা শেখর-মাল্য অনুলেপন নিয়ে তোমাকে উপাসনা করেছি। সেই সুযোগই তোমার প্রতি তাঁর প্রেম-সমাহিতির গভীরতা দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজেই নিজের প্রতিকৃতি এঁকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি তোমার এই আকাঙ্ক্ষার সুনিশ্চিত কোনো ভিত্তি থাকে তা হলে বলতে পারি, এই অতিমানুষটির সামনে কোনো বাধাই বাধা নয়। প্রাণ, শৌর্য্য, এবং বুদ্ধির প্রখরতায় সব কিছুই লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা তিনি রাখেন। আজই তোমার কাছে তাঁকে নিয়ে আসতে পারি। যদি চাও, সঙ্কেত দাও।’

কল্পসুন্দরী কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে নিয়ে শেষে বললেন—

‘দেখ, অত্যন্ত গোপনীয় হলেও তোমার কাছে আর গোপন রাখা যায় না। তাই বলছি শোন। রাজা প্রহারবর্ম্মার সঙ্গে আমার পিতৃদেবের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। আমার মা ‘মানবতী’র প্রিয়-বয়স্যা ছিলেন দেবী প্রিয়ংবদা। তখন তাঁদের কারও সন্তান হয়নি, কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটি শপথ করেছিলেন, পুত্রবতীর পুত্র এবং দুহিতৃমতীর দুহিতার বিয়ে দেবেন। এখন, আমিও জন্মালুম, আর প্রিয়ংবদা দেবীর পুত্রও জন্মাল। কিন্তু কোথায় যে তারা নষ্ট হয়ে গেল! তাই পিতার নিকটে বিকটবর্ম্মা যখন আমাকে প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি আমাকে তাঁরই হস্তে সম্প্রদান করে দিলেন। কিন্তু এই বিকটবর্ম্মা আমার স্বামী হলে কি হবে;—সে নিষ্ঠুর, পিতৃদ্রোহী, গুণ বলে কোনো কিছুরি ধার দিয়ে সে যায় না, এমন কি কামের উপচারেও তার বিচক্ষণতা নেই! একে নিয়ে কি করব বল? কলাবিদ্যা জানে না, কাব্যনাটকে তেমন মনই নেই, কেবল নিজের শৌর্য্যে নিজে মাতাল, মুখের ভাষায় ভূত ছাড়ে, মিথ্যা বই সত্য জানে না, আর যদি কদাচিৎ দান করবার সখ জাগল, সে দান হবেই হবে—অপাত্রে। এমন লোককে কি কেউ ভালবাসতে পারে? বিশেষ যখন এই রকমের বসন্তকাল আসে—তার এই রকমের স্বাদ, গন্ধ আর উন্মাদনা নিয়ে! এই সেদিন উদ্যানে নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমার অন্তরঙ্গিণী পুষ্করিকাকে তিনি কি অনাদর-অপমানটাই না করলেন! ঐ ‘রময়ন্তিকা’—যে নিজেই নিজেকে এখনো চিনতে শেখেনি,—বাচ্ছা, বলতে গেলে যাকে আমি মেয়ের মত করে মানুষ করেছি, তাকে আমার স্বামীটি আমারি সপত্নী বানিয়েছেন, দেমাকে তার পা পড়ে না, খাস-নর্ত্তকী হয়েছেন। ‘চম্পকলতা’ নিজে ফুল তুলে চিত্রকূটের গর্ভবেদীতে রতনশয্যাটি সাজিয়ে একটু বিশ্রাম করে উঠে কোথায় গেছে, অমনি সেখানে আমার স্বামীটি সেই নর্ত্তকীটাকে নিয়ে এসে নৃত্যবিহার করতে লেগে গেলেন। একেবারে পুরুষ নামের অযোগ্য! একবার অবজ্ঞা করতে প্রবৃত্ত হলে আর অপেক্ষা করেই বা কাজ কি! ইহলোকের যন্ত্রণা আমার পরলোকের ভয়কে দূরে ঠেলে দিয়েছে। যে মেয়ে প্রেমে পড়েছে তাকে যদি চিরকাল থাকতে হয় মনের শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে,—সে দুঃখ অসহ্য, সে যন্ত্রণা অমানুষিক। তুমি এই ছবির পুরুষটিকে আমার উদ্যানের মাধবীগৃহে নিয়ে এসে আমাকে দেখিয়ে দাও। আমাকে ভুলিয়ে দাও আমার অতীত। তাঁর কথা শোনার পর থেকেই আমার মন তাঁর জন্যেই বিহ্বল হয়ে উঠেছে। ধনসম্পদ সবই আমার রয়েছে। সমস্তই তাঁর পায়ের কাছে ফেলে দেব, তাঁরি সেবা করে চিরদিন আমি বাঁচব, সুখী হব।’—কল্পসুন্দরীর মুখে এই সব শুনে আমি ছুটে এসেছি। এখন কুমার, যা ভাল বোঝ, কর।”

ধীরে ধীরে আমি তখন ধাত্রী-মা'র কাছ থেকে সন্ধান নিতে লাগলুম, অন্তঃপুরের কোথায় কি আছে, অন্তর্বংশিক পুরুষেরা কোন্ কোন্ জায়গায় পাহারা দেয়। প্রমোদবনটি কোথায়, কি তার বিভাগ ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে অবসন্ন হয়ে এল দিন। অস্তগিরিতে পড়ে গিয়ে শোণিতের মত লাল হয়ে গেলেন ক্ষুব্ধ ভানু। দেখতে দেখতে নামতে লাগল অন্ধকার। সূর্য্যের অঙ্গারখানি যেন পশ্চিম সমুদ্রে পড়ছে আর আকাশ ছেয়ে ঘনিয়ে উঠছে ধূমসম্ভার ঐ অন্ধকার।

'পরস্ত্রী দর্শন করতে চলেছি, এখানে আচার্য্য করব কাকে'—এই কথা ভাবছি, এমন সময় দেখি আকাশে উঠলেন চাঁদ,—নিশি-উত্তার চাঁদ। হাঁ, তাই ত, এই চাঁদই ত একদিন গুরুস্ত্রী হরণ করেছিলেন! ইনিই আজ হবেন আমার পথদ্রষ্টা আচার্য্য। উদয়রাগরঞ্জিত সেই চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল মনে হল—কল্পসুন্দরীর পদ্মফোটা মুখটিও বোধ হয় এই চাঁদের মত নিথর, আমাকে দেখে যেন একটু অরুণ হয়ে হাসছে। এই ভাবনা যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল পুষ্পধনুর তেজে। আমার মধ্যে নৃত্য করে উঠলেন পুষ্পধনু তাঁর পৃথ্বীজয়ী কামনা নিয়ে। কিন্তু তখনই বেরতে পারলুম না। পালঙ্কে এলিয়ে দিলুম অঙ্গ। বিচার-বিতর্ক চলতে লাগল মানসিক রাজপথে।

'সফল হব-হক বলে ত মনে হচ্ছে। কিন্তু পরের ভার্য্যার সঙ্গে মিলন!—ধর্ম্মপীড়া হতে পারে। আবার শাস্ত্রকারেরা অনুমোদন করেছেন পারদারিক-বিধি, যদি অর্থ এবং কাম—দুটিকেই পেতে হয়। আর আমি ত এই পথ নিয়েছি—গুরুজনদের বন্ধনমুক্ত করবার অভিপ্রায়ে। তবে আবার কি। পাপের চেয়ে এখানে পুণ্যের ভাগ হবে বেশী। এই সব ব্যাপার শুনে, দেব রাজবাহন বা আমার অন্যান্য সুহৃদরাই বা কি বলবেন?" এই ধরণের নানান কথা ভাবতে ভাবতে, যেন চিন্তার বন্দী হয়ে গেলুম। বন্দীকে দুর্ব্বল পেয়ে অভিভূত করে ফেলল নিদ্রা। স্বপ্ন পেলুম।

হস্তিমুখ ভগবান গণনাথ স্বপ্নে বলছেন, "সৌম্য উপহারবর্ম্মা, আশা করি তুমি দুষ্ট বিচার করে বসবে না। তুমি আমার অংশ। আর ঐ বরবর্ণিনী কল্পসুন্দরী—সুরসরিৎ মন্দাকিনী অলকনন্দা। ইনিই লালিত হয়ে থাকেন শঙ্করের জটিল জটায়। এই মন্দাকিনীতে নেমে স্নান করছিলুম। আমার বিলোড়ন সহ্য করতে না পেরে আমাকে শাপ দেন, 'যা মর্ত্ত্যে যা'। আমিও প্রতিশাপ দিই, 'এখানে যেমন তুই বহুভোগ্যা, তেমনি মানুষী হয়েও তুই বহুভোগ্যা (অনেক-সাধারণী) হবি।' তারপর মন্দাকিনী আমাকে অনুনয়-বিনয় করে অভ্যর্থনা করে। তখন আমি বলি, 'বেশ মর্ত্ত্যলোকে একপূর্ব্বা হয়ে তুমিই আমার রমণী হবে। যাবজ্জীবন রমণী।' সেই ঘটনাই ঘটবে, তোমার আশঙ্কার কারণ নেই।"

ছিঁড়ে গেল স্বপ্ন, ভেঙে গেল ঘুম।

জেগে উঠলুম। মনের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রীতি। সারাটি দিন আমার কেটে গেল ভাবতে ভাবতে, স্মরণ করতে করতে···প্রিয়ার সঙ্কেতটি কেমন, কোথায় মিলন, কেমন করে হবে, মিলনের আদিতেই বা কি, অন্তেই বা কি।

তারপরের দিন, অসহ্য হয়ে উঠল স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা:—অনঙ্গদেব যেন সব ছেড়ে আমাকেই নিয়ে পড়েছেন! কী দুঃসহ তাঁর বাণবর্ষণ! ঐ বাণের কৃপাতেই কি শুকিয়ে যায় জ্যোতিষ্মন্ সূর্য্যের প্রভা-সরোবর, বেরিয়ে পড়ে তিমিরময় পঙ্ক? শেষে ঘরে রইতে পারলুম না।

নীল কাপড় (কার্দ্দমিক) পরে, ক'ষে কোমর বেঁধে, খড়গপাণি বেরিয়ে পড়লুম। এই রকম অভিযানে যে যে সামগ্রীর প্রয়োজন হয় সেগুলিও সঙ্গে নিলুম। ধাত্রী-মা-কথিত অভিজ্ঞানগুলি স্মরণ করতে করতে রাজমন্দিরের পরিখার তীরে এসে পৌছলুম। দেখি, পরিখাতে থই থই করছে জল। পরিখার পরপারে পুষ্করিকা সজাগ রয়েছে। মাতৃগৃহদ্বারে প্রথম থেকেই একটি বেণুযষ্টি রাখা ছিল। পুষ্করিকা সেই বেণুযষ্টিটি পরিখার উপরে শায়িত করে দিলে। সেইটির উপরে ভর দিয়ে পরিখা পার হয়ে গেলুম, এবং সেইটিকেই প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন করে উল্লঙ্ঘন করলুম রাজমন্দিরের প্রাকার। আরোহণ করে দেখি, পাকা ইটের গাঁথনি গোপুরের উপরতলায় উঠে গেছে একটি সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে নেমে পড়লুম রাজমন্দিরের অভ্যন্তরে। নামতেই দেখি,—বকুলফুলের সুন্দরী একটি বীথি।

সেটিকে অতিক্রম করে দোধারি চাঁপা গাছের পথ ছেড়ে সবে বেরিয়েছি হঠাৎ চুপ করে দাঁড়াতে হল। একটা যেন আওয়াজ পেলুম। নাঃ কিছু নয়। ও শুধু উত্তর দিক থেকে ভেসে আসা চক্রবাক-মিথুনের করুণ ক্রেঙ্কার। আবার পশ্চিম দিকে চলতে লাগলুম একটি লাল রংএর পথ ধরে।—বিশাল সৌধ-শ্রেণীর একেবারে পেটের কাছ দিয়ে গা ঘেঁসে, শরক্ষেপের মত ছুটে গিয়ে পূব দিকে একটি বালিপথে পড়লুম। সেই পথের দুপাশে অশোকের লৌহিত্য এবং যূথিকার শুভ্রতা। ফিরতেই দেখি আমি দক্ষিণ দিকে আম্রবীথিতে অবগাহন করেছি।

কী ঘন সেই আমের বাগান! সমুদ্গকে একটি দীপবর্ত্তি জ্বলছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার আলো। সেই আলোর সাহায্যে দেখতে পেলুম আম্রকাননের ঠিক মধ্যস্থলে, মাধবীলতার মণ্ডপ,—মণ্ডপের মাঝখানে রত্নবেদিকার রচনা। প্রবেশ করলুম। একেবারে জনহীন। একপাশে গর্ভগৃহ। তারি চারপাশে শিশু কুরণ্টের পুষ্পিত বাহার, মাটির উপর ছড়িয়ে রয়েছে অশোকফুলের রাঙ্কুমা। নতুন কুঁড়ির পুলক লাগা প্রবালের মত পাটল রং। চোখে পড়ল কপাট। খুলে ভিতরে ঢুকলুম। দীপদানে দীপবর্ত্তি জ্বলছে। বিস্তীর্ণ পুষ্পশয্যার উপরে হাতীর দাঁতের (তাল) পাখা, পদ্মপাতার মোড়কে নানান রকমের জিনিষ—সুরতের উপকরণ; পাশেই ছোট্ট একটি ভৃঙ্গার, গন্ধসলিলে ভরা।

পুষ্পপালঙ্কে বসে পড়লুম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছি এমন সময় হঠাৎ আমার নাকে এসে লাগল অতি-মোহ মিষ্টি একটি সুবাস। কানে শুনতে পেলুম—কে যেন ধীরে ধীরে পা ফেলে আসছে। শোনবা মাত্র কুঞ্জঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম; সামনেই যে রক্তাশোক ছিল তারি মোটা গুঁড়িটির পিছনে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে রইলুম। কল্পসুন্দরী এলেন, দীপের আলো তাঁর মুখের উপর

লাগতেই শুধু সেই সুন্দরীর সুন্দর ভ্রূদুটিকেই দেখতে পেলুম। সেই মুহূর্তটি সার্থক।

গর্ভগৃহে প্রবেশ করে আমাকে দেখতে না পেয়ে মত্ত রাজহংসীর মত সেই অ-শীতল-কামার কণ্ঠ হতে এল গদ্‌গদ্ বক্তবাণী—"ধরা পড়ে গেছি, প্রতারিত হইনি ত! মরণ ছাড়া তা হলে অন্য উপায় নেই। ওরে হৃদয়, যা করা উচিত ছিল তা তোর করা হল না—এখন অসম্ভব জেনেও এত উতলা হ'চ্ছিস কেন? ভগবান পঞ্চবাণ, কি এমন অপরাধ আমি করেছি—যাতে আমাকে ভস্মশেষ না করে শাস্তি দিয়েছ দহন!

অশোকতরুর আড়াল থেকে বেরিয়ে আমি তখন দীপালোকে এসে দাঁড়ালুম। বললুম—

"ভামিনি, ভগবান মনসিজের কাছে নিশ্চয়ই আপনি বহু অপরাধ করেছেন। আমিই ত দেখতে পাচ্ছি। প্রথম অপরাধ—প্রাণপ্রিয়া রতিদেবীকে আপনি রূপকুণ্ঠিত করেছেন; দ্বিতীয় অপরাধ—তাঁর ধনুখানিকে পরাস্ত করেছে আপনার মোহন ভ্রূ; তৃতীয় অপরাধ—তাঁর ভ্রমরমালার মত জ্যা আপনার চূর্ণ কুন্তলের নীল দ্যুতির কাছে হার মেনেছে।

কত অপরাধের নাম করব। মদনের সব কটি বাণের যা অসাধ্য তা দেখছি একলাই সাধল আপনার কটাক্ষের নীল বর্ষণ। ঐ যে আপনার দশন-ঢাকা অধর থেকে আলোর ধারা ঝরছে, তার কাছে কি দাঁড়াতে পারে কুসুম্ভফুলের কেতন? সুন্দরি, তোমার নিশ্বাসের পরিমলেও লজ্জা পাচ্ছেন শ্রীমদনের প্রথমবন্ধু বসন্তদেব। কথা বলবেন না, আপনার ঐ অতি-মঞ্জুল প্রলাপ শুনেই ত কোকিল পালাল। এই দেখুন না, আমাকে জয় করতে, দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন মদনদেবতা। শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে সঙ্গে নিতে হল—

পুষ্পময়ী পতাকা নয়, আপনার দুখানি বাহু,
পূর্ণকুম্ভ নয়, আপনার কুচমিথুন,
রথমণ্ডল নয়, আপনারি শ্রোণিমণ্ডল।

অপরাধ কি আপনি কম করেছেন?—আপনার চরণতলের প্রভা দেখে মদনের কানের লীলাকিসলয়খানি পর্য্যন্ত খসে গেল! অতএব আমি বলি, যোগ্যস্থানেই এসে পৌঁছেচে মহারাজ মীনকেতুর শাসন। কিন্তু তাঁর এক দোষ দেখছি। আমি বেচারী ভালমানুষটি, কোনো অপরাধই ত করিনি, তবুও তাঁর শাসন আমাকে দেয় কেন প্রখর যন্ত্রণা? তাই বলছি, সুন্দরি, তোলো তোমার প্রসন্ন মুখ, তোমার কটাক্ষেরই প্রলেপ দিয়ে মিটিয়ে দাও আমার জীবনের জ্বালা। অনঙ্গ-ভুজঙ্গ আমাকে দংশেছে।"

এই বলতে বলতে আমি আমার সমস্ত শরীর দিয়ে কল্পসুন্দরীকে আলিঙ্গন করলুম। আমার দিকে চোখ তুলে সে চাইল। কী তার বড় বড় চোখ! বিশালনয়না তখন অনঙ্গরাগের আবেশে বেপথু হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে আমার প্রিয়-মিলন ঘটল।

ধীরে ধীরে পুষ্ট হল লালসার লাবণ্য, বিদ্যুৎ হানতে লাগল তার দুটি দুষ্টু চোখের রক্তিমা, গালের উপর ফুটে উঠলো স্বেদের মঞ্জরী, ঝরে পড়তে লাগল চর্ম্মমধু, নব-প্রণীত শব্দের সম্ভার নিয়ে অনর্গল বেরতে লাগল প্রলাপের বর্ষা, আর তার মধ্যে মধ্যে দাঁতের উপর আঙুল রাখার কি তার অপূর্ব্ব বাহার! দেখতে দেখতে শিথিল হয়ে এল প্রিয়ার অঙ্গের বন্ধনী, রসক্লান্তা আর্দ্রা একটি মাধুরী! তখন প্রিয়ার মানসী এবং শারীরী ধারণাটিকে শিথিল করতে করতে আমি নিজেও উপভোগ করলুম প্রিয়ার সঙ্গে ঐকরসের সফলতা। তৎক্ষণাৎ এল সঙ্গম-বিসৃষ্টি, বিমুক্তি, হল রত্যাবসানিক বিধির অনুষ্ঠান। দুজনেরই দুজনকে মনে হতে লাগল, আতপরিচিত আবার চির-পরিচিত বলে। অতিরূঢ় বিশ্রম্ভের মধ্য দিয়ে কেটে গেল মিলন-জড় কয়েকটি মুহূর্ত্ত। তারপরে পুনর্বার আমার যেন জ্ঞান ফিরে এল। দীর্ঘায়ত নিঃশ্বাস নিয়ে দীন নয়নে বাহু প্রসারিত করে সচকিতে সুন্দরীকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে অতিপীড়ন না করে ওষ্ঠে দিলুম শুভ্র-মৃদু একটি চুম্বন।

কল্পসুন্দরীর ভাসা ভাসা চোখে ভেসে উঠল অশ্রু। "যদি তুমি চলে যাও, তা হলে মনে রেখো, আমারো চলে গেছে জীবনখানি। নিয়ে যাও, আমাকেও তুমি নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। দেখবে যাকে ভালবাসা দিয়ে কেনা যায় তার প্রয়োজন সব সময়েই থাকে।" এই বলে, কানের পাশে নিয়ে এসে, হাত দুটিতে রচনা করল অঞ্জলি। এত সুন্দর দেখাল, যে কি বলব। সেই অঞ্জলিটি যেন কানের দুল!

আমি তখন তাকে বললুম—

"মুগ্ধে, সচেতন এমন কোথায় রয়েছে পুরুষ, যে অভিনন্দিত করে না অনুরাগিণী প্রেয়সীকে? কিন্তু যদি তুমি চাও আমার নিশ্চল ভালবাসা, তা হলে এখন আমি যা তোমাকে করতে বলব, তা নির্বিচারে মেনে নিয়ে তোমাকে করতে হবে। বেশ! রাজা বিকটবর্ম্মার কাছে গিয়ে, নিভৃতে আমার এই মূর্ত্তি-আঁকা চিত্রপটখানি তোমাকে দেখাতে হবে। দেখিয়ে বলবে, 'আচ্ছা বল ত এই আকৃতিটি কেমন? পুরুষের সৌন্দর্য্যের এই কি শেষ কথা নয়? রাজা নিশ্চয় বলবেন, 'হাঁ সুন্দর বটে।' তারপরে বোলো,—'দেখ, রাজা, তাই যদি তোমার মনে হয় তা হলে একটি রহস্য বলবার অনুমতি চাই। সে দিন একটি তাপসী এসেছিলেন, আমার কাছে। দেশ-দেশান্তর ঘুরে তাঁর অন্ত নেই প্রগল্‌ভ জ্ঞানের। পারলুম না মায়ের মত তাঁকে না বিবেচনা করে। তিনিই এই আলেখ্য রূপটিকে আমার সামনে ধরে বললেন, 'আমি এক মন্ত্র জানি, যাতে পুরুষ মানুষের আকৃতি এই রকমের হয়। তবে তার একটা বিধিবিধান-পালন-ব্যাপার আছে। স্ত্রী উপবাসিনী থেকে পর্বদিনে বিবিক্ত স্থানে বিরাট হোমের আয়োজন করবে। অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠান করে পুরোহিতেরা বিদায় নিলে স্ত্রী একাকিনী রাত্রে যদি একশত চন্দন-কাঠ, একশত অগুরুসমিৎ, কর্পূরমুষ্টি, এবং প্রভূত পট্টবাস দিয়ে নিজে হোমানুষ্ঠান করে, তা হলে স্বামীর চেহারার এই রকম পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। কিন্তু এই হোমশেষের ঠিক আগে স্ত্রী একটি ঘণ্টা বাজাবে। ঘণ্টা চালনার শব্দটি শুনে ভর্ত্তা সেখানে উপস্থিত হয়ে, প্রথমে, যদি কিছু রহস্য থাকে তা হলে স্ত্রীর কাছে খুলে বলবে; দ্বিতীয়তঃ, নিমীলিত করবে নয়নযুগল; তৃতীয়তঃ, স্ত্রীকে করবে আলিঙ্গন দান; তবেই সেই স্বামীতে উপসংক্রামিত হবে এই রকমের আকৃতি। কিন্তু স্ত্রীর আকার পূর্ব্বের মতই থেকে যাবে। যদি তুমি তোমার প্রিয়ের এই রকম রূপ চাও, যদি তাঁর রুচি হয়,

তা হলে এ বিষয়ে দ্বিধা কোরো না।' এই কথাগুলি তিনি আমাকে বলেছেন। এখন আমি বলি তুমি এক কাজ কর। যদি তোমার এই রকমের চেহারা পাবার অভিমত হয় তা হলে আহ্বান কর তোমার অনুজদের, সুহৃদ্‌দের, মন্ত্রীদের, এবং পৌরবৃদ্ধদের। তাঁরা যদি অনুমতি দেন তা হলেই তোমার এ পথে নামা উচিত, নচেৎ নয়।"

দেখো, তোমার স্বামী এতে রাজী হয়ে যাবেন। এই যে প্রমোদবন, এই যে প্রমোদবনের বীথি, ঐ যে বীথিতে এসে মিশেছে চারিটি পথ, ঐখানেই আথর্বণিক বিধিতে পশু হনন করিয়ে পুরোহিতদের দিয়ে হোমানুষ্ঠান করাবে। হোমের ধূম নেবাবার কাজে নিযুক্ত হয়ে আমি এখানে আসব, এসে ঐ লতামণ্ডপে লুকিয়ে থাকব। তারপরে যখন বেশ গাঢ় হয়ে উঠবে প্রদোষ বেলা, নর্মহাসি হেসে বিকটবর্ম্মার কর্ণকুহরে মধু ঢেলে আলাপ করতে করতে বলবে, 'তুমি একটি ধূর্ত্ত, তুমি অকৃতজ্ঞ। আমার অনুগ্রহে তুমি রূপ লাভ করবে, সেই রূপের আলোয় নিখিল জগতের নয়নোৎসব হবে তুমি। কিন্তু জানি, তুমি কি করবে ঐ ঐশ্বর্য্য নিয়ে। তুমি আমার সতীনদের ঘরে গিয়ে ঢুকবে। এই না? নাঃ, আমি নিজের পায়ে কুড়ুল মারবার জন্যে এই বেতাল-উত্থাপন করতে পারব না।' তোমার স্বামী নিশ্চয় তখন কিছু বলবে। কী বলেন সেটি আমাকে ঐ লতাগৃহে এসে বোলো। তারপর যা করবার তা আমি জানি।

এখন এক কাজ কর। আমি বিদায় নিচ্ছি; উপবনের যেখানে যেখানে আমার চিহ্ন পড়েছে পায়ের, সেগুলিকে ভাল করে মুছিয়ে দাও পুষ্করিকাকে দিয়ে।"

কল্পসুন্দরী আমার আদেশটিকে আদর করে গ্রহণ করলে, শাস্ত্রের মত। তারপরে—আতৃপ্তপুরবতবাগা—যাই যাই করে শেষ পর্য্যন্ত বিদায় নিয়ে চলে গেল রাজান্তঃপুরে। আমারও যথা-প্রবেশ তথা-নির্গম। ধীরে ধীরে ফিরে এলুম নিজের নীড়ে।

সেই মত্তকাশিনী তখন আমার আদেশ মত সমস্তই অনুষ্ঠান করে বসল। তৃষ্ণার্ত্ত বিকটবর্ম্মার মন মিশ খেয়ে গেল কল্পসুন্দরীর মনের কথার সঙ্গে।

পৌরজনতার মধ্যে, একটা বার্ত্তা, ঘুরতে লাগল, অদ্ভুত, অদ্ভুত, একটা বার্ত্তা। "দেবীর মন্ত্রবলে রাজা পাচ্ছেন দেবতুল্য রূপ। একি কম কথা! এতে চুরি নেই, প্রতারণা নেই, বিপ্রলম্ভ নেই। একটি মাত্র চেষ্টা রয়েছে—সেটি অতি-কল্যাণী। বিপদ ঘটতে পারে তাও অসম্ভব। কেন না, অন্তঃপুরের মধ্যে রয়েছে যে উপবন, সেই উপবনে এই মন্ত্রবলের পরীক্ষা হবে। কে করবেন?—অগ্রমহিষী। বিপদ ঘটা অসম্ভব। তার উপর অনুমতি দিয়েছেন বৃহস্পতির মত বুদ্ধিধারী মন্ত্রীরা। তাও অনেক তর্ক-বিতর্কের পর। যদি সত্যিই এরকম হয় তা হলে বলবই এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার পৃথিবীতে কিছু ঘটেনি। মণিমন্ত্রৌষধির প্রভাব মনুষ্য-চিন্তার অতীত।"

ঘটনার ঘনঘটার পর দেখতে দেখতে পর্বদিন এল। প্রদোষ-বেলা। ঘন হয়ে বেশ জমাট বেঁধে আসছে অন্ধকার। আমি প্রবেশ করলুম প্রমোদবনে। দূর থেকে দেখলুম—ধূম উঠেছে বেদী থেকে, ধূর্জ্জটির কণ্ঠের মত ধূম্র। বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে—মিষ্টি একটি পরিমল। হাঁ, আহুতিতে নিশ্চয় দেওয়া হয়েছিল, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, তিল, গৌরসর্ষপ, মাংস আর রুধির। তারি গন্ধে মাতাল যেন দিক্‌-বিদিক্‌। হঠাৎ প্রশান্ত হয়ে গেল ধূমোদ্গার। সেই মুহূর্ত্তে আমি প্রবেশ করলুম লতাগৃহে।

নিশান্তে গজকামিনীর মত হেলতে দুলতে লতাগৃহে প্রবেশ করল কল্পসুন্দরী। বক্ষলীন আলিঙ্গন করে আমার দিকে চাইল। তার চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি। বললে "তুমি বড় ধূর্ত্ত। তোমার চেষ্টা বুঝি সত্যিই সফল হতে চলল। শিকল পরিয়ে দিয়েছি পশুটার পায়ে। যা বলেছিলে, তা শুনেই তার প্রলোভ হল। তোমারি দেখান-পথে চলতে চলতে শেষে তাকে বললুম, 'তুমি শঠ, আমি করব না তোমার হয়ে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। এত সুন্দর হলে, আকাশের অপ্সরারা এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে, মানুষীদের কথা ভুলে যাও। আমি পারব না। তুমি নির্দ্দয়, তুমি নৃশংস, কালো ভোমরার মত উড়তে উড়তে নিশ্চয়ই একটা না একটা রঙীন ফুলে গিয়ে বসবে।"

বিকটবর্ম্মা আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল, তোষামোদ করে মিনতি করে বললে, 'প্রিয়ে, সত্যিই এত সুন্দরী হয়েও তুমি আমার কাছ থেকে পেয়েছ একমাত্র শঠতা। আমি স্বীকার করছি, ক্ষমা কর আমায়, সহ্য কর। শপথ করছি, এর পরে আমার মনের কোণেও স্থান পাবে না পর-নারীর চিন্তা। অনুষ্ঠান প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। দেরী কোরো না।"

তারপরে আমি সেখান থেকে চলে এসেছি। প্রিয়, আজ আমি তোমার অভিসারে এসেছি বিবাহের সাজে সেজে। রাগাগ্নিকে সাক্ষ্য করে এর আগে একদিন গুরুদেব অনঙ্গ তোমার হাতে আমাকে সঁপে দিয়েছিলেন পত্নীরূপে, আর আজ আমার হৃদয় নিজে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে এই দেহখানিকে, সাক্ষী রেখে জাতবেদা অগ্নি।"

এই কথা বলে কল্পসুন্দরী আমার চরণপৃষ্ঠে এক পায়ের আঙুল-গুলিকে রেখে ভর দিয়ে দাঁড়াল, তারপরে বাম পায়ের পাশ (পার্ষ্ণি) টিকে উৎক্ষিপ্ত কোরে ভুজলতার যুগল বেষ্টনীর মধ্যে কোমল অঙ্গুলি-দলের আকর্ষণীতে আমার গ্রীবাখানি টেনে নিল; তারপরে লীলাভরে আমার মুখখানিকে নামিয়ে এবং নিজের পদ্মমুখখানিকে উন্নত করে বারম্বার ভিতরে বাহিরে দিল চুম্বন। তার বিশাল দৃষ্টিতে কেমন এক বিহ্বল বিভ্রান্তি!

কল্পসুন্দরীকে আমি তখন বললুম "তুমি এইখানেই থাক, এই কুরণ্টগুল্মের কোল ঘেঁসে তুমি স্থির হয়ে থাক। আমি ততক্ষণ আমার কর্ত্তব্যটুকু শেষ করে ফেলি।"

এই বলে যেখানে হোমের আগুন জ্বলছিল সেই দিকে অগ্রসর হয়ে অশোক গাছের শাখায় যে ঘণ্টাটি ঝোলান ছিল সেটিকে বাজিয়ে দিলুম। সে ত ঘণ্টাধ্বনি নয়! সেই ঘণ্টা যেন কূজন করে উঠল।—কিসের যেন আহ্বান জানিয়ে কূজন করে উঠল কৃতান্তের দূতী। ঘণ্টাটিকে তুলিয়ে দিয়ে হোমানলে আমি ধীরে ধীরে সময় নিয়ে নিয়ে, নিক্ষেপ করতে লাগলুম অগুরুর বাহুল্য আর চন্দনের সম্ভার।

দেখতে দেখতে যথোক্ত স্থানটিতে রাজা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এলেন—ধীরমন্থরগতি; একটা শঙ্কা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে,—বিস্ময়; হ্যাঁ, বিস্ময় তাঁর সর্ব্বশরীরে। কী যেন ভাবছেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কল্পসুন্দরীকে আমি বললুম—"এই বার বলো। বলো, ভগবান চিত্রভানুকে সাক্ষী করে আমাকে সত্য করে বলো—এই অপরূপ রূপলাবণ্য গ্রহণ করলে তুমি আমার সপত্নীদের কাছে আর যাবে না, তাদের প্রশ্রয় দেবে না; যদি শপথ কর, তবেই তোমাতে আমি সংক্রামিত করাব এই রূপ।"

ধীরে ধীরে বিকটবর্ম্মার মধ্যে যেন জন্ম নিতে লাগল গভীর বিশ্বাস। ধীরে ধীরে বুঝলেন, "হ্যাঁ, ঠিক, ঐ ত দেবীই রয়েছে,—বলছে, এর মধ্যে সংশয়, দ্বন্দ্ব, চাতুরী নেই।" স্ফুট হল, ব্যক্ত হল, প্রত্যয়। শেষে শপথ করতে প্রবৃত্ত হল রাজা।

স্মিত হাস্যে ফিরে বললুম, "শপথ করেই বা হবে কি ? মানুষীদের মধ্যে কে আছে যে আমাকে হারাতে পারে সৌন্দর্য্যে! হ্যাঁ, তবে যদি অপ্সরাদের সঙ্গে বিহার করতে চাও তবে অনুমতি দিলুম—কোরো, প্রভূত কোরো, সুখে কোরো।" তারপরে বললুম "বেশ, এখন আমাকে বলো, তোমার গোপন রহস্য কি কি আছে। বলবার পর দেখবে তোমার ঘটছে স্বরূপ-ভ্রংশ।"

বিকটবর্ম্মা তখন বলতে লাগল,

"প্রথম—আমার খুল্লতাত 'প্রহারবর্ম্মা' বন্ধনদশায় রয়েছেন; মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেছি তাঁকে বিষান্ন খাইয়ে হত্যা করব এবং পরে প্রকাশ্যে জানাব যে অজীর্ণ দোষে তিনি মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়—আমি বাসনা করেছি, পুণ্ড্রদেশ আক্রমণ করব; সেই উদ্দেশ্যে আমি আমার অনুজ 'বিশালবর্ম্মাকে' দান করেছি সেনাচক্র।

তৃতীয়—পৌরবৃদ্ধ 'পাঞ্চালিক' এবং সার্থবাহ 'পরিব্রাতে'র সঙ্গে গোপনে আমার কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে; 'খনতি' নামে এক যবন এসেছে, তার কাছে বসুন্ধরা-মূল্যের একখানি হীরক রয়েছে—সেইখানিকে সংগ্রহ করতে হবে; দাম যদি দিতেই হয়—যত কম দেওয়া যায় তারি হবে ব্যবস্থা।

চতুর্থ—গৃহপতি জনপদমহত্তর আমার অন্তরঙ্গ 'শতহলি'কে আমি আনিয়েছি; তার কাজ জনপদকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মিথ্যাবাদী দাম্ভিক দুষ্ট গ্রামণী 'অনন্তসীর'টাকে বধ করানো এবং যথা সময়ে সেই উদ্দেশ্যে দণ্ডধরদের নিয়ে সরে পড়া।"

অচিরেই বিকটবর্ম্মার মুখ থেকে তার প্রাণের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পেয়ে গেল। মর্ম্মে সেটিকে গ্রহণ করে বললুম, "তা হলে তোমার এই দেহের এই আয়ু এখানেই শেষ হল;—যেমন কাজ, তেমন গতি তোর হোক্।" এই বলে ছুরিকা দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললুম, দেহখানাকে টুকরো টুকরো করে কেটে সামনেই যে হোমের আগুন ঘৃতস্ফীত হয়ে জ্বলছিল, তাতে ফেলে দিলুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাই হয়ে গেল সে।*

হৃদয়বল্লভা কল্পসুন্দরী কেমন যেন তখন বিহ্বল হয়ে গেছে ভয়ে। স্ত্রীলোকদের স্বভাবই ঐ। অনেক আশ্বাস দিয়ে করকিশলয় ধরে, ধীরে প্রবেশ করলুম কল্পসুন্দরীর মন্দিরে। সুন্দরীর আদেশ মত ছুটে এল অন্তঃপুরিকারা। তাদের সেবা-বিলাসের মধ্যে কিছুকাল যাপন করে, অবরোধ-মণ্ডলকে বিসর্জ্জন দিলুম। তারা চলে গেল। কিন্তু বিহ্বলা কল্পসুন্দরী তখনও সংহতোক্ত। শেষে তাকে অনেক ভুলিয়ে 'উরুপপীড়' 'ভুজোপপীড়' আলিঙ্গনের সোহাগে আকুল করে, তল্পাভিরমণে অল্পার মত সেই যামিনীটিকে কখন না জানি ভোর করে দিলুম।

কল্পসুন্দরীর মুখ থেকে সেই রাত্রেই সংগ্রহ করে নিয়েছিলুম রাজকুলের সমস্ত আচার-ব্যবহারের সমাচার। উষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্নান সমাপন করে, কৃত-মঙ্গলবিধি মন্ত্রীদের আহ্বান করে বললুম—

"আর্য্যগণ, রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বভাবও কেমন যেন পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে বলে বোধ হচ্ছে।

বিষান্ন দিয়ে যাঁকে হত্যা করবার চিন্তা করেছিলুম তিনি আমার পিতৃস্থানীয়; তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক্। নিজের রাজ্য তাঁকে পুনর্বার গ্রহণ করতে হবে এবং আমার কাছে তিনি লাভ করবেন পুত্রের শুশ্রূষা। পিতৃহত্যার চেয়ে পাতক আর কিছু নেই।"

তারপরে ভ্রাতা বিশালবর্ম্মাকে আহ্বান করে বললুম—

"বৎস, এখন পুণ্ড্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। তারা দুঃখে পড়েছে, উপহত হয়েছে মোতে। নিজেরাই জানে না কি করে তারা সংসার চালাবে। যে রাষ্ট্র সুভিক্ষ নয় সেখানে অভিদ্রব করা বিফল। সুতরাং যখন পুণ্ড্রদেশের জমিতে বীজ প্রক্ষেপ হবে বা পরিণত ধান্যচ্ছেদের সময় উপস্থিত হবে, তখন অভিযান করা সঙ্গত। এখন যাত্রা করা যুক্তিযুক্ত নয়।"

তারপরে নাগরিক বৃদ্ধ দুটিকে ডেকে বললুম—

"মহার্ঘ বজ্রমণিটিকে আমি স্বল্প মূল্যে নিতে চাই না। তাতে ধর্ম্মরক্ষা হবে না। অনুগুণ মূল্য দিয়েই সেটিকে খরিদ করবার ব্যবস্থা কর।"

রাষ্ট্রমুখ্য শতহলিকে আহ্বান করে বলে দিলুম—

"দেখ, এই যে 'অনন্তসীর'—একে বিনাশ করতে চেয়েছিলুম; কারণ অনন্তসীর ছিল প্রহারবর্ম্মার সপক্ষ। এখন সেই পিতৃতুল্য প্রহারবর্ম্মাই যদি নিজের পূর্ব্বাবস্থায় এবং প্রকৃতিতে ফিরে যান, তা হলে অনন্তসীর হত্যার সার্থকতা কোথায় ?"

এই সব আভিজ্ঞানিক পরিচয় পেয়ে মন্ত্রীদের মন থেকে সন্দেহের লেশটি মুছে গেল। তাঁরা দুলতে লাগলেন বিস্ময়ের তরঙ্গে। শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন মহাদেবীকে এবং আমাকে। ঘোষণা করতে লাগলেন মন্ত্রের কি অদ্ভুত প্রভাব!

পিতামাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করে তাঁদের প্রত্যর্পণ করা হল তাঁদেরই রাজত্ব।

ধীরে ধীরে আমার ধাত্রীর মুখ দিয়ে পিতৃদেবকে জানিয়ে দিলুম আমার প্রচেষ্টার সমস্ত ইতিহাস এবং তার পরিণতি। প্রহর্ষের কাষ্ঠায় অধিরূঢ় হয়ে ভজনা করতে লাগলুম তাঁদের চরণপদ্ম এবং তাঁদের অনুজ্ঞায় অভিষিক্ত হলুম যৌবরাজ্যে।

---

* এই প্যারাগ্রাফটির মধ্যে কতকগুলি শব্দের ভিন্নপাঠ ছিল। যথাসম্ভব দুরস্ত করে দিয়েছি। (প্র০ মা, ঠা)

এখন আমি লঘু-সমুত্থান (শীঘ্রগামী) বিশাল সৈন্যচক্র নিয়ে চম্পানগরে চলেছিলুম। পিতৃসখা সিংহবর্ম্মার পত্রে আমরা জানতে পাই, চণ্ডবর্ম্মা আক্রমণ করেছে চম্পানগর। এই অভিযানে শত্রুবধ এবং মিত্ররক্ষা দুইটি ফলই ফলবে।

বন্ধু, তাই এখানে দেখা হয়ে গেল, সাক্ষাৎ পেলুম আপনার পাদলক্ষ্মীর ; এ যেন আনন্দরাশির মহোৎসব।"

রাজবাহন উপহারবর্ম্মার কাহিনী শুনে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন—

"দেখেছ, পরস্ত্রীগমন কাপট্যযুক্ত হলেও, পাপ হলেও, এখানে গুরুজনদের শৃঙ্খল-মোচনের হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে, উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে দুষ্ট শত্রুর বিনষ্টির, এবং মূল হয়েছে রাজ্যলাভের। বিপুল অর্থ এবং ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করেছে। লোকে যদি বুদ্ধিটিকে যথার্থভাবে পরিচালিত করে চলে, তা হলে শেষ পর্য্যন্ত কল্যাণ-শোভাই আসে।" তারপরে অর্থপালের মুখের উপর স্নিগ্ধ দীর্ঘ দৃষ্টি রেখে আদেশ দিলেন—

"এবার তুমি বল তোমার আত্মীয় চরিত।"

অর্থপাল বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বলতে লাগল।

ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে
উপহারবর্ম্মাচরিতং নাম তৃতীয় উচ্ছ্বাসঃ।

কৃষিবিশেষজ্ঞ রায় বাহাদুর রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

শ্রীসুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত তাঁহার কীর্ত্তির মধ্যেই বাঁচিয়া থাকিবেন। তিনি কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির যে পরিকল্পনা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা যদি তিনি সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া যাইতে পারিতেন তবে আজ দেশের অন্নসমস্যার অনেকটা সমাধান হইত। কিন্তু তাঁহার জীবনের সেই মহৎ ব্রত যথাযথ ভাবে উদ্‌যাপিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত অবিভক্ত বাংলার কৃষি বিভাগের একজন স্বনামধন্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মী ছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী করিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ঐ পদ পান। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উচ্চ কৃষিশ্রেণীতে বিশেষ ছাত্ররূপে প্রবেশ করেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কৃষিশিক্ষা সমাপন করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন।

এদেশে বহু-মালিকানার জন্য জমি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় বৃহৎ আকারের ট্রাক্টরের প্রচলনের অসুবিধা ইনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জন্য উন্নত ধরণের বলদ-চালিত লোহার হালকা লাঙ্গলের প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। অল্পায়াসে, অল্পব্যয়ে অধিক জমি চাষ করার জন্য ইনি একটি লাঙ্গল উদ্ভাবনা করেন। তাহা "রাজেশ্বর প্লাউ" নামে খ্যাত।

জনসাধারণকে কৃষি-মনোভাবাপন্ন করিবার জন্য তিনি প্রায়ই কৃষি-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেন ও কৃষি-প্রচারের জন্য "কৃষি-কথা" নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় হুগলী জেলার অমরপুরে কৃষি শিক্ষা-কেন্দ্রের স্থাপনা হয় ও ঢাকা কৃষিক্ষেত্র এবং চুঁচুড়া কৃষিক্ষেত্র ও বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের সম্ভব হইয়াছে। কৃষকদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইনি ডিমনষ্ট্রেটরের পদের সৃষ্টি করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইনি গো-মহিষাদির গণনা, পাটের হিসাব ও বঙ্গীয় বাৎসরিক বিবরণী প্রস্তুতকার্য্য বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। রাজকীয় কৃষি কমিশন ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালা পরিদর্শনে আসেন, তখন যোগ্যতম ব্যক্তিরূপে বঙ্গীয় সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকেই যোগাযোগরক্ষী কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করা হয়।

রাজেশ্বর বাবু মাত্র পঁচিশ বছর দেশবাসীর সেবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অপরিসীম উন্নতি দেখাইয়া গিয়াছেন। এদেশে কৃষি-বিষয়ক পুস্তকের অভাব তিনি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'কৃষি-বিজ্ঞান—কৃষির মূলনীতি, প্রথম খণ্ড' সেই শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থমালার এক অংশ মাত্র। 'কৃষি-বিজ্ঞান, দ্বিতীয় খণ্ড'—ফসল, সবজী ও ফল এবং গো-পালন—শীঘ্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে। তিনি পরাশর কৃষিগ্রন্থ হইতে মূল বচন উদ্‌ধৃত করিয়া পুরাকালে কৃষির স্থান যে কত উর্দ্ধে ছিল তাহা জানাইয়াছেন, এবং কৃষির উন্নতি কামনায় বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকে বিভিন্ন অধ্যায়ে কৃষির অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি, যেমন—মৃত্তিকা, উদ্ভিদ্-জীবনের বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদের খাদ্য, ভারতের ভূমিতে সেই খাদ্যের বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা, উদ্ভিদের সহিত প্রাকৃতিক অবস্থার সম্বন্ধ, উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ, প্রজনন-প্রণালী, কৃষিকার্য্যে জীবাণু সার, শস্যের ক্রমপর্য্যায়, বীজ রক্ষা ও বীজ নির্ব্বাচন এবং কৃষিকার্য্যে অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; এবং বিভিন্ন বিষয় চিত্র-সমন্বিত করায় পুস্তকখানি অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়াছে। রাজেশ্বর বাবু এই পুস্তকের প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পরলোকগত রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত সেই গুরু দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পাট-চাষীদের উৎসাহ দানের জন্য তিনি একটি অভিনব তাঁত প্রস্তুত করেন। তিনি জলসিঞ্চনের জন্য একটি সুপরিকল্পিত নলকূপের উদ্ভাবনা করেন। তিনি ভারতীয় কৃষি-সংস্থা এবং রয়াল এগ্রিকালচারাল সোসাইটি অব ইংলণ্ডের একজন সদস্য ছিলেন।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

মোগল-যুগের ভারত

[সম্রাট শাজাহানের পুত্রকন্যার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে বার্নিয়ের বলছেন যে চারপুত্রের বদ্‌মেজাজের জন্য শেষজীবনে শাজাহান রীতিমত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে কাটিয়েছেন। পুত্ররা সকলেই বিবাহিত ও বয়স্ক, কিন্তু তবু সমস্ত আত্মীয়তার বন্ধন ও রক্তসম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ভাইয়ে ভাইয়ে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দিল সিংহাসন নিয়ে। রাজদরবারের পরিবেশও বিষাক্ত হ'য়ে উঠলো। সম্রাট তাদের শাস্তি দিতে পারতেন, বন্দীও ক'রে রাখতে পারতেন, কিন্তু সাহস করেননি। চারপুত্রকে চারটি প্রদেশের সুবাদারি দিয়ে তিনি শান্ত করতে চাইলেন, কিন্তু তাতে উল্টো ফল হ'ল। সুবাদারি পাবার পর পুত্রদের স্বেচ্ছাচারিতা আরও বাড়তে লাগল। স্বাধীন রাজার মতন তাঁরা বেপরওয়া ব্যবহার করা শুরু করলেন এবং রাজস্ব পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন সম্রাটকে। গৃহবিবাদ শেষে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। এই গৃহযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন বার্নিয়ের। অনেক ইতিহাসের বইয়ে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাই বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের অংশ—"History of the States of the Great Mogol"—অনুবাদ করব না ঠিক করেছি। এই অধ্যায়ে যুদ্ধের বর্ণনার শেষে বার্নিয়ের লিখছেন: "এইভাবে চার ভাইয়ের সাম্রাজ্য-লোভের জন্য যে যুদ্ধের আগুন জ্ব'লে উঠেছিল, তার অবসান ঘটল। প্রায় পাঁচ ছ'বছর ধ'রে যুদ্ধ চলেছিল, অর্থাৎ প্রায় ১৬৫৫ সাল থেকে ১৬৬০ কি ১৬৬১ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধের শেষে ঔরঙ্গজীব বিশাল

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

২

যুদ্ধান্তের পর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা

যুদ্ধান্তের পর ঔরঙ্গজীব যখন হিন্দুস্থানের সম্রাট হলেন তখন উজবেক তাতাররা সর্বপ্রথম ব্যস্ত হয়ে দূত পাঠালেন তাঁর রাজসভায়। উজবেক তাতাররা ঔরঙ্গজীবের সমস্ত কার্যকলাপ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁরা দেখলেন, একে-একে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত ক'রে ঔরঙ্গজীব রাজসিংহাসন দখল করলেন। তাঁরা জানতেন যে সম্রাট শাজাহান জীবিত আছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পুত্র রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। ঔরঙ্গজীবের প্রতি তাঁদের প্রাক্তন বিশ্বাসঘাতকতার কথা তাঁরা ভোলেননি, তার জন্য তাঁদের আতঙ্ক ও সঙ্কোচও ছিল যথেষ্ট। তবু উজবেক খাঁ'রা দুজনেই দূত পাঠালেন ঔরঙ্গজীবের দরবারে এবং তাঁদের ব'লে দিলেন যথারীতি সম্রাটকে "মুবারক" জানাতে, অর্থাৎ শুভেচ্ছা জানাতে। যুদ্ধবিগ্রহের পর যদি স্বেচ্ছায় কেউ বন্ধুত্ব করতে চায় তাহলে তার কি মূল্য দেওয়া উচিত, দূরদর্শী ঔরঙ্গজীব তা বিলক্ষণ জানতেন। তিনি এও জানতেন যে উজবেক খাঁ'রা প্রতিশোধের ভয়ে, অথবা কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছেন। তাহলেও তিনি তাঁদের যথারীতি ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা জানাতে কুণ্ঠিত হননি। ঠিক এই সময় আমি রাজদরবারে নিজে উপস্থিত ছিলাম এবং স্বচক্ষে আমি সব দেখেছি। যা নিজে দেখেছি তার বিবরণ এখানে দিচ্ছি। (১)

তিন-তিনবার হাত কপাল থেকে মাটিতে ঠেকিয়ে উজবেক রাষ্ট্রদূতরা সম্রাটকে সেলাম করলেন। তারপর তাঁরা ঔরঙ্গজীবের এত কাছে এগিয়ে গেলেন যে সম্রাট স্বচ্ছন্দে তাঁদের হাত থেকে চিঠি ক'খানা নিজেই নিতে পারতেন, কিন্তু নিলেন না। একজন ওমরাহ(২) এই পত্র উপহারের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করলেন। তিনি নিজে চিঠি গ্রহণ করলেন এবং খুললেন, তারপর সম্রাটের হাতে সেগুলি অর্পণ করলেন। সম্রাট সেই পত্র গম্ভীরভাবে পাঠ করলেন এবং পাঠান্তে আদেশ দিলেন রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যেককে "শিরোপা" উপহার দিতে। অর্থাৎ পাগড়ি, জরির কারুকাজ করা মেরজাই এবং কোমরবন্ধনী তাতার দূতদের উপহার দিতে সম্রাট আদেশ দিলেন। তারপর উজবেক খাঁ'রা যে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, দূতরা তাই নিয়ে এলেন। তার মধ্যে ছিল কয়েক বাক্স উৎকৃষ্ট নীলরঙের নীলোপল বা বৈদূর্যমণি (Lapis Lazuli) (৩) ভাল

১ বার্নিয়েরের এই প্রত্যক্ষ বিবরণের মধ্যে মোগল রাজদরবারের রাষ্ট্রীয় আদবকায়দা সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক দিয়ে এর মূল্য অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিকে নজর রেখে এখানে তাই প্রত্যক্ষদর্শী বার্নিয়েরের এই বিবরণের আমি সারানুবাদ ক'রে দিচ্ছি।

২ "ওমরাহ" কথাটি কিন্তু "আমীর" শব্দের বহুবচন, মোগল রাজদরবারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণতঃ লেখক ও বিদেশী পর্যটকরা 'আমীর' ও 'ওমরাহ' একই অর্থে (একবচনে) ব্যবহার করেন।

Amir, corruptly *Emir* (*Amir*, corruptly *Emir*). A nobleman, a Mohammedan of high rank.
Amrá or *Umrá*, corruptly *Omrah*. The nobles of a native Mohammedan court collectively.

(Wilson's Glossary)

৩ "Lapis-Lazuli" গাঢ় নীলবর্ণের মূল্যবান পাথরবিশেষ,

সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন।" এই কথা ব'লে বার্নিয়ের গৃহযুদ্ধের অধ্যায়টি শেষ করেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়—"Remarkable Occurrences"—যুদ্ধান্তের পর রাজদরবারের প্রায় পাঁচবছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। এর মধ্যে মোগলযুগের রাষ্ট্রীয় আদবকায়দার অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে, যদিও আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান বিশেষ নেই। রাষ্ট্রীয় আচারেরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে ব'লে এই অধ্যায়ের 'সারানুবাদ' করব। এই দুই অধ্যায় মূলগ্রন্থের অর্ধেকের কিছু কম, তার মধ্যে যুদ্ধের বিবরণের অধ্যায়টি চারভাগের একভাগ। বাকি অর্ধেক হ'ল, ফ্রান্সের তাৎকালিক অর্থসচিব (চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালে) মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখিত বার্নিয়েরের বিখ্যাত চিঠি, ফরাসী পণ্ডিত মঁশিয়ে ভেয়ারের কাছে আগ্রা ও দিল্লীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণ সম্পর্কিত চিঠি, ফরাসী কবি শাপলাঁর কাছে লিখিত হিন্দুস্থানের সমাজ সংস্কার ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে চিঠি, ঔরঙ্গজীবের কাশ্মীর অভিযান ও কাশ্মীর সম্পর্কে কয়েকখানি চিঠি এবং বাংলাদেশের সম্পদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ। এর মধ্যে কলবার্ট, ভেয়ার ও শাপলাঁর কাছে লিখিত চিঠি তিনখানি এবং বাংলাদেশের বিবরণটি, আমার মনে হয়, বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। এই চিঠি তিনখানি ও বাংলাদেশের বিবরণটি সম্পূর্ণ অনুবাদ করব, কাশ্মীরের কথা আপাততঃ বাদ দেব। এখন "যুদ্ধান্তের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর" কথা বলা যাক। —অনুবাদক]

ভাল তেজী তাতার অশ্ব কয়েকটি; উটের পিঠে বোঝাই নানারকমের ফল, আপেল আঙুর ইত্যাদি; বোখারা সমরকন্দ থেকেই প্রধানতঃ এইসব ফল দিল্লীর দরবারে আমদানি করা হ'ত। এছাড়া কয়েক ঘোড়া শুকনো বোখারাই ফলও ছিল তার মধ্যে (৪)।

উজবেক খাঁদের উপঢৌকনের প্রাচুর্য দেখে ঔরঙ্গজীব প্রীত হলেন এবং উচ্ছসিত হয়ে প্রত্যেকটি জিনিসের প্রশংসা করলেন। এমন ফল, এমন ঘোড়া, এমন উট নাকি আর কোথাও দেখা যায় না। তারপর সমরকন্দের মাদ্রাসা সম্বন্ধে(৫) কয়েকটি প্রশ্ন ক'রে তিনি তাঁদের বিদায় দিলেন।

মুরাদ বক্স

অভ্যর্থনাদির পর তাতার দূতরা ফিরে এলেন বেশ খুশী হয়ে। ভারতীয় রীতিতে মাথা হেঁট ক'রে "সেলাম" করার জন্য তাঁরা বিশেষ বিরক্ত হননি। "সেলামের" পদ্ধতিটা বাস্তবিকই বিসদৃশ, কোথায় যেন একটা গোলামীর চিহ্ন তার মধ্যে রয়েছে। সম্রাট যে নিজে হাতে ক'রে তাঁদের কাছ থেকে পত্র নেননি, তাতেও তাঁরা তেমন ক্ষুব্ধ হননি। তাঁদের যদি মাটিতে মুখ দিয়ে সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন জানাতে হ'ত, অথবা তার চেয়েও লজ্জাকর কোন উপায়ে, তাহ'লেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা তা বিনা দ্বিধায় করতেন। একথা ঠিক যে তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এইভাবে অভিবাদন জানাতে বলা হয়নি, অথবা ওমরাহ মারফৎ পত্রও গ্রহণ করা হয়নি। এই মর্যাদা একমাত্র পারস্যের রাষ্ট্রদূত মোগলদরবারে পেয়ে থাকেন, তাও সব সময় তাঁরা পান না।

উজবেক রাষ্ট্রদূতরা প্রায় চারমাস দিল্লীতে ছিলেন। দীর্ঘদিন থাকার জন্য তাঁদের স্বাস্থ্যহানি হয়। তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা অনেকে রোগে ভুগে মারাও যান। তাঁরা হিন্দুস্থানের অত্যধিক গরম আবহাওয়া সহ্য না করতে পেরে মারা গিয়েছিলেন কিনা তা অবশ্য সঠিক বলা যায় না। নিজেদের নোংরা জীবনযাত্রার জন্য, অথবা হয়ত অত্যধিক ভোজনপটুর যতটা পরিমাণ খাদ্য খাওয়া উচিত, তা না খাওয়ার জন্য তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল। এই উজবেক তাতারদের মতন সঙ্কীর্ণচিত্ত ও অপরিচ্ছন্ন নোংরা জাত আমি আর দেখিনি। দূতাবাসের কর্মীরা সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে যা হাতখরচ পেতেন, তা খরচ না ক'রে কৃপণের মতন জমাতেন এবং দীনহীনের মতন জঘন্যভাবে দিন কাটাতেন। তা

ঔরঙ্গজীব

নীলোপল বা বৈদুর্যমণি বলা হয়। এই পাথর গুঁড়ো ক'রে পারস্য, কাশ্মীর ও দিল্লীর লিপিকররা পাণ্ডুলিপি চিত্রণের জন্য নীল রং তৈরী করতেন। বৈদুর্যমণিচূর্ণের এই নীলরঙের উজ্জ্বলতার সঙ্গে আজকালকার রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরী নীলরঙের কোন তুলনাই হয় না। এইসব মণিরত্ন রাষ্ট্রদূতরা উপঢৌকন দিতেন, বোধ হয় তাজমহলের জন্য। তাজমহল তৈরী যদিও ১৬৪৮ সালে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাহলেও তার কারুকাজ শেষ করতে নিশ্চয় আরও দীর্ঘদিন সময় লেগেছিল ("built by Titans, finished by Jewellers")। ১৮৬৯ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত একখানি ফারসী পাণ্ডুলিপির মধ্যে তাজমহল নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাতে বলা হয়েছে যে নীলোপল সিংহল থেকে আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু একথাও প্রসঙ্গত বলা হয়েছে যে তাজমহল নির্মাণে যেসব মূল্যবান মণিরত্ন ব্যবহার করা হয়েছে তার অধিকাংশই রাজামহারাজা নবাবরা স্বেচ্ছায় উপহার দিয়েছেন অথবা বিদেশের রাজারা উপঢৌকন পাঠিয়েছেন।"

৪ বোখারার এই শুকনো খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি ফলকেই আমরা "আলু-বোখারা" বা আলু-বখ্‌রা (চলতি কথায়) বলি।

৫ সমরকন্দ এককালে তৈমুরের রাজধানী ছিল এবং তখন তার রূপ

সত্ত্বেও, এ-হেন জীবদের বিদায় দেওয়া হ'ল মহাসমারোহে। সম্রাট প্রত্যেককে মূল্যবান শিরোপা দিলেন দু'টি ক'রে এবং নগদ আট-হাজার ক'রে টাকা দিলেন। এছাড়া তিনি খাঁদের জন্ম উপঢৌকনও পাঠালেন—সুন্দর সুন্দর শিরোপা, সোনারূপো ও জরির কাজ করা নানারকমের কাপড়, কয়েকখানা কার্পেট, এবং দুই খাঁর জন্ম মণি-রত্নখচিত দু'খানি কৃপাণ।

আমার একজন উজবেক বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাকে এই রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন সম্রাটের চিকিৎসক ব'লে। আমিও তিনবার দূতাবাসে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করি। আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের দেশ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় কিছু সংগ্রহ ক'রে নেব। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব! তাঁরা রাষ্ট্রদূত হলেও নিজের দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এমনকি তাঁরা নিজের দেশের ভৌগোলিক সীমানাটুকু সম্বন্ধেও অজ্ঞ। স্বদেশ সম্বন্ধে এরকম নীরেট অজ্ঞতা সচরাচর দেখা যায় না। তাতাররা যে এক-সময় চীন জয় করেছিল, সে-সম্বন্ধেও তাঁরা কিছুই জানেন না(৬)। মোটকথা, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে আমি বিশেষ নতুন কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারিনি। একবার আমার প্রবল বাসনা হ'ল, তাঁদের সঙ্গে ব'সে খানা খাবার। খানাটেবিলে কাউকে বসতে দিতে তাঁদের অবশ্য বিশেষ আপত্তি নেই দেখলাম। নিমন্ত্রিত হয়ে একদিন খানা খেতে বসলাম। খাব কি? খাদ্য বলতে বিশেষ কিছু নেই, একমাত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘোড়ার মাংস ছাড়া। তা'হলেও খেতে যখন বসেছি, তখন খেতে কিছু হবেই। না খেলে, আমার ব্যবহারে হয়ত তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন। তাঁদের কাছে যা পরম সুস্বাদু খাদ্য, আমার কাছে তা যে অখাদ্য তা প্রকাশ করবার উপায় নেই। খাবার সময় আমি আর একটি কথাও বললাম না। দেখলাম, গোগ্রাসে তাঁরা পোলাও গিলতে লাগলেন(৭)। চামচ দিয়ে খেতে তাঁরা জানেন না। বেশ পেট ভরে খেয়েদেয়ে তাঁরা খোশমেজাজে দু'চারটে কথা আলাপ করতে লাগলেন। বুঝলাম, এতক্ষণে আলাপ করবার মতন তাঁদের মেজাজ হয়েছে। প্রথমেই তাঁরা আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে উজবেকদের মতন বলিষ্ঠ জাত আর নেই এবং তীরধনুকের ব্যবহারে তাদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারে না। কথাটা বলা মাত্রই তীরধনুক আনার হুকুম দেওয়া হ'ল। হিন্দুস্থানের তীরধনুকের চেয়ে আকারে অনেক বড়। ধনুকে তীর সংযোজন ক'রে একজন বললেন যে, এই তীর দিয়ে তাঁরা যে কোন ষাঁড় বা ঘোড়াকে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দিতে পারেন। তারপর আরম্ভ হ'ল উজবেক মেয়েদের বীরত্বের সব চমকপ্রদ কাহিনী। সে-কাহিনীর আর শেষ হয় না। তার মধ্যে একটি কাহিনী শুনে আমিও চমৎকৃত হয়েছিলাম। উজবেকী ঢঙে তার বর্ণনা করব কি! কাহিনীটি এই: ঔরঙ্গজীব একবার উজবেকদের দেশ জয় করতে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রায় পঁচিশত্রিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য উজবেকদের একটি গ্রামে হানা দিয়ে লুঠতরাজ করছিল। সেই সময় এক উজবেক বৃদ্ধা রমণী এসে সৈন্যদের বলেন: "বাছারা, আমার কথা শোন। এইভাবে লুঠতরাজ ক'রো না। আমার মেয়েটি এখন বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়েছে তাই, তা না হ'লে টের পেতে। যাই হোক, কন্যার আমার ঘরে ফেরার সময় হ'য়ে গেছে, সময় থাকতে স'রে পড়।" বৃদ্ধার কথায় কেউ কর্ণপাত করল না, করবার কথাও নয়। তারা নিজেদের কাজ হাসিল ক'রে, অশ্বপৃষ্ঠে লুঠের মাল বোঝাই ক'রে নিয়ে চলতে থাকল। গ্রামের কিছু লোকজনও বন্দী ক'রে নিয়ে চলল দাসদাসী হিসেবে, তার মধ্যে ঐ বৃদ্ধাও একজন। কিছুদূর যেতেই পথে বৃদ্ধার সেই গৃহাভিমুখী কন্যাকে দেখা গেল। বৃদ্ধা তো দেখেই হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে ফেললে। কন্যাকে কিন্তু তখনও স্পষ্ট দেখা বা চেনা যাচ্ছে না। দুরন্তবেগে ধাবমান অশ্বের খুরোৎক্ষিপ্ত ধূলির ধূম্রজাল ভেদ করে ঘোড়সওয়ার উজবেক কন্যার মূর্তি দূর থেকে আবছা ভেসে উঠছে বৃদ্ধা মায়ের চোখের সামনে। ক্রমে সেই মূর্তি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'তে থাকল। দেখা গেল অশ্বপৃষ্ঠে ধনুর্বাণধারী উজবেক কন্যার দৃপ্ত মূর্তি, নির্ভীক যোদ্ধার মতন তেজোদ্দীপ্ত। দূর থেকে তখনও সে

ছিল অন্যরকম। "সমরকন্দের মধ্যস্থলে ছিল রিজিস্থান, একটি স্কয়ার, তার মধ্যে তিনটি বিখ্যাত মাদ্রাসা—উলুগ্-বেগ, শের্-দর্ ও তিল্ল-করি। স্থাপত্যের সৌন্দর্যে ইতালীয় শহরের স্কয়ারগুলির সঙ্গে এর তুলনা করা চলে।… শের্-দর্ মাদ্রাসা ১৬০১ সালে তৈরী হয় এবং তার সিংহদ্বারের মাথায় দু'টি সিংহ থেকে নাম হয় 'শের্-দর্'। নীল, সবুজ, লাল ও সাদা এনামেল-করা ইট দিয়ে মাদ্রাসাটি তৈরী এবং সমরকন্দের উক্ত তিনটি মাদ্রাসার মধ্যে এই শের্-দর্ই অন্যতম ও বৃহত্তম। ১২৮ জন মোল্লা এই মাদ্রাসার ৬৪খানা ঘরে বাস করতেন। "টিল্ল-করি" অর্থে 'স্বর্ণাচ্ছাদিত', ১৬১৮ সালে তৈরী। এই মাদ্রাসায় ৫৬টি ঘর ছিল। কিন্তু আয়তনে সবচেয়ে ছোট হলেও, 'উলুগ্-বেগ্' মাদ্রাসাই সবচেয়ে বিখ্যাত, ১৪২০ (বা ১৪৩৪) সালে তৈমুর তৈরী করেছিলেন। গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চার জন্য এই উলুগ্-বেগ্ মাদ্রাসা পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে খ্যাতি অর্জন করেছিল।" (Encyclopaedia Britannica, 9th Ed. 1886)

৬ ১১০০ খৃষ্টাব্দে তাতারবাহিনী চীনে প্রথম অভিযান করেছিল। বার্নিয়ের বোধ হয় সেই অভিযানের কথা বলছেন না। তখন তাতাররা বিতাড়িত হয় এবং ১৬৪৪ সালে পুনরায় অভিযান ক'রে চীন জয় করে। স্থন্-চি বা চুন্-চি সম্রাট হ'ন চীনের। বার্নিয়ের এই চীন-বিজয়ের কথা বলছেন। তখন যে মাঞ্চু-তাতার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের বংশধররাই চীনে রাজত্ব করেন।

৭ পার্সী "পিলাও" থেকে "পোলাও" কথার উৎপত্তি, মুসলমান আমলের বিখ্যাত খাদ্য। ওভিংটন্ সাহেব তাঁর "A Voyage to Suratt, in the year 1689" নামক গ্রন্থে (১৬৯৬ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত) "পোলাও" সম্বন্ধে—এই বর্ণনা দিয়েছেন: "Polau, that is Rice boiled so artificially, that every grain lies singly without being added together, with Spices intermixt, and a boil'd Fowl in the middle, is the most common Indian Dish; and a dumpoked Fowl, that is, boil'd with butter in any small Vessel, and stuft with Raisons and Almonds, is another." পোলাও-বিলাসীরা এই বর্ণনা প'ড়ে খুশী হবেন। নানারকমের মশলাপাতি ও ঘি দিয়ে চাল এইভাবে সিদ্ধ ক'রে রান্না এবং তার মধ্যিখানে একটি সিদ্ধ মুর্গী, এই হ'ল পোলাও। অর্থাৎ মুর্গীর পোলাও। অবশ্য ওভিংটন্ বললেও, এই খাদ্য মোগলযুগে "common" ছিল না, তিনি যে মহলে ঘোরাফেরা করতেন, অর্থাৎ ওমরাহ-মহলে ও রাজদরবারে, সেখানে হয়ত "common dish" ছিল। 'Dumpoked' কথাটি সাহেব কিন্তু পার্সী "দমপুখ্ত" থেকে ইংরেজী করেছেন, অর্থ হ'ল "steam-boiled" বা বাষ্পে সিদ্ধ করা। আজকালকার দিনে এই "দমপুখ্ত" বা "ষ্টীমসিদ্ধ" মুর্গীর কথা নিশ্চয় ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার দরকার নেই।

বলছে, কোন প্রতিশোধ না নিয়ে সে শত্রুদের মুক্তি দিতে রাজী আছে, যদি সমস্ত লুঠের সম্পত্তি ও গ্রামের বন্দী লোকজনদের ফিরিয়ে দিয়ে তারা নির্বিবাদে নিজেদের দেশে ফিরে যায়। মোগল সৈন্যরা উজবেক যুবতীর কথায় কর্ণপাত করল না, বীরাঙ্গনার বীরত্বে তারা বিশ্বাসী নয়। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে তিনচারটি তীর এসে সৈন্যদের গায়ে বিঁধল এবং সেই তিনচার জনেরই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'ল। মোগল সৈন্যদের তীর বিচিত্র ভঙ্গীতে পাশ কাটিয়ে উজবেক কন্যা আবার তীর ছাড়ল এবং ঠিক সেই এক-একটি তীরে একজন ক'রে মারা গেল। এইভাবে সেনাদলের প্রায় অর্ধেক ধনুর্বাণে নির্মূল ক'রে, উজবেক কন্যা তলোয়ার হাতে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং বাকি অর্ধেকের শিরশ্ছেদন করল (৮)।

তাতার রাষ্ট্রদূতরা দিল্লীতে যখন অবস্থান করছিলেন তখনই ঔরঙ্গজীবের কঠিন অসুখ হয়। জ্বরের প্রাবল্যে তিনি প্রায়ই ভুল বকতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে যেত (৯)। চিকিৎসকরা হতাশ হলেন এবং বাইরে র'টে গেল যে তিনি মারা গেছেন। তাঁর অসুখের সংবাদটা অবশ্য নিজের কোন গোপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য রৌশন-আরা বেগম গোপন ক'রে রেখেছিলেন। এই গোপনতাই হ'ল গুজবের কারণ! শোনা গেল, রাজা যশোবন্ত সিং নাকি সম্রাট শাজাহানকে কারামুক্ত করবার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাত্রা করেছেন। মহবৎ খাঁ, যিনি নির্বিবাদে ঔরঙ্গজীবের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত কাবুলের সুবাদারি থেকে পদত্যাগ ক'রে, লাহোরের মধ্য দিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হয়েছেন, সম্রাট শাজাহানকে মুক্ত ও পুনরভিষিক্ত করার জন্য। বন্দী শাজাহানের প্রহরী খোজা আতবর খাঁও সম্রাটের কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য অস্থির।

এদিকে ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মুয়াজ্জাম পূর্ণোদ্যমে ওমরাহদের সংগে সিংহাসন দখলের সলাপরামর্শ করতে লাগলেন। ছদ্মবেশে তিনি গভীর রাত্রিতে রাজা যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে তাঁর পক্ষে যোগ দেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালেন। অন্যদিকে রৌশন-আরা বেগম কয়েকজন ওমরাহ ও ফিদাই খাঁর (ঔরঙ্গজীবের বৈমাত্রেয় ভাই) সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঔরঙ্গজীবের তৃতীয় পুত্র সুলতান আকবরের (তখন সাত-আট বছরের ছেলে) পক্ষে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

দুই দলেরই অভিপ্রায় হ'ল সম্রাট শাজাহানকে মুক্তি দেওয়া। অন্ততঃ বাইরে জনসাধারণকে তাই তাঁরা বোঝালেন। কিন্তু একমাত্র বাইরে মুখরক্ষা করা ছাড়া এই অভিপ্রায়ের মধ্যে অন্য কোন সদুদ্দেশ্য ছিল না। আমি অন্ততঃ আদৌ তাঁদের কোন সদুদ্দেশ্যে বিশ্বাস করি না। আমি জোর ক'রেই বলতে পারি যে রাজদরবারের আমীর-ওমরাহদের মধ্যে তখন অন্ততঃ এমন একজনও ছিলেন না যিনি সম্রাট শাজাহানের মুক্তি ও পুনরভিষেক মনেপ্রাণে কামনা করতেন। একমাত্র যশোবন্ত সিং ও মহবৎ খাঁ প্রকাশ্যে বৃদ্ধ সম্রাটের কোন বিরোধিতা করেননি। তাছাড়া ওমরাহদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি বৃদ্ধ সম্রাটের প্রতি ঔরঙ্গজীবের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ পর্যন্ত করেছিলেন। তাঁদের ধর্মই তা নয়, ন্যায়বিচার বা সাধুতা সততার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্কই নেই। যিনি যখন সিংহাসন দখল করেন, তাঁরা তখন তাঁর খোশামোদ ক'রে আমীরত্ব বজায় রাখেন। ওমরাহরা খুব ভালভাবেই জানতেন যে বৃদ্ধ শাজাহানকে কারামুক্ত করার অর্থ হ'ল পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহকে মুক্ত করা। সকলেই বৃদ্ধ সম্রাটের ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসার ভয় করতেন, খোজা আতবর খাঁ পর্যন্ত, কারণ বন্দী শাজাহানের প্রতি অকথ্য রূঢ় ব্যবহার সম্পর্কে খোজা খুবই সচেতন ছিলেন।

অসুস্থতার মধ্যেও ঔরঙ্গজীব স্থিরচিত্তে রাজকার্য পরিচালন করতেন এবং বন্দী বৃদ্ধ পিতার দিকে নজর রাখতেন। যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তা'হলে বৃদ্ধ শাজাহানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি পুত্র সুলতান মুয়াজ্জামকে অনুরোধ করতেন। ওদিকে আবার খোজা আতবর খাঁর কাছে প্রায় চিঠি লিখতেন, বৃদ্ধ শাজাহানের উপর কড়া নজর রাখার জন্য। বাইরের গুজব বন্ধ করার জন্য অসুস্থ অবস্থায় তিনি একাধিকবার রাজদরবারে ওমরাহদের সামনে দর্শন দিয়েছেন। একবার অসুস্থ অবস্থায় তিনি মূর্চ্ছা যান এবং মূর্চ্ছার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে যাবার আগে যশোবন্ত সিং ও কয়েকজন হোমরাচোমরা ওমরাহকে ডেকে পাঠান, তিনি জীবিত কি মৃত, স্বচক্ষে দেখে যাবার জন্য। মূর্চ্ছার পর থেকেই তিনি ক্রমে সুস্থ হ'তে থাকেন।

একটু সুস্থ হয়েই ঔরঙ্গজীব চেষ্টা করলেন দারার কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্র সুলতান আকবরের বিবাহ দেবার জন্য। কিন্তু চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হ'ল। শাজাহান ও তাঁর কন্যা বেগমসাহেবার উপরেই দারার কন্যার দায়িত্ব ছিল। তাঁরা কিছুতেই ঔরঙ্গজীবের প্রস্তাবে রাজী হলেন না। রাজকুমারীর মনে মনে ভয় হ'ল এবং তিনি স্থির করলেন যে যদি তাঁকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ঔরঙ্গজীব এই বিবাহ দেন তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া তাঁর উপায় থাকবে না। পিতৃহন্তার পুত্রকে তিনি প্রাণ থাকতে বিবাহ করবেন না।

শাজাহানের কাছে ঔরঙ্গজীব কিছু মণিরত্নও চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসনটি আরও বেশী ঐশ্বর্যমণ্ডিত করা। বন্দী শাজাহান ক্রুদ্ধ হয়ে ঔরঙ্গজীবের দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তাঁকে এই ব'লে হুঁশিয়ার ক'রে দিলেন যে তিনি যেন তাঁর রাজকার্য নিয়েই থাকেন, সিংহাসন নিয়ে মাথা না ঘামান। ধনদৌলত মণিরত্নের কোন কথা শাজাহান আর শুনতে চান না, ওসবের প্রতি তাঁর আর কোন আসক্তি বা আগ্রহ নেই। ধনরত্ন নিয়ে যদি বেশী কাড়াকাড়ি চলতে থাকে, তাহলে তিনি যে কোন মুহূর্তে লোহার হাতুড়ির আঘাতে মণিরত্নের সম্ভার চূর্ণ ক'রে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে হুকুম দেবেন।

[ক্রমশঃ।

৮ বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের ডাচ সংস্করণে (আমষ্টার্ডাম, ১৬৭২ সাল) এই কাহিনীটির একটি চমৎকার খোদাই-চিত্র আছে। ইংরেজী সংস্করণে ছবিটি নেই।

৯ ঔরঙ্গজীবের অসুখের তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। ঔরঙ্গজীব পীড়িত হন—১৬৬২ সালের মে-আগষ্ট মাসে (Indian Antiquary, ১৯১১)।

আন্তর্জাতিক

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ভারত ও কোরিয়া সমস্যা—

গত ৩রা ডিসেম্বর (১৯৫২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদে কোরিয়া সম্পর্কে ভারতের শান্তি-পরিকল্পনা যেরূপ বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাসে আর কোন প্রস্তাবের অনুকূলে এত অধিক ভোট হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে পড়িতেছে না। কিন্তু ভোটের এই বিপুল আধিক্যই যেন কোরিয়ায় শান্তি স্থাপনের জন্য ভারতের এই প্রচেষ্টার বিরাট ব্যর্থতাও সূচনা করিতেছে। এই ব্যর্থতার পরিণাম যে শুধু ব্যর্থতাই, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। বরং এই ব্যর্থতার পরিণতি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। কোরিয়া সম্পর্কে ভারতের এই শান্তি-প্রস্তাবের অনুকূলে ভোটের এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাই কোরিয়ায় যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার দায়িত্ব কম্যুনিষ্টদের ঘাড়ে চাপাইবার বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে মনে করিলেও বোধ হয় ভুল হইবে না। মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও উহার মহত্ত্ব নষ্ট হয় না, ইহা ভাবিয়া ভারতবাসী আমাদের পক্ষে সান্ত্বনা লাভ করিবারও কিছু আমরা দেখিতে পাইতেছি না। কোরিয়া যুদ্ধের উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটি শান্তি-পরিকল্পনা রচনা করিবার শুধু গুরুতই নয়, এক অসম্ভব দায়িত্ব ভারত গ্রহণ করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিপুল ভোটে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু রাশিয়া এবং চীন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধের এক পক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ভারতের প্রস্তাব গ্রহণ করায় এবং অপর পক্ষে উহা অগ্রাহ্য করায় ভারত যে উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। এই ব্যর্থতার জন্য দায়িত্ব কাহার তাহা আলোচনা করিতে হইলে কোরিয়া যুদ্ধের উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোন প্রস্তাব রচনা করা সত্যই সম্ভব কি না, এই প্রশ্নও অবশ্য উপেক্ষার যোগ্য নয়।

ইহা সকলেরই ধারণা যে, শুধু একটি মাত্র সমস্যাই পানমুনজোমে যুদ্ধবিরতি আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে এই সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে সমস্ত চীনা ও উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীদিগকে ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্ন লইয়া। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর-অধিনায়ক দাবী করিতেছেন যে, অধিক সংখ্যক কম্যুনিষ্ট যুদ্ধবন্দীই আর দেশে ফিরিয়া যাইতে চায় না এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমর-অধিনায়ক অনিচ্ছুক যুদ্ধবন্দীদিগকে জোর করিয়া দেশে ফেরৎ পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট পক্ষ দাবী করিতেছেন, সমস্ত যুদ্ধবন্দীকেই ফেরৎ দিতে হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন জেনেভা-চুক্তির উপর। ভারতের প্রস্তাব যুদ্ধবিরতির পথে অবশিষ্ট এই একটি মাত্র বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। অনিচ্ছুক কম্যুনিষ্ট যুদ্ধবন্দীদিগকে দেশে ফেরৎ পাঠাইতে অস্বীকৃতির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে একটা গভীর মানবতা-বোধের অভিব্যক্তি দেখা যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত বন্দী-বিনিময় সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া স্বতন্ত্র প্রস্তাব উত্থাপন করায় এই মানবতা-বোধের অকৃত্রিমতায় যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। স্বাভাবিক অবস্থায় কম্যুনিষ্ট যুদ্ধবন্দিগণ স্বেচ্ছায় দেশে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিলে ভারতের পক্ষ হইতে আপোষমূলক কোন মীমাংসার প্রস্তাব উত্থাপন করার বোধ হয় কোন প্রয়োজন হইত না। অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট বন্দী স্বেচ্ছায় বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছে কি না, এই সন্দেহ বা অনিশ্চয়তার উপর ভারতের আপোষ প্রস্তাব রচিত হইয়াছে। ভারতের এই আপোষ প্রস্তাবে জেনেভা-চুক্তির বিধান অনুযায়ী সমস্ত যুদ্ধবন্দী ফেরৎ দেওয়া সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের দাবী স্বীকার করা হয় নাই। পক্ষান্তরে পশ্চিমী শক্তি-বর্গের অনিচ্ছুক বন্দীদিগকে ফেরৎ না দেওয়ার দাবী মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট বন্দীই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই দাবী ভারতের আপোষ প্রস্তাবে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। এই ভিত্তির উপর রচিত ভারতের আপোষ প্রস্তাবে কম্যুনিষ্ট যুদ্ধবন্দীরা যাহাতে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া সম্পর্কে তাহাদের মতামত স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করিতে পারে, তাহার জন্য কতকগুলি বিধান করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীন এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজী হয় নাই। জেনেভা-চুক্তি লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া রাশিয়াও এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। কোরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে ভারতের মহৎ উদ্দেশ্য এই ভাবে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আমরা ক্ষুব্ধ হইতে পারি, রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীনের উপর দোষারোপ করিতেও পারি, কিন্তু ভারতের আপোষ প্রস্তাব যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও উপেক্ষা করিতে পারিত, এই সম্ভাবনাও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। বস্তুতঃ গত ১৭ই নবেম্বর (১৯৫২) ভারতের খসড়া প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটির প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করিবার পরই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এক মুখপাত্র সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, বর্ত্তমান আকারে ভারতের প্রস্তাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং গোড়াতেই যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতঃপর গত ২৬শে নবেম্বর (১৯৫২)

ঐতিহ্যময় ভারত

শ্রীকৃষ্ণ মন্দির—দ্বারকা

সৌম্য ও প্রশান্ত, বহু শতাব্দীর পুরাতন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—তাঁহার মানব জীবনের আবাসস্থল—ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের শান্তি দিয়ে থাকে এবং আমাদের সমগ্র দেশের অনেকেরই এই পবিত্র ঘাটে স্নান করার একটা বাসনা আছে।

ভারতের অন্যান্য বহু সহরের ন্যায় এখানেও ব্রুক বণ্ডের একজন নিজস্ব সেলস্‌ম্যান আছে এবং সে সর্বদা ডিলারদের নিকট এবং স্থানীয় চায়ের দোকানগুলিতে সরবরাহে ব্যস্ত অধিকতর টাট্‌কা ও উৎকৃষ্ট..............................

টাটকা জিনিষই ব্যবহার করুন

Brooke Bond Tea

Blend
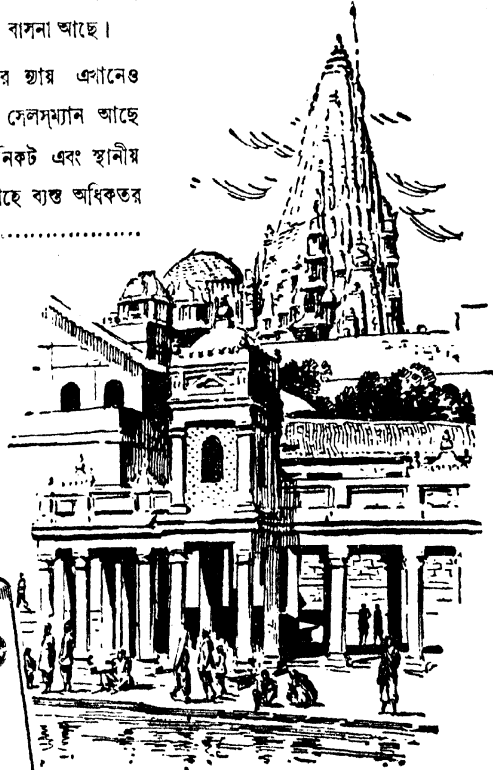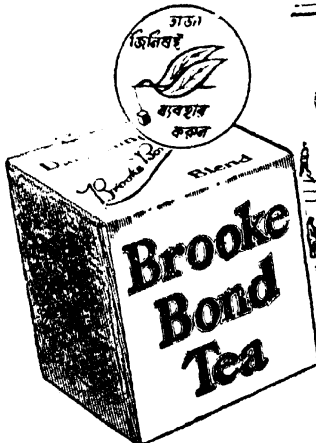
ব্রুক বণ্ড চা

চমৎকার দেশীয় প্যাকেটে সেরা ভারতীয় চা

ভারত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য করিয়া খসড়া প্রস্তাবটির সংশোধন করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্রও ঘোষণা করেন যে, কোরিয়া যুদ্ধের যুদ্ধবন্দী লইয়া যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অবসানকল্পে উত্থাপিত ভারতের প্রস্তাব তাঁহারা সমর্থন করিবেন।

কোরিয়ায় শান্তি-স্থাপনের জন্ত একটি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব রচনা করাই প্রধান সমস্যা নয়। এইরূপ প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রশ্নই একমাত্র প্রশ্ন, এ কথাও স্বীকার করা যায় না। প্রস্তাবটি উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য করিয়া রচিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ প্রস্তাব রচনা করা কঠিন বা অসম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রস্তাবটি উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য হইয়াছে কি না, তাহা আগেই নিশ্চিতরূপে জানিয়া লওয়া কঠিন নয়। অন্ততঃ নিশ্চিতরূপে জানিয়া লওয়ার সুযোগ ভারতের পক্ষে যথেষ্টই ছিল। উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব রচনা করিতে না পারার মধ্যে কূটনৈতিক বুদ্ধির দুর্ব্বলতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু যেখানে উভয় পক্ষ গ্রহণ না করিলে প্রস্তাবের কোন সার্থকতা নাই, সেখানে প্রস্তাবটি যে উভয় পক্ষই গ্রহণ করিবে তাহা আগে জানিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করার মধ্যেই কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক, শান্তি-পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে যাইয়া তাঁহারা এই কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন কি না, তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সহকারী নেতা শ্রীযুক্ত মেনন গত ১১শে নবেম্বর (১৯৫২) রাজনৈতিক কমিটিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে চীনের জনগণের গবর্ণমেণ্টের অনুপস্থিতিই যে সুদূর প্রাচ্যের সমস্যাসমূহের সমাধানের পথে অন্ততম বাধা, ভারত ইহা কখনই গোপন রাখিতে চাহে নাই। তাঁহার এই উক্তি খুবই সত্য। কিন্তু ভারতের শান্তি-প্রস্তাব সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট চীনের মতামত জানিতে পারা অসম্ভব কিছুই ছিল না। কম্যুনিষ্ট চীনের মতামত জানিবার চেষ্টা হইয়াছিল কি না এবং ভারতের শান্তি-প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহারা কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানিতে পারা যায় না। অবশ্য নয়াদিল্লী হইতে ১০ই নবেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, জওহরলালজী কোরিয়ার অচল অবস্থা সম্বন্ধে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রধান মন্ত্রীর সহিত মতামত বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। তার পর এ-সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই। বরং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হেড কোয়ার্টাস হইতে ১৫ই নবেম্বরের এক সংবাদে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, সমাধানের পথের হয়ত কোন সন্ধান না পাইয়া ভারত কোরিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতেও পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রস্তাবটি রচিত হওয়ার পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের মধ্যে উহা বিতরণ করিবার পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে চীন গবর্ণমেণ্টের মতামত জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না। ২১শে নবেম্বর ভারতের শান্তি-পরিকল্পনা সম্পর্কে লোকসভায় জওহরলালজী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি যথেষ্ট আশাবাদ প্রকাশ করিলেও চীন গবর্ণমেণ্টের মতামত সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। তিনি কি তাঁহার আশার প্রাসাদ বালির উপর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ?

গত ২৪শে নবেম্বর (১৯৫২) রুশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ ভিশিনস্কি রাজনৈতিক কমিটিতে বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রস্তাব কোরিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনার অচল অবস্থা মীমাংসা করিবার কোন সন্তোষজনক সমাধান প্রদান করিতে পারে নাই। তিনি এই অভিযোগও করিয়াছেন যে, ভারতের প্রস্তাবগুলি মূলতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের প্রস্তাব যে জেনেভা-চুক্তির বিরোধী তিনি শুধু এই অভিযোগই করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রস্তাব কার্য্যতঃ স্বেচ্ছামূলক বন্দী-বিনিময়ের নীতির আবরণ দ্বারা বাধ্যতামূলক আটক রাখার ব্যাপারটিকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। যুদ্ধবন্দীদের মতামত স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করিবার জন্ত ভারতের প্রস্তাবে যে পদ্ধতি প্রদান করা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে মঃ ভিশিনস্কির সমালোচনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্ত একটি রিপ্যাট্রিয়েশন কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটির চারি জন সদস্যের মধ্যে দুই জন কম্যুনিষ্ট এবং দুই জন অ-কম্যুনিষ্ট সদস্য হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি মতভেদ হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মীমাংসার জন্ত আম্পায়ারের ভোট গৃহীত হইবে। অর্থাৎ আম্পায়ারের ভোট দ্বারাই চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। রিপ্যাট্রিয়েশন কমিশন তাঁহাদের প্রথম অধিবেশনেই আমপায়ার নিযুক্ত করিবেন। আম্পায়ার সম্পর্কে কমিশনের মধ্যে মতানৈক্য হইলে সাধারণ পরিষদ আম্পায়ার নিযুক্ত করিবেন। মঃ ভিশিনস্কি ভারতীয় প্রস্তাবের আম্পায়ার নিযুক্ত করার অংশটি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রিপ্যাট্রিয়েশন কমিশনের দুই জন কম্যুনিষ্ট সদস্য এবং দুই জন অ-কম্যুনিষ্ট সদস্যের একমত হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে। এই অবস্থায় আম্পায়ারের ভোট দ্বারাই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং প্রকৃতপক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদকেই আম্পায়ার নিযুক্ত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। মঃ ভিশিনস্কি বলিয়াছেন যে, কোরিয়া যুদ্ধের এক পক্ষ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইলেও তাহারই উপর দেওয়া হইয়াছে আম্পায়ার নিযুক্ত করিবার ভার এবং এই আম্পায়ারের ভোট দ্বারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তাঁহার এই মন্তব্য উপেক্ষার বিষয় নয়। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কম্যুনিষ্ট বন্দীরা স্বেচ্ছায় ফিরিয়া যাইতে অস্বীকৃত কি না তাহা নিঃসন্দেহরূপে বুঝিবার উপায় নাই।

সাধারণ পরিষদে আলোচনার সময় মঃ ভিশিনস্কি ভারতের প্রস্তাবকেই শুধু "weak and emaciated" বলিয়া অভিহিত করেন নাই, ভারত সম্পর্কেও মন্তব্য করিয়াছেন, "At least you are dreamers and idealist. At worst you do not understand your own position but camouflage horrible American policy." তাঁহার এই মন্তব্য আমাদের কাছে যে অত্যন্ত তিক্ত বলিয়াই মনে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মঃ ভিশিনস্কির দৃষ্টিতে ভারতের প্রস্তাব যে প্রচ্ছন্ন মার্কিণ প্রস্তাব বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, এ কথাও অনস্বীকার্য্য। ইহা অনুমান করিলেও বোধ হয় ভুল হইবে না যে, ভারতের প্রস্তাব রাশিয়া ও চীনের গ্রহণযোগ্য হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও ভারত সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্যই করিত। ভারতের প্রস্তাব প্রচ্ছন্ন মার্কিণ প্রস্তাব কি না, সে-সম্পর্কে মতভেদ থাকিতে

পারে, কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। চীন ভারতের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় চীনের বিরুদ্ধে এশিয়ার দেশগুলিতে প্রচার-কার্য্য চালাইবার একটা মস্ত সুবিধা হইবে। এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে লেলাইয়া দেওয়া সম্পর্কে মিঃ আইসেন-হাওয়ার তাঁহার নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন না-ও হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের শান্তি-পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যখন আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় নব নির্ব্বাচিত মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার কোরিয়া পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার কোরিয়া পরিদর্শন সংক্রান্ত সংবাদ সতর্কতার সহিত গোপন রাখা হইয়াছিল। ২রা ডিসেম্বর (১৯৫২) তাঁহার কোরিয়া সফর আরম্ভ হয় এবং ৫ই ডিসেম্বর তিনি কোরিয়া হইতে আমেরিকা যাত্রা করেন। ভারতের প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেও উহার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু মিঃ আইসেনহাওয়ারের কোরিয়া সফরের পরিণাম কি হইবে, তাহা অনুমান করা সত্যই খুব কঠিন।

কোরিয়া সফরের সময় মিঃ আইসেনহাওয়ার খুব কম সংখ্যক মন্তব্যই করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার একটি মন্তব্য খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন, "How difficult it seems to be in a war of this kind to work out a plan that will bring a positive and definite victory without possibly running a grave risk of enlarging the war." সুনির্দ্দিষ্ট জয়লাভ করিতে হইলে কোরিয়া যুদ্ধের সম্প্রসারণ ছাড়া যদি আর কোন উপায় না থাকে, তবে তিনি ঐ পথ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন কি? তিনি হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা কেহই প্রত্যাশা করে না। কোরিয়া সফরের সময় মিঃ আইসেন-হাওয়ার জয়েণ্ট চীফস্ অব ষ্টাফের চেয়ারম্যান জেঃ ব্রাডলেকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার উপর অনেকে গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ, জেঃ ক্লার্ক এবং ভ্যানফ্লিট উভয়েই আগামী বসন্ত কালে এক ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু জেঃ ব্রাডলে উহা পছন্দ করেন না। মিঃ আইসেনহাওয়ার জেনারেল চেইজ এবং এডমিরাল রেডফোর্ডের সহিত এক দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। জেঃ চেইজ ফরমোসায় মার্কিণ সামরিক মিশনের অধ্যক্ষ এবং এডমিরাল রেডফোর্ড প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিণ নৌবহরের অধি-নায়ক। অনেকে অনুমান করেন যে, জেঃ চেইজ জাতীয়তাবাদী চীনা সৈন্য দ্বারা চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণের জন্য মিঃ আইসেন-হাওয়ারের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট মিঃ রী মিঃ আইসেনহাওয়ারের নিকট ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। নব নির্ব্বাচিত মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ারের ভাবী মন্ত্রিসভার রাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডুলেস প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কম্যুনিজম নিরোধের ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী তিনি কম্যু-নিজম নিরোধের জন্য অধিকতর আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী। এই অধিকতর আক্রমণাত্মক নীতির প্রকৃত স্বরূপটি এখনও সুস্পষ্ট

রূপ গ্রহণ করে নাই। কিন্তু শীঘ্রই যে উহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ৮ই ডিসেম্বর (১৯৫২) হইতে ক্রুজার হেলেনায় মি: আইসেনহাওয়ারের যে-সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কোরিয়ায় কি সামরিক নীতি গৃহীত হইবে তাহাই শুধু নির্দ্ধারিত হইবে না, সুদূর প্রাচ্যে কম্যুনিজমের সম্প্রসারণের আশঙ্কা নিরোধের জন্য নূতন নীতিও নির্দ্ধারিত হইবে। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হওয়ার পূর্ব্বেই এই সম্মেলন সমাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু কম্যুনিজম নিরোধের জন্য গৃহীত নূতন নীতি যে প্রকাশ করা হইবে, ইহা আশা করা সত্যই দুরাশা। কার্য্যক্ষেত্র ছাড়া এই নূতন নীতির পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যাইবে না। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই তাহার আক্রমণের নীতি ও পদ্ধতি পূর্ব্বেই শত্রুকে জানিতে দেয় না। কিন্তু এই নূতন নীতি কি হইবে তাহা অনুমান করা সত্যই খুব কঠিন, তাহা মনে করিবার যেমন কোন কারণ নাই, তেমনি শুধু বন্দীমুক্তি সমস্যাই কোরিয়ায় শান্তি স্থাপিত হওয়ার পথে একমাত্র বাধা কি না, তাহারও পরিচয় এই নয়া নীতির মধ্যে পাওয়া যাইবে। বস্তুত: শুধু বন্দীমুক্তি সমস্যাই কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির প্রবল অন্তরায়, এ কথা স্বীকার করা সত্যই কঠিন। অনিচ্ছুক যুদ্ধবন্দীদিগকে ফেরৎ দিতে অস্বীকার করার মধ্যে মানবতা-বোধের যতই অভিব্যক্তি দেখা যাউক না কেন, উহা যে শুধু প্রকৃত কারণের উপর একটা মনোমুগ্ধকর আবরণ মাত্র, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যুদ্ধবন্দীদিগকে ফেরৎ দেওয়ায় প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া যুদ্ধবিরতি হওয়ার পর যে-সকল সমস্যা দেখা দিবে, সেগুলি আলোচনা করিলেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র না কম্যুনিষ্টরা যুদ্ধবিরতির পথে প্রধান অন্তরায়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কোরিয়া হইতে বিদেশী সৈন্যের অপসারণ এবং ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনই যে যুদ্ধবিরতির পরবর্ত্তী প্রধান সমস্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোরিয়া হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ বলিতে শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রসহ যে-চৌদ্দটি দেশের সৈন্য কোরিয়ায় যুদ্ধ করিতেছে তাহাদের অপসারণই বুঝায় না, কোরিয়ায় যুদ্ধরত চীনা স্বেচ্ছাসৈনিকদের অপসারণও বুঝায়। কিন্তু কোরিয়া চীনের নিকটতম প্রতিবেশী। মার্কিণ সৈন্য এবং চীনা স্বেচ্ছাসৈনিকদের কোরিয়া হইতে অপসারিত করার পর চীনা সৈন্যবাহিনী অনায়াসেই অন্যের অলক্ষ্যে পুনরায় কোরিয়া সীমান্তে আসিয়া হাজির হইবে, ইহাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আরও আশঙ্কা করে যে, যুদ্ধবিরতির পর কোরিয়া হইতে মার্কিণ সৈন্য সরাইয়া আনিলে কোরিয়ায় যেরূপ চীনা স্বেচ্ছাসৈন্যরা যুদ্ধ করিয়াছে, তেমনি ইন্দোচীনে, মালয়ে, ব্রহ্মদেশেও চীনা সৈন্যরা অনুপ্রবেশ করিবে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবে। মুক্তি-লাভের পর এই সকল দেশ হয়ত কম্যুনিষ্ট চীন ও রাশিয়ার সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ইহাকেই কম্যুনিজমের সম্প্রসারণ বলিয়া এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতি-শ্রেণীকে বুঝাইতে চাহিতেছে। তাঁহারাও নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য এই টোপ যে গিলিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির পরিণামে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদীদের হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কাই কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির পথে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। এই আশঙ্কার সৃষ্টি হইত না, যদি কম্যুনিষ্ট চীন এশিয়ায় এক নূতন শক্তিরূপে আবির্ভূত না হইত। কোরিয়া, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট চীন আরও বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই আশঙ্কা উপেক্ষা করিতে পারে না।

চীনে যত দিন কম্যুনিষ্ট শাসন বজায় থাকিবে তত দিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিজম নিরোধের প্রয়াস পরিত্যাগ করিবে না। কোরিয়া যুদ্ধ তাহার একটা নমুনা মাত্র। চীনে আবার মার্কিণ তাঁবেদার চিয়াং কাইশেকের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত চীনকে অবরোধ করিয়া রাখার নীতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিতে চায় না। কোরিয়া যুদ্ধের উৎপত্তির কারণের সন্ধানও এইখানেই পাওয়া যায়। সুতরাং মি: আইসেনহাওয়ার তাঁহার ভাবী মন্ত্রিসভার সদস্য ও উপদেষ্টাগণ এবং সামরিক অধ্যক্ষদের সহিত পরামর্শ করিয়া যে-নীতি নির্দ্ধারণ করিবেন তাহাতে দূর-ভবিষ্যতেও সুদূর-প্রাচ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। সুদূর-প্রাচ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ার দুইটি মাত্র পথ আছে। এক পথ—চীনে কম্যুনিষ্ট শাসনের অবসান। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইহাই চায়। কিন্তু এই পথে সুদূর প্রাচ্যে অশান্তিই শুধু দীর্ঘস্থায়ীই হইবে না, এশিয়ার দেশগুলি আরও দীর্ঘকাল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকিবে। দ্বিতীয় পথ—কোরিয়া, জাপান, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া। শুধু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরাই নয়, এই সকল দেশের পুঁজিপতিরাও এই পথের প্রবল অন্তরায়।

ফরাসী সাম্রাজ্যের দশম দশা—

কিছু দিন পূর্ব্বে ভিয়েটমিন বাহিনী ইন্দোচীনে যে নূতন আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহার তীব্রতা পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত আক্রমণকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। আক্রমণের চাপে ফরাসী সৈন্য সন-লা পরিত্যাগ করিয়া না-সামে আশ্রয় লইয়াছে। ইন্দোচীনের কোন সংবাদ প্রকাশ করা না হইলেও প্রায় ১৭ হাজার ভিয়েটমিন সৈন্যের না-সাম আক্রমণের সংবাদ গোপন রাখা সম্ভব হয় নাই। না-সামে ইন্দোচীনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ফরাসী দুর্গ অবস্থিত। এই দুর্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। এই দুর্গ ফরাসীদের হস্তচ্যুত হইলে ইন্দোচীনে ফরাসীদের এক বিপুল পরাজয় ঘটিবে। হংকং হইতে ২রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, চৌদ্দ ঘণ্টা যুদ্ধের পর না-সাম দুর্গ এখনও ফরাসীদের হাতেই রহিয়াছে। কিন্তু না-সাম দখলের জন্য যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে গত ছয় বৎসরের মধ্যে এত বড় যুদ্ধ আর হয় নাই। আক্রমণকারী ভিয়েটমিন সৈন্যবাহিনীর পিছনে রহিয়াছে সন-লা'র ধ্বংসাবশেষ। তাহারও পশ্চাতে নৃঘিয়া-লো। উহা উত্তর-পশ্চিম টংকিংএর একটি প্রধান আউটপোষ্ট। গত ১৮ই অক্টোবর (১৯৫২) ভিয়েটমিন বাহিনী উহা দখল করে। গত ৩রা ডিসেম্বর না-সামের উপর দ্বিতীয় আক্রমণও ফরাসী সৈন্য প্রতিহত করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভিয়েটমিন বাহিনী যে আর একটি আক্রমণ চালাইতেছে তাহার ফলে ফরাসী বাহিনী শুধু আত্মরক্ষা করিতেই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে। এই আক্রমণের ফলে

এই সর্ব্বপ্রথম লাওস বিপন্ন হওয়ার এবং টংকিং ডেল্টার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। হ্যানয়ের চারি দিকে ফ্রান্স যে ত্রিমুখী রক্ষা-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছে তাহা যদি বিপন্ন হয়, তাহা হইলে ইন্দোচীনে ফ্রান্সের পরাজয় সম্পূর্ণ হইতে আর বাকী থাকিবে না।

শুধু ইন্দোচীনেই নয়, ফরাসী-মরোক্কো এবং টিউনিশিয়াতেও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামীদের সংগ্রাম যেমন তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরাও সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য হন্যে হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি তাহার আর এক দফা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে টিউনিশিয়ায় এবং মরোক্কোর ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা সহরে। গত ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৫২) টিউনিশিয়ার অ-কম্যুনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ফেরাৎ হাসেদ নিহত হন। টিউনিশিয়ার জাতীয়তাবাদী দল এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, 'রেডহ্যাণ্ড' নামক একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান ফেরাৎ হাসেদের হত্যার জন্য দায়ী। এই গুপ্ত প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ অবসরপ্রাপ্ত ফরাসী সৈন্যদের লইয়া গঠিত। তাঁহাদের আরও অভিযোগ এই যে, কতক পুলিশ অফিসার এবং সৈনিকের সহযোগিতাও এই গুপ্ত প্রতিষ্ঠানটি পাইয়া থাকে। কয়েক জন বিশিষ্ট টিউনিশিয়াবাসীর উপর বোমা নিক্ষেপের অভিযোগও তাহাদের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডের পরেই টিউনিশিয়ার ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ প্রকাশ তো বন্ধ করিয়া দেনই, প্যারী ও টিউনিসের মধ্যে টেলিফোনের যোগাযোগও বন্ধ করিয়া দেন। ঐ রাত্রেই টিউনিসে এক ব্যাপক হাঙ্গামা হয়। ৬ই ডিসেম্বর কয়েক জন জাতীয়তাবাদী নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ফেরাৎ হাসেদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিন দিনব্যাপী হরতাল প্রতিপালন করা হয় এবং হরতালের শেষ দিন বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদিগকে পুলিশ ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলে এক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।

টিউনিশিয়ায় এবং ফরাসী-মরোক্কোতে ফরাসী দমন-নীতি সমান তালেই চলিয়াছে। ফরাসী-মরোক্কোর ক্যাসাব্লাঙ্কা সহরে যে শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং উহা দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়োগ, তাহা অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ সংঘটিত ঘটনারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রধূমায়িত অসন্তোষই প্রবল বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। ৭ই ডিসেম্বর ক্যাসাব্ল্যাঙ্কার আরব অঞ্চলে অবস্থিত জাতীয়তাবাদ-বিরোধী আরব সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আল্ আজিমা'র আফিসে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং আর একটি বোমা ফাটে একটি ঔষধের দোকানের সম্মুখে। ঐ দিনই স্থানীয় সময় রাত্রি দশটার সময় হইতে হাঙ্গামা স্বরু হয় বলিয়া ফরাসী সরকারের ইস্তাহারে প্রকাশ। টিউনিশিয়ার শ্রমিক নেতা ফেরাৎ হাসেদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মরোক্কোর ইস্তিক লাল দল চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে। দুই জন ইউরোপীয় নর-নারী তিনটি সন্তান সহ একটি মোটরে করিয়া যাওয়ার সময় তাহাদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয় এবং তিন জন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আক্রান্ত ও নিহত হয়। ঐ দিন রাত্রির হাঙ্গামা বিক্ষোভ প্রদর্শনকারিগণ এবং পুলিশের মধ্যে একটি খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। পরের দিন ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা সহরে হাঙ্গামার সময় প্রায় তিন হাজার বিক্ষোভকারীর এক জনতা একটি থানা চড়াও করিয়া ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ক্যাসাব্ল্যাঙ্কার এই হাঙ্গামায়

৮ জন ইউরোপীয় নিহত এবং ১২ জন আহত হইয়াছে। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের মধ্যে নিহত হইয়াছে ৪০ জন এবং আহত ৭৪১ জন। প্রায় চৌদ্দ শত লোককে গ্রেফতার করা হইয়াছে। ইহা হইতে ক্যাসাব্লাঙ্কার গণবিক্ষোভের ব্যাপকতা ও গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইলেও সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেই।

ইরাকে ঘনীভূত সঙ্কট

অবশেষে ইরাকেও সামরিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। গত ২৩শে নবেম্বর (১৯৫২) ইরাকের রাজধানী বাগদাদে প্রায় ২০ হাজার লোকের এক বিরাট জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন শুধু সরকারী অফিস ও বৃটিশ ও মার্কিণ দূতাবাসে লোষ্ট্র নিক্ষেপেই পর্য্যবসিত হয় নাই, ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা 'ইরাক টাইমসে'র অফিস ও ছাপাখানা এবং মার্কিণ দূতাবাসের প্রচার-দপ্তরেও আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গেও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ ঘটে এবং হাঙ্গামা দমনের জন্য সৈন্য-বাহিনী তলব করিতে হয়। বিক্ষোভকারীরা ইরাকী এয়ারওয়েজের অফিস ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং সহরের কয়েকটি থানাও পুড়াইয়া দেয়। হাঙ্গামা দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই রিজেণ্ট সৈন্যবাহিনীর জেনারেল ষ্টাফের প্রধান কর্ত্তা জেনারেল নুরুদ্দিন মহম্মদকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য অনুরোধ করেন। মুস্তাফা ওমারির অদলীয় গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন। বোগদাদে এই ধরণের হাঙ্গামা নূতন কিছুই নয়। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সালেহ জবের সংশোধিত ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তি সম্পাদন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এক বিরাট হাঙ্গামা হইয়াছিল। এই হাঙ্গামা অবশ্য দমন করিতে কসুর করা হয় নাই, কিন্তু এই হাঙ্গামার ফলে ইরাকী পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত সংশোধিত চুক্তি অনুমোদন করা সম্ভব হয় নাই। সালেহ জবের দেশ হইতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন এবং নূতন গঠিত মন্ত্রিসভা সংশোধিত ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র অভিমত ঘোষণা করেন।

মিশর ও ইরাণের ঘটনাবলী ইরাককে যে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোচ্য হাঙ্গামার অব্যবহিত কারণ যে নির্ব্বাচন-সমস্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইরাক পার্লামেণ্টের চারি বৎসর আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ায় গত ২৭শে অক্টোবর (১৯৫২) পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরেই বিরোধী দলের নেতারা ঘোষণা করেন যে, পুরাতন নির্ব্বাচন আইন অনুসারে সাধারণ নির্ব্বাচন হইলে তাঁহারা এই নির্ব্বাচন বর্জ্জন করিবেন। পুরাতন নির্ব্বাচন আইন অনুসারে পরোক্ষ পদ্ধতিতে দুইটি স্তরে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইরাকের পাঁচটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে চারিটি রাজনৈতিক দলই পরোক্ষ নির্ব্বাচন-পদ্ধতির বিরোধী। তাঁহারা প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন-পদ্ধতি দাবী করিয়াছেন। একমাত্র জেনারেল নূরি এস সৈয়দের কনষ্টিটিউশন দলই পরোক্ষ নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। কারণ এই নির্ব্বাচন-পদ্ধতিতে এফেন্দি, উপজাতীয় সর্দ্দার এবং মুষ্টিমেয় ধনী শ্রেণীর সুবিধা। ইরাকী পার্লামেণ্টে চাহিবেন, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। কেয়ারটেকার মন্ত্রিসভার সভায় প্রধান মন্ত্রী মুস্তাফা আল্ ওমারি অবশ্য বিরোধী দলগুলিকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, সাধারণ নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচন আইন সংশোধন করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হইবে এবং নয়া পার্লামেণ্ট যথাসম্ভব সত্বর এ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার সুযোগ পাইবেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলি তাঁহার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের দাবী ব্যতীত জনসাধারণের আরও কতকগুলি দাবী আছে। এই সকল দাবীর মধ্যে ভূমি-ব্যবস্থার সংশোধন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের প্রচুর ধনসম্পদের উৎস সম্বন্ধে তদন্ত, বিদেশী স্বার্থের বিশেষ সুবিধার বিলোপ, তৈল-সম্পদ হইতে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করা, সিনেটার মনোনয়নে রাজার ক্ষমতার সঙ্কোচসাধন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইরাকের তৈল-সম্পদ এবং সামরিক ঘাঁটিগুলির উপর বৃটিশের আধিপত্যও জনসাধারণের অসন্তুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। ম্যাণ্ডেট আমলের মতই এখনও ইরাকের প্রত্যেক মন্ত্রিদপ্তরে জনকতক বৃটিশারের আসন রহিয়াছে। তাহাদের একমাত্র কাজ ইরাকের বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষা করা এবং গবর্ণমেণ্ট যে-সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে বৃটিশ দূতাবাসকে ওয়াকিবহাল রাখা। সুতরাং ম্যাণ্ডেটের অবসান হইলেও ইরাকে যে এখনও বৃটিশ-শাসনই অব্যাহত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জনসাধারণের কাছে ইহা ভাল নালাগিবারই কথা। এই অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। নির্ব্বাচন আইন লইয়া এই বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মিশরের মত ইরাকেও সামরিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ।

নূতন সামরিক প্রধান মন্ত্রী জেনারেল নুরুদ্দিন মহম্মদ অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন-পদ্ধতিতেই আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। কিন্তু এই আশ্বাস প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী নূরী এস্ সৈয়দের কনষ্টিটিউশনেল পার্টি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলই বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র সালেহ জবের ছাড়া আর সমস্ত রাজনৈতিক নেতাকে বন্দী করা হইয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলির মুখপত্র এবং তাহাদের সমর্থক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক মিলিয়া ১৭খানি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার একমাত্র তাৎপর্য্য এই যে, আগামী নির্ব্বাচন প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন-পদ্ধতিতে হইলেও নূরী এস সৈয়দের কনষ্টিটিউশনেল পার্টিই ক্ষমতা পাইবে। বৃটেনও তাহাই চায়। এই উদ্দেশ্যেই যে সামরিক গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই! ১৯৪১ সালে মধ্য-প্রাচী পরিভ্রমণ করিয়া জনৈক বৃটিশ সাংবাদিক বলিয়াছিলেন, "one thing remains to be done. The Army must take over." সিরিয়ায় অনেক পূর্ব্বেই তাহা হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে মিশরে ঘটিয়াছে তাহাই। সম্প্রতি ইরাকেও তাহা ঘটিল। মধ্য-প্রাচীর দেশগুলিতে সামরিক গবর্ণমেণ্ট হইতেছে বৃটিশ স্বার্থের ত্রাণকর্ত্তা।

প্রাগের বিচার ও তাহার তাৎপর্য্য—

সম্প্রতি প্রাগে চেকোস্লোভাকিয়ার চৌদ্দ জন প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট নেতার যে-বিচার হইয়া গেল, তাহা কম্যুনিষ্ট ছাড়া আর সকলের

সংখ্যা, তাঁহাদের প্রাক্তন পদমর্য্যাদা এবং অভিযোগগুলির গুরুত্ব অতীতের অনুরূপ সমস্ত মামলাকেই ম্লান করিয়া দিয়াছে। এই মামলার চৌদ্দ জন অভিযুক্তের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব্ব জেনারেল সেক্রেটারী রুডলফ শ্লানস্কীর নাম অনুসারেই এই মামলা শ্লানস্কী মামলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ অভিযুক্তদের মধ্যে তিনিই যে মধ্যমণি তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৪৪ সালের শ্লোভাক অভ্যুত্থানের তিনিই ছিলেন নায়ক। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের বিদ্রোহ বা বিপ্লবের পর চেকোশ্লোভাকিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল। ১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদার দিক হইতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট গোটওয়াল্ডের পরেই ছিল শ্লানস্কীর স্থান। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার পদ বিলোপ করা হয় এবং ঐ পদের দায়িত্বভার স্বয়ং গোটওয়াল্ড গ্রহণ করেন। শ্লানস্কীকে অবশ্য সহকারী প্রধান মন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়। কিন্তু নবেম্বর মাসেই তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচ্ছন্ন এজেন্ট এই অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারের পূর্ব্বে তিনি এক বৎসর জেলে ছিলেন। শ্লানস্কীর পরেই ডাঃ ভলাডিমার ক্লিমেণ্টিসের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁহাকে শ্লানস্কীর পূর্ব্বেই ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেফতার করা হয়। জান মাসারিকের পর তিনি পররাষ্ট্রসচিবের পদ লাভ করিয়াছিলেন। বুর্জ্জোয়া জাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণের অভিযোগে ১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাসে পররাষ্ট্র-সচিবের পদ হইতে তাঁহাকে অপসারিত করা হয়। তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা কিছুই অনুমান করা সম্ভব ছিল না। এই দুই জন ব্যতীত অভিযুক্তদের মধ্যে সাত জন আছেন প্রাক্তন ডেপুটী মন্ত্রী। অবশিষ্ট পাঁচ জন অভিযুক্তের মধ্যে দুই জন কম্যুনিষ্ট পার্টির ডেপুটী জেনারেল সেক্রেটারী, এক জন ব্রুনো জেলার কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী, এক জন প্রেসিডেন্টের ব্যুরোতে অর্থনৈতিক বিভাগের চেয়ারম্যান এবং আর এক জন প্রাগে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান মুখপত্র 'Rude Pravo' পত্রিকার প্রাক্তন কূটনৈতিক সম্পাদক। অভিযুক্তদের প্রত্যেকেই যে কিরূপ গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

এক সময়ে যাঁহারা গোঁড়া কম্যুনিষ্ট ছিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় কম্যুনিজমের সুদৃঢ় স্তম্ভ ছিলেন, কম্যুনিজমের প্রতি যাঁহাদের নিষ্ঠা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশও ছিল না, তাঁহারা যে সত্যই খাঁটি কম্যুনিষ্ট ছিলেন না বা হইতে পারেন নাই, তাহা আগে কে জানিত? শুধু কি তাই? তাঁহাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করা, অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপের চেষ্টা করা, জিওনিজম, সামরিক বিশ্বাসঘাতকতা, চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করা, পশ্চিমী শক্তিবর্গের এজেন্টদের সহিত ষড়যন্ত্র করা, টিটোবাদ এবং ট্রটস্কীবাদ অনুসরণ করার অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। এই অভিযোগগুলির মধ্যে জিওনিজমের অভিযোগটির কথা পৃথক ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে এই ধরণের যত মামলা হইয়াছে তাহার কোনটিতেই জিওনিজমের অভিযোগ উপস্থিত করা হয় নাই। কম্যুনিষ্টদের প্রতি আর যত দোষারোপই করা হউক না কেন, তাহাদের বিরুদ্ধে ইহুদী-বিরোধিতার অভিযোগ কেহ করিতে পারে নাই। হাঙ্গেরীতেও শ্লানস্কী মামলার মত এক মামলা হইয়া গিয়াছে। এই মামলার ফলে বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মাথিয়াস রাকোশী ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তিনি একজন ইহুদী। সুতরাং শ্লানস্কী মামলায় জিওনিজমের অভিযোগ উপস্থিত করা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই মামলায় চৌদ্দ জন অভিযুক্তের মধ্যে এগার জনই ইহুদী। ইহাই জিওনিজমের অভিযোগ উপস্থিত করিবার একমাত্র কারণ কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ইহুদী-বিরোধী না হইলেও জিওনিজম সম্পর্কে তাহার নীতি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

ইহা সকলেরই জানা কথা যে, 'স্বাধীন পাকিস্থান' আন্দোলন সমর্থন করিবার জন্য মস্কো হইতে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর নির্দ্দেশ আসিয়াছিল। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস স্থাপনের বিরোধিতা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস স্থাপন সম্পর্কে রাশিয়ার এই নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। এত বেশী বিলম্ব হইয়াছিল যে, প্যালেষ্টাইনের নূতন ইহুদী-রাজ্যে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের আর কোন সুযোগ ছিল না। প্যালেষ্টাইনে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন রাশিয়ার এই নীতির পরিবর্ত্তন হয় এবং কম্যুনিষ্ট দেশগুলি হইতে ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে যাওয়া সম্পর্কে রাশিয়া বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিয়াছিল। ইহুদীদিগকে চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে গোলা-বারুদ প্রভৃতি এবং বিমান সাহায্য দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন সময় হারাইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ইস্রাইলের উপর মার্কিণ প্রভাবই প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করে। রাশিয়ার পূর্ব্বের নীতির জন্যই মাপাম পার্টি ক্ষমতা লাভ করিতে পারে নাই, পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন মাপাই পার্টিই ক্ষমতা লাভ করে। ফলে ইস্রাইলের সহিত রাশিয়ার যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, সূচনাতেই তাহা বিনষ্ট হয়। ইস্রাইলের উপর মার্কিণ প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যই রাশিয়া জিও-নিজমের বিরোধী হইয়াছে বলিয়া অবশ্য মনে হইতে পারে। কিন্তু মধ্য-প্রাচীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উপর ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের অপ্রতিহত প্রভাব সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়ার ইসলামানুরাগ একটুকুও ক্ষুন্ন হয় নাই। সে-দিন পিকিংয়ে যে শান্তি-সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র হইতে যে-সকল প্রতিনিধি গিয়াছিলেন, চীনা মুসলিম এসোসিয়েশন তাঁহাদিগকে এক প্রীতিভোজে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

শ্লানস্কী মামলার সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিই উত্থাপিত অভিযোগগুলি স্বীকার করিয়া স্বীকারোক্তি করিয়াছেন। এই ধরণের মামলায় এইরূপ স্বীকারোক্তির মধ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নাই। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে আসামীর নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায়ের যেরূপ 'থার্ড ডিগ্রি' পদ্ধতি অর্থাৎ কচুয়া ধোলাই নীতি গ্রহণ করা হইয়া থাকে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে ঐরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় না, ইহা স্বীকার করিবার মত কোন তথ্য-প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। আমাদের দেশেও কচুয়া ধোলাই প্রমাণ করা যে কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার, তাহা কাহারও অজানা নয়। তা ছাড়া রাজনৈতিক মামলার যে কতগুলি বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব আছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাজেই শ্লানস্কী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তিতে আমরা আদৌ বিস্মিত হই নাই। কিন্তু তাঁহাদের স্বীকারোক্তিতে তাঁহাদিগকে

মাসিক বসুমতীর

বাদ্ধত হচ্ছে

আগামী ইংরেজী জানুয়ারী থেকে সেই মূল্য নামমাত্র বর্দ্ধিত হচ্ছে শতকরা পঁচিশ টাকা।

বিজ্ঞাপনের মূল্য বর্দ্ধিত হচ্ছে কেন?

দিগ্‌দর্শন; বিবিধার্থ সংগ্রহ; বেঙ্গল স্পেকটেটর; বিজ্ঞান-কৌমুদী, বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্ঞানান্বেষণ; বঙ্গদর্শন; ভারতী, সবুজ পত্র; প্রদীপ; বঙ্গবাসী; কালি-কলম, কল্লোল; বিচিত্রা এবং অলকা প্রভৃতির মত উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আদৃত হওয়া সত্ত্বেও উঠে গেল কেন বলুন তো? আমরা জানি, অনেকেই বলবেন সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে। কিন্তু কথাটি আদপেই সত্যি নয়। যথেষ্ট বিজ্ঞাপন না পাওয়ার জন্য। অর্থাৎ সাময়িক পত্র প্রকাশ ক'রলে তার বিনিময়ে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ না ক'রলে প্রকাশকদের কোন উৎসাহই থাকে না। ঘরের খেয়ে কে আর কবে গণজনের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছে? এখন বোধ করি, সকলেই অনুমান ক'রতে সক্ষম হচ্ছেন যে বিজ্ঞাপন বিনা কোন কাগজ কখনও চলতে পারে না। কথাটি সবুজ পত্র প্রকাশকালে 'বীরবল' ওরফে প্রমথ চৌধুরী পর্য্যন্ত লিখে স্বীকার ক'রে গেছেন। মাসিক বসুমতী সগর্ব্বে ঘোষণা ক'রতে পারে, বিজ্ঞাপনদাতাগণ তাকে যথেষ্ট সাহায্য পূর্ব্বেও ক'রেছেন এবং এখনও করছেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের সহায়তা না পেলে 'মাসিক বসুমতী' প্রকাশ করে স্থগিত হয়ে যেতো। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ ক'রতে বাধ্য হচ্ছি, পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন বাঙলা দেশে এখন যতগুলি সাময়িক-পত্র আছে তন্মধ্যে মাসিক বসুমতীতে থাকে অধিকতম বিজ্ঞাপন। কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতা খসামনে আমাদের কাছে ব্যক্ত ক'রেছেন যে, অন্যান্য মাসিক পত্র অপেক্ষা মাসিক বসুমতীতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে তাঁরা আশাতীত ফললাভ ক'রেছেন। কিন্তু বাজারের দুরবস্থা; কাগজ, কালি এবং মুদ্রণে অত্যধিক ব্যয় হওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ শতকরা পঁচিশ টাকা বিজ্ঞাপনের মূল্য বর্দ্ধিত ক'রতে বাধ্য হচ্ছেন। পাঠক-পাঠিকাদের তৃপ্তি দিতে গিয়ে, মাসিক বসুমতী প্রকাশ ক'রতে ব্যয় যা হচ্ছে তা কল্পনাতীত। কিন্তু আমাদের পক্ষে সুখের কথা এই যে, বাঙলা দেশে যখন হাজারে হাজারে সাময়িক-পত্র সকালে প্রকাশিত হয়ে বিকালে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং চল্লিশ বছরের ঐতিহ্যওয়ালা মাসিকগুলি পর্য্যন্ত দিনে দিনে স্ফীতকায় হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশঃ কৃশকায় হতে চলেছে, তখন মাসিক বসুমতী অতুলনীয় লেখা, রেখা এবং বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ হয়ে ক্রমেই স্ফীতকায় হয়ে উঠছে। অন্যান্য বিখ্যাত কাগজ যখন উঠে যাওয়ার দাখিল হচ্ছে, তখন মাসিক বসুমতীর পাঠক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। সুতরাং মাসিক বসুমতীর বিজ্ঞাপনের মূল্য কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত ক'রলে এমন কিছু অন্যায় হবে না।

বিজ্ঞ বিজ্ঞাপনদাতাগণ নিশ্চয়ই জানেন, মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মূল্য কি? অর্থ কি? কি পরিমাণ অর্থকরী? মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের যে-জন্য কোন মূল্য হয় না। কর্তৃপক্ষ যে মূল্য ধার্য্য করেন সেই মূল্য নেহাৎ নামমাত্র। এবং

আমরা আরও বলছি, কায়দা এবং প্যাঁচ কষে যে কোন কাগজে মুদ্রণ-সংখ্যা দ্বিগুণ কেন চতুর্গুণ বেশী দেখানো যায়। এবং সেই পথ অনুসরণ ক'রে নিজেদের যুগান্তকারী ব'লে কেউ কেউ প্রতিপন্ন ক'রতে সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা কত কপি ছাপি সে-কথা মুখে বা লিখে বলতে চাই না। আমরা সাগ্রহে ডাকছি, যে কেউ মাসিক বসুমতীর কার্য্যালয়ে পদার্পণ ক'রে দেখে যান, মাসিক বসুমতীর মুদ্রণ সংখ্যা, গ্রাহক এবং গ্রাহিকাদের সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে অনুগ্রাহক ও অনুগ্রাহিকা সংখ্যা। মাসিক বসুমতী কোথায় কোথায় পৌঁছয় এবং কে কে গ্রাহক এবং কারা কারা এজেন্ট, সকল বৃত্তান্ত আমরা ছেপে প্রকাশ ক'রে দিয়েছি। সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্যে মাসিক বসুমতী আজ বাঙলা দেশে অতুলনীয় কাগজ। মাসিক বসুমতীতে এ যাবৎ যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেই সকল লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে Best Seller (অধিক সংখ্যায়

অনুগ্রাহক-গ্রাহিকাদেরও ধরতে হবে

বিক্রীত) পুস্তক হিসাবে গণ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। আমরা হলপ ক'রে বলতে পারি যে, মাসিক বসুমতী লেখা, রেখা ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য শীঘ্র একমাত্র গ্রহণযোগ্য সাময়িক-পত্র হয়ে উঠবে।

অন্যান্য তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজগুলিকে পাততাড়ি গোটাতেই হবে এবং তাই হচ্ছে। অধিক বলার প্রয়োজন নেই। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদের সহযোগিতা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা ক'রি।

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্ম যে-করুণ আবেদন করা হইয়াছে, তাহা আমাদের কাছে এক হাস্যকর ব্যাপার বলিয়াই মনে হইতেছে। স্বীকারোক্তিকে অত দূর গড়াইয়া লইয়া যাওয়া আমাদের কাছে সত্যই অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কঠোর শাস্তি দিবার জন্মই যেখানে বিচারের ব্যবস্থা, সেখানে আসামীর পক্ষ হইতে কঠোর শাস্তি দাবী করা একান্তই নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি পাওয়ার দাবী অপূর্ণ রাখা হয় নাই। চৌদ্দ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে এগার জনকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে রুডলফ শ্লানস্কী এবং ডাঃ ভলাডিমার ক্লিমেণ্টস অন্যতম। অবশিষ্ট তিন জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

শ্লানস্কী মামলা যে-সকল প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে, এই প্রসঙ্গে সেগুলির আলোচনা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। পশ্চিমী শক্তিবর্গ কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে মুক্তি-আন্দোলন চালাইবার জন্ম যে চেষ্টা করিতেছে, তাহা কাহারও অজানা নয়। কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে মুক্তি-আন্দোলন চালাইবার জন্ম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মিউচুয়েল সিকিউরিটি আইনে ১০ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের প্রচার-কার্য্যের সময় মিঃ আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ ডুলেস পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে মুক্ত করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির এজেণ্টরা যে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে অনুপ্রবেশ করিয়া গোপনে বহু লোককে তাহাদের দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্লানস্কী প্রমুখ চেকোশ্লোভাকিয়ার চৌদ্দ জন বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত কম্যুনিষ্ট নেতা লোভে পড়িয়া চেকোশ্লাকিয়ায় ধনতন্ত্রবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কম্যুনিজমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা বড় সহজ নয়। এই ধরণের বহু পরীক্ষিত, বিশিষ্ট এবং বিশ্বস্ত কম্যুনিষ্ট নেতারাও যদি কম্যুনিজমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারেন, তাহা হইলে কম্যুনিজমের ভরসা কোথায়? কাহার উপর কম্যুনিজম একান্ত ভাবে নির্ভর করিবে? আজ যাঁহারা শ্লানস্কী প্রমুখ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, কাল যে তাঁহাদের বিরুদ্ধেও ঐ সকল অভিযোগ উত্থাপিত হইবে না, তাঁহারাও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি সত্য হইলে ইহাও বলিতে হয় যে, এই ধরণের লোক যদি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বস্ত পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাদের স্থান যাঁহারা অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার প্রতিও কি লোকের সন্দেহ জন্মিবে না? এই মামলার মূলে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা কতখানি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অনুমান করিবার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই না জাগিয়া পারে না। ভারতবর্ষ যদি কম্যুনিষ্ট দেশ হইত, তাহা হইলে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতে বহিষ্কৃত পি সি যোশী, রণদিভ প্রমুখ কম্যুনিষ্ট নেতার বিরুদ্ধেও শ্লানস্কী প্রমুখ চেক কম্যুনিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলিই কি উত্থাপন করা হইত না? বিচারে তাঁহাদের প্রতিও কি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইত না? যোশীর অনুসৃত নীতিকে ভ্রষ্ট নীতি বলিয়া অভিযোগ করিয়া রণদিভ প্রমুখ তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যোশীর নীতিই খাঁটি নীতি ছিল। আবার রণদিভদের নীতি দিন কতক খাঁটি নীতি বলিয়া চলিল। পরে তাঁহাদের ঐ নীতিও ভ্রষ্ট নীতি বলিয়া অভিহিত হইয়া তাঁহারাও বহিষ্কৃত হইলেন। এখন যাঁহাদের নীতি খাঁটি নীতি বলিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাঁহাদের নীতিও এককালে ভ্রষ্ট নীতি বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। তাঁহারাও তখন দল হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারেন। তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মচক্র, ইমামবাজার, হুগলি। মূল্য দুই টাকা।

সেক্সপিয়ার গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ)—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

জনান্তিক—যাযাবর। নিউ এজ পাব্লিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

সোভিয়েটের মেয়েরা—কল্যাণী রায়। ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন—অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন্। আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

গীতি মালিকা—শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথ। প্রকাশক—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২।১, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বর্ষপঞ্জী (১৩৫৯)—শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত। এস, আর, সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ২৫এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

একতারা—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়। চলতি নাটক-নভেল এজেন্সি, ১৪৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীপার্থিবের দপ্তর (১ম খণ্ড)। রূপমঞ্চ প্রকাশিকা, ৮৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

শ্রীশ্রী৺সদানন্দ (দাসী) স্বামীর জীবনী ও গান—শ্রীশ্রীক্ষ্যাপা মনোহর ঠাকুর প্রণীত। শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক, মার্ব্বল প্যালেস, ৪৬, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

শ্রীশ্রীক্ষ্যাপা মনোহর ঠাকুরের তন্ত্র সাধনা—শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক। মার্ব্বল প্যালেস, ৪৬, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

পকেটমার—শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়। ঘোরতর পাব্লিশিং, ৬১এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

কণ্ট্রোলের অভিশাপ—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ। "নিরালা", ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা। মূল্য দুই টাকা।

প্রেমের সমাধি তীরে—শ্রীনিত্যানন্দ সাহা। বৈকুণ্ঠ বুক হাউস, ১৮০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

আর্ত্তনাদ—বীরেশ্বর সিংহ। ক্রান্তি প্রকাশনী, ১১৫এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

শ্রীরমেন চৌধুরী

ষ্টুডিয়ো-পরিচিতি

ইন্দ্রলোক ষ্টুডিয়ো

ইন্দ্রলোক সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে এর অতীতকে স্মরণ না করে উপায় নেই। বর্ণোজ্জ্বল ফেলে-আসা দিনগুলি আজ হয়তো শুধু স্মৃতির পর্যায়ভুক্ত হয়েছে কোনো-কোনো তদানীন্তন কর্মীর, কিন্তু সাধারণের সেটা কিছু মনে রাখার কথা নয়। এটাই যে ফিল্ম কর্পোরেশন, ক'জন তা জানে? সেই ফিল্ম কর্পোরেশন— যে একমাত্র 'বিজয়া' কল্যাণে সারা ভারতে পরিচিত হয়ে পড়েছিলো সেদিন। যুদ্ধের সময় ষ্টুডিয়ো-বাড়িটি মিলিটারীর হাতে চলে যায়। তারপর শ্রী পি, এন, রায়ের নেতৃত্বে বর্তমান নাম নিয়ে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হোলো এর ১৯৪৭ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে। শ্রীযুক্ত রায়ের নিজস্ব ইউনিটের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ-বিরতির অবসান হোলো। উঠতে শুরু করলো 'প্রিয়তমা', 'ভুলি নাই,' 'তরুণের স্বপ্ন,' 'দিনের পর দিন' প্রভৃতি ছায়াছবি। এই সময় মিঃ রায়ের ইউনিটে ছিলেন কলা-কুশলীদের মধ্যে শব্দযন্ত্রে শ্রীমধু শীল, শ্রীমাল্লা লাডিয়া, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মল্লিক; ক্যামেরায় সুহৃৎ ঘোষ, চীফ ইলেক্‌ট্রিসিয়ান চুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

'৪৮ সালের শেষের দিকে শ্রীরায় সরে গেলেন মঞ্চ থেকে। শেঠ ইন্দ্রকুমার কারনানী (ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োর মালিক) এইবার পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অবিশ্যি আগেও এঁর অংশ ছিলো (সেটা তো ষ্টুডিয়োর নামেই প্রকাশ) কিন্তু কর্তৃত্বের ভার ছিলো শ্রীরায়ের ওপর। ষ্টুডিয়ো-ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন মিঃ এম, এস, সুবেদার। মিঃ সুবেদার যে একজন সুযোগ্য এবং সৎ লোক, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এখন এখানে চিত্রশিল্পী হিসাবে আছেন শ্রীবিজয় দে, শ্রীনলিন ডোরা; শব্দযন্ত্রে শ্রীপাঁচুগোপাল দাস, শ্রীধরণী চৌধুরী; শিল্প-নির্দেশক শ্রীসতীশ অধিকারী এবং চীফ ইলেক্‌ট্রিসিয়ান শ্রীচুণীলাল ব্যানার্জি। পাঁচু বাবু ও ধরণী বাবু এসেছেন ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়ো থেকে আর চুণী বাবু তো গোড়া থেকেই এখানে রয়েছেন।

ছবি উঠছে একের পর একটা—তার মধ্যে 'ক্ষুদিরাম', 'তিন্ দেশের মেয়ে', 'ভগবান', 'এরাই মানুষ', 'ভুবন', 'মানুষ', 'মুখোস', 'জালিয়াৎ', 'শেষ কোথায়', 'পোড়ো বাড়ি', 'সন্ধান', 'হত্যাকারী কে?' 'তাল-বেতাল ও বিক্রমাদিত্য', 'তীর ও তরংগ', 'মালা', 'কৈ সে ভুলু' (হিন্দি), 'পার-ঘাট', 'রুপুমি' (অসমিয়া), 'রোল নং ২৮', 'সপ্ত শয্যা' (উড়িয়া), 'চুচুকা মোরব্বা' (পাঞ্জাবী)— এইগুলিই প্রধান। এর মধ্যে কিছু-কিছু মুক্তি পেয়ে গেছে, আর সব দিনের আলো দর্শনের অপেক্ষারত। ফ্লোর আছে দুটি, ক্যামেরা দুটি, সাউণ্ড মেসিনও তাই। অটোমেটিক ল্যাবরেটারী আছে, তার পরিচালনা করেন শ্রীশৈলেন ঘোষাল। এঁর দলে আছেন শ্রীভোলানাথ চ্যাটার্জি ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী। এ ছাড়া আছে ছোট একটি পুকুর আর আগে পিছে বিরাট চত্বর। মনে হোলো, দীর্ঘাকার ষ্টুডিয়ো বলতে 'ইন্দ্রলোক'কেই বুঝায়। তবে নামের প্রতি সুবিচার করতে হলে সাজাতে হবে একে আরো অনেক। ইন্দ্রলোক কি যে-সে জায়গা!

কলা-কুশলী

চিত্রশিল্পী ধীরেন দে

খুশিমত আলো বাড়িয়ে-কমিয়ে ষ্টুডিয়োর ভেতরে ছবি তোলা আর মুক্ত প্রকৃতির বুকে উদার আকাশের তলায় সূর্যের আলোর সাহায্য নিয়ে চিত্র গ্রহণ—দুয়ে প্রভেদ আছে বৈ কি! চিত্র-শিল্পীর বাহাদুরি বোঝা যায় এই শেষের কাজটির মাঝে। আর সত্যি কথা বলতে কি, ক্যামেরাম্যান শ্রীধীরেন দে এ বিভাগে উচ্চ নম্বর পাবার যোগ্য জন। তাঁর একাধিক বহির্দৃশ্য গ্রহণের প্রত্যক্ষদর্শী আমি, এমন অনাড়ম্বর কলা-কুশলী খুব কমই আমার চোখে প'ড়েছে। স্রেফ একটি পান মুখে পুরে ক্লান্তি ভুলে ভদ্রলোক ছুটোছুটি করে একাই সব ব্যবস্থা করে নেন, কুলি কিংবা সহকারীর আশায় বসে থাকেন না কখনো। শুনলাম ওঁর জীবন-কথা। কর্ম-জীবনের সুরুতে কিন্তু উনি অন্য বিভাগের কাজে ঢুকেছিলেন। হয়েছিলেন ল্যাবরেটারীর অ্যাসিষ্টেণ্ট। কিন্তু ইটালিয়ান ক্যামেরাম্যান মিঃ লিগোরা ওঁকে সহকারী করে নিলে অভাবিত ভাবে কর্ম-প্রবাহ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হ'তে থাকলো। জায়গাটা কোথায় জানতে চাইছেন? অনুমান আপনাদের ঠিক—ম্যাডান থিয়েটার্সের ষ্টুডিয়োতেই ঘটেছিলো ব্যাপারটা।

এই লিগোরা সাহেবের সহকারী থাকাকালীন ছবি উঠলো 'ধ্রুব-চরিত্র', 'নল-দময়ন্তী', 'শিবরাত্রি' ও 'পতিভক্তি'। বলা বাহুল্য, এ ক'খানাই নির্বাক্ ছবি। এই সময় মিঃ লিগোরা চলে গেলেন দেশে। কর্মহীন সময় কাটলো কিছু কাল। দমদমে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী গড়ে উঠলো। সেখানে চিত্রশিল্পী শ্রীননীগোপাল সান্যাল মশায়ের সহকারীত্বে অভিষেক হোলো এঁর। 'আঁধারে আলো', 'খোকাবাবু', 'চন্দ্রনাথ', 'মানভঞ্জন' (রবীন্দ্রনাথের) তোলার পর এ প্রতিষ্ঠান পথ চলা বন্ধ করলো। কাজে-কাজেই ধীরেন বাবুকে অন্য রাস্তা দেখতে হোলো। এবারে আমরা এঁকে দেখতে পেলুম স্বাধীন চিত্রশিল্পী হিসাবে অরোরা সিনেমায়। যোগাযোগ করে দিলেন স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় অনাদি বসু। অহীন্দ্র চৌধুরী পরিচালিত 'কৃষ্ণ-সখা' এঁর জীবনের প্রথম ছবি। এর পরের প্রয়াস 'কেলোর কীর্তি'!

মাদ্রাজে প্রথম ষ্টুডিয়ো জন্ম নিলো ২৫ কি ২৬ সালে, নাম জেনারাল পিকচার্স লিমিটেড। এখানকার কর্ণধার অনাদি বাবুর
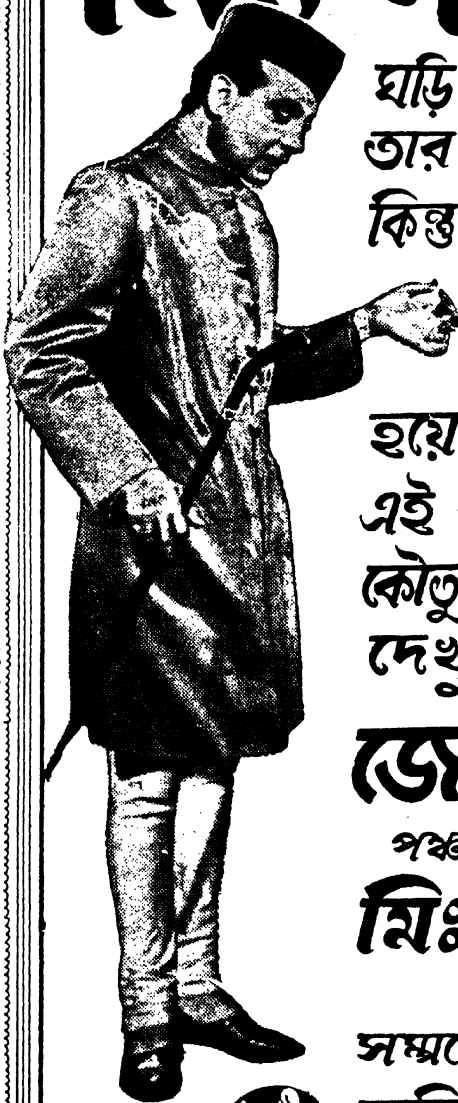
মিঃ সম্পত
ঘড়ি ধরেই চলে
তার কাজ...
কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনে
তার বছরের পর
বছর অতিবাহিত
হয়ে যায় ......
এই অলীক বাবুর
কৌতুকোজ্জ্বল কাহিনী
দেখুন ~
জেমিনীর
পঞ্চম হিন্দি চিত্র
মিঃ সম্পত
শ্রেষ্ঠাংশে
সম্পতের ভূমিকায় মতিলাল
মালিনী ,, পদ্মিনী

শরণাপন্ন হলেন ক্যামেরাম্যানের জন্যে। অনাদি বাবু পাঠিয়ে দিলেন শ্রীযুক্ত দে'কে সেখানে। স্থান পরিবর্তন হোলো দীর্ঘ চার বছরের জন্যে। মাদ্রাজে গোটা কুড়ি ছবি তুললেন—নির্বাক্ 'লংকা দহন', 'কোভালম', 'ধর্মপত্নী' ইত্যাদি। কলকাতায় ফিরে এসে সোজা অরোরায় স্থান করে নিলেন আবার এবং পরিচালক নিরঞ্জন পালের 'পূজারী' ছবিটির চিত্রগ্রহণ করলেন। এইবার এলো নিউ থিয়েটার্সে যোগদানের শুভ-লগ্ন। এ যোগাযোগও করে দিলেন অরোরার কর্ণধার। দেবকী বসু ও প্রেমাংকুর আতর্থীর দু'খানি ছবি 'আফ্‌টার দি আর্থ-কোয়েক' ও 'কারওয়ানী হায়াৎ'-এর কাজ দ্বিতীয় ক্যামেরাম্যান হিসাবে সম্পন্ন করলেন শ্রীধীরেন দে। শেষের ছবিটির আউট-ডোরের কাজে লাহোর ও ভাওয়ালপুর যেতে হোলো তাঁকে। কিন্তু মন বসলো না কলকাতায়, নিউ থিয়েটার্সের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন লক্ষ্ণৌ। সেখানে আইডিয়েল ফিল্মস লিমিটেড। কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সে প্রতিষ্ঠানের। উর্দু ছবি 'আদর্শ মহিলা'র চিত্রগ্রহণ করলেন এইবার। নরেশ মিত্র অরোরার 'পথের সাথী' তুলবেন, কে ক্যামেরার দায়িত্ব নেয়? বিরাট প্রশ্ন। ধীরেন বাবু ফিরে এলেন এখানে, তুললেন ছবিখানি যত্ন সহকারে।, কিন্তু সামান্য কাজ বাকী থাকা অবস্থায় বাধা ফিল্মে যোগ দেওয়ায় শেষটুকু আর সমাধা করতে পারেননি। সেই জন্যে নাকি 'পথের সাথী'র পরিচয়-লিপিতে শ্রীযুক্ত দে'র নামটুকুর উল্লেখ করা ওঁরা প্রয়োজন বোধ করেননি।

রাধায় এসে চিত্ররূপা'র 'শান্তি' গ্রহণ করলেন। এ প্রতিষ্ঠানের ও ভাড়াটিয়া সংস্থার বিভিন্ন ছবি ইনি করেছেন, তার মধ্যে 'অলকানন্দা', 'বন্দে মাতরম্', 'পরভৃতিকা', 'যুগের দাবী', 'স্যার শংকরনাথ', '১০১ ধারা', 'আশাবরী', 'সাবিত্রী', 'কবি', 'ক্ষুদিরাম', 'সবুজ পাহাড়', 'আমার দেশ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন শৈলজানন্দের 'আমাদের সিরাজ' নিয়ে ব্যস্ত আছেন। বিশিষ্ট কাজের মধ্যে অরোরার ডকুমেণ্টারী ছবি অনেকগুলি আছে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কলকাতায় আগমন উপলক্ষে টপিক্যাল নিউজ তুলে ইনি ঘরে-বাইরে প্রশংসা অর্জন করেছেন। দেখলুম, সে সম্মান-পত্র তৎকালীন গভর্ণর জেনারাল চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারীর স্বাক্ষর সম্বলিত। মাউণ্টব্যাটেনও সার্টিফিকেট পাঠিয়েছেন বিলাত থেকে। কর্মীর পক্ষে স্মরণীয় নিঃসন্দেহে।

টকির টুকিটাকি

প্রশ্ন।

হাঁ, ভারত চিত্রমের নির্মীয়মান ছবি 'প্রশ্ন' সম্বন্ধে জনৈক চিত্রামোদীর প্রশ্ন: ছবিটির মুক্তি পেতে কত দেরি? সুশীল মজুমদার পরিচালিত এই অনন্যসাধারণ কাহিনীটির ব্যাপারে অনুরূপ আগ্রহশীল। কতো ছবিই তো উঠছে, কিন্তু এর নামের ধরণে ঔৎসুক্য জাগে অসীম আর তাইতে সকলের এতো ব্যস্ততা।

এস, বি, প্রোডাকসন্স

এবার তুলছেন 'হরিলক্ষ্মী'। শরৎ-সাহিত্য নিয়েই এঁদের এখন যা-কিছু প্রচেষ্টা। তবে পরিচালনার ভার পেয়েছেন এ ছবির যশস্বী চিত্র-সম্পাদক অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি। চিত্রনাট্য রচনা ও আলোকচিত্র গ্রহণের জন্যে যথাক্রমে নিতাই ভট্টাচার্য ও যতীন দাস নিযুক্ত হয়েছেন। 'হরিলক্ষ্মী'র মহরৎ হয়ে গেছে সেদিন।

কেরাণীর জীবন

আমরা গোটা জাতটাই আজ কেরাণী হয়ে গেছি, কি ভাবে দিনের পর দিন বুকের রক্তে তিলে-তিলে বাঁচিয়ে যাচ্ছি সভ্যতার ধ্বজাধারী আর সব মানুষকে।—আছে, আছে—কেরাণীর জীবন দেখাবার ও দেখবার মত আছে, কিন্তু বিষয়টা এতো সহজ নয়। কাজেই মুভি টেকনিক-কর্ণধারগণকে অনুরোধ জানাই, তাঁরা যেন তাঁদের পূর্ব সুনামের দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলেন। এতে সে যশ সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে।

দিবাকর চিত্র

'দিবাকরী', 'থার্ড ক্লাশ' প্রভৃতির বরেণ্য রচয়িতা স্বর্গত রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নতুন করে খুলতে চলেছেন সেলুলয়েডের ফিতেয়। একটি মাত্র নাটক লিখে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন স্বর্গত মৈত্র মহাশয়। এর কল্যাণে কানন দেবী, জহর গাঙ্গুলী সাধারণ্যে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সে-যুগে। অতি আপনার এই কাহিনীটিকে নতুন ভাবে রূপায়িত করলে ভালোই হবে মনে হয়। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের চিন্তাধারার প্রশংসা করি।

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ

সত্যনারায়ণ পিকচার্সের ভক্তিমূলক ছবি। দ্রুতগতি এগিয়ে চলেছে এর চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োয়। পরিচালনা করছেন হরি ভঞ্জ।

জেমিনীর 'মিঃ সম্পত'

জেমিনী "চন্দ্রলেখা"র রাজকুমারী, "নিশান" ও "মঙ্গলা"র ভানুমতী এবং "সংসার"-এ পুষ্পাবলী ও বনজাকে চিত্রামোদীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এবার তাঁরা এক নূতন নৃত্য-পটীয়সী তারকা পদ্মিনীকে চিত্রামোদীদের নিকট উপস্থিত করছেন "মিঃ সম্পত" চিত্রের মধ্য দিয়ে। এই ছবিতে পদ্মিনী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন। পদ্মিনী ছাড়া এই ছবিতে অভিনয় করেছেন বনজা, মতিলাল এবং আরও অনেকে।

বিধ্বস্ত বাঙ্গালী সমাজ

"পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীকে তাহার পূর্ব্ব-গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আমরা তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু ইহা কি উপায়ে হইবে? বাঙ্গালী জাতি ১৯৪৩ সাল হইতে দুর্ভিক্ষে এবং দেশ বিভাগে বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই দশ বৎসরে বাঙ্গালী জীবনযাত্রার সর্ব্বক্ষেত্রে যতটা নিজ দেশে পরবাসী হইয়াছে এমন বোধ হয় আগে হয় নাই। একমাত্র ফুটপাথের হকারবৃত্তি ছাড়া জীবিকা অর্জ্জনের প্রায় সর্ব্বক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী একরূপ বিতাড়িত। চাকুরীতে মাদ্রাজী, কণ্ট্রাক্টে ও যানবাহনে পাঞ্জাবী, কল-কারখানায় বিহারী, ব্যবসা-বাণিজ্যে মাড়োয়ারী—বাঙ্গালী সর্ব্বত্র এক প্রচণ্ড এবং অসম প্রতিযোগিতায় পর্য্যুদস্ত। ব্যাঙ্ক, কল-কারখানার মালিক কেহই বাঙ্গালীকে সাহায্য করিতে চায় না। নিজের গভর্ণমেণ্টও বিমুখ। বিহার গভর্ণমেণ্ট নিজ প্রদেশে বিহারী ভিন্ন অন্য সমস্ত নিয়োগ বন্ধ করিয়াছে, কল-কারখানাতেও বিহারী নিয়োগে বাধ্য করিতেছে। বিহারের শ্রেষ্ঠ কারখানায় যাহাতে বিহারী নিয়োগের সুবিধা হয়, তাহার জন্য বিহার সরকার যোগাযোগ অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বাদ দিয়া নিয়োগ বোর্ডের বৈঠক করা যায় না। আমাদের গভর্ণর কাজে কিছু না করিয়া যদি কেবল বক্তৃতা দিয়াই নিবৃত্ত হন, তবে আর জাতি বাঁচিবে কিরূপে? আজিকার সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রে সরকারী সহযোগিতা ছাড়া বিধ্বস্ত বাঙ্গালীর সমাজ ও জীবনের পুনর্গঠন সম্ভবপর নহে।"

—দৈনিক বসুমতী।

হাওড়ার দুর্গতি

"হাওড়া একটি চিরস্থায়ী ঘাটতি জেলা। এই জেলায় ১২ মাসের মধ্যে মাত্র ৩ মাসের খাদ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাকী ৯ মাসের খাদ্য আমাদের বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। অন্য স্থানের ধান-চালের উপর আমাদের নির্ভর করিতে হয় বলিয়া আমাদের চড়া দাম দিতে হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, রূপনারায়ণের অপর পারে মেদিনীপুরে যখন ধানের দাম মাত্র ১০ টাকা তখন নদীর এপারে হাওড়া জেলার অধিবাসীদের দ্বিগুণ মূল্যে অর্থাৎ ২০ টাকা মণ দরে ধান কিনিতে হয়। এই অবস্থার হাত হইতে বাঁচিতে হইলে খাদ্য-শস্যের বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। হাওড়া জেলার মধ্যে যে পরিমাণ জমি আছে তাহা ঠিকমত ফসল হইলে, জেলার ঘাটতির পরিমাণ অনেকটা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা আছে। জল-নিকাশের বন্দোবস্তের অভাবে এই জেলার এক বিরাট পরিমাণ অংশের জমির ফসল নষ্ট হইয়া যায়। আবার সেচের অভাবেও বহু পরিমাণ জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকে। সুচিন্তিত পরিকল্পনায় যদি কেতুয়া, সরস্বতী, যাদারিয়া, মোঁসোপাটি, বাঘারখোলা, সাবগাশতলা, মজাদামোদর, হাওড়া ড্রেনেজ প্রভৃতি খাল ও উপ বা শাখানদীগুলির উপযুক্ত সংস্কার সাধন করা হয়, তাহা হইলে এই সব এলাকার জমিগুলিতে শস্য উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি হইতে পারে। একমাত্র কেতুয়া মাঠে অবস্থিত জমি হইতেই, বর্ত্তমানে সমগ্র হাওড়া জেলায় যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয় সেই পরিমাণ ধান উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কটের দিনে হাওড়া জেলায় শস্য বৃদ্ধি করিতে হইলে কেতুয়া পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্য্যকরী করার জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আবেদন জানাইতেছি।"

—হাওড়া পত্রিকা।

শিলচরের অন্ন-সমস্যা

"গত অক্টোবরের বন্যার পর শিলচরে চাউল বিনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণ চাউল সংগ্রহের হয়রাণি হইতে বাঁচিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে চাউল খরিদ করিতে হইলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চাউল বাজার হইতে খরিদ করিতে পারিত। কিন্তু গত ২২শে নবেম্বর হইতে আবার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। বাজারে এক মুষ্টি চাউলও পাওয়া যায় না। রেশনে যে চাউল দেওয়া হয় তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের। সম্প্রতি আটাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে অথচ চাউলের বরাদ্দও বাড়ানো হয় নাই। ইহাতে জনসাধারণের কষ্টের একশেষ হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ-প্রথা অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া অথবা বহুল পরিমাণে শিথিল করিয়া দেওয়া উচিত। আর যদি তাহা সম্ভবপর না হয় তবে চাউলের বরাদ্দ এমন ভাবে বাড়াইয়া দেওয়া উচিত যে, পেটভরা দেওয়া চলে।"

—জনশক্তি।

লেভী প্রথা

"পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের লেভী প্রথা সবে সুরু হইতেছে। সর্ব্বত্রই আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। যে পরিমাণ ধান্ত মাপ করা হইবে বলা হইয়াছে এবং চাষের খরচ বাবদ যাহা বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা অবাস্তব। ইহা ব্যতীত সরিষার মধ্যেই কি ভাবে এবং কত পরিমাণ ভূত থাকে তাহা কাহারও অজানা নয়। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি পুনর্ব্বিবেচনা করা প্রয়োজন। নচেৎ আগামী বৎসর পশ্চিম-বাংলায় ধান্ত চাষ আশঙ্কাজনক ভাবে হ্রাস পাইবে। ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ খুব একটা অসম্ভব বিষয় নহে। দেশের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় এই শস্য সরকারের জন্য সংগ্রহ করিয়া দিবে, স্বাধীন দেশের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক পথ। কিন্তু দেশবাসী জনসাধারণকে বৃথা সরকারী জুলুমের সম্মুখীন হইতে হইতেছে—দলগত রাজনীতির, বেদরদী সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দের ও অতি চতুর ব্যবসায়ী কুচক্রের গণ্ডী অতিক্রম করাইবার মত দেশে বলিষ্ঠ সৎ নেতৃত্বের অভাব থাকার জন্য এবং দেশবাসীর অধিকাংশ "স্বাধীনতা" প্রকৃত প্রস্তাবে যে কি বস্তু তাহা সম্যক্ ভাবে না জানার জন্য। প্রত্যেকের দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার জন্য বহু বিড়ম্বনার সৃষ্টি হইতেছে।"

—লেভী প্রথা।

গুপ্ত আয় ?

"পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমহাবীর ত্যাগী জানাইয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নোক্তরূপ গোপন আয় প্রকাশ করা হইয়াছে—

আসাম	১,২৮,১২,০০০ টাকা
বিহার ও উড়িষ্যা	১০,০০,৪৪,০০০
বোম্বাই সহর	৮,০১,৩৫,০০০
বোম্বাই উত্তর	৫,০২,৫১,০০০
বোম্বাই দক্ষিণ	৬২,৪৭,০০০
বোম্বাই মধ্য	৬৬,৯৭,০০০
কলিকাতা মধ্য	৯৭,০১.০০০
পশ্চিমবঙ্গ	২২,৯৭,৬২,০০০
দিল্লী	২,২০,১০,০০০
মধ্য-প্রদেশ ও ভূপাল	১,৩২,৭৪,০০০
মাদ্রাজ	৫,২০,৯৬,০০০
পাঞ্জাব	১,৮৭,৭৩,০০০
উত্তর প্রদেশ	১০,৮১ ৫৬,০০০
হায়দরাবাদ	২৫,১৪,০০০
মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	৬৮,২৬,০০০
মোট	৭১.৯২,৯৮,০০০

দেখা যাইতেছে, মোট গুপ্ত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে। বাঙ্গালীকে লুঠ করিয়া টাকাটা উঠিয়াছে। অথচ দেশমুখ এওয়ার্ডে পশ্চিম-বাঙ্গলা আয়করের ভাগ পায় ১৩½, ৩৩⅓ নহে।"

—যুগবাণী।

বাংলা ভাষা

"মানভূম থেকে বাংলা ভাষা উচ্ছেদের চক্রান্ত চলিয়াছে। স্কুলের খাতা-পত্র হিন্দিতে রাখার জন্য আদেশ জারী হইয়াছে। এমন কি বঙ্গভাষাভাষী শিক্ষায়তনের জন্য বাংলায় অজ্ঞ পরিদর্শক নিযুক্ত [illegible]।"

—[illegible]।

কংগ্রেসী পুরস্কার ?

"কংগ্রেস সরকারের প্রথম পুরস্কার বাংলার কৃষিজীবীর ঘরে-ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ৩০ বিঘার অতিরিক্ত যার জমি আছে কিছুমাত্র গোপন না রাখিয়া সরকারকে জানাইতে হইবে; ভুলভ্রান্তি গোপন হইলে অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড হইবারও ভয় আছে। যত দিন আইন সভার বৈঠক চলিতেছিল, তত দিন এ আইন জারী হয় নাই। যেই বৈঠক বন্ধ হইল, গোপন বৈঠকে মন্ত্রী মহোদয় এই ফতোয়া জারী করিলেন। সারা দেশের চাষীর মাথায় বাজ পড়িল। জনপিছু ৭/০ মণ ধান রাখিয়া বাকী সব দিতে হইবে, দাম করিবেন খরিদ্দার স্বয়ং, ইহাতে যার মাল তার কোনও হাত থাকিবে না। "যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই।" দেশের লোক শতকরা ৯০টি অশিক্ষিত, তাহারা ফরম পূরণ কি করিয়া করিবে? চাষী কেরাণী পাইবে কোথায়? আবার চাষীকে দৈনিক ধান্য ও চাউলের জমা-খরচ রাখিতে হইবে। তবেই ত মুস্কিল, টীপসহি করা মোড়লকে একজন কর্ম্মচারী বাহাল করিতে হইবে। যাহাদের বাস্তবজ্ঞান নাই তাহারা রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া যা-খুসী তাই করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা প্রকৃতই নির্য্যাতন ছাড়া আর কি! আজ চাষী সহরের উকিল, মোক্তারের বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে নিতান্ত অসহায় ভাবে। খতিয়ান নাই, দাগ-নম্বর জানে না। খতিয়ান উই পোকায় খাইয়াছে নয়ত হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু জোর তলব স্বল্প মেয়াদ রিটার্ণ দিতেই হইবে। যাহারা কংগ্রেস-প্রীতিতে পড়িয়া ভোট দিয়া কর্ত্তাদিগকে মসনদে বসাইয়াছে, আজ "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি" পুরস্কার পাইয়া হতভম্ব হইয়াছে। ভাবিতেছে, "এই কি লভিনু শেষে" অনাহারে অনিদ্রায় কংগ্রেস-সমর্থন জন্য চীৎকার করিয়া? না বুঝিয়া কানুর পীরিতে পড়িয়া আজ চাষী কাঁদিয়া আকুল। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলকে খাওয়াইবে কেন্দ্র, ইহা স্থির হইয়াছে। এখন যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই, দেশের অবস্থা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবু এই ব্যাপক ধান সংগ্রহ কেন? অভাব বজায় না রাখিলে ঘুষ বেপরোয়া চালান যাইবে না বলিয়াই কি এই ব্যবস্থা? লোকে গত বছর খাইতে পায় নাই। এবার দুমুঠা খাইবে, অপর সকলকে খাওয়াইবে, দুস্থ আত্মীয়কে কিছু দিবে, হায়, সে পথে কণ্টক! মা-লক্ষ্মীকে গোলায় তুলিয়া সাঁজ-ধূপ দিবে, প্রণাম করিবে, এই ছিল কামনা, কিন্তু এ সাধে পড়িল বাজ! রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, কাদা মাখিয়া ধান উৎপাদন করিয়াছে ভাজই—দাও সব সরকারী গোলায় তুলিয়া, তার পর সারা বছর আধপেটা খাও। এই হইল পুরস্কার? এখন কংগ্রেসীরা কোথায়? যাহারা কংগ্রেসীকে ভোট দিয়াছে—তাহারা এখন সে প্রার্থীকে খুঁজিয়া পায় না—তিনি এখন লুকাইয়া বেড়াইতেছেন। দেশে এ যেন আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নিরক্ষর, মূর্খ চাষীরা ইহার প্রতিবাদ করিতে পারিতেছে না। আগে যদি জানিতাম কানুর পীরিতি এমন চাতুরীপূর্ণ—তাহা হইলে কি আর কংগ্রেসের সঙ্গে প্রেমালাপ করিতাম—এই লোকের মুখের বাণী। মূর্খ অজ্ঞ চাষী ক্ষেতের ধান দেখিয়া বুক ফুলাইয়াছিল—এখন হঠাৎ সরকারী নোটিশ পাইয়াছে, তার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

—বীরভূমের ডাক।

চা-শিল্পে সঙ্কট

"যে কারণেই হউক, হঠাৎ চায়ের বাজার অস্বাভাবিক মন্দা হইয়া পড়ায় এবং ব্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজনীয় টাকা না পাওয়ায় অনেক বাগান চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। তদুপরি ভারত সরকারের রপ্তানী-শুল্ক, আবগারী কর, আয়কর, চা-শুল্ক ইত্যাদি এবং রাজ্য সরকারের বিক্রয়করাদির বোঝা বহন করিতে হয় বলিয়া নীলামের চায়ের বিক্রয়-মূল্য অপেক্ষা উৎপাদন ব্যয় অধিক পড়িতেছে এবং ফলে অনেক চা-কোম্পানীর পক্ষেই টিকিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এতৎসম্পর্কিত নিত্য নূতন আইন-কানুন ও অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ মালিক ও শ্রমিক উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর হইতেছে—এরূপ অভিযোগও শোনা যাইতেছে। অন্য দিকে এ-কথাও অনস্বীকার্য্য যে, যুদ্ধের বাজারে চা-বাগান সমূহ অস্বাভাবিক ভাবে প্রচুর লাভ করিবার সুযোগ পায় এবং সেই সময় হইতেই ক্রমশঃ অনভিজ্ঞ পরিচালনায় চায়ের উৎকর্ষ হ্রাস পাইতে থাকে। বিদেশে ভারতীয় চায়ের সুনামও আজ নষ্ট হইয়াছে এবং চাহিদাও কমিয়াছে। এক্ষণে সরকার, চা-বাগানের মালিকগণ ও জনপ্রতিনিধিগণ একযোগে চা-শিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সচেষ্ট না হইলে বর্ত্তমান পরিস্থিতির সুমীমাংসা হইবে না। প্রয়োজন বোধে সরকারী ঋণদান ও অন্যান্য সাহায্য ব্যবস্থা, করভার লাঘব, বিদেশে ভারতীয় চায়ের সুনাম বৃদ্ধি, ভারতের অভ্যন্তরে চায়ের মূল্য হ্রাস ও উৎকৃষ্ট চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যয়-হ্রাস, বাগানের পতিত জমি ও বনজ সম্পদের সদ্ব্যবহার দ্বারা আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে সুব্যবস্থা করিতে পারিলে চা-শিল্পের কথিত সঙ্কট কাটাইয়া উঠা নিশ্চয়ই অসম্ভব হইবে না।" —যুগশক্তি।

বেকার সমস্যা

"সর্ব্বপ্রথম সুযোগ গ্রহণের হেতু বাঙ্গালী একদিন কেরাণীগিরির যে সুযোগ সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া লাভ করিয়াছিল, অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী আজ সে সুযোগ হারাইয়াছে। অপরের উপর অভিমান করিয়া অথবা দোষারোপ করিয়া কালাতিপাত করিতেছে। বেকার সমস্যা বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে। বেকার সমস্যা সমাধানের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে আজ সর্ব্বপ্রথম পশ্চিম-বাংলার অধিবাসীকে নিজস্ব কৃষি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লইতে হইবে। অন্যথায় অপরের প্রতি দোষারোপ করিয়া অথবা নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়া কর্ত্তব্য এড়াইয়া যাওয়া সহজ হইবে। প্রকৃত বেকার সমস্যা সমাধানের কোন সন্ধান মিলিবে না।"

—বর্দ্ধমানের কথা।

মানভূমের খাদ্যনীতি

"আমরা জানি, বিনা পারমিটে অন্য প্রদেশ—যথা বাংলা হইতে চোরাই চাউল আমদানী করিয়া খরিদ করা সম্বন্ধে বিহার গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এবং চোরাই চাউল খরিদের ব্যবস্থার সুবিধার জন্যই মানভূম জিলাকে উদ্বৃত্ত জিলা বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাঁকুড়ার চাউলের সহিত মানভূম জিলার চাউলও পাচার করিয়া জেলার অশেষ দুর্দ্দশা করা হইতেছে। মানভূমে খাদ্যনীতির নিষ্ঠুর অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে বিহার গবর্ণমেণ্টকে এবার আমরা পূর্ব্বাহ্নেই বিবেচনার সহিত কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছি। কারণ, ইহার ফলে জিলার খাদ্যাবস্থা অদূর ভবিষ্যতে যদি সঙ্কটাপন্ন অবস্থা পরিগ্রহ করে তবে কেবল আইন অথবা পুলিশের লাঠির জোরে তাহার প্রতিবিধান করা যাইবে না।" —মুক্তি।

মেজাজ দেখাইতে হইবে

"মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয় মধ্যে যেন একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছিলেন, আবার একটু তৎপর হইয়াছেন মনে হইতেছে। ই, আই, আর, স্কুলের সম্মুখে পুনরায় ব্লিচিং পাউডার ও চূণ ছিটান হইতেছে দেখিতেছি। আমরা বলি কি, ইহা যেন ছিটান বন্ধ না হয়। তাহা হইলে গন্ধে রাস্তা চলা দায় হইবে যে! আর বাকী ট্যাক্স এখনও অনেক বাকী, যে হারে আদায় হইতেছে তাহাতে কাজের সুবিধা হইবে না। একটু মেজাজ দেখাইয়া ও শক্ত হইয়া সমস্ত আদায় করিয়া ফেলিতে পারিলে আমরা দুই হাত তুলিয়া তাঁহার জয়গান করিতে পারিব। বসু মহাশয় আমাদের ঐ সুযোগ দিবেন কি?" —আসানসোল হিতৈষী।

সার্কাসে নগ্ন নারী

"নগাঁও সহরে কমলা সার্কাস নামক একটি সার্কাস পার্টি জনসাধারণকে অর্থের অপব্যয় করিয়া নিজেদের অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে সব খেলা দেখাইতেছে তাহা একেবারেই বাজে, এবং সভ্য সমাজে অর্দ্ধনগ্ন মেয়েদের আসরে নামাইয়া ক্রীড়া প্রদর্শন করানোতেও নৈতিক মান নীচু স্তরে নামিয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্কুল-কলেজের ছাত্র ও মাতা-পিতার সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা এই সব খেলায় মেয়েদের এইরূপ নগ্ন রূপ দেখিয়া সাময়িক উত্তেজিত ও চারিত্রিক অধঃপতিত হইতে বাধ্য। সুতরাং নগাঁও জেলার ডেপুটী কমিশনার ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় অগোণে নগ্ন রূপ নিয়া যাহাতে কোনও খেলা প্রদর্শিত না হয়, সেই ব্যবস্থা করিবেন কি?" —পূরবী।

টোলের অপমৃত্যু?

"জনৈক পথচারীর জিজ্ঞাসা। 'মশায়, এই সহরের কলেজ, বালিকা বিদ্যালয়, নয়া প্রস্তাবিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্যে অর্থ সংগ্রহের অভিযান হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান টোলের নাম নাই কেন?' বন্ধু! রামরাজ্যে বাস কর্চ্ছো,—তুমি ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ নাগরিক—ওটা যে একেবারেই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, ওটা মৃত্যুবরণ কর্ল্লে ক্ষতি কি? আমরা "টোল"কে শুধু বলতে অনুরোধ করি—"ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কী দেখাও ভয়?"

—রাঢ় দীপিকা।

কর্ত্তৃপক্ষের গাফিলতী

"এমন অভিযোগও রহিয়াছে যে, ১৯৫১ সালের শেষাশেষি হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত সময়োচিত বেতন ও ভাতা ইত্যাদির বরাদ্দ করত পিয়নের স্থায়ী পদ সৃষ্টির আবেদন জানাইয়া ক্রমাগত পত্রাঘাত করা সত্ত্বেও "নিউকোর্স ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে" ছাড়া আর কোনো সাড়াশব্দ পশ্চিমবঙ্গের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নিকট হইতে পাওয়া

যায় নাই। ইতিমধ্যে বহু চায়ের কাপে তুফান উঠিল, ভাগ্যহতদের ভোগান্তি চরমে আসিয়া ঠেকিল, তবু সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার 'কোর্স' এখনো 'ডিউ' হইল না। অনেক স্থলে গ্রামবাসীদের দেওয়া চাঁদা বন্ধ হওয়ার ফলে এবং ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক চাপে পিষ্ট পোষ্টাল পিয়নরা চিঠিবিলির কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে গ্রাম গ্রামান্তরের অধিবাসিগণ নিজ-নিজ চিঠিপত্রাদি লইবার তাগিদে পোষ্টাপিসে আসিতে বাধ্য হইতেছেন। কষ্টবৃদ্ধির কথা বাদ দিলেও ক্ষয়-ক্ষতি ও অসুবিধা যে ইহাতে কত বাড়িতেছে একমাত্র লাল ফিতার আবেশমুগ্ধ কতিপয় বিভাগীয় কর্ম্মচারী ব্যতীত আর সকলেরই বোধ হয় তাহা বোধগম্য হইবে। শুধুমাত্র একটুখানি কর্ম্মতৎপরতা, বিচার-বিবেচনা ও মানবতা-বোধের কল্যাণে যেখানে এত বড় অভিযোগের অন্ত হইতে পারে, সেখানে কর্তৃপক্ষের এই গাফিলতী অমার্জ্জনীয় অপরাধের সীমানাতেই আসিয়া দাঁড়ায়।"

—পল্লীবাসী।

কেহ ভাবিয়াও দেখেন না

"জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলার সংযোগবিহীন ও বিচ্ছিন্ন অবস্থার বিষয় পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষ সম্যক্ অবগত আছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ইহা না জানিবার কথা নহে। কিন্তু এই জেলায় মাল রেলে আমদানীর বিশেষ কোন সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় নাই। রেলে দ্রুত ও সুলভে উত্তরাঞ্চলের এই দুইটি জেলায় মাল আমদানীর বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিলে এই স্থানের চালানী খাদ্যদ্রব্যাদি এত দুর্ম্মূল্য হইতে পারিত না। রেলের মাশুল ও ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব ধরিয়া চালানী মালের যে মূল্য পড়তা অনুযায়ী হয়, তাহা অন্য স্থান অপেক্ষা দ্বিগুণ অথবা তিন-চার গুণ অধিক। বহু চালানী দ্রব্যাদিও এই জেলার জনসাধারণের ক্রয়শক্তির বাহিরে। এই জেলার বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা জেলায় উৎপন্ন হয় তাহাতে জেলার প্রয়োজন আদৌ মিটিতে পারে না। জেলা ও সহরের জনসংখ্যাও তিন বা চার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া সরবরাহ বিভাগ মারফৎ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রেলপথে এই অঞ্চলে দ্রুত ও সুলভে মাল আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তবে এই অঞ্চলের এই দুর্ভোগ হইত না। এই অঞ্চলে আমদানীর জন্য মাশুলের হার সুলভ হওয়া প্রয়োজন, কারণ, নিতান্ত অবস্থার বিপাকে এই অঞ্চলের দূরত্ব এত অধিক হইয়াছে। পাঁচটি বৎসর নির্ব্বিবাদে এই ভাবে গত হইল। মানুষ দুঃখ-কষ্টে দুর্ম্মূল্যতার মধ্য দিয়াই চলিয়াছে। এই অঞ্চলে পদার্পণ অনেকেই করেন, কিন্তু এখানকার অবস্থাটা কেহ ভাবিয়াও দেখেন না। তাঁহাদের বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।" —ত্রিস্রোতা।

জেলা বোর্ডের প্রয়োজন কি ?

"সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও নলকূপের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জেলা বোর্ডের তিনটি অঙ্গ প্রায় নষ্ট করিয়া দিয়াছেন; রোড বোর্ড রাস্তা লইতেছেন, স্কুল বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় লইয়াছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ মধ্য-বিদ্যালয় লইতে চলিয়াছেন। রিলিফের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই আছেন। অতএব জেলা বোর্ডের দপ্তর রক্ষার সার্থকতা কোথায়? রাখিলে দায়িত্ব পালনের উপযোগী অর্থ ও ক্ষমতা কোথায়? আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান অবস্থায় জেলা বোর্ড অপ্রয়োজনীয়, ইউনিয়ন বোর্ড "বেখাপ্পা", সামঞ্জস্যহীন। পল্লী অঞ্চলের স্বায়ত্ত-শাসন প্রয়োজন; ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড ইহার উপযোগী প্রতিষ্ঠান নহে। ক্ষমতায় ও আয়তনে ইউনিয়ন বোর্ডকে বাড়াইয়া থানায় থানায় থানা বোর্ড করিলে এই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে।'

—দৃষ্টি।

প্রার্থনা

"মেদিনীপুর জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবি, এল, ঘোষ মহোদয় সত্বর অন্যত্র বদলী হইবেন জানিয়া অনেকেই সরকারের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, তাঁহাকে মেদিনীপুরে যথোপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত রাখা হউক। ইঁহার গুণগ্রাহিতায় সকলেই মুগ্ধ। ইঁহার কর্ম্মকুশলতায় সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরাও এই অভিমতই জানাইতেছি।" —মেদিনীপুর হিতৈষী।

শোক-সংবাদ

"বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, স্বরাজ্য দলের অন্যতম নেতা, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীহেমন্তকুমার সরকার (৫৮) ১০ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। হেমন্তকুমার নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এনট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পরে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। শ্রীযুক্ত সরকার কিছু কাল প্রেসিডেন্সী কলেজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগেও শিক্ষক ছিলেন। বিদেশে যাবার জন্য তিনি "ষ্টেট স্কলারশিপ' প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। স্বরাজ্য দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি কৃষ্ণনগর হইতে বঙ্গীয় আইন সভায় নির্ব্বাচিত হন। সেই সময় তিনিই সর্ব্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। শ্রীযুক্ত সরকার কয়েকখানি সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী ও তিন পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন একনিষ্ঠ দেশসেবকের অভাব ঘটল।

"অবিলম্বে পৃথক অন্ধ্র প্রদেশ গঠনে"র দাবীতে শ্রীযুক্ত পটি শ্রীরামুলু গত ১৯শে অক্টোবর হইতে অনশন আরম্ভ করেন। ১৫ই ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণতম সলিসিটর এবং খ্যাতনামা সলিসিটর স্বর্গত নিমাইচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র বসু (৮৪) ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

মাসিক বসুমতী
পৌষ, ১৩৫১

একটি মুখ
—শীতাংশু ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত

একটি মুখ

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয় খণ্ড] [তৃতীয় সংখ্যা

পৌষ

১৩৫৯

৩১শ বর্ষ
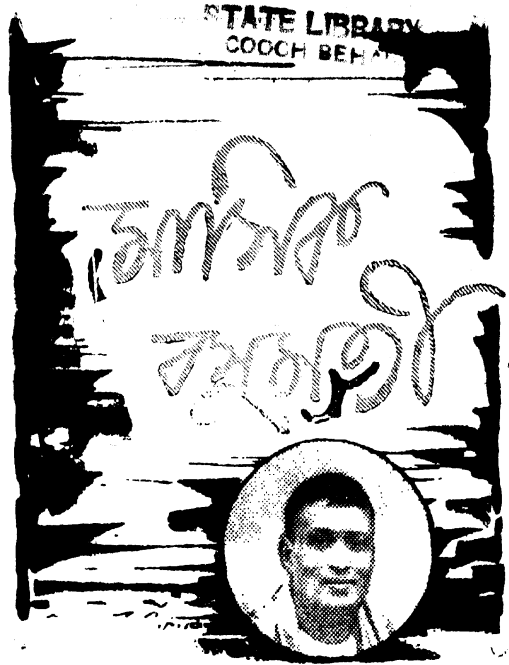
ক থা মৃ ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "কেশব, তুমি কিছু বল ; এরা সকলে তোমার কথা শুনতে চায়।"

কেশবচন্দ্র। (বিনীত ভাবে সহাস্যে) এখানে কথা কওয়া কামারের নিকট ছুঁচ বিক্রী করতে আসা !

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) তবে কি জান, ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে, আমিও একবার টানলাম।

(সকলের হাস্য)

—বেলা ৪টা। কালীবাড়ীর নহবতে বাজনা শোনা যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। (কেশব প্রভৃতিকে) দেখলে কেমন সুন্দর বাজনা, তবে কেবল একজন পোঁ করছে, আর একজন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগ-রাগিণীর আলাপ করছে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পোঁ করব—কেন শুধু সোঽহং সোঽহং করব। আমি সাত ফোকরে নানা রাগ-রাগিণী বাজাব। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করব। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর সব ভাবে তাঁকে ডাকব—আনন্দ করব, বিলাস করব।

কেশবচন্দ্র সেন। জ্ঞান ও ভক্তির এরূপ আশ্চর্য্য, সুন্দর ব্যাখ্যা কখনও শুনি নাই। আপনি কত দিন এরূপ গোপনে থাকবেন—ক্রমে এখানে লোকারণ্য হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ও তোমার কি কথা। আমি খাই দাই থাকি, তাঁর নাম করি। লোক জড়করা-করি আমি জানি না। কে জানে তোর গাঁইগুঁই, বীরভূমের বামুন মুই। হনুমান বলেছিলেন—আমি বার, তিথি, নক্ষত্র ও-সব জানি না, কেবল এক রামচিন্তা করি।

কেশবচন্দ্র সেন। আচ্ছা, আমি লোক জড় করব। কিন্তু আপনার এখানে সকলের আসতে হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। আমি সকলের রেণুর রেণু। যদি দয়া করে আসেন, আসবেন।

কেশবচন্দ্র সেন। আপনি যা' বলুন, আপনার আসা বিফল হবে না।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তপ্রসঙ্গ

(মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর অপ্রকাশিত ডায়েরী অবলম্বনে)

শ্রীঅনিল গুপ্ত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগান-বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। ঠাকুরের কঠিন পীড়া, ডাক্তারগণের যাহাতে দেখা-শুনার সুবিধা হয় ও অধিকাংশ ভক্ত কলিকাতায় থাকেন, তাহাদের দক্ষিণেশ্বর সব সময় যাওয়ার সুবিধা না হওয়ায় ও শ্যামপুকুরের বাটীটি তেমন আলো-বাতাস ও স্বাস্থ্যকর না হওয়ায় এই বাগান-বাটীটি তাঁহার বাসের জন্য ভক্তেরা ঠিক করিয়াছেন।

ঠাকুরের রোগ সম্বন্ধে প্রায় সকল ডাক্তারই একমত যে, রোগ দুঃসাধ্য। এই সংবাদে ভক্তগণ সর্ব্বদাই বিষাদপূর্ণ, মনে না আছে আনন্দ, না আছে ফূর্ত্তি, না আছে শান্তি। ভক্তেরা সকল সময়েই ভাবেন, কি তাঁর ভালবাসা, কি তাঁর কৃপা, কি তাঁর স্নেহ! এত অসুখ কিন্তু এক চিন্তা, কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়! যখনই কোন ভক্তের মনে সংশয় বা সংসার-যন্ত্রণায় অশান্তি আসিয়াছে, শান্তি তাঁহারা পাইয়াছেন একমাত্র কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহপূর্ণ কোলে। যখনই তাঁহারা কোন বিপদে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে বাজিয়া উঠিয়াছে, সেই করুণ আর্ত্তনাদ সর্ব্বপ্রথম। ঠিক মা যেমন বিপদগ্রস্ত সন্তানের জন্য ব্যাকুলা হয়ে অস্থির ভাবে বিচরণ করেন সেইরূপ। তিনি ভক্তদের পিতা, তিনিই ভক্তদের মাতা! তাঁহার কৃপা ও স্নেহস্পর্শে দিয়েছেন মনে বল, প্রাণে দিয়েছেন শান্তি, দূর করিয়াছেন অহঙ্কার, প্রাণে জাগাইয়াছেন সত্য সন্ধানে

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মশায়)

আকুলতা! অবারিত দ্বার, আনন্দের হাট বসাইয়া রাখিয়াছেন সর্ব্বক্ষণ—এ বিষয়-আনন্দের হাট নয়, এ যে হরিপ্রেমরসের হাট!

আজ ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৫ খৃঃ। গিরিশ ও মাষ্টার কাশীপুর যাত্রা করিলেন। পথে অবতারতত্ত্ব প্রসঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে—

মাষ্টার—ওঁর এত অসুখ—কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, তবু দেখুন আমাদের সঙ্গে কত আনন্দ করেন কিন্তু নিজের অসুখ ও যন্ত্রণার কষ্ট একেবারে বোধ থাকে না। আমাদের প্রতি তাঁর কতই না কৃপা! কিসে আমাদের শান্তি হয়, কিসে আমাদের মঙ্গল হয়, এইই এক চিন্তা তাঁর মনে। সেদিন আমার আমাসা হ'য়েছে জেনে আমায় বল্লেন, "রামলালের কাছে ঔষধ আছে, খাবে। তিন দিনে সারবে যদি না সারে সাত দিনে নিশ্চয়ই সারবে"। কিন্তু নিজের দিকে কোনই ভ্রূক্ষেপ নাই। আশ্চর্য্য হই, ভগবানের কি লীলা! আমরা সাধারণ জীব কিছু বুঝতে পারি না। আবার ভাবি ঠাকুরের এই রোগ কি যোগমায়ারূপ ছায়ার আবরণ!

গিরিশ—শ্রীরামকৃষ্ণের এই রোগ আর যন্ত্রণা, আমাদের মনে হয় বটে কি ভীষণ কিন্তু উনি অবতার ওঁর দেহ আলাদা। অবতারের দেহ চিন্ময় দেহ, দুঃখ-কষ্টের অতীত। অবতার পুরুষ ভবরঙ্গমঞ্চে যখন অভিনয় করতে আসেন তখন জগৎ প্রপঞ্চের অনুকরণে অভিনয় করে থাকেন। প্রাকৃত জীব আমরা মনে করি, ওঁদের কতই না কষ্ট-যন্ত্রণা, সুখ-দুঃখ। অবতারের দেহ সাধারণ মানুষের মত দেখতে হ'লেও মানুষের মত রক্ত মাংসে গঠিত নয়। অবতারের দেহ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সে দেহে শোণিত শুক্রের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা নিত্য বস্তু! কিন্তু ভগবান যখন নররূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন সাধারণ মানুষ তাঁকে রক্ত-মাংসে গঠিত জীবের মতই মনে করে। ভগবান যোগমায়ার আবরণে থাকেন বলিয়াই জীবের এই ভ্রম কিন্তু যাঁহারা তাঁর ভক্ত, তাঁরই কৃপায় এই আবরণ ভেদ করতে সক্ষম হন ও তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করে থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতে নরাবতার সম্বন্ধে সোজা পয়ারে একটি সিদ্ধান্ত আছে—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহারই স্বরূপ।"

"গীতায় আছে, আমি যখন মানুষরূপে অবতীর্ণ হই তখন জীব সাধারণ আমার স্বরূপ বুঝিতে পারে না; আমাকেও সাধারণ মানুষের মত মনে করে। শ্রীভগবান গীতায় আবার বলেছেন, আমি যোগমায়ার আবরণে আচ্ছাদিত থাকি বলিয়াই সকলে আমার প্রকাশ বুঝিতে পারে না—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।" আবার যার যতটুকু মায়ার আবরণ দূরীভূত হয় সে ততটুকু অংশই বুঝিতে পারে।

"যেমন রঙ্গমঞ্চে Drop Scene পড়ে থাকে আর তার ঠিক পশ্চাতেই অভিনেতারা সজ্জিত অবস্থায় থাকে, Drop Scene ক্রমশঃ উঠতে থাকলে অভিনেতাদের শরীরের অংশ ক্রমশঃ ক্রমশঃ

দেখতে পাওয়া যায়। আর সম্পূর্ণ উঠলে তাদের শরীরের সম্পূর্ণ অংশ দেখতে পাওয়া যায়। সেইরূপ জীবের যখন মায়ার আবরণ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তারাও অবতারের পূর্ণ স্বরূপ দর্শনে সক্ষম হয়।

"আবার এই জগৎ প্রপঞ্চে তিনিই রোগ তিনিই আরোগ্য, তিনিই ছায়া তিনিই আলোক। পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থাবলম্বী বলিয়াই ভগবানের ভগবত্তা। 'কো হি ভগবান? সঃ হি বিরুদ্ধ-স্বভাবঃ। যিনি একই সময় তনুও বটে বৃহৎও বটে। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।' সাধারণ জীবের পক্ষে এই বিরুদ্ধ অবস্থা কখনও সম্ভব হয় না। একই সময় ছোট জিনিস বড় হয় না বা বড় জিনিস ছোট হয় না। তবে যোগ-বিয়োগের দ্বারা হ'তে পারে। ভগবৎকৃপা ভিন্ন অবতারতত্ত্ব অনুভূতিতে আসে না, ধারণা মাত্র হয়। একমাত্র বিশ্বাসে ও তাঁর কৃপা-শক্তিবলে ধারণা ও অনুভূতি উভয়ই হ'তে পারে।

"আমার মনে হয়, এই কষ্ট বা যন্ত্রণা উনি যা দেখাচ্ছেন সেটা বাহ্যিক আর লোকশিক্ষার জন্য, বাস্তবিক ওঁর তাতে কোন কষ্ট নাই। এটা কেবল অবতারের নরলীলায় যোগমায়ার আশ্রয় লওয়ার জন্য অভিনয় মাত্র। আমাদের মায়াপাশ সম্পূর্ণ দূরীভূত না হ'লে ওঁর স্বরূপ উপলব্ধি হবে না। ঠাকুরের বাল্য ও সাধনার অনেক কথাই তাঁর মুখে ও অন্যের নিকট শুনেছেন। এসব অবতার ভিন্ন অন্যে কখনও সম্ভব নয়।

"আবার ভাবি, আমি এমন তো কিছু পুণ্য কাজ করি নাই যার জন্য ওঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পাই ও তাঁর সেবা করতে পাই! এমন পাপ নাই যে আমি করি নাই তবু তিনি আমায় গ্রহণ করেছেন। যখন ওঁকে বললাম, 'আমায় পবিত্রতা দাও।' তা বললেন, 'তুমি পবিত্র তো আছ, তোমার যে ভক্তি বিশ্বাস!' অন্যে আমার বিষয় ওঁর কাছে নিন্দা করায় বললেন, 'ওর তাতে দোষ নাই, সব একে একে যাবে।' নিষেধ তিনি আমায় কিছু করেন নি কিন্তু একে একে সবই যাচ্ছে। আমি ভাবি আমার মত পাপী আছে কি না? তবু ওঁর কথা, 'তুমি পবিত্র তো আছো, তোমার যা ভক্তি বিশ্বাস,' 'ওর তাতে দোষ নাই, সব একে একে যাবে।' এই আশ্বাস-বাণী আমার মনে এক অভূতপূর্ব্ব জোর এনে দিয়েছে যা আমাকে বিস্মিত ক'রেছে। তিনি আমাদের দুঃখ দেখে আর থাকতে পারলেন না তাই নেমে এলেন আমাদের উদ্ধার করতে।

"আমরা যেটুকু তাঁকে জানতে পেরেছি, এ শুধু তাঁরই কৃপা। তিনি যেমন বলেন, 'চাঁদের আলোয় চাঁদ দেখা যায়'।"

"আচ্ছা মাষ্টার মশাই বলুন কি তাঁর অশেষ করুণা!"

মাষ্টার—তাঁর ভালবাসার কোন সীমা নাই! ভগবানে কি সীমা থাকে? তিনি যে অনন্ত; তাঁর না আছে অন্ত, না আছে মধ্য না আছে আদি! তাঁর কৃপা হ'লে কি না হ'তে পারে? ঠাকুর যেমন বলেন 'সরস্বতীর একটি কিরণে পণ্ডিত কাঁপে ও রাস ঠেলা।' Whatever he teaches are beyond human methods. ওঁর মত এমন শিক্ষা আর কাহাকেও কখনও দেখি নাই, ইহা মানুষে সম্ভবে না। যখনই কারু মনে কোন সংশয় এসেছে তিনি কিন্তু ঠিক জানতে পেরেছেন ও তার মনে এমন এক শক্তি দিয়েছেন যার জোরে সে মনে পেয়েছে বল ও মুক্ত হ'য়েছে সেই সংশয় থেকে। তিনি যেমন বলেন, 'পাপী পাপী কেবল বল্লে, পাপীই হ'য়ে যায়, বদ্ধ বদ্ধ কেবল বল্লে বদ্ধই হয়ে যায়।' আপনি যদি কেবল বলেন আমি নীচ, আমি পাপী, আমি এতো খারাপ কাজ করেছি, এই ভেবে ভেবে যদি সদা সর্ব্বদা মন খারাপ করেন তাতে হয়তো আপনার মনের অধঃপতন হওয়াই স্বাভাবিক; তাই ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনার মনে জোর দিয়ে দিলেন ঐ সব ব'লে। এর মানে মনই সব। মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। Paradise lost এ আছে "Mind is its own place, it can make heaven a hell, hell a heaven." আবার শাস্ত্রে আছে, 'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ'।

"ভগবান সরল, শুদ্ধাত্মা ও ভক্তি বিশ্বাসের কাছে ধরা পড়েন। যীশু বলেছেন, 'হে পিতঃ তুমি ধন্য, কেন না তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাছ থেকে নিজেকে গোপন রেখেছ অথচ শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ!'

শিশুদের মন সরল, শুদ্ধ আধার। তাদের মনে বিষয়-বাসনা ঢোকে নাই। তারা তর্ক-বিচার করে না। ঈশ্বর তর্ক-বিচারের অতীত, বিষয়-বাসনার বাহিরে। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, কলিতে নারদীয় ভক্তিই ভাল। একটি গল্প আছে—

"দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে গমন কালে দেখলেন একটি যোগী পা গাছের ডালে বেঁধে মাথা নিচু দিক করে ও তলায় অগ্নিসংযোগ করে কঠোর তপস্যা করছে। যোগী নারদকে দেখে বললেন, 'আপনি বৈকুণ্ঠে যাচ্ছেন ভগবানের কাছে, একবার দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন,
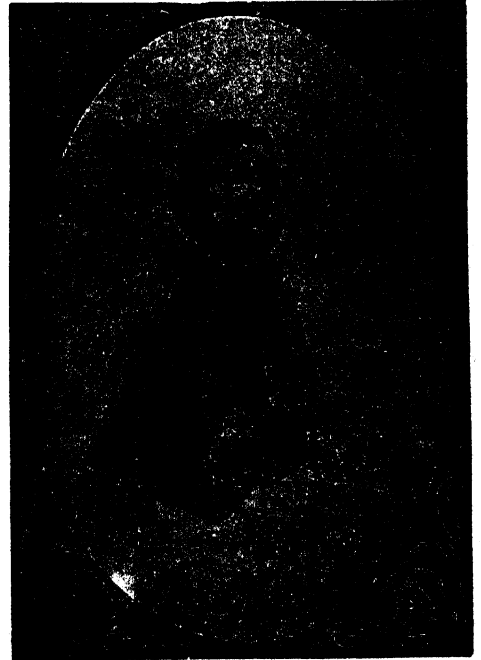
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

আমায় কবে কৃপা ক'রে দর্শন দিবেন।' পরে তিনি কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, একটি পাগলের মত লোক সরোবর-তীরে বসিয়া পা দিয়া জল নাড়িতেছে, গাঁজা পান করিতেছে কিন্তু তার মধ্যেও ভগবানের ভজনা করিতেছে। তিনিও নারদকে দেখিয়া বলিলেন, 'আপনি বৈকুণ্ঠে যাচ্ছেন। একবার দয়া করে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমার প্রতি তাঁর কবে কৃপা হবে।' উভয়ই নারদকে বলিয়াছিলেন ভগবান কি বলেন তাহা জানাইতে। দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়া সকল কথা ভগবানকে বলিলেন। ভগবান ইহার উত্তরে দেবর্ষি নারদকে বল্লেন, 'যোগীকে বলবে, যে গাছে ঝুলে তপস্যা করছে সেই গাছের সব পাতা পড়ে আবার যবে নূতন পাতা গজাবে তখনই সে আমার দেখা পাবে। আর পাগলকে বোলো, আমি এখন একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি আর আমার ছুঁচের ভিতর দিয়ে হাতী গলান কাজ শেষ হ'লে সেও আমার দেখা পাবে।' দেবর্ষি নারদও ঠিক ঠিক ঐ কথাগুলি পরস্পরকে বলিলেন। যোগী সব শুনে মর্মাহত হ'য়ে বল্লে, 'আমার আর এই কঠোর তপস্যা ক'রে কাজ নাই। কবে যে এই গাছের সব পাতা পড়বে আর নূতন পাতা গজাবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নাই।' পাগলটা কিন্তু সব শুনে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে নাচতে আরম্ভ করলো আর বললো, 'তবে পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি!' দেবর্ষি নারদ তার এই আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করায় পাগলটা বললো, 'যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাঁর লোমকূপবিবরে প্রবেশ করাতে এক নিমিষও সময় লাগে না তাঁর আর ছুঁচের ভিতর হাতী গলাতে কতই বা সময় লাগবে?' দেবর্ষি নারদ ভক্তের এই বিশ্বাস ও ভগবানের উপর নির্ভরতায় "ভক্তের জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দ করিলেন।

"ভক্তিপ্রিয় ভগবান কেবল ভক্তি ও বিশ্বাস দ্বারাই সন্তুষ্ট হন, কোন গুণের অপেক্ষা রাখেন না। সরল বিশ্বাসের সহিত যে তাঁকে চায় সে তাঁকে পায়। কঠোর তপস্যাও ভক্তি-বিশ্বাসহীন হ'লে পণ্ডশ্রম হয়। ঠাকুর যেমন বলেন, 'ভগবান মন দেখেন।' ঠাকুরের সেই গল্পটি আপনার মনে আছে, 'দুই বন্ধু, একজন ভাগবত শুনতে গেলো ও আর একজন বেশ্যালয়ে।"

গিরিশ—যা বলেছেন, মন নিয়েই কথা। কোন রকমে মনে জোর করতে পারলেই হ'য়ে যায়। আমরা তো সংসারী লোক, নিজে থেকে মনে জোর করতে পারি না তাই আমাদের দুঃখ কষ্ট দেখে তাঁরা স্থির থাকতে না পেরে কৃপা করে মনে জোর দিয়ে দেন। তাঁর শিক্ষা উত্তম আচার্য্যের ন্যায়। তাঁরই কৃপায় আমার সব দোষ গুণে পরিণত হ'য়েছে। আমি ওঁকে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে দেখি না। আমি ওঁকে এক জেনেছি ঈশ্বরের অবতার আমায় উদ্ধার করতে এসেছেন! জগাই মাধাইয়ের মত মহাপাপী ভগবৎকৃপায় নিমিষের মধ্যে উদ্ধার হয়ে গেছে। জগাই মাধাইয়ের সময় তাদের চেয়ে অনেক ভাল লোক থাকা সত্ত্বেও লোকশিক্ষার জন্য জগাই মাধাইকেই নিত্যানন্দ বেছেছিলেন ও ভগবৎকৃপা পড়েছিল তাদের উপরে। শ্রীরামকৃষ্ণও লোকশিক্ষার জন্য আমাকেই বেছেছেন।

গিরিশের কথাগুলি শুনিয়া মাষ্টার অশ্রুবিসর্জন করিলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আহা! কি ভক্তি-বিশ্বাস! ধন্য গিরিশ, ধন্য তোমার বিশ্বাস! আহা! এই বিশ্বাস যেন সকলের হয়! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুকী কৃপার তুমিই জ্বলন্ত নিদর্শন!"

গিরিশ—আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনার highest ambition কি?

মাষ্টার—যদি যাই গো বাপের বাড়ী স্বামীকে সঙ্গে করি।

গিরিশ—আমার ambition যা পরমহংসদেব বলেছেন, 'যাতে আছিস তাতেই থাক', তবে soldier of God.' আমি soldier of God হ'য়ে থাকবো, যখনই ডাকবেন তখনই প্রস্তুত। আমরা তো ওঁর কিছু করতে পারলাম না। আর দেখছেন তো ওঁর অবস্থা! এর মধ্যেও দেখুন ওঁর ভালবাসা ও কৃপার কোনই ত্রুটি নাই, আমরা কি ছিলাম কি হ'য়েছি! একবার বেশ কিছুদিন পরে তাঁর কাছে যাওয়াতে কেঁদে উঠে বল্লেন, 'তোর কাজ ফুরলে ডুব মারলে আর কেউ দেখতে পাবে না।' কি কৃপা!

"তাঁর তো কিছুই করতে পারলাম না। সংসারে সব সময়েই একটা না একটা ঝামেলা এসে বাধা দেয়। দেখুন মাষ্টার মশাই, এখন তো টাকার প্রয়োজন, তেমন দরকার হ'লে এমন কি বাড়ী বাঁধা দিয়েও যেন দিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।"

মাষ্টার—ঠাকুর যেমন বলেন "তুঁহু তুঁহু", সেই ভাবে থাকতে পারেন। যদু মল্লিক তার মাকে বলেছিলেন, "তুমি ও তোমার জ্ঞান আর আমি ও আমার অজ্ঞান।"

গিরিশ—তা হয় কৈ? পরের ছেলেটির বেলায় তো হয় না।

মাষ্টার—Miracle objected so is Jesus the grand miracle. Jesus, the all sufficient evidence. আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে! 'দাস ভাব', যা উনি দিয়েছেন সেই ভাবেই থাকব।

গিরিশ—তা হয় কৈ?

মাষ্টার—প্রার্থনা করতে হয় কল্পতরুর কাছে। একটি গান আছে—

"আর কিছু চাই নে গো মা!
কেবল তোমার সঙ্গে রবো।"

গিরিশ—অতো সঙ্গে থেকে কি করবেন?

এইরূপ কথা কহিতে-কহিতে গিরিশ ও মাষ্টার কাশীপুর বাগান-বাটীতে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা উপরে আসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া মেঝেতে বসিলেন। ঘরে দেখিলেন নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র প্রভৃতির সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—(দেবেন্দ্রের প্রতি) কিছু কি ভাল দেখছো?

দেবেন্দ্র মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'মনে করলেই সব যায়' কিন্তু পরে বলিলেন—কিছু বলবো আবার রোগ দেখাবেন! (সকলের হাস্য)।

গিরিশ—আচ্ছা, মহাপ্রভু যেমন পাদোদক বলেছিলেন সেই রকম কিছু বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কৈ মনে তো উঠে না, উঠলে বলতাম।

গিরিশ—আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ রোগী আবার শ্রীকৃষ্ণই রোঝা তাতে যেমন একটা উদ্দেশ্য ছিল, আপনার এ রোগেরও একটা উদ্দেশ্য আছেই!

দেবেন্দ্র (গিরিশের প্রতি)—আপনি বললেন শ্রীকৃষ্ণ রোগী আবার শ্রীকৃষ্ণই রোঝা, এর মানে কি?

গিরিশ—রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে একদিন বললেন, 'দেখ আমার সবাই

কলঙ্কিনী বলে।' শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার এই কথা শুনে কলঙ্কভঞ্জনের জন্য একটি নূতন অভিনয় করলেন।

"শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ পীড়িত হ'য়ে পড়লেন। ক্রমে রোগ বৃদ্ধি পেলো। কোন বৈদ্য কোথাও পাওয়া গেল না! শেষে একটি অল্পবয়স্ক সুন্দর মূর্ত্তিবিশিষ্ট রোঝা পাওয়া গেলো। তিনি সকল পরীক্ষা করিয়া উদ্বেগের কোনই কারণ দেখিলেন না। পরে বলিলেন, এই শিকড়টি বাঁটিয়া খাওয়াইলেই তিনি রোগমুক্ত হবেন। তবে একটি কথা আছে, এই শিকড়টি বাঁটাতে যে জল লাগবে সেই জল সহস্র ছিদ্র কলসী করে আনতে হবে, যেন জল না পড়ে। ইহা সম্ভব হবে যদি সতী সাধ্বী নারী ঐ জল আনে। জটিলা কুটিলা অল্প বয়সে বিধবা হ'য়েছে এবং তারা সতী সাধ্বী ব'লে প্রখ্যাত তাই তাদের উপরই এই জল আনার ভার পড়লো। সতীত্বের গর্ব্ব নিয়ে তারা জলও আনতে গেল কিন্তু কাজ কিছুই হলো না, সব জলই পড়ে গেলো। তারাও ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললে, 'এ কখন সম্ভব হয়? এক পাগলের কথায় তোমরাও পাগল হলে!'

"যশোদা পড়লেন ভীষণ চিন্তায়। অত্যন্ত ব্যাকুলা হ'য়ে বললেন, 'তবে আমিই যাই।' তাতে রোঝা চিন্তিত হ'য়ে বললেন, 'ছেলের ঔষধ মার দেওয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।' যশোদা হলেন নির্ব্বাক্। সকলে হলো দিশাহারা। রোঝা সান্ত্বনা দিয়ে সবাইকে বললেন, 'চিন্তার কোনই কারণ নাই, সবই হ'য়ে যাবে।' পরে গণনা ক'রে বললেন, 'এমন কোন নারী নাই যার নামের প্রথম অক্ষর 'রা' ও পরে 'ধ'।' সকলে ভেবে ঠিক করলে রাধা ছাড়া আর তো কেউ নাই। জটিলে কুটিলে বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগলো। যশোদা রাধাকে বলাতে রাধা সহস্রধারা কলসী নিয়ে গেলেন যমুনার কূলে জল আনতে। মনে-মনে ভাবতে লাগলেন, এ কি পরীক্ষা তোমার, একেই তো আমি কলঙ্কিনী, তার উপর আবার এই! সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ ক'রে কলসী ফেললেন যমুনার জলে। জলে দেখলেন সহস্র কৃষ্ণ, একে একে সহস্র ছিদ্র বন্ধ করলেন। রাধিকা সহস্র ছিদ্র কলসীতে করে জল নিয়ে এলেন, এক ফোঁটাও জল পড়লো না। জটিলে কুটিলে হলো নির্ব্বাক্। সকলেই রাধিকার গুণগান করতে লাগলেন। রাধিকা বললেন, 'আমার গুণগান তোমরা করো কেন? বলো কৃষ্ণের জয়, তোমরা কৃষ্ণের গুণগান করো!'

"কৃষ্ণের অসুখের যেমন একটা উদ্দেশ্য ছিল, ওঁরও অসুখের তো একটা উদ্দেশ্য আছেই! (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)।

সকলে গিরিশের কথা একমনে শুনিতেছেন ও অবাক হইয়া গিরিশকে দেখিতেছেন, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। মনে-মনে বলিতেছেন, ধন্য গিরিশ! ধন্য তোমার বিশ্বাস!

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—আর বকাস নি। তুই নীচে যা।

গিরিশ—ঠাকুর! এই যাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করুন এতে যেন আমার কোন অভিমান না আসে।

[গিরিশ ও নরেন্দ্রের প্রস্থান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখছো গিরিশের কি বিশ্বাস! লোককে যেমন ভূতে পায় আমায় গিরিশে পেয়েছে!

"আমার বাবা মারা যাওয়ার পর মা গয়া যাবার জন্য বেরুলেন। আমার ভাই-বোনেরা তখন ১২।১৩ বছরের হবে। তারা মার পেছু-পেছু গিয়ে কাঁদতে লাগলো, 'মা, আমাদের ফেলে কোথা যাও, মা, আমাদের ফেলে কোথা যাও!' মা কিন্তু ঐ কান্না শুনে আর থাকতে পারলেন না, ফিরে আসতে হলো। সেই রকম করে কেউ যদি ডাকে, তিনি কি স্থির হ'য়ে থাকতে পারেন? তাই ঐ রকম করে ডাকতে পারলে আর কি বাকি থাকে?

ঠাকুরের খাবার জন্য কিঞ্চিৎ সুজির পায়স আসিল। মাষ্টার ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও মনে-মনে বলিতেছেন, 'দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম, দেও দেও ও-পদে আশ্রয়!'

সকলে প্রণাম করিয়া নীচে গেলেন। মাষ্টার ও দেবেন্দ্র নীচে আসিয়া দেখিলেন নরেন্দ্র বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন—

নরেন্দ্র (দেবেন্দ্রের প্রতি)—এ ব্যক্তি কি করে। জগতের মধ্যে প্রাণ দিয়ে যাকে ভালবাসে, তাঁরই এই দশা, বাড়ীতে স্ত্রী পাগল আর ছেলেদের কেবল রোগ!

মাষ্টার মনে-মনে বলিতে লাগিলেন—এ সংসার ধোঁকার টাটী ঐ সংসার মজার কুটী!

দেবেন্দ্র—যাঁর ইঙ্গিতে স্বর্গ, তাঁর এই অবস্থা দেখতে হলো!

মাষ্টার—উনি বলেছেন মনে নাই—রাম নামে বিশ্বাসের জোরে হনুমান সমুদ্র পার হলো আর স্বয়ং রামচন্দ্রকে সেতু বাঁধতে হলো! অবতারের লীলা বোঝা শক্ত, তাঁর কৃপা ভিন্ন সম্ভব নয়! ঠাকুর বলেছেন—

"বাউলের দল কত এলো গেলো কিন্তু কেউ চিনতে পারলো না!"

আপনি কি জানেন?

১। ভারতবর্ষ এবং রোমের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক কবে স্থাপিত হয়?

২। কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি যুগের আয়ুষ্কাল কত?

৩। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে ছদ্মনামধারী লেখক যাযাবর এবং রঞ্জন কি একই ব্যক্তি?

৪। বাঙলা ভাষায় প্রথম ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থবিদ্যার অনুবাদ গ্রন্থাবলীর আকারে কে রচনা করেন? গ্রন্থাবলীর নাম কি?

৫। বাঙলা সাহিত্যে 'মহাস্থবির জাতক' গ্রন্থের রচনাকার মহাস্থবির কে?

৬। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ কি বাঙলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানতেন?

৭। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকার কবিকঙ্কণের আসল নাম?

৮। "এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রী মাগধী মিশ্রার্দ্ধ-মাগধী শকা আভীরী প্রবন্তী দ্রাবিড়ী উড়্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহ্লিকাবন্তিকা দাক্ষিণাত্যা পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।" এই উক্তি কে করেছিলেন?

[৩১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

রামকৃষ্ণ পরমহংস

ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ অংশের প্রথম ভাগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বেশী দিনের কথা নহে, কিন্তু আধুনিক সময়ের ইহা একটি পরমাশ্চর্য্য ঘটনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যে সকল মহাপুরুষের বার্ত্তা আমরা কেবল ইতিহাসে, পুরাণে অথবা শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে পাইয়া থাকি, তাঁহাদেরই একজন আধুনিক সময়ে, আমাদেরই মত, আমাদেরই মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা আমরা অনেক সময় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব শুধু আকস্মিক ব্যক্তিগত অভ্যুদয় নহে, যুগধর্ম্মের সমন্বয় ও বিকাশ। পরমহংসদেবের অভ্যুদয়ের মধ্যে বাঙ্গলা দেশের প্রাণই নূতন রূপে ও নূতন চেতনায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিতায়, মঙ্গল কাব্যে অথবা রামপ্রসাদ প্রভৃতির সাধন-সঙ্গীতে যে চিরন্তন আধ্যাত্মিক অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়, তাহাই যেন বর্ত্তমান যুগে আবার নূতন করিয়া এই মহাপুরুষের জীবনীতে অপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষার কৃত্রিম আঘাতে, রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কার যুগ হইতে প্রবর্ত্তিত একটি ধর্ম্মবিপ্লব, স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম এই দুই বিপরীতগামী স্রোতের মুখে বাঙ্গালীর প্রাণকে পরানুকরণের মোহে বিপর্য্যস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। সেই বাহির ও ভিতরের আক্রমণ ও সংঘাতের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতি এই মহাপুরুষের ভিতর তাহার স্বভাব ধর্ম্মের আশ্চর্য্য বিকাশ দেখাইল, এবং আপনার ঘরে আপনিই স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার পথ খুঁজিয়া পাইল। কি করিয়া যে এই নিরক্ষর দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে এরূপ গভীর অধ্যাত্মবোধের সহিত জগতের বিবিধ ধর্ম্মমত ও সাধনার অনুভূতি বিকশিত হইল, তাহার কারণ দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গালী জীবনের বহু বিচিত্র ভাবস্রোতগুলি প্রতিকূল অবস্থার আঘাতে যে বিচ্ছিন্ন বা লুপ্ত হয় নাই, তাহার পরিচয় আমরা পরমহংসদেব ও তৎশিষ্য বিবেকানন্দের অদ্ভুত জীবনধারার মধ্যেই দেখিতে পাই।

পরমহংসদেব ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিলেও অনেক কাল নিভৃত সাধনায় যাপন করিয়াছিলেন, এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। এই আকর্ষণের প্রথম ও অন্যতম প্রধান কারণ হইলেন কেশবচন্দ্র সেন। তখনও বিবেকানন্দ অজ্ঞাত ও অখ্যাত। কিন্তু বিবেকানন্দের বহু পূর্ব্বে মতান্তরাবলম্বী কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের ধর্ম্মসাধনার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা কেশবচন্দ্রের অগৌরবের কথা নহে, ইহাতে তাঁহার অকৃত্রিম ধর্ম্ম-পিপাসা ও উদারতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। এই ঘটনাটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কারণ, ইহা কেবল ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ বা শ্রদ্ধার নিবেদন নহে। কেশবচন্দ্রকে আমরা কেবল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি হিসাবে দেখিব না, গত শতাব্দীতে যে যুক্তিবাদী সংস্কারের যুগ রামমোহন রায় প্রভৃতি প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র সেই যুগের সর্ব্বশেষ ক্ষমতাশালী নেতা, সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি। সেই সংস্কার যুগের যাহা কিছু নূতন আদর্শ তাহাই যেন তাঁহার মধ্যে সংহত হইয়া দেশবিদেশে ঘোষিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন কেবল ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন নহে, ইহা সেই সংস্কার যুগের শেষ ও নূতন সমন্বয় যুগের সূচনার প্রতীকস্বরূপ আমরা গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু কেশবচন্দ্র সামান্যতঃ পরমহংসদেবের অভ্যুদয় স্বীকার করিলেও সম্পূর্ণরূপে তদ্ভাবে ভাবিত হইতে পারেন নাই। যেদিন কেশবচন্দ্রের আদর্শ-সম্পৃক্ত নরেন্দ্রনাথ, সেই আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রামকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিলেন, সেই দিন হইতেই এই পূর্ব্বতন সংস্কার যুগের প্রকৃত পরিবর্ত্তন এবং এক নূতন যুগের বিকাশ ও প্রচারের বীজ দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর মৃত্তিকায় রোপিত হইল।

পরমহংসদেবের চরণে এই দৃপ্ত যুবক নরেন্দ্রনাথের বশ্যতা স্বীকার ও আত্মসমর্পণ এই যুগের ধর্ম্ম ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে উদ্দাম বিদ্রোহের ভাব ছিল, তাহা তাঁহার প্রথম যৌবনে নবোদিত ব্রাহ্মসমাজে যোগদান হইতে বুঝা যায়।

কিন্তু এই সহজলভ্য বা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ নিরাকার উপাসনা তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারিল না। ইহা শীঘ্রই শিথিল হইয়া প্রতিক্রিয়ামুখে তাঁহার মনে সংশয়বাদাচ্ছন্ন বিষম আধ্যাত্মিক সঙ্কট আনয়ন করিয়া দিল। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিরদিন তাঁহার মনে একটি তীব্র ব্যাকুলতা ছিল। এই ব্যাকুলতাই তাঁহাকে সুলভ ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে বা নাস্তিক্যতিমিরে চিরকাল ফেলিয়া রাখিতে পারে নাই, তাঁহার জীবনকে গতিমুখে খরবেগে চালিত করিয়াছিল, এবং অবশেষে পরমহংসদেবের সংস্পর্শে একটি বৃহৎ পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে স্বভাবসিদ্ধ সত্যানুরাগ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল, তাহা তাঁহাকে, কি হিন্দুসমাজে কি ব্রাহ্মসমাজে, কোথাও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইতে দেয় নাই। সর্ব্বত্র ইহা তাঁহাকে, নিজের চক্ষে দেখিয়া নিজের অনুভূতির নিকটে সমস্ত অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে প্রেরিত করিয়াছিল। সেইজন্য রামকৃষ্ণকেও তিনি সহসা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন যে, প্রথম সাক্ষাতের প্রায় তিন-চারি বৎসর পরে নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের চরণে সম্পূর্ণরূপে মাথা নোয়াইয়াছিলেন।

এই ইতিহাস সকলেরই সুবিদিত, সুতরাং বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নাই। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতায় পরমহংসদেবের সহিত নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ। তখন পরমহংসদেব দ্বাদশ বৎসর সাধনা শেষ করিয়া, তারপর ছয় বৎসর নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, প্রায় সাত বৎসর দিব্যভাবের মধ্যে মগ্ন ছিলেন। কেশবচন্দ্র ইহার ছয় বৎসর পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন, এখন নরেন্দ্রনাথ আসিলেন। তারপর পুনর্ব্বার যখন দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন, তখন পরমহংসদেব তাঁহাকে নিতান্ত পরিচিত পরমাত্মীয়ের মত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তুমি কেন এতদিন আস নাই, আমি যে তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি। সেদিন নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া পরমহংসদেব তাঁহাকে সমাধিভাবাপন্ন করিয়া দিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মধ্যে তখনও বিচারবুদ্ধি প্রবল। সংশয়বাদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য গূঢ় ব্যাকুলতা থাকিলেও, নানা পথের মধ্যে পথভ্রান্ত হইয়া তিনি তখনও বিশ্বাসহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত। পুনরায় একমাস পরে যখন পরমহংসদেব আবার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সমাধিমগ্ন করিয়া দিলেন, তখনও নরেন্দ্রনাথ ইহাকে সম্মোহন বিদ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তৃতীয়বারের সাক্ষাতে আবার যখন এইরূপ ঘটিল, তখন নরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, ওগো তুমি এ কি করলে? এই অর্দ্ধ-উন্মাদ নিরক্ষর ব্রাহ্মণ কি দিব্যশক্তির প্রভাবে, তাঁহার মত সংশয়বাদী প্রবল-ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন যুবককে, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্পর্শমাত্র সমাধিমগ্ন করিয়া দিলেন, এই প্রশ্ন নরেন্দ্রনাথের মনে একটি নূতন ভাব জাগাইয়া দিল। তথাপি তাঁহার মনোভাব এখনও পরিবর্ত্তিত হইল না। গুরুবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষামূলক বিরুদ্ধ সংস্কার তিনি একদিনে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তারপর, তাঁহার পিতৃবিয়োগ, দৈন্যাবস্থা, সংসারের চিন্তা ও ক্লেশ তাঁহার মনকে উপর্য্যুপরি পীড়িত করিল। দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাস একেবারে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিল। কিন্তু এইবার এই দুর্দ্দিনের অন্ধকারে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া মৃন্ময়ী কালীর মধ্যে চিন্ময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ইহাও সম্ভব হইল। ধর্ম্মজীবনের বিকাশের পথে অসম্ভব সম্ভব হয়, কারণ ইহাই জীবন, ইহাই বিকাশ। নরেন্দ্রনাথও সন্ন্যাসী হইলেন। মুক্তস্বভাব, কৃতবিদ্য, সঙ্গীতাদি কলাপ্রিয়, পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদী, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা যুবকও একদিন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, বিবেকানন্দ নাম লইয়া, এই নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

পরমহংসদেবের অতীন্দ্রিয় শক্তি ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শ হইতেই বিবেকানন্দের সন্ন্যাস ও প্রচারের প্রেরণা আসিয়াছিল। বিবেকানন্দের বহুবিস্তৃত ও বিচিত্র কর্ম্মধারায় তাঁহার নিজস্ব শক্তি ছিল, কিন্তু কতটা তাঁহার জীবন এই বীতরাগ স্থিতধী মহাপুরুষের দ্বারা চালিত হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। পরমহংসদেবের আবির্ভাবের উল্লেখ করিয়া এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, 'এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিরাজমান থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক ও চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হইবেন। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন

এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এইরূপ একজন ব্যক্তির জন্মিবার সময় হইয়াছিল, প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যা কিছুমাত্র ছিল না, এরূপ মনীষাসম্পন্ন হইয়াও তিনি নিজের নামটি পর্য্যন্তও লিখিতে পারিতেন না। তথাপি এই ব্যক্তির শিক্ষার ফলে আমি প্রথম উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র, কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া, স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টতররূপে বুঝিতে শিখিয়াছি।' এরূপ সম্ভব হইয়াছিল, কারণ বিবেকানন্দ তাঁহার পদতলে বসিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, পরমহংসদেবের সমগ্র জীবনই উপনিষদের মহাসমন্বয়স্বরূপ, এতদ্বিধ ব্যাখ্যাস্বরূপ, এবং তাঁহার উপদেশ অপেক্ষা জীবন সহস্রগুণে উপনিষদমন্ত্রের ভাষ্যস্বরূপ।

এই অদ্ভুত জীবনের আদর্শই বাঙ্গালী জাতির জন্য পরমহংসদেবের শ্রেষ্ঠ দান, যাহা চিরদিন বাঙ্গালীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এই জীবনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বিবেকানন্দ আপন জীবন গঠিত করিয়াছিলেন, তাই তিনি অসীম কৃতজ্ঞতাভরে বলিয়াছিলেন—"যদি এই মূর্ত্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম? আমাকে দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিও না।"

রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব ও রামকৃষ্ণযুগের ধর্ম্মসাধনা এখনও ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের অপেক্ষা করিতেছে। এত অল্পদিনে এই প্রভাব দূরবিস্তৃত হইলেও আমরা এখনও এই যুগে বাস করিতেছি, সুতরাং সহজে ও সম্পূর্ণ ভাবে ইহার বিচার করিতে পারি না। তবুও এইটুকু আমরা বুঝিতে পারি যে, পরমহংসদেব কোনও নূতন ধর্ম্মমতের প্রচার করেন নাই, কোনও নূতন সাধন-প্রণালীর নির্দ্দেশ করেন নাই, বরং যাহা আমাদের প্রাচীন সাধনার ধারা তাহাকেই আত্মসাৎ করিয়া আপনার জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের ধর্ম্মসাধনপ্রণালীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া, সকল সাধনমার্গের সমস্ত সোপানগুলিই তিনি অধিকারী ভেদে আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি কোনও ধর্ম্মমতকে অগ্রাহ্য করেন নাই। মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতির অনুযায়ী বিভিন্ন পথ আছে, সকল পথই তাহাকে গন্তব্যস্থানে অগ্রসর করাইয়া দেয়, এ কথা তিনি আপন সাধকজীবনের মধ্যে দেখাইয়াছেন। রামমোহন প্রভৃতিও এইরূপ ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরমহংসদেবের এই সমন্বয় স্বাভাবিক সমন্বয়, ইহা উপলব্ধি। এই হিসাবে রামমোহন বা কেশবচন্দ্রের যুক্তিবাদী সমন্বয়ের ধারা হইতে ইহা পৃথক। কারণ, ইহা পল্লবগ্রাহীর মত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের বিভিন্ন অংশের একত্র জোড়াতাড়া দিয়া বুদ্ধির সমন্বয় নহে, বোধির সমন্বয়। ইহা পরানুকরণের দ্বারা প্রাপ্তি নহে, স্বকীয় চিরন্তন অনুভূতির দ্বারা অর্জ্জন। ইহা সংস্কার নহে, পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন করিয়া গড়া নহে, পুরাতনকেই নূতনরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। 'I come to fulfill, not to destroy.' এই fulfilment হইতেছে আধুনিক যুগে পরমহংসদেবের শ্রেষ্ঠ বাণী। বাঙ্গালী জাতির চিরন্তন আধ্যাত্মিক অনুভূতিই পরমহংসদেবের জীবনে স্বকীয় গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়াছিল। আজ সেই কথা স্মরণ করিয়া, আমরা সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম করি—

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

নায়ক কয় শ্রেণীর?

প্রেমের খেলায় নায়ক ও নায়িকার ভূমিকাই সকল কিছু। কিন্তু নায়ক কয় শ্রেণীর বলুন তো? আমাদের জানা যে কয়েক শ্রেণীর নায়ক আছে, উল্লেখ করা হচ্ছে। যথা,—পতি, বৈশিক, উপপতি, উৎকণ্ঠিত, আভিসারিক, বিপ্রলব্ধ, স্বাধীনভার্য্য, খণ্ডিত, কলহান্তরিত, প্রোষিতভার্য্য, প্রোষিতপত্নীক, পীঠমর্দ্দ, বিট, চেট, বিদূষক।

লোকমাতা নিবেদিতা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১

একটা সামান্য ফুল, তাকে ফোটাতে হলে রোদ, বৃষ্টি, হাওয়া আর মাটীর প্রচণ্ড আয়োজন।

কিন্তু এই প্রচণ্ড আয়োজন এমন নিঃশব্দে ঘটে যে, ফুলের বিকাশের মধ্যে ধরা পড়ে না এতটুকু চেষ্টার লক্ষণ।

একটা নতুন ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে ইতিহাসের অধিদেবতাকে করতে হয় ঠিক সেই রকম প্রচণ্ড নেপথ্য আয়োজন।

দৃষ্টির অন্তরালে, মহাকালের স্তব্ধ গভীরতার স্তরে স্তরে মহানিঃশব্দে চলে মন্থন, চলে আহরণ, চলে সংমিশ্রণ, যার ফলে অকস্মাৎ একদিন এই প্রতিদিনের পরিচয়হীন অসংখ্যের জনতার মধ্যে মহাবিস্ময়ের মত দেখা দেয় অপরূপ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, যার একার অস্তিত্বে সার্থক হয়ে ওঠে অসংখ্যের নিরুদ্ধ কামনা, স্তব্ধগতি মানবতার রথ যার আবির্ভাবে অকস্মাৎ দ্রুত এগিয়ে যায় বহু যুগের পথ···সাধারণ জীবনের সমতল প্রান্তর ভেদ করে ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে মাথা তুলে জেগে ওঠে মানব-সম্ভাবনার নব গৌরীশঙ্করশৃঙ্গ।

নিবেদিতা ইতিহাসের সেই বিস্ময়কর পরম প্রকাশ, মানবীয় সম্ভাবনার নব গৌরীশঙ্করশৃঙ্গ, নারীত্বের অভিনব দিব্য অভিব্যক্তি, অজাতপূর্বা অপরূপা এক মর্ত্ত্যকন্যা। নিবেদিতার আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য, দুঃখের বিষয়, আমরা আজও উপলব্ধি করিনি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, ভারতবর্ষে, বাংলা দেশে, দক্ষিণেশ্বরের মতন সামান্য এক গণ্ডগ্রামে, নিরক্ষর-প্রায় এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণের জীবনকে কেন্দ্র করে, মানবীয় সম্পর্কের ও মানবীয় প্রভাবের যে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব মহাপরীক্ষা সংঘটিত হয়ে গিয়েছে, আমার বিশ্বাস, উনবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর ইতিহাসে তা সব চেয়ে স্মরণীয়, বরণীয় ঘটনা।

উনবিংশ শতাব্দী অথবা বর্ত্তমান যুগের পৃথিবীর বহু ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই আজ পর্য্যন্ত বিশ্বের পটভূমিকায় দক্ষিণেশ্বরের এপিক ঘটনার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারেননি। এই বিস্ময়কর শতাব্দীর কাহিনী নিয়ে যে সব বিখ্যাত ইতিহাসের বই লেখা হয়েছে, তার প্রায় সমস্ত বই থেকে অপ্রয়োজনীয় বলে এই ঘটনাকে বাদ দেওয়াই হয়েছে।

অথচ এই বিষয়ের মধ্যেই আছে, বর্ত্তমান যুগের মানুষের সব চেয়ে প্রয়োজনীয়, সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বাস্তব ঘটনা। যে-ঘটনার সঙ্গে শুধু ভারতবর্ষের যোগ নয়, যে-ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে সমগ্র বিশ্বের। এত বড় ও এমন সার্থক মানবীয় পরীক্ষা সভ্যতার ল্যাবরেটরীতে আর হয়েছে কি না, জানি না।

এই মানবীয় পরীক্ষার মহাকাব্য তিন পর্ব্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব্বের নাম রামকৃষ্ণ—সারদামণি; দ্বিতীয় পর্ব্বের নাম রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ; তৃতীয় পর্ব্বের নাম বিবেকানন্দ—নিবেদিতা। ধর্মের কথা বাদ দিয়ে, শুধু মানবীয়তার দিক থেকে, সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ও বেলুড়ে মানুষের সম্পর্কের যে অপরূপ কাহিনী রচিত হয়েছিল প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার বাস্তবতায়, অমর মহাকাব্যের সমস্ত উপাদান নিয়ে তা অপেক্ষা করে আছে ভবিষ্যতের কোন ব্যাস-বাল্মীকির জন্যে।

২

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রী মহাকাব্যের নামকরণ করেছিলেন, Savitri, a Legend and a Symbol. অর্থাৎ সাবিত্রীর জীবন অতীতের দিক থেকে Legend, ভবিষ্যতের দিক থেকে Symbol. যে-জীবন শুধু কাহিনীতে পরিণত হয়েছে, সে-জীবন সাবিত্রীর নয়, সাবিত্রীর জীবনকাহিনীর মধ্যে আছে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনার প্রতীক। অনাগত ইতিহাসের দিব্য ইঙ্গিত।

নিবেদিতার জীবনও একাধারে Legend ও Symbol. নিবেদিতার জীবনের এক দিগন্তে রয়েছে গত যুগের ভারতের রেনাশাঁসের সূর্য্য, অপর দিগন্তে রয়েছে ভবিষ্যতের নব জীবনের চন্দ্রোদয়। পূর্ব আর পশ্চিমের সংঘাত ও নব পরিচয়ের ভেতর দিয়ে, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন আদর্শের সংঘর্ষ ও মিলনের ভেতর দিয়ে আগামী কালের যে-নতুন পৃথিবী জেগে উঠছে, জেগে উঠছে যে-নতুন বিশ্ব-চেতনা, এই অপরূপা নারীর জীবন-সাধনার বাস্তবতার মধ্যে পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে সেই মহাসম্ভাবনার প্রতীক। মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তির দিব্য ইঙ্গিত হয়ে গিয়েছে নিবেদিতার জীবনে। মহাকাল এই অপরূপা নারীর জীবনে, দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম ও ঐতিহ্যের ব্যবধান তুচ্ছ করে মানব-ধর্মের যে মহাপরীক্ষাকে সফল ও সত্য করে তুলেছে, সামনের পৃথিবীর মানুষ তার মধ্যে একদিন পাবে আজকের এই জাতি-দ্বন্দ্বের ভদ্রবেশী হিংস্রতার অবসান-মন্ত্রের সন্ধান। আজকের যুক্ত-রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক সুবিধাবাদের গোষ্ঠীবন্ধন ভেঙে, একদা যখন উচ্ছেদ-ভয়-ভীত বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ছদ্মবেশী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোস খুলে ফেলে, মানব-ধর্মের বলিষ্ঠ সত্য-স্বকৃতির ভিত্তিতে নতুন করে গড়ে তুলবে ভবিষ্যতের লীগ অফ নেশনস্, তখন সেই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ-দ্বারে জেগে থাকবে, অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সাদা পাথরে গড়া এক তপস্বিনীর মূর্ত্তি", বিবেকানন্দ যাঁর নাম দিয়েছিলেন নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বন্দনা

করেছিলেন লোকমাতা বলে, শিখাময়ী বলে শ্রীঅরবিন্দ যাঁকে নিবেদন করেছিলেন অন্তরের শ্রদ্ধা।

৩

নিবেদিতার জীবন যেখানে Legend, তার কাহিনী বলবার আগে, নিবেদিতার জীবন যেখানে Symbol, সে-সম্পর্কে দু'-একটা কথা বলতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট বিচিত্রতম নায়কের মুখ দিয়ে এক জায়গায় বলিয়েছেন, "মানুষের ইতিহাস দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়···যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।"

কুমারী মারগারেট নোবল্ ইতিহাসের ধারাবাহিকতার একটি সাধারণ তরঙ্গ, নিবেদিতা ইতিহাসের পরম আকস্মিক, যার ভেতর দিয়ে ইতিহাসের অধিদেবতা করেন দিব্য-পরীক্ষা। মানুষের যুক্তি, মস্তিষ্কের বুদ্ধি, বিজ্ঞানের অঙ্ক যাকে অসম্ভব বলে সরিয়ে রাখে, এই সব দুর্লভ পরম আকস্মিক আবির্ভাবের মধ্যে তা কোন্ নিগূঢ় প্রাণ-মন্ত্রে অকস্মাৎ সম্ভব হয়ে ওঠে, যুক্তি আর তর্ক আর বাঁধা হিসাবের শিকল ছিঁড়ে তখন মানুষের ইতিহাস আবার পায় এগিয়ে-চলার চরম দুঃসাহস।

নিবেদিতার জীবনে সত্য হয়ে আছে এক চরম দুঃসাহসিক মানবীয় পরীক্ষার সার্থক ফল।

পুঁথির নির্দ্দেশ মত, যুক্তির ধোঁয়াওয়ালা কেরাসিন ডিবের আলো হাতে, এতদিন ধরে মানুষ রাজনীতির বাঁকা পথে মানব-মৈত্রীর যে ব্যর্থ সন্ধান করে চলেছে, নিবেদিতার জীবনে দেখলাম মস্তিষ্কের সেই প্রচণ্ড আত্ম-প্রতারণার বিরুদ্ধে মহাকালের অট্ট-বিদ্রূপ। ইতিহাসের অন্তর-লক্ষ্মীর মতন এই শিখাময়ী নারী নিজের ইতিহাস, নিজের ঐতিহ্য, রক্ত-কণিকায় সঞ্চিত জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি, নিজের সমগ্র আত্মাকে আনন্দে দগ্ধ করে যে অগ্নিশিখাকে জ্বালিয়ে তুললেন, সেই অগ্নিশিখার আলোকে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো মানব-মৈত্রীর তীর্থপথ।

আজ যদিও এ কথা স্বীকার করতে অনেকের মনে আছে অনেক সংশয়, কিন্তু প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের মতন, এ কথা দিব্য সত্য যে, এই বহু-প্রাচীনা চির-নবীনা আমাদের জননী, ভারতবর্ষ যাঁর নাম, তাঁর অন্তরেই সংরক্ষিত হয়ে আছে মানব-মৈত্রীর দীক্ষা-মন্ত্র···মানুষের এগিয়ে-চলার ইতিহাসে শেষ হয়ে যায়নি ভারতবর্ষের দান। শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ভস্মস্তূপকে সরিয়ে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন শাশ্বত ভারতের সেই অনির্ব্বাণ প্রাণ-বহ্নিকে, শতাব্দীর শত গ্লানি আর শত অপমৃত্যুর ঊর্দ্ধে আজও অমলিন জ্বলছে তার পাবক শিখা। সমগ্র জগতের প্রয়োজন আছে সেই অগ্নিশিখার।

পশ্চিমের সমস্ত অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনা, তার রাজনৈতিক প্রভুত্ব আর চতুরতার সমস্ত দম্ভ, তার অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সমস্ত অভ্রান্ততা, যেদিন আপনার প্রমত্ততার ভারে আপনা থেকে ভেঙ্গে পড়বে, সেদিন তাকে রিক্ত-হৃদয়ের ব্যথা-হরণ মন্ত্রের সন্ধানে আসতে হবে এই ভারতবর্ষে। কি ভাবে তাকে আসতে হবে, কোন্ পথে তাকে আসতে হবে, এবং কি ভাবে সেদিন ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করবে, ভবিষ্যতের এই অনিবার্য্য সম্ভাবনার প্রতীক সত্য হয়ে রইলো নিবেদিতার জীবনে।

উনবিংশ শতাব্দীর পরাজিত ভারতের শত গ্লানিময় জীবনে, বিজয়ী ইংরেজের ঘরের খাঁটি পশ্চিমা মেয়ে, সেদিন দেহ-মন-চৈতন্য বদল করে যে নবজন্ম গ্রহণ করেছিল, এই পরম আকস্মিক ঘটনার নিটোল ছন্দবন্ধ সুষমার পরিপূর্ণতার মধ্যে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে আছে ইতিহাস-পুরুষের অন্তরের অভিসন্ধি।

মারগারেট নোবল্ শুধু নাম বদল করে নিবেদিতা হননি, এই ঐতিহাসিক নামান্তর-গ্রহণের পেছনে যে প্রচণ্ড মানসিক তপস্যার আগুন বাস্তব হয়ে আছে, ইতিহাসের মিউজিয়ামে তা শুধু দর্শনীয় মৃত নজীর হয়ে থাকবে না।

৪

পাঁচটা বিপুল নদীর স্বতন্ত্র খরবেগধারা, একটি তরুণী নারীর জীবন-সঙ্গমে এসে মিশেছিল, তাকে করে তুলেছিল স্বতন্ত্র, সুগভীর, অনন্যসাধারণ।

স্কচ পিতার কাছ থেকে তরুণী পেয়েছিল স্কটল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য দৃঢ়তা আর সরলতা, আইরিশ মাতার কাছ থেকে পেয়েছিল কেলটিক অনুরাগ আর ভাব-প্রবণতা, ইংলণ্ডের কাছ থেকে পেয়েছিল শিক্ষার ভেতর দিয়ে সংস্কার-নিষ্ঠা আর নিয়মধর্ম্মিতা। রোমান ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে, রক্তে পেয়েছিল ভক্তি আর তপস্যার আবেগ। চেতনায় ছিল যা অর্দ্ধ-জাগ্রত হয়ে। সকলের ঊর্দ্ধে স্পষ্ট হয়েছিল, পঞ্চমধারার দান, উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক নব-জাগরণের বিস্ময়।

সে-তরুণীর নাম হলো মারগারেট নোবল্।

পরস্পর-বিরোধী এই সব বিভিন্ন ধারার প্রচণ্ড সংঘাতে উদ্বেল হয়ে ওঠে তরুণী নারীর জাগ্রত মন। সামনে উনবিংশ শতাব্দীর বিচিত্র বিশ্ব···পুরানো সব পাঁচিল আর সীমানা ভেঙে, গড়ে উঠছে সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবী···সম্পূর্ণ নতুন এক চেতনা···তার মধ্যে কোথায় তার স্থান? এই অর্দ্ধ-গঠিত চেতনার অনিশ্চিত জগতে কোথায় লুকিয়ে আছে তার জীবনের রাজ-পথ?

সন্ধান পায় তারই মতন জাগ্রত-চেতনা এক তরুণের। গেলোয়া তার নাম। ইমারসন আর থোরো গেলোয়ার জাগ্রত চেতনাকে বহ্নিমান করে তোলে আদর্শবাদের শিখায়। নিভৃতে দুজনে একসঙ্গে পড়ে বৈজ্ঞানিক যুগের পাশ্চাত্য ঋষিদের বই, একই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দুজনার

চেতনা। আকাশে আছে শুকতারা, জীবনে আছে ব্রত··· আকাশের মত জীবনেরও আছে বিস্তার, নিঃসীমতা। জলে ওঠে চেতনা। জেগে ওঠে প্রেম। কুহেলি-অপগত দিগন্তের তলায় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে বুঝি জীবনের রাজ-পথ।

অকস্মাৎ নেমে আসে ঝড়। নিবে যায় সযত্নে-জ্বালা দীপের মৃদু শিখা। আসে মৃত্যু। নিয়তি।

নির্বাপিত-দীপের অকস্মাৎ অন্ধকারে এক তরুণী নিরুদ্ধ বেদনায় খোঁজে পথ। জেগে ওঠে অন্তরে সুপ্ত ছিল যে তপস্বিনী। স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে দারিদ্র্য ব্রত···দরিদ্র পল্লীতে গিয়ে আহত অন্তরে পরিবেশন করে সান্ত্বনা, উপযাচিকা হয়ে দেয় সেবা, অবৈতনিক স্কুলে পাঠশালায় করে শিক্ষকতা। স্বাধীনতার স্বভাব-তৃষ্ণায় জেগে উঠছে তখন আয়ারল্যাণ্ড, জন্মভূমি। হোম-রুল আন্দোলনের নব-তরঙ্গে তখন জোয়ার জাগছে আইরিশ তরুণ-তরুণীর মনে। লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হলো তার শাখা। মারগারেট হলো সেই লণ্ডন-শাখার অধিনায়িকা।

কিন্তু যে-উৎসের জল নিষ্ক্রমণের মুখে পেয়েছিল বাধা, সেই বাধার চারদিকে ঘুরে সে শুধু হয়ে ওঠে আবর্ত্তময়···যত আবর্ত্ত বাড়ে, তত বাড়ে নিরুদ্ধ গতির বেগ···বাড়ে চাঞ্চল্য, নিষ্ক্রমণের তৃষ্ণা, মুক্তির আবেগ···

এমন সময় একদিন, অকস্মাৎ, লণ্ডনের পশ্চিম প্রান্তের এক গৃহে, উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগতের মানস-কন্যা তরুণী মারগারেট দেখা পেলেন সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবীর···দেখা পেলেন ভারতবর্ষের, যে-ভারতবর্ষ বৃটিশের বিজিত সাম্রাজ্য নয়···যে-ভারতবর্ষ অপরাজিত, অপরাজেয়···শাশ্বত ভারতবর্ষ।

কুমারী মারগারেট নোবল দেখা পেলেন বিবেকানন্দের।

৫

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস। রবিবার বিকেল বেলা। লণ্ডনের পশ্চিম প্রান্তে এক সম্ভ্রান্ত নাগরিকের সুসজ্জিত বৈঠকখানা। বাইরে দুরন্ত শীত।

পনেরো-ষোল জন বান্ধবীর সঙ্গে মারগারেট এসেছেন, বিচিত্র এক হিন্দুযোগীর কথা শুনতে। নাম তাঁর বিবেকানন্দ। তরুণ সন্ন্যাসী, বয়স মাত্র একত্রিশ। তরুণী মারগারেটের বয়স তখন উনত্রিশ।

মারগারেট বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন সেই গৈরিক বসনাবৃত অপরূপ ভারত-সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসীর বিরাট ললাটে, দীর্ঘ আয়ত চোখে, প্রস্ফুট শতদলের মতন পূর্ণ-বিকশিত আননে, মারগারেট চেয়ে দেখেন কোথা থেকে যেন বিচিত্র এক অচঞ্চল আলোর আবেশ এসে পড়েছে, শুধু একবার যেন কোথায় আর এক কোন্ মুখে দীপ্ত বহ্নির সেই স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোতি তিনি দেখেছেন···সমস্ত চেতনাকে রোমাঞ্চিত করে সহসা মনে পড়ে, র‍্যাফেলের আঁকা শিশু যিশুর মুখে, চোখে, কপালে দেখেছেন সেই দিব্য জ্যোতির স্থির প্রশান্ত আবেশ।

সেই মুহূর্ত্তে তরুণীর মনে হয়, যে-পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সন্ন্যাসী বসে আছেন, সে-পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যেন তাঁর কোন যোগ নেই। সূর্য্যের মত তাঁর আলো দেহ ভেদ করে মর্ম্মের অতি নিকটে এসে লাগছে, অথচ সূর্য্যেরই মত সুদূর। মাঝে মাঝে, গুহার ভেতরের তরঙ্গ-ধ্বনির মত উঠছে ধ্বনি, শিব! শিব! শিব!

কি এক অজানা অস্বস্তিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে তরুণীর মন। নিবিষ্ট চিত্তে শোনেন সন্ন্যাসীর আলাপ। মানব-সভ্যতা, বিভিন্ন ধর্ম্মের স্বরূপ, ভারতবর্ষ, ভারতের ধর্ম্ম, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা, বিভিন্ন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত একতা···বিচিত্র সঙ্গীতের মত আলাপের মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর কণ্ঠে জেগে ওঠে সংস্কৃত শ্লোক···অশ্রুতপূর্ব্ব এক ধ্বনির ঝংকার···

সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শেষ হলে, পরম বিজ্ঞের মত বান্ধবীরা পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যের দম্ভে চুপিচুপি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, এ আর এমন কি নতুন কথা!

সভা ভাঙ্গবার আগে, সন্ন্যাসী শ্রোতাদের আহ্বান করেন, প্রশ্ন করবার জন্যে।

পাশ্চাত্য শ্রোতারা প্রশ্ন করে, ভারতের কুসংস্কার সম্বন্ধে, ভারতের পুরোহিত-মন্দির-জাতিভেদের অনাচার সম্বন্ধে··· সুসভ্য পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্ন্যাসীকে সমঝিয়ে দেবার জন্যে। তরুণী শুধু নির্বাক্ হয়ে শোনে।

সহসা সন্ন্যাসীর কণ্ঠে জেগে ওঠে বজ্র।—ভারতবর্ষকে তোমরা জান না, তোমরা জান না ভারত-ধর্ম্ম কি। যেখানে আমাদের ধর্ম্মের প্রাণ, সেখানে পাদ্রী বা পুরোহিত কেউ নেই, নেই গির্জ্জা বা মন্দিরের কোন প্রয়োজন···এমন কি, সেখানে নেই স্বর্গ বা নরক!

শ্রোতারা উত্থাপন করে, বর্ত্তমান সভ্যতায় পাশ্চাত্যের বিস্ময়কর অর্গানিজেশনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা।

নিঃসংশয় কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলেন, আমরা ভারতবর্ষে বিশ্বাস করি, অন্তর থেকে বিশ্বাস করি, য়ুরোপে তোমরা যে অর্গানিজেশনের গৌরব কর, তার পাঁচিলের বেড়ার মধ্যেই বেড়ে ওঠে মানবতার বিষবৃক্ষ, সেই বেড়া-ভাঙ্গাই হলো আমাদের প্রধানতম ধর্ম্ম!

সন্ন্যাসীর সমস্ত কথা প্রচণ্ড হেঁয়ালীর মতন তরুণীর সজাগ অন্তরে আলোড়ন তোলে। এতদিন সযত্ন চেষ্টায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য বলে তরুণী স্বীকার করে এসেছেন, সন্ন্যাসীর নিঃসংশয় কণ্ঠে জেগে ওঠে তার মারাত্মক প্রতিবাদ। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তরুণীর শিক্ষিত মন। সন্ন্যাসীর প্রত্যেক কথা যেন শাণিত তলোয়ারের মতন আঘাত করে আশৈশব-সঞ্চিত মারগারেটের সমস্ত বিশ্বাসকে। প্রতিবাদ করবার জন্যে জেগে ওঠে মাস্তিষ্কের প্রচণ্ড আক্রোশ। এতদিন যে-পৃথিবীকে একান্ত পরিচিত বলে জেনে এসেছে, তার সীমার বাইরে এ কোন্ অজানা এক নতুন পৃথিবীর বার্ত্তা নিয়ে এলো অজানা নতুন সন্ন্যাসী!

সভা ভেঙ্গে যায়, মৌখিক আলাপের পর ফিরে যায়

যে-যার ঘরে। তরুণী মারগারেটও ফিরে আসেন। কিন্তু বিস্মিতা মারগারেট দেখেন; সমস্ত মন-প্রাণ আর মস্তিষ্ক দিয়ে যাকে অস্বীকার করতে চান, সমস্ত চেতনাকে জুড়ে রয়েছে তারই অস্তিত্বের আলো! মনের দিগন্তরেখায় যেন জাগছে নতুন এক পৃথিবী, অপরূপ এক প্রভাত, দিব্য জ্যোতির্ময় এক নবসূর্য্য…

সেই অপরিচিত আলোর আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে পড়ে তরুণীর অন্তর। যাকে জানি না, যাকে চিনি না, বুঝি না যাকে, কোন্ পথে কেমন করে সে অধিকার করে নিলো সমস্ত চেতনা? এ কি সম্ভব?

৬

তার কয়েক দিন পরে, সন্ন্যাসীকে ঘিরে গড়ে ওঠে একটা ছোট গোষ্ঠী। ছাত্রের মত, শিষ্যের মত তাঁরা শোনেন সন্ন্যাসীর বক্তৃতা। প্রশ্ন করেন, গুরুর মতন সন্ন্যাসী দেন উত্তর।

সাহস করে এবার মারগারেট প্রতিবাদ করেন। অন্য সকলে যেখানে নীরবে স্বীকার করে নেন, সেখানে তীক্ষ্ণ প্রশ্নে মারগারেট উদ্বেজিত করে তুলতে চেষ্টা করেন সন্ন্যাসীর প্রশান্তিকে। একমাত্র সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন, কোথা থেকে আসছে এই প্রশ্নকারিণীর বিদ্রোহ।

সঙ্গিনীরা মারগারেটকে ভর্ৎসনা করে, আমরা তো বেশ বুঝতে পারছি, তোর বুঝতে কোথায় আটকাচ্ছে এতো?

মারগারেট নিজেও তখন জানতেন না, সন্ন্যাসীর সেই সব উক্তিকে স্বীকার করে নিতে তাঁর অন্তরে কেন জেগে উঠছে বিদ্রোহের প্রচণ্ড আক্রোশ। লণ্ডনের সেই নামহীনা অখ্যাত তরুণীর চেতনাকে কেন্দ্র করে, লোকচক্ষুর অন্তরালে তখন চলেছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের এক মহা-পরীক্ষা। সেদিন বিবেকানন্দ এসে দাঁড়িয়েছিলেন, লণ্ডন শহরের কোন এক সম্ভ্রান্ত নাগরিকের বৈঠকখানায় নয়, তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিব্যক্তি-ধারার সফেন গতির মুখে…পাশ্চাত্য সভ্যতা তার বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিকতায় ও রাজনৈতিক প্রভুত্বে যা-কিছুকে অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য বলে ধরে নিয়েছিল, এই একটি নিঃসঙ্গ ভারত-সন্ন্যাসী নিঃশঙ্ক নিষ্কম্প বীর্য্যে করলো তাকে প্রচণ্ড আঘাত।

ইতিহাসের অন্তর্লোকে জেগে উঠলো ঘাত-প্রতিঘাতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব সজীব হয়ে উঠলো লণ্ডনের সেই অখ্যাতনামা আইরিশ তরুণীর মধ্যে। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে, অকস্মাৎ মারগারেট হয়ে উঠলো সেই ঐতিহাসিক সংঘর্ষের প্রতীক। মানবের বিরাট শোভাযাত্রায়, আমরা বারে বারে দেখেছি, অকস্মাৎ একটি নিঃসঙ্গ পথিক-চিত্তকে আশ্রয় করে সমগ্র ভাবে জেগে ওঠে একটা সমগ্র শতাব্দী, অসংখ্যের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণচঞ্চু শ্যেন পাখীর মত মহাকাল ছিনিয়ে বার করে নিয়ে আসে একজনকে, এঁকে দেয় তার কপালে শতাব্দীর বেদনা আর সম্ভাবনার দুর্লভ প্রতীক। তখন সেই কাল-চিহ্নিত এককের চোখে অনায়াসে ধরা পড়ে, অসংখ্যের চোখে যা ধরাই পড়ে না, তার দৃষ্টি চলে যায় ইন্দ্রিয়ের বৈজ্ঞানিক সীমা পেরিয়ে অনাগত কালে, তার সমস্ত চেতনায় এসে পড়ে আগামী কালের ছায়া…অসংখ্যের মন যেখানে পড়ে থাকে নিশ্চেতন অসাড়, সেখানে সে সজাগ ভাবে ওঠে সাড়া দিয়ে…

তাই, নিজের অজ্ঞাতে, ভারতবর্ষের সেই ঐতিহাসিক আহ্বানে সেদিন সাড়া দিয়ে উঠলো এই বিদেশিনী মেয়ে… কেন যে সেই ভাবে শুধু সে সাড়া দিয়ে উঠলো, তা সে নিজেই তখন জানতো না…মারগারেট তখন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি যে, এই ভারত-সন্ন্যাসীর লণ্ডনে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবন লণ্ডনের দরিদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র সীমানা ত্যাগ করে প্রবেশ করেছে মানব-ইতিহাসের সীমাহীন শাশ্বত ক্ষেত্রে গাঁথা হয়ে গেল মানবের চির-যাত্রার সঙ্গে।

বিবেকানন্দের মধ্যে সেদিন লণ্ডনের সাধারণ লোকেরা যেখানে দেখলো, একজন হিন্দু-যোগীকে, বড় জোর বিচিত্র এক হিন্দু-যোগীকে, মারগারেট সেখানে দেখলেন, মহা-অনিবার্য্যকে, ইতিহাস-পুরুষকে…যাকে গ্রহণ করতে গেলে নিজের সমস্ত বর্তমান যায় নিঃশেষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে, অথচ যাকে প্রত্যাখ্যান করবারও কোন শক্তিই থাকে না অবশিষ্ট। জাগরণের প্রভাতের আগে মহা-বেদনার আলো-আঁধারী।

এমন সময় ফুরিয়ে এলো সেবারের মত বিবেকানন্দের লণ্ডন-প্রবাস কাল।

অন্যান্য শিষ্যার সঙ্গে মারগারেটও এলেন দেখা করতে। ভেতরে তখন চলেছে, মহা নীরবতায় প্রচণ্ড একটা সংগ্রাম। পুরানো পৃথিবীর ভিত্তি উঠছে কেঁপে কেঁপে, ভেঙ্গে পড়ছে তার পাঁচিল, অথচ সামনে অনিশ্চিত নতুন পৃথিবী, সম্পূর্ণ অজানা, অগঠিত…

সেই অনিশ্চিতের দ্বন্দ্বের মহা-বেদনায় সহসা ভারত-সন্ন্যাসীর সামনে নতজানু হয় বিদেশিনী আইরিশ তরুণী, অন্তরের অন্তরতম স্থল থেকে বেরিয়ে আসে শুধু একটি কথা, হে গুরু! প্রণাম!

স্মিতহাস্যে চলে আসে ভারত-সন্ন্যাসী।

[ক্রমশঃ।

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত যে-কোন নামহীন রচনা সম্পাদকীয় হিসাবে ধার্য্য করতে হবে।—সম্পাদক।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নব্বই

তুমি তোমার সিংহাসন ছেড়ে নেমে এলে। নেমে এলে আমার পর্ণকুটিরের ভগ্নদুয়ারে। আমার দুয়ারের চৌকাঠে ঠেকে যাবে বলে ফেলে এলে তোমার রাজমুকুট। আমি দীনদুঃখী বলে পরে এলে রিক্ততার সাজ। আমি ছোট বলে তুমিও ছোট হলে।

আমি কি তোমাকে ছোট করেছি? তুমি নিজেই ছোট হয়েছ আমার জন্যে। আমি দুর্বল বলেই সুলভ হয়েছ। ভঙ্গুর বলেই হয়েছ সুকোমল। নইলে তোমাকে ধরি কি করে? রাখি কি করে বুকের নিবিড়ে?

কিন্তু, ছোট হয়ে শুনতে চাও তুমি বড় কথা। আমার ছোট মুখের বড় কথা। সে-কথাটির নাম, ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বসংসার ভরে উঠবে, ঘুচে যাবে সব ঘর-গড়া ব্যবধান। এইটিই বড় কথা। এইটিই শোনবার জন্যে ছোট হয়ে কাছে এসেছ। ছোট হয়েছ বড় করবার জন্যে। রিক্ত সেজেছ মুক্তির পথ দেখাতে।

তুমি ভিখারি শিব। ভস্মমাখা। হাড়ের মালা গলায় দোলানো। তুমি নিষ্কিঞ্চন বলেই তো প্রবঞ্চিতের বন্ধু। সরল বলেই তো ডাক দিয়েছ সহজ হতে।

কিন্তু এ কেমনতরো শিব? কেমনতরো সাধু? থেকে থেকে কেবল হাত পাতে। কেবল খেতে চায়।

দু পয়সার দেদো সন্দেশ কিনে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে অঘোরমণি। থাকে কামারহাটিতে, দত্তদের ঠাকুর বাড়ির দক্ষিণের কোঠায়। রাধাকৃষ্ণের মন্দির। নিজের হাতে ভোগ রাঁধে অঘোরমণি। কলাপাতায় করে গোপালের জন্যে ভোগ সাজায়। গঙ্গাজলের ছোট গ্লাশ পাশে রেখে পিঁড়ি পাতে সামনে। এস, বসো, খাও—আহ্বান করে গোপালকে।

দু পয়সার দেদো সন্দেশের জন্যেই হাত বাড়ায় রামকৃষ্ণ। বলে, 'কই, কি এনেছ আমার জন্যে? দাও। ও কি, ঢাকছ কেন আঁচলে?'

ছি ছি, অমন 'রোঘো' সন্দেশও কেউ চায় হাত বাড়িয়ে! লজ্জায় পিছিয়ে গেল অঘোরমণি। কত ভালো জিনিস খাওয়াচ্ছে এসে ভক্তেরা, কত তবক-দেওয়া, কত বা রাংতা-জড়ানো। অঘোরমণির যেমন অদৃষ্ট, দু পয়সার দেদো সন্দেশের বেশি জোটেনি। তা, লুকিয়ে এনেছি আঁচলের তলায়, একেবারে আসামাত্রই খেতে চাওয়ার কী হয়েছে? একটু রয়ে-সয়ে ধীরে সুস্থে চাইলেই তো হয়।

'দাও না গো। এনেছ তো লুকোচ্ছ কেন?'

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে সন্দেশগুলো বের করে দিল অঘোরমণি। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে কিন্তু তুমি কি আমার নৈবেদ্যের দৈন্য ধরবে? দেখবে না কি আমার নিবেদনের ভাবটি? তুমি কি ভাবে নও? তুমি কি উপকরণে?

স্বচ্ছন্দে মুখে পুরল সেই দেদো সন্দেশ। সানন্দে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তুমি গরিব মানুষ, পয়সা খরচ করে বাজার থেকে সন্দেশ আনো কেন?'

ন বছরে বিয়ে হয়েছিল, তেরো বছরে বিধবা হয়েছে। অল্প কিছু ধানজমি পেয়েছিল শ্বশুরঘর থেকে, বিক্রি করে তারই সামান্য আয়ে দিন চালায়। দিন কি আর চলে? দিন না চলে তো মনও চলে না। মন অচল হয়ে পড়ে থাকে বিগ্রহের পদমূলে।

গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে অঘোরমণি। সমস্ত সৃষ্টির যে সম্রাট তাকে সে সন্তানরূপে কাছে টেনে এনেছে। দিন কাটাচ্ছে শুধু মন্দিরের তদারকে। ফুল তুলছে, মালা গাঁথছে, চন্দন বাটছে, বাসন মাজছে, ঝাঁটপাট দিচ্ছে। তার পর কোনোরকমে নিজের স্নানাহার সেরে বাকি সময় শুধু জপযজ্ঞ। শুধু মানসনামগুঞ্জন।

এমনি এক-আধ দিন নয়, একটানা তিরিশ বছর।

'ন'রকোলের নাড়ু করবে নিজের হাতে, তাই আনবে দুটো একটা।' কিন্তু এতে বিশেষ আগ্রহ নেই রামকৃষ্ণের। বললে, 'যা নিজের জন্যে রাঁধো, তারই থেকে কিছু নিয়ে এলেই তো ভালো হয়। কী রেঁধেছিলে আজ? লাউশাকের চচ্চড়ি, না, আলুবেগুন-বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার ঘাঁট? তাই নিয়ে এসো না দু-একদিন। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ যায়।'

কেবল খাওয়া আর খাওয়া। এ ছাড়া সাধুর কি আর কোনো কথা নেই? দত্তগিন্নি খুব ভালো সাধুরই খোঁজ দিয়েছে যা হোক। গোপাল-গোবিন্দের কথা নেই, শুধু এ খাই না ও খাই।

দূর ছাই, আর আসব না। আমি অনাথ-কাঙাল লোক, কোথায় পাব অত ভোজনের পারিপাট্য। নিজের পেট চলে না, এখন আবার অতিথি খাওয়াই! তাও, যে অতিথি দুয়ারে এসে দাঁড়ায় না, দূর থেকে বসে হুকুম দেয়। দরকার নেই অমন আদিখ্যেতায়।

কিন্তু কি হল অঘোরমণির, ক দিন যেতে না যেতেই চচ্চড়ি রেঁধে হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে।

'দাও দাও, কী এনেছ বাটিতে করে? লাউশাক না সজনে খাড়া?' হাত বাড়িয়ে বাটিটা টেনে নিল রামকৃষ্ণ। কোনোরকম ভূমিকা না করে খেতে লাগল রসিয়ে-রসিয়ে। বললে, 'আহা, কী রান্না! সুধা! সুধা!'

অঘোরমণির চোখে জল এল। কী এমন রেঁধেছি, সাধু একেবারে স্বাদে-গন্ধে গদ্‌গদ হয়ে উঠেছে! কী করুণা এই সাধুর! দরিদ্র বলে উপেক্ষা করল না, সাধারণ ব্যঞ্জনে কী অসাধারণ ব্যঞ্জনা পেল না জানি।

এমন একটি মশলা এসে মিশেছে যা বাজারে কেনা যায় না। সেটি হৃদয়রসের পাঁচফোড়ন। ভক্তি-প্রীতির সম্বরা।

যতই যায় ততই শুধু খাই-খাই। এটা আনো ওটা আনো। এটা রাধো ওটা রাঁধো। আর কোনো প্রসঙ্গ নেই, শুধু ভোজনবিলাস! শুধু নোলার শকশকানি। অনেক সাধু দেখেছি জীবনে কিন্তু এমন পেটুক সাধু দেখিনি!

এ তুমি আমাকে কোথায় এনে ফেললে। গোপালের কাছে মনে-মনে কাঁদে অঘোরমণি। এমন সাধুর কাছে আনলে যার খাওয়া ছাড়া আর কথা নেই। ধর্ম-কর্মের ধার ধারে না, যেন খাওয়াই পরমার্থ! এত আমি খাওয়াই কি করে? আমার ভাঁড়ার কি অফুরন্ত?

রাত তিনটের সময় জপে বসেছে অঘোরমণি। জপ সেরে প্রাণায়াম সুরু করেছে, কে একজন তার পাশে এসে বসল! গা ছমছমিয়ে উঠল অন্ধকারে। কে, কে তুমি? চমকে চোখ চেয়ে দেখল—এ কি, এ যে সেই দক্ষিণেশ্বরের সাধু। ডান হাত মুঠ করে ধরা, যেমনটি দেখেছে দক্ষিণেশ্বরে, আর মুখে সেই মধুর মৃদুল হাসি। এত রাতে এল কি করে এখানে? অন্ধকারে পথ চিনে-চিনে?

আশ্চর্য একটা সাহস হল অঘোরমণির। নিজের বাঁ হাত বাড়িয়ে ধরল রামকৃষ্ণের বাঁ হাত।

মুহূর্তে ঘটে গেল অভাবনীয়। পাশে বসে আর সেই প্রৌঢ় রামকৃষ্ণ নেই, তার বদলে একটি দশ মাসের শিশু। নধর, নবনীতকোমল। স্নেহদ্রব নবজলধর। এ কি, এ যে সত্যি কার গোপাল!

হামা দিয়ে একেবারে বুকের কাছে চলে এল দেখছি। হাত তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'মা গো, ননী দে।'

এ কি কাণ্ড! অঘোরমণি আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠল: 'বাবা, আমি কাঙালিনী, চিরদুখিনী। ননী কোথা পাব? আমি খুদ খাই, পাতা কুড়ুই।'

সে কথা শুনে নিরস্ত হবার ছেলে নয় গোপাল। অঘোরমণির আঁচল টানে, হাত থেকে মালা কেড়ে নেয়। বলে, 'ও সব আমি শুনি না। মা হয়েছিস কেন তবে? খেতে দিবি কিনা বল—'

শিকে থেকে নারকেল-নাড়ু বের করে অঘোরমণি। ছোট হাতখানি ভরে নাড়ু দেয়। বলে, 'বাবা গোপাল, তোমাকে এ বাসি জিনিস দিতে বুক ফেটে যাচ্ছে—'

তার আগে যে খিদেয় আমার পেট চুপসে যাচ্ছে। বাসি নাড়ু, বাসি নাড়ুই সই। সন্তানবিরহে যে মা উপবাসী তার সঞ্চিত স্নেহ কি কখনো বাসি হয়? মুখ ভরে খেতে লাগল গোপাল। উপভোগের আনন্দে চোখের পাতা নাচতে লাগল।

কিন্তু খেয়েই কি সে শান্ত হবে? না কি সে শান্ত হবার মত ছেলে? ঘরময় ছুটোছুটি করে

বেড়াতে লাগল। কখনো অঘোরমণির কোলে, কখনো বা কাঁধে চেপে বসতে লাগল। জপ-তপ ঘুচে গেল অঘোরমণির।

সকাল হলেই ছুটল দক্ষিণেশ্বরের দিকে। ছুটল প্রায় পাগলিনীর মত। অগোছাল চুল, অসামাল বেশবাস। বুকের উপর দু বাহুর মধ্যে কখন উঠে এসেছে গোপাল। তার রাঙা পা দুখানি বুকের উপর টুকটুক করছে।

গোপাল! গোপাল! বলতে-বলতে রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অঘোরমণি। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, রামকৃষ্ণের পাশ ঘেঁসে বসে পড়ল। আর, এরই জন্যে যেন অপেক্ষা করছিল রামকৃষ্ণ। ভাবাবেশে অঘোরমণির কোলে চড়ে বসল।

যে দেখল সেই অবাক। বাষট্টি বছরের বুড়ির কোলে আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় সন্তান! যে ঠাকুর স্ত্রীজাতির ছোঁয়া সহ্য করতে পারেন না তাঁর এ কেমনতরো ব্যবহার!

কেমনতরো তা কে বোঝে! একবার মা হয়ে কোলে নিয়েছিল ছেলেকে, রাখালকে; এবার ছেলে হয়ে কোলে বসলো মা'র।

ক্ষীর-সর খাইয়ে দিতে লাগল অঘোরমণি। খাইয়ে দিচ্ছ তো কাঁদছ কেন? অন্তরের স্নেহধারা নয়নের অশ্রুধারা হয়ে বেরুচ্ছে। আমি নন্দরানি তুমি আনন্দদুলাল। তুমি গোপাল আর আমি গোপালের মা।

ভাব সংবরণ করে সরে বসল রামকৃষ্ণ। কিন্তু গোপালের মা'র আর ভাব থামে না। ছেলে সরে বসে কিন্তু মা'র স্নেহভাবের কি ইতি আছে? সে ভাবগঙ্গায় কি ভাটা পড়ে? সেখানে শুধু জোয়ারের জল। শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ। তাই ঘরময় নাচতে লাগল অঘোরমণি। আর গাইতে লাগল, ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে আর নাচে শিব।

'দেখ দেখ আনন্দে ভরে গেছে। গোপাললোকে চলে গেছে গোপালের মা।' বললে রামকৃষ্ণ।

'এই যে গোপাল আমার কোলে, ঐ যে আবার তোমার ভেতর'—সুতোর আর বিরাম নেই অঘোরমণির: 'আয় রে গোপাল বেরিয়ে আয়, আয় রে আমার কঠিন কোলে—'

এবার ছেলের হাতে কিছু খাও গোপালের মা। ছেলের ভালোবাসার কিছু স্বাদ নাও। নিজের হাতে খাইয়ে দিল রামকৃষ্ণ। বুকে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে ভাবভূমি থেকে নিয়ে এল বাস্তবভূমিতে।

'বড় দুঃখে দিন কেটেছে বাবা! কোথায় ছিলি তুই এত দিন? টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে দিন কেটেছে। আজ বুঝি তোর দুখিনী মায়ের কথা মনে পড়েছে? তাই এত আদর করছিস মাকে? বল্ যখন একবার তোকে কোলে পেলাম, আর তুই যাবি না কোল ছেড়ে—'

রামকৃষ্ণ এখন নিজেই রামলালা।

অনেক বলে কয়ে সন্ধের দিকে পাঠিয়ে দিল অঘোরমণিকে। নিজের বাড়ি কামারহাটিতে। কিন্তু যখনই পথে নেমেছে, গোপাল কখন ছুটে এসে দিব্যি কোলে চড়ে বসল। তা বসেছিস বোস, বুকে করে নিয়ে যাচ্ছি বাড়ি। কিন্তু বাড়ি এসে এ তুই কী রঙ্গ সুরু করে দিলি? এ কি, আমাকে আজ তুই জপ করতে দিবিনে দুষ্টু ছেলে? বেশ, তাই করব না জপ, মালার থলে গঙ্গাজলে ফেলে দেব। কিন্তু এখন তুই কী চাস বল তো? ঘুমুবি? এই তো দেখছিস আমার বিছানার ছিরি, শুকনো তক্তপোষের উপর ছেঁড়া মাদুর পাতা। নরম বিছানা-বালিশ আমি পাব কোথায়? শুবি তো শো এই শুকনো কাঠে।

শুয়েছে বটে কিন্তু গোপালের স্বস্তি নেই। খুঁতখুঁত করতে লেগেছে। দুধের শিশুকে কি তার মা এমন কঠিন বিছানায় শুতে দেয়? বালিশ নেই তোষক নেই এ কী নিষ্ঠুরতা।

'বাবা, আজ এ রকমই শোও, কাল কলকাতায় গিয়ে নরম বিছানা করিয়ে দেব।'

বাঁ বাহুর বালিশে গোপালের মাথা রেখে ঘুম পাড়াল গোপালের মা। মাতৃ-অঙ্গের স্নেহস্পর্শ পেয়েছে, আর চাই কি গোপালের। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অঘোরমণিকে দেখিয়ে রামকৃষ্ণ বললে, 'এ খোলটা কেবল হরিতে ভরা। হরিময় শরীর।' মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিলে। শিশু যেমন মাকে আদর করে তেমনি। পায়ে হাত দিয়েছে বলেও চমকাল না গোপালের মা। ছেলে যদি পায়ে হাত দেয়, মা কি চমকায়, না, প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করে?

সেদিন বাড়ি ফিরবার সময় মাকে অনেকগুলি মিছরি দিলে রামকৃষ্ণ। ভক্তরা যত এনেছিল

শ্রীশ্রীমা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মানবী হয়েই ছিলে চিরদিন
দেবতা তোমার স্বামী।
প্রণমামি, প্রণমামি।
গৃহ-তপোবনে তোমার সাধনা,
শত কাজে রত, তবু আনমনা,
অন্তরে তব, তপ করে উমা
তন্ময়ী দিবাযামি।

ছিলে না স্বামীর লীলাসঙ্গিনী,
সহধর্ম্মিণী ছিলে।
সমধর্ম্মিণী তুমি যে তাঁহার,
শক্তি তাঁহাকে দিলে।
ছিল না তোমার কিছু তাঁহা ছাড়া,
তুমি হয়েছিলে তাঁহাতেই হারা,
সব চেয়ে বড় সুকঠিন ব্রত
তুমি যেচে বেছে নিলে।

জননী তুমি যে জগৎজননী
জ্ঞাতে অজ্ঞাতে স্মরি,
তোমার পুত্র কন্যার ভিড়ে
জগৎ উঠিছে ভরি।
ভুবন ভবনে তুমি মা গৃহিণী,
স্নেহের পরিধি বাড়িতেছে দিনই
প্রতি গৃহে গৃহে পূজা করি মোরা
তোমার প্রতিমা গড়ি।

আজিকে তোমার শত বার্ষিকী
পুণ্য জন্মতিথি।
শত সহস্র বার্ষিকী যাবে
আয়ু যে বাড়িবে নিতি।
তব নামে হবে নরনারী শুচি,
হবে সংযমী, সত্যেতে রুচি,
তারাই আনিবে বিশ্বশান্তি
গড়িবে নূতন ক্ষিতি।

উপচার, সমস্ত। গোপালের মা বললে, 'এত মিছরি দিয়ে কী হবে?'

তার চিবুক ধরে সোহাগ করে বললে রামকৃষ্ণ, 'ওগো, আগে ছিলে গুড়, পরে হলে চিনি, এখন হয়েছ মিছরি। এখন মিছরি খাও আর আনন্দ করো।'

সন্তান কোলে নিয়ে মেয়েরা যেমন কোমর বাঁকিয়ে হাঁটে, তেমনি করে চলে গোপালের মা। 'না বিইয়ে কানায়ের মা।' সর্বজীবে গোপাল দেখে। ক্ষুধার্ত ভগবান মাতৃহৃদয়ের কাছে স্নেহের নবনী ভিক্ষা করে ফিরছেন।

আত্মীয়ের মধ্যে একটি শুধু বেড়াল। বেড়ালের মধ্যে ঠাকুর দেখেছেন কালী, অঘোরমণি দেখছে গোপাল। সেবার, ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সিষ্টার নিবেদিতার ঘাড়ে বেড়ালটি ঘুমিয়ে আছে। নিবেদিতাও নির্বিকার। এ কি দুর্দৈব, কে একজন স্ত্রী-ভক্ত তাড়িয়ে দিল বিড়ালটাকে।

'আহাহা, কি করলি মা, কি করলি? গোপাল যে চলে গেল, চলে গেল—'

কিন্তু কোথায় সে যাবে? সে যে বস্ত্রাঞ্চলের নিধি। সকাল হতেই চলেছে সে বাগানে মা'র সঙ্গে কাঠ কুড়োতে। পিঠে পড়ে মা'র রান্না দেখতে। পুকুরে নেমে ঝাঁপাই বড়তে।

দিন যায়। অঘোরমণি বুড়ো হয়, কিন্তু গোপাল আর বড় হয় না। চিরকাল মা'র বুকের আঁচল ধরে টানে আর কাঁদে, 'মা, খেতে দে, খিদে পেয়েছে—'

কোথায় তুমি খেতে দেবে, তা নয়, তুমিই খেতে চাও। ভ্রমর হয়ে ফিরছ গুঞ্জন করে, গুনগুন করে বলছ, কোথায় ফুলটি ফুটেছে, কে আমাকে একটু মধু দেবে! [ক্রমশঃ।

দ্বিতীয় প্রবাহ

প্রথম তরঙ্গ

'কল্লোল'

সবে যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, নির্ঝর তখনও গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে নাই, দিগন্তপ্রসারী সমতল শ্যামল প্রান্তর তখনও বহু নিম্নে ক্ষীণ রজতমেখলা-মণ্ডিতবৎ বোধ হইতেছিল, সহসা জল-কল্লোল কানে আসিল। যুক্তিবিচারহীন অসাবধানী আত্মভোলা পথিকের নিশ্চয়ই সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু আমরা খেলাচ্ছলে যাত্রা করিলেও উৎকর্ণ হইয়াই ছিলাম, শ্রবণমাত্র একটু চকিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, গিরি-প্রপাতেরই কল্লোল—সমুদ্রের নহে। পূর্বগামী অন্য এক নির্ঝরিণী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ একস্থানে স্খলিত হইয়া একটা বড় রকমের পতনের ফলে "ফল্‌সে"র (falls) সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সর্বৈব "ফল্‌স্‌" (false) সমুদ্র-কল্লোল। আমরাও নাগাল ধরিয়া ফেলিলাম, ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

তরুণ হনুমান জননী অঞ্জনার স্নেহক্রোড় ছাড়িয়া নিদারুণ ক্ষুধার বশে পাকা ফল ভ্রমে রক্তবর্ণ সূর্যকে করায়ত্ত করিবার জন্য মহাশূন্যে লম্ফ প্রদান করিয়াছিল। ভ্রম তাহার তারুণ্যের; বস্তু ও মানুষের যথাযথ মূল্যবোধ এই অবস্থায় থাকে না—ছোটকে বড় মনে হয়, বড়কে ছোট। উভয় পক্ষেই এই ভুল ঘটিয়াছিল, ফলে সম্পূর্ণ বাহিরের নিরীহ ভালোমানুষ লোকের কাছাতেও টান পড়িয়াছিল। কবি মোহিতলাল মজুমদার এই ভালোমানুষ সম্প্রদায়ের একজন। তিনি কাছা সামলাইতে সামলাইতে এই কল্লোলের আবর্তে একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রগড় জমিয়া উঠিল।

এতদিন পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান উপজীব্য ছিল পলিটিক্স, স্বরাজ-পলিটিক্স। এ-পক্ষের রথচূড়ায় আত্মগোপন করিয়াছিলেন স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অভিযানের লক্ষ্য ছিলেন সি. আর. দাশ—তখনও পাকাপাকি রকম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হন নাই। গড়পাড় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এক ক্ষুদ্র জনসভায় দাশ মহাশয় শনিবারের চিঠি'র উল্লেখ করিয়া "চ্যালেঞ্জ অ্যাক্‌সেপ্ট"ও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পর্ব জমিতে না জমিতে আমি আসিয়া পড়িয়া ভাগের মায়ের বোঝা স্কন্ধে লইলাম, বাকি কয়েকজন কাঁধ সরাইয়া লইয়া এদিকে ওদিকে সরিয়া পড়িবার উপক্রম

শ্রীসজনীকান্ত দাস

করিলেন; সাপ্তাহিকের অষ্টম হইতে একাদশ সংখ্যার মধ্যেই এইরূপ ঘটিল। একাদশ সংখ্যার কামস্কাটকীয় ছন্দের শেষ "অসম ছন্দ" অন্য উপদ্রব টানিয়া আনিল। "আমি ব্যাঙ" বলিয়া আরম্ভ হইয়া হঠাৎ তাল-ফেরতায় ব্যাঙ সাপ হইয়া গেল—

> "আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
> আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।
> আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিতফণা,
> আমি ছোবল মারিলে নরের আয়ুর মিনিট যে যায় গণা—
> আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
> আমি "বে অব বিস্কে", "সাইক্লোন" আমি, মরু সাহারার আঁধি।"

এবং পরেই, "আমি খোদার ষণ্ড, নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি...।" আবেদন যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিল। হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিরীক্ষণ করিয়া সম্মুখে কাহাকেও না পাইয়া মোহিতলাল মজুমদার নেপথ্যে আছেন কল্পনা করিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই কবিতার গদা নিক্ষেপ করিলেন। গুরুর সহিত শিষ্যের তখন মনোমালিন্য গাঢ়তর হইয়াছে। এই গদার বাহন হইল 'কল্লোল' নামক মাসিকপত্রের দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১) ষষ্ঠ বা আশ্বিন সংখ্যা। 'কল্লোল' আসিয়া আমাদের পাড়ায় পৌঁছিল। ইতিপূর্বে তেইশ সংখ্যা ধরিয়া ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে এই পত্রিকা নিয়মিত বাহির হইয়াছে। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত এমন কিছু নহে; আর পাঁচটা পত্রিকা যেমন হয় সেই রকমই পাঁচমিশেলি ব্যাপার, থোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি থোড়; লেখক রবীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্য নৃপেন্দ্র বুদ্ধদেব পর্যন্ত; পুরাতন এবং নূতনের মিশাল, ভাল মন্দ মাঝারি সবরকমের লেখাই ইহাতে থাকিত। যুগ-পরিবর্তনের কোন সূচনাই ইহাতে ছিল না। ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'যমুনা'তে

ধারাবাহিক ভাবে 'নারীর মূল্য' ও 'চরিত্রহীন' ছাপিয়া শরৎচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ওই বৎসরেই প্রথম প্রকাশিত 'ভারতবর্ষে' নবভাবধারার যে জোয়ার আসিয়াছিল তখন পর্যন্ত তাহারই জের চলিতেছিল। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস হইতে সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আওতায় তাঁহারই আশ্রয় হইতে 'বঙ্গবাণী' বাহির হইয়া বঙ্গভাষায় মৌলিক চিন্তাশীল প্রবন্ধ-সাহিত্যে যে অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, আমরা তখন পর্যন্ত তাহাতেই মুগ্ধ বিস্মিত ছিলাম। আমাদের সামাজিক এবং অন্য বহুবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্যিক আন্দোলন তুলিয়াছিলেন ১৩২৯-৩০ বঙ্গাব্দে তিন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ—ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য 'বেপরোয়া' নামক অসাময়িক পত্রিকায়। যে বিপ্লব ও বিদ্রোহের ধুয়া ইঁহারা এই চটি সচিত্র পত্রিকায় তুলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার মত, তাহার তুলনা হয় না। এই সব দিক দিয়া 'কল্লোলে'র কোনও বৈশিষ্ট্যই ছিল না। বাংলা-সাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র যে নূতন ধারার প্রবর্তক তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল অন্যত্র, কয়লাকুঠির গল্পগুলিতে। যে অশ্লীলতার দাপাদাপি করিয়া 'কল্লোল' তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে অন্য ধরনের নূতনত্ব সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিল তাহারও আরম্ভ হইয়াছিল চিত্তরঞ্জন দাশ প্রবর্তিত 'নারায়ণে' (১ম বর্ষ ১৩২১-২২)। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন জগদীশ গুপ্ত-যুবনাশ্ব-অচিন্ত্যকুমার-বুদ্ধদেব বসুর পূর্বগামী।

যাহা হউক, "আমি ব্যাঙ" পড়িয়া কাজী নজরুলের রক্তে "সর্ব্বনাশের নেশা" জাগিয়া উঠিল, গুরুসম্বোধনে মোহিতলালকে রণে আহ্বান করিয়া তিনি লিখিলেন, "রক্ত অসির কৃষ্ণ মসী"র যে কোনো যুদ্ধে তিনি গুরুর সহিত বোঝাপড়া করিতে প্রস্তুত আছেন এবং মোহিতলালকে শেষে এই বলিয়া শাসাইলেন "ভূধরপ্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার।" মোহিতলাল হস্তদন্ত হইয়া 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে ছুটিয়া আসিলেন। হাতে একটি দীর্ঘ রচনা—"দ্রোণ-গুরু" নামে একটি কবিতা। বলিলেন, নজরুল গালাগালি দিলেও 'শনিবারের চিঠি'র সহিত সরাসরি যুক্ত হইতে তাঁহার আপত্তি আছে। তাঁহার কবিতাটি 'শনিবারের চিঠি'র "ক্রোড়পত্র" করিয়া ছাপাইতে হইবে। আমরা তাহাতেই রাজী হইলাম। "বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা" বা দ্বাদশ সংখ্যায় (৮ কার্তিক, ১৩৩১) কবিতাটি মুদ্রিত হইল। কবিতাটিতে তিনি একটি ভূমিকা যোজিত করিয়া আমাকে অর্জ্জুন বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। অংশত উদ্ধৃত করিতেছি :

"কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য্য কুরু সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলে, তিনি প্রাচীন ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া দ্রোণ-বিদ্বেষী কর্ণের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়। এদিকে দ্রোণ-শিষ্য অর্জ্জুনের কৃতিত্বও কর্ণের দুঃসহ হইয়া উঠে।...দ্রোণাচার্য্যের মনে অর্জ্জুনের প্রতি আন্তরিক স্নেহ নষ্ট করিবার জন্য, এবং তাঁহার উপর যাহাতে গুরুর নিদারুণ অভিশাপ বর্ষিত হয় এই উদ্দেশ্যে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া একখানি গুরুদ্রোহসূচক কুৎসাপূর্ণ পত্র দ্রোণাচার্য্যের নিকট প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য, এই কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।"

এই নিদারুণ কবিতার শেষ কয়েক পংক্তি মারাত্মক, বাংলা-সাহিত্যে অভিশাপের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ :

"আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
অধঃপাতের দেরী নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর!
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
গুরু ভার্গব দিল যা' তুহারে! ওরে মিথ্যার রাজা!
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার,—মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে!
দুদিনের এই মুখোস মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস—
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস!"

অতঃপর রণদামামা বাজিয়া উঠিল, আর ঠেকানো গেল না। দুইটি নিরীহ শান্ত সমুদ্রপথযাত্রী স্রোতস্বিনীর মধ্যে কলহের কল্লোল ফেনল হইয়া উঠিল। 'শনিবারের চিঠি' ও 'কল্লোল' দুই পত্রিকারই কর্তৃপক্ষ পরস্পর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন প্রখ্যাত সংস্কৃতি-সংঘ 'ফোর আর্টস ক্লাবে'র সদস্য উভয় পক্ষেই ছিলেন। 'কল্লোলে'র সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশই 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম প্রচ্ছদপট অঙ্কিত করিয়াছিলেন, অনেকটা চাবুকহস্তে সমুদ্র-শাসনরত কাপ্তাটের ছবি যেন; আবার তাঁহারই আঁকা

'কল্লোলে'র প্রচ্ছদপট—সমুদ্রতটে নৃত্যরত নটরাজের চরণতল স্পর্শ করিতেছে সমুদ্রের উদ্বেল তরঙ্গমালা—প্রায় একই ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। দুই সহোদরা দিতি ও অদিতির সন্তানদের মত 'শনিবারের চিঠি'র আর 'কল্লোলে'র কলহ বাধিবে, ইহার সম্ভাবনাও প্রারম্ভে অভাবনীয় ছিল। কিন্তু সেই অভাবনীয়ই ঘটিল। দুই সখীর সহজ দৃষ্টি প্রায় অকারণ ক্রোধে কুটিল হইয়া উঠিল। আশ্বিনের (১৩৩১) 'কল্লোলে' কাজী নজরুল ইসলাম যে কলহের সূত্রপাত করিলেন, আমরা তাহার জের টানিয়া "বিদ্রোহ সংখ্যা"র ভূমিকায় লিখিলাম :

"...আজ বাংলা দেশেও একটা বিদ্রোহের রোমাঞ্চ, একটা পুলকস্পন্দন জাগছে। সকলের চেয়ে তা প্রকাশ পাচ্ছে বাংলা সাহিত্যে—বিশেষত কাব্যে। ঝঞ্চার ঝনৎকার, প্রলয় ঝড়ের বিষম ঝড়ংকার, মহাকুলিশের কড়ক্কাকড়ি আজ বাংলার সাহিত্যগগনকে দিকে দিকে বিদীর্ণ বিশীর্ণ করে ফেলছে। বিদ্রোহী রক্তাশ্বের উন্মত্ত হ্রেষা যাদের চিত্তে বিপ্লবের চিহি-রব প্রতিধ্বনিত করছে, বিশ্বের খিলানে তার প্রচণ্ড খুরক্ষেপ যাঁরা মুহূর্তে মুহূর্তে লক্ষ্য করে চলেছেন বাংলা দেশের সেই প্রধান কয়েকটি বিদ্রোহী কবির লেখা এইবার দেওয়া গেল। বাংলার প্রত্যেক পাঠকেরই এই কবিদের সঙ্গে পরিচয় থাকা আবশ্যক। যে মুটে দুপুরবেলায় ঝাঁকায় শুয়ে ঘুমোয় তার অন্তরে তখন কি ব্যথা জাগছে—পাহারওয়ালারা যখন মোড়ে মোড়ে রোঁদ দিয়ে ফেরে, তাদের সেই নীরব গাম্ভীর্যের মধ্যে অত্যাচারের কি বিকট মূর্ত্তি লুক্কায়িত রয়েছে—নবোঢ়া পত্নী বায়স্কোপ-দর্শনাভিলাষিণী হয়ে যখন পতির অনুমতি না পেয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে অশ্রুবর্ষণ করে, তার সেই নিবিড়-হৃদয়-নিঙড়ানো ব্যথার ধারায় যুগে-যুগে সঞ্চিত অবরুদ্ধ পীড়িত অত্যাচারিত নারীর বিদ্রোহী অন্তরের কি করুণ অথচ কি রূঢ় ইতিহাস জলের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—সেই সব গণপ্রাণের কথা জানতে গেলে এই কবিদের লেখা পড়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ এঁদের ছন্দে সুরে সমস্তই ধরা পড়েছে, যেমন করে ধরা পড়ে নব কিশোরী তার প্রণয়পাগল মনচোরের বাহুবন্ধনের মধ্যে।"

"নব-শিহরণে" অশোক চট্টোপাধ্যায় "হর্ষক" বেনামীতে লিখিলেন—

"শিহরণ জেগেছে রে কি হরণ করিব ?
স্ত্রীহরণ বিহরণে যুঝে রণ মরিব।"

সম্পাদক যোগানন্দ দাস নামহীন "ছড়া"য় লিখিলেন,

"ভেপসে উঠে খেপলি কেন কী হল তোর খাপ্পা খোকা,
থাবড়া মেরে হাবড়া গেল ঘাবড়ে গিয়ে বাপ খামোখা ?"

এবং পরবর্তী ত্রয়োদশ সংখ্যায় (কার্তিক ১৫, ১৩৩১) "বিদ্রোহী-সংখ্যা"য়-স্বাতন্ত্র্য-প্রার্থী মোহিতলাল "চামার খায়-আম" বেনামীতে সরাসরি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া লিখিলেন—

"চাহি না আঙুর—শুধু চানাচুর,
কাঁকড়ার ঠ্যাং খান্ দুই,—
দলঘসে ফুল নিয়ে আয় সখি,
চাই না গোলাপ বেল যুঁই।
লোকে বলে গানে আঁশটে গন্ধ,
বোঝে না আমার এমন ছন্দ!—
আর কিছু দিনে ইহারি ক্ষুধায়
নাড়ী যে করিবে চুঁই চুঁই!
চাবে না আঙুর, চাবে চানাচুর
চিংড়ির চপ খান্ দুই।"

ফলে 'শনিবারের চিঠি'র পলিটিক্সের দুই নয়ন ক্রমশ স্তিমিত হইয়া আসিল, সাহিত্যের তৃতীয় নেত্র, যাহা এতদিন অলক্ষ্য ছিল, ধীরে ধীরে বিস্ফারিত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে আমার ভাগ্যের বাসস্থানে শনির দৃষ্টি পড়িল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বিশ্বভারতীর হর্তাকর্তা বিধাতা; তিনি সর্বগ্রাসী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষ, তাঁহার আশ্রয়ে অর্ধেক মাথা গলাইয়া থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। গভীর রাত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রুফ দেখিতেছি, তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "কামস্কাটকীয় ছন্দ" তোমার লেখা ? কোন্ দিকে নীত হইতেছি ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া সগর্বে উত্তর দিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। যীশুর মুখে সস্মিত হাসি ফুটিল, বলিলেন, খুব ভাল লেখা কিন্তু এ সব কাজে বাজে সময় নষ্ট না ক'রে বিশ্বভারতীর সেবায় পুরোপুরি লেগে গেলে কতকটা স্থায়ী কাজ করতে পার। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা বাকি আছে। সে কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না এবং স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্রের অনেক গভীর গবেষণা সত্ত্বেও আজিও অনেক কিছু করিবার আছে সে বিশ্বাসও

আমার আছে। কিন্তু যে "কামস্কাটকীয় ছন্দে"র জন্য 'শনিবারের চিঠি'র ভোলই বদলাইতে চলিয়াছে, তাহার রচনাকে বাজে কাজের পর্যায়ভুক্ত মনে করিতে পারিলাম না। সুতরাং পরদিনই প্রশান্ত-শাসিত বিশ্বভারতীকে সেলাম বাজাইয়া আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিলাম। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে থাকিলে হয়তো তাঁহার দরবার পর্যন্ত যাইতাম, কিন্তু তিনি তখন "পশ্চিম-যাত্রিকী"।

এবার আমার মুরুব্বি হইলেন স্বয়ং সম্পাদক যোগানন্দ দাস; তিনি মতান্তর বাপদেশে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের উপরে মানিকতলা মেন রোডের ঠিক দক্ষিণে "সায়ান্স কট" নামক গালভরা নামওয়ালা একটি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাস্থ্যকর মেস সন্ধান করিয়া পাশাপাশি দুইটি ঘর ভাড়া লইলাম। পূর্বপরিচিত বিপিনবাবুর রেস্তরাঁয় ধারে কারবার ছিল, সুতরাং এখানকার কদর্য আহার-ব্যবস্থায় বিশেষ আহত হইলাম না। রাত্রির ভয়াবহ পরিবেশকে প্রায়শই সঞ্জীবিত ও সুসহ করিয়া দিতেন খুড়দা—অশোক চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন রায় রোডের অদূরবর্তী এই মেসে তিনি নৈশ-আহার-প্রারম্ভিক ভ্রমণে আসিতেন, একটা ভাঙা চেয়ার ছিল তাহাতে প্রায় 'ময়ূর সিংহাসনে' বসার ভঙ্গিতে বসিতেন এবং কবিতা লেখার কম্পিটিশন লাগাইয়া যোগানন্দদা ও আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিতেন। নীচের অখাদ্য চায়ের দোকান হইতে পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসিত, খুড়দা যোগানন্দদা উভয়ে মোটা মোটা বর্মাচুরুট ধরাইয়া বসিতেন, আমি চায়ের ও চুরুটের পরস্মৈপদী ধোঁয়ায় মশগুল হইয়া কবিতা লিখিয়া যাইতাম। এই সময়ে আমরা পরস্পর পাল্লা দিয়া অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলাম। মোহিতলালও ধারাবাহিকভাবে "রুবাইয়াৎ-ই-চামার-খায়-আম" লিখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

একদিন এই সময়ে 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে অর্থাৎ 'প্রবাসী' আপিসেই "কম্পিটিশনে"র আসর বসিল। সেই বৎসরের ডিঙ্গ লণ্ঠনের ক্যালেণ্ডারে এক সুন্দরী বিদেশিনীর অপরূপ রঙিন চিত্র ছিল। তিনিই হইলেন কবিতা-প্রতিযোগিতার বিষয়। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত-সজনীকান্ত এই চারিজন প্রতিযোগী; এই অধমই সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম হইল; ২২শে কার্তিকের (১৩৩১) 'শনিবারের চিঠি'তে কবিতাটি প্রকাশিতও হইল; আরম্ভটা এইরূপ—

"ওগো তুষার দেশের মেয়ে—
কেন এই বাংলা দেশের গোবেচারির পানেতে রও চেয়ে।
তোমার ঐ নীল নয়নে নিমেষ নাহি
ফ্যালফেলিয়ে আছ চাহি
প্রণয়-ভীতু কুমারীদের
নয়কো রীতি যে এ!
ওগো তুষার দেশের মেয়ে!
যেদিন কিনে ছ আনাতে
গোলদীঘির ওই পুব কোণাতে;
সুমুখের এই দেয়ালটাতে
টাঙিয়ে দিলেম তোমায়,
সেদিন হতে আজও
তোমার একটু নাহি লাজও,
নিমেষবিহীন নয়নবাণে
বিঁধছ কেবল আমায়!
আমার কাজ-অকাজে ঘুমের মাঝে
মনটি আছ ছেয়ে—
ওগো তুষার দেশের মেয়ে!"

এই সময়ে বাংলা দেশের সংস্কৃতি-রাজ্যের তিনজন ধুরন্ধর পণ্ডিতের সহিত আমাদের প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক জন্মে। 'প্রবাসী' আপিসে ও বিশ্বভারতী আপিসে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর কালিদাস নাগের নিত্য যাতায়াত ছিল। ডক্টর নাগ তখনই 'প্রবাসী'র সহিত ঘনিষ্ঠতর হওয়ার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সুতরাং তিনি 'কল্লোলে'র সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগের জ্যেষ্ঠ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আত্মীয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অতি সামান্য সহজ কথাবার্তায় এমন একটা আবেগ-স্পন্দন থাকিত যে আমাদের চিত্তও কিছু একটা করিবার জন্য ব্যাকুল ও স্পন্দিত হইয়া উঠিত; তিনি সর্বদাই নিজের চতুর্দিকে একটা মহত্ত্বের ও বিশ্ব-সৌহার্দ্যের তপ্ত পরিমণ্ডল সৃজন করিয়া রাখিতেন; অথচ তাঁহার সম্ভাষণ শুনিতে শুনিতে আমাদের মনে হইত, কি যেন একটা করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয় নাই। ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকরকেও বৃহৎ ভাবনায় ভাবিত করিবার মন্ত্র তাঁহার জানা ছিল। তিনি এখনও সেই মন্ত্রেরই কারবার করিতেছেন।

সুনীতিকুমার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ; তিনি কত বড় তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সন্নিধানে

থাকিয়া তাহা বুঝিবার জো নাই। তখন হইতেই আমাদের সকল সংশয়ের মীমাংসা একমাত্র তাঁহার নিকটেই ছিল। তিনি ভাষাতত্ত্বের টাইটানিক জাহাজ, কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনও তত্ত্ব নাই যাহাতে ডিঙ্গি বাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসুকে পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে না পারেন; আরবের মরুভূমিতে তাঁহার গল্প আরম্ভ হইলে জাপানের ক্রিসেন্থিমাম-উদ্যানে গিয়া তাহা শেষ হইত, মুণ্ডাদের কথা শুরু হইলে তাহা শেষ হইত ক্রোম্যাগ্‌নন মানুষের মুণ্ডুতে। মহাভারত—কথাসরিৎসাগর—আরব্য-উপন্যাসের মত গল্প হইতে গল্পান্তরে বিচরণ করিতে করিতে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে কোনও আসর সরগরম করিয়া রাখিতেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কদের মত তাঁহার প্রেম-প্রীতি বিশেষ স্ফূর্তি পাইত আহার্যবস্তুর মাধ্যমে, এত বড় খাদ্যরসিক এযুগে আমি আর দেখি নাই। দেশভ্রমণে তাঁহার ক্লান্তি নাই, বুড়া বয়স পর্যন্ত সকল দৈহিক অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া তিনি সারা পৃথিবী চষিয়া বেড়াইতেছেন, আর সমস্ত পৃথিবীর সুন্দর ও উৎকট "কিউরিও"-নিচয় তাঁহার বৃহৎ লাইব্রেরি-ঘরে ভিড় জমাইয়া সেটিকে স্বল্প-পরিসর করিয়া তুলিতেছে। তিনি 'শনিবারের চিঠি'র গোড়া হইতে অন্যতম প্রধান হিতৈষী, তাঁহারই কৃপায় তাঁহার মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে আমরা নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলাম। সুনীতিকুমার 'শনিবারের চিঠি'তে খুব কমই লিখিয়াছেন, অনেকের ধারণা 'শনিবারের চিঠি'র বহু পাণ্ডিত্যমূলক প্রবন্ধ তাঁহার রচনা। তাহা নয়; কিন্তু হাতেকলমে তাঁহার রচনা না হইলেও 'শনিবারের চিঠি'র সকল পাণ্ডিত্যের নীচে তাঁহারও স্বাক্ষর আছে। এমন সহজ সবল সুস্থ স্বধর্ম ও স্বদেশ-প্রেমিক আনন্দময় পুরুষ আমি কমই দেখিয়াছি, তাঁহার সাহচর্যে আমাদের অনেক লাভ হইয়াছে।

তৃতীয় পণ্ডিতের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইলেন মোহিতলাল, তিনি তাঁহারই যৌবনের বন্ধু ডক্টর সুশীলকুমার দে। সুশীলকুমার কথায় চিঁড়া ভিজাইবার লোক নহেন, কাজের লোক। আমাদের চেষ্টাকে আশীর্বাদের দ্বারাই সমর্থন করিলেন না, একেবারে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ত্রয়োদশ সংখ্যা সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে (১৫ কার্তিক, ১৩৩১) তিনি প্রেমমুকুল জানা ও শান্তশিব গাজনদার এই দুইটি বেনামীতে যথাক্রমে "অজানা প্রেম" কবিতা ও "আর্ট ও আলোক-পন্থা" প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। সেই দিন হইতে আজও পর্যন্ত তিনি 'শনিবারের চিঠি'র প্রায় কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার বহু গদ্য-পদ্য রচনায় 'শনিবারের চিঠি' সমৃদ্ধ হইয়াছে। তিনি বাহিরে মৃদু স্বল্পভাষী হইলেও আমাদের আসর জমাইয়া মুখরোচক গল্প বলিতে ওস্তাদ ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র প্রাথমিক দলের যে চিত্র প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে সুনীতিকুমার মোহিতলালের সঙ্গে তিনিও আছেন।

'কল্লোল'-সংঘর্ষের দরুণ 'শনিবারের চিঠি'র ক্রম-সাহিত্যপরায়ণতার মোট ফল কিন্তু এই সাপ্তাহিক পর্যায়ে ভাল হইল না। তবে এ কথাও সত্য যে, পলিটিক্সের পথও আর তাহার পক্ষে কুসুমাস্তীর্ণ হইত না। যে স্বরাজ্য পার্টির বিরুদ্ধে ইহার প্রধান অভিযান ছিল তাহার নেতা ও কর্মীরা ধৃত ও কারান্তরালে নীত হইয়া দেশের ও দশের চোখে জয়ী হইয়া গেলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি আর শোভনভাবে চলিত না; যে ভাবেই হউক বিষয়ান্তরে যাইতেই হইত।

'কল্লোলে' তখন ফুট্‌কি-কণ্টকিত গল্প-কথিকার রেওয়াজ আরম্ভ হইয়াছে, আর আরম্ভ হইয়াছে অবাস্তবের সঙ্গে অতি-বাস্তবের বিচিত্র সংমিশ্রণ—গোকুল নাগের সঙ্গে যুবনাশ্ব। 'শনিবারের চিঠি'র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ সেই পথেই নূতন অভিযান শুরু করিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পুলিন-বিহারী দাস প্রভৃতি যাঁহারা ইহাতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা একেবারেই বিদায় লইলেন, এবং নানা কারণে রুধিরেরও অভাব ঘটিতে লাগিল। আমি পর পর রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার প্যারডি লিখিয়া নাম করিয়া ফেলিলাম। প্রমথনাথ বিশী (১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩১) এবং রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (২১ অগ্রহায়ণ ১৩৩১) 'শনিবারের চিঠি'র দলে নেপথ্যে যোগ দিলেন—ইঁহারা সশরীরে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন আরও অনেক পরে। সে কাহিনী যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

সপ্তদশ সংখ্যা পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র কিছু সৌষ্ঠব ছিল, পঞ্চবিংশ সংখ্যা পর্যন্ত কোনও

রকমে পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২ বজায় রাখিয়া বিপন্ন পণ্ডিতের মত সে দেহের অর্দ্ধেক ত্যাগ করিল এবং আরও দুই সংখ্যা সেইরূপ কাহিল ভাবে চলিয়া ৯ই ফাল্গুন ১৩৩১ সপ্তবিংশ সংখ্যায় একেবারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, তাহার সাপ্তাহিক জন্ম চিরদিনের মত ঘুচিয়া গেল। 'কল্লোল' তখন মহাসমারোহে প্রতি মাসে অনিয়মিত ভাবে হইলেও বাহির হইতেছে। ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ৫ই ফাল্গুন তারিখে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ পাশ্চাত্য সফরান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই ঘটনার সহিত আমার পরবর্তী সাহিত্যজীবন বিশেষভাবে যুক্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সাহিত্যসাধনার লোভে আমি প্রায় সর্বস্ব—আত্মীয়-স্বজন-পিতামাতা-বিজ্ঞানাধায়ন-উচ্চচাকুরিগত আরাম, এমন কি শ্বশুর-বাড়ির স্নেহাশ্রয় ত্যাগ করিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে তাহার মূল আসনটি কাঁচা মাটির সরার মত গলিয়া গেল। ইহাতে আমাদের দলের একমাত্র আমিই মর্মান্তিক আঘাত পাইলাম। যোগানন্দ দাস সন্ন্যাসী—মায়ামমতাহীন বৈদান্তিক পুরুষ, বাকি সকলেরই অন্য অবলম্বন ছিল। আমার সম্বল অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কৃপাকণা মাসিক পঁচিশটি রৌপ্যমুদ্রা। 'প্রবাসী'-আপিসে তখন পর্যন্ত আমার অবস্থান অনধিকার-প্রবেশেরই সামিল হইয়া ছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় লেখক হিসাবে আমার প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছিল। সে কাহিনীও কম করুণ নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা নির্বাচক শ্রীমতী শান্তা দেবী আমার তিনটি কবিতা 'প্রবাসী'র জন্য মনোনীত করিয়া-ছিলেন সেই ভাদ্র মাসে। কিন্তু তাহা আর বাহির হয় না। সেখানেই 'শনিবারের চিঠি'র আপিস, নিত্য যাই আসি। অশ্বিনীকুমার ঘোষ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সহসম্পাদকমণ্ডলীর প্রত্যহই খোসামদ করি, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হয় না। শান্তা দেবী থাকেন নেপথ্যে, তাঁহার নিকট নালিশ রীতিমত আয়াসসাপেক্ষ; অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রধান কর্মাধ্যক্ষ কিন্তু আমার কবিতা ছাপা হইতেছে না একথা তাঁহার কর্ণগোচর করাইলেও তিনি আমার মেয়েলিপনায় কিরূপ হাসিবেন তাহা অনুমান করিয়া তাঁহার দরবারও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সরাসরি ছোট কর্তাদেরই শরণাপন্ন হইতাম; শেষ পর্যন্ত এক প্লেট করিয়া মতিবাবুর দোকানের ('প্রবাসী' আপিসের সংলগ্ন) রান্না মাংস ও এক ভাঁড় করিয়া রাবড়ি কবুল করিয়া কথা আদায় করিলাম—অগ্রহায়ণে আমার "স্বপ্ন জাগরণ" কবিতা বাহির হইবে। কার্তিক মাস শেষ হইয়া আসিল, 'বিবিধ প্রসঙ্গ'ও ছাপা শেষ হয় হয়, আমার কবিতা সম্পাদকীয় টেবিলের ঝুড়িতেই পড়িয়া থাকে। শেষে কোনও প্রকারে মহামূল্যবান তিনটি টাকার মায়া কাটাইয়া মাসের শেষ রাত্রে তিন প্লেট মাংস ও তিন ভাঁড় রাবড়ি লইয়া মরিয়া হইয়া 'প্রবাসী'র সহসম্পাদকদের দরবারে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা নিমকহারামী করিলেন না, কবিতাটি "বিবিধ প্রসঙ্গে"র পরে 'প্রবাসী'তে স্থান পাইল। আমি এতদিনে স্বনামে বাংলা দেশের অসংখ্য ভাগ্যবান সাহিত্যিক দলে পাংক্তেয় হইলাম।

[ক্রমশঃ।

আধুনিক শিল্প-প্রদর্শনী

—দেখ, বোঝ আর নাই বোঝ, শুধু ব'লে যাবে, বাঃ, চমৎকার!

—প্রমথ সমাদ্দার অঙ্কিত

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

রোখাল—ক্রোধী, রাগী, ক্রুদ্ধ, রুষ্ট।
রোগ—পীড়া, ব্যাধি, আময়, ব্যামোহ।
রোগা—রুগ্ন, কৃশ, ক্ষীণ, পীড়িত।
রোগী—পীড়িত, অসুস্থ, ব্যাধিগ্রস্ত।
রোচক—রুচিজনক, ক্ষুধাকর, সুস্বাদু।
রোচকপাচক—আগ্নেয় ও রুচিজনক।
রোদন—ক্রন্দন, বিলাপ করণ, কাঁদন।
রোদ্ধা—প্রতিবন্ধক, নিবারক, রোদ্ধক।
রোধ—গতিবারণ, আটক, প্রতিবন্ধ।
রোধক—নিষেধক, আটকানিয়া, বেষ্টক।
রোধন—আটকান, বেষ্টন, নিবারণ।
রোপক—পোতনিয়া, বীজবপ্তা, বপক।
রোপণ—বৃক্ষাদি স্থাপন, বপন, যোড়ান।
রোপিত—পোতিত, উপ্ত, বপন করা।
রোম—লোম, ঊর্ণা, রোঁয়া, তনুরুহ।
রোমকূপ—লোমকূপ, লোমের মূল।
রোমহর্ষ—লোমাঞ্চ, লোমোদ্গম।
রোমাঞ্চ—লোমহর্ষ, শিহরণ, লোমাঞ্চ।
রোমাবলী—লোমশ্রেণী।
রোষ—ক্রোধ, কোঁপ, রাগ, মন্যু।
রোষাল—রোষী, ক্রোধান্বিত, রাগাল।
রোহিণী—চতুর্থ নক্ষত্র, বলরামের মাতা।
রোহিত—রুই মৎস্য, ইন্দ্রের সরল ধনুক।
রৌদ্র—রোদ, আতপ, সূর্য্যের কিরণ।
রৌপ্য—রূপ্যময়, রজত, রূপা।
রৌরব—নরক বিশেষ, ভয়ানক।
লওন—গ্রহণ, পাওন, আদান, ধারণ।
লওয়ান—প্রবোধ বা প্রবৃত্তি জন্মান।
লক—মাঞ্জা করা সূক্ষ্ম রেশমের সূত্র।
লক্তক—অলক্তক, আলতা, লাক্ষা।
লক্ষ—চিহ্ন, শত সহস্র।
লক্ষণ—চিহ্ন, কলঙ্ক, প্রমাণ, বিশেষ গুণ।
লক্ষণা—শব্দের গৌণার্থবোধিকা শক্তি।
লক্ষণাক্রান্ত—লক্ষণযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট।
লক্ষ্মী—কমলা, শ্রী, সম্পত্তি, বিষ্ণুর পত্নী।
লক্ষ্মীমান—ধনী, ভাগ্যবান, ধনবান।
লক্ষ্য—শরব্য, উদ্দেশ্য।
লগা—বৃক্ষফল পাড়নার্থে দণ্ড, ধ্বজা।
লগী—চাড়ী, ফিকনা, নৌকা চালনদণ্ড।
লগুড়—লাঠী, দণ্ড, লৌহযুক্ত যষ্টি।
লগ্ন—সংগত, সংযুক্ত রাশির উদয়।
লগ্নক—প্রতিভূ, ঋণশোধে স্বীকার।
লগ্নপত্র—বিবাহের লগ্নসূচক লিপি।
লগ্নালগ্নি—লাগালাগি, সংলগ্ন, মিলিত।
লঘিমা—লাঘব, লঘুতা, হ্রাসতা।
লঘীয়স্—লঘু, চপল, তুচ্ছ, হেয়।

লঘু—অল্প, অগুরু, সূক্ষ্ম, হ্রস্ববর্ণ।
লঘুতা—লাঘব, তুচ্ছতা, অল্পতা, সূক্ষ্মতা।
লঘুপাক—সুপাচ্য, শীঘ্রপাক, সুজীর্ণ।
লঙ্কা—গাছমরিচ, সিংহল দ্বীপ।
লঙ্কামরিচ—অত্যুগ্র মরিচ বিশেষ।
লঙ্গ—লবঙ্গ, লং, দেবকুসুম।
লঙ্ঘন—অতিক্রমন, ডিঙ্গান, উপবাস।
লগুঘা—আঘাত, প্রহার, মারণ।
লগুঘালগুঘি—হাতাহাতি, মারামারি।
লজ্জা—ত্রপা, হ্রী, ব্রীড়া, তিরস্কার।
লজ্জাকর—লজ্জাজনক, ব্রীড়াকর।
লজ্জালু—ত্রপান্বিত, লাজুক, সলজ্জ।
লজ্জাবান—লজ্জাযুক্ত, লজ্জিত।
লজ্জাশীল—লজ্জাশালী, অপত্রপিষ্ণু।
লজ্জিত—ত্রপিত, মুখচোরা, সলজ্জ।
লটকন—ঝুলন, টাঙ্গন, দোলন।
লটকান—ঝুলান, টাঙ্গান, দোলান।
লটখট—ঝঞ্ঝাট, ক্লেশ, পেঁচ, উৎপাত।
লটপট—লুণ্ঠন, ঝড়ফড়, ছটফট।
লঠুয়া—লম্পট, নাগর, লোচ্চা, কামুক, পারদারিক।
লড়চড়—চঞ্চল, কম্পন, হেলন।
লড়ন—স্পন্দন, কম্পন, হেলন।
লড়ী—লাঠী, যষ্টি, লগুড়, দণ্ড।
লড়কান—লোভ দেখান, চার দেওন।
লড্ডুকা—মিষ্টান্ন বিশেষ, লাড্ডু।
লড়বড়ান—হেলান, ঝোঁকান, দোলান।
লণ্ড—স্পন্দ, হেলনি, দোলন, কম্পন।
লণ্ডভণ্ড—হেলাদোলা, বিশৃঙ্খল।
লতা—লতিকা, বৃক্ষাশ্রিত তৃণ বিশেষ।
লনী—লবনী, নবনীত, মাখন।
লপটান—চাপটান, লাগান, জড়ান।
লব—কণিকা, তনু, ক্ষুদ্রাংশ, সূক্ষ্ম মাত্রা।
লবণ—লোণ, ক্ষার রস, করকচ।
লব্ধ—উপার্জ্জিত, প্রাপ্ত, উপাত্ত।
লব্ধি—লাভ, হরণোৎপন্ন, প্রাপ্তি।
লভ্য—প্রাপ্য, প্রাপ্তি, ফলোদয়, ব্যাজ।
লম্ফ—উৎফাল, উৎপল্লব, লাফ।
লম্ফন—কুর্দন, লাফ দেওন।
লম্বমান—টাঙ্গা, ঝুলনিয়া, দীর্ঘ।
লম্বা—দীর্ঘ, উচ্চ, ঢেঙ্গা, প্রাংশু।
লম্বাই—দ্রাঘিমা, উচ্চতা, দীর্ঘতা।

[ক্রমশঃ]

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

৩

এইবার হল্যাণ্ডের পালা। ডাচদেরও দেরী হ'ল না বাদ্‌শাহ ঔরঙ্গজীবকে 'মোবারক' জানাতে। দেরী হবার কথাও নয়। তাঁরাও স্থির করলেন যে মোগল দরবারে একজন দূত পাঠাবেন এবং সুরাটের বাণিজ্যকুঠির কর্মকর্তা মঁসিয়ে আদ্রিকানকে(১) দূত মনোনয়ন করলেন। আদ্রিকান বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। দরবারে দূত হয়ে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের দেশের জন্য অনেক কাজ ক'রে এসেছিলেন। যদিও ঔরঙ্গজীব অত্যন্ত উদ্ধত ও দুর্দমনীয় প্রকৃতির সম্রাট, গোঁড়া মুসলমান হিসেবেও অত্যন্ত সচেতন এবং খৃষ্টধর্মীদের প্রতি সাধারণত: বিরূপ মনোভাবাপন্ন, তাহলেও এক্ষেত্রে তিনি বিশেষ শিষ্টতা ও নম্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজদরবারে তিনি যেভাবে ডাচ রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেছিলেন তা থেকেই তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মঁসিয়ে আদ্রিকান যখন ভারতীয় পদ্ধতিতে 'সেলাম' জানিয়ে দরবারগৃহে প্রবেশ করলেন তখন ঔরঙ্গজীব খুশী হয়ে তাঁকে বললেন, সেলামের পরিবর্তে ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে "স্যালুট" জানাতে। আদ্রিকান সাহেবী কায়দায় তাঁদের জাতীয় ভঙ্গীতে স্যালুট করলেন। সম্রাট অবশ্য ওমরাহ মারফৎ তাঁর পরিচয়-পত্র গ্রহণ করলেন, নিজে হাতে নিলেন না। এটা তিনি কোন অসম্মান দেখানোর জন্যে করেননি, এইটাই হ'ল বাদ্‌শাহী রীতি। উজবেক রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকেও এইভাবে তিনি পরিচয়পত্র গ্রহণ করেছিলেন।

(১) দার্ক ভ্যান্ আদ্রিকেম্ (Dirk van Adrichem) ১৬৬২ থেকে ১৬৬৫ সাল পর্যন্ত সুরাটের ডাচ কুঠির ডিরেক্টর ছিলেন। তিনিই বাদ্‌শাহ ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে একখানি ফরমান আদায় ক'রে (দিল্লী, ২৯শে অক্টোবর, ১৬৬২ সাল) বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার বাণিজ্যের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ক'রে নিয়েছিলেন। মোগল দরবারে রাষ্ট্রদূত হয়ে গিয়ে তিনি এই ফরমানটি আদায় ক'রে নিয়ে আসেন।

মোগল-যুগের ভারত

প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি শেষ হবার পর ঔরঙ্গজীব ডাচ রাষ্ট্রদূতকে তাঁর উপঢৌকন দিতে আদেশ করলেন। এটাও একটা রাজদরবারের রীতি; প্রথমে সম্রাট নিজে একটি শিরোপা উপহার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করলেন। ডাচ দূত যেসব উপহার দিলেন তার মধ্যে লাল ও সবুজ রঙের কাপড়, বড় বড় ভাল আয়না, চীনে ও জাপানী কাজ করা নানাবিধ জিনিস(২)—তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল একটি পালকি ও একটি তখ্‌ৎ-রওয়ান(৩)। শিল্পকলার নিদর্শনরূপে দুটি জিনিসই চমৎকার।

বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের যত দীর্ঘকাল সম্ভব বাদ্‌শাহ আটকে রাখতে চান। বোধ হয় তাঁর ধারণা যে বিদেশী দূতরা তাঁর রাজদরবারে উপস্থিত থাকলে বাইরের সাধারণ লোকের কাছে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়বে। তিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যই বিদেশী সম্রাটরা তাঁর দরবারে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন সাগ্রহে। তা না হ'লে তার এমন কোন কারণ নেই যার জন্য তিনি বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের এতদিন ধ'রে রাজধানীতে আটকে রাখতে পারেন। লোক-দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। আমীর ওমরাহদের সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা নানা বেশে রাজ দরবারের শোভাবর্ধন করবে, এইটাই হ'ল বাদ্‌শাহের মনোবাসনা। মঁসিয়ে আদ্রিকানকে সেইজন্য তিনি সহজে ছাড়লেন না। আদ্রিকানের সেক্রেটারী মারা গেলেন, তত্রাচ কয়েকজন দূতাবাসের কর্মচারীরও মৃত্যু হ'ল। তখন ঔরঙ্গজীব ডাচ রাষ্ট্রদূত আদ্রিকানকে রাজধানী ত্যাগের অনুমতি দিলেন। বিদায়কালে তিনি আর একটি শিরোপা উপহার দিলেন তাঁকে এবং বাতাভিয়ার (৪) গবর্ণরের জন্য একটি আলাদা শিরোপা দিলেন, অত্যন্ত মূল্যবান। তার সঙ্গে একটি ভোজালিও দিলেন, মণিমুক্তাখচিত। স্বহস্তে একটি বিনয়পত্রে অভিনন্দন জানাতেও ভুললেন না।

ডাচ রাষ্ট্রদূতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মোগল বাদ্‌শাহের নেকনজরে আসা এবং হল্যাণ্ড যে একটা উন্নত দেশ, ডাচরা যে একটা বিরাট ব্যবসায়ীর জাত, এই উচ্চধারণা তাঁর মনে জাগানো। আদ্রিকান জানতেন যে যদি কোন রকমে তিনি এইভাবে মোগল সম্রাটকে প্রভাবিত করতে পারেন, তাহলে হিন্দুস্থানে তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্যের

(২) মোগলযুগের ভারতীয় চিত্রকরের আঁকা রাজ-দরবারের ছবির মধ্যে জাপানী ও চীনা ফুলদানি ইত্যাদি যথেষ্ট দেখা যায়। তার থেকে বোঝা যায় যে চীনা ও জাপানী দ্রব্যাদি মোগল দরবারে অনেকে উপহার দিতেন।

(৩) "তখ্‌ৎ-রওয়ান" কথার অর্থ 'চলন্ত সিংহাসন'। 'তখ্‌ৎ' অর্থে আসন বা সিংহাসন এবং 'রওয়ান' অর্থে ভ্রাম্যমান, চলমান।

Takhta or Takht-rawān : A plank or platform on which public performers, singers and dancers, are carried on men's heads in festival and religious processions.

—Wilson's Glossary

(৪) বাতাভিয়ার গবর্ণরই 'ইষ্ট ইণ্ডিজে'র সমস্ত ডাচ বাণিজ্যকুঠির প্রধান কর্মকর্তা, অর্থাৎ ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের গবর্ণর-জেনারেল।

সুযোগ ক'রে নিতে পারবেন। তাঁরা যেসব জায়গায় এর মধ্যে বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানকার সুবাদারদের উৎপীড়ন ও বাধাবিপত্তি থেকেও তাঁরা মুক্তি পাবেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক এই মর্মেই একটি ফরমান্ তিনি ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন। বাদ্‌শাহকে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে তাঁদের দেশের সঙ্গে হিন্দুস্থানের বাণিজ্যিক লেনদেন থাকলে হিন্দুস্থানেরই ঐশ্বর্য বাড়বে। কিন্তু হিন্দুস্থানের কতটা ঐশ্বর্য তাঁরা পাকেচক্রে ব্যবসায়ের নামে লুণ্ঠন করতে পারবেন, সেকথা আর জানানো দরকার মনে করেননি।

ঠিক এই সময় একজন বিখ্যাত ওমরাহ বিশেষ ব্যস্ত হয়ে এসে একদিন সম্রাটকে বললেন যে সর্বক্ষণ তিনি যেরকম রাজকার্য নিয়ে চিন্তা করেন, তাতে তাঁর স্বাস্থ্যহানি হবার সম্ভাবনা আছে, এমন কি মানসিক সজীবতা পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শদাতার কথাগুলো সম্রাটের কাণে পৌঁছল ব'লে মনে হ'ল না। তিনি অন্য আর-একজন ওমরাহের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে যা বললেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সেই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাটি আমি সেই ওমরাহের এক চিকিৎসক পুত্রের কাছ থেকে শুনেছি। পুত্রটি আমার বিশেষ বন্ধু। সম্রাট ঔরঙ্গজীব বলেছিলেন :

"আপনারা সকলেই সুধীজন, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। আপনারা জানেন, সঙ্কটের সময় সম্রাটের কর্তব্য কি। জাতির বা দেশের সঙ্কটকালে সম্রাটের একমাত্র কর্তব্য হ'ল তাঁর নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন ক'রে, প্রয়োজন হ'লে নিজে তলোয়ার হাতে নিয়ে, প্রজাদের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া। রাজার এই কর্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু তবু আমার এই শুভাকাঙ্ক্ষী ওমরাহটি আমাকে বোঝাতে চান যে প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য আমার নাকি মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। তার জন্য একটি বিনিদ্র রাত্রিও যাপন করা আমার উচিত নয়, একদিনের জন্যও আমার আমোদ-প্রমোদ বর্জন করা ঠিক নয়। তাঁর মতে আমার উচিত সব সময় নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা এবং আমার ভোগবিলাস সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। হয়ত তিনি চান যে কোন একজন উজীরের উপর সমস্ত রাজ্যের ভার দিয়ে আমি নিষ্কৃতি পাই। তিনি জানেন না বোধ হয় যে রাজার ছেলে হয়ে যখন জন্মেছি এবং রাজসিংহাসনে বসেছি তখন ঈশ্বর আমাকে নিজের জন্য বাঁচার ও চিন্তা করার সুযোগ দেননি, আমার প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য চিন্তা করার আদেশ দিয়েছেন। যেখানে প্রজাদের সুখ নেই, সেখানে আমারও সুখ নেই। প্রজাদের সুখই আমার সুখ। প্রজাদের সুখ ও শান্তিই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়। একমাত্র ন্যায়বিচার, রাজকীয় কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য সাময়িকভাবে এচিন্তা বিসর্জন দেওয়া যায়, তাছাড়া অন্য কোন সময় নয়। নিষ্ক্রিয়তা বা অন্যের উপর নিজের দায়িত্ব চাপানোর ফলাফল যে কি রকম ভয়াবহ হতে পারে সে সম্বন্ধে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরামর্শদাতার বোধ হয় কোন ধারনা নেই। এইজন্যই তো মহাকবি সাদী বলেছেন : 'রাজা হয়ে জন্ম না, রাজা হ'য়ো না। যদি রাজা হও, তাহ'লে প্রতিজ্ঞা করো যে তোমার রাজ্য তুমি নিজেই শাসন করবে।' আমার ঐ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুটিকে গিয়ে বলুন যে তিনি যদি বাস্তবিকই আমার প্রিয়পাত্র হ'তে চান, তাহ'লে এরকম সদুপদেশ আমাকে দেওয়ার বা অকারণে মোসাহেবি করার কোন প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে আর যেন কোনদিন তিনি এই ধরনের অযাচিত উপদেশ দিতে না আসেন। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের জন্য মানুষের সহজ-প্রবৃত্তি এমনিতেই যথেষ্ট সজাগ, তাকে জাগাবার জন্য কোন উপদেশের প্রয়োজন নেই। ঘরেতে আমাদের স্ত্রীরাই সেকাজ অনেকটা করতে পারে, রাষ্ট্রীয় পরামর্শদাতার দরকার হয় না তার জন্য।"

এই সময় আরও একটি বেশ মজার ঘটনা ঘটে। বাদ্‌শাহের বেগম-মহলে তাই নিয়ে রীতিমত সাড়া পড়ে যায় এবং খোজারা কখনও প্রেমে পড়তে পারে না ব'লে আমার মনে যে বদ্ধমূল ধারনা ছিল, তাও বদলে যায়। ঘটনাটি বেশ মজার ঘটনা এবং সত্য ঘটনা। দিদার খাঁ নামে বাদ্‌শাহের হারেমের একজন খোজা ছিল, সে একটি আলাদা বাড়ী তৈরি করেছিল ফূর্তি করার জন্য এবং সেখানেই সে মধ্যে মধ্যে ঘুমুত। হঠাৎ সে এক হিন্দু কেরানীর(৫) সুন্দরী ভগিনীর প্রেমে পড়ে। কিছুদিন দু'জনের মধ্যে একটা গোপন সম্পর্কের কথা নিয়ে কাণাঘুষা চলতে থাকে। কিন্তু কারও মনে ব্যাপারটা সন্দেহের গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। যতই যাই হোক, খোজা তো! কি আর এমন ঘটতে পারে! কোন মেয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে খোজা আবার প্রেমে পড়বে কি! আর যদিও বা দৈবচক্রে পড়ে, তাহ'লেও এমন কিছু তাদের মধ্যে ঘটতে পারে না, যা নিয়ে কাণাঘুষা চলতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোজার প্রেম কবির প্রেমকেও ছাড়িয়ে গেল। প্রেমের জল অনেকদূর পর্যন্ত গড়াল। দিদার খাঁ ও কেরানী-ভগিনীর সম্পর্ক ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকল। প্রতিবেশীরা সকলে হিন্দু কেরানীকে সাবধান ক'রে দিল। অনেকে কটু কথায় অপমান করতেও ছাড়ল না। কেরানী ভদ্রলোক তাদের কথায় বিচলিত ও অপমানিত হয়ে একদিন তাঁর ভগিনী ও খোজাটিকে ডেকে পরিষ্কার বলে দিলেন যে তাদের সম্বন্ধে যে সব কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে তা যদি সত্য হয়, তাহ'লে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। সত্য প্রমাণ হতে খুব বেশী দেরী হ'ল না। একদিন দেখা গেল, এক ঘরে একই শয্যায় সেই ভগিনী খোজাসহ শয়ন ক'রে আছে। হিন্দু ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে দিদার খাঁ ও তাঁর ভগিনীকে হত্যা করলেন। হারেম ও বেগম-মহলে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। হারেমের

---

(৫) বার্নিয়েরের পাণ্ডুলিপিতে "Un Ecrivain Gentil" কথাটি আছে। অর্থ হ'ল হিন্দু লেখক, লিপিকর বা কেরানী। এই সময় রাজস্ব আদায়, হিসাবপত্র রাখা, রাজদরবারের পত্রনবীশের কাজ প্রায় হিন্দুদেরই একচেটিয়া ছিল। হিন্দু চৌধুরী, হিসাবনবীশ ও পত্রনবীশরা সকলেই ফারসী ভাষায় রীতিমত দুরস্ত ছিলেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান "ক্যালকাটা রিভিউ" (No CIV, 1871) পত্রিকায় "A chapter from Muhammadan History" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"The Hindus from the 16th century took so zealously to Persian education, that, before another century had elapsed, they had fully come up to the Muhammadans in point of literary acquirements."

অন্যান্য খোজারা ষড়যন্ত্র করল, কেরানীকে তারা হত্যা করবে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কথা সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কাণে পৌঁছতেই তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং চক্রান্তকারীদের সায়েস্তা করলেন। অবশ্য সম্রাট সেই হিন্দু কেরানী ভদ্রলোককে বাধ্য করলেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতে। খোজা দিদার খাঁর অপূর্ব প্রেমকাহিনীর এইভাবে শেষ হ'ল।

খোজার প্রেম শেষ হ'তে না হ'তে, রাজকন্যার প্রেম আরম্ভ হ'ল। ঠিক যে সময় দিদার খাঁর প্রেমের ব্যাপার ঘটে, সেই সময় রৌশন-আরা বেগম অন্তঃপুরে দু'জন ভদ্রলোককে (?) প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন ব'লে গুজব রটে। সম্রাট ঔরঙ্গজীব আদ্যোপান্ত কাহিনী শুনে ক্রুদ্ধ হন। তাহ'লেও ঔরঙ্গজীব তাঁর ভগিনীর সঙ্গে শুধু সন্দেহের বশে কোন দুর্ব্যবহার করেননি। সম্রাট শাজাহান যেভাবে তাঁর কন্যার প্রেমিককে ফুটন্ত গরম জলের টবে দগ্ধ করে হত্যা করেছিলেন, ঔরঙ্গজীব তা করেননি। ঘটনাটি আমি এক বৃদ্ধার মুখ থেকে যা শুনেছিলাম তাই এখানে বর্ণনা করছি। বৃদ্ধার অন্তঃপুরে অবাধগতি ছিল। দু'জন যুবকের সঙ্গে রৌশনআরার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল এবং তার মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ বোধ হয় প্রেমালাপ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। রৌশনআরা তাকে অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখেছিলেন শোনা যায়। একদিন তিনি সেই যুবকের উপর ভার দিলেন, অন্তঃপুর থেকে তাঁর পরিচারিকাদের বাইরে পাঠিয়ে দিতে। রাত্রির অন্ধকারে যুবকটি যখন তাদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন প্রহরীর চোখে পড়ার জন্যই হোক বা আতঙ্কেই হোক, পরিচারিকারা পালিয়ে যায়। বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে গভীর রাতে যুবকটি একাকী দিশাহারা হয়ে ঘুরতে থাকে। এমন সময় কোন প্রহরী তাকে পাকড়াও ক'রে আটকে রাখে এবং পরে সম্রাটের কাছে ধ'রে নিয়ে যায়। সম্রাট ঔরঙ্গজীব হঠাৎ উত্তেজিত না হয়ে তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন। প্রশ্নের উত্তর থেকে তিনি শুধু এইটুকু জানতে পারেন যে রাত্রে প্রাচীর টপকে সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল। যুবকটির অপরাধের কোন সঠিক প্রমাণ তিনি পেলেন না তার উত্তর থেকে। সুতরাং কোন কঠোর দণ্ড না দিয়ে তিনি আদেশ দিলেন, যেভাবে যুবকটি এসেছিল ঠিক সেইভাবে প্রাচীর টপকে যেন চ'লে যায়। বাঁশের চেয়ে চিরকালই কঞ্চি দড়। সম্রাটের আদেশে ও বিচারে খোজাদের তুষ্টি হ'ল না। যুবকটি যখন প্রাচীরের উপরে উঠলো তখন খোজারা তাকে উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচের প্রাকারের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর তার কি হ'ল-না-হ'ল জানা যায়নি।

দ্বিতীয় প্রেমিকের বিচারও ঠিক এইভাবে করা হ'ল। একদিন তাকেও গভীর রাতে বাগানের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরতে দেখা গেল। খোজারা তো চ্যাংদোলা ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল বাদ্‌শাহের কাছে। সম্রাট তাকেও প্রশ্ন ক'রে শুনলেন যে সে সামনের ফটক দিয়ে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। সম্রাট আদেশ দিলেন তাকে সোজা ফটক দিয়ে প্রাসাদের বাইরে চ'লে যেতে। নিশ্চয় অন্যেরা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অপরাধীকে সোজা ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলা আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি? ঔরঙ্গজীব খোজাদের কঠিন দণ্ড দেবেন স্থির করলেন। কারণ তাদের পাহারার গুণে যদি সোজা ফটক দিয়েও বাইরের লোক অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে তা'হলে বেশীদিন আর অন্তঃপুরের সম্মানরক্ষা করা সম্ভব নয়। শুধু সম্মানরক্ষা নয়, সম্রাটের আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যও খোজাদের এই উদাসীন পাহারায় চলবে না। প্রেমিকের উত্তর শুনে সম্রাট তাকে না দণ্ড দিয়ে, খোজাদের কঠোর দণ্ড দিলেন।

এই ঘটনার কয়েকমাস পরে পাঁচজন রাষ্ট্রদূত দিল্লীতে এসে পৌঁছলেন, প্রায় একই সময়। প্রথম দূত এলেন মক্কার শরীফের কাছ থেকে। তিনি যা উপঢৌকন নিয়ে এলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল কয়েকটি আরবী ঘোড়া। একটি খেজুরপাতার ব্রাশও তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। এই ব্রাশ দিয়ে মক্কার বিখ্যাত কাবা-মসজিদের প্রাঙ্গণ ঝাড়া হয়, সেইজন্যই এই উপহার। দ্বিতীয় দূত এলেন ইয়েমেন থেকে, তৃতীয় দূত বসরা থেকে। দু'জনেই আরবী ঘোড়া উপহার এনেছিলেন সম্রাটের জন্য। আরও দু'জন রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন ইথিওপিয়া থেকে। প্রথম তিনজন দূতকে বিশেষ কোন মর্যাদা দেওয়া হয়নি, কারণ তাঁরা এমন বেশে এসেছিলেন যে তাঁদের রাজার দূত বলেই মনে হয় না। তাঁদের হাবভাব দেখে যেকেউ মনে করবেন যে উপঢৌকন দিয়ে কিছু টাকাপয়সা আদায় করার জন্যই যেন তাঁরা হিন্দুস্থানের সম্রাটের কাছে এসেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা অনেক আরবী ঘোড়া এনেছিলেন নিজেদের ব্যবহারের জন্য ব'লে। তার জন্য কোন শুল্ক তাঁদের দিতে হয়নি। সেইসব আরবী ঘোড়া এবং আরও নানারকমের জিনিস যা তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন, তাই বেচে হিন্দুস্থানের অনেক মূল্যবান জিনিস কিনে তাঁরা বিনা শুল্কে দেশে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্যটাই যেন ছিল তাঁদের ব্যবসা করা, দৌত্যগিরি করা নয়। সেইজন্যই তাঁরা রাষ্ট্রদূতের যোগ্য মর্যাদা পাননি সম্রাটের কাছ থেকে, পেতেও পারেন না।

ইথিওপিয়ার সম্রাটের দূত ঠিক এই ধরনের ছিলেন না। হিন্দুস্থানের আভ্যন্তরিক ব্যাপার সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান ছিল এবং তিনি হিন্দুস্থানে তাঁর নিজের রাজ্যের সুনাম অর্জনের জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সেইজন্যই তিনি দূত হিসেবে যাঁদের পাঠিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই শ্রদ্ধেয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। দু'জনকে তিনি রাজ-প্রতিনিধিরূপে মনোনয়ন করেছিলেন এবং দু'জনেই খুব উপযুক্ত ব্যক্তি। তার মধ্যে একজন মুসলমান ব্যবসায়ী। এঁকে আমি চিনতাম, কারণ মক্কায় এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হ'ল, কিছু হাবসী ক্রীতদাস বিক্রী ক'রে সেই টাকায় হিন্দুস্থানের মূল্যবান জিনিস কিছু কেনার ব্যবস্থা করা। হাবসী ক্রীতদাসদের এইভাবে তখন বাজারে পণ্যের মতন বিক্রী করা হ'ত। আফ্রিকার মহান্ খৃষ্টান সম্রাটের এই দাস-ব্যবসাই ছিল অন্যতম ব্যবসা!

ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় দূত হলেন এক জন আর্মেনিয়ান খৃষ্টান ব্যবসায়ী, আলেপ্পোতে জন্ম এবং হাবসীদের দেশে 'মুরাদ' বলে পরিচিত। এঁর সঙ্গেও আমার মক্কাতেই পরিচয় হয়েছিল। মক্কাতে আমরা দু'জন একটি ঘরে কিছুদিন একসঙ্গে বাস করেছিলাম। মুরাদই আমাকে হাবসী দেশে যেতে নিষেধ করেছিলেন। প্রত্যেক বছর মুরাদের প্রধান কাজ হ'ল, ইংরেজ ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুদের কাছে মনোরম উপহার নিয়ে যাওয়া এবং তার বিনিময়ে কিছু ভাল ভাল জিনিস প্রত্যুপহার আনা। ক্রীতদাস বিক্রী করার জন্যও তিনি প্রতি বৎসর মক্কাতে আসতেন।

[ক্রমশঃ।

আকাশ-পাতাল

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

মধ্য রাত্রে তন্দ্রা টুটে গিয়েছিল রাজেশ্বরীর।

একটা বেশ সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল রাজেশ্বরীর দেহ আর মন। মৃদু মৃদু শৈত্যে পা থেকে বুক পর্য্যন্ত একটি সুদৃশ্য বালাপোষে আবৃত ক'রে রাজেশ্বরী শুয়েছিল চুপচাপ। ভাবছিল, কৃষ্ণকিশোরের প্রেমালাপের ধরণ-করণ, মিলনের প্রস্তুতি, লতাবেষ্টিতক জড়াজড়ি আর পরম প্রীতির মধু-মুহূর্ত্ত। পায়ে থাকতে চেয়েছিল রাজেশ্বরী, কাতর সুরে পায়ে থাকতে দেওয়ার কথা ক'টি ব্যক্ত ক'রেছিল, কিন্তু কৃষ্ণকিশোর বাতিল ক'রে দিয়েছে রাজেশ্বরীর প্রার্থনা। ব'লেছে, বুকে রাখবে তাকে। বুকে জড়িয়েই ব'লেছে। প্রেমালাপে আর মিলনের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বরীর সর্ব্বাঙ্গে জ্ব'লে উঠেছে আগুনের লেলিহান শিখা। লজ্জা আর ব্রীড়া জলাঞ্জলি দিয়ে রাজেশ্বরী হয়ে উঠেছিল অন্য এক ধরণের। আবেগ আর উত্তেজনায় হারিয়ে ফেলেছিল বা বিচারবুদ্ধি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য ঠিক হিমের শীতল হয়ে গিয়েছিল রাজেশ্বরী। বালাপোষটা টেনে আবক্ষ ঢেকে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল কখন। মধ্য রাত্রে আচমকা ঘুমটা ভেঙ্গে যায় হঠাৎ। বেশ ভাল লাগে বিনিদ্র রাত্রি। উন্মুক্ত জানলার ফাঁক থেকে আকাশে চোখ মেলে থাকে আর রোমন্থন করে যেন কিছুক্ষণ আগের অতীত স্মৃতি। ভাবতেও ভাল লাগে যে! ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম ঘণ্টা বাজে কোথায়? অনেক, অনেক দূর থেকে শুনতে পায় রাজেশ্বরী। নির্জ্জন রাত্রি, তাই হয়তো শুনতে পায়। তরঙ্গায়িত শব্দের ছন্দ আছে—ক্রমে ক্রমে শুধু বিলীন হয়ে যাচ্ছে ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম ধ্বনি এই যা। রাজেশ্বরী জানে না, গভীর ও নির্জ্জন অন্ধকার ভেদ ক'রে দ্রুতগতিতে ছুটে চ'লেছে ডাক-হরকরা। ভয়ের পথ, চোর আর দস্যুর পথ। ডাক-হরকরা না ডাক-বেহারা? পিঠে ঝুলছে পাটের থলিয়া, এক হাতে একটা বল্লম। বল্লমের শীর্ষে বাঁধা আছে স্তূপীকৃত ঘণ্টা, পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বাজতে থাকে ঝুম-ঝুম-ঝুম। অন্য হাতে একটা জলন্ত লণ্ঠন। পথ-প্রদর্শক। হয়তো কারও কোন জরুরী খবর আছে। গভীর অন্ধকারকে উপেক্ষা ক'রে ছুটছে ডাক-হরকরা। বিলীয়মান ঝুম-ঝুম শব্দ শুনে অবাক-চোখে তাকিয়ে আছে রাজেশ্বরী। আকাশ দেখছে জানলার ফাঁক থেকে। এই কিছুক্ষণ আগে শৃগালের ডাক শেষ হয়েছে। গঙ্গাতীর থেকে ডেকে উঠেছিল শৃগালের পাল। নিমতলা শ্মশানের আশ-পাশ থেকে ডেকেছিল। অর্দ্ধদগ্ধ, পরিত্যক্ত ও বেওয়ারিস শব-ভক্ষণকারী শৃগালের দল। তখন ভয়ে আর ত্রাসে রাজেশ্বরীর দেহটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হয়তো। চোখ দু'টো মুদে ফেলেছিল জোর ক'রে। বুকের ধুকপুকুনি বর্দ্ধিত হয়েছিল! শরীরটা হিম হয়ে গিয়েছিল ধীরে-ধীরে। ক্ষণেকের জন্য কুপিত হয়েছিল রাজেশ্বরী—কৃষ্ণকিশোরের প্রতি। এমন অসময়ে, যখন রাজেশ্বরী ভয়ে কাঁপছে ঠকঠকিয়ে, তখন কি না কৃষ্ণকিশোর ঘুমোচ্ছে অঘোরে! যদিও ক্ষণেকের মধ্যে অভিমান মিলিয়ে যায় মন থেকে, রাজেশ্বরীর মায়া হয় কৃষ্ণকিশোরের জন্য। কো॰ দোষ নেই কৃষ্ণকিশোরের, ঘুম না হ'লে কাটবে কোথা থেকে কায়িক গ্লানি? ক্লান্তি যায় কখনও বিনিদ্রায়! বালাপোষটা আবক্ষ টেনে আকাশে চোখ মেলে শুয়ে থাকে রাজেশ্বরী। আকাশে হাসছে নক্ষত্র ইতস্তত ছড়িয়ে, মিটি-মিটি হাসছে, হাসছে আর জ্বলছে দপ্ দপ্।

—বৌ, উঠবে না?

ডাক শুনে ঘুম ভাঙে না রাজেশ্বরীর। নিদ্রায় অচেতন হয়ে থাকে।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—বৌ, উঠে পড়'। বেলা যে অনেক হয়ে গেছে! কথা বলতে বলতে রাজেশ্বরীকে ঠেলা দেয় মৃদু মৃদু।

ঘুমের ঘোরে বলে রাজেশ্বরী,—উঁ?

কৃষ্ণকিশোর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললে,—বলছি যে বেলা কত হয়ে গেল জানো? উঠবে না?

চোখ মেলে তাকায় রাজেশ্বরী। বালাপোষের ফাঁক থেকে তাকায়। আচ্ছন্নের মত বলে,—উঁ, কি বলছো?

কৃষ্ণকিশোর সহাস্যে বললে,—আচ্ছা মেয়ে বটে! একটা কথা, ব'লে ব'লে যে মুখে ব্যথা ধ'রে গেল! বলছি, বেলা হয়েছে অনেক। উঠে পড়' তুমি। বালাপোষটা টেনে খুলে দিই?

হয়তো আলগা ছিল পোষাক। লাজুক হাসি হাসলো রাজেশ্বরী। বললে,—ধ্যেৎ!

কৃষ্ণকিশোর ঢ'লে পড়লো রাজেশ্বরীর পিঠে। বললে,—বালাপোষটা খুলে না দিলে দেখছি তুমি উঠবে না।

তৎক্ষণাৎ উত্তর পাওয়া যায়—না, না। তুমি ঘর থেকে যাও, আমি উঠছি। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে কথা বলে রাজেশ্বরী। বালাপোষটা দু'হাতে আঁকড়ে ধ'রে থাকে। কৃষ্ণকিশোর দেখে রাজেশ্বরীকে। ঘুম-ঘুম চোখে অপূর্ব্ব দেখায় তাকে। ফুলে-ওঠা আঁখি-পল্লবে।

—আমি যাচ্ছি। তুমি উঠে প'ড়বে তো? শুধোয় কৃষ্ণকিশোর। পালঙ্ক থেকে উঠে পড়ে। বলে,—আমি চ'লে গেলে ফের ঘুমিয়ে প'ড়বে না তো?

—না, না, সত্যি বলছি। মা কালীর দিব্যি বলছি, বিশ্বাস করো। বললে রাজেশ্বরী।—আমি কি বুঝতে পেরেছি যে এত বেলা হয়ে গেছে! তুমি যাও, মুখ-হাত ধুঁতে যাও। ছিঃ, দাসী, তাঁবেদার, ব্রাহ্মণী কি ভাববে বল' তো? বলাবলি করবে না বৌ কত বেলায় উঠলো! ছিঃ! তুমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেও, লক্ষ্মীটি।

কৃষ্ণকিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালাপোষ খুঁলে উঠে ব'সলো রাজেশ্বরী। সত্যিই বেলা অনেক হয়ে গেছে। শীতের সকাল, তাই বোঝা যায়নি। জানলা ভেদ ক'রে ঘরে ছড়িয়ে প'ড়েছে খটখটে রৌদ্র। পালঙ্কের বিপরীত দিকে দেরাজের আয়নায় দেখতে পায় রাজেশ্বরী। দেখে স্বীয় প্রতিবিম্ব। দেখে রূপচ্ছটা। মোমের মত গড়ন। ডিমের মত রঙ। পত্রবহুল আয়ত আঁখিদ্বয়। রাজেশ্বরী প্রথমে খুলে-যাওয়া খোঁপাটা জড়িয়ে বাঁধে দু'বাহু তু'লে। বালিশের তলায় রেখে-দেওয়া সোনার কাঁটাগুলো একটি একটি খোঁপায় বিঁধে দেয়। খোঁপা বাঁধা শেষ হ'লে জামার বোতাম ক'টা আঁটে একে একে। ভেতরের জামার বোতাম। ব্লাউসটা আর গায়ে চাপায় না। স্নানের ঘরে যাবে, নাই বা আর ব্লাউসটা চাপালো? শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে পালঙ্ক ছেড়ে তড়িৎ গতিতে চ'ললো স্নানের ঘরের দিকে। দরজা খুলতেই দেখলো এলোকেশীকে। শাড়ী জামা আর সায়া হাতে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। রাজেশ্বরী এক পলকে লক্ষ্য ক'রলো এলোকেশীর মুখাকৃতি। এলোকেশীর মুখটা গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। রাজেশ্বরী বুঝলো, গত রাত্রির তিরস্কারের মৌখিক অভিব্যক্তি। স্নানের ঘরে পোষাক-আষাক রেখে এলোকেশী বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময়ে দয়ার্দ্র-চিত্তে বললে রাজেশ্বরী,—হ্যাঁ লো এলো, কালকের কথায় বুঝি তোর দুঃখু হয়েছে?

এলোকেশী কোন প্রত্যুত্তর দেয় না।

ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকে নতমুখী হয়ে। লোলচর্ম্মা বৃদ্ধার মুখাবয়বে গাম্ভীর্য্যের স্পষ্ট চিহ্ন। রাজেশ্বরী বললে,—কথা বলছিস্ নে কেন? আমি বেশ বুঝেছি তুই মান করেছিস্। নয় কি না বল্?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে এলোকেশী,—আমাকে মাইনে চুকিয়ে ছেড়ে দাও। ঢের হয়েছে। বিনি কারণে আমাকে যাচ্ছেতাই করবে তুমি? আমি সহ্যি করতে পারবো না। হাতে ক'রে মানুষ করলাম, তারই পুরস্কার এই?

রাজেশ্বরী মৃদু হেসে বললে,—রাগ করিস্ নে ভাই! মন-মেজাজ ভাল ছিল না, দু'টো কটু কথা ব'লে ফেলেছি। ক্ষমা কর্ ভাই! আর কখনও হবে না। এই মার্জ্জনা চাইছি জোড়হাত ক'রে।

তবুও এলোকেশীর অভিমান যেমনকার তেমনি থাকে। বলে,—না রাজো, এক-বাড়ী লোকের সমুখে তুই অযথা এত কথা বলবি আর আমি সহ্যি ক'রে যাবো? দোষ করলে না হয় কথা ছিল! আমাকে মাইনে চুকিয়ে ছেড়ে দে। ভিক্ষে মেগে খাবো, সেও ভাল। বিনি কারণে অপমান সহ্যি করবো না।

—পায়ে মাথা খুঁড়বো? বাধ্য হয়ে বলতে হয় রাজেশ্বরীকে। বলে,—পায়ে মাথা খুঁড়লে যদি রাগ পড়ে তো বল্, পায়ে মাথা খুঁড়ছি।

এলোকেশীর অভিমান হয়তো দ্রবীভূত হয়। বললে,—মিথ্যে কেন আমাকে পাপের ভাগী করবি? নে নে, খুব হয়েছে। বেলা কত ঘড়ি দেখেছিস? নে, তাড়াতাড়ি নে। তুই না গেলে তোর সোয়ামীর জল-খাবার দেওয়া যাবে না। কি কি করবে বলবি?

ভেবে-চিন্তে বললে রাজেশ্বরী,—কড়াইশুঁটির কচুরি করতে বল্ না! মিষ্টির মধ্যে বাদাম-চাকতি আর ঘিওর ঘরেই আছে। ভাবনা কি? ক' গণ্ডা কচুরি করতে কতক্ষণ লাগবে আর! তাও বেলা-কচুরি। যা, তুই ব্রাহ্মণীকে ব'লে আয় শীঘ্রি।

—ভাল কথা। কথা বলতে বলতে পা বাড়ায় এলোকেশী।

রাজেশ্বরী স্নান-ঘরের দরজায় অর্গল তুলে দেয়। মৃদু কণ্ঠে কি একটা গান ধরে। রবি বাবুর কি একটা গান কে জানে!

শীতের সকাল।

অনেক দূরে দূরে, আকাশস্পর্শী তাল আর নারকেল গাছের মাথায় মাথায়, স্থির আর অচঞ্চল হয়ে আছে ছাই রঙের পাতলা কুয়াসা। গৃহস্থের উনুনের ধোঁয়া না কুয়াসা কে জানে, থমকে আছে জড়বস্তুর মত। কোন কোন বৃক্ষশীর্ষে বা স্পর্শ ক'রেছে অরুণাভা। তেজহীন, দীপ্তিহীন মিষ্টি রৌদ্রালোক। চিৎপুরের মসজিদের মিনারের ফাঁক থেকে মধ্যে মধ্যে উঁকি মারছেন আদিত্য। রক্তিমাকার, আবীরের মত রঙ দিবাকরের, সুগোল আকৃতি, যেন একটা বৃহৎ রক্তপিণ্ড। ধীরে, অতি ধীরে দিকচক্র ত্যাগ ক'রে উদিত হচ্ছেন, আকাশ পরিক্রমায় যাত্রা করবেন। সমগ্র আকাশ অতিক্রম ক'রে ডুবে যাবেন দিগ্‌বলয়ে দিনের শেষে।

গাছে-গাছে ডাকছে নানা জাতের পাখী।

শিষ দিচ্ছে সুমধুর কণ্ঠে। শিমুল গাছে বুলবুলি আর কাঠ-ঠোকরার নাচানাচি। বট ফল খাচ্ছে বিভিন্ন জাতের শালিখ আর টিয়ার ঝাঁক। মনিয়া পাখী উড়ে ব'সছে এ-গাছ থেকে ও-গাছে। খঞ্জনের লাফালাফি চ'লেছে। মাঝে-মিশেলে কাকের কর্কশ ডাক যেন তাল কেটে দিচ্ছে অন্যান্য আকাশচারীর রাগ-রাগিণীর। মৌমাছি, ভীমরুল, কাচপোকা আর প্রজাপতি সোনালী রৌদ্রে ঝিলিক তুলে ফুলের রেণু ওড়াচ্ছে, হুল ফুটিয়ে মধু খাচ্ছে মৌসুমী ফুলের। সূর্য্যমুখী সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। মৌমাছির ভারে থেকে-থেকে নুয়ে পড়ছে। সদ্য প্রস্ফুটিত জবা ঘোর-সবুজতা ভেদ ক'রে মানুষের দৃষ্টিপথে দেখা দিয়েছে। ঘন-হলুদ গাঁদার

ভীমরুল বিরামবিহীন চুমা খায়। ক্যানা, ডালিয়া আর ক্রিসিন্থিমাম্ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা শিশির চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ে। কখনও কখনও দেখা দিয়ে লুকিয়ে পড়ে দু'-চারটে দোয়েল আর চন্দনা। কোথায় কাদের পোষা তিতির থেকে থেকে ডাকতে থাকে।

সদরের স্নানাগার থেকে মুখ-হাত ধুয়ে বেরোতেই আমলাদের একজন বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মস্তকাবনত হয়ে নমস্কার জানিয়ে বললে,—হুজুর, আসতে হুকুম হয়।

প্রথমটায় বিস্মিত হয়ে প'ড়েছিল কৃষ্ণকিশোর।

ঘুম-ভাঙা চোখে ভুল দেখছে না তো! কিয়ৎক্ষণ লক্ষ্য ক'রে বললে,—হাঁা, হাঁা, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। কিছু বলবেন?

—আজ্ঞে হাঁা, হুজুর! নিবেদন ছিল কিছু।

কৃষ্ণকিশোর তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে বললে,—বলুন, কি ব'লবেন?

আমলাটি এগিয়ে আসে সসম্ভ্রমে। বলে,—হুজুর, হেড-নায়েব মশাই সাক্ষাতের প্রার্থনা জানিয়েছেন। হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। বলছেন যে, অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। হুজুরের হুকুম মিল্লেই—

—কোথায় তিনি? প্রশ্ন করলো কৃষ্ণকিশোর। পাশেই দাঁড়িয়েছিল একজন তাঁবেদার। তোয়ালের প্রয়োজন মিটে গেলে তোয়ালেটা নেবে হুজুরের কাছ থেকে। তাঁবেদারের হাতে ছিল সংবাদপত্র। তোয়ালে নিয়ে দেবে কাগজটা।

আমলাটি বললে,—হুজুর, তিনি কাছারীতে খাতা লিখছেন। হুকুম হ'লেই সাক্ষাৎ করবেন হুজুরের সঙ্গে।

সদর-বাড়ীতে দালান একাধিক।

এক দালানের মধ্যিখানে ছিল বেতের কয়েকটা কেদারা আর গোলাকার টেবিল। টেবিলে ছিল চীনা মাটির নক্সা-কাটা ফুলদানি। পুষ্পশোভিত। টাটকা ফুলের একটা তোড়া। ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ আর মৌসুমী কয়েক জাতের। কয়েকটা ঝাউ-পাতা।

বেতের একটা কেদারা টেনে বসে কৃষ্ণকিশোর।

তোয়ালেটা দিয়ে কাগজটা নেয় তাঁবেদারের হাত থেকে। বলে,—তাঁকে পাঠিয়ে দিন। আমি আছি এখানে।

—যথাজ্ঞা হুজুর!

কথা দু'টি বলেই বিদায় গ্রহণ করে আমলাটি।

ইতোমধ্যে অনন্তরামের দেখা পাওয়া যায়। অনন্তরাম বললে,—বৌদি এই আলোয়ানটা গায়ে দিতে বললে। বললে যে, ঠাণ্ডা হাওয়া চ'লেছে, শীতও বেশ প'ড়েছে হঠাৎ। আলোয়ানটা গায়ে চাপাও।

অনন্তরামের হাতে ছিল একটা পশমী আলোয়ান। ভাঁজ-করা।

হালকা-আগুন রঙের। সত্যি শীত-শীত করছিল এলোমেলো হিমার্ত্ত হাওয়ায়। আলোয়ানটা খুলে গায়ে জড়ালো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—অনন্তদা, বল' গিয়ে, খিদে লেগেছে। যা হয় কিছু দিতে।

অনন্তরাম তৎক্ষণাৎ বললে,—সে তোমাকে বলতে হবে না। দেখলাম, বৌদিই যোগাড় করতে লেগে গেছে। দু'দণ্ড অপেক্ষা কর' তুমি. আমিই নে আসছি!

কাগজে কত বিচিত্র খবর, দেশ-বিদেশের?

মুক্তিকামী গণজনের মুক্তিলাভের আকুল ও অদম্য আকাঙ্ক্ষার কথা। সেই সঙ্গে রক্তলোলুপ শাসকের শোষণের কাহিনী। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত-সরকার জারী ক'রেছেন "ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট", ইংরাজী ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে—যার উদ্দেশ্য, দেশজ ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র সমূহের নিরঙ্কুশতা। রাজরোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্ত কত কাগজের আত্মপ্রকাশ স্থগিত আছে। সর্ব্বজনাদৃত 'সোমপ্রকাশ' পড়তে পায় না বাঙালী। সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনায় 'সোমপ্রকাশ'। লাহোরের সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট হাজার টাকা ডিপোজিট ও মুচলকা চাওয়ায় সম্পাদক তদ্দানে সমর্থ না হওয়া 'সোমপ্রকাশ' প্রচার স্থগিত রেখেছেন। যশোরের শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'অমৃত-বাজার পত্রিকার' প্রতিও সরকার মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার এক কৌশল অবলম্বনে ইংরাজী ১৮৭৮ সালের ২১শে মার্চ্চের মধ্যে 'অমৃতবাজার'কে রীতিমত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত করলেন। 'অমৃতবাজার' ইংরাজী হওয়ায় উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষগণের প্রতিজ্ঞা মতে 'আনন্দবাজার' প্রবর্ত্তিত করলেন। কৃষ্ণকিশোর কি কাগজ পড়ছিল? শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'সমালোচক', কেশব-চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বালকবন্ধু' না 'আনন্দবাজার পত্রিকা'? শাসকদের প্রজাপীড়ন, ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও রাজদ্রোহের বিপ্লবাত্মক কাহিনী, মিশনারীদের ধর্ম্মপ্রচারের কথা, ব্রাহ্মধর্ম্মসম্প্রদায়ে ভাঙনের ইতিবৃত্ত, সাম্রাজ্যবাদী কূট-কৌশলকে ব্যর্থ ক'রে শোষিত ভারতবাসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রূপ গ্রহণ করে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায়। ভারতহিতৈষী হিউম সাহেবের অন্তহীন চেষ্টায় ভারত-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাহিনী।

—একটা নিবেদন ছিল হুজুর!

হঠাৎ কথা শুনে কাগজ থেকে মুখ তুললো কৃষ্ণকিশোর। কাগজ টেবিলে রেখে বললে,—কি, বলুন?

—চুপিচুপি ব'লবো হুজুর। বললেন হেড-নায়েব।

ব্যাকুল কণ্ঠে কথা বলে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—বেশ তো, তাই বলুন। কি হয়েছে কি? ফাঁস হয়ে গেছে না কি?

হেড-নায়েব কাছে এগিয়ে আসে। বলে,—না হুজুর, আমি আছি যখন, তখন ফাঁস হবে কোত্থেকে? তবে হুজুর, চালে একটা ভুল হয়ে গেছে আমাদের।

—কেন? সাগ্রহে জিজ্ঞেস ক'রলো কৃষ্ণকিশোর।

হেড-নায়েব ইতিউতি তাকিয়ে বললেন ফিসফিসিয়ে,—আজকে যে রবিবার, কথাটা হুজুর আমার মনেই ছিল না। সুতরাং আদালতে যাওয়ার নাম ক'রে বেরোলে সকলেই তো

হুজুর বুঝে ফেলবে। ধ'রে ফেলবে। এখন উপায়? কাল মাঝ রাতে হুজুর কথাটা আমার মনে প'ড়লো। মনে পড়া পর্য্যন্ত হুজুর, এক দণ্ড আর চোখে-পাতায় করতে পারলাম না। ঘুমই এলো না! মনে মনে হুজুর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, কি করা যায় তাই ভেবে-ভেবে। সকাল না হ'লে তো হুজুরকে বলা যাবে না কথাটা। এখন উপায় হুজুর?

—ঠিক ব'লেছেন। ঠিক ব'লেছেন। আজ তো রবিবার বটে। বললে কৃষ্ণকিশোর। চিন্তিত দৃষ্টিতে চেয়ে কথাগুলি বললে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত বললে,—তবে আর কি হবে। কালকেই যাওয়া হবে। তবে আমাকে বেরোতেই হবে আজ। কিছুক্ষণের জন্যে। গৃহস্থকে ব'লবো যে, উকীল-বাড়ী যাচ্ছি। আপনাকে জিজ্ঞেস করলেও বলবেন, কেমন? বলবেন, উকিল-বাড়ী যাচ্ছি পরামর্শ করতে।

—নিশ্চয় হুজুর, নিশ্চয়। বললেন হেড-নায়েব।—দু'বার বলতে হবে না হুজুর আমাকে। আমি তো বাপের ব্যাটা হুজুর। নয় কিনা বলুন?

—কি যে বলেন মশায়? বললে কৃষ্ণকিশোর।—যা নয় তাই বলবেন?

—যাই হোক, হুজুর যান, ঘুরে আসুন। ভালয় ভালয় ঘুরে আসুন! বললেন হেড-নায়েব।—দুগ্‌গা বলে ঘুরে আসুন। তবে এই কথা রইলো, কালকে যাওয়া হবে। আপনার প্রাতর্ভোজন এনেছে অনন্ত। ঐ যে আসছে।

মনে মনে হেড-নায়েবের বুদ্ধির তারিফ করে কৃষ্ণকিশোর। সত্যিই তো ভুল হয়ে গিয়েছিল। হাতে-নাতে ধরা পড়তে হ'ত শেষ পর্য্যন্ত। রবিবারে আদালত খোলা থাকে না, মনেই ছিল না কথাটা। ক্রীশ্চান রবিবার, স্যাবাত্‌ ডে—এই বিশেষ দিনটি যে ইকরায়েলে গিয়ে ধার্ম্মিক বিশ্রাম করতে হয়। এই দিনে কোন কাজ নয়, শুধু ধার্ম্মিক বিশ্রাম গ্রহণ। সপ্তাহের ছ'দিন কাজ আর কাজ—আর একটি দিন শুধু খ্রীষ্টের ভজনা কর আর ছুটি উপভোগ কর। রবিবারে কাজে বিরতি, বাঙলা তথা ভারতবর্ষে হয়তো এই প্রথাটি চালু করে ইংরাজ। গির্জ্জার দ্বার ব্যতীত আর সকল কর্ম্মকেন্দ্রের দ্বার বন্ধ থাকে রবিবারে। বৈদিক যুগে গ্রহাধিপতি সূর্য্যের উপাসনার জন্যও যে রবিবার ধার্য্য ছিল।

হোক রবিবার, আদালত নাই বা খোলা থাকলো, তবুও বেরোতে হবেই কিছুক্ষণের জন্য। যেন কত কত যুগ দেখা মেলেনি! ক'দিনের অদেখায় মনে হয় বুঝি বা কত শত দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শুধু চোখের দেখা দেখলেই হয়তো স্থির হয়ে যাবে চঞ্চলচিত্ত। মানসপটে গহরজানের মুখটি ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে। গতিশীল মেঘের মধ্য থেকে যেমন হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয় শুক্লপক্ষের পূর্ণাকার চাঁদ। কিম্বা ঝড়ের বেগে দোদুল্যমান গাছে লুকিয়ে-পড়া পত্রবাহুল্যে গন্ধরাজের দেখা দেওয়ার মত।

শীতের সকালের হিমার্দ্র হাওয়া, গাঁদার সুদূরবাহী গন্ধ আর গাছে গাছে নানা পাখীর কূজনে মন যেন কোথাও উড়ে চ'লে যায়। কাঁচা হলুদ রঙের একজোড়া পাখী, যাদের কণ্ঠে কৃষ্ণরেখা, শিষ দিতে দিতে উড়ে আসে কোথা থেকে, কনকচাঁপা গাছের ছায়ায় বসে। লাফালাফি করে। মাটি ঠুকরোয়। বট গাছের লাল লাল ফল শুকপাখীদের নির্দ্দয় দলকে কটুকটু ক'রে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে নীচে ফেলে দিতে দেখা যায়। ভ্রমরের গুঞ্জরণ, হয়তো কান পেতে শোনা যায়। ফুল থেকে ফুলে উড়ে যায়—ক্রিসিন্থিমামের ঘন পাপড়ি ভেদ ক'রে অনুপ্রবেশ করে ফুলের অভ্যন্তরে। ফুলরেণুর স্পর্শে ভ্রমরের গায়ের রঙ সোনালী হয়ে গেছে। বাতাসে দুলছিল বৃক্ষশীর্ষ, বিশেষতঃ প্রাঙ্গণের প্রাচীর-স্পর্শী সুপারী গাছের প্রাচুর্য্য।

বেশ লাগে যেন এই শীতের সকাল।

প্রিয়সঙ্গসুখে লোলুপ হয়ে ওঠে যুব-মন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে কৃষ্ণকিশোর অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য যেতে হবে গহরজানের কাছে। বসিরুদ্দীন মিঞা কেন যে দেখিয়ে দিয়ে গেল গহরকে, কেন যে ব'লে গেল ঠিকানা! বেশ ছিল কৃষ্ণকিশোর! ছিল না কোন ভাবনা, গহরজানের রূপলাবণ্য ছিল অদৃষ্ট। মিঞা যে কি ফ্যাচাঙ বাধিয়ে দিয়ে গেল! উৎকণ্ঠায় বিশ্রী লাগে কখনও কখনও।

—এই নাও, খাও। আমাকে আবার যেতে হবে এক্ষুনি।

কথা শুনে সম্বিৎ ফিরে পায় যেন কৃষ্ণকিশোর। অনন্তরাম সকালের প্রাতর্ভোজন বসিয়ে দেয় টেবিলে। বেতের টেবিল। একটা স্ফটিকের রেকাবীতে আহার্য্য—কড়াইশুঁটির বেল' কচুরী, ঘিওর আর দু'টো আমলকী। আচারের আমলকী। এক গেলাশ জল—রূপোর গেলাশ।

—কোথায় যাবে অনন্তদা? জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরাম বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলে,—সে কি, তুমি শোন' নাই? তোমার প্রজাদের নে যেতে হবে যে। কলকাতায় যা যা আছে, দেখাতে হবে যে! বৌদির কাছ থেকে ছুটি মিলেছে, এখন তুমি হুকুম দিলেই দুগ্‌গা ব'লে যাত্রা করি ওদের সঙ্গে।

একটা আমলকী দাঁতে কামড়ে বললে কৃষ্ণকিশোর,—কোথায় কোথায় যাবে অনন্তদা?

—সে কি তুমি শোন' নাই? বললুম তো কালকে যে তোমার প্রজাদের সঙ্গে ক'রে ওদের দেখাতে হবে আলিপুরের চিড়িয়াখানা, কালীঘাটের কালী, মনুমেণ্ট, হাইকোর্ট, আর-আর যা আছে।

হঠাৎ আজ আমলকীর আচার পাঠালো রাজেশ্বরী।

আমলকী তো বলকারক আর—ভাবতে ভাবতে মনে মনে হাসে কৃষ্ণকিশোর। অনন্তরাম প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে শুনে বললে,—আহা, ওরা থাকে বিদেশ-বিভুঁয়ে, দেখতে পায় না কিছু। যেও অনন্তদা, দেখিও কলকাতায় যা যা দেখবার আছে। প্রয়োজন হয়তো কাছারী থেকে গোটা কয়েক টাকা নে যেও তুমি।

—তুই তা হ'লে খা। আমি আসি? ভাল কথা ব'লেছিস, কাছারী থেকে কিছু টাকা নিয়ে যাবো। তাতে তোর মান ওদের কাছে অনেকটা বেড়ে যাবে। কথার শেষে বিদায় নেয় অনন্তরাম। দ্রুতপদে চ'লে যায়।

গহরজানের ধমনীতে উঁচু জাতের রক্ত প্রবাহিত, যেজন্য ক'দিনের অদর্শনে সেও ব্যাকুল হয়ে আছে।

জাত-বারাঙ্গনা নয় গহরজান। হয়তো সেই কারণেই তার মনে দস্তুর মুআফিক রেখা পড়েছে। সৌদামিনীর জন্য মুখে কিছু বলতে না পারলেও যখন-তখন গহরজানেরও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হচ্ছে। পুরাপুরি দেহবিক্রেতা হ'লে, যে-কেউ আসে আর যায় তাতে কোন' কথা থাকে না। কালকে কে এলো, আজ আর মনে থাকে না। মালদার মানুষকে হাতের নাগালে পাওয়া গেলে কিছুটা বেশী নকল হাসি আর অত্যধিক প্রেম-নিবেদন করতে দেখা যায়, যাতে পুনরায় আসে এই উদ্দেশে—কিন্তু গহরজানের দেহে আছে যে ভদ্র-রক্ত। টাকা না দিয়ে যদি সৌদামিনীর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে গহরজানকে নিয়ে যায় অন্যত্র তাতেও তার কোন' ওজর-আপত্তি নেই। শুধু এই অসহ্য পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেওয়া হোক গহরজানকে। আর বেশী কিছু সে আকাঙ্ক্ষা করে না। আলাহিদা থাকবে গহরজান, ইআরদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ইজ্জৎ বাঁচিয়ে থাকবে, এমারতে বাস না ক'রে থাকবে বস্তীতে, কিংখাপ বাতিল ক'রে গায়ে চাপাবে অতি নগণ্য স্তুতীর পোষাক, আঙুর ফল আর মেওয়া না খেয়ে খাবে শাক্-ভাত—কিন্তু খালাস চায় গহরজান। দম-আটকানো এই ঠাট-ঠমক থেকে ছেড়ে দিয়ে থাকতে চায় স্বস্তি ও শান্তির নীড়ে। চড়াই পাখী না হয়ে, হ'তে চায় গহরজান বাবুই পাখী। রৌদ্র, ঝড় ও বৃষ্টি হোক সহ্য করতে, তবুও সে মুক্তি চায়।

ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে 'হা আল্লা' 'হা আল্লা' করছে গহরজান।

আল্লাকে মনে মনে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে, আজকে যেন আসে বাঙালী বাবুটি। নেহাত ছোকরা, তবুও তাকে দেখলে গহরজানের মনের সকল জ্বালা মুহূর্ত্ত মধ্যে উবে যায়।

চোখে জলের ধারা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ। ভারাক্রান্ত মন।

তবুও গহরজান ঘর সাজাতে লেগে গেছে সকাল হ'তে না হ'তেই। রোদ্দুর ফুটতে না ফুটতেই। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে। গহরজানের পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে উঠেছে সৌদামিনীর অত্যাচার। পাছে কৃষ্ণকিশোর হঠাৎ গিয়ে হাজির হয় সেই ভয়ে সৌদামিনী সিঁড়ির দরজায় খাড়া দাঁড়িয়ে থেকেছে। নগদানগদি টাকা হাতে পেয়ে শনিবারের মরসুমে দিন আর রাত্রির মধ্যে ধ'রে ধ'রে ডেকে এনেছে ঠিকা মানুষদের জনাকয়েককে। সৌদামিনীর ভাবগতিক দেখে মুষড়ে প'ড়েছে গহরজান। আপত্তি জানিয়েছে শারীরিক অসুস্থতা জানিয়ে, কিন্তু কোন' ফল হয়নি। নিহায়ৎ যখন ভেঙ্গে প'ড়েছে গহরজান তখন পেঁয়াজী আর ফুলুরীর সঙ্গে নির্জ্জলা দেশী মদ গিলিয়ে বেহুঁষ ক'রে দিয়েছে মেয়েটাকে।

গহরজান দুঃখ-কাতর স্বরে ব'লেছে,—মাসী, আর যে পারি না আমি! ক্ষেমা দাও আমায়। নয়তো বিষ দাও খানিকটা। ম'রে বাঁচি আমি।

সৌদামিনী হিংস্র জানোয়ারের মত খিঁচিয়ে উঠেছে। ব'লেছে,—বড্ড যে বাড় হয়েছে তোর দেখছি! যা ব'লবো তোকে শুনতে হবে! নয়তো মুখে খ্যাংরা মেরে বিদেয় ক'রে দেবো।

টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করেনি গহরজান। চোখ দু'টো শুধু তার ছলছলিয়ে উঠেছে। সৌদামিনীর কথার কোন' জওয়াব দেয়নি। ঠিকা মানুষগুলির অসহ্য কায়িক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য ক'রে গেছে। নগদ টাকা দিয়েছে তারা, খিমচে কামড়ে অর্দ্ধমৃত ক'রে তবে ছেড়ে গেছে গহরজানকে। শরীরের কত জায়গায় কালশিটে পড়েছে। ব্যথা হয়েছে কত জায়গায়।

গত কালের অত্যাচারের ঘটনা মনে প'ড়েছে আজ।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর সাফ করতে লেগে গেছে গহরজান। একেকটি মানুষ যেন তাণ্ডবলীলা ক'রে গেছে ঘরে। মদ আর সোডার বোতলের ছিপি, পোড়া বার্ডসাই আর শালপাতায় ঘরের মেঝে ভ'রে গেছে।

গহরজানের চোখের জল টপ-টপ পড়ছে ঠিক বুকে।

তবুও সকল কিছু উপেক্ষা ক'রে ঘর সাফ করছে। ঝাঁট দিচ্ছে মেঝেয়। আল্লার কাছে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা জানাচ্ছে মনে মনে, আজ যেন আসে। আর যদি আসে, গহরজান খোলাখুলি জানাবে তাকে সকল পরিস্থিতি। জানিয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়বে পায়ে। বলবে,—দোহাই তোমার আমাকে বাঁচাও, উদ্ধার কর' আমাকে।

ঘর সাফ করতে করতে দেওয়ালের আয়নায় নিজের মুখটা দেখে গহরজান। দেখে যে, মুখেও কতক কতক জায়গায় কালশিটে প'ড়েছে। ওষ্ঠাধর ফুলে উঠেছে। গাল দু'টোতে কালো কালো দাগ। দেখতে দেখতে চোখ দু'টো জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কেঁদে কেঁদে না কে জানে, চোখ দু'টো রাঙা হয়ে উঠেছে। রাত্রে ঘুমও ভাল হয়নি। ঠিকা মানুষের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে শুয়েছে যখন, তখন প্রায় রাত্রি দেড়টা। গত কাল মদের নেশায় বুঝতে পারেনি গহরজান, আজকে চলতে-ফিরতে ব্যথিয়ে উঠছে শরীরের কত জায়গা।

মধ্যে মধ্যে হিমার্ত্ত হাওয়ার বেগ জানলা ভেদ ক'রে ঘরে আসে।

ঘরের পর্দ্দা ক'টা কাঁপে আর গহরজানের চূর্ণকুন্তল দু'লে ওঠে। শাড়ীর স্খলিত আঁচলটা বুকে-পিঠে জড়ায় গহরজান। শরীরটা যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে। নড়তে-চড়তে কষ্ট হচ্ছে। আয়না থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় গহরজান। রুক্ষ কেশের বিনুনীটা বুকের 'পরে ঝুলে প'ড়েছিল। পরম আক্রোশে

বিনুনীটা সজোরে পিঠে ছুঁড়ে দেয়। ভাল লাগে না ঘর ঝাড়-পোঁচ করতে। পায়ের কাছাকাছি চুপটি ক'রে ডালিম ব'সেছিল। ডালিমকে বুকে তুলে কয়াসে ব'সে দেহ এলিয়ে দেয় গহরজান। একটা তাকিয়ায় এলায়িত হয়ে ডালিমকে বলে,—কোন্ আঙুলটা কামড়াবি, কামড়া ডালিম। দেখি, ঠিক হয় কি না?

গহরজান দু'টো আঙুল ডালিমের মুখের কাছে ধরে। একটা আঙুল কামড়ায় ডালিম। তুক করে গহরজান। জোর কামড় নয়, খুব আস্তে কামড়ায়। লাফিয়ে ওঠে যেন গহরজান। বলে,—ডালিম, ডালিম, মেরা ডালিম! ঠিক পাকড়া হায় তুম।

হাসি আর উল্লাসে গহরজানের মুখাকৃতিতে পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। তুক ক'রেছিল গহরজান। দু'টো আঙুল কামড়াতে দিয়েছিল ডালিমকে। আসবে কি আসবে না—তাই জানতে চেয়ে তুক ক'রেছিল। ডালিম যেটি কামড়েছিল সেটিতে প্রমাণিত হয় যে আসবে। শরীরের সকল ব্যথা ও যন্ত্রণা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলে যায় গহরজান। ডালিমকে বুকে জাপটে ধরে। ডালিমকে চুমা খায়।

—কে আছিস?

প্রাতর্ভোজন সমাপনান্তে ডাক দেয় কৃষ্ণকিশোর। অদূরে দাঁড়িয়েছিল একজন তাঁবেদার। হুজুর যদি কোন ফাই-ফরমাইষী করেন। তাঁবেদার সেলাম জানিয়ে বললে,—হুকুম হুজুর!

কৃষ্ণকিশোর বললে,—অন্দরে বৌদিকে ব'লে পাঠাও যে বন্দুকের আলমারীর চাবিটা পাঠাতে।

—যো হুকুম হুজুর! বললে তাঁবেদার। সেলাম জানিয়ে চ'লে যায়।

অনেক দিন ধ'রেই মনে প'ড়েছিল কৃষ্ণকিশোরের, বন্দুকের আলমারী খুলে বন্দুকগুলো সাফ করাতেই হবে। সব ক'টা আজ হ'য়ে উঠুক আর না উঠুক, অন্ততঃ কয়েকটা তো হবে।

—রাজো, ওলো রাজো!

এলোকেশী ডাকে রাজেশ্বরীকে। বলে,—তোর সোয়ামী বন্দুকের আলমারীর চাবি চাইতে পাঠিয়েছে।

কুটনো কুটতে ব'সেছিল রাজেশ্বরী। আজকের তরি-তরকারী আর শাক-শব্জী কুটতে ব'সেছিল। আরেকটু হ'লে বঁটিতে হাতটা কেটে যাচ্ছিলো আর কি! বন্দুকের আলমারীর চাবি চাই? বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ ক'রে ওঠে রাজেশ্বরীর। ইচ্ছা না থাকলেও বলে,—অপেক্ষা করতে বল্ এলো। দোতলায় যাবো, গিয়ে তবে দেবো। ক'টা আলু আর আছে? কুটে দিয়েই যাচ্ছি। এলো, জিজ্ঞেস করতো, বাবু কোথায়, কি করছে?

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁবেদারকে জিজ্ঞেস ক'রে এলোকেশী বললে,—ব'সে আছে সদরে। জলখাবার খেয়ে ব'সে আছে।

কৃষ্ণকিশোর তখন ভাবছিল, কয়েকটা বন্দুক সাফ করা শেষ হ'লে বেরুবে। বাড়ীতে ব'লে যাবে যে, যাচ্ছে উকিল-বাড়ী।

কিন্তু যাবে উকিল-বাড়ীতে নয়।

সাজাগোজা ক'রে যাবে গহরজানের কাছে। যাওয়ার নামেও মনটা কৃষ্ণকিশোরের খুশীতে পূর্ণ হয়ে যায়।

ডালিমের আঙুল কামড়ানো তবে সত্যে পরিণত হচ্ছে। কৃষ্ণকিশোর তবে যাচ্ছে গহরজানের কাছে। কিন্তু কতক্ষণের মধ্যে? গহরজান যে ওদিকে অধীর প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে আছে!

[ক্রমশঃ

প্রচ্ছদপট

শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংসিত বাগ্‌দেবীর এই শিল্পমূর্ত্তিটি কৃষ্ণনগর (নদীয়া) জাগরণী ক্লাব কর্ত্তৃক পূজিত হয়। শান্তিনিকেতনে রাখিবার জন্ত শান্তিনিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষ নগদ বহুমূল্যে মূর্ত্তিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ বিক্রয় করিতে না চাওয়ায় মূর্ত্তিটি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। মূর্ত্তির আলোকচিত্রী শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক। চিত্রটি মাসিক বসুমতীর জন্ত বিশেষ ভাবে গৃহীত।

তুমিই সুন্দর! দয়া কর, কৃপা কর ভগবান, শিখিয়ে দাও অত্যাচারীদের ক্ষমা করতে!

বিদায়! বিদায় প্রিয়তমে! আশীর্ব্বাদ ক'রো আমার হতভাগ্য পুত্রকে। প্রার্থনা ক'রো আমার জন্যে। ভগবান যেন দুই বাহু প্রসারিত করে তোমায় কোলে টেনে নেন।

যে এক দিন তোমার স্বামী ছিল, তার মরণমান কর লিখল এই চিঠি। স্বামী এক দিন তোমারই ছিল, আজ আর তোমার নয়। এ হাত এক দিন তোমারই ছিল, আজ আর তোমার নয়।

ওয়াল্টার ব্যালে।

ফরাসী-সম্রাট ৩য় নেপোলিয়নের কাছে ইংরেজ-কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংএর চিঠি

[বিখ্যাত ফরাসী-কবি ভিক্টর হুগোর 'লা-সাটিমেণ্টস্'-এর বিদ্রূপ-বাণ ফরাসী-সম্রাট ৩য় নেপোলিয়নেরও অসহ্য হয়েছিল। উদ্ধত এই কাপুরুষ সম্রাট কবিকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করেছিল। উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠতম ইংরেজ মহিলা কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং সহানুভূতি দেখিয়ে নিচের যে পত্রখানি রচনা করেছিলেন, ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের মনোমালিন্য হবে ভয়ে তা সত্যি-সত্যিই ফরাসী-সম্রাটের কাছে পাঠান হয়নি। এই চিঠিখানি রচিত হবার তিন বছর পর হুগোর বর্ণিত এই 'ক্ষুদে নেপোলিয়নটি'কেই ফ্রান্স থেকে নির্ব্বাসিত হতে হয়েছিল। তখন ভিক্টর হুগোকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।] —অনুবাদক

রাজাধিরাজ,

তুচ্ছ নারী আমি। এমন কোন ঐশ্বর্য্যই নাই যাতে সম্রাটের নজর পড়তে পারে আমার উপর। সবলের উপরেও দুর্ব্বলের দাবী আছে। তাই আপনার উপর আমার দাবী। আপনার হয়ত জানা নেই যে, আমি এক ইংরেজ কবির স্ত্রী, ইংরেজ কবিরা আমায় জানেন। আমার দেশের রাজার কাছে কখনও কোন আবেদন নিয়ে দাঁড়াইনি। রাজাদের কি বলে সম্বোধন করতে হয় তা পর্য্যন্ত জানিনে। তবু কেতাবে-কেতাবে অনেক বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তাই সম্রাট নেপোলিয়নকে আমার মনের কথা জানাতে অক্ষম হব বলে আমি মনে করি না।

একটু ধৈর্য্য ধরে আমার আবেদনটা পড়তে আপনাকে অনুরোধ করছি। অনুরোধ আমার নিজেরও নয়, নিজের জন্যেও নয়। 'লা-সাটিমেণ্ট' বইখানি আমি পড়েছি। পড়ে ভাবে বিহ্বল হয়েছি। পড়ে আমার চোখ জলে ভরে উঠেছে। উদার মন নিয়ে বইখানি পড়েছি। গ্রন্থকার রাজনীতির আলোচনা করতে গিয়ে আপনার সম্বন্ধে অন্যায় কথা লিখেছেন। এই সমালোচনার জন্যে লেখক জারসী দ্বীপে নির্ব্বাসিত। লেখককে ব্যক্তিগত ভাবে জানি না। তাঁকে কখনও দেখিনি। তাঁর জন্যে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করতে আসিনি। ক্ষমা তিনি পেতে পারেন না।

তবু একটা কথা বলব। লেখক তবু ফরাসী দেশের কবি। আপনি সম্রাট, দেশের সর্ব্ব মহত্ব, সর্ব্ব গৌরবের আপনি ধারক। অনুরোধ, আপনি কবিকে ভুলবেন না, কবিকে ত্যাগ করবেন না।

'ক্ষুদে নেপোলিয়ন' বলে লেখক আপনাকে অভিহিত করেছেন, এতে আপনার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের লেখায় উপরই আপনার মর্য্যাদা নির্ভর করে। তাঁরা লিখবেন ফরাসী-সম্রাট নেপোলিয়নের আমলে ফরাসী-কবি ভিক্টর হুগোকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছিল। আপনার কৃপাসিক্ত সওদাগর, সৈনিক আর বৈজ্ঞানিক কত ছিল, তার হিসাব করে আপনার দেশবাসী হয়ত জানতে চাইবে —এ হিসাবে জাতের কবির নামকে? হয়ত রাজনীতিকরা সমর্থন করবে ভিক্টর হুগোর নির্ব্বাসন, হয়ত ভাব-দুর্ব্বল প্রজা-সাধারণ তাঁর জন্য নিশ্বাসটুকুও ফেলবে না। কিন্তু আমার মত নারী? আপনার ভবিষ্যৎ বংশধর যখন হুগোর কবিতা পাঠ করবেন, তখন এ ভেবে গর্ব্বিত হবেন যে, তাঁর মহানুভব সম্রাট পিতা এক দিন এই মহাকবির দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করেছিলেন।

আপনি বিরাট, আপনি মহান্। কবির মন বিচিত্র, কবি সূক্ষ্ম বিচারপ্রবণ, কবি বুদ্ধিমান। এই কবি-চিত্তের ক্রোধ, এই কবি-মনের চাঞ্চল্য ও অসাধারণ তীব্র অনুভূতি আপনাকে উদার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। এ কথাও ত আপনি ভেবে দেখতে পারেন যে, যখনই কবিরা কাউকে ঘৃণা করে অহেতুক, তখনই হয়ত তারা অনৈসর্গিক ভাবাবেগে ব্যাকুল। তখন হয়ত কবির নজরে পড়েছে কোথাও একটা অদ্ভুত রহস্যাবৃত আলো। আপনি ক্ষমা করুন এই শত্রুকে, ক্ষমা করুন, এ-হেন অপরাধীকে। আপনার উদার ক্ষমা প্রমাণ করে দিক, কবি যুক্তিহীন। দেখবেন, হুগোর কাব্যপ্রিয়দের চোখের জলে আপনার রাজমুকুট যেন ভিজে না যায়! ভগবান কবিকে অসামান্য প্রতিভা দিয়ে যদি পক্ষপাতিত্বই করতে পেরে থাকেন, আপনিও ক্ষমা করে কবির পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন। বিনাসর্ত্তে কবিকে ফিরিয়ে আনুন সেই দেশে, যেখানে রয়েছে তাঁর কন্যার সমাধি।

কাউকে জানাইনি আমি, কথাগুলো আপনাকেই লিখছি। আমি নারী, হয়ত উচিত ছিল মমতাময়ী রাণী ইউজেনের মারফৎ আমার এই আবেদন পাঠান। কিন্তু আমিও যে পত্নী। পত্নী হয়ে কি করে ভাবতে পারি যে, রাণীর পক্ষে কি করে সম্ভব তাঁর স্বামী, সম্রাটকে যে হতমান করছে, তাকে ক্ষমা করা? বরং সম্রাটের পক্ষেই এই অপরাধীকে ক্ষমা করা বেশী সহজ।

একটা অদম্য ভাবপ্রবণতায় আমি প্রণোদিত। তাই সম্রাটের কাছে এই করুণা ভিক্ষার আবেদন। হুগোর গুণমুগ্ধদের অন্তরের মৌন আবেদন এক নারীর ভাষায় প্রকাশ পেল। আমার আস্থা আছে ৩য় নেপোলিয়নের উপর। গণনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র আমি ভালবাসি। সুরু থেকেই উপলব্ধি করছি যে, আপনার মারফৎ গোটা য়ুরোপে এই গণরাষ্ট্র-পদ্ধতি সিদ্ধ হবে। আমি বিশ্বাস করি, আপনি মহৎ কাজ করবেন। নেপোলিয়নের মত আপনিও ক্ষমা করবেন উদার ভাবে। এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং।

স্বদেশবাসীদের নিকট বিপ্লবীদের পত্র

[১৯২৫-২৬ সালে মান্দালয় জেলে বাংলার বিপ্লবীদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। উপনিবেশে আছেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, ৺সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (মহারাজ), শ্রীপ্রতুল গাঙ্গুলী,

শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমনমোহন ভৌমিক প্রভৃতি। কারাগারে বিপ্লবীরা অসুরদলনী দুর্গাপূজা করবেন। অসুররা এতে সম্মত হয়নি। বিপ্লবীরা প্রায়োপবেশন করলেন। আর স্বদেশবাসীদের কাছে এই পত্রখানি মৌলানা সৌকত আলীর মারফত পাঠিয়ে দিলেন]

স্বদেশবাসিগণ,

লালা লাজপৎ রায়, শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী এবং আরও অনেকে অনুরোধ ও আদেশ করেছেন এ অনশন ত্যাগ করতে। মৌলানা সৌকত আলীও এসেছিলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করেছি।

চলতি এই সরকারের কাছে অনুগ্রহের আশা দুরাশা। যারা কখনো জেলে থাকেনি, জেলের ভিতরকার অবস্থা যে কি, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের নেই। আটক আসামী আর রাজনৈতিক কারণে বন্দীরা যে সামান্য অধিকার আজ পেয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে পূর্ব্ববর্ত্তী বিপ্লবী বন্দীদের সত্য ও স্বাধীনতার জন্যে জীবন বলিদানের ফলে। গত ফেব্রুয়ারীতে আমরা ইংরেজ সরকারকে জানিয়েছিলাম,—ধর্ম্ম-কর্ম্মে তোমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা না দাও আমরা নিশ্চয় এ প্রাণ ত্যাগ করব। বিভিন্ন হিন্দু-পর্ব্ব ও পূজা নির্ব্বাহের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দেবে কিনা, এখনও জানতে পারিনি। অথচ এই গবর্ণমেণ্ট দেমাক করে বলে থাকে যে, ওরা প্রজাদের ধর্ম্মে-কর্ম্মে পূরো স্বাধীনতা দিয়েছে। বন্দীদের পূজোর ব্যয় ওরা দিতে চাচ্ছে না। পিঞ্জরের দানা-পানির জন্যে ওরা আমাদের সামান্য যে ক'টা টাকা দেয়, তা থেকে ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য ব্যয়-ব্যবস্থা করা অসম্ভব। আমরা কষ্ট পাব এতে বিচলিত হয়ে নেতারা চাচ্ছেন বিপ্লবী বন্দীরা ঈশ্বর ও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হোক্। অনশন ত্যাগ করতে অনুরোধ করে তাঁরা ভুল করেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন, স্বদেশের স্বাধীনতা ও কল্যাণের জন্য আমাদের মত কয়েকটি তুচ্ছ প্রাণীর প্রাণবলি অপরিহার্য্য। মৌলানা সৌকত আমাদের যুক্তি দিতে এসেছিলেন—আমরা সাধারণ সৈনিক, সেনাপতি নেতৃগণের আদেশ পালন করতে আমরা বাধ্য। ইংরেজ সরকারের তরফ থেকে অনুগ্রহের আশা নেই, নেতারাও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট, সুতরাং আমরা স্বাধীন ভাবে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করে যাব। এ কর্ত্তব্য পালন করতে গিয়ে যদি প্রাণ বলিও দিতে হয়—প্রস্তুত! ভগবান আমাদের সহায়। বন্দে মাতরম্।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদনমোহন ভৌমিক ও শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীমাকে লেখা ভগিনী নিবেদিতার পত্র

[ভগিনী নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে মাতার আশীর্বাদপুত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। নিবেদিতা যখন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে একান্তভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন, তখন স্বামীজী দেহরক্ষা করিয়াছেন। একমাত্র মায়ের নির্দেশই ভগিনী নিবেদিতাকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছিল। মাতার সহিত ভগিনীর কি নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল তাহা ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কেম্ব্রিজ ম্যাস হইতে লিখিত মাকে লেখা তাঁহার এক পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বামী আত্মবোধানন্দ পত্রটির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পত্রটি শ্রীসজনীকান্ত দাস অনূদিত।]

"সাধের মা (Beloved Mother),

আজ সকালে, খুব সকালে, আমি গীর্জ্জায় গিয়েছিলাম—সারার জন্যে প্রার্থনা করতে। যখন সেখানকার সবাই যীশুমাতা মেরির কথা ভাবছিল, তখন হঠাৎ তোমার কথা আমার মনে হ'ল। তোমার মন-ভোলানো মুখখানি, তোমার স্নেহ দৃষ্টি, তোমার সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা—আমি সবই প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। আর আমার মনে হ'ল তোমার এই আবির্ভাবই বেচারা এস, সারার রুগ্ন-শয্যায় তাকে শান্তি দেবে, আশীর্বাদ দেবে। আর জানো মা, অমনি আমার মনে পড়ল সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময় আমি কি বোকার মতন তোমার ঘরে ব'সে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম; আমি কেন বুঝতে পারিনি, তোমার বাঞ্ছিত পায়ের তলায় শিশুর মতো ব'সে থাকাটাই যথেষ্ট! ভালবাসায় ভরা মা আমার! তোমার সেই ভালবাসায় আমাদের মত উচ্ছ্বাস আর উগ্রতা নেই, এই জগতের ভালবাসাও তা নয়, স্নিগ্ধ শান্তির মত তা সকলের কল্যাণ নিয়ে নেমে আসে, এতে কারুর কোন অকল্যাণের ছোঁয়া লাগে না—লীলাচঞ্চল সোনালি আলোর আভা যেন। কয়েক মাস আগের সেই রবিবারটা কি আশীর্বাদই না ব'য়ে এনেছিল, যখন গঙ্গায় স্নান করবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম এবং স্নান সেরেই মুহূর্তের জন্যে আবার ফিরে এসেছিলাম তোমার কাছে! তোমার ঘরখানির স্বাগত সম্ভাষণ তোমার আশীর্বাদের সঙ্গে মিশে কি অপরূপ মুক্তিই দিয়েছিল আমাকে! আমার সবার চাইতে আপন মা তুমি—সাধ হয়, চমৎকার একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা লিখে তোমার কাছে পাঠাই। কিন্তু এও জানি সেটাও শোনাবে কর্কশ চীৎকারের মতো, খুবই শব্দমুখর ব'লে মনে হবে। তুমি যে ভগবানের অপূর্বতম সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই—তুমিই শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব আধার। তোমার মধ্য দিয়েই মর জগতের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রবাহিত হচ্ছে—তাঁর সন্তানদের অসহায় অবস্থায় তিনি তোমাকেই তাঁর প্রতীকস্বরূপ রেখে গেছেন; তোমার কাছেই খুব শান্ত হয়ে চুপ ক'রে আমরা থাকব—একটু মজা করার জন্যে মাঝে মাঝে গোলমালও আমরা করব বইকি! ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি সবই নিঃসন্দেহে শান্ত-নীরব। আমাদের জীবনে আমাদের অজ্ঞাতেই তারা প্রবেশ করে—এই বাতাস, এই সূর্যালোক, বাগানের মিষ্ট সুরভি এবং গঙ্গার স্নিগ্ধতা যেমন। এই সব শান্ত জিনিসের সঙ্গেই শুধু তোমার তুলনা হ'তে পারে।

বেচারা এস, সারাকে তোমার শান্তির আঁচলে ঢেকে রাখো। ঊর্দ্ধে যে শান্তি বিরাজ করে, যেখানে ভালবাসাও নেই, ঘৃণাও নেই, তোমার ভাবনা তো মাঝে মাঝে সেখানে পৌঁছয়; তোমার সেই ভাবনা কি পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত ভগবানে কম্পমান স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়—জগতের স্পর্শে যা মলিন হয় না!

প্রিয়তমা মা, আমি তোমার চিরদিনের, চিরদিনের সেই বোকা খুকু

নিবেদিতা"

নারিকেলের শাখে শাখে— —দীপক শর্ম্মাচার্য্য

ডালপালা —অপর্ণা দত্ত
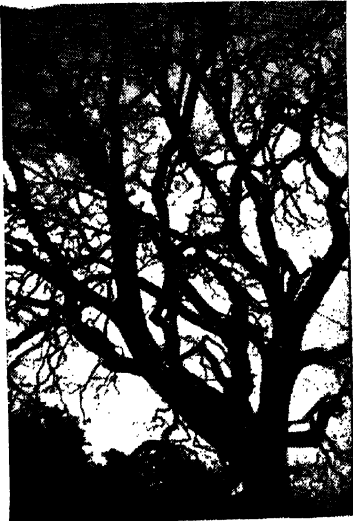
ছায়াপথ —ধীরেন্দ্রনাথ দেব
(তৃতীয় পুরস্কার)

ছায়াতরু —কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(দ্বিতীয় পুরস্কার)
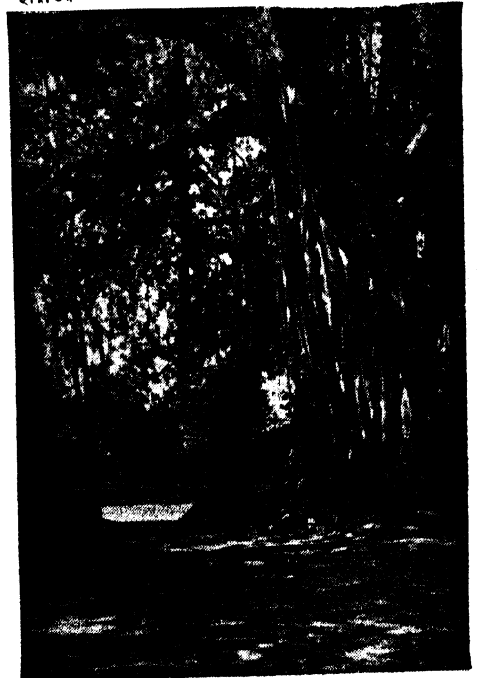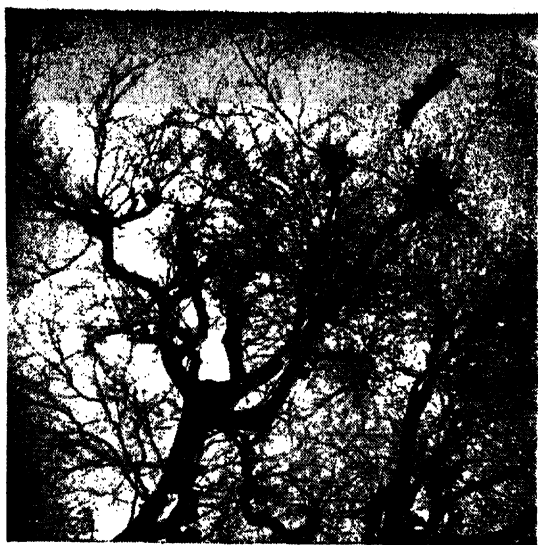
শীতের সকাল
—সুনীলকুমার দাস

শীতের বিকাল
—অশ্বিনীকুমার দত্ত

রুদ্র-বৈশাখে
—রমা সেন

দিনের শেষে —ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য

(প্রথম পুরস্কার)

প্রতিচ্ছায়া —বিনয়কুমার দে

ছিটেফোঁটা

—মানসী ঘোষ
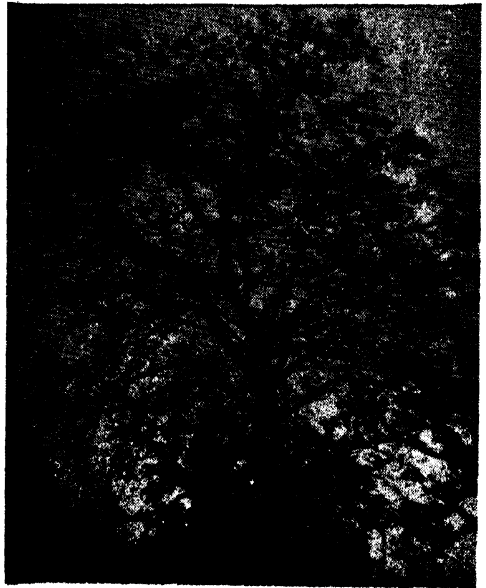
জলে-স্থলে —সোমেন্দ্রনাথ মিত্র

—প্রতিযোগিতা—

বিষয়

নৌকা

প্রথম পুরস্কার ১৫৲

দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

[ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২২শে মাঘ]

মাসিক বসুমতীর পাঠিকা ? —চঞ্চল মিত্র

প্রতিচ্ছবি

—কেশব দত্ত

এডওয়ার্ড ফিট্জারাল্ড্ কে ও কি?

এডওয়ার্ড ফিট্জারাল্ডের নাম শুনেছেন? সামান্য পরিচয় দিলেই ফিট্জারাল্ড্কে অবশ্যই চিনবেন 'মাসিক বসুমতীর' পাঠক-পাঠিকা। ফিট্জারাল্ড্ ছিলেন কবি ওমর খৈয়ামের লেখা রুবাইয়াতের ইংরাজী অনুবাদক। জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ এবং গাণিতিক হিসাবেই ওমর পরিচিত ছিলেন। ফিট্জারাল্ডই ওমরকে প্রতিভাময় কবিরূপে প্রথম পরিচিত করলেন। প্রাচ্য ভাষায় রচিত কাব্য যথেষ্ট পড়েছিলেন ফিট্জারাল্ড। তাঁর এক ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বড্লিয়ান্ পাঠাগারে রক্ষিত ওমরের রুবাইয়াতের অনুবাদের হস্তলিখিত পুঁথির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ফিট্জারাল্ড দেখলেন রুবাইয়াতের পুঁথি—তুলট কাগজে, কালো কালিতে লেখা। পুঁথিটি সোনার গুঁড়ায় পরিপূর্ণ। ওমর ছিলেন সত্যিকার সত্যম্ শিবম্ এবং সুন্দরমের উপাসক। ফিট্জারাল্ডও তাই ছিলেন। তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা ক'রেছিলেন, কিন্তু ওমরের রুবাইয়াতের অনুবাদই তাঁকে অমর ক'রেছে সমগ্র পৃথিবীতে। ফিট্জারাল্ড ইং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সাফোকের উডব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তিনি জীবনের অধিক দিন অতিবাহিত করেন প্রায় একা-একাই। তিনি থাকতেন নির্জ্জনে, গোপনে। স্বাধীন হয়ে থাকার মত সঙ্গতিও ছিল ফিট্জারালডের। দিন এবং রাত্রির মধ্যে তিনি বেশীক্ষণ বিশ্রামেই কাটাতেন। কখনও বা কাঁদতেন। উডব্রিজের মানুষ তাঁর নাম দিয়েছিল "the shadow-haunted dreamer". ছাত্রাবস্থায় তিনি পড়াশুনার কোন নিয়ম মেনে চলতেন না। পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা বেশী পড়তেন 'ক্লাসিক' সাহিত্য। পাঠ্যপুস্তক যেমনকার তেমনি পড়ে থাকতো। ফিট্জারাল্ড কবিতা রচনা করতেন। গান গাইতেন। ছবি আঁকতেন। সামাজিকতা ও রাজনীতির তিনি ধার ধারতেন না, যেজন্য বন্ধুরা তাঁর প্রতি চ'টে যেতেন। কিন্তু চটলে কি হবে, তিনি ঠিক বেড়াতে যেতেন বন্ধুদের গৃহে। তাঁদের ঘরে ব'সেই ধূমপান করতেন, গান গাইতেন। আর মধ্যে-মধ্যে সাহিত্যিক থ্যাকারের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। অর্থ ছিল তাঁর প্রচুর, কিন্তু খরচ ছিল না বললেই হয়। একটি বেশ অদ্ভুত অভ্যাস বা বাতিক ছিল ফিট্জারালডের। যে-বই তিনি প'ড়ে খুশী হতেন সেই বইয়ের কিছু অংশ ছিঁড়ে ফেলে দিতেন আর বাকী অংশ রেখে দিতেন, যে-কারণে কোন একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ থাকতো না তাঁর কাছে। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদও থাকতো শতছিন্ন। একদিন তার মা তাঁকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু শুধু মাত্র বুট জুতোর অভাবের জন্য তিনি মাতৃদর্শন করতে পেলেন না। একুশ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ ক'রেছিলেন। ত্রিশ বছর যখন বয়স তখন ফিট্জারালডের অভিপ্রায় হ'ল, তিনি একটি গুহার মত ঘরে থাকবেন। সুবৃহৎ গৃহ থাকতেও গৃহের ফটকের ধারে কুটীর তৈরী করালেন। কুটীরে তিনি এবং তাঁর সঙ্গে থাকলো সেক্সপিয়রের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি আর তাঁর পোষা বিড়াল, কুকুর এবং টিয়া পাখী। কিছু দিনের মধ্যে তাঁর ঘর হয়ে উঠলো দ্রষ্টব্য। ইজেলে টাঙানো ছবি; যেখানে-সেখানে ছড়ানো বই; টেবিল কিংবা পিয়ানোর ওপরে ছড়ি; বীয়রের পিপে ঘরের মধ্যিখানে। এখানেই তিনি দিন-রাত্রি থাকতেন ড্রেসিং গাউন আর চটি জুতো পায়ে। চাঁদের আলোয় কচিৎ কখনও গৃহলগ্ন প্রাঙ্গণে পায়চারী করতেন। গীর্জ্জায় যেতেন অনেক দিন অন্তর একদিন হয়তো। ফিট্জারাল্ডের প্রিয়বন্ধু হয়ে উঠেছিল ডিবেন নদীর একজন মাঝি। তার নৌকাতে ব'সে ডিবেন নদীর কুলু-কুলু ধ্বনি শুনতেন আর গল্প করতেন। মধ্যবয়সে তিনি বিয়ে করলেন মিস্ বার্টনকে। কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ফিট্জারাল্ড তাঁর কুটীরে ফিরে এলেন আর শ্রীমতী বার্টন গেলেন মিশতে সুউচ্চ সমাজে। কখনও-কখনও তাঁরা স্বামি-স্ত্রীতে পত্র-বিনিময় করতেন, কিন্তু মিলন হ'ত না।

ফিট্জারাল্ডের ইংরাজী অনুবাদ "ওমর খৈয়াম" 'ফ্রেজার' নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অথচ "ওমর খৈয়াম" ছাপা হচ্ছে না দেখে ফেরৎ চেয়ে পাঠালেন পাণ্ডুলিপি। তিনি নিজেই ছেপে প্রকাশ করলেন ওমর খৈয়ামের "রুবাইয়াৎ"। মাত্র পাঁচ শিলিং ব্যয় হ'ল। বই ছাপা তো হ'ল কিন্তু বিক্রী নেই বাজারে। বই বাজারে কাটা দূরের কথা, পোকাতেও কাটতে চায় না! "কুয়ারিচ" নামক পুস্তকবিক্রেতা এক পেনি দামের বইয়ের আলমারীতে ফেলে রাখলো ফিট্জারালডের তর্জ্জমাকে।

সৌভাগ্যক্রমে বিখ্যাত কবি রোসেটির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় আলমারীতে ফেলে-রাখা ঐ তর্জ্জমা-গ্রন্থের প্রতি। রোসেটি তর্জ্জমা প'ড়ে চমৎকৃত হয়ে তাঁর বন্ধুদের ঐ বই কিনতে অনুরোধ করলেন। এবং তখন থেকেই ফিট্জারালডের খ্যাতি ছড়িয়ে প'ড়লো দেশ থেকে বিদেশে। পূর্ব্বেই ব'লেছি, ফিট্জ ছিলেন বন্ধুপ্রিয়। টেনিসন, কারলাইল, থ্যাকারে, জর্জ্জ বোরো ছিলেন ফিট্জের ঘনিষ্ঠতম। মৃত্যুশয্যায় টেনিসনকে যখন শুধোনো হয় যে, কোন্ বন্ধু তাঁর অধিক প্রিয়? তখন কবি বলেছিলেন, "Why, old Fitz, to be sure." অর্থাৎ, "কেন, নিশ্চয় ক'রে বলা যায়, বৃদ্ধ ফিট্জ।"

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ। নরফোকে এক বন্ধুর গৃহে ফিট্জ বেড়াতে গেছেন। একদিন প্রাতঃকালে ভৃত্য কবিকে ডাকতে গিয়ে দেখলো ফিট্জারাল্ড চিরনিদ্রার মগ্ন। তখন কবির বয়স চুয়াত্তর।

আগামী সংখ্যা থেকে

দেশে-দেশে

"বিক্রমাদিত্য"

মাসিক বসুমতী বাঙালী পাঠক-পাঠিকার সমীপে দৃষ্টিপাতের যাযাবর এবং যাযাবরের দৃষ্টিপাতকে উপস্থাপিত ক'রেছে। বিক্রমাদিত্যের 'দেশে-দেশে'ও আশা করি বাঙলা সাহিত্যে অবশ্যই 'আলোড়ন তুলবে লেখার মাধুর্য্যে। লেখক প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার অন্যতম সাংবাদিক, যেজন্য তিনি স্বীয় নাম প্রকাশ করতে চান না।

৩২

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

আমি তখন কলকাতায় দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার বার্ত্তা ও সিনেমা-সম্পাদক! দীর্ঘ ছয় বৎসরেরও অধিক কাল রাজবন্দী জীবন-যাপনের পর ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ করে সহ-রাজবন্দী বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর চেষ্টায় 'কৃষকে' যোগদান করি অন্যতম সহ-সম্পাদকরূপে। তার পর বার্ত্তা-সম্পাদক কেশব সেনের আকস্মিক মৃত্যুর পর আমিই বার্ত্তা ও সিনেমা-সম্পাদক নিযুক্ত হই। বৈপ্লবিক রাজনীতি থেকে চিরদিনের মতো অবসর গ্রহণ করে সংসার-নীড় রচনার কাজে করেছি আত্মনিয়োগ, সারা জীবনে আর 'জীবনের ঝুঁকি নেবার বেহিসাবী পরিকল্পনাকে মনের কোণেও স্থান দিই না, এমনি একটা ছদ্ম-মনোভাব ব্যক্ত করে এবং চলা-ফেরায় রাজনীতি সম্পর্কে একটা ছদ্ম উদাসীনতা দেখিয়ে পত্রিকার অফিসে আমি এই চাকরি গ্রহণ করি। থাকি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে মলোঙ্গা লেনে।

ক্রীক রো-তে 'কৃষকে'র অফিস। পত্রিকার কর্ম্মকর্ত্তা রমেশ বসু বন্ধুস্থানীয় বলে প্রায় প্রতিদিনই রাত বারোটা পর্য্যন্ত আমাকেই অফিসে থেকে সব কিছু গুছিয়ে নৈশ-সম্পাদকের হাতে বাকি রাতটুকুর দায়িত্ব তুলে দিয়ে বাসায় ফিরতে হতো।

১৯৪২ সালের গণবিপ্লব সুরু হয়ে গেছে তখন পূর্ণোদ্যমে! ১৪৪ ধারা অমান্য করে কলকাতার পথে-পথে বেরুচ্ছে প্রতিদিনই অগণিত শোভাযাত্রা, পার্কে-পার্কে শুধু নয়, মোড়ে-মোড়ে চলছে বিরামহীন সভা ও অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, শোভাযাত্রীদের শ্লোগানে-শ্লোগানে একই অনড় দাবীর প্রতিধ্বনি: কুইট ইণ্ডিয়া!···ভারতের উর্ব্বর ভূমিতে যে একবার পা রাখতে পেরেছে, লাল কেল্লার শীর্ষে উড়িয়ে দিয়েছে ইউনিয়ন জ্যাক, গত দু'শো বছর ধরে যারা ভারতের প্রতিটি শিরা ও উপশিরায় মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে খাচ্ছে অগস্ত্য মুনির মতো, কুইট ইণ্ডিয়ার হুমকিকে যে তারা ভয় করে না, লাঠিচালনা, কাঁদুনে-বোমা নিক্ষেপ ও গুলীবর্ষণের মধ্য দিয়ে যে তারা তাদের অনিচ্ছা ও অস্বস্তি প্রকাশ করবে, এ তো জানা কথা।

···কিন্তু তথাপি, ১৯৪২ সালে গণসংগ্রামের যে মহাতরঙ্গ সমগ্র ভারতে শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড অজগরের মতো, আঘাত হানবার উদ্যত আবেগে যার প্রশ্বাসে জেগে উঠেছিল ১৩২৬ সনের ঝড়, চকচকে চক্ষু দুটিতে যার মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল বিস্মভিয়াসের নৃশংসতা, সেই গণজাগরণের তরঙ্গাঘাতে যখন বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ইস্পাতের বনিয়াদ টলটলায়মান হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময় বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সে'র যারা তখনো জেলের বাইরে ছিল, তারা এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিপ্লবকে ঠিক পথে পরিচালনার বিপজ্জনক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করলো।

ঢাকা থেকে গোপনে কলকাতায় এল চঞ্চল গাঙ্গুলী। ধর্ম্মতলার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-অধ্যুষিত একখানি নোংরা দোতলা বাড়ীর দোতলায় একটি কক্ষে সে আশ্রয় গ্রহণ করলো। ফেরারী চঞ্চলকে গ্রেপ্তারের জন্য তখন কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে আর যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপের যুগে হায়েনার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দ্দিকে আই-বি ও এস-বি-র দল শিকারের সন্ধানে। কিন্তু বিপদের হিসেব করলে আর বিপজ্জনক কাজ করা চলে না। তাই চঞ্চলকে চাকরি দেয়া হলো আমাদেরই 'কৃষক' অফিসে অন্যতম নৈশ সহ-সম্পাদকরূপে। নাম হলো তার কানু রায়। প্রতিদিনই রাত দশটায় কানু রায় অফিসে আসতেন এবং অফিসে বসে দু'-চার লাইন লিখবার পরই একে-একে এসে হাজির হতেন বাংলা ও বাংলার বাইরের কর্ম্মীরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। প্রায় সারা রাত বসে চলতো পরিকল্পনা— সৈন্যবাহী কোন্ ট্রেণখানা উলটে দেবে ফিসপ্লেট সরিয়ে, কোন্ সাহেবী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের টাকার ভ্যানখানা আটক করবে, কোন্ ঘুষখোর সামরিক অফিসারের কাছ থেকে ক্রয় করবে গোটাকতক রিভলভার ও ষ্টেন গান, কোন্ প্রেসে ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ হাণ্ডবিল ছেড়ে দেবে ডালহৌসী স্কোয়ারে···

মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের উগ্র জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের অগ্রদূত বলা যায়। এই সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে আমাদের পত্রিকার সম্পাদক, আমার ব্যক্তিগত বন্ধু সিরাজউদ্দীনের মারফৎ। অদ্ভুত মনোবল-সম্পন্ন অথচ অত্যন্ত স্বল্পভাষী এই বৃদ্ধ। এঁরা এমনি ধরণের লোক, যাঁরা সভায় বা কোনো প্রকাণ্ড অনুষ্ঠানের ব্যাক বেঞ্চে বসে চুপি-চুপি বসে থাকেন ভালো মানুষটির মতো। হঠাৎ চোখে পড়লে অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন অতি সাধারণ বা তার চাইতেও নিম্নস্তরের অনুল্লেখযোগ্য কাউকে মনে করে। তার পর হঠাৎ চিনতে পারলেও বক্তৃতা-মঞ্চে এসে এঁরা নিজের পরিচয় দিতে সীমাহীন সংকোচ বোধ করেন, প্রস্তাব উত্থাপন বা সমর্থনের ঝামেলা এড়িয়ে এঁরা শুধু প্রয়োজনের সময় হস্ত উত্তোলনেই কাজ শেষ করে ফেলতে চান। এঁরা চলেন রাজপথ এড়িয়ে অলি-গলি দিয়ে, সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে। পরিচিতির গাল-ভরা বুলি উচ্চারণ করে এঁরা নিজেদের ঢাক পেটান না, এঁদেরই কাছে আসে এবং কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসংখ্য অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসুর দল, যেমন করে অপেক্ষায় থাকে ভক্তের দল মন্দিরের দরজায় ভক্তি-ভরা মন নিয়ে।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শুভ্র শ্মশ্রু ও কেশ এই বৃদ্ধ মুসলমানকে প্রায়ই আমার মনে হয়েছে প্রাচীন কালের ঋষির মতো। অনেক বার গেছি তাঁর বাসায়, মৌলালীর মোড়ের প্রকাণ্ড বাড়ীখানার দোতলায়, অনেক দিন অনেক কথাই আলোচনা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। নেতাজীর প্রসঙ্গ এসে পড়লেই দেখেছি তাঁর ফরসা মুখখানা উত্তেজনায় একেবারে লাল হয়ে উঠতো। তার পর যা বলতেন, তা সমাধিস্থ ব্যক্তির আপন মনে উচ্চারিত অন্তর্বাণীর মতো। বলতেন: নেতাজীকে ঠাঁই দিতে না পারার লজ্জা আমাদের রাখবার স্থান নেই। কংগ্রেসী কূটনৈতিক চালে এই নেতাকে কোণ-ঠাসা করে রাখবার ষড়যন্ত্র যখন প্রকাশ পেল, কেন দেশবাসী তখন হাতিয়ার হাতে রুখে দাঁড়ালো না বলতে পারেন?···কিন্তু যৌবনজলতরঙ্গ রুখিবে কে? তাই গেছেন তিনি জার্ম্মাণীতে। এই বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারত থেকে বৃটিশকে চিরদিনের মত বিতাড়িত করে দেবার পরিকল্পনা তাঁর দেশ যখন গ্রহণ করলো না, তখন গেলেন তিনি বিদেশে সেই পরিকল্পনা কার্য্যে রূপান্তরিত করবার মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে।···বিশ্বাস করুন দ্বিজেন বাবু, বিজয়ীর বেশে একদিন ফিরে আসবেন আমাদের নেতাজী,

আমি হয়তো সেদিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবো না। কিন্তু আজ তাঁকে রুখবার জন্য দেশের মধ্যে যাঁরা গলাবাজি সুরু করেছেন, শত্রুপক্ষের হাতে হাত মিলিয়ে যাঁরা ধর্ম্মযুদ্ধের বুলি আওড়াচ্ছেন, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছি, একদিন এঁরাই এগিয়ে যাবেন সর্ব্বাগ্রে সেই বিজয়ী নেতাজীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। সেদিন বেশী দূরে নয়।···

ইসলামাবাদীর এই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সফল হয়েছিল বা হয়নি, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

এই ইসলামাবাদীর সঙ্গে কানু রায়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম। কানু রায় অত্যন্ত বুদ্ধিশালী ও কৌশলী। অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ের বয়সের বিরাট ব্যবধান ভেঙে দিয়ে ইসলামাবাদীর সঙ্গে চঞ্চলের স্থাপিত হলো এমনি নিবিড় বন্ধুত্ব যে, প্রায়ই গভীর রাত্রে চঞ্চল কানু রায়ের নৈশ চাকরি শেষ করে গভীর রাত্রে গিয়ে হাজির হতো ইসলামাবাদীর দোতলার কক্ষে। চলতো সেখানে মারাত্মক সলা-পরামর্শ।

অকস্মাৎ একদিন গ্রেপ্তার হয়ে গেল চঞ্চল। 'কৃষক' অফিসের সঙ্গে তার যোগাযোগ কী করে পুলিশ জেনে গেছে। তাই রমেশ বোসকেও ডেকে নিয়ে গেল তারা ইলিসিয়াম রো-তে। রমেশ বোস আমাদের ব্যাঙ্কে টেলিফোন করে আমায় জানিয়ে দিল যে, কানু রায় গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। বস্তুতঃ, চঞ্চলের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যাপারটা এতই গুপ্ত ছিল যে, রমেশও তা টের পায়নি। চঞ্চল গ্রেপ্তার হবার পর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সমস্ত কাজের ভার গিয়ে পড়ে মুষ্টিমেয় যে ক'জনের ওপর, সুবোধ চক্রবর্ত্তী তাদের অন্যতম। সুবোধ তখন পলাতক এবং পলাতক অবস্থাতেই সে বাংলা, বিহার ও আসামের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে, প্রত্যেক গুপ্ত কেন্দ্রে গিয়ে সেখানকার কাজ-কর্ম্মের তদারক করছে, সংগঠনের কাজও চালিয়ে যাচ্ছে অক্লান্ত ভাবে।

কিছু দিন পর নেতাজীর দুর্দ্ধর্ষ আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে বসে, রেঙ্গুণের ওপর ভারতের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে তারা 'দিল্লী চলো' ধ্বনি তুলে এগিয়ে আসে ভারতের দিকে ইম্ফলের পথে। রেঙ্গুণে আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্তচর শিক্ষালয়ের পরিচালক-প্রধান নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ট্রেনিংএ যাঁরা এই বিপজ্জনক কার্য্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন, তাঁদের জনকতককে ভিন্ন ভিন্ন দলে নেতাজী সাবমেরিন যোগে গুপ্তভাবে পাঠান ভারতবর্ষে। বেয়াল্লিশের আন্দোলন তখন পুরো মাত্রায় চলছে। গণজাগরণ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত, বিমথিত করে তুলেছে এমনি ভাবে যে, সমগ্র ভারতে তখন চলছে কার্য্যত: সামরিক শাসন, সমগ্র ভারতই তখন এক প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেছে! নেতাজীর প্রেরিত গুপ্ত পত্র এসে পৌঁছায় বক্সা বন্দীনিবাসের রাজবন্দী মেজর সত্য গুপ্তের কাছে। বক্সা থেকে সেই সংবাদ হিজলী ও বাংলার অন্যান্য জেলে প্রেরিত হয়: নেতাজীর নির্দ্দেশ—আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফলের পথে আসামে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিকামী বন্দী বিপ্লবীরা সদলবলে কারাগার ভেঙে বেরিয়ে পড়বে ও সমগ্র বাংলায় গণসংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। বাংলা যদি একবার অধিকার করে নেয়া যায়, তাহলে দিল্লী পৌঁছোবার পথে বৃটিশ সেনা আর কতখানি বাধা পারবে সৃষ্টি করতে?

এই সময় মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর সঙ্গে সুবোধের পরিচয় ঘটে। সুবোধের সঙ্গে আলাপে বৃদ্ধ এতটা মুগ্ধ হন যে, শেষ বয়সে তিনি একটা চরম ঝুঁকি নিতে স্বীকৃত হন। সুবোধকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে যান তাঁর দেশ চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে, ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরাকানের পথে নেতাজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনই ইসলামাবাদী ও সুবোধের লক্ষ্য। কিন্তু সীমান্তে সতর্ক প্রহরা; আরও, আরাকান আজাদ হিন্দ ফৌজের দখলে যাবার পর এখানকার সতর্কতা যেন একেবারে সীমাহীন! কী করা যেতে পারে—বৃদ্ধ খানিকটে চিন্তা করলেন, তার পর স্বাভাবিক ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বললেন: সুবোধ বাবু, আমার জীবনের মাত্র কয়েক দিন বাকী। তাই চরম ঝুঁকি নেবার অসুবিধে আমার আদৌ নেই। আপনি এখন যুবক, প্রশস্ত জীবনের পথ আপনার সম্মুখে, অনেক আশা ও সম্ভাবনা আছে। বরং আপনি পেছিয়ে যান পরদার আড়ালে, আমিই প্রত্যক্ষ ভাবে এগিয়ে যাই। যদি কিছু হয়—

বাধা দিয়ে সুবোধ বললো: যদি কিছু হয়, তাহলে আমার ওপর দিয়েই হোক তা। যদি কিছু হয়—সে চিন্তা তো কোনো দিন আমরা করিনি মৌলবী সাহেব! অভ্যস্ত নই। আজও করতে চাই না। বিশেষ করে নেতাজী—আমাদের নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কাজে মৃত্যুকে আমরা গ্রাহ্যই করি না। নিজের জন্যে চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব আর যে-ই নিক, আমরা কোন দিন নিয়েছি বলে কেউ আমাদের বদনাম দিতে পারে না। বিনয়, বাদল, দীনেশ, কানাই, প্রদ্যোৎ এঁরা আমাদেরই শিক্ষাগুরু ছিলেন মৌলবী সাহেব!

ইসলামাবাদী দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন সুবোধকে।

কিছু দিন পর দেখা গেল, ভারত-আরাকান সীমান্তে সৈন্যদের ও গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য গোটাকতক সস্তা রেস্তোরাঁ স্থাপিত হয়েছে গোটা কয়েক শানকী, কাচের গ্লাস ও একখানা লম্বা টেবিল ও একখানা বেঞ্চ নিয়ে, আর সেই রেস্তোরাঁয় বয় হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নীরেন রায় ও অজিত রায়। আরও দেখা গেল, পার্ব্বত্য পথে গামছা ও লুঙ্গি ফেরি করে বিক্রয় করে বেড়াচ্ছে জন কতক দরিদ্র মুসলমান—উপেন সরকার, জগদীশ ভৌমিক প্রভৃতি। ভারতীয় সেনারা এই সব রেস্তোরাঁয় বেশ আড্ডা জমিয়ে ফেললো এবং সস্তা গোমাংস ও চাপাটি খেয়ে তারা মনের আনন্দে সীমান্ত পাহারা দিতে লাগলো। আনন্দের আতিশয্যও যে ঘটলো না কখনও, তা নয়। অসতর্ক মুহূর্ত্তে সেই আনন্দ যে গোমাংস, চা ও চাপাটির সহযোগে একেবারে বীভৎস হয়ে উঠতে পারে, সে ধারণা পুরো মাত্রায় ছিল ঐ রেস্তোরাঁর বয়দের—সেনাদের নয়। তাই বীভৎস আনন্দের প্রাবল্যে সৈন্তেরা যখন হুল্লোড় সুরু করে কোনো মিঠে ঠুংরীর একটি কলি সবাই মিলে একই সঙ্গে ভাঁজতে শুরু করেছে, ঠিক তখন চৌকার পাশের ঝোপে ছোট্ট একটি শব্দ শোনা গেল। বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ-বয় নীরেন রায়। একটু পরই ফিরে এসে জানালো, ইসলামাবাদীর জামাই সাহেব এসেছেন। অজিত তখন সিপাইদের গরুর মাংস পরিবেশনে ব্যস্ত ছিল। তার হাত থেকে কাজ নিয়ে ব্যস্ততার মাত্রা সীমাহীন ভাবে বাড়িয়ে দিয়ে নীরেন চোখের ইসারায় অজিতকে রওনা হতে বললো।

বাইরে ঝোপের আড়ালে জামাই সাহেব অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন, এই সুযোগ। এই সময়টাই ওরা খানাপিনায় এত মত্ত থাকে যে, হাতী গলে গেলেও টের পায় না তা। বোধ হয় পেতে ইচ্ছেও করে না। দুজনে পাহাড়ের সর্পিল ঘুর-পথে বহু চড়াই ও উৎরাই পেরিয়ে, পাথর থেকে পাথরে উল্লম্ফনে ধেয়ে-চলা পার্ব্বত্য ঝরণা অতিক্রম করে এসে হাজির হলেন একেবারে চট্টগ্রাম সীমানার শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে বিদায় নিলেন জামাই সাহেব। তার পর একাই রওনা হলো অজিত রায় সেই বিপদসঙ্কুল পথে,··· অচিন পথে,···তার পর কী করে সে আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাইদের সাক্ষাৎ লাভ করে এবং অবশেষে একেবারে নেতাজীর কাছে গিয়ে পৌঁছে বাংলার সঙ্গে আরাকানের পার্ব্বত্য পথে গুপ্ত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে, সে প্রসঙ্গ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

শুধু এইটুকুই আমি বলতে চাই এবং জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, সে যুগে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের যে সব সদস্য নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে এবং শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয়, সেই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্ব্ব দায়িত্ব তখন যাদের স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল, সুবোধ চক্রবর্ত্তী তাদের এক জন।

৩৩

পূর্ব্বেই বলেছি, অভিনয়ে আমার দক্ষতা ছিল সর্ব্বজনস্বীকৃত। স্বগৃহে অন্তরীণে এসে সেই দক্ষতা পুরোপুরি কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুরু হলো সীতা ও ষোড়শী নাটকের মহলা। সুবোধকে দেয়া হলো উর্ম্মিলা ও ষোড়শীর ভূমিকা। এক দিকে যেমন পাড়ার ও গ্রামের ছেলেদের মধ্যে তীব্র উৎসাহের সঞ্চার হলো, তেমনি আমদানী করা হতে লাগলো নিকটবর্ত্তী গ্রামের ছেলেদের—কাউকে শিল্পিরূপে, কাউকে সংগঠকরূপে, আবার কাউকে কর্ম্মকর্ত্তার সাহায্যকারী হিসেবে। উদ্দেশ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগঠন। আমাদের বাড়ীর পুব দিকে আমাদেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের বাড়ী ছিল এক-কালে। তার পর তাঁরা কুমিল্লার দিকে কোথায় স্থায়িভাবে বসবাস করছেন। টিনের ঘরগুলো প্রায় সবই বিক্রী করে দেবার পর প্রাঙ্গণটি বেশ প্রশস্ত হয়ে উঠলো এবং সেখানে এক প্রান্তে আমাদের রঙ্গমঞ্চ খাড়া করা হলো।

নাটকের রাত্রে আর এক বিভ্রাট! দুর্ম্মুখ ও ফকির সাহেবের ভূমিকায় রসিক কবিরাজ এত কাল মহলা দিয়ে অকস্মাৎ নাটকের দিনে সে অনুপস্থিত। তার ভাই অবশ্য সংবাদ দিয়ে গেল যে, তার দাদা নাকি একটা জরুরী মামলার ব্যাপারে অকস্মাৎ গেছেন মুন্সীগঞ্জে, রাত সাতটার মধ্যে অবশ্য এসে পৌঁছোবেন বলে গেছেন।

আর সাতটা, দশটা বাজতে চললো, অথচ রসিক কবিরাজের দেখা নেই। বর্ষাকাল হলে কী হবে, ওদিকে নৌকাযোগে দর্শক এসে জমায়েৎ হয়েছেন প্রায় হাজার খানেক। মিনিট গুণে বিজ্ঞাপিত সময়ে অভিনয় আরম্ভ করবার রেওয়াজ শহর থেকে গ্রামে গিয়ে তখনো পৌঁছোয়নি তাই রক্ষে। নইলে ড্রপসিনের আর অস্তিত্ব থাকতো কি না সন্দেহ। ডে-লাইটগুলোও নিশ্চিহ্ন হতো! গ্রামদেশে সে যুগে সন্ধ্যায় সুরু হবে জানলে সবাই নৈশ আহার শেষ করে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে অবশেষে হেলতে-দুলতে এসে হাজির হয়ে থাকেন অভিনয় দেখতে। ওতে দোষ নেই, এমন কি, তেমন তীব্র আপত্তিও জানান না দর্শকেরা। কিন্তু রাত দশটা পর্য্যন্ত যাঁরা ঠায় বসে আছেন, পর-পর খানকতক ঐক্যতান বাদন শুনিয়েও আর তাঁদের নীরবে আরও একটু ধৈর্য্য ধরবার অনুরোধ জানাবার মুখ নেই। তাই অবশেষে স্থির করা হলো যে, আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কথা দর্শকদের পূর্ব্বাহ্নেই সরল ভাবে নিবেদন করে নোব। বলে নোব যে, আজকের সীতা নাটকের দুর্ম্মুখের ভূমিকায় একজন একেবারে আনকোরা নয়া শিল্পীকে নামাচ্ছি জোর করে। তিনি এই ভূমিকায় জীবনে অভিনয় করেননি, মহলাও দেননি। অতএব, তাঁর অভিনয়—অভিনয় বলে যেন গণ্য করা না হয়।

স্পষ্ট মনে পড়ে, আমি, ফুলবৌদি আর তাঁর দূর-সম্পর্কীয় একটি বোন সে সময় আমাদের দালানের মধ্যিখানকার কোঠায় খাটে শুয়ে-শুয়ে এই নাটকীয় বিভ্রাট ও অন্যান্য এলোমেলো হাসি-ঠাট্টা করছিলাম। আমি মাঝখানে, আমার এক পাশে ফুলবৌদি ও অপর পাশে সেই মেয়েটি—নাম রেবা। রেবার সঙ্গে আমার কেন, ফুলবৌদিরও কোনো নিকট-আত্মীয়তা নেই। না থাকলেও সে প্রায় বারই ফুলবৌদির সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতো এবং বাড়ীর মেয়ের মতো প্রায়ই একাদিক্রমে দু'-চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত থেকে যেত। তাই আমাদের পরিবেশে তার সংকোচ দূর হয়ে গেছে। রেবার বয়স ষোলোর কাছাকাছি হবে। খুব ফর্সা রং, চোখা-চোখা গড়ন, আর কথাগুলো ভারী মিষ্টি! ভালো যে লাগতো তাকে, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রসিক কবিরাজের যখন টিকিটিরও আর দেখা নেই, আর দর্শকদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা যখন প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে, তখন চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেই ষ্টেজের দিকে যাবো, তখন ফুলবৌদি বাধা দিলেন: দাঁড়াও, না খেয়ে যেতে হবে না। নাটক সুরুই হলো না, শেষ হতে কত রাত হবে কে জানে! মাছের ঝোল দিয়ে খেয়ে যাও দুটি। পরে আর হবে না জানি।

সত্যিই দুটি খাবো।—বললাম ফুলবৌদিকে। আর দুটিই খেতাম আমি নাটকের রাত্রে। পেট ভরে খেলে আমি অভিনয় করতে পারতাম না। কেমন আই-ঢাই করতো আর শ্রান্তিতে চোখ বুজে আসতো। স্মারকের একটি কথাও কানে আসতো না। উইংসের পাশে বসে রেবা তখন মুচকি-মুচকি হাসতো আর মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে তার কাছে এলেই বলতো: খোকাবাবুর ঘুম পেলো নাকি? বিছানা পেতে দোব ষ্টেজে? আমি অবশ্য তাকে মুখ ভেংচে গ্রীণরুমের দিকে সরে যেতাম। তবুও শ্রান্তি যেন আর কাটতে চাইতো না। বিছানার কথা সত্যিই মনে পড়তো।

ফুলবৌদি রান্নাঘরের দিকে গেলেন খাবার দিতে। আমিও তাঁর যাবার একটু পরই উঠতে যাবো, এমন সময় অকস্মাৎ রেবা দু'হাতে আমায় বেষ্টন করে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলো: আমি তোমায় চাই, দ্বিজুদা!

চমকে উঠলাম। আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না এমনি অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য!···অডিটোরিয়ামে অমার্জ্জনীয় বিলম্বের জন্য মৃদু গুঞ্জন তখন সুরু হয়ে গেছে। জানাজানি হয়ে গেছে যে, একজন অভিনেতা নাকি তখনো এসে পৌঁছোয়নি। সেই জন্যই রং-চং মেখে পোষাক-পরিচ্ছদ পরে এদিকে-ওদিকে নির্লিপ্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করছেন লক্ষ্মণ, বাল্মীকি, সীতা ও অষ্টাবক্র। স্বয়ং রামরূপী আমি বাড়ীতে ফুলবৌদি

ও রেবার সঙ্গে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ নিচ্ছিলাম রসিক কবিরাজের, লোক পাঠাচ্ছিলাম বার বার তার বাড়ীতে।

এমনি চিন্তাভারাক্রান্ত মন নিয়ে যখন বিপদের বার্ত্তা, তা সে যতই অপ্রিয় ও বিস্বাদ ঠেকুক না কেন দর্শকদের কাছে, সকলের সমক্ষে যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করে দেবার সংকল্প করেছি দুম্মুখেরই মতো, ঠিক সেই অসময়ে অকস্মাৎ এ কী বিভ্রাট!··· রেবা শুধু আমার দিকে ফিরে শোয়নি, সে আমায় একখানা হাত দিয়ে রীতিমত জড়িয়ে ধরেছে। ষোলো বছরের সুডৌল হাতখানি মাধবীলতার মতো পোষাক-আঁটা আমার বুকের ওপর দিয়ে ক্রস্ করে এপাশে এসেছে। আমার কাঁধে রামের কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যে সুন্দর মুখখানি তার গুঁজে দিয়েছে, যেমন করে ভীরু পায়রা ঠোঁট গুঁজে দেয় নিজের পালকের মধ্যে। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ষোলোটি বসন্তের ইন্দ্রজাল স্পর্শে বসরাই গোলাপের মতো ফুটে-ওঠা তার নরম শরীর আমার পাশে এসে শুধু ঠেকেছে নয়, ভাবাতিশয্যে চেপে গেছে।

ভাবলাম, হয়তো রেবা ঠাট্টা করছে, যেমনি ঠাট্টা ও হরদম করে থাকে আমার সঙ্গে বৌদির বোন হয়ে। তাই এক মুহূর্ত্ত ফিরে চাইলাম তার মুখের দিকে, তার চোখের দিকে। কিন্তু আজো মনে পড়ে এবং স্পষ্ট মনে পড়ে, সেদিন, ঘরের সেই আবছা আলোয় রেবার মুখে দেখেছিলাম শ্রীরাধিকার মত তনুমনপ্রাণ অকুণ্ঠ ভাবে সমর্পণের নিরুদ্ধ আবেগের অভিব্যক্তি, আমার পানে চেয়ে-থাকা তার পলকহীন চোখে দেখেছিলাম মোনালিসার অতলস্পর্শ প্রেমের সমুদ্র! ভাষাহীন সেই আবেদন সংবেদনশীল মনে সহজেই তরঙ্গ তুলে থাকে। যে গ্রহণ করে সেই ফুলের মালা, বসরাই গোলাপের সেই ফুটন্ত সম্ভার, মনে হয় সেই হয় ধন্য!···

আমি কিন্তু রেবাকে তার ছোট্ট আবেদনের জবাবে অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলাম: আমাকে চাও মানে?

সে জবাব দিল: চাই মানে তোমায় বিয়ে করতে চাই।

বিয়ে?···একটু চিন্তা করলাম। সিনেমার রূপালী পর্দায় চলমান ছবির মতো অনেকগুলো চিত্র পর-পর মনের পরদায় ঝলকে উঠলো। বিয়ে? বিয়ের কথা ভাববার অবসর কোথায় আমাদের? সরকারী বুদ্ধি বিভাগ যে বুদ্ধি ব্যয় করে আমায় পাঠিয়েছে স্বগৃহে অন্তরীণ করে, তা যে তাদের কী মহা অপব্যয় হয়েছে, সেটাই তো প্রমাণ করে দিতে হবে আমাকে। সুকঠিন সেই কাজে অহর্নিশি ব্যস্ত থাকার পর আর কি সময় আছে ভাববার কোথায় ফুল ফুটলো, কার মনে জেগে উঠলো বেলোয়ারী তরঙ্গ, কিউপিডের সোনার তীর কার কোমল বুকে এসে অলক্ষ্যে ঘা দিয়ে বসলো!···

তবু চেষ্টা করে নির্দ্দয় হলাম না এবার। কাঠখোট্টার মতো নীরস ভাষায় স্নেহের প্রত্যাঘাত হেনে বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা না করে সমস্ত বুদ্ধিটুকু নিয়ে এলাম একেবারে হাতের মুঠোয়। বললাম: আমায় বিয়ে করে যে তুমি নিজেই বিপদে পড়বে রেবা! স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য আমার থাকতে পারে. কিন্তু রোজগার করি নে আমি একটি পয়সাও। তার পর কী অনিশ্চিত আমাদের জীবন, তাও তো তুমি জানো, তুমি বোঝ। আজ তোমার পাশে শুয়ে গল্প করছি, থিয়েটার করছি, কালই হয়তো কোথাকার এক ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশ দিল আমায় জড়িয়ে, আর হয়ে গেল আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, এমন কি, ফাঁসীও—

রেবা আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো আমায়। বললো: ওসব অলক্ষুণে কথা বলো'না দ্বিজুদা!

বাধা অগ্রাহ্য করে বলে যেতে লাগলাম: তার চাইতে আমি শুনেছি কোন্ এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা চলছে। শুধু কুলের দিক থেকে তারা একটু খাটো বলেই নাকি তোমার বাবা মত দিচ্ছেন না। আমি বরং তোমার বাবাকে বুঝিয়ে মত করবার ভার নিচ্ছি। কি বল রেবা?

রেবা কোনো জবাব দিল না, বোধ হয় জবাব দিতে পারলো না। শুধু অনুভব করলাম, সে যেন আরও নিবিড় ভাবে চেপে ধরলো আমায়।

এমন সময় রক্ষা করলেন ফুলবৌদি। এসে হাজির: তোমায় খাবার দিয়েছি ঠাকুরপো!

চল রেবা, আমার সঙ্গে খাবে চল। বলে ওকেও তুলে নিলাম সঙ্গে করে। তার পর একসঙ্গে বসে খেলাম। খাওয়া শেষ হবার পূর্ব্বেই সংবাদ এল দুর্ম্মুখ এসে গেছে। রসিক কবিরাজ মুন্সীগঞ্জ থেকে সোজা নৌকো করে চলে এসেছে আমাদের ঘাটে।

আশ্বস্ত হলাম। রেবাকে বললাম: খুকি, চল এবার, রামের কসরৎ দেখাচ্ছি তোমায়।

রেবা মুখ ভ্যাংচালো।

প্রায়ই আমি বেরিয়ে যেতাম বছিরদ্দীর নৌকো করে। সন্ধ্যার পর হলে তো সোজাই ছিল, দিনের বেলাতেও তেমন কঠিন কিছু ছিল না। কারণ বছিরদ্দী নৌকোর দুদিকে ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে ঢেকে নিয়ে আমায় তার বিবিতে রূপান্তরিত করতো এবং এমনি নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে বৈঠা বেয়ে জারী গানের কলি তার ঐ হেঁড়ে গলায় ভাঁজতে-ভাঁজতে চলতো যে, কারুর সাধ্যি ছিল না যে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করে।

কিন্তু সর্ব্বত্রই আর বছিরদ্দীকে নিয়ে যাওয়া চলে না, তা সে যতই বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ হোক! তাই মাঝে-মাঝে নিজেরাই বেরিয়ে পড়তাম নৌকো ভাসিয়ে। খগেন, বিপদভঞ্জন, অনাথ, সুবোধ এরা সব সাজতো মাঝি, আর আমি কখনো পুলিশের পোষাকে, কখনো ফিনফিনে বাবুর পরিচ্ছদে নৌকোয় বসে থাকতাম। সারা রাত নৌকো চলতো। কেয়টখালী থেকে তন্তর হয়ে আবিরপাড়া, রাজদিয়া হয়ে মধ্যপাড়ার মধ্য দিয়ে কোনা দিন চলে গেছি হয়তো একেবারে ফুরসাইল অর্থাৎ তালতলায়। তার পর ফিরে আসবার সময় আরও অনেকগুলো গ্রাম ঘুরে ভোরের আলো পূবের আকাশে ফুটে ওঠবার পূর্ব্বেই এসে পৌছে যেতাম ঘরের ছেলে ঘরে।

আমার সোনাদা বাঙালী পল্টনে যোগদান করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বছর দুই মধ্য-প্রাচ্যে কাটিয়ে যখন ফিরে আসেন, তখন নানা রকম সামরিক পোষাক তাঁর বাক্সভর্ত্তি ছিল। আমি এবার সেগুলোর সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হলাম। ব্রিচেজের ওপর চড়িয়ে দিলাম সামরিক গলাবন্ধ কোট। কাঁধের ওপর গোটা কয়েক ষ্টারও দিলাম এঁটে, মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপী আর পায়ে পটি ও ব্রাউন বুট। খোলা ছিপ জাতীয় সরু নৌকোয় উঠে বসতেই মাঝি

খগেন অনুচ্চ কণ্ঠে অপর মাঝি দু'জনকে "হাফিজ" হুকুম দিল। নৌকো আমাদের ঘাট ছেড়ে, গ্রামের সীমারেখা অতিক্রম করে ছুটে চললো তাজপুরের দিকে।

শ্রাবণ মাস। পুরো বর্ষাকাল। চতুর্দ্দিক জলে জলাকার। ধানগাছগুলি অবশ্য জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঁচু করে জলের ওপরেই গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তথাপি ক্ষেতের আইল ঘুরে না গিয়ে সোজাসুজি ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে নৌকো চালিয়ে দিলে ধানগাছের কোনো ক্ষতি হতে পারে মনে করেই আমাদের নৌকো একটু ঘুর-পথে এগিয়ে চলেছে। সামরিক কোনো বিশিষ্ট অফিসারের মতো মুখের ভাবখানা করে বসে আছি আমি একেবারে মাঝখানে। নাকের নীচে স্পিরিট গাম্ দিয়ে আঁটা সুরু গোঁফটা মাঝে-মাঝে আঙুল দিয়ে অনুভব করে দেখছি ঠিক আছে কি না। দু'-একখানা নৌকো আমাদের বিপরীত দিক থেকে এসে আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে, কিন্তু নির্ভীক ভাবে চলেছি আমরা। মাঝে-মাঝে ঘড়ি দেখছি আমি ক্ষুদ্র টর্চ্চের আলোয়—দশটা বাজতে তখনো বিশ মিনিট বাকী।

তাজপুরের পশ্চিম দিকের গ্রামে প্রবেশ করে কিন্তু আমাদের পথ ভুল হয়ে গেল। খাল মনে করে যে পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম পরম নিশ্চিন্তে, অকস্মাৎ দেখলাম সেটা খাল নয়, আমরা এসে পড়েছি একটি পুকুরের মাঝখানে। এদিক-ওদিক চেষ্টা করে পথ আর ঠাওর করা গেল না এবং মাঝি খগেন এক সময় হতাশ ভরে বলে ফেললো: আজ ধরা পড়তেই হবে।

বললাম: দাঁড়াও, জীবনে ধরা পড়িনি। যদি পড়ি, তাহলে রাজনৈতিক কাজের ইতিহাসে এই হবে প্রথম বিচ্যুতি। হ্যাঁ, বিচ্যুতিই বলবো একে। চ্যালেঞ্জ করে ঘোরা-ফেরা যারা করে, তারা চ্যালেঞ্জের অর্থ বোঝে ও তার মর্য্যাদা রাখতে জানে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অন্ধকার এতই গাঢ়'যে, যে ভুল পথে আমরা প্রবেশ করে বসেছি এই পুকুরে, এখন সেই পথটাও আর খুঁজে পাচ্ছি না। পুরো বর্ষায় গাছপালা সব ডুবে গিয়ে শুধু চতুর্দ্দিকে দেখা যাচ্ছে তাদের মাথাগুলো আর নিবিড় অন্ধকারে সেগুলো যেন তুলে ধরেছে অনতিক্রম্য কালো যবনিকা। এমনি বার বার জলমগ্ন গাছের ডালে আমাদের ডিঙ্গি ঘা খেতে লাগলো। বড় পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ্চ একটা আছে বটে, কিন্তু জ্বালানো কি নিরাপদ? এমন কি, ক্ষুদ্র টর্চ্চটাও জ্বালিয়ে আর ঘড়ি দেখতে পারছি না। ওদিকে তাজপুরে মণীন্দ্র হয়তো সব রেডি করে বসে আছে। একটি মিনিট দেরী আমি জীবনে করি নে। কী ভাববে সে!

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, একখানা বাড়ী থেকে জন দুই মহিলা অনেকগুলো বাসন নিয়ে এসে জলের ধারে বসলো। তাদের সঙ্গে স্তিমিত কেরোসিনের ডিবা। এই গাঢ় অন্ধকার ওতে যেন গাঢ়তর হয়ে উঠলো এবং আমাদের পথ যেন হয়ে উঠলো আরও ভয়াবহ! দেখলাম, খগেন, অনাথ ও বিপদভঞ্জন নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে বৈঠা চালাচ্ছে বটে, কিন্তু উৎসাহ যেন শেষ হয়ে এসেছে তাদের। বোধ হয় নিশ্চিত ভাবে জেনে বসে আছে যে, আজ আর উপায় নেই।

আমি কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নাই। বললাম: মাঝি, চল তো ঐ ঘাটের দিকে, মহিলারা যেখানে বাসন ধুচ্ছেন।

স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা কইতে বোধ হয় ওরা চমকে উঠলো এবং আমার প্রস্তাব শুনে বোধ হয় প্রমাদ গুণলো।···নৌকো মহিলাদের প্রায় কাছাকাছি আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম: দেখুন, কিছু মনে করবেন না। বলতে পারেন আপনাদের গাঁয়ের চৌকিদার-বাড়ী কোন্ দিকে?

এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য আমার সহকর্ম্মী মাঝিরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো কি না জানি নে। মহিলাদের মধ্যে একজন বললেন যে, ঐ বাড়ীটাই চৌকিদারের।

এগিয়ে গেলাম আরো ঘাটের দিকে। আমার পোষাকের পিতলের বোতামগুলো ও আমার চোখের চসমা কেরোসিনের ডিবার আলোয় চক্‌চক্ করে উঠলো।

প্রশ্ন করলাম: কোথায় সে?

সভয়ে জবাব এল: সে তো বাবু খাওয়া-দাওয়া করছে। অখনই বাইর হইবো পাহারায়।

ডাকুন তাকে।—আদেশ জারী করে ঘাট থেকে একটু দূরে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। মাঝি খগেন, অনাথ ও বিপদভঞ্জনকে অন্ধকারে ঠিক দেখতে না পেলেও ওদের বিস্ময়ের সীমা যে অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তা মনে-মনে অনুভব করতে পারছিলাম।

একজন মহিলা কাজ অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই ছুটে গেলেন বাড়ীতে, এবং দেখা গেল, একটু পরই এক হাতে লম্বা বল্লম ও অপর হাতে একটি হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ত্রস্তপদে এগিয়ে আসছেন চৌকিদার-পুঙ্গব। এসে পাড় থেকেই বার কয়েক স্যালাম জানিয়ে ছুটে এসে উঠলো তার ডিঙ্গি নৌকোয় এবং নৌকো বেয়ে চলে এল আমাদের নৌকোর গায়ে।

বুঝলাম, সে ভেবেছে তার সেরাজদীঘা থানার দারোগা আমি। তাতে অবশ্য আপত্তি ছিল না আমার, কিন্তু নিজের থানার দারোগাকে সে চেনে নিশ্চয়ই। সুতরাং—

প্রথমেই পরিচয় দিলাম: আমি আসছি ঢাকার পুলিশ সাহেবের দপ্তর থেকে। কী নাম যেন তোর?

আইগা, বরকত আলী।

হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। তোমার নামেই নালিশ আছে অনেকগুলি। তুই পাহারা দিস তো রোজ?

আইগা, হ।

তবে নালিশ যায় কেন? গ্রামের সবাই তোমার দুর্নাম বলতে চাও নাকি? কেন তারা বলে যে তুমি প্রায়ই নাকে তেল দিয়ে দিব্যি ঘুমোও। তোর বউ কয়টা?

গভীর লজ্জায় এঁকে-বেঁকে বরকত আলী জবাব দিল: আইগা, তিনটি।

ছোটটার বয়স কত?

আইগা, বচ্ছর বারো তো হইবোই।

ঝাঁঝিয়ে উঠলাম: বচ্ছর বারো তো হইবোই!—শালা, বদমাস্ কোথাকার! বারো বছরের খুকি সাদী করেছ তুমি বেয়াল্লিশ বছরের বুড়ো? আর সেটাকে নিয়ে সারা রাত পড়ে থাক, শালা, পাহারা দেবে তোমার কোন্ চাচা আর ফুফারা তাই শুনি! এই গ্রামে যে কেউ তোমায় দেখতে পারে না কেন, তা বুঝলাম। কিন্তু চাকরি তো থাকবে না তোর। কিছুতেই থাকতে পারে না।

বরকত আলী পারে তো আমারই নৌকোয় উঠে এসে একেবারে আমার পায়ের ওপরে লুটিয়ে পড়ে, এমনি ভাবখানা দেখিয়ে কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বললো : হুজুর, তাইলে খামু কি ? আষ্টটা পোলা মাইয়া যে, না খাইয়া মরতে লাগবো হুজুর !

ধমক দিলাম : হুজুরের পয়সা খুব সস্তা কি না, তাই শালা তুমি বৌ নিয়ে ফূর্ত্তি করবে সারাটা রাত আর গ্রামে প্রত্যেক রাত্রেই দু'-চারটে করে চুরি হতে থাক্। বল্ শালা, কাজে আর কামাই করবি কিনা !

বরকত আলী নাক-কান মলা খেয়ে আল্লার নামে ও অন্যান্য পীর-পয়গম্বরের নামে জিভ কেটে শপথ করলো হাজারো বার যে, আর একটি রাত্রিও সে কামাই দেবে না, এবারটা তাকে রেহাই দেওয়া হোক্।

বললাম : এবারটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু শালা, বলে রাখছি তোকে, যদি আর একখানা দরখাস্ত যায় আমাদের ওখানে, তাহলে মহিম চক্কোত্তির হাতে তোর মরণ আছে রে শালা ! বুঝলি, হারামজাদা ?

হারামজাদা ও শালা মর্ম্মে-মর্ম্মে যে অনুভব করেছে, তা বোঝা গেল। অকস্মাৎ নরম সুরে আবেদনের ভাষায় বরকত আলী বললো : আইবেন না হুজুর বাড়ীতে, পান তামুক—

বললাম : না, সময় নাই। আবার তাজপুরের চৌকিদার ব্যাটার ওখানে যেতে হবে।—এই ব্যাটা, চল্ তো, তাজপুরের পথটা আমায় দেখিয়ে দিবি।

মহানন্দে বরকত আলী তার ডিঙ্গি ভাসিয়ে এগিয়ে চললো আমাদের অনুসরণ করতে বলে। গ্রামের বাইরে এসে তাজপুরের রাস্তা আমার মাঝিকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার প্রাক্কালে সে আবার বার কয়েক সবিনয় স্যালাম জানিয়ে ও ভবিষ্যতে আর ত্রুটি না হবার প্রতিশ্রুতি ও গ্যারাণ্টি উচ্চারণ করে যখন ল্যাপ ডগের মতো তার গ্রামের দিকে নৌকো ভাসিয়ে দিল, আমার মনের হাসি তখন মুখেও ফুটে উঠেছে।

বরকত আলীর নৌকো দূরে সরে যেতেই খগেন প্রশ্ন করলো : তাহলে মহিম দারোগা সাহেব, কোন্ চৌকিদারের বাড়ী যামু এ্যালা ?

তাজপুর সরকার-বাড়ীর পূব দিকে একটি বিরাট দীঘি, সেই দীঘির উত্তর দিকে অন্যান্য গাছের মধ্যে আছে একটি কাঁটাল গাছ, সেই গাছের নীচের অন্ধকারে মণীন্দ্র আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। দূরে থাকতেই একবার ক্ষুদ্র টর্চ্চটা জালিয়ে বার তিনেক আন্দোলিত করতেই ওখান থেকে তেমনি ক্ষুদ্র টর্চ্চের আন্দোলন দেখা গেল।

কাছে যেতেই সে এগিয়ে এল। প্রশ্ন করলাম : সব রেডি ?

সব রেডি।

কোথায় বসছি আমরা ?

ঐ মন্দিরের মধ্যে !

মন্দিরের মধ্যে ! ঠাকুর-বিগ্রহ কিছু নেই ওর মধ্যে ?

না।

নৌকো থেকে নিঃশব্দে নেমে মণীন্দ্রকে অনুসরণ করলাম। মাঝিরা সবাই নৌকোতেই অপেক্ষা করতে লাগলো। পুকুরের পূব দিকে মন্দির। মন্দিরের কাছাকাছি এসে মণীন্দ্র বললো : আপনি গিয়ে বসুন। ভেতরে মাদুর পাতা আছে। আমি লীলাকে নিয়ে আসছি।

একটু পরই দরজা নিঃশব্দে খুলে লীলা প্রবেশ করলো। মণীন্দ্র গলা বাড়িয়ে বলে গেলো : আমাদের দাদা আর আমার বোন লীলা।—বাইরেই অপেক্ষা করছি আমি। তিন বার টোকা দিলেই দরজা খুলবো।—নিশ্চিন্তে কথা বলুন আপনারা, পাড়ার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই মন্দিরের মধ্যে রইলাম শুধু লীলা আর আমি আর জমাট অন্ধকার ! অনুভব করে লীলাকে পাশে টেনে নিলাম।

তার পর সুরু হলো আমাদের আলাপ। ছক-কাটা পথেই এগিয়ে যেতে লাগলাম, সামান্য ও লঘু আলোচনার মধ্য দিয়েই এসে পড়লাম গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গে : স্বাধীনতার সংগ্রামে সীতারামের মতো ছেলেরা যেমন যোগদান করবে, তেমনি শ্রীর মতো তাদের সাহায্য করবে দেশের মেয়েরা। সীতারামের কামানের গোলা মাথায় করে এনে দিয়েছিল শ্রী। ঠিক তেমনি তোমাদেরও অনেক কাজ করবার আছে লীলা ! জননী হয়ে সন্তান পালন করবে, সুসন্তান তৈরী করবে, এমনি প্রসপেক্টের জৌলুসে আমাদের আস্থা কম, কারণ আমরা গ্রহণ করেছি ভাঙনের ব্রত। গতি চাই, চাই বেহিসাবী পরিকল্পনা ও তা কার্য্যে রূপান্তরিত করবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। তাই জননী হয়ে সুসন্তান তৈরী করবার জন্য অপেক্ষা না করে আমরা চাই বোন হয়ে এগিয়ে এস তুমি—ভাইয়ের পাশে-পাশে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, জীবনের সর্ব্ব সম্ভাবনা ও রঙীন ভবিষ্যৎ পশ্চাতে ফেলে রেখে। পারবে না লীলা ?

লীলা আমার হাতে হাত রেখে বললো : রাঙাদা'র কাছে সবই শুনেছি দাদা ! সব কিছুই বিলিয়ে দেবার সংকল্প নিয়েই তো এসেছি তোমার কাছে।

প্রায় এক ঘণ্টা কথা হলো। এমনি অন্ধকারে লীলার সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গ আলোচনা হলো, অথচ সে দেখতে পেলো না আমার মুখ। দিনের বেলা কোথাও দেখলে চিনতে পারবে না আমায়। বিপ্লবী দলের রিক্রুটমেণ্ট এমনি কঠিন সতর্কতার সঙ্গেই হতো।

সেই অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে প্রণাম করে এক সময় বিদায় নিল লীলা আমায় আবার আসবার অনুরোধ জানিয়ে।

ফিরে এসে নৌকোয় যখন উঠলাম, তখন রাত প্রায় একটা। আকাশ মেঘে একেবারে সমাচ্ছন্ন। একেই নিবিড় অন্ধকার, সেই অন্ধকারে জমাট মেঘগুলো যেন বিরাটকায় দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বাতাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। থম্‌থমে ভাব, আক্রমণের পূর্ব্বক্ষণের মতো। বৃষ্টি হবেই।

কিন্তু তাই বলে একটি মিনিটও বিলম্ব করা চলে না। আকাশের অবস্থা দেখে তার পর যাত্রা করবার মতো সহজ কাজে তো আমরা বেরোইনি। কিংবা যাত্রা স্থগিতের কথাও ওঠে না। যে কাজে বেরিয়েছি, কালবৈশাখীর ঘনঘটা তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারলেও সে বাধাকে আমরা গ্রাহ্য করি না। শুধু তাই নয়। সর্ব্বত্র ঠিক সময় মত পৌঁছে ঠিক কাজটি শেষ করে এগিয়ে চলবো আমরা আমাদের লক্ষ্য-পথে। বাধা এলে ধরবো তাকে চেপে দু'হাতে,

করবো তার সঙ্গে লড়াই। তার পর হয় বিজয়মাল্য পড়বে আমাদের গলায়, নয় মৃত্যুর তুহিনশীতল বক্ষে এলিয়ে পড়বো সাহসীর মতো।······

চড়-চড় করে বৃষ্টিও সুরু হলো। মণীন্দ্র চেনে আমাকে, তাই অপেক্ষা করবার নিষ্ফল অনুরোধ আর উচ্চারণ করতে সাহস করলো না। মাঝি খগেনকে শুধু একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, আড়াইটেতে আর-একটা এনগেজমেণ্ট আছে। বৈঠা তুলে নিয়ে সে প্রস্তুত হয়ে বললো: Let us start······

আমাদের ডিঙ্গি নৌকো তাজপুরের ঘাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। গ্রামের আঁকাবাঁকা খাল পেরিয়ে বাইরে মাঠে এসে পড়তেই মুসলধারে বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে হু-হু করে পাগলা হাওয়া। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বেশ বড় আর তীরের মতো এসে বিঁধতে লাগলো গায়ে।

মাঝিদের খালি গা, কষ্ট হতে লাগলো তাদেরই বেশী। ডিঙ্গি নৌকোয় ছই থাকে না, তাই ঠায় ভেজা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। মাঝখানে পাটাতনের ওপর বসে রইলাম আমি আর ওরা প্রাণপণে বেয়ে চললো। আকাশ ভেঙে তখন বর্ষা নেমেছে। মাঝে মাঝে আকাশ চিরে-চিরে বিদ্যুতের সর্পিল চমক্। এলোপাথাড়ি বইছে বাতাস! এক হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। দেখবার জন্ত চোখ খোলা যায় না, এমনি বৃষ্টি ও বাতাসের তোড়! নৌকোয় জল জমে যাচ্ছে মুহুর্মুহু আর আমি অর্থাৎ মহিম দারোগা বার বার সেঁওতি দিয়ে সেই জল ছেঁচে ফেলছি। সামরিক পোষাক ভিজে গেছে, ঘড়ি ভিজে গেছে, আমার কৃত্রিম গোঁফ কোথায় ভেসে গেছে কে জানে, একেবারে খোলা মাঠের মাঝখানে বৃষ্টি ও বাতাসের তোড়ে আমাদের ডিঙ্গি টলমল করে উঠছে!

তথাপি, তথাপি, তথাপি বেয়ে চলেছি আমরা অবিশ্রাম ভাবে। পৌছুঁতে হবে কেষ্টখালী গ্রামে ঠিক আড়াইটের মধ্যে। সেখানে অপেক্ষায় বসে থাকবে সুবোধ—সুবোধ চক্রবর্তী।

একটি মিনিট নষ্ট করবার উপায় নেই।

[ক্রমশঃ।

পেশা হিসাবে সাংবাদিকতা

শিক্ষিত মানুষের পেশা হিসাবে সাংবাদিকতা অধুনা আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আগেকার দিনে সাংবাদিকতা ছিল অনেকের সখ। কেন না, এই সাংবাদিক-বৃত্তি যে কত সুখ, কত জ্ঞান ও কত শিক্ষাদায়ক কে জানবে, যে কখনও সংবাদ-কার্য্যালয়ে প্রবেশ ক'রলো না? প্রতি শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশেই অসংখ্য বিখ্যাত ব্যক্তি পেশা হিসাবে সাংবাদিকতাকে উৎকৃষ্টতম ব'লে গেছেন। ডব্লিউ. জি. মিচেল্ (যিনি ন্যাশানাল ইউনিয়ন অব জার্ণালিষ্টদের সভাপতি ছিলেন) ব'লেছিলেন যে, "There are no doubt other professions where mental activity is more sustained and intense, but for endless variety and contact with the everyday affairs of life modern journalism has a charm one finds it extremely difficult to define." মিচেলের বক্তব্যের মূল হচ্ছে যে, পেশা হিসাবে সাংবাদিকতায় যত বৈচিত্র্য আছে এবং এই কাজে দৈনন্দিন ব্যাপারের সঙ্গে যত যোগাযোগ রক্ষা করা যায় এবং এই বৃত্তি মানসিক বৃত্তির পক্ষে যতটা উন্নতির সহায়ক তত আর অন্য কোন পেশা বা বৃত্তিতে নেই। আমেরিকার বিখ্যাত সাংবাদিক জে, হলকম্ব, নেক্সের মৃত্যু হ'লে তাঁর পিতলের প্রতিমূর্ত্তিতে এই কথা ক'টি খোদিত হয়, যথা—সাংবাদিকতা অর্থে বোঝায় যে, "Truth, fairness, generosity, devotion to duty, unselfish public service." অর্থাৎ "সত্যতা, স্পষ্টতা, দাক্ষিণ্য, কর্ত্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং স্বার্থহীন গণসেবা।" বিখ্যাত 'Daily Express' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক র‍্যালফ ডি. ব্লুমেনফেল্ড বলেছেন যে, "the finest and most interesting of all professions." অর্থাৎ "সকল পেশার মধ্যে সুন্দরতম এবং অধিকতম কৌতূহলপূর্ণ।" অন্যান্য দেশে যখন প্রায় দেড়শো বছরেরও অধিক দিন পূর্ব্বে সাংবাদিকতা শিক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র কয়েক বছর পূর্ব্বে সাংবাদিকতা শিক্ষা দেওয়ার বিভাগ প্রবর্ত্তিত হয়েছে। তবুও সুখের কথা যে, বিভাগটি উন্মুক্ত হওয়ায় দেশবাসী শিক্ষালাভ করতে পাবে। লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় ও কিংস কলেজ এবং বেডফোর্ড কলেজ কত যুগ আগে থেকে সাংবাদিকতা শিক্ষা দিচ্ছে! ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক-বৃত্তির জন্য উপাধি দেয়। লণ্ডন স্কুল অব জার্ণালিজম্ তো আছেই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে মিশৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই পৃথিবীতে প্রথম সাংবাদিক-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ইং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। রাশিয়াতেও এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বাঙলা দেশে সাংবাদিকতা শিক্ষা দেওয়ার রীতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি প্রচলিত হ'লেও বাঙালী জাতি সাংবাদিকতা-ক্ষেত্রে প্রচুর দক্ষতা দেখিয়েছে ইং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে থেকে, যখন জে, সি, মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান নামে সম্পাদক থাকলেও তাঁরই সুষ্ঠ পরিচালনাধীনে তৎকালীন পণ্ডিতগণ 'সমাচার-দর্পণে' লিখতেন। সেই পণ্ডিতগণের মধ্যে ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ৺তারিণীচরণ শিরোমণি, ৺ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বাঙালী সাংবাদিকদের কাছে চিরজীবী হয়ে থাকবে। 'সমাচার-দর্পণ' থেকে এখন পর্য্যন্ত অসংখ্য সংবাদপত্র বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সংবাদপত্রে কড়া ভাষায় লেখার জন্য কত খ্যাতিমান বাঙালী সাংবাদিক শাসকের শাস্তি ভোগ ক'রেছেন! কারাবাস ক'রেছেন! বাঙলা সংবাদপত্র এবং বাঙালী সাংবাদিক এখনও পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় সাংবাদিকতায় অগ্রগামী—যা আমাদের অহঙ্কারের বিষয়। কিন্তু পেশা হিসাবে সাংবাদিকতা উৎকৃষ্টতম হ'লেও বাঙালী সাংবাদিকদের আর্থিক আয় খুবই কম। সাংবাদপত্র সমূহের মালিকগণ দৃষ্টি না দিলে বাঙলা সাংবাদিকতায় পূর্ব্ব ঐতিহ্য বজায় থাকবে না।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নানা সাহেবের হুমকীর সঙ্গে কানপুর সেনা-নিবাসের সমস্ত ভারতীয় সিপাহী দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ ও পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থের নামে জয়ধ্বনি তুলে প্যারেডের মাঠে সমবেত হলো। কানপুরের ইংরেজরা বুঝলেন, নানা সাহেব সময় বুঝে মুখ থেকে ভদ্রতার মুখোস খুলে ফেলেছেন, তিনি এখন কোম্পানী সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে উদ্যত। এই লোককেই তাঁরা অতি উদার আত্মভোলা সাদাসিধে নিরীহ ও নির্বোধ মানুষ সাব্যস্ত করেছিলেন—আগেকার নানার সঙ্গে এখনকার নানার প্রকৃতির এ কি পার্থক্য!

স্যার হিউ হুইলার বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি সহরের সমস্ত ইংরেজ নরনারী ও সেনানিবাসের ইউরোপীয় সেনাদের নিয়ে সুদৃঢ় ইংলিশ ব্যারাকে আশ্রয় নিলেন। মালখানার সঙ্গে সমস্ত সহর নানা সাহেবের করায়ত্ত হলো। ইংলিশ ব্যারাক পরিবেষ্টন করে সিপাহীরা আক্রমণ আরম্ভ করল—নানা সাহেব অতি কষ্টে তাদের নিরস্ত করলেন।

এই সময় শুধু সিপাহী নয়—সমগ্র দেশবাসীর উদ্দেশে এই মর্মে লক্ষ-লক্ষ ঘোষণাপত্র প্রকাশ্যে প্রচারিত হতে লাগল :

> হে হিন্দুস্থানের সন্তানগণ! এসো—আমরা মিলিত হয়ে আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমিকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করি। হে ভারতের হিন্দু-মুসলমান! তোমরা আর ঘুমিয়ে থেক না; চোখ মেলে চেয়ে দেখ, জন্মভূমি হিন্দুস্থান মুক্ত করবার জন্য দিকে-দিকে কি ভাবে স্বাধীনতা-যুদ্ধের বহ্নি জ্বলে উঠেছে! এই যুদ্ধে উঁচু-নীচুর তারতম্য নেই, কেউ এখানে সেনাপতি নয়—সবাই আমরা সৈনিক; সমান আমাদের পদবী, সমান আমাদের ইজ্জৎ ও সম্মান—দেশের জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দেয়, তারা সকলেই এক!

ভারতবাসীর এই স্বাধীনতা-সংগ্রামকে ইংরেজ সাধারণ একটা মিউটিনি বা সিপাহী বিদ্রোহ বলেই উল্লেখ করেছেন। যেহেতু, এ যুদ্ধে অতি কষ্টে জয়ী হবার পর ইংরেজই যুদ্ধের ইতিহাস লেখেন। যদি ইংরেজ হারতেন, তাহলে এর ইতিহাসও রূপান্তরিত হোত। সিপাহী বিপ্লবের পর এই বিপ্লব-সংক্রান্ত সঠিক বিবরণ প্রকাশ সম্পর্কে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এতই সতর্ক ও সচেতন ছিলেন যে, প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে প্রকৃত কাহিনী লিখে প্রকাশ করতে কোনও ভারতীয় ঐতিহাসিক বা প্রত্যক্ষদর্শী সাহস পান নাই। তথাপি দুঃসাহসের বশবর্তী হয়ে যাঁরা এই সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনে ইতিহাস লিখেছেন, ইংরেজ লেখকদের লিখিত বর্ণনার অনুসরণ ভিন্ন তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু ইংরেজদের ভারত ত্যাগের পর সিপাহী বিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবার যে সুযোগ আমাদের ঘটেছে, তার ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইংরেজ আমাদের মনে যে ধারণার সৃষ্টি করেছিল, তা ঠিক নয়। কতকগুলি ভারতীয় সিপাহী ভুল বুঝে বিগড়ে গিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল—ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না, ইংরেজ-প্রচারিত এই বৃত্তান্ত এখন অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে। দেশবাসী জেনেছেন, সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংরেজ কর্তৃপক্ষের জবরদস্ত শাসন-জনিত লাঞ্ছনা ও অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই ভারতের নেতৃবর্গ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সুচিন্তিত পরিকল্পনায় সেদিন বিদেশী শাসন থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের সেই প্রচেষ্টাকে বিদ্রোহ না বলে ভারতভূমির মুক্তিকল্পে মুক্তিপাগল সন্তানদের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলেই আমরা গর্ববোধ করব।

এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের পতাকাতলে সেদিন হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন; বিদেশী শাসকের হাত থেকে স্বদেশের শাসনদণ্ড কেড়ে নেবার জন্যে দুই সম্প্রদায়ই সমান ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। হিন্দুর মনে এমন ধারণা হয়নি যে, মুসলমানকে বাদ দিয়ে হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, পক্ষান্তরে হিন্দুকে বঞ্চিত করে মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনাও কোন মুসলমান করেননি। এমন কি হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই দিল্লীর বাদশাহ-বংশধর পেন্সনভোগী বাহাদুর শাহকে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক স্বীকার করেই যুদ্ধে নেমেছিলেন। যদিও নানা সাহেব ছিলেন এই মহাবিপ্লবের প্রবর্তক ও অগ্রনায়ক, তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত ও পরিকল্পনায় এর বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং বৃটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে মোগল-শক্তিকে পর্যুদস্ত করে মারাঠা-শক্তিই সারা ভারতে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিল, তা সত্বেও নানা সাহেব নিজেই বর্ষীয়ান্ বাদশাহ-বংশধর বাহাদুর শাহকে স্বাধীন ভারতের সম্মানিত বাদশাহের মর্যাদা দিয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। তাঁর এই মহানুভবতা অতুলনীয়।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসীর মন্দিরে মহাশক্তির আরাধনা করেন নিয়মানুবর্তিতা ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রিয়তম স্বামীকে হারিয়েও

তিনি যখন ভেঙ্গে না পড়ে স্বামীর নির্দেশ অনুসারে তাঁর রাজ্য ও প্রজাবর্গের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তখন ব্রহ্মচর্য পালনে আচারবতী হয়েও রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে বিধবার পক্ষে করণীয় কেশমুণ্ডন বা বৈধব্য-বেশ ধারণে বিরত ছিলেন; কিন্তু তার জন্য শাস্ত্র নর্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত সাধনে কোন দিনই কুণ্ঠিত হননি। এই প্রায়শ্চিত্তও বড় সাধারণ কথা নয়; এ জন্ত প্রত্যহ তাঁকে স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয়—তার পর তুলসীমঞ্চের কাছে গিয়ে তুলসী গাছে জলদান ও তুলসী পাতায় ইষ্টদেবতার সুনির্দিষ্ট সংখ্যক নাম লিখে জলে বিসর্জন করা তাঁর নিত্য কাজ ও এই প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ। এ ছাড়া পূজা, জপ এবং শাস্ত্রানুশীলন তো আছেই। তাঁর রাজ্যশাসন ব্যবস্থার রীতি-নীতির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

দুর্বার সামরিক শক্তির প্রভাবে অহঙ্কারী ইংরেজের অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে যেদিন দৃপ্ত কণ্ঠে মৌখিক প্রতিবাদ মাত্র জানিয়ে রাণী লক্ষ্মী-বাঈ দুর্গ-প্রাসাদ ত্যাগ করে পুরাতন প্রাসাদে ফিরে এসে মহাশক্তির চরণতলে বিচার-প্রার্থিনী হন, তখন তিনি অষ্টাদশ-বর্ষীয়া তরুণী মাত্র! সেদিন থেকে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সমস্ত সময়ই মন্দিরের নিভৃত কক্ষে দেবীর আরাধনাতেই নিয়োজিত হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতীত হতে থাকে, রাণী লক্ষ্মীর আরাধনার শেষ নেই—নিষ্ঠাবতী পুজারিণীর মত একই ভাবে তিনি দেবীর আরাধনা করেন, মহাশক্তিকে জানান তাঁর অন্তর-বাণী! বীরাঙ্গনা তিনি, রাজ্ঞীরূপে দাম্ভিক ইংরেজের অন্যায় দাবীর উত্তরে তিনি যে বলে-ছিলেন—ঝাঁসী তিনি দেবেন না ইংরেজকে ছেড়ে; অথচ ঝাঁসীর সেই রাজপাট তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছে—তাঁরই স্বামীর রাজ্য বাহুবলে শাসন করছে ইংরেজ কোম্পানী। রাজ্যত্যাগের পর সেই কণ্ঠবাণীই যে অহরহ তাঁর সর্বাঙ্গে লৌহ-শলাকার মত বিদ্ধ হচ্ছে। এত বড় অন্যায়, এমন একটা জঘন্য অনাচার করেও সেই অনাচারীরা অক্ষত দেহে বিরাজ করছে! এ কি তাঁর পক্ষে কম বেদনার কথা—সর্বাঙ্গ যে তাঁর জ্বলে যাচ্ছে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের এই স্পর্দ্ধার তাপে? এর প্রতিকার না করে তো তিনি স্থির থাকতে পারেন না; তাই না শক্তি-মন্দিরে মহাশক্তির আরাধনা করছেন কায়মনোপ্রাণে!

যেদিন মহাশক্তির আসন টলে উঠল, ঝাঁসীর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে অসংখ্য কণ্ঠের বজ্রধ্বনি উঠল: ইংরেজ বেনিয়া, ঝাঁসী ছোড় দো—ঝাঁসীর মালিক রাণী লক্ষ্মীবাঈ!···সেদিন সেই রণ-হুঙ্কারে তপস্বিনী রাণীরও ধ্যান ভেঙ্গে গেল; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনলেন—বাঙলা দেশের এক ব্যারাক থেকে ইংরেজ রেজিমেন্টের ভারতীয় সিপাহী বিপ্লবী হয়ে যে আগুন জেলেছে, সারা হিন্দুস্থানের ইংরেজ রেজিমেন্টে তা ছড়িয়ে পড়েছে। ঝাঁসীর সেনা-ব্যারাকের সিপাহীরাও বিপ্লবের পতাকা উড়িয়ে ইংরেজের গ্রাস থেকে ঝাঁসী উদ্ধার করবার জন্তে ক্ষেপে উঠেছে; তারা রাণীকে আবার সিংহাসনে বসাতে চায়। ঝাঁসীর রেজিমেন্টের সমস্ত দেশীয় সিপাহী বিপ্লবিরূপে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে; গোরা সৈন্তদের সঙ্গে ঝাঁসীর সমস্ত ইংরেজ কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছে; তারা এখন অবরুদ্ধ। পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী সিপাহীরা রাণীর প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হয়ে রাণীর সহায়তাপ্রার্থী।

স্তব্ধ-বিস্ময়ে রাণী সব শুনলেন। ভাবলেন, তাঁর একান্ত আরাধনার ফলেই কি ইংরেজ কোম্পানীর বিশাল রণবাহিনীর মধ্যে এই ভাবে দারুণ অন্তর্বিপ্লবের বহ্নি জলে উঠল? তাহলে তো আর তাঁর পক্ষে দেবমন্দিরের নিভৃত কক্ষে ধ্যানমগ্ন থাকা সম্ভব নয়—মহাশক্তিই যে ধ্যান তাঁর ভেঙ্গে দিয়েছেন; অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিকার-প্রার্থিনী হয়েছিলেন; তাঁর সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন মহাশক্তি; অত্যাচারীর দম্ভের যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছেন শক্তিরূপা দেবী; এ সুযোগ তো তাঁর উপেক্ষা করা উচিত নয়? উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দেবীবন্দনা করে মহাশক্তির কাছে বিদায় নিয়ে দীর্ঘ তিন বছর পরে রাণী আবার এক অভিনব কর্তব্য পালনে অবহিত হলেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর মাত্র।

এই সময় ক্যাপ্তেন ডনলাপ ঝাঁসীর রেজিমেন্টের অধিনায়ক, ক্যাপ্তেন আলেকজাণ্ডার স্কীন এই রাজ্যের কমিশনার ও সমগ্র রাষ্ট্রীয় বিভাগের কর্তা। লেফটেন্যান্ট গর্ডন নামে জনৈক ইংরেজ অফিসার স্কীন সাহেবের সহকারী বা ডেপুটীরূপে ঝাঁসীতে নূতন এসেছেন। মীরাট, কানপুর, বেরিলী প্রভৃতি অঞ্চলের সিপাহীরা একসঙ্গে বিপ্লবী হলেও কমিশনার স্কীনের ধারণা ছিল, ঝাঁসীর সৈনিকরা সহজে বিগড়াবে না। তাঁরা খবর নিয়ে জেনেছিলেন, সিংহাসন ত্যাগের সময় ঝাঁসীর রাণীসাহেবা যদিও দিয়াশালায়ের কাঠির মত একবার জ্বলে উঠেছিলেন, কিন্তু তার পরই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজ কি চীজ; সেই থেকে তাঁর বিরুদ্ধে আর কোন রকম বেয়াদপির খবর তাঁরা পান নাই—সেই রাণী এখন দেওয়ানার মতন দেবালয়ে থাকেন, উপাসনা করে দিনযাপন করেন। যে সব রাজ্যে সিপাহীরা ক্ষেপে উঠেছে, সেই সব রাজ্যের পূর্বতন রাজবংশীয় ব্যক্তিদের কুমন্ত্রণাই তার জন্তে দায়ী। ঝাঁসীর ভূতপূর্ব রাণী যখন অবলা নারী ও বৈধব্যদশায় উদাসিনী, তখন ঝাঁসীর সিপাহী পল্টন বরাবরই অনুগত থাকবে। তখনো পর্য্যন্ত ব্যাপক ভাবে ভারতীয় সিপাহীদের প্রস্তুতির কথা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জানতে পারেননি বলেই ঝাঁসীর সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করেছিলেন।

কিন্তু ২রা জুন সেনাবারিকের গোরাদের ঘরের চালায় হঠাৎ আগুন লাগতেই তাঁদের সেই ধারণা দূর হলো; সাহেবরা বুঝলেন যে, বিপ্লবের বহ্নির ছোঁয়াচ এখানকার ব্যারাকেও এসেছে—এই অগ্নিক্রিয়া তারই আভাস মাত্র। তাঁরা খুব সতর্ক ভাবে রেজিমেন্টের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এই ঘটনার পর ৪ঠা জুন একবারে হুলস্থূল কাণ্ড! ৩ নং পদাতিক পল্টনের গুরবক্স নামে এক হাবিলদার তার অধীনস্থ সিপাহীদের নিয়ে রণ-হুঙ্কার তুলে 'ষ্টার ফোর্টের' মধ্যে প্রবেশ করল। এই সুরক্ষিত ইমারতের মধ্যে রেজিমেন্টের সমস্ত বন্দুক, গোলাগুলী, বারুদ ও রাজ্যের তহবিল থাকে। হঠাৎ এ-হেন ফোর্টটি অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপ্লবীদের হাতে পড়ায় রেজিমেন্টের কর্তারা চোখে অন্ধকার দেখলেন।

সেনাধিনায়ক ক্যাপ্তেন ডনলাপ ঐ ফোর্ট উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে রেজিমেন্টের বাকি দেশী বিদেশী সমস্ত ফৌজ ব্যারাকের ময়দানে এনে প্যারেড করালেন। ক্যাপ্তেন ডনলাপের সঙ্গে কমিশনার আলেকজাণ্ডার স্কীন, লেফটেন্যান্ট গর্ডন প্রভৃতিও প্যারেডের স্থানে এলেন। কিন্তু প্যারেডের সময় ভারতীয় সিপাহীদের ভাবভঙ্গি

দেখে তাঁরা প্রত্যেকেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। যদিও তারা প্যারেড করতে আপত্তি করেনি, কিন্তু তাহলেও তাদের মুখ ও চোখের ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা আর আগেকার মত বাধ্য বা অনুগত আদেশবাহী নয়—যে কোন মুহূর্তে বিগড়ে যেতে পারে।

এই সময় সেনানায়কের নির্দেশ মত লেফট্‌ন্যাণ্ট গর্ডন গোরা-সৈনিকদিগকে চুপি-চুপি কেল্লার মধ্যে যাবার জন্যে হুকুম দিলেন। ডনলাপ সিপাহীদের নিয়েই প্যারেড করতে থাকলেন। এরই মধ্যে গোরা সৈন্যরা কেল্লার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল। ডনলাপ দেশী সিপাহীদের হাবিলদারদের বললেন: এদের এখন ব্যারাকে নিয়ে যাও; এর পর কি করা হবে সে হুকুম আমি শীঘ্রই জানাচ্ছি।

এই ব্যবস্থা করেই ডনলাপ ও স্কীন উভয়েই অশ্বারোহণে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করলেন। হাবিলদার ও সিপাহীরা সাহেবদের উদ্দেশ্য বুঝলেন। এঁদের প্রতি আস্থা হারিয়ে সাহেবরা গোরা সিপাহীদের কেল্লার মধ্যে নিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। ভারতীয় সিপাহীরা কেল্লার বাহিরে সেনা-ব্যারাকের মধ্যেই রইল। 'ষ্টার ফোর্ট' উদ্ধারের আর কোন ব্যবস্থা সেদিন হলো না। সিপাহীরাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাহেবদের কার্যকলাপের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেল্লার মধ্যে গিয়েই ডনলাপ নো-গাঙ্গ নামক ছাউনীর গোরা রেজিমেণ্টকে ঝাঁসীতে পাঠাবার জন্য এক বিশ্বস্ত সওয়ার পাঠালেন। কিন্তু সে কথা ফাঁস হয়ে গেল। সেই সওয়ার নো-গাঙ্গের সেনানায়কের কাছে না গিয়ে বিপ্লবী পক্ষকে ব্যাপারটা বলে দিল। এমন ভাবে কাজটা হয়ে গেল যে, ডনলাপ কিছুই জানতে পারলেন না। নো-গাঙ্গের রেজিমেণ্টের ভরসায় পরদিন সকালে ডনলাপ ও গর্ডন প্যারেডের মাঠে উপস্থিত হলেন। কেল্লা থেকে ব্যবস্থা করে গেলেন, নো-গাঙ্গ থেকে গোরা রেজিমেণ্ট এসে পড়লেই কেল্লার গোরা ফৌজ তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়বে। ফলে প্যারেডের মাঠে ভারতীয় সিপাহীরা দুদিক থেকে গোরা ফৌজের মাঝখানে পড়বে। কিন্তু সিপাহীরাও ব্যাপারটা বুঝে মতলব ঠিক করে রেখেছিল।

স্কীন সাহেব ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলেন নো-গাঙ্গের গোরা ফৌজকে এগিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে। এদিকে সেনানায়ক ডনলাপ ও লেফটেন্যাণ্ট গর্ডন ময়দানে সমবেত সিপাহীদিগকে কাওয়াত (প্যারেড) করবার জন্য হুকুম দেবা মাত্র সামনের সিপাহীরা এগিয়ে এসে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ডনলাপ ও গর্ডনের উপরে। তাদের অস্ত্রাঘাতে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত হয়ে প্যারেডের মাঠেই নিহত হলেন। সিপাহীরা তখন ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করতে লাগল: ফিরিঙ্গীদের নিপাত কর—নিপাত কর!

এন, সাইনটেলার নামে এক ইংরেজ অফিসার এই ব্যাপার দেখেই কমিশনার স্কীন সাহেবের সন্ধানে ছুটলেন। তিনি নগরোপকণ্ঠে নো-গাঙ্গের রেজিমেণ্টের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। এমন সময় সাইনটেলার ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দুর্ঘটনার খবর দিল। স্কীন সাহেব তৎক্ষণাৎ সহরের ইংরেজ নর-নারীদের কেল্লায় আশ্রয় নেবার জন্য হুকুম জারি করলেন। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে-সঙ্গে সিপাহীদের বিগড়াবার খবর সহরময় রাষ্ট্র হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক ইংরেজ-পরিবারে হাহাকার উঠল; হাতের কাজ ফেলে, যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই ভাবেই সহরের সমস্ত ইংরেজ স্ব স্ব স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে কেল্লার মধ্যে আশ্রয় নিতে ছুটলেন।

এ কাজ সম্পন্ন হতেই স্কীন সাহেবের আদেশে কেল্লার সিংহ-দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। স্থানে স্থানে বড়-বড় পাথর-খণ্ড এনে স্তূপাকার করে সাজিয়ে রাখালেন। সিপাহীরা এ সময় সাহেবদের কাজে কোন রকম বাধা দিল না, কিম্বা কেল্লার উপর চড়াও হলো না। এই সুযোগে তারাও আর এক মারাত্মক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

ঝাঁসী সহর থেকে কয়েক ক্রোশ তফাতে নো-গাঙ্গের ছাউনীতে যে গোরা রেজিমেণ্ট ছিল, ঝাঁসীর সিপাহীরা প্যারেডের মাঠ থেকে বেরিয়ে ঝড়ের বেগে সেখানে গিয়েই সেই রেজিমেণ্টের অপ্রস্তুত ও অসতর্ক গোরা সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় সকলকেই নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করল। এই হত্যাকাণ্ডের পর তারা আরো উগ্র হয়ে উঠল; রণ-হুঙ্কার তুলে পুনরায় ঝঞ্ঝার গতিতে সহরে প্রবেশ করে কেল্লার দিকে ছুটল সেখানকার বিদেশীদিগকে সংহার করবার অভিপ্রায়ে।

কিন্তু হঠাৎ তাদের বিক্ষুব্ধ অন্তর-মধ্যে শুভবুদ্ধির সঞ্চার হলো। যে মহীয়সী নারী এই ঝাঁসীর প্রকৃত অধীশ্বরী—যাঁর শৌর্য্যময়ী দেবীমূর্তি তাদের চোখের উপর থেকে এখনো মুছে যায়নি—এই দুর্য্যোগের সময় তাঁকেই সহসা মনে পড়ে গেল। যে পাষণ্ড ইংরেজ তাঁর মত দেবীর রাজপাট কেড়ে নিয়ে তাঁকে দেওয়ানা বানিয়েছে, ইংরেজদের এই দুর্দিনে তিনি যদি তাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেন—তাঁর লাঞ্ছনাকারী বিদেশীদিগকে কুকুরের মত হত্যা করবার জন্য তাদের উপরে হুকুম দেন, তিনি যদি তাদের চালনা করেন—তবেই তাদের এই বিপ্লব সার্থক হবে।

যেমন চিন্তা, অমনি কার্য্য। তৎক্ষণাৎ সেই রণোন্মত্ত বাহিনী উত্তেজিত কণ্ঠে 'রাণীমা'র নামে জয়ধ্বনি তুলে তাঁর প্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হলো। শত-সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠল: 'ইংরেজ বেনিয়া—ঝাঁসী ছোড় দো! ঝাঁসীর মালিক রাণীজী লক্ষ্মীবাঈজী! জয় রাণী লক্ষ্মীবাঈজী কী জয়!'

উপাসনা-মগ্না রাণীর কর্ণে রণোন্মত্ত সিপাহীদের এই জয়ধ্বনিই দামামার ধ্বনির মত ঝঙ্কার তুলে তাঁর ধ্যান ভেঙে দেয়।

[ক্রমশঃ।

বিখ্যাত প্রকাশক ফয়েল

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

দোকানটি অবশ্য আমাদের দেশে নয়। আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রভুদের দেশের রাজধানী লণ্ডনে। লণ্ডনে ফয়েল কোম্পানীর বইয়ের দোকান জগদ্বিখ্যাত। এখানে কোন দিন ক্রেতার অভাব হয় না। দোকানটি নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম খুচরা পুস্তকের দোকান এবং গ্রন্থকীটদের নন্দনকানন।

লণ্ডনের চ্যারিংক্রশ ষ্ট্রীটে এগারখানা বাড়ী নিয়ে এই দোকান। দোকানে বই রাখার যে সব সেলফ আছে, সেগুলি একসঙ্গে জোড়া দিলে তার দৈর্ঘ্য হবে তিরিশ মাইল। পুস্তকের সংখ্যা তিরিশ লক্ষের অধিক। এই দোকানের সঙ্গে সংযুক্ত আছে, একটি চিত্রশালা, একটি বক্তৃতা-কক্ষ, একটি গ্রন্থাগার ও ক্লাব। পৃথিবীর সকল স্থান থেকে

এই দোকানে বইয়ের অর্ডার আসে। রোজ যে-সব চিঠিপত্র আসে তার সংখ্যা কুড়ি হাজার থেকে তিরিশ হাজার।

ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন সেলফগুলি মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে এবং সেই সব সেলফ পুস্তকে ঠাসা। গুদামগুলিতে রাশি-রাশি বই স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে, পরে বেছে ঠিক করা হবে। যেগুলি ভাল আছে সেগুলি তুলে জমা হবে, আর যেগুলি খুব পুরানো হয়ে গিয়েছে সেগুলি ওজন-দরে বিক্রী করে দেওয়া হবে। এই ভাবে প্রতি সপ্তাহে আনুমানিক চার টন বই কাগজের কলে বিক্রী করে দেওয়া হয় কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করার জন্য—যা থেকে নতুন কাগজ তৈরী হবে।

ফয়েলের দোকানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা সাত শত। কিন্তু তবুও তারা সব কাজ করে উঠতে পারে না। নতুন বই এত বেশী আমদানী হয় যে, তাল রেখে কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অসংখ্য নর-নারী ফয়েলের দোকানে বই বিক্রী করে দেবার জন্য সারি-সারি দাঁড়িয়ে যায়। রোজই পৃথিবীর নানা স্থান থেকে বাক্স-বোঝাই বই এসে হাজির হয়। এ ছাড়া ফয়েল কোম্পানীর গাড়ীগুলি লণ্ডন ও উপকণ্ঠের বিভিন্ন স্থানে টহল দিয়ে বই সংগ্রহ করে। যে রকম বই-ই হ'ক না কেন, কিছুই বাদ দেওয়া হয় না। খবরের কাগজে যদি কোন দিন এ রকম খবর বেরোয় যে, একখানা পুরানো বাইবেল খুব চড়া দামে বিক্রী হয়েছে, অমনি তার পরদিনই সহর ও উপকণ্ঠের অধিবাসীরা তাদের সমস্ত পুরানো বাইবেল নিয়ে ফয়েলের দোকানে হাজির হবে বিক্রী করার জন্য। এগুলি হয়ত আর বিক্রী হবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তবুও কেউ বৃথা ফিরে যাবে না।

ফয়েলের দোকানে হাজিরা দেন না, এমন লোক খুব কমই আছেন। রাণী মেরী থেকে আরম্ভ করে চার্চ্চিল প্রমুখ নেতৃবৃন্দও বাদ যান না। বিখ্যাত লেখকবৃন্দ এবং নাম-না-জানা লেখক-লেখিকারাও তাঁদের বইএর কাটতি লক্ষ্য করবার জন্য এখানে এসে থাকেন।

একবার এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ফয়েলের দোকানে এলেন। ট্রেনে যাবার পথে পড়বার জন্য তিনি একখানা বই কিনতে চান। তিনি তরুণী বিক্রেতাকে প্রশ্ন করলেন, "কি বই নেওয়া যায় বলুন ত?" তরুণীটি বললে, "আপনি একখানা "ফর্সাইট সাগা" কিনুন। আমি বইটা নিজে পড়েছি, একখানা পড়বার মত বই।"

ভদ্রলোক বইখানা কিনে কয়েক মিনিট পরে সেখানা আবার তরুণীটিকে ফেরৎ দিলেন, অবশ্য দাম ফেরৎ চাইলেন না। তরুণী বই নিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন, ভদ্রলোকটি মলাটের উপর লিখেছেন এই ক'টি কথা—"To the young lady who enjoyed my book—John Galsworthy."

প্রসিদ্ধ নাট্যকার নোয়েল কাওয়ার্ড নাকি তাঁর "ক্যাভালকেড" নাটকের প্রেরণা পেয়েছিলেন ফয়েলের দোকানে পুরানো ম্যাগাজিন ঘাঁটতে-ঘাঁটতে। বিখ্যাত লেখক আর্ণল্ড বেনেট খ্যাতি অর্জ্জনের আগে ফয়েলের দোকানে ও লাইব্রেরীতে ঘুরে বেড়াতেন কেউ তাঁর বই পড়ছে কি না দেখবার জন্য। তাঁর পকেটে থাকত একশ পাউণ্ডের নোট—উদ্দেশ্য, যদি কাউকে তাঁর বই পড়তে দেখেন, তাকে ঐ নোট উপহার দেবেন। কিন্তু তিনি নাকি এমন কোন লোক খুঁজে পাননি।

রাজা ও প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে পথের ফেরীওয়ালা পর্য্যন্ত ফয়েলের দোকানের খদ্দের। তবে বেশীর ভাগ ক্রেতাই সাধারণ নর-নারী, কারণ বড়লোকের সংখ্যা ত আর বেশী নয়। এই সাধারণ লোকরা বছরে ফয়েলের দোকান থেকে আড়াই কোটি টাকার মত বই কেনে। যুদ্ধের সময় তারা দৈনিক দশ হাজার করে বই কিনেছিল।

এ রকম দোকানের কল্পনাও আমাদের দেশে করা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষের আচরণও অপূর্ব্ব। অনেকে বই কিনতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই পড়ে চলে যায়, কেউ-কেউ আবার খাবার পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়ে আসে। কিন্তু কখনো তাদের এমন কথা বলা হয় না, "নেবেন ত নিন, নইলে আর শুধু-শুধু ঝামেলা করবেন না।"

আপনি কিনুন আর নাই কিনুন, আপনাকে আদৌ বাধা দেওয়া হবে না। কলেজের যে সব ছাত্র পয়সার অভাবে বই কিনতে পারে না, তারা ফয়েলের দোকানে এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বই পড়ে। বৃটিশ শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা মিঃ হার্ব্বার্ট মরিসন যখন গরীব ছিলেন, তখন তিনি ফয়েলের দোকানের সাহায্যেই পাঠ সমাপ্ত করেছিলেন।

কখনো কোনো রকম বাধা না পেয়ে এই সব বিনা পয়সার খদ্দেরদের মেজাজ এখন এ রকম হয়েছে যে, তারা এই ভাবে পড়াটাকে তাদের দাবী বলে মনে করতে শিখেছে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এই সব বিনা পয়সার পাঠকরা বাধা পেলে চটে যান। মনে করুন, একজন এই রকম বিনা পয়সার খদ্দের একখানা বই দেখতে নিয়ে পড়ে যাচ্ছেন, এমন সময় অপর একজন প্রকৃত খদ্দের এসে সেই বই কিনতে চাইলেন। সেই বই যদি মাত্র ঐ একখানাই থাকে, তাহলে বিক্রেতাকে বাধ্য হয়ে পাঠকের কাছ থেকে বইখানা চাইতে হবে এবং চাইলেই তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করবেন। ফয়েলের দোকানে এ রকম হামেশাই হয়ে থাকে। এইরূপ এক ব্যক্তি রোজ বেলা ছুটোয় ফয়েলের দোকানে আসতেন এবং যতক্ষণ না দোকান বন্ধ হয়, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে বই পড়তেন। একদিন তিনি এসে শুনলেন যে, তিনি যে বইখানা পড়ছিলেন, সেখানা বিক্রী হয়ে গেছে, তার আর অন্য কপি নেই। এই কথা শুনে তিনি ত রেগে আগুন, শেষে দোকান থেকে চলে গেলেন এবং যাবার সময় জানিয়ে গেলেন যে, আর কখনও দোকানে আসবেন না।

দোকানের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিকের নাম উইলিয়ম আলফ্রেড ফয়েল। হাইস্কুলের পাঠও তিনি সাঙ্গ করতে পারেননি। কিন্তু ব্যবসা-বুদ্ধি তাঁর বেশ পাকা। হিটলার যখন সব বই পুড়িয়ে ফেলতে থাকেন তখন তিনি ভাল দাম দিয়ে বইগুলি কিনে নেন। এই বইএর সদ্ব্যবহারও তিনি ভাল ভাবেই করেছিলেন। যখন লণ্ডনে জার্ম্মাণ বোমারু বিমান হানা দেয় তখন তিনি তাঁর দোকানের ছাদে বালির বস্তার বদলে Mein Kampf এর কপিগুলি গাদা করে সাজিয়ে রাখেন এবং তাতেই বালির বস্তার কাজ চলে যায়।

তিনি একবার ওজন দরে গুদাম সাবাড় করতে আরম্ভ করেন। সহকর্ম্মীরা তাই দেখে মন্তব্য করেন, "এ কি মুদীর দোকান?" ফয়েল উত্তর দেন, "ক্ষতি কি, আমার বাবাও মুদী ছিলেন।" কেউ যদি কোন বইএর দাম জানতে চেয়ে চিঠি দেয়, তবে সাধারণতঃ তাকে উত্তরে দামটা জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ফয়েলের নিয়ম

আলাদা। ফয়েলের দোকানে বইয়ের দাম জানতে চেয়ে চিঠি দিলে উত্তরে চিঠি পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে সেই বইখানি। এর ফল হয় কি, যিনি দাম জানতে চেয়েছিলেন, তিনি বইখানি আর ফেরত না দিয়ে কিনে ফেলেন। শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে এ রকম হয়ে থাকে। পুস্তকের ব্যবসা ফলাও করার জন্য ফয়েলের আরও অনেক রকম ফন্দী-ফিকির আছে।

ফয়েলের বইএর ব্যবসা আরম্ভ করার ইতিহাসও অদ্ভুত। তাঁর বয়স যখন সতের বছর, তখন তিনি ও তাঁর ছোট ভাই গিলবার্ট সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য খান পনের-কুড়ি বই কেনেন। পরীক্ষায় দুজনেই গাড্ডু মারেন, কিন্তু হতাশ হন না। বইগুলি বেচে দাম তুলে নেবার উদ্দেশ্যে তাঁরা খবরের কাগজে এক বিজ্ঞাপন দিলেন। তখন লণ্ডনে পুরাতন পাঠ্য পুস্তক বিক্রয়ের কোন দোকান ছিল না। ফয়েল ভ্রাতৃযুগলের কাছে বই কেনার জন্য এত চিঠি এল যে, তাঁদের বই ত বিক্রী হয়ে গেলই, অধিকন্তু তাঁরা সহর চুঁড়ে পুরাতন বই সংগ্রহ করে সে সব বইও বেচে ফেললেন। এর পর তাঁরা একখানি ছোট দোকান খোলেন। তাকে ঠিক দোকান বলা যায় না। কলকাতা সহরের রাস্তার ধারের ছোট্ট পানের দোকানের মত। এ হ'ল চল্লিশ বছর আগেকার কথা। তার পর সেই দোকান বৃহত্তম পুস্তকের দোকানে রূপান্তরিত হওয়া এক বিরাট ও বিচিত্র ইতিহাস।

ফয়েলের দোকানের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর বই রাখা হয়। প্রধান দোকান ছাড়া চিকিৎসা-শাস্ত্রের পুস্তকের একটি আলাদা বিভাগ আছে এবং এই বিভাগে চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে এত বই আছে, যা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রাচ্য বিভাগে কেবল নিকট ও সুদূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার বই পাওয়া যাবে। দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সমূহেরও একটি আলাদা বিভাগ আছে। এঁদের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা দশ লক্ষের অধিক। ফয়েল কোম্পানী ভাল-ভাল বইএর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করে বিক্রী করেন এবং যাঁরা নিয়মিত ভাবে এই সব বই কেনেন, তাঁদের সংখ্যা অন্ততঃ আড়াই লক্ষ।

ফয়েল কোম্পানী মাসে একবার করে লেখক ও সাহিত্যিকদের ভোজ দিয়ে থাকেন। এই ভোজসভায় যোগদানকারীদের সংখ্যা দু'হাজার পর্য্যন্ত হয়। এইরূপ এক ভোজসভায় জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অতিথিদের নিরামিষ খাদ্য পরিবেশন করা হবে কি? শ' একটু ভেবে উত্তর দেন, "না, দু'হাজার লোক একসঙ্গে গাজর চিবোবে, এ কথা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হয়।"

ফয়েলের দোকান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটি আড়ত। একবার দশ আনা দামের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের মধ্যে একজন ফয়েলের দোকান থেকে বয়েডের "Coloured Views of London" বইখানি পেয়ে এক সপ্তাহ পরে আড়াই হাজার টাকায় সেই বই বিক্রী করে। এ ক্ষেত্রে ফয়েলের লোকসান হলেও ক্ষতিপূরণও অনুরূপ ভাবেই হয়। ফয়েল একবার চোরাবাজার থেকে মাত্র কয়েক আনা দিয়ে এক বাণ্ডিল বই কেনেন এবং এই সব বইএর মধ্যে ফিটজারাল্ডের রুবাইয়াতের অনুবাদের প্রথম সংস্করণখানি পাওয়া যায় এবং তিনি এই বই কয়েক হাজার টাকায় বিক্রী করেন। একবার এক খদ্দের এসে অভিযোগ করলেন, তিনি যে বই কিনেছেন, তার পাতায় কি সব হিজিবিজি কাটা রয়েছে। বইখানি ফেরৎ নিয়ে তাঁকে দাম ফিরিয়ে দেওয়া হল। ফয়েল দমবার পাত্র নন। তিনি হস্তলিপি-বিশারদকে সেই লিপি দেখালেন। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, ঐ হিজিবিজি আর কিছুই নয়, যেন জনসনের হাতের লেখা। বইখানি পরে চড়া দামে বিক্রী হয়ে গেল।

ফয়েলের দোকানে শ'য়ের লেখা চিঠিপত্রের একখানি সংগ্রহ-পুস্তক ছিল। বইখানি বিক্রী করে আটশ' ডলার পাওয়া যায়। ক্রেতা পরে জানতে পারেন, চিঠিপত্রগুলি শ'য়ের লেখা নয়, জাল। ফয়েল ক্রেতাকে তাঁর আটশ' ডলার ফেরৎ দিলেন এবং পত্রগুলি শ'য়ের কাছে পাঠালেন। শ' সেগুলি দেখে তীব্র সমালোচনা করলেন এবং তাঁর লেখার সঙ্গে জাল লেখার পার্থক্যের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলেন। ফয়েল শ'য়ের মন্তব্য সহ জাল চিঠিপত্র পুস্তকাকারে বিক্রী করে এক হাজার ডলার সংগ্রহ করলেন।

ফয়েলের ব্যবসাবুদ্ধি সম্বন্ধে এরূপ অনেক কাহিনী আছে। একবার এক দল ব্যবসায়ী কয়েক লক্ষ পাউণ্ড দিয়ে তাঁর বইএর দোকান কিনে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফয়েল রাজি হননি। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "What would I do, without my books and my book-worms?"

মান্ধাতার মুল্লুকে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দ্বিতীয় পর্ব্ব

অমানুষিক কণ্ঠস্বর

বিমল বললে, "খবরটা কৌতূহলোদ্দীপক ব'লেই আমি 'স্ক্র্যাপবুকে' তুলে রেখেছিলুম। কিন্তু তারপর এ সম্বন্ধে আর কোন তথ্যই কাগজে প্রকাশিত হয়নি। জীবটা কি? গরিলা? জামা-জুতো পরা গরিলার কথা কেউ কোনদিন শোনেনি।"

রোলা মাথা নেড়ে বললেন, "না, সে গরিলা নয়।"

—"তবে কি তাকে আপনি মানুষ ব'লে মনে করেন?"

—মানুষ বলতে আমরা ঠিক যা বুঝি, সে তাও নয়।"

—"তার মানে?"

—"মানেটা ভালো ক'রে বোঝাতে গেলে আমাকে সুদূর অতীতে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যেতে হবে—সেই যখন রোমশ ম্যামথ হাতী ও গণ্ডার, খাঁড়াদেঁতো বাঘ, গুহাভল্লুক আর অতিকায় বৃষ প্রভৃতি জীবের দল পৃথিবীতে বিচরণ করত।"

—"সে সব কথা আমরাও কেতাবে কিছু কিছু পাঠ করেছি। খালি পশু নয়, তখন মানুষেরও অস্তিত্ব ছিল।"

—"আমি যখনকার কথা বলছি, তখনও 'হোমো সেপিয়েন' বা সত্যিকার মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি। নৃবিদ্যাবিশারদরা সত্যিকার মানুষদের নাম দিয়েছেন—'ক্রো-ম্যাগ্‌নন'। আমি তাদের কথা বলছি না।'

বিনয় বাবু বললেন, "তাদের আগেকার যুগে য়ুরোপে যে মানুষদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, পণ্ডিতদের কাছে তারা 'নিয়ান্‌ডার্থাল' মানুষ ব'লে পরিচিত। সত্যিকার মানুষদের সঙ্গে তাদের

কোনই সম্পর্ক নেই। তাদের চেহারা অনেকটা গরিলার মত দেখতে হ'লেও তারা গুহায় বাস করত, আগুনের ব্যবহার জানত, চকমকি পাথরের হাতিয়ার প্রভৃতি তৈরি করতে পারত। আরো নানা জাতের তথাকথিত মানুষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যেমন জাভা দ্বীপের বানর-মানুষ, ইংলণ্ডের পিল্টডাউন মানুষ, আফ্রিকার রোডেসিয়ান মানুষ! এরাও কেউ সত্যিকার মানুষের জাতি নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সব হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগেকার কথা, আবার কোন কোন জাতের মানুষ পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে আরো অনেক কাল আগে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে অন্ততঃ দুই লক্ষ বৎসর আগেও পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়ে ওঠবার জন্যে মানুষ যে কত কাল ধ'রে চেষ্টা ক'রে আসছে, তা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু মানুষ আজও নিখুঁত হয়ে উঠতে পারেনি।"

রোলাঁ বললেন, "হয়তো তা পারবেও না। নিখুঁত হবার আগেই পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্যে মানুষ আজ যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করছে না। মারাত্মক অ্যাটম বোমা তৈরি ক'রেও সে খুসি নয়, তারও চেয়ে সাংঘাতিক হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে আজ ব্যস্ত হয়ে আছে।"

আলোচনাটা মোড় ফিরে অন্য দিকে চ'লে যাচ্ছে দেখে কুমার বললে, "মিঃ রোলাঁ, পৃথিবীতে সত্যিকার মানুষদের আবির্ভাব যখন হয়নি, আপনি তখনকার কথা বলতে যাচ্ছিলেন না?"

রোলাঁ বললেন, "হ্যাঁ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার রোডেসিয়া প্রদেশে এক জাতীয় মানুষের খুলি আর দেহের হাড় পাওয়া গিয়েছে। পণ্ডিতরা পরীক্ষা ক'রে বলেছেন, য়ুরোপে যখন নিয়ানডার্থাল মানুষরা বাস করত, খুব সম্ভব সেই সময়েই আফ্রিকায় বর্ত্তমান ছিল এই রোডেসিয়ান মানুষরা। গরিলার সঙ্গে তাদের চেহারার মিল ছিল নিয়ানডার্থালদের চেয়ে বেশী। আজকাল পৃথিবীতে সব চেয়ে পশ্চাৎপদ জাতি ব'লে গণ্য হয় অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা। হয়তো সুদূর অতীতে তাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল এই রকম রোডেসিয়ান মানুষরাই।"

বিমল বললে, "কিন্তু আধুনিক ফ্রান্সে যে গরিলার মত জীবটাকে দেখা গিয়েছে, তার সঙ্গে এ সব কথার সম্পর্ক কি?"

—"আমার মতে, ঐ জীবটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরই বংশধর।"

—"আমরাও তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরই বংশধর! তা ব'লে আমাদের তো আর প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বলা চলে না?"

—"তা চলে না! কিন্তু শুনুন। এই বিপুলা পৃথিবীতে আজও হয়তো এমন কোন কোন স্থান থাকতে পারে, প্রাচীন বা আধুনিক কোন সভ্যতারই সংস্পর্শ না পেয়ে স্মরণাতীত কাল থেকেই যেখানকার মানুষদের অগ্রগতি একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যাদের মধ্যে ক্রমোন্নতির জন্যে কোন চেষ্টাই নেই, বর্ত্তমানকে নিয়েই যারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে, তাদের 'বর্ত্তমান'ও আবদ্ধ হয়ে থাকে সুদূর অতীতের আবহের মধ্যেই। সুতরাং আজও কোন অজানা দুর্গম প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ থাকা অসম্ভব নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন কোন মাছের অস্তিত্ব আজও লুপ্ত হয়নি। আমেরিকার প্যাট্যাগোনিয়া প্রদেশে কেউ কেউ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুও দেখেছে। তবে কোন বিশেষ জাতের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান নেই, এ কথা কি জোর ক'রে বলা যায়?"

বিমল বললে, "তর্কের অনুরোধে না হয় আপনার কথাই মেনে নিলুম। কিন্তু ফ্রান্সে যে আজব জীবটা দেখা গেছে, সে যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ, আপনার এমন অনুমানের কারণ কি?"

রোলাঁ বললেন, "এ আমার অনুমান নয়, এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস।"

—"আপনার দৃঢ়বিশ্বাস?"

—"হ্যাঁ। কারণ তাকে আমি চিনি। সে আমার বাড়ী থেকেই পালিয়ে গিয়েছে।"

বিমল ও কুমার দুই জনেই সবিস্ময়ে একসঙ্গে ব'লে উঠল, "তাই নাকি?"

—"ঠিক তাই। সব কথা আগেই আমি বিনয় বাবুর কাছে বলেছি।"

বিমল সাগ্রহে বললে, "আমরাও সে-সব কথা শুনতে চাই।"

চেয়ারের উপরে ভালো ক'রে ব'সে রোলাঁ বললেন, "সেই কথা বলবার জন্যেই আমি আজ এখানে এসেছি। চায়ের প্রতি আমার অতি ভক্তি আছে। আর এক পেয়ালা আনলেও আপত্তি করব না।"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "আমারও ঐ মত। অষ্টপ্রহরের কোন সময়েই চা আপত্তিকর পানীয় নয়। (সচীৎকারে) রামহরি, আবার চা!"

আবার চা এল। পিয়ালায় মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে রোঁলা বলতে লাগলেন:

"১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের কথা। আমন্ত্রিত হয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলুম বেলজিয়ানদের দ্বারা অধিকৃত মধ্য-আফ্রিকায়—অর্থাৎ কঙ্গো প্রদেশে। সে এক অদ্ভুত দেশ! সেখানে আছে পিগমি বা বামন জাতের মানুষ আর বামন হাতীর দল। সেখানে বড় জাতের হাতীও আছে, আর সেই সঙ্গে পাওয়া যায় গরিলা, শিম্পাঞ্জী, বন্য মহিষ, চিতাবাঘ প্রভৃতি জন্তু। আমরা গিয়েছিলুম গরিলা শিকারে।

"নীলাভ জল নিয়ে যেখানে কিভু হ্রদ টলমল করছে, তারই তীরে আছে কিভুর নিবিড় অরণ্য। সেইখানে আকাশের দিকে মাথা তুলে দিয়েছে মিকেনো পর্ব্বত। সেখানকার ভীষণ ও মধুর সৌন্দর্য্যের কথা বর্ণনা করতে গেলে দরকার হবে কবির ভাষা। আমি কবি নই, সুতরাং সে চেষ্টা করব না। যদি আমরা আবার কখনো সেখানে যাই, আপনারা সকলেই সমস্ত দেখতে পাবেন স্বচক্ষে। আপাততঃ সংক্ষেপে আমার বক্তব্যটা সেরে নিতে চাই।

"একদিন আমরা সদলবলে মিকেনো পর্ব্বত থেকে নেমে আসছি, হঠাৎ রাস্তার পাশে পাহাড়ে-বাঁশবনে জেগে উঠল হাতীর ক্রুদ্ধ বৃংহিত, সেই সঙ্গে বিকট আর্ত্তনাদ আর একটা ভারি দেহপতনের শব্দ।

"সে অঞ্চলে পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু এক রকম গাছ জন্মায়, স্থানীয় লোকরা যার নাম দিয়েছে 'মুসুনগুয়া' বা বুনো গোলাপ গাছ। সেই রকম একটা গাছের গুঁড়ির পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, একটা মস্ত হস্তী শুঁড় আস্ফালন করতে করতে আর বাঁশবন দোলাতে

দোলাতে বেগে অন্য দিকে চ'লে যাচ্ছে। সেখানে আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

কিন্তু আমরা সকলেই যে একটা ভয়াবহ, বিকট আর্ত্তনাদ শুনেছি, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তখন গোধূলি কাল। বনের পাখীরা সব বাসায় ফিরে এসে মুখর কণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে বিদায়-সম্ভাষণ করছে, একটু পরেই সন্ধ্যা এসে চারিদিকে তিমিরাঞ্চল উড়িয়ে সমস্ত দৃশ্য ঢেকে দেবে, তখনও আমরা পাহাড়ের প্রায় দেড় হাজার ফুট উপরে আছি, সন্ধ্যার আগে পৃথিবীর বুকে গিয়ে নামতে না পারলে অন্ধের মত ঘুরে বেড়াতে হবে বিপদজনক অপথে বিপথে কুপথে।

কিন্তু চতুর্দ্দিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ক'রে এখনি যে প্রচণ্ড আর্ত্তনাদটা শ্রবণ করলুম, তা কি কোন মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছে? মানুষের কণ্ঠস্বর কি এমন ভাবে বুকের রক্ত হিম ক'রে দিতে পারে?

পায়ে পায়ে পথ ছেড়ে বনের ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, বন্ধু বাধা দিয়ে বললেন, "কোথা যাও?"

—"কে অমন ক'রে চেঁচিয়ে উঠল, একবার দেখা দরকার।"

—"না, কিছুই দেখবার দরকার নেই। আমাদের আগে এখন নীচে নামা দরকার। এ হচ্ছে আদিম কালের গভীর অরণ্য, মানুষের সভ্যতা এখনো এর অন্দরমহলে ঢুকতে পারেনি। ওখানে কত রহস্য হয়তো লুকিয়ে আছে, তা নিয়ে তুমি-আমি মাথা ঘামিয়ে মরব কেন?"

আমি বললুম, "বন্ধু, রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার ধর্ম্ম। এখনি যে আকাশ-ফাটানো আর্ত্তনাদটা হ'ল, তুমিও তো তা শুনেছ?"

—"হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু আমার মতে ওটা হচ্ছে অমানুষিক আর্ত্তনাদ।"

—"হ'তে পারে। তবু ওটা বোধ হয় কোন জানোয়ারের চীৎকার নয়। আমি ওর মধ্যে পেয়েছি মানুষের ভাব।"

—"রোলাঁ, তুমি নির্ব্বোধের মত কথা বলছ। এই গহন বনে যারা বাস করে তারা জন্তুই হোক আর মানুষই হোক, তাদের জীবনের নীতি হচ্ছে একেবারেই স্বতন্ত্র। সকল রকম বিপদ-আপদের জন্যে সর্ব্বদাই তারা প্রস্তুত থাকে, কারণ তাদের ন্যায়শাস্ত্র বলে—'হয় মরো, নয় মারো'! মারতে না পারলে বাঁচতে পারবে না, এই বিপদজনক নীতিই যেখানে সর্ব্ববাদিসম্মত, সেখানে পরের ভালো-মন্দ নিয়ে আমরা ভেবে মরব কেন?"

কিন্তু বন্ধুর যুক্তি আমার মনঃপুত হ'ল না, আমি বললুম, "এই দুর্গম অরণ্যে সত্য সত্যই যদি কোন মানুষ বিপদে প'ড়ে থাকে, তবে প্রত্যেক মানুষেরই উচিত তাকে সাহায্য করা। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি।" এই ব'লে দুই হাতে ঝোপ সরিয়ে জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করলুম। তারপর সেখানে গিয়ে দেখলুম সে কি দৃশ্য!

এখানে যেখানে-সেখানে জন্মায় মস্ত মস্ত বিছুটির ঝোপ—স্থানীয় ভাষায় বিছুটিকে বলে 'কাগারা'। সেই রকম একটা ঝোপের ভিতরে দুই দিকে দুই হাত ছড়িয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে প'ড়ে শরীরী দুঃস্বপ্নের মত একটা আশ্চর্য্য মূর্ত্তি!

তার দেহের উচ্চতা ছয় ফুটের কম নয়, প্রকাণ্ড চওড়া বুক, কণ্ঠদেশ নেই বললেই হয়—যেন কাঁধের উপরেই আছে মুখমণ্ডল—আর সে মুখও দেখতে অনেকটা গরিলার মত, সর্ব্বাঙ্গে লম্বা-লম্বা কালো রোম। সে যেন কতক মানুষ আর কতক গরিলার আদর্শে গড়া এক মূর্ত্তি! তার দেহের ঠিক পাশে রয়েছে একটা বর্শাদণ্ড—ফলক তার পাথরে গড়া!

অবাক-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

[ক্রমশঃ।

উত্তর

১। ২১ খৃষ্টপূর্ব্বে, যখন সম্রাট অগাষ্টাস্ ছিলেন রোমাধিপতি।

২। ১,৭২৮,০০০; ১,২৯৬,০০০; ৮,৬৪০,০০০ এবং ৪৩২,০০০ বছর যথাক্রমে।

৩। না। যাযাবরের আসল নাম শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় এবং রঞ্জনের নাম শ্রীনিরঞ্জন মজুমদার।

৪। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাবলীর নাম "বিদ্যাকল্পদ্রুম"।

৫। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

৬। হ্যাঁ। সংস্কৃত, ফারসী এবং হিন্দী ভাষাতেও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন।

৭। গোবিন্দানন্দ।

৮। "বাঙ্গলা শিক্ষক" নামক গ্রন্থের লেখক ৺রাধাকান্ত দেব গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন।

রেলগাড়ী কে আবিষ্কার ক'রলো?

[ভারতীয় রেলপথ স্থাপিত হয়েছে এক শো বছর পূর্ব্বে। ভারতবর্ষের যাবতীয় রেল-ব্যবসায়ী একত্রে শতবার্ষিকী পালন করছেন। এই বিষয়টি এখন ঐতিহাসিক পর্য্যায়ে প'ড়েছে—যেজন্য 'মাসিক বসুমতী'তে এই সঙ্গে তিনটি বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ রচনা ছাপা হচ্ছে। প্রকাশিত লেখা তিনটি শ্রীতারানাথ রায় কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে 'মাসিক বসুমতী'র জন্য লিখিত]

—সম্পাদক

"কলেতে চলেছে গাড়ী নাম বাষ্পরথ।
ছয় দণ্ডে চলে যায় ছ'দিনের পথ॥
কি আশ্চর্য্য দেখি আঁখি মেলিতে মেলিতে।
কতদূর গিয়ে পড়ে পবন গতিতে॥"

"শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশম স্কন্ধে প্রকাশ আছে যে, শাল্বরাজ যদুকুলের বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া শিল্পিবর ময়দানবের নিকট সৌভ যন্ত্র নামক এক কামগ যান প্রাপ্ত হয়েন, এবং ঐ যান জলে স্থলে শূন্যে সমভাবে গমন করিত এবং তাহা ধূমযুক্ত ছিল, যথা :—৭৬ অধ্যায়ে

স লব্ধ্বা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্।
যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্॥
কচিদ্ভূমৌ কচিদ্ব্যোম্নি গিরিমূর্দ্ধ্নি জলে কচিৎ।
অলাতচক্রবদ্‌ভ্রাম্যৎ সৌভং তদ্দূরবস্থিতম্॥"

অর্থাৎ সেই শাল্বরাজা কামধায়ি অথচ তমোধাম (অন্ধকারবহুল ফলতঃ ধূমযুক্ত) ও আসন্ন হওয়া দুষ্কর এরূপ যান প্রাপ্ত হইয়া যদুকুলকৃত বৈর স্মরণ পূর্ব্বক দ্বারবতী পুরী গমন করিয়াছিলেন। সেই সৌভ নামক যান কখন ভূমিতে ও কখন আকাশে এবং কখন পর্ব্বতমস্তকে ও কখন বা জলে অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিত, এবং তাহার বেগাতিশয়তা প্রযুক্ত স্থিরতররূপে অবস্থিতি কেহ লক্ষ্য করিতে পারিত না।"—শ্রীরামপুর তমোহর প্রেসে মুদ্রিত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ—১২৬২ সাল]

ইটালীর প্রাচীন নগরসমূহের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিকরা রেলপথের নিদর্শন পেয়েছিলেন। এ পথ পাথরের। এই প্রস্তর-পথের উপর দিয়ে শকট-চক্র চলত।

ময়দানবের এই মায়া-যান বা ইটালীর এই প্রস্তর-পথ বর্ত্তমান রেলওয়ে হয়ত না-ও হতে পারে। এ যুগে রেল-পথ প্রথম তৈরী হয়েছিল ইংলণ্ডে, ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে, নিউ কোষ্টল কয়লা-খনি থেকে টাইন নদীর তীর পর্য্যন্ত। এই রেল-পথের দুই পাশে সোজা কাঠ বিছান হয়েছিল, কাঠের উপর গাড়ীর চাকার খাঁজের উপর দিয়ে চার চাকার ঘোড়াগাড়ী অতি অল্প সময়ে দেড়শ' মণ কয়লা বয়ে নিয়ে যেত। ক্রমে এই কাষ্ঠ রেল-পথের অনুকরণ অন্যান্য কয়লা-খনির মালিকরাও করতে লাগল। চলতি পথে যেখানে একটা ঘোড়া ১৭ হন্দর মাল টানত, এই ভাবে ট্রাম-পথে একটা ঘোড়া টানতে লাগল ৪২ হন্দর। কাঠের যায়গায় লোহার রেলের প্রবর্ত্তন করেন কোলব্রুক-ডেল আয়রণ কোম্পানীর (১৭৬৭) মিঃ কর। এই রেলপথের নাম ছিল Dram বা Tram Road বা Waggon way.

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ বার্ণস লোহার পাটি কাঠের উপর না বিছিয়ে পাথরের উপর স্থাপন করতে লাগলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে স্বয়ং-চালিত গতিশীল ষ্টিম এঞ্জিন আবিষ্কার করলেন ত্রেভিনিক।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মার্থার টিডভিল রেল-পথে প্রথম ষ্টিম এঞ্জিন সাহায্যে গাড়ী চালালেন। ১০ টন বয়ে নিয়ে যাওয়া হল ঘণ্টায় ৫ মাইল বেগে।

১৮২৫, সেপ্টেম্বরে ষ্টকটন এণ্ড ডার্লিংটন রেলওয়ের এঞ্জিনিয়র জর্জ্জ ষ্টিফেনসন লোকোমোটিভ এঞ্জিন ব্যবহার করলেন। সে ট্রেনে ৩৪খানি গাড়ী থাকত; ওজন ৯০ টন, টানত একটা এঞ্জিন; এঞ্জিন চালাতেন ষ্টিফেনসন নিজে। গাড়ীর আগে আগে চলত একজন সিগন্যালম্যান ঘোড়ায় চড়ে। ট্রেন চলত ঘণ্টায় ১৫ মাইল। প্রথমে ট্রেনে চলত মালপত্র। তার পর ১৮২৫, অক্টোবর থেকে "একস্‌পেরিমেণ্ট" নাম দেওয়া একখানি কোচ প্রত্যহ জুড়ে দেওয়া হল। কোচের ভিতরে ৬ জন ও বাহিরে ১৫।২০ জন যাত্রী নিয়ে ট্রেন দু'ঘণ্টায় ডার্লিংটন থেকে ষ্টকটন যাতায়াত করত।

এর পর এ রকমের অনেক ছোটখাট রেল-লাইন ইংলণ্ডে খোলা হতে লাগল। ১৮৩০-এর লিভারপুল-মাঞ্চেষ্টার রেল-পথ রচিত হলে ইংরেজ জাতের মনে প্রথম ধারণা বদ্ধমূল হল যে, যান-বাহনের সত্যিকার এক মহাবিপ্লব সুরু হয়েছে।

কিলিংওয়ার্থ এঞ্জিন, তৈরী করেছিলেন জর্জ্জ ষ্টিফেনসন, এর ওজন ছিল মাত্র ১০ টন, চলত ৫০ টন নিয়ে ঘণ্টায় ৬ মাইল।

১৮৪২ সেপ্টেম্বরে মিঃ আর ডেভিডসন সর্ব্বপ্রথম রেলওয়েতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করলেন এডিনবরা-গ্লাসগো রেল-পথে। এ সময় এক চার-চাকার ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক এঞ্জিন তৈরী হল, যার গতিবেগ ঘণ্টায় ৪ মাইল।

১৮৮১ সালে বার্লিনের সিমেন্‌স এণ্ড হাল্‌স্ক কোম্পানী বৈদ্যুতিক রেলওয়ে প্রচলন করলেন।

তার পর পৃথিবীময় এই রেলওয়ে স্থাপিত হতে লাগল—

ফ্রান্স	১৮২৬—৩২	খৃঃ
অষ্ট্রীয়া	১৮২৮	"
আমেরিকা	১৮২৮—৩০	"
বেলজিয়াম	১৮৩০	"
জার্ম্মাণী	১৮৩৫	"
হল্যাণ্ড	১৮৪০	"
ভারত	১৮৪৫	"
	(ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনসুলা রেলওয়ে গঠিত)	
"	১৮৪৯	খৃঃ
	(রেলওয়ে কোম্পানীদ্বয়ের সঙ্গে বাংলায় রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য ১১ বৎসরের চুক্তি)	
"	১৮৫৩	খৃঃ
	(বোম্বাই থেকে টানা পর্য্যন্ত ২০ ½ মাইল রেল-পথ স্থাপিত)	
স্পেন	১৮৪৮	খৃঃ
চিলি	১৮৫০	"
ব্রেজিল	১৮৫০—৬০	"
পেরু	১৮৫২	"
পর্ত্তুগাল	১৮৫৩	"
কলম্বিয়া	১৮৫৫	"
মিশর	১৮৫৬	"
দঃ অষ্ট্রেলিয়া, রুশিয়া	১৮৫৭	"
ইটালী	১৮৬০-এর পূর্ব্বে	"
তুরস্ক, নিউজীল্যাণ্ড	১৮৬০	"
মেক্সিকো	১৮৬৫	"
জাপান	১৮৬৯—৭২	"
চীন	১৮৭৬	"
গুয়াটেমাল	১৮৮০	"
কানাডা, পঃ অষ্ট্রেলিয়া	১৮৮৩	"

১৮৫৩, ২০শে এপ্রিল লর্ড ডালহৌসী পরামর্শ দেন যে, ভারতে রেল-পথ স্থাপিত হলে এ দেশের অনেক উপকার হবে, আর সেই উপকারে রাজ্যের ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে এ দেশের নেটিভরা ধনী হবে। ইংরেজ সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করে তের কোটি টাকা মঞ্জুর করেন।

১৮৫৬, ২৮শে ফেব্রুয়ারী লর্ড ডালহৌসীর চরম মন্তব্য-লিপিতে আছে—

"সুপ্রীম গবর্ণমেন্টের কাছে সর্ব্বপ্রথম ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেনসন (ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল ওয়ে কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষ) ভারতে রেল-পথের বিষয় উপস্থাপিত করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষামূলক লাইন নির্ম্মাণের জন্য অনরেবল কোম্পানী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানার সঙ্গে চুক্তি করলেন, তবে বরাদ্দ রইল খরচা যেন ১০ লক্ষ ষ্টার্লিং-এর বেশী না হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলোর একটা ট্রাঙ্ক লাইন করার কল্পনা হল, প্রস্তাবিত রেল-লাইন তারই অংশ হবে। এতদনুসারে ঠিক হল, হাওড়া থেকে রাজমহল পর্য্যন্ত রেল-পথ হয়ে এর শাখা-লাইন রাণীগঞ্জ কয়লা-খনি পর্য্যন্ত যাবে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের শীতে বর্দ্ধমান থেকে রাজমহল পর্য্যন্ত লাইন জরীপ করা হল। পরের শীতে জরীপ এলাহাবাদ পর্য্যন্ত করা হল।

"১৮৫৩ খৃঃ বসন্ত কালে ভারত সরকার কোর্ট অব ডিরেক্টারদের কাছে ভারত-সাম্রাজ্যের জন্য রেল-পথ সম্বন্ধে আপনার মত পেশ করলেন। ওতে অনরেবল কোর্টকে সবিনয়ে পরামর্শ দেওয়া হল, ভারতে যথাসম্ভব অধিক রেল-পথ নির্ম্মাণ করা হোক। যে বিশাল জনপদ হাতে এসেছে, আর তার সঙ্গে এসেছে যে মহা রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ, তার উপযোগী ব্যবস্থা করতে যেন ইতস্তত: করা না হয়।"

ভারতের রেলওয়ে প্রবর্ত্তন ও প্রসারের জন্য সত্যিকার মান পাবেন মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেনসন। এ দেশের ভাবী রেলওয়ের নক্‌শা নিয়ে তিনি ১২ বছর বৃটিশ-বিশিষ্টদের খোসামোদ করেন।

কিন্তু সত্যিকার প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজের ভারতকে লৌহ-জালে বেষ্টিত করার। "কোম্পানি বাহাদুরের ভারতবর্ষে এমত
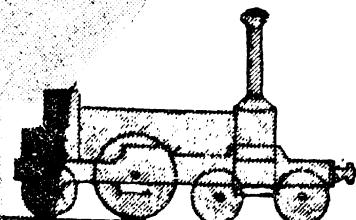
রাজ্য বিস্তার হইয়াছে যে, সৈন্যগণকে বহু দূর গমনাগমন করিতে হয়, এ কারণ সৈন্যের মন্দ মন্দ গতি প্রযুক্ত কোম্পানির বহু ব্যয় হয়, অতএব রেলওয়ে রাজ্য ব্যাপিয়া স্থাপিত হইলে কোম্পানির ব্যয়ের অল্পতা এবং বিপক্ষ ঝটিতি দলন হইতে পারে। তাহাতে নেপোলিয়ন বনাপার্টি রাজ্যশাসন বিষয়ে এইরূপ কহিয়াছেন যে: 'বিপক্ষ শাসনের মহৌষধি ঝটিতি তৎসন্নিধানে সৈন্য প্রেরণ করা।' যদি পঞ্জাব যুদ্ধের কালীন কলিকাতা অবধি দিল্লি পর্য্যন্ত রেলওয়ে থাকিত, তবে বহু প্রাণী এবং অর্থ রক্ষা পাইত।···শ্রীযুত চ্যাপম্যান সাহেব কহিয়াছেন যে, 'আমি অনেক প্রাচীন ও প্রবীণ লোকের সহিত কথোপকথনে অবগত হইয়াছি যে, মুসলমানদিগের রাজ্যাধিকার সময়ে ভারতবর্ষীয় লোকে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল। বৃটিশ রাজ্যাধিকারে ভারতবর্ষীয়গণ ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া রেলওয়ে স্থাপিত না হইয়া সুখস্বচ্ছন্দ সলিলে ভাসমান হইলেও আমি তাহা সম্পূর্ণ সুখ বলিতে পারি না'।"—(প্রাচীন বিবরণ, ১২৬২ সাল, ২৩ শ্রাবণ)

সে সময় সেকেলে কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনী মতিলাল শীল মত দিয়েছিলেন—"রেলওয়ে স্থাপিত হলে এ দেশের অনেক উন্নতি হবে কিন্তু এ জন্য যে ব্যয় হবে, সে ব্যয় উঠবে কি না সে বিষয়ে এখন মত দিতে পারি না। তবে মফঃস্বলের প্রধান প্রধান বাণিজ্য-স্থলের সঙ্গে কলকাতা রেলওয়ে দ্বারা সংযুক্ত হলে যে প্রচুর লাভ হবে না, এ কথা ভাবা যায় না। যে দেশে ত্রিশ কোটি লোকের বাস, যে দেশের ভূমি অতি উর্ব্বর, যে দেশের নানা শস্য উৎপন্ন হয়, সে দেশে রেলওয়ে স্থাপনে যে লাভ হবে না এ-ই বা কে বলতে পারে?"

সে সময় একজন ইংরেজ লিখেছিলেন—"গঙ্গার দুই পারে প্রায় ৫ কোটি লোকের বাস। মির্জ্জাপুর থেকে কলকাতায় প্রতি বছর ৬০ হাজার লোক নৌকায়, ২ হাজার ষ্টীমারে এবং গাড়ী, ঘোড়া, এক্কা, পাল্‌কী প্রভৃতিতে ও পদব্রজে পাঁচ লক্ষ লোক যাতায়াত করে, আর স্থল ও জলপথে ৬০ লক্ষ মণ বাণিজ্য-সম্ভারের গতিবিধি হয়। কানপুর ও এলাহাবাদের রাস্তায় এক বছরে ১ লক্ষ গরু গাড়ীতে, ১ লক্ষ ১৭ হাজার উট ও ৬০ হাজার ঘোড়া বাণিজ্য-পণ্য বহন করে থাকে।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে রেলওয়ে কোম্পানীর যে চুক্তি হয় তাতে স্থির হয় যে, প্রথমে দুই ভাগ রেলওয়ে স্থাপন করতে হবে। এক ভাগ বাংলায় আর এক ভাগ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। এ জন্য রেলওয়ে কোম্পানীর যে ৩ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে, তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দাদন দেবেন। তিন বছরে এই টাকা রেল কোম্পানীকে শোধ করতে হবে।

বিলাতী পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্‌স এ সম্বন্ধে এক সিলেক্ট কমিটী নিযুক্ত করলে সিলেক্ট কমিটী মন্তব্য করেন—"উপযুক্ত স্থানে রেলওয়ে স্থাপিত হইলে যে কেবল মহানগরীর উন্নতি হইবে এমত নহে, যে যে স্থান দিয়া রেলওয়ের গতি হইবে, সেই সেই স্থানের মূল্য বৃদ্ধি হইবে, এবং যে যে স্থানে যে যে দ্রব্য অপ্রাপ্য সেই সেই স্থান সেই সেই দ্রব্য সুলভে প্রাপ্ত হইয়া তথাকার দীনতা এবং তত্তৎস্থানীয় লোকের তত্তদ্দ্রব্যের অপ্রাপ্ত জন্য আলস্য না জন্মিয়া শ্রম জন্য ধনবর্দ্ধন হইবে, এতাবত রেলওয়ে দ্বারা দেশের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি হইয়া দেশীয় লোকের বিদ্যা বল বিক্রম বৃদ্ধি এবং ধনবৃদ্ধি ইত্যাদি হইবে, সুতরাং রেলওয়ে সর্ব্বতো ভাবে উপকারিণী।"—(বঙ্গভাষায় প্রাচীনতম বিবরণ, ১৮৫৫ খৃঃ)।

রেল-পথ সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এঞ্জিনিয়র মিঃ সিম্‌সকে ভারতে পাঠালে তিনি রিপোর্ট দেন যে,—

"গঙ্গার পূর্ব্ব বা পশ্চিম তট দিয়া কলিকাতা হইতে উত্তরাভিমুখে রেলওয়ে স্থাপিত হইয়া বারাকপুরের কিঞ্চিৎ দূর গঙ্গা পার হইয়া বারানসির দক্ষিণ দিয়া মৃজাপুর ও আলাহাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তার হইয়া শোনভদ্র নদ পার হইতে হইবেক, এবং সেই স্থল হইতে শাখা রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়া চুনার অর্থাৎ চণ্ডালগড় পর্য্যন্ত রেল বিস্তীর্ণ হয়, এইরূপে কলিকাতা অবধি দিল্লী পর্য্যন্ত সাড়ে চারিশত ক্রোশ পথে রেলওয়ে নির্ম্মিত হওয়া উচিত, এবং ইহাতে প্রতি মাইলে অর্থাৎ অর্দ্ধক্রোশে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হইবে।" --(প্রাচীন বিবরণ, ১৮৫৫ খৃঃ)

কিন্তু মিঃ সিমসের প্রস্তাব কোম্পানী প্রথমে গ্রহণ করেন নাই। পরে ভারতবাসীর অঙ্গে-অঙ্গে শৃঙ্খল বন্ধনের সঙ্গে-সঙ্গে রেলওয়ের শেকলে বাঁধা পড়েছিল ভারতের উটজ শিল্প, কৃষি-ব্যবস্থা। রেলওয়ে যোগে উৎপাদন কেন্দ্রগুলো থেকে বন্দরে-বন্দরে দ্রুত পণ্য প্রেরণ করা হতে লাগল ইউরোপের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভোলিউসন পরিপক্ক করবার জন্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ রেলপথের প্রবর্ত্তনে সমৃদ্ধ হলেও গত দুশ' বছরে ভারত এই রেলওয়ের সহায়তায় লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব ইংরেজের এত দেশ থাকতে তড়িঘড়ি ভারতে রেলওয়ে লৌহজাল বিস্তারের হেতু সম্বন্ধে ফরাসী পর্য্যটক এর্ণেষ্ট পিরিউও বলেছিলেন—

"বিজয়ের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে এই বিশাল রাজ্য হইতে আর্থিক লভ্য নিষ্কর্ষণের চেষ্টা আরম্ভ হইল। ইংরেজের মূলধন চারি দিক হইতে আসিয়া পড়িল। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া যাইবার সুব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিল এবং এই উদ্দেশ্যেই রেল-পথের সূত্রপাত হইল।···সর্ব্বপ্রথমে, কতকগুলি রেল-পথ স্থাপনের ভার বাণিজ্যিক ও সামরিক সুবিধার জন্য কোন-কোন অদরকারী কোম্পানীর হস্তে অর্পিত হয়; উহা সরকারের আয়ত্তাধীন থাকিবে এবং সরকারই উহার প্রতিভূ থাকিবেন—এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। সরকার প্রতিভূ না হইলে মূলধন আইসে না। কিন্তু শীঘ্র বুঝা গেল, এইরূপ প্রতিভূ পদ্ধতিতে সরকারের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। সরকার সুদের জন্য দায়ী, এই মনে করিয়া কোম্পানীরা বেশ নিশ্চিন্তে থাকে ও কোন প্রকার অপব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লরেন্‌স্ সরকারী ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে কতকগুলি রেল-পথ স্থাপন করিয়া লাভের উদ্দেশে উহা খাটাইতে লাগিলেন। এই অতীব প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য রেল-জাল, দশ হাজার মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ইহার দরুণ সরকারী বাজেটের উপর অত্যন্ত বেশি চাপ পড়িল।···প্রথমে দেখ, রেল হইতে যে লাভ হয় তাহার প্রায় অধিকাংশই ইংরেজ ধনপতিদিগের হস্তে যায়। রেল সংক্রান্ত মূল উপকরণগুলি ইংরেজের খনি হইতে উৎপন্ন এবং তাহাদের কামারখানা হইতেই সে সমস্ত প্রস্তুত হইয়া আইসে··· রেল-পথ স্থাপনের সূত্রপাত হইতেই যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারা ···মোটা মোটা বেতন ভোগ করে; সরকারের বাজেটে

যে টাকা অপ্রতুল হয় তাহা বাজেট হিসাবে গোঁজামিল দিয়া কোন প্রকারে সারিয়া লওয়া হয়…এ টাকার কোন ঝুঁকি নাই, প্রভূত লাভের বিলক্ষণ প্রলোভন আছে, এইরূপ স্থলে লণ্ডন-বাজারে এই সকল রেলওয়ে শেয়ারের মূল্য যে চড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?"
—L' Inde Contem poraine et C movement national—Ernest Piriou.

হোরেশ বেলও তাঁহার 'Railway Policy in India' গ্রন্থে বলেছেন—"ইংরেজ কারখানার মালিক ও ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে ভারত 'সংরক্ষিত মৃগয়াভূমি'। ওরা নতুন-নতুন রেল-পথ ক্রমাগত নির্ম্মাণ করে তাদের মালপত্র লেন-দেনের সুবিধা করে নিয়েছে। কিন্তু এতে এ দেশের ত কোন লাভ হয়ইনি, বরং তাদের উন্নতিতে বাধা হয়েছে, রেলে দেশ ছেয়ে গেছে, সম্মুখে ইংরেজ কারখানা-ওয়ালারা গট্ হয়ে বসেছে। এই দ্রুতগতি ও দূরস্পর্শী পন্থাগুলোর প্রভাবে ভারতের দূরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ইংরেজী পণ্যে দেশ প্লাবিত হয়েছে আর সে সব পণ্যের প্রতিযোগিতায় দেশী ব্যবসাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।"

ইংরেজের রেলওয়ে নীতির পিছনের এই অভিসন্ধি বুঝতে পেরে দেশবাসীর চৈতন্য সম্পাদন করবার জন্য কবি বলেছিলেন—

"পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহ বিনিম্মিত হার বুকে।"
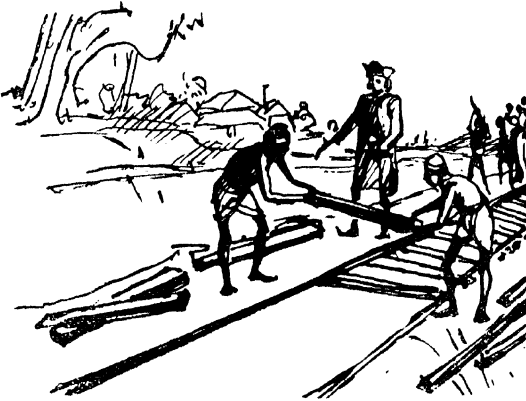
বাংলায় যখন রেল-পথের প্রবর্ত্তন হয় তখন দেশের পথ ভাল ছিল না। অধিকাংশ মুসলমান শাসকরা এদিকে নজর যেমন দেয়নি, তেমনি এই সব পথের সুযোগ নিয়ে হিন্দু বীররা মুসলমানদের সঙ্গে বীরত্বের প্রতিযোগিতা করে দেশকে সম্পূর্ণ মুসলমান করতে দেয়নি। সেকালের বাংলায় নর-বাহিত যান—যেমন ডুলি, পাল্কী, চৌপালা, মহাপায়া, নালকির প্রচলন ছিল। রাজ-অনুচররা ঘোড়ায় চড়ত। সরকারী চিঠিপত্রের জন্য 'ধাঁড়িনর ডাক' উটের পিঠে চলত। সে সময় বড়-বড় সহরে পত্রাদি বহন করত ভট্ট ডাক পদাতিকরা। কলকাতা যাবার জলপথ ও স্থলপথে চলতে গেলে শতকরা আশী জন ডাকাতের হাতে প্রাণ দিত। কলকাতার উপকণ্ঠে ভোটের-বাগান, ঘুসুড়ি প্রভৃতি স্থানে ডাকাতদের আড্ডা ছিল। জগন্নাথাদি তীর্থস্থানে যাবার পথ ছিল দুর্গম বনের মধ্য দিয়ে। একে বলা হ'ত 'সুঁড়ি পথ।' শ্রীক্ষেত্রের পথে 'ছবুড়ি ছুটা' নদ-নদী পায়ে হেঁটে পার হতে হত, তাতে অনেক যাত্রী জলে ডুবে মরত, বা বাঘ-ভালুকের হাতে প্রাণ দিত। এ জন্য বাংলায় তীর্থযাত্রীদের যাত্রার পূর্ব্বে পিতৃশ্রাদ্ধ করবার ব্যবস্থা।

সেকালের বাঙ্গালী দিনে প্রায় দশ ক্রোশ পায়ে হেঁটে চলত। এই গতির নাম ছিল "মঞ্জিল"। বাংলার নর-যান পালকী, ডুলি, চৌপালা, মহাপায়া, নালকি প্রভৃতি ছাড়া গো-যান ছিল 'বহিলি', অশ্ব-যান ছিল 'এক্কা'। এদেরও গতি দিনে ১০ ক্রোশের বেশী ছিল না। ডাকাতরা কিন্তু 'রণপায়ে' দিনে ২৫ ক্রোশ গতায়াত করতে পারত।

বাংলায় রেলওয়ে পরিকল্পনা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দেরও আগেই হয়েছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে রেল-পথ তৈরীর জন্য জমি দখলের আইন তৈরী হয়েছিল। আইনটির মুখবন্ধ এই—

"ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ আইন
বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে সরকারী কার্য্য নির্ম্মাণ করণের
পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুগম করিবার আইন।

"যেহেতুক বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন সরকারি কার্য্যের জন্যে যে কোন ভূমির আবশ্যক হয় তাহা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৪ সালের ১ আইনের দ্বারা সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মক্রম লইতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে এই রাজধানীতে যে লৌহের রাস্তা অল্প কালের মধ্যে প্রস্তুত হইবেক সেই রাস্তা নির্ম্মাণ করণেতে নিরর্থক বিলম্ব নিবারণের জন্যে ঐ সরকারি কর্ম্মের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক হয় তাহার অবিলম্বে দখল করিতে কোন কোন গতিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সরকারী ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইতেছে।"
—গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

বাংলায় রেলওয়ের জন্য যে সব জমি নেওয়া হয়েছিল তার দাম ধার্য্য হয়েছিল বিঘা প্রতি ৪০৲। তবে শ্রীরামপুর, চাতরা, বৈদ্যবাটীর জমির বিঘা প্রতি ২০০৲ দিয়ে কেনা হয়। জমির উপর যে সব ফলবান গাছ ছিল, সে সব গাছের দশ বছরের বার্ষিক ফলকর। উৎপন্ন হিসাব করে দাম দেওয়া হয়। কাঠের দাম দেওয়া হয়

শত মণে ৫।৬৲। তক্তার উপযুক্ত গাছের কাঠের দাম শত মণে ৭৲।
পাকা ইমারতের দাম দেওয়া হয়েছিল এই রকম—

রাঙ্গা সুরকী	১০০ মণে	১০৲—১৩৲
অন্য ,,	,, ,,	৮৲—৯৲
চুণ	,, ,,	৩৫৲—৪০৲
কলি চুণ	,, ,,	৩৩৲
মগরার বালি	,, ,,	৩৸০
খোয়া	,, ,,	৬৲
৯″ ইট	১০০০	২৲
১০″ ,,	,,	২৸০
১১″ ,,	,,	৪।০
জানালা	৬′×৩′	২৲
কড়ি-কাঠ	৫′×৭′	হাত প্রতি ।/০

ভূমি পরিষ্কৃত হইবার পর ৩৩ ফিট চওড়া ও ৬ ফুট উঁচু 'ভেড়িবন্দি' (embankment) করা হয়। ভেড়ির উপর খোয়া, খোয়ার উপর কাঠ আড়ে স্থাপিত হয়, সেই কাঠের উপর লোহার পাটি ফেলা হয়।

সমসাময়িক বিবরণ—"বালি ও বৈঞ্চবাটীর এবং শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানের খালের ও সরস্বতী ও কুন্তী নদীর উপর একই কাষ্ঠের সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, যে যে স্থলে বর্ত্মের বক্রভাব সেই সেই স্থলে গাড়ির মোড় ফেরাইবার কারণ দ্বৈগুণ্য লৌহের পাটি স্থাপিত হইয়া হাওড়া অবধি ১২১ মাইল চারি বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৫৭ সালে আর ৬৪৯ মাইল কন্‌ট্রাক্টর দ্বারা প্রস্তুত হইবে।"

হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত ৩৭½ মাইল রেল-পথ তৈরী হয়ে ১৮৫৪, ১৫ই আগষ্ট থেকে ট্রেন চলতে সুরু করে। ১৮৫৫, ফেব্রুয়ারী মাসে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ট্রেন চলে। ট্রেন চলবার কয় দিন আগে রেলওয়ে আইন রচিত হয়।

ভারতে প্রথম রেলওয়ে আইন রচিত হয় ১২ আগষ্ট, ১৮৫৪। ১৮৫৪, ১২ সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত এই আইনের 'হেতুবাদ' এইরূপ—

"ইঙ্গরেজী ১৮৫৪ সাল ১৮ আইন
ভারতবর্ষেতে ঐ রেলওয়ের বিষয়ি আইন।

[হেতুবাদ]

"যেহেতুক কোম্পানি বাহাদূরের তত্ত্বাবধানে ও আজ্ঞাধীনে কোন রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা যে সকল রেলওয়ে কোম্পানি বাহাদূরের অধিকৃত ও শাসিত দেশের কোন স্থানে চড়নদারদিগকে কি মাল প্রকাশরূপে লইয়া যাওনের জন্যে খোলা গিয়াছে কি খোলা যাইবেক সেই সকল রেলওয়ে একি আইনের অধীন করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল…"

সে সময় রেলওয়ে কোম্পানীর প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এজেণ্ট ও ম্যানেজার ছিলেন আর ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেনসন। প্রথম রেলওয়ে নিয়ম তাঁর স্বাক্ষরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯ মার্চ্চ, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে।

"এই প্রথম প্রকাশিত নিয়মে ছিল—

১। দ্রব্যের ভাড়া প্রতি ৩ মাইল /০ হিঃ।

২। প্রতি রবিবার ট্রেন চলবে না। * চিহ্নিত ষ্টেশনগুলি ভিন্ন গাড়ী থামবে না।

৩। গাড়ী, ঘোড়া এবং পালকী ট্রেনে নিয়ে যেতে হলে ট্রেন ছাড়বার আধ ঘণ্টা আগে ষ্টেশনে রাখতে হবে।

৪। মানুষের সঙ্গে কুকুর যাবে না। কুকুর যাবে গার্ডস ভ্যানে।

৫। প্রত্যেক প্রধান প্রধান ষ্টেসনে বিশ্রামাগার খোলা যাইবেক তাহাতে খাদ্য দ্রব্য থাকিবেক এবং যে কেহ তদ্দ্রব্যের বন্ধানমত মূল্য প্রদান করিবেন তিনি পাইতে পারিবেন।

৬। ট্রেন সময়ের ১৫ মিনিট আগে ষ্টেসনে উপস্থিত থাকতে হবে। ট্রেন আসবার সময় Termini দপ্তর বন্ধ রাখা হবে এবং "পথের মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত মধ্যবর্ত্তি ষ্টেসন আছে তথায় ৩ মিনিট পূর্ব্বে দপ্তর বন্ধ হয় ইহার পর টিকিট দেওয়া যাইবেক না।"

৭। ১ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের ভাড়া নেওয়া হবে না। ৮ বছর পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক ভাড়া।

৮। মালের মাশুল—

১ম শ্রেণীতে	শত মণে মাইল প্রতি	৵৩
২য় "	" "	।/৬
৩য় "	" "	॥৪

৯। প্রেরণের জন্য মাল "রবিবার ও কৃসমিস ডে ভিন্ন অপর দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে বেলা ৯ ঘণ্টার মধ্যে ও অপরাহ্ণ বেলা ৫ ঘণ্টার মধ্যে মাল ডিপার্টমেণ্টের কেরানির নিকট দিতে হইবেক।"

এইবার আমরা যে সব অঞ্চলে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়, সে সব অঞ্চলের প্রধান-প্রধান স্থানগুলোর তৎকালীন গুরুত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করে প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করব।

কলিকাতা—বৃটিশ-ভারতের রাজধানী। তখন ৫ লক্ষ লোকের বাস। ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত কেল্লায় থাকত ২০ হাজার সৈন্য। প্রতি বৎসর কম-বেশী দেড় কোটি টাকার বাণিজ্য হত।

হাওড়া—দশ আনি জমিদারদের সম্পত্তি ছিল। এখানে জাহাজ তৈরী ও মেরামত হত। এখানে শ্বেতাঙ্গরাই বেশী থাকত, দেশী লোক বাস করত না। "এই স্থানে রেলওয়ের অন্তিম আড্ডা (Station)।"

সালকিয়া (সালিকা)—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তুলা ও অন্যান্য বাণিজ্য-পণ্যের গুদাম ছিল। রেলওয়ে নির্ম্মাণের সময় এখানে ইংরেজের প্রধান বাণিজ্য-পণ্য লবণের আড়ত ছিল। লাহোর ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশ থেকে যে সব বাণিজ্য-পণ্য স্থলপথে, গাড়ীতে ও উটে কলকাতায় আসত, সালকেয় তার আড্ডা ছিল। সালকে থেকে নৌকা বা ষ্টীমারে নদী পার হয়ে কলকাতায় মাল পৌছত।

বেলুড়—তখন খুব ছোট একটি গ্রাম ছিল। এখানে ভাল পেয়ারা ও আতা হত।

বারাকপুর—"এখানে বাহাতুরি চৌকর ও দৌকর এবং বাতি কাষ্ঠ প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই সমস্ত কাষ্ঠ কলিকাতার অন্তঃপাতি বাগবাজারে ক্রয় বিক্রয় হইত, ক্রমে তথায়, বসতি ও অপরাপর বাণিজ্য-দ্রব্য নৌকা যোগে অধিক আসিবাতে নদীতীরে কাষ্ঠ রাখিবার স্থান সংকীর্ণ হইবায় কাষ্ঠের মহাজনেরা বারাকপুরে কাষ্ঠের বি পণি (আড়ঙ্গ) করিল।"

বালি—এখানে প্রায় দুই হাজার ব্রাহ্মণের বাস ছিল। বালি বাংলার অন্যতম প্রধান স্থান ছিল। বহু পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ্ এখানে বাস করতেন। বালির পঞ্জিকা, তখন নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, গণপুর, মৌলা, পোচপাড়া, চন্দ্রদ্বীপ বাকলা ও কুবিজপুরের পঞ্জিকার মতই মান পেত। বালি বাজারে ছিল এক সরাই। বালির খাল থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতি বছর ফেরীতে ৩ হাজার টাকা আয় করত। এই সময় লোহার সেতু তৈরী করেন কর্ণেল গুডউইন। খালপাড়ে চিনির কুঠি ও রম মদের কুঠি ছিল। রেল কোম্পানী রেলওয়ের জন্য ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় করে এক পুল নির্ম্মাণ করেন। পুলের উত্তর ভাগে রেলওয়ের সরঞ্জাম ও লোহার পাটি তৈরী করবার এক কারখানা। কারখানার কাছেই "এষ্টেসন"।

উত্তরপাড়া—প্রথমে স্থাপন করেন গঙ্গারাম রায় চৌধুরী। বহু ভদ্রলোকের বাস ছিল। এ সময় জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্থাপন করেছেন "বিদ্যাধ্যাপনীয় সভা" সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজী শেখাবার জন্যে স্কুল, হাসপাতাল স্থাপিত করেছেন, পথ পাকা করেছেন, মদ গাঁজা ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করেছেন।

ভদ্রকালী ও কোতরং—ক্ষুদ্র গ্রাম। চাষীদের বাস। এখানে চট ও শণের কাপড় তৈরী হত।

কোন্নগর—ভদ্র পল্লী। দুই পাঠশালা। 'ধর্ম্ম-মর্ম্ম প্রকাশিকা' নামে ধর্ম্ম-সভা থেকে প্রতি মাসে হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশিত হত। এখানে হরসুন্দর দত্তের দ্বাদশ মন্দিরওয়ালা ঘাটই দ্রষ্টব্য ছিল।

রিসড়া—রিসড়া তখন পানের চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। গঙ্গার তীরে নীলের আবাদ হত। এখানে মিঃ অকল্যাণ্ডের এক মস্ত পেটো সুতার কল ছিল। এখানে ছিল দিনেমার কোম্পানীর জাহাজ মেরামতী ডক। পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের জন্য রিসড়ায় হাট ছিল।

মাহেশ—ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দির ও রথের জন্য প্রসিদ্ধ। জ্যৈষ্ঠের স্নানযাত্রায় ও আষাঢ়ের রথে যে মেলা হত তাতে বহু দূর থেকে প্রায় ২০ হাজার লোকের সমাগম হত। রথের মেলা আট দিন থাকত।

বল্লভপুর—এখানে প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে রুদ্র পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ স্থাপন করেন। মাহেশ ও বল্লভপুরের চড়ায় ভাল নীলের চাষ হত। রেলওয়ে স্থাপনের সময় এ অঞ্চলের বহু লোক ভাল ইট বানিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করত।

শ্রীরামপুর—শ্রীপুর, গোপীনাথপুর ও মোহনপুর এই ৩খানি গ্রাম কিনে নিয়ে ডেনিস কোম্পানী নাম রেখেছিল ফ্রেডিক্স নগর, ডাক নাম শ্রীরামপুর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা গোপনে ব্যবসা করে টাকা ফরাসী, ডাচ, সুইস ও ডেনিস কুঠিতে জমা দিয়ে হুণ্ডী দেশে পাঠাত। শ্রীরামপুরের পত্তন ও উন্নতি করে ডেনিসরা। এখানে বছরে ২০খানি ডেনিস জাহাজ পণ্য নিয়ে আসত। [illegible] বাণিজ্য-সূত্রে শ্রীরামপুরের রামনারায়ণ ও হরিনারায়ণ গোস্বামী বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করে সর্ব্বপ্রধান ধনী হয়েছিলেন। রেলওয়ে পত্তনের প্রাক্কালে কলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে ধনীরা শ্রীরামপুরে জমি কিনেছিলেন। ইংরেজের অত্যাচারে মানী ও ধনীরা শ্রীরামপুর গিয়ে আশ্রয় নিতেন। ইংরেজের চোখে এঁরা ছিলেন 'বদমায়েস'। Sanders, Cones and Co's Railway Guide তাই এ সময়ে লিখেছিল—"Serampore formerly the house of refuge for Insolvent debtors and rogues." ডাঃ কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ইংরেজ সরকারের ভয়ে এখানে ডেনিসদের আশ্রয় নিয়ে ভবিষ্য বাংলা সংস্কৃতির পত্তন করেছিলেন শ্রীরামপুরে বসে। এঁরা ভারতে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন, সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন করেছিলেন, শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮) ও ৪০ হাজার বই দিয়ে অদ্ভুত গ্রন্থাগার 'স্থাপন করেছিলেন। শ্রীরামপুরে 'কেরি সাহেবের বাগানে' ৩ হাজার নানা জাতীয় গাছ ছিল। এই তিন মিশনারীই ভারতের প্রথম কাগজের কল স্থাপন করেন এখানে। রেলওয়ে স্থাপনের সময় এখানে ৪টি ছাপাখানা ছিল—'কেরি সাহেবের ছাপাখানা', 'শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্র', কেশব কর্ম্মকারের 'জ্ঞানারুণোদয় যন্ত্রালয়', দে-চৌধুরীদের 'শ্রীরামপুর তমোহর যন্ত্র'। কেরির ছাপাখানা থেকে প্রকাশ হত, 'Friend of India' 'সংবাদপত্র ও বাংলা' 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট।'

রেলওয়ের জন্য শ্রীরামপুরের ২৩ বিঘা জমি ও ৪১০টি গাছ, ১৩ ঝাড় বাঁশ ও ১০খানি খড়ো ঘর ও ২খানি পাকা বাড়ী নষ্ট করা হয়। এখানে বেশীর ভাগ লোকেরই উপজীবিকা ছিল রেশমের ব্যবসায়।

চাতরা—৪০০ বছর আগে ভীষণ বন ছিল। সেখানে তপস্বী কাশীশ্বর পণ্ডিতের (চাতরার চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ) সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়। রেলপথ প্রবর্ত্তনের সময় এখানে মাত্র ১৩ ঘর লোকের বাস। বাঘের উৎপাতে এখানকার অনেক নারী বিধবা হয়, এদের বলা হত, 'বেগো রাঁড়'। শ্রীরামপুর শহর হবার পর অনেক জাহাজ এখানে গতায়াত করতে থাকলে চাতরায় 'হামার' 'কাতা' ও 'লাকলাইন' দড়ী তৈরী হতে থাকে। হামারের ব্যবসায়ে অনেকে ধনী হয়। এখানে ভাল পান জন্মিত, কাজেই চাতরায় অনেক বারুজীবির বাস ছিল।

শেওড়াফুলি—আগে অরণ্য ছিল। হরিশ্চন্দ্র রায় শেওড়াফুলির গঙ্গাতটে কালীমূর্ত্তি স্থাপন করেন ও বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের কাছে বৈদ্যবাটীর বিখ্যাত হাট বসান হলে ব্যবসায়ীদের সমাগম হতে থাকে। শেওড়াফুলির শনি-মঙ্গলবারের হাট থেকে তরিতরকারী কেনবার জন্য কলকাতা হতে ২ শত নৌকা আসত।

বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর—প্রাচীন গ্রাম। এখানে শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছায় নিম গাছে চাঁপা ফুল ফুটেছিল। বৈদ্যবাটীর যে ঘাটে শ্রীচৈতন্য গঙ্গাস্নান করেন, তাহার নাম "নিমাইতীর্থের ঘাট"। বিভিন্ন যোগে বহু নর-নারী এই ঘাটে স্নান করতে আসে। এখানে ডাল কলাইয়ের গঞ্জ ছিল; তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়গণ এই গঞ্জ ভদ্রেশ্বরে স্থানান্তরিত করেন। ভদ্রেশ্বরও এ সময়ে বাংলার বিখ্যাত শস্যগঞ্জে পরিণত হয়।

চন্দননগর ও ফরাসডাঙ্গা—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ ক্লাইভ এই সহর থেকে ১২ লক্ষ টাকা লুঠ করে। এ সময় ফরাসডাঙ্গায় ৪০০০ অট্টালিকা ছিল। ফরাসীরা নগরের পার্শ্বে রেলওয়ে ষ্টেশন করতে দেন নাই, তাই খলসি নামক স্থানে রেলওয়ে ষ্টেশন করা হয়।

চুঁচুড়া—১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজরা শহরটি স্থাপন করে। পলাশী যুদ্ধের আগে এখানে তাদের ব্যবসায় প্রতিপত্তি ছিল। মুসে পিরণ

নামক মারাঠাদের অধীনে এক ফরাসী সেনানায়কের বিরাট ভবনে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া হুগলী জিলাভুক্ত হয়।

হুগলী—হাওড়া থেকে ২৪ মাইল। মুসলমান আমলে হুগলী ছিল বাংলার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-স্থান। ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ সবারই এখানে কুঠি ছিল। এখানে ইংরেজদের সোরার মস্ত কারবার ছিল। ১৭৫৭ খৃঃ বর্গীরা হুগলী লুঠ করে। হুগলীর নিকট দেবীদাসতলা নামে এক স্থানে শীতকালে অত্যন্ত শীত হলে বরফ পড়ত, বাংলায় কোথাও তা হত না।

সপ্তগ্রাম—এই স্থান দিয়ে গঙ্গার প্রধান স্রোত প্রবাহিত হয়ে বারুইপুর ও রাজগঞ্জ হইয়া সমুদ্রে পতিত হ'ত। নদীর স্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হওয়ায় এই প্রচীন বাণিজ্য-সমৃদ্ধ স্থান নষ্ট হয়ে যায়। নদীর শুষ্ক বক্ষের উপর ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করে এক রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণ করা হয়।

মগরা—হাওড়া থেকে ২১ মাইল। এখানে এক লোহার সেতু ছিল। এই সেতুর ওপর দিয়ে শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতি বৎসরে ৭৩ হাজার বোঝাই গাড়ী, ১৭,১৫৫ খালি গাড়ী, ৬৪,৪১৫টি বলদ ও ৩৩১টি সরকারী ডাক হুগলী থেকে বর্দ্ধমানে যেত। রেলপথ প্রবর্ত্তনের সময় যে খালের ওপর মগরার পুল তৈরী করা হয়, দু'শ বছর আগে সেখান দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত ছিল।

পাণ্ডুয়া—হাওড়া থেকে ৩৮ মাইল। যেখানে পাণ্ডুয়া রেলওয়ে ষ্টেশন নির্ম্মাণ করা হয়েছিল, তার ২০০ ফুট দূরে ছিল প্রদ্যুম্ননগরের 'অমৃতকুণ্ড'।

মেমারি—পাণ্ডুয়ার কাছেই বৈঁচি। রেল প্রবর্ত্তনের সময় বৈঁচি জনবহুল ছিল। এর পরই মেমারি ষ্টেশন স্থাপন করা হয়। পূর্ব্বে এখানেই ডাকের ঘাঁটি বা ডাক বাঙ্গালা ছিল। মেমারির কাছেই দামোদর নদের উপর ২৮০ খিলানযুক্ত ইটের এক পুল রেল কোম্পানী ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নির্ম্মাণ করে। এরই বাঁ দিকে পাদরীদের বাসস্থান ও গির্জ্জা ছিল। তার পর বাঁকা নদী। বাঁকার উপরেও এক লৌহসেতু নির্ম্মাণ করা হয়।

বর্দ্ধমান—সেকালে প্রসিদ্ধ নগর ছিল। রাজবাড়ীর ১ মাইল দূরে প্রথম রেলওয়ে ষ্টেশন নির্ম্মাণ করা হয়। ষ্টেশনের বাঁ দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য-ঘাঁটি, ডাক বাঙ্গালা ও জেল। ষ্টেশনের পাশ দিয়ে মুর্শিদাবাদ যাবার রাজপথ। এখান থেকে অজয় তটবর্ত্তী তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ইলামবাজারের কাছ দিয়ে রাণীগঞ্জ যাবার রেলপথ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করা হচ্ছিল।

কাটোয়া—কাটোয়া গঞ্জ, যার আগের নাম ছিল 'গঞ্জ মুর্শিদপুর'—এখান থেকে বড়-বড় সওদাগরী নৌকা অজয় দিয়ে চলাচল করত। কাটোয়া গঞ্জ শত বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রেশ্বরের মত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান ছিল।

বড়পেঁতো—প্রাচীন গৌড় থেকে ৫ ক্রোশ আর মালদহ থেকে ৩½ ক্রোশ দূরে। এখানে এক অদ্ভুত প্রাচীন রাজপথ দিয়ে শত বৎসর পূর্ব্বে মালদহ থেকে দিনাজপুরে যাতায়াত করা যেত। এই "মশলায় জমাট করা" রাজপথ দিয়ে শত বৎসর পূর্ব্বে রেল-পথ নির্ম্মাণ করা হয়—"এই স্থান দিয়া রেলওয়ে শ্রেণী নির্ম্মাণ হইতেছে তদ্দারা ডার্জ্জিলিং (দুর্জ্জয় লিঙ্গ) সকরিগলি, মালদহ, কাহালগাঁ, পাতুরে ঘাটা, মুঙ্গের, পাটনা প্রভৃতি স্থান সুগম্য হইবে।"

মানকর—হাওড়া থেকে ৮১ মাইল। শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে চিনি ও তুলার গঞ্জ ছিল। গ্রামে ছিল প্রায় ৫০০০ লোকের বসতি।

তমলা—হাওড়া থেকে ১০২ মাইল। দক্ষিণে গভীর বন ছিল রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বামে দামোদর ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে কালীপুরের জঙ্গল ছিল।

"কালীপুর জঙ্গলের মধ্য দিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘে এবং ৩৬ ফিট গভীর করিয়া পাহাড় কাটা হইয়াছে তাহাতে যে প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা লৌহ-যুক্ত, তন্নিম্নে বেলে পাতর, তাহার নিম্নে গৈরিক-মৃত্তিকা। এই অর্দ্ধ ক্রোশের উপর অশীতি ফিট বিস্তার এমত এক ইষ্টক নির্ম্মিত পুল হইয়াছে। এই স্থান হইতে ঐ অঞ্চলের সুন্দর দর্শন হয়। এই স্থানের পশ্চিম রাণীগঞ্জ যাইবার রেলওয়ে শ্রেণীর ভেড়ি। এই ভেড়িতে ২০ ফিট প্রশস্ত এমত সতের খিলানযুক্ত এক স্থলসেতু আছে। সেই সেতুর নাম তমলা বায়াডক্ট অর্থাৎ তমলার স্থলপুল। এই পুল ১৮৫৩ সনের এপ্রিল মাসে নির্ম্মাণারম্ভ হইয়া অষ্টম মাসের মধ্যে সমাপন হইয়াছে। দূর হইতে এই স্থলপুল সামান্ত জ্ঞান হয় কিন্তু যত তাহার নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় ততই তাহা অতি সুদৃঢ়তর রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে এমত বোধ হইয়া থাকে।"
—সমসাময়িক বিবরণ।

রাণীগঞ্জ—১৮২০ সালে মিঃ জোন্স রাণীগঞ্জের নিবিড় জঙ্গলে কয়লা-খনি আবিষ্কার করেন। তৎপর দেড় লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে বেঙ্গল কোল কোম্পানী স্থাপিত হয়। শত বছর পূর্ব্বে এখান থেকে প্রতি বছর ৮১ হাজার টন কয়লা দামোদর নদ দিয়ে কলকাতায় চালান দেওয়া হত। তখনকার দাম ছিল রাণীগঞ্জে টন-প্রতি ১০ টাকা। ১৮৫৫, ফেব্রুয়ারী মাসে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ট্রেন চলে।

রেলপথ

"লৌহবর্ত্ম। পরস্পর সমান্তরাল ভাবে স্থাপিত লৌহদণ্ডদ্বয়, ইহা বাষ্পীয় শকটাদির গমনাগমনে বিশেষ উপযোগী। শকটচক্রের অনবরত ঘর্ষণ হ্রাস করিবার জন্যই এই কৌশল অবলম্বিত হয়। ট্রাম-পথ হইতেই রেলপথের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে বাষ্পীয় যান যে রেলপথে যাতায়াত করিতেছে, তাহার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি ইংলণ্ড দেশে হইয়াছিল।" —বিশ্বকোষ।

[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ঠিক সমুদ্রের উপকূল ঘেঁষে 'সাগর-সৈকত' হোটেলটি। বলতে গেলে ছোটখাটো সহরটিই যেন গড়ে উঠেছে সাগরেরই কূল ঘেঁষে। সহরটিতে নানা শ্রেণীর স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভিড় ও আনাগোনা যেন লেগেই আছে। এবং একমাত্র বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের বাকী সময়টা নানা জাতীয় নানা শ্রেণীর যাত্রীদের আনাগোনা চলে। মাঝে-মাঝে হোটেলে স্থান পাওয়াই দুষ্কর হ'য়ে ওঠে। 'সাগর সৈকত' হোটেলটির মালিক একজন সিন্ধী। সময়টা মাঘের শেষ এবং শীত এখনো যেন বেশ আঁকড়েই বসে আছে এখানে। কিরীটির ধারণা, শীতকালে কোন সমুদ্রসৈকতই নাকি রৌদ্র সেবনের প্রকৃষ্ট স্থান এবং এমন কোন স্থানে আসতে হলে নাকি মনের মত একজন সঙ্গী বা সাথী অপরিহার্য, অতএব আমাকেও সে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে, আমার কোন যুক্তিতেই সে কান দিতে চায়নি।

আমি অনেক করে ওকে বুঝাবার চেষ্টা করেছিলাম রৌদ্র সেবনের আমার আদৌ প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমার জন্মগত দৈহিক কৃষ্ণ বর্ণের উপরে আর এক পোঁচ কৃষ্ণ রং, সূর্য দেবতার নিকট হতে আমি গ্রহণে একান্তই অনিচ্ছুক কিন্তু যুক্তি আমার সে মেনে নিতে রাজী হয়নি, বলেছে, 'গায়ের রংটাই বড় কথা নয় সুব্রত! আমাদের মাথার মধ্যে যে স্নায়ুকোষ গ্রে সেলগুলো আছে সূর্যরশ্মির মধ্যস্থিত বেগুনী পারের আলোর প্রভাবে সেগুলো আরো সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া সমুদ্রের মত মনের খোরাকও কেউ দিতে পারে না। তুই দেখবি, কি আশ্চর্য রকম সক্রিয় করে তোলে রৌদ্র সেবন তোর মনকে ও চিন্তাশক্তিকে—

'কিন্তু রৌদ্র সেবন ত এখানে বসেও চলতে পারে?'

'উঁহু'! এখানে হলে চলবে না। রৌদ্র সেবনেরও অনুপান আছে—সমুদ্র-সৈকত!—' কিরীটি মাথা নেড়ে জবাব দেয়।

কিরীটির যুক্তিকে হয়ত তর্কের ঝঞ্ঝা তুলে কিছুক্ষণ ক্ষত-বিক্ষত করতে পারতাম কিন্তু তাতেও তাকে নিরস্ত্র করা যেত না; কারণ, রৌদ্র সেবন ও সমুদ্র সৈকত একটা অছিলা মাত্র। মোট কথা মনে-মনে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গা সে স্থির করেছে এবং কিছু দিনের জন্য সে সেখানে গিয়ে নিরবচ্ছিন্ন খানিকটা নিষ্ক্রিয় আরাম উপভোগ করতে চায় এবং সাথী হতে হবে আমায়, তাই বৃথা আর যুক্তি-তর্কের জাল না বুনে একান্ত ভাবেই ওর হাতে আত্ম-সমর্পণ করে দিন পাঁচেক হলো আমরা এই জায়গাটিতে এসে 'সাগর-সৈকত' হোটেলে অধিষ্ঠিত হয়েছি, এবং হোটেলের সামনে খোলা জায়গাটিতে বসে রীতিমত রৌদ্র সেবনও চলেছে আমাদের।

'সাগর-সৈকত' হোটেলটি থেকে সমুদ্র হাত কুড়ি-পঁচিশের বেশী দূর হবে না। হোটেলের বারান্দা হতে সমুদ্র একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়—ঐ দিগন্তে আকাশ ও সমুদ্র যেন প্রীতির আনন্দে কোলাকুলি করছে। একটানা সমুদ্রের নোণা বাতাসে ভেসে আসছে যেন অবিশ্রাম নিষ্ঠুর চাপা হাসির একটা উল্লাস। সফেন তরঙ্গগুলি যেন আদি-অন্তহীন সমুদ্রের ঝকঝকে করাল দন্তপাঁতি। পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। বলতে গেলে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মাটি যেটুকু সমুদ্রের বলয়গ্রাসের বেষ্টনীতে বন্দী হয়ে আছে, সেটুকুও যেন গ্রাস করবার জন্য দুরন্ত নিষ্ঠুর ঐ জলধির চেষ্টার অন্ত নেই। ব্যাকুল নির্মম লক্ষ লক্ষ বাহু প্রসারিত করে মুহুর্মুহু সে এসে মাটির বুকে দুরন্ত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ক্ষুরধার তৃষিত লোল জিহ্বা দিয়ে লেহন করে নিষ্ঠুর কলহাসিতে যেন পরক্ষণেই আবার ভেঙ্গে শতধায় গুঁড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটা হবে। সূর্যের তাপ এখনো প্রখর হয়নি। হোটেলের সামনেই বালুবেলার উপরে নিত্যকারের মত আমি ও কিরীটি দু'টো ক্যাম্বিশের ফোলডিং চেয়ার পেতে কিরীটিরই নির্দেশ মত মাথায় শোলার হ্যাট্ চাপিয়ে গেঞ্জী গায়ে পায়জামা পরিধান করে যথানিয়মে রৌদ্র সেবন করছি, রৌদ্র সেবনের ফলাফল যাই হোক, শীতের সকালে সমুদ্রোপকূলে বসে রৌদ্রের তাপটুকু বেশ উপভোগই করছিলাম।

অল্প দূরেই সমুদ্র সৈকত এবং শীতকাল হলেও নানা জাতীয় যুবা-বৃদ্ধ-পুরুষ-রমণী ও কিশোর-কিশোরী স্নানার্থী ও দর্শকদের ভিড়ে সমুদ্র সৈকতটি আলোড়িত হচ্ছে এবং মধ্যে মধ্যে তাদের উল্লাসের সুস্পষ্ট গুঞ্জনও কানে আসছে সাগর বাতাসে ভেসে।

হোটেলের সামনে যে জায়গাটিতে আমরা বসে আছি তাকে ছোটখাটো একটা উদ্যান বলা চলে। নানা জাতীয় পাতাবাহারের গাছ ও মরশুমি ফুলের বিচিত্র রঙিন সমারোহ স্থানটিকে সত্যিই মনোরম করে রেখেছে। হোটেল থেকে যে পায়ে-চলা পথটা বরাবর সাগর সৈকতে গিয়ে মিশেছে তার দু'পাশে ঝাউয়ের বীথি। সাগর বাতাসে ঝাউ গাছের পাতায় একটা করুণ কান্না যেন নিরন্তর দীর্ঘশ্বাসের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অল্পক্ষণ আগে কিরীটি তার মাথা হতে শোলার টুপিটা খুলে একটা মোটা লাঠির মাথায় বসিয়ে পাশেই বালুর মধ্যে লাঠিটা পুঁতে দিয়ে আড় হয়ে আরাম-কেদারাটার উপরে বাম হাঁটুর উপরে ডান পা'টা তুলে দিয়ে মৃদু মৃদু নাচাচ্ছিল সামনের সাগর সৈকতের দিকে তাকিয়ে। হাতের মুঠোয় ধরা একটা ইংরাজী উপন্যাস। হঠাৎ আমাকে সম্বোধন করে বললে, 'সু, ঐ যে শাদা

ফ্ল্যানেলের প্যান্ট ও গায়ে কালো গ্রেট কোট একটা চাপিয়ে যুবকটি এই দিকেই আসছে, শ্রেফ ওর চলা দেখে এই মুহূর্তের ওর মনের চিন্তাধারার একটা study করে বলতে পারিস কিছু ?—'

হাতের মধ্যে ধরা বাংলা বইটা বুজিয়ে কিরীটির কথায় সামনের দিকে তাকালাম : শ্লথ মন্থর পায়ে যুবকটি এই দিকেই আসছে। একেবারে পথের ধারের ঝাউ বীথি ঘেঁষে আসছে যুবক। মুখের রং শ্যামবর্ণই। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বাতাসে চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে উড়ছে। চুলের সঙ্গে তেলের বা চিরুণীর যে সংস্পর্শ বড় একটা নেই বোঝা যায় বিস্রস্ত রুক্ষ চুলগুলো দেখেই। যুবকের দু'টি হাতই পরিহিত গ্রেট কোটের দু'পাশের পকেটে প্রবিষ্ট। মুখটা নিচু করে হাঁটার দরুণ মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। মনে হয়, কোন কারণে যুবক যেন একটু চিন্তিতই !

'ভদ্রলোকটি বোধ হয় কিছু ভাবছেন ?—'

'ভাবছেন ! কি ভাবছেন ?—' কিরীটি প্রশ্ন করে : হিত না অহিত ?'

চলতে চলতে ঐ সময় যুবকটি একবার সামনের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাল।

'তা কি করে বলি, থট্‌রিডিং ত জানা নেই ?'

'থট্ রিড করতে ত বলিনি তোকে, বলেছি ভদ্রলোকের গেইট্ অর্থাৎ চলাটা দেখে বলতে,—অর্থাৎ পা থেকে মাথা !—'

কিরীটির মুখের কথাটা শেষ হলো না, হঠাৎ কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এলো। সেই সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় উপবিষ্ট কিরীটির পাশেই লাঠির মাথায় বসান তার শোলার টুপিটা ছিট্‌কে গিয়ে মাটিতে পড়ল ও অস্ফুট একটা কাতর শব্দও কানে এলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় দু'জনেই চম্‌কে উঠেছিলাম। জায়গাটায় হাওয়া ছিল কিন্তু হাওয়ার বেগ এত ছিল না যাতে করে সহসা অমন করে লাঠির মাথায় বসান কিরীটির টুপিটা উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়তে পারে।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, মাত্র হাত ৮।১০ ব্যবধানে একটু পূর্বে যে যুবকটিকে কেন্দ্র করে আমাদের কথাবার্তা চলছিল সে বাঁ হাতে তার নিজের ডান কাঁধটা চেপে মাটির উপরেই বসে পড়েছে। আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম যুবকটির দিকে। তার সামনে গিয়ে পৌঁছাবার আগেই যুবক উঠে দাঁড়িয়েছে : চোখে-মুখে তার সুস্পষ্ট একটা যন্ত্রণার চিহ্ন। যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে আমিই প্রশ্ন করলাম, 'পড়ে গিয়ে হঠাৎ কাঁধে লাগল বুঝি ?—পড়ে গেলেন কি করে ?—'

আমার প্রশ্নে যুবকটি মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। মৃদু কণ্ঠে বললে, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ কাঁধে যেন একটা ধাক্কা লাগতে পড়ে গেলাম আচম্‌কা !—না, তেমন কিছু লাগেনি !—'

'হঠাৎ ধাক্কা লাগল মানে ?—' বিস্মিত আমি প্রশ্ন করলাম।

কিরীটি ইতিমধ্যে তার টুপিটা মাটি হতে কুড়িয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কখন টের পাইনি। সহসা অতি নিকটে তার কণ্ঠস্বর শুনে যুগপৎ আমরা দু'জনেই ফিরে তাকালাম।

'মনে হচ্ছে একটা বুলেট শুব্রত—'

'বুলেট !—' সবিস্ময়ে কথাটা উচ্চারণ করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে ঘুরে তাকালাম।

কিরীটি কিন্তু তখনও গভীর মনোযোগ সহকারে তার হস্তধৃত টুপিটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছে এবং দেখতে-দেখতেই মৃদু কণ্ঠে বললে, 'হাঁ, নিশ্চয়ই it was a bullet and that blessed bullet pierced through and through my poor hat !'

এবং কথাটা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় হস্তধৃত টুপিটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, 'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথাটা ? Well see !—এই দেখ !—'

তাকিয়ে দেখলাম কিরীটির কথা মিথ্যা নয়, সত্যি। টুপিটার দুই দিকে দু'টি গোলাকার ছিদ্র।

'কিন্তু সর্বাগ্রে আপনাকে একবার দেখা দরকার—' বলতে-বলতে কিরীটি আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান যুবকটির দিকে অগ্রসর হয় : বুঝতে অবশ্য পারছি আঘাতটা নিশ্চয়ই তেমন মারাত্মক হয়নি; তা হলেও ক্ষতস্থানটা আপনার কাঁধের একটি বার পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। জামাটা খুলুন ত !—'

'না ! না—বিশেষ কিছু হয়নি—' যুবকটি কাঁধের উপর থেকে ততক্ষণে হাতটা সরিয়ে নিয়েছেন, স্মিত ভাবে বললেন : 'ব্যস্ত হবেন না।'

'আপনি বলছেন কি—মানে—'

'আমার নাম শতদল বোস্। না, ব্যস্ত হবার কিছু নেই।—' মৃদু হাস্যতরল কণ্ঠে জবাবটা দিলেন মিঃ বোস্। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় গায়ের গরম ওভার কোটটা খুলে ফেলে দিলেন। কোটের নীচে সাদা টুইলের সার্ট ছিল। দেখা গেল, মিঃ বোসের কথাই সত্য। গুলীটা তাঁর কাঁধ ছুঁয়ে গেলেও কোটের নীচে সার্ট পর্যন্তও পৌঁছায়নি। বোধ হয় সামান্য কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁয়ে গেছে যার ধাক্কাতেই বেমক্কা তিনি টলে পড়ে গেছেন।

'যাক্ গে, না লেগে থাকলেই ভাল ! But it was a bullet—এ যাত্রা খুব বেঁচে গেছেন যা হোক !—' কিরীটি স্বস্তির একটা নিশ্বাস নিয়ে বলে।

মিঃ বোস্ আবার কথা বলেন, 'কিন্তু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না ত। আপনি বলেছেন একটা বুলেট। কিন্তু কই কোন ফায়ারিংএর শব্দও ত শুনলাম না ? তাছাড়া এখানে আমাকে গুলীই বা করবে কে ? এবং কেন ?—'

'কে আর করবে। করছেন অবশ্য তিনিই যিনি হয়ত এ পৃথিবীতে আপনার বেঁচে থাকাটা বাঞ্ছনীয় মনে করছেন না। তাছাড়া ফায়ারিংএর শব্দ বলছেন ? সমুদ্রের হাওয়া ও সী-বীচের স্নানার্থীদের একটানা হৈ-হল্লার মধ্যে ফায়ারিংএর শব্দটা না শুনতে পাওয়াটাও বিশেষ কিছু আশ্চর্য নয়। তাছাড়া পিস্তলে সাইলেন্সারও ত লাগান থাকতে পারে। তাতেও আপনি ফায়ারিংএর শব্দ শুনতে পারবেন না। কিন্তু কেউ না কেউ যে একটা গুলী ছুঁড়েছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।—' বলতে-বলতে হঠাৎ কথাটার মোড় ঘুরিয়ে কিরীটি অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় : 'আপনিও আমাদের মত স্বাস্থ্যান্বেষী নাকি মিঃ বোস্ ? না এইখানেই থাকেন ?'

'আজ্ঞে, দু'টোর একটাও নয়। মাসখানেক হলো বিশেষ একটা কাজে এখানে এসে আছি। ঐ যে দেখছেন দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের উপর বাড়িটা—ঐ বাড়িতেই আমি থাকি।—'

১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে)
আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীতদিকে ফোন- এভিন্যু ১৭৬১ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,

ব্রাঞ্চ—হিন্দুস্থান মার্ট, বালিগঞ্জ ফোন—পি. কে.

শতদল বাবুর কথা অনুসরণ করে দক্ষিণ দিকে আমরা তাকালাম। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে একটা ছোট পাহাড়, তারই উপরে যেন ঐতিহাসিক দুর্গের মত বাড়ীটা দূর থেকে মনে হয়। দুর্গের মত পাহাড়ের উপরের ঐ বাড়িটার প্রতি এখানে এসে পৌঁছবার পর-দিনই প্রত্যুষে কিরীটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দূর হতে মনে হয় একখানা ছবি। পাহাড়টা লোকালয় হ'তে আধ মাইলটাক দূর ত হবেই।

কিরীটি শতদল বাবুর কথায় দূর পাহাড়ের মাথায় দুর্গের মত বাড়িটার দিকে তখনও তাকিয়ে ছিল অন্যমনে। এক সময় ঐ দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে: 'অদ্ভুত জায়গায় বাড়িটা তৈরী করা হয়েছে। বাড়িটা যিনি তৈরী করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে দু'টো কথা কেউ না বললেও স্বতঃই মনে হয়—'

'কি বলুন ত ?—' সকৌতুকে শতদল প্রশ্ন করে।

'প্রথমতঃ যিনিই বাড়িটা তৈয়ারী করে থাকুন বিশেষ খেয়ালী প্রকৃতির ছিলেন তিনি। দ্বিতীয়তঃ তাঁর অর্থের অভাব ছিল না—'

'আশ্চর্য! সত্যিই তাই। বাড়িটা আমার দাদা মশাইয়ের। এক কালে পূর্ববঙ্গে ওঁদের সুবিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল। যার আয় ছিল শুনেছি প্রায় বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা। আর দাদা মশাই লোকটিও ছিলেন নিজে এক জন নাম-করা চিত্র ও মৃৎশিল্পী। শিল্পী রণধীর চৌধুরীর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই ?—'

'নিশ্চয়ই। শুনেছি বৈ কি। অত বড় শিল্প-প্রতিভা নিয়ে আমাদের দেশে খুব কম লোকেই জন্মেছেন। আপনি তাঁরই দৌহিত্র ?—'

'হাঁ। তাঁর একমাত্র মেয়ের একমাত্র পুত্র। তাঁর বিরাট সম্পত্তির শেষ ও একমাত্র অবশিষ্ট তাঁর ঐ 'নিরালা' নামক পাহাড়ের উপরে বাড়িখানার ওয়ারিশন।—' মৃদু হাস্যতরল কণ্ঠে শতদল বললে।

'এক জন শিল্পীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মূল্যের দিক দিয়ে যাচাই করতে গেলে হয়ত আপনাকে হতাশই হতে হবে। কিন্তু সাগরের উপকূলে ঐ পাহাড়ের উপর নগরের কোলাহল হতে দূরে অমন একখানা বাড়ির মধ্যে যে মহামূল্যবান সৌন্দর্যসৃষ্টির ইংগিত ওর প্রতিটি গাঁথুনীর মধ্যে ওতপ্রোত হ'য়ে জড়িয়ে আছে, তার মূল্য নিছক শ্রেফ কাঞ্চন-মূল্যে ত ধার্য করা যায় না শতদল বাবু!—বিশেষ মূল্যেই যে ওর বিশেষত্ব!—'

শতদল বাবু কিরীটিকে বাধা দিয়ে কি বলতে উদ্যত হতেই কিরীটি বলে ওঠে: না, না—শতদল বাবু! এ সংসারের সব কিছুকেই নিছক টাকার নিক্তিতে ওজন করবেন না। এ শিল্পীর প্রতিভা—'

'আপনিও হয়ত আমার দাদুর মতই শিল্প-পাগল, তাই ও নির্জন সমুদ্রের উপকূলে জনমানবের বসতি ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপরে বাড়িখানা দূর থেকে দেখেই অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যের আভাস পাচ্ছেন। এবং বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করলে হয়ত আরো কিছু দেখতে পাবেন। কারণ, বাড়ি-ভর্তি সব নর-নারীর ষ্ট্যাচু এবং অয়েল ও ওয়াটার কলার পেণ্টিং, এ ছাড়া আর কিছুই নেই কিন্তু আমি অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক লোক, অতি সাধারণ ছাপোষা মধ্যবিত্ত মানুষ, আমার কাছে ওর কি-ই বা মূল্য বলুন!—' শতদল হাসতে হাসতে বলে।

'মানুষের মন এমনিই বিচিত্র বটে মিঃ বোস্! কিন্তু মন আপনার যতই বস্তুতান্ত্রিক হোক আপাততঃ, ক্ষমা করবেন একটা কথা আপনাকে আমি কিন্তু না বলে পারছি না; আপনার প্রাণটি নেবার জন্য কেউ না কেউ অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন।—'

'এইবারই হাসালেন মশাই! আমার মত এক জন অতি সাধারণ লোকের প্রাণের এমন কি মূল্য আছে বলুন ত যে সেটি নেবার জন্য কেউ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে? না আছে আমার অগাধ সম্পত্তি না আছে এ দুনিয়ায় আমার কোন শত্রু।—'

'হতে পারে, তবে আমার কথায় যদি বিশ্বাস করেন তাহলে জানবেন it was a pure and simple attempt on your life!—'

'সত্যি নাকি! আমার কৌতূহলটা মাপ করবেন, আপনার নামটি জানতে পারি কি ?—'

'কিরীটি রায়!—' মৃদু কণ্ঠে কিরীটি জবাব দেয়।

'নমস্কার! আপনিই কি বিখ্যাত সেই রহস্যভেদী কিরীটি রায় ?—'

'বিখ্যাত কি না জানি না, তবে আমিই কিরীটি রায়!—' মৃদু হেসে কিরীটি জবাব দেয়।

'আর উনি ?—'

'সুব্রত!—'

'কি সৌভাগ্য, আপনাদের মত লোকের এখানে পদার্পণ হয়েছে অথচ জানতেও পারিনি! তা আসুন'না আজ আমার বাড়িতে। রাত্রির আহার-পর্বটা গরীবের ঘরেই সারবেন—'

'বিলক্ষণ, সে এক দিন হবে'খন, তবে আজ নয়, কাল সকালের দিকে যাবো আপনার ঐ বাড়িটি দেখতে—' কিরীটি জবাব দেয়।

'আসবেন, নিশ্চয়ই আসবেন কিন্তু—' শতদল বাবু অনুরোধ জানান দরদ দিয়ে।

'যাবো কিন্তু আমার কথাটা মনে থাকে যেন!—'

'কি বলুন ত ?—' শতদল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকাল আবার।

'একটু সাবধানে থাকবেন। আপনার আততায়ীটির নিশানা একবার ব্যর্থ হলেও বার বার ব্যর্থ না-ও হতে পারে।'

'সত্যিই কি আপনার তাই সন্দেহ নাকি কিরীটি বাবু, আমার জীবনের উপরেই কেউ attempt নিয়েছিল ?—'

'কোন ভুল নেই তাতে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, একটু ভেবে বলুন ত আজকের এই দুর্ঘটনার আগে আপনার অন্য কোন accident দু'-দশ দিনের মধ্যে হয়েছে কি না ?—'

'Accident ?—'

'হাঁ, মানে কোন প্রকার দুর্ঘটনা ?—'

'কই, এমন বিশেষ কোন ঘটনা ত আমার মনে পড়ছে না যাকে প্রাণহানিকর দুর্ঘটনার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে ?—'

'ভেবে দেখুন—'

'না মশাই! তবে—কিন্তু তাকে দুর্ঘটনাই বা বলি কি করে এবং সেগুলো যে আমার জীবনের 'পরেই attempt নেওয়া হয়েছে তাই বা—'

'কি ঘটেছিল বলুন ত ?—'

'এমন বিশেষ কিছুই নয়। এই ত পরশু রাত্রে যে ঘরে শুই—আমার ঠিক শিয়রের ধারে মাথার উপরে দেওয়ালের গায়ে মস্ত বড় একটা অয়েল পেণ্টিং টাঙ্গানো ছিল হঠাৎ মাঝ-রাত্রে সেটা ছিঁড়ে আমার মাথার কাছেই পড়ে—অবশ্য অল্পের জন্যই আঘাত পাইনি—'

'হুঁ। আর কোন ঘটনা ঘটেছে ?—'

'গত কাল সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের গায়ের ঢালু পথ বেয়ে নিচে নেমে আসছি. হঠাৎ একটা বড় পাথরের চাই গড়াতে-গড়াতে আর একটু হলে হয়ত আমার ঘাড়েই পড়ত এবং ঐ পাথরটা এসে গায়ে পড়লে একেবারে যে পিষে ফেলত তাতে কোন সন্দেহই নেই, তবে দু'টো ব্যাপারই ত pure and simple accident। আমার জীবনের উপরে attempt বলি কি করে! আপনি না বললে হয়ত মনেও পড়ত না, ভুলেই গিয়েছিলাম।—'

'ভুলে যে যাননি তার প্রমাণ আপনার ঘটনা দু'টির narraiton এবং আগের দু'টিও যেমন আপনার জীবনের উপরে attempt হয়েছিল আজও ঠিক তেমনি চেষ্টা হয়েছিল। তিন-তিন বার নিষ্ফল হয়েছে যখন চতুর্থ বারের প্রচেষ্টা হয়ত খুব শীঘ্রই হবে। সাবধান হবেন।'

কিরীটির চরিত্রের সঙ্গে আমি যতখানি পরিচিত অনেকেই তা নয় এবং বিশেষ করে সে যখন কোন সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে, তার গুরুত্ব যে কতখানি সেও আমার চাইতে বেশী কেউ জানে না। কিন্তু শতদল বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, তিনি যেন কিরীটির কথায় কোন গুরুত্বই আরোপ করতে পারছেন না। সামান্য দু'চারটে কথাবার্তার মধ্য দিয়েই বুঝেছিলাম শতদল বাবু মানুষটি বেশ দিলখোলা ও সরল প্রকৃতির। সংসারের কূটনীতি যেন তাঁকে কোনরূপে স্পর্শই করতে পারে না।

শতদল হাসতে হাসতেই এবারে প্রত্যুত্তর দিলেন, 'আপনি যখন অত করে বলছেন মিঃ রায়, চেষ্টা করবো সাবধান হতে—'

'হাঁ, করবেন। এবং শুধু বাইরেই নয় বাড়ির মধ্যেও সাবধানে থাকবেন।—'

'বাড়ীর মধ্যেও সাবধানে থাকবো? কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।—'

'এই ধরুন, যে ঘরে আপনি রাত্রে শয়ন করেন সে ঘরটা ভাল করে দেখে-শুনে শোবেন—'

'কেন বলুন ত, রাত্রেও কেউ আমার শয়ন-ঘরে চড়াও হয়ে আমার প্রাণহানি করবার চেষ্টা করবে নাকি?'

'ঘরের বাইরে ও ভিতরে যখন চেষ্টা হয়েছে সেটা কিছু অসম্ভব নয়।—'

সহসা এমন সময় কুড়ি-বাইশ বৎসরের অপরূপ সুন্দরী একটি তরুণী হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে শতদল বাবুকেই সম্বোধন করে বললে: 'বাবাঃ, এতক্ষণে তোমার আসবার সময় হলো? দোতলায় বারান্দা থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসছি। ষ্টেশনে আসনি কেন?'

তরুণীর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হ'য়ে আমরা তিন জনেই আগন্তুক তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

'এই ত সবে সকালেই আজ তোমার চিঠি পেয়েছি রাণু—তুমি কবে এসে পৌঁছেছো?—'

'কাল সকালের গাড়ীতে—' রাণু জবাব দেয়: 'কিন্তু সত্যিই তুমি আজই আমার চিঠি পেয়েছো?—'

'হাঁ!—' কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকায় শতদল রাণুর মুখের দিকে।

'বিশ্বাস করি না!—' অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠে রাণু জবাব দেয়।

'সে হবে'খন। এসো আগে এঁদের সঙ্গে তোমার আলাপটা করিয়ে দিই রাণু! আশ্চর্য ভাবেই এঁদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল এই মাত্র—এঁকে চেনো, বিখ্যাত রহস্যভেদী কিরীটি রায় আর ইনি সুব্রত রায়—'

শতদলের কথায় রাণু আমাদের দিকে তাকাল। কিন্তু আমাদের পরিচয় পেয়ে যে সে বিশেষ কিছু আনন্দিত হয়েছে তেমন কোন কিছু তার মুখের চেহারায় বোঝা গেল না।

তথাপি সে হাত তুলে বোধ হয় একান্ত সৌজন্যের খাতিরেই আমাদের নমস্কার জানাল।

সহসা এমন সময় কিরীটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'চল্ সুব্রত, সমুদ্রের ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।—'

বলে আর কোনরূপ কাউকে কোন কথার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে সমুদ্র সৈকতের দিকে এগিয়ে চলল। অগত্যা কতকটা যেন বাধ্য হ'য়েই তাকে আমি অনুসরণ করলাম।

কিরীটির হঠাৎ এ ভাবে'চলে আসাটা কেমন যেন আকস্মিক ও বিসদৃশ বলেই আমার কাছে মনে হলো।

কিন্তু কিরীটি বেশী দূর অগ্রসর না হ'য়ে সামনেই জলের একেবারে কোল ঘেঁষে বালুর উপরেই একটা জায়গায় হঠাৎ বসে পড়ল। আমিও পাশে বসলাম।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। বুঝলাম, কোন একটা বিশেষ চিন্তা আপাততঃ কিরীটির মাথার মধ্যে ফেনিয়ে চলেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ভাবছিস কিরীটি?—'

কিরীটি আনমনে সমুদ্রের দিকেই তাকিয়েছিল। সেই দিকেই তাকিয়ে সে বললে: 'পর পর দু'টি আবির্ভাব। বুলেট ও নারী—সুন্দরী তরুণী।'

কিরীটির কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে তার মুখের দিকে না তাকিয়ে আমি পারলাম না।

দুই

কিরীটি কিছুক্ষণ আবার নিঃশব্দে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

হঠাৎ আবার কতকটা যেন খাপছাড়া ভাবেই কিরীটি বলে উঠলো, 'এমন সুন্দর পৃথিবী অথচ মানুষগুলোর কি বিচিত্র স্বভাব! শান্তির মধ্যে নিশ্চয়তার মধ্যে যেন ওরা কিছুতেই দিন কাটাতে চায় না।—'

মৃদু হেসে বললাম, 'কেন, তোর আবার শান্তির অভাব ঘটলো কিসে?—'

'এখনো বলছিস অভাব হলো কিসে? এর পরও শান্তিতে থাকতে পারবো বলে মনে করিস? দুর্ঘটনাটা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির করেছিলাম ওদিকে চোখ দেব না কিন্তু শতদল আর রাণু, নাঃ, কিছুতেই

যোগে মিলছে না। কিন্তু তারও আগে সর্বাগ্রে আমাকে একটি বার ঐ নির্জন সাগরকূলে পাহাড়ের উপরে 'নিরালা' নামক বাড়িখানি দেখতে হচ্ছে।—'

'তোর কি তাহলে নিশ্চয়ই ধারণা যে, ঐ বাড়িটার সঙ্গেই কোন রহস্য জড়িয়ে আছে কিরীটি ?—'

'নিশ্চয়ই, নচেৎ এমন অকস্মাৎ বুলেটের আবির্ভাব ঘটবে কেন ?—'

'কিন্তু একটা কথা তোকে না বলে পারছি না। বুলেটটা যেন বুঝলাম কিন্তু রিভলভারের—'

কথাটা আমার কিরীটি শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠে, 'আওয়াজটা শুনতে পাসনি এই ত ? কিন্তু বললাম ত—'

'কিন্তু—'

'রিভলভারের সঙ্গে সাইলেন্সার ফিট্ করা ছিল।—'

কিন্তু গুলীটা এলো কোন্ দিক থেকে ?—'

'পুব দিক অর্থাৎ সাগরের দিক থেকেই এসেছে বলে আমার মনে হয়।—'

'ঐ সময় সেই দিকে অত লোকজন ছিল ?—'

'সেটা ত আরো চমৎকার কেমোফ্লাজ—শতদল বাবুর দিক থেকে সামান্য একটু ক্ষণের জন্য আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম সুব্রত, তোর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এবং ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ব্যাপারটা ঘটে গেল, নচেৎ আমার দৃষ্টিকে সে এড়াতে পারত না।—'

সহসা একটা আনন্দ-মিশ্রিত হাসির শব্দে চমকে ফিরে তাকালাম। মাত্র হাত আট-দশ দূরে সমুদ্রের ধার দিয়ে শতদল ও রাণু পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। এবং রাণু ও শতদল দু'জনেই খুব হাসছে।

'চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু ওদের দু'জনকে কিরীটি! চেয়ে দেখ a nice pair !'

আমি ওদের সম্পর্কে বিশেষ করে বলা সত্ত্বেও কিন্তু কিরীটি ফিরে তাকাল না, কেবল মৃদু কণ্ঠে বললে: 'নির্জন সাগরকূলে পাহাড়ের উপরে এক দুর্গ গড়ে তুলেছিল এক আপন-ভোলা শিল্পী। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সেই দুর্গের মধ্যে শিল্পী বসে-বসে কখনো আঁকত ছবি, কখনো গড়ত মূর্তি কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, আমাদের দেশে যে একটা প্রবাদ আছে মরা হাতীর দামও লাখ টাকা যদি সেই দিক দিয়ে ভাবা যায় তাহলে কি দাঁড়ায় বল ?—'

'কিন্তু উত্তরাধিকারী শতদল বাবুই ত' একটু ক্ষণ আগে বলে গেলেন অবশিষ্ট এখন মাত্র ঐ গৃহখানিই। সম্পত্তির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।—'

'তারই দাম লাখ টাকা। চল ওঠা যাক। হোটেলে গিয়ে আপাততঃ ত এক কাপ গরম চা সেবন করা যাক।' বলতে-বলতে কিরীটি উঠে দাঁড়াল এবং হোটেলের দিকে চলতে শুরু করল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

সমস্তটা দ্বিপ্রহর কিরীটি হোটেলের সামনের বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে একটা মোটা মত বাংলা উপন্যাস নিয়েই কাটিয়ে দিল।

সকালের ব্যাপারে তাকে বিশেষ ভাবে যে একটু উত্তেজিত বলে মনে হয়েছিল সে উত্তেজনার যেন এখন অবশিষ্ট মাত্রও নেই। তার হাব-ভাব দেখে মনে হয়, ব্যাপারটা যেন সে ইতিমধ্যেই একেবারে ভুলেই গিয়েছে। মনের মধ্যে তার কোন চিহ্ন মাত্রও নেই।

বাইরে শীতের রৌদ্র ইতিমধ্যেই ঝিমিয়ে এসেছে। নিবন্ত দিনের আলোয় সমুদ্রও যেন রূপ বদলিয়েছে। বিষণ্ণ ক্লান্তিতে সমুদ্রের নীল রং কালো রূপ ক্রমে ক্রমে নিচ্ছে যেন। এ বেলা আর স্নানার্থীদের কোন ভিড় নেই। তবে বায়ুসেবনকারীদের চলাচল শুরু হয়েছে।

হোটেলের ভৃত্য শিবদাস চায়ের ট্রেতে করে চা ও কিছু কেক্ বিস্কুট রুটি জ্যাম সামনের টেবিলের 'পরে এনে নামিয়ে রাখল।

কিরীটি একমনে পড়ছে দেখে আমিই উঠে চায়ের কাপে চা ঢেলে কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বললাম: 'চা।'

কিরীটি হাতের বইটা মুড়ে কোলের উপর নামিয়ে রেখে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিল। উষ্ণ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললে: 'তোর সঙ্গে টর্চ আছে না সুব্রত ?'

'আছে।—'

'কেড্স্ জুতো আছে ?—'

'না, তবে আমার ক্রেপ্ সোলের জুতো—'

'ওতেই হবে।—'

'কোথায়ও বের হবি নাকি ?—'

'হাঁ, নিরালা দর্শনে যাবো !—'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হ'য়ে দু'জনে 'নিরালা'র দিকে অগ্রসর হলাম।

'সূর্যাস্তের পূর্বে ওখানে আমাদের পৌঁছাতে হবে।—' কিরীটি বলল।

'তা আর পারা যাবে না কেন ?—'

ক্রমে লোকালয় ছেড়ে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে অপ্রশস্ত একটা পায়ে-চলা পথ ধরে আমরা দু'জনে এগিয়ে চললাম।

সমুদ্র যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

টের পাচ্ছি সমুদ্রের পাড় যেন ক্রমে সমুদ্র থেকে উঁচু হ'য়ে চলেছে। সমুদ্রের গর্জমান ঢেউগুলো পাড়ের গায়ে এসে ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। এ জায়গাটায় সমুদ্রের পাড়টা বড়-বড় পাথর দিয়ে বাঁধান। মধ্যে মধ্যে বড়-বড় এক-একটা ঢেউ বাঁধান পাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলকণার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিকাল থেকেই হাওয়াটাও যেন বেড়েছে।

ক্রমে খাড়াই-পথ ধরে আমরা উপরের দিকে উঠছি। চমৎকার বাঁধান পথ। সূর্য ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে অনেকটা নেমে এসেছে পশ্চিম দিক্‌বলয়ে।

তিন-চারশ' ফুটের বেশী পাহাড়টা উঁচু হবে না।

ক্রমে যত উপরের দিকে উঠছি ডান দিকে সমুদ্র আরো স্পষ্ট ও অবারিত হয়ে ওঠে। ভারি চমৎকার দৃশ্যটি !

'এমন জায়গায় শিল্পী না হলে কেউ এত টাকা খরচ করে বাড়ি করে ?—'

কিরীটির কথায় সায় না দিয়ে আমি পারলাম না: 'যা বলেছিস। লোকটা সত্যিই শিল্প-পাগল ছিল।—'

আরো কিছু দূর উপরের দিকে উঠতেই একটা লোহার গেট দেখতে পেলাম। এবং গেটের সামনে দাঁড়াতেই বাড়িটার সামনের দিকটা সুস্পষ্ট হয়ে চোখের উপর ভেসে উঠল।

মুঘোল যুগের স্থাপত্য-শিল্পের পরিপূর্ণ একটি নিদর্শন যেন বাড়িখানি। দ্বিতল বাড়িটা, চার দিকে চারটি গোলাকার গম্বুজ! গম্বুজের গায়ে বোধ হয় নানা রংয়ের পেটেন্ট ষ্টোন বসান, অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি সেই পাথরগুলোর 'পরে প্রতিফলিত হয়ে যেন মরকত মণির মত জ্বলছে।

বাড়িটার সামনেই একটা নানা জাতীয় ফল-ফুলের বাগান। গেট বন্ধ ছিল, এক পাশের থামে শ্বেত-পাথরের প্লেটে সোনালী অক্ষরে বাংলায় লেখা : নিরালা।

গেট ঠেলে দু'জনে ভিতরের কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলাম। হাত চারেক চওড়া লাল সুরকী-ঢালা পথ বরাবর বাড়ির সদর দরজার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে দু'জনে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম।

দোতলা ও একতলার সব জানলাগুলোই দেখছি ভিতর থেকে বন্ধ।

মাঝামাঝি রাস্তা এগিয়েছি হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে পাশের দিকে তাকালাম। এক ঝাড় গোলাপ গাছের সামনে হাতে একটা খুরপী একজন প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে।

'কাকে চান—?'

দেখলাম লোকটা বেশ রীতিমত ঢ্যাংগা। এবং একটু কুঁজো হ'য়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে। পরিধানে একটা ধুতি ও গায়ে একটা গরম গেঞ্জী। গেঞ্জীর হাতা দু'টো গোটান এবং দুই হাতেই কাদা-মাটি লেগে আছে। বুঝলাম, প্রৌঢ় বাগানের গোলাপ বৃক্ষগুলোর সংস্কার করছিল।

প্রৌঢ়ের মাথার চুলগুলো সবই প্রায় পেকে সাদা হ'য়ে গিয়েছে। কপালের 'পরে বলিরেখাগুলো বয়সের ইংগিত দিলেও দেহের মধ্যে যেন একটা বলিষ্ঠ কর্মপটুতা দেহের সমগ্র পেশীতে-পেশীতে সুস্পষ্ট ও সজাগ হ'য়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, এক কালে ভদ্রলোক শরীরে যথেষ্ট শক্তি ত ধরতেনই, এখনও অবশিষ্ট যা আছে তাও নেহাৎ কম নয়।

দেহের ও মুখের রং অনেকটা তামাটে। রৌদ্র-জলে পোড় খাওয়া দেহ।

হাতের আংগুলগুলো কি মোটা-মোটা ও লম্বা!

ভদ্রলোকের প্রশ্নে এবারে কিরীটি জবাব দিল: শতদল বাবু আছেন?

'শতদল! সে ত এমন সময় কখনো বাড়িতে থাকে না! গোটা চারেকের সময় বের হ'য়ে যায়—'

'ফেরেন কখন?—'

'তা রাত্রে ক্লাব থেকে ফিরতে রাত এগারটা সাড়ে এগারটা হয়।—'

এখানকার ক্লাব বলতে 'সাগর সৈকত' হোটেলেরই নিচের একটা ঘরে নাচ-গান তাস-দাবা খেলা ও ড্রিংকের ব্যবস্থা আছে। সেটাই এখানকার ক্লাব। এখানকার স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সেইখানেই

প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে মিলিত হন। এবং রাত্ত দশটা পর্যন্ত আনন্দ চলে সেখানে।

'আমি যত দূর জানতাম এখানে শতদল বাবু একাই থাকেন ?—' কিরীটি প্রৌঢ়কে আবার প্রশ্ন করে।

'শতদল ত মাত্র মাসখানেক হলো এসেছে। আমি আমার স্ত্রী ও আমার মেয়েকে নিয়ে এক বছরের উপরে এখানে আছি। তা ছাড়া চাকর অবিনাশ, মালী রঘু আছে।'

'ওঃ, তা আপনি শতদল বাবুর—'

'রণধীর আমার সম্পর্কে শ্যালক হতো—'

'ওঃ, রণধীর বাবুর আপনি তাহলে ভগ্নীপতি হন !—'

'হাঁ—'

'চমৎকার জায়গায় বাড়িটি কিন্তু—' কতকটা যেন তোষামোদের কণ্ঠেই কথাটা উচ্চারণ করে কিরীটি।

'আর মশাই চমৎকার জয়গা। নেহাৎ আটকা পড়ে গিয়েছি নইলে এমন জায়গায় মানুষ থাকে ? আধ মাইলের মধ্যে জন-মনিষ্যি পর্যন্ত একটা নেই। রাত-বিরেতে ডাকাত পড়লে চেঁচিয়েও কারো সাড়া পাবার উপায় নেই।—'

কিরীটি হাসতে-হাসতে জবাব দেয়, 'বাইরে থেকে যে ভাবে বাড়িটা তৈরী দেখছি তাতে ডাকাত পড়লেও বিশেষ তেমন কিছু একটা সুবিধা করতে পারবে বলে ত মনে হয় না—'

এমন সময় সুমিষ্ট মেয়েলী গলায় আহ্বান শোনা গেল। 'বাবা গো বাবা ! এত করে তোমাকে ডাকছি তা কি শুনতে পাও না ? ওদিকে চা যে জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল।'

চেয়ে দেখি, একটি উনিশ-কুড়ি বৎসরের শ্যামবর্ণ একহারা চেহারার মেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মেয়েটির পরিধানে চমৎকার একটি নীলাম্বরী সাড়ী কলকাতার কলেজের মেয়েদের মত ষ্টাইল করে পরা, গায়ে শাদা ব্লাউজ !

'কখন আবার তুই ডাকলি আমায় সীতা ?—' মেয়েটির বাপ জবাব দেন।

মেয়েটি ততক্ষণে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রোগা একহারা চেহারা হলে কি হয় এবং গায়ের রং শ্যাম হলেও অপরূপ একটা লাবণ্য যেন মেয়েটির সর্বদেহে। সর্বাপেক্ষা মেয়েটির মুখ-খানির যেন তুলনা হয় না—চোখে-মুখে একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ রয়েছে।

মেয়েটির দেহে সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ তার পর্যাপ্ত কুঞ্চিত কেশ : বর্মিদের ধরণে মাথার উপরে প্যাগোডার আকারে বাঁধা। হাতে একগাছি করে কাচের চুড়ি।

'এইটিই আমার মেয়ে সীতা। হাঁ, ভাল কথা, আপনাদের নাম ত জানা হলো না ! আমার নাম হরবিলাস ঘোষ।—' হরবিলাস নিজের পরিচয় দিলেন।

পরিচয়টা দিলাম এবারে আমিই : 'আমার নাম সুব্রত রায় আর ইনি হচ্ছেন কিরীটি রায়।'

আবার এক দফা নমস্কার প্রতি-নমস্কারের আদান-প্রদান হলো।

'আসুন না কিরীটি বাবু, শতদলের কাছে এসেছেন, সে যখন বাড়িতে নেই আমার আতিথ্যটুকুই না হয় গ্রহণ করুন এক কাপ করে চা—আপত্তি আছে নাকি কিছু ?—' কথাগুলো বলে হরবিলাস একবার কিরীটি ও একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি একটু ইতস্ততঃ করছিলাম কিন্তু কিরীটি দ্বিধামাত্র না করে বললে : 'সানন্দে। বিশেষ করে চা যখন। কিন্তু সীতা দেবী, আপনার আপত্তি নেই ত ?—' কথাটা শেষ করল কিরীটি সীতার মুখের দিকেই তাকিয়ে।

'আপত্তি ! বা রে, আপত্তি হবে কেন ? আসুন না।—'

'হাঁ, চলুন, এই পাণ্ডব-বর্জিত বাড়িতে লোকের মুখ দেখবারও ত উপায় নেই। তাছাড়া আমার স্ত্রীও আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে সুখী হবেন। রোগী মানুষ, কোথায়ও ত বের হতেও পারেন না—'

'রোগী ?—' কিরীটি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

'হাঁ, আজ দুই বছর ধরে নিম্ন অঙ্গের পক্ষাঘাতে ভুগছেন। তার জন্যই ত এখানে আসা আমার শ্যালকের অনুরোধে—'

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার প্রকৃতির বুকে ঘন হ'য়ে এসেছে। দূরে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় মনে হয়, সমুদ্রের জলে কে যেন একরাশ কালো কালি ঢেলে দিয়েছে, কেবল মধ্যে মধ্যে ঢেউয়ের চূড়ায়-চূড়ায় শুভ্র ফেনাগুলো অন্ধকারে কোন এক ক্ষুধিত করাল দানবের হিংস্র দন্তপাতির মত ঝিকিয়ে উঠছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন একটানা ছেদহীন।

প্রকাণ্ড দরজা পার হয়ে আমরা সকলে বাড়ীর মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম।

সামনেই একটা বারান্দা এবং বারান্দা অতিক্রম করে একটা সুসজ্জিত হল-ঘর, সেটা পার হ'য়ে মাঝারী গোছের একটা আলোকিত কক্ষ মধ্যে এসে আমরা প্রবেশ করলাম।

ঘরের সিলিং থেকে একটা বাতি ঝুলছে। সেই আলোয় প্রথমেই নজরে পড়ে ঘরের ঠিক মধ্যখানে একটা টেবিলের পাশে একটা ইনভ্যালিড চেয়ারের উপরে বসে একজন স্থূলাঙ্গী মধ্যবয়েসী মহিলা উল ও কাঁটার সাহায্যে কি যেন একটা বুনে চলেছেন অত্যন্ত ক্ষিপ্র হস্তে।

ভদ্রমহিলা আমাদের পদশব্দে মুখ তুলে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন কিন্তু হাত দু'টি যেন মেসিনের মতই অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে বয়ন-কার্য চালিয়ে যেতে লাগল।

সিলিং হতে ঝুলন্ত আলোর স্বল্প রশ্মি যা সেই উপবিষ্ট ভদ্রমহিলার মুখের উপরে এসে পড়েছিল তাতেই তাঁর মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পাথরের মত ভাবলেশহীন এমন মুখ ইতিপূর্বে খুব কমই যেন চোখে পড়েছে। আর তাঁর দু'টি চক্ষুর স্থির দৃষ্টি মনে হচ্ছিল যেন আমাদের অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত ভেদ করে চলে যাচ্ছে। আমাদের চোখে-মুখে এসে যেন বিঁধছে। মুখের একটি রেখারও যেন এতটুকু পরিবর্তনও দেখা গেল না।

আড়চোখে একবার কিরীটির দিকে না তাকিয়ে পারলাম না, কিন্তু কিরীটির চোখে-মুখে কোন কিছুরই সন্ধান পেলাম না।

'হিরণ, দেখো এঁরা আজ আমাদের গৃহে সান্ধ্য অতিথি ! সুব্রত বাবু, কিরীটি বাবু, এই আমার স্ত্রী হিরণ্ময়ী—' হরবিলাস শেষের কথাগুলো আমাদের উভয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে শেষ করলেন।

'আসুন। বসুন, কি সৌভাগ্য আমাদের :—' হিরণ্ময়ী আমাদের নিষ্প্রাণ কণ্ঠে যেন আহ্বান জানালেন। আমরা উভয়ে পাশাপাশি দু'টো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

আশ্চর্য একটা জিনিষ লক্ষ্য করছিলাম, ঘরের সব কয়টি

এও
স্তনারী
কেবলসু
তিহাস,

এল
রাই)।
স্কৃতাধ্যাপক,
কোর্ড ইণ্ডিয়ান
ক. সি. আই. ই.,

জানালাই বন্ধ! একটা চাপা গুমোট ভাব যেন সমস্ত কক্ষটার মধ্যে থম্‌-থম্‌ করছে। বুকটা কেমন চেপে ধরছে।

সামনের টেবিলটার উপরে সূক্ষ্ম সূচের এম্‌ব্রোয়ডারী করা একটি টেবল-ক্লথ বিছান, তার উপরে সজ্জিত চায়ের সাজ-সরঞ্জাম। ঘরের মধ্যে আসবাব-পত্র সামান্য যা আছে তাও একান্ত পরিপাটি ভাবে যেখানকার যেটি ঠিক হওয়া উচিত রুচিসম্মত ভাবে সাজান। তথাপি মনে হচ্ছিল, সব কিছুর মধ্যে একটা সযত্ন সুচারু পরিচ্ছন্নতা থাকলেও ঠিক কিসের যেন একটা অভাব আছে। সবই আছে অথচ কি যেন নেই। কোথায় যেন ছন্দপতন হয়েছে।

'সত্যিই সৌভাগ্য আমাদের কিরীটি বাবু আপনাকে আজ আমার ঘরে অতিথি পেয়ে—' হিরণ্ময়ী দেবী কিরীটিকে লক্ষ্য করেই কথাটা ক্ষেত্রেণ করলেন: 'আপনাকে ইতিপূর্বে আমার দেখবার সৌভাগ্য না

'আপনার নাম আমি শুনেছি।'

নইলে ·রীটির ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু একটা হাসির আভাষ যেন বঙ্কিম রেখায় জেগে উঠেই মিলিয়ে যায়।

'তাছাড়া—' হিরণ্ময়ী দেবী আবার বলতে সুরু করেন, 'আজ দেড় বৎসরের মধ্যে এমন জায়গায় পড়ে আছি যে কারও সঙ্গে বড় একটা দেখাই হয় না, তাই কেউ এলে মনে হয় যেন বদ্ধ এই ঘরটার মধ্যে একটা খোলা হাওয়ার ঝলক বয়ে গেল। উঃ, এই ঘরটি এবং পাশের ছোট একটা ঘর এরই এই সংকীর্ণতার মধ্যে এই দীর্ঘ দেড় বছরের রাত্রি দিন দুপুরগুলো কি ভাবে যে কাটাচ্ছি তা আমিই জানি—' একটা ক্লান্ত অবসন্নতা যেন হিরণ্ময়ীর কণ্ঠস্বরে মূর্ত হয়ে ওঠে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন তাঁর বুকখানা কাঁপিয়ে বের হ'য়ে আসে।

হরবিলাস কন্যাকে তাড়া দিলেন, 'কই রে সীতা, এঁদের চা দে—'

সীতা ইতিমধ্যে চায়ের কাপগুলো সাজিয়ে দুধ দিয়ে চা ঢালতে সুরু করেছিল। আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল: 'আপনাদের কে কয় চামচ করে চিনি নেন চায়ে?'

আমি বললাম: 'আমাকে ছোট চামচের এক চামচ দেবেন আর ওকে দেড় চামচ দেবেন।'

সীতা আমাদের দিকে চা ও একটা প্লেটে কিছু কেক্‌ এগিয়ে দিল।

চা-টা নিতে নিতে বললাম: 'ও প্লেটটা সরিয়ে রাখুন সীতা দেবী—বিকালে হোটেল থেকে বের হবার পূর্বেই এক পেট খেয়ে এসেছি।'

'তা হোক্‌, তা হোক্‌, একটু খেয়ে দেখুন, বাজারের জিনিষ নয়, আমার স্ত্রীরই নিজের হাতের তৈরী—' হরবিলাস বলে উঠলেন।

'কিন্তু পেটে যে একেবারে জায়গা নেই হরবিলাস বাবু!—' কিরীটি হাসতে-হাসতে বলে।

'আরে মশাই, এক পিস্‌ কেক্‌ আর খেতে পারবেন না? বললে হয়ত বলবেন লোকটা তার নিজের স্ত্রীর প্রশংসা করছে কিন্তু তা নয়, ২১ বছর ঘর করছি ত, অমন রান্না মশাই কোথায়ও খেলাম না। আসবেন একদিন, এখানে দুপুরে আহার করবেন—'

'না, না, উনি রোগী মানুষ—' কিরীটি প্রতিবাদ জানায়।

তও কি উনি নিশ্চিন্ত থাকেন, ঐ invalid চেয়ারে বসে-

বাড়িতে

'বেলা রান্না যাবতীয় সব করেন—'

করে চা—আ

ত।—' আমি বলি: 'কষ্ট হয় না আপনার?'

একবার কিরীটি ও

'বরং এমনি করে সারাটা দিন চেয়ারের উপরে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে বসে থাকাটাই আমার দুঃসহ লাগে। তাই যতটা পারি নিজেকে engage রেখে দেহের এই অভিশাপটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করি!—তা ছাড়া দেখুন, এমন জায়গায় পড়ে আছি একটা লোকজনের মুখ পর্যন্ত দেখবার উপায় নেই। তাই ত ওকে বলি যে ভাই এত আদর করে এখানে নিয়ে এলো আমায়, সেই যখন চলে গেল আর কেন, চল অন্য কোথায়ও চলে যাই। দেহটা অকর্মণ্য হ'য়ে গিয়েছে বলে বেশী দিন এক জায়গায় থাকতেও আর ভাল লাগে না।'

ঘরের মধ্যে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হচ্ছিল। শীতকাল হলেও কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। কিরীটিরও বোধ হয় গরম লাগছিল ঘরের মধ্যে। সে-ই বলে উঠল: ঘরটার মধ্যে বেশ গরম মনে হচ্ছে যেন—'

'ওঃ, সত্যিই ত আমারই ভুল হ'য়ে গিয়েছে! সীতা, দাও ত মা দক্ষিণের জানালাটা খুলে। এ বাড়ীতে এত বেশী হাওয়া যে বিরক্ত ধরে যায়, তাই বেশীর ভাগ সময় জানালাগুলো এঁটে রাখি—'

'না, না, থাক না, তেমন কিছু বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না—' কিরীটি প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে। সীতা কিন্তু ততক্ষণে মায়ের আদেশে এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা জানালা খুলে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের সমুদ্রবক্ষ থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে হু-হু করে বহে এল সমুদ্রের নোণা স্বাদ নিয়ে। সেই সঙ্গে এলো অদূরাগত সমুদ্রের শব্দ-কল্লোল। বাইরের দুরন্ত ক্ষ্যাপা সমুদ্রের স্পর্শ যেন সমস্ত ঘরটার মধ্যেকার পীড়িত বদ্ধ আবহাওয়াটাকে মুহূর্তে এসে একটা মুক্তির স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে গেল।

দেখলাম, জানালাটা খুলে সীতা আর ফিরে এলো না, খোলা জানালার গরাদ ধরেই দাঁড়িয়ে রইল ঘরের দিকে পিছন ফিরে। বাইরের রহস্যময় সমুদ্রের মত সীতার দেহটাও যেন একটা রহস্যে পরিণত হয়েছে।

'এখানে বুঝি বেড়াতে এসেছেন, মিঃ রায়?—' হিরণ্ময়ী আবার প্রশ্ন করলেন কিরীটিকেই লক্ষ্য করে।

'হাঁ। সি সাইড্‌টা এখানকার ভারি চমৎকার!—'

'শতদলের সঙ্গে আপনার আগেই বুঝি আলাপ ছিল?—'

'না। আজই সকালে সবে আলাপ হয়েছে—' কিরীটি প্রত্যুত্তর দেয়।

'ওঃ, সবে আজই আলাপ হয়েছে?—'

'হাঁ।—'

'আপনারা আসবেন সে কি জানত না?—' আবার প্রশ্ন করলেন হিরণ্ময়ী দেবী।

'না! ভেবেছিলাম, একটা surprise visit দেবো!—'

সহসা এমন সময় বাইরের অন্ধকার ভেদ করে সমুদ্রের একটানা গর্জনকে ছাপিয়ে ক্রুদ্ধ একটা জন্তুর চিৎকার কানে ভেসে এলো। বাইরের অন্ধকার যেন সহসা একটা আর্তনাদ করে উঠলো। চমকে হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকে তাকাতেই দ্বিতীয় বার আবার সেই ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল, এবারে বুঝলাম কোন বড় জাতীয় বিলেতী কুকুরের ডাক সেটা।

হঠাৎ সীতা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুতপদে কক্ষ হতে বের হ'য়ে গেল।

কুকুরটার গম্ভীর ডাকটা বাইরের অন্ধকারকে যেন ফালি-ফালি করে দিচ্ছে তখনও।

[ক্রমশঃ।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৯১৬ খৃঃ ১লা জুন কলিকাতায়। পিতা—প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা—রিপন কলেজ। কর্ম—সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন ব্র্যাঞ্চে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৩৪৫), বেঙাচি (১৩৪৬), সমুদ্র (১৩৪৮), বাঁশীর ডাক (১৩৫৪), বিপ্লবের বিয়ে (১৩৫৫), তোমারই হউক জয় (১৩৫৭), প্রেমের সমাধি তীরে (১৩৫৭), নহ একাকী (১৩৫৭), Ripples (১৯৫১)।

মধুসূদন জানা—সাংবাদিক ও সংকলয়িতা। জন্ম—১৮৫৭ খৃঃ ২৩এ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে। মৃত্যু—১৯৩৮ খৃঃ ২১এ অক্টোবর। সম্পাদিত গ্রন্থ—শ্রীমদ্‌ভাগবত (উৎকল কবি সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ দাসের সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশ স্কন্দ নবাক্ষরী বাংলায়)। সম্পাদক—নীহার (পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিক, ১৯০১—১৯৩৬)।

মধুসূদন দত্ত, মাইকেল—কবি। জন্ম—১৮২৪ খৃঃ ২৫এ জানুয়ারি যশোহর কপোতাক্ষ-তীরবর্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে। মৃত্যু—১৮৭৩ খৃঃ ২৯এ জুন। পিতা—রাজনারায়ণ দত্ত। মাতা—জাহ্নবী। শিক্ষা—হিন্দু কলেজের জুনিয়র পরীক্ষা (১৮৩৩), সিনিয়র পরীক্ষা (১৮৪১), খৃষ্টধর্ম গ্রহণ (১৮৪৩, ৯ই মে), বিশপ কলেজ (১৮৪৪)। কর্ম—ইংরেজি অধ্যাপক, মাদ্রাজ মেল অরফ্যান এ্যাসাইলাম (১৮৪৮)। প্রথম বিবাহ—রেবেকা ম্যাক্টাভিস (১৮৪৯), দ্বিতীয় বিবাহ—হেনরিএটা (১৮৫৫, ২০এ ডিসেম্বর)। প্রথম কাব্য রচনা—Captive Ladie (১৮৪৯, এপ্রিল)। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কর্ম—Madras Circulator & General Chronicle, Athenaeum, Spectator. প্রধান সম্পাদক—Athenaeum (কিছুদিন)। প্রকাশক ও সম্পাদক—Hindu Chronicle (১৮৫১)। সম্পাদক—Hindu Patriot (১৮৬২)। শিক্ষক Madras University High School Dept. (১৮৪৯—৫৬)। মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন (১৮৫৬), পুলিশ কোর্টে চাকুরী লাভ (১৮৫৬), এবং সদর আইন পরীক্ষা। কিছুকাল পুলিশ কোর্টের Interpreter, পিতৃ-সম্পত্তি উদ্ধার, বৈষয়িক ব্যবস্থা ও ইউরোপ যাত্রা (১৮৬২, ৯ই জুন), ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় সাফল্য (১৮৬৬, ১৭ই নভেম্বর), স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও আইন ব্যবসায় (১৮৬৭-৭০), কলিকাতা হাইকোর্টে চাকুরী—অনুবাদ বিভাগের পরীক্ষকের পদ (১৮৭০), দুই বৎসর পর পুনরায় ব্যারিষ্টারি। পঞ্চকোটের আইন-উপদেষ্টা (১৮৭২)। গ্রন্থ—শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০), বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০), তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম (১৮৬১), ২য় (ঐ), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬), হেক্টর বধ (১৮৭১), মায়াকানন (১৮৭৪) The Captive Ladie (১৮৪৯), The Anglo Saxon & The Hindu (মাদ্রাজ, ১৮৫৪), Ratnavali (১৮৫৮), Sermistha (১৮৫৯), Nildarpan or The Indigo Planting Mirror.

মধুসূদন দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলায় এলাটী গ্রামে। গ্রন্থ—বৈষ্ণবতত্ত্বদীপিকা।

মধুসূদন বাচস্পতি—আলঙ্কারিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—ছন্দোমালা (১৮৬৮)।

সাহিত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

মধুসূদন ভট্টাচার্য—সাহিত্যসেবী। গ্রন্থ—চলিতাঙ্ক (১৮৭৩)। সম্পাদক—রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ (সাপ্তাহিক, ১৮৬০, এপ্রিল)।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবরহস্য, ২ খণ্ড (অনুবাদ, ১৮৬০-৬১), হংসরূপী রাজপুত্র (১৮৫৭), মৎস্যনারী উপাখ্যান (১৮৫৮), বয় চতুষ্টয় (১৮৫৮), কুলফস্ ফেবলস্ (১৮৭০), অবোধ, অহল্যা হড্ডিকা (১৮৫৮), সত্য ইতিহাস, নুরজেহান (১৮৫৮), Life of Mujahid Shah (১৮৫৯), Life of Lord Clive (১৮৫৯)।

মধুসূদন সরকার—সাহিত্যসেবী। যুগ্ম সম্পাদক—অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা (মাসিক, ১৮৫৬, ডিসেম্বর)।

মধুসূদন সরস্বতী—অদ্বৈতবাদী। জন্ম—১৭শ শতাব্দী ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায়। পিতা—পুরন্দর আচার্য (কাশ্যপ গোত্রীয়)। বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিষ্য এবং মাধব সরস্বতীর নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন। শ্রীক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ এবং গোবর্ধন মঠের মঠাধীশ। গ্রন্থ—অদ্বৈতসিদ্ধি, গূঢ়ার্থদীপিকা (ভগবদ্‌গীতা), প্রস্থানভেদ, ভাগবতোক্ত প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা। সংক্ষেপ-শারীরক টীকা, সিদ্ধান্তবিন্দু, অদ্বৈতরত্ন-লক্ষণ, বেদান্ত-কল্পলতিকা, মহিম্নঃ-স্তোত্রব্যাখ্যা, ভক্তিরসায়ন।

মধ্বাচার্য—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১১৯৯ খৃঃ দশহরার দিন দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী বেলিগ্রামে। মৃত্যু—১৩০৩ খৃঃ সরিদন্তর নামক স্থানে। পিতা—মধ্যগেহ ভট্ট। মাতা—বেদবতী। বাল্যনাম—বাসুদেব। দীক্ষা গুরু—শুদ্ধানন্দ বা অচ্যুত প্রেক্ষাচার্য। গুরুদত্ত নাম—পূর্ণপ্রজ্ঞ। নামান্তর—আনন্দ তীর্থ। অল্পবয়সে ক্রীড়াকৌতুকে পারদর্শী হওয়ায় 'ভীম' আখ্যালাভ। বেদ ও নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের পর সন্ন্যাস গ্রহণের দীক্ষা, অনন্ত মঠের আধিপত্য লাভ, শৃঙ্গেরী মঠাচার্যের সহিত বিচারে পরাস্ত। ইঁহার জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। গ্রন্থ—বেদান্ত ভাষ্য (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন), গীতাভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, অণুভাষ্য, অনুব্যাখ্যান, প্রমাণ-লক্ষণ, কথা-লক্ষণ, উপাধিখণ্ডন, মায়াবাদখণ্ডন, প্রপঞ্চমিথ্যাবাদ-খণ্ডন, তত্ত্বসংখ্যান, তত্ত্ববিবেক, উদ্যোত, কর্মনির্ণয়, বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়, ঋক্‌ভাষ্য, দশোপনিষদ্‌ভাষ্য, গীতাতাৎপর্যনির্ণয়, ন্যায়বিবরণ, যমক ভারত, দ্বাদশস্তোত্র, কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, তন্ত্রসারসংগ্রহ, সদাচার স্মৃতি, ভগবৎতাৎপর্যনির্ণয়, মহাভারত তাৎপর্যনির্ণয়।

মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়মস্, স্যর—সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্। জন্ম—১৮১৯ খৃঃ বোম্বাই শহরে। মৃত্যু—১৮৯৯ খৃঃ। পিতা—কর্নেল মনিয়ার উইলিয়মস্ (তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল, বোম্বাই)। সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। সংস্কৃতাধ্যাপক, হেলিবেরি কলেজ, অক্সফোর্ড কলেজ। স্থাপনা—অক্সফোর্ড ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট। উপাধি—ডি. সি. এল (লণ্ডন), কে. সি. আই. ই.,

এল. এল. ডি (কলি: বিশ্ববিদ্যালয়)। গ্রন্থ—Brahminism, Hinduism, Buddhism, Indian Epic Poetry, Indian wisdom, Sanskrit-English Dictionary.

মনীষিনাথ বসু—সাহিত্যিক ও দর্শনশাস্ত্রবিদ্। জন্ম—১৮৮১ খৃ: ২১এ মার্চ মেদিনীপুর জেলার পিংলা গ্রামে। পিতা—হেমাঙ্গচন্দ্র বসু। শিক্ষা—এম.এ (১৯০১), বি.এল (১৯০৫), 'সরস্বতী' উপাধি লাভ (১৯০১)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন-ব্যবসায়ী। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৯১২), পরে সভাপতি। বহু সাময়িক পত্রের লেখক। সম্পাদক—মাধবী (মাসিক, মেদিনীপুর, ১৯২৩), অন্যতম সম্পাদক—বঙ্গীয় মহাকোষ।

মন্মথচন্দ্র সর্বাধিকারী—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১৬ বঙ্গ ১৪ই মাঘ বহুবাজার জেলিয়াপাড়ায়। পিতা—নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (এটর্ণী)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৯২৫); কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। অল্প বয়স হইতেই কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণ। সাংবাদিক বৃত্তি অবলম্বন। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। সাহিত্যিক-সমাজে চারণ কবিরূপে স্বীকৃত। গ্রন্থ—ভৈরব শিঙা, (ক), ডমরু (ক), সঙ্কেত (ক), মনোতোষিণী, বিভীষিকা। সম্পাদক—দৈনিক হিন্দুস্থান, স্বাধীন হিন্দুস্থান (সাপ্তাহিক)।

মনোজমোহন বসু—গ্রন্থকার। জন্ম—কলিকাতা গোকুল মিত্রের ষ্ট্রীটে। বি. এল। আইনজীবী। প্রহসন গ্রন্থ—সোনায় সোহাগা, রেশমী রুমাল।

মনোজ বসু—শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৯০১ খৃ: যশোহর জেলায় ডোঙ্গাঘাটা গ্রামে। শিক্ষা—বাগেরহাট ও কলিকাতা। এখন প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইনি আধুনিক কালের কথা-সাহিত্যিকদের অন্যতম। গ্রন্থ—প্লাবন (১৩৪৮), বিপর্যয়, নূতন প্রভাত (১৩৫৩), নরবাঁধ, দেবী কিশোরী (১৩৪১), বনমর্ম্মর (১৩৩৯), পৃথিবী কাদের, সৈনিক (১৯৪৫), ভুলি নাই (১৩৫০), খদ্যোত, দুঃখনিশার শেষে (১৩৫১), নবীন যাত্রা, ওগো বধূ সুন্দরী (১৩৫৩), আগষ্ট ১৯৪২ (১৯৪৭), বাঁশের কেল্লা, শত্রুপক্ষের মেয়ে (১৯৪৭), দিল্লী অনেক দূর (১৩৫৮), রাখিবন্ধন, কাচের আকাশ, একদা নিশীথ কালে, উলু (১৩৫৫), যুগান্তর, জলজঙ্গল (১৩৫৮) বকুল, কুঙ্কুম।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—পূর্ত্ততত্ত্ববিদ্। জন্ম—১৮৮০ খৃ:। মৃত্যু—১৯২৬ খৃ:। শিক্ষা—এম. এ (কলি: বিশ্ববিদ্যালয়) বি. ই (শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)। কর্ম—মার্টিন এণ্ড কোং, কলিকাতা কর্পোরেশন। পুরাতত্ত্ব গবেষণায় নিযুক্ত এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লেখক। গ্রন্থ—Orissa Ancient and Mediaeval, Handbook of Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad.

মনোমোহন গোস্বামী—নাট্যকার। বি. এ। কর্ম—কাষ্টমস্ হাউস। নাট্যগ্রন্থ—সংসার, পৃথিরাজ, ধর্মবিপ্লব, বিধির বিধান, সমাজ, মুরলা, শিবজী, গুরুদক্ষিণা (প্রহসন)।

মনোমোহন ঘোষ—আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ্। জন্ম—১৮৪৪ খৃ: ১৩ মার্চ ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯৬ খৃ: ১৬ই অক্টোবর কৃষ্ণনগরে। পিতা—রামলোচন ঘোষ (সদর-আলা)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, ১৮৫৯), প্রেসিডেন্সী কলেজ, সিবিল সার্বিস পরীক্ষার জন্য বিলাত গমন (১৮৬২), পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা (১৮৬৬)। কর্ম—আইন ব্যবসায় ও বিশেষ খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম উদ্যোক্তা। "Indian Mirror" পত্রের প্রবর্ত্তন (১৮৬২)। ইনি প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশপ্রেমিক এবং দেশহিতকল্পে বঙ্গের প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া আন্দোলন সুরু করেন। (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯০, ১৮৯৫)। গ্রন্থ—The Administration of justice in India, ২ খণ্ড।

মনোমোহন ঘোষ—শিক্ষাব্রতী। এম. এ. পি. এইচ. ডি.। গ্রন্থ—প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা (১৩৫২)।

মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। ইনি শৈশব হইতেই সাহিত্যানুরাগী। গ্রন্থ—পূর্ণিমা, মানদা, অপরাজিতা, সুকুমারী, পঙ্কজ, মোক্ষদা, অশ্রুকুমার, স্বপ্নময়ী।

মনোমোহন বসাক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রহস্য প্রকাশ, ১ম (১৮৬৯)।

মনোমোহন বসু—নাট্যকার, কবি ও সাংবাদিক। জন্ম—১২৪২ বঙ্গ যশোহর জেলার নিশ্চিন্তপুরে (মাতামহ-গৃহে)। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গ ৩০এ আষাঢ়। পৈতৃক নিবাস—২৪-পরগনা ছোট জাগুলিয়া। পিতা—দেবনারায়ণ বসু। শৈশব হইতে সাহিত্য-সেবা ও কবিতা রচনা। চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা (১২৭৩)। গ্রন্থ—রামাভিষেক নাটক (১২৭৪), প্রণয়পরীক্ষা নাটক (১২৭৬), পদ্যমালা ১ম (১৮৭০), ২য় (১৮৮২), ৩য় (১৮৯৪), সতী নাটক (১২৯৭), হিন্দু আচার ব্যবহার, ১ম (১৮৭৩), বক্তৃতামালা (১২৮০), নাগাশ্রমের অভিনয় (প্রহসন, ১৮৭৫), হরিশ্চন্দ্র নাটক (১২৮১), পার্থ-পরাজয় নাটক (১৮৮১), মনোমোহন গীতাবলী (১২৯৩), রাসলীলা নাটক (১২৯৬), আনন্দময় নাটক (১২৯৭), দুলীন (ঐতিহাস নবোন্যাস—১৮৯১), সত্যনারায়ণ কথা (১৩২৮)। সম্পাদক—সংবাদ-বিভাকর (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক, ১২৫৯), মধ্যস্থ (সাপ্তাহিক, পরে মাসিক, ১২৭৯)।

মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—আইনজীবী। বি. এল। আইন ব্যবসা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী।

মনোমোহন রায়—নাট্যকার। নাট্যগ্রন্থ—রিজিয়া।

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। বি.এ। কর্ম—ভারতীয় ডাক বিভাগে (ব্রহ্মদেশে ১৯৪৬ খৃ: পর্যন্ত ও বর্তমানে আসাম ডাক বিভাগে)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ-লেখক। গ্রন্থ—বিংশ শতাব্দীর সেরা সাহিত্যিক, বোমার ভয়ে বার্মা ত্যাগ।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বন্দনার বিয়ে।

মনোরমা দেবী (মহারাজকুমারী)—গ্রন্থ-রচয়িত্রী। জন্ম—১২৬৩ বঙ্গ ৯ই আষাঢ়। মৃত্যু—১৩৪২ বঙ্গ ১৭ই আষাঢ়। পিতা—মহারাজা বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। স্বামী—পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় (কর্পোরেশনের ট্রেজারার)। নাট্যগ্রন্থ—বিরজা, মোহিনী, অনিরুদ্ধ-মিলন; গীতি-নাট্য—মানকুঞ্জ, গৌরী গীতিকা; জীবনী—পিতৃদেব চরিত।

মনোহর দাস বাবাজী মহারাজ—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—

১২৫৪ বঙ্গ কার্ত্তিক মাস নদীয়া জেলার মাধবপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৪ বঙ্গ শ্রাবণ। পিতা—ভোলানাথ অধিকারী। পূর্বনাম—মহেন্দ্র অধিকারী। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া মাতৃষ্বসার আলয়ে শিমুলিয়া গ্রামে লালিত। নবদ্বীপের বড় আখড়ায় পণ্ডিতদিগের নিকট অধ্যয়ন। তীর্থভ্রমণ, ভেক গ্রহণ ও মনোহর দাস নাম গ্রহণ। গিরিরাজ তটবর্তী গোবিন্দকুঞ্জে বাস ও নামকীর্তন। গ্রন্থ—বৈদগ্ধীবিলাস, নামরত্নমালা।

মন্মথচন্দ্র বসু মল্লিক—বাগ্মী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৩ খৃ: পটলডাঙ্গায় বিখ্যাত মল্লিক-বংশে। মৃত্যু—১৯০১ খৃ: কাশীধামে। পিতা—জয়গোপাল বসু মল্লিক। শিক্ষক—প্রবেশিকা (হিন্দু স্কুল), প্রেসিডেন্সী কলেজ, বার-এট-ল পরীক্ষার জন্ম বিলাত গমন (১৮৭১)। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৭৫), ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। আমেরিকা চিকাগো শহরে (১৮৯৩) ভ্রমণ। ইংলণ্ডের স্থায়ী অধিবাসী হন (১৮৯৫)। ইনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন—ভারতবর্ষের বহু স্থান ও আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর স্বর্গারোহণের পর ইনি ফরাসী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন (১৮৯৯)। প্রতিষ্ঠাতা—জয়গোপাল মল্লিক স্কলারশিপ ফাণ্ড (১৮৯২)। ইনি তেজস্বী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। ইনি দর্শন, বিজ্ঞান, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও লাটিন সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। গ্রন্থ—Orient & Occident, Impressions of an Wanderer, Problems of Existences, Great Britain & India, A Study in Ideas.

মন্মথনাথ গোস্বামী—পণ্ডিত। সম্পাদক—গুরুদর্পণ (বোধখানা, যশোহর, মাসিক ১৩০৯)।

মন্মথনাথ ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯১ বঙ্গ ৩রা আশ্বিন কালকাতায়। পিতা—অতুলচন্দ্র ঘোষ (সবজজ)। পিতামহ—প্রসিদ্ধ বাগ্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষ। শিক্ষা—প্রবেশিকা (সেনট্রাল কলেজিয়েট স্কুল (১৯০০), এফ. এ (জেনারেল এসেম্ব্লিজ বিএ (১৯০৪), এম. এ (১৯০৫)। বঙ্কিমচন্দ্র পদক প্রাপ্ত। কর্ম—কন্‌ট্রোলার জেনারেলের অফিসে, পরে ভারতের ট্রেজারীসমূহের কন্‌ট্রোলার অফিসের সুপারিনটেনডেণ্ট, এসিস্‌টেণ্ট অ্যাকাউণ্ট অফিসার। অবসর গ্রহণ (১৯৩৭)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক ও বহু জীবনী রচয়িতা। গ্রন্থ—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কবি হেমচন্দ্র, ৩ খণ্ড, মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, রঙ্গলাল, সেকালের লোক, অবরুদ্ধা, বাঙ্গালা সাহিত্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক বর্ণপরিচয়, Memories of Kali Prassunno Sing, The Alphabet of Bengali Lit. Celebrities.

মন্মথনাথ ঘোষ—সাময়িকপত্রসেবী। যুগ্ম সম্পাদক—বিকাশ (১৩০০)।

মন্মথনাথ চক্রবর্তী—শিল্পী ও গ্রন্থকার। অধ্যক্ষ, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল। গ্রন্থ—আলোকচিত্রণ, চিত্রবিজ্ঞান, ছায়াবিজ্ঞান, বর্ণবিজ্ঞান।

মন্মথনাথ জ্যোতিঃশেখর—সংস্কৃত পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ। জন্ম—১২৭০ বঙ্গ মেদিনীপুর জেলার গড়বীর নগরে। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ৮ই কার্ত্তিক। পি, এম, বাগচীর পঞ্জিকার ব্যবস্থাপক। পঞ্জিকা সংস্কারের উদ্যোক্তা। গ্রন্থ—জ্যোতিষ, ব্যাকরণ।

মন্মথনাথ দত্ত—অনুবাদক। জন্ম—রামবাগান দত্তবংশে। এম. এ। কেশব একাডেমীর রেক্টর। ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ—রামায়ণ (মূল হইতে), মহাভারত (মূল, ১৮৯৫), শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত।

মন্মথনাথ দে—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—আলাপনী (পাক্ষিক, ১৩০৩ বঙ্গ, কার্ত্তিক)।

মন্মথনাথ দে—কবি। নিবাস—মুরাদপুর, বাঁকীপুর। বি. এল। গ্রন্থ—ভেরী, শৈবাল।

মন্মথনাথ নাগ—সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার বক্সীবাজার। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত, ৩ খণ্ড, শ্রীকৃষ্ণ (পরিশিষ্ট), শ্রীরাধা, ২ খণ্ড, ভক্তের ভগবান, আস্তিক ভাষ্য, কমলাক্ষী (উপন্যাস), কলঙ্ক (নবন্যাস), প্রণয়ীর পত্র। সম্পাদক—মেদিনীপুর হিতৈষী (১৩১৪ বঙ্গ)।

মন্মথনাথ বসু—সাময়িকপত্রসেবী। যুগ্ম-সম্পাদক—পন্থা (মাসিক, ১৩০৪)।

মন্মথনাথ মিত্র—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—কৃষক (মাসিক, ১৯০১), কমলা (মাসিক, ১৮৯৯)।

মন্মথ রায়—নাট্যকার। গ্রন্থ—মুক্তির ডাক, চাঁদ সদাগর, দেবাসুর, মহুয়া, শ্রীবৎস, কারাগার, সাবিত্রী, একাঙ্কিকা, অশোক, খনা, রাজনটী, বিদ্যুৎপর্ণা, সতী।

মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য—স্মার্ত পণ্ডিত। গ্রন্থ—হিন্দু সংকর্মমালা, হিন্দু ব্রতমালা, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, সত্যনারায়ণ, গায়ত্রী সহস্রনাম, বিরাট, হিন্দু নিত্যকর্ম, স্বপ্নফল ও লক্ষ্মীচরিত।

মম্মট ভট্ট রাজানক—আলঙ্কারিক। জন্ম—১১শ শতাব্দী। পিতা—উবটাপচার্য। কবি শ্রীহর্ষের মাতুল। গ্রন্থ—কাব্যপ্রকাশ।

ময়ূর ভট্ট—কাব্য-রচয়িতা। জন্ম—৭ম শতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীক্ষেত্রের পথে এবং ময়ূরগণ কর্তৃক রক্ষিত। কবি বাণভট্ট ইঁহার জামাতা। গ্রন্থ—সূর্যশতক (কাব্য)।

মল্লিকার্জ্জুন সূরি—প্রাচীন বাঙালী জ্যোতির্বিদ। জন্ম—১১০০ শকে বঙ্গদেশে। ইনি অনন্তনারায়ণ আচার্যের পৌত্র। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ও সনাতন বেদপন্থী। টীকাগ্রন্থ—শিষ্যধীমহাতন্ত্রের ব্যাখ্যান, সূর্য-সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যান।

মল্লিনাথ কোলাচল ভট্ট—টীকাকার ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৪-১৫ শতাব্দী দাক্ষিণাত্যে দেবপুরে (ত্রিভুবন নগরে)। পিতা—নরসিংহ ভট্ট। মাতা—নাগম্মা। কথিত আছে প্রথম জীবনে বুদ্ধিমান্দ্যের জন্ম পেড্ডভট নাম ছিল—পরে কাশীতে শিবের উপাসনা করিয়া সকল বিদ্যায় পারদর্শী হন এবং পত্নী মল্লির নাম চিরস্মরণীয় করার জন্ম মল্লিনাথ নাম গ্রহণ করেন। গ্রন্থ—রঘুবীর চরিত (কাব্য); টীকাগ্রন্থ—সঞ্জীবনী (রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের টীকা), সর্বঙ্কষা (শিশুপাল বধ), ঘণ্টপথ (কিরাতার্জুনীয়ম্), জীবাতু (নৈষধ), সর্বপাঠী (ভট্টিকাব্য), তরল (একাবলী অলঙ্কার শাস্ত্র), নিষ্কণ্টক (তার্কিকরক্ষার টীকা)।

মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—কানপুর জুহি নামক স্থানে। গ্রন্থ—সম্পত্তিশাস্ত্র; সম্পাদক—সরস্বতী (মাসিক হিন্দী)।

মহাদেব পাঠক—গ্রন্থকার ও কবি। গ্রন্থ—ঋণ পরিশোধ (১৮১৮)।

মহাদেব সরস্বতী, আচার্য—অদ্বৈতবাদী। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। স্বয়ং প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। গ্রন্থ—তত্ত্বানুসন্ধান (প্রকরণ গ্রন্থ), অদ্বৈতচিন্তা কৌস্তুভ (ঐ টীকা)।

মহাদেব বিষ্ণুনাথ ধুরন্ধর—ঐতিহাসিক। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ ৪ঠা মার্চ বোম্বাই। শিক্ষকতা, স্কুল ও কলেজ। 'রায় বাহাদুর' উপাধিলাভ। গ্রন্থ—ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী (ইতিহাস), The Woman of India.

মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—বিক্রমপুর-প্রকাশ (মাসিক, ১২৮৭)।

মহিমচন্দ্র দাস—সাংবাদিক ও নেতা। জন্ম—১২৭৮ বঙ্গ চট্টগ্রাম। মৃত্যু—১৩৪৭ বঙ্গ (৩রা এপ্রিল), কলিকাতায়। কর্ম—আইন-ব্যবসায়। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান (১৯০৫ খৃঃ)। সম্পাদক—পাঞ্চজন্য (সাপ্তাহিক), জ্যোতি (দৈনিক, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, চট্টগ্রাম)।

মহিমচন্দ্র মজুমদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আশাকাব্য, রাণা রাও।

মহিমচন্দ্র সরকার—রাজকর্মচারী। কর্ম—সবজজ। 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ। স্বত্বাধিকারী—রায় এস, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স। গ্রন্থ—Practice & Procedure iu Civil Cases & Examination of witnesses, The Case-noted Indian Evidence Act. The Specific Relief., The Provincial Insolvency Act.

মহিমাচন্দ্র মজুমদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গৌড়ে ব্রাহ্মণ (১৮৮০)।

মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। জন্ম—হেতমপুর রাজবংশে। গ্রন্থ—বীরভূম রাজবংশ, বীরভূম-বিবরণ, ২ খণ্ড, রমাবতী (নাটক), কিশোরীমিলন (ঐ), চিত্রগুপ্ত (প্রহসন)।

মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। এম.এ, বি.এল। 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ। কর্ম—শিক্ষকতা, আইন-ব্যবসায় ও পরে ভারত সরকারের কর্ম। ইনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। গ্রন্থ—শিক্ষার ভূমিকা।

মহীউদ্দীন—মুসলমান গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পথের গান।

মহীধর আচার্য—ভাষ্যকার। জন্ম—১১শ শতাব্দী বারাণসী ধামে। পিতা—আচার্য রামভক্ত। শিক্ষা—রত্নেশ্বর মিশ্রের নিকট। গ্রন্থ—বেদদীপ (যজুর্বেদভাষ্য), কাত্যায়নগৃহ্যসূত্রভাষ্য, কাত্যায়ন শুল্বসূত্রভাষ্য, ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য, রামগীতাটীকা, বিষ্ণুভক্তিকল্পলতা প্রকাশ, একাক্ষরকোষ, মন্ত্রৌষধি (সংগ্রহ)।

মহীন্দ্রনারায়ণ কবিরত্ন—গ্রন্থকার। কাওয়াকোলা। গ্রন্থ—দেবীপুজায় জীববলি।

মহেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন—পণ্ডিত। জন্ম—১৮৩৬ খৃঃ হাওড়া জেলায় নারীট গ্রামে। মৃত্যু—১৯০৬ খৃঃ। পিতা—হরিনারায়ণ তর্করত্ন। শিক্ষা—টোলে, (কাশীধামে)। শোভাবাজার রাজবাটী চতুষ্পাঠী স্থাপনা (১৮৬৩)। অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ। 'সি. আই. ই' উপাধি (১৮৮১), মহামহোপাধ্যায় উপাধি (১৮৮৭) লাভ। ইনি সংস্কৃতে উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তক। নিজ গ্রামে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন। টীকাগ্রন্থ—কৃষ্ণচতুর্বেদ, মীমাংসাদর্শন, কাব্যপ্রকাশ।

মহেন্দ্রচন্দ্র রায়—গ্রন্থকার। জন্ম—কলিকাতা। গ্রন্থ—বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ ও সাধুজীবন।

মহেন্দ্রনাথ কবিরত্ন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিষ-কুসুম (১২৯৩)।

মহেন্দ্রনাথ করণ—কবি ও ঐতিহাসিক। জন্ম—১২৯৩ বঙ্গ ৪ঠা অগ্রহায়ণ মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার অন্তর্গত জঙ্গলমারী গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩৫ বঙ্গ ১লা শ্রাবণ। পিতা—ক্ষেমানন্দ করণ। গ্রন্থ—সমাজ-রেণু (১৩৩২), হিজলীর মসনদ-ই-আলা (১৩৩৩), খেজুরী বন্দর (১৩৩৪), পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ (১৩৩৫), বঙ্গলক্ষ্মী ব্রতকথা (১৯০৫ খৃঃ), স্মৃতির দান (১৩৩৭), History and Ethnology of Cultivating Pods (১৯১৯), পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয় (১৩৩৪)। সহ-সম্পাদক—প্রতিজ্ঞা (সাপ্তাহিক, ১৩২৫), সম্পাদক—পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাচার (মাসিক ১৩৩১)।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য। ছদ্মনাম—'শ্রীম'। জন্ম—১২৩১ বঙ্গ ২১এ আষাঢ় কলিকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে। মৃত্যু—১৯৩২ খৃঃ ৪ঠা জুন। পিতা—মধুসূদন গুপ্ত। মাতা—স্বর্ণময়ী। শিক্ষা—হেয়ার স্কুল, বি-এ, (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৭৪)। কর্ম—সওদাগরী অফিসে, প্রধান শিক্ষক, নড়াইল উচ্চ বিদ্যালয়, সিটি, রিপণ, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, মর্টন ইনষ্টিটিউসন। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে গতায়াত, পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। মাষ্টার মহাশয় নামে পরিচিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত প্রথম পরিচয় (১৮৮২ খৃঃ মার্চ মাসে)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের ঘটনাবলী ও উপদেশ ইনি ডায়েরী আকারে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫ খণ্ড, (১৮৮২—১৯৩২) Gospel of Ramkrisna. (১৮৯৭)।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—চিকিৎসক। এল.এম.এস। গ্রন্থ—ভৈষজ্যসার (১৮৬৯)।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—শিবপূজা-পদ্ধতি।

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—হেমলতা (পাক্ষিক, ১২০০ বঙ্গ)।

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বঙ্গভাষার ইতিহাস (১৮৭১)।

মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সেবিকা (মাসিক, ১৮৯৯, ডায়মণ্ডহারবার)।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত—নাট্যকার। গ্রন্থ—উষা ও অনিরুদ্ধ, বৃহন্নলা।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—কলিকাতা শিমুলিয়া অঞ্চলে। পিতা—বিশ্বনাথ দত্ত। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা। গ্রন্থ—লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান, স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান, সাধু চতুষ্টয়।

মহেন্দ্রনাথ দাস—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৯৩ বঙ্গ ১১এ অগ্রহায়ণ মেদিনীপুর শহরের পাটনাবাজার পল্লীতে। শিক্ষা—মেদিনীপুর ও কলিকাতা। এফ-এ (মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন)। কর্ম—মেদিনীপুর কালেকটরী, পরে সর্বোচ্চ সুপারিনটেনডেন্ট পদ

লাভ। অবসর গ্রহণ (১৯৩১)। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা। গ্রন্থ—রূপান্তর (উপ, ১৩৪৪), শৈলজার কথা (১৩৩৪), সেবার পথে (অনুবাদ); 'দ'কারের দান (রস-রচনা)। সম্পাদক—কল্যাণী (সাপ্তাহিক), দেশের ডাক (ঐ), মাধবী (মাসিক), সুদর্শন, মেদিনীবাণী।

মহেন্দ্রনাথ বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নানকপ্রকাশ।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬০ বঙ্গ ১৫ই চৈত্র হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৯ বঙ্গ ৪ঠা অগ্রহায়ণ। পিতা—গোপীনাথ চূড়ামণি গোস্বামী। শিক্ষা—শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালা ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। কর্ম—শিক্ষকতা, বিভিন্ন বিদ্যালয়। সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যাবস্থায় মহাত্মা হ্যানিম্যানের ক্ষুদ্র জীবনী রচনা। ইহার প্রথম প্রবন্ধ 'আর্যদর্শনে' প্রকাশ হয়। এই সময়ে শিক্ষকতা হইতে দূরে থাকিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত কর্মী ও অন্যতম সহকারী সম্পাদক। 'সাহিত্য-সভা'রও অন্যতম সহকারী সম্পাদক। বিভিন্ন বিষয়ে ইনি অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থ—মহাত্মা হ্যানিম্যান জীবনচরিত, অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত, প্রাচীন আর্যরমণীদের জীবনবৃত্তান্ত। সম্পাদক—সাহিত্য সংহিতা, জন্মভূমি (১৯০১), কল্পনা পুরোহিত (মাসিক, ১৩০০); সহ-সম্পাদক—আর্যভূমি; পরিচালক—অনুশীলন (মাসিক, ১৩০১)।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য, ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—নবদ্বীপ। পিতা—রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য। শিক্ষা—এম.এ (১৮৬৯), বি.এল (১৮৭১)। কর্ম—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা' নামে পঞ্জিকার প্রচলন করেন। 'বিদ্যারণ্য' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—পদার্থদর্শন, বিজ্ঞানরহস্য, বিজ্ঞানসূত্র।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—বিজ্ঞান-রহস্য (মাসিক, ১২৭৮)।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—নবদ্বীপ। গ্রন্থ—পদার্থদর্শন, বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক।

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—আভা (রংপুর, মাসিক, ১৩০১)।

মহেন্দ্রনাথ মল্লিক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সঙ্গীত-সুধাকর ১২ খণ্ড।

মহেন্দ্রনাথ রায়—পণ্ডিত। 'তত্ত্বনিধি' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ, ঋগ্বেদ, মানবতত্ত্ব, ব্রহ্মচর্য, অষ্টোত্তর শতোপনিষদ্, ৩য় খণ্ড, মরণের পরপারে।

মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী—কবি। গ্রন্থ—পঙ্কজকলাপ (শ্রীরামপুর, ১৮৭০)।

মহেন্দ্রনাথ হালদার—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—বিশ্বজীবন (মাসিক, ১৩০৩, পৌষ)।

মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—রঙ্গপুরের হালিশহরের জমিদার-বংশে। সম্পাদক—আভা (মাসিক, ১৩০১)।

মহেন্দ্রলাল খাঁন, রাজা—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৩ খৃঃ ১লা অক্টোবর মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোলে। মৃত্যু—১৮৯৩ খৃঃ ১৩ই জানুয়ারি। পিতা—রাজা অযোধ্যালাল খাঁন। গ্রন্থ—সঙ্গীতলহরী (১৮৭১), মানমিলন (১৮৭৮), গোবিন্দগীতিকা (১৮৮০), শারদোৎসব (১৮৮১), মথুরামিলন (১৮৮৯), History of Midnapur Raj.

মহেন্দ্রলাল গর্গ—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ মথুরা। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। হিন্দী গ্রন্থ—চীন দর্শন, জাপান দর্শন, শিশুপালন, পৃথ্বিপরিক্রমা, পতিপত্নীসংবাদ, দন্তরক্ষা, তরুনোঁ কি দিন চর্যা, অনন্ত জওয়া, জাপানী স্ত্রীশিক্ষা, ধ্রুবদেশ, সুবমার্গী, প্লেগ চিকিৎসা।

মহেন্দ্রলাল সরকার—স্বদেশপ্রেমিক ও চিকিৎসক। জন্ম—১৮৩৩ খৃঃ ২রা নভেম্বর। মৃত্যু—১৯০৪ খৃঃ ২৩এ ফেব্রুয়ারি। পিতা—তারকনাথ সরকার। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। শিক্ষা—হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ (১৮৫৪), এল. এম. এস (১৮৬০), এম্‌-ডি (১৮৬৩), ডি.এল (বিশ্ববিদ্যালয়)। সি. আই. ই উপাধি লাভ। কর্ম—প্রথমে ইনি এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা শুরু করেন, পরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সুফল দেখিয়া হোমিওপ্যাথি মত গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ইনি বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতিতে পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রতিষ্ঠাতা—দেওঘর রাজকুমারী লেপার এসাইলাম। পরিচালনা—Calcutta Journal of Medicine. ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক (১৮৭৬—১৯০৪)। গ্রন্থ—A Sketch of the Treatment of Cholera.

মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—গদ্য-প্রসূন (মাসিক, ১৮৬১ খৃঃ ঢাকা), গদ্যমাসিক (মাসিক, ঢাকা, ১৮৬১)।

মহেশচন্দ্র ঘোষ—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—সম্বাদকৌস্তুভ (সাপ্তাহিক, ১৮৪৮, অক্টোবর)।

মহেশচন্দ্র বক্সী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অপূর্ব সন্ন্যাস (ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩০২)।

মহেশচরণ সিংহ—হিন্দী গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি. এ, এম.এস.সি। অধ্যাপক, গুরুকুল, কাংড়ী, হরিদ্বার। হিন্দী গ্রন্থ—রসায়ন শাস্ত্র, বনস্পত শাস্ত্র, বিদ্যুৎ শাস্ত্র, হিন্দী কেমিষ্ট্রী।

মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার—পণ্ডিত। জন্ম—১৫৮২ খৃঃ শ্রীহট্টে। পিতা—মুকুন্দ বিশারদ। গ্রন্থ—চিন্তামণি (কাব্যপ্রকাশের ভাবার্থ টীকা), বর্ণধর্মপ্রদীপ, দারপ্রদীপ, বিচারপ্রদীপ, সংসার-প্রদীপ।

মাখনলাল ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Life of Yudhisthira (১৮৬৮)।

মাখনলাল চক্রবর্তী—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—কালভৈরব (মাসিক, ১২৯১)।

মাখনলাল দত্ত—সাময়িকপত্রসেবী। গ্রন্থ—মগের মুলুক (১২৯৩)। সম্পাদক—মালা (মাসিক, ১২৮৯), সমীরণ (মাসিক, ১২৮১)।

[ক্রমশঃ।

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

৬

রাজদরবারেই কেবল নন, সারা ফরাসী দেশের অভিজাত সমাজের মধ্যমণি হলেন মঁসিয়ে। গতরাত্রি কেটেছে কতকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিকতার আহ্বানে। গ্র্যাণ্ড অপেরা থিয়েটার দেখেছেন সপারিষদ। তার পর সান্ধ্য-ভোজনের বিরাট পর্ব। রাজকার্যের জগদ্দল দায়িত্বের পর এই সব প্রমোদ-অনুষ্ঠান আছে বলেই মঁসিয়ের মত অভিজাতদের নিশ্বাস ফেলার অবসর ঘটে।

যেখানেই যান সঙ্গে থাকে বিরাট কর্মচারী, খানসামা-বাবুর্চির দল। পাণ থেকে চুণ খসলে সম্ভ্রম থাকে না। কেবল কর্মচারী-খানসামাদের দেখলেই বোঝা যায় কী বিরাট ধনী মঁসিয়ে। আভিজাত্যের পরিমাপ পাওয়া যায় আহার-পর্বের খতিয়ানে, আনুষ্ঠানিকের ঐশ্বর্য আড়ম্বরে, বসন-ভূষণের জৌলুষে। কোন একটির ক্ষুন্নতা ঘটলে সম্মান-প্রতিপত্তির ক্ষুন্নতা ঘটে। তাতে প্রাণ থাকলেও মান থাকে না।

সারা ফ্রান্সের যত ভোজ্য, যত ভোগ্য সব একমুষ্টি অভিজাত আঁকড়ে বসে আছেন। আর সেই সৌভাগ্যবানদের অন্যতম হলেন ইনি। ভোগ করে করে এই মানুষগুলির উদরের পরিমাণ এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সারা দেশ গিলে খেলেও হয়ত তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটবে না।

সংসারের রীতি সম্বন্ধে মারকুইস উদার মতাবলম্বী। তিনি বলেন, জীবন ও জীবিকা যেমন চলেছে চলুক। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁরা ললাটে ভাগ্যের জয়টীকা পরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা ঈশ্বরের বরপুত্র। তাঁরই পবিত্র ইচ্ছায় রাজসুখ উপভোগ করছেন। এ পৃথিবীর যত প্রাচুর্য সব আমাদের, এ কথা বলেন মঁসিয়ে। বলেন,—বিশ্বাসও করেন।

সেদিনকার বিরাট ভোজ-সভায় সমবেত হয়েছিলেন ফ্রান্সের সেরা অভিজাতরা। কক্ষের ঐশ্বর্যমণ্ডিত শিল্পরুচির সঙ্গে অতিথিদের প্রসাধন ও রূপসজ্জা যেন এক মধুর ঐক্যতান সৃষ্টি করেছিল। সামরিক রথীরা ছিলেন, যাঁদের সমর-বিদ্যা সম্বন্ধে অণুমাত্র জ্ঞান নেই। ছিলেন নৌ-অফিসাররা, যাঁরা জাহাজের 'জ' জানেন না। অসামরিক রাজপুরুষরা সম্মানিত করেছিলেন মঁসিয়েকে, যাঁরা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনার কোন সংবাদ রাখেন না। গীর্জার পুরোহিত ও ধর্মের প্রহরীরা ছিলেন। এঁরাই বোধ হয় পৃথিবীর সর্বাধিক লোভী, কামী, আত্মসুখী-গোষ্ঠী। এঁদের চোখে কামনার নীল আলো। জিহ্বা অসংযত। জীবন যাপন ততোধিক নিন্দার। যে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের এঁরা প্রতিভূ তার যোগ্যতা থাকা তো দূরের কথা, এঁদের সমস্ত সততাই ভণ্ডামি। বাইরের মুখোস মাত্র।

আর ছিলেন ফড়েদের দল। এঁরা কারুরই প্রতিনিধি নন। সংসারের সোজা সড়কের বাইরে যেখানেই কিছু মুনাফা শিকারের সম্ভাবনা, সেখানেই এই ভাগ্যান্বেষীদের পর্যাপ্ত সমাগম। মানুষের আয়ু ও স্বাস্থ্য নিয়ে যাঁরা ছিনিমিনি খেলে প্রভূত দৌলত জমাচ্ছেন, তেমন এক দল ডাক্তারও ছিলেন আসর উজ্জ্বল করে। রাষ্ট্রের শত পরিকল্পনার মন্ত্রণাদাতার দল আজকের আসরে অনুপস্থিত ছিলেন না। এঁদের উর্বর কল্পনাশক্তি নব-নব দিকে ধাবিত। কেবল বাস্তবের একখানি পাথর সরিয়ে বসানোর যোগ্যতা বা শক্তি এঁদের নেই।

প্যারিসের অভিজাত ধনী সমাজের একটি ছবি যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছিল মঁসিয়ের ভোজ-সভায়। বাক্‌চতুর দার্শনিকের সঙ্গে আলাপরত বৈজ্ঞানিক। পোষাকী আচার-আচরণে নিটোল মুক্তার মত প্যারিসের বড়বাবুর দল। মহিলারাও সমবেত হয়েছেন দলে-দলে। তরুণী থেকে বৃদ্ধা। রূপে-রোশনায়ে সবাই প্রতিদ্বন্দ্বী। বয়স ঢলে পড়েছে। সারা জীবনে মনোমত বর পেলেন না বলে আজও কুমারী। এমনও কত। যাঁরা বিবাহিতা, তাঁরা মা নন। মা সব চাষীর ঘরে। ফ্রান্সের ভাবী কাল বড় হচ্ছে গরীব মা-বাপের কোলে। ঐশ্বর্যের দিন কাটে শুধু রূপ-পরিচর্যায় আর নিষ্ফল বিলাস-বাসনা মেটাতে।

এখানে যেন মনুষ্যত্বের অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ।

তা হোক্। কিন্তু সর্বাঙ্গের সজ্জায় আভরণে এতটুকু চ্যুতি নেই। পাউডারে প্রসাধনে কত যত্ন করে করে বর্ণ ঠিক রাখা। ত্বকের কমনীয়তা। মুখের লাবণ্য। বিরলকেশ মাথায় পরচুলার চাতুরী। অঙ্গের সুবাস রূপের সঙ্গে যেন ছন্দোময়। তার সঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারের ধ্বনি। রেশমে পশমে সোনায় জরিতে সুরে সুরভিতে সভা-কক্ষ যেন নন্দন!

আর তার মধ্যে মঁসিয়ে মৃদুপদে হেঁটে যাচ্ছেন। ঈষৎ স্ফুরিত অধরে মৃদু মানবী হাসি বিতরণ করছেন। দুটি-একটি কথা কইছেন কোন ভাগ্যবানের সঙ্গে। আশ্বাসও দিচ্ছেন। কাউকে শুধু স্মিত হাস্যে পুলকিত করছেন। সর্বাঙ্গের সুবাস ছাপিয়ে সন্ধ্যায় পান করা বহু মূল্য সুরার সুরভি জড়িয়ে আছে মানুষটিকে।

মানুষ তো নন। যেন দেবতা! অমৃত-পাত্র এনেছেন অভাজনদের কৃপা করতে। এমনি অভিবাদন আর বিনয়ের ঘটা। যত পূজা পেলেন, দেখে দেবতাদের ঈর্ষা ঘটে। পর্যটন শেষ হলে মঁসিয়ে নিজের কামরায় অন্তর্হিত হলেন। তখন সভা ভঙ্গ হোল। একে-একে অতিথিরা বিদায় নিলেন। শুধু সেই উজ্জ্বল আলোকিত সভায় বিচিত্র শব্দ গন্ধের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে একটি পরিণত-বয়স্ক পুরুষ কতকক্ষণ কি ভাবলেন। তার পর হাতে হ্যাট নিয়ে দর্পণ-খচিত প্রাচীরের পাশ দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। দ্বার-প্রান্তে দাঁড়িয়ে একবার মাত্র পিছন ফিরে তাকালেন সেই কক্ষটির দিকে। তার পর কাকে যেন উদ্দেশ করে বললেন—'নরকস্থ হও তুমি।'

তার পর সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে এলেন নীচে।

ষাট বছরের মানুষটি রূপবান। বেশ-বিন্যাসে সে রূপ দৃপ্ত। মুখ যেন মুখোস। পৃথিবীর দাম্ভিকতা মাখান সেই মুখ। ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলে চোখের ব্যঞ্জনায় নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ নজরে পড়ে। আভিজাত্যের কৃত্রিম হাসিতে সেটুকু ঢাকতে পারে না।

বাগানে গাড়ী অপেক্ষায় ছিল। উঠে বসতেই গাড়ী ছুটল।

আজকের সভায় যথাযোগ্য সমাদর পাননি। তার জন্য মনটা বিরক্ত হয়ে আছে। মঁসিয়ে আজ কারুর সঙ্গে আলাপে প্রসন্নতা দেখালেন না। কি জানি কেন সকলের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ কাটালেন সময়।

গাড়ী ছুটেছে যেন শত্রুব্যূহ ভেদ করছে। প্যারিসের সরু-সরু

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়।
SUNLIGHT
SOAP

রাস্তায় এত জোরে গাড়ী চালান মারাত্মক। ফুটপাত নেই যে নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সতর্ক সাবধান হয়ে পথ চলবে। কিন্তু সে কথা কে ভাবে? যেমন চলে আসছে তেমন চলে। আর চলে বড়লোকদের এই পৈশাচিক তাণ্ডব।

তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ করে গাড়ী ছুটছে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে। মানুষের জীবনের উপর কোন মায়া-দয়া নেই এদের। এতটুকু অসাবধানে কী বিপদ ঘটে যেতে পারে, ভেবে দেখে না এরা। ডুকরে কেঁদে উঠে গাড়ীর সামনে থেকে ছুটে পালায় মেয়েরা। ছোট ছেলেদের পাখীর ছানার মত ছোঁ মেরে সরিয়ে নেয় মা-বাপ। এমনি চলে পথ থেকে পথে এক রকম।

হঠাৎ বাঁক নিতেই গাড়ীর চাকা লাফিয়ে উঠল সশব্দে। আর সেই সঙ্গে আর্ত্ত চীৎকার উঠল বাতাস বিদীর্ণ করে।

এমন ঘটনা নূতন নয়। কোচোয়ান ক্বচিৎ এরূপ ক্ষেত্রে গাড়ী থামায়। হত হোক, আহত হোক, তা বলে তো মারকুইস মঁসিয়েদের গাড়ী নোংরা রাস্তায় দাঁড়াতে পারে না!

এখানেও তাই হোত। কিন্তু ঘোড়ার লাগামে দশ জোড়া হাত উদ্যত প্রতিরোধে দৃঢ় হয়েছে দেখে সহিস ভয়ে-ভয়ে নেমে এল রাস্তায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন মারকুইস—'কি হয়েছে?'

মাথায় টুপি একটি লম্বা লোক ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে এক দলা রক্ত মাংস তুলে নিয়ে পথের ধারে রাখলে। তার পর সেই কাদার মধ্যে বসে বন্য জন্তুর মত আছাড়ি-পিছাড়ি করে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

—'একটা ছেলে মরেছে হুজুর!'

—'তাতে এত চেঁচামেচি কিসের? ওর ছেলে?'

—'হ্যাঁ হুজুর—'

সেই কাদা-রক্ত-মাথা লোকটি ততক্ষণে উঠে কাছে এসে দাঁড়াতেই মারকুইস একবার তরবারির হাতলে হাত দিলেন।

বাতাসে দুটি হাত ছুঁড়ে দিয়ে লোকটি কান্না-ভাঙা গলায় বললে —'মেরে ফেলেছে। একেবারে পাথর হয়ে গেছে।'

পথের ভিড় জমেছে মারকুইসের গাড়ীর কাছে। চোখে-চোখে কৌতূহল। রাগ-বিদ্বেষ তখনো জ্বলেনি সে সব দৃষ্টিতে। বাপের তীব্র আর্ত চীৎকারের পর সব ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা এক দল ইঁদুর যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—ভাবলেন মারকুইস।

পকেট থেকে মোহরের থলি বার করলেন। তার পর মানুষগুলোকে উদ্দেশ করে বললেন—'আশ্চর্য লাগে আমার যে, নিজেদের আর ছেলেপিলেদের কোন যত্ন নিতে অবধি তোমরা শেখোনি। একটা না একটা সব সময় পথে আছেই আছে। আমার ঘোড়াগুলোর কি ক্ষতি করেছ তোমরা জান না। যাও, এই মোহরটা ছোঁড়ার বাপটাকে দিয়ে দাও।'

সহিসকে লক্ষ্য করে মারকুইস একটা মোহর ছুঁড়ে দিলেন পথে। অনেক জোড়া চোখ কৌতূহলে নত হয়ে দেখলে।

লোকটা আর একবার প্রেত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—'মরে গেছে।' আর একটি লোক এসে তাকে সবলে উঠাতেই লোকটি তার কাঁধে মাথা রেখে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল। শুধু একটি বার পথিপার্শ্বের সেই নিশ্চল রক্ত-মাংসের ডেলাটুকু দেখাতেই তার পিতৃহৃদয়ের শোক বিগলিত ধারায় ঝরতে লাগল।

—'কেঁদো না—অমন করে ভেঙে পড়ো না ভাই! ছেলে তোমার সুখেই গেল। বেঁচে তার কি সুখ ছিল? মরে শান্তি পেলে চিরজন্মের মত।'

—'তুমি দেখছি দার্শনিক। এই যে ওহে—' হেসে বললেন মারকুইস—'তোমার নামটি কি?'

—'আমার নাম দাফার্জ।'

—'কি কাজ কর?'

—'মদ বেচি।'

—'মোহরটা তুলে নাও। যেমন খুশী খরচ করো। কোচোয়ান গাড়ী ছাড়।'

গাড়ীর ছাড়ার উদ্যোগ হতেই মারকুইস সিটের পিছনে আরাম করে বসলেন। কি যেন একটা জিনিষ ভেঙে ফেলেছেন অসাবধানে। তার বাবদ মূল্যও ধরে দিয়েছেন। সুতরাং আর মাথা ঘামাবার কিছু রইল না।

এমন সময় একটা মোহর টুং করে গাড়ীর ভিতরে ছিটকে এসে পড়ল।

—'রোখো। কে ছুঁড়েছে মোহর?'

এই মাত্র যেখানে দাফার্জ দাঁড়িয়েছিল সেদিকে তাকালেন মারকুইস। দেখলেন, পথের উপরে কেঁদে-কেঁদে মুখ ঘসছে বাপ। আর তার পাশে একটি বলিষ্ঠাঙ্গী মেয়ে দাঁড়িয়ে উল বুনছে।

—'নোংরা কুকুরের দল। তোদের বুকের উপর দিয়ে এই গাড়ীর চাকা পিষে দিয়ে যেতে পারলে তবে আমার আক্রোশ মেটে। যে রাস্কেল মোহর ছুঁড়েছে—'

এই মানুষটা মুখে যা বলছে তার চেয়ে ঢের বেশী হিংস্রতা করতে পারে এ কথা জানে না কে? আইনের বাইরেও তার অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা নেই। সে কথা ভেবে জনতার মুখে একটা রা উঠল না। শুধু সেই উল-বোনা মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মারকুইসের দিকে।

কতক্ষণ পরে আবার হুকুম দিলেন—'ছোড়ো গাড়ী।'

মারকুইসের গাড়ীর পিছনে আরো কত গাড়ী ছুটে গেল। পথের ধারের কুকুরের দল অবাক চোখে দেখতে লাগল এই ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের ছেদহীন মিছিল। তাও এক সময় শেষ হোল।

শুধু সেই উল-বোনা মেয়েটির কাজের বিরতি ঘটল না। উদাসিনী নিয়তির মত সে ভাগ্য-সূত্র গেঁথে যেতে লাগল।

৭

এপাশে-ওপাশে যত দূর দৃষ্টি চলে, ফসলের ফলন চোখে পড়ে। তাও একটানা নয়। ছাড়া-ছাড়া। কোথাও কয়েক ফালি যব, কয়েক ফালি কড়াই মটর। কোথাও গমজাতীয় শস্য। এখানকার মানুষের চেহারার মতই যেন ফসলের অবস্থা। না আছে দীপ্তি, না পুষ্টি।

চার ঘোড়ায় টানা বিহার-শকটে চলেছেন মঁসিয়ে মারকুইস। গাড়ী খাড়াই ভেঙে উপরে উঠছে। মারকুইসের মুখে পড়েছে রক্তের আভা। আভিজাত্যের রঙে রাঙা নয়, অস্তগামী সূর্যের আলোয়

বক্তিম। খাড়াই পার হয়ে পিছনে ধূলির ঝড় তুলে গাড়ী উৎরাইতে নামতে না নামতেই পাহাড়ের আড়ালে সূর্য নেমে গেলেন দিনের মত। সূর্যের সঙ্গে-সঙ্গে মারকুইসও নেমে গেলেন দৃষ্টির আড়ালে। মুখের আভাও আর রইল না মুখে। সূর্য নেমে যাবার পর মারকুইস নেমে যাবার পরও শুধু জেগে পড়ে রইল পাহাড়ের পায়ের কাছে একটি ভগ্ন জীর্ণ দেউলে হয়ে যাওয়া গ্রামজীবন। পড়ে রইল গ্রামের সেই বিশাল উদার মাঠ। মাঠের শেষে আকাশমুখী গীর্জা। জেগে রইল শুধু বন আর টিলা। আর সেই টিলার উপর প্রহরীর মত দুর্গ কারাগার।

দিক্-দিগন্ত আচ্ছন্ন করে সন্ধ্যা নামল। অন্ধকার যেন কালো আবরণে ঢেকে নিতে এল গৃহ-ফেরা যাত্রীকে।

যেমন গ্রাম তেমনি লক্ষ্মীছাড়া লোক-জন। কোথাও শ্রী নেই, ছাঁদ নেই—সব কিছুতেই দারিদ্র্যের ছাপ। সন্ধ্যা বেলা অনেকেই বেকার, দরজার সামনে বসে। কেউ-কেউ রাতের খাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত। কেউ বা ঝরণার ধারে গেছে শেকড় ও ঘাস-পাতা ধুতে। মাটীর ফসল যা কিছু, সবেতেই পেট ভরে, ক্ষুধা মরে। এদের ভরসাতেই বেঁচে আছে। নইলে এখানকার মানুষ কর-ভারে এমন জর্জরিত যে, পেষণ নিষ্পেষণে তাদের আর অবশিষ্ট যেন কিছু নেই।

রাস্তায় কদাচিৎ শিশুদের মুখ দেখা যায়—কুকুরদের তো দেখাই যায় না।

পৃথিবীতে এরা দুটি ভবিষ্যৎ নিয়ে এসেছে। কায়ক্লেশে টিঁকে থাকা, নয় কারাগারে মরণ।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর সহিসদের চীৎকারের সঙ্গে উদ্যতফণা চাবুকের তীক্ষ্ণ শব্দ বাতাসে ধ্বনিত হয়ে উঠল। মারকুইসের গাড়ী এসে ফোয়ারার কাছ বরাবর ডাক-গাড়ীর আড্ডায় থামল। চাষীরা কাজ-কর্ম ফেলে তাকাল তাঁর দিকে। জমিদারও তাকালেন তাদের দিকে। সে দৃষ্টির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সবাই চোখ নামাল।

হুকুম দিলেন মারকুইস—'লোকটাকে ধরে নিয়ে আয়।'

হাতে টুপি লোকটিকে নিয়ে আসা হোল। বাকী সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল চারি দিক থেকে।

—'রাস্তায় তোমার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল?'

—'হ্যাঁ হুজুর!'

—'একবার নয় দু'বার। তা অত জ্বল্-জ্বল্ করে কি দেখছিলে?'

একটু নত হয়ে লোকটা হাতের নীল টুপি বাড়িয়ে গাড়ীর তলার দিকে দেখল। সমবেত জনতাও কুঁজো হয়ে গাড়ীর তলার দিকে তাকাল।

—'কে? ওখানে কি দেখছ?

—'লোকটি শেকলে ঝুলছে।'

—'কে?'

—'লোকটি।'

—'যত সব মূর্খের দল! লোকটার নাম নেই? এই গ্রামের সকলকে চেন। কে ও?'

—'হুজুর, ও এ গ্রামের নয়। জীবনে আমি কখনো ওর মুখ দেখিনি।'

—'শেকলে ঝুলছে? দম আটকে মরার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি?'

—'সেইটাই আশ্চর্য ঠেকছে হুজুর। মাথাটা ঝুলছে—ঠিক এই ভাবে।'

—'কিসের মত দেখতে?'

—'কি দেখব হুজুর? সব সাদা। সারা গা ধূলায় ঢাকা—ভূতের মত লম্বা দেখতে। ভূতের মত সাদা।'

এই বর্ণনায় সমবেত জনতার মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হোল। প্রত্যেকের দৃষ্টি মঁসিয়ের উপর নিবদ্ধ।

—'আমার গাড়ীর তলায় চোর আর তুমি হতভাগা মুখটি বুজে আছ নির্বিকার। ওটাকে দূর করে দাও।' —মঁসিয়ে গর্জন করে উঠলেন।

—'ভাগো এখান থেকে।' —ধমক দিলেন পোষ্ট মাষ্টার।

—'লোকটা যদি আজ রাত্রে এই গ্রামে থাকে ওর উপর নজর রেখো। চুরি-টুরি করে না যেন।'

—'আপনার হুকুম, হুজুর!'

হুড়মুড় শব্দে গাড়ী আবার ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে লাগল। খাড়া পাহাড়ে উঠতেই গতি শ্লথ হয়ে এল গাড়ীর। গ্রীষ্ম রাতের নানা সুরভির হাট বসেছে চারি দিকে। ডাঁশ-মশারা ঘোড়াগুলির মুখের চারি দিকে গুনগুনানির সূক্ষ্ম জাল রচনা করতে লাগল।

পাহাড়ের একটি উচ্চতম শীর্ষে ছোট্ট একটি কবর। কবরের উপর একটি ক্রুশ-চিহ্ন আর ক্রুশে আঁটা বিশ্ব-পরিত্রাতার চেহারা। কাঠে খোদাই-করা অনিপুণ হাতের নিরাভরণ মূর্তি। কিন্তু মূর্তিটি যেন নিজের জীবনের প্রতিচ্ছায়া। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। লোকটি জীবন-শিল্পীই বটে।

একটি নারী সেই অপরিমিত দুঃখের প্রতীকটির নীচে হাঁটু গেড়ে বসেছে। গাড়ীটি নিকটে আসতেই পলকে উঠে দাঁড়াল সে। তার পর গাড়ীর দরজার কাছে সরে এল।

—'হুজুর, আপনি! একটি আবেদন আছে।'

—'কি চাই? সব সময় শুধু আবেদন আর আবেদন!' —অধৈর্যের সঙ্গে বললেন মঁসিয়ে।

—'হুজুর, ভগবান আপনাকে দয়া করুন! আমার স্বামী—বন বিভাগে কাজ করত।'

—'কি হয়েছে তোমার স্বামীর? তোমাদের স্বভাবই ঐ রকম। সরকারকে কিছু দেবে না?'

—'তার আর দিতে কিছু বাকী নেই হুজুর! সব দিয়ে একেবারে মরে গেছে।'

—'মরে গেছে! আমাকে কি তার প্রাণটা ফিরিয়ে দিতে হবে?'

—'না হুজুর! সে ঐখানে শুয়ে আছে—ঐ আগাছার নীচে।'

—'কি হয়েছে তাতে?'

—'এত আগাছা, হুজুর, সেখানে—'

—'তাতে কি?'

অল্প বয়সে জীর্ণ হয়ে পড়েছে মেয়েটি। যেন মূর্তিমতী শোক। কথা কইতে-কইতে মাঝে মাঝে নীল শিরা বের করা একটি হাত সে গাড়ীর দরজার উপর রাখছিল।

—'হুজুর, শুনুন আমার নিবেদন! আমার স্বামী না খেতে পেয়ে মারা গেছে। না খেতে পেয়ে অনেকেই মরে, আরো কত মরবে।'

—'আমি কি সকলকে খাওয়াব?'

—'হুজুরের কাছে সে দাবী আমি করি না। আমার আবেদন,

হুজুর, শুধু এক টুকরো কাঠ বা পাথর—তাতে আমার স্বামীর নাম খোদাই করে তার কবরের উপর রাখা হোক্—তার অন্তিম শয়ানের স্থানটি জানুক সবাই। না হলে স্থানটির কথা ভুলে যাবে লোকে—আমিও যখন ঐ এক রোগে মারা যাব তারা খুঁজে পাবে না কোথায় কবরটি ছিল। আমাকেও অমনি কোন আগাছার নীচে গোর দেবে। এত আগাছা হুজুর—এত বাড়ন তাদের, অথচ এত অভাব চারি দিকে।'

পার্শ্বচর মেয়েটির হাতখানা সরিয়ে দিল গাড়ীর দরজা থেকে। গাড়ী আবার যাত্রা সুরু করল। অশ্বরেরা ছুটতে লাগল হাওয়ার বেগে। দেখতে দেখতে তাদের ব্যবধান দুস্তর হতে লাগল।

গ্রীষ্ম রাতের সুমধুর সুরভি চারি পাশে আবার মায়াজাল রচনা করে। বনস্পতির ডালপালা-বাহু-বিজড়িত নিজ প্রাসাদের ছায়ায় প্রবেশ করলেন মারকুইস। ছায়া অপসারিত করে বাড়ী দেখা দিল। মঁসিয়ের গাড়ী থামল। অবারিত হোল বিরাট প্রাসাদের বিরাট দরজা।

—'মঁসিয়ে চার্লস—ইংল্যাণ্ড থেকে যার আসার কথা, এসেছে কি?'

—'না মঁসিয়ে।'

৮

মারকুইসের প্রাসাদটি বিপুলকায়। আগাগোড়া পাথরের তৈরী। সম্মুখের শান-বাঁধান চত্বরটি প্রস্তর-শিল্পের আভরণে সজ্জিত।

গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াতেই খানসামা সিঁড়ি ভেঙে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাইরে কালো রাত। পেঁচার ডানা-ঝাপটায় একবার যেন সচকিত হয়ে উঠল। তার পর আবার সব নীরব-নিঝুম। যেন হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে রাত আবার নিরুদ্ধ নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল।

বিরাট দরজা বন্ধ করার ভারী আওয়াজ হোল। মারকুইস প্রবেশ করলেন অস্ত্র-ঘরে। এ ঘরের থরে-থরে সাজান চাবুক আর লোহার ডাণ্ডার পরিচয় জানে চাষী প্রজারা। জমিদারের রাগের মুখে পড়ে যারা ওর ঘায়ে সাবাড় হয়েছে। নয় তো ঘায়েল হয়েছে রীতিমত।

আরো সিঁড়ি ভেঙে মারকুইস নিজের মহলে এসে পড়লেন। তিনখানি ঘর নিয়ে এ মহল—তাঁর নিজস্ব নিরিবিলি। ফ্রান্সের রাজবংশের অনেক ধারারক্ষী চিত্রপট আর আসবাবে সাজান তাঁর নিজের শয়ন-কক্ষ। অনেক ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খাওয়ার টেবিলে দু'জনের ব্যবস্থা তৈরী। সেদিকে নজর পড়তেই মারকুইস বললেন—'ভাইপো এখনো এসে পৌঁছয়নি শুনলাম। আজ রাতে আর আসবে বলে মনে হয় না। খাবারের ব্যবস্থা যেমন আছে থাক। পনের মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে আসছি আমি।'

অল্প পরেই আহারের জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেন তিনি। একলাই খেতে বসলেন। ঝোল মুখে দিয়ে আর একটিতে হাত দিতে যাবেন, যেন কিসের আওয়াজ পেয়ে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। খানসামাকে বললেন—'দেখ তো? কি ওখানে?'

জানলার পর্দা তুলে রাতের কালো আঁধার মন্থন করলে সে। কান পেতে শুনলে। তারপর নিবেদন করলে—'কিছু নয় হুজুর—'

—'ঠিক হ্যায়—'

অর্ধেক খাওয়া সারা হয়ে এসেছে এমন সময় শুনলেন বাইরে গাড়ীর ঘড়-ঘড় শব্দ। প্রাসাদের ফটকের সামনে এসে থামল।

—'কে এল?'

ভাইপো এসে পড়েছে। তক্ষুণি তার কাছে সংবাদ গেল যে, আহার্য প্রস্তুত। মারকুইস অপেক্ষা করছেন তার জন্য। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভোজের টেবিলে এসে উপস্থিত হোল সে। ইংল্যাণ্ডে চার্লস ডার্নে এরই নাম।

মারকুইস ভাইপোকে সংযত সৌজন্যে অভ্যর্থনা করলেন কিন্তু করমর্দন করলেন না।

আসন নিয়ে প্রশ্ন করলে ডার্নে—'গত কালই প্যারিস ছেড়ে এসেছেন?'

—'তা বটে, কিন্তু তুমি?'

—'আমি সোজা আসছি।'

—'লণ্ডন থেকে?'

—'হ্যাঁ—'

—'আসতে বেশ সময় লেগেছে তো?'

—'না, সোজাই তো আসছি—'

—'আসতে দেরী হয়নি, দেরী হয়েছে মনস্থির করতে।'

—'নানা কারণে কাজের ঝঞ্ঝাটে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম—' উত্তর দিতে গিয়ে ডার্নে মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করলে।

—'তা বটে—'

ঘরে চাকর যতক্ষণ ছিল এ ছাড়া আর অন্য কোন কথাবার্তা হোল না। কফি পরিবেশনের পর তাঁরা দু'জনে একলা হলেন। কাকার মুখের দিকে চেয়ে ডার্নে বললে—'যে কাজের জন্য গিয়েছিলাম তাতে নানা ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য যে পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলাম তাতে মৃত্যু হলেও আমি আপশোষ করতাম না।'

—'মৃত্যু অবধি বলছ কেন?'

—'সত্যিই যদি আমার মৃত্যু ঘটার উপক্রম হোত, আপনি তবুও আমাকে বিরত হতে দিতেন কি না সন্দেহ।'

মুখের রেখায়-রেখায় ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নিগ্ধ মমতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন মঁসিয়ে, কিন্তু তাতে আন্তরিকতা এল না।

সেদিকে তাকিয়ে ডার্নে স্পষ্টই বললে—'আপনি আমার চারি পাশের পরিবেশকে সহজ করে দেবার চেষ্টা করতেন'না নিশ্চয়ই!'

—'না, না, সে কি?'

অল্প একটু অপেক্ষা করে বললেন—'দেখ, যে ঘরে তুমি জন্মেছ, যে বংশ-মর্যাদা তোমার রক্তে, তার সৌভাগ্য মাথা খুঁড়ে মানুষ পায় না।'

—'কিন্তু ফ্রান্সের ইতিহাসে আমাদের কৌলীন্য বিন্দুমাত্র গরিমা পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সেকালে ত বটেই, একালেও আমরা আমাদের অধিকার এমন জবরদস্তি জাহির করেছি যে, আজকে সারা ফ্রান্সে আমাদের মত এমন ঘৃণার পাত্র আর দ্বিতীয় কাউকে চোখে পড়ে না।'

—'এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। নীচের তলায় যারা থাকে ওপরওয়ালাদের প্রতি তাদের এই ঘৃণা-ভাব পূজারই নামান্তর।'

—'ও কথা সত্য নয়। এই জমিদারীর মালিকদের সমীহ করে লোকে নিছক ভয়ে। কোন ভক্তি নেই তার মধ্যে।'

—'আমাদের পারিবারিক আভিজাত্যের দিক থেকে তাতে অন্ততঃ লজ্জার কারণ নেই।'

মারকুইস এক টিপ সুগন্ধ নস্য নাসারন্ধ্রে দিয়ে আরাম করে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসলেন। বললেন—'চাবুকের চেয়ে বড় শাসনও নেই, শিক্ষাও নেই। যত দিন মাথার উপর এই ছাদ থাকবে, কুকুরগুলোকে চাবুকের ভয়ে বশে রাখব। তোমার ভাবনা নেই। যত দিন এ পরিবারের শান্তি সম্ভ্রম বজায় রাখার দায়িত্ব আমার, তত দিন তোমাদের কারুরই মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কিন্তু তুমি খুব পরিশ্রান্ত। যাও, বিশ্রাম নাও গে।'

—'আর একটা কথা।'

—'একটা কেন। যত খুশী কথা আছে বলো।'

—'আমরা অন্যায় করেছি আর সে-অন্যায়ের ফসল ফলতেও সুরু করেছে।'

—'অন্যায় করেছি?'

—'অন্যায় নয়? আপনারা সবাই অন্যায় করেছেন। অত্যাচার করে এসেছেন, এখনো করতে কসুর করছেন না। কিন্তু আমি কি করে ভুলব মায়ের শেষ অনুরোধ, তাঁর অন্তিম দৃষ্টির কাতর মিনতি—লোকের প্রতি স্নেহশীল হবে, লোকের দুঃখ মোচন করবে—সে আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু সে শক্তি ও সাহায্য কোথায় পাব আমি?'

—'আমার কাছ থেকে যদি সে রকম কিছু পাবার আশা করে থাক, সে আশা দুরাশা মাত্র।'

একটু থেমে বললেন মারকুইস—'যে সমাজ-ব্যবস্থায় আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, তাকে ভাঙতে দেব না আমি বেঁচে থাকতে।'

—'এই সম্ভ্রম সম্পত্তি আমার জীবনে মূল্যহীন। ফ্রান্সেও আমি থাকতে চাই না'—বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে ডার্নে—'আমি স্বেচ্ছায় আমার অধিকার ত্যাগ করছি।'

—'এ দুটোই কি তোমার নিজস্ব? ফ্রান্স হয় তো হতে পারে কিন্তু এই সম্পত্তি?'

—'এ সম্পত্তি আঁকড়ে থাকার ইচ্ছা নেই আমার। যদি আগামী কাল এ সম্পত্তি আমাতে বর্তায়—'

—'সে-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।'

—'কুড়ি বছর পরেও তো হতে পারে—'

মারকুইস পরিহাস-বিজড়িত কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন।

—বাহির থেকে দেখলে সুন্দরই মনে হবে, কিন্তু দিনের আলোয় উন্মুক্ত আকাশের নীচে দেখলে এ শুধু ঋণ আর অপচয়, অত্যাচার আর নিপীড়ন, বুভুক্ষা আর নগ্নতার ধ্বসে পড়া দুর্গ ছাড়া কিছু নয়।'

মারকুইস আবার শ্লেষোক্তি করলেন।

—'যদি কোন দিন এ সম্পত্তি আমার হাতে আসে'—বললে ডার্নে—'আমি উপযুক্ত লোকের হাতেই তুলে দেব একে। তুলে দিয়ে বাঁচব। এ সম্পত্তি আমার জন্য নয়—এর উপর ভগবানের অভিশাপ উদ্যত হয়ে আছে।'

—'তার পর?'

—'আমি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বাস করব। সাধারণ সজ্জন ভদ্রলোকের মত বাঁচতে চাই আমি।'

—'ইংল্যাণ্ড দেখছি তোমার মনে রং ধরিয়েছে।' স্মিত হেসে প্রশান্ত দৃষ্টিতে মারকুইস তাকালেন ভাইপোর দিকে।

—'ইংল্যাণ্ড আমার আশ্রয়।'

—'দাম্ভিক ইংরেজরা বলে বটে ইংল্যাণ্ড সবার আশ্রয়-স্থল। জান বোধ হয়, এ দেশের একজন সম্প্রতি সেখানে আশ্রয় পেয়েছে। একজন ডাক্তার?'

—'জানি।'

—'তার একটি মেয়ে আছে?'

—'হ্যাঁ—'

—'হুঁ! তুমি শ্রান্ত। শুভ রাত্রি।'

বলে মারকুইস স্মিত হাসি হাসলেন। সে হাসির আড়ালে একটা চাপা রহস্যের ইংগিত। এমন একটা ভংগিমায় কথাগুলি উচ্চারণ করলেন তিনি, তাতে রহস্য যেন আরো নিবিড়তর হয়ে উঠল। তিনি আবার পুনরাবৃত্তি করলেন—'একজন ডাক্তার আর তার একটি মেয়ে। নব দর্শনের প্রথম পাঠ।'

আজকের রাত নিস্তব্ধ, নির্বাত। হাল্কা স্লিপার পায়ে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন মারকুইস। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন হিংস্র বাঘের মত।

সারা দিনের টুকরো-টুকরো স্মৃতি মনের পর্দায় আসছে-যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্য শেষ পাড়ি দিচ্ছেন। পাহাড়ের কোলে গ্রাম—পুকুর-পাড়ে চাষীদের জটলা। নীল টুপি-পরা একটা মজুর পথের মাঝে তালগোল-পাকানো একটা মেয়ের শরীরের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—'মরে গেছে! একেবারে শেষ করেছে।'

অগ্নিকুণ্ডে একটি মাত্র বাতি পুড়ছে। পাতলা মশারি টেনে দিয়ে শুয়ে পড়লেন মারকুইস।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

ঘোষ বসু সেন রায় এণ্ড কোং

ঘোষ বসু সেন এণ্ড কোং

ঘোষ সেন এণ্ড কোং

সেন এণ্ড কোং

বাঙালীর ব্যবসা!

—প্রমথ সমাদ্দার অঙ্কিত

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা
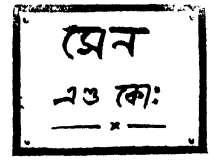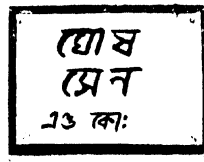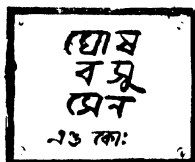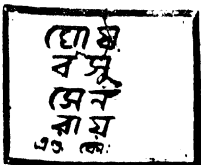
কিন্তু বিয়ের বছরও ফুরলো মিত্রাও আর সুস্থ হলো না। পিছনে পড়ে রইলো ওর বৈদগ্ধ্য স্পৃহা। তারও পিছনে পড়ে রইলো দাম্পত্য মাধুর্য্য। পরিচয় হলো ওর বিবাহিত জীবনের পরিণতি সীমাহীন চরম ব্যথার সঙ্গে। প্রথম ছেলে এলো বয়স তখন ওর বড় জোর ষোল। অপূর্ণ স্বাস্থ্য, তবুও বয়স বা যে কারণেই হোক ছেলেটি হলো মৃত। এবং মাকেও রেখে গেলো অর্ধমৃত করে! তিনটি বধূর ভেতর স্বর্ণময়ী মিত্রাকেই স্নেহ করতেন বেশী—ছোট ছেলেই বিশেষ প্রিয় সেই জন্যে। তাঁর সযত্ন তদারকে মাত্র শরীরটা ভালোর দিকে যাচ্ছে—আবার এলো আর একটি। আসতে হলো মিত্রাকে মা'র কাছে।

মিত্রাকে দেখে গায়ত্রী হেসেই ফেললো—'এ কি চেহারা হয়েছে রে তোর? যেন একটা আলু কাঠির মত হাত-পা নিয়ে হাঁটছে।'

গীতা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললে—'দূর, তোর চোখ নেই দিদি! দেখতে হয়েছে কাশীর সাদা বেগুনের মত—রোগা আর পেটমোটা।'

সিঁড়ি ভাঙ্গার শ্রমে মিত্রা তখন হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। বললো—'তোরা হেসেই খুন। মায়াও হয় না একটু?'

লজ্জা পেলো দুজনে। গায়ত্রী কুণ্ঠিত ভাবে বললে, 'সত্যি কি ভীষণ খারাপ চেহারা হয়েছে তোর! দেখলে মায়া হওয়াই উচিত। এখন দেখবি আমাদের এখানের যত্নে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার শাশুড়ীও আমাকে যত্ন করেন। সে কথা নয়!' প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করলো মিত্রা—'তোরা এমন সেজে-গুজে যাচ্ছিস কোথায় তাই শুনি?'

'আমাদের কলেজে থিয়েটার হচ্ছে। তাতে 'তপতী' হয়েছি আমি। আজ ষ্টেজ রিহার্সাল। তোর যা শরীরের অবস্থা, ভয় করে। নইলে নিয়ে যেতাম তোকেও।'

স্বাস্থ্যপূর্ণ ঝলমলে চেহারা। অভিনয়ের জন্য মাথা ঘষে আঁটসাঁট শাড়ী পড়ে খোঁপায় রিবন জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু' বোন—কলেজ-গার্ল। উপরের ঘূর্ণায়মান ফ্যানটার দিকে চোখ রাখলো মিত্রা।

মিত্রাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলো নীলাকান্ত। সে এসে ঢুকলো এ ঘরে। গায়ত্রীর দিকে তাকাতেই গায়ত্রী বলে উঠলো—'আমায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে নয়?'

বিস্মিত নীলাকান্ত বললো—'তা লাগছে। কিন্তু সে কথা তো আমি কিছু বলিনি!'

'চোখের কথা বুঝতে পারি যে! দেখুন, আমাদের খারাপ চেহারা দিনে-দিনে উঠছে ভালো হয়ে। আর আপনার স্ত্রীটির ভালো চেহারাখানার কি দুরবস্থাই না করেছেন! ও স্কুলে থাকতে রাণী নয় ওর সখী সাজতে হতো আমায়।'

সুমিত্রা এসে এক বাটি দুধ ধরলেন মুখের কাছে—'নে, গরম গরম খেয়ে নে। বাবা, কি চেহারা হয়েছে মেয়ের!'

ক্ষেপে উঠলো মিত্রা। দুধের বাটি সরিয়ে দিলো ধাক্কা দিয়ে—'দুধ খা! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাক। দেখ খেয়েই ক' ইঞ্চি মোটা হয়ে যাই! যেন দুধ না খেয়েই আমার এ অবস্থা?'

পড়ে গেলো দুধের বাটিটা সুমিত্রার হাত ঝলকে। হতভম্ব সুমিত্রা—'কি হলো, রেগেছিস কেন?'

নীলাকান্ত দাঁড়িয়ে মাঝখানে অপ্রস্তুতের মত।

বাটি পড়ে যাওয়ার শব্দে ঘরে এসে ঢুকলো ছোট নূতন দু' মামী—সৌমী আর লীনা। একজনে নেকড়া দিয়ে পড়ে-যাওয়া দুধ মুছে নিলো আর একজন বাটি তুলে নিয়ে বললে—'থাক্, মাত্র তো এসেছে। খাবে'খন পরে।'

বড় মামী নীলিমা মুখ বাড়িয়ে বললেন—'তুমি কিন্তু এখানেই খাবে নীলাকান্ত!'

বৌদের পেছন-পেছন নীরবে বেরিয়ে গেলো সুমিত্রা।

গায়ত্রী হেসে সহজ করতে চাইলো আবহাওয়াটা—'স্ত্রীটির মেজাজ খারাপ করিয়ে নিয়ে এসেছেন। শান্ত করিয়ে দিয়ে তবে যেতে পারেন। বাড়ী ফিরে যেন খুশী মন দেখতে পাই। এখন আমরা বিদায় হচ্ছি। এর পর লম্বা ছুটি আছে, চমৎকার কাটবে কি বলিস্ মিত্রা?'

বেরিয়ে গেলো দু' বোনে। ওদের দিকে তাকিয়ে দু' চোখের দৃষ্টি যেন ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলো মিত্রার।

"হলো কি? এখন মারমুখো হয়ে উঠলে যে? কিছুক্ষণ আগেও না এখানে আসবার আনন্দে মেতে উঠেছিলে? হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেলে কেন?"

মিত্রা উঠে এসে সামনে দাঁড়ালো নীলাকান্তর—'অন্যায় হয়েছে, ঘাট মানছি।' হাত জোড় করলো মিত্রা, 'কিন্তু তুমি যতক্ষণ সামনে থাকবে এমনি অন্যায় হয়তো আরো অনেক করে ফেলবো। নীচে মামাদের কাছে গিয়ে বসো। আমি অসুস্থ, আর কথা বাড়িয়ো না। ভালো বোধ করলে ডেকে পাঠাবো।'

ওর বুকের ওঠা-নামার শব্দ যেন নীলাকান্ত শুনতে পায়। তবু হেসে শান্ত করবার চেষ্টা করে, 'ছেলেমানুষ!'

ঠোঁট বাঁকালো মিত্রা—'ছেলেমানুষ! বুড়িয়ে এনেছ তো—দুঃখ কি? এখন এক পাতিল চূণ মাথায় ঢেলে দাও, ভুলেও আর কেউ বাষট্টি বছরের কম বলবে না।'

নীলাকান্ত হেসে বললে—'আশীর্ব্বাদ করি, সবার যে ভাবে কেশ পাকে তোমারও সে ভাবে পাকুক। আমি—'

কিন্তু মিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর হাসি আর কথা মুখেই মিলিয়ে গেলো। বললে—'আমি গেলে তুমি শান্ত হবে—আচ্ছা, তাই যাচ্ছি।'

নীলাকান্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। মিত্রার ক্ষেপা চরিত্রের সঙ্গে সে ভালো ভাবেই পরিচিত। একটুও আশ্চর্য্য হয় না। শুধু জানে, শান্ত হতে সময় দিলে আধ ঘণ্টা বাদে ঠাণ্ডা মানুষটিই এসে দেখতে পাবে। এখন ঘাঁটালে ঘটবে কুরুক্ষেত্র। কখন
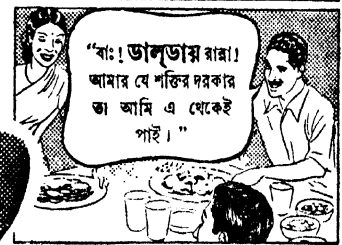
কেন ক্ষেপে ওঠে মিত্রা প্রায় সময়ই সে বুঝে উঠতে পারে না। মনে হয় নিছক অকারণে। হবেই তো মনে অকারণ—কারণ মিত্রার মন-মেজাজ যে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কারণে বিগড়োয়, ততটা সূক্ষ্মতার ধার নীলাকান্ত ধারে না।

তিন-মাস পূর্ণ হলে নির্ব্বিঘ্নে নয় অনেক বিপদ পার হয়ে মিত্রার হলো একটি কন্যা। জাপানী চেহারার-ছোট্ট মেয়েটি এবার মিত্রাকে দিলো শুধু কষ্টই নয়, মা হওয়ার আনন্দও। কিন্তু তার পর—তার পরও উপর্য্যুপরি প্রায় বছরের ব্যবধানে হলো মিত্রার মৃত অর্দ্ধমৃত গোটা দু'-তিন সন্তান। শরীরের রক্ত-মাংস নিঃশেষ করে-দিয়ে এই বয়সে যে মেয়েকে নাড়ী ছিঁড়ে জন্ম দিতে হলো এতগুলো শিশুকে, সে মেয়ের কাছে দাম্পত্য রস তখন গাঁগলে বিষ হয়ে উঠেছে। ভয়ে-আতঙ্কে সিঁটকে এ যন্ত্রণা হতে বাঁচবার উপায় খুঁজে চোখে অন্ধকার দেখছিলো—এই তো ছিলো মিত্রার জীবন—এর কোথায় বা ছিল কথা, কোথায় বা ছিল কাহিনী!

তার পর—তার পর ভবিষ্যৎ জীবনে হয়ত জন্ম দিত আরো কয়েকটিকে। সামনের চুল উঠে কপালটি দেখাত টাক-পড়া চক্‌চকে চওড়া। সূতিকায় ভুগে-ভুগে অবশিষ্ট থাকত হেজে-যাওয়া চামড়া আর হাড়। দু'বার চলা-ফেরার শ্রান্তিতে ধুঁকতে-ধুঁকতে একদিন হয়ত ত্রিশ বছরের জীবনে যাট বছরের বৃদ্ধার মত শুকনো বক্ষঃস্থল হতে বেরিয়ে যেত প্রাণবায়ুটি। বহু দিন পর স্বচ্ছ নীল আকাশে নিশ্বাস টেনে শান্তি পেত মিত্রার মৃত আত্মা।

কিন্তু তা হলো না। মানুষের এত ক্ষুদ্র ভাগ্য ললাটের তলাটি—সীমাহীন আকাশ আর সমুদ্রের মতই সমান অজানার রহস্যে আবৃত। মানুষের সব জানা, বোঝা, ভাবা মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হয় তাই অভাবিত অচিন্ত্যনীয় ঘটনায়।

মাঝ-রাতে জোর কড়া নাড়ার শব্দে জেগে উঠল বিমল। তার ঘরটাই রাস্তার দিকে। তাতে সে ভুগছে ডিস্‌পেপসিয়ায়। সমস্ত দিন কাটে পেটে হাত বুলিয়ে। এই মধ্য রাতেও ঘরময় পায়চারী করছিলো সে পৈটিক উদ্বেগেই। চমকে উঠল। এত রাতে কে কি খবর নিয়ে এলো? দোতলার জানালা দিয়ে উঁকি দিল বিমল।

—"কে?"

—"শ্যামবাজার থেকে চিঠি নিয়ে এসেছি।'

—"আরে কে? সরকার মশাই? দাঁড়ান, দোর খুলছি।'

উৎকণ্ঠিত মন নিয়ে নেবে এলো বিমল। পাশের দু' ঘর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো কিরণ আর অরুণ। জানতে চাইলো ব্যাপার কি? মিত্রার বাড়ীর সরকার মশাই এসেছে? গরমে ঘুম আসছিলো না অরুণের স্ত্রী সৌমীর, উঠে বসলো সেও। কথাবার্ত্তা, এ দরজা খোলা, ও দরজা খোলার শব্দে উঠলো সুমিত্রা। অর্থাৎ জেগে উঠলো সমস্ত বাড়ী।

—'সৌমি, কি হয়েছে?' সুমিত্রা জানতে চাইলো।

—'মিত্রার ওখান থেকে লোক এসেছে।' সৌমী বলে।

—'এত রাতে!' উদ্বেগে কাতর হয়ে উঠলো সুমিত্রা। দিদির ভীত মুখের দিকে তাকিয়ে বাইরের ঘরের দিকে যেতে-যেতে অরুণ বললো—"ভাবনার কিছুই নেই দিদি! তোমার বেয়ান হয়তো বৌমার নির্ব্বিঘ্নে আর একটি পুত্র কিংবা কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার খবর জানিয়েছেন।···স্কাউণ্ড্রেল!' গুলী করে মারা উচিত—' নিজ মনে বলতে-বলতে চলে গেলো সে বাইরের ঘরে। এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মিত্রার বিয়ের পর থেকে রাতে-বেরাতে তো এ খবর নিয়েই লোক আসে।

সুমিত্রা চাইলো সৌমীর দিকে—'তুমি জানতে মিতুর শরীর খারাপের কথা?'

—'কই, শুনিনি তো।'

—'জানতে না? তবে কি খবর এলো?—গলা কেঁপে উঠলো সুমিত্রার। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসু মুখে।

সরকার মশাইএর হাতের চিঠি ঘুরলো তিন ভাইএর হাতে, কিন্তু কারু মুখ দিয়েই কথা বেরুলো না। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় তারা।

চিঠি হাতে ভাইদের চেহারা আর স্তব্ধ ভাব···মিত্রার বর্ত্তমান ভগ্ন স্বাস্থ্য···ডুকরে কেঁদে উঠে হাত বাড়ালো সুমিত্রা। 'দেখি, চিঠি দেখি। মিতু'···ঠোঁট দুটি তার কাঁপলো থর-থর করে। হাত দিয়ে সামনের দরজাটা চেপে ধরে, প্রায় সংজ্ঞাহীন পতনোন্মুখ দেহটাকে সামলাতে চেষ্টা করে সুমিত্রা।

ছুটে এলো অরুণ। জড়িয়ে ধরলো সুমিত্রাকে হাত দিয়ে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে উঠলো—'দিদি, মিতু নয়, মিতু নয়—সে ভালো আছে। নীলাকান্ত হঠাৎ ব্লাড-প্রেসারের ষ্ট্রোক হয়ে—' সুমিত্রাকে হাত ধরে বসিয়ে দিলো সে সামনের কৌচে।

আশ্চর্য্য! সামলে ফেলেছে সুমিত্রা নিজেকে। যতই আঘাত আসুক একমাত্র মেয়ের মৃত্যু-খবরের মত কোনটাই নয়। সেই উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় ছিল অরুণ।

সৌমী দৌড়ে উঠলো গিয়ে উপরে। সমস্ত দিন খেটে খুব ঘুমায় নীলিমা। ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে জাগিয়ে তুললো সৌমী তাকে। 'ওঠ শীগগির, কি কাণ্ড হয়ে গেল—' হাঁপাচ্ছে সৌমী।

বিমলের স্ত্রী নীলিমা উঠে বসলো। নীলাকান্তর মৃত্যুর খবর শুনে উঠলো কেঁদে। 'ও-বাড়ীতে যেতে হবে দিদি, ওঠ।' সৌমী ছুটে গেলো নিজের ঘরে। রাস্তার দিককার জানালা বন্ধ করলো ছুটোছুটি করে। ঝিকে ডেকে তুলে তার তত্ত্বাবধানে দিলো ছোটদের জিম্মা করে। আবার এসে ঢুকলো এ ঘরে। 'চল, চল, শীগগির।'

নীলিমা মোটা মানুষ, জামা গায়ে রাখতে পারে না, বয়সও হয়েছে। ও-বাড়ী যেতে হবে শুনে জামা গায়ে দিচ্ছিল। কাঁদতে-কাঁদতে নেমে এলো।—'তোরা তো কিছু দিন মাত্র এসেছিস সৌমী! গীতা-গায়ত্রীর সঙ্গে কোলে করে আমিই যে ওকে মানুষ করেছি—এই কচি বয়সে—'

খুলে গেলো প্রতিবেশীদের দরজা-জানালা। উঁকি-ঝুঁকি দিল মেয়ে-পুরুষের মুখ। কি হলো এ-বাড়ীতে—চোখে নীরব জিজ্ঞাসা।

তিন বৌ আর সুমিত্রাকে নিয়ে রওনা হলো ভায়েরা মিত্রাদের বাড়ীর উদ্দেশে।

বাড়ী ফিরতে পরদিন দুপুর গড়িয়ে গেলো। স্নানান্তে বিছানায় পড়ে রইলো সুমিত্রা চোখ বুজে।···বোজা চোখের পাতা দিয়ে

ঝরতে লাগলো জল। যেমন করে বৃষ্টির পর গাছের পাতা বেয়ে জল পড়ে টপ-টপ।···এক জীবনে কত মরণ সঙ্গে করে এনেছে সে! আর কত সহ্য করতে হবে?···মা'র ভাগ্য কি মেয়েতে বর্ত্তায়?··· ভগবান! ভগবান! কি প্রার্থনা তার ভগবানের দরবারে? মিতুকে আমার সুখী করো!···সন্ত বিধবার জন্ম এ কামনা···লোকে হাসবে না?···মিতু কাল কি শঙ্কিত দৃষ্টি মেলেই না তাকিয়েছিলো তার দিকে। ওর ভয় সুমিত্রা বুঝতে পেরেছে। মা'র মানসিক অসুস্থতাকে বড় ভয় ওর। যদি—এই যদিতো শঙ্কিত হয়ে বসেছিল তো মিতুও। একটা দীর্ঘনিশ্বাস টানলো সুমিত্রা না মিতু জানে না—'অল্প শোকে কাতর বেশী শোকে পাথর।' হ্যাঁ, পাষাণই হয়ে গেছে সে, নইলে কোথায় একমাত্র মেয়ের বৈধব্য বেদনায় মনের সে অদম্য অস্থির চঞ্চলতা? কোথায় সুস্থ বুদ্ধির বিচলন? যে শঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে আছে সবাই। আঘাত সে পেয়েছে বৈ কি! অসহ্য ব্যথা লেগেছে মনে। ভেতরটা উঠছে যেন কেবলই কেঁপে-কেঁপে মোচড় দিয়ে। কিন্তু এবার সে শক্ত হবে। কিছুতেই দেবে না নিজেকে দুর্ব্বল হতে। সহ্য করবে সুস্থ বুদ্ধিতে যেমন সবাই করে। কিন্তু মিতুর ঐ হবিষ্যি খাওয়া সাদা কাপড়-পরা চেহারা! এ সহ্য করবে সে কি করে? নিজের সমস্ত জীবন তো কাটলো কৃচ্ছসাধনায়—মেয়েকেও কাটাতে হবে তাই? অসম্ভব! অসম্ভব? সম্ভব তবে কি? সাজবে? শাড়ী পড়বে? সব খাবে?···না, না, থাক্, ও-সব চিন্তা এখন থাক্। মাথা উঠতে চায় গরম হয়ে। সুমিত্রা দেবে না—কিছুতেই দেবে না মাথা গরম হয়ে উঠতে। কপালের দু'পাশের শিরা দুটো ফুলে নীলবর্ণ হয়ে কাঁপে দপ-দপ করে। উঠে গিয়ে সুমিত্রা মাথায় ঢালে ঘটি-ঘটি ঠাণ্ডা জল।

মেজবৌ লীনা এলো মিছরির সরবৎ হাতে। উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—'দিদি, স্নান করে এলেন খানিক্ষণ আগে আবার এখুনি মাথায় জল ঢালছেন যে!' দস্তরমত স্পষ্ট হয়ে ভয় ভাবটা চোখে ফুটে ওঠে লীনার। সে নিজে অবশ্যি সুমিত্রার মানসিক অসুস্থতা দেখেনি কিন্তু গল্প শুনেছে তো?

এক নিশ্বাসে সরবৎটা খেয়ে নিয়ে সুমিত্রা হাসলো। বললো—'তোমাদের ভয়ে-ভয়েই এবার আমি দেখছি পাগল হয়ে যাব। এমনি মাথাটা ধুয়ে এলাম। একসঙ্গে নানা চিন্তা এসে ভীড় করে আর ভীড়ের চাপে মাথা ওঠে গরম হয়ে—এটা স্বাভাবিকতার লক্ষণ লীনা—অস্বাভাবিকতার নয়। আমি সুস্থ আছি এবং তাই থাকব। চিন্তা করো না তোমরা।'

লজ্জিত হয়ে উঠল লীনা। অন্য কথায় চলে গেলো সে। বললে,—'সেদ্ধ ভাত বসিয়েছি। হলে গরম-গরম দুটি মুখে দিয়ে এসে ঘুমুতে চেষ্টা করুন দিদি! কাল রাত তো কেটেছে একেবারে বসে। আজও বেলা গড়িয়ে এলো। মুখে এখন পর্য্যন্ত কিছু পড়েনি।' খালি গ্লাস হাতে চলে এলো লীনা।

ফের বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলো সুমিত্রা।···

ভাইরা বলেছিলো—থাক কিছু দিন, তার পর নিয়ে আসব মিত্রাকে। থাকবে ও এখানেই। সে অবশ্যি তখন কিছু বলেনি। কিন্তু এ ব্যবস্থা তার মনোমত নয়। আসবে-যাবে—যখন যেখানে মন চায় থাকবে মিতু। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখনও নয়। আপন জীবন কাটলো বাপ-ভাইর সংসারে। দোষে-গুণে মানুষ—কিন্তু স্বীকার করতেই হবে দোষের চাইতে গুণই বেশী ভাইএর বৌদের। তবু চলতে হয় প্রতিপদে কত বিচার-বিবেচনায়। ও-পক্ষের মান-সম্মানের অপেক্ষায় থাকে না, নিজেই বুঝে চলে। নিজের মান নিজের কাছে যে রাখতে জানে তার মান নেয় কে—তাই আছে। নইলে তিনটি বৌ যতই ভালো হোক্, সব সময় কি আর মন-মেজাজ ঠিক রেখে চলে-বলে? আগে মা ছিলেন, ছিলো ভিন্ন কথা। কিরণ আর অরুণকে বিয়ে দিয়ে বছরও তো বেঁচে রইলেন না তিনি। আর মা'র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এক ধাপ দূরে সরে গেলো না কি সুমিত্রা? ছিলো মা'র কাছে, সে থাকা হয়ে গেলো ভাইএর সংসারে। কত দিন আরও বাঁচতে হবে কে জানে? হয়তো পড়তে হবে শেষে কিরণ-অরুণের ছেলেদের হাতে। থাকতে হবে তাদের সংসারে। সম্পর্কে ব্যবধানের দূরত্ব বাড়ছে আর হয়ে উঠছে সে অপরের সংসারের বোঝা। না, এর ভেতর আর মিত্রাকে টেনে আনা নয়। ছেলে আছে, মেয়ে আছে, থাক্ আপন ঘরে তাদের নিয়ে। নিজ সংসারের মত জোর-বল মেয়েমানুষের আর কোথায়?

—'দিদিমণি?'

—'আয় আয়।' দু'হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিলো মুন্নিকে সুমিত্রা। 'ভাইটি কোথায় মুন্নি? কি করছিলে এতক্ষণ?' মুন্নির মাথায় হাত বুলোয় সুমিত্রা। আশ্চর্য্য! মনেই ছিলো না মিতুর ছেলেমেয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বেশী বলতে হয়নি। শৈলনন্দিনী নিজেই গরজ করে দিয়ে দিয়েছে। থাকবে ওরা এখন এখানেই। অযত্ন হচ্ছে। স্বাস্থ্য তো ভালো নয়—শেষ কালে যদি গুরুতর অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়ে!

—'মা'র কাছে যাব।' মুন্নি নাকে কাঁদে। কত সময় কত থেকেছে এখানে মাকে ছাড়া। আজ কিন্তু ওর মা'র জন্য মন কেমন করছে।

—'যেও দিদি বিকেলে। আমরাও তো যাব, কেমন? লক্ষ্মী মেয়ে মিনু আমার! কুমার কোথায় বললে না তো?'

—'ভাইটি নন্তু-মন্টুর সঙ্গে খেলছে। বড় দাদু কত ডাকলেন সঙ্গে ঘুমোতে—গেলো না কিছুতেই। ভাই বড্ড দুষ্টু, নয়?'

—'হ্যাঁ, ভারী দুষ্টু। তুমি খুব ভালো মেয়ে। ঘুমোও তো বুকে শুয়ে।' চুমু খেলো মুন্নিকে সুমিত্রা।···না, মিতুর জন্যই চাইবার আছে বৈ কি! ওরা দুটিতে বেঁচে থাক্—সুখী হোক্ মিতু মুন্নি আর কুমারকে বুকে করে। মা'র জন্য সন্তানের মঙ্গল কামনায় চাইতে বড় চাওয়ার আর কি থাকতে পারে? মিতুকে যেন সন্তান-সুখে বঞ্চিত করো না ভগবান!···মুন্নির চুলের জট আঙুল দিয়ে ছাড়িয়ে চলে সুমিত্রা।

মুন্নি দিদিমণির কান্না-রাঙা মুখের দিকে ফোলা-ফোলা জাপানী চোখের দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখলো—তার পর সুমিত্রার মুখে মুখ রেখে বললে—'আমরা কাঁদলে বল ছিঃ কাঁদতে নেই, লোকে মন্দ বলবে, বলবে দুষ্টু মেয়ে; জুজু ধরবে—কত কি? বড়রা কাঁদলে কি বলে দিদিমণি?'

দু'হাত দিয়ে মুন্নিকে জড়িয়ে ধরে সুমিত্রা বলে—'কিছু বলে না! শুধু ছোটরা তাদের কচি-কচি গাল এমনি করে বড়দের গালে রাখে আর তাতেই তারা শান্ত হয়, শান্তি পায়!'

'এই তো আমি তোমার গালে মুখ রেখেছি তুমি আর কাঁদবে না বল ?'

'না, কাঁদব না মণি ।'

রাতের বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো মাতামাতিটা কিছু মাত্রাধিক্য পরিমাণেই হয়ে থাকবে কিন্তু সেটা কারণ নয়। ঘরে এসে এক গ্লাস জল চেয়েছিলো নীলাকান্ত। বৈশাখের গরমে শরীরে রক্তশূন্যতার জ্বালা-পোড়া নিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে গড়াচ্ছিলো মিত্রা। উঠে গিয়ে জল এনে হাতের কাছে ধরে চমকে উঠল নীলাকান্তের চোখের দিকে তাকিয়ে। সুস্থ মানুষের চোখে এ কী ভীত বিহ্বল দৃষ্টি! 'কি হলো ?'—উৎকণ্ঠিত হয়ে মিত্রা জানতে চাইল। কিন্তু না পারলো আর কথা বলতে না পারলো হাতে ধরতে গ্লাস। ঢলে পড়ল নীলাকান্ত। মিত্রার আর্ত চিৎকারে ছুটে এলো স্বর্ণময়ী—এলো একে-একে সবাই। ছুটোছুটি করে গেল গাড়ী বেরিয়ে, এলো ডাক্তার। কিন্তু তার বহু পূর্বে নীলাকান্তের হৃৎপিণ্ড কাজ বন্ধ করে ফেলেছে। যে রক্ত জীবের জীবনী তারই মাত্রাহীন চাপে স্তব্ধ করে দিলো নীলাকান্তের হৃৎস্পন্দন। চির বিদায়ের মুহূর্ত্ত আগেও বুঝতে পারলো না সে যাচ্ছে। তার আর জানা হলো না যে সে গেছে। কিন্তু যারা রইলো ঘটনার আকস্মিকতায় তারা বিমূঢ় অভিভূত।

ভূমিকম্পে ভেঙে না পড়লেও অনেক সময় বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেমন বিস্তৃত চৌড় ধরিয়ে দিয়ে যায়—নীলাকান্তের আকস্মিক মৃত্যুও তেমনি করে চৌড় ধরিয়েছিল বাড়ীর মানুষগুলোর মনে। অক্টোপাসের মত আটটা শুঁড়ওয়ালা দেহ নিয়ে মৃত্যু তো চারি দিকে কিলবিল করেই বেড়াচ্ছে শুধু অতর্কিত আক্রমণে চেপে ধরবার অপেক্ষা মাত্র—যখন যার উপরে এসে পড়বে চলে যেতে হবে তাকে নীলাকান্তেরই মত তাজা স্বাস্থ্য নিয়ে এমনি আকস্মিক ভাবে!

বিস্ময় লাগে মিত্রার। জানা কথা অনেক মানুষ বাড়ীতে। কিন্তু তা এত! লোকজনের আনাগোনা যেন বয়ে চলেছে প্রবাহের মত। সাধ্য কি একটু একা থাকবে। ভাশুরদের সঙ্গে কথা বলার চল আছে বটে কিন্তু নেই বসে গল্প করার রেওয়াজ। দাঁড়িয়ে ঘুরে দেখে যায় তারা। ঘরে এসে বসে দেওররা। শশীকান্ত ভালোবেসেছেন মিত্রাকে। দিনের ভেতর কত বার এসে মাথায় হাত রাখেন। শোকে আর সমবেদনায় বৃদ্ধের অঙ্গুলি কাঁপে। আসছে যাচ্ছে বসছে মেজ তরফের বউ-মেয়েরা। বড় আর মেজ গিন্নী মনোমালিন্য ভুলে এসে সামলাচ্ছে স্বর্ণময়ীকে। রাতে এসে শোয় জায়েরা ওর কাছে পালা করে।

বড় গিন্নীর বড় মেয়ে প্রৌঢ়া বালবিধবা নীহারিকা। কাছে এসে বসে, সান্ত্বনা দেয়—'ছেলে-মেয়ে আছে···বুক বাঁধবে···সংসার করবে। পোড়া অদৃষ্টে তো সে সম্বলও ছিলো না। কি ভাবে যে'—অসমাপ্ত কথার ভেতর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীহারিকা।

মাথা নাড়েন বুড়ো পিসশাশুড়ী—"যা বলেছিস নিহার! শ্যাওলার মত এ-ঘাটে ও-ঘাটে ভেসে পরজীবি আর পরচ্ছন্ন হয়েই তো দিন গেল। এ বয়সে স্বামী যাওয়া যে কি শাস্তি'—চোখে আঁচল চাপা দিলেন পিসীমা।

কানে এলো স্বর্ণময়ীর বিলাপ—'ঐ কচি বৌ আমার!'

কান্না, কান্না, কান্না! কিন্তু আশ্চর্য্য, সবই ওকে নিয়ে, ওকে বুকে করে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওরই মাথায় হাত রেখে! ও তো মরেনি—কেন তবে ওকে নিয়ে এ হা-হুতাশ!···মৃত্যু এসে যার জীবনে অকাল সমাপ্তি-রেখা টেনে দিলো, আশা-আকাঙ্ক্ষা পেছনে ফেলে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে যে গেলো—সেই মানুষটির কথা ভাবা, তার জন্য দুঃখ-শোক করা যেন এ নয়। সব শোক যেন যে গেলো তার জন্য নয়—যে রইলো সে নারীর দুর্ব্বিষহ বৈধব্য-জীবনের বেদনায়!

পাতলা, ফর্সা মুখখানার ওপর মিত্রার কাঠিন্যের ছাপ পড়ে—অমর শোকের আকাঙ্ক্ষায় নারীর ওপর শোকের বোঝা চাপাতে গিয়ে কি নিদারুণ ফাঁকির বোঝাতেই চাপা পড়েছে পুরুষ নিজে! শেষ নিশ্বাসের চোখের জলটুকুও নিয়ে যেতে পারে না সঙ্গে করে! জীবিতকে মৃত আত্মার সাথে এমন নিশ্ছিদ্র বাঁধনে বেঁধে জীবন্মৃত করে রেখে যাওয়ার ভেতর একটু ফাঁক থাকলেও—যে গেলো তার কথা ছাপিয়ে যে রইলো তার জন্য দুঃখটা এত বড় হয়ে উঠত কি?···

কিন্তু এ সব তত্ত্বকথার ভাববারই কি এখন সময় ওর? তা চোখ দেখলে বুদ্ধি ভাবলে কি করতে পারে মিত্রা? নিজ বশে প্রকৃতি কতটুকু? মানুষ পারে শুধু পারিপার্শ্বিক মানানো ভাণ করতে—করতে হয়ও।···তাই বলে কি ও ভাসা মন নিয়ে শুধু দেখলই! হৃদয় দিয়ে কাঁদলো না? কাঁদলো। সত্যিকারের কান্নাই কাঁদলো। নিজের কথা ভেবে নয়—যে গেছে তার অসমাপ্ত জীবনের স্বল্পায়ুর বেদনায়!

আবার ঝাড়া দিয়ে মন যেদিন ঝরঝরে পরিষ্কার হয়ে উঠলো তাও তেমনি সত্য।···কে জানে মনের অবচেতন কোণে ওর লুকিয়ে ছিলো কি না ছাড়া পাওয়ার স্বস্তি!···দাম্পত্য-জীবন স্মরণে আনলে এমন একটা দিনও কি হাতড়ে পায়, যার কল্পনায় শরীর ওর আনন্দে শিউরে ওঠে···আছে কি এমন কোন স্মৃতি যার অনুভূতি মনকে করে রাখে আবিষ্ট?···তবে ওর অপরাধ কি? আত্মসম্ভোগটাই যার কাছে সব—তারই নিবিড় সংস্পর্শ দিনের পর দিন যে নারীকে টেনে চলতে হয়, সে-ই জানে সে গ্লানি কি! ও কেবল গেছে সহ্য করে! সে যে কি অসহ্যকে সহ্য করা—মনে হলে শরীর-মন এখনও শিউরে উঠতে চায়! দিনের উদাসীন অনাসক্ত স্বামীর শয্যায় রাতে গা ছোঁয়াতেও মিত্রার মন ঝংকৃত হত বিতৃষ্ণার বিষে। যেন নিতান্ত অপরিচিত কারুর শয্যায় অংশ গ্রহণ—সহ্য করা বলপ্রয়োগের অত্যাচার। উপায়হীন নারীর সর্ব অবয়বের পেশী কঠিন করে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকা। পড়ে থাকা, ঠেলে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার দুর্দমনীয় ইচ্ছাকে হাতের শক্ত মুঠোয় বেঁধে। নারীর আনন্দ-তৃপ্তিতে উদাসীন পুরুষ—পরিতৃপ্ত হয়েছে যে ঘৃণার দানে, এমন দান দীন-দরিদ্রও বুঝি গ্রহণ করে না।···কিন্তু এই তো ঘটেছে।···দিনের সঙ্গী নয়, নয় রাতের প্রেয়, এমন ব্যক্তির অভাবে শরীর-মন অভাব-বোধের সাড়া তুলে কেঁদে মরতে যদি না চায়—কি করতে পারে মিত্রা?···কারা এলো! গাড়ী থামার শব্দে শঙ্কিত হয়ে উঠলো ও। ঝট করে উঠে কাঁপন হাতে টুক করে নিবিয়ে দিলো ঘরের বাতি। পা টিপে-টিপে গেল দরজার কাছে এগিয়ে। অতি সাবধানে সামান্য শব্দ না করে বন্ধ করলো দরজা। তার পর ঝুপ করে

শুয়ে পড়লো গা-মাথা চাদরে মুড়ে। বুকটা ধক্-ধক্ করছে—যেন চুরি করার উত্তেজনা। মুহূর্ত্তে গরমে ঘেমে নেয়ে উঠলো।···য':, ফ্যানটা ছেড়ে আসতে ভুল হয়ে গেছে···থাক, দরকার নেই, যদি কেউ টের পায় ও জেগে আছে—তা হলেই তো এসে ওকে নিয়ে আরম্ভ করে দেবে হা-হুতাশ! আর মিত্রা বরদাস্ত করতে পারছে না এ সব সমবেদনার অত্যাচার—তার চাইতে ও ঘেমেই জল হবে।···এক জনের পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো—থামলো এসে ওর ঘরের দরজায়।···'মিত্রার ঘর অন্ধকার জ্যাঠাইমা, ডাকব?' বড় জা জয়ন্তীর গলা।

—'এ সন্ধ্যের সময় কি আর ঘুমিয়েছে—ডাক।' বললো শৈলনন্দিনী।

বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলো শমিত—শৈলনন্দিনীর ছোট ভাই। মা-মরা। দিদির কাছেই মানুষ। দিদির কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়ালো—'না দিদি—কেন ওকে সব সময় ডাকাডাকি করো! কেউ এলেই আসতে হবে—এটা কি ওর ভদ্রতা রক্ষার সময়? একাই থাকতে দাও ওকে।'

'ধন্যবাদ!' নীরব কৃতজ্ঞতা জানালো মিত্রা।···শমিত। ভেসে উঠলো রোজকার দেখা শমিত। দিব্য সেজে-গুজে বের হওয়া এই সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ হবে ঘড়ির বারোটা-একটার পর, কিন্তু এক চুল আগে নয়।···চমৎকার গাইতে পারে ও, তুলনা মেলা ভার। রাত হয় নাকি গানের বৈঠকেই···বড় দাম্ভিক—বাড়ীর কাউকে যেন গ্রাহ্যে আনতে চায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য! তবু সবাইর কাছ থেকে এমন একটা সম্মান ও সমীহ ভাব ও আদায় করে নেয়—যা আদায় করে নিতে না জানলে কেউ কাউকে সেধে দেয় না। কি সেটা? ছাই। অন্ধকার ঘরে মানুষ যেমন সতর্কতা অবলম্বনে চলে—শমিতের স্তব্ধতার অন্ধকারে এও সবার এক রকমের সতর্ক হয়ে চলা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু গানটা গায় এতো ভালো ব্যবধান ভুলিয়ে দেয়।···যদি গাইত এখন? কিন্তু এমন একটা প্রস্তাবেও সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে ওর দিকে। চাইবে এ ওর মুখের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে—যেন শোকের ঘরে টান পড়লো। গান যে দুঃখ-শোক ভুলবার জন্যই এ-বোধ ওদের নেই। যদি শমিতের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠ এই নিস্তব্ধ শোকাচ্ছন্ন সন্ধ্যার হাওয়ায় ছড়িয়ে দিত গানের সুরে—

"আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।"

ও কেন স্বর্ণময়ীর অশ্রু-ভেজা বুকেও কি সান্ত্বনার দোলা তুলত না?

গেলো বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, গেলো শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন, এলো পুজো। কাটলো নীলাকান্তের মৃত্যুর পর এতোগুলো দিন। কথায় কথা এসে গেলে আলোচিত হয় নীলাকান্ত। নইলে কমে এসেছে বাড়ীর শোকাচ্ছন্ন মলিনতা। সন্ধ্যায় বাড়ীর মেয়ে-বৌরা এসে এখনও জড় হয় মিত্রার ঘরে। সবাই কথা বলে, ও শোনে। কথা বলতে ভালোবাসে না মিত্রা? মোটেই তা নয়—তবে সবার সঙ্গে বাসে না এটা সত্যি! ওর চরিত্রে দুটো দিক—একটা রাশভারী, অপরটা হাস্যকৌতুকে উজ্জ্বল। খুশী মনে কথা বলে যার সঙ্গে উজাড় করে দিয়েই বলে। যেখানে বসে না, সেখানে বলা সাধ্যই শুধু নয়—বুঝি দুঃসাধ্যই।

পুজো এসে গেছে। বাড়ীর বাৎসরিক পুজো বাদ দেওয়া চলে না! যতই সংক্ষেপে হোক্ গাড়ী করে বেরিয়েছে শাড়ী-কাপড়ের সওদা তাই আছে শুধু মেজ জা রাণী। ও যায়নি। খুলছে আর বাঁধছে সে। রাণীকে মিত্রার ভাল দরদী মেয়ে। বয়সে ওরা সমানই হবে, কিন্তু চাইতেও বেশী ছোটোর স্নেহদৃষ্টিতে।

রাণী মিত্রার কানের কাছে মুখ এনে বলে আজ আমি শোব।'

—'রাত কি তোমার না শুয়ে কাটে নাকি?'

—'বাঃ, না শুয়ে কাটবে কেন? আজ শোব তোমার কাছে তাই বলছি।'

মিত্রা চোখ তুলে তাকালো—'লাভ?'

—'লাভ-লোকসান জানি নে—ইচ্ছে করছে।' রাণী মাথা ঝাঁকালো ছেলেমানুষের মত।

—'আর কত দিন তোমরা এ সব চালাবে শুনি? কোন প্রয়োজন নেই—তবু'—মিত্রা ক্ষুব্ধ ভাবে ভ্রূ কুঁচকালো।

—'আচ্ছা, আজ আমি শুই তো। তার পর তুমি খুব কড়া বকুনি দিয়ে বন্ধ করে দিও এ সব—এ সব, কি যেন বলে···ওঃ, আদিখ্যেতা।'

আধ্যাত্মিক কবিতা

শ্রীকালিদাস রায়

বন্ধু বলিল আজ
"বুড়া হ'য়ে গেলে হয়নাক আজো লাজ,
তোমার লেখায় পাইনাক মোটে পারমার্থিক কিছু।"
শুনিয়া সে কথা করিলাম মাথা নীচু।

বসিলাম সন্ধ্যায়
ভক্তিমূলক কবিতা লিখিব করিয়া অভিপ্রায়।
ভোজনের ডাকে প্রিয়া আসিলেন, বলিলাম তাঁরে "রোসো,
কি পারমার্থিক কবিতা লিখছি চুপ ক'রে কাছে বোসো।"
পারলো আ... প্রিয়া বলিলেন, "আমিও ত বলি তাই
নীলাকান্ত। ঝি হ'ল ধর্ম্মের কথা তোমার লেখায় চাই।"
একে-একে সবাই। ছুঁত আশা ক'রে বসিলেন প্রিয়া কাছে,
কিন্তু তার বহু পূর্ব্বে নীল তাড়াতাড়ি, ব'লে হাতে বড় কাজ আছে।
যে রক্ত জীবের জীবাঙ্ক, জানিনা ঠিক কি তিথি,
নীলাকান্তের হৃৎস্পন্দন'র আলিপনে হোথা ভরা অঙ্গন বীথি,
পারলো না সে যাচ্ছে
কিন্তু যারা রইলো ঘটন'

ভূমিকম্পে

বেলার গন্ধ উড়ে উড়ে আসে পাশের বাগান থেকে,
উড়িছে জোনাকি, শত শত পাখী একসাথে যায় ডেকে।
মলয় সমীর নয় তত ধীর, উলটায়ে দেয় পাতা,
প্রিয়ার অলক কি যেন স্মরায়। এক হাতে চাপি খাতা,
স্মরিয়া আমার গুরু,
পারমার্থিক কবিতা করিনু সুরু।

হৃদয়াবেগের অভাব ত নেই, তাগিদও রয়েছে বেশ,
আধ ঘণ্টায় কবিতাটা হ'ল শেষ।
খাতা টেনে নিয়ে বলিলেন প্রিয়া—"দেখি,"
পড়া শেষ ক'রে ছুঁড়ে ফেলে খাতা কহিলেন—"হায় একি!
তুমি পাষণ্ড, লিখেছ আমারি স্তব,
তোমার কলমে আর কিছু লেখা কখনো কি সম্ভব?"
বলিলাম—"প্রিয়ে, তাড়াতাড়ি নিলে টানি'
এক বারে শেষ না হ'তে কবিতা, আমার এ খাতাখানি!
দুইটি কথার বদল হইত, মাঝখানে দিলে বাধা,
'আমি'র বদলে হইবে কানাই, 'তুমি'র বদলে রাধা।

রাণীর সঙ্গে হেসে ফেললো মিত্রাও। চুল বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো রাণী। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে শাড়ীর আঁচল তুলে মাথায় দিতে-দিতে প্রায় দৌড়লো সে।

'কি হলো?'

মিত্রার প্রশ্নে যেতে-যেতে বললো রাণী—'কমলাকে ওষুধ-পথ্য দেবার সময় পার হয়ে গেছে। এমন বাঁকা কথা শুনিয়ে দেবে তার উত্তর আর আমার মত সোজা মানুষের জোগাতে হয় না! আজ আর রক্ষে নেই।' দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেলো সে।

কমলা ছোট ননদ। ছেলেমেয়ে হতে মা'র কাছে এসে বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছে।···মিত্রার শরীরটা বার কয়েক কাঁটা দিয়ে শিউরে উঠে শান্ত হলো···আঃ, এ পাট আর তার জন্যে নয়···।

চুল বাঁধা শেষ। এখন উঠতে হবে গা ধুতে। তবু বসে থাকে ও কুঁড়ের মত।···আশ্বিনের স্বচ্ছ আকাশ পরিচ্ছন্ন নীল। কোথাও গাঢ় পাতলার অসামঞ্জস্যের ছোঁয়াটুকু নেই।···বৈশাখ নিয়ে এসেছিলো বৈশাখের দুর্য্যোগ। আষাঢ়-শ্রাবণে—ধারা বইলো মানুষগুলোর চোখে আষাঢ়-শ্রাবণের মত। আজ আশ্বিন দেখা দিয়েছে নির্মেঘ নীল আকাশের সুস্থ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে।···বিপদ ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে অতর্কিত আক্রমণে সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। যেন ভয় দেখিয়ে ধমকে উঠে বলে—'থাম, আর চলতে হবে না।' আকস্মিক আঘাতে আহত মানুষকে করে ফেলে অসাড় নিশ্চল। কিন্তু ক'দিন? সামলে ওঠার সময়টুকু মাত্র। তার পর দু' ঝাঁকুনীতে ঝেড়ে ফেলে তাকেও মানুষ ধমকে উঠে বলে—'পথ ছাড়—নষ্ট করবার সময় নেই।'

···নাঃ, সন্ধ্যে হয়ে গেলো। গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো মিত্রা। প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হলো সামনের আয়নায়। এ কে? অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো ও নিজ অঙ্গের প্রতি স্তম্ভিত বিস্ময়ে! অসুস্থ রুগ্ন দেহ ওর হবিষ্যান্ন আর দুধ ফলের রসে দিনে-দিনে কখন পুষ্ট হয়ে ভরে উঠেছে এমনি স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যে? এই কি বাঙালী মেয়ের কুড়িতে বুড়িয়ে যাওয়া ওর সেই শরীর? কোন্ মায়ামন্ত্রে দেহের এই বিস্ময়কর রূপান্তর—প্রতি অঙ্গগঠনে এমন দৃঢ় ভঙ্গিমাময় দম্ভ?

পায়ের শব্দে সরে দাঁড়ালো মিত্রা আয়নার কাছ থেকে। মিহি সরু পাড়ের কাপড়খানা টেনে নিলো হাতে। চললো স্নানের ঘরের উদ্দেশে।

বারান্দায় বসে পূজোর সলতে পাকাচ্ছিল স্বর্ণময়ী। পাশে ছোট্ট বাটিতে জল ও স্তূপাকৃতি নেকড়ার ফালি। দূর থেকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো মিত্রা। হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে নীরবে কেঁদে চলেছে স্বর্ণময়ী। মায়ের চোখের জল সময় শুকিয়ে তুলতে পারেনি। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যার নিরিবিলি, রাত্রিশেষের অস্পষ্ট ঊষার নিভৃতি—প্রতিদিনের প্রতিটি নির্জ্জন অপনীয় অবসর সর্পিত হয়ে চলে ছেলের উদ্দেশ্যে চোখের জলের তর্পণে। শিউলি ফুলের পাপড়িতে ভোরের শিশিরের সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকে স্বর্ণময়ীর চোখের জল···অত বড় মানুষটি গেছে শুকিয়ে, এতটুকু হয়ে। ফিরে চলে এলো মিত্রা। নিজের এই স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর নিয়ে ঐ নিবিড় শোকাচ্ছন্ন ছোট মানুষটির কাছ দিয়ে হেঁটে যাওয়া হয়তো মাড়িয়ে যাওয়া। সংকোচে বুঝি পা উঠলো না মিত্রার।

[ক্রমশঃ।
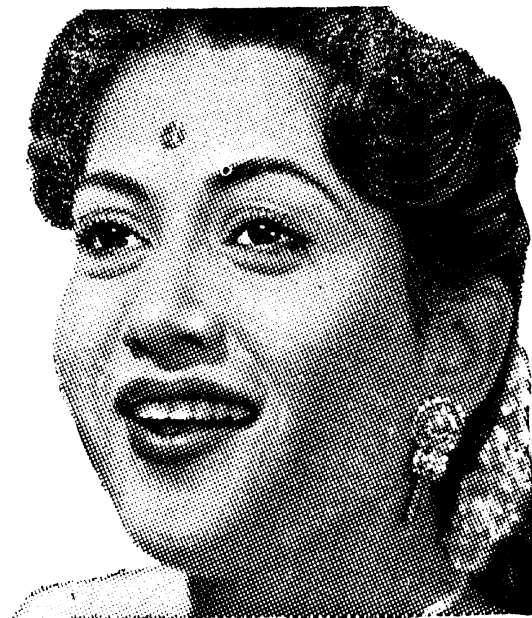
কঠোপনিষদ

চিত্রিতা দেবী

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ১ স্বয়ম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ।১

পরাচ কামান অনুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ।
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ।২

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্,
স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্,
এতেনৈব২ বিজানাতি কিমত্র
পরিশিষ্যতে । এতদ্বৈতৎ ।৩

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ
যেনানুপশ্যতি ।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা
ধীরো ন শোচতি ।৪

য ইমং মধ্বদং১ আত্মানং
জীবমন্তিকাৎ
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো
বিজুগুপ সতে
এতদ্বৈতৎ ।৫

ইন্দ্রিয়দল ছোটে অবিরাম বাহিরের পথ ধ'রে
জীবচোখে তাই এ মহাবিশ্ব তোলে গ'ড়ে নানা রূপ ।
অন্তরে আছে অন্তরযামী সেথায় চলে না দৃষ্টি,
নিজেরেই যেন হিংসিয়া প্রভু করেছেন এই সৃষ্টি ।
কোন মনস্বী অমৃত আশায় ইন্দ্রিয়দল রুধিয়া,
আপন স্বরূপ করে দরশন, আপনার মাঝে ডুবিয়া ।১

কামনার ধন যাহা কিছু আছে, কেবল তাহারি তরে,
বালকস্বভাব অল্পবুদ্ধি লোকে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া পড়ে মৃত্যুর জালে ।
জ্ঞানী যারা, তারা অনিত্য-মাঝে,
ধ্রুব সেই ধন খোঁজে
অমৃত পরশে জ্ঞানী লভে তাই
সকল কামনা বিরতি ।২

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মৈথুন,
যে আত্মা করিছে ভোগ, আপনার জ্ঞানে,
তাহারি স্বরূপ সন্ধানে ধায়, সকল বিশ্বজিজ্ঞাসা,
সেই নাচিকেত প্রশ্ন ।৩

জাগরণ আর স্বপ্নের যত কোটি বিচিত্ররূপ,
যাঁহার পরশে হয়েছে দৃশ্যমান,
সে মহা বিভুরে, যে দেখে হৃদয়ে,
অশোক চিত্ত তার ।৪

মধুপায়ী১ আর প্রাণ চঞ্চল, এই জীব আত্মারে,
ত্রিকাল অতীত ঈশারূপে,
যেবা জানে অন্তর-মাঝে,
সে নয় ব্যাকুল আপন প্রাণের তরে ।
নয় সে আকুল কোন দুঃখের ডরে,
সে দেখিতে পায় চিরশাশ্বত ব্রহ্ম ।৫ ।

---

১ ব্যতৃণৎ—অর্থাৎ হিংসা করেছিলেন ।—স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়দের হিংসা করেছিলেন । আশ্চর্য্য নয় কি ? তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদেরই হিংসা করলেন ?—হাঁ । না হলে কেন তিনি ইন্দ্রিয়দের কেবল বহির্মুখী করে সৃষ্টি করলেন ? তারা কেবল বাইরেটাই দেখতে পায়, নিজের ভিতরে তাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না । দর্পণ যেমন বাইরেটাই ফুটিয়ে তোলে, তার ভিতরে পারদের অস্তিত্ব থাকে চোখের অন্তরালে । এমন বিপরীত ভাবে ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করে স্বয়ম্ভু যেন তাদের হননই করেছেন । স্বরূপের প্রতি তাদের দৃষ্টিপাত করতে না দিয়ে, অহর্নিশি তাদের বহির্মুখে ছুটিয়ে, হিংসাই করেছেন যেন তাদের প্রতি ।

২ ইন্দ্রিয়ের অন্তরাল হতে আত্মাই সমস্ত ভেদবিচিত্র বিশ্বজ্ঞান ভোগ করছেন । ইন্দ্রিয় এবং বিষয়, এই উভয়েরই জ্ঞান সেই আত্মায় সঙ্ঘটিত হয়ে চলেছে । জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় যে একটি শুদ্ধ জ্ঞানানন্দের মধ্যে বিধৃত রয়েছে, আত্মা, সেইতো এবং সেইতো নচিকেতার প্রশ্ন ।

১ মধুপায়ী—অর্থাৎ কর্মফলভোগী জীবাত্মা অজ্ঞানের জন্য আপন স্বরূপের প্রতি জিজ্ঞাসু না হয়ে কর্মফল ভোগ করে । যে মুহূর্তে সে আপন অখণ্ড অদ্বৈত স্বরূপ উপলব্ধি করে, সেই মুহূর্তে তাহার সকল ভয় বিনষ্ট হয় । ফলভোগী সত্তাকে আপন অবিনাশী শাশ্বত সত্তার সহিত মিলিত দেখিয়া নিরাসক্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ করে।

যঃ১ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ
পূর্বমজায়ত ।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো
ভূতেভির্ব্যপশ্যত
এতদ্বৈতৎ ।৬

চিদ্‌ঘন এই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত যাহা,
পঞ্চভূতেরো পূর্বে,
সে মহাশক্তি১ হৃদয়ে প্রবেশি,
আছে তনু মন ব্যাপিয়া,
যে তাঁরে দেখেছে, সেও তো দেখেছে
ব্রহ্ম ।৬

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং
যা ভূতেভির্ব্যজায়ত ।
এতদ্বৈতৎ । ৭

সব দেবতার শক্তিরূপিণী
প্রাণময় যিনি ব্যক্ত,
নিত্য নবীন প্রতি জীবে জাত,
অন্তরে চিরস্থির—
তিনি সনাতন ব্রহ্ম । ৭

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা,
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিনীভিঃ
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ
এতদ্বৈতৎ । ৮

গর্ভিণী যেমন রাখে আপন সন্তান,
অরণিকাষ্ঠ যেমন আগুন রাখে,
আহুতি-অর্ঘ্যে ঋত্বিক্ যথা রাখে
অগ্নিরে জ্বালায়ে,
ধ্যানসাধনায় যোগী সেই মতো
ব্রহ্মরে রাখে, অন্তরে চিরস্থির । ৮

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি ।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্ত-
দু নাত্যেতি কশ্চন ।
এতদ্বৈতৎ । ৯

সূর্য্যউদয়, সূর্য্যঅস্ত, সকল দেবতা,
সকল প্রকৃতি শক্তি,
যাঁর মাঝে অভিব্যক্ত,
এই বিশ্বের (চিরবহমান) শক্তি-উৎস যিনি,
তাঁহারে ছাড়ায়ে, কেহ কভু কোথা,
কখনো চলিতে নারে
তিনিই পরমব্রহ্ম । ৯

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ,
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ,
নানেব পশ্যতি । ১০

সংসার-মাঝে যাহা বিচিত্র
সংসার-পারে, তাহাই রয়েছে স্থির,
এই বিচিত্র জগতে ছন্ন, একই পরম তত্ত্ব,
সেই সত্যেরে বিভিন্ন জেনে, যে রয়
মায়ায় মুগ্ধ,
মরণ হইতে মরণান্তরে বার বার তার গতি । ১০

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব
পশ্যতি । ১১

অবিকারী মন যাহারে লভিতে পারে,
সেই ভেদহীন ব্রহ্মেরে যেবা
বিভিন্নরূপে দেখে,
মৃত্যুর পরে মৃত্যুই তার গতি । ১১

---

১ চেতনাময় ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টির কারণরূপী প্রাণশক্তি অথবা হিরণ্যগর্ভ প্রথমে জাত হইয়াছিলেন। তাহা হইতেই পঞ্চভূত ও সৃষ্টি প্রকাশক প্রাকৃতিক দেবতা ও বিষয় গ্রাহক ইন্দ্রিয়দল উৎপন্ন হয়। অনন্ত সৃষ্টি ব্যাপিয়াও সেই প্রাণশক্তি মানব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আপন আদিকারণ চিৎব্রহ্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকেন। সেই আদিম প্রাণশক্তি অথবা হিরণ্যগর্ভকেও যে সত্য করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে, সেও ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করিয়াছে।

অঙ্গুষ্ঠ১ মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি
তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো
বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈতৎ ।১২

অঙ্গুষ্ঠ১ মাত্র হৃদয়পদ্মে আনন্দে অনুভূত,
তিনিই ব্যাপ্ত ভূতভবিষ্য সকল
সৃষ্টি-মাঝে।
তাঁহারে জানিলে আপনার তরে
ব্যাকুল হয় না কেহ ।১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য
স উ শ্বঃ।
এতদ্বৈতৎ ।১৩

অন্তরে যিনি ধূম্রবিহীন নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি
ত্রিকাল ঈশান, তিনিই পরম সত্য।
বর্তমান ও ভবিষ্যতের অন্তরে,
চিরস্থির ।১৩

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু
বিধাবতি
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেব
অনুধাবতি ।১৪

এই বিচিত্র জগৎকে যেবা স্বরূপে,
ভিন্ন জানে,
পাহাড়ের যত বৃষ্টিধারার ন্যায়
নিম্নে ঝরিয়া;
গলিয়া গলিয়া,
এই ভিন্নেরই পিছে পিছে
ঘুরে মরে ।১৪

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং
তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি
গৌতম ।১৫

শুচি জল, যথা শুচি জলে মিলে,
হয় চির-নির্মল।
সমানদর্শী জ্ঞানী মানবের
মহান্ আত্মাটিও,
জেনো গৌতম, ব্রহ্মের মাঝে
এই মত মিলে যায় ।১৫
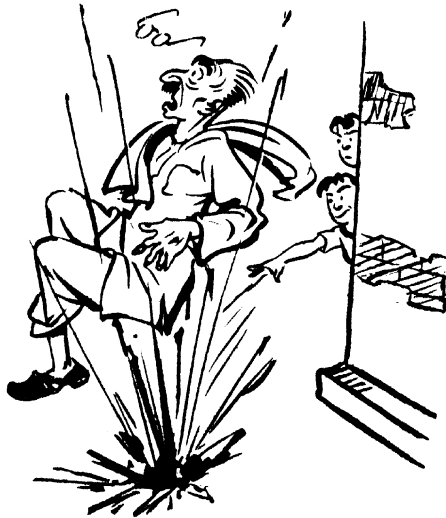
[ক্রমশঃ।

১। যে আত্মা অকায়ম্ অব্রণম্। যিনি অনন্ত সৃষ্টি কল্পনা করিয়া এবং তাহাতে, পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও অণুতে অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাপে পরিমিত করিয়া বর্ণনা করা কল্পনাতীত।—অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলিতে ঋষি হৃৎপিণ্ডকে বুঝাইতেছেন। হৃৎপিণ্ডের পরিমাপ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণই বটে। তাহারই ভিতরে অনুভাবিত অনুভূত এবং উপলব্ধ হন বলিয়াই আত্মাকেও যেন অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

১৯৫২ সালের ছাত্র—
পরীক্ষায় ফেল্‌ করিয়াছে।

—প্রমথ সমাদ্দার অঙ্কিত।

নিবেদিতা

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

দ্বিতীয় খণ্ড

গুরুর পাশে

অষ্টম অধ্যায়

নব পরিচয়

সমুদ্র শান্ত। কিন্তু গরমে যেন পুড়িয়ে মারছে। এরই মধ্যে ভেসে চলেছে 'মোম্বাসা' জাহাজ। গঙ্গার মোহনায় এসে তার গতি মন্দা হল, আর তেমন ভৈরব উচ্ছ্বাসে জল কেটে পড়ে না চাকার দু'পাশে। নদীর উজান-পথে নাক ঢোকালো জাহাজ; ঘোলা জলের মাঝে ডুবো চর এখানে-ওখানে, মাস্তুলের উপরে চক্কর দিচ্ছে বালিহাঁস আর চিল। চার কোণা পাল-তোলা চ্যাপ্টা-গড়নের ভারী ভারী জেলে ডিঙ্গী ভেসে উঠছে চার দিকে। ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মধ্যে শুশুক ঘাই মারছে।

যে-পুণ্যভূমির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে-ছিলেন বিবেকানন্দ তারই প্রথম আভাস দেখবার আশায় জন কয়েক হিন্দু যাত্রী ডেকের উপর উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব-দ্বীপের মুখে ভেঙে-পড়া জলের কিনারায় সূর্যকরোজ্জ্বল তটরেখা এমন করেই মিশে গেছে যে, ভারতের মাটির সাথে প্রথম ছোঁয়াটুকু মনে হয় যেন অপ্সরালোকের মায়া!

হঠাৎ ডাঙ্গা দেখা গেল। ডাইনে আর বাঁয়ে নল-ঝোপে ভরা সোনালী বালুর দু'টুকরো চর। আগুনে-রঙের পাখিরা সব উড়ছে মাথার উপরে, ডানার 'পরে ঝিক্‌মিক্ করছে রোদের আলো। এবার ডাঙ্গার উপরে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল। প্রথমেই চোখে পড়ে, তাল আর নারকেলের ঝাঁকড়া পাতার গোছা আকাশে মাথা তুলেছে। এখানে-ওখানে সবুজের পোঁছ, ছোট ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল গুগুলো। কোথাও গাছ-ভরতি গাঢ় লাল রঙের ফুল যেন অগ্নিশিখার মত লকলকিয়ে দুলছে। ছোট্ট-ছোট্ট গ্রাম চোখে পড়ে দু'-একটা, একটার গায়ে আরেকটা কতগুলো খড়ের ঘর। পায়ে-চলা পথে, মাঠে-মাঠে মেয়ে-পুরুষের কালো ছবি—যেন একখানি চলন্ত ফ্রেস্‌কো।

একটা গোটা দিন ধরে জনপদের ভিতর দিয়ে জাহাজ এমনি এগিয়ে চলল যতক্ষণ না কলকাতা চোখে পড়ে। প্রথম দেখা গেল আকাশ-কালো-করা ধোঁয়ার কুণ্ডলী, তারপর কলকাতা বন্দরের লাইট হাউস, অসংখ্য বয়া আর পাহারা ঘাঁটিগুলো। ভারতবর্ষের এই প্রথম দর্শনে মার্গারেট এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, ডেকের উপরে যে আস্তে-আস্তে বিদায়ের ছায়া ঘনিয়ে উঠছে সেটা তাঁর নজরেই আসেনি।

যাত্রীরা পরস্পর সম্ভাষণ করছেন, লাল পাগড়ি-পরা কোমরে পট্টি বাঁধা খালাসীরা দড়ি-দড়া ঝুলিয়ে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে ডেকের উপরে মালের পাহাড় এনে তুলছে খোলের ভিতর থেকে। ক্যাপ্টেনের হুকুম দেওয়া হচ্ছে—ঘণ্টা বাজিয়ে। ওয়াল্টার স্কটের জলদস্যুদের মত দেখতে সুশ্রী এক ঝাঁক লোক জাহাজের পাশে এসে ভিড় জমিয়েছে। চার দিকে কেবল চেঁচামেচি আর দৌড়াদৌড়ি, তার মাঝে এরা মালপত্র তুলে বোঝাই করতে শুরু করল নামবার সিঁড়ির উপর।

এইবার জাহাজ থেকে নামা। ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে বন্দরের দিক থেকে অদ্ভুত একটা কোলাহলের শব্দে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে—হেঁইয়ো—হেঁইয়ো। নেংটি-পরা কালো-কালো অনেক লোক, মাথায় গাঢ় নীল রঙের ফেটা বাঁধা, নোঙরের শিকল ধরে টানছে। দড়ির উপর ঝুলে পড়ে এক ছাঁদে ওরা শরীরটা বাঁকাচ্ছে-চোরাচ্ছে: 'হেঁইয়ো—হেঁইয়ো!'

বন্দরের উপরে বিরাট জনতা। ধাঁধানো আলোয় মার্গারেট বার-দুই চোখ মিট্‌মিট্ করলেন। আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করতে চারি দিকে রুমাল উড়ছে, ফুলের মালা দুলছে হাতে-হাতে। নানা রঙের ঝল্‌মলে শিরস্ত্রাণ আর মেয়েদের শাড়িতে মিলে একটা চোখ-ঝলসানো রঙের মেলা—তামাটে মুখের আদল নিখুঁত রেখায় ফুটিয়ে তুলে সর্বত্র কেবল রঙে-রঙে ছয়লাপ।

ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে মাটিতে পা দিয়েই মার্গারেট দেখলেন স্বামী বিবেকানন্দ এগিয়ে আসছেন ওঁর দিকে। তাঁর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা আর ঐ রঙেরই পাগড়ি। শুধু স্যাণ্ডাল-পরা খালি পা, মোজা নাই। মার্গারেটের মনে হল আগের চেয়ে ওঁকে যেন আরো লম্বা মনে হচ্ছে, চার পাশের সবাইকে ছাপিয়ে—দীর্ঘ আর বলিষ্ঠ ছাঁদের মানুষটি।

সবে নমস্কার করতে যাবেন, এমন সময় স্বামীজিরই মত গেরুয়া-পরা এক সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে মার্গারেটের গলায় একখানি মালা পরিয়ে দিলেন। যুঁই আর গোলাপে মেশানো সাদা ফুলের মালা—তিন লহরে গাঁথা, মাঝে-মাঝে জরির থোপনা। নিতান্তই ক্ষণেকের সজ্জা, কিন্তু দেব-প্রতিমাকেও তো এই দিয়েই সাজানো হয়। মার্গারেট একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন, হাঁটছেন যেন স্বপ্নের ঘোরে। এর মধ্যে লক্ষ্য হল, স্বামীজি জনতাকে পথ ছেড়ে দিতে বলছেন। অপরিচিত ভাষার কথা—উচ্চারণগুলো কাটা-কাটা, কিন্তু আওয়াজটা গম্‌গম্ করছে যেন।

কুলিরা ছুটে চলেছে পাহাড়-প্রমাণ বোঝা মাথায় নিয়ে, নগ্ন দেহে ঘামের ধারা বইছে। পিছনে-পিছনে জাহাজের যাত্রীরা চলেছে ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলি করে। সোনালী-কিনারা-দেওয়া ইউনিফর্ম-পরা পাহারাওয়ালারা হাতের ছড়ি দিয়ে একবার তাদের তাড়া করছে, একবার ঠেলে দিচ্ছে। কোনও কোনও আগন্তুকের গলায় সুগন্ধি মালার বোঝা, তাকে ঘিরে ঘোমটায়-ঢাকা মেয়েরা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্দরের ঠিক বেরুবার পাটিতে কেবল ভিড়েরই ঠেলা,—তার বিশৃঙ্খল শ্লথ গতিতে গা না ছেড়ে দিয়ে উপায় নাই।

মার্গারেটের সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছিল পুরুষদের অদ্ভুত পোষাক দেখে। কারও পোষাক শরীরের উপর কষে জড়ানো, পেশীর রেখাগুলো ফুটে উঠেছে তার ভিতর দিয়ে; কেউ বা লম্বা ঢল্‌ঢলে

শার্টের উপর চড়িয়েছে ওয়েষ্ট-কোট, কারও পোষাক আটসাঁট, কারও বা ঢিলেঢালা। দাড়িতে-চুলেতে দৈত্যের মত এক-একটা মানুষ, কানে ঝিক্‌মিক্ করছে দামী পাথর, মাথায় পাতলা মসলিনের পাগ। কারও-কারও মাথা দিব্যি চেঁচে কামানো, কারও বা ন্যাড়া মাথায় একগোছা লম্বা টিকি। কারও ডান কানের উপরে কাঁটা দিয়ে আটকানো একটা ঝুঁটি, আবার কারও ঝাঁকড়া চুল গুচ্ছে-গুচ্ছে এসে পড়েছে কাঁধের উপর। কাষ্টম হাউসের দোর দিয়ে যাত্রীরা একে-একে পার হচ্ছে। কাছেই তালপাতার ছাতার নীচে এক সাধু নিশ্চল হয়ে ধ্যান করছে, মাথায় জটা, সর্ব-শরীরে লাল-সাদা ডোরা কাটা, দেখতে লাগছে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি। সুগন্ধি ধুনা পুড়ছে তার চার পাশে।

বন্দর থেকে শহর মাইল খানেক হবে। কলকাতার রাস্তায় সব রকম যান-বাহন ছড়ানো; তারই মধ্যে ওঁদের গাড়ি কষ্টে-সৃষ্টে পথ করে চলেছে। রকমারি বোঝা চাপানো বলদে-টানা গাড়ি, তেরপল-ঢাকা মালের গাড়ি, ঘামে-ভেজা ঠেলাওয়ালাদের ঠেলা-গাড়ি—এই বাহিনীর মধ্যে শেষ পর্যন্ত ওঁদের গাড়িটাও একটা জায়গা করে নিল। সবাইকে ছাড়িয়ে চলেছে অসংখ্য জুড়ি-গাড়ি—তাদের কাঠের খড়খড়িগুলো বন্ধ, আগে-পিছে জোড়া কোচোয়ান চাবুকের সাপটে আর গলার দাপটে লোক সরিয়ে হাঁকিয়ে চলেছে। সব গোলমাল ছাপিয়ে এক সময় শোনা গেল স্বামীজির শান্ত স্বর—'লণ্ডনের বন্ধুরা কেমন আছেন মার্গাবট? তোমার মা ভাল আছেন তো? স্কুলে আর কী নতুন কাজ করেছ?'

এবার গাড়ি যে-রাস্তা দিয়ে চলল তার দুপাশে চিকণ সবুজ ঘন-পাতায়-ভরা গাছের সার। দু'দিকেই ঝোপে-ঝাড়ে, লতাপাতায় ঢাকা ছোট্ট-ছোট্ট খড়ের ঘর চোখে পড়ে। বারান্দায় আলো জ্বলছে, আদুড় গায়ে মানুষ বসে আছে দোরের কাছে। উস্কু-খুস্কু চুলে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা ছাগলছানা নিয়ে খেলছে, ছুটোছুটি করছে। বাতাসে পোড়া তেলের আর ফোড়নের গন্ধ।

পার্ক ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ মিশনের জন কয়েক বান্ধব থাকতেন, তখনকার মত মার্গারেট সেখানেই উঠলেন। চলে যাওয়ার সময়, বিবেকানন্দ বলে গেলেন, 'থিতু হয়ে বসে একটু জিরিয়ে নাও। তবে আমার কথা যদি শোন তো বলি, কাল থেকেই কাজ শুরু করে দাও। তোমায় বাংলা শেখাতে কাউকে গিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

সন্ধ্যার দিকে, কাগজপত্র বার করে মার্গারেট তাঁর নোট-বই খুলে লিখলেন,—'২৮শে জানুয়ারী, ১৮৯৮। আমি বিজয়িনী, শেষ পর্যন্ত ভারতে এসেছি।'

সম্ভবতঃ পথের ক্লান্তিতে আর এদেশে পৌঁছানোর উত্তেজনায় প্রথম রাত্রিটা ভাল ঘুম হল না। তখনও যেন স্বপ্নের ঘোরে জাহাজের সঙ্গীদের উপদেশ কানে বাজছে, 'সব সময় হুঁসিয়ার থাকবে। ভারতবর্ষে বিপদ একেবারে আনাচে-কানাচে···ওখানকার জলে বিষ, ফলে বিষ, ফুলের গন্ধে নেশা ধরে। এক আজব দেশ,—একটা গরু বাঁদর কি ময়ূরের কিছু করলে একটা মানুষ মারার চাইতে বেশী গুনাহ।' স্বপ্ন দেখলেন, একটা জঙ্গলে গিয়ে পড়েছেন, সেখান থেকে বেরুতে পারছেন না। বনের আশে-পাশের ডাঙা বন্যায় ভেসে গেছে। রোদে-পোড়া ছোট্ট একটি ছেলে ওঁর হাত ধরে কোথায় নিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত গাছগুলো ঝাপসা একাকার হয়ে গেল। গাছের ডালে-ডালে হাওয়ার সন্‌সনানি হয়ে গেল মানুষের কোলাহল। হঠাৎ দেখেন, এক অচেনা ভিড়ের মাঝে তিনি একা, ভিড় ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, এই বুঝি পিষে ফেলবে। যতই বোঝাতে চাইছেন কত ওদের ভালবাসেন, মুখে আর কথা সরে না। ওরা আঁজলায়-আঁজলায় যুঁইয়ের মালা ছুঁড়ে ফেলছে ওঁর দিকে, পায়ের কাছে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ছে, গন্ধে ম'-ম' করছে চার দিক···

চোখের জলে মার্গারেটের ঘুম ভেঙে গেল।

পৌষের শীতে ভারতবর্ষের সঙ্গে এমন পরিচয়ের একটা নেশা আছে, মুহূর্তে-মুহূর্তে সেটা বেড়েই চলে। বিদেশীর কাছে তখনকার আবহাওয়াটা ভারী মিষ্টি কি না। বেশ কিছু দিন ধরে মার্গারেট শিশুর উৎসাহে মনের রাশ আলগা করে দিলেন। এখানকার সবটুকু রূপ-রস ছেঁকে নেবার ইচ্ছাটা বড় বেশী, ঔৎসুক্যের যেন আর তর সয় না। অহরহ খোলা জানলার ফাঁকে আনন্দ-বিহ্বল প্রকৃতির হাতছানি—তাতে একমনে একখানা চিঠি লেখাও কঠিন হয়ে ওঠে। জবার ফুলন্ত ঝোপে-ঝাড়ে যেন বসন্তোৎসবের সজ্জা—সানাইয়ের মত বড়-বড় নাম-না-জানা ফুলের পুরু পাপড়ির মেলা—গুঞ্জন তুলে পতঙ্গেরা ছুটেছে ঐ দিকে। অযত্নে বেড়ে-ওঠা অচিন লতা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে উঠে গেছে এঁকে-বেঁকে, ছড়িয়ে পড়েছে শূন্যের কোলে, হাওয়ায় দুলছে তাদের আকর্ষণ। বাতাস গরম, বাগানের দেয়ালের ওপারে রাস্তার অবোধ্য কোলাহল ভেসে আসছে থেকে-থেকে।

লোভ ছাড়ানো বড় কঠিন, সব কিছু ঘুরে-ঘুরে নিজের চোখে দেখবার জন্য না বেরিয়ে ঘরে বসে থাকাটা এখন একেবারে অসম্ভব।

কলকাতা শহরের নানা বৈশিষ্ট্য। প্রথম দফা, এ হল ভারতবর্ষের রাজধানী,—প্রকাণ্ড থামওয়ালা বড়-বড় প্রাসাদে, পাথর-বাঁধানো গঙ্গাতীরে, রাজপুরুষদের সুরম্য ভবনে, পুষ্পবাটিকায় আর বিহারোদ্যানে পণ্যসজ্জিত বিপণিতে সমৃদ্ধ এক মহানগরী। ছক-কাটা চৌরাস্তা,—তারই মোড়ে-মোড়ে ভারতীয় পুলিশ জনতা নিয়ন্ত্রণ করছে। সোনালী তকমা-আঁটা সাদা উর্দি আর লাল পাগড়ি ওদের, কোমরবন্ধের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ছাতা আটকানো। যখনই নড়ে-চড়ে, দেখায় যেন একটি দম-দেওয়া খেলার পুতুল।

এই ইউরোপীয়ান অঞ্চলের ঠিক ওপারেই আদত হিন্দুস্থান আবার জাঁকিয়ে বসেছে। যেমন-তেমন করে তৈরী পাকা বাড়ির সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েছে হালকা কাঠের ছাদওয়ালা মাটির বাড়ি। ভিখিরী আর ফেরিওয়ালার দল একঘেয়ে সুরে চেঁচিয়ে চলেছে। পানের দোকানীর তাঁবেতেই ডাবের রাশ সাজানো রয়েছে ফুটপাথের চাতালে, তারই পাশে বসে নাপিত বাবুদের খেউরি করছে। রাস্তার উপরেই মানুষ পড়ে ঘুমুচ্ছে মুখের 'পরে একখানা কাপড় ঢাকা দিয়ে,—দিনের বেলায় ওটাই হবে তার মাথার ফেটা বা উড়ানি। গেরুয়া কাপড়ের ঝাণ্ডা-জড়ানো দণ্ডের উপর ভর দিয়ে জীর্ণ গৈরিক পরে সাধুরা চলেছেন। তাঁদের নগ্ন বুকে দু'-তিন ছড়া বড়-বড় রুদ্রাক্ষের মালা। এই রঙ-বেরঙের ভিড়ে মেয়েদের কদাচিৎ চোখে পড়ে। চওড়া-পেড়ে সাদা শাড়িতে আগাগোড়া মোড়া, মুখ তো প্রায় দেখাই যায় না,—এমনি ভাবে ত্রস্ত চকিত পায়ে তারা যাওয়া-আসা করে।

এদেশে তখন ঘোড়ার গাড়ির খুব চলন। দেখতে ঠিক কালো

বাক্সের মত, কাঠের খড়খড়ি ইচ্ছামত নামান-উঠান যায়, এরই একটাতে চড়ে মার্গারেট পুরানো কলকাতার বুকে ঘুরে বেড়াতেন। কোচোয়ান যেদিকে যায় যাক, মার্গারেট তার উপরে নিজেকে ছেড়ে দিতেন, আর যাতুকরের মত আরব্যরজনীর মায়াপুরীতে সে তাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। কোচোয়ানটি অদ্ভুত, মাথায় জরদা রঙের এক ইয়া পাগ, তার নীচ দিয়ে একরাশ চুল এসে পড়েছে ঘাড়ে-গলায়। কানে সোনার মাকড়ি। একসঙ্গে জিবে টকটক্ আর চাবুক হাঁকড়ানো ছুটোই করে চলেছে ওস্তাদের মত। ঘোড়া ছুটো যখন টাপে চলে ও চোখ ঘুরিয়ে দাঁত বার করে হাসে, যেন কী এক কারখানাই হচ্ছে!

মার্গারেট যেখানে থাকেন তারই কাছাকাছি একটা রাস্তায় পথের সমতলে পর-পর অনেকগুলো মাল-ভরতি ছোট দোকান খুলেছে,—সব শুদ্ধ যেন মনে হয় মৌমাছির একটা বড় চাক, অসংখ্য ছোট-বড় খোপ তাতে। ওর মধ্যে সব-চাইতে বড়গুলো হাত ছু'-তিন চওড়া হবে, তাতে সেই সনাতন পণ্যসজ্জা। এরই একটা দোকান দেখে দেখে মার্গারেটের আশ মেটে না। চার দিকে কাচের বয়াম, তামার পাত্র, ঝোড়া-ঝুড়ি—তার মধ্যে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে দোকানদার ঝিমুচ্ছে। বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব, কানে একটা ফুল গুঁজে পান চিবুতে-চিবুতে গাহেকের অপেক্ষায় আছে। দোকানের সামনে চাতালে ওর চটি জোড়া পড়ে রয়েছে, পিছনে আবছা দেখা যায়, এক কাঁড়ি ধুলো-পড়া জিনিসের দঙ্গল—জড়ি-বুটির মালা, ঝিনুক-কড়ি, সাতসতেরো টুকিটাকি, কাচের বাসনপত্র, বালা-চুড়ি, ঘণ্টা-ঘুঙুর, ছোট-ছোট মূর্তি, সেণ্টের শিশি,—এমনি কত কী।

রাত্তিরে—তেলের ডিবা আর ধোঁয়া-ওঠা মশালে এ সব ছোট্ট দোকানগুলোতে একটা ভুতুড়ে আলোর সৃষ্টি করে। এই সময়টা দোকানীরা পরম ভক্তের মতই একমনে নিষ্ঠার সঙ্গে মালা টপকায়।

আসার পরদিন একজন সন্ন্যাসী মার্গারেটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে পাঠিয়েছেন বাংলা শেখানোর জন্য। তাঁর পরনে ব্রহ্মচারীর সাদা কাপড়—কামানো মাথায় একগোছা শিখা শুধু। ভদ্রলোকের ধরনটা জড়সড়, একটা ছেলেমানুষী নিরীহ ভাব,—দোরের বাইরে চটি খুলে খালি পায়ে অপেক্ষা করছেন ছাত্রী কতক্ষণে প্রস্তুত হয়ে আসে। নিজের কাজটুকু ছাড়া আর কিছুই তাঁর নজরে আসে না। স্বামীজি বেশ সাবধানেই তালিম দিয়েছেন ওঁকে। তখন পর্যন্ত মার্গারেট ভাল করে জানেন না কী করে মন স্থির করতে হয় বা অন্তরকে বৃত্তিশূন্য করতে হয় কী উপায়ে। এই বিদেশী মেয়েটির দিকে একবারও না তাকিয়ে শিক্ষক মশাই 'ঠাকুরের কথা' নিয়ে ছোট্ট ছু'খানি বই টেবিলের উপরে রেখে বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইংরেজীতে ও-ছুটি অনুবাদ করতে হবে। থতমত খেয়ে মার্গারেট বলেন,—'কোন্ ঠাকুর? যিশু? কৃষ্ণ?' প্রাণপণ হাতড়িয়ে একটা-কিছু ধরতে চেয়েও যে পারছেন না, এটা বেশ বুঝতে পারেন। কিন্তু কোথায় তাঁর ঠেকছে বুঝতে না পেরে সাধু শান্ত স্বরে উত্তর দেন, 'আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ'।—'ওঃ···হাঁ···নিশ্চয়···' বলতে গিয়ে মার্গারেট বুঝতে পারেন লজ্জায় তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে শেষে বলেন, 'আচ্ছা, তাহলে কাজ শুরু হ'ক।'

মার্গারেট কলকাতার বাসিন্দা হওয়ার উপক্রম করছেন, আর এদিকে স্বামীজি একবার বলরাম বাবুর বাড়ি একবার বেলুড় ছুটোছুটি করছেন। তাঁর বিদেশী শিষ্যা হেনরিয়েটা মূলারের সাহায্যে, বেলুড়ে গঙ্গাতীরে পনেরো একর জমি কিনে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও মিশনের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার তখন কথা হচ্ছে।

জায়গাটায় গঙ্গা এক মাইলেরও বেশী চওড়া হয়ে গেছে। বরানগরের ঘাটের ঠিক বিপরীত দিকে মঠ উঠবে, উত্তরে তাকালে কলকাতা এখান থেকে চোখে পড়ে। আর দক্ষিণে তালের সারির পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের সোনালী চুড়ো মাথা তুলেছে।

একটু বৃষ্টি হলেই বেলুড়ের এই জমিটা একটা কাদাবিল হয়ে উঠত। মূল বাড়িটা নেহাৎ বে-মেরামতী অবস্থায়—দেয়ালগুলো নোনায় ধসে পড়ছে। এটার জীর্ণ সংস্কার করে, আরেকটা তলা জুড়ে দেওয়া হল। নতুন দোতলায় অনেকগুলো ঘর, আর ঠিক গঙ্গার উপরেই একটা বারান্দা। হতশ্রী একটা ঘাট ছিল, তার ভাঙ্গা-চোরা ধাপগুলো জলে নেমে গেছে, সেটাও ভাল করা হল। ঘাটের ছু'পাশে পাথরের থামের উপর ছুটো বাতি—মাঝিদের যাতে সুবিধা হয়।

আর একটা ছোট বাড়ি ছিল, তার চার দিকই খোলামেলা। আগে ওটা অতিথশালা হিসাবে ব্যবহার হত। মিসেস বুল এবং মিস ম্যাকলয়েড, স্বামীজির ছুই অন্তরঙ্গ সুহৃৎ বেলুড়ে আসবেন খবর পেয়ে ওই বাড়িটাও তাড়াতাড়ি মেরামত করা হল। মঠের কাজ-কর্ম দেখাশোনা করবার জন্য তাঁরা বেলুড়েই বাস করতে চেয়েছিলেন। ছোট বাড়িটি নেহাৎ সাদাসিধে, একখানা বাংলো গোছের। আসবাবপত্রের বালাই বড় নাই, পর-পর কতগুলো ঘর আছে মাত্র। জানালাগুলোতে সার্সী নাই, খিল দিয়ে আটকাতে হয় জানলার পাল্লা। চওড়া বারান্দায় খড়ের ছাউনি, তাতে রোদের তেজটা মৃত্যু হয়ে ঢোকে।

ভদ্রমহিলারা ফেব্রুয়ারির প্রথমে এসে পৌঁছলেন। নিজেদের এমন ভাবে তৈরি করেছেন যে জগতের সঙ্গে প্রায় কোন সম্পর্কই নাই তাঁদের। বিবেকানন্দ প্রথম যখন আমেরিকায় যান তখনই এঁরা ছু'জন আচার্যের দেশটা একবার ঘুরে দেখবার মতলব করেন। কিন্তু স্বামীজি সাধ্যমত ওঁদের ঠেকিয়ে রেখেছেন। —'যদি দারিদ্র্য, দৈন্যদশা আর নোংরামি দেখতে চাও, ন্যাকড়া-পরা মানুষের মুখে ভগবানের কথা শুনতে চাও, কী ভাবে শুধু দেবতার মুখ চেয়ে তারা বেঁচে আছে দেখতে চাও, তাহলে হাজার বার এদেশে এসো। এ ছাড়া আর-কিছু চাও যদি তাহলে এসো না। আর একটি টিপ্পনীও শুনতে চাই না কারও মুখে, ওসব ঢের শুনেছি।' আচ্ছা, তাই-ই সই। চারটি বছর ধরে অক্লান্ত উৎসাহে তাঁরা সহযোগিতা করেছেন স্বামীজির কাজে, তার পর স্বামীজি নিজেই ওঁদের ভারতে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই বেলুড়-বাস যেন তাঁদের নিষ্ঠার আর একটি পুণ্য অর্ঘ্য।

স্বামীজি তখন গুরুভাইদের সঙ্গে নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়িতে থাকেন—বেলুড় থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ। রোদ উঠতেই প্রতিদিন সকালে ছুই মহিলার কাছে এসে স্বামীজি ঘণ্টা দুয়েক থেকে নানা উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে যেতেন। একদিন বললেন,—'আমাদের

আসরে যে আইরিশ মেয়েটি আসত তার কথা তোমাদের মনে আছে? সে এখানে এসেছে এদেশের সেবায় জীবন দেবে।'

'স্বামীজি, মেয়েটি এসে আমাদের কাছে থাকুক না! থাকবে?'

স্বামীজি একটু ভাবলেন। তিনি চেয়েছিলেন মার্গারেট তাঁর মায়ের কাছে থাকে, তাহলে হিন্দু পরিবারের সঙ্গে মিশে যেতে একটুও দেরি লাগবে না তার। কিন্তু মা দার্জিলিং চলে যাওয়ায় তা এখন আর সম্ভব নয়। কাজেই শিষ্যাদের প্রস্তাবটা তিনি মেনে নিলেন। মিস ম্যাকলয়েড তখনই একজন চাকরকে কলকাতা পাঠালেন মার্গারেটকে আমন্ত্রণ জানিয়ে। পরদিন মার্গারেট এলেন। মশার কামড়ে মুখখানা যেন চেনা যায় না, কিন্তু চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল। সারা অঙ্গে যেন বিজয়-গর্ব ঝলমল্ করছে।

মিস ম্যাকলয়েডকে আবার দেখতে পেয়ে মার্গারেট সত্যিই আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মিস ম্যাকলয়েডও ভারী খুশি, তাড়াতাড়ি সারা বুলের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সারা ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। ত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, তখন থেকেই অগাধ টাকার মালিক, মাথার উপরেও কেউ নাই। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাঁকে ডাকত 'ধীরা মাতা'। তাঁর বয়স এখন আট-চল্লিশ। দেখতে এখনও খুব সুন্দরী, স্বভাবটি শান্ত, আত্ম-সংবৃত। পরকে চালিয়ে নেবার মত আত্মবিশ্বাসের অভাব হত না তাঁর কখনও; একটা চৌকশ বুদ্ধির ঝলমলানিই ছিল তাঁর স্বভাবের প্রধান আকর্ষণ। যেমন অবস্থাতেই পড়ুন না, তাঁর কর্তৃত্ব ছিল অব্যাহত। নিজে ছিলেন ওস্তাদ গাইয়ে, কুড়ি বছর বয়সে বিখ্যাত নরওয়েজিয়ান্ বেহালাবাদক ওলি বুলকে ভালবাসলেন, তাঁর সঙ্গে চল্লিশ বছরের ছোট-বড়। এর পর দশ বছর ধরে স্বামীর যশের অংশীদার ছিলেন সারা। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র তাঁরা ঘুরতেন, ইউরোপের সকল রাজসভায় তাঁদের কলানৈপুণ্য দেখিয়ে ফিরতেন। স্বভাবটা অমায়িক হলেও, কর্তৃত্বের ভাবটা উনি লুকোতে পারতেন না, আচার্য বলে যাঁকে বরণ করেছেন সেই বিবেকানন্দের কাছেও না। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, বৈষয়িক ব্যাপারে স্বামীজি ওয়াকিফ ছিলেন না। এই সুযোগে ধীরা মাতা ছেলের মত তাঁকে উপদেশ দিতেন—'সাংসারিক বিষয়ে আমাকে আপনার মায়ের আসন দিতে হবে। সামান্য একটা তেরিজ বোঝবারও ক্ষমতা আপনার নাই—এ বিষয়ে আপনি এখনও নেহাৎ ছেলেমানুষ।'

মার্গারেট আসায় ভারতে বিবেকানন্দের বিদেশী শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা ছয় পূর্ণ হল। এঁরা হলেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার, হেনরিয়েটা মূলার, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলয়েড আর মার্গারেট। গুডউইন তখন মাদ্রাজে। এঁদের একত্র সম্মেলনের ব্যাপারটাকে উৎসবের রূপ দেবার জন্য স্বামীজি সকলকে বেলুড়ে ডেকে পাঠালেন। এমনি সব ঘরোয়া প্রীতিভোজেই কুশলী নেতার মত তিনি সবচেয়ে গোঁড়া সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদেরও বিদেশীদের সঙ্গে পংক্তি-ভোজনে বসাতেন, আর এমন সব আলোচনার অবতারণা করতেন যাতে উভয় পক্ষেরই সমান আগ্রহ। তার ফলে একটা সহানুভূতির সজীব বোধ সবার মনে ছড়িয়ে পড়ত।

নদীর ধারে সুন্দর একটা জায়গায় কাল আমরা ওঁর অতিথি হয়ে বনভোজন করলাম, মার্গারেট তাঁর এক বন্ধুকে লেখেন: 'চার ধারের গাছপালাগুলো খুব খুঁটিয়ে না দেখলে জায়গাটা উইম্বলডনেরই এক টুকরো বলে মনে হবে। শেষে হয়তো খেয়াল হবে যে-সব গাছের তলায় বসেছ সেগুলো রূপোলী বার্চ নাট কি ওক নয়—, ফুলে-ছাওয়া বাবলা আর আম! সামনে এখানে-ওখানে দু'-একটা তাল গাছ, ফুলন্ত লতার ঝাড় আর দড়ার মত পাকানো গাছের গুঁড়ি—তোমার ব্র্যাকেনও নয়, ব্রুবেলও নয়।'

স্বামীজি তখন তাঁর পরিকল্পনা রচনা করছেন আর দিনকার দিন তাই নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। মিসেস বুল ভবিষ্যৎ মঠ আর সঙ্কল্পিত মন্দিরের সমস্ত খরচা দেবেন বলেছেন। এ-বিষয়ে লণ্ডনের শিষ্যদের সব খবর খুঁটিয়ে জানাবেন বলে মার্গারেট কথা দিয়েছিলেন। তাই সেদিনকার আলোচনার একটা চুম্বক পাঠালেন এই বলে, '…তার পর এখানকার কাজের কথা। স্বামীজির প্রবল আগ্রহ সন্ন্যাসি-চালিত একটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করা। সেখানে শুধু এদেশে নয় ওদেশেও জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশ্যে তরুণদের তৈরি করা হবে। মনে হয় ঠিক এই কথাটাই আমরা ধরতে পারিনি। সব ধরনের অধ্যাত্ম সাধনাই যে বেদান্তের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমার এ-কথায় তোমরাও সায় দেবে নিশ্চয়। কেবল এইটে আমাদের কারও জানা ছিল না যে, গত তিন হাজার বছর ধরে এক শ্রেণীর লোক জেনে-শুনে এ আলোকে তাদের এক-চেটিয়া করে রেখেছে।—তার বিতরণ বা প্রসারের চেষ্টা দূরে থাক, তারা বিদ্বেষবশে শুধু ভিন্ন জাতিকে নয়, স্বজাতির নিম্ন শ্রেণীকে পর্যন্ত তা' হতে বঞ্চিত করেছে। স্বামীজি এই অন্যায়ের প্রতিকার করবার জন্যই যা কিছু করছেন। আর এই জন্যই ইংল্যাণ্ডের তরফ থেকে আমাদেরও অর্থসাহায্যের একটা ব্যবস্থা করা উচিত। বেশ ভাল করেই জান, স্বামীজির প্রচেষ্টার গোড়ার কথাটা হচ্ছে শিক্ষাবিস্তার। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করা হবে এ-ও একটা দিক। বুঝতেই পারছ, স্বামীজির কাজের এই দিকটা কারও-কারও মনে বেশী দাগ কাটবে।'—(নেল হ্যামণ্ডকে লেখা চিঠি, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৮)

কিন্তু উদার বুদ্ধিতে স্বামীজি যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, তাকে একটা নতুনতর সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির গোড়াপত্তন বলে কেউ না ভাবে, তার জন্য যত দূর সম্ভব সাবধান হতে হবে। লণ্ডনে স্বামীজি আচার্যের আসন পেয়েছিলেন এই জন্য যে, অবাঙ্-মনসগোচর 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'এর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তাঁর ছিল। সে-'শান্তম্' কোনও জাতি বা ধর্মের একচেটিয়া নয়। একাধারে তিনি সেখানে ছিলেন তপস্বী, যুক্তিবাদী এবং সন্ন্যাসী, কিন্তু লণ্ডনে তাঁর যেটুকু প্রকাশ পেয়েছিল সে শুধু একটা দিক;—আর একটা দিক প্রকাশ পাবে ভারতে যে বিবেকানন্দ, তাঁর কাজ হতে। কাজেই তাঁর কথা লিখতে মার্গারেটকে বেশ মাথা ঘামাতে হত। এদেশে এসে স্বামীজি কথা বলছেন সন্ন্যাসীর ভূমিকা থেকে। তাঁকে বুঝতে গিয়ে মার্গারেট খেই হারিয়ে ফেলেন, কেন না, এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সবখানিই তিনি তখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। তাই যা শুনেছি পাছে সেটা বিকৃত করে ফেলি, এই ভয়ে মার্গারেট নিজের মনে অনেক ভাঙাগড়া করে তবে একটা কথা বলতেন। প্রথমেই ধরা যাক সাম্প্রদায়িকতা—এই জিনিষটায় আমাদের ভূতের ভয়। এ বিষয়ে আমরা সবাই একমত যে, "একটা নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করার ঝাতিকটা এড়াতে হবে।"

একটা ছাপ মেরে দল তৈরি করা বা কোন দলের ছাপ নেওয়া—এ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। এখন কিন্তু ব্যাপারটা একা ভেবে দেখবার সময় পেয়েছি। ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, "সম্প্রদায়" মানে একটা সংঘ, যাতে করে এক দল লোক আর এক দল থেকে নিজেদের পৃথক্ করে সাবধানে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে। যারা ঐক্যের পোষকতা না করে সম্প্রদায় গড়ে, অন্য সম্প্রদায় তাদের প্রতিপক্ষ। কিন্তু যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিজেদের গোষ্ঠী বা সমাজ না ছেড়ে কোনও একটা বিশেষ বিষয়ের চর্চা বা কোনও একটা মত কি আন্দোলন সমর্থন করবার জন্য দল বাঁধে, সেটা নিশ্চয়ই একটা ধর্ম-সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়ায় না। আমাদের দেশে যেমন উপকথা সংগ্রহের সমিতি, হাসপাতালের রোগীদের রক্ষণাবেক্ষণের সমিতি বা শিশু-নির্যাতন নিবারণের সমিতি আছে—এ-ও তাই। সেই সঙ্গে সংঘের উদ্দেশ্য আর কাজ-কর্মের পরিষ্কার নির্দেশ থাকায়, সদস্যদের সহযোগিতার ক্ষমতাটা এলিয়ে না পড়ে আরও দানা বাঁধে, কর্ম ও চিন্তার পরিসরও বাড়ে। কথাটা মানছ তো? ভাববার একটা সূত্র পেয়েছি বলে "সম্প্রদায়" কথাটার উপরে যে বিদ্বেষ সেটা এখন জুজুর ভয় বলেই মনে করি। রাশিয়ানদের বা স্কারলেট সিভার নিয়ে আমাদের যে ভয় সে যেমন মনের দুর্বলতা ছাড়া কিছু নয়—'নতুন একটা দল হবে' বলে ভয়টাও সেই রকম···।

"ব্যাপারটার আরেকটা দিকও আছে। এ-অন্দোলনে অধ্যাত্ম-সাধনার ভিতর দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি আরও সংহত হবে। মিসেস বুল বলেন, থিয়সফিক্যাল সোসাইটি রাশিয়ান গবর্ণমেন্টের ধামাধরা। সাম্প্রতিক হাঙ্গামার সুযোগে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সদস্যরা জনসাধারণকে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে পরামর্শ দিয়েছে, সত্যি কথা। কিন্তু এদিকে হিন্দুধর্মের এই অভ্যুদয়ের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে আর লণ্ডনে। হাতে-কলমে যারা কাজ করছে তারা আবার ইংল্যাণ্ডেরই একান্ত অনুরাগী। স্বামীজি যত দিন ভারতে আছেন, অন্ততঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে এতটুকু বিদ্রোহের আভাসও পাওয়া যাবে না। তাই মনে হয়—যারা পাদ্রী পাঠায় এদেশে, তারা ছাড়াও ইংল্যাণ্ডের সকল সম্প্রদায়ের কাছেই এ নিয়ে আবেদন করার মত সার্বজনীনত্ব এ-ব্যাপারটার আছে। আর যখন মেয়েদের নিয়ে কাজ শুরু করব, তখন সমস্ত মহিলা-নেত্রীরই সহানুভূতি পাব আশা করি। এমন কাজে কী যে আনন্দ!'

এই হল মার্গারেটের প্রথম নজরের ফল।

নবম অধ্যায়

প্রস্তুতি

স্বামী বিবেকানন্দ ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন যখন, সারা দিনের মধ্যে সেই সময়টুকুই তিন বন্ধুর কাছে সবচেয়ে সার্থক মনে হয়। সাধারণতঃ উনি একাই আসতেন—কখনও এক দল তরুণ ব্রহ্মচারী সঙ্গে আসত। যে দু'মাস তিনি এমনি শিক্ষা-উপদেশ দিয়েছিলেন (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৮৯৮), সেই দুটি মাস তাঁর অনুগামীদের মনে তুলেছিল বাঁধ-ভাঙা ভাবাবেশের ঢেউ।

তিনি এলেই যেন জায়গাটার আবহাওয়াটা বদলে যায়। মেয়েরা বসে তাঁকে ঘিরে, ব্রহ্মচারীরা বসে পায়ের তলায়। তার পর অন্তর উজাড় করে আপনার সবখানি তিনি ঢেলে দেন—নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও বোধ হয় গলে যায় তাঁর বাণীর বিভবে। ভারতবর্ষকে তিনি ভালবাসেন—ভালবাসেন এদেশের সমস্ত সন্তাকে। গাছ তো মাটিকে চেনে না, তবু সহস্র শিকড়ে আঁকড়ে থাকে তার অণু-পরমাণু। তেমনি সহজ তাঁর ভারত-প্রেম। দেশবাসীর গভীর ধর্মপিপাসা তাঁর গর্বের জিনিস, সেই সঙ্গে তিনি চান ভারতবাসীকে কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করতে। ভারতের বিরাট সম্ভাবনাকে তারা মর্মে-মর্মে অনুভব করুক। দেশকে জাগানোর এই কাজে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চান তিনি তাঁর বন্ধু আর শিষ্যদের। সর্বরকমে এক নতুন ভারতকে সৃষ্টি করতে চাইছেন বিবেকানন্দ। সংক্ষেপে তাঁর বাণী এই—'মানুষের সেবা-পূজাই একমাত্র উপাসনা যার দ্বারা সাধক সাধনা সাধ্য-বস্তুর সাযুজ্য ঘটে।···খাঁটি দেশপ্রেমিকের নিষ্ঠা থাকা চাই আমাদের। এই যে হাজার জীব না খেয়ে মরছে, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এ দেখে কি হৃদয় কেঁপে ওঠে না? প্রত্যেককে বুঝিয়ে দাও যে, সে ছোট নয়,, সে ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেককে এ সত্য জানবার শেখবার সুযোগ দাও। জাগিয়ে তোল দেশবাসীকে! তাদের ডেকে বল, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, ঝাঁপ দাও কাজে! কাজ চাই কাজ!'

স্বামীজি বেশ জানতেন সবাই তাঁর দিকে চেয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি যেমন আপনাকে অভেদ ভেবে গুরুর কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তেমনি আত্মোৎসর্গে উন্মুখ মুষ্টিমেয় এক দল সন্ন্যাসী তাঁর একান্ত আপন হয়েছিল। এদের নিয়ে অমানুষিক সাধনা করে গেছেন তিনি। এদের ভাবালুতা আর ধর্মপ্রাণতাকে তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন জীবন্ত কর্মযোগে। ফলে আপাত-বিরুদ্ধ নানা মতবাদও এদের জ্বলন্ত উৎসাহকে না নিবিয়ে দিয়ে বরং উস্কে দিত। তাঁর নেতৃত্বে যে-সব কর্মী কাজ করত তাদের সম্বন্ধে কোন কঠোর নিয়ম জারি করতেন না তিনি। এমন কি তিনি বলতেন, 'বেদ, কোরাণ, পুরাণ শাস্ত্র-টাস্ত্র এখন রেখে দে কিছু দিন। মানুষ হচ্ছে জ্যান্ত ঠাকুর, প্রেম আর সেবা দিয়ে তাঁর পূজা চালা। ভেদবুদ্ধিই হল বন্ধন আর অভেদ জ্ঞানেই মুক্তি। আমাদের কাজে সকল ধর্মের ছেলেদেরই আমরা নেব—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বা সে যাই হোক—তবে আস্তে-আস্তে, সইয়ে-সইয়ে। এক তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাটা তোদের আলাদা-আলাদা করতে হবে। কিন্তু সবাইকে শেখাবি যেন তারা সচ্চরিত্র, সাহসী হয় আর পরহিতে রত থাকে। একেই বলে ধর্ম···।'—(১০ই অক্টোবর, '৯৭, মুরী হতে লেখা)

কারও সমালোচনা হজম করে যেতেন না বিবেকানন্দ। যে-কাজের পত্তন তিনি করছিলেন তাঁর দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহান্। এদেশে তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের যে বিজাতীয় ম্লেচ্ছ হিসাবে অস্পৃশ্য হয়ে সকল রকম লাঞ্ছনা সইতে হবে তা তিনি জানতেন। তাই তিনি নিজে তাদের নানা রকম অধিকার দিয়েছিলেন—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে যাওয়া, সেখানে বসে পূজার্চনা করা ইত্যাদি। এগুলো আস্তে-আস্তে সবাইকে মেনে নিতে হয়েছিল, এমনি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব। তিনি পারিয়াদের ডেকে এনে একসঙ্গে বসে খেতেন। তাঁর কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হত মানুষের জয়গান—ভাবের জগৎ হতে বাস্তবে নেমে এসে হাজার বছরের অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতাকে তিনি নিত্যিকার জীবনযাত্রায় ফুটিয়ে তুলতেন। 'সবল বা দুর্বল, ব্রাহ্মণ কি পারিয়া ব্রহ্মোপাসনা সবাই

করতে পারে, সে অধিকার সবার আছে', বলতেন তিনি। 'তাঁর যে-রূপ ফোটে তোমার কাছে, তারই উপাসনা কর। সাধনা মানে বাস্তব [illegible]—আত্মসত্তার উপলব্ধিই ধর্ম।' মার্গারেট এর ব্যাখ্যা করে বলতেন, 'তিনি মনে করতেন, জাগ্রত চেতনার প্রথম লক্ষণ হল পর-পর কতকগুলো বিবিক্ত অথচ সুস্পষ্ট উপলব্ধি, সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোনও সঙ্গতি প্রথম থাকে না। কিন্তু তাতেই সাধকের মনে, নিজের ভাবানুযায়ী সেগুলোকে ক্রমে সাজিয়ে নেবার একটা তাগিদ আসে।'

স্বামী বিবেকানন্দ অকৃত্রিম মমতা নিয়েই এই মেয়ে তিনটির সঙ্গে কথা কইতেন—বিশেষ করে মার্গারেটের সঙ্গে, কারণ সে যে তাঁর সঙ্গে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করতে এসেছে। 'দীন-দরিদ্রের অন্তরের সম্পদকে গ্রহণ করবার মত প্রশস্ত কর হৃদয়কে। তোমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেখলে তারা ভাববে যেন দেবতা এসেছেন ঘরে। ক্ষুধায় জর্জর দীনহীন কাঙাল ওরা, মানুষের অধিকার হতে বঞ্চিত। কিন্তু ওরাই পরমার্থকে এনে দেবে তোমাদের হাতের মুঠোয়, কেন না, তোমাদের মাঝেই তাদের পুজার ঠাকুরকে তারা দেখতে পাবে। এর বিনিময়ে কী তোমরা দেবে তাদের?' একদিন মিস ম্যাকলয়েড শুধোলেন, 'স্বামীজি, কী করে আপনার সব চাইতে বেশী সেবায় লাগব?' স্বামীজি বললেন, 'ভারতকে ভালবেসে তার সেবা করে। এদেশের অন্তর হতে নিরন্তর প্রার্থনা উৎসারিত হচ্ছে দ্যুলোকের পানে। পুজা করতে শেখ এদেশকে।'

ভারতের যথার্থ রূপকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য স্বামীজির পক্ষে যা দেবার তা তিনি দিয়ে গেছেন। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে শিষ্যদের গঠন করতে চাইতেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যে প্রেমের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তারই দায় নিয়ে দীন-দরিদ্রের সেবায় সহস্র নরক-যন্ত্রণা সইতেও যে তিনি উন্মুখ ছিলেন! শিষ্যদের কাছে নিজের পরিব্রাজক জীবনের কথা বলতেন, কী সব দিন গেছে তখন! ঈশ্বর-প্রেমে উন্মাদ হয়ে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত, প্রখর রৌদ্রে হয়তো শরীর পুড়ে গেছে, মরুর তাপ বা পাহাড়ের কনকনে হাওয়া কিছুরই বোধ নাই, বিদ্রোহী শরীর ভেঙে পড়ছে দিনে-দিনে, কে তার খেয়াল রাখে!

কোনও কোনও দিন সকালে ক্লান্ত থাকার দরুণ স্বামীজি এঁদের কুটীরে আসতে পারতেন না, তাঁর বদলে অন্য কোনও একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী আসতেন। তিনটি মহিলা এই সুযোগে স্বামীজির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যত রকমে পারেন খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতেন। তরুণ বয়সে কি স্বামীজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল? পরিব্রাজক কালে কি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন? সময় বুঝে মার্গারেট এক সময় ধরে বসতেন, 'স্বামীজি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছিলেন তখনকার কথা কিছু বলুন।' হয়তো সন্ন্যাসী তাঁদের দক্ষিণেশ্বর আর কাশীপুরের দিনগুলোর কথা বলতে লাগলেন—ভক্তি-বিশ্বাসের আলোয় ঝলমল কী আশ্চর্য দিনই গেছে সে সব! শেষে বলেন, 'সেদিনের জের যে আজও চলছে, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ নরেনের কাছে। এখন ঠাকুরের ভাব ওরই মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে।'

বিবেকানন্দ যখন বিশেষ করে তাঁকেই উপদেশ দিতেন তখন মার্গারেটের সবচেয়ে বেশী আনন্দ হত। তাঁর কথামৃত অধীর আগ্রহে পান করতেন মার্গারেট, কিন্তু স্বামীজির যাবার সময় হলেই একটা অবোলা ব্যথায় সব যেন ডুবে যেত। বলতে ইচ্ছা হত, 'স্বামীজি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যাচ্ছে—যে স্কুলের কাজের জন্য আমি এসেছি তার বিষয়ে তো আপনি একটা কথাও বলেন না। কেন বলেন না?' একেক সময় মার্গারেটও তাঁর সঙ্গ নিতেন। দু'পাশে ফণিমনসার ঝোপ, স্বামীজি চলছেন হন্‌হন্ করে, মনে-মনে অধৈর্য হয়েও মুখ ফুটে কিছু বলার রাস্তা খুঁজে পান না মার্গারেট। যদি কখনও কথা তোলার চেষ্টা করেছেন, স্বামীজি বাধা দিয়ে, সকালের আলোয় ঝলমল গঙ্গার তীর দেখিয়ে বলেছেন, 'এ-আলো প্রাণ ভরে শুষে নাও, চোখ মেলে চেয়ে দেখ চার দিকে, সবই কী সুন্দর! কোনও পরিকল্পনা নয়, ও তো তোমার কাজ না।' কোনও-কোনও দিন নিজের ভাবনায় ডুবে থাকেন তিনি, তখন তার নাগাল পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। মার্গারেট ফিরে আসেন। যে-অনিশ্চয়তার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন, সে যেন তাঁর মনকে একেবারে দিশেহারা করে দেয়। মিস ম্যাকলয়েডের কাছে নালিশ জানান, 'এখানে এত দিন ধরে কী করছি বসে-বসে? স্বামীজি কেন কোন কাজের কথা বলেন না?'

ধর্মাচার্যদের স্বভাবে ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়া জিনিসটা আদৌ থাকে না, স্বামীজিরও ছিল না। তিনি অপেক্ষায় ছিলেন কত দিনে শিষ্যার মনটি ফুটে উঠবে, নিজেকে কেমন করে তৈরি করতে হয় তার রহস্যটুকু ও নিজেই বুঝবে। উত্তরায়ণের যে উদার পথে ওকে নিয়ে যেতে চান তিনি, ওর কাজের ঝোঁক আর বুদ্ধির দাবি যে সে-পথের দুস্তর বাধা সেটাই তো এখনও ও বোঝেনি। সার্থকতার আশায়, সুচারু কর্তব্যপালনের কামনায় অন্ধ হয়ে, ভারতবর্ষ প্রথমেই তাঁকে যে শিক্ষা দিতে চায় তা মার্গারেট ধরতে পারেননি: বর্তমানকে একমাত্র সত্য বলে জানতে হবে, 'সর্বারম্ভ পরিত্যাগী' হয়ে বুঝতে হবে নিষ্কাম কর্মের রহস্য। স্বামীজি চুপ করেই থাকতেন, কারণ কথা বলা এখন বৃথা। ও আপনিই ক্রমে বুঝুক যে, ওর ওই প্রগতিবাদী শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা ভারতের পক্ষে নেহাৎই অনাবশ্যক, স্বামীজিরও এ-বিষয়ে বিশেষ কোনও আগ্রহ নাই। উনি যে মার্গারেটকে ভারতের কাজে চেয়েছিলেন, সে ওর সৃষ্টি-প্রতিভা, চরিত্রের দৃঢ়তা আর ন্যায়নিষ্ঠার জন্য। তিনি জানতেন, একদিন ও কাজের পিছনে যে বিরাট আদর্শ তার সন্ধান পাবেই, শুরুতে যে আয়োজনের অভাব সেটা আর চোখেই ঠেকবে না তখন। যখন পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের ভাবটি অন্তরে জাগে, তখন আপনি কাজ জমে ওঠে, আপনিই তা সার্থক হয়।

ভারতের প্রতিটি ভাবনার একটা রহস্যার্থ আছে। রূপক ভেবে সেই মর্মকথাটি যে না বোঝে, ভারত-ভারতীর সত্যমূর্তি সে জীবনে কখনও দেখতে পায় না। স্বামীজি সেই ধ্যানের ভারতকে তুলে ধরলেন মার্গারেটের সামনে আর মার্গারেট ধীরে-ধীরে বদলে যেতে লাগলেন স্বামীজির অমোঘ শক্তির প্রভাবে। হিন্দু নারীর শিক্ষার ভার নিতে হলে, স্বভাবের যত কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব ছেড়ে মার্গারেটকেও যে হতে হবে হিন্দু মেয়ে। জন্মসূত্রে হিন্দুর মেয়ে যা-কিছু সংস্কার আর ভাব পায় মার্গারেটকে তা আয়ত্ত করতে হবে সজ্ঞানে। বুদ্ধির দিক দিয়ে—সে-সব নীতি নির্দেশ বা সংস্কার মেনে চলতে মার্গারেট অবশ্যই রাজী ছিলেন কিন্তু স্বামীজির প্রত্যাশা আরও বেশী। তাই—সকালের আলাপ-আলোচনার কালে—ভারতের

পুণ্য ইতিহাসে যে-সব মহীয়সী মহিলার কথা আছে, সেই সীতা মীরাবাই আর তাঁদেরই সোদরাদের জীবনকাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠত স্বামীজির মুখে। এঁদের চরিত্র যুগ-যুগ ধরে এদেশের মেয়েদের প্রভাবিত করে এসেছে। মার্গারেটের উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাঁর একটুও আস্থা নাই, ওতে যে কেবল অসংযত আবেগেরই পরিচয় মেলে। স্বামীজি বোঝাতে চাইতেন ওর আদর্শ হবে শুদ্ধান্তবাসিনী, সংযত-চরিতা, শান্ত, নম্র, হিন্দু মেয়ে। তলিয়ে দেখলে, এই হিন্দু মেয়ের মনোভাব আয়ত্ত করার অর্থ এ নয় যে জোর করে আপন চরিত্রের একটা বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এর অর্থ, মনের গড়নটাই বদলে ফেলতে হবে, জীবনটাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখে সেই অনুসারে ধীরে-ধীরে জীর্ণ করতে হবে হিন্দু মেয়ের ভাব। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিতে প্রশান্ত ধ্যানচিন্তিতায় আর আত্মোপলব্ধির স্থির মহিমায় কেমন করে নিজেকে প্রকাশ করতে হয় তা শিখতে হবে মার্গারেটকে। নিজের প্রতিভায় তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাই হতাশ হয়ে পড়েননি তিনি।

কিন্তু এ-ভূমিতে পৌঁছবার আগে গুরু-শিষ্যের মধ্যে তুমুল একটা দ্বন্দ্বের অপেক্ষা ছিল। মার্গারেটের যুক্তি-তর্কের অস্ত্রগুলো তছনছ করে দেওয়াই স্বামীজির উদ্দেশ্য ছিল—অথচ এই মানসিক বিক্ষোভের মধ্যে ওর ব্যক্তিত্ব যেন নষ্ট না হয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে ও প্রতিরোধ করুক স্বামীজির প্রভাব, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। ওর বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে এক মুহূর্তের জন্যও খাটো করতে চাইতেন না তিনি। যে-আন্তরিকতা নিয়ে মার্গারেট ভাবতে এসেছেন তার মূলে তো ওই বুদ্ধিরই প্রেরণা; আর—এখনও ঐ অপ্রতিহত মেধার শক্তিতেই আপনা-আপনি ঘটবে তাঁর স্বভাবের রূপান্তর। নিজের জোরে উনি নিজে বদলে যাবেন, শুধু এই শর্তের স্বামীজি তাঁকে বৈরাগ্য আর অনাসক্তির মন্ত্র দিতে রাজী ছিলেন। এতে করে তাঁর আত্ম-প্রতিষ্ঠা হবে অচল অটল। যখনই বুঝতেন, মার্গারেটের মনে নতুন অধ্যাত্ম-বুদ্ধির উন্মেষটা বেশ পাকা রকমের হয়েছে, তখনই হঠাৎ আর একটা সিদ্ধান্ত হাজির করে ওঁর সেই নবার্জিত ধারণাটা গুঁড়িয়ে দিতেন,—তার পর নিজের ইচ্ছামত ওঁকে আর এক পথে এগিয়ে দিতেন। এমনি করে ভারতের অন্তরঙ্গ ভাবনার সকল দিকের সঙ্গেই মার্গারেটকে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে চাইতেন স্বামীজি।

শিষ্যাকে যে-পথে চালিয়ে নিতে হবে আচার্য হিসাবে তার সব খবরই তিনি জানতেন। কিন্তু বাইরে থেকে মাঝে-মাঝে তাঁকে বড় নিষ্ঠুর মনে হত। বিশেষ করে সব অভ্যাস ছেড়ে পূর্বজীবনের সব মুছে ফেলে মার্গারেটকে পুরোপুরি কায়িক সংযমের বিধান মেনে চলতে হবে এমন দাবি যখন করতেন, তখন তো আরও। এই যেমন, স্বামীজি বললেন, গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা যে-ভাবে জীবন কাটায় মার্গারেটকে তেমনি ভাবে চলতে হবে। অবশ্য খুব অল্প সময়ের জন্য এমনি চলা, কিন্তু তার মধ্যে কোন কাটছাঁট থাকবে না, একেবারে পুরাদস্তুর সব মানতে হবে। এক-বস্ত্রে থাকতে হবে, মাটিতে শুতে হবে, হাত দিয়ে খেতে হবে—এক কথায় ব্রহ্মচারিণী মেয়েদের উপরে এদেশে যত রকম বিধি-নিষেধ চাপানো হয়, যত দিন সেগুলোর অর্থ আর গুরুত্ব বুঝতে না পারবে তত দিন মার্গারেটকে সেগুলো মানতে হবে। এর পরে স্বামীজি শেখালেন কায়মনোবাক্যে প্রশান্ত হওয়া যায় কী করে। অসঙ্গ আর পরিপূর্ণ স্তব্ধতা চিত্তে ঘনিয়ে এলেই আত্মার নির্মাণশক্তির সন্ধান মেলে। বহু বৎসর পরে দেখি, মার্গারেট নির্জনে উপবাস-সংযত চিত্তে উপাসনা করছেন, তাঁর নির্মল অন্তর্দৃষ্টি আর অন্তরারামের ভাস্বরতা নিঃশব্দে ছুঁ'য়ে পড়ছে কতজনার 'পরে।

মার্গারেটের সমস্ত মন আচার্যের শাসন মেনে দীনতায় উঠুক, আবার তারই ফলে স্বাধীন কর্মের প্রেরণায় তা উদ্দীপ্ত হ'ক, এমনি ভাবে ওঁর চিন্তা-ভাবনাগুলোকে ঢালাই করতে চেয়েছিলেন স্বামীজি। ব্যাপারটা বোঝা একটু শক্ত, কেন না দুটো ভাবের অসঙ্গতিটা অমনিতেই চোখে ঠেকে। উত্তরকালের দেশনেত্রী মার্গারেটকে স্বামীজি যেন আগেভাগেই কল্পনায় দেখতে পেতেন। গুরুভাইদের এমন কথাও বলে রেখেছিলেন, 'ওর স্বাধীনতায় তোমরা কেউ কখনও হাত দিও না। আমি যে ওকে কী দিয়ে গেলাম তোমরা তার কী জান?' এইখানে গুরু-শিষ্যা দু'জনেরই শক্তি-যোগের মাঝে একটা ভারসাম্য ছিল। সমান আগ্রহে তাঁরা পরস্পরের সহযোগিতা চাইতেন, দু'জনেরই দু'জনকে সমান দরকার! লক্ষ্যের পানে চলতে গিয়ে যে-সামর্থ্য আর আত্মবিশ্বাসটা গোড়াতেই দরকার, স্বামীজি মার্গারেটকে সেইটি যুগিয়ে দিয়েছিলেন। তার পর অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্রটা ছিঁড়ে তিনি সরে দাঁড়ালেন—মার্গারেটের জন্য রেখে গেলেন ভয়াবহ শূন্যতা যার মধ্যে আঁকড়ে ধরবার কিছুই রইল না। এই বুঝি সেই হৃদয়গ্রন্থি, সাধনশাস্ত্রে নানা ভাবে যার কথা শুনি। নিশীথের গাঢ় তমিস্রাতেই শক্তি-সাধকের আত্মবলির লগ্ন, তার পর চেতনা উন্মেষিত হয় নবজীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে। কলায়-কলায় তার উপচয়, পবমান সোমের আনন্দরসে তার পুষ্টি, তার স্থিতি। আচমকা গুরু এসে তখন হানা দেন, ভেঙে পড়ে যত্নে-রচা আত্মরতির যত আয়োজন। মহাকাশের স্বারাজ্য পেয়েছে যে-সুপর্ণী, এ-যেন তারই মাঝে খাঁচা ভেঙে তাকে মুক্তি দেওয়া।

মার্গারেটের মন যখন আশঙ্কায় দুরু-দুরু করে, হয়তো স্খলন ঘটে মুহূর্তের তরে, তখনই সে শুনতে পায় গুরুর অভয় বাণী—'সামনে তাকাও।—ঐ যে আলো! দেখ, কী স্বচ্ছ কী সহজ সব।'

প্রথম-প্রথম, বিরুদ্ধ ভাবের বিক্ষোভে মার্গারেট যেন কোন গহনে আপনাকে হারিয়ে ফেলতেন, বার বার চাইতেন লণ্ডনের সেই স্বামীজির স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে। সেই গম্ভীর যতাত্মা স্নিগ্ধ-স্বভাব পুরুষের সঙ্গে এঁর কতই না তফাৎ! এখানে ওঁকে কারবার করতে হচ্ছে এক কর্তৃত্ব-কঠোর গুরুর সঙ্গে, তাঁর জীবনের পট-ভূমিকা মার্গারেটের দৃষ্টির বাইরে। অথচ এমন একটা লীলোচ্ছলতা তাঁর মাঝে যে, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বোঝা ভার। যা কিছু কঠিন বা মার্গারেটের কাছে জুগুপ্সিত, তাকেও যে ওর খাতিরে এতটুকু সহজ করে দেননি তিনি, তার জন্য মার্গারেট তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আচার্য যদি সত্যকে বিকৃত করেন কারও মুখ চেয়ে, কেমন আচার্য তিনি! অধ্যাত্ম-সাধনার প্রতি পর্বে প্রথমে যতখানি নত হয়েছেন মার্গারেট, ঠিক ততখানি বিরোধিতাও করেছেন প্রত্যেকটা বিষয়ে। কার্যের 'পরে নয়, কারণের 'পরেই তাঁর আস্থা; এই আস্থাকে অটুট রাখবার ইচ্ছাও ছিল তাঁর অদম্য। আর স্বামীজিও তেমনি। হয়তো বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের আলোচনা হচ্ছে, তার মধ্যে এমন কথা তুললেন যা মার্গারেটের মতে 'বর্বরতম কুসংস্কার'। অথচ স্বামীজি

বেপরোয়া। সাজ-পোষাকেও তেমনি বেপরোয়া—কখন যে তিনি সিল্কের পোষাক করে রাজবেশে এসে হাজির হবেন, আর কখন যে সাদা-মাঠা একখানা গেরুয়া গায়ে চড়াবেন, তার কোনও ঠিক ছিল না। তাঁর কথাবার্তার সুরও বদলাত ক্ষণে-ক্ষণে। শুধু একটা জিনিস নিশ্চিত—তাঁর আসার সঙ্গে-সঙ্গে একটা অকৃত্রিম প্রীতির হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ত চার দিকে, তাঁর গভীর ভালবাসার ছোঁয়া লাগত সবার মনে।

একদিন স্বামীজিকে মার্গারেট এক অদ্ভুত অবস্থায় দেখলেন। সে-দৃশ্য ভোলবার নয়—দেখে আত্মহারা হয়ে যেতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন নবগোপাল বাবু, তাঁর নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন। তাঁর বাড়ির সামনের ঘটনা। ফেব্রুয়ারি মাসের এক পূর্ণিমা রাত্রি সেদিন।

তিনখানা বড় নৌকায় মশাল জ্বালিয়ে গঙ্গা বেয়ে সন্ন্যাসীরা এসেছেন। তীরে লোকের ভিড়, তাঁরা নামতেই মহাকলরবে শোভাযাত্রা শুরু হল, কাঁসর-খোল-করতাল বাজতে লাগল। মার্গারেট দেখলেন, স্বামীজি ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত, একেবারে আত্মহারা হয়ে পাগলের মত উদ্দণ্ড নৃত্য করছেন। গলায় একরাশ ফুলের মালার সঙ্গে একটি খোল ঝুলছে, গান ধরেছেন—'দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে এসেছে আলো করে, কে রে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীর দ্বারে', সঙ্গে সবাই যোগ দিয়েছে। দর্শকদেরও যেন একটা উদ্দামতার ছোঁয়াচ লেগেছে। বাজি ফুটছে নানা রকম, নৃত্যের তালে-তালে খোল বাজছে। শোভাযাত্রা নবগোপাল বাবুর বাড়ীর সামনে আসতেই তুমুল শঙ্খধ্বনিতে রাতের জ্যোৎস্না যেন আলোড়িত হয়ে উঠল। স্বামীজির মাথায় বিভূতি লেপা, ধূলায় লুটিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন। তার পর শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপনা করেন যথামন্ত্রে।

মার্গারেট নিজেকে শুধান, 'এ কী উদ্দাম আনন্দ! এ কি পাগলামি না ভক্তের দৈন্য, না ঈশ্বর-প্রেম—কী এ?'

স্বামীজি যাদের নিয়ে দিনের বেশী ভাগটা কাটান, সেই সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের প্রত্যেকের উপর হিংসা হয় মার্গারেটের। তাঁর ইচ্ছা হয় ওঁদের সঙ্গে থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনার ভাগ নিতে। শুনেছিলেন, প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই তরুণ ব্রহ্মচারীদের নিয়ে স্বামীজি ধ্যান করেন, পূজার্চনা করেন, বা গান করেন কখনও। নিছক দার্শনিক আলোচনা করতে-করতে একেবারে সমাধি-ভূমির উপান্তে নাকি নিয়ে যান ওঁদের। মঠের অধ্যাত্ম-পরিবেশ এই সব শিক্ষার্থীদের মাঝে যেন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, সত্যের শিখাকে উদ্দণ্ড করে তুলছে সবার অন্তরে।

ব্রহ্মচারী ওঁকে বাংলার পাঠ দিতে আসেন। তিনি যতক্ষণ পড়ান মার্গারেট একমনে তাঁর ভাব-ভঙ্গী ধরন-ধারন লক্ষ্য করেন। কিছু দিন আগেও না উনি সংশয়ে জর্জর ছিলেন? ছেলেপুলের বাপ ছিলেন সংসারে? স্বামীজি ওঁর চোখ খুলে দিয়েছেন, দেখিয়েছেন আলোকতীর্থের পথ। এখন ওঁর অন্তর পাহাড়ী ঝরণার মত প্রসাদোচ্ছল, মার্গারেট যা কিছু প্রশ্ন করেন, একটু থতমত খেয়ে সরল ভাবেই তার জবাব দেন। ছাত্রীর মানসিক উদ্বেগের আভাস পেয়ে যথাসাধ্য শান্ত করতে চেষ্টা করেন তাকে। তাঁর প্রথম উপদেশ হল, এ রকম একশ' গণ্ডা গোলমেলে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে নাই। সামনে যে কাজটা পড়েছে একমনে সেটা করে যেতে হয়। যেমন এই বাংলা শেখাটা। এর মধ্যে যে-সব চলতি কথা বেশ প্রাণস্পর্শ করে বিশেষ করে সেগুলো মনে নাড়াচাড়া করলেই তো হয়। এই ভাবেই না মার্গারেট ক্রমে স্বামীজির কাজের যোগ্য হয়ে উঠবেন।

ব্রহ্মচারীর সরল কথায় তাঁর মনের রুক্ষতা কেটে গেল অনেকটা। অল্প ক'টি কথা, কিন্তু ইশারা দেয় অনেক-কিছুর। কথাগুলোতে মার্গারেটের উপকার হল। কিন্তু উপলব্ধি চাই যে! বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছেন মার্গারেট বিবেকানন্দের মানস-কন্যা হতে হলে ওঁকেও সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের একজন হতে হবে। কিন্তু কেমন করে তা হয় সেটা তো জানা নাই? ওঁদের যে শান্ত, ধীর-স্থির ধরন-ধারন তার নকল করলেই কি মার্গারেট যা হতে চাইছেন তা হওয়ার সুবিধা হবে? চেষ্টা করে দেখলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচারীর প্রশান্ত চাল-চলন উনি অনুকরণ করেন, তাঁর নির্দেশ মত মনের প্রতিটি ভাবনাকে আয়ত্তে রাখতে চান। পরে তিনি বলতেন, 'ব্রহ্মচারীজি আর আচার্যদেবের মাঝে যে ভাবের বিনিময় চলত, আমি পড়েছিলাম ঠিক তার মাঝখানে। মনে হয়, এরই জন্মে আমাদের পরিবেশে যে-সব ভাবের বিদ্যুৎ ঝিলিক হেনে যেত অহর্নিশ, তার খানিকটা পাঠোদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।'

তাঁর আর দুটি আমেরিকান বান্ধবীর তো এমন দাবি-দাওয়া নাই আশ্রম-জীবনের 'পরে। তাঁরা দিব্যি আনন্দে আছেন। স্বামীজির যা-কিছু সঞ্চয়—তারই টানা-পোড়েনে তাঁরা তো তাঁদের জীবনটাকে বুনতে চান না। মার্গারেট কেন তাঁদের মত হতে পারেন না? তিনি যেন জাঁতা-কলে আটকা পড়েছেন। কে যেন তাঁকে গূঢ় আত্মোপলব্ধির পথে ঠেলছে, তাঁর আর নিস্তার নাই। নিজে যাঁকে আচার্য বলে বরণ করে নিয়েছেন, তাঁর প্রতি মার্গারেটের শুদ্ধ ভক্তি-ভালবাসার অভাব নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভয় যেন দিন-দিন বেড়ে চলেছে, কোন মতেই তাকে উনি দাবিয়ে রাখতে পারেন না। এ তাঁকে কোথায় নিয়ে চলেছেন স্বামীজি? কোনও কথা না বলে শুধু পরিপূর্ণ শুচিতার দীক্ষায় দীক্ষিত করে স্বামীজি তাঁকে প্রতি মুহূর্তেই শেখাচ্ছেন, যেন তাঁর আন্তরিকতায় কোনও দাগ না পড়ে। বলতেন, 'ভবিষ্যতের কাছে কোনও প্রত্যাশা যেন তোমার না থাকে। নিজের আত্মোৎসর্গকে যেন বড় চোখে দেখো না। শুধু এই বর্তমানটুকুই সত্য—এই ক্ষণবিন্দুটি, যা রহস্যে মূক, নিথর—এই তো কালরূপে স্বয়ং ঈশ্বর···অপ্রতর্ক্য, সর্বব্যাপী···।'

একদিন সকালে স্বামীজি বলছিলেন গুরুর স্বাতন্ত্র্যের কথা। শিষ্যকে বর্জন বা গ্রহণ করা তাঁর ইচ্ছা, তাদের অন্তরে যে-বাসনা বীজ হয়ে আছে তারও তিনি খবর রাখেন। মার্গারেট দু'হাতে মুখ ঢাকলেন, বলবার কিছুই নাই তাঁর। এই যে তাঁর মনোময় সত্তার একটা নিটোল অনুভূতি—এই কি ছদ্মরূপী অহং তাহলে? সে অহং বিসর্জন দিতে কি প্রস্তুত তিনি? স্বেচ্ছায় তাহলে অকর্তা ভাবকে লালন করতে হবে, ব্যক্তিত্ব আহুতি দিতে হবে মৌন আত্মদানের যজ্ঞে? এই ব্রহ্মচারীরা···মাঠের রোদে ছোট ছেলেদের মত হুড়োহুড়ি করে আবার পরক্ষণেই ডুবে যায় ধ্যানের নৈঃশব্দ্যে—কী অক্ষুব্ধ ওদের মুক্ত জীবন! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মার্গারেটও কি কোন দিন অমন জীবনের স্বাদ পাবেন?

দশম অধ্যায়

ব্রহ্মচর্য দীক্ষা

সে-বছর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-বার্ষিকী-তিথি পড়েছিল ফেব্রুয়ারির শেষে। ঐ দিনই বেলুড় মঠ উদ্বোধন আর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হবে, সেটা যথাযোগ্য স্মরণীয় করে রাখবার জন্য স্বামীজি এ-উৎসব এবার বিশেষ ধুমধামের সঙ্গেই করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু-রীতি অনুযায়ী এ-সব অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ হল প্রচুর আয়োজন করে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। উৎসবের খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তে। কাজেই নির্দিষ্ট দিনে হাজার-হাজার দরিদ্র গ্রামবাসী আর ভিখারী স্ত্রী-পুরুষ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে হাজির হতে লাগল। ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা, নানা ব্যাধিগ্রস্ত সব নিরন্ন, লাঠি আর ভিক্ষার পাত্রটি নিয়ে ভবিষ্য মঠের আঙিনাকে করে তুলল এক আজব পুরী। ওদিকে সিমেন্টের বেদিতে বড়-বড় পিতলের হাঁড়া চাপান হয়েছে—ভাত-তরকারি রাঁধা হবে। রাশি-রাশি মাটির খুরি-গেলাস এসেছে বাজার থেকে। ক্ষুধার্ত জনতা খাবারের জন্য ঠেলাঠেলি লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে। তাদের বাগ মানাতে সন্ন্যাসীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন।

বাঁশ আর তালপাতা দিয়ে ছাউনির মত অস্থায়ী মণ্ডপ তোলা হয়েছে গায়েনদের জন্য—তারা সকাল থেকে সারা দিন গানের সঙ্গে ঢোল-তবলা নিয়ে সঙ্গত করছে। ওদিকে সাধুরা সেই কীর্তনে যোগ দেওয়ার জন্য সাধারণকে ঠেলে দিচ্ছেন বার বার। চারি দিক খোলা এক দেউল উঠেছে, সেখানে ঝালর-দেওয়া নেটের পর্দা, ফুল-পাতা আর মালা আলো দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে পরমহংসদেবের একখানি ছবি। তার সামনে যত পূজার উপচার—নৈবেদ্য, বাটি-ভরা ঘি, ঝুড়ি-ঝুড়ি কলা, শাক-সবজি—সন্ন্যাসীরা সে-সব আবার রান্না-ঘরের দিকে চালান দিচ্ছেন। বাতাসে ধূপ-ধুনার গন্ধ আর ভক্তকণ্ঠের 'শ্রীগুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল—হরিবোল!'

এই উৎসব আর আমোদ-প্রমোদ যেন জনসাধারণের বিজয়োৎসব। ভিতরের কথা জানেন যাঁরা, তাঁদের অন্ততঃ সেই রকমই ঠেকল। কারণ, পাঁচ দিন আগে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, সেই উপলক্ষে তাঁর অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন স্বামীজি। এদেশের অভিজাতশ্রেণী উত্তরাধিকার-সূত্রে যে-সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সর্বত্র সঙ্কীর্ণ জাতিভেদের গণ্ডী রচেছে, স্বামীজি চেয়েছিলেন চিরদিনের মত তা ঘুচিয়ে দিতে। তাই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা দেবসেবার যে অধিকারকে একচেটিয়া করে রেখেছে এত দিন, বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যসন্তানদের সেই অধিকার দিয়ে বিরাট বিপ্লবের সূচনা করলেন। তিনি মনে করতেন, নব্য ভারতের স্রষ্টা যারা তারা সবাই ভাই-ভাই। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে এক হয়েছে এরা, গোঁড়ামির অন্ধকার হতে উত্তীর্ণ হয়েছে ঔদার্যের উষালোকে। এ ওদের নবজন্ম, তাই ওরা 'দ্বিজ' বৈ কি। প্রভুর পুণ্য নামে পবিত্র ওদের দেহ-মন। বিবেকানন্দ বুঝিয়ে বলেন সবাইকে, 'প্রত্যেক হিন্দুই প্রত্যেকের ভাই, ভিন্ন ভিন্ন মত আর পথ নিয়ে এই যে ঝগড়া আর দলাদলি, এর অবসান ঘটুক এবার। আমরা প্রচার করব আশা আর আনন্দের বাণী। সবাই আমরা ভাই-ভাই, সবার আমাদের সমান অধিকার। সব নদীই তো সাগর পানে ছোটে। পাহাড়ের বুক থেকে মাটিতে নামে নির্ঝরিণী হাজার ধারায়, কিন্তু জল তো সেই একই।' সেদিন গঙ্গাস্নান করে প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে এসে প্রণাম করল। তাদের উপনয়ন হল। তার পর তারা গ্রহণ করল সনাতন গায়ত্রী মন্ত্র—'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'

ঘরোয়া এ-অনুষ্ঠান, তবু ভট্টাচার্য পণ্ডিতদের গোঁড়ামির উপরে এ একটা সরাসরি বেপরোয়া আঘাত হানা বটে। এর ফলে নতুন মিশনের বিরুদ্ধে সদ্য একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে আশ্চর্য কিছুই নাই। আবার সেই দিনই বেদের বহু কাল বিস্মৃত এক মন্ত্রের প্রমাণ নিয়ে স্বামীজি সিদ্ধান্ত করলেন, হিন্দু বা বিদেশী, সন্ন্যাসের অধিকার উভয়েরই আছে। ইতিপূর্বেই একথা উঠিয়েছেন তিনি, 'কে আমি আর কে ম্লেচ্ছ? যে অহংকারের পুঁটুলি হয়ে সবাইকে তফাৎ করে রেখেছে, সে, না যে জাতিবর্ণের গণ্ডির বাইরে গিয়ে পরম সত্যের সর্বজনগ্রাহ্য বার্তা এনেছে, সে?' অধ্যাত্ম-ভাবনার কাঠামোটা ক্রমেই তিনি প্রসারিত করে তুলছিলেন। তিনি যে দেখেছেন তাঁর কোনও-কোনও বিদেশী বন্ধু হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন মত বানপ্রস্থীর জীবন যাপন করছেন। তিনি যে দেখেছেন তাঁদেরই কেউ-কেউ ভারতবর্ষকে দিয়েছেন ঋগ্বেদের ভাষ্য, সূত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ। তাঁদের কাজের দাম যে কত, তা জানেন যাঁরা প্রাচীন শাস্ত্রের কারবারী তাঁরা। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এবং নানা জায়গায় ঘোরার ফলে এদেশে-ওদেশে তুলনা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন স্বামীজি। নিজের মতকে বাস্তবে রূপ দেবার জোর ছিল তাঁর সেইখানে। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন সত্যিকারের নেতা।

তাই, মাস খানেক পরেই হিন্দু সমাজের বর্ণবিধি আর অহিন্দু বর্জন নীতি অমান্য করে বিবেকানন্দ তাঁর আইরিশ শিষ্যা মার্গারেট নোবলকে যথাবিধি ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দিলেন। সেদিন ১৮৯৮এর ২৫শে মার্চ, সকালবেলা। এবার মার্গারেট রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবর্ত সাধিকা। আশীর্বাদ-স্বরূপ স্বামীজি ওঁর কপালে এঁকে দিলেন বিভূতির পুণ্য তিলক। হোমকুণ্ডে সব কিছু আহুতি দিয়েছেন মার্গারেট, তার ছাই সে তো তাঁরই জীবনের প্রতীক! এ-আশ্রমে স্বামীজি তাঁর নাম রাখলেন 'নিবেদিতা'। এ বড় কৌতুক! স্বামীজি কি অলৌকিক উপায়ে জানতে পেরেছিলেন, মার্গারেটের প্রসূতি তাঁর জন্ম-মুহূর্তেই তাঁকে নিবেদন করে দিয়েছিলেন দেবতার কাছে? আজ কি বিবেকানন্দের মাধ্যমে সেদিনের সেই শিশু সত্যি-সত্যিই আপনাকে নিবেদন করল দেবতার পায়ে? মার্গারেটের আজকার এই আত্মনিবেদন আর একত্রিশ বছর আগে মায়ের সেই উৎসর্গ—এ দুটি ব্যাপারের পুণ্যগ্রন্থিস্বরূপ এ নামটি ছাড়া আর কোন নাম তো তাঁকে এমন মানাত না!*

নীলাম্বর মুখার্জীর বাড়িতে এই ব্রহ্মচর্য দীক্ষার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটি হল। সন্ন্যাসীরা তখনও ঐখানেই থাকতেন। মার্গারেটের দুই আমেরিকান বান্ধবী ছিলেন সে অনুষ্ঠানের সাক্ষী। যা ছিলেন আর যা হয়েছেন মার্গারেট, তাঁর সেই অতীত আর বর্তমান যেন এই সন্ধিক্ষণে একটি নিটোল নির্মল আত্মদানে

---

* স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার মায়ের সে উৎসর্গের কথা কোন দিনই জানতে পারেননি। মিস ম্যাকলয়েড মায়ের মুখে এই গোপন কথাটা প্রথম শোনেন।

দানা বেঁধে গেল। গুরুর কাছে যেন সর্বস্ব উজাড় করে ঢেলে দিলেন নিবেদিতা। অনুষ্ঠান শেষে মার্গারেট বেরিয়ে এলেন প্রভাস্বর মূর্তিতে, তাঁর জীবনটাই যে আজ আহুতি দিলেন, এ তো তিনি ভাল করেই জানেন। এইটুকুই করতে পারেন তিনি, এর বাইরে আর কিছুই জানেন না। এর পরের যা-কিছু, তার জন্য প্রস্তুতি তাঁর আজও সারা হয়নি তো! তিনি চেনেন তাঁর গুরুকে শুধু—স্বামী বিবেকানন্দের ওই দীপ্ত মুখের বর্ণচ্ছটা হতে তিনি আহরণ করেন দেবতার প্রসাদ। গুরুর বাণীতেই আজও তিনি ভগবদ্বাণী শুনতে পান। তিনি জ্ঞানমূর্তি; সেই জ্ঞানকে সবার করে তিনি ছড়িয়ে দেন। তাঁর গেরুয়ার প্রান্তটুকুও ছুঁয়ে দেখবার সাহস মার্গারেটের নাই, ভয় হয় তাহলেই বুঝি আধারের যত অপূর্ণতা অসুরের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে আবার···কাজ নাই, কাজ নাই ও-সাহসে। মার্গারেট শুধু তাকাতেন তাঁর চোখের দিকে, ওইটুকু ভরসা ছিল। সে-চোখে স্নিগ্ধ ক্ষমার আর সব-সংশয়-দূরে-ঠেলা নিশ্চিত সিদ্ধির আশ্বাস মাখানো।

দীক্ষার আগের দিন, একেবারে উপবাস করতে হল। সেদিনই তাঁর চোখের পানে চেয়ে বার বার মার্গারেট আশার আলো খুঁজেছেন, নইলে সবই মনে হয় অর্থহীন। সারা দিন মৌনব্রত পালন করেছেন, শেষের ক'ঘণ্টা যেন আর ফুরায় না, কত যে দুর্দম আকাঙ্ক্ষায় মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায় ক্লান্ত শরীর। সেই সঙ্গে দীক্ষার মুহূর্ত যতই ঘনিয়ে আসে ততই একটা আকুল উদ্বেগ। 'যা ঘটতে চলেছে জীবনে, ভয় করি কি তাকে?' বলতে পারেন না, জানেন না, মার্গারেট। শুধু গুরুর চোখে চোখ রেখে আবার যেন প্রাণ পান। অথচ কেন এ উদ্বেগ তার ব্যাখ্যা তো আর তাঁর চোখে লেখা নাই!

অনেক বার মনে জল্পনা-কল্পনা করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ কি কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আর উনিই বা তার কী জবাব দেবেন। এখনও ভাবতে পারছেন না যে, তাঁর দেহ মন বুদ্ধি কিছুই আর তাঁর নয় এর পর। সবই সঁপে দিতে হবে গুরুর হাতে, এক তাল কাদার মতন ইচ্ছামত তিনি ভাঙা-গড়া করবেন তাঁকে। থেকে-থেকে কেমন একটা-বিদ্রোহ ফুঁসে ওঠে। গুরুর কাছে এমন একটা পোষ-মানা জীব হতে যাবেন কেন তিনি?···কিন্তু তাছাড়া আর কী করবেন তাও তো জানা নাই। ভুলে যাচ্ছিলেন যে যত দিন না গুরুর শিক্ষায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন তত দিন গুরুরই কি কম জ্বালা? তাঁকেও তো ঢের সইতে হবে, বইতে হবে। আর তাছাড়া বিবেকানন্দ তো মার্গারেটের কাছে কিছুই চাননি। আত্মোৎসর্গ করতেই বলেছেন কি? না।

ভস্ম-তিলক নিয়ে নিবেদিতা গুরুকে প্রণাম করে উঠলেন। বুঝতে পারলেন যে ব্রত তিনি আজ গ্রহণ করলেন তার গুরুত্ব কত। সেই সঙ্গে বুঝলেন কত অজ্ঞান তিনি, একলা পথ চলতে কত-না অক্ষম। আজ সমস্ত অতীত তাঁর চূর্ণ হয়ে গেল, গেল ছাই হয়ে ঐ হোমশিখায়। কিন্তু শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরবার মত সামনে তো কিছু এল না! আবার উৎসুক চোখে গুরুর চোখের-ভাষা বুঝতে চান। আজ তিনি ছাড়া নিবেদিতার আর সব কিছুই যে হারিয়ে গেল!

মন্দিরে সাধু-ব্রহ্মচারীরা ধ্যান করছেন। কে একজন আবৃত্তি করে চলেছেন তাঁর প্রিয় প্রার্থনা-মন্ত্রটি—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

মেয়ে তিনটিকে নিয়ে স্বামীজি বাইরে আসতেই প্রসাদী ফল-মিষ্টির বহরে সন্ন্যাসীরা তাঁদের একেবারে দিশেহারা করে তুললেন। সেদিন ভোগের বিশেষ আয়োজন হয়েছিল নিবেদিতার দীক্ষা উপলক্ষে। স্বামীজি নিজে সেদিন উল্লাসে আত্মহারা—থেকে-থেকে স্মরণ করছেন উমা আর শঙ্করকে—ভারতের বিরাট সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের অধিষ্ঠাতা যে দেব-মিথুন। অন্তরের ভাবোল্লাসকে প্রশ্রয় না দেওয়াই স্বামীজির চিরদিনকার অভ্যাস, কিন্তু সেদিনের সারাক্ষণ তাঁর তোলা রইল নিবেদিতার জন্য। যে-দিব্যোন্মাদের ছোঁয়ায় সমস্ত সত্তা ভাবে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তারই একটু আভাস এনে দিলেন নিবেদিতার মনে, তানপুরা নিয়ে গাইতে লাগলেন—

'পর্বত পাথার, ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত বাজ—
দেবদেব মহাকাল, ধর্মরাজ শংকর শিব, তার হর পাপ।'

শৈব যোগীদের মত স্বামীজির মাথায় পরচুলের জটা—হাঁটু অবধি নেমে এসেছে। কানে শঙ্খের কুণ্ডল, বিভূতি-লিপ্ত বুকে এক রাশ ছোট-বড় রুদ্রাক্ষের মালা। চোখ বুজে গান গাইছেন, ভাবের আবেশে এই বুঝি ঢলে পড়েন। ভক্তির সঙ্গীত-লহরী আর্তের মিনতিতে উচ্ছল হয়ে উঠছে তাঁর কণ্ঠে।

ব্রহ্মচারীরা তাঁর পায়ের কাছে বসেছেন, গানের সঙ্গে করতাল বাজাচ্ছেন একজন। পুরো একটি ঘণ্টা গানের পর, মেয়েরা যখন অতিথি-নিবাসে ফিরে যাচ্ছে, স্বামীজি তখন নবীন ব্রহ্মচারিণীর দিকে ফিরে তাকালেন। যে অসীম শূন্যতার চকিত আভাস এনে দিয়েছেন শিষ্যার মনে, তার সামনে দাঁড়িয়ে যে উদ্বেল বেদনা তার—যেন বিদ্যুচ্চমকে স্বামীজি তা দেখতে পেলেন। কিন্তু থমকে গেলে তো চলবে না? যে-পথে তাঁকে নিয়ে যেতে চান বিবেকানন্দ, সে পথ-চলার আগে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস জেগে উঠুক নিবেদিতার অন্তরে। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস, তাঁর কাজের ভার আমায় তিনি দিয়ে গেছেন, সে-কাজ শেষ না করে আমার ছুটি নাই।' তার পর বেলুড়ের ওপারে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'নিবেদিতা, ঐখানে আমি চাই মেয়েদের একটি মঠ হ'ক। আকাশে উড়তে দুটি পাখা লাগে পাখির—ভারতবর্ষের চাই শিক্ষিত নারী-পুরুষ দুই-ই।' এমনি করে তাঁর সুচিরলালিত স্বপ্নের কথা এত দিনে ভেঙে বললেন স্বামীজি—অপটু নেয়ে হালখানি ধরবার আগেই তাকে দিলেন বন্দরের ইশারা।

এর চার দিন পরে নিবেদিতাকে বাংলা শেখাতেন যে ব্রহ্মচারী তাঁকে সন্ন্যাস দেওয়া হল। নাম হল তাঁর স্বামী স্বরূপানন্দ।—প্রবর্ত অবস্থায় না রেখে স্বামীজি একেবারেই তাঁকে জ্যেষ্ঠাশ্রমের অধিকার দিলেন। এ নিয়ে সামান্য দু'-চার কথা হওয়ার পর তিনি খুশির সুরে বললেন, 'স্বরূপানন্দের মত একজন নিপুণ কর্মী পাওয়া হাজার গণ্ডা মোহর পাওয়ার চেয়ে ঢের বেশী লাভের।'

নিবেদিতা ভাবলেন, আমিও কি কোন দিন গেরুয়া পরতে পাব?

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী

রোজকার ধূলোময়লার
রোগবীজানু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
লাইফ্‌বয়ের
ফেনার আবরণে
যতোই কেন হুঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধূলো ময়লার রোগবীজাণ্ থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফ্‌বয়ের ফেনার আবরণে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন। লাইফ্‌বয়ের তাজা-গন্ধের ফেনা রোগবীজাণ্দের হটিয়ে দিয়ে আপনার দেহকে মুক্ত বাতাসের মতোই ঝর্‌ঝরে ক'রে তোলে—নিরাপদ ক'রে দেয় স্বাস্থ্যকে। রোজই নিজেকে লাইফ-বয়ের পন্থায় বাঁচিয়ে চলুন—এটির মতো আর পাবেন না।
LIFEBUOY SOAP
লাইফ্‌বয় সাবান
দৈনন্দিনের রোগবীজাণ্ থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা
L. 237-50 BG
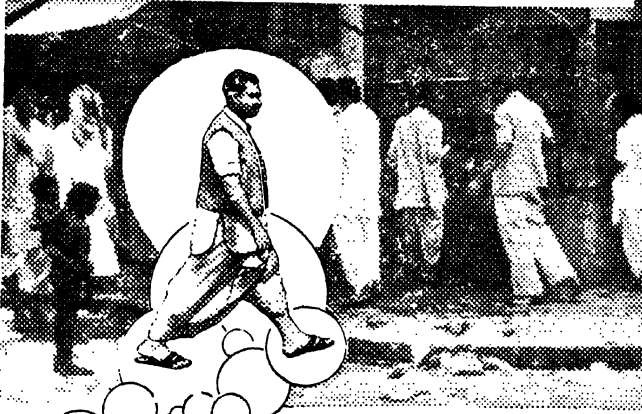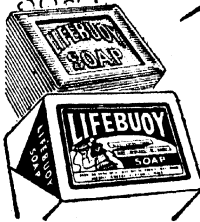
শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

১৯

মাণিকতলা বোমার অন্যতম আসামী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ধৃত হইবার পর পুলিশের নিকট ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে এক স্বীকারোক্তি করে। নরেন্দ্র শ্রীরামপুরের এক বিখ্যাত পরিবারের সন্তান। বোমার মামলায় রাজসাক্ষী হইয়া আলিপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লির তদন্তকালে পর-পর পাঁচ দিন জবানবন্দী দেয়। নরেন্দ্র নিজেকে বাঁচাইবার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিপ্লবী দলের অনেক গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেয়; তাহার স্বীকারোক্তিতে বহু লোককে সে জড়িত করে।

নরেন্দ্রের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে অরবিন্দ বলেন, "গোঁসাইয়ের কথা নির্বোধ ও লঘুচেতা লোকের ন্যায় হ'লেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি খালাস পাইবেন। তিনি বলিতেন, 'আমার বাবা মোকর্দ্দমার কীট, তাঁহার সঙ্গে পুলিশ পারিবে না। আমার এজাহারও আমার বিরুদ্ধে যাইবে না। প্রমাণিত হইবে পুলিশ আমাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া এজাহার করাইয়াছে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি পুলিশের হাতে ছিলে, সাক্ষী কোথায়?' গোঁসাই অম্লান বদনে বলিলেন, 'আমার বাবা কত-শত মোকর্দ্দমা করিয়াছেন, ওসব বেশ বোঝেন। সাক্ষীর অভাব হইবে না।' এইরূপ লোকই এ্যাপ্রুভার হয়।"

তিনি তাঁহার সম্বন্ধে আরও বলেন, "অন্য বালকদের ন্যায় তাঁহার শান্ত ও শিষ্ট স্বভাব ছিল না; তিনি সাহসী, লঘুচেতা, এবং চরিত্রে কথায় কর্ম্মে অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার পরে নরেন গোঁসাই তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও প্রগল্‌ভতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা বলিয়া কারাবাসের যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ ও অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল।"

নরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির পর তরুণের দল তাঁহার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসাবে বিভিন্ন প্রকারে প্রস্তাব আসিল। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে হেমচন্দ্র দাস এক বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "অনেক গবেষণার পর প্রথমে স্থির হ'য়েছিল, নরেনকে হত্যা করার ভার বাইরে যে কয় দল আমাদের বৈপ্লবিক বন্ধু ছিল তাদের ওপর দেওয়া হবে। আমাদের মধ্য থেকেও বারীন ঐ ব্যবস্থাই করেছিল। চার-পাঁচ দল পৃথক্ ভাবে চেষ্টা করলে যে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে, সে আশা তখনও ছিল···"

"নরেনকে মেরে ফেলুক, অরবিন্দ বাবু, দেবব্রত বাবু প্রভৃতি কয়েক জন ছাড়া প্রায় অধিকাংশের মনে এই ইচ্ছা জেগেছিল। তখন বাংলা দেশে যে কয়টি বৈপ্লবিক গুপ্ত দল ছিল, বারীনের প্রস্তাব অনুযায়ী তার প্রায় সকল দলের ওপর নরেনের হত্যার ভার দেওয়া হয়। তিন-চারিটা দল প্রায় এক ধরণের উত্তর দিয়েছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুরের দলও ছিল। তার মর্ম্মটা ছিল—গোঁসাই হত্যার চাইতে তাদের হাতে বিস্তর গুরুতর কাজ রয়েছে। গোঁসাইর ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে অর্থাৎ তারা দল ভেঙ্গে দিয়ে দুর্গা-নাম জপ করছিল। বাকী যে দু' একটি দল কোন উত্তর দেয়নি, তারা চেষ্টা করলেও করতে পারে আশা ক'রে, কোথায় কি ভাবে চেষ্টা করবে, তার একটা লম্বা প্লানও দেওয়া হ'য়েছিল।"

কিন্তু কোন প্লান মতেই কাজ হয় নাই বা হইবার লক্ষণ দেখা যায় নাই। কাজেই মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ এই বিষয়ে একটি ব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর হন। হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ পাঁচ জন বিপ্লবী মিলিয়া বারীন্দ্রকুমারকে গোপন পূর্ব্বক একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন এবং তাঁহারা নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করাই স্থির করিলেন।

এই সম্বন্ধে মতিলাল রায় লিখিয়াছেন যে, "প্রথম হইতেই মতের পরিবর্ত্তন করায় বারীন্দ্রকুমারের অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। এই ভীষণ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি যে বাধা দিবেন, এ বিষয়ে ইঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। প্রথম স্বীকারোক্তিতে বিপ্লব নিবারণ চেষ্টা, তার পর আবার বিপ্লবী দল গঠনের যুক্তি, পরিশেষে নিজেরাই জেলের বাহিরে গিয়া পূর্ব্বানুষ্ঠান সফল করার সঙ্কল্প, ইহার কোনটাই ইঁহাদের মনঃপূত হইতেছে না।"

জেল কর্তৃপক্ষ নরেন্দ্রনাথকে ইউরোপীয় ওয়ার্ডে সতর্ক প্রহরি-বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ আলিপুরে আসিয়া অবধি অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষী হইতে ইচ্ছুক, এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে খবর পাঠান এবং বলেন যে, উভয়ে একত্রে পরামর্শ করিয়া এজাহার দিলেই ভাল হয়। কারণ, তাহা হইলে নরেন্দ্রনাথ কেবল যে একজন সমর্থক পাইবে তাহাই নয়, অধিকন্তু অসংলগ্ন কিছু থাকিলে তাহাও শোধরাইয়া যাইবে এবং তাহাদের সাক্ষ্যও খুব জোর হইবে। সত্যেনের কথায় বিশ্বাস করিয়া নরেন্দ্রনাথ পুলিশের অনুমতিক্রমে তাঁহার সহিত হাসপাতালে সাক্ষাৎ করেন।

কানাইলাল সত্যেন্দ্রনাথের নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া এই কাজে তিনিও সত্যেনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। নরেন ও সত্যেনের রাজসাক্ষীর উপযোগী এজাহারের আবৃত্তি হাসপাতালের ডাক্তারখানায় চলিতে লাগিল। বারীন্দ্রকুমার কর্তৃক আনীত রিভলবার জেলের মধ্যে হেমচন্দ্রের নিকটে ছিল। রোগী ব্যতীত অন্যের যাওয়া হাসপাতালে নিষিদ্ধ থাকিলেও তিনি কাপড়ে জড়াইয়া রিভলবারটি সত্যেনকে দিয়া আসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত রিভলবারটি মরচে-পড়া থাকায় তিনি ইহার দ্বারায় নরেন্দ্রকে হত্যা করিতে সাহসী হন নাই। তিনি অন্য আর একটি রিভলবারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র যখন প্রথম রিভলবারটি লুকাইয়া হাসপাতালে সত্যেনকে দিতে যান, তখন হাসপাতালের ডাক্তার তাঁহাকে বিনা অনুমতিতে সাক্ষাৎ করিতে আসার জন্য সতর্ক করিয়া দেন। সেই জন্য রিভলবারটি স্বয়ং লইয়া যান নাই। কানাইলালকে দিয়া ইহা সত্যেনকে পাঠান হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়, ১লা সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে

নরেন যখন এজাহার লিখিবার জন্ত হাসপাতালে আসিবে, তখন এই কার্য্যটি সমাধা করা হইবে। পূর্ব্ব দিনের অসমাপ্ত এজাহার লিখিবার জন্ত নরেন্দ্রনাথ প্রাতে সাতটার সময় সত্যেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। হিগিনস্ নামক একজন ইউরোপীয় কয়েদী তাহার দেহরক্ষিরূপে আসিলেও, খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে বলিয়া সে অন্তত্র সরিয়া যায়। কানাইলাল রিভলবার হস্তে সেই সময় দাঁত মাজিবার ভাণ করিয়া একতলার বারান্দার খাঁটি আগলাইয়া রহিলেন, যাহাতে নরেন্দ্রনাথ পলাইয়া যাইতে না পারেন।

উপেন্দ্রনাথ, নরেন গোঁসাইকে কি প্রকারে হত্যা করা হয় তাহার এক বিবরণে বলেন, "কথা কহিতে কহিতে যখন সত্যেন পিস্তল বাহির করিয়া তাহার উরু লক্ষ্য করিয়া গুলী করে, তখন নরেন ঘর হইতে পলাইয়া যায়। পলাইবার সময় তাহার পায়ে একটি গুলী লাগিয়াছিল, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। গুলীর শব্দ শুনিবা মাত্র কানাইলাল হাসপাতালের নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসে। ইউরোপীয় প্রহরী তাহাকে ধরিতে যায়, কিন্তু হাতে একটা গুলী খাইয়া সে সেইখানেই পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। ইতিমধ্যে নরেন নীচে আসিয়া হাসপাতালের বাহির হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় প্রহরীকে ধরাশায়ী করিয়া কানাই যখন নরেনকে খুঁজিতে থাকে তখন সে হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং হাসপাতালের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একজন প্রহরী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। কানাই তাহার বুকের কাছে পিস্তল ধরিয়া ভয় দেখায় যে, নরেন কোথায় পলাইয়াছে, তাহা যদি না বলিয়া দেয় ত তাহাকে গুলী খাইয়া মরিতে হইবে। বেচারা দরজা খুলিয়া দিয়া বলে যে, নরেন অফিসের দিকে গিয়াছে। কানাই ছুটিয়া আসিতে দূর হইতে নরেনকে দেখিতে পায় ও গুলী চালাইতে থাকে। গুলীর শব্দ শুনিয়া জেলার, ডেপুটি জেলার, এ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার, বড় জমাদার, ছোট জমাদার সবাই সদলবলে হাসপাতালের দিকে আসিতেছিলেন। পথের মাঝে কানাইএর রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়: বোধ করিলেন। কে যে কোথায় পলাইলেন, তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না; তবে জেলার বাবু যে তাঁহার বিপুল কলেবরের অর্দ্ধেকটা কারখানার একটা বেঞ্চের নীচে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এদিকে কানাইএর হাত হইতে গুলী খাইতে খাইতে নরেন কারখানার দরজার কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। কানাইয়ের গুলী যখন ফুরাইয়া গেল তখন বন্দুক কীরিচ লাঠি-সোটা লইয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং কানাইকে ঘিরিয়া ফেলিল।"

নরেন্দ্রনাথের সংজ্ঞাহীন দেহ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেইখানে অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইল। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল নরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি গুলী করেন; তন্মধ্যে চা'রটি গুলী নরেন্দ্রের শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিদ্ধ হয়, একটি গুলী ডাক্তারখানার ভিতরের দেওয়ালে, তুইটি গুলী বাহিরে এবং শেষ গুলী নরেন্দ্রের বক্ষে বিদ্ধ হয়। কানাইলাল সমস্ত গুলী নিঃশেষ করিয়া রিভলবারটি মাটিতে ফেলিয়া দিলে, তবে তাহাকে সাহস করিয়া ধরা হয়।

জেলের ভিতরে রাজসাক্ষীকে এই ভাবে হত্যা করা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই প্রকার হত্যাকাণ্ড খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০ অব্দে গ্রীসের এক ঘটনার সহিত উপমেয়। তথায় জেলের মধ্যে দেশদ্রোহীকে নিহত করিয়া হারমোডিয়াস ও এ্যারিস্টোজিটন নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। অত্যাপি সেই জন্ত তাঁহারা গ্রীসে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বার এইরূপ কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হন।

গোঁসাইএর হত্যাকাণ্ডের পর আলিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ, এ, ম্যার উক্ত ঘটনার তদন্ত করিয়া যে সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, সেই সম্বন্ধে কানাইলালের কিছু বলিবার আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কানাইলাল বলেন যে, ইন্দ্রনাথ নন্দীর কথা সাক্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নির্জ্জলা মিথ্যা এবং তিনটি রিভলবার ছিল বলিয়া যাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও সত্য নয়। ইন্দ্রনাথকে জড়াইবার জন্ত তিনটি রিভলবারের অবতারণা করা হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট—"তাহ'লে তুমি স্বীকার করছো যে, তোমরাই নরেনকে মেরেছ?"

কানাই—"হাঁ, আমি ও সত্যেন আমরা উভয়েই নরেনকে মেরেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট—"কেন মেরেছ?"

কানাই—"কেন মেরেছি তার কোন কারণ বলতে পারবো না—(একটু চিন্তা করিয়া) না—কারণটাও বলা দরকার। নরেন দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, তাই তাহাকে খুন করেছি।"

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে জেলের বাহিরে যে সকল বিপ্লবী ছিলেন, তাঁহাদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে এবং গুপ্তচর ও গোয়েন্দা-দিগের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

হত্যার অভিযোগে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের বিচার আরম্ভ হইল। প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ করিয়া মিঃ ম্যার মোকর্দ্দমাটি দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়া দেন। আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ এফ, আর, রো, সাহেবের আদালতে ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিচার আরম্ভ হয়। সতীর্থ সত্যেনকে বাঁচাইবার জন্ত কানাই নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব লইয়া আদালতে বর্ণনা দিলেন। বিচারের পর জজ মিঃ রো কানাইলালকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সত্যেন্দ্রনাথকে দুই জন শ্বেতাঙ্গ জুরী দোষী এবং তিন জন ভারতীয় জুরী নির্দ্দোষ বলায়, জজ সত্যেনের মোকর্দ্দমা পুনরায় বিচারের জন্ত হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর, হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ কক্স ও বিচারপতি সফিরুদ্দিনের এজলাসে সত্যেন্দ্রনাথের মোকর্দ্দমার শুনানী হয়। কানাইলালের ফাঁসির হুকুমও হাইকোর্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া ইহাও সত্যেনের মোকর্দ্দমার সহিত উপস্থাপিত হয়। ২১শে অক্টোবর তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং এই সঙ্গে কানাইলালের দণ্ডও অনুমোদন করেন।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ দানের পর ১০ই নভেম্বর কানাইলাল এবং ২১শে নভেম্বর সত্যেন্দ্রনাথ ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জ্জন দেন। ফাঁসির আদেশের পর কানাইলাল ওজনে ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়াছিলেন—উভয়েই প্রফুল্ল মুখে ফাঁসিকাষ্ঠে গিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ভীক, নির্ব্বিকার, আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিয়া জেলের সাহেব ও বাঙালী

কর্ম্মচারিগণ সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া পড়িয়াছিল। "মৃত্যুর গর্জ্জন শুনেছিল তারা সঙ্গীতের মত"—কবির এই মর্ম্মোখিত বাণী বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল কানাই ও সত্যেন্দ্রের জীবনে। মৃত্যুর পর তাঁহারা দেশবাসীর অতুল সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিলেন।

মাণিকতলা বোমার মামলার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল যে, আলিপুর জেল হইতে বোমার মামলার আসামী অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির পলায়নের চেষ্টা। এই সম্পর্কে শ্রীসুকুমার মিত্র এক বিবরণে বলেন, "এক দিন বারীন্দ্র দাদা আমাকে পত্রে জানাইলেন যে, তাঁহারা জেল হইতে পলায়ন করিবেন ও তজ্জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি আমাকে জানান যে, আমি যেন একটি ম্যাপ প্রস্তুত করিয়া দেই, তাহাতে জেল হইতে চতুর্দ্দিকে যাইবার রাস্তা সকল এবং কোথায় কোথায় পুলিশের থানা ও ফাঁড়ি আছে তাহা যেন চিহ্নিত করিয়া দেই। বিশেষ করিয়া গঙ্গার দিকে যাইবার রাস্তা, গলি, ক্ষুদ্র গলি, পায়ে-হাটা পথ ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া ম্যাপে দেখাইয়া দেই। তদুপরি বাহিরে আসিলে অরবিন্দকে কোনওরূপে যেন দ্রুত সরাইবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

"তখন কলিকাতায় খুব কমই মোটর গাড়ী ছিল। মোটর গাড়ীতেই অরবিন্দকে নিজেই সরাইয়া লইয়া যাইতে মনস্থ করি। তদনুসারে আমার বন্ধু মেদিনীপুরের অন্তর্গত কেঁচকাপুরের জমিদার স্বর্গীয় নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহকে বলি যে, তিনি যেন তাঁহার বন্ধু নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁকে বলেন যে, আমি মোটর গাড়ী চালাইতে শিখিতে চাই, সে জন্য রাজা যেন তাঁহার চালককে দিয়া আমায় গাড়ী চালাইতে শিক্ষা দেন। রাজা মহাশয় ইহাতে রাজী হন।

"বারীন্দ্র দাদার নির্দ্দেশ পালন করিবার জন্য আমি নোয়াখালীর অন্তর্গত লামচরের স্বর্গীয় সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীকে কলিকাতার আলিপুরের অংশের ম্যাপ দেই এবং তাঁহাকে আদিগঙ্গার উত্তর দিকে ও পশ্চিম দিকে যত রাস্তা ও গলি আছে সেই সকল রাস্তা দিয়া যাইতে ও পুলিশের ঘাঁটি সকল কোথায় আছে তাহা উক্ত ম্যাপে চিহ্নিত করিয়া দিতে বলি। এই জন্য তাঁহাকে আমার বাইসাইকেল ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। দুই তিন দিনের মধ্যে তিনি একটি নিখুঁত ম্যাপ প্রস্তুত করেন। সুরেন্দ্রকুমার ছিলেন এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটির অন্যতম কর্ম্মী, ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। সকল কর্ম্মে তিনি আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ ছিলেন।......অনুরূপ ভাবে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাসকে আলিপুরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের ম্যাপ তৈয়ারী করিতে বলি ও তাঁহাকে আমার অপর বাইসাইকেল দেই। তিনিও ঐরূপ ম্যাপ তৈয়ারী করিয়া দেন।

"ইতিমধ্যে আমি মোটর গাড়ী চালাইতে শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা করি। তাহার পরে হঠাৎ একদিন শুনিলাম, আলিপুর জেলে কড়া পাহারা বসিয়াছে এবং জেলের পশ্চিমে যেদিকের দেওয়াল টপকাইয়া আসামীদের পলায়নের কথা ছিল তথায় প্রহরী বসিয়াছে ও দেওয়ালের উপর আলোক দেওয়া হইয়াছে। এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় ছিল ও তাহার পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তা ও বেলভেডিয়ার ছিল। জেল হইতে মুক্তি পাইবার পরে আমি অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহারা পলায়নের ব্যবস্থা হঠাৎ বন্ধ করিলেন কেন? তিনি আমাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের ভিতরের কোন একজন কর্ত্তৃপক্ষকে এই পলায়নের কথা জানাইয়াছিল। সে ব্যক্তি পরে খালাস পায়। অরবিন্দ তাহার নামও আমাকে বলিয়াছিলেন।"

পলায়নের ব্যবস্থা ব্যর্থ হইলেও বোমার মামলায় বন্দিগণ মোকর্দ্দমার ভবিষ্যতের ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বন্দীদের মানসিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে অরবিন্দ বলেন, "যে কয়েক দিন আমরা একসঙ্গে এক বৃহৎ দালানে রক্ষিত ছিলাম, আমি তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দুই জন ভিন্ন কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণবয়স্ক, অনেকে অল্পবয়স্ক বালক, যে অপরাধে ধৃত তাহা সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড যেরূপ ভীষণ, তাহাতে দৃঢ়মতি পুরুষেরও বিচলিত হইবার কথা। আর ইঁহারা বিচারে খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না। বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষী, লেখা-সাক্ষ্যের যেরূপ ভীষণ আয়োজন জমিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আইন-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সহজেই ধারণা হয় যে, নির্দ্দোষীরও এই ফাঁদ হইতে নির্গমনের পথ নাই! অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষণ্ণতার পরিবর্ত্তে কেবল প্রফুল্লতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভুলিয়া ধর্ম্মের ও দেশের কথা। আমাদের ওয়ার্ডে প্রত্যেকের নিকট দুই-চারিখানি বই থাকায় একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী জমিয়াছিল। এই লাইব্রেরীর অধিকাংশই ধর্ম্মের বই, গীতা, উপনিষদ, বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, রামকৃষ্ণের কথামৃত ও জীবন-চরিত, পুরাণ, স্তবমালা, ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি। অন্য পুস্তকের মধ্যে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী, স্বদেশী গানের অনেক বই, আর য়ুরোপীয় দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য-বিষয়ক অল্প-স্বল্প পুস্তক। সকালে কেহ-কেহ সাধনা করিতে বসিত, কেহ-কেহ বই পড়িত, কেহ-কেহ আস্তে গল্প করিত। সকালের এই শান্তিময় নীরবতার মাঝে-মাঝে হাসির লহরীও উঠিত। "কাচেরী" না থাকিলে কেহ-কেহ ঘুমাইত, কেহ-কেহ খেলা করিত—যেদিন যে খেলা জোটে, আসক্তি কাহারও নাই। কোন দিন মণ্ডলে বসিয়া কোন শান্ত খেলা—কোন দিন বা দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, দিন কতক ফুটবল চলিল, ফুটবলটা অবশ্য অপূর্ব্ব উপকরণে গঠিত। দিন কতক কানামাছিই চলিল; এক-এক দিন ভিন্ন-ভিন্ন দল গঠন করিয়া এক দিকে জুজিৎসু শিক্ষা, অন্য দিকে উচ্চ-লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ, আর এক দিকে drafts বা দশ-পঁচিশ। দুই-চারি জন গম্ভীর প্রৌঢ় লোক ভিন্ন সকলেই প্রায় বালকদের অনুরোধে এই সকল খেলায় যোগ দিতেন। দেখিলাম, ইহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকেদেরও বালস্বভাব। সন্ধ্যা বেলায় গানের মজলিস্ জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেম দাস, যাহারা গানে সিদ্ধ, তাহাদের চারি দিকে আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতাম। স্বদেশী বা ধর্ম্মের গান ব্যতীত অন্য কোনরূপ গান হইত না। এক-এক দিন কেবল আমোদ করিবার ইচ্ছায় উল্লাসকর হাসির গান, অভিনয়, Ventriloquism, অনুকরণ বা গেঁজের গল্প করিয়া সন্ধ্যা কাটাইত। মোকর্দ্দমায় কেহ মন দিত না, সকলেই ধর্ম্মে বা আনন্দে দিন কাটাইত।"

অপর এক বিবরণে উপেন্দ্রনাথ বলেন, "স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা যেমন মহা স্ফুর্ত্তিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে, আমরাও সেইরূপ আদালত ভাঙ্গিবার পর গান গাহিতে-গাহিতে চীৎকার করিতে-করিতে

গাড়ী চড়িয়া জেলে ফিরিয়া আসিতাম। তাহার পর সন্ধ্যার সময় যখন সভা বসিত তখন বার্লি সাহেব কি রকম ফিরিঙ্গি বাঙ্গলায় সাক্ষীদের জেরা করে, নর্টন সাহেবের পেন্টলোনটা কোথায় ছেঁড়া, আর কোথায় তালি লাগান, কোর্ট-ইন্সপেক্টরের গোঁফের ডগা ইঁদুরে খাইয়াছে কি আরশুলায় খাইয়াছে—এই সমস্ত বিষয়ে উল্লাসকর গভীর গবেষণা করিত; আর আমরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতাম।

"কানাইলাল প্রভৃতি চার-পাঁচ জন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইত। রাত ১০টা ১১টায় সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত, তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ, আম, বিস্কুট লুকান আছে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যেদিন সে সব কিছু মিলিত না, সেদিন এক গাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরের কাছা বা কাহারও কানের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে শুইয়া পড়িত। এক দিন রাত্রে প্রায় একটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি, কানাই এক জনের বিছানার চাদরের তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দ বাবু পাশেই শুইয়াছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খানকয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দ বাবু চাদরে মুখ লুকাইলেন; নিদ্রাভঙ্গের কোন লক্ষণই দেখা গেল না! চুরিও ধরা পড়িল না।"

য়ুরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের পরিচালিত 'তলোয়া'র পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত হিন্দী সঙ্গীতটি বোমার মামলার আসামীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। জেল হইতে আদালতে যাওয়ার সময় এবং আসার সময় তাঁহারা প্রায়ই সমস্বরে গাহিতেন:

"আও মর্দানা জঙ্গী জোয়ানা
জলদি লেও হাতিয়ার।
গোরে তুম পর জুলুম কর্ত্তি হ্যায়
দিন পর দিন দুনিয়া ভার ধরতি হ্যায়
সারে রুপিয়া তুমসে লেকর—আব বনে সাওকার।"

সেসনে বহু দিন ধরিয়া মামলা চলার পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে সেসন জজ মিঃ সি, পি, বিচক্রফট মামলার রায় প্রদান করেন। তিনি বারীন ও উল্লাসকরকে চরম দণ্ড প্রদান করেন। উপেন্দ্র, বিভূতি, হৃষিকেশ, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর, অবিনাশ, ইন্দ্র নন্দী ও শৈলেন বসুর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; পরেশ মৌলিক, শিশির ও নিরাপদর দশ বৎসর দ্বীপান্তর; অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হরি কানে ও সুশীল সেনের সাত বৎসর দ্বীপান্তর ও কৃষ্ণজীবন সান্যালের এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যার অপরাধে পূর্ব্বেই কানাইলালের ও সত্যেনের ফাঁসির হুকুম হয়, সেজন্য বিচক্রফট সাহেবের বিচারে তাহাদের সম্বন্ধে দণ্ডদানের প্রশ্ন ছিল না। বাকী অন্য সব আসামী মুক্তিলাভ করে।

দণ্ডিত আসামীদের আপীলের শুনানী হয় কলিকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স, এইচ, জেনকিনস্ ও বিচারপতি কারনডফএর আদালতে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর আপীলের রায় প্রকাশিত হয়। বিচারে বারীন্দ্র ও উল্লাসের ফাঁসির হুকুম রদ হইয়া উহা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইল। হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের পূর্ব্বের সাজাই বহাল রহিল। নিম্নলিখিত কয়েক জনের দণ্ড হ্রাস পাইল—বিভূতিভূষণ, ইন্দুভূষণ রায় ও হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল দশ বৎসর দ্বীপান্তর; অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পরেশ মৌলিক ও সুধীর-কুমার সরকার সাত বৎসর দ্বীপান্তর; শিশিরকুমার ঘোষ ও নিরাপদ রায় পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। বালকৃষ্ণ হরি কানে পাইলেন মুক্তি। নিম্নলিখিত পাঁচ জনের সম্পর্কে বিচারপতিদ্বয়ের মতভেদ হওয়ায় আইনের বিধান মতে তাহাদের আপীল তৃতীয় জজ হ্যারিংটনের নিকট চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রেরিত হইল। তিনি বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ও শৈলেন্দ্রনাথ বসুর দণ্ড বহাল রাখিলেন এবং সুশীল সেন, ইন্দ্রনাথ নন্দী ও কৃষ্ণজীবন সান্যালকে মুক্তি দিলেন।

[ক্রমশঃ।

ভারতীয় কামশাস্ত্রকার

অধুনা বিদেশে কামশাস্ত্রের চর্চ্চা বিশেষ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। যৌনতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থপাঠের জন্য ভারতবাসীর এখন বিদেশী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে কত যুগ পূর্ব্বে যে কামশাস্ত্র রচিত হয়েছে সেই দিকে কারও দৃষ্টি নেই। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' সমগ্র দুনিয়ায় পরিচিতি পেয়েছে এবং এমন কি অনেকানেক বিদেশী কামশাস্ত্ররচককে পর্য্যন্ত বাৎস্যায়নের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আরও অনেকে কামশাস্ত্র রচনা করেছেন। শিবের অনুচর নন্দী সর্ব্বপ্রথম কামশাস্ত্র সঙ্কলন করেন। নন্দীর গ্রন্থটি ছিল এক হাজার অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থকে সাধারণের জন্য পাঠযোগ্য ও বোধগম্য করেন শ্বেতকেতু নামে জনৈক ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি। ছান্দোগ্যোপনিষদ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবং মহাভারতে শ্বেতকেতুর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। পিতৃদেবের নাম উদ্দালক হওয়ার জন্য শ্বেতকেতুর নাম "কামসূত্রে" ঔদ্দালকী বলা হয়। পৌরাণিক ভারতের অন্যতম বিখ্যাত কামশাস্ত্রকার ছিলেন বাভ্রব্য। বাৎস্যায়ন বিশেষতঃ বাভ্রব্যের গ্রন্থকে ভিত্তি ক'রে "কামসূত্র" রচনা করেন। "কামসূত্রে" বাৎস্যায়নের পূর্ব্বতন আরও কয়েক জনের নামোল্লেখ আছে। যথা—চারায়ণ ঘোটকমুখ; সুবর্ণনাভ; গোনর্দ্দীয়; গোনিকাপুত্র; দত্তক এবং কুচুমার। কেউ কেউ অনুমান করেন, "যোগসূত্র"-প্রণেতা পতঞ্জলি এবং গোনর্দ্দীয় অভিন্ন। বাৎস্যায়নের "কামসূত্রে"র টীকাকার ছিলেন যশোধর। বাৎস্যায়নের অবর্ত্তমানে যৌনতত্ত্বের ব্যাখ্যায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন "রতিরহস্য" গ্রন্থের লেখক কোকা পণ্ডিত। বেণুদত্ত নামক জনৈক রাজার প্রীত্যর্থে "রতিরহস্য" রচিত হয়। ঋষি নাগার্জ্জুন "সিদ্ধবিনোদন" নামে যৌনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সংস্কৃত ভাষায় অন্য একটি শ্রেষ্ঠ যৌনশাস্ত্র কল্যাণমল্ল রচিত "অনঙ্গরঙ্গ"। অধুনা বাঙলা সাহিত্যে কয়েক জন লেখক কামশাস্ত্র বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন—যেগুলি উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ উক্ত গ্রন্থসমূহ বাজারে পাওয়া যায়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

৩

ঘোড়ার গাড়ীর পরে আমরা পাল্কীর উল্লেখ করিব। পাল্কী নরবাহ্য যান। নরবাহ্য যান এ দেশে বহু দিন হইতে প্রচলিত। কালিদাসের 'কল্পনা ইন্দুমতীকে তাহাতেই স্বয়ম্বর-সভায় আনিয়াছিল :—

"মনুষ্য-বাহ্যং চতুরস্র-যান-
মধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তর-রাজ-মার্গং
পতিংবরা কৢপ্ত বিবাহবেষা।"

নরবাহ্য চতুষ্কোণ যানে আরোহিয়া
স্বয়ংবরার্থিনী বালা পরি' চারু বেশ,
পরিজনগণে তাঁর বেষ্টিতা হইয়া
মঞ্চশ্রেণীমধ্য পথে করিলা প্রবেশ।

মোগল বাদশাহদিগের পতন দশায় ঔরঙ্গজেবের সেনাপতিরা পাল্কীতে শয়ন করিয়া শিবির হইতে শিবিরান্তরে যাইতেন। অথচ বাবর সেনাবলসহ সন্তরণে গঙ্গা ও সিন্ধু পার হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতামহীদিগের সময়ের পাল্কী দেখিয়াছিলেন।—"খুব দরাজ বহর তার, নবাবী ছাঁদের। ডাণ্ডা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কাণে মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাত-কাটা মেরজাই পরা বেহারার দল সূর্য্য ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে।"

এই সোনার কাঁকন, কাণের মাকড়ী আর লাল মেরজাই—বোধ হয়—এ কালের ভৃত্যের উর্দ্দীর মত প্রভুর দ্বারা ব্যবহারজন্য প্রদত্ত।

এমন যে হয়, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা'য় লিখিয়াছেন। ইন্দিরার "নূতন বড় মানুষ" শ্বশুর তাহাকে লইতে পাল্কী পাঠাইয়াছিলেন :—"পাল্কীখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁশে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী মাগী যে আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোনার দানা। চারি জন কালো দাড়িওয়ালা ভোজপুরে পাল্কীর সঙ্গে আসিয়াছিল।"

পিতামহীদিগের পরে মা'র আমল। তখন—"মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজা-বন্ধ পাল্কীর হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। * * * * বড়ো-মানুষের ঝি-বউদের পাল্কীর উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকতো মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজী। এদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি-আগলানো, দাড়ি চোমরানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুম্ববাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্ব্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ-পাল্কী-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা।"

রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন—তাঁহার মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত হ'ন—"তখন অন্তঃপুরে অবরোধ প্রথা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তখনো মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইতে হইলে ঘেরাটোপ-মোড়া পাল্কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখনো নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্কীশুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে। স্ত্রীকে মেজদাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই—সমুদ্রপার, কিন্তু এখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ী চড়াইতে পারিলেন না। * * * অগত্যা পাল্কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল।"

কিন্তু মাত্র দুই বৎসর পরে তিনি যখন সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, "তখন আর কেহ বধূকে পাল্কী করিয়া গৃহে আসিতে বলিতে পারিলেন না।" পরিবর্ত্তন কত দ্রুত হইয়াছিল, তাহা ইহাতে বুঝিতে পারা যায়।

কেবল যে মহিলারাই পাল্কী ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে. পুরুষরাও পাল্কী ব্যবহার করিতেন। গল্প শুনিয়াছি, কৃষ্ণনগরে আমার পিতামহের এক মামলায় দুই পক্ষে কলিকাতা হইতে দুই জন বড় ব্যারিষ্টার গিয়াছিলেন। পিটারশন তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহারা পাল্কীর ভিতরে প্রবেশ না করিয়া তাহার ছাতে শয্যা পাতিয়া শয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় হইতে বহু দিন ইংরেজরাও পাল্কী ব্যবহার করিতেন। সেকালে কলিকাতার য়ুরোপীয় সমাজে দুর্নীতি প্রবল ছিল এবং কথায় কথায় দুই জনে যুদ্ধ হইত। যুদ্ধার্থীরা পাল্কী চড়িয়া যুদ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও ফিলিপ ফ্রান্সিস যখন পরস্পরের সহিত আলীপুরে যুদ্ধ করেন, তখন তাঁহারা কি পাল্কী করিয়া গমন করেন নাই? আহত ফ্রান্সিসকে কি পাল্কীতেই আনয়ন করা হয় নাই?

কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজে পাল্কীর বহুল প্রচলন ছিল। মুৎসুদ্দীরা পাল্কী চড়িয়া সওদাগরী আফিসে যাইতেন। গল্প আছে, মুৎসুদ্দী বারাণসী ঘোষ এক বার কোন কার্য্যোপলক্ষে আফিসে যাইতে না পারায় জামাতাকে দিয়া সে সংবাদ "সাহেবের" নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। জামাতা পাল্কীতে যাইয়া "সাহেবকে" বক্তব্য ইংরেজীতে বলেন। "সাহেব" ঘোষ মহাশয়ের ইংরাজীর ভাবার্থ বুঝিতে শিখিয়াছিলেন; জামাতার কথার অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া নিরুত্তর থাকেন। জামাতা তাহাতে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া আসিয়া সে কথা শাশুড়ীকে বলেন এবং গৃহিণীর কথায় ঘোষ মহাশয় পাল্কী চড়িয়া আফিসে যাইয়া "বড় সাহেবকে" বলেন—"Send son-in-law, speak not speak টি not! I...your service."

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাল্কী তাঁহার তালতলার চটি জুতারই মত সুপরিচিত ছিল। যখন কলিকাতায় নানারূপ গাড়ীর চলন হইয়াছিল তখনও অনেক ডাক্তার ও কবিরাজকে পাল্কী চড়িয়া রোগী দেখিতে দেখা গিয়াছে।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

"প্রথম যখন নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন একটা কালো

ঘোড়া-জোতা পাল্কী গাড়ীতে গিয়াছিলাম। গাড়ী চড়িয়া স্কুলে গিয়াছিলাম, সে আনন্দ হৃদয়ে ধরিত না। কিছু দিন পরে কর্তৃপক্ষের আদেশ হইল—পাল্কী করিয়া স্কুলে যাইতে হইবে। সে আরও মজা লাগিল। 'ধাক্ কুনাবড় হেইয়া নাবড়' এই ছন্দের বুলি শুনিতে শুনিতে স্কুলে যাতায়াত হইত—পাল্কী-বেহারাদিগের বুলির প্রতিধ্বনি করিয়া আমিও বলিতাম—'ধাক্ কুনাবড় হেইয়া নাবড়'। সাধারণতঃ ৪ জন বাহক পাল্কী কাঁধে করিয়া লইয়া চলিত। আশ্চর্য্য এই যে, জীবনের এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে উড়িয়া ভিন্ন অপর কোন জাতীয় ব্যক্তিকে কলিকাতায় পাল্কী কাঁধে করিতে দেখিলাম না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, পাল্কী বহন করিতে তাহাদের কষ্ট হওয়া দূরে থাক, তাহারা যেন এই কার্য্যে আনন্দলাভ করিত। ইহার কারণ মনে হয় এই যে, তখন উড়িষ্যায় কথায় কথায় বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি লাগিয়াই ছিল; দারিদ্র্যের করাল বিভীষিকা উড়িষ্যাবাসীকে যেন সর্ব্বদাই ঘিরিয়া থাকিত। তাই পাল্কী বহিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিয়া অপেক্ষাকৃত সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে, ইহাতেই তাহাদের আনন্দ। এখন বুঝিতেছি যে, উড়িয়াদের মধ্যে গৌড় বাউরী প্রভৃতি দুই-চার জাতি আছে, যাহারা একমাত্র পাল্কী বহনের অধিকারী—অপর কোন জাতির কেহ পাল্কী বহিলে তৎক্ষণাৎ তাহার জাতি যাইবে। সে কালে আমরা অত শত জানিতাম না—উড়িয়া মাত্রকেই 'দাস' বা 'দাসপুয়া' অর্থাৎ দাসপুত্র বলিয়া জানিতাম এবং মনে করিতাম যে, প্রধানত পাল্কী বহনের জন্যই উহাদের জন্ম।"

"পাল্কী বহনের জন্যই উহাদের জন্ম"—এই কথায় একটি গল্প মনে পড়ে। যখন বিদ্যুৎচালিত পাখাও হয় নাই তখন গ্রীষ্মকালে—জানালায় জলসিক্ত খসখসের পর্দ্দা দেওয়া ঘরে টানা-পাখার নিম্নে বসিয়া য়ুরোপীয় "বড় সাহেব" ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেন না—তাঁহার "সরকার" কিরূপে মধ্যাহ্নে রৌদ্রে ক্যাম্বিসের ব্যাগ লইয়া তাগাদা করিয়া বেড়াইত। তিনি মনে করিতেন, "সরকার" স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক। সেই জন্য এক দিন পথিপার্শ্বে পিঁড়ির উপর শায়িত তৈলসিক্ত শিশুকে রৌদ্রে রক্ষিত দেখিয়া আসিয়া তিনি "বড় বাবুকে" বলিয়াছিলেন—তিনি দেখিয়াছেন, কিরূপে "সরকার বানাতা।"

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"সেকালে পাল্কী দাঁড়াইবার স্থান কর্পোরেশন তেমন কিছু ঠিক করিয়া দেয় নাই। পাল্কীবাহকেরা যেখানে বাসা করিয়া থাকিত, সেই বাসার কাছেই কর্পোরেশন 'Palanquin Stand' বলিয়া একটা কাঠের খোঁটা মারিয়া দিত এবং কাছাকাছি যে পাল্কীর আড়া বা আড্ডা আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য বাহকেরা হয়তো একখানি পাল্কী ঐ খোঁটার পার্শ্বে রাখিয়া দিত। কাহারও পাল্কীর দরকার হইলে সেই পাল্কীর কাছে গিয়া—'বেহারা, দাসপো' ইত্যাদি আহ্বানে চীৎকার করিতেই আড়া হইতে সুখনিদ্রিত বেহারাগণ চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে সাড়া দিয়া উঠিত। * * * সেকালে পাল্কীর ব্যবহার বেশী থাকিবার কারণে আড়াও অনেকগুলি ছিল।"

ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু কলিকাতায় উড়িয়া ব্যতীত পাল্কীবাহক দেখেন নাই বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে লাল মেরজাই-পরা বেহারাদিগের কথা বলিয়াছেন, বোধ হয়, তাহারা বাঙ্গালী—হুলে বা অন্য জাতীয় ছিল। মফঃস্বলে বাঙ্গালী বাহকই দেখা যাইত—এখনও যায়। বাগদী, বাউরী এবং মুচি বেহারাও ছিল।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় উড়িয়া বেহারারা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছিল। তখনও তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না—ভাড়ার হার নির্দ্দিষ্ট ছিল না—ইত্যাদি। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে মোকর্দ্দমা হইত, ম্যাজিষ্ট্রেটরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেন। শেষে স্থির হয় পাল্কীতে "নম্বর" দেওয়া হইবে এবং বাহকদিগকে বাহুতে পিতলের ক্ষুদ্রাকার একরূপ "টিকেট" ধারণ করিতে হইবে (এখন রেলষ্টেশনে কুলীদিগকে ইহা পরিতে হয়)। উড়িয়া বাহকরা ইহাতে ঘোর আপত্তি করে; বলে, "টিকেট" করিলে তাহাদিগের জাতি যাইবে! ম্যাজিষ্ট্রেটরা কিন্তু তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। বাহকরা ভয় দেখায়, তাহারা উড়িষ্যায় চলিয়া যাইবে। তাহারা গড়ের মাঠে সমবেত হইয়া এই সঙ্কল্প জানায়। তাহাদিগকে কাজ করিতে বাধ্য করাইবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্মঘটে কয় দিনের মধ্যেই কলিকাতায় হিন্দুস্থানী বাহকের আগমন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবহারও বাড়িয়া যায়। ফলে উড়িয়া বাহকরা বাধ্য হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

এই ধর্ম্মঘটে যে "ব্রাউনবেরী" গাড়ীর উদ্ভব হয়, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

হিন্দুস্থানী বাহকদিগকে Rouwanee বলিত। ইহার কারণ আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

কলিকাতায় পাল্কী ব্যতীত আরও কয় প্রকার নরবাহ্য যান সে কালে প্রচলিত ছিল। ইংরেজ, মহীশূরের টীপু সুলতানের যুদ্ধে
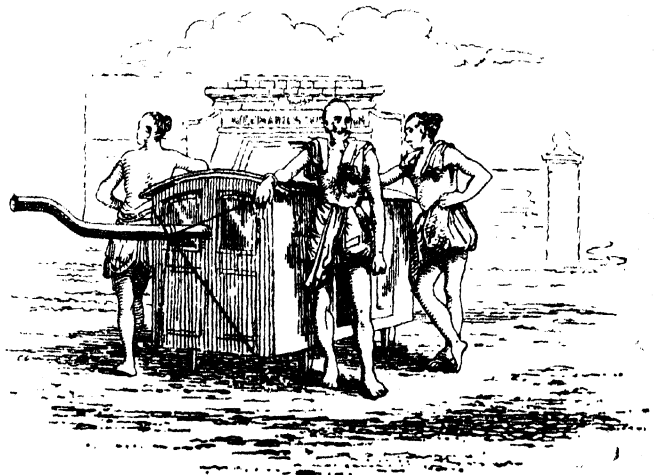
পাল্কী

পরাভব ও মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশীয়দিগকে টালিগঞ্জে এবং অযোধ্যার নবাব ওয়াজীদ আলী শাহকে মুচিখোলায় (মেটিয়াবুরুজে) মাসহারা দিয়া নজরবন্দী অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের জন্য তাঞ্জাম আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু তাহা তাঁহাদিগের বিব'হাদি ব্যাপারে লুপ্ত গৌরবের সুপ্তোত্থিত স্মৃতির মত ব্যবহৃত হইত। সহরে তাহা বড় দেখা যাইত না।

সহরে—হিন্দুদিগের বিবাহে—চতুর্দ্দোলা বরের ব্যবহারের জন্য ও মহাপায়া বধূর জন্য ব্যবহৃত হইত।

চূড়ামণি দত্ত মহাপায়ায় আপনার সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি যে অঞ্চলে বাস করিতেন, সেই অঞ্চলে নবকৃষ্ণ দে (দেব) যখন হেষ্টিংশের মুন্সীগিরী করিয়া ভাগ্যোদয়ে প্রসিদ্ধিলাভ করেন, দত্ত মহাশয় তখন সে পল্লীতে "বনিয়াদী ঘর"। সেই সময় হইতে উভয়ে "আখছা-আখছি" ছিল। জীবনে নবকৃষ্ণকে জব্দ করিতে না পারিলেও চূড়ামণি মৃত্যুতে তাঁহাকে জব্দ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ চূড়ামণি এক দিন ছুরিকায় লেখনী কাটিবার সময় স্বীয় অঙ্গুলী কাটিয়া ফেলেন। তিনি বলেন, যখন তাঁহার দেহ হইতে অকারণ রক্তপাত হইয়াছে, তখন তাঁহার মৃত্যু সমাগত। হয়ত কোন জ্যোতিষী তাঁহাকে তাহা বলিয়াছিলেন। তিনি অসুস্থ হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে থাকেন এবং সেই সময় নবকৃষ্ণকে জব্দ করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। নবকৃষ্ণ গৃহে মরিয়াছিলেন—গঙ্গাতীরে নহে। চূড়ামণি সেই জন্য চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করিয়া "নবার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া" স্বীয় গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করেন এবং যাত্রাকালে গীত হইবার জন্য গান রচনা করেন—

"যম জিনিতে যায়, ওরে ভাই যম জিনিতে যায়
চূড়ামণি যম জিনিতে যায়।
যপ তপ মিথ্যা রে ভাই,
মরতে জানলে হয়।"

—ইত্যাদি

মহাপায়া বধূ আনিবার জন্য ব্যবহৃত হইত—পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

দীনবন্ধুর "মাণিক পীরের গানে"—"সাদীর পরে দোলার বিবি ডুলী চেপে যায়।" সেই ডুলীও তখন সময় সময় কলিকাতার পথে দেখা যাইত। তাহার ব্যবহার মুসলমানদিগের মধ্যেই প্রায় নিবদ্ধ ছিল।

এখন পাল্কী পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহা অনিবার্য্য। ফ্রেডরিক ট্রিভস ভারত-ভ্রমণে আসিয়া লিখিয়াছিলেন, পরিত্যক্ত নগর অম্বরে যাইতে হইলে মোটর যানে না যাইয়া করিপৃষ্ঠে যাতায়াত ভাল; তাহাই অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন—মোটর গাড়ীর চালক অপেক্ষা মাহুত দেখিতে ভাল। কিন্তু আজ আর কেহ অম্বর দেখিতে হাতীতে গমন করেন না। সময়ের অল্পতা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।—গোযানের স্থান আজ রেলগাড়ী লইয়াছে—দূরত্ব আজ দূর হইয়াছে।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, তিনি বাল্যকালে পাল্কী করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন; কিন্তু "দু' দশ বৎসর পরে যখন আর একবার বাধ্য হইয়া পাল্কী চড়িয়া স্কুলে গিয়াছিলাম, তখন স্কুলের ছেলেরা বড়ই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল—তখন সভ্যতার সুর বদলাইয়া গিয়াছে। আমরাও অগত্যা পাল্কী ছাড়িয়া পায়ের গাড়ীতেই স্কুলে যাইতে লাগিলাম।"

শুনা গিয়াছে, বদ্ধ পাল্কীতে কোন মহিলাকে গঙ্গায় চুবাইবার ফলে শ্বাসরোধে তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছিল। ঘেরাটোপ-ঘেরা পাল্কীর ব্যবহার বহু দিন কোন কোন পুরাতনানুরক্ত ধনীর পরিবারে মহিলাদিগকে করিতে দেখিয়াছি।

আমাদিগের কোন ধনী জমীদার বন্ধুর পত্নী কলিকাতায় মোটরে ষ্টেশনে যাইয়া হাঁটিয়া প্ল্যাটফর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ট্রেণের কামরায় উঠিতেন বটে, কিন্তু যখন বাসস্থানের ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতেন, তখন কামরার দ্বারে পাল্কী ধরিতে হইত। উহাই ছিল—সম্ভ্রমের বালাই।

সে কালে বাঙ্গালী ধনীদিগের পাল্কীর ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন। সে বিষয়ে ইংরেজরাও পশ্চাদ্‌গামী ছিলেন না। তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও পাল্কীতে ১০টি পর্য্যন্ত দীপ থাকিত। এক জন বলিয়াছেন, অত আলোকের কোন প্রয়োজন ছিল না; পরন্তু তাহাতে লোকের চক্ষুর পীড়া হইত এবং ঘোড়া ভয় পাইত।

মফঃস্বলে এখনও পাল্কী আছে। তাহা আমাদিগের আলোচ্য নহে। কলিকাতায় পাল্কীর বেহারার "ডাক" গিয়াছে—পথে মোটর গাড়ীর "হর্ণ" বাজে। ভবিষ্যতে কি হইবে, কে বলিতে পারে?

অসুখের পর তাড়াতাড়ি
সেরে উঠতে হ'লে
দু-তরফা
পুষ্টি চাই
১. স্কট্‌স ইমালশন খাঁটি কড্‌লিভার অয়েল, যা পুষ্টিকর ও বলবর্ধক প্রাকৃতিক খাদ্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট। এতে 'এ' ও 'ডি' ভিটামিন থাকায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। ২. ইমালশন আকারে তৈরী হওয়াতে অত্যন্ত দুর্বল পাকস্থলীর পক্ষেও এর পুষ্টিকর উপাদানগুলি হজম করা সহজ। স্কট্‌স ইমালশন-এর চেয়ে সহজপাচ্য কড্‌লিভার অয়েল আর হয় না।
যাতে শক্তি-সামর্থ্য গড়ে ওঠে
গুরুতর কোনো অসুখের পর তাড়াতাড়ি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে হ'লে সারবান্‌ ও শক্তি-বর্ধক পুষ্টিকর জিনিস একান্ত দরকার। এ অবস্থায় স্কট্‌স ইমালশন খাবেন—দুর্বল শরীরের পক্ষে যেসব পুষ্টিকর পদার্থ আবশ্যক সবই এতে আছে।
প্রতিরোধ শক্তি ফিরে আসে
অসুখ-বিসুখকে বাধা দেবার যে স্বাভাবিক শক্তি মানুষের ভেতরে থাকে, রোগভোগের পর তা একেবারেই কমে যায়। তাই অসুখ থেকে উঠে আবার যাতে নতুন ক'রে পড়তে না হয় সেজন্যে নিয়মিত স্কট্‌স ইমালশন খেয়ে রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে তুলুন। ডাক্তাররা আজ ৭৯ বছর ধ'রে স্কট্‌স খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।
SCOTT'S EMULSION
SCOTT'S Emulsion
স্কট্‌স্‌ ইমালশন
প্রতি চামচে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়
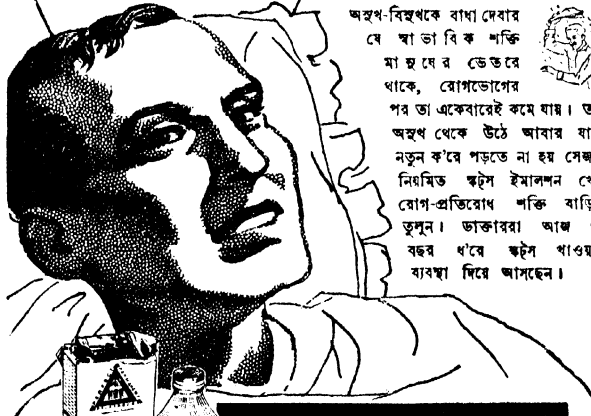
চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

সমুদ্রের খাড়ি। পারঘাটার এ ধারে রেলষ্টেশন। জলের একেবারে উপরে ষ্টেশনটা। সকাল ৭-২০ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল।

খাড়ির কিনারা ধরে গাড়ি চলেছে। ডানদিকে জল, বাঁদিকে শহর। শহর শেষ হয়ে বস্তি অঞ্চল। জনালয় ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে এসে পড়েছি। পাহাড়, পাহাড়—দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে আছে রক্তাভ পাহাড়ের সারি। সহসা অবারিত হয়ে গেল ডানহাতের দিকটা। বিস্তীর্ণ জলধারা—জলের উপর নৌকো-ষ্টিমার। কি গাঢ় নীল জল! সীমাহীন প্রশান্ত মহাসাগর হাত বাড়িয়ে মহাচীনের এক মুঠো মাটি আঁকড়ে ধরেছে। তারই নাম হংকং।

নাদুসনুদুস কার্তিক ঠাকুরটি—আজ্ঞে না, খাঁটি নাম কিছুতে বলছি নে। বাপ-মা ঠাহর পান নি যে ভাবীকালে ছেলের চেহারা এমন খুলবে। তাই অন্য একটা নাম রেখেছিলেন। কার্তিকই ভদ্রলোকের নাম হওয়া উচিত।

এদিককার বেঞ্চি থেকে কার্তিক ঘাড় লম্বা করে ঝুঁকে পড়লেন।

কি লিখছেন?

খরচগুলো টুকে রাখছি—

খরচ আবার কি? হেঁ-হেঁ, ও বললে কি শুনি? আমি তবু ট্রাউসার কিনলাম আঠারো ডলারে। আপনি কৃপণের যাসু, খরচ করবার ভয়ে বেরুলেন না মোটে। দেখেছেন আমার ট্রাউসার?

আমি একা নই এবং শুধুমাত্র ভারতীয়েরা নয়। কার্তিকের ট্রাউসার অনেকজনকে দেখতে হয়েছে। এবং শুনতে হয়েছে দাও মেরে ঐ বস্তু আঠারো ডলারে কেনবার আদ্যন্ত ইতিহাস। সেই ব্যাপার আবার উঠে পড়ে বুঝি! ভয়ে-ভয়ে মুখ তুলে তাকালাম।

না, কার্তিকের মতি এখন অন্যদিকে। বলে, বই লিখছেন তা বুঝতে পেরেছি। আমার কথা লিখবেন কিন্তু।

ভোঁতা-বুদ্ধি এই মানুষগুলোর ভারি ঝোঁক, ফাঁকতালে নাম করে নেবার। নামের নেশায় কোন এক মওকায় হঠাৎ বীরত্বের কাজও করে বসে। কিন্তু আপাতত হাত এড়ানোর দরকার। মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, শান্তিস্থানও এক ট্রাউসার কিনেছেন। ভালো জিনিষ।

দেখেছেন আপনি? আমার চেয়ে ভালো?

তাই তো মনে হল—

ব্যস। মুহূর্তে উধাও। শান্তিস্থান ওদিকে—কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে। অতএব নিশ্চিন্ত আপাতত।

পাহাড় আরো ঘনীভূত হয়েছে। টানেল পার হচ্ছি মাঝে মাঝে। একটা টানেল অত্যন্ত বড়। আলো জলে উঠল কামরার মধ্যে। চলেছে তো চলেইছে—শেষ আর হতে চায় না টানেল।

ষ্টেশন—কি নাম? চীনা অক্ষর···ইংরেজিতেও লেখা আছে ওদিকে। সা তিন। একটা মেয়ে ঐ পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে বসে রেলগাড়ি দেখছে। জেলে জাল ফেলছে খাড়ির জলে।

পায়োনীয়র ছেলেমেয়ে ও কয়েক জন অতিথি

পাল-তোলা কত নৌকো যাচ্ছে সারবন্দি—মেঘনার উপর দিয়ে এমনি-ধারা বহর যেতে দেখেছি। কলাগাছ, ঝাউগাছ। নাম-না-জানা রকমারি গাছের জঙ্গল কলকেফুলের মতো হলদে হলদে ফুলে আলো হয়ে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে পিচ-ঢালা এক পথ উঠে গেছে কচ্ছপের সুমসৃণ পিঠের মতো। খাড়ি চওড়া হচ্ছে ক্রমশ। বাঁদিকের উত্তুঙ্গ পাহাড় থেকে কলোচ্ছলিত ঝরণা এ-পাথর থেকে ও-পাথরে নাচতে নাচতে নেমে এসে আমাদের রেললাইনের নিচে গুঁড়ি মেরে খাড়ির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।···

পাটনার দৈনিক 'নবরাষ্ট্রের' সম্পাদক দেবব্রত শাস্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল কংগ্রেসের কাজ করেছেন; এখন আর কংগ্রেসে নেই। চমৎকার মানুষ, আমার সঙ্গে খাতির জমেছে কলকাতা থেকেই। একবার গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালাম।

স্বর্গ না পাতাল—কোথায় চলেছি বলুন তো ?

জবাব দিলাম, মর্তে'ই নিঃসন্দেহ। জড়বাদীর দেশ বলে মাটি কিছু কঠিন হতে পারে।

সারা দেশ রক্তে ভেসেছে এই তো সেদিন অবধি—

মাটিতে দাগ আছে কি না, খুঁজে দেখতে হবে। এত দেশের এতগুলো চোখ এড়াতে পারবে না।

মনোভাব অনেকেরই এমনি। কৌতূহল, সন্দেহ—একটু-আধটু আতঙ্কও যে নেই, এমন কথা হলপ করে বলতে পারি নে। সবজান্তা হিতৈষীদের অভাব নেই, ঘরে বসেই এক এক দিক্‌পাল। যাত্রার মুখে তাঁরা মুষলধারে সদুপদেশ ছেড়েছেন।

সমাজতান্ত্রিক নতুন ব্যবস্থা—দেশজোড়া দেখবে শুধু এক বিরাট মেশিন, মানুষগুলো সেই মেশিনের ইস্ক্রুপ-নাট। ব্যক্তি-সত্তা বলে কিছু আর নেই। কথাবার্তা সামাল হয়ে বোলো হে, দেখে বুঝে চলাফেরা কোরো। বেফাঁস কিছু ঘটলে কচ করে মুণ্ডটা ধড় থেকে নামিয়ে নিতে বাধে না ওদের।···

কত রকমের উদ্ভট ধারণা! শুধুমাত্র প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু নেই নাকি সেখানে? ফুলের মধ্যে হয়তো ফুলকপি—মানুষের যা ক্ষুধা-নিবৃত্তির কাজে লাগে। হাসি-আনন্দ-হীন উৎকট বস্তু সর্বস্বতা। যাওয়া পণ্ডশ্রম ওসব দেশে। রীতিমত ওজনদার পর্দায় ঘেরা চতুর্দিক। সে পর্দার যেটুকু ওরা প্রয়োজন মাফিক তুলে ধরবে, ঝাপসা-ঝাপসা আলোয় তাই দেখে এসো। আর শুনে এসো দম-দেওয়া পুতুলের মতো কলের মানুষগুলোর মুখে কয়েকটি শেখানো কথা। এই মাত্র, এর বেশি নয়।

সে যাই হোক, আর যে লেখা চলে না! প্লেন হয়, রেলগাড়ি। জোরে ছুটছে। যে চীনে চলেছি, হাতের বাংলা অক্ষর এখন থেকেই তার বর্ণমালার প্রতিরূপ নিতে শুরু করেছে। লেখা অবশ্য চালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু পড়ে দেবে কে?···

পাহাড় জমে আসছে, খাড়ির ওপারেও পাহাড়। ক্রমশ পাহাড়-ঘেরা হ্রদ হয়ে দাঁড়াল ঐ খাড়ি। পাহাড়ের ছায়া পড়ে মসীকৃষ্ণ দেখাচ্ছে জলের রং। জলের নিচে থেকেও ছোট ছোট পাহাড় মাথা উঁচু করেছে। পাহাড়ের গায়ে একেবারে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে এক নিশ্চল ষ্টিমার—চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে ঘুমন্ত জনের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো।
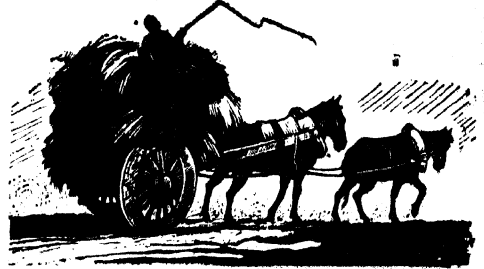
খবন ঘরে ফিরে যাচ্ছে (চীনা উডকাট)

তার পর কখন এক সময়ে হ্রদ থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছি, জল আর কোন দিকে নেই। সমতল জনপদ, একটা ছুটো পাহাড় কদাচিৎ। ষ্টেশন, হাটবাজার, ইস্কুল-মাঠ সাঁ-সাঁ করে পার হয়ে যাচ্ছি। সীমান্তে এসে গাড়ির গতি স্তব্ধ হল। আর এগোবার এক্তিয়ার নেই।

লাউহু—ষ্টেশনের নাম। বৃটিশ-প্রভুত্বের শেষ। মহাচীনের প্রান্তভাগে কীটদষ্ট কয়েকটা টুকরা এমনি রয়ে গেছে এখনো। অনেক দিন ধরে বিস্তর আরাম করেছে, হাই-হাই করে এখন যেন হাই তুলছে।

ছোট্ট খাল। খালের উপর পুল। খাল-পারে অনেক দূর অবধি কাঁটা-তারে ঘেরা। নতুন-চীনের আরম্ভ পুলের ও-পার থেকে।

আই-চুং হোটেল—ক্যাণ্টন

রোদ প্রখর। মালপত্র নামিয়ে স্তূপাকার করে রেখেছে। তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে যে যার জিনিষ দেখে নিতে ব্যস্ত। শুধু চোখের দেখা দেখলেই হল যে ঠিকমতো সমস্ত এসে পৌঁচেছে। আর কোন হাঙ্গামা নেই। এখান থেকে বয়ে নিয়ে ও-পারের গাড়িতে তোলা এবং ক্যাণ্টনে পৌঁছে দেওয়ার যাবতীয় দায়ঝক্কি ওঁদের। সর্বদা হাতের কাছে প্রয়োজন, গাড়ির গাদার মধ্যে দিলে চলবে না, সেই ক'টি জিনিষ শুধু হাতে করে নাও।

আমি ছোট স্যুটকেশটা নিয়েছি। কে আবার ওর থেকে আজে-বাজে জিনিষ বের করে আলাদা ভরে দিতে যায় এখন? কিন্তু আলস্যটুকু না করলেই ভাল হত। ভাবা উচিত ছিল, এক এলাকা থেকে একেবারে পৃথক আর এক এলাকায় ঢুকছি—পথ কিছু বেশিই হবে। আরও মুসকিল, কাষ্টমসের নানা আগড় অতিক্রম করে গজেন্দ্রগমনে এগুতে হচ্ছে। মাথায় চড়চড়ে রোদ—ছুটে গিয়ে বসব ও-পারে তার জো নেই।

পুলের মাঝামাঝি এসে পিছনে তাকাই একবার। ছোট খাল—এপারে-ওপারে তবু কি দুস্তর ব্যবধান! কার্তিক পাশে এসে পড়েছে। বলে উঠল, ট্রাউসার পনেরো ডলারে কিনেছে। কিন্তু কাপড় খেলো। সওদায় আমার সঙ্গে পারবে? উনি তো শান্তিস্থান—ওঁদের মাথা রাজাগোপালাচারীকে নিয়ে আসুন না!

পুল পেরিয়ে নতুন চীনের মাটিতে পা দিলাম। উঁচু টিলার উপর এখানে একজন ওখানে একজন বন্দুকধারী সৈন্য ঘাঁটি আগলাচ্ছে। নিচের মাঠে শুয়ে বসে ছিল একদল—গায়ে পোশাক কিন্তু হাতে অস্ত্র নেই। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তারা হাততালি দিচ্ছে। হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা করছে আমাদের।

চীনা যুবাণী

আর ওদিকে তারের বেড়ার ওধারে পদ্মবন। পদ্মফুলের সময় এখন নয়, ডাঁটার উপর বড় বড় পাতা ছত্রাকারে মেলা। দুলছে প্রসন্ন বাতাসে।

না দাদা, ঠকিয়েছে আমায়। তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ। কাপড় হয় তো উনিশ-বিশ—গালে চড় মেরে আমার কাছ থেকে আঠারো ডলার নিয়ে নিল। ট্রাউসারের দাম পনের-ষোলর বেশি হতে পারে না।

দ্রুত হেঁটে দূরবর্তী হই কার্তিকের কাছ থেকে। এ হাহাকার শুনতে পারি না। আরও যে কত ঠকে যাচ্ছ, হুঁশ নেই। দূরবিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তর-শেষে ছবির মতন ঐ সব ঘরবাড়ি, উদার সূর্যালোক, আনন্দ-ভাসিত পদ্মবন—তিন ডলারের শোকে আচ্ছন্ন হয়ে আছ, কিছুই এ সব তাকিয়ে দেখলে না একটি বার!

রাজা-মহারাজাদের অভ্যাগম হচ্ছে—এমনি খাতির! উঁহু, ভুল বললাম—অনেক কালের অদেখা আপন মানুষদের পেয়ে এরা উল্লাসে মেতে গিয়েছে। তাই বটে! প্রশান্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইদানীং যারা চীনের তটে উঠেছে, লুঠেরা প্রায় সবাই; আফিঙের মৌতাতে অজ্ঞান করে রেখে সর্বস্ব পাচার করে দিত নানান দিকে। আজকের এই ব্যাপার নিতান্ত অভিনব। সাঁইত্রিশটা দেশের নির্বিরোধী মানুষেরা শলা করতে আসছে, আনন্দ এবং মান-ইজ্জত নিয়ে কি করে সকলে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারে।

বাজনা বাজছে। শিল্পী পিকাসোর পরিকল্পিত সুবৃহৎ কবুতরের ছবি—তারই নিচে দিয়ে তোরণদ্বার অতিক্রম করে এগিয়ে গেলাম। ষ্টেশনের নাম সেন-চুন। মোভি-ক্যামেরায় চলন্ত ছবি নিচ্ছে। দুজন মহিলা ছিলেন, কার্তিক এগিয়ে তাঁদের কাছে জুটল। হাত নেড়ে ব্যস্তভাবে কি কথা বলছে। আমি কিন্তু জানি। কথোপকথন লোক-দেখানো—আসল দরকার বুঝতে পেরেছি। মেয়েদের সঙ্গে ক্যামেরার মুখে দাঁড়াবে। মেয়েদের খাতিরে ক্যামেরা নিশ্চয় একটু বেশি ক্ষণ থাকবে ওঁদের উপর, কার্তিক ঐ সঙ্গে ভালমতো ছবিতে উঠবে।

ষ্টেশনে পা দিয়েই তাজ্জব! ওয়েটিং-রুম না লাইব্রেরি? টানা টেবিলের ধারে বেঞ্চি, লোকে সারি সারি বসে পড়ছে। বই সাজানো আছে একদিকে, রেল কোম্পানির লোক আছে লেনদেন ও খবরদারির জন্য। মহাব্যস্ত তারা। চীনা ভাষা অবোধ্য, তবু উল্টে-পাল্টে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে বোঝা গেল, শিশুপাঠ্য থেকে উঁচু রাজনীতি-সংক্রান্ত—সকল রকমের বই আছে। কার্ল মার্কস এঙ্গেলস লেনিন ষ্টালিন প্রভৃতির ছবি থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে মার্কসবাদ ও কম্যুনিজমের বইও বিস্তর। একেবারে চুপচাপ—মাটিতে সূঁচ ফেললে বুঝি শোনা যাবে। হৈ-হল্লোড়ের জায়গা ষ্টেশন—কিন্তু এই প্রান্তটুকুতে যেন ধ্যানস্তব্ধ তপস্যার ক্ষেত্র বানিয়েছে। ট্রেনে যাবার জন্য ষ্টেশনে এসেছে, গাড়ির দেরি আছে—আহা, মিছে সময় নষ্ট করে হবে কি? পড়ো বসে বসে—শিখে নাও এই ফাঁকে যতটুকু পারো।

সবাই যে পড়ছে, তা নয়। পড়তে জানেও না কত জন! ক্যারমবোর্ড আছে, ভূমিতে নয়—খানিকটা উঁচুতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলতে হয়। খেলছে কয়েক জনে চারিদিক ঘিরে। আর ওদিকে সারি সারি বেঞ্চি পাতা, পিছনে ঠেশ দেবার ব্যবস্থা

য়াছে। আমাদের ইস্কুলে যেমন ক্লাস সাজানো থাকে! অনেকে বসে আছে সেখানে। যাত্রীদের মালপত্র একদিকে পাশাপাশি সাজানো। শৃঙ্খলা সর্বত্র।

দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও পোষ্টার। ইতস্তত নয়, সাজাবার পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি আছে। শিক্ষার সঙ্গে শিল্পরুচির অপরূপ সমন্বয়। আছে খবরের কাগজ—বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে আঁটা। নতুন-চীন ডাকহাঁক করে সকলকে শোনাতে চায়—কি মাণিক্য সে পেয়েছে, আরও কি কি সে পেতে চায়। এই সীমান্ত-ষ্টেশন থেকেই তার শুরু।

আর এক বিস্ময়—ষ্টেশন জায়গা, এত মানুষের আনাগোনা, কিন্তু ধূলো-ময়লা নেই কোনখানে। ছোট্ট মেয়েটা কমলালেবু খেল—আরে আরে, খোসা নিয়ে গুট গুট করে যায় কোথা ওদিকে? আবর্জনা ফেলবার জায়গা আছে—উপরে ঢাকনি, ঢাকনির সঙ্গে কাঠের লম্বা হাতল। হাতল ধরে ঢাকনি তুলে লেবুর খোলা তার মধ্যে ফেলে আবার ঢাকা দিল। থুতু ফেলচে, তা-ও এই সব জায়গায়। কেমন অসোয়াস্তি লাগে। নিতান্তই রেললাইন পাশে, তাই ধরে নিচ্ছি ষ্টেশন। নইলে বাস-ঘর বললেই বা ঠেকায় কে? ভয় হয়, কেউ আবার জুতো খুলতে না বলে বসে!

এদিকে—

ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন না—হাত নেড়ে হাস্যমুখে পাশের হলঘর দেখাচ্ছেন, ঢুকে পড়তে ইসারা করছেন।

নিচু নিচু টেবিলে কেক স্যাণ্ডউইচ রকমারি ফল লেমন-স্কোয়াশ ইত্যাদি। চা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে জনে জনের কাছে। অতএব ঢোকাবার কারণ বোঝা যাচ্ছে; মুখের বাক্য নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু বাক্যবিদ্‌ও একজন এসে পড়লেন।

দাঁড়িয়ে আছেন আপনি?

এতক্ষণ বসে বসে এলাম। আবার এই ঘরের ভিতর ঠায় বসিয়ে রাখবেন, দেখতে শুনতে দেবেন না?

দেখবেন বই কি! দোষ-ত্রুটিও দেখিয়ে দেবেন, এই আমরা চাই। কিন্তু কষ্ট করে এলেন, এখন বিশ্রাম নিন।

বললাম, সকালে হংকং থেকে আচ্ছা এক দফা হেঁটে ট্রেনে উঠেছি। তুলোর বাক্সে যেমন করে আঙুর আনে, সারা পথ তেমনি করে তো নিয়ে এলেন। বলছেন যখন, কষ্ট কিছু করেছি নিশ্চয়। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি নে। দয়া করে যদি একটু ধরিয়ে দেন, তদনুপাতে বসে বসে হাঁপাতে থাকি আর সরবত গিলি।...

এক বর্ষীয়সী ষ্টেশনে আসছেন—পিঠের সঙ্গে বাচ্চা বাঁধা, আর এক বাচ্চাকে হাতে ধরে হাঁটিয়ে আনছেন। পিছনে এক তরুণী—ছোট বোনই হবে আগের জনের। হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা—ছিমছাম আধুনিকা। কিন্তু কাণ্ড দেখুন—কাঁধে এক বাঁক, বাঁকের দুই প্রান্তে গন্ধমাদন তুল্য দুই বোঝা। দিন দুপুরে অন্তত পক্ষে শ' দুই-তিন চক্ষুর সামনে প্রকাশ্য ষ্টেশনের উপর আধুনিকা বাঁকে ঝুলিয়ে বোঝা নিয়ে আসছে—ভ্যানিটি-ব্যাগ বইতেই ঘাম বেরিয়ে যায় 'পল্লবিনী-লতেব' এবম্বিধ ললনা দর্শনে অভ্যস্ত আমাদের দৃষ্টিতে আর পলক নেই।

না, দেখেছিলাম একবার গোবরডাঙা ষ্টেশনে। পায়ে মল ও আলতা, মাথায় দেড়গজি ঘোমটা—এক বউ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে নিয়ে চলেছে। আগে আগে যাচ্ছে স্বামীপ্রবর—হাতে ছড়ি, মুখে বিড়ি, কাঁপানো টেড়ি মাথায়। ছড়ি তুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, বউ পিছিয়ে পড়ছে বলে। গাড়ির কামরায় বসে সেই একবার দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে ছড়ি-ধারী মার্তণ্ড-মূর্তি দেখছি না কেউ কাছে-পিঠে। আর বোঝা বয়ে মেয়েটা একটু যে কাতর হয়েছে, তার কোন চিহ্ন নেই। বরঞ্চ 'রণং দেহি' দৃষ্টি। দাও না আর গোটা দুই বোঝা এর উপর, ভরাই নাকি—চোখে মুখে এমনি ভাব প্রকট। দুম করে বোঝা নামাল, রাখল সে দুটো সাজিয়ে। হাতঘড়ি এক নজর দেখে টিকিট করতে চলল।

স্বাস্থ্যাম্বিত উজ্জ্বল-মেয়েগুলোর এমনি প্রতাপ নতুন-চীনের পথে ঘাটে সর্বত্র। ওয়াং-সিও-মেই-কে তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম—থাক গে এখন। ওকথা পরে হবে।

ছোট ষ্টেশন ছিল। এখন প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে নানান দিকে। অনেক লোক খাটছে, দিনকে-দিন ভোল বদলে যাচ্ছে। আমাদের জিনিষপত্র এনে ফেলেছে। আবার একটু কাজ—কোন জিনিষটা কার, বলে দেওয়া। ওদের নিজ ভাষায় নাম লিখে নিয়ে যথাব্যবস্থা করবে। ক্যান্টনের হোটেলে গিয়ে দেখতে পাবেন, ঘরের তাকে আপনার বাক্স-বোঁচকা সাজানো রয়েছে।

দাদা, রাখবেন তো আমায়?

কার্তিক এসে অনুনয় করছে। অবাক হয়ে বলি, মারছে কে আপনাকে? আর মারে যদি, আমিই কোন শক্তি ধরি রুখবার?

কার্তিক বলে, আপনি মালিক—সর্বশক্তিমান। সমস্ত আপনার হাতে—হাতের ঐ কলমের ডগায়। এত টুকছেন, আমার কথাও টুকে নেবেন। বইয়ে যেন বাদ না পড়ি।

হুড়মুড় করে ট্রেন এসে পড়ল। ট্রেন এলো কামরা ভর্তি কলহাস্য আর প্রাণ-চাঞ্চল্য নিয়ে। গাড়ি থামতে না থামতে

লেখককে অভ্যর্থনা

ছড়িয়ে পড়ল প্লাটফরমে, আমাদের বসবার ঘরে, আমাদের সকলের মনে মনে।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রী—টাটকা গ্রাজুয়েটও আছে কয়েকটি। অতিথিদের দেখাশুনো ও দোভাষির কাজ করবে। ভার পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে, এমনি ভাব। পরে আরো কত ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে—তাদের এ কাজে আনা হয় নি, যেহেতু তারা বিদেশি ভাষা-বিভাগের (foreign language department) নয়। বেচারিরা সেজন্য মরমে মরে আছে।

সাঁইত্রিশটা দেশের প্রায় পৌনে চার শ' অতিথি—এমনি হাজার তিনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের আপ্যায়নের জন্য এসেছে। পড়াশুনো মুলতুবি রেখে ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। নানা জায়গায় ছড়িয়ে রাখা হয়েছে তাদের, যেখানে-যেখানে অতিথিদের পা পড়বে। সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি অবশ্য পিকিনে; কাজের দক্ষতাও তাদের সর্বাধিক। দিন নেই রাত নেই, শীত নেই বর্ষা নেই, সময় নেই অসময় নেই—ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে আছে। পান থেকে কারো চুণ না খসে, এমনি সতর্কতা।

ঐ ট্রেনই আমাদের বয়ে নিয়ে যাবে ক্যাণ্টনে। দাঁড়িয়ে আছে। উঠুন, উঠে পড়ুন এবার দয়া করে। ছেলে আর মেয়েগুলো ঘিরে নিয়ে আমাদের গাড়িতে তুলল। ওরাও চলল সঙ্গে। শুধুমাত্র বিদেশীয় হওয়ার গুণে এতখানি খাতির মেলে, আগে কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি?

গাড়ি ছাড়ল। পিছনে তাকালাম একবার। বৃটিশ-এলাকা একটু-একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। দুই রাজ্যের মাঝখানে ছোট্ট একটু খাল—অথচ আকাশ ও পাতালের ব্যবধান। হঠাৎ যেন নিশ্বাস লাগল গায়ে, নিশ্বাসের মতন হাওয়া। হাওয়া আসে ওপারের লাউ-হু ষ্টেশনের দিক থেকে। ঝর-ঝর করে পাতা ঝরে প্লাটফরমের গাছটার। রৌদ্রদীপ্ত আকাশের নিচে মনে হল রূপগরবিণী হংকং ঈর্ষ্যান্বিত চোখে তাকাচ্ছে নবীন-চীনের দিকে। মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরামেই ছিল মোটের উপর। একটিমাত্র বৃটিশ-মনিবের মন জুগিয়ে এসেছে—চীনের মতো বারো ভূতের হাতে ভোগান্তি হয়নি। আজকে শতেক বৎসর পরে টনটন করে উঠেছে বুঝি পুরানো নাড়ি-ছেঁড়া বেদনা!

ট্রেনে দুটো ক্লাস—নরম আর শক্ত। নরম ক্লাসের বেঞ্চিতে গদি-আঁটা, ভাড়াও কিছু বেশি। শক্ত ক্লাসে শুধু কাঠ। তফাৎ এই মাত্র, আর কিছু নয়। যাত্রীরা চা পায় বিনামূল্যে। খাও বা না খাও সামনে চা রয়েছে; ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঢেলে নিয়ে চা-পাতায় আবার গরম জল দিয়ে যাচ্ছে। নরম বা শক্ত ক্লাস বলে কোন বাছ-বিচার নেই। টানা পথ গিয়েছে আমাদের খোপগুলোর পাশ দিয়ে—ইঞ্জিন থেকে শেষ অবধি এই পথে গতায়াত চলে। লাউড-স্পিকার প্রতি কামরায়—মাঝে-মাঝে গান হচ্ছে যাত্রীদের খুশি রাখবার জন্য। কাজের কথাও হচ্ছে—অমুক ষ্টেশনে আসছে এবার; এক মিনিট থাকবে; যারা নামবে, তৈরি হও এখন থেকে। কিম্বা, অমুক পাহাড় দেখ ঐ ডান দিকে। অমুক নদীর পুল। লড়াইয়ের সময় বিশ জন মুক্তিসৈন্য আশ্রয় নিয়েছিল এই পুলের নিচে—কি কষ্ট তাদের, কি কষ্ট!

ট্রেন যে অঞ্চল অতিক্রম করছে, সেটা চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এমনি করে। ভূগোল আর ইতিহাস পুঁথির পাতায় মাত্র নয়—জীবন্ত হয়ে উঠছে চোখের সামনে। আমরা চীনা ভাষা বুঝি না, বোকার মতো হাঁ করে থাকি—ওরাই সদয় হয়ে যা-কিছু মানে বলে দেয়। কিন্তু কত আর বলবে! নানা জনের নানা প্রশ্নে টগবগ করে মুখে খই ফুটছে। চতুর্মুখের চারটে করে মুখ হলেও বোধ হয়, খই পেতো না।

সত্যি, একি অমোঘ সঙ্কল্প! শতকরা আশী জন ছিল অশিক্ষিত—তাদের একটি প্রাণীকে আর অজ্ঞ থাকতে দেবে না। সেন-চুন ষ্টেশনে পা দিয়ে দেখেছিলাম, গাড়ির মধ্যেও ঠিক সেই ব্যাপার। ইস্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তো আছেই—পথযাত্রী, এখন একটু ফাঁক পেয়েছে, শিখে নাও যেটুকু পারো।

পরে দেখেছি, এ নীতি চীনের সর্বত্র। ভোর বেলা—হ্যাংচাউয়ে হ্রদের কিনারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সারি সারি নৌকো বাঁধা। নৌকো চালায় মেয়েরাই বেশির ভাগ। চড়নদার বেলায় আসবে। হাতে কাজ নেই—কি করবে, গলুয়ের সঙ্গে আঁটা কাঠের বাক্স থেকে বই বের করে নিয়ে পড়তে লাগল। রাত বারোটায় বাসে চড়ে পিকিঙের পথে শেষ দিনের শান্তি সম্মেলনে যাচ্ছি—রাস্তার ধারে আলো জেলে ঐ বাঘা শীতের মধ্যে বয়স্কেরা লেখাপড়া করছে। দিনমানে সময় পায় না, লেখাপড়া শিখতেই তো হবে—রাত বারোটায় এসে জমেছে। গিয়েছি এক গ্রামে। বেলা দুপুর। ভয়াবহ চিৎকার আসছে উঠোন থেকে। কি ব্যাপার? একদল সৈন্য বিশ্রামের জন্য আছে, সেখানেই হাঁক ডাক করে তারা পাঠ অভ্যাস করছে। নিরক্ষর ছিল। অল্প ক'দিনের মধ্যে শিখে নিতে হবে। তাই উৎসাহ ও বিক্রমের অবধি নেই।

যাক গে, পরের কথা—এ সব পরে হবে। ঝকমক করছে গাড়ির কামরাগুলো, বেঞ্চির উপরে পাটভাঙা চাদর পাতা। দুপুরের ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা চলতি ট্রেনে—আমিষ নিরামিষ যেমন খুশি। খেয়েদেয়ে ঝিমুনি আসছে। কিন্তু না—অপরাধ মনে করি এ জায়গায় ঘুমানো। জীবনের এত বছর অতীত হয়েছে, অর্ধেক তার তো ঘুমিয়েই কাটালাম। আজকে জাগ্রত থাকো দুই চক্ষু। ট্রেন ছুটেছে মাটি কাঁপিয়ে। গ্রাম ঘরবাড়ি মাঠঘাট নদীনালায় শ্যামশ্রী নতুন-চীনের হাস্যাননই দেখতে পাচ্ছি চতুর্দিকে। বন্ধুজনেরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অনেক অনেক রক্তস্রোতে ভেসে আজকের এ দিনে এরা পৌঁছেছে। সকলের মুখে নজর করি, এক-একটা ষ্টেশনের প্লাটফরমে নেমে তাকাই এদিক-ওদিক। রক্তের দাগ লেগে থাকে যদি কোথাও!

দক্ষিণ-চীনের এই অঞ্চল বাংলা দেশ বলে বারম্বার ভুল হয়ে যায়, ঠিক পূর্ব-বাংলা। বাঁশঝাড় গ্রামের ধারে। কলাগাছ, পেঁপেগাছ, কলাই ক্ষেত। জলা জায়গায় কত পদ্মবন! নিঃসীম ধানক্ষেত। পাটক্ষেতও অনেক। আমাদের পাটের জিনিষের পুরানো খদ্দের চীন। মতলব ভাল নয় তবে তো—নিজেরা পাট চাষ করছে। নানা একজিবিশনে গিয়ে দেখেছি, কোথায় কত পাটকল হয়েছে তার হিসাব। পাটের জিনিষের উৎপাদন অতি-দ্রুত বাড়ছে। তৈরি জিনিষের নমুনাও দেখিয়েছে।

ঢাকা-ময়মনসিঙের মতো উৎকৃষ্ট নয় যদিচ, তবু দিব্যি কাজ চলবে। পাকিস্তানি বন্ধুদের সঙ্গে একত্র গিয়েছিলাম এক একজিবিশনে। উভয় তরফ থেকে চোখ টেপাটেপি করি—হায় রে, এ বাজারটাও হাতছাড়া হয়ে গেল! আগে জানতাম, পাট বাংলার একচেটিয়া। সে গর্ব নির্মমভাবে ভেঙে দিচ্ছে নানান জায়গা থেকে।

দীর্ঘ দেহ এবং দীর্ঘ দাড়ি মকবুল হোসেন—মাথায় কালো টুপি। বম্বের নাম-করা চিত্রকর। তিনি স্কেচ করে চলেছেন পাতার পর পাতা। ছেলে-মেয়েরা ঘিরে ধরেছে। স্বচ্ছ হাসি সর্বদা তাঁর মুখের উপর—সেই হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে দিলেন স্কেচগুলো। ওরা দেখছে, মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকাতাকি করছে পরস্পরের দিকে। হাতে হাতে ঘুরছে ছবি।

হঠাৎ দেখি, হোসেন সাহেবকে ছেড়ে আমার দিকে ধাওয়া করেছে। কৌশলটা তাঁরই—আমি এক লম্বা-চওড়া লেখক ইত্যাদি বলে থাকবেন। হাতে কলম, সিঁদের মুখে চোর ধরার গতিক। ছেলেমেয়ের দঙ্গল হটিয়ে দিয়ে হোসেন আবার কাজে মনোযোগ করেছেন। দু চোখে যা দেখেন, মহামূল্য মণিরত্নের মতো খাতার পাতায় তুলে নিতে চান।

কিন্তু আমার ছবি নয়, কলমের লেখা। তা-ও বাংলা অক্ষরে। এই দেখে বুঝবে কোন জন?

একটি মেয়ে তবু নাছোড়বান্দা।

কি লিখেছ পড়ো না একটুখানি!

তোমাদের কথা—

আমাদের নিয়ে আবার লেখা যায় নাকি?

ভাবীকালের মহাচীন তোমরা। তোমাদের জন্যেই চারিদিকের সকল আয়োজন! অবহেলার বস্তু তোমরা কিসে?

ঘাড় নেড়ে আবদারের সুরে বলল, বাজে কথা রাখো। নবেল আর গল্প লেখো, আমরা শুনেছি। কাদের নিয়ে তোমার গল্প, বলো তাই।

ফুটন্ত ফুলের মতো মুখখানা দুই করতলে ন্যস্ত করে উৎসুক চোখে চেয়ে আছে। জবাব দিতেই হয়।

বাংলা দেশের মানুষ নিয়ে। তাদের হাসি অশ্রু, ঘর-গৃহস্থালী, রাগ-অনুরাগের গল্প। আর আছে আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের কথা। কংগ্রেস আর দেশের মানুষ ইংরেজের সঙ্গে কতকাল ধরে অসম যুদ্ধ চালাল···শুনেছ কংগ্রেসের নাম?

কংগ্রেসের কথা অতি সামান্য জানে। বেশি শুনেছে নেহরুর নাম। আর সব চেয়ে বেশি জানে টেগোর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে। বিদেশি ভাষার ছাত্রছাত্রী বলেই সম্ভবত।

বলছিলাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা—তোমাদেরই মতো এমনি বয়স—হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে চড়েছে, গুলির মুখে প্রাণ দিয়েছে। ব্যক্তি-জীবনের সুখদুঃখ কপালের ঘামের মতো তারা মুছে ফেলেছিল দেশের মুক্তির জন্য। তাদের কথা লিখেছি আমার বইয়ে—

চোখ ছলছলিয়ে উঠল, স্পষ্ট দেখলাম। হাজার-হাজার মাইল দূরে ভিন্ন দেশের মেয়ে—সেখানকার চাঁদ সূর্যিও বুঝি আলাদা। আর সেই চলন্ত ট্রেনের মধ্যে ঐটুকু সময়ে আমাদের সর্বত্যাগীদের

কি-ই বা বলতে পেরেছি! তবু কাঁদল। ধরা গলায় বলে, বলো আরও তাদের কথা। ভাল করে শুনি।

খাতা এগিয়ে দিই। তোমার নামটা লেখো এখানে।

চীনা অক্ষরে লিখল। পাশে ইংরেজি বানানে লিখল আবার। ওং-ওইন (Wong Oyun)। কয়েক ঘণ্টার সঙ্গিনী সমব্যথিনী মেয়েটার হাতের লেখা ঝিকমিক করছে আমার ছোট্ট খাতাখানায়।

পরে এক সময় জিজ্ঞাসা করি, কেঁদেছিলে কেন?

ওং-ওইন মুখ ফিরিয়ে নিল। অত স্ত্রী স্বাধীনতার দেশ, তবু নজর তুলে কথার জবাব দিতে পারে না।

তোমার দেশেরও কত ছেলে-মেয়ে গেছে অমনি!

মেয়েটা বলে, অনেক—অনেক—আকাশের তারার মতো অগণ্য। কিন্তু তাদের জন্য কাঁদব কেন? তারা যা চেয়েছিল সে তো পাওয়া যাচ্ছে—

স্বচ্ছন্দ শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল। স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ফসল-ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি ছুটেছে। দিগব্যাপ্ত সবুজ শীর্ষে আজকের জনমনের আনন্দোচ্ছ্বাস ঢেউ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যেন। ওদের মানস-স্বপ্ন মঞ্জরিত হল এত দিনে?

হবে আমাদেরও। বললাম সেই কথা। ইংরেজ তামাম জাতটাকে দক্ষতাশূন্য করে রেখে গেছে। উঠে দাঁড়াতে কিছু সময় লাগবে। পড়ে থাকব না আর। দুঃখ-নিশার অন্তে স্বাধীন বিমুক্ত দুই পুরানো প্রতিবেশী আমরা আবার নতুন করে পরিচয়-স্থাপনা করতে এসেছি।

লড়াই চলছে চীনের সীমান্তে—কোরিয়ায়—ইয়েলু নদী পার হয়ে গিয়ে। তাই বা কেন—ইয়েলুর এ পারেও পড়েছে সাংঘাতিক বোমা। সে থাক গে, দেশে ফিরে অনেক সকালবেলা চায়ের বাটি ও খবরের কাগজ নিয়ে আলোচনা চালানো যেতে পারবে। আর এক বিষম লড়াই হচ্ছে সমস্ত চীন জুড়ে, এমন গ্রাম নেই যেখানে লড়াই না আছে। ঘরোয়া যুদ্ধ—বিস্তারিত ব্যাপারটা অনেক বিদেশির চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু ফলাফল অতি প্রত্যক্ষ। রেলপথের দু-পাশে ঐ দেখতে দেখতে যাচ্ছি।

আচ্ছা, জ্ঞান হবার পর থেকেই যে-চীনে দুর্ভিক্ষের কথা শুনে আসছি, দুর্ভিক্ষের চাঁদাও দিয়েছি কতবার—হঠাৎ সে-দেশ এমন আড়তদারি কেঁদে বসল কিসে? দেদার চাল বিক্রি করছে। পিকিনে ভারতীয় দূতাবাসে দেখা করতে গেলাম, সে সময়টা তাঁরা ভারি ব্যস্ত। বললেন, কিছু চাল খরিদের তালে আছি এদের কাছ থেকে। পিকিন ছাড়বার মুখে আবার যখন গিয়েছি, চাল গস্ত করা হয়ে গেছে। বহুবিস্তীর্ণ দেশের সংখ্যাতীত মুখে ভাত জুগিয়ে আরও বিক্রি করে, এত চাল চীন পাচ্ছে কোথায়?

ঐ যা বললাম—লড়াইয়ের ফল। লড়াইয়ে মানুষ সাফ হয়ে যায়, খাদ্যের আর প্রয়োজন থাকে না। এ লড়াইয়ে কিন্তু তা নয়। মানুষ বিষম জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ভীষণ খাচ্ছে। এত খেয়েও ফুরোয় না, তাই এখন বাজারে দিচ্ছে।

দেখুন—দেখুন না তাকিয়ে—

আঙুল দিয়ে দেখায় ওরা। ফসলের ক্ষেত রেলের পাটি ছোঁব-ছোঁব করেছে। এক ছিটে জায়গা বাদ দিতে চায় না।

দুই পাটির ফাঁকে ওখানেও তো কিছু আর্জানো যেত! গোল আলু কি ব্যাঙের ছাতা? তা কি হয়েছে—রেলগাড়ি গড়গড় করে উপর দিয়ে চলে যেত। এ কিন্তু জমির অন্যায় অপচয়।

ঠাট্টা করে বললাম, কিন্তু গতিক এমনই বটে! পাগল হয়ে চাষে নেমেছে। খানাখন্দ ভরাট করছে। পাহাড়ের উপরে কেটে চৌরস করে সেখানেও চাষ। যে ফসল যেখানে ফলানো যায়।

চীনদেশের অফুরন্ত জমি, কিন্তু নিজের বলতে এক ছটাক জমি ছিল না অধিকাংশ লোকের। জমির মালিক জমিদার কিম্বা ধনী-চাষী—ঈশ্বর যেন তাদের ইজারা দিয়ে দিয়েছেন। চড়া খাজনায় জমি বন্দোবস্ত নিতে হত ওদের কাছ থেকে, কিম্বা মজুরি খাটত অন্যের ভুঁইয়ে। ঋণ করত মহাজনের কাছে—সে ঋণ যথানিয়মে লাফিয়ে লাফিয়ে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠত। মাটির সন্তানের দুর্ভোগে কুপিতা ভূমিলক্ষ্মী বিগড়ে গেলেন, রুগ্ন অশক্ত শিরদাঁড়া-ভাঙা চাষীর জমিতে ফসল ফলে না। দেশ জুড়ে নিরন্নের হাহাকার। সরকারি প্রচার-যন্ত্র হাঁকড়াচ্ছে—জনবৃদ্ধি ঘটেছে, অত খাদ্য আসবে কোত্থেকে? ধান-গম ছেড়ে ঘাসপাতা খাও বেশি করে। বিদেশের তুষ-ভুষি আনা হচ্ছে জাহাজ বোঝাই করে। উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের এই চীনের সঙ্গে, দেখুন দিকি, আমাদের অবস্থা মেলে কিনা খানিকটা?

জমিদারের সঙ্গে চাষাভুষোর রোমহর্ষক নানা সম্পর্ক—এ ব্যাপারে চীন আমাদের অনেক দূর ছাড়িয়ে ছিল। খাজনার উপরে এটা-ওটা দেওয়া, বেগার খাটা—ওসব তো ছিলই। আমাদের এখানে আছে, ওদেরও ছিল। আর যা ছিল, আমাদের লোকে শুনে কানে আঙুল দেবে। নতুন লাউ ফললে কি প্রথম গাই বিয়োলে মনিবের ভোগে দিতে হয়। নিজের স্ত্রী-কন্যার সম্পর্কেও কোন কোন ক্ষেত্রে অমনি বিধি।

কিন্তু এসব নিতান্তই অতীতের কথা। তিনটে বছরেই যেন অনেক পুরানো ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের মানুষ শিউরে ওঠে বিভীষিকার সে সব দিন মনে করতে গিয়ে। মুক্তির অবাধ আলো, নব জীবনের আনন্দ-স্বাদ! আর কি লড়াই, কি লড়াই! গ্রামে ঢুকছ—পথের মোড়ে ও নানা প্রকাশ্য জায়গায় দেখতে পাবে লড়াইয়ের বীরদের ছবি। কৃষক-বীর, শ্রমিক-বীর। ক্ষেতে দেড়া-ফসল ফলিয়েছে—চারিদিকে সেই বীরের জয়জয়কার। খবরের কাগজে ছবি উঠছে, নাম বেরুচ্ছে। সরকার থেকে পুরস্কার দিচ্ছে, আরামের প্রাসাদে পাঠাচ্ছে কিছুদিনের জন্য। রাজা-মহারাজা এবং বড় বড় ধনীরা ঐ সব প্রাসাদ বানিয়েছিলেন—স্ফূর্তির তুফান উঠত অহোরাত্রি। নিরন্ন নির্ধন গ্রাম্য চাষী, সর্ব সঙ্গে এখনো সেদিনের দারিদ্র্য লাঞ্ছন—প্যালেসে গিয়ে এখন তারা গদিতে শুচ্ছে, কৌচে বসে তাস দাবা খেলছে। শুধু বিলাস-সম্ভোগই নয়—কত ইজ্জত। চাষীরা তাই প্রাণপাত খাটে। আর, মা-লক্ষ্মী চুপিসাড়ে হিমালয় পার হয়ে গিয়ে ঐ নিরীশ্বর দেশে আঁচল বিছিয়ে বসেছেন। আমাদের ভাগ্যে অধিষ্ঠিতা মা ভবানী।

সন্ধ্যা হল। আকাশে মেঘের ঘন ঘটা। ক্যান্টনের আর দেরি নেই। পূর্ববর্তী শহরতলীর ষ্টেশনে গাড়ি থামল। জায়গাটার নাম—না, পড়বার উপায় নেই—এখন শুধুমাত্র চীনা অক্ষরে

ইংরেজি পরিচায়িকা বন্ধ চীনভূমিতে প্রবেশের পর থেকেই। ষ্টেশনের পাশে এক সাইজে-কাটা টুকরা কাঠ স্তূপীকৃত। দেশলাইয়ের কারখানা আছে তার জন্য। এরা যত দেশলাই জ্বালায়, আর যত সিগারেট পোড়ায়, সমস্ত স্বদেশে তৈরি। গাড়ি ধীরে ধীরে চলল ক্যাণ্টন অভিমুখে।

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামল। গান কানে আসছে বৃষ্টি-বাদলার অবিরল আওয়াজ ছাপিয়ে। বহুকণ্ঠের সমবেত গান। সুর থেকে আন্দাজ পাচ্ছি, এ গান শুনেছি সঙ্গীদের মুখে। তাদের গান করতে বলা হল, তারাও পাল্টা ভারতীয় গান শুনতে চাইল। উভয় তরফের গান হয়েছিল কয়েকটা। তার মধ্যে এই গানও শুনেছি। গানের মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল—'পৃথিবীর মানুষ এক হও, এক হও। সকল মানুষের একটি মাত্র হৃদয়—'

থামল গাড়ি। সম্বর্দনার অপরূপ ব্যবস্থা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে—বছর বারো-চোদ্দ বয়স—সারবন্দি প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে। পরিচ্ছন্ন বেশ, গলায় লাল রুমাল বাঁধা, সাদা কামিজ, কালো প্যাণ্ট। হাস্যবিস্মিত মুখ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। ইয়ং-পায়োনিয়র এরা। এক একজন আমরা কামরা থেকে নামছি, ওদের এক একটি এগিয়ে এসে প্রায় ব্রতচারী কায়দায় হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ফুলের মালা নয়, তোড়া দেওয়ার রীতি। তোড়া হাতে দিয়ে তারপর ডান হাত জড়িয়ে ধরল। এগিয়ে চলেছি। আমার পিছনে যিনি নামলেন, তিনিও ঠিক এমনি। তাঁর পিছনে যিনি, তিনিও।

ছবিটা কল্পনা করুন। সন্ধ্যার আঁধার ঘনতর হয়েছে মেঘ-ছায়ায়। বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিক বিমন্দ্রিত শত শত কণ্ঠের ঐক্য-সঙ্গীতে। হাত ধরে নিয়ে চলেছে প্রবীণ কর্তাব্যক্তিরা কেউ নয়—এই শিশুরা, ভাবী দিনের চীন! মিছিল করে চলেছি। উপহার-পাওয়া ফুলের তোড়া বুকের উপর, ডান হাতখানা কোমল মুঠির মধ্যে নিয়ে চীনভূমিতে পথ দেখিয়ে চলেছে—সে-ও পরম শুচি ফুল একটি। বিশিষ্টেরাও এসেছেন অবশ্য ষ্টেশনে—আপাতত তাঁরা অবান্তর। ছেলে-মেয়েদের দক্ষিণে ঐ দূরে দূরে চলেছেন তাঁরা, দরকার মতো দুটো-একটা কথার জোগান দিচ্ছেন।

আরও এগিয়ে আসতে হাততালি উঠল। হাততালি দিয়ে ক্যাণ্টনের মানুষ আবাহন করছে। গানও চলছে। আলো দিয়ে সাজিয়েছে সারা ষ্টেশন আর রাস্তার অনেক দূর অবধি। সৈন্য-দল সারবন্দি দূরে দাঁড়িয়ে গান করছে। সৈন্যেরা শুধু বন্দুক মারে না, গানও গায় তা হলে! গান গেয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে ষ্টেশনে জমায়েত হয়েছে। গান গাইছে ছাত্র-ছাত্রী, ফ্যাক্টরির কর্মী, ক্যাণ্টনের অগণ্য নাগরিকদল। গম্ভীর স্বস্তি-মন্ত্র। 'পৃথিবীর মানুষ এক হও সকলে, মানুষের দুঃখ বিদূরিত হোক, কল্যাণ আসুক সর্বত্র···'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভুলে গেলাম, বিদেশে এসেছি—কয়েক হাজার মাইল দূরবর্তী বাংলা দেশ থেকে। এ-ও আমার আপন ভূমি, চারিপাশের এই সব মানুষ আমার আপনার। মহাচীনকে ভালবেসে ফেললাম সেই মুহূর্তে, আমাদের চিরকালের সম্পর্ক নতুন করে চেতনায় এলো। মনের সমস্ত আকুতি দিয়ে কামনা করলাম, কোন অমঙ্গল কখনো যেন স্পর্শ না করে এই শিশুদের! বোমা না পড়ে এদের মাথায়, রক্ত না ঝরে মাটির উপর! পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হোক—সূর্যের আলোর মতো এদের এই সোনার হাসি ছড়াক দিগ্‌দিগন্তে।

আমার হাত ধরে যাচ্ছে মেয়েটি—দোভাষিকে দিয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। ওয়াই-মিঁয়া। ডাকলাম নাম ধরে। ওয়াই-মিঁয়া, তুমি ওয়াই-মিঁয়া? সরল নিষ্পাপ মুখ তুলে সে মধুর হাসি হাসল।

ষ্টেশনেই জলযোগের ব্যবস্থা। তা-বড় তা-বড় যাঁরা এসেছেন, এতক্ষণে তাঁদের পরিচয় পেলাম। অঞ্চলের গবর্নর, শহরের মেয়র, ডেপুটি-মেয়র, বড় বড় ব্যবসাদার ইত্যাদি। বেশভূষায় কিন্তু ঠাহর করবার উপায় নেই—মামুলি গলাবন্ধ-কোট ও প্যাণ্ট।

অপেক্ষমান মোটর ষ্টেশনের বাইরে। ছোট্ট সঙ্গিনীর হাতে হাত দিয়ে এসেছি, এইবারে বিচ্ছিন্ন হব। হাত ঝাঁকাচ্ছে, বারম্বার ঝাঁকাচ্ছে—কচি তুলতুলে হাতটুকুতে যত জোর আছে সমস্ত দিয়ে সেকহ্যাণ্ড করছে। ছাড়বে না···ছাড়তে কিছুতে চায় না। তার পর মোটরে উঠে বসলাম। জীবনে আর কোনদিন চোখে দেখব না ওয়াই-মিঁয়াকে। নামটা রয়েছে খাতায়।

গাড়ি হোটেলে নিয়ে চলল। পার্ল নদীর উত্তর তীরে আই-চুং হোটেল। ১৯৩৭ অব্দে তৈরি, পনের তলা প্রকাণ্ড বাড়ি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল এবার—প্রবল ধারাবর্ষণের মধ্যে ভিজতে ভিজতে অবিচল জনতা তখনো গাইছে। গান ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে একসময় মিলিয়ে গেল। হোটেলের ঘরে গভীর রাত্রি অবধি মনে তার অনুরণন শুনছি। এক হও, একপ্রাণ হও সমস্ত মানুষ···

[ক্রমশঃ।

জোটের মহল

[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

এক

বেশি দিনের কথা নয়—ইংরেজ আমলের একটা বিচ্ছিন্ন অজ্ঞাত বিপ্লবের কাহিনী।...

ঘুম আসছে...নিঝুম, মধুর ঘুম।

ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেছে পশ্চিম দিগন্তে। বাড়িয়াল বাঁশ বেতস বন বাবলার গায় রাঙা রশ্মি এখনও যেন রয়েছে জড়িয়ে। গাঁয়ের নীচে সুদূরপ্রসারী বিল—প্রায় বৃত্তাকার। তার জলে এই কিছুক্ষণ হয় ঝিলমিল করছিল যেন ঘন হিঙ্গুল।

ঘুম এলো বিলের উঁচু পাড়ের বাড়িয়াল ছেয়ে। চাষীর গোয়ালের গরু শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে চোখ বুঁজে। হাঁস পায়রা উঠেছে খোপে। সারা দিনমান দুরন্ত ছেলেমেয়ে খেলে নেতিয়ে পড়েছে মা'র কোলে, নয়ত মাসীর বিছানায়। ভাত চাইছে জেলেনীর কাছে দিনান্তের পরিশ্রান্ত জেলে। ঝিমিয়ে এলো 'পরণকথা-বলুনি' (রূপকথা বলা) ঠাকুরমা।

ঘুম আসছে...নিঝুম, মধুর ঘুম।

প্রদীপ যেমন একটু একটু করে নেবে, তেমনি নিবতে নিবতে নিবে নিঃশেষ হয়ে গেল গাঁয়ের কলরব।

ঘুমিয়ে পড়ল সব।

এ একখানা বাঙলার হাসি-কান্না বিয়োগ-বেদনা স্মৃতি ও বিস্মৃতি জড়ান জেলে জোলা কৈবর্ত ও চাষী নমঃশূদ্রের গ্রাম। শহর থেকে বহু নদী-নালা বিল-ঝিলে বিচ্ছিন্ন এই পল্লী। দূরত্ব এর অনেক—সভ্যতা এর অভিনব। জল-বায়ু ও মৃত্তিকার সংমিশ্রণে, শুধু কয়েকখানি লক্ষ্মীর পাঁচালী, মনসামংগল, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, সত্যপীরের পাঁচালী অথবা মানিকপীরের গান সম্বল করে গড়ে উঠেছে এই পল্লী-সভ্যতা। গরীব গৃহস্থেরা কি ভাবে কেমন করে একে একে এসে এই বিলাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে তা হয়ত অনেকেরই আজ স্মরণ নেই। কিন্তু বড় সুখে কেটে যাচ্ছিল দিন। বিলের জলে মাছে ধানে পরিপূর্ণ গৃহস্থের ঘর। হয়ত অভাব ছিল অনেকেরই কিন্তু তাদের মনটা অন্তত ভরা ছিল। আশা ছিল, ভরসা ছিল—ছিল আদান-প্রদানের প্রাচুর্য।

সেই বিলের কোলের গাঁয়েই ঘুম এলো, লঘু পায়ে আঁধার ও আবছায়ায়।...

কিছু মুসলমান কৃষাণও আছে—এসেছে এই বিলান জল ও জমির স্বার্থে। মিত্র হয়ে রয়েছে হিন্দুর,—তাই মমতা জন্মেছে প্রচুর। একই সংগে চাষ-আবাদ করে, হাটে-বন্দরে যায়, মাছ ধরে, বড় নদীতে তুফান এলে পাড়ি জমায়।

রাত নিশুতি হতে না হতে তারাও ঘুমিয়ে পড়ল।

জীবনের একটা দিন কেটে গেল।

দুই

এমনি আরও কত দিন যে কাটত তা বলা যায় না। পরিবর্তন এলো খাসমহলে—পূর্বাভাস সূচিত হলো নতুন ইতিবৃত্তের।

এই বিলাঞ্চল ছিল একজন ব্রাহ্মণের খারিজা তালুক। প্রজার সংগে খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে গোলমাল হতে হতে যায় এগার আইনে নিলাম হয়ে। তখন পরিণত হয় খাসমহলে এবং যোগ হয় পূর্বের সরকারী মহল দেবনগরের সংগে। একটা বড় নদীর শাখা শুকিয়ে যাওয়ায় এই সময় আংশিক জরিপেরও প্রয়োজন হয়। কারণ, বিল বাড়ল যেমন, তেমনি বৃদ্ধি হবে কর।

পুরান রাজকর্মচারীর অদল-বদল হল। নতুন আই, সি, এস জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন নয়া জরিপ ও নক্সা করতে। দক্ষ এবং পটু অফিসার নিয়োগ করা হল এক এক এলাকায়, নিংড়ে চুষে যারা আনতে জানে টাকা, যারা এতকাল খয়ের খেয়েছে ইংরেজের, ট্রেনিং নিয়েছে বুড়ো বয়স পর্যন্ত। কতক মধ্যস্বত্ব নালিশ দিয়ে নিলাম করান হয়েছিল পূর্বেই। ধীরে ধীরে তার পরের স্বত্বও নিলাম করিয়েছিল ব্রাহ্মণ কাগজ-পত্রে, কিন্তু দখলে ছিল প্রজার।

একটা তুমুল হট্টগোলের মুখে খাসমহলের হাতে এসে পড়ল বিলগাঁ।

বহু একর পরিধি এ বিলের—বহু জীবনযুদ্ধের ইতিহাস লেখা এর জলে, পাড়ে ও জংলা চরে। সুখ দুঃখ দম্ভ ও বীর্যের কত যে কাহিনী মানুষের মুখে মুখে আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়! বহু সত্যের সংগে অপূর্ব কবিত্ব করে অনেক মিথ্যার মসলা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সব এখন ধরা কঠিন, আর ধরতে বড় একটা কেউ চায় না—চায় শুধু শুনতে—কে কুমীরের লেজ ধরে টেনে তুলেছিল কূলে, কে ফকীর হয়ে বন্দী করেছিল বিলের বাঘকে মন্ত্রে, এমনি নানা আজগুবি কাহিনী। ছিল নাকি এক দল পরী এ বিলে।

ওরা এই বিলের মানুষ, তাই বিলকে ওরা ভালবাসে। স্বপ্ন বলো, স্বার্থ বলো, এই বিলকে ঘিরেই ওদের আশা-নিরাশার জন্ম।

যে তাঁতি সে জোটায় জেলেদের কাপড়, যে কলু সে যোগান দেয় তেল—বর্গাদার ফসল কেটে উঠানে তোলে, ভাগ-শিকারী ধরে আনে মাছ। জেলে-জেলেনীকে গান শোনায় বৈরাগী, পূজা-পার্বণ করে জগৎ আচার্য। কেবল কুন্দ বৈষ্ণবী পদাবলীর ললিত কলি গাইতে আসে ফাল্গুনে নয়ত চৈত্রের প্রথম। দোলের লাস্য ফুরিয়ে যেতে না যেতে সে এসে হাসিমুখে কুন্দ ফুলের মতই উদয় হয়। গান শোনায়, মন টলায়, তারপর একদিন ভিনগাঁয়ে চলে যায়।

জীবনটা যেন সুখ-দুখের মালা গাঁথা,—যুদ্ধ আছে, জরা আছে, আছে যুবক-যুবতীর যৌবন। অনেকটা কেয়ার গন্ধে সুরভিত যৌবনের মত, কিন্তু কাঁটা আছে, আরও আছে অতৃপ্তি এবং বিরহ মিলন। তবু এই বিচ্ছিন্ন বিলের বাসিন্দারা সুখেই ছিল—আদিম মুক্ত প্রকৃতির ওপর বংশানুক্রমিক অধিকারে।

এলো জলকর জরিপ। মুক্ত প্রকৃতিকে শোষণের শৃংখলে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দিনী করার সামন্ততান্ত্রিক চক্রান্ত! একটা ভয় ও আতংক সৃষ্টি হল ঘরে-ঘরে।

দীর্ঘ দুটো বছর কেটে গেল জল, চর ও বন্য জমি মেপে। এখন শিকল দেখে কোলের ছেলে-মেয়েও ভয় পায় না। আলাপ করে বিদেশী পাইক-পেয়াদা বরকন্দাজের সংগে। কেউ কেউ বা সংগে সংগে শিকল টানে। বৌরা হাসে জল আনতে গিয়ে। তারা বোঝে না যে কি সর্বনাশ আসছে ঐ জরিপের সংগে। সাপের মত শিকল, ছড়িয়ে যাবে কি যে উগ্র বিষ!

এ বিলের বৈশিষ্ট্যই বিশালতা। পশ্চিম পারের অর্দ্ধবৃত্তাকার

গ্রাম থেকে একদৃষ্টিতে পূর্ব পারের কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে কূর্মপৃষ্ঠের মত চর জেগেছে বিস্তর। আবার চরের বুকে উর্বর মাটির গর্ভকোষ ভেদ করে জন্মেছে প্রচুর নাম-গোত্রহীন ঝোপ-জংগল গাছ-গাছালি। তাদের নধর শ্যাম সমারোহ দেখলে চোখ ফেরান যায় না। এরও অনেকগুলি চরকে কেন্দ্র করে রূপকথার মতই অতি অপরূপ গল্প তৈরী হয়ে লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অতি উচ্চাংগের সুসাহিত্যের স্বাদ আছে প্রতিটি গল্প অথবা কাহিনীর ঘটনা-বিন্যাসে। সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রু গর্ব-গৌরব ও পৌরুষ মিশিয়ে এ এক বিচ্ছিন্ন মহাকাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাঝে মাঝে আছে হাজা-মজা বদ্ধ জলা—কোথাও বা গুমগুম শব্দ হয় কাচের মত পরিষ্কার অথৈ জলের তল থেকে। নেয়েরা প্রণাম ক'রে নাও সামলে চলে সেখান থেকে বাঁক ঘুরিয়ে।

কখনও বা পিংগল অথবা রাঙা মেঘের ছায়া নির্বাক্ হয়ে থাকে বিলের স্থির অচঞ্চল আর্শিতে। চখা ডাকে, বক ওড়ে, বাজ বিদ্যুতের মত ছোঁ মেরে উড়ে যায় শিকার ধরে। ফসলের মরসুমে কখনও বা আসে অগণিত পংগপাল। তাদের ধাওয়া করে নিয়ে যায় ঝাঁক-বাঁধা পাখীর দল। বিলের চরে ফসল জন্মেছে মানুষের প্রয়োজনে—প্রকৃতিই তা যেন পাহারা দিয়ে রাখছে মায়ের মত সযত্নে। সময়েতে জেলেরা দামাল ছেলের মত তার সংগে লড়াই করে, সময়েতে তারই কাছে আবার যেন আত্মসমর্পণ করে পরাভূত শিশুর মত কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকে। তাই সবাই যখন ঘুমায়, বিল যেন চেয়ে থাকে নুয়ে পড়ে, চিবুক ছুঁয়ে।

তিন

ভোর না হতেই কনক ঘাটে গেল। গ্রীষ্মকাল—ভাল লাগল ঠাণ্ডা জল, স্নান করল মনের আনন্দে। কাপড় সে বদলায়নি, কূলে উঠবে ভাবছে, এমন সময় একখানা ছিপডিঙি এসে ভিড়ল ঘাটে। তিন-চারটা বড় বড় বাঁশের ডালার মধ্যে যেন থৈ ফুটছে।

'কে ?'

'আমি জীবন।'

'কি মাছ ?'

'কই।'

'নিমু কিসে ?'

'কেন খারই আননি ?'

'না।'

'শীগ্গির আঁচল পাতো। রোজই তোমার এক ভুল। কেও আইস্যা পড়বে, শীগ্গির'···

'কানশায় যে কাঁটা।'

'মাছ খাবে, কাঁটা সবে না ?' একটু ব্যংগ হাসি হাসল জীবন 'নেও নেও আসো নায়ের কোলে।'

অগত্যা এগিয়ে এলো বিধবা কনক। এসে ভিজা আঁচল পাতল নিংড়ে। গোটা আষ্টেক বড় বড় কই মাছ তার আঁচলে গুঁজে দিল জীবন। ফুল দিল, একটা অসময়ের রাঙা পদ্ম। 'গৃহের ঠাকুররে নিবেদন কইর‍্যা দিও।'

'কেন আমি যদি খোঁপায় পরি ?'

'তুমি, তুমি যে বিধবা···না, না ইচ্ছা হইলে পর খোঁপায় ঠারইন কিন্তু কেও যেন দেখে না।'

মুখ ফাকাশে হয়ে গেল কনকের। কিন্তু পরক্ষণেই সে জল থেকে উঠে একটা তীক্ষ্ণ খাঁড়ার মত হাসল। আধো আঁধারে সে হাসি যেন ঝিলমিলিয়ে উঠল। 'আমি বিধবা—আর তুই বড় সধবা লো!'

আসল কথা, জীবনের স্ত্রী মারা গেছে বিয়ের দশ দিনের মধ্যেই। কিন্তু কনকের স্বামী মারা গেছে, না, আদৌ তার বিয়ে হয়নি তা কেউ জানে না। এ এক রহস্য। ছোট কাল থেকে সে মানুষ মামা-বাড়ীতে। হঠাৎ বড় হয়ে সে একদিন নিজেই এসে বাপের বাড়ী উঠল।

এখানে একমাত্র তার ভাই ছিল। পিতার মৃত্যুর পর সে জীবিকার জন্য নানা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াত। তাই কনক ছিল মামার বাড়ী। ঠিক জীবিকার অভাবে দিবাকর যে ঘুরত তা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। সে কতকটা খেয়ালের বশেই ঘুরত। কয়েক বছর সে এখানে-ওখানে কাটাল গুরুমশায়গিরি করে। অল্প বয়স, এ সব ভাল লাগবে কেন বেশী দিন ? হঠাৎ ঢুকল গিয়ে এক গানের দলে। সে দলে সে বশিষ্ঠের পাঠ বলত। বাকি সময়টা সে রামায়ণ ও মহাভারত পড়ে কাটাত। এ গানের দলেও তার মন বসল না। নির্জ্জীব পাঠ, ভীরু বাচন-ভংগি তার স্বভাবের সংগে খাপ খেল না। ছেলে ঠ্যাঙানও ছিল ভাল, এ যে তার চেয়েও অধম কাজ !

দিবাকরকে এই অধম কাজে দেওয়া হয়েছিল তার রূপ দেখে। ঠিক মুনি-ঋষির মত উন্নত দেহ, খাড়া নাক, তপ্ত গৌরবর্ণ। রাজা-গজা যে কোন ব্যক্তিই সাজতে পারে আভ আবীর ও সবেদার মাত্রা একটু বাড়িয়ে মেখে। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী সাজা বিষম দায়—পাঠ বলতে হয় স্রেফ আদুল গায়। ভাল একখানা নামাবলীও কুঞ্জ ভূঁইমালী অর্থাৎ দলের অধিকারী তখন পর্যন্ত খরিদ করতে পারেনি। তবে কিনলে কি কিনতে পারত না ? দলের মনোহর শীল, যে সাজে রাণী তারও নাকি শাড়ী নেই। তা না কিনে যদি আগে কেনা হয় নামাবলী তবে দল ভাংবে সেই দিনই। ভাল শাড়ী-ব্লাউজ পরিয়ে তাকে আসরে নামান হবে এই ভাংগানি দিয়েই নাকি মনোহরকে আনা হয়েছিল কালী শূরের দল থেকে। কালী শূরের দলে সে যে বসন পরে বছরের পর বছর রাণী সেজেছে, তা নাকি মেথরাণীতেও পরে না।

'আমি সেনাপতির পাঠ বলুম।' একদিন দিবাকর প্রস্তাব করল। 'নইলে অন্তত দুর্বাসার।'

'ওরে বাপ রে, তা হয় না—এ দলের সবাই দুর্ব্বাসা।'

'তবে আমার আর আশা করবেন না। নমস্কার অধিকারী মশাই!'

'ছিঃ ছিঃ, বামুনের ছেলে হইয়া তুমি পেন্নাম করছ কাকে ? ছিঃ ছিঃ, আস বাবা রাগ করে না। আমার দলের সব কয়ডিই দুর্ব্বাসা, তোমাকে আর লিষ্টিভুক্ত কইর‍্যা লাভ কি ?'

এইখানেই দিবাকরের নটজীবনের সমাপ্তি। কুঞ্জ ভূঁইমালীও বাঁচল কিছু মাইনের দেনা থেকে। সে আড় চোখে চেয়ে উদাস ভংগিতে দাঁড়িয়ে রইল।

দিবাকর তো যায় না! আর কতক্ষণ একটা ভংগি করে দাঁড়িয়ে থাকা চলে। 'ও কি?'

'এই ফুটা কমণ্ডলুটা নিয়া যাই। মাইনা যখন দেবেন না, তাপে গিয়া বৈশাখ মাসে 'ঝারা' বান্ধুম তুলসী-মঞ্চে।'

'না, না, সর্বনাশ! কে তোমার মাইনে বকেয়া রাখতে চায়? এই খেয়ার কড়ি নেও—পয়সা চাইর গণ্ডা—সপ্তাহ বাদে আইস বাবা, একেবারে চুক্তি কইর‍্যা দিমু'। একটা কানাকড়িও বাকি রাখুম না।'

'সপ্তাহ বাদেও কি গানের দল এখানে থাকবে?'

'না থাকে চিন্তা কি? জিগাইতে জিগাইতে একটু খোঁজ খবর কইর‍্যা যাবা—কুঞ্জ ভূঁইমালীরে এ তল্লাটে না চেনে কে?'

'কমণ্ডলুটাও তখন না হয় আমুম সংগে—এ তো আর দশ-বিশ মণ বোঝা না—আপনেই বা ভাবেন ক্যান?'

'তুমি বশিষ্ঠর নামে কলংক দিবা? এতকাল পাঠ কইলা মুনির? হিংসা ছাড় বাবা, লোভ করে না পর দ্রব্যে।'

'পর হইলে কি আপনে পীড়ন করতে সাহস পাইতেন মজুরী বকেয়া রাইখ্যা? আমিই বা তা ভাবুম ক্যান? আর হিংসার কথা কইলেন—আপনারে তো গুতাই নাই আমি। এখন চললাম —দেখা হইবে সময় মত। পেন্নাম!' হন্‌হন্ করে হেঁটে চলল দিবাকর। বহু দিনের পুরান কমণ্ডলুটা তার হাতে ঝক্‌মক করতে লাগল একটা স্বর্ণপাত্রের মত।

চার

এখনও পদবীটা আচার্য থাকলেও দিবাকর ব্রাহ্মণ নয়। পূর্বের সংস্কারই সমস্যা ঘটিয়ে রেখেছে।

দিবাকর সন্ধ্যার একটু আগে চলন্ত নৌকায় এক হাটে এসে উঠল। বিলাকলের হাট। মাঝখানে কতটুকু উঁচু স্থান—চারিদিকে অথৈ জল—যেন একটা দ্বীপ। তার চারিদিক বেড়ে অসংখ্য ডোঙা ডিঙি, জেলে যুগী ধান-চালের ব্যাপারীর নাও। ঢাকাই পান্‌সী, বরিশালের কাঠামীও আছে কয়েকখানা। তাদের উঁচু মাস্তুলগুলো বহু দূর থেকে দেখা যায়। এবং দূরে বসেই হাটুরেরা গবেষণা করে যে আজ ধানপাট, না, নারকেল সুপারি উঠবে বেশি।

আষাঢ় মাসে যখন ঢলক নামে, আকাশ ছেয়ে চলে কালো মেঘের সারি, তখন মাঝে মাঝে আসে চাটগায়ের ব্যাপারীর দল। নৌকাগুলো তাদের অদ্ভুত। জাহাজের যেন ছোট-খাট সংস্করণ—অথচ নেই একটি লোহা, আছে শুধু বেতের বাঁধন। সাগর পাড়ি দিয়ে আসে, তাই নাকি চুম্বকের পাহাড়ের আকর্ষণের ভয়ে শুধু বিখ্যাত প্রাচীন বেতই তারা ব্যবহার করে। তারা ওস্তাদ নেয়ে। প্রতিকূল বাতাসেও পাল খাটাতে পারে।

'ঠাকুর গোসাই পেন্নাম।' হাটের এক পাশ থেকে একটি যুবতী নারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মেয়েটি বলরামের। নায়ের ছইয়ের আবডালে থেকে প্রণাম জানাল দিবাকরকে। গলায় তার সোনার করমজা, হাতে মোটা রুলি, নিতম্ব বেষ্টন করে ঝলমল্ করছে একছড়া রূপোর বেট!

'কেমন আছিস?'

'ভাল—কাছে আসো, পা ধুইয়া এই নায়েই ওঠ না—আমরাও যামু বাড়ী।'

একটা লম্প জ্বালাল মেয়েটি তুষের আগুনের তাওয়ায় গন্ধকের কাঠি সংযোগ করে।

'গেছিলি কই? তোর দেখি বিয়া হইছে।' দিবাকর হেসে উঠল সজোরে। 'এটুখানি মাইয়া…হাঃ হাঃ হাঃ।'

'তবে কি আইবুড়া থাকুম চিরকাল, এই তোমার মত বুড়া বয়েস পর্যন্ত?'

'হাঃ হাঃ হাঃ এটুখানি মাইয়া—কথা কয় টাস্-টাস্। আমি নাকি বুড়া হইছি!'

'বড় যে হাস! তুমি আমায় এটু দেখলা কি?'

আজ প্রায় তিন বছর দিবাকর বাড়ী ছাড়া। তখন সত্যই এতটুকু ছিল মুক্তা—ছিল যেন ঝিনুকের বুকে সুপ্তা। কোন্ জহুরীর স্পর্শে যেন হঠাৎ খুলেছে যৌবন। আলো করে ফেলেছে নাওখানা। দিবাকর আশ্চর্য হয়ে গেল। জীবনের মাত্র তিনটি বছর! কিছুই তো আর ছোট নেই মুক্তার। চোখ মুখ সমস্ত অবয়ব। জতে এ কি ভংগিমা, দেহে এ কি কান্তি! এই কি সেই ছেঁড়া আধ-ময়লা কাপড়-পরা পাগলী মুক্তা? দিবাকর কেমন যেন জ্বালা অনুভব করে অন্তরে। কিসের জ্বালা সে তা বলতে পারে না—মধুর না বিষের তা সে সঠিক ধরতে পারে না।

সন্ধ্যা উতরে গেছে—বিলের কালো জল আর চেনা যায় না, গাঢ় হয়ে মিশে গেছে আঁধারের সংগে। হাট এতক্ষণে ভাঙা উচিত ছিল। কিন্তু বিলদেশের হাট বলেই তা ভাঙেনি, বরঞ্চ জমে উঠেছে জম্‌জম্ করে। হাজার হাজার লম্প এবং আলো জ্বলছে দোকানে পসারে নায়ে নায়ে! এত রোশনাই, এত কলরব, কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ ছিল না দিবাকরের—বাড়ীর কথাও সে ভুলে গেছে।

'দুঃখ হইল নাকি?' মুক্তা জিজ্ঞাসা করে।

'কিসের জন্য মুক্তা?'

'এই আমারে দেইখ্যা,—ভাল ঘরে ভাল বরে বিয়া হইছে বইল্যা।'

'আমি কি তোর শত্তুর?' একটু হাসতে চেষ্টা করল দিবাকর। কিন্তু পূর্বের মত আর সে হাসতে পারল না।

'মিত্তিরই বা বলি ক্যামনে? মুখ যে শুকনা। হিংসা হইল নাকি আমার মত বৌ অন্যে পাইছে দেইখ্যা?' শেষের কথাগুলি মুক্তা কানের কাছে এসে বলে।

'মুক্তা, তুই ঠিক তেমনিই আছিস।'

'বিয়ার জল গায় পড়ার পরও? তোমার চোখে ছানি পড়ছে গোসাই, কবিরাজ দেখাও।'

'আমি চললাম।'

মুক্তা খপ করে হাতখানা চেপে ধরে। একে এই হাটের ভিতর, তাতে নতুন কুটুম্বের নাও, দিবাকর লজ্জা ও ভয়ে একটুকু হয়ে যায়। 'ছাড় ছাড় মুক্তা—ছাড়।'

'যদি না ছাড়ি?'

'বড় বাড়াবাড়ি করিস তুই।'

'তবু তো ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল গোসাই।'

'তুই চুপ না করলে আমি উইঠ্যা যামু। হাত ছাড় আমার।'

'এই তোমার হাত ছাড়লাম গোসাই—রাইত যে আমার কাটে না।'

'ক্যান?'

কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে মুক্তা একটা অস্বাভাবিক সুরে বলে, 'এত যার গয়না, এত যার বাহারিয়া শাড়ি,—চোর-ডাকুর ভয়ে তার কি কখনও ঘুম আসে রাইতে? শয্যায় মনে হয় কণ্টক—গোসাই, বাবলা কাঁটা।'

'তুই পাগল!'

'হই নাই, কিন্তু হইতে কতক্ষণ!' মুক্তা এবার হাসিমুখে বলে, 'তোমার আশীর্বাদ অখণ্ড দেবতা। কত দিন কইছ, তুই সুখী হবি—এখন আমার সুখ সব্বখানে,—টাকা-পয়সা সোনা-দানা বসন-ভূষণে।' মুক্তা হাসতে থাকে। তার হাসির সংগে যেন হাজার হাজার সাচ্চা মুক্তাই ঝরতে থাকে।

মুক্তা সত্যই পাগল হলো নাকি? না এ তার কৃত্রিমতা, না সরলতা অথবা ব্যংগ ঠিক ধরতে পারল না দিবাকর। সে মুখ ফিরিয়ে মুক্তার দিকে তাকাল। সে চায় মুক্তার মুখে তার যে মনের প্রতিবিম্ব পড়েছে তাই দেখতে। একটা সমস্যার জাল নির্ভুল ভাবে খুলতে।

'এ কি! তুই কান্দ নাকি?'

'না, না।'

'তবে মুখ তুইল্যা চা।'

'ক্যান, তাকামু ক্যান? আমি না পরের মাইয়া মানুষ।'

বড় মুস্কিলে পড়ল দিবাকর। সে তো পরস্ত্রী হিসাবে দেখছে না মুক্তাকে! তার মনেও কোন কালি নেই। সে কিশোরী মুক্তার গলা শুনেই নায়ে এসেছে। এখন দায় ঠেকাল যুবতী মুক্তা। সে এখন শাঁখের করাতের মতই কাটতে চাইছে। একটা আশংকাও জাগল দিবাকরের মনে। এ নৌকার পুরুষ যাত্রীরা ফিরে এলে, তাদের সুমুখেই ও হয়ত যা-তা বলে ফেলবে। তখন আর লজ্জার পরিসীমা থাকবে না।

'আমি এখন উঠুম মুক্তা।'

'ক্যান গো, বাড়ী যাবা না?'

ইতস্তত করে দিবাকর জবাব দেয়, 'আইজ না।'

'কও কি! বিস্মিত মুক্তা দিবাকরের দিকে দুটো বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকে। স্পষ্ট বোঝা যায় কি যেন একটা ঝড়ো মেঘ ধেয়ে এলো ওর মনের আকাশে। 'এত কাছে আইস্যা ফিইর্যা যাবা? দুঃখ করে না? এত কঠিনও তোমার পরাণডা!'

'ক্যামনে বুঝলি?'

'বোঝে আবার ক্যামনে? বুদ্ধি থাকলে সবই বোঝে। আমারে পোলাপান (ছেলেমানুষ) পাইছ?' একটু চুপ করে সময় হরণ করে মুক্তা। 'তবে কাইলও যাবা না, পরশুও না। আমি হ্যাশে থাকুম মাত্তর তিন দিন।'

'এর মধ্যেই যামু একদিন।'

'এই নায়ে আমাগো সাথে আইজ গেলে দোষ হইত কি?'

'না, না, তেমন কিছু দোষ হইত না...'

'আমি অত অবুঝ না। আইজ যদি না-ই যাও তবে অন্তত আমি হ্যাশে থাকতে ও-মুখি আর ফিরিও না। ভবঘুইর্যা ঠাকুর এই নেও তোমার কমণ্ডলু—তোমার গুরুর দোহাই আমার কথার জানি ব্যত্যয় না হয়।'

দিবাকর উঠে গেল নাও ছেড়ে।

মুক্তা ভেবেছিল অনেক দিন পরে দেখা, কত কথা জিজ্ঞাসা করবে এবং বলবে। শোক-দুঃখের কথা নয়, কথা দেশ-বিদেশের। নিজেদের কাহিনী নয়—কাহিনী অপরের—হয়ত ব্যথিতা নিতান্ত কোন অপরিচিতার। আরও ইচ্ছা ছিল, নিজের ঘরের কোটা টাটকা চিড়া মেখে দেবে একখানা দৈ আনিয়ে। আর যা-ই হক, সে তো মেয়ে-মানুষ—একেবারে প্রড়শীর মেয়ে—দেখেছিল একখানা অনাহার-ক্লিষ্ট শুকনা মুখ।

পাঁচ

কিছুক্ষণ বাদে মুক্তা উঠে গিয়ে মুখে-চোখে একটু জল দিয়ে এলো। দিবাকর পাশের বাড়ীর এক নমঃশূদ্রের ছেলে। পিতা তার ব্রাহ্মণ ছিল। বাড়ী ছিল তাদের ভিন্ন এক দেশে। সে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের কথা। একদিন সামাজিক তর্ক-বিতর্ক নিয়ে গাঁয়ের বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা রাগ করে দিবাকরের পিতাকে গালাগালি দেন, 'তুই চণ্ডাল—আমাদের সমাজের অস্পৃশ্য। তোর বাড়ী কেউ জলগ্রহণ করবে না।'

'কেন?'

'আবার কেন?' এর বেশি কিছু জবাব দিলেন না উমেশ ন্যায়রত্ন এবং বিজয় স্মৃতিতীর্থ। তখন তাঁরা ক্রোধে প্রায় মুক্তকচ্ছ।

দিবাকরের পিতার মাতৃশ্রাদ্ধ। ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজনের সংগে সংগেই নাকি দিবাকরের পিতা নিমন্ত্রণ করেছে পাঁচটি নমঃশূদ্র বন্ধুকে: তার ইচ্ছা—লোক যখন বেশি নয়, মাত্র পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন নমঃশূদ্র, তখন একই সময় সকলকে পাত-পিঁড়ি দেওয়া হবে। অংশ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। কিন্তু পরিবেশন করা হবে উভয় সম্প্রদায়কে একসংগে।

'এ সব অনাচার অসম্ভব!'

'শুধু তাই নয়—ব্রাহ্মণের ছেলের কল্পনারও অতীত, ধূর্জটি!'

'কল্পনার অতীত হবে কি করে মহেশ খুড়ো—ওদের কাছে যে আমার দেনাও অল্প না। মা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন রাতের পর রাত ওদের ছাড়া কাউকে পাইনি। মরার পরও হবিষ্যের খরচা ওরাই দিয়েছে—এখন যা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করবেন—সে তণ্ডুলও ওদের ঘরেরই হাওলাত করা। আমার তো দেনা অল্প না।'

'তবে ওদের ওখানে গিয়েই থাকলে পারো। তুমি বাবা বামুনের ঘরের চণ্ডাল!'

'তাই নাকি খুড়ো? তবে আমি চললাম।' দিবাকরের পিতারও ক্রোধ কম ছিল না। সে তখনই গ্রামের বাইরে বেরিয়ে এলো নমঃশূদ্র পল্লীতে। হবিষ্য করল এক নমঃশূদ্রের বাড়ীতে। তারপর ঘটা করে মায়ের শ্রাদ্ধও করল নমঃশূদ্র বন্ধুদের সাহায্যে। ব্রাহ্মণেরা হতবাক্ হয়ে রইলেন। কিছুদিন পর শোনা গেল, জগৎ আচার্য নাকি এক মোড়লের মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে কোন এক বিলান দেশে। এইখানেই দিবাকর ও তার ভগিনীর জন্ম। ব্রাহ্মণের কৃষ্টি ও অন্ত্যজের বর্ব্বরতার অপূর্ব মিলন ঘটল—যেমন, পদ্মার ঘোলা জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেঘনার কাক-চক্ষু জল। জন্মাল নতুন এক বংশধারা। এই বিলগাঁয়ের অনেক জাতিই অস্পৃশ্য বলে ভাবে—কিন্তু মনে মনে আবার সমীহও করে। তাই এদের ঠাকুর-ঠাকুরাণী খেতাবটা আজও বর্তমান।

দিবাকর তেমন লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু বুদ্ধি ছিল

তার প্রখর—সাহস ছিল দুর্জয়। অথচ মনটা ছিল মাটির মত নরম—এই বিলদেশের মাটির মতই। সে মনের খবর অনেকেই রাখত না—সময় সময় মুক্তাই ঠিক বুঝে উঠতে পারত না। জগৎ আচার্য যত দিন জীবিত ছিল সে-ই গাঁয়ের স্বজাতিদের পূজা-পার্বণ করাত। স্ত্রী-বিয়োগের পর সে আর বেশি দিন বাঁচেনি।

পিতার মৃত্যুর পর বোনকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে দিবাকর বেশি দিন আর গ্রামে থাকেনি। পূজা-আচ্ছায় তেমন আর মন বসত না, কেনই জানি তার মনে হত এ সব মিছে এবং বুজরুকি। আবার তার ভয় হত, শিউরে উঠত সর্বাংগ। সে ভাবছে কি? সে তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে মনে-প্রাণে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইত। বিশেষ করে মা বিশালাক্ষী ও শীতলার কাছে—যাদের স্থায়ী আসন আছে তাদের বাড়ীর পূর্ব সীমানায় বটগাছের তলে। ঐ বটগাছের সে কত অলৌকিক গল্প শুনেছে মা ও বাবার মুখে। কিন্তু তাদের চেয়েও অনেক গুণ অভিজ্ঞ ছিল একানব্বই বছরের প্রাচীন সামন্ত। জানত ঐ বুড়ো বটের একেবারে আদি-অন্ত ইতিহাস। কোনও কোনও ঘটনার সে নাকি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিল। সে সব কথা ভাবলে গায় কাঁটা দেয়—সাহস হয় না ঠাকুর-দেবতার অস্তিত্বে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করতে। ভয় যখন কেটে যায়, আবার আসে যুক্তি। দিবাকর এত করে দেবতাদের ডাকল তবু তার বাপ মরল কেন, কেন অল্প বয়সে মরল মা? এমন তারা ছন্নছাড়া হয়ে গেল কেন? আবার একটু বাদেই কুসংস্কারের রুদ্র ঝটিকা এসে অন্ধকার করে ফেলে তার মন। সেই অন্ধকারে দেখা দেয় লাঠিতে ভর করে এগিয়ে আসছে প্রাচীন সামন্ত। ঐ ভূত, ঐ প্রেত, ঐ দেখ শিবের সহচর লক্ষ লক্ষ দানা। খল্খল্ হাসছে মা শীতলা তোদের ঐ বুড়ো বটতলায়। এখনও অবিশ্বাস?…কিছু অস্বীকার করতে পারে না দিবাকর। তার স্মরণ হয় ছেঁড়া-খোঁড়া মাচায় তোলা মহাভারতের কথা। কাহিনী মনে পড়ে সমস্ত দেব-দৈত্য গন্ধর্ব-কিন্নরের। সে নত-মস্তকে হাত জোড় করে থাকে।

এমনি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে সে একদিন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। সংগে থাকে তার ছোট একখানা গীতা ও বটতলায় ছাপা রামায়ণ এবং মহাভারত। কোন্ হাটের কোন্ দোকানীর কাছ থেকে যে তার পিতা এ তিনখানা পুস্তক সংগ্রহ করেছিল তার ইতিবৃত্ত হয়ত পুরান জমা-খরচের খাতায় লেখা ছিল, কিন্তু সে খাতা এত বিপর্যয়ের মধ্যে অনেক দিন নষ্ট হয়ে গেছে—শুধু নষ্ট হয়নি পিতার সঞ্চিত জমা। শতধা-জীর্ণ মলিন পুঁথি তিনখানা যতই ছিন্নভিন্ন হোক না কেন, এখন তা প্রায় কণ্ঠস্থ দিবাকরের। কুসংস্কারের সংগে সংগে কতগুলি চিরসত্য সংস্কারও অম্লান হয়ে রয়েছে দিবাকরের হৃদয়ে। অথচ আধুনিক জগতের কাছে সে এক হিসাবে বন্ধ বর্ব্বর ও অশিক্ষিত। আর কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। যদিও সে কিছুদিন গুরুমহাশয়গিরি করে থাকুক—একটা যুক্তাক্ষরের বানান লিখতে কলম ভাঙে তিনটা। মাথা ধরে 'আস্কলা' 'আস্কলা' পড়াতে গিয়ে।

নৌকা থেকে উঠে গিয়েও দিবাকর মুক্তি পেল না। হাটের সহস্র হট্টগোল ছাপিয়েও তার কানে মুক্তার কণ্ঠস্বর বাজছিল। 'গোঁসাই রাইত যে আমার কাটে না! শয্যায় মনে হয় কণ্টক—গোঁসাই গো বাবলা কাঁটা।' ধনের অভাব নেই মুক্তার, তার নিদর্শন ওর বসন-ভূষণে। তবে মনে কি ওর সুখ নেই? কেন, কি তার হেতু? না চিররহস্যময়ী মুক্তা ওর সংগে একটু অহেতুক কৌতুক করল? জেলের মেয়ে—জালের জটিল গ্রন্থির মতই ওর মন। কি যে চায়, কি যে বলে, তা দিবাকর কোনও দিনই সঠিক বুঝতে পারে না। সময় সময় ভয় হয় ওর ব্যবহারে, কখনও বা পায় হাসি। আজ কিন্তু বারংবার চমকে দিয়েছিল মুক্তা দিবাকরকে।

দিবাকর হাটের ভিতর এসে বহু লোকের ভিড়ে নিজেকে সুরক্ষিত ভাবল—হালকা ঠেকল হৃদয়টা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে হেঁটে বেড়াল অন্যমনস্ক ভাবে। কিন্তু মুক্তার সপ্রশ্ন চাউনি দুটো তাকে কেবলই বিব্রত করতে লাগল। 'তুমি আমার এটু দেখলা কি?'

দেখতে দেখতে রাত গভীর হয়ে এলো। হাট ভাঙতে লাগল, এবং ভেঙেও গেল খুবই তাড়াতাড়ি। জেলেরা মাছের সরঞ্জাম গুছিয়ে তুলল নায়ে, ময়রা মুদী নিবিয়ে ফেলল আলো। নষ্ট হওয়ার আশংকায় কাঁচা মালের ব্যাপারী সস্তা দরে বেচে দিল অবিক্রিত অবশিষ্ট যত ফল-মূল—কাঁকুড় করমজা জামরুল।

মুক্তার নায়ের কাছে একটা গোলমাল শোনা গেল। কেউ কি জলে পড়ে গেছে? একে খাড়িখাল (গভীর) তাতে রাতও কম হয়নি—দিবাকরের চিন্তা হলো। সে শংকায় এগিয়ে গেল। পাগলী মুক্তা ইচ্ছা করেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

'ঐ চোর, চোর!'

'চোরা বেটা নাও ছাইড়া গেল। ধর ধর হালারে।' কেউ অবশ্য ধরতে গেল না। কূলে বসেই সবাই আস্ফালন করতে লাগল। একজন বলল, 'যামু নাকি ডোঙা লইয়া?' আর একজন জবাব দিল, 'যাও না—নায়ে নাইয়া মানুষ—রাখবে বেঁকিদা দিয়া কান দুখান কাইট্যা।' যে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল সে সভয়ে ফিরে এসে নিজের কান দুখানা পরীক্ষা করে দেখল যে যথাস্থানে আছে কিনা।

কি হয়েছে, কে কি চুরি করেছে সঠিক বোঝা গেল না। তবে একটা হৈচৈ চলল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর যে যার কাজে চলে গেল। অনেক চেষ্টা করে দিবাকর শুধু জানতে পারল আড়াই সের বাতাসার একটা ঠোংগা চুরি গেছে। এবং এদের কথায় মনে হয় আসামী মুক্তার নায়েই পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু চোর কে? মুক্তার স্বামী ব্রজ? না, না, অন্য কেউ নিশ্চয়। ব্রজ অবস্থাপন্ন।

দিবাকর জেলেদের নায়ের বহরের কাছে ফিরে এলো। তখনও তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়নি। এই তো কতক্ষণ হয় রান্না চড়েছে নায়ের গলুই খোপে তোলা উনুনে। দিনান্তে এখনই যা একটু অবকাশ। হলধর বলল, 'দেখ মামা, কে আইসাছে?'

খুড়ো গৌতম একটু সাধু প্রকৃতির লোক। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা—দাড়ি গোঁফ ও চুল সে কোনও দিনই কামায় না। এই সময়টা সে একতারা বাজিয়ে গুরুর নামে কাঁদায়। সারা দিন জীবনধারণের জন্য যত মিথ্যা কথা বলেছে, পচা মাছকে টাটকা বলে চালিয়েছে, কুড়িতে দিয়েছে যত বার উনিশ—তার জন্য সত্য সত্যই সে কাঁদে:

গুরু গো এ কি তোমার খেলা?
আর কত কাল গোনাবা মোরে দিয়া উইনজা-কুড়ি
বয়েস হইল যে মোর পঞ্চকুড়ি—

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস কলিকাতা ১২

ডুবুডুবু হইছে পাপে জীবন-ভেলা।
গোসাই গো এ কি তোমার খেলা ?

গান থামিয়ে গৌতম জিজ্ঞাসা করে, 'কে এয়েছে ? লক্ষীন্দর ? এখনও 'তো আমার মাছ বেচা শেষ হয় নাই—যোউল মরস তিন কুড়ি, ক্যামনে বুঝ দিমু ভাগীদারের জমা ? তা আইছ যখন অবুঝের মত, ফিইরা যাবা খালি হাতে—কিন্তু বসো লক্ষীন্দর—বসো, চারডি আহার কইর‍্যা যাইও।'

'আমি লক্ষীন্দর না—দিবাকর।'

গৌতম আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

লক্ষীন্দর ভাগের ব্যাপারী। টাকার জমাটা সম্পূর্ণ তার কিন্তু খাটুনীটা সম্যক গৌতমের। মুনাফার অংশ চিরদিনই লক্ষীন্দর দাবী করে ন্যায্য থেকে বেশী। তাই গৌতমও মিথ্যা বলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত—অবশ্য গুরুই তাকে দিয়ে বলায়। সত্য বলতে গেলে কি, এ ক্ষেপের একটি বোলও মরেনি।

'তুমি আইল্যা কেমনে—তোমার না জেল হইছিল ?'

'জেল নয় খুড়া হাজত খাইট্যা আইছি পনের দিন—সে তো অনেক দিনের কথা।'

'কামডা ভাল কর নাই। মিতার বংশে একটা চিহ্ন পড়ল রাজ-রোষের চিনা, পুলিশ আইবে নিত্য নিত্য।'

কিন্তু কি করে থাকবে দিবাকর ? যার বাপ সামান্য সামাজিক অত্যাচারের প্রতিবাদে জাতি ত্যাগ করেছে—তার ধমনীতে এতটুকু রক্ত থাকতে কি করে সইবে এ সব নিষ্ঠুরতা ? অপমান-অবিচারের কাছে সে কিছুতেই মাথা নোয়াতে পরামর্শ দিতে পারে না।

[ক্রমশঃ।

প্ল্যাটফর্ম

রমাপতি বসু

অমূল্য বিরক্ত হয়ে দু'টো চড় বসিয়ে দেয় তার চার বছরের রুগ্ন ছেলে বিঠাইকে। ককিয়ে কেঁদে ওঠে বিঠাই। কান্না···কান্না···আর কান্না। ভাল লাগে না।

শৈলবালার মেজাজটা এমনিতেই ভাল নয়, তার ওপর ছেলেকে এই ভাবে মারার জন্য বলে: মরে না। মড়া মরে গেলে বাঁচি। একে তো পেটে কিছুই পড়ে না, তার ওপর এই ভাবে মার-ধোর করলে কত দিন আর বাঁচবে ?

অমূল্য শৈলবালার কোনো কথারই জবাব দেয় না। বিঠাই একটানা কেঁদে চলে। এ কান্নার বুঝি শেষ নেই!

শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কোনো রকমে মাথা গুঁজে পড়ে আছে অমূল্য। সঙ্গে আছে শৈলবালা, মালতী আর বিঠাই। সম্পর্ক এদের স্বামী, স্ত্রী, মেয়ে আর ছেলে। মালতীর বয়স মাত্র চোদ্দ। দাঙ্গা লাগার আগেই অমূল্য মালতীর বিয়ে দেয় তার পাশের গ্রামের বৈকুণ্ঠ বাঁড়ুজ্জের ছোট ছেলে নরেশের সঙ্গে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য অমূল্যর যে, বিয়ের পাঁচ মাসের মধ্যেই নরেশ বিবাগী হয়ে যায়। কত খোঁজ করেছে অমূল্য যে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। শেষে মালতী অমূল্যর কাছেই থেকে যায়। শ্বশুরবাড়ীতে অপয়া বলে মালতীর ঠাঁই হয়নি। আহা বেচারী মালতী, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় যেমন কেঁদেছিল, তেমনি নরেশ বিবাগী হওয়ার জন্য শ্বশুরের ভিটে থেকে বাপের কাছে আসার সময়ও কেঁদেছিল খুব হাউ-হাউ করে।

অমূল্য কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি যে তার জীবনে এমনি একটা বিপর্যয় ঘটবে। দেশে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলে তাকে সকলেই সম্মান করে চলতো। যজমানী করে যা আয় হতো—তাতেই বেশ সচ্ছন্দে চলে যেতো এদের সংসার। অভাব কিছুরই ছিল না। এ ছাড়া জমি-জমা থেকে বছর-অন্ত যে ধান হতো—তাতে সারা বছরের চালটা অন্তত কখন কিনে খেতে হয়নি অমূল্যকে।

কিন্তু আজ অমূল্যকে পরের দানের ও কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। যদি কোনো কারণে সে জনসেবকদের কৃপালাভে অসমর্থ হয়—তবে তাকে, আর তার স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রকে অনাহারে দিন কাটাতে হয়। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

জীবনের ফেলোআসা দিনগুলির কথা ভেবে অমূল্য মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বাস্তবের কোনো কিছুতেই তার সাড় আসে না। আশা নেই, ভরসা নেই—এমনি একটা পঙ্গু জীবন সে কত দিন বয়ে চলবে ? দিনের পর দিন এই ভাবে নানা রকম চিন্তা করতে-করতে সে একেবারে মুষড়ে পড়ে। কিছুতেই আজ তার বিশ্বাস নেই। অভাব ও অনটনের পাকে পড়ে সে ভগবানের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে, এমন কি, তার নিজের ওপরেও এতটুকু বিশ্বাস নেই। সে আজ ঘোর নাস্তিক।

শুধু অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও ধর্মনষ্টের ভয়েই অমূল্য তার জন্ম-ভিটে ছেড়ে কোলকাতায় চলে এসেছে। কিন্তু আজ তার জাত ধর্ম কোথায় ? অনাহারে, অনিদ্রায় দিন কাটিয়ে অমূল্য তার ধর্মাধর্ম—সব-কিছুই জলাঞ্জলি দিয়ে দিয়েছে।

বিঠাইএর রোগ ধরেছে। শৈলবালা ও মালতীর অনাহারক্লিষ্ট দেহ—ক্রমেই জীর্ণ শীর্ণ হয়ে চলেছে। এর জন্য যদি অমূল্যর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, তবে আর তার অপরাধ কোথায় ?

শৈলবালা বলে: চলো আমরা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে সহরের ফুটপাথে গিয়ে থাকি।

অমূল্যর আর আপত্তি কোথায় ? সরকারী শিবিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। দেশসেবার আদর্শ নিয়ে যারা ষ্টেশনে এসে উদ্বাস্তু হতভাগা হিঁদু বলে কিছু খাবার বিলি করে থাকে—তাদের ওপর নির্ভর করে আশায় আশায় আর কত দিন এখানে পড়ে থাকা যায় ?

অমূল্য বলে: এই ডাগর মেয়েটা আর দুধের ছেলেটাকে নিয়ে ফুটপাথে যাবে কি করে ?

অমূল্যর সংস্কার এসে বাধা দেয়। জাত ধর্ম সব-কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে এলেও স্রেফ ফুটপাথের ভিখিরী হয়ে যাবার কথাটা ভেবে অমূল্য আর কোনো জবাবই দেয় না।

শৈলবালা বলে : আমি লোকের বাড়ী গতর খাটিয়ে খাবো। যা হোক্ একটা ব্যবস্থা করা যাবে। এই ভাবে না খেয়ে মুখ বুজিয়ে পড়ে থেকে লাভ কি ?

তবু অমূল্য বলে : দেখা যাক্ আর দু'টো দিন। তার পর যাওয়া যাবে'খন। এও তো ফুটপাথেই এক রকম আছি।

প্ল্যাটফর্ম ভরে গেছে আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড়ে। এরই মধ্যে তিন জন চার জনে মিলে গড়ে উঠেছে ভ্রাম্যমান সংসার। মাটির হাঁড়ি ও টিনের কৌটো সম্বল করে যারা নতুন করে সংসার পাতার চেষ্টা করছে, তারা অবুঝ না হ'লেও—নিঃসন্দেহে বলা যায়, দুঃস্বপ্ন দেখছে। এদের নতুন করে বাঁচার চেষ্টা দেখা যায়। কাঁথা ও ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো মুড়ি দিয়ে এদের রাত্রি কেটে যায়।

প্ল্যাটফর্মে যারা ভীড় করে আছে, তাদের মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত ও চাষী সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশী। যারা ধনী—তারা তো আনসার ও পাকিস্তানী কাষ্টমস্ অফিসারদের সামনে উড়ো জাহাজে করে উড়ে চলে এসেছে হিন্দুস্থানে। কিন্তু যাদের সম্বল নেই, অসহায়—তারা কেউ বা পায়ে হেঁটে, কেউ বা ট্রেনে করে কোনো রকমে লাঞ্ছনা অপমান হজম করে এসেছে হিন্দুস্থানের নাম-করা সহর কোলকাতায়। শুধু বাঁচার লোভে। এরা হিন্দুস্থানের আশ্রয়প্রার্থী—তাই নানা রকমের নানা ফিকিরের লোকেরা শুধু ষ্টেশনে এসে এদের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে যায়। কেউ বা সমবেদনা জানায়, আবার কেউ এদের ভ্রাম্যমান সংসারের পরিপাটি দেখে কটাক্ষ করে মন্তব্য করতে ছাড়ে না।

শৈলবালার কথায় অমূল্য শেষে রাজী হয়ে যায়। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে তারা ফুটপাথে গিয়ে থাকবে। অমূল্যর ইচ্ছে ছিল, আরো ক'টা দিন ষ্টেশনে থেকে দেখে যাবে সরকারী সাহায্য বা খয়রাতী কিছু ঠিক মত পাওয়া যায় কি না। কিন্তু থাকার সুবিধে হ'লো না মোটে। গুণ্ডা, চোর, জোচ্চোর, ভিখিরী ও লম্পট লোকের ভীড় দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল ষ্টেশনে। গেরুয়া-পরা এক দল স্বেচ্ছাসেবক রোজ সকালে এসে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উদ্বাস্তুদের মুড়ি-মুড়কী দিয়ে যেতো। তারা আজ ক'দিন হ'লো মুড়ি-মুড়কী দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। তার কারণ, সহরের বেশী সংখ্যক ভিখিরী ও আধ-পাগলা লোকেরা প্ল্যাটফর্মে এসে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মিশে গেছে। বোঝা শক্ত কারা উদ্বাস্তু আর কারা পেশাদার ভিখিরী। অমূল্যর সঙ্গে ভিখিরীদের সেদিন বেশ ঝঞ্ঝাট হয়ে যায়। একটা রুগ্ন, আধ-পাগলা ভিখিরী রাত্রে বিঠাইএর গা থেকে কাঁথাখানা টেনে নিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। অমূল্য দেখে তো আগুন হয়ে যায়। কারুকে কিছু না বলে দু'ঘা কষিয়ে দেয় ভিখিরীটাকে। তার পর সুরু হয় মারামারি। অমূল্য পারবে কেন ? অমূল্যও মার খায়। শেষে প্ল্যাটফর্মে কর্মরত পুলিশ অমূল্য ও আধ-পাগলা ভিখিরীটাকে ষ্টেশন এলাকা থেকে বার করে দেয় রাস্তায়। শৈলবালা প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু কর্মরত পুলিশ শান্তিরক্ষার জন্যই সেখানে নিয়োজিত হয়েছে। সে শৈলবালার ক্ষীণ প্রতিবাদকে গ্রাহ্যই করলে না। শেষে নিরুপায় হয়ে, ক্ষোভে দুঃখে শৈলবালা বিঠাইকে কোলে ক'রে মালতীর হাত ধরে চলে আসে ফুটপাথে।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে আসার জন্য শৈলবালার কোনো ক্ষোভ ছিল না—শুধু তার ক্ষোভ, হিন্দুস্থানের পুলিশ তো তাদের লোক—তবে কেন সে শৈলবালার কোনো কথাই কানে নিলে না ?

বহুবাজার ষ্ট্রীটের গাড়ীবারান্দার নীচে এসে অমূল্য তার আস্তানা গাড়লো নতুন করে। ষ্টেশনের চেয়ে ফুটপাথ ঢের ভালো। ট্রাম, বাস, কর্মব্যস্ত জনতা দেখতে মন্দ লাগে না অমূল্যর। ষ্টেশনে যেন এরা সকলেই হাঁপিয়ে উঠেছিল। অসহ্য হয়ে উঠেছিল আবহাওয়া। তিনখানা ইট দিয়ে, রাস্তা থেকে কুড়োনো কাঠ-কুটো দিয়ে উনুন জ্বালায় শৈলবালা। মালতী বিঠাইকে কোলে করে বাজার থেকে কুড়িয়ে আনে, চেয়ে আনে শাক-সব্জী। এমনি করে দু'-এক দিন মন্দ কাটেনি অমূল্যর। কিন্তু এমনি করে আর কত দিন চলবে ?

নিরুপায়, নিরাশ্রয় একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-পরিবার ক্রমে ক্রমে কোলকাতা সহরে এসে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করলো। আত্মসম্মান, জাত্যভিমান, বংশ-মর্যাদা—সব-কিছুই কোলকাতা কর্পোরেশনের হোস্ পাইপের ঘোলা জলে ধুয়ে ম্লান হয়ে গেল।

প্রথম প্রথম অমূল্য চেষ্টা করেছিল বাজারের ফুটপাথে ভাগা দিয়ে লঙ্কা আর ধনেপাতা বিক্রী করতে, কিন্তু তাতে কিছুই হ'লো না। কিছু যে বিক্রী না হ'তো—তা নয়। তবে অবিক্রীত লঙ্কা, ধনেপাতা শুকিয়ে গিয়ে অমূল্যর লোকসানই হয়ে গেল বেশী। তার পরিশ্রমটাই ব্যর্থ হ'লো।

লজ্জাটা ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারেনি অমূল্য। কেন জানি না—তার দিনের বেলা লোকের কাছে হাত পাততে লজ্জা হয়। তাই অমূল্য শৈলবালাকে নিয়ে দিনের বেলা চলে যেত ডালহাউসী স্কোয়ারের দিকে। শৈলবালা একগলা ঘোমটা দিয়ে শাঁখের শাঁখা-পরা হাত দুটি বার করে বসে থাকে সারা দিন ভিক্ষের জন্য। বিঠাই কখনো তার কোলে, কখনো বা তার পাশে বসে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। যাতায়াতের পথে কেরাণী, ব্যবসায়ীরা দু'-এক পয়সা যা দেয়—তাই নিয়ে অমূল্য, শৈলবালা ফিরে আসে গাড়ীবারান্দার নীচে। সন্ধ্যে বেলায় মালতী আর অমূল্য গ্যাসের অস্পষ্ট আলোয় দাঁড়িয়ে বাসের যাত্রীদের কাছে করুণ সুরে বলে : বাবু গো, একটা পয়সা দাও বাবু ! দু'দিন খাওয়া হয়নি বাবু ! বাবু গো···বাবু !

দয়াপরবশ হয়ে অনেকে এক পয়সা, দু'পয়সা, এমন কি আনি, দু'আনি পর্যন্ত দিয়ে যায়। এমনি ভাবে ভিক্ষে করে যা সারা দিনে হয় তাই দিয়ে কোনো রকমে এক বেলা খাওয়া চলে এদের। রোজ-রোজ আর ভিক্ষে দেবে কে ? শুধু-শুধু লোকে ভিক্ষেই বা দেবে কেন ?

শৈলবালা আর ডালহাউসী স্কোয়ারের দিকে যেতে পারে না। ক'দিন হ'লো বিঠাইটার জ্বর বেড়েছে। রাত্রি-দিন শুধু কাঁদছে। কি বা দেবে শৈলবালা ? মালতী দু' পয়সার বার্লি কিনে এনেছিল, কিন্তু বিঠাই বার্লি কিছুতেই মুখে দেয় না। শৈলবালা জোর করে কোলে শুইয়ে একটু মুখে ঢেলে দিয়েছিল। বিঠাই তা গেলেনি। বমি করে উঠিয়ে দিয়েছিল।

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভীড় যেন বেড়ে যায়—গাড়ী-বারান্দার নীচে। কত ভিখিরী যে এখানে আস্তানা গেড়েছে, তা গুণে বলা যায় না। আঁস্তাকুড়ের ভাত-তরকারি এনে আধপাগল একটা লোক খায় আর চার দিকে ছড়ায়। ঘেয়ো কুকুর, ভবঘুরে

ষাঁড় পর্য্যন্ত এসে শুয়ে পড়ে এই গাড়ীবারান্দার নীচে। কি এক বিচিত্র জীবন এদের!

কুমুদ এদেরই মধ্যে এসে ক'দিন হ'লো ভীড়ে গেছে। রাত্রে বিঠাইএর একটানা কান্নায় কুমুদের বোধ হয় ঘুম ভেঙ্গে যায়। কুমুদ সরাসরি এসে শৈলবালাকে জিগ্যেস করে: ছেলেটার কি হয়েছে রে? রোজই রাত্তিরে দেখি কাঁদে?

—অসুখ।

—অসুখ? হো-হো করে বিকট শব্দে হাসে কুমুদ। বলে: ভিখিরীর আবার অসুখ কি রে? কিছু খেতে দে—ঠিক হয়ে যাবে। পেটে বোধ হয় কিছু নেই, তাই ওমনি ককাচ্ছে।

শৈলবালার গলার স্বর যেন বসে গেছে। তবু ভাঙা গলায় বলে: কিছু মুখে নেয় না।

—ইস্। দেখবি খাবে? বলে কুমুদ তার বোঁচকা থেকে একটু চিনি এনে দেয় শৈলবালাকে।

শৈলবালা চিনিটুকু নিয়ে বিঠাইএর মুখে দেয়। মিষ্টির স্বাদ পায় বিঠাই। চুপ করে যায়। মুখের চিনি ফুরিয়ে যেতে আবার কাঁদে। শৈলবালা একটু-একটু করে দেয়। সত্যি বিঠাই চুপ করে যায় সে রাত্রির মতন। মালতী জেগে থাকে রাত্রে। শৈলবালা ও অমূল্য অঘোরে ঘুমোয়। অমূল্যর আবার ঘুমোলে নাক ডাকে। কুমুদ কিন্তু ঘুমোয় না। আস্তে-আস্তে উঠে এসে সে মালতীকে জিগ্যেস করে: তোর নাম কি?

—মালতী।

—খাসা নাম তোর, বলে কুমুদ।

মালতী নিরুত্তর। কোনো কথাই বলে না। কুমুদ ভাল করে দেখে মালতীকে। মনে-মনে ভাবে: আহা, বাড়ন্ত গড়ন। খেতে না পেয়ে-পেয়ে শুকিয়ে গেছে একেবারে। একটু যত্ন পেলে আবার ফুলে-ফেঁপে উঠবে।

কুমুদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে: ছেলেটা বুঝি ঘুমিয়েছে?

মালতী উত্তর দেয়: হ্যাঁ।

কুমুদের কৌতূহল বেড়ে যায়। জিগ্যেস করে: ছেলেটা কে হয় তোর?

—আমার ভাই।

—আর ও কে? শৈলবালাকে দেখিয়ে জিগ্যেস করে কুমুদ।

—আমার মা।

—তোর বুঝি আর কেউ নেই?

—ঐ পাশে শুয়ে আমার বাবা।

—বাবা? তোর বাবা আছে?

—হ্যাঁ।

—তবে তোরা ভিখিরী কেন? কুমুদ টপ করে জিগ্যেস করে ফেলে মালতীকে। বাপ থাকতে মা মেয়ে ভিক্ষে করে কেন? কুমুদের বুদ্ধিতে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আসে না।

মালতী বলে: আমরা ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এসেছি। পাকিস্তান হতে আর সেখানে থাকার সাহস হ'লো না। আমরা তাই আজ ভিখিরী।

কুমুদ ভয় পায় আর কোনো কথা জিগ্যেস করতে। মনে-মনে শুধু বলে: ভদ্দরলোকেরাও ভিক্ষে করছে? এরা ভদ্দরলোক?

মালতী বলে: কি, চুপ হয়ে গেলে কেন?

কুমুদ বললে: বড়ো ঘুম আসছে। শুয়ে পড়ি।

কুমুদ চলে আসে তার বোঁচকার কাছে। মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুম আসে না। কত কি চিন্তা করে সে। কুমুদের বুদ্ধি আছে। এক কালে চুরি করে পকেট মেরে সে চালাতো। তার পর ধরা পড়ে জেল খাটে। জেল থেকে ফিরে সে আর চুরি করবে না বলেই ঠিক করে ফেলে। কিন্তু চুরি করার জন্য বেদম মার খেয়ে পায়ে একটা চোট খায় কুমুদ। পায়ে তার দগদগে ঘা। পা-টাও দুর্বল—মোটে জোর পায় না। এখন এই ঘা-টাকে না শুকিয়ে—এই দেখিয়ে লোকের কাছে ভিক্ষে চায়। মানুষের দয়ার শরীর। তাই কুমুদ ভিক্ষে পেয়ে যায়। তা ছাড়া ভিক্ষে করার টেকনিকটা কুমুদ সহজে বুঝে গিয়েছিল! তেল দিয়ে-দিয়ে ঘা-টাকে বীভৎস করে রাখে। শীতকালে ঘা-টা বেশ একটু কষ্ট দেয়। গ্রীষ্মকালে শুধু মাছিতে বিরক্ত করে, তা ছাড়া জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু হয় না। কুমুদ শুয়ে-শুয়ে অনেক কথাই ভাবে। সব চেয়ে বেশী করে ভাবে মালতীর কথা। আজ আর তার ঘুম আসে না।

ঘেয়ো কুকুরটা শীতে কুঁ-কুঁ করে কাঁদছে। নিস্তব্ধ রাত্রি। মাঝে-মাঝে পাহারাওয়ালার নাল-মারা জুতোর খট্-খট্ আওয়াজ শোনা যায়। দু'-একটা লরী বা ট্যাক্সি জোরে চলে যায় বড়ো রাস্তা দিয়ে। মালতীর একটু তন্দ্রা আসে। হঠাৎ কুকুরটার বিকট চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে যায়। মালতী উঠে বসে। বিঠাইএর গায়ে হাত দিয়ে দেখে ঠাণ্ডা। মালতীর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। সে চুপি-চুপি অমূল্যকে ডাকে।

অমূল্য বলে: কি?

—একবার ওঠো না।

—কেন?

—বিঠাইএর গা একেবারে ঠাণ্ডা।

—ঠাণ্ডা? চমকে ওঠে অমূল্য।

হাজার হোক্ অমূল্য তো বাপ! লাফিয়ে উঠে এসে গায়ে হাত দেয়। বিঠাই ঠাণ্ডা। একেবারে ঠাণ্ডা। সে ঘুমোচ্ছে—একেবারে ঘুমোচ্ছে। আর কোনো দিন তার কান্না শোনা যাবে না।

অমূল্য আর কোনো কথাই বলতে পারে না।

মালতী জিগ্যেস করে: কি হ'লো?

অমূল্য বলে: কিছু না। সব ঠাণ্ডা।

কুমুদ মুড়িটা খুলে পিট্-পিট্ করে চেয়ে দেখে অমূল্য ও মালতীকে।

মালতী বলে: তা হ'লে কি হবে?

অমূল্য বলে: কিছু ভাবিস্‌নি। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

মালতী অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার বাবার দিকে। অমূল্য বিঠাইকে কোলে তুলে নিয়ে বললে: তুই তোর মাকে কিছু বলিসনি মালতী। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

ভোর রাত্রে সেই যে অমূল্য চলে গেল—আর ফেরেনি। কোথায় গেল—কি করলো—মালতী আর শৈলবালা তার কোনো হদিস করতে পারেনি। বহু খোঁজা তারা খুঁজেছে পথে, কিন্তু অমূল্যর কোনো

সন্ধানই পায়নি। বিঠাইএর মরে যাওয়ার খবরটা শৈলবালা অনেক পরে জানতে পেরেছিল। কেন যে মালতী তাকে সে সময়ে বলেনি তা সঠিক বলা যায় না।

অমূল্য চলে যাওয়ায় কুমুদের একটু সুবিধা হয়ে যায় বেশী। কুমুদ শৈলবালা ও মালতীদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যায় যে দেখলে মনে হবে, সে এক গোষ্ঠীভুক্ত। শৈলবালাকে ভাবতে দেখে কুমুদ বলে: তোরা কেন ভাবছিস্। আমি যত দিন আছি তোদের কিছু ভাবনা নেই।

শৈলবালা কোনো জবাব দেয় না।

কুমুদ বলে: একটা কথা শুনবি মালতীর মা?

—কি? শৈলবালা কুমুদের মুখের দিকে চায়।

কুমুদ একটা আধ-পোড়া বিড়ি ধরিয়ে টান মারে আর ধোঁয়া ছাড়ে। কি যেন ভেবে সে বলে: আমার সঙ্গে তোরা যাবি? আমি তোদের একটা নতুন আস্তানায় নিয়ে যাবো।

মালতী আর শৈলবালা একসঙ্গে বলে: যাবো।

কুমুদ বলে: তবে চল্।

কুমুদ, মালতী ও শৈলবালা বহুবাজার ষ্ট্রীটের গাড়ীবারান্দা ছেড়ে চলে আসে মৌলালীর কাছে—কর্পোরেশনের বড়ো বড়ো পাইপগুলো যেখানে পড়ে আছে সেখানে। দর্মা, চেঁচাড়ী, ভাঙা পিচের টীন আর দেয়াল থেকে খসিয়ে নিয়ে আসে এক চাবড়া সিনেমা-থিয়েটারের পোষ্টার। ঐই দিয়ে যেমন পৃথিবীর এক শ্রেণী ভ্রাম্যমান মানুষ সংসারের জন্ম অস্থায়ী ঘর বানায়—কুমুদও ঠিক তেমনি একটা ঘর বানিয়ে থেকে যায় শৈলবালা আর মালতীকে নিয়ে।

ভিক্ষে করেই এদের চলে। মাঝে-মাঝে কুমুদ ছিঁচকেমী করে দু'-এক পয়সা বেশী আনে। মালতীও আজকাল মন্দ রোজগার করে না। লোকে পয়সা দিচ্ছে। হঠাৎ মানুষের দয়া যেন বেড়ে গেছে মনে হয়। এপাশে আরও একদল যাযাবর কুরুঙ্গী মেয়ে-পুরুষ থাকে। তারা ঘর বা পাকা দালানের ধার ধারে না। ছেলে-বুড়ো মিলে পাইপের মধ্যে শুয়ে দিন-রাত কাটিয়ে দেয়। কি করে চলে—তা কেউ বলতে পারে না। এরা মাংস খায় খুব বেশী। মেয়ে-পুরুষ মিলে রান্না করে আর সঙ্গে সঙ্গে খায়। পুরুষগুলো দিনের বেলা কোথায় যায়, কোথায় কি করে বোঝা যায় না। মেয়েগুলো শুয়ে গল্প-গুজব করে দিন কাটিয়ে দেয়।

রাত্রে মালতী ঘুমিয়ে পড়েছে। কুমুদ যখন ফিরল তখন শৈলবালা জেগে বসে আছে।

শৈলবালা জিজ্ঞেস করে: এত রাত্তির হ'লো কেন?

কুমুদ বলে: রোজগারের ফিকিরে ঘুরছিলাম।

শৈলবালা বলে: কিছু খেয়েছিস্?

—হ্যাঁ। নিয়েও এসেছি সঙ্গে। বলে কুমুদ কাপড়ের খুঁট থেকে খুলে কলাপাতায় মোড়া লুচি তরকারি মিষ্টি বার করে দেয়।

শৈলবালা বহু দিন লুচি দেখেনি। দেখে লোভ হয়। এত লোভ হয় যে মালতীকে সে ডাকে না। নিজেই কিছু না বলে খেয়ে যায়। কুমুদ বলে: তোর ওপর আমার বড়ো মায়া পড়ে গেছে মালতীর মা!

শৈলবালা খেতে-খেতে বলে: আমারও।

কুমুদ চট পেতে তার বিছানা করে। এত দিন ফুটপাথে সে শুয়ে এসেছে। এখন তার নিজের তৈরী চালের তলায় বিছানা পেতে শুতে বেশ আরাম অনুভব করে।

শৈলবালার খাওয়া শেষ হতে কুমুদ বলে: ঐ সিগরেটের খোলে আর একটা জিনিষ আছে।

শৈলবালা খুশিতে জিগ্যেস করে: কি?

দেখ না খুলে।

শৈলবালা খোলটা খুলে দেখে—একখিলি পান।

—খেয়ে ফেল। বলে কুমুদ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শৈলবালার দিকে।

শৈলবালা বহু দিন এমন যত্ন পায়নি। কি জানি কেন মনটা তার আজ বেশ খুশি-খুশি।

কুপিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে শৈলবালা এসে শুয়ে পড়ে কুমুদের একেবারে পাশে।

কুমুদ বলে: পানটা কি রকম লাগছে?

—বড়ো মিষ্টি।

—এক বাবুদের বাড়ীতে বিয়ে ছিল। কত লোক খাচ্ছে। আমি গিয়ে বিকেল থেকে ধন্না দিলুম। খুব খেয়েছি আমি। তোদের জন্মও বেঁধে এনেছি। আরও একটা লাভ হয়েছে।

শৈলবালা নিজেকে আর সামলাতে পারে না। কুমুদের বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জিগ্যেস করে: আবার কি লাভ হ'য়েছে?

—ত্রিশটা টাকা।

—ত্রিশ টাকা! কৈ দেখি? শৈলবালার বিশ্বাস হয় না। কুমুদ শৈলবালার হাত নিয়ে তার কোমরে-বাঁধা নোটের গেরোটা ধরিয়ে দেয়!

শৈলবালা অন্ধকারে নোটের গেরোটা টিপে-টিপে অনুভব করে। কুমুদ শৈলবালাকে খুব কাছে টেনে নেয়। খুব আদর করে কুমুদ। শৈলবালা কোনো আপত্তিই জানায় না কুমুদকে। অনেকক্ষণ ধরে এদের দু'জনের কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না।

গভীর অন্ধকার রাত্রে সারা সহর যখন নিঝুম, তখন এক আদিম স্পৃহা দুটি প্রাণীর রক্তে আনে জোয়ার, মনে আনে চঞ্চলতা। কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কুমুদ বলে: ওদিকে উঠে শো মালতীর মা! বড়ো গরম হচ্ছে।

শৈলবালা উঠে মালতীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভোর হয়। কাক ডাকে—রাজপথ আবার মুখরিত হয়ে ওঠে যান-বাহনের যাতায়াতে। কুমুদ তেল দিয়ে দগদগে করে তোলে তার পায়ের ঘা-টাকে। অন্য দিনের মত শৈলবালা, কুমুদ ও মালতী বেরিয়ে পড়ে পথে ভিক্ষের জন্ম। তিন জনে চলে যায় তিন দিকে।

মালতী আনমনে চলে যায় সহরতলীর দিকে। সহরতলীর মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা কিছু-না-কিছু দিয়ে থাকে মালতীকে। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখে, যাযাবর কুরুঙ্গী দলের একটি বাবরী-কাটা ছোকরা মালতীর পিছু-পিছু আসছে। কেন জানি না মালতীর খুব খারাপ লাগে। পিছু ফিরে তাকালেই দেখে ছোকরাটা পানের ছোপ লাগা দাঁত বার করে হাসছে। মালতী পা চালিয়ে চলে। খুব

জোরে পা চালায়। শেষে এক গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে সে ঢুকে পড়ে। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সদর দরজার পাশে। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে, বাবরী-কাটা ছোক্‌রাটা চলে যায় কি না! বাড়ীর গৃহিণী দোতলার বারান্দা থেকে লক্ষ্য করছে মালতীকে। দেখছে ভিখিরী মেয়েটা কি মতলবে ঢুকেছে।

গৃহিণীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে কৃত্রিম করুণ স্বরে মালতী বলে: মা গো—ও মা! কিছু খাওয়া হয়নি মা দু'দিন। কিছু খেতে দাও মা গো!

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বলে: সকাল হতে না হতে ভিখিরীর উৎপাত! কি দুর্ভিক্ষের দেশে বাবা বাড়ী কিনেছি। ও ঠাকুর··· ঠাকুর! বাড়ীতে ভিখিরী ঢুকেছে।

ঠাকুর বোধ হয় রান্না-ঘরে আটকা ছিল, তাই নীচের ঘর থেকে উত্তর দেয়: যাই মা!

ঠাকুর উঠোনে এসে গৃহিণীর দিকে তাকাতেই, গৃহিণী হুকুম করে: কালকের যা রুটি আছে—ঐ মেয়েটাকে দিয়ে দাও।

মালতী বলে: রাজরাণী হও মা!

গৃহিণী বলে: নে···নে, তোকে আর রাজরাণী বানাতে হবে না। ছুঁড়ির তো বয়স আছে। ভিক্ষে করে মরিস কেন?

ঠাকুরের হাত থেকে বাসি রুটি আর তরকারী নিয়ে মালতী বেরিয়ে আসে বাহিরে।

না—এই খেয়ে কোনো রকমে আজ সে কাটিয়ে দেবে। মালতী ফিরে আসে তার আস্তানায়। ভিক্ষেয় বেরোতে তার আর ইচ্ছে হয় না। বাসি রুটিগুলো খেয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে মালতী। বাবরী-কাটা কুরুঙ্গী ছোকরাটা যেন পেয়ে বসেছে। হুজ্জুতি লাগায় এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে-ঘুরে। সিটি দেয় মুখে। হঠাৎ একটা টাটকা রক্ত-মাখা মুর্গীর ঠ্যাং এসে পড়ে মালতীর গায়ে। মালতী উঠে এসে দাঁড়ায় বাহিরে। দেখে ছেলেটা দূরে দাঁড়িয়ে সেই রকম দাঁত বার করে হাসছে।

মালতী রেগে যায়। খুব রেগে যায়। চীৎকার করে বলে: কেয়া দিল্লাগী হোতা? লাথ মারেগা মু মে। বাবরী-কাটা কুরুঙ্গী ছোকরাটা আর হাসে না। চলে যায় সেখান থেকে।

রাত্রে কুমুদ এসে মালতীকে জিগ্যেস করে: কি হ'লো রে আজ তোর?

মালতী বলে: কিছু না।

কুমুদ বিস্মিত হয়ে বলে: কিছু না? সে কি? তুই বুঝি আজ আর বেরোসনি?

—হ্যাঁ, বেরিয়েছিলুম। কিছু হয়নি। তা ছাড়া আজকাল ভিক্ষে আর পাওয়া যায় না। লোকে ভিক্ষে না দিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে আমার দিকে।

কুমুদ এই প্রথম ভাল করে দেখে মালতীকে। অনাবৃত যৌবনের ছাপ মালতীর সারা দেহে দেখা যায়। নিস্তেজ নিষ্প্রাণ একটা ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে। ভিক্ষে দিতে কারই বা মন চায়? কুমুদ বলে: তুই কাল থেকে আর বেরোসনি কোথাও। আমি আর তোর মা যা রোজগার করবো—তাতেই আমাদের তিন জনের চলে যাবে।

এই দিন থেকে মালতী আর ভিক্ষে করতে বেরোয় না। শৈলবালা আর কুমুদ দু'জনে মিলে যা সারা দিনে পায় তা দিয়েই তিন জনের চলে যায়।

ভিক্ষা বৃত্তি হ'লে মানুষের স্বভাব-বুদ্ধিরও পরিবর্তন হয় অনেক। আসল গৃহী যদি চাপে পড়ে বৈরাগী হতে চেষ্টা করে—তার যেমন স্বভাবে গৃহী-মনের ছাপ দেখা যায়, তেমনি মালতী ও শৈলবালা জাত ভিখিরী নয় বলেই তারা তাদেরই অজ্ঞাতে অস্থায়ী সংসারের আকর্ষণ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না।

ভিক্ষে করে কি কখন স্বচ্ছলতা আসে? শৈলবালা আজকাল মোটেই কিছু পায় না। সারা দিন ধরে আকুল স্বরে কেঁদেও হাতে একটা ফুটো পয়সাও পড়ে না।

কুমুদ আজকাল আর শৈলবালাকে মোটেই পছন্দ করে না। আর পছন্দ করে না বলেই মোটে আমল দেয় না। কুমুদ সন্দেহ করে শৈলবালাকে। ভাগ্য যখন বিরূপ তখন শৈলবালা আর কি করবে? কুমুদের মেজাজটা মোটেই ভাল নেই। সে বলে: আজকাল কি মোটেই কিছু হচ্ছে না তোর—মালতীর মা?

শৈলবালা সোজা জবাব দেয়: না।

কুমুদ রেগে ওঠে। চীৎকার করে বলে: সরিয়ে রাখলে আর হবে কোথা থেকে? তোরা বেশ মজায় আছিস্। আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে দু'জনে চালিয়ে যাচ্ছিস।

শৈলবালা বলে: ভিক্ষে না দিলে আমি আর কি করবো?

কুমুদ বলে: বুজরুকি আমি বুঝি।

—কেন, আমি যে দিন যা পেয়েছি তা তোর হাতে দিইনি?

—তখন যে একেবারে কাঁচা ছিলি। কুমুদের গলায় বেশ ঝাঁজ।

শৈলবালার গলা শুকিয়ে যায়। চোখে জল আর বাগ মানে না। মেয়েছেলের চোখের জলে কুমুদের মন ভিজে যায়। কুমুদ বলে: রাগ করিস কেন মালতীর মা? সকলেই তো দু'দিন আধপেটা খেয়ে আছি। পেটে খিদে থাকলে রাগটা একটু বেশী হয়।

—একটা উপায় বললে আমি তাই করবো?

—করবি মালতীর মা, করবি। এক কাজ কর, গরম জলে কিছু সোরা দিয়ে পা-টা পুড়িয়ে ফেল। দেখবি কি ভীষণ দগ দগে ঘা হবে। সুস্থ শরীরে ভিক্ষে চাইলে লোকে দেবে কেন? ঘা দেখে লোকের মায়া হবে।

শৈলবালা বললে: বেশ, আজ রাত্তিরেই আমি তাই করবো।

মালতী এ সবের কিছুই জানে না। কুমুদ ও শৈলবালার কোনো কথাবার্তাই সে শোনেনি। মোড়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাম-বাস দেখছিল। ফিরে এসে কুমুদকে জিগ্যেস করে: মা কোথায়?

কুমুদ বলে: জানি না।

—সন্ধ্যে বেলায় আবার বেরুলো কোথায়?

—আমি তা কি করে জানবো?

মালতী আর কোনো কথা জিগ্যেস করে না কুমুদকে। চুপ-চাপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। কুমুদও এদিক-ওদিক একটু ঘুরে এসে শুয়ে পড়ে।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায় কুমুদের। ডান দিকের একটা দর্মা সরিয়ে দিতে রাস্তার আলো এসে পড়ে ঘরে। কুমুদ দেখে শৈলবালা তখনও ফেরেনি। সে ভাবে, শৈলবালা গেল কোথায়?

দর্মাটা খোলাই থেকে যায়। শুয়ে শুয়ে অনেক কথাই ভাবে কুমুদ। অস্থির হয়ে ছটফট করে সে বিছানায়।

মালতীর চোখে গাঢ় ঘুম। কোনো সাড়া নেই তার। গায়ের কাঁথাটা সরে গেছে মালতীর। ছেঁড়া ফুটো কাপড়ে সারা দেহের আব্রু বজায় রাখা যায় না। হাত-পা ও মুখের রঙ মালতীর রোদে ঘুরে-ঘুরে ঝলসে গেছে, কিন্তু রাস্তার আলোয় তার গায়ের রঙ সোনার মতন মনে হয়।

টাটকা সবুজ সব্জী দেখতে যেমন ভাল লাগে, কুমুদের তেমনি ভাল লাগে মালতীকে দেখতে। কুমুদ উঠে এসে মালতীর গায়ে চাপা দিয়ে দেয় কাঁথাখানা। কিছুক্ষণ বসে থাকে তার কাছে, গায়ে গা লাগাতে বেশ ভালই লাগে কুমুদের।

না—কুমুদ উঠে এসে দাঁড়ায় বাইরে। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রে বাদুড় প্যাঁচার ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। ওদিকে কুক্সীরা আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে ঘিরে বসে সবাই মিলে তাত পোয়াচ্ছে। কুমুদ কি ভেবে যেন ফিরে আসে। আস্তে-আস্তে অতি সন্তর্পণে মালতীর গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। মালতী অঘোরে ঘুমোয়।

কুমুদ মালতীকে ডাকে: মালতী, এই মালতী!

মালতীর কোনো সাড়া নেই। কুমুদ মালতীর বুকে কান দিয়ে শোনে। কত সঞ্চিত ব্যথার আকুল আর্তনাদ—কুমুদের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ বলে মনে হয়। মালতী ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শোয় কুমুদের দিকে। তার হাতটা গিয়ে পড়ে কুমুদের গায়ে।

কুমুদের খুব শীত করছে। সে মালতীর কাঁথার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ে। মালতীর উষ্ণ, নরম দেহের স্পর্শে শিহরণ আসে কুমুদের। কান দুটো গরম হয়ে যায়। মালতী জেগেই হোক্ আর ঘুমের ঘোরেই হোক্ প্রথমে ঝাপটা মেরে সরিয়ে দেয় কুমুদকে। কিন্তু কুমুদ যখন জোর করে কাঁথার মধ্যে শোবে, তখন সে আর কারুরই বাধা মানবে না।

ভোর হতে কুমুদ দেখে, মালতী তার গলাটা জোর কোরে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে, আর শৈলবালা শুয়ে আছে কুমুদের জায়গায়।

অন্নের দাম

বন্দে আলী মিয়া

আষাঢ় মাস পার হয়ে শ্রাবণ এসে গেল তবু আকাশে এক বিন্দু জলের সম্ভাবনা দেখা গেল না। গোলাগঞ্জে ধান-চাল পূর্ব্বের মতো প্রকাশ্য ভাবে বিক্রয় হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আড়তে মহাজনদের ঘরে যা আছে তার দাম আগুন। বৌ-ঝির গায়ের সোনা-রূপা—ঘরের বাসনপত্র আসবাব ধীরে-ধীরে মহাজনদের গদিতে চলে গেল, তার পর নিরুপায় হয়ে ছেলেপুলে নিয়ে কচু সেদ্ধ, গাছের পাতা সেদ্ধ ইত্যাদি খেয়ে দিন কাটতে লাগলো। ঘরে-ঘরে হাহাকার—আর্তনাদ! যাদের ঘরে সম্বৎসরের ধান উঠেছিল তারা কোম্পানীর লোককে চড়া দরে বিক্রয় করে নোটের কাগজ বুকে জড়িয়ে উপবাস সুরু করেছে। খাদ্যবস্তু আজ একান্ত দুর্লভ!

গাছের পাতা এবং মাঠের কচু ফুরিয়ে গেল। সুতরাং ঘরে-ঘরে অনাহার চল্‌তে লাগলো। কারো দুয়ারে একটুকু ফেনের প্রত্যাশা অবধি রইলো না।

গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই গরীব। চিরকাল পরের বাড়ীতে জনমজুরী খেটে দিন কাটিয়েছে। অনাগত দুর্দ্দিনের জন্য একটি কপর্দ্দকের সঞ্চয়ও কারো ঘরে নাই। আজ দুঃসময়ে কারো জন খাটবার প্রয়োজন হয় না। খামারে কারো এক মুঠো ধান নাই, সুতরাং ছেলে-বৌ নিয়ে সকলের দুর্দ্দশার অবধি রইলো না। ক্ষুধার যাতনায় এত দিনের বাড়ী-ঘর ছেড়ে দলে-দলে সকলে শহরে চললো দুটি দানার প্রত্যাশায়।

নটবর দাস, হরি মাইতি, আহম্মদ সেখ এবং আরো দু'-এক জন ঘর ছেড়ে গেল না। এদের কারো দু'-তিনটি অবিবাহিতা কন্যা, কারো তরুণী বিধবা বোন, ভ্রাতৃবধূ এবং কারো বা সুন্দরী স্ত্রী তাদের পথ চলার অন্তরায় হয়ে সুমুখে দাঁড়ালো। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। পেটের দায়ে ইজ্জৎ খোয়াতে কেউ পারবে না।

নায়েব রাজীবলোচন খোরশেদ পাইককে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের অবস্থা দেখবার জন্য বের হয়েছিল। প্রায় প্রতি গৃহ তালাবন্ধ, পথ-ঘাট জনমানবশূন্য। দু'-চার জন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা দুঃসহ অনাহার-যন্ত্রণা সহ্য করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তিলে-তিলে এগিয়ে চলেছে, মাঝে-মাঝে তাদের সকরুণ আর্ত্তনাদ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আশে-পাশে দু'-তিন মাইল রাজীব ঘুরে এলো—প্রতি গ্রামের অবস্থা একরূপ।

সূর্য্য কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অস্তমিত হয়েছে। রাজীব নটবর দাসের আঙিনায় এসে হাঁক দিয়ে দাঁড়ালে। নটবর বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে ধুঁকছিলো। উপবাসে দুশ্চিন্তায় শরীর শীর্ণ।

নটবর ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিলে: বোসো নায়েব মশাই! আজ চার-পাঁচ দিন বৌ-মেয়ে নিয়ে নির্জ্জলা উপোস, এ দুঃসময়ে খাজনা দিতে পারবো না।

রাজীব একটা অস্বাভাবিক শব্দে হাসলে। মৃদু কণ্ঠে বললে: পাগল, তোর কাছে খাজনা চাইতে এসেছি নাকি? দেখতে এলুম—কেমন আছিস্।

জবাব দিতে গিয়ে নটবর হাঁফাতে লাগলো। টেনে-টেনে বললো: আর দুটো দিন পরে এসে সবাইকে শ্মশানে নিয়ে যেও।

রাজীব কোনোও প্রত্যুত্তর না করে শুধু একটা শব্দ করলে: হুম্। তার পর দুটো বিড়ি বের করে একটা নিজে ধরালে—অপরটা নটবরের দিকে এগিয়ে দিলে। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলে: এই টাকাটা রাখ, গোলাগঞ্জ থেকে চাল আনিয়ে নিস্।

নটবরের চোখ দুটো ধবক্ করে জ্বলে উঠলো। বললে: টাকা? টাকা নিয়ে কি হবে নায়েব মশাই! দুটো চাল যদি দিতে পারতে!

চাল! চাল দেওয়াই তো মুসকিল! তা এক কাজ কর, তোর বড়ো মেয়েটাকে সঙ্গে দে—আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

নটবর চীৎকার করে উঠলো : মালতী !

পিতার আহ্বানে একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

রাজীব লোভাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আস্তে-আস্তে বললে : এইটি তোমার বড়ো মেয়ে বুঝি? আহা, না খেয়ে-খেয়ে কি ছিরি হয়েছে ছাখো ! তা, ওকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও, কিছু চাল দিয়ে দেব। হ্যাঁ, দেখ নটবর, বেশী তো একসঙ্গে দিতে পারবো না। রোজ বিকেলের দিকে ওকে একবার পাঠিয়ো—সের খানেক করে নিয়ে আসবে। এ কথা আর কাউকে যেন বোলো না বাপু, পাড়ার পাঁচ জনকে তো আর দিতে পারা যাবে না ?

নটবর কৃতজ্ঞতায় গলে গেল। টল্‌তে টল্‌তে ছুটে এসে রাজীবের পা জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে।

রাজীব তাকে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লো। বললে : এই জন্তে খোরশেদ কারু বাড়ীতে যাই না ! লোকের দুঃখ-কষ্ট দেখলে আমার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এদের যে রোজ এক সের চাল দিতে চাইলুম, আজকের দিনে এই চালের দামটা কত ভেবে ছাখ দিকি !

খোরশেদ মাথা নেড়ে মনিবকে সমর্থন করলে : আপনার দয়ার শরীল হুজুর, আপনি না দিলে এদের আর জান রক্ষা হয় না।

কথাটা অতিশয় সত্য।

রাজীব উঠে দাঁড়ালো। মালতী বাড়ী থেকে বের হয়ে তার পিছু-পিছু চাল আন্‌তে চল্‌লো।

নটবর মনকে দৃঢ় করলে। রাজীবকে সে জানে। নারী-মাংস-লোলুপ এই ব্যক্তিটির পূর্ব্ব-ইতিহাস বিশেষ সুখশ্রাব্য নয়।

প্রতিদিন সে এক সের চাল দেবে—এর বিনিময়ে সে যা প্রার্থনা করবে এ কথা অনুমান করে সে মনে মনে শঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠলো। কিন্তু আজ সে নিরুপায়। এক বেলার অন্নের সংস্থান যার ঘরে নাই তার মান-ইজ্জতের বালাই রাখলে চল্‌বে কেন? পিতা হয়ে তার অনূঢ়া সুন্দরী কন্যাকে পাঠিয়েছে নর-শার্দ্দূলের গহ্বরে এক মুষ্টি অন্নের জন্য—হয় তো তার নারী-ধর্ম্মকে অক্ষত রেখে সে আসতে পারবে না। কিন্তু উপায় কী !

সন্ধ্যার কিছু পরে মালতী ফিরে এলো। এসেই আঁচলের গেরো খুলে বারান্দার উপরে চালটা ঢেলে দিয়ে ঘরে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। নটবরের স্ত্রী এবং তার পনেরো-ষোলো বছরের ছোটো মেয়েটি পাংশু মুখে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

নটবর বিষয়টা অনুমান করেই বারান্দা থেকে হুঙ্কার ছাড়লে : খবরদার, ওসব কান্নাকাটি চলবে না। যারা খেতে পায় না, তাদের আবার ইজ্জৎ-আবরু কী ! আজ চার-পাঁচ দিন ওপোষে কাটছে, যা হোক্ দুটি সেদ্ধ করবার ব্যবস্থা করো।

নটবরের স্ত্রী চালগুলো নিয়ে রান্না-ঘরের দিকে চলে গেল। ছোট বোন আন্না চুপি-চুপি প্রশ্ন করলে : কী হয়েছে রে দিদি ?

মালতী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে জবাব দিলে : চাল আন্‌তে আর আমি যাবো না রে ! নায়েব লোকটা ভারী ইয়ে। চাল দেবার জন্তে একটা ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল—পাইক ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে। আমি আর যাবো না !

আন্নার বয়স কম। মালতীর দুর্দ্দশার কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খুক্‌-খুক্ শব্দে হেসে ফেললে।

মালতী সাপের মতো গর্জ্জে উঠলো : পড়তিস্ যদি ওই রকম লোকের পাল্লায় তবে হাসি বেরিয়ে যেত। পোড়ারমুখী—বাঁদরী, যা এখান থেকে।

আন্না বললে : তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। মেয়েছেলেকে একা পেলে পুরুষদের অমন একটু-আধটু ইয়ার্কি দেবার সখ হয়ে থাকে। সব পুরুষই সমান। কাল আমি চাল আন্‌তে যাবো।

ওষ্ঠ দুটি বিস্ফারিত হয়ে মালতীর মুখে এইবার হাসি দেখা দিল। বললে : যাস্। কিন্তু চালের যা দাম দিয়ে আসতে হবে তা সারা জীবনে ভুলতে পারবি না।

পরদিন আন্নাকে চাল আন্‌তে মালতী যেতে দিল না ;—বেশ-বিন্যাস করে সে নিজেই গেল এবং ফিরে এসে চাল তো দিলই—উপরন্তু দুটো টাকাও দুঃসময়ে সংসার খরচ বাবদ আঁচলের খুঁট থেকে খুলে পিতার পায়ের কাছে রাখলে।

টাকা দুটির দিকে নটবর ভ্রুক্ষেপ মাত্র করলে না। কঠিন দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে জোরে-জোরে হুঁকা টান্‌তে লাগলো।

রাস্তার ওপাশে হরি মাইতির বাড়ী। একান্ত অসময়ে হরির বৌয়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ জনহীন গ্রামের নিঃশব্দ শূন্যতাকে চিরে ফালা-ফালা করে দিলে।

—যে মিন্সে ছেলে-বৌকে খেতে দিতে পারে না তার মুখে আগুন ! দুধের বাছারা আমার চার-পাঁচ দিন ওপোষ করে কাতরাচ্ছে—এক ফোঁটা জল মুখে দিতে পারলুম না।

হরির গলা শোনা গেল : কথা শোনো মাগীর। নিজের এক মুঠো জুটছে না—তোদের দেব কেমন করে ? এত কাল খাইয়েছি পরিয়েছি, এখন আর পারবো না ! তোরা যেখেনে ইচ্ছে যা—যা-খুশী করগে যা।

বৌ জবাব দিলে : যা-খুশী করবো—যেখানে ইচ্ছা যাবো ! গাঁয়ের দশ জনে শহরে গেল -মেগে খাবার জন্যে—তুইও গেলি না, আমাদেরও যেতে দিলি না। ভারী নবাব রে—ঘরে বসে থাকলেই খাবার আসবে ! তোর মুখে নুড়ো জেলে যেদিকে দু'চোখ যায় আজই চলে যাবো।

হরির কর্কশ কণ্ঠ ঝন্‌-ঝন্ শব্দে বেজে উঠলো : যা, যা, যা, আমি বাঁচি বাপু,—না খেয়ে মরে বাঁচি। জমিদার-বাড়ীর পাইকের সঙ্গে কাল থেকে ফাসুর-ফুসুর করছিস, সে কি আমি বুঝি না কিছু ? খেতে-পরতে দিতে পারছি না, তাই বলে চোখের সামনে এ সব আর করিস না।

নটবর নিঃশেষিত হুঁকাটাকে দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো। সম্মুখে ও পিছনে মাথাটাকে বার দুই আন্দোলিত করে অস্ফুট কণ্ঠে আপন মনেই বলে উঠলো : চোখের সামনে করবে না, ভারী মানী লোক রে ! ব্যাটার পেটে নেই ভাত—কিন্তু তেজটুকু ঠিকই আছে ! বলে হা-হা শব্দে মৃত কণ্ঠে টেনে টেনে হাসতে লাগলো।

সেই দিন রাত্রি প্রভাতে হরি মাইতির স্ত্রীর ক্রন্দন ও চীৎকারে বুঝতে পারা গেল, তার বছর বারো বয়সের বড় ছেলেটি শুধু মাত্র অনাহারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে : কোলাহলে নটবরের ঘুম ভেঙে গেল। কঠিন মুখে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বীভৎস কণ্ঠে হা-হা করে উঠলো। হাসলে কি কাঁদলে কিছু বোঝা গেল না।

তামাক সেজে বাইরের দিকের বারান্দায় বসে গম্ভীর মুখে ফুড়ুক-ফুড়ুক করে টান্তে লাগলো।

প্রভাতের আধো-অন্ধকার আধো-আলোকে অনতিদূরে ঝোপের অন্তরাল থেকে দুটি নারী-মূর্ত্তি সুমুখের প্রান্তরে এসে পড়লো। ভ্রূ কুঁচকে এদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নটবর অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরালে। নারী দুটির মধ্যে একটি তার কনিষ্ঠা কন্যা আন্না ও অপর জন ও-পাড়ার আহমদ সেখের বিধবা ভ্রাতৃবধূ। এরা দু'জন সন্ধ্যার দিকে উদরান্নের সন্ধানে বেরিয়েছিল। প্রতি রাত্রে এই নারীর দল কখনো দলবদ্ধ হয়ে, কখনো বা পৃথক্-পৃথক্ ভাবে অভিযানে বের হয়। কেউ হয় তো এক সান্‌কী ভাত দেয়—কেউ বা দু'মুঠো চাল—কেউ বা দু'-চার আনা পয়সা। শূন্য হাতেও কোনো কোনো রাত্রিশেষে কাউকে ফিরতে দেখা যায়। পুরুষেরা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণ হয় তো কোনরূপে সংগ্রহ করে আনে—তার মধ্যে থেকে বিলাসের জন্য কোনো নারীকে দান করা তাদের পক্ষে কষ্টবহ হয়ে ওঠে।

আন্না নিকটবর্ত্তী হয়ে হাতের মুঠো থেকে চৌদ্দ আনা পয়সা পিতার সুমুখে ছুঁড়ে দিয়ে ফিক্ করে একটুখানি হেসে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলো।

নটবরের মনে হলো, ধরণী দ্বিধা হলে সে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে, কিন্তু নিতান্তই তা সম্ভব না হওয়ায় তার ভেতরে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। পাহাড়ের মতো স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। ধিক্—তার জীবনে শত ধিক্! দুটি অবিবাহিতা কন্যার অসদুপায়ের উপার্জ্জন দ্বারা তাকে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে, এর চেয়ে নৈতিক অধঃপতন আর কি হতে পারে! এমন জীবনে তার লক্ষ কোটি ধিক্কার!

চিরকাল যাদের বৌ-ঝি রীতিমতো আবরু রক্ষা করে চলেছে—তারা আজ এক মুষ্টি দানার জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে কেউ না খেয়ে মরছে—কেউ বা হাসপাতালে পড়ে ধুঁকছে। যাদের রূপ-যৌবনের ঐশ্বর্য্য আছে তারা বাড়ীউলিদের আশ্রয়ে থেকে দেহের বেসাতি খুলেছে। নটবরের জীবনে কন্যার উপার্জ্জন ভোগ করতে হলো! দুর্ভিক্ষের দুঃসহ যন্ত্রণায় তার প্রবৃত্তি—তার রুচি ও মন এত নীচু ধাপে চলে গেছে যে, আজ সহস্র অত্যাচারেও আর সাড়া জাগে না। দু'মাস পুর্ব্বেও এই পঙ্গু মন তার ছিলো না। বাড়ীর মেয়েদের কী কড়া শাসনেই না সে রাখতো।

দিনের পর দিন চলে। পল্লী থেকে যারা শহরে এসেছিল তাদের আশা ছিল অফুরন্ত—আকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশের মতো বিস্তৃত। মফঃস্বল শহর থেকে কলকাতাতেই এদের ভিড় জমলো অধিক। মহানগরীর পথে-পথে দুর্গত নরনারী আর শিশু-দেবতার দল। বঙ্গজননী যেন এদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আর্ত্তনাদ করছে, 'ম্যায় ভুখা হুঁ।' শিশুরা কেউ মা'র কোলে চীৎকার করছে—কেউ পিতার কাপড় ধরে পিছু-পিছু ঘুরছে এবং ক্ষীণ কণ্ঠে ক্ষুধার আবেদন জানাচ্ছে। পিতা অসহায়—মাতা নিরুপায়। ক্ষুধায় দেহ অবসন্ন—অনিদ্রায় অনশনে মন নিস্তেজ। দ্বার হতে দ্বারে স্খলিত পদে ঘুরছে আর ক্ষীণ কণ্ঠে নিবেদন করছে; আজ তিন দিন কলের জল খেয়ে আছি মা, এক মুঠো ভাত দাও গো—এতটুকু ফেন দিয়ে জীবন বাঁচাও!

যারা এক দিন ছিলো পল্লীর সমৃদ্ধিমান কৃষাণ, তারা আজ নিঃস্ব, অসহায়, দুর্গত। মহানগরীর সুবিস্তৃত রাজপথ আজ তাদের আশ্রয়, লক্ষ কোটি পদচিহ্নের মাঝে তাদের পদরেখা মহাকালের পৃষ্ঠায় আঁকা হয়ে রইলো। সেই পথের কঠিন শিলাতল আজ সকলের শয্যা। মেটে সান্‌কী—পরিত্যক্ত টিনের মগ হাতে নিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি দ্বারে-দ্বারে পথে-পথে ঘোরে। কেউ দয়া করে এক মুষ্টি দেয়, কেউ বা তাড়িয়ে দেয়। পথ দিয়ে রঙ বেরঙের কাপড় পরে সারা দিন লোকজন যাওয়া-আসা করে। কেউ যায় অফিসে—কেউ যায় স্কুল-কলেজে—কেউ যায় সিনেমায়—কেউ ফেরে ঘরের পানে—কেউ যায় বাইরে। এরা ক্ষুধাতুর ছেলেপুলেকে কোলে নিয়ে একটি পয়সার জন্য জনে-জনে আবেদন জানায়।

পথ দিয়ে যায় বাস, ট্রাম, যায় গাড়ী, ঘোড়া, অগণিত রিক্সা, মাল-বোঝাই লরী আর ভ্যান। চারি দিকে প্রাসাদ সম সুবিশাল সৌধ—দিকে-দিকে মহানগরীর বিপুল জনসমারোহ! তাদের বিলাস-ব্যসনের মাঝে পল্লীর সহস্র সহস্র বুভুক্ষু পথাশ্রয়ী নরনারী নিতান্তই কদর্য্য—কুৎসিত। পথে-পথে মন্বন্তরের বীভৎস দৃশ্য! মিষ্টান্নের দোকানে—হোটেলে—রেস্তোঁরায় খাদ্যের বিপুল আয়োজন, কিন্তু এই নিরন্নের দল দিনের পর দিন রইলো উপবাসী। বর্ষার বারিধারা শিরোধার্য্য করে ডাষ্টবিন থেকে—ড্রেনের ময়লা থেকে খাদ্যকণা সংগ্রহ করতে লাগলো। ধনীরা এই জীর্ণ কৌপীনধারী জীবন্ত কঙ্কালগুলোর দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো, এ একটি অভিনব প্রচণ্ড কৌতুক!

সর্ব্বহারা গৃহহারার দল স্বাধীন বাংলার মহানগরীর বিলাস এবং ঐশ্বর্য্যকে নিতান্তই তাচ্ছিল্য করে পথে-পথে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলো। যারা মরতে পারলো না তারা ধুঁকতে লাগলো। লক্ষ লক্ষ নর-নারীর সকাতর করুণ দীর্ঘশ্বাস বাংলার আকাশ-বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলতে লাগলো। পিতার বুকের ওপরে অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলো সন্তান—পুত্র-কন্যা হারালো পিতা-মাতাকে, স্ত্রীকে ধরে রাখতে পারলো না স্বামী—কত নারী হলো বিধবা। বুকে-বুকে হাহাকার, অশ্রুহীন ব্যথাতুর আঁখি—ক্ষুধাক্ষিন্ন কণ্ঠে কণ্ঠে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ!

এই মন্বন্তরে শুধু দুটি জাতি আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারা হিন্দু নয়—তারা মুসলমান নয়—তারা ধনী আর দরিদ্র। হিন্দুর বাটীর সম্মুখের রাজপথে শেষ নিশ্বাস ফেলেছে তার স্বজাতি—সেদিকে সে দৃষ্টিপাত মাত্র করেনি। ধনী মুসলমানের সম্মুখে কাতারে-কাতারে মরেছে অনাহারী ক্লিষ্ট মুসলমান; সে জন্য তার আমোদ-প্রমোদের, আহার-বিহারের এতটুকু ত্রুটি ঘটেছে এমন দুর্ঘটনা কেউ প্রত্যক্ষ করেছে বলে মনে হয় না। এ জগতে ধনী আর দরিদ্রে বৃহৎ ব্যবধান। মানুষে মানুষে এত বড় হৃদয়হীনতার সাক্ষ্য ভারতের ইতিহাস চিরকাল প্রদান করবে।

ভাবান্তর

জন গলস্‌ওয়ার্দ্দি

'নর্ত্তকী বিমর্ষ ভাবে মাথায় হাত দিয়ে উদাস নয়নে বসে আছে। তার রক্ষণাবেক্ষণ করা অসম্ভব দেখছি। প্রার্থনা করার জন্য তাকে বিশেষ ভাবে বললাম। কিন্তু হতভাগিনী তাও জানে না। এতে তার কোন বিশ্বাসই নাই। কোন স্বীকারোক্তি করতেও সে নারাজ। সে পৌত্তলিক—পুরোদস্তুর পৌত্তলিক। এই অন্তিম মুহূর্ত্তে তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কি করা যায়! এমন কি তাকে বললাম তার জীবনের কাহিনী শোনাতে; তা কথাটা সে কানেই নিল না। ভাবলেশহীন চোখে শুধু চেয়ে আছে। সত্যই তার জন্য দুঃখ হচ্ছে। মরবার আগে তাকে কি কেউ কোন রকমে একটু সান্ত্বনা দিতে পারবে না? হাসি-গানে ভরা উচ্ছ্বসিত মুহূর্ত্তে—জীবনের প্রভাতেই তাকে মরতে হবে? তার ওপর কি কারও আস্থা নাই? এই সুন্দর সজীব প্রাণটি কোরকেই বিনষ্ট হবে, মা?'

কথাটুকু শেষ করে বেঁটে প্রবীণা ভগিনীটি হাত দুটো তুলে ধূসর রংএর জামায় আচ্ছাদিত বুকের উপর রাখলেন। স্নিগ্ধ খয়েরী চোখ দুটোয় তাঁর প্রশ্ন।

মোমের মত ফ্যাকাসে কপালের উপর বাঁধা মস্তকাবরণের ফাঁকে শুভ্র কেশগুচ্ছ। শ্বেত পরিচ্ছদে আবৃত ঋজু, ক্ষীণ, কাঁটা-সার দেহখানায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মঠাধ্যক্ষা এ নিয়ে তোলপাড় করছেন।

তদন্তে এই ভ্রাম্যমানা নর্ত্তকীকে গুপ্তচর সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে, সে তার প্রণয়ী জনৈক ফরাসী নাবিকের কাছ হতে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে স্পেনে জার্ম্মানীদের বিক্রয় করত। বিচারে অপরাধ সপ্রমাণ হয়েছে। তারা তাকে আশ্রমে রেখে গিয়ে বলেছিল—১৫ই পর্য্যন্ত একে আপনাদের কাছে রাখুন। জেলের চেয়ে এখানে সে নিশ্চয়ই ভাল থাকবে। যুদ্ধের খাতিরে, ফ্রান্সের স্বার্থের জন্য তারা হত্যা করবে—হত্যা করবে একটি মেয়েকে?

শিউরে উঠলেন মঠাধ্যক্ষা।

প্রবীণা মঠচারিণীর পানে আয়ত দৃষ্টিতে চেয়ে প্রধানা বললেন—যত্ন নেওয়া কর্ত্তব্য। আমায় নিয়ে চল তার ঘরে।

ধীর পদক্ষেপে তাঁরা দু'জনে অলিন্দ অতিক্রম করে তার ঘরে ঢুকলেন। নর্ত্তকী পা ঝুলিয়ে বিছানার উপর বসেছিল। প্রাচ্য জাতির মত পীতাভ গায়ের রং; স্নিগ্ধ তার মুখচ্ছবি। ভ্রূযুগল ধনুর মত বাঁকা, পুষ্ট অধরের ফাঁকে দাঁতগুলি মুক্তোর মত ঝকঝকে। কপালের কাছে কালো চুলের চূড়া। মনের ঝালে যেন নরম দেহখানা চেপে রেখেছিল হাতের নিষ্পেষণে। জাল-পড়া বাঘিনীর মত ঢুলু-ঢুলু চোখে সে চাইছিল দেওয়ালের পানে ও বাইরে; আমাদের দিকেও।

মঠাধ্যক্ষা বললেন—'বাছা, তোমার জন্য আমরা কি করতে পারি?'

নর্ত্তকী দেহটা একটু দোলাল মাত্র। রেশমী পোষাকের অন্তরালে দেহের প্রতিটি ভাঁজ প্রকট হয়ে উঠল।

'তোমার কষ্ট হচ্ছে! শুনলাম, তুমি প্রার্থনা করতে জান না।'

নর্ত্তকী মাথা হেলিয়ে হাসল—মধুর স্বরে, তৃপ্তির সঙ্গে।

'তোমায় বিরক্ত করতে কেউ আসবে না। জেনো, আমরা প্রত্যেকে তোমার ব্যথার ব্যথী। বই পড়তে চাও বলো, সুরা পছন্দ করলে এনে দিচ্ছি—এক কথায় কিসে তোমার মন হাল্কা হবে বলো?'

নর্ত্তকী গা-ঝাড়া দিয়ে হাত দুটো ঘাড়ের পিছনে মুঠো করে ধরল। অদ্ভুত তার ভঙ্গিমা—সুন্দর! নর্ত্তকী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। মঠাধ্যক্ষা বিচলিতা হয়ে পড়লেন।

'আমাদের আনন্দ দেবার জন্য না হয় একটু নাচ দেখাও?'

আবার নর্ত্তকী হাসল—উছলে-পড়া চাঁদের আলোর মত সে হাসি ফুটে উঠল তার মুখে-চোখে।

'হ্যাঁ!' সে বলল—'আপনাদের আনন্দ দিতে আমি সানন্দে নাচব। এতে আমিও আনন্দ পাব।'

'বেশ! খাওয়া-দাওয়ার পর আজকেই সন্ধ্যের সময় ভোজনালয়ের হল-ঘরে। কেমন? প্রয়োজন হলে কেউ না হয় পিয়ানো বাজাবে। ভগিনী ম্যাথিলডে চমৎকার বাজিয়ে।'

'হ্যাঁ, সাধারণ নাচে সঙ্গত থাকা ভাল।···আমি ধূমপান করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! আমি সিগারেট দিচ্ছি।'

নর্ত্তকী হাত বাড়াল। শিরা-সঙ্কুল শীর্ণ হাতে নিটোল বাহুর উষ্ণতার ছোঁয়াচ লাগতেই মঠাধ্যক্ষা শিউরে উঠলেন। আগামী কাল এ দেহ হিম-শীতল কঠিন হয়ে যাবে!

ঘোষিত হোল: আমাদের আনন্দ-বিধানের জন্য নর্ত্তকী আজ নাচবে। বিস্ময়ে সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। এক জন পিয়ানোটি রেখে গেল। সান্ধ্য-ভোজনে বসে সকলেই নানা জল্পনা-কল্পনা করছে। অদ্ভুত ব্যাপার! মঠের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। উঃ! ভুলে-যাওয়া দিনের আনন্দ। ওঃ! নাটকীয়—অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড কিন্তু।

চটপট খাওয়া-দাওয়া শেষ করে টেবিলগুলো সরিয়ে ফেলা হোল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে লম্বা একটা বেঞ্চে গেরুয়া-পরিহিতা ষাট জন মঠচারিণী বসে পড়ল। সকলেরই শুভ্র মস্তকাবরণ। মাঝখানে মঠাধ্যক্ষা; আর পিয়ানোর সামনে বসেছে ভগিনী ম্যাথিল্ডে।

বেঁটে প্রবীণা ভগিনীটির পিছনে নর্ত্তকী ঝরঝরে ভোজনাগার পেরিয়ে কৃষ্ণ ওক-কাঠ-নির্ম্মিত মঞ্চের দিকে চলল। মঠাধ্যক্ষা ছাড়া সকলেই ঘুরে তাকাল। নিঝুম হয়ে তখন তিনি ভাবছিলেন—চঞ্চল মেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে না দেয় ত ভাল।

নর্ত্তকী কালো রেশমী ঘাঘরা পরে এসেছে। পায়ে মোজা, তার উপর রুপালী পাদুকা। কটিদেশে স্বর্ণখচিত কটিবন্ধ। জরীর কাজ-করা আঁটসাট পোষাকে ঢেকেছে ঊর্দ্ধাংশ। বাহু দুটি নগ্ন। খোপায় গুঁজেছে রাঙ্গা ফুল। হাতে নিয়েছে হাতীর দাঁতের একটি ব্যজন। তাম্বুল-রাঙ্গা ঠোঁট দুটি। চোখে এঁকেছে কাজলরেখা। ছবির মত সুন্দর দেখাচ্ছে তার মুখখানা।

চোখ নামিয়ে আসরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। পিয়ানো বেজে উঠল। নর্ত্তকী ব্যজন তুলে ধরল। স্পেনদেশীয় রীতিতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরে দুলে ঝুঁকে পাক খেয়ে বিভিন্ন ভঙ্গীতে সে নাচল। সব-কিছুর ভিতর চোখ দুটি তার মুখর হয়ে উঠছিল। এই চোখের ইশারা সকলের মনে জাগায় সংশয়। কখন আনন্দ অথবা ভীতি, হয়ত শঙ্কা কিংবা কৌতূহল।

নাচ শেষ হতেই গুঞ্জরণ উঠল দর্শক-সারিতে, হাসল নর্ত্তকী। আবার শুরু হোল বাজনা। যেন সঙ্গতের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছে না এমন ভাব নিয়ে মুহূর্ত্ত মাত্র নিস্পন্দ থেকে সে পায়ে তাল ঠুকল; স্মিত হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের ফাঁকে।

বড় আমুদে নর্ত্তকী—দ্বিধাহীনা, প্রজাপতির মত চটুলা! সবার মনেই আনন্দের দোলা দিয়েছে দোল।

স্থবিরের মত বসেছিলেন মঠাধ্যক্ষা শীর্ণ হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করে, পাণ্ডুর ঠোঁট দুটি কামড়ে ধরে। মনে ভেসে উঠছে কত কথা। স্মৃতির স্তরে-স্তরে লেগেছে যেন আলোর স্পর্শ। অনেক দিন আগে, স্পষ্ট মনে পড়ে, ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধে তাঁর প্রণয়ী মারা যাওয়ার পর হতেই তিনি এই যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেছেন। যবনীর এই কোমল দেহলতা, ঐ রাঙ্গা ফুল, বিকশিত মুখশ্রী, আয়ত দৃষ্টি মন মাতিয়ে তোলে। ফেলে-আসা দিনগুলো মুখর হয়ে ওঠে। আগে মনে হোত, এই অনুভূতি বুঝি, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মঠবাসিনী হয়েছেন এই অনুভূতি, এই স্পৃহা, এই উচ্ছ্বাসকে মন হতে দূর করতে, সমাধিস্থ করতে।

নাচের তালে মনের গহন প্রদেশে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে ঘুমন্ত স্মৃতি। ডাইনে-বামে ঘুরে দেখলেন অধ্যক্ষা। কাজটা কি ঠিক হোল? এদের মন এখনও যে চঞ্চল, যৌবনের আসক্তি এরা যে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি! অথচ এই মেয়েটি যখন মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, তখন তার আকাঙ্ক্ষা না মেটান কি উচিত হোত? সে তৃপ্ত, তাই মনের আনন্দে নাচছে। সত্যিই সে খুশী। কি সাধনা—তবু কত ত্যাগ! ভয়ের কারণ বটে। খরগোশের চোখে চোখ দিয়ে সাপ যেমন তাকে যাদু করে, তেমনি ভাবে সকলের মনকে নর্ত্তকী আকৃষ্ট করেছে—এমন কি ভগিনী লাউসীর পর্য্যন্ত।

অধ্যক্ষা হাসবার প্রয়াস পেলেন। হতভাগী লাউসি!

মোহিনীরূপী বিভীষিকাময় মুখের পাশেই তাঁর চোখে পড়ল ভগিনী মেরীকে। বালিকার চোখ দুটি যেন জ্বলছে। বালিকা মেরী—যুবতী, সবে বিশ বছরে পা দিয়েছে। বছর খানেক হোল তার প্রণয়ী যুদ্ধে মারা গিয়েছে। মঠের মধ্যে সেরা সুন্দরী মেরী। নিটোল হাত দুটি চেপে ধরেছে কোলের উপর। আর হ্যাঁ, নর্ত্তকীর একাগ্রদৃষ্টিও তার উপরেই নিবদ্ধ। মেরীর সামনেই সে সুন্দর নরম দেহের বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচছিল। নর্ত্তকীর বিহ্বল হাসির ঝিলিক্ এসে লাগছিল মেরীর মনে, ফুটে উঠছিল তার তৃষিত অধরে। সুন্দর ফুলের আশে-পাশে ঘুরে প্রজাপতি যেমন নেচে বেড়ায়, তেমনি নাচের পর নাচের ভিতর দিয়ে মেরীর সঙ্গে নর্ত্তকীর যেন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠল। অধ্যক্ষা মনে মনে ভাবলেন—মাতা ভার্জ্জিনের ইচ্ছা, না শয়তানের প্ররোচনা? দর্শকদের কাছ ঘেঁসে নর্ত্তকী নাচছে। চোখের দৃষ্টি তার দীপ্ত, অধরে দর্প। ভগিনী মেরী! একি? কটাক্ষ হানল, ব্যজন দিয়ে ছুঁয়ে গেল তাকে।

স্তব্ধ হোল আসর। নর্ত্তকী সম্ভাষণ জানাল—'শুভেচ্ছা জানাই, মহোদয়াগণ! বিদায়।'

ধীরে, হেলে দুলে যেমন ভাবে সে এসেছিল তেমনি ভাবে প্রবীণা ভগিনীর সঙ্গে চলে গেল।

সকলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'তোমরা যে-যার ঘরে যাও।…মেরী!'

মেরী এগিয়ে এলো। চোখে তার জল।

'মেরী! ক্ষমা চেয়ে মনের পাপ প্রবৃত্তির জন্য যীশুর নিকট প্রার্থনা কোর। বুঝি বাছা, দুঃখ হবারই কথা। যাও নিজের ঘরে—প্রার্থনা কোর।"

তার চলার ভঙ্গীটি কি অপূর্ব্ব! সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব তারও।

অধ্যক্ষা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ঘাসের বুকে তুষার ছড়িয়ে হিম-শীতল সকাল বেলা এলো নর্ত্তকীর শেষ মুহূর্ত্তের সংবাদ নিয়ে।

গুলীর শব্দ কানে এলো। কম্পিত অধরে অধ্যক্ষা হতভাগ্য আত্মার জন্য যীশুর নিকট প্রার্থনা জানালেন।…

সেদিন সন্ধ্যার পর ভগিনী মেরীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। দু'দিন পরে একখানা চিঠি এলো:

"ক্ষমা করুন, মা! আমি পুরোন জীবনে ফিরে এসেছি।—মেরী।"

অধ্যক্ষা নিস্পন্দ ভাবে বসে পড়লেন। মৃত্যুর মধ্যেই জীবন! ছায়াছবির মত ভেসে ওঠে নর্ত্তকীর মুখখানা। খোঁপায় গোঁজা রাঙা ফুল। মিশ, কালো আয়ত দুটি চোখ, আঙুলের চাপে চুম্বনোন্মুখ অধরের স্মিত ব্যাপ্তি।

অনুবাদিকা।—অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

অর্থপাল চরিত

হে দেব, আমার সুহৃদেরা যা করেছিলেন আমিও তাই করেছিলুম। এককর্মা। সমুদ্রের নেমি দিয়ে ঘেরা এই পৃথিবীতে কী ঘোরাই না ঘুরেছি। ঘুরতে ঘুরতে একদম কাশীপুরী বারাণসীতে এসে উপস্থিত হই।

গঙ্গার তীরে মণিকর্ণিকার ঘাট। টুকরো টুকরো মণির মত নির্ম্মল ঝক্‌ঝকে জল! সেই জলে স্নানাদি সমাপন করে, ভগবান্ অন্ধক-মথন অবিমুক্তেশ্বরকে প্রণাম-প্রদক্ষিণ করে মণিকর্ণিকার ঘাটে ফিরে এসেছি; এমন সময় আমার চোখে পড়ল,—একটি বিরাট মানুষ। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। লোহার পরিঘের মত পীবর বাহু দুটি দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। কাঁদছেন ত কাঁদছেনই। কান্না তাঁর আর থামে না। চোখ দুটো ফুলে উঠেছে, তামার মত লাল! আমার মন তর্ক করে উঠল:

"লোকটির আকৃতি বড় কর্কশ, বড় দুর্দ্ধর্ষ। অথচ চোখের তারা দুটি ম্লান হয়ে আছে, ঝরে পড়ছে সহায়হারা দীনতা। তবে কি ভয়ঙ্কর সাহসের বা গভীর দুঃখের কিছু একটা ঘটেছে এঁর জীবনে? প্রাণের উপর মমতা বা স্পৃহা ত কিছু দেখছি না। প্রিয়জনের দুঃখে বা বিপদে আতঙ্কিত হয়ে কোনো রকমের কৃচ্ছ্রসাধনা করছেন না ত? যাক্, এঁকে না হয় জিজ্ঞাসাই করে দেখা যাক্। হয়ত আমিও কোনো সাহায্য পেয়ে যেতে পারি এঁর কাছ থেকে।"

এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ভদ্র, আপনাকে দেখে এবং আপনার আচার-ব্যবহারের প্রকাশ দেখে আমার মনে এই সাহসের সঞ্চার হয়েছে। গোপনীয় কিছু থাকলে আমি শুনতে চাই না, তবে এত শোকের কারণ কি হতে পারে, এই প্রশ্ন মনে জাগছে।"

সবহুমান তিনি আমাকে অনেকক্ষণ ভাল করে দেখে বললেন, 'তাতে আর দোষ হয়েছে কি, শুনুন।' এই বলে একটি করবীর গাছের তলায় আমাকে নিয়ে বসলেন। বলতে লাগলেন কথা—

"মহাভাগ, এই যে আমাকে দেখছেন, এই আমি একদিন পূর্ব্বাঞ্চলে বাধাহীনভাবে ঘুরে বেড়াতুম। নাম—'পূর্ণভদ্র'। জনৈক গ্রামাধ্যক্ষের আমি পুত্র। অনেক যত্নে অনেক ব্যয় করে আমাকে মানুষ করেছিলেন পিতৃদেব; কিন্তু দৈব ব'লে একটি পদার্থ আছে, তার চক্রানুবর্ত্তী হয়ে শেষে আমার বৃত্তি হয়ে দাঁড়াল চৌর্য্য। এই কাশীপুরীতে এক (অর্যবর্য) বৈশ্যশ্রেষ্ঠের ঘরে চুরি করতে গিয়ে চুরির ধনসমেত ধরা পড়ি। ধরা পড়ে আমার বিচার হল। রাজদ্বারের গোপুরের উপরতলায় অধিরোহণ করে মহামন্ত্রী 'কামপাল' দেখতে লাগলেন শাস্তি। তাঁর আদেশমত হিংসাবিহারী প্রসিদ্ধ মত্তহস্তী—নাম 'মৃত্যুবিজয়'কে—আমাকে হনন করবার জন্যে নিয়ে আসা হল। শুঁড় উঁচু করে আমার দিকে ধেয়ে এল সে। তার গলার ঘণ্টা ঢং ঢং করে দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে জনতার চীৎকার। আমিও একটা নির্ভয় ভাব নিয়ে তাকে দ্রুত আক্রমণ করলুম বিপুল চীৎকার ও ভৎ'সনা করতে করতে। হাতীর শুঁড়ের নীচে, পাকা কাঠের ভিতরে বাঁধা আমার শিকল-পরা হাত দুখানা ঢুকিয়ে দিয়ে চণ্ড প্রহার করলুম। ভীত হয়ে শুঁড় নামিয়ে দাঁতাল হাতী ভড়কে গিয়ে থেমে দাঁড়াল। মাহুত তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বচন, অঙ্কুশ আর চরণের দারুণ আঘাতে হাতীকে উত্তেজিত করে আমার দিকে ফেরাল। আমিও তখন দ্বিগুণ ক্রোধে পুনর্বার ভীষণ নিনাদ তুলে আঘাত করলুম হাতীকে। হাতী ফিরে গেল। আমি তার পিছন পিছন দৌড়লুম। ক্রুদ্ধ মাহুত হাতীকে আবার রুখে নিলে, চীৎকার দিয়ে ধমকে উঠল: "বেটা, হাতীর অধম, মরতে চলেছিস কোথায়?" ধারালো অঙ্কুশ দিয়ে হাতীর মাথা ফাটিয়ে দেবার উদ্যোগ করল। আবার আমার দিকে হাতীর মুখ ফেরালো। আমি চীৎকার করে বললুম, "নিয়ে যা এই হস্তীকীটটাকে। অন্য হাতী থাকে ত নিয়ে আয়, তাকে মেরে আমি পথ দেখি।" আমার সেই চণ্ড এবং রুষ্টমূর্ত্তি দেখে হাতীটা গর্জ্জন করে উঠল, তারপরে মাহুতের নিষ্ঠুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে দৌড় দিয়ে পালাল। মহামন্ত্রী কামপাল তখন আমাকে নিকটে আহ্বান করে বললেন:

"ভদ্র, জানতুম—সাক্ষাৎ মৃত্যু, এই হিংসাবিহারী 'মৃত্যুবিজয়'। তাকেও তুমি এইরকম করে তাড়ালে। হাত যাতে ময়লা হয়

এমন কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে তোমার উচিত বিমল আর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা।"

তারপরে আমি যখন প্রতিশ্রুতি দিলুম তখন আমার উপর মহামন্ত্রীর আচরণ হল মিত্রের মত।

দিন চলে যায়। মহাভাগ, ধীরে ধীরে আমি মহামন্ত্রীর বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠি। শেষে একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম তাঁর জীবনের কথা। আমাকে যা বললেন তা এই—

'কুসুমপুরের রাজা 'রিপুঞ্জয়ে'র এক শ্রুতধী: শ্রুতর্ষি মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম 'ধর্ম্মপাল'। তাঁর পুত্র 'সুমিত্র' প্রজ্ঞাগুণে পিতৃসদৃশই হয়েছিলেন। আমি 'কামপাল' তাঁর বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ছিলেন বিনয়রুচি এবং আমি ছিলুম বারাঙ্গনা-ব্রতী। বুঝতেই পারছ, তিনি আমাকে অনেক বারণ করতেন, বাধা দিতেন, কিন্তু দুর্নীতি কখনও বারণ মানে না, আমি শেষে গৃহত্যাগ করে কামচরের মত পৃথিবীতে ঘুরতে থাকি। ঘুরতে ঘুরতে একদা উপস্থিত হই, এই বারাণসীরই এক প্রমোদবনে। সেদিন সেই উপবনে মদনদমন মহাদেবের আরাধনা করতে সখীদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কাশীরাজ 'চণ্ডসিংহের' কন্যা 'কান্তিমতী'। কন্দুকক্রীড়া করছিলেন, এমন সময় তাঁকে আমি দেখতে পাই। ভালবেসে ফেলতে দেরী লাগে না। কামনায় আমি আতুর হয়ে উঠি। যাক্, কোনরকমে আমার মিলন ঘটল তাঁর সঙ্গে। কুমারীপুরে তাঁর সঙ্গে গুপ্তবিহারের ফলে তিনি গর্ভবতী হয়ে উঠলেন। প্রসূত হল একটি পুত্রসন্তান। পাছে রহস্যের নির্ভেদ হয়ে যায় এই ভয়ে—কান্তিমতী পরিজনদের দিয়ে পুত্রটিকে ক্রীড়াশৈলে ফেলিয়ে দেন। হৃদয় কিন্তু ভেঙে পড়ে। একটি শবরী তাকে তুলে নিয়ে শ্মশানের প্রান্তে রেখে আসে। গভীর নিশীথে যখন সেই শবরী ফিরে আসছিল, রাজ-বিধি-অনুসারে নগররক্ষকেরা তাকে রাজবীথিতে বন্দী করে। তর্জ্জিতা হয়ে, এবং দণ্ডপারুষ্যের ভয়ে ভীতা হয়ে, সে প্রকাশ করে দেয় রহস্য। আমি তখন নিতান্ত আরামে নিদ্রা দিচ্ছিলুম ক্রীড়াশৈলের গুহাগৃহে। শবরী আমাকে সেইখানে রাজ-আজ্ঞায় ধরিয়ে দেয়। দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে প্রহরীরা শ্মশানে নিয়ে আসে। চণ্ডালের হাতে উদ্যত কৃপাণ। আমাকে বধ করবার জন্যে উল্লসিত হল কৃপাণ। কিন্তু নিয়তির এমনি লীলা, হঠাৎ ছিঁড়ে যায় আমার বন্ধন। এক মুহূর্ত্তে চণ্ডালের হাত থেকে ছিন্ন করে নিলুম কৃপাণ। তার পরে আর দেখে কে! সেই চণ্ডালকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই শবরীকে প্রহার করতে করতে অন্তর্দ্ধান করলুম। তারপর কতদিন আশ্রয়হীন হয়ে বনে বনে ঘুরেছি!

ঘুরছিই তো ঘুরছি। এমন সময় হঠাৎ একটি ব্যাপার ঘটে গেল। এক দিব্যকন্যার আবির্ভাব! তাও আবার সপরিবার। বনের গহনতায় হঠাৎ একদা অশ্রুমুখী এক দিব্যাকার কন্যার হল আবির্ভাব! তাঁর মুখের উপর বিলোল অলক। শেখরীবদ্ধ অঞ্জলির পাতায় মাথাখানিকে রেখে আমাকে এসে করলেন প্রণাম। তারপরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যের একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়াঘন শীতলতার নীচে বসলেন। কুতূহল শান্ত হতে চায় না। "কে আপনি, কোথা থেকেই বা এই আসা, কি কারণেই বা আমার উপর এই প্রসন্নতার বর্ষণ?"—এই সব প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন;—আহা, সে বাণী তো বাণী নয়, যেন বর্ষণ হল মধু-বর্ষার।

"হে নাথ, যক্ষপতি মণিভদ্রের দুহিতা "তারাবলী" আমার নাম। কোন এক সময়ে অগস্ত্য-পত্নী দেবী লোপামুদ্রাকে নমস্কার করে আমি ফিরে আসছিলুম মলয়গিরি থেকে। বারাণসীতে এসেছি, এমন সময় প্রেতাবাসে আমার চোখে পড়ল,—একটি ছেলে। ছেলেটি কাঁদছিল। তীব্র স্নেহ আমাকে উতলা করে। তাকে নিয়ে চলে যাই পিতা এবং মাতার নিকটে। আমার পিতৃদেব আমাকে সঙ্গে নিয়ে দেব অলকেশ্বরের আস্থানীতে উপস্থিত হন। হরসখা কুবের একদিন আমাকে আহ্বান করে জিজ্ঞাসা করেন, "কন্যা, এই ছেলের উপর তোমার চিত্তে কী রকমের ভাবোদয় হয়েছে?"

আমি উত্তর দিই, "বাৎসল্য ভাব। এই ছেলেটি যেন আমার নিজের পেটের ছেলে।"

যক্ষনাথ তখন বলেন, "কল্যাণি, সত্যই বলেছ।" তারপরে এই ব্যাপারের মূলতত্ত্ব আমাকে বলেন। অতিমহতী কথা। আমি যা জেনেছি, এর সূত্র হচ্ছেন যক্ষনাথ। জেনে রাখুন, শৌনক, শূদ্রক এবং কামপাল—অভিন্ন। বন্ধুমতী, বিনয়বতী ও কান্তিমতী—অভিন্না। দেববতী, যক্ষদাসী ও সোমদেবী—একই। হংসাবলী, শূরসেনা, সুলোচনা—অনন্যা। নন্দিনী, রঙ্গপতাকা ও ইন্দ্রসেন—পৃথক্ নন। এবং শৌনক যাকে অগ্নিসাক্ষী করে শেষবিবাহ করেন সেই গোপকন্যাই পরজন্মে আর্য্যদাসী এবং তারপরের জন্মে

হন তারাবলী। সেই তারাবলীই আমি। শূদ্রকাবস্থায় যখন আপনি ছিলেন, এবং আর্য্যদাসী-অবস্থায় আমি,—তখন আমার গর্ভে এই ছেলেটি জন্মায়। বিনয়বতী তাকে লালন পালন করেন। বিনয়বতী যখন পরজন্মে কান্তিমতী-অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন কান্তিমতীর গর্ভে স্নেহ এবং বাসনার প্রাবল্যে জন্ম নেয় এই পুত্র। অনেকগুলি মৃত্যুমুখ থেকে পরিভ্রষ্ট এই ছেলে, সেই ছেলেকে দৈবাৎ আমি পেয়েছি। একলিঙ্গের আদেশে অরণ্যে তপস্যানিরত রয়েছেন দেব রাজহংস ও দেবী বসুমতী। তাঁদের পুত্র ভাবী চক্রবর্ত্তী রাজবাহনের পরিচর্য্যায় তাকে সমর্পণ করে দিয়েছি। তারপরে গুরুদেবের মুখে শুনলুম আপনার রয়েছে কৃতান্ত-যোগ। তাই আমি আপনার পাদপদ্ম শুশ্রূষার জন্য এসেছি। কিন্তু আপনি এখন কৃতান্ত-মুখ-ভ্রষ্ট।"

আমি বাকাহারা হয়ে সব শুনলুম। এ তো তবে আমার বহু-জন্মের রমণীয়া রমণী! থাকতে পারলুম না। বার বার কতবার যে তাকে আলিঙ্গন করলুম তার স্থিরতা নেই। মুহুর্মুহুঃ সান্ত্বনা দিলুম, সৌভাগ্য পেলুম। আমার মুখ বেয়ে ঝরতে লাগল আনন্দিত অশ্রু। তখন যক্ষকন্যা সেই অরণ্যের মধ্যে আত্ম-প্রভাবে অকস্মাৎ রচনা করে ফেলল মহীয়ান্ এক মন্দির। অহর্নিশি অনুভব করতে লাগলুম ইন্দ্রদুর্লভ ভোগের পরাকাষ্ঠা। দু'-তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। মত্তকাশিনীকে তখন বললুম—

"প্রিয়ে, আমার প্রাণদ্রোহী ঐ চণ্ডসিংহকে হত্যা আমায় করতেই হবে—প্রত্যপকার। আমি অনুভব করতে চাই বৈর-নির্য্যাতনের সুখ।"

তারাবলী মৃদু হাস্যে আমাকে বললে—"কান্ত, এস, তোমায় আমি কান্তিমতীকে দেখাব, সেখানে তোমাকে আমি নিয়ে যাব।"

তখন অর্দ্ধরাত্রি। ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়ে অকস্মাৎ আমাকে রাজার বাসগৃহে নিয়ে এল তারাবলী। চণ্ডসিংহ ছিল নিদ্রিত। তাঁর শিরোভাগে রক্ষিত ছিল অসি-যষ্টি। হাতের মুঠোর মধ্যে সেটিকে গ্রহণ করে রাজাকে দিলুম জাগিয়ে। উঠে বসলেন। আমাকে দেখে থর থর করে কাঁপতে লাগল তাঁর শরীর। চণ্ডসিংহকে তখন আমি বললুম—

"আমি আপনার জামাতা। আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি আপনার কন্যাভিমর্শী হয়েছি। সেই অপরাধকে ক্ষালন করবার উদ্দেশ্যেই আজ এসেছি।"

চণ্ডসিংহ ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন। আমার দিকে প্রণামাঞ্জলি রচনা করে বললেন—

"আমিই মূঢ়। অপরাধ আমারি। কোথায় তুমি আমার কন্যাকে বরণ করে অনুগ্রহ দেখালে, না, আমি এমনি মূঢ়, গ্রহগ্রস্তের মত সীমালঙ্ঘন করে সেই তোমারি প্রাণবধের আদেশ দিলুম! তা, আজ থেকে আমি আদেশ দিচ্ছি,—কান্তিমতী তোমার, এবং এই রাজ্য, ও আমার প্রাণ তোমার অধীন।"

পরের দিন রাজা চণ্ডসিংহ প্রজাপুঞ্জকে আহ্বান করে বিধিবৎ তাঁর দুহিতার সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন। তারাবলী তখন ধীরে ধীরে কান্তিমতীর কর্ণগোচর করলে তার তনয়ের বার্ত্তা, সোমদেবী, সুলোচনা, ও ইন্দ্রসেনার বৃত্তান্ত। জন্মান্তরের মহতী কথা। সেই থেকে যদিও আমি লাভ করলুম মন্ত্রিত্ব—কিন্তু সেটা নামেই। আসলে আমি রইলুম—যেন যুবরাজ। বিলাসিনীদের নিয়ে মত্ত হয়ে পড়লুম উচ্ছলিত বিহারে।"

পূর্ণভদ্র পুনর্বার বলে যেতে লাগলেন—

"এই সব অন্তরঙ্গ আলাপের মধ্য দিয়ে মহামন্ত্রী কামপাল ও আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেল মৈত্রীর একটি স্থায়ী সম্পর্ক। সত্যিই, সর্ব্বভূতেই ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর উদার স্নেহ ও মৈত্রীপ্রবণতা। আমার মত একটা জন্তু বিশেষেরও পরিচর্য্যায় সুখী ও বিশ্বাসী হয়ে উঠল তাঁর সাধু মন।

এদিকে তাঁর শ্বশুর চণ্ডসিংহ "অলসক" (ডিসপেপসিয়া) রোগে ভুগতে ভুগতে ক্ষীণায়ুঃ হয়ে স্বর্গারোহণ করলেন; এবং শ্বশুরের স্বর্গারোহণের পূর্ব্বেই তাঁর প্রথম শ্যালক "চণ্ডঘোষ" অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি হেতু যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। দ্বিতীয় শ্যালক "সিংহঘোষ",—তখন মাত্র পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক একটি রাজনন্দন, —তাকেই মহামন্ত্রী কামপাল রাজপদে অভিষিক্ত করে দিলেন। নবীন রাজা কামপালের সেবা ও পরিচর্য্যায় পুষ্ট হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিছুদিন কাটল। যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সিংহঘোষের মধ্যে একটি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলুম। সিংহঘোষের দেহে এবং পরিবেশে যেমন জাগল যৌবনের উন্মাদনা তেমনি বসন্তদিনের কৃষ্ণভৃঙ্গের মত তার আশেপাশে জটলা বাঁধল আসন্ন-সুহৃদ কয়েকটি বয়স্য; গুঞ্জন উঠল তাদের দুর্মন্ত্রণার এবং তাদের মুখে অবাধ প্রবাহিত হতে লাগল খলতার নগ্ন ভাষা। সিংহঘোষের কান ভাঙাতে তাদের বেশী বিলম্ব হোলো না। তাদের কথার ধারাই কেমন যেন অন্য ধরণের। যথা,—

"এই কামপালটা একটা লম্পট, ভুজঙ্গ বিশেষ। আজ, জগতের কে না জানে যে,—ঐ ভুজঙ্গটা তোমার ভগিনীকে বলাৎকার করেছে,...তার সতীত্ব নষ্ট করেছে?...ঐ ডাকাতটাই ত একদিন রাত্রে,...তখন তোমার পিতৃদেব নির্বিঘ্নে পালঙ্কে ঘুমোচ্ছেন...খোলা তলোয়ার...তাঁকে হত্যা করতে যায়? প্রাণের দায়ে তাইতো তিনি ঐ ডাকাতটার হাতে নিজের সাধের মেয়েকে তুলে দিতে বাধ্য হন। বল হে, তুমিই বল না,...এ সব কি জাহু, মিছে কথা? ঐ পাপীটাই কি তোমার দেবজ্যেষ্ঠ চণ্ডঘোষকে বিষ খাইয়ে হত্যা করায়নি? তার পরে তোমাকে,—তখন একটা নাবালক, রাজকার্য্যের যে কিছু বোঝে না, তাকে —সাগ্রহে বসিয়ে দেয় সিংহাসনে। কেন জানো? প্রজাপুঞ্জকে হাতে রাখতে তো হবে...তাদের বিশ্বাস জাগাতে তো হবে! সে কাজ কি সহজ কাজ? অভিনয় চলেছে ...সততার অভিনয়। গভীর কোনো মতলব হাসিল করবার উদ্দেশ্যেই এখনও পর্য্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে মারাত্মক কিছু করেনি, তোমাকে উপেক্ষা করে চলছে। কিন্তু রাজা, সামনে পড়ে রয়েছে তোমার ভবিষ্যৎ। ঐ মতলব-বাজ কৃতঘ্নটা তোমাকে যমালয়ে না পাঠিয়ে ছাড়বে না। কেবল যক্ষিণীটার ভয়েই নতুন পাপের হাট বসাতে পারছে না।"

এই সমস্ত কথায় সিংহঘোষের মনে যে একটা গভীর সন্দেহ জাগবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সন্দেহ না জাগাই আশ্চর্য্য।

এর দু'-চার দিন পরে রাজমহিষী "সুলক্ষণা" দেবীর চোখে পড়ল একটা জিনিষ—ননদিনী 'কান্তিমতী'র চেহারাতে কেমন একটি ভাবান্তর। তাই প্রণয়ের কপট আগ্রহ দেখিয়ে তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছে তোমার, দেবি? বাজে কথা বলে

কিন্তু আমাকে প্রতারণা কোরো না, দিদি! ম্লান পদ্ম দেখতে কি ভালো লাগে?"

কান্তিমতী উত্তর দিলেন, "ভদ্রে, কোনোদিন বাজে কথায় তোমাকে ভুলিয়েছি ব'লে তো মনে পড়ে না। এটি আমার সখী ও সতীন ঐ তারাবলীর কীর্ত্তি। বিজনে দুজনে ছিলেন। তখন তারাবলীকে ডাকতে গিয়ে আমার নামটি ধরেই তাকে ডেকে ফেলেন। গোত্র স্খলন! মহা অপরাধ। ভেঙে গেল প্রণয়, এল উপেক্ষা। কত সাধলুম, প্রণাম করলুম। কিন্তু কোনো কিছুরই অপেক্ষা না করে হিংসায় ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে যক্ষকন্যা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন প্রবাসে। সেই থেকে সংসার আঁধার দেখছেন আমার স্বামী। সেইজন্যেই বোন, মনটা আমার ভাল নেই।"

সিংহঘোষকে একান্তে আহ্বান করে এই গোপন কথাটি নিবেদন করল সুলক্ষণা। সেই থেকে সিংহঘোষও লক্ষ্য করতে লাগল কামপালকে।

প্রিয়তমার বিরহে, সত্যিই, পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল কামপালের শরীর; স্তম্ভিত অশ্রুতে নিত্য ছলছল করত চোখ; নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় শোষিত হয়েই যেন মুখ থেকে বেরত রুক্ষ বাণী। রাজকুলের সকল কাজেই কেমন যেন একটা ছন্নছাড়া ভাব।

কামপালের মধ্যে যে এই পরিবর্ত্তন এল, তার অর্থ সিংহঘোষ করলেন—অন্যবিধ, এবং কালবিলম্ব না করে পূর্ব্বসঙ্কেতিত পুরুষদের দিয়ে মহামন্ত্রী কামপালকে সহসা বন্দী করিয়ে নিক্ষেপ করলেন কারাগারে। রাজ্যপদের স্থানে স্থানে প্রজাপুঞ্জের প্রতীতির জন্যে মহামন্ত্রী কামপালের দোষাবলীর ভীষণতা ঘোষণা করা হোলো এবং অধুনা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ঐ দুষ্ট ব্রাহ্মণের দুটি চক্ষুই উৎপাটিত করা হবে।

কিন্তু আমার মনে হয় এমন করে চোখ দুটি উৎপাটন করা হবে, যাতে অনিবার্য্য হয় ব্রাহ্মণমন্ত্রীর মৃত্যু; অথচ ব্রহ্মহত্যার পাতক হতে না হয় রাজাকে।

বন্ধু, সেইজন্যেই এই একান্তে বসে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে চোখের জল ফেলছি, কাঁদছি, আর ভাবছি···কেমন করে অমন একটা মহাপ্রাণ বাঁচাই। এ বিষয়ে আমি বদ্ধপরিকর।"

শেষ হল পূর্ণভদ্রের বিবৃতি।

রাজকুমার, পিতার নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের কথা শুনে প্রথমে কিছু ভাবতেই পারলুম না। চোখে থই থই করতে লাগল জল। শেষে নিজেকে সংযত করে পূর্ণভদ্রকে বললুম—

"সৌম্য, তোমার কাছে আর গোপন রেখে কী হবে? দেব রাজবাহনের চরণশুশ্রূষার অভিলাষে রাণী বসুমতীর হস্তে যে ছেলেটিকে যক্ষকন্যা ন্যাস রেখে এসেছিলেন, সেই ছেলেই—এই আমি। আমি জানি আমি শক্তিশালী। অস্ত্রধারী সহস্র বীরকেও হত্যা কোরে পিতাকে মুক্তি দেবার শক্তি আমি রাখি। যুদ্ধের সময় যদি একটা ছোট্ট ছোরাও আমার পিতার গায়ে এসে লাগে, তাহলে জেনে রেখো, আমি আমার এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে ভস্মে ঘৃতাহুতির মত ব্যর্থ মনে করব। আমি তাঁকে রক্ষা করবই।"

এই কথা বলে আমি গাত্রোত্থান করতে যাব, এমন সময়

দেখি—একটা প্রকাণ্ড বিষধর সাপ ; প্রাকারের রন্ধ্র থেকে মাথা বার করে তার বিরাট ফণাখানা দোলাচ্ছে। মন্ত্রৌষধির বলে আমি টপ করে সাপটাকে ধরে ফেলি। হঠাৎ মাথার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেল বুদ্ধির বিদ্যুৎ। পূর্ণভদ্রকে বললুম—

"মহাশয়, এবার দেখছি সিদ্ধ হবে—অভীষ্ট, দেখুন, এক কাজ করা যাক্। যুদ্ধসঙ্কট যদি উপস্থিত হয়, তখন পিতৃদেবকে লক্ষ্য করে, সকলের অলক্ষিতে এই বিষধরটিকে, যেমন খুসী ছাড়ব। জানি, ঐ সাপ পিতাকে দংশাবে। আমি তখন গোপনে বিষের ক্রিয়া স্তম্ভিত করে দেবো। কিন্তু লোকে মনে করবে—কামপাল মৃত। বন্ধু, তুমি তখন শঙ্কা-সম্ভ্রম সমস্ত ত্যাগ করে আমার মায়ের কাছে দৌড়ে যাবে। এবং বিশদভাবে মাকে বুঝিয়ে বলবে—

"রাণী বসুমতীর হাতে যক্ষিণী আপনার যে ছেলেটিকে গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন, সেই ছেলে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আমার কাছ থেকে মহামন্ত্রী কামপালের সমুদায় বৃত্তান্ত জেনে সর্পদংশনে তাঁর কল্প-মৃত্যু ঘটিয়েছেন। আপনি রাজার কাছে এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাবেন যে,—বন্ধুই হোক্ বা শত্রুই হোক্, যদি সে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে নিরপেক্ষভাবে তার নিগ্রহ করা ক্ষাত্র-ধর্ম্ম। তেমনি স্ত্রীধর্ম্মও হচ্ছে' যে,—স্বামী দোষী হোক্ বা নির্দ্দোষী হোক্, স্বামীর নিয়তির অনুসরণ করা। সেইজন্যে আমি স্বামীর চিতাগ্নিতে আরোহণ করব। জীবন সমাপ্তি। এই শেষ বিধান জ্ঞানীদের অনুমোদিত।

"দেখো, পূর্ণভদ্র, রাজা মত দেবেন। পিতৃদেবের সর্পাহত দেহখানি সযত্নে নিজের বাড়ীতে তুমি তখন নিয়ে আসবে। একটি নিভৃত স্থান উঁচু কানাৎ দিয়ে ঘেরাও করে, কুশের শয্যা বিরচন করে, তার উপর দেহখানিকে রাখবে। অনুমরণের জন্যে যা কিছু শাস্ত্রীয় উপকরণ প্রয়োজনে লাগে, সমস্তই পিতৃদেবের দেহের কাছে সজ্জিত রেখো। আমি কিন্তু সেই সময়ে তোমার বহিঃকক্ষে থাকব। ধীরে ধীরে তুমি আমায় সকলের অলক্ষ্যে সেই নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিয়ে দেবে। পিতাকে উজ্জীবিত করে, পরে যা করণীয়, পিতার অভিরুচি অনুসারে করা যাবে।"

আমার কথা শুনে পূর্ণভদ্র আনন্দে লাফাতে লাফাতে বেগে প্রস্থান করল।

রাজকুমার, ঘোষণা-স্থানে পৌঁছে গেলুম। বিপুল ছায়া বিস্তার করে একটি প্রাচীন চিঞ্চাবৃক্ষ ছিল সেখানে। ছায়ার নিভৃতিতে শাখায় দেহগুপ্তি করে স্তব্ধ বসে রইলুম। দেখতে দেখতে সেই বৃক্ষটির উচ্চস্থানগুলিকে অধিকার করে বসল আরোও অনেক লোক। তাদের মুখে আবোল তাবোল নানান্ কথার প্রলাপ।

একটু পরেই দেখি, সাধারণ চোরের মত পিছমোড়া করে, দুহাত বেঁধে চণ্ডালেরা পিতাকে নিয়ে আসছে। নগরের বহু মহাজন তাঁর পিছনে পিছনে আসছেন। বিশৃঙ্খল একটা হট্টরোল। আমি যেখানে বসেছিলুন তার খুব নিকটেই অপরাধীকে দাঁড় করিয়ে তিনজন চণ্ডাল উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল,—

"সকলে অবহিত হোন, শুনুন। ইনি আমাদের মহামন্ত্রী কামপাল। রাজ্যলোভে উন্মত্ত হয়ে নিজের প্রভু মহারাজ চণ্ডসিংহকে এবং যুবরাজ চণ্ডঘোষকে বিষপ্রয়োগ করে উপাংশু হত্যা করেছেন। অনেক দিন ধরে আয়োজন ক'রে তিলে তিলে গুপ্তহত্যা করেছেন। এখন আবার সেই দুর্ম্মতি আমাদের পূর্ণযৌবন দেব সিংহঘোষের উপর পাপাচরণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। রাজহত্যা সাধনের উদ্দেশ্যে অবিশ্বাসী পূর্ব্বামাত্য "শিবনাগকে" এবং "ষুণ" ও "অঙ্গারবর্ষ" নামক দুটি প্রসিদ্ধ পাপাচারীকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরাই প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সমস্ত গুহ্য কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। বিচারপতি বিচারে সাব্যস্ত করেছেন,—'রাজ্যকামুক এই ব্রাহ্মণের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করে আঁধার কুঠরিতে নিক্ষেপ।' ইনিই সেই মন্ত্রী ব্রাহ্মণ অপরাধী কামপাল। যদি অন্য কোনো অন্যায় বৃত্তি ইনি আচরণ করে থাকেন, তাহলে সেই সকল অপরাধের জন্যও যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করা হবে।"

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জনতা ও মহাজনদের উপস্থিতিতে সমুত্থিত হল এক ভীষণ কলকলধ্বনি কোলাহল। অবসর বুঝে আমিও অকস্মাৎ পিতৃ অঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম প্রদীপ্তশিখ সেই বিষধর। এবং চক্ষের নিমেষে গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে, ভয়ার্ত্তের মত 'মূর্তি নিয়ে, 'কি হল, কি হল' সোর তুলে জনতার বিস্ময় অপনোদনের পূর্ব্বেই পিতার দেহের পাশে গিয়ে বসলুম। ক্রুদ্ধ সর্পের দংশনে পিতার দেহ তখন মড়ার মত—মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। ব্যাপার কি,—দেখবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল বিরাট জনতা। আমিও সেই হট্টরোলের মধ্যে প্রাণরক্ষক উপচার প্রয়োগ করে স্তম্ভিত করে দিলুম বিষের প্রগতি।

জনতাকে লক্ষ্য করে, মস্তক হেলন করতে করতে বিচক্ষণতার অভিনয় করে বললুম, "সত্যের মার নেই ; রাজা হচ্ছেন পৃথিবীর দেবতা। রাজাকে যে অবমাননা করে, তুচ্ছ করে, তাকে যে দৈবদণ্ড স্পর্শ করবে, সে বিষয়ে আর ভুল কি? চক্ষুহীন করবার আদেশ দিয়েছিলেন মর্ত্ত্যের রাজা, প্রাণহীন করবার আদেশ এল দৈবের রাজার কাছ থেকে।"

আমার কথা শুনে, কেউ কেউ বললে—"ঠিক্, ঠিক্!" আর কেউ কেউ বললে, "একি হল, একি হল, ছিঃ ছিঃ!"

বিষধর কিন্তু তখন চণ্ডালের উপর বিষ ঝেড়ে, জনতার 'পালা পালা' শব্দের মধ্য দিয়ে সড়সড় করে না জানি কোথায় হয়ে গেছে অন্তর্ধান।

ইতিমধ্যে পূর্ণভদ্র আমার মাকে সমস্ত খবর ও কিং-কর্ত্তব্য জানিয়ে রেখেছিল। তাই নিতান্ত বিহ্বলা হলেও বিপদের মধ্যেও বিহ্বলতা প্রকাশ করলেন না আমার মা। কেবলমাত্র অল্প কয়েকটি পরিজনকে সঙ্গে নিয়ে ধীরপদক্ষেপে উপস্থিত হলেন ঘোষণা-স্থানে। পিতৃদেবের শিরোদেশ কোলের উপর তুলে নিয়ে বললেন—

"আমার স্বামী তোমার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করেছেন, কি না করেছেন,—দেবতারা জানেন। সে সব চিন্তায় এখন কোন ফল নেই। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, মহামন্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে আমি তোমাদের কুলের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছি। অতএব আমি স্থির করেছি, স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে চিতারোহণ করব। আশা করি, অনুমতি দিয়ে এই অন্তিম আবেদনটি তুমি গ্রাহ্য করবে।"

সিংহঘোষও প্রীতিযুক্ত হয়ে আবেদনটি গ্রাহ্য করলেন এবং বললেন, "কুলোচিত সংস্কার যেন সম্পন্ন করা হয়। আশা করি, আমার ভগিনীপতি স্বর্গধামে আসীন হয়ে চিতারোহণ-উৎসবের অন্তিম সংস্কার-সুখ ভোগ করবেন।"

[ক্রমশঃ।

হাসি, হুল্লোড় আর গল্পোতেই ব্যস্ত। লেনার দিকে কারও বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য নেই।

দিনটা ছিলো যেমন গুমোট তেমনি গরম। আকাশের প্রান্ত-সীমায় অনেকক্ষণ ধরেই একটু-একটু করে রক্তবর্ণ মেঘের আভাস দিচ্ছিল, ক্রমেই সেটা প্রায় অর্দ্ধেক আকাশ ঢেকে ফেললে, পরক্ষণেই শুরু হোলো বর্ষণ। মুষলধারায় অবিরাম বর্ষণ। সেই অবিরল ধারায় ঝাপসা হোয়ে এলো চার দিক। মুহূর্তে সিক্ত হোলো সেই নীল জার্সি, স্কার্ট, আর এলানো চুলের রাশি—তার ওপর স্রোতের মত জলের ধারা পড়তে লাগলো লেনার চোখে, মুখে, গায়। অন্য আরোহীরা যে-যার কোট আর বর্ষাতি মাথার উপর টেনে নিয়ে তার নীচ থেকেই সমান চালিয়ে গেলো তাদের হাসি আর গল্প। সামনের ঢাকা জায়গাটিতে ড্রাইভারও বসে পরম নিশ্চিন্ত আরামে। আর সর্ব্বাঙ্গ জলসিক্ত অবস্থায় কাঁপতে-কাঁপতে লেনা ভাবলে, 'উঃ, কি জানোয়ার এই লোকগুলো !'

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

লেনা

লেনা। কিশোর বালকের মত দুরন্ত চপল লেনা।

কিন্তু ভালোবাসার নিবিড় আবরণে ঘেরা আছে ওর মনখানি। বেশী দিন তো হয়নি, যুদ্ধ লাগবার মাত্র দশ মাস আগে ওর বিয়ে হোয়েছে।

কোনো মফঃস্বলের ছোটো এক গ্রামে সখের উৎসব। উৎসবে চলছিলো—নাচ, গান, আবৃত্তি, খেলা, ব্যায়াম-কৌশল দেখানো, আরও নানান ধরণের ব্যাপার। স্থানীয় স্পোর্টস কমিটি থেকে লেনাকে প্রতিনিধি হিসাবে উৎসবে যোগ দিতে পাঠানো হোলো।

একটা ঝড়ঝড়ে নোংরা লরী, তার চারি পাশে বসবার জন্য বেঞ্চ পাতা। লেনা সোজা গিয়ে একেবারে পিছনের বেঞ্চে বসলো। আর সব জায়গাগুলো ইতিমধ্যেই ভর্ত্তি—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠানো অনেক অচেনা লোক-জনেতে।

ওদের কাউকেই লেনা চেনে না। ওরা সবাই পরেছে হয় চামড়ার ওভারকোট কিম্বা বর্ষাতি, আর সবারই হাতে ছোটো একটি করে সুটকেস। কিন্তু লেনার পরনে শুধু একটি নীল রঙের জার্সি—বেশ আঁটসাঁট আর গরম জার্সিটাতে যথেষ্ট আরাম হবে ভেবেই ও পরেছিলো। হাত দুটি আবার কনুই অবধি গুটানো। কিন্তু এখন হাতের আঙুলগুলো অবধি শিরশির করাতে লেনার খুব ইচ্ছে হোলো হাত দুটো টেনে কব্জি অবধি নামাতে, কিন্তু লজ্জা আর অস্বস্তি দিলে বাধা। পিছনের জায়গাটাতে বসে বেচারা কেবল লরীটার প্রত্যেক ঝাঁকুনিতে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে টলে পড়তে লাগলো। বাতাসে খোলা চুলগুলো উড়ে-উড়ে মুখের উপর ঝাপটা দিতে লাগলো।

অন্য আরোহীরা নিজেদের মধ্যেই কি একটা কথায় হৈ-চৈ করে

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

হঠাৎ এক জন লোক উঠে এলো। মস্ত কোটটায় মাথাশুদ্ধ ঢেকে এগিয়ে এসে একেবারে লেনার পাশ ঘেঁসে বসে পড়লো।

"দুজনে মিলেই কোটটাকে ব্যবহার করা যাক"—এই বলে লোকটি তার চামড়ার কোটের একটা দিক টেনে লেনার মাথাটা শুদ্ধ ঢেকে নিলে।

লেনার মনে হোলো বুঝি ছোটো একটা তাঁবুর ভিতর দুজনে রয়েছে। লেনাকে একেবারে লোকটির কাছ ঘেঁসে আরও সরে আসতে হোলো, জলের ছাঁট এড়াবার জন্য। আর কোটটার উপর শোনা যেতে লাগলো অবিশ্রান্ত ধারায় জল পড়ার শব্দ—ঝর, ঝর, ঝর।

জলে ভিজে কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে এই নিবিড় আশ্রয়টুকুতে লেনার একটুও অসোয়াস্তি হচ্ছিল না, বরং রাগই হচ্ছিল, এই ভেবে যে, 'আশ্রয়টা যদি জুটলোই, তবে এত দেরীতে কেন ? এইটুকু ভেবে ঠিক করতেই এত সময় লাগে ? আশ্চর্য্য বোকা তো !'

লেনার মাথাটা লাগানো ছিলো লোকটির বুকের সঙ্গে। নীচু দিকে চেয়ে নিজের জড়োসড়ো হাঁটু দুটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, তার উপর ভিজে স্কার্টটা ঠিক ত্রিপলের ঢাকার মত এঁটে বসেছে।

হঠাৎ ওর কানে বাজলো একটা শব্দ—অতি ধীর ছন্দে—ধুক্, ধুক্, ধুক্। হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ।

কার···?······

যার বক্ষোলগ্ন লেনার নরম ভেজা চুলে ভরা মাথাটি।

আশ্চর্য্য হোয়ে লেনা শুনতে লাগলো। কই, এতক্ষণ তো এমন ভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল না ! হৃদ্‌স্পন্দন থেমে থাকেনি নিশ্চয়ই, কিন্তু এতক্ষণ তো বোঝাই যাচ্ছিল না।

কিন্তু এখন তো স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে। লেনার সমস্ত মন এক মুহূর্তে উদ্‌গ্রীব হোয়ে উঠলো একবার ওর মুখের দিকে চাইতে। এখনো অবধি তো লেনা জানেই না কেমন দেখতে লোকটিকে। হয়তো ভালোই হোতো যদি—নাঃ, লোকটি যেমনই হোক, চলুক না ক্ষণগুলি ঠিক এমনি ভাবেই।

হ্যাঁ, চলুক না। এমনি ভাবেই···হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দময় ছন্দও চলুক না!

একটুও না নড়ে, আশ্চর্য্য ধীরতার সঙ্গে লেনা কোটের খোলা দিকটায় ছোট্টো দুটি আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে একটু ফাঁক কোরে দিলে—য'তে আসতে পারে একটুখানি আলো। তার পর ধীরে-ধীরে মাথাটি ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে। দেখলে সেই লোকটিকে।

ভ্রূকুটিময়, ছায়া-ঢাকা, বিক্ষুব্ধ সে মুখ।

শুধু দুটি গভীর কালো চোখের অনন্ত দৃষ্টি লেনার মুখে। চকিতে মাথাটা নামালো লেনা, আর তুললে না, একটি বারও না। শুধু চামড়ার সেই মস্ত কোটটার তলায় এবার ধ্বনিত হোতে লাগলো দুটি বক্ষের যুগ্ম হৃদ্‌স্পন্দন।

দুটি চোখ আপনা তোতেই বুঝি বুজে এলো—নিঃশব্দে লেনা শুনতে লাগলো সেই মুহুর্মুহু বজ্রপতনের (?) শব্দ—তার নিজের আর সেই অজানা লোকটির বুকের প্রতিধ্বনি।

এক নিবিড় উত্তপ্ত অনুভূতিতে ভরে গেলো সারা দেহ-মন··· লজ্জা? না তো, এ যেন নিবিড় সুখে মেশানো লজ্জা, গর্ব্ব, বিস্ময় আর···আর জয়ের উল্লাস।

বৃষ্টি থেমে গেলো। উঠে পড়লো লোকটি।

একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে, "ওঃ, এত দূর এসে গেছি, প্রায় পৌঁছে গেছি মনে হচ্ছে···কিন্তু, আপনি এখানেই বসে থাকুন, উঠবেন না এখন—"

অত্যন্ত দ্রুত ভাবে কথাগুলি শেষ করেই গায়ের কোটটায় লেনাকে ভালো করে ঢেকে দিলে, "ঠাণ্ডা লাগবে তা' না হলে···"

কিন্তু একেবারে একা বসে-বসে লেনার মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হোয়ে গেলো। কোটটা গা থেকে খুলে ফেলে দিয়ে স্কার্টটা নিঙড়োতে সুরু কোরলো। দেখতে দেখতে সমস্ত মেঘ অন্তর্হিত হোলো—চার দিক ঝলসে উঠলো সূর্য্যের প্রখর আলোয়। লরীটার ভিতর ইতিমধ্যেই এক হাঁটু জল। ভেসে আসছিলো পাকা ফসলের সঙ্গে ভিজে মাটীর সোঁদা গন্ধ—সুন্দর বাতাস। সুন্দর সেই 'তার' মুখখানি। আর বৃষ্টিটা?

তাও তো সুন্দরই ছিলো—শুধু কেন যে এত শীগগির থেমে গেলো! অবিশ্রান্ত ধারায় শুধু যদি ঝরতেই থাকতো, তাহলে বুঝি সুন্দরতম হোতো!

শেষকালে ওরা পৌঁছে গেলো গন্তব্য স্থলে। আর লেনা—নামলো বটে লরী থেকে, কিন্তু ভুলে গেলো তার সিক্ত পরিচ্ছদ, তার ব্যায়াম-কৌশল—কিছুই মনে রইলো না, কিছুই চোখে পড়লো না—শুধু নতুন অনুভূতির স্বপ্নেই সে বিভোর।

* * * *

এত দিন অবধি লেনার জীবনে ভালোবাসার ছোঁয়া লাগেনি। স্নেহ করবার ভালোবাসার মত কিছুই ছিলো না, কেউই ছিলো না ওর। জীবনের স্রোতে ভেসে গেছে ওর অতীত দিনের লোক-জন, গৃহ-পরিবার সব-কিছু। নিজের পরিবার বলতে কিছুই ছিলো না, এমন কি নিজের ঘর বলতেও কোনো দিনই কিছু ছিলো না।

নিজের নাম···?

জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে তারও ঘটেছে বারংবার পরিবর্ত্তন। কোন্ শৈশবে ভ্যালেন্টিনা নামে ওর দীক্ষা হয়—মা ডাকতো ভাল্যা বলে। আরও পরে—অনাথ আশ্রম—সেখানে ছ'জন ভ্যালেন্টিনা থাকাতে তারা ডাকতো টীনা বলে। তার পর আরও বড় হোয়ে ঐ টীনা নামে বিরক্তি ধরাতে নিজেই রাখলো নাম—এলেনা—লেনা।

নিজের অতীতের দিকে চাইতে ঘৃণা হোতো লেনার।

হাসপাতালের শিশু-বিভাগের ছোট্টো বিছানায় শুয়ে ছয় বছরের লেনা। 'এ্যাপেণ্ডিসাইটীস' অপারেশন হোয়েছিলো ওর। জ্ঞান হবার পর সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা আর অসোয়াস্তি সুরু হোলো—সমানে মুখ দিয়ে তিক্তস্বাদ জল উঠে-উঠে ওর দমবন্ধ হোয়ে এলো—কিন্তু কেউ নেই ওর পাশে মুখখানি একবার মুছিয়ে দিতে। কেউ নেই তো ওর যাকে ও ডাকতে পারে!

অন্য ছেলেমেয়েদের পাশে ছিলো তাদের 'মা'। সেদিনটা ছিলো দেখা করার। লেনা শুয়েছিল একটা পর্দ্দার আড়ালে। যন্ত্রণায় অস্ফুট স্বরে চীৎকার করতেই মোটাসোটা নার্স'টি এসে বলে গেলো—'চুপ করে শুয়ে থাক, কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না।'

লেনা শুনেছিলো পর্দ্দার ওপাশ থেকে একটি স্বর—'বাচ্ছাটি কার?'

'কারোই নয়—অনাথ আশ্রম থেকে এসেছে'—নার্সে'র উত্তর শোনা গেলো।

মায়ের কাছে যখন থাকতো লেনা, তখনকার দিনগুলোও ছিলো তেমনি অভিশপ্ত। মা ছিলো অত্যন্ত মাতাল। যেই কিছু টাকা হাতে আসতো, সঙ্গে-সঙ্গে জুটতো ভদ্‌কা, টক্ চাটনী আর এক দল স্ত্রীলোক। চলতো নাচ, গান, হল্লোড় আর তার মায়ের প্রতি অযাচিত অজস্র উপদেশ বর্ষণ।

"শয়তানটার নামে তোমার নালিস করা উচিত! লোকটা এত বড় শয়তান? সোজা নালিস ঠুকে দাও ওর নামে! ব্যস্!"

লেনা অবশ্য সেই "শয়তান"টিকে বার কয়েক দেখেছিলো। মা তাকে ওরি মধ্যে একটু পরিষ্কার করে সাজিয়ে নিয়ে যেতো চৌমাথার বাজারে একটা ছোটোখাটো কালোবাজারীর দোকানে। রাস্তার উপর দোকানের সামনেই মস্ত একটা ষ্টোভ তাতে লোহার শিকে গাঁথা মাংসের টুকরো শিককাবাবের জন্য রাখা। সেই সুখাদ্যের সৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়াতো। দোকানের মাঝখানে একটা মস্ত টেবল পাতা, তার উপর নুণ, মরিচ সাজানো, আর একটি ডিসে ভরা পিঁয়াজকুচি। "শয়তান"টিই ছিলো দোকানের মালিক। সে মাংস কাটতো, কাবাবও বানাতো, ঘরও সাফ করতো। লেনা আর তার মা টেবিলে বসে শিকে গাঁথা মাংস একটু-একটু করে তুলে নিয়ে খেতো। লেনার হাত থেকে চর্ব্বি গড়িয়ে যেতো। দোকানের মালিকও ঐ একই সঙ্গে বসে-বসে একটা আধ-ময়লা এ্যাপ্রন দিয়ে কপালের ঘাম মুছতো।

মাঝে-মাঝে লেনার হাতে মাংসের ছোট্টো-ছোট্টো টুকরো গুঁজে দিয়ে বলতো,—"খাও, এই ছাখো এটা খুব নরম।"

বলার সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শোনা যেতো।

লোকটার বয়স হোয়েছিলো। একটা পা ছিলো কাঠের, আর মুখের মধ্যে সোনালী আর ছাই রঙ মেশানো ছুঁচোলো গোঁফ জোড়াটা চোখে পড়তো সব আগে। লেনার মা'র হাত আর মুখ দিয়ে যত চর্ব্বি গড়াতো, চোখ দিয়েও তত জল গড়াতো।

"বুক ভেঙে যায় আমার, যখন দেখি আর সব ছেলেমেয়েরা কেমন সেজেগুজে বেড়ায়, আর ঐ বেচারীর কি শীত, কি গ্রীষ্ম এক জোড়া জুতোই জোটে না—অথচ ওদের চেয়ে এই বা কম কিসে ?"

"খাও, এই টুকরোটা আরও নরম"—লোকটা মৃদু স্বরে বলে আর লেনাকে খাওয়াতে থাকে। আবার বলে, "কী যে করি ভেবে পাই না, আমার সৎ-মেয়ে এসে হাজির ছেলেমেয়ে শুদ্ধ,—তার উপর ট্যাক্স-ইন্‌স্‌পেক্টর আসছে—ভগবান জানেন কোথা থেকে ট্যাক্স দেবো !...এদিকে মাংসের দাম চড়ছে, ওদিকে খদ্দেরের অবস্থা কাহিল, ভাবতে পারি না যে কী করবো আমি—"

"মানুষকে বিপথে টানবার আগেই তোমার সেটা বোঝা উচিত ছিলো,—আর সাবধান হওয়া উচিত ছিলো"—লেনার মা বলে ওঠে।

লোকটা সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আপন মনেই বিড়-বিড় করে বলে, "কোনো প্রমাণ যদি দেখাতে পারো তখন দেখা যাবে..."

"হায় ভগবান"—মাংসের টুকরোটা বুকে চেপেই লেনার মা আর্তনাদ করে ওঠে।

আর লেনা ? মরিচের শিশিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে থাকে। সারাক্ষণই ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ মরিচের শিশিতে, কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহস ওর ছোট্টো বুকে কুলোয় না।

যাবার আগে লোকটি কিছু টাকা মায়ের হাতে গুঁজে দিলে। পথে বেরিয়ে ওর মা প্রথমেই মাছের দোকানে গিয়ে কিছু মাছ কিনলে, তার পর কিনলে সেই ভদ্‌কা—আবার সুরু হোলো বাড়ী ফিরেই হৈ-হল্লা আর মাতলামি। অত্যধিক ভদ্‌কা খেয়ে মুখটা লাল করে ওর মা চীৎকার করতো,—"দেখে নেবো ওটাকে, পাজী শয়তান ! প্রমাণ ? আমিও দেখে নেবো, ভুলিয়ে কুপথে টানার ফল কি সে শিক্ষা ওকে ভালো করেই দেবো—ছোটো লোক, বদমাইস।"

"স্রেফ একটা নালিস ঠুকে দাও"—সবাই একবাক্যে সায় দিলো—"একটা আঙুল নাড়লেই অনেকে...।"

লেনার মা রাস্তায় ছেঁড়া ন্যাকড়া কুড়িয়ে বেড়াতো ! মাঝে একবার দু'-তিন দিন কোথাও ডুব মেরে আবার হাজির হোলো একটি লোককে সঙ্গে নিয়ে। তার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা বিছানায় গেলো। আর বেচারী লেনাকে শোয়ানো হোলো খানকয়েক জড়ো-করা চেয়ারে। ভোরের আলোয় লেনার ঘুম ভেঙে যেতো ! উঠেই ও সোজা চলে এলো বিছানার পাশে, আর একান্ত মনোযোগের সঙ্গে লোকটিকে দেখতে লাগলো। বিছানার ধারেই লোকটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মোটা হাতখানা প্রায় মাটিতে ঝুলে—সারা হাতখানায় ফুটে উঠেছে মোটা-মোটা নীল শিরা, আর আঙুলগুলো অবধি কালো লোমে ভরা। লেনা হঠাৎ একটা লাঠি নিয়ে এসে সজোরে মারলো ঐ বীভৎস লোমশ হাতটাতে। কিন্তু হাতখানা একটুও নড়লো না।

একেবারে খাবার সময় ওর মা'র ঘুম ভাঙলো। সোজা উঠেই ও দোকানে গেলো। আর লেনা সেই লোকটার সঙ্গে খেতে বসলো—খাবার কিছু ছিলো বৈ কি—আধ গেলাস বিয়ার আর একটু জেলি। কথাবার্তার ভিতর থেকে লেনার কচি বুদ্ধিতে এটুকু বুঝতে পারলে যে, মা কোথাও চলে যাচ্ছে—ভারী খুশী হোয়ে উঠলো তাই। প্রথমটা বিদায়ের ঝোঁকে খুব খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠছিলো, কিন্তু ক্রমেই নেশায় আচ্ছন্ন হোয়ে যেখানে বসেছিলো সেখানেই একেবারে ঘুমে ঢলে পড়লো।

পরদিন সকালে ওর মা ওকে নিয়ে বেরোলো। শেষে একটা সাদা চূণকাম-করা দোতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "এখানেই তোকে যেতে হবে—সোজা ভিতরে যাবি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একাই যাবি। গিয়ে বলবি যে, তোর বাপ-মা কেউ কোথাও নেই, তুই অনাথা, বুঝলি ?"

সেদিন বাড়ী এসে ওর মা ভালো কোরে টেবিল সাজালো, আবার একটা কেকও তৈরী করলো—বেশ একটা ভোজের ব্যাপার আর কি ! তার পর সুরু করলো নাচ, যতক্ষণ না নতুন সিল্কের ব্লাউসটা একেবারে নষ্ট হোয়ে গেলো। তার পর টেবিলের ধারে দু'হাতের চেটোয় মুখটা রেখে বসে পড়লো, "এ আমার বরাত প্রিয়তম, কে তাকে দোষ দেবে বলো ? যেটা আসলে ওরই, সেটাই ও মানতে চাইলে না। কেনই বা ঐ বোঝাকে ঘাড়ে নেবে ?...ডাইনীর বেটা, যদি আমার খোরপোষটাও দিতে রাজী হোতো ! তা দেবে কেন—?—শুয়োরটা নিজের স্বার্থটা বাগিয়ে এখন সোজা সট্‌কান দিতে চায়—আমি যেন হাঁদা, কিছু বুঝি না !...চুলোয় যাক্...আমার আরও ঢের ছেলেমেয়ে হোতে পারে..."

"নিশ্চয়ই পারে, হবেও নিশ্চয়ই, তুমি একটুও আশা ছেড়ো না পাঙ্গা"—লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো। লেনার মা আবার উঠে পড়ে উদ্দাম নৃত্য জুড়ে দিলে।

লেনার ক্রমেই এই গোলমাল আর দাপাদাপি অসহ্য মনে হোলো। আস্তে-আস্তে উঠে পড়ে নিজের একমাত্র সম্বল ছেঁড়া বোনা টুপিটি মাথায় পরে, খেলনাগুলি গুছিয়ে নিলে—খেলনা তো ভারী—এক টুকরো পালিশ-করা টিন, আর একটা ভাঙ্গা হাতল। কেউ লক্ষ্যও করলো না, লেনা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো। সোজা গিয়ে সেই সাদা চূণকাম-করা বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

গেটের ধারে ছোটো করে চুল ছাঁটা লম্বা ধরণের দুটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের সামনে গিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে লেনা বললে, "আমি অনাথ, আমার মা-বাবা কেউ নেই, কে—উ কোথাও নেই—"

মেয়ে দুটি মুখে কিছু না বলে গম্ভীর ভাবে লেনাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। ছোট্টো লেনা মাথাটা উঁচু করে মায়ের শেখানো কথাগুলি বার বার বলে যেতে লাগলো—ঠিক যেমন করে মা শিখিয়েছিলো। একটি মেয়ে শেষে ওকে জিজ্ঞাসা করলো—"তোমার কত বয়স বলো তো ?"

অপরটি সঙ্গিনীকে উদ্দেশ করে বললে,—"তার চেয়ে আমরা আনা ইয়োকভলেভনাকে খবর দি।"

লেনা গেট থেকে উঁকি মেরে দেখলে ভিতরে চমৎকার সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, আবার মাঝে-মাঝে দোলনা টাঙানো। খুব খুশী হোয়ে লেনা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলে যেতে লাগলো—"আমি অনাথ, আমি অনাথ !" আনা ইয়োকভলেভনা এসে লেনার হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলো।

বড়রা সবাই ওর চার দিকে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। সবারই

সেই একই প্রশ্ন যে, 'ওকে কে এখানে আসতে বললে, আর কোথায়ই বা এর আগে থাকতো ?' লেনা এত ছোটো ছিলো যে, ওকে ওরা একটা টেবিলের উপর বসিয়েছিলো কথাবার্ত্তার সুবিধার জন্য, কিন্তু মাথায় ছোটো হোলে হবে কি, ওদের চেয়ে লেনা কিছু কম চালাক নয়।

নিশ্চিন্ত ভাবে টেবিলে বসে পা দোলাতে-দোলাতে স্পষ্ট বলে যেতে লাগলো—"কেউ বলেনি আমাকে, আমি এর আগে কোথাও ছিলাম না—"

ওর মন কেমন যেন বুঝেছিলো যে, এরা সবাই ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তখন যে সমস্ত মনটি জুড়ে রয়েছে সেই সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ আর দোলনা!

সরল বিশ্বাসে লেনা আবার তাই বলে উঠলো,—"আমি যে এখানেই থাকতে চাই—"

সবাই হেসে উঠলো। এক জন সোনার চশমা-পরা ভদ্রলোক বললেন, "আমাদের একবার Militiaকে খবর দেওয়া উচিত।"

সে রাতটা লেনা ঐ বাড়ীতেই রইলো। রাঁধুনীর কাছে রাত্রে ঘুমোলো। সেই ওকে স্নান করিয়ে চুলগুলো সমান করে ছেঁটে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিলে। সন্ধ্যাবেলা আর পরদিন সকালে ওর চেয়ে বড়-বড় ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই লেনা খেলা করলে, ওর মত অতটুকু ছোটো বাচ্ছা সে বাড়ীতে আর ছিলো না।

লেনাকে স্নান করাবার সময় রাঁধুনীটা ক্ষুব্ধ রাগত ভাবে বলতে সুরু করলে, "এমন মা-ও আছে?···ইচ্ছে করছে তার মুখটা ধরে আচ্ছা করে নোংরায় ঠুসে দিতে···কি ভাব তো কি দে···এমন কচি বাচ্ছাটাকে···"

এক জন Militia man এসে পৌঁছালো। সোনার চশমা-পরা লোকটি লেনাকে এক ধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে দিলে ঐ লোকটির কাছে সমস্ত সত্যি কথা বলতে, না হলে ওর খুব খারাপ হবে। লোকটি তাহলে ওকে পুলিসের কাছে ধরে নিয়ে যাবে।

"আচ্ছা, ঠিক আছে—" লেনার চোখে-মুখে কথা—"তাতে কি হোয়েছে, ঠিক আছে, আমি পুলিসকে একটুও ভয় পাই না—"

Militia manকেও লেনা সেই একই কথা জানালো যে, ওর কেউ কোথাও নেই, ছিলোও না। সে তখন জিজ্ঞাসা করলো—"আচ্ছা খুকু, বল তো তোমার মা কি করে?"

লেনা চট্ করে বললে—"ছেঁড়া ন্যাকড়া কুড়িয়ে বেড়ায়—"

ঘরশুদ্ধ লোক হাসিতে ফেটে পড়লো। যাই হোক, কোথায় কোন্ মেয়ে ন্যাকড়া কুড়িয়ে বেড়ায় যার ছোটো মেয়ের নাম ভ্যালেন্টিনা, এমন লোকের খোঁজ পাওয়া অসম্ভব। তাই লেনাকে পাঠানো হোলো একটি শিশুসদনে।

সেখানে কাটলো পুরো একটি বছর। লেনার স্বভাবটা ছিলো ভারী মিষ্টি, সবার সঙ্গেই ওর বনতো, কিন্তু কারো উপরই ওর বিশেষ টান ছিলো না—ও কখনো কিছু চাইতো না, দাবী করতো না—যে কোনো জিনিষ পেয়েই, যে কোনো অবস্থাতেই মানিয়ে নিতো। কিছু দিলে খুসী হোয়ে নিতো বটে, কিন্তু এতটুকুও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো না। ক্রমেই এমন আদর-যত্নে ও বেশ অভ্যস্ত হোয়ে গেলো। ওর একটুও অবাক লাগতো না—এই যে ওকে সবাই খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, লেখাপড়া শেখাচ্ছে—মেয়েরা জামা-কাপড় কেচে দিচ্ছে, খাবার তৈরী করে খাওয়াচ্ছে—যেন ওর প্রাপ্য, এমনি সহজ ভাবেই সব-কিছু ও নিয়েছিলো, যেমন সহজে চার পাশের এই ছোটো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তালি দিয়ে গান গাইতো:

"কচি কচি পা ফেলি তালে তালে যাই
ছোটো হাতে মিঠে বাজে তাই তাই তাই—।"

কিন্তু কিছু দিন পরেই লেনার ডাক এলো অন্য একটি জায়গা থেকে। শিশুসদনটির নতুন ব্যবস্থা করার জন্য লেনাকে পাঠানো হোলো অনেক দূরের একটি শিশুসদনে। সেটির সঙ্গে এই নতুনটির তফাৎ কিছু নেই—কেবল শীতটা এখানে যেমন দীর্ঘ তেমনি তীব্র—সব সময়েই বড়-বড় উনুন জ্বলছে কয়লার বদলে কাঠ দিয়ে—বাকী সবই আগেরটির মত একই ভাবে চলতো।

শুধু সেদিনের সেই ছোটো মেয়েটি বড় হোতে লাগলো। পিছনে ফেলে আসা সেই কোন অতীত দিনের ভাল্যা আর নেই—এ যেন অন্য কেউ। ওর নাম এখন টীনা। ওর আশ্রয় আছে, নেই আপন ঘর—সঙ্গী আছে নেই স্বজন—যত্ন আর আদরও পায়—পায় না শুধু স্নেহ-সুনিবিড় মমতার গভীর স্পর্শ—ওকে ব্যথা দিতেও কেউ নেই—কেউ নেই বুকে টানতেও।

[ক্রমশঃ।

জলযাত্রা

শান্তা দেবী

মিলান

জেনিভাতে মাত্র দু'দিন ছিলাম। ১৬ই আমেরিকার জাহাজ ধরতে হবে, তার আগে ইউরোপে যতটুকু দেখে নেওয়া যায়, তাই লাভ। কাজেই জেনিভাতে ট্রেণ ধরে মিলান অভিমুখে চললাম। আবার সেই বিরাট জেনিভা হ্রদের পাশ দিয়ে Lausanne পর্য্যন্ত একই পথে ফিরলাম। সেই লেকের ভিতর জাহাজ, নৌকা, মোটর-বোটের ভীড়। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট দ্বীপে বাগান ও ফুল। লেকের ধার দিয়ে গাড়ী যাবার বাঁধানো রাস্তা চলেছে, কিছু দূরে দূরে জাপানী ধরণের দুই-একটা বাগান। অধিকাংশ বাগান অবশ্য ইউরোপীয় ধরণের। তবে তাতেও সবুজের মধ্যে নানা রঙের ফুলের কেয়ারি পারস্য ধরণের।

এর পর কতকগুলি মুরগী-পালনের ক্ষেত্র, কিছু দূর ঘন বন এবং কাঠগুদাম পার হয়ে Ville neuve ষ্টেশনে এলাম। এটি ছিল রোমাঁ রোলাঁর বাসস্থান। ভারী চমৎকার দেখতে জায়গাটি। কবির বাসস্থান এমনই হওয়া উচিত। গ্রামের গায়ে-গায়ে পাহাড়ের চূড়াগুলি চমৎকার। তার মাথায় শিবের জটার মত মেঘ, নানা স্তর-কাটা-কাটা পাথর। সবুজ পাহাড়গুলির বন কেটে-কেটে সেখানে জল ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ক্ষেত করেছে। কোথাও বা ঝরণা ঝরে পড়ছে, অবশ্য হিমালয়ের ঝরণার মত বড় বা বহুমুখী নয়।

কিছু দূরে নদী ছুটে চলেছে। কাশ্মীরে যেমন পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঝিলম নদী ছুটে চলেছে, খানিকটা সেই রকম, তবে নদীটি তার চেয়ে সরু এবং অত দ্রুত উল্লম্ফনশীল স্রোত নয়। কোনো কোনো নদীর জল প্রায় দুধের মত সাদা, বোধ হয় খড়ি কি শ্বেত-পাথর আছে।

গাড়ীতে ইটালীয় হোটেলওয়ালারা ঘণ্টা দিয়ে নিজেদের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে. আইস্‌ক্রীমওয়ালারা আইস্‌ক্রীম বেচে যাচ্ছে, প্লাটফরমে কলা, স্যাণ্ডউইচ, আরও কত কি বিক্রী হচ্ছে। রেল-লাইনের ধারে-ধারে আপেলের বাগান, চাষী ছেলে-মেয়েরা অন্যান্য ফসলেরও চাষ করছে। তাদেরই হয়ত ছোট-ছোট কুটির, কোন-কোনটি সাজান বাক্সর মত দেখতে, ইংলণ্ডের কটেজের মত বড়-বড় বাড়ী নয়।

ইটালীর সীমানা সুরু হতেই মাথায় পালক-গোঁজা টুপি পরে সোনালি শ্যামবর্ণের সৈন্তেরা বা পুলিশরা দেখা দিতে লাগল। Domodessola বলে একটা ষ্টেশনে সুইস পয়সা বদলে ইটালীয় পয়সা নিয়ে অনেকে খাবার কিনে খেতে সুরু করল। ষ্টেশনের নামগুলো মাঝে-মাঝে বাঙালী মেয়ের নামের মত আকারান্ত। ময়না নাম মনে পড়ছে।

ইটালী সুরু হবার পর পাহাড়ে পাথর বেশী, এটা পাথরেরই দেশ। পাহাড়ের মাথায়-মাথায় দাঁতের মত বহু চূড়া, কোনোটা উঁচু, কোনটা নীচু, দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। এদিকে চওড়া-চওড়া নদীগর্ভ, আমাদের দেশের অন্তঃসলিলার মত একেবারে শুষ্ক না হলেও স্বল্পজলা। উপলখণ্ড চারি দিকে গড়াচ্ছে, অল্প জলেই লোকে স্নান করছে, মেয়েরা কাপড় কাচছে। কেউ জলের ধারে শুধু-শুধু বসে আছে। শ্লেট পাথরের টালি দিয়ে অনেক ঘর ছাওয়া, পাথরের ঘরের জীর্ণ রূপে দারিদ্র্য খুব চোখে পড়ে। বাইরে ময়লা বিছানা শুকোচ্ছে। ইউরোপে এতটা দারিদ্র্য দেখব ভাবিনি।

রাত্রি আটটায় আমরা মিলান ষ্টেশনে পৌছলাম। আমেরিকান এক্সপ্রেসের লোক আমাদের হোটেলে নিয়ে যাবে কথা ছিল। কেউ আসেনি দেখে নিজেরাই গাড়ী থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে যখন বেরোচ্ছি তখন এক জন ইউনিফর্মধারী লোক এসে উপস্থিত। তারও অনেক পরে তাদের প্রাইভেট মোটরকার এল। গাড়ী চড়ে হোটেলের পথে অগ্রসর হলাম। ষ্টেশন থেকে কিছু দূর পর্য্যন্ত পথ ও ঘর-বাড়ী কেমন যেন কলকাতার মত লাগছিল। আর একটু এগিয়ে দেখি, আমেরিকান ধরণের বারো-চৌদ্দ তলা সব বাড়ী। শুনেছি, এগুলি আমেরিকার মূলধনেই তৈরী। ওদের টাকা ইটালীতে অনেক সূত্রেই আসে।

সহরে ঢোকবার গেট আছে, যেমন আমাদের দিল্লী প্রভৃতিতে আছে। গেট পার হয়ে কিছু দূরে হোটেল রেজিনা বলে একটা হোটেলে এলাম। রাত সাড়ে ৯টায় কোথায় আর খেতে যাব ? এই হোটেলেই খেয়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরোলাম। ইটালীর হোটেলের কর্ম্মীরা এবং পথে-ঘাটে সাধারণ লোকেরা অনেকে দেখতে খুব সুন্দর। আমাদের দেশের ভাল চেহারার লোকের সঙ্গে এদের খুব সাদৃশ্য আছে। অবশ্য এক দল লোক আছে যারা বড়ই খর্ব্বাকৃতি, তাদের মুখও একটু বেশী গোল। আমাদের দেশে এত খর্ব্বকায় লোক বেশী দেখা যায় না।

এই হোটেলের কাছেই সুবিখ্যাত Duomo Cathedral. এই গির্জ্জা দেখেই Goethe বলেছিলেন, 'petrified music' বা পাষাণীভূত সঙ্গীত। সত্যই বটে! ৩৫৫ ফুট উঁচু চূড়া সমেত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-সমন্বিত শ্বেত-পাথরের গির্জ্জা। পাথরের কাজ, কিন্তু দেখলে মনে হয় হাতীর দাঁতের শিল্পসৃষ্টি। ব্রোঞ্জের বড়-বড় দরজায় যীশুখৃষ্টের জীবনীর ছবি খোদাই করা। জল-ঝড়ের আক্রমণে সাদা পাথরে কালো-কালো রং ধরে গিয়ে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। গির্জ্জার ভিতর কাচের রঙীন ছবিতে যীশুর জীবনের নানা ঘটনা, সে রাতে দেখা হল না।

আমাদের দেখে এক দল ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী আমাদের পিছন-পিছন ভীড় করে এল। কোথায় দেশ, কেন এসেছ, কে মা কে বাবা, কোন মেয়ে বড়, কে ছোট—নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমরা গির্জ্জা দেখে The Arcade বা Galleryর ভিতর দিয়ে এলাম। সুন্দর একটা খোলা দালানের মত জায়গা। আমাদের কলকাতার মিউনিসিপাল মার্কেটের মত চার দিকে পথ চলে গিয়েছে। দেখতে অবশ্য তার চেয়ে অনেক সুন্দর। এখানে নানা জায়গায় পথের ধারেই লোকে ভীড় করে বসে খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা করছে। আমরা এক জায়গায় দাঁড়ালাম। একটি মেয়ে চমৎকার গলায় গাইছে, এক জন পুরুষ বেহালা ও এক জন পিয়ানো বাজাচ্ছে। ভীড় করে এক দল লোক তাদের গান-বাজনা শুনছে আর দেখছে। এত সুন্দর গাইছে, কিন্তু টিকিট করা ব্যাপার নয়। একটা নূতন দেশে এসেছি খুব মনে হচ্ছিল।

অনেক সুন্দর-সুন্দর জিনিষের দোকান চার ধারে রয়েছে। ইটালীতে চামড়ার কাজ, বেতের কাজ, রূপোর কাজ, কাচের কাজ এবং নানা রকম খেলনা দেখবার মত। আমরা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সাজানো দোকানগুলি দেখছিলাম। পথচারীরা তাদের সব কাজ ফেলে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরতে লাগল। রাত্রে হোটেলে ফিরে এলাম, রাত্রেও বিশেষ শীত নেই এখানে। এ দেশটা অনেক গরম সবাই জানে।

সকালে টাকা ভাঙাতে গেলাম। ১৫ পাউণ্ড ভাঙিয়ে পেলাম ২৫৬১৫ লিরা। এখানের কারবার সব হাজারে, সামান্য জিনিষেরও দাম ২০০।৪০০, কারণ পয়সার কোন মূল্য নেই। তার উপর নোটগুলো এমন অসম্ভব জীর্ণ ও ছিন্ন যে ধরতেই ভয় হয়, মনে হয়, এখুনি দু'টুকরো বা চার টুকরো হয়ে যাবে, কোন-কোনটা প্রায় গুঁড়ো হয়ে এসেছে। আমাদের সঙ্গে ৬।৭টা জিনিষ ট্রেণে থাকত, তাই নামাতে পোর্টারদের ৫০০ লিরা দিতে হত। ৫০০ লিরার দাম অবশ্য সাড়ে ৩ টাকার বেশী নয়।

দিনের বেলা আবার সেই 'মর্ম্মর-সঙ্গীত'রূপী গির্জ্জাটি দেখতে গেলাম। গির্জ্জার চূড়া বোধ হয় ১৩০টি এবং থাম ৯৪টি। ঊর্দ্ধমুখী সঙ্গীতের মত চূড়াগুলি আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে। ভিতরের কাচের ছবিগুলি Old Testament এবং New Testament দুই থেকেই আঁকা। কত মহা-মহা শিল্পী এই সব রঙের খেলায় তাঁদের অন্তরের পূজা নিবেদন করে গিয়েছেন।

গির্জ্জার পর শিল্পিগুরু লিওনার্ডোর নাম-লেখা Ambrosiana ছবির এবং পাণ্ডুলিপির মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। গির্জ্জা ছাড়া সর্ব্বত্রই দর্শনী দিয়ে ঢুকতে হয়। এখানে গুইডোরেণি, বটিচেলি, র‍্যাফল এবং তাঁর গুরুর আঁকা ছবি আছে। লিওনার্ডোর আঁকা ছোট-ছোট ছবির খসড়া ছাড়া একটি বিরাট ছবির খসড়া আছে। এই বড় ছবিটি পরে কাপড়ে বুনে Tapestry করা হয়। লিওনার্ডোর পাণ্ডুলিপিতে অনেক যন্ত্রপাতির নক্সাও আছে; বোধ হয়, বায়ব-যানের কল্পনা করেও তিনি তার নানা অংশ এঁকে রেখে গিয়েছিলেন।

"সময়ে সামান্য সতর্ক হলে সহজেই সংক্রমণ রোধ করা যায়"

রোগবাহী জীবাণুই রোগ-সংক্রমণের কারণ। জীবাণু এত ছোটো যে খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এরা ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়। যে-বাতাস আপনি শ্বাসের সঙ্গে টেনে নেন, যে কোনো জিনিসে আপনি হাত দেন, এমন কি আপনার গায়ের ত্বকেও লক্ষ লক্ষ জীবাণু রয়েছে।

শরীরের কোথাও কেটে বা চামড়া উঠে গেলে সেই মুহূর্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে জীবাণু আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সামান্য একটু পিনের খোঁচাকেও তুচ্ছ করবেন না, তা থেকেই সারা শরীর বিষাক্ত হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত অঙ্গহানি কি প্রাণহানিও ঘটতে পারে।

সুতরাং জীবাণুর হাত থেকে নিজে ও বাড়ীর সবাই নিরাপদে থাকতে চান তো 'ডেটল' ব্যবহার করুন — 'ডেটল' আধুনিক জীবাণুনাশক।
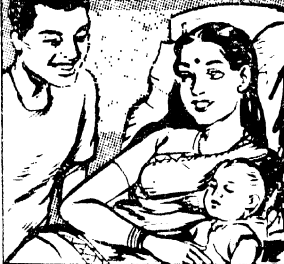
প্রসবপথের মুখে বা ভেতরে সামান্য একটু ক্ষত থাকলেও প্রসূতিজ্বর দেখা দিতে পারে, যা থেকে চিরতরে অকর্মণ্য বা বন্ধ্যা হয়ে থাকাও বিচিত্র নয়। ডাক্তাররা তাই জীবাণু-সংক্রমণের ভয় দূর করবার জন্য প্রসবের সময় প্রসূতিকে জীবাণুনাশক 'ডেটল' ব্যবহার করতে বলেন।

ক্ষতস্থান যত ছোটোই হোক তা যেন বিষাক্ত হতে না পারে। কেটেকুটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগাবেন। ডেটল জীবাণু নাশ করে, বিষাক্ত সংক্রমণের পথ রুদ্ধ করে এবং ক্ষত শুকোতে সাহায্য করে।

ডাক্তারদের মতো আপনিও 'ডেটল' ব্যবহার করুন—'ডেটল' স্নিগ্ধ, এতে জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না। 'ডেটল' লাগালে কাপড়ে বা গায়ে দাগ হয় না। শিশুরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে। খরচ খুব কম, একটুতেই অনেকটা কাজ হয়। মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আদর্শ জীবাণুনাশক উপকরণ এই 'ডেটল'। "মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষা) পুস্তিকাটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়—চিঠি লিখুন।

দাড়ি কামানোর জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে নেবেন, তাতে ছোট-খাটো কাটাকুটি বা আঁচড় আর বিষিয়ে ওঠার ভয় থাকবে না। বেশী জলে অল্প 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচো করলে গলায় আরাম ও উপকার পাবেন।

অ্যাটলান্টিস (ইষ্ট) লিঃ,

পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা ১

DBI-2

আমেরিকান এক্সপ্রেস এবং অন্যান্য ব্যবসাদারবা পর্য্যটকদের দেশ দেখাবার জন্য ইউরোপে গাড়ীর এবং পাণ্ডার ব্যবস্থা করেন। এই রকম একটা গাড়ীতে এক দল আমেরিকান ও অন্যান্য পর্য্যটকদের সঙ্গে আমরা বেড়াতে বেরোলাম। যা আগেই দেখেছি, তা আবার দেখলাম এবং কিছু-কিছু নূতন জায়গাতেও গেলাম। সেণ্টামারিয়া দেলা গ্রাৎসি নামে একটা লেভ্রু-পড়া গির্জ্জায় একটি ঘরে লিওনার্ডোর সুবিখ্যাত চিত্র Last Supper দেয়ালে আঁকা রয়েছে। গির্জ্জাটি ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দের। ছবিটি দেখে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এই ছবির কত প্রতিলিপি এখনও জ্বল-জ্বল্ করছে। কিন্তু আসল ছবিটির রং, রেখা সব যেন অর্দ্ধেকেরও বেশী ধুয়ে-মুছে গিয়েছে। আমাদের দেশের অজন্তার ছবি যদিও অনেক জায়গায় খসে পড়ে গিয়েছে, তবু অত প্রাচীন হলেও তা এমন ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। সেই বিলীয়মান ছবিটির ফোটো তুলতে পর্য্যটকেরা সবাই ক্যামেরা খাড়া করে দাঁড়ালেন, অনেকেই তুললেন। কিন্তু কোথায় তার সেই পূর্ব্ব-গৌরব ?

এর পর কতকগুলো বড় লোকের সমাধিক্ষেত্রে টাকার অমরত্ব দেখে ৩৮৬ খৃষ্টাব্দের একটি ভাঙা প্রাচীন গির্জ্জায় গেলাম। সেখানে খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের বহু চিহ্ন আছে। কোনো অখৃষ্টীয় পূজা-মন্দির ছিল আগে, তাকেই ভেঙে-চুরে খৃষ্টীয় গির্জ্জা ৩৮৬তে করেছিল। স্বস্তিক চিহ্ন, নাগ দেবতা ইত্যাদির পরিচয় কিছু-কিছু ওরা রেখে দিয়েছে। উঠানে এখনও প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নস্তূপ দেখা যাচ্ছে। রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীরা গম্ভীর মুখে ঘোরা-ফেরা করছেন। এই মন্দিরে মেয়েদের ছোট হাতের জামা পরে ঢোকা বারণ শুনে মহিলারা যাঁর-যাঁর সঙ্গে ছিল তাঁরা বড় হাতের একটা করে জামা পরে নিলেন।

মন্দিরের কাছে রোমান ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে দূর থেকে দেখলাম।

সমস্ত মিলান সহরটি প্রাচীনতার আবহাওয়ায় মনটাকে অনেক অতীত কালে টেনে নিয়ে যায়।

[ক্রমশঃ।

মিনতি

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

তুমি এসো মোর দীনতার বৈভবে
এসো জীবনের অবনত গৌরবে
এসো চৈত্রের মলয়ের সৌরভে
এসো প্রাণ-সমারোহে।

এসো গো আঁধার বর্ষণ-ঘন রাতে
এক হাতে ত্রাস, বরাভয় আর হাতে
এসো জীবনের দুর্গম দূর পথে
উত্থান-অবরোহে।

বিরক্ত-বিধুর ম্লান হেমন্ত-সাঁঝে
ঝরা পত্রের মর্ম্মরে যেন বাজে
মঞ্জীর তব আমার সকল কাজে
সুধাধারে ভরে রাখি।

দুঃখসাগর মন্থন, হে অমৃত,
জ্যোতির প্লাবনে উজ্জ্বল কর চিত,
হৃদয়-পদ্ম-কোরক যে নিমীলিত
পুলকে মেলুক আঁখি।

দাঁড়ায়ে আজিকে জীবনের নদীতীরে
ফেলে-আসা পথ পানে চাহি ফিরে-ফিরে
স্মৃতির বাষ্প চারি দিক হতে ঘিরে
গাঢ় কুজ্ঝটী সম

কঠিন আঘাতে, এসো, ভাঙি ঘুমঘোর
দীর্ঘ তামসা শর্ব্বরী হোক ভোর
তোমার চরণে ঝরুক ছিঁড়িয়া ডোর
কামনার মালা মম।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

হাওড়া শহরের একটা নাম-করা স্থান। বিরাট অট্টালিকাটি কিন্তু বড়ো রাস্তা হতে বহু দূরে অবস্থিত। গেটের ভিতর দিয়ে বহুদূর-বিস্তৃত লাল কাঁকরের রাস্তা অতিক্রমণ করে তবে ঐ বাড়ীতে পৌছানো যায়। বিশাল বাটী ও তার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ জেলখানার ন্যায় উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

সবে মাত্র তখন সকাল ছয়টা বেজেছে, কিন্তু এই সময়টাতেই বাড়ীর মালিকের সঙ্গে দেখা করার উপযুক্ত সময়। বাড়ীর মালিক বাদশা মিয়া খান এক জন শহরের নাম-করা খানদান মানুষ। কিছু কিছু দান-ধ্যানও তাঁর আছে। লোকে বলে, গরীব-গুর্ব্বোর তিনি নাকি মা-বাপ। শহরের বড়ো-বড়ো বহু বস্তী বাড়ীর মালিক তিনি। নিউ টাউন সিনেমার ম্যানেজার রতন রায় দায়ে পড়ে পোষা গুণ্ডা মধু বাবুকে সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এই রকম দুই-এক জন গুণ্ডাকে হাতে না রাখলে শহরের অঞ্চল-বিশেষে সিনেমা চালানো দায় হয়ে পড়ে, এই জন্যই মধু বাবুর সঙ্গে রতন বাবুর দহরম-মহরম। কিন্তু সম্প্রতি এক নূতন আপদ উপস্থিত হওয়ায় উভয়েই হালে পানি পাননি, তাই তাঁরা আজ বাদশা মিয়ার শরণাপন্ন হয়েছেন।

গেটের ভিতরকার দরওয়ান সারা রাত জেগে ঝিমোচ্ছিল, 'হাঁ হাঁ' করে পথ আগলে সে বললো, 'কাঁহা জা-গা ? হুকুম নেহি হ্যায়।' মধু বাবু এগিয়ে এসে বললো, 'হাম্ হ্যায় ভাই, আউর 'হুকুমৎ'ভি হ্যায়।' মধু বাবু দরোয়ানের অচেনা লোক ছিল না। দরোয়ান মৃদু হেসে উত্তর করলে,, 'আরে আপ, বাবু সাহেব! আচ্ছা, যাইয়ে আপ। লেকেন উন তো শোতি রহে।'

মধু বাবু রতন রায়কে সঙ্গে করে ধীর পদবিক্ষেপে এই আজব বাড়ীর সম্মুখের প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়ে দেখলেন, এক জন চাপদাড়ীওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের উপর একটি চারপায়ার উপর তখনও পর্য্যন্ত সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হলো, সারা রাত তিনি এইখানেই অতিবাহিত করেছেন।

রতন রায় আরও একটু এগিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু মধু বাবু কাঁধে ধরে তাঁকে রুখে দিল।

'কি ব্যাপার মধুদা ?' রতন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আর এগুনো বারণ না কি ? 'চুপ!' মধু বাবু উত্তর করলে, 'খোদ বাবু ওখানে শুয়ে রয়েছেন। সারা রাত্রি বাইরে শোয়া ওঁর অভ্যাস। একটু দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এখোন। এসে চলে গেলে আবার বিপদ আছে। তাতে জান পর্য্যন্ত কবুল হয়ে যেতে পারে। এখানকার নিয়ম-কানুন সব আলাদা।'

রতন রায় প্রখ্যাত বাদশা মিয়ার নাম বহুবার শুনেছিলেন, কিন্তু এর আগে তাঁকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। একটু-আধটু যে তাঁর ভয়ও হচ্ছিল না তা'ও নয়। কে জানে জেগে উঠে তাঁদের এখানে উপস্থিতি তিনি কি ভাবে নেবেন। তাঁর একটি মাত্র ইঙ্গিতে যে, যে-কোনও এক ব্যক্তির মস্তক নিমেষে দেহচ্যুত হতে পারে, তা এই তল্লাটের কোনও ব্যক্তিরই অগোচর নেই। দুরু-দুরু বক্ষে রতন বাবু মধু গুণ্ডার গা ঘেঁসে বাদশা মিয়ার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রায় বিশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু বাদশা মিয়ার জেগে ওঠার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পেল না। সূর্য্যদেবও ইতিমধ্যে আরও কিছু দূর এগিয়ে এসেছেন। সূর্য্যের লোহিত রশ্মি বাদশা মিয়ার চোখে এসে পড়ছিল। সহসা এক জন প্রৌঢ়া মহিলা বারাণ্ডা হতে নেমে এসে একটি রঙিন রুমাল দিয়ে তাঁর চোখ দু'টো ঢেকে পুনরায় বাড়ীর ভিতর ফিরে গেলেন। এর পর আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল, সূর্য্যের খর রশ্মি এইবার সমুদয় প্রাঙ্গণটি প্লাবিত করে দিলে। কিন্তু স্বনামধন্য বাদশা মিয়া তখনও পর্য্যন্ত নিদ্রিত। সহসা চার জন ভৃত্য ত্বরিত গতিতে প্রাঙ্গণে এসে খাটিয়া শুদ্ধ বাদশা মিয়াকে বহন করে অর্দ্ধাবৃত বারাণ্ডার মেঝের উপর নামিয়ে দিলে। এই অদ্ভুত দৃশ্যে রতন বাবু বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এইবার জিজ্ঞাসু নেত্রে মধু গুণ্ডার দিকে চাইলেন। মধু গুণ্ডা ইসারায় তাঁকে আরও একটু অপেক্ষা করতে বললো। আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা গেল, ভৃত্যগণ খাটিয়া শুদ্ধ বাদশা মিয়াকে সম্মুখের একটি ঘরে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রতন বাবু বিস্মিত হয়ে বাদশা মিয়ার প্রাত্যহিক জীবনের এই অদ্ভুত প্রণালী সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন, এমন সময় গেটের দরোয়ান সেইখানে উপস্থিত হয়ে বললে, 'আভি টাইম হুয়া, যানে সেকথা আপ লোক।' বদলি আসার পর দরোয়ানজী ছুটি পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। এইখান-কার হাল-চাল সম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞ নয়, তার কথাও এই কারণে বিশ্বাস্য ছিল। দরোয়ানজীর প্রদর্শিত পথে অলিন্দে উঠে উভয়ে দেখতে পেলে, খোদ বাদশা মিয়া খাটিয়ার উপর বসে গড়গড়া টানছেন।

দুয়ারের দিকে বাদশা মিয়ার দৃষ্টি পড়া মাত্র এগিয়ে এসে মধু বাবু কুর্নিশ করে বললো, 'গোস্তাকি মাফ কিজীয়ে সাব! থোড়ী পহেলাহি হামি লোক এসে গিয়েছে।' 'ঠিক হ্যায়! ঘাবড়াও মাৎ।' স্মিত হাস্যে বাদশা মিয়া উত্তর করলেন, 'ম্যানেজার বাবু ভি এইসে গিয়েছেন। আসেন, বসেন ঐখানে। এখোন কি হিল্লা হয় উ ভি বলেন।'

সম্মুখে একটি হাল ফ্যাসানের বেতের মোড়া রাখা ছিল। বাদশা মিয়ার নির্দ্দেশ মত মোড়াটার উপর বসে পড়ে রতন বাবু তাঁর আর্জ্জি জানালেন, 'আপনি তো শুনেছেন সবই। মালিকরা তো দূরে থাকেন, ম্যানেজারকেই সিনেমা চালাতে হয়। এতো দিন তো মধু

বাবুর মতে হাউস চালিয়ে আসছিলাম। সকলেই এসে বলে, ফ্রি পাশ দেও, তা আর সকলকেই তো তা দেওয়া যায় না? মধু বাবুর দল-বলই তাদের তাড়িয়ে দিতো, কক্ষণো তাদের ঝামেলা করতে দেয়নি। আমরাও ওঁকে এই জন্যে মাসে-মাসে পারিশ্রমিক দিয়ে আসছিলাম, লেকেন ঐই দিন তো এক জবরদস্ত দল এসে গেলো, সব ভেঙে-চুর তছ-নছ করে দিয়ে গেলো। পরে শুনলাম, তারা সবকোই আপনার লোক ছিল। এখোন আপনি যদি একটু নেক-নজর করেন, তাই মধু বাবু আপনার কাছে আমাকে নিয়ে এলেন। মধু বাবু জানতেন না যে, ওরা আপনার লোক আছে।'

"হুঁ"—গড়গড়ায় জোরে-জোরে গোটা কয়েক টান দিয়ে বাদশা মিয়া উত্তর করলেন, 'হুঁ, সমঝে। বড়ো আপশোষ কি বাত্। হামার তো ই বাত একদম মালুম ছিল না। হাম উ লোককো জরুর ডাঁট দেগা। লেকেন উন লোক গরীব আদমী হ্যায়, আপ হর হপ্তামে খালি এক রোজ পাঁচ আদমীকো বৈঠায় দি'জীয়ে। হামলোককো ভি আপকো পুরা মদত মিলেগা। আরে কৌন? বিহারী বাবু! আইয়ে আইয়ে! শোচতা'থে আভি তক্ আপলোক আ' যাতি নেহি কাঁহে।'

বিহারী বাবুকে তাঁর দু'জন বিশ্বাসী সাকরেদ সহ উপস্থিত হতে দেখে বাদশা মিয়া রতন ও মধু বাবুকে অনুরোধ জানালেন, 'আপলোক ভাই তেনি বারাণ্ডামে বৈঠ যাইয়ে। আপিলোকসে হামার আউর বহুত বাত ভি আছে।' উভয়ে বাহিরের বারাণ্ডায় এসে দুইখানি চেয়ারে বসে পড়লে বাদশা মিয়া বিহারী বাবুকে বললেন, 'কেয়া তাজ্জবকা বাত! সবকোইকো বুড়বাক বনায় দিয়া। উস্ ছোক্‌রা থানেদার কৌন থে?' 'কেয়া বোলে ভাই সাব', বিহারী বাবু ক্ষুব্ধ ভাবে উত্তর করলেন, 'আভি তো এক উল্টা কেইস মেরি পর বান যাতা। যো কুছু হোয় কর দিয়ে, নেহি তো হাম মর যায়গা। ইসমে থানেদার একলা নেহি হ্যায়, রামবাগানকো রহেনাউলি এক ছুকরী ভি হ্যায়। উসকো নাম খুকুরাণী, * * নংমে উ আউরাতি হ্যায়। উসি ছুকরীসে সব কুছ পাত্তা উনলোককো মিল গয়া। লেকেন দিন রাত উস্ সড়োকমে অনেকো পাহারা মজুত রহি থি। আউর থানেদার ভি ঘড়ী-ঘড়ী উঁহা আ যাতি। হাম তো বহুত বেইজ্জতি হো গয়া। হামরা আদমী লোক কুছ কামকো লায়েক নেহি।'

'হা রে আল্লা!' গড়গড়ায় জোরে একটা টান দিয়ে বাদশা মিয়া বললেন, 'তোমরা ঘরকো বাত এক ছুকরীকো মালুম হোতি কেঁইসে? পয়েলা আপনা ঘর তো সামলাও।' 'সে সব কাম ফতে করে তবে এসেছি সাহেব!' দাঁত কড়মড়িয়ে চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিহারী বাবু উত্তর দিলেন, 'একটা পুরানো চাকর ছিল আমার। বেটা আমাদের সলা-পরামর্শের সব খবর রাখতো। তখনো কি আমি জানি যে, সে ঐ খুকুরাণীর চাকরের মাসতুতো ভাই! তার এই নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতার আমি শাস্তিও দিয়েছি। এতোক্ষণে তার লাস ম্যানহোলের ভিতর দিয়ে বোধ হয় ধাপার মাঠে বিত্তেধরী নদীতে পৌঁছিয়ে গিয়েছে। এইবার হচ্ছে ঐ খুকুরাণীর চাকরের পালা, আর ঐ বজ্জাত ছুকরী খুকুরাণীরও। অন্ততঃ ওর ঐ চাকরটাকে আমি দুই-এক দিনের মধ্যেই শেষ করবো। বদমায়েস বেটা আমার প্যাজ-পয়জার দু'এরই ব্যবস্থা করে দিলে।'

বাদশা মিয়া পরিষ্কার বাঙলা বলতে না পারলেও বাঙলা ভাবা তিনি ভালোই বুঝতেন। সহসা বিহারী বাবুকে হিন্দি ছেড়ে মাতৃভাষা ধরতে শুনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিহারী বাবু ক্রোধে দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। বিহারী বাবু একটু শান্ত হলে বাদশা মিয়া বললেন, 'বেসামাল মাত হো যাও। শোচকে ভি কাম করো। আপনার চাকোর কো অপরাধ গুরুতর, উনকো দণ্ড ঠিকই হুয়া। লেকেন উস্ ছুকরীয়োঁকো নকরকো ক্যা অপরাধ? উ তো আপনা মনিবিনীকো হুকুম মোতাবেক কাম কিয়া। উসকো জানমে মাত মারো; শহরমে উসকো খেদ দেও। আউর এক বাত হ্যায়, উস ছুকরীকো বাড়ে। উ ছুকরী খুপসুরত হোগা তো উসকো লোপাট কর দেও। মামুলী বাগানি লেড়কী, খানদানী কোহি নেহি হ্যায়। ইসমে মুস্কিল কি আছে?'

বাদশা মিয়ার শেষের প্রস্তাব বিহারী বাবুর মনঃপুত হয়েছিল। তিনি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন—'ঠিক কথা ব'লেছো ভাই সাব! কিন্তু এই জন্য লোক দিতে হবে তোমাকে। তোমার একখানি ভালো ট্যাক্সী গাড়ীও, ড্রাইভারও তোমার কাছ হতে নেবো সা'হেব। বেটীকে তাক মাফিক রাস্তা হতে জোর করে তুলে পাচার করে দিতে হবে। আমার প্রতিশোধ সাংঘাতিক সাহেব, সাংঘাতিক! এ সব সাহেব তোমার পর্য্যন্ত কল্পনার বাইরে। তার চোখ গেলে দিয়ে তাকে রাস্তায় বসিয়ে ভিক্ষে করাবো। আজই বাড়ী ফিরে শাস্তারা'মকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি। শাস্তারামের পোষা ভিখিরীদের দিয়ে তার ওপর করাবো অকথ্য অত্যাচার। এর পর সব্বার শেষে দেখে নেবো আমি ছোকরা দারোগা প্রণব বাবুকে আর তার সঙ্গে দেখে নেবো আমি ঐ ঝনো বড় দারোগা নরেন বাবুকেও। সোজা রাস্তাতেই তো আমি গিয়েছিলাম ভাই সাহেব! বেফয়দা খুন-খারাপি বা রাহাজানি আমিও পছন্দ করি না, কিন্তু খোদার মর্জি নয় যে আমর সোজা পথে কায হাসিল করি, তেরি—'

'উ তুহরি মামলা; তুহু সমঝো। হাম কুছ নেহি বলেগা।' শান্ত ভাবে বাদশা মিয়া বললেন, 'লেকেন উ রোজকো হামলামে হামার মার্ডার সেকসেনকো যে এক আদমী পাকোড় গয়া, উসকো জামানত কেঁয়ো নেহি হুয়া?' 'চেষ্টা কি আমি কম করেছি, সাহেব', প্রত্যুত্তরে বিহারী বাবু বললেন, 'ও যে বলে জামীনে আসবে না। কারণ সে আপনার সাথে বেইমানি করেছে। আমাদের মদতের সে উপযুক্ত ব্যক্তি নয়। সে আপনার সম্পর্কে বহু বিষয় পুলিশের নিকট বলে দিলেও কোনও একটি আড্ডারও ঠিকানা তাদের দেয়নি। যেটুকু সে পুলিশকে বলে ফেলেছে তার জন্য আপনাকে সাবধানে থাকতে বলেছে। জেল থেকে ফিরে এসে আপনার নিকট সে মাথা পেতে শাস্তি নেবে। আমার মনে হলো, মাথাটা ওর বিগড়ে গিয়েছে।'

'ও হামাকে ছাড়লেও হামি ওকে কেইসে ছাড়বে,' বাদশা মিয়া উত্তর করলেন, 'আচ্ছা, যানে দিইয়ে। হাপনারা তা'হলে এখোন আসেন। মেরি কিড ন্যাপিঙ সেকসেনকো আদমীয়োঁ লোক মজুত হ্যায়। আপিলোককো উনলোক সব কুছ মদত দেবে। চিন্তা করবার কুচ্ছু নেহি আছে। আচ্ছা, সেলাম, রাম রাম!'

বিহারী বাবু তার সাকরেদদের নিয়ে বার হয়ে গেলে রতন ও মধু বাবু পুনরায় বাদশা মিয়ার ঐ ঘরটির সমুখে এসে দাঁড়ালেন। তাদের যে বাদশা মিয়া অপেক্ষা করতে বলেছিলেন তা তিনি

কথোপকথনের মধ্যে ভুলে গিয়েছিলেন। উভয়ে আসন গ্রহণ করলে বাদশা মিয়া একটু চিন্তা করে রতন বাবুকে বললেন, 'দেখেন বাবু-সাব, এখানকার কুচ্ছু কথা শুনে থাকেন তো তা কাউকে বলবেন না। হামি হাপনার উপর খুউব খুশ আছি। আউর একটা বাত, এই লেন আমার পাঞ্জা। কোথাও বিপদে পড়েন তো তাদের এই পাঞ্জা দেখিয়ে দেবেন। আপনি এখোন হতে এক জন আমাদের লোক হলেন।'

বাদশা মিয়ার পাঞ্জা-অঙ্কিত কাগজটি হাতে তুলে নিয়ে রতন বাবু উত্তর করলেন, 'এ আমার পরম সৌভাগ্য খান সাহেব! এর মর্য্যাদা আমি নিশ্চয়ই রাখবো। কিন্তু—' রতন বাবুকে 'কিন্তু' বলতে শুনে বাদশা মিয়া বললেন, 'কিন্তু! কিন্তু কেয়া সাব? শোচকে বাত কী'জিয়ে। বেইমানি মাৎ করিয়ে। আচ্ছা, আ'জীয়ে আজ, হাম আভি নাস্তা করেগা।'

রতন বাবুর 'কিন্তু কিন্তু' করার একটি বিশেষ কারণও ছিল। কিন্তু বাদশা মিয়াকে সব কথা খুলে বলা সম্ভবও নয়। কিছু দূরে বসে থাকলেও ভিতরের কথোপকথনের কিছু-কিছু তাঁর কর্ণগোচর হচ্ছিল। খুকুরাণী এবং রামবাগান সম্পর্কীয় শব্দ ক'টি তাঁকে ইতিমধ্যেই উতলা করে দিয়েছে। খুকুরাণীর সহিত তাঁর সম্পর্ক বহু দিনের। রতন বাবু ছিলেন খুকুরাণীর এক জন গৃহশিক্ষক। প্রায় দু'বৎসর হলো সিনেমায় আসার পথে তিনি তাকে সপ্তাহে দু'দিন পড়িয়ে আসতেন এবং তার পরিবর্ত্তে সে পেত আশাতীত দাক্ষিণ্য। খুকুরাণী প্রদত্ত মাসিক এক শত টাকা বেতন না পেলে সংসার নির্ব্বাহ করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। খুকুরাণীর দয়া-দাক্ষিণ্য, লিখন-পঠনে আগ্রহ তাঁকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। আগামী বৎসরে খুকুরাণীর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা, এই জন্যে ইদানিং প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে খুকুরাণীর বাড়ীতে আসতে হয়েছে। প্রণব বাবুর সম্পর্কেও তিনি খুকুরাণীর নিকট বহু কাহিনী শুনেছেন। এক দিন তিনি পুলিশের হাল্লার মধ্যেও পড়ে গিয়েছিলেন, প্রণব বাবুকে ফোন করে খুকুরাণী তাঁকে তক্ষুনি ছাড়িয়ে আনে।

বাদশা মিয়ার নিকট হতে বার হয়ে এসে রতন বাবুর মনে হলো, তিনি যেন বাঘের মুখ হতে বার হয়ে এলেন। কোনও প্রকারে মধু বাবুকে বিদায় দিয়ে রতন বাবু একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে নিলেন। এবং তার পর তিনি স্খলিত পদে ফিরে এলেন তাঁর নিউ-টাউন সিনেমায়। এই দিন তাঁর সিনেমা হাউসে একটা নাম-করা ছবি দেখানো হবে। সকাল আটটা হতে টিকিট বিক্রী সুরু হয়েছে, সেই সঙ্গে ক্রেতাতে-ক্রেতাতে মারামারিও। ভিতরে ও বাহিরে ছোটখাটো উপদ্রবেরও বিরাম নেই। নিজের কাযের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেও, ব্যস্ততা ও কার্য্যের ফাঁকে-ফাঁকে খুকুরাণীর আশু বিপদের সম্ভাবনা থেকে-থেকে তাঁকে উতলা করে তুলছিল। রতন বাবু ভাবছিলেন কখন কার্য্য শেষে তিনি খুকুরাণীর বাড়ী এসে তাকে সাবধান করে দিতে পারবেন।

রাত্রি বারোটার পর সকল কার্য্য শেষ করে ক্যাশ মিলিয়ে রতন বাবু দেখলেন, এই দিন ক্যাসে জমা পড়েছে প্রায় আড়াই হাজার টাকা। এতো টাকা সিনেমা হাউসে রেখে যাওয়া নিরাপদও নয়। অগত্যা একটা বড়ো বাক্সে ক্যাশ পূরে, ক্যাশ-বাক্স সহ ঘোড়ার গাড়ী করে হাওড়া পুলের দিকে তিনি রওনা হলেন। রতন বাবুর গাড়ী-খানা হাওড়ার পুলের উপর এসে পৌঁছুল প্রায় রাত্রি দেড়টায়। ধীরে-ধীরে গাড়ীখানা এগিয়ে চলছিল, এমন সময় 'মারে মারে' করে তাদের ঘিরে দাঁড়ালো ছুরী হাতে জন দশ-বারো দেশবালি জোয়ান। এদের মধ্যে এক জন এগিয়ে এসে নির্ব্বিবাদে ক্যাশের বাক্সটি তুলে নিয়ে খেঁকরে বললে, "এবে শালা, জান বাঁচাও!" রতন বাবু কিন্তু এই দিন এই ব্যাপারে একটুও ভীত হলো না। প্রত্যুত্তরে তিনিও খেঁকরে উঠে বললেন, 'খবরদার! হাম মিয়া সাহেবকে আদমী। বাকোস্-আপোষ দেও আভি।'

রতন বাবুর এই দম্ভোক্তিতে দস্যু দলের সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ এ ওর মুখ-চাওয়াচায়ি করে, তাদের এক জন জিজ্ঞেস করলো, 'কুছ নিশানা হ্যায় আপকো পাশ?' রতন বাবু পকেট হতে বাদশা মিয়ার পাঞ্জাখানি বার করে উত্তর করলেন, 'দেখলিয়ে! এহি হ্যায়।' আড় চোখে পাঞ্জাখানি দেখে নিয়ে দলের সর্দ্দার নিঃশব্দে ক্যাশের বাক্সটি পুনরায় গাড়ীর ভিতর তুলে দিয়ে বললে, 'লিজীয়ে বাবু সাব! মালুম নেহী থে, মাফি মাঙতা। লেকেন, আউর এক বাত আছে। পুলকো ইধারমে হামলোককো এলাকা। দরিয়াকো উ পারমে হামিলোককো এক্তার নেহি হ্যায়। হাম হাপনার সঙ্গে দু'জন আদমী দিচ্ছে, নয়া সড়ক তক্ পৌঁছিয়ে দিবে। সেলাম—'

নূতন রাস্তার মোড়ে সাথী দুই জনকে বুঝিয়ে বিদায় দিয়ে রতন বাবু সোজা রামবাগানে এসে খুকুরাণীর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। এত রাত্রে তাঁকে সেইখানে দেখে বিস্মিত হয়ে খুকুরাণী জিজ্ঞেস করলো, 'এ কি, মাষ্টার মশায়, এত রাত্রে, এই পাড়ায়?' উত্তরে রতন বাবু বললেন, 'ভুল বুঝিসনি, বোন! নিতান্ত দায়ে পড়ে এখানে এতো রাত্রে এসেছি। চল, বসবার ঘরে চল, সব কথা তোকে খুলে বলবো। তার পর যা ভালো বুঝিস করিস।'

রতন বাবুর প্রত্যেকটি কথা খুকুরাণী প্রায় গিলে-গিলেই শুনে নিল। বিপদে ধৈর্য্যহারা হওয়া খুকুরাণীর ধাতে নেই। এ রকম বহু বিপদ সে পূর্ব্বেও কাটিয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে খুকুরাণী বললে, 'বিপদের মধ্যে যারা বাস করে তাদের আবার বিপদ কি? আমি ভাবছি মাষ্টার মশাই, শুধু অন্যদের কথা। কিন্তু এখোন আমাদের একমাত্র অবলম্বন আপনি। আপনাকে যখোন-তখোন আমার প্রয়োজন হতে পারে। আমি জানি, আপনি মনে-মনে আমাকে কতো ভালবাসেন এবং এও জানি, আপনি আমাকে এ বিষয়ে এতটুকুও নিরাশ করবেন না। আপনি বরং একটু সাবধানে থাকবেন, যাতে ওরা জানতে না পারে আপনি আমাদের লোক। আমার একটা পথ বন্ধ হলো বটে, কিন্তু ঠিক এই সময় আর একটা পথ অভাবনীয়রূপে খুলে গেলো। কে বলে ভগবান নেই, আছেন আছেন, নিশ্চয়ই তিনি আছেন।'

[ক্রমশঃ।

লবকুমার বসু

কিছু দিন পূর্ব্বেও ভারতের ক্রীড়ামহলে পাকিস্থান দলের ভারত সফরের কথাই একমাত্র আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। পাকিস্থান ক্রিকেট দলটি আবদুল কারদার হাফিজের নেতৃত্বে আমাদের দেশে সফর করতে আসে গত অক্টোবর মাসে। শিশুরাষ্ট্র পাকিস্থানের এই হ'ল প্রথম সরকারী ক্রিকেট সফর। সম্পূর্ণ নবীন খেলোয়াড়দের নিয়ে দলটি গঠিত হ'লেও তাদের সুযোগ্য অধিনায়ক কারদারের নিপুণ পরিচালনা এবং প্রতিটি খেলোয়াড়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় তাদের এই সফর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। পাকিস্থান দল ভারতের বিরুদ্ধে চার দিনব্যাপী পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচ খেলে। পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচের মধ্যে ভারতীয় দল দুটি খেলায় জয়লাভ ক'রে "রাবার" লাভ করে; পাকিস্থান একটি খেলায় জয়লাভ করে এবং বাকী খেলা দুটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। কিন্তু মাত্র একটি টেষ্টে জয়লাভ করলেও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে এই নবীন দলটির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এছাড়া আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দলটি সফরের অন্যান্য খেলার মধ্যে একটিতে জয়লাভ করে এবং বাকী খেলাগুলি অমীমাংসিত ভাবেই শেষ হয়।

এই সফরের খেলায় পাকিস্থান দলের যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখান তাঁদের মধ্যে ব্যাটিংএ হানিফ মহম্মদ, নাজার মহম্মদ ও ওয়াকার হোসেন এবং বোলিংএ ফাজল মামুদ, মামুদ হোসেন ও আমীর এলাহির নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ক'রে ১৮ বছর বয়স্ক হানিফ মহম্মদ যেরূপ নিপুণতার সঙ্গে ব্যাটিং করেন, তা সকল ক্রীড়া-সমালোচক ও খেলার মাঠের দর্শকদের চমৎকৃত করে।

পাকিস্থান দল এদেশে প্রথম ম্যাচ খেলে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে অমৃতসরে। এই খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল হানিফ মহম্মদের উভয় ইনিংসে শতাধিক রাণ লাভ। ইতিপূর্ব্বে কোন খেলোয়াড়ই ভারত সফরে এসে প্রথম শ্রেণীর খেলায় প্রথমেই এইরূপ উভয় ইনিংসে শত রাণ লাভ করতে সক্ষম হননি। উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে এই খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

এর পর দিল্লীতে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থান দল প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলে। এটিই এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক ক্রিকেট খেলা। কিন্তু এই খেলায় পাকিস্থান দল আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বিশেষ ক'রে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার ভিনু মানকড়ের বিরুদ্ধে তাদের কোন ব্যাটস্‌ম্যানই সুবিধে করতে পারেনি। মানকড় তাঁর অপূর্ব্ব বোলিংএর দ্বারা মাত্র ১৩১ রাণ দিয়ে পাকিস্থানের ১৩ জন খেলোয়াড়কে আউট করেন। এছাড়া ভারতীয় দলের হাজারে, অধিকারী ও গুলাম আমেদ এবং পাকিস্থানের পক্ষে অধিনায়ক কারদার, হানিফ এবং ইমতিয়াজ আমেদের ব্যাটিং উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় দল এই খেলায় এক ইনিংস ও ৭০ রাণে জয়ী হয়। ভারতের এই সাফল্যের জন্য অধিনায়ক অমরনাথের কৃতিত্বও অনেকাংশে দায়ী। তিনি যেরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁহার দলটিকে পরিচালনা করেন, তা সকলেরই শিক্ষণীয়।

ফলাফল :—

ভারত—৩৭২ (অধিকারী নট আউট ৮১, হাজারে ৭৬, গুলাম আমেদ ৫০, আমীর এলাহি ১৩৪ রাণে ৪টি)

পাকিস্থান—১৫০ (হানিফ ৫১, মানকড় ৫২ রাণে ৮টি); এবং ১৫২ (কারদার নট আউট ৪৩, ইমতিয়াজ আমেদ ৪১, মানকড় ৭৯ রাণে ৫টি, গুলাম আমেদ ৩৫ রাণে ৪টি)

কিন্তু পাকিস্থান দল তাদের প্রথম টেষ্টের পরাজয়ের গ্লানি মোচন করে লক্ষ্ণৌএর দ্বিতীয় টেষ্টে। ম্যাটিং উইকেটে খেলায় অভ্যস্ত পাকিস্থান দল মানকড়, হাজারে, অধিকারী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়বিহীন দুর্ব্বল ভারতীয় দলকে এক ইনিংস ও ৪৩ রাণে লক্ষ্ণৌএর ম্যাটিং উইকেটে পরাজিত ক'রে, দিল্লী টেষ্টের পর যে সকল সমালোচকগণ তাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তাঁহাদের ধারণা বদলিয়ে দেয়। পাকিস্থানের ভারতে এই প্রথম জয়লাভ বহুলাংশে সম্ভব হয়েছিল নাজার মহম্মদের অপূর্ব্ব ব্যাটিং এবং ফাজল মামুদের ম্যাটিং উইকেটে বোলিং-সাফল্যের জন্য। অপর পক্ষে ভারতীয় দলের অধিনায়ক অমরনাথ ব্যতীত কেউই আশানুরূপ খেলা দেখাতে পারেননি।

ফলাফল :—

ভারত—১০৬ (পঙ্কজ রায় ৩০, ফাজল মামুদ ৫২ রাণে ৫টি, মামুদ হোসেন ৩৫ রাণে ৩টি); এবং ১৮২ (অমরনাথ নট আউট ৬১, ডি. কে. গায়েকওয়াড় ৩২, উম্রিগড় ৩২, ফাজল মামুদ ৪২ রাণে ৭টি)

পাকিস্থান—৩৩১ (নাজার মহম্মদ নট আউট ১২৪, মকসুদ আমেদ ৪১, গুলাম আমেদ ৮৩ রাণে ৩টি)

পাকিস্থান দলের পরবর্ত্তী তিনটি খেলা মধ্যাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল এবং বোম্বাই রাজ্যের বিরুদ্ধে, অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে ইমতিয়াজ আমেদ নট আউট দ্বিশতাধিক এবং আবদুল হাফিজ ও খুরশীদ আমেদ উভয়ে শতাধিক রাণ করেন। মধ্যাঞ্চলের হয়ে একমাত্র প্রখ্যাত খেলোয়াড় মুস্তাক আলিই তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে সক্ষম হন।

পাকিস্থান দলের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের খেলায় পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে পি. পাঞ্জাবী শতাধিক রাণ করেন এবং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে এই সফরের মধ্যে প্রথম শতাধিক রাণ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। পাকিস্থানের ওয়াজির মহম্মদও শতাধিক রাণ করেন।

এর পর বোম্বাই রাজ্যের সঙ্গে খেলায় উভয় দলেরই ব্যাট্‌স্‌ম্যানগণ বহু রাণ তুলতে সক্ষম হন। এর মধ্যে পাকিস্থানের পক্ষে হানিফ মহম্মদের নট আউট ২০৩, ইমতিয়াজ আমেদের ৯৬, এবং বোম্বাই রাজ্যের পক্ষে বি. আর. ইরাণীর নট আউট ১০৩ ও মঞ্জরেকারের ১৭৩ রাণ উল্লেখযোগ্য।

এই খেলার পর বোম্বাইতে পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে তৃতীয় টেষ্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় ভারতীয় দল দশ উইকেটে

জয়লাভ করে টেষ্ট পর্যায়ে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হয়। ভারতীয় দল এবার মানকড়, হাজারে, অধিকারী প্রভৃতি প্রখ্যাত খেলোয়াড়গণ যাঁরা দ্বিতীয় টেষ্টে খেলতে পারেননি, তাঁদের যোগদানে অধিকতর শক্তিশালী হয়েছিল।

এই খেলার প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল মানকড়ের বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন। তিনি পাকিস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াকার হোসেনের উইকেট নিলে, সর্ব্বাপেক্ষা কম সংখ্যক টেষ্ট খেলে, টেষ্ট খেলায় 'ডাবল' অর্থাৎ শত উইকেট নেওয়ার ও হাজার রাণ করবার গৌরব অর্জ্জন করেন। তিনি এই খেলায় দুই ইনিংসে ১২৪ রাণ দিয়ে ৮টি উইকেট লাভ করেন। এছাড়া হাজারে ও উম্রিগড়ের শতাধিক রাণ এবং অধিনায়ক অমরনাথের ইন-সুইং বোলিং ভারতীয় দলের এই জয়লাভে সাহায্য করেছিল। পাকিস্থানের হানিফ ও ওয়াকার হোসেন ব্যতীত কোন খেলোয়াড়ই মানকড় ও অমরনাথের বোলিংএর বিরুদ্ধে সুবিধে করতে না পারায় তাদেরকে এই পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ফলাফল :—

পাকিস্থান :—১৮৬ (ওয়াকার হোসেন ৮১, অমরনাথ ৪০ রাণে ৪টি, মানকড় ৫২ রাণে ৩টি) ; এবং ২৪২ (হানিফ ৯৬, ওয়াকার হোসেন ৬৫, মানকড় ৭২ রাণে ৫টি ; গুপ্তে ৭৭ রাণে ৩টি)

ভারত :—৪ উইকেটে ৩৮৭ ডি: (নাজারে নট আউট ১৪৬, উম্রিগড় ১০২, মানকড় ৪১, মামুদ হোসেন ১২১ রাণে ৩টি) এবং বিনা উইকেটে ৪৫ (মানকড় নট আউট ৩৫)

পাকিস্থান ও ভারতের চতুর্থ টেষ্ট খেলাটি হয় মাদ্রাজে। এই খেলায় পাকিস্থান দল প্রথমে ব্যাট করতে নামে এবং অধিনায়ক কারদার, জুলফিকার আমেদ প্রভৃতি খেলোয়াড়ের সহায়তায় ৩৪৪ রাণ তুলতে সক্ষম হয়। এর পর ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামলে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ প্রখ্যাত খেলোয়াড়ের অসাফল্যই তাদের এই বিপর্যয়ের কারণ। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের শেষে ৬ উইকেটে ১৭৫ রাণ তোলে। অতঃপর খেলার তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ খেলাটি বন্ধ থাকে এবং অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

ফলাফল :—

পাকিস্থান :—৩৪৪ (কারদার ৭৯, জুলফিকার আমেদ নট আউট ৬৩)

ভারত :—৬ উইকেটে ১৭৫ (উম্রিগড় ৬২, আপ্তে ৪২)

চতুর্থ টেষ্টের পর বাঙ্গালোরে পাকিস্থান দলের সঙ্গে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের যে খেলাটি হয় সেটিও অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলার পর পাকিস্থানের পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয় কলকাতায়। এই টেষ্টটিও অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'লে ভারতীয় দল পূর্ব্বেই ২—১ খেলায় অগ্রগামী থাকায় শেষ পর্য্যন্ত 'রাবার' লাভ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে এটিই প্রথম সরকারী টেষ্ট খেলায় 'রাবার' লাভ। এই গৌরব অর্জ্জন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা অধিনায়ক অমরনাথ ও তাঁর দলটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

টসে জয়লাভ করলেও অধিনায়ক অমরনাথ পাকিস্থান দলকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান। ফাদকার ও রামচাঁদের ফাষ্ট বলের বিরুদ্ধে কেউই বিশেষ সুবিধে করতে না পারলেও হানিফ মহম্মদ, ইমতিয়াজ আমেদ ও নাজার মহম্মদের চেষ্টায় পাকিস্থান দল প্রথম ইনিংসে ২৫৭ তোলে। এর পর ভারতীয় দল ৩৯৭ রাণ ক'রে ১৪০ রাণে অগ্রগামী হয়। ভারতীয় দলের তরুণ খেলোয়াড় দীপক শোধন তাঁর প্রথম টেষ্ট খেলাতেই শতাধিক রাণ করতে সক্ষম হন। অমরনাথ ব্যতীত আর কোন খেলোয়াড়ই ভারতীয় দলের হয়ে এই কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পারেননি। অতঃপর পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে পাকিস্থান দল তৃতীয় দিনের শেষের দিকে ব্যাট করতে নামে। কিন্তু চতুর্থ বা শেষ দিনে ওয়াকার হোসেনের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংএর ফলে তাদেরকে এই পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়নি এবং শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

ফলাফল—

পাকিস্থান :—২৫৭ (নাজার মহম্মদ ৫৫, হানিফ মহম্মদ ৫৬, ইমতিয়াজ আমেদ ৫৭ ; ফাদকার ৭২ রাণে ৫টি, রামচাঁদ ২০ রাণে ৩টি) এবং ৭ উইকেটে ২৩৬ ডি: ।

ভারত :—৩৯৭ (শোধন ১১০, ফাদকার ৫৭ ; ফজল মহম্মদ ১৪১ রাণে ৪টি, মামুদ হোসেন ১১৪ রাণে ৩টি) এবং বিনা উইকেটে ২৮।

পঞ্চম টেষ্টের পর, পাকিস্থানের সঙ্গে পূর্ব্বাঞ্চলের যে খেলাটি জামসেদপুরে হয়, তাও অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। এই খেলাতে পাকিস্থান দলের নাজার মহম্মদ ও ইমতিয়াজ আমেদ যথাক্রমে ১২৩ ও ১০৩ এবং পূর্ব্বাঞ্চলের বি ফ্র্যাঙ্ক ১৩ রাণ করেন। এর পর পাকিস্থান দলের শেষ খেলাটি হয় কলকাতায় বি, সি, রায়ের দলের সহিত। পাকিস্থান দল দশ উইকেটে জয়লাভ করে এবং এই সফরের মধ্যে এই হ'ল তাদের সাধারণ খেলায় প্রথম সাফল্য লাভ। হানিফ মহম্মদ ১১১ রাণ ক'রে এই সফরে তাঁর সহস্র রাণ পূরণ করেন। হানিফ ব্যতীত পাকিস্থানের পক্ষে অন্য কোন খেলোয়াড়ই সহস্র রাণ করতে পারেননি।

* * * *

পাকিস্থান দলের ভারত সফরের পরই ভারতীয় দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে খেলতে যাবে। এই দলের অধিনায়ক ও খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের জন্যে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্ব্বাচক কমিটি মাদ্রাজে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে অধিনায়ক পদে বিজয় হাজারেকে নির্ব্বাচিত করেন। ইংলণ্ডের মাঠে হাজারের অসাফল্যতা এবং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অমরনাথের দক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় দলকে পরিচালনের পরও নির্ব্বাচক কমিটি অমরনাথকে অধিনায়ক না ক'রে হাজারেকে মনোনীত করায় সকলেই বিস্মিত হয়েছে। নির্ব্বাচক কমিটি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্য যে সকল খেলোয়াড় মনোনীত করেছেন তা নিম্নে প্রকাশিত হ'ল :—

বিজয় হাজারে (অধিনায়ক), ভিনু মানকড় (সহ-অধিনায়ক), উম্রিগড়, ফাদকার, ডি. কে. গায়েকওয়াড়, পি. রায়, ই. এস. মাকা, পি. জি. যোশী, গুপ্তে, রামচাঁদ, দীপক শোধন, আপ্তে, মঞ্জরেকার, কানাইরাম, এবং সি. ডি. গাডকারী—

টেবিল টেনিস :—

সিঙ্গাপুরে প্রথম এশিয়ান টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পুরুষ ও মহিলাদের দলগত বিভাগে হংকংএর সাফল্য এবং মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগে ভারতের মিসেস্ গুল নাসিকওয়ালার সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিসেস্ নাসিকওয়ালা এই প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস্, ডাবলস্ ও মিক্সড ডাবলস্এ জয়ী হয়ে ত্রিমুকুট লাভ করেন। পুরুষদের সিঙ্গলস্এ হংকংএর সিন্ সু চু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হিরোজী সাতোকে পরাজিত ক'রে জয়ী হন। ফলাফল :—

পুরুষদের সিঙ্গলস্ :—সিন্ সু চু (হংকং)
বিজয়ী সাতো (জাপান) ২১-১২, ২১-১০, ২১-১৩।

মহিলাদের সিঙ্গলস্ :—মিসেস্ গুল নাসিকওয়ালা (ভারত)
বিজয়ী বাগুয়া ওয়াং (হংকং) ২১-১৬, ১৩-২১, ২১-১৭, ১৮-২১, ২১-১৭।

মিক্সড ডাবলস্ :—কে জয়ন্ত ও মিসেস্ নাসিকওয়ালা (ভারত)
বিজয়ী সিন্ সু চু এবং মিসেস্ বাগুয়া ওয়াং (হংকং) ২১-১৭, ১৬-২১, ২১-১৩, ১০-২১, ২১-৯।

পুরুষদের ডবলস্ :—সিন্ সু চু (হংকং) ও ফুচি ফং (হংকং)
বিজয়ী-জয়ন্ত ও ভাণ্ডারী (ভারত) ২১-১১, ২১-১৪, ২১-১৯।

ফুটবল :—

দিল্লীতে এবারের ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় কলকাতার ইষ্ট বেঙ্গল দল জয়ী হয়েছেন। তাঁরা ফাইনালে হায়দারাবাদ পুলিশ দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করেন। ইষ্ট বেঙ্গল দল এর আগে ১৯৫১ সালেও এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। এঁদের পূর্ব্বে কোন ভারতীয় দলই এ রকম উপর্য্যুপরি দু'বার ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হবার গৌরব লাভ করেননি।

বিলিয়ার্ডস :—

সম্প্রতি কলকাতায় বিশ্ব বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতে এই প্রথম এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, স্কটল্যাণ্ড ও বর্ম্মা থেকে এক জন করে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় যোগদান করেন এবং হোষ্ট-কাউণ্টি হিসাবে ভারতের দুই জন খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিযোগিতাটি লীগ-প্রথা অনুযায়ী হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ড্রিফিল্ড জয়ী হন। এই প্রতিযোগিতায় ড্রিফিল্ড ও ভারতে চাঁদু হিঙ্গোরীর কাছে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান রবার্ট মার্শালের পরাজয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে খেলোয়াড়দের ক্রম অনুসারে নাম প্রকাশিত হ'ল এবং নামের পাশে খেলার ফলাফলও দেওয়া হ'ল :—

১। ড্রিফিল্ড (ইংলণ্ড)—৫ জয়ী, ০ পরাজয়
২। রবার্ট মার্শাল (অষ্ট্রেলিয়া)—৩ জয়ী, ২ পরাজয়
৩। চাঁদু হিঙ্গোরী (ভারত)—৩ জয়ী, ২ পরাজয়
৪। র‍্যামেজ (স্কটলণ্ড)—৩ জয়ী, ২ পরাজয়
৫। জোন্স (ভারত)—১ জয়ী, ৪ পরাজয়
৬। ইউনস (বর্ম্মা)—০ জয়ী, ৫ পরাজয়।

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া। মূল্য এক টাকা।

ধুস্তুরীমায়া গল্প—পরশুরাম। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বকুল—শ্রীমনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দু টাকা।

অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী—শ্রীহেমন্ত চাকী। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

গানে রামপ্রসাদ—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত—শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত। মহানির্ব্বাণ মঠ, নবদ্বীপ, নদীয়া। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

মহাকবি মধুসূদন জীবননাট্য—শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, কবিভূষণ। যশোহর সাহিত্য সঙ্ঘ, যশোহর। মূল্য আড়াই টাকা।

বঙ্কিম প্রতিভা—শ্রীহৃষীকেশ হালদার। দেশবন্ধু বুক ডিপো, ৮৪এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। মূল্য দু টাকা।

পাথনা—শ্রীবটকৃষ্ণ দাস। ইউনাইটেড বুক্স, ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য দু টাকা।

সুধার ধারা—শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ। শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী। মূল্য আট আনা।

স্মৃতিলেখা—শ্রীসত্যেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ আশ্রম, শিলচর, আসাম। মূল্য আট আনা।

বাঁশরী—শ্রীঅসীমানন্দ। সংগ্রহ প্রকাশনী, ৮।১।এস্, হাজরা লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

শ্রীরমেন চৌধুরী

ষ্টুডিয়ো-পারচিতি

ন্যাশানাল সাউণ্ড ষ্টুডিয়ো

এম. পি. প্রোডাকৃসন্স

শেষ চিত্র-নির্মাণশালা আমাদের বাঙলা দেশে এই ন্যাশানাল সাউণ্ড ষ্টুডিয়ো। তা হলে দেখা যাচ্ছে, একুনে বারোটি ষ্টুডিয়ো আছে কলকাতাতে। এ বাড়ীটির অবস্থিতি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে।

ষ্টুডিয়োটির বর্তমান কর্তৃত্ব এম. পি. প্রোডাকৃসনের। সার্থক চিত্র-নির্মাতা এম. পি. প্রোডাকৃসন বহু দিন অপেক্ষা করছিলেন নিজস্ব ষ্টুডিয়ো নির্মাণের, পেয়ে গেলেন লিজ ন্যাশানাল সাউণ্ডের। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এই যোগাযোগ হোলো। নব-ব্যবস্থাপনায় ছবি উঠলো সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'আভিজাত্য'। এর পর অগ্রদূতের 'সংকল্প'। ক্রমে আরো ছবি উঠলো—যাবতীয় এম. পি'র নিজস্ব ছবি; যেমন—'ইন্দ্রনাথ', 'বানপ্রস্থ', 'কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে', 'সহযাত্রী', 'বিদ্যাসাগর', 'প্রত্যাবর্তন', 'নষ্টনীড়'। তার পর এলো ঘরে-বাইরে উচ্চ-প্রশংসিত 'বাবলা'। 'সঞ্জীবনী'র দেখা মিললো এবারে। যেছবি এর পর আমরা এখান থেকে পেয়েছি তার নাম 'বসু-পরিবার'।

যৌন-ব্যাধি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধীয় 'কার পাপে' ছবিটির স্মৃতি নিশ্চয় আজো ম্লান হয়নি আপনাদের মনে—কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় ও অগ্রদূতের তত্ত্বাবধানে সমাজ-জীবনের অপরিহার্য এই বাণীচিত্রটি পরবর্তী প্রয়াস এঁদের। ইতিমধ্যে 'বিদ্যাসাগর' হিন্দী-ভাষান্তরিত হোলো। তার পরই এলো 'আঁধি'। আগামী দিনের মুক্তি-পিয়াসী ছবির মধ্যে প্রথমেই পড়বে নির্মল দে পরিচালিত 'সাড়ে চুয়াত্তর'। সামনের মাসেই দেখা মিলবে বলে শোনা গেল। এ ছাড়া 'বাবলা'র হিন্দী ও বাঙলা 'প্রতাপাদিত্য' নির্মাণরত। হিন্দী 'কার পাপে'র কথাও শুনলাম। তার ব্যবস্থাও হবে অবিলম্বে।

এম. পি. প্রোডাকৃসন বিভিন্ন ছবি তুলে চলেছেন একের পর এক। এঁদের কর্মিবৃন্দের উল্লেখ করছি এবার। চিত্রশিল্পী—বিভূতি লাহা, বিজয় ঘোষ, অমল দাস; শব্দযন্ত্রী—যতীন দত্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অনিল তালুকদার; সম্পাদক—কালী রাহা; শিল্প-নির্দেশক—সত্যেন রায় চৌধুরী, সুধীর খান; ম্যানেজার—বিমল ঘোষ; প্রোডাকসন-ইন-চার্জ—তারক পাল, নিতাই সিংহ; অফিস-ইন-চার্জ—পশুপতি মুখোপাধ্যায়।—এ ছাড়া প্রায় শত কর্মী ক্লান্তি-বিহীন পরিশ্রমে বিভিন্ন বিভাগে সহায়তা করছেন।

ষ্টুডিয়ো-তত্ত্বাবধায়ক ও অগ্রদূত-গোষ্ঠীর অন্যতম বিমল ঘোষ মশাই নিয়ে চললেন ফ্লোরে। শ্রীযুক্ত ঘোষের তৎপরতায় অতি সত্বর পরিদর্শন শেষ হোলো। এ ষ্টুডিয়োটিও সুন্দর। ফ্লোর আছে দুটি। এবং দুটি ফ্লোর চালু রাখবার জন্যে আছে মিচেল ও আইমো ক্যামেরা। আর. সি. এ. পি. এম—৪৫ পাউণ্ড ট্রাক।

কলা-কুশলী

শব্দযন্ত্রী লোকেন বসু

'আমার কর্মময় জীবনের সফলতার মূলে রয়েছে সেজদার (নীতীন বসু মহাশয়ের অকুণ্ঠিত সাহায্য এবং শ্রীযুক্ত বি. এন. সরকারের) অতি বাঞ্ছিত পৃষ্ঠপোষকতা! এই দু'জনের ঋণ শ্রদ্ধার সংগে আমি আজীবন স্মরণ করবো।'

আমার সংগে সাক্ষাৎকারের সময় যশস্বী শব্দযন্ত্রী শ্রীযুক্ত লোকেন বসু উপরোক্ত মন্তব্য করলেন। বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর কৃতজ্ঞতায় মন্থর হয়ে এলো। কোনো একটি চিত্র-সাপ্তাহিকের ভুল সংবাদ পরিবেশনের জন্ত লোকেন বাবু ঠিক এই কথাই প্রতিবাদস্বরূপ লিখে পাঠিয়েছিলেন। দেখলুম সে চিঠি। অর্থাৎ সর্বত্র একই বক্তব্য ধ্বনিত হয় তাঁর মুখে। প্রকৃত গুণীজনের এই-ই তো লক্ষণ।

সস্ত্রীক উদয়শঙ্কর —কালীশ মুখোপাধ্যায়

লোকেন বসু

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের শত চিত্র পূর্ণ হতে চলেছে অবিলম্বে। এই এক শতটির মধ্যে লোকেন বাবুর নাম আছে শব্দযন্ত্রী হিসাবে প্রায় অর্ধ শতে। আজ ১৮।১৯ মাস স'রে এসেছেন ওখান থেকে। কিন্তু তবু ভুলতে পারেন না নিজেদের হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠানটির হাজারো সুখ-দুঃখের স্মৃতি। কী গভীর প্রীতি রয়েছে মনের অন্তরালে ফল্গুধারার মত, পরিচয় পেয়েছি তার সামান্য দু'ঘণ্টার আলোচনায়।

১৯৩১ সালে গ'ড়ে উঠলো নিউ থিয়েটার্স সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগি নিয়ে। মাস খানেকের মধ্যেই সহকারী হয়ে যোগ দিলেন লোকেন বাবু। তখন ভারতীয় চিত্ররাজ্যে প্রদোষান্ধকার কেটে গিয়ে ফুটে উঠতে শুরু করেছে দিনের আলো, তাই প্রয়োজন হোতো বিদেশীয়দের সাহায্য ক্যামেরায়, শব্দযন্ত্রে। এই কারণে মিঃ ডেমিং এলেন টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স থেকে সাউণ্ড মেসিন চালানোর শিক্ষা দিতে ওই শব্দযন্ত্রটির সংগেই। বাড়া-দা অর্থাৎ মুকুল বসু মহাশয় প্রথমে যোগ দিলেন নীতীন বসুর নির্দেশে। তারপর এলো লোকেন বাবুর আহ্বান! লোকেন বাবু তখন কালিম্পং-এ বাস

পুত্রসহ সুমিত্রা দেবী —কালীশ মুখোপাধ্যায়

করেন, তাই কলকাতা থেকে পর পর তারবার্তা প্রেরিত হোলো তাঁর উদ্দেশে। বাবা-মা'র অনুমতি নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন ভাবী দিনের সার্থক-কর্মী শব্দযন্ত্রী লোকেন বসু। অভাবিত ভাবে উদয় হোলো জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ—কে-ই বা তখন তা লক্ষ্য করেছিলো?

নিউ থিয়েটার্সে স্বনামে প্রথম ছবি হোলো এঁর 'নন্দনার' ('মাদ্রাজী) ও 'সীতা' (ভাদুড়ী মশাই পরিচালিত)। বহু দিনের বাসনা রূপায়িত হোলো বাস্তবে। যাত্রা শুরু হোলো এক থেকে অন্যে, অখ্যাতি থেকে খ্যাতির তুংগশিখরে।

সেদিনের সদ্যোজাত প্রতিষ্ঠান ক্রমশ স্তর অতিক্রম করে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হোলো! ভারতের ছবির ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখলো নিজের কীর্তি-কাহিনী, অক্ষয় আসন সংগ্রহ করে নিলো সারা ভারতের মানুষের মনে! এই সংঙ্গে কলা-কুশলীদের পরিচিতিও সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়লো অবশ্যম্ভাবী রূপে।

লোকেন বাবুর নাম কোন্ কোন্ ছবিতে আমরা দেখেছি বলছেন? সে ফিরিস্তি কিছুটা দেবার চেষ্টা করছি, কিন্তু তার কোনো ধারাবাহিকতা না থাকাই সম্ভব। তবু ধরুন—'রূপ-লেখা', 'দেবদাস', (হিন্দি, বাংলা), 'রজত-জয়ন্তী', 'জিন্দিগী' (হিন্দি প্রিয়বান্ধবী), 'বিদ্যাপতি', 'সৌগন্ধ', 'কপালকুণ্ডলা' (অর্ধেকটা), 'সাথী', 'ষ্ট্রীট-সিংগার', 'ডাক্তার' (বাংলা), 'নর্তকী', 'পহেলা আদমী' (গান ও আবহ সংগীত), 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'দুই পুরুষ', 'বিজয়া' প্রভৃতি। গোড়াতেই বলেছি অর্ধ শতের কাছাকাছি ছবি করেছেন শ্রীযুক্ত বসু, সে কথা ঠিকই। বড়ুয়া সাহেব, দেবকী বসু, বিমল রায়, ফণি মজুমদার প্রভৃতি খ্যাতিমান পরিচালকের সংগে কাজ করেছেন কর্মজীবনের প্রথম থেকেই।

কোন' ছবিতে নয়, ক্যামেরার চোখে দীপ্তির দীপ্তি
—কালীশ মুখোপাধ্যায়

সুদীর্ঘ কুড়ি বছর একটানা একটি প্রতিষ্ঠানে নিজেকে সংযুক্ত করে রেখেছিলেন লোকেন বাবু, '৫১ সালের এপ্রিল মাস থেকে সে সংস্পর্শ আর রইলো না নিউ থিয়েটার্সের সংগে। কয়েক মাস কর্মক্ষেত্র থেকে অবকাশ নিলেন বলা চলে। কিন্তু এ অবসর স্থায়ী হতে দিলেন না ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষ। জোর করেই এঁকে টেনে নিয়ে গেলেন নিউ থিয়েটার্সের পথেরই

শেষ প্রান্তের ইুডিয়োটিতে। এ হোলো ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসের কথা।

গত জুলাই মাসে লোকেন বাবু বিশিষ্ট বন্ধু হিমাংশু মুখার্জি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে বোস-মুখার্জি কোম্পানী গঠন করে এই ক্যালকাটা মুভিটোন পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন। কার্তিক সংখ্যায় ইুডিয়ো-পরিচিতিতে সে কথা আমরা উল্লেখ করেছি।

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সেটা হোলো সার্থক কলা-কুশলীর কৃতজ্ঞতা! নিউ থিয়েটার্স'ই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। প্রতিটি কথার মাঝে থেকে-থেকে উঁকি দেয় পূর্বের কর্মস্থান, তার মানুষজন! এখনো চোখে ভেসে ওঠে অতীতের স্বর্ণ-বিভা, চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসে—ভুলে যান শিল্পী আগন্তুকের উপস্থিতি সম্পূর্ণ ভাবে।

টকির টুকিটাকি

বকুল

আসছে ছায়াচিত্রে! ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর এই নতুন বইটি বসুমতীর এ বছরের পুজো সংখ্যায় পড়েছেন সবাই। এবার নিউ থিয়েটার্স তাকে চিত্ররূপ দিতে তৎপর হয়েছেন। ভোলানাথ মিত্রের পরিচালনায় শীগ্‌গিরই স্যুটিং আরম্ভ হবে বলে প্রকাশ। উপস্থিত শিল্পী-নির্বাচনের দুরূহ কাজ চলেছে।

পরশুরামের

'চিকিৎসা সংকট' ক্যালকাটা সিনে কর্পোরেশনের প্রথম চিত্রার্ঘ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। পরিচালক হচ্ছেন বিনয় সেন। এ ছবির বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল গল্পে শিল্পী যতীন্দ্রনাথ সেন যেমন ছবি এঁকেছিলেন, অভিনয়-শিল্পীর চেহারাও সেই রকম হবে। তারি জন্যে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যস্ত।

বুড়োর বিয়ে

শীগগিরই হবে চিত্র-রূপায়িত। বাঙলা দেশে বিয়েটা খুবই সস্তার, এখন কানা-খোঁড়া, হাবা-কালা, বুড়ো-শুঁড়ো সবারই বিয়ে হয় অতি অবশ্যই! তবে এ বুড়ো হয়তো সে বুড়ো নয়…এই 'বুড়োর বিয়ে' ছবিখানি মহরৎ হয়ে গেছে কিছু দিন আগে। নন্দদুলাল সরকার মশাই উদ্যোক্তা হয়ে বিয়েটা দেবেন, পুরোহিত হচ্ছেন অমলেন্দু বসু।

অবশেষে

নিউ থিয়েটার্সের পতাকাতেই প্রবোধ সান্যালের 'নদ ও নদী' গৃহীত হবে বলে স্থির হয়েছে। পরিচালক চিত্ত বসু ('বিন্দুর ছেলে'-খ্যাত) চিত্রনাট্য রচনা শেষ করেছেন, বাকী শুধু চিত্রগ্রহণ।

রিসেন্ট ফিল্মের পরিবেশনায়

'গোপাল ভাঁড়' হাসির ফোয়ারা নিয়ে অপেক্ষারত। এর পরিচালক হচ্ছেন বিক্রমজিৎ। প্রদর্শন শুরু হবে বিশিষ্ট ছবিঘরগুলিতে অনতিবিলম্বে। এর মধ্যে রিসেন্ট ফিল্ম আর একখানি ছবির পরিবেশন-ভার গ্রহণ করেছেন। সেটি মুভি পিকচার্সের 'বেহুলা'। ফণী বর্মা 'বেহুলা'র চিত্রনাট্যকার।

বিজলী পিকচার্স

তাঁদের প্রথম স্মরণীয় চিত্র-নিবেদন 'সেবা'র প্রারম্ভিক কাজকর্ম বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। 'সেবা'র অন্যতম আকর্ষণ হবে কালোবরণ-প্রদত্ত গান ও আবহ সুর। বিভিন্ন চরিত্রে গুরুদাস, দীপ্তি রায়, শিবশংকর, কবিতা সরকার (রায়) প্রেমতোষ রায়, ও নবাগত সুদর্শন নির্মল ব্যানার্জি প্রভৃতিকে দেখা যাবে।

পথের পাঁচালী

দেখা এবং শোনার বন্দোবস্ত হয়েছে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। স্বর্গত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য রচনাটিকে রূপায়িত করছেন জেনে আমরা নির্মাতা দর্পণ কথাচিত্রকে ধন্যবাদ অর্পণ করছি। একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিও কাম্য।

আর দেরি নেই

রসিক পিক্‌চার্সের প্রথম প্রচেষ্টার মুক্তিলাভে। এঁদের 'ধ্রুব' দর্শক-চিত্ত হরণ করবে—তাও নাকি ধ্রুব! শ্রীমান্ বিভু নাম-ভূমিকায় আর স্বর্গের উর্বশীর চরিত্রে মর্তের উর্বশী ইন্দ্রাণী রহমান (মিস্ ইণ্ডিয়া), সেই সংগে আছে অপরাপর আকর্ষণ…স্বাগত জানাই কর্তৃপক্ষকে।

দিগন্তের ডাক

পি. এস. এস. প্রোডাক্‌শনের মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি। পরিচালনা বেণু দাস, চিত্রনাট্য শান্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। লোটাস ডিষ্ট্রীবিউটার্সের পরিবেশনায় অচিরে বিশিষ্ট চিত্রগৃহে 'দিগন্তের ডাক' শোনা যাবে।

খেলাধুলা

মাসিক বসুমতীর অসংখ্য গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং অনুগ্রাহক-গ্রাহিকার অনুরোধে "খেলাধুলা" বিভাগটি পুনরায় উন্মুক্ত হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, মাসিক বসুমতীতে প্রায় সকল বিভাগই আছে, কেবল মাত্র "খেলাধুলা" নেই। সেই কারণে বিভাগটি প্রবর্তিত হ'ল। আশা করি, মাসিক বসুমতীর পাঠকগোষ্ঠী খেলাধুলা দেখে পরিতৃপ্ত হবেন। —সম্পাদক।
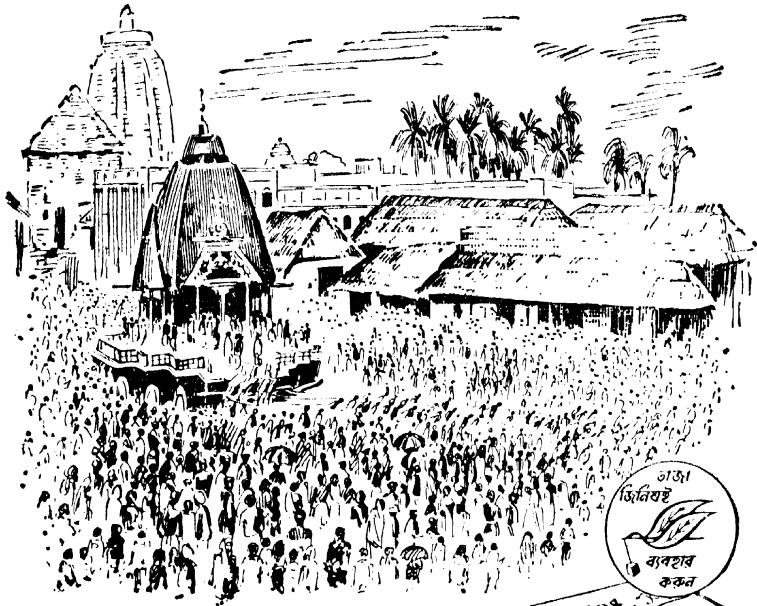
আন্তর্জাতিক

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

১৯৫৩ সাল—
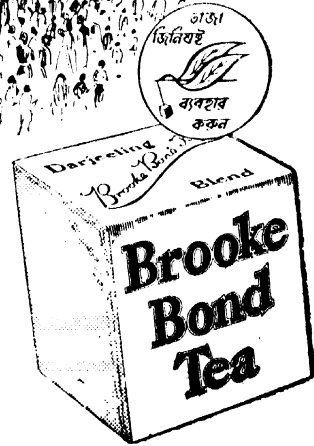
খৃষ্টীয় ১৯৫২ অব্দ বিদায় লইয়াছে। এই বৎসরই তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার যে-গভীর আশঙ্কা জাগিয়াছিল, প্ররোচনার অভাব না থাকা সত্ত্বেও তাহা বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। কিন্তু ১৯৫২ সাল ব্যাপিয়াই কতগুলি দেশে যে যুদ্ধ চলিয়াছে, বহু নর-নারী, বালক-বালিকা, শিশু হতাহত হইয়াছে, কতগুলি দেশে ঠিক যুদ্ধ না চলিলেও সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা-লিপ্সু জনগণের সংগ্রাম চলিয়াছে, চলিয়াছে স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কতগুলি দেশে চলিয়াছে ব্যাপক অশান্তি, সংঘটিত হইয়াছে প্রাসাদ-বিপ্লব, শাসন-ক্ষমতা এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে। কিন্তু অসন্তোষ এবং অশান্তির অবসান হয় নাই। তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কার কাছে এগুলির কিছুই মূল্য দেওয়া হয় না। বরং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ ১৯৫২ সালে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ না হওয়ায় অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন, বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ১৯৫২ সালেই বহু দূর পিছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু নূতন বৎসর ১৯৫৩ সালে ভয়াবহ ভাবী সংগ্রামের আশঙ্কার অনিশ্চয়তা দূর হইবে কি না, এ সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু অনুমান করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ১৯৫২ সালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াইতে পারা গিয়াছে, ১৯৫৩ সালেও এড়াইতে পারা যাইবে কি? শান্তির জন্য যে নানা ভাবে আন্তরিক এবং কৃত্রিম যে-সকল চেষ্টা চলিতেছে ১৯৫৩ সালে তাহার ফল কি দাঁড়াইবে? আশা ও আশঙ্কায় সাধারণ মানুষের চিত্তকে দোদুল্যমান করিয়া রাখিয়াই ১৯৫৩ সাল আরম্ভ হইয়াছে। যে-সকল সমস্যা ১৯৫২ সালের প্রথমে গভীর আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছিল, সমাপ্তির পথে বৎসরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির তীব্রতা সামান্য মাত্রও হ্রাস পাইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তা ছাড়া ১৯৫২ সালেই আরও অনেক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। তবু অনেকের দৃঢ় ধারণা, বহু-আশঙ্কিত তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম নূতন বৎসর ১৯৫৩ সালে আরম্ভ হইবে না, ঠাণ্ডা-যুদ্ধই আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিবে। ভাবী বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কা আরও পিছাইয়া যাইবে কি না, তাহা অবশ্য ১৯৫৩ সালের ঘটনাবলীর গতির উপরেই নির্ভর করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন বৎসরে ঘটনাবলীর গতি যুদ্ধের পথে না শান্তির পথে অগ্রসর হইবে, তাহা যুদ্ধ বাধাইবার ক্ষমতা যাঁহাদের হাতে রহিয়াছে, তাঁহাদেরই উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করিতেছে।

ভাবী যুদ্ধের পরিণতি কি হইবে, সে-সম্বন্ধে ভয়াবহ অনিশ্চয়তার জন্যই ১৯৫২ সালে বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই কি না, এক কথায় তাহার উত্তর দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৫২ সালের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে উহার ইঙ্গিত পাওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে করিবারও কোন কারণ নাই। সমগ্র পৃথিবী দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়াছে, এ কথা সকলেরই স্বীকৃত। একটি শিবির গঠিত হইয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদিগকে লইয়া; ইহাকে গণতান্ত্রিক শিবির বলিয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অভিহিত করিয়া থাকে। যে-সকল দেশ এই শিবিরের প্রভাবাধীন তাহাদের দৃষ্টিতে শুধু সেগুলিই স্বাধীন দেশ। তাহাদিগকে লইয়াই গঠিত হইয়াছে বর্ত্তমানের স্বাধীন বিশ্ব, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পুনঃ পুনঃই এ কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই গণতান্ত্রিক শিবিরের উদ্দেশ্য পৃথিবীর অবশিষ্ট অধীন দেশগুলিকে মুক্ত করিয়া সমগ্র বিশ্বে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় শিবির সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট দেশগুলি লইয়া গঠিত। ওডার-নিশি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের সমস্ত দেশ এই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে এই সকল দেশের জনগণ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাদের উপর চলিতেছে কম্যুনিজমের নির্ম্মম ভাবে নিপীড়ন। শুধু কি তাই? কম্যুনিষ্টরা স্বাধীন পৃথিবীর দেশগুলিকেও তাহাদের অধীনে আনিতে চায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে স্বাধীন পৃথিবীর গণতান্ত্রিক শিবির কম্যুনিজমের প্রসারই শুধু নিরোধ করিতে চায় না, পূর্ব্ব-ইউরোপ ও সুদূর-প্রাচ্যের দেশগুলিকেও কম্যুনিষ্টদের নিপীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন দেশে পরিণত করিতে চায়। গণতান্ত্রিক শিবিরের দৃষ্টিতে ভাবী আক্রমণকারী সোভিয়েট রাশিয়া। এই দুই শিবিরের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ না হইলেও ঠাণ্ডা-যুদ্ধ ব্যাপক ভাবেই চলিতেছে। এই দুইটি শিবিরের মধ্যে গণতান্ত্রিক শিবিরকে পাশ্চাত্য বা পশ্চিমী শিবির বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং কম্যুনিষ্ট শিবিরকে প্রাচ্য শিবির বলা হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই শিবিরের মধ্যে ঠাণ্ডা-যুদ্ধ আদর্শগত সংগ্রাম আখ্যা লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিবির দুইটির মধ্যে এই সংগ্রাম এখনও সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয় নাই কেন? অনেকে মনে করেন, পশ্চিম-ইউরোপে কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধ করা হইয়াছে। এক হিসাবে কথাটা খুবই সত্য। শক্তিশালী দল হইয়াও ফ্রান্সে ও ইটালীতে কম্যুনিষ্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করিতে পারে নাই। বৃটিশ ও মার্কিণ সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া গ্রীক গবর্ণমেণ্ট গৃহযুদ্ধে কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তথাপি উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম-ইউরোপে রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য বিপুল আয়োজন চলিতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিবিরের মধ্যে

চূড়ান্ত সংগ্রাম ইউরোপে হইবে, না এশিয়ায় হইবে, ইহা লইয়াও এক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিম-ইউরোপে কম্যুনিজমের অগ্রগতি যদি নিরুদ্ধ হইয়াও থাকে, এশিয়া সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা কিছুতেই বলা চলে না। বিশাল চীন দেশ কম্যুনিষ্টদের শাসনাধীনে চলিয়া গিয়াছে। জাপান মার্কিণ তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোরিয়ায় চলিয়াছে সশস্ত্র সংগ্রাম দুই বৎসরের অধিককাল ধরিয়া। মালয়ে, ইন্দোচীনে স্বাধীনতা-সংগ্রাম অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিতেছে। সুদূর-প্রাচী এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে এই অবস্থার মধ্যে রাখিয়া ইউরোপ হইতে কম্যুনিজম নিশ্চিহ্ন করিবার সংগ্রাম আরম্ভ করিতে গেলে সমগ্র এশিয়াই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে। কাজেই সুদূর-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াই বর্ত্তমানে প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ দ্বারাই সমগ্র পৃথিবীর ভবিষ্যৎ হইবে নির্দ্ধারিত, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

কোরিয়া যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করিয়া সুদূর-প্রাচ্যে ভাবী বিশ্ব-সংগ্রামের সূচনা করার পথে যে অনেকখানি অসুবিধা আছে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহা ভাল করিয়াই জানে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার তাঁহার এক নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় যখন বলিয়াছিলেন, "If there is a war, let Asians fight Asian." অর্থাৎ যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে এশিয়াবাসীকেই এশিয়াবাসীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তখন এই অসুবিধার প্রতিই তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য এশিয়াবাসীরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিবে কি না, পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শিবির এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারে নাই। তাঁবেদার জাপানকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র করিয়াছে। ফরমোসায় চিয়াং কাইশেকের বাহিনীকেও সুশিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত অঞ্চলে যে কুয়োমিণ্টাং বাহিনী রহিয়াছে, তাহাকেও প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানে গত যুদ্ধের সময় ২০ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছিল, এ কথাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অজানা নয়। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, কম্যুনিষ্ট শিবির এবং পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা ছাড়াও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মধ্যে আরও একটা সংগ্রাম চলিতেছে, ইঙ্গ-মার্কিণ শিবির তাহা স্বীকার না করিলেও উপেক্ষা করিতে অসমর্থ। এই দ্বিতীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগ্রামের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বর্ত্তমান সপ্তম অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি মিঃ প্যালার বলিয়াছেন, "Besides the usual type of East-West struggle which one hears so often, there is another East-West struggle which as reflected in the U. N. threatens no less the stability of the world. In this struggle there are the Western Colonial powers and their friends on one side, and peoples who were Colonial subjects formerly." তিনি অবশ্য টিউনিসিয়া ও মরোক্কোর স্বাধীনতার জন্য আরব-এশিয় ব্লক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যে চেষ্টা করিতেছে, তাহার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু এখনও এশিয়ার ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার সংগ্রাম যে অক্লান্ত ভাবেই চলিবে এ কথাও অনস্বীকার্য্য। এই সংগ্রামে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত এশিয়াবাসীকে এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত করা সম্ভব নয়। ইহাই এখন পর্য্যন্ত কোরিয়া যুদ্ধের সম্প্রসারণের পথে বিপুল বাধা হইয়া রহিয়াছে।

এশিয়ার বিপুল জনশক্তিকে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সৈন্যবাহিনী গঠনে নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও ও অস্ত্রসজ্জিত করিয়া তোলাও অবশ্য বড় সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু ইহাই একমাত্র সমস্যা নয় এবং উহা অপেক্ষাও বৃহত্তর সমস্যা রহিয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, দক্ষিণ-কোরীয় বাহিনী মার্কিণ সমরনায়কদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াও এবং উন্নততর মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াও উত্তর-কোরীয় বাহিনীর মত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না। ইন্দোচীনেও বাও দাইয়ের ভিয়েটনাম বাহিনী হো-চী-মিনের বাহিনীর মত যুদ্ধ-ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছে। ইহার জন্যও অবশ্য কম্যুনিষ্টদের উপরে দোষারোপ করা হইয়াছে। বলা হইয়া থাকে যে, কম্যুনিষ্টরা তাহাদের আন্দোলনকে জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত এমন ভাবে জড়িত করিতে পারে যে, তাহারা কম্যুনিষ্টদের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। কম্যুনিষ্টদের এই প্রচারকার্য্যের প্রতিবিধান করিতে যাইয়া পশ্চিমী গণতান্ত্রিক

শিবির কম্যুনিষ্টদের প্রচারকার্য্য যে একটা বিপুল ধাপ্পা, তাহাই শুধু এশিয়াবাসীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্য দিকে তাহাদের কার্য্যকলাপ এশিয়ার দেশগুলিকে তাহাদের অধীনে রাখিবার কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। ফলে এশিয়ার জনসাধারণ যদি কম্যুনিষ্ট-বিরোধীও হয়, তাহা হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা কম্যুনিষ্ট-শিবিরে যাইয়াই পড়ে। সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে জনৈক আরব সদস্য বলিয়াছিলেন, "We certainly are not in the Soviet camp, but when on various issues it comes to voting, we see ourselves on the same side with the Soviets." অর্থাৎ 'আমরা নিশ্চয়ই সোভিয়েট শিবিরের লোক নই, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে ভোট দিবার সময় আসিলে আমরা আমাদিগকে সোভিয়েটের পক্ষেই দেখিতে পাই।'

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ এশিয়া ও আফ্রিকার নব-জাগরণের স্বরূপটা বুঝিতে পারে নাই, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আর বুঝিলেই বা তাহাদের চলিবে কেন? তাই স্বাধীনতার জন্য যে-কোন প্রচেষ্টাকেই কম্যুনিষ্টদের দ্বারা প্ররোচিত বলিয়া সমস্ত শক্তি দিয়া দমন করিবার চেষ্টা করা হয়। উপনিবেশগুলি দখলে রাখিবার সংগ্রামকে কম্যুনিজম নিরোধের সংগ্রামের রূপ দেওয়া হইতেছে। ফ্রান্স ইন্দোচীনে ছয় বৎসর ধরিয়া হো-চী-মিনের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৫২) এই সংগ্রামের সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ছয় বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, উত্তর-পশ্চিম ইন্দোচীনের থাই অঞ্চলের ৪ হাজার বর্গ-মাইল অঞ্চলের ভিতর দিয়া ভিয়েটমীন বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ফলে ফরাসী ইউনিয়নের বিরাট বাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং বিমান-ঘাঁটি না-সাম রক্ষা করিতেছে। চল্লিশ হাজার ভিয়েটমীন বাহিনী টংকিং-এর অধিত্যকা অঞ্চলে উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের আশঙ্কিত আক্রমণ হইতে টংকিং-এর ধান্য ফসলের অঞ্চল রক্ষার জন্য ফরাসী ইউনিয়নের সৈন্য সতর্কতার সহিত অবস্থান করিতেছে। ভিয়েটমীন বাহিনী লাওসের আউট-পোষ্টগুলির দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ। ভিয়েটমীন বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ দাবী করিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত ইন্দোচীনে আড়াই লক্ষ ফরাসী ও ভিয়েটনাম সৈন্য তাহারা নির্ম্মূল করিয়াছে, এবং গত দুই মাসে তাহারা ১১ হাজার বর্গ-মাইল স্থান দখল করিয়াছে এবং গত শীত ও শরৎকালীন অভিযানে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য ধ্বংস করিয়াছে। তাহাদের এই দাবী অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইন্দোচীনে ফ্রান্স যে অত্যন্ত বে-কায়দায় পড়িয়াছে, তাহা গত ডিসেম্বর (১৯৫২) মাসে প্যারী নগরীতে অনুষ্ঠিত উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি-পরিষদের অধিবেশনে ফ্রান্সের দাবী হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ইন্দোচীনের যুদ্ধে ফ্রান্স আটলান্টিক চুক্তি পরিষদের সাহায্য দাবী করিয়াছে এবং পরিষদও এই দাবী বিবেচনা করিবার আশ্বাস দিয়াছে। কি ভাবে এই সাহায্য দেওয়া হইবে তাহা স্থির করা হয় নাই বটে, কিন্তু ইন্দোচীনের যুদ্ধে ফ্রান্স যে সৈন্য-সাহায্য চায় তাহা কাহারও অজানা নয়। গত জানুয়ারী (১৯৫২) মাসে General Juin ওয়াশিংটনে যাইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সৈন্যসাহায্যই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কোরিয়ায় যুদ্ধ চলিতে থাকা পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সৈন্য দিয়া সাহায্য করা সম্ভব নয়। আটলান্টিক চুক্তি পরিষদ ইন্দোচীনে ফ্রান্সকে সাহায্য করিতে রাজী হওয়ায় ইহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, শুধু সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্যই নয়, ভবিষ্যতে সুদূর-প্রাচ্যে, মধ্য-প্রাচ্যে এবং আফ্রিকায় উপনিবেশগুলি রক্ষা করিবার জন্যও আটলান্টিক চুক্তি প্রয়োগ করা হইবে।

মালয়ের অবস্থারও যে বিশেষ কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। মালয়ের বৃটিশ হাই কমিশনার জেনারেল স্যার জেরাল্ড টেম্পলার অবশ্য ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৫৩) তারিখে এক বিবৃতিতে মালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট আত্মসন্তুষ্ট মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, নিরাপত্তা বাহিনী ও মালয়ের জনগণ মিলিয়া কম্যুনিষ্টদের যথেষ্ট চিন্তার কারণ ঘটাইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সন্ত্রাসবাদীরা এখনও এমন আক্রমণ করিতেছে যাহার আঘাত সত্যই গুরুতর। কবে যে এই যুদ্ধের শেষ হইবে তাহাও তিনি বলিতে পারেন না। কম্যুনিষ্ট গরিলার সংখ্যা পাঁচ হাজারের নীচে কোন সময়ই নামিতেছে না, ইহা অবশ্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহাদের অধিকাংশই হয়ত চীনা, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মালয়ী ও ভারতীয়ের সংখ্যা যত আছে বলিয়া অনুমান করা হয়, তাহাদের সংখ্যা উহা অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া অনেকে মনে করেন। মালয়ে কম্যুনিষ্টদের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ হ্রাস পাওয়াকে জেঃ টেম্পলার নিরাপত্তা বাহিনীর গৌরব বলিয়া দাবী করিলেও কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি পরিবর্ত্তনই যে ইহার কারণ, তাহা অনেকেই এখন স্বীকার করিতেছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির নূতন নির্দ্দেশ দেওয়া ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে। বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকার সিঙ্গাপুরস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, জেঃ টেম্পলারের মালয়ে আসিবার বহু পূর্ব্বে, এমন কি স্যার হেনরী গুরনী নিহত হওয়ারও পূর্ব্বে কম্যুনিষ্টদের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ হ্রাস করিবার পরিকল্পনা গঠন করা হইয়াছে বলিয়া এখন স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং কম্যুনিষ্ট পার্টি যে মালয়ের জরুরী ব্যবস্থাকে অনেকখানি অকেজো করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মালয়ে কম্যুনিষ্টদের নূতন নীতির ফলে যুদ্ধের রূপই বদলাইয়া গিয়াছে। জনগণের অসন্তোষই যেখানে কম্যুনিষ্টদের প্রধান অস্ত্র, সেখানে জেঃ টেম্পলার কি ভাবে 'জনগণের হৃদয় ও মন জয় করিবার সংগ্রাম' পরিচালন করিতেছেন? সামরিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা কোন দিনই সম্ভব হয় নাই।

কম্যুনিষ্ট পার্টি চীনা স্কোয়াটারদের মধ্য হইতে 'রংরুট' সংগ্রহ করিয়া থাকে এই অজুহাতে গ্রামকে গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। তাহাদিগকে লইয়া নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে সন্দেহ নাই এবং তাহাদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য রেডক্রসের নারী কর্ম্মীও আমদানী করা হইয়াছে। গায়ের জোরে নিজের বাড়ী-ঘর ত্যাগ করিতে বাধ্য করাকে কেহই পছন্দ করে না। তা ছাড়া নূতন গ্রামে তাহাদের অবস্থা কয়েদীর মত। গ্রামের চারি দিকে কাঁটা তারের বেড়া আছে, পুলিশ পাহারা আছে। সন্ধ্যার পরে কেহ গ্রামের বাহিরে যাইতে পারে না। সঙ্গে খাদ্য

লইয়া কেহই গ্রামের বাহিরে যাইতে পারে না। এইরূপ সতর্ক পাহারার মধ্যে কয়েদীর মত বাস করিলেও গ্রামের পুরুষদের মধ্যে কখন যে কাহাকে সন্দেহবশে গ্রেফ্‌তার করা হইবে, সে-সম্বন্ধে কোনই নিশ্চয়তা নাই। ইহারই নাম হৃদয়-মন জয়ের সংগ্রাম। দশ-এগার জন লোকের একটি পরিবার যেখানে একটি ছোট কুঁড়ে ঘরে বাস করে, জীবিকার উপায় যেখানে অনিশ্চিত রবরের বাজার-দরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সেখানে কম্যুনিষ্টদের শাসনে তাহারা উহা অপেক্ষা খারাপ অবস্থার মধ্যে বাস করিবে, এ কথা বলিয়া তাহাদের হৃদয়-মন জয় করা যাইবে কি? তাহারা এ কথা বিশ্বাস করিতেই চাহিবে না। কম্যুনিষ্টদের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা হইতেছে, এ কথা বলিলে তাহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিবে কি? তাহারা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহাদিগকে এ কথা বলাও কি অর্থহীন নয়? কম্যুনিষ্টদিগকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলে কম্যুনিষ্টদের গুলীতে তাহাদের মরিতে হইবে, নিরাপত্তা বাহিনী বা গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আবার গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য না করিলে তাহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ডিটেন্‌শন ক্যাম্পে রাখা হইবে। মালয়ের প্রকৃত সমস্যা কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করা নয়। প্রকৃত সমস্যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯৫২) সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটির ১০ হাজার এশিয়াবাসী শ্রমিক মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি এবং উন্নত ধরণের চিকিৎসা-ব্যবস্থার দাবী করিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে। মালয়ের প্রকৃত সমস্যার ইঙ্গিত এইখানেই পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ অবস্থা দেখা গেলেও প্রকৃত অবস্থা যে কি, তাহা জানা যায় না। মাঝে-মাঝে বিদ্রোহীদের আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপের সংবাদ প্রকাশিত হইলেও ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট আশাবাদ পোষণ করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশের এই অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ অবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টের সামরিক কার্য্যকলাপ অপেক্ষা সাদা ঝাণ্ডা কম্যুনিষ্টদের নীতিই অনেকখানি দায়ী বলিয়া মনে হয়। তাহারা নিজেরাই ইচ্ছা করিয়া মান্দালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সরিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্য সুদৃঢ় ঘাঁটি তৈয়ার করাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। এখান হইতে তাহারা যদি ব্রহ্ম গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশের গৃহযুদ্ধ ইন্দোচীনের যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। ভারত ও পাকিস্থানের মত ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনেও শান্তিপূর্ণ অবস্থাই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। কিন্তু জনগণের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান কোন দেশেই হয় নাই।

মধ্য-প্রাচীতে ১৯৫১ সালের শেষে যে-সকল সমস্যা ছিল ১৯৫২ সালে তাহার একটিরও সমাধান হয় নাই, অধিকন্তু উপস্থিত হইয়াছে নূতন পরিস্থিতির। সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণ এবং সুদান সমস্যা লইয়া ইঙ্গ-মিশর বিরোধের কোন মীমাংসাই সম্ভব হয় নাই। এই বিরোধ হইতে উদ্ভূত গত জানুয়ারী (১৯৫২) মাসের হাঙ্গামার পর যে মন্ত্রিত্ব-সঙ্কট সৃষ্টি হয়, তাহারই ক্রমপরিণতিরূপে জুলাই মাসে (১৯৫২) জেঃ নাগীবের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং রাজা ফারুক সিংহাসন ত্যাগ
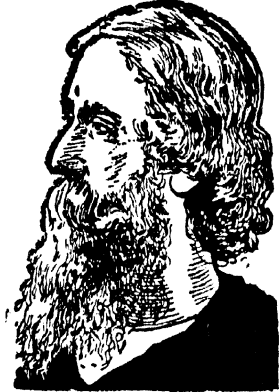
করিতে বাধ্য হন। অবশেষে তিনি নিজেই প্রধান মন্ত্রী হইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। তিনি দুর্নীতি দূর করিবার এবং ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কারের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯২৩ সালের শাসনতন্ত্র পুনরায় প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি একে-একে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের শাসনাধীনে চলিয়া যাইতেছে। সিরিয়া উহার প্রথম পথ-প্রদর্শক। তার পর মিশর। লেবাননেও প্রায় অনুরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে লেবাননের প্রেসিডেণ্ট বেচারী এল খোরী পদত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রধান সেনাপতি শেহাবের হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর গত নবেম্বর মাসে ইরাকেও সামরিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইরাণের তৈল লইয়া ইরাণ ও বৃটিশের মধ্যে কোন মীমাংসাই এ-পর্য্যন্ত হয় নাই। জর্ডানের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই আজকাল আর জানা যায় না। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে রাজা আবদুল্লা নিহত হওয়ার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তালালকে লইয়া এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তালাল ভয়ানক বৃটিশ-বিরোধী। তিনি নাকি একবার তাঁহার পিতার সম্মুখেই গ্লুব পাশার গালে এক চড় বসাইয়াছিলেন। গ্লুব পাশা নামে পরিচিত এই ইংরাজটিই জর্ডানে আরব লিজিয়ন্ গঠন করেন। উহার নেতৃত্ব ছিল তাঁহার হাতেই। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন জর্ডানের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা। তালালকে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। অবশেষে রিজেণ্ট গঠন করিয়া এই সমস্যার একটা সমাধান করা হইয়াছে।

মধ্য-প্রাচীতে বৃটিশ-বিদ্বেষ প্রবল এবং বৃটিশের প্রভাবও ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। ইহার উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করিতেছে মধ্য-প্রাচীতে অনুপ্রবেশ করিতে। মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যার ইহা এক দিক। মধ্য-প্রাচীর শাসকশ্রেণী এবং জনগণের মধ্যে প্রধূমায়িত বিরোধ সমস্যার আর এক দিক। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির জন্যই জনগণ শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারিতেছে না। অবশ্য শাসকশ্রেণীর সহিত সাম্রাজ্যবাদীদেরও একটা বিরোধ রহিয়াছে। উহার জন্যই মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যের কয়েকটি দেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের পক্ষে কতখানি সুবিধা হইয়াছে, তাহা এখনও বলা সহজ নয়। কিন্তু মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থা গঠিত হইলে মধ্য-প্রাচীর উপর ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরের সামরিক আধিপত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

আফ্রিকার দেশগুলিতে অশান্ত অবস্থা ১৯৫২ সালে অধিকতর প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যমূলক আইনগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয় ও কাফ্রীদের চলিতেছে সত্যাগ্রহ। কেনিয়ায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মাউ মাউদের আন্দোলন তীব্র বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সের দমন-নীতি সত্ত্বেও টিউনিশিয়া ও মরোক্কোতে স্বাধীনতার সংগ্রাম দমিত হয় নাই। টিউনিশিয়ার অ-কম্যুনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ফেরাৎ হাসেদ নিহত হওয়ায় শুধু টিউনিশিয়াতেই নহে, মরোক্কোতেও অশান্তি প্রবল হইয়া উঠে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ টিউনিশিয়া ও মরোক্কোকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রশ্নের উপর কোনই গুরুত্ব আরোপ করে নাই। টিউনিশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য আরব-এশীয় রাষ্ট্রসমূহ যে প্রস্তাব উপাপন করিয়াছিল, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। এই প্রস্তাবে টিউনিশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ও টিউনিশিয়ার মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা ও সাহায্য করিবার জন্য একটি শুভেচ্ছা মিশন গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে ১১টি লাটিন আমেরিকান দেশ কর্ত্তৃক আনীত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, টিউনিশিয়াকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়ার জন্য ফ্রান্স ও টিউনিশিয়া আলোচনা চালাইয়া যাইবে। পরিশেষে এই প্রস্তাবে বর্ত্তমান উত্তেজনা-পূর্ণ পরিস্থিতিতে ইন্ধন যোগাইবার মত কোন কিছু না করিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাব দ্বারা টিউনিশিয়া স্বাধীনতা লাভের পথে এক পদও অগ্রসর হইবে না। ফ্রান্স টিউনিশিয়ার শাসন-সংস্কারের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছে অবশেষে বে তাহা দস্তখত করিতে বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতার দাবী তাহাতে পূর্ণ হইবে না।

পশ্চিমী গণতন্ত্র শিবির ১৯৫২ সালে যে-নীতি অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের দাবী দাবাইয়া রাখিয়া সামরিক শক্তি দ্বারা কম্যুনিজম নিরোধের ব্যবস্থা মাত্র। এই নীতির প্রতি আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণের সমর্থন পাওয়া যাইবে, ইহা ভরসা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই নীতির ফলে ১৯৫৩ সালে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে কি না, তাহা নির্ভর করিবে কোরিয়া সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতির উপর। যুদ্ধের আশঙ্কা যদি দূরবর্ত্তী হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও ১৯৫৩ সাল ১৯৫২ সাল অপেক্ষাও সঙ্কটপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। মিঃ আইসেনহাওয়ার ক্ষমতা গ্রহণের পর এই সঙ্কটের স্বরূপ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিবে।

বিশ্বশান্তি ও ষ্ট্যালিন—

'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা মিঃ জেমস রেষ্টনের প্রশ্নের উত্তরে মঃ ষ্ট্যালিন শান্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই হয়ত নূতনত্ব কিছুই দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু শান্তির সমস্যাটাও নূতন নয়। ইহাকে শুধু রুশ প্রচারকার্য্যের পুনরাবৃত্তি বলিয়া উপেক্ষা করা যায় কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান দল জয়লাভ করায় যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া যে একটা ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। রুশ-প্রভাবাধীন দেশগুলিকে রাশিয়ার প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে না পারা পর্য্যন্ত কম্যুনিজম নিরোধ করা সম্ভব নয় বলিয়াই রিপাবলিকান দলের বিশ্বাস। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মঃ ষ্ট্যালিনের উক্তি বিবেচনা করিতে হইবে।

মিঃ জেমস রেষ্টন মঃ ষ্ট্যালিনকে মোট চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, "আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করা যায় না এবং আমাদের এই উভয় দেশই শান্তিতে বাস করিতে পারে।" কিন্তু ইহাও অতি সত্য কথা যে, শান্তিতে বাস করিবার জন্য ঠাণ্ডা-যুদ্ধ বা আন্তর্জ্জাতিক মন-কষাকষির কারণগুলিকে সর্ব্বপ্রথম উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। কোথায় উহাদের মূল, ইহাই রেষ্টনের দ্বিতীয় প্রশ্ন। ষ্ট্যালিন এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, "সর্ব্বত্রই এবং যেখানেই সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে

ঠাণ্ডা-যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ সমূহ প্রকটিত হইতেছে" সেইখানেই আন্তর্জ্জাতিক মন-কষাকষির মূল নিহিত। ঠাণ্ডা-যুদ্ধের মূল উৎস কোথায় তাহা কাহারও অজানা নয় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াই শুধু উহার মূলোচ্ছেদ করিতে পারে। এই জন্যই তৃতীয় প্রশ্নে মিঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ষ্ট্যালিনের আগ্রহ আছে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ষ্ট্যালিনও জানাইয়াছেন যে, এই ধরণের প্রস্তাব তিনি অনুকূল ভাবেই বিবেচনা করিবেন। চতুর্থ প্রশ্নটি কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে। এই প্রশ্নের উত্তরে মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতির জন্য নূতন কোন কূটনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি উহার সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত আছেন এবং ইহাও জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়া যুদ্ধের অবসানই কামনা করে। মঃ ষ্ট্যালিনের এই সকল উত্তরের মধ্যে নূতনত্ব যাঁহারা দেখিতে পান না, তাঁহারা কিরূপ নূতনত্ব প্রত্যাশা করেন তাহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। মিঃ ডুলেস এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া মঃ ষ্ট্যালিনের নিকট হইতে শান্তির জন্য সুস্পষ্ট প্রস্তাব দাবী করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নূতন শাসন-ব্যবস্থায় মিঃ ডুলেস হইবেন রাষ্ট্রসচিব। কাজেই তাঁহার এই দাবীর একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। মিঃ আইসেনহাওয়ার ষ্ট্যালিনের উক্তি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে চাহেন নাই। ইহাকেও তাৎপর্য্যহীন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। 'কম্বেট' পত্রিকা (Combat) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মস্কোর অভিপ্রায় কি তাহা না জানিয়া মিঃ আইসেনহাওয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চান না।

এই বৎসরেই পূর্ব্বে মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন যে, পরস্পর সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা থাকিলে দুই শিবির পাশাপাশি বাস করিতে পারে। ইহারও পূর্ব্বে ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ অনিবার্য্য নয়। কিন্তু শান্তির জন্য মঃ ষ্ট্যালিনের অভিপ্রায়কে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা সন্দেহের চোখে দেখেন কেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ১৯২৫ সালে মঃ ষ্ট্যালিন যখন অন্যান্য সকল দেশের সহিত শান্তিতে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন অনেকে উহাকে রাশিয়ার সামরিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে রাশিয়ার বিপুল সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়ার পর ষ্ট্যালিনের শান্তির অভিপ্রায়ের মধ্যে কেহই আর আন্তরিকতা দেখিতে পান না। ইহার কারণ কি? এই প্রসঙ্গে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে 'নিউইয়র্ক টাইমসে' মিঃ জেমস রেষ্টনের যে-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন, মিঃ ডুলেস ক্রুজার হেলেনায় মিঃ আইসেন-হাওয়ারের সহিত আলোচনা করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত মিঃ রেষ্টনের যে আলাপ হইয়াছিল, তাহার ভিত্তিতেই এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "........the Soviet policy now seems based on the assumption that a general settlement will not be negotiated with the non-Communist world but that a major war may have to be fought." মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাশিয়া

যদি মনে করে যে, একটা বড় রকমের যুদ্ধ এড়ানো আর সম্ভব নয়, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। কারণ, মিঃ আইসেন-হাওয়ার এবং মিঃ ডুলেস উভয়েই নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যের সময় ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাশিয়ার প্রভাবাধীন দেশগুলিকে মুক্ত না করিয়া তাঁহারা ছাড়িবেন না। কিন্তু ইহার জন্য শান্তির প্রতি ষ্ট্যালিনের আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিবার কারণ কি?

মিঃ ডুলেস ষ্ট্যালিনের কাছে শান্তির জন্য সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব দাবী করিয়াছেন। ষ্ট্যালিন কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব দেন নাই বটে, কিন্তু ভিয়েনার শান্তি-কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অবশ্যই বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। উহাকেই রাশিয়ার সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব বলিয়া মনে করিলে দেখা যায়—কোরিয়ায়, ইন্দোচীনে এবং মালয়ে অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি, এই সকল দেশ হইতে এবং জাপান হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ এবং উপনিবেশগুলিতে নির্ম্মিত সামরিক ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিবার সর্ত্তের আলোচনার ভিত্তিতে পঞ্চ শক্তি সম্মেলনের দাবী করা হইয়াছে। ইন্দোচীন ও মালয়ের কথা বাদ দিলেও শুধু কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি হইলেই ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস তো পাইবেই, উহার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইবে। কম্যুনিষ্ট এবং অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলি পাশাপাশি বাস করিলে অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির দুঃস্থ জনগণের মনে অসন্তোষ প্রবল হইয়া ঐ দেশগুলির ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে, এই আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। এই জন্যই ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পায় এমন কিছু করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাজী নহে। কাজেই শান্তি সম্বন্ধে শুধু ষ্ট্যালিনের আন্তরিকতায় সন্দেহ না করিলে চলিবে কেন?

আটলাণ্টিক চুক্তি-পরিষদ—

রাশিয়ার শান্তির জন্য আগ্রহের প্রতি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের যত সন্দেহই থাকুক না কেন, পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের মতভেদ উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি-পরিষদের প্যারী অধিবেশনে বেশ সুস্পষ্ট হইয়াই উঠিয়াছে। এই পরিষদের ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৫২) তারিখের অধিবেশনে জেঃ রীজওয়ের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও লিসবন অধিবেশনে গৃহীত সামরিক শিক্ষা ও ঘাঁটি নির্ম্মাণের ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে। এই ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন। তিনি সংখ্যা অপেক্ষা গুণাগুণের উপরেই বেশী জোর দেন। জেঃ রীজওয়ে খুব দৃঢ় কণ্ঠেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া সশস্ত্র যুদ্ধের পরিবর্ত্তে দীর্ঘস্থায়ী ঠাণ্ডা-যুদ্ধ চায়, মিঃ চার্চ্চিলের এই মতবাদে আশ্বস্ত বোধ করা ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু তাঁহার এই দৃঢ়তা ব্যর্থ হইয়াছে। আটলাণ্টিক চুক্তিবদ্ধ ১৪টি দেশের ৩২ জন মন্ত্রী বিমান-ঘাঁটি এবং অন্যান্য সামরিক নির্ম্মাণ-কার্য্য বাবদ ১৯৫৩ সালের জন্য জেঃ রীজওয়ে ৪২৮ মিলিয়ন ডলার দাবী করিয়াছিলেন, তাহা কাটিয়া অর্দ্ধেক করিয়া দিয়াছেন। লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিঃ ইডেন জেঃ রীজওয়ের সহিত এই মতভেদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আটলাণ্টিক চুক্তি-পরিষদের রক্ষা-ব্যবস্থার ব্যয় হ্রাস করিয়া ঠিক কাজই করা হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ রিপাবলিকান দলের মুখপত্র 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' অস্ত্রসজ্জার পরিকল্পনা সম্পর্কে এই ইঙ্গ-মার্কিণ মতভেদকে "at once depressing and paradoxical" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপেই পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও অত্যধিক সামরিক ব্যয়ের বোঝা বহন করিতে বাধ্য হইতেছে, এ কথা 'দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা পর্য্যন্ত স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। এই বিপুল সামরিক ব্যয়ের জন্যই পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর তাহাদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইতিপূর্ব্বে বৃটিশ সব সময়ই অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে মার্কিণ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। ১৯৫১ সালের শেষ ভাগের তুলনায় ১৯৫২ সালের শেষ ভাগে পশ্চিম-ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামরিক শক্তির অনেক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু 'অর্গেনিজেশন ফর ইউরোপীয়ান ইকনমিক কো-অপারেশনে'র চতুর্থ বার্ষিক রিপোর্টে এ কথা স্বীকার করা হইয়াছে যে, পশ্চিম-ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখনও দৃঢ় হয় নাই এবং সামরিক শক্তির উন্নতি হইলেও উহা এখনও সন্তোষজনক হয় নাই। জেঃ রীজওয়ের কম্যাণ্ডের অধীনে বর্ত্তমানে ২৫ ডিভিশন সৈন্য আছে। তন্মধ্যে ১৮ ডিভিসন সৈন্য জার্ম্মাণীতে রহিয়াছে। আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্গত সৈন্যবাহিনীগুলির অধিকাংশই আধুনিক যুগের যুদ্ধ-পরিচালনের উপযোগী নহে। মার্কিণ সৈন্য ৬ ডিভিশন, বৃটিশ সৈন্য ৪ ডিভিশন এবং কানাডার দুইটি ব্রিগেড বাদ দিলে অন্যান্য বাহিনীর সামরিক দক্ষতা তেমন নয়। গ্রীস ও তুরস্ককে আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাতেও শক্তিবৃদ্ধি কিছুই হয় নাই।

পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য জার্ম্মাণ বাহিনী গঠনের সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। জার্ম্মাণীর ঐক্য সমস্যারও কোন কূল-কিনারা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ইহার উপর মার্শাল টিটোকে লইয়াও সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। চার্চ্চের সম্পত্তিগুলি কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের ব্যাপারে যুগোশ্লাভিয়ার সহিত ভেটিকানের মতভেদ ঘটিয়াছে। ১৯৪৬ সালে যুগোশ্লাভ কোর্ট কর্ত্তৃক ১৬ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত আর্চবিশপ আলবিসিয়াস ষ্টেপিনাককে মার্শাল টিটো পাঁচ বৎসর পর পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু ভেটিকান তাঁহাকে কার্ডিনাল পদে উন্নীত করার প্রতিবাদে মাঃ টিটো ভেটিকানের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। ত্রিয়েস্তে সম্পর্কে ইটালীর নীতিরও তিনি কঠোর সমালোচনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। টিটো যত দিন পুরাপুরি ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরে যোগদান করেন নাই, তত দিন তাঁহাকে তোয়াজ করিবার প্রয়োজন ছিল। কারণ, তত দিন পশ্চিম-ইউরোপেরই তাঁহাকে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আজ তাঁহারই ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরকে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা। রাজনৈতিক অদৃষ্টের এমনি নিদারুণ পরিহাস যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখনও তাঁহাকে কম্যুনিষ্ট বলিয়াই মনে করে, আর কম্যুনিষ্ট দেশগুলি তাঁহাকে বলে ফ্যাসিষ্ট।

কোরিয়া যুদ্ধের ভবিষ্যৎ—

নূতন বৎসর ১৯৫৩ সালের প্রারম্ভেই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল আমেরিকায় যাইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নব-নির্ব্বাচিত

প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত দেখা করিয়াছেন। গত বৎসরও প্রায় এই রকম সময়েই তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার একরূপ বার্ষিক তীর্থযাত্রার মতই হইতে চলিল। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মিঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত তাঁহার কি কি বিষয় আলোচনা হইয়াছে তাহার সত্যিকার খবর কিছুই অবশ্য আমরা জানিতে পারিব না। কিন্তু আর কয়েক দিন পরেই যিনি চারি বৎসরের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন, পৃথিবীর সমস্ত অ-কম্যুনিষ্ট দেশ যাঁহার অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত হইবে, ভাবী বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হওয়া না হওয়া যাঁহার কোরিয়া নীতির উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করিবে, সাম্রাজ্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমেরিকায় ছুটিয়া কেন যাইবেন না? অতঃপর তাঁহার কুখ্যাত ফুল্টনের বক্তৃতার মত কোন বক্তৃতা তিনি দিবেন কি না, তাহা বলা কঠিন। হয়ত উহার প্রয়োজনও আর হইবে না। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে মিঃ আইসেনহাওয়ারের নীতি তিনি না মানিয়া চলিতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায়।

কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হইবে সে-সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল মিঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত কোন আলোচনাই করেন নাই, এ কথা বলা অসম্ভব। কোরিয়া সম্পর্কে মিঃ আইসেনহাওয়ার কি নীতি গ্রহণ করিবেন তাহা ইতিমধ্যেই স্থির করা হইয়াছে কি না, তাহাও বলা কঠিন। কিন্তু কোরিয়া সমস্যাই যে আজ প্রধান সমস্যা, উহার উপরেই যে পৃথিবীর শান্তি বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোরিয়া সম্পর্কে মিঃ আইসেনহাওয়ার কি নীতি গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির না হইলেও, কি কি নীতি তিনি গ্রহণ করিতে পারেন তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে জেঃ ম্যাকআর্থারের গর্ব্বপূর্ণ দাবীর কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত ৫ই ডিসেম্বর (১৯৫২) এক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, "কোরিয়া যুদ্ধের সমাধানের জন্য সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট পথ যে রহিয়াছে সে সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।" তাঁহার এই উক্তিতে মিঃ আইসেনহাওয়ার সাড়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। জেঃ ম্যাকআর্থারের পন্থার পরিচয় পূর্ব্বেই আমরা পাইয়াছি। উহা ছাড়া আর নূতন কি থাকিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন। আর কেনই বা সেই পন্থার কথা তিনি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে জানান নাই?

কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য হতাহত হইয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার একটি সৈন্যও নষ্ট হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, রাশিয়াকে এই যুদ্ধে নামানো সম্ভব হয় নাই। রাশিয়া নামিলেই কোরিয়া যুদ্ধই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবে। বর্ত্তমানে কোরিয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে পরিমাণ সৈন্য আছে তাহা দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সামরিক অচল অবস্থা শুধু বজায় রাখা সম্ভব। দ্বিতীয় পথ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করা। ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিতে গেলে বাচ্ছা পরমাণু বোমা ব্যবহারের প্রশ্ন ছাড়াও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি, এবং চীনের উপকূল অবরোধ এবং মাঞ্চুরিয়ায় চীনের সামরিক ঘাটিতে বোমা বর্ষণ করার প্রশ্ন উঠিবে। সৈন্য পাওয়া যাইবে কোথায়? পশ্চিমী শক্তিবর্গকে যদি আরও সৈন্য কোরিয়ায় পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে ইউরোপের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? জাপ সৈন্য ব্যবহারে প্রেসিডেণ্ট সিংম্যান রীর ঘোরতর আপত্তি আছে। অক্ষমের এই আপত্তির অবশ্য কোন মূল্য নাই। জাতীয়তাবাদী চীনা সৈন্যও অবশ্য পাওয়া যাইতে পারে। গত ২২শে ডিসেম্বর (১৯৫২) চিয়াং কাইশেক ঘোষণা করিয়াছেন যে, চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি ১৯৫৩ সালেই শেষ হইবে। সুতরাং ১৯৫৩ সালে কোরিয়ায় ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করা হইবে কি না, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ব্যাপক আক্রমণটা যে শেষ পর্য্যন্ত চীন আক্রমণে পর্য্যবসিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা পরিণামে কি তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামই আরম্ভ হইবে না?

কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই অতঃপর কোরিয়া যুদ্ধের তীব্রতা কি ভাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার পরিণাম কি হইবে, তাহা যেমন ভাবিবার বিষয়, তেমনি কম্যুনিষ্ট যুদ্ধ-বন্দীদিগকে ব্যাপক ভাবে হত্যা করার যে-অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে, এশিয়ার সাধারণ মানুষ তাহা উপেক্ষা করিতে পারে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ২২শে ডিসেম্বর (১৯৫২) সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ গ্রোমিকো এই অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, ১৯৫১ সালের মে মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৪০০ জন চীনা ও কোরীয় কম্যুনিষ্ট বন্দীকে পরমাণু-সংক্রান্ত পরীক্ষায় গিনিপিগরূপে ব্যবহার করিবার জন্য আমেরিকায় প্রেরণ করে। ১৮ জন বন্দীর চক্ষু উৎপাটন করা হয় এবং মার্কিণ সৈন্যদের অগ্নিনিক্ষেপের পরীক্ষায় (flame-thrower experiments) ৮০০ জন বন্দীকে আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করা হইয়াছে। তাছাড়া পোংগাম দ্বীপে মার্কিণ প্রহরীরা ৮০ জন চীনা ও কোরীয় যুদ্ধ-বন্দীকে হত্যা এবং ১২০ জনকে আহত করিয়াছে। কম্যুনিজম নিরোধের উপায় হিসাবে কম্যুনিষ্ট বন্দীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্যই এই নীতি গৃহীত হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? কোজে দ্বীপে, চেজু দ্বীপে ও পুষানেও কম্যুনিষ্ট বন্দীদিগকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহার উপর উত্তর-কোরিয়ায় এবং চীনের কতক অংশে জীবাণু-যুদ্ধও চালানো হইয়াছে।

এশীয় সমাজতন্ত্রী সম্মেলন—

এশীয় সমাজতন্ত্রীদের যে সম্মেলন ৬ই জানুয়ারী (১৯৫৩) ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনের সিটি হলে আরম্ভ হয়, এশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদীদের ইহাই প্রথম সম্মেলন। ব্রহ্মদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইজরাইল, জাপান, মালয়, পাকিস্তান লেবানন এবং মিশর এই কয়েকটি দেশ এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে। সোশ্যালিষ্ট ইণ্টারনেশন্যালের পক্ষ হইতে প্রাক্তন বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রী মিঃ এটলী, ফ্রান্সের আঁদ্রে বিদে এবং সুইডেনের মিঃ কাজ রজোর উপস্থিত হইয়াছেন। ইরাক এবং সিরিয়ার সমাজতন্ত্রী দল কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করে নাই। টিউনিসিয়ার নিও দস্তর পার্টি পর্য্যবেক্ষক প্রেরণ করিয়াছে। নাইজেরিয়া ও আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদী দল অর্থাভাবে এই সম্মেলনে যোগদান করিতে পারে নাই।

এই সম্মেলন আহূত হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে

সর্ব্বপ্রথম লণ্ডনে 'International Workingmen's Association বা আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘ গঠিত হয়। ইহাই প্রথম আন্তর্জ্জাতিক বা ফার্ষ্ট ইণ্টারনেশন্যাল নামে খ্যাত। প্রথম আন্তর্জ্জাতিক গঠিত হইবার পর হইতেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। প্যারী কমিউনের পতনের পর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এক প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। মার্কসপন্থী এবং নৈরাষ্ট্রবাদীদের মধ্যে টানাটানির ফলে প্রথম আন্তর্জ্জাতিক খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল। আন্তর্জ্জাতিকের পুন:প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৯ সালে। উহাই দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক নামে খ্যাত। কিন্তু চারি বৎসরব্যাপী প্রথম বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের সমাধি রচিত হয় বলিলে ভুল হয় না, যদিও ১৯১৯ সালে উহাকে পুন: প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঐ বৎসরের মার্চ্চ মাসে মস্কো সহরে প্রথম আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী সম্মেলনের (First Congress of the Communist International) অধিবেশন হয়। উহাই তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক নামে অভিহিত হয় এবং উহা কমিণ্টার্ণ নামে খ্যাতিলাভ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফ্যাসিজমের অগ্রগতি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সূচিত হয় এরূপ কর্ম্মপদ্ধতি বর্জ্জন। অর্থাৎ ফ্যাসিজমের সহিত গণতন্ত্রের সংগ্রাম নিষ্পত্তি হওয়ার সাপেক্ষে সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্ম্মপদ্ধতি মুলতুবী রাখেন। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রথম চেষ্টা হয় ১৯৪৮ সালে। ঐ বৎসর আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রীদের এক সম্মেলন (Comisco) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার খবর আর পাওয়া যায় নাই। অত:পর ১৯৫১ সালের মার্চ্চ মাসে লণ্ডনে পৃথিবীর ২১টি সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যগণ মিলিত হইয়া নূতন সোশ্যালিষ্ট ইণ্টারনেশন্যাল বা সমাজতন্ত্রী আন্তর্জ্জাতিকের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাকে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের উত্তরাধিকারী বলিয়া অভিহিত করাও হইয়া থাকে। অত:পর ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রুসালসে অনুষ্ঠিত সোশ্যালিষ্ট ইণ্টারনেশন্যালের অধিবেশনে সুদূর-প্রাচ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদের অভিযান আরম্ভ করিবার পরিকল্পনা করা হয় এবং আন্তর্জ্জাতিকের সাধারণ পরিষদ (General Council) স্থির করেন যে, সুদূর-প্রাচ্যে সমাজতন্ত্রী দলগুলির আঞ্চলিক ফেডারেশন গঠন করাই গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত এশীয় সমাজতন্ত্রী সম্মেলনের প্রেরণা এইখান হইতেই আসিয়াছে সন্দেহ নাই। ১৯৫২ সালের মার্চ্চ মাসে ভারত, ব্রহ্মদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিনিধিগণ রেঙ্গুনে এক প্রস্তুতি সম্মেলনে সমবেত হইয়া এশীয় সমাজতন্ত্রী সম্মেলন আহ্বান করা স্থির করেন। তদনুযায়ী রেঙ্গুনে এশীয় সমাজতন্ত্রী সম্মেলনের এই অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হওয়ার পূর্ব্বেই হয়ত এই অধিবেশন সমাপ্ত হইবে। এখানে এই সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ আমাদের হইবে না। কিন্তু এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সম্মেলনের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সমাজতন্ত্রের নীতি ও উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ, এশিয়ায় এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন, এশীয় সমাজতন্ত্রী সম্মেলনের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন, এশিয়ার জন্য কৃষি-সংক্রান্ত নীতি নির্দ্ধারণ, এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এশিয়ার সাধারণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা, উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রধান-প্রধান বিষয়। উদ্দেশ্যগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ, নীতি, কর্ম্মপন্থা ও কর্ম্মকৌশল কি হইবে, তাহারই উপরে সমাজতন্ত্রবাদের সাফল্য নির্ভর করিবে। সমাজতন্ত্রবাদ বা সোশ্যালিজম কথাটা প্রথম ব্যবহৃত হয় উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রবার্ট ষাওয়েনের মতবাদকে বুঝাইবার জন্য। কম্যুনিজম শব্দ দ্বারা প্রথমে উত্তর-ফরাসী বিপ্লবের সমাজতন্ত্রবাদী যোসেফ ব্যাবুফের অনুবর্ত্তিগণের মতবাদকেই বুঝাইত। কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসএর 'ম্যানিফেষ্টো অব্‌ দি কম্যুনিষ্ট পার্টি' প্রকাশিত হইবার পর সমাজতন্ত্রবাদ বৈজ্ঞানিক রূপ গ্রহণ করে এবং তাঁহাদের মতবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা কম্যুনিজম আখ্যা লাভ করিয়াছে। প্রাকমার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের সহিত মার্কসের মতবাদের ছিল মূলনীতিগত মৌলিক পার্থক্য। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদের উপর মার্কসের প্রভাব বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বৃটিশ সমাজতন্ত্রবাদের উপর উহার কোনই প্রভাব প্রভাবিত হইতে পারে নাই। ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বামপন্থী মনোভাবই বৃটিশ সমাজতন্ত্রের সম্বল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রীরা নিজদিগকে মার্কসপন্থী বলিয়া দাবী করিলেও তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। তথাপি প্রথম বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্টগণ ও সমাজতন্ত্রিগণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একযোগে কাজ করিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে আসিল রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব। এই সময় হইতেই সমাজতন্ত্রবাদ ও কম্যুনিজমের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে মৌলিক ব্যবধান। এখানে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। এশীয় সমাজতন্ত্রী সম্মেলন শেষ হওয়ার পর সমাজতন্ত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের রহিল।

লোকসেবক

"পম্পাতীরে মৎস্য-শিকারান্বেষী বকের নিঃশব্দ নিরীহ গতি দর্শনে সরলচিত্ত রামচন্দ্র মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন :—

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ
প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং
বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ।

ভাবার্থ—দেখ লক্ষ্মণ, পম্পাতীরে পরম ধার্মিক বক পায়ের চাপে প্রাণিবধ আশঙ্কায় ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে।

বক-চরিত্রজ্ঞ লক্ষ্মণ অগ্রজকে প্রকৃত তথ্য অবগত করাইয়া বলিলেন :—

ন জানাসি রাঘব ত্বং
বকঃ পরমদারুণঃ।
নির্জীবভক্ষকো গৃধ্রঃ
সজীবভক্ষকো বকঃ।

ভাবার্থ—হে রাঘব, তুমি জান না, বক পরম দারুণ জীব। গৃধ্র (শকুনি) মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে, কিন্তু এই বক জীবন্ত প্রাণী ধরিয়া খায়।

পম্পাতীরে না হইলেও পম্প-বহুল (Pomp—জাঁকজমক) এই কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপর সেবকের ছদ্মবেশে যে বক পরোক্ষে বহুনীতি বধের মূলীভূত কারণ বলিয়া বিখ্যাত, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র এক প্রশ্নের জবাবে সে বকত্বের অহঙ্কার সাত তারের ঝঙ্কারে ঘোষিত হইয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সে বকের তিনখানি মোটর গাড়ী এবং দুর্নীতির চতুরঙ্গ চালে চৌরঙ্গীতে অট্টালিকা সংগ্রহের ধ্বনি সরগ্রামের সা রে গা নিনাদে সাত তার ঘোষণা করিয়াছে—"সারেগা। সারেগা" অর্থাৎ এ কলঙ্ক সব সেরে যাবে। কিংবা ইহাও হইতে পারে যে, এমনি করে সে বক সারেগা (রাষ্ট্রভাব'র), অর্থাৎ সব নাশ করিবে। অনেকে বলে সে বক কানা। তাতে কি যায়-আসে? মানময়ী রাধা একদিন কৃষ্ণের কাল বর্ণ বর্জন করিতে চাওয়ায় সখীগণ বলেছিলেন—স্থা লো, যদি কালো সবই ত্যাগ করবি, তবে তোর নয়নের তারাও যে কালো, কানা হবি যে? শ্রীমতী তখন বলে উঠেছিলেন—আমার কানাই ভাল সখি, কানাই ভাল। ব্রজরাখালগণ কৃষ্ণকে কানাই বলিয়া ডাকিত। শ্রীমতী এ ক্ষেত্রে কানাই ভাল বলিয়া পরোক্ষে কৃষ্ণের প্রশংসাই করিলেন। কানা সে বক নানা স্থানে এমনি নিন্দাচ্ছলে স্তুতি এবং স্তুতিচ্ছলে নিন্দা উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। কানা সে বককে লইয়া সারা দেশময় অনেক কানাকানি (আলোচনা) চলিতেছে। আজ মাত্র দুই-একটি উল্লেখ করিতেছি। সময় বুঝিয়া কানা চোখের সুবিধাও অনেক পাওয়া যায়। একদিন চৌরঙ্গীর এক বিখ্যাত সিনেমায় আর একজনকে সঙ্গে লইয়া টিকিট কিনিবার সময় কানা দেড়খানা টিকিট চাহিতেই টিকিট-বিক্রেতা বলিয়া উঠিল, 'আধখানা টিকিট বিক্রয় হয় না।' তখন কানা চশমা খুলিয়া কানা-চোখ দেখাইয়া বলিল, 'আমি তো এক চোখে দেখিব, আধা দাম দিব।' সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "যে চোখটি ভাল আছে, সেটিতেও কেবল আভা দেখেন মাত্র, সম্পূর্ণ নজর হয় না। সিনেমার ম্যানেজার যখন শুনিলেন সে বক, তখন দেড়খানা টিকিটও কিনিতে হইল না। মুফৎ সিনেমা দেখা হইল। একদিন সে বক এক পল্লীগ্রামে পাঠশালার পাশ দিয়া চলিতেছে—ছেলেরা তখন সুর করিয়া সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া ধারাপাত পড়িতে পড়িতে যেই বলিয়া উঠিল—চার পণে এক চোক, সে বক মনে করিল বালকেরা তাহাকেই ব্যঙ্গ করিতেছে। পাঠশালার গুরু মহাশয়কে ডাকিয়া বলিল, জানো আমি কে? পরিচয় পাইয়া গুরু মহাশয় করযোড়ে ক্ষমা চাহিয়া তবে নিস্তার পাইলেন। নচেৎ পাঠশালার মাসিক সাড়ে তিন টাকা সাহায্য গিয়াছিল আর কি! মানময়ী শ্রীমতীর মত সারা পশ্চিমবঙ্গের লোককে বলিতে হইবে, মোদের কানাই ভাল গো!"

—দৈনিক বসুমতী।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গলদ কোথায়?

"পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে সর্বাধিক। দেশে বর্তমানে শুধু খাদ্য-শস্যে নহে, পাট-কার্পাস প্রভৃতি কাঁচা মালেরও অভাব। এ জন্য কৃষির উপর জোর অতি অবশ্যই দিতে

হইবে। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃক শিল্পের ধ্বংস সাধনের ফলে কৃষির উপর যে অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে, সে চাপের অপসারণ না হইলে কৃষির উন্নতি সাধন খুবই কঠিন। এ জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষি ও শিল্পের উপর সমান জোর দেওয়া। পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট পড়িয়া মনে হয়, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী গত পাঁচ বৎসরব্যাপী শিল্পপতিদের বহু অপকর্ম সত্ত্বেও তাহাদের উপর গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস অটুটই রহিয়াছে। শিল্পপতিদের দ্বারা কোনও দেশের শিল্পের উন্নতি সাধন সম্ভব নহে। শিল্পের উন্নতি একমাত্র সরকার দ্বারাই সম্ভব। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের উন্নতির যে সামান্য আভাষ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কার্যে রূপায়ণ শিল্পপতিদের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় এই সামান্য আভাষ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। এ দেশকে পাকাপোক্ত ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিল্পবিকাশে অগ্রাধিকার দান সম্বন্ধে রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। কোন পরিকল্পনাই জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত সাফল্য লাভ করিতে পারে না। পরিকল্পনা কমিশনও এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া দেশের জনগণের নিকট সহযোগিতার আবেদন জানাইয়াছেন। কিন্তু এই পরিকল্পনায় নিজেদের মঙ্গলের সুস্পষ্ট সন্ধান পায় নাই বলিয়া ইহা গণ-প্রাণে কোনরূপ সাড়া জাগাইতে পারে নাই।" —লোকসেবক।

ন্যায়পরায়ণ

"বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেসনে ভাইস চ্যান্সেলার শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহার প্রভু ও মুরুব্বী ডাঃ বিধান রায়। শম্ভুনাথের পিতৃদেবও যদি আসামী হইয়া তাঁহার আদালতে আসিতেন তাহা হইলে পিতাকেও ফাঁসি দিতে নাকি পুত্র দ্বিধা করিতেন না, পরে হয়ত আত্মহত্যা করিতেন। শম্ভুনাথের ন্যায়পরায়ণতা আমরাও স্বীকার করি। পিতা স্কুলে তাঁর বয়স লিখাইয়াছিলেন, তিনি কোর্টে হলফ করিয়া সাক্ষী রাখিয়া পিতাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে কীর্ত্তিনাশ মৃত্যুতুল্য। ফাঁসি তবে হইয়া গিয়াছে বুঝিলাম, কিন্তু আত্মহত্যাটা হইল কোথায়? সেল-ট্যাক্স টি বিউনালে?" —যুগবাণী।

মর্য্যাদা

চাণ্ডিলে অসুস্থ আচার্য্য বিনোবা ভাবেকে দেখিবার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঐ দিন বিমানযোগে জামসেদপুরে আসেন ও বিমানঘাঁটি হইতে মোটরযোগে চাণ্ডিলে গমন করেন। রাষ্ট্রপতিকে সামরিক কায়দায় সেলাম দিবার জন্য রাঁচী হইতে এক দল বিশেষ সৈন্যকে আনা হয়। সর্ব্বসাকুল্যে দুই কি আড়াই মিনিটের অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় ত্রিশ জন সৈন্যকে ভাড়া ও রাহা-খরচ দিয়া জামসেদপুরে আনা ও তাহাদের বিমানঘাঁটিতে লইয়া যাওয়া ও লইয়া আসার জন্য পেট্রোল পোড়ান যে নিতান্তই বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ, এ কথা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে। অতঃপর রাষ্ট্রপতির মর্য্যাদা ও নিরাপত্তার জন্য জামসেদপুর হইতে চাণ্ডিল পর্য্যন্ত প্রায় ২২ মাইল রাস্তার দুই দিকে সামান্য ব্যবধানে এক-এক জন সশস্ত্র পুলিশ দাঁড় করান হয়। এই সকল হতভাগ্য পুলিশকে সকাল ৮টার মধ্যে নিজ নিজ যায়গায় হাজির হইবার জন্য ভোর চারটার মধ্যে উঠিয়া এক রকম সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহাদের সদর কেন্দ্রে হাজির হইতে হয়। সারা দিন ঠায় দাঁড়াইয়া তাহাদের কাটিয়া গেল। বৈকাল ৪টায় রাষ্ট্রপতি চলিয়া গেলে তাহাদের অবকাশ হইল। সারা দিন অস্নাত এবং অভুক্ত অবস্থায় এই সিপাহী আখ্যাধারী শত শত ব্যক্তিকে জেব্বা-জোব্বা পরিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অপরিসীম বিরক্তি ও যন্ত্রণায় এই সকল হতভাগ্যের অনেকে যে রাষ্ট্রপতি হইতে সুরু করিয়া কংগ্রেসী সরকার প্রত্যেকের মুণ্ডপাত করিয়াছে, ইহা আমাদের অনেকে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন। এই সকল নিরাপত্তা পুলিশ এবং আরও অর্দ্ধ শত সাদা পোষাকধারী পুলিশের জন্য দেশের যে কয় সহস্র মুদ্রা খরচ হইল, তাহাও ভাবিবার কথা।" —নবজাগরণ।

"মড়ার দেশে মরাই ভালো, বাঁচাই মহাপাপ"

—নজরুল।

"তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠনের এবং তৎসহ অন্যান্য এক-ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া ভাষার ভিত্তিতে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত হইলেও মহাত্মাজী, সর্দ্দার প্যাটেল, সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের তিরোভাবের পর বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক কংগ্রেসী সরকারের মুখ্য ব্যক্তিগণ মুখ-চাওয়াচায়ি করিয়া, স্থানবিশেষে ব্যক্তিগত খাতির করিয়াও এই অবশ্যকর্ত্তব্য ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনে সযত্নকৃত বিরতি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়া গড়িমসি করিতেছিলেন। তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া অন্ধ্র রাজ্য গঠনের দাবিতে মহাপ্রাণ অন্ধ্রনেতা শ্রীপত্তি রামুলু "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" এই পণ করিয়া ৫৮ দিন অনশনের পর নশ্বর মানবদেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার মহৎ আত্মার অবিনশ্বরত্বের গুরুত্বের প্রমাণ জগৎবাসীর নিকট রাখিয়া গেলেন। একদিন নয়, দু'দিন নয়, দীর্ঘ ৫৮ দিন অর্থাৎ ২ দিন কম দুই মাস কালের মধ্যে কর্ত্তাদের টনক নড়িল না। এই সঙ্গত দাবির জন্য অনশন আরম্ভ করার পরই যদি ভারতের শাসকবর্গ এ বিষয়ে তৎপর হইতেন, তাহা হইলে শ্রীপত্তি রামুলুর মত একটি মহাপ্রাণকে তিলে তিলে প্রাণদান করিতে হইত না। তাঁহার এই অনশন-মৃত্যুতে মাদ্রাজের এগারটি তেলেগু ভাষাভাষী জেলায় প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিবার সুযোগ উপস্থিত হইত না। পুলিশের গুলী চালাইয়া দশ জনের জীবনাস্ত এবং বহু লোককে আহত করিবার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইত না। রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীলালবিহারী শাস্ত্রীর লোকসভায় কথিত অশান্তির ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইত না। কংগ্রেসী শাসকবর্গ আজ তেলেগু ভাষাভাষী এগারটি জেলা লইয়া অন্ধ্র রাজ্য গঠন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইংরেজ কর্ত্তৃক বাঙলার চোরাই অঞ্চলগুলি, যাহা আজও বাঙলাভাষী, বিহারের সামিল থাকিতে বাধ্য হইয়া, নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছে, নানা আন্দোলন সত্ত্বেও ভারত সরকার গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। বাঙলার অমর মহাপ্রাণ ৺যতীন দাস শ্রীপত্তি রামুলুর বহু পূর্ব্বে সন্নিমিত্তে এই প্রকার মরণ বরণ করিয়া আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।" —জঙ্গিপুর সংবাদ।

কথার কথা?

"আমাদের গবর্ণমেণ্ট সর্বদা বলিয়া থাকেন সরকারী কর্মচারীরা যদি দুর্নীতির আশ্রয় নেয়, তাহা হইলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত

করাইবার জন্য। কিন্তু অবহিত করাইয়া যদি কোনও প্রতিকার না পাওয়া যায় তবে কোথায় উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে হইবে তাহা আমরা জানিতে পারি কি? নগাওএর R. R. O.র বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কোনও প্রতিকার করা হইয়াছে কি?" —পূরবী।

ছিল না শুধু

"কাশিমবাজারে রাসের মেলায় সং ছিল রং-বেরঙের। পাশাপাশি সাজানো ছিল সেকাল ও একাল, সেকালের মেয়ে ও একালের মেয়ে, সেকালের বিয়ে ও একালের বিয়ে, সেকালের সংসার ও একালের সংসার। ছিল না শুধু সেকালের রামরাজ্য ও একালের রামরাজ্য।" —মুর্শিদাবাদ সমাচার।

মাদ্রাজে ফাটল

"মাদ্রাজে সংযুক্ত গণতান্ত্রিক দলে ফাটল ধরিয়াছে। ইহাতে যাঁহারা উৎসাহিত বোধ করিতেছেন রাজাগোপালাচারীর সতর্কবাণী তাঁহাদিগকে সাবধান করিবে বলিয়াই আশা করি। রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন—এ ফাটল উপরের ফাটল; গভীর গোপনে মিল ঠিকই আছে; সে মিল হইল সরকারকে উচ্ছেদ করিবার জন্য একতার বন্ধন।···ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য যাহারা একতাবদ্ধ তাহাদের উৎসাহ ও একাগ্রতা সচরাচর খুবই উগ্র হইয়া থাকে। যাঁহাদের উপর রচনাত্মক কাজের ভার তাঁহারা যদি সদাসর্বদা এ কথা না মনে রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে বেশী দূর অগ্রসর হওয়াই কঠিন। মুখ্যমন্ত্রী রাজাগোপাল একথা মনে রাখিতে পারেন বলিয়াই সমস্যাসংকুল মাদ্রাজ তাঁহার নেতৃত্বে আজও কংগ্রেস-শাসিত। (পশ্চিমবঙ্গে ঘটনার স্রোত উল্টা মুখে বহিতে সুরু করিয়াছে বলিয়াই এ কথা বিশেষ করিয়া বলা)।" —নিশানা।

ইংরাজী ভাষা

"সম্প্রতি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয়দিগের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আন্তর্জ্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরাজী ভাষার গুরুত্ব কোন প্রকারে হ্রাস করা উচিত হইবে না। চীন, জাপান ও রাশিয়ার মত দেশ ইংরাজী ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছে এবং রাশিয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে অবশ্য শিক্ষণীয় দ্বিতীয় ভাষারূপে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়।" বলা বাহুল্য, আমরা ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের এই মত সমর্থন করি। আমাদিগের রাষ্ট্রভাষা এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষা সমৃদ্ধ, পুষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক আলোচনার ও ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাহকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠুক, ইহাই আমারা চাহি। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ইংরাজী ভাষাকে "কুইট্ ইণ্ডিয়া" (Quit India) করাইবার পক্ষপাতী আমরা নহি। আজই যাঁহারা ইংরাজী ভাষাকে সরাসরি আসর ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন তাঁহাদিগকে উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।"

—হিন্দুবাণী।

ডাকঘর

"কাঁথি ডাকঘরে এখনও কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে যেমন কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় খাম পোষ্টকার্ড ইত্যাদি পাওয়া যায় না। উহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন sectionএ দেওয়া হয় ব্যবস্থা দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়, খাম পোষ্টকার্ড বিক্রয় করা যেন ডাকঘরের একটা অনাবশ্যক কর্ম্ম। কারণ, যখন যে departmentএ খাম পোষ্টকার্ড দেওয়া হয় তখন তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিয়া অযথা সময় নষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। কারণ, হাতের কাজ শেষ না হইলে তাঁহারা মুখের দিকে তাকাইতে পারেন না। এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টির প্রতি আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ সুনজর দিয়া নিজেদের ও জনসাধারণের সুবিধা করিবেন। আর একটি অসুবিধা হইতেছে টেলিগ্রাফ ব্যাপারে। কারণ টেলিগ্রাফ করিবার সময় টেলিগ্রাফ-মাষ্টারের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণকে যে কি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা না বলিলেও অনুমান করা যায়। মাষ্টারের অনুপস্থিতির প্রধানতঃ কারণ হইতেছে ডাকঘর-সংলগ্ন বাসা না হওয়ায় তাঁহাকে অনুপস্থিত থাকিতে হয় অথচ দুই জন টেলিগ্রাফ-মাষ্টারেরও ব্যবস্থা নাই বা quarter হওয়ার উপযুক্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও অফিস-সংলগ্ন কোন quarter নাই। ইহাতে যে সাধারণকে কি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। —নীহার।

পড়েছি মোগলের হাতে

"এবার দু'-দুটো দুর্দ্ধান্ত কেচ্ছা গাঁটছড়া বাঁধা আরও। কালোবাজারী আর কংগ্রেস মুখোসপরা দল দুটো নাকি একসঙ্গে ভাঙ্গা আসরে সংখ্যাগরিষ্ঠ। একজন কম্যুনিষ্ট প্রার্থীর জামানত নাকি বাজেয়াপ্ত! অনেকে বলবেন এ হ'লো কী? তবে কি সত্যই সত্যই রামপুরহাট পৌরসভার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে অবাঞ্ছনীয়দের হাতে? না কালোবাজারী কংগ্রেসের মাঝে সত্যিকার দু'-এক জন মানুষ আছে? কে জানে বাপু—সহরবাসী বলবে—'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।" —রাঢ়দীপিকা।

দামোদর পুলের অভিনয়

"বর্দ্ধমান সদরঘাটে দামোদরের উপর গ্রীষ্মকালে যাতায়াতের জন্য বালির উপর লোহার প্লেট এবং দুই দিকের জলের উপর সাময়িক কাঠের পুল নির্ম্মাণের জন্য ২২০০০৲ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষ হইতেছে সদরঘাটের দামোদর-বক্ষে বালির উপর গত বৎসরের মত কিছু প্লেট পাতা হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হইল না এবং কাঠের পুলের এখনো কোন আয়োজনই নাই। যদি এখনো ত্বরান্বিত করা যায়, তাহা হইলেও অন্ততঃ জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগ নাগাদ ঐ কার্য্য সমাধা হইতে পারে। ইহার পর বর্ষায় দামোদরের জল বৃদ্ধি হইতে মাত্র সাড়ে তিন মাস বাকী থাকিবে। এই সাড়ে তিন মাসের জন্য এত টাকার ছেলেখেলা করিবার কি প্রয়োজন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বালির উপর লোহার প্লেট পাতিয়া কিছু দিন দামোদর-বক্ষে বর্দ্ধমানের টাউন-বাস যাত্রী লইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু নদীর দুই কিনারায় যে জল আছে, তাহার উপর শালবল্লা দিয়া সাময়িক পুল নির্ম্মাণ করিলে তাহার উপর দিয়া বাস এবং খাদ্য বিভাগের অত্যন্ত ভারবাহী লরী যাওয়া নিরাপদ নহে। মধ্যে ফুটা লোহার প্লেটের উপর দিয়া গো-গাড়ী যাতায়াত করিতে পারিবে না। তবে মাত্র সরকারী কর্ম্মচারীদের জীপ যাতায়াত ও মন্ত্রী মহাশয়দের সফরের জন্য যদি এই রাজকীয় ব্যবস্থা হয় তাহা পৃথক্ কথা।" —দামোদর।

মস্তিষ্ক ও হৃদয়

"আমাদের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কি ছাত্রদিগকেই একথা বলিয়াছেন, না out of the fulness of heart the mouth speaketh—a great empire & a little mind go ill together—আজ তিনি আমাদের রাষ্ট্রপতি। কিন্তু তিনি কি পূর্ব্বের রাজেন্দ্রপ্রসাদ আছেন! তাহা হইলে প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে পুরুলিয়ার নেতা নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে যে সভা হয় তাহাতে তিনি নিজেই বক্তৃতা-মুখে বলিয়াছিলেন, বাংলার যে জেলাগুলি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বিহারের মধ্যে ভুক্ত করিয়াছেন তাহা বাংলার অবশ্যপ্রাপ্য। আর আজ তিনি বলিতেছেন রাজনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা মিলাইও না। তবে কি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষায় বলিতে হইবে, Dr. Rajendraprasad fell a "Victim" to the influence of Mahatma Gandhi—আর আজ গান্ধীজিও নাই—রাজেন্দ্রপ্রসাদের সে সত্য প্রতিশ্রুতি পালনেরও দরকার নাই। মহাত্মাজির Vtctim হইয়াছিলেন বলিয়াই তো আজ রাষ্ট্রপতি—শুধু উকিল হইলে তো এ সৌভাগ্য জুটিত না! আমরা এখনও বলি, তিনি বাংলার প্রাপ্য জিলাগুলি প্রত্যর্পণ করুন—নতুবা উহা narrow mindednessএর পরিচায়কই হইবে।" —নিশান।

সে নিশ্চয়তা কোথায়?

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, এই ৫ই জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় চিনির দর মণকরা ৫৲ টাকা অর্থাৎ সেরকরা ৵০ আনা কমিবে। ইহা কলিকাতা-বাসীদের পক্ষে সুখবর হইতে পারে কিন্তু মফঃস্বলবাসীরা বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছে না। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, ১লা ডিসেম্বর হইতে চিনির মূল্য মণকরা ৪৲ টাকার মত কমিবে কিন্তু কার্য্যতঃ মফঃস্বলবাসীরা এখনও প্রায় পূর্ব্বের মত দরেই চিনি খরিদ করিতেছে। এই তমলুক সহরেই ৸৴০—৸৵০ আনার কমে এক সের চিনি পাওয়া যায় না অর্থাৎ পূর্ব্বের তুলনায় মাত্র এক আনা কমিয়াছে। এই রকম ময়দার ক্ষেত্রেও আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সরকারী ঘোষণার কোন মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে না। সরকার এক সের ময়দার সর্ব্বোচ্চ মূল্য সাড়ে ৸০ বারো আনা বাঁধিয়া দিলেও এখানে ৸৴০—৸৵০ সের দরে উহা অবাধে বিক্রয় হইতেছে। এত সরকারী লোকলস্কর এনফোর্সমেণ্ট সকলেই এখানে হয় অসহায়, না হয় উদাসীন। সুতরাং সরকার দর কমাইলেন বলিলেই যে লোক সেই দরে জিনিষ পাইবে সে নিশ্চয়তা কোথায়?" —প্রদীপ।

কলিকাতা রাজ-ভবনে মিঃ ক্লিমেণ্ট এটলীর সঙ্গে আলাপরত পশ্চিম-বঙ্গ লৌহ-ব্যবসায়ী-সমিতির সভাপতি ও বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের এক্‌জিকিউটিবস্ বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত তারকতোষ ঘটক

আমাদের মনে হয়

"আমাদের মনে হয়, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু আশা করিয়াছেন যে, তাঁহার অনুগামী লোক-সভার সদস্যগণ ও বিধান-সভার সদস্যগণ জন-সংযোগ রক্ষা করিয়া তাঁহার ভারত গড়ার স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। এই আশা লইয়াই তিনি সম্ভবতঃ লোক-সভায় প্রগতিমূলক বিল রচনায় ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু অবস্থা যে সম্পূর্ণ বিপরীত দাঁড়াইতেছে, এক্ষণে সে বিষয়ে সন্ধান না রাখিলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। লোক-সভা ও বিধান-সভার সদস্যগণ যে কেবল মাত্র ভোট দিয়া সরকারের সমর্থন জানাইয়াই তাঁহাদের দায়িত্ব শেষ করিতেছেন, জন-সংযোগের কোন খবরই তাঁহারা রাখেন না—এ সংবাদ গবর্ণমেণ্ট পরিচালকগণের রাখা উচিত। অন্যথায় জন-সংযোগ-বিহীন সরকারী বিল যে লোক-সভা ও বিধান-সভার নথিপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, জনসাধারণের সামাজিক জীবনে কোন কাজে লাগিবে না, এ বিষয়ে আমরা তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিতে চাই।" —বর্দ্ধমানের কথা।

আমাদের অভিলাষ জাগে যে—

"আজ আমাদের অভিলাষ জাগে যে বর্ত্তমানের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলি—"রাজনৈতিক জীবনের যে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আজ তুমি অধিকারী এর জন্য সকল গৌরব বাংলার। বাংলার পুরুষ-সিংহ স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যদি প্রবল ভাবে আপত্তি না করিতেন এবং তোমার পিতৃদেবের অভিপ্রায় অনুসারে তোমাকে চাকুরী গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে আজ হয়ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র "এম, এ; এম, এল" রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অবসরগ্রহণকারী কোন অখ্যাত "জেলা জজ" বা বিশেষ কোন মহলে কিঞ্চিৎ খ্যাত 'হাইকোর্ট জজ'রূপে দেখিতাম। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দেখিতে পাইতাম না। তাই বাংলার ও বাঙালীর এই মহা দুর্য্যোগের দিনে আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আমাদের গুরুভাই, আমাদের নিজস্ব ব্যক্তি, বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের কর্ণধার, সমগ্র বিহারের আত্মার আত্মীয় ও নির্ভরযোগ্য প্রকৃত নেতা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার গুরুঋণ পরিশোধে স্বেচ্ছায় অগ্রণী হইবেন—বাঙ্গালী জাতিকে ও বাংলার অতি গৌরবময় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিবার জন্য?"
—মেদিনীপুর পত্রিকা।

যায় কোথায়?

"মানভূম জিলার চাণ্ডিল ও বরাবাজার থানার এবং সিংভূম জিলার সাকচী থানার প্রায় ৩৩টি গ্রামের অধিবাসীদের এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছিলেন যে—"এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক করা যাইতেছে যে আগামী ২৬শে, ২৭শে এবং ২৮শে নভেম্বর তারিখে সামরিক আগ্নেয়াস্ত্র ক্ষেপণ ও কামান চালনা অনুশীলন হইবে। উক্ত তিন দিন বেলা ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গ্রামবাসিগণ কেহই যেন ঘরের বাহিরে আসিবেন না।" এই কামান চালনার মহড়া এক নম্বর পার হইয়া গিয়াছে। আবার শোনা যাইতেছে যে শীঘ্রই আবার আর এক দফা হইবে। গ্রামবাসীরা তো ঘরের বাহির হইবে না বোঝা গেল—আর ঠিক কাজের সময়টিতে। কিন্তু তাহারা খায় কি? এ যে কি দুর্ভোগ ভুগিতে হয়, গ্রামবাসীরা কি কষ্টে পড়ে, তাহা দিল্লী বা পাটনার গদীতে সমাসীন কর্ত্তৃপক্ষের অনুভবে আসে না।" —মুক্তি।

হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়

"উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারী সাহায্য পরিকল্পনায় হঠাৎ পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে বলিয়া সরকারী প্রচার বিভাগ যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত। সংবাদে প্রকাশ, এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এ বৎসর শতকরা ৪০।৫০ ভাগ হ্রাস করা হইবে। উদ্বাস্তু সাহায্যের ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদাই এক ছিনিমিনি খেলার মনোভাব সরকারের বিভিন্ন আচরণ হইতে এমন নগ্নভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে যাহা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে।" —ভারতী।

বিচারক চাই

"শুনা যাইতেছে, আসানসোল কোর্টের অতিরিক্ত সাব-জজের পদটি তুলিয়া লওয়া হইতেছে। আমরা কিন্তু দেখিতেছি যে দায়রার কাজ দিন দিন এতই বাড়িয়া যাইতেছে যে, সাধারণের কাজগুলিতেও সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা যাইতেছে না। সহযোগী 'বঙ্গবাণী' এ বিষয়ে যথার্থই অনুমান করিয়াছেন। আমাদের পরামর্শ, অতিরিক্ত সাব-জজের পদ তো তুলিয়া লওয়া ঠিক হইবেই না বরং অতিরিক্ত জেলা-জজের পদ এখানে পুনঃ সংস্থাপিত করিলে জনসাধারণ অতিরিক্ত খরচ ও হয়রাণি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। আমরা এদিকে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"
—আসানসোল হিতৈষী।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ দাবী করিয়াছে

"ফারাক্কার বাঁধ বা সেতু নির্ম্মাণের দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে! পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও ইহা গৃহীত হয় নাই। ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার কারণ অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ইহা অত্যন্ত জরুরী ও প্রয়োজন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী ইহা নয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু ইহা দাবী করিয়াছে সুতরাং তাহা হইবার নহে।" —ত্রিস্রোতা।

সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ

"সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজে গত কয়েক মাস হইতে যে সব ঘটনা ঘটিতেছে, জনসাধারণের অনেকেই হয়তো সেই লজ্জাকরজনক সংবাদ অবগত নহেন। গভর্ণিং বডির কতিপয় সদস্যের সহযোগে অত্যন্ত অসঙ্গত ভাবে জনৈক অধ্যাপককে কি ভাবে কলেজের সহাধ্যক্ষ করা হইয়াছে এবং ইহার অন্তরালে যে ঘটনা এখনও ঘটিতেছে তাহা সাধারণে প্রকাশিত হওয়া উচিত বলিয়াই আমরা মনে করিতেছি। কারণ এই কলেজটি ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা আদায়ের যন্ত্রবিশেষে পরিণত হউক, এই অন্যায় এবং অযৌক্তিক কথা কেহই বলিবেন না।"
—বীরভূম বার্ত্তা।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বৃক্ষ

—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

মাসিক বসুমতী
ফাল্গুন, ১৩৫১

বৃক্ষ
—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয় খণ্ড] [পঞ্চম সংখ্যা

ফাল্গুন

১৩৫৯

৩১শ বর্ষ
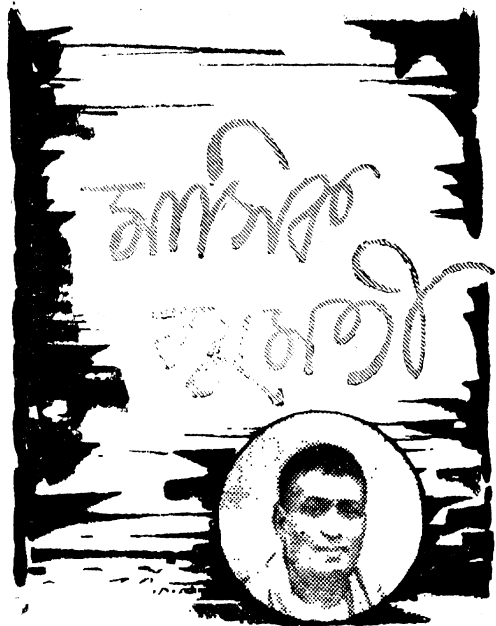
কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কলিকালে ঈশ্বরের নাম করাই এক মাত্র সাধনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে দেখবার ইচ্ছা থাকলে নামে বিশ্বাস ও সদসৎ বিচার করা চাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। হাতীকে ছেড়ে দিলে চারিদিকের গাছপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যায়; কিন্তু তার মাথায় ডাঙ্গস মারলে ঠাণ্ডা হয়। মনকে ছেড়ে দিলে সে নানারকম ভাবে, কিন্তু বিবেকরূপ ডাঙ্গস মারলে সে মন স্থির হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। উপাসনা কতক্ষণ দরকার, যতক্ষণ নামে অশ্রুপাত না হয়। হরিনাম শুনলে যাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে, তাঁর আর উপাসনা করবার দরকার নেই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। দশবার গীতা উচ্চারণ করলেই গীতার অর্থ বোঝা যায়, যেমন গীতা-গী-ত্যাগী-ত্যাগী অর্থাৎ, হে বদ্ধজীব! সমুদয় ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরেতে মন দাও।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যে মুসলমান 'আল্লাহো' 'আল্লাহো' ক'রে চীৎকার করছে, জেনো, সে আল্লাকে পায় নাই, যে পেয়েছে সে চুপ্ ক'রে ব'সে আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। জাহাজের কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে, তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তা হ'লে কোনও ভয় থাকে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সদা সর্ব্বদা হাঁ ক'রে জলের উপর ভাসে, কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে প'ড়লে তারা মুখ বন্ধ ক'রে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর উপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুপ্তমন্ত্র-রূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[বাঙলা সাহিত্যে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নাম আজ সকলের নিকট প্রায় পরিচিত। এই সঙ্গে প্রকাশিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পত্রসমূহ আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চঞ্চলা দেবীর নিকট লিখিত। পত্রসমূহে একান্ত ঘরোয়া কথা থাকিলেও ত্রিবেদী মহাশয়ের পরিবারবর্গের প্রতি কবিগুরুর স্নেহাধিক্যই প্রকাশ পাইয়াছে। পত্রসমূহ জেলা মুর্শিদাবাদ, ডাকঘর কান্দি এবং বাঘডাঙ্গা নিবাসী চঞ্চলা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। —সম্পাদক]

নং ১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দেশে ফিরিয়াছি। আগামী কাল শান্তিনিকেতনে ফিরিব। তুমি আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৯০২

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নং ২

ওঁ

"উত্তরায়ণ"
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

পরম কল্যাণীয়াসু

তোমার পিতার নামে যে পাঠশালা উৎসর্গ করেছ তার বিবরণ পাঠ করে পরম আনন্দ লাভ করলুম। ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমার কল্যাণ করুন। ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩৩৯

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible] কন্যা শ্রীমতী চঞ্চলা দেবী

নং ৩

ওঁ

মাদ্রাজ

কল্যাণীয়াসু

আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। কর্ম্মের আকর্ষণে মাদ্রাজে আসিয়াছি, এখানে আরও দশ দিন কাটিবে। শরীর ভালোই আছে। আশা করি তুমি ভালো আছো। ইতি ২৫ অক্টোবর ১৯৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকু

নং ৪

ওঁ

"উত্তরায়ণ"
শান্তিনিকেতন
বেঙ্গল

কল্যাণীয়াসু

তোমার পেঁপেগুলি উপহার পাইয়া আনন্দে ভোগ করিতেছি। তুমি আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি '৯ কার্ত্তিক ১৩৪৩

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নং ৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ।

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। আশা করি ভালোই আছ। ইতি ২৭।১০।৩৬

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নং ৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার স্নিগ্ধ চিঠিখানি পড়ে আনন্দ পেলুম। এখন আমি অনেকটা ভালো আছি। চিকিৎসা সমাধা করবার জন্যে কলকাতার দিকে এসেছি। তুমি আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২০।১০।৩৭

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নং ৭

খড়দহ

পরম কল্যাণীয়াসু

তুমি কষ্ট করিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া আমার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছ ইহা শুনিয়া বড় বেদনা পাইলাম। আমি অসুস্থ শরীরে গঙ্গাতীরের বাগানে বিশ্রামের জন্য আসিয়াছি। কিছুদিন পরে সুস্থ হইলে শান্তিনিকেতনে ফিরিব।

তুমি আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি ১৬ মাঘ ১৯৩৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নং ৮

"উত্তরায়ণ"

ওঁ শান্তিনিকেতন

বেঙ্গল

কল্যাণীয়াসু

আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। আমি অবিলম্বে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি। কিছুদিনের জন্যে বায়ু পরিবর্ত্তন করে আসব। ইতি ৭।১।৩৮

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নং ৯

কল্যাণীয়াসু মংপু

তোমার পত্রখানি পেয়ে আনন্দিত হলুম—তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আমি কিছুদিনের জন্যে দার্জিলিঙের নিকট মংপু পাহাড়ে বায়ু পরিবর্ত্তন করতে এসেছি। সপ্তাহ খানেক পরে আবার আশ্রমে ফিরে যাবো। আমার শরীর অপেক্ষাকৃত ভালোই আছে। ইতি ২৮।১০।৩৯

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'না'

"আর্য্য জাতির ভাষায় 'না' অতি প্রাচীন শব্দ, উহা 'হাঁ'এর বিপরীত, সম্মুখের দিকে উর্দ্ধাধোভাবে ঘাড় নাড়িলে হয় 'হাঁ', উহা সম্মতিসূচক, আর পাশাপাশি ডাহিনে বামে ঘাড় নাড়িলে হয় 'না'—উহা অসম্মতিজ্ঞাপক। 'না'য়ের ক্ষমতা বড় ভীষণ, উহা চকিতের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উড়াইয়া দিতে পারে।

'না'কে 'হাঁ' করিবার অভ্যাস অনেকের থাকিলেও উহাকে অব্যয় শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, উহা কোনরূপ বিভক্তি গ্রহণ করিতে চায় না। ক্রিয়ার সহিত উহা বিশেষণরূপে বসে, কিন্তু যে ক্রিয়ার বিশেষণ হইল, তাহাকে একেবারে উল্টাইয়া দেয়। এমন সর্ব্বনেশে বিশেষণ ভাষায় আর নাই।"

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিরানব্বুই

ঈশ্বর কি শুধু কোমলকান্ত পদাবলী? শুধু কি ললিতললিত বংশীস্বর? বিলাস-আলস্যে সুখে-সমৃদ্ধিতে থাকলেই কি বলব তিনি আছেন? তাঁর আবির্ভাব কি শুধু আরামরম্যতায়? কণ্টক-শয়নে তিনি নেই? নেই কি কোপকর্কশ বজ্রবহ্নিতে? তাঁর আশীর্বাদ কি শুধু ধনমান সাফল্য-স্বাচ্ছন্দ্য? এই আঘাত আর অভাব, সংগ্রাম আর ব্যর্থতা—এ কি নয় তাঁর অনুকম্পা? সুখের পেলবতাটুকুই তাঁর স্পর্শ, দুঃখের কাঠিন্যটুকুই আর তার স্পর্শ নয়?

হায়, সুখ হচ্ছে চকিতে একটু ছোঁয়া, দুঃখই হচ্ছে নিবিড় আলিঙ্গন।

যা দেন সব নেব নতশিরে। খরশর হোক, হোক বা পুষ্পবৃষ্টি। জল যেখান থেকেই আসুক, কুম্ভ থেকেই হোক বা কূপ থেকেই হোক, হোক তা খাল-বিলের বা বর্ষাবাদলের নেব সব অঞ্জলি ভরে। ঈশ্বর সুখকরও নন দুঃখকরও নন, ঈশ্বর কল্যাণকর। নন শুধু শীতনিবারিণী কন্থা, তিনি আবার হিমরাত্রির অনাবরণ।

তাই ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বরের নাম করে নরেন।

পাশের ঘর থেকে একদিন শুনতে পেলেন ভুবনেশ্বরী। ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'চুপ কর্। ছেলেবেলা থেকেই তো কত ভগবান-ভগবান করলি,—ভগবান তো সব করলেন!'

বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল নরেন। সর্বংসহা যে মা তিনিও অস্থির হয়েছেন। ভগবান তাঁর কান্নাও কানে নেননি। তবে তাঁকে করুণাময় বলি কি করে? যিনি কল্যাণ করেন তিনি একটু করুণা করতে পারেন না?

পর-দুঃখে কাতর হয়ে তাই বলেছিলেন বিদ্যাসাগর: 'ভগবান যদি দয়াময়ই হবেন তবে দুর্ভিক্ষে লাখ-লাখ লোক দুটি অন্নের জন্যে কেঁদে-কেঁদে মরে কেন?'

ঠিকই বলেছিলেন। যার ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা আছে সে যদি এত কান্নায়ও বিচলিত না হয়, তবে কী বলব? হয় বলব তিনি নেই বা তাঁর ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা নেই, কিম্বা বলব তিনি নিশ্চেষ্ট নিষ্ঠুর অনাত্মীয়। কেউ নন তিনি আমাদের।

এই প্রশ্ন নিয়েই একদিন সটান গিয়েছিল ঠাকুরের কাছে।

'বলুন ঈশ্বর কিসে দয়াময়? দয়াময় তো, এত দুঃখ কেন দিনে-রাত্রে? যারা নিষ্পাপ-নির্দোষ তাদের কেন এত যন্ত্রণা?'

আয়ত-স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, বোস পাশটিতে। একটু স্তব্ধ হয়ে তাকা একবার রাতের আকাশের দিকে।

কোথায় রাতের আকাশ! রাতের আকাশের মতই রহস্যগভীর যে দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে রইল নরেন।

হ্যাঁ রে, কী দেখছিস? গুঁড়ো গুঁড়ো কাঁচের টুকরোর মত কত তারা ছড়িয়ে রয়েছে আকাশে গুনতে পারিস? কেউ পারে? একথালা সুপারি, গুনতে নারে বেপারী। তেমনি গুনতে পারিস গঙ্গা-পারের কাঁকড়া? চেয়ে দ্যাখ ভালো করে। শর্বরীর নীলাম্বরীতে কুচি-কুচি চুমকি। একটা দুটো নয়, লক্ষ-লক্ষ, হয়তো কোটি-কোটি। তার মধ্যে তোর এই পৃথিবী। হাওয়ায় উড়ে আসা ছোট্ট একটা বালুকণা। সেই পৃথিবীই বা কি কম বড়! হাঁটতে সুরু করলে পথ আর ফুরোয় না একজন্মে। অন্তরীক্ষের প্রেক্ষিতে তোর এই বিশাল পৃথিবীই বা কি। তুচ্ছ একটা কীটাণু। তার মধ্যে আবার তুই! তোর মস্তিষ্ক! তোর হৃৎস্পন্দন!

নরেন মাথা নোয়াল।

হ্যা, নত কর মাথা। কার বিচার করবি তুই, কোন আইনে? সেই বিচারদৃষ্টি কতদূর প্রসারিত করবি? তারপর শেষে আকাশে এসে ঠেকবে না? এই কালো রাত্রির আকাশে? তখন কী বলবি রে নরেন? এতগুলো তারা কেন? কোন ভূতের বাপের পিণ্ডি দিতে? সূর্য-চন্দ্র বুঝি, কিন্তু তারা দিয়ে কি মানুষ ধুয়ে খাবে? কী উত্তর দিবি? যদি বলি ওরা সব চিন্তামণির নাচ-দুয়ারের মণি-মাণিক্য, পারবি মেনে নিতে? বলি, বিচার কতদূর যাবে? শেষে সকল পথ পায়ে হেঁটে দুয়ারে এসে আছড়ে পড়বি! বিচার থা পাবে না।

না থাক, নোয়াব না মাথা। ঈশ্বরের কাছেও না। নিজের পায়ে দাঁড়াব। লড়ব নয় মরব। আকাশটাকে ছিনিয়ে আনব দুহাতে।

পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে পড়ে গিয়েছেন ভুবনেশ্বরী। যেন ধরা পড়ে গিয়েছেন। যেন জল খাচ্ছিলেন ডুবে-ডুবে। মুখে ঠাট্টা, অন্তরে কান্না। মুখে রাগ, অন্তরে অনুরাগ।

তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিলেন ভুবনেশ্বরী। আর কিছুর জন্যে নয়, যে চেলি পরে আহ্নিক করছিলেন সেটা শতচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথাটা: 'আমাকে একখানা চেলি বা গরদের কাপড় কিনে দিতে পারিস? এটা পরে আর পারা যায় না।'

মাথা হেঁট করল নরেন। কোথায় পাবে সে চেলি-গরদ? সে বেকার, উদয়াস্ত ভূতের বেগার খাটছে। কোথায় পাবে সে পট্টবস্ত্রের পয়সা? লজ্জা মা পাবে কেন, লজ্জা পেল ছেলে। মার সমুখ থেকে চলে গেল ম্লানমুখে।

সেইদিনই বিকানির থেকে এক মাড়োয়ারি এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে মিছরির থালা তার উপরে একখানা গরদের কাপড়। দেখে ঠাকুরের বড় খুশি-খুশি ভাব। ডুমো ডুমো মিছরি দিয়ে ভর্তি-করা গরদ-ঢাকা থালা নামিয়ে প্রণাম করল মাড়োয়ারি।

দু দিন পরে নরেন এসে হাজির। যাকে মানে না সেই আবার টানে। যার নিন্দে তারেই বন্দে।

'শোন, কাছে আয়—' নরেনকে ডাকলেন ঠাকুর।

নরেন কাছে এল। দাঁড়িয়ে রইল, বসল না।

'শোন, এই মিছরির থালা আর গরদখানা তুই নিয়ে যা—'

উচ্চশব্দে হেসে উঠল নরেন। পরবার নেংটি নেই দরবারে যেতে চায়। মিছরি দিয়ে আমি কী করব? আমি কি ছোট ছেলে যে মিষ্টি দিয়ে ভোলাবেন? আর গরদ—

'গরদখানা তোর মাকে নিয়ে দে গে। তার আহ্নিক করবার চেলি ছিঁড়ে গিয়েছে। সে এ গরদ পরে আহ্নিক করবে।'

বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল নরেনের। তা আপনি কি করে জানলেন? আপনাকে বললে কে?

ওরে, আমি জানতে পাই। উৎসটি ঠিক থাকলে ধ্বনিটি ঠিক আমার কানে লাগে। দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের সময় এক হাতে নিজের কাপড় ধরে আরেক হাত তুলে ডাকছিল কৃষ্ণকে। প্রথম-প্রথম শত কান্নায়ও কৃষ্ণ সাড়া দেয়নি। কিন্তু দ্রৌপদী যখন দু হাত তুলে দিলে, ছেড়ে দিলে, তখনই বস্ত্রভার কাঁধে নিয়ে দাঁড়ালেন শ্রীকৃষ্ণ। যোগক্ষেম বহন করে নিয়ে এলেন। তেমনি যে দু হাত ছেড়ে দিয়ে ডাকে, তাকে তুলে নেন ভগবান। তার ডাকাটি ঠিক।

'শোন, নিয়ে যা গরদখানা। তোর নিজের জন্যে বলছি না, তোর মার জন্যে।'

'মার জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষে করতে যাব কেন?'

'ভিক্ষে?'

'তা ছাড়া আবার কি! মা আমার কাছে চেয়েছেন। আমাকে বলেছেন কিনে দিতে। যখন উপার্জন করতে পারব তখন কিনে দেব। আপনার কাছ থেকে ভিক্ষে করে নেব কেন?'

নরেনের তেজ দেখে প্রসন্নবয়ানে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'এই না হলে নরেন! আমরা হলুম নর আর তুই যে নরের ইন্দ্র।'

কিছুতেই নিল না নরেন। গরদের কাপড় মার কত দরকার, আকস্মিক ভাবে পেয়ে গেলে কত খুশি হতেন—তা জেনেও টলল না একচুল। মা আমার কাছে চেয়েছেন, আমি রোজগার করে তা কিনে দেব। কিন্তু হাত পেতে ভিক্ষে নিতে যাব কেন? না, কিছুতেই ভিক্ষে করব না। স্বয়ং ভগবানের কাছেও নয়।

নরেন চলে গেলে ডাকলেন রামলালকে। বললেন, তোকে একটা কাজ করতে হবে রামনেলো!

কি কাজ ?

'কাল শিগ্‌গির করে খেয়ে নিয়ে চলে যাবি কলকাতায়। সেই শিমলেয় নরেনের বাড়িতে। বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যখন বুঝবি নরেন বাড়িতে নেই, সটান চলে যাবি তার মার কাছে। ঠিক তার মার হাতে এই গরদখানা আর এই মিছরির থালা পৌঁছে দিয়ে আসবি। বুঝলি ? বলবি, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। কি, পারবি তো ?'

পারব।

'দেখিস বাইরে থেকে যেন ডাকাডাকি করিস নে।' নরেনকে যেন কত ভয় ঠাকুরের। 'দেখিস অন্যের হাতে গিয়ে যেন পড়ে না। নরেন টের পেলে দরজা বন্ধ করে দেবে।'

কিন্তু ঠাকুর যখন নিজে নরেনকে খুঁজতে আসেন, বাড়ির ভিতর ঢোকেন না। বাইরে থেকে বলেন, 'নরেন কোথায় ? নরেনকে ডেকে দাও।'

কিন্তু রামলালের জন্যে অন্য ব্যবস্থা। তাকে তাগ বুঝে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে। ঢুকতে হবে নরেনের দৃষ্টি এড়িয়ে।

চাদরের তলায় থালা আর কাপড় লুকিয়ে গ্যাস-পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে আছে রামলাল। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের তিন নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। দুপুরের রোদ উঠে এসেছে মাথার উপর। চারদিক ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কখন না-জানি নরেন বেরোয় বাড়ি থেকে। তার দৈনন্দিন চক্রাবর্তে।

কি হল ? নরেন আজ আর বেরুবে না নাকি ?

না, ঐ বেরুচ্ছে। খুলেছে সদর দরজা। মলিন চাদরখানা গায়ে ফেলে চলেছে পথ দিয়ে। অমনি ঐ ফাঁকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে রামলাল।

একেবারে ভুবনেশ্বরীর দরবারে।

'আপনাকে এই মিছরির থালা আর গরদের কাপড় পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুর।'

গরদের কাপড়! পাঠিয়ে দিলেন লোক দিয়ে! হাসলেন ভুবনেশ্বরী। কি করে জানলেন তিনি ? তিনি কি দূরের ভাষা শুনতে পান ? শুনতে পান মনের মৌন ?

বললেন, 'এইখানে কি কথা হল বিলের সঙ্গে, তাই দক্ষিণেশ্বরে অমনি টেলিগ্রাম হয়ে গেল ?'

কেন হবে না ? তিনি খুব কানখড়কে। সব শুনতে পান। যত ডেকেছ যত কেঁদেছ সব শুনেছেন। শুধু কথাটিই শোনেন না, বলতে না পারার ব্যথাটিও শোনেন। এক মুসলমান নমাজের সময় হো আল্লা হো আল্লা বলে খুব চীৎকার করে ডাকছিল। একজন তার চীৎকার শুনে বললে, তুই অত চেঁচাচ্ছিস কেন ? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান। শুনতে পান তোর অস্ফুটতম দীর্ঘনিশ্বাস।

নরেন বাড়ি ফিরে এসে দেখল মা গরদের কাপড় পরে বসে আছেন পূজার ঘরে।

এ কে ওস্তাদ বীণকার! সব সুরের রাগিণীই যেন জানেন খেলতে। কখনো আঘাতে কখনো আনন্দে, কখনো কড়িতে কখনো কোমলে। শুধু তার বাঁধা সুর বাঁধার মুখেই যন্ত্রণা। এই বুঝি ছিঁড়ে গেল তার, সুরু হল বেসুরের আর্তনাদ। বিচ্ছিন্ন তারের ঝঙ্কারকে কবে নিয়ে যেতে পারব একটি সঙ্গীতের সমগ্রতায় ? পৃথক পৃথক জিজ্ঞাসাকে গ্রথিত করতে পারব একটি মহাবিশ্বাসের মূলসূত্রে ?

যত দিন তা না পারি তত দিন হাজরার কাছে গিয়ে বসি।

দক্ষিণেশ্বরে বসে জপ করে হাজরা। তারই মধ্যে আবার দালালির চেষ্টা করে। বাড়িতে ক'হাজার টাকা দেনা আছে তা শোধবার ফিকির খোঁজে। জপ করে তার বেজায় অহঙ্কার। রাঁধুনে বামুনদের কথায় বলে, ওদের সঙ্গে কি আমরা কথা কই ? শোনো কথা! রাঁধুনে বামুনরা যেন আর মানুষ নয়!

শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছে সেদিন। ইচ্ছে দু-এক রাত্তির থেকে যায় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাকে যত্ন করে থাকতে বললেন। কিন্তু হাজরা ঝামটা মেরে উঠল। বললে, 'এ ঘরে নয়, ওকে খাজাঞ্চির ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

মানেটা বুঝতে পেরেছেন ঠাকুর। মানেটা আর কিছুই নয়, এখানে থাকলে পাছে হাজরার দুধ-মিষ্টিতে ভাগ বসায়। যদি তার বরাদ্দে কিছু টান পড়ে। এত হিসেবী এত স্বার্থপর!

ঠাকুর ঝলসে উঠলেন, 'তবে রে শালা! গোঁসাই বলে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর সংসারে থেকে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে নানা কাণ্ড করে—এখন একটু

জপ-তপ করে তোর এত অহঙ্কার হয়েছে। লজ্জা করে না ?'

লজ্জা করবে কি! জটিল-কুটিল না হলে লীলারস জমবে কি করে?

কিন্তু নরেন বলে, 'হাজরা খুব ভালো লোক।'

'তুমিও একদিন বলবে, আমি বলে রাখছি।' হাজরা লক্ষ্য করে ঠাকুরকে: 'এখন আমাকে তোমার ভালো লাগছে না, কিন্তু দেখো, পরে আমাকে তোমার খুঁজতে হবে।'

আমি হচ্ছি সংশয়। আমি হচ্ছি স্বার্থপরতা। আমি হচ্ছি ব্যবসাবুদ্ধি।

সংশয় ছাড়া প্রত্যয়ের দাম কোথায়? স্বার্থপরতা না থাকলে কোথায় থাকবে আত্মত্যাগের মহিমা? ব্যবসাবুদ্ধিতে শেষ পর্যন্ত কুলোবে না বলেই তো শরণাগতির শান্তিজল।

থেকে-থেকে রসিকতা করে। সত্ত্বগুণের রঙ শাদা, রজোগুণের লাল, তমোগুণের কালো। সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, রজ তম ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। হাজরাকে জিগগেস করলেন ঠাকুর: 'বলো তো, কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে?'

'নরেনের ষোল আনা।' নির্লিপ্ত মুখে বললে হাজরা। 'আমার এক টাকা দুই আনা।'

'বলো কি? আর আমার?'

'তোমার এখনো লালচে মারছে—তোমার বারো আনা।'

বাইরের বারান্দায় হাজরার কাছে গিয়ে বসেছে নরেন। হাজরাও অভাবী লোক, জীবিকার্জনের জন্যে সংগ্রাম করে, আবার সেই সঙ্গে নিবিষ্ট নিষ্ঠায় জপধ্যান করে তারই জন্যে বোধ হয় পক্ষপাত।

কিন্তু বেশিক্ষণ ঠাকুরকে না দেখেও থাকা যায় না। বারান্দা ছেড়ে ঘরের মধ্যে এসে বসল নরেন।

'তুই বুঝি হাজরার কাছে বসেছিলি?' বললেন ঠাকুর, 'আহা, তুই বিদেশিনী, সে বিরহিণী। হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।'

সবাই হেসে উঠল।

'হাসলে কি হবে? আমি তাকে বলি, তুমি শুধু বিচার করো তাই তুমি শুষ্ক। সে বলে, আমি সৌরসুধা পান করি, তাই শুষ্ক। যদি শুদ্ধা ভক্তির কথা বলি, যদি বলি শুদ্ধ ভক্ত টাকাকড়ি কিছু চায় না, সে বিরক্ত হয়, বলে, কৃপাবন্যা এলে নদী তো উপচে যাবেই খাল ডোবাও পূর্ণ হবে। শুদ্ধা ভক্তিও হয়, আবার ষড়ৈশ্বর্য্যও হয়, টাকাকড়িও হয়। কি হয় না হয় কে বলবে?'

কৃপাবৃষ্টি অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে দিবানিশি। সেই বৃষ্টির জল ধরি তেমন পাত্রই এখনো হতে পারছি না। কিন্তু আমি যদি তোমার কৃপাপাত্র না হই, তবে আর কোথায় পাবে তোমার কৃপার পাত্র?

নরেন অন্য কথা পাড়ল। বললে, 'গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল। আপনার কথা হচ্ছিল—'

'কি কথা?' একটু বোধ হয় কৌতূহলী হলেন ঠাকুর।

'এই আপনি কিচ্ছু লেখাপড়া জানেন না—আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা।'

'তা তো ঠিকই বলছিলি। আমি শুধু সার কথা জেনে নিয়েছি। বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; আর গীতার সার ত্যাগী। আর বই পড়ে কি হবে? জানবার পর এখন শুধু সাধন-ভজন। সর্ষে পিষে তেল, মেদিপাতা বেটে রঙ আর কাঠ ঘষে আগুন বের করো।

আরো এক দিন তর্কের মুখে বলেছিল নরেন: 'তুমি দর্শনশাস্ত্রের কী জানো? তুমি তো একটা মুখখু।'

সেবার ঠাকুর করেছিলেন রসিকতা। বলেছিলেন, 'নরেন আমাকে যত মুখখু বলে আমি তত মুখখু নই।' বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে লিখে দেখিয়ে দিয়েছিলেন: 'আমি অক্ষর জানি।'

ঠাকুরের ইচ্ছে নরেন একখানা গান গায়। মাষ্টারকে বললেন তানপুরাটা পেড়ে দিতে। নরেন বাঁধতে লাগল তানপুরা।

বাঁধা আর শেষই হয় না। বিনোদ বললে, 'বাঁধা আজ হবে, গান আরেক দিন হবে।'

আর সকলের সঙ্গে ঠাকুরও হেসে উঠলেন। বললেন, 'ইচ্ছে করছে তানপুরাটা ভেঙে ফেলি। কি টং-টং সুরু হয়েছে—তারপর আবার তানা নানা নেরে নুম হবে।'

'যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্ত হয়।' ফোড়ন দিলে ভবনাথ।

নরেন ঝলসে উঠল: 'সে না বুঝলেই হয়।'

সদানন্দ ঠাকুর প্রসন্ন স্নেহে বলে উঠলেন, 'ঐ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।'

তিরানব্বই

দারিদ্র্যের রন্ধ্র দিয়ে উঁকি দিতে চাইল অবিদ্যা। নানা ভাবে কি পরীক্ষা করে নেবে না? তুমি কি স্ফটিক দিয়ে তৈরি, না, ইস্পাত দিয়ে। পরীক্ষায় না ফেলে কি করে বুঝব তুমি দুর্বাসনারজ্জু নারীকে প্রত্যাহার করতে পেরেছ?

একটি সুন্দরী মেয়ের নজর ছিল নরেনের উপর। শুধু সুন্দরী নয়, ধনিনী। ভাবলে, তার এই দুর্যোগের সুযোগে টোপ ফেলি। গোপনে প্রস্তাব করে পাঠাল, সভূমিভূষণা আমাকে গ্রহণ করো। শুধু দারিদ্র্য-মোচন হবে না, নিঃসঙ্গতার অবসান হবে। রুক্ষবেশ ছেড়ে ধরো এবার রাজবেশ।

ধ্যান ভেঙে মুনিরা তপস্যার ফল বিসর্জন দিয়েছে নারীর পায়ে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ও-সব মুনি-ঋষির চেয়ে দৃঢ়ব্রত।

প্রথমটা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিল নরেন। মেয়েটা তবু ফেরে না। শেষে কাঁদতে সুরু করল। ভাবলে নারীর বল, চোখের জল। ছলনাজাল গুটিয়ে বিস্তার করলে শোকজাল। যদি এবার একটু বিগলিত হয় সেই পাষাণপিণ্ড।

কিন্তু পাষাণের চেয়েও কঠোর নরেন্দ্রনাথ। ধ্রুব, নির্বিচল। তার শুধু এক প্রার্থনা: 'ব্রতপতে, ব্রতং চরিষ্যামি, সত্যং উপৈমি অনৃতাং।' হে ব্রতপতি, যে দীক্ষা দিয়েছ তাই আমাকে রক্ষা করুক। মিথ্যা থেকে দূরে থেকে যেন সত্যেই শরণাগত থাকি। আর কাউকে চিনি না তুমিই শক্তি দাও। সাহস দাও।

সেই রজনীরঞ্জিনী দুঃখশৃঙ্খলা নারী চলে গেল দুয়ার থেকে।

কিন্তু এবার যে এল প্রলুব্ধ করতে, সে বারবধূ। সে জ্বলন্ত দুষ্কৃতাগ্নিশিখা। গুরুকে এসেছিল পরখ করতে, শিষ্যকে একবার দেখবে না বাজিয়ে?

আগে বীর্যলাভ, পরে ব্রহ্মলাভ। আগে বীর্যানন্দ, পরে ব্রহ্মানন্দ।

বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বাগানবাড়িতে গিয়েছে নরেন। কি অমন দারিদ্র্যদুঃখে ম্লান হয়ে আছিস। চল ফুর্তি করবি চল। 'ন পুণ্যং সুখতঃ পরং।' সুখের চেয়ে আর পুণ্য নেই। দু ঢোক খেলেই দেখবি সমস্ত জগৎসংসার একটা রঙিন ফানুস হয়ে উড়ে চলেছে।

রাজ হয়নি প্রথমে। সে কি কথা, তুই না গেলে গান গাইবে কে? ফুর্তির মুখে হরিনাম—যেন মুড়ির সঙ্গে ফুটকড়াই। যেমন ভোজন তেমন দক্ষিণা। চল চল মনমরা হয়ে বসে থাকিস নে মুখ গুঁজে।

গান গাইবে এই শুধু জানে নরেন। কিন্তু এ কাকে পাঠিয়ে দিয়েছে বন্ধুরা? মাংসপাঞ্চালীকায়া শৃঙ্গারবেশাঢ্যা রমণী। নববিহঙ্গের বন্ধনবাগুরা।

বুঝল এও এক মহামায়ার খেলা। বিচলিত হল না। বিমোহিত হল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

স্ফুরৎচকিতচক্ষে তাকাল একবার মোহিনী। উত্তর দিল না।

'তোমার বাবার নাম কি? বাড়ি কোথায়? কেন পা বাড়ালে এ পথে?'

আবার কটাক্ষগর্ভ নেত্রপাত। আবার স্তব্ধতা।

'নিজের কথা একবার ভাবো? ভবিষ্যতের কথা? কি হবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? নিত্য ভিক্ষায় তনুরক্ষাই সাধনা? কিন্তু যখন ভিক্ষে আর মিলবে না?'

অপাঙ্গবীক্ষণ নেই আর মোহিনীর। চোখের দৃষ্টিটি এবার স্থির হয়েছে, শান্ত হয়েছে। ভরে উঠেছে তাতে হতাশার কুয়াশা, লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

'যখন থাকবে না এই শরীর? কি সম্বল নিয়ে যাবে তুমি ওপারে?'

এবার বুঝি দিগদর্শন হল মেয়েটির। দেখল চারদিকে শুধু ধু-ধু করছে মরুভূমি। কোথাও এতটুকু পিপাসার জল নেই, নেই অনুতাপের অশ্রুলেখা।

দ্রুতপায়ে চলে গেল। বললে গিয়ে বন্ধুদের 'অমন লোকের কাছে পাঠাতে আছে আমাকে?'

ঠাকুর নরেনকে বলেন, শুকদেব।

তাই শুনে বিশ্বনাথ দত্ত ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'ব্যাসদেবের ব্যাটা শুকদেব।'

কায়রোতে এক দিন পথ হারিয়ে ফেলেছেন বিবেকানন্দ। সঙ্গীদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলতে-বলতে। সঙ্গী সস্ত্রীক ফাদার লয়সন, শিকাগোর মিস ম্যাকলিয়ড আর সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা এম্মা-ক্যালভি। পথ হারিয়ে চলে এসেছেন একটা নোংরা গলির মধ্যে।

দু দিকে সার-সার ঘর, দরজা-জানলা খোলা। সেই সব জানলা আর দরজার সামনে অর্ধনগ্ন নারীর দল বসে আছে দেহের বেসাতি সাজিয়ে। কিছু লক্ষ্য করেন নি স্বামীজী, ঈশ্বরোন্মাদনার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আছেন। চারদিকে শুধু ঈশ্বর-প্রতিভাস।

কিন্তু তাঁর লক্ষ্য না ফিরিয়ে ছাড়বে না মেয়েগুলো। কে একটা মুখরা মেয়ে তাঁকে ডাকতে লাগল হেসে-হেসে। দেহে যৌবনের এমন দিব্যশোভা নিয়ে কোথায় তুমি চলে যাচ্ছ, উদাসীন!

সঙ্গীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। কি করে অবিলম্বে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে স্বামীজীকে তার জন্যে তাড়া দিতে লাগল। কিন্তু সহসা বিবেকানন্দ দল ছেড়ে সেই পণ্যাঙ্গনাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কি করেছ! নিজেদের দেবীত্বকে ঢেকেছ এ কোন সৌন্দর্যসজ্জায়! আত্মস্বরূপকে দেখ, দেখ সেই দেবীবিভব! এ করেছ কি!' বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। রূপাজীবাদের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন কেঁদেছিলেন যীশুখৃষ্ট।

মেয়েগুলির মুখে আর কথা নেই। একজন এগিয়ে এসে স্বামীজীর গৈরিক বাসের এক প্রান্ত স্পর্শ করল, সেই প্রান্তভাগ চুম্বন করে ভাঙা-ভাঙা স্পেনী ভাষায় বলতে লাগল, 'হোমব্রি ডে ডিওস, হোমব্রি ডে ডিওস—দেব-মানব, দেব-মানব।'

আরেক জন চোখ ঢাকল দু হাতে। স্বামীজীর সেই চক্ষুচ্ছটা যেন সে সইতে পারছে না। তার পাপলিপ্ত আত্মা যেন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল বকে গিয়েছে নরেন্দ্রনাথ, নাস্তিক হয়ে গিয়েছে। মদ আর তার অনুষঙ্গ কিছুতেই তার অরুচি নেই। কেউ যদি এ প্রশ্ন নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়, কি উত্তর পেলে সে সুখী হবে বুঝতে পেরে নরেন বলে, 'বেশ করেছি। যদি কেউ বুঝে থাকে ও-সব ক্ষণিক সুখভোগেই সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকা যায়, তবে তাকে তা বুঝতে দিতে আপত্তি কি? যাও, সরে পড়ো, যত পারো নিন্দা করো মনের সুখে। নিন্দা করে আনন্দিত হও।'

কথা কানে হাঁটে। দেয়ালে শোনে। বাতাসে লেখা হয়ে যায়।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কানে উঠল। তাও আবার কানে এল নরেনের। তবে আর কি, ঠাকুরও এবার বিশ্বাস করুন তাঁর নরেন মন্দিরের দ্বার ছেড়ে চলে এসেছে নরকের দরজায়! তাঁর সেই বৃহদ্‌ব্রতধর ব্রহ্মতেজা নরেন!

ভবনাথ তো একেবারে কেঁদে পড়ল ঠাকুরের পায়ে। 'নরেনের এমন হবে এ কথা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি।'

ঠাকুর পা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, 'দূর শালারা, চুপ কর। আমার মার কথার চেয়ে তোদের কথা বড় হবে? আমার মা বলে দিয়েছেন, সে কখনো ও রকম হতে পারে না, তার জীবনে যোষিৎসঙ্গ হবে না কোনোদিন। তার জন্যে ভাবতে হবে না তোদের। ফের যদি ও কথা বলিস তোদের মুখ-দর্শন করব না।'

কথা শুনে আনন্দে বুক ভরে গেল নরেনের। সত্য-দর্শী অন্তর্যামী ঠিক দেখতে পেয়েছেন তার অন্তরের মানচিত্র। তিনিই তাকে রক্ষা করবেন আমরণ।

কেউ যদি কখনো বলে, সে কি মশাই, এ তো নরেনও বলে, তখন ঝলসে ওঠেন ঠাকুর: 'এ তো নরেন বলে! নরেন বলতে পারে, তা বলে তুই বলতে যাসনি। তুই আর নরেন এক না।'

'আপনি নরেনকে এত ভালবাসেন কেন? নিজের ছোট হুঁকোয় করে নরেনকে তামাক খেতে দিলেন হুঁকোটা যে এঁটো হয়ে গেল!' আরেক জন কে নালিশ করলে ঠাকুরের কাছে: 'ও যে হোটেলে খায়। ওর এঁটো কি খেতে আছে?'

'ওরে শালা, তোর কি রে? নরেন হোটেলে খাক বা নাই খাক, তাতে তোর কি? তুই শালা যদি হবিষ্যিও খাস আর নরেন যদি হোটেলে খায়, তা হলেও তুই নরেন হতে পারবি নে।'

কেবল নরেন আর নরেন! নরেন যে আপনাকে গাল দেয় তার হিসেব রাখেন?

'নরেন আমাকে গাল দেয়, কিন্তু আমার ভিতরে যে শক্তি আছে তাকে সে মানে, তাকে সে গাল দেয় না।'

সে আশ্চর্য শক্তিই বরাবর রক্ষা করে এসেছে নরেনকে। সে শক্তিই তো ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী বংশীধ্বনি। নিরন্তর বেজে চলেছে বাতাসপ্রবাহে। শোণিতপ্রবাহে।

আমেরিকাতে একবার একটি মেয়েকে দেখে খুব সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল স্বামীজীর। কোনো মন্দ ভাব থেকে নয়, অমনি। ইচ্ছে হয়েছিল আরেকবার দেখি। দেখা হল আরেকবার। কোথায় সুন্দরী! দেখলেন একটা বাঁদরের মুখ!

স্বপ্নে কখনো স্ত্রীলোক দেখেননি স্বামীজী। একবার কিন্তু দেখে ফেললেন। একটি স্ত্রীলোক মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। ইচ্ছে হল ঘোমটা খুলে মুখখানি দেখি। যাই ঘোমটা খোলা, অমনি দেখেন ঠাকুর!

'অন্যেরা কলসী বটি, নরেন্দ্র জালা। অন্যেরা ডোবা পুষ্করিণী, নরেন্দ্র বড় দীঘি, যেমন হালদারপুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু বড় রুই, আর এরা সব পোনা, মৃগেল, কাঠিবাটা।' বলছেন ঠাকুর, 'নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়িতে তাই ডানদিকে বসে। আর ভবনাথের মেদি ভাব, ওকে তাই অন্য দিকে বসতে দিই।'

ওর বিষয়ে নালিশ করতে আসিস নে। ওকে আমার তামাক সাজতে পর্যন্ত দিই না, দিই না শৌচের জল বইতে। ও সব কাজের জন্যে অন্য লোক আছে। তোরা আছিস।

'আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—'

'কে নরেন্দ্র?' জিগগেস করলে প্রতাপ মজুমদার।

'ও আছে একটি ছোকরা।' বলতে লাগলেন ঠাকুর: 'আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, ছাখ, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছে হয় না কি, এই রসের সাগরে ডুব দিই! আচ্ছা, মনে কর এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস। তা হলে তুই কোনখানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। কেন, কিনারায় বসবি কেন? সে বললে, বেশি দূরে গেলে ডুবে যাব আর প্রাণ হারাব। তখন আমি বললুম, বাবা, সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নেই। এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড হয় না।'

দুটোর একটা করো। হয় পাগলামি ছেড়ে দাও, নয় তো ঈশ্বরের নামে পাগল হও।

নববৃন্দাবন প্লে হচ্ছে কেশব সেনের বাড়িতে। নরেন শিব সেজেছে। ঠাকুর দেখতে গিয়েছেন।

অভিনয়ের মধ্যেই ঠাকুর বলে উঠলেন, নরেনকে নেমে আসতে বলো। হ্যাঁ, ঐ বেশেই নেমে আসুক আমার সামনে। চোখের সমুখে দাঁড়াক একবার স্থির হয়ে, শিব হয়ে।'

নরেন ইতস্তত করছে। কেশব বললে, 'উনি যখন বলছেন তখন এস না নেমে।'

কে নামে, কে ওঠে!

নরেন অবতার মানে না, তাতে কি এসে যায়! এতে যেন আরো উথলে উঠেছে ঠাকুরের ভালোবাসা। নরেনের গায়ে হাত দিয়ে বলছেন, 'মান করলি তো করলি, আমরাও তোর মানে আছি রাই।'

ওরে, কতক্ষণ বিচার? নিমন্ত্রণ বাড়ির শব্দ কতক্ষণ শোনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই লুচি-তরকারি পড়ে, বারো আনা শব্দ কমে যায়। অন্যান্য খাবার পড়লে আরো কমতে থাকে। দই পড়লে তখন কেবল সুপসাপ। খাওয়া হয়ে গেলে নিদ্রা। তেমনি ঈশ্বরকে যত লাভ হবে ততই বিচার কমবে। তাঁকে লাভ হলে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হলে আর শব্দ বা বিচার থাকে না। তখন শুধু নিদ্রা—সমাধি।

নরেনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, মুখে হাত দিয়ে আদর করছেন আর বলছেন, 'হরি ওঁ! হরি ওঁ। হরি ওঁ।'

ক্রমশ বহির্জগতের হুঁশ চলে যাচ্ছে। একেই বুঝি বলে অর্ধবাহ্যদশা, যা শ্রীগৌরাঙ্গের হত। আশ্চর্য, এখনো নরেনের পায়ের উপর হাত, যেন ছল করে নারায়ণের পা টিপছেন। অত গা টেপা পা টেপা কেন? কেন কে বলবে! এ কি নারায়ণের পদসেবা, না, শক্তিসঞ্চার!

তারপর হাত জোড় করে বলছেন, 'একটা গান গা। নইলে উঠতে পারব কেমন করে? গোরা-প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা।' বলেই নিজে গান ধরছেন: 'দেখিস রাই, যমুনায় যে পড়ে যাবি! সখি, সে বন কতদূর। যে বনে আমার শ্যামসুন্দর। ঐ যে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যায়। আমি যে চলতে নারি—' উঠতে চেয়েই আবার বসে পড়ছেন। বলছেন, 'ঐ একটা আলো আসছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে আসছে আমাকে কে বলে দেবে! ধর একটা গান ধর—'

নরেন গান ধরল:

'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে
সপ্ত লোক ভোলে শোক, তোমারে পাইয়ে—
কোথায় আমি অতি দীনহীন!'

ঠাকুরের নেত্র নিমীলিত। দেহ স্পন্দহীন। সমাধিস্থ।

সমাধিভঙ্গের পর বলছেন বিহ্বল কণ্ঠে, 'আমাকে কে লয়ে যাবে?' সঙ্গীহারা বালক যেমন অন্ধকার দেখে তেমনি।

'কে যায় অমৃতধামযাত্রী, আজি এ গহন তিমির রাত্রি, কাঁপে নভ জয় গানে।' [ক্রমশঃ।

লেশ—কণা, বিন্দু, অল্প, কিঞ্চিৎ, মাত্র।
লেহন—জিহ্বাগ্রহণ, চাটন, চাটা।
লেহাই—লেই, মণ্ড, কাই।
লোক—জন, ব্যক্তি, মানুষ, জগৎ।
লোকতঃ—সর্ব্বতঃ, ব্যবহারতঃ।
লোকপাল—রাজা, ইন্দ্রাদি দশ দেবতা।
লোকবাদ—জনশ্রুতি, কিম্বদন্তী, জনরব।
লোকযাত্রা—লৌকিক ব্যবহার, মেলা।
লোকান্তর—পরলোক, পরকাল, মরণ।
লোকারণ্য—ভিড়, লোকযাত্রা, জনতা।
লোকালয়—পৃথিবী, মানুষের বাসস্থান।
লোকালোক—পৃথিবী-বেষ্টিত পর্ব্বত।
লোচন—(চক্ষু দেখ)।
লোটন—অবলুণ্ঠন, কপোত-বিশেষ।
লোটা—পিতলের জলপাত্র, ঘটী, টুক্নী।
লোটান—ফেলিয়া দেওন, বিলোড়ন।
লোড়া—পিষিবার প্রস্তরখণ্ড, ডলন, নোড়া।
লোণা—লবণাক্ত, ক্ষারযুক্ত।
লোপ—বিনাশ, ধ্বংস, অন্তর্ধান।
লোপ্ত্র—চৌর্য্যধন, লুঠ, লোৎ, স্তেয়।
লোভ—লিপ্সা, প্রাপ্তীচ্ছা, লালসা।
লোভনীয়—লোভের দ্রব্য, লোভ্য।
লোভী—লুব্ধ, লিপ্সু, লাভার্থী।
লোম—রোম, রোঁয়া, তনুরুহ, অঙ্গজ।
লোমকূপ—তনুকূপ, রোমের মূল।
লোমশ—সর্ব্বাঙ্গে রোমযুক্ত, কেশর।
লোমহর্ষ—পুলক, শিহরণ, লোমহর্ষ।
লোল—চঞ্চল, শ্লথ, অস্থির, কম্পমান।
লোলক—ঝুলিত, নাসিকাভরণ, নোলক।
লোলা—অভিলাষ, লিপ্সা, লক্ষ্মী।
লোলিত—ঝুলিত, শ্লথ, কম্পিত।
লোলুপ—অতিশয় লোভী।
লোষ্ট্র—ঢেলা, মৃৎখণ্ড, মৃৎপিণ্ড।
লোহ—অয়স্, লোহা, ধাতু-বিশেষ, লৌহ।
লোহকান্ত—চুম্বক পাথর, অয়স্কান্ত মণি।
লোহার—লোহকার, কর্ম্মকার, কামার।
লোহিত—রাঙ্গা, রক্ত, শোণিত, রুধির।
লৌকিক—লোকপ্রসিদ্ধ, চলন।
লৌকিকতা—ব্যবহার্য্যতা, বিদায়ী।
লৌহ—ঔষধ-বিশেষ।
শক—প্রাচীন জাতি-বিশেষ, শকাব্দের প্রবর্ত্তক, বছরের সংখ্যা-বিশেষ।
শকট—শকড়া, যান-বিশেষ।
শকরকন্দ—শর্করাকন্দ, রাঙ্গা আলু।
শকুন—শকুনি, শকুন্ত, শগুন, গৃধ্র।
শক্ত—দৃঢ়, কঠিন, সমর্থ, অদাতা, নির্দ্দয়।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

শক্তাই—বল, দৃঢ় ভাব, কাঠিন্য, শক্ততা।
শক্তিগ্রহ—বলগ্রহণ, সামর্থ্যজ্ঞান।
শক্তিমান—শক্তিবিশিষ্ট, বলবান।
শক্তু—ভাজা যবাদি চূর্ণ, ছাতু।
শক্য—যত্ন দ্বারা নিষ্পাদ্য, সাধ্য।
শক্রধনুঃ—ইন্দ্রধনু, মেঘধনু।
শঙ্কর—শুভঙ্কর, মঙ্গলদায়ক, শিব।
শঙ্কা—ভয়, ত্রাস, সঙ্কট, ভীতি, সাধ্বস।
শঙ্কাস্পদ—শঙ্কার বিষয়।
শঙ্কু—শেল, গোঁজ, কীলক, কাঁটা, খুঁট।
শঙ্খ—শাঁখ, স্ত্রীলোকের ভূষণ-বিশেষ।
শঙ্খক—এক শত খর্ব্ব, ভূষণ-বিশেষ।
শঙ্খিনী—বিশেষ লক্ষণাক্রান্তা স্ত্রী।
শচী—ইন্দ্রপত্নী, ইন্দ্রাণী।
শজারু—শল্লকী, পঞ্চনখী।
শজিনা—শজনা, শজন্যা, শোভাঞ্জন।
শটিত—বাসি, ছাতাপড়া, যাতযাম।
শটী—শঠী, বনহরিদ্রা, মূল-বিশেষ।
শঠ—ধূর্ত্ত, কুটিল, ক্রূর, দুষ্ট, বিটল।
শঠতা—ধূর্ত্ততা, কুটিলতা, দুষ্টতা, খলতা।
শড়ঙ্গা—শড়িঙ্গ্যা, ডিঙ্গী, দীর্ঘ, ক্ষীণ।
শড়া—সূক্ষ্ম, তনু, ক্ষুদ্র, ক্ষীণ।
শড়শড়ি—ভৃষ্ট, ভাজা ব্যঞ্জন-বিশেষ।
শণ—তৃণ বিশেষ, গাঁজ, পাট।
শণ্ড—ষাঁড়, ক্লীব, পণ্ড।
শণ্ডা—চাষা, মূর্খ, অজ্ঞান, অসভ্য।
শত—শতক, সংখ্যা-বিশেষ, এক শো।
শতধা—শত প্রকার, শতবিধ, শতরূপ।
শতপদী—কর্ণজলোকা, কেন্নো, বিছা।
শতভিষা—চতুর্ব্বিংশতি নক্ষত্র।
শতরঞ্জ—শতরঞ্জি, বিচিত্র সূত্রময় আসন।
শত্রু—রিপু, বিপক্ষ, অরি, বৈরী, দ্বেষ্টা।
শত্রুতা—রিপুতা, বিপক্ষতা, বৈরিভাব।
শনি—শনৈশ্চর, শনিগ্রহ, সপ্তম গ্রহ।
শনিবার—সপ্তাহের শেষ দিন, সপ্তম বার।
শম্বি—বিন্দু, বিপ্রুষ, শূন্য, অনুস্বার।
শনৈঃ—শনৈঃশনৈঃ, ধীরে, অল্পে।
শনৈশ্চর—সপ্তম গ্রহ, শনি, শনিগ্রহ।
শপথ—দিব্য, পণ, কিরা, প্রতিজ্ঞা।
শপ্ত—অভিশাপগ্রস্ত, মন্যুগ্রস্ত।
শপশপ্যা—আর্দ্র, শপ্‌শপে, ভিজা, সজল।
শফ—পশ্বাদির ক্ষুর, বৃক্ষমূল। [ক্রমশঃ।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দ্বিতীয় প্রবাহ

তৃতীয় তরঙ্গ

আসন

শস্যশ্যামল প্রান্তরে বিপুল কলোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত তরঙ্গভঙ্গময় নদী যেন অকস্মাৎ অজ্ঞাত মরুবালুকার তলদেশে হারাইয়া গেল। সকলে ভাবিল, নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমি জানিতাম উহা আমাদেরই অবহেলার পাপে অন্তঃসলিলা হইয়া ফল্গুধারায় বিরাজ করিতেছে। আমার অন্তঃকরণ তাহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিত। আমাকে মাটিতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া জলধারা যেখানেই আত্মগোপন করুক, আমি একথা প্রতিনিয়ত বিশ্বাস করিতাম, একদিন তাহা আবার আত্মপ্রকাশ করিবেই। মাটির আশ্রয় লাভ করিয়া আমি তাহার উপরেই তপস্যার আসন পাতিলাম, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা পাপক্ষালন করিতে হইবে। মাসিক মাত্র চল্লিশ টাকা বেতনে আসন দৃঢ় হইবার কথা নয়, সুতরাং কৃচ্ছ্রসাধন স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইয়া "বাধ্যতামূলক" হওয়াতে আমার মনের গ্লানি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের কৃপায় বিশ্বভারতীতে পুনরায় প্রুফ দেখার কাজে বহাল হইলাম বটে কিন্তু সে কাজ তো নির্বেতন আপ্‌খোরাকী। দেবদ্বিজে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, স্বভাব ও বয়োধর্মে একমাত্র নারী-শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতাম, সেই ঘোরতর দুর্দিনে কাজেই তাঁহারই বন্দনা রচনা করিলাম :

"......পূর্ণ আজি অনন্ত নিখিল
তব স্নেহের সুধাধারে। অন্তরের প্রতিবিন্দু রক্তকণাদানে
জীয়াইয়া রাখো তুমি শুষ্ক শীর্ণ পুরুষ-পাদপে; সে ত নাহি জানে
কোথা কোন্ অন্ধকার ভূমিবক্ষ হতে লুব্ধপ্রেমে করে আহরণ
আপন জীবনীরসধারা। অন্তঃপুর অন্তরালে রহিয়া গোপন
কে জোগায় প্রাণের পীযূষ! কত স্নেহ, কত ব্যথা, শঙ্কা দ্বিধা কত
বিনিদ্র রজনী, অনাহার, দেবতা দুয়ারে শত প্রার্থনা নিয়ত
আজন্ম রেখেছে তারে ঘেরি! সে কি জানে কভু হায়, নিয়ে কত ব্যথা
বাহিরে পাঠাল তারে সংসারের জয়যাত্রা পথে আর্ত্ত ব্যাকুলতা
জননীর! নিস্ফল ক্রন্দনে দীর্ণ করি জীর্ণবক্ষ দেবতা চরণে
জানায়েছে করুণ মিনতি। উল্লাসে যে ছুটে চলে মরণ বরণে
সে কি জানে প্রেয়সীর নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণা মরণ অধিক,
সে কি জানে ভগিনীর অশ্রু ছলছল; কত শুষ্ক শূন্য চারিদিক
জননীর নয়নে বিরাজে? সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে আজো তুমি নারী
অন্তরালে রয়েছ গোপনে, আঁধার মৃত্তিকা হ'তে সঞ্জীবনী-বারি
যুগে যুগে করিছ প্রদান।......"

পূর্বেই বলিয়াছি, ১৩৩১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে দীর্ঘ "নারী" কবিতাটি প্রকাশিত হইল এবং আমার অন্তরের গভীর আবেদন ব্যর্থ হইল না। ভ্রাতা যখন বন্ধুত্ব ও অতি-পরিচয়ের দরুণ কিংকর্তব্য-বিমূঢ়, অন্তরাল হইতে ভগিনী তখন কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করিলেন; আমি অচিরাৎ চল্লিশ টাকা হইতে মাসিক পঁচাত্তর টাকাতেই শুধু উন্নীত হইলাম না, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার স্থায়ী পোক্ত সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়া জীবনে ও সাহিত্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলাম।

শান্তা দেবীকে লইয়া শান্তিনিকেতন পৌঁছিয়াছিলাম ১৩৩২ বৈশাখের মাঝামাঝি; গিয়াই দেখি, রবীন্দ্রনাথের ৬৫তম জন্মদিন উপলক্ষে বিপুল আনন্দের আয়োজন চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে দলে দলে ভক্তেরা আসিতেছেন, শান্তিনিকেতন সরগরম; 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক তখনও পর্যন্ত আমার বিস্ময় শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সহিত অন্তরঙ্গ হইবার কারণ ইতিমধ্যে ঘটিয়াছিল, "নূতন কথামালার গল্প" লইয়া শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা রূপে তিনি

গত মাঘ সংখ্যায় অনবধানতাবশত "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন" শুধু "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল মহাশয় আমার অনভিজ্ঞতাপ্রসূত একটি ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গত শ্রাবণ সংখ্যার কিস্তিতে আমি লিখিয়াছিলাম, "আমাদের সময়েই সর্বপ্রথম স্কটিশ চার্চে'স কলেজে ছাত্রী সমাগম আরম্ভ হয়। তৎপূর্বে সিটি কলেজে অধ্যাপকদের অন্তরালে ব্রাহ্ম-ছাত্রীরা কিছুদিন পড়িয়াছিলেন, শুনিয়াছিলাম।" সান্যাল মহাশয় জানাইয়াছেন, ১৯০৮-১০ সালে তিনি যখন স্কটিশে বি-এ ক্লাসের ছাত্র তখন মোসেস অ্যালটন নাম্নী একজন ইহুদী ছাত্রী তাঁহার সহপাঠিনী ছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজেও ১৯০০-০১ সালে শ্রীমতী মেনী রায়, অমিয়া রায় এবং ১৯০১-২ সালে শ্রীমতী উষা ঘোষ বি-এ পড়িতেন। সান্যাল মহাশয় বিবিধ তথ্যের ডিপো, সুতরাং নির্বিচারে তাঁহাকে মানিয়া লইতেছি।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র আসরে সপ্তদশ (১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৩১) হইতে পর পর কয়েক সংখ্যায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এবারেও মুরুব্বি পাকড়াইলাম। মাত্র মাসাধিক কাল আগে রবীন্দ্রনাথের সহিত কতকটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ব্যাকুলতা ছিল না। এবারে প্রমথনাথ ও কালিদাস নাগকে ধরিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও ক্ষিতিমোহনের সহিত পরিচিত হইলাম। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সেখানেও সর্বময় কর্তা, সুরুল-শ্রীনিকেতনে তৎপ্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান-সম্মত কৃষিকার্য মহাসমারোহে চলিতেছিল, স্বদলবলে তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। একজন উৎসাহী সংবাদদাতা সংবাদ দিলেন এই নবপদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিলাতী বেগুন পিছু খরচা পড়িয়াছে কয়েক আনা করিয়া। কৌতুক বোধ করিলাম; সেই দিনই আমার মনে পরবর্তী কালে রচিত "হসন্ত তরফদার" গল্পের গোড়া পত্তন হইল। পরে আরও উপকরণ জুটিয়াছিল।

বিগত দোলপূর্ণিমার দিন (২৬ ফাল্গুন, ১৩৩১) বসন্ত উৎসবের মধ্যে 'সুন্দর'কে সঙ্গীতে বরণের মনোহারী আয়োজন কালবৈশাখীর অকাল-অভ্যাগমে ব্যর্থ হইয়াছিল। শুনিলাম, বর্ষশেষের দিন সেই 'সুন্দর'-বরণ সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। 'সুন্দর'—তেরটি সঙ্গীতের মালা, তন্মধ্যে এগারটিই নূতন রচিত। আরও সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সর্বসাধারণের জন্য নহে। শ্রীমতী রাণী মহলানবিশকে লক্ষ্য করিয়া রচিত একটি গানের নিম্নোদ্ধৃত প্রথম দুই পংক্তি লইয়া আমরা খুবই হুল্লোড় করিয়াছিলাম—

> "চৈত্র-রজনী আজ যাবে অ-ফলা,
> বিরহিণী-রূপে ব'সে প'য়ে র'ফলা।"

বলা বাহুল্য প্রশান্তচন্দ্র সেই বসন্তোৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, সুন্দরের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য আমরা কবির নিকট আবেদন জানাইলাম। আবেদন মঞ্জুর হইল। কবির জন্মদিনে সকাল সাড়ে সাতটায় উত্তরায়ণেরও উত্তরে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকী অর্থাৎ "পঞ্চবটী" রোপিত হইল, সন্ধ্যায় কলাভবনে মেয়েদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয়ান্তে 'সুন্দরে'র গান হইল। মুগ্ধ হইয়া গেলাম, গান শুনিতে শুনিতে এই চিরপুরাতন পৃথিবীর এক চির নূতন রূপ যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। সেইদিনই প্রথম শুনিলাম—

> "আজ কি তাহার বারতা পেলরে কিশলয়?
> ওরা কার কথা কয় বনময়?…"

এবং

> "কুসুমে কুসুমে চরণ-চিহ্ন
> দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
> ওহে চঞ্চল; বেলা নাহি যেতে
> খেলা কেন তব যায় ঘুচে…"

সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম এই "কিশলয়ের বারতা" ও "কুসুম-চরণ-চিহ্নে"র গানের উৎস কবিকে ও আমাকে একই সঙ্গে স্পর্শ করিয়াছিল; আমার নাড়া খাওয়া মন "অগ্নি-দূত"কে আহ্বান করিয়াই শান্ত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন 'সুন্দরে'র অজস্র গান। আলিপুর হাওয়া আপিসের অরণ্যময় পরিবেশই যে এই উৎস তাহা প্রমথনাথের সম্পাদকীয় দপ্তরে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষের ভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশ দৃষ্টে বুঝিতে পারিলাম:

> "এবার অসুস্থ শরীর নিয়ে মৃত্যুর পশ্চিম কূলে বসে ম্লান প্রাণের আলোকে অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা থেকে দূরে আপনাকে ও বিশ্বকে দেখবার অবকাশ পেয়েছিলুম। কলকাতায় যেখানে ছিলুম সেখানে সহরের পাথরে-বাঁধানো শুষ্কতা ছিল না, চারদিক গাছপালায় ছিল শ্যামল। সেখানে এবার অনেকদিন পরে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন স্পর্শ করে দেখতে পেলুম। হঠাৎ গাছপালার তন্দ্রা ছুটে গেল, বিশ্বযজ্ঞের নিমন্ত্রণ তাদের কাছে এসে পৌঁছল, সাজসজ্জার সাড়া পড়ে গেল; ফিকে সবুজে, গাঢ় সবুজে, নীলে লালে সোনালীতে প্রত্যেকে নিজের বিশেষত্ব নিয়ে আনন্দিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে এল; দেখে আমার মন পুলকিত হয়ে উঠল। কোথা থেকে এ ডাক এল; যার সাড়া সমস্ত পৃথিবীর বুক থেকে উঠছে! আকাশের কোন্ গূঢ় অলক্ষ্য চঞ্চলতা দক্ষিণ হাওয়াকে ব্যাকুল করে তুলেছে। তরুলতার প্রাণশক্তি রূপের লীলায় দিকে দিকে বিচিত্র হয়ে উঠল। প্রত্যেক গাছ আপনার স্বরূপকে পরিস্ফুট করে তুলচে। প্রাণ যেখানে আপন বিশেষত্বের ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানে তার অকৃপণ দাক্ষিণ্য, সেইখানে সে বিশ্বকে উদারভাবে আহ্বান করে। একধারে অশ্বত্থ, তারি পাশে শিরিষ, তারি পাশে কাঞ্চন—তারা সকলেই রূপে স্বতন্ত্র অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণতাতেই তাদের পরস্পরের ভাবের মিল। আকাশ-বীণার একই আলোকের সুরে তাদের নিজ নিজ বিভিন্ন রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠচে। অরণ্যব্যাপী প্রাণের আনন্দ-সঙ্গীতে তাদের অবিরোধ মিলন। প্রত্যেক গাছ আপনার বিশেষ আতিথ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আপন আত্মীয়তা জানাচ্ছিল। তা না হলে গাছ দেখে আমার মনে কোনো ভাব আসত না। যখনই সে নিজেকে পূর্ণ করলে, তখনই সে আমাকেও আহ্বান করলে—তার আপনার পূর্ণতা আমারও পূর্ণতাকে উদ্বোধিত করলে।"

নূতন ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আমিও কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং আসিয়াই পূর্বোল্লিখিত উন্নত বেতন ও পদমর্যাদার দ্বারা সম্মানিত হইলাম। 'প্রবাসী'-কার্যালয়েই কাজের বহর এত বাড়িয়া গেল যে বিশ্বভারতীর সেবা কদাচিৎ করিতে পারিতাম। একদিন সেখানে গিয়া শুনিলাম রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্যগ্রন্থ 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে প্রধানত 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র কবিতাগুলি লইয়া। আমার অনুলিখিত ডায়ারির শেষাংশও জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছে সুতরাং পুস্তকাকারে প্রকাশের বাধা নাই। প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ নয় বৎসর-কাল কবির কোনও কাব্যগ্রন্থ বাহির হয় নাই, সেই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'বলাকা' প্রকাশিত হইয়াছে; 'পলাতকা' (১৯১৮) এবং 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২) অবশ্য হিসাবের মধ্যে ধরিতেছি না। নূতন কবিতা-গুলির সঙ্গে কাজেই পুরাতন, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবিতাগুলিও ছাপাইবার প্রস্তাব হইল। আধুনিক পুরাতন খুঁজিতে খুঁজিতে অতি পুরাতন অনেকগুলি কবিতাও আবিষ্কৃত হইল—অনেকগুলি স্বদেশী আমলের বিখ্যাত কবিতা—যাহা এতাবৎকাল পরিত্যক্ত হইয়া আসিয়াছে। আমার খাতায় নকল ছিল, আমিই সেগুলি সরবরাহ করিলাম। বইখানির তিনভাগ হইল, "পূরবী"-অংশে হালী পুরাতন কবিতা, "পথিক"-অংশে নূতন ডায়ারির কবিতা এবং "সঞ্চিতা"-অংশে হারাইয়া যাওয়া পুরাতন কবিতা। কলিকাতা বিশ্ব-ভারতী আপিসের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়া শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি 'পূরবী' বাহির হইল। যথাসময়ে এককপি হাতে পাইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল। অসংখ্য ভুল এবং বিশ্রী ভুলে ভরা বইখানি আমার শিরঃ-পীড়ার কারণ হইল। রবীন্দ্রনাথ তখন যোড়া-সাঁকোতেই ছিলেন। অবিলম্বে সংশোধিত কপিখানি সরাসরি তাঁহার নিকট দাখিল করিলাম। তিনি অতি সংযত ধীরস্থির পুরুষ; সেদিন দেখিলাম রাগে আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং তখনই কাহাকে যেন ডাকিয়া বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের মুণ্ডপাত করিতে করিতে হুকুম দিলেন, সব আগুনে পুড়িয়ে ফেলে নতুন ক'রে ছাপাও। এই সকল ভুলের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব অনবধানতা দুই এক ক্ষেত্রে ছিল, সেগুলির প্রতিও আমি সভয়ে ও সাবধানে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। এই ধরণের ভুল কবি মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক, সুতরাং সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা দোষের হইবে না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিয়োগে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন এবং যাহা রামমোহন লাইব্রেরিতে স্বয়ং পাঠ করিয়া-ছিলেন তাহাতে গোড়াগুড়ি এই পংক্তি কয়েকটি ছিল:

> "সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
> আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
> দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত; কাননের পল্লবে কুসুমে
> রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার।..."

আঠারো অক্ষরের পয়ার। পয়ারের ধর্ম অনুযায়ী চার বা আট অক্ষরের পরে যতি স্বাভাবিক ও নিরাপদ। ছয় বা দশ অক্ষরের পর যতি দিতে গেলেই বিপদ অনিবার্য; "দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত..." পংক্তিতে সেই বিপদ ঘটিয়াছে, যতি পরি-বর্তনের ফলে দুইটি অক্ষর আপনা হইতেই বাড়িয়া গিয়া পংক্তিটি কুড়ি অক্ষরে দাঁড়াইয়াছে। ইহা ভুল। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেও কয়েকবার এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন, 'পূরবী'তেও অন্যত্র এই ভুল ঘটিয়াছে। অমন যে ছন্দ-সাবধানী মোহিতলাল, তিনিও 'বিস্মরণী'র "সুইনবার্নের অনুসরণে" কবিতায় যতিভঙ্গের জন্য এই অক্ষরাতিশয্যদোষ এড়াইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ আমারই 'পূরবী'তে স্বয়ং এই সংশোধন করিলেন—

> "দিয়ে গেলে গীতচ্ছন্দ; কাননের পল্লবে কুসুমে"...

পরবর্তী সংস্করণ ছাপিবার সময় আমার বইখানিই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অন্য সকল ভুল আদর্শানুযায়ী সংশোধিত হইলেও "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" কবিতার এই পংক্তি সংশোধিত হয় নাই, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তেও ভুল থাকিয়া গিয়াছে। "গ্রন্থ-পরিচয়ে" শ্রীপুলিন সেন অবশ্য ভুলটির উল্লেখ করিয়া অন্য সংশোধন দিয়াছেন।

শ্রীনিকেতনে কৃষিকর্মের মত আর একটি কঠিন ও কৌতুককর কাজে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কলিকাতার বিশ্বভারতী আপিসেই হাত দিয়াছিলেন—গণভোটের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিচার। তাঁহার অদম্য ষ্ট্যাটিসটিক্স্-বুদ্ধি এই ধরণের "একটা নতুন কিছু করা"র দিকে তাঁহাকে এই কালে অবিরত

প্ররোচিত করিতেছিল; তিনি বিশ্বভারতীর উপর দিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাইতেছিলেন। এই পরীক্ষা যদি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারেই শেষ হইত তাহা হইলেও রক্ষা ছিল। তিনি ভোট-মাহাত্ম্য বিচারে তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ 'চয়নিকা' ছাপিতে বসিলেন। আমরা প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম কিন্তু ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ কখনও যুক্তি মানে না। ফাল্গুন মাসে (১৩৩২) সেই বিপুলকায় বিচিত্র 'চয়নিকা' বাহির হইয়া রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করিয়াছিল, কিন্তু ইহার প্রতিকারে তাঁহাকে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে তাঁহার 'স্বয়ং'-নির্বাচিত 'সঞ্চয়িতা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিয়া কবি গণ-'চয়নিকা'র সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করেন।

বাহিরের সঙ্গে সংযোগ আমার আর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, 'প্রবাসী' কার্যালয়ই আমাকে ধীরে ধীরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিতেছিল। মাসিক পঁচাত্তর টাকা তখন আমার প্রয়োজনের অতিরিক্তই মনে হইয়াছিল। বাবা, মা বা অপর কেহ আমার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না, গৃহিণী ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত কখনও ধানবাদে মাতুলালয়ে, কখনও শ্যামবাজারে পিত্রালয়ে দোল খাইয়া ফিরিতেছিলেন। আকস্মিক সমৃদ্ধির মোহে সংসার পাতিবার বাসনা স্বতঃই হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেসে আমাকে আর যেন ধরে না, এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের অপঘাত-মৃত্যু এবং মোহিতলাল মজুমদারের মেস-ত্যাগেও মনটা উদাস হইয়াছিল। বিপিনবাবুর চায়ের দোকানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, কথায় কথায় জানিলাম তাঁহাদের বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়ির নীচের অংশ ভাড়া দেওয়া হইবে। মাসিক ভাড়া ত্রিশ। একা অতখানি সামলাইতে পারিব না ভাবিয়া শিল্পীবন্ধু এবং মেসের রুমপ্রতিবেশী শ্রীহরিপদ রায়ের সঙ্গে একযোগে বাড়ি ভাড়া লইব স্থির হইল। তখন আমার আসবাব ও বইয়ের সংখ্যা নিতান্ত মন্দ নয়; হরিপদ রায় তো চিরকালই খুদে লাট। আমার জীবনে যে তিন জন খাঁটি অ্যারিষ্টক্র্যাটকে আমি দেখিয়াছি তিনি তাহার অন্যতম ও প্রথম। তাঁহারও লটবহর বড় কম নয়। একদিন প্রাতে আমাদের মালবাহী ক্যারাভান বাদুড়বাগান লেন হইতে বাহির হইয়া আপার সার্কুলার রোড অতিক্রম করিয়া রামমোহন রায় রোড ধরিয়া বাহির মির্জাপুরের দিকে চলিল, পিছনে পিছনে জলভরা কুঁজা হস্তে আমরা দুই হাফ গৃহস্থ পরস্পর সহযোগে পুরা গৃহস্থালী পাতিতে চলিলাম। হঠাৎ আমার পিছনে টান পড়িল। ফিরিয়া দেখি আমার বাঁকুড়া কলেজ হষ্টেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিরণচন্দ্র দত্ত, উস্কখুস্ক রুক্ষ বেশ; আমার প্রশ্নাতুর বিস্মিত দৃষ্টির কোনও জবাব সে দিল না; কোনও রকমে শ্রান্ত দেহ টানিয়া নীরবে আমার পশ্চাদ্ধাবন করিল। চার নম্বর বাহির মির্জাপুর রোডে আমরা তিনটি প্রাণী একতলায় অধিষ্ঠিত হইলাম। কিরণচন্দ্র কুচবিহারের দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র, চারুচন্দ্র দত্ত আই. সি. এসের খুল্লতাতপুত্র; চারু বাবুদেরই কলিকাতা গঙ্গাধর বাবু লেনের বাড়িতে আরাম-আলস্যে থাকিয়া সে লেখাপড়া করিতেছিল। কিরণেরই সম্পর্কে চারুচন্দ্র দত্তকে আমি দাদা বলিতাম, তিনিও কনিষ্ঠবৎ আমাকে স্নেহ করিতেন। বুঝিলাম, পারিবারিক কলহের ফলেই কিরণ দেওয়ানা হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। তাহাকে আর ঘাটাইলাম না, চুপচাপ নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে দিলাম।

হরিপদ রায়ের চেষ্টায় গোবিন্দ নামধেয় এক মন্ত্র-দেশীয় কমবাইণ্ড্‌হ্যাণ্ড জুটিল, সেই একাধারে আমাদের ঠাকুর চাকর ঝি দারোয়ান সব। হরিপদ রায় স্বয়ং অত্যন্ত সুগৃহিণী, রন্নায় দ্রৌপদী বলিলেও হয়। তিনি একদিন গুরুতর একটা ভোজের আয়োজন করিলেন। তাঁহার গৃহিণী দূর বরিশালে শ্বশুরালয়ে ছিলেন; তাঁহার এক শ্যালিকা এবং আমার গৃহিণী সেই ভোজে আমন্ত্রিত হইয়া আমাদের সংসারাশ্রমের গোড়াপত্তন করিলেন। কিরণ তখনও অবিবাহিত সুতরাং সে বৈঠকখানায় রহিল। সেই প্রায় "ব্যাচিলার্স ডেনে" অকস্মাৎ নারীসমাগম হওয়াতে পাড়ায় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।

'শনিবারের চিঠি'র পরবর্তী পুনর্জীবনে এই হরিপদ রায়ের স্থান প্রায় সর্বাগ্রে; ইনি বর্তমানে একজন প্রসিদ্ধ কমার্সিয়াল আর্টিষ্ট কিন্তু গোড়ায় অবিরত উৎকৃষ্ট কার্টুন আঁকিয়া মাসিক 'শনিবারের চিঠি'কে মাসে মাসে ইনি সমৃদ্ধ না করিলে ইহার এত দ্রুত প্রতিষ্ঠা হইত না। আমাদের লেখার

সঙ্গে রেখায় ইনি সমানে তাল রাখিয়া চলিবার ক্ষমতা রাখিতেন। 'শনিবারের চিঠি'র মাসিক প্রথম পর্যায়ে ইনি শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। নব পর্যায়ে ফেনী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (পি সি এল ও কাফী খাঁ নামে খ্যাত) হরিপদ রায়ের স্থলাভিষিক্ত হন। আমারই আকর্ষণে তিনি অধ্যাপনা ছাড়িয়া শুধু কার্টুন শিল্পী হিসাবে কলিকাতার সাময়িকপত্র জগতে ভাগ্যপরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং অশেষ যোগ্যতার সহিত আজ এই পথেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। এই দুই শিল্পীর কথা যথাসময়ে বলিব।

আমার এই বাহির মির্জাপুরী জীবনের একটি প্রায় নিখুঁত চিত্র "গল্প" নাম দিয়া ১৩৩২ সালের পৌষের 'প্রবাসী'তে বাহির করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, এখানে বেশিদিন আমাদের থাকা হয় নাই। কেন হয় নাই তাহার কারণ সেই "গল্প" হইতেই একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"পেয়ালার [চায়ের] ঠন্‌ঠন্ যত দ্রুততর এবং সিগারেটের ধোঁয়া যত নিবিড়তর হইতে লাগিল, মাসিক ৭০৲। ৭৫৲ টাকা কোথায় ফুঁকিয়া গিয়া দেনার অঙ্ক ততই ভারী হইতে লাগিল এবং একদিন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বোধোদয় হইল। ভাবিলাম এ লাটীয় চাল চলিবে না—পুনর্মূষিক হইতে হইবে। মেস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার করিতে গেলাম, তিনি খুব একচোট ধমকাইয়া লইয়া বাড়ী এবং চাকর ছাড়িয়া দিয়া বাগবাজারে [শ্যামবাজারে] তাঁহার কেয়ারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমি সেইটাই সুবিধা ও লাভজনক ভাবিয়া যতীনকে [বাড়িওয়ালা] নোটিশ দিলাম। গোবিন্দকেও অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করিতে বলিলাম।"

আশ্বিন মাসের (১৩৩২) মাঝামাঝি এই ঘটনা ঘটিল। হরিপদ রায় বরিশালে পূজাবকাশ যাপন করিবার জন্য চলিয়া গেলেন, কিরণও ছুটিতে দেশে গেল। আমি দিনাজপুর হইতে হঠাৎ তারযোগে মায়ের নিদারুণ অসুখের সংবাদ পাইয়া ছুটি লইয়া সেখানে চলিয়া গেলাম। আমাদের সাধের সংসার সূত্রপাতেই ছারখার হইল।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র মরুবালুতলে প্রথম অন্তর্ধানের (৯ ফাল্গুন, ১৩৩১) পর ১৩৩২এর আশ্বিন পর্যন্ত এই আটমাস কালে সাহিত্যের দিক দিয়া আমার অনেক লাভ হইয়াছিল—অধিকাংশই মোহিতলালের দৌলতে, একটি শুধু শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু মহাশয় ছিলেন আমার শ্বশুর মহাশয়ের প্রতিবেশী। প্রায় সামনা-সামনি ঘর। দুই বাড়িতে নিত্য যাতায়াত ছিল। বসু মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী আমার গৃহিণীকে নাত্‌নি বলিতেন, আমি হইলাম তাঁহাদের নাতজামাই। রসরাজ বহুদিন আমাকে ধরিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের আড্ডায় লইয়া যাইতেন। বহু পুরাতন কাহিনী, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক ব্যাজস্তুতি-মূলক কথা তাঁহার নিকটে শুনিতে পাইতাম। যে বার শেষ জেলেপাড়ার সং হয় সে বার আমরাই দুই জনে মিলিয়া সঙের গানগুলি লিখিয়াছিলাম; দাদাশ্বশুর-নাতজামায়ের সম্পর্ক ইহা দ্বারা ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল। এই কালে অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র যখন ফল্গু-অবস্থা তখন তিনি আধুনিক প্রেমের কবিতা পাঠে অপ্রসন্ন হইয়া "শ্রীকবরীরঞ্জন গাংগার্জি" এই বেনামে কয়েকটি অতি সাংঘাতিক ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়া আমাকে প্রকাশার্থ দিয়াছিলেন। সেগুলি প্রকাশ করিতে পারি নাই, একটি মাত্র আজও আমার সংগ্রহে আছে, নাম "দুলীনী-দোলন"; সবটা ছাপিবার সাহস নাই, শেষ চারিটি পংক্তি এই—

"মশানে, গঙ্গালে বুঝি তাজা ভালবাসা—
কালো-কোলো দুলীনীর এই যাওয়া-আসা।
পোয়েটিক প্রেম লিখি ঢেলে দিয়ে দেল,
হই-হবো হই-হবো ম্যাট্রিক্ ফেল।"

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মোহিতলাল আমাকে একরকম হাতে ধরিয়া ইঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন; আর একটি বিচিত্র মানুষের সহিত তাঁহারই দৌলতে আলাপ হইল—তাঁহার অতিপ্রিয় ছাত্র শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী। প্রথম দর্শনে করুণানিধানের যে ভাবে-ভোলা দিগম্বর মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার পর পূরা আটাশ বৎসর পার হইতে চলিল, তিনি এখনও ঠিক তেমনিটি আছেন। যে উত্তপ্ত সমাদরে তিনি সেদিন আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া "ভাই সজনী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, আজিও উত্তাপ সমান আছে,

সমাদরের এতটুকু ব্যত্যয় হয় নাই। কাব্যই জীবন—ইহা তাঁহার মধ্যে যেমন দেখিয়াছি এমন আর কাহারও মধ্যে নহে। তিনি অত্যন্ত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুসন্ত শ্রেণীর মানুষ, অথচ খাঁটি কবি; ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার কান যেমন একদিকে নিখুঁত যন্ত্রের মত কাজ করে তেমনি অন্যদিকে তাঁহার মন ভাব সম্পর্কে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে, যেখানে ভাবের স্পর্শ নাই সেখানে কবিতা তাঁহাকে স্পর্শ করে না; শুধু ছন্দের ঝঙ্কার তাঁহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে—এ বিষয়ে তাঁহার বিচার অতিশয় নির্মম ও কঠিন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচি মহাশয়কেও ভাল লাগিয়াছিল। প্রথম পরিচয়েই তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম, এইটুকুও বুঝিয়াছিলাম, তিনি হিসাবী ভদ্রলোক। তাঁহার কাব্যবুদ্ধি তাঁহার বিষয়বুদ্ধিকে কখনই পরাভূত করিতে পারে নাই। দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে তাঁহার মান-অভিমান অনেক সময় পীড়াদায়ক বলিয়া ঠেকিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার অনাবিল কাব্য ও সাহিত্যপ্রীতি আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার সান্নিধ্যে আমি খুব বেশি আসি নাই কিন্তু যখনই গিয়াছি তিনি দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহনেরই মিতা সুবাদে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সহিত আমাদের পরিচয়। তাঁহার কাব্যে যেমন একটা বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততা সুপরিস্ফুট, মানুষটির মধ্যেও তেমনি উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি নাই, তাঁহার মুখের শান্ত সংযত মৃদু হাসি তাঁহার উদাসীন নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও আমাদের আকর্ষণ করিত। এই সংসার-মরুভূমিতে তিনি 'মরীচিকা', 'মরু-মায়া' ও 'মরু-শিখা' দেখাইয়া হয়তো আমাদিগকে নির্ভয় হইতে বলিয়াছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই তাঁহার বিজ্ঞান দর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, যে দুর্জ্জেয় শক্তির বিরুদ্ধে 'মরীচিকা'য় "ঘুমের ঘোরে" তাঁহার অভিযান, বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিতে পাইতেছি তিনি শেষ জীবনে ধীরে ধীরে সেই শক্তিরই নিকট ধরা দিতেছেন, অবশ্য তাঁহার সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতির (হাতুড়ে অনুসন্ধান নয়!) দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া বুঝিয়া। উত্তরপাড়া-ভদ্রকালীতে করুণানিধান, উজানী-কোগ্রামে কুমুদরঞ্জন, কলিকাতা-টালিগঞ্জে কালিদাস এবং বহরমপুর-খাগড়ায় যতীন্দ্রনাথ বাংলার হাজার বছরের পুরাতন কাব্যাকাশের অস্তাচলচূড়া এখনও রাঙাইয়া রাখিয়াছেন, ইহাও আমাদের সৌভাগ্য।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তাঁহার সৌজন্য ও শালীনতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একত্রে এমন ভদ্রতা, সাহিত্যবুদ্ধি, রুচিবোধ ও সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতি রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে আর কোনও বাঙালী সাহিত্যিকের মধ্যে দেখি নাই। তাঁহার মাথা হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক কষ্টসহিষ্ণুতার সাক্ষ্য বহন করিত কিন্তু তাঁহার মুখের প্রসন্ন হাসি ক্ষণেকের তরেও মিলায় নাই। তিনি যে জাপানে কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার রচিত 'জাপান' ও 'চিত্রবহা'য় যতটুকু আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, তাঁহার আতিথেয়তায়, তাঁহার গৃহশ্রীতে, তাঁহার ধূপদীপের সুন্দর সন্নিবেশে। তিনি খুব ধীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাঁহার উচ্চকণ্ঠ কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি তখন তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'চিত্রবহা' রচনা করিতেছেন, আমরা সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়া একটু একটু করিয়া শুনিতেছি, সঙ্গে আহার্যের যে সামান্য আয়োজন থাকিত পরিবেশন-পারিপাট্যে তাহা পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিত। আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সহিত আমি এখানেই প্রথম পরিচিত হই। দেবীপ্রসাদ অশোক চট্টোপাধ্যায়েরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং আমাদের পরস্পর অন্তরঙ্গ হইতে বিলম্ব হয় নাই। দেবী-প্রসঙ্গ আমার জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া আছে, যথাস্থানে তাহা নিবেদন করিব।

সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুর দিনটি আমার মনে পড়ে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—বাতি দুই দিকে জ্বলিয়া দ্রুত নিঃশেষ হওয়ার কথা; দেখিলাম, তিনিও দুই দিকে জ্বলিয়া দ্রুত ফুরাইয়া গেলেন। বর্দ্ধিষ্ণু পিতার সন্তান তিনি, পিতার সহিত সত্য ও নীতি লইয়া সংঘর্ষ বাধিয়াছিল কিন্তু তিনি সত্যচ্যুত হইয়া পিতার আশ্রয়ে বাস করেন নাই, বীরের ন্যায় তাঁহার সত্যকে লইয়াই পৃথক হইয়াছিলেন। অনেক দুঃখ পাইয়াছেন কিন্তু কখনও অনুশোচনা করেন নাই। চাকুরি করিয়াছেন এবং সামান্য অবসর কালে সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন; বাহিরে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করেন নাই, অন্তরে বাণীর আশীর্বাদ

পাইয়াছিলেন কিনা তিনিই বলিতে পারেন। আমরা তাঁহার মধ্যে একজন আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্যিককে পাইয়া শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে তাঁহাকে অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। হয়তো ইহাই তাঁহার নীরব সাধনার নীরব পুরস্কার।

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীকে বিচিত্র মানুষ বলিয়াছি। বেঁটেখাট মানুষটি অথচ বিদ্যার জাহাজ। সাত সমুদ্র তের নদীর খবর তাঁহার নখাগ্রে ছিল, ফরাসী সাহিত্যের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত এবং সারা পৃথিবীর সামরিক বিদ্যার তিনি ছিলেন মানোয়ারী জাহাজ। তাঁহার ভাল-লাগা এবং মন্দ-লাগা গুরু মোহিতলালের মতই অতি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ছিল; একটু খামখেয়ালি প্রকৃতির ছিলেন, বিপুল সমারোহে কাজ আরম্ভ করিয়া মধ্যপথে থামিয়া যাওয়া তাঁহার একটা বিলাস ছিল; আরম্ভ করিয়া তিনি শেষ করিতেন না, গাছে উঠিয়া নিজেই মই ফেলিয়া দিতেন। তখনই ইউরোপীয় জ্ঞান ও আদর্শকে এত উচ্চে স্থান দিতেন যে দেশের সব কিছুর প্রতি একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব তাঁহার কথায় বার্তায় প্রকাশ পাইতেছিল। এই ভাবেরই চরম পরিণতি তাঁহার 'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান'। মনোরথের উত্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে পতনের ফলে অর্থাৎ ফ্রাস্ট্রেশনের ফলে তাঁহার চিত্ত বিষাক্ত হইয়া তাঁহাকে কাজে কর্মেও খর্ব করিয়াছিল নতুবা তাঁহার মত হিমালয়-প্রতিভা হ্রস্ব বিন্ধ্যাগিরি হইয়া কখনই থাকিতেন না; নিশ্চয়ই তাঁহার সাধনার দ্বারা স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বসাহিত্যকে প্রসন্ন করিতেন, আঘাত করিয়া উল্লাস করিতেন না। তিনি পরবর্তী কালে 'শনিবারের চিঠি'র কর্ণধারগণের অন্যতম প্রধান হইয়াছিলেন। তাঁহার সরস বিদ্যাবত্তার ফলে ইহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল কিন্তু তিনি কখনই 'শনিবারের চিঠি'র আপন হইতে পারেন নাই। তাঁহার বিদ্যা ও প্রতিভার কথা যথাসময়ে আসিবে।

মাটি পাইলাম, মাটিতে আসন বিছাইয়া সাধনা আরম্ভ করিলাম। অকস্মাৎ যে প্রবাহ রুদ্ধ হইয়াছিল, যে প্রবাহ আমাদেরই দোষে মরুবালুতলে লুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহাকে পুনরায় সমতলক্ষেত্রে বহমান করিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইতেছিলাম। 'প্রবাসী'তে গল্প কবিতা প্রবন্ধ পুস্তকপরিচয় পঞ্চশস্য লিখিতাম কিন্তু তাহাতে আমার মন ভরিত না। 'শনিবারের চিঠি'র উপকরণ আমার জীর্ণশীর্ণ বাজে খাতার পাতায় সঞ্চিত হইতেছিল। দরিদ্রা শবরীর মত আমি ব্যাকুল প্রাণে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

মায়ের কঠিন ব্যাধির খবর পাইয়া 'শনিবারের চিঠি'র চিন্তা-ভাবনা কলিকাতায় ফেলিয়া আমি দ্রুত দিনাজপুরে উপস্থিত হইলাম। উনিশ শ পঁচিশ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস।

আলাউদ্দীন খাঁ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্থলতান নহ, খিল্‌জিও নও, হও নি কলঙ্কিত,
কাহে লুণ্ঠনে দম্ভে হও নি স্ফীত, পুষ্ট ও প্রীত।
পাঠাও নি চতুরঙ্গ বাহিনী তুমি কভু দিকে দিকে,
নৃশংসতায় হত্যা ধ্বংসে নিপীড়িতে অবনীকে।
তুমি ছুটায়েছ দিকে দিকে তব স্থরের অক্ষৌহিণী,
সমগ্র এই ভারত এবং ভুবন লয়েছ জিনি।
তুমি বসায়েছ প্রীতির জিজিয়া সকল জাতির পরে,
নিতি নব নব উপঢৌকন আসিছে তোমার তরে।
স্থলতানদের স্থলতান তুমি শিল্পী স্থপ্রবীণ,
পুরানো নামের কর্কশতাকে করে দিলে মসৃণ।
এনেছ স্থধার হিল্লোল নব হে স্থরতপস্বী,
স্ফুরিত নয়নে দেহে মনে তব কি দিব্য রশ্মি!
ওহে দরবেশ, হে স্থরস্রষ্টা, অপরূপ-রূপকার,
ভক্ত তোমার, স্থদূর হইতে পাঠাই নমস্কার।

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

ডক্টর কিচলু কোথায়—আমাদের দলপতি?

হোটেলে পা দিয়েই খোঁজ করছি। বাতের ব্যথায় তিনি শয্যাশায়ী—ঘরে আছেন।

সুইচ টিপতে [illegible] ল ঘর বিভাসিত হল।

দূর থেকে দে[illegible] কয়েক বার। আর আশৈশব জেনে এসেছি, অনেক উ[illegible]। পাঞ্জাব-কংগ্রেস বলতে সেকালে ছিল দু'টি মানুষ—সত্য[illegible] কিচলু। ইংরেজ তাঁদের গ্রেপ্তার করল (১ই এপ্রিল, ১৯[illegible] মৃতসরে হরতাল—একটা বিড়ির দোকান অবধি খোলা নে[illegible], ইংরেজের কামানে মরচে ধরে নি—মজা বোঝ তবে! [illegible] জালিয়ানওয়ালাবাগের কুয়া ভরতি মড়ার গাদায়, রক্তে[illegible] তৃণভূমি রাঙা। তারপর আহিমাচল-কুমারিকা মেতে উঠল গান্ধিজীর নেতৃত্বে।

সেই কিচলু। মানুষের হিতে অতন্দ্রিত-সাধনা। কতবার জেল, কত নির্যাতন! আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মী—বহু জনে মুসলিম লীগে যোগ দিল—নিন্দা-লাঞ্ছনা এমন কি প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়েছে, নির্বিকার [illegible] কিচলু—যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব থেকে একটিমাত্র পথ ধরে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হয়ে এলেন—কংগ্রেসের পথ।

ভারতের শান্তি-আন্দোলনে সকলের পুরোভাগে তিনি। নিঃসংশয়ে জেনে রেখেছেন, রাজনীতি-পঙ্কের উপরে এই স্ফুট কমল। সকল মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতিতে থাকবে, প্রভু বুদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধি—একই জীবন-সাধনা সকলের।

বয়স ও শরীরের গ্লানি অবহেলা করে কিচলু চলে এসেছেন এতদূর এই পিকিনে। শয্যার উপর উঠে বসে সোল্লাসে বললেন, এসো, এসো—

এসো বাচ্চা—বলে আহ্বান করলেন। এমন ভাল লাগে কথার মাঝে 'মাই চাইল্ড' এই আদরের সম্ভাষণ! তারুণ্য কবে পার হয়ে এসেছি, মা-বাপ ওপারে; এমন ডাক ডাকবার মানুষ কই? আজ সন্ধ্যায় সুদূর পিকিন শহরে কিচলুর কণ্ঠে যেন অতীত গুরুজনেরা কথা বলে উঠলেন।

পেরিনকে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি পথের উপরে—আর একজনের এদিকে যে ঘুম ছিল না!

কটাক্ষ হল রমেশচন্দ্রের দিকে। নবোঢ়া দু'টি ছেলেমেয়ে বিচ্ছেদের পর মিলিত হয়েছে—ভাবখানা এমনি। বৃহৎ কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্নেহমধুর এমনি রহস্যালাপ চলে।

ঘুম নেই রমেশচন্দ্রের, কথা মিথ্যা নয়। সাইত্রিশটা দেশের প্রতিনিধি আসছেন আসন্ন সম্মেলনে—ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। সেই দায়িত্ব কাঁধে চেপে রয়েছে, দু-চোখ এক হয়ে ঘুমোবার ভরসা পাবে, কি করে?

আমার হাত জড়িয়ে ধরে কিচলু বলতে লাগলেন, তুমি বাঙালি

আধেক আংটির পুল

পোর্সিলেনের জয়স্তম্ভ
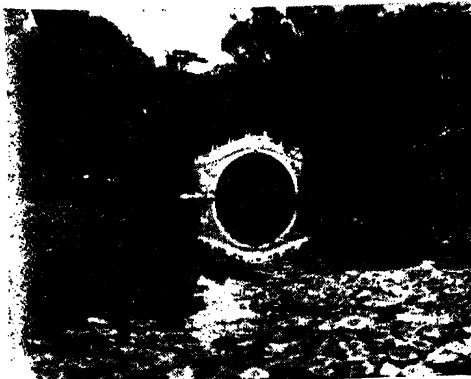
—বাংলার মানুষ পেলে আমার বড় আনন্দ হয়। ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলাদেশ।

সকলের মুখে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, বাংলাই আমায় রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বাংলার কাছে ঋণের অন্ত নেই।

তাজ্জব লাগল। ঋণ অনেকেরই অনেক রকম থাকে, বেমালুম চেপে যাওয়াই তো রীতি। মলিন মুখে এক ব্যক্তি 'তা বটে! তা বটে!' গোছের হাসি হাসছেন। ভদ্রলোকের মনোবেদনা বুঝতে পারছি—কিন্তু মুখ চেপে ধরে দলপতিকে থামানো যায় বা কি করে?

প্রসঙ্গ পাল্টাল অবশেষে।

কিচলু বললেন, ভারতীয়দের সম্পর্কে সকলের বড্ড আশা। সব চেয়ে বড় দল আমাদের, সম্মেলনেও তেমনি কিন্তু বিশেষ স্থান নিতে হবে।

গোলমেলে কথা এসে পড়ছে—খাওয়াদাওয়া, দেখাশুনো এবং আমোদস্ফূর্তি মাত্র নয়, পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দায়িত্বের কাজও করতে হবে অনেক কিছু।

সে যাক, পরের কথা পরে হবে। নমস্কার সেরে এইবার কেটে পড়া উচিত। খাওয়ার ঘরে যাই চলো, সময় হয়ে গেছে। কোন্ দিকে?

কি রকম খাবে, সেইটে ঠিক করো—

কি চাও? নৈকষ্য বিলাতি খানায় রুচি থাকে তো সাততলার উপর। চক্ষু বুজে লিফটে উঠে পড়ো, সেখানে নিয়ে তুলবে। বিরাট ভোজনশালা, টেবিলগুলো সরিয়ে দিয়ে অক্লেশে ফুটবল খেলার গড়ের-মাঠ বানানো যায়। এমন ঘরেও না কুলায় তো পাশে আর একটি আছে। পানশালা ওদিকে—মাল টানো ও বিলিয়ার্ড খেলো। যতক্ষণ দমে কুলায়, খাও এবং খেলে যাও—দাম দেবার হাঙ্গামা নেই। অথবা প্রশস্ত ফাঁকা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে স্মরণাতীত কাল থেকে গড়ে-ওঠা সুপ্রাচীন নগর নিরীক্ষণ করো। রঙিন টালিতে ছাওয়া চৈনিক পদ্ধতির সংখ্যাতীত ঘরবাড়ি, মন্দিরের উঁচু চূড়া, পেই-হাই পার্কে তিব্বতী লামার সমাধির উপর আকাশভেদী চৈত্য আর হালফিলের ঐ একটি বৃহৎ ব্যাপার—পীস হোটেল। রাত্রিবেলা ছাদ থেকে ভারি বাহার পিকিন শহরের—আকাশের তারার মালা যেন চারিদিকে ছিটকে পড়েছে, মাটির উপরে ঝিকমিক করে তারা জ্বলছে।

চীনা মতে যদি খেতে যাও, নেমে পড়ো সর্বনিম্ন তলে—সুপ্রশস্ত ড্রইংরুম অতিক্রম করে। কোন বেলা কোথায় ইচ্ছা করবে, পূর্বাহ্নে কাউকে বলতে হবে না—কিছুই তোমার করণীয় নেই। যথা ইচ্ছা ঢুকে টেবিলে বসে পড়ো, হুকুম করো যত এবং যে রকম খুশি। খাওয়ার পরে একটা বিল নিয়ে আসবে—কিসের কত দাম কিছু তুমি জানো না। জানার প্রয়োজনও নেই। এক লক্ষ দেড় লক্ষ যা-হোক একটা অঙ্কপাত করে এনেছে—নিচে সই মেরে খালাস। নিজে না পারো, যে কেউ পেন্সিল নিয়ে একটু হিজিবিজি করে দিক।
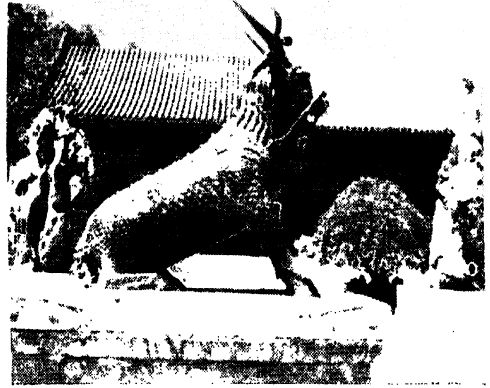
সু-নি (পৌরাণিক জীব)

এমন দরাজ ব্যবস্থা আমার দেশে কেন চালু হয় না রে! মহাশ্রদ্ধেয় মহাদেব-দার গল্প শুনেছি—খবরের কাগজে কাজ করতেন, সেই সুবাদে ডাইং-ক্লিনিঙেও মাংনা কাপড় কাচতেন। নয়তো—রোস বেটা, লিখব তোর নামে এক কলম। কিন্তু হোটেলে যদৃচ্ছা খেয়ে একটি মাত্র নাম-সইর ওয়াস্তা—এ ব্যাপার সম্ভবে সত্যযুগে। আর ঐ দেখে এলাম নতুন-চীনে।

কিন্তু কথাটা উঠল যা নিয়ে—এক বেলায় এক টেবিলে বসে এক লক্ষ দেড় লক্ষ ইয়ুয়ান উদরস্থ করছি। এর উপর শোনা গেল, সেক্রেটারি-জেনারেলের কাছে নগদ হাতখরচাও গুঁজে দিয়ে গেছে—প্রতি জনের দশ লক্ষ হিসাবে। কোন সুলগ্নে যাত্রা গো চীনের

জাতীয় উৎসবের আয়োজন করছে। শান্তির কপোত বানাচ্ছে পিচবোর্ড কেটে, ফুলপাতা তৈরি করছে কাগজের···
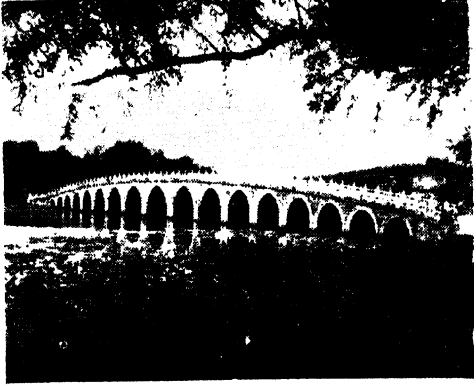
সাত-খিলানের পুল

মাটিতে পা দিতে না দিতেই (লক্ষপতি বলে গালি দেবেন না) অনেক লক্ষের অধিকারী। আমাদের দেশে হয়েছে যেন চড়ুইপাখির খড়কুটো-সংগ্রহ—দু-টাকা সাত আনা রোজগার, সাত সিকে খরচ ; সারা জীবনে একত্র করলাম দু-শ' সাতান্ন টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আর ওখানে দশ-বিশ হাজারের নিচে কথাই নেই। সওয়া মাসে যা খরচ করে এসেছি, ইনকামট্যাক্স-কর্তাদের মাথা ঘুরে যাবে, সেই টাকার অঙ্ক শুনলে।

বাজারে যাচ্ছি হয়তো কয়েক জনে মিলে খেয়ালমাফিক সওদা করতে।

এই যাঃ, মনিব্যাগ ফেলে এসেছি। টাকা বেশি আছে তোমার কাছে ?

কোথায় ? দু-আড়াই লাখ হবে বড় জোর—তাতে কি হবে ? আড়াই লাখের বাজার ভদ্রলোকে আবার কি করবে ? ক্ষুণ্ণ মনে ফিরতে হল অর্ধপথ থেকে।

দাম লিখে জিনিষের গায়ে সেঁটে রাখবার নিয়ম ও-দেশে—তার উপরে কানাকড়ির দরদস্তুর চলে না। ওয়ান-টু ইত্যাকার আন্তর্জাতিক সংখ্যায় লেখা দাম—দেশি বিদেশি কারো বুঝতে আটকায় না। আমিও এটা-ওটা কিনে এনেছিলাম বন্ধুবান্ধবদের জন্য। দামের কাগজ আঁটাই ছিল জিনিষের গায়ে, ছিঁড়ে ফেলতে যেন ভুলে গিয়েছি। বন্ধুরা চমকে ওঠেন—কি কাণ্ড, দশ হাজার এটার দাম ? এত খরচ করে নিয়ে এলে ?

প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বলি, তা কি হবে—তুমি তো পর নও ! চীনের একটা স্মরণ-চিহ্ন—জীবনে হয় তো আর যাবো না—টাকার মায়া করলে চলবে কেন ?

চুপি-চুপি বলছি, দশ হাজারের ঐ মহার্ঘ বস্তুর আমাদের হিসাবে দাম দাঁড়িয়েছে দু-টাকা এক আনার মতো। আটচল্লিশ শ' চীনা ইয়ুয়ানে এক টাকা। কিন্তু চেপে যান—খবরদার, যেন চাউর হয়ে না পড়ে আমার বন্ধুজনের মধ্যে। পশার ভেস্তে যাবে।

চীন থেকে ফেরার মুখে সাংহাই ও ক্যাণ্টনে দু হাতে বাজার করছি। নিজে করছি, ওখানকার তরুণ বন্ধুরাও করে দিচ্ছেন। চীনা ইয়ুয়ান শেষ করে ফেলতে হবে। শেষ অবধি হাজার ছয়ে ঠেকে গেল। ওরা বলে, এতে আর কি-ই পাওয়া যাবে—রেখে দিন। হাজার দুয়েক ওর থেকে ঔদার্য বশে দিয়ে দিলাম ক্ষিতীশকে। হাজার চারেক আছে এখনো। অর্ধেক কিম্বা সিকি পরিমাণ টাকায় নিয়ে নিন না কেন ! কত সস্তায় যাচ্ছে—কিনবেন ?

আমাদের তো এই। আগের খবর কিঞ্চিৎ শুনুন। সতীরঞ্জন সেনের কথা বলেছি। তাঁরা অনেক বেশি ভাগ্যবান। ১৯৪৭ অব্দে ভারত-গবর্নমেণ্ট পাঠিয়েছিলেন তাঁদের। দশ জন ছাত্র গিয়ে পৌঁছলেন তো সাংহাইয়ে। হাতখরচা ইত্যাদির জন্য প্রত্যেকে দশটা করে টাকা দিলেন চীনা ইয়ুয়ানে ভাঙিয়ে আনবার জন্য। লোক গেছে তো গেছেই—অনেকক্ষণ পরে রিক্সায় ফিরে এল বিশাল এক বস্তা নিয়ে। সস্তাবন্দি নোট। কাঁধে বয়ে আনতে পারেনি, রিক্সা করে আনতে হল। বস্তা খুলে সর্বাগ্রে রিক্সা ভাড়া তো চুকিয়ে দিলেন কোটিখানেক। তার পরে ঐ নোটের গাদা গণে মিলিয়ে নেওয়া। সে কি বিপদ, দশ জনে ভাগে ভাগে গণছেন—কোটি কোটির ব্যাপার—প্রতি বারে আলাদা এক এক রকম হয়। ঘণ্টা কয়েক ধস্তাধস্তি করে তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে যা লিখে দিয়েছে, তাই ধরে নেওয়া গেল। আমাদের অতটা ভাগ্য হয়নি। কোটি কোটি নয়, তবে কোটির কাছাকাছি নাড়া-চাড়া করে এসেছি বটে !

গালগল্প বলে ঠেকছে। কিন্তু সতীরঞ্জনের মুখে স্বকর্ণে শুনে তবে লিখছি। আন্দাজ করুন অবস্থা ভয়াবহতা। সাধারণের ক্রয়শক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে—কিনতে পারে, আঙুলে গণা যায় এমনি কয়েকটি ভাগ্যবান। আর খরচ

মার্বেল-পাথরের নৌকা (এখন জাহাজ)

চালাবার জন্ম সরকারি ছাপাখানায় দেদার নোট ছেপে যাচ্ছে। গতিক এমনি, ছেলেপুলে হাতের লেখার কাগজ পায় না, নোট ছাপানোয় কাগজের এমনি টান পড়েছে। নতুন-চীন খতিয়ে দেখেছে, কুয়োমিংটাং যুদ্ধপূর্ব আমলের চেয়ে ১,৭৬৮,০০০,০০০,০০০ গুণ বেশি নোট চালু করে গেছে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাবার মুখেও তারা বগল বাজাচ্ছিল, বিজীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ক'দিন চলবে গণতন্ত্রী সরকার? মাও-সে-তুঙকেও পাততাড়ি গুটোতে হবে।

সতীরঞ্জনেরই আর একটা গল্প। ওঁরা পিকিনে তখন। কুয়োমিংটাঙের টলমল অবস্থা—মুক্তি-সৈন্ত আসছে ঝড়ের বেগে। পাওয়ার-হাউসে বিশৃঙ্খলা—বিদ্যুৎ-সরবরাহ যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হবে। সতীরঞ্জন গিয়েছেন দুর্দিনের জন্ত এক টিন কেরোসিন কিনে রাখবেন বলে। এক দোকানে দর নিলেন। যাচাই করতে তারপর আর এক দোকানে গিয়ে দেখলেন, সেখানকার দর অনেক বেশি। প্রথম দোকানে এলেন আবার। এবার এরা যে দর হাঁকল, সেটা দ্বিতীয় দোকানকে ছাড়িয়ে গেল।

আধ ঘণ্টাও হয়নি মশায়, তখন যে এই দাম বলেছিলেন—

দোকানি বলল, কিনতে হয় তো এক্ষুনি নিয়ে যান। সাড়ে-দশটায় এখন এই দর। দশ মিনিট পরে শুনবেন আর এক রকম।

এমনি কাণ্ড। চীনা মুদ্রার উপর লোকের এক তিল আস্থা নেই। হেন ইনফ্লেশন পৃথিবীর কোন রাজ্যে কখনো ঘটেনি। আজকে বিলকুল সামলে নিয়েছে। সামলাতে পেরেছে, তাই চীন বেঁচে গেল। আর এত বড় অসাধ্য-সাধন যারা করতে পারে, তামাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জোট পাকিয়েও তাদের মারতে পারবে না।

ইনফ্লেশন দমনের পদ্ধতি শুনুন তবে কিছু কিছু। সে আমলে যা হয়েছিল, আর এঁরা যা করেছেন। অবস্থা এমন, মাইনে হাতে পাওয়া মাত্রই লোকে জিনিষ কিনে ফেলবে। দরকারে লাগবে কিনা, সে বিবেচনা করতে গেলে হবে না। চাল মিলল না তো কিনে ফেলুন বিশ গ্রোস ইস্ক্রুপ, নয় তো কাপড়-কাচা সাবান দু-পেটি। মোটের উপর টাকা হাতে রাখবেন না—তা হলে সর্বনাশ—হু-হু করে নেমে যাচ্ছে টাকার ক্রয়মূল্য। কাল হয়তো দেখবেন, সাবান এক পেটি মাত্র পাওয়া যাচ্ছে ঐ টাকায়।

অথবা কিনে রাখুন সোনা-রুপো। রুপোর মুদ্রা বাজারে নেই, মানুষে সিন্দুকে পুরেছে। কালে ভদ্রে দুটো-পাঁচটা বেরুলো তো তার পিলে-চমকানো দর। বাজারে যা সগৌরবে চলছে সে হল আমেরিকান ডলার। নামে চীন দেশ এবং স্বাধীনও বটে, কিন্তু টাকার বাজারে আধিপত্য আমেরিকার। এক্সচেঞ্জের একটা সরকারি হার নির্দিষ্ট আছে—কিন্তু সে হল ঐ যে পাঠ্য বইয়ে থাকে 'সদা সত্য কথা কহিবে' তারই মতন এক নীতিকথা। কেউ মানে না, জানেও না বড় বেশি লোকে। আমেরিকান ডলারও কাগজ বটে—কিন্তু তার অশেষ ইজ্জত, রীতিমতো দরদস্তুর করে কিনতে হয় সে বস্তু। শহরে গ্রামে সর্বত্র তাই সংখ্যাতীত মজুতদার, সাধারণের দুঃখকষ্ট সীমাহীন হয়ে পড়ল। ব্যাঙ্ক অথবা জাতীয় ধনাগারে লক্ষ্মী নয়—তাঁর পেঁচার বসতি। স্তূপীকৃত পেঁচার ঝরা-পাখনা—ছাপা-নোটের হিমালয় পর্বত।

তেড়ে ফুড়ে কুয়োমিংটাং আইন করল, সোনা-রুপো আটকে রাখা বে-আইনি—ভিন দেশের মুদ্রাও চলবে না। ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দাও। এ আইন অমান্য করা দেশদ্রোহিতা—চরম দণ্ড হবে অপরাধীর।

কা কস্য পরিবেদনা। বাজার এত গরম—কে যাচ্ছে ঐ সরকারি বাঁধা দামে জমা দিতে? ফাঁসিতেও লটকানো হল নাকি দু-একটাকে। কিছুতে কিছু নয়। শুধু আইনে দায় খালাস হয় না, আইন লোকে মানতে পারে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হয়। সোনা-রুপো এবং আমেরিকান ডলার ভাঙিয়ে ধরুন বিশ কোটি ইয়ুয়ান নিয়ে এলাম। সেই বিশ কোটি আগামী কাল তো বিশ লক্ষের দামে নেমে যাবে। তখন?

নতুন-চীনের পদ্ধতি শুনুন এবার। সোনা-রুপো এবং আমেরিকান ডলার সরকারি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দাও। ব্যাঙ্কের দর দেওয়া হল কালোবাজারের চেয়ে কিছু বেশিই। একটা জিনিষ তবু বাকি থেকে যায়। আজকে আমার নামে যে পরিমাণ চীনা ইয়ুয়ান জমা পড়ল, কাল যদি তার দাম কমে যায়? অর্থাৎ জিনিষপত্রের দাম চড়ে, কম জিনিষ পাওয়া যায় ঐ মুদ্রায়? সে ব্যবস্থাও হল। জমা দেবার সময় টাকার অঙ্কের পাশে ঐ তারিখের চাল-কাপড়-তেলের দামও লেখা রইল। ব্যাঙ্ক থেকে যেদিন টাকা তুলবে, জিনিষের দর যদি ডবল হয়ে থাকে, আমার জমা টাকাও ডবল হয়ে গেছে, এই রকম গণ্য হবে। তার উপরে নিয়মমাফিক সুদ তো আছেই।

মাসের পর মাস চলল এই নিয়মে। কালোবাজার অচল। লোকের আস্থা ফিরে এলো জাতীয় অর্থনীতির উপর। নতুন-চীন ইনফ্লেশন পুরোপুরি সামলে নিয়েছে, দরের এখন উঠানামা নেই। কনট্রোলেরও আবশ্যক নেই কোনখানে। সেদিনের পরম দুর্গতির একটুখানি স্মরণচিহ্ন রয়েছে—নোটের উপর ছাপা মোটা মোটা অঙ্ক। ব্যস, আর কিছু নয়।

সতীরঞ্জন প্রভৃতির কাছে শোনা কাহিনী। সুনিশ্চিত ধ্বংস থেকে জাতি বেঁচে গেল এমনি নানা কৌশল ও বিচক্ষণতায়। শাপে বর হল। সোনা-রুপো আটক পড়ে গিয়ে, এবং বিদেশি মুদ্রা চালু হয়ে একদা চীনের সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল—এখন সমস্ত গবর্ণমেন্টের হাতে এসে গেছে। বাইরের বাজারে নতুন-চীনের তাই ইজ্জত হয়েছে। দেশ-পরিগঠনের জন্তে বিদেশি যন্ত্রপাতি ও মালপত্র কিনবার কোন রকম আর দারিদ্র্য নেই।

কিন্তু কি কথায় কতদূর এসে পড়লাম! দু-লাখ পাঁচ-লাখ অহরহ পকেটে নিয়ে ঘুরেছি—আর এখন? কাজ নেই, গুমর ফাঁক হয়ে যাবে। [ক্রমশঃ।

প্রচ্ছদপট পরিচয়

পুরীতে গোপীনাথ বিগ্রহ। বিগ্রহটি 'টোটা-গোপীনাথ' নামে খ্যাত। আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আকাশ-পাতাল

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

তখন দিনের শেষ।

কে ডাকলো নাম ধ'রে, না দরজায় করাঘাত ক'রলো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না রাজেশ্বরী। ঠাওরাতে পারলো না। ঘরের বৌ, দিন নেই রাত্রি নেই, প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোবে— শুধু এই লজ্জাটাই সহসা রাজেশ্বরীকে সজাগ ক'রে তোলে হয়তো। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে। তাকায় ইদিক-সিদিক। আয়ত চোখ দু'টিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকিয়ে চেখে চতুর্দ্দিক। দরজা কিংবা জানলাগুলোর ফাঁক-ফোকর থেকে কৈ দেখা যায় না তো দিনের আলো? ঘরের ভেতরে না হয় অন্ধকার থাকতে পারে, কিন্তু ঘরের বাইরের পৃথিবীতেও কি তমসা নেমেছে! তবে কি দিন শেষ হয়ে গিয়ে রাত্রি নামলো? না রাত্রি শেষ হয়ে ভোরের আলো-আঁধারি দেখা দিয়েছে! ঠিক ঠাওর করতে পারে না যেন রাজেশ্বরী। ঘুমে অচেতন ছিল কতক্ষণ। চেতনা ফিরে পেয়েছে, কিন্তু ঘুমের জড়তা যে এখনও বিলুপ্ত হয়নি। ঠিক যন্ত্রচালিতের মতই পালঙ্ক ছেড়ে মেঝেয় নেমে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। ঠিকঠাক করে নেয় বেশভূষা। কি লজ্জার কথা? বলবে কি শ্বশুরবাড়ীর লোকজন? বৌ মানুষ হয়ে এই অবেলা পর্য্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে আছে কখনও? ঘরের ভেজিয়ে-দেওয়া দরজাটা এক টানে খুলে ফেললে রাজেশ্বরী। দেখলো, ঘরের সামনের দালানে চুপচাপ উবু হয়ে ব'সে আছে এলোকেশী। দুই হাঁটুর মধ্যিখানে এলোকেশীর মুখ। দালানে আলো জ্বালানোর পালা পর্য্যন্ত চুকে গেছে? রাত তবে কত এখন! লজ্জায় কিংকর্ত্তব্য বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত্ত পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। দরজার একটা পাল্লা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে। লজ্জায় না কেন কে জানে, চোখ ফেটে জল আসে রাজেশ্বরীর। বলবে কি বৌকে শ্বশুরবাড়ীর জনমানুষ! বলবে না, লক্ষীছাড়ী? দিন নেই রাত্তির নেই নাক ডাকিয়ে যখন-তখন।

বেশ কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হ'লে ধীরে ধীরে মনে পড়ে রাজেশ্বরীর।

সেই দুপুর থাকতে স্বামী তার গেছে আদালতে, বকেয়া খাজনার টাকা জমা দিতে। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে রাজেশ্বরীর, না আদালতে তো নয়! আজকে যে আদালত বন্ধ। আজ যে রবিবার, ছুটির দিন; তবে কোথায় গেল? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে প'ড়েছে রাজেশ্বরীর—এতক্ষণে ভেবে পেয়েছে। কৃষ্ণকিশোর গেছে আদালতে নয়, উকিল-বাড়ী। উকিলের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে। উকিলের মতামত জানতে চাইতে। কিন্তু রাত্রি হয়ে গেছে কত, এখনও মতামত নেওয়া শেষ হ'ল না? চিন্তিত মনের সকল ভাবনার জেরটা গিয়ে পড়ে এলোকেশীর 'পরে। রাজেশ্বরী কথা বলে বেশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে। বলে,—তুই কি ধরণের মানুষ বল্ তো এলো?

এলোকেশীর বয়স হয়েছে কত! হয়তো চার কুড়ির বেশী। একবার ব'সলে তাই আর চট ক'রে উঠে দাঁড়াতে পারে না। তবুও অনেক কষ্টে উঠলো এলোকেশী। বললে, —কেন লা, আমি আবার কি করতে গেনু!

—আমাকে তো ঘুম থেকে ডেকে দিতে হয়! লোকজন কি ব'লবে বল্ তো? ধীরে ধীরে ব'ললে রাজেশ্বরী। কথা থেকে ক্রোধের সুর মুছে নিয়ে ব'ললে।—রাগ ক'রে আর কি হবে! দে তুই, চানের ঘরে কাপড়-জামা দে। কথার শেষে সুর নত ক'রে নেয় রাজেশ্বরী। বলে,—আমার লজ্জায় তোর লজ্জা হবে না এলো? আমার অপমান হ'লে তোরও যে অপমান।

এলোকেশী ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসে। বলে,— খুব যে দেখি শিক্ষে দিচ্ছিস্! এ্যাতক্ষণ কেন ডাকি নাই বল্ তো দেখি? আমার কি আর মনে হয় নাই কথাটা! তোকে ঘুম থেকে তুলে দেওয়ার কথাটা! কিন্তু কেন ডাকি নাই বল্ তো?

রাজেশ্বরী বললে,—তাও ব'লে দিতে হবে আমাকে? ইচ্ছা করেই ডেকে দেওয়া হয়নি। যাতে আমার অপমান হয় সেই জন্যে।

—না লো না। চাকরী করতে গেলে কি আর অত ইচ্ছের প্রাধান্য চলে! তবে শুনে তুই যৎপরোনাস্তি খুশী হবি। এলোকেশী শেষের কথা ক'টা বলে মৃদু হাসির সঙ্গে।

রাজেশ্বরী ব্যগ্র কণ্ঠে বললে,—তবে?

এলোকেশী বললে,…তোর ঠাগ্‌মা এয়েছে যে! দেখতে এয়েছে তোকে।

রাজেশ্বরীর মুখে খুশীর হাসি ফুটে ওঠে সহসা। বলে,— ঠাগ্‌মা এয়েছে? কখন? কোথায় বসিয়ে রাখলি ঠাগ্‌মাকে? ডাকলি না কেন আমাকে?

এলোকেশী বললে,—ঠিক আছে তোর ঠাগ্‌মা। জলে তো আর পড়ে নাই। নীচে ব'সে আছে। তুই ঘুমোচ্ছিস্ শুনে তোকে ডাকতে মানা করলে। রান্না-বাড়ীতে ব'সে ব'সে গল্প করছে।

—কার সঙ্গে? শুধোয় রাজেশ্বরী। সহাস্যে শুধোয়।

এলোকেশী বললে,—বামুনদিদি আছে, বাড়ীর আর আর

ঝিয়েরা আছে। আর আছে তোদের শশীবৌ। সে এসেছে এই কিছুক্ষণ। তোকে দেখতে এসে ঠাগ্‌মার সঙ্গে কথা কইতে ব'সে গেছে। কথা কইছে সুখ-দুঃখের।

রাজেশ্বরী যেন আর থাকতে পারে না। ঠাগ্‌মাকে দেখবার জন্য মনটা তার আনচান করতে থাকে। কত দিন দেখা পাওয়া যায়নি ঠাগ্‌মার। রাজেশ্বরী বললে,—তুই চানের ঘরে শাড়ী-জামা দে। একটা আলো দে। আমি এক্ষুনি আসছি।

এলোকেশী বললে,—যা না, চানের ঘরে গিয়ে দেখে আয় না। রেখে এয়েছি শাড়ী, জামা, আলো।

স্নানের ঘরের দিকে যেতে-যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো রাজেশ্বরী। বললে,—হ্যাঁ রে এলো, শোন্, একটা কথা বলি।

রাজেশ্বরীর পিছু-পিছু এগোচ্ছিল এলোকেশী। বললে,—বল, কি বলছিস ?

রাজেশ্বরী চুপি-চুপি কথাগুলি বলে। এলোকেশীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে,—হ্যাঁ রে এলো, উকিলবাড়ী থেকে ফিরেছে ? সদরে আছে বুঝি ?

ঠোঁট ওলটায় এলোকেশী।

বলে,—কোথায় কে! ঠাগ্‌মা পৌঁছেই তো নাত্‌-জামায়ের খোঁজ ক'রেছে। একবার আধবার নয়, অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ দফায়।

যতটা খুশী হয়েছিল রাজেশ্বরী এতক্ষণে, কথা ক'টা শোনা মাত্র খুশীর মাত্রা ততটা যেন আর থাকলো না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'ললো স্নান-ঘরের দিকে। অবশ পদক্ষেপে। ভাবতে ভাবতে গেল, গেছে কি এখন ? কতক্ষণ! সেই দুপুর বেলায়। ঠাগ্‌মা যে ব'সে ব'সে শশীবৌয়ের সঙ্গে গল্প করছে, সেই কথাটি শুনে যেন মুহূর্ত্তের জন্য হাঁপ ছেড়ে বাঁচে রাজেশ্বরী। যাক্‌, একা তো আর ব'সে নেই ঠাগ্‌মা। শশী দিদির অজানা নেই, কার সঙ্গে কি ভাষায় কথা কইতে হয়। কার কাছে দেখাতে হয় কতটা সামাজিকতা। এখন স্বামী ভালয় ভালয় ফিরলে বাঁচে রাজেশ্বরী। ফিরে যদি লোক-হাসানো কিছু একটা করে, তখন ? ভাবতেও শিউরে ওঠে রাজেশ্বরী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার অবশ হ'তে থাকে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

এলোকেশী বললে,—দেরী করিস্‌ না বেশী। ঠাগ্‌মা তোর জন্যে কত খাবার-দাবার এনেছে, দেখবি আয়।

সত্যিই প্রচুর মণ্ডা-মেঠাই তৈরী করে এনেছেন রাজেশ্বরীর ঠাগ্‌মা। আরও কত কি এনেছেন, যা-যা ভালবাসে রাজেশ্বরী। নিজহাতে প্রস্তুত ক'রে এনেছেন। কয়েকটা পেতলের থালা ভর্ত্তি করে এনেছেন। এক জনের বদলে হয়তো খেতে পারে একশো জন মানুষ।

স্নান-ঘরে ঢুকে ভাঙা মনে দরজার পাল্লা দু'টো ভেতর থেকে ভেজিয়ে দেয় রাজেশ্বরী। অর্গল তুলে দেয় দরজার।

—বেশী দেরী হয় না যেন রাজো! বাইরে থেকে কথা বলে এলোকেশী। বলে,—এই রেতের বেলায় ঠাগ্‌মাকে আবার ফিরতে হবে মনে থাকে যেন! ব্যাচারী বুড়ী মানুষ!

—হ্যাঁ। বললে রাজেশ্বরী। শান্ত কণ্ঠে বললে শুধু মাত্র ঐ একটি কথা।

বাইরে থেকে সাবধান ক'রে দেয় এলোকেশী। বলে,—বেশী জল-ঘাঁটাঘাঁটি করিস্‌ না বাছা! নতুন হিম পড়ছে!

এ কথার উত্তর রাজেশ্বরী দেয় মাত্র একটি কথার জবাবে। বলে,—না।

বেশী কথা বলতে ইচ্ছা হয় না যেন রাজেশ্বরীর। স্বামী এখনও এলো না ফিরে—ঐ একটি কল্পনার অতীত বিষয় কানে পৌঁছতেই ঠাগ্‌মাকে দেখার যত আনন্দ মুহূর্ত্তের মধ্যে মন থেকে উবে যায় যেন। স্নান-ঘরে ঢুকে, দ্বারে অর্গল তুলে দিয়েও চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। ভাবে আকাশ-পাতাল। এতক্ষণ ধ'রে কি এমন শলা-পরামর্শ করছে উকিল! ভেবে কিছু কূল-কিনারা খুঁজে পায় না রাজেশ্বরী। দন্তচূর্ণ দাঁতে ঘষতে থাকে। রূপোর জিব-ছোলাটা খুঁজতে থাকে। ঐ তো আনলায় ঝুলছে। লণ্ঠনের আলোয় ঝিলিক মারছে ক্ষণে-ক্ষণে। রূপালী রঙের ঝিলিক। দেখে দেখে আজকের দিনে এলোকেশীও আনলা সাজিয়ে দিয়েছে জ্যাকেট আর শাড়ীতে। রেশমের অন্তর্বাসে। শান্তিপুরী তাঁতের ঘন-লাল ডুরে শাড়ী। মিহি কালো রঙের পাড়। আসমানী রঙের বিলাতী রেশমের জ্যাকেট।

যতই যা হোক, অনেক দিন বাদে ঠাগ্‌মার পদার্পণ হয়েছে রাজেশ্বরীর শ্বশুরালয়ে।

রাজেশ্বরী হাত চালিয়ে নেয়। কতক্ষণ বৃদ্ধা ব'সে আছেন রাজেশ্বরীকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে। রাজেশ্বরীর সঙ্গে দু'টো কথা কইতে। চোখের দেখা আর মুখের কথাতেই খুশী হয়ে চ'লে যাবেন ঠাগ্‌মা। নাতনীর বিরহ-বেদনায় যে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন ঐ বৃদ্ধা পিতামহী। বহুদিন অপেক্ষা ক'রেছেন সময়ে অসময়ে কেঁদে-কেঁদে। কিন্তু আর বোধ হয় প্রতীক্ষার কাততা সহ্য হয়নি তাঁর। রাজেশ্বরীকে দেখতে আসবেন, সেই জন্য ভোর হ'তে না হ'তেই উনুনের ধারে গিয়ে ব'সেছেন। তাঁর অতি আদরের নাতনীটি যা-যা খেতে ভালবাসে নিজহাতে প্রস্তুত ক'রে এনেছেন। ঘি আর মশলার সুগন্ধে রান্না-বাড়ী পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

রাজেশ্বরীর দেখা মিলছে না দেখে শেষ পর্য্যন্ত ব'লে ফেললেন ঠাগ্‌মা—হ্যাঁ দিদি, রাজো আসতে কেন এত দেরী করছে ভাই ? ডাকাও না তাকে ভাই! দু'টো কথা ব'লে চলে যাই। উদিগে রাত হয়ে এলো যে ভাই।

বৃদ্ধা কথা বলেন কম্পিত কণ্ঠে। হয়তো তাঁর জপ আর আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হ'তে চ'লেছে। পূর্ণশশী সমুখেই ব'সেছিলেন। বললেন,—ঘুমোচ্ছিল, আপনি ডাকতে মানা করলেন যে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই উঠেছে। বামুনদিদি একবার দেখুন না ভাই।

বৃদ্ধা দন্তহীন মাড়ি দেখিয়ে হাসলেন ফিক-ফিক।

বললেন,—বুঝলে না ভাই, নতুন বে হয়েছে। হয়তো রাত-টাত জেগেছে। সেই জন্যে বলছিলাম, আহা, ঘুম ভাঙিও না। কিন্তু ভর্-সন্ধ্যেয় বেশী ঘুমোলে যে শরীর খারাপ করবে। অসময়ে কি ঘুমোতে আছে ভাই। আহা, নাতনী যে আমার ভীষণ ঘুম-কাতুরে! একবার ঘুমিয়ে পড়লে ঘুম থেকে ওঠায় কার সাধ্যি?

ব্রাহ্মণী কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথা থেকে ঘুরে এসে বললে,—বৌ উঠেছে। আসছে এখুনি। ঘুম থেকে উঠেছে, পোষাক বদলেই আসছে। ঠাগ্‌মা এসেছে শুনেছে। এই এলো ব'লে।

সত্যিই দেখতে দেখতে রক্তাম্বরা এক কিশোরীর হঠাৎ আবির্ভাব হয়।

দুই পায়ে হয়তো ছিল রূপোর তোড়া। ঝম্-ঝম্ শব্দ তুলতে তুলতে রাজেশ্বরী আসে। ঠাগ্‌মাকে দেখে একগাল হেসে তাঁর পাদস্পর্শ ক'রে তাঁকে প্রণাম করে। সমুখে ছিলেন শশীবৌ, তাঁকেও প্রণাম করে।

ঠাগ্‌মা রাজেশ্বরীকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—আয় ভাই, আয়। কতদিন তোকে দেখতে পাই না বল্ তো! তাই আর থাকতে না পেরে চ'লে এলাম। দেখতে না পেয়ে পেয়ে দম যেন আমার বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল।

দাসীরা কে কোথায় ছিল কে জানে!

একজন এসে একটা আসন পেতে দিয়ে যায়। রাজেশ্বরীকে বসতে দিয়ে যায়। পশমের নক্সা-তোলা আসন।

পূর্ণশশী বললেন,—ভ্যাখ, ভাই বৌ, কেমন দিনে আমিও এসে প'ড়েছি! ঠাগ্‌মার দর্শন তো পেলাম। প্রণাম করলাম ঠাগ্‌মাকে।

বৃদ্ধা বললেন,—তুই ঘুমোচ্ছিস্ শুনে তোর দিদির সঙ্গেই ঠায় ব'সে-ব'সে গল্প করছি। হ্যাঁ রে রাজো, আমার নাত-জামাই কোথায়? তাকে তো দেখছি না!

অধোমুখী হয়ে যায় রাজেশ্বরী। হয়তো লজ্জায়।

নত কণ্ঠে বললে,—উকিলবাড়ী গেছে জমিদারীর কাজে। কিন্তু ফেরবার সময় তো হয়ে গেছে।

ঠাগ্‌মা বললেন স্নেহমাখা কণ্ঠে,—কতক্ষণ ঘুমোলি দিদি-ভাই? নাতজামাইও বেরিয়েছে, তুইও গিয়ে-শুয়েছিস্ তো?

লজ্জায় অধোবদন হয় রাজেশ্বরী। ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা যায় ওষ্ঠাধরে। বলে,···না, তারপর আমি খাওয়া-দাওয়া করেছি। খেয়ে-দেয়ে শুয়েছি।

—তা বেশ। তা বেশ। বললেন ঠাগ্‌মা। পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন।—আচ্ছা দিদিভাই, এখন নিশ্চয়ই খিদে হয়েছে বেশ। তা আমি তোমার জন্যে দু'-চার রকম খাবার তৈরী ক'রে এনেছি। অবিশ্যি তুই যা-যা ভালবাসিস। দুই বোনে এখন আমার সামনে কিছু-কিছু মুখে দাও, দেখি আমি। দেখে খুশী মনে ঘরে ফিরে যাই। আমার জপ্-তপ্ সব বাকী এখন। গেলে তবে হবে।

পূর্ণশশী মৃদু মৃদু হাসেন। বৃদ্ধার প্রস্তাব শুনেই হয়তো হাসেন। ঠাগ্‌মা বললেন,—ডাক্ না দিদিভাই তোদের ব্রাহ্মণীকে। দু'খানা রেকাবী দে' যেতে বল্ না।

ব্রাহ্মণী কোথায় ছিল কাছাকাছি। কোন্ থামের আড়ালে। নয় তো কোন্ দরজার পাশে। বৃদ্ধার কথা হয়তো শুনতে পেয়েছিল। ক্ষণেকের মধ্যে দু'খানি রেকাবী এনে ব্রাহ্মণী বসিয়ে দেয়। বলে,—ঠিক বলেছেন ঠাকুমা। বৌকে আমাদের খেতে দিন। আজ বিকেলের জলখাবার যেমন সাজানো তেমনি প'ড়ে আছে।

ব্রাহ্মণীর কথা শুনে ঠাগ্‌মা পেয়ে ব'সলেন যেন।

হাসতে হাসতেই বললেন বৃদ্ধা,—ভ্যাখ, তোদের ঘরের কথা কিনা ব'লে দিচ্ছে আমাকে! যাক্, ব'লে ভাই ভালই করলে ব্রাহ্মণী। নয় তো নাতনী আমার ব'ল্ তো হয়তো, আজেবাজে কি যে ছাই এনেছো তুমি! কত ভালমন্দ খেয়ে পেট আমার আই-ঢাই করছে। কি বল্ রাজো?

রাজেশ্বরী কথার কোন প্রত্যুত্তর দেয় না।

মুখটি তুলে শুধু হাসে মৃদু-মৃদু। কৌতুকপূর্ণ হাসি। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর উদ্দেশে বললেন,—তুমি ভাই, দাও তো তুলে সব একটি একটি করে। দু'টো রেকাবীতেই সাজিয়ে দাও।

হেসে ফেললেন পূর্ণশশী। বললেন,—এখন এত সব খেলে রাতে আর খাওয়া যাবে না যে!

ঠাগ্‌মা তৎক্ষণাৎ ব'ললেন,—নেই বা খেলে ভাই। একটা রাত এই বুড়ীটার তৈরী খাবারই খাও না। ঘরে যা আছে সোয়ামীকে খাইয়ে দিও।

এইবার নতমুখী হ'লেন পূর্ণশশী।

মুখ থেকে তাঁর আর কথা বেরুলো না! ঠোঁটের কোণে হাসি মাখিয়ে ব'সে রইলেন চুপচাপ। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় রাজেশ্বরী আর পূর্ণশশীর রূপের ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে ঠিকরে পড়তে থাকে বুঝি। যেমন রঙ তেমনি দৈহিক গঠন দু'জনেরই। এ বলে আমাকে দেখো, ও বলে আমাকে। একজন লাল আর অন্যজন ঘন-নীল রঙের জরিপাড় নীলাম্বরী প'রেছে। যেজন্য পূর্ণশশীর রূপপ্রভা কিঞ্চিদধিক প্রকাশ পাচ্ছে যেন। শাড়ীর রঙ নীল হ'লে কি হবে লণ্ঠনের আলোয় রঙটা কালো ব'লেই ভ্রম হয় যে!

পূর্ণশশী পেতলের থালা ক'টায় কি কি আছে, তাই লক্ষ্য করছিলেন। আছে মিষ্টান্ন কয়েক রকমের আর নোনতা খাবার। রাজেশ্বরী যা-যা খেতে ভালবাসে। পূর্ণশশী বললেন, —ঠাগ্‌মা, কত কষ্ট ক'রেছেন আপনি? এত খাবার ব'সে ব'সে তৈরী করলেন কখন? দোকানের খাবারের সঙ্গে দেখতে কোন' তফাৎ নেই!

পাক-প্রশংসা শুনলে হয়তো নারীজাতি সহজেই খুশী হয়।

রাজেশ্বরীর পিতামহী বৃদ্ধা হ'লে কি হবে, পূর্ণশশীর কথা শুনে গ'লে পড়লেন যেন। বললেন,—মিষ্টিগুলো দিদি কাল ক'রে রেখেছি, আর আজকে নোনতাগুলো তৈরী করেছি, সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত করতে লেগেছে। নাও ভাই, খাও

এখন তোমরা দু'জনে। দেখে চোখ দু'টো জুড়িয়ে যাক আমার।

পূর্ণশশী বললেন,—ছাখ্, তো বৌ, কোথা থেকে উড়ে এসে তোর ভাগের খাবার খেতে জুড়ে বসলাম!

রাজেশ্বরী বললে,—আমি একা কখনও এত খাবার একলা খেতে পারি? খান না দিদি, খান। ছিঃ, ও সব কথা বলতে আছে কখনও! আপনি কি আমাদের কাছে ভিন্ন কেউ? বল' তো ঠাগ্‌মা?

বৃদ্ধা বললেন,—তাই না তাই। আমার কাছে তোমাতে আর রাজেশ্বরীতে কি কিছু পার্থক্য আছে? আর তা ছাড়া, আমার তো উচিত তোমাকে একদিন রাজোর বাপের বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রে পোলাও-কালিয়া খাওয়ানো। তুমিই তো প্রথম রাজোর বিয়ের কথা আমার কাছে পেড়েছিলে। মনে আছে দিদিভাই? দক্ষিণেশ্বরে?

—হ্যাঁ, মনে আছে। সে তো এই সেদিনের কথা। বললেন পূর্ণশশী। ঠোঁটের কোণে হাসির রেশ টেনে বললেন,—তবে কি ঠাকুমা ঘটকালী না দিয়ে শুধু পোলাও-কালিয়া খাইয়েই নাতনীর বিয়েটা চুকিয়ে নিতে চান? কথাটা যখন উঠলো, তখন আমিই বা না বলি কেন!

—তবে কি বল' দিদি, নগদ টাকা দিয়ে রাজোর শ্বশুর-ঘরে তোমার অপমান করা হোক, সেইটেই চাও তুমি? কি বল্ রাজো?

রেকাবীতে আহার্য্য সাজাতে সাজাতে ক্ষণিকের জন্য বিরত হ'লেন রাজেশ্বরীর পিতামহী। কথা বলতে থামলেন।

আয়ত আঁখি মেলে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী। কার পক্ষে হয়ে কথা বলবে! কার কথায় সায় দেবে আর কার কথা ফেলবে! তবুও কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—আমাকে আবার টানছো কেন? আমি বাবা জানি না।

—এই তো কেমন বুদ্ধিমতী মেয়ের কথা! বলুন তো ঠাকুমা? সহাস্যে বললেন পূর্ণশশী। মুক্তার মত দাঁতের সারি দেখিয়ে বললেন,—ও যে এখন আমাদের মেয়ে হয়ে গেছে। ও কি এখন আর আপনাদের বাড়ীর মেয়ে আছে? ওর ভোল পালটে গেছে।

কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন তখন অসহায় বৃদ্ধা।

রাজেশ্বরী আর পূর্ণশশী দু'জনের কথা শুনেই যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। বললেন,—আচ্ছা ভাই, আচ্ছা। হার মানছি দু'জনের কাছেই। কয়েক দণ্ড থেমে পুনরায় বললেন,—তার চেয়ে এক কাজ কর' না দিদি, যার বে দিয়েছো তার কাছ থেকেই আদায় কর' না যা মন চায়। এখন রেকাবী দু'টি দু'জনে শেষ কর দেখি, দেখে আমার মনটা জুড়োক্।

পূর্ণশশী বললেন,—রেকাবী শেষ ক'রতে হবে, তা হ'লেই হয়েছে!

—না ভাই, ও সব কথা আমি শুনতে চাই না। না খেলে আমি মনে খুব কষ্ট পাবো কিন্তু। বললেন রাজেশ্বরীর পিতামহী। বললেন,—গল্প করতে করতে খাও না, কি আর এমন দেওয়া হয়েছে!

পূর্ণশশী মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন,—এদিকে রাত কত হয়েছে জানেন? বোধ হয় আটটা বাজতে চ'ললো। অসময় যে ঠাকুমা! এখন কি খাওয়া যায় এই রেকাবী-ভর্ত্তি খাবার?

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে রাজেশ্বরীর।

আটটা প্রায় বাজলো যে, এখনও ফিরলো না উকিল-বাড়ী থেকে! আশ্চর্য্য! ঘর থেকে জানলার বাইরে আকাশ দেখতে প্রয়াস পায় রাজেশ্বরী। কিন্তু কিছু দেখা যায় না। শুধু কালো আকাশ, ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। একটা নক্ষত্র পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না। দিনের আকাশ তো নয় যে, দেখেই বোঝা যাবে সময়ের গতি? ক'টা বাজলো? রাত্রির আকাশ দেখে কি বুঝবে রাজেশ্বরী! যত ভাবে ততই যেন ঐ কালো আকাশের মতই রাজেশ্বরীর চিন্তিত মন নানা ভাবনার ঘূর্ণাবর্ত্তে পাক খেতে থাকে। ফ্যাল-ফ্যাল চোখে, পলকহীন দৃষ্টিতে চুপটি ক'রে ব'সে থাকে রাজেশ্বরী।

—খাও ভাই। বললেন রাজেশ্বরীর পিতামহী। বললেন,—না খেলে আমি উঠছি না কিন্তু।

—কে আপনাকে ব'লেছে উঠতে? বললেন পূর্ণশশী।—বসুন না। কখনও তো নাতনীর বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেন না।

বৃদ্ধা যেন কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন,—এও রাজেশ্বরীর, সেও রাজেশ্বরীর। আমি তো সেখানে শুধু বাড়ী আগ্‌লাবার জন্যে আছি দিদি। রাজোর বাপ তো রাজোকেই দিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে রাজো আমাকে যখন খুশী তাড়িয়ে দিতে পারে।

পূর্ণশশী বললেন,—কি যে বলেন ঠাকুমা!

রাজেশ্বরী বললে,—কিসে এয়েছো? কার সঙ্গে?

—না খেলে আমি আর একটি কথাও বলছি না। এই আমি মুখে তালা দিচ্ছি। তোমরা খাও, খেতে-খেতে কথা বল'। বললেন বৃদ্ধা। নকল তিরস্কারের সুরে।

শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হ'য়ে দু'জনকেই খাবারে হাত দিতে হয়। পূর্ণশশী ব্রাহ্মণীর উদ্দেশে বললেন,—বামুনদি, খাবারের থালা ক'টা তুলে ভাঁড়ারে রাখো।

কিছু ভাল লাগছে না রাজেশ্বরীর।

ভাল লাগছে না এই পরিস্থিতি। রাত্রি কত হয়ে গেল; কখন বেরিয়েছে; এখনও ফিরলো না উকিল-বাড়ী থেকে! ভাল লাগছে না বুড়ী পিতামহী আর পূর্ণশশীকে। ভাল লাগছে না মানুষের চোখের সম্মুখে থাকতে। ইচ্ছা না থাকলেও একেকটা আহার্য্য মুখে তোলে রাজেশ্বরী। কারও কথা শুনতে ভাল লাগে না পর্য্যন্ত। এখন, ঠিক এই মুহূর্ত্তে দোতলায় গিয়ে খাস-কামরায় বসতে পারলে হয়তো কিছুটা মনস্থির হয়। কিন্তু উপায় নেই যে কোন'। বলবে কি বাড়ীর লোকজন! ঠাগ্‌মাই বা কি মনে করবে!

বৃদ্ধার কথায় কেন কে জানে আজ যেন মধ্যে মধ্যে দুঃখের আভাষ পাওয়া যায়। তিনি বলেন,—কার সঙ্গে আর আসবো ভাই! এয়েছি তোমাদের ঘরের গাড়ীতে। সঙ্গে কেউ নেই। তোমাদের পুরানো কোচুয়ান আছে, আবার কি?

রাজেশ্বরীর মৃত পিতৃদেবেরও আছে একটা ঘোড়ার গাড়ী।

কৃষ্ণকিশোরদের গাড়ীর মত তত দামী না হ'লেও বিলীতি কোম্পানীর তৈয়ারী। জুড়ীর ঘোড়া দুটোর বয়স হ'লেও একেবারে বেতো ঘোড়া নয়। অক্স-ব্লাড অর্থাৎ যাঁড়ের-রক্ত-রঙের একটি ফাটন। পুরানো হ'লেও নতুনের মতই মজবুত গাড়ীটা।

কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে রাজেশ্বরী। হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়।

ব্রাহ্মণী খাবারের থালা তুলতে দাঁড়িয়েছিল এক পাশে। রাজেশ্বরী বললে,—শুনুন বামুনদিদি।

ব্রাহ্মণী কান বাড়িয়ে এগিয়ে আসে।

কানে কানেই চুপি চুপি কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে—কাউকে ব'লে দিন না, কাছারীতে ব'লে আসা'ব যে গাড়ীর কোচয়ান আর সইসদের বকৃশিস্ দেওয়া হয় যেন। আর আপনি একটা মাটির মালসায় ওদের কিছু জল-খাবার পাঠিয়ে দিন। নইলে ভাল দেখাবে না।

—ঠিক ব'লেছো বৌ। বললে ব্রাহ্মণী। থালা ক'টা ভাঁড়ারে তুলে দিয়েই আমি ব্যবস্থা করছি। হাঁ বৌ, থালাগুলো আজ আর আজাড় করতে হবে না তো?

রাজেশ্বরী বললে,—না, না। আজকে থাক্। পরে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। আপনি ভাই কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন।

—এই যে এখনই ব্যবস্থা করছি।

কথার শেষে আহার্য্যে পরিপূর্ণ একটা থালা তুলে নিয়ে চলে যায় ব্রাহ্মণী। যায় দ্রুতপদে। হাতে ভার থাকলে যেমন দ্রুত যায় মানুষ। ব্রাহ্মণী যেন অনুমানে বুঝতে পারে, রাজেশ্বরী কেন এত তাড়া করছে। ব্রাহ্মণী ভাবে, বৌ নিশ্চয়ই মনে করছে, স্বামী কোন্ রূপে আসে কে জানে। তার আগে ঠাগ্‌মা মানে-মানে চ'লে গেলে ভাল হয়। মাতাল অবস্থায় স্বামী ফিরে কোন' একটা কেলেঙ্কারী করলে ঠাগ্‌মাকে আর মুখ দেখাতে পারবে রাজেশ্বরী!

পিতামহী সেই শৈশব থেকে লালন পালন ক'রেছেন।

বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছেন বলা চলে। অনেকক্ষণ দেখে দেখে বললেন,—হ্যাঁ লা রাজো, তোর মুখে হাসি নেই কেন? তোকে কেন কি জানি মনমরা মনে হচ্ছে আমার। খাচ্ছিস তো খাচ্ছিস, নে না সাপটে খেয়ে।

কৃত্রিম হাসি হেসে পিতামহীর কথাগুলিকে লঘু ক'রে দিতে চায় রাজেশ্বরী। পূর্ণশশী বলেন,—ঘুম থেকে উঠেছে অবেলায়। হয়তো সেই জন্যে।

উপরোধে মানুষ ঢেঁকিও গেলে।

সুখাদ্য আহার্য্য তো দূরের কথা। যতগুলো পারে, পূর্ণশশী আর রাজেশ্বরী দু'জনেই খেতে চেষ্টা করে। দাসীদের কে একজন রেকাবীর কাছাকাছি দু'পাত্র পানীয় জল বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। রাজেশ্বরী বাম হাতে জলের পাত্র তুলে ডান হাত ধুয়ে জল খায় কিছুটা।

বৃদ্ধা বললেন,—আর খাবি না কিছু?

রাজেশ্বরী বললেন,—না, আর আমি পারছি না।

পূর্ণশশীও বললেন,—আমি আর পারছি না। ক্ষমা করুন ঠাকুমা।

—থাক্ ভাই, থাক্। না পারো কি হবে! আমাদের রাজ্যের নোলা কি আর আগের মত আছে! কত ভাল-মন্দ খেয়ে এখন নোলা বদ্‌লে গেছে। কিন্তু আমার নাত-জামাইয়ের সঙ্গে তো দেখা হ'ল না!

পূর্ণশশী বললেন,—বসুন না একটু। এখুনি হয়তো ফিরে আসবে!

বৃদ্ধা দুঃখের হাসি হেসে ব'ললেন,—বেশ, তাই বসি। আসা তো আর হয় না। এয়েছি যখন তখন দেখেই যাই। আহা, বাছাকে অনেক দিন দেখিনি আমি।

বেশ চ'লে যাচ্ছিলেন ঠাগ্‌মা, দিদি আবার এ কি ফ্যাসাদ করলেন! মনে মনে ভাবে রাজেশ্বরী। তবুও সে বললে,—তার চেয়ে এক কাজ কর' না। আমি না হয় ওকে একদিন পাঠিয়ে দেবো তোমার কাছে। গিয়ে দেখা ক'রে আসবে। আজকে ফিরতে যদি রাত হয়! কতক্ষণ বসবে তুমি! খাওয়া-দাওয়াও তো এখানে করবে না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত সবিস্ময়ে চেয়ে থাকেন বৃদ্ধা।

সত্যিই বৃদ্ধা স্বপাক অন্ন ব্যতীত অন্যের হাতে কিছু গ্রহণ করেন না। প্রায় একাহারী হয়ে থাকেন বললেই হয়। রাত্রে সামান্য কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আর দু'টো কি একটা ফল খেয়ে থাকেন। যা খাওয়ার ঐ মধ্যাহ্নের মধ্যেই খান।

পূর্ণশশীও হয়তো এতক্ষণে বুঝতে পারেন রাজেশ্বরীর মনোভাব। তাঁর নিজের বলা কথার জন্য মনে মনে লজ্জানুভব করেন। কি বলতে কি বললেন তিনি। কি ভাবলো রাজেশ্বরী? পূর্ণশশী বললেন,—নাত্‌নীর সঙ্গে আপনি কথা বলুন, আমি দু'টো পান সেজে খেয়ে আসি।

কথা বলতে বলতে উঠে পড়লেন পূর্ণশশী।

বৃদ্ধা অনন্যোপায় হ'য়ে বললেন,—আমিও তবে যাই ভাই! সেই বরং ভাল, একদিন নাতজামাইকে পাঠিয়ে দিও। কি ক'রবো বল্ রাজো?

এমন সময়ে দাসীদের একজন কথার মধ্যে কথা বললে,—এই তো দেখে এনু, হুজুর ফিরেছে, সদরে আছে। অনুমান করি, অন্দরে আসতেছে।

মিথ্যা কথা বলেনি দাসী!

জুড়ী কিছুক্ষণ আগে ভিড়েছে ফটকের মুখে। কৃষ্ণকিশোর ফিরেছে উকিল-বাড়ী থেকে না অন্য কোথাও থেকে জানেন শুধু ঈশ্বর, যাঁর চোখে ধুলো দিয়ে না কি কারও

কিছু করবার নেই। দেখলে কিন্তু কে বলবে যে, হুজুর কোথায় ছিলেন এতক্ষণ। উকিল-বাড়ীতে না গহরজানের কাছে?

অন্যান্য দিনের মত গহরজান সত্যিই আজ কোন বেয়াদপি করেনি। স্ফূর্ত্তি আর আহ্লাদে ডুবে না থেকে, কথায় কথায় কারণে অকারণে হাসির ঢেউ না তুলে অশ্রুসজল চোখে থেকেছে। কেঁদেছে কতক্ষণ? কোন বজ্জাতি করেনি। গরাণহাটার পল্লীতে ভাল ভাল মুখরোচক খানা-খাবারের অর্ডার পাঠিয়ে বন্দোবস্ত করেছে তৃপ্তিকর আহার্য্য-সামগ্রীর। কিছু বরফ আনিয়ে নিয়ে আর খাবারের পাত্রগুলো ঘরে নিয়ে ঘরের ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়েছে দরজাটা। আজে-বাজে খাবার নয়, নবাবী খানা অর্ডার দিয়েছিল গহরজান। পাঁঠার সামি-কাবাব, দুম্বার চর্ব্বির ঝোল, মুরগী-ডিমের পোলাও আর গোটা কয়েক সিদ্ধ পেঁয়াজ আনিয়েছে গহরজান। ক'খানা ঘিয়ে-ভেজা পরোটা। পেস্তা আর বাদামের চাকতি। কয়েক গণ্ডা তবক দেওয়া আমীরী পান আর কয়েক বোতল জলসোডা।

গহরজানের ঘরের একটা কোণ ভ'রে গিয়েছিল এই সকল খাদ্যদ্রব্যে। ঘরের এক দেওয়ালে ভেড়ানো এক আবলুস কাঠের দেরাজের মাথায় জলসোডার বোতল আর কয়েকটা বেলোয়ারী কাচের রঙীন নক্সা কাটা গেলাস সাজিয়ে রেখে ফরাসে গিয়ে ব'সেছে নিশ্চিন্ত হয়ে। হ্যাঁ, দেরাজের মাথায় সযত্নে রেখেছে কি একটা বোতল, যেটার দাম নাকি অনেক। জাত বিলীতি। কড়া আর উগ্র পানীয় নয়, হয়তো বিলীতি দ্রাক্ষাসুধা। কিংবা হয়তো শ্যাম্পেন্ কিংবা শেরী; ইটালীর পুরানো পোর্ট কিংবা ফরাসী তারমুখ, হয়তো—যা খেলে নেশা হয় কিন্তু মাতাল হওয়া যায় না। এই ভরা দুপুরে কি হবে নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে। তার চেয়ে বরং গল্প-গুজব ক'রে সময় কাটানো যাবে—ভেবেছিল গহরজান। গল্প করতে করতে মাঝে মিশেলে খাওয়া যাবে একটু একটু, ঢুকু-ঢুকু। পরিধানের জামাটা যাতে লাট হয়ে না যায় সেই কথা ভেবে কথায় কথায় কৃষ্ণকিশোরের অঙ্গ থেকে গহরজান সাদা রেশমের বুটিদার বেনিয়ানটা সাদরে খুলে নিয়ে টাঙিয়ে রেখেছিল ঘরের দেওয়াল-আলনায়।

নেশাও উগ্র হয়নি আর জামাটাও লাট হয়ে যায়নি।

যা লক্ষ্য ক'রে সত্যিই মন থেকে খুশী হয় রাজেশ্বরী। কৃষ্ণকিশোর অন্দরে আসতেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে রাজেশ্বরী। লক্ষ্য করে আর ভয়ে সিঁটিয়ে যায় সে। যদি কিছু অশোভনীয় চোখে পড়ে। যদি কোন অন্যায় দেখা যায়। দেখা যায় যদি নেশায় টলটলায়মান মুর্ত্তি আর লাট হয়ে যাওয়া জামা, তা হ'লে কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাবে রাজেশ্বরী! স্বামীকে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেললে রাজেশ্বরী।

কৃষ্ণকিশোর দিদিশাশুড়ীকে দেখতে পেয়ে, অর্থাৎ রাজেশ্বরার বৃদ্ধা পিতামহীকে দেখে তাঁর পায়ে করস্পর্শ ক'রে তাঁকে প্রণাম করে। বলে,—কখন এলেন?

—এসেছি ভাই বহুৎ ক্ষণ। যাবো যাবো করছি। তোমার জন্যেই ভাই ব'সে আছি। তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো ভেবেছি। উকিল-বাড়ী গিয়েছিলে? কাজ মিটলো? স্নেহসিক্ত সুরে কথা বললেন রাজেশ্বরীর পিতামহী।

কৃষ্ণকিশোর প্রণাম ক'রে বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আইন যেমন আছে, তেমনি আইনের ফাঁকও তো আছে। জমিদারীর একটা বিশেষ কাজে গিয়েছিলাম। কাজ মিটেছে। তা এখুনি আপনি চ'লে যাবেন কেন? থাকুন না আজ রাতটা আমাদের এখানে।

কৃষ্ণকিশোরের প্রকৃতিস্থ কথাগুলি শুনে রাজেশ্বরী তৃপ্ত যেমন হয় তেমনি খুশীও হয়। বুড়ীর গলা জড়িয়ে বলে আবদারের সুরে,—হ্যাঁ ঠাগমা, আজকে তুমি থাকো। কালকে খেয়ে-দেয়ে সেই দুপুরে যেও।

বৃদ্ধা হাসতে হাসতে বলেন,—সে কি কথা ভাই? ঘর-দোর যে আলগা ফেলে এয়েছি! কে দেখবে?

রাজেশ্বরী বললে,—দেখবার লোক যথেষ্ট আছে। তোমাকে আজ ছাড়ছি না আমি। চল' ঠাগ-মা, এখান থেকে চল'। দোতলায় চল'। মেয়েদের বৈঠকখানা আছে কেমন, দেখবে। চলুন দিদি, আপনিও চলুন।

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে পূর্ণশশী দেখছিলেন পিতামহী আর নাতনীকে। শুনছিলেন তাদের কথা-বার্ত্তা। একজন প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধা আর অন্য জন যৌবনে টলমল কিশোরী। যেন সদ্য-প্রস্ফুটিত একটি ফুল, রঙে আর গন্ধে পরিপূর্ণ। পূর্ণশশী সহাস্যে বললেন,—হ্যাঁ বৌ, ছেড়ো না ঠাকুমাকে। তোমাদের গাড়ীকে আজ ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। ব'লে পাঠাও, আগামী কাল দুপুরে ঠাকুমাকে নিতে আসবে।

একান্ত অসহায়ের মত বৃদ্ধা বললেন,—তুমিও দিদি যোগ দিলে ঐ পাগলীটার সঙ্গে? না ভাই রাজো, আর একদিন আসবো আমি। থাকবো যতদিন ব'লবি। আজকে আমি যাই। কোথায় খাবো, কোথায় শোবো, কোথায় কি ক'রবো ভাই!

মুক্তার সারির মত দাঁত দেখিয়ে খিল-খিল শব্দে হাসতে লাগলেন পূর্ণশশী। হাসতে হাসতেই বললেন,—নাতনীকে এমন ঘরে দিলেন কেন, যাদের বাড়ীতে থাকবার শোবার ঘর পর্য্যন্ত নেই?

—বালাই ষাট! ছিঃ, এমন কথা মুখে আনতে আছে কখনও! আমি কি তাই ব'লেছি? তুমি দিদিভাই দেখছি, সাংঘাতিক মেয়ে তো! কথা বলতে বলতে বৃদ্ধা যেন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন।

খিল-খিল শব্দে হাসি যেন পূর্ণশশীর থামতেই চায় না। হাসির তরঙ্গ তুলে বললেন,—বললেন না আপনি? তবে, তবে না ব'লে থাকেন তো ভালই, নাতনীর কথাটি রক্ষা করুন।

কি যেন ভাবতে থাকেন বৃদ্ধা। কয়েক মুহূর্ত্ত ভেবে ব'ললেন,—তবে, তুমিও থাকো দিদি। সবাই মিলে আজ আনন্দ করা যাক্। ছাড়বেই না যখন, তখন—

পূর্ণশশী বললেন,—আমার বাসায় যে ঠাকুমা দু'টো বাচ্ছা আছে। একটি ছেলে আর আরেকটি মেয়ে। আমাকে তো শীঘ্রি আপনার নাতনীর কাছে এসেই থাকতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই এসে থাকবো। আপনার নাতনী আর নাতজামাই অনুমতি দিয়েছেন।

এতক্ষণ কৃষ্ণকিশোর কোন' কথা বলেনি।

পূর্ণশশীর কথায় থাকতে না পেরেই যেন কৃষ্ণকিশোর ব'ললে,—শশীবৌদিকে থাকবার জন্যে আমাদের অনুমতি দিতে হবে? নাঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন শশীবৌদি আপনি!

বৃদ্ধা হতাশার শ্বাস ফেলে ব'ললেন,—পোড়া কপাল যেমন আমার! আমার বাসায় তো দিদি ব্যাটারা নেই! ব্যাটা আমারও ছিল ভাই. রত্নের মতই ছিল রাজোর বাপ! এই পোড়া-কপালীর দোষে চ'লে গেল, বড় অসময়ে স্বর্গে চ'লে গেল! রাজোর বাপও গেল, মাও গেল। রাজোর মা বোধ হয় বৈধব্যের কঠোর জ্বালা সহ্যি করতে পারলো না। স্বামী যাওয়ার এক বছরের মধ্যে সেও স্বামীর কাছে চ'লে গেল। বাইরে থেকেই দেখছো আমাকে, তোমাদের সঙ্গে হাসছি, কথা কচ্ছি। ভেতরটা আমার সদাক্ষণ জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সকল সময়ে। শোকে আর তাপে।

যারা শুনছিল তাদের সকলের মুখেই যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে বিষাদের ছায়া নামলো। সহানুভূতির করুণতা। কথা বলতে বলতে বৃদ্ধার চোখের কোণগুলি চিক-চিক করতে থাকে। হয়তো অবাধ্য চক্ষুর্দ্বয় বাধা না মেনে দু-এক বিন্দু উষ্ণ জলবিন্দু উপহার দেয়। শোক আর তাপের পার্থিব বিকাশ হয়তো!

তবুও খুশীতে উছলে ওঠে রাজেশ্বরীর দেহ ও মন।

স্বামী ভাল হ'লে নারীর কত সুখ, তা হয় তো কেবল মাত্র অনুভব করতে সক্ষম হয় নারীগণ,—মনের মত মনের সাথী পেয়ে সমস্ত কিছু দুঃখকে হয়তো উপেক্ষা করতে পারে।

কৃষ্ণকিশোরের কাছাকাছি এগিয়ে পূর্ণশশী স্বর নত ক'রে বললেন,—ওঁদের গাড়ী তুমি ফিরে যেতে ব'লে দাও। আহা, বুড়ীর কত কষ্ট দেখেছো!

—যে আজ্ঞে। বললে কৃষ্ণকিশোর।—আমি এখনই সদরে গিয়ে ব'লে আসছি। আপনিও কিন্তু এখন যেতে পাবেন না শশীবৌদি। খেয়ে-দেয়ে যাবেন।

সে-কথার কোন' প্রত্যুত্তর দিলেন না পূর্ণশশী। হাসলেন শুধু সামান্য। আপত্তি করতে পারলেন না যেন। কথা ঠেলতে পারলেন না। কৃষ্ণকিশোর বললে,—বলেন তো আমি ব'লে পাঠাই আপনার বাসায়।

এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে বললেন পূর্ণশশী,—তাই ব'লে পাঠাও ভাই! ওঁকে একবার ব'লে আসবে। তা হ'লে আর অপেক্ষা না ক'রে উনি খেয়ে নেবেন। বাচ্ছা দু'টোকে খাইয়ে দেবেন। আমি রাত্রির খাওয়া তৈরী ক'রে দিয়েই আসছি।

—বেশ, ভাল কথা। বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—এই তো কেমন লক্ষ্মী মেয়ের কাজ!

সে-কথারও কোন' প্রত্যুত্তর দেন না পূর্ণশশী।

এই গৃহটির প্রতি পূর্ণশশীর মনোমধ্যে আছে যে কেমন আন্তরিক এক আকর্ষণ। আর সেই-আকর্ষণ কি আজকের, কবে থেকে তাঁর সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে এই গৃহের! পূর্ণশশী তখন বালিকা বেলায়, যখন কৃষ্ণকান্ত জীবিত ছিলেন। বাসায় থাকতে থাকতে সামান্য দু'খানা ঘরে যখন মন তাঁর অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখনই যেন এই গৃহ পূর্ণশশীকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। কত দিন পূর্ব্বের সেই সকল হারানো দিনের স্মৃতি ভেসে ওঠে পূর্ণশশীর মানসপটে! পূর্ণশশী আর কৃষ্ণকান্ত যখন ছিলেন একে অন্যের প্রতি—

—চলুন ঠাকুমা, দোতলায় চলুন। মেয়েদের বৈঠকখানা দেখাবে আপনাকে আপনার নাতনী। বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললেন পূর্ণশশী। ভাঙা-মনে আর কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে চ'ললেন। কি একটা পুরানো ছায়াছবি যেন দেখতে পেয়েছেন পূর্ণশশী। সকলের আগে আগে গিয়ে তাই হয়তো চোখের জল লুকাতে ব্যস্ত ছিলেন। নারী সত্যিই হয়তো শেষ দিন পর্য্যন্ত ভুলতে পারে না প্রথম প্রেমের গোপন কথা। ভুলতে পারে না ফেলে-আসা দিনের একেকটি মধু-মুহূর্ত্ত! পেছন পেছন উঠছিলেন বৃদ্ধা আর রাজেশ্বরী। পূর্ণশশী বললেন,—বৌ, ডাক্ একজন দাসীকে। বল্, ঘরটা খুলে দিক্। আমি ততক্ষণ ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলি, তুই স্বামীকে ডাকিয়ে স্বামীর কাছে যা। কিশোর হয়তো এখনও কিছু খায়নি। বেরিয়েছিল তো কতক্ষণ হয়ে গেছে!

লজ্জায় রাঙা হয়ে যায় রাজেশ্বরীর মুখটি।

রাজেশ্বরী বলে,—দিদি, আপনি তবে ঠাগ্‌মাকে সঙ্গে নে যান। আমি দাসীদের কাকেও ডেকে দিই। ঘর খুলে দিক্।

বৃদ্ধা বললেন,—হ্যাঁ ভাই, সেই বেশ কথা। দিদিভাই তুমি যাও একটিবারের জন্যে, খোঁজ-টোজ নাও আমার নাতজামাই যদি জল-টল কিছু খায়। তবে আমার তো মনে হয়, কিচ্ছু খেতে হবে না। আমার নাতনীর মুখের হাসি দেখলেই ছেলের পেট ভ'রে যাবে। কি বল' শশীদিদি?

পূর্ণশশী কিছু বলেন না। বৃদ্ধার একটি হাত ধ'রে শুধু মৃদু মৃদু হাসেন। রাজেশ্বরী বলে,—ধ্যেৎ, ঠাগ্‌মা যেন কি!

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকেন আর রাজেশ্বরী নেমে যায় একতলায়। পূর্ণশশী বললেন,—বড্ড অন্ধকার, নয় ঠাকুমা? আপনি আমার হাত ধ'রে সাবধানে উঠুন। কোন ভয় নেই।

বৃদ্ধা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি ভাঙেন। বলেন,—কিন্তু, তখন তো দিদি কথাটা শুনে বুঝলাম না কিছু?

—কি কথা বলুন তো ঠাকুমা? শুধোলেন পূর্ণশশী।

—ঐ যে তখন বললে, তুমি শীঘ্রি আসছো এই বাড়ীতে, থাকছো আমার নাতনীটির কাছে? খুব ভাল কথা। শুনে আমি কত যে খুশী হয়েছি! রাজোর তো কথা বলবার মত একটি কেউ নেই। শুনে খুব আহ্লাদ হ'ল। কিন্তু কেন তাই? বৃদ্ধা কৌতূহলী স্বরে কথাগুলি বললেন।

পূর্ণশশী বললেন,—উনি বেশ কিছুদিনের জন্য সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছেন। ইউরোপ যাত্রা করছেন। মাষ্টার মানুষ তো, তাই বিলেত-টিলেত থেকে লেকচার দেওয়ার ডাক প'ড়েছে। তাদেরই খরচায় যাচ্ছেন। সেখানে লেকচার দিয়ে টাকা উপার্জ্জন করবেন। অন্ততঃ মাস ছ'য়েক লাগবে ফিরতে।

বৃদ্ধা বললেন,—ম্লেচ্ছ দেশে যাচ্ছেন সোয়ামী? তা ফিরে ভাল ক'রে একটা প্রায়শ্চিত্তির করালেই চলবে। শুনে ভাই বড় আহ্লাদ হ'ল। ভাগ্যি বটে তোমার!

পথ চলতে চলতে কখনও কখনও পূর্ণশশীর বক্ষস্থল চমকে চমকে ওঠে কেন?

সে অনেক দিন আগের কথা। এই সিঁড়িতে একদিন তাঁদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়েছিল। অনেক, অনেক দিন আগে এক সন্ধ্যায়, পূর্ণশশীর চোখে ঠিক ছবির মতই ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য, কৃষ্ণকান্ত যখন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলেন আর পূর্ণশশী বাড়ীর বড়বৌ কুমুদিনীর আহ্বানে দোতলায় চলেছিলেন তখন দেখা হয়েছিল দু'জনে। দেখেই প্রথম কারও মুখে কোন কথা ফুটলো না। একে অন্যকে দেখলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিলেন দু'জনেই। কল্পনাতীতের দেখা পাওয়া গিয়েছিল যেন দু'জনের চোখেই। অনেকক্ষণ অতীত হ'লে কৃষ্ণকান্ত ব'লেছিলেন,—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

পূর্ণশশী দৃষ্টি নত ক'রে বলেছিলেন,—যাচ্ছি, কুমু বৌঠানের কাছে। চুল বাঁধতে ডেকেছিলেন।

কৃষ্ণকান্তর বিশাল চক্ষুর অপলক দৃষ্টি যেন সহ্য করা যায় না বেশীক্ষণ। কে কোথায় দেখবে, দেখে কে কি ভাববে এই ভাবনায় অস্থির হয়ে পূর্ণশশী ব'লেছিলেন,—আমাকে পথ ছেড়ে দিন। যেতে দিন। ডাকছেন আমাকে কুমু বৌঠান।

সিঁড়ির দ্বারে কৃষ্ণকান্ত দণ্ডায়মান। তাঁর বিশাল বপু।

তাঁকে পাশ কাটিয়ে যায় এমন পথ নেই। হাসতে হাসতে ধীর কণ্ঠে কৃষ্ণকান্ত ব'লেছিলেন,—যেতে নাহি দিব।

তখন ভয়ে যেন জড়সড় হয়ে প'ড়েছিলেন পূর্ণশশী। কে কোথায় দেখলো, দেখে কে কি ভাবলো, এই ভাবনায় শরীরটা যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল তাঁর। ভালই লাগছিল দৃষ্টি-বিনিময়ের খেলা খেলতে, কিন্তু লোকলজ্জা আছে তো! যদি কেউ দেখে কোথাও থেকে, তখন?

আদো-আদো সুরে মিনতি করেছিলেন পূর্ণশশী,—আমাকে পথ ছেড়ে দিন। কেউ যদি দেখে তখন কি হবে? না না, আমাকে যেতে দিন। ঐ শুনুন কুমু বৌঠান ডাকছেন।

কথাগুলি শুনে হো-হো শব্দে হেসে উঠেছিলেন কৃষ্ণকান্ত। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন,—কৈ না তো, বৌঠান তো তোমাকে ডাকেনি। মৃষা মা বদেৎ।

শেষ কথাটার অর্থ বোধগম্য হয়নি পূর্ণশশীর। সেই দৃশ্য আজও যেন ছবির মত ভেসে ওঠে পূর্ণশশীর মানস-পটে। সিঁড় ভাঙতে ভাঙতে মধ্যে মধ্যে তাই চমকে চমকে ওঠে পূর্ণশশীর বক্ষস্থল। কিন্তু বিবাহিতা নারীর যে অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করাই পাপ! আর সেই পুরুষ যখন ইহলোকে নেই, কবে কোন্ কালে চ'লে গেছেন স্বর্গে।

একজন দাসী ছুটতে ছুটতে আসে। বৈঠকখানার কুলুপ খুলে দিতে আসে। একজন তাঁবেদারও আসে জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে। ঘরের আলো জ্বালাতে আসে। বেলোয়ারী কাচের দেওয়াল-গিরি আছে ঘরে। জ্বেলে দিয়ে যাবে তাঁবেদার।

পূর্ণশশী বললেন দাস আর দাসীকে,—একটু তাড়া ক'রে নাও। বুড়ী মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর আলোয় আলোকময় হয়ে উঠলো। বৃদ্ধার হাত ধ'রে ঘরের মধ্যে ফরাসে বসিয়ে দেন পূর্ণশশী। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের ইদিক-সিদিক দেখতে থাকেন বৃদ্ধা। চমৎকার সাজানো ঘর। পূর্ণশশীও ব'সে পড়লেন ফরাসে।

এমন সময়ে একগাল হেসে ঘরে ঢুকলো রাজেশ্বরী।

ইশারায় ডাকলো পূর্ণশশীকে। দু'পোছ রঙ, লাল আর কালো; না না, লাল আর নীল। ঘন নীল জলে টকটকে লাল পদ্ম? রাজেশ্বরী আর পূর্ণশশীর শাড়ীর রঙ আলোর আভায় বিচিত্র দেখায়।

পূর্ণশশী ঘরের বাইরে আসতেই রাজেশ্বরী বললে ফিস-ফিস,—দিদি, একটা অনুরোধ করছি। ঠাগ্‌মার জন্যে কিছু যদি খাওয়ার জোগাড় ক'রে দেন। যার-তার হাতে ঠাগ্‌মা তো খাবে না। আমি একটা গরদের শাড়ী এনে দিচ্ছি। সেইটে প'রে যদি—

পূর্ণশশী লক্ষ্য করছিলেন রাজেশ্বরীর মুখাকৃতি। বৌয়ের কথার সুরে কত কাকুতি আর মিনতি। বললেন,—বেশ কথা। আমি এক্ষুনি ক'রে দিচ্ছি। তুই স্বামীর কাছে গিছলি? কিছু খাবে-দাবে না?

রাজেশ্বরী বললে,—বেশ খুশীভরা মুখে হাসতে হাসতে বললে,—বললাম খেতে। খাবে না এখন। একেবারে রাতের খাওয়া যাবে।

পূর্ণশশী বললেন,—তা ভাল কথা তো। আমি যাচ্ছি, তুই দাসীদের ব'লে দে, আমাকে জোগাড় দিক্। কি খাবেন কি ঠাকুমা?

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তিত থেকে বললে রাজেশ্বরী,—কিছু ফল, পোয়াটাক দুধ আর দু'টো-একটা মিষ্টি।

—তা আর এমন বেশী কথা কি? আমি এখনই যাচ্ছি। ফলটা কেটে দেবো। দুধটা জ্বাল দিয়ে দেবো আর একটু ছানা কাটিয়ে দু'টো মিষ্টি তৈরী ক'রে দেবো'খন। তুই গরদের শাড়ীটা আমাকে তোদের ভাঁড়ারে পাঠিয়ে দে।

কথার শেষে পূর্ণশশী ত্বরায় চললেন রান্না-বাড়ীতে।

আর রাজেশ্বরী চললো দেরাজ থেকে গরদ বের করতে।

কৃষ্ণকিশোর পালঙ্কে শুয়েছিল হয়তো ক্লান্তি-মোচনের নিমিত্তে। চক্ষু মু'দিত ক'রে শুয়েছিল। গরদখানা এলোকেশী মারফৎ পাঠিয়ে দিয়ে রাজেশ্বরী প্রায় ছুটতে ছুটতে যায়। বৃদ্ধা পিতামহীর কাছে যায়। বৃদ্ধাকে দু'বাহুতে জড়িয়ে রাজেশ্বরী বললে,—ঠাগ্‌মা, ঠাগ্‌মা, ঠাগ্‌মা!

দন্তহীন মাড়ি দেখিয়ে হাসতে লাগলেন বৃদ্ধা। নাতনীকে জড়িয়ে ধরলেন সস্নেহে। [ক্রমশঃ।
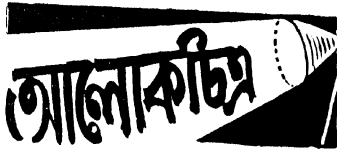
দৃষ্টিকোণ —সুব্রত মুখোপাধ্যায়

সমুদ্রের নৌকা
(প্রথম পুরস্কার)

—দেবকুমার রায়

কাশ্মীরের হাউস বোট
—বিদ্যুৎকুমার দত্ত
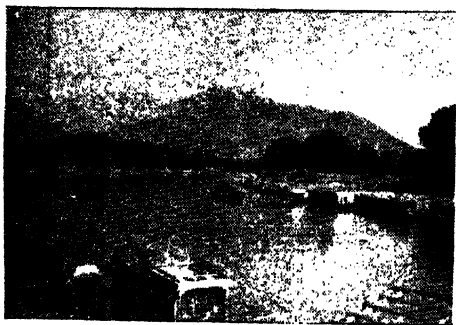
কাশ্মীরের হাউস বোট
—তারকনাথ ঘোষ
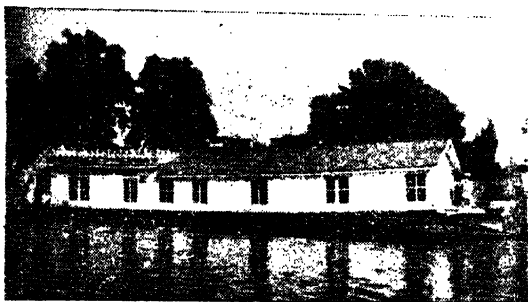
জব্বলপুর মার্ব্বল রকের ধারে
(দ্বিতীয় পুরস্কার)
—অজিতকুমার মিশ্র

—প্রতিযোগিতা—

নৌকা বিষয়ক প্রকাশযোগ্য আলোক-চিত্র অত্যধিক আসতে থাকার জন্য আগামী সংখ্যা মাসিক বসুমতীর আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় পুনরায় নৌকা বিষয়ক চিত্র মুদ্রিত হইবে। নৌকা বিষয়ক চিত্র কেহ পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে, আগামী ২২শে চৈত্রের মধ্যে পাঠাইবেন।

যাত্রা হ'ল শুরু (তৃতীয় পুরস্কার) —শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
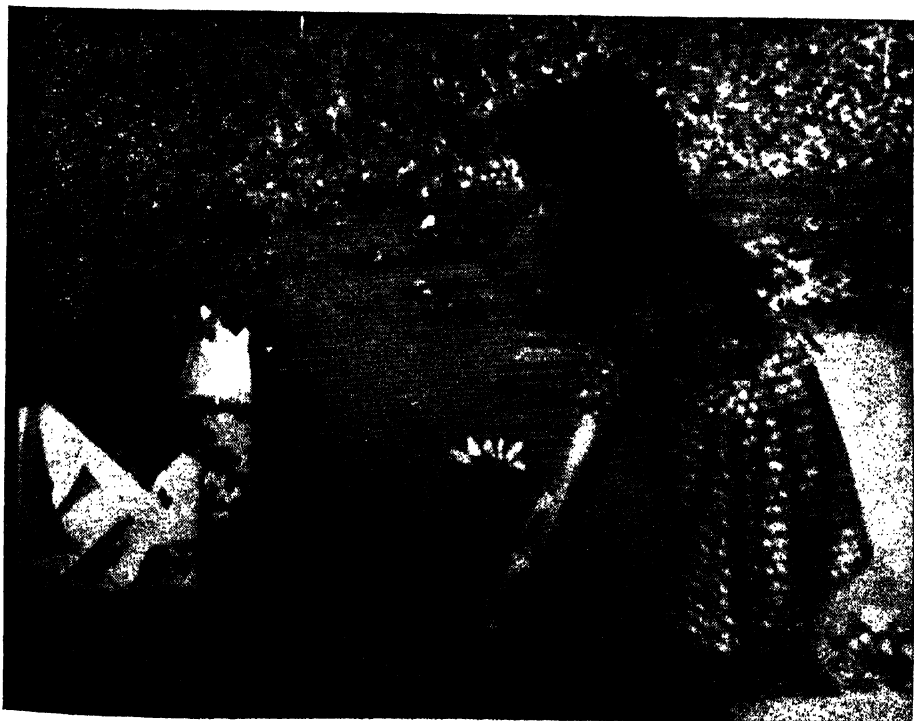
কাগজের নৌকা —গৌরীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

বাৎসল্য
—সি, গুহ এণ্ড কোং

ডিঙ্গি
—নরেন রায়

লোকমাতা নিবেদিতা
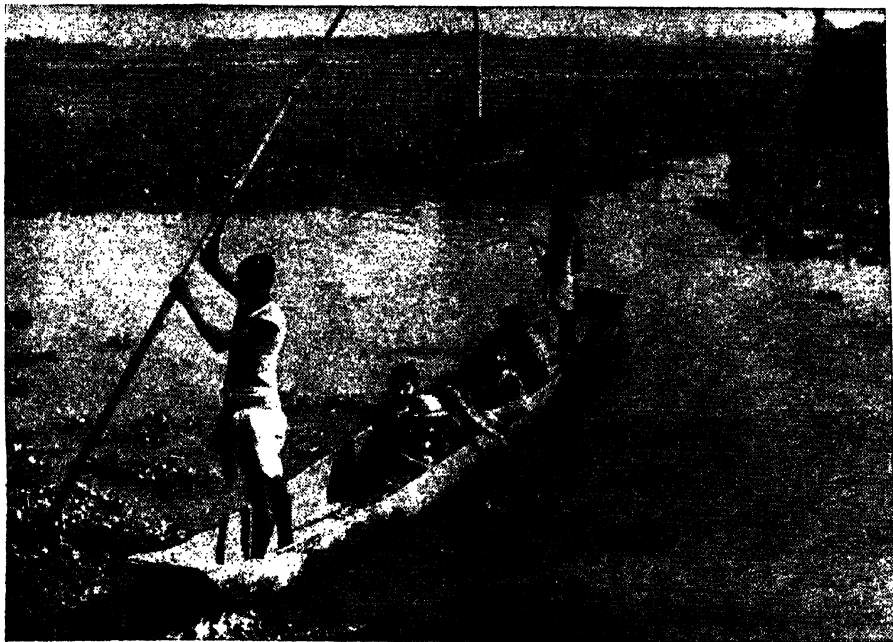
[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নিবেদিতা যেদিন বিবেকানন্দের সেই চরম আহ্বানে পাশ্চাত্য জগৎ পেছনে ফেলে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, সেদিন তাঁর সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না, তিনি সত্যিকারের কি দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়েছেন। বিবেকানন্দের অপরূপ ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের আগুনে-ভরা বিবেকানন্দের প্রত্যেক বাণী, সমস্ত জীবন-ধারা আর ইতিহাসকে দেখবার সেই সম্পূর্ণ অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী, তরুণী মারগারেটের জাগ্রত মস্তিষ্ক ও মনে প্রচণ্ড ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণ জীবনের গতানুগতিকতার ঊর্দ্ধে তরুণী মারগারেট তখন একটা বৃহত্তর মহত্তর জীবনের পথ ব্যাকুল ভাবে খুঁজছিলেন। লণ্ডনে বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে, দিনের পর দিন তাঁর প্রত্যেকটি কথা ও আচরণ অন্তরের সুগভীর স্তরে পর্য্যালোচনা করে, তরুণী মারগারেটের অন্তরে সুগভীর ভালবাসার মতন জেগে ওঠে এক সুগভীর বিশ্বাস, জীবনের মহত্তর প্রকাশের যে-পথ তিনি খুঁজছেন, এই অপরূপ ভারত-সন্ন্যাসীই দিতে পারেন তাঁকে সেই পথের সন্ধান, নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় গুরু হিসাবে তাঁর কাছে করা যায় আত্মসমর্পণ। তাই বিবেকানন্দকে গুরু হিসাবে আত্মসমর্পণ করেই তিনি ভারতবর্ষে আসেন। কিন্তু তরুণী মারগারেটের মনে ও মস্তিষ্কে তখন কোন ধারণাই ছিল না এই "গুরু" শব্দটির তাৎপর্য্য কি, এবং এই আত্ম-সমর্পণের ব্যাপারে তাঁকে কি এবং কতখানি সমর্পণ করতে হবে। সাধারণ ভাবে তাঁর পাশ্চাত্য চেতনায় তখন গুরু বলতে তিনি বুঝেছিলেন, যাঁর কথা ও নির্দ্দেশ মত তাঁর কর্ম্ম-জীবন পরিচালিত হবে। এবং যাঁকে গুরু বলে মারগারেট সেদিন স্বীকার করে নিলেন, তাঁকে অন্তর থেকে ভালবাসলেও তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সেদিন আদৌ চিনতে পারেননি, বুঝতে পারেননি। লণ্ডনে ওয়েষ্ট এণ্ডের সেই বৈঠকখানা-ঘরে বিবেকানন্দকে দেখে মারগারেটের মনে নিশ্চয়ই প্রত্যয় জন্মেছিল যে, এই ব্যক্তিটি ইতিহাসের এক জন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলতে পাশ্চাত্য জগতে যা বোঝায়, তার বেশী কিছুই তখন মারগারেট অনুমান করতে পারেননি। নিবেদিতা পরে তাঁর সেই সময়কার মনের ভাবের কথা উল্লেখ করে নিজেই লিখে গিয়েছেন, সেদিন আমার সুদূরতম স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারিনি, শিষ্য হয়ে যাঁর কাছে যাচ্ছি, তাঁর আর আমার মধ্যে কি প্রচণ্ড ব্যবধান! লণ্ডনে যে-বিবেকানন্দকে মারগারেট দেখেছিলেন, তাঁর কাছে ছুটে আসতে মনে কোন শঙ্কা জাগেনি···ভারতবর্ষে এসে একান্ত নিকটে যে-বিবেকানন্দকে দেখলেন, মারগারেটের সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো···এ কোন্ মহা-অপরিচিত, কোন্ অদৃশ্য মেঘলোকে গিয়ে ঠেকেছে তার আলোক-উদ্ভাসিত শৃঙ্গ, কোথায় এ মহাসাগরের তট, কোনখানে কি ভাবে স্পর্শ করা যায় এই আকাশকে, অপ্রকাশ্য মহা-বেদনায় নবদীক্ষিতা নিবেদিতা মাসের পর মাস বিহ্বল বিস্ময়ে শুধু খুঁজেছে গুরুর সঙ্গে এতটুকু সংযোগের ক্ষেত্র। সাধারণত যাঁদের ধারণা যে মারগারেট অনায়াসেই নিবেদিতা হয়েছিলেন, তাঁরা বিবেকানন্দ-নিবেদিতার মহা-সম্পর্কের অদ্বিতীয় মাধুর্য্যের কোন স্বাদই পাননি। নিবেদিতার নামকে বেষ্টন করে আছে নবজন্মের প্রচণ্ড বেদনার অগ্নিশিখা।

পুরাণে আমরা দেখেছি, দগ্ধ-মদনের ভস্মস্তূপে ব'সে হিমগিরি-কন্যা গৌরী সুকঠোর তপস্যায় হয়েছেন উমা, বহু বহু শতাব্দী পরে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা আবার দেখলাম আর এক গৌরীকে তেমনি সুকঠোর তপস্যায় হতে উমা। যে-বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় মারগারেট হয়েছিলেন নিবেদিতা, তার মধ্যে রয়ে গিয়েছে এক অদ্বিতীয় মানবীয় পরীক্ষা, মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের আগামী স্তরের প্রস্তুতি।

ইংলণ্ডের তীর ত্যাগ করে যেদিন মারগারেট ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হলেন, সেদিন ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও তাঁর মনে ছিল সাধারণ য়ুরোপবাসীর মতনই একটা অস্পষ্ট ধারণা। সেদিন তাঁর সুদূরতম কল্পনাতেও তিনি ভাবতে পারতেন না, যে-অজানা দেশে তিনি যাচ্ছেন, সেই অজানা দেশের জল-হাওয়া-মাটীর মধ্যে এই ইহ-দেহেই তিনি নেবেন জন্মান্তর···তিনি জানতেন না, প্রবাসী কন্যার মত তিনি ফিরে যাচ্ছেন নিজের জননীর কাছেই, যে-জননীর কোল থেকে আর তিনি যাবেন না ফিরে। লণ্ডনে বিবেকানন্দের মুখে ভারতবর্ষের কথা শোনার আগে, মারগারেটের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত ইংরেজের মতন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষ ইংরেজের বিজিত একটা বিরাট উপনিবেশ, যেখানে হাতী আর বানরকে লোকে দেবতা বলে পূজা করে, আর মানুষকে মানুষ ঘৃণায় স্পর্শ করে না, অতি প্রাচীন তার ইতিহাস, এবং এই প্রাচীনতারই ভূত-প্রেত নানা রকম কুসংস্কারের রূপে সেই দেশের কোটি কোটি মানুষকে অশিক্ষা আর দারিদ্র্য আর অর্দ্ধ-সভ্যতায় এমন ভাবে বেঁধে রেখেছে যে, সুসভ্য ইংরেজের স্কন্ধে পড়েছে সেই দেশকে সভ্য করে তোলবার অতি দুরূহ দায়িত্ব। বিবেকানন্দের মুখে ভারতবর্ষের কথা শুনে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে-ধারণা খানিকটা মুছে গেল বটে কিন্তু ভারতবর্ষ যে কি, সে-সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণাই তখন জাগেনি। বিবেকানন্দের কথা থেকে মারগারেট স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এই গৈরিক-বাস সন্ন্যাসীর অন্তরে যদি কোন ইষ্টদেবী থাকেন, তবে সে ইষ্টদেবী হলেন ভারতবর্ষ, সন্ন্যাসীর স্বদেশ। সন্ন্যাসীর প্রত্যেক কথা থেকে বুঝলেন, সন্ন্যাসীর যদি কোন ধর্ম্ম থাকে, সে-ধর্ম্ম হলো স্বদেশকে ভালবাসা। স্বদেশ-প্রেমিক আইরিশ তরুণীর মনে জেগে উঠলো নিগৃহীত, নির্য্যাতিত দরিদ্র ভারতবর্ষের রূপ। তাই বিবেকানন্দ যেদিন ক্লাসের বাইরে আলাদা করে তাঁকে বললেন, ভারতের অসংখ্য অশিক্ষিত নারীর সেবায় তোমার মতন মেয়ের সহায়তার প্রয়োজন আছে, সেদিন আইরিশ-তরুণীর অন্তরে ভারতবর্ষকে সেবা করবার একটা সত্যিকারের প্রেরণা জেগে উঠেছিল। তাই যেদিন ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, সেদিন তাঁর চোখের সামনে ছিল—দরিদ্র ভারতবর্ষ, অশিক্ষিত ভারতবর্ষ, অসহায় নারীদের ভারতবর্ষ, ইংরেজের পরাজিত ভারতবর্ষ।

সেদিনও মনের নিভৃতে তিনি ছিলেন বিজেতা ইংরেজের মেয়ে, সভ্যতার উচ্চ স্তর থেকে যাকে স্বেচ্ছায় নেমে আসতে হচ্ছে অর্দ্ধ-সভ্যতার নিম্ন স্তরে, সংগোপনে মনের ভেতর ছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-সুলভ অনুগ্রহ আর অনুকম্পার ভাব। সেদিন মারগারেট কল্পনা করতেও পারতেন না যে অচিরকালে একদিন তাঁকেই হতে হবে ভারতবর্ষ···সেই প্রাচীনা ভারতবর্ষের কোলে তাঁকে নিতে হবে নব-জন্ম, নব-জাতকের মধ্যে আবার প্রাচীনা জননী ফিরে পাবেন তাঁর নব-যৌবন।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর এই মধ্যপাদ পর্য্যন্ত, পৃথিবীর ইতিহাস হলো মানুষের চরমতম দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিহাস। এত বিস্ময়কর দ্রুততালে এই আবিষ্কার আর অভিযানের ধারা প্রবাহিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের মন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেনি,···এমন ভাবে একটার পর আর একটা ঘটনা ভিড় করে এসেছে যে, কোন্ ঘটনার কি মূল্য তা নিরূপিত করবার অবকাশ পর্য্যন্ত মানুষ পায়নি। এই সব বিস্ময়কর ঘটনা আর দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যে এমন গুটিকতক ঘটনা আছে, যার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য আজকের যুগের রাজনৈতিক-সর্ব্বস্বতার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে···সেই স্বল্পসংখ্যক অতি-নিঃশব্দ ঘটনার দরুণ শেয়ার-মার্কেটের বাজার-দর ওঠা-নামা করেনি বলে আমরা তার কোন বাস্তব মূল্য দিইনি, কিন্তু বাজারের হট্টগোল যেদিন আপনা থেকে কমে আসবে সেদিন আমরা দেখতে পাবো, আজ যে-সব ঘটনাকে মূল্যহীন বলে অবজ্ঞা করে চলেছি, সেই সব ঘটনার মধ্যেই আছে আমাদের অস্তিত্বের বাস্তব আয়ুর খবর, আমাদের জীবনের আসল সোনা। সেদিন আমরা সেই পুরাতন সত্যকেই আবার নতুন করে বুঝতে শিখবো, প্রচণ্ড শব্দে সকলকে সজাগ করে বোমা ফাটে বলে সেইটেই মানুষের ইতিহাসের একমাত্র ঘটনা হয়, নিঃশব্দে সকলের অজ্ঞাতে কুঁড়ি যখন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, মানুষের ঘটনার ইতিহাসে তারও আছে যোগ্য স্থান।

যে-প্রক্রিয়ায় সেদিন ইংরেজের মেয়ে মারগারেট হয়েছিলেন নিবেদিতা, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে, সেই ঘটনার মধ্যে আছে আজকের বিস্ময়কর শতাব্দীর অন্যতম সব চেয়ে বড় বিস্ময়, সব চেয়ে বড় আবিষ্কার।

আর এক জন বিদেশিনী ফরাসী ভাষায় অধুনা তাঁর একখানি জীবন-চরিত লিখেছেন এবং সে-জীবন-চরিতও অনেক দিক থেকে অসম্পূর্ণ।

মারগারেট যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসেন এবং যথারীতি বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে নিবেদিতা নামগ্রহণ করেন, সেই সময় থেকে প্রায় এক বৎসর কাল তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি দিন এক বিস্ময়কর সংঘর্ষ ও সংঘাতের মধ্যে অতিবাহিত হয়। এই এক বৎসর কাল নিবেদিতা গুরু বিবেকানন্দের পাশে থেকেও ছিলেন তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে। এই নিদারুণ একটি বছরের মধ্যে বিবেকানন্দ প্রিয়তমা শিষ্যাকে পরম নিষ্ঠুরের মত ভেঙ্গে-চুরে-গুঁড়িয়ে, সেই চূর্ণিত চেতনার অণু-পরমাণু থেকে যেভাবে আবার গড়ে তোলেন সম্পূর্ণ নতুন আর এক চেতনা-ময়ী দিব্য নারী-মূর্ত্তি, তার মধ্যে আছে মানব-ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়কর মানবীয় পরীক্ষা এবং সেই সঙ্গে আছে ভারত-তত্ত্বের বহু গূঢ় তথ্য ও সমস্যার একান্ত বাস্তব প্রয়োগ ও প্রমাণ। এই বিস্ময়কর মানবীয় পরীক্ষার সমস্ত খবরই থাকতো আমাদের অজানা, যদি নিবেদিতা না লিখতেন "দি মাষ্টার এ্যাস্ আই শ হিম্" এবং হিমালয়-ভ্রমণের ছোট একখানি ডায়েরী। প্রসঙ্গত এখানে একটি কথা বলতে চাই। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব-সাহিত্যে যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে যদি আমাকে দশখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বইএর নাম করতে হয়, তাহলে আমি নিঃসংশয়ে তার মধ্যে একখানি বইএর নাম উল্লেখ করবো, সে হলো নিবেদিতার লেখা—"দি মাষ্টার এ্যাস্ আই শ হিম্।" যাঁদের ওপর আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীদের শিক্ষার ভার, তাঁরা যদি সত্যিই ভারতীয় শিক্ষার প্রাণ-শিখাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইতেন, তাহলে প্রত্যেক কলেজে এই অপরূপ বইখানিকে—যা সাহিত্য ও ঐতিহাসিকতা দু'দিক থেকেই অনবদ্য—অবশ্যপাঠ্য হিসাবে ধার্য্য করতেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই একখানি বই থেকে যে উপকার তাঁরা পেতেন, একটা সমগ্র সরকারী বিভাগ থেকে তা তাঁরা পান না। সরকারী শিক্ষা-স্পেশালিষ্টদের সেকুলার অরণ্যে সামান্য সাহিত্যিকের এই ক্রন্দন-ধ্বনি হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে কিন্তু ভারতের ভাগ্য-বিধাতা যদি জাগ্রত থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর সময়মত এবং তাঁর টেকনিক মত এই এই ভুলের সংশোধন একদিন করবেনই।

২

একান্ত বেদনার বিষয়, নিবেদিতা-বিবেকানন্দের এই অপরূপ পুরাণের ইতিবৃত্ত আমরা কিছুই জানি না বললেই হয়, জানবার আর কোন উপায়ই নেই। সেই বিস্ময়কর মানবীয় পরীক্ষার অধিকাংশ খবরই অলিখিত। এবং তার চেয়েও লজ্জার কথা, এই বৈজ্ঞানিক প্রচারের যুগে যে-নারী রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশচন্দ্রকে প্রেরণা দিয়েছেন, যে-নারী বিবেকানন্দের কর্ম্ম-সহচরী, যে-নারী প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ ভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দিয়েছেন শক্তি ও প্রেরণা, ভারতের শিল্পকে জননীর মতন করেছেন লালন-পালন, ভারতের নব-রেনাশাঁসের যে-নারী জীবনদায়িনী ধাত্রী, ভারতের ক্ষুদ্রতম নাগরিকের জীবনের কল্যাণ-চিন্তা থেকে যে-নারী ভারতের লুপ্ত ঐতিহ্যের প্রবাহকে অভিভাবায় করে গিয়েছেন জীবন্ত, একান্ত সম-সাময়িক সেই নারীর উল্লেখযোগ্য একখানিও নেই জীবন-চরিত···

৩

মারগারেট ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাংলায় আসেন, তার মাস দেড়েক পরেই বিবেকানন্দ যথারীতি তাঁকে দীক্ষা দেন এবং দীক্ষার সময় তিনি মারগারেটের নাম পরিবর্ত্তিত করে দিলেন নতুন নাম নিবেদিতা। লণ্ডনে বহু ইংরেজ শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তদের মধ্যে এই আইরিশ-তরুণীটিই তাঁকে সব চেয়ে বেশী সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করেছেন, এই তরুণীটির পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মনে সব চেয়ে বেশী জেগেছিল প্রতিবাদ, রামকৃষ্ণ শিষ্য নীরবে তা শুধু লক্ষ্য করেন, সেই বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন সেই পশ্চিমা মেয়ের মধ্যে মুক্তি-প্রয়াসী মনের জাগরণ-স্পৃহা। তাই পরে একদিন পশ্চিমা শিষ্যাদের সামনেই নিবেদিতাকে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আমার কথাকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে না পেরে থাক, তার জন্যে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়ো না,···তোমরা জান না,

আমার যিনি ইষ্ট-পুরুষ, আমার গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ, তাঁকে আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কি ভাবে সন্দিগ্ধ নিষ্ঠুর প্রশ্নে জর্জ্জরিত করেছিলাম…"

লণ্ডনের সেই প্রথম পরিচয়েই বিবেকানন্দ মারগারেটের সমস্ত শ্রদ্ধার ভেতর থেকে লক্ষ্য করেছিলেন পাশ্চাত্য-সুলভ আত্ম-সচেতন মনের স্বাতন্ত্র্য। সেখানে তখন তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে সেই স্বাতন্ত্র্য-বোধের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেননি। তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, সমস্ত অর্জ্জিত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার বাইরে মারগারেটের অন্তরে শীতের দিনের ঘুমন্ত সর্পের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে পরম-চেতনা। তিনি জানতেন, যে-পশ্চিমা মেয়ে খৃষ্টান ধর্ম্মের জীবন্ত আবহাওয়ায় সজাগ ভাবে মানুষ হয়েছে, পরিণত যৌবন পর্য্যন্ত যে ইংরেজ-মেয়ে শিক্ষার ভেতর দিয়ে ইংরেজ-চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য যে স্বাতন্ত্র্যবোধ, তাকে মজ্জায় মজ্জায় গ্রহণ করেছে, তার পক্ষে ভারত-ধর্মের অন্তরঙ্গতায় পৌঁছনো কি দুরূহ দুঃসাধ্য ব্যাপার! তবুও বিবেকানন্দ জানতেন, তাঁর অন্তরের স্বপ্ন এই পশ্চিমা মেয়ের মধ্য দিয়েই একদিন হবে সত্য, পূর্ব আর পশ্চিমের মধ্যে গড়ে উঠেছে যে দুস্তর ব্যবধান, এই পশ্চিমা মেয়ের জীবনেই দূর হয়ে যাবে সেই ব্যবধান, মানুষের মনের রাজ্যে নেই পূর্ব আর পশ্চিমের আলাদা জগৎ।

তাই দীক্ষার সময়ে বিধাতা-পুরুষের মত তিনি মারগারেটের নামকরণ করলেন, নিবেদিতা। সেই নামের ভেতর দিয়েই চিহ্নিত হয়ে গেল মারগারেটের ভবিষ্যৎ জীবন। কিন্তু মারগারেট নিজে তখন জানতেন না, সেই নামের সঙ্গে গুরু কি প্রচণ্ড ভবিতব্যতাকে তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে দিলেন বেঁধে। সেদিন যে-নামটিকে সন্ন্যাসী নিজের অন্তরের গহন গভীরতা থেকে জন্ম দিলেন, একমাত্র সেই সন্ন্যাসীই জানতেন, সেই নামকে সার্থক করবার দায়িত্বও তাঁর। সেদিন তাই সন্ন্যাসী নব-জাত মানস-কন্যার জন্যে বিশ্ব-জননীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন অপূর্ব্ব একটি ইংরেজী কবিতায়…

"জননীর যে-হৃদয়, বীরের যে-মন,
কোমলতম কুসুমের মধুরতম যে-স্পর্শ,
পূজা-বেদীর আরতি-শিখার যে-তেজ আর যে-মাধুরী,
কর্ম্মে যে-শক্তি নায়কের মত করে আজ্ঞা
অথচ প্রেমে যা স্বেচ্ছায় পালন করে আজ্ঞা
যে-স্বপ্নের নেই সীমা,
যে-ধৈর্য্য নিশ্চল,
অনন্ত যে-আত্ম-বিশ্বাস
প্রতিষ্ঠিত সর্ব্ব-জীবের স্বীকৃতিতে,
যে-ভাগবতী আলো জ্বলে বৃহতে, ক্ষুদ্রে, সর্বভূতে,
এই সমস্ত এবং তারও বেশী
যা রইলো আমার উল্লেখের বাইরে,
আজ প্রার্থনা করি, জননী দিক্ তোমাকে।"

সেদিন গুরু বিবেকানন্দ নব-দীক্ষিত শিষ্যার জন্যে বিশ্বজননীর কাছে যা-যা প্রার্থনা করেছিলেন, এমন কি, "তারও বেশী যা রইলো আমার উল্লেখের বাইরে", আমরা আজ জানি, তা পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। কিন্তু যেদিন মারগারেট নিবেদিতা-নাম গ্রহণ করেন, সেদিন একমাত্র গুরু বিবেকানন্দের অন্তর ছাড়া, নিবেদিতার সেই পরিপূর্ণ নব-রূপ, বীজের মধ্যে পরিপূর্ণ সবুজ শস্যের মত সুপ্ত ছিল। যে-নারীকে শ্রীঅরবিন্দ শিখাময়ী বলে বন্দনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁর মধ্যে দেখেছিলেন শিবাম্বিতা সতীকে, অবনীন্দ্রনাথ যাঁর মধ্যে দেখেছিলেন কাদম্বরীর মহাশ্বেতার আলোক-রূপ, যে-নারী ধাত্রীর মত, জননীর মত লালন করে গিয়েছেন নতুন ভারতকে, যে-নারীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সেই ইংরেজ-আমলে ভাইসূরয়ের পত্নী সংগোপনে ছদ্মবেশে এসেছেন তাঁর কুটীরে, সে-নারী তখন ছিল বহু বহু দূরে, খড় আর মাটীর প্রতিমার কাঠামো মাত্র, তখনো হয়নি তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। কি করে হলো তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা? কি করে সেই পাশ্চাত্য-শিক্ষিতা মারগারেট হলেন ভারত-কন্যা নিবেদিতা? ইতিহাস, ঐতিহ্য, রক্ত-ধারা, জাতি-ধর্ম্ম-ভাষা-শিক্ষা-সংস্কার, এই সমস্তের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে কি করে এক-দেহে হলো নব জন্মান্তর? বহু পাশ্চাত্য পুরুষ ও নারী ভারতবর্ষের প্রেমে ভারতীয় জীবন-ধারা অবলম্বন করেছেন, নিবেদিতার ভারতীয়ত্ব সে-ধরণের নয়,…ভারতের জল-হাওয়া-মাটী, তার ইতিহাস, পুরাণ, তার অতীত-বর্ত্তমান, তার ভাল-মন্দ, তার আলো-ছায়া, তার দুঃখ-দৈন্য-কুসংস্কার, নিবেদিতার চেতনার অণু-পরমাণুর সঙ্গে এমন সহজ ভাবে এক হ'য়ে গিয়েছিল যে, তাঁর স্মৃতিতে কোথাও ছিল না পাশ্চাত্য-জন্মের ক্ষীণতম ছাপ। তিনি ভারতীয় হননি, তিনি হয়েছিলেন ভারতবর্ষ। কি করে তা সম্ভব হলো? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আছে নিবেদিতার জীবনের মূলসূত্র, তাঁর বিস্ময়কর জীবনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য। [ক্রমশঃ।

গুণীর গুণ

মরণেই সদ্‌গুণীর গুণের প্রচার।
পুড়িলে চন্দনকাষ্ঠ সৌরভ বিস্তার।

—অজ্ঞাত কবি।

গুণীর যে গুণ তাহা জানে গুণধর।
অন্যে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর।
মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন।
নাসিকাই জানে কভু না জানে লোচন।

—অজ্ঞাত কবি।

যত্র দোষচয়, প্রকটিত হয়,
বিখ্যাত না হয় গুণ।
চন্দ্রে মৃগরেখা, স্পষ্ট যায় দেখা,
প্রসন্নতা তাহে ন্যূন।

—অজ্ঞাত কবি।

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ছিন্নমূল

বাইরে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে শিক্ষা-উপদেশ দিলেও আলমোড়ার এই সকালের ক্লাসগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের মনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লুকানো ছিল। নিবেদিতার রূপান্তর ঘটাতে হবে, তারই কার্যকরী ভূমিকা তৈরী হত এই উপলক্ষ্যে। শিষ্যাকে নিয়ত চোখে-চোখে রাখতেন বিবেকানন্দ। নিবেদিতা ভারতবর্ষকে সত্যি-সত্যি ভালবাসতে চেষ্টা করছেন, অথচ পারছেন না। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর বিলাতী সংস্কারগুলো। স্বামীজি এটা বেশ জানতেন।

এমন কোনও সংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ করলে নিবেদিতা কিন্তু অস্বীকার করতেন একেবারে, কেননা এ-বিষয়ে তিনি একটুও সচেতন ছিলেন না। স্বামীজি এক কাজ করলেন। নানা ধরনের কূট-সমস্যা সম্পর্কে নিবেদিতার মনে যে-সব বাঁধাধরা ধারণা ছিল সেইগুলোকে খোঁচাতে লাগলেন। কেবলই বলতে লাগলেন, সমাজ, সাহিত্য বা শিল্পকলা সম্বন্ধে নিবেদিতার যে-সব মতামত আছে ওগুলোকে একদম নাকচ করতে হবে। এতে যে শিষ্যার বুদ্ধিবৃত্তি সাময়িক ভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে তা নিয়ে উনি মাথা ঘামালেন না।

এত দিন নিবেদিতা ভারতবর্ষকে দেখে এসেছেন বাইরের লোকের মত। আগে যা শুনেছেন বা দেখেছেন তার সঙ্গে এখনকার দেখাটাকে পৃথক্ করবার প্রয়োজন বুঝতেন না কিছু। মনে হত, এইটাই স্বাভাবিক, এই ভাবেই দেখা উচিত। কিন্তু গুরু বেশ কঠিন হয়েই বুঝিয়ে দিলেন যে এমন দৃষ্টিভঙ্গি কোনও স্বাধীন দেশের নাগরিকের পক্ষে যদি আদর্শ হয়, প্রত্যেক দেশেরই তাহলে নিজস্ব ধরনে অন্য দেশকে সমালোচনা করবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের সমস্যা একেবারে নতুন রকম। পাশ্চাত্য সভ্যতা এখানে একটা সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে রাহুগ্রস্ত করবার চেষ্টায় আছে। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের সনাতন জীবনযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এক আধুনিক জীবনের খসড়া সে পেশ করেছে এদেশবাসীর সামনে।

এ-সব যে নিবেদিতা ভেবে দেখেননি তা নয়। তাঁর তখনও ধারণা ছিল, ভারতের ব্যাপারে বৃটেন হস্তক্ষেপ করায় এদেশের ভালই হয়েছে। ব্যবহারিক উন্নতির জন্য যে-রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন বৃটিশরাজের কাছ থেকে ভারতবর্ষ সেইটা পেয়েছে। নৈনিতালে বিবেকানন্দের ভাবভঙ্গিতে নিবেদিতা তাই আশ্চর্য হয়েছিলেন। আরও আশ্চর্য হলেন স্বামীজির অসহিষ্ণু উক্তি শুনে, 'কেন তোমরা এদেশকে তোমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করতে যাও কেবল? সেখানে যা হয়েছে তার সঙ্গে এখানে যা হওয়া উচিত তার কী সম্পর্ক? তোমাদের এমন ধরনের দেশপ্রেম বাস্তবিক একটা অধর্ম।'

বেলুড়ে দীক্ষিত হওয়ার পরদিনই নিবেদিতার বিলাতী সংস্কারে দারুণ একটা ঘা লেগেছিল। যেন সরল ভাবেই স্বামীজি ওঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'নিবেদিতা, এখন কোন্ পুণ্যভূমি তোমার স্বদেশ?' নিবেদিতা বুঝতে পারলেন না। তখনও তো ঈশ্বর-সমর্পিত প্রাণ নয় তাঁর। 'স্বামীজি, আমি তো বৃটিশ···' স্বামীজি চুপ করে রইলেন। এত দিন নিবেদিতার সঙ্গে হিন্দুদের সম্পর্কটা কেমন দাঁড়াচ্ছে তা শুধু দেখেই গেছেন। এবার, বর্ষায় মালী যেমন বীজ পোঁতবার আগে মাটি খুঁড়ে উলটিয়ে আগাছা সাফ করতে লেগে যায়, তেমনি নিবেদিতার স্বভাবটি তৈরী করবার কাজে লাগলেন।

ভারতীয়দের সঙ্গে থাকতে গিয়ে অপ্রত্যাশিত সব সমস্যা দেখা দিয়েছে নিবেদিতার মনে, এখনও সেগুলো ঠিক মত বুঝে উঠতে পারছেন না। এখানে মানুষের সঙ্গে মিশতে গিয়ে অদ্ভুত সব স্বতঃবিরুদ্ধ ধারণার পরিচয় পেয়েছেন তিনি। যেমন, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠটাও মেনে চলে না এমন-সব লোকের কাছে তিনি হলেন 'অশুচি'। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও মহা সমস্যা। অবশ্য সন্ন্যাসীরা চমৎকার রান্না করেন; কিন্তু রাস্তার দোকানে যে-সব খাবার বিক্রি হয় বা মেয়েরা বাড়িতে যে-সব খাবার তৈরী করে, ও-সব কি উনি চেখে দেখতে পারবেন কখনও? ম্যাপেও ভারতবর্ষের ছবি দেখেননি যখন, সেই ছেলেবেলায় এদেশ সম্পর্কে যা শুনেছেন, নিজের অজ্ঞাতে সে-সব মনে পড়ে যায় তাঁর। বিশেষ করে ভারতের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা শুনতেন পাদ্রীদের মুখে, সে তো চোখেই দেখছেন। যেখানেই যান সেখানেই সেই দৈন্যের ছাপ—শেষ পর্যন্ত তাঁর মন সত্যি-সত্যি বিচলিত হয়ে ওঠে ওই সব দেখে: রাস্তার ধারে কুষ্ঠ রোগীরা বসে ভিক্ষা করছে, পিলেপটকা ছোট-ছোট ছেলে গাড়ির পিছনে দৌড়তে-দৌড়তে পেট চাপড়াচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও হাড়-জিরজিরে ক্ষুধার্ত পশু একটা ঘাসের শিষ খুঁজে বেড়াচ্ছে!

এদের দুর্ভাগ্যে করুণা হয় নিবেদিতার, নানা দাতব্য প্রতিষ্ঠান কি চাঁদা আদায় করার ব্যবস্থার কথা তোলেন তিনি। শেষে বিবেকানন্দ একদিন কটু কণ্ঠেই বললেন, 'আমি শুধু চাই, এইটা তুমি বোঝ যে বেশির ভাগ লোকের পক্ষে দান করা অহং পরিতৃপ্তির একটা অছিলা মাত্র, ওটা তাদের স্বার্থের পরিচয়।' এর মধ্যে কোনও আপোসের কথা তুলতেই দিলেন না উনি। সময়-সময় তর্ক করতে গেলে এমন আগুনের মত জ্বলে উঠতেন যে, তখন আর কথা বলা চলত না। ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে স্বামীজির এইটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, শ্বেতাঙ্গেরা এখনও যা তাদের নিজেদের সভ্যতা হতে আমদানী নয় তাকেই পরধর্ম বা বর্বরতা বলে মনে করে। তিনি জানতেন কৃষ্ণকায়েরা শ্বেতাঙ্গদের কাছে

একটা নাক-সিঁটকানো কৌতূহলের বস্তু। দু'চার জন ছাড়া সবারই ধারণা, কৃষ্ণাঙ্গেরা দরিদ্র, ওঁদের দয়ার দানেই এদের দিনগুজরান হবে। পশ্চিমের কাছে অকুতোভয়ে ভারতের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছেন বিবেকানন্দ, দিব্য প্রেমের কবচে সুরক্ষিত ছিলেন বলেই পথের বাধা দু'পায়ে দলে গেছেন। শ্বেতাঙ্গ-রমণী ভারতের সেবায় ব্রতী হলেও, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কাছে কতখানি যে ভুগতে হবে তাকে, সে-কথা আপাতত নিবেদিতাকে বলেননি তিনি। তাঁর যে এটা খেয়াল হয়নি তা নয়। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে-ক্ষমা আর সহিষ্ণুতার বাণী জীবন দিয়ে তিনি প্রচার করেছেন, তাঁর শিষ্যাও তারই কবচে আত্মরক্ষা করবে।

বহু বৎসর পরে এই মনোমালিন্যের বর্ণনা করতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছিলেন,…'মনে হত যেন সম্ভ ইস্কুলে ঢুকেছি! তখন যেমন নিয়ম-কানুন অসহ্য লাগে তবুও মেনে নিতে হয়, এখানেও আমার তাই। যন্ত্রণার যেন আর শেষ ছিল না। তবু, আধখানা দেখার যে-দোষ সেটা কাটিয়ে উঠতেই হবে এই ছিল আমার সঙ্কল্প। মনের ভারকেন্দ্রটাই বদলে ফেলতে হবে—এর এক তিল বেশী-কম হলে চলবে না, একটা মত বা পথের কথা আউড়ে গেলেই হবে না। আবার পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত রাখতে হবে মনকে। আমার অভিজ্ঞতা হল সাংঘাতিক রকমের। কিন্তু দেশ বা জাতি সম্বন্ধে এমনি তালিম দেওয়ার পর স্বামীজি আর কখনও অমন করে আমায় শাসন করেননি। আর, এই মানসিক দ্বন্দ্ব শেষ হলে পর স্বামীজি কখনও আমার মুখ থেকে কোনও স্বীকারোক্তি বা কোনও ধর্মবিশ্বাসের কথা শুনতে চাননি, কখনও কোনও নতুন মতবাদের ঘোষণা আমায় করতে বলেননি। ব্যাপারটা তিনি যেন বেমালুম ভুলে গেলেন। আমি তখন স্বাধীন। কিন্তু ভাবে-চিন্তায় এমন একটা নতুন ভূমির সন্ধান স্বামীজি আমায় দিয়েছিলেন, আর সে-দেওয়া এমনি নিটোল এমনি জোরালো যে আমার নিশ্চিন্ত থাকবার যো ছিল না। যতক্ষণ না নিজের চেষ্টায় আমার এই আধখানা বোঝাকে পুরো করতে পেরেছি যুক্তি দিয়ে, আমি থামতে পারিনি।…প্রথম-প্রথম মনে হয়েছে, এগুলো যেন পথের দুরন্ত বাধা। শেষে বুঝেছি, এই সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-মহিমা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, তাকে কোন রকমে আড়াল করবার চেষ্টার মত নির্বুদ্ধিতা আর নাই।'

এদিকে এই সময়টায় নিবেদিতার নিজের হাত থেকেই নিবেদিতাকে সযত্নে রক্ষা করেছেন বিবেকানন্দ। হিন্দুসমাজের এক জন হতে যাচ্ছেন নিবেদিতা, ওঁকে গ্রহণ করতে গিয়ে ওঁর মনোদ্বন্দ্বের কথা যেন তারা ধরতে না পারে। তাঁর মনের মত না হওয়া পর্যন্ত নিবেদিতাকে তিনি সবার থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। গুরুর শাসন নির্বিচারে মেনে চলে হিন্দু, সমষ্টির জন্য ব্যষ্টিকে তারা বলি দেয়। এই হিন্দু-চরিত্রের সঙ্গে নিবেদিতার দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু একদিন সে দুয়ের মধ্যে মিলন-সেতু রচিত হবেই, নিবেদিতার দূরদর্শী কুশলী বুদ্ধির 'পরে এ-নির্ভর বিবেকানন্দের ছিল। সেই সঙ্গে তিনি চাইতেন, নিবেদিতার মনের দিগন্ত প্রসারিত হ'ক, তাহলে নেতৃত্বের যে কোনও পর্বে আত্মকর্তৃত্ব হারাবার ভয় থাকবে না আর।

এত সূক্ষ্ম ঘোরপ্যাঁচ নিবেদিতা এখনও বুঝে উঠতে পারেন না। কখনও-কখনও অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখেছেন, তাঁর ভাবনা-চিন্তাগুলো হিন্দুদের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে। তখন খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন সত্যিই। কিন্তু এ-সব লগ্নের আয়ু কতটুকু? স্বপ্ন আচমকা ভেঙে গেছে। তখন নিজের উপর একটা সুপ্ত রোষ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সে-রাগ আইরিশ মেয়ের রাগ, সদা-সাবধানী নিবেদিতা বহু দিন ও-রাগের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দেখতেন, স্বামীজি নিঃশব্দে ইংরেজের অতি নিষ্ঠুর অপমানও সহ্য করে যাচ্ছেন। তখন, স্বামীজির নির্বিকার প্রশান্তি তাঁকে যদি ঠেকিয়ে না রাখত, রিচার্ড হ্যামিল্টনের নাতনী একটা প্রলয় ঘটাতেন নিশ্চয়। প্রথমটায় তিনি বুঝতে পারেননি, ট্রেনে যাওয়ার সময় স্বামীজি কেন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিজেদের গাড়িতে বসে যাওয়াটাই পছন্দ করেন। একদিন এক ষ্টেশনে দেখলেন, ওঁরা যে-রেস্তোরাঁয় ঢুকেছেন, উর্দিপরা খানসামা স্বামীজিকে সেখানে ঢুকতেই দিচ্ছে না। আরেক বার দিনের বেলায় সবাই এক কামরায় একত্র হয়েছেন, এক রেল-কর্মচারী তাই দেখে ফেটে পড়ল একেবারে। সন্ন্যাসীদের বের হয়ে যাবার হুকুম হল। স্বামীজিরা কিছু না বলে চলে গেলেন।

নিবেদিতা নিজেও এমনি অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়েছেন। একবার সত্যি ভয়ানক রাগ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। উত্তরের এক শহরে সবাই মিলে রামকৃষ্ণ মিশনের এক বন্ধুর সঙ্গে শহর দেখতে বেরিয়েছেন। হিন্দুপল্লী দিয়ে ওঁদের নিয়ে যাচ্ছেন সে-ভদ্রলোক। এক দল বাচ্চা মেয়ে 'মেমসাব মেমসাব' বলে দৌড়চ্ছে ওঁদের পিছনে-পিছনে। নোংরা হলেও বাচ্চাগুলো দেখতে সুন্দর, চুলে ফুল গোঁজা, মাথায় ঝলমলে ছেঁড়া উড়ানি বাতাসে উড়ছে। মিসেস্ বুল একমুঠো পয়সা ছড়িয়ে দিতে ওরা কুড়িয়ে নিতে লাগল। হঠাৎ লাঠি হাতে এক পুলিস এসে উপস্থিত। ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠল। চার দিকে লোকের ঠেলাঠেলি লেগে গেল, ভয়ে চেঁচামেচি শুরু করল সবাই। নিবেদিতা চটে গিয়ে পুলিসটিকে বললেন, 'তোমার এ রকম করার মানে? আমি তো তোমায় ডাকিনি।' পুলিস তো এই বকুনিতে হতভম্ব। হিন্দু বন্ধুটি ভয় পেয়ে গেলেন, এ-ঘটনার আবার জের না চলে। তাড়াতাড়ি নিবেদিতাকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'মিস্ নোবল্, আপনি যদি এই রকম প্রতিবাদ-প্রতিকারে লাগেন, তাহলে এদেশে ঘোরাফেরা আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে।'

আলমোড়াতেও ব্যাপার বড় সুবিধার হয়নি। ওঁরা পৌঁছবার দিন কয়েক যেতেই এক জন সন্ন্যাসী জানতে পারলেন, স্বামীজির কাজ-কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য গুপ্তচর লাগানো হয়েছে। নিবেদিতা শুনে একেবারে বজ্রাহত হয়ে গেলেন। নেল্ হ্যামণ্ডকে লিখলেন, 'স্বামীজির কাজে যদি বাধা দেয়, তাহলে বলব এখানকার গভর্ণমেণ্ট পাগল—অন্তত তার কাজে তাই প্রমাণিত হবে। সমস্ত দেশে এতে আগুন ধরে যাবে। আমি যে এতখানি রাজভক্ত, এখানে আসবার আগে তা সন্দেহও করিনি। কিন্তু এদেশের সবচেয়ে রাজানুরক্ত ইংরেজ মহিলা হওয়া সত্ত্বেও ওরা এমন করলে আমিই সবার আগে আগুন জ্বালাব। জাতিবিদ্বেষ যে কী, ইংলণ্ডে থেকে তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। এইখানে এসে তা দেখলাম।'

চার মাস পরে কাশ্মীরে আবার এই রকম ধাক্কা খেতে হল নিবেদিতাকে। একটা সংস্কৃত-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজা স্বামীজিকে কিছু সম্পত্তি দান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দানপত্র

করবার অনুমতি পাওয়া গেল না। স্বামীজির মস্ত বড় একটা স্বপ্ন ভেঙে গেল। কিন্তু কেন? তিনি শুধু বললেন, 'মায়ের ইচ্ছা অন্য রকম, একটি ভারতীয় রাজ্যে পূর্ব-পশ্চিমকে এক করে তোলবার কাজটায় তাঁর সায় নাই। তিনি বেছে নিয়েছেন দুর্গম পথ। কলকাতা সমস্ত দেশের সংস্কৃতি-কেন্দ্র, সেইখানেই আমাদের কাজ শুরু হবে এই বোধ হয় ভাগ্যের লিখন।'

নিবেদিতার মনে প্রশ্ন জাগে, 'এ কী? এক জন ভারতীয় রাজা তাঁর জাতভাইকে নিজের সম্পত্তির অংশ দান করতে পারবেন না? আর এই-বা কেমন যে স্বদেশের কল্যাণে এক জন হিন্দু তার দেশে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে না?'

সরকারী দপ্তর হতে জানা গেল, কাশ্মীরের রেসিডেন্ট সার অ্যাডালবার্ট ট্যালবট প্রস্তাবটা শাসন-পরিষদে তোলবারও অনুমতি দেবেন না। খৃষ্টান পাদ্রীদের বিরোধিতার আর এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটা ভারতীয় সংস্কৃতি-কেন্দ্র আর প্রতিষ্ঠা করা গেল না। এ-সংঘর্ষে নিবেদিতা কিন্তু উদাসীন থাকতে পারলেন না। নিজের কর্তব্য স্থির করে নেল্ হ্যামণ্ডকে লিখলেন, 'স্বামীজিকে না জানিয়ে একবার যদি রেসিডেন্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ-আলোচনা করতে পারি, তাহলে বোধ হয় একটা সুরাহা হয়। পাদ্রীদের যেমন তাঁর বিরুদ্ধে বলবার অধিকার আছে, আমারও তেমনি রাজপ্রতিনিধিদের কাছে গুরুর হয়ে কথা বলবার অধিকার আছে।... ইংরেজের মেয়ে হয়ে কেমন করে ইংল্যাণ্ডকে এমন হীন কাজ করতে দেব?'—(২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)।

নেল্ হ্যামণ্ডকে লেখা চিঠিগুলো রাজনৈতিক পরিকল্পনায় ভরা থাকত। 'ইংল্যাণ্ডের সন্তানেরা নানা ভাবেই ভারতের অকপট সেবা করছে, এ-কথা না বললে তার প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু যে-ভাবে করলে ভারতের দিক থেকে প্রীতির সাড়া পাওয়া যেত সে-ভাবে করছে না। আবার ভেবে দেখ, প্রত্যেক দেশই স্বাধীনতার দাবি করে, ইটালী অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে, গ্রীস তুর্কীর কাছ থেকে স্বাধীনতা চায়। স্বভাবতই ভারতও ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে মুক্তি চায়। কালে হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে মিশে রাষ্ট্রচালনাও করতে শিখবে। ভারতবর্ষের সামাজিক উন্নতির পক্ষে রাজনৈতিক সুশাসন অপরিহার্য। আপাতত সে-জিনিস মিলতে পারে কোনও শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে, এদেশের সর্ববিধ সংস্কারমুক্ত কোনও দূর দেশের শাসন থেকে।'

ব্যাপারটা আরও ভাল করে বোঝবার জন্য এ-বিষয়ে ওয়াকিব-হাল হিন্দুদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন নিবেদিতা। গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবার জন্য অনেকেই তখন আলমোড়ায় আছেন। মিসেস্ অ্যানি বেসান্তও ছিলেন ওখানে। দু'বার তাঁদের দেখা হয়। নিবেদিতা নেল্ হ্যামণ্ডকে লিখলেন, 'মিসেস্ বেসান্ত বললেন, এখন যে-সব ইংরেজ ভারতে আছে তাদের প্রভাবিত করবার কোনও আশা তিনি রাখেন না। তাঁর মতে, আমাদের একমাত্র কর্তব্য ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণকে এ-বিষয়ে অবহিত করা, তাঁদের মতামত গড়ে তোলা—যাতে করে এর পর যারা এখানে আসবে তাদের ধরন-ধারন বদলে যাবে।...' কী উপায়ে দু'দেশের মাঝে সার্থক যোগস্থাপন করা যায়, তা নিয়ে দু'জনের অনেক কথা হল। ভারতবর্ষেই সে কাজ করা দরকার এ-বিশ্বাসটা কিন্তু নিবেদিতা ছাড়লেন না। লণ্ডনে তাঁর যত বন্ধু সবাইকে লিখলেন, 'আমি যাদের চিনি তারা প্রত্যেকে যথাসম্ভব পরিচয়পত্র দিয়ে আমাকে ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের সঙ্গে পরিচিত করে দিক এই আমি চাই। সুতরাং এদিকে সবাই খেয়াল রেখো। এখানে ইংরেজদের সঙ্গে যার যথেষ্ট পরিচয় আর তার দরুন কিছু প্রতিপত্তি আছে, সে যে কত কাজ করতে পারে! এখানকার জনসাধারণের মন অভাবনীয় রকমে বদলে দেওয়া যায়, আর দু'দেশের লোকের পরস্পর সম্পর্কে অজ্ঞতাও দূর করা যায়। ভারতবর্ষ আর ইংল্যাণ্ড পরস্পরকে ভালবাসবে এই আমার সারা জীবনের স্বপ্ন...'

হ্যামণ্ডের কাছে প্রবন্ধ পাঠাবার আগে যেমন উৎসাহে স্বামীজিকে সেটা শুনিয়েছিলেন, তেমনি করে নিবেদিতা তাঁর এই পরিকল্পনার কথা গুরুকে জানালেন। তিনিও উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'কাজে লেগে যাও, দেখ চেষ্টা করে, হয়তো তুমি একটা পথ খুঁজে পাবে...'। কিন্তু নিবেদিতার মত অত আশা তাঁর ছিল না। উনি বলেন, 'দু'বছর আগে ওঁর ধারণা আমারই মত ছিল, এখন হতাশ হয়ে গেছেন। দু'বছরের অপমানের পর এই হয়েছে। কিন্তু উনি যত শীগগির আমার দেশের আশা ছেড়ে দিয়েছেন, আমি অত তাড়াতাড়ি ওঁর দেশ সম্বন্ধে নিরাশ হব না বলেই মনে করি...।'

তাঁর স্বভাব যে কত বদলে গেছে নিবেদিতার কি তা খেয়াল ছিল? ভারতের মাটিতে যে আশ্চর্য কোমল স্নিগ্ধতা তারই রসে জারিত হয়ে এদেশকে নতুন চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর মনে আর কোনও প্রশ্ন উঠত না। গুরু আর তাঁর অনুচরদের কাজে সহযোগিতা করে যেতেন তিনি নির্বিবাদে, চেষ্টা করতেন যেন গুরুর হাতে শুধু যন্ত্র হয়ে উঠতে পারেন।

নিবেদিতার ইচ্ছা হত, স্বামীজি যদি অনুমতি করেন তো উনি ধনীদের দুয়ারে-দুয়ারে ভিখারীর মত ডাক ছেড়ে বলেন, 'টাকা দাও, বই দাও, কাপড়-চোপড় চাল ওষুধ সব দাও আমায়। হিসাব করে দিও না, তোমাদের দেওয়া জিনিস কোন্ কাজে লাগবে জিগগেস করো না—শুধু দাও।' নিজের মনেই হাসি পায় নিবেদিতার। 'এত অহঙ্কারী ছিলাম ছোট বেলায় যে অনেক চেষ্টায় তবে নিজের মায়ের কাছে খাবার চাইতে পারতাম, কারও কাছে কিছু চাইতে হলে মাথা কাটা যেত। আর আজ আমি এসব চাইতে একটুও লজ্জা পাই না।'

নিবেদিতা যখন সত্যি-সত্যি হিন্দু হয়ে উঠবেন, সেদিনের কথা আগেই ভেবে সেই মত নিয়মে তাঁর জীবন বেঁধে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। এত দিনে সে-সব সার্থক হতে চলল। 'তোমার ভাবনা, তোমার প্রয়োজন, তোমার ধারণা, তোমার অভ্যাস সব-কিছুকেই হিন্দু-ছাঁচে ঢালতে হবে তোমায়। অন্তরে-বাইরে নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর মত জীবন গড়ে তুলতে হবে। কেমন করে তা হবে সে জন্য ভেব না। তোমার মনে যদি ইচ্ছার অভাব না থাকে, উপায় আপনি খুঁজে পাবে। তোমায় কিন্তু তোমার অতীত ভুলতে হবে, যাতে ভুলে যাও তাই করতে হবে। ওর আবছায়া পর্যন্ত ভুলতে হবে।'

বহু বৎসর পরে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'স্বামীজি আমাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, আমার অন্তর ভরে দিয়েছেন তিনি।'

চতুর্দশ অধ্যায়

কাশ্মীরে —

আলমোড়া থাকার দিন ফুরিয়ে এল। যে-যাতনায় মন-বুদ্ধি জর্জর হয়ে উঠেছিল, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের আনন্দে সে-যাতনার কথা নিবেদিতা ভুলে গেলেন। গুরু যেন প্রতিদিন অমৃতধারা ঢেলে দেন প্রাণে। তাঁর রাজর্ষির মহিমাকে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অনুভব করেন নিবেদিতা।

ভক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচর্যা করেন। শুধু তাঁর সংস্পর্শে এলেই যেন নিবেদিতার অন্তর নিটোল শান্তিতে ভরে ওঠে। আশ্চর্য ভাবে দু'জনের কাজের ধারা অদল-বদল হয়ে গেল। শিষ্যা যেমন তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে নির্জিত করতে শিখলেন, গুরুও তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে আলোর পথে এগিয়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন। কাশ্মীরের চড়াই-উৎরাইএর পথে এমনি করে তাঁদের আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা জীবন্ত হয়ে উঠল দিনে-দিনে।

জুনের প্রথমে এঁদের বাহিনী কাঠগোদামের পথে রওনা হল। প্রচণ্ড গরমে কাবু হয়ে আর কুলিদের চলার তালে ঢুলুনি লেগে নিবেদিতা আপনাকে একেবারে ছেড়ে দিলেন, রাশ আলগা হয়ে গেল দেহ-মনের। মাঝে-মাঝে হনুমানের পাল সদর্পে চলন্ত বাহিনীকে আক্রমণ করে,—তা ছাড়া বনপথে কোনও উৎপাত নাই, সব নিথর। একদিন স্বামীজি এক চৌমাথার মোড়ে বিশ্রামের হুকুম দিয়েছেন। কাছেই একটি মন্দির। দিশারী আর কুলিরা এই সুযোগে রামদাস বীর-হনুমানের পূজা লাগিয়ে দিল। খানিকটা কর্পূর পুড়িয়ে গোটাকতক কাঁচা বাদাম মন্দিরে ভোগ দিয়েছে কি না-দিয়েছে, আশে-পাশের গাছপালার ডালে-ডালে যেন হাওয়ার ঝাপটা লেগে থরথর করে সেগুলো কাঁপতে লাগল। পূজারীরা উঠে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতে খান দশেক লোমশ হাত পূজোপকরণ ছিনিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। সকলেই প্রাণ-খুলে হাসতে লাগলেন। কুলিরা চেঁচিয়ে উঠল, 'জয় হনুমানজী কী জয়। বনের রাজা তুমি, আমাদের রক্ষা কর।'

একটা পুরো দিন যাত্রীরা ভীমতাল হ্রদের তীরে তাঁবু ফেলে রইলেন। বাতাসে ঝিঁঝির গুঞ্জন। দূরের একটা পাহাড় দেখিয়ে স্বামীজি একটা গল্প বললেন। এ ধরনের গল্প সমস্ত ভারতবর্ষে চলতি, সত্য আর রহস্যে মেশানো সে-সব গল্পের সূত্র কোথায় তা ভগবান জানেন। ঐ পাহাড়ে এখনও নাকি কিন্নরেরা বাস করে, মানুষের কাছে তারা কদাচিৎ আসে। স্বামীজি বললেন, তিনি সত্যি ও-রকম একটা জীবকে একদিন জঙ্গলে দেখেছেন। কী রহস্যে ভরা এই হিমালয়! প্রত্যেকটি পাহাড় কোনও-না-কোনও দেব-দেবীর নামে; এইখানে কঠোর তপস্যায় মুনি-ঋষিরা ধরিত্রীকে পবিত্র করেছেন। এখনও কত সাধু-মহাপুরুষ ওখানে আছেন। তাঁদের নাম-গোত্র বয়স কিছুই জানা যায় না। শুধু এইটুকু লোকে জানে, নির্জনে ভগবদ্দর্শনের আনন্দে বিভোর রয়েছেন তাঁরা।

কাঠগোদাম থেকে ওঁরা ট্রেনে চাপলেন। পাঞ্জাবের জনাকীর্ণ শহর লাহোর-লুধিয়ানার উপর দিয়ে চললেন আরও উত্তরে। গত বছর এই সব শহরে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন স্বামীজি। শেষ ষ্টেশন হল রাওলপিণ্ডি, পাহাড়ের বেশ খানিকটা উপরে।

এখান থেকে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রইলেন শুধু মেয়েরা তিন জন। দুই ঘোড়ায় টানা টাঙ্গায় চড়ে মুরীতে চললেন ওঁরা। টাঙ্গাগুলো চলে খুব দ্রুত, কিন্তু ঠিক চাকা-দুটির উপরেই বসবার আসন হওয়ায় বসতে ভারী অসুবিধা লাগে। ঝিলামের খাড়া খাদের পাশ দিয়ে গাড়ি মন্থর-গতিতে চলছে। বৃষ্টির জন্য দুয়ালিতে ওঁরা আটকা পড়লেন, সেখানে সঙ্কীর্ণ খাত বেয়ে বন্যার বেগে নদী ছুটে চলেছে। তার পর এল উরি। পোড়ামাটির দেয়াল দিয়ে জায়গাটি ঘেরা, বাজারসুদ্ধ সব মিলিয়ে শহরটা যেন দুর্গের মত করে তৈরী। তৃতীয় দিনে ওঁরা একটা গিরিপথে এসে পৌঁছলেন, ওখানে একটি সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এইখান থেকে শুভ্র পর্বতশিখরে বেষ্টিত কাশ্মীর উপত্যকার সবখানি চোখে পড়ে। বারামুল্লা পৌঁছানোর পর নদীপথ শুরু হল। নদী ওখানে 'নীলতারা'র খেতের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে।

ওঁরা তিনখানা হাউসবোট ভাড়া করলেন এবার। ডাঙা থেকে পদ্মফুলের গালিচা আর উঁচু নলঝোপের মাঝখান দিয়ে নীল জলের উপর নিঃশব্দে ভেসে পড়ল ওঁদের বোট। মাঝিদের হুঁকার ফড়্ ফড় আর গানের সুর ছাড়া কোনও শব্দ নাই চার দিকে।

তীরে কী সুন্দর পপলারের বীথি। নৌকা থামলেই মেয়েদের পায়ে হেঁটে নদীর ধারে ঘুরে দেখবার অনুমতি দেন স্বামীজি। নিজেও উধাও হয়ে যান, যখন 'চীড়'-কাঠের মশাল জ্বালায় মাঝিরা তখন ফিরে আসেন। তার পর কান পেতে শোনেন, নৌকায়-নৌকায় মাঝিরা গান ধরছে। তীরে তাঁবু ফেলে রয়েছে বাতিওয়ালা আর গুণ টানিয়েরা, এরা তাদের হাঁকে সাড়া দিচ্ছে থেকে-থেকে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ধ্যান করেন বিবেকানন্দ···পূবের আকাশে জ্বলজ্বলে তারাগুলো ম্লান হয়ে যায় ওঁর ধ্যান শেষ হতে-হতে।

শ্রীনগর-পথের মুখবন্ধটা চমৎকারই হল। পর পর অনেকগুলো বিশিষ্ট আমন্ত্রণ পেলেন ওঁরা জনসাধারণের তরফ থেকে। মহারাজা স্বামীজিকে তাঁর গ্রীষ্মাবাসে আহ্বান করলেন। আমেরিকান মহিলা দুটি আবিষ্কার করলেন, পৃথিবীর সব দেশের লোক ওখানে নদীর উপরে গ্রীষ্মবিহার করছে! প্রথম দু'সপ্তাহ ধরে বোটে-বোটে অনবরত দেখা-সাক্ষাতেরই পালটাপালটি চলল। সেই সঙ্গে চলল ভাস্বালো-বাগানে যাওয়া, শহরের উপকণ্ঠে প্রাসাদ আর মন্দির দেখে বেড়ানো।

সকালটা সেই বরাবরের মতই কাটত, এ-সময়টা ধর্মকথার জন্য বাঁধা। কিন্তু নিবেদিতা বুঝতে পারেন, গুরুর উপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। নবপ্রতিষ্ঠিত সংঘের জন্য সাধারণের সহানুভূতি আদায় করা দরকার, তাই এই জনসঙ্গ। কিন্তু এ-ভার ক্রমেই যেন স্বামীজির পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক দিন নিবেদিতার ভয় হয় এইবার হয়তো উনি কোনও দূরের আস্তানায় পালিয়ে যাবেন। তিনি যে নিঃসঙ্গ হতে চাইছেন এটা স্বামীজি নিবেদিতার কাছে লুকোতেন না। কাশ্মীরের অন্তর তাঁকে ডাকছে। এখানে এসে অবধি এত তীব্র ভাবে দেবতার সান্নিধ্য অনুভব করছেন যে, তাঁর দেহ যেন এ-আনন্দ আর বইতে পারছে না, স্নায়ুর বন্ধন যেন টুটে যেতে চায়। পশ্চিমের সামনে যিনি নিরাকার ব্রহ্ম-সত্তার বাণী প্রচার করেছেন, সেই তিনিই এখন সমস্ত হিন্দু দেব-দেবীর সামনে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দেওয়ার পিপাসায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। অহরহ তাঁদের ডাকছেন

তাঁর পূজা নিতে—আজ দেবতার সকল রূপের সকল বিভূতির উপাসক তিনি।

এর মধ্যে একদিন গুলমার্গে গিয়েছিলেন আমেরিকান মহিলা দুটিকে।' সেখানে থেকে গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থাতে তিনি অমরনাথের পথে রওনা হলেন একা-একা। পাহাড়ী রাস্তায় তখনও পুরু হয়ে বরফ জমে আছে, তাই তাঁকে ফিরে আসতে হল। অভিযান থেকে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু চোখে তাঁর আগুন জ্বলছে নতুন নেশার। ঠিক করেছেন, অমরনাথে শিবের সঙ্গে মিলবেন গিয়ে। অমরনাথ ভারতের সেই পুণ্যতীর্থ, যেখানে ত্রিগুণাতীত স্বয়ম্ভু শঙ্কর প্রকট হয়েছেন, রূপাতীত পুরুষ ধরা দিয়েছেন প্রকৃতির মায়ায়। বছরে মাত্র একদিন তাঁকে দেখা যায় নিয়ত পরিবর্তনশীল এক তুষারলিঙ্গের আকারে। স্বামীজি যাবেন সেই অমরনাথে।

দিন কয়েক পরে এঁদের নৌবাহিনী ইসলামাবাদ রওনা হল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি তখন। প্রথম থামা হল পান্দ্রেথানের ভাঙা মন্দির দেখবার জন্ম। অরণ্যের বুকে এক হ্রদে অর্ধনিমগ্ন দেউলে দেবতা নিদ্রিত। একখানা নড়বড়ে নৌকায় শেওলা-ভরা জলের উপর দিয়ে মন্দিরে পৌঁছনোটা বেশ শক্ত। পাথর-গড়া নিরেট মন্দিরটি আসলে একটা চৌকো ঘর, চার দিকে চারটা দরজা, খিলানের গড়ন অদ্ভুত। পিরামিডাকৃতি গম্বুজ, চূড়া নাই কিন্তু, তার উপরে আগাছা গজিয়েছে। একদিকে উদ্ধতপাণি বুদ্ধমূর্তি,—আরেক দিকে বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মূর্তি, তাঁকে ভাল করে ঠাহর হয় না। ভিতরে গিয়ে নিবেদিতা দেখেন, গুরু সেই জীর্ণ পাথরগুলোর গায়ে হাত বুলোচ্ছেন,—তাঁর কাছে সবই যেন জীবন্ত। দেবতা আর মানুষে যে চিরন্তন সাযুজ্যের সম্বন্ধ, সেইটি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই সব শিলামূর্তিতে। যুগে-যুগে মানুষের মনে একই প্রার্থনার মন্ত্র, একই ব্রতদীক্ষার পিপাসাই থাকে বুঝি।··· চলে আসবার আগে স্বামীজি একটি বনফুল তুলে বুদ্ধের পায়ে দিলেন: 'হে মৃত্যুঞ্জয়ী জিন, আমার সহায় হয়ো তুমি।' এক দৃষ্টিতে বুদ্ধকে দেখতে-দেখতে নিবেদিতাকে বললেন, 'মনে রেখো, অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম যা দিতে চেয়েছিল, পৃথিবী তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না—এবার হয়েছে। পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে, বুদ্ধ তাদের সবার চেয়ে বড়। তাঁর একটি নিঃশ্বাসও নিজের জন্ম পড়ত না। সব চাইতে বড় কথা, কোনও পূজা চাননি তিনি, কোন প্রতিষ্ঠা না। গণিকা অম্বপালীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, জানতেন পরিণামে মৃত্যু হবে তবু পারিয়ার সঙ্গে খেয়েছেন···বুদ্ধি আর হৃদয়ের এমন সমন্বয় আর চোখে পড়ে না। সত্যি, তাঁর মত আর কেউ নাই।'

পান্দ্রেথানের মন্দির দেখে ওঁরা অবন্তীপুরের প্রকাণ্ড মন্দির দুটি দেখতে গেলেন, তার পর বিজবেনারার মন্দির আর মার্তণ্ড মন্দির দেখা হল। অমরনাথের রাস্তায় চটিতে-চটিতে যতই যাত্রীদের ভিড় দেখেন, ততই স্বামীজি দণ্ডী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়বার জন্ম অধীর হয়ে ওঠেন। দিন-দিন তাঁর আগ্রহ বেড়েই চলল। নিবেদিতাকে বলেন, 'ডাক শুনতে পাচ্ছ কি? তৈরী হয়েছ? যাওয়ার সময় এসেছে।'

পাহাড়ের পথ লাঠির শব্দে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যাত্রীরা চলেছে গান গাইতে-গাইতে। স্বামীজির একা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। নিবেদিতাকেও ঐ পথে চলতে হবে, উঠতে হবে পাহাড়ে, আত্মাহুতির সঙ্গিনী হতে হবে। ভগবান শিবের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাবেন এই তো তাঁর সাধ নয়,—তাঁর ইচ্ছা নিবেদিতাকে তাঁর পায়ে উৎসর্গ করে দেবেন ঐ সঙ্গে। নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন। 'প্রভু, পথ দেখাও, আমিও আসছি।'···

আহ্বানবলে মিসেস বুলের কাছে স্বামীজি তাঁর অভিপ্রায় জানালে তিনিও সমর্থন করলেন। তখনই সে ব্যবস্থা করা দরকার। আমেরিকান মহিলা দু'জন ঠিক করলেন, পহেলগাম অবধি ওঁরা সঙ্গে যাবেন। তার পর সেখানে এঁদের জন্ম অপেক্ষা করবেন।

পরদিন বোট ছেড়ে খচ্চর আর ডাণ্ডি ভাড়া করা হল।

একাদশীর পর দিন নিবেদিতা আর তাঁর গুরু যাত্রা করলেন। অধিকাংশ যাত্রীই সূর্যোদয়ের আগে চলে গেছে, ধুনির ছাই কেবল রয়ে গেছে তাঁদের তাঁবুর জায়গায়। সর্বাঙ্গে ভস্মমাখা স্বামীজি সাধুদের দলে মিললেন গিয়ে। ডাণ্ডি থেকে নিবেদিতা দেখেন, দূরে স্বামীজি মালা জপতে-জপতে আপন-ভাবে বিভোর হয়ে চলেছেন। এক-এক সময়ে বিদ্যুতাহতের মত মাটিতে শিথিল হয়ে পড়েন। এখন বহু দিন ধরে চলবে দিনে একবার মাত্র আহার, যাত্রাপথে কঠোর মৌনব্রত। তাঁর চারদিকে বন্দনারত যাত্রীদের একটানা গুঞ্জন চলেছে, 'নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়।'

পহেলগাম অবধি, এমন কি সেখানেও, বিদেশী মেয়েরা সঙ্গে থাকায় যাত্রীদের মধ্যে বেশ আপত্তির গুঞ্জন উঠেছে। কয়েক জন সাধু তো সরাসরি স্বামীজির কাছে অভিযোগই করেছেন, 'মহারাজ, এঁদের যাত্রী দলে স্থান দেবার ক্ষমতা আপনার আছে ঠিকই, কিন্তু সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা কি উচিত?' স্বামীজি এই আপত্তির ভাবটা হালকা করে দিতে চাইলেন। প্রথম সুযোগেই নিবেদিতাকে তাঁবুতে-তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিয়ে ভিক্ষা দেওয়ালেন। যাঁরা তাঁর দান গ্রহণ করলেন, তাঁদের দিয়ে আশীর্বাদ করালেন নিবেদিতাকে। স্বামীজির সামনে সবচেয়ে বিরুদ্ধবাদী যারা তারাও শান্ত হয়ে রইল। মেয়েরা নিবেদিতাকে কোন রকম বিদ্বেষের চোখে দেখল না। তিনিও তো তাদেরই মত শিবের পূজা করতে চলেছেন, তিনি যে তাদের তাদের 'বহিন'। এদের মধ্যে তাঁরই মত যারা ডাণ্ডিতে তাদের নিবেদিতা চিনতেন। তাদের মধ্যে একটু সলজ্জ হাসির আদান-প্রদান হত।

পহেলগামকে মনে হতে লাগল যেন ছোটখাটো চলন্ত শহর। সব রকমের সব আয়তনের তাঁবু পড়েছে দু'ধারে, মাঝখানে রাস্তা। কোথাও দোকানের সার, সেখানে চাল ডাল সরাবীন পেস্তা শুকনো ফল দারচিনি মায় লাকড়ি বিক্রি হচ্ছে। ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা এক-এক জায়গায় জমা হয়েছেন, গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষেরা জাতি-অনুসারে দল বেঁধেছেন,—এতে যার-যার আচার পালনে সুবিধা হবে।

পহেলগামের পর চন্দনওয়ারিতে প্রথম সন্ধ্যায় থামা হল। জায়গাটা পাহাড়ী নদীর একটা খাতের ধারে। দিনে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, রাতটা বেশ ঠাণ্ডা।

এর পরের পথ সবচেয়ে দুর্গম। নিবেদিতা যাত্রীদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে চললেন। এই তাঁর গুরুর ইচ্ছা। যে-পথে তুষার-প্রপাত নেমে আসে, পাহাড়ী ছাগল চরে, পথ প্রায় খাড়া উঠে গেছে—সেইখান দিয়ে উঠতে হবে। তার পর একটা হিমবাহ

পার হয়ে এক নির্জন মালভূমিতে পৌঁছল সবাই। ক্লান্ত যাত্রীরা শ্বাসকষ্টে টান হয়ে পড়ল সেখানে। কোনমতে প্রাণ নিয়ে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছনোর কথা ছাড়া আর-কিছু কেউ ভাবে না। অন্য গাছপালার কোনও চিহ্ন নাই, কিন্তু খদের ভিতর সাদা-ফুলে ভরা এক রকম গাছ অজস্র হয়ে রয়েছে। নিবেদিতার শরীর ঝিমঝিম করছে। অনেক কষ্টে পাহাড়ে উঠেছেন, কান ভোঁ-ভোঁ করছে, দু'চোখ টকটকে লাল। সেদিন বিকালে ১৮০০০ ফিট উপরে চিরতুষারের রাজ্যে তাঁদের তাঁবু পড়ল।

তীর্থযাত্রীরা উন্মত্ত আবেগে এগিয়ে চলেছে। ক্লান্ত দেহ-মনে নিবেদিতার নিজেকে এত একা মনে হয়। গলায় দড়ি দিয়ে কে যেন খুঁটায় বেঁধে রেখেছে তাঁকে। পথের শেষে তাঁর চরণে শরণ মিলবে কি, এতটুকু বয়স থেকে অনাদি-নিধন যে-দেবতাকে খুঁজে ফিরছেন! সেই ভূতনাথ বিশ্বেশ্বর, তাঁর দেখা কি পাবেন তিনি? নিজেকে কত শতবার প্রশ্ন করেন, 'অমরনাথে গিয়ে কী দেখব?' শুধু মাটির সঙ্গে যে নাড়ীর বাঁধন, সে ছাড়া আর-সব পুরানো সংস্কার খসিয়ে ফেলতে চান তিনি। কিন্তু কেমন করে তা হবে? চারদিকের আবহাওয়ায় এই যে পুণ্য তন্ময়তা, তার সঙ্গে আপন সত্তা মিশিয়ে দিতে সাধ যায় তাঁর, দেবতার বন্দনা সহস্রবার আউড়িয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। হাজার-হাজার যাত্রীর সঙ্গে তাঁর গুরুও তো তাদের এক জন হয়ে চলেছেন দীনতম ভক্তের অকুণ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে। সৌরকরোজ্জ্বল পাহাড়ে-পাহাড়ে মেঘে-মেঘে সর্বত্র সেই প্রভাস্বর দেবতার দর্শন পাচ্ছেন, অর্চনা করছেন তাঁর যিনি 'সাক্ষি-স্বরূপে বিশ্বভুবনের 'সমবর্ত্তাগ্রে'। কখনও তারস্বরে বলেন, 'এই পর্বতভূমির অধীশ্বর সেই দেবাদিদেব, সমুদ্রমেখলা ধরণী আর তারকাখচিত আকাশ—এ-সবই তাঁর, তাঁরই সব।' কায়মনোবাক্যে কখনও আবাহন করেন, 'শিব শিব! আমি তোমার নিত্যদাস। জন্মের পর মা আমাকে তোমার মন্দিরে শুইয়ে দিয়ে এসেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন বীরেশ্বর। আমি শুধু তোমার ডাক শুনেই পথ চলি, হে রুদ্র! বিশ্বের মাঝে তোমার প্রকাশ যেন দেখতে পাই এই বর দাও…।'

ভাঙ্গাচোরা গড়ানে রাস্তায় পঞ্চতরণী পৌঁছতে হয়। পাঁচটি নদী ওখানটায় একত্র মিলেছে, সারা পথের মধ্যে এইখানটা সবচেয়ে দুর্গম। কিন্তু যাত্রীরা তখন উত্তেজনার চরমে। প্রতিটি সঙ্গমস্থলে স্নান করতে-করতে তারা এগিয়ে চলে। বিবেকানন্দের শরীর ভেঙে পড়েছে, সকলের শেষে পড়েছেন তিনি, তবুও যাত্রাপথের কোনও কঠোর নিয়ম তিনি অমান্য করবেন না। শেষ দিন শরীর আর মনের জোরে চলতে চায় না। তখনও যাত্রীদের এক হিমবাহের ধার দিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হবে, সেই হিমবাহের ওপারে অমরনাথের গুহা। সেদিন ২রা আগষ্ট।

অমরনাথে জীবনের এক পরম মুহূর্ত এল বিবেকানন্দের। যাত্রীরা যাতে ওঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়, এই ভাবে চলতে লাগলেন উনি। সমস্ত শরীর কাঁপছে, নাড়ীতন্ত্র উত্তেজনার চরমে পৌঁছেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। আবেগ-বিহ্বল হয়ে অর্ধনগ্ন শরীরে তিনি সেই বিরাট গুহায় ঢুকে মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে তিন বার প্রণাম করলেন। দেবাদিদেবের কাছে একটি মাত্র নৈবেদ্য এনেছেন তিনি—নিবেদিতার জীবন। আত্মহারা আনন্দে অনুভব করলেন দেবতার সাক্ষাৎ প্রসাদ, অলখের অনির্বচনীয় প্রকাশ। ভাবাবেশে আচ্ছন্ন আড়ষ্ট দেহ-মন নিয়ে মূর্ছাহতের মত টলতে-টলতে উনি বাইরে এলেন।

তাঁর পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নিবেদিতার কী যন্ত্রণা! এ কী কালরাত্রি তাঁর। যাঁর কাছে আত্মনিবেদন করতে এসেছেন, কই সে দেবতা? একে উৎকণ্ঠা তায় ওখানকার কন্‌কনে ঠাণ্ডা, তাঁর সর্বশরীর যেন অবশ করে আনতে লাগল। গুরুর উদ্দেশে এদিক-ওদিক তাকান, কোথায় তিনি হারিয়ে গেছেন তার ঠিক নাই। দিশেহারা নিবেদিতাকে সবাই বুঝি ছেড়ে গেছে। ভিতরটা রুদ্ধ আক্রোশে যেন ফেটে পড়তে চায়। স্বামীজির রহস্যময় হাবভাব অসহ্য মনে হয়। কেন, কেন তিনি যা পেয়েছেন তার ভাগ দিলেন না ওঁকে?

স্বামীজিকে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন নিবেদিতা। শিবসুন্দরের দাক্ষিণ্যে ধন্য তিনি, স্খলিত কণ্ঠে জপ করছেন, 'শিব! শিব!' চোখের উপর হাত আড়াল দেওয়া, যেন প্রখর আলোয় ধাঁধা লেগেছে। দিব্যোন্মাদের অসহ পুলকে মন্থর চরণে চলছেন স্বামীজি।

কিন্তু তাঁর কী হবে? ঠাণ্ডা অসহ্য না হওয়া অবধি গুহার মধ্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন নিবেদিতা। তার পর? কোথায় যাবেন জানেন না। 'দেবতার মত পূজা কর যাঁকে, তাঁর কাছে যা একান্তই অন্তরের জিনিস তার একটুখানি বাইরের আভাস মাত্র পেলে। এ কথা স্পষ্ট করে বোঝাবার যন্ত্রণা যে কী তা বলবার নয়। স্বামীজি পাষাণকেও আমার কাছে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনি আপন ভাবেই বিভোর…'—(নেল্ হ্যামণ্ড কে লেখা চিঠি, ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৮)।

গুরুকে দেখতে পেয়ে কটু কণ্ঠে তিরস্কার করলেন তাঁকে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন নিবেদিতার পানে। বলতে চেয়েছিলেন, 'শান্ত হও। নিজেকে উজাড় করে না দিতে জানলে আনন্দ মেলে না…'। কিন্তু হতাশায় নিবেদিতার মন ভরা, কোনও কথা শোনবার শক্তি তখন তাঁর ছিল না।

স্বামীজি সস্নেহে নিবেদিতার হাত ধরলেন, শ্রান্ত বালকের মত অতি কোমল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর নিবেদিতাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন, ওঁকে একটু চা খাওয়ালেন। দুঃখে-অবসাদে ক্লান্ত হয়ে নিবেদিতা ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওঁকে চোখে-চোখে রাখলেন।

পরদিন সকালে আবার বরফের উপর দিয়ে রওনা হতে হল। যাত্রীর দল 'শিবমহিম্ন' স্তব গেয়ে চলেছে। ভারাক্রান্ত মনে নিবেদিতা চলেছেন যন্ত্রের মত। অস্ফুট স্বরে কেবল বলছেন, 'কেন—কেন? আমি কিছুই বুঝলাম না।' স্বামীজি এবার আর ওঁর কাছছাড়া হলেন না। একটা গভীর অনুশোচনায় ওঁরই মত কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনিও, কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। দশ ঘণ্টা পথ হেঁটেছেন, তখনও জলভরা চোখে নিবেদিতা সমানে প্রশ্ন করে চলেছেন, 'কেন? কেন আমি পেলাম না কিছু?'…শেষে স্বামীজি বললেন, 'মার্গট, তুমি যা চাইছ তা দেবার শক্তি আমার নাই। এখন কিছুই বুঝতে পারছ না, কিন্তু তীর্থকৃত্য শেষ করেছ তুমি, এর কাজ ভিতরে-ভিতরে হবেই। কারণ ঘটলে কার্য দেখা দেবেই, এর পরে ভাল করে বুঝতে পারবে তা। এর ফল ফলবেই…'

খদের ভিতর দিয়ে যে ফেরবার পথ তা অনেক কম। প্রথম রাত্রিতে এক তুষার-ক্ষেত্রে তাঁবু পড়ল। এর পর গাছপালায় ঢাকা উপত্যকা দেখা দিল। পাহাড়ী কৃষকেরা যাত্রীদের চাপাটি আর গরম চা এনে দিচ্ছে। এবার সবাই নানা দিকে ছড়িয়ে পড়বে। ছোট-ছোট দলে যাত্রীরা ভিন্ন-ভিন্ন রাস্তা দিয়ে সমতলে নেমে চলল। বিকালে স্বামীজি আর নিবেদিতা পহেলগামে পৌঁছে বন্ধুদের আবার দেখতে পেয়ে খুশী হলেন। তার পর শ্রীনগরে ফিরে যাবার পালা।

বেশ কিছু দিন পরে, হাউস-বোটের শান্ত পরিবেশে নিবেদিতা ক্ষুব্ধ মনের এলোমেলো চিন্তাগুলো গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। নেল্ হ্যামণ্ডকে লেখেন, 'এখনও সে সময়ের কথা মনে করতে গেলে আশাভঙ্গের তীব্র যাতনায় মনটা কোন্ অতলে তলিয়ে যায়। কিন্তু বুঝতে পারছি আমি ভুল করেছি। আমার "রাজা" আমার অপরাধ মার্জনা করেছেন। আর এই তীর্থযাত্রার ফলে আশ্চর্য ভাবে আমি তাঁর আর দেবতার আরও যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কিন্তু যে-সুযোগ হাতে এসে হারিয়ে গেল, আর যা কখনও ফিরে আসবে না, হায় রে, তার ব্যথা তো ভোলবার নয়! গুরুর উপরে রাগ করেছিলাম, তিনি যা বলতে যাচ্ছিলেন তা শুনিনি। যদি এমন বেসুরা না বাজতাম সেখানে। একটু ধৈর্য একটু মমতা নিয়ে যদি তাঁর ভাবের ভাগ নিতাম! যা করেছি তার সংশোধনের আর উপায় নাই। কেবল এইটুকু সান্ত্বনা যে এতে শুধু আমারই ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সে যে কী ক্ষতি! শামুকের শক্ত খোলায় নিজেকে গুটিয়ে রেখে যে-লাঞ্ছনা আমি তাঁকে করেছি! খোঁটা দিয়ে এমনও বলেছি, আমি যে তাঁকে "আচার্য" বলে ডেকেছি, এই ডাককে তিনি যদি সত্য করে না তুলতে পারেন, তাহলে আমাদের মধ্যে সাধারণ দুটি নর-নারীর সম্বন্ধ ছাড়া আর কোনও সম্বন্ধই থাকবার কথা নয়। পরদিন সকালে যথাস্থানে পৌঁছনোর পর রাজা বললেন, "মার্গট, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নই। আত্মবিস্মৃত দীনভক্ত ছিলেন বলেই তিনি পূর্ণ মানব। এমনটি উদার কোথাও দেখবে না"।'—(৭ই আগষ্ট, ১৮৯৮)।

অন্তরে হাহাকার উঠতে থাকে, কিন্তু নিজেকে আর কোনও প্রশ্ন করেন না নিবেদিতা। সময়-সময় শুধু একটা ইচ্ছা জাগে, 'তোমায় দেখতে চাই আমি। যদি তুমি সত্যের ঠাকুর হও, প্রকাশিত কর আপনাকে।' কখনও দ্বিধাভরে আবাহন করেন দেবতাকে। মায়ের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ 'প্রাণ খুলে যেমন করে প্রার্থনা করতেন, অজানতে সেই সব প্রার্থনা আউড়িয়ে চলেন।

শ্রীনগরে পৌঁছে স্বামীজি তাঁর বোট একটা নির্জন খাড়িতে বাঁধবার ব্যবস্থা করলেন। এইখানে দু'দিন বিশ্রাম নেবেন। শিবময় হয়ে গেছেন তিনি, দেবতার মহিমা যেন তাঁর অণু-পরমাণুকে চূর্ণ করে দিয়ে গেছে আনন্দে। এক ফোঁটা বৃষ্টির জলে সম্পূর্ণ রামধনুটি বিম্বিত হয়েছে যেন, দিব্যশক্তি ঝড়ের বেগে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। দেবতার ইচ্ছা লীলায়িত হচ্ছে তাঁর সীমিত আধারে। তিনি বলেন, অমরনাথে শিব তাঁকে অমর বর দিয়েছেন, স্বেচ্ছায় না মরতে চাইলে তাঁর মৃত্যু নাই।

অমরনাথে মহেশ্বর প্রত্যক্ষ হয়ে যেন তাঁর হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করেছেন। সেই দীর্ণ রক্তাক্ত হৃদয় দু'হাতে মুঠো করে ধরলেন বিবেকানন্দ। মাকে আকুল ক্রন্দনে ডেকে বললেন, 'মা, মা, আমায় কোলে নে গো, তোর হাসিমুখ একবার দেখি'…। রূপের জগতে নেমে এসে শিশুরই মত মায়ের মূর্তিকে ব্যাকুল আবেগে তিনি আঁকড়ে ধরলেন। তাঁর বুকে মাথা রেখে শ্রান্তিতে এবার ঘুমিয়ে পড়তে চান তিনি। কখনও গুমরে ওঠেন, 'মা, তোর ছেলেকে দেখ…'। মনে হতে লাগল, অষ্টপ্রহর শিব যেন তাঁকে আবিষ্ট করে রেখেছেন, তাঁর ছাড়ান নাই।

মায়ের বুকে থেকে তিনি অনুভব করছিলেন, প্রতি জীবে সিসৃক্ষার কী বিপুল প্লাবন আবর্তিত হয়ে চলেছে। বন্দী মানবাত্মা কামনার শৃঙ্খল যেদিন ভাঙতে পারবে, সেই দিন তার মুক্তি। অলখের বাঁশির ডাকে সেই ছায়ালোকের প্রত্যন্তে এসে আজ তিনি দাঁড়িয়েছেন, মানুষ যেখানে 'অন্ধেন নীয়মানাঃ' অন্ধের মত পথ হাতড়াচ্ছে সংসারের গোলকধাঁধায়। মুসলমানের ছোট মেয়ের মাঝে 'উমা'কে দেখতে পেয়ে প্রণাম করেন তাকে। শিষ্যাদের মাঝে, চাকর-বাকর বা নদীর তীরে পথচারীদের মাঝেও তাঁকে দেখেন তিনি। আচ্ছন্ন উন্মাদের মত নির্বাক্ হয়ে থাকেন দিনের পর দিন। একদিন কোনমতে একটা কলম জোগাড় করে লিখলেন, 'Kali the Mother'—অহন্তার প্রলয়ে কালী যে-রূপে তাঁর কাছে প্রকট হয়েছেন তাই নিয়ে একটি কবিতা। কবিতাটির তুলনা নাই। নিবেদিতাকে বলেন, 'মৃত্যুর ধ্যান কর। করালী কালীর অর্চনা কর। তিনি সর্বশক্তিময়ী…পাষাণের বুক থেকে পরন্তপ বীর সৃষ্টি করতে পারেন তিনি।'

তাঁর কাছে করালিনীর এই রূপ: 'দীর্ঘ আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পিছনে—ধাবমান পকুর, কালের বা ঘটনার স্রোতের মত। কিন্তু ত্রিনয়নার দৃষ্টিতে কাল মহাকাল, সেই মহাকালই ঈশ্বর। এক বিপুল ছায়ার মত কৃষ্ণায়িত তাঁর অঙ্গের নীলিমা। জীবন-মৃত্যুর রূঢ় সত্যের প্রতীক তিনি, তাই মা আমার নগ্না দিগবসনা। কিন্তু এ-আঁধার শিবের কাছে আঁধার নয়। এই ভীষণাদপি ভীষণার রক্ত-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন, ধ্যানে তাঁর তত্ত্ব জেনে তাঁকে ডাকেন "মা" বলে। এই তো আত্মা আর পরমাত্মার সাযুজ্য।' (নিবেদিতার লেখা Kali the Mother হতে)।

সেপ্টেম্বরে যখন সরকারী ভাবে জানতে পারলেন কাশ্মীরে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সব পরিকল্পনা পণ্ড হয়েছে, তখন একটা সাংঘাতিক আঘাত পেলেন স্বামীজি। রেসিডেন্টের সঙ্গে নিবেদিতার বার বার দেখা-সাক্ষাৎ বা আমেরিকান মহিলাদের কনসালের কাছে দরবার করা সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হল না। স্বামীজি বিচলিত হলেন না বটে, কিন্তু দিন কয়েক একটু দূরে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন। ঠিক করলেন, ক্ষীরভবানীর মন্দিরে ক'টা দিন জগদ্ধাত্রী জগজ্জননীর পূজায় কাটিয়ে আসবেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলা রওনা হলেন স্বামীজি, নিষেধ করে গেলেন কেউ যেন তাঁর পিছু না নেয়। পূজার উপকরণ সাধারণ রকম—চাল, বাদাম আর ক্ষীর। এই দিয়েই মায়ের পূজা করলেন। মায়ের সঙ্গে কথা কয়ে, তাঁর কোলে মাথা রেখে, তাঁর

মধুর মুখের পানে হাসিমুখে চেয়ে থাকতে-থাকতে ঘুমিয়ে পড়তে চান তিনি।

এক সপ্তাহ স্বামীজি বাইরে রইলেন। এই সময়টা নিবেদিতার নিজের কাজ নিয়ে থাকবার কথা। কিন্তু স্বামীজির ব্যাকুল কণ্ঠের আবেদন তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে রাখে। তিনি বলে গেছেন, 'মা··· মা···মাকে ডাক! তুমি তাঁরই, তুমি ডাকলে তিনি আসবেন। কিন্তু তিনি তোমায় গ্রহণ করবার আগে তাঁকে সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।'

নিবেদিতার মনে হয়, 'সন্তানের কি মায়ের স্পর্শে ভয়ে বুক কাঁপে? তাঁর সঙ্গে যে আমার রক্তের সম্বন্ধ, আমি কি চিনব না তাঁকে?' ধ্যান করতে বসে একটা অদ্ভুত প্রীতিরসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।···গির্জার অন্ধকার গম্বুজের মধ্যে পশ্চিমের ম্লান গোধূলির আলো এসে পড়েছে। মোমবাতি পুড়ছে। তাঁর আবাল্যপরিচিতা কুমারী মাতা বেদির 'পরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষীণ তনু ভারী পোশাকের ভাঁজে-ভাঁজে ঢাকা পড়েছে। পাথরের প্রতিমা। দুটি হাত মেলা, কচি মুখখানির চারদিকে শিরোগুণ্ঠনের বেষ্টনী। চার পাশে সোনালী ছটামণ্ডল, মাথাটি একটু নুয়ে পড়েছে। গুঞ্জরিত প্রার্থনা উঠছে তাঁর উদ্দেশে: 'মহিমময়ী তুমি, ক্ষমাসুন্দর করুণাময়ী তুমি, মা গো, অরাতির কবল হতে রক্ষা কর আমাদের···।' থামের আড়ালে করুণ কণ্ঠে কারা গুন-গুন করছে, 'প্রসাদসুমুখী হে জননী, তোমায় নমস্কার···।' চড়া সুরে কেউ গাইছে, 'তুমি অনুপমা, সুদক্ষিণা মূর্তি তোমার, আবার তুমি রণদুর্মদ সেনানীর মত ভীষণা। হে ঈশ্বরজননী, আমাদের তরে মাগ করুণা, আন ক্ষেম।' জননী বলেন, 'প্রেমের মাধুরী আর ভয়, দুয়েরই উৎস আমি। ক্রুশবিদ্ধ হয়েছ যারা, যারা ব্যথার ভার বয়ে এনেছ আমার কাছে আমি তাদের ভালবাসি···'

এমনি আলাপ চলতে থাকে। অপরের কণ্ঠে-কণ্ঠে মিলিয়ে নিবেদিতাও প্রার্থনা করছেন। ক্যাথিড্রেলের অর্গলরুদ্ধ দুয়ারের পিছনে বাইরের জগৎ আছড়ে পড়ছে ক্ষিপ্তের মত, একাগ্রচিত্ত নিবেদিতা তাতে কান দেবেন না। স্পন্দমান প্রাণ—প্রচণ্ড শক্তি তার, বিপুল মহিমা, দুর্ধর্ষ উদ্যম। কৌমারীশক্তি কি এই প্রাণলীলা হতে বিবিক্তই থাকেন? না তো। কখনও তিনি সন্তানদের করেন বহুব্রীহি, প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নেন তাদের,—কখনও বা তাঁরই বাহুর নিষ্পেষণে পিষ্ট হয় তারা, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাকেই তারা ডাকে 'মা! মা!' তিনিই আবার প্রাণদায়িনী, অভয়দাত্রী, ব্যগ্র বাহুপাশে সন্তানদের বুকে ধরেন কখনও-বা। সকল দুঃখের অতীত বিশ্বধাত্রী তিনি, মহাপ্রাণস্বরূপিণী—আর্ত কণ্ঠে তাঁকেই তো ডাকে শরণাগতেরা।

সৃষ্টির ছন্দে আবর্তিত হচ্ছে জীবন-মৃত্যুর আবর্ত, প্রচণ্ড গর্জনে মিলিয়ে যাচ্ছে প্রলয়ের অতলে। কুমারী মা সবার পানেই হাসিমুখে চেয়ে আছেন, তাঁর আশিস্ সবার 'পরে। গর্জে উঠছে সাগরতরঙ্গ, অরণ্য-পর্বত কম্পমান। ভারতবর্ষের কৌমারীশক্তি কালিকা ঝঞ্ঝার মত নেচে চলেছেন। কখনও বা নত হয়ে বীজগর্ভ শস্যমঞ্জরীকে মৃদু স্পর্শে আদর করে যান তিনি কমলারূপে। এক হাতে-ধ্বংস করেন, অন্য হাতে দেন অভয়। এই মায়াবিনীর মায়া টোটে শুধু তারই কাছে যে কালজলের বর্ণচ্ছটায় দেখে শিবসুন্দরের নৃত্যের ছন্দ।

এই নৃত্যলোলা কালীকে দেখেছেন নিবেদিতা। বিশ্ব জুড়ে এই যে অবিরাম শক্তিপ্রবাহ, কালী তারই কেন্দ্রিত প্রতীক। নিবেদিতা সোয়াস্তি পান না। খৃষ্টান ধর্মে কল্পিত ঈশ্বরশক্তির সৌম্য আদর্শকেই জানতে অভ্যস্ত তিনি। এখনও বুঝে উঠতে পারেননি, দেবতাকে শুধু দীনবন্ধু করুণাময় ভাবলে, অগ্ন্যুৎপাতে বা প্রলয়লীলায় তাঁর রুদ্র রূপকে না দেখলে তাঁর পরিচিতি পূর্ণ হয় না, তার মধ্যে মানুষের অহংএর দাবিটাই প্রচ্ছন্ন থাকে। হিন্দু প্রশ্ন করে, যিনি পরম দেবতা তাঁর কাজ কি শুধু দোকানদারের মত লাভের হিসাব কষা? এ-সত্য ধীরে-ধীরে ফুটে উঠেছিল নিবেদিতার হৃদয়ে। সর্বনাশা রূঢ় সত্য বটে, কিন্তু তার পরিধি দূর-বিস্তৃত। ভগবান শুধু মঙ্গলেই আত্মপ্রকাশ করেন না, অমঙ্গলের মধ্যেও তাঁরই বাম মূর্তি। যে প্রকৃত বীর, সে বিবেকের ক্ষুরধার পথে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চায় রুদ্রের শাশ্বত সাযুজ্য। অহন্তার পুষ্টি নয়, চাই তার মরণ। সেই মরণের ওপারেই মহাজীবনের ভাস্বর মহিমা।

অন্তরের সব-কিছু মায়ের পায়ে উজাড় করে দেওয়ার আকুলতায় নিবেদিতা প্রার্থনা করেন। সে-প্রার্থনার ভাষা গুছিয়ে আনা শক্ত। তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যের ব্যঞ্জনাকে রূপ দেওয়া চলে না—সে যেন শুদ্ধ-সত্তার ক্ষণভঙ্গী বিচ্ছুরণ শুধু। তাও মিলিয়ে যায়, থাকে কেবল স্তব্ধতা। কথা ফুরিয়ে গেল, রইল শুধু সত্তার অনির্বচনীয় অব্যক্ত। তার কর্ম পরিক্ষীণ, শক্তি নিঃশেষিত—শুধু সে জেগে উঠেছে আবরণ দীর্ণ করে। ঐ যে পাখিটি, ও কেবল একখানি গানই জানে; আত্মহারা আনন্দে সে-গান ও গেয়ে চলে, ঝড়ের ঝাপটায় ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবার আগে অবধি ওর বিরাম নাই। নিবেদিতার ঈর্ষা হয় ওকে দেখে, অমন অশ্রান্ত একটি সহজ প্রার্থনা কেন ফোটে না তাঁর কণ্ঠে?

এই যে কালী জেগে উঠছেন তাঁর বুকে—তূর্যধ্বনিতে আহ্বান করছেন জনতাকে। মহাশূন্যে বিদ্যুজ্জ্বালার মত উৎসর্পিণী গতি তাঁর। লোকে মাকে হৃৎপিণ্ডমালিনী করেনি কেন? মানুষের রাগ-দ্বেষ উৎসারিত হয় তো ঐ হৃদয় থেকেই। না, তাও নয়। মাকে সাজানো হয়েছে মরণ-সজ্জায়। তাঁর বক্ষে দলমল রক্তক্ষরা নরকপালের মালা। মানুষের যত-কিছু কামনা আর দুষ্কৃতির আবরণে মা আবৃতা, তাই বুঝি 'নর-কর-কটি-বেড়া'? মানুষকে তার নিজের হাত থেকে বাঁচান তিনি, তাদের সকল বেদনা সকল ক্ষত তাঁরই বুকে—তাই বুঝি মানুষ তাঁর পূজারী। সমস্ত দ্বন্দ্বের প্রলয় যে-আঁধারে, মা আমার সেই পূর্ণতার প্রতীক পরঃকৃষ্ণা মহামায়া।

নিবেদিতা সহজ দৃষ্টিতে এই করালিনীর চোখের দিকে চাইলেন, নিজেকে সম্পূর্ণ তুলে ধরলেন তাঁর সামনে। যত-কিছু অভীপ্সা আর যা-কিছু সংস্কারের মালিন্য নিবেদিতার, সবই যেন এক প্রবল শক্তির সংঘাতে অখণ্ড আকার ধরল। নিপুণ নাবিকের মত এমন করেই মাস্তুলের গায়ে পালটি জড়িয়ে নিলেন যে যেদিক থেকেই বাতাস আসুক, তরী চলবে ঠিক ঘাটের পানে।

নিবেদিতা দেখছেন জগৎ জুড়ে প্রাণের স্ফুরণ···চিৎ আর জড়ে যে গাঁটছড়া বাঁধা, এ তো দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ। দ্যাবাপৃথিবীর মত যুগনদ্ধ রয়েছেন শিব আর কালী, পুরুষ আর প্রকৃতি, নিমিত্ত-কারণ আর উপাদান-কারণ। পঞ্চভূত বৈরুতসামের ছন্দে মিলিত

হচ্ছে, মানুষের সামনে মেলে ধরছে প্রকৃতির নিত্য উপচার। ধরিত্রীর জামাজে পুলক, উচ্ছলে উঠছে নদীর জল, তরুলতা কাঁপছে থরথর—কালী ধেয়ে চলেছেন ক্ষণে-ক্ষণে রূপান্তরের চমক হেনে। সবাই জানুক তাঁকে, রূপে-রূপে পাক তাঁরই পরিচয়—ওদের তৃষ্ণা মিটুক। ভক্তকে দেন তাঁর শক্তি, তাঁর ঐশ্বর্য ; আর যে-বুদ্ধি তাঁকে বাঁধতে চেয়েছিল, চেয়েছিল হাতের মুঠোয় আনতে, সেই বুদ্ধিকে অট্টহাস্যে ধুলোয় লুটিয়ে দেন। মায়ার চঞ্চল আবরণে আড়াল তিনি…'মা, মা!' স্খলিত কণ্ঠে নিবেদিতা কেঁদে ওঠেন, 'তোমার প্রাণের মুক্ত-ধারায় আমার তৃষ্ণা মেটাও…'

'…উত্তিষ্ঠত, বৎস! বীরের মত পথ চল। যে-বোঝা বইতে হবে, মানুষের মত তাকে বহন কর। যে-কাজ তোমার 'পরে, নির্ভয়ে পূর্ণ উদ্যমে তা' সমাধা কর। ভুলো না, আমি জাগাই সে পৌরুষ, ফোটাই নারীত্ব,—আমারই করতলে জয়শ্রী, আমিই তোমাদের মা। জীবনকে অত বিষম ভাবছ কেন? নিয়তি যে মায়েরই লীলা। আয়, আমার খেলার সাথী হ' তোরা, হাসিমুখে সব কিছু মেনে নে…বাঁধা ছকের কথা ভাবিস্ নে। তীর যখন ছাড়া পায় ধনুক থেকে, তার কি আর নিজের কোনও ছক থাকে? তোরাও যে তাই। জীবনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেই কাজের ছক আপনি জাগে। ততক্ষণ তোরা কালের শিশু…কিছুই তোদের জানবার নাই, জিজ্ঞাসার কিছু নাই, দেখবার কিছু নাই, ভাববার কিছু নাই। শূন্য ঝিনুকের খোলে সাগরের দোলার মত আমার ইচ্ছা বয়ে যাক তোদের মাঝে…

'পরাজয়ে ভয় পাস্ নে, হতাশাকে নিত্যসঙ্গী কর…

'আমার ইচ্ছাকে প্রতিহত করবে যে-কামনা, তাকে গুঁড়িয়ে দে…

'করুণা চাস্ নে আমার কাছে, তবেই আমার করুণার সাক্ষী হবি তুই বিশ্বের সভায়…

'দুরূহ আমার ব্রত, তাতে প্রাণপাত কর…

'নির্ভীক হ', শক্তিমান্ হ', সঙ্কল্পে অটল হ'! যখন দিনের আলো ঢলে পড়বে, খেলা হবে শেষ, তখন জানবি, ওরে বৎস, আমি কালী, আমি তোর মা…' —(Kali the Mother)।

বিবেকানন্দ ক্ষীরভবানী থেকে ফিরে এলেন। নিবেদিতা গুরুর পায়ে মাথা রেখে বললেন, 'এত দিনে আমার মাকে চিনেছি।'

ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

আপনি কি জানেন?

১। আগামী বাং ১৩৭০ সাল কলিযুগের কোন্ অব্দ হবে?

২। পুরাণে উক্ত ৯টি (নয়টি) ভূভাগ (এশিয়ার বিভিন্নাংশ) কোথায় কোথায় ছিল?

৩। বাৎস্যায়নের "কামসূত্রে" কয় অধ্যায়, কয় প্রকরণ, কয় অধিকরণ এবং কয়টি শ্লোক আছে?

৪। নন্দবংশধ্বংসকারী চাণক্যের অন্য কোন নাম আছে কি?

৫। চরক এবং সুশ্রুত রচিত চিকিৎসা এবং শরীরতত্ত্ব বিষয়ক সংহিতা আরবী ভাষায় কি অনূদিত হয়? কবে, কোন্ সময়ে?

৬। মানুষের শরীরে অস্থি-সংখ্যা কত?

৭। "বাঙলা নামে একটা ভাষা আছে। ইহা সম্ভবতঃ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ বা বলেন কোন অনার্য্য ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পরিচ্ছদ পরিয়া, সংস্কৃত ও প্রাকৃত অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া বাঙলা রূপ ধারণ করিয়াছে। হয়ত এ সিদ্ধান্তের সম্যক্ ভিত্তি নাই, হয়ত ইহা অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু প্রমাণ আবশ্যক।" কে ব'লেছিলেন?

৮। প্রীতির লক্ষণ কি কি?

[উত্তর ৭৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি

প্রবোধচন্দ্র সেন (শান্তিনিকেতন)

বাংলা দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা স্বীকার করতে হয় যে, বাঙালির একমাত্র না হোক, তার প্রধান গৌরবের বিষয় হচ্ছে সাহিত্য ; সাহিত্যসৃষ্টির বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙালি এমন কোনো কীর্তি অর্জন করতে পারেনি যা নিয়ে সে বিশ্বের সম্মুখে সগৌরবে দাঁড়াতে পারে। সংগ্রামক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রগঠনে বাঙালির নৈপুণ্য সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব, একথা বললে সত্য লজ্জিত হয় না। বাঙালির বীরত্বকীর্তি নেই, কিন্তু তার মনীষার সৃষ্টি আছে ; সে রাষ্ট্র গড়তে পারেনি, কিন্তু সাহিত্য গড়তে পেরেছে। লুইপাদ ও জয়দেবের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সে যে সাহিত্যরাজ্যের অধিকারী হয়েছে, তাতে তার লজ্জিত হবার কারণ নেই। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহিত্যই তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রধান ক্ষেত্র ; সাহিত্যসৃষ্টিতেই তার মনীষার স্ফুরণ ঘটেছে সব চেয়ে বেশি। সুতরাং বাঙালিকে বুঝতে হলে তার সাহিত্যকেই বিশেষ করে বুঝতে হবে।

সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উক্ত সাহিত্যের আধুনিককালীন গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র কথা বলাই এই প্রসঙ্গের লক্ষ্য। বলাই বাহুল্য যে, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে বর্তমান কাল। বিগত দেড়শো বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে বিস্ময়কর অভ্যুদয় ঘটেছে, পৃথিবীর ইতিহাসেই তার তুলনা পাওয়া কঠিন। গ্রীসে পেরিক্লিসের যুগ, রোমে অগষ্টসের যুগ, ইংলণ্ডে এলিজাবেথের যুগ, ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইএর যুগ, ভারতবর্ষে গুপ্ত যুগ, পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম কয়েকটি যুগই হচ্ছে সাহিত্যবিকাশের শ্রেষ্ঠ যুগ। ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগটিও ওই একই পর্যায়ভুক্ত। বাংলা সাহিত্যের এই যে আকস্মিক অভ্যুত্থান, তার মূলে রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মননশক্তির সংঘাত ও সমন্বয়। ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, যখনই বাইরে থেকে কোনো নূতন চিন্তার ঢেউ এসে কোনো জাতির চিত্তকে আঘাত করে, তখনই ঘটে সে জাতির নব জাগরণ এবং ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের উন্মোচন। বাংলা দেশে ইংরেজের আগমনে অনুরূপ ভাবেই ইতিহাসের এক বিস্ময়কর নূতন কক্ষের দ্বারোদ্‌ঘাটন হল। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, বাংলা দেশে ইংরেজের আবির্ভাব সামান্য ঘটনা নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই মহাসভ্যতার মহামিলন ঘটেছে এই বাংলা দেশেই। তাতে বাংলা দেশ যে মহাতীর্থের গৌরব অর্জন করেছে এমন আর কোনো দেশের ভাগ্যে কখনও ঘটেছে কি না সন্দেহ। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দুই মহাসভ্যতার সমন্বয়ে এমন মহাজাগরণের দৃষ্টান্ত তো মনে পড়ে না। স্পেনে এবং গ্রীসে খৃষ্টীয় ও ইসলামিক সভ্যতার মিলন ঘটেছিল বটে, কিন্তু সে মিলনে নব চিন্তোদ্‌বোধনের প্রেরণা ছিল না। এক দিকে ছিল প্রচণ্ড আধিপত্য এবং অন্য দিকে ছিল একান্ত অভিভব, ফলে দুই শক্তির সমবায়ে নূতন আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হবার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু বাংলা দেশে তাই ঘটেছে।

> হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগ রে ধীরে,
> এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এই যে চিত্তজাগরণ, এ শুধু কবির জাগরণ নয় ; শুধু বাংলা বা ভারতের জাগরণও নয়, সমগ্র প্রাচ্য বা এসিয়ারই জাগরণ। বাংলা দেশের গৌরব এই যে, সমগ্র এসিয়ার এই মহাজাগরণের প্রথম উন্মেষ ঘটে এই বাংলা দেশে, মহামানবসাগরের প্রথম তরঙ্গস্পর্শ লুটে বাংলা দেশেরই তটভূমিতে।

> কি জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
> দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

এ যেন নূতন যুগসূর্যের অভ্যুদয়কালে বাংলা দেশেরই হৃদয়ের কথা। যুগসূর্যের নবরশ্মিপাতে তখন বাংলার হৃদয়শায়ী যে তুহিনময় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল, তার কলসংগীতে আজ বিশ্বের আকাশকে মুখরিত করেছে। তখন তার কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

> উদ্‌বেগ-অধীর হিয়া
> সুদূর সমুদ্রে গিয়া
> সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
> ওরে চারিদিকে মোর
> এ কি কারাগার ঘোর।
> ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর।
> ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি,
> এয়েছে রবির কর।

যে যুগসূর্যের অভ্যুদয়ে এভাবে বাংলার হৃদয়নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল, তার উদয়ক্ষেত্র কোথায়? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, বাংলার এই নবীন যুগসূর্যের উদয় ঘটেছে পলাশির রণক্ষেত্রে। কালিদাসের একটি উক্তি মনে পড়ছে :—

> যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
> আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
> তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্‌ব্যসনোদয়াভ্যাং
> লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু॥
>
> —অভিজ্ঞান-শকুন্তল, চতুর্থ অঙ্ক।

একদিকে অস্তমিত হচ্ছেন ওষধিপতি চন্দ্র এবং আর এক দিকে বিকশিত অরুণচ্ছটার মধ্যে সমুদিত হচ্ছেন সূর্য ; একই সঙ্গে দুই তেজোময় জ্যোতিষ্কের যুগপৎ পতন ও অভ্যুদয়ের দ্বারাই যেন ইহলোকের ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত হয়।

পলাশির রণক্ষেত্রেও বাংলার ইতিহাসের এক যুগশক্তির অবসান এবং আর এক যুগশক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে একই সঙ্গে। সে যুদ্ধ এক দিকে বাংলার কলঙ্কের হেতু, আর এক দিকে তার গৌরবের সেতু। ওই যুদ্ধক্ষেত্র বস্তুতঃ বাঙালির জাতীয় শক্তির চরম পরীক্ষাক্ষেত্রও বটে। সে পরীক্ষায় তার জয় ও পরাজয় দুই-ই ঘটেছে একসঙ্গে। তাতে এক দিকে প্রমাণিত হল, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বাঙালির সংহতিশক্তি কত দুর্বল। পক্ষান্তরে, তখন থেকেই এদেশে যে সংস্কৃতি-সংঘাতের আরম্ভ হল তাতে দেখা গেল যে, মননশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙালি দুর্বল নয়। এই মননের ক্ষেত্রে দুই শক্তির মধ্যে যে যুগব্যাপী সংগ্রাম দেখা দেয় তাতে বাঙালি পরাভব স্বীকার

করেনি, বরং রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মহারথীর নায়কতায় বাঙালি সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রেই বিজয়-গৌরবের অধিকারী হয়েছে। তার বিশদ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

একদা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামিক এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ ঘটেছিল বহু শতাব্দী ধরে। এই দুই মনোধারার মিলনকে দারা শিকো তুলনা করেছিলেন দুই মহাসমুদ্রের মিলনের সঙ্গে। কিন্তু এই মহামিলনের ফল কি হয়েছে? দারা শিকোর নিজের জীবনের মতোই তা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ওই মিলন ও সংঘাতের ফলে জয়নাল আবেদীন ও আকবরের মতো দুই-এক জন আদর্শ রাজা এবং কবীর নানক দাদু প্রভৃতির মতো কয়েক সাধুপুরুষের আবির্ভাব ছাড়া আর কোনো মহৎ পরিণতি ঘটেনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে। বস্তুতঃ, মধ্যযুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুই মহাসংস্কৃতি পরস্পরের অতি কাছাকাছি এসেছিল বটে, কিন্তু একত্র মিলতে পারেনি। দুই দিকে দুই মহাসিন্ধু তরঙ্গিত-কল্লোলিত হয়েছে, কিন্তু মাঝখানে কোন্ এক অজ্ঞাত পানামা বা সুয়েজ যোজক তাদের মধ্যে এক সংকীর্ণ অথচ এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচনা করে রেখেছিল। খাল কেটে পানামা বা সুয়েজের ব্যবধানকে অস্বীকার করবার শক্তি তখনও দেখা দেয়নি। তারই ফলে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি ছিল, কিন্তু মিলতে পারেনি। আর তারই চরম পরিণতি ঘটেছে ভারতবর্ষের আধুনিক কালিন বিভাজনে।

কিন্তু পলাশির ক্ষেত্রে যে শক্তি ও সংস্কৃতি এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করল তার প্রকৃতি অন্য রকম। যে শক্তি উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে, যে শক্তি সুয়েজ বা পানামার ব্যবধানকে বিদীর্ণ করতে পারে, সেই শক্তিই দেখা দিল পলাশির রণভূমিতে। সে শক্তির কাছে আমরা পরাভূত হয়েছি বটে, কিন্তু সেই শক্তিই আমাদের মুমূর্ষু স্নায়ুতে নবজীবনের প্রেরণা সঞ্চার করেছে। উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রমণের ইতিহাস বস্তুতঃ ইতিহাসের সমস্ত অন্তরায় অতিক্রমণেরই ইতিহাস। সে ইতিহাস শুধু ভাস্কো-ডা-গামা বা পোর্তুগালের পক্ষেই উত্তম আশার বার্তা বহন করেনি, সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই সেদিন উত্তম আশার প্রথম আলোকপাত ঘটেছিল। বাংলার ইতিহাসের রুদ্ধদ্বারও সে আশার করাঘাত থেকে বঞ্চিত হয়নি। সুয়েজ-পানামার কঠিন ব্যবধান অতিক্রম করবার জন্তে যে প্রণালী খনন করা হয়েছে তাতে প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসমুদ্রের মধ্যবর্তী সমস্ত অন্তরায় অন্তর্হিত হয়েছে। ফলে তিন মহাসমুদ্রের মধ্যেই মহামিলন ঘটেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে এদেশের মাটিতেই। এই সাংস্কৃতিক মহামিলনের ফলেই ভারতের পুণ্যতীর্থে নব জাগরণের সূচনা হয়। সে তীর্থের সোপানাবলী রচিত হয়েছে বাংলা দেশের মাটিতে, সে জাগরণের অগ্রদূতস্বরূপ প্রথম অরুণোদয়ও ঘটেছে বাংলার আকাশেই। এটাই বাংলার গৌরব। বাংলার ইতিহাসের এই পর্ব তার পূর্ববর্তী সব পর্বকেই ম্লান করে দিয়েছে। কেউ-কেউ মনে করেন, বাংলা দেশে এই যে বিশ্বমিলন এবং তার ফলে এই যে নবসংস্কৃতির অভ্যুদয়, বাংলার ইতিহাসে তা আকস্মিক ঘটনা মাত্র, তার জন্য কোনো কৃতিত্ব বাঙালির প্রাপ্য নয়। এই মত সত্য বলে মানতে পারি নে। দুই সংস্কৃতির সমবায়ে কোনো নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটতেই পারে না, যদি দুই পক্ষেই নব সৃষ্টির শক্তি, প্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগ না থাকে। দুই পক্ষই অবন্ধ্য না হলে এ রকম মিলনও নিষ্ফল হয়ে থাকে, তার দৃষ্টান্ত পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই বাংলা দেশেই মধ্যযুগে যে দীর্ঘকাল ধরে দুই সংস্কৃতির সমাবেশ ঘটেছিল, তার ফলে যে নব সংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটেনি সে নিষ্ফলতার ইতিহাস আজ অত্যন্ত মর্মান্তিক রূপেই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু পলাশি যুদ্ধের সময় থেকে যে দুই সংস্কৃতির সমাবেশ ঘটে তার ফলে এদেশে নব সংস্কৃতির প্রাণসঞ্চার ঘটে, তাও আজ সমভাবেই প্রত্যক্ষ। ইংরেজ এদেশে এসেছে এক হাতে শক্তির তরবারি, আর এক হাতে জ্ঞানের মশাল নিয়ে। ফলে আমরা তাদের অধীন হয়েছি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগীয় বিভীষিকা-রজনীর অন্ধকারও কেটে গিয়ে নবযুগের অরুণাভাসে দিক্‌প্রান্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইংরেজ শুধুই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নিয়ে আসেনি; তার হাতে ছিল বন্ধনের পাশ আর কণ্ঠে ছিল মুক্তির মন্ত্র। ফলে আমাদের দেহ যখন তার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়, তখনই আমাদের মন নূতন মুক্তির আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই আনন্দেরই প্রকাশ আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য। পলাশির পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল বাংলা দেশ নব দাসত্বের পীড়নে ও বেদনায় আড়ষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তার পরেই উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্য মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে নূতন জীবনের পথে যাত্রা শুরু করল। সেই যাত্রার গতিবেগ আজও নিঃশেষ হয়নি। একটু গভীর ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত দেড়শো বছর ধরে বাংলা সাহিত্য একই বাণী বহন করছে, সে বাণী হচ্ছে মুক্তির বাণী। সে কালে-কালে ক্ষেত্র পরিবর্তন করেছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তথা বাঙালির জাতীয় জীবনে মুক্তির পতাকা কখনও অবনমিত হয়নি। আধুনিক কালে বাংলা সাহিত্যের এই মুক্তি-অভিযানের ইতিহাস বিচিত্র ও বিস্ময়কর। তার গতিবেগ যেমন অপূর্ব, তার নানা সংকটময় বন্ধুর ও বঙ্কিম গতিপথও তেমনি বিচিত্র, আর সে পথে যে বাধা-বিঘ্ন তাকে লঙ্ঘন করে আসতে হয়েছে তাও সামান্ত নয়।

সে ইতিহাসের বর্ণবৈচিত্র্যহীন রেখামাত্রিক পরিচয় দেওয়াও বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। শুধু এই ইতিহাসের পর্ব-প্রকৃতির উল্লেখ মাত্র করেই নিরস্ত হব। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, এই দেড়শো বছরের ইতিহাসকে মোটামুটি ভাবে তিনটি সমান ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০) থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু (১৮৫৯) পর্যন্ত। এ পর্ব হচ্ছে উদ্‌বোধন ও আত্মসংস্কারের পর্ব। এ পর্বের নায়ক রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই পর্বে জাতীয় উদ্‌বোধন ঘটে নব্য শিক্ষা ও নব্য সাহিত্যের উন্মেষের দ্বারা, আর তার আত্মসংস্কারের প্রয়াস দেখা যায় ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় পর্ব মধুসূদনের আবির্ভাব (১৮৫৮) থেকে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু (১৯০২) পর্যন্ত। এ পর্ব হচ্ছে সৃষ্টি ও আত্মসংরক্ষণের পর্ব। এ পর্বের নায়ক মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ। এই

পর্বে সৃষ্টি ঘটে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও অভিনয়-মঞ্চে ; আর আত্ম-সংরক্ষণের প্রয়াস দেখা দেয় ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে। এই পর্বের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে কর্মের প্রেরণা। তার ক্রিয়া দেখা দেয় তৃতীয় পর্বে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধকেই মোটামুটি ভাবে এই পর্বের ব্যাপ্তিকাল বলে ধরে নেওয়া যায়। সৃষ্টি-প্রতিভার ব্যাপ্তি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মকীর্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এই পর্বের বিশিষ্ট লক্ষণ। সৃষ্টির মুখ্য ক্ষেত্র সাহিত্য ও শিল্প, আর কর্মপ্রচেষ্টার মুখ্য ক্ষেত্র রাজনীতি ও শিক্ষা। এ পর্বের প্রধান নায়ক রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ। বিভিন্ন জ্ঞানের রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠার সাধনাও এই পর্বের আরেক প্রধান লক্ষণ। তারই ফলে দর্শনে ব্রজেন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, ইতিহাসে রাখালদাস ও যদুনাথকে আমরা পেয়েছি। বস্তুতঃ এই পর্বই বাংলার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ও সব চেয়ে গৌরবের পর্ব। এই পর্বে বাঙালির মনস্বিতার যে বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। এই সর্বতোমুখী মনস্বিতার বিকাশ বাংলা সাহিত্যকেও অভূতপূর্ব পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু সর্বতোভাবে করতে পারেনি। তা যে পারেনি তার কারণ শিক্ষায় ও সাহিত্যে বিশ্বগ্রাসী ইংরেজির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জাতীয় মনস্বিতার বিকাশ ঘটবে, অথচ তার সম্পদ্ জাতীয় সাহিত্যকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করবে না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? এই দুর্ভাগ্য থেকে যদি বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করতে হয় তবে মুখ্যতঃ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে এবং গৌণতঃ সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে ইংরেজির প্রতিযোগিতাকে অপসারিত করা অবশ্যকর্তব্য।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের চতুর্থ পর্ব চলছে। এই পর্ব হচ্ছে বেদনার পর্ব। ইংরেজের হাতের যে তরবারির তীব্র দীপ্তি একদা বাংলার আকাশকে উদ্ভাসিত করে ঐতিহাসিক অমানিশার অবসান সূচনা করেছিল, সে তরবারিই পূর্বোক্ত তৃতীয় পর্বের আরম্ভে ও শেষে বাংলা দেশকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে তাকে নানা ভাগে বিখণ্ডিত করেছে। সে আঘাত প্রথম আসে ১৯০৫ সালে বাংলার ঠিক বুকের উপরে। কিন্তু তখনকার ঐক্যবদ্ধ বাংলার বর্মের দৃঢ়তায় সে আঘাত প্রতিহত হয়। কিন্তু অচিরেই দ্বিতীয় আঘাত আসে তার দক্ষিণ বাহুকে লক্ষ্য করে (১৯১১-১২); ফলে বাংলার দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পড়ে বিহারের সীমার মধ্যে। তার পূর্বেই তার বাম বাহু খণ্ডিত হয়ে আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এভাবে দুর্বলীকৃত বাংলার উপরে তৃতীয় আঘাত আসে ১৯৪৭ সালে আবার তার মর্মস্থলকেই লক্ষ্য করে। ফলে তার হৃৎপিণ্ডই উৎক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে পড়ে একেবারে বিদেশীকৃত পাকিস্থানের ক্ষুধিত কবলে। একদা যে বণিকের মানদণ্ড সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে রাজদণ্ডরূপে আবির্ভূত হয়েছিল, অতঃপর তা বাংলার প্রাণদণ্ডের বিধান করেই তিরোহিত হল। নবজীবনের অগ্রদূতরূপে যার আবির্ভাব, অকালমৃত্যুর যমদূতরূপেই তার তিরোভাব। এই বহুধা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে বাংলার আধুনিক ইতিহাসের চতুর্থ পর্ব আরম্ভ হয়েছে। এই পর্ব বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও পরম দুর্যোগপূর্ণ। ইতিহাসের তৃতীয় পর্বে ইংরেজির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাংলা সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমান পর্বে আরও চারটি ভাষা সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিয়েছে—বিহারী, আসামী, উর্দু ও হিন্দি। এই পঞ্চ ভাষাবেষ্টিত ব্যূহের মধ্য থেকে বাংলা সাহিত্য কি ভাবে আত্মরক্ষা করবে, এই হল আজকের প্রধান সমস্যা। অথচ ঠিক এই সময়েই বাংলার মনস্বিতা নিষ্প্রভ, তার কর্মক্ষেত্র সংকুচিত, তার জ্ঞানসাধনার লক্ষ্য অনিশ্চিত। সর্বোপরি কঠিন অন্নসমস্যা ও নিদারুণ আত্মকলহ আমাদের অনাগত ইতিহাসের আকাশকে ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু তবু হতাশ হই নে। কালো মেঘের ফাঁকেই আশার আলো কি দেখা যাচ্ছে না? রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মহামনস্বীরা যে ইতিহাসকে বিশ্বের কাছে মহিমান্বিত করেছেন, সে ইতিহাস কখনও একান্ত ব্যর্থতার মধ্যে অবসিত হতে পারে না। সে কথা মনে করার হেতুও আছে।

বাংলা সাহিত্যের এই চতুর্থ পর্বের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে আত্মবিচার ও প্রসারণ। প্রথম পর্বে আত্মসংস্কার, দ্বিতীয় পর্বে আত্মসংরক্ষণ, তৃতীয় পর্বে আত্মগৌরব চেতনা এবং চতুর্থ পর্বে আত্মবিচার। আত্মবিশ্লেষণই হচ্ছে ভ্রান্তি নিরসন ও সত্য নির্ধারণের প্রধান উপায়। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আজকাল বাংলার প্রাচীন ও অর্বাচীন সর্বকালেরই ইতিহাসের আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ খুব বেশি করেই হচ্ছে। ইতিহাস বিচারের দৃঢ় ভূমির উপরে যে জাতির প্রতিষ্ঠা ঘটে, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কারণ নেই। বর্তমান সাহিত্যের দ্বিতীয় লক্ষণ আত্মপ্রসারণ। উত্তুঙ্গ মনস্বিতা আজকাল বিরল বটে, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত জনের মননের তুঙ্গতা পঞ্চাশ বছর আগে কল্পনাও করা যেত না। বিংশ শতকের প্রথম দিকের সাহিত্যের সঙ্গে বর্তমান কালের তুলনা করলেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকবে না। মননশক্তির এই উন্নতি বাংলার লেখক ও পাঠক উভয় সমাজেই দৃশ্যমান। ভাষার, রীতিভের, আলোচ্য বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও প্রসারের প্রতি লক্ষ্য করলেও নৈরাশ্যের কারণ থাকে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিচিত্র দিক সম্বন্ধে এখন যত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত হয়, অল্প কাল পূর্বেও তা আশাতীত ছিল। খুব উচ্চাঙ্গের লেখা হয়তো বিরল, কিন্তু চলনসই লেখার বৈচিত্র্য ও বিস্তার আশাপ্রদ। তার পাঠক-সংখ্যাও ক্রমেই বাড়ছে। শিশু-সাহিত্যের সম্বন্ধে এই মন্তব্য বোধ করি অধিকতর প্রযোজ্য। শিশু সাহিত্যের এই বৈচিত্র্য ও বিস্তারই ভাবী বাংলা সাহিত্যের শুভ সূচনা করছে। একথা বলছি না যে, বাংলায় অপ-সাহিত্য রচনা হচ্ছে না ; বরং বেশি করেই হচ্ছে। নদীর জলে আবিলতা থাকেই, তবু সে জলেই দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ্। রুদ্ধগতি নদীর জলে যখন শেওলা দেখা দেয় তখনই বিপদ। নানা আবিলতা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ধারা খরগতিতেই অগ্রসর হচ্ছে,—এটা আশারই কথা, নৈরাশ্যের নয়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্য ছিল স্বল্পপরিমাণ, পাঠক ও লেখকের সংখ্যা স্বল্প। তার তুলনায় আজ সাহিত্যের আয়তন তথা লেখক-পাঠকের সংখ্যা অনেক পরিমাণেই বেড়ে গেছে ও যাচ্ছে। এক কথায় সাহিত্যের ভিত্তি-পরিসর আজ আর সংকীর্ণ নয়। জন-জীবনের বিস্তীর্ণ ভূমিকার উপরেই তার প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। সুতরাং আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভার-কেন্দ্রও এখন সুস্থিতি লাভ করছে, একথা স্বীকার করতে হবে। আত্ম-বিচারপরায়ণ জাতীয় চিত্ত যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে, তবে বিভিন্ন ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের এই চতুর্থ পর্বে নূতন গৌরবেরই অধিকারী হবে, এ প্রত্যাশা অমূলক বলে মনে করি না।

বৈষ্ণব কাব্য

হরপ্রসাদ মিত্র

জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-কাব্যে লিখেছেন :—

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ।

স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দের সাহায্যে শ্রীচৈতন্য এঁদের লেখা আস্বাদন করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণকথার জন্যই এঁদের মহিমা,—এঁদের খ্যাতি! কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য নামে আত্মপরিচয় দিয়ে মুকুন্দদাস (অষ্টাদশ শতকের লেখক?) অবশ্য তাঁর 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় লিখেছেন যে, দ্বিজোত্তম চণ্ডীদাস ছিলেন তারা নাম্নী রজকীর সঙ্গী! কিন্তু বিচক্ষণ ঐতিহাসিকের সত্যবোধ অর্বাচীন মুকুন্দদাসের কথায় অণুমাত্র টলে না। তাঁরা বলেন, কিংবদন্তীর প্রভাবে এই 'তারা'ই নাকি কালক্রমে 'রামতারায়' নামান্তরিত হয়েছেন। চণ্ডীদাসের যিনি সঙ্গিনী, তিনি 'তারা'ই হোন্ আর 'রামতারা'ই হোন্,—চণ্ডীদাসের বাসস্থানের খ্যাতি বীরভূমেরই প্রাপ্য হোক আর বাঁকুড়ারই সম্পদ্ হোক—তাতে কিছুই আসে-যায় না, সমস্ত বৈষ্ণব কবির কাব্যে যা ছিলো একমাত্র লক্ষ্য, তার স্পষ্ট নির্দেশ বাঁধা পড়েছে জয়ানন্দের চরম পয়ারে :—

'শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ।'

তথাপি, এই প্রদেশের কবিদের কোষ্ঠীকুলজীর বিষয়ে গবেষণা থামেনি। ১২৮৫ সালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার চণ্ডীদাসের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার পর নীলরতন মুখোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ব্রজসুন্দর সান্যাল, রমণীমোহন মল্লিক, সতীশচন্দ্র রায়, জগবন্ধু ভদ্র, মৃণালকান্তি ঘোষ, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, করালীকিঙ্কর সিংহ, যোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্রমোহন বসু, ডক্টর সুশীলকুমার দে, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় এবং আরো অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি চণ্ডীদাসকথার আলোচনা করেছেন। বিদ্যাপতির বিষয়েও তাই হয়েছে। জন বীম্‌স্ ১৮৭৩-৭৫ সালে বিদ্যাপতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রায় একই সময়ে সারদাচরণ মিত্রের সম্পাদনায় বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশিত হয়। ১৮৮০—৮২ সালে গ্রীয়ার্সন 'এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল'-এ বিদ্যাপতির ৮২টি পদ প্রকাশ করেন। এই সময়ে 'বঙ্গদর্শনে' বিদ্যাপতি সম্পর্কে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা ছাপা হয়। তার পর রমেশচন্দ্র দত্ত, রামগতি ন্যায়রত্নের আমল থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এতৎবিষয়ক আলোচনার কাল অবধি প্রায় তিরিশ বছরের মধ্যে এ প্রসঙ্গে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যদুনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি বহুশ্রুত নামগুলি বিনা প্রয়াসে মনে পড়ে। শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' বইখানির সম্পাদনা করে পরবর্তী আলোচকদের দিগদর্শনী-স্বরূপ মূল্যবান বহু তথ্যসমৃদ্ধ একটি ভূমিকা লিখে রেখে গেছেন। তার পর যোগেশচন্দ্র রায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর), ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নানা সুধীজনে এ অনুসন্ধান চালিয়ে এসেছেন।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদের কাব্য ও কুল-পরিচয়ের আলোচনায় সুনিষ্ঠ এই বিদ্বৎসমাজের সকলের নামের তালিকা প্রণয়ন করা এ আলোচনার লক্ষ্য নয়। এঁরা প্রধানতঃ যে ধারায়, যে আদর্শ সামনে রেখে কাজে এগিয়েছেন, সেইটি স্মরণ করবার দায়িত্ব-নির্বাহ সূত্রেই এঁদের কথা মনে পড়ে। এখানে যাঁরা অনুল্লিখিত রইলেন, তাঁরাও আপন আপন কীর্তিতে উজ্জ্বল। উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত এই সব শ্রুতকীর্তি বিদ্বজ্জনের দীর্ঘ ধারায় অনুল্লিখিতপূর্ব অন্য দুটি নাম বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে আছে। এক হলো বঙ্কিমচন্দ্র,—অপরটি,—রবীন্দ্রনাথ। পূর্বস্মৃত যশস্বীরা মুখ্যতঃ প্রত্নতাত্ত্বিক আগ্রহে কাজে এগিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ এগিয়েছেন কাব্যশ্রীর আকর্ষণে! এ দু'য়ের মধ্যে কোন্ টানটি বরণীয়,—সে কথা অবান্তর। যাঁর যা সাধ্য, তিনি তারই সাধক। কাব্য আস্বাদনের জন্য কবির কুল-পরিচয় জানা দরকার কি না,—সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য পেশ করাও বর্তমান রচনার আশু কর্তব্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন :—

"জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত।…সুতরাং তাঁহাদের কবিতা ইন্দ্রিয়ের সংশ্রবশূন্য বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে।"—বিদ্যাপতি ও জয়দেব।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসাহ যে কম ছিল না, 'কৃষ্ণচরিত্র'ই তার প্রমাণ। কিন্তু জয়দেব বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাত্নিক উৎসাহ মৌনী হইলো কেন? বাঙ্গালীর বাহুবল সম্বন্ধে তথ্য আহরণের জন্য যিনি পুরাকথার ধূলো ঘাঁটতে দ্বিধা বোধ করেননি, বাঙ্গালীর গৌরব জয়দেব—চণ্ডীদাস সম্বন্ধে তিনি বীরভূমে-বাঁকুড়ায় প্রাত্নিক কৌতূহল বিস্তার করলেন না কেন?

এ জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারতেন মাত্র একজন—তিনি হলেন বঙ্কিম-মানসের বিধাতা। সেই অদৃশ্য বিধাতা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য একটি লেখায় ইঙ্গিতে এ প্রশ্নের জবাব রেখে গেছেন। 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' নামে ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধটির প্রথম বাক্যই হলো :—

"কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়।"

এই ধারায় আলোচনা এগিয়েছে। তিনি আরও লিখেছেন :—

"দেবচরিত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মনুষ্য চরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য-লেখক বা মনুষ্য-পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না।"

পরবর্তী অংশ লেখা হয়েছে :—

'মনুষ্যচরিত্রের অননুকারী দৈবচরিত্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না। এই কারণেই কুমারসম্ভব এবং Paradise Lost-এর তুলনাসূত্রে তিনি কুমারসম্ভবের কবির অধিক সামর্থ্য লক্ষ্য করে লিখেছেন :—

"দেবচরিত্র প্রণয়নে তিনি মিল্টন অপেক্ষা অধিককৌশল প্রকাশ করিয়াছেন…

"উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাঁহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না।"

এই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আরও একটি উক্তি মনে পড়া অনিবার্য। 'উত্তররামচরিতে'র আলোচনায় তিনি বলেছেন :—

"কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি-ক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথামৃতের স্বাদ নিতে নিতে এই উক্তিতে পৌঁছে সাহিত্য-পাঠকের আগ্রহ উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। সে উদ্দীপনার কারণ বলবার আগে এ পর্যন্ত তিনি কি বললেন, তা পুনরায় স্মরণ করা যাক। চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির কবিতার স্বাদন বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত; কাব্যরসের সামগ্রী (অর্থাৎ আধার এবং আধেয় দুই-ই) মনুষ্যহৃদয়; মনুষ্যচরিত্রের অননুকারী দৈবচরিত্র কাব্যে অগ্রাহ্য। অতএব চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির রচনা যদি কাব্য হিসেবে আস্বাদ্য হয়েই থাকে, তা হলে তাঁদের আরাধ্য রাধা-কৃষ্ণ যে মনুষ্যচরিত্রের অননুকারী ছিলেন না, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই সন্দেহমুক্ত ছিলেন।

এই তিনটি সিঁড়ি ভেঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবটি জানবার পরেই দেখা গেল যে তিনি কবিত্বের কথা বলতে গিয়ে 'সৃষ্টি'র সামর্থ্যকেই সিদ্ধির মন্ত্র বলে স্বীকার করেছেন। জয়ানন্দ ঐ যে এক আঁচড়ে লিখে গেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ',—বঙ্কিমের রসদৃষ্টির দ্যুতিপাতে সে মন্তব্যের গভীর তলদেশ অবধি আলোকিত হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রই হোক আর শ্রীরাধাচরিত্রই হোক—কাব্যের স্বর্গে উঠতে হলে দেবদেবীর পক্ষে মনুষ্যচরিত্রের অনুকারী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু শুধু 'অনুকরণ' তো কাব্য নয়,—কাব্য যে 'সৃষ্টি'! 'সৃষ্টি' কি? জিজ্ঞাসুর মনে কৌতূহলের চাঞ্চল্য জাগে—ফেনিয়ে ওঠে জটিল আবর্ত! সৃষ্টি কি? সৃষ্টি যদি অনুকরণ না হয়, তা হলে কী সে অন্যতরকরণ? প্রাজ্ঞ, রসিক, সুসংযত বঙ্কিমচন্দ্রের চাপা ওষ্ঠাধরের বাধা ঠেলে এ প্রশ্নের জবাব উচ্চারিত হয়নি। সৃষ্টির ব্যাখ্যান নিষ্প্রয়োজন,—সৃষ্টির বিশ্লেষণ বিবেচকের অনভিপ্রেত। বঙ্কিমচন্দ্র যে সুবিবেচক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? তাঁর ইঙ্গিতটি স্পষ্ট:—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিরা রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়লীলার স্রষ্টা! বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিগুলি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই। মহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্তা লিখেছিলেন:—

মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার।*

অর্থাৎ, 'শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত প্রেম-মাধুর্যে প্রবেশ করিবার সংকেত আমাদিগকে জানাইয়াছেন।'

কিন্তু চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাক্-চৈতন্য কবি তাঁদের কাব্যে কোন্ সংকেত রেখে গেছেন?

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম;

এ তো চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির আয়ুষ্কালের অনেক কাল পরে লেখা হয়েছিল। যাঁরা মহাপ্রভুকে দেখে বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত প্রেম-মাধুর্যে প্রবেশ করবার সংকেত পেয়েছিলেন, তাঁদের স্বীকারোক্তির ধারায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই উক্তি প্রকাশিত হয় মহাপ্রভু-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-রসসাধনার বেদতুল্য মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। কিন্তু চণ্ডীদাস কবি কা'কে দেখে লিখেছিলেন:—

বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে।—?

মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কবিরা রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর প্রথাটি (convention) পেয়েছিলেন পূর্ববর্তী ভাবাদর্শের উত্তরাধিকার সূত্রে। সেই প্রথাকে তাঁরা আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁদের সৃজনী-শক্তির উত্তাপে-আকর্ষণে সেই 'প্রথা' হলো 'সৃষ্টি'। এই প্রক্রিয়ার নাম কুশীলকত্ব (plagiarism) নয়। তাঁদের প্রতিভার গুণে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকথা হলো কাব্য। কেমন করে হলো? চীনদেশের ঘাস, চন্দ্রমল্লিকা, দেবদারু, রাজহাঁস থেকে যেমন করে চীনা কবিতার নন্দনকানন উৎসৃষ্ট হয়েছে! বিশ্বে কবিতার উপকরণ নিত্যই বিদ্যমান। কবির ধারণী শক্তির (Imagination) পরিধির মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র নিষ্প্রাণ উপকরণ হয়ে ওঠে রসময়ী সৃষ্টি। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাক্-চৈতন্য কবিদের অন্তরাকৃতির স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে অতীত কালাগত রাধাকৃষ্ণ-প্রথাটি হয়ে উঠলো রাধাকৃষ্ণলীলার কাব্য। মহাপ্রভু নীরস কোনো প্রথার (convention) অবিমিশ্র তাত্ত্বিক ডাকে জাগেননি,—কাব্যের জীয়নকাঠিই তাঁকে জাগিয়েছিল। বৈষ্ণবদের সাধনা তো জ্ঞানমার্গের নয়—তাঁরা যে রস-সাধক। পূর্ববর্তী তত্ত্বজ্ঞানকে পূর্ববর্তী কবিরা রসমূর্তি দিয়েছিলেন বলেই রস-সাধক শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। তত্ত্বকথার ওপর আপন আপন স্বত্বের স্বাক্ষর দিয়ে চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিরা যেমন কাব্যসৃষ্টি করেছিলেন,—সেই কাব্যের ওপর তাঁর স্বতন্ত্র সত্তার স্বত্বাধিকার স্থাপন করে মহাপ্রভু তেমনি করলেন ধর্মের সৃষ্টি।

এ থেকে এই সিদ্ধান্তই সম্ভব যে,—প্রাচীন চীনা কাব্যের মূলে যেমন দেখা গেছে চীনা কবিদের দূরায়নী অন্তরাকৃতি,—আমাদের প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্যের মূলেও তেমনি ছিল কবিদের বিশেষ এক অন্তরাকৃতি—তাঁদের অন্তর্জীবনের গভীর এক-একটি মাহেন্দ্রক্ষণ।

কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে। বসন্ত রায়ের পদাবলীর বিষয়ে আলোচনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:—

"প্রতিভার স্ফূর্তির ন্যায় প্রেমের স্ফূর্তিও একটি মাহেন্দ্রক্ষণ একটি শুভ মুহূর্তের উপর নির্ভর করে। হয়ত শতেক যুগ আমি তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, তবুও তোমাকে ভালবাসিবার কথা আমার মনেও আসে নাই—কিন্তু দৈবাৎ একটি নিমিখ আসিল তখন না জানি কোন্ গ্রহ কোন্ কক্ষে ছিল—দুই জনে চোখাচোখি হইল, ভালবাসিলাম। সেই এক নিমিখ হয়ত পদ্মার তীরের মত অতীত শত যুগের পাড় ভাঙ্গিয়া দিল ও ভবিষ্যৎ শত যুগের পাড় গড়িয়া দিল।"

মহাপ্রভুর জীবনে যেমন এক 'নিমিখ' বা লগ্নর শুভ যোগ ঘটেছিল,—আমাদের দূর অতীতের অপরিজ্ঞাত কোনো এক আদি বৈষ্ণব কবির চেতনায় সেই রকম কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণ দেখা দিয়ে থাকবে। নিশ্চিত ভাবে আজ তাঁদের নামরূপ নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। শ্রীচৈতন্যকে তিনিই জাগিয়েছিলেন—অথবা তাঁরাই

* নরহরি সরকার এবং বাসু ঘোষ উভয়েরই নামে প্রচলিত।

জাগিয়েছেন, কারণ, তাঁরাই পূর্বগামী। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ,—পয়স্বিনীতীরে মহাপ্রভু আদিকেশবের মন্দিরে 'ব্রহ্মসংহিতা'র যে পুঁথি পেয়েছিলেন এবং কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী অন্য এক মন্দিরে বিল্বমঙ্গল-রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামে যে পুঁথিখানি তাঁর চোখে পড়েছিল,—এই সব বিভিন্ন সূত্রের ভাবস্পন্দনের সঙ্গে মহাপ্রভুর ভাবস্পন্দনের উদ্বাহ ঘটেছিল। কেন এমন ঘটলো? 'তখন কোন্ গ্রহ কোন্ কক্ষে ছিল?'

সৃষ্টির কারণ দুর্জ্ঞেয়। বোধ হয় এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যস্রষ্টা চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির প্রত্নানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেননি। রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে মৌনী। স্বপ্নদর্শী, কারণভিক্ষু নিমিত্তবাদী সাধারণ পাঠকের স্মৃতিতে তাঁর একটপ্রাসঙ্গিক একটি উক্তি অনুচিত অর্থেই মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। সে উক্তিটি হলো:—'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'। তার মানে এ নয় যে, প্রিয় ব্যক্তির ধারণা থেকে বৈষ্ণব কবিরা দৈবী ধারণায় পৌঁছেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই উক্তির সূত্রে বৈষ্ণব কবির সত্যবোধের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। খণ্ডদর্শী মনস্তাত্ত্বিকের কৌশলের রাস্তায় নয়,—পূর্ণকাম সত্যদ্রষ্টার ধ্যানবলেই প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের মানস-রহস্য তিনি বুঝেছিলেন। 'সত্যকে দেখা' নামক প্রবন্ধে তিনি যে কথা লিখেছেন বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস তাঁদের পদাবলীর নানান্ পদে সেই কথাই বলে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:—

"আলোক আছে বলে দেখছি তা নয়, তিনিই আমার অন্তরে ও বাইরে সত্য হয়ে আছেন বলেই সমস্ত জিনিসের সঙ্গে আমার দেখার যোগ হচ্ছে—তাঁর শক্তিতেই তাঁকে দেখছি—তাঁরই ধী দিয়ে তাঁকে ধ্যান করছি, তাঁরই সুরে আমার কণ্ঠ তাঁরই নাম করছে, তাঁরই আনন্দে আমি তাঁর স্মরণে আনন্দ পাচ্ছি।"*

বিদ্যাপতির রাধিকা বলেছেন:—

বিহু মোর পরসন ভেল
হরি মোহি দরসন দেল।
দেখলি বদন অভিরাম
পূরল সকল মন কাম।
জাগি উঠল পঞ্চ বাণ।
বসি নাহি রহল গেয়ান।

রসের সমুদ্রে এই ভাবেই জ্ঞানের সমাধি ঘটে যায়!

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কাব্যের এই রসলক্ষ্যতা মেনে নিয়েই তৃপ্ত হয়েছেন। কবিদের কুল-পরিচয় সম্বন্ধে তাঁরা গবেষণা করেননি। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে জয়ানন্দ এবং তাঁর পূর্বগামী অন্যান্য চরিতকারদের সুরে সুর মিলিয়ে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিকে তাঁরা 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে'র লেখক বা প্রকাশক মাত্র মনে করেননি। গীতা, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, আলওয়ার সম্প্রদায়ের ধ্যান ইত্যাদি সম্ভব-অসম্ভব যতো বিভিন্নতার মধ্য দিয়েই বাংলার বৈষ্ণব কাব্যের স্ফুরণ ঘটে থাকুক না কেন,—চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির প্রতিষ্ঠার কারণ অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত। রাধাকৃষ্ণের প্রাচীন প্রথাটিকে কাব্য-প্রেরণার অমৃতযোগে তাঁরা বিস্ময়জনক নব লোকে উন্নীত করলেন। জয়ানন্দের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটিকে কিছু বদলে নিয়ে বলা যায়:

রাধাকৃষ্ণ কাব্য তারা করিল সৃজন।

---

* ১৩১১-এ রচিত।

উত্তর

১। ৫০৫৪ অব্দ। ২। কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভারত, ভদ্রাশ্ব, কিম্পুরুষ। ৩। ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়; চতুঃষষ্টি প্রকরণ; সাতটি অধিকরণ এবং শ্লোক-সংখ্যা সপাদ এক সহস্র মাত্র। ৪। হাঁ; যথা,—দ্রামিল (দ্রমিল), পক্ষিলস্বামী, অংগুল, বিষ্ণুগুপ্ত, বাৎস্যায়ন, চনকাত্মজ ও কৌটিল্য। কিন্তু স্বর্গতঃ সুপণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমাণ ক'রেছেন যে "কামসূত্র" রচয়িতা বাৎস্যায়ন অন্য জন। ৫। হাঁ। ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে হারুণ এবং মনসুরের সময়ে আরবী ভাষায় অনূদিত হয় এবং আরবীগণ কর্তৃক রীতিমত পঠিত হয়। ৬। বেদের মতানুযায়ী ৩৬০ এবং শল্যতন্ত্রের মতানুযায়ী ৩০০। ৭। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ৮। অভ্যাস বশতঃ, অভিমান বশতঃ, প্রত্যভিজ্ঞা বশতঃ এবং বিশেষ সেবা বশতঃ।

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

৩৭

সে-যুগে মহকুমার ক্ষুদ্রাকার জেলে (যাকে সহজ ভাষায় বলা হয় সাব-জেল) পদার্পণের সৌভাগ্য জীবনে যার একটি বার হয়েছিল, নিশ্চয়ই আজও তার স্মৃতিপটে প্রস্তর-ফলকে লেখার মতো খোদিত হয়ে আছে অবিস্মরণীয় একটি ব্যক্তির কথা, তিনি আর কেউ নন—জেলের কেরাণী বাবু। তিনি কেরাণী, তিনি এ্যাকাউনটেণ্ট, তিনি কিচেন-ম্যানেজার, তিনি জেলর এবং কার্য্যতঃ তিনিই সাব-জেলের প্রবল পরাক্রান্ত সুপারিনটেনডেণ্ট। কাগজে-কলমে অবশ্য মহকুমা হাকিমই মহকুমা জেলের সুপার, কিন্তু এই শিখণ্ডীর আড়ালে থেকে পরম নিশ্চিন্তে শাসন-মুদ্গর ঘোরান দোর্দণ্ডপ্রতাপ কেরাণী বাবু মহাভারতের ভীমসেনের মতো। আপনার কোনো যুক্তিই যুক্তি নয়, যদি মহামান্য কেরাণী বাবু তার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে না পারেন। আপনার কোনো সকরুণ আর্জ্জি বা রোরুদ্যমান আবেদন কোনো দিনই হাকিমের দরবারে প্রবেশাধিকার পাবে না, যদি না কমাণ্ডার-ইন-চীফ কেরাণী বাবু তাতে স্বাক্ষর করে পাসপোর্ট প্রদান করেন। কেরাণী বাবুর বিনয়াবনত ও অনড় ঔদাসীন্যে মরিয়া হয়ে উঠে যদি কোনো দিন আপনি ছয়শো অশ্বারোহীর লাইট ব্রিগেডের মতো অপরিমিত দুঃসাহস দেখিয়ে একদিন সোজাসুজি স্বয়ং হাকিমের সম্মুখেই আপনার বক্তব্য পেশ করে বসেন, তাহলে আপনার ভাবাবেগের বন্যা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার পূর্ব্বেই স্মার্ট মহকুমা হাকিম মিষ্টি করে দুটি হাল্কা কথা বাতাসে ছেড়ে দেবেন: কেরাণী বাবু, নোট করুন তো!

খুশী হয়ে উঠলেন আপনি এই ভেবে যে, এত দিন পর তবু কর্ত্তার কান পর্য্যন্ত পৌঁছলো আপনার আকুতি, হয়তো উৎফুল্লও হয়ে উঠলেন এই আশায় যে, এইবার নিশ্চয়ই একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হয়ে সুবিচার পাবেন আপনি আগামী দু'-চার দিনের মধ্যেই। কিন্তু কেরাণী বাবুর নোট-বইয়ের পাতা প্রতিদিনই দু'-চারখানা করে এগিয়ে চলে, পেছন ফিরে তাকায় না তারা উনিশশো পাঁচ সালের বিপ্লবী বাংলার মতো। তাই ফুরিয়ে-যাওয়া নোট-বইটি একদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে চিঠি বার করে নেয়া এনভেলপের মতো, আর একদিন জমাদার তাকে নিয়ে গিয়ে বিসর্জ্জন দেয় কোনো ডাষ্টবিনে, কোনো ডোবায় বা কোনো আস্তাকুঁড়ে। সুতরাং এক দিন নয়, দু'দিন নয়, দশ দিনও নয়, মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করতে হবে আপনাকে বিরহিণী যক্ষ-প্রিয়ার মতো। সে প্রতীক্ষার আর নেই শেষ।···আপনার অস্তিত্বের ঝুঁকি নিয়ে এরই মধ্যে যদি আবার একদিন কম্পিত পদে এগিয়ে এসে অধীনের বিনীত নিবেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন মহকুমা হাকিমকে, তাহলেও এবং তার অনেক—অনেক দিন পরেও অনন্তকাল ধরেই হাকিমের শ্রীমুখে শুনতে পাবেন সেই একই অমৃত-বাণী বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ঘড়ির মতো: কেরাণী বাবু, নোট করুন তো!

নোট-বই সর্ব্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকে এবং তাতে বাজারের তেল নুন-ডালের হিসেব থেকে শুরু করে বাৎসরিক ব্যালান্স-সীট সবই টুকে রাখা আছে। কিন্তু ঠিক যে অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে তিনি হুজুরের হুকুম তামিল করেন নোট-বুকে নোট করে, ঠিক তেমনি উৎকট উৎসাহের সঙ্গেই তিনি নোট-করা কথাগুলো একেবারে কবরস্থ করে ফেলেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার চাপে। শুধু রেকর্ড ঠিক রাখবার জন্যই মহকুমা হাকিম সারাটি দিন আদালতে হাজারো মামলার ঝামেলা সইবার পর গৃহে প্রত্যাগমনের পথে প্রতিদিন অপরাহ্ণে একবার এই সাব-জেলের গরীবখানায় আসেন হাতীর পা ফেলে ভাগ্যবান বাসিন্দাদের ধন্য করে দেবার জন্য। যত কিছু অভিযোগই করা যাক্, যত আবেদনই জানানো হোক্, সবার জবাবে ঐ একই বাণী শোনা যায় তাঁর মুখে: কেরাণী বাবু, নোট করুন তো!···

সে সময় কেরাণী বাবুর এই লোভনীয় উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন, যত দূর মনে পড়ে, সুরেন মৈত্র। মহকুমা হাকিম ছিলেন কামাখ্যা মৈত্র। এই দুই বারেন্দ্র মৈত্রের নিবিড় মিত্রতার ফলে মুন্সীগঞ্জ সাব-জেলের সাধারণ কয়েদীদের তখন দুর্দ্দশার আর অবধি ছিল না এবং যে দু'-চার জন বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, তাঁরাও খুব অবমানিত বোধ করতেন।

বাইরে থেকে কোনো বন্দী প্রথম জেলে এলেই অথবা এখানকারই কোনো বন্দী সারা দিন আদালতে কাটিয়ে দিনের শেষে ফিরে এলেই প্রহরারত সিপাই প্রত্যেকের দেহ তল্লাসী করতো একেবারে তাদের উলঙ্গ করে। স্বদেশী আসামী হলেও বড় একটা রেহাই দেয়া হতো না। আর সাধারণ বিচারাধীন আসামীদেরকে এরা নিশ্চিন্তে খাটিয়ে নিত তাদের মামলার ফলাফল বেরুবার পূর্ব্বেই। রান্নার জল টানা, রান্না করা, তরকারি কাটা, মাছ কাটা, মশলা বাটা, কয়লা ভেঙে উনুন ধরানো সব কাজই এদের করতে হতো। আর পাণ থেকে চুণ খসলেই চলতো সিপাইদের হাতে বেদম প্রহার। যে ক'জন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী ছিল, তাদের মেথর, ধোপা, নাপিত ও ঝাড়ুদারের কাজ করতে হতো আর প্রায় সময়ই হাকিম বা কেরাণী বাবুর বাড়ীর কাজে এরা ব্যস্ত থাকলে এদের কাজগুলোও এসে পড়তো বিচারাধীন আসামীদের স্কন্ধে। বিচারে নিরপরাধ সাব্যস্ত হয়ে এদের মধ্যে যারা ঘরে ফিরে যেত, তাদের অনেকেরই পিঠে কালশিরের চিহ্ন সহজে মিলিয়ে যেত না।

একটি মাত্র বৃহৎ কক্ষ সর্ব্বশ্রেণীর পুরুষ কয়েদী ও আসামীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, তার পর সুউচ্চ দেয়ালের ওপারে জেনানা ফাটক অর্থাৎ নারী আসামীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্রাকার কক্ষ। স্বদেশী বন্দীদের সাধারণ কয়েদীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখবার জন্যই রাখা হয় ঐ জেনানা ফাটকে। স্বদেশীরা বসন্ত রোগে আক্রান্ত রোগীর মতো ব্যবহার পেতো কেরাণী বাবুর হাতে। সাধারণ কয়েদী, এমন কি, বিচারাধীন আসামীদেরও তাঁদের ধারে ঘেঁসতে দিতে চাইতেন না। বসন্ত রোগ বড্ড ছোঁয়াচে, বলা যায় না।···কিন্তু নারী আসামী থাকলেই এই রেসপেকটেবল্ ভিসট্যান্স আর রক্ষা করা সম্ভব হয় না, স্বদেশীদের বাধ্য হয়ে স্থান করে দিতে হয় ঐ বৃহৎ কক্ষেই, সবার সঙ্গেই। তখন কেরাণী বাবুর আর এক রূপ দেখা দেয়—আই-বি-গিরি। স্বদেশীদের ওপর জেন-দৃষ্টি রাখতে হয় স্পাই মারফৎ এবং সুযোগ ও সাধ্যমত নিজেকেই। আর জল পরিমাপকারী ষ্টীমারের খালাসীর মতো ঘণ্টায় ঘণ্টায় রিপোর্ট পেশ করতে হয় হাকিমকে, নয় তো ঢাকায় বুদ্ধি বিভাগের অফিসে আর নয় তো উভয়কেই।

আমি যখন এলাম মুন্সীগঞ্জের সাব-জেলে, তখন একটি নারী আসামী ছিল বলেই আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় বৃহৎ কক্ষে সবার সঙ্গে।

কিন্তু বোধ হয় তৃতীয় দিনেই সুরেন মৈত্রের সঙ্গে আমার বেশ এক পশলা বচসা হয়ে গেল।

জেলের মধ্যেই ক্ষুদ্র একটি সব্জী-বাগান, তাতে কিছু-কিছু তরকারি ফলেছে। বেশ বড় বড় বেগুন, টমেটো, ওলকপি ফলেছে, আলুর গাছ বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। একদিন বিকেলে গাছে জল দেবার সময় একজন আসামী একটি লাল টমেটো ছিঁড়ে খায়। সবাই শপথ করে যে, এই দুর্ঘটনা তারা কোন ক্রমেই বেফাঁস হতে দেবে না। সহকর্ম্মী ও রুম-মেটকে তারা কেরাণী বাবুর কোপাগ্নি থেকে রক্ষা করবেই। কিন্তু পরদিনই তা কেরাণী বাবুর কানে পৌঁছে যায় এবং বিচারকরূপে অপরাধীকে "কম্বল ধোলাই" দণ্ডে দণ্ডিত করে জেলের জল্লাদরূপে কেরাণী বাবু নিজেই এলেন বিচারকের হুকুম তামিল করতে।

বাধা না দিয়ে পারলাম না। বললাম : কেরাণী বাবু, আপনার হুকুম প্রত্যাহার করতে হবে।

চমকে উঠলেন ঔরংজেব যশোবন্ত সিংহের ঔদ্ধত্যে : কেন দ্বিজেন বাবু?

কারণ অতি সহজ, আপনার আদেশ বেআইনী।

বিস্মিত হলেন কেরাণী বাবু : বেআইনী!

জবাব দিলাম : আজ্ঞে হ্যাঁ। বিচারাধীন আসামী আর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীর মধ্যে যে পার্থক্য অনেক, তা তো আপনার অজানা নয়, কেরাণী বাবু! বিচারাধীন আসামী আপনার এখানে কয়েদীতে পরিণত হয়েছে দেখছি। তাদের দিয়ে দিব্যি মেহনতি কাজ করিয়ে নেয়া হচ্ছে। সেটাই আপনার বেআইনী কাজ। তার'পর যে গাছগুলোকে জন্ম থেকে তারা এত বড় করে তুললো জল দিয়ে পরিচর্য্যা করে, সেই গাছের একটি ফলও তারা ছুঁতে পারবে না, আপনাদের এই আদেশ অমানুষিক ও বর্ব্বরোচিত। এই আদেশ না-মানাই উচিত।

চমকে উঠলেন চাণক্য মহারাজ নন্দের বাক্যবাণে : বলেন কি দ্বিজেন বাবু!

আমাদের চারি দিকে ততক্ষণে দু'-চার জন আসামী এসে দাঁড়িয়ে গেছে। দু'-এক জন কয়েদীও বার বার তাকিয়ে দেখছে উত্তাপের পারা কতখানি ঠেলে ওঠে! আমি বললাম ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই : এমনিই আমরা বলে থাকি কেরাণী বাবু। উঁচু দেয়ালের আড়ালে আপনারা নিরীহ ও নিরপরাধ লোকগুলোর ওপর কী অত্যাচারই না করেন, আমরা তার প্রতিবাদ জানাই। আসামীই হোক, আর কয়েদীই হোক, তার গায়ে হাত তোলবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? কেন আপনার সিপাইগুলো যখন-তখন ওদের চড়-চাপড় দেয়?

একটু চঞ্চলতা দেখা দিল। কেরাণী বাবু আশে-পাশে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে পরিস্থিতি উপলব্ধি করে কণ্ঠস্বর মোলায়েম করবার চেষ্টা করে বললেন : থাক্, শাস্তি না-হয় আমি না-ই দিলাম, কিন্তু গাছের ফল এমনি ভাবে যদি ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে, তাহলে ক্ষতি তো ওদেরই। ওদের জন্তই তো এই বাগান।

কয়েদী রহমৎ খুনের দায়ে জেল খাটছে। জীবনেরই যে পরোয়া করে না, কেরাণী বাবু তো তার কাছে মেষশাবক! হঠাৎ সে বলে উঠলো : মিছা কথা কন্ ক্যান বাবু? বাগান আমাগো লইগা, না আপনাগো লইগা? তরিতরকারী যা হইবো, তার সবটাই তো যায় হয় হাকিমের বাড়ী, নয় তো আপনার বাড়ী।

কেরাণী বাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন : অ্যাঁ, বলিস কি রে হারামজাদা?

রহমৎ ওতে দমবার পাত্র নয়। বললো : হারামজাদা কন্ আর যাই কন্ বাবু, এই বাগানের তরকারি আমাগো ভাইগ্যে জোটে না। তাই কি করুম, চুরি কইরাই খাওনের সাধ মিটাইতে হয়। হারাণ খাইছে একটা, আমি খামু দশটা!

এবার জমাদার এগিয়ে এল হুজুর কেরাণী বাবুর মর্য্যাদা রক্ষার জন্ত। বললো রহমৎকে : এই শালা, হাঠ হিঁয়াসে। যা, লম্বরমে যা, নাই তো মারতে মারতে ইট বানাইয়ে দোব।

বললাম : কেরাণী বাবু, বাগানের তরকারি নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কয়েদীদের জন্ত খরচা লিখে হিসাব-খাতায় একটা মোটা অঙ্ক ব্যয় দেখানো যায়, তা আমি জানি। কিন্তু এই প্রতারণা আর চলবে না। এখানে যখন এসেই পড়েছি, তখন এর শেষ একবার দেখবোই।—রহমৎ, কাল এই বাগানের বাঁধাকপির তরকারী হবে আর টমেটোর চাটনী আর আলু দিয়ে ওলকপির ডালনা—দেখা যাক্, কামাখ্যা মৈত্র কি করতে পারে। রাজী সবাই?

রহমৎ-প্রমুখ সকলে হল্লা করে আনন্দ প্রকাশ করলো। কেরাণী বাবু মুখখানা হাঁড়ী করে বেরিয়ে গেলেন বেগতিক দেখে।

রাত্রে আমাদের কক্ষে রীতিমত একটা সভা বসে গেল। রাজনৈতিক বন্দী মাত্র আমরা দু'জন—সত্যেন বাবু আর আমি। পরদিনের অভিযান সম্পর্কেই আলোচনা হলো। যারা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী, তারা একবাক্যেই মত দিল বাগানের তরকারি খাবার অধিকার তাদেরই। যারা বিচারাধীন অর্থাৎ যাদের ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত, দেখা গেল তাদের মধ্যেই কিছু মতভেদ আছে। নিরীহ ও নির্বিরোধী যারা, তারা গভীর আশা পোষণ করে যে, বিচারে তারা নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হবেই; সুতরাং ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবার সম্ভাবনা যখন প্রচুর, তখন মিছেমিছি কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ করে লাভ কি? আর এক দল আছে, এমনি দল বোধ হয় সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের রাজনৈতিক দলগুলিতেই দেখা গেছে ও দেখা যাবে, যারা সবাইকে এগিয়ে দেবার বেলায় যেমন সর্ব্বাগ্রে নেমে আসে রাস্তায়, তেমনি প্রথম বুলেটের শব্দেই তারা সর্ব্বাগ্রে গিয়ে আশ্রয় নেয় নিরাপদ কোটরে। যুদ্ধের প্রস্তাব এরা শুধু সমর্থন করে না, অনেক সময়ই তা উত্থাপন করে এবং যুদ্ধ সমর্থন করে এদের ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতা গমকে-গমকে একেবারে পঞ্চমে ওঠে এবং সভাস্থলে অগ্নিস্রাব ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেন শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে দেয় হত্যার নেশা···কিন্তু তার পর সত্যিই যখন একদিন রণতূর্য্য বেজে ওঠে, শিবিরে শিবিরে সাজো-সাজো রব পড়ে যায়, হ্রেষারবে ও বৃংহণে আকাশ-বাতাস হয়ে ওঠে প্রতিধ্বনিত, নায়কের গুরুগম্ভীর আদেশবাণী শোনা যায়, তখন এদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না!···কেউ অসুস্থ, কেউ অন্যত্র সাংঘাতিক ব্যস্ত, কেউ গোপনে পলায়িত, কেউ হয়তো শমুকের মত নিজের মধ্যেই অন্তর্হিত।

সে রাত্রে কিন্তু জোর দিল একা রহমৎ, 'বি' ক্লাস কয়েদী।

অত্যন্ত ধারালো ভাষায় সে তার বক্তব্য এমনি ভাবে উচ্চারণ করলো যে, অকস্মাৎ মনে হয় সে বুঝি বিশ্ববিত্তালয়ের বিতর্ক-সভার জনৈক যুক্তিবাদী বক্তা। সে বললো: কোদালি চালাইয়া মাটি কাটছি আমরা, বীজ ছড়াইছি, এত্তটুক চারা গাছেরে জল দিয়া-দিয়া এতটা বড় করছি, সেই গাছে ফলছে টমেটো। খাউক—হাকিম খাইতে চায়, কেরাণী বাবু খাইতে চায়, খাউক, কিন্তু তাই বইলা আমরা কি একটাও খাইতে পারুম না? এ ক্যামন বিচার রে মশয়? আপনাগো মনে কি আছে খোদা জানে। আমি তো কাইল সকাল হইতেই আগে গোটা চারেক কফি আইনা ফালাইয়া দিমু গাঙ্গুলী কর্তার পায়ের কাছে, তার পর যা হয় হোক্। সাত বছর তো থাকতে হইবেই, না-হয় থাকুম আরও দুই-চাইর মাস!

শ্রোতাদের মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করলো: সিপাইরা যদি লাঠি চালায়, যদি বন্দুক লইয়া আইসে, তাইলে?

রহমৎ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: আরে, ও হারামীর বাচ্চাদের ঠাণ্ডা করনের দাওয়াই আমার লগেই আছে। বিশ্বাস হয় না, ভাখবেন?—বলেই সে একটা ম্যাজিক দেখিয়ে দিল। গলায় একটা আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বমি করবার মতো বার কয়েক শব্দ করলো তার পর মুখের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে টেনে বার করলো একটি বিছে হার, বললো: একটা না, এমনি তিনটা আছে। ছিড়া টুকরো টুকরা কইরা শালাগো হাতে দিলেই, বন্দুকের গুলী আর ছুটবো না, বোঝছেন?—বলে রহমৎ মনের আনন্দে হা-হা করে হাসতে লাগলো। কিন্তু হারছড়া সে বেশীক্ষণ আর বাইরে রাখলো না, আবার মুখে পুরে গিলে ফেললো।

গিলে ফেললেই হারছড়া কিন্তু গলার মধ্য দিয়ে সোজা পথে গিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে না। এদের গলার মধ্যে বোধ হয় জিহ্বার গোড়ার দিকে টনসিলের কাছাকাছি স্থানে একটি গর্ত্ত থাকে, যাকে এদের ভাষায় বলা হয় খোপড়। শোনা যায়, চোরের দলে নাম লেখাতে এলেই শিক্ষকদের প্রথম পাঠ হয় খোপড় তৈরী। মার্ব্বেলের মত সাইজের একটি সীসের বল গলার মধ্যে রেখে-রেখে ওখানটা খইয়ে ফেলা হয়, ধীরে ধীরে ওটা নরম মাংসের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরী করে। প্রায় চার ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত তৈরী হবার পর সীসের বল ফেলে দেয়া হয়। হাত সাফাই করে টাকা-পয়সা, আংটি, দুল, লকেট, নাকছাবি, এমন কি, একটি গোটা হার বা একটা ফাউনটেন পেনও ঐ গর্ত্তে লুকিয়ে ফেলা যায়। জেলের মধ্যে নানারূপ অতিরিক্ত সুবিধে আদায়ের জন্ত পাকা কয়েদীরা খোপড়ে ভরে টাকা, পয়সা বা সোনার টুকরো নিয়ে আসে। রহমৎও এনেছে। টাকা দিলে যে সাপকেও বশ করা যায়, বন্দীরা তা জানতো। তাই রহমতের কথায় ও সন্ত সন্ত হারের প্রদর্শনীতে তারা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

পরদিন কেরাণী বাবু বেশ একটা চাল চাললেন। তিনি এলেন না, এল হেডজমাদার, বললো হাকিম বাবু নাকি আমায় তাঁর বাড়ীতে একবার যেতে বলেছেন। অনায়াসেই সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, কিন্তু কামাখ্যা মৈত্রের মুখোমুখি ঝগড়া করে কিছু সুবিধে আদায় করা যায় কিনা, দেখবার জন্তই যাওয়াই স্থির করলাম। রহমৎকে বলে গেলাম আমি ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত আইন অমান্ত স্থগিত রাখতে।

মুন্সীগঞ্জ সাব-জেলের পাশেই একটি বহু প্রাচীন দুর্গ আছে, তার নাম, যত দূর মনে পড়ে, ইদ্রাকপুর ফোর্ট। কোন্ কালে কে তৈরী করেছিলেন জানি নে। শুধু দেখেছিলাম, এর প্রধান ইমারতটি গোলাকার ও তার একাংশ একেবারে মাটির নিয়ে বসে গেছে। সেই গোলাকার ইমারতের ছাদে কামাখ্যা মৈত্রের সুদৃশ্য বাংলো ধরণের গৃহ। অত্যন্ত প্রশস্ত অনেকগুলো সোপান বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই স্বয়ং কেরাণী বাবু এসে অভ্যর্থনা জানালেন আমায়: আসুন, আসুন দ্বিজেন বাবু,—এই ঘরে বসুন। সাহেব এলেন বলে।

বেশ সাজানো ঘর। সোফা, সেট, টিপয়, কাচের আলমারী-ভর্ত্তি বই, ফুলদানী, দরজা-জানালায় রঙীন ফুল-আঁকা পর্দা।

কিন্তু সাহেবের আসতে দু'-চার মিনিট দেরী হওয়াতে কেরাণী বাবু আমায় আপ্যায়িত করতে চেষ্টা করলেন: রাত্রে বোধ হয় আপনার খুব কষ্ট হয় দ্বিজেন বাবু, তাই না? যে মশা—

হ্যাঁ, তা হয়।—জবাব দিলাম।

কেরাণী বাবু বলতে লাগলেন: তার ওপর আবার ঐ নোংরা লোকগুলোর সঙ্গে থাকা, সে এক ভীষণ ব্যাপার! ভদ্রলোকের পক্ষে সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু কী আর করা যায়, মেয়ে আসামীটাই তো বিভ্রাট বাধিয়ে দিলে। নইলে ওদিকের ঘরটা চমৎকার! সত্যেন বাবু আর আপনার পক্ষে গ্র্যাণ্ড হতো।

কী হতো আর কী হতে পারলো না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্ত আমি এখানে আসিনি। তাই চুপ করেই রইলাম। কেরাণী বাবু কিন্তু চুপ করে থাকলেন না, বলে যেতে লাগলেন: তা আমি হাকিম সাহেবকে বলেছি, মেয়েটার মামলা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলুন হুজুর, ওটাকে ঢাকায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হই। দ্বিজেন বাবুদের একটু সুবিধে করে দিই। আপনিও একটু বলুন না দ্বিজেন বাবু! আপনার অনুরোধ হুজুর না রেখে পারবেন না।

বললাম: আমি তো হুজুরকে কোনো অনুরোধ জানাতে এখানে আসিনি কেরাণী বাবু! কেন ডেকেছেন, সেটা আপনার জানা থাকলে আপনিই বলে ফেলুন না। ওদিকে রান্না-বান্নার সব রেডি যে!

কথাটা উপাদেয় লাগলো না কেরাণী বাবুর, তা তাঁর মুখের চেহারাতেই স্পষ্ট বোঝা গেল। কী বলবেন স্থির করতে না পেরে যখন দিশেহারার মত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় স্লিপিং স্যুট পরে কক্ষে প্রবেশ করলেন কামাখ্যা মৈত্র। রক্ষা পেলেন সুয়েন মৈত্র।

প্রত্যূষে রেস্তোরাঁয় সংবাদপত্র খুলে বসে মৌজ করে চা-পানের সময় মনটা যেমন হয়ে ওঠে হালকা এবং তার পর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার থেকে সুরু করে একেবারে মুচীরাম গুড়ের সম্বন্ধে নানাবিধ মুখরোচক আলোচনায় যেমন চায়ের কাপে তোলা যায় মেদিনীপুরের ঝড়, অমিতবিক্রম কামাখ্যা মৈত্র তাঁর ড্রয়িং-রুমটিকে যেন তেমনি একটি চায়ের হোটেলে পরিণত করে বসলেন এবং হাকিমী খোলসটা একেবারে পরিত্যাগ করে হাসি পরিহাসে ও ঠাট্টা-তামাসায় একেবারে উত্তাল হয়ে উঠলেন।

বুঝতে দেরী হলো না আমার যে, কালক্ষেপই এই বারেন্দ্র যুগলের একমাত্র উদ্দেশ্য। ওদিকে আইন অমান্য করবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে অস্ত্রহীন অক্ষৌহিণী, একটি মাত্র অঙ্গুলি হেলনে তারা বাগান আক্রমণ করবে অহিংস ভাবে। উত্তেজনা টগবগ করে ফুটছে তপ্ত কটাহে তেলের মতো। ঠিক এই সময় প্রয়োগকর্ত্তাকে কৌশলে যদি অকুস্থল থেকে সরিয়ে রাখতে পারা যায়, তাহলে দপ্ করে জ্বলে-ওঠা আগুন খপ করে নিবেও যেতে পারে, এই এঁদের পরিকল্পনা। কিন্তু কাঁদে গলা বাড়িয়ে দেবার মত নিরীহ গোবেচারা আমি নই। তাই আসল কথাটা এবার নিজেই বলে ফেলতে কসুর করলাম না: শুনুন, গল্প করবার জন্তই যদি আমায় ডেকে থাকেন, তাহলে অন্ত সময় আসবো, আরও বেশীক্ষণ থাকতে পারবো। এখন আমি আর সময় নষ্ট করতে পারছি না। চলি।

বলে উঠতে যেতেই প্রায় হাত ধরে অনুনয়ের স্বরে বললেন হাকিম মৈত্র: আরে বসুন, বসুন দ্বিজেন বাবু! আসল কথাটাই এখনো হয়নি আপনার সঙ্গে। শুনুন। কাল আপনার ভাই রঙ্গলাল এসেছিল আপনার মামলার খবর করতে। বললাম, দাদাকে নিয়ে যাও সামান্ত একটা জামিনের ব্যবস্থা করে। রঙ্গলাল আপনাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু বলতে পারে না, বললো। আমি বললাম তখনই এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে। এল না, বললো, ওর নাকি অনেক কাজ আছে, সময় হবে না। অবশ্য আমি আজও রঙ্গলালকে বলে দিয়েছি আমার সঙ্গে কোর্টে দেখা করতে। তা কী বলবো তাকে?

স্পষ্ট জবাব দিলাম: জামিন তো আমি চাইনি মিঃ মৈত্র! আইন ভঙ্গ করবার আলটিমেটাম দিয়েছিলাম, আপনারা তার পূর্ব্বেই নিয়ে এলেন এখানে। আমার দাবীর তো কোনো ফয়সালা হয়নি, তাই বাইরে গেলে যে আবার আমি কলকাতা রওনা হবো।

হে-হে করে বিশ্রি ভাবে হেসে উঠলেন কামাখ্যা মৈত্র। কিন্তু কথা কইলেন কেরাণী বাবু: আরে মশাই, কেন এমনি মশার কামড় খাবেন বলুন তো! মশারি আছে, টাঙ্গাবেন না। কারণ, আর কারুর মশারি নেই। ঐ ছোটলোক বদমায়েসদের জন্ত এই মমতার কোনো মানে হয়, আপনিই বলুন না। আজ ওরা আপনাকে মাথায় করে নাচছে, কাল বাইরে গিয়ে আপনারই ঘরে সিঁদ কাটতে ওদের এতটুকু চক্ষুলজ্জা হবে না।

জবাব দিলাম না এসব কথার, দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। বললাম: আচ্ছা, চলি তাহলে।

আবার বাধা দিলেন কামাখ্যা: কিন্তু আর আপনাকে চাকরির জন্ত কলকাতায় যেতে হবে না, গভর্ণমেণ্টই আপনার চাকরির ব্যবস্থা করেছেন।

মানে?

মানে, আপনারই জেদ বজায় রয়েছে। গভর্ণমেণ্ট আপনার পুরোনো টাকা মাসিক ভাতা মঞ্জুর করেছেন। And you are the only Detenue interned at home throughout Vikrampore, who is granted a monthly allowance—খুশী হলেন তো?

আমি খুশী হলেও কামাখ্যা মৈত্র যে আদৌ খুশী হওয়া দূরে থাক্, অত্যন্ত অবমানিত বোধ করেছেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গ্র্যাজের এই অহেতুক উদারতায়, তা নিশ্চিত ভাবে বোঝা গেল তাঁর ললাটের কুঞ্চিত রেখায়। মনের ক্রোধ অনেক কষ্টে ঢেকে রাখতে হয়েছে তাঁকে।

খুব অল্প কথায় ক্যামাখ্যার প্রশ্নের জবাব দিলাম: হ্যাঁ, হলাম। কিন্তু সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। আমাদের পিকনিকের রান্নাও এখনো চড়েনি বোধ হয়। সিপাইকে ডাকুন, কেরাণী বাবু, আমি এখন যাবো।

বলে আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করলাম না। বাইরে আসতেই জনৈক প্রহরী আমার সঙ্গ নিল এবং জেলের গেট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। রহমতের নেতৃত্বে গোটা আটেক ফুলকপি তখন তোলা হয়ে গেছে, কিছু টমেটো, ওলকপি আর সের পাঁচেক আলু। আমি জামাটা খুলে ফেলে কোমরে গামছা জড়িয়ে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম।

আশ্চর্য্য ভাবে এই সব উত্তেজনাকর মুহূর্ত্তগুলি কূটনীতিবিদ্ বৃটিশ বা তার প্রতিনিধি ম্যানেজ করে থাকে। বাধা তারা আদৌ দিতে এল না, কারণ বেশ জানে বাধা কেউ মানবে না আর বাধা দিয়ে আটকানোও যাবে না। তাই তারা তাচ্ছিল্য করলো এই অভিযানকে, তারই মধ্য দিয়ে ফুটে উঠলো অভিযানকারীর প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা ও অবাঙ্ময় তিরস্কার! আমরা বাগানের তরকারি সেদিন পেট ভরে শুধু খেলাম না, দিনের শেষে আমাদের আরও গোটাকতক দাবী যোগ দিয়ে আর একখানা আবেদন পত্র পাঠালাম হাকিম সাহেবের কাছে এবং স্পষ্ট ভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলাম, আমাদের দাবী পুরোপুরি পূরণ না হলে দশ দিন পরেই অনশন সুরু করা হবে অহিংস সত্যাগ্রহী হিসেবে।

কিন্তু সে সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অনশন আর সুরু করা সম্ভব হলো না ঐ কামাখ্যা মৈত্রেরই কূটনৈতিক চালে। জামিনে মুক্তি দেবার টোপ তো তিনি ইতিমধ্যে ফেলেই দিয়েছিলেন রঙ্গলালের মারফৎ। রঙ্গলাল কামাখ্যার কাছে খুব মেজাজ দেখিয়ে চলে এলেও বাড়ীতে এসে মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতেই মা তাকে বিশেষ ভাবে পীড়াপীড়ি সুরু করলেন জামিনের ব্যবস্থা করবার জন্ত। রঙ্গলালের সমস্ত যুক্তি মায়ের আবেগ ও উৎকণ্ঠার বন্যায় স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে গেল। মুন্সীগঞ্জ ফিরে এল রঙ্গলাল এবং আমাদের পারিবারিক মোক্তার যতীন চক্রবর্ত্তী তৎক্ষণাৎ জামিনের আবেদন পেশ করলেন হাকিমের দরবারে।

সেদিন আমার মামলার তারিখ ছিল। মামলা যে কী হবে, তা তো জানাই ছিল। যে মাসিক ভাতা নিয়েই এত গণ্ডগোল, আলটিম্যাটাম ও আইন অমান্তের আয়োজন, সেই ভাতাই যখন মঞ্জুর হয়ে গেছে, তখন মামলার উত্তাপও যে অনেকখানি কমে গেছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবুও বৃটিশ ক্রাউনের আত্মম্ভরিতার ইস্পাতে পাছে বিন্দু মাত্রও দাগ লাগে, বুদ্ধির পাশা খেলায় সে একটি দানও হেরে গেছে বলে পাছে কারুর মনে সন্দেহ হয়, তাই বাইরের ঠাট সে যথারীতি বজায় রেখেই চলবে, এ আমার অজানা ছিল না। তাই সেদিনকার মামলার তারিখকে কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়েই আমি আদালতের পুলিশ-অফিসে এসে উপস্থিত হলাম দেহরক্ষিসহ। কিন্তু দেখা গেল, কোর্টে হাজির করবার উৎসাহ যেন এদের একেবারেই নেই। ব্যাপার কি, ঠিক ঠাওর

করতে না পেরে দারোগা বাবুকে ও কোর্ট-ইনসপেক্টরকে জিজ্ঞেস করাতে তাঁরা উত্তরটাকে একেবারে পাশ কাটিয়ে গেলেন। বিকেলের দিকে অকস্মাৎ রঙ্গলাল এসে হাজির। বিস্ময়ের অবধি রইল না।

কি রে, তুই এসেছিস্ যে?

তোমায় নিয়ে যেতে।

নিয়ে যেতে!

হ্যাঁ, নিয়ে যেতে। তোমার জামীন হয়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ হলাম: জামীনের দরখাস্ত করলি কেন আমায় জিজ্ঞেস না করে?

রঙ্গলাল জবাব দিল: কী করি, যাকে বোঝানো গেল না। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে ছেড়েছেন যে, আগে জামীনের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে তার পর তোমার সঙ্গে দেখা করবো, নইলে নাকি রাজী হবে না তুমি জামীনে বাইরে আসতে।

আরো রাগ হলো: যা, দরখাস্তখানা ছিঁড়ে ফেল গে, আমি যাবো না।

রঙ্গলাল বলে উঠলো: বল কি, দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেছে বললাম যে।

কত টাকা?

মাত্র একশো। ইতিমধ্যেই দারওয়াজা অর্থাৎ হাজতের দ্বাররক্ষী সিপাই এসে দরজা খুলে দিল। অর্থাৎ শুধু হুকুম নয়, হুকুম তামিল করা সুরু হয়ে গেছে! বাইরে এলাম। রঙ্গলাল বললো: কামাখ্যা মৈত্র বললেন জেলের মধ্যে নাকি তুমি ভারী গণ্ডগোল সুরু করেছ? Hunger stike করবে বলে নাকি Ordinary কয়েদীর সঙ্গে জোট পাকিয়েছ?

জবাব দিলাম না এ-সব প্রশ্নের।

৩৮

সুবোধ ছেলের মত বাড়ী ফিরে এলেও দুরন্ত রাজবন্দীর মতো আবার ডুবে গেলাম গুপ্ত সমিতির কাজে। মাসিক ভাতায় সুবিধে হলো খানিকটে আর্থিক দিক থেকে। গোটা দুই টিউশনিও নিলাম জোগাড় করে, ফলে মাসিক আয় দাঁড়ালো মোট পঁয়তাল্লিশ টাকা। অর্থাৎ যাকে বলে উপার্জনশীল রাজবন্দী।

যত দূর মনে পড়ে, ২০শে মার্চ্চ ফিরে এলাম বাড়ীতে আর ২৬শে মার্চ্চ আবার তল্লাসী হলো আমাদের বাড়ী। যথারীতি আপত্তিজনক কিছুই না পেয়ে দারোগা যখন তল্লাসী মালের জন্ত নির্দ্দিষ্ট ফরম্‌খানা পূরণ করছিলেন, তখন মৃদু স্বরে জানালেন আমায় যে, রঙ্গলালকে একবার থানায় যেতে হবে। রঙ্গলাল বাড়ীতে ছিল না তখন, কোথায় গেছে তা জানি না বলে দিলাম। কিন্তু তমিজদ্দী চৌকীদার তাকে বাজারে দেখে এসেছে এই একটু আগেই। সুতরাং দুটো সাদা পোষাক-পরা পুলিশ নিয়ে মহা উৎসাহে সে হাঁসাড়াবাজার অভিমুখে যাত্রা করলো। এইবার সে কাজ দেখাবেই!

রঙ্গলাল তখন বিপদভঞ্জনের সঙ্গে বাজারের সওদা খরিদে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় তমিজদ্দী এসে হাজির। সঙ্গী পুলিশদের পোষাক সাদা হলেও আমাদের সাদা চোখেই ধরা পড়তো তারা। সুতরাং ব্যাপারটা অনুধাবন করতে ওদের একটুও বিলম্ব হলো না। তমিজদ্দীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই দু'জনের চোখের কোণে একটা ইসারা খেলে গেল। বিপদভঞ্জন তৎক্ষণাৎ নাটকীয় অভিনয়ের মতো কণ্ঠস্বরে ভাবাবেগের বন্যা বইয়ে দিয়ে বলে উঠলো: দাদা, আবার কত কালের জন্ত চলেছেন আমাদের অসহায় করে, নিঃসম্বল করে, আমাদের অকূল সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে, কে বলবে? যদিও বয়সে আপনি দাদার মতো, তথাপি কাজের মধ্য দিয়ে সত্যিই আপনাকে পেয়েছিলাম আমরা একেবারে একান্ত ভাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। প্রতিদিনকার মেলামেশায় হয়তো কখনো তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, আশা করি, সে জন্ত ক্ষমা করবেন আমাদের ছোট ভাই মনে করে। বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে চলুন, তবু একসঙ্গে বসে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিই আপনাকে।

শেষ দিকে আবেগে বিপদভঞ্জনের কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল! বোধ হয় আর একটু হলেই তার চোখে অশ্রু দেখা দেবে, এমনি অবস্থায় সে রঙ্গলালের হাত ধরে নিয়ে এসে উঠলো মহেন্দ্র ঘোষের মিঠাইয়ের দোকানে। সঙ্গে সঙ্গে এল তমিজদ্দীরাও। দোকানের উত্তর দিকেই খাল আর খালের উত্তরেই শান্তি সোমের বাড়ী। সুতরাং দোকানের পেছন দিকে যেখানে প্রকাণ্ড কড়াইতে রসগোল্লাগুলো সন্তরণ করছিল মনের আনন্দে, সেখানে এসে উপস্থিত হলো দু'জনে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে বললো বিপদভঞ্জন: এইটুকু পারবেন তো সাঁতরে পার হতে? ওপারে উঠে শান্তিদা'র বাড়ীতে লুকিয়ে পড়লে শালা তমিজদ্দীর বা পুলিশের বাবারও ক্ষমতা হবে না—

রঙ্গলাল বললো: যাক্, কয়েকটা রসগোল্লা খাওয়া যাক তো, নইলে দোকানের পেছনে আসা নিয়ে ব্যাটা সন্দেহ করতে পারে।

রসগোল্লা চললো এবং সঙ্গে চললো সুযোগের প্রতীক্ষা। পকেটে টাকা-পয়সা যা ছিল, ইতিমধ্যেই হাত সাফাই করে রঙ্গলাল তা ভরে দিয়েছে বিপদের পকেটে। আয়োজন সম্পূর্ণ, রঙ্গলাল খালে নিঃশব্দে নেমে পড়বে, ঠিক এমন সময় বোধ হয় কিছু একটা সন্দেহ করেই তমিজদ্দী অকস্মাৎ এসে হাজির হলো একেবারে রসগোল্লার কড়াইয়ের পাশে।

প্রমাদ গুণলো ওরা দু'জন। তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি? বিপদ বলে উঠলো: এ কি, এখানে যে চৌকিদার?

সবিনয়ে নিবেদন করলো তমিজদ্দী: না—এমনি। গরম রসগোল্লা কি ভালো লাগবো কর্ত্তা? সেরখানেক লইয়া চলেন, থানায় বইসা খাইবেন 'খনে। আমরাও পামু দুই-চাইরডা—

আর রসগোল্লা! সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। রসগোল্লা বিপদের কাছে একেবারে নীরস ময়দার গোলা মনে হতে লাগলো।

রঙ্গলালকে নিয়ে যাবার পর দু'-এক দিনের মধ্যেই সংবাদ পেলাম, সেরাজদীঘা গ্রামে আমাদেরই জনৈক সদস্যের বাড়ী ঐ দিনই তল্লাসী করে কিছু রিভলভারের কার্ত্তুজ পাওয়া গেছে এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এতে কিন্তু আদৌ চিন্তিত হলাম না। কাজে নিযুক্ত থাকা কালে কে কোথায় ছিটকে পড়ে গেল, কার ওপর নেমে এল হাজতবাসের দুর্দ্দিন, আই-বি অফিসে কার তলব পড়লো, সে হিসাব রাখতেন তাঁরা, মোটা পরদার অন্ধকার অন্তরালে বসে যাঁরা দলীয় কর্ম্মতৎপরতার কল টিপতেন।

কিন্তু দু'চার দিন পরই মুক্তি পেয়ে ফিরে এল রঙ্গলাল। জানতে পারলাম তার মুখে, অমানুষিক অত্যাচার চলেছিল তার ওপর।

কোনো কৌশল, কোনো ভদ্রতা, কোনোরূপ বিচার না করে নির্ব্বিবাদে হাণ্টার চালিয়েছে তার সর্ব্ব শরীরে আই-বির দারোগা মনোরঞ্জন—মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। নামটি আমার মনে দাগ কেটে বসে গেল পাথরে লেখার মতো।···

এর দু'-এক দিন পরই অকস্মাৎ একদিন বিকেলে মণীন্দ্র হন্তদন্ত হয়ে আমার এখানে এসে হাজির। ব্যাপার কি ?

ব্যাপার সংক্ষেপে সে যা জানালো, তা হচ্ছে এই : নাণ্টু ঘোষ, মতিলাল মল্লিক আর মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় দু'-একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ নারায়ণগঞ্জ শহরের অনতিদূরে দেওভোগ গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় জনকতক মুসলমান কৃষক তাদের সম্মুখীন হয়। কৃষকদের নানারূপ প্রশ্নের স্বাভাবিক জবাব তারা ঠিকই দিয়ে যাচ্ছিল এবং আশা করছিল এবার তারা রেহাই পেয়ে যাবে।

কিন্তু অকস্মাৎ ওদের মধ্যে এক জন বলে উঠলো : সে যাই হোক, আপনাদের আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। চারি দিকে এত ডাকাতি হচ্ছে যে, কে যে ডাকাত নয়, তা বলা শক্ত। কাজে কাজেই চলুন আমাদের বাড়ীতে, সকাল হোক, পাড়ার আরো দশ জন আসুক, তার পর তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনাদের যেতে দোব।

চট্ করে মাথায় রক্ত উঠলো মধুর। কোটর থেকে বেরিয়ে-আসা বড়-বড় তার চক্ষু দুটিতে অগ্নিকণা চকচক করে উঠলো। দেরী করা নিরর্থক মনে করে সে কোটের পকেটে হাত দিতেই নাণ্টু বাধা দিল, মুসলমানকে সম্বোধন করে বললো : শোন ভাই, অনর্থক তোমরা হায়রানি করছো আমাদের। আমাদের শহরে যেতে দাও। ডাকাত বলে বৃথাই সন্দেহ করছো আমাদের।

যুক্তির ধার ধারে না মুসলমান চাষী। সে তার গোঁ ছাড়তে নারাজ আর তার ওপর সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্থনও পেল আশে-পাশে সবার কাছ থেকে। সুতরাং স্পর্দ্ধা তার উত্তাল হয়ে উঠলো। সে হুকুম করে বললো এক জনকে : এই, দাঁড়িয়ে না থেকে এই তিন জনকে ধর, ধরে নিয়ে যা আমার বাড়ী, বৈঠকখানায় আটকে—

কথা তার শেষ হতে পারলো না। অকস্মাৎ গর্জ্জে উঠলো মতিলালের রিভলবার এবং তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হলো সেই মুসলমান বক্তা। বেঁচে আছে কি না বোঝা গেল না। তখনও রাত্রের অন্ধকার একেবারে কেটে যায়নি। মধুও গুলী চালালো, বোধ হয় তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

তাড়া করলো ওরা এদের তিন জনকে। ছুটে পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মতিলাল। ধরা পড়লো চাষীদের হাতে। অবশিষ্ট দু'জনের জন্ম আর ততটা উৎসাহ নেই ওদের। মতিলালকেই সবাই মিলে ধরে নিয়ে গেল।

ছুটে পালাতে গিয়ে নাণ্টু তার চশমা হারিয়ে এসেছে। কোথায় পড়ে গেছে। আর পশ্চাদ্ধাবনরত চাষীরা যে ইষ্টক-বৃষ্টি করছিল, তার একটি এসে পড়েছে একেবারে নাণ্টুর চোখের ওপর। মণীন্দ্র বললো : নাণ্টুদা'র চোখটা লাল হয়ে ভয়ানক ভাবে ফুলে গেছে। আদৌ ভালো হবে কি না কে জানে! আর চশমা তাকে জোগাড় করে দিতে হবেই দু'-এক দিনের মধ্যেই। নইলে, সর্ব্বদাই যে পুরু কাচের চশমা ব্যবহার করতো, তাকে চশমাহীন অবস্থায় দেখলে এবং চোখে আঘাত লেগেছে দেখতে পেলে লোকের মনে নানা প্রশ্ন জাগতে পারে।

খাল সাঁতরে নাণ্টু আর মধু এসে উঠেছে মণীন্দ্রের বাড়ীতে। দু'-চার দিনের জন্ম ওদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে। দেওভোগের উত্তেজনা না কমে যাওয়া পর্য্যন্ত এবং এর জের কত দূর যায়, তা না দেখে তো আর এরা দু'জন প্রকাশ্যে বার হতে পারে না! নাণ্ট মণীন্দ্রের ওখানেই থাকবে, কারণ সেন্নাজদীঘাতেই এক জন চশমা-বিক্রেতা আছে, যার কাছ থেকে সে চশমা নিতে পারবে বাড়ীতে ডাকিয়ে এনে। শুধু মধুর একটা থাকবার ব্যবস্থা—

তৎক্ষণাৎ বললাম : আমাদের বাড়ীতে পৌছে দিয়ে যাও।

বিস্মিত মণীন্দ্র প্রশ্ন করলো : আপনার এখানে ?

হেসে জবাব দিলাম : তাই তো ভালো। সব চাইতে সেফ। দারোগারা এসে দেখে যায় শুধু আমায়, ভেতরে কোনো পলাতক আসামী থাকতে পারে এ তারা ধারণাও করতে পারে না। শুধু তল্লাসী। তা সে সময় ওকে পেছন দিক দিয়ে সরিয়ে ফেলা যাবে। যাও, মধুকে নিয়ে এসো এখানে।

মতিলালের জন্ম মণীন্দ্রের মন খচ-খচ করছিল, তা বুঝতে পারলাম। সে বললো : কিন্তু মতির কী দশা হলো, কে জানে! বি-ভির আর একটি কর্ম্মীকে বোধ হয় হারাতে হলো।

দৃঢ়স্বরে বললাম : এই পথটাই এমনি মণীন্দ্র যে, দেনা-পাওনার হিসেব করে এতে চলা যায় না। পাওনার ঘরে যখন শূন্য, একেবারে শূন্য থাকে, তখন দেনার ঘর তুলতে হয় কাঁপিয়ে। খালি দিয়েই যেতে হয়। যা দিয়েছ, যা দিচ্ছ, যা দেবে, তারও কোনো হিসেব থাকে না। নিশিদিন শুধু দিয়েই যেতে হয় তিলে তিলে, আপনাকে থইয়ে, দুমড়ে, মুচড়ে একেবারে নিঃশেষ করে। পাওনার সংবাদ নিয়ে তো আর বিপ্লবের পথে পা বাড়াওনি মণীন্দ্র। এটা ব্যবসা নয় যে, লাভের অঙ্কটার একটা হদিস নিতে হবে। একে বলে নিছক আত্মবলিদান। দেশের জন্ম জীবন বিসর্জ্জন।···তুমি যাও, আর দেরী করো না। সন্ধ্যের পরই মধুকে এনে পৌছে দিয়ে যাবে।

মণীন্দ্রের আশঙ্কা মিথ্যে হয়নি। পরে স্পেশাল ট্রাইবিউনালে মতির বিচার হয় এবং তার প্রতি ফাঁসীর আদেশ হয়।

একদিন আমিও গেলাম তাজপুরে মণীন্দ্রের বাড়ীতে গভীর রাত্রে। নাণ্টুর চোখ তখন অনেকটা ভালো হয়ে গেছে, চসমাও একটা নেয়া হয়েছে। মতির জন্ম গভীর দুঃখ প্রকাশ করলো নাণ্টু। দেওভোগের ঘটনার পরদিনই ঢাকা শহরে অনেকগুলো বাড়ীতে তল্লাসী হয় এবং হরিপদদের ওখানে পাওয়া যায় একটি আটঘরা অটোমেটিক পিস্তল ও পাঁচটি তাজা কার্ত্তুজ। তবুও সেখানকার ঢেউ ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ রইলো, বিক্রমপুরের দিকে আর এলো না দেখে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এইখানেই দার্জ্জিলিং শহরে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর এবং জবরদস্ত গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনকে হত্যা করবার জন্ম বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স যে পরিকল্পনা করেছে, সে সম্বন্ধে নাণ্টুর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। পরিকল্পনার মূলে যিনি ছিলেন, তিনি আর কেউ নন, বহরমপুর বন্দীশিবিরের সেই যতীশ গুহ, যিনি অকস্মাৎ সবার আগেই সর্ত্তহীন মুক্তি পেয়ে আমাদের ঠাট্টা করে একখানা দশ টাকার নোট দেখিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখনই উল্লেখ করেছি যে, তাঁকে মুক্তি দিয়ে সরকারী বুদ্ধি বিভাগ কী নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেছিল, ক্রমশঃ তা জানা যাবে। যে

নীতির বশবর্ত্তী হয়ে ওরা আমায় স্বগৃহে অন্তরীণ করেছিল, ঠিক সেই ভ্রান্ত নীতির ফলেই যতীশ বাবুকে ওরা বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেয়। তেমনি ভাবে কামাখ্যা রায়কেও। এঁদের সঙ্গে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের প্রকাণ্ড সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হলেই যে আই-বির উদ্দেশ্য সফল হয়, তা জানতো বি-ভির কর্ম্মীরা। তাই খিড়কি দ্বার দিয়ে চলতো আনাগোনা, গভীর নিশীথে চলতো সলা-পরামর্শ।···

নান্টু মোটামুটি জানালো যতীশ গুহের পরিকল্পনা। দার্জ্জিলিং শহরে পৌঁছে ছেলেরা কোথায় থাকবে, কী ভাবে থাকবে এবং কী ভাবে লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে গভর্ণর যখন ঘোড়দৌড় দর্শনে মত্ত থাকবেন, তখন ভবানী ও রবী···সবই বললো নান্টু। পরিশেষে life for life-এর জন্ম জন-দুই ছেলে পাওয়া যাবে কি না জিজ্ঞেস করলো আমায়। বলে দিলাম বিপদভঞ্জন ও সুবোধের কথা। নান্টু বললো যতীশ বাবুর সঙ্গে আলোচনা করে সে যথাসময়ে জানাবে আমায়।

কিন্তু লেবং-এর ঘটনা বিবৃত করবার পূর্ব্বে সে সময় চট্টগ্রামে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, তার একটুখানি আভাস দেয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

চট্টগ্রামে তখন প্রবল উত্তেজনার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। মাষ্টারদা জেলের অভ্যন্তরে ফাঁসীর প্রতীক্ষা করছেন, তেমনি তারকেশ্বর দস্তিদারও। সারা বাংলার বিপ্লবীদের চোখে নিদ্রা নেই, মুহূর্ত্তের নেই বিরাম। বিশেষ করে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা একেবারে অধীর হয়ে পড়েছেন। ক্রোধের আতিশয্যে তাঁরা নিজেদের হাত কামড়াচ্ছেন। একটা কিছু করতে হবে।···

১৯৩৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর শহরের দেয়ালে দেয়ালে দেখা গেল লাল ইস্তাহার: হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা ঘোষণা করছে যে, আজ এই মুহূর্ত্ত থেকে নর-নারী নির্ব্বিশেষে শহরের সমস্ত ইয়োরোপীয়দের নির্ব্বিচারে হত্যা সুরু হবে। দয়া-দাক্ষিণ্যের আবেদন বা যুক্তির তারা ধার ধারে না।

৭ই জানুয়ারী ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে অগণিত দর্শকের সম্মুখে। খেলা পরিদর্শনে মত্ত সবাই লক্ষ্যই করলো না যে মোটবাহক কুলির ছদ্মবেশে চার জন ভদ্রলোকের ছেলে মাঠে এসে প্রবেশ করলো এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে স্থান গ্রহণ করলো সমবেত ইয়োরোপীয় নর-নারীর ঠিক পশ্চাতে। মাঠের পাশেই একটি উঁচু টিলা, খেলা শেষ হলে ইয়োরোপীয়েরা জড়ো হয়েছেন সেই টিলার ওপর, এমন সময় পুলিশ সুপার টিলার পশ্চাৎ দিকের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন মোটরে। অকস্মাৎ সেই নির্জ্জন রাস্তায় দু'জন ভদ্রলোকের ছেলেকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে দেখে তাঁর সন্দেহ হলো। মোটর থামালেন তিনি এবং দেহরক্ষীকে আদেশ করলেন ওদের দু'জনের দেহতল্লাসীর জন্ম। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। নেমে এলেন তিনি নিজে সশস্ত্র ড্রাইভার সহ ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করবার উদ্দেশ্যে।

তৎক্ষণাৎ এক জন ছেলে তাঁর প্রতি একটি বোমা নিক্ষেপ করলো এবং ভীষণ শব্দে তা বিস্ফোরিত হলো। কিন্তু আহত হলো না কেউ। প্রত্যুত্তরে সশস্ত্র ড্রাইভারের রিভলভারের গুলী ছেলেটির ফুসফুস ফুটো করে দিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তার প্রাণহীন দেহ। ড্রাইভারের আর একটি গুলী পুলিশ সাহেবের হাতে বিদ্ধ হলো। দ্বিতীয় ছেলেটি পলায়নের চেষ্টা করায় সাহেবের দেহরক্ষী তার পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং কিছুতেই তাকে ধরতে না পেরে অবশেষে সে তুলে ধরলো রিভলভার। গুলীবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়লো সে মাটিতে এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হলো।

কিন্তু কুলীর ছদ্মবেশে যারা মাঠে প্রবেশ করেছিল, তারা এই দুর্ঘটনার সংবাদ হয় জানতো না, নয় তো জানবার প্রয়োজন ছিল না তাদের। যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে তারা, তা সম্পূর্ণ করবার জন্ম সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। যদি তাতে দিতে হয় প্রাণ, তবুও। তাই তারা ছুটে এল সেই টিলার সম্মুখে, পর-পর ছয়টি বোমা নিক্ষেপ করলো ইয়োরোপীয় নর-নারীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু হায়, একটিও বিস্ফোরিত হলো না। বেগতিক দেখে অপরে বেল্ট থেকে টেনে বার করলো রিভলভার, দু'বার গুলীবর্ষণ করলো ওদের লক্ষ্য করে, কিন্তু আশ্চর্য্য, একটি গুলীও কাউকে আহত করতে পারলো না। ফলে যা হয়, তাই হলো, ধরা পড়লো সবাই।

ঐ দিনই, ঐ ৭ই জানুয়ারী তারিখেই বিপ্লবীরা হানা দিল গৈরালা গ্রামে নেত্র সেনের বাড়ীতে। এইখানেই ধরা পড়েছিলেন সূর্য্য সেন নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা তা ভোলেনি, ভুলতে পারে না। যে বিশ্বাসহন্তা স্তূপীকৃত রৌপ্য-মুদ্রার বিনিময়ে বিনা দ্বিধায় মাষ্টারদাকে তুলে দিতে পেরেছে ক্যাপ্টেন ওয়ামস্‌লির হাতে, তাকে কি ভুলতে পারে চট্টলের বিপ্লবীরা ?···

নেত্র সেন আহারাদির পর শোবার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময় এল এরা। থানা থেকে বা নিকটস্থ আই-বি শিবির থেকে হয়তো কোনো বার্ত্তাবহ নিয়ে এসেছে জরুরী কোনো সংবাদ। মহা উৎসাহে নেত্র সেন প্রাঙ্গণ পেরিয়ে বাড়ীর বাইরে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো এঁরা তাঁর ওপর—যেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেকড়ে বাঘ মেষশাবকের ওপর। রিভলভার নয়, বোমা নয়, তীক্ষ্ণধার ভোজালির আঘাতে-আঘাতে একেবারে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললো তাঁর দেহ, ভীম পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেললো তাঁর মস্তক। তার পর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে অন্ধকারে জঙ্গলের পথে মিলিয়ে গেল তারা সরীসৃপের মতো।

পরদিনই প্রত্যূষে দেখা গেল বিপ্লবীদের ইস্তাহার চট্টগ্রাম শহরের দেয়ালে দেয়ালে। দেখা গেল কুমিল্লায়, নোয়াখালীতে, চাঁদপুরে। দেখা গেল ঢাকায়, ময়মনসিংহে, মেদিনীপুরে ও মুর্শিদাবাদে, দেখা গেল বাংলার প্রতিটি শহরে সেই একই বিপ্লবী ইস্তাহার। বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল চট্টগ্রাম সেনট্রাল জেলের সুপারিন্টেনডেন্ট, জেলার ও অসংখ্য জেলরক্ষী, যখন দেখা গেল সেই একই ইস্তাহারের একখানি আঁটা রয়েছে রাজবন্দী ইয়ার্ডের দেয়ালে আর মাষ্টারদা'র ফাঁসীর ঘরের বাইরে।

মাষ্টারদাকে বাঁচাবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আইনের রক্তচক্ষু এই মহাবিপ্লবীর অন্তরের পানে ফিরেও চেয়ে দেখেনি, তাঁকে দস্যু, হত্যাকারী নামে অভিহিত করে চরম দণ্ডাদেশ উচ্চারণে এতটুকু কম্পিত হয়নি আইনের কণ্ঠস্বর। মুহূর্ত্তের জন্মও বিজলী চমকের মতো ঝলসে যায়নি তাদের মনে যে নিপীড়িত জনগণের মুক্তি ও শান্তির জন্মই বিংশ শতাব্দীর ক্রুশে আত্মবলিদানে অগ্রসর হয়েছিলেন এই যীশুখৃষ্ট, বিনাশার চ দুষ্কৃতাম্ চক্রহস্তে নেমে

এসেছিলেন এই আধুনিক কালের মুরারি।···অনুগামীরা তাঁর চেষ্টা করেছিল ডিনামাইট দ্বারা জেলের দেয়াল ভেঙে ফেলে দিয়ে তাদের প্রিয় নেতাকে উদ্ধার করতে, পারেনি। ট্রাইবিউনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছিল, সে আপীল প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নানা ভাবে নানা জন চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ফাঁসীর আদেশ মকুব করতে, পারা যায়নি। সর্ব্ব জনের সর্ব্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর পরপারের মহাযাত্রী আত্মনিয়োগ করেছিলেন গীতাপাঠে, ধ্যানে ও প্রাণায়ামে!···

কিন্তু যাদের রেখে গেলেন তিনি পশ্চাতে, ইষ্টমন্ত্র যে তারা কখনো ভোলেনি, ভুলবে না, তারই জলন্ত শপথ তারা শেষ বারের মতো সেঁটে দিয়ে গেছে মাষ্টারদা'র ঘরের দেয়ালে। চিরবিদায় নেবার পূর্ব্বে অন্ততঃ জেনে যাবেন তিনি তাঁর অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে বাংলার বিপ্লবীরা। ঐ ইস্তাহারই তার সুনিশ্চিত স্বাক্ষর!···

৩৯

লেবং-এর স্মরণীয় ঘটনার পূর্ব্বে বাংলা দেশের আরও কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। যাঁরা এই সব কাজে অংশ গ্রহণ করেন বা সরাসরি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'-এক জন ব্যতীত আর কারুরই নাম উল্লেখ করলাম না কেন, আশা করি পাঠকেরা তার কারণ উপলব্ধি করবেন।

জানুয়ারী মাসে বীরভূমে একটি ষড়যন্ত্র মামলা সুরু করা হয়। ফেব্রুয়ারীতে কলকাতায় দু'জন পলাতক রাজবন্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বীরভূমের একটি পরিত্যক্ত চালের কলের মধ্য থেকে একটি পাঁচঘরা রিভলভার ও কয়েকটি তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। বরিশালের ঝালকাটিতে একটি দোকানে পাওয়া যায় গোটাকতক তাজা বোমা, রংপুরের এক জন উকিলের বাড়ী তল্লাসী করে পাওয়া যায় একটি লাইসেন্সবিহীন বন্দুক।

নলডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম ও হিলি ডাকাতির মামলার রায় বেরুবার পরই মার্চ্চ মাসে রংপুর জেলায় বিপ্লবীদের তৎপরতা একটু বেশী দেখা দেয়। শহরের দেয়ালে-দেয়ালে, ল্যাম্প-পোষ্টে ও গাছের গায়ে বৈপ্লবিক ইস্তাহার আঁটা দেখতে পাওয়া যায়। ১৭ই মার্চ্চ জন কয়েক যুবককে রাস্তার মধ্যে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করে দুটি বন্দুক উদ্ধার করা গেলেও যুবকেরা সবাই পালিয়ে যায়। ১৯শে মার্চ্চ কলকাতার সন্নিকটবর্ত্তী আলমবাজারে জনৈক মহিলার গৃহ তল্লাসী করে পুলিশ হস্তগত করে দুটি অটোমেটিক পিস্তল। বরানগরে একটি গৃহসংলগ্ন বাগানে মাটির নীচে একটি সাবানের বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায় একটি রিভলভার, একটি পিস্তল ও অনেকগুলো তাজা কার্ত্তুজ। বরিশালে স্থানীয় কলেজের জনৈক অধ্যাপকের গৃহ ও প্রাঙ্গণ তল্লাসীর ফলে পুলিশ হস্তগত করে অনেকগুলো বোমার খোল, অনেকগুলো তাজা কার্ত্তুজ, দুটো ছোরা, দুটো পিস্তল ও স্তূপীকৃত বিপ্লবী ইস্তাহার।

এপ্রিলের প্রথম দিকেই ঝালিতে জনৈক স্থানীয় জমিদারের গৃহে গ্রেপ্তার হন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর পলাতক আসামী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, বাংলায় দলনির্ব্বিশেষে বিপ্লবীদের কাছে যিনি আজও 'বিপিনদা'। ১৯৩১ সাল থেকেই তিনি গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। ১৬ই এপ্রিল ময়মনসিংহ রেল-ষ্টেশনে বিনা টিকিটে ভ্রমণের অপরাধে দু'জন মুসলমান যুবককে রেলওয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের মালপত্র তল্লাসী করে পাওয়া যায় একটি পাঁচঘরা রিভলভার। সরিষাবাড়ী থানার অন্তর্গত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় তল্লাসী করে পুলিশ হস্তগত করে কতকগুলি রিভলভারের কার্ত্তুজ। ২৮শে এপ্রিল তমলুক থেকে আগত জনৈক যুবককে কলকাতার স্যাণ্ডেল ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার করা হয়, তার সঙ্গে ছিল একটি পাঁচঘরা রিভলভার ও কতকগুলো কার্ত্তুজ।

এ ছাড়া আরও অনেকগুলো ছোটখাটো ঘটনার পর এল স্মরণীয় সেই ৮ই মে, ১৯৩৪ সাল। গ্রীষ্মকাল, বাংলার জবরদস্ত গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন সদলবলে গ্রীষ্মাবাস দার্জ্জিলিং-এ গেছেন। শহরের নীচেই লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ৮ই মে সেখানে ঘোড়দৌড় হচ্ছে। এই সময় দার্জ্জিলিং শহরে প্রায়ই ধনী লোকের আমদানী হয়ে থাকে, বিশেষ করে বাংলার রাজা-মহারাজারা প্রভুভক্তির নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য রাজ্যের হাজারো গুরুতর কাজ ফেলে রেখেই ওপরে উঠে আসেন এবং ঘোরাফেরা করেন বিলিতি গভর্ণরের আশেপাশে যেমন করে রেস্তোরাঁর বয় ঘুর-ঘুর করে ঘুরে বেড়ায় টেবিল থেকে টেবিলে একখানা রূপোর থালা হাতে করে হুকুম তামিল করবার জন্য।

তখন অপরাহ্ণ, দৌড় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গভর্ণরের আসন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে সময়োপযোগী রাজকীয় পোষাক পরিধান করে সমাসীন স্যার জন এণ্ডারসন। Governor's Cup দৌড় হচ্ছে এবার। প্রত্যেকের সর্ব্ব মনোযোগ সেই দিকে। হুজুরের কাপ!···অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ ও দেহরক্ষীর শ্যেন-দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এসে এই রাজা-মহারাজার মাঝে নিঃশব্দে এসে উপবেশন করেছে বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের দু'জন কর্ম্মী—ভবানী চক্রবর্ত্তী ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিধানে চক্‌চকে সাহেবী পোষাক আর গৌরবর্ণ চেহারা, সুতরাং সন্দেহ হলো না কারুরই মনে।

দৌড় শেষ হয়ে গেল। ঘোড়াগুলোকে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে ঘেরা জায়গায়, এবার জিন ও লাগাম খুলে ওদেরকে একটু বিশ্রাম করবার সুযোগ দিতে হবে পায়ে হেঁটে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। প্রত্যেকের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ, যেদিকে চেয়ে আছেন তাদের হুজুর।

ভবানী অনুচ্চ স্বরে বললো: This is the time, let us start. Let both of us go to the front at point-blank range—চল্!

কিন্তু গভর্ণরের সম্মুখে না এসে রবী এল তাঁর দক্ষিণ দিকে এবং এসেই গুলী নিক্ষেপ করলো গভর্ণরের আসনের রেলিংয়ের ওপর হাত রেখে। এক বার, দু'বার, তিন বার, এমন সময় বিহারের বারোয়ারীর জমিদার ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিং ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর, ধরে ফেললেন তাকে। ঠিক সেই সময় পুলিশ সুপার ও দেহরক্ষীদের নিক্ষিপ্ত গুলীও রবীর শরীরে এসে বিদ্ধ হয়েছে। জোর করে তার হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নেয়া হলো।

ভবানী কিন্তু এদিকে ফিরেও চাইলো না। কার্য্য সম্পাদনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে সে, সহকর্ম্মীর দুঃখের দিকে ভ্রূক্ষেপ করবার তিলমাত্র অবসর তার কোথায়? রবীর পশ্চাতে একেবারে সোজা সে সিঁড়ি

বেয়ে উঠে এল গভর্ণরের আসনের সম্মুখে, একেবারে point-blank range থেকে গুলী নিক্ষেপ করলো সে। গভর্ণর রেলিংয়ের নীচে শুয়ে পড়লেন, লাথি খেয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুর যেমন করে পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে কেঁউ-কেঁউ শব্দ করে। প্রথম গুলী ব্যর্থ হওয়ায় ভবানী আবার উঁচিয়ে ধরলো আগ্নেয়াস্ত্র, এমন সময় অকস্মাৎ তাকে পশ্চাৎ থেকে দু'হাতে জাপটে ধরলেন পি-ডবলিউ-ডির ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ট্যাণ্ডি গ্রীন। ভবানীও গ্রেপ্তার হলো।

···তার পর চললো পুলিশের বৈদ্যুতিক অভিযান···ঘিরে ফেলা হলো সমগ্র ঘোড়দৌড়ের মাঠ, দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে ছুটলো পুলিশ, ছুটলো মোটরবাসের ষ্ট্যাণ্ডে, আটক করলো শিলিগুড়িগামী সমস্ত প্রাইভেট মোটর ও ট্যাক্সি এবং লরী, মাঝপথে থামিয়ে ট্রেনের প্রত্যেকটি কামরা তন্ন-তন্ন করে তল্লাসী চললো, পঙ্গপালের মতো ছড়িয়ে পড়লো আই-বি ও পুলিশের দল একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে :···কিন্তু এদের সর্ব্ব সতর্কতা ও প্রহরার চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করে একেবারে দার্জ্জিলিং শহর থেকে ভবানী ও রবীর সহগামী যাঁরা নেমে এলেন কলকাতা শহরে, তাঁদের মধ্যেই ছিলেন বি-ভির বিপ্লবিনী কিশোরী উজ্জ্বলা মজুমদার।

এই মামলার কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরাই জানেন, ক্রমে ক্রমে পুলিশ অনেককেই গ্রেপ্তার করে—মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল চক্রবর্তী, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, নান্টু ঘোষ এবং আরো জন কতক বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য এবং অবশেষে উজ্জ্বলা মজুমদারকেও। মামলার সওয়াল করতে গিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর এই পরিকল্পনার পশ্চাতে যাঁদের বুদ্ধি কাজ করেছে, তাঁদের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন কামাখ্যা রায়ের নাম, যতীশ গুহের নাম। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের এই দু'জনকে অতিবুদ্ধি দেখিয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ করে এবং বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়ে কী মারাত্মক আত্মঘাতী ভুলই না করেছিল তখনকার বাংলার আই-বি, সে সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে তারা উপলব্ধি করলো।

পাবলিক প্রসিকিউটর উজ্জ্বলার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কোমলপ্রাণা নারীও যে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় ও ষড়যন্ত্রকারীদের প্রভাবে কী ভাবে নরহন্ত্রী হয়ে উঠতে পারে, এই কিশোরীই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাক্ষ্য ও দলিল থেকে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, যতীশ গুহের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে নান্টু ঘোষ, মধু তাকে সাহায্য করে দক্ষিণ হস্তের মতো। তার পর যে ক্ষুদ্র দলটি দার্জ্জিলিং যাত্রা করে প্রস্তুত হয়ে, উজ্জ্বলাই ছিল তার নায়িকা। সাধারণের মনে যাতে বিন্দুমাত্রও রাজনৈতিক সন্দেহের উদ্রেক না হয়, সেজন্য আধুনিকা বেশধারিণী এই স্মার্ট কিশোরী কিশোর সহকর্ম্মীদের নিয়ে এসে ওঠে একটি ব্যয়বহুল হোটেলে, সেখানে একই কক্ষে এরা বাস করতো। রাত্রে হোটেলের সবাই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লে এই বিপ্লবিনী নায়িকা দার্জ্জিলিংএর শীতের প্রকোপে পাছে অকেজো হয়ে যায়, তাই রিভলভারের কার্ত্তুজগুলো আগুন জ্বালিয়ে সেঁকে নিত, সহকর্ম্মীদের নির্দেশ দিত কী ভাবে কাজ শেষ করতে হবে।···

লেবং-এর ঘটনার জের আমাদের বাড়ীতেও এসে পড়তে দেরী হলো না। একদিন ভোর না হতেই গোরা সৈন্যের একটি দল সহ প্রায় পঞ্চাশ জন লাল-পাগড়ী পুলিশ এসে আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেললো। শ্রীনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জ তখন কলিমদ্দীন সরকার। কিন্তু তিনি আসেননি, এসেছেন এদের সঙ্গে নতুন এক জন দারোগা, চিনি নে তাঁকে।

জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কোন্ থানার?

ধমক দিয়ে জবাব এল : তা দিয়ে আপনার দরকার কি? এখন যা বলি, তাই করুন।

চুপ করে গেলাম তীক্ষ্ণ মেজাজ দেখে। মনে মনে হাসিও পেল। আই-বি বোধ হয় এদের বুঝিয়েছে যে, লেবং-এ আমিও গিয়েছিলাম। কলিমদ্দীনকে পাঠায়নি, পাছে শ্রীনগর থানার দারোগা তাঁরই এলাকার রাজবন্দী বলে কিছু খাতির করে বসে, তল্লাসীর কড়াকড়ি হ্রাস করে দেয়। তাই পাঠিয়েছে কড়া মেজাজের লোক।

গোরা সৈন্যেরা আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের আম গাছগুলির নীচে অপেক্ষা করছে। তাদের হাতে সামরিক রাইফেল, সঙ্গীন চড়ানো। একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পোষাক পরা। যেন সংগ্রাম করতেই বেরিয়েছে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কঠিনতম শত্রুর সঙ্গে! ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলের ভাঙা-ভাঙা দুর্বোধ্য ইংরেজীতে নিজেদের মধ্যে কথা কইছে, এক বর্ণও তার বোঝা দুষ্কর। ওদের যিনি কমাণ্ডাণ্ট, দেখলাম একটি হ্যাটারের মাথায় আঁটা কেমন-একটা ইস্পাতের পাত প্রসারিত করে নিয়ে দিব্যি তার ওপর বসে 'লাকি ষ্ট্রাইপ' সিগারেট ধরিয়েছেন। তল্লাসীর সঙ্গে যেন এদের সম্পর্ক নেই কিছু।

দারোগা বাবুর বোধ হয় ভালো লাগলো না তা। তাড়াতাড়ি এসে কমাণ্ডাণ্টের কানে কানে কী যেন বলতেই কমাণ্ডাণ্ট অকস্মাৎ সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং সামরিক আদেশ উচ্চারণ করে ওদেরকে আমাদের সমগ্র বাড়ীখানা বেষ্টন করে দাঁড় করিয়ে দিল। বোধ হয় দারোগার ধারণা আমাদের বাড়ীর বোমা ও রিভলভার কারখানার শ্রমিকেরা খিড়কীর দ্বারপথে অথবা টিনের দেয়াল টপকে পালিয়ে যেতে পারে!

তার পর সুরু হলো স্মরণীয় তল্লাসী। সাদা পোষাকে আই-বির যে লোকটি এসেছেন এই অভিযানকারী দলের সঙ্গে, তিনি অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে হস্ত-ইসারায় আমায় একান্তে ডেকে নিয়ে গেলেন। তার পর এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন : কিছু থাকে তো বলুন। আমি ওদেরকে অন্য দিকে তল্লাসী করতে নিয়ে যাই, এই অবসরে সরিয়ে ফেলুন আপনি, নইলে পুকুরেই দিন না ফেলে।

চমকে উঠলাম শুভানুধ্যায়ীর নিঃস্বার্থ উপদেশের জন্য। চোখের দৃষ্টিতে যেন দেখতে পেলাম গোখরো সাপের হাসি! কিন্তু অভিনয়ে আমিও বড় কম যাই না। বললাম : কিছু নেই।

লোকটা কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে দিল, বললো : মশাই, সরকারী নিমক খেয়েছি, বলা নিষেধ; তবুও বলে দিচ্ছি আপনাকে ওরা সবাই সব কথা বলে দিয়েছে, লেবং যাত্রার পূর্ব্বে ওরা সবাই নাকি আপনার এখানে এসে দিন কতক থেকে রিভলভারের নিশানা অভ্যাস করে গেছে আড়িয়ল বিলে। গ্রেপ্তার আপনাকে করবেই, কিন্তু তার ওপর আগ্নেয়াস্ত্র যদি কিছু পেয়ে যায়, তাহলে আর রক্ষা করতে

পারবো না আপনাকে ফাঁসী থেকে। একেবারে গভর্ণর কি না, তাও আবার যে-সে নয়, স্বয়ং জন এ্যাণ্ডারসন!

ফস্ করে প্রশ্ন করে বসলাম: আমায় রক্ষা করবার জন্য আপনার এত উদ্বেগ কেন জানতে পারি কি?

লোকটি জবাব দিল: ঐ তো, বিশ্বাস হবে না আপনাদের, ভাববেন যা বলি আমরা, সবই মিছে আর লোকের মন্দ ছাড়া ভালো করি নে কখনও।—বিশ্বাস করুন দ্বিজেন বাবু, একেবারে ধর্ম্মতঃ সত্যি কথা বলছি, আপনাকে দেখতে ঠিক আমার ছোট ভাইয়ের মতো। সেদিন মারা গেছে সে। ঠিক আপনারই মতো মাথায় ঘন চুল আর চসমা। আপনারই মতো স্বাস্থ্য।···দীর্ঘনিশ্বাস একটি ত্যাগ করে তার পর লোকটি বললো: তাই চাকরির মায়া ত্যাগ করে বলে দিলাম আপনাকে, যদি থাকে কিছু, বলুন, আমি নিজেই সরিয়ে ফেলছি। আমায় ওরা সন্দেহ করবে না।

আবেদনের ভাষা ও তা উচ্চারণের কৌশল এত নিখুঁত যে, সত্যিই কেউ সন্দেহ করবে না সহজে এবং সরল বিশ্বাসে গলা বাড়িয়ে দেবে এই ধারালো গিলোটিনে। আমি কিন্তু অতটা সরল নই।··· তাই অর্থবোধক হাসিতে মুখখানা ভরে ফেলে শুধু বললাম: কিছুই নেই।

ওদিকে পুরো দমে চলছে তল্লাসী। জনকতক পুলিশ দক্ষিণের কোঠায় ঢুকে পড়েছে। পুব দিকের দেয়ালে যে মোটা ফাটল দেখা দিয়েছে, লাঠি দিয়ে ওরা তার মধ্যেও খুঁচিয়ে দেখছে। বিছানাপত্র টেনে নামিয়েছে মেজের ওপর, তার পর বালিশ ও তোষক মুচড়ে-মুচড়ে দেখছে তুলোর মধ্যে কিছু লুকিয়ে রেখেছি কি না।

মাঝের কোঠায় এক দল খুলে বসেছে সোনা বৌদির গোপনীয় পত্রের তাড়া। সোনাদা'র লেখা। ওতে উপভোগ্য রস কিছু না থাকলেও ব্যাটারা দিব্যি পড়ে চলেছে একখানার পর একখানা।

উত্তরের কোঠায় যারা ঢুকেছে, তারা পড়ে গেছে ফাঁপরে। এই ঘরে আছে গোটা ত্রিশেক ছোট-বড় নানা সাইজের ট্রাঙ্ক, ছোটো বাসন-কোসন ভর্ত্তি কাঠের সিন্দুক, একটি প্রকাণ্ড লোহার জাল দিয়ে ঘেরা আলমারী, চারখানা দেরাজের আর একটি আলমারী, একটি বড় মিট্-সেফ, গোটা কয়েক সুটকেস এবং আরো মালপত্র। মাথার ওপর ঝুলছে কাপড় দিয়ে প্যাক করা গোটা দশেক লেপের বিরাটাকার বাণ্ডিল। হিন্দুস্থানী মগজ এ সব দেখে একেবারে গুলিয়ে গেছে। এ কেয়া তাজ্জব বাত ছায়!···

এর পর একখানা দোতলা টিনের ঘর, তার পর রান্না-ঘর, তার পর দক্ষিণের চারচালা টিনের ঘর···সব শেষে ওরা এল বাড়ীর পুব দিকের পরিত্যক্ত আমাদের শরিক গাঙ্গুলীদের বাড়ীর জঙ্গলে ভরা প্রাঙ্গণে। কোদালি চালাতে লাগলো জন চারেক সিপাই।

এ-সবে আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না, উদ্বেগও ছিল না একবিন্দুও। কারণ সত্যিই সেদিন কিছুই আপত্তিজনক ছিল না আমার ওখানে।

ঘণ্টা চারেক তল্লাসীর পর একেবারে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই দারোগা-পুঙ্গব যখন আবার আমার ঘরের টেবিলে এসে বসে দীর্ঘ তালিকায় ক্রস্ চিহ্ন দিতে লাগলেন, তখন ধীরে জিজ্ঞেস করলাম: পেলেন কিছু?

কী করে পাবো? সরিয়ে ফেললে সব আর পাবো কী করে? ঠাট্টা করছেন বুঝি?

বললাম: না, না, আপনার খুব পরিশ্রম হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। চা খাবেন? এই রঙ্গলাল, একটু চা করতে বল্ রে হেনাকে। দারোগা বাবুকে—

Shut up—গর্জ্জন করে উঠলো দারোগা, বললো: চালাকির আর জায়গা পাও না, না?—বলেই সে ঘরের বাইরে চলে এল। আমিও বাইরে এলাম সঙ্গে সঙ্গে। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম: কী বলছিস্?

দারোগা বললো: যাও, ঘর থেকে গোটা কতক চেয়ার বাইরে এনে দাও, এঁরা সব বসবেন।—বলে সে ঐ গোরা সৈন্যদের দেখিয়ে দিল। ওরা সবাই আবার এসে জড়ো হয়েছে এক জায়গায়।

বললাম: সে জন্য গভর্ণমেণ্ট তোকেই তো চাকর রেখেছে। শুধু বসতে দিবি নয়, ওদের জুতোয় কালি লাগিয়ে ব্রাস করে দিবি। ব্যাটা ছোটলোক কোথাকার!

Shut up।—আবার গর্জ্জন করে উঠলো দারোগা।

সহ্য হলো না আর। অত্যন্ত উত্তেজনার ক্ষেত্রে আমার মাথা ভারী ঠাণ্ডা থাকে বলে সুনাম ছিল আমার। কিন্তু কেন জানি নে, আজ সুরু থেকেই এই দারোগাকে সহ্য করতে পারছিলাম না; এইবার তা চরমে উঠলো। কসে এক লাথি মেরে দিলাম দারোগার তলপেটে।

ছুটে এল লাল-পাগড়ীর দল, ছুটে এল সাদা পোষাক-পরিহিত আই-বির লোক, ছুটে এল গোরা সৈন্যের কমাণ্ডাণ্ট, ছুটে এলেন বাবা ও মা ও বোন হেনা, সংবাদ পেয়ে ছুটে এল পাড়া-পড়শী, কাকা ও কাকীমারা, এমন কি, রেণুও। সংজ্ঞাহারা ধরাশায়ী দারোগাকে সবাই ঘিরে দাঁড়ালো। মারাত্মক কাণ্ড একটা কিছু ঘটবেই!

আমি শুধু স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে ধীর ভাবে বললাম রঙ্গলালকে: এক ঘটি জল নিয়ে আয় আর একখানা পাখা।···

[ক্রমশঃ।

জিজিয়া কর কি?

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, খলিফ ওমার মুসলমান ব্যতীত অন্য সকল জাতির জন্য এই কর ধার্য্য করেন। উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের জন্য এই কর ৪৮ দর্হাম, মধ্যবিত্তগণের জন্য ২৪ দর্হাম এবং দরিদ্রদের জন্য ১২ দর্হাম ধার্য্য ছিল।

কঠোপনিষদ

চিত্রিতা দেবী

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌ শাখ এষোঽশ্বত্থঃ
সনাতনঃ
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম
তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে
তদু নাত্যেতি কশ্চন
এতদ্বৈতৎ। ১

অনাদি অসীম এ জগৎসংসার,
যেন প্রকাণ্ড বৃক্ষ।
সেই সনাতন বৃক্ষের মূল
ঊর্দ্ধে প্রোথিত আছে।
কোটি শাখা তার নিম্নে ঝুলিয়া রয়।
সবার অতীত সেই মূলই জেনো
এই ত্রিলোকের আশ্রয়।
সেই তো শুভ্র, সেই তো ব্রহ্ম,
অবিনাশী সেই আত্মা,
সেই নাচিকেত প্রশ্ন। ১

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং
প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্‌
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য
এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। ২

চিরচঞ্চল এই বিশ্বের বস্তুপুঞ্জরাশি,
নিঃসৃত তাঁহা হতে, তাঁহারি মাঝারে,
চিরকাল ধরে, কাঁপিছে অসীম সুখে,
তিনিই আবার বজ্রসদৃশ মহাভয়ানক-রূপে,
কভু হন প্রতিভাত,
যারা তাঁরে জানে তারা লভে সুখ,
লভে তারা অমৃত। ২

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।৩

তাঁহারি নিয়মশৃঙ্খলাবশে,
অগ্নি জ্বলিছে,
সূর্য্য ঢালিছে তাপ।
তাঁরি ভয়ে ভয়ে ইন্দ্র ও বায়ু করে
আপনার কাজ
তাঁহারি আদেশে মৃত্যু ফিরিছে,
সৃষ্টির পিছে পিছে। ৩

ইহ চেদশকদ্‌বোদ্ধুং প্রাক্‌ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে।৪

এই জন্মেই যদি কেউ লভে সেই বিশ্বের জ্ঞান,
তবেই মুক্তি তার।
অজ্ঞানে-ভরা অন্ধ চিত্তে, দেহের
মৃত্যু হলে,
বারে বারে তারে দেহ ধরিয়া,
এই সংসার-মাঝে,
জন্মে জন্মে কেবলি মরিতে হয়। ৪

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা
পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব * ব্রহ্মলোকে। ৫

দর্পণে যথা লোকে দেখে রূপ,
আর শুভবুদ্ধিতে আত্মা,
জলেতে যেমন আবছায়াময়,
স্বপ্নের ঘোরে, সকলি যেমন মিথ্যা,
পিতৃলোকেও তেমনি দেখিবে তাঁরে।
আলো ও ছায়ার মত বিবিক্ত স্বচ্ছ, শুদ্ধ জ্ঞানে,
ব্রহ্মের মাঝে, দেখিবে তাঁহারে
আর পাবে এ জীবনে। ৫

---

* দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি এই জীবনের ধ্যানতপস্যাসংস্কৃত চিত্তে আত্মার আত্মদর্শন সম্ভব। গন্ধর্ব এবং পিতৃলোকেও এমন ভাবে আত্মদর্শন করা যায় না। সেখানে সমস্তই অস্পষ্ট ছায়াময়। কেবল মাত্র ব্রহ্মলোকে, অন্ধকার ও আলোকের মত আত্মার এই দুই বিলক্ষণ রূপ পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি সহজ নয়। এই মনুষ্যজন্মও অতি দুর্লভ। কারণ, একমাত্র ব্রহ্মলোকে এবং এই জন্মেই ব্রহ্মোপলব্ধি অথবা আত্মদর্শন সাধনার দ্বারা সম্ভব করা যায়।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬

আত্মা হইতে নিঃসৃত এই যত আছে ইন্দ্রিয়,
সে নহে আত্মরূপ।
খণ্ডকালের মধ্যে তাহারা,
উদয়-অস্ত জন্ম-মরণশীল।
এই কথা জেনে ধীর হন, শোকমুক্ত ॥ ৬

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ৭

ইন্দ্রিয়দের পারে আছে মন,
মন পার হয়ে সত্ত্ব।
তাহারো ওপারে, বিরাট মহান্‌,
তারো পারে আছে, সে মায়া,
অপ্রকাশ ॥ ৭

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥৮

তারো পরে আছে সে মহা আত্মা,
লিঙ্গবিহীন, কার্য্যকারণহীন,
তাঁহারে জানিলে, এই জীবনেই,
অমৃত লভিয়া, লোকে পায় চিরমুক্তি ॥৮

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৯

এ আত্মা নয় কখনো কাহারো কভু দর্শনসাধ্য।
এ নয় চক্ষুগামী।
(দেহমনোময় অণু-পরমাণু-মাঝে,
যে চেতনা ফেরে 'অহং' আকারে ঘুরে,
সেই তো আত্মা, আপনার জালে,
আপনি রয়েছে ঢাকা)
সে জাল ছিঁড়িয়া তাহার শুদ্ধ রূপ,
যে পায় দেখিতে, আপন শুদ্ধ জ্ঞানে,
ধন্য সে জন, এই জীবনেই,
লভে অনন্ত, লভে অমৃত রূপ ॥৯

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম ॥১০

যে দশায়, মন পার হয়ে যায়,
পাঁচ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান,
বুদ্ধি ছোটে না চঞ্চল হয়ে, নানা বিষয়ের পানে।
শান্ত সে যোগযুক্ত চেতনা,
জীবনের পরাগতি ॥১০

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥১১

চঞ্চল যত ইন্দ্রিয় মন, স্থির হয়ে গিয়ে যবে,
আপন স্বরূপ-মাঝে নিযুক্ত হয়,
বিকারবিহীন শান্ত সে চেতনাকে,
যোগী বলে 'যোগ',
তারো আছে জেনো জন্ম-মৃত্যু-লয়।
যোগ আরম্ভে, প্রথমেই তাই,
প্রমাদশূন্য হয়ো ॥১১

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥১২

বাক্য ও মন, অথবা চক্ষু হতে,
তাঁরে নাহি পাওয়া যায়,
"রয়েছেন তিনি" যোগবিদের,
এই বাণী ছাড়া আর,
জানিব তাঁহারে কিরূপে ॥১২

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ।১৩

একনিষ্ঠায় তুমি আছ এই বাণী
হৃদয়ে গ্রহণ করিলে,
তুমি আমি, এই ভেদহীন; তার
উপাধিবিহীন সত্তা,
যোগীর চিত্তে উদ্ভাসি ওঠে স্বরূপে ।১৩

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ।১৪

যা কিছু কামনা হৃদয়গ্রন্থিময়
জড়ায়ে ধরিছে মানবেরে শতপাকে,
যে পারে তাদের শীর্ণ করিয়া,
জীর্ণ করিয়া দিতে,
মরণধর্মী এই জীবনেই, সে লভে অমৃতফল ।
ক্ষণ দেহমাঝে অনন্ত সেই
ব্রহ্মরে করে ভোগ ।১৪

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্ ।১৫

একে একে যত হৃদয়গ্রন্থি খুলে ফেলে
যদি সব,
আত্মার সেই মুক্ত স্বাধীন অনন্ত সুধামৃত,
আপনি যোগীরে বরিয়া লইবে ধীরে
এই জেনো উপদেশ ।১৫

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিঃ
তাং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং
ধৈর্য্যেন ।
তাং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং
বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ।১৬

সর্বজনের হৃদয়পদ্মে, যে রহে সন্নিবিষ্ট,
অনেক ধৈর্য্য বহু সাধনায় ধীর,
তাহারে আপন শরীর হইতে,
মুঞ্জা ঘাসের শীষের মতন
পৃথক্ করিয়া লন ।
সেই বিবিক্ত শুদ্ধ চেতনই
ব্রহ্মের মহা আনন্দঘন পরমশুভ্র
পরমজ্যোতি রূপ ।১৬

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্
ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্‌বিমৃত্যু
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ।১৭

মৃত্যুকথিত এই পরা জ্ঞান,
এই যোগবিধি লভিয়া,
নচিকেতা হোল কর্মের জাল,
মৃত্যুর পাশ মুক্ত ।
তার মত যদি আরো কেউ কভু
লভে বিশুদ্ধ জ্ঞান ।
তারো তরে রবে চির মুক্তির
চির আনন্দ ফল ।১৭

[ক্রমশঃ।

বিপদে মোরে রক্ষা কর

আপদেও অবিকৃত স্বভাব সাধুর ।
পাবকে পুড়িয়া গন্ধ বিতরে কর্পূর ।
—অজ্ঞাত কবি ।

আপৎ সময়ে সাধু আরো শোভাকর ।
রাহুগ্রস্ত সুধাকর দ্বিগুণ সুন্দর ।
—অজ্ঞাত কবি ।

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

১৩

টেলসন ব্যাঙ্কের বাইরের দরজার কাছে একখানা টুল নিয়ে বসে থাকে জেরেমিয়া। পাশে থাকে তার ছেলে জেরী। অফিসের সময় এই রাস্তায় লোকের ভীড়ের অন্ত থাকে না। বিরাম থাকে না হৈ-চৈ কলরবের।

শুধু সেই অবিরাম জনস্রোত আর ব্যস্ততার মধ্যে টেলসন ব্যাঙ্কের প্রহরী দাঁতে কাঠি গুঁজে চুপচাপ সব লক্ষ্য করে।

এমনি একদিন বসে থাকতে থাকতে বিরাট হৈ-চৈ শুনে জেরেমিয়া উঠে এল। দেখলে একখানা শব-টানা গাড়ীর পিছনে হৈ-হৈ করে লোক ছুটছে। একটা গোলমাল পাকানোর সম্ভাবনায় দোকানদাররা ঝাঁপ নামাচ্ছে ভয়ে-ভয়ে। মারমুখো জনতাকে ভয় করে কিনা সবাই।

সব গণ্ডগোল ছাপিয়ে শুধু দুটো কথা বার বার কানে এল জেরেমিয়ার। স্পাই! স্পাই!

শুনে তার অবধি রক্তে আগুন লাগল। কাছাকাছি একটা লোককে পেয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞেসা করল তাকে—'ব্যাপার কি ভাই? এত হল্লা কিসের?'

—'কে জানে!'

জেরেমিয়া আর এক জনকে জিজ্ঞেসা করল।

উত্তেজনায় লোকটার গলা কাঁপছিল। বললে—'কি ব্যাপার জানি না। এক জন গুপ্তচর মরেছে। তাকে নিয়েই হৈ-চৈ লেগেছে।'

শেষ অবধি ওয়াকিবহাল লোকের কাছে পাকা খবর পেলে জেরেমিয়া।

লোকটার নাম ছিল রজার।

—'স্পাই বুঝি?'

—'সাংঘাতিক, স্পাই।'

—'মরে গেছে?'

আর কে সাড়া দেয় কথার! সমুদ্র-গর্জনের মত জনতা তখন চেঁচাচ্ছে—'টেনে বার কর গাড়ী থেকে। টেনে বার কর।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত জনতা গাড়ী দুটোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যে লোকটা শবযাত্রী সেজে যাচ্ছিল সে ভয়ে চম্পট দিল পাশের গলি দিয়ে।

জনতা মহা আনন্দে লোকটার পোষাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে চারি দিকে ছড়িয়ে দিলে। আশে-পাশে দোকানীরা ভয়ে তাড়াতাড়ি দোকানপাট বন্ধ করে দিতে লাগল। কারণ সে-যুগে এই উচ্ছৃংখল জনতাকে লোকে দুর্দান্ত রাক্ষসের মত ভয় করত। যে-কোন-কিছু করতে তাদের বাধত না। এক দল বললে—'বার কর মড়াটাকে।' আর এক দল বললে—'দূর, চ' না টেনে নিয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে জনা আষ্টেক লোক গাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ল—জনা বারো রইল বাইরে আর ছাদের উপরে যত জন ধরল উঠে পড়ল। এই দলে যোগ দিল জেরেমিয়া।

সরকারের লোক শবযাত্রায় জনতার এই অন্যায় হস্তক্ষেপে মৃদু প্রতিবাদ জানাতে এসেছিল, কিন্তু লোক ক্ষেপে তাকেই নদীর জলে ফেলে দেবার ভয় দেখালে। লোকটিও ভয়ে নিজের পথ দেখল।

গগনবিদারী চীৎকারে প্রাণে আতংক লাগিয়ে মদমত্ত জনতা অগ্রসর হতে লাগল। আর প্রতি পদক্ষেপেই স্ফীত হতে লাগল জনতার কলেবর। শেষ অবধি জনতা জোর করে গিয়ে ঢুকল গীর্জার কবরখানায়।

কিন্তু উচ্ছৃংখল জনতার তৃপ্তি হোল না এটুকুতে। তখন সুরু হোল নিরীহ পথচারীদের উপর হামলা। কত নিরীহ পথচারী যে জনতার হাতে নিগৃহীত হোল তার ইয়ত্তা রইল না। তার পর আমোদের শেষ পরিণতি হোল লুঠতরাজে। দোকান-বাড়ী ভেঙে লুঠপাট করলে জনতা, রাস্তার মোড়ের রেলিং ভেঙে তাই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। হঠাৎ খবর রটে গেল পুলিশ আসছে। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে জনতাও পাতলা হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল। হয়ত সৈন্যরা এসেছিল শেষ পর্যন্ত—হয়ত আসেই নি। কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতার রীতিই এই।

জেরেমিয়া শেষ পর্যায়ে এই উন্মত্ত জনতার দলে ছিল না। জনতা বাইরে গেলে সে একলা কবরখানায় বসে রইল। সেখানকার শান্ত নির্জন পরিবেশের প্রলেপে তার উত্তেজনা ক্রমশঃ প্রশমিত হয়ে এল। তখন ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার আগেই যাতে সেখানে পৌঁছতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কদমে-কদমে পা বাড়ালে। এসে দেখলে, ছেলে নিজের জায়গাটি ছেড়ে যায়নি কোথাও। কেউ তাকে খোঁজও করেনি। ব্যাঙ্ক বন্ধ হলে কেরাণী বাবুরা যে-যার বাড়ী চলে গেলে বাপ ও ছেলে বাড়ীর দিকে রওনা হোল।

রাত্রে খাওয়ার সময় স্ত্রী জিজ্ঞেস করল—'রাত্রে বাইরে যাবে নাকি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, বাবা!'—বায়না ধরল ছেলে।

—'না না—আমি যাচ্ছি মাছ ধরতে। তোর মা জানে। তুই কোথায় যাবি? তুই না ঘুমুলে আমি যাবই না জেরী।'

রাত গভীর হলে জেরী শুতে গেল। তার পর কতক্ষণ জেগে রইল জেরেমিয়া! একটা বাজতে যাত্রার উদ্যোগ করল সে। পকেট থেকে চাবী নিয়ে আলমারী খুললে। একটি থলে, দড়ি, শাবল, শেকল—এই জাতীয় আরো অনেক মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জাম বার করলে। তার পর জিনিষগুলি গুছিয়ে নিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

জেরী এতক্ষণ ঘুমের ভাণ করে জেগে শুয়েছিল। বাপ বের হয়ে যাওয়া মাত্র সেও উঠে পিছু নিল বাপের। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঘর ছেড়ে সিঁড়ি পেরিয়ে সটান রাস্তায় এসে নামল। ফিরে বাড়ী ঢোকার কোন অসুবিধে নেই। নানা ভাড়াটের বাস বাড়ীটিতে। সদর দরজা সারা রাত হাট হয়ে খোলাই থাকে।

বাপ যাতে না দেখতে পায়, ভয়ে-ভয়ে দেয়াল ঘেঁসে পা টিপে-টিপে এগুতে লাগল জেরী। ইতিমধ্যে আর এক জন লোক এসে বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দু'জনে একসঙ্গে আগে-আগে যাচ্ছে।

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস কলিকাতা ১২

আধ ঘণ্টা হাঁটার পর তারা মিটি-মিটি আলো আর পাহারাওয়ালাদের এলাকা ছাড়িয়ে নির্জন রাস্তায় এসে পড়ল। এইখানে তৃতীয় ব্যক্তি যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

চলতে চলতে রাস্তার ধারে এক উঁচু বাঁধের গায়ে এসে গতি রুদ্ধ হোল তাদের। বাঁধের পাড়ে লোহার রেলিং দেওয়া ইটের গাঁথুনি। বাঁধের দীর্ঘ কালো ছায়া পড়েছে রাস্তায়। তারা রাস্তা ছেড়ে একটি কানা-গলিতে ঢুকল। গলির দিকটায় বাঁধের যে অংশ পড়েছে তার উচ্চতা আট কি দশ ফিট হবে। জেরী সবিস্ময়ে দেখল, তার বাবা লোহার গেট টপকে ভিতরে লাফিয়ে পড়ল—তার পর সঙ্গী দু'জনও। তারা মাটিতে পড়ে কয়েক মিনিট নিশ্চল হয়ে রইল—তার পর হামাগুড়ি টেনে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

জেরীও তাদের পদাংক অনুসরণ করল। অগ্রবর্তী দল দীর্ঘ ঘাস ঠেলে গুঁড়ি মেরে চলেছে। এটি গীর্জা-সংলগ্ন কবর-প্রান্তর। গীর্জাটাকে স্তিমিত আলোয় দেখাচ্ছিল বিরাটকায় দৈত্যের মত। জেরীর গা ছম-ছম করতে লাগল। লোক তিন জন খানিকটা ছামা টেনে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর সুরু হোল তাদের কাজ।

প্রথমে খোন্তা, পরে শাবল—দ্রুত-হাতে কাজ করতে লাগল তারা। এই শ্মশান-নিস্তব্ধতায় গীর্জা-ঘড়ির বিশ্রী আওয়াজ শুনে ভয়ে জেরীর চুল খাড়া হয়ে উঠল—ছুট দিল সে সেখান থেকে। কিন্তু তক্ষুনি আবার অদম্য কৌতূহলের তাড়নায় ফিরে আসতে বাধ্য হোল। গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল—তখনও অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছে তারা। স্ক্রু খোলার শব্দ পেল জেরী—ক্রমশঃ মাটি ফাঁক হয়ে গেল—এইবার কফিনের বাক্সের ডালা খুলতে লাগল তার বাবা। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে এত ভয় পেল জেরী যে, আবার সে ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে এবং এক মাইলের আগে আর থামল না। থামল যখন দম নেওয়ার প্রয়োজন হোল। আর মনে হোল, কফিনের লোকটা বুঝি তাকে পিছনে তাড়া করে আসছে। এই প্রবল আতংক পিছে নিয়ে জেরী ছুটতে ছুটতে একেবারে বাড়ী—সিঁড়ি টপকে নিজের ঘরে এসে বিছানায় লাফিয়ে পড়ল। ভয়ে মুখ গুঁজে শুতেই চোখের পাতা সীসের মত ভারী হয়ে এল ঘুমে। তার পর মনে রইল না কিছু।

পরের দিন সকালে খাওয়ার সময় পাতে মাছ পড়ল না। এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলে না জেরী। যথাসময়ে হাত-মুখ ধুয়ে বেশ পরিবর্তন করে বাপ ছেলেকে নিয়ে রোজকার মত কাজে চলল।

১৪

একদিন মদের দোকান খুলছে সকাল সকাল। ভোর ছটার আগেই ভেতরে লোক ভিড় করে। শিক-লাগান জানলার বাইরে থেকে বিবর্ণ চোয়াড়ে লোকগুলো উঁকি-ঝুঁকি মারে।

সবই জমজমাট চলছে। শুধু একটি লোক নেই। সে মালিক। আর এমন সব খদ্দের যে, দোকানে এত ভিড় সত্ত্বেও একটি খদ্দেরও দোকানের মালিকের খবর জিজ্ঞেসা করে না। শুধু তাই কি, একবার তাকিয়েও দেখে না কেউ সেই শূন্য আসনটির দিকে, যেখানে মাদাম ডফার্জ বসে একলা মদ দিচ্ছেন,—গুণে নিচ্ছেন তার পয়সা।

কেমন যেন সব ছাড়া-ছাড়া ভাব। যেন প্রাণ নেই, মন নেই। রাজার গুপ্তচরেরা সর্বত্র নজর রাখে। তারাও মাঝে মাঝে উঁকি মারে। কিন্তু কিছুই যেন ধরতে-ছুঁতে পারে না এই দোকানের। যে যার ইচ্ছা মত মদ খায়—বসে বসে টেবিলে আঁক কাটে, তাসের আড্ডা ঝিমিয়ে থাকে। আর নির্জীবের মত বসে মেয়েটি কেবল জামার হাতা বোনে। আর মাথা নামিয়ে সতর্ক হয়ে কি যেন শোনে।

এমনি করে বেলা গড়িয়ে যায়। দুপুরের দিকে মালিক আর এক জন সঙ্গী নিয়ে এসে দোকানে ঢুকল।

একবার চকিতে সবাই মুখ তুললে। তার পর আবার যে যার ইচ্ছা মত বসে রইল। যারা মুখ তুলেছিল সবাই একবার এদিক-ওদিক চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

—'কেমন আছ ভাই সব? ভাল ত? হাওয়া বড়ই খারাপ পড়েছে।' স্ত্রীর কাছে পরিচয় করিয়ে দিল সঙ্গীর। বললে—'এক গ্লাস মদ দাও ওকে।'

লোকটি জামার ভেতর থেকে একখানা কালো রুটি বার করলে। সেই রুটি চিবুতে চিবুতে মদ খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে দোকানদার বন্ধুকে বললে—'ঘর দেখিয়ে দি, চল! পছন্দ হবে নিশ্চয়ই।'

মদের দোকান থেকে বেরিয়ে উঠোন। উঠোন পেরিয়ে খাড়া সিঁড়িপথে উঠে সেই ছাদ-লাগোয়া ঘর। একদিন এই ঘরেই বসে এক জন বিস্মৃতস্মৃতি বৃদ্ধ জুতো সেলাই করত আপন মনে। ছোট মেয়ের পায়ের জুতো।

আর তিন জন আগে এসেই বসেছিল। এখন সঙ্গীকে নিয়ে এসে ডফার্জ সতর্ক ভাবে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল—'এইবার বল।'

নীল টুপিটা হাতে নিয়ে কপালের ঘাম মুছে লোকটি বললে—'কোথা থেকে সুরু করব?'

—'একেবারে গোড়া থেকে।'

লোকটি শুরু করে তার কাহিনী:

—'গত বছর গরম কালে লোকটাকে আমি মারকুইসের গাড়ীর নীচে শেকলে ঝুলতে দেখেছিলাম। সন্ধ্যে হয়-হয়। সূর্য ডুবু-ডুবু। মারকুইসের গাড়ী পাহাড়ে ঠেলে উঠছিল। আমি হাতের কাজ রেখে সরে দাঁড়াতেই দেখলুম একটা লোক গাড়ীর তলায় শেকলে ঝুলছে।'

—'এর আগে তাকে দেখেছিলে কখনো?'

—'না, না।'

—'এত দিন পরে লোকটাকে চিনতে পারলে কি করে?'

—'তার লম্বা চেহারা দেখে। সেদিনও সন্ধ্যায় মারকুইস জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'কেমন দেখতে দেখ তো।' আমি বলেছিলাম—'ভূতের মত ঢ্যাঙা।'

—'তোমার বলা উচিত ছিল বৈটে।'

—'আমি কি তখন জানতাম স্পাই। আর তখনো তো মারকুইসকে খুন করেনি সে। তেমন কিছু বলেওনি আমাকে। আমিও নিজের কোন পরিচয় দিইনি।'

—'বেশ করেছিলে। তার পর।'

মুখে-চোখে একটা রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করে লোকটি আবার শুরু করল—'সেই থেকে লোকটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কত খোঁজাখুঁজি করেছি। নয়—দশ—এগার মাস কেটে গেল।

'সেদিন আমি পাহাড়ের পথে কাজে ব্যস্ত—সেদিনও সূর্য তেমনি ডুবু-ডুবু। কাজের শেষে গাঁয়ে ফিরে আসার জন্য যন্ত্রপাতি জড় করছিলাম। অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এসেছে। হঠাৎ চোখ তুলে সামনে তাকাতেই দেখি, পাহাড়ের উপর থেকে ছ'জন সৈন্য নেমে আসছে। আর তাদের মাঝখানে তেমনি ঢ্যাঙা একটি লোক। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। আমি এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। কাছ বরাবর আসতেই লোকটাকে চিনতে পারলাম। সেও চিনতে পারলে আমায়।

'আমি যে তাকে চিনি, কিম্বা সে যে আমায় চেনে তেমন ভাব আমরা কেউ-ই দেখাইনি। চোখে-চোখে আমাদের পরিচয় হোল। আমি তাদের পিছু-পিছু যেতে লাগলাম। এমন আঁট করে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল লোকটাকে যে তার হাত দুটো ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছিল। পায়ের কাঠের জুতো-জোড়া একটু বড়—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল সে। সৈন্যরা বন্দুকের গুঁতো মেরে-মেরে তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল তাকে।

'তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারায় পাহাড় থেকে নামেত গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। সৈন্যরা হেসে উঠল—টেনে তুলল তাকে। মুখ দিয়ে তার রক্ত পড়ছিল। সারা মুখ ধুলোয় মাখা হয়ে গেছে। কিন্তু মুখ মোছবার ক্ষমতা নেই। তার দুর্দশায় সৈন্যদের আমোদ দেখে কে! তারা তাকে গাঁয়ে নিয়ে এল—গাঁয়ের লোকেরা ছুটে দেখতে এল তাকে। তার পর জেলখানায় নিয়ে গেল তাকে। গাঁয়ের লোকেরা দেখল—জেলের ফটক খুলে গেল। আর সেই রাতের গাঢ় অন্ধকারে কারাগার যেন দৈত্যের মত বিরাট হাঁ করে গিলে ফেলল তাকে।'

এতখানি হাঁ করে লোকটা আবার শব্দ করে মুখ বন্ধ করলে। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে সে।

—'গাঁয়ের লোকেরা ফিরে গেল। সেখান থেকে ফিরে সব জমায়েত হোল ঝরণার ধারে। কানাকানি হতে লাগল কত রকম। তার পর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সারা গাঁ। জেলের লোহার গারদের আড়ালে তালাবন্ধ মানুষটার কথা দুঃস্বপ্ন হয়ে রইল সারা রাতের ঘুমে। জেলে যে একবার ঢোকে, জীবন্ত আর সে কখনো ফেরে না। পরের দিন সকালে রুটি খেয়ে যন্ত্রপাতি কাঁধে করে কাজে যাওয়ার আগে জেলের চার পাশটা একবার ঘুরে দেখে আসতে গেলাম। দেখলাম, ঐ উঁচুতে লোহার খাঁচায় রক্তাক্ত ধূলিমাখা লোকটা বসে আছে। হাতে তার শেকল। আমার দিকে চেয়ে সে হাত নাড়তে লাগল। তাকে ডাকতেও সাহস হোল না আমার।'

গুফর্জ আর বাকী তিন জন মুখ চাওয়াচায়ি করল। দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে প্রতিহিংসার আগুন।

—'বলে যাও—থেম না'—বললে গুফর্জ।

—'কদিন লোকটা রইল সেই লোহার খাঁচায়। গাঁয়ের লোকেরা চুরি-চামারি করে দেখা-সাক্ষাৎ করত তার সঙ্গে। কিন্তু দূর থেকে। কাছে ঘেঁসত না। দিনের কাজ শেষ হলে ঝরণার ধারে জটলা চলত কিন্তু সবার চোখ-মন পড়ে থাকত সেই বন্দিশালার দিকে। কানাকানি হত, হয়তো বা লোকটাকে ফাঁসীতে লটকাবে না। রাজার কাছে আপীল হয়েছে। মারকুইসের গাড়ীর নীচে পড়ে রাস্তায় ছেলে মরে যেতে লোকটি রাগে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই সে খুন করেছে। রাজার কাছে আপীল হয়েছে শুনেছি। সত্যি কি না জানি না।'

—'সে কৃতিত্ব কার জান? ঘোড়ার লাথি আর গাড়োয়ানের চাবুক খেয়ে গুফর্জ সেই আপীল পৌঁছে দিয়েছে স্বয়ং রাজার হাতে।'

—'ও কথা থাক। তুমি বল তোমার গল্প।'

—'মারকুইস ছিলেন জমিদার। প্রজাদের মা-বাপ। তাদের মনিব। তাকে যে খুন করেছে তার ফাঁসী হবেই হবে। কত গুজব রটল মুখে-মুখে। রবিবার রাত্রে সারা গাঁ যখন ঘুমে অচৈতন্য তখন সৈন্যরা এল। সারা রাত চলল মজুরদের মাটি খোঁড়া—হাতুড়ী পেটা। চলল সৈন্যদের হাসি আর গানের হল্লা। সকালে সবাই দেখলে ঝরণার ধারে মস্ত উঁচু এক ফাঁসী কাঠ তৈরী হয়েছে। গাঁয়ের লোকের কাজে ছেদ পড়ল। সবাই এসে জড় হতে লাগল সেখানে। গোয়াল থেকে গরু বের করলে না কেউ।

'আজ সব ছুটি। তার পর দুপুর বেলা ড্রাম বেজে উঠল। লোহার শেকলে বাঁধা কয়েদীকে নিয়ে এল সৈন্যরা ঘিরে। মুখে একটা কাপড় গোঁজা, যাতে না কথা বলতে পারে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে, যেন হাসছে। ফাঁসীকাঠের মাথায় খুনের ছুরীর ফলাখানা আকাশের দিকে তোলা। সেইখানেই ফাঁসীতে লটকে দিল ওরা লোকটাকে। চল্লিশ ফুট উঁচুতে দেহটা ঝুলতে লাগল ফাঁসীকাঠে। দুলতে লাগল হাওয়ায়।

'সে কি বীভৎস দৃশ্য! শিশুরা আর মেয়েরা জল আনতে যেতে পারে না ঝরণার ধারে। সন্ধ্যায় কে আসবে সেখানে গল্প করতে! পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ আমি চলে এসেছি। যখন আসি তখন সূর্য পাটে বসেছেন। পাহাড় থেকে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখেছিলাম। সেই প্রেত-ছায়া দীর্ঘ হয়ে গীর্জার চূড়া ঢেকে ফেলেছে। ঢেকে ফেলেছে জেলখানা। সারা পৃথিবীর গায়ে যেন লেপটে গেছে। এক রাত আধ দিন একলা হেঁটেছি। তার পর এই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গেও বাকিটা দিন আর পুরো একটি রাত কখনো ঘোড়ায়, কখনো হেঁটে এসেছি।'

অনেকক্ষণ কেউ-ই কথা কইলে না। অবশেষে গুফর্জ বললে, —'একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও না ভাই। আমরা দুটো কথা কয়ে নি।'

—'তাতে কি হয়েছে। এই আমি যাচ্ছি।'—ঘরের বাইরে গেল লোকটি।

—'তোমার কি মত? খাতায় নাম লেখাবে নাকি?'

—'অর্থাৎ মরবার জন্য প্রস্তুত হতে বলছ?'

—'বরং মাদামের ওপর ভার দাও।'

সবাই সায় দিল এ প্রস্তাবে।

—'চাষাটাকে কি এখনই ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে? লোকটি কিন্তু ভারী সরল। একটু বিপজ্জনক নয় কি?'

—'ও কিছুই জানে না'—গুফর্জ বললে—'আমি ওর ভার নিচ্ছি। থাকবে আমার কাছে। তার পর গ্রামে পাঠিয়ে দেব। ও রাজা-রাণীকে দেখতে চায়। দেখুক না রবিবারে!'

—'সে কি? রাজা-রাণীকে দেখলে বিগড়ে যাবে না তো?'

—'দুধের তেষ্টা জাগাতে হলে বেড়ালকে দুধ দেখাতে হবে।

শিকার না চিনলে কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কুকুর। কাকে টুকরো টুকরো করবে রাগে?'

লোকটি সিঁড়িতে বসে ঢুলছিল। তাকে বিছানায় শুয়ে আরাম করতে বলে নীচে নেমে গেল সবাই।

১৫

রবিবারে জ্যাকুজকে রাজা-রাণী দেখিয়ে খুশী-মনে তাকে বিদায় দিলে স্তফর্জ। তার পর স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ী করে ফিরলে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা হয়ে এসেছে। সেই অন্ধকার দিগ দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে। যে গ্রামে হাঁটা-পথে চলেছে জ্যাকুজ, সেই গ্রামের এক ঝরণার ধারে চল্লিশ ফুট উঁচুতে একটা গলিত মৃতদেহ শূন্যে দুলছে। আর ঝরণার জল পচে যাচ্ছে দুর্গন্ধে। স্পাই বলে সেই মড়ার মুখে নাকি প্রতিহিংসার তৃপ্তি দেখেছে তারা। যেমন দেখেছিল একদিন রাত্রে এক জন দাম্ভিক জমিদারের মুখে মৃত্যু-ভয়ের বীভৎসতা।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ী এসে থামল প্যারীর উপকণ্ঠে। সীমান্তরক্ষীদের আস্তানায় দুলে উঠল লণ্ঠনের সারি। সুরু হোল পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তরের পালা। স্তফর্জের সঙ্গে দু'-এক জন পুলিশের ঘনিষ্ঠ জানা-শোনা। তাদের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা কয়ে আবার গাড়ী নিয়ে এগিয়ে গেল স্তফর্জ বাসার দিকে। গলির মুখে গাড়ী রেখে দু'জনে পায়ে হেঁটে গলির কাদা আর ময়লা ভেঙ্গে আসতে লাগল।

—'পুলিশের সঙ্গে কি কথা হোল?'—স্বামীকে জিজ্ঞেস করলে মাদাম।

বললে—'আমাদের এদিকে নতুন স্পাই এসেছে। আরো নাকি আসবে। তবে এক জনকে চেনে সে।'

—'লোকটি কে?'

—'জাতে ইংরেজ। নাম জন বরসাদ।'

—'চেহারা কেমন?'

—'বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। লম্বায় পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি। চুল কালো—গায়ের রং ময়লা। চেহারাটি মোটামুটি সুন্দর। চোখের মণি কালো—মুখ সরু লম্বা। নাক বঁড়শীর মত বাঁকা—বাঁ দিকে একটু হেলান। অর্থাৎ মুখে শয়তানি ছাপ মাখান।'

—'যা বর্ণনা দিলে কাল দেখলেই চিনতে পারব।' কথা বলতে বলতে তারা এসে মদের দোকানে ঢুকল।

স্তফর্জ মুখে পাইপ পুরে পায়চারী করতে লাগল আর স্ত্রী সারা দিনের রোজগারের হিসেব মেলাতে বসল।

গুমোট গরম রাত। আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ। নোঙরা পরিবেশে ঘরে কেমন একটা ঝাঁঝাল দুর্গন্ধ।

—'তোমায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বিশ্রাম কর'—টাকা রুমালে গিট বাঁধতে বাঁধতে স্বামীর দিকে তাকাল মাদাম।

—'যা ভিড় গেছে আজ সারা দিন। তা ছাড়া রাজ-আনুগত্য দেখে একটু হতাশ হয়েও পড়েছো মনে হচ্ছে।'

—'বিপ্লবের এখনও অনেক দেরী।'

—'তা হোক। চূড়ান্ত হিসেব-নিকেশের পালা সাঙ্গ করতে সময় লাগবে বই কি।'

—'তা বললে কি হয়। বাজ পড়ে মানুষ মরতে কি সময় লাগে?'

—'কিন্তু বাজ বিদ্যুৎগর্ভ হয় কি একদিনে? তারও সময় লাগে। প্রস্তুতি শেষ হলেই সুরু হয় ভূমিকম্পের তাণ্ডব। সমস্ত তচনচ করে দেয় মুহূর্তে। কিন্তু ভূমিকম্প ঘটায় আগে প্রস্তুতি চলে লোক-লোচনের অন্তরালে। কোন-কিছু শোনা যায় না—দেখা যায় না। এইটুকু যা সান্ত্বনা। তোমায় আমি বলছি বিপ্লব আসতে সময় লাগলেও তার উদ্যোগ-আয়োজনের বিরাম নেই। একবার চারি পাশে চেয়ে দেখ। তাকিয়ে দেখ মানুষের মুখে। কি অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে সেখানে। অভাবে-অনাহারে চাবুক-খাওয়া মানুষগুলোর চোখে বিদ্বেষ-বহ্নি ধিকি-ধিকি জ্বলছে নিরন্তর। আগুন কি বেশী দিন ছাই চাপা থাকবে ভাব?'

স্ত্রীর চোখের অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে কি যেন দেখলে স্তফর্জ। বললে—'কিন্তু আমার প্রশ্ন তা নয়। এত দেরী হলে তুমি-আমি কি দেখতে পাব? হয়ত তার আগে আমাদের গায়ে মাটি চাপা পড়বে।'

—'কিন্তু সে বিপ্লবের হোমানলে আমরা আমাদের অর্ঘ্য দিয়েছি। যা কিছু করেছি, জীবনের ধন কিছুই ফেলা যাবে না। আমাদের জীবিতকালেই বিপ্লব আসবে। দেখে যাব বৈ কি সেই মরণ-মহোৎসবে নব সৃষ্টির প্রলয়। কিন্তু আর নয়। রাত হয়েছে, তুমি শুয়ে পড়।'

দুপুর বেলা নিজের জায়গাটিতে বসে মাদাম আপন মনে বুনছিল, এমন সময় নতুন মানুষের ছায়া পড়ল গায়ে। চোখ তুলে তাকাবার আগেই মন বললে, এ নতুন লোক। আজ সকাল থেকে দোকানে খদ্দেরের আনাগোনার বিরাম নেই। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। কেউ মদ খাচ্ছে, কেউ খাচ্ছে না। গুমোট গরমে মাছির উৎপাত বেড়েছে দোকানে।

মুখ তুলে দেখে সেলাই সরিয়ে রাখলে মাদাম। পাশে ছিল একটি গোলাপ। সেটি নিয়ে মাথার চুলে পরাতে পরাতে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে।

কিম্ আশ্চর্যম্। গোলাপ ফুলটি হাতে তুলেছে মাদাম আর দোকানের সরগম যেন যাদুর মত থেমে গেল। দোকান হতে একে একে সবাই সরে পড়তে লাগল।

—'সুন্দর দিন'—বললে আগন্তুক।

—'তা বটে'—জবাব দিলে মাদাম।

তা তো বটেই। সেই হিসেব। মনে মনে মিলিয়ে নিলে সে। বয়স চল্লিশ। পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি লম্বা। কালো চুল। মাটো রং, তবে চেহারাটা সুশ্রী। চোখের মণি কালো! লম্বাটে গাল, ত্যাবড়ানো মুখ। নাকের ডগাটা ঠিক তেমনি বাঁ গালের দিকে একটু বাঁকান। সারা মুখে শয়তানি ছাপ।

—'এক গ্লাস মদ আর একটু ঠাণ্ডা জল।'

—'সানন্দে। তবে ভাই সব একটু সাবধান।'

সৌজন্যে পরিবেশন করলে মাদাম।

—'চমৎকার মদ!'

এই প্রথম তার দোকানের মদের প্রশংসা করলে কেউ। আপন মনে সেলাই করে যাচ্ছে দেখে আগন্তুক একবার তার আঙুলের দিকে তাকিয়ে দেখলে। তার পর তার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সারা ঘরখানির উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

—'চমৎকার হাত আপনার বোনায়।'

—'ঐ আমার অভ্যেস।'

—'প্যাটার্ন'টিও করেছেন ভাল।'

সহাস্য দৃষ্টি তুলে তাকালে মাদাম।

—'জিনিষটা কি হচ্ছে?'

—'বিশেষ কিছু নয়, সময় কাটানোর জন্য করছি।'

দুটি লোক দোকানে এসে মদের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ নতুন লোককে দোকানে দেখে থমকে গেল—বন্ধুর খোঁজে এসেছিল এমনি একটা মিথ্যা ভান করে সরে পড়ল সেখান থেকে। দোকানে যারা ছিল তারাও সরে পড়েছে কখন। স্পাই চোখ-কান খুলে রেখেছে—কিন্তু সন্দেহজনক কোন কিছু নজরে পড়ল না।

—'আপনার স্বামী আছেন?'

—'আছেন।'

—'ছেলেমেয়ে?

—'ছেলেমেয়ে আমার নেই।'

—'ব্যবসা কেমন? দেখে তো ভাল মনে হয় না।'

—'বেচা-কেনা ভারী মন্দা। লোকের হাতে পয়সা নেই।'

—'লোকের কথা আর বলবেন না। ওদের অভাবও যত, ওদের ওপর অত্যাচারও হয় তত। তাই বলছিলেন না আপনি।'

—'ঐ রকমই বলছিলেন বটে আপনি'—ভুল শুধরে দেন মাদাম।

—'মাপ করবেন,—আমিই বলেছি কথাটা। কিন্তু আপনারও কি সেই মত নয়—বলুন?'

—'আমি আর আমার স্বামী'—চড়া-গলায় বললেন মাদাম—'সারা দিন মদের দোকান নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে ওসব কথা ভাববার অবসর পাই না। আমাদের একমাত্র ভাবনা—বাঁচার। সকাল-সন্ধ্যা এই ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। নিজের জ্বালায় মরছি, পাঁচ জনের দিকে তাকাব কখন?'

মাদামের দোকানের ছোট্ট কাউণ্টারে কনুই রেখে মদ খেতে খেতে লোকটা সোৎসাহে গল্প করতে লাগল মাদামের সঙ্গে। যেন কত আত্মীয়, আপন জন।

—'গেসপার্ডের ফাঁসীর ব্যাপারটাই ধরুন। কী মানে হয় তাকে ফাঁসী দেবার।' দরদ যেন কণ্ঠে উথলে উঠল।

—'লোকে যদি খুন করতে ছুরী চালায়, তার ন্যায্য মূল্য তাকে দিতে হবে বই কি'—কাউণ্টারের এ-পাশ থেকে নিরুত্তাপ জবাব দিল মাদাম।—'কত দাম পড়বে সে কাজের তা তো সে জানত। দিলেও তাই।'

—'এ পাড়ায় ওর জন্যে অনেকের মনে বিদ্বেষ জন্মেছে।'—খুব গোপন কথা নিজেদের মধ্যে রাখবার জন্যে লোকটা গলার স্বর নীচু পর্দায় নামিয়ে আনল।

—'তাই নাকি?'

—'আপনি লক্ষ্য করেননি কিছু?'

কিন্তু সে কথার উত্তর না দিয়ে মাদাম বললে—'ঐ আমার স্বামী আসছেন।'

দোকানের মালিক দোকানে ঢুকতেই স্পাই টুপি খুলে তাকে নমস্কার করল, তার পর মুখে হাসি টেনে বললে—'শুভ দিন, জ্যাকুজ।'

ডিফর্জ মাঝপথে থেমে গেল—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

—'শুভ দিন জ্যাকুজ'—স্পাই পুনরাবৃত্তি করলে।

ডিফর্জের তীব্র দৃষ্টির সামনে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

—'আপনি আমাকে অন্য লোক বলে ভুল করেছেন। আমার নাম জ্যাকুজ নয়—আমার নাম ডিফর্জ।'

—'তাই নাকি?'—অপ্রতিভ হলেও লোকটা সামলে নিলে নিজেকে।

—'শুভ দিন'—

—'শুভ দিন'—শুষ্ক কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করলে ডিফর্জ।

—'এতক্ষণ মাদামের সঙ্গে কথা কইছিলাম। হতভাগ্য গেসপার্ডকে নিয়ে এ অঞ্চলে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে।'

—'কই, তেমন কথা আমায় তো কেউ বলেনি'—মাথা ঝাঁকিয়ে বললে ডিফর্জ—'এ রকম ব্যাপার আমার কিছুই জানা নেই।'

এ কথা বলেই ডিফর্জ চলে এল কাউণ্টারের পিছনে। স্ত্রীর চেয়ারের পিছনে হাত রেখে তাকাল সামনের দিকে। যে লোকটিকে গুলী করে মেরে ফেলতে পারলে দু'জনেই খুশী হত, তাকাল দু'জনেই সেই গুপ্তচরের দিকে।

এ রকম পরিস্থিতি অনেক গা-সওয়া হয়ে গেছে তার। পারিপার্শ্বিকের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করে পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে গ্লাসের শেষ মদটুকু নিঃশেষ করে এক চুমুক জল খেয়ে আর

এক গ্লাস মদের অর্ডার দিল। মাদাম মদ ঢেলে দিয়ে আবার সেলাই নিয়ে বসলেন আর সেই সঙ্গে চলল সুরের গুনগুনানি।

—'এ জায়গাটা দেখছি আপনি খুব ভাল করে চেনেন অর্থাৎ আমার চেয়ে বেশী।'—বললে ডফর্জ।

—'একটুও নয়। তবে জানার আশা আছে। এখানকার হতদরিদ্রের সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত কৌতূহলী।'

ডফর্জ অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল।

—'মঁসিয়ে ডফর্জ, কথা বলতে বলতে আপনার নামের সঙ্গে জড়িত একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল।'

—'তাই নাকি ?'

—'হ্যাঁ। ডাঃ ম্যানেট যখন ছাড়া পেলেন তাঁর পুরোনো কর্মচারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব আপনার হাতেই দেওয়া হয়েছিল। আপনিই তাকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই রকম শুনেছি আমি।'

—'ঠিকই শুনেছেন।'

—'ডাঃ ম্যানেটের মেয়ে আপনার কাছেই এসেছিল এবং আপনার হেফাজৎ থেকে সে তার বাপকে নিয়ে গেছে ইংল্যাণ্ডে। সঙ্গে ছিল আর এক জন ভদ্রলোক—খুব ফিটফাট দেখতে—কি নাম যেন—টেলসন ব্যাঙ্কের মিঃ লরি।'

—'যা শুনেছেন সবই সত্যি।'

—'ইংল্যাণ্ডে ডাঃ ম্যানেট আর তার মেয়েকে চিনতাম।'

—'তাই নাকি ?'

—'এখন আর তাদের কোন খবর পান না ?'

—'না।'

মাদাম সেলাই থেকে মুখ তুলে বললে—'আমরা তার কোন খবরই জানি না। তাদের নিরাপদে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছানোর খবর পেয়েছি। তার পর একখানি কি দু'খানি চিঠি। ক্রমশঃ তারা তাদের নিজের পথ বেছে নিয়েছে—আমরা আমাদের। এর পর আমাদের মধ্যে কোন চিঠি-চালাচালি হয়নি।'

—'মেয়েটির শীগ্‌গির বিয়ে হবে।'

—'বিয়ে হবে ?' প্রতিধ্বনি করলো মাদাম—'যেমন রূপবতী মেয়ে, এত দিনে তার বিয়ে হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল।'

—'প্রেমের ব্যাপারে আপনারা ইংরেজরা বড্ড বেশী কুনো।'

—'আমি যে ইংরেজ জানেন দেখছি।'

—'আপনার কথার ধরন দেখেই বুঝেছি। মুখের কথা থেকেই বোঝা যায় কে কোন্ জাতের।'

লোকটি হো-হো করে হেসে উঠল। তার পর মদের গ্লাস নিঃশেষ করে বলল :

—'হ্যাঁ, লুসি ম্যানেটের শীগ্‌গিরই বিয়ে হবে। বিয়ে হবে কোন ইংরেজের সঙ্গে নয়—এক জন ফরাসীর সঙ্গেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর হোল যে, লুসি নাকি মারকুইসের ভাইপোকেই বিয়ে করতে যাচ্ছে। এই মারকুইসের জন্যই গেসপার্ডের ফাঁসী হোল। এখন মারকুইসের ভাইপো ইংল্যাণ্ডে অজ্ঞাতবাস করছেন। এখন তাঁর নাম চার্লস ডার্নে।'

মাদাম অবিচলিত ভাবে বুনে যেতে লাগল। কিন্তু এই তথ্যটুকু তার স্বামীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সুস্পষ্ট। তার এই বিচলিত ভাব যদি স্পাই লক্ষ্য না করে থাকে তো সে স্পাই-ই নয়।

বারসাদ মদের দাম চুকিয়ে বিদায় নিল। লোকটি চলে গেলে স্বামি-স্ত্রী অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইল নিজ নিজ আসনে। যদি বারসাদ আবার ফিরে আসে।

নীচু-গলায় ডফর্জ বললে—'লুসি ম্যানেটের সম্বন্ধে লোকটি যা-যা বলে গেল তা কি সত্যি ?'

—'ও যখন বলেছে খুব সম্ভব মিথ্যা। কিন্তু সত্যিও তো হতে পারে ?'

—'যদি সত্যি হয় ?'

—'যদি সত্যি হয়—যদি বিপ্লব আসে আমাদের জীবিত কালেই, আশা করি, মেয়েটির জন্য ভাগ্য তার স্বামীকে ফ্রান্সের সীমানার বাইরে রাখবে।'

স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে মাদাম উত্তর দিলে এ কথার।

—'ভাগ্য তাকে যেখানে নিয়ে যাবার নিয়ে যাবেই। যা তার কপালে লেখা আছে ঘটবেই। এই তো আমি বুঝি।'

—'সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হোল আমাদের দরদ মেয়েটির জন্য, মেয়েটির বাবার জন্য। যে ঘৃণ্য কুকুরটা এই মাত্র চলে গেল তার মতই অস্পৃশ্য হয়ে রইল ওর স্বামী।'

—'যখন ঘটবে অদ্ভুত ঘটনাই ঘটবে।'

মাদাম তার সেলাই গুটিয়ে নিলে। স্পাইয়ের নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে মদের দোকানের স্বাভাবিক রূপটি ফিরে এল।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা এল—অন্ধকারের পক্ষছায়ায় ঢেকে গেল চারি দিক। বেজে উঠল গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি আর দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল মিলিটারী ড্রামের গর্জন। এমনি আর এক তিমির-ঘন রাত্রি নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। সেদিন গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি কামানের গর্জনে চাপা পড়ে যাবে। একটি হতভাগ্যের আর্ত চীৎকার চাপা দেবার জন্য আজ বাজছে সামরিক দামামা। সে অনাগত রাত্রে শক্তি, সমৃদ্ধি, নবজীবন ও স্বাধীনতার দৃপ্ত ঘোষণা দিগন্ত মুখরিত করে তুলবে। কিন্তু সে রাত্রির আর দেরী কত ? [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

নায়িকা কয় শ্রেণীর ?

নায়িকা ত্রিবিধা। যথা—স্বীয়া, পরকীয়া ও সামান্যবনিতা। স্বামীর প্রতি অনুরক্তার নাম স্বীয়া। স্বীয়া তিন শ্রেণীর—মুগ্ধা, মধ্যা, ও প্রগল্‌ভা। আরও কয়েক শ্রেণীর নায়িকা আছে। যথা—অজ্ঞাতযৌবনা, বিজ্ঞাতযৌবনা, পরকীয়া অনূঢ়ানায়িকা, পরকীয়া ঊঢ়ানায়িকা। পরকীয়া নায়িকার ভেদাভেদ আছে। যথা—বিদগ্ধা, বাগ্বিদগ্ধা, ক্রিয়াবিদগ্ধা, লক্ষিতা, গুপ্তা, কুলটা, মুদিতা, সামান্যবনিতা, বক্রোক্তি-গর্ব্বিতা, রূপগর্ব্বিতা, প্রেমগর্ব্বিতা অবস্থাভেদ। নায়িকাভেদ আরও আছে। যথা—উত্তমা, মধ্যমা, অধমা এবং চণ্ডী, ধীরা, কালপ্রগল্‌ভা এবং বেশ্যা।

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

শীতের অপরাহ্ণ।

মিঠে রোদে পিঠ পেতে বসে দক্ষিণের বারান্দায় কাঁথার গায় সেলাই তুলছিলেন দু'জা—শৈলনন্দিনী আর স্বর্ণময়ী। ঘর-জোড়া কাঁথায় সূক্ষ্মতম ঘন সহস্র সেলাইএর এক-একটি ফুল-লতা-পাতা। তিল পরিমাণ স্থানও বুঝি থাকছে না সেলাই ছাড়া। দেখে বিস্ময় লাগে কি অসীম ধৈর্য্য এই বৃদ্ধ বয়সেও!

পিসিমার মাথা গলে না কোন চিকণ কাজে—বঁটি পেতে তিনি ছাড়াচ্ছিলেন তেঁতুল বীচি।

গুজরাটি এমব্রোয়ডারি করছিল দেয়ালে পিঠ পেতে বসে কমলা। ছেলের দৌরাত্ম্যে দুপুরের ঘুমটি প্রায় তুলেই দিতে হয়েছে ওর। তার পর এক জন কেউ কাছে না থাকলে বার বার সূচে সুতো পরিয়েই বা দেয় কে—মা-জ্যাঠাইমার এ কাজটাও করে দেয় রোজ কমলাই। স্বর্ণময়ীর তিন ছেলের পর এক মেয়ে এই কমলা। অত্যন্ত আদরের—তাই ঘুরে-ফিরে বেশীর ভাগ সময়ই ওর থাকা হয় মার কাছে।

স্বর্ণময়ী মেয়ের দিকে সূচ এগিয়ে ধরতেই কমলা হাতের সেলাই মাটিতে রেখে বললে, 'বাব্বা, এদিকে নাকি চোখে দেখতে পাও না—কিন্তু হাত চলে যেন কলে। এই পরিয়ে দিচ্ছি এই নেই! তোমাদের জন্য আমার কাজ যদি কিছুমাত্র এগুতে পারি!'

পিসিমা বলে উঠলেন, 'তিন-তিনটে বৌ। একদিন এসে কাউকে বসতে দেখি নে। দরজা বন্ধ করে শুধু ঘুমের ঘটা! বৌদের কারু ডেকে বসতে বলতে পার না? ও কাজ করছে আর ওকেই বিরক্ত করা!'

পিসিমার কমলার প্রতি সহানুভূতিটা নিতান্তই মৌখিক—উদ্দেশ্য পরোক্ষে বৌদের খেওয়া।

স্বর্ণময়ী মেয়ের হাত থেকে সূচ নিয়ে সুতোর শেষ প্রান্তে গিঁট দিতে দিতে বললেন,—'কমলা রয়েছে ব'লে, নইলে তো রাণী এসে বসে।'

—'ঐ তো এক রাণী। আর দুটি বৌর তো তোমায় পাত্তাও মেলা ভার। মিত্রার দিন কাটে শুয়ে-বসে। এতে শরীর-মনও ভাল থাকে না।' কথার সঙ্গে সঙ্গে পিসিমা তেঁতুল ঠাসেন হাঁড়িতে।

কমলা বলে উঠল—'তা যা বলেছ পিসিমা! খালি শুয়ে-বসে দিন কাটানো কোনো কাজের কথা নয়। আর দুপুরে বসে বসে শাশুড়ীর সূচে সুতো ভরে দিলেই বা স্বাস্থ্য-মনের এমন কি উন্নতি ঘটবে? আমার কিন্তু ইচ্ছে করে ছোট বৌদি পড়ুক। কি বল জ্যাঠাইমা?' কমলা মুখ ফেরাল শৈলনন্দিনীর প্রতি। বললে,—'সেদিন যে তোমার মামাতো বোন হয়—জয়া মেয়েটি এসেছিল—সে তো এম-এ পাশ দিয়ে এলো বিধবা হবার পরই?'

—'হ্যাঁ! আমারও মনে হয়েছিল ঠিক এই কথাটাই, জয়াকে দেখে। পাশ করে এসেছিল প্রণাম করতে। ঘরে বসে না থেকে, মেয়েটা কাজের মতো কাজ করল। অবশ্যি শমিতই জোর করে পড়ার ব্যবস্থা করে, নিজে গিয়ে পড়িয়ে এসেছে। দরকার হলে মিত্রাকেও ওই পড়াবে।'

খুশী হয়ে ওঠেন স্বর্ণময়ী। একান্ত নিবিষ্ট মনে করবার মতো কিছু মিত্রার সামনে ধরে দিতে পারলে তিনিও বুঝি স্বস্তি বোধ করতে পারেন।

কিন্তু হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যায় পিসিমার।—'মেয়ের কথায় মা-জ্যেঠি নেচে উঠলে! আমরা নয় কেউ না। কিন্তু শশীর মতটা তো জানতে হবে?'

—'তুমি নিশ্চিন্ত থাক পিসিমা—এ বুদ্ধিটা তাঁরই। নিজের বলে চালিয়ে বাহাদুরি নিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু চালাকি চলবে তোমার সঙ্গে! বা-ব্বাঃ!' কমলা হাসলো।

পিত্তি জ্বলে উঠল পিসিমার। মুখ বাঁকালেন।—'এত লোক থাকতে তোকে ডেকে বলেছে শশী মিত্রার পড়ার কথা?'

—'বলেছেন—ডেকে নয়, কাছেই ছিলাম। বললেন—'বাতের ব্যথায় একেবারেই কাবু করে ফেলেছে রে, নইলে ছোটমাকে নিয়ে নিজেই উঠে-পড়ে লেগে যেতাম।···ও কি, উঠছ যে! এই না তুমি কিছু তেঁতুল নামিয়েছিলে কাটবে বলে? কাটা হলো না, এমন কি ভীষণ তাড়া, এক্ষুনি খবরটা বড় জ্যাঠাইমাদের কাছে পৌঁছে দেবার? দিও ধীরে-সুস্থে।'

এবার ধমকে উঠলেন মেয়েকে স্বর্ণময়ী—'অযথা কথা বাড়ানো তোমার অত্যন্ত মন্দ স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তুমি ফের—'

—'থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে। এমনি মিন্‌মিনে সাজানো কথার 'তুমি, আপনি' ধমকের শাসন কি না—তাই জিবে লাগাম নেই মেয়ের। এখনও একটা ভাই বেঁচে—তাই আছি। তার পর এ অপমানের রাজত্বে একদিনও নয়। একটা পেট চালিয়ে নিতে পারব কাশীতে রাঁধুনীর কাজ করেও।' বড়-বড় পা ফেলে বারান্দায় হাঁটা দিলেন তিনি।

—'কাজই যদি করতে হয়, রাঁধুনীর কাজের চাইতে কেউ উপযুক্ত হোক এ পছন্দ নয় তোমার—না পিসিমা?'

পিসিমার কানে গিয়ে কথা পৌঁছিল কিনা বোঝা গেল না—ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন স্বর্ণময়ী—'ফের যদি কোন দিন ওঁর মুখে-মুখে কথা বলবে, তবে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

সেলাই-সরঞ্জাম গুটিয়ে তুলতে তুলতে নির্বিকার কণ্ঠে কমলা বললে,—'পিসিমা-টিসিমা জানি নে—কথা মনে এলে, না বলে আমি পারবই না বাপু!'

বিকেলের দিকে ডাক পড়ল মিত্রার শাশুড়ীর ঘরে। মিত্রা এলে স্বর্ণময়ী বললেন—'আমরা মনস্থ করেছি, তুমি আই-এটা পড়। বই তো তুমি পড় খুবই। বাজে বই না পড়ে পাঠ্য-পুস্তক পড়বে এই। কি বল বৌমা, আপত্তি নেই তো?'

বইএর জগতে বাজে বলে বড় কিছু নেই—পড়া মানেই কাজের

পড়া। মনের কথাগুলো অবশ্যি বলে না মিত্রা। বললে—'আপত্তি তো নিশ্চয়ই নেই। বরং বিশেষ উৎসাহই বোধ করছি। কিন্তু কলেজে ভর্তি না হলে বাড়ীতে দেখিয়ে দেবার লোক দরকার হবে।'

—'সে তো নিশ্চয়ই। তোমার জ্যাঠাইমা বলছিলেন শমিত পড়াবে। ওর মামাতো বোনটিকে যত্ন করে পড়িয়ে এম-এ পাশ পর্য্যন্ত করিয়েছে। তোমাকেও দেখাশুনা করবে ওই।'

দিদির আহ্বানে নীচে নেবে এলো শমিত।

এবার বলে নেওয়া যাক্ একটু শমিতের দিদির বাড়ী প্রতিপালিত হওয়ার কারণটা।

বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন শৈলনন্দিনী। হঠাৎ মায়ের মৃত্যু-খবর পেয়ে গিয়ে দেখলেন, অনেক বয়সে সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছিল মায়ের। অশেষ কষ্টে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ করেই চোখ বুজেছেন। যে ছেলে এত আকাঙ্ক্ষার—দেখে যেতে পারেননি সে ছেলের কচি মুখটি পর্য্যন্ত! ফিরে এলেন তিনি মা-মরা ভাইটিকে নিজ সন্তানের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে। পালন করতে লাগলেন আপন বুকের স্তন্যপান করিয়ে। ছেলেমেয়ে তাঁর হলো, কিন্তু রইল না। মৃতবৎসা দিদি অকূল আগ্রহে আঁকড়ে ধরলেন ভাইটিকে সন্তান-বাৎসল্যে। বাপ যে ছেলেকে নিতে না চেয়েছেন তা নয়। তবে সে চাওয়ায় তেমন জোর ছিল না—তিনি বিয়ে করেছিলেন।

আজ আর কারু সে সব বিগত ঘটনা স্মরণেও নেই। শমিত এখন একান্ত ভাবেই একীভূত এ-বাড়ীর ছেলে।

একই কলেজে পড়ে, একই রান্না খেয়ে এবং একই পারিপার্শ্বিকতায় মানুষ হয়েও শশীকান্তের প্রভাবেই হোক বা জন্মের গঠন-বৈচিত্র্যেই হোক, ওর স্বভাবটা নয় বাড়ীর অপর ছেলেদের মত। থাকে তেতলার একটি মাত্র ঘরে; নির্জন—একা। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কের আদান-প্রদানটা সাংসারিক দায়-দায়িত্বে না জড়িয়ে—কলহ-বচসার ঝক্কি এড়িয়ে নির্ঝঞ্ঝাট দু'-এক টুকরো কথা, একটু হাসি, কৌতুক—বাস্-এই পর্য্যন্ত। প্রতিদিনের বের হওয়া দেখলে মনে হয়, পৃথিবী ওলট-পালট হলেও বের তাকে হতেই হবে। কিন্তু কিছু দিন বাদেই মাস কেন না অতিবাহিত করল শুধু চতুর্দিকে বই ছড়িয়ে তার ভেতর তন্ময় হয়ে।

যেন গ্রহ-যোগ আছে।

গভীর রাত তার সঙ্গীত-সাধনার সময়। কাজ শেষে ফাটা পায়ের আঙুলে গরম তেল মালিশ করতে করতে দাস-দাসীরাও শোনে মুগ্ধ-বিস্ময়ে। বলে—বাবুর গান শুনে আকাশ থেকে নেবে আসবে এবার সগ্গের পরীরা।

বাড়ীতে ওর বয়সী সবারই গেছে বিয়ে হয়ে—বাদে শমিত। দিদি; শেষে শশীকান্ত নিজেও গেছেন হার মেনে চুপ করে। ক্ষোভের অন্ত নেই শৈলনন্দিনীর—সবার ঘরে আছে বৌ, মেয়ে। তাঁর ঘরে না আছে একটা মেয়ে, না এলো বৌ!

শশীকান্ত মজা দেখেন, 'আছে বুঝি কোথাও মন ঠিক করা।'

—'বেশ তো, সেখানেই করুক।'

—'করবে কি, পাত্রী নির্বাচনে হয়ত কিছু কিন্তু-টিন্তু রয়ে গেছে।'

—'খৃষ্টান, মুসলমান না হলেই হলো।'

—'যদি বিধবা হয়?' হাসেন শশীকান্ত।

আঁৎকে ওঠেন শৈলনন্দিনী—'কি যে বল! মা গো, শুনে বুক কেঁপে ওঠে।···তোমার আপত্যি হবে না বুঝি?'

—'না, কথা মাত্রও নয়।' অত্যন্ত জোরের সঙ্গে মন্তব্য করেন শশীকান্ত। এটা ঠাট্টা নয়, নয় মজা দেখা।

গুম্ মেরে থাকেন শৈলনন্দিনী। মনের ভেতরটা ওঠে সংশয়াকুল হয়ে—জয়া! আপন মামাতো বোন তো নয়। অসীম যত্ন খেয়াল শমিতের ওর প্রতি। স্বামীর ইঙ্গিত কি সেই দিকে?

কিন্তু এ সবই অনুমান মাত্র।

বাড়ীর মেয়ে-বৌরা কারণ জানতে চাইলে শমিত বলে—'শত কারণের কয়টা বলব?'

—'হু'-একটাই শুনি।'

—'এই ধর, সুন্দর হ'লো, নেই বুদ্ধি। রইল বুদ্ধি, নেই সৌন্দর্য্য। আর ঐ দুই থাকল যদি নাই বিত্ত! এই তো এতটি আছ তোমরা। দেখ আমার কথা সত্যি কি না।'

—'তোমার বুঝি চাই একাধারে সব?'

—'হ্যাঁ, বিয়েই করতে পাব একটি, এক আধারে না হয়ে দ্বিতীয় আধারে আমার লাভ?'

—'পাবে মনে হয় না।'

—'যত দিন আশায় থাকা যায়। তার পর অগত্যা···'

বর্তমানে বাইর, বই, গান—এই তার জীবন। মাঝে মাঝে ঝোঁক হয় চাকরী করবার, করতে যায়ও—কিন্তু ছেড়ে এসে হাঁফ ছাড়তে দু'দিনের বেশী বিলম্ব হয় না।

দিদির ডাকে নীচে নেমে এসে দাঁড়ালো শমিত জিজ্ঞাসু মুখে। শুনল একান্ত মনোযোগে মিত্রাকে পড়ানোর কথা। স্বীকার করল বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব। কিন্তু পড়াতে রাজী হলো না নিজে। বললে, 'ভালো প্রফেসর রেখে দেও এক জন। বল ত আমি দিচ্ছি ব্যবস্থা করে।'

শৈলনন্দিনী উঠলেন বিষম রেগে—'তুমি পারবে না কেন তাই শুনি? অনেক কাজ! এও তো একটা কাজই। বাড়ীর ছেলে দেখাশুনা করবে সে হলো এক কথা—না প্রফেসর। কাজের কথা বললেই দূরে সরে থাকার অজুহাত।'

শমিত হাসলো দিদির ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে। বললো, 'বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত ফাঁকিতে প্রশ্রয় দিয়ে-দিয়ে কুড়ের সর্দার বানিয়ে তুলেছ তো তুমিই। এখন চটলে কি হবে? ও-সব মাষ্টারি করা আমার ধাতে নেই।'

'পড়াওনি তুমি জয়াকে নিত্য-দিন গিয়ে? আজকালকার ছেলেদের বাড়ীর কাজ, বাড়ীর লোক—কিছুই ভালো লাগে না। ভালবাসা যত সবই বাইর নিয়ে।'

দিদির কথার সুরটা শমিতের কানে বড় বেসুরো বাজল। আর সে কথা বলবে না, দাঁড়িয়ে থাকবে নীরবে। তার পর চলে যাবে নিজের ঘরে। এ শমিত জানে, তার দিদিও জানেন। এবং শমিত তাই গেল।

দুঃখিত ভাবে স্বর্ণময়ী বললেন—'থাক তবে এখন। এক জনের তো নয়, এত বড় পরিবার প্রফেসর রেখে বৌ পড়াতে আরম্ভ করলে—বহু রকমের কথা উঠবে। এমনিতেই বৌদের জন্ত কথা শুনতে হয় আমায়।'

কথাটা সত্য। শ্বশ্রূদের কাছ থেকে যে অনুদার স্নেহহীন ব্যবহার বধূদের ভাগ্যে জোটে, মিত্রারা তিন জা' সে হিসাবে ভাগ্যবতী। স্বর্ণময়ীর মুখে কোন দিনও কেউ শুনতে পায়নি বৌদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষাক্ত সমালোচনা। আপন সন্তানের মত দোষ-অপরাধ আড়াল করে বলে বেড়ান শুধু গুণগুলো। বধূরাও তাই মুগ্ধ অনুগত।

স্বর্ণময়ীর আদর্শটা শাশুড়ীদের মুখের উপর শুনিয়ে ছাড়ে অন্যান্য ঘরের বৌরা। জা'য়েরা গালাগাল দেয় বোবা তোবামুদে বলে। প্রফেসর রেখে পড়াতে ভয় পাবেন বৈ কী তিনি।

শমিতের এমনি স্পষ্ট খোলাখুলি প্রত্যাখ্যানে মিত্রার চোখ দুটো জ্বলে উঠল অন্ধকার ঘরে বিড়ালের চোখের মত। ও সামনে দাঁড়িয়ে—চক্ষুলজ্জার বাঁধটুকুও মানতে নেই—এমন গর্বিত অস্বীকৃতি!

মনের অদমনীয় উত্তেজনায় কিছুক্ষণ বাদে ঢুকলো এসে মিত্রা শমিতের ঘরে। কথাবার্তাটা শমিত বলে কিছুটা কাটা-কাটাই। তাতে কাটা কথার টুকরোর সঙ্গে প্রায় সময় কাঁটাও থাকে। তাই ওর কাছে বড় একটা কেউ এ ভাবে এসে জবাব চেয়ে বসে না। এক মিত্রাই বসল—ওর রাগ আর বেপরোয়া ভাবটা কাউকেই খাতির করে চলে না বলে।

আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত ভঙ্গিতে শুয়েছিল শমিত। বুকের উপর মধ্যমার চাপে বন্ধ বই। পড়তে পড়তে হয়ত এই মাত্র বন্ধ করেছে,—নয় ত নিয়েই বসেছে খোলা হয়নি। অনামিকার হীরের আংটিটা আলোকরশ্মিতে জ্বলছে—যেন ওর তৃতীয় দৃষ্টিবিন্দু। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য ওর মুখে নয়—শরীর গঠনে। কপাল হতে হাত-পায়ের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত সর্ব-অবয়ব যেন দুর্বার আকর্ষণের ছন্দময় রেখায় গঠিত।

দরজায় পা দিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো মিত্রা।

চোখ চাইল শমিত।

—'আরে মিত্রা! এসো এসো!' ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে জানালো সাদর অভ্যর্থনা। 'বোস!' হাত বাড়িয়ে বসতে দেখিয়ে দিল সামনের কৌচটা।

এক জয়ন্তীকে বাদ দিয়ে রাণী আর মিত্রাকে নাম ধরেই ডাকে শমিত। বলে, 'অত সম্বোধনের গুরু গাম্ভীর্য্য পোষাবে না। বয়সে বড়, সম্পর্কেও বড়—ডাকব নাম ধরেই।'

মিত্রা বসল না। এ ঘরে ও আসে না বললেই চলে। গুছানো ঘর নয়। দামী বিছানার ঢাকাটির আদ্ধেক ঝুলছে মেঝের কার্পেটে। আকাশ রংএর ঢাকনার ভেতর লেড্‌লয় বিপণির ধবধবে চাদর আর বালিসের ওড়গুলোকে দেখাচ্ছে যেন নীল আকাশের বুকে উড়ন্ত বালিহাঁসের ডানা। পরদাগুলো দুলছে সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে—আব্রু নয় শোভা। মিনে-করা ফুলদানীতে ফুল—টাটকা নয়, ঝরে পড়ার মুখে। বুকশেলফ-ভর্তি বই। যেমন বাঁধাই তেমন ঝকঝকে চকচকে। বইও কি কেনে শমিত মলাট আর দাম দেখে! শেলফটার কাছে কার্পেটের উপর মোটা তাকিয়াটা পড়ে। বিছানা থেকে টেনে নামান হয়েছিল—আর ওঠেনি। এত যে বে-গোছ বিশৃঙ্খলতা ভরা ঘর, তবু সুন্দর। রূপসী মেয়ে যেমন না সেজেও সুন্দরী।

আর শমিত দেখল—লাল টুকটুকে কার্পেটটার উপর মিত্রার পা দু'খানা—যেন এক-জোড়া সাদা কমল ফুল।

শমিত বললে—'কি ব্যাপার? হঠাৎ একেবারে সশরীরে এসে উপস্থিত? বসবে না?'

—'না, বসতে আসিনি। আপ্যায়ন করবার প্রয়োজন নেই। তোমার ভদ্রতা-জ্ঞানের উপর এমনিতেই অসীম শ্রদ্ধা আমার। আমি জানতে এসেছি, কেন তুমি কিছুতেই পড়াতে রাজী নও?'

শমিত নীরব।

—'কি, চুপ করে রইলে যে? স্পষ্ট কথায় উত্তর দিতে তোমার তো বাধে না। বলেই ফেল।'

তেমনি করে কৌচের মাথায় হাত রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল শমিত।

—'কি, কথা বলবে না?' মিত্রা টান হয়ে দাঁড়ালো।

—'শুনতে ভালো লাগছে।' স্বল্প হাসলো শমিত।

—'না, তেমন ভাল লাগার মতো কথা আমি কিছু বলিনি। বলতেও আসিনি। সাদা কথায় তোমার জবাবটা শুনতে পেলেই চলে যাব। আর যদি কথা বলা প্রয়োজন মনে না কর—তবে যাচ্ছি এখনই।'

এবার শমিত কৌচ থেকে হাত দুটো তুলে বিবেকানন্দ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যাবে; মিত্রা বলে উঠল—'বাব্বা, যে রকম বীরপুরুষের মতো দাঁড়ালে, মারবে নাকি?'

হেসে ফেললো শমিত—'কাউকে মারবার পক্ষে বুঝি এ ভঙ্গিটা খুব প্রশস্ত?' তার পর হাত দুটোর আড় খুলে ফেলে বললে—'তা, কি ভাবে রাখব এ দুটোকে এবং কোথায়?'

—'সে তোমার খুশী।'

—'না খুশী মতো রাখা চলবে না। রইল এ দুটো এখানেই।' কৌচের উপর হাত রাখল সে। তার পর বললে, 'আপন অভিরুচি মতো চলতে-বলতে সঙ্কোচ আমার বাধা হয়ে পথ আটকায় না, এ সত্য। কিন্তু একেবারেই না, কখনও না, কোন দিনও না—এ কথা আমি বললেও মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা স্বীকার করবে না। হাসবে মিথ্যে বলছি বলে।'

—'শুধু কথার খেলা!' কণ্ঠের বিরক্তি চাপা থাকে না ওর।

—'ঠিক ধরেছ—কথার খেলা। কাজের কথা যারা জানে না তারাই কথা নিয়ে খেলে।'

—'কাজ নিয়ে, কথা নিয়ে, মানুষ নিয়ে—খেলা, যত তোমার মন চায়। আমার শুনবার সময় নেই। যে কথাটার জন্ম এসেছি সেটার উত্তরই শুধু জানতে চাইছি।'

—'এ বিষয়ে কথা বলবার ইচ্ছে নেই এ নিশ্চয়ই তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না?'

—'কেন, কি এমন ভীষণ ব্যাপার এর ভেতর আছে?'

—'আবার কেন? ঘুরে-ফিরে সেই দাঁড়ালো ত গিয়ে জবাব চাওয়াতেই!'

—'শুধু মাত্র এ জন্তই দাঁড়িয়ে আছি। নইলে হাস্ত-কৌতুকে রম্য সন্ধ্যা কাটাতে নয়।'

অসহায়ের মত বসে পড়ল শমিত। বলল, 'আর পারছি নে দাঁড়িয়ে থাকতে—তোমার সম্মানার্থেও। তুমি তো বসবে না, আমি বসলাম। শোন, বিদ্রূপ করে কথা বলা তোমার স্বভাব নয়—কিন্তু আজ তাই তুমি করছ। আর আমার স্বভাবে নেই কেউ করলে

নীরবে মেনে যাওয়া—কিন্তু আমি তাই যাচ্ছি। দু'জনেই চলেছি যখন স্বভাব-বিরুদ্ধ পথে—তখন সাদা কথায় আর সাদা চোখে এর হদিস মিলবে না।'

মিত্রার অসহিষ্ণু মুখে ফুটে উঠল এবার একটা বিরাগ-বিতৃষ্ণার ভাব। বললে—'তোমার বাক্যের গোলক-ধাঁধায় ঘুরপাক খাওয়ার আর বাসনা নেই। চোখে অন্ধকার দেখছি।'

এবার শমিত গম্ভীর হলো। চুলগুলো দু'হাত দিয়ে পেছন দিকে চেপে ধরে বললো—'রক্ষা পাওয়া গেল। ভয় হচ্ছিল কত কি বলে ফেললাম বুঝি।···ক্ষেপে আছ, কোন কথাই এখন আর তুমি নেবে না ভালো অর্থে। আর আমার পক্ষে ডেকে আনা হবে অসম্মান। অনর্থক সময় নষ্ট—ভালো লাগছে না আমারও। পড়াতে ভালবাসি নে এই। ছেড়ে দেও এর ভেতর কারণ খোঁজা। এবার নিশ্চয়ই প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হয়েছে? বুঝতে কষ্ট হয়নি তো?'

—'না, হয়নি। খুশী হলাম শুনে।···পড়তে যেমন ভালবাস, পড়াতেও তেমনি। তাই নাকি জয়াকে নিজের উৎসাহে পড়িয়েছ। অবশ্যি সেটা নজির টানছি নে—মিত্রা জয়া নয়। জয়াকে—'

—'আর একটি কথাও নয়।' থামিয়ে দিল শমিত মিত্রাকে। জয়া, জয়া! দিদির কথায়ও ছিল এ জাতীয় খোঁচা। কিন্তু মিত্রার পক্ষে যে এ চেহারা বড় অগৌরবের! বললো—'অধৈর্য্য হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছ, আর নয়। মাপ করো, আমি চললাম।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল শমিত।

বিড়ম্বিত মিত্রা বিহ্বল দৃষ্টি মেলে রইল অপস্রিয়মান শমিতের দিকে তাকিয়ে। এগিয়ে গিয়ে বলতে পর্য্যন্ত পারল না, তোমার যাবার দরকার কি, যাচ্ছি আমিই! তবেও বুঝি কিছুটা শেষ রক্ষা হতো। অপমানে লাঞ্ছনায় শরীরের সমস্ত রক্ত জল হয়ে যেন চোখ দিয়ে ফেটে বেরুতে চাচ্ছিল। কিন্তু ওর অহঙ্কার সে অশ্রুকে ঝরে পড়তে নয়—তার আভাসটুকুর ছায়া পর্য্যন্ত পড়তে দিল না চোখে।

নিজেকে সামলে নিয়ে নীচে নেমে আসতেই দেখা জয়ন্তীর সঙ্গে। সে মুখ বাঁকিয়ে বললেন—'শমিতের কাছে যাওয়া মানে সেধে অপমানিত হতে যাওয়া। নিজের মান নিজের কাছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে বাবা ভেবে চিন্তে এগুতে হয়।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সামান্য সময় নিয়ে মিত্রা বললো,—'তুমি জানলে কি করে? গিয়েছিলে সঙ্গে?'

—'সঙ্গে যাব কেন ভাই—জানলাম তোমার মুখের চেহারা দেখে। খুশী মনে ফিরলে কি আর মুখের চেহারা ও-রকম দেখতে হয়। ও কাউকেই গ্রাহ্য করে না—তুমি ভাব তোমায় করবে! কিন্তু দেখলে তো—ও বাবুর কাছে সবাই সমান।'

কমলা এদিক দিয়েই যাচ্ছিল। জয়ন্তীর কথা শুনল দাঁড়িয়ে। বললো—'পাহাড়ের চূড়ো থেকে নীচের সব মানুষকেই যেমন মাথায় সমান দেখায়, শমি মামাও নিশ্চয়ই তেতলায় বসে তোমাদের তেমনি দেখেন। নইলে তো সবাইকে সমান দেখার কারণ দেখছি নে—না মাথায় না মগজে।' কমলা হাসল।

চটে উঠল জয়ন্তী—'তোমার বড্ড মুখ হয়েছে কমলা!'

—'হয়েছে কি গো, ছিলই। বল দিন্‌দিন বাড়ছে।'

মিত্রা হেসে ফেলল।

জয়ন্তী মুখ কালো করে বললে—'তা বাড়ুক। একটা মুখ হোক তোমার বিশ-পঁচিশটা। কিন্তু আমার সঙ্গে ভাল ভাবে কথা বলতে পার তো বলো—নইলে বলতে এসো না।'

—'ভাল কথা জুগিয়ে না এলে ভাই নিজেই আমি চুপ থাকি। আবার এলে পারি নে চেপে যেতে। কি করব বল! স্বভাব।' তার পর এ প্রসঙ্গে একেবারে যতি টেনে দিয়ে বললে—'চা তৈরী করেছি। খাবে তো দু'জনেই এসো।' এগিয়ে গোটা কয়েক সিঁড়ি ভেঙ্গে দাঁড়ালো মাঝ-সিঁড়িতে। চেঁচিয়ে বললো—'চা খাবে শমি মামা? মা'র জন্য বিশুদ্ধ পাথরের বাটিতে বানিয়েছি। পাঠিয়ে দিচ্ছি এক বাটি—তুমি তোমার লণ্ডন-মেড কাপে ঢেলে নিও।' বলেই তরতরিয়ে নেবে এলো। 'আবার জবাবের জন্য অপেক্ষা করব কি—খাবে তো জানিই।' চলে যেতে যেতে গুনগুনিয়ে উঠলো—'অন্ন লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়—'

কিন্তু আশ্চর্য্য, কমলা চা তৈরী করেনি, কস্মিন্‌কালেও কথা ভাবেওনি। তবে এবার গিয়ে বসল চা প্রস্তুত করতে—এতগুলো মানুষকে নেমন্তন্ন করে এলো যে!

শমিত কমলার ডাকে ছাদ থেকে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তখন সেখানে কেউ নেই।···ক্লান্ত লাগছে। যেন বোঝা-বওয়া শ্রান্তি ওর শরীরে। ঘরে ফিরে গিয়ে চোখ বুজে দিল বিছানায় গা ঢেলে।···একমাথা চিন্তা করতে বসল শমিত। না, মাথা তার এখন একেবারে শূন্য। টোকা দিলে বুঝি শূন্য কলসীর মত ঠনঠন শব্দ বেরুবে। [ক্রমশঃ।
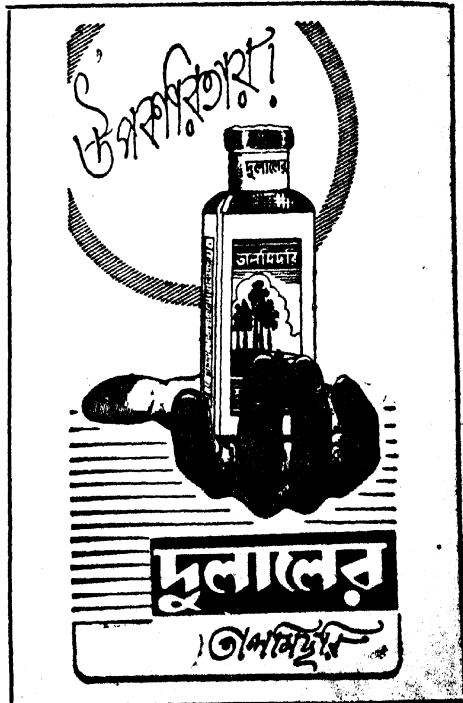
[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পাঁচ

শতদল বাবুর কথায় তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই ঘরময় ছোট-বড় কাচের টুকরো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে। কিরীটি সাবধানে পা ফেলে এগুতে এগুতে বললে, 'ইস্, কাচের টুকরোগুলো এখনো এই ভাবে ঘরময় ছড়িয়ে রেখে দিয়েছেন! কাউকে বলুন ঘরটা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে দিতে।'

'হাঁ, এক্ষুনি পরিষ্কার করছি!—' বলে শতদল ভৃত্য অবিনাশকে ডেকে ঘরটা পরিষ্কার করে নিতে আদেশ দিল।

ঘরটা বেশ বড় আকারেরই হবে। ঘরের মেঝেটে লাল সিমেণ্টের তৈরী এবং পুরাতন হলেও এখনো ঝক্‌ঝক্ করে এমন চমৎকার পালিশ। এক ধারে মস্ত বড় একটা পালঙ্ক এবং তারই এক পাশে একটা লোহার সিন্দুক কাঠের একটা চৌকীর উপরে বসান। ঘরের অন্য কোণে একটা জানালার একেবারে বরাবর একটা লিখবার টেবিল; ঐ টেবিলটি এখন বিশেষ ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না, কারণ টেবিলের উপরে নানা কাগজ-পত্র ও বই এলোমেলো ভাবে ছড়ান রয়েছে। সেই টেবিলটা থেকে হাত চারেক দূরে অনেকটা ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট একটি রাইটিং টেবিল, তারই উপরে টেবিল-ল্যাম্পটি বোধ হয় বসান ছিল এবং জানালা-পথে নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে ল্যাম্পটি মেঝেতে ছিটকে পড়ে চিমনীটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

অবিনাশই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একটা ঝাড়নের সাহায্যে কাচের টুকরোগুলো তুলে তখনও মেঝের উপরের উল্টে পড়ে থাকা ল্যাম্পটা তুলে রাখতে যাচ্ছে, কিরীটি এগিয়ে গিয়ে অবিনাশের হাত থেকে এক দিকে খানিকটা টোল খেয়ে যাওয়া ল্যাম্পটা হাতে নিল চেয়ে: 'দেখি অবিনাশ, ল্যাম্পটা।'

অবিনাশ ল্যাম্পটা কিরীটির হাতে এগিয়ে দিয়ে ঘর হতে চলে গেল। বার কয়েক ল্যাম্পটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কিরীটি এগিয়ে গিয়ে ল্যাম্পটা সামনের টেবিলের উপরে বসিয়ে রাখল। এবং হঠাৎ শতদলের একেবারে মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল: 'গুলীটা কোন্ দিক দিয়ে ঘরে এসে ঢুকেছিল শতদল বাবু?—'

'সামনের ঐ বাগানের দিককার জানালাটাই রাত্রে খোলা ছিল। ঐ জানালা-পথেই গুলীটা এসেছিল।'

শতদল বাবু হাত তুলে ঘরের অনেকটা মধ্যস্থলে রক্ষিত রাইটিং টেবিলটার ঠিক মুখোমুখি যে জানালাটা তখনও বন্ধ ছিল, সেইটার দিকে হাত তুলে দেখাল।

কিরীটি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ না করে নিজেই এগিয়ে গিয়ে ছিটকানীটা তুলে হাত দিয়ে ঠেলে জানালার বন্ধ কবাট দু'টো খুলে দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে কি যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল।

কৌতূহল ভরে আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এ বাড়ীর পশ্চাতের অংশ সেটা। দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না দীর্ঘ দিন জমিটা অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত হয়ে আছে। বড় বড় ঘাস ও আগাছায় জায়গাটা জংগলে পরিণত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। মধ্যে মধ্যে শেয়াকুলের ঝোপ ও ঝাউ গাছ। শেষ প্রান্তে জমির সীমানা দেড় মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের ওদিকে জমি ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে, সমুদ্র বেশ কিছুটা দূরে সেখান থেকে। ঐ সব ঝোপ ও আগাছার মধ্যে আত্মগোপন করে থেকে আততায়ীর পক্ষে এই ঘরের মধ্যে অবস্থিত কাউকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়াটা এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, কারণ নিচের ঐ জমিতে দাঁড়িয়ে ঘরের এই জানালাটা খোলা থাকলে ঘরের ভিতরের অনেকটা অংশই চোখে পড়া সম্ভব মনে হলো।

'আততায়ী ঐখানে থেকেই বোধ হয় শতদল বাবুকে রাত্রে আলোর সামনে বসে থাকতে দেখে গুলী ছুঁড়ছিল।' কথাটা কিরীটিকে সম্বোধন করেই নিম্ন স্বরে বললাম আমি।

কিরীটি বোধ হয় নিজের আত্মচিন্তায় অন্যমনস্ক ছিল, আমার প্রশ্নে চমকে ফিরে তাকাল: 'কি বলছিলি সুব্রত?—'

'বলছিলাম, ঐখান থেকে অনায়াসেই গুলী ছোঁড়া যেতে পারে—'

'তা পারে!—' মৃদু কণ্ঠে কিরীটি জবাব দিল। কিরীটির কণ্ঠস্বরে যেন কোন আগ্রহের সুরই নেই।

রাণু এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করা অবধি, এবারে সে শতদলকে বলছে শুনতে পেলাম: 'তুমি কিন্তু সত্যি সত্যিই কাল খুব বেঁচে গেছ শতদল!—'

'হাঁ! তাই ত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি রাণু, এখনো যেন এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমাকে কারো হত্যা করে কি লাভ থাকতে পারে? তাছাড়া তুমিও ত জান, এ জগতে কারো সঙ্গেই আমার কোন শত্রুতা নেই।'

'কিন্তু ব্যাপারটা যে রকম দাঁড়াচ্ছে—'

রাণুর কথায় প্রতিবাদ জানিয়ে শতদল বলে: 'সে যাই হোক, ব্যাপারটা ক্রমে এমন দাঁড়াচ্ছে যে এর একটা হেস্তনেস্ত না করে চুপ করে বসে থাকাটাও হয়ত আর উচিত হবে না। আপনি কি বলেন মিঃ রায়?'

'হাঁ, তা বই কি! We must see to its end!'—কিরীটি ফিরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল।

'তাহলে এখন আমার কি করা উচিত? আপনার পরামর্শ কি?—'

'সেইটাই এতক্ষণ আমি ভাবছিলাম শতদল বাবু! দু'টো কাজ এখন সর্বাগ্রে আপনাকে করতে হবে।—' কিরীটি শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

'কি বলুন?—'

'প্রথমত: সমস্ত ব্যাপারটা এখানকার স্থানীয় থানা-ইনচার্জকে জানাতে হবে। কারণ তাদের বাদ দিয়ে আমরা এ সব ব্যাপারে এক পাও এগুতে পারবো না, তাছাড়া সেটা একেবারেই আইনসংগতও হবে না।—'

'হাঁ। গত রাত থেকে আমিও ঐ কথাটাই ভাবছিলাম।—' মৃদু ভাবে শতদল বলে।

'শুধু ভাবা নয়, মিঃ বোস! আপনার উচিত ছিল ইতিমধ্যেই থানা-ইনচার্জকে সমস্ত ব্যাপার বলে তার পরামর্শ নেওয়া। যাক, আর দেরী করবেন না, এখুনি কেউ এক জনকে থানায় পাঠিয়ে দিন এবং লিখে পাঠান তিনি যেন এখুনি একবার অনুগ্রহ করে এখানে আসেন, লিখবেন বিশেষ জরুরী।'

'এখুনি দেবো?'

'হাঁ, আর এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত হবে না।'

কিরীটির নির্দেশমত তখুনি শতদল একটা কাগজে স্থানীয় থানা-অফিসারকে সংক্ষেপে বাপারটা লিখে এবং কিরীটির নামটাও ঐ সঙ্গে যোগ করে মালী রঘুকে দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দিল।

'থানা-অফিসার আসুন, ততক্ষণ আমরা চা-পান পর্বটা শেষ করে নিই, কি বলেন—শতদল বাবু?—'

'নিশ্চয়ই' নিশ্চয়ই। আমি এখুনি আসছি—' শতদল বোধ হয় সকলের চায়ের ব্যবস্থা করতেই ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রাণু দেবী সমুদ্রের দিককার খোলা জানালাটার ধারে গিয়ে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম: 'ওঁরা দু'জনেই বেশ নার্ভাস হ'য়ে গিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।'

কিরীটি পকেট থেকে সিগার-কেসটা বের করে একটা সিগার কেস থেকে টেনে নিয়ে সেটাতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টায় ছিল, আমার কথার কোন জবাব দিল না।

বুঝতে পারলাম তার নিঃশব্দতার কারণ। কোন একটা বিষয় যখনই সে গভীর ভাবে চিন্তা করে সেই চিন্তার মধ্যেই সে বরাবর এমন ভাবে অন্যমনা হ'য়ে যায় যে, বাইরের পারিপার্শ্বিকের থেকে সে যেন অনেক দূরে চলে যায়।

আমি আর একবার কতকটা অনন্যোপায় হ'য়েই ঘরটার চারি দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ঘরটার দু'দিকে তিনটে তিনটে করে ছ'টা জানালা। দক্ষিণের দিকে সমুদ্র, উত্তরের দিকে একটু পূর্বে দেখা সেই খোলা জমিটা—প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়ীটার পশ্চাতের অংশ। ঘরের দেওয়ালে বড় বড় সব অয়েলপেনটিং এবং সবগুলোই নারী ও পুরুষের প্রতিকৃতি। বোধ হয় শিল্পী রণধীর চৌধুরীর পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি। প্রত্যেকটি প্রতিকৃতি যেন একেবারে সজীব, প্রাণবন্ত। কি অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য!

শতদল এসে প্রবেশ করল অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে, অবিনাশের হাতে চায়ের ট্রে।

চা পরিবেশন করল রাণু দেবী কিরীটিরই অনুরোধে। চা-পান করতে করতেই এক সময় কিরীটি তার অর্ধসমাপ্ত কথার জের টেনেই যেন বলতে লাগল, 'যে কথাটা আপনাকে যেন বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম। আমার কিন্তু মনে হয়, এর পর আর আপনার এই ভাবে একা-একা এ বাড়ীতে থাকা উচিত হবে না। এবং যুক্তিসংগতও হবে না মিঃ বোস।'—

রাণু যেন কিরীটির কথাটা কতকটা লুফে নিল। সে বলে ওঠে: 'আমিও সেই কথাটাই বলবো বলবো ভাবছিলাম তোমাকে, শতদল! কিরীটি বাবু ঠিকই বলেছেন। এ বাড়ীতে আর তোমার এ ভাবে risk নিয়ে একা-একা থাকা উচিত নয়।—'

'তোমার যেমন কথা রাণু! একা-একা আবার আমি এ বাড়ীতে আছি কোথায়? ভিতরের মহলে অবিনাশ আছে, দিন দুই হলো অবিনাশের এক ভাইপো এসেছে রমেশ। তাকেও এ বাড়ীর কাজে আমি নিযুক্ত করেছি, তাছাড়া দাদুর একমাত্র বোন হিরণ্ময়ী দিদি ও হরবিলাস দাদু এবং তাদের মেয়ে সীতা আছে। এতগুলো লোক এ বাড়ীতে আছে।—' প্রতিবাদ জানায় শতদল।

'তা হোক শতদল' বাবু! হরবিলাস বাবু ও তাঁর স্ত্রী-কন্যা তারা সকলেই থাকেন বাইরের মহলে। ভিতরের এত বড় মহলটায় বলতে গেলে আপনি ত একাই থাকেন। অবিনাশের বয়স হয়েছে, সেও হয়ত থাকে ভিতরের দিকে, কিন্তু এ অবস্থায় রাত্রে যদি আচমকা একটা বিপদ-আপদ ঘটে ত সময় মত কারো সাহায্যও ত আপনি পাবেন না। তাছাড়া আমি এমন এক জন লোককে সর্বদা আপনার কাছে কাছে রাখতে চাই যিনি সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য ত করতেই পারবেন এবং সর্বদা আপনার প্রতি দৃষ্টিও রাখতে পারবেন।—' কিরীটি জবাব দেয়।

'কিন্তু এমন কোন এক জন সহচর আমি এখন পাই বা কোথায় মিঃ রায়?' শতদল যেন একটু চিন্তিতই হয়ে উঠে।

'এমন কোন আত্মীয় কেউ কি আপনার নেই যিনি অন্তত কিছু দিন এসে আপনার কাছে থাকতে পারেন?'

'কিছু দিন মানে?—' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় শতদল কিরীটির মুখের দিকে।

'এই ধরুন দিন ১৫।২০?—দেখুন না ভেবে কেউ আছেন কি না?—' কিরীটি আবার শতদলের মুখের দিকে কথাটা বলে তাকায়।

'না, এমন কাউকেই মনে পড়ছে না। তবে আমার দাদুর বোন ঐ হিরণ্ময়ী দেবী ওঁদেরই না হয় আমি অনুরোধ জানাতে পারি ভিতরের মহলে এসে থাকতে।—' শতদল বলে।

'আমার মনে হয়, সেইটাই সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা হবে।—' আমিই কথাটা বলি।

হরবিলাস বাবু ও তাঁর স্ত্রীকে অনুরোধ জানাতে তাঁরা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হলেন অন্দর-মহলে এসে থাকতে এবং মনে হলো হরবিলাস যেন প্রস্তাবটা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেন যেন আমার মনে হলো কিরীটির এ প্রস্তাবে হরবিলাস বাবু

সম্মত হওয়ায় শতদল খুব বেশী সন্তুষ্ট হতে পারেনি। হরবিলাস বাবুকে প্রস্তাবটা জানাবার জন্ত আমরাই সকলে নিচে বাইরের মহালে গিয়েছিলাম। হরবিলাস পরিবারের স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থাটা যাতে ঐ দিনই সম্ভব হয়, কিরীটি শতদলকে অনুরোধ জানাল।

শতদল বললে, 'রঘু ফিরে আসুক, সে এলেই অবিনাশ ও রঘু সব ব্যবস্থা করে দেব খ'ন।'

ঠিক এই সময় রঘু এসে ঘরে প্রবেশ করল এবং বললে, 'দারোগা বাবু এসেছেন নিজেই। বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

'চলুন শতদল বাবু, উপরে আপনার ঘরে যাওয়া যাক! রঘু, দারোগা বাবুকে উপরের ঘরে নিয়ে এসো!' রঘুর দিকে তাকিয়ে কিরীটি নির্দেশ দিল।

শতদল বাবুকে নিয়ে আমরা অন্দর-মহলে তার ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম, রঘু বাইরে চলে গেল দারোগা বাবুকে ডাকতে।

স্থানীয় থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল, বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশের বেশী হবে না।

ভদ্রলোকের বোধ হয় নিয়মিত ব্যায়াম করা অভ্যাস, বেশ বলিষ্ঠ পেশীবহুল চেহারা। লোকটি কথায়-বার্তায় অত্যন্ত অমায়িক। আমি কিরীটির পরিচয় দিতে তিনি সোল্লাসে এগিয়ে এসে কিরীটির সঙ্গে করমর্দন করলেন: 'কি সৌভাগ্য, আপনিই মিঃ কিরীটি রায়?'

ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে আমিও যেন মনে মনে অনেকটা স্বস্তি পাই। অন্তত এর পর প্রতি পদে যার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে, তাঁর মধ্যে কোন পুলিশী অহমিকা বা গাম্ভীর্য নেই। সত্যিই ভদ্রলোক।

কিরীটিই শতদল বাবুর সঙ্গে ঘোষাল সাহেবের পরিচয়টা ঘটিয়ে দিল: 'ইনিই শতদল বাবু, এই বাড়ীর মালিক। ইনিই আপনাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন মিঃ ঘোষাল!'

'বলতে লজ্জা নেই মিঃ রায়, আমি কিন্তু ওর চিঠিতে আপনি এখানে উপস্থিত জেনেই সমস্ত থানার কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে এসেছি। কি আশ্চর্য দেখুন, আপনি এখানে এসেছেন জানতেও পারিনি।'

মিঃ ঘোষালের কথা শুনে শতদল একবার ঘোষালের মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটির দিকে চেয়ে দেখি কিরীটি কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছে। ব্যাপারটার মধ্যে যে হাসির কি কারণ থাকতে পারে সেদিন ঐ মুহূর্তে বুঝিনি, পরে যখন রহস্যটা উপলব্ধি করেছিলাম—থাক, সে কথা। বহু বার বহু ক্ষেত্রে দেখেছি, কিরীটির অত্যাশ্চর্য অনুসন্ধানী দৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে সর্বদা এমন ভাবে সজাগ থাকে যে, ভাবতেও বিস্ময়ে যেন অভিভূত হ'য়ে যেতে হয়। শুধু মাত্র তাই নয়, বহু ক্ষেত্রে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ ঘটনা—অনেক সময় যার মধ্যে কোন তাৎপর্যই হয়ত আমরা খুঁজে পাই না,—কিরীটি প্রবল ভাবে সেইটার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এবং বারংবার সেইটা নিয়েই নাড়াচাড়া করতে থাকে নিজের মনের গভীর তলদেশে। কিরীটিকে ঐ সম্পর্কে পরে প্রশ্নও করেছি। জবাবে সে বলেছে: 'প্রত্যেক মানুষেরই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আছে সুতরাং এবং তার বিচার-পদ্ধতিটাও মানুষ-বিশেষে বিভিন্ন। সামান্য একটা তুচ্ছ ঘটনা যা হয়ত অনেকেরই চিন্তায় রেখাপাতও করে না, অনেক সময় সেই তুচ্ছর মধ্যেই আমি রহস্যের ইংগিত পাই।'

কিরীটির কথায় আবার আমার সম্বিৎ ফিরে এলো: 'তা'হলে আপনাকে আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলেই বলি, মিঃ ঘোষাল! যদিও ব্যাপারটার মধ্যে কাল পর্যন্তও শতদল বাবু কোন গুরুত্বই আরোপ করেননি এবং গত রাত্রি থেকে কতকটা বাধ্য হ'য়েই মত পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন, সেটা হচ্ছে ভদ্রলোক বর্তমানে সত্যিই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। আরো সোজা করে বললে বলা উচিত, শতদল বাবুর প্রাণ কয়েক দিন থেকে বিপন্ন হ'য়ে উঠেছে।'

'বিপন্ন হ'য়ে উঠেছে কি রকম?—' প্রশ্ন করে ঘোষাল মশাই কিরীটির মুখের দিকে তাকালেন।

'Somebody is after his life!—'

'বলেন কি! সত্যি?'—

'হাঁ, চার-চারটে attempt অর্থাৎ অত্যন্ত সাধু প্রচেষ্টা ওঁর জীবনের 'পরে হয়ে গিয়েছে।—'

'চার-চার বার attempt হয়েছে?—'

'হাঁ। প্রথম বার ঐ যে দেখছেন খাটের পাশে মাটিতে নামান বড় অয়েল-পেন্‌টিংটা, ঐটাই বোধ হয় ওঁর অজ্ঞাতে কোন এক সময় এমন কায়দা করে ফিট্ করে রাখা হয়েছিল যাতে করে রাত্রে ঘুমের ঘোরে কোন এক সময় সহসা ছবিটা মাথার উপরে ছিঁড়ে পড়ে ওঁর মাথাটা থেঁতলে দিয়ে ওঁর মৃত্যু ঘটায়! যদিও ব্যাপারটা গত কালই মাত্র ওঁর মুখে শোনা; আজ ঘরে ঢুকে এক সময় ইতিপূর্বে ঐ ছবিটার প্রতি নজর দিয়েই আমি দেখেছি এবং আপনিও ইচ্ছা করলে এগিয়ে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। ছবিটা টাংগানো ছিল একটা মোটা তার দিয়ে এবং সে তারটাকে এমন ভাবে সামান্য একটু অংশ বাকী রেখে কাটা হয়েছে যে ছবির ভারে বাকী তারের অংশটুকু ছিঁড়ে পড়া এক সময় এমন কিছুই বিচিত্র নয়।—'

কিরীটির কথা শুনে আমরা সকলেই খাটের পাশে নামিয়ে রাখা ছবিটির দিকে তাকালাম এবং বুঝলাম কিরীটির কথাটা মিথ্যা নয়। গত কাল সকালে হোটেলের সামনে সী-বীচে শতদল বাবু ছবি সম্পর্কে কিরীটিকে কি বলেছিলেন ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ আবার হঠাৎ কিরীটির কথায় মনে পড়ে গেল।

এগিয়ে গেলাম সকলে কিরীটির সঙ্গে সঙ্গেই ছবিটার দিকে।

যে তারের সাহায্যে ছবিটা দেওয়ালে পেরেকের সঙ্গে পাকাপোক্ত ভাবে টাঙ্গানো ছিল, দেখলাম পরীক্ষা করে সত্যি সত্যিই সে তারটা কোন কিছুর সাহায্যে এমন ভাবে কাটা যে বাকী যে অংশটুকু কাটা ছিল না সেটা ছবির ভারেই ছিঁড়ে গিয়েছে। কিরীটি কথাটা ভোলেনি এবং আজ ঘরে প্রবেশ করে অন্যান্য কথাবার্তার মধ্যেও ছবিটাকে লক্ষ্য করেছে এবং বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই সবটুকু লক্ষ্য করেছে ইতিমধ্যেই। কিরীটি আবার বলতে লাগল: 'তার পর দ্বিতীয় বার attempt হয় এই বাড়ীর বাইরে। এখানে আসবার সময়ই লক্ষ্য করে থাকবেন হয়ত মিঃ ঘোষাল, বাড়ীর গেট থেকে যে রাস্তাটা বরাবর সামনের দিকে চলে গিয়েছে, বাড়ীটা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বলে রাস্তাটা ক্রমে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গিয়েছে। সেই ঢালু রাস্তা

দিয়ে এক সময় শতদল বাবু যখন অন্যমনস্ক হ'য়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন পিছন থেকে কেউ একটা বড় পাথরের চাঁই গড়িয়ে দিয়ে ওঁকে পিষে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।'

ঘোষাল শতদলের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

'হাঁ—' মৃদু কণ্ঠে শতদল বললে: 'প্রথমটায় আমি বিশ্বাস করিনি ব্যাপারটা। ভেবেছিলাম হয়ত সাধারণ ভাবেই হঠাৎ পাথরের চাঁইটা নিচের দিকে গড়িয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কিরীটি বাবুর কথাই ঠিক, that was also an attempt on my life!'

'তার পর তৃতীয় প্রচেষ্টা গত কাল সকালে সমুদ্র-সৈকত হোটেলের সামনে সী-বীচে।—' কিরীটি আবার বলে।

'বলেন কি মিঃ রায়?—'

'হাঁ, and that was a bullet. কিন্তু আততায়ী লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়। ফলে উনি ত বেঁচে যানই, আমার পৈতৃক প্রাণটাও মানে প্রাণ ঠিক নয় মাথাটাও বেঁচে যায়—'

'সত্যি?—' বিস্ময়ে যেন একেবারে হাঁ হ'য়ে গিয়েছেন ঘোষাল কিরীটির কথায়।

'হাঁ, আমার মাথার টুপীটা ফুটো করে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হ'য়ে বুলেটটা বের হয়ে যায়। এবং সেই ব্যাপারের পরই আকস্মিক ভাবে ওঁর সঙ্গে আমাদের চেনা-পরিচয়। আমি আর সুব্রত তখন ঠিক ঐ সময় সী-বীচে বসে রৌদ্র সেবন করছিলাম।'

'কই, এ কথা ত তুমি কাল আমাকে বলোনি শতদল?—' এতক্ষণে প্রশ্ন করল রাণু শতদলকে।

'কি বলবো তোমাকে, গত কাল ব্যাপারটা আমিই কি বিশ্বাস করেছিলাম?—' শতদল বিষণ্ণ ভাবে জবাব দেয়।

'কিন্তু দিনের আলোয় অমন জায়গায় কাউকে গুলী করে হত্যা করবার প্রচেষ্টা, এ যে তাজ্জব ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে, মিঃ রায়! আপনি না হ'য়ে অন্য কারো মুখে ব্যাপারটা শুনলে ত আমি বিশ্বাসই করতাম না। হেসেই উড়িয়ে দিতাম।—' ঘোষাল বললেন।

'ব্যাপারটা অবশ্য কতকটা সেই রকমই বটে, মিঃ ঘোষাল! তবে অনেক সময় দেখা গিয়েছে, সত্যিকারের তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্রিমিন্যাল দু'-একটা ঐ প্রকারের দুঃসাহসের কাজ করে থাকে। যাই হোক, এর পর আমি কতকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই শতদল বাবুকে fourth attempt সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিই।—'

'দিয়েছিলেন ওঁকে সতর্ক করে?'

'হুঁ! and the fourth attempt was rather too early! ভাবতেই পারিনি এত দ্রুত আবার আততায়ী ওঁর জীবনের উপরে attempt নেবে। এবারেও গুলী এবং এই ঘরের মধ্যে!—'

'এই ঘরের মধ্যে?—'

'হাঁ। পিছনের বাগান থেকে কেউ ওঁকে গত রাত্রে টেবিলের সামনে আলোয় বসে লেখাপড়া করতে দেখে নিশ্চিন্ত মনে বন্দুক চালায়। এবং সৌভাগ্য বশতঃ এবারের নিক্ষিপ্ত মৃত্যুবাণটিও লক্ষ্য ভেদ করতে সক্ষম হয়নি আততায়ীর। আলোর চিমনিটার উপর দিয়ে গিয়েছে। এর পর আর আপনাকে সংবাদ না দিয়ে থাকাটা এবং সব কিছু আপনার গোচরীভূত না করাটা বিবেচনার কাজ হবে না বুঝেই আপনাকে সংবাদ পাঠান হয়েছে। Now you are in the spot! এবারে আপনি এর একটা বিহিত করুন, কারণ আইন আপনাদেরই হাতে। আমরা সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি, বুদ্ধি বা মৌখিক সাহস দিতে পারি ওঁকে, কিন্তু সত্যিকারের সাহস বলতে যা বোঝায় একমাত্র তা উনি আপনার কাছেই আশা করতে পারেন ও পেতে পারেন।—' কিরীটি চুপ করল।

ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সমস্ত ঘটনা শোনবার পর তাঁর অবস্থা কতকটা ন যযৌ ন তস্থৌ!

ভদ্রলোক বিমূঢ় ও বিহ্বল হ'য়ে পড়েছেন। অসহায়ের মতই ঘোষাল কিরীটির মুখের দিকে তাকালেন।

'কিন্তু এ ব্যাপারে আমি—আমি যে ঠিক কি ভাবে ওঁকে সাহায্য করতে পারি সেটা ত বুঝে উঠতে পারছি না, মিঃ রায়! অবশ্য যদি উনি ভাল বোঝেন ত জন দুই পাহারাওয়ালা এ বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য মোতায়েন করতে পারি।—'

'কিন্তু তাতে করে বিশেষ কোন ফল হবে বলে কি আপনার মনে হয়, মিঃ ঘোষাল?' কিরীটি ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

'তবে কি ভাবে আমি সাহায্য করতে পারি বলুন? I would be always at your service!—' ঘোষাল বললেন।

'তার চাইতে যদি কোন plain dress-এর গোয়েন্দাকে সর্বদা শতদল বাবুকে পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করা যায়—' কথাটা আমি বললাম।

'না, না, মিঃ ঘোষাল! ও-সব কিছুর প্রয়োজন নেই। তার চাইতে যা বলছিলেন রাত্রে জন দুই যদি পাহারাওয়ালা আমার এ বাড়ীটা পাহারা দেবার জন্য পাঠাতে পারেন আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।—' শতদল বাবু আমার কথার প্রতিবাদ জানায়।

কিরীটি নিঃশব্দে চোখ বুজে আপন মনে চেয়ারটার উপর বসে বসে পা নাচাচ্ছিল, শতদল বাবুর প্রতিবাদে একটি বার মাত্র বোজা চোখ দু'টি খুলে শতদলের মুখের দিকে তাকিয়েই আবার পূর্ববৎ পা নাচাতে লাগল।

শতদল বাবুর প্রস্তাবে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন বলে ঘোষালকে মনে হলো। তিনি কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা'হলে সেই ব্যবস্থাই করি, মিঃ রায়?'

কিরীটি সহসা উঠে দাঁড়ায়, 'হাঁ, আপাততঃ তাই করুন। আচ্ছা শতদল বাবু, আমরাও তা'হলে উঠি। আপনি তা'হলে হরবিলাস বাবুদের অন্দর-মহলে আনবার ব্যবস্থা করুন আজই।—'

'হাঁ, তাই করবো। তবে আপনার সাহায্যও কিন্তু আমি চাই, মিঃ রায়!'

কিরীটি হাসল, 'তা অবশ্যই পাবেন বই কি! তাছাড়া ব্যাপারটায় আমি নিজেও কম interested নই। চল সুব্রত—' কিরীটি দরজার দিকে অগ্রসর হয়। ঘোষালও আমাদের অনুসরণ করলেন।

সিঁড়ির শেষ ধাপে অবিনাশের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

কিরীটি হঠাৎ থেমে দাঁড়াল: 'অবিনাশ?'

'আজ্ঞে বাবু।'

'অনেক দিন এ বাড়ীতে আছো, না?—'

'হাঁ, বাবু মশাইয়ের কাছেই আমি ত পনের বছর চাকরী করেছি।'

হঠাৎ কিরীটি শতদলের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা শতদল বাবু, কত দিন আগে আপনার ঘরের সেই ছবিটা ছিঁড়ে পড়েছিল বলুন ত ?'

'তা দিন চারেক আগে হবে!—' শতদল বাবু জবাব দেয়।

'ব্যাপারটা তুমি জান অবিনাশ ?—' কিরীটি ঘুরে দাঁড়িয়ে এবারে অবিনাশকে প্রশ্ন করে: 'শতদল বাবুর ঘরের একটা ছবি ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিল ?'

'হাঁ বাবু, দেখেছি। তাজ্জব ব্যাপার! অমন মোটা তারটা যে কি করে ছিঁড়ল—'

'ছেঁড়েনি ত—কেউ কেটে রেখেছিল তারটাকে।—' কিরীটি জবাব দেয়।

'বলেন কি বাবু ?—' বিস্মিত অবিনাশ কিরীটির মুখের দিকে তাকায়।

'হাঁ! তুমি আর রঘু ছাড়া ত বাড়ীর মধ্যে কেউ ঢোকে না!—' কিরীটি আবার প্রশ্ন করে।

'আজ্ঞে না। তবে দিন কতক হলো আমার ভাইপো এসেছে। বাবু তাকে চাকরীতে বাহাল করেছেন দয়া করে—'

'ও! বাবুর রান্না-বান্না করে কে ?—'

'হিন্দুস্থানী ঠাকুর আছে একটা, বাবুর সঙ্গেই ত এসেছে।—' অবিনাশ জবাব দেয়।

'কই, আপনি ত সে কথা বলেননি শতদল বাবু—' কিরীটি প্রশ্ন করে শতদলের মুখের দিকে তাকায়।

'মনে ছিল না। হাঁ ভুখনা আছে, আমার সঙ্গেই এসেছে, লোকটা বোবা আর কালা।—'

'বোবা আর কালা ? এমন রত্নটি কোথায় পেলে শতদল—?' প্রশ্নকারী রাণু দেবী।

'লোকটা অনেক দিন থেকেই আমার কাছে আছে—জাতে ছত্রী। রান্না করে চমৎকার!—' শতদল জবাব দেয়।

'কই, ডাকুন ত দেখি লোকটাকে ?—' আমিই বলি।

'অবিনাশ, ভুখনাকে ডেকে নিয়ে এস ত।—' শতদল অবিনাশের দিকে তাকিয়ে আদেশ করে।

অবিনাশ ভুখনাকে ডাকতে চলে গেল।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম সকলে।

ছয়

ভুখনাকে ডেকে নিয়ে এল অবিনাশ।

দ্রষ্টব্য বটে ভুখনা। যেমন লম্বা তেমনি ঢ্যাঙ্গা। দৈর্ঘে প্রায় ছয় ফুট ছয় ইঞ্চির কাছাকাছি হবে। দেহের অতিরিক্ত দৈর্ঘের জন্যই বোধ হয় লোকটা একটু কোলকুঁজো হ'য়ে হাঁটে। বড় বড় ভাসা-ভাসা দু'টো চোখের তারায় কেমন এক প্রকার বোবা নির্বোধ দৃষ্টি। ছড়ানো চৌকো চোয়াল। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। অন্ধকারে আচমকা লোকটাকে দেখলে আঁতকে ওঠাও কিছু অসম্ভব নয়।

'লোকটা ত বলছিলেন বোবা আর কালা, তা ওকে নিয়ে কাজ চালান কেমন করে শতদল বাবু ?—' প্রশ্ন করল কিরীটি।

'অনেক দিন আমার কাছে থেকে থেকে এখন আমার মুখ-নাড় দেখলেই ও বুঝতে পারে কি আমি বলতে চাই। তাই কাজ-কর্মে কোন অসুবিধাই হয় না। তাছাড়া একমাত্র রান্না করান ছাড়া ওকে দিয়ে ত আর অন্য কোন কাজই করান হয় না।—' শতদল জবাব দেয়।

'এখানে আসবার পূর্বে ত আপনি কলকাতাতেই ছিলেন—তাই না শতদল বাবু ?—'

'হাঁ! কলকাতার একটা বেসরকারী কলেজের আমি ইংরেজীর অধ্যাপক।—'

কিরীটি আবার অবিনাশের দিকে ফিরে তাকিয়ে তাকেই প্রশ্ন করল, 'ভুখনা একেবারেই শুনতে পায় না অবিনাশ, না ?—'

'তাই ত মনে হয় বাবু, একেবারে বেহদ্দ কালা!—'

এমন সময় সহসা গত রাত্রের সেই ভয়ংকর সীতার আলসেসীয়ান কুকুরটার ডাক শুনতে পেলাম।

ঘেউ-ঘেউ করে টাইগার ডাকছে।

আমরা সকলেই কুকুরের ডাকে চমকে বোধ হয় ক্ষণেকের জন্য অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কিরীটির দিকে তাকিয়ে দেখি, নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে ভুখনার দিকেই তাকিয়ে আছে।

ভুখনার চোখে কিন্তু সেই বোবা নির্বোধ দৃষ্টি। নিষ্প্রাণ স্থির।

'চলুন মিঃ ঘোষাল।—' কিরীটিই আবার সর্বাগ্রে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

আমরাও সকলে তাকে অনুসরণ করলাম।

শতদল গেট্ পর্যন্তই আমাদের পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে গিয়েছে।

নিঃশব্দে সর্বাগ্রে কিরীটি ও মিঃ ঘোষাল পাশাপাশি ও আমি ও রাণু দেবী পাশাপাশি পাহাড়ের ঢালু পথটা দিয়ে এগিয়ে চলেছি হোটেলের দিকেই।

সকালের শীতের রৌদ্রে নীল সমুদ্র যেন চূর্ণ ঢেউয়ের মাথায় মাথায় গুচ্ছ-গুচ্ছ যুঁই ফুল ছড়িয়ে আপন মনে খেলে চলেছে। আমার মনের মধ্যে তখন 'নিরালা' ও তার অধিবাসীদের কথাই ঘোরাফেরা করছে।

শতদল বাবুর জীবন বিপন্ন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন ? কোন গোপন রহস্য কি ঐ 'নিরালা'র মধ্যে লুকিয়ে আছে ? কিম্বা কোন গুপ্তধন! শতদলই শিল্পী রণধীর চৌধুরীর যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলো কি করে ? আইনের দিক থেকে সীতা বা তার মা হিরণ্ময়ী দেবীর কি কোন স্বত্বই-নেই মৃত শিল্পীর সম্পত্তিতে ? এবং শতদল, সীতা ও হিরণ্ময়ী দেবী ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারীই কি নেই ? আর শতদল বাবুই বা বলেন কি করে তিনিই তাঁর মৃত দাদুর যাবতীয় সম্পত্তির একমেবাদ্বিতীয়ম্ উত্তরাধিকারী ? কোন উইল বা ঐ জাতীয় কোন লেখাপড়া আছে কি ? মৃত শিল্পী রণধীর চৌধুরীর কি কোন আইন উপদেষ্টা সলিসিটার বা এ্যাটর্ণী ছিল না ? না, আছে ? বৎসরাধিক কাল হরবিলাস, তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী ও তাঁদের কন্যা সীতা ঐ নিরালাতে আছেন এবং রণধীর চৌধুরীর জীবিত

কালে তাঁরই আমন্ত্রণে রুগ্না হিরণ্ময়ী ওখানে আসেন—তাঁরা বাইরের মহলে থাকেন কেন? ব্যবস্থাটা কি রণধীর চৌধুরীরই? তাই যদি হয় তা'হলে নিজের রুগ্না ভগিনীর প্রতি এ ব্যবহার কেন? কোন কারণ বশতঃই কি তিনি—রণধীর চৌধুরী তাঁর রুগ্না ভগিনীকে বাইরের মহলেই এনে স্থান দিয়েছিলেন? ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে, তথাপি হিরণ্ময়ী দেবীরা এখনো এখান হতে অন্যত্র যাননি কেন? হরবিলাসদের কি ভাবেই বা সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয়? পূর্বেই বা কি করতেন, এখনই বা কি করেন? পেনসন্ পান, না কোন জমিদারী বা সঞ্চিত অর্থ আছে? তাই যদি থাকে তা'হলে এ ভাবে ইতাদের বহির্মহলে পড়ে থাকবারই বা কি কারণ থাকতে পারে? বাড়ীর প্রত্যেকটি প্রাণীই যেন আমার মনের মধ্যে আনাগোনা করে ফিরতে থাকে। একান্ত ভাবে পত্নীর শরণাপন্ন ও মুখাপেক্ষী হরবিলাস, তাঁর স্ত্রী—পক্ষাঘাতগ্রস্ত চলচ্ছক্তিহীনা প্রৌঢ়া স্ত্রী হিরণ্ময়ী; তাঁর দু'চক্ষুর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাঁদের একমাত্র তরুণী কন্যা সীতা যেন একটি নির্বাক্ দ্রষ্টা। সদা-সঙ্গী তার ভীষণাকৃতি আলসেসীয়ান কুকুর—টাইগার। বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য অবিনাশ। পুরাতন মালী রঘু। শতদলের বোবা ও কালা ছত্রী অনুচর ভূখনা। সহজ সরল অধ্যাপক মানুষ শতদল ক্রোড়পতির একমাত্র কন্যা অনন্যা-সুন্দরী তরুণী রাণু দেবীর অনুরক্ত।

নিঃশব্দেই আমরা সকলে দীর্ঘ পথটা অতিক্রম করে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘোষাল কিরীটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে এবারে আমাকে বিদায় দিন মিঃ রায়!'

'তা কি হয় এক কাপ অন্তত চা না খেয়ে—আসুন! রাণু দেবী, আপনি?—' কিরীটি রাণুর মুখের দিকে তাকাল।

'আমাকে ক্ষমা করতে হবে মিঃ রায়—কয়েকটা জরুরী চিঠি সকালেই আমাকে শেষ করতে হবে। তাছাড়া অনেকক্ষণ বের হয়েছি, মা হয়ত ব্যস্ত হ'য়ে আছেন।'

রাণু বিদায় নিয়ে উপরে চলে গেল।

আমরা তিন জনে হোটেলের বারান্দায় এসে বসলাম তিনটে চেয়ার টেনে নিয়ে। আমার মাথার মধ্যে তখনও পূর্বের চিন্তাগুলোই নিঃশব্দে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে। সম্মুখের রৌদ্রালোকিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে রইলাম আমি।

কিরীটি ও ঘোষাল নিম্নস্বরে কি সব আলাপ করতে লাগল। মধ্যে মধ্যে কেবল তাদের দু'-একটা কথার অস্পষ্ট টুকরো শ্রুতিপথে আমার ভেসে আসছিল। বুঝলাম সম্পূর্ণ অন্য সাধারণ কথাবার্তা। 'নিরালা' সম্পর্কে বা শতদলঘটিত কোন আলোচনাই নয়।

দিন দুই এর পর যেন কতকটা নির্বিবাদেই কেটে গেল। দুটো দিন কিরীটিও বিশেষ হোটেল থেকে কোথায়ও একটা বের হয়নি। বেশীর ভাগ সময়ই বারান্দায় ডেক-চেয়ারে শুয়ে নিঃশব্দে একটার পর একটা সিগার ধ্বংস করেছে। মনে হয়েছে, সে যেন চারি দিক হতে হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বিশেষ কোন একটা চিন্তায় সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েছে। তৃতীয় দিন হঠাৎ বিকালের দিকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চল সুব্রত, সমুদ্রের ধার দিয়ে একটু ঘুরে আসা যাক্।'

দু'জনে নিঃশব্দে সমুদ্রের বালু-বেলার উপর দিয়ে পাহাড়টার দিকে হেঁটে চলেছি হঠাৎ দূরে মনে হলো যেন কে একটি তরুণী আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। অস্তমুখী ম্লান সূর্য্যালোকে দূর হতে সীতাকে দেখে আমার চিনতে কষ্ট হলেও কিরীটির কিন্তু চিনতে কষ্ট হয়নি।

সে বলে ওঠে, 'আশ্চর্য! সীতা দেবী একাকী আসছেন। সঙ্গে তাঁর সেই চিরানুগত সাথী দুরন্ত ব্যাঘ্র-সদৃশ ভয়ঙ্কর আলসেসীয়ান কুকুর টাইগারকে কই দেখছি না যে—

সত্যি! সীতাই আসছে।

কাছাকাছি আসতে কিরীটিই প্রথমে হাত তুলে সম্ভাষণ নমস্কার জানাল: 'শুভ সন্ধ্যা! এই যে সীতা দেবী! একা যে, আপনার অনুগত সাথীটি কই? তাকে দেখছি না যে—?'

'নমস্কার!'—সীতাও হাত তুলে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললে: 'আমার অনুগত সাথী?'

'হাঁ! আপনার সেই টাইগার—'

সহসা লক্ষ্য করলাম কিরীটির প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সীতার চোখের তারা দু'টি যেন কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল: 'কাল রাত্রে হঠাৎ গুলী লেগে বেচারার একটা পা জখম হয়েছে, মিঃ রায়—' কাতর কণ্ঠেই সীতা বললে।

'বলেন কি! টাইগার গুলীতে জখম হয়েছে?'—হাসতে হাসতেই কিরীটি শেষের কথা কয়টি উচ্চারণ করে, তার পর সহসা সীতার মুখের দিকে তাকিয়েই বলে, 'কিন্তু ব্যাপার কি বলুন ত? এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের ব্যাপার!—'

'সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার, মিঃ রায়! আমি আপনার সঙ্গেই হোটেলে দেখা করতে যাচ্ছিলাম—'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন?'

'হাঁ! আপনি ত জানেন, সেদিনই আমাদের অন্দর-মহলে থাকবার জন্য শতদল ভাগ্নে অনুরোধ জানান। আপনারা চলে আসবার পর কতকটা যেন নিজে উৎসাহ দেখিয়েই এক প্রকার আমাদের অন্দর-মহলের দক্ষিণ দিককার যে দু'টো ঘর খালি পড়ে ছিল, তাতে নিয়ে গিয়ে আমাদের থাকবার সব ব্যবস্থা করে দেন। একটা দিন ও একটা রাত ভালই কেটে গেল। বলতে গেলে আমার ত অন্দর-মহল ভালই লাগছিল। কিন্তু—' কথাগুলো বলে সীতা যেন একটু দম নেয়।

কিরীটি ও আমি দু'জনাই উদ্গ্রীব হ'য়ে সীতার কথা শুনছি।

সীতা আবার বলতে শুরু করে, 'কাল রাত তখন বোধ হয় গোটা দুই হবে। অন্যান্য দিনের মতই টাইগার আমার ঘরের বাইরে শুয়ে ছিল। হঠাৎ তার ক্রুদ্ধ একটা চাপা গোঁ-গোঁ শব্দে ঘুমটা আমার ভেঙ্গে গেল। মনে হলো, কোন কারণে টাইগার যেন হঠাৎ ভীষণ খাপ্পা হ'য়ে উঠেছে। তার পরই পর-পর দু'টো গুলীর শব্দ।'

'গুলীর শব্দ?—'

'হাঁ। প্রথমটায় ত সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, ভয়ে-আতঙ্কে আমি একেবারে কাঠ হয়েই গিয়েছিলাম ঘটনার আকস্মিকতায়। কিন্তু চিরদিনই ভয় বস্তুটা আমার একটু কম। নিজেকে সামলে নিতে তাই আমার খুব বেশী সময় লাগেনি। তাড়াতাড়ি বিছানা হতে উঠে দরজাটা খুলে একবারে বাইরে চলে এলাম। মাঝ রাতে কাল

বোধ হয় চাঁদ উঠেছিল। ম্লান চাঁদের আলো বারান্দাটার উপরে এসে পড়েছে—দেখলাম, টাইগার তখনও আমার ঘরের দরজার অল্প দূরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে গোঁ-গোঁ করে গর্জাচ্ছে যন্ত্রণায়। ইতিমধ্যে পাশের ঘরে মা-বাবার এবং উপরের তলায় শতদল ভায়েরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, তারাও যে-যার ঘর থেকে টাইগারের গর্জন শুনে বের হয়ে এসেছে। শতদল ভায়ের ডাকা-ডাকিতে অবিনাশও ঘুম ভেঙ্গে উঠে এলো। আমি টাইগারকে ডাকতেই সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, তার ডান পা'টা বেশ গুরুতর ভাবেই জখম হয়েছে। রক্ত ঝরছে তখনও। বারান্দাতেও রক্ত। আর—আর বারান্দায় দেখলাম অনেকগুলো কেডস্ জুতোর সোলের ছাপ। ছাপগুলো জুতোর সোলে বোধ হয় ভিজে কাদা লেগেছিল তারই। এবং জুতোর ছাপ লক্ষ্য করে দেখলাম। বরাবর বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তের শেষ পর্যন্ত যেখানে প্রাচীর শুরু হয়েছে এবং প্রাচীরের গায়ে যে দরজাটা সেই পর্যন্ত চলে গেছে। দরজাটা কিন্তু বন্ধ। দরজাটা বাইরের থেকে শিকল তুলে বন্ধ করে দিয়েছে। এদিককার খিল খোলা। দরজাটা ভিতর থেকেই খিল এঁটে বন্ধ করা ছিল।'

সীতা চুপ করল।

কিরীটি আগাগোড়া সীতার বর্ণিত কাহিনী গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিল। এতক্ষণে কথা বলল: আচ্ছা। 'সীতা দেবী, ইতিপূর্বে আর কখনো ঐ বাড়িতে থাকা-কালীন সময়ের মধ্যে আপনার টাইগারের উপরে কোন প্রকার attempt হয়েছিল কি?—'

'এখন মনে হচ্ছে, দিন দশেক আগে একবার বোধ হয় টাইগারের উপরে কোন attempt হয়েছিল।—'

'কি রকম?—'

'সে রাত্রেও ঠিক অমনি কালকের রাতের মতই টাইগারের চাপা গর্জন শুনে ঘর থেকে আমি বের হয়ে আসি কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না—'

'কোন firingএর শব্দ শুনেছিলেন সে রাত্রে?—'

'না।—'

'হুঁ!—' কিরীটি মুহূর্ত কাল কি যেন ভাবে, পরে প্রশ্ন করে: 'শতদল বাবু কোথায়? এখন বাড়িতে আছেন নাকি?'

'তিনিও ঘণ্টা খানেক আগেই বের হয়ে এসেছেন; জানি না ঠিক কোথায় গিয়েছেন।'

'আচ্ছা সীতা দেবী, জুতোর সেই ছাপগুলো বারান্দায় এখনো আছে কি?—' কিরীটি আবার প্রশ্ন করে।

'বোধ হয় আছে। কারণ সকালেই ত থানা-অফিসার মিঃ ঘোষালকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।'

'মিঃ ঘোষাল গেছিলেন ওখানে?'

'হাঁ। তিনি দুপুরেই এসেছিলেন। বললেন আপনার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। বুঝতে পারছি তিনি দেখা করেননি!'

সন্ধ্যার ধূসর অস্পষ্টতা ক্রমে যেন চারি দিকে চাপ বেঁধে উঠ্‌ছে। একটু একটু করে চারি দিককার পটচ্ছায়া লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যাকাশে দেখা দিতে শুরু করেছে একটি-দু'টি করে তারা। অল্প দূরে ডান দিকে সমুদ্র সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে একটানা গর্জনে জানাচ্ছে তার অস্তিত্ব।

ক্ষণকালের জন্য কিরীটি বোধ হয় কি চিন্তা করে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে সীতা দেবীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'সীতা দেবী, আপনার বাবা মিঃ ঘোষ এখন বাড়িতেই ত আছেন, না?—'

'হাঁ। বাড়ি থেকে বড় একটা তিনি ত কোথায়ও বের হন না।—' মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় সীতা।

'চলুন। একবার না হয় আপনাদের ওখান থেকেই ঘুরে আসা যাক। শতদল বাবু এর মধ্যে ফিরে এলে তাঁর সঙ্গেও হয়ত দেখাটা হয়ে যেতে পারে, কি বলেন?—'

'চলুন! হতেও পারে।—' কতকটা সোৎসাহেই সীতা যেন কিরীটির প্রস্তাবটা অনুমোদন করে।

কিরীটি ও সীতা পাশাপাশি এগিয়ে চলে, আমি ওদের অনুসরণ করতে লাগলাম।

মাথার উপরে শীতের কুয়াশাহীন প্রথম রাতের কালো আকাশে তারাগুলো বেশ উজ্জ্বল মনে হয় এখন। সমুদ্রের ভাঙ্গা ঢেউয়ের শীর্ষে শীর্ষে ফসফরাসের সোনালী ঝিলিক চিক্‌চিক্ করে ওঠে। কালো জলে আলোর চুমকী ওগুলো যেন।

সহসা কিরীটিই আবার পাশাপাশি চলতে চলতে সীতাকে প্রশ্ন করে, 'আপনি আমার ওখানে যাচ্ছিলেন কেন মিস্ ঘোষ?—'

'ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করবো—'

'পরামর্শ! কিসের বলুন ত?—'

'এখানে, মানে ঐ বাড়িতে থাকাটা আর ভাল হবে কি না তাই ভাবছি!—'

'কেন?—'

'ভাবছিলাম মা'র বর্তমান অবস্থা ভেবেই। এমনিতে মা'র নার্ভ খুব ষ্ট্রং, কিন্তু গত রাত্রের ব্যাপার দেখে-শুনে মা যেন বেশ একটু নার্ভাসই হ'য়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। জানেন ত একে প্যারালিটিক্ রোগী—ডাক্তারের এড্‌ভাইস আছে যেন ওর পক্ষে কোন সময়েই কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনার কারণ না ঘটে। মাকে সর্বদাই তাই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে ওঁর মানসিক শান্তি অটুট থাকে। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে ঐ বাড়িতে যা সব ঘটছে—সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষেই উত্তেজনার কারণ হচ্ছে; তা মা ত রোগী!—'

'কথাটা অবশ্য ভাববার মিস্ ঘোষ। কিন্তু আপনার বাবা কি বলেন?—' কিরীটি প্রশ্ন করে।

'বাবা! এ সব ব্যাপারে অত্যন্ত indifferent! জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছি ত কোন ব্যাপারেই তিনি বড় একটা থাকতে চান না। নির্লিপ্ত! অসুস্থ হলেও মা-ই সব কিছু দেখাশোনা করেন। তাঁর পরামর্শ মতই সব চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে মাকে নিয়েই কথাটা!—'

সীতার কথায় এবারে আর কিরীটি কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে কেবল পথ অতিক্রম করতে থাকে।

সীতাই আবার কথা শুরু করে: 'মা'র আপনার উপরে একটা অসাধারণ শ্রদ্ধা আছে মিঃ রায়! আমার ত মনে হয়, এ অবস্থায় আমাদের আর ও বাড়িতে বেশী দিন থাকা উচিত হবে না। যে যাই বলুক, definitely some fowl play is going over there! তাছাড়া, স্বাস্থ্যের জন্যই মা'র ঐ বাড়িতে থাকা—

স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও মা'র বর্তমানে বিশেষ যে কোন progress হচ্ছে বলেও আমার মনে হয় না।—'

'কিন্তু কোন প্রকার fowl play-ই যে বর্তমানে ঐ বাড়িতে চলেছে তাই বা আপনার ধারণা হলো কেন মিস্ ঘোষ ?—'

'নইলে গত কয়েক দিন ধরে যে সব ব্যাপার ঘটছে এ সবের আর কি explanation হতে পারে, আপনিই বলুন! একটা হানা বাড়ী।—'

'ভূত-প্রেতে আপনার বিশ্বাস আছে নাকি সীতা দেবী ?—'

'না। না—ঠিক সে ভাবে কথাটা আমি অবশ্যই বলিনি মিঃ রায়! বলছিলাম যা ও-বাড়িতে ঘটছে, যুক্তি-তর্ক দিয়েও যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি না।'

'আমার কি মনে হয় জানেন সীতা দেবী ?'

'কি ?'

'এখুনি ও-বাড়ী ছেড়ে হয়ত আপনার মা অন্যত্র কোথায়ও যেতে রাজী হবেন না।'

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল সীতা: 'এ কথা বলছেন কেন ?'

সীতার প্রশ্নের জবাবটা কিরীটি বোধ হয় একটু ঘুরিয়েই দিল: 'আপনার মামা স্বর্গীয় রণধীর চৌধুরীর সম্পত্তিতে আপনাদের কি কোন অংশই নেই মিস ঘোষ ?'

'তা ত জানি না।—'

'রণধীর চৌধুরী গত হয়েছেন কত দিন ?'

'মাস দুই হলো।'

'তাঁর কোন উইল বা ঐ জাতীয় কোন নির্দেশনামা নেই ?'

'বলতে পারি না।'

'আপনার মা'র মুখেও কিছু শোনেননি ?'

কিরীটির শেষ প্রশ্নে সীতা কেমন যেন একটু ইতস্তত করতে থাকে। কিরীটির তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসাতে সেটুকু এড়ায় না। কিরীটি সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রশ্ন করে, 'সাধারণ ভাবে বিচার করে দেখতে গেলে আপনার মা'রও তাঁর ভাইয়ের সম্পত্তিতে কিছু দাবী থাকাটা ত বিচিত্র নয়। তবে অবশ্য যদি তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি উইল করে তাঁর একমাত্র মেয়ের ছেলে নাতীকেই দিয়ে গিয়ে থাকেন ত আলাদা কথা। আপনার মা'র সঙ্গে শতদল বাবুকেও ও-সম্পর্কে কোন কথা কোন দিন বলতে শোনেননি ?'

'শতদল ভাগ্নে এখানে আসবার কয়েক দিন পরে মা'র সঙ্গে তার যেন ঐ ধরণের কি সব কথাবার্তা হচ্ছিল, আমি বিশেষ কান দিইনি।—' মৃদু কণ্ঠে সীতা জবাব দেয়।

ইতিমধ্যে আমরা প্রায় নিরালার গেটের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। অন্ধকারে কালো আকাশ-পটের নীচে 'নিরালা' যেন কেমন একটা ভয়াবহ ছায়ার মতই মনে হয়। মনে হয় যেন কোন প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের বিরাটাকায় রক্তলোলুপ জানোয়ার ঘাপটি মেরে বসে আছে, নিজের অজ্ঞাতেই গা'টা অকারণেই কেমন যেন ছম্‌ছম্ করে ওঠে।

গেটটা খোলাই ছিল। সর্বাগ্রে সীতা, পশ্চাতে কিরীটি, তারও পশ্চাতে আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম।

অস্পষ্ট তারকার আলোয় চারি দিককার গাছপালা কেমন ধোঁয়াটে অস্পষ্ট, হঠাৎ তিন জনেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

দোতালার একটা জানালা খুলে গেছে আর সেই জানালা-পথে একটা শক্তিশালী টর্চের অনুসন্ধানী আলো নিচের অন্ধকারে এসে বার দুই ঘুরে ঊর্দ্ধ দিকে উৎক্ষিপ্ত হলো। শূন্য আকাশ-পথে অন্ধকারে আলোর রেখাটা কয়েক মুহূর্ত ঘুরে-ফিরে দপ্ করে এক সময় নিবে গেল। আলোটা দেখা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটি দ্রুত বলিষ্ঠ হাতে আকর্ষণ করে আমাকে ও সীতাকে একটা মোটা ঝাউ গাছের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। আলোটা নিবে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা তিন জনেই গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়েছিলাম আত্মগোপন করে রুদ্ধ নিশ্বাসে। কিরীটির দু'হাত দিয়ে তখনও আমাদের দু'জনের হাত ধরা। তিন জনেই নির্নিমেষে আমরা উপরের খোলা জানালাটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা মানুষের ছায়া।

ছায়াটা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিতের মত।

সহসা চাপা গলায় কিরীটি প্রশ্ন করে, 'কোন্ ঘরের জানালা ওটা বলতে পারেন মিস্ ঘোষ ?—'

'মনে হচ্ছে শতদল ভাগ্নের ঘরের জানালা—' চাপা উত্তেজিত কণ্ঠেই জবাব দেয় সীতা।

'আমারও তাই ধারণা।—' কতকটা যেন স্বগতোক্তিই করে কিরীটি।

একটু পরেই জানালাটা বন্ধ হ'য়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ পরে আমরা গাছের আড়াল হতে বের হ'য়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজাটা ভিতর হতে বন্ধই ছিল। কিরীটি দরজা খোলার সংকেত-ঘণ্টার দড়ির প্রান্তটা ধরে টেনে দরজাটা খোলাবার জন্য দড়ির সংগে সংযুক্ত ভিতরের ঘণ্টাটা বাজাতে যাবে, হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে অবিনাশ।

অবিনাশই কথা বললে, 'বুড়ো বাবু ত ঠিকই বলেছেন আপনারা এসেছেন। দরজাটা খুলে দিতে।—'

'বুড়ো বাবু! তিনি জানলেন কি করে যে আমরা এসেছি ?—' প্রশ্ন করল কিরীটিই।

'তা ত জানি না। তিনি দরজাটা এসে খুলে দিতে বললেন, তাই ত খুলতে এলাম—' মৃদু হাসির সঙ্গে কথাটা বললে অবিনাশ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

২০

আলিপুর বোমার মামলার পর অরবিন্দ রাজনৈতিক কর্ম্ম হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। মামলা চলিবার কালেই জেল-হাজতে থাকিবার সময়ই তিনি তাঁহার ঈপ্সিত ভগবৎ-সাধনা ও যোগ অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই নির্জ্জন কারাবাস যেন তাঁহার পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যই হইয়াছিল। অরবিন্দ গোপনে জাহাজ-যোগে পণ্ডিচেরীতে চলিয়া যান। পরবর্ত্তী কালে তিনি তথায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন।

ফাঁসী, দ্বীপান্তর, কারাগার কিছুতেই বিপ্লবীদের কর্ম্মশক্তিকে ম্লান করিতে পারিল না। বরং ইংরেজের এই রুদ্রনীতি বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে ঘৃতাহুতি-স্বরূপই কাজ করিল। আলিপুরের মামলার পর অখণ্ড কেন্দ্রীভূত দল ভাঙ্গিয়া যায়। এক এক মণ্ডলী স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। এই দলগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) উত্তরবঙ্গ দল, (২) পূর্ব্ববঙ্গের অনুশীলন দল, (৩) পশ্চিমবঙ্গ বা 'যুগান্তর' দল। কিন্তু প্রত্যেকটি দলই অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর সহিত পরামর্শ করিত; তিনি বিভিন্ন দলের যোগসূত্র হিসাবে রহিলেন।

যে সমস্ত বিপ্লবী বাহিরে ছিলেন তাঁহারা ক্ষণিকের জন্য ছন্নছাড়া হইলেও অতি অল্প দিনের মধ্যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া কাজ করা সুবিধা মনে করিয়া ছোট ছোট দল সৃষ্টি করেন। আত্মোন্নতি ও অনুশীলন ব্যতীত বহু ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হইল। কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত ও মোক্ষদা সামাধ্যায়ীর একটি দল গঠিত হয় এবং নিখিলেশ্বর রায় প্রভৃতিও একটি দল গঠন করেন। প্রভাসচন্দ্র দেব, ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির কেদার চক্রবর্ত্তী, প্রিয়শঙ্কর সেন, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতায় 'পন্থা' নামক বিদ্রোহাত্মক পুস্তক প্রকাশের জন্য দণ্ডিত বিপ্লবী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতা হইয়া অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত সংযোগ-সাধন ও গোপনে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশে রত হন। চোরবাগানে যোগেন্দ্রনন্দন ঠাকুরের ছাপাখানা ও হ্যারিসন রোড ও মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে প্রতিষ্ঠিত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের বণিক প্রেস হইতে গোপনে 'যুগান্তর' বাহির হইতে লাগিল। 'ছাত্র-ভাণ্ডারে'র দল শ্রমজীবি সমবায়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মজুমদারের সহিত একযোগে কাজ করিতে লাগিল। "ছাত্র-ভাণ্ডারের" দলস্থ অধ্যাপক বিমলচন্দ্র দেব, লাভ্‌লিমোহন মিত্র (পরে বঙ্গবাসী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক), যতীন্দ্রলোচন মিত্র প্রভৃতি বিদ্যাসাগর কলেজের কতিপয় ছাত্রের সহযোগিতায় 'যুগান্তর পত্রিকা' নামে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। যুগান্তর দলের হরিশচন্দ্র শিকদার ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছন্নছাড়া দলগুলিকে একত্রিত করিতে প্রয়াসী হইলেন।

এই সময় ঢাকার অনুশীলন সমিতির দল ব্যতীত অন্যান্য সকল দলই অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্ব স্বীকার করে। পরে অবিনাশচন্দ্র উপযুক্ত লোক হিসাবে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব বাঞ্ছনীয় মনে করাতে, যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব সকলে মানিয়া লয়। দলগুলির সাধারণ সদস্যগণ অপর দলের সন্ধান না রাখিলেও, নেতাগণের মধ্যস্থতার যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নাই।

এ সময়ে যে সকল দল গঠিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত দলগুলির সন্ধান ললিত চক্রবর্ত্তী হাওড়া ষড়যন্ত্রের মামলায় ফাঁস করিয়া দেয়:—(১) শিবপুর দল, (২) কুর্চ্চি দল, (৩) খিদিরপুর দল, (৪) চাঙ্গরিপোতার দল, (৫) মজিলপুর দল, (৬) হলুদবাড়ীর দল, (৭) কৃষ্ণনগর দল, (৮) নাটোর দল, (৯) ঝাউগাছা দল, (১০) যুগান্তর দল, (১১) ছাত্রভাণ্ডার দল ও (১২) রাজসাহী দল। এই দলগুলি ব্যতীত আরও বহু দল ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে অনুশীলন দল, সাধনা সমিতির দল, বরিশালের প্রজ্ঞানন্দের দল, বগুড়ার যতীন্দ্র রায়ের দল প্রভৃতি প্রধান দলগুলি তখন যথেষ্ট সক্রিয় হইয়া উঠে।

আলিপুরে যে সময়ে বোমার মামলা চলিতেছিল, সেই সময়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী দলের উদ্যোগে কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতি সংঘটিত হয়। বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে চালু রাখিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন প্রচুর। প্রথমে বাংলার কয়েক জন ধনী গুপ্ত সমিতিগুলিকে অর্থ-সাহায্য করিতেন, কিন্তু পরে তাঁহারা যখন হাত গুটাইলেন তখন অর্থ-সংগ্রহের জন্য ইংরেজের টাকা কাড়িয়া লইবার সিদ্ধান্ত হয়।

এই সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "রাজনীতিক ডাকাইতি করিয়া বৈপ্লবিক কর্ম্মের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবার মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে প্রথম হইতেই ছিল। আমি যখন এই সমিতিতে যোগদান করি তাহার পূর্ব্বেই এ মতটা পাকাপাকিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কারণ দেশের লোক টাকা দেয় না। দুই-চার জন ত্রিফলেস ব্যারিষ্টার—যাঁহারা নেতাগিরি করিতেন তাঁহারাই কিছু কিছু সাহায্য করিতেন; কাজেই স্থির হইল, ইংরেজের টাকা কাড়িয়া লও। কিন্তু স্বদেশী যুগের পর যখন রাজনীতিক ডাকাইতি আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল যে ডাকাইতি কেবল দেশের লোকের উপর হইতে লাগিল। কারণ, বোধ হয় ইংরেজের বা গভর্ণমেণ্টের উপর ডাকাইতি করা তত সোজা নয়, নিরস্ত্র দেশের লোকের উপর করা যত সোজা।

"বঙ্গে রাজনীতিক ডাকাইতির ইতিহাস এক 'মেলো ড্রামার' অভিনয়। ইহা বঙ্গেই সংঘটিত হইতে পারে। বাংলা আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীর দেশ। সেই অভিনয়ই বঙ্গে পুনঃ পুনঃ হইয়াছিল। ...ডাকাইতি বা গুপ্তহত্যা বীরত্বের লক্ষণ নয়। বীর জাতিরা এই সব উপায় অবলম্বন করে না, তাঁহারা সম্মুখ-যুদ্ধ করে। বাংলা ডাকাইতির দেশ; সেই জন্যই রাজনীতিক ডাকাইতির ছড়াছড়ি হইয়াছিল। ইহার ফলও শোচনীয় হইয়াছিল। ইহার জন্য নিজেদের মধ্যে দলাদলি হয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদের নিকট টাকা লুকাইয়া রাখা হইত তাঁহারা গচ্ছিত অর্থ অনেক স্থলে আত্মসাৎ করিয়াছেন।

"ডাকাইতি লইয়া বঙ্গে দলাদলি ছিল। আমার বোধ হয়, কোন কোন লোকের কাছে ইহা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পরিণত হইয়াছিল। এই সব দলের লোক বলিয়াছেন যে, মহাশয়, যেদিন একটা ডাকাইতি বা হত্যা হইয়াছে সেই স্থানে হুড়হুড় করিয়া দলে সভ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শেষকালে এই সব বিভিন্ন দল ভাল যুবক সংগ্রহ করিবার দিকে নজর না দিয়া কেবল মাত্র সভ্যশ্রেণী বাড়াইবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। সেই জন্যই হুজুগে ছোকরা দলে লওয়া হইয়াছিল। ফলে ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে ধর-পাকড়ের সময় অনেক ছেলে ধরা পড়িলেই সব গুপ্তকথা বলিয়া দিত। শেষাশেষি বোধ হয় বেশীর ভাগই বাজে সভ্য লওয়া হইয়াছিল।"

ডাকাত দলের সদস্য-তালিকাভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত :—

"স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই অসৎ কর্ম্ম জানিয়াও আমরা ডাকাতি করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাতি-লব্ধ অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করিয়া সমস্ত অর্থই নেতাকে দিব এবং তিনি পারিবারিক অভাব বুঝিয়া যাহা অর্পণ করিবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।

"যাহারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী, গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর, কপটাচারী, মদ্যপ, বেশ্যাসক্ত, অসৎ প্রকৃতির, দরিদ্র ও দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারী, জ্ঞাতি অথবা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, অতিরিক্ত সুদখোর, ধনী অথচ অতিরিক্ত কৃপণ, কেবল মাত্র তাহাদের বাড়ীতেই ডাকাতি করিব।

"শপথ করিতেছি যে ডাকাতি উপলক্ষে কোন রমণী, শিশু, দুর্ব্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতির প্রতি কদাচ কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।"

অনুশীলন সমিতির সভাপতি প্রমথ মিত্র মহাশয় কোন প্রকার ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহের বিরুদ্ধে থাকিলেও সমিতির অধিকাংশ সভ্যই ডাকাতির অনুকূলে মত পোষণ করিতেন। একবার এই উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে সমিতির কোন সভ্য রিভলবার চাহিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিষম রাগান্বিত হন এবং এই যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন।

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যখন সার্কুলার রোডের আখড়া স্থাপিত হয়, তাহার কিছু দিন পরে সর্ব্বপ্রথম তারকেশ্বরে ডাকাতির চেষ্টা হয়। ইহার কিছু দিন পরে জন কয়েক কর্ম্মী কড়েয়ায় রাজনীতিক ডাকাতি করেন। এক জন ফিরিঙ্গিকে ধরিয়া তাহার টাকা কাড়িয়া লওয়া হয়।

ডাকাতি সম্পর্কে বিপ্লবীদের প্রথম দিকে দৃঢ়তার অভাব ছিল বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রংপুরে মহীপুর গ্রামে যে ডাকাতির প্রচেষ্টা হয়, তাহা গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে এই সংবাদেই পরিত্যক্ত হয়। মানিকতলার বোমার রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এই ডাকাতির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "আমি টাকা লইয়া রংপুর চলিয়া যাই। আমার পূর্ব্বেই প্রফুল্ল চাকী চলিয়া গিয়াছিল। আমি, হেম দাস, মহেন্দ্র লাহিড়ী ও পরেশ মৌলিক ছিলাম। প্রফুল্ল চাকী আর পরেশ আমাদের গাইডের কার্য্য করে। সেখানে প্রথমে আমরা বলিহার জমিদারের কাছারীতে যাই। ঈশান চক্রবর্ত্তী ও তার ছেলে মনোরথ আমাদিগকে সাহায্য করে। মনোরথও এক জন জমিদার।···কিন্তু মনোরথ রাত্রে আমাদিগকে খবর দেয় গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে, বোধ হয় পূর্ব্বে কোন রকমে সংবাদ পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। আমরা চলিয়া আসিলাম।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাঁকুড়ায় পুনরায় এক ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নরেন্দ্রনাথ তাহার স্বীকারোক্তিতে আরও বলেন, "অতঃপর বাঁকুড়ায় যাই···সেখান হইতে হাঁসডাঙ্গা যাই। স্থির হয় যে রাত্রে মোহান্তের বাড়ী লুঠ করিব। মোহান্তের অনেক টাকা আছে।···বীরেন্দ্র, আমি, নিরাপদ ও প্রফুল্ল চাকী ছিলাম। রাজার দারোয়ান প্যালারাম সময় বুঝিয়া আমাদিগকে খবর দিবে কথা ছিল। কিন্তু সেই লোকটা এত মদ খাইয়াছিল যে আমাদের কাজ হয় নাই।"

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যদের ডাকাতি করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। শশী সরকার নামক এক জন লক্ষ্যভেদী শিকারীর নিকট হইতে যুবক দল বন্দুক চালনা শিক্ষা করিত ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মাঝিদের নিকট হইতে নৌ-চালনা করিতে অভ্যাস করিত।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনুশীলন দল সর্ব্বপ্রথম ঢাকা জেলার অন্তর্গত শেখরনগর গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি করে। এই ডাকাতিতে বিশেষ সুবিধা হয় না; অপহৃত লোহার সিন্দুকের ভারে নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে সামান্য টাকা লইয়াই ডাকাত দলকে ফিরিতে হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জে একটি ডাকাতি হয়। বিপ্লবীরা মাত্র ৮০৲ টাকা আনিতে সমর্থ হয়। এই ডাকাতি সম্পর্কে এক জন ছোরার আঘাতে আহত হয়। উক্ত বর্ষে আগষ্ট মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত আরগুলিয়া গ্রামের নিকট একটি পাটের অফিসে ডাকাতির এক প্রচেষ্টা হয়। উক্ত অফিসের লোকেদের নিকট একটি দোনলা বন্দুক আছে জানিতে পারায় ঐ ডাকাতির প্রচেষ্টাও পরিত্যক্ত হয়।

১৯০৭ সালের শেষ ভাগে মেদিনীপুর হাটগেছ্যায় সরকারী ডাক লুণ্ঠিত হয়। পূজার ছুটিতে ক্ষুদিরামের ভগিনীপতি অমৃত বাবু তাঁহার হাটগেছ্যার বাড়ীতে সপরিবারে যান। গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে ক্ষুদিরাম স্থানীয় ডাক-হরকরার নিকট হইতে সরকারী ডাক লুঠ করিবার মনস্থ করেন। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিবার নিমিত্ত ক্ষুদিরাম এক জন সহকর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া উক্ত গ্রামে তাঁহার ভগিনীপতির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ডাক লুঠ সম্পর্কে তাঁহার দিদি অপরূপা এক বিবরণে বলেন: "১৯০৭ সালের পূজার সময় আমরা হাটগেছ্যায় যাই। সেখানে লক্ষ্মীপূজার পর কালীপূজার মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের এক সন্ধ্যার সময় ডাক-হরকরার মেল-ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সেই দিন সন্ধ্যার সময় জানতে পারি, ক্ষুদিরামই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এক জন দেখেছিল—কিন্তু পুলিশ তদন্তের সময় কেউ কোন কথা বলেনি। এর ফলে নিরপরাধ মঙ্গল ডুলের হ'ল আট মাস জেল। আমার কাছে ধরা প'ড়ে যাওয়াতে ক্ষুদিরাম সেই দিনই সকলের অগোচরে গভীর রাতে ধান-জমির জল-কাদা ভেঙ্গে ৮ মাইল পথ হেঁটে গোপীগঞ্জের ষ্টীমার ধরে। তার পর কোলাঘাট হ'য়ে মেদিনীপুরে চলে যায়।"

১৯০৮ সালের ৩রা এপ্রিল হাওড়া জেলার অন্তর্গত শিবপুরে

শ্রীহরিণপাড়াতে এক ডাকাতি হয়। ডাকাত দলের নিকট ছোরা ও পিস্তল ছিল। গহনা ও নগদে প্রায় চারি শত টাকা লুণ্ঠিত হয়।

মানিকতলার বোমার মামলা সম্পর্কে অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইবার ঠিক এক মাস পরে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ২রা জুন অনুশীলন দল ঢাকা, নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাহ্রা গ্রামে একটি ডাকাতি করিয়া ২৫৮৩৭৲ টাকা লুণ্ঠন করে। এই ডাকাতি সংঘটিত হয় এক অসৎ ধনী-পরিবারের গৃহে। রাইফেল, রিভলবার ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রায় ৫০ জন যুবক দুইটি নৌকায় চড়িয়া বাহ্রা গ্রামে প্রবেশ করিয়া এই লুণ্ঠন সম্পন্ন করে। গ্রামের লোক বাধা দেওয়াতে এক সংঘর্ষ বাধে এবং গুলীতে কেহ কেহ আহত হয়। এই ডাকাত দলের নেতৃত্ব করিয়াছিল বিক্রমপুরের শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অংশ গ্রহণ করেন—আশুতোষ দাশগুপ্ত ও অমৃতলাল হাজরা।

সংবাদ পাইয়া সাভার থানার দারোগা নৌকা করিয়া ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং পুলিশের গুলী গোপাল নামক একটি যুবকের ললাটে বিদ্ধ হওয়াতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাত্রিকালে দেহে ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। গোপালই ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রথম শহীদ।

এই ডাকাতির বর্ণনা প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, "ডাকাতেরা সম্ভবতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়ী আক্রমণ করিতে পারে নাই, তাহারা মধ্য-রাত্রিতে আক্রমণ করিয়াছিল এবং যখন তাহাদের লুণ্ঠন-কার্য্য শেষ হয় তখন প্রায় ভোর হইয়াছে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিয়া নৌকায় উঠিয়াছে, নৌকার দাঁড়ী-মাঝির কাজও তাহারাই চালাইয়াছে। অপ্রশস্ত খালের মধ্য দিয়া ডাকাতের দল নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। ডাকাত দেখার জন্য খালের দুই পাড়ে শত শত লোক নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে। ডাকাত ধরার জন্য বহু লোক বন্দুক, কোচ, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ডাকাতদের আক্রমণ করিয়াছে। ডাকাতের দল মাঝে মাঝে বন্দুক ছুঁড়িয়া লোকদিগকে ভয় দেখাইতেছে। ইতিমধ্যে থানায় সংবাদ পৌঁছিয়াছে। দারোগা পুলিশ কনষ্টেবল ও বন্দুক সহ উপস্থিত হইয়াছে। খণ্ডযুদ্ধ সুরু হইয়াছে। এ ভাবে কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়াছে। ডাকাতের দল ছোট নদী হইতে বড় নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। চারিদিকে সংবাদ পৌঁছিয়াছে। বিভিন্ন থানার পুলিশ বাহিনী সহ দারোগারাও বন্দুক লইয়া ডাকাত ধরার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। লড়াই চলিতেছে। ধলেশ্বরী নদীতে শত শত নৌকা সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছে। উভয় পক্ষ হইতে গুলীর আওয়াজ আসিতেছে, উভয় পক্ষেই হতাহত হইয়াছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন এ ভাবেই চলিতেছে। ডাকাতির সংবাদ ইতিমধ্যে ঢাকাতে পৌঁছিয়াছে। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ডাকাত ধরার জন্য গুর্খা সহ 'লঞ্চ' যোগে রওনা হইয়াছেন। ডাকাতেরা ছিল তরুণ যুবক। আহার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত পরিশ্রম করিতেছে। হতাহত হইতেছে। নৌকা গুলীবিদ্ধ হওয়ায় অনবরত নৌকায় জল উঠিতেছে। কয়েক জন জল সেচার কাজে নিযুক্ত আছে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চারিদিক অন্ধকার, ধলেশ্বরী নদী

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছে। ধলেশ্বরীর রুদ্র মূর্ত্তি, উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া বহু লোকের মনে ডাকাত ধরা অপেক্ষা প্রাণ বাঁচানোর চিন্তাই প্রবল হইল। নিশার অন্ধকারে ডাকাতের নৌকা যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল, কেহ তাহার সন্ধান পাইল না।"

শচীন্দ্রনাথ ও শশী এই ডাকাতির পর ফেরার হয় এবং বহু দিন পর কাশীতে দলের সহিত পুনরায় সংযোগ স্থাপন করে। অমৃতলাল পরে রাজাবাজার বোমার মামলায় ধরা পড়ে ও দণ্ডিত হয়। এই ঘটনায় পাঁচ জন নিহত ও কয়েক জন আহত হয়।

১৯০৮ সালের ৩০শে অক্টোবর আর একটি বড় রকমের ডাকাতি হয় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নড়িয়া গ্রামে। কিন্তু এই ডাকাতিতে ডাকাত দলের বিশেষ লভ্য হয় নাই। প্রায় ৩০।৪০ জন যুবক বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নৌকা করিয়া উক্ত গ্রামে অবতরণ করে। তাহারা নৌকা হইতে নামিয়াই ইতস্ততঃ গুলী বর্ষণ করায় নৌকার মাঝিরা এবং গ্রামবাসীরা পলায়ন করে। ইহার পর ডাকাত দল ষ্টীমার-অফিস এবং তিনটি বাড়ী লুঠ করিয়া মাত্র ৬৭০৲ টাকা পায়। লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে বাজারে এবং কয়েকটি গৃহে অগ্নি সংযোগ করার ফলে প্রায় ৬৪০০৲ টাকা ক্ষতি হয়। সরকার পক্ষে অপরাধীর সংবাদ প্রদানকারীকে এক সহস্র টাকা পুরস্কার দিবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই। এই বর্ষের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ময়মনসিংহ জেলায় বাজিতপুর গ্রামে এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার বিঘাটি গ্রামে ডাকাতি হয়। উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকটি যুবক পুলিশের বেশে এবং রিভলবার প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া থানাতল্লাসীর অজুহাতে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করে। ডাকাত দল বাজিতপুরের ডাকাতিতে ১৫০০৲ টাকা এবং বিঘাটির ডাকাতিতে ৫৩৬৲ প্রাপ্ত হয়। বিঘাটি ডাকাতি মামলায় এক জনের ছয় বৎসর, দুই জনের পাঁচ বৎসর এবং এক জনের সাড়ে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বাজিতপুর ডাকাতি মামলা সম্পর্কে এক জনের দেড় বৎসর এবং আর এক জনের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বাজিতপুর ডাকাতির ঠিক পূর্ব্বদিন সাটিরপাড়া বিপ্লব-কেন্দ্রের ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী নৌকা চুরির দায়ে গ্রেপ্তার হন। উক্ত নৌকা চুরি সম্পর্কে এক বিবরণে তিনি বলেন, "সাটির পাড়ার নিকট মাছিমপুর গ্রামে আমাদের শাখা-সমিতি ছিল। সেই সমিতির সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ছিল দুই ভাই। তাহারা উভয়েই পুলিশের গুপ্তচর ছিল। তাহারা খুব উৎসাহী, বিনয়ী এবং এতটা বাধ্য ছিল যে কেহ তাহাদের কোনরূপ সন্দেহ করেন নাই। মাছিমপুর সমিতিটি আমার এক সহকারীর অধীন ছিল। একদিন সংবাদ পাইলাম সহরে খেলার প্রতিযোগিতা হইবে। আমরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিব মনস্থ করিলাম। ইহা জানিতে পারিয়া গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্বয় আমার সহকারীর নিকট প্রস্তাব করিল যে, তাহাদের এক প্রকার নৌকা আছে, বিনা ভাড়ায় তাহারা সেই নৌকায় ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে। আমাদের নিজেদেরই নৌকা চালাইয়া যাইতে হইবে। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম। নৌকা ছয় মাইল দূরে শীতললক্ষার পারে ছিল—গুপ্তচর দুইটি আমাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া লইয়া চলিল। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আমরা নদীর ধারে এক নির্জ্জন স্থানে একটি নৌকা দেখিতে পাইলাম। গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্বয় সহ আমরা মোট আঠার জন ঐ নৌকায় ছিলাম। ঢাকা কত দূর—যাইতে কত দিন লাগিবে, এতগুলি লোক লইয়া যাইতেছি- তাহারা রাস্তায় কি খাইবে—ইত্যাদি চিন্তা আমার মাথায় আসে নাই, নৌকাতে কোন আলো ছিল না; উপরন্তু আমরা সকলে নৌকা চালানো সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলাম। যাহা হউক, স্রোত আমাদের অনুকূল ছিল, নৌকা চলিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে ডাঙ্গা বাজারে আমাদের নৌকা পৌঁছিল।

"সারা রাত্রি পরিশ্রমে সকলেই ক্ষুধার্ত্ত ছিল—বাজার নিকট দেখিয়া চিড়া-গুড় কিনিবার প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবে আমার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিলাম, 'টাকা তো আনি নাই।' যদু তখন আমাকে রক্ষা করিল। সে বলিল, টাকা আমার নিকট আছে। ...সেই টাকা হইতে চিড়া-গুড় কেনা হইল। এই সময় একটি গুপ্তচর বলিল, তাহার শরীর বিশেষ ভাল বোধ হইতেছে না, বাড়ীতেও একটু কাজ আছে। সে বাড়ীর কাজটুকু সারিয়া সেই দিনই ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিবে এবং সেইখানে আমাদের সহিত দেখা করিবে। আমি তখন কোন সন্দেহ করিতে পারি নাই, তাই তাহাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিলাম। সে চলিয়া গেলে আমরা নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। গুপ্তচরটি ডাঙ্গা বাজারে নামিয়া নরসিংদী থানার দারোগা সহ ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জে রওনা হইল।

"আমাদের নৌকায় থালা, বাটি, ঘটি কিছু ছিল না, কাজেই খাইবার খুব অসুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু উৎসাহ ও আনন্দে কেহ তাহা গ্রাহ্য করে নাই। বৈকালে আমাদের নৌকা নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিল। রাস্তায় যদুর খুব জ্বর হইয়াছিল। পূর্ব্ব-রাত্রিতে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিল। আমাদের সঙ্গে বিছানাপত্র কিছু ছিল না। জ্বরের ঘোরে কতকটা অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে। সঙ্গে গুপ্তচরটি, আমাদের নৌকা নিরাপদে রাখিবে বলিয়া স্থির ছিল, সে তদনুসারে ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল। যদুর সেবার জন্য আমি ও বিনোদ নৌকায় রহিলাম। অপর সকলকে ঢাকা পাঠাইয়া বলিয়া দিলাম, তাহারা ট্রেণে যাইয়া আমাদের সংবাদ দিবে। কিছুক্ষণ পর গুপ্তচরটি একটি হিন্দুস্থানী 'কনষ্টেবলকে' ময়লা কাপড় পরাইয়া বাসার চাকর সাজাইয়া আনিয়া আমাকে বলিল, সে তাহার এক আত্মীয়ের বাসার চাকর, সে নৌকা পাহারা দিবে। আমি নৌকার জন্য নিশ্চিন্ত হইলাম। ঘণ্টা খানেক পর দেখিতে পাইলাম, অনেকগুলি পুলিশ আমাদের দিকে দৌড়াইয়া ও লাফাইয়া আমাদের নৌকায় উঠিল। সারা নৌকা তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করিল কিন্তু কিছুই পাইল না। অবশেষে আমাদের গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল।"

বিচারের প্রহসনের পর ত্রৈলোক্যনাথ সহ তিন জনের চার মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রত্যেকের ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে দুইটি এবং পূর্ব্ববঙ্গে বাখরগঞ্জে একটি বড় রকমের ডাকাতি হয়। ২১শে নভেম্বর নদীয়া জেলার অন্তর্গত রায়তা গ্রামে এক ডাকাতির ফলে ১,১১৫৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ২রা ডিসেম্বর তারিখে হুগলী জেলার মরীহাল গ্রামে ডাকাতগণ মাত্র ১৩০৲ টাকা পায়। কিন্তু বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দেহারগতি গ্রামে ডাকাতির ফলে তিন হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। মরীহাল ডাকাতির সম্পর্কিত মামলায় এক জনের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

[ক্রমশঃ।
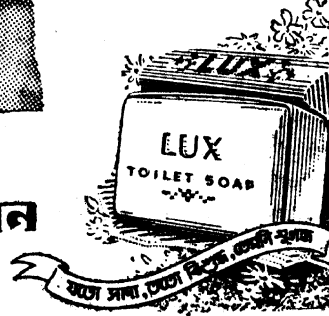
বিবাহে লোকাচার ও মেয়েলী সঙ্গীত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীকামিনীকুমার রায়

কন্যার পতি-গৃহে যাত্রা

সাধারণতঃ বিবাহের পরদিন বর কন্যাকে লইয়া স্বগৃহে যাত্রা করে। আমাদের সমাজে কন্যার এই প্রথম পতিগৃহে যাত্রা মাতাপিতার পক্ষে, বিশেষ করিয়া মাতার পক্ষে বড়ই বেদনাদায়ক। মুসলমান রাজত্ব-কালে ঘোর বিপদের মুখে প্রবর্ত্তিত 'অষ্টমবর্ষে গৌরীদান' প্রথা বর্ত্তমানে লোপ পাইলেও এবং আইনে যৌবন-বিবাহের নির্দ্দেশ থাকিলেও যেন পূর্ব সংস্কারবশেই এখনো পল্লীগ্রামে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ দেওয়া হয়। কন্যাকে পাত্রস্থ না করা পর্য্যন্ত পিতামাতার চিন্তা-চেষ্টার, দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। ছেলের বিবাহে যেমন চারিদিক দেখিবার, শুনিবার ও বুঝিবার পক্ষে অপেক্ষা করা যায়, মেয়ের বিবাহে তেমন দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিবার অবকাশ নাই,—তাহার বয়স বাড়িয়া গেলেই নিন্দাচর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং পিতামাতা কোনওরূপে তাহাকে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই যেন বাঁচেন। কিন্তু এই দায়মুক্তির পর হইতেই আরম্ভ হয় কন্যার কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা এবং স্নেহময়ী জননীর তীব্র অন্তর্জ্বালা। পিত্রালয়ের স্নেহ-শীতল সংস্পর্শ, আশৈশব পরিচিত সঙ্গি-সাথী, পাড়াপ্রতিবেশী, উদার-মুক্ত প্রকৃতি, পথঘাট, বৃক্ষলতা, পশুপাখী, প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবন—সমস্ত একদিনে পরিত্যাগ করিয়া সরলা বালিকা স্বামি-গৃহে যায়। সেখানে গিয়া স্বল্প-পরিসর সম্পূর্ণ এক নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে, বিভিন্নরুচি অপরিচিত লোকদের লইয়া, সম্পূর্ণ নূতন ভাবে, অশেষ বিধি-নিষেধ ও শাসন-সঙ্কোচের মুখে সে বধূ-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। অপরিচয়ের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন, পরকে আপন করা, আপনাকে পরের কারণে বিলাইয়া দেওয়া, সমস্ত বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলা বধূ-জীবনের ব্রত। এই ব্রতে সফল হওয়া খুব সহজ নহে। তদুপরি স্বামীর সংসার যদি সচ্ছল না হয়, সে-পরিবারের লোকেরা যদি অনুদার হয়, প্রতি কাজে আচার-ব্যবহারে ভুল-ত্রুটি ধরিবার নির্ম্মম চেষ্টা থাকে এবং স্বয়ং স্বামীও যদি দরদী না হয়, বালিকা-বধূর দুঃখ-দুর্গতির সীমা থাকে না। সংসার-ক্ষেত্রে অভিজ্ঞা জননীর বধূ-জীবনের এ-সকল কথাই জানা; একদিন তিনিও বধূ ছিলেন, আজ মা হইয়াছেন। কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে একদিন বিবাহ-সূত্রে পর-গৃহে যাইতে হইবে—ইহাই তো স্বাভাবিক,—ইহাই তো চিরকাল হইয়া আসিতেছে। তবু স্নেহের পুত্তলিকে দূরে পর-গৃহে পাঠাইতে স্নেহাতুর জননীর চিত্ত একটা অজানিত আশঙ্কা ও বেদনায় ভরিয়া উঠে। স্নেহ অতি বিষম বস্তু! কন্যা নিতান্ত বালিকাই হউক, আর পূর্ণবয়স্কাই হউক, তাহাকে দূরে স্বামি-গৃহে, নূতন পরিবেষ্টনীতে পাঠাইতে কোন্ মাতাপিতার না চক্ষু ছলছল্ করিয়া উঠে! শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে মহাকবি কালিদাস-বর্ণিত কণ্ব মুনির মনের অবস্থাটি মনে পড়ে। শকুন্তলা ছিলেন কণ্বমুনির পালিতা কন্যা। পরিণত বয়সে স্বেচ্ছাক্রমে তিনি রাজা দুষ্মন্তের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ স্থলেও শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে তপশ্চারী বনবাসী মহর্ষি কণ্ব শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মনে এই কথাগুলি আলোড়িত হইয়াছিল:—

"অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে! বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু।" মানব-চিত্তের এই যে কোমল-করুণ বাৎসল্য ভাব—ইহা চিরন্তন।

কন্যা'কে যাত্রা করাইবার কালে আসন্ন বিরহকাতরা জননীর হৃদয়-ভাবটি অবলম্বন করিয়া পল্লীরমণীরা অতি করুণ সুরে গীত গাহিয়া থাকেন, অথবা এককালে গাহিতেন। ঢোল, কাঁসী এবং শানাইতেও তখন করুণ সুর বাজিতে থাকে। এখানে কন্যাযাত্রার ময়মনসিংহের একটি মেয়েলী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল:—

"পরের ঘরে যাও রে কন্যা কন্যা আ রে কইয়া দেই তোর আগে,
দুঃখিনী জননীর কথা মা গো, তোমার মনে যেন থাকে।
কত কষ্টে পালন করলাম কন্যা আ রে করলাম আলা ঝালা,
না চাইতে হাতে তুইল্যা দিলাম কত সোহাগের ডালা।
দশ মাস দশ দিন কন্যা আ রে গর্ভে ধরলাম তোরে,
খাইতে শুইতে চলতে ফিরতে মরলাম কত দুর্ভাবনা করে।
কত নিয়ম পালন করলাম কন্যা আ রে বইস্যা ঘরের কোণে,
ভোগলাম কত বিষ বেদনা কেউর কাছে না কইয়া গোপনে।
নিদ্রা নাহি গেছি রে কন্যা দিছি কন্যা পেট ভইর্যা না দানা,
অসুখে বিসুখে আমি তোমার লাইগ্যা হইয়াছি দেওয়ানা।
কত মন্ত্র কত ঔষধ দিছি আইন্যা কত মুলুক খুইজ্যা,
অত বড় করলাম তোরে কত না যে দেব দুর্গা পূইজ্যা।
বর ভালা, ঘর ভালা পাইয়া কন্যা তোরে করলাম রে কোল ছাড়া,
তুই যে আমার প্রাণের নিধি তুই যে আমার নয়নের তারা।
দিবা নিশি ভাববাম রে কন্যা কন্যা রে তোর সোনা মুখখানি,
ঘরের বস্তু পরকে দিয়া কাইন্দ্যা মরবে অভাগী জননী।
মনে হইলেই মরবাম রে কন্যা তোমার লাইগ্যা জ্বলিয়া পুড়িয়া,
পাখ থাকিলে পঙ্খী হইয়া পড়তাম যাইয়া তোর কাছে উড়িয়া।
যাওয়ার কালে একটি রে কথা কন্যা আ রে কইয়া দেই রে তোরে,
বিষ খাইয়া বিষ হজম কইর্যা কন্যা তুমি থাইকো জামাইর ঘরে।
শাশুড়ী ননদীর কথা কন্যা তুমি শুইনো মন দিয়া,
হই না যে কলঙ্কিনী কন্যা তোমায় গর্ভেতে ধরিয়া।

এই সঙ্গীতটিতে মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-ধারা যেন শতমুখে উছলিয়া পড়িয়াছে! সন্তানের জন্য মা কত দুঃখ-কষ্টই না বরণ করেন! শুধু তাহাকে 'দশ মাস দশ দিন' গর্ভেই ধারণ করেন না, খাইতে

শুইতে চলিতে ফিরিতে সন্তানের জন্ম মায়ের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। তাহার মঙ্গলের জন্ম মা কত নিয়ম-ব্রত পালন করেন, কত দেব-দুর্গার পূজা করেন। সন্তান অসুস্থ হইলে মা পাগলপ্রায় হইয়া উঠেন, আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যান ; ডাক্তার ডাকেন, কবিরাজ ডাকেন, কত ঝাড়-ফোঁক, তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয় লন। এমন যে সন্তান,—প্রাণের নিধি, নয়নের তারা, সে যদি কন্সা হয়, নির্দ্দিষ্ট বয়সে তাহাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া দিতে হয়। তখন হইতেই মায়ের অন্তর্বেদনা তীব্রতর হইয়া উঠে। সংসারের প্রতি কাজে প্রতিদিন কন্সার সোনা মুখখানি তাঁহার মনে পড়ে, আর কেবলই নয়ন ঝরে। সঙ্গীতটিতে শুধু শোকের উচ্ছ্বাসই নাই, কন্সার প্রতি জননীর কয়েকটি সময়োপযোগী উপদেশও আছে: 'জামাতৃ-গৃহে যাইয়া শাশুড়ী ননদ সকলের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিও, কখনো তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণ করিও না ; বিষ খাইয়া বিষ হজম করিও—কেহ যদি তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে তুমি নীরবে তাহা সহ্য করিও ; তোমার আচরণে ও কার্য্যদক্ষতায় আমাদের বংশের যেন দুর্ণাম না হয়।'—এই সকল উপদেশ হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থার আদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

সেকালে যখন আট, নয়, কি আরও অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইত, তখন তাহাদেরও মনোবেদনার সীমা থাকিত না। মাঘমণ্ডল ব্রতে 'সূর্য্যাই ঠাকুরে'র বিবাহের যে গীত গাওয়া হয়, তাহাতে ইহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। নবপরিণীতা অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীকে লইয়া সূর্য্যাই ঠাকুর নিজ দেশে যাত্রা করিতেছেন। গৌরী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মায়ের আঁচল ধরিতেছে আর কাঁদিতেছে,—সে যাইবে না। মা সাশ্রুনেত্রে প্রবোধ দিতেছেন :

"টাকা নয় রে কড়ি নয় রে কোঁচরে রাখিমু।
পরের লাগ্যা হৈছে গৌরা পরেরে সে দিমু।"

সূর্য্যাই ঠাকুর ও গৌরী নৌকায় নদীপথে চলিয়াছে। মা বাপ ভাই বোন্ সকলের কান্না তখনো গৌরীর কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। সে মাঝিদের মিনতি করিয়া বলিতেছে :—

"ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে উঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি-ভাই মায়ের কান্দন শুনি।
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে উঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি-ভাই ভাইয়ের কান্দন শুনি।
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে উঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি-ভাই বুইনের কান্দন শুনি।"

সূর্য্যাই নানা ভাবে গৌরীকে প্রবোধ দিতেছে,—পিত্রালয়ের অনুরূপ সব-কিছুই সে স্বামি-গৃহে যাইয়া ফিরিয়া পাইবে। সেকালের অনেক 'গৌরী'কেই এই ভাবে পিত্রালয় ছাড়িয়া যাইতে হইত।

বয়স্কা শিক্ষিতা কন্সারা আজকাল পতিগৃহে যাত্রার সময় চীৎকার করিয়া কাঁদে না বটে এবং তাহাদিগকে প্রবোধও দিতে হয় না। বিবাহের পর এক রাত্রেই তাহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য এক পরিবর্ত্তন—ভাবান্তর ঘটে। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার 'পালামৌ' প্রবন্ধে অতি নিপুণ ভাবে এই পরিবর্ত্তনের একটি চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নববধূর মুখশ্রী প্রথম রাত্রেই একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাসও থাকে। তদ্ব্যতীত তাহাকে যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কুচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম। বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের দুরন্তপনার অন্ত থাকে না, তাহারা নিঃসঙ্কোচে খেলাধূলা করিয়া বেড়ায়, ভাইকে পিটায়, পথের গোরুকে গাল দেয়, বিবাহের কথা উঠিলে মুখ ভ্যাঙচাইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যেই বিবাহ হইয়া গেল, তাহার মধ্যে এক আশ্চর্য্য ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। 'বিবাহে লোকাচার ও মেয়েলী সঙ্গীত' প্রবন্ধে এই সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে, কাজেই আমরা আর অধিক বলিতে নিরস্ত হইলাম।

লোকমত এই যে, স্বামী কর্ত্তৃক নববধূকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অন্নবস্ত্র না দেওয়া পর্য্যন্ত সে শ্বশুরবাড়ীর কিছু গ্রহণ করিবে না। বহু সমাজে তাই কন্সাযাত্রার সময়ে পিত্রালয় হইতে কন্সার সঙ্গে কতক চাল, ডাল, মসলা ইত্যাদি দেওয়া হয়। নববধূ দুই-এক দিন তাহাই খায়। যাত্রাকালে বর ও কন্সা গৃহদ্বারে দুইটি আলপনাযুক্ত পিঁড়িতে বসে। তাহাদের সম্মুখে থাকে মঙ্গলঘট ও মঙ্গলদ্রব্যাদি, একটি পাথরের থালায় জল, ও একটি পাত্রে ধান। কন্সা এক হাতের উপর অন্য হাত আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া দুই মুষ্টি ধান তুলিয়া লয় এবং সেই ভাবেই দুই পার্শ্ব দিয়া তাহা পিছনের দিকে ফেলিয়া দেয়। তিন বার এইরূপ করিবার পর পাথরের জলে পা ধোয় বা পা ডোবায় এবং গুরুজনদিগকে প্রণাম ও স্বস্তিবাচন করিয়া উভয়ে যাত্রা করে। পিত্রালয় ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কন্সার ঐরূপে মুষ্টি মুষ্টি ধান্য নিক্ষেপের উদ্দেশ্য কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া কেহ বলিতে পারেন না। কাহারো মতে কন্সা ঐরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা পিতৃগৃহের ঋণ নাকি শোধ করিয়া যায়। ইহা যেমন হাস্যোদ্দীপক তেমনি বেদনাদায়ক। মাতাপিতার ঋণ কি কেহ কখনো শোধ করিতে পারে? এই আচার সকল সমাজে পালিতও হয় না।

বধূবরণ

বধূবরণ একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠান। বর যখন নববধূকে লইয়া স্বগৃহে আসিয়া পৌঁছায়, তখন তাহাদিগকে দেখিতে বা সাদর সম্ভাষণ জানাইতে সমস্ত পাড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। শাঁখ বাজে, উলু দেয়, গীত গায়, কলকোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। কিন্তু বধূবরণের পদ্ধতিও সর্ব্বত্র সকল সমাজে একরূপ নহে। কোনও কোনও সমাজে নববধূ পতিগৃহে প্রথম প্রবেশের মুখে বরের বাম পার্শ্বে উঠানে একটি আলপনাযুক্ত স্থানে দুধভরতি থালায় কাঁকে জলের কলস, মাথায় ধানের কুনকে, এবং হাতে একটি ছোট মাছ (সাধারণতঃ কই, লেটা বা চেং) বা মাছের ডোলা লইয়া দাঁড়ায়। আলতা ঢালিয়া বা অন্য কিছু মিশাইয়া দুধের রং লাল করিয়া দেওয়া হয়। বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা নববধূকে তখন সেই অবস্থায় বাস্তবিকই লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো মনে হয়, সে যেন প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মের উপর দাঁড়াইয়া আছে! অতঃপর মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কেহ অপর কয়েক জন পুরস্ত্রীর সঙ্গে 'বরণকুলায়' সজ্জিত বিবিধ মঙ্গলদ্রব্য দ্বারা বর ও বধূকে বরণ করিয়া ঘরে লইয়া যান। যাইবার পথে ঘরের মেঝে হইতে দরজা পর্য্যন্ত একটি কাপড় বিছানো থাকে, বর ও বধূ তাহা মাড়াইয়া যায় ; বধূ থাকে আগে, বর পিছনে, হাতের জাঁতি দিয়া সে বধূর মাথা হইতে দুই-চারটি করিয়া ধান সেই কাপড়ে

ফেলিতে ফেলিতে চলে। এইরূপ প্রথাও দেখা যায়,—বরণ-স্থানের সম্মুখে, প্রবেশ-পথে কেহ একটি পাত্রে দুধ জাল দিতে থাকে এবং উহা যখন উথলাইয়া পড়ে তখন বধূকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কি দেখিতেছ?' সে উত্তর দেয় 'সংসারের শ্রীবৃদ্ধি।' বরণের পর নববধূকে রান্নাঘরে নিয়া হাঁড়িভরতি এবং হাঁড়িঢালা ভাত দেখাইবার প্রথাও কোনও কোনও সমাজে আছে। বধূ যে সচ্ছল সংসারে আসিয়াছে, এ-সংসারে যে 'ভাত ফেলিয়া ভাত খায়', বধূর মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই হয়তো এককালে এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানেই দেখা যায়, বর-বধূকে বাটীতে প্রবেশের মুখেই এয়োস্ত্রীরা বরণকুলা মাথায় লইয়া বরণ করেন। কোথাও সেই সময় নবদম্পতির মাথার উপর দিয়া বাহিরের দিকে দুইটি ডিম ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে নাকি যাবতীয় বালাই দূর হইয়া যায়। প্রবেশ-পথে একটি কাপড় বিছাইয়া উহাতে ষোল মুষ্টি চাউল, ষোলটি, কি ষোলগণ্ডা কড়ি ও একটি নোড়া রাখিয়া দেওয়া হয়। বর-কন্যা গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় সেই কাপড়টি মাড়াইয়া অগ্রসর হয় এবং পিছন হইতে কয়েক জন এয়োস্ত্রী চাউল-কড়ি ইত্যাদি সহ উহা জড়াইয়া জড়াইয়া তুলিয়া লন। চৌকাঠের কাছে গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলে মা (তদভাবে মাতৃস্থানীয়া কেহ) বর ও বধূকে সস্নেহে কোলে বসাইয়া তাহাদের মুখে মিষ্টি (সন্দেশ, চিনি অথবা গুড়) তুলিয়া দেন। এই যে নববধূর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম পতি-গৃহে প্রবেশ, ইহাকে পূর্ব্বাঞ্চলের কোথাও কোথাও (ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা) "বউবরা' বা 'বউভরা' বলা হয়। এই উপলক্ষে ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও যে সকল গীত গাওয়া হইত এখানে তাহার একটি উদ্ধৃত হইল। ইহাতে বধূ-বরণের খুঁটিনাটি বিবরণও আছে:—

"চল রঙ্গ দেখি গিয়া,
রামচন্দ্র দেশে আইলাইন জানকীরে লইয়া।
দূত গিয়া বার্ত্তা কইলো কৌশল্যা গো রাণী,
তোমার রামচন্দ্র আইছে লইয়া জানকী।
দুয়ারে ফালাইয়া পিড়ি চাউল দিল মুটি,
কড়ি দিল ষোলগণ্ডা ফুল দিল পঞ্চটি।
বাইর 'হইলো রাজরাণী কুলা মাথায় দিয়া,
ঘরে নিল রামচন্দ্র সীতারে আর্ঘিয়া।
রামের মাথায় ধান্তদূর্ব্বা সীতার মুখে চিনি,
দুয়ারে ফালাইয়া পিড়ি বসলাইন রাজরাণী।
বাৎসল্যের ভরে রাণীর গদগদ তনু,
কোলেতে বইসাছে রাম মেঘের বরণ ভানু।
রাণীগণে রঙ্গভরে দিলাইন উলুধ্বনি,
এই মতে বধূবরা সাঙ্গ করলেন রাণী।"

বধূ-বরণ বা 'বউবরা'র পর অনেক পরিবারেই বর ও বধূর মধ্যে বিবাহ-রাত্রির অনুরূপ পুনরায় পাশা বা কড়ি খেলা হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত কাপড়ের পোঁটলাটি আনিয়া কেহ বধূর কোলে দেন, বধূ তাহা স্বামীর কোলে রাখে, স্বামী আবার তাহা বধূর কোলে ফিরাইয়া দেয়। পোঁটলাটি নাকি ভাবী সন্তানের দ্যোতক।

সাধারণতঃ বধূ-বরণের পরই আরম্ভ হয় বধূর মুখদর্শনের পালা। একটি পাটির উপর বর ও বধূ পাশাপাশি দাঁড়ায়; তাহাদের সম্মুখে থাকে আলপনার উপর একটি জলঘট (অধিবাসের ঘট), দধিপাত্র এবং শাদা রঙের কোনও মাছ। বর-বধূ উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন ও সামাজিক সজ্জনদিগকে সম্পর্কানুযায়ী প্রণাম ও নমস্কারাদি করে এবং তাঁহারা বিবিধ উপহার প্রদানের ভিতর দিয়া শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। পূজনীয়-পূজনীয়ারা তৎসহ নবদম্পতির মস্তকে ধান্ত-দূর্ব্বাও দিয়া থাকেন; মহিলারা বধূর মুখে চিনি-সন্দেশও দেন। এখানে সমাজ-বদ্ধ পল্লীগ্রামের কথাই বলা হইল; শহরে-বন্দরে সাধারণতঃ 'বউভাত' অথবা প্রীতিসম্মেলনের দিনেই এইরূপ 'লৌকিকতা'র অনুষ্ঠান দেখা যায়। বধূর মুখদর্শনের একটি সময়োপযোগী গীত এখানে উদ্ধৃত হইল। গীতটি ময়মনসিংহের।

"এস এস সখি তোরা সবে মিলে এইস্থানে
দাঁড়াইয়া নববধূ অতিশয় প্রফুল্ল মনে।
আহা কিবা মুখশশী, যেন শরতের শশী
ভূতলে পড়েছে খসি এই ভ্রান্তি হয় মনে।
আহা কিবা দন্তপাতি, মুকুতা রেখেছে গাথি
আরক্তিম বিম্বাধর শোভিত চাঁদবদনে।
সুকুন্তল সুগঠন বর্ণ চম্পক সম—
লক্ষ্মী যেন হয় ভ্রম দেখা দিল জনগণে।
কুলের যত রমণী হাতে নিয়া ক্ষীর চিনি
হ'য়ে সবে আহ্লাদিনী অর্পিছে বধূর বদনে।
পূর্ণঘট দধিপাত্র একটি মীন শুভ্র গাত্র
সকলি আছে একত্র সুমঙ্গল আচরণে।"

ভাত-কাপড়

'ভাত-কাপড়ে'র কথা আমরা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। ইহা স্বামী কর্ত্তৃক পত্নীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম অন্ন-বস্ত্র প্রদান। এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক পরিবারেই নববধূকে পিত্রালয় হইতে আনীত অন্নাদি মাত্র পরিবেশন করা হয়। কোথাও স্বামি-গৃহে আসিবার পর শুধু প্রথম রাত্রিতে বধূ সেখানকার কিছু গ্রহণ করে না। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, অন্ন-বস্ত্র দ্বারা আজীবন প্রতিপালন করিবার প্রতিশ্রুতি তো বর বিবাহকালেই অগ্নি সাক্ষী করিয়া দিয়াছে, তজ্জন্য আবার স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? মানুষের হৃদয়-প্রকৃতি এমনই যে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যেরই সূচনায় তাহারা একটু আমোদ-উৎসব, জাঁকজমক করিতে চায়, পাড়াপ্রতিবেশী সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করে। পত্নী স্বামি-গৃহে জীবনভর কি খায়, কি না খায়, কি পরে, কি না পরে, অতঃপর কেহ আর দেখিতে আসে না! তবু মানুষের একটা সংস্কার যে, আরম্ভটি ভাল হওয়া চাই, সর্ব্বতোভাবে দোষমুক্ত হওয়া চাই, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত সকলই ভাল যাইবে। বৎসরের প্রথম দিনে আমাদের অনেকেই ভাল খান, ভাল পরেন। উদ্দেশ্য হয়তো সমস্ত বৎসরই ভাল খাইবেন, ভাল পরিবেন। কিন্তু তাহা হইয়া উঠে কি? হয় না। আমরা শুভদিনে শুভক্ষণে সন্তানের মুখে ভাত দিই,—'অন্নারম্ভ' করি; কত লোকজন খাওয়াই, আমোদ-উৎসব

করি। কিন্তু সেই সন্তানকেও তো অন্নসংস্থানের জন্য পথে বিপথে, অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরিতে দেখি! তবু যে মানুষ জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করে, তাহার মূলে রহিয়াছে ঐ সংস্কার, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

সাধারণতঃ বিবাহের তৃতীয় দিবসে, মধ্যাহ্নে 'ভাত-কাপড়' অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; ইহা পূর্ববঙ্গেই অধিক প্রচলিত। এয়োরা পৃথক্ ভাবে এই 'ভাত-কাপড়ে'র রান্না রাঁধেন। উপকরণের অন্ত থাকে না,—মাছ, মাংস, ডিম, অতি সুগন্ধি মিহি চা'লের ভাত, পিঠা, পরমান্ন অনেক কিছু রাঁধা হয়। দধি দুগ্ধ ক্ষীর কিছুই বড় বাদ পড়ে না। শুভক্ষণে নববধূ শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে একটি পিঁড়িতে বসে এবং থালায় ও বাটিতে বাটিতে সব কিছু সাজাইয়া তাহার সম্মুখে আনিয়া দেওয়া হয়। স্বামী আসিয়া তখন অন্নের থালাটি এবং শঙ্খ, সিন্দুর ও শাড়ীখানি বধূর হাতে তুলিয়া দেন; চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে ও উলুধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। ভাত-কাপড়ের এই শাড়ীটি, অন্ততঃ ইহার পাড় লাল হইলেই ভাল হয়, কালো কখনই চলিবে না। স্বামি-দত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি বধূ উপস্থিত ছেলেমেয়েদিগকে কিছু কিছু পরিবেশন করিয়া পরে নিজে খান। 'ভাত-কাপড়ে'র সময় পল্লীরমণীরা এক সময়ে যে ধরণের গীত গাহিতেন এখানে তাহার দুইটি উদ্ধৃত হইল। প্রথম গানটিতে আচারের খুঁটিনাটি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি হইতে মনে হয়, বর বিদেশে চাকুরি করে, মাত্র কয়েক দিনের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে, হয়তো 'ভাত-কাপড়ের' পরদিনই চলিয়া যাইবে। তাই এই গানটিতে নববধূর আসন্ন বিরহ-ব্যথা উথলিয়া উঠিয়াছে এবং স্বামীর প্রবোধবাক্য তাহাতে স্থান পাইয়াছে।—

১

"দেখ দ্বারকা ভবন, রুক্মিণীরে অন্ন-বস্ত্র দিছে নারায়ণ!
শঙ্খ বস্ত্র সঙ্গে নিয়া ফুলমালা চন্দন
স্বর্ণ থালে শাইলের অন্ন অতি সুলক্ষণ।
চতুর্দ্দিগে খণ্ড খণ্ড বাটিতে ব্যঞ্জন
দধি দুগ্ধ ঘৃত আর অপূর্ব্ব মাখন
বেষ্টন কইর্য়া বইস্যা আছে নন্দের নন্দন
সামনে আইস্যা রাজকুমারী দিলা দরশন
ভাত-কাপড় দিয়া কৃষ্ণ তোষিলেন মন
মঙ্গল জোকার দিল যত সখীগণ।"

২

"নাগর, তুমি বৈদেশে যাইও না।
একলা ঘরে কাইন্দ্যা মরে সুন্দরী ললনা।
এখন হইতে নাগর তোমার পায় লাগলো বেড়ি
সুন্দর মুখ তার মলিন 'হইবো কর যদি দেরী
চুপি দিয়া চাইয়া থাকবো আম গাছের তলায়
যেখানে সোনার কোকিল আমের মুকুল খায়।
আমের মুকুল খাইয়া কোকিল কুহু কুহু করে
বিরহিণী নারী বল কেমনে ধৈর্য্য ধরে?

—থাক থাক সুন্দরী গো, ধৈরয ধরিয়া
তোমার লাইগ্যা আন্‌বাম সিন্দুর থালেতে ভরিয়া
থাক থাক সুন্দরী গো, তিন দিনের লাগিয়া
পাটেশ্বরী শাড়ী আন্‌বাম তোমার লাগিয়া
থাক থাক সুন্দরী লো, পথের পানে চাইয়া
টাকা থাইক্যা শাঁখা চুড়ি আন্‌বাম কিনিয়া
এরে বুল্যা হাতে তুইল্যা ভাত-কাপড় দিল
চারিদিগে নারীগণ জোকার করিল।"

বউভাত বা পাকস্পর্শ

বিবাহের পর বর নববধূকে লইয়া স্বগৃহে আসিলে বরপক্ষ হইতে একদিন সমাজের সকলকে ভোজ দিতে হয়। এই প্রথা বাংলার সর্ব্বত্রই সকল সমাজে প্রচলিত আছে। অন্য বহু প্রথা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু সংসার-সমাজে থাকিতে হইলে এই প্রথা পালন করিতেই হয়। সমাজ-বন্ধনকে সুদৃঢ় করিবার পক্ষে এমন সহজ সূত্র আর নাই। 'বৌভাত' বা 'পাকস্পর্শের' ভোজ-প্রথা উপলক্ষে নববধূ স্বামি-গৃহে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া প্রথম পাক স্পর্শ করে এবং তাহার স্পৃষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়া বরের আত্মীয়-বান্ধব ও সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা তাহাকে নিজেদের সমাজে তুলিয়া লন। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও নববধূকে ভোজনশালায় উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভোজনপাত্রে সর্ব্বপ্রথমেই নিজ হাতে কিঞ্চিৎ ঘৃতান্ন পরিবেশন করিতে হইত। বর্ত্তমানে নববধূর এইরূপ সাক্ষাৎভাবে পরিবেশনের গণ্ডী ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে, শহর-বন্দরে প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। পূর্ব্বে এই পাকস্পর্শের ভোজ লইয়া প্রায়ই গোলযোগের সৃষ্টি হইত। হীন 'ঘর' হইতে কন্যা আনিলে সমাজপতিরা বরের নিকট হইতে উপযুক্ত 'বিদায়' না পাইয়া আহার করিতেন না। তর্কে-বিতর্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি কোনও ক্ষেত্রে দুই-এক দিনও চলিয়া যাইত, রন্ধনশালায় অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পচিয়া উঠিত, ক্ষুধার তাড়নায় ছেলেমেয়ের দল ছট্‌ফট্ করিতে থাকিত, তবু মীমাংসা হইতে চাহিত না। এইরূপে যে কত ভোজ, কত আয়োজন-উদ্যোগ নষ্ট হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন লোকের অবস্থা সচ্ছল ছিল, কোন ব্যয়কেই তাহারা অপব্যয় বলিয়া মনে করিত না। হাতে যথেষ্ট সময় থাকিত, অতি সামান্য বিষয় লইয়াও কুতর্কে দিনকে দিন, রাতকে রাত কাটাইয়া দিতে পারিত।

বিবাহোপলক্ষে আত্মীয়-বান্ধব এবং স্ব-সমাজের ঘনিষ্ঠ সকলকে পান দিয়া নিমন্ত্রণ করিবার রীতি এক সময়ে বহুপ্রচলিত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগ্রামে অনেক সমাজে এখনো 'পাকস্পর্শ' বা 'বৌভাত'এর নিমন্ত্রণ পান দিয়া করা হয়। এই ভোজের নির্দ্দিষ্ট কোনও দিন নাই ; সাধারণতঃ বিবাহের তৃতীয় দিবসে অথবা যত শীঘ্র সম্ভব হয় তৎপর কোনও সময়ে ইহা হইয়া থাকে। ভোজের পূর্ব্বদিন বর বা বরপক্ষীয় কেহ, যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত হইয়া এক খিলি পান তাঁহার হাতে তুলিয়া দেন, অথবা পানের বাটাটি তাঁহার দিকে আগাইয়া ধরেন এবং ভোজে যোগদানার্থ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি পান গ্রহণ করেন, তবেই তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ; আর যদি পান প্রত্যাখ্যান করেন, তবে নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করিলেন—বোঝা গেল। অবস্থার চাপে পড়িয়া ক্রমে এই প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া নিমন্ত্রণ করাই ছিল চিরাচরিত রীতি। এই জন্যই পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলে মার্জ্জনা চাওয়া হয়।

ফুলশয্যা

বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই 'ফুলশয্যা' বা 'শুভরাত্রি' আচারটি সুপ্রচলিত। বিবাহ-রাত্রির পর একদিন একরাত্রি বাদ দিয়া বিবাহের তৃতীয় রাত্রিতে এই মনোরম অনুষ্ঠান আচরিত হইয়া থাকে। ইহার সমস্ত ব্যয়ই বহন করেন কন্যার পিতা বা অভিভাবক। কন্যাপক্ষ হইতে যথাসময়ে 'তত্ত্ব' আসে। বর-বধূকে বসন-ভূষণে, মালা-চন্দনে আবার নূতন করিয়া সাজানো হয় ; গৃহতল, শয্যাতল সুগন্ধি ফুলের আস্তরণে অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়া ওঠে ; ধূপ-দীপ জ্বলে, শঙ্খ বাজে, বান্ধব-বান্ধবীরা মিলনের গান গায়, ছেলেমেয়ের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। সুসজ্জিত কক্ষে, সুসজ্জিত বেশে বর-বধূ পাশাপাশি বসে, সম্মুখে থাকে কত কি মিষ্টির থালা ! বর-বধূ সহাস্য বদনে সকলকে তাহা একে একে বাঁটিয়া দেয়, নিজেরাও সামান্য গ্রহণ করে। পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও সমাজে দেখা যায়, নববধূ তখন ডাবের জল দিয়া স্বামীর পা ধুইয়া দেয় এবং মাথার চুল খুলিয়া তাহা মুছিয়া লয়। ক্রমে কলকোলাহল থামিয়া আসে এবং নবদম্পতি নিভৃতে শয়ন করে।

ফুলশয্যার রাত্রিতে বর্ত্তমানে মিলনের অনেক আধুনিক গান শুনা যায়। সেকালে পল্লীরমণীরা নিজেদের রচিত গান নিজেরা গাহিতেন। এখানে একটি উদ্ধৃত হইল :

নেহার যুগল রূপ ভুবনমোহন
আ মরি কি মধুময় প্রেমলীলা রঙ্গ
শশধরে চকোরে মিলন।
ভ্রমর নলিনী যেন খেলিছে প্রেমের খেলা
উথলিছে প্রেমের তরঙ্গ।
প্রেমের আবেশে ভুলি প্রেমময়ী কুতূহলী
প্রেমময় করে বিলোচন।

কতকগুলি মেয়েলী আচার ও সঙ্গীতের তাৎপর্য্য বিষয়ে আমরা প'র আরও আলোচনা করিব।

[ক্রমশঃ।

ব্রাহ্মণ-বন্দনা

"শতাধিক হস্ত দূর থেকে ব্রহ্মমূর্ত্তির অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দ্বারা
ব্রাহ্মণেরা সুপরিচিত হয়ে থাকেন।" —মহর্ষি বাল্মীকি

ভল্গা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রবাহন উপাখ্যান

স্থান—পাঞ্চাল (উত্তর প্রদেশ)
কাল—খৃষ্টপূর্ব ৭০০ শতাব্দী

[এই কাহিনী ১০৮ পুরুষ আগেকার, বৈদিক যুগের শেষ দিক্‌কার। এই কালেই উপনিষদের তত্ত্বকথা রচিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে ভারতে উদ্যান রচনা করা এবং লৌহ ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।]

"এক ধারে সবুজ বনানী করিণ্ডা ফলের গন্ধে আর পাখীর কূজনে ভরা—অন্য ধারে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা প্রবাহিনী, তীরে আমাদের হাজার হাজার পিঙ্গলবর্ণের গাভীগুলি চরে বেড়াচ্ছে, বলিষ্ঠ বণ্ডগুলি তাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই ধরনের রম্য দৃশ্য থেকে দৃষ্টি-সুখ লাভ ত অন্তত করতে পারো, প্রবাহন! কিন্তু তোমাকে দেখি দিবা-রাত্রই মন্ত্র উচ্চারণে নিবিষ্ট রয়েছ, অথবা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথা কণ্ঠস্থ করতে প্রবৃত্ত রয়েছ।"

"তোমার চোখ ত এ-সব দৃশ্য দেখে—আমি তোমার সেই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েই সুখলাভ করি, লোপা।"

"এই রকম কথা খুঁজে বের করতে তুমি খুব ওস্তাদ, অথচ তোমাকে যখন অন্য ছাত্রদের সাথে সারমেয়-চীৎকারে পুরাতন সব গাথা বার বার আবৃত্তি করতে শুনি—তখন আমার মনে হয় যে আমার প্রবাহন বোধ হয় সারা জীবন এমনি বালকই থেকে যাবে।"

"তাই বুঝি! তার সম্পর্কে তোমার ধারণা বুঝি তাই?"

"আমার এ ধারণার কথা ছেড়ে দাও—এটা ছাড়া আমার অন্য একটা অভিমতও আছে, সেটিই হচ্ছে আসল মত, তা হল এই যে—প্রবাহন চিরকাল আমারই থাকবে।"

"আমার আশা ও বিশ্বাসও তাই লোপা—আমার সমস্ত শ্রম ও অধ্যয়নে এই আশাই আমাকে শক্তি জোগায়। এই ভরসাতেই আমার মনকে আমি দৃঢ় ভাবে সংযত রাখি—তা না হলে অনেক সময়ই আমার মন উড়ে যেতে চায় ঐ সব পুরাতন কাব্য, শ্লোক বা স্তোত্র থেকে। আমার মাথা যখন শ্রমে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, যখন ইচ্ছা হয় সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি, তখন তোমার সাথে কয়েকটি মুহূর্ত অতিবাহনের প্রত্যাশাই আমায় একমাত্র প্রেরণা জোগায়।"

"আর আমি সারাক্ষণই প্রত্যাশা করে থাকি তোমার জন্যে।"

প্রভাতী হাওয়া লোপার চুলগুলোর মধ্যে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, লোপার দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছিল বহু দূরে। মনে হচ্ছিল সে যেন কোন্ সুদূরে চলে গেছে। প্রবাহন তার চুলগুলোর মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—"লোপা, তোমার তুলনায় আমার নিজেকে মনে হয় বামন বলে।"

"বামন!"—কথাটার প্রতিধ্বনি করে লোপা প্রবাহনের গালের উপর গাল রেখে বলল—"না প্রবাহন, প্রিয় আমার, তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত। সেই দিনের কথা আমার মনে পড়ে—যেদিন তুমি প্রথম এলে আমাদের বাড়ীতে আমার কাকীমার সাথে। আট বছরের বালক তুমি তখন, সেদিন তোমাকে আমি প্রথম দেখলাম আমার আরও ছোট বয়সের চোখ দিয়ে। আমার তখন সবে তিন বা চার বছর বয়স, কিন্তু শিশুকালের সেদিনের সেই ছবি আমার মন থেকে কোন দিনই মুছে যাবে না। এখনও স্পষ্ট সে-সব আমি চোখের সামনে দেখতে পাই—হলুদ রং-এর কোঁকড়োনো তোমার চুলগুলো, টিয়া পাখীর ঠোঁটের মত তোমার নাক, রাঙ্গা রং-এর হাল্কা ঠোঁট দুটি তোমার—বড় বড় উজ্জ্বল দুটি চোখ, আর গৌর বরণ তপ্ত তোমার সেই গায়ের রং। আমার মনে পড়ে আমার মা আমাকে ডেকে বললেন—'লোপা, এই তোমার এক দাদা।' আমার কেমন লজ্জা হল। মা তখন তোমাকে আদর করে চুমু খেয়ে বললেন—"প্রবাহন, তোমার এই ছোট বোনটি, লোপা, বড় লাজুক, তুমি ওর সাথে খেলা করো।"

"আমি তখন তোমার কাছে এগিয়ে গেলে তুমি আমার কাকীমার সত্তস্নাত মিষ্টি চুলগুলোর মধ্যে মুখ লুকিয়েছিলে।"

"আমি লুকিয়ে লুকিয়ে চুলগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম তুমি কি করো। বাড়ীতে আমার মা, দাসীকন্যারা এবং তাদের ছেলে-মেয়েরা ভিন্ন অন্য কেউ ছিল না। আমার বাবার বিদ্যাপীঠ তখনও গড়ে ওঠেনি। বাড়ীতে আমার বড় একা মনে হত, তাই তোমাকে দেখে আমি বড় খুশী হয়ে উঠেছিলাম।"

"খেলার সাথী পেলে তা ত হওয়ারই কথা। কিন্তু তবু তুমি মুখ লুকিয়েছিলে। আমি তোমার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—ছোট্ট একটি উলঙ্গ মেয়ে, ফোলা-ফোলা তার দুটো গাল। আমার ছেলে-বয়সের সেই চোখে তোমাকে মনে হল অপরূপ সুন্দরী। আমি তোমার কাছে গিয়ে তোমার পিঠে হাত রাখলাম। তোমার মনে আছে আমাদের মায়েরা তখন কি বলেছিলেন? তাঁরা দু'জনেই হাসিমুখে বলেছিলেন—'ঈশ্বর যেন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।'—তখন অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম না—তাঁদের ইচ্ছাটা কি ছিল।"

"আমার সবটা মনে নেই। আমার শুধু এইটা যথেষ্ট মনে আছে যে, আমার পিঠে আমি তোমার নরম হাতের ছোঁয়া পেয়েছিলাম।"

"তোমার মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল বোকা-বোকা—একটা বলের মত। তুমি এত লাজুক ছিলে।"

"তুমি আমার হাত দুটো তোমার হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিলে—কিন্তু তোমার মুখে কোন কথা ছিল না। তখন মা কি বলেছিলেন মনে আছে?"

"তাঁর সবগুলো কথাই আমার মনে আছে—আমি তার কথা ভুলব কি করে? আমার মা খুল্লতাত গর্গ্যের নিকট আমাকে রেখে ত বাড়ী চলে গেলেন, কিন্তু আমার কাকীমা'র স্নেহ আমার মাকে ভুলিয়ে দিল। কি করে আমি কাকীমাকে ভুলতে পারি?"

প্রবাহনের চোখ দুটো জলে ভরে এল—সে লোপার ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে দিল। "তাঁর মুখাকৃতি ছিল ঠিক তোমারই মত, লোপা! আমরা দু'জন ছেলেবেলায় পাশাপাশি শুতাম। তুমি ঘুমিয়ে পড়তে আমি অনেক সময় জেগে থাকতাম। কিন্তু কাকীমাকে আসতে দেখলেই আমি তাড়াতাড়ি চোখ বুঝতাম। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি আমার মুখে চুমু খেতেন। তখন আমি চোখ খুললে তিনি বলতেন—'এখন ওঠ, খোকামণি—' তার পর তোমাকেও চুমু খেতেন, কিন্তু তুমি তখনও ঘুমিয়ে থাকতে।"

লোপার চোখ দুটোও তখন জলে ভরে গিয়েছিল। সে সখেদে বলল—"আমার মাকে ত আমি অল্পই দেখেছি।"

"তা ঠিক। তার পর সেই প্রথম দিনে যখন আমি তোমার পাশে নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন—"ও তোমার বোন বাবা! ওকে চুমু দাও এবং ওর সাথে তুমি ঘোড়া-ঘোড়া খেলো।"

"তুমি আমাকে চুমু দিয়েছিলে এবং খেলবার জন্য আমাকে ডেকেছিলে। আমি মায়ের চুলের নীচে থেকে আমার মুখ বের করে নিয়ে এসেছিলাম। তার পর তুমি ঘোড়া সেজেছিলে এবং আমি তোমার পিঠে চেপেছিলাম।"

"আমি তোমাকে পিঠে চড়িয়ে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"সত্যি, আমি কি বেয়াদপ ছিলাম!"

"তুমি কোন দিন কোন-কিছুতে ভয় পাওনি লোপা! এর পর অচিরেই তুমি আমার সর্বস্ব হয়ে উঠলে। আমি খুল্লতাতের ভয়ে আমার পাঠ প্রস্তুত করতে কঠোর শ্রম করতাম, আর পরিশ্রান্ত বোধ করলেই তোমার কাছে আসতাম।"

"তোমার কাজের সময়ও তোমার পাশে আমি বসে থাকতাম—তোমার সঙ্গ পাবার জন্যে।"

"আমার ত মনে হয়, তুমি যদি আমার অর্দ্ধেক সময়ও পাঠে নিয়োগ করতে—তাহলে তুমি খুল্লতাতের শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে পারতে।"

প্রবাহনের চোখের দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে লোপা উত্তর দিল—"না, তোমার থেকে ভালো হতাম না। তোমাকে আমি কোন ব্যাপারেই অতিক্রম করতে চাই না।"

"কিন্তু তা করলে আমি খুব সুখী হতাম।"

"তার কারণ আমাদের দু'জনের যে পৃথক্ কোন সত্তা নেই।"

"লোপা, তুমি দেহে-মনে উভয়তই আমাকে শক্তি জুগিয়েছ! রাত্রে আমি কত কম ঘুমাতাম। নিজের পাঠ মুখস্থ করে এবং অন্যের পাঠ শুনেই আমি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে যেতাম। তুমি আমাকে পাঠশালার অন্ধকার থেকে টেনে বের করে আনতে এবং জোর করে হয় আমাকে বনের মধ্যে, উদ্যানে অথবা গঙ্গাতীরে বেড়াতে নিয়ে যেতে। তাতে কত উপকার আমার হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও অবশ্য ত্রিবেদ এবং ব্রাহ্মণের জ্ঞান যত দ্রুত সম্ভব অধিগত করতে আমি অভিলাষী ছিলাম।"

"এখন ত সব সমাপ্ত করেছ। বাবা ত বলেন, এখন তুমি তাঁর সমকক্ষ হয়েছ।"

"তা আমি জানি।"

"ব্রাহ্মণের জ্ঞান অধিগত করতে আমার সামান্যই হয়ত বাকী আছে। কিন্তু এতে করেই জ্ঞানার্জ্জন কিন্তু শেষ হয়ে যায় না।"

"আমিও ত তোমাকে সব সময়ে সেই কথাই বলছি। কিন্তু তুমি কি এখনও ছাত্রজীবনের পলাশ-দণ্ড এবং রুক্ষ কেশ ধারণ করে থাকতে চাও?"

"না, ও কথা আর বোলো না লোপা! আমি পলাশ-দণ্ড পরিত্যাগ করছি এবং তুমি এখন আমার এই ষোল বছরের রুক্ষ কেশে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিতে পারো।"

"আচ্ছা প্রবাহন, আমি কিন্তু বুঝতে পারি না, রুক্ষ কেশ সম্পর্কে এত হৈ-চৈ কেন করা হয়। রুক্ষ কেশ ধারণের এই সময় কালে তুমি ত কোন সময় আমাকে চুমু খেতে ইতস্তত করোনি।"

"না, কিন্তু তোমাকে ত আমি বাল্যকাল থেকেই চুমু খেতে অভ্যস্ত ছিলাম।"

"অন্যান্য বিদ্যাশ্রমের ছাত্ররাও কি একই ধরনের কঠোর নিয়ম পালন করে?"

"তা তারা করতে বাধ্য হয়—আসলে এ-সবগুলো করা হয় সুনাম কিনবার জন্য। ব্রাহ্মণ যুবকদের কঠোর নিয়মনিষ্ঠা থেকে এই সব রীতির উৎপত্তি হয়েছে বলে লোকে মনে করে।"

"আর ইতিমধ্যে কুরুরাজ আমার বাবাকে জনপদ, রৌপ্য, স্বর্ণ, দাস, এবং রথাশ্ব উপঢৌকন দিয়েই চলেছেন। আমার অনেকগুলো দাসী ত আগেই ছিল, আবার তিন জনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাদের দেবার মত কাজই নেই।"

"তাদের বিক্রয় করে দাও লোপা! তারা যুবতী, তাদের প্রত্যেকের জন্য তুমি ত্রিশটি করে স্বর্ণমুদ্রা ত অন্ততঃ পাবে।"

"ও, না, না! আমরা যে ব্রাহ্মণ এবং অন্যদের থেকে আমরা যে বেশী জ্ঞানী, কারণ জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ আমাদের বেশী আছে। কিন্তু যখন আমাদের ক্রীতদাসদের জীবনের কথা আমি ভাবি—আমি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, ভৃগু, অঙ্গিরা এবং অন্যান্য ঋষিদের এবং আমার বাবার মত ধনী ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে আমার ঘৃণা জেগে ওঠে। সর্বত্রই আজ ব্যবসা, দরকষাকষি, মুনাফাবৃত্তি আর লোভের ছড়াছড়ি, একদিন বাবা এক জন কৃষ্ণাঙ্গী দাসীর স্বামীকে কোশলের এক বণিকের নিকট পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রয় করলেন। দাসীটি ত আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, আর কত অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। আমিও বাবাকে তার হয়ে অনেক বললাম, কিন্তু বাবা বললেন—'সবগুলো ক্রীতদাসকেই যদি আমরা রাখি তাহলে আমাদের ঘরে জায়গা থাকবে না, তাছাড়া এ লোকটাকে দিয়ে আমাদের লাভই বা কি হবে?"

তাদের বিচ্ছেদের পূর্ব-রাত্রে তারা কি ভীষণ ভাবে কাঁদতে লাগল। তাদের একটি মেয়ে ছিল—দু'বছর তার বয়স। তার আকৃতি দেখে সবাই বলাবলি করত যে, আমার বাবার সাথে তার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। দাসীটি ভোর থেকে উঠেই কাঁদতে আরম্ভ করল। কিন্তু তার স্বামীকে বিক্রয় করেই দেওয়া হল। মনে হল সে যেন একটি জানোয়ার…মানুষ নয়। ব্রহ্মা যেন তাকে এবং তাঁর অন্য প্রজাবৃন্দকে এই কারণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আমি এই ধরনের প্রথায় কোন ক্রমেই আস্থা রাখতে পারি না, প্রবাহন! তোমার মত আমি ত্রিবেদ পড়িনি, কিন্তু আমি তা শুনেছি এবং বুঝতেও পেরেছি।

বেদে অপ্রাকৃত বস্তু, জগৎ, শক্তি বা সেই শক্তির মায়া বা বিভীষিকা ছাড়া অন্য কিছুই নেই।'

প্রবাহন লোপার উত্তেজিত গণ্ডে গণ্ড রেখে বলল—"আমাদের প্রেম যেন আমাদের মত-পার্থক্যকে বাড়িয়েই তুলছে।"

"এই মত-পার্থক্য আমাদের প্রেমকে আরও দৃঢ় করে তুলছে।"

"সে ঠিক লোপা! তুমি যে ভাবে কথা বলো, অন্য কেউ অমন করে বললে আমি চটে যেতুম। কিন্তু যখন তোমার ঐ মুখ থেকে আমি আমার দেবতা, গুরু বা শিক্ষকদের সম্বন্ধে নিন্দাবাক্য নিঃসৃত হতে শুনি, তখন আমার শুধু ইচ্ছা হয় ঐ মুখে চুমু এঁকে দিতে, কেন বলতে পারো?"

"তার কারণ আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই অনেক সময় পরস্পরবিরোধী দুটো মত থাকে—সেই পার্থক্যকে আমাদের সহ্য করতে হয়, কারণ সে বিরোধ আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংগ।"

"তুমিও ত লোপা আমার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ!

২

"তুমি কখনও শিবির শাল, কাশীর চন্দন অথবা সমুদ্র থেকে আহরিত এই রত্নাভরণ ব্যবহার করোনি। এ-সবে তোমার এত বিরাগ কেন প্রিয়ে?"

"এগুলো পরলে কি আমাকে বেশী সুন্দর দেখাবে?"

"আমার কাছে তুমি সব সময়ই সুন্দরী।"

"তাহলে এগুলো দিয়ে বোঝা বাড়িয়ে বা এগুলো বহনের কষ্ট পেয়ে আমার কি লাভ? সত্যি কথা বলতে কি প্রবাহন, তোমার মাথায় যখন তুমি ঐ গুরু বোঝাটা—যাকে তোমরা বলো রাজমুকুট—ওটা যখন তুমি পরো, তখন আমার দুঃখ হয়।"

"অথচ অন্য মেয়েরা কাপড়-গহনার জন্য লড়াই করতেও ত পিছপা হয় না!"

"আমি সে ধরনের মেয়ে নই।"

"তুমি সেই মেয়ে—যে পাঞ্চালের অধীশ্বরের হৃদয়েশ্বরী।"

"আমি প্রবাহনের স্ত্রী, আমি পাঞ্চালের অধীশ্বরী নই।"

"বেশ তাই! কিন্তু দেখ—আজকের এমনি দিনের কথা আমরা ত স্বপ্নেও ভাবতাম না। আমার খুল্লতাত একেবারেই এ কথা গোপন রেখেছিলেন যে আমি পাঞ্চালের এক জন রাজপুত্র।"

"বাবা এ ছাড়া আর কি করতে পারতেন? তোমার মা ছিলেন আরও প্রায় এক শত রাণীর মধ্যে এক জন। তোমার থেকে বয়সে বড় আরো প্রায় বারো জন রাজপুত্রও ছিলেন। তাই এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল যে, একদিন তুমিই পাঞ্চালের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে?"

"আচ্ছা লোপা, তুমি এই রাজপ্রাসাদে মোটেই সন্তুষ্ট হচ্ছ না কেন?"

"তার কারণ, আমি, এমন কি আমার পিতার সেই অট্টালিকাতেও সুখে ছিলাম না—যেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। আমাদের পক্ষে সে অট্টালিকা ত যথেষ্ট আরামেরই ছিল, কিন্তু আমাদের ক্রীতদাসদের পক্ষে কি তা ছিল? আর তার তুলনায় এই প্রাসাদ ত শতগুণে বড়। এই বিরাট প্রাসাদে একমাত্র তুমি আর আমি ছাড়া বাকী সবাই-ই ত দাস। ক্রীতদাসে পরিপূর্ণ এই প্রাসাদ কখনও স্বাচ্ছন্দ্যের আগার হতে পারে না। আমি ত আশ্চর্য্য হয়ে যাই এই ভেবে প্রবাহন যে—তোমার হৃদয়ও এত কঠোর হয় কি করে?"

"হৃদয় এত কঠোর বলেই ত এত তীক্ষ্ণ শরের মত রূঢ় কথা সহ্য করতে পারি।"

"না, কোন মানুষের এমন হওয়া উচিত নয়।"

"আমি শুধু মানুষ হতে চাইনি, আমি জ্ঞানী মানুষ হতে চেয়েছি—যদিও যখন আমি আত্মোন্নতিতে রত ছিলাম তখন কোন সময় এ কথা ভাবিনি যে, আমাকে কোন কালে এই রাজকীয় প্রাসাদে এসে স্থান গ্রহণ করতে হবে।"

"আচ্ছা, আমাকে ভালবাসতে হওয়ার জন্য তুমি কি দুঃখিত নও, প্রবাহন?"

"তোমাকে ভালবাসা আমার কাছে মাতৃদুগ্ধের মতই স্বাভাবিক, এর জন্যে আমাকে কোন প্রচেষ্টা করতে হয়নি। আমার জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে সে ভালবাসা। আমি জাগতিক মানুষ, লোপা, কিন্তু তোমার প্রেমের মূল্য আমি বুঝি। মন সব সময়ই একই ধারায় ধাবিত হয় না। যখনই কোন দুর্বলতা আমাকে পেয়ে বসে, জীবন আমার কাছে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে—তখন তোমার প্রেম এবং করুণাই আমাকে শুধু আশ্রয় দেয়।"

"কিন্তু যতটা আশ্রয় তোমাকে দিতে চাই তা কোন সময়ই আমি দিতে পারি না—তাতে আমি বড় বেদনা বোধ করি।"

"তার কারণ, আমি যে জন্মেছিলাম শাসন করতেই।

"কিন্তু এক সময়ে তোমার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল এক জন সুপণ্ডিত হবার?"

"তখন ত এ কথা আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবতাম না যে, আমাকে কোন দিন এই পাঞ্চাল রাজধানীর (কনৌজ) উত্তরাধিকারী হতে হবে।"

"কিন্তু রাজ্য-শাসনের সাথে সম্পর্ক নেই এমন সব কাজে মন দেওয়ার তোমার প্রয়োজন কি?"

"সৃষ্টি থেকে সৃষ্টিকর্তার আসনে উন্নীত হবার আমার প্রচেষ্টার কথা বলছ? রাজ্য-শাসন থেকে এই প্রচেষ্টা পৃথক্ নয় লোপা! তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্যই আমার পূর্বপুরুষেরা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে এত সম্মান দেখিয়েছিলেন। এই সমস্ত ঋষিরা ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার নামে জনগণকে তাঁদের রাজাদেরই মানতে শেখাতেন। সেকালে রাজারা অনেক মূল্যবান বলিদান দিতেন সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য। আজকালও আমরা অনেক মূল্যবান জিনিষ আহুতি দিই এবং পুরোহিতদের দামী দামী বস্তু দান করি প্রজাসাধারণের মনে ভগবদ্ভক্তি সৃষ্টির জন্য এবং এই বিশ্বাস তাদের মনে জন্মাবার জন্য যে ঈশ্বর-অনুগ্রহেই আমরা শ্রেষ্ঠ তণ্ডুল বা সব থেকে নরম গো-মাংস ভোজনের এবং মণি-মুক্তার রত্নাভরণ ধারণের অধিকার পেয়েছি।" [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়লো স্বামীর। কি ভীষণ সেই দিনটা!

সেই দিন প্রথম লেনা জানলো যে স্বামীর অন্তরে তার চেয়েও বড় অন্য কিছু আছে। লেনার প্রশ্নের উত্তরে কেমন যেন অন্যমনস্কের মত উত্তর দিতে দিতে এ-ঘর-ও-ঘর ঘোরাঘুরি করে এটা-সেটা গোছাতেই ব্যস্ত। ভারী অস্থির আর ভারী চঞ্চল হয়ে আছে ওর মন। না, না, লেনা কিন্তু তাতে ব্যথিত কিম্বা অপমানিত হয়নি—এ শুধু স্বামীর পুরুষোচিত দিকটির সঙ্গে লেনার পরিচয়।

এখনও স্বামী যদিও চলে যায়নি—কিন্তু এখনই আর সে লেনার নয়।

লেনা দুই হাতে মুখ ঢাকলো—কিন্তু স্বামী যদি এছাড়া আর অন্য রকম ব্যবহার করতো তাহলে···? না, তাহলে লেনাও আর কোনো দিনও তাকে ভালোবাসতে পারতো না।

না, না, তাই কি ঠিক? তাও নয়—লেনা কোনো দিনই না ভালোবেসে পারতো না তার দান্যাকে, কিন্তু সে ভালোবাসায় থাকতো না তার সেই প্রচ্ছন্ন গর্ব্ব আর আনন্দের জ্যোতি। লেনা খেলোয়াড় মেয়ে, পৌরুষ কিছু কম নেই ওর—ও মেয়ে পারে ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ করতে, পারে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে—ও তাই বোঝে এই সব জিনিষ। কঠিনকে জয় করাতেই তো আনন্দ! দুর্ব্বল চিত্তকে জয় করায় সুখ মেলে কি? স্বামীর কঠিন হৃদয়···লেনার তাই তো একমাত্র গর্ব্ব।

লেনাকে করতেই হবে একটা কিছু। স্বামীকে জানাতেই হবে যে লেনাও বোঝে—লেনাও অনুভব করে সেও পিছিয়ে নেয়। তবেই না বিদায়ের ক্ষণটিতে স্বামীর মন ভরে উঠবে লেনার প্রতি প্রেমে আর শ্রদ্ধায়···

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

তাই তো লেনার প্রথম কাজ এখন আসন্ন বিরহের ম্লান ছায়াখানি মুছে ফেলা।···কেন, দান্যার তো পূর্ণ সংযম আপনার উপর—কত সহজ, শান্ত। ছোটো ছোটো কথায়, হাসিতে, কৌতুকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—লেনাকেও তাই করতে হবে।

তার পর ওর গোছগাছে সাহায্য করতে হবে বৈ কি। কোলের উপর হাত দুটি জড়ো করে দর্শকের মত বসে থাকলেই কি চলবে লেনার—এদিকে বেচারা দান্যা পিঠের ষ্ট্রাপ-বাঁধা থলিটায় একটা সার্ট পুরতে হিমসিম খাচ্ছে···লেনার মনে পড়ে সার্টটায় তো বোতাম লাগানো নেই, এতক্ষণে বুঝি কাজের হদিশ মিললো:

"দান্যা, এক মিনিট দাঁড়াও, আমি আগে দেখে দিই···"

উঠে এসে থলির ভিতর থেকে সব জামা-কাপড় বার করে ফেলল। তার পর প্রত্যেকটি ঠিক করে দেখে প্রয়োজন মত সেলাই করে আবার গুছিয়ে দিলে। ছোটো একটি খাবারের পুলিন্দাও দিয়ে দিলে···বেশী দিতে বারণ করেছে দান্যা। ওই যা! দাড়ি কামাবার ক্ষুরের কথাটা মনে পড়ে এতক্ষণে···তাছাড়া জুতোর পালিস, ব্রাশ, আর?—আরও কত-কিছুই মনে পড়ে একে একে—একে একে লেনা সব প্যাক করে খাম, কাগজ, দেশলাই···

এবার বসে থাকার পালা দান্যার। নীরব দর্শকের মত সে দেখে লেনার কাজগুলি। এই তো ভালো লাগে—নারীই তো দেবে প্রেরণা, দেবে প্রস্তুতি, দেবে রণসজ্জায় সজ্জিত করে!

একে একে শেষ হোলো সব গোছগাছ। এগিয়ে এলো দানিল লেনার কাছে—ধীরে ধীরে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হোলো দুটি দেহ—শেষ বারের মত বিদায়-আলিঙ্গন। স্বামীর কাঁধে মাথাটি নামিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলো লেনা স্বামীর চোখে—বুকের মধ্যে কোন এক নতুন উত্তেজনা—যেন একান্ত গভীর করে পাওয়ার সীমাহীন অনুভূতি, আর সুনিবিড় কোমলতায় ওর সমস্ত বুকের ভিতরটা মুচড়ে যাচ্ছে···

শুধুই কি প্রিয়তমা···? ওর মধ্যেই তো আছে দান্যার মা—দান্যার বোন—দান্যার সারা দুনিয়াটাই তো লেনা।

ষ্টেশন অবধি ও সঙ্গে গেলো—বিচ্ছেদের ক্ষণটি মুহূর্ত্তের জন্যও হোলো না অশ্রুম্লান।

—"আমি যখন থাকবো না—তখন তুমি কি করবে বলো তো?" দান্যা প্রশ্ন করে।

—"কিচ্ছু ঠিক করিনি এখনও।"—সলজ্জ অপরাধীর ভঙ্গীতে হেসে ফেলে লেনা।

স্বামীর চোখে চকিতে একটা ভয়ের ছায়া খেলে যায়।

—"খেয়ালের ঝোঁকে কিছু করে বসবে না তো?"

—"না, না,—যাঃ, কি ভাবছো তুমি, একটুও খামখেয়ালীপনা করবো না"—আশ্বাস দেয় লেনা।

—"শোনো লক্ষ্মীটি—এটা রোমান্সে ভরা বীরত্বের কল্পনা নয়। যুদ্ধটা কঠিন বাস্তব—কঠিন এর দায়িত্ব···এর সেই কঠিনের মূল্যও নিতে হবে যোগ্য মর্য্যাদায়, শান্ত সংযত স্থৈর্য্যে, বুঝেছো···?"

—"এই, তুমি একটুও ভেব না···জোর করে বীরত্ব আমি দেখাবো না—নিশ্চিন্ত থাক···"

সময় হোয়ে আসে। দীর্ঘ গভীর চুম্বনে সমাপ্ত হয় ওদের সব

না-বলা কথা। কামরার ভিতর চলে যায় দান্তা—প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে লেনা—স্বপ্নাচ্ছন্ন।···

লেনা ফিরে আসে বাড়ীতে। সারা ঘরে ছড়ানো জিনিষপত্র··· কি প্রয়োজন, কি দাম এদের—যদি না সবের মাঝখানে থাকে 'সে'? উঃ, কত দিন ধরে চলবে এই যুদ্ধ? দান্তা বলে গেছে দুটি বছর—সুদীর্ঘ দু—টি বছর? এখনই যে এক-একটা মুহূর্ত বুকের উপর চেপে বসছে শ্বাসরোধ করে!···নেই, নেই—তাকে ছাড়া জীবনের একটা মিনিটেরও দাম নেই! এই অসহ্য একাকীত্ব ওকে পাগল করে দেবে যে! কি দিয়ে ভরাবে এই বিরাট শূন্যতাকে···?

ঘরের মধ্যে ছড়ানো স্তূপীকৃত জামা-কাপড় আর খোলা সুটকেশের মাঝখানে নিশ্চল পাথরের মত বসে রইলো লেনা। সমস্ত মুখখানা ছাইয়ের মত বিবর্ণ হোয়ে গেছে—এতটুকু প্রাণের স্পন্দন বুঝি নেই ওখানে। মুখের হাসির সঙ্গে চোখের জলও বুঝি নিঃশেষ হোয়ে গেছে—মিলিয়ে গেছে রক্তিমাধরের লালিমার শেষ বিন্দুটিও···

হঠাৎ বুঝি জাগলো জীবনের সাড়া সেই পাষাণ-প্রতিমায়! বঙ্কিম অধর দুটির প্রান্তে ফুটে উঠলো কেমন এক রহস্যময় হাসির আভাস—চোখের দৃষ্টি হোলো প্রখর উজ্জ্বল। বুঝি খুঁজে পেয়েছে একটি আলোর রেখা অতল অন্ধকারের বুকে—খুঁজে পেয়েছে সেই পথের নিশানা—যে পথে এগিয়ে গেছে তার দানিল।

উঠে পড়লো লেনা। ঈশ ষ্টেশন থেকে ফিরে জামা-কাপড় অবধি ছাড়া হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো লেনা—কিন্তু কি হবে এত দিনের অভ্যস্ত সজ্জায়? লেনা বার করে সেই পুরানো দিনের নীল জাম্পার কনুইএর কাছে সেলাই করা। ঘরের দুটো চাবির মধ্যে একটা দেবে গৃহ-পরিষদের কাছে—আর একটা কাত্যা প্রাসনোভার কাছে রাখবে ঠিক করে। ওকে বলতে হবে মাঝে-মাঝে ঘরটার দিকে একটু নজর দিতে। এখানে ওর আর কিছুই তো নেই করবার—কোনো কাজই নেই। কিন্তু 'সে' যদি ফিরে আসে ওর আগেই? কাজ আছে বৈ কি? গৃহসজ্জায় লেনার হাতের স্পর্শই তো জানাবে তাকে সাদর সম্ভাষণ! * * * নিখুঁত পরিচ্ছন্নতায় সাজিয়ে তুললো ঘর—তার পর বেরিয়ে এলো পিছনে রুদ্ধ করে ওর চিরদিনের স্বর্গের দুয়ারখানি···

রিক্রুটিং অফিস। লেনা এসে থামলো তার দরজায়—পথের নিশানা বুঝি মিললো!

* * * *

দানিলভ লেনাকে খুবই পছন্দ করতো। প্রায়ই বলতো, চমৎকার মেয়ে! স্বচ্ছন্দে একটা জোয়ান লোককে তুলে ধরতে পারে।

কিন্তু লেনাও পছন্দ করতো দানিলভকে। না, দানিলভ লোকটিকে তত নয়, যতটা লোকটির 'দানিলভ' নামটিকে। সবাই তাকে ডাকতো কমরেড 'কমিশার' বলে—শুধু লেনা ডাকতো কমরেড দানিলভ। তার কাছে 'দানিলভ' নামটাই যে সব চেয়ে বেশী মিষ্টি—ওই নামের ধ্বনিই তো তাকে মনে পড়িয়ে দেয় তার প্রিয়তমকে—তার দানিল—দান্তা—দাফাকে···

দানিলভ লেনাকে ডিসপেন্সারীর কাজেতেই নিযুক্ত করেছিলো—ভেবেছিলো, রোগীদের তুলে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাওয়া, শোয়ানো ইত্যাদি কাজ লেনাই পারবে দ্রুত অভ্যস্ত হাতে ঠিকমতো সাবধানতার সঙ্গে।···কিন্তু সিষ্টার জুলিয়া ডিমিট্রিয়েভনা ট্রেনের কমাণ্ডাণ্টকে ডেকে জানালে।

—"কমরেড কমাণ্ডাণ্ট, আপনি আমাকে অন্য এক জন নার্স ঠিক করে দিন।"

—"কেন? কি হোয়েছে বলো তো?"—ডাক্তার সব সময় প্রত্যেকের মন জুগিয়ে চলতেই অভ্যস্ত—"তোমার কি ওকে পছন্দ হচ্ছে না?"

—"না, একটুও না—।"

—"হুম্"—ডাক্তারের অভ্যস্ত উত্তর—"জানো, আমারও মনে হয়···মানে···মেয়েটি একটু ইয়ে···মানে বুঝলে কি না···"

—জুলিয়া ঠোঁট দুটি চেপে বললে—"ঠিক, ঠিক তাই।"—ওর পাতলা চাপা ঠোঁট দুটি দেখলে মনে হয় যেন কে স্কেল দিয়ে সোজা সরু একটা লাইন এঁকেছে। ডাক্তারের কথায় সায় দিলে—"অত্যন্ত লঘু প্রকৃতির মেয়ে—ওর সর্বাঙ্গে তার ছাপ আঁকা রয়েছে···"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অত্যন্ত লঘু প্রকৃতির, ঠিকই বলেছো—আচ্ছা ঠিক আছে, এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখবো—"অত্যন্ত বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে ডাক্তার। তার পর দানিলভের কাছে গিয়ে বলে:—'কি হে ডিসপেন্সারীতে আর এক জন নার্স পাঠানোর কি ব্যবস্থা হোলো—?"

—"কেন?"—দানিলভ অবাক—"আপনার কি মনে হয় লেনা ও-সব কাজ ঠিকমতো পারছে না?"

—"উঁহু, মোটেই নয়, সিষ্টার আর আমি দু'জনেই এ বিষয়ে ভেবে দেখেছি—ওর পক্ষে এ সব কাজ খুবই শক্ত হোয়ে দাঁড়াবে। মেয়েটা ভারী লঘু প্রকৃতির—আমরা চাই আর একটু কঠিন প্রকৃতির মেয়ে—"

না, দানিলভ নিজে একথা কখনই মানে না। তবে এক জন ডাক্তার নিশ্চয় এ-সব বিষয়ে তার চেয়ে ভালো বুঝবে। ক্লাভা মুখিনাকে বদল করে দিলে ডিস্পেন্সারী গাড়ীতে, আর লেনাকে নিয়ে এলো "ক্রীগার" গাড়ীতে।

সারাটা দিন লেনার কাটলো সমস্ত জিনিষপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজাতে আর সারাক্ষণ এই গোছানো আর পরিষ্কার করানো নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করে বেড়াতে। চক্চকে বার্ণিশ-করা জানলাগুলোর উপরও সারাক্ষণ ধুলো জমছে। লেনার মনে লেগেছে—খুবই লেগেছে ওকে ডিসপেন্সারী গাড়ী থেকে সরানো হোয়েছে বলে। নিশ্চয়ই—ওই লালমুখো জানোয়ার ঐ সিষ্টারটার কাছে এটাই ওর স্বাভাবিক প্রাপ্য—কেনই বা নয়, ওটা তো একটা কুৎসিত পশুর মত—তা ছাড়া আর কিছু নয়। সম্ভবতঃ জীবনে ও কখনও কোনো মানুষের ভালোবাসা পায়নি। ঠিক হোয়েছে—বেশ হোয়েছে পায়নি। কিন্তু এত দেশ থাকতে ওর যত হিংসে যত জ্বালা লেনার উপরই বা পড়লো কেন? বেশ, লেনাও ওকে জব্দ করবে—লেনার গাড়ীটাই হবে ট্রেনের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গাড়ী। যেমন ভাবা, তেমনি কাজে লেগে যাওয়া। ঝাড়ন আর বালতী নিয়ে সারাটা দিন কাটালো লেনা—কাত্যার মায়ের মতো করে খবরের কাগজ ঘষে জানলার কাচ পরিষ্কার করলো—বিছানা, কম্বল সব হাওয়ায় মেলে দিলে···কিন্তু মাছি আর মাছি···কোথা থেকে যে আবার মাছি এসে জুটলো লেনা ভেবে পায় না। সারা কামরাটার কোথাও তো এক টুকরোও খাবার নেই—একটা মানুষও নেই। বুড়

দেখো, একটা মাছি উড়লো, দেখতে দেখতে আরও একটা এসে তার সঙ্গ ধরলো···লেনা মারবার চেষ্টা করলে। অতি কষ্টে একটা ধরা পড়লো, আর একটা যে কোথায় লুকোলো আর দেখাই গেলো না। ক্লাভা মুখিনা আলোর চাকাগুলো সত্যিই চমৎকার করেছে কাপড়ের ফুল কেটে। লেনার হিংসে হয় ওর উপর—অমন ফুল লেনা কিছুতেই করতে পারতো না। খুব ইচ্ছে করে তাই ক্লাভার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে—কিন্তু ক্লাভা তো সারা দিন-রাত ডিসপেন্‌সারীতেই ব্যস্ত—আর লেনা তো পারতপক্ষে ডিসপেন্‌সারী মাড়াতে চায় না—পাছে ওই সিষ্টার জুলিয়ার সঙ্গে দেখা হোয়ে যায়।

দানিল আর দানিল। সারা দিন যেখানেই থাকুক আর যে কাজই করুক না কেন, মনের সমস্ত অনুভূতির ভিতর দিয়েই তো লেনা পায় ওর স্বামীকে—ওর দানিলকে, ওর পাশটিতে। অবশ্য এটাও তো সত্যি যে, ও তার সঙ্গে কথা বলতে পারছে না—পারছে না হাজারো ছল করে ওর মন খুশী করতে—কিন্তু এক মুহূর্ত্তও তো ভুলতে পারছে না যে, সে নেই এখানে···সে যে রয়েছে ওর সারাটি মন জুড়ে···সে যে রয়েছে ওর সব কাজের আড়ালে।

তাই বুঝি বিছানার উপর বালিসগুলোকে ঠিকমতো সুন্দর করে সাজিয়ে নিজের কাজেই মুগ্ধ হোয়ে আত্মবিস্মৃতের মত বলে ওঠে—"এই তো, ঠিক হোয়েছে না দান্কা—?" কখনও বলে,—"দানিল, ঘরটা আর একবার মুছতে হবে কি বলো ?"

সারা দিন-রাত কাজের মাঝে-মাঝে জাগ্রত চেতনায় চলে ওর এই ফিরে পাওয়া—আর কাজের শেষে যখন নিরালা অবসরের ক্ষণটি আসে তখন—শুধু তখনই লেনা ডুব দেয় স্বপ্ন-সাগরে···সেখানে যে ওর কল্পনার স্বর্গলোক···সে জগতে শুধু ওরা দু'জনে—লেনা আর দানিল···আর ওদের ভালোবাসার স্বপ্নসৌধ···

কিন্তু সেই অমূল্য ক্ষণটুকু যে সত্যিই ক্ষণস্থায়ী! হয়ত তখনই ডাক পড়ে রান্নাঘরে আলুর খোসা ছাড়াতে, কিম্বা ক্লাসের সময় হোয়ে যায়—বক্তৃতা আছে, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে—বক্তা ডাক্তার সুপ্রাগভ।

ভোর বেলা দানিলভ সবাইকে ডেকে পাঠায় সদ্য-আসা যুদ্ধের খবর শোনাবার জন্য—ব্যাখ্যা করে ফ্যাসিস্ত অত্যাচারের বীভৎস বর্ব্বর কাহিনীর—বলে, 'আমাদের পক্ষ হটছে কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য—শেষে লালফৌজ জয়ী হবেই, ধূলিসাৎ করে দেবে হিটলারের সমস্ত শক্তি'···লেনা শোনে দানিলভের প্রত্যেকটি কথা আর মনে মনে ভাবে—'কেনই যে তুমি এত বোঝাচ্ছ, এত কথা বলছো জানি না—আমি তো জানিই যে আমরা জিতবোই, দান্কা আর আমি—না, না, তাছাড়া আর কিছুই তো হোতে পারে না। আর কিছু হওয়া মানেই তো পরাজয়···মানে দান্কার মৃত্যু, আমার মৃত্যু···ভবিষ্যতে আর ফিরে পাবো না সেই মিলিত মধুর দিনগুলি! সে কি হয়? সে কি হওয়া সম্ভব ?'

নাঃ, জার্ম্মাণরা একের পর এক গ্রাম অধিকার করে নিলেও লেনা ভয় পায় না অকারণ। আরও একটা সহর অধিকৃত? হোক্ না, কি আর করা যাবে? যতই বলো না কেন, ওদের হটতেই হবে শেষে—শুধু যেন তাড়াতাড়ি—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হটানো যায়! তাহলেই যে আবার ফিরে আসবে সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি—ফিরে আসবে ওর দান্কা।

চিঠি? না আজও একটি লাইনও লেনা পায়নি ওর দান্কার কাছ থেকে। না-ই বা পেলো, ও জানে—ওর সমস্ত মন জানে, ওর দান্কা হারায়নি—সে আছে, নিশ্চয় আছে···।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন লেনা। দানিলভের পরিদর্শন কিম্বা ট্রেনের ঝাঁকুনিতেও ওর ঘুম ভাঙ্গলো না। যখন জাগলো তখন আকাশে আলোর প্রথম পরশ লেগেছে। স্বপ্ন দেখছিলো—ভারী মিষ্টি স্বপ্ন দেখছিলো, ঠিক ঘুম ভাঙ্গার আগেই। ইচ্ছে করলো না—একটুও ইচ্ছে করলো না উঠতে। তখনও ঘুমের মাঝের হাসিটি অধরের প্রান্ত ছুঁয়ে আছে—চোখ দুটি তখনও বুঝি স্বপ্নের মায়ায় বিভোর···চোখ মেলার আগেই মনে পড়লো, এ তো সত্যি নয়—এ তো শুধুই স্বপ্ন, এটা 'হসপিটাল ট্রেন'—রোগীদের রণক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনতে চলেছে। সেই মুহূর্ত্তে ট্রেনটা থামলো—তবে কি ওরা পৌঁছে গেলো—সে কি সম্ভব ?

লেনা লাফিয়ে উঠে পড়লো। জানলা দিয়ে ঝুঁকে বাইরে তাকিয়ে দেখলো—সবুজ মাঠ আর এক ধারে ঘন বন—গাছে-গাছে পাখীদের কাকলী সুরু হোয়ে গেছে। অরুণোদয়ের আভাস জেগেছে আকাশের বুকের রক্তিমাভায়। ভোরের মিষ্টি বাতাস এসে লাগলো লেনার চোখে-মুখে···অশ্রুসজল হোয়ে এলো ওর দৃষ্টি—কি অপরূপ দৃশ্য! নীল আকাশের বুকে পেঁজা তুলোর মত ছড়িয়ে আছে গোলাপী মেঘ,—এমন আকাশ বুঝি আর কখনও দেখেনি লেনা!

ট্রেনটা থামলো। ওদের কোনো তাড়াই নেই।

কোন ভোরেই লেনার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিলো, অন্যেরা কেউ ওঠেনি। এখনও দু'ঘণ্টা সময় আছে—চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে অলস ক্ষণটুকু উপভোগ করবার—বাইরের আকাশের ঐ সীমাহীন রঙ-সাগরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে···কে জানে হয়তো দু'চোখ ভরে নেমে আসবে আর একটি রঙীন স্বপ্ন মধুর কল্পনায় ভরা!

কিন্তু দানিলভ উঠেছিলো অনেক আগেই। ও তখন রান্না-ঘরের দিক থেকে আসছিলো। লেনাও উঠে পড়লো, স্কার্টটা গায়ে দিয়ে খালি পায়েই নেমে পড়লো ট্রেন থেকে। ভারী মিষ্টি লাগছে আজকের এই সোনালী সকালটা, পাখীর গানে ভরে উঠেছে চার দিক, রেলওয়ের ছোটো কুঁড়ে ঘরটির পাশে লাইলাকের ঝোপে আর একটি পাতাও দেখা যায় না—গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুলে ভরে গেছে। লেনার ভারী ইচ্ছে হোলো তুলে আনতে ওর একটি ফুলে-ভরা শাখা। এগিয়ে চললো তাড়াতাড়ি ঐ ঝোপটার পাশে—

—"লেনা—লেনা অগরোদিন্‌কোভা—" দানিলভের গলা শোনা গেলো—"শীগগির এসো, আমরা এক মিনিটের মধ্যেই ছাড়ছি। শেষ কালে তুমিই পড়ে থাকবে দেখছি—"

লেনা ঠোঁট ওল্টালো—'ছাড়ছি, ওটা কি এক্সপ্রেস নাকি? চলন্ত ট্রেনে লেনা কি পারে না লাফিয়ে উঠতে?' ফুলে-ভরা শাখাটা ভাঙ্গতেই ঝর ঝর করে শিশিরের সঞ্চিত বিন্দুগুলি ঝরে পড়লো ওর চোখে, মুখে, বুকে।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা চলতে সুরু করলো। দানিলভ আর মেডভেদিয়েভও উঠে পড়লো গাড়ীতে। লেনা উঠলো না—ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে রইলো লাইনের ধারে—চলন্ত চাকাগুলির গরম হাওয়া এসে লাগলো ওর খোলা দুটি পায়ে। শেষ গাড়ীটা যখন ওর সামনে এলো তখন লাফিয়ে উঠে হাতলটা ধরে ফেললে, তার পর হাঁটু অবধি

উঁচু পাদানীর উপর ভর দিয়ে তুলে উঠে পড়লো। সেখানটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অকারণ খুশীতে ভরে উঠলো ওর মনটা। শুধুই অকারণ নয়—নিজের প্রাণোচ্ছল যৌবনের গতি-চাঞ্চল্যে। অটুট দেহের সামর্থে নিজেরই মন উঠলো ভরে ভোরের শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগলো সারা দেহে।

—'দেখছো তো দাশা ?—দেখছো ?—কি চমৎকার মেয়ে তুমি পেয়েছো ; একবার ছাখো ?'···লেনা ওর দিবাস্বপ্নেই বিভোর—না দিয়ে কি পারে ওর এই ভোরের খুশীর ভাগ ওর দাশাকে ?—দাঁড়িয়ে রইলো লেনা আপন মুগ্ধ অনুভবে···অপলক সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দাশা—দেখুক আরও কিছুক্ষণ—আরও কিছুক্ষণ ওর দৃষ্টির পরশ ছুঁয়ে যাক লেনার দেহে-মনে—সোনালী সকাল সার্থক হোক !

আরও অনেকক্ষণ পরে লেনা উঠে এলো কামরার ভিতর···।

* * * *

ডাক্তার বেলভ

লেনিনগ্রাদে এসে পৌঁছালো ট্রেনটা। একটা মালগাড়ীর ষ্টেশনে ট্রেনটাকে সরিয়ে রাখা হোলো। একটা ইঞ্জিন এসে পৌঁছবার কথা ছিল ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর, কিন্তু দু'ঘণ্টা হোয়ে গেছে, এখনও সে ইঞ্জিনের দেখা নেই। ইতিমধ্যে ট্রেনের অফিস-কামরাতে ডাক্তার বেলভ সমানে এ-ধার থেকে ও-ধারে পায়চারী করে চলেছেন বিড়-বিড় করে বকতে বকতে—'অসহ্য···একেবারেই অসহ্য···'

নাঃ, ইঞ্জিনের দেরীর জন্ত কোনো চিন্তাই নেই ডাক্তারের। ভলোপদা থেকে ডাক্তার ওঁর স্ত্রীকে একটা টেলিগ্রাম পাঠান এই বলে যে, ট্রেনটা লেনিনগ্রাদের ভিতর দিয়ে যাবে, ওঁর স্ত্রী যেন ষ্টেশনে এসে দেখা করেন। কিন্তু কোন্ ষ্টেশনে থামবে, সেটা ডাক্তার নিজেই জেনেছেন সবে এই ভোরে। এখনও অবধি স্ত্রীর দেখা নেই ষ্টেশনে, তাই অসহ্য হোয়ে উঠেছে এই সন্দিগ্ধ মুহূর্ত্তগুলো—আসবে কি আসবে না ? আর সব চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হোচ্ছে যে, হয়তো সে অনেকক্ষণ আগেই এসে এই সারি সারি আঁকাবাঁকা লাইনগুলো পেরিয়ে খুঁজতেই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে হয়তো ইঞ্জিন পৌঁছে ট্রেনটাকে নিয়ে চলেই গেলো—দেখা আর মিললো না। সারি সারি ট্রেন দাঁড়িয়ে, তার হাজারখানা কামরা—এর ভিতর থেকে খুঁজে বার কারর সময় পাওয়া অসম্ভব। ডাক্তার রাগে জ্বলতে লাগলো। এক-এক বার মনে করলে নেমে পড়ে খুঁজলে হয়, কিন্তু তখনি ভয় হোতে লাগলো, যদি ওর নেমে খোঁজ করার মধ্যে ট্রেনটা ওকে না নিয়েই চলে যায় ? অবশ্য সেটা ও ঠিক করে নিতে পারে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে, যদি দানিলভ টের পায় ? কি বলবে সে···? ডাক্তারের বেশ একটু ভীতি আছে দানিলভ সম্বন্ধে।

এমন সময় দানিলভ এসে ডাক্তারের সামনে অভিবাদন করে দাঁড়ালো। সেদিন ডাক্তারের সঙ্গে দানিলভের দেখা এই প্রথম। সকালে কম্যুনিষ্ট পার্টি সভ্যদের একটা মিটিং ছিলো, পার্টির অর্গানাইজার নির্ব্বাচিত করার। জুলিয়া ডিমিট্রিয়েভনাই নির্ব্বাচিত হোয়েছিলো। দানিলভ যদিও তখন আর কাউকে না পেয়ে ওকেই ভোট দিয়েছিলো, তবুও এখন ওর কেবলই মনে হোতে লাগলো যে, কাজটা ঠিক হোলো না। কারণ যতই পুরুষালি হোক জুলিয়া আসলে তো নারী। আর ডাক্তার বেলভকে নিয়ে পার্টি 'অর্গানাইজার'কে বেশ ভুগতে হবে। দানিলভের মনে হোতে লাগলো, ডাক্তার বেলভকে সত্যিকারের ট্রেন কমাণ্ডাণ্ট তৈরী করতে হলে রীতিমত শক্ত হাতের দরকার—স্বভাব-কোমল মেয়েরা কেমন করে পারবে সেই কঠিন কাজ ?

দানিলভ মনে মনে করুণার হাসি হেসে ডাক্তারকে অভিবাদন জানালো। এই তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক, পুরো ইউনিফর্ম পরে এই অসহ্য গরমে পায়চারী করে চলেছেন। বুক-পকেটে এত জিনিস ঠাসা যে, শক্ত হোয়ে ফুলে আছে পকেটটা। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল যেন শক্ত চৌকো লোহার তৈরী পকেট দুটো—কত রাজ্যের জিনিস ওতে ঢোকানো আছে কে জানে ? মাথার টুপীটার চক্চকে ডগার নীচে ডাক্তারের ওল্টানো নাকের ডগাটাও চক্চক্ করছে—তার উপর থেকে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে গড়িয়ে আসছে—চেহারাখানা সেই 'রোদে ভাজা ইটের পাঁজার' মতই লাগছিলো।

—"বেশ গরম পড়েছে"—দানিলভ বলে ওঠে।

—"বেশ মানে, অসহ্য গরম"—ডাক্তার বললেন—"এমন কি আমার জুতোর তলা থেকেই টের পাচ্ছি মুড়ির গরম—"

দানিলভ কৌতুকময় দৃষ্টিতে তাকালো—তাহলে এগুলোকে 'মুড়ি' বলে ? বেশ লাগে এমনি করে জিনিষগুলো জানতে। এই সব বৃদ্ধ পণ্ডিতরা সব সময় বিদেশী ঢংয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। ডাক্তার তখনও থামেনি :

—"এ কোন্ চুলোয় এনে আমাদের ফেলেছে জানি না। এঁ্যা—এ তো রেলের জঙ্গল বললেই চলে—আমি লেনিনগ্রাদের পুরোনো বাসিন্দা—আরে, আমিই তো সাতজন্মে দেখিনি এ জায়গা—"

দানিলভ কোনো উত্তর দিলে না—যেখানেই থামুক না কেন কি আসে-যায় তাতে—আসলে গন্তব্য স্থলে পৌঁছালেই হোলো—আর গাড়ীটা ঠিক সময় ছাড়লেই হোলো। ও তো আর জানতো না বেচারা ডাক্তার কেন এত উদ্বিগ্ন—জানতো না তো যে ডাক্তারের প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম বাচ্ছা ছেলেদের মত !

—"ইভান ইগোরিচ, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব আছে ?"—ডাক্তার বলে।

দানিলভ অবাক—"কেন বলুন তো, স্ত্রীর সঙ্গ আবার কি হবে ?"

অপ্রস্তুত ভাবে ডাক্তার বলে ওঠে—"না, না, বুঝলে কি না, আমি জানতে চেয়েছিলাম···মানে, এই আর কি···বুঝলে কি না,···অনেক সময় দেখবে ত্রিশ বছর ধরে একসঙ্গে থাকার পরও দু'জনের মধ্যে সত্যিকারের মিল দেখা যায় না—মানে, তা' বলে সব সময় কি আর···ঐ মাঝে-মাঝে বুঝলে কি না···"

—"হ্যাঁ, তা ঠিক, মাঝে-মাঝে দেখা যায়—" দানিলভ অন্যমনস্কের মত বলে।

—"আবার মাঝে-মাঝে ঠিক উল্টোটাও দেখা যায়—" ডাক্তারের মুখের ভাব হঠাৎ বদলে যায়—চোখ দুটো খুশীতে ভরে ওঠে, সমস্ত মুখে নামে গর্ব্বমেশা, লজ্জিত উল্লাসের কোমল ছায়া। দানিলভের বিস্ময় এতক্ষণে সমাপ্ত হোলো।

কাছেই একটা ট্রেনের পাশ থেকে দেখা গেলো লাইন পেরিয়ে আসছেন একটি লম্বা ধরনের মহিলা—মাথার চুলে পাক ধরেছে, মুখে নেমেছে উদ্বিগ্নতার ছায়া। [ক্রমশঃ।

সকাল বেলায়
সারাদিন
খেলাধুলোর পরে
প্রফুল্ল
শোবার সময়
থাকতে...
স্নিগ্ধ, সুগন্ধ
হিমালয় বোকে
পাউডার
ব্যবহার করুন
ছুটি শুভ্র ইরাসমিক পাউডার
Himalaya Bouquet
TALCUM POWDER
Himalaya Bouquet
TOILET POWDER
HIMALAYA BOUQUET SNOW
হিমালয় বোকে স্নো ত্বক্‌কে সব ঋতুতে রক্ষার জন্য
HBP. 7-X80BG
ইরাসমিক্ কোং, লিঃ, লণ্ডনএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।
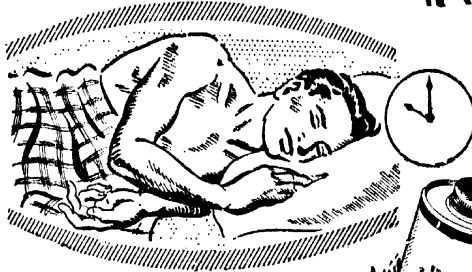
জলযাত্রা

শান্তা দেবী

ফ্লরেন্স

এই অগষ্ট ১১টা ২৩ মিনিটে আমরা ফ্লরেন্স ষ্টেশনে পৌঁছলাম। ট্রেণে আসতে আসতে পথে দান্তের বর্ণিত বিখ্যাত মাধুর্য্য-মণ্ডিত নদী এবং আর একটা বড় অন্তঃসলিলা নদী চোখে পড়ল। এ দিকটা পার্ব্বত্য প্রদেশ, তাই অনেক সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ট্রেণ চলে। মাঝে মাঝে সব অন্ধকার হয়ে যায়। গাড়ীতে ভীষণ ভীড়, খুব টুরিষ্টরা চলেছে। সমস্ত গাড়ীটায় ঢোকবার দরজা মাত্র একটা, অনেক কষ্টে উঠতে হয়। অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সারা পথ এল। দাঁড়িয়ে নদী পর্ব্বত গাছপালা হ্রদ দেখতে অবশ্য বেশ ভালই লাগে। অনেকে ট্রেণেই নব পরিচিতদের সঙ্গে খুব ভাব জমাচ্ছে। ইটালীয়ানরা বোধ হয় বিশেষ লম্বা জাত নয়, অনেকে অসম্ভব বেঁটেও আছে। এদের মুখশ্রী ভারী সুন্দর। তবে কতক লোক আছে একেবারে গোল মুখ, চাপা-চাপা গড়ন। বাঙালীদের সঙ্গে অনেকের বেশ সাদৃশ্য আছে। আমাদের পরিচিত অনেক সুপুরুষ বাঙালীর সঙ্গে এখানের অনেকের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লাগছিল, ঠিক যেন যমজ ভাই। এক জন আবার বাংলায় 'নমস্কার' বলতে শিখল।

ফ্লরেন্সে আমাদের দেশের মত ঘোড়ার গাড়ীর খুব চলন। এখানে এসে দেখলাম, মালগাড়ী অশ্বতর টানছে এবং টুরিষ্টরা অনেকেই ঘোড়ায়-টানা ফিটন গাড়ীতে চলেছে। ষ্টেশন থেকে আমরা মোটর পেলাম। হোটেলে পৌঁছে দেখি ঘর-দোর লণ্ডভণ্ড অপরিষ্কার; শুনলাম এই মাত্র একজনরা ঘরগুলো ছেড়ে গিয়েছে, তাই পরিষ্কার করবার সময় হয়নি। কোন রকমে তাড়াতাড়ি ঘর গুছিয়ে দিল। আমরা দোকান থেকে খাবার কিনে এনে খেলাম, কারণ হোটেলে খেতে বড় বেশী খরচ। তার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও স্নানাদি করে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে বেড়াতে বেরোলাম। গাড়ীর মাথায় মস্ত একটা ছাতা থাকে, রোদের সময় বেশ সুবিধা। এখানকার টাকা ভীষণ সস্তা। দশ পাউণ্ড ভাঙিয়ে আমরা ১১০০০ হাজার লিরা (lira) পেলাম। ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া লাগল ২০০০ লিরা। মিলান ষ্টেশনে কুলি নিল ৫০০ লিরা, ফ্লরেন্সে ৬০০ লিরা। গাড়োয়ান বেশ গাইডের মত সব বলে দিচ্ছিল।

এখানকার বড় গির্জ্জা (Duomo) খুব নিরেট, মস্ত দেখতে, মিলানের মত সূক্ষ্ম কাজ নয়। নানা রঙের মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী। গির্জ্জার ভিতরে অনেক বড়-বড় শিল্পীর আঁকা ফ্রেস্কো, কাচের ছবি এবং সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি। বাইরে এক দিকে একটা উঁচু চূড়া, অন্য দিকে একটা বড় গম্বুজ। খুব বড় বড় পাথর দিয়ে গড়েছে। গির্জ্জাগুলি রোমান ক্যাথলিকদের। মেরী ও শিশু যিশুর সামনে আরতির বাতি জ্বলছে। ভক্তরা তাঁদের কাছে মানসিক করে কত যে সোনা-রূপা আর মুক্তার গহনা দিয়েছে তার ঠিক নেই। অসংখ্য সোনার "heart" মেরী ও যিশুর আশে-পাশে ঝুলছে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে এদের মিল আছে। তবে এদের পাণ্ডারা পিছনে অমন করে লাগে না এবং মন্দিরগুলি পুরী বা ভুবনেশ্বরের মত অপরিষ্কার নয়। সব ঝকঝক্ তকতক্ করছে। মিলানের গির্জ্জার মত ভিতর-বাহিরে সূক্ষ্ম কাজ ও ছবিতে মণ্ডিত না হলেও এই অপেক্ষাকৃত সাদাসিধা Florence-এর মন্দিরটি বিরাট আর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। দরজাগুলি ব্রোঞ্জের এবং তাতে বাইবেলের নানা গল্প খোদাই করা।

এই গির্জ্জার সামনেই John the Baptist-এর Baptistery। সেখানে অতি আশ্চর্য্য একটি ব্রোঞ্জ ও সোনার কাজ-করা দরজা। এর কাজগুলিও বাইবেলের ছবি। গাছের পাতা নদীর জল সবই ধাতুতে এমন করে গড়েছে যে, দেখলে রেশমের সেলাই মনে হয়। এখানে সব সময় ভীড় করে দর্শকরা দাঁড়িয়ে যায়।

এ দেশের মেডিচি (Medici) রাজাদের সমাধি আছে একটি বিখ্যাত বাড়ীতে—মাইকেল এঞ্জেলোর পরিকল্পিত। ভারি সুন্দর পরিকল্পনা। মাইকেল এঞ্জেলোর সমাপ্ত ও অর্দ্ধ-সমাপ্ত কয়েকটি মূর্ত্তি এক-এক মেডিচির সমাধির উপর রয়েছে। পুরুষ মূর্ত্তিগুলি অদ্ভুত শক্তির প্রতীক, মেয়েগুলি যেন রূপে মার্ব্বেলকে মৌন করে তুলেছে। প্রভাত, রাত্রি প্রভৃতি নাম আছে মনে হচ্ছে। সব বিখ্যাত মূর্ত্তির ছবি এখানেই কিনতে পাওয়া যায়।

Santa Maria Nouvella-র গির্জ্জা এবং শিল্পী সেলিনির গড়া বহু মূর্ত্তি-সজ্জিত চত্বরটি যেন পুরাকালকে বাঁচিয়ে তুলেছে। চারি দিকে রাস্তার মাঝখানে আগ্রা-দিল্লীর মত পাথর দিয়ে বাঁধানো চত্বরে বড়-বড় মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে, আধুনিক কলকব্জার যুগ বলে মনেই হয় না। মনে হয়, এখুনি বড়-বড় টোগা (toga) আর ফিতে-বাঁধা স্যাণ্ডাল পরে প্রাচীন রাজারা সব বেরিয়ে আসবে।

ঘোড়ার গাড়ী করে Arno নদীর সেতুর উপর দিয়ে এলাম। নদীতে কত ছেলে-মেয়ে স্নান করছে, জলটা সবুজ হয়ে গিয়েছে গতিও বেশী নেই কিন্তু দেখতে বেশ লাগে। এর কাছেই মিসেস্ ব্রাউনিঙের (Browning) বাসস্থান ছিল, দূর থেকে দেখলাম। মহাকবি দান্তের বৃদ্ধ বয়সের একটি মূর্ত্তি রয়েছে।

আমাদের হোটেলের কাছেই খাবারের দোকান আছে। সেখানে গিয়ে আঙুল দিয়ে খাবার দেখিয়ে এবং ক'টা কিনব আঙুল গুণে-গুণে বলে আমরা জিনিষ কিনতাম, কারণ, অধিকাংশ লোকই ইংরিজী বুঝতে পারে না। ছেঁড়া নোটগুলো হাতের কাছে ধরলে তারা যত দাম পাবে নিয়ে নিত। এখানে পীচ প্রভৃতি নানা রকম ফল পাওয়া যায়। এ দেশে কলের জল খেতে লোকে বারণ করে, খেলে নাকি অসুখ করে। আমরা প্রথম প্রথম mineral water খেতাম। তার পর স্বাভাবিক জলের স্বাদ পাবার জন্য কলটা অনেকক্ষণ খুলে রেখে সেই জল ধরে খেতাম। এখানের লোকে সস্তা মদ খুব খায় শুনেছি; কিন্তু রাস্তায় পাইপের জল খেতেও অনেককে দেখেছি।

১০ই সকালে আবার একটা ঘোড়ার গাড়ী জোগাড় করা গেল। প্রথম পাথর-বাঁধানো সরু-সরু গলি দিয়ে খানিক বেড়ালাম। দু'পাশের বাড়ীগুলি পাথর বা ইটে গড়া, মাথার উপর খোলার চালের ছাউনি, সব একটু জীর্ণ হয়ে এসেছে। বেড়াতে বেড়াতে পুরাতন বারাণসী ও যোধপুর কেন জানি না বারে বারে মনে পড়ে। কিছু একটা মিল আছে। ঘাঘরা আর ওড়না-পরা মেয়েরা এখানে বেড়ালে বেশ মানাত। চার দিকে অনেক সুন্দর সুন্দর দোকান। গহনা এখানে ভারী সুন্দর গড়ে। চামড়া আর বেতের কাজও সুন্দর। ষ্টেশনেও ঠেলা-গাড়ী করে বেচতে আসে।

খানিক বেড়িয়ে একটা গির্জ্জায় এলাম। তার ভিতরে এ দেশের সব মহা মহা রথীদের সমাধি ও স্মৃতি-ফলক প্রভৃতি। দান্তে, গ্যালিলিও, লিওনার্ডো, এবং ম্যাকিয়াভেলির নাম সবার আগে চোখে পড়ে। দান্তের মৃত্যু এখানে হয়নি, সুতরাং তাঁর দেহ বোধ হয় এই গির্জ্জার ভিতর নেই, স্মরণ করবার জন্ত সমাধি-আকারে ভাস্কর্য্যের উপহার দেওয়া হয়েছে। গ্যালিলিও হাতে গ্লোব আর টেলিস্কোপ নিয়ে মর্ম্মরমূর্ত্তিতে বসে আছেন; দান্তের বিরাট সমাধিতে পত্রমুকুট পরে তিনি এবং তাঁর দু'পাশে শোকরতা তরুণীরা দাঁড়িয়ে। লিওনার্ডোর বিরাট সমাধি। এ সব সমাধি দেখে মনটা কেমন করে সেই সব বিরাট মানুষের জন্ত। এ সব মানুষ এত দিন গল্পের বস্তু ছিলেন আমাদের কাছে, আজ তাঁরা জীবন্ত হয়ে উঠলেন মৃত্যুর এত শতাব্দী পরে। দান্তের জন্ম-গৃহও দেখলাম। এমন মানুষরা পৃথিবীতে জন্মায় যদি, তবে কেন মরে আর সমাধির তলায় অস্থিমাত্র হয়ে পড়ে থাকে?

ন্যাশন্যাল মিউজিয়মের একটা বিরাট চকমিলানো বাড়ী কয়েক তলা উঁচু। নীচে সেকালের রাজাদের অস্ত্রশস্ত্র বর্ম্ম সাজানো, অনেক রাজা-রাজড়ার মূর্ত্তিও আছে। জাল নিয়ে একটি জেলেদের ছেলের কিশোর মূর্ত্তিটি ভারী জীবন্ত লাগে দেখতে। উপরে আরও অনেক দেখবার জিনিষ আছে, আমি যেতে পারিনি। বাড়ীটা রাজপ্রাসাদের ধরণের।

এর পর গেলাম ন্যাশন্যাল গ্যাল্যারিতে। কি বিরাট সংগ্রহ! ঘরে ঘরে, তলায় তলায়, বারান্দায়, পথে মূর্ত্তিতে-মূর্ত্তিতে ঠাসা! ছবির ত কথাই নেই। জুলিয়াস সিজার, মার্কাস অরিলিয়াস সবাই মর্ম্মরমূর্ত্তিতে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। বিখ্যাত ভিনাস ডি মেডিচি প্রভৃতি দেখে চক্ষু সার্থক হল। ছোট ছোট ছেলেদের মূর্ত্তি পাথরে এমন নরম মিষ্টি করে গড়া—দেখলে আদর করতে ইচ্ছা করে। যেমন ছবি ও মূর্ত্তির ভীড়, তেমনি দর্শকদের ভীড়। বেশীর ভাগ দর্শক বোধ হয় আমেরিকান টুরিষ্ট। অবশ্য সেটা আমার আন্দাজ। তবে অনেক আমেরিকান আমাদের সঙ্গে কথা বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেন। একটি ঘরে Cameo ছবি দেখানো হচ্ছে। অত ছোট ছবির মধ্যে মানুষের চোখের পাতা, ভ্রূ, চুল, ঠোঁট পর্য্যন্ত এত সুন্দর করে এঁকেছে যে magnifying glass দিয়ে দেখলে সত্যি মনে হয়।

র‍্যাফেলের নাম শিশুকাল থেকে শুনে আসছি। শিশুবয়সে 'প্রবাসী'তে র‍্যাফেল, গুইডো রেনি ও বটি চেলির ছবির প্রতিলিপি দেখতাম। এত কাল পরে এখানে র‍্যাফেলের কয়েকটি বিখ্যাত ছবি, বটি চেলির (Boticelli) অনেক ছবি, গুইডো রেনি এবং র‍্যাফেলের গুরুর আঁকা ছবির আসলগুলি দেখলাম। বাইজেণ্টাইন (Byzuntine) স্কুলের Cimabue এর একমাত্র ছবি রয়েছে দেখলাম। মস্ত বড় ছবিটি ম্যাডোনার। গিয়েটোর (Giatto) ছবিও রয়েছে। ছবিগুলি রঙে-রেখায় অপূর্ব্ব। কাপড়ের ভাঁজ, চুলের রেখা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। মুখের ভাব আশ্চর্য্য সুন্দর। কোন কোন ম্যাডোনার মাতৃমূর্ত্তি দেখে নিজের মায়ের মুখ মনে পড়ে যায়। দেশে কালে সর্ব্বত্র মায়ের মুখ কি একই রকম! ম্যাডোনা

দেখে মন এত মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু শিশু যিশুর ছবি কেন জানি না বেশীর ভাগই বিশেষ ভাল লাগে না।

ফ্লরেন্সের ছবি—মানে সর্ব্বত্রই ম্যাডোনা ও যিশু। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে কিন্তু তা নয়। ফ্লরেন্স বেশী প্রাচীন এবং রোম্যান ক্যাথলিকের দেশ বলে বোধ হয় এখানে ম্যাডোনাই সর্ব্বত্র। আমাদের দেশে মিউজিয়মে যেমন বুদ্ধমূর্ত্তির আধিক্য—খানিকটা সেই রকম। এই ন্যাশন্যাল গ্যালারীতে আধুনিক ছবি আছে কি না জানি না। আধুনিক চিত্রকররা হয়ত অন্য রকম ছবিও আঁকেন।

এখানে একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। মেয়েটি ডাঃ অমিয় সেনের কন্যা শ্রীমতী হৈমন্তী সেন, এখানে চিত্রবিদ্যা শিখতে এসেছেন। ইনি কলকাতায় আমার কন্যার সঙ্গে কলেজে পড়তেন, পরে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন।

ন্যাশন্যাল গ্যালারীর জানালা থেকে আর্নো নদী, তার সেতু, Duomo গির্জ্জার গম্বুজ ও চূড়া এবং খোলার চাল দেওয়া সারি সারি পুরানো বাড়ী ছবির মত লাগছিল। কিন্তু বহু শতাব্দীর ধূলি-ধূসরিত ছবি!

বিকেল বেলা আবার ঘোড়ার গাড়ী করে পাহাড়ের গায়ের সুন্দর চওড়া আধুনিক পথে বেড়িয়ে ক্লবের পাশ দিয়ে পাহাড়ের মাথার উপর গেলাম। সেটা বেড়াবার জায়গা, অনেক মানুষ জড় হয়েছে। সবাই আমাদের দেখতেই ব্যস্ত। দেখা মানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা, হাসা, মন্তব্য করা ও গান করা। ব্যবহারটা মোটেই ভাল লাগল না। আমাদের দেশের লোক বিদেশী মেয়েদের দেখে এ রকম করে না। আমরা তাই বেশীক্ষণ দাঁড়ালাম না। পাহাড়ের চূড়ায় মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া ডেভিড দাঁড়িয়ে। সেখানে একটু দাঁড়িয়ে আইসক্রীম কিনে আমরা ঘোড়ার গাড়ীতেই ফিরলাম।

পথটি ভারি সুন্দর, কাশ্মীরের বড়-বড় বাগানে এই রকম পথ আছে। তবে এখানের পথে কাশ্মীরের মত অত ফুল নেই, গাছও কাশ্মীরের মত ভীষণ মোটা নয়, তবে পথগুলি ঘসা-মাজা বেশী।

পরদিন সকালে ব্যাঙ্কের কাজ সেরে একটা পুরানো মিউজিয়মে গেলাম। সেখানে সব রোম্যান যুগের আগের জিনিষ। বাসন-কোশন, গহনা, অস্ত্র ইত্যাদি। সেখান থেকে রাস্তায় রাস্তায় অনেক হেঁটে একটি ছোট ঘরে র‍্যাফেলের গুরুর আঁকা কয়েকটি ছবি দেখতে গেলাম। দরজায় টোকা দিতে এক জন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে ঘরের ভিতর নিয়ে কয়েকটি ছবি দেখাল। তার পর পয়সা চাইল।

এখান থেকে এলাম Pitti Palace। রাজপ্রাসাদে ছবির মিউজিয়াম হয়েছে। অসংখ্য ছবি! র‍্যাফেল, তস্য গুরু, ভ্যান ডাইক, মুরিলো, রেনি, কত নাম করব? এখানেও বটি চেলির মোলায়েম কাজ আছে অনেক। অনেক নূতন শিল্পী এখানে বোসে শিল্পি-গুরুদের ছবি নকল করছে। এক-এক জন বেশ ভালই করছে। কেউ বা লোকের ফোটো চেয়ে নিয়ে তখুনি তখুনি হাতে এঁকে কপি করে দিচ্ছে। প্রাচীন ছবির copyও চাইলে করে দিচ্ছে। মেডিচি রাজাদের এই প্রাসাদে তাঁদের খাবার ঘরে, শোবার ঘরে, বসবার ঘরে কত যে ঐশ্বর্য্য! ঝাড়-লণ্ঠন দেখে তাকিয়ে থাকতে হয়। পাথর-বসানো এবং রেশমী গদি-মোড়া টেবিল চেয়ার ক্যাবিনেট—আশ্চর্য্য সুন্দর কাজ! ঘরগুলির নাম Sala Ullysis, Illiad, Saturn ইত্যাদি নাম দিয়ে। স্নানের ঘরের সুন্দর কাজ-করা মর্ম্মর চৌবাচ্চাটি দেখলেই স্নান করতে ইচ্ছা হয়। ফ্লরেন্স শীতের দেশ নয়, কাজেই স্নানের ঘর দেখলে আনন্দ হয়।

ফিরবার পথে অনেক গহনার দোকানের সামনে দিয়ে এলাম। এ দেশের গহনার কাজ বিখ্যাত। তবে দাম বড় বেশী। চামড়ার কাজও খুব সুন্দর। আমরা ছোটখাট কিছু কিনলাম। দুটি সুন্দরী মেয়ে জিনিষ বিক্রী করছিল। তাদের ছবি আমার মেয়েরা তুলল।

শূন্যগুলি পড়ে আছে

শ্রীবারি দেবী

জীবনের মহালগ্ন কবে মোর গেল চলি?
কবে যেন জ্বলেছিলো হৃদে প্রেম-দীপগুলি?
আলোকের পথ বাহি কবে তুমি এসেছিলে
মধুর লগনে যেন মোরে ভালোবেসেছিলে।
সেদিন স্বপন দিয়ে ছিলো শুধু জাল-বোনা
ধরণীর বেশী কিছু ছিল নাকো জানা-শোনা,
জীবন ধারণ লাগি বেশী কিছু প্রয়োজন—
ছিল নাকো, তার তরে নানাবিধ আয়োজন।
আনন্দের ঝরণায় হৃদি মোর অবগাহি
অনিমেষ আঁখি মেলি তব পানে ছিল চাহি।
এলোমেলো চিন্তাগুলি ছিলো যেন মধু-ঝরা
ছিল যেন এ ধরণী রামধনু রঙে ভরা,
যা কিছু নয়নে হেরি, সব যেন লাগে ভালো
কোথাও আঁধার নাই শুধু খুসি ভরা আলো।
তার পর কবে যেন হেরি নাহি সেই দিন
দিন, মাস, বর্ষ মাঝে কবে হয়ে গেছে লীন,
ধন, মান, গৌরব কত লভিয়াছি আজ
ঘিরেছে আমারে আজি ছোট-বড় কত কাজ।
ভ্রমিলাম কত দূর কত দেশ-দেশান্তর
সাগর-পর্ব্বত হেরি, কত মরু-প্রান্তর,
ভালো লাগা দিনগুলি কোথাও না খুঁজে পাই
পৃথিবীতে যেন আজ রূপ রস গন্ধ নাই।
বাহিরের আভিজাত্য ঐশ্বর্য্য রূপের পায়
অন্তরের শূন্যতা মাথা খুঁড়ে মরে হায়,

শূন্যগুলি পড়ে আছে রূপে তুমি নাই
জীবন বৈচিত্রহীন, লক্ষ্যহীন আজি তাই।
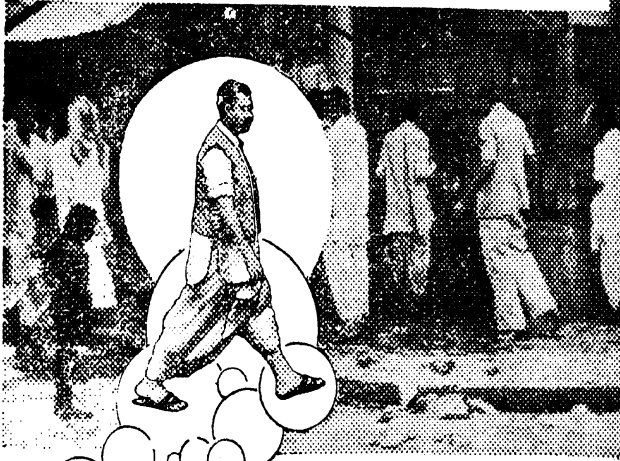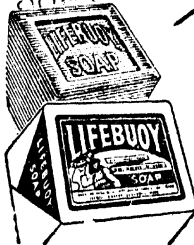
সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

যতীন্দ্রনাথ মজুমদার—গ্রন্থকার। নিবাস—মৈমনসিংহ। শিক্ষা—বি-এল। গ্রন্থ—আকাশের গল্প (জ্যো)।

যতীন্দ্রনাথ মিত্র—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা (মাসিক, ১৩০৭)।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯০ খৃঃ ১৫ই মে ২৪-পরগনার বসিরহাটের অন্তর্গত বাজিতপুরে। পিতা—যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাল্যকাল হইতেই গদ্য ও পদ্য রচনা। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। 'সাহিত্যরত্ন', 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিলাভ। পরিচালক—বসিরহাট-হিতৈষী (সাপ্তাহিক, ১৯৪৩—১৯৫০)। গ্রন্থ—মমতার ফাঁসী (উপ, ১৩৩৩), আসমানতারা (ঐ, ১৩৩৪), আরত্রিক (কাব্য, ১৩৩৮), গীতিকদম্ব (কাব্য, ১৩৩৯), রসায়নাচার্য চুণীলাল (জীবনী, ১৩৪১)। সম্পাদক—আরতি (মাসিক, ১৩১৪-১৫)।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—জ্যোতির্বিদ্। নামান্তর—জ্যোতি-র্বাচস্পতি। জন্ম—১২৯০ বঙ্গ মাঘ পুরুলিয়া। পিতা—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। ছাত্রজীবন—পুরুলিয়া ও রাঁচীতে। গ্রন্থ—নিবেদিতা (নাটক), সমাজ (নাটক), ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র, মাসফল, রাশিফল, লগ্নফল, হাতদেখা, কোষ্ঠি দেখা। সম্পাদক—বিধিলিপি (জ্যো-মাসিক)।

যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—নাট্যকার। বি-এ। গ্রন্থ—মণিমেলা, শিখের কথা, অভিশাপ (নাটক)।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—কবি। জন্ম—১৮৮৭ খৃঃ বর্ধমান জেলায় পাতিলপাড়ায় (মাতুলালয়ে)। পিতা—দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। পৈতৃক বাসস্থান—শান্তিপুরের হরিপুর। শিক্ষা—বি· ই (শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ)। কর্ম—কৃষ্ণনগর জেলা বোর্ড, কাশিমবাজার এষ্টেট। কাব্য গ্রন্থ—মরীচিকা, মরুমায়া, মরুশিখা, সায়ম্, অনুপূর্বা, কাব্য পরিমিতি।

যতীন্দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নভোরেণু, ছায়াপথ, হাসির হররা, মর্মগাথা, রামধনু।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা, স্যর—সাহিত্যানুরাগী ও সুকবি। জন্ম—১২৩৮ বঙ্গ ২রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটায়। মৃত্যু—১৩১৪ বঙ্গ ২৪এ পৌষ। পিতা—হরকুমার ঠাকুর। মাতা—শিবসুন্দরী দেবী। শিক্ষা—ইন্ফ্যাণ্ট স্কুল, হিন্দু কলেজ ও স্বগৃহে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৭০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অফ ফ্যাক্যালটী অব আর্টস; জাষ্টিস অফ দি পিস, বহু জন-হিতকর শিক্ষা, শিল্প ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। রায় বাহাদুর (১৮৭১), মহারাজা (১৮৭৭), সি-আই-ই (১৮৭৯), কে-সি-আই-ই (১৮৮২), মহারাজা বাহাদুর (১৮৯০) উপাধি লাভ। গ্রন্থ—Flights of Fancy. বিদ্যাসুন্দর, বুঝলে কি না? গীতমালা।

যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী—কবি। জন্ম—১২৮৫ বঙ্গ নদীয়া জেলার জামসেরপুর গ্রামে বিখ্যাত জমীদার-বংশে। মৃত্যু—১৯৪৮ খৃঃ কলিকাতা বালিগঞ্জে। পিতা—হরিমোহন বাগ্চী। শিক্ষা—হেয়ার স্কুল, বি-এ (১৯০২)। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যচর্চা ও কবিতা-রচনা। প্রথম কবিতা প্রকাশ (১৮৯১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে। 'কবি ভূষণ' উপাধি লাভ (কাশী, ১৩৩০), বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—পল্লীকথা (ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ), রেখা (১৩১৩), লেখা (১৩১৭), অপরাজিতা (১৩২০), নাগকেশর (১৩২৪), বন্ধুর দান (১৩২০), জাহ্নবী (১৩২৯), নীহারিকা (১৩৩৪), পাঞ্চজন্য (১৩৩৮), পথের সাথী (উপন্যাস), মহাভারতী, কাব্যমালঞ্চ। সম্পাদক—মানসী (অন্যতম, ১৩১৩—২০), যমুনা (যুগ্ম, ১৩২৮), পূর্বাচল (মাসিক)।

যতীন্দ্রমোহন মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সাধক সহচর (ধর্ম)।

যতীন্দ্রমোহন রায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮৩ বঙ্গ বিক্রমপুর রূপসার বিখ্যাত জমীদার-বংশে। শিক্ষা—টোল, এবং বি-এ পর্যন্ত পাঠ। গ্রন্থ—ঢাকার ইতিহাস।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ—সাহিত্যিক। জন্ম—ফরিদপুরে। মৃত্যু—১৩৪৪ বঙ্গ পৌষ কলিকাতা। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—উড়িষ্যার চিত্র (১৩১০) ধ্রুবতারা, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা, অনুপমা, সন্ধি, সাকার ও নিরাকারতত্ত্ব বিচার।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিল্বদল, দূর্বাদল, গৌরী, পুষ্পদল, অশ্রুময়।

যতীশচন্দ্র বসু—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯৩ খৃঃ ২৬এ জানুয়ারী মেদিনীপুরের কাঁথিতে। পিতা—জ্ঞানদাচরণ বসু (রায় সাহেব) শিক্ষা—বি· এ (১৯১৫)। কর্ম—সরকারী চাকুরী, ভারত গভর্ণমেণ্ট—কলিকাতা-দিল্লী (১৯১৭—১৯৫০)। গ্রন্থ—নমিতা (১৩৩৭), বঙ্কিম সাহিত্যে ছদ্মবেশ ও ছদ্ম পরিচয় (১৩৪৫), পাষাণের স্নেহাশীষ (১৩৪৪)। সহ-সম্পাদক—Indian Bridge World (১৯৩৩)।

যদুকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—কবি। গ্রন্থ—বাণযুদ্ধ (প-অনুবাদ, ১২৯৬)।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—সংবাদপত্রসেবী। গ্রন্থ—হতভাগ্য মুরাদ (অনুবাদ, ১২৬০)। সম্পাদক—সাপ্তাহিক সমাচার (১২৮০)

যদুনাথ চক্রবর্তী—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—আসাম-মিহির (আসামের প্রথম সাপ্তাহিক, দ্বিভাষিক, ১৮৭২)।

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। গ্রন্থ—পরিত্যক্ত গ্রাম (কাব্য, ১৮৬২)। যুগ্ম-সম্পাদক—জ্ঞান অরুণোদয় (মাসিক, শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত বাঙালি পরিচালিত প্রথম সাময়িকপত্র, ১৮৫২ খৃঃ ৩১এ জানুয়ারি)।

যদুনাথ তর্কভূষণ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—ভারত পরিদর্শন (সাপ্তাহিক, ১৮৬৩ খৃঃ ১৫ জুন); পরিদর্শন (মাসিক, ১৮৬৪, ডিসেম্বর)।

যদুনাথ পাল—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সম্বাদ-রত্নাকর (পাক্ষিক, ১৮৪৯ খৃঃ ডিসেম্বর), রসরত্নাকর (১২৫৬)।

যদুনাথ বিদ্যারত্ন—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—ঈশ্বরচন্দ্র সমালোচনা পত্রিকা (১৩১৫)।

যদুনাথ ভট্টাচার্য, অন্ধ—ঔপন্যাসিক। জন্ম—১২৬৪ বঙ্গ যশোহর জেলায়। শিক্ষা—বি-এ এবং আইন পাস। আইন ব্যবসায়, যশোহর মাগুরায়। গ্রন্থ—কালাপাহাড় (১৩১৪), কমলা, কর্মবীর, লক্ষীবৌমা, নির্মলা, রাজা দেবল রায়, রাজা শত্রাজিৎ সিংহ, সোনার সংসার, সুলক্ষণা, সুশীলা ও সরলা, দুই ভ্রাতা, সীতারাম রায়, কৃষককুটীর, লক্ষ্মীগিন্নী, লক্ষ্মীছেলে, পাঁচফুল, দেখলে হাসি পায় (১২৯৫), সুখচক্র (১২৮৮)।

যদুনাথ মজুমদার—আইন-ব্যবসায়ী ও জননেতা। জন্ম—১২৬৬ বঙ্গ ৭ই কার্ত্তিক যশোহর লোহাগড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩০০ বঙ্গ ১২ই চৈত্র। শিক্ষা—এম. এ, বি. এল। বেদান্তবাচস্পতি ও রায় বাহাদুর (১৯০২) উপাধি লাভ। কর্ম—কিছু কাল শিক্ষকতা, নেপাল দরবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কাশ্মীরের রাজস্বসচিব। এই সময়ে আইন পাস। আইন ব্যবসায়, যশোহর (প্রথম উকীল, যশোহর)। নীলকরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান (১৮৮৯-৯০) হন, যশোহর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি (১৯০২)। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—আমিষের প্রচার, দুই খণ্ড, ব্রহ্মসূত্র, ঋক্‌ভাষ্যোপদ্‌ঘাত প্রকরণ, উপবাস, পল্লীস্বাস্থ্য, শাণ্ডিল্যসূত্র (ইংরেজি টীকা), গীতা-সপ্তক, গীতাত্রয়, পরিব্রাজক সূক্তমালা। সম্পাদক—হিন্দুপত্রিকা (মাসিক, ১৩০১), Tribune (লাহোর), যু-সম্পাদক—United India।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার—চিকিৎসক। জন্ম—১২৪৬ বঙ্গ শান্তিপুর (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩০০ বঙ্গ ১২ই চৈত্র গরিবপুরে। পিতা—কালিদাস মুখোপাধ্যায়। পৈতৃক নিবাস—যশোহর গরিবপুর। শিক্ষা—জুনিয়ার স্কলারশিপ, মেডিকেল কলেজ এল.এম. এস। চিকিৎসা ব্যবসায় (রাণাঘাট, চুঁচুড়া ও কলিকাতা)। গ্রন্থ—ধাত্রীবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিচার, শরীর পালন, সরল জ্বরচিকিৎসা, ; সম্পাদক ও প্রকাশক—চিকিৎসাদর্পণ (মাসিক, রাণাঘাট, ১২৭৮), Indian Empire (সাপ্তাহিক, কলিকাতা)।

যদুনাথ সরকার—বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর রাজসাহী জেলার করচমাড়িয়া গ্রামে। পিতা—রাজকুমার সরকার (জমীদার)। শিক্ষা—রাজসাহী কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, বি. এ (১৮৯১), এম, এ (১৮৯২), রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি (১৮৯৭), ডি. লিট্ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৪), মোয়াট পুরস্কার (১৮৯৭)। কর্ম—অধ্যাপক, রিপণ কলেজ (১৮৯৩), মেট্রোপলিটান ইন্‌সটিটিউসন (১৮৯৬—৯৮), প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৯৮-১৮৯৯, ১৯০১) পাটনা কলেজ (১৮৯৯-১৯০১, ১৯০২-১৯১৭, ১৯২৩-২৬), হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (কাশী, ১৯২৩-১৯২৬) ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (১৯১৭-১৯১৯), আই-ই-এস (১৯১৮), অধ্যাপক, র‍্যাভেনশা কলেজ (১৯১৯-২৩), ভাইস-চ্যান্সেলর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৬-১৯২৮), লেকচারার, মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। কে. টি (১৯২৯), সি-আই-ই (১৯২৬), রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি (১৯৩৫-৩৬, ১৯৪০-৪৪, ১৯৪৮) ভারতে মোগল শাসন ও শিবাজী সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান ও মৌলিক গবেষণা করেন। গ্রন্থ—শিবাজী (১৯২৯, নভেম্বর), মারাঠা জাতির বিকাশ (১৯৪৩, আষাঢ়), India of Aurangzib (১৯০১), Economics of British India (১৯০৯, মার্চ), History of Aurangzib, ১ম (১৯১২, জুলাই), ২য় (ঐ), ৩য় (১৯১৬), ৪র্থ (১৯১৯, নভেম্বর), ৫ম (১৯২৪, ডিসেম্বর), Anecdotes of Aurangzib & Historical Essays (১৯১২, নভেম্বর), Chaitanya : His pilgrims & teaching (১৯১৩), Shivaji & his times (১৯১৯, জুলাই), Studies in Mughal India (১৯১৯, অক্টোবর), Mughal Administration ১ম (১৯২০), ২য় (১৯২৫), India through the Ages (১৯৩০), Bihar & Orissa during the fall of the Mughal Empire (১৯৩২), Fall of Mughal Empire, ১ম (১৯৩২), ২য় (১৯৩৪, সেপ্টেম্বর), ৩য় (১৯৩৮, নভেম্বর), Studies in Aurangzib's Reign (১৯৩৩), House of Shivaji (১৯৪০, মে), Maasir-i-Alamgiri (১৯৪৭, অক্টোবর); সম্পাদিত গ্রন্থ—সিয়ার-উল-মুতাখ রীন (১৯১৫), Later Mughals (উইলিয়ম আরভিং কৃত, ১৯২২), Poona Residency Correspondence, ১ম (১৯৩৬), ২য় (১৯৪৫), ৩য়, Ain-i-Akbari, ২য় ও ৩য়।

যদুনাথ সর্বাধিকারী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮০৫ খৃঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের (অধুনা আরামবাগ) মধ্যে খানাকুল থানার রাধানগর গ্রামে। মৃত্যু—১৮৭০ খৃঃ। পিতা—মথুরামোহন সর্বাধিকারী। ইনি অল্প বয়স হইতেই গীতরচনা করেন এবং সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও স্বাধীনচেতা ছিলেন ও বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। গ্রন্থ—তীর্থভ্রমণ, সঙ্গীতলহরী (১২৭০ খৃঃ)।

যদুনাথ সার্বভৌম—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১২৪৮ বঙ্গ আশ্বিন নবদ্বীপে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩১১ বঙ্গ ২৭এ আষাঢ় নবদ্বীপে। পিতা—রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৈতৃক নিবাস—হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার নিকট সাতগাছিয়া গ্রামে। বাল্যে মাতামহ রামনাথ ন্যায়রত্নের নিকট শিক্ষা, পরে প্রসন্ন তর্করত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন ও 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ। টোল স্থাপনা, অধ্যাপনা, 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ (১৯০৭)। গ্রন্থ—আত্মতত্ত্ববিবেক (টিপ্পনী সহ, ১৮২২ শকে)।

যদুনাথ সেনগুপ্ত—কবি। গ্রন্থ—কুসুমকলিকা (কাব্য ১২৮৮)।

যশোদা দেবী—হিন্দী গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—এলাহাবাদ কর্ণেলগঞ্জে। হিন্দী গ্রন্থ—সচ্চি মত, সুখী কুটুম্ব, মহিলা জীবন, জীবন-রক্ষা, গর্ভ-রক্ষা-বিধান, শিশুরক্ষা, সন্ততিসুধর, ধাত্রীবিদ্যা, পতিব্রতাধর্ম্ম, সচ্চাপতিপ্রেম, বনিতাপত্রদান। সম্পাদিকা—কন্যাসর্বস্ব, স্ত্রীধর্ম-রক্ষক।

যশোদানন্দন সরকার—সাময়িকপত্রসেবী। যশোহরে স্কুল-সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর। সম্পাদক—একাকিনী (মাসিক, ১২৮২)। গ্রন্থ—শক্তিশেল (কাব্য, ১২৭৭), ঋতুসংহার, সমাজ-দর্পণ (সাপ্তাহিক, ১২৭৯)।

যশোদালাল তালুকদার—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—ইন্দুমতী (১৩০১), নন্দরাণী, প্রলাপ।

যাত্রামোহন বিশ্বাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৈদিক সন্ধ্যাপদ্ধতি, চট্টল কায়স্থ-পরিচয়।

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। কুচবিহারের সিবিল এবং সেসন জজ। রায় বাহাদুর উপাধি লাভ। গ্রন্থ—কুলশাস্ত্রদীপিকা।

যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলার শান্তিপুর। বি. এ, এম, বি। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—বিধবা-বিবাহ-বিবাদভঞ্জন (১২৯৫)।

যাদবচন্দ্র সরকার—কবি। জন্ম—যশোহর। গ্রন্থ—কল্পলতা (কাব্য)।

যাদবপ্রকাশ—পণ্ডিত। নামান্তর—যাদবাচার্য। ১১শ শতাব্দী। প্রসিদ্ধি আছে যে, যাদবপ্রকাশ রামানুজের গুরু হইয়াও পরে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গ্রন্থ—যতিধর্মসমুচ্চয়, বিষ্ণুস্মৃতির টীকা, বৈজয়ন্তী (অভিধান)।

যামিনীকিশোর গুপ্ত রায়—গ্রন্থকার। এম. এ, বি. এল। গ্রন্থ—রাজগীতা বা বঙ্গোচ্ছ্বাস।

যামিনীকুমার বিশ্বাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তামাকের চাষ।

যামিনীমোহন কর—সাহিত্যিক। জন্ম—১৯১১ খৃঃ ২রা মার্চ কলিকাতা। শিক্ষা—এম. এ (১৯৩২)। কর্ম—অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ (১৯৩৪), আশুতোষ কলেজ (১৯৩৫)। প্রাথমিক স্থিতিবিদ্যা ও খনিবিদ্যা কমিশনের সদস্য (১৯৪৪)। গ্রন্থ—আপ টু-ডেট, এম-সি-সি লেফটেন্যাণ্ট, বকধার্মিক, মডার্ণ শকুন্তলা। সম্পাদক—মাসিক বসুমতী।

যামিনীমোহন ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিক্ষা-সমস্যা, সংসার-সমস্যা।

যামুনাচার্য—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। জন্ম—৯৫৩ খৃঃ বীরনারায়ণপুরে (মাদুরা)। পিতা—ঈশ্বরমুনি। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে কোলাহল নামক পণ্ডিতকে পরাভব করিয়া পাণ্ড্যরাজের নিকট বিপুল বৈভব লাভ এবং ৩২ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ। গ্রন্থ—সিদ্ধত্রয় (আত্মাসিদ্ধি, ঈশ্বরসিদ্ধি, সংচিৎসিদ্ধি), গীতার্থসংগ্রহ, আগমপ্রামাণ্যম্, স্তোত্ররত্নম্।

যাযাবর—ছদ্মনাম। আসল নাম—বিনয় মুখোপাধ্যায়। জন্ম—১৯১২ খৃঃ ১০ই জানুয়ারি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। পিতা—ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—সেণ্ট পলস্ ও ইউনিভারসিটি কলেজ। কর্ম—অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তরে সাংবাদিক বিভাগে, ডেপুটি অফিসার, ইনফরমেশন ব্যুরো। গ্রন্থ—দৃষ্টিপাত (১৯৪৭, পৌষ) জনান্তিক (১৩৫৯, অগ্রহায়ণ)।

যাস্ক—টীকাকার! জন্ম—খৃষ্টপূর্ব ৭০০—৫০০ শতকের মধ্যে। গ্রন্থ—নিরুক্ত।

যোগমায়া মাতাজী—তপস্বিনী। সম্পাদিকা—ভারতলক্ষ্মী (১৩১৭, চৈত্র)।

যোগানন্দ প্রামাণিক ভারতী—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—নদীয়া জেলায় শান্তিপুরে। সম্পাদক—যুবক (১৩০৫)।

যোগানন্দ সরস্বতী, স্বামী—সন্ন্যাসী। গ্রন্থ—বৈদিক রহস্য সন্দর্ভ, স্বরূপসিদ্ধ।

যোগানন্দ স্বামী—সন্ন্যাসী। গ্রন্থ—সনাতন ধর্ম ও মানবজীবন, শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত, যোগানন্দলহরী, ছেলেদের দেবদর্শন।

যোগানন্দ হংস—গ্রন্থকার। যোগানন্দ সাহা দ্রষ্টব্য।

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—হাওড়া। ইনি বহু সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—উপন্যাস—সতীকাহিনী, বর্ণাশ্রম, সতীর চিতা, মোহনমালা, অনাথা, নষ্টচরিত্র, সতীপ্রতিভা; জীবনী—তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, সংসারচক্র, শক্তিসাধনা, বামা ক্ষেপা; সম্পাদক—বিশ্বজননী (মাসিক, ১৩০৭—১৩০৯), আলোচনা (১৩০৪—১৩২৯)।

যোগীন্দ্রনাথ বসু—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৪ বঙ্গ ১৮ই শ্রাবণ ২৪-পরগনা জেলায় ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত নিতাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩৪ বঙ্গ ৪ঠা শ্রাবণ কলিকাতায়। পিতা—নিতাইচাঁদ বসু। মাতা—বামাসুন্দরী। শিক্ষা—বাল্যে মাতুলালয়ে দক্ষিণ বারাসাতে, বহড়ু গ্রামে ইংরেজি বিদ্যালয়ে, প্রবেশিকা (মেট্রোপলিট্যান ইন্‌স্‌টিটিউসন, ১৮৭১), এফ. এ (সংস্কৃত কলেজ, ১৮৭৩), বি, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৭৫)। কর্ম—অধ্যাপক, রিপন কলেজ, ইউনিভার্সিটী স্কুল; অসুস্থ হইয়া দেওঘরে গমন এবং দেওঘর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (১৮৮৪—১৯০০)। দেওঘরে কুষ্ঠাশ্রম, চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা। কলিকাতায় প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহশিক্ষক (১৯০১), অতঃপর ঠাকুর এষ্টেটের একসিকিউটর। বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা। প্রথম কাব্যরচনা 'রাজ উদাসীন' বি. এ পাঠ্যাবস্থায়। 'কবিভূষণ' উপাধি লাভ (১৯১৭)। নানা কাজের অবসরে পুস্তক রচনা। বঙ্গ-সাহিত্যে ইঁহার দান অতুলনীয়। ইঁহার কাব্যের মাধুর্য, শিল্পচাতুর্য ও সৌন্দর্য চিরকালই বঙ্গবাসীর নিকট আদরণীয়। গ্রন্থ—রাজ উদাসীন, একাদশ অবতার (ব্যঙ্গকাব্য, ১২৯৩), মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (১৩০০), সরল কৃত্তিবাস (১৩১৪), সরল কাশীরামদাস (১৩১৫), কঠোপনিষদ্ (১৩১৯), পতিব্রতা (১৩২০), পৃথ্বিরাজ (কাব্য, ১৩২২), শিবাজী (ঐ, ১৩২৫), ছোট ছোট গল্প, মানবগীতা (১৩৩২), অহল্যাবাঈ, তুকারাম চরিত, অমর কীর্তি, কবিতা প্রসঙ্গ, ৩ খণ্ড, সরল শিশুপাঠ, ৩ ভাগ, ছবি ও কবিতা, ২ ভাগ, রচনা প্রকরণ, আদর্শ পাঠ, ৫ ভাগ, আদর্শ কবিতা, রামায়ণের ছবি ও কথা, সরল প্রবন্ধ ও কবিতা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতবর্ষের সুখপাঠ্য ইতিহাস, সীতা, দেববালা (নাটক) গন্ধর্বনগর (প্রহসন), পর্ণকুটীর (উপন্যাস—অপ্রকাশিত)। সম্পাদক—সুরভি (সাপ্তাহিক, ১২৮৯)।

যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—শিক্ষাব্রতী ও আইনবিদ্। জন্ম—নবদ্বীপ। পিতা—রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য। শিক্ষা—এম. এ (১৮৭১), বি. এল (১৮৮৩), ডি. এল (১৮৮৫), 'স্মৃতিশিরোমণি' উপাধি লাভ। কর্ম—বর্ধমান রাজ এষ্টেটের আইন-সদস্য, কাশ্মীর রাজ্যের আইন-উপদেষ্টা। অধ্যক্ষ, হেতমপুর কৃষ্ণনগর কলেজ। গ্রন্থ—ব্যবস্থা-কল্পদ্রুম।

যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—শিক্ষাবিদ্ ও সুচিকিৎসক। জন্ম—২৪-পরগনা বসিরহাটের অন্তর্গত বাজিতপুর। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ও গীতবাদ্যানুরাগী। গ্রন্থ—শিশুরঞ্জন ব্যাকরণ।

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্। জন্ম—১৮৮৩ খৃঃ যশোহর জেলার কচুবাড়িয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৯২৮ খৃঃ চুনারে। পিতা—বিপিনবিহারী সমাদ্দার। শিক্ষা—বঙ্গবাসী কলেজ,

বি. এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। কর্ম—অধ্যাপক, টাঙ্গাইল কলেজ, হাজারিবাগ কলেজ, পাটনা গভর্ণমেন্ট কলেজ। বহু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণা। 'প্রত্নতত্ত্ববারিধি', 'প্রত্নতত্ত্ববাগীশ' উপাধিলাভ (পাটনা)। 'পাটনা মিউজিয়ম' ইঁহারই প্রচেষ্টায় স্থাপিত। বহু সাময়িকপত্রের গবেষণামূলক প্রবন্ধরচয়িতা। গ্রন্থ—সমসাময়িক ভারত (২১ খণ্ড), অর্থনীতি, অর্থশাস্ত্র, ইংরাজের কথা, সাহিত্য পঞ্জিকা, পঞ্চবাণ (গল্প), চতুর্বেদ (ঐ), দেশভক্তি (ঐ)। Glories of Magadh, Economic Condition of Ancient India, Economic History of Behar.

যোগীন্দ্রনাথ সরকার—শিশু-সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬৭ খৃঃ (আম্লু)। বিখ্যাত চিকিৎসক স্যর নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মৃত্যু—১৯৩৭ খৃঃ। কর্ম—শিক্ষকতা (প্রথম জীবনে); প্রতিষ্ঠাতা 'সিটি বুক সোসাইটি'। প্রকাশক—'মুকুল' (শিশুপাঠ্য মাসিক)। গ্রন্থ—পশুপক্ষী, হিজিবিজি, জানোয়ারের কাণ্ড, ছোটদের চিড়িয়াখানা, হাসিখুসি, কুরুক্ষেত্র, খুকুমণির ছড়া, বনে-জঙ্গলে, ছবি ও গল্প, হাসিরাশি, হাসি ও খেলা, সাবিত্রী, রাঙাছবি, খেলার হাসি, আষাঢ়ে স্বপ্ন, ছবির বই, লঙ্কাকাণ্ড, মজার গল্প, নূতন ছবি, হরিশ্চন্দ্র, নলদময়ন্তী শ্রীবৎস।

যোগীন্দ্রনাথ সেন—আয়ুর্বেদবিদ্। 'বিদ্যাভূষণ' 'বিদ্যারত্ন' উপাধিলাভ। কবিরাজী চিকিৎসা-ব্যবসায়ী (কাশী)। গ্রন্থ—পরিব্রাজকের গীতা।

যোগীন্দ্রনারায়ণ সিংহ—সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—১৮৬৫ খৃঃ ফাল্গুন। মৃত্যু—ঘাটশিলায়। শিক্ষা—প্রবেশিকা (উত্তরপাড়া স্কুল, ১৮৮৬)। কর্ম—শিক্ষকতা, উত্তরপাড়া স্কুল, কৃষ্ণগঞ্জ স্কুল (পূর্ণিয়া), গোয়ালন্দ রাজবাড়ী, কলিকাতা রামফ্রে রোজা এর্টনীর অফিসে চাকুরী, সরকারী আবগারী বিভাগে (১৮৯৫-১৯২৫)। ঘাটশিলায় স্থিতি (১৯১১)। সম্পাদক—সবিতা (মাসিক উত্তরপাড়া ১২৯৬)।

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—বৃদ্ধের বচন, আগন্তুক, জামাই জাঙ্গাল, শ্রীমন্ত সওদাগর, অমিয় উৎস। সম্পাদক—বঙ্গবন্ধু।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। এম. এ, বি. এল। আইন-ব্যবসায়ী। রায় বাহাদুর উপাধি লাভ। গ্রন্থ—Hindu Law, Hindu Law of Imparticible Property & Endowment.

যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—কমলা (১৩৩০)।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার ও সাময়িকপত্রসেবী। জন্ম—১৮৫৪ খৃঃ ৩০এ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলায় মেমারির নিকট ইলসবা গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৯০৫ খৃঃ ১৮ই আগষ্ট। পিতা—মাধবচন্দ্র বসু। পৈতৃক নিবাস—দামোদর তীরে বেড় গ্রামে। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল, ১৮৭২), এফ. এ, হুগলী কলেজ। শিক্ষকতা—জনাই স্কুল। আইন পাঠ, এলাহাবাদ। গ্রন্থ—মডেল ভগিনী ৪ খণ্ড (১২৯৩-৯৫), বাঙ্গালী চরিত, ৩ খণ্ড (১২৯২-৯৩), চিনিবাস চরিতামৃত (১৮৮৬), মহীরাবণের আত্মকথা (১২৯৫), কালাচাঁদ, ৫ পর্ব (১৮৮৯-১৮৯০), পঞ্চানন্দ (১৮৯৮), কৌতুককণা (১৩০৭), নেড়া হরিদাস (১৩০৮, অগ্রহায়ণ), শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৯০২) এবং বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রকাশ। সম্পাদক—বঙ্গবাসী (সাপ্তাহিক, ১২৮৮, অগ্রহায়ণ), জন্মভূমি (১২৯৭), যুগ্ম-সম্পাদক—সঙ্গীত চিত্তসন্তোষ (মাসিক, ১২৭৭)।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। গ্রন্থ—মাধবী, তসবীর ও ছোট গল্প, শুভক্ষণ, প্রিয়তমা, নারীধর্ম, গৃহলক্ষ্মী, পল্লীরাণী, পরশমণি, বঙ্গের মহিলা কবি, ভারত মহিলা, ভারতের বীর রাজা, অজানা দেশ, বিদ্রোহী বালক। বিক্রমপুরের ইতিহাস, কেদার রায়, প্রহ্লাদ, রূপকথা, ভীমসেন, ডালি, অর্জুন, ধ্রুব। সম্পাদক—বিক্রমপুর (ত্রৈমাসিক, মৈমনসিংহ, ১৩২০-২৮), পথিক (মাসিক, ১৩১১), শিশুভারতী।

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—সাময়িকপত্রসেবী। প্রকাশক—সাহিত্য-সংক্রান্তি (মাসিক, ১৮৬৩, জুন)। সম্পাদক—অবোধবন্ধু (মাসিক, প্রকৃত পক্ষে অবোধবন্ধুর দ্বিতীয় পর্যায়, ১৮৬৩ খৃঃ এপ্রিল)।

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষাল—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—শক্তিনারায়ণ তিননাথ।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৮৫৮ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল হুগলী জেলায় বাঘাণ্ডা গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৯০৯ খৃঃ ২৯এ জানুয়ারি। পিতা—গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৭৬), এফ. এ পর্য্যন্ত পাঠ (জেনারেল এসেম্‌ব্লিস)। পঠদ্দশা হইতে সাহিত্যে অনুরাগী। প্রকাশক—সুধাকর (১৮৭৭), কল্পনা (মাসিক, ১৮৭৮)। সম্পাদক—অবকাশ (মাসিক, ১২৮৮), কল্পনা (মাসিক, ১২৯৬), বিদ্যাদর্পণ (মাসিক, ১৮৫৩ খৃঃ এপ্রিল), সিদ্ধান্তদর্পণ (মাসিক, ১৮৫৫, মার্চ)। গ্রন্থ—আমাদের ঝি (১৩০০), উন্মাদিনী (১৩০৩), কলঙ্কিনী (১৩০২), গল্পগুজব (১৩০৫), চা-কুলীর আত্মকাহিনী (১৩০৮), জঙ্গলী মেয়ে, দুই বন্ধু, পঞ্চপ্রদীপ (১৩০২), পাহাড়ী বাবা (১৩১৩), প্রেম প্রতিমা, ফুলের সাজি (১২৯৭)।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—বড় ভাই (১৩০১), রমা বাই (১৩০২), রায় পরিবার (১৯০৪), লীলাময়ী (১২৯৮) সংসার-চিত্র, সমাজ-চিত্র (১৩১৩), সরলা, স্ত্রী ও স্বামী (১৩০১)।

যোগেন্দ্রনাথ বসু—সাময়িকপত্রসেবী। এম. এ, বি. এল। সম্পাদক—জমীদারী পঞ্চরং (মাসিক, ১২৯৮)।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৫ খৃঃ ১লা জুলাই রাণাঘাট সাবডিভিসনের শিমহাট গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৯০৪ খৃঃ ১২ই জুন। পিতা—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নদীয়ায় সুবর্ণপুরনিবাসী)। শিক্ষা—কলিকাতা লং সাহেবের স্কুল (১৮৫৬), সংস্কৃত কলেজ (১৮৫৭), এনট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ (১৮৬৫), এফ. এ (ঐ, ১৮৬৭), বি. এ (ঐ, ১৮৭১), এম. এ (ঐ, ১৮৭২)। কর্ম—শিক্ষকতা, সংস্কৃত কলেজ, অধ্যাপক। ক্যাথিড্রেল মিশন দলে সংশ্লিষ্ট (১৮৭৬), ডেপুটী ক্যালেক্টর ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৮০-১৯০৩)। গ্রন্থ—কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থ সমালোচনা (১৮৭১,

অক্টোবর), জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত (১২৮৪, বৈশাখ), ম্যাট্‌সিনির ইতিবৃত্ত (১২৮৬, চৈত্র), হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলি (১২৮৭, মাঘ) আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা (১৮৮৩), সমালোচনা-মালা (১২৯২, ভাদ্র), ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত (১৮৮৬, অক্টোবর), প্রাণোচ্ছ্বাস (কবিতা, ১২৯৫, চৈত্র), শাস্তি পাগল (স্তোত্র, ১২৯৬, জ্যৈষ্ঠ), কীর্তিমন্দির বা রাজপুত্রবীর কীর্তি (১২৯৩, আশ্বিন), গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত (১৮৯০, জানুয়ারি), চিন্তাতরঙ্গিণী (১২৯৬, চৈত্র), প্রহ্লাদ (১৩০১), বীরপূজা, ১ম (১৯০০, মার্চ), ২য় (ঐ, মে), আইন সংগ্রহ, ৮ খণ্ড, জ্ঞানসোপান, ৩ খণ্ড, (১২৮৭), শিশুপাঠ, ২ খণ্ড (১২৯৮), চৌকিদার দর্শন (১৩০২)। সম্পাদক—আর্যদর্শন (মাসিক, ১৮৭৪, এপ্রিল)।

যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—পাক্ষিক প্রবেশিকা (১২৭৭)।

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—ব্রহ্মবিদ্যা (১৩৩০-৩৫)।

যোগেন্দ্রনাথ রায়—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—জ্যোতিবিজ্ঞান-কল্পলতিকা, গায়ত্রী উপাসনা, উৎকলে পঞ্চতীর্থ, চতুর্বেদীয় পুরুষসূক্ত, দেবদেবী, ঋষিবংশাবলী, মণিরত্নবিজ্ঞান, গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব, বৃদ্ধবোধ বর্ণ-পরিচয়, জন্মপত্রিকা'করম, অনন্তগরুড় রহস্য, নারীজাতক ও নারীলক্ষণ।

যোগেন্দ্রনাথ সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পতিতা, পথের ধূলি, মাসিমা।

যোগেন্দ্রনাথ সাহা—দার্শনিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮৩ বঙ্গ অগ্রহায়ণ পাবনা জেলায় নাকালিয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৮ বঙ্গ আষাঢ়। শিক্ষা—বি. এল। কর্ম—আইন ব্যবসায়। পরে সন্ন্যাস গ্রহণ। নামান্তর—যোগানন্দ হংস। গ্রন্থ—যোগব্রহ্মবিদ্যা, ২০ খণ্ড, আর্যভাষ গীতা, জ্যোতিববিজ্ঞান, সনাতন ধর্ম, আনন্দ-মালিকা, আনন্দসন্ধান, আনন্দসংবাদ, আনন্দজ্যোতি, Mastery of Man, Light and Truth, God and Path, Knot and Riddle.

যোগেন্দ্রনাথ সিংহ—সাময়িকপত্রসেবী। যু-সম্পাদক—তাম্বুলি-সম্বাদ (মাসিক, ১৩০১, বহরমপুর)।

যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—পল্লী-প্রকাশ (১২৯৩)।

যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—পাবনা জেলায় নূতন ভারেঙ্গা গ্রামে। আবগারী ইন্সপেক্টর। গ্রন্থ—গৌড় ও পাণ্ডুয়া (মালদহ জেলার ঐতিহাসিক কীর্তির বিবরণ)।

যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র—রাজকর্মচারী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ ৮ই এপ্রিল, মুর্শিদাবাদ জেলায় আখেরীগঞ্জে। মৃত্যু—১৯৩২ খৃঃ ১৩ই জানুয়ারি। পিতা—রামপ্রসন্ন মিত্র। আদি নিবাস—নদীয়া জেলার চাকদহ। শিক্ষা—বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল, হুগলী কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজ। কর্ম—শিক্ষকতা, সিটি স্কুল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, বাংলা সরকারের রাজস্ব বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী পদে। প্রকাশক—রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতসংকলন গ্রন্থ 'রবিচ্ছায়া' (১৮৮৫)। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ-লেখক। গ্রন্থ—'আমরা কেন অন্ন পাইব না' (প্রবন্ধ)।

যোগেন্দ্রলাল চন্দ্র—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। এল.এম.এস। গ্রন্থ—A Treatise on Treatment (১৯১১), The Art of Life (১৯১১)।

যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৯ খৃঃ ২৭এ জুলাই। সব জজ। গ্রন্থ—সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলি (১৯০৩), গীতলহরী, আদর্শ রমণী।

যোগেশচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হরিমতী, পাগল-সঙ্গীত, শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী, টাকা।

যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯৪ বঙ্গ ভাদ্র ঢাকা শহরের বনগ্রাম রোডে (মাতুলালয়ে)। পিতা—গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী। মাতা—সুপ্রসন্না দেবী। পৈতৃক নিবাস—ঢাকা জেলার কুল্লা গ্রামে। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—ব্রতকথা (১৩৩৭)

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—আইনজ্ঞ। জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ ২৮এ জুন পাবনা জেলার হরিপুর। মৃত্যু—১৯৫১ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী বালিগঞ্জে। পিতা—দুর্গাদাস চৌধুরী। স্যর আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা। শিক্ষা—কৃষ্ণনগর কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ, এম.এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৮৬)। কর্ম—অধ্যাপক, মেট্রোপলিটান কলেজ, বিলাত গমন ও বার-এ্যাট্-ল (১৮৯৫) ও আইন ব্যবসায়। ইনি সুবক্তা ছিলেন। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—ভারতীয় শিল্প কংগ্রেস। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক—Calcutta Weekly Notes.

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—নট ও নাট্যকার। জন্ম—১২৯৪ বঙ্গ (আনু) ২৪-পরগনার বসিরহাট মহকুমার চারঘাট গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৫ বঙ্গ। পিতা—বিরাজমোহন চৌধুরী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (টাকী ইংরেজি স্কুল, ১৯০৮), এফ.এ পর্যন্ত পাঠ (মেট্রোপলিট্যান ইন্‌স্‌টিউসন)। বাল্যাবস্থা হইতে সাহিত্যপ্রীতি ও ছাত্রাবস্থায় নাটক রচনা। কর্ম—শিক্ষকতা, মেট্রোপলিট্যান স্কুল, ওরিয়েণ্ট্যাল ট্রেনিং একাডেমি। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান—পরবর্তী জীবনে অভিনেতা ও নাট্যকাররূপে সমাদৃত। গ্রন্থ—নাদির শাহ, সীতা, দিগ্বিজয়ী, বিষ্ণুপ্রিয়া, মাকড়সার জাল, নন্দরাণীর সংসার, মহামায়ার চর, রাবণ। এতদ্ব্যতীত ইনি বহু প্রথিতযশা লেখকের বহু গ্রন্থ নাট্যীকৃত করেন।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব (১২৮২)।

যোগেশচন্দ্র বসু—ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৮৪ খৃঃ ৪ঠা মার্চ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে। নিবাস—জমর্দী, গোপাড়া। পিতা—জ্ঞানদাচরণ বসু (রায় সাহেব)। কর্ম—সরকারী চাকুরী—সেটেলমেণ্ট ও খাসমহল বিভাগে বিভিন্ন জেলায় (১৯০৭-৪০)। বহু সাময়িকপত্রের লেখক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর (১৩২১), মেদিনীপুরের ইতিহাস ১ম (১৩২৮), ২য় (১৩৪৬), বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন (১৩৩২), মেদিনীপুরের কথা (১৩৩৮), বঙ্কিম-সাহিত্যে স্বপ্নদর্শন (১৩৩১), বঙ্কিম-সাহিত্যে নৌকাযাত্রা (১৩৪৫), মেদিনীপুরের প্রথম যাহারা (১৩৫৬), মেদিনীপুরের ভূগোল (পাঠ্য), বাংলার ভূগোল (ঐ), স্বদেশের ইতিকথা (১৩৫৭)। সম্পাদক—সুযুক্তি (মাসিক, ১৩১১), মেদিনীবাণী (১৩৪৫), বিভাগীয় সম্পাদক—বঙ্গীয় মহাকোষ (১৩৪৬-৪৮)। [ক্রমশঃ।

রূপ-চয়ন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অপূর্বশপথ নিভৃতে বসে স্রষ্টিকার আঁকছেন বিশ্বছবি। দুর্নিরীক্ষ অন্তরাল থেকে ভেসে আসে চির রূপের বাণী, 'নিজেকে প্রকাশ করে গেলাম'। সে ছবি আর বাণী অনুক্ষণ আলোড়িত আবর্তিত হচ্ছে মানুষের অন্তরতম নিভৃতে। যুগ যুগ ধরে তাই এ প্রকাশের সাধনা। আকাঙ্ক্ষাগুলো তার ছুটে চলে পতঙ্গের মত, রচনা করে কীর্তি-প্রতিমা, তোলে জয়স্তম্ভ। আর আকাঙ্ক্ষার সেই বেদনাকে জড়-অমরতার পরমায়ুতে বাঁধতে চায় তার কল্প-নির্ঝর রূপের স্রষ্টারা। সে রূপকার, রূপ-রসিক। কিন্তু নির্লিপ্ত নয় বিশ্ব-শিল্পীর মত। আঁকতে জানে, মুছতে জানে না। বিলুপ্তির খরস্রোত পেরিয়েও সেই রূপ-চয়নের কিছু চিহ্ন পর্ণপত্রের মত ছড়িয়ে পড়ে থাকে এই রঙ্গস্থলীতে। সেগুলো সংগ্রহ করে বেড়ায় আবার কোন রূপদর্শী। স্তব্ধ-বিস্ময়ে উপলব্ধি করে 'এক যে ছিল কালের প্রতিচ্ছবি।' এমনি কোন সংগ্রহশালায় হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হলে মনে হয়, এরা যেন জমাট-বাঁধা এক প্রাণ-তরঙ্গের কাহিনী, বিনা সুতোয় গাঁথা মহাকালের একখানি নীরব দীর্ঘনিশ্বাস—স্থিরতার অন্তঃপুরে বন্দী হয়ে আছে।

আমি কাব্য করতে বসিনি, শিল্প নিয়ে প্রবন্ধ রচনাও উদ্দেশ্য

নিভৃতে ব'সে দু'জনে যেন কথা কইছেন

পাশ্চাত্য ঘরের সংগ্রহ থেকে

নয়। মাসিক বসুমতীর রসজ্ঞ সম্পাদক-বন্ধু সাদা কথায় রসপিপাসু পাঠকজনের কাছে একটা খবর পৌঁছে দিতে চান। বস্তুজগতে ভাগের মা গঙ্গা পায় না। রসজগতের নিয়ম আলাদা। সেখানে ভাগের পরিবেশন যত বেশী, ভোগের অমরাবতী তত সম্পূর্ণ। কিন্তু তবু ভয় হয়, এই সহজ খবরটা দিতে গিয়ে পাছে সহজতার সীমাই যাই ছাড়িয়ে। অতল-সমুদ্র প্রাণ-প্রাচুর্যের নিখুঁত নক্সা কালির অক্ষরে গণ্ডিবদ্ধ করা সম্ভব নয় কোন ভাষা-বণিকের পক্ষেও।

যে পরিবেশ নিয়ে এই ভূমিকা (২২৩।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দরকার। দু'বেলা যাতায়াতের পথে বাড়িটার স্বাতন্ত্র্যটুকুও এখন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু কমলার দরবারে লাহা-বাড়ির প্রতিষ্ঠা অবিদিত নয় কারো। বংশের ভাগ্যবিধাতা প্রাণকৃষ্ণ লাহা। সামান্য অবস্থা থেকে এই বরাসনে উন্নীত হলেন কি করে সে সম্বন্ধে চমকপ্রদ গল্প শোনা যায় দুই-একটা। কিন্তু আসল সত্য বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সাধনা। প্রাণকৃষ্ণ লাহার সেই বিপুল সঞ্চয় আজও শুনি এই পরিবারের শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত।

এই সৌধের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর ছেলে শ্যামচরণ লাহা। কাঁচা কলকাতার শ্যামলিমা তখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি। এখানে-ওখানে জঙ্গল। পাশে বিখ্যাত ঠন্‌ঠনে কালীবাড়ি, রোমাঞ্চকর ইতিহাস যার আজও গবেষণাসাপেক্ষ। সে পরিবেশে এ বাড়িটাকে এখন কল্পনা করাও সহজ নয়। সেদিনের ঘোড়ায়-টানা ট্রামের কথা শুনেই তো আমরা প্রায় হাঁ করে ফেলি। গৃহস্বামীর জীবনও ছিল বৈচিত্র্যবহুল। একদিকে খেয়ালী, দাতা এবং বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন।

যোগমায়া মূর্ত্তি

বীভৎস কিন্তু সুন্দর

প্রাচীন রোম শিল্প

অন্যদিকে বাসনার দেহলীতে প্রাণ-বন্যার উৎসব। রাজা-মহারাজা পরিবৃত শ্যামচরণের বৈঠকখানার প্রতি সেদিন কৌতূহল ছিল কলকাতাবাসীর।

পরবর্ত্তী গৃহস্বামী চণ্ডিচরণ লাহা। পিতার অনুবর্ত্তী। প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহের প্রতিও কিছুটা ঝোঁক ছিল তাঁর। কিন্তু বাড়ির চেহারা একেবারে বদলে গেল তাঁর ছেলে ভবানীচরণ লাহার সময়। স্বয়ং কলা-লক্ষ্মী হলেন অন্তঃপুরবাসিনী। শুধুই প্রথিতযশা শিল্পী নন মানুষটি। আরো বড় তাঁর শিল্পীপ্রাণ। এই বিরাট সংগ্রহ-শালার নেপথ্যে সেই প্রাণ-গুঞ্জরণ শ্রুতিমুখর! বর্ত্তমান মালিক শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ লাহা। পিতার এই অক্ষয় কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার মৌন সাধনায় নিবিষ্ট-চিত্ত। সে অনাড়ম্বর আগ্রহ দেখলে মনে হয়, সৃষ্টি বড় জিনিস, কিন্তু সৃষ্টিরক্ষার কাজটুকুও কম বড় নয়।

সুবিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশ মাত্র এক নৈঃশব্দ রাজ্যের আমন্ত্রণ কানে আসে। এখানে-ওখানে দুই-একটা লীলায়িত নারী-মূর্তি। যৌবন-প্রাচুর্য শ্বেত মর্মরে আবদ্ধ।

৺ভবানীচরণ লাহা

গাড়ি-বারান্দার নীচে তিনটি বুদ্ধমূর্তি। তাৎপর্য নেই বলতে পারিনে। যৌবনের উচ্ছলতা ছাড়ালে তবে জ্ঞানের দরজার সন্ধান মেলে। পাশের দেউড়ি অতিক্রম করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে গিয়ে পা থেমে গেল। চারদিকে চক্‌চকে শিংওয়ালা হরিণের মাথা বসানো দেয়ালে রণ-দুর্মদ রাজপুত যোদ্ধাদের লোহার সাজ-সজ্জা, বর্ম এবং অস্ত্রশস্ত্র ঝক্‌মক্‌ করছে। আজও বীর্য-সমাহিত যেন। ফাঁকির কারবার নেই এখনকার দিনের মারণাস্ত্রগুলির মত।

সামনে ঠাকুর-দালান সংলগ্ন সুপ্রশস্ত বাঁধানো অঙ্গন। কলকাতায় প্রাচীন কালের অনেক ধনী-গৃহে এমনটি দেখা যায়। পুজা-পার্বণের সাড়ম্বর সমারোহে একদা মুখরিত হত এই পরিবেশ নানা উপলক্ষ্যে তখনকার দিনের চলতি বিলাস যাত্রা ঝুমুর কবিগান প্রভৃতির আসর বসত। পুজোর তিন দিন থিয়েটার হত। চণ্ডিচরণ লাহা নাকি সিনেমাও দেখতেন এই উঠোনে। তাঁর সময়ে মিনার্ভা থিয়েটার সদলবলে এখানে অভিনয় করে গেছে কত বার। দানী বাবু, হাঁদু বাবু, নীরদাসুন্দরী, চারুশীলা প্রভৃতি প্রখ্যাত

শিল্পীদের সে প্রাণ-ঢালা অভিনয় আজ অর্ধ-বিস্মৃত গল্পের মত শোনায়।

তিন দিকে বারান্দা। সেখানে সাজানো অদ্ভুত ঢঙের নানা মূর্তি এবং অস্ত্রশস্ত্র। সকলের আগে দু'চোখ সংবদ্ধ হবে যে জীবটির প্রতি তার ইংরেজী নাম Demon faced lion, বীভৎস কিন্তু সুন্দর। রাজ্যের ক্রুরতা এবং দানব-শক্তির প্রতিকৃতি। চীনে বুদ্ধমন্দিরের সামনে এমনি জোড়া মূর্তি থাকে। কোন একজন পরিচিত চীনাদেশীয় ভদ্রলোককে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি সাদাসিধে একটা জবাব দেন। পুণ্য-মন্দিরে পৌঁছুতে হলে নরকের অপ্রতিহত শক্তিকে আগে পরাভূত করতে হবে। আবাস তার মানুষেরই আলোক-বিবর্জিত গুহা-গহ্বরে।

বন্দিনী নারী—সৌন্দর্য্যে আগুনের আভা

বারান্দার দ্বিতীয় আকর্ষণ কাঠের নিকষ কালো সায়ামী রাবণ-মূর্তিটি। ফোক্-ড্যান্স অথবা ঔপাখ্যানিক নৃত্যভঙ্গী। বাল্মীকির রাক্ষস পরিকল্পনা এবং মাইকেলের নিয়তি-নিপীড়িত মানুষ-চিত্রের সংমিশ্রণ যেন। নাচের ভঙ্গিমা এবং মুখের বিকৃত অভিব্যক্তিতে অফুরন্ত বিস্ময় এবং নির্বোধ হতাশা স্বতঃস্ফূর্ত।

দোতলায় ওঠবার মুখে সিঁড়ির ঘরটি অতিক্রম করে যেতেই সময় লাগল। সোনার পাতে বাঁধানো সারি সারি দেয়াল-জোড়া অয়েল-পেন্টিং। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে যশস্বী চিত্রকর মুরিলোর আঁকা পোপের দরবারে রমণীর বিচারের ছবিটি। কর্তব্যের মুখোস-পরা জনকতক কার্ডিনাল বিচারাসনে উপবিষ্ট পোপের সম্মুখে ধরে নিয়ে এসেছেন এক হতচকিত রমণীকে। পিছনে কৌতূহলী জনতা। বন্দিনী নারী সৌন্দর্যে আগুনের আভা। প্রখ্যাত জার্মান চিত্রকর অসওয়াল্ড ম্যালুবা'র Palate knifeএ আঁকা কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের চিত্রটিও নয়নাভিরাম। বিশ্বনাথের মন্দির, পতিত 'পাবনী' গঙ্গা, ঘাট এবং পুণ্যার্থী অগণিত নারী-পুরুষের সজীব দৃশ্যটি যেন তুলে এনে দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বাড়ির অন্তরঙ্গ সুহৃদ চিত্রশিল্পী শ্রীযুত বিজয়রতন পালের মুখে এই ছবি আঁকার মুখরোচক কাহিনীটি শুনলাম। মোটর গাড়িতে পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরোন শিল্পী অসওয়াল্ড ম্যালুবা। কলকাতায় ভবানীচরণ লাহার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন এ বাড়ি থেকে বিদায় নিতে এসে হঠাৎ ইচ্ছে হল কিছু স্মৃতি-চিহ্ন রেখে যাবেন। টেবিলের ওপর পড়েছিল একটা বাঁধানো বই। সেটা খুলতে প্রথমেই এই দৃশ্যটা চোখে পড়ল। একাগ্র মনযোগে নিরীক্ষণ করে দেখলেন কিছুক্ষণ। বইটি বন্ধ করে দিলেন সশব্দে। আঁকার সরঞ্জাম তো এ বাড়িতে সর্বদাই মজুত। সকলের বিস্ফারিত চোখের সামনেই চলল শিল্পীর কারিগরী। কিন্তু সাহেবের ওদিকে জাহাজের সময় হয়ে যায়। ঘন ঘন ঘড়ি দেখেন আর প্যালেট নাইফ চালান। এক ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে এই বৃহদাকার তৈলচিত্র শেষ করে পড়ি মরি করে তিনি ছুটলেন জাহাজ ধরতে। অথচ, চিত্রটি দেখলে মনে হবে, এর শিল্পী আজীবন বুঝি বাবা বিশ্বনাথের রাজ্যেই কাটিয়ে গেছেন।

তাঁর অনুকরণে ভবানী বাবুও মন থেকে প্যালেট নাইফ-এ জগন্নাথ মন্দিরের তৈলচিত্র আঁকলেন। উল্টো দিকে এটিও টাঙানো আছে। প্রতিযোগিতায় এই ছবিটি প্রথম হওয়ায় লর্ড উইলিংডন তাঁকে সোনার মেডেল পুরস্কার দেন। লোরেঞ্জের 'জিপসী মাদার' চিত্রটিও সুন্দর। মায়ের আশীষ-চুম্বন নিয়ে প্রথম ইস্কুলে যাচ্ছে ছেলে। ভোরের আলোর মত মাতৃস্নেহের যন্ত্রধারাও সর্বত্রই এক রকমের।
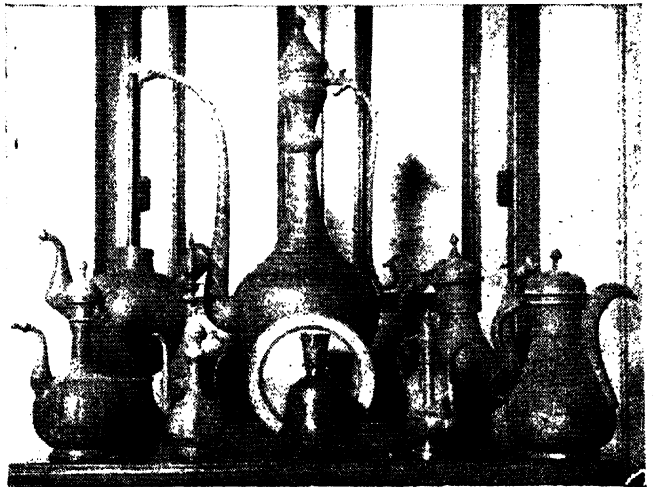
সুদূর অতীতের কত উল্লসিত মুহূর্ত্তের সাক্ষী ওরা কে জানে!
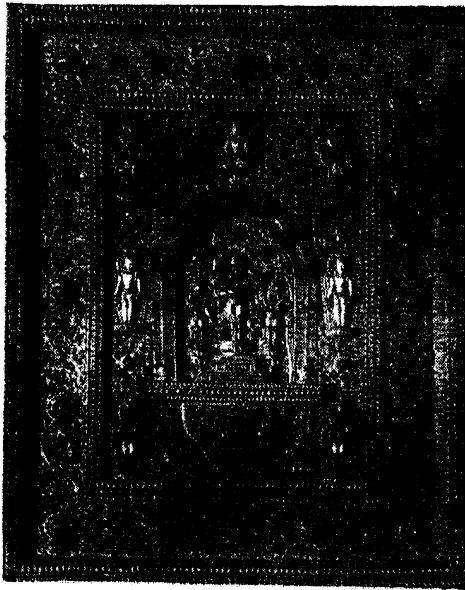
একজন নেপালী শিল্পীর সমগ্র জীবনের কাজ

মাঝখানে বসানো কারুকার্যমণ্ডিত বার্মিজ টেম্পলএর মিনিয়েচার। পুণ্য-ভস্ম অথবা মৃত ব্যক্তির স্মরণ-চিহ্ন রাখার আধার। সাধারণত মন্দিরে অথবা রাজা-মহারাজার ঘরে এগুলো থাকত। এর পিছনে যে হাস্যোদ্ভাসিত মূর্তিটি বসে তিনি জাপানী শিশু বুদ্ধ—গড অব্ দি চিল্‌ড্রেন। ঝকঝকে কালো বার্ণিশের মধ্য দিয়ে তাঁর জ্যোতির্ময় আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে। হাতে খেলনা, মুখে প্রশ্রয়ের হাসি—শিশুরা তাঁর গণেশ-মার্কা দেহ বেয়ে উঠছে ঘাড়ে, কাঁধে, পিঠে। মিল্টন কালোকে বলেছিলেন, 'Wisdom's hue', তাছাড়া শ্যামা-সঙ্গীত শুনেছি, কালো রূপে ভুবন আলো। অতিকায় এই শিশু বুদ্ধমূর্তিটি দেখলে এ সব কথার তাৎপর্য কিছুটা উপলব্ধি করা যায় বোধ হয়। অন্যথায় এই প্রবন্ধ পড়ে গায়ের রঙ যাঁদের কালো এবং সে জন্যে যাঁদের দুর্বলতা আছে, তাঁদের অহেতুক একটু সান্ত্বনা পাওয়াই সার হবে।

দোতলায় ওঠবার প্রশস্ত সিঁড়ি। পাশের দেয়াল ধরে আগাগোড়া চোখ-জুড়ানো তৈলচিত্র এবং ঝকঝকে আয়নাগুলো সিঁড়ির জাঁকজমক বাড়িয়েছে। এসব পেরিয়ে এলাম নাচ-ঘরে। শ্যামচরণের সময় এই নাচ-ঘরের উৎসব ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। তখনকার দিনের ধনী-গৃহে এ ধরনের বিলাস সাধারণ বিলাস বলেই পরিগণিত হত। শুনলাম, বংশপরম্পরায় এ ঘরের অনেক ঐশ্বর্য ভাগ হয়ে গেছে। আছে যা, তারও মূল্য নিরূপণ সহজ নয়। প্রশস্ত হল, মেঝেয় পুরু গালিচা বিছানো। দু'ধারে সারি সারি গদি-আঁটা আসন। তৈলচিত্র, সোনালী গিল্ট করা ফ্রেমের ছাদ ঠেকানো আয়না, বিচিত্র কারুকার্যের ভাস্, বহুমূল্যের ঝাড়—সব কিছুই যেন এক স্বতন্ত্র বিস্ময় নিয়ে বিরাজ করছে।···একদা এখানে রাতের আলোর কণায় কণায় ঘোর লাগত নৃত্য-গীত-কুশলিনী রূপচারিণীর নূপুর-ধ্বনিতে আর সুরের মূর্ছনায়। বিস্মৃতি-দায়িনী দূতীরা মুগ্ধ দর্শকদের সুরলোকের নৃত্য-সভার ছবি স্মরণ করিয়ে গেছে কত বার। গহরজান, পুঁটিয়া বাঈ, মালকাজান—উর্বশী মেনকা-রম্ভার মর্ত-কল্পনা। সে আজ কত দিনের, কত কালের কথা। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে সেই মদিরোচ্ছল আবেশটুকু আজও কল্পনা করতে বাধে না। সব তেমনি আছে, সেই ঐশ্বর্য-পসার, ঢালা পরিবেশ, আলোক বন্যার উৎস। শুধু কার একটু ইঙ্গিতের অপেক্ষা যেন। তার পর ওই ওখানে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গুণ্ঠন উন্মোচন করতে পারে কোন এক মূর্তিমতী প্রত্যাশা। ঝম্ ঝম্ শব্দে সহসা বেজেও উঠতে পারে তার পায়ের নূপুর।

এর পরেই 'চায়নিজ রুম'। নামের সার্থকতা আছে। ভিতরে প্রবেশ করে বোবা-বিস্ময়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এক মুহূর্তে যেন কলকাতা ছাড়িয়ে সুদূর চায়নার বহু শতাব্দী ওপারের এক রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে পদার্পণ করলাম। শুধু অমূল্য সংগ্রহরাজির জন্য এ কথা বলছি না। এই ঘরটাকেও যেন চীন থেকে এখানে তুলে আনা হয়েছে। চার দিকের দেয়ালে চীনে কারুকার্য, খোঁচা খোঁচা চীনে অক্ষর সালুর ওপর বড় বড় চীনে হরফের জরি ব্যানার। চতুর্দিকে ইতিহাস-অধ্যুষিত মিং রাজবংশীয় (১৩৬৮—১৬৪৩) প্রাসাদে স্মৃতিচিহ্ন, দু'দিকে শেষ মিং সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীর দু'খানা বড় ছবি। আমার সঙ্গে

পাশ্চাত্য ঘরের সংগ্রহ থেকে
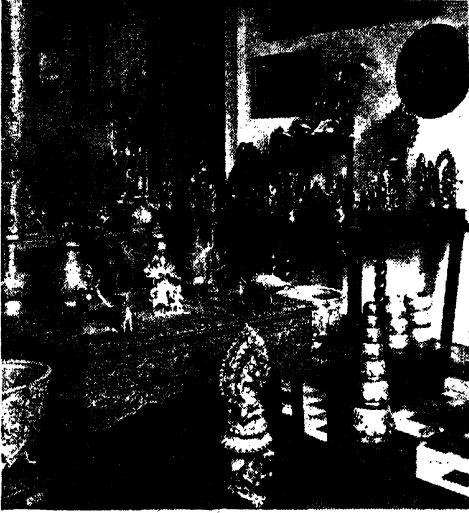
ভারতীয় ঘর

যে দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাঁদের এক জন সঙ্গীত-রসজ্ঞ (সুকুমার দত্ত), সাদা কথায় গান-পাগল। আত্মবিস্মৃতের মত গুন্‌গুন্ শব্দে তিনি একটা চীনে সুরই ভাঁজতে লাগলেন বোধ করি। অপর জন কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়ের লেখক অমল মিত্র। নাটকের কথা লিখে লিখে অভ্যাসও তেমনি দাঁড়িয়েছে। মীং সম্রাটের লেখবার টেবিল-চেয়ারের সামনে আমায় টেনে এনে বসিয়ে দিলেন,—'এখানে বসুন, বসে দেখুন এবং দেখে নোট্ করুন'। শিল্পী বিজয়রতন বাবুও সাগ্রহে সেই অপরূপ চিত্রকারুর ছোট ভাঁজ-করা টেবিলটা খুলে দিলেন। অমল বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগছে? পাশের ছবিটা ইঙ্গিত করে জবাব দিলুম, সম্রাটের দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি।

···দেখছি। সে সময়ের পিকিং প্যালেস্‌কেই বুঝি এখানে এনে বসানো হয়েছে। মেঝেয় সোনার তারে মোড়ানো নানা কাজ-করা রাজঘরের কার্পেট, সাদাসিধে কাঠের চেয়ারগুলিতে অপরূপ রঙের বাহার, এক কোণে রাজার দলিলপত্র রাখবার 'ক্যাবিনেট চেম্বার' সোনালি কাজে ঝক্‌ঝক্ করছে, অন্য দিকে রাণীর তেমনি একটি পুজোর মূর্তি রাখার কক্ষাধার। দেয়ালে ঝুলছে মীং দরবারের চোখ-ঝলসানো রাজপোষাক, তার নীচে মণি-মুক্তা-খচিত জুতো, টুপী ইত্যাদি। এখানে-ওখানে নানা আকৃতির ড্রাগন এবং সিংহ মূর্তি। এক দিকের সিংহাসনে ভক্ত সহ বুদ্ধ সমাসীন। মাঝখানে প্যাগোডার মিনিয়েচার, তার পাশে চায়নিজ শিঙা এবং শানাই। ওদিকে পোর্সিলেনের দ্বিতীয় স্তরের স্মৃতিচিহ্নটুকু কত হাজার বছরের কেউ বলতে পারে না। ধ্যানরত ঊর্দ্ধবাহু মূর্তিটির নীচে চীনে অক্ষরের লেখাটুকু পড়তে না পারার যাতনা ভুলতে পারছিলাম না। কিন্তু এ ঘরে দু'চোখ সকলের থেকে বেশী সম্মোহিত হবে সোনার পাতে বাঁধানো কাঠেরই আর একটি নিদর্শন দেখে। সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর ভেসে উঠেছে এক হিংস্র-কুটিল ড্রাগন মূর্তি, চোখে তার আগুনের হল্‌কা। কিন্তু তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি মৃণাল-কমল। ধ্যানী বুদ্ধ সমাসীন তার ওপর। মীং সম্রাট কোথাও যেতে হলেই নাকি এই মূর্তি দর্শন করে বেরুতেন।···শিল্প-নিপুণ মহাচীন। একদা সারা বিশ্বকে ছিল তার কিছু দেবার সঙ্গতি। বিদেশী সভ্যতার কামান কণ্ঠে তার আফিমের পিণ্ড বর্ষণ করে তাকে করে ফেলল মোহাচ্ছন্ন। তার সেই দেবার রস গেল শুকিয়ে।

পাশের দরজা দিয়ে করিডোরে এলাম। এখানেও বিগত চীনের অনেক নিদর্শন সাজানো। বিচিত্র রকমের ভাসগুলিই বিশেষ করে চোখে পড়ে। গাছ, লতাপাতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ড্রাগন মূর্তি, ডেমন মূর্তি প্রভৃতি আঁকা। নানা জাল-জটিল শ্মশ্রু-বাহারের চীনে মুখও আছে। দেবস্থানের বিশাল ধুনুচিগুলি দেখবার মত। ষ্টীল প্লেট্‌এ ডাইস্ কেটে কেটে তৈরী ল্যাণ্ডস্কেপের দৃশ্যটিও চমৎকার। বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট, গাছপালা সব কিছুরই আভাস পাওয়া যায়। সিল্কের ওপর আঁকা নরকের সম্পূর্ণ দৃশ্য নিশ্চিন্ত আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। অন্য দিকে, দেয়ালে টাঙানো শুভ ঠাকুরের আঁকা সরস্বতীর বীণাবাদিনী মূর্তি—শিল্পীর প্রতিটি দৃপ্ত রেখায় তাঁর সেই চিরাচরিত বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যটুকু সুপরিস্ফুট। এখানকার বুদ্ধ মূর্তিটিও অপরূপ। ব্রোঞ্জের, কিন্তু নিটোল কালো পাথরের মত দেখতে। সারনাথের কাছে মাটির তলায় এটি পাওয়া যায়। এমন

যে হাস্যোদ্ভাসিত মূর্ত্তিটি ব'সে—তিনি জাপানী শিশুবুদ্ধ

অনিন্দ্য-সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্তির বোধ করি তুলনা নেই। শিক্ষাদান-মুদ্রায় ধ্যান-সমাধিস্থ। গত এপ্রিলে সিলোনের হাই-কমিশনার কুমার- স্বামী কিউরিও দেখতে এসে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই বুদ্ধ-মূর্তিটি স্বদেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

পাশে 'মোগল রুম'। এখানে সোনার পাতের ওপর আসল হীরা, মুক্তা, নীলা, চুণি, মণি, পান্না প্রভৃতি নবরত্ন দিয়ে তৈরী বিষ্ণু-মূর্তিটির বর্ণনা দিতে গেলে লেখনী বিভ্রান্ত হবে। এক জন নেপালী শিল্পীর সারা জীবনের কাজ এটি। সোনার পাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খাঁজ কেটে অজস্র রং-বেরঙের রত্ন দিয়ে সেটা ভরাট করা হয়েছে। বিষ্ণু-মূর্তির সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গদা, চক্র, সব কিছুই নানা আকারের রত্ন-পাথরে গড়া। গৃহস্বামী তার ওপর একটা বড় টর্চের আলো ফেলতে সপ্ত রশ্মির সকল ছটা যেন একসঙ্গে ঝলমলিয়ে উঠল। অন্যান্ত দেয়ালে নানা কারুকার্যের মোগল ছবি টাঙানো। জাহাঙ্গীরের শিকারের দৃশ্য, অভ্রের ওপর কাজ-করা নৃত্য-গীতের দরবার, মোগল সম্রাট এবং নূরজাহানের অবসর বিনোদন প্রভৃতি সকল চিত্রগুলিতেই মোগল ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এক দিকের বড় টেবিলের ওপর সাজানো নানা সূক্ষ্ম কাজের অনেকগুলি পারসিয়ান্ সাকি জাগ। সুদূর অতীতের কত উল্লসিত মুহূর্তের সাক্ষী ওরা কে জানে! বিদেশী রঙ্গালয়-লেখক মহাশয় সঙ্গীত-রসিকের দিকে চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশংসাসূচক পরিহাস করলেন, 'ভরে দাও পানপাত্র মোর'।

এর পরে 'ভারতীয় ঘর'। পিতলের ওপর সোনার জলের কাজ-করা ঘর-ভরতি দেব-দেবীর নানা মূর্তির ছটায় দিনের বেলায়ও ঘরের রঙ বদলে গেছে। প্রথমেই মাঝখানের বড় যোগমায়া মূর্তিটির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তারপর টেবিলে দেখলুম তিব্বত এবং নেপালী তন্ত্র-সাধনা-কল্পিত দেব-দেবীর নানা ভঙ্গিমার প্রতিরূপ। হর-গৌরীর শিবরাত্রির বিলাস দেখে মনে হল, নিভৃতে বসে দু'জনে যেন কথা কইছেন। কোথাও তন্ত্র-সাধনায় ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর ওপর ভৈরবীর বজ্রপাত, কোথাও দোল, দুর্গা, কালী, সূর্য মূর্তি, কোথাও বা মহাকালের অষ্টবজ্র—সতীর দেহত্যাগে মহাদেব তাঁকে নিয়ে চলেছেন। তার পর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পরিকল্পনা—পূর্ণ সঙ্গমরত মহাকাল।

পাশ্চাত্ত্য ঘরের সংগ্রহরাজি অবশ্য নতুন কিছু নয়। কলকাতার অনেক পুরানো বনিয়াদী ঘরেই এ রকম নিদর্শন আছে। চার দিকের দেয়ালের বড় বড় তৈলচিত্রগুলিতে স্রস্ত-বসনা মোহিনী-মাধুর্য। মেঝেতে কারারা মার্বেলের পূর্ণ ভেনাস মূর্তি, হাতে আপেল। উর্বশীর মতই স্বর্গ-মর্ত্যের দেবতা মানুষের অন্তস্তলে ছড়িয়ে রেখেছে দুর্দম যৌবন-বেদনা। অনতিদূরে আসুরিক শক্তির প্রতীক হারকিউলিসের সংহার-মূর্তি। এর পরে পার্শিয়ার বাজারে বিবস্ত্রা দাসী বিক্রির একটা নমুনা দেখা গেল।

মিশ্র ঘরটি আবার বৈচিত্র্যবহুল। মেঝেতে অদ্ভুত-দর্শন সব ইঁদুর কাঠবিড়াল প্রভৃতি বসানো। এ সব ছাড়িয়ে চোখ যায় ছুঁচের কাজে তোলা পল্লীগ্রামের নৌকা-বিহারের দৃশ্যটির দিকে। আলো-ছায়ার অপূর্ব সংমিশ্রণটুকু দু'চোখ ভরে দেখবার মত। শিল্পীর নাম লেখা, শিখরবাসিনী ঘোষ। নাম হয়ত ভুলে যাব, কিন্তু এই শিল্প-রচনাটুকু মনে থাকবে। আলমারিতে কতগুলি মৌলিক কাট্-গ্লাসের পান-পাত্র দেখা গেল। কত কালের কেউ জানে না। এ সবের সমঝদার ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালের প্রাক্তন কিউরেটার পারশী ব্রাউন সাহেব এগুলো দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, 'এ কোথায় পেলেন! এগুলো যে ভেনিসের প্রথম কাট্-গ্লাসের নিদর্শন!' অন্য দিকের আলমারিতে সাদাসিধে অথচ অদ্ভুত আকারের 'ডেমন ডল্' দুটো দেখে ভারী অবাক লাগল। প্রাচীন চীনে অভিজাত কারো মৃত্যু হলে এই ডেমন ডল্ কফিনে রেখে তাঁকে কবর দেওয়া হত। মাটির তলা থেকে এ দুটো পাওয়া যায়। কি রঙ ব্যবহার করা হত তখন কে জানে, শত শত বছর মাটির নীচে অতিবাহিত হয়েছে অথচ মূর্তির রং আজও এতটুকু বিকৃত হয়নি। আর এক দিকে সাজানো ভাগ্য-বিড়ম্বিত নবাব-কবি ওয়াজেদ আলির ব্যবহার করা জুয়েল কেস্।

ছোট নাচ-ঘরে আছে সেই মী[illegible] আমলের অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার। চায়নিজ ঘরে সেগুলো ধরেনি বলেই এই পৃথক ব্যবস্থা। ফ্রেঞ্চ ঘরের জাঁক-জমক নামেরই প্রতিরূপ। কিন্তু নিদর্শনগুলির সবই ফরাসী দেশের নয়। জেড্-এর ওপর কাজ-করা কোম্পানীর আমলের নানা পরিবেশের চিত্রগুলি নিখুঁত-সুন্দর। চোখ-ধাঁধানো ঈগল পাখীর ফ্রেমের বহুমূল্যের প্যারিস আয়না। নীচে ফ্রেঞ্চ পোর্সিলেনে গড়া সেকালের অভিজাত ফরাসী নারীপুরুষের মূর্তিগুলোর লাস্যময় আড়ম্বর দেখলে ইতিহাস-প[illegible] প্রাক্-ফরাসীবিপ্লবের ধনী সমাজের চিত্র চোখে ভাসে।
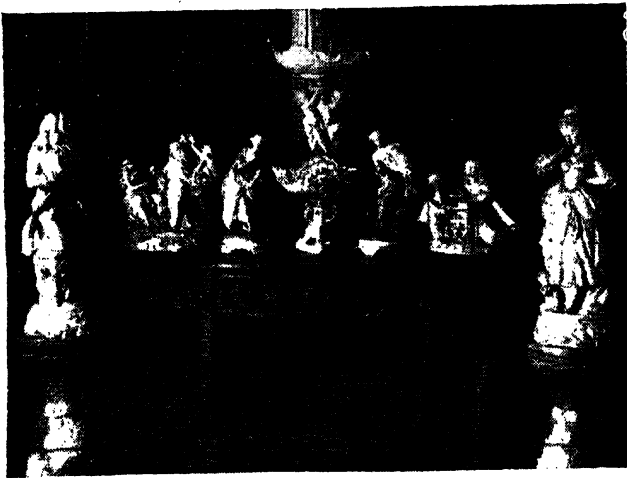
ফ্রেঞ্চ ঘরের জাঁকজমক নামেরই প্রতিরূপ

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮

সেই গভীর রাত্রে রেসিডেন্সীর ব্যারাকে ইংরেজ নর-নারীদের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সময় রাণী শয়নকক্ষে নিদ্রিতা—সারা দিনের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও প্রতীক্ষার পর অধিক রাত্রেই তিনি শয়ন-কক্ষে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন। রেসিডেন্সীর দিকে হল্লা শুনে রাণীরই জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর অকুস্থলে উপস্থিত হয়, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তিই দুঃসংবাদ বহন করে এনে রাণীর পিতা পন্থজীকে জানায়। তিনিও ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাৎ রাণীর দুই প্রিয় সহচরী মন্দার ও কাশীকে ডেকে বললেন: রাণী যদিও ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাহলেও তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে এ খবর এখনি দেওয়া উচিত।

জেগে উঠেই এই ভীষণ খবর শুনে রাণী শিউরে উঠলেন; তখনি বেশ পরিবর্তন করে দুই সহচরী ও এক দল রক্ষী সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে ধাবিত হলেন। তাঁর নির্দেশমত এক দল অনুচর মশাল জ্বেলে পথ প্রদর্শন করে চলল। দুর্ঘটনা-স্থলে গিয়ে স্বচক্ষে নিহতদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শবদেহ দেখে রাণী শিউরে উঠলেন। তিনি স্বয়ং তন্ন-তন্ন করে দেখতে লাগলেন—তখনো কেউ বেঁচে আছে কি না! রাণীর সেই চেষ্টার ফলে কতিপয় অসামরিক নর-নারীর সন্ধান পাওয়া গেল—যাঁরা প্রাণভয়ে নিহতদের মধ্যে মৃতের মত ভাণ করে অসাড় ভাবে পড়েছিলেন। তাঁদের অভয় দিয়ে রাণী বিশ্বস্ত লোকের তত্ত্বাবধানে নিরাপদ স্থানে সেই রাত্রেই পাঠিয়ে দিলেন; তার পর নিহতদের সৎকার সম্বন্ধেও যথোচিত নির্দেশ দিয়ে প্রাসাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় ঝাঁসীর কেল্লা থেকে সিপাহীদের কতিপয় দলপতি তাঁর সামনে এসে ভূলুণ্ঠিত হয়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন করে জানাল যে, এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে তারা কেউ দায়ী নয়; ঝাঁসীর গদীর সেই পুরানো দাবীদার সদাশিব রাও করেরি কেল্লার সিপাহীদের হাত করে এই কাণ্ড করেছে। তার খুবই আশা ছিল, এই রাতেই কেল্লার গদী-ঘরে গিয়ে গদীতে বসে ঝাঁসীর মহারাজ খেতাব নেবে। তারাই রাওজীর সে মতলব ব্যর্থ করে দিয়েছে
এখন রাণীজী তাদের উপর প্রস
হয়ে ঝাঁসীর গদীতে বসুন-
তাদের চালনা করুন।

রাণী বললেন: এই হত
কাণ্ডের জন্যে আমি এমন ব্য
পেয়েছি যে, ও-সব কথা ভাবব
মত অবস্থা আমার এখন নয়
ভেবে-চিন্তে পরে আমার অভিপ্র
জানাব। এখন আমার ইচ্ছ
যাদের হত্যা করা হয়েছে, সকা
হলেই যেন তাদের সমাধির ব্যবস্থ
করা হয়। আমি সে বন্দোব
করেছি; তোমরাও সেদিকে লক্ষ
রেখ—উদ্ধত সিপাহীরা শবে
প্রতি যেন কোন রকম অশ্রদ্ধা
অসম্মান না করে।

সিপাহী দলপতিরা সমস্বরে রাণীর আজ্ঞাপালনে সম্মতি জানাল
রাণীও সদলবলে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

কিন্তু এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে রাণী লক্ষ্মীবাঈ নির্লিপ্ত থাকা সত্ত্বে
বিরোধী পক্ষের অপপ্রচারের ফলে অন্যান্য স্থানের ইংরেজ কর্তৃপক্ষদে
মনে তাঁর সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা হয় যে, এতে রাণীর হাত ছিল—তাঁ
আজ্ঞাতেই করেরি কেল্লার সিপাহীরা বন্দীদের হত্যা করেছিল। কি
প্রকৃতপক্ষে রাণীর অজ্ঞাতসারেই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং সে জ
রাণী মনে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। দুর্ঘটনার পর তাঁরই উদ্যো
বিহিত বিধানে মৃতদেহগুলির সমাধির ব্যবস্থা হয়। রাত্রির অন্ধকারে
কয় জন ইংরেজ নর-নারী কোন রকমে রক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ
মার্টিন নামে এক ইংরেজ এই বিপ্লবাবসানের বহু দিন পরে (১৮৮
অব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে) রাণীর দত্তক পুত্র দামোদর রাওজী
এই মর্মে এক পত্র লিখেছিলেন: বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভুল ধারণার বশব
হয়ে ঝাঁসীর হত্যাকাণ্ডের জন্য আপনার মহীয়সী মাতাকে দা
সাব্যস্ত করেছিলেন। সে বৃত্তান্ত আমার চেয়ে বেশী কেউ জা
নন। ১৮৫৭ অব্দে ঝাঁসীর ব্যারাকে বন্দী ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষদে
হত্যায় রাণীর কোন হাত ছিল না, বরং তিনি বরাবর অবরুদ্ধ কেল্লা
সংগোপনে আমাদের আহার যুগিয়েছিলেন; তিনি স্কীন সাহেব
তেহরি বা দতিয়ার রাজার এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেবার পরাম
দিয়েছিলেন। কিন্তু মেজর স্কীন ও তাঁর সহকারী লেফটন্যান্ট গ
সে কথায় কর্ণপাত করেননি। রাণী সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহা
করতেও প্রস্তুত ছিলেন। আমি যে সেই দুর্ঘটনার পরও প্রাণরক্ষ
সমর্থ হই, রাণীরই অনুগ্রহে। আমরা যে ক'জন প্রাণে বেঁচেছিল
রাণী আমাদের রক্ষার জন্য চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করেন নাই।

ঐতিহাসিক কে সাহেবও ঐ হত্যা-ব্যাপারে রাণীকে অপরা
সাব্যস্ত করেন নাই। তিনি লিখেছেন—'হত্যাকাণ্ডের সময় রা
নিজস্ব কোন অনুচর বা সৈনিক সেখানে উপস্থিত ছিল না।
দল অনিয়মিত সিপাহী কর্তৃক এই হত্যা অনুষ্ঠিত হয়।'

উক্ত ঘটনার পরদিন রাণী খবর পেলেন যে, গত রাত্রেই সদা

াও করেরি কেল্লা দখল করে সেখানেই ঝাঁসীর মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেছেন। করেরির সিপাহীরা তাঁকে মহারাজের সম্মান দিয়ে ঝাঁসীর গদীতে বসবার জন্ম প্ররোচিত করছে। সদাশিব এখন মহা উৎসাহে সৈন্ম সংগ্রহ করছেন। ঝাঁসীর সিপাহীরা যদি তাঁকে বাধা দেয়, এই আশঙ্কায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ এক দল শক্তিশালী নূতন বাহিনী গঠন করছেন। এই অবস্থায় রাণীর পিতা পন্থজী, দেওয়ান লক্ষ্মণরাও এবং ঝাঁসীর কেল্লার সিপাহীনায়কগণ রাণীকে ঝাঁসীর গদীতে আরোহণ করে ঝাঁসী রক্ষার জন্ম অনুরোধ জানালেন। রাণী তখন সিপাহী-নায়কদিগকে কতকগুলি অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে সর্বসম্মতিক্রমে দীর্ঘ তিন বছর পরে পূর্ববৎ রাজ্ঞীর সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে ঝাঁসীর দুর্গ-প্রাসাদে পুনঃপ্রবেশ করলেন।

রাজ্যভার গ্রহণের পূর্বে দুর্গের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সমবেত সমগ্র সেনানী ও সৈনিকগণকে ধর্মের নামে শপথ করে স্বীকৃতি দিতে হলো যে, শেষ পর্যন্ত তারা প্রত্যেকে রাণীকে অনুসরণ করবে, রাণীর আজ্ঞায় জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। তাদের এখন কর্তব্য হবে প্রাণপণে ঝাঁসীকে রক্ষা করা। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তারা কোন প্রকার নৃশংসাচার করবে না, লুণ্ঠনে ও হত্যাকাণ্ডে কখনো যোগ দেবে না। ঝাঁসীকে সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ ও সর্বশ্রীমণ্ডিত করে তোলাই হবে তাদের কর্তব্য।

দীর্ঘকাল পরে পূর্বের সেই আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষায় সজ্জিতা রাণীকে ঝাঁসীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা দেখে সহস্র সহস্র কণ্ঠে তাঁর নামে জয়ধ্বনি তুলে সৈনিক ও নাগরিকগণ সহর্ষে তাঁকে অভিনন্দিত করল। রাণীও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন: আমার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করবার যে সুযোগ জগদীশ্বরী আমাকে দিলেন, আমি সযত্নে তাকে সার্থক করব। আমার এখন প্রথম কর্তব্য হচ্ছে—ঝাঁসীর পরম শত্রু সদাশিব রাওয়ের দণ্ডবিধান। ঝাঁসী আক্রমণ করবার জন্ম সেই দেশবৈরী সৈন্মসজ্জা করছে, কিন্তু আমার ইচ্ছা, তার সেই সজ্জা সম্পূর্ণ হবার আগেই তাকে শাস্তিদান করা হোক।

রাণীর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁসীর সেনানী ও সৈনিকগণের শত শত তরবারি সূর্যকিরণে ঝলসিত হয়ে উঠল, অসংখ্য কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল—রাণী মায়ী কি জয়, মহারাণী লক্ষ্মীবাঈজী কি জয়!

দুর্গ ও রাজধানী রক্ষার সুব্যবস্থা করে এক দল ক্ষিপ্রগামী ও শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে রাণী ত্রিশ মাইল দূরবর্তী করেরি দুর্গ অভিমুখে ...না হলেন। সেনানী ও সৈনিকদের উপর যুদ্ধ করবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার পাত্রীই তিনি নন—নিজেও বীরাঙ্গনা সহচরীদের সঙ্গে রণসজ্জায় সজ্জিতা হয়ে অশ্বারোহণে বাহিনী-মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে সৈনিকদের অন্তরে বিপুল আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করলেন। সদাশিব রাও কল্পনাও করেননি যে, রাণী তাঁর মত-পরিবর্তন করে সেনাদল নিয়ে করেরি আক্রমণে অগ্রবর্তিনী হবেন! তিনি সুখস্বপ্ন দেখছিলেন—করেরি থেকে রণযাত্রা করে রাজধানীতে বিজয়গর্বে প্রবেশ করবেন, বিদ্রোহী সিপাহীরা সসম্ভ্রমে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে ঝাঁসীর গদীতে তাঁকে বসিয়ে ধন্ত হবে। কিন্তু সে সুখস্বপ্ন তাঁর ভেঙে গেল ঝাঁসীর শক্তিশালী রণবাহিনীর আকস্মিক আবির্ভাবে ও তাদের মিলিত কণ্ঠে রাণী লক্ষ্মীবাঈর নামে জয়ধ্বনির প্রমত্ত আরাবে। করেরির সিপাহীরা রাণীকে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে রণস্থলে দেখেই অবাক হয়ে গেল! কোথায় তারা শত্রুপক্ষকে প্রতি-আক্রমণ করবে, সে স্থলে মুক্তকণ্ঠে রাণীর জয় ঘোষণা করে তাঁর সেনাদলের সঙ্গেই মিশে গেল, তারা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগল—মহারাণীকে দেখেই আমাদের মনে পড়ছে রণচণ্ডীর কথা, অসুরদলনী দুর্গার কথা; আমাদের মোহ দূর হয়েছে, আমরাও রাণীর সেবক, তাঁর সন্তান। ওদিকে কেল্লার সিপাহীরাও ফটক খুলে দিয়ে রাণীর জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে তুলল। সদাশিব রাও বুঝলেন, এখানেও তাঁর কপাল ভেঙেছে; তিনি তাঁর নিজস্ব রক্ষীদল নিয়ে অতি কষ্টে গুপ্ত-পথে কেল্লা ত্যাগ করে গোয়ালিয়র অভিমুখে পলায়ন করলেন।

করেরিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রাণী রাজধানীতে ফিরে এসে তাঁর নিজস্ব উন্নত পরিকল্পনায় রাজ্যের সংস্কার সাধনে ব্রতী হলেন। পূর্বে যে-সব কর্মচারীকে ইংরেজ সরকার বরখাস্ত করেছিলেন, রাণী তাঁদের আহ্বান করে কোনও না কোন কার্যে নিযুক্ত করলেন। প্রজাবর্গের কল্যাণমূলক যে-সব দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যয়সাধ্য বলে ইংরেজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, রাণীর আদেশে সেই সব প্রতিষ্ঠানের দ্বার পুনর্মুক্ত হলো। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে রাণী রণবাহিনীর পুষ্টি সাধনে সচেষ্ট হলেন; রাজ্যের সমর্থ ব্যক্তিগণকে নিয়মিত ভাবে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দেবার বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো, দলে দলে নূতন নূতন যোদ্ধারা সেনাদলে যোগ দিতে লাগল। নারীদের সম্বন্ধেও রাণী উদাসীন রইলেন না, নিজেই অগ্রণী হয়ে তাদের নিয়ে আপৎকালের উপযোগী যে-সব শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, পরবর্তী সংগ্রামের সময় তাঁদের অসামান্ত দক্ষতার নিদর্শন পেয়ে ইংরেজ সেনানায়করা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়েছিলেন।

নানা ভাবে যখন স্বাধীন ঝাঁসীর সংস্কার-কার্য চলেছে, সেই সময় সদাশিব রাও পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে গোয়ালিয়রাধিপতি সিন্ধিয়া মহারাজের এক দল সৈন্ম নিয়ে পুনরায় ঝাঁসী অভিমুখে কুচ করলেন। গুপ্তচর মুখে এ খবর পেয়েই রাণী সসৈন্ম ঝাঁসীর সীমান্তে এসে তাদের অভ্যর্থনার জন্ম প্রস্তুত হয়ে রইলেন। রাণীর এই কৌশলময় আয়োজন সর্বাংশে সার্থক হলো—ঝাঁসীর এলাকায় প্রবেশ করা মাত্র ঝাঁসীর রণবাহিনী এমন অতর্কিত ভাবে তাদের ঘিরে ফেলল যে, বেড়াজালে মাছের ঝাঁকের মত তাদের অবস্থা হলো। প্রায় বিনা রক্তপাতে রাণী বিজয়িনীরূপে সদাশিবের সঙ্গে সিন্ধিয়ার সেনাগণকে বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে এলেন। কিছু দিন পরে কতিপয় সর্তাধীনে রাণী সদাশিব রাওকে মুক্তি দিলেন। সিন্ধিয়ার সেনাদলও মুক্তি পেয়ে নূতন এক অভিজ্ঞতা নিয়ে গোয়ালিয়রে ফিরে গেল। তারা মুক্তকণ্ঠে রাণীর রাজনীতি ও সেনাদলের প্রতি স্নেহ-প্রীতির যে সব কাহিনী বলতে লাগল, তার ফলে সিন্ধিয়ার সমগ্র বাহিনী ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়ল। সিন্ধিয়া জিয়াজীরাও দেখলেন, ঝাঁসীর বিরুদ্ধে সেনাদের পাঠিয়ে তিনি আর এক নূতন বিপত্তি ডেকে এনেছেন। তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে দিন কাটাতে লাগলেন।

ঝাঁসীর প্রতিবেশী রাষ্ট্র বোরছার দেওয়ান নথে খাঁ এ সময় খুব প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। ঝাঁসী ইংরেজের হস্তচ্যুত হওয়ায় তিনি ঝাঁসীকে বোরছার অন্তর্ভুক্ত করবার স্বপ্ন দেখছিলেন। বোরছার মালিকও এক নারী, রাণী লড়য়িবাঈ তাঁর নাম। দেওয়ান নথে খাঁ তাঁর অধীনে প্রায় বিশ হাজার সৈনিক সমবেত করে রাণী লক্ষ্মীবাঈএর

কাছে দূত পাঠিয়ে জানালেন যে, রাণী যদি ঝাঁসীর গদী ছেড়ে দেন, তাঁর রাণী তাঁকে একটা মোটা মাসোহারা দেবেন। এবং ইংরেজ সরকার যে পরিমাণ টাকা দিতেন, বোরছা-সরকার তার দ্বিগুণ টাকা দেবেন। রাজ্য-শাসনের ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে রাণীর পক্ষে তাঁর যুক্তি গ্রহণ করাই সঙ্গত। রাণী নথে খাঁর দূতকে এই মর্মে প্রত্যুত্তর দিলেন যে, ঝাঁসীর রাণী ইংরেজ সরকারের মাসোহারা কোন দিন স্পর্শও করেন নাই—তাই জগদীশ্বরী মহালক্ষ্মীর প্রসাদে তিনি আবার ঝাঁসীর গদীতে বসেছেন। আর, রাজ্যশাসন হচ্ছে তাঁর কাছে সহজ স্বাভাবিক সংস্কারের মত—তিনি এ কাজকে ঝঞ্ঝাট মনে করেন না।

নথে খাঁ বুঝলেন, এ রাণী বড় সাধারণ চীজ নন। তিনি তখন উগ্র ভাবে জানালেন—রাণী যদি ঝাঁসীর গদী বোরছা-সরকারকে ছেড়ে দিতে রাজী না হন, তাহলে তিনি বোরছার শক্তিশালী সেনাদল নিয়ে ঝাঁসী আক্রমণ করবেন ···রাণীও প্রত্যুত্তরে জানালেন—'ঝাঁসী আক্রমণ করতে আসবার আগে দেওয়ান সাহেব যেন মনে ঠিক দিয়ে রাখেন—আমরা তাঁকে ও তাঁর লোক-লস্করদিগকে নারী বানিয়ে ছাড়ব। সদাশিব রাওয়ের অদৃষ্টেও এই দুর্ভোগ ঘটেছিল।' কিন্তু বিশ হাজার ফৌজের অধিনায়ক নথে খাঁ রাণীর কথায় জ্বলে উঠলেন এবং তাঁর সাহসী সৈনিকগণ যে অবলা নারী নন, বলবান পুরুষ—হাতে-কলমে সেটা দেখিয়ে দেবার জন্তে মহোৎসাহে ঝাঁসী আক্রমণে প্রবৃত্ত হলেন। শুধু তাই নয়, ঝাঁসীর রাণীর অহঙ্কার চূর্ণ করবার জন্তে বোরছার রাণী লড়য়িবাঈকে প্ররোচিত করে সুসজ্জিত এক বিরাট চতুর্দোলায় চাপিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যস্থলে রেখে রণযাত্রা করলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈও তৎপরতার সঙ্গে এই প্রবল সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করছিলেন। তিন বছর পূর্বে রাজ্যচ্যুতির প্রাক্কালে তিনি ঝাঁসীর যে কয়টি বিখ্যাত কামান দুর্গের বাহিরের রাজপ্রাসাদে (যেখানে রাজ্যচ্যুত অবস্থায় তিনি অবস্থিতি করতেন) উদ্যান মধ্যে মাটীর নীচে প্রোথিত করে রেখেছিলেন, সেগুলি ভূগর্ভ থেকে তুলে সংস্কারের আদেশ দিলেন। গুপ্ত কক্ষগুলির মধ্যে যে-সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগোপনে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল, সেগুলিও সুশাণিত করে ব্যবহারোপযোগী করা হলো। এ ছাড়াও দক্ষ কর্মকারগণ তাদের কারখানায় রাষ্ট্রের ব্যয়ে দিবা-রাত্রি কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে লাগল। সেদিন দূরদর্শিনী রাণীকে যাঁরা মাটীর নীচে কামান লুকিয়ে রাখতে দেখে কৌতুক বোধ করেছিলেন, গুপ্ত তয়খানার মধ্যে প্রহরণ-সমূহ সঞ্চয় করে রাখবার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে হেসেছিলেন, এখন তাঁরা চমৎকৃত হলেন।

বিশ হাজার ফৌজ নিয়ে নথে খাঁ ঝাঁসীর সীমান্তে এসে দেখলেন, ঝাঁসীর রাণীর তরফ থেকে বাধা দেবার কোন ব্যবস্থাই নেই। তিনি বুঝলেন, রাণী হয়ত ধারণা করতে পারেননি যে, তিনি সত্য সত্যই এত বড় একটা রণবাহিনী নিয়ে ঝাঁসীতে হানা দেবেন। এর পর নথে খাঁ যখন ঝাঁসীর মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন, সেই সময় রাণীর এক অনুচর বস্ত্রাবৃত দুটি পাত্র নিয়ে নথে খাঁর সঙ্গে ভেট করতে এলেন। ঝাঁসীর রাণী উপহার পাঠিয়েছেন ভেবে নথে খাঁ তাঁর অনুচরকে সামনে আহ্বান করলেন। অনুচর সেখানে পাত্রের আবরণ মুক্ত করতেই দেখা গেল, একটি পাত্রে রয়েছে ৫টি গোলা, আর একটি পাত্রে কিছু বারুদ। অনুচর সবিনয়ে জানাল: রাণীজী আপনার জন্তে এই উপহার পাঠিয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন—এর পরও যদি আপনি ঝাঁসীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেন, তাহ[লে] এই শ্রেণীর উপহার নিয়ে তিনি আপনাকে রীতিমত ভাবে অভ্যর্থ[না] করবেন।

এ ভাবে রাণীর উপেক্ষা ও পরিহাসে নথে খাঁ ধৈর্য্যচ্যুত হ[য়ে] অনুচরকে বললেন—'তোমার রাণীজীকে বলবে, ঝাঁসীর গদীতে বসবা[র] জন্তে বোরছার রাণী চতুর্দোলায় চেপে এসেছেন। তিনি ঝাঁসীর গদী[তে] বসলে, ঝাঁসীর রাণী যেদিন সোনার থালায় মোহর সাজিয়ে তাঁ[র] সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দয়া ভিক্ষা করবেন, সেই দিন তাঁর সঙ্গে এ[ই] তামাসার ব্যাপারের বোঝাপড়া হবে।'

অনুচরের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে নথে খাঁ ঝাঁসীর কেল্লার উদ্দেশে কুচ করবার জন্ত সেনাদলকে হুকুম দিলেন। অবাধেই এই বিপুল বাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত এগিয়ে এল। ইংরেজরা ঝাঁসী[র] কেল্লার বুরুজের উপর কামান সাজানো প্রয়োজন মনে করেননি রাণী কিন্তু রাজ্যভার নিয়েই বুরুজে বুরুজে দূরপাল্লার কামান বসিয়ে ছিলেন। এ ছাড়া শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের লক্ষ্য এড়াবার জন্তে রাতারাতি রাজধানীর উপকণ্ঠে বৃক্ষবল্লরীর আড়ালে কতিপয় তোপমঞ্চ সাজিয়ে সুবিখ্যাত ঘনবজ্র, অগ্নিবর্ষ, শত্রুসংহার, কড়কবিজলী আজাদী প্রভৃতি কামানগুলি এমন ভাবে স্থাপিত করেছিলেন যে সহসা সেগুলির দিকে পথিকদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় না। রাজধানী রক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা করেই রাণী ঝাঁসীর সামন্তবর্গ, সরদার ও ঠাকুর উপাধিধারী ভূস্বামীদের সাহায্যপ্রার্থী হলেন, দলে দলে তাঁরা রাণীর আহ্বানে রাজধানীতে সমবেত হতে লাগলেন। জহরসিংহ নামে অভিজ্ঞ সাহসী ও বিশ্বস্ত যোদ্ধার হাতে রণ-কঙ্কণ পরিয়ে রাণী তাঁকে সেনাপতির মর্য্যাদা দিলেন। সিদ্ধহস্ত গোলন্দাজ যোদ্ধা গোশ খাঁকেও ঐ ভাবে কঙ্কণ উপহার দিয়ে রাণী তাঁকে গোলন্দাজবাহিনী পরিচালনার ভার দিলেন। নিজেও তিনি পূর্ববৎ রণরঙ্গিণী বেশে তাঁর প্রিয় অশ্বে আরোহণ করে সমস্ত ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। মন্দার, কাশী-প্রমুখ রাণীর সহচরীরাও রণসজ্জায় সজ্জিতা হয়ে রাণীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হলেন। তোপমঞ্চের পিছনে সহস্র সহস্র সাহসী সৈনিক প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল; অথচ, চারি দিক নিস্তব্ধ—কে বলবে যে, গোপনে গোপনে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক মারণ-যজ্ঞের আয়োজন চলেছে!

সসৈন্য নথে খাঁ রাজধানীর দক্ষিণ ভাগে উপস্থিত হলেন—তখনও প্রতিপক্ষের কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। তিনি তখন সমগ্র বাহিনীকে ঝঞ্ঝার বেগে এগিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। একটু পরে এই দল মঞ্চে স্থাপিত তোপগুলির নাগালের মধ্যে আসা মাত্রই গোশ খাঁ গোলা বর্ষণের হুকুম দিলেন। অমনি আকাশ-বাতাস ও সমগ্র ভূভাগ প্রকম্পিত করে ঝাঁসীর অতিকায় কামান কয়েকটির মুখনিঃসৃত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিময় গোলা সন্নিবদ্ধ শত্রুবাহিনীর উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে পলকের মধ্যে বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটাল। প্রথম গোলাটি বজ্রনাদ তুলে নথে খাঁর বাহিনীর পুরোভাগে উন্নত ধ্বজপতাকা ধ্বংস করে সেনাদলের মধ্যে পড়ে বিদীর্ণ হয়ে গেল—বহু সৈন্য তাতে হতাহত হলো, ঘোড়াগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাল। এই দুর্ঘটনা এক দিকে যেমন অত্যন্ত অকল্যাণকর ভেবে বোরছার নায়কগণ উদ্বিগ্ন হলেন, পক্ষান্তরে, ঝাঁসীর রাণীর রণকৌশলের এই নমুনা দেখে

চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নথে খাঁও তৎক্ষণাৎ বোরছার তোপখানা থেকে তোপ দাগবার হুকুম দিলেন। কিন্তু গোলন্দাজগণ শত্রুর কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে লক্ষ্যহীন ভাবেই তোপ দাগতে লাগল। রাণীর তোপখানা এমন ভাবে স্থাপিত হয়েছিল যে, গোলন্দাজরা প্রয়োজন অনুসারে কামানগুলির মুখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তোপ দাগতে সমর্থ ছিল, কিন্তু বোরছার তোপখানা অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকায় সে সুযোগ ঘটে নাই। ঝাঁসীর বর্মাবৃত এক দল দুঃসাহসী সৈনিকের প্রতি ভার দেওয়া হয়েছিল, তারা প্রাণপণ প্রয়াসে বোরছার তোপখানা দখল করে যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিতে সহায়তা করবে। সে সুযোগ সহজেই এসে গেল। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বোরছার তোপখানা পূর্ব থেকে সতর্ক এই দুঃসাহসী সৈনিকদের আয়ত্তে আসা মাত্র গুপ্তস্থান থেকে ঝাঁসীর তীরন্দাজ ও বন্দুকধারী সেনাদল আত্মপ্রকাশ করে সিদ্ধহস্তে ঝাঁকে-ঝাঁকে তীর ও গুলী বর্ষণ করতে লাগল। এই দারুণ বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত হয়ে বোরছা বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল। রঘুনাথ সিংহ প্রমুখ অভিজ্ঞ সেনানীরা সসৈন্যে পলাতক শত্রুদের অনুসরণ করলেন। নথে খাঁ অতঃপর অতিকষ্টে বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশকে নিরাপদ স্থানে সন্নিবেশিত করে রাণীর কাছে সন্ধিপ্রার্থী হতে বাধ্য হলেন। ঝাঁসীর রাণীর আদেশেই দেওয়ান নথে খাঁ রাজা সত্ত্বেও রাণী লড়য়িবাঈকে প্রাধান্য দিয়ে রণস্থলে এনেছিলেন। বোরছার অধিকাংশ সৈন্য রাজা ও রাণীকে রক্ষা করবার জন্য তাঁদের চতুর্দোলার চৌদিকে সমবেত হয়েছিল। অধিক প্রাণিহত্যায় রাণী লক্ষ্মীবাঈএরও আগ্রহ ছিল না। এখন দেওয়ানের বিরুদ্ধে রাজশিবিরে অসন্তুষ্ট রাজকর্মচারীদের এক বৈঠক বসল। সকলেই দেওয়ানজীর হঠকারিতার নিন্দা করে ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের জন্য রাজাকে পরামর্শ দিলেন। রাজাও দেওয়ান নথে খাঁকে আহ্বান করে অমাত্যবর্গের অভিমত জানালেন। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে নথে খাঁ সে প্রস্তাব সমর্থন করলেন। ফলে, যুদ্ধের খরচ-স্বরূপ কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে বোরছা-রাজ ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে বোরছার রাণীর সৌখ্যমূলক সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত হলেন। এই সন্ধিবন্ধনের সময় সুসজ্জিত শান্তি-শিবিরে দুই রাণীতে মিলন হলো—সমরক্ষেত্রে আনন্দের স্রোত বইল।

কিন্তু পরে দেওয়ান নথে খাঁ বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের ইংরেজ ঘাঁটির কর্তা মেজর হ্যামিল্টনের বরাবর এই মর্মে এক ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিলেন যে, ইংরেজ সরকারের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যেই তিনি ঝাঁসী আক্রমণ করেছিলেন। কূটবুদ্ধি দেওয়ান ভবিষ্যৎ ভেবে এই ভাবে তাঁর স্বার্থরক্ষার এক চাল চেলে রাখেন।

সে যাই হোক, বোরছার সঙ্গে সংগ্রামে এত সহজে ও সগৌরবে জয়লাভ করায় ঝাঁসীর খ্যাতি ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল, সেই সঙ্গে মহীয়সী বীরাঙ্গনা রাণীর নাম লোকের মুখে-মুখে ফিরতে লাগল। নানা সাহেব এ সময় নানা দিকে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় যদিও ঝাঁসীতে আসতে পারেননি, কিন্তু রাণীকে তিনি পত্রযোগে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সারা ভারত তৎকালে অগ্নিময় হয়ে উঠেছে; সবার মুখে এক কথা—যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

এই মহাবিপ্লবের প্রথম মুখে ইংরেজরা প্রায় প্রত্যেক সহর থেকেই বিতাড়িত হয়ে শুষ্ক পত্ররাশির মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন সহর দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। বিপ্লবীদের পক্ষে প্রথম ত্রুটি হয়েছিল, সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হবার তিন মাস আগেই আকস্মিক ভাবে বিপ্লব সুরু করায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপ্লবী নায়কদের তৎপরতায় বিপ্লব এমন ভাবে সর্বত্র ব্যাপক হয়ে ওঠে যে, প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ইংরেজরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে সেই বহুবিচ্ছিন্ন বিপ্লব-শিখাকে একমুখী করে তোলবার জন্য নানা সাহেব, তাত্যিয়া প্রমুখ নেতারা বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হলেও, অধিকাংশ বিপ্লবীর অহমিকা, হঠকারিতা ও সামরিক শিক্ষার অভাবের জন্যে এবং পক্ষান্তরে ইংরেজের কূটবুদ্ধির অসামান্য প্রভাবে তাঁদের মধ্যে এমন সব ভুল-ত্রুটি ঘটতে থাকে যে, তাঁরা পদে পদে বিভ্রান্ত হন—বিভিন্ন ক্ষেত্র ও বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে যোগসূত্র সুদৃঢ় হয়ে উঠতে বাধা পায়, আর সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদেরই দেশের লোক নিজেরাই স্বার্থের খাতিরে ইংরেজের তুষ্টি-বিধানের জন্যে সেই যোগসূত্রকে ছিন্ন করতে সাহায্য করে।

একটা প্রবাদ আছে, বিপদ এলে ইংরেজ জাতটার সাহস আরো বাড়ে, বুদ্ধি খোলে। তাই দেখি, এত বড় বিপদেও ইংরেজ হাল ছেড়ে দেয়নি—পরাজয়ের প্রথম ধাক্কা কোন রকমে সামলে নিয়েই ইংরেজ সেনানায়কগণ তাঁদের শিক্ষালব্ধ সামরিক বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আরো গভীর ভাবে অনুশীলন করে প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হলেন। তাঁরা হিসেব করে দেখলেন যে, ভারতের চার দিকে একমুখী হয়ে চলেছে বীর সিপাহীদের বিজয়-পর্ব। দেড় বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষের এক লক্ষ বর্গ-মাইলেরও বেশী জমি তারা দখল করে নিয়েছে, তার ফলে সাড়ে চার কোটি ভারতবাসী স্বাধীন হয়েছে। অসংখ্য নগর, বড় বড় দুর্গ, বন্দিশালা তারা অধিকার করে নিয়েছে। এ সব পুনরুদ্ধার না করলে ইংরেজের প্রেস্টিজ থাকবে না। এর জন্যে শক্তি, বুদ্ধি, কূটকৌশল, অন্যায়, অধর্ম যা-কিছু প্রয়োজন নির্বিচারেই চালিয়ে যেতে হবে। ফলে, দেড় বছরের মধ্যেই ইংরেজ যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হলো। বিলেত থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে ইউরোপীয় সৈন্য এলো, সেই সঙ্গে নূতন ধরণের এক মারাত্মক অস্ত্রও এল প্রচুর পরিমাণে। এই অস্ত্রটি হচ্ছে—এনফিল্ড নামে নবাবিষ্কৃত দূর পাল্লার রাইফেল; এর গুলী সাংঘাতিক, আর বহু দূর থেকে লক্ষ্য বিদ্ধ করে। এ ছাড়া পাঞ্জাবের শিখশক্তিকে দলভুক্ত করল ইংরেজ, নেপালের গুর্খা সৈন্যও ইংরেজের পাশে এসে দাঁড়াল, ভারতের কতকগুলি সামরিক শক্তিসম্পন্ন উপজাতি, হায়দ্রাবাদ ও ভুপালের রাজশক্তি ইংরেজকে সাহায্য করতে সম্মত হলো; মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে ইংরেজের যে দেশী সেনাবাহিনী ছিল, তারাও ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিল।

এই ভাবে পরিপুষ্ট হয়ে ও বিপুল শক্তি-সঞ্চয় করে দুই বিখ্যাত ইংরেজ সেনানায়ক বিপুল বাহিনী নিয়ে দুদিক দিয়ে এই বিপ্লব দমনে অগ্রসর হলেন। এক দিক থেকে স্যার কলিন ক্যাম্পবেল, আর এক দিক থেকে স্যার হিউরোজ—উভয়েই বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেনাপতি। কাম্পবেল উত্তর-ভারতের বিপ্লবী কেন্দ্রগুলির সঙ্ঘবদ্ধ হবার সুযোগ-সুবিধা আগে থেকেই ছিন্ন করে এক-একটি কেন্দ্রকে সবলে চূর্ণ করতে অগ্রসর হলেন। সার হিউরোজ বিরাট বাহিনী নিয়ে ঝাঁসীর অভিমুখে অভিযান করলেন। ঝাঁসীর দিকেই তখন ইংরেজের দৃষ্টি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

[ক্রমশঃ।

গল্প হ'লেও সত্যি

শ্রীশ্যামলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গাড়াই নদীর তীরে ছোট্ট একটি খেয়া-ঘাট। সূর্য্য অস্ত যাবার কিছু পূর্ব্বে একটি খেয়া-নৌকা এসে হাজির হ'ল। তা' থেকে নামল এক বৃদ্ধা। বয়স তা'র পঞ্চাশ কি তা'রও ওপর। মাঝি তা'র সঙ্গে যে ঘাসের বোঝাটি ছিল নামিয়ে দিয়ে গেল। আরও অনেকে নামল নৌকা থেকে; কিন্তু তা'রা কাজের লোক। তাই সব পা চালিয়ে দিল দ্রুতগতিতে গন্তব্য স্থলের দিকে। এদিকে নৌকা বোঝাই করে মাঝিও দিল পাল খুলে।

খেয়া-ঘাট ফাঁকা হয়ে গেল। বৃদ্ধা পড়ল মহা মুস্কিলে। বোঝাটি মাথায় তুলে দেয় এমন এক জনও লোক নেই কাছাকাছি। এরই মধ্যে কয়েক জনকে অনুরোধ করেছিল সে তুলে দেবার জন্যে; কিন্তু ফল হয়নি তা'তে। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নৌকায় উঠে গেল তা'রা সে কথায় কান না দিয়েই। যা'র কথাটি কানে পৌঁছাল সে বিরক্তিকর জবাব দিয়ে উঠে পড়ল নৌকায়।

—ও বাবা, আমার বোঝাটা একটু তুলে দিয়ে যা না বাবা!— মোলায়েম কণ্ঠে অনুরোধ করল বৃদ্ধা এক পথচারীকে।

—সময় নেই গো, সময় নেই; এখনই গিয়ে বাছুর না বাঁধলে সমস্ত দুধটিই খেয়ে ফেলবে।

—আমারও যে বাবা গরু খেতে পাবে না। মাণিক আমার, একটু তুলে দে বাবা—

—না, না, সময় নেই।

বৃদ্ধা মাথায় হাত দিয়ে বসল।

এদিকে সন্ধ্যেও আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল। এমন সময় এক বলিষ্ঠকায় যুবক এল খেয়া-ঘাটে। বৃদ্ধা তা'কে দেখতে পেয়েই অনুরোধ করল—বাবা, আমার বোঝাটা তুলে দিয়ে যা' না বাবা! তোরা না দেখলে কে দেখবে?

যুবক সাগ্রহে এগিয়ে এল। বোঝাটি নেড়ে-চেড়ে দেখল একবার। বেশ ভারী বলে মনে হ'ল।

—এত ভারী বইবে কেমন করে? বাড়ী কোথায় তোমার?

—আধ কোশটাক্ হ'বে বাবা।

—চল।

বোঝাটি কাঁধে তুলে নিল যুবক।

—ওমা, ভদ্দরলোকের ছেলে—!

—তা' হোক্, চল তুমি।

এগিয়ে চলল যুবক বোঝা নিয়ে। বৃদ্ধা আর কথা বলতে সাহস পেল না। এ যেন সাক্ষাৎ ভগবানের দয়া! জীর্ণ একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে থামল যুবক। বৃদ্ধার বাড়ী। কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধার চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তা'র দুঃখ দেখে যুবকের অন্তরে ব্যথা লাগল। একমাত্র পারের কড়ি রেখে বাকি পয়সা সব দান করে গেল বৃদ্ধাকে। কে এই বেদনার্ত্তের সহায়? এ সেই পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহী—মুক্তিপথের অগ্রদূত—বাঘা যতীন!

যৌবনের এই দান পরে আরও বৃহত্তররূপে দেখা দিল। তাই দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল কবির বাণী:—

"বাঙ্গালীর রণ দেখে যা রে তোরা রাজপুত শিখ মারাঠী জাত,
বালাশোর, বুড়িবালামের তীরে নব ভারতের হলদিঘাট!"

সেই যুবকই পরে নতুন রূপে দেখা দিলেন—দেখা দিলেন বুড়িবালামের যুদ্ধক্ষেত্রে মরণবিজয়ী সেনাপতিরূপে!

বন্দে মাতরম্

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

[এই বিশাল পৃথিবীর যে অংশে আমাদের বাস তার নাম ভারতবর্ষ। এমনি আরও কত না অংশ এই পৃথিবীর, এবং তাদের নামও বিভিন্ন। বিভিন্ন হলেও কিন্তু সমষ্টিরূপে তারা অভিন্ন। যেখানে আমরা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম চোখ মেলি সেই স্থানটি হয়তো একটি ছোট্ট গ্রাম—ছোট্ট পরিবেশের মধ্যে শান্ত তার জীবনের প্রবাহ চলেছে। গ্রাম ছেড়ে যাই গ্রামান্তরে; নতুন বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে চোখে। এমনি করে জাগে বিস্ময়, আর সেই বিস্ময় থেকেই নতুনকে জানবার ঔৎসুক্য। গ্রামের সীমানা ছেড়ে সীমান্তরের পরিচয় যখন দীর্ঘতর হয়েছে তখন পাই ভারতবর্ষকে—পৃথিবীর সভ্যতার আদি জন্মভূমি। পর্বত-কান্তার-মহাসমুদ্রে ঘেরা এই বিচিত্র দেশের রূপে মুগ্ধ হই। কিন্তু আর কোন দেশ কি নেই এর সীমানার বাইরে? আছে—একটা নয়, দু'টা নয়, অনেক। নেই কি যোগাযোগ তাদের সঙ্গে এই দেশের? তা-ও আছে। এই পরিচয়ই ভূ-পরিচয়। সমগ্র পৃথিবীর এবং সেই সঙ্গে বিশেষ করে ভারতবর্ষের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি ছন্দোবদ্ধ কথায় সাজিয়ে দিয়েছি। ছন্দের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, এবং সেই আকর্ষণের জন্যেই এ রচনা কিশোর-মনে সহজে রেখাপাত করবে বলে আমার ধারণা। যে উদ্দেশ্যে এই রচনা তা সফল হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। বলা বাহুল্য, আমার এই রচনাটির জন্যে প্রেরণা পেয়েছি স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরীর "ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি" প্রবন্ধ থেকে। এই প্রথিতযশা রসজ্ঞ সাহিত্যিককে স্মরণ করে তাঁর কাছে আমার অশেষ ঋণ স্বীকার করছি।—লেখক]

[দাদামশায় তাঁর নাতি-নাতনীদের সঙ্গে বার হয়েছিলেন বৈকালিক ভ্রমণে। আসন্ন সন্ধ্যার আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসতেই তিনি বাড়ী ফিরছেন।]

ওরে দাদু, ওরে দিদিমণি সব চল্ ঘরে ফিরে চল্,
আকাশে জমেছে ঘন কালো মেঘ, এখুনি নামিবে জল।
ঘাটে পারাপার বন্ধ হয়েছে, বুঝি কেহ নাই হাটে,
রাখালের দল দেখা নাহি যায় ছাতিমতলার মাঠে।

[জোর বৃষ্টি নেমেছে। বন্ধ-দুয়ার ঘরে বাহিরের বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ শুনা যায়। দাদামশায় গল্প সুরু করলেন—সে গল্পে তাঁদের ছোট গ্রামখানির ছোট্ট পরিবেশের সঙ্গে তাঁর শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত।]

কড়্‌কড়্ করে ডাকে মেঘ শোন, বৃষ্টি নেমেছে জোর।
জানলাগুলোরে খোলা রেখো নাকো, জোরে এঁটে দাও দোর।
কোথাও হয়তো নারিকেল-বনে হানা দিয়ে যাবে বাজ;
ভয় পেয়ো নাকো তাতে যেন কেউ, ঠিক হয়ে বসো আজ।

বুড়ো দাদুটিকে ঘিরে বসো সব এমনি বাদল সাঁঝ,
আজিকার দিনে গল্প বলাটা আর শুনাটাই কাজ।
বাদল-বাতাসে কী যেন মন্ত্র টেনে আনে ঘর-কোণে,
নিজেরে গুটাতে ভালো লাগে তবু মন উড়ে চলে বনে।
তোমাদের মতো আমারো বয়েস ছিল যে সে একদিন,
তোমাদের পায়ে-চলার শব্দ আসেনিকো কানে ক্ষীণ।
এই পৃথিবীতে তখনো ; তখন সবে মোর আনাগোনা,
হাজারো রকম খেয়াল-খুশির স্বপ্নের জাল বোনা।
বাবলার বন বাঁয়ে রাখি আর দুস্তর প্রান্তর
পার হয়ে গিয়ে বাঁকা যেই পথ আমন ধানের চর।
ওড়কলমীর গলাটি জড়ায়ে পলাশ দীঘির পানে
চেয়ে থাকে আর দেখে ছায়া তার জলে দোলে কোনখানে ;
সেইখানে নাকি ছিল নদী এক অথৈ তাহার জল,
হাজার ডুবেও কখ্খনো তার পায়নিকো কেহ তল ;
তারি মাঝখানে ছিল নাকি এক যক্ষ ভয়ঙ্কর,
টেনে নিয়ে যেতো নৌকা-জাহাজ পাতালপুরীর ঘর।
এমনি করিয়া জমা হতো তার মণি-মাণিক্য কত,
অনেকেই বলে এখনো খুঁড়িলে পাবে নাকি শত শত।
যখন শুনেছি এই সব কথা ঠাকুরমায়ের কাছে
গায়ে কাঁটা দিত তবু মন যেন ছুটিত কিসের পাছে।

*　　*　　*　　*

[কিন্তু ঐ গ্রাম কিংবা আর একটু দূরের গ্রামান্তর—সে তো বাংলা দেশেরই অংশ মাত্র। আর, বাংলা দেশ ? সেও যে এক বৃহত্তর দেশের অংশ। সেই বৃহত্তর দেশের নাম ভারতবর্ষ।]

ছোট গ্রামখানি শ্যামল বরণ পেরিয়ে উদয়পুর
বাঁ-হাতী রাখিয়া পিপুলের ক্ষেত যদি আরো কিছু দূর
যাও চলে তবে দেখিবে সেখানে আছে ঠিক দাঁড়াইয়া
মানার খাঁয়ের আমের বাগানে গায়ে গা-টি হেলাইয়া
বুড়ো বট গাছ, কত সে কালের কেহ না বলিতে পারে ;
কারো অনুমান হাজার বছর কিংবা তাহারি ধারে।
লক্ষ কাহিনী ঢাকা আছে তার পাতার অন্তরালে ;
একটি অমনি ঘটে গেছে শোন আমারি বয়েস কালে :
ঈশান সে ছিল আমারি বয়সী উধাও সে একদিন !
কোথায় যাইতে গেল কত দূর ? কোথা হয়ে গেল লীন ?
সুন্দর তার দেহের গড়ন, কালো চুলে মেঘ মায়া ;
টানা দুটো চোখে ছড়ায়ে পড়িত তাহারি দীঘল ছায়া।
রাজার ছেলের মতো তার রূপ আলো-করা দশ দিক
হাজার লোকের মাঝে থাকিলেও চেনা যেতো তারে ঠিক।
সেই সে ঈশান দেখা গেল একা পড়ে আছে অতি ক্ষীণ
আখের ক্ষেতের মাঝে জ্ঞানহারা, কেটে গেছে সাত দিন।
তার কথা যদি শোন তবে কারো হবে নাকো বিশ্বাস,
চোখ দুটি হবে এত বড়, বইবে ঘন ঘন নিশ্বাস !
বুড়ো ওই বট গাছের উপর সে ছিল এ কয় দিন,
মাথার উপরে ঝুলিত ঝালর অকাশ অন্তহীন !
দুধের বরণ শয্যা তাহার আর পালঙ্ক সোনা,
তারি পরে শুয়ে ঘুম কভু চোখে তবু তার মিলিতো না।
পাশে তার দিবা-রাত্রি থাকিত সুন্দরী এক পরী,
কে দেবে তাহার বর্ণনা হায় কী যে রূপ মরি মরি !
দিদিমণিদের কথা ছেড়ে দাও, কেহ কি তেমন আছে ?
পারিত কি কভু দাঁড়াতে তাহার পায়ের নখের কাছে
উর্বশী আর তিলোত্তমারা ? মনেও দিও না স্থান।
তার সাথে নহে তুলনায় কেহ, সব তার কাছে ম্লান।
হেন পরী তার সেবার ভিখারী, বলিত—'কও না কথা'
তাহার মুখের একটু হাসির লাগি সে কী আকুলতা !
আশে-পাশে তার আরো কত পরী আজ্ঞাবাহিনী কত
কিসে তার হবে মনোরঞ্জন সেই ব্রতে সদা রত।
সোনার থালায় কত যে খাদ্য, কত তার অনুপান ;
মুখে তার কোন কথা ফোটে নাকো, হৃদয় কম্পমান !
ফুলের গন্ধে ভুল হয়ে যায়, না পায় কোথাও কূল,
কি আছে তাহার এ-হেন সুখের যাতনার সমতুল ?
মূক মানুষের মনোহরণের বৃথাই চেষ্টা করি
অবশেষে তারে ছেড়ে দিয়ে গেছে গাছের দেশের পরী।
এই কাহিনীর মরমের কথা শুধু কি অলীক ফাঁকা ?
এই মাটিতেই জন্ম তাহার এই মাটিতেই ঢাকা।

*　　*　　*　　*

জমিদার-বাড়ী দেখি একদিন হাতী বাঁধা আছে দোরে,
হরিণশিশুরা থমকিয়া চায়, খাঁচার সিংহ ঘোরে ;
নাম-না-জানা সে হলুদে পাখীটা দোলায় চাঁপার শাখা,
কোথাও মেঘের আভাষ দেখিয়া ময়ূর মেলেছে পাখা !
কেহ আসিয়াছে জুনাগড় ছাড়ি, কেহ বা বৃন্দাবন,
কেহ ছিল দূর রাজপুতনায় নির্বাধ, নির্জন।
ভাবিতাম মনে এই সব দেশ কোথায় ? কেমন ধারা ?
এদের মাঠে কি রোদ ঝরে পড়ে ? ফোটে কি আকাশে তারা ?
কারো বুকে খর নদী বয়ে যায়, কারো পর্বত পাশে,
কারো বা সম্মুখে মরু-প্রান্তর, কারো শ্যাম শোভা ঘাসে ;
তবু সবে মিলি ভারতবর্ষ বহু বিচিত্র দেশ ;
তুলনা ইহার মিলে না কোথাও মহিমার নাহি শেষ।
শুনি এই দেশ বিশাল, মহান্, দেবদুর্লভ ধাম ;
আর্যেরা আসি দিয়ে গেছে এর আর্যাবর্ত নাম।
বেদের মন্ত্রে বন্দনা এর উঠেছিল উচ্ছলি ;
এর ছবি আছে পৃথিবীতে আঁকা শোন আজ তবে বলি :

[কোথায় ভারতবর্ষ—পৃথিবীর মানুষের আদি সভ্যতার ভূমি ? সসাগরা ধরিত্রীর অন্তর্ভুক্ত এশিয়াখণ্ডের একটি অংশ এই ভারতবর্ষ। আলোকিত ঘরে টেবিলের উপর রক্ষিত একটি ভূগোলকের চিত্রে এশিয়াখণ্ড দেখা যায় আর সম্মুখের দেওয়ালে ঝুলে রয়েছে ভারতবর্ষের একখানি প্রকাণ্ড মানচিত্র।]

এই পৃথিবীর অংশ এ দেশ এ দেশ জানিতে হলে
নদী-কান্তার গিরি-প্রান্তর ছাড়ি যেতে হবে চলে,
দূর-দূরান্তে মানুষের যেথা গতির হয়েছে লয় ;
আগে জানো সেই ভূমণ্ডলের নির্ভুল পরিচয়।
ঘর ছেড়ে কেন বাহিরে ছুটেছি কিসের এমন তাড়া ?
কারণ এ দেশ বাহিরেতে বাঁধা নয়কো সৃষ্টিছাড়া।
বাহির যাহার বন্ধ-দুয়ার, ঘরেও শিকল আঁটা ;
তার কাছে হয় দুর্লভ ঘর-বাহিরের তুলনাটা। [ক্রমশঃ।

ফারুকের অত্যাচার

শ্রীমতী বিভা দেবী

নীল নদের দেশ—গত এক বছর তার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। রাজা ফারুক বিতাড়িত হলেন। দেশ ছেড়ে তাঁকে যেতে হ'ল ইতালীতে, সঙ্গে চলল তাঁর সামান্য দ্রব্য-সামগ্রী, শিশুপুত্র ও তার মা, আর কারা। আর তাঁর প্রথমা স্ত্রীর কন্যা। অবশ্য ফারুক নিঃস্ব অবস্থায় যাননি। ভবিষ্যতের সংস্থান আগেই করেছিলেন বিদেশী ব্যাঙ্কের মারফৎ। ফারুকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই, কিন্তু মিশরের জনসাধারণ তাঁকে এক নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজা বলেই জানে।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রে এ-সব খবর আসে না। সম্প্রতি একটি বিশিষ্ট ইংরাজী দৈনিকে তাঁর প্রথমা স্ত্রী ফারিদার বেদনাময় জীবনের কথা বেরিয়েছে।

১৯৩৮ সালে রাজা ফারুকের ১৭ বছর পূর্ণ হ'ল। ফারিদা তখন ১৬ বছরের সুন্দরী যুবতী। রাজা ফারুকের আগ্রহে সেই বছরই তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। কয়েক বছর বেশ আনন্দে কেটে গেল। কিন্তু তার পরেই উচ্ছৃঙ্খল রাজার স্বরূপ প্রকাশিত হ'ল। নানা তুচ্ছ কারণে তাঁদের মনোমালিন্য ক্রমেই বাড়তে থাকে। রাজার নির্দ্দেশে ফারিদা ও তাঁর দুই কন্যা প্রাসাদেই বন্দী হলেন। কোনও উৎসবে যোগ দেওয়া তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না, এমন কি আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষেও তাঁদের দেখা পাওয়া শক্ত ছিল।

১৯৪৩ সালে ফারিদার ছোট মেয়ের জন্ম হয়। তার জন্মের পরেই নেমে আসে বিচ্ছেদের যবনিকা। ফারিদা ফারুকের নির্য্যাতন সহ্য করতে না পেরে বিবাহ-সম্পর্কের ইতি করতে চাইলেন। দারুণ আক্রোশে ফারুক তার সমস্ত রাজকীয় মর্য্যাদা কেড়ে নিলেন। কতকটা রাজকর্ম্মচারীদের প্রবল মতের জন্যই ফারিদার খোরপোষের দাবী তাঁকে মেটাতে হ'ল। ৩০,০০০ পাউণ্ড বার্ষিক আয়ের এক জমিদারী ফারিদার নামে ছেড়ে দিতে হ'ল। ফারিদার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অলঙ্কার ও হীরা-জহরৎ লোভী ফারুকের হস্তগত হ'ল।

ফারিদা মনস্থ করলেন যে, নীল নদের ধারে নিজের জমিদারীতে একটা অনুপম প্রাসাদ তৈরী করে তাঁর কন্যাদের পরম আদরে মানুষ করবেন। যাতে তারা নিজেদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা বুঝতে না পারে। প্রকাণ্ড প্রাসাদ বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। রাজপ্রাসাদের সকল সুখ-সুবিধাই সেখানে বর্ত্তমান। কিন্তু ফারুকের তা সহ্য হ'ল না। তাঁর হুকুমে বড় দুই মেয়েকেই রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত করা হ'ল। মায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠল। শূন্য পুরী খাঁ-খাঁ করে রাণীর দুঃখের কথা যেন স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল। রাণীর কাছে রইল তাঁর ছোট মেয়ে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকলেন তাঁর বাবা ইউসুফ জুলফিকার। তিনি তাঁর সুসময়ে মিশরের এক জন বিচারপতি ছিলেন ও পরে ইরাণে মিশরের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হ'ন। কন্যার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও রাজার বিষ-নজরে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

রাণী তাঁর দুঃখের বোঝা লাঘব করতে সমস্ত প্রাণ উজাড় করে ভালবাসা ঢেলে দিলেন ছোট মেয়ের ওপর। দিনে দিনে সে বড় হতে লাগল। কিন্তু এখনও দুঃখের শেষ হয়নি। রাজার আদেশে সাত বছরের ছোট মেয়েকে মা'র কোল হতে ছিনিয়ে নিয়ে আটক করা হ'ল রাজপ্রাসাদে। ফারিদার বুক ভেঙ্গে গেল। অনেকে তাঁকে পরামর্শ দিলেন আদালতের আশ্রয় নিতে, কারণ ইসলামের আইনানুসারে সন্তানের থাকা উচিত মায়ের কাছে। কিন্তু ফারিদা ফারুককে ভাল ভাবেই চিনতেন। তিনি জানতেন যে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করলেও ফারুকের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কারুর কথা কওয়ার ক্ষমতা মিশরে নেই বরং তার ফলে তাঁর মেয়েদের ওপর নির্য্যাতনের সম্ভাবনা খুবই বেশী। নিদারুণ দুঃখ ও হতাশা তাঁকে দগ্ধ করতে লাগল। তিনি প্রাসাদের মধ্যে একাকী কালযাপন করতে লাগলেন। দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্ত্তা সবই বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গীর মধ্যে আছেন তাঁর বৃদ্ধ পিতা ও কতকগুলি বই।

তার পর এল নাগিবের অভিযান। সকলের ধারণা হ'ল যে ফারিদার দুঃখ এবার মিটবে। কিন্তু ফারুকের চক্রান্তে তিন মেয়েকেই মিশর ছাড়তে হ'ল। নাগিব ছিলেন রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। তাই এই সব ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের ঘটনাগুলি তাঁর মনে রেখাপাত করেনি। যাবার আগে মেয়েদের মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের শেষ সুযোগও দেওয়া হয়নি। ইতালীর ক্যাপ্রি বন্দরে ফারুক আশ্রয় নিলেন। ভোগী রাজার বিলাস-ব্যসনের উপযুক্ত আয়োজন অবিলম্বেই হ'ল। কিন্তু তিনটি মেয়ের এই অসহ্য বেদনার কথা কেউ শুনল না, কেউ জানল না। বড় মেয়ে মায়ের কাছে এক চিঠি লিখল:

মা—

মিশর ছাড়বার সময়ে তোমার সাথে দেখা করার ও বিদায়ের আগে শেষ বারের মত তোমায় চুম্বন করার সুযোগও পাইনি। যদি কোনও দিন তোমার কথার অবাধ্যতা করে থাকি, ক্ষমা কর। মা গো, নিশ্চয় জেন, আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকেই ভালবাসি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে এই ক'দিনের মত দুঃখ আর না দেন— ইতি তোমার মেয়ে

ফেরিয়েল

ভাগ্যের বিপর্য্যয় সব দিক দিয়েই দেখা দেয়। মিশরে নূতন জমিদারী আইন পাশ হয়েছে। ২০০ একরের বেশী জমি কারুর পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। ফারিদাকেও তাঁর জমিদারীর বিরাট অংশ ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর অপরূপ ঐশ্বর্য্যময় প্রাসাদও শীঘ্রই বিক্রী হয়ে যাবে। বার্ষিক ৩,০০০০ পাউণ্ডের আয় এখন ৩০০০ পাউণ্ডে এসে ঠেকেছে। মানসিক দুঃখে তিনি এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দিনে দিনে শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। ডাক্তারের মতে এ রোগ তাঁর সারবার নয়। সুখের দেখা না পেলে তাঁর পক্ষে এই রোগের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

রাজনৈতিক পট-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনমতও প্রবল হয়ে উঠছে। মিশরের জাতীয় মহিলা দল নাগিবের কাছে এক আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদনে ফারিদার তিন মেয়েকে অবিলম্বে মিশরে ফিরিয়ে এনে তাদের মায়ের তত্ত্বাবধানে রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে: প্রসিদ্ধ আল আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকেও সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে রাজা ফারুকের এই নিষ্ঠুরতার নিন্দা করা হয়েছে ও ফারুকের কন্যাদের ওপর দাবী অগ্রাহ্য করা হয়েছে। রাণী ফারিদাও সম্প্রতি আদালতে এক মামলা পেশ করেছেন। মামলার ফলাফল কি হয় তা দেখবার জন্য সারা জগতের সহানুভূতিসম্পন্ন লোকই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। এই নিরপরাধ মহিলার জীবনে শান্তি ফিরে আসুক, এই কামনা সকল নারীই নিঃসন্দেহে জানাবে।

যখনই হোক... যেখানেই হোক...
ব্রুক বণ্ড চা
বাগান থেকে সদ্য আসে
তাই এত তাজা

দেশে দেশে
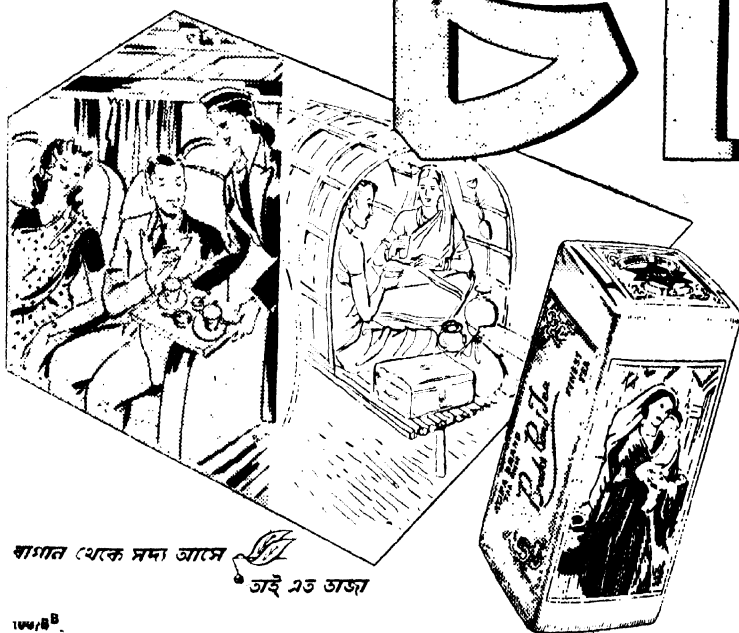
"বিক্রমাদিত্য"

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতায় গান্ধীজি উচ্ছ্বসিত হ'লেন না—তাই কিছু দিন বাদে তিনি স্থির ক'রলেন নোয়াখালী যাবেন। মাঝের কয়েকটা দিন বহু দেশ থেকে বহু বাণী এসেছে ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষা কামনা করে। কিন্তু গান্ধীজি অবিচলিত রইলেন। এটা ছিল তাঁর স্বভাব—আনন্দ ও দুঃখের মাঝে স্থির হয়ে থাকা। নিজের উচ্ছ্বাসকে কখনো প্রকাশ করেননি ভাষায় ও ভাবে। ক'লকাতায় যে আনন্দের সাড়া পড়েছিল, তা'তে তিনি অন্তরের সায় দিতে পারেননি। তাই তিনি স্থির করলেন যে নোয়াখালীর পল্লীগ্রামে তিনি তাঁর আস্তানা গাড়বেন। সঙ্গে যাবেন মুস্লিম নেতা শহীদ সুরাবর্দী।

নোয়াখালী যাবার কল্পনা কাউকে বিস্মিত করলো না। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে তখনো অনেকে নোয়াখালীর গ্রামে-গ্রামে শান্তির কাজ করছিলেন। নোয়াখালী ছেড়ে আসার সময় তিনি নিজেও গ্রামবাসীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি আবার নোয়াখালী ফিরে যাবেন। কিন্তু তাঁর সংকল্প কখনো বাস্তবে পরিণত হয়নি। দিল্লী থেকে তিনি যাত্রা করেছিলেন নোয়াখালীরই উদ্দেশে, কিন্তু সোদপুরে এসে হঠাৎ তাঁর মতির পরিবর্তন হ'লো। যাবার আগের দিন সন্ধ্যাকালে বৃইক গাড়ী চ'ড়ে সুরাবর্দী এলেন—গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে। বিকেলে প্রার্থনা-সভায়ও একটা আভাষ পাওয়া গিয়েছিল যে, নোয়াখালী যাত্রা স্থগিত থাকবে। বহুক্ষণ ধরে দুই নেতায় মগ্ন রইলেন বাক্যালাপে। আলোচনা শেষে সুরাবর্দী জানালেন সাংবাদিকদের যে, গান্ধীজি স্থির করেছেন যে নোয়াখালীর পরিবর্ত্তে তিনি ক'লকাতার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে যেয়ে বসবাস করবেন। হুঁসিয়ার লোক সুরাবর্দী, গান্ধীজির সংকল্পের কথা বললেন বটে কিন্তু চেপে গেলেন জায়গার নামটা। কিন্তু যারা ঘুঘু রিপোর্টার, তাদের কাছে অজানা রইলো না জায়গার নাম।

এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেলো পরদিন। দুপুরের কিছুটা বাদে রওনা হওয়া গেলো ক'লকাতাভিমুখী। সারিবন্দী মোটর গাড়ী—রাস্তার দু'ধারে অগণিত জনসমুদ্র। সে জনরাশির শেষ হয়নি কোথাও—এমন কি বেলেঘাটা অঞ্চলেও। বরং টের পাওয়া গেল যে, এ অঞ্চলের জনতা কিছুটা চঞ্চল। এদের মধ্যে কেউ কেউ ঘিরে ধরলেন গান্ধীজির গাড়ী। উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃই বেড়ে গেলো। ধ্বনি উঠলো 'গো ব্যাক্ গান্ধী', 'গো টু পার্কসার্কাস'। জনতা বৃদ্ধি পেলো নতুন আশ্রমের সামনে। এক দল ভেতরে ঢুকে সুরু করে দিলো ঢিল ছোঁড়া। সার্সী, জানলা ভেঙ্গে গেলো। আহত হ'লেন হোরেস আলেকজাণ্ডার। কিন্তু গান্ধীজি অবিচলিত রইলেন, জনতার এই উদ্দামতা তাঁর মনে কোনই রেখাপাত করলো না। জনতার মধ্যে থেকে নেতৃস্থানীয় কয়েক জনকে আহ্বান করলেন নির্মলদা', গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। দীর্ঘ দু'ঘণ্টা ধরে আলাপ চললো, অনেকটা একতরফাই বলা যেতে পারে। তরুণের দল যাঁরা এই বিশৃঙ্খলতার পুরোভাগে ছিলেন তাঁরা শুনলেন গান্ধীজির উপদেশ। মাঝে-মাঝে উঠলো আপত্তি কিন্তু তাঁর অমায়িক হাসিই তাঁদের শান্ত করে দিলো। আলোচনা যখন খুব জমে উঠেছে হঠাৎ গান্ধীজি ঘড়ি বের করে বললেন, 'রাত্রি দশটা, আমার ঘুমুবার সময় হয়েছে, আপনারা এখন যেতে পারেন।'

তরুণ নেতাগণ পরদিন থেকে গান্ধী-আশ্রমের স্বেচ্ছা-সেবকের ভার নিলেন। গান্ধীজির আদেশানুযায়ী পুলিশ-মিলিটারী উঠিয়ে দে'য়া হ'লো—দ্বারে প্রহরী রইলো পাড়ার তরুণ দল।

* * * *

কিন্তু বিধাতা এবারও বাদ সাধলেন। নোয়াখালী যাবার সংকল্প এবারও ব্যর্থ হ'লো। ঘটনা ঘটলো অপ্রত্যাশিত ভাবে, ইংরাজীতে একে বলা যেতে পারে আনএক্সপেক্টেড। নোয়াখালী যাবার আগের দিন রাত্রে বেলেঘাটার ক্যাম্পে হানা দিলো এক দল যুবক। এদের চেহারা বা আকৃতিতে এমন কিছু ছিলো না যা দ্বারা বলা যেত যে, এরা ভদ্রস্থানীয় কেউ। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো হল্লা করা, গৌণ উদ্দেশ্য অবশ্য সুরাবর্দীর সন্ধান।

প্রধান মন্ত্রীর আসন থেকে নেমে এসে সুরাবর্দীর পরিবর্ত্তন হয়েছিলো অনেক। মাত্র এক বছর আগে বোম্বের মালাবার হিলে তিনি তাঁর নেতা কায়েদ-ই-আজম জিন্নাকে দিয়েছিলেন পূর্ণ সমর্থন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নাজিমুদ্দিন; কিন্তু রাজনীতির বানচালে সুরাবর্দী তাঁকে হারিয়েছিলেন তখন। কিন্তু কিছু দিন বাদে ভাগ্যচক্র ঘুরে গেলো। পাকিস্থানের কাঠামো যখন তৈরী হ'লো, সুরাবর্দীর অস্ত তখন স্তিমিত হয়েছে। নাজিমুদ্দিন ছিলেন কায়েদ-ই-আজমের প্রিয়পাত্র; কাজেই অতি সহজে তাঁর স্থান হলো পাকিস্থানে। ব্যর্থমনোরথ হয়ে সুরাবর্দী হাত মেলালেন শরৎ বোস, কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে। রচনা করলেন স্বাধীন বাংলার বিস্তৃ কল্পনা তাঁর স্বপ্নেই ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। জনতা ক্ষিপ্ত, বিশেষ করে সুরাবর্দীর প্রতি। শরৎ বোসেরও জনপ্রিয়তা অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে, বিশেষ করে এই নতুন কল্পনা করে তুলেছে অনেকটা অপ্রিয়। অবশ্য এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিলো না, কারণ, বাংলা দেশে জনপ্রিয়তা অনেকটা পেণ্ডুলামের মতো চলে। গান্ধীজি নিজেও শংকিত হয়ে উঠেছিলেন সুরাবর্দী সম্বন্ধে। তাঁর বুদ্ধির ছটা তাঁকে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিলো। তাই প্রথমেই তিনি সুরাবর্দীকে হাত করলেন, দীক্ষা দিলেন তাঁকে তাঁর অহিংসা মন্ত্রে। এই নবদীক্ষার স্থান হলো বেলেঘাটা ক্যাম্পে; প্রতিদিন প্রার্থনা-সভায় সঙ্গে নিতেন সুরাবর্দীকে। কিন্তু জনতা

...চল্লিশের ষোলোই আগষ্টের কথা সহজে ভুলতে পারলো না। তার প্রমাণ দিলো এই যুবকবৃন্দ।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা এক সঙ্গীকে দেখিয়ে তারা দাবী করলে গান্ধীজির সাক্ষাৎ। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা, গান্ধীজি ঘুমুতে গেছেন। তারা অভিযোগ করলে যে মুসলমানেরা তাদের সঙ্গীকে জখম করেছে। হল্লা শুনে গান্ধীজি উপস্থিত হলেন কিন্তু শান্ত করতে পারলেন না উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে এক জন লাঠি ছুঁড়ে দিলে, কিন্তু নিশানা ব্যর্থ হ'লো। সুরাবর্দীর সন্ধান না পেয়ে যুবক দল চলে গেলো। গান্ধীজি তাঁর নোয়াখালী যাত্রা স্থগিত রাখলেন, পরদিন থেকে সুরু করলেন অনশন, জনতার এই ব্যবহারে দুঃখিত হয়ে। সেই দিন রাত্রে খবর এলো যে, ক'লকাতায় আবার দাঙ্গা সুরু হয়ে গেছে পূর্ণোদ্যমে।

* * * *

সাতচল্লিশের পনেরোই আগষ্ট, ভারতের স্বাধীনতা "কভার" করতে ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশন যে তিন জন নামজাদা সাংবাদিক পাঠিয়েছিলেন, রিচার্ড শার্প ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক জন। পনেরোই আগষ্টের কিছু দিন আগে শার্প ক'লকাতায় চলে এলেন, গান্ধী-ক্যাম্পে। হাত পাকিয়েছেন তিনি সংবাদ সংগ্রহ করে। পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিলো তাঁর অতি তীক্ষ্ণ। এসেই তিনি সংগ্রহ করলেন সুরাবর্দীর কাছ থেকে এক বিশেষ ইণ্টারভিউ। বন্ধুত্ব পাতালেন লণ্ডন এক্সচেঞ্জ টেলিগ্রাফ নিউজ এজেন্সীর সংবাদদাতা ল্যারী এটকিন্‌সনের সঙ্গে।

ক'লকাতার সাংবাদিক মহলে এটকিন্‌সন দুর্নাম কিনেছিলেন ষ্টার অফ ইণ্ডিয়াতে কৃষ্ণের প্রেমলীলা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় লিখে। জাতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, এটকিনসন ছিলেন চিরকুমার, গঙ্গার জল আর বিয়ারের সঙ্গে কোন পার্থক্য ছিলো না তাঁর কাছে। বন্ধুকে তিনি আশ্বাস দিলেন সমস্ত সাহায্যের। আশ্বস্ত হ'লেন শার্প।

গান্ধী-ক্যাম্পে রোজই আসতেন ল্যারী এটকিন্‌সন ও রিচার্ড শার্প। গান্ধীজির অনশনের খবর আকর্ষণ করলে আরো অনেক সাংবাদিককে। দিল্লী থেকে এলেন 'ডেইলী মেলের' র‍্যালফ ইজার্ড, এলান মুরহেড।

অনশনের দ্বিতীয় দিনে ক্যাম্পে এক চাঞ্চল্য উঠলো। সন্ধ্যার একটু পরে এক ভলাণ্টিয়ার দৌড়ে এলো গান্ধীজির ঘরের কাছে। উত্তেজনায় সে কাঁপছে। চীৎকার করে বললে, 'টেলীফোন ফ্রম বাকিংহাম প্যালেস। রাজা টেলীফোন করছেন গান্ধীজির কুশলতা জিজ্ঞেস করে।'

আশ্রমবাসীদের এক জন দৌড়ে গেলো টেলীফোনে কথা বলতে। ল্যারী এটকিন্‌সন রিচার্ড শার্পকে ডেকে বললে, 'বিরাট স্কুপ, ভেরী বিগ ষ্টোরি'। তার পর পাকড়াও করলে সেই ভলাণ্টিয়ারকে, জেরা সুরু হ'লো নানান্‌ ভাবে।

খবর সংগ্রহ করে এটকিন্‌সন ও শার্প দৌড়ে গেলো টেলীগ্রাফ অফিসে। কাজ শেষ করে বিয়ারের বোতল নিয়ে বসলে স্পেন্সাস হোটেলে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে এটকিন্‌সন গর্ব্বের সঙ্গে শার্পকে বললে, 'আই টোল্ড ইউ। আই এ্যাম দি অন্‌লি জার্ণালিষ্ট হ্যাভিং গুড কণ্টাক্ট্ ইন গান্ধী ক্যাম্প।' আধা ডজন বোতল নিঃশেষ করে এটকিন্‌সন ও শার্প গেলো ঘুমুতে। শেষ রাত্রে টেলীগ্রাফ পিয়নের ডাকে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। দু'জনেই দেখতে পেলো, দু'জনের নামে হেড অফিস থেকে তার এসেছে। তারে তাদের জবাবদিহি করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজার টেলীফোন করার কথা সমস্ত বাজে, ভুঁয়ো। বি, বি, সি, এই খবর প্রচার করার পর বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। টেলীফোন রাজা করেননি, করেছিলেন সুধীর ঘোষ। কিন্তু খবর তখন ছাপা হয়ে গেছে।

প্রভাতে গম্ভীর মুখ নিয়ে এলো শার্প ও এটকিন্‌সন গান্ধী-ক্যাম্পে। বিদ্রূপ করে শার্প এটকিন্‌সনকে বললে, 'ইউর কনটাক্ট্ হ্যাজ ল্যাণ্ডেড মী ইন ট্রাবল।'

গান্ধীজি তখন অনশন ত্যাগ করেননি। আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে তাঁকে বোঝাবার। কিন্তু গান্ধীজির দৃঢ় পণ, যতো দিন না ক'লকাতা-বাসী তাদের ভুল বুঝতে পারবে ততো দিন তিনি অনশন ত্যাগ করবেন না। কথা চলছে যে, যাঁরা সেদিন রাত্রে এই হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা এসে গান্ধীজির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে নজর দেবেন তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্র। সোস্যালিষ্ট নেতা রাম-মনোহর লোহিয়া এই কাজে সাহায্য করলেন। আগের দিন নতুন পুলিশ কমিশনার চ্যাটার্জি ঘুরে বেড়িয়েছেন অলিতে-গলিতে। গভীর রাত্রে হানা দিলেন হাঙ্গামাসৃষ্টিকারীদের আড্ডায়। অনুরোধ করলেন এই গোলমাল বন্ধ করতে, নইলে গান্ধীজির জীবন বাঁচানো যাবে না।

প্রাতঃকালে গান্ধীজিকে বলা হ'লো যে, গত রাত্রে কোথায়ও আর কোন গোলমাল হয়নি। কিন্তু গান্ধীজি এতেও আশ্বস্ত হ'লেন না। শরীর তার ক্রমশঃই দুর্ব্বল হয়ে আসছে। বিকেলের দিকে লোহিয়া নিয়ে এলেন কয়েক জন যুবক নেতাকে। তাঁরা এসে আশ্বাস দিলেন গান্ধীজিকে যে, হাঙ্গামা বন্ধ হয়েছে, যারা এই গোলযোগের মূলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে; গান্ধীজির কাছে তারা ক্ষমা চাইছে। এরা গান্ধীজির পায়ের কাছে রাখলেন গোটা তিনেক ষ্টেন গান্‌, কার্টিজ ও রিভলভার। গান্ধীজি সেগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখলেন, তার পর তুলে দিলেন পুলিশ ডেপুটী কমিশনারের হাতে। অনুরোধ করলেন যেন এই সব লোকদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করা না হয়।

রাত্রি আটটার কিছুক্ষণ বাদে গান্ধীজি তাঁর অনশন ভাঙলেন। মোসাম্বীর রস্‌ করে দে'য়া হ'লো গ্লাসে, বাড়িয়ে দিলেন সুরাবর্দী। সমস্ত দরজা-জান্‌লা প্রায় বন্ধ ছিলো, তবু একটুখানি ছিদ্র করে নিয়ে এসোসিয়েটেড প্রেস অফ আমেরিকার ম্যাক্‌স্ ডেস্‌ফর এক ঐতিহাসিক ছবি তুললেন অনশন ভঙ্গের।

এদিকে বাইরের আঙ্গিনায় তখনো পায়চারী করছে ল্যারী এটকিন্‌সন ও শার্প। তাদের সমস্ত মন-প্রাণ গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কোম্পানী কঠোর স্বরে বলে দিয়েছে টেলীগ্রামে যে, কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক না হ'লে চাকুরী যাবে। এটকিন্‌সনের নেশার ঘোর কেটে গিয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে হদিস মিললো নির্ম্মলদার। সমস্ত কথা খুলে বলা হ'লো তাঁকে। পরদিন গান্ধীজির কাছে এঁদের তলব হলো। সমস্ত ঘটনা শুনে গান্ধীজি এঁদের আচ্ছা করে বকে দিলেন। তার পর-এদের-দিলেন

এক ইণ্টারভিউ, তাতে টেলীফোন বিভ্রাটের কাহিনীটা খানিকটা লঘু করে দিলেন।

* * * *

এমনি ভাবে আমাদের দিন কেটেছে গান্ধী-ক্যাম্পে। কখনো উত্তেজনার অবকাশ ঘটেনি, বিরাম পড়েনি কখনো কোলাহলের বা সংবাদের কোন প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। দিনের পর দিন দেখেছি অগণিত জনতার স্রোতরাশির নানা জাতের সংমিশ্রণ। বিভিন্ন মতধারায় গঠিত কিন্তু সবারই মিলন-ক্ষেত্র হয়েছে এই আশ্রম। বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের সংকল্পে এঁরা আসতেন, যাঁদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো তাঁরা দর্শনলাভ পেতেন, বাকীর দল বিদায় নিতেন সেক্রেটারীর কাছ থেকে। তাই দেখেছি নির্মলদার ধৈর্য্যের সীমা; কখনো শুনিনি কঠোর স্বরে কথা বলতে, কখনো তিরস্কার করে কথা বলেননি বা দেখা না দিয়ে কাউকে বিদায় দেননি। স্মিত হাস্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক করে সময় কাটিয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

দর্শনার্থীর দল আসতো রোজই অজস্র। এঁদের মধ্যে কারু-কারু দেখা করার টেকনিক্ ছিলো অভিনব। স্বামীর পশ্চাতে আসতো মেদবহুল স্ত্রী, সঙ্গে থাকতো সিকি, দুয়ানি, আধুলির দল। এঁদের কাছে পয়সা রক্ষাকবচ, 'সিসেমের' দ্বার খোলার মত এঁরা এই রক্ষাকবচের ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন। বাধা পেলে নতুন পন্থার সৃষ্টি হ'তো। সঙ্গে থাকতো ঝকমকানো নতুন মডেলের গাড়ী, নির্জ্জনে আভাষ দিতেন যে গাড়ী মহাত্মাজীর জন্যেই দ্বারে মজুত। দু'-এক বার সুযোগও মিলতো প্রার্থনা-সভায় নিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু এঁরা প্রার্থনা শেষে হাওয়া হয়ে যেতেন গান্ধীজিকে নিয়ে। সর্ব্বদাই চেষ্টা নির্জনে গান্ধীজিকে পাবার, তাঁদের পুঞ্জীভূত দুঃখের কাহিনী উদ্‌ঘাটন করার জন্যে। ব্যবসায়ে লাভের সারাংশ কম, এটাই অবশ্য সমস্ত কথার প্রতিপাদ্য। কখনো বা আসতেন নানা উপঢৌকন নিয়ে। ঘরে ফ্যান বসাবার অছিলায় সস্ত্রীক চলে যেতেন ঘরে। গান্ধী-দর্শনের এই অভিনব 'টেকনিক' সবাইকে বিস্মিত করেছিল, আরো বিচলিত করে তুলেছিল নির্ম্মলদাকে। এঁদের কাছ থেকে বৃদ্ধকে দূরে রাখা ছিলো এক বিরাট সমস্যা। আর এক দল ছিলেন যাঁরা প্রশ্নবাণে গান্ধীজিকে জর্জ্জরিত করে তুলতেন। এঁরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন পত্রের মারফৎ। এঁদের রুচি ছিলো বিবিধ, ভূত-ভবিষ্যৎ থেকে সুরু করে হোমিওপ্যাথীর দাওয়াই নিয়ে এঁরা আলোচনা করতেন।

সাংবাদিকদের প্রতি গান্ধীজির লক্ষ্য ছিল অতি তীক্ষ্ণ। তাঁদের জন্যে প্রতিদিন তৈরী করতেন প্রার্থনা-সভার বক্তৃতা, নিজ হাতে তিনি লিখে দিতেন সেগুলো। প্রার্থনা-শেষে প্রসাদ হিসেবে সেগুলো মিলতো আমাদের। স্পষ্ট মনে আছে, একদিন রাত্রে হঠাৎ ক্যাম্পের বাতি নিবে গেলো, মোমবাতি জ্বালিয়ে আমরা প্রার্থনা-সভার বিবরণ লিখতে সুরু করে দিলাম। এমনি সময়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন গান্ধীজি। মোমবাতি নিবে যাবার ভয়ে ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো। দেখে তিনি বিস্মিত হ'লেন। নির্ম্মলদাকে তিরস্কার করে বললেন দরজা-জানলা খুলে দিতে, নইলে আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হবে এই তাঁর আশংকা। বন্ধ ঘরে থাকা উচিত নয়।

অতি ছোট ঘটনা, তবু গান্ধীজির নজর এড়ায়নি। কখনো ভোলেননি যে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে এক দল কর্ম্মী। তাই এদের সুখ-সুবিধার প্রতি তিনি ছিলেন সজাগ।

* * * *

অলোকানন্দার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় গান্ধী-ক্যাম্পে। আলাপ হওয়াটা অনেকটা দুর্ঘটনাই বলতে হবে। সারা দিনের কাজ শেষ করে এক রাত্রিতে ফিরে আসছিলাম অফিসে, গাড়ীতে 'লিফট্' দিয়েছিলেন পুলিসের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার বিমল সেন।

সারা জীবন চোর-জুয়াচোর ঘেঁটে বিমল বাবুর বাইরের খোলসটা হয়ে গিয়েছিল অতি কর্কশ কিন্তু অন্তরটা ছিলো অতি সরল। তত্ত্বাবধানের ভার দে'য়া হয়েছিলো তাঁকে গান্ধী-ক্যাম্পের। সেই হিসেবেই আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয়েছিলো, সময়ে-অসময়ে বিশেষ করে দিনান্ত-শেষে তিনি ছিলেন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা—তাঁর গাড়ীতে আমাদের ঠাঁই মিলতো। এ ছাড়া গান্ধী-ক্যাম্পে দুর্য্যোগের সময় তিনি সাহস দেখিয়ে যথেষ্ট সুনামও কিনেছিলেন কিন্তু তাঁর চাকুরী-জীবনে এই সুনামই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিমল বাবুর যশ কর্ত্তাদের অহরহ দহন করতো, তাই চাকুরীর জীবনে তিনি উন্নতি লাভ করতে পারেননি। পুলিস সাহেব হওয়া সত্ত্বেও বিমল বাবু ছিলেন অতি সৌখীন। অভিনয়ে দক্ষ ছিলেন; বেমানান দেখালেও তিনি তাঁর বিশাল বপু নিয়ে জাহানারা রিজিয়ার পার্ট করতেন। রাশভারী পুলিশের গলাকে দক্ষতার সঙ্গে তিনি মিহি করে আনতেন, পান খাওয়ায় রপ্ত ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে রাঙ্গা ঠোঁট বানানো মুস্কিল হ'তো না। সেদিন ছিলো বিমল বাবুর ড্রেস রিহার্সাল। সন্ধ্যার একটু পরেই বিমল বাবুর গাড়ীতে রওনা হওয়া গেলো নর্থ ডিষ্ট্রিক্ট ডেপুটী কমিশনারের অফিসে। ওখানেই রিহার্সাল, স্বয়ং তার কর্ত্তা হবেন সাজাহান। বিমল বাবু জাহানারা, পালা জমবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলো না।

দাঙ্গার দরুণ এদিকের রাস্তাও অনেকটা নির্জন হয়ে গিয়েছিলো।

শিয়ালদ'র মোড়ের কাছে এসে হঠাৎ এক নারীকণ্ঠের ধ্বনি শুনতে পেয়ে ড্রাইভার গাড়ী থামালে। অন্ধকারের আলোকে দেখতে পেলাম একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে গাড়ীর পানে। কাছে এসে সহজ ভাবেই জিজ্ঞেস করলে, 'আমায় একটু গাড়ীতে লিফট দিতে পারেন? বড়ো বিপদে পড়েছি।' বিমল বাবুর তখন থিয়েটারের আবেগ এসে গিয়েছে, তাই সেই ভঙ্গীতেই জবাব দিলেন, 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী।'

নারীর আহ্বান চিরকালই জ্যোতিদার প্রাণ ব্যাকুল করে তোলে। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে, কাজেই বিমল বাবুর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সাদর সম্ভাষণ জানালেন মেয়েটিকে। মেয়েটি বিনা দ্বিধায় চলে এলো।

মেয়েদের বয়স অনুমান করা রীতিমতো ক্রসওয়ার্ড পাজল করা, বিশেষ করে রাত্রিবেলা। তবে আন্দাজ করা গেলো বছর কুড়ি-একুশ হবে। চেহারার মধ্যে তার ছাপ ছিলো সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের তবে এতে সৌন্দর্য্যের কোন ভাঁটা পড়েনি। তবে বোঝা যায় যে, তাকে ধরে রাখার কোন চেষ্টা করা হয়নি। মেয়েটির নাম অলোকানন্দা।

অলোকার অকস্মাৎ আগমনে বিমল বাবু একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন। রিহার্সালের সময় তাঁর বয়ে যাচ্ছে, এইক্ষণে হঠাৎ বাধা

পাওয়াতে বিরক্তও বোধ করলেন। কিন্তু তবু আপত্তি করলেন না, অলোকা গাড়ীতে উঠে বসলো।

অলোকার কোন সংকোচের ভাব ছিলো না, তাই অতি অল্প সময়ে সে আসর জমিয়ে নিলে। সে কাজ করে টেলীফোন অফিসে, বিকেলের দিকে তার ডিউটি ছিলো। অফিসে যাবার পথে, শিয়ালদ'র কাছে এসে দেখে সমস্ত ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে দাঙ্গার ভয়ে। বাধ্য হয়ে সে হাঁটা দেয় বাড়ীর পানে। জনমানবশূন্য রাস্তায় হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে ডাকে। অলোকা অনুরোধ করলে তাকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিতে। বিমল বাবু তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন কিন্তু কিছু বলবার আগেই জ্যোতিদা সানন্দে তার সম্মতি দিলে।

আলাপ-প্রসঙ্গে অলোকা দিলো তার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বৈচিত্র্যময় জীবন নয় তবু এতে থ্রিল আছে। কলেজে বি-এ পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়াশুনা ছেড়ে দেয়, বিয়ে করার জন্যে। বাবা ছিলেন জমিদার, অন্ততঃ মুখে তাই ব'লতেন। মেয়ের বিয়েও ঠিক করেছিলেন সুপাত্রের সঙ্গে কিন্তু যখন দেনা-পাওনার রফা হচ্ছিলো তখন গোল বাধলো। 'জমিদার' লেবেলটি দিলো পাত্রপক্ষকে প্রলোভন, দাম হাঁকলো যথেষ্ট। অন্তঃসারশূন্য জমিদারী চাল, পাত্রীর পিতা বুঝতে পারলেন যে এখানে আর এগুনো যাবে না। কিন্তু বাস্তবঃ প্রকাশ করলেন না তাঁর মনোভাব, দম্ভভরে সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিলেন। বিয়ের আশায় ইতি দিয়ে অলোকানন্দা এসে চাকুরীতে ঢুকলো। মা মত দিলেন কিন্তু বাবা তার নারাজ। ভাই তার বেকার কিন্তু বোনের চাকুরী-পেশা তার অপছন্দ। অন্য মেয়ের চাকুরী-জীবন মন্দ নয় কিন্তু নিজের ঘরে সে "কেলেঙ্কারী" টেনে আনতে রাজী নয়। এতে বোন বখে যাবে।

অসংকোচে অলোকা বলতে লাগলো তার জীবন। দু'-মিনিটের পরিচয়ে নিজের গোপনতর রহস্যকে এমন ভাবে উদ্ঘাটন করতে কোন মেয়েকে শুনিনি। মনে হলো এর সঙ্গে যেন বহু দিনের পরিচয়।

ঝাঁঝালো মেয়ে জ্যোতিদা পছন্দ করেন। কাজেই আলাপ বেশ জমে উঠলো। ইতিমধ্যে গাড়ী এসে পৌঁছল নর্থ ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার। থিয়েটারের মহড়া দিতে নেমে গেলেন বিমল বাবু, ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন আমাদের গন্তব্যস্থলে নামিয়ে দিতে। অলোকা নেমে গেলো বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে। যাবার সময় ধন্যবাদ জানালে অশেষ। ছোট একটি নমস্কার দিয়ে বললে, আবার দেখা হবে। জ্যোতিদা, নিজের নামের কার্ডটা বের করে দিয়ে বললেন, আসবেন একদিন গান্ধী-ক্যাম্পে।

অলোকা বলে, 'ওখানে যাবো কি করে? কোন পুণ্যই যে অর্জ্জন করিনি নিজের জীবনে!'

'তাতে কি আছে, বলেন জ্যোতিদা, পুণ্য করার রেওয়াজ ছিল আদম-ইভের আগে। আজকাল ধারা বদলে গেছে। তাই আসতে পারেন স্বচ্ছন্দে।'

* * * *

অলোকার সঙ্গে এর পরে দেখা হয় লেক ময়দানের প্রার্থনা-সভায়, ময়দান লোকে-লোকারণ্য, যাবার কোন পথই ছিলো না! নির্মলদাকে শিখণ্ডী করে কোন রকমে ঢোকা গেলো। প্রার্থনা-সভার কাজ শুরু হ'লো 'রঘুপতি রাঘব' সঙ্গীত দিয়ে। এই গানের পদাবলীর অনেক অদল-বদল হয়েছে। দু'-একটা কলিও সংযুক্ত হয়েছিলো নোয়াখালীতে। হঠাৎ সভার এক প্রান্তে এক গুঞ্জন উঠলো। কৌতূহল টেনে নিয়ে গেলো আমাদের সেই জায়গায়। মধ্যম বয়সীর এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসার চেষ্টা করছেন, তাই আপত্তি উঠেছে। করুণ কণ্ঠে জ্যোতিদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখুন তো, কি অন্যায়! আমি বুড়ো', কানে একটু কম শুনতে পাই। একটু আগে যেয়ে বসতে চেয়েছি, এটা কি অন্যায়?'

গলা-খাঁখারী দিয়ে উঠলো দুটি পাশের লোক। তারা বললে, 'ন্যায়-অন্যায় বহুত দেখেছি স্যর, ও-সব কারসাজী আর দেখাবেন না। একটু সাইলেণ্ট হয়ে বসে থাকুন।'

জ্যোতিদা বুড়োর প্রতি কৃপা করলেন। হাতজোড় করে বললেন, 'দিন না, একটু জায়গা ছেড়ে। বুড়ো মানুষ, একেই তো কষ্ট পাচ্ছে, এক পা এগিয়ে এলে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

পাশের লোকটি বলে, 'তা পেছনে বসলেই বা কি অশুদ্ধ হবে?' শেষ পর্য্যন্ত রাজী হ'লেন জায়গা ছেড়ে দিতে। ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ বাদে আবার সোরগোল উঠলো। এবার দেখতে পাওয়া গেলো ভদ্রলোক তাঁর দুই পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্রকে নিয়ে আসার চেষ্টা করাতে এ নতুন গোলযোগের উৎপত্তি হয়েছে। ভদ্রলোক বলেন, 'নিজের ছেলে দুটোকে কি স্যর আড়ালে রাখতে পারি?' এবারও অনুরোধ রাখা হ'লো। কিন্তু একটু বাদেই আর এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা এগিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। বাধাটা এলো মধ্যম-বয়ীয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে, 'আপনাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই, ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এখানে নিশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই, আর আপনারা চাইছেন আগে আসতে!'

ঠাট্টা করে বলে পাশের ভদ্রলোক, 'নিজের জায়গার বন্দোবস্ত হয়েছে কি না, তাই আস্ফালন দেখানো হচ্ছে।'

ভদ্রলোক চটে যান, 'দেখুন ম'শায়, মুখ সামলে কথা বলবেন।'

বেশ একটু হৈ-চৈ সুরু হলো। ভীড়ের ধাক্কায় ছিটকে প'ড়লাম এক কোণে। হঠাৎ শুনতে পেলাম পাশ থেকে নারীকণ্ঠ। শুনতে পেলাম, আমার নাম ধরে কে ডাকছে। তাকিয়ে দেখি অলোকা।

জিজ্ঞেস করি, 'আপনি এখানে?'

'কেন, আপত্তি আছে? বেলেঘাটার ক্যাম্পে তো যাবার অধিকার নেই, তাই এলাম মহাত্মাজীকে এই ময়দানেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে। আপত্তি আছে।'

একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। অলোকার পাশেই বসে পড়লাম। নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল সভা। এর পরে খোঁজ সুরু করলাম জ্যোতিদার। সন্ধান পেতে দেরী হ'লো না। কিন্তু জীপ গাড়ী নিখোঁজ। জ্যোতিদা অলোকার সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিলেন, আমি গাড়ীর সন্ধানে বেরুলাম। গাড়ী পাওয়া গেলো লেকের এক প্রান্তে। ফিরে এসে দেখি, জ্যোতিদা অলোকার সঙ্গে আলাপে মগ্ন। আমায় দেখে ব'ললেন, 'আরে, এ যে তোমাদের ঢাকার মেয়ে!' আমি কিছু বলার আগে অলোকা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় থাকতেন আপনি? ঢাকার শহরে—উয়ারী, না আরমাণীটোলা?'

হেসে বললাম, 'এ দুটো পাড়া ছাড়াও যে ঢাকায় বসবাস করবার মতো জায়গা ছিলো!' আস্তানা ছিলো গেণ্ডারিয়ায় কিন্তু সময় কাটিয়েছি ঢাকা-হলেই বেশীর ভাগ।'

'ঢাকা-হলে?' অলোকা একটু ঔৎসুক্যের কণ্ঠেই প্রশ্ন করে, 'আপনি অজয় রায়কে চিনতেন?'

'কোন্ অজয় রায় বলুন তো?'

'আজকাল স্কোয়াড্রন লীডার মেহের সিং-এর গ্রুপে আছে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েই যুদ্ধের সময় ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়েছিলো।'

চিনতে দেরী হ'লো না। অজয় আমার বিশেষ বন্ধু ছিলো। ছেলেবেলা বহু দিন কাটিয়েছি একসঙ্গে। কলেজে পিং-পং খেলতাম দিন রাত। প্রতি শুক্রবার কলেজ কামাই করে যেতাম লায়ন সিনেমায় ম্যাটানি বাহাদুরের খেলা দেখতে। বললাম, 'অজয় আমার বিশেষ বন্ধু। ও আজকাল আগ্রায় আছে। আপনার কি দরকার বলুন তো?'

অলোকা বলে, 'আমারও চেনা, তাই জিজ্ঞেস করলুম। আমি আরমাণীটোলা পাড়ার মেয়ে। অজয় জগন্নাথ কলেজে মামার ছাত্র ছিলো, তাতেই আলাপ-পরিচয়।'

অলোকার কথার ভঙ্গীতে মনে হ'লো কি যেন ও চেপে গেলো। আমি আর কথায় জোর দিলাম না। জ্যোতিদা কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

কিছু দিন পরে দিল্লী থেকে ডাক এলো গান্ধীজির। পাঞ্জাব ও দিল্লীতে তখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আগুন জ্বলছে। পাঞ্জাব ছেড়ে আসছে প্রতিদিন হাজার-হাজার হিন্দু নর-নারী। সঙ্গে তারা বয়ে নিয়ে আসছে তাদের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। সেই কাহিনী ইন্ধন যুগিয়েছে দিল্লীর হাঙ্গামায়, প্রতিদিন বহু মুসলমান দিল্লীতে হচ্ছে আশ্রয়হীন। কতো লোক বিসর্জ্জন দিয়েছে প্রাণ।

যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। স্থির হ'লো গান্ধীজি ট্রেণ ধরবেন মাঝ রাস্তা থেকে, আমাদের আয়োজন অবশ্য হ'লো হাওড়া ষ্টেশন থেকেই।

ষ্টেশনে অলোকা এসেছিলো। গাড়ী ছাড়ার তখন বহু বাকী। তাই আলাপ বেশ জমে উঠলো। হঠাৎ অলোকা জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি দিল্লী যাচ্ছেন, অজয়ের সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়?'

অবাক হলাম প্রশ্নটা শুনে, কারণ অজয়ের কথা হঠাৎ উঠবে এ আশা করিনি। তবু নিজের কৌতূহলকে চেপে রেখে জবাব দিলাম, 'হয়তো হতে পারে। কিন্তু ওর দিল্লীর ঠিকানা যে আমার জানা নেই, আপনি জানেন কী?'

'হ্যাঁ, অজয় আছে ওয়াই. এম. সি-তে, জয়সিংহ রোডে। যদি দেখা হয়…।'

অলোকা তার কথা শেষ করলো না। মনে হ'লো যেন কি ও লুকোতে চাইছে। ট্রেণের হুইসেল বেজে উঠলো। অলোকা আমার দিল্লীর ঠিকানা লিখে নিলো।

গাড়ী ছেড়ে দিলো।

* * * * * * * *

ট্রেণে ঘুমবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুম এলো না। মাঝে-মাঝে ষ্টেশনে গাড়ী থামলো, সেই সঙ্গে এলো বিরাট জনতা। রাত্রিবেলা বলে তাদের উৎসাহ দমে যায়নি, তারা এসেছে রীতিমতো প্রসেশন্ করে। বিপুল জয়ধ্বনি ষ্টেশনের নিস্তব্ধতা ভেদ করে তুললো। তারা চাইলে—গান্ধীজির দর্শন কিন্তু মহাত্মাজীর তখন গভীর ঘুম। একটা ষ্টেশনে জ্যোতিদার তৃষ্ণা পেলো, সামনেই ছিলেন ষ্টেশনের এক কর্ম্মচারী। জলের জন্যে ইসারা করতেই নিয়ে এলেন জল, সেই সঙ্গে আনলেন সীতাভোগ, মিহিদানা।

'এ কী করেছেন? আমি মাত্র জল চেয়েছিলাম,'—জ্যোতিদা বলেন।

মৃদু হাসি হেসে বলেন, 'আপনারা গান্ধীজির লোক, আপনাদের জন্যে একটু আয়োজন করেছি, এ আর বেশী কি?'

তার পরেই একটু আড়ালে ডেকে বলেন, 'বাপুজীর সঙ্গে দেখা হবে কি?'

'সে কি করে সম্ভব, উনি যে ঘুমুচ্ছেন?'

'থাক্, থাক্, তাঁকে আর বিরক্ত করে লাভ নেই। আমার ওঁর সঙ্গে আলাপ আছে কি না, তাই দেখা করতে চেয়েছিলুম।'

সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ, চিনতুম বটে এককালে, ছোটবেলায়। বাবা ছিলেন সত্যাগ্রহী, সেই সূত্রেই পরিচয়টা হয়েছিলো। তবে বহু দিনের পুরানো কথা। আর ম'শায়, আজকাল কী কেউ আর সে সব কথার মূল্য দেয়? ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলেছিলুম একদিন এ কথা। সেই শুনে ব্যাটা আমার উপর বড্ডো জেলাস হয়ে আছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে আমার নামে লাগিয়েছে ডি. টি. এসের কাছে। তার ফলে হয়েছে প্রমোশনের জায়গায় ডিমোশান। এই তো আমাদের বাঙ্গালী-চরিত্র! কারু ভালো সইতে পারে না।'

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে গাড়ী ছেড়ে দিল।

* * * *

ট্রেণে ক'লকাতার স্মৃতি আমার মনে পড়তে লাগলো। এ নগরীর সঙ্গে আমার পরিচয় বেশী দিনের নয়, বিশেষ করে সাংবাদিক হিসেবে। শহরের অলি-গলির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কখনোই গাঢ় হয়ে ওঠেনি। তবু এই অল্প পরিচয় আমাকে বেশ মুগ্ধ করেছিলো। বিদেশে বন্ধুদের যখন এ কথা বলেছি, তাঁরা বিদ্রূপ করে বলেছেন, ওটা তোমার হোম সীক্‌নেস। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে ওটা সীক্‌নেসের চাইতে প্রবল, ওটা প্রীতির টান। এই বিরাট মহানগরীতে প্রতিদিন হাজার-হাজার লোক, রোজই তারা আসতো সোদপুরে, বেলেঘাটায়, বা প্রার্থনা-সভায়। তাদের মধ্যে ছিলো আবেগ, ছিলো উচ্ছ্বাস। পুঞ্জীভূত দুঃখকে ভুলবার চেষ্টা করতো তারা ক্ষণিকের জন্যে প্রার্থনা-সভায়।

প্রবাসে অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবেরা বিদ্রূপ করে বলতেন যে, তোমরা, বাঙ্গালীর জাত ইমোশনাল। এটাই হচ্ছে তোমাদের সমস্ত দুঃখের সিক্রেট। তোমরা যেমনি অক্লেশে সমাদরে বরণ করে নাও কোন নতুন চিন্তাধারাকে, তেমনি তাকে বর্জন করতে কুণ্ঠাবোধ করো না। যে কামনাকে পূরণ করতে তোমরা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছো তাকে তোমরা সহজেই অবজ্ঞায় পদদলিত করেছো। তোমরা জিনিষের মূল্য দিতে জানো, কিন্তু যখন পাও, তখন তার মর্য্যাদা দিতে পারো না।

এই বিদ্রূপের প্রতিবাদ কখনো করিনি। বরং বলেছি, এটাই আমাদের গর্ব্ব যে আমরা পাকা জহুরী। গিল্‌টী সোনার পেছনে আমরা কখনো যাই নে। পরে ভেবে দেখেছি যে সমালোচকেরা সত্যি কথাই বলেছেন। আমরা জিনিষের মূল্য দিয়েছি কিন্তু সম্ভবতঃ মর্য্যাদা দিইনি। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইংরাজ প্রথমে এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা আনলেন আমরাই প্রথমে তাকে বরণ করে নিয়েছিলাম। আমরা তখন ইংরাজী শিক্ষাকে নকল করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু হঠাৎ যখন দেশে স্বাদেশিকতার বন্যা এলো তখন আমরা হ্যাট-কোট-টাইকে আগুনে দিয়েছি। ইউনিয়ন জ্যাকের প্রতি আমাদের প্রীতি ও ঘৃণা দুই-ই সমান ছিলো বলতে হবে। এর পরে দেখেছি দেশনেতাদের অভ্যুদয়। সেকালে স্বদেশীটা আমাদের একচেটিয়া ছিলো, যেমনি ছিলো সরকারী চাকুরী পাওয়াটা। কিন্তু এর পরে দলের নেতা হলেন অবাঙ্গালী। আমাদের মন বিগড়ে গেল। যে প্রতিষ্ঠানকে আমরা নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলাম, তাকে চাইলাম ভেঙ্গে ফেলতে। কেন হ'লো? বহু দিন ভেবে দেখেছি এই প্রশ্নটা কিন্তু এর সমাধান মেলেনি। আমার মনে হয়েছে যে আমাদের পরকে তাড়াতাড়ি আপন করে নিয়ে ভালোবাসার ক্ষমতা যেমনি, তেমনি আবার ঘৃণা করার শক্তিও প্রবল। আমাদের উন্নতির এটাই হয়েছে সব চাইতে বড়ো প্রতিবন্ধক। ক'লকাতায় গান্ধী-ক্যাম্পে এতো উচ্ছ্বাস-আবেগের মধ্যে যেন দেখতে পেয়েছি অসংখ্য নর-নারীর মধ্যে কিসের অভাব। মাঝে-মাঝে সেই অভাব দেখা দিয়েছে অসংকীর্ণ মনোভাবের রূপে। তাই মনে হয়েছে, এই জাতির মধ্যে প্রাণের অভাব, এরা পারে না বিলিয়ে দিতে বা ভালোবাসতে। বাংলার বাইরে আমাদের এই দৈন্যতাই দেখা দিয়েছে প্রাদেশিকতার রূপ নিয়ে। এর কারণ ভেবে দেখবার চেষ্টা করেছি কিন্তু যাচাই করতে পারিনি, শুধু মনে হয়েছে যে এটা ইনফিরিয়রিটিরই অন্য রূপ।

গান্ধী-ক্যাম্পে আমাদের এই দৈন্যতা বেশ চোখে পড়লো। আমাদের গান্ধী-প্রীতি অনেকটা জোয়ার-ভাঁটার মতো চলেছে। তাঁর প্রতি আমাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে ক্ষণে-ক্ষণে। যেদিন প্রথম বেলেঘাটায় এলাম, সেদিন ক্যাম্পে দেখতে পেলাম উচ্ছৃঙ্খল জনতা, কিন্তু অবাক হ'লাম পরদিন যখন এঁদের দেখতে পেলাম স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। কিন্তু যেদিন গভীর রাত্রে এসে ক্যাম্পে হানা দিয়ে লোক হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করেছিল, সেদিন ততোটা বিস্মিত হয়নি। [ক্রমশঃ।

অপব্যয়ী সিজার

ইতিহাসখ্যাত সম্রাট্ সিজার অপব্যয় ক'রেছিলেন এক শত সাতচল্লিশ কোটি টাকা। সম্রাট্ হওয়ার পূর্ব্বে সিজারের দেনা ছিল প্রায় তিন কোটি টাকা।

একটি চাষীর মেয়ে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

এখন বসন্তকাল।

বসন্ত রোগের কালও বটে। কিন্তু গোড়াতেই সে কথা তুলতে গেলে কেউ হয় তো বলবে, এটা তোমার চাষাড়ে রসিকতা।

খাঁটি বসন্ত এদেশে কটা দিনের ব্যাপার, শীত গ্রীষ্মের কটা দিনের সমতা ফুরোলেই রাতদিনের গরমকালীন ভাগটা হু-হু করে বেড়ে চলে, সে হিসাব করবার জন্তও আবহাওয়া বিভাগ আছে।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। শুক্লপক্ষের শেষের দিক। রাত্রিশেষে ম্লান তারার আবছা আলোয় মাঠে-ঘাটে হাঁটতে গেলে শীতের শিশিরেই পা ভিজে যায়। দক্ষিণ ঘেঁষা স্নিগ্ধ হাওয়ায় সর্বাঙ্গ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কাঁচা-মিঠে মেয়ের মতই লাগে সেকেলে এই পুরানো পৃথিবীটা। নিরানন্দের হিংস্র সাপগুলি ফুসলে ফুসলে ছুবলে ছুবলে চলেছে সন্ত্রস্ত অধ্যবসায়ে, তবু যেন মাটির পৃথিবী প্রাণের রসে পুলকময়ী।

কেবল সাপের মতনেরা নয়, এমনি সাপও অবশ্য ফোঁস করে উঠে মানুষকে ছোবল দেয় এখানে-ওখানে। সত্যিকারের বিষাক্ত সাপ।

কামড়ানো কোন ক্ষেত্রেই সাপের অপরাধ নয়। হিংস্র কথাটা সাপের কোন অপবাদ নয়, নিছক সংজ্ঞা মাত্র। তবু যদি গায়ের জোরে নিরীহ অহিংস মানুষকে কামড়ানো সাপের দোষ ধরা হয়, গোবিন্দের বেলা সাপটার দোষ ছিল না মোটেই। বিষধর কিন্তু বাস্তু সাপ। পোষা সাপের সামিল। অদ্বৈতের বাড়ীর লোকেরা সাপটা দেখলে দাঁড়িয়ে যায়, সেও নির্ভয়ে চলে যায় সামনে দিয়ে। পূজা পায়, দুধ-কলা পায়। গায়ের এক ইঞ্চির মধ্যে মানুষের পা পড়লেও কামড়ে দেবার সাপ সে নয়।

বাঁধানো সরকারী সড়কটার ধারেই অদ্বৈতের ঘর। পাশের গাঁয়ের গোবিন্দ সাপটার শৈশব থেকে এই পথ দিয়ে কতবার যাতায়াত করেছে ঠিক নেই, গত দু'বছর ছুটির দিন ছাড়া রোজ নিয়মিতভাবে দু'বার যায়-আসে—ভোর রাত্রে যায় আর বিকালে বা সন্ধ্যাকালে ফেরে। সাপটা কয়েকবার তার নজরেও পড়েছে।

সেদিন অল্প কুয়াশা ভরা আবছা ভোরে সাপটা রাস্তায় একটা ব্যাঙ ধরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কোনদিকে না তাকিয়ে জোরে জোরে ষ্টেশনের দিকে যেতে যেতে গোবিন্দ তার লেজটা মাড়িয়ে দিল।

ভোরের দিকে এ সময় ব্যাঙেরা এপাশ ওপাশ থেকে একে-দুয়ে রাস্তা পেরিয়ে গর্তে ফেরে। সাপটাও আসে ব্যাঙ ধরতে।

কত দিন হয় তো তার কাছ দিয়ে কোনদিন হয় তো বা তাকে ডিঙিয়ে গোবিন্দ নিরাপদে চলে গেছে। আশ্চর্য্য কি?

আজ লেজে পা পড়ার সেই পায়েই সে ছোবল বসিয়ে দেয়।

দাঁত বসিয়ে মাথা একটু বাঁকিয়ে তবে বিষ ঢেলে দেওয়া—মুহূর্তের ব্যাপার। তারই মধ্যে গোবিন্দের সর্বাঙ্গে অদ্ভুত একটা শিহরণ বয়ে যায়।

রেবতী গিয়েছিল ঝোপঝাড় ঘেরা ডোবার ঘাটে। গোবিন্দের চীৎকার শুনে সে-ই সবার আগে ছুটে এসে ছাখে, মাথাটা থেঁতো হয়ে তাদের বাস্তু সাপটা রাস্তায় ছটফট করছে আর হাফপ্যান্ট পরা মানুষটা দু'হাতে হাঁটুর ওপরে পা'টা চেপে ধরে রেখে চেঁচাচ্ছে।

: কামড়ে দিয়েছে?

গোবিন্দ বলে, কামড়েছে। চট করে তোমার কাপড়ের পাড়টা ছিঁড়ে দাও।

: পাড়? নতুন কাপড় যে? ছুটে দড়ি এনে দিচ্ছি।

সে দৌড়তে যাবে, ফস করে গোবিন্দ তার আঁচল ধরে টেনে নিয়ে ফড় ফড় করে শাড়ীর একদিকের পাড় অনেকটা ছিঁড়ে ফেলে। টানের চোটে রেবতীকে পাক দিয়ে ঘুরে অতটা কাপড় ছেড়ে দিয়ে খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়তে হয়।

সে রেগে বলে, কাপড় টেনো না, আমি ছিঁড়ে দিচ্ছি!

যতটা ছিঁড়ে ফেলেছিল তাই দিয়ে গোবিন্দ হাঁটুর উপরে শক্ত করে পাড়ের বাঁধন দিতে আরম্ভ করলে, শাড়ীর পাড়-ছেঁড়া অংশটা গায়ে জড়িয়ে পাড়ের বাকীটা রেবতী নিজেই ছিঁড়ে দেয়।

গোবিন্দ যতদূর সম্ভব আঁট করে বাঁধন দেয়।

ততক্ষণে আরও মানুষ এসে জমতে আরম্ভ করেছে।

তারপর গোবিন্দ সার্টের পকেট থেকে ছুরি বার করে দংশনের যায়গাটা গভীর করে চিরে দেয়।

একজন প্রশ্ন করে, কি করে কামড়াল?

অদ্বৈত বলে, এ সাপ তো যেচে কামড়ায় না।

গোবিন্দ জবাব দেয়, লেজে পা পড়েছিল।

অদ্বৈত যেন হাঁফ ছেড়ে বলে, তবে? রাস্তা দেখে চলবে না, লেজে পা দেবে, সাপের কি দোষ?

গোবিন্দ বলে, দোষের কথা হচ্ছে না দাদা। একটা গাড়ী-টাড়ী আনো? নয়তো মাচা-টাচা করে হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা কর সবাই? এ সাপের বিষ ভারি চড়া—দেখতে দেখতে পা-টা কি হয়ে যাচ্ছে দেখছ তো? হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে থেকো না, চটপট একটা ব্যবস্থা করে ফেল।

কুঞ্জ বলে, নকুলকে ডাকব না?

গোবিন্দ বলে, নকুল ওঝা-টোঝার কম্ম নয়। হাসপাতালে নিয়ে চল চটপট।

কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

তখনো ভাল করে ফর্সা হয়নি। তবে গোটা দুই লণ্ঠন এসে গিয়েছিল।

গোবিন্দের যন্ত্রণায় বিকৃত মুখের দিকে রেবতী পলকহীন চোখে চেয়ে মুখ বাঁকিয়ে কি যেন ভাবে। সিক্তবসনা তার দিকে কে তাকাচ্ছে না তাকাচ্ছে এটা তার খেয়ালও থাকে না। আত্মভোলা হয়ে এতগুলি পুরুষের প্রায় গা ঘেঁষে সে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে এটা এই অবস্থাতেও অনেকের বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে।

একটা মানুষকে সত্ত সত্ত ভয়ানক বিষাক্ত সাপ কামড়েছে, হয় তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মানুষটা মরে যাবে তবু অল্পক্ষণের জন্ত লজ্জা-সরম ভুলবার অধিকারও রেবতীর নেই।

বড় ভাই মধু কড়া সুরে বলে, ঘরে যা না?

রেবতী আনমনে বলে, যাই।

কিন্তু সে নড়ে না।

গোবিন্দের ক্ষতস্থানে লতা-পাতার ও গুণযুক্ত দ্রব্যাদি দেওয়া সুরু হয়েছিল কিন্তু কয়েক জন হাজির হবার পরেই। গোবিন্দ আপত্তি করেনি।

তাকে হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থাও হচ্ছিল। মথুর গাড়ী জুততে গেছে, এসে পড়ল বলে।

অদ্বৈত মেয়েকে ধমক দিয়ে বলে, ঘরে যা না হারামজাদি, কাপড় ছাড় না গিয়ে ?

একটু তফাতে কয়েকটি মেয়ে বৌ জড়ো হয়েছিল, তার মধ্য থেকে চারুর তীক্ষ্ণ গলার ঝাঁঝালো ধমক আসে, বুতি! এদিকে আয় মুখপুড়ী মেয়ে।

রেবতীও তীক্ষ্ণ গলা চড়িয়ে বলে, যাচ্ছি গো যাচ্ছি। একটা মানুষের মরণ-দশা, তোমরা যেন কেমন কর!

বলে পাগলী মেয়ে করে কি, হাঁটু পেতে বসে আঁচল দিয়ে গোবিন্দের ক্ষতস্থানের ছেঁচা লতা-পাতা বিষ-চোষা পাথর আর রক্ত আঁচল দিয়ে মুছে সেইখানে মুখ দিতে যায়।

গোবিন্দ ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থাতেই সে রেবতীর মাথাটা হাত দিয়ে ঠেলে রেখে একটু জড়ানো সুরে বলে, করছ কি ?

রেবতী অধীর হয়ে বলে, আঃ, হাত সরাও না। বিষটা চুষে নেব। আমার মুখে ঘা-টা কিছু নেই।

এই কথাই এতক্ষণ ভাবছিল রেবতী।

বছর দেড়েক আগে তার মামা-মামী এসেছিল কয়েকদিনের জন্য। তারা নতুন লোক, বাস্তু সাপ নিয়ে ঘর করার অভ্যাস ছিল না। মামাকে কামড়ে দিয়েছিল এই সাপটাই।

রেবতীর মনে আছে, নানা রকম টোটকা ব্যবস্থা সুরু হবার আগেই মামী কামড়ানোর যায়গায় মুখ লাগিয়ে চুষে-চুষে বিষ আর রক্ত থুথু করে ফেলে দিয়েছিল অনেকক্ষণ ধরে।

মামা নাকি বেঁচে গিয়েছিল মামীর জন্যই।

এ লোকটা তার কেউ নয়। কিন্তু যোয়ান একটা মানুষ তো ? তাদের ঘরের সাপটা একে কামড়েছে তো ?

তার কি উচিত নয় বিষটা চুষে বার করে ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করা ?

দাঁতগুলি ভাল ছিল না মামীর, মাড়ি ফুলে ব্যথা হত। বিষ চুষে বার করে স্বামীর প্রাণটা বাঁচিয়ে দিলেও মামীর মুখ ফুলে হয়ে গিয়েছিল ঢোল।

বেশ কিছুকাল সে কি যন্ত্রণাভোগ!

ডাক্তার বলেছিল, যার মুখে ঘা নেই, দাঁত ভাল, তারই শুধু সাপের বিষ চুষে বার করা সাজে।

কথা বলতেও দারুণ কষ্ট হত, তবু মামী কোন রকমে বলেছিল, আর কে মুখ দিয়ে বিষ টানবে ?

ডাক্তার সহানুভূতির সঙ্গে সায় দিয়ে মাথা হেলিয়েছিল।

সত্যই তো। আর কিছু নয়, সাপের বিষ। কৈকেয়ী যে দশরথের ক্ষত থেকে পুঁজ-রক্ত চুষে বর লাভ করেছিল, তার চেয়েও ঢের বেশী কঠিন কাজ। বৌ ছাড়া কে এগিয়ে যাবে ?

বৌ টেনে বার করে স্বামীর গায়ের বিষ।

ভিন্ গাঁয়ের এ মানুষটা তার অজানা অচেনা, মাঝে মাঝে সড়ক দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছে এই মাত্র।

তাই যত তাড়াতাড়ি বিষ টেনে নেওয়া যায় ততই যে ভাল সেটা জানা থাকলেও এতক্ষণ তার একটু লজ্জা করছিল, দ্বিধা বোধ করছিল। নইলে হয় তো তার নতুন শাড়ীটার পাড় ছিঁড়ে পা বেঁধে গোবিন্দ যায়গাটা চিরে দেওয়া মাত্র সে ক্ষতের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিত।

সকলে থ' বনে চেয়ে থাকে।

অঘোর কটমট করে চেয়ে থাকে, কুঞ্জের দৃষ্টি দেখে মনে হয় সে বুঝি বোনটাকে ভস্ম করে ফেলবার চেষ্টা করছে।

রাজুর গলা চিরে তীক্ষ্ণ ডাক বার হয়, বুতি! বজ্জাত নচ্ছার মেয়ে, ইদিক এলি ?

কিন্তু রেবতী তখন কালা হয়ে গেছে।

মানুষটাকে সে বাঁচাবেই।

যে যাই বলুক আর যত শাসনই তার কপালে জুটুক।

কোনদিকে না তাকিয়ে ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে সে প্রাণপণে রক্ত চুষে নিয়ে থুতু থুতু করে ফেলে দিতে থাকে। রক্তের সঙ্গে যে বিষও আসছে সেটা সে টের পায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

মুখের মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে জ্বালা বাড়তে থাকে।

কতক্ষণ সে তার দুঃসাহসী চিকিৎসা চালিয়ে যেত বলা যায় না, খানিক পরে রাজু এসে হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেলে চিকিৎসা বন্ধ হয়।

বার বার থুতু ফেলতে ফেলতে রেবতী বলে, মুখ জ্বালা করছে, ধুয়ে আসি, ছাড়ো।

ভায়ের বৌয়ের ফোলা মুখের কথা রাজুর স্মরণ ছিল, সে মেয়ের হাত ছেড়ে দেয়।

রেবতী ছুটে যায় ডোবার ঘাটে।

বার বার কুলকুচো করে মুখ ধোয় কিন্তু জ্বালা যেন না কমে বেড়েই চলে।

ঢোঁক গিলতে রেবতী সাহস পায় না। বিষ যদি পেটে চলে যায়! সে নিজেই যদি মরে যায়!

সেইখানে ডোবার ঘাটে তার কাছে হাজির হয় অর্জুন। তার এক হাতে ঘটিভরা লাল টকটকে জল, অন্য হাতে কাগজে মোড়া লাল ওষুধের দানা।

বলে, সাদা জলে নয়, এই জলে কুলকুচো কর। কি কাণ্ড যে তুই করিস!

এ ওষুধটা রেবতীও জানে। সাপে কামড়ালে চেরার মধ্যে এই দানা গুঁজে দিতে হয়।

সে জিজ্ঞাসা করে, ওকে দিয়েছো, যাকে কামড়েছে ?

: দিয়েছি। কটা দানা মুখে ফেলে ঘটির জল দিয়ে কুলকুচো কর।

অর্জুন প্রতিবেশী। যোয়ান বয়েসী চাষী। গোড়ায় সে হাজির ছিল না, পরে খবর পেয়ে যখন সে আসে রেবতী তখন গোবিন্দের ক্ষতের বিষ চুষে নিচ্ছিল।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ব্যাপার বুঝেই সে ছুটে গিয়েছিল পরেশ সাহার বাড়ী থেকে পারমাঙ্গানেট আনতে।

কুলকুচো করার ফাঁকে ফাঁকে রেবতী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, মোর দাঁত ভাল, মুখে ঘা নেই—মুখ ফুলবে না তো ?

অর্জুন তাকে অভয় দেবার বদলে কড়া সুরে বলে, কে জানে ফুলবে কি না! জাতসাপের বিষ সোজা জিনিষ? এত লোক থাকতে তোর বাহাদুরি করতে যাওয়া কেন? ঢং শিখেছিস, না?

: ঢং! ঢং আবার কিসের? ছিল তো সবাই, কেউ এগুলো না কেন? মানুষটা মিছিমিছি মরবে নাকি!

: বড় যে দরদ দেখছি মানুষটার জন্য! খাতিরের লোক বুঝি, অ্যাঁ?

ওষুধের লাল জল খানিকটা প্রায় গিলে ফেলেছিল রেবতী, বিষম লাগায় রেহাই পায়।

সামলে উঠে চোখ পাকিয়ে অর্জুনের দিকে চেয়ে বলে, কি বলছ ছ্যাঁচরার মত? লোকটাকে চিনি? জন্মোবয়সে কথা কয়েছি কোনদিন? খাতিরের মানুষ না তোমার শাউরীর ইয়ে!

সামান্য কথায়, বাহাদুরি করে নিজেকে বিপদে ফেলতে যাওয়ার জন্য স্নেহের ভর্ৎসনায়, রেবতীকে এরকম চটে যেতে দেখে অর্জুন সত্যই ভড়কে যায়। সুর পাল্টে বলে, তা বলছি নাকি? মেয়েছেলে, কি তোর দরকার ছিল ঝন্‌ঝাট করার? সোনারপুরের বিষ্টু মহাজনের ছেলেটাকে জাতসাপে কামড়ালো, বুড়ো ঢোলন ওঝাকে ডাকলে, ডাক্তার ডাকলে, কবরেজ ডাকলে। ঢোলন নিকটে থাকে, আগে এসে তুকতাক সুরু করে দিলে। ছুবলে ছিল বাঁ হাতের কব্জিতে, ঢোলন বাঁধন এঁটেছিল শক্ত, কিন্তু কনুয়ের ওপরে আঁটেনি। শশধর ডাক্তার এসে বললে, ছি ছি, ওখানে বাঁধলে কি হয়? কনুয়ের ওপরে বাঁধন দিতে হয়। বলে একটা শক্ত মোটা রবাটের দড়ি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে টেনে লম্বা করে কনুয়ের ওপর পেঁচিয়ে এঁটে দিলে। সত্যি সে কি বজ্র আঁটুনি বাবা, মাংসের মধ্যে ডেবে গিয়ে যেন সেঁটে রইল রবাটের দড়িটা।

: তুমি দেখেছ?

: দেখেছি বৈ কি। দায়ে ঠেকে সোনারপুর মামাবাড়ী গেছলাম, মনে নাই তোর? রতন কাকা যেবার জেলে গেল?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে।

রাগ কমিয়ে রেবতীকে খুসী করার জন্যই যেন রসিয়ে বাড়িয়ে কাহিনীটা শোনায় অর্জুন, রেবতীকে একটু ভড়কে দেওয়াই যদিও তার আসল উদ্দেশ্য।

: তারপর পৌঁছল দীনু কবরেজের ছেলে সূর্য্যো সেন শর্মা—যায় ওই দন্তরুচি কৌমুদী দাঁতের মাজনটা ইষ্টিসনে গাঁয়ে গাঁয়ে খুব ফিরি হচ্ছে। দাঁত মেজে দেখেছি এক আনায় প্যাকেট কিনে, ওই নুন কপ্পুর আর নিমের আরকের ব্যাপার। কোনটাতে—

রেবতী অধীর হয়ে বলে, সাপের কামড়ের কথাটাই বলো না? বিষ্টু মহাজনের ছেলেটো তো মরেনি?

তার অধীরতায় খুসী হয়ে অর্জুন বলে যায়, ছেলেটা মরল কৈ? মরল তো ঢোলন ওঝা।

বলে সে যেন নিজের মনে কি ভাবতে থাকে। আরও অধীর হয়ে রেবতী বলে, তারপর কি হল বল না?

আরও খুসী হয়ে অর্জুন বলে, সে হল মজার ব্যাপার। শশধর ডাক্তার সূয্যো কবরেজ ঢোলন ওঝা তিন জনে হাজির হয়ে ঝগড়া জুড়েছে দেখে বিষ্টু মহাজন কেঁদে ফেললে। বললে, ভগবান, কে আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারে তা তো জানিনে। এখন আমি করি কি!

রেবতী মুখের রাঙা জল ফেলে দিয়ে একটা ঢোঁক গিলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

কবিগান গাওয়া চাষা ছাড়া এমন ভাবে কি কেউ বর্ণনা করতে পারে সাধারণ একটা ঘটনা? তারপর কি হল জানবার জন্য রেবতী যেন নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলে যায়!

অর্জুন কোঁচার খুঁটে নাক ঝেড়ে বলে, কেঁদে উঠেই বিষ্টু মহাজন করলে কি জান? ব্যাটা কঞ্জুসের কঞ্জুস, ছেলেটাকে পেট ভরে মাছ দুধ খেতে পর্য্যন্ত দিত না। উঠে গিয়ে সিন্দুক খুলে হাজার টাকার একতাড়া নোট এনে ছেলের মাথার কাছে রেখে বললে, যে ওকে বাঁচাবে এ হাজার টাকা তার। তিন জনাই হাত বাড়িয়েছিল, ঢোলন খপ করে আগে তোড়াটা কোমরে গুঁজে ফেললে। বললে কি জানো? হয় তোমার ছেলে বাঁচবে, নয় আমি মরবো।— বলে সে দাঁত দিয়ে কামড়ে খানিকটা মাংস তুলে নিলে যেখানটায় সাপে ছুবলেছিল। তারপর সেখানে মুখ দিয়ে চুষে-চুষে রক্ত টেনে বার করতে লাগল। দু'-তিন জন সাগরেদ সাথে থাকত ঢোলনের। তাদের কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে চোলাই খায় আর বিষ চুষে তোলে।

রেবতীর ঔৎসুক্য যেন হঠাৎ একেবারে ঝিমিয়ে যায়। আর যেন কিছুই তার শুনবার বা জানবার প্রয়োজন নেই।

সে বুঝে গিয়েছে ঢোলন ওঝার চোলাই খেতে-খেতে সাপের বিষ চুষে তোলার ব্যাপারটা। কতটা বিষ চুষে তুলে থুথু করে ফেলে না দিয়ে গিলে ফেলছিল, সেটা কি তার খেয়াল ছিল মদ খেতে সুরু করে। মদ সহজ বিষ নয় সাপের বিষের চেয়ে। কোন বিষ কতটা গিলছে কি খেয়াল ছিল ঢোলনের।

২

আন্দাজ নয়। ডাক্তারের কথা।

রেবতীর জন্যই গোবিন্দ এ যাত্রা বেঁচে গেল। আর অর্জুনের জন্য অনেক কম হল রেবতীর চড়া সাপের বিষ মুখে নেবার দুর্ভোগ। হাসপাতালের সরকারী ডাক্তারের নাম সুনীল, প্রৌঢ় বয়স।

তার কাছে জানা গেল, পায়ে সাপে কাটলে হাঁটুর উপর বাঁধন দিতে হয় এটুকু গোবিন্দ জানত কিন্তু বাঁধবার কায়দা জানত না। রেবতীর নতুন শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে বাঁধন দিলেও খুব বেশী কাজ তাতে হয়নি। গায়ের জোরে পাড় পেঁচিয়ে বাঁধলেও ও-রকম সাদাসিদে বাঁধনে কি আর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়।

একটু যান্ত্রিক ব্যবস্থাও দরকার। লাঠি ইত্যাদি একটা কিছু যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। বাঁধনের মধ্যে ঢুকিয়ে যতটা সম্ভব পাক দিয়ে আরও শক্ত করতে হয় বাঁধন!

সব শুনে সুনীল ডাক্তার রায় দিয়েছিল স্পষ্ট। রেবতী ও-ভাবে বিষ চুষে না নিলে গোবিন্দের কপালে ছিল নির্ঘাৎ মরণ।

ফোলা মুখের জ্বালা-যন্ত্রণায় কাতর রেবতী কুঞ্জ আর অর্জুনের সঙ্গে হাসপাতালে হাজির হলে সুনীল কিন্তু তাকে বসিয়ে রাখে তিন ঘণ্টা!

অর্জুন বুক ঠুকে একটু চালাকি করে ডাক্তারের ঘরে ঢুকে

পড়েছিল। হাত জোড় করে সবিনয়ে জানিয়েছিল যে সেদিনের সাপে-কাটা মানুষটাকে প্রাণদান করেছিল যে মেয়েটি, ডাক্তারবাবু যার খুব প্রশংসা করেছিলেন, সেই মেয়েটি এসেছে। ওই সাপের বিষের ক্রিয়াতেই বড় কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটি।

তড়বড় করে কথাগুলি বলে যায় অর্জুন। বলতে বলতে সুনীলের ধমক খেয়ে বেরিয়ে আসে।

সুনীল ধমকে বলে, খুব ভোরে এসে আগে নাম লেখাতে পারেনি!

কুঞ্জ বলে, শোনেনি তোমার কথা, বোঝেনি তুমি কি বলছ। ভারি ব্যস্ত 'তো। নইলে সেদিন অমন করে বুতির গুণ গাইলেন, বললেন কি এরকম মেয়েকে সরকারী পুরস্কার দেওয়া উচিত, মিটিং করে সম্মান দেওয়া উচিত। সেই মেয়েটা হাসপাতালে এসেছে শুনেও কি এরকম করতে পারেন? রোগীর কি ভিড় দেখছ তো। তোমার কথা শুনতেই পাননি।

তাই হবে।

সাতটার আগে এসেছিল, দশটার পর রেবতী ডাক্তার বাবুর কাছে যাবার হুকুম পায়। অর্জুন আরেক বার এই অল্পবয়সী বিশেষ রোগিণীটির বিশেষ কাহিনী বিশদভাবে বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে চুপ করে যায়।

রেবতীর মুখটা ও-রকম বিকৃত হয়ে না থাকলে কি ঘটত অবশ্য বলা যায় না।

সুনীল প্রশ্ন করে, তুমি ওর কে হও?

: আজ্ঞে, আমি কেউ হই না।

সুনীল কুঞ্জকে প্রায় ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করে, তুমি?

: আজ্ঞে, আমি ওর বড় ভাই।

: তোমার বাপের সিফিলিস ছিল?

: আজ্ঞে না।

: কি করে জানলে ছিল না?

: সিফিলিস কি রোগ জানতে না পারলে বলতে পারছি না ডাক্তারবাবু। বাবার বাতের ব্যামো আছে।

সুনীল কটমট করে তাকায়। একটা ছাপানো ফর্মে ফস-ফস করে একটা প্রেসক্রিপ্‌সন লিখে দেয়। লাল-নীল পেন্সিলের লাল দিক দিয়ে ফর্মের উপরে লিখে দেয় 'রক্তপরীক্ষা খুব জরুরী। সিফিলিসগত বিষ হওয়াই সম্ভব।'

চোখ পাকিয়ে কুঞ্জকে বলে, কলকাতায় ব্লাড পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আসবে। এমনি একটা ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি—তিনবার করে খাবে।

অর্জুন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, কি বলছেন ডাক্তারবাবু? সাপের বিষে মেয়েটার মুখ ফুলেছে—

সুনীল উদারভাবে হেসে বলে, আমায় হাঁদা পেয়েছিস বাবা? মুখের মধ্যে সাপের বিষ! সাপটা কামড়েছিল কোথা?

: আজ্ঞে, ওই যে সেদিন একজন সাপে-কাটা লোককে দেখলেন —অর্জুন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে যেতেই সুনীল তাদের ধমক দিয়ে খেদিয়ে দেয়।

গোবিন্দের কথা তার মনে নেই। তাকে বাঁচাবার জন্য চাষীর ঘরের অজানা একটি মেয়েকে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল তাও সে ভুলে গেছে।

গরীব-মহলে হাসপাতালটার এ বদনাম আছে। মাঝে মাঝে অতি আশ্চর্য্যজনক ভাবে এক রোগে মর-মর রোগী আরেক রোগের ইনফেক্‌সন লাভ করে বসে।

অর্জুনের অনেক দায়।

দায় সামলাতে হিমসিম খেয়ে যায়।

তবু সে গাঁটের পয়সা খরচ করে গঙ্গাধর ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে রেবতীকে খেতে দেয়।

সত্যই সে ওষুধে আশ্চর্য্য ফল দেখা যায়।

কত চালাক হয়ে উঠেছে যোয়ান চাষা অর্জুন!

গঙ্গাধর ডাক্তারের কাছে সে রেবতীর নাম পর্য্যন্ত বলে না।

সাপের নামও না।

ভক্তি সহকারে প্রণাম করে জানায় যে বিষম তেজী বিষে রক্ত বিগড়ে গেছে একজনার, একটা ব্যবস্থা দিতে হবে।

কল্কেতে তামাক প্রায় নেই বললেই চলে। তবু খানিকক্ষণ হুঁকোটা টেনে গঙ্গাধর বলে, হবে না? যা দিনকাল। খালি কুসংসর্গ, খালি কুসংসর্গ, রক্ত বিগড়ে যাবে না? গোপন রোগ ছাড়া যেন রোগ নেই দেশে। বায়োস্কোপ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে গোপন পাপের ব্যারাম নিয়ে। হুঁকোটা গঙ্গাধর নামিয়ে রাখে প্রায় দেড়শো বছরের পুরানো একটা দোতলা গর্তকাটা পিঁড়ির কোণার দিকের একটা গর্তে।

কাঠের এই দেড়শো বছরের পুরানো বিশেষ কাঠের ধারকটিতে আজও আট রকমের হুঁকো বসানো যায়।

হুঁকোর রকমারি শেষ হয়ে গেছে, টিঁকে আছে পুরানো হুঁকো বসাবার ব্যবস্থাটার জের।

: বিড়ি আছে?

: সিগ্রেট খান।

অর্জুন এক প্যাকেট সস্তা দামের সিগারেট বাড়িয়ে দেয়। সবাই জানে যে সিগারেটের প্যাকেট পেলে গঙ্গাধর ভারি খুসী হয়।

গঙ্গাধরের ওষুধ খেয়ে আর ওষুধ-গলানো জলে কুলকুচো করে কয়েক দিনের মধ্যেই রেবতীর সমস্ত উপসর্গ দূর হয়।

রেবতীর কৃতজ্ঞতা জানাবার রকমটা অর্জুনের বড়ই খাপছাড়া মনে হয়।

রেবতী সোৎসাহে বলে, তাকেও দিয়ে এসো না ওষুধটা? পা'টা চটপট সেরে যাবে?

: ওর পা ভাল হয়ে গেছে। ওর বেলা তো আর পাগলামি করেনি ডাক্তার, ঠিক ওষুধ দিয়েছিল।

রেবতীকে ক্ষুণ্ণ মনে হয়।

গোবিন্দের পা ভাল হয়ে গেছে শুনে সে যেন খুসী হয়নি!

বলে, কি রকম লোক বাবা! একবারটি খবর নিতে এল না?

অর্জুন মুখ বাঁকিয়ে বলে, কারখানার কুলি তো, আর কত হবে?

কথাটা বিশ্রী দাঁড়ায় বৈ কি।

অমন করে প্রাণে বাঁচিয়ে দিল আর তার কি হল একবার খবর নেবার গরজ হল না মানুষটার? এমন অকৃতজ্ঞ গোবিন্দ? এমন ছোটলোক?

রেবতীর মনটা জ্বালা করবে আশ্চর্য্য কি !

আসলে কিন্তু খবর নিতে গোবিন্দ কসুর করেনি। তবে রেবতীর সেটা জানা ছিল না।

গোবিন্দ খবর নিয়েছে অঘোর আর কুঞ্জর কাছে, অন্তরের সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছে। চিরদিনের জন্য সে ঋণী হয়ে রইল তাদের কাছে, রেবতীর কাছে। শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, চূড়ান্ত প্রশংসা। রেবতীর মত মেয়ে নাকি লাখে একটা হয় না।

অঘোর বা কুঞ্জ খুশী হয়নি, ভাল ভাবে কথা বলেনি গোবিন্দের সঙ্গে। রেবতীর খাপছাড়া কাণ্ডে মনে তাদের অসন্তোষই জমা হয়েছিল। ভয় ছিল যে কে জানে কিসের থেকে কোথায় গড়াবে ব্যাপার, লোকে কি বলাবলি করবে।

যতই ভাল হয়ে থাক কাজটা, কোন মেয়ে তো করে না এরকম। শুধু এই জন্যই গরীবের ঘরের বাড়ন্ত মেয়ের কাণ্ডটা লোকে ভাল চোখে দেখতে পারে না।

এ ব্যাপারের জের টানতে তাদের ছিল দারুণ অনিচ্ছা, যত তাড়াতাড়ি চাপা পড়ে যায় ততই ভাল। গোবিন্দের কাছে তারা কৃতজ্ঞতাও চায় না, মেয়ের প্রশংসাও শুনতে চায় না।

গোবিন্দ তাদের অসন্তোষ টের পেয়েছিল। কারণটাও অনুমান করেছিল মোটামুটি।

রেবতীকে দেখবার বা তার সঙ্গে কথা বলার প্রসঙ্গই সে তাই তোলেনি।

শুধু একটি অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। সে গরীব মানুষ, বেশী কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু অঘোরের মেয়ে তার প্রাণ দান করেছে, এটাই বা সে ভোলে কি করে!

রেবতীর নতুন শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে পায়ে বেঁধেছিল। সে রেবতীকে একটি কাপড় কিনে দিতে চায়।

: প্রাণের ধার তো শোধ হবার নয়। শাড়ীটা নষ্ট করেছি তাই—

অঘোর ধীরে ধীরে বলেছিল, তোমার মাথা খারাপ আছে বাবা!

: কি রকম ?

: সে কি আর তুমি বুঝবে ? নইলে উপকারের বদলে অপকার করতে চাও ? মোর মেয়েরে কাপড় দেবে কি রকম ? তোমার সাথে তার সম্পর্কটা কি ?—বলতে বলতে অঘোর হাত জোড় করেছিল, কপাল জোরে বিপদ থেকে রেহাই পেয়েছ, দোহাই তোমার, এবার চুকে যেতে দাও।

তাই সই।

গোবিন্দ আর দাঁড়ায়নি।

ক'দিন বাদে শ্যামগড়ের বাজারে কুঞ্জর সঙ্গে তার দেখা। কুঞ্জ গিয়েছিল বেগুন বেচতে। নতুন কচি বেগুন, দর খুব চড়া। নতুন বেগুন ভাল করে হাটে-বাজারে উঠতে এখনো কিছু দেরী আছে, দরটা চড়াই চলত কিছু দিন। সময় দিলে গাছে আরও বড় হত বেগুনগুলি, ওজন বাড়ত।

নগদ পয়সার তাগিদে তুলে আনতে হয়েছে। সখ করে এত বেশী দামের বেগুন যারা খাবে, বিক্রী শুধু তাদের কাছে।

একপো আধপো বিক্রীই বেশী।

সারা সকালে আট সের বেগুন কাটেনি। কুঞ্জকে বিকালেও বসতে হয়েছে। অন্য দোকানীকে পাইকারী বেচে দিতে পারত কিন্তু পয়সা অনেক কম পাবে।

গোবিন্দ বাড়ী ফেরার পথে বাজারে গিয়েছিল তরকারী কিনতে।

গাঁয়ের মানুষ, চাষী পরিবারের মানুষ। ষ্টেশন বাজারে তাকে তরকারী কিনে নিয়ে যেতে হয়।

গোবিন্দদের শুধু ধানের চাষ। তাও আবার পরের জমিতে, ভাগে বখরায়।

সামনে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ বলেছিল, আরে, এই যে! কেমন আছ ভাই ? ভাল ত' ?

কুঞ্জ হাসেনি। মুখ তুলে চেয়ে মুখ নামিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল, এই আছি।

রেবতীর খবর জিজ্ঞাসা না করেই গোবিন্দ এগিয়ে গিয়েছিল। তার পরেও দু'-একবার অঘোর আর কুঞ্জর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোবিন্দ যেচে কথা বলার চেষ্টা করেনি।

দুঃখ বা ক্ষোভ জাগেনি। এটা অবশ্য ওদের বাড়াবাড়ি, কিন্তু কি আর করা যাবে। ওদের বাড়ীর মেয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে এটা ভুললে তো চলবে না। ওরা যদি তাকে এড়িয়ে চলতে চায়, তাই ভাল!

কিন্তু রেবতী তো আর তাকে এড়িয়ে চলতে চায় না। দু'বেলা কখন সে ঘরের সামনের সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে তাও অজানা নয় রেবতীর। তাছাড়া গোবিন্দের অকৃতজ্ঞতায় তার গায়েও ধরেছে জ্বালা।

সে কেন রেহাই দেবে গোবিন্দকে ?

একদিন ভোরবেলা তাই রেবতী একেবারে সামনে পড়ে যায়। ঠিক যেন পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

বাঁকা সুরে বলে, তোমার বাড়ী কোন দেশে গো ? সে দেশের লোকেদের বুঝি এমনি ছোট মন হয় ?

গোবিন্দ ভড়কে গিয়ে বলে, কি করলাম আমি ?

: কিছুই করলে না। তাই তো বলছি। একজনা মুখ দিয়ে বিষ টানল, মরল না বাঁচল একটিবার খবর নেবার দরকারটা কি!

খুব ঝাঁঝের সঙ্গে দিব্যি গড়-গড় করে রেবতী কথা বলে। অচেনা অন্য লোকের সঙ্গে পারত না। কিন্তু আলাপ-পরিচয় না হয়েও গোবিন্দ তার ঘনিষ্ঠভাবে জানা-চেনা মানুষ হয়ে গেছে। মুখের বিষের উপসর্গের যন্ত্রণাভোগের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, লোকের মুখে তার জন্য গোবিন্দের বেঁচে যাওয়ার কথা শুনতে শুনতে হয়েছে, গোবিন্দের অকৃতজ্ঞতার জন্য জ্বালাবোধ করতে করতে হয়েছে।

গোবিন্দ বলে, খবর নিয়েছি বৈ কি। তোমার বাপ-দাদার কাছে খবর নিয়েছি।

শুনে রেবতী নরম হয় কিন্তু নিবে যায় না। জিজ্ঞাসা করে, আমায় ডাকোনি যে ?

: তোমার বাপ-দাদা পছন্দ করবে না, তাই।

গোবিন্দের যাবার সময় এখন ভোরের আলো আরও কম ফোটে। আজ আবার কিছু কিছু কুয়াশাও হয়েছে। সামনাসামনি দাঁড়িয়েও তারা খানিকটা আবছা হয়েছিল পরস্পরের কাছে। সত্য কথা বলতে কি, রেবতী অনেকটা আন্দাজেই পথ আটকেছিল গোবিন্দের।

মুখোমুখি পথ আটকে তাকে অন্ত মানুষ বলে চিনতে পারলেই অবশ্য চোখের পলকে তার কুয়াশায় মিলিয়ে যাবার সুযোগ ছিল। সে ভেবেও রেখেছিল তাই।

গোবিন্দ হঠাৎ প্রশ্ন করে, কপালকুণ্ডলার গল্প জানো ?

: শুনিনি তো। বল না শুনি ?

গোবিন্দ সিনেমার মারফতে গল্পটা জেনেছিল। প্রশ্ন করে সে পড়ে মুস্কিলে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখন রেবতীকে কাহিনীটা শোনাবার মত সময় তার নেই। অগত্যা সে বলে, সে একটা মেয়ের গল্প, একজনের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

শুনে রেবতীর কৌতূহল যায় বেড়ে।

: সাপে-কাটা থেকে ?

: না, সে অন্য গল্প।

: বলই না শুনি ?

: আজ সময় হবে না গো, উদিকে কলের ভোঁ বেজে যাবে। কাল নয় খানিক আগে বেরোব, কাল শুনো। ঘুম ভাঙবে তো ?

রেবতী দ্বিধার সঙ্গে বলে, ঘুম নয় ভাঙবে, আরও আগে যে রাত রয়ে যাবে, ভয় করবে ?

গোবিন্দ এক মুহূর্ত ভেবে বলে, ঘর থেকে ইদিক পানে চেয়ে থেকো, বেরিও না। এখেনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরাব, তখন বেরিও।

গোবিন্দ চলে যাবার পর রেবতীর মনে একটু আপশোষ জাগে। সে যে পাড় ছেঁড়া শাড়ীটা পরে আছে এটা নজরে পড়ল না গোবিন্দের।

[ক্রমশঃ।

জোটের মহল

[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

নয়

বাড়ী পৌঁছাতে বেশ বেলা হলো দিবাকরের। আরও বেলা বাড়লে দুঃখ ছিল না। বাড়ী, বাড়ী, সুখ কি বাড়ী এসে ? ভগিনীকে দেখাই যে মুখ্য কারণ তা কেন জানি গৌণ হয়ে দাঁড়াল এখন। ঘাটে এসে নাও ভিড়ল—সবাই তাড়াতাড়ি উঠে গেল। শুধু দিবাকর রইল স্থবিরের মত বসে।

গৌতম জিজ্ঞাসা করল, 'ওকি গোঁসাই ?'

'এই তো যাই—কমণ্ডলুটা দেও তো।'

ঘর আছে ঘরণী নেই। তৃষ্ণা আছে তৃপ্তি নেই। মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডের মত যৌবন আছে কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত জীবন কোথায় ?

তবু গৃহে যেতে হয়। যাবে সন্ন্যাসীর বেশে একটা কমণ্ডলু হাতে। এ যেন উপহাস! পথে মুক্তাদের বাড়ি। হয়ত মুখ মুচকে সে হাসবে। কথা বলবে না। ওঃ! কথার চেয়েও সে হাসির ঝাঁজ কী তীব্র!

ভিন্ন পথে একটু ঘুরে গিয়ে ঘরে উঠল দিবাকর।

'কনক, আমি যা কইছি এখন দেখ তা সত্য কিনা। তোর সাধু-ভাই আইছে, বসতে দে, বাতাস কর—আমি চলি এবার। চিঁড়া আর দৈ রইল ভাই, খাইতে জানি ভুলিস না।'

'এতগুলা—'

'বেশী না রে, খাইস ভাগে-যোগে, জীবনেরে লইয়া।'

প্রথম মুক্তার গলা শুনে চমকে উঠেছিল দিবাকর। মুক্তা নেমে চলে গেলে স্বস্তি বোধ করল সে।

'ও ভাত কার ? অত বড় বড় মাছ পাইলি কই ?'

'ভাত বাইড়্যা লইয়াছিলাম, তখন মুক্তা আইল কিনা…'

তাড়াতাড়ি একটা বাসন দিয়ে ভাত ও মাছগুলো চাপা দিয়ে চিঁড়া ও দৈ সামলাতে লাগল কনক। 'কেমন আছ দাদা ?'

কনক বিধবা—দূরে বসে দিবাকর তার বৈধব্যের কাহিনী শুনেছেও সব। খোঁপায় তার রাঙা পদ্ম। বেশ-ভূষা তেমন কিছু নেই, যেটুকু আছে তার জৌলুস এবং চাকচিক্য শত গুণে বাড়িয়েছে ঐ অকালের ফুল—সেই যে সকাল না হতে উপহার দিয়েছিল জীবন। জীবনও এসে সুমুখে হাজির হলো। 'কেমন আছেন ঠাকুর ভাই ?'

ঠিক সেই সময় পদ্মফুলটা পড়ে গেল আচমকা খোপা খসে, বিশেষ কিছু শব্দ হলো না, কিন্তু তিন জনেরই দৃষ্টি পড়ল গিয়ে ঐ একটি বস্তুর দিকে। ফুল তো নয় যেন এক হল্কা আগুন! নীরবে জ্বলতে লাগল ঘরের মেটে মেজেতে।

দশ

দেবনগরের খাসমহল কাছারী বাড়ি। নদীর পারে মাঠের ভিতর কয়েকখানা টিনের ঘর। সিমেণ্টের মেজে, চাঁচের ওপর রঙ করা বেড়া চেয়ার টেবিল আলনা র‍্যাক আরও আছে নানা রকম আসবাব। খাসমহল অফিসার দীনেশ সেন এককালে কাননগো ছিল। কতকটা বরাত ও বেশিটা বুদ্ধির জোরে সে এখন এই কাছারীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। আই, সি, এস নয়—তবু আই, সি, এস-গন্ধি। চেহারায় একটা বৃষের ছাপ, দেহে অসীম শক্তি, ভয় ও ভক্তি জাগায় এ এলাকার যত প্রজাদের মনে।

করগেটের সেডগুলোতে মাঝে মাঝে লাল রঙ দেওয়া হয় বেশ ঘন করে। দূর থেকে মনে হয় যেন বাসি রক্তের ছোপ—অন্তত এদেশের লোকেরা তাই ভাবতে শিখেছে। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এখানে কোন সাধারণ লোক আসে না। গাঁ থেকে যারা দুধ কলা ডিম আম বেচতে আসে নিত্য দেবনগরের বাজারে, তারা পর্যন্ত কাছারীর সুমুখ দিয়ে যাওয়ার সময় অতি সন্তর্পণে যায়। পেয়াদা পাইক এমন কি তাদের নবাগত আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের দেখলেও মনে মনে অভিশাপ দেয়।

দেবনগরের কাছারীটা ছিল যেন কোন এক বিরাট জমিদারের, সূর্যাস্ত আইনে কেমন করে জানি নিলাম হয়ে যায় হঠাৎ। স্বত্ব বদলায় কিন্তু কায়দা-কানুন বদলায় না। তার নিদর্শন-স্বরূপ আজও এক জোড়া প্রকাণ্ড নাগরাই জুতা রয়েছে কাছারীবাড়ির দেয়ালে ঝুলান। এখন আর তার ব্যবহারের বিধি নেই, কিন্তু সনাতনী স্মৃতি কেউ লোপাট করতে রাজি নয়। মুষ্টিমেয়র মন থেকে কিছুতেই ঘুচতেই চায় না অপ্রমেয় অহংকার। তাই মাঝে মাঝে দীনেশ

সেনের হুকুমে তেল মাজা হয়, ঝুল ঝাড়া হয় ঐ জুতোর। দীনেশ সেনের ছিল একটা চোখ কানা। কিন্তু বাকিটা জাগ্রত থাকত এই একদিকেই—তাই কখনও তার ভুল হত না নিজেদের ঔদ্ধত্য জীয়িয়ে রাখতে। রাজা এবং রাজকর্মচারী ছাড়া যে আর এক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আছে, তাদেরকে মানুষ বলে ভাবতেই শেখেনি সে। জমিদারের প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম এখন থাকেন অভুক্ত—পূজা-পার্বণের ব্যয় হয়েছে বিধি-বহির্ভূত। ভেঙে নিলাম করে দিয়েছে দীনেশ সেন পান্থ-প্রবাসীর অন্নশালা, কিন্তু তৈলসিক্ত হচ্ছে নাগরাই পয়জার।

'বাবা ও জোড়া কি? অত বড় জুতো? কে পায়ে দিত?' অবাক হয়ে চেয়ে রইল কুন্তলা।

'কেউ পায় দিত না।' একটা চোখ মেয়ের মুখের দিকে ফিরিয়ে দীনেশ সেন বলতে লাগল, 'জমিদারের ব্যয়বহুল অপ্রয়োজনীয় যত সব স্মৃতি আমি নষ্ট করে দিয়েছি, কিন্তু এমন একটি জিনিষ জীয়িয়ে রেখেছি যার দরুণ সে কখনই বিস্মৃত হবে না।

'কেউ পায় দিত না, তবে ও জোড়া কি কাজে লাগত?'

'তোমরা কি গল্পও শোননি রাজা-রাজরার? এম, এ পরীক্ষা দিয়ে এলে, তারপর নাকি একটা কি প্রবন্ধ লিখে—এই সেকেলে জমিদার-প্রজার সম্পর্ক নিয়ে—একখানা পদক ও পুরস্কার পেয়েছ কোন প্রতিযোগিতায়, অথচ তুমি এই সামান্য জিনিষটার খবর রাখ না? তবে তুমি লিখলেই বা কি, আর মেডেল যাঁরা দিলেন তাঁরাই বা বুঝলেন কি?'

সত্যই "The sweet relation between zaminder and tenants of the past" নামক একটা প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি অর্জন করেছে কুন্তলা। বাংলা দেশের বিদগ্ধ সমাজে সে এখন সুপরিচিতা। তার পিতা একজন খাসমহল অফিসার—সকলের অনুমান মেয়ের অভিজ্ঞতা বাস্তব। আর অনুমানের ওপর নির্ভর না করেও উপায় নেই। কারণ বিজ্ঞ যাঁরা, যাঁদের হাতে এই সব মেডেল বিতরণের চাবিকাঠি তাঁরা সত্যিকার অভিজ্ঞও নন, বহুদর্শীও নন। কিন্তু সমঝদারের উচ্চাসন অধিকার করে আঁকড়ে রয়েছেন কূট রাজনৈতিক পাণ্ডাদের মত।

'আমি তো মধুর সম্পর্কের কথা লিখেছি, The sweet relation between...'

'মানে স্বপ্নের কথা—বিশ্বপ্রেমের?' বৃষের মত হেসে ওঠে দীনেশ। 'তোমরাই তো সব নষ্ট করবে। বিশ্বে আবার প্রেম আছে? আর যদিও বা কিছু থাকে তা শার্দুলে এবং মেষে কি সম্ভব? সত্যি বলতে গেলে কি, আমরা যাদের রক্ত খাওয়ার অধিকারী তাদের জন্য চোখে জল—Crocodile's tear!' আবার হাসে দীনেশ সেন। 'তোমরা সব ডোবাবে কুন্তলা। জমিদারী তালুকদারী আর থাকবে না। তারপর খাবে কি? ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বুঝি পথে পথে উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াবে?'

'এ অধিকার তো স্বাভাবিক নয় বাবা!'

'আলবৎ স্বাভাবিক—যেমন মৎস মার্জারের ভক্ষ্য।'

'না বাবা, তা নয়—এ সব অস্বাভাবিক সমাজ-ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক কাল ফুরিয়ে এসেছে।' ধীরে ধীরে জবাব দেয় কুন্তলা।

দীনেশ সেন উত্তর দেন, 'না, কিছুতেই তা ফুরায়নি—শুধু রকম-ফের হয়ে গড়ে উঠছে গ্রাম ছেড়ে সহরে। নিত্যই তো দেখি খবরের কাগজের পাতায় মিলমালিক ও শ্রমিকদের কাহিনী।'

'এক জন-হিতৈষী অভিজ্ঞ নেতা বলছেন...'

'মা, রেখে দাও তোমার জন-হিতৈষী। সর্বজনের এককালীন হিত আবার হয় নাকি? ঘোড়ায় ঘাস খাবে, বিড়ালে মাছ খাবে, এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এক দল মানুষ যখন শ্রম করবে, আর এক দল তার শ্রমের ফসল বুদ্ধি এবং পয়সার জোরে খাবে। সৃষ্টি-রহস্যই এই—অতএব সমষ্টিগত হিত অবাস্তব।'

এই একগুঁয়ে পিতার ওপর ক্রুদ্ধ হয় কুন্তলা। যুক্তির তেমন জোর না থাকায় সে পিছিয়ে আসে। কয়েকখানা মাত্র বই মুখস্থ করা বিদ্যা দিয়ে এমন দুর্ধর্ষ পিতাকে সহজে সমঝান অসম্ভব। তার মনে হয়, সে যেন টিয়াপাখী। শক্ত লোকের পাল্লায় পড়ে ধরা পড়ে গেছে ফাঁকি—বুলি ফুরিয়ে গেছে, বাছা-বাছা কয়েকটি আবোল-তাবোল। দুঃখ কষ্ট মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যে মানুষ দরদী হয়ে আসে তাদের দলেও সে অপাংক্তেয়—পিতার দলেও কখন সে মিশতে পারবে না—

ত্রিশংকুর অবস্থা। কুন্তলা একটা ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। ধিক্কার জন্মে তার নিজের অগভীর শিক্ষাদীক্ষার ওপর। সে আবার প্রবন্ধ লিখেছে, দরদী সেজেছে দীন-দরিদ্র চাষাভূষার!

'তোমার সঙ্গে তর্ক করে গলা শুকিয়ে গেছে—'

'চলো চা খাবে—বেলা প্রায় চারটা।'

দু'জনে উঠে এসে একটা টেবিলের সুমুখে বসে। দীনেশ সেন হুকুম করল, 'উমেশ, আমাদের চা এখানেই নিয়ে এসো, এখন আর বাড়ীর ভিতর যাব না।'

কুন্তলা যেখানে বসেছিল সেখান থেকে নাগরাই পয়জার জোড়া দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। চিকমিক করে উঠছিল পড়ন্ত সূর্যালোকে। এ যেন এক নিষ্ঠুর হাসি—দ্যুতি ছড়াচ্ছে ব্যংগের। কুন্তলা বিরক্তি বোধ করল। এমন সময় চা-ও এলো—পুনর্ব্বার দীনেশও কথা পাড়ল ঐ জুতোর।

'এই যে চাষাভুষা কৃষাণ প্রজা এদের কলিজা কি বজ্রে যে গড়া তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়...'

পিতার মুখের দিকে চায়ের পেয়ালা হাতে চেয়ে রইল কুন্তলা।

'ঐ জুতো মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও চরম দণ্ড দিতে পারে—ভারতীয় চিন্তাশীল শাসকদের এ এক গৌরবময় আবিষ্কার। গলায় ফাঁসি লাগাও, গুলী করো, তাতে আর লাভ হলো কি, যদি মানুষটা মরেই গেল! জীবন্ত অপমানে দগ্ধে-দগ্ধে মারতে হবে—সে ক্ষমতা আছে কেবল ঐ জুতোর। তাই আমি আজও সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছি বিগত মহাত্মাদের আবিষ্কার। কিন্তু কি জান মা...' দীনেশ সেন থামল। চা জুড়িয়ে যাচ্ছিল, কয়েক চুমুক খেল। 'ঐ জুতোতেও তেমন কাজ হচ্ছিল না, সেই জন্যই বুঝি বন্ধ হয়েছে ওর ব্যবহার। কাজ হবে কি করে—ঐ যাদের নাম করলাম তাদের কলিজা, এই একটু আগে যা বলছিলাম—যেন বজ্রের চাইতেও শক্ত—তোমার আমার মত বোধ নেই অপমানের। তবু মা, সনাতনী ঐতিহ্য আমি তো পারি নে কাণ্ডজ্ঞান থাকতে ফেলে দিতে। কতদিন ধরে চিন্তা করেছি, আমার পরে যিনি আসবেন তাঁর অত স্বদেশ-প্রীতি নাও থাকতে পারে—

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লিখে দেখব কলকাতার যাদুঘরে এ জুতোর স্থান হয় কি না।'

কুন্তলার হাত কাঁপছিল। ঝনাৎ করে পেয়ালাটা পড়ে গেল সান-বাঁধান মেজেতে। সে অস্পষ্ট ভাবে শুধু বলল, 'তুমি এত বড় নিষ্ঠুর, বাবা!'

কিন্তু পিতা কি তা হতে পারে? 'জল জল' করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দীনেশ সেন।

উমেশ দ্রুত জল নিয়ে এলে—দেখা গেল সংজ্ঞা হারায়নি কুন্তলা। সে শুধু অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সে উঠে চলে গেল।

দীনেশ সেন নিজের মনে মনে বলল, 'এরা জানে অনেক অথচ কিছুই মানে না। এরা চায় বাঘ বলদকে এক দরে বেচতে। সামঞ্জস্য কিছুটা হয়ত হতে পারে—কিন্তু সাম্যবাদ মেয়ের আমার স্রেফ সৌখিন কল্পনা। কার মেয়ে ও, কার রক্তে ওর জন্ম? ও কি পারে ভ্রান্ত পথে চলতে, সিংহের ঐতিহ্য ভুলে শেয়ালের দলে মিলতে?'

একটি রোগা লম্বা প্রাচীন লোক ভিতরে ঢুকল।

'কখন সদর থেকে ফিরে এলে ওস্তাদ? সংবাদ ভাল তো?'

'ভাল বলে ভাল—সক্কলের আগে খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে বিদায় দিয়েছেন নক্সা পরচা গুছিয়ে দিয়ে।'

'নিজের হাতেই কি সাহেব বাণ্ডিলটা বেঁধে দিলেন?' কথা কটি জিজ্ঞাসা করে একটু তির্যক হাসি হাসল দীনেশ সেন।

'না স্যার, না—অমন কথা কি আমি মুখ দিয়ে বলতে পারি? আপনিও হুজুর তিনিও হুজুর—হুজুরে হুজুরে ঠাট্টা চলে, লড়াই করে শিং ভাঙা চলে—আমরা তো হুকুমের দাস।'

'রাখ তোমার ভনিতা—এখন কাজের কথা বলো।'

'রাগ করলেন স্যার—আমরা গরিব লোক! ভাবছেন অন্নদা বড় ওস্তাদ—এ কথা যে ভাবে, সে নিতান্ত মুখ্যু। আপনার চিঠি না হলে কি এত চট করে কাজ আদায় করে ফিরতে পারতাম আমি? খোদ সাহেবের কাছে আমি তো দূরের কথা, আপনারাই কত নগণ্য। একবার ভেবে দেখুন তো সেবারের কথাটা—ড্যাম্ সোয়াইন্…আরে বললি কাকে? আমাদের যে সাক্ষাৎ হুজুর, যমের সামিল—বলতে গেলে তোদেরই স্ব-গোষ্ঠী। একটু যা কালো চামড়া কিন্তু রক্তটা তো এক…এই নীল রক্ত…থুড়ি থুড়ি লাল, রক্ত কি কখনও আবার নীল হতে পারে!'

ইচ্ছা করেই দীনেশ সেন ওর কথায় জবাব দিল না—কারণ অন্নদার মত বোকা আধ-পাগলা আমীন এ তল্লাটে আর নেই। কিন্তু যেমন সে পরিশ্রমী তেমনি বিশ্বাসী। তাই ওর আবোল-তাবোল সহ্য করে নেয় সকলে।

'তারপর?'

'বিরক্ত হবেন না আমার ওপর। অন্নদা বসে থাকার লোক নয়।' সে বাণ্ডিলটা খুলতেই একটা রঙিন নক্সা বেরিয়ে পড়ল।

'এঃ! একেবারে দেখি ম্যাপ এঁকে নিয়ে এসেছ। সাধে বলি তোমাকে ওস্তাদ!'

'গয়নার নায়ে একটুও চোখ বুঁজিনি। যাঁর নুন খাই তাঁর গুণ না গেয়ে কি করে আপনি আমি ঘুমোই? কয় বুদ্ধি চাই-ই। ইংরেজ বিদেশী হলেও রাজা তো বটে, শাস্ত্রে বলে পঞ্চ পিতা সপ্ত মাতা—রাজাও একজন বাপ, রাজাকে এতটুকুও ফাঁকি দেওয়া চলবে না—অন্তত আমি আপনি জীবিত থাকতে। এক দিকে মেঘনা অন্য দিকে কালাবদর, মাঝখানে বিলগাঁ। চাঁদেরা যাবে কোথায়? সাতটা রঙ খেলিয়ে একেবারে রাঙিয়ে এনেছি ওদের চলাচলের পথ।'

'তুমি পাগল নও অন্নদা, তুমিই যথার্থ সৈনিক।'

'এখন কোন দিক দিয়ে যেতে চান—মেঘনা, না কালাবদরের পথে?'

'যাব তো না, একেবারে বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ধরব—এক দিক দিয়ে নয়, চার দিক দিয়ে। সুমুখে আষাঢ়ের কিস্তি, ওদেরও নদীর মরসুম—ইলশে মরসুম। এই সময়েই বশেখী বকেয়ার নামে, চৈতি আগামের খাজনা পর্যন্ত আদায় করে রাখতে হবে। সরকারের একটু দেরি হয়ে গেল নয়া জরিপের নক্সা পরচা গুছিয়ে দিতে—তা হক, তার জন্য দেড়া সুদ দেবে ওরা।'

'বলেন কি!'

'বলি ভাল। এ আর বুঝলে না—বিনা তাগাদায় 'বলন' (বৃদ্ধি) দিয়ে গেলেই পারত। ওরা তো জানেই সব।'

'জানে বলেই তো মুখ্যু প্রজারা মানে করে নানা রকম—এই যা ফ্যাসাদ!' মাথা চুলকাতে থাকে অন্নদা।

দীনেশ সেন আর কিছু জবাব দেয় না। সে একটা চোখের দৃষ্টি শাণিত শায়কের মত নিক্ষেপ করে, গভীর ভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়ে কাগজ-পত্র নিয়ে।

১১

অল্প কিছুদিনের জন্য কুন্তলা এখানে এসেছে। মা নেই, পিতার কাছে মাস খানেক কাটিয়ে ফের কলকাতা ফিরে যাবে। ইতিমধ্যে তার দরদী মন কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চায় এই লক্ষ লক্ষ পল্লীবাসীর জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে। তার ধারণা ছিল, সে যা জানে তা প্রচুর—কারণ পুঁথি সে পড়েছে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সমাজের। কথায় কথায় কৃষাণ মজদুর আন্দোলনের জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে, ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে তার মুখ ফ্যাসিজমের কথা ভেবে। কিন্তু তার পিতা কি? কুন্তলা তো নিজের ঘরের কথাই জানে না—অথচ অঝোরে কাঁদে পরের দেশের বই পড়ে। সহরে আর কটা লোক? তার সহস্র গুণ বেশি এই পল্লী অঞ্চলে। তাদের অন্তরে যখন একটা পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ছাইচাপা আগুনের মত ধিকি-ধিকি জ্বলছে, তারা যখন বাধ্য হয়ে একটা আলাদা শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে—তখন কিনা কুন্তলা প্রবন্ধ লিখল "The sweet relation between……" ছিঃ ছিঃ! এ কি ভাবা যায়! সে এর একটা প্রায়শ্চিত্ত করবেই করবে। মিশবেই মিশবে তার দীন-দরিদ্র দেশবাসীর সংগে।…ভাবতে ভাবতে কুন্তলার বড় তৃষ্ণা গেল। সে দ্রুত আয়নার কাছে গিয়ে ঘর্মাক্ত কপোলে একটু পাউডার মেখে চা খেতে গেল। পিপাসা তার তীব্র হলেও প্রসাধন তীক্ষ্ণ না করে সে উমেশের সুমুখেও যেতে লজ্জা বোধ করে। কৃষ্টি এবং রুচি তার মার্জিত—অতএব সে করবে কি?

'দিদিমণি, মাষ্টার মশাই আপনার সংগে দেখা করতে এয়েছেন—দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাইরে।'

'কে ? মাষ্টার মশাই উমেশ ?'

'খাসমহল ইস্কুলের হেড স্যার।'

'যাও, যাও, তাঁকে ভিতরে ডেকে আনো—আর শোন, আরও দু'কাপ চা দিয়ে যেও, এ এক কাপে আমার গলাই ভিজল না।'

একটি প্রৌঢ় ভিতরে এসে তটস্থ হয়ে রইল। স্থানীয় খাসমহল অফিসারও যা তাঁর মেয়েও তা। চাকরি করতে করতে অন্তত এটুকু রীতি ভাল করে শিখেছিল যতীন দাস। বিশ্ববিদ্যালয় ও সংসারে পর পর ডবল বি, এ, দিয়ে ও করে প্রথম জীবনে যতীন দাস বড়ই বিব্রত হয়ে পড়ে। তখন সে এইখানে এসে একটি মাইনর স্কুল খোলে। ইয়ুনিভার্সিটির যাবতীয় বিদ্যা ও নিজস্ব সম্যক মেধা মোসাহেবীতে ব্যয় করে সে গত তিন বছর হয় এ্যাফিলিয়েসন পেয়েছে। এখন ছাত্রদের মাইনে বাড়িয়ে এবং গ্র্যাজুয়েট হোক কি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের মাইনে কমিয়ে সে ইস্কুলটিকে একটি ছোটখাট কারখানায় প্রায় পরিণত করে এনেছে। তার একমাত্র সহায় অনারারী সেক্রেটারী খাসমহল অফিসার।

যতীন দাস শুধু শিক্ষকই নন—তিনি জ্যোতির্বিদ, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। পরোপকারী বলে খ্যাতিও আছে এদেশে। জলকর আন্দোলন দিন দিন যে ভাবে রূপ পরিগ্রহ করছে, তাতে অচিরেই একটা অগ্ন্যুৎপাত সৃষ্টি না করে ক্ষান্ত হবে না। এখন বিলগাঁয়ে যা সীমাবদ্ধ, এখান পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ! সেই আগুনে তাঁর সাধের ইস্কুলটি পুড়ে ছারখার না হয়ে যায়। গ্রাম্য চাষী জেলে জোলার ছেলেই তো তার ইস্কুলের প্রাণ। যতীন দাসের বহু অনাহার ও ক্লেশের ফল এই বিদ্যাপীঠ—যৌবনের সঞ্চয়, বার্দ্ধক্যের জন্ত তহবিল।

কম্পিত কণ্ঠে যতীন দাস সম্বোধন করল, 'দেবী! নমস্কার।'

স্বভাবতই কুন্তলা লজ্জা বোধ করে। কখনও যতীন দাসের সংগে তার পরিচয় হয়নি। 'ও কি, বসুন বসুন আপনি···'

'দেবী, আমি বড় বিপন্ন। যদি আপনি অভয় দেন তবে বসতে পারি।'

একজন শিক্ষিত অভিজ্ঞ পদস্থ শিক্ষকের এ কি ভাষণ! কি অদ্ভুত চেহারা! মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনে রুচি-বর্জিত একটা জামা। তার চেয়েও কাপড়খানা ময়লা। এ কি একটা মানুষ, না—সমাজের ফাঁপা-ফোলা একটা অর্বুদ? না ব্যাধি সভ্যতার, গ্লানি বর্তমানের?

একটা বিরক্তি জন্মেছিল কুন্তলার মনে। সেই বিরক্তি ছাপিয়ে ক্রমে এলো করুণা। সে খোঁপার চুল কটি গুছিয়ে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

'চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নিন—তারপর আপনার বক্তব্য শুনব।'

'আমরা যারা এই দুর্গম গ্রামাঞ্চলে বিদ্যা বিতরণ করছি তাদের একটা ডিউটি আছে। জানি আমরা মজুরী পাব না, তবু কর্তব্যচ্যুত হতে পারি নে। আমরা একটা সভা করতে চাই। দেখুন, চিরটা দিন পরার্থেই খেটে মরলাম।'

'কিসের সভা?'

প্রজাদের জোট যাতে দমন করে দেওয়া যায়।'

'দমন করে দিতে চান কেন?' রূঢ় হয়ে ওঠে কুন্তলা। 'তাদের দাবী কি মিথ্যা—এই চাষা-ভূষা ভাইদের?'

'না, না, মিথ্যা কে বলে, জোট কে দমন করতে চায়—চাই একটা মীমাংসা করে দিতে। অনর্থক শক্তিক্ষয় করে লাভ কি? ওরা এমনিতেই তো হালে পানি পায় না বার মাস।'

'মীমাংসা বরঞ্চ ভাল যদি ওদের স্বার্থ রক্ষা হয়।'

'তা হবেই, কিছু খাজনা বৃদ্ধি দেওয়া আর তেমন কঠিন কথা নয়। সভা হবে ইস্কুলের মাঠে, সভানেত্রী হবেন আপনি—নইলে মানুষ জমবে না। আপনার কথা শুনলে এমনি আপনাকে দেখতে আসবে অনেক লোক।'

'কেন বলুন তো? আমি কি চিড়িয়াখানার জীব নাকি?'

'ছিঃ ছিঃ, এ কি বলছেন আপনি? ওরা শিক্ষিতা মহিলা কোন দিন দেখেনি কি না—।'

'এ আন্দোলনের নেতা কে?'

'নেতা ঠিক কেউ নেই। তবে একজন চালক আছে তার নাম দিবাকর আচার্য। ব্রাহ্মণের ঔরসে এক নমশূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম তার।'

'আশ্চর্য!'

'আরো আশ্চর্য হবেন তাকে দেখলে। যেমন সে রূপবান, তেমনি শক্তিমান—বক্তাও অদ্ভুত।'

'নিশ্চয় শিক্ষিত।'

'ঠিক তার উলটো—অনেক দিন গানের দলে থেকে থেকে মুখ দিয়ে এখন তার কথার তুবড়ি ছোটে।'

'সে কি সভায় আসবে?'

'নইলে কোন মীমাংসাই হবে না—তাকে আনতেই হবে।'

'আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী হলাম।'

'নমস্কার দেবী! আপনার বাবাকে বলে একটা হুকুম করিয়ে নেবেন সভার।'

'সে জন্য আপনার ভাবতে হবে না।'

আর একবার নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন পরহিতব্রতী যতীন দাস।

১২

মুক্তা চলে গেল, কিন্তু মুক্তি পেল না দিবাকর। সে আর এক রহস্যের সম্মুখীন হলো। বিধবা ভগিনী এ কি প্রবৃত্তি! কনক নিঃসংকোচে মাছ খায়, খোঁপায় পরে সুগন্ধি ফুল। হয়ত রাত কাটায় ভিন্ন জাতের ছেলে জীবনের সংগে। সে আর ভাবতে পারল না। 'তুই যে এখানে জীবন? তোর হাট-ঘাট মাছধরা নাই?'

'মাছ ধরি রাত্তিরে কৈ মাছের জাল পাইত্যা—বেইচ্যা দেই ভোর বেলাই পাইকার বাড়ী যাইয়া।'

'ক্যান, হাটে যাইয়া খুচরা বেচতে পার না—তাতে যে দুই পয়সা হয় বেশি।'

'করতাম তো তাই-ই। বুইন ঠাহইন আইল···'

'আর তোর মাথাডি খাইল।' রাগের মাথায় মন্তব্য করল দিবাকর। কনক নিকটে কোথায়ও আছে কিনা সে কথাটাও ভাবল না সে একবার।

'গোঁসাই, কইতে গেলে আমরাও অনেক কথাই কইতে পারি—তোমার চরিত্তিরও এমন একটা কিছু দেব-চরিত্তির না।' একটু

হাঁপ ছেড়ে জীবন আবার বলতে আরম্ভ করে, 'বাপ-দাদার ঘর-দুয়ার উদাম ফেইল্যা গেলা—বুইন ঠারইন আইস্যা থায় কি? ছোনের ছাউনি, না হোগলের বেড়া? থাকে ক্যামনে রাইত-বিরাইতে একা এটা সোমত্ত মাইয়া একজন পুরুষ বিনা?' জীবনের নিজের বিছানার জন্ম যে হেউলি পাতার নরম হোগলা একখানা কনক বুনে দিয়েছিল সেখানা সে গুটিয়ে বগল দাবা করে। 'এখন আমার আর কোন দায় নাই—বাড়ী চললাম। নিজের পাঁঠা, ইচ্ছা হইলে নিজে তুমি ল্যাজে কাট।' জীবন বেড়ায় ঝুলান ডাবা হুঁকোটা টেনে নিয়ে আসে। ওটা ওর পৈত্রিক সম্পত্তি। হোগলাখানা আবার কি ভেবে যেন পূর্বের স্থানে যত্ন করে রাখে। বাড়ী না গিয়ে গায়ের জোর দিয়ে ঠেশে ঠেশে তামাক সাজতে থাকে।

দিবাকর ওর সুমুখ দিয়ে চলে যায়।

জীবন যাবে কোথায়? তার যৌবনের অনেক সাধই যে অপূর্ণ রয়েছে! শুধু রঙ লেগেছিল চৈত্রের সান্ধ্য গোধূলির। রাঙা রঙের আলপনা বুলিয়ে যাচ্ছিল কনক এই ধীবরের মনে। ইতিমধ্যে এলো করাল কালবৈশাখের রূপে দিবাকর।

এবার কনক বাপের বাড়ী ফিরে এসে মহা মুস্কিলেই পড়েছিল। ত্রিকালজ্ঞ ভূষণ্ডী কাকের মত আশ্রয় একটা খাড়া হয়ে আছে বটে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভিভাবক কোথায়? বাড়ীর চারি দিক বন-জংগলে ভরে গেছে, হয়ত চামচিকা ও বাদুড়ের বাসা হয়েছে বসত-ঘরের বাঁশের মাচায়। সময়টা ঠিক ঘোর সন্ধ্যা। কনক হাতের বোঁচকাটা নিয়ে ভাঙা মনে বসে পড়ল দাওয়ায়, এমন সময় এলো জীবন। 'কত কাল পরে দেখি বুইন ঠারইন···বাইরে ক্যান? ঘরে আসো।' দুয়ার খুলে প্রদীপ জ্বালল সে।

বাহিরটা যতই অপরিষ্কার হক না কেন ভিতরটা তো বেশ ফিটফাট। একটু আশ্চর্য হয় কনক।

'আমি একলা এখানে থাকি—তোমার কোনও চিন্তা নাই। দুজনের মত চাউল আছে ডালায়। আইজ চলুক, কাইল আবার জাল পাতুম।'

এখন আর আগ্রহ ও অভিভাবকের অভাব নেই। তবু কনক খুব স্বস্তি বোধ করতে পারে না। যে সমস্যাটা এতক্ষণ পরে জলের মত সমাধান হয়ে গেল, তাতেই হঠাৎ পড়ল আবার জটিল গ্রন্থি। সম্পর্ক এবং বয়সের ধর্ম ওদের বাসের অন্তরায়। জীবন যতটা ভাবুক আর নাই ভাবুক, কনক খুব উৎসাহ বোধ করতে পারে না। অথচ সে দুঃখিতও করতে চায় না জীবনকে। সে বলে, 'সত্যিই তো এখন আর চিন্তা কি!' তারপর সে গৃহকর্মে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে।

অতি শৈশবে জীবনের হয়েছিল মাতৃকা। একটা কি যেন ওষুধ দিয়েছিল কনকের মা। তাতেই সে নাকি আরোগ্য হয়। বড় হয়ে বার বার এ কথাটা শুনেছিল জীবন এবং এইটাই এ পরিবারের কাছে তার কৃতজ্ঞতার কারণ।

জীবনের স্ত্রীবিয়োগের পর এক বন্যায় তার ভদ্রাসনের ঘরখানা পড়ে যায়। তারপর সে আর ঘর তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি।—লেত্তিচ্যুত লাটুর মত ঘুরে বেড়াত গাঁয়ের পাঁচ বাড়ী। দিবাকর বিদেশে যাওয়ার সময় তাকে ডেকে ঘর-দোরের ভার দিয়ে গেল। সেই থেকেই জীবন এখানে রয়ে গেছে। সে উঠানখানা পরিষ্কার না রাখতে পারলেও ঘরের জিনিষপত্র গোছ-গাছ করে রেখেছে। গৃহদেবতার আসনখান তার নিদর্শন।

একজন ধীবর, অপর জন নমশূদ্রাণী।

কনক জিজ্ঞাসা করে, 'এখন রান্ধনের হইবে কি?'

'তুমি যা কর, আমি অত মানি-গুনি না। আর রাত্তির কাল দেখবে কে? তোমার মা ছিল বইল্যা আইজও জীবন বাইচ্যা আছে। ওমা সে কি যে-সে ব্যাধি—এই ক্ষণে ক্ষণে হয় লাল নীল হইলদা···'

খাওয়া-দাওয়ার পর কনক পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, 'এখন শোওয়ার কি হইবে?'

'আমি তো একবারই কইছি।'

'কি কইছ?' প্রশ্ন করেই মনে মনে শিউরে ওঠে কনক—আবার না জীবন বলে ফেলে 'আমি অত মানি-গুনি না।'

জীবন উত্তর দেয়, 'আমার অত বাছ-বিচার নাই, ঘরে না হইলে দাওয়ায় দেও হোগলাখান। এই যে শুমু আর উঠুম ভোরে।'

কনক যথা-সম্ভব শয্যা রচনা করে দিয়ে ঘরে গিয়ে দোর ভেজাল।

পরপুরুষের শয্যা রচনায় হয়ত একটা মোহ আছে। জীবনের হোগলাখানা ছিঁড়ে গেছে। আর এ হোগলা সাধারণত শোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় না। লাগে নায়ের ছই বাঁধতে, নয় ত ধান-চালের মোড়া বানাতে। এর বেতিগুলো যেমন শক্ত তেমনি খসখসে। সপ্তাহ একটা ঘুরতে না ঘুরতে কনক নিজের হাতে নতুন নরম হোগলা বোনে হেউলি কেটে এনে। চরের চার ধারে তো অভাব নেই হেউলি ঘাসের।

'এ ক্যামন হইল বুইন ঠারইন—বড় নরম ঠেকে যে?'

'গীরিষ্যি কালে নরম ঠেকে, শীত আইলে গরম—এ তুই বুঝবি না, রমণী স্পর্শের ধরম। এখন তুই ঘুমা।'

কিন্তু সে রাত্রে ভাল করে ঘুমাতে পারে না জীবন।

কনকের চরিত্রে চিরদিনই একটা তীক্ষ্ণতা ছিল। কতকটা সাদৃশ্য ছিল দিবাকরের সংগে। অন্যায় সে কোন দিনই সহ্য করে নিতে পারত না। পাড়া-প্রতিবেশীর সংগে তাই চট করে বচসা হতো সামান্য কারণে। অনেক দিন বাদে কনক এসেছে, কি খায়, কেমন করে থাকে—এ সব খোঁজ অবশ্যই নিত পাশের বাড়ীর বাসিন্দারা, কিন্তু অনেকে এলো না ভয়ে, আবার কেউ কেউ এলো না ও পাছে গলগ্রহ হয় এই আশংকায়।

একদিন রাত্রে জীবন ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করে, 'বুইন ঠারইন, তুমি যে মাছ-ভাত খাও, খোঁপায় ফুল পর, পানের রসে ঠোঁট রাঙাও, তুমি কি সোমাজ মান না?'

'তুইও তো সোমাজ মানিস না, খাইস আমার হাতের রান্ধন।'

'তা তো খাই গোপনে। কিন্তু তোমার হাতের ছোঁয়ায় দোষ হইলে, আমার মনে হয় স্বোয়ং লক্ষ্মীর ছোঁয়ায়ও দোষ আছে। আহা, কেমন মধুর তোমার ব্যঞ্জন!'

'গোপনে খাইলে বুঝি দোষ হয় না জীবন?'

'না—টের পাইলেই যত জ্বালা।'

'তয় আমিও তো যা করি তা গোপনে। তুই না কইলে আর জানবে কেডা?' হেসে হেসে জবাব দিল কনক।

'কিন্তু···'

'খালি কিন্তু কিন্তু করে বোকায়। একটা একটা কইর্যা দিন চইল্যা যায়, সাধের দিন রে জীবন, বুদ্ধিমানে লুইট্যা-পুইট্যা খায়।'

'ভাল কথা কইলা বুইন ঠাঞইন। তুমি ইচ্ছা মত খাও, তোমার যা মনে চায়। আমি কই মাছ ধইর্যা আন্নুম নিত্য।'

জীবন শেষের কথা কটি কি বলল তা ঠিক লক্ষ্য করল না কনক। সে ভাবল, এ ব্যক্তি-বিশেষের বা বস্তু-বিশেষের ভোগ নয়—উভয়ের মিলিত সম্ভোগ। কিন্তু তা তো বুঝল না জীবন।

তবে দিবাকর বাড়ী এসে পৌঁছাবার কিছুদিন পূর্ব থেকে কি যেন বুঝে উঠেছিল ধীবর। তাই দিবাকরের বক্রোক্তি শুনেও ছাড়স না দাওয়া—লাগল তামাক সাজতে।

জীবন এমনিতেই কৃতজ্ঞ ছিল আচার্য বংশের কাছে। কনকের সেবা-যত্ন ও প্রেমের মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ স্ফুরণে সে আরও যেন কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। সে কনককে সন্তুষ্ট করার জন্য বোধ হয় জীবনটা পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠা বোধ করত না।

সেই কনকের ভাইর উক্তি শুনে তার চোখ ফেটে জল আসার জোগাড় হলো।

ঘরে চাল ছিল না। কনক ক্ষিপ্র হাতে ফুলটা মেজে থেকে তুলে নিয়ে. আবার খোঁপায় গুঁজে ঝটিতি চলে গেল বাইরে। তারপর দিবাকরের সংগে জীবনের হয় কথা।

কনক পাশের বাড়ীর এক বৌর কাছ থেকে ঝগড়া করেই চাল আদায় করে আনল। 'তোমাগো ঘরে থাকতে আমার ভাই থাকবে উপোসী, বড় আহ্লাদের কথা! আমতা আমতা করার আর সময় পাইলা না।'

'খাড়াও খাড়াও, দেখি ভাণ্ডে আছে কিনা—আমিই মাইপ্যা দি।'

'ভাণ্ডে না থাকলে আর মাপে কি লো বৌ—যা আছে আমি তা কুড়ায়্যা-কাছায়্যা নি।' কনক যা মনস্থ করে এসেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়ে গেল।

জীবনের মুখের দিকে চেয়ে কনক বুঝল একটা কিছু হয়ে গেছে নিশ্চয়। এবং সে একটা যে কি তাও তার অনুমান করতে কষ্ট হলো না। তার মনে একটু দুঃখ হলো বটে, কিন্তু আনন্দও হলো প্রচুর। এ ভাবেই স্পষ্ট হবে, রাষ্ট্র হবে আসল সত্যটা। ভালবাসা কখনও লুকিয়ে থাকে না। [ক্রমশঃ।

টিপ

রমাপতি বসু

আসল নাম তার আম্মা কুট্টি। লোকে তাকে কুট্টি বলেই ডাকে। ডাগোর, কালো ও মজবুত চেহারা। শাড়ী পরার ধরণ দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, সে দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী। দক্ষিণ-ভারতের বিশাখাপটম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে কোনো এক অখ্যাত গ্রাম থেকে কুট্টি ভেসে এসেছে কোলকাতার এই জনস্রোতে। কি করে সে এলো, কার সঙ্গে এলো—তা কেউ জানে না। তবে তার সঙ্গে একটি প্রৌঢ় লোককে দেখা যায়। লোকটা তার আত্মীয় নয়। তবে তার ব্যবহার ও আচরণ দেখলে মনে হবে বুঝি সে আত্মীয়। প্রথম প্রথম সে কুট্টির সঙ্গেই থাকতো। কুট্টির জন্য টিপ আর নিজের জন্য চুরুট যে করেই হোক সংগ্রহ করতো।

এই সংগ্রহ করার আগ্রহ থেকেই অনেকে ঐ লোকটাকে কুট্টির আত্মীয় বা কুট্টির সঙ্গে লোকটার একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে করতো। কিন্তু আসলে এদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। সম্পর্ক শুধু এরা দুজনেই দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী।

কুট্টিকে রোজ দেখা যায় এসপ্লেনেডে। গুমটির বাহিরে যে চত্বরটা আছে সেখানে প্রায় শুয়ে-বসে থাকে। ছেঁড়া এক টুকরো চট আর কয়েকটি সিগারেটের খালি কৌটো নিয়ে কুট্টির ভ্রাম্যমান সংসার। আর আছে একটি ভবঘুরে কুকুর ও কুট্টির আট-ন' মাসের একটি ছোট ছেলে।

সকালে যাঁরা এই পথে যাতায়াত করেন—তাঁরা নিশ্চয় দেখে থাকবেন কুট্টিকে। দামী একটা নোংরা সাড়ী ও বোতাম ছাড়া ব্লাউজ পরে সে কোনো দিন শুয়ে পড়ে দুধ দিচ্ছে বাচ্চাটাকে। আবার কোনো দিন ট্রাম কোম্পানীর বেতনভুক্ ঝাড়ুদার মতিনের সঙ্গে বসে ভাঁড়ে চা নিয়ে খোসগল্প করছে। কি যে গল্প করে তা কুট্টিই জানে না, শুধু কথার মাঝে-মাঝে হেসে কুটকুটি হ'য়ে যায় কুট্টি। কোনো দিন তার এই গল্পের সময় কচি ছেলেটা যদি ককিয়ে কেঁদে ওঠে, কুট্টি আর পাঁচ জনের মত বিরক্ত হ'য়ে দু'ঘা চাপড় দিয়ে দেয় না। বুকের কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয় ছেলেটাকে। ছেলেটা বুকের দুধ পেলেই চুপ করে যায়।

টিপ পরতে কুট্টি খুব বেশী পছন্দ করে। খেতে পাক আর না পাক। নেশা করার কিছু অসুবিধা হ'লেও কুট্টি সহ্য করে যেতে পারে, কিন্তু টিপ না পরলে তার মাথা গরম হ'য়ে যায়। অন্তত আবিরের টিপ সে পরবেই। এক টুকরো আয়না-ভাঙা এনে দিয়েছে মতিন। কুট্টি সেই আয়না-ভাঙায় সকালে উঠে তার মুখ দেখে আর টিপ পরে নেয়।

স্নান করার বালাই নেই তার। কোনো দিন মাঠের ধারে পুকুরে রক্ষীদের চোখ এড়িয়ে সে স্নান করে নেয়। আবার অনেক দিন সে স্নানই করে না। স্নান না করলে কুট্টির কিছু অসুবিধা হয় না, যত অসুবিধা হয় টিপ না পরলে।

শীতের সময় গুমটিতে ছেঁড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়। সকাল হ'লে আর তাকে বোঝা যায় না। মতিন তাকে সোহাগ করে। চাকুরী ছাড়া মতিনের অন্য আয় আছে। চৌরঙ্গীর আশে-পাশে কয়েকটি ফ্ল্যাটে সে কোম্পানীকে না জানিয়ে গোপনে ঝাড়ুদারের কাজ করে। টুকিটাকি জিনিষ যা সে যোগাড় করে—সবই এনে দেয় কুট্টিকে।

এই তো সেদিন দু'খানা শাড়ী এনে দিয়েছে মতিন কুট্টিকে। অবশ্য কিনে নয়। এত দামী শাড়ী মতিন কিনবে কোথা থেকে? যোগাড় করেছে মতিন। খুব কৌশলে যোগাড় করেছে তার মনিব-গিন্নি এক পার্শী মেমসাহেবের কাছ থেকে। নগদ পয়সা-কড়ি মতিন কোনো দিন বকশিস্ হিসেবে চায় না। যা সে চায় তা ঐ

কুট্‌টির জন্যে। কুট্‌টির কাজে লাগে যা—তাই সে ফিকির করে আদায় করে নেয়।

কুট্‌টি তাই মতিনের ওপর বেশী খুশি।

রাত্রে মতিন অনেক দিন তার ডেরায় ফেরে না। শুয়ে পড়ে গুমটিতে। গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দেয় কুট্‌টির সঙ্গে। আগে মতিন মোটেই ডেরায় ফিরতো না। কুট্‌টির সঙ্গে চাওয়াচায়ি করে যখন আলাপটা বেশ হ'য়ে গেল, তখন মতিন যেন কুট্‌টির নেশায় বুঁদ হ'য়ে থাকতো। কিন্তু এই ছেলেটা হওয়ার পর থেকে মতিন যেন নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে। কুট্‌টির কাছে জোর মাসে একবার কি দু'বার রাত্রে থাকে। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই মতিন কুট্‌টির কাছে বসে থাকে। মতিন গল্প করে, আর কুট্‌টি তার মাথা থেকে খুঁটে-খুঁটে উকুন টেনে টেনে বার করে নখের চাপে মেরে আওয়াজ শোনে। উকুন মেরে আওয়াজ না শুনলে মনটা যেন ঠিক বসে না। অন্যমনস্ক হ'য়ে যায় কুট্‌টি। উকুন মারার আওয়াজ শুনতে পেলে গল্প শোনার আমেজটা যেন জমে ভালো।

ছেলে যদি কেঁদে ওঠে—কুট্‌টি তার বুকের কাপড়টা সরিয়ে ছেলের মুখে পুরে দেয় তার মাইটা। একটানা টানতে টানতে ছেলেটা নিজেই আবার অন্যটা খুঁজে মুখে পুরে নেয়। হুঁস থাকে না কুট্‌টির। মতিনের কাছ থেকে খোসগল্প শোনে।

সেদিন মতিন নিজেই যেন চমকে উঠেছে কুট্‌টিকে দেখে। এমনি ভাবে দিনের বেলায় সে কোনো দিন দেখেনি। কুট্‌টির গড়নে ভাঙন ধরেছে। তার মজবুত গড়ন যেন আলগা হ'তে চলেছে। আহা, বেচারী কি-ই বা খায়? না পায় পোড্ডা, না পায় ধোসা। ইমলি কুট্‌টি একটু-আধটু যোগাড় করে খায়। দৈ-ভদাই তো সে বহু দিন খায়নি। শরীর তার ফিরবে কিসে? পাঁউরুটি আর এদিক-ওদিক থেকে কচিৎ কখনো খাবার-টাবার সে পায়। এই খেয়ে কি আর কুট্‌টির মত সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ের শরীর থাকে? তার ওপর একটা ছেলে তো দিন-রাত চুষছে। এতে কি আর শরীর থাকে? মতিন এ সবই জানে বা বোঝে। কিন্তু কুট্‌টির বুকের দিকে নজর পড়তেই একদিন বলে ওঠে, আর দুধ দিসনি কুট্‌টি! চুষে-চুষে তোকে যে শেষ করে ফেললে!

কুট্‌টি উত্তর দেয়, তোরই তো ছেলে। হিংসে করলে বাঁচবে কি করে?

মতিন এর কোনো জবাবই দেয় না। কিন্তু কুট্‌টির ভুল হ'য়ে যায়। কুট্‌টি জানে না, মেয়েদের মত পুরুষদের মন অত নরম নয়। স্নেহপ্রবণতা মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের একটু কমই থাকে।

জনবহুল পথের ধারে দুটি প্রাণীর মনের আদান-প্রদানের কথা কেউ-ই জানে না। অনেকেই লক্ষ্য করে এদের, কিন্তু আসলে কোথায় এসে ওদের মন ঠেক খেয়েছে—তা জানার জন্য কারুরই আগ্রহ নেই। আর আগ্রহ না থাকারই কথা।

কুট্‌টি ছেলেটাকে বসিয়ে দেয় মাটিতে। ছেলেটা কাঁদে না। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে থাকে। মাথা তুলে বসতে কষ্ট হয়। টাল সামলাতে পারে না বলে মাটিতে দু'হাত দিয়ে ভর দেয়। মতিন আজই প্রথম ভাল করে দেখলো ছেলেটাকে। এত ভাল করে সে কোনো দিনই দেখেনি ছেলেটাকে। রোগা হাড়জিরজিরে মতন দেখতে। মতিনের অদ্ভুত লাগে দেখতে। মনে মনে বলে, না, এ কিছুতেই তার ছেলে নয়। কুট্‌টি তাকে ধোঁকা দিচ্ছে।

মতিন তার ডান হাতের কব্জিটা একবার দেখে নেয়। কত বলিষ্ঠ হাত। তার ছেলে কিছুতেই এমনি হাড়জিরজিরে হতে পারে না। মনে মনে সন্দেহ হয় মতিনের। কুট্‌টির ছেলে, এতে তো আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কুট্‌টির ছেলে হ'লেই মতিনের ছেলে। কিন্তু মতিন বাপ হ'তে যেন রাজী হয় না মনে-মনে।

পথের ধুলোর মত যে মেয়ে এসে জমা হ'য়েছে কোলকাতার মত শহরের এক প্রান্তে—জনবহুল এই পথের ধারে থেকে—প্রত্যহ হাজার মানুষের হাজার জোড়া চোখের চাহনি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মত সামর্থ যে কুট্‌টির নেই, তা আর কেউ জানুক বা না জানুক—মতিন ভাল করেই জানে। কুট্‌টিকে দেখে মতিনের তাই মনে হ'য়েছিল এবং সেই জন্যই মতিন সহজে ভাব করে নিতে পেরেছিল কুট্‌টির সঙ্গে।

কুট্‌টির দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে থাকে মতিন।

কুট্‌টি বলে, দুধ এনে দিস্। আমি আর দুধ দেব না।

মতিন অন্যমনস্ক হ'য়ে বলে, আচ্ছা।

কুট্‌টি বলে, আর একটা জিনিষ চাই।

মতিন এবার কুট্‌টির দিকে মন দেয়, বলে: কি আবার চাই?

—কুমকুম।

—কুমকুম কি?

কুমকুমের টিপ পরবো। বলে কুট্‌টি তার ডাগর চোখে চেয়ে থাকে মতিনের দিকে।

মতিন বলে, এনে দেবো। কাল বাদে পরশু দিন এনে দেব। পরশু দিন তলব পাবো।

কুট্‌টির চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। মতিন কুট্‌টির কোনো কথাতেই না করে না। সেই জন্যই মতিনকে তার ভাল লাগে। সেই জন্যই কুট্‌টি মনে-মনে তার সৌভাগ্যের কথা ভেবে গর্ব অনুভব করে।

এর পর সাত দিন প্রায় হ'য়ে গেছে মতিনের সঙ্গে কুট্‌টির আর দেখা হয়নি। কুট্‌টির খুব খারাপ লাগে। সে ছটফট করে মতিনের কথা ভেবে। এক দিন বা জোর দু'দিন মতিন না এসে থাকতে পারে। কিন্তু এই সাত-সাত দিন না-আসার কি কারণ থাকতে পারে? কুট্‌টি অনেককে মতিনের কথা জিগ্যেস করে—কিন্তু কেউ-ই সঠিক বলতে পারে না মতিন কোথায় গেছে। অনেকে মতিনের এই না-আসার সুযোগে বেশী করে আলাপ জমিয়ে তোলে কুট্‌টির সঙ্গে। কুট্‌টি আলাপ, মস্‌করা পছন্দ করে, কিন্তু তারও তো সময় আছে একটা। মস্‌করা তার ভাল লাগে না। মেজাজটা বেশ তিরীক্ষি হ'য়ে আছে। লোকের কাছ থেকে সোজাসুজি উত্তর না পেলে সে ঝাম্‌টা দিয়ে ওঠে। অনেকে কুট্‌টির ঝাম্‌টা শুনতে ভালবাসে; অনেক বলে, মাগীর মুখের জন্যই মতিন কেটে পড়েছে।

কুট্‌টি কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করে না যে মতিন তাকে ছেড়ে চলে গেছে। নিশ্চয় মতিনের কোনো দুর্ঘটনা হ'য়েছে, না হয় তার খুব অসুখ করেছে। কুট্‌টিকে ছেড়ে মতিন কিছুতেই কোথাও থাকতে পারে না। দু'বছর তাকে দেখে আসছে সে। কোনো দিন

সে এমনি ভাবে এক নাগাড়ে সাত দিন না এসে থাকেনি। কুট্টির দৃঢ় বিশ্বাস মতিন কোনো না কোনো বিপদে পড়েছে।

অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় কুট্টি। গুমটি ছেড়ে সে চলে যায় কার্জন পার্কে। একেবারে লাটসাহেবের বাড়ীর দিকে। ছেলেটাকে এক পাশে শুইয়ে রেখে ভবঘুরে কুকুরটাকে ধরেই প্রশ্ন করে কুট্টি। বলে,—এই ব্যাটা, বল, মতিন কোথায়?

কুকুরটা কুট্টির মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁকপাঁক করে আর নেজ নাড়ে। আধখানা জিভ বেরিয়ে থাকে কুকুরটার। টস্‌টস্ করে নাল পড়ে ঘাসের ওপর। কুট্টি কুকুরটার মাথায় একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে,—বল্ ব্যাটা, মতিন বেঁচে আছে কি না?

কুকুরটা একবার কেঁউ-কেঁউ করে ওঠে। কুট্টি এবার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, আর আদর করে বলে,—আচ্ছা যদি বেঁচে থাকে তো তুই শুয়ে পড়। আর যদি মরে গিয়ে থাকে তো লাফালাফি কর। বোবা পশু। কুট্টির মনের জ্বালার কথা সে কিছুই বোঝে না। অবোধের মত হাঁকপাঁক করে কুট্টির কাঁধের ওপর সামনের পা দুটো তুলে দিয়ে। তার পর বোধ হয় ক্লান্ত হ'য়ে এলিয়ে পড়ে ঘাসের ওপর, আর নেজ নাড়তে থাকে।

কুট্টি খুসীতে লাফিয়ে ওঠে। হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—ও, তাহ'লে মতিন বেঁচে আছে? আদর করতে থাকে কুকুরটাকে। বুকের মধ্যে তুলে নেয় তাকে। মতিনের কথা ভেবে কুকুরটাকে বেশ করে চেপে ধরে বুকের মধ্যে। কুট্টির চাপে মানুষ হ'লে দম বন্ধ হ'য়ে যেত, নেহাৎ বোবা পশু বলে কেঁউ-কেঁউ করে ওঠে। কুকুরটাকে নামিয়ে দিতে সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে ঘাসের ওপর। কুট্টি নিবিড় করে তাকিয়ে থাকে কুকুরটার দিকে। অবোধ পশু কুট্টির মনের নাগাল পায় না। সন্ধ্যেবেলা কুট্টি গুমটির কাছে ঘোরাফেরা করে। তার মনে হয় যদি মতিন এসে কুট্টিকে দেখতে না পেয়ে ফিরে যায়! ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে।

সুখাই ট্রাম কোম্পানীর পয়েন্টস্‌ম্যান। গ্যালিফ ষ্ট্রীটের গাড়ী টালিগঞ্জ বা বালীগঞ্জে চলে না যায়—এই হচ্ছে তার কাজ। লম্বা একটা লোহার রড দিয়ে ট্রামের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। লোকটা উত্তর-প্রদেশের লোক। ফাঁক পেলে একটু খৈনি টিপে মুখে দিয়ে নেয়। অনেক সময় অনেক ট্রাম-ড্রাইভার যাত্রীদের নামার জন্য একটু বেশী থামে এই যায়গায়। সুখাই খৈনি দিয়ে আপ্যায়ন করে তাদের। আবার খুব বেশী জানা-শোনা ড্রাইভার হ'লে রসিকতা করে বলে, পাঞ্জাব মেলের ড্রাইভার, একটু থামো! বুড়ীরা গঙ্গাস্নান করতে চলেছে; চাকার তলায় গেলে—একেবারে শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে। ড্রাইভারদের কেউ-কেউ অজ গেঁয়ো ভাষায় সুখাইকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়। কেউ বা আবার হেসে বলে, চল্, তোকে গঙ্গায় দিয়ে আসি।

কুট্টির ওপর সুখাইএর লোভ অনেক দিনের। মাঝে মাঝে কুট্টিকে নিরিবিলিতে পেলে সুখাই তার মনের ইচ্ছে জানিয়েছে। কুট্টি আমল দেয়নি সুখাইকে। অথচ চোখের সামনে মতিনের এই মেলামেশা সুখাই কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। গা-টা তার জ্বলে যেতো। বুকটা সুখাইএর হিংসেয় ভারী হ'য়ে উঠতো। আদিম স্পৃহা মনের কানায়-কানায় যখন উপচে পড়তো, তখন সুখাইয়ের মাঝে মাঝে ইচ্ছে হ'তো বে-পরোয়া ভাবে কুট্টিকে আক্রমণ করে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে কুট্টি আর তার ছেলের মাথাটা দু'ফাঁক করে দেয়। আবার সহজ অবস্থায় থাকলে, সুখাই কুট্টিকে ডেকে তার ছেলেকে আদর করতো। কুট্টির কোল থেকেই ছেলেকে চুমা খেতো। ছেলের হাতে আনি, দু'আনি, এমন কি আধুলী পর্যন্ত দিয়েছে। সুখাইএর এই ছিল বড়ো সান্ত্বনা। ছেলেকে চুমা খেতে গিয়ে অনেক বার কুট্টির গায়ে গাল ঠেকে গেছে সুখাইএর। এই তো পরম তৃপ্তি, এই তো পরম আনন্দ সুখাই-এর; কুট্টির আর অন্য কোন চিন্তা নেই। একমনে সে শুধু চিন্তা করে যায় মতিনের কথা। আহা, বেচারী ক'দিনে যেন আরো বেশী শুকিয়ে গেছে!

সুখাই সহানুভূতি জানায় কুট্টিকে। বলে: কোনো খোঁজ পেলি?

—না। দৃঢ় স্বরে জবাব দেয় কুট্টি।

—তোর সঙ্গে কি গোলমাল হ'য়েছিল কিছু?

—না। আবার সংক্ষেপে বলে কুট্টি।

সুখাই বলে, নিশ্চয় কোনো অঘটন ঘটেছে। তোর কপালটাই মন্দ।

কুট্টি বলে, তুই কোনো খবর আনতে পারিস্ না?

—আমি আর কোথায় তার খবর পাবো? দেখ, কোথায় আবার কোন নতুন মাগীর সঙ্গে ফেঁসে গেছে।

রেগে ওঠে কুট্টি। মুখঝামটা দিয়ে বলে, খবরদার! বে-আদপের মত কথা বলিস্ না।

সুখাই কুট্টির কথায় বেশ ভড়কে যায়। সামলে নেয় নিজেকে। নীচু-গলায় বলে, না—তা হবে না। তোকেই সে বেশী করে সোহাগ করতো। আমি একটু ঠাট্টা করছিলুম।

—ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

কুট্টির চোখ দুটো হিংস্র পশুর মত জ্বল-জ্বল করতে থাকে। সে আরো বলে, দু'দিন ধরে পেটে কিছু পড়েনি, তার ওপর আবার ঠাট্টা?

সুখাই যেন একটু লজ্জিত হ'য়েছে। খোঁচা মেরে কথা বললে মেয়েরা রাগে আসে না। দুস্. সুখাই জানেই না মেয়েমানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে।

সুখাই বলে, দাঁড়া, তোর খাবারের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

কুট্টি বলে, খাবার কি হবে? খাবার খেলে কি পেট ভরে?

সুখাই কুট্টির খুব কাছ ঘেঁষে গিয়ে বলে, খাবার, খাবার। পেট ভরে খাবার। যা খাবার আনবো তাতে তোর পেট ভরে যাবে।

সুখাই চলে যায় খাবার আনতে। কুট্টি গিয়ে বসে পড়ে গুমটির মেঝেতে। ছেলেটারও ক্ষিদে পেয়েছে। একটু ঘ্যান্-ঘ্যান্ করতেই কুট্টি তার মাইটা নিয়ে ছেলেটার মুখে পুরে দেয়। চুপ করে যায় ছেলেটা।

সুখাই খাবার আনতে গিয়ে মনে মনে ভয়ানক খুশি হয়। এই তো সে চেয়েছিল এত দিন। মতিনের চেয়ে সে কোন্ অংশে ছোট? মতিনের চেয়ে সুখাই বেশী রোজগার করে। তা ছাড়া ঝাড়ুদারের চেয়ে পয়েন্টস্‌ম্যানের চাকরীর সম্মানটা একটু বেশী।

চেহারাও খুব যে অপছন্দের তা তো নয়! বয়সে একটু যা মতিন ছোট। সুখাই এই সবে মহা খুশী। সে তো চায় কুট্‌টির জন্য হামেশা ফরমায়েস খাটতে। মতিন থাকলে কিছুতেই এই সুযোগ সে পেত না। সুখাই আজ অনেক খাবার কিনবে। এত খাবার কিনবে যে কুট্‌টি অবাক হ'য়ে যাবে। খাবার দেখে তারিফ করবে সুখাইএর উদার অন্তঃকরণের। সুখাই দু'টাকার অনেক রকম খাবার কিনে আনে। আসার সময় মনে মনে ভাবে মতিনের কথা। আজ যেন সুখাইএর বেশী করে মনে পড়ছে মতিনের কথা।

সুখাই যে মতিনকে কৌশল করে এখান থেকে তাড়িয়েছে, তা আর কেউ জানে না। ওপরওলার কাছে মতিনের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল সুখাই। গোপনে সাহেব-বাড়ী চাকরী করে, কোম্পানীর কাজে ফাঁকি দেয়। রাত্রি-দিন নেশা করে কুট্‌টির সঙ্গে বেলেল্লাপনা করে।

সুখাই পুরোনো লোক বলে ওপরওলারা এ সব কথাই বিশ্বাস করেছিল। তা ছাড়া অনেকেই নিজের চোখে দেখেছিল কুট্‌টির সঙ্গে বসে মতিন ফষ্টি-নষ্টি করছে।

একজন সাহেব মতিনকে ডেকে তার এই সব বে-আদপির জন্য খুব ধমক দিয়ে দেয়। শুধু ধমকে কি কাজ হয়? ক্ষমতার অধিকারী হ'লে ক্ষমতার ব্যবহার করা উচিত। তাই সেই সাহেব মতিনকে কারখানায় বদ্‌লী করে দিল। শাসন করে দিল— এদিকের ছায়া মাড়ালে চাকরী যাবে।

বেচারা মতিন কোনো প্রতিবাদ করেনি। ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করে গেছে। একবাক্যে সেই যে গিয়ে জুটেছে কারখানায়—আর একদিনের জন্য এসপ্ল্যানেডের পথে পা দেয়নি। সুখাই যে এই সব করেছে—তা মতিন টের পেয়েছিল। টের পেয়েছিল এই জন্য, সাহেব সুখাইএর সামনে শুধু বলেনি—এ কথাও বলেছে যে, যদি মতিন তার আদেশ অমান্য করে তবে সুখাইএর রিপোর্টে জবাব হ'য়ে যাবে মতিনের।

মতিন আর যা হোক নির্বোধ ছিল না। সে সবই বুঝেছিল এবং বুঝেছিল বলেই সাহেবের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

কিন্তু কুট্‌টির দিকে তাকিয়ে সুখাইএর বিবেকের যেন দংশন আরম্ভ হয়। সুখাই যেন আরো বেশী নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে।

যাই হোক, কুট্‌টি এ সব কিছুই জানে না। শুধু মতিনের কথা ভেবে ভেবে কি রকম যেন মুষড়ে পড়েছে। সুখাই খাবারের ঠোঙাটা এনে কুট্‌টির হাতে দেয়।

কুট্‌টি বলে: চল্, ময়দানে গিয়ে খাই।

সুখাই বলে: চল্, সবই তো ময়দান।

কুট্‌টির এক কোলে ছেলে আর এক হাতে খাবারের ঠোঙা। দু'জনে চলে মনুমেণ্ট ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যিখানে।

একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে কুট্‌টি বলে, বোস্ সুখাই। দু'জনেই বসে পড়ে। ভবঘুরে কুকুরটা কখন কুট্‌টির পিছু নিয়েছে— তা কেউ জানে না। সেও এসে বসে পড়ে এদের সঙ্গে।

কুট্‌টি খাবার দেখে বলে: এত খাবার?

—খা না। দুদিন তো পেটে কিছু পড়েনি।

কোনো কথাই আর বলে না কুট্‌টি। ছেলের হাতে একটা মিষ্টি দিয়ে নিজে গোগ্রাসে খেতে থাকে।

সুখাই উদাস হ'য়ে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে।

* * * *

সেদিন রাত্রে সুখাই আর বাড়ী ফেরেনি। কাজের শেষে যখন শেষ ট্রামগুলি ডিপোর দিকে চলে যায়—তখনও আর বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করে না সুখাইএর। মহানগরী ক্রমেই নিস্তব্ধ হ'য়ে আসছে। চৌরঙ্গীর বুকে দু'-একটি ট্যাক্সি মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে যদি কোনো বেহুঁস সোয়ারী পাওয়া যায়। বিজলী আলোর তেজ ক্রমেই কমে আসছে। মধ্য-রাত্রে মহানগরীর এই ক্লান্ত রূপ কোনো দিনই সুখাই দেখেনি। তাই আজ তার বেশী করে ভালো লাগে।

গুমটিতে গিয়ে দেখে কুট্‌টির সঙ্গী সেই প্রৌঢ় লোকটা গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে আছে। ঘুমোলে লোকটার নাক ডাকে। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে বিকট এক নিশ্বাস ছাড়ার আওয়াজ হ'চ্ছে। কিন্তু কুট্‌টি কোথায়? কুট্‌টি কি তা হ'লে এখানে শোয় না? সুখাই চারিদিকে তন্ন-তন্ন করে খোঁজে।

শীত কবে চলে গেছে। বসন্তের হাওয়া বইছে বটে কিন্তু তাতে যেন শীতের ছোঁয়া রয়েছে। সুখাইএর শরীর মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। সুখাই কার্জন পার্কে গিয়ে ঢোকে। রাত্রে এখানে থাকা নিষিদ্ধ হ'লেও ভিখিরীরা ঢুকে ঘাসের ওপর ঘুমোয়। তাই সুখাই খোঁজ করে যদি কুট্‌টি এখানে থাকে।

লর্ড কার্জনের স্মৃতি-বিজড়িত এই উদ্যান। মৌসুমী ফুলে ভরে থাকে। 'কারনেশান' বা 'পেটুনিয়া' কোনো দিন না ফুটলেও নকল 'ন্যাসটার্সিয়াম' ছড়িয়ে ছিল দক্ষিণ দিকের গেটের কাছে। মাঝে মাঝে ছোট জাতের 'ক্যামিয়া জাভানিকা' ফুটতো। ইংরেজ আমলে মালীরা এখান থেকে বেশ রোজগার করতো দু'পয়সা। আয়ারা বা আশে-পাশের বাড়ীর বাবুর্চিরা রাত্রে এখান থেকে ফুলের সওদা করতো মনিব-গিন্নীদের খুশি করার জন্য। উত্তর দিকের গেটের পাশে এখন দোলনচাঁপার গাছটা আছে। অন্ধকার রাত্রে কলকে ফুলের বুনো গন্ধ নাকে এসে লাগে সুখাই-এর। এখন আর বিলিতি ফুল এখানে নেই। শীতের শেষে কয়েকটা গাছে চন্দ্রমল্লিকা বা ডালিয়া নেতিয়ে আছে। একদিন যে এখানে ফুলের চাষ হ'তো—এই বুঝি তার শেষ স্বাক্ষর।

পার্কের আর সে রূপ নেই। ট্রাম কোম্পানী ইজারা নিয়ে কাজ সুরু করে দিয়েছে। বড়ো লোহার রেল পাতা হ'য়েছে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে ট্রামগাড়ী ঘুরবে বলে। ওপরে ঝুলছে তামার মোটা মোটা তার। লাইন পাতার জন্য অর্ধেকের বেশী মাঠ সমতল হ'য়ে গেছে। পার্কের এক কোণে পড়ে আছে একটা ষ্টীম রোলার। এ পাশে একটি ছোট কাঠের ঘর। একটি বা জোর দুটি ওভারসীয়র বসে জ্যামিতিক অঙ্ক কষতে পারে। পাতাবাহার গাছ কয়েকটা এখন আছে। ইট আর সুরকীর মাঝখানে পড়ে যেন মুষড়ে পড়েছে। আর কিছু দিন এই ভাবে থাকলে আপনিই মরে যাবে। জ্যান্ত আর উপড়ে ফেলতে হবে না।

সুখাই এই সব ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে এগিয়ে যায় পশ্চিম দিকের সীমানায়। অন্ধকারে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মর্মরমূর্তিটা বেশ ভালই দেখা যায়। মহানগরীর ভিখিরীরা আশ্রয় নিয়েছে রাষ্ট্রগুরুর পদতলে। এদের মধ্যে অনেকে আবার উদ্বাস্তু আছে। খণ্ডিত

বাঙলার জন্ম যারা নিজেদের বলিদান দিয়েছে, তারা জানে না এটা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মর্মরমূর্তি। আছড়ে এসে পড়েছে পাথরের সিঁড়িতে।—

কুট্টি কিন্তু এদের মধ্যেও নেই। একটু দূরে কাগ্‌জী লেবু গাছের পাশে যেখানে রক্তকরবী গাছটা রয়েছে—তারই পাশে ঘাসের ওপর কে যেন শুয়ে আছে।

সুখাই এগিয়ে যায়। কোলের কাছে ছেলেটা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। তার চিনতে আর দেরী হয় না এ কুট্টি। সুখাই সটান্ গিয়ে ধাক্কা দেয় কুট্টিকে।

ঘুম-চোখে কুট্টি উঠে বসে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিগ্যেস্ করে: কি হ'য়েছে? কি চাই?

সুখাই বলে, তোকে খুঁজছি।

—কেন? কি দরকার?

—আজ আর ঘরে যাবো না। তাই দেখতে এলুম তোকে। অন্য দিন তো আর তোকে দেখা যাবে না।

খুব বড়ো করে একটা হাই তোলে কুট্টি। তার পর নিজেই শুয়ে পড়ে। সুখাই বলে: তোর ছেলে কোথায়?

কুট্টি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। মুখে কোনো জবাব দেয় না। সুখাই এবার কি কথা পাড়বে? আর তো তার কোনো কথা নেই। সুখাই বলে, আমিও এখানে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই।

—শুয়ে পড়্। এত বড়ো মাঠ পড়ে রয়েছে, শুয়ে পড় না। এই বলে কুট্টি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে।

সুখাইও শোয়। কুট্টির কাছ থেকে ব্যবধান রেখেই সুখাই শোয়। কিন্তু তার চোখে আর ঘুম আসে না। ঘাসের ওপর ছট্‌ফট্ করে সে। কুট্টি ঘুমোয়। সুখাই কিন্তু বিরক্ত করে না। ঘুমের ঘোরে কুট্টি চলে আসে সুখাইএর খুব কাছে। একেবারে গায়ের ওপর। কাঠ হ'য়ে যায় সুখাই। কুট্টির একটা হাত গিয়ে পড়ে তার বুকের ওপর। সুখাই সরিয়ে দেয় না। জেগে জেগে সবই লক্ষ্য করে সে।

রক্তকরবী গাছের কয়েকটা শুকনো পাতা ঝরে পড়ে সুখাইএর মুখের ওপর। হাত দিয়ে সে সরিয়ে দেয়। কুট্টি ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে ধরে সুখাইকে।

নিস্তব্ধ মহানগরী। দূরে কয়েকটি কুকুরে ঝগড়া করছে। কুকুরের চীৎকার অসহ্য লাগে সুখাইএর। ভয় হয় কুট্টির ঘুম বুঝি ভেঙে যাবে। আড়ষ্ট হ'য়ে শুয়ে থাকে সুখাই।

ঘুমন্ত কুট্টির ক্লান্ত দেহটাকে আরো কাছে টেনে নেয় সুখাই। জীবনের এই পরম ক্ষণে সে অনুভব করে তার তপ্ত নিশ্বাস। কুট্টির বুকে কান দিয়ে শুনতে পায় তার হৃৎপিণ্ডটা ধক্‌ধক্ করছে। সমুদ্রের ঢেউ-এ যে উত্তালতা, সুখাই-এর মনেও সেই উত্তালতা। তার দেহের স্নায়ুগুলো যেন একসঙ্গে সব জোট পাকিয়ে গেছে। নিশ্বাসও তার বন্ধ হ'য়ে যায়। তার পর দেহ ও মনে ক্লান্তি। অগাধ তৃপ্তিতে তার দেহ যেন অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। মহানগরীর এক নির্জন প্রান্তরে দুটি নর-নারীর মনের আর্তনাদ তারা শুধু পরস্পরে জানলো। জীবনের এই ব্যাকুলতা আর কেউ-ই জানলো না।

কাগজী লেবুর গাছের ডালে কয়েকটা চড়াই পাখী এসে যখন হুড়োহুড়ি সুরু করেছে, তখন কুট্টি আর সুখাইএর ঘুম ভেঙে যায়। কুট্টির ছেলেটা রোদ ওঠার আগেই উঠেছিল। উঠে সে ভবঘুরে কুকুরটার গায়ে পড়ে খেলা করছে। রাত্রের ঘুমের ঘোরে কুট্টির কাচপোকার টিপটা কখন যে খসে পড়েছিল তার কপাল থেকে—তা সে জানে না।

সুখাই ঘাসের ভেতর থেকে টিপটা খুঁজে বার করে। তার পর কুট্টির কপালে এঁটে দিতে কুট্টি যেন কি ভেবে হাসে। সুখাইও হাসে কুট্টির হাসি দেখে।

* * * *

সুখাইএর সঙ্গে কুট্টির ভাব খুব বেশী। মতিনের কথা কুট্টি যেন ভুলে গেছে। আজ-কাল সুখাই যেখানে দাঁড়িয়ে ট্রামের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে, তারই পিছনে মাটির ঢিপির ধারে—রেলিঙ-এর ওপাশে সারা দিন বসে থাকে কুট্টি। কুট্টির ছেলেটা সুখাইকে বেশ চিনে গেছে। ট্রামগাড়ী দাঁড় করানোর জন্ম যে লাল নিশানটা সুখাইএর হাতে থাকে, তা দেখালে কুট্টির ছেলেটা হাসে। ঝুঁকে পড়ে সুখাইএর কোলে চড়ার জন্য। ট্রামের ড্রাইভাররা সুখাইএর কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করে। গাড়ী বেঁধে টুকরো ইয়ার্কি করে সুখাইএর সঙ্গে। সুখাই না থাকলে কুট্টিকে বলে। অনেকে আবার পায়ে করে একটানা ঘণ্টিবাজিয়ে কুট্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝে ছেলেটাকে সুখাইএর কোলে দিয়ে সে স্নান করতে যায়। মাঠের ধার ধরে খেয়াল বশতঃ খানিকটা ঘুরেও আসে। সুখাই কুট্টির ছেলে কোলে করেই রাজাবাজার, গ্যালিফ ষ্ট্রীটের গাড়ী যাতে বালীগঞ্জ বা টালীগঞ্জ না যায়—সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

কার্জন পার্ক ভেঙে ফেলে ট্রামের লাইন বসানো হ'চ্ছে বলে ফেরিওয়ালারা এদিকে এসে বসতে সুরু করেছে। বাদাম ভাজা, কাটা ফল, পান্, বরফ, এ ছাড়া আরো কত রকমের জিনিষ নিয়ে ভোর থেকেই সব ফেরিওয়ালারা বসে বিক্রী করছে। কুট্টিকে দেখে এদের অনেকেই ঠাট্টা বা মশকরা করে। কুট্টি কোনো সময় এদের সঙ্গে যোগ দেয়, আবার কোনো সময় গম্ভীর হয়ে চলে যায়। সুখাইএর সঙ্গেও এই সব বিক্রেতাদের বেশ আলাপ জমে গেছে। কুট্টি এদের কাছ থেকে জিনিষ কেনে। ফাউ নিয়ে বচসাও করে তবু কুট্টির উপস্থিতি এরা সকলেই যেন মনে মনে কামনা করে। কুট্টিও পছন্দ করে এদের সঙ্গে মশকরা করতে।

সুখাই কিন্তু এ-সব পছন্দ করে না। মুখ ফুটে কুট্টিকে বলেও ছিল, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। তাই সুখাই কুট্টিকে শাসন করতে ভয় পায়। তবু সকলকে সুখাই সহ্য করতে পারে, শুধু পারে না সহ্য করতে ঐ ফলবিক্রেতা নন্দকিশোরকে।

নন্দকিশোরের চেহারায় বেশ জৌলুষ আছে। বয়সও কম হবে। পেশোয়ারি ফলবিক্রেতাদের মত টক্‌টক্ করছে রঙ। আঙুরের মত নিটোল মুখ। বেনারসের লোক।

প্রত্যেক দিন সকাল বেলা, ফলবিক্রেতা নন্দকিশোর কুট্টি আর তার ছেলেকে পেঁপে হোক, কলা হোক—নিদেন শশা অন্তত দেবেই। কুট্টি অবশ্য সুখাইকে ভাগ দিয়ে খেতো। সুখাইএর ফলের ভাগ নেবার কোনো ইচ্ছাই থাকে না, শুধু কুট্টি যদি ভুল বোঝে—তাই সেই ভয়ে সে ভাগ নিত।

সুখাই বলে, বেটা যত পচা ফল দেয়। সব কষা, সব তেতো।

কুট্টি তার উত্তরে বলে, দুনিয়াই কষা। তুই কি তা বলে দুনিয়াকে ফেলে দিবি? কথাটা যেন সহজ নয়। সুখাইএর কানে লাগে। মুখ বুজে সুখাই সহ্য করে যায়। কোনো জবাব দেয় না কুট্টিকে।

মতিনকে দেখলে এত রাগ হ'তো না সুখাইএর, যত রাগ হয় নন্দকিশোরকে দেখলে। কুট্টির কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না।

আগেও সে ড্রাইভার, ঝাড়ুদার, ভিখিরীদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়, গল্প-গুজব করে-কাটিয়েছে—এখনও সে ঐ রকম হুল্লোড় করে কাটায়। শুধু এই ফেরীওয়ালারা সংখ্যায় বেড়েছে বলে কুট্টির হুল্লোড় করার পরিধিরও বিস্তৃতি লাভ ক'রেছে।

নন্দকিশোর ব্যবসায়ী। তাই স্বভাবটা তার খুব মিষ্টি। খদ্দেরকে সে খুশি করার কৌশল জানে। খদ্দেরের ভীড় তার কাছেই সব চেয়ে বেশী। কিন্তু সুখাই নন্দকিশোরকে মোটেই পছন্দ করে না। দেখলে তার রাগ হ'য়ে যায়। কুট্টি যদি নন্দকিশোরের বিষয়ে কোনো কথা বলে—সুখাই সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। মুখে-চোখে তার বিরক্তি ভাব ফুটে ওঠে।

চীনে-বাদাম বিক্রেতা একদম শেষের দিকে বসে। বয়সে সে খুব কাঁচা। কুট্টির কোটা ছাড়ায়নি। চ্যাপটা নাক। মুখটা তার একেবারে ভোঁতা। চোখ দুটো ঘোলাটে। স্বভাবটা নন্দকিশোরের একেবারে বিপরীত। খদ্দেরদের সঙ্গে বচসা তার লেগেই আছে। তার স্বভাব ও ব্যবহারে কেউই খুশি নয়।

* * * *

সকাল আটটার পর থেকে রোদের তাত খুব বেড়ে যায়। রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুখাই তার নির্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে। অফিসের সময় কেরাণী ও ব্যবসায়ীদের ভীড় যখন খুব বেশী বেড়ে যায়—তখন সুখাইএর কাজও বেড়ে যায়। একটু বেলা বাড়তে দেখা যায়: দূরে চিঠির বাক্সের ওপর উঠে একটা লোক গান ধরেছে। হাতে তার দু'টুকরো ভাঙা কাচ। কাচের টুকরো দুটো করতালির মত করে বাজিয়ে গান ধরেছে: "হিন্দুস্থান, পাকিস্থান সব ঝুটা হায়।" মাঝে মাঝে গান থামিয়ে খাঁটি উর্দুতে বক্তৃতা করে। বলে: "ইংরেজ বানিয়েছে হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান। আমরা সব হনুমান। বোকার মত ইংরেজের ধাপ্পাবাজীতে ভুলে নিজেরা কাটাকাটি করে মরেছি।"

কুট্টি তার ছেলেটাকে সুখাইএর কোলে দিয়ে এসে শোনে গান। অনেক লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। তারিফ করছে লোকটার বক্তৃতার আর হাততালি দিচ্ছে।

গান থেমে যায়। লোকেরা যে-যার কাজে ফিরে আসে। ক্রমেই ফাঁকা হয়ে যায় চত্বরটা। সুখাই ভাবে, কুট্টি বুঝি এবার এসে তার ছেলেটাকে ধরবে! কিন্তু কোথায় কুট্টি? যারা গিয়েছিল গান শুনতে, একে একে সবাই ফিরে এসেছে। শুধু ফেরেনি কুট্টি আর সেই চীনে-বাদামওয়ালা নাক-চ্যাপটা ছোকরাটা।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে প্রত্যক্ষ ভাবে মানুষকে বোঝা যায় না। আঁধারের মধ্যে ছায়া দেখে হয় ভুল। দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখা যায়, সুখাই কুট্টির ছেলেটাকে কোলে করে লাল আর সাদা নিশান দেখাচ্ছে। মহানগরীর জনবহুল পথে সে ট্রামগাড়ীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে—প্রাত্যহিক অভ্যাস মত। ভবঘুরে কুকুরটা একবার করে সুখাইএর কাছে এসে মাটি সোঁকে আর চলে যায় লাফাতে লাফাতে গুমটির ভেতর। কুকুরটা সরু গলায় ডাকতে সুরু করে। আজ যেন তার স্বর খুব অস্বাভাবিক মনে হয়।

কুট্টির ছেলেটার দিকে তাকালে, কুট্টির কালো নিটোল টিপ-পরা মুখটা সুখাইএর চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

সুখাই তার লোহার শিকটা দিয়ে দুটো লাইনের মাঝখানে চাপ দিতে, একটা আওয়াজ হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি কালীঘাটের গাড়ী ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে যায় ডালহাউসীর দিকে।

ইংরাজদের জ্ঞান-স্পৃহা

"লণ্ডনে বাস কালে আমি অনেক দিন ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িয়াছি। শুনিয়াছি, সেখানে এত বইয়ের আলমারি আছে যে, একটির পাশে আর একটি দাঁড় করাইলে ছয় মাইল পূর্ণ হইতে পারে, অথচ কাজের কি সুব্যবস্থা! এই লাইব্রেরির বাতিক ইংরাজগণের এক প্রধান বাতিক। ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়া দেখিতাম যে, তাঁহাদের পাঠাগারে মেঝে হইতে ছাদ পর্যন্ত পুস্তকের আলমারিতে পরিপূর্ণ। পথ-ঘাট, গলি-ঘুঁজি সর্বত্রই পুস্তকালয়। সামান্য ব্যয়ে সকল শ্রেণীর মানুষ পড়িবার সুবিধা পায়। ইহাতে প্রমাণ ইংরাজদের জ্ঞান-স্পৃহা কত প্রবল!"

'আত্মচরিত'—শিবনাথ শাস্ত্রী।

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

মিত্রগুপ্ত আরম্ভ করল তার বিবৃতি।

"হে দেব, সুহৃদ্‌দের ভ্রমণের কারণ ও তার উদ্দেশ্য আমাদের কারও অবিদিত নেই। আমিও ঘুরতে ঘুরতে একদা উপস্থিত হই সুহ্ম দেশের প্রসিদ্ধ নগর দামলিপ্তিতে। নগরের বাহ্যোদ্যানে দেখলুম মহান্ একটি উৎসব-সমাজ জমেছে। ঘোরা-ফেরা করছি, এমন সময় আমার চোখ পড়ল একটি লতিকা-নিকুঞ্জে। অতিমুক্ত ফুলে ছেয়ে আছে তার মণ্ডপ। এত উৎসবের আয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেখানে দেখি একটি যুবাপুরুষ বীণা বাজিয়ে আত্মবিনোদন করছেন একাকী। কৌতূহল আমাকে নিয়ে গেল তাঁর কাছে! প্রশ্ন করল আমার রসনা—

"মহাশয়, এই যে উৎসব, একে কী বলে? আর কোন্ উদ্দেশ্য নিয়েই বা আরম্ভ হয়েছে এই উৎসব? আর, আপনিই বা কেন উৎসব-সমাজে যোগদান না করে, বরং উৎসব-লক্ষ্মীকে অনাদর ক'রে, কেবল পরিবাদিনী-দ্বিতীয় হয়ে উৎকণ্ঠিতের মত একান্তে রয়েছেন বসে?"

তিনি তখন বললেন,—

"সৌম্য, আমাদের এই সুহ্ম দেশের রাজার নাম হচ্ছে তুঙ্গধন্বা। তিনি অপুত্রক। এই দামলিপ্তে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর একটি আয়তন রয়েছে। মনে হয়, বিন্ধ্যকান্তারের নিবাসপ্রীতি বিস্মৃত হয়ে এই আয়তনেই বাস করছেন দেবী বিন্ধ্যবাসিনী। তুঙ্গধন্বা তাঁর চরণমূলে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন—দুটি অপত্য। প্রার্থনার পরে এখানে প্রতিশয়িত হয়ে রইলেন। ধর্ণা ধরে থাকার কিছুকাল পরে স্বপ্নাদেশ হয়—"তোমার একটি পুত্র হবে, তার পরে একটি দুহিতা! কিন্তু ঐ পুত্র, দুহিতার পাণিগ্রাহকের অনুজীবী হয়ে রইবে। সপ্তম বর্ষ বয়স থেকে পরিণয় না হওয়া পর্যন্ত, গুণবান্ পতিলাভের উদ্দেশ্যে সেই কন্যা যেন প্রতিমাসের কৃত্তিকা তিথিতে আমার আয়তনে আসে, এবং আমার আরাধনা করে কন্দুকনৃত্যের লাস্য-নৈবেদ্যে। দুহিতার অভিলাষ-অনুযায়ী যেন বিবাহ হয়।" আজকের এই উৎসব, সেই কন্দুক-উৎসব। স্বপ্নাদেশের পর কিছু কাল অতিবাহিত হলে মহিষী "মেদিনী" দেবীর জন্মগ্রহণ করে একটি পুত্র। তার পরে জন্ম হয় একটি কন্যার। সেই কন্যা,—নাম তার "কন্দুকাবতী" চন্দ্রশেখরা দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে কন্দুকবিহার-নৃত্য দেখিয়ে আরাধনা করতে আসবেন। তাঁরি ধাত্রীর পুত্রী, তাঁর সখী তার নাম "চন্দ্রসেনা"—আমার প্রিয়া। একদিন প্রিয়া ছিল, কিন্তু এখন নেই। কয়েক দিন পূর্ব্বে রাজপুত্র ভীমধন্বা তাকে অবরুদ্ধ করেছে—বলপ্রয়োগে। সেই থেকে অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে, পুষ্পধন্বার শরাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে, অনন্ত দুঃখ। বেদনার আবেশে বৃন্ত-শিথিল হয়ে যাচ্ছে চিত্তের প্রথম প্রেমের ফুল। তাই, একান্তে বসে আছি। ঝঙ্কার দিচ্ছি বীণায়; শুনেছি বীণার ঝঙ্কারে আশ্বস্ত হয় হৃদয়।"

এই বিরহভাবণের মধ্যপথে সেই ক্ষণে অকস্মাৎ শুনতে পাওয়া গেল মণিনূপুরের শিঞ্জা। একটি অঙ্গনা দ্রুত এসে উপস্থিত হোলো। তাকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল যুবকের দৃষ্টি। বীণা ফেলে সে দাঁড়িয়ে উঠল। দুহাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করল গাঢ়। মেয়েটিও তার কণ্ঠটিকে আশ্লেষ করে বসে পড়ল সেই লতামণ্ডপে।

যুবকের মুখ থেকে তখন অনর্গল স্খলিত হতে লাগল বাক্য।

"এইটি আমার প্রিয়া, আমার প্রাণের দোসর, প্রেয়সী। বিরহ—সে তো একটা আগুন। কেবল দগ্ধায়, কেবল পোড়ায়। আমার একেই সেদিন চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন রাজপুত্র, কী ভীষণ তাঁর নাম—ভীমধন্বা, যম যেমন করে চুরি করে নিয়ে যায় জীবনকে। আমাকে একেবারে অসাড় করে দিয়ে গিয়েছিল; তাপ ছিল না, হিম হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু এখন কী করব? রাজার ছেলে। তার বিরুদ্ধে পাপ আচরণ করা আমার দ্বারা হবে না। যে প্রাণী প্রতিশোধ নিতে পারে না, তাকে আর দেহের ভিতর বন্দী রেখেই বা কী হবে? ত্যাগ করবই। প্রিয়ে, তার আগে ভাল করে তোমায় আর একবার দেখে নিতে দাও।"

অশ্রুতে পরিস্নাত হয়ে গেল অঙ্গনাটির মুখ। সে বললে—

"অমন কথা বোলো না, অমন সাহস তুমি দেখিও না! গুরুস্থানীয় লোকেরা তোমায় জানে শ্রেষ্ঠিশ্রেষ্ঠ 'অর্থদাসের' পুত্র 'কেশদাস' বলে। তুমি আমাকে ভালবাস—তাই অসহ্য ক্রোধে আর ঈর্ষ্যায় শত্রুরা তোমার প্রসিদ্ধ নাম দিয়েছে—"বেশদাস'। এখন তুমি যদি হঠকারী হয়ে বর্জ্জন কর প্রাণ, আর আমি থাকি জীবিতা, তাহলে জগতের সমস্ত লোক ধিক্কার দেবে, নৃশংস বারাঙ্গনা বলে কুণ্ঠা করবে না আমায় সার্থক অপবাদ দিতে। তার চেয়ে ভাল হয়, যদি তোমার ঈপ্সিত কোনো রাজ্যে বা দেশে আমাকে সাথী করে নিয়ে তুমি চলে যাও।"

আমাকে সম্বোধন করে কেশদাস তখন বললে—

"ভদ্র, আপনি ত এত ঘুরেছেন,—আপনার দেখা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন্ রাষ্ট্রটি সমৃদ্ধ এবং সম্পন্ন-শস্য বলে আপনার মনে হয়? কোন্ রাষ্ট্রেই বা রয়েছে ভদ্রমানুষের বাস?

ঈষৎ হেসে তাকে বললুম—

"ভদ্র, অতি বিস্তীর্ণা এই অর্ণবাম্বরা ধরণী। এখানে ওখানে কত যে রম্য জনপদ রয়েছে, তার কি হিসাব দেওয়া সহজ? সে কথা এখন থাক্। আমি বলি, তোমাদের দুজনের এইখানেই যাতে সুখনিবাস হয়, তারি একটা উপায় আমি উদ্ভাবনা করে দেব। যদি না পারি তাহলে তখন আমিই হব তোমাদের প্রবাসের পথ-দর্শী।"

চলেছে কথা এই ধরণের,—এমন সময় আমরা সকলে সম্ভ্রমভরে শুনতে পেলুম—অনেকগুলি চরণের মণিনূপুরের রণন। চন্দ্রসেনা চকিত হয়ে বললে—

"ভর্ত্তৃদারিকা কন্দুকাবতী দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে আরাধনা করতে এসে গেছেন। এবার হবে কন্দুকনৃত্য। কন্দুকোৎসবে নিষিদ্ধ নয় এঁর দর্শন। সফল করো তোমাদের চক্ষু। দেখবে এস। আমি এগিয়ে চললুম, সখীর কাছে থাকতে হবে আমাকে।"

চন্দ্রসেনা চলে গেল। তার অনুগমন করলুম আমরা দুজনে।

সুমহান্ রত্ন-রঙ্গপীঠে তাম্রোষ্ঠীকে দেখতে পেলুম প্রথমে। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিরস্থায়ী হয়ে গেলেন আমার হৃদয়ে। আমি তাঁকে দেখলুম—আড়াল থেকে নয়; তিনিও আমাকে দেখলেন—আড়াল থেকে নয়। নয়নের সেই বিস্ময় আবেশের মত আমার চিত্তের চিন্তায় এসে লগ্ন হয়ে রইল। চিন্তার ভাষায় ফুটে উঠল আক্ষেপ-অলঙ্কার।

"ইনিই কি লক্ষ্মী? না, না। হতে পারে না। তাঁর তো হস্তে থাকে কমল। এঁর কিন্তু হাতখানিই তো কমল। তিনি তো পুরাতন পুরুষপ্রবর পূর্ব্বরাজাদের ভুক্তপূর্ব্বা। কিন্তু এঁর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি অভুক্ত এবং অনবদ্য যৌবনের সংগঠন।"

এই রকমের চিন্তা করছি, এমন সময় সর্ব্বগাত্রের অনবদ্যতা বিকশিত করে প্রসারিত এবং ব্যস্ত হস্ত-পর্ণের অগ্রভাগ দিয়ে তিনি স্পর্শ করলেন ভূমিতল, এবং সসম্ভ্রমে ভগবতী ভবানীকে করলেন অভিবন্দন। কী অপূর্ব্ব সুন্দর তাঁর সেই আলোল অলকের নীল-কুটিল শ্রী! তার পরে ধীরে ধীরে গ্রহণ করলেন কন্দুক;—যেন গ্রহণ করলেন মৃদুরাগরুষিতাক্ষ কন্দর্পকে।

তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন সেই কন্দুকটিকে, লীলাভরে, শিথিল-করে। মাটি ছুঁয়ে খানিকটা লাফিয়ে উঠল সেই কন্দুক। পাণিপল্লবের কোমল অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত করে, পদ্মের স্পন্দিত পাপড়ির মত ঈষৎ-কুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে, আঘাত করলেন সেই কন্দুক। হস্তপৃষ্ঠ দিয়ে সেটিকে উর্দ্ধে উন্নীত ক'রে, চটুল কটাক্ষের লাঞ্ছনা দিয়ে তার গতি-চারটিকে করলেন অনুসরণ; এবং যখন পতনশীল সেই কন্দুকটিকে শূন্যেই ধরে ফেললেন, তখন মনে হোলো তাঁর হাতে যেন এসে পড়ল ভ্রমরের মালায় গাঁথা ফুলের একটি স্তবক। মধ্য, বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে কন্দুকটিকে ছোঁড়া আর লোফা চলতে লাগল। মৃদু মৃদু প্রহার করতে করতে দেখাতে লাগলেন "চূর্ণপদ" মুদ্রা,—অর্থাৎ গতি ও অগতির আনুলোম্য, ন্যূনাধিক্যক্ষেপণ। যখন প্রশান্ত হোলো কন্দুক তখন নির্দয় প্রহারে জর্জ্জরিত করে সেটিকে শূন্যে দিলেন উড়িয়ে, এবং বিপরীত আঘাত করে পলকে নিলেন থামিয়ে। বাম এবং দক্ষিণ কর দিয়ে অভিঘাত করতে করতে সেটিকে পক্ষ-বিস্তার পক্ষীর মত দাঁড় করিয়ে রাখলেন শূন্যপথে। তার পরে দূরোৎক্ষিপ্ত কন্দুকের প্রপাতটিকে অভিহননের সঙ্গে সঙ্গে দশ-পা পরিক্রমা করে রচনা করলেন "গীতমার্গ"। দিকে দিকে কন্দুকটিকে পাঠিয়ে আবার যেন আকর্ষণ করে সেটিকে আনলেন ফিরিয়ে।

এই রকমের অনেক প্রকারের অনেক করণের মধুরলীলা দেখতে দেখতে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল রঙ্গ-গত জনতার চিত্ত। তাদের মুখ থেকে প্রতিক্ষণ উৎসারিত হতে লাগল প্রশংসাবাক্যের ফোয়ারা। আর আমি কেশদাসের কাঁধের উপর হাত রেখে অবাক্ নয়নে দেখতে লাগলুম সেই নৃত্যের লীলাপ্রকাশনী ভঙ্গি। কেশদাসেরও অবস্থা তখন আমারি মতন; কণ্টকিত তার গণ্ড, ফোটা ফুলের মত চোখ। আর আমি দাঁড়িয়ে আছি রাজকন্যার দিকে মুখ করে, আর তিনি নাচছেন।

আমি ভুলতে পারব না রাজকন্যার সেই নৃত্য। উদ্বিগ্ন আগ্রহ আমাকে যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে দিতে লাগল নৃত্যের উপকরণ।—

> কটাক্ষের চাহনিটি যেন নবীন কন্দর্পের প্রাথমিক সৃষ্টি:
> লীলাঞ্চিত ভ্রূলতায় সে কী অনুরাগী বিলাস;
> নিঃশ্বাসের বেগে হিল্লোলিত হয়ে উঠতে লাগল অধরমণির রশ্মিজাল,—যেন একখানি লীলায়িত পল্লব কেবল তাড়া দিয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে মুখপদ্মের গন্ধগ্রাহী অতি লোল ভৃঙ্গদের;

মণ্ডল-ভ্রমণ করতে করতে এত দ্রুত চতুর্দ্দিকে ঘোরাতে লাগলেন সেই কন্দুকটিকে, যে, মনে হোলো আমাকে দেখতে পেয়ে লজ্জায় যেন একটি পুষ্পময় পিঞ্জর সৃষ্টি করে মধ্য-প্রবেশ করেছেন রাজকন্যা।

নৃত্যের পঞ্চ ঘূর্ণীর মধ্যে কন্দুকটিকে পাঁচবার প্রহার করলেন এমন "পঞ্চবিন্দু"-করণের নৈপুণ্যে, যে দেখে মনে হল, মূর্ত্তিমান ত্রাস যেন দেহের বিরুদ্ধ ঘটনে যুগপৎ স্তম্ভিত করে দিল কামদেবের পাঁচটি বাণ।

তারপরে প্রদর্শন করলেন "গোমূত্রিকা-প্রচার"; অনুরাগের মেঘের মধ্যে বিভ্রমের বাহার দেখিয়ে সেই মুদ্রায় যেন খেলে গেল বিদ্যুতের লতা।

ভূষণমণির রণনের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিতে দিতে সে কি সুন্দর সংবাদি "পাদচার"!

ছল ভরা হাসির মিষ্টি আলোতে বিম্বাধরের সে কি মধুস্নান!

কী লালিত্যের মধ্য দিয়ে, কী অপূর্ব লীলায়,—তিনি প্রতি-সমাহিত করলেন নিজের অবসংসিত শিখণ্ড-ভার, আঘট্টিত করলেন রত্ন-খচিত ক্বণনমুখর রত্নকাঞ্চীর ছড়া, উত্থানকালে সম্বরণ করলেন—পৃথু নিতম্ববিম্ব থেকে লম্বমান অংশুকের চঞ্চল অঞ্চল! আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আকুঞ্চিত, প্রসৃত, বেল্লিত ভুজলতার অভিঘাতে, আহা, নেচে নেচে উঠতে লাগল কন্দুক।

নৃত্য করতে করতে কখনো আবর্জিত হোলো বাহুপাশ;

পরিবর্ত্তিত ত্রিকের (coccyx) উপর কখনো বিলগ্ন হয়ে রইল লোল কুন্তল;

প্রকৃত (আসল) ক্রীড়ায় বাধা না জন্মিয়ে, যথাস্থানে কখনো সত্বর রেখে দেওয়া হোলো কান-থেকে-খসে-পড়া সোনার ঝুমকো; এবং তারি মধ্যে হাত এবং পায়ের বাইরে দিয়ে বা অভ্যন্তর দিয়ে বারংবার উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল আবর্ত্তমান কন্দুক।

উন্নমন এবং অবনমনের মধ্যে নষ্ট-দৃষ্ট হতে লাগল যষ্টিকের মত ক্ষীণ কটির ভ্রমী।

উৎপতন এবং অবপতনের মাঝখানে বিপর্যাস্ত হোলো মুক্তাহার।

কর্ণপল্লবের বাতাস যেন আদেশ পেয়েই শুনিয়ে দিতে লাগল স্বেদাঙ্কুর-দূষিত কপোলতলের আর্দ্র পত্রভঙ্গ।

অতিবিচিত্র এই নৃত্যকলায় প্রকাশ পেতে লাগল—

কখনো শয়নের, কখনো জাগরণের ভঙ্গিমা,

কখনো নিমীলন, কখনো উন্মীলনের মাধুর্য্য,

কখনো গতি, কখনো বা স্থিতির লালিত্য।

কন্দুকনৃত্য সমাপ্তির দিকে এগিয়ে এল রাজকন্যার। তখন তিনি প্রদর্শন করলেন ভূতলচারী ও আকাশচারী নৃত্যকলা এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি কন্দুক নিয়ে অনেকগুলি কন্দুকের ভ্রমোৎপাদী, আশ্চর্য্য কন্দুক-ক্রীড়া।

সর্ব্বশেষে নৃত্যবিহার করলেন চন্দ্রসেনা প্রভৃতি প্রিয়সখীদের নিয়ে একত্রে বিহারশেষে রাজকন্যা, দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে অভিবন্দনা করে প্রস্থান করলেন কুমারীপুরের অভিমুখে। তাঁর অনুগামী হয়ে চলল পরিজন এবং অনুরাগী আমার মন।

যেতে যেতে তিনি কি আমার কাছে রেখে যেতে লাগলেন নয়নকোণের ঐ কটাক্ষ?—পুষ্পধনুর নীলপদ্মে গড়া ঐ বাণ?

যেতে যেতে তিনি কি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন আবর্ত্তিত আননের চন্দ্রোজ্জ্বলা ছলনা?—যেন নিজের হৃদয়?

আর আমি! সেদিন আমি বেশ বুঝতে পারলুম, অনঙ্গবিহ্বল হয়ে পড়া কী নিদারুণ একটি বস্তু।

গৃহে ফিরে এলুম, যেন আচ্ছন্ন। কেশদাস যত্নের উদারতায় আমাকে স্নান-ভোজন করালে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। বসে আছি, আর ভাবছি। এমন সময় চন্দ্রসেনা এল সঙ্গোপনে। আমাকে প্রণাম করলে। কেশদাসের অংসদেশটিকে নিজের অংস দিয়ে ধীরে ধীরে প্রণয়-পেশল পেষণ করে বসে পড়ল পাশে। হৃষ্ট কেশদাসের ওষ্ঠে ফুটে উঠল বাক্যচেষ্টা। বললে—"প্রিয়ে, যেমন তোমার দীঘল দীঘল চোখ, তেমনি দীর্ঘ হোক্ তোমার আয়ুঃ—আর আমাকে করে রেখো তোমার প্রসন্নতার পাত্র।"

আমি একটু হেসে বললুম—"সখা, তোমার এত হতাশ হলে চলবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর। আমার জানা আছে এক প্রকারের 'অঞ্জন'। সেই অঞ্জন মাখিয়ে দাও তোমার প্রেয়সীর চোখে। সেটি ব্যবহার করলে একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যাবে। মাথা-অবস্থায় রাজপুত্র এঁর দিকে চাইলে, তিনি এঁর বদলে দেখতে পাবেন একটি বানরীর মূর্ত্তি। বিরক্ত হয়ে তখন এঁকে ত্যাগ করবার পথ তিনি পাবেন না।"

আমার প্রস্তাব শুনে চন্দ্রসেনা মুচকি হেসে বললে—"আপনার মত আর্য্যবুদ্ধির প্রস্তাব শুনে আমার মত প্রাণী অনুগৃহীত না হয়েই যায় না। মনুষ্য-বপুর পরিবর্ত্তে এই জন্মেই যদি বানরী-বপুঃ লাভ করা যায়—তার চেয়ে সৌভাগ্যের আর কী থাকতে পারে? তা, সে বিদ্যার প্রয়োগ আপাততঃ প্রয়োজন হবে না, বলেই বোধ হচ্ছে। আমাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্যে আর একটি উপায় উদ্ভাবন করেছি। আজ যে কন্দুকোৎসব হোলো সেখানে রাজকন্যা আপনার ঐ মদন-হাসানো মূর্ত্তি দেখেছেন, তাঁর মনে ধরেছে আপনাকে। শম্বরশত্রু এখন অতিরুষ্ট হয়ে তাঁকে পীড়া বা যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করেছেন। আমি জানতে পেরেছি রাজকন্যার মনের ভাব। দেখুন, এবার আমি এক কাজ করব। আমার মায়ের কাছে—তিনি রাজকন্যার ধাত্রী,—সব প্রকাশ করে দেব। মা আমার তখনি ছুটে যাবেন মহিষীর কাছে,—মহিষী আবার তখনি ছুটে যাবেন মহারাজের কাছে। সব জানাজানি হয়ে যাবে। মহারাজ তখন,—দেখবেন,—উপায়ান্তর না দেখে আপনার হাতে তুলে দেবেন তাঁর দুহিতাকে। তখন রাজপুত্রকে আপনার অনুজীবী হয়ে থাকতে হবে। দেবতার আদিষ্ট বিধি—খণ্ডাবে কে? রাজ্য তখন আপনার আয়ত্তাধীন হবে, আপনার আদেশ অতিক্রম করে আমাকে অবরুদ্ধ করে রাখা রাজপুত্র ভীমধন্বার পক্ষে তখন হবে অসম্ভব। এখন কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে—তিন চার দিন।"

এই কথা বলে চন্দ্রসেনা আনন্দের আতিশয্যে কেশদাসকে বার বার আলিঙ্গন করে অনেক সোহাগ জানিয়ে প্রস্থান করল নিজের মন্দিরে। কেশদাস ও আমি এই প্রস্তাব নিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে জল্পনা কল্পনা করলুম, দেখতে দেখতে ক্ষীণ হয়ে এল রাত্রি।

প্রভাত হোলো। প্রাভাতিক নিয়ম পালন সাঙ্গ করে, উদ্যানের দিকে বেড়াতে বেড়াতে চলেছি—আহা, সেই উদ্যান—যেখানে দর্শন দেয় প্রিয়া। মন নিয়ে খেলা করছি, এমন সময় সেই উদ্যানে বিহার করতে এলেন রাজপুত্র। আলাপ হোলো। কী তাঁর নিরভিমানতা! কী সুন্দর কথা বলার ভঙ্গি! কী অনুরাগ! আমার সঙ্গে পদচারণ করতে করতে আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন নিজের 'উপকার্য্যা'য়—(অর্থাৎ) রাজভবনের প্রান্তে গৃহে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই জমে গেল ঘনিষ্ঠতা। আত্মসমান স্নান, আত্মসমান ভোজন, শয়নাদির ব্যবস্থা! প্রমোদগৃহে মাথায় বালিশ দিয়ে শুয়ে পড়লুম পালঙ্কে। স্বপ্ন দেখতে লাগলুম;—

প্রিয়া এলেন, তাঁকে দেখলুম, ধীরে ধীরে এল আলিঙ্গন, ধীরে ধীরে এল অনিন্দ্য এক সুখের জড়িমা।

তারপরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয়, একটা প্রকাণ্ড পুরুষ তার সমস্ত গায়ের জোর নিয়ে আমাকে চেপে ধরে দিয়েছে। আমার বলিষ্ঠ দুখানা হাত দিয়ে বাধা দিতে গেলুম, কিন্তু কিছুই হোলো না, লোহার শৃঙ্খল দিয়ে যেন আমাকে বেঁধে ফেললে। চমকে ফিরে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন রাজপুত্র। তিনি বলছেন—

"ওরে দুর্মতি, আমি স্বকর্ণে, সমস্ত শুনেছি ঐ হতভাগিনী চন্দ্রসেনার আলাপ। জালরন্ধ্রপথে কী মৃত্যু-নিমন্ত্রণ না নিয়েই ভেসে এল সেই আলাপ! আমার সেই কুঁজো বোনটার সঙ্গে তোমার স্বপ্নসম্ভাষণ, প্রেমালাপ! বরাকী কন্দুকাবতী! তাকে তুমি চাও! বিবাহ করবে! আমি থাকব আমরণ তোমার অনুজীবী! তোমার আদেশ লঙ্ঘন করলে কেশদাসকে দান করা হবে চন্দ্রসেনা! সুন্দর দুরভিসন্ধি!"

তারপরে পার্শ্বচর সেই প্রমাণ-পুরুষটিকে আদেশ দিলেন—

"যা, এটাকে সাগরের জলে ফেলে দিয়ে আয়।"

সেই পুরুষটি পুলকিত হয়ে উঠল অত্যন্ত, যেন একটা রত্নলাভ করে ফেলেছে। প্রভুর আদেশ মান্য করতে একটুও বিলম্ব করল না। আমাকে নিক্ষেপ করল দূর সমুদ্রের গর্ভে।

আমি তখন একেবারে অবলম্বনহীন, নিরুপায়। দুখানা হাত দিয়ে সাঁতরাবার চেষ্টা করে চলেছি, ঢেউএর মাথায় ইতস্তত: ভাসছি। প্রাণের স্পন্দন তখনও থামেনি। অকস্মাৎ দৈব যেন আমার হাতে দান দিয়ে গেলেন একখানা ভাসা কাঠ। বুকের নীচে সেটিকে রেখে ভাসতে লাগলুম। দিন শেষ হোলো, রাতও শেষ হয়ে গেল। পরের দিন, সবে তখন ভোর হয়েছে, চোখে পড়ল একটি বহিত্র। দাঁড়টানা সেই পোতের নাবিকেরা ছিল যবন। তারা আমাকে উদ্ধার করে। তারা নাবিক-নায়ক "রামেষু-কে" বললে—

"লৌহশৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় এই লোকটাকে জল থেকে তুলেছি। এ লোকটা শুনছি, এক মুহূর্তে এক হাজার দ্রাক্ষার রস বার করতে পারে।"

হেন সময়ে নাবিকেরা দেখতে পায়, অনেকগুলি নৌকা-পরিবৃত হয়ে একখানি মদ্গু (gabley পোতবিশেষ) তাদের বহিত্রের দিকে অভিধাবন করে আসছে। যবনেরা ভয় পেলে গেল। কুকুরেরা যেমন করে বরাহকে আক্রমণ করে, নৌকাগুলিও সেইরকম করে আক্রমণ করল যবনদের বহিত্রকে। ভীষণ যুদ্ধ হোলো। যবনেরা পরাজিত হব-হব করছে, অন্য কোনো গতি নেই, ধীরে ধীরে তারা অবসন্ন হয়ে পড়ছে দেখে—আমি তাদের আশ্বাস দিয়ে বললুম—

"তোমরা আমার শৃঙ্খল মোচন করে দাও। আমি পরাস্ত করব তোমাদের শত্রুদের।"

দ্বিরুক্তি না করে তারা মোচন করল বন্ধন। তারপর আমি বীর যোদ্ধাদের উত্তমরূপে সজ্জিত করে—ভীমটঙ্কার শার্ঙ্গধনু তাদের হাতে, ভল্লবর্ষণে গগন অন্ধকার—খণ্ড খণ্ড করে ছিন্নভিন্ন করলুম নৌকাগুলিকে। হতবিধ্বস্তসৈন্য সেই মদ্গু-পোতটির পার্শ্বদেশে আমাদের বহিত্রখানিকে সংসক্ত করে সসৈন্য লাফিয়ে পড়ে জীবগ্রাহ বন্দী করলুম অসহায় নাবিক-নায়ককে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। সেই নাবিক-নায়কটি আর কেউ নয়, তিনি আমাদের রাজপুত্র ভীমধন্বা। তাঁকে দেখে আমার কেমন যেন লজ্জা বোধ হোলো! বললুম "তাত, কৃতান্তের খেলা ত এবার দেখলেন।" কিন্তু সাংযাত্রিকেরা আমার কথায় অপেক্ষা না রেখে, আমারি শৃঙ্খল দিয়ে তখন কঠিনবন্ধনে বেঁধে ফেলেছে ভীমধন্বাকে, এবং হর্ষধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করে পূজা করতে লেগে গেছে আমাকে।

ক্ষণপরেই ঝড়ের মুখে তুলে উঠল আমাদের দুর্বহ নৌবাহিনী। ভিন্নমার্গে ছুটে চলল দূরে। যখন ঝড় থামল তখন দেখি একটি দ্বীপে নিবিড়ভাবে আটকে গেছে আমাদের বহিত্র। সেইখান থেকেই স্বাদু জল, জ্বালানি কাঠ, কন্দ, মূল, ফল সংগ্রহ করতে হবে; তাই—উপায়ান্তর না দেখে সমুদ্রগর্ভে শিলাবলয় নিক্ষেপ করে (নোঙর ফেলা) হোলো।

দ্বীপে দেখি, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটি পাহাড়। পানীয় জলের সন্ধানের জন্যে নেমে পড়লুম দ্বীপে। ঘুরতে ফিরতে পৌঁছে গেলুম পর্ব্বতের সানুদেশে। রম্য সেই সানুদেশ, আবার তার চেয়েও সুন্দর বলে মনে হোলো গন্ধপাষাণ (sulphur)-বতী তার উপত্যকা। তারি পাশে জল ঝরাচ্ছে ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝরণা। কী শীতল তার গোত্রবারি (nobly protected water)! স্বচ্ছ জলতলে ভেসে আসছে অরবিন্দ আর ইন্দীবরের মকরন্দবিন্দুর চন্দ্রক। নির্ঝরিণীর ধারে ধারে কুঞ্জলতা, তরুকানন, ফুটে রয়েছে নানান রঙের নানান রূপের মঞ্জু ফুলের মঞ্জরী। সেই স্থানটি এত সুন্দর যে, তৃপ্তি ভুলে যায় চোখ। সৌন্দর্য্যে আবিষ্ট হয়ে কখন না জানি অলক্ষিতে উঠে পড়েছিলুম ক্ষৌণীধরের শিখরে! একেবারে পরাভূত হয়ে গেলুম সেখানকার পদ্মপরাগধূসর সরোবরটিকে দেখে। পদ্মরাগমণির শিলা দিয়ে গড়া তার সোপান। রাঙা করে রেখেছে দিগন্ত।

সরোবরের জলে নেমে গন্ধস্নান সারছি, অমৃতের মত স্বাদু আস্বাদন করছি কচি কচি মৃণাল, আমার কাঁধে এসে লাগছে কহ্লারের কমনীয়তা, এমন সময়ে আচম্বিতে সেখানে আবির্ভূত হলেন একটি রুদ্ররূপী ব্রহ্মরাক্ষস। ভর্ৎসন করে প্রশ্ন করলেন—

"কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ?"

নির্ভয়ে উত্তর দিলুম—

"সৌম্য, আমিও দ্বিজন্মা। শত্রুহস্ত থেকে সমুদ্র, সমুদ্র থেকে যবনের বহিত্র, বহিত্র থেকে এই বিচিত্র-শিলা মহাপর্ব্বতে পৌঁছে, স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে করতে সরোবরে এখন স্নানে নেমেছি, এবং বিশ্রাম করছি। আশা করি আপনার সব কুশল।"

চীৎকার করে উঠল ব্রহ্মরাক্ষস। বললে—

"বাঁচতে যদি চাও আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে। না পার, তোমাকে আহার করব।"

আমিও বললুম—

"বেশ, তাই হবে, করুন প্রশ্ন।"

তখন আমাদের মধ্যে একক—আর্য্যাছন্দে এই সংলাপটি হোলো।

"কিং ক্রূরং স্ত্রীহৃদয়ং কিং গৃহিণঃ প্রিয়হিতায় দারগুণাঃ।
কঃ কামঃ সংকল্পঃ কিং দুষ্করসাধনং প্রজ্ঞা।"

[অর্থ]:—

প্রশ্ন—"ক্রূর কি ?"
উত্তর—"স্ত্রীহৃদয় ।"
প্রশ্ন—"গৃহী কে ?"
উত্তর—"যার আছে প্রিয়কল্যাণী গুণবতী ভার্য্যা ।
প্রশ্ন—"কাম কি ?"
উত্তর—"সংকল্প ।"
প্রশ্ন—"কি সাধন করা দুষ্কর ?"
উত্তর—"প্রজ্ঞা ।"

প্রশ্নোত্তর দিয়ে পুনশ্চ বললুম—

"ধূমিনী, গোমিনী, নিম্ববতী ও নিতম্বতীর সোপদেশ আখ্যায়িকা আমার উত্তরের প্রমাণ ।"

"বেশ, কী রকমের আখ্যায়িকা, আমাকে শোনাও ।"

আমি তখন প্রথমটির উদাহরণ দিলুম ।

১। একটি জনপদ ছিল—তার নাম ত্রিগর্ত্ত। সেখানে বাস করত তিনজন গৃহপতি। অর্থের প্রাচুর্য্যে তারা স্ফীত হয়ে উঠেছিল। তারা তিনজনই সহোদর ভ্রাতা। তিনজনের নাম যথাক্রমে ধনক, ধান্তক, ও ধন্যক। তাদের জীবদ্দশায় দেশে দেখা দিল অনাবৃষ্টি। দ্বাদশ-বৎসর বর্ষণ করলেন না ইন্দ্রদেব।

ক্ষীণসার হোলো শস্য, ওষধিরা তোলো বন্ধ্যা, প্রকাণ্ড গাছে ফল নেই। মেঘেরা ক্লীব, নদীর ধারা গেল বদলিয়ে। পল্বলগুলি পঙ্কশেষ, ঝরণায় নেই জল, বিরল হয়ে গেল কন্দ, মূল, ফল। মানুষের মুখে কথাবার্ত্তা নেই, কল্যাণোৎসব সব বন্ধ। বেড়ে গেল চোর-ডাকাতের আড্ডা, আরম্ভ হয়ে গেল প্রজাদের মধ্যে লুঠতরাজ, এ ওকে খায়, তো, ও একে খায়। জনপদের এখানে সেখানে দেখা যেতে লাগল অগণ্য নর-কপাল—বলাকাদের মত পাণ্ডুর তাদের রং। মুখ হাঁ করে মণ্ডলে মণ্ডলে উড়তে লাগল কাক, শূন্য হয়ে গেল নগর, গ্রাম, খর্ব্বট, পত্তন ইত্যাদি।

বিপদে পড়ল তিনজন গৃহপতি। তারা ধনী হলে হবে কি ? ধীরে ধীরে প্রলয় এল তাদেরও সংসারে ;—ধানের অতগুলি গোলা, শূন্য হয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল। গৃহপালিত ছাগ, ভেড়া, গরু, মহিষ—এইসব ভক্ষণ করে জীবনধারণ, কিছুকাল তাদের চলল। তারপরে একটি একটি করে কাটা হতে লাগল—দাস, দাসী, তাদের আপনার জন, তারপরে শিশু, ছেলে ; তারপরে যখন প্রাণের দায়ে নেওয়া হয়ে গেল বড়বৌ এবং মেজবৌ-এর প্রাণ তখন সময় এল ছোট বৌকে বধ করবার। কিন্তু ছোট বৌ ছিল ধন্যকের অত্যন্ত ভালবাসার বৌ। নিজের স্ত্রীকে ভক্ষণ করতে অক্ষম হোলো ধন্যক, তাই নিশীথে "ধূমিনী"কে সঙ্গে নিয়ে গৃহত্যাগ করে গেল পালিয়ে। ছোট বৌ ধূমিনী পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়, ধন্যক তাকে বহে নিয়ে চলে পথে। চলতে চলতে তারা প্রবেশ করল একটি বনে। ক্ষুধায় অন্ন নেই, পিপাসায় জল নেই। নিজের দেহ থেকে রক্তমাংস কেটে কেটে ধন্যক খাওয়াতে লাগল ধূমিনীকে। এমন সময় তাদের দৃষ্টিপথে পড়ল একটি পুরুষ মানুষ। তার হাত, পা, কান, এবং নাক—কাটা, সর্ব্বাঙ্গে ঘা, বনের মধ্যে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট করছে। সেই ভয়ঙ্কর বিকৃতির রূপ দেখে ধন্যকের মন করুণায় ভিজে গেল। তাকেও সে কাঁধের উপর তুলে নিলে। তারপরে প্রবেশ করল গহন বনে। সৌভাগ্যবশতঃ সেখানে পাওয়া গেল কন্দ, মূল, ফল এবং মৃগ। সেইখানেই সযত্নে পর্ণকুটির রচনা করে তিনজনে বাস করতে লাগল। বিকৃত পুরুষটির ব্রণ ক্ষত ইত্যাদি ইঙ্গুদী তৈলের উপচারে ধীরে ধীরে নিরাময় করে শাকপাতা আমিষাদি পুষ্টিকর পথ্য দিয়ে ধন্যক তার ফিরিয়ে আনল স্বাস্থ্য। নীরোগ পুরুষের মত সে ক্রমে উদ্রিক্তধাতু হয়ে উঠল। তার পরে একদা যখন ধন্যক মৃগান্বেষণে বনান্তরে প্রস্থান করেছে, তখন তার স্ত্রী কামাতুরা ধূমিনী সেই পুরুষটির কাছে প্রার্থনা করল প্রেম-প্রসঙ্গ, এবং শেষ পর্য্যন্ত ভৎর্সিতা হয়েও বলপ্রয়োগে দেহের ক্ষুধা মেটাতে দ্বিধা করল না।

স্বামী ক্লান্ত হয়ে কুটিরে ফিরে আসে। ধূমিনীকে বলে—"একটু জল দাও!" ধূমিনী উত্তর দেয়, "কুয়ো থেকে জল তুলে নাও, আমার শিরোরোগ, মাথায় বড় ব্যথা ।"—ধন্যকের সামনে ফেলে দিল জল তোলবার ঘড়া (উদঞ্চন) আর দড়ি। তারপরে যখন ধন্যক জল তুলছে কুয়ো থেকে তখন পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে কুয়োর ভিতরে অতলে তাকে ফেলে দিতে একটুও বাধল না ধূমিনীর। এবং তারপরেই বিকৃত পুরুষটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে পর্ণকুটির থেকে অন্তর্হিত হোলো ছোটবৌ। সেই অবস্থায় ফিরতে লাগল দেশে দেশান্তরে।

বিকলাঙ্গ স্বামীকে নিয়ে ভিক্ষা করছে স্ত্রী, পাতিব্রত্যের এই নিদর্শন দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগল দেশদেশান্তরের লোক। পূজা পেতে দেরী হোলো না ধূমিনীর। তারপরে একদা সে অবন্তিরাজের চোখে পড়ে গেল। রাজার অনুগ্রহ লাভ করে শেষে অতিপ্রসিদ্ধা হয়ে সুখে বাস করতে লাগল অবন্তী দেশে।

এদিকে সেই বনের মধ্যে ভাগ্যবশতঃ জলান্বেষী লোকেদের কানে পৌচেছিল ধন্যকের আর্ত্তনাদ। জল তুলতে এসে তারা উদ্ধার করে সঙ্কটাপন্ন ধন্যককে। ধন্যক তখন আর কি করবে! সেই অবন্তী দেশে আহারের চেষ্টায় ঘুরতে লাগল—নিরন্ন এক ভিক্ষুক। হঠাৎ ধূমিনী একদা তাকে দেখতে পেল নগরের পথে। উর্ব্বর মস্তিষ্ক জোগাল বুদ্ধি। জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চীৎকার করতে লাগল—"এই দুরাত্মাটাই আমার স্বামীকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে।" রাজার কাছে যখন আবেদন পৌছল তখন অজ্ঞতার পরাধীন হয়ে রাজা আদেশ দিলেন, সাধু সেই ধন্যকের—চিত্রবধ। পিছনে দড়ি বাঁধা, বধ্যভূমিতে নীত হোলো ধন্যক। কিন্তু তখনও বোধ হয় তার আয়ুঃর কিছু বাকি ছিল, তাই ধন্যকের মুখ থেকে রাজার চরণে শেষ ভিক্ষা, শেষ প্রার্থনা পৌছল—"মহারাজ, যাকে আমি বিকলাঙ্গ করে দিয়েছি, সেই ভিখারী আমাকে একবার দেখুক, বলুক,—আমি পাপ করেছি ; তারপরে আমার জীবনে নেমে আসুক আপনার পবিত্র রাজদণ্ড।"

"এই আবেদনে দোষের কিছু তো নেই,"—এই সাব্যস্ত করে রাজা আদেশ দেন—"সেই বিকলাঙ্গকে নিয়ে এস।" বিকলাঙ্গ এল। ধন্যককে দেখল। চোখ ফেটে তার জল ঝরতে লাগল। তারপর ধন্যকের পায়ে পড়ে কী তার ভাগ্যবান ক্রন্দন! সত্য এবং মিথ্যা, সুকৃত এবং দুষ্কৃত রাজার আর্য্যবুদ্ধির কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। তারপরে এল ক্রোধ। আদেশ দিলেন—"ধূমিনীর বিরূপ করে দাও মুখ, ঐ দুষ্কৃতকারিণী কুকুরগুলোর জন্যে চিরদিন পাচিকা হয়ে থাকবে।" রাজার প্রসাদভূমিতে আরোহণ করল সার্থক ধন্যক। তাই বলেছিলুম, "স্ত্রীহৃদয় অতি ক্রূর।" [ক্রমশঃ।
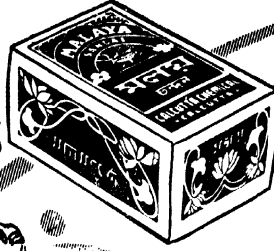
আকর্ষণীয় সৌন্দর্য্যের জন্য
ক্যালকেমিকোর
মলয় চন্দন সাবান
শরীর স্নিগ্ধ রাখে চন্দনের গন্ধে চিত্ত প্রসন্ন করে।
ক্যাষ্টরল...
সুপরিশ্রুত মধুর সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল। ব্যবহারে চুল ঘন, চিকণ ও রেশমের মত মসৃণ হয়।
লাবণি স্নো ও ক্রীম
মুখের শ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে। দিনের প্রসাধনে স্নো ও রাত্রে ক্রীম ব্যবহার্য্য।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯
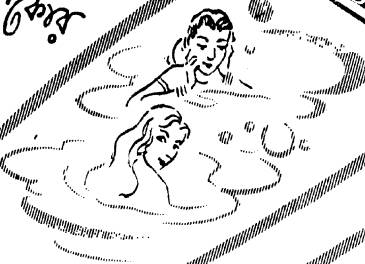
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

শান্তিডাঙ্গা রোডের কুখ্যাত গুণ্ডা-অধ্যুষিত বস্তির সম্মুখে রাস্তার ওপারে বিরাট দ্বিতল অট্টালিকাটি ছিল এ অঞ্চলের এক ধনী অভিজাত-পরিবারের। এই পরিবারের শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন রায় বাহাদুর সুখেন্দ্রলাল দত্ত। তিন-চার পুরুষ যাবৎ তাঁদের এইখানে বসবাস। গুণ্ডা-অধ্যুষিত পল্লীতে বাস করলেও তাঁদের এ যাবৎ কোনও অসুবিধা হয় নাই। বরং এই পাড়ার প্রখ্যাত গুণ্ডা সর্দ্দার শ্যামা পাঞ্জাবী সাক্ষাৎ মাত্র তাঁকে সেলাম জানিয়েই এসেছে, কিন্তু সম্মুখের ঐ বস্তির কয়েক ব্যক্তি সারা রাত্রি এতো অধিক হাল্লা সুরু করেছিল যে তিনি তা সহ্য করতে পারছিলেন না। একদিন তিনি এদের এই ব্যবহারে তীব্র প্রতিবাদ করায় এক জন একটি মাঠ-কোঠার বারাণ্ডা হতে তাঁকে গালিগালাজ করে। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিবরণ জানিয়ে প্রতিকারার্থে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এ যাবৎ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হতে তিনি এর কোনও প্রত্যুত্তর পাননি।

এই দিন সকালে প্রাতর্ভ্রমণের পর তিনি তাঁর গাড়ীটিকে বিদায় দিয়ে বাড়ী ঢুকছিলেন, এমন সময় খোদ শ্যামা পাঞ্জাবী দুয়ারের মুখে তাঁর পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো। শ্যামা পাঞ্জাবীর হাতে একটা টাইপ-করা দরখাস্ত ছিল এবং তার সঙ্গে ছিল আরও কয়েক জন লোক। সেই দিন যে লোকটা দত্ত সাহেবকে গালিগালাজ করেছিল সে-ও এই দিন এদের এই দলে ছিল। বিব্রত হয়ে দত্ত সাহেব ভাবছিলেন, বাড়ী ঢুকে সাহায্যের জন্ম থানায় ফোন করবেন কি না। এমন সময় শ্যামা পাঞ্জাবী এগিয়ে এসে দরখাস্তর কাগজটা তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরে জিজ্ঞেস করলে, 'ইস্ দরখাস্ত আপ ভেজা থে বাবু সাহেব?'

বিস্মিত হয়ে দত্ত সাহেব দেখলেন, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ-করা দরখাস্তটাই শ্যামা পাঞ্জাবী মুঠি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে থেকে দত্ত সাহেব প্রত্যুত্তর করলেন, ইস খত্ তুমনে কেইসেন মিলা? ই'তো বহুত তাজ্জব কা বাত হ্যায়, এঁ্যা!'

'উ বাত মাত পুছিয়ে বাবুসাব', শ্যামা পাঞ্জাবী উত্তর করলো, 'লেকেন ই' কাম করনে ঠিক নেহি থে। হাম'লোক সবকই আপকো বান্দা আছে। আপকো হামকো বোলায়কে সব কুছ বোলনা চাহিয়ে। ঝুটমুট আপ তপলিক কিয়া, বাবু সাহেব! পাড়াকো বদনামি হামি কভি নেহি হোনে দেগা।'

পিতার অপেক্ষায় দত্ত সাহেবের কন্যা হেনা দত্ত বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছিল। শ্যামা গুণ্ডাকে পিতার কাছ ঘেঁসে দাঁড়াতে দেখে সে-ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এতোক্ষণ ধরে তাঁকে নীচে দাঁড়িয়ে ভাবতে দেখে সে ভীত হ'য়ে পিতাকে ডেকে উঠলো, 'ভিতরে চলে এসো বাবা!' হেনা দত্তর কণ্ঠস্বর হতে শ্যামা গুণ্ডা বুঝতে পারলে যে, সে-ও ভয় পেয়েছে। হেনা দত্তের উদ্দেশ্যে সেলাম জানিয়ে শ্যামা পাঞ্জাবী বললো, 'কুছ গড়বড় নেহী, দিদিভাই! হামিতো ইনকো লেড়কা হ্যায়।' শ্যামা পাঞ্জাবী এইবার পিছু ফিরে তার সঙ্গের এক ব্যক্তির চুলে ধরে টেনে এনে দত্ত সাহেবের পায়ের কাছে তাকে ঠেলে দিয়ে বললো, 'এই আদমী আপসে বেইমানি কর চুকা।' এবং এর পর পর শ্যামা গুণ্ডা তার সেই লোকটাকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করতে সুরু করে দিলে। লোকটার মুখ ও ঠোঁট ব'য়ে গল-গল করে রক্ত বার হচ্ছিল, কিন্তু শ্যামা পাঞ্জাবীর সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই; সে সমানে তাকে কিল চড় ঘুষি ও লাথি মেরেই চলছে।

এইরূপ অমানুষিক উৎপীড়ন কেউ শত্রুর উপরও কামনা করে না। এতদ্ব্যতীত ভদ্রসন্তান দত্ত সাহেব সম্পর্কে এই প্রশ্ন আদপেই ওঠে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্যামা গুণ্ডার ব্যক্তিত্ব ও হিম্মত এবং ঐ প্রহৃত ব্যক্তির নিয়মতান্ত্রিকতা দত্ত সাহেবকে মুগ্ধ করে তুলেছিল। তাঁবেদার গুণ্ডা বিধায় প্রহৃত ব্যক্তি শ্যামার সকল অত্যাচার সহ্য করছিল বিনা প্রতিবাদে—যেন এ তার হক পাওনা। অস্ফুট স্বরে দত্ত সাহেবের মুখ হতে বার হয়ে এলো, 'সাবাস শ্যামু! তুমি গুণ্ডা-সর্দ্দারের উপযুক্ত বটে!'

মার-ধোরের পালা শেষ করে শ্যামা পাঞ্জাবী এইবার লোকটার ঘাড়ে ধরে দত্ত সাহেবের দিকে ঠেলে দিয়ে হুকুম করলো, 'যাও, বাবু সাহেবকো গোড় পাকড়ো।' অপরাধী ব্যক্তি দত্ত সাহেবের পা' ধরে মাফি মাঙতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় তাদের পিছনে রাস্তার উপর এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। একটি সুন্দরী সুবেশা নারী একখানি ট্যাক্সী করে সেই পথে এগিয়ে চলছিল। সঙ্গে ছিল তাঁর মাত্র এক জন পশ্চিমদেশীয় ভৃত্য। সহসা তিন-চার খানা অনুরূপ ট্যাক্সী পিছন থেকে এগিয়ে এসে তাদের ঘিরে ফেললে। পিছনের এই ট্যাক্সী কয়টি থেকে নিমিষে প্রায় জন পনেরো-ষোলো গুণ্ডা-প্রকৃতির পুরুষ নেমে এসে সম্মুখের ট্যাক্সীতে উঠে তার আরোহী সুন্দরী মহিলাটিকে সকলে মিলে চেপে ধরলে। মহিলাটির সঙ্গের দেশবালী ভৃত্য তার মনিবণীকে রক্ষা করবার জন্যে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে আততায়ীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু তাদের একজনের ছুরিকার আঘাতে তার এই সামান্য প্রচেষ্টা সেই মুহূর্ত্তেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়ে গেল। মনিবণীর প্রতি একবার কাতর নয়নে সে চেয়ে দেখল এবং তার পর রক্তাক্ত কলেবরে ঘাড় গুঁজে নিচে ভূমির উপর গড়িয়ে পড়লো। গুণ্ডা দলের এক জন এইবার এগিয়ে এসে বাঙ্গালিনী আরোহিণীর ট্যাক্সীর ড্রাইভারটিকে ধরে তার গলা একখানা ছুরী দিয়ে পেঁচিয়ে দুলে দিলে। হতভাগ্য ড্রাইভার পূর্ব্বেও তাদের কাজে যেমন বাধা দেয়নি, তেমনি সে তাদের এই কার্য্যেও বাধা দিতে পারলো না; বিনা প্রতিবাদে বাঙ্গালিনী আরোহিণীর দেশবালী ভৃত্যের

অনুকরণে সেও বিনা প্রতিবাদে রক্তাক্ত কলেবরে নিচের রাজপথে লুটিয়ে পড়লো।

নিমিষে দুটি হত্যাকাণ্ড সমাধা করে গুণ্ডা দল এইবার আতঙ্কে ও ভয়ে অর্দ্ধমৃতপ্রায় মহিলাটিকে পুনরায় চেপে ধরলো। মহিলাটি প্রাণপণে তাদের বাধা দিতে দিতে আর্ত্তনাদ করে পথিকদের সাহায্য-ভিক্ষা করছিল। গুণ্ডা দলের এক জন তার মুখটা কাপড় দিয়ে চেপে ধরে ধমকে উঠলো, 'চুপ করে থাক্ বলছি, নইলে তোকেও শেষ করব।' কিন্তু মহিলাটি বোধ হয় শেষ হয়ে যাওয়াই শ্রেয়: মনে করেছিল, তাই প্রত্যুত্তরে সে তার চীৎকারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল।

শ্যামা পাঞ্জাবী এবং তার 'দলবল এইরূপ একটি ঘটনার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। স্বপল্লীতে অন্য স্থান হতে কেউ এসে হামলা করে যাবে, এ ছিল তাদের পক্ষে বিশেষ অপমানকর। হুঙ্কার দিয়ে শ্যামা পাঞ্জাবী ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'খবরদার, হুঁসিয়ার ভাই সব!' তার পর বাঘের মত সে আগন্তুক গুণ্ডা দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে সাহায্য করবার জন্যে তার পিছনে তার সাকরেদরাও এসে দাঁড়ালো, এমন কি যে লোকটিকে সে এতোক্ষণ মার-ধর করছিল সেও তার পিছন-পিছন ছুটে এলো।

শ্যামা পাঞ্জাবী ছুটে গিয়ে প্রথমে নিজের মাথাটা এক জন গুণ্ডার মাথার সঙ্গে সজোরে ঠুকে দিয়ে বলে উঠলো, 'ডরো মাৎ মা'জী, হাম...।' শ্যামা পাঞ্জাবীর নিরেট মস্তকের সঙ্গে সংঘাতে এদের এক জনের মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে সুরু করলে। আর্ত্তনাদ করে লোকটা মহিলাটিকে ছেড়ে দিয়ে ট্যাক্সী হতে নিচে লাফিয়ে পড়লো। শ্যামা পাঞ্জাবী এর পর অপর এক জনকে দু'হাতে শূন্যে তুলে আছড়ে নিচে ফেলে দিলে এবং তার পর অবশিষ্ট দু'জনকে দু'হাতে ধরে তাদের দু'জনার মাথায় তাদেরই মাথা ঠুকতে ঠুকতে নিচে নামিয়ে আনলো। এদিকে আস্তীনা হতে ছুরী বার করে শ্যামুর সাকরেদরা পথের উপরকার অন্যান্য গুণ্ডাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছে। ভয় পেয়ে আগন্তুক গুণ্ডার দল একটু একটু পিছনে হঠছিল, এমন সময় অপর একখানি ট্যাক্সী করে আরও পাঁচ-ছয় জন গুণ্ডার সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন খোদ বিহারী বাবু।

'এ কেয়া কিয়া তুম্? এঁ্যা,' ধমকে উঠে বিহারী বাবু বললেন, 'আভি ভাগ যাও হিঁয়াসে। সব কুছ মেরি হুকুমসে হোতা। তুম আদমীয়োঁ পছনতা নেহি?' 'আরে কৌন? বিহারী বাবু!' বাম হাতে কপালের ঘাম মুছে শ্যামা পাঞ্জাবী উত্তর দিলে, 'ই হাপনার কাম আছে? লেকেন মেরি মহল্লামে কেঁও আয়া? জানানাকে উপর জুলুম হোনে হাম নেহি দেঙ্গে।'

শ্যামা পাঞ্জাবীর মতি-গতি বিহারী বাবুর অজানা ছিল না। তার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট করার অর্থ জেলের পথ সুগম করা। বিহারী বাবু আর একটি মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করা সমীচীন মনে করলেন না। এই দিন মরিয়া হয়ে তিনি স্বয়ং গুণ্ডা দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে বিহারী বাবু পকেট হতে একটি পিস্তল বার করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তব তুমভি মরো।' তার পর তাক করে তিনি পিস্তলের ঘোড়াটি টিপে দিলেন, আওয়াজ হলো, হুড়্দড়াম্। ধূম উদ্গীরণ করে নিরেট সীসার গুলী বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে শ্যামু পাঞ্জাবীর বক্ষ বিদীর্ণ করে বার হয়ে গেল। কুঠারাহত শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় শ্যামা পাঞ্জাবীর বিরাট দেহটা ঘুরপাক খেয়ে মাটির ওপর আছড়ে পড়লো।

প্রিয় সর্দ্দারজীকে এইরূপ নির্ম্মম ভাবে আহত হতে দেখে শ্যামার সাঙ্গোপাঙ্গগণ ছুটে গিয়ে তার দেহটা ঘিরে বসে পড়লো তাকে শুশ্রূষা করবার জন্যে। এই অবসরে বিহারী বাবু তার দলের লোকদের হুকুম দিলেন, 'যাও, কাম ফতে করো, আভি।' হুকুম পেয়ে আগন্তুক গুণ্ডাগণ সকলে মিলে মহিলাটিকে পিছমোড়া করে একটা কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেললে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহিলাটি তার গলায় লকেট সহ একটা হার খুলে দত্ত সাহেবদের দোতলার বারাণ্ডায় ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'প্রণব বাবুকে জানাবেন আমাকে বিহারী বাবুর দল ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই থানার ইনেস্পেকটার তিনি; প্র-ণ-ব-বাবু-উ।'

বিহারী বাবু ছুটে এসে বাম হাতে মহিলাটির মুখ চেপে ধরে ডান হাতে পকেট থেকে ক্লোরোফর্মের শিশি বার করে দাঁত দিয়ে ছিপি খুলে সেটা তার নাকের নিচে ধরলেন। মুখ বন্ধ করে দেওয়ায় মহিলাটির দম এমনিই বন্ধ হয়ে আসছিল, জোরে জোরে বার কতক নিশ্বেস নিয়ে মহিলাটি নিস্তেজ হয়ে পড়লো। এই সুযোগে বিহারী বাবুর নির্দ্দেশে গুণ্ডার দল তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিজেদের একটা ট্যাক্সীতে তুলে নিলে। এবং তার পর সব কয়টি ট্যাক্সীতে ষ্টার্ট দিয়ে তারা সকলে দ্রুতবেগে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে সরে পড়লো। এদিকে শ্যামা পাঞ্জাবীর সাকরেদরা তখনও পর্য্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে তাদের সর্দ্দারের শুশ্রূষা করছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তারা উপলব্ধি করলো, তাদের প্রিয় নেতা ইতিমধ্যেই ইহলোক হতে বিদায় গ্রহণ করেছে। যে হাঙ্গামা তারা তাদের নেতার নির্দ্দেশে সুরু করেছিল, নেতার অবর্ত্তমানে তাদের কাছে তার কোনও মূল্যই নেই। এদিকে বেশীক্ষণ এখানে উপস্থিত থাকলে এই সকল খুন-খারাপির ব্যাপারে তাদেরও জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে; কারণ, তারা সকলেই ছিল এই অঞ্চলের মার্কা-মারা দাগী গুণ্ডা। চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রিয় নেতাকে সেলাম জানিয়ে এইবার তারাও একে একে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে সরে পড়লো। তাদের পিছনে পড়ে রইলো মাত্র রক্তাক্তকলেবর তিনটি বিকৃত-অঙ্গ মৃতদেহ।

দত্ত সাহেবের বাটীর উপরের বারাণ্ডায় তাঁর সপ্তদশী কন্যা হেনা দত্ত ও তাঁর শিশুকন্যা অনিতা এবং নিম্নে গেটের নিকট দত্ত সাহেব স্বয়ং নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা পরিদর্শন করলেন। নিজেরাও যে এই সঙ্গে বিপদাপন্ন হননি এই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান ব্যতীত এই সম্পর্কে অন্য কিছু করবার তাঁদের ক্ষমতাও ছিল না। এদের এই অপকার্য্যে বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, এতোক্ষণ কারুর বাক্‌স্ফুরণ পর্য্যন্ত হয়নি, নির্ব্বাক্ নিস্পন্দরূপে প্রস্তরীভূত জীবের ন্যায় স্ব স্ব স্থানে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন কতোক্ষণ—তা তাঁদের কারুরই স্মরণ নেই। সহসা দত্ত সাহেবের শিশুকন্যার করুণ আর্ত্তনাদ সকলকে সচকিত করে জাগিয়ে দিলে, দত্ত সাহেবের শিশুকন্যা শ্যামা গুণ্ডার রক্তাক্ত দেহের দিকে চেয়ে সহসা কেঁদে উঠেছিল, 'ও বাবা, শ্যামু কাকা মরে গেছে।' দত্ত সাহেবের শিশুকন্যা অনিতার সঙ্গে শ্যামা পাঞ্জাবীর একটি প্রগাঢ় সম্বন্ধ অজ্ঞের অগোচরে গড়ে উঠেছিল।

যখনই সে ভৃত্যের ক্রোড়ে উঠে বাইরে এসেছে, শ্যামু কাকা তাকে লজেন্স দিয়েছে, খেলনা দিয়েছে, আদরও করেছে। প্রতিবেশী বিধায় এই পল্লীর অন্যান্য শিশুদের ন্যায় সেও তাকে কাকা বলে সম্বোধন করতো। দত্ত সাহেব এই প্রথম উপলব্ধি করলেন, শ্যামা গুণ্ডা ছিল তাঁদের পাড়ার গুণ্ডা, একান্ত আপন জনের মত এতো দিন সে-ই তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করে এসেছে, তা না হলে এই গুণ্ডা-অধ্যুষিত স্থানে তাঁদের পক্ষে সপরিবারে নির্ব্বিঘ্নে বাস করা হয়তো সম্ভব হতো না। অদূরে শায়িত শ্যামার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বারে বারে তাঁর মনে আসছিল শ্যামার অনুযোগ বাণী 'বাচ্ছাপানা সে আপ হামকো দেখতা, তবভি মেবি নামমে দরখাস্ত ভেজা,' এবং সেই সঙ্গে তার অন্য এক দিনের অভয় বাণী, 'কেঁও আপ মহল্লা ছোড়েগা বাবুসাব। দাঙ্গা হাম ইধার হোনে নেহি দেঙ্গে। আপলোককো বাস্তে হাম জান কবুল করেঙ্গে।' বিগত দিনের এমনি আরও কথা দত্ত সাহেবের মনে পড়ে গেল, কিন্তু দুঃখ করার জন্তে তাঁর আর একটুও সময় ছিল না, কারণ তখুনি থানায় একটা সংবাদ না দিলে, তাঁকেই এই জন্ম কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। দত্ত সাহেব ত্বরিৎগতিতে বাড়ী ঢুকে থানায় ফোন করে দিয়ে একটা শোফার উপর ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়লেন।

এইরূপ একটি সাংঘাতিক মামলা সম্পর্কীয় সংবাদ পাওয়া মাত্র একটা পুলিশের দল নরেন বাবুর নেতৃত্বে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে। এইরূপ একটি সাংঘাতিক মামলার তদন্তে বহু রক্ষীর প্রয়োজন হয়ে থাকে; তাই নরেন বাবুর সঙ্গে প্রণব বাবু, ইয়ুসুফ সাহেব, সুধীর বাবু এবং অন্যান্য অফসারও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাজপথের উপর শায়িত তিনটি মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে নরেন বাবু বললেন, 'বাপ রে বাপ, এ তো ট্রিবল মার্ডার। এক্ষুনি বড় সাহেবকে খবর দাও, ডেপুটি সাহেবকেও, এ ছাড়া একটা নারী-হরণের ব্যাপারও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, বোধ হয় অপহৃতা মহিলাটিকেও এতোক্ষণে তারা শেষ করে দিয়েছে। প্রথমে আমাদের তদন্ত করে বার করতে হবে ঐ অপহৃতা নারীটির নাম ও ঠিকানা। তাহ'লেই এই সাংঘাতিক মামলার এখুনি কিনারা হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এই তো সামনেই দত্ত সাহেবের বাড়ী। এসো তো, দেখি উনি কি বিবৃতি দেন, উনি তো পুরো ঘটনাটাই দেখেছেন বললেন।'

পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই দত্ত সাহেব নীচে নেমে এসেছিলেন। ইয়ুসুফ সাহেব ও সুধীর বাবুকে বাইরের তদন্তে নিযুক্ত রেখে নরেন বাবু প্রণব বাবুকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্ম এগিয়ে এলেন। নরেন ও প্রণব বাবুকে বাইরের কক্ষে ডেকে এনে দত্ত সাহেব আদ্যোপান্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে বলছিলেন। যতোই তিনি ঘটনা বিবৃত করেন প্রণব বাবুর মুখ ততোই পাংশু বর্ণ ধারণ করে, একটা দারুণ আশঙ্কা তার মনে বারে বারে উঁকি দেয়। ঠিক এই সময় দত্ত সাহেবের জেষ্ঠ্যা কন্যা হেনা দত্ত ঘরে ঢুকে নরেন বাবুর হাতে অপহৃতা মহিলাটির নিক্ষিপ্ত লকেট সহ হারটা তুলে দিয়ে বললে, 'এইটা আমাদের বারাণ্ডার উপর ছুঁড়ে দিয়ে মহিলাটি চেঁচিয়ে এই থানার প্রণব বাবুকে ঘটনা সম্বন্ধে খবর দিতে বলেছিলেন।' পাগলের মত দ্রেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ঝুঁকে-পড়ে প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন—ঐ সোনার হারের লকেটের উপর খোদাই-করা রয়েছে খুকুরাণীর নাম,—'খুকুরাণী'। প্রণব বাবুর মনে হলো, তাঁর পায়ের তলা হতে বুঝি সমস্ত মাটী ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, তাঁর পদযুগল আর যেন তাঁর দেহের ভার রাখতে পারে না, তিনি হুমড়ি খেয়ে সম্মুখের চেয়ার-খানার উপর পড়ে গেলেন।

'এ কি? প্রণব বাবু! এ কি হলো,' প্রণব বাবুকে ধরে ফেলে নরেন বাবু বললেন, 'শরীর খারাপ হচ্ছে, বাড়ী যাবেন?' হেনা দত্ত নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সে জিজ্ঞেস করলে, 'ঠাণ্ডা জল আনবো?' ইসারায় তাকে বারণ করে প্রণব বাবু উঠে বসে নরেন বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'দরকার হবে না, স্যার, ভালো হয়ে গিয়েছি। এ মেয়েটি কে জানেন স্যার, এ হচ্ছে খুকুরাণী—যে আমাকে খবর দিতো—আমিই স্যার, এই অনর্থের মূল। সব কথা আপনাকে বলতে পারছি না।' স্নেহের সঙ্গে প্রণব বাবুর পিঠে হাত বুলিয়ে নরেন বাবু বললেন, 'আমি তোমার দুঃখ বুঝতে পারছি প্রণব বাবু! কিন্তু সব কথা আমাকে বলতে পারলে ভালোই হতো। আমি সব খবর রাখতাম।' 'আপনি স্যার', চিন্তিত হয়ে প্রণব বাবু বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না।' 'দূর, তাই না কি?' উত্তরে নরেন বাবু বললেন, 'ভুল বুঝবো কেন, আমার কি চোখ নেই? কাউকে জানতে হলে তাকে চিনতে হয়, ভালোবাসতে হয়। তাই সাচ্চা ব্যক্তি ও কর্ম্মীদের আমি সহজে খুঁজে বার করি। তুমি ছেলেমানুষ, অল্প বয়সে পুলিশে ঢুকেছো। কতো প্রলোভন তোমার সামনে, ভুলচুক হওয়ারও সম্ভাবনা পদে পদে। পিতা-মাতার অবর্ত্তমানে এখানে আমিই তোমার অভিভাবক। তোমার ব্যক্তিগত ভালো-মন্দের জন্মও আমি দায়ী। তাই তোমাকে না জানিয়েই তোমাকে আমি ওয়াচ করেছি। কিছু মন্দ বুঝলে নিশ্চয়ই তোমাকে আমি সাবধান করে দিতাম। আমি জানি, ঐ মেয়েটা তোমাকে কতো বেশী ভক্তি করতো, তোমার মনের অবস্থাও আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ও-সব কথা এখোন থাক, উতলা হলে চলবে কেন? সবার উপর হচ্ছে কর্ত্তব্য, মানুষ নয়। কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে আমাদের নির্ম্মম হতে হবে। এখানে ভাই, বন্ধু, পিতা-মাতা কেউই নেই, এখানে থাকবে শুধু ষ্টীম-রোলারের ন্যায় লৌহ-যন্ত্র। এখোন আমরা এদিককার তদন্ত সুরু করছি, তুমি এক্ষুনি রামবাগানের মাঠে চলে যাও, জেনে এসো খুকুরাণী কোথায় ও কেন এই সময় যাত্রা করেছিল।'

খুকুরাণী এই সময় কোথায় যাত্রা করেছিল তা প্রণব বাবুর জানা ছিল না, কিন্তু সে যে কেন ও কিসের তাগিদে এই সময় তার অতো দিনের বাসস্থান ছেড়ে যাত্রা করেছে, তা তিনি ভালোরূপেই বুঝতে পারছিলেন। প্রণব বাবুর চোখ ফেটে জল বার হয়ে আসতে চায়, তার এতো উপকারের এই কি তিনি প্রত্যুপকার দিলেন? কোনও প্রকারে আত্মসংবরণ করে ত্বরিতগতিতে একটা ট্যাক্সী করে প্রণব বাবু রামবাগানের মাঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, সশস্ত্র সিপাহীর অভাবে সঙ্গে মাত্র দু'জন নিরস্ত্র সিপাহী নিয়ে।

উদ্দাম গতিতে নয়া সড়ক ধরে ট্যাক্সী ছুটে চলেছে, তবুও প্রণব বাবুর মনে হয়, গাড়ীর গতি বুঝি স্বল্প; অথচ আরও জোরে চালাতে বলা নিরাপদ নয়। সহসা প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন, অপর একটি ট্যাক্সীতে জন দশ-বারো তাঁকে অনুসরণ করছে। প্রণব বাবু পিছন
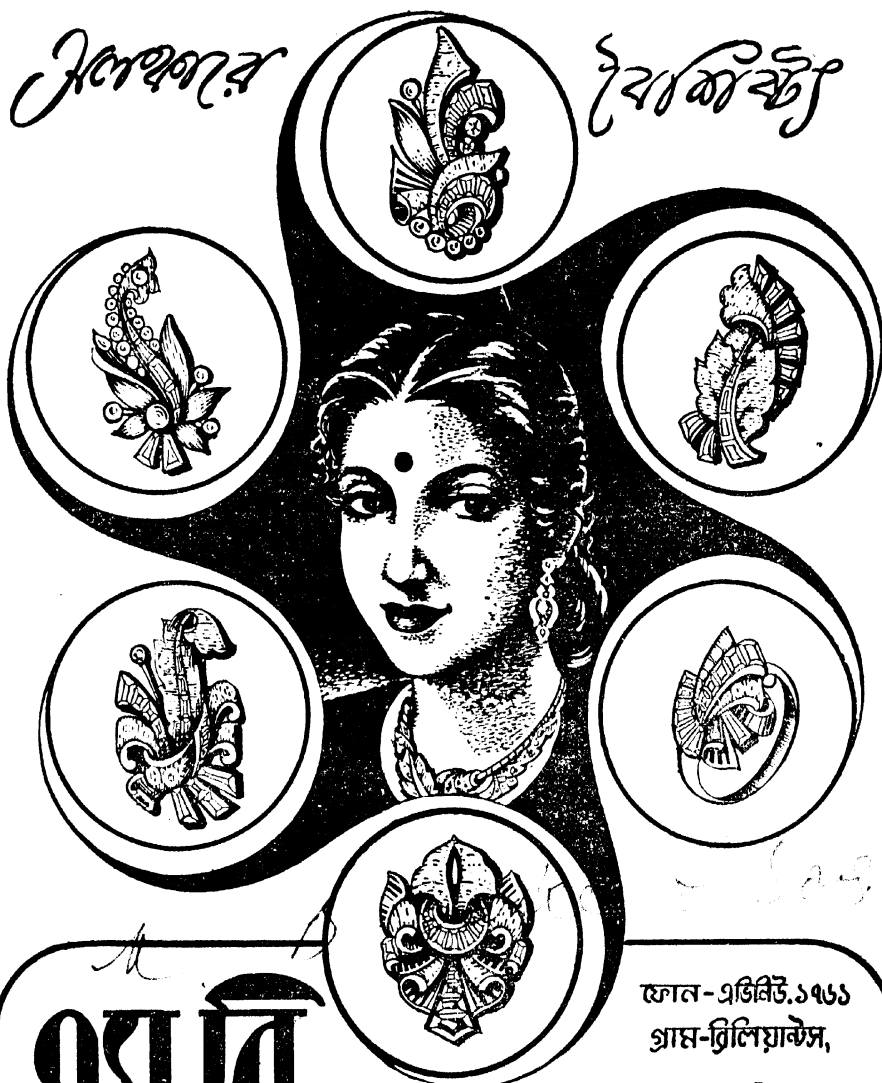
অলঙ্কারে বৈশিষ্ট্য
ফোন-এভিনিউ.১৭৬১
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
সুখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও
বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল) আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীত দিকে
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ: ১৫৯/১বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা : ফোন পি,কে. ৪৪৬৬

ফিরে তাকানো মাত্র ট্যাক্সীটা পাশের একটি গলিতে ঢুকে পড়লো। প্রণব বাবু বুঝলেন এ তাঁর মনের ভুল হবে। সকল সময় বিপদের আশঙ্কা মনে জাগলে এইরূপ হামেশাই ঘটে থাকে। নিশ্চিন্ত হয়ে প্রণব বাবু ড্রাইভারকে রামবাগানের মাঠে ঢুকে পড়তে নির্দ্দেশ দিলেন।

রামবাগানের মাঠের রাস্তায় এসে ট্যাক্সী হতে নেমে পড়ে প্রণব বাবু উপলব্ধি করলেন চারি দিকে একটা থম্‌থমে ভাব। অন্য দিন হলে বহু নারী স্ব স্ব কক্ষের বারাণ্ডায় এসে জমা হতো, কিন্তু এই দিন মাত্র সেখানে দু'-এক জন নারীকে দেখা গেল, নির্লিপ্ত ভাবে তারা সেখানে ঘোরাফেরা করছিল। চারি দিকে শুধু বিষাদের ছায়া, কেমন যেন থম্‌থমে ভাব। মোড়ের পান-বিক্রেতা পর্য্যন্ত বিষণ্ণ মুখে বসে রয়েছে। সকলেই যেন বুঝতে পারছিল যে, এই পাড়ার লক্ষ্মী এই একটু আগে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেছে। জোর করে প্রণব বাবু মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন খুকুরাণীদের প্রবেশ-পথের দরজায় তালা লাগানো। প্রণব বাবুর মনে হলো তাঁর বুকটা যেন কে চেপে ধরে পিষে দিচ্ছে। প্রণব বাবুর নিশ্বাস ফেলতে পর্য্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল।

সম্মুখের বাড়ীর একটি বারাণ্ডার উপর এই সময় এক জন বৃদ্ধা বাড়ীওয়ালী এক জন ভাড়াটিয়ার সহিত এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রণব বাবুকে ক্ষুণ্ণ মনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তার ভাড়াটিয়ানীকে উদ্দেশ করে বললো, 'বাবা, এই দু'-দিন কি অত্যাচারই না করলে, এখোন আবার এইখানে এসেছেন দরদ দেখাতে। সময়ে অসময়ে যে হাত পেতেছে তাকেই মেয়েটা কিছু না কিছু দিয়েছে। এমন ভালো মেয়ে, এ পাড়ায় কেন, গৃহস্থ পাড়াতেও দেখা যায় না। তা তাকেও বলি, পুলিশের সঙ্গে বেশী ভাব করতে তুই বা গেলি কেন? ওরা কি কখোন কারুর হয় না কি? বলি ভদ্রলোকের ছেলেরাই আপনার হয় না, তা ওরা তো পুলিশ! আমরা কতো বারণ করেছি, উত্তরে সে বলতো, 'মাসী! এই তোমাদের উপকারের জন্যই এই সব দরকার। ওঃ, হিংসে করে তাড়ালে, হিংসের কি আছে রে? আমরা কি কেউ কারুর ঘরের বৌ না কি? তাছাড়া চোখের দেখাও তো তোদের কখনো ছিল না। আঃ, দেখ মতি, দেখ; কি রকম ঘোরাফেরা করছে। আবার না আগের মতো উৎপাত সুরু করে দেয়!'

বাড়ীওয়ালী স্ত্রীলোকটির প্রতিটি শ্লেষোক্তি প্রণব বাবুর কর্ণ-গোচর হচ্ছিল। প্রণব বাবু বুঝতে পারলেন আরও বহু ব্যক্তির ন্যায় এই বাড়ীওয়ালী স্ত্রীলোকও তাঁদের ভুল বুঝেছে। কিন্তু প্রণব বাবু আজ আর কারুর উপর রাগ করতে পারলেন না। বরং তাঁর মনে হলো, এই বাড়ীওয়ালী স্ত্রীলোকটিই তাঁকে মামলা সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে পারবে। তিনি আর কালবিলম্ব না করে এই বাড়ীটাতেই ঢুকে পড়ে হেঁকে উঠলেন, 'কে আছো বাড়ীতে! বাড়ীওয়ালী কোথায়?'

প্রমাদ গুণে বাড়ীওয়ালী স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি নিচে নেমে প্রণব বাবুর কাছে এসে পুনরায় দুই পা পিছিয়ে গেল, তার পর বলে উঠলো, 'আসুন বড়ো বাবু, আসুন! আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। ওরে-এ ও গোপালী! শীগ্‌গির নেমে আয়। খোদ বড়ো বাবু এসে গেছেন।' বাড়ীওয়ালী মায়ের হাঁক-ডাকে তার একমাত্র সুন্দরী ষোড়শী কন্যা তাড়াতাড়ি সাজগোছ করে নিচে নেমে আসবা মাত্র, তার মা তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে প্রণব বাবুকে উদ্দেশ করে বললে, 'এই আমার একমাত্র মেয়ে। ও-বাড়ীর খুকুরাণীকে আর কি দেখেছেন, তার চেয়েও সুন্দরী এ বাবু! নাচে, গানে, কথাবার্ত্তায় এ তল্লাটে এর জুড়ি আর কেউ নেই, বাবু! তা এ পথে বাবু, একে এখনও নামাইনি, কি রকম মায়া হয়, হাজার হোক এ পেটের মেয়ে! ওরে, এই! বড়বাবুকে প্রণাম কর।'

প্রত্যুত্তরে গোপালী ঘাড় বেঁকিয়ে প্রণব বাবুর দিকে চেয়ে ফিক-ফিক করে হেসে উঠলো মাত্র। এতোক্ষণে প্রণব বাবুর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল, তিনি গোপালীকে চেঁচিয়ে ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর পাজী মেয়ে! আমি তোর ইয়ার! এক থাপ্পড়ে দাঁত ভেঙে দেবো। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসি হচ্ছে। যা জিজ্ঞেস করবো তার উত্তর দাও আগে।'

মানুষকে এই ভাবে অভ্যর্থনা করতে গোপালী কিশোরী বয়স হতে শিক্ষা করেছিল, এই জন্যে প্রশংসা না পেয়ে এইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করবে তা সে কল্পনাও করেনি! প্রণব বাবুর ধমকানিতে হতবুদ্ধি হয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। পেটের মেয়েকে এইবারে অকারণে ভৎ'সিত হয়ে কাঁদতে দেখে বাড়ীওয়ালী মায়েরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল। সে কোনও প্রকারে আত্মসংবরণ করে প্রণব বাবুকে অনুযোগ করে বললো, 'ওর কি দোষ বাবা, ও কি এতো সব বোঝে—বাচ্ছা মেয়েটা আমার, কাঁদিয়ে দিলেন ওকে!'

প্রণব বাবু এতোক্ষণে নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর মনে হলো, এতোটা বাড়াবাড়ি না করলেই হতো। প্রণব বাবু ভাবছিলেন মামলা সম্পর্কীয় কথাবার্ত্তা কিরূপে সুরু করবেন, এমন সময় দুই-তিনখানি ট্যাক্সি এসে এই বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়ালো। পিছন ফিরে প্রণব বাবু দেখলেন প্রায় জন বাইশ-তেইশ গুণ্ডা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে, তাদের কারুর-কারুর হাতে ছুরী ছিল, এদের একজনের হাতে একটা পিস্তলও দেখা যায়। এদিকে প্রণব বাবু তাঁর সাথী সান্ত্রীদ্বয়ের ন্যায় নিজেও ছিলেন নিরস্ত্র। একত্রে তিনটি হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে তিনি আর সকলের সঙ্গে এতো দ্রুত কোতোয়ালী ত্যাগ করেছিলেন যে, আগ্নেয়াস্ত্র নেবারও তাঁর সময় হয়নি। এদিকে বাড়ীর ভিতর হতে পালাবারও অন্য কোনও পথ ছিল না। প্রণব বাবু বুঝলেন, খুকুরাণী, শ্যামা গুণ্ডা প্রভৃতি যে পথে গিয়েছে, তাঁকেও সেই পথে যেতে হবে। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল বোধ হয় ভিন্ন রূপ। সহসা পিছন হতে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বলে উঠলো, 'খবরদার ভাই সব, বাদশা মিয়াকো হুকুম। ছোড় দেও উনকো।'

গুণ্ডা দল পিছন ফিরে চেয়ে দেখলো, খুকুরাণীর মাষ্টার মশায় রতন বাবু বাদশা মিয়ার পাঞ্জা হাতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। বাদশা মিয়া এবং বিহারী বাবু, এই উভয় ব্যক্তির লোক-জন এই গুণ্ডা দলে মোতায়েন ছিল।

বাদশা মিয়ার লোকেরা পাঞ্জা দেখা মাত্র হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'লোট আ' যাও, ভাই সব, মিয়া সাহেবকো হুকুম।' বিহারী বাবুর লোকেরা কিন্তু এতে মত দিল না, তাদের দলপতি পাল্টা হুকুম দিয়ে বললো, 'কভি নেহি; আভি খতম করো।'

বাদশা মিয়ার হুকুম তামিল হবে না, বাদশা মিয়ার লোকদের তা সহ্যের বাইরে। তারা বিহারী বাবুদের লোকেদের হটিয়ে দিয়ে প্রণব ও রতন বাবুকে বাড়ীর বার করে আনলে। এবং তার পর তাদের দলপতি কুর্নিশ জানিয়ে তাঁদের বাইরে অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে উঠিয়ে বললে, 'ভাগ যাইয়ে, বাবু সাহেব। কুছো ডর না আছে। হামি লোক উনলোকসে ভারি গুণ্ডা।'

দ্রুতগতিতে থানায় ফিরে সশস্ত্র সান্ত্রী দল সহ প্রণব ও রতন বাবু পুনরায় রামবাগানে ফিরে এসে দেখলে, মহল্লার প্রত্যেকটি বাটীর দরজা ও জানলা ভেতর হতে বন্ধ। বেশ্যা নারীরা ভয়ে যে যার কক্ষের অর্গল বন্ধ করে দিয়েছে। উভয় দলের গুণ্ডাদের এক জনেরও আর সেখানে সন্ধান পাওয়া গেল না, তারা ঘটনার অব্যবহিত পরে ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছে।

প্রণব বাবুর আর অন্যত্র তদন্ত করার প্রয়োজন হলো না। প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ তিনি রতন বাবুর নিকট পেয়ে গেলেন। অপরাপর সংবাদ রতন বাবু পেলেন প্রণব বাবুর নিকট হতে। উভয়ে উভয়ের সম্মুখে বহুক্ষণ নতমস্তকে চেয়ে রইলেন, উভয়ের কাছে উভয়েই যেন অপরাধী। এই প্রথম তাঁদের মনে হলো, উভয়ের কাছে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। এখন হতে তাঁদের উভয়কে একযোগে কাজ করতে হবে, ত্বরিতগতিতে খুঁজে বার করতে হবে খুকুরাণীকে।

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে রতন বাবু বললেন, 'সে যাবার আগে বলেছিল তার অবর্ত্তমান আমাদের একযোগে কাজ করতে বাধ্য করবে। আসুন, আমরা দু'জনে মিলে তাকে খুঁজে বার করি। ভাগ্যিস্ আমি খুকুর বাড়ীর তদারক করতে এসে পড়েছিলাম, তা না হলে কি সর্ব্বনাশ হতো, বলুন তো! একটা পিস্তলও সঙ্গে রাখেননি!

প্রণব বাবু রতন বাবুর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁর মন ততোক্ষণে অন্যত্র চলে গিয়েছে। তাঁর কপোলদেশের শিরা-উপশিরা চিন্তায় চিন্তায় ফুলে উঠছিল। মামলা সম্পর্কে আর একটু চিন্তা করে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাদশা মিয়ার পাঞ্জার সাহায্যে এখুনি তার গোপন আড্ডায় ঢোকা যায় না?'

'পাগোল,' রতন বাবু উত্তর করলেন, 'এর কার্য্যক্ষমতা এতোক্ষণে শেষ হয়েছে। এখোন আমি আমার নিজের জীবনও রক্ষা করতে পারি না। এইবার বোধ হয় আমার শেষ হবার পালা। তবে খুকুকে ওরা ওদের ওই আড্ডায় যে নিয়ে যায়নি, এ কথা ঠিক। আমি যতো দূর বুঝছি, ওকে ওরা কোনও ভিখারী সর্দ্দারের হেপাজতে রেখে দেবে, এই কোলকাতাতেই। এই রকম একটা সলা ওদের করতে শুনেছিলাম, খবরটা আমি খুকুকে দিয়েও ছিলাম। কিন্তু সে সাবধান হলো কৈ?' 'থাক ও কথা, এখোন হতে রতন বাবু—প্রণব বাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'আপনার ও আমার পথ এক, মতও এক। আপনি আমার কোয়ার্টারে এসে এই কয় দিন থাকুন। দু'জনা মিলে আমরা তাকে এক্ষুনি খুঁজে বার করবো।'

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

৫

এখন কলিকাতার অলিতে গলিতেই নহে পল্লীগ্রামের মেঠো পথেও বাইসাইকেলের বাহুল্য বিবেচনা করিলে যে সময় সাইকেল ছিল না, সে সময় কল্পনা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতাতেও সাইকেলের আমদানী হইয়াছিল কি না, সন্দেহ।

অনেক জিনিষেরই উদ্ভবের ইতিহাস এবং উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়—গবেষণা পরাভূত হয়। সাইকেলেও সেই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বা প্রায় সেই সময়ে ইংলণ্ডবাসী ফরাসী ব্যারন ভন ড্রেইস নাকি প্রথম বর্ত্তমান বাইসাইকেলের পূর্ব্বপুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে নাকি এজওয়ার্থ ঐ জাতীয় এক প্রকার যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথমে যানের চাকা কাঠের ছিল—লোহার নহে।

ক্রমে বিবর্ত্তনের ফলে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পা-গাড়ী কতকটা সুব্যবহার্য্য হইলেও লোহার হাল দেওয়া কাঠের চাকার যানকে যে তখন "হাড়কাঁপান" (Boneshaker) বলা হইত, তাহা অসঙ্গত নহে। যখন লোহার হালের স্থানে রবারের ব্যবহার হয়, তখন অনেকটা উন্নতি সাধিত হয় এবং তাহার পরে ফাঁপা অর্থাৎ হাওয়া-ভরা রবারের টিউব বা নল ব্যবহৃত হইতে থাকে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বা ঐরূপ সময়ে যখন প্রথম য়ুরোপ হইতে এ দেশে সাইকেল আমদানী আরম্ভ হয়, তখন তাহা অদ্ভুত যান বলিয়াই লোক চাহিয়া দেখিত। ইংরেজরা প্রথমে উহার ব্যবহার করিতে থাকেন।

তাহার কিছু দিন পরে সৌখীন বাঙ্গালীর সমাজে সাইকেল ব্যবহার আরম্ভ হয়। যাঁহারা প্রথমে তিন চাকার পা-গাড়ী ব্যবহার আরম্ভ করেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদিগের অন্যতম। তখন তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই থাকিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ পার্ক ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে থাকিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতি দিন প্রাতে জোড়াসাঁকোর বাড়ী হইতে তিন চাকা পা-গাড়ীতে চীৎপুর রোড দিয়া চৌরঙ্গী পার হইয়া পার্ক ষ্ট্রীটে যাইতেন। পাজামা পরা—চাপকানচোগাধারী—মাথায় পাগড়ী; যাহাকে "ফুল ড্রেস" বলে তাহাই। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন, সেকালের পিরালী পরিবারের কর্ত্তা; পুত্রদিগকেও তাঁহার নিকট যাইতে হইলে "দরবারী" বেশে যাইতে হইত। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গল্প আছে, এক বার চাপকান হাতের কাছে না পাইয়া তিনি একটি চোগা সোজা ও একটি উল্টা করিয়া পরিয়া গিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঐ বেশে যখন গড়ের মাঠের পাশ দিয়া গাড়ীতে যাইতেন, তখন তাঁহার শ্মশ্রুরাজি অবাধে উড়িতে থাকিত।

শুনা যায়, এক বার একজন প্রার্থী দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকটে আসিয়া কন্যার বিবাহের জন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা করে। তখন তাঁহার হাতে টাকা ছিল না; তিনি প্রার্থীকে ঐ সাইকেল দিয়া বলেন, "সাবধানে নিয়ে যাও—হেমেন্দ্র যেন দেখতে না পান।"—প্রার্থীর ভাগ্য—সে যখন উহা লইয়া যাইতেছে, তখন ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হ'ন এবং সব শুনিয়া প্রার্থীকে কিছু টাকা দিয়া উহা আনিয়া যথাস্থানে রাখেন। উহা যথাস্থানে দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন বিস্ময় প্রকাশ করেন, তখন হেমেন্দ্রনাথ বলেন, "বড়দাদা, ওখানি আমি কিনে নিয়েছি, আপনি ব্যবহার করবেন—কিন্তু দান করতে পারবেন না। কারণ, ও আমার।" দ্বিজেন্দ্রনাথ মনের আনন্দে উচ্চ হাসি হাসিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববৎই উহা ব্যবহার করিতেন বটে কিন্তু আর কাহাকেও দান করেন নাই।

'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রনাথ বসু বিশালবপু ছিলেন। তিনি চাকার পা-গাড়ী চড়িতে তাঁহার সখ হইলে তিনি আপনার দেহের ভার কিরূপ তাহা লিখিয়া ইংলণ্ডে কোন সাইকেলের কারখানা হইতে নিজ ব্যবহার জন্য একখানি যান প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছিলেন। দুই-চারি দিন উহাতে চড়িবার পরেই যখন তাঁহার সখ মিটিয়া যায়, তখন তিনি উহা বিক্রয় করিবার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার সখ করিয়া আনান যান বিক্রয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুরসিক যোগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—হ্যারিসন রোড চওড়া রাস্তা, সেই রাস্তার ধারে বাড়ী করিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, ঐ গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইবেন; কিন্তু দেখিলেন, তিনি ও তাঁহার গাড়ী রাস্তায় উভয়ের স্থান হওয়া দুষ্কর। শুনিয়াছি, তাঁহাকে ঐ গাড়ীতে চড়িয়া যাইতে দেখিয়া পাড়ার ছেলেরা হাততালি দিয়া হাসিয়াছিল।

প্রথম যে বাই-সাইকেল আমদানী হয়, তাহার সম্মুখের চাকা বড়, পশ্চাতের চাকাখানি ছোট। মাত্র কয় জন য়ুরোপীয় সে যান ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের নাম—বিলি ব্রাডশ। তিনি যখন এক দিন সকালে ঐ যানে কলিকাতার দক্ষিণে হেষ্টিংসে—ক্লাইভ রো দিয়া যাইতেছিলেন, তখন সমর বিভাগের সরবরাহ উপবিভাগের একটি দামড়া ঐ যান দেখিয়া উগ্র হইয়া পশ্চাতের চাকার মধ্যে সিং ঢুকাইয়া টানিয়া তুলে। আরোহী ছিটকাইয়া পথিপার্শ্বস্থ গৃহের বেড়া টপকাইয়া গৃহস্বামীর আহারের টেবলের উপর যাইয়া পড়েন।

আর এক জন য়ুরোপীয় বাই-সাইকেল ব্যবহারকারীর নাম—মিচেল। মহিলাদিগের মধ্যে তাঁহার দুইটি সুন্দরী কন্যা প্রথম ঐরূপ যান ব্যবহার করিতেন।

প্রথম যানগুলি বিশেষ দৃঢ় ছিল না। এক দিন জন ডিউয়ার নামক এক জন ইংরেজ যখন সঙ্গীণ ও বন্দুক লইয়া কুচকাওয়াজে যাইতেছিলেন, তখন পথে তাঁহার যান ভাঙ্গিয়া যায় ও তিনি "চিতপটাং" হইয়া পথে পড়িয়া যান। তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ডিউয়ার তাহাতে এতই ক্রুদ্ধ হ'ন যে, কোনরূপে উঠিয়া খাপ হইতে সঙ্গীণ বাহির করিয়া বন্ধুকে তাড়া করেন। বন্ধু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন।

সাইকেলে দ্রুত পথ অতিবাহিত করা যায় বলিয়া ইহার ব্যবহার বাড়িতে বিলম্ব হয় নাই। অনেকে হয়ত জানেন না, সেকালে

ভারতেও দ্রুত পথ অতিক্রম করিবার জন্ত "রণপা" ব্যবহৃত হইত। দুইখানি দীর্ঘ যষ্টিতে পা রাখিবার ব্যবস্থা থাকিত এবং পথাতিবাহী তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্রুত চলিতে পারিত।

স্থূল রবারের পরিবর্তে যখন ফাঁপা রবারের চাকা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বাই-সাইকেল চড়া যেমন আরামপ্রদ হয় তেমনই তাহার ব্যবহার বাড়িয়া যায়। সেই সময় বাঙ্গালী তরুণরাও তাহা ব্যবহারের অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার উত্তরাঞ্চলের এক দল যুবক প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া সাইকেলে বারাকপুরের দিকে যাইতেন। গরু, ঘোড়া ও কুকুর তথনও এই নূতন যান দেখিতে অভ্যস্ত হয় নাই। সেই জন্ম বাই-সাইকেল দেখিলে গরুর বা মহিষের গাড়ীর গরু মহিষ চঞ্চল হইয়া উঠিত—যান ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিত; আর কুকুরগুলি চীৎকার করিতে করিতে যানের পশ্চাদ্ধাবন করিত। পাছে কুকুর কামড়ায় সেই ভয়ে আরোহীরা সঙ্গে চাবুক লইয়া যাইতেন—কুকুর তাড়া করিলে তাহা আস্ফালিত করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইতেন।

প্রথম যখন রেলগাড়ী চলে, তখন গ্রামের লোক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহা দেখিত; তখন গ্রাম্য কবির গান—

"কি কল বানালে সাহেব কোম্পানী!
কলেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি সজনি।"

বাই-সাইকেলও প্রথমে পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের মনে অনুরূপ বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল।

হাওয়া-ভরা ফাঁপা চাকা যখন ব্যবহার আরম্ভ হয়, তখন কিন্তু দুই প্রকার বিপদ ঘটিতে লাগিল :—

প্রথম—চাকায় ছিদ্র হইলে বা চাকা অন্যরূপে জখম হইলে সারান দুর্ঘট হইতে লাগিল;

দ্বিতীয়—ঘোড়ার ও গরু-মহিষের যে সব নাল পথে বা গড়ের মাঠে পড়িয়া থাকিত, সে সকলে লাগিয়া চাকায় যখন তখন ছিদ্র হইতে লাগিল।

হাওয়া-ভরা রবারের চাকাযুক্ত বাই-সাইকেল যাঁহারা প্রথম আমদানী করিয়াছিলেন—ষ্ট্যানলী ওকস্ তাঁহাদিগের অন্যতম। তখন ঐ চাকা সারাইবার কোন ব্যবস্থা এ দেশে ছিল না। এক জন বিব্রত হইয়া বিলাত হইতে "কুশান"—অর্থাৎ ফাঁপা নহে এমন চাকা আনাইয়া লইয়া তবে গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। প্রয়োজন অনেক আবিষ্ক্রিয়ার মূল। উইলশন হোটেলে (গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল) পাচকের কার্য্যরত এক ব্যক্তি প্রথম প্রতি ছিদ্রের জন্ত ৫ টাকা লইয়া ছিদ্র সারাই করিতে থাকে। সে রবারের তামাকের থলিয়া কিনিয়া তাহাই কাটিয়া তালি দিবার কাজে ব্যবহার করিত। সে কিরূপে তালি দিত তাহা জানা যায় না।

এ দিকে তখন বাই-সাইকেল ক্লাব গঠিত হইয়াছে। ক্লাবের সদস্যগণ কলিকাতার উপকণ্ঠে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত চক্কর দিতেন। ঘোড়ার বা গরু-মহিষের নালে তাঁহাদিগের গাড়ীর চাকায় ছিদ্র হইত দেখিয়া তাঁহারা ক্লাবের ভৃত্যদিগকে—গড়ের মাঠের রাস্তায় পতিত নাল কুড়াইবার জন্ত এক পয়সা হিসাবে বক্সিশ দিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দেখা গেল, এত অধিক নাল সংগৃহীত হইতে লাগিল যে, তাহা সন্দেহের কারণ হইয়া উঠিল এবং অনুসন্ধানে জানা গেল, ভৃত্যরা নালবাঁধদিগের নিকট হইতে পাইকারী দামে নাল কিনিয়া আনিয়া—ক্লাবে দেখাইয়া—বক্সিশ আদায় করিত। হবস তাঁহার স্মৃতি কথায় লিখিয়াছেন :—

"One has to be up very early in the morning to be sharp enough for the courteous and wily Ooryah, although greed can be generally relied upon to over-reach itself, as it did in this case."

এমন হইয়াই থাকে।

এ দিকে বাই-সাইকেলের যত উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল তাহা তত লোকপ্রিয়—বিশেষ "ফ্যাশানেবল" হইতে লাগিল। যাহার বাই-সাইকেল নাই সমাজে (অর্থাৎ তৎকালীন ইংরেজ সমাজে) তাহার আদর থাকিত না—সে একটা "কেহ কেটা" বলিয়া বিবেচিত হইত না। তখন ভাল বাই-সাইকেল সাড়ে ৪ শত টাকা হইতে ৬ শত টাকা দামে বিক্রীত হইত। শুনা যায়, সেই সময় কোন ব্যবসায়ী আমেরিকান সাইকেল কোম্পানীর গাড়ীর এজেন্সী লইয়া প্রায় এক বৎসরে অন্যূন ৩৫ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার ইংরেজ সমাজের অনুকরণে বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও বাই-সাইকেলের চলন বাড়িতে লাগিল—তবে বাঙ্গালী তরুণীরা ইংরেজ মহিলাদিগের মত বাই-সাইকেল ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কারণ, তখনও "সেকাল"। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দেও বাঙ্গালায় স্ত্রী স্বয়ংসেবিকার প্রচলন হয় নাই। তাহা পরবর্ত্তী কালের—"স্বদেশী আন্দোলনের"ও পরের।
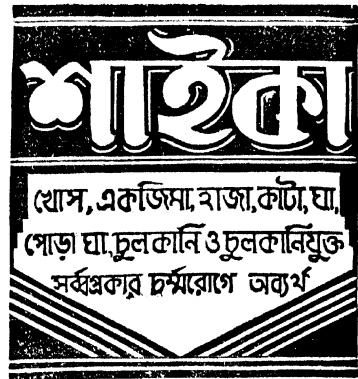
কলিকাতার ইংরেজরা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লালদীঘিতে অবস্থিত "ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে" এক সভা করিয়া "বেঙ্গল সাইক্লিষ্টস এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার সভাপতি—মিষ্টার ম্যাককারশন।

এই সময় কলিকাতার ইংরেজ সমাজে টালিগঞ্জে সান্ধ্য ভোজের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়; এবং পুরুষরা যেমন মহিলারাও তেমনই বাই-সাইকেলে ভোজে যাইতেন। সে যেন শোভাযাত্রা হইত।

এই সময়ে কলিকাতায় সাইকেল চালনার প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রেজার, লান ও লো ৩ জন য়ুরোপীয় সাইকেলে ভূপর্য্যটনে বাহির হইয়া জুন মাসে কলিকাতায় উপনীত হ'ন। যেন সেই—

"নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ
. ভারতের নানা দেশ করি পর্য্যটন,
অবশেষে উপনীত রাজপুতানায়—
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়।"

কলিকাতা তখন ইংরেজ-শাসিত ভারতের রাজধানী—প্রাচীতে সর্ব্বপ্রধান নগর—এ দেশে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র। লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন, ভারতে ইংরেজ-প্রাধান্য দুই ভাগে বিভক্ত—শাসন ও শোষণ। শাসকরা কলিকাতায় রাজধানী করিয়াছিলেন, শোষকরা তাঁহাদিগের সান্নিধ্যে ও আশ্রয়ে কলিকাতায় ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন—শোষকদিগের প্রভাব শাসকদিগের প্রভাব অপেক্ষা অল্প ছিল না, সময় সময় তাঁহারাই শাসকদিগকে পরিচালিত করিতেন। হেমচন্দ্র "ভারত-বিলাপে" কলিকাতার কথায় লিখিয়াছিলেন :—

"অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা,
অলকা জিনিয়া হেন মনোহরা
কা'র রাজধানী? কি জাতি ইহারা—
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায়?
নাহি যদি জান, এস এইখানে,
চলিছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায়।
অদূরে বাহিছে 'রুল ব্রিটানিয়া',
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রিটনবাসীরা
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায়!"

এই কলিকাতায় সাইকেলে ভূপর্য্যটকদিগের সম্বর্দ্ধনার জন্য আগ্রহ লক্ষিত হইল। 'ইংলিশম্যানে' ফ্রেজারের কয়টি প্রবন্ধ পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত হইতেছিল। তখন সণ্ডার্স 'ইংলিশম্যানে'র সম্পাদক। তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। পর্য্যটকরা জুন মাসে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। সেই দারুণ গরমেও কলিকাতার ২৬৫ জন সাইকেল-বিলাসী তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেণে বালী রেল ষ্টেশনে গমন করিলেন। এই ২৬৫ জনের মধ্যে যেমন ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীরা ছিলেন, তেমনই চীনা ছুতার মিস্ত্রীও ছিলেন। সম্বর্দ্ধনাকারীদিগের মধ্যে ২ জন চন্দননগর পর্য্যন্ত যাইয়া পর্য্যটকদিগের সহযাত্রী হইয়া আসিলেন। পর্য্যটকদিগের মধ্যে এক জনের পথে বসন্ত হইয়াছিল—তিনিও অল্পক্ষণ পরে সাইকেলে কলিকাতায় উপনীত হ'ন। বালীর সেতু (বর্ত্তমান ওয়েলিংডন সেতু নহে—বালীখালের উপর তখন যে সঙ্কীর্ণ সেতু ছিল তাহা) হইতে কলিকাতায় প্রিন্সেপ ঘাট পর্য্যন্ত পথে পুলিশ পাহারা ছিল। এক জন লেখক বলেন —"It was a triumphant procession all the way."

কলিকাতায় পর্য্যটকগণ বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কলিকাতায় অবস্থিতি কালে বিষম ভূমিকম্প হয়। সে ভূমিকম্প উত্তরবঙ্গে যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, কলিকাতায় তত প্রবল না হইলেও তাহার ফলে কলিকাতার বহু পুরাতন গৃহ বাসের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়াছিল। পর্য্যটকগণ সেই নূতন অভিজ্ঞতাও সম্ভোগ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতে কি মনে করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না।

পর্য্যটকদিগকে যে "বড় খানা" দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল আহারের ঘরের সজ্জার জন্য ৫০খানি বাই-সাইকেল কক্ষ-প্রাচীরে ঝুলাইয়া নূতন সজ্জার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সাইকেল-বিলাসীদিগের জন্য এক জন বাই-সাইকেল যানে নানা স্থানে গমন করিয়া সাঁওতাল পরগণার যে বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বহু সাইকেল-বিলাসীকে তথায় আকৃষ্ট করিয়াছিল। পথে একটি ছোট নদী থাকায় তিনি নিজ ব্যয়ে তথায় একটি বাঙ্গলো করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সাইকেল-বিলাসী দলে চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয়। ষ্টীভেন্স নামক এক আমেরিকান "ধূলিধূসরিত" অবস্থায় কলিকাতায় সাইকেলে উপনীত হয়। তাহার পরিধেয় ধূলিতে পূর্ণ, তাহার সবল বাহুতে ধূলি স্থায়ী আসন রচনা করিয়াছে। সে পুরাতন ধরণের অচ্ছিদ্র রবারের চাকাযুক্ত বাই-সাইকেলে পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিল। সে, পথে যদি প্রয়োজন হয়, সেই ভয়ে—গাড়ীর নানা অংশ একপ্রস্ত সঙ্গে লইয়াছিল। লোকটি আমেরিকার নিউইয়র্ক হইতে রওনা হইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া কুইনস্ টাউনে যাইয়া তথা হইতে সাইকেলে ডাবলিনে গমন করে। সে তথা হইতে লিভারপুল হইয়া—সমগ্র য়ুরোপ পরিভ্রমণ করিয়া চলে। পারস্যে সে উষ্ট্রযাত্রীদিগের গমনপথে আসিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করে এবং তথায় গ্রেপ্তার হয়। বৃটিশ সরকার তাহার মুক্তির ব্যবস্থা করিলে সে পেশাওয়ারের পথে কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা হইতে চীন যাত্রা করে। তাহার ইচ্ছা ছিল—ব্রহ্মের পথে চীনে যাইবে। কিন্তু তখন ব্রহ্মে যুদ্ধ চলিতেছিল; সেই জন্য তাহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

সে দিনের যানের মধ্যে পাল্কী আজ প্রায় লুপ্ত: ঘোড়ার গাড়ীর প্রয়োজন শেষ হইয়া আসিয়াছে। নৌকার ব্যবহার কমিয়াছে কিন্তু বাই-সাইকেলের ব্যবহার বাড়িয়াই চলিয়াছে ও চলিবে বলিয়া মনে হয়। তাহা আর বিলাসের জন্য নহে—নিত্যপ্রয়োজনে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। আজ তাহার উপযোগিতা তাহার প্রচলনের কারণ এবং দেশের সর্ব্বত্র—সাধারণ গৃহস্থেরও সাইকেল আছে। সর্ব্ববিধ পথে দ্রুত পথাতিক্রমের জন্য ইহা অতুলনীয় এবং অতিঅল্পব্যয়সাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না।
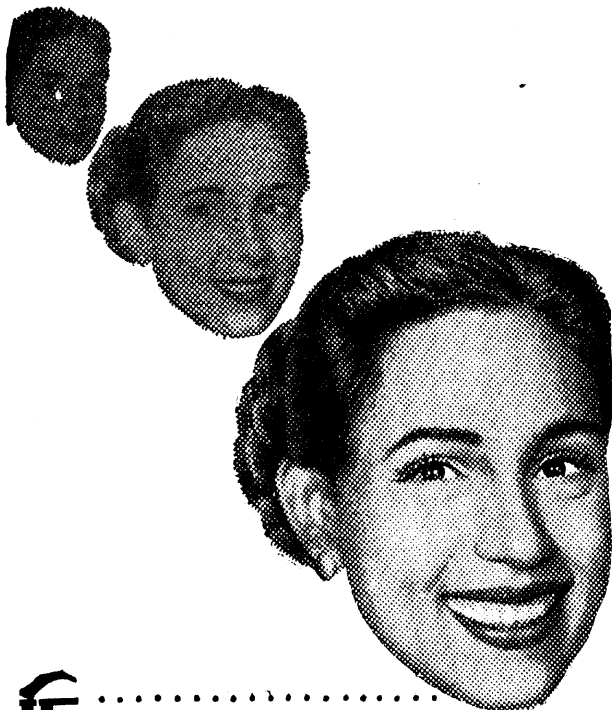
শেষ

লবকুমার বসু

ফুটবল

গত ফেব্রুয়ারী মাসে মহাবোধি সোসাইটির গৃহে আমাদের দেশে ফুটবল খেলার প্রবর্ত্তক স্বর্গত: নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেছিলেন মাননীয় প্রদেশপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি।

আজ এদেশে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বিচার করলে ফুটবলকেই প্রথম স্থান দিতে হবে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাছেই এ খেলাটি অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কিরূপে দশ বৎসরের বালক নগেন্দ্রপ্রসাদের আন্তরিক প্রচেষ্টাতে এদেশে প্রথম এই খেলাটির প্রচলন হয়। সেই বিষয়ে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না নিশ্চয়।

আজ থেকে প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশীয়দের কাছে সম্পূর্ণ ই অপরিচিত ছিল এই ফুটবল খেলাটি। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ একদিন সকালে মাকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন দশ বৎসরের বালক নগেন্দ্রপ্রসাদ। ময়দানে হঠাৎ এক দল গোরাকে এই খেলাটি খেলতে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন বালকটি এবং তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে মুগ্ধ নেত্রে দেখতে লাগলেন সেই অপরিচিত খেলাটি। মনে মনে সঙ্কল্পও করলেন ওটি শেখবার, সেইখানেই দাঁড়িয়ে। পরের দিনই হেয়ার স্কুলের ছাত্র নগেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহপাঠীদের কাছে জানালেন আগের দিনের সকল কথাই। তার পর বালক নগেন্দ্রপ্রসাদ নানা যায়গা থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে ও সহপাঠীদের কাছ থেকে মাত্র কুড়ি টাকা চাঁদা তুলে সঙ্গীদের নিয়ে হাজির হলেন তখনকার একমাত্র ফুটবলবিক্রেতা ম্যানটন কোম্পানীর দোকানে। কিন্তু বলের দাম ছিল বত্রিশ টাকা ; এদিকে তাঁদের কাছে তখন মাত্র কুড়িটি টাকা। তাই দাম শুনে সকলেই অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। দোকানের মালিককে তখন নগেন্দ্রপ্রসাদ বুঝিয়ে বললেন তাঁদের অবস্থার কথা। খুসী হলেন দোকানের মালিক বালকদের এরূপ উৎসাহ দেখে এবং কুড়ি টাকাতেই দিয়ে দিলেন বত্রিশ টাকার বলটি। তার পর আজকের এই জনপ্রিয় খেলাটি বালক নগেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে প্রথম সুরু হল হেয়ার স্কুলের মাঠে। সেদিন এই অপরিচিত খেলাটি খেলতে দেখে হেয়ার স্কুলের সামনের রাস্তাটি পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল এবং স্কুলের প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল এই ভিড়টিকে ঠেকিয়ে রাখা। এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। নগেন্দ্রপ্রসাদ বা তাঁর সঙ্গীরা একেবারেই জানতেন না এই খেলাটির নিয়ম-কানুন ; তাই ভুল করে ফুটবলের পরিবর্ত্তে একটি রাগবী বল কিনে এনেছিলেন। ... দূর থেকে খেলতে দেখে খুবই খুসী হন ; কিন্তু রাগবীর পরিবর্ত্তে সোকার (ফুটবল) খেলতে উপদেশ দেন এবং তিনি নিজে দুটি ফুটবল কিনে তাঁদেরকে দেন। সেই সঙ্গে এই খেলার নিয়মগুলিও তাঁদেরকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর নগেন্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় গড়ে উঠল হেয়ার স্পোর্টিং ক্লাব। এইরূপে বাঙালীদের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রচলন হল। তার পর তাঁরই পরিচালনায় প্রেসিডেন্সী, ওয়েলিংটন, হাওড়া স্পোর্টিং প্রভৃতি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল। ধীরে ধীরে এদেশে ফুটবল খেলাটি প্রসারতা লাভ করতে লাগল। অতঃপর নগেন্দ্রপ্রসাদ আজকের বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন গঠন করলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ফুটবল, ক্রিকেট, হকী প্রভৃতি সব খেলাগুলিতেই নগেন্দ্রপ্রসাদের পারদর্শিতা ছিল এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অষ্ট্রেলিয়া দ্বাদশের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেনে বাঙালী দ্বাদশের অধিনায়কত্ব করেন। তাঁর বিষয়ে অধ্যাপক মন্মথমোহন বোস বলেছেন, "Amongst Indians it was Nagendra Prasad who convinced the European that prowess of the Bengalees was in no way inferior to their intellect ; and the kick of their naked foot perhaps superior to the kick of the men with boots..." অর্থাৎ বিদেশীয়দের কাছে নগেন্দ্রপ্রসাদ প্রমাণ করেছেন যে, বাঙালীর শারীরিক শক্তি তার উর্ব্বর মস্তিষ্কের মতনই প্রখর এবং তাদের নগ্ন পদের ফুটবল খেলা কোন অংশেই বিদেশীয়দের বুট পরে খেলার তুলনায় খারাপ ত নয়ই, বরঞ্চ উঁচু দরের।

এদেশে প্রথম ফুটবল প্রচলনের কথা আলোচনা করতে গেলে আমাদের আর এক জন স্মরণীয় ব্যক্তির নাম করতে হয় ; তিনি হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এক বক্তৃতায় বলেন যে, এদেশের ছেলেদের শারীরিক উন্নতির জন্যে তিনিই প্রথম রাগবী খেলার প্রচলন করেন। কিন্তু রাগবী খেলতে গিয়ে এক জনের মৃত্যু হওয়ায় চারি দিকে ভীতির সঞ্চার হয় এবং এই খেলার প্রতি উৎসাহও কিছু কমে যায়। এই কারণে এবং খেলাটির প্রবর্ত্তক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নিজেও রাজনৈতিক কাজে জড়িত থাকায় খেলাটিকে জনপ্রিয় করবার জন্যে সময় ক্ষেপণ করতে না পারায় ধীরে ধীরে বাঙালীদের ভিতর রাগবী খেলা বন্ধ হয়ে যায়। তার পর নগেন্দ্রপ্রসাদ সোকার খেলাটির প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই হল আমাদের দেশে আজকের ফুটবল খেলাটির আরম্ভের ইতিহাস।

হকী

কলকাতার ময়দানে এখন হকী খেলা পুরোদমে চলেছে। লীগের খেলাগুলি সাধারণের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। তার ওপর এ বছরে বাইরে থেকে বহু নাম-করা খেলোয়াড়ের আগমন হওয়ায় এর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর প্রদেশের কৃতী খেলোয়াড় বাবু এ বছর ভবানীপুর দলে যোগ দিয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাবু বিগত হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় হকী দলের অধিনায়কত্ব করেন এবং ভারতীয় দল তাঁরই পরিচালনায় পঞ্চম বারের স্বর্ণপদকটি লাভ করতে সক্ষম হয়। বাবু ছাড়াও বহু প্রখ্যাত অবাঙালী খেলোয়াড় এ বছর কলকাতার বিশিষ্ট ক্লাবগুলির হয়ে খেলছেন। কিন্তু এতে এক দিকে যেমন

ভবিষ্যতে বাংলা দেশেই বড় খেলাতে যেই বাঙালীর ছেলেদের স্থান পাওয়া দুর্লভ হবে, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান।

যাই হোক, লীগ পাবার জন্যে ক্লাবগুলির মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। তার মধ্যে ভবানীপুর দলই এখন অধিক সংখ্যক পয়েণ্ট পেয়ে এগিয়ে আছে। তবে লীগ খেলা শেষ হতে এখনও অনেক বাকী এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান, কাষ্টমস্ প্রভৃতি শক্তিশালী দল রয়েছে। তাই শেষ পর্য্যন্ত কে জয়ী হবে তা এখন থেকে বলা সম্ভব বা উচিত নয়।

টেবিল-টেনিস

বর্ত্তমানে ভারতের টেবিল টেনিস মহলের প্রধান খবর হল, হংকং থেকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সি স্চু এবং চুং চিন্ সিং-এর ভারত আগমন। তাঁরা এদেশের বিভিন্ন স্থানে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচ খেলবেন। তার মধ্যে দুটি টেষ্ট ম্যাচ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। প্রথমটিতে বাঙ্গালোরে ভারত ৩-২ খেলায় এবং দ্বিতীয়টিতে মাদ্রাজে হংকং দল ৩-০ খেলায় জয়লাভ করে। কলকাতাতেও একটি টেষ্ট ম্যাচ খেলবার কথা আছে। ইতিমধ্যে হংকং-এর খেলোয়াড়দের ভারতে আগমনের কিছু দিন আগে থেকে কলকাতায় যে পূর্ব্ব-ভারতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা চলছিল তা শেষ হয়ে গেছে। এই প্রতিযোগিতাতেও হংকং-এর খেলোয়াড় দুটির যোগদান করবার কথা ছিল; কিন্তু পৌছতে বিলম্ব হওয়াতে তাঁদের পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের অনুপস্থিতি কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের নিরাশ করেছিল। অবশ্য শীঘ্রই কলকাতায় ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে তাঁদের খেলা দেখতে পাওয়া যাবে। পূর্ব্ব-ভারতীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কল্যাণ জয়ন্ত এবং মিস্ সৈয়দ সুলতানা দ্বি-মুকুট লাভ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার কিছু দিন পূর্ব্বে জয়ন্ত বাংলা রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতাতে ত্রি-মুকুট লাভ করেছিলেন। পূর্ব্ব-ভারতীয় টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফল:—

পুরুষদের সিঙ্গলস্—কল্যাণ জয়ন্ত বিজয়ী সরোজ ঘোষ, ২১-১৪, ২১-১২, ২১-১২।

মহিলাদের সিঙ্গলস্—মিস্ সৈয়দ সুলতানা বিজয়ী মিস্ ই· মোসেস, ২১-৫, ২১-৭, ২১-৮।

পুরুষদের ডবলস্—কল্যাণ জয়ন্ত এবং রণবীর ভাণ্ডারী বিজয়ী তুন ঘোষ এবং এম· বিশ্বাস, ১৭-২১, ১৮-২১, ২১-১৬, ২১-১৩, ২১-৬।

মিক্সড ডবলস্—রণবীর ভাণ্ডারী এবং মিস্ সৈয়দ সুলতানা বিজয়ী কল্যাণ জয়ন্ত এবং মিসেস্ কাপুর, ২০-২২, ১৫-২১, ২১-১৩, ২১-১৩, ২১-১৫।

ক্রিকেট

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ক্রিকেট মরসুমও শেষ হয়ে যাবে। এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে পূর্ব্বাঞ্চলের বিজয়ী বাংলা দল। ফাইনালে তারা হোলকার ও মহারাষ্ট্রের বিজয়ী দলের সঙ্গে খেলবে। কোয়াটার ফাইনালে উত্তরাঞ্চলের বিজয়ী সার্ভিসেস একাদশকে ২৫৬ রাণে এবং সেমি-ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের বিজয়ী মহীশূর দলকে ১০৪ রাণে পরাজিত করে বাংলা দল ফাইনালে ওঠবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। এই নিয়ে বাংলা দল চতুর্থ বার এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠল। বাংলার সঙ্গে ফাইনাল খেলাটি সম্ভবতঃ ২১শে মার্চ্চ আরম্ভ হবে। কলকাতায় সি· এ· বি কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রথম নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। ফাইনালে কালীঘাট দলকে এক ইনিংস ও ২৭ রাণে পরাজিত করে মোহনবাগান দল এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার গৌরব অর্জ্জন করেছে।

এবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় দলের খেলার কথা কিছু বলা যাক্। প্রথম টেষ্টের সমাপ্তির পর ভারতীয় দলের পরবর্ত্তী খেলাটি হয় বারবাডস একাদশের সঙ্গে। সফরের এই চতুর্থ খেলাটি ব্রিজটাউনে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক শক্তিশালী বারবাডস দলের অধিনায়কত্ব করেন। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে স্থানীয় দল উইকস, অ্যাটকিন্সন, উলিয়ামস প্রভৃতির সাফল্যমণ্ডিত ব্যাটিং-এর ফলেই সাত উইকেটে ৬০৬ রাণ করে তাঁদের ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেন। ভারতীয় বোলারদের চিরশত্রু উইকস ভারতের বিরুদ্ধে পুনরায় শতাধিক রাণ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি ভারতের বিপক্ষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ভারত সফরকালে চারটি এবং পোর্ট অফ স্পেনে প্রথম টেষ্ট ম্যাচে একটি সেঞ্চুরী করেন। এই খেলায় তিনি ১৪ রাণ করলে ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব সহস্র রাণ পূর্ণ হয়। ভারতীয় দল ব্যাট করতে নেমে মাত্র ২০৯ রাণে সকলে আউট হয়ে যান। উম্রিগড় ভিন্ন কোন খেলোয়াড়ই বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি! কিন্তু 'ফলো অন' হতে বাধ্য হয়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানগণ দ্বিতীয় ইনিংসে অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে খেলেন। প্রথমে মঞ্জরেকার ও পঙ্কজ রায় ভারতীয় দলের সাফল্যের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং শেষ দিনে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয় উম্রিগড়ের প্রশংসনীয় আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে খেলা। ভাগ্যদেবীও তাঁদের দিকে সুপ্রসন্না হলেন। তাই শেষ দিনে খেলা শেষ হবার ৮৫ মিনিট পূর্ব্বে যখন খেলাটি জয় পরাজয়ের আশা-আশঙ্কায় দুলছে এবং ভারতীয় দল মাত্র ৪৮ রাণে এগিয়ে আছে ও একটি মাত্র উইকেট অবশিষ্ট আছে সেই সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এই উত্তেজনাবহুল খেলাটির সমাপ্তি ঘটাল। ফলাফল:—

বারবাডস—৭ উইকেটে ৬০৬ রাণ ও ডিঃ (উইকস ২৫৩, এ্যাটকিন্সন ৮১, উইলিয়ামস ৬০, ওয়ালকট ৫১, গোডার্ড নট আউট ৫০)

ভারত—২০৯ (উম্রিগড় ৬৩, মঞ্জরেকার ৪৪; সোবার্স ৫০ রাণে ৪টি, বার্কার ২২ রাণে ৩টি, মার্শাল ৬২ রাণে ৩টি); এবং ৯ উইকেটে ৪৪৫ (মঞ্জরেকার ১৫৪, পঙ্কজ রায় ৮৯, উম্রিগড় নট আউট ৯৬; সোবার্স ৯২ রাণে ৩টি, বার্কার ১১৩ রাণে ৩টি)

বারবাডসের সঙ্গে খেলার পর সফরের পঞ্চম খেলায় ভারতীয় দলকে তাঁদের প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ একাদশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে। যদিও ১৪২ রাণের ব্যবধানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল জয়লাভ করেছে, কিন্তু ফলাফলের দ্বারা

খেলার প্রকৃত রূপ নিরীক্ষণ করা যাবে না ; কারণ এক সময়ে খেলাটি ভারতীয় দলের পক্ষেই মীমাংসিত হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় ব্যাটম্যানদের অকৃতকার্য্যতার ফলেই সে আশা সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

টসে জয়লাভ করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল প্রথমে ব্যাট করতে নামে। কিন্তু ওয়ালকট ভিন্ন কোন খেলোয়াড়ই তাঁদের গুপ্তে ও মানকড়ের স্পিন বলের বিরুদ্ধে খেলতে না পারায় মাত্র ২১৬ রাণে সকলে আউট হয়ে যান। তার পর ভারতীয় দলের খেলা আপ্তে, উম্রিগড় ও হাজারের চেষ্টায় বেশ ভাল ভাবেই আরম্ভ হলেও শেষের দিকের খেলোয়াড়দের কেউই বেশীক্ষণ টিকে থাকতে না পারায় ২৫৩ রাণে ইনিংস শেষ হয়। এর পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের মাত্র ২২৮ রাণে সকল উইকেটের পতন হয়। ফাদকারের বোলিং-নৈপুণ্যই তাঁদের এই বিপর্যয়ের কারণ। অতঃপর ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হয়। চতুর্থ দিনের শেষে মানকড় ও আপ্তের উইকেট হারিয়ে তাঁরা ৫৪ রাণ করেন এবং তাঁদের পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু পঞ্চম দিনে রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইনের নিখুঁৎ বোলিং তাঁদের বিপর্যয় ঘটায়। মাত্র ৭৫ রাণে অবশিষ্ট উইকেটগুলির পতন হলে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ১২৯ রাণে সমাপ্ত হয়। খেলা শেষ হবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের একদিন ও কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ১৪২ রাণে জয়লাভ করে এবং খেলাটির সমাপ্তি হয়। ফলাফল :—

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২১৬ (ওয়ালকট ৯৮, উইকস ৪৭, পেরোদো ৪৩, ষ্টলমেয়ার ৩২, গুপ্তে ৯১ রাণে ৩টি, মানকড় ১২৫ রাণে ৩টি) ; এবং ২২৮ (ষ্টলমেয়ার ৫৪, গোমেজ ৩৫, ক্রিষ্টিয়ানী ৩৩, ওয়ালকট ৩৪, ফাদকার ৬৪ রাণে ৫টি)

ভারত—২৫৩ (আপ্তে ৬৪, হাজারে ৬৩, উম্রিগড় ৫৬ ; ভ্যালেণ্টাইন ৫৮ রাণে ৪টি) ; এবং ১২৯ (রামচাঁদ ৩৪, মঞ্জরেকার নট আউট ৩২, রামাধীন ২৬ রাণে ৫টি)

এর পর পোর্ট অফ স্পেনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেষ্ট খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে সম্পন্ন হয়। ভারতীয় দল প্রথমে খেলা শুরু করে অল্প রাণের মাথায় আপ্তের উইকেটের পতন হলে পঙ্কজ রায় ও রামচাঁদ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দ্বিতীয় উইকেটে ৮১ রাণ যোগ করেন। তার পর উম্রিগড়ের সুপরিচিত আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে খেলা ও টেষ্টে নবাগত ঘোড়পাড়ের আকর্ষণীয় ব্যাটিং ভারতের মানরক্ষা করতে সক্ষম হ এবং ভারতীয় দলের রাণ-সংখ্যাকে সন্তোষজনক করতে সহযোগিতা করে।

অতঃপর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ব্যাট করতে নামলে মাত্র ৪১ রাণের মধ্যে প্রথম উইকেট জুটির ব্যাটসম্যানদ্বয়কে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তার পরই ভারতীয় বোলারদের আতঙ্ক, উইকস নেমে শতাধিক রাণ করেন এবং ওয়ালকট ও পরে ওরেলের সহযোগিতায় ভারতের সকল আশা নির্মূল করে দিলেন এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের আশঙ্কাও দূরীভূত হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উইকস্ ভারতের বিরুদ্ধে টেষ্ট ম্যাচে তাঁর অষ্টম খেলায় ষষ্ঠ বার শতাধিক রাণ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল বৃহৎ রাণসংখ্যা তুলবে এরূপ আশা করা গেলেও স্পিন বোলার গুপ্তের চতুরতায় তা বিফল হয়ে গেল ; ৩১৫ রাণে তাঁদের ইনিংস শেষ হল এবং ভারতীয় দল অপেক্ষা মাত্র ৩৫ রাণে অগ্রগামী থেকে সন্তুষ্ট হতে হল। গুপ্তে ১০৭ রাণে ৫টি উইকেট গ্রহণ করেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের শেষের পাঁচটি উইকেট মাত্র ৩৪ রাণে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে মাত্র ১০ রাণে পঙ্কজ রায়, রামচাঁদ ও মঞ্জরেকারের উইকেটের পতন হলে ভারতীয় দলকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আপ্তের অপরাজিত শতাধিক রাণ এবং উম্রিগড়, মানকড় প্রভৃতির ব্যাটিং-সাফল্য ভারতের সুনাম রক্ষা করতে সমর্থ হয়। অসীম ধৈর্য্য সহকারে সমস্ত ইনিংস ধরে খেলে আপ্তে ১৬৩ রাণ করে নট আউট থাকেন এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় ভারতের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রাণ করবার গৌরবলাভ করেন। এর আগে বোম্বাই টেষ্টে হাজারের ১৩৪ রাণই সর্ব্বোচ্চ ছিল। খেলার শেষ দিনে ভারতীয় দল ৭ উইকেটে ৩৬২ রাণ করলে হাজারে তাঁদের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে জিততে হলে তখন ১৭০ মিনিটে ৩২৭ রাণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁরা দুই উইকেট হারিয়ে ১৯২ রাণ করেন এবং খেলাটিও অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। কৃতী অধিনায়ক ষ্টলমেয়ার শতাধিক রাণ করে এবং উইকস ৫৫ রাণ করে অপরাজিত থাকেন। ফলাফল :—

ভারত—২৭৯ (রামচাঁদ ৬২, উম্রিগড় ৬১, পঙ্কজ রায় ৪৯, ঘোড়পাড়ে ৩৫, কিং ৭৪ রাণে ৫টি) ; এবং ৭ উইকেটে ৩৬২ রাণ ও ডিঃ (আপ্তে নট আউট ১৬৩, উম্রিগড় ৬৭, মানকড় ৯৬)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—৩১৫ (উইকস ১৬১, ওরেল ৩১, ওয়ালকট ৩০ ; গুপ্তে ১০৭ রাণে ৫টি) ; এবং ২ উইকেটে ১৯২ (ষ্টলমেয়ার নট আউট ১০৪, উইকস নট আউট ৫৫)

Cadbury-Fry

ভারতে ক্যাডবেরি-ফ্রাই

ক্যাডবেরির বোর্ন-ভিটা

ছোটোবড় সকলের পক্ষেই সমান পুষ্টিকর — একাধারে পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয়। এর চমৎকার স্বাদ ও পুষ্টির গুণে আপনারও উপকার হবে।

ক্যাডবেরির বোর্নভিল কোকো

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের শক্তি যোগায়। এর চকোলেট গন্ধ তাদের অত্যন্ত প্রিয়।

ক্যাডবেরির রেড লেবেল ড্রিংকিং চকোলেট

একটি অত্যন্ত সুস্বাদু পানীয় এবং পর্যাপ্ত চিনি দিয়ে তৈরি। তৈরি করা যেমন সহজ খেলেও তেমনি উপকার।

ফ্রাই-এর ব্রেকফাস্ট কোকো

কম খরচে চমৎকার স্বাদগন্ধযুক্ত পারিবারিক খাদ্য ও পানীয়। সুস্বাদু কেক ও পুডিং তৈরির সময় ব্যবহার করতে পারেন।

ক্যাডবেরির ডেয়ারি মিল্ক চকোলেট
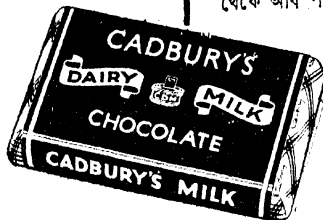
গুণের জন্য পৃথিবী-খ্যাত। দেড় গ্লাস খাঁটি দুধ থেকে আধ পাউণ্ড চকোলেট তৈরি।

CFY-18 BEN

শ্রীরমেন চৌধুরী

কলা-কুশলী

চিত্র-সম্পাদক রবীন দাস

মুষ্টিযোদ্ধা আর চিত্র-সম্পাদক! দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মানুষ! একজনের ভিতর-বাহির ইস্পাত-কঠিন; অন্যের মন অন্তত শিল্পিজনোচিত, আর তা স্বভাবতই কোমল, ভাবপ্রবণ! একজনের চোখে আছে হিংসার আগুন, বুকে মধ্যযুগীয় কাঠিন্যের তপ্ত রক্ত—(এ না হলে সুস্থ মনে প্রতিপক্ষকে যদৃচ্ছ আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা সম্ভব নয় কিছুতেই! কেন যে সভ্য-সমাজে এখনো এ খেলার প্রচলন রয়ে গেছে, ভাবলে অবাক হতে হয়)। অপরের কানে বাজে সৃষ্টির বিচিত্র রাগিণী, মনে-আঁকা কল্পনার আল্পনা! কাজেই ইংরিজিতে যাকে বলে poles asunder—অবিকল তাই! দুটি parallel straight line-এর মিলন যেমন সম্ভব নয়, এও সেই রকম! কিন্তু চিত্র-সম্পাদক রবীন দাস মশায়ের জীবনে এই অসম্ভব অতি-বাস্তব হয়ে উঠেছে অবলীলায়। জীবনের প্রথম দিকটায় তিনি ছিলেন কুশলী মুষ্টিযোদ্ধা। খেলাধূলার বিভিন্ন বিভাগে দেখা গেছে এঁকে অংশ গ্রহণ করতে, নাম লেখা হয়েছে এঁর সকলের শীর্ষস্থানে। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবেই হয়তো আজও শ্রীরবীন দাসকে দেখা যেত, যদি না আকস্মিক ভাবে সেদিন বাধা পড়তো। চোখে আঘাত পেলেন খেলতে গিয়ে, বহু চিকিৎসাতেও ফল মিললো না, ফলে সেই চোখটির দৃষ্টিশক্তি চিরতরে অবলুপ্ত হোলো।

এর পর জীবন-প্রবাহ করলো দিক-পরিবর্তন। নিদারুণ বিপদের অবসানে দিনগুলি যখন কর্মহীন অবকাশে ঝরে যাচ্ছিলো সেই মুহূর্তে অরোরার আলোক-চিত্র-সহকারী রবীন মজুমদার মশায়ের সহায়তায় অভাবিত ভাবে অরোরায় স্থান পেয়ে গেলেন ইনি। ছায়াছবির বিভিন্ন কাজ শেখার মিললো সুযোগ। শব্দযন্ত্রের ওপর এঁর অনুরাগ থাকায় তৎকালীন অরোরার বিশিষ্ট শব্দযন্ত্রী শ্রীঈশান ঘোষের সহকারী হতে চেষ্টিত হন এবং শ্রীঘোষের নির্দেশে সম্পাদনার কাজে করেন আত্ম-নিয়োগ। জহুরী সেদিন রত্ন নির্ধারণ করেছিলেন ঠিকই—আজকের চিত্রামোদীরা সে-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

বিশিষ্ট সম্পাদক বিনয় ব্যানার্জি (বর্তমানে পরিচালক) মশায়ের কাছে এসে হাজির হলেন শ্রীদাস, শুরু হোলো সম্পাদনা-শিক্ষা। 'রিক্তা' ছবিটিতে বিনয় বাবুর প্রথম সহকারী হতে দেখা গেল এঁকে। এর পর কালী ফিল্মসের Topic picture-এর সম্পাদনায় লেগে যান। 'টু লিভস্ এণ্ড এ বাড' (ব্রুকবণ্ড কোম্পানীর প্রচার-চিত্র) ছবির সম্পাদকতা করেন—এর জন্যে তিনি গাঙ্গুলী মশাই প্রভৃতির কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী।

রূপসজ্জার বাইরে সুমিত্রা দেবী —শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

বিনয় বাবুর প্রধান সহকারী হিসাবে এর পর রবীন দাস করলেন 'বন্দী,' 'সন্ধি', 'সুলুহা', 'শহর থেকে দূরে', 'তকরার', 'পি W ডি' 'পোষ্যপুত্র', 'বন্দিতা' প্রভৃতি চিত্ররাজি। বড়ুয়া সাহেবের 'আমীরি'ই এঁর প্রথম সম্পাদিত ছবি—স্মরণীয় ঘটনা জীবনের।

রাধা ফিল্ম খোলা হোলো নব-অধিনায়কত্বে, এখানে সুযোগ পেলেন নানা বিষয়ে। রবীন বাবু নিযুক্ত হলেন সম্পাদক। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় আবার কিছুদিনের নীরবতার পালা শুরু হয়।

সরোজ মুখার্জি প্রযোজিত প্রথম ছবি 'অলকানন্দা'য় এঁর নাম দেখতে পাওয়া গেল এর পর। সেই সঙ্গে চিত্ররূপার 'শান্তি', মুভি টেকনিকের 'প্রতিমা' (এ দুটি কোম্পানীই রাধা ফিল্ম কর্তৃপক্ষের) এবং রাধার ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি ছবি করলেন। তার মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' ও 'কবি' উল্লেখযোগ্য।

রাধার বাধ-বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেলে রবীন বাবু করলেন 'দাসীপুত্র', 'রক্তের টান', 'অনুরাধা' ছবি। ডাবিং-এ হাত পরিপক্ক হোলো ডি, জি, পরিচালিত 'ঝরাফুল' বাণীচিত্রের কল্যাণে। ঝরাফুলের নায়িকা মণিকা দেশাই-এর অস্পষ্ট উচ্চারণের প্রতিবিধানকল্পে নায়িকার সমুদয় কথাবার্তাই আলাদা গ্রহণ করতে হয়—সেই রীতি অর্থাৎ Dubbing-এর পূর্ণ শিক্ষা হোলো এ সময়।

রবীন বাবু কৃত স্মরণীয় চিত্রগুলির মধ্যে 'বিন্দুর ছেলে', 'রত্নদীপ', 'পণ্ডিত মশাই', 'নিয়তি', 'মানদণ্ড', 'রাণী ভবানী' অন্যতম। এ ছাড়া 'অনুরাগ', 'বাগদাদ', 'মর্যাদা', 'ভক্ত রঘুনাথ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মহিষাসুর বধ', 'অনিবার্য', 'আজাদীকে বাদ' উল্লেখনীয়। 'কবি'র কথা তো আগেই বলেছি।

এখন কবি-গুরুর 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এবং আরো কয়েকটি ছবির কাজে এই তরুণ সম্পাদক আত্ম-সমাহিত। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে চলেছে, সম্ভাবনার শত দুয়ার উন্মুক্ত হচ্ছে যাত্রাপথে—কলা-কুশলীর আদর্শ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক, শুভেচ্ছা জানাই।

চিত্র-সম্পাদক হরিদাস মহলানবিশ

সোনার বাঙলার মাটিতে যেখানে সোনা ফলে—সেই পূর্ববংগের মানুষ হলেন শ্রীহরিদাস মহলানবিশ। প্রমত্তা পদ্মার কোল ঘেঁষে ঢাকা জেলার একটি অনতিখ্যাত গ্রামে এই সফল চিত্র-সম্পাদক মশাই যখন পৃথিবীর আলো প্রথম প্রত্যক্ষ করেন সেটা ছিলো প্রকৃতই গোটা বাঙলার সোনার দিন। প্রতিটি মানুষই তখন পেট ভরে খেতে পেত, পাঁচ-দশ টাকায় সে সময় অনেক কিছু করা সম্ভব ছিলো। আজকের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের 'জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন' পরিকল্পনায় কণ্ঠাগতপ্রাণ হয়নি সে যুগের আপামর জনসাধারণ। মাছ-দুধ-ঘির বন্যায় মজ্জমান ছিলো পূর্ববংগের প্রতিটি গ্রামাঞ্চল, তাই সেখানকার মানুষের প্রয়োজন হোতো না তেমন বাইরে গিয়ে অর্থ রোজগারের। শ্রীমহলানবিশের গাঁয়ের লোক মোটেই পল্লী-মায়ের আঁচল-ছাড়া হয়নি কোনো দিন, তবু ভাগ্যান্বেষী কর্মসাধক বেরিয়ে পড়লেন দুরূহ কর্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-সাধনে। অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পুরস্কার লাভ হয়েছে; আর বিত্ত; সেই সংগে জনগণচিত্ত অধিকার করতে পেরেছেন হরিদাস বাবু।

কাজে নিজেকে না হারিয়ে ফেলতুম, তাহলে আজ কি যে হোতো, তাই ভাবি! অবিশ্যি এ কাজ এবং নাম ততোদিনই থাকবে যতোদিন আছে এই হাত দুটিতে কাঁচি ধরার ক্ষমতা! কিন্তু তার পর?'

সবলদেহী, সরল প্রকৃতির মানুষটির সচিন্তিত কথায় যে জিজ্ঞাসা ঝরে পড়লো সেদিন নিউ থিয়েটার্সের এডিটিং রুমে—সে অনন্ত প্রশ্ন তো আজ এই শিল্প-জগতের প্রতিটি ছোটো-বড়ো কর্মীর মুখেই! এ পথে এসে সবাই এখন কম-বেশি বিপদগ্রস্ত!

বেশ খানিকটা জর্দা সহযোগে পান মুখে পুরে চিত্র-সম্পাদক মশাই হাসিমুখে বললেন: 'যাক্ গে ওসব কথা! আমাদের বরাতে যা আছে হবে! দুঃখ আছে বলে কোন্ কাজটা ফেলে রাখে মানুষ!—হ্যাঁ, কি জিগগেস করলেন, কবে হাজির হোলাম N. T. তে?'

আমি সবিনয়ে জানাই N. T.র আগে যদি কিছু থেকে থাকে, তা বলুন।

সুরু করেন শ্রীমহলানবিশ অতীতের রোমন্থন। ষ্টুডিয়ো পরিবেশ বেশ সমাহিত। 'নবীন যাত্রা'র স্যুটিং চললেও ফ্লোর এখান থেকে (এডিটিং রুম থেকে) এঁকে-বেঁকে দূরে খানিকটা। বসন্তের সদ্য-সমাগমে পথচারী পাখিটি মেতে উঠেছে অবিশ্রান্ত কুহু-রবে, ঝরা বকুলের মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে দক্ষিণ বাতাসে। র‍্যাকের ওপর অগণিত ফিল্ম ক্যান কাৎ করে সাজানো রয়েছে•••চাদর-পাতা মেঝের ওপর দুটি চেয়ারে বসে আছি আমরা দু'জনে। বেয়ারা চা দিয়ে গেল—রসান পেয়ে যেন রসনা তৃপ্ত হোলো। শুনতে লাগলুম হরিদাস বাবুর জীবন-কথা।

জনৈক আত্মীয়ের সহায়তায় স্বর্গত পরিচালক জ্যোতিষ মুখার্জির প্রত্যক্ষ সাহায্যে ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিয়োয় কর্মী হিসাবে প্রবেশাধিকার লাভ করলেন ইনি আনুমানিক ১৯৩৩ সালে। যশস্বী পরিচালক প্রফুল্ল রায় মশায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোলো এঁর প্রতি, করে নিলেন এঁকে তাঁর সহকারী। 'চাঁদ সদাগর', 'রামায়ণ', 'ভক্ত কি ভগবান',

রামী-চণ্ডীদাস চিত্রে সাবিত্রী এবং সন্ধ্যা

'ইনসাফ কি তোপ'—এই চারখানি ছবিতে কাজ করে প্রফুল্ল বাবুর সংগেই হরিদাস বাবু ভারতলক্ষ্মীর সংস্রব-ত্যাগ করলেন। সেখান থেকে ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী এলেন সোজা N. T বা নিউ থিয়েটার্স। কিন্তু N. Tর ছবিতে কাজ করার আগেই 'ব্লাউ ফিউড' ছবি করতে শ্রীপ্রফুল্ল রায় গেলেন লাহোর, তাঁর সাথে পাড়ি জমালেন শ্রীমহলানবিশ।

লাহোর থেকে প্রত্যাবর্তন করে কর্ম-প্রবাহ ভিন্নমুখী হতে দেখা গেল—পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে চিত্র-সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করতে হোলো এঁকে আর তার ফলে প্রফুল্ল বাবুর সহকারিত্ব শেষ হয়ে সার্থক সম্পাদক সুবোধ মিত্র মশায়ের কাছে শিক্ষানবিশী শুরু হোলো। ছত্রিশ মাস অর্থাৎ তিন বছর চললো শিক্ষা গ্রহণ, হাত পাকা হয়ে উঠলো কাঁচি ধারায়। 'দিদি', 'প্রেসিডেণ্ট', 'বড়দিদি', 'দেশের মাটি', 'অভিজ্ঞান', 'ষ্ট্রীট সিংগার', 'বিদ্যাপতি' প্রভৃতি যুগান্তকারী ছবিগুলি ওঠে সেই সময়।

শিক্ষা সমাপনান্তে পুরোদস্তুর সম্পাদকরূপে দেখা গেছে এঁকে অপূর্ব প্রতিভাধর স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়ার 'রজত-জয়ন্তী' ছবিতে। এইটাই এঁর জীবনের প্রথম স্মরণীয় ঘটনা। তার পর একে-একে ভিড় করে এসেছে বহু বরণীয় চিত্র—'ডাক্তার', 'চাঁদ্ কি কলি', 'জিন্দিগী', 'প্রিয়-বান্ধবী', 'শোধবোধ', 'ওয়াশিয়াৎনামা', 'উদয়ের পথে', 'হামরাহী', 'অঞ্জনগড়', 'পহেলা আদমী', 'রামের সুমতি', 'ছোটা ভাই', 'বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রভৃতি। এতোগুলি স্বনামধন্য ছায়া-ছবির সার্থক সম্পাদক হলেন শ্রীযুক্ত মহলানবিশ। এ ছাড়া নিউ থিয়েটার্স থেকে [illegible]

এখন কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'বনহংসী' ও ভোলানাথ মিত্রের দো-ভাষী চিত্র 'বকুল' নিয়ে ইনি বিশেষ ব্যস্ত।

সহজ সরল কার্যকুশল মানুষটির এই হোলো কর্ম-পরিচয়। পর্দার আড়াল ঘুচিয়ে ক্ষণিকের জন্যেও যে এই সব কলা-কুশলীকে সাধারণ্যে টেনে আনতে পারছি, এই-ই আমার পরিতৃপ্তি।

টকির টুকিটাকী

চিত্রমায়ার

'পথিক' বহু-প্রতীক্ষিত দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টিপথে চলা সুরু করবে অবিলম্বে। প্রখ্যাত পরিচালক দেবকীকুমার বসুর নেতৃত্বে বাস্তবানুগ বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা বহুরূপী সম্প্রদায়ের 'পথিক' চলচ্চিত্রের ফিতের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে এসেছে প্রায় পুরোপুরিই। যেটুকু বাকী আছে তার সফল-সমাপ্তি সমাসন্ন। মণিকা গাঙ্গুলী, শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালী সরকার, তৃপ্তি মিত্র, কাহিনীকার তুলসী লাহিড়ী স্বয়ং এবং অন্যান্য অগণিত রূপশিল্পী রূপায়িত এই চিত্রোত্তমটি সার্থক চিত্র-প্রচেষ্টা বলে গণ্য হবে এ বিশ্বাস কর্তৃপক্ষের সুদৃঢ়; আমরা 'কবি', রত্নদীপ' প্রভৃতি নির্মাতার সাফল্য কামনা করি।

বিদ্যুৎ

নবগঠিত 'ছবিস্থান'-এর নৃত্যগীতবহুল প্রথম ছবি। মহিলা সাহিত্যিক শান্তি দাশগুপ্তার কাহিনী অবলম্বনে 'বিদ্যুৎ' অচিরে যশস্বী অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রত্যক্ষ সাহায্যে পূর্ণাংগ চিত্ররূপে পর্দায় প্রতিফলিত হবে। যা অনেকের জীবনে ঘটে থাকে, এমনই একটি দুঃখ-সুখের ইতিহাস এই ছায়াচিত্র 'বিদ্যুৎ'। 'সম্পূর্ণ নতুন ধরণ', 'অভিনব টেক্‌নিক' ইত্যাদি কথার তুবড়ি ছুঁড়তে আমরা নারাজ—জানাচ্ছেন 'ছবিস্থানে'-এর প্রচারক। কর্তৃপক্ষের সরলতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আশা রাখি, তাঁরা শেষ পর্যন্ত আমাদের মুগ্ধ করেই রাখবেন।

ষ্টুডিওতে কল্যাণী মুখোপাধ্যায় ও মীরা মিশ্র

নিরোগ্রাফস্

হচ্ছে 'রাধাচক্র' ছবিটির প্রযোজক। এর পরিচালক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রয়োগ-কর্তা সুশীল মজুমদার। হাসি ও শিক্ষা পাশাপাশি বিরাজ করবে এই কাহিনীটিতে—জানা গেছে সে কথা।

হিজিবিজি

অমর হতে পারে লেখা কিংবা আঁকার গুণে। হাস্যরসার্ণব নবদ্বীপ হালদারের 'হিজিবিজি'ও লোক-চিত্তে স্থায়ী দাগ কাটতে পারে—অন্তত আমরা তো তাই চাই। তাড়াতাড়ি চিত্রগ্রহণ ইত্যাদি সমাধা হলে সবাই প্রাণ খুলে হাসতে পাবে বলে আশা করছি।

ফিল্মস্ ফাউনটেইনের

'রাঙা রাত' লেখা হবে সেলুলয়েডের ফিতেয়। প্রাথমিক সব কাজ সারা হয়ে গেছে—খবরে প্রকাশ। আমরা কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, এখনো এই ইংরিজি-প্রীতি নামকরণের বেলায়, দুঃখের বিষয়। জগৎ-সভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান পাওয়া বাঙলা ভাষায় নাম দেওয়া সম্ভব হয় না যে কেন, সেটা আমাদের ধারণার বাইরে। ঘরের প্রতি দৃষ্টি ফিরবে আমাদের কবে?

তমোগাহন

কালিকা কলা-মন্দিরের নির্মাণ-রত ছবি। 'দিক্‌ভ্রান্ত'-খ্যাত বিশু দাশগুপ্তের পরিচালনায় রমাপদ চৌধুরীর কাহিনীটি ক্রম-অগ্রসরমান।

দোভাষী 'নবীন যাত্রা'

দ্রুতগতি যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। প্রায়ই তাই স্যুটিং চলেছে সুবোধ মিত্র মশায়ের পরিচালনাধীনে। নিউ থিয়েটার্সের পূর্বতন সুনাম রক্ষিত হোক।

সেই কথাই বলতে হয়

'বনহংসী' সম্বন্ধে। প্রবোধ সান্যালের এই বিশিষ্ট রচনাটি 'মহাপ্রস্থানের পথে'-খ্যাত পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কল্পনা মুভিজের পরিবেশনায় কিছু দিনের ভেতরে মুক্তিলাভ করবে।

আর্ট কর্পোরেশনের

'রামী-চণ্ডীদাস' ছবিটি দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় বেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। বহু তারকা-খচিত চিত্রটি সামনের মে-জুন মাসে মুক্তি পেতে পারে।

বি, এন, সরকারের সম্বর্ধনা

প্রযোজক সরোজ মুখার্জির স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত সরকার বাঙলা দেশের প্রযোজক-রাজচক্রবর্তী। তাঁর দান সারা ভারতের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। কিন্তু আমরা আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি ঘরের গুণী লোককে পর করে বাইরের রাঙা মূলোদের নিয়ে করি মাতামাতি। সরোজ বাবু জাতির দুর্নাম ঘুচিয়ে নতুন চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছেন, সে জন্যে তাঁকে সাধুবাদ দিচ্ছি।

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি স্বীকার)

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত—শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দ পরিব্রাজকাবধূত। মহানির্বাণ মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

উপনিষদ্ জড় ও জীবতত্ত্ব—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ; ৮সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

তন্বী—বনফুল। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

ভূমিকা—শ্রীগোপাল হালদার। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

স্বয়ংসিদ্ধা (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা আট আনা।

ভারতমাতা—তারানাথ রায়, ওরিয়েণ্টাল পাবলিশিং কোং, ১১ডি আরপুলি লেন, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা আট আনা।

জীবনসঙ্গিনী—শ্রীমতিলাল রায়। প্রবর্তক পাব্লিশার্স, ৬১৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

Karl Marx and Vivekananda—Sree Bejoy Chandra Bhattacharjee. 133 Upper Circular Road, Block No 3, Calcutta. Price Rupee one & annas eight only.

সরল যোগ ব্যায়াম—শ্রীনীরদকুমার রায়। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

শরীর ও শক্তি, শ্রীনীরদকুমার রায় প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার। মূল্য এক টাকা চার আনা।

নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন—শ্রীনীরদকুমার রায়। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

Hindusthan Year Book 1953.—M. C. Sarkar & Sons Ltd. 14 Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12. Price Rupees four only.

যাযাবর (কাব্য)—শ্রীসুধীর গুপ্ত। চয়নিকা, ১৪১।৫ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

যদি—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়। ২ পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

সুরের পরশ—দেবাচার্য্য। রিডার্স এসোসিয়েট, ৪বি রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা—৫। মূল্য দুই টাকা।

অমৃতধারা—শ্রী৫৫ স্বামী বিশ্বজিৎ মহারাজের পত্রাবলী। প্রেস এণ্ড প্রিণ্টার্স, ৫ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ফলিত যোগ—শ্রীসুকুমার বসু। ব্যায়াম পত্রিকা কার্য্যালয়, ৪।২ রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য দুই টাকা।

নাম চয়নিকা—শ্রীমিহিরকুমার দাস। গ্রন্থ-মন্দির, ১২১বি বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য বারো আনা।

চার কলম—শ্রীমানব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ভবানীপুর বুক ব্যুরো, ১বি রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আন্তর্জাতিক

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মার্শাল ষ্ট্যালিন—

রুশ বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নেতা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রথম রচয়িতা মার্শাল ষ্টালিনের জীবনাবসান হইয়াছে। চারি দিন পক্ষাঘাত রোগে ভুগিবার পর ৫ই মার্চ্চ (১৯৫৩) বৃহস্পতিবার মস্কো-সময় রাত্রি ৯টা ৫০ মিনিটেয় সময় তাঁহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু যে কম্যুনিষ্ট-জগতে ইন্দ্রপাত হইল তাহা নয়, সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার মত শক্তিশালী এক বিরাট পুরুষেরও জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সংগঠনে তিনি যে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিপ্লবী হিসাবে মার্শাল ষ্ট্যালিনের উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তাঁহার কোন কোন নীতি আমরা সমর্থন করিতে না পারিলেও তাঁহার এই সাফল্যই যে সমাজতন্ত্রী রাশিয়াকে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে বিজয়ী করিয়া পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করিয়াছে, একথা তাঁহার পরম শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে। রুশ-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সংগঠনকে বাদ দিয়া ষ্ট্যালিনকে বুঝিবার উপায় নাই, আর ষ্ট্যালিনকে বাদ দিয়া রুশ-বিপ্লব না হইলেও বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সংগঠনকেও বুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। আমরা সাধারণতঃ শুধু দেখিতে পাই, ব্যক্তিকে যাঁহার অঙ্গুলী হেলনে বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লবের পথে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সৃষ্টি করিয়া মানব-সমাজ হয় আগাইয়া চলে, না হয় পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। আসলে কিন্তু এই ব্যক্তি শুধু ব্যক্তি নয়, এই ব্যক্তি প্রতিনিধি মাত্র। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মার্শাল ষ্টালিন কাহার প্রতিনিধি, এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। আবার তাঁহার জীবনের ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যেই পরিস্ফুট তাঁহার প্রতিনিধিত্বের যথার্থ স্বরূপ। 'লৌহমানব' ষ্ট্যালিনের বিরাট ব্যক্তিত্বের অভিনব প্রাধান্য আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পারিপার্শ্বিক ও যোগাযোগের আনুকূল্য জর্জ্জিয়ার অতি দরিদ্র মুচীর পুত্রকে এক অভূতপূর্ব্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগঠনে নেতৃত্ব করিবার বিস্ময়কর যোগ্যতা ও সুযোগ দিয়াছিল, তাহাকেও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

[illegible]

যে-জর্জ্জিয়া প্রদেশের ভূমি একদিন আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিজ খাঁ ও তৈমুরলঙের বিজয়ী সেনাবাহিনীর নৃশংসতায় রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই এক ক্ষুদ্র সহর গোরির এক দরিদ্র পরিবারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রথম রচয়িতা ষ্ট্যালিনের জন্ম হওয়া একটা আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে। কিন্তু বাল্যকালেই যাঁহাকে ধর্ম্মযাজক বৃত্তির জন্য শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কৈশোরেই তাঁহার কার্ল মার্কসের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মধ্যে রহিয়াছে তদানীন্তন সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাব। ষ্ট্যালিন ১৮৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব্বেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল সার্ফ অর্থাৎ অর্দ্ধ-ক্রীতদাস চাষীদিগকে মুক্তি দিবার পূর্ব্বেই। উহা আবদ্ধ ছিল কতিপয় বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই। কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থাও তাঁহাদের ছিল না। মুক্তি আইন (Emancipation Act) দ্বারা অর্দ্ধ-ক্রীতদাস চাষীদিগকে যখন মুক্তি দেওয়া হইল, তখন দেখা গেল, এক দিকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে আর এক দিকে অর্দ্ধ-ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াও জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়ে চাষীদের দারিদ্র্যও চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময়েই সর্ব্বস্বান্ত ভূম্যধিকারীর দল হইতে বিপ্লবের ইন্ধন সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং কৃষকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল নিহিলিষ্ট আন্দোলন। [illegible]

নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদই গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই মতবাদ প্রুধোঁর নৈরাষ্ট্রবাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রসার, প্যারী কামিউনের চাঞ্চল্যকর কাহিনী এবং জার্ম্মাণীতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রবল প্রেরণা যোগাইয়াছিল। রুশ গবর্ণমেণ্ট লৌহ-কঠিন হস্তে এই আন্দোলনকে দমন করিয়াছিলেন। বলপূর্ব্বক সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য্য বন্ধ করা হইল বটে, কিন্তু রাশিয়ায় দেখা দিল সন্ত্রাসবাদ তাহার নগ্ন মূর্ত্তিতে। জনৈক সন্ত্রাসবাদী নারীর হাতে রুশ সম্রাট নিহত হওয়ার পর সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিষ্ঠানটিকে সমূলে ধ্বংস করা হইল। প্লেখানভ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতঃপর তিনি শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারের জন্য একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। রাশিয়ায় আবার কিছু দিনের জন্য একটা শান্ত ভাব দেখা দিল। এই সময়ে টুর্গেনিভ, ডষ্টএভস্কি, প্রিন্স ক্রোপটকিন, কাউণ্ট টলষ্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কী প্রভৃতি রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা ও উপন্যাসের ভিতর দিয়া যেমন প্রচারকার্য্য চলিতেছিল, তেমনি গোপনে গোপনে চলিতেছিল নৈরাষ্ট্রবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রচারকার্য্য। এদিকে রাশিয়াতে ক্রমে ক্রমে শিল্পবিস্তার ঘটিতেছিল। অনেক নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল সর্ব্বহারা শ্রমিকের দল। এই ভাবেই রাশিয়ায় বিপ্লবের রঙ্গভূমিতে ভাবী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়ক, রাশিয়ার জনগণের মুক্তির একনিষ্ঠ সাধক লেনিনের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল।

লেনিন যখন মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র সেই সময় রুশ সম্রাটকে হত্যা করার অভিযোগে তাঁহার বড় ভাইয়ের ফাঁসী হয়। মাধ্যমিক স্কুল হইতে উচ্চ সম্মানের সহিত পরীক্ষা পাশ করিয়া কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যাওয়ার অল্প কিছু কাল পরেই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব করিবার অভিযোগে তাঁহাকে একটি গ্রামে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই সময়েই কৃষকদের জীবনের সহিত তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিন বৎসর নির্ব্বাসনের পর লেনিন যখন সেণ্ট পিটার্সবার্গে ফিরিয়া গেলেন তখন সেখানে শ্রমিকদের মধ্যে জাগিয়াছে এক বিরাট চাঞ্চল্য। তেইশ বৎসরের যুবক লেনিন শ্রমিকদের এই ছোট ছোট গুপ্ত আলোচনা-চক্রে যোগদান করিয়া আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে তাঁহার জীবন-সূত্র চিরদিনের জন্য জড়িত হইয়া পড়িল। সেণ্ট পিটার্সবার্গের বিভিন্ন মার্কসবাদী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ১৮৯৫ সালে লেনিন এবং মারটোভ একটি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকেই ভাবী বলশেভিক পার্টির বীজস্বরূপ বলিতে পারা যায়। ইহারই এক বৎসর পরে সেণ্ট পিটার্সবার্গে শ্রমিকগণ যে ব্যাপক ধর্ম্মঘট করে, তাহারই মধ্যে তাহারা সর্ব্বপ্রথম লাভ করে সঙ্ঘশক্তির পরিচয়। এই সময়ই রাশিয়ায় সর্ব্বপ্রথম সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি গঠিত হয় এবং উহা লণ্ডনের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ১৮৯৫ সালের শেষ ভাগে লেনিন চৌদ্দ মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ১৮৯৭ সালে তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য পূর্ব্ব-সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়।

এই সময়ে রাশিয়ায় শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ যেমন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল তেমনি বৃদ্ধি পাইতেছিল শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এই সময়ে মার্কসবাদের প্রসার ব্যাপক হইয়া উঠে। প্রত্যেকটি বিদ্যায়তন মার্কসবাদের উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কোন চিন্তাশীল ছাত্রের পক্ষেই বিপ্লব তথা মার্কসবাদের ছোঁয়াচ হইতে দূরে থাকা সম্ভব ছিল না। তরুণ যোসেফ ষ্টালিনের গায়েও উহার ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। তিনি ১৮৯৮ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির স্থানীয় শাখায় যোগদান করেন। ১৮৯৯ সালের মে মাসে তিনি তিফ লিসের সেমিনারী হইতে বহিষ্কৃত হন, আরম্ভ হয় তাঁহার বৈপ্লবিক জীবন। এই সময় হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার বৈপ্লবিক জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে দুইটি বিবরণ পাওয়া যায়। একটি রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির রচিত সরকারী ইতিবৃত্ত, আর একটি ষ্টালিনের বিরোধীদের প্রদত্ত বিবরণ। ইহা লইয়া এখানে আলোচনা করার স্থানাভাব। তাঁহার জীবনের এই সময়ের ঘটনাবলীর কথা কমই জানিতে পারা যায়। যেটুকু জানিতে পারা যায় তাহাতে দেখা যায়, ১৯০২ সালে চরমপন্থী আন্দোলনকারী হিসাবে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া দেড় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অতঃপর তিনি সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেখান হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। ১৯০৩ সালে চিঠিপত্রের মারফৎ সর্ব্বপ্রথম তিনি লেনিনের সহিত পরিচিত হন। রাশিয়ার ভাবী বিপ্লবের ইতিহাসে এই সালটির গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। এই বৎসরেই লণ্ডনে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির অধিবেশনে প্লেখানভ এবং মারটোভের সহিত লেনিনের মতভেদের ফলে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি বলশেভিক ও ম্যানশেভিক এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া

ভি, আই, লেনিন এবং জে, ভি, ষ্টালিন (ইং ১৯২২ অব্দে)

যায়। অতঃপর লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বলশেভিক দলেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী বিপ্লবের মধ্যে বলশেভিকগণই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ট্রটস্কি ছিলেন ম্যানশেভিক দলে। বিপ্লবের সময় তিনি লেনিনের সহিত যোগদান করেন।

লেনিনের সহিত ষ্ট্যালিনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৫ সালে। কিন্তু তাঁহার জীবনে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটে ১৯১২ সালে। এই বৎসরই লেনিন তাঁহাকে দলের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতিতে গ্রহণ করেন। ইহার কিছু কাল পরেই তাঁহার চেষ্টায় 'প্রাভদা' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে লেনিনের প্রতিষ্ঠিত 'ইস্ক্রা' পত্রিকার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯০০ সালে বিদেশ হইতে তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সাহায্যেই তিনি বলশেভিক পার্টি গঠনের ভিত্তিভূমি রচনা করেন। ১৯০৩ সালের মত ১৯০৫ সালও রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই বৎসর লেনিন রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব পরিচালিত হয়। রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই বিপ্লবের উদ্ভব এবং এই বিপ্লবের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম 'সোভিয়েট' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালের নবেম্বর (অক্টোবর) বিপ্লবে সোভিয়েটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

জোসেফ ষ্ট্যালিন ১৯১৩ সালের ৮ই মার্চ শেষ বারের মত ধরা পড়েন এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বাসনে কাটাইয়াছেন। এই বিপ্লবে রাশিয়ার জার সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং কেরেনেস্কির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইল বুর্জ্জোয়া ডেমোক্রাটিক গবর্ণমেণ্ট। এই গবর্ণমেণ্টের সহিত বলশেভিকদের সহযোগিতা করা উচিত কিনা ইহা লইয়া বলশেভিকদের মধ্যেও মতভেদ হইয়াছিল। এমন কি ষ্ট্যালিন পর্য্যন্ত প্রথমে সহযোগিতা করার পক্ষপাতী ছিলেন। লেনিন তখনও সুইজারল্যাণ্ডে। তিনি এই সহযোগিতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এপ্রিল মাসে তিনি রাশিয়ায় ফিরিয়া আসেন। জুলাই মাসে বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন এবং দলের নেতৃত্ব-ভার ষ্ট্যালিনের হাতে আসিয়া পড়ে। অতঃপর ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বেই বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। নবেম্বর মাসে লেনিন পেট্রোগ্রাডে ফিরিয়া আসেন। ট্রটস্কিও এই সময় তাঁহাদের দলে যোগদান করেন। ৭ই নবেম্বর লেনিন, ষ্ট্যালিন, ট্রটস্কির নেতৃত্বে শাসনযন্ত্র অধিকৃত হইল। ইহাই নবেম্বর (অক্টোবর) বিপ্লব নামে খ্যাত।

এই বিপ্লবের পরে ১৯২১ সালের শেষ পর্য্যন্ত বৈদেশিক শক্তিবর্গের প্ররোচিত বহু ফ্রণ্টে গৃহযুদ্ধ এবং বৈদেশিক শক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বলশেভিক নেতৃবর্গের কঠোর সংগ্রামের সর্ব্বজন-পরিচিত ইতিহাসের আলোচনা করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও ছিল একান্ত অভাব। বাহির হইতেও কিছু পাইবার উপায় ছিল না। ইহার উপর চলিতেছিল বহু ফ্রণ্টে গৃহযুদ্ধ এবং চারিদিক হইতে বৈদেশিক শক্তিবর্গের আক্রমণ। অবশেষে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিবার আশঙ্কায় বৈদেশিক শক্তিবর্গ বলশেভিক শাসনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিবার প্রচেষ্টা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। গৃহযুদ্ধেও বলশেভিকগণ জয়লাভ করিলেন। যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপে বিধ্বস্ত রাশিয়ায় ১৯২১ সালের অনাবৃষ্টির ফলে দেখা দিল ব্যাপক দুর্ভিক্ষ। বলশেভিকগণ এবং কম্যুনিজম উভয়েই আর এক কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। এই অবস্থায় লেনিন নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (N. E. P.) প্রবর্ত্তন করিলেন। উহাই রাশিয়াকে উপস্থিত অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে রক্ষা করে এবং পরিকল্পনামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়। উহার পূর্ব্বেই বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য ১৯২০ সালে একটি কমিশন গঠন করা হইয়াছিল। ইউনিয়ন অব সোশ্যালিষ্ট সোভিয়েট রিপাবলিকস্ গঠিত হয় ১৯২২ সালে। বিপ্লবের পর রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিসমূহের সমস্যা সমাধানের জন্য ষ্ট্যালিন 'পিপলস্ কমিশার ফর নেশনিলিটিজ' নিযুক্ত হন এবং ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত এই পদেই তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বিপ্লবকে সংহত ও সংগঠিত করিবার ব্যবস্থার পূর্ব্বেই ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী লেনিনের মৃত্যু হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিন সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের আসন দখল করিতে সমর্থ হন। এই সময় হইতেই তাঁহার গভীর রাজনৈতিক কৌশল এবং সংগঠন-প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ষ্ট্যালিন লেনিনের হাতে গঠিত কম্যুনিষ্ট নেতা কি না, এ বিষয়ে মতভেদ থাকা খুব স্বাভাবিক। কম্যুনিষ্টদের সরকারী ভাষায় লেনিন-ষ্ট্যালিনের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করাই রীতি। এ-সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা অবান্তর বলিয়াই আমরা মনে করি। ষ্ট্যালিন যে-অভূতপূর্ব্ব সংগঠন-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা কাহারও স্বীকার করা না-করার উপর নির্ভর করে না। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে হিটলারের পরাজয়ের মধ্যেই উহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধি, সংগঠন শক্তি এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে শুধু নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্যই নিজেকে সর্ব্বময় ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে তাঁহার প্রতি গুরুতর অবিচার করা হইবে। বিপ্লবী রাষ্ট্রের হাল দৃঢ়হস্তে ধারণ না করিলে বিপ্লবই যে ব্যর্থ হইবার আশঙ্কাও সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু মানুষের যে-সকল দুর্ব্বলতা, দোষ-ত্রুটি আছে কম্যুনিষ্ট হইলেই সেগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এ কথা যেমন স্বীকার করা যায় না, তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারিত করার মধ্যেও কোন নূতনত্ব নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে উহাকে অন্যায় বলিয়াও গণ্য করা হয় না, যদি তাঁহাকে অপসারিত করার জন্য উৎকৃষ্ট রকম গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারা যায়। বিপ্লবী রাষ্ট্রে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মত গুরুতর অভিযোগ আর কিছু হইতে পারে না। বিপ্লবে তাঁহার যত কিছু দান ইতিহাসের পাতা হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবার ব্যবস্থাও করিতে হয়। তাঁহাকে যত ভাবে সম্ভব কালিমালিপ্ত করিতে হয়। ট্রটস্কি, জিনোভিয়েব এবং কামেনেভের বিরুদ্ধে এইরূপ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াই তাঁহাদিগকে দল হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। লাল ফৌজ গঠনে ট্রটস্কির যে কিছুমাত্র দান আছে কম্যুনিষ্টদের রচিত ইতিহাসে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৯৩৪

সালের শেষ ভাগে কিরভ নিহত হওয়ার পর ১৯২৫ এবং ১৯৩৬ সালে দুই দফায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগের বিচারে যে-সকল বিশিষ্ট বলশেভিষ্ট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, তাঁহারা সকলেই নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে জিনোভিয়েব, কামেনেভ এবং বুখারিন অন্যতম। ইহার পর ১৯৩৭ সালে বিনা বিচারেই কয়েক জন বিশিষ্ট জেনারেলকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। পুরাতন ও প্রধান বলশেভিষ্টদের মধ্যে ষ্ট্যালিন ও মলোটভ ব্যতীত আর কেহই অবশিষ্ট রহিলেন না। অতঃপর ১৯৩৮ সালে য়াগোডা ও ইয়েঝোভকেও অপসারিত করা হইল। যে-সকল বিশিষ্ট বলশেভিষ্টকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ায় বিপর্য্যয় ঘটিত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইঁহাদিগকে অপসারিত করিবার সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছে, এ কথা বলা হইয়া থাকে। হইত কি হইত না তাহা প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। বিপ্লবের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিপ্লবীর পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই স্বাভাবিক এবং ইঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ায় বিপর্য্যয় ঘটিত, সামাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত, এ কথা শুনিলে কোন্ বিপ্লবীর প্রাণ ইঁহাদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত না হইয়া উঠে! রুশ বিপ্লবের ইতিহাসের এই দিক সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণাই থাকুক, ষ্ট্যালিন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে যে-যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

বিপ্লবকে সার্থক করিবার জন্য কি কি করা প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে ষ্ট্যালিনের একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার পথে যত প্রবল বাধাই উপস্থিত হউক না কেন, কঠোর হস্তে তাহা দূর করিবার মত লৌহ-কঠিন দৃঢ়তাও তাঁহার ছিল। বিপ্লবের পূর্ব্বে রাশিয়া ছিল শিল্পে অনুন্নত, তাহার কৃষি-ব্যবস্থা ছিল মান্ধাতার আমলের। প্রথম মহাযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ এবং দুর্ভিক্ষে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। নয়া অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা শুধু শ্বাস ফেলিবার সুযোগ দিয়াছিল মাত্র। সমাজ-তান্ত্রিক শিল্পোন্নয়ন এবং ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার পথে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের কাজ সর্ব্বপ্রথম সুরু হয় ১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ষ্ট্যালিন রাশিয়ার কৃষি ও শিল্পের এরূপ উন্নতি সাধন করিতে, দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে এমন সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহার অব্যর্থ শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে। ১৯৩৯ সালে সম্পাদিত রুশ-জার্ম্মাণ চুক্তির বহু নিন্দাই এ-পর্য্যন্ত শোনা গিয়াছে। রাশিয়ার আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য আরও সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে উহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্যই ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম পরিচালনা ব্যাপারেও ষ্ট্যালিন যে-যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। রাশিয়াকে তিনি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করিয়াছেন, গড়িয়া তুলিয়াছেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। ষ্ট্যালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে বিরোধের প্রকৃত কারণ 'এক দেশে সমাজতন্ত্র' বনাম 'স্থায়ী বিপ্লব' কি না, এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু ষ্ট্যালিন

ইহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝিয়াছিলেন যে, চারি দিকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সোভিয়েট রাশিয়াকে যদি টিকিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক হইতে রাশিয়াকে প্রভূত শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যে সব সময়ই সমাজতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক বিপদ এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে-কোন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলে পুনরায় যে ধনতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাতেও ষ্ট্যালিনের কোন সন্দেহ ছিল না। তথাপি তিনি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তিতে পাশাপাশি বাস করিবার অভিপ্রায় দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব চিচেরিন ১৯২২ সালে জেনোয়া সম্মেলনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাশিয়ার যোগদানের যে সর্ত্ত উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা লইয়া আলোচনার স্থান এখানে নাই। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ পাল্টা প্রস্তাবে যাহা দাবী করিয়াছিলেন তাহা আসলে সোভিয়েট রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্ত্তনের দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। উহার প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া জার্ম্মাণীর সহিত অনাক্রমণ, বাণিজ্য এবং মৈত্রীর সর্ত্তে রেপ্যালো চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। এই চুক্তির উপর আঘাত হানিবার জন্য পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সম্পাদন করিয়াছিল লোকার্ণো চুক্তি। উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিকে লোকার্ণো চুক্তিরই বৃহত্তর সংস্করণ মনে করিলে ভুল হইবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহাতে ভাঙ্গন ধরে। আজ আর উহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। ষ্ট্যালিনের শান্তি প্রস্তাবকে সকলেই সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও চীনের অস্তিত্বই ধনতন্ত্রের পক্ষে তাঁহারা বিপজ্জনক মনে করেন। এই জন্যই ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে সোভিয়েট রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গ মহলে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ির ফলে রাশিয়া কি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে? যদি ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ি না-ও হয়, তাহা হইলেও শুধু ষ্ট্যালিনের অভাবেই রাশিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে কি? আমাদের বিশ্বাস, ইহার কোনটাই ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এ কথা খুবই সত্য যে, যতদিন ধনতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের বিপদ থাকিবে ততদিন সমাজতন্ত্র নিরাপদ নয়। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেছে তাহার সাফল্য ও পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন শান্তি। রাশিয়ার নূতন রাষ্ট্রনায়কগণ তাহা ভাল করিয়াই জানেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্ররোচনায় তাঁহারা যেমন বিভ্রান্ত হইবেন না, তেমনি আত্মরক্ষার জন্য শক্তিবৃদ্ধি করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করিবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ডুলেসের ইউরোপ পরিদর্শন—

নূতন মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ জন ফষ্টার ডুলেস সম্প্রতি দশ দিনে পশ্চিম-ইউরোপের সাতটি রাজ্যের রাজধানী পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন মিউচুয়েল সিকিউরিটি ডিরেক্টার মিঃ হ্যারল্ড ষ্ট্যাসেন। পশ্চিম-উইরোপের যে সাতটি রাজধানী মিঃ ডুলেস পরিদর্শন করিয়াছেন তন্মধ্যে প্যারী, লণ্ডন এবং বন্ পরিদর্শনের গুরুত্বই সর্ব্বাধিক। তাঁহার এই পরিদর্শনের ফলাফল অবশ্য প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু উহা অনুমান করা কঠিন নয়। পশ্চিম-ইউরোপ পরিদর্শনে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পশ্চিম-ইউরোপের বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের মতামত জানাই তাঁহার ইউরোপ যাত্রার উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলে তিনি পশ্চিম-ইউরোপের বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের মতামত জানা অপেক্ষা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতামতই যে তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া শুনাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, ইউরোপের বিভিন্ন প্রভাবশালী সংবাদপত্রে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহাতে এই ধারণাই দৃঢ় হইয়াছে। পশ্চিম-ইউরোপের ঐক্য এবং ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী গঠনই যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে পশ্চিম-ইউরোপের প্রধান সমস্যা, এ কথা অনস্বীকার্য্য। ঐক্যের পথে পশ্চিম-ইউরোপের অগ্রগতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। পশ্চিম-ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের পথেও এখনও প্রবল বাধা রহিয়াছে। ১৯৫২ সালের মে মাসে প্যারী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম-ইউরোপীয় বাহিনী গঠিত হইবে। কিন্তু এই চুক্তি এখনও বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। ইহার উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে পশ্চিম-ইউরোপে যে আশঙ্কা জাগিয়াছে, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নয়। মিঃ ডুলেস স্বরাষ্ট্র-সচিবের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই বেতার বক্তৃতায় পশ্চিম-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে একবার ধমকাইয়াছেন। সাম্‌না-সাম্‌নি ধমকাইবার জন্যই তিনি ইউরোপে গিয়াছিলেন।

মার্কিণ কংগ্রেসের নিকট প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের বাণীতে ফরমোসা সম্পর্কে ঘোষিত নীতি সম্পর্কে কমন্স সভায় বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেনের প্রথম মন্তব্য মিঃ ডুলেস লণ্ডনে পৌছিবার পূর্ব্বেই করা হয়। কিন্তু মিঃ ডুলেসের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁহার ধমকের সম্মোহন শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মিঃ ইডেন তাঁহার সুর একেবারেই পাল্টাইয়া ফেলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি কমন্স সভায় বলেন যে, আমেরিকার নূতন ফরমোসা নীতির মধ্যে কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণ করিবার কোন অভিপ্রায় নাই। তিনি শ্রমিক সদস্যদিগকে এই অনুরোধও করেন যে, মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব লণ্ডনে উপস্থিত থাকিবার সময় তাঁহারা যেন নরম ভাষায় সমালোচনা করেন। বিশেষতঃ আমেরিকার নিকট হইতে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য মিঃ বাটলার এবং মিঃ ইডেনের আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতির কঠোর সমালোচনা মিঃ ইডেনের কাছে ভাল না লাগিবারই কথা।

পশ্চিম-ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর না হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছে, মিঃ ডুলেস প্যারীতে এ কথাটা বেশ কড়া ভাষাতেই বুঝাইয়া দিয়াছেন বলিয়াই সকলের বিশ্বাস। কিন্তু ইহাতে প্যারী চুক্তি সম্পর্কে ফ্রান্সের আশঙ্কা দূর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং আমেরিকা পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সহযোগিতার উপর ক্রমেই বেশী করিয়া জোর দেওয়ায় ফ্রান্সের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ফ্রান্স প্যারী চুক্তিকে যে ভাবে সংশোধন করিতে চায় তাহাও যে মিঃ ডুলেস

অন্তর্গত হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্যারী চুক্তিতে ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক ভাগ থাকিবে ইউরোপীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এবং আর এক ভাগ থাকিবে ফ্রান্স গবর্ণমেন্টের অধীনে। ফ্রান্স ইহাতে সন্তুষ্ট নয়। তাহার সাম্রাজ্য আছে। এই সাম্রাজ্যের ইন্দোচীনে ফ্রান্স অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। মরোক্কো এবং টিউনিশিয়াতেও সে স্বাধীনতা-আন্দোলনের সম্মুখীন। ফ্রান্স চায়, তাহার সাম্রাজ্যকে ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থার দিক হইতে ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলেই পশ্চিম-ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ফরাসী বাহিনীকে সে স্বাধীন ভাবে অন্যত্র নিয়োগ করিতে পারিবে, তাহার এই অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে ইউরোপীয় বাহিনীর প্রকৃতিই বদলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া, ফ্রান্সের আরও একটা আশঙ্কা আছে যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণী এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে যাহাতে একটা অনভিপ্রেত যুদ্ধে ফ্রান্স জড়িত হইয়া পড়িতে পারে। এই জন্যই সে বৃটেনকে ইউরোপীয় ডিফেন্স কমিউনিটির সহিত নিবিড় ভাবে সংযুক্ত করিতে চায়। রোমের আলোচনা-বৈঠকে ফ্রান্সের সংশোধন প্রস্তাবগুলিকে প্যারী চুক্তির ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই প্যারী চুক্তির কাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বনে চ্যান্সেলার এডেনেয়ুরের সহিত আলোচনায় মিঃ ডুলেসকে বোধ হয় কড়া ভাষা ব্যবহার করিতে হয় নাই। ধমকানিটা বোধ হয় সমাজতন্ত্রী নেতা ওলেনহাউয়েরের জন্যই মজুত ছিল। মিঃ ডুলেস বনে এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণী এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই প্যারী চুক্তি অনুমোদন করিবে। ইউরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিঃ ডুলেস বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থার মৃত্যু হয় নাই, শুধু ঘুমাইতেছে। কিন্তু উহার এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যে সহজে ভাঙ্গিবে না তাহা ইউরোপ পরিদর্শনের ফলে মিঃ ডুলেস নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমেরিকা ইহাতে মোটেই বিচলিত হইবে না। যে ভাবেই হউক, আমেরিকা জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী গঠন করিবেই। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে এবং বাল্‌টিক অঞ্চলে তাহার ঘাঁটিগুলিকে দৃঢ় করিবার ব্যবস্থাও আমেরিকা করিতেছে। নরওয়ে ও ডেনমার্কের নিকট রাশিয়া যে প্রতিবাদ জানাইয়াছে, ইহাতে বুঝা যায় রাশিয়াও আমেরিকার এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ সজাগ। কিন্তু মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি যে ইতিমধ্যে সুদূর প্রাচ্যেই তীব্র আকার ধারণ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সুদানের স্বাধীনতা—

অবশেষে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) সুদান সম্পর্কে বৃটেন ও মিশরের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে, সুদান স্বাধীন হইতে চায় কিম্বা মিশরের সহিত কোন ভাবে সংযুক্ত হইতে চায় তাহা তিন বৎসরের মধ্যে সুদানীরা নিজেরাই নির্দ্ধারণ করিবে। এই সময়ের মধ্যে সুদানের শাসন-কার্য্য সুদানীরাই চালাইবে। কেবল পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপার এবং দেশরক্ষার ব্যবস্থা গবর্ণর জেনারেলের নির্দ্দেশে পরিচালিত হইবে। গবর্ণর জেনারেলকে সাহায্য করিবার জন্য তিনটি মিশ্র কমিশন গঠিত হইবে। একটি কমিশন গবর্ণর জেনারেলের ক্ষমতার উপর খবরদারী করিবে। দ্বিতীয় কমিশন গঠিত হইবে নির্ব্বাচন-কার্য্য পরিচালনার জন্য। সরকারী বিভাগগুলি সুদানীকরণ করিবার কাজ পরিচালন করিবেন তৃতীয় কমিশন। কমিশন তিনটির গঠন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু চুক্তিতে সুদানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুইটি বিকল্প ব্যবস্থা কেন করা হইল, ইহা সত্যই ভাবিবার কথা। একটি বিকল্প ব্যবস্থা এই যে, সুদান সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইবে। সুদান কোন-না-কোন ভাবে মিশরের সহিত ইউনিয়ন গঠন করিবে, ইহাই অপর বিকল্প ব্যবস্থা। এই দ্বিতীয় বিকল্প ব্যবস্থা দক্ষিণ-সুদানের অধিবাসীদের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি না করিয়া পারিবে না। তাহারা নির্ব্বাচন বর্জ্জন করিতেও পারে। কিন্তু তাহাতে সুদানের ঐক্য এবং মিশরের সহিত যোগদানের কোন বাধা হইবে না। তবে দক্ষিণ-সুদানের অ-মুসলমানদের অবস্থা পাকিস্তানের হিন্দুদের মত হইলে বিস্ময়ের বিষয় না হওয়ারই কথা।

দুইটি বিকল্প ব্যবস্থার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। মিশর সুদানকে অঙ্গীভূত করিতে চায় এবং উত্তর-সুদানীরা বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থার অনুকূলে রহিয়াছে। মিশরের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়াই মিশরের সহিত সুদানের সংযোগের বিকল্প ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবার বৃটেনের আশা আছে, সুদান সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া বৃটিশ কমনওয়েলথে যোগদান করিবে। বস্তুতঃ বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন এই আশাই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে মিশরের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল নাগীব গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) হুমকী দিয়া বলিয়াছেন যে, সুদান যদি বৃটিশ কমনওয়েলথে যোগদান করার সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইলে মিশর নূতন চুক্তি অগ্রাহ্য করিবে। তাঁহার এই উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া মিঃ ইডেন বলিয়াছেন যে, সুদান কি করিবে তাহা স্থির করিতে সুদানের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে। ইঙ্গ-মিশর স্বার্থের দ্বন্দ্বের জন্যই সুদানের স্বাধীনতাকে সর্ত্তাধীন করা হইয়াছে।

তেহরাণে হাঙ্গামার তাৎপর্য্য—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চ্চ (১৯৫৩) ইরাণের রাজধানী তেহরাণে যে হাঙ্গামা হইয়া গেল তাহার তাৎপর্য্য দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। ইরাণের শাহ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন যে, তিনি স্বাস্থ্যের জন্য বিদেশে যাইবেন এবং এই সুযোগে শিয়া ধর্ম্মস্থানগুলিও দর্শন করিবেন। ইহাতেই তেহরাণের কতকগুলি লোকের মনে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেক শাহকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি? জনতা উত্তেজিত হইয়া ডাঃ মোসাদ্দেকের বাসগৃহ পর্য্যন্ত ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি মজলিশে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এই ব্যাপারে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হাঙ্গামা দমনের জন্য যখন সৈন্য ডাকার কথা হইল তখন অফিসারগণ লরীর জন্য পেট্রলের অভাবে সৈন্য পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই হাঙ্গামার কারণ বুঝিতে হইলে শাহ এবং ডাঃ মোসাদ্দেকের মধ্যে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিরোধের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ইহা ব্যতীত শাহ না ডাঃ মোসাদ্দেক কাহাকে সমর্থন করা উচিত সে-সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মতভেদও প্রণিধানযোগ্য। শাহ এবং তাঁহার পারিষদ দলের উপরেই বৃটেনের গভীর আস্থা। কিন্তু মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, ইরাণ এবং আরব রাষ্ট্রগুলিকে পাশ্চাত্য শিবিরভুক্ত রাখিতে হইলে ডাঃ মোসাদ্দেককেই সমর্থন করা উচিত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইরাণের যে-সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজনীতিক ইরাণে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ মোসাদ্দেক এখনও জীবিত আছেন। বর্ত্তমান শাহের পিতা রেজা শাহ পলহবী ১৯২৩ সালে যখন ক্ষমতা দখল করিয়া বসিলেন তখন যাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্পর্কে তিনি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ডাঃ মোসাদ্দেক এই দমন নীতির কবল হইতে রক্ষা পান নাই। তা ছাড়া যে-রাজবংশের উচ্ছেদ করিয়া রেজা শাহ পলহবী ক্ষমতা দখল করেন তাহার সহিত ডাঃ মোসাদ্দেকের কিছু সম্পর্কও ছিল। তাঁহার নেশন্যাল ফ্রণ্ট পুরাতন শাসন-ব্যবস্থার প্রতীক হিসাবে শাহ ও তাঁহার পারিষদ দলের বিরোধী। যে-অবস্থাধীনে তিনি প্রধান মন্ত্রী হন শাহের কাছে তাহা তিক্ত বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জেঃ রাজমারার প্রতি শাহের বিশেষ সমর্থন ছিল। তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ায় ডাঃ মোসাদ্দেক প্রধান মন্ত্রী হন। ডাঃ মোসাদ্দেকের ধারণা, তাঁহার বিরুদ্ধে কি বৈদেশিক কি আভ্যন্তরীণ সমস্ত চক্রান্তের কেন্দ্রস্থল শাহের দরবার। শাহের পত্নী দক্ষিণ-ইরাণের বখ্‌তিয়ারী উপজাতীয় জনৈক সর্দ্দারের কন্যা। কিছু দিন পূর্ব্বে এই উপজাতীয়েরা বিদ্রোহ করিয়াছিল এবং এই বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট বলিয়া জেঃ জাহেদিকে গ্রেফতার করা হয়। ইরাণের রাজনীতিকদের ধারণা, ইরাণের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক রাজনৈতিক শত্রুদের উস্‌কানীই এই বিদ্রোহের মূল। সর্ব্বোপরি ডাঃ মোসাদ্দেক আশঙ্কা করেন যে, বৃটিশের প্ররোচনায় শাহের পক্ষে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করিয়া তাঁহার পতন ঘটাইতে পারে। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি যখন আবাদান হইতে বৃটিশদিগকে বিতাড়িত করেন তখন উহাতে বাধা দিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শাহকে তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বিশেষ ভাবে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ মোসাদ্দেক সাফল্যের সহিত এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হন এবং শাহের মাতা ও ভগিনীকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

ইরাণের শাহের ক্ষমতার উৎস দুইটি,—সৈন্যবাহিনী এবং সিনেট। শাহ সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক। সিনেটের সদস্যরা শাহের দ্বারা মনোনীত হইয়া থাকেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে নূতন আইন রচনা করিয়া সিনেটের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যেই এক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ মোসাদ্দেক মার্কিণ সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। গত বৎসর সামরিক ব্যয় হ্রাস করায় বহু জেনারেলকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। বিদ্রোহের চেষ্টা করিবার অভিযোগেও কতক অফিসারকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। যে-সপ্তাহের শেষে হাঙ্গামা হয় তাহার প্রথম দিকে ডাঃ মোসাদ্দেক শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চারি ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করেন। অনেকে মনে করেন, এই সাক্ষাৎকারের সময় সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কের পদ পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি শাহকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই অনুরোধের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই হাঙ্গামা কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী করা হইয়াছিল, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

ব্রহ্মদেশে কুয়োমিণ্টাং সৈন্য—

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী ব্রহ্ম পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি চীনের উনান প্রদেশের সীমান্তবর্ত্তী ব্রহ্মদেশের অঞ্চলে চীনা কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর উপস্থিতি ও কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিবেন। ব্রহ্মদেশে কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদ বড় একটা প্রকাশিত হয় না। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ফরমোসা নীতি ঘোষিত হওয়ার পর ইহাদের কর্ম্মতৎপরতা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৯ সালের শেষ ভাগে চীনদেশে কম্যুনিষ্টদের জয়লাভে কুয়োমিণ্টাং শাসন যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন জেঃ লিমির নেতৃত্বে পরিচালিত কুয়োমিণ্টাং অষ্টম বাহিনীর সৈন্যরা ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। সেই সময় হইতেই তাহারা ব্রহ্মদেশে অবস্থান করিতেছে। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট প্রথমে এই কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর ব্রহ্মদেশে অবস্থানের কথা স্বীকার করেন নাই। ১৯৫১ সালের প্রথম দিকে জেঃ লিমি তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া চীনের উনান প্রদেশে হানা দিতে আরম্ভ করেন। এই সকল হানাকে চিয়াং কাইশেক সগর্ব্বে চীন দখলের চেষ্টা বলিয়া প্রচারও করিয়াছিলেন। কিন্তু লিমির সৈন্যরা পরাজিত হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে পুনরায় ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া আসে। অতঃপর লিমির সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়াও প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি সংবাদ প্রকাশ পাইতে থাকে যে, লিমি তাহার সৈন্যবাহিনীর জন্য বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য পাইতেছেন। আবার ১৯৫১ সালের শেষ ভাগে চীনের কম্যুনিষ্ট সৈন্যদের সহিত লিমির সৈন্যদের কতকগুলি সংঘর্ষের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ সময় চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্যরা লিমির সৈন্যদের তাড়া করিয়া ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। উহাকেই পশ্চিমী শক্তিবর্গ ব্রহ্ম ও ইন্দোচীন সীমান্তে চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্য চলাচল বলিয়া অভিহিত করিয়া চীনের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়াসের ধূয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পিকিং গবর্ণমেণ্টও লিমির সৈন্যরা ব্রহ্মদেশের মাটিতে অবস্থান করিয়া চীনের বিরুদ্ধে যে-সকল শত্রুতামূলক কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিতেছিল, তৎপ্রতি ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পিকিং গবর্ণমেণ্টের এই কূটনৈতিক চাপে বাধ্য হইয়া অবশেষে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট কুয়োমিণ্টাং বাহিনীকে ব্রহ্মদেশ হইতে সরাইয়া নিতে চিয়াং কাইশেককে অনুরোধ করিবার জন্য মিত্রশক্তিবর্গকে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতেও ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছিল। অতঃপর কিছু দিন ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়িয়া থাকে। কিন্তু প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের ফরমোসা নীতি ঘোষিত হওয়ার পর ব্যাপারটি আবার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

লিমির সৈন্যরা শুধু ব্রহ্মদেশে অবস্থানই করিতেছে না, তাহারা ব্রহ্মদেশের কতকগুলি অঞ্চল দখল করিয়া ঘাঁটি স্থাপন

করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াও প্রকাশিত সংবাদ হইতে বুঝা যাইতেছে। তাহারা মঙ্গসু ও কেংটুং দখল করিয়া সেখানে তাহাদের হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করিয়াছে। ব্রহ্মসৈন্যদের সহিত তাহাদের কতকগুলি সংঘর্ষও ঘটিয়াছে। অবশ্য ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট মঙ্গসু রাজ্য (একটি শান রাজ্য) পুনরায় দখল করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের ফরমোসা নীতি ঘোষণার প্রাক্কালেই চিয়াং কাইশেক তাঁহার চীন দখলের পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ চীনের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য ছায়া-গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া ফেলিয়াছেন। জেঃ লিমিকে করা হইয়াছে উনান প্রদেশের ছায়া-গবর্ণমেণ্টের গবর্ণর। গত ৩রা মার্চ্চের এক সংবাদে প্রকাশ, লিমি নূতন সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ফরমোসা হইতে সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এদিকে গত দুই মাস যাবৎ লিমির সৈন্যরা তাহাদের ব্রহ্মদেশের ঘাঁটি হইতে উনান প্রদেশে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উনান প্রদেশে যে-সকল জাতীয়তাবাদী গেরিলা আছে তাহাদের সহিত সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। পিকিং গবর্ণমেণ্ট দুই ডিভিসন নিয়মিত সৈন্যবাহিনী উনান সীমান্তে প্রেরণ করিয়াছেন। লিমির বাহিনী কার্য্যকরী ভাবে উনান আক্রমণ করিতে পারিবে কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, এই দুই মাসের মধ্যে লিমির যে-সকল সৈন্য উনান প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের কুড়ি জনের বেশী প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে নাই।

গ্রেনেড নারী লী তেন-তাই—

হাঙ্গেরীয় গবর্ণমেণ্ট যদি মালয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত চীনা গ্রেনেড নারী মিস্ লী তেন-তাই-এর বিনিময়ে এডগার স্যাণ্ডার্সকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মিস্ লী তেন-তাইয়ের বিচারের কথা বিশ্ববাসী কিছুই জানিতে পারিত না। মিস্ লী তেন-তাই যে প্রথম মালয়ী চীনা নারী কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নয়। ইতিপূর্ব্বে আর দুই জন নারীকে এই অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। যে-সকল পুরুষ এই অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ১৮০ জন। কিন্তু মিস্ লী তেন-তাইয়ের বিচারের এমন একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা বৃটিশ ন্যায়বিচারের সুনামকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া পারে নাই। অবশ্য অন্যান্য কম্যুনিষ্টদের বিচারও আদালতের রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপনেই করা হইয়াছে এবং অজুহাত দেখান হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সাক্ষীদের নিরাপত্তার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। কিন্তু মিস্ লী তেন-তাইয়ের বিচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, কম্যুনিষ্ট দেশে ন্যায়বিচার হয় না বলিয়া যে-প্রচারকার্য্য করা হইয়া থাকে, গণতান্ত্রিক ন্যায়বিচারের এই নমুনা তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

১৯৫২ সালের ২৪শে জুলাই পেরাক রাজ্যের রাজধানী ইপোহ্‌তে একটি বাড়ীতে একটি হাতবোমা সহ মিস্ লী-তেন-তাইকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহার কাছে দুইটি পরিচয়-কার্ড (identity card) ছিল। তন্মধ্যে একটি চুরি যায় এবং তাহার আসল ফটোর পরিবর্ত্তে অন্য ফটো রাখা হয়। আত্মসমর্পণকারী কম্যুনিষ্টরা তাঁহাকে লী মেং বলিয়া সনাক্ত করে। লী মেং মালয়ের এক জন উচ্চপদস্থ নারী কম্যুনিষ্ট। তিনিই নাকি ইউরোপীয়দিগকে হত্যার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গত আগষ্ট মাসে (১৯৫২) তাঁহার প্রথম বিচার হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ১৯৪৮ সালের ১৫ই জুলাই হইতে ১৯৫১ সালের অক্টোবরের মধ্যে তিনি একটি হাতবোমা বহন করিয়াছেন। মালয়ের জরুরী আইন অনুসারে উহা প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ। ছয় জন প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। তাহাদের সাক্ষ্যের পোষকতায় বিদ্রোহী কম্যুনিষ্টদের একটি গ্রুপ-ফটো উপস্থিত করা হয়। উহাতে একটি তরুণীর ছবিও আছে। তাহাকে দেখিতে মিস্ লী তেন-তাইয়ের মতই। বিচারপতি মিঃ টমসন দুই জন এশীয় এসেসর লইয়া বিচার করেন। এই দুই জন এসেসরের মধ্যে একজন ভারতীয়, আর এক জন চীনা। তাঁহারা মিস লী তেন-তাইকে নির্দ্দোষী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু বিচারপতি তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ না করিয়া পুনর্ব্বিচারের নির্দ্দেশ দেন। আইনতঃ বিচারপতি এসেসরের অভিমত গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

প্রথম বিচার শেষ হওয়ার দশ দিন পর দ্বিতীয় দফার বিচার আরম্ভ হয়। এসেসর হওয়ার জন্য আহূত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে বিচারপতি দুই জনকে এসেসর মনোনীত করিয়া থাকেন। এবার বিচারের সময় এসেসর হওয়ার জন্য রেজিষ্ট্রার যে-তিন জনকে আহ্বান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুই জনই ইউরোপীয় এবং এক জন মাত্র মালয়ী চীনা। বিচারপতি এক জন ইউরোপীয়কে এবং মালয়ী চীনাকে এসেসর নিযুক্ত করেন। মিস লী তেন-তাই ইহাতে আপত্তি জানাইয়া বিচারপতি মিঃ গ্রিথেরোকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'এ ক জন এসেসর এবং আপনি এই দুই জনই ইউরোপীয়, চীনা মাত্র এক জন।' বিচারপতি তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপীয়দিগকে যাহারা হত্যা করে তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগেই তিনি অভিযুক্ত। এই অবস্থায় ইউরোপীয় এসেসর তাহার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা পোষণ করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। তিন দিন ধরিয়া বিচার চলে এবং আরও তিন জন প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহী সাক্ষ্য দেয়। এই সকল সাক্ষীর মধ্যে মাত্র এক জনকে ক্ষমা করা হইয়াছে। অন্যান্য সকলের ক্ষমা পাওয়া নির্ভর করে পুলিশকে তাহারা কিরূপ সাহায্য করে তাহারই উপরে। বিচারপতি এসেসরদিগকে মামলা বুঝাইবার সময় এই সকল সাক্ষী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এই সকল লোকের স্বভাব এরূপ যে, তাহাদিগকে আপনারা আপনাদের ক্লাবের সদস্য করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন না। কিন্তু একটা লোক খারাপ হইলেই সে মিথ্যাবাদীও এ কথা বলা চলে না।' দুই জন এসেসারের মধ্যে ইউরোপীয় এসেসর তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং এশীয় এসেসর তাঁহাকে সাব্যস্ত করেন নির্দ্দোষী। বিচারপতি ইউরোপীয় এসেসরের সহিত একমত হইয়া মিস্ লী তেন-তাইয়ের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে মালয়ের আপীল আদালতে আপীল করা হইয়াছিল। আপীল আদালতের তিন জন বিচারপতির মধ্যে দুই জন আপীল অগ্রাহ্য করেন। শুধু এক জন বিচারপতি আপীল গ্রাহ্য করিবার পক্ষে ছিলেন। অতঃপর প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার অনুমতির জন্য উক্ত কাউন্সিলে দরখাস্ত করা হয়। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

অবশ্যম্ভাবী

"জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার অত্যধিক আগ্রহে আমাদের স্বদেশী শাসকবর্গ কি রকম বে-আইনী ভাবে নাগরিকদের আটক রাখেন, সুপ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে তাহা আর একবার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ডা: শ্যামাপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত এন, সি, চ্যাটার্জী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তিদানের আদেশ দিয়া রায়দান প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের কনষ্টিটিউশনাল বেঞ্চ বলিয়াছেন, আটক ব্যক্তিদের ৯ই মার্চ্চের পর আটক রাখার কোন আদেশ দেওয়া ছিল না। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৬ই মার্চ্চ রাত্রে আটক রাখার যে 'আদেশ দেন, তাহার মেয়াদ ৯ই মার্চ্চ তারিখে শেষ হয়। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ৯ই মার্চ্চ তারিখে মামলার শুনানী ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখেন। কিন্তু আটক ব্যক্তিদের ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত আটক রাখার কোন আদেশ ছিল না; কিন্তু দেখা যাইতেছে, তৎসত্বেও তাঁহাদের আটক রাখা হয়। সরকারী কর্ত্তারা সুবিধা পাইলেই জনসাধারণের "বেআইনী" কার্য্যকলাপের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন; কিন্তু তাঁহারা নিজেরাই যে বেআইনী ভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের প্রধান পাণ্ডা, অন্যান্য ঘটনার মত এই ঘটনাও তাহা ভাল ভাবে লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। বস্তুত: পক্ষে, এই ঘটনা আকস্মিক কিছু নয়। যেখানে পুলিসের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়, পুলিসই যে ক্ষেত্রে দেশের লোকের হণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে এই অবস্থাই অবশ্যম্ভাবী।"

—দৈনিক বসুমতী।

কোথায় লইয়া চলিয়াছে

"গত শুক্রবার লাহোরে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে পোড়াইয়া মারার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শিয়ালকোট, গুজরাণওয়ালা, নাজিরাবাদ ও শেখুপুরায় আহমদিয়াদের দোকানে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম্মান্ধতার এই উন্মত্ত তাণ্ডব দেখিয়া ১৯৪৭ সালের কথা মনে পড়িতেছে। তখন আক্রমণের লক্ষ্য ছিল অমুসলমান অর্থাৎ হিন্দু ও শিখ। তাহাদের বিতাড়ন বা বিলোপসাধন প্রায় সফল হইয়াছে, কিন্তু হিংসাবুদ্ধিকে যাহারা তাতাইয়া ইন্ধন দিয়া রাখিতেছে, তাহারা ত আর নীরব থাকিতে পারে না। তাহারা 'কাহাকে মারিব, কাহাকে কাটিব' করিতে করিতে আর কাহাকেও নিকটে না পাইয়া আহমদিয়া মুসলমানদের উপরেই লাফাইয়া পড়িয়াছে। লাহোরে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে, সহরে সান্ধ্য আইন বা কারফিউ আদেশ বলবৎ রহিয়াছে। ধর্ম্মোন্মত্ততা বা হিংস্র সাম্প্রদায়িকতা যে কত সর্বনাশ করিতে পারে, এবারে পাকিস্থানী ভাইরা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন এবং সেই সঙ্গে ইহাও ভাবিয়া দেখুন, তাঁহাদের শরিয়তী রাষ্ট্র তাঁহাদিগকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে।"

—যুগান্তর।

লাল ফিতার গোলকধাঁধা

"সরকারী লাল ফিতার গোলকধাঁধার কল্যাণে রাষ্ট্রের কত অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য যে উপেক্ষিত হইয়া থাকে—সম্প্রতি একটি ঘটনায় তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। হায়দরাবাদ রায়চূড় জেলার কিম্পল তহশীলের একজন পিওনের বেতনের বিল সরকারী কর্ম্মচারীরা ৬ মাসের মধ্যেও 'পাশ' করিবার 'সময়' পান নাই। ফলে দরিদ্র পিওনটি কলেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিল পাশ করাইবার চেষ্টা করে। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া কলেক্টরীর সম্মুখেই পিওনটি অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। হায়দরাবাদের অর্থমন্ত্রী বিধান সভায় অবশ্য এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, তিনি অতঃপর লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইবেন। পিওনটি দান-খয়রাত চাহে নাই; সরকারের নিকট তাহার ন্যায্য পাওনা পাইতে এই বিলম্ব না ঘটিলে এই ভাবে তাহার মৃত্যু ঘটিত না। বিধান সভায় অর্থমন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশের দ্বারাই মাত্র এই অমানুষিক অন্যায় ও শৈথিল্যের প্রতিকার হইতে পারে না। পিওনটির মৃত্যুর জন্য যাহারা দায়ী—যাহাদের ঔদাসীন্য ও গাফিলতিতে এই শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়া গেল—তাহাদের আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত। সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণকে অন্তত: তিন দিন অনাহারে থাকিতে বাধ্য করিয়া সমঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, দরিদ্রের অনাহারের জ্বালা কিরূপ।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ততই মঙ্গল

"কলেরা ও বসন্তের টিকা গ্রহণের আবেদন জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রতি কলিকাতার নাগরিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ও দ্রুত আসিয়া পড়িতেছে। পল্লীবাসী বা নগরবাসী রাজ্যের সকল লোকেরই এখন বসন্ত ও কলেরার টিকা লওয়া দরকার। গ্রীষ্ম আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটি রোগের প্রাদুর্ভাব-সম্ভাবনা দেখা যায়। চিকিৎসা ব্যবস্থায় যখন এই সম্ভাবনা প্রতিরোধের বিধান রহিয়াছে, তখন সেই বিধান যত অধিক মান্য করা যায়, ততই মঙ্গল। আমরা আশা করি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন পৌর-কর্তৃপক্ষও যথোচিত তৎপরতা অবলম্বন করিবেন।"

—জনসেবক।

দরিদ্র জনগণ লুণ্ঠিত হইবে

"ভারতীয় পার্লামেণ্টে অর্থ-সচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ বাজেট বিতর্কের জবাবে ঋণাত্মক ব্যয় বা ঘাটতি ব্যয় সংকুলানের পক্ষে অনেক যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং ঘাটতি ব্যয় সংকুলান বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থনৈতিক প্রগতির অনুকূল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে ঘাটতি ব্যয় সংকুলান দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু আমাদের দেশে যে বেকার সমস্যার কোন সমাধান হইবে না, দেশমুখ তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেকার সমস্যার কোন আশু সমাধান নাই। ঘাটতি ব্যয় সংকুলানের দ্বারা সরকার কতগুলি প্রজেক্টের কাজ সম্পন্ন করিতে চান। কিন্তু মূল্যস্তরের উপর ইহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। ঘাটতি ব্যয় সংকুলানের ফলে মূল্যস্তর বাড়িবে, ইহার পরিমাণে প্রত্যেকটি প্রজেক্টের ব্যয়-ভার বাড়িয়া যাইবে এবং এই ভাবে ঘাটতি ব্যয়ের অঙ্ক ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকিবে। ভারতের জনৈক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ এরূপ আশংকা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট আর একজন অর্থনীতিবিদ্ বলেন, ঘাটতি ব্যয়ের কল্যাণে সমাজের বিত্তবান শ্রেণী ঠিকাদারী প্রভৃতির মারফৎ রোজগার করিতে পারিবে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণ লুণ্ঠিত হইবে।" —সত্যযুগ।

দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি

"আসানসোল সহরে মোটরের স্পীড বা গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা বার বার পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু উহা অরণ্য-রোদনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ ইহার মধ্যে এমন কি কঠিন কার্য্য আছে যাহা পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের সাধ্যাতীত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা মনে করি, ব্যক্তিনির্বিশেষে উপরি উপরি দুই-চারি দিন আইনভঙ্গকারীদিগকে প্রসিকিউট বা ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিলেই জি, টি, রোডের মত জনাকীর্ণ রাস্তার উপর দিয়া উদ্দাম গতিতে মোটর চালাইবার বিলাস ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। অথচ এইটুকু না করার জন্য আসানসোলে মোটর-দুর্ঘটনা ত লাগিয়াই আছে। ইহাকে কি আমরা স্থানীয় পুলিসের যোগ্যতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিব? আমরা এ বিষয়ে স্থানীয় এস্. ডি. ও. মহাশয় ও পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি"— বঙ্গবাণী।

কালাকা নুন ও কালা কানুন

"ইংরেজ ২০০ বৎসর ধ'রে এই কালা ভারতবাসীর নুন খেয়ে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ক'রে শতকরা ১৫ জনের বেশী লোককে অক্ষর পরিচয় করাতে পারে নাই। কালার নুন খেয়ে কালা কানুনের চলন ক'রে ভারতবাসীর কত মঙ্গল সাধন ক'রে গিয়েছেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিম-বাংলার কালা প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এই কালা কানুন দিয়ে দেশের সেবা ক'রে তাঁর সেবকত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। পশ্চিম-বঙ্গের সুচিকিৎসক প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ঘোষের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন মেনে নিয়া কেবল "রিপীট দি মিক্‌শ্চার" অর্থাৎ ঐ দাওয়াই চালাইতে বলিয়াছেন। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে বলদকে ভোট-রূপ নুন চাটানই কালা কানুন পাইবার যোগ্যতা এনে দিয়েছে। বলদ মানে দামড়া হয়, যে বল দান করে তাকেও বলদ বলা চলে। কালাকা নুন হইতেই কালা কানুনের জন্ম। এ আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য।" —জঙ্গিপুর সংবাদ।

কিরূপ বিধান?

"বোলপুরের রিক্সাওয়ালাদের একটি ষ্ট্যাণ্ডের দাবী বহু পুরাতন দাবী। তদানীন্তন ও আধুনিক ভাইস চেয়ারম্যান ষ্ট্যাণ্ড করিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। ষ্ট্যাণ্ডও দিবেন না অথচ ক্লান্ত রিক্সাওয়ালা একটু চা খাইতে পাশে দাঁড়াইলে পাঁচ আইন হইবে এ আবার কিরূপ বিধান?" —বীরভূম।

সর্ব্বোদয়ে বাঙ্গলা বর্জ্জন

"চাণ্ডিলে সর্ব্বোদয়-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য বিনোবা ভাবে বলিয়াছেন যে ভূদান যজ্ঞ সফল না হইলে তিনি সত্যাগ্রহ করিবেন। ভূদান যজ্ঞের মাহাত্ম্য আমরা কোন সময়েই উপলব্ধি করিতে পারি নাই, এখন দেখিতেছি, আরও অনেকে উহার সমালোচনা করিতেছেন। ভূদান যজ্ঞ সফল করিবার জন্য ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছাড়িতে বলা হইয়াছে। ইহারও মহিমা আমরা বুঝিলাম না। যাঁর যখন দরকার তিনিই ছাত্রদের লেখাপড়া ছাড়িয়া আসিতে বলেন, যখন নিজের কাজে ছাত্রদের সাহায্য দরকার হয় না তখন তাহাদের লেখাপড়ায় অমনোযোগী বলিয়া গালি দেন। ছাত্রদের লেখাপড়ায় যে প্রচণ্ড বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন না। চাণ্ডিল মানভূমে, মানভূমের ভাষা বাঙ্গলা। অথচ সর্ব্বোদয়-সম্মেলনের সাইনবোর্ড, নোটিশ, পোষ্টার, পুস্তিকা প্রভৃতি সব কিছু হিন্দিতে করা হইয়াছে। আবার বলা হইতেছে তাঁহারা গণসংযোগ করিতেছেন! 'জনসাধারণ যে ভাষার এক বর্ণ বুঝে না, সেখানে ঐ ভাষায় গণসংযোগ কি চমৎকার হইতেছে তাহা অন্ততঃ একটি বাঙ্গালী ধরিয়া দিয়াছেন। মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের তেজস্বী কর্ম্মী শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ সর্ব্বোদয়-সম্মেলনে দাঁড়াইয়া ভূদান যজ্ঞে তাঁহারা কেন আসিতে পারেন নাই, তাহা বুঝাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে সর্ব্বোদয়ের কর্ম্মীরা মানভূমের গুণ্ডাদের সঙ্গে জুটিয়াছে, ইহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা

সম্ভব নয়। মানভূমে বঙ্গভাষা উচ্ছেদের জন্য বিহার সরকার যে অত্যাচার চালাইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও আচার্য্য বিনোবা ভাবে শ্রীঅরুণ ঘোষের তিরস্কারের পরেও বলেন নাই। গান্ধী-শিষ্য, জহর-শিষ্য এবং বিধান-শিষ্যদের মধ্যে স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষমতা-লিপ্সায় কোন পার্থক্য আমরা দেখিতেছি না।" —যুগবাণী।

কংগ্রেস-প্রীতি না কংগ্রেস-ভীতি

"সংবাদে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে গলসী থানার অন্তর্গত ক্ষেতুরা গ্রামের ধান্য ও চাউল লাইসেন্সধারীর ব্যবসায়ের হিসাবপত্রের খাতা ঠিক ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে সঠিক হিসাব না রাখার জন্য উক্ত অঞ্চলের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের পরিদর্শক মহাশয় উক্ত লাইসেন্স-ধারীর খাতায় নোট লিখিয়া দেন ও লাইসেন্স বাতিল করিবার সুপারিশ করেন। কয়েক দিন পর উক্ত বিভাগের শাখানিয়ামক (সাব ডিভিসন্যাল কন্ট্রোলার) মহাশয় নিজে তদন্তে যাইলে উক্ত লাইসেন্সধারী পুরাতন খাতা না দেখাইয়া নূতন খাতা দেখান এবং পরিদর্শকের পূর্ব্ব-তদন্ত অস্বীকার করেন। পরে পরিদর্শক তাঁহার নিজস্ব নোট দেখাইলে উক্ত লাইসেন্সধারীর দোষ প্রমাণিত হয় এবং শাখানিয়ামক মহাশয় তাঁহার লাইসেন্স বাতিল করেন। কিছুদিন পরে উক্ত অঞ্চলের জনৈক কংগ্রেসকর্ম্মী ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভ্য সদর অফিসে আসিয়া শাখানিয়ামকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ বিষয়ে ধামাচাপা দিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং যথাসময়ে তাহা ধামাচাপা পড়ে। ইহা কি সদর শাখানিয়ামকের কংগ্রেস-প্রীতি না ভীতি?" —দৃষ্টি।

জিজিয়া কর

"কত রকমে টাকা জনসাধারণের পকেট থেকে বের করা যায় তার প্রচেষ্টায় কংগ্রেসীদের হার মানাতে কেউই পারবে না। গরুর গাড়ীর বছরে ৬৲ টাকা করে ট্যাক্স করার বিল এসেছিল। 'জোড়া বলদ' আপত্তি জানিয়ে বলে আমরাই যাকে টানবো তার উপর ট্যাক্স হলে ভোট পাবো কি করে? বিল স্থগিত রাখা হয়েছে। গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীদের জন্য মাথা-পিছু ১।• করে ট্যাক্স ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডকে আদায় করতে দেওয়ার জন্য এক বিল পাশ হলো। মোগল বাদশারা হিন্দুদের কাছে জিজিয়া কর আদায় করতো। সেকুলার বাদশারা তাদের থেকে এক কাঁটা উপরে; তাঁরা মোগলাই পন্থানুসরণের অধিকার ত্যাগ করবেন কেন? এই বিলের উপর সংশোধন প্রস্তাব দিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন সব দলই। কম্যুনিষ্টরা কোন আপত্তি দেননি। বিলটার টাকা আদায় হবে হিন্দুদের কাছ থেকে। সুতরাং এতে আপত্তি জানানো সাম্প্রদায়িকতারই নামান্তর মাত্র।" —হিন্দুবাণী।

সত্যই অদ্ভুত!

"কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য-সচিব লোক-সভায় জানাইয়াছেন, বর্ত্তমান ভারতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের সংখ্যা ৩ কোটি ১১ লক্ষ। সুতরাং প্রতি আট জন ভারতবাসীর মধ্যে এক জন যে না খাইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পরেও এই অবস্থা বজায় থাকা সরকারের পক্ষে গ্লানিকর। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ অন্নহীনের মুখে অন্ন জোগাইবার জন্য যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ গত ৮ মাসে মাথা-প্রতি ২ টাকার অধিক হইবে না! ইহার পরেও ৩ কোটি ১১ লক্ষ লোকের বাঁচিয়া থাকাটা সত্যই অদ্ভুত।" —লোকসেবক।

অবিলম্বে চাই

"নেহরু সরকারের পরিকল্পনায় শ্রমিকের বাড়ি তৈরির জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর সাহায্য ও ঋণ মিলাইয়া সরকার ৫ বছরে মাত্র ৩৮ কোটি টাকা খরচ করিবেন বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ ১ কোটি বাড়ি তৈরি করিতে হইলে বাড়ি-পিছু ৩৮ টাকা মাত্র ব্যয় হইবে। অবশ্য সে টাকাও ঠিকাদার-জমিদারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া ঘর তৈরির বেলায় কোথায় আসিয়া পৌছিবে, দামোদর-ময়ূরাক্ষীতেই তাহার ইঙ্গিত মিলিতেছে। সুতরাং বস্তির মানুষের জন্য কংগ্রেসী শাসকদের প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যবস্থাই নাই। তাই, টালিগঞ্জের ভবানী মণ্ডল বস্তির শিশুকে পুড়িয়া মরিতে হইবে। শত শত নর-নারীকে গৃহহারা হইতে হইবে। ইহাই কংগ্রেসী শাসনের বিধান। মানুষের প্রতি এই বর্ব্বর আচরণের প্রতিবাদে আজ দেশের মানুষকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যে শিশুটি আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আজ সমস্ত দেশবাসীকে বস্তির মানুষের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দাবি করিতে হইবে: অগ্নিকাণ্ডের উপযুক্ত অনুসন্ধান চাই। অবিলম্বে গৃহহারা নর-নারীদের উপযুক্ত বাসের ব্যবস্থা চাই, রিলিফ ও সাহায্য চাই। সেই সাথেই দেশবাসীকেও আগাইয়া আসিতে হইবে বস্তির নিঃস্ব ভাই-বোনদের সাহায্যে।" —স্বাধীনতা।

অশিক্ষিতের অভিশাপ

"সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার মস্কোর লেনিন গ্রন্থাগার। পুস্তক-সংখ্যা প্রায় ১,৫০,০০,০০০ (দেড় কোটি)। ১৯৫২ সালে ১৮ লক্ষ পাঠক এই গ্রন্থাগার থেকে ৯০ লক্ষাধিক গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন। এই গ্রন্থাগার থেকে ডাকযোগে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সর্ব্বত্র পাঠক-পাঠিকাকে বই সরবরাহ করা হয়ে থাকে, তা ছাড়াও প্রতিটি এলাকায় কারখানায় গ্রামে পঞ্চায়েত খামারে বড় বড় লাইব্রেরী আছে। অশিক্ষিতের অভিশাপ সোবিয়েৎ ইউনিয়নে দূর করা হয়েছে।" —মধ্যবিত্ত।

প্রতিকারের আশায় রইলাম

"নদীয়া সীমান্তে এক স্থানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলিয়াছেন: শুনিতে পাই, হানাদারগণ স্থানীয় অধিবাসীদের আশ্রয় লইয়া তাহাদের সাহায্যে রাত্রির দিকে চুরি-ডাকাতি ও লুঠতরাজ করে; এমন কি খুন-জখম করিয়াও পাকিস্থানে পলাইয়া যায়। স্থানীয় মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, লুকাইয়া পাকিস্থানী দুর্বৃত্তদের এইরূপ সাহায্য দিয়া আপনাদের কোন লাভ হইবে না। রাজ্যপালের এইরূপ স্পষ্টোক্তির জন্য ধন্যবাদ দিয়া আমরা পুনরায় বলিতেছি যে, যাহা রাজ্যপাল একদিন সীমান্ত অঞ্চলে আসিয়া জানিতে ও বুঝিতে পারিয়া এ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, ঠিক সেই কথা আমরা সীমান্তে বাস

করিয়া বার বার করিয়া সরকার ও দেশের নেতৃস্থানীয়দের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি, কিন্তু অরণ্যে রোদনের মত তাহা সীমাবদ্ধ আছে। অথচ দিনের পর দিন সীমান্তবাসীদের শঙ্কিত মনে বাস করিতে হইতেছে। আবার কখন কাহার জীবন বিপন্ন হয়, কেহ সর্ব্বস্বান্ত হয়। প্রতিকারের পন্থা থাকা সত্ত্বেও সরকার কেন যে উহা গ্রহণ করিতেছেন না তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যে সংবাদ আমরা এতদিন ধরিয়া শুনাইতেছি তাহা রাজ্যপালের বক্তৃতায় সমর্থিত হইয়া এক্ষণে যদি কোন প্রতিকার হয়, তাহা দেখিবার আশায় রহিলাম।" —সীমান্ত।

প্রজা-সোসালিষ্ট পার্টি কি?

"সোসালিষ্ট পার্টি ও কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির মিলনে যে অপূর্ব্ব প্রজা-সোসালিষ্ট পার্টি গঠিত হইয়াছে, তাহার পরিণতি অনেকেই লক্ষ্য করিতেছেন। নবগঠিত প্রজা-সোসালিষ্ট দল এখনও নির্ব্বাচনের সম্মুখীন না হইলেও নির্ব্বাচন কমিশনার প্রজা-সোসালিষ্ট দলকে সর্ব্বভারতীয় দলরূপে নাকি স্বীকার করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু কর্ত্তৃক শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও শ্রী জে, বি, কৃপালনীকে ব্যক্তিগত পত্র দেওয়ার পর অনেক কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। সর্ব্ব-ভারতীয় দল হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি এই নবজাত শিশুকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে কি? সংবাদে প্রকাশ, বিন্ধ্য প্রদেশের সমাজতন্ত্রী দলের নয় জন এম. এল. এ. ও ৫০০ কর্ম্মী সোসালিষ্ট দল ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই প্রজা-সোসালিষ্ট দলের প্রথম ধাপ।" —বীরভূম বাণী।

শিক্ষিত বেকার

"বাংলার শিক্ষিত বেকার সমস্যা দিনে দিনে যে ভয়াল রূপ-পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে, তাহাতে দেশহিতৈষী এবং প্রকৃত দেশ-প্রেমিকগণের মনে যে একটা কৃষ্ণবর্ণ ঘনায়মান মেঘের প্রতিচ্ছায়া মাঝে মাঝে উদিত হইয়া উদ্ভ্রান্ত করিতে চাহিতেছে তাহা আদৌ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলার মরীয়মান, মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত সমাজে সন্তান-সন্ততিগণের শিক্ষাদান ব্যাপার যে কিরূপ কষ্টদায়ক এবং ভারবহ হইয়া উঠিয়াছে তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, তাঁহারা কল্পনা করিতেও পারিবেন না। সংসারের নিত্য-প্রয়োজনীয় জীবন-ধারণের ব্যয় কিরূপ মারাত্মক ভাবে সঙ্কোচ করিলে, এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করা যায় এবং তাহার ফলে একটা পরিবারের কতটা কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হয়, ভারতের স্বাধীন (?) মন্ত্রিগণও হয়তো গদীতে সুখাসীন হইয়া সে চিন্তা আদৌ করিতে পারেন না, বা করিবার উদগ্র বাসনা ও শ্রীভগবান অকাতর দানেও বোধ হয় কার্পণ্য করিয়া থাকিবেন। ভবিষ্যতে কত রঙিন স্বপ্নে বিভোর হইয়া বাংলার যুবকগণ একটার পর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুনাতন দুর্লঙ্ঘ্য সোপানে আরোহণ করিতেছে, কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে! বুকে শুধু একমাত্র আশা, ভদ্রভাবে এই লাঞ্ছিত, অবহেলিত জীবনখানা কাটাইয়া যাইবে,—বৃদ্ধ পিতা-মাতার বুকে আশার সঞ্চার করিবে—নিরানন্দ গৃহে হাসির গান জাগাইবে! কিন্তু তারপর!"

—রাঢ়দীপিকা।

বি. সি. জি টীকার নামই জানে না!

"বাঙ্গালা দেশে বি. সি. জি. দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। যক্ষ্মা রোগের প্রতিরোধের জন্ম বি. সি. জি টীকার প্রয়োজন। অথচ জনসাধারণের মধ্যে এই টীকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রচারকার্য্য হয় নাই। অনেকে ইহার নামও অবগত নহে। নদীয়ায় যক্ষ্মারোগের প্রসার কম নহে। আমরা আশা করি, সুপরিকল্পিত ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারের দ্বারা এই কালব্যাধির কবল হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সহর ও পল্লীর জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করা হইবে।" —নদীয়ার কথা।

আমরা মনে করি

"মানভূম জিলা বোর্ডের আবার সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় পার হইয়া গিয়াছে। গত ছয় বৎসর পূর্ব্বে জিলা বোর্ডের সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। গত দুই বৎসর যাবৎ কয়েক জন সদস্যের পদত্যাগের ফলে এবং দুই-তিন জন সদস্যের মৃত্যুতে প্রায় ১১০টি শূন্য সদস্যপদ লইয়া জিলা বোর্ড চলিতেছে। যতদূর দেখা যাইতেছে, এ পর্য্যন্ত এই সাধারণ নির্ব্বাচন করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোন প্রকার প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে ইহাই হইয়াছে যে—প্রতি পঞ্চাশ হাজার লোক-পিছু ১ জন করিয়া সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে এবং অধিকাধিক ৫০ জনের অধিক সদস্য কোন বোর্ডে থাকিবে না। ইহার মধ্যে আবার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা কয়েক জন সদস্যকে কো-অপ্ট করিয়া লওয়া হইবে। এই অনুসারে মানভূম জিলা বোর্ডে ৪৪ জন সদস্য প্রাপ্তবয়স্ক ভোটার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে এবং ৬ জন হরিজন ও আদিবাসী উক্ত সদস্যদের দ্বারা কো-অপ্ট হইবে। কোন প্রকার বিশেষ নির্ব্বাচন ক্ষেত্র অথবা সংরক্ষিত আসনের কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং এই ৪৪ জনের নির্বাচনের জন্ম নির্ব্বাচন ক্ষেত্রগুলিকে পুনর্ব্বণ্টন করিতে হইবে। ইহারও ব্যবস্থা কিছু হইতেছে কিনা এবং কি হইতেছে তাহা জনসাধারণের জানা প্রয়োজন বলিয়াই আমরা মনে করি। কি জন্ম মানভূমে গবর্ণমেণ্ট এই জিলা বোর্ডের নির্ব্বাচনে অস্বাভাবিক বিলম্ব করিতেছেন—তাহা বাস্তবিকই রহস্যাবৃত। জনস্বার্থে এই নির্ব্বাচন ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন বলিয়াই আমরা মনে করি।" —মুক্তি।

আদিবাসীদের অভিযোগ

"গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পঃ বঙ্গীয় আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় মহাশয় ঝাড়গ্রামে আসিলে ঝাড়গ্রামের আদিবাসী নেতা শ্রীরতনচন্দ্র সরেনের নেতৃত্বে এক দল আদিবাসী ভাগচাষী মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা অভিযোগ করেন যে, এই মহকুমাতে ব্যাপক ভাবে আদিবাসী ভাগচাষীদের জমি হইতে উৎখাত করা হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চন্দ্রী এলাকার উল্লেখ করেন। ঐ এলাকার ভাগচাষীরাও মন্ত্রী মহাশয়কে তাঁহাদের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভাগচাষীদের জমি হইতে উচ্ছেদ করা কোন মতে চলিবে না। তিনি শীঘ্রই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। শ্রীযুক্ত সরেন মহাশয়

উপর্য্যুপরি দুই বৎসর ফসল হানির জন্ম মজুরদের অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়াছে, এ জন্য শীঘ্রই সরকারী সাহায্যের দাবী জানান। মন্ত্রী মহাশয় আশু ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।"

—নির্ভীক।

সবে শুরু হইল

"উড়িষ্যা-প্রত্যাগত অধুনা শিয়ালদহ ষ্টেসনে অবস্থিত চার জন উদ্বাস্তু ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে। কিছু দিন পরে গভীর রাত্রে পুলিস কর্ত্তৃক ইহারা অপসারিত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশের বিধান সভায় প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীরাজ-নারায়ণ ও অপর দুই জন সদস্যকে বলপূর্ব্বক পুলিস দ্বারা পরিষদ কক্ষ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। পুলিসকে অপসারণের কার্য্যে নিয়োগ সবে সুরু হইল দেখা যাইতেছে।"

—ত্রিস্রোতা।

উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে

"আসানসোলের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের আমন্ত্রণে আপ্যায়িত হইয়াছি। হিন্দীপ্রচারে অস্বাভাবিক দ্রুততা কিন্তু কল্যাণকর হইবে না। তা'ছাড়া রাষ্ট্রভাষা হইতে হইলে হিন্দীকে তাহার বর্ত্তমান ত্রুটি সংশোধন করিতে হইবে। 'তৎসম' শব্দের বানান হিন্দীতে শোচনীয় বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার আশু সংশোধন না হইলে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাভাষীর খুবই অসুবিধা। হিন্দীপ্রচারে উৎসাহী বন্ধুগণকে বার বার জানাইতেছি—সংস্কৃত ভাষার সান্নিধ্য হারাইলে উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে! লিঙ্গানুশাসন একান্তই অবৈজ্ঞানিক। আরও নানা কথা আছে। উত্তেজিত না হইয়া আলোচনা করিলে একটি সুমীমাংসা হইতে বিলম্ব হইবে না।"

—পল্লীবাসী।

কিন্তু বড্ড দেরীতে

"ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। অর্থাৎ অতুল্য ঘোষ বাদ পড়িয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ মসনদের দুধের সর সর্ব্বগ্রাসী ডাঃ রায় গ্রাস করিয়াছেন, এবার আবার কংগ্রেসী ভোজ-সভাতেও তাঁহার ডাক পড়িল দেখিতেছি। অতুল্য ঘোষদের ভাগ্যে এঁটো পাতা। ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষকে মন্ত্রিত্ব হইতে হটাইবার জন্ম শ্রীঅতুল্য ঘোষ এণ্ড কোং ডাঃ রায়কে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। ডাঃ রায় বিচক্ষণ ব্যক্তি, কোনরূপে নাক গলাইয়া এখন সমগ্র শরীর ঢুকাইয়া দিয়াছেন। এবার আর অতুল্য ঘোষ এণ্ড কোং-এর স্থান হইতেছে না। খাল কাটিয়া কুমীর আনার ফল যে একদিন ফলিবে এ জানা কথা। এতদিনে হয়ত অতুল্য বাবুও হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন—। কিন্তু বড্ড দেরীতে। তবে ডাঃ রায় ভক্তজন-বাঞ্ছাকল্পতরু। মাছ খাইয়া তিনি কাঁটাটা না দিবার মত লোক নহেন। বড় বড় গদী না দিন, অতুল্য বাবু'দের তিনি ডেপুটী মন্ত্রী বা পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। পাঁজা মহাশয়ের মত যা হোক একটা পেনসেন জুটিলেই সই—আর কি চাই।"

—দামোদর।

বিধান সভা অভিযানের হিড়িক

"সম্প্রতি বিধান সভা অভিযান এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার নিরাপত্তা বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় এই অভিযানের রেওয়াজ সুরু হয়। পর-পর তিন দিন এই উপলক্ষে বিধান সভায় অভিযান করা হয়। তারপর থেকে নানা উপলক্ষে বিধান সভায় অভিযানের হিড়িক লেগেছে। গণতান্ত্রিক রীতিতে বিধান সভায় অভিযান গণবিক্ষোভ বা জনমত প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। জনমত প্রকাশের সমস্ত রকম কার্যক্রমের অন্তিম কার্যসূচীরূপে সাধারণত জনবিক্ষোভ প্রকাশ করার জন্ম বিধান সভায় অভিযান করা হয়। যারা গণতান্ত্রিক বিধানে বিশ্বাস করে না, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বাংলার সমস্ত বামপন্থী দলই গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণের কথা বলেন। গঠনতন্ত্রকে ভাঙবার জন্ম বা চলতি গঠনতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জনবিক্ষোভ গড়ে তোলার জন্ম বিধান সভায় গণ-অভিযান করার ইতিহাস আছে। কিন্তু আজিকার ভারতে বর্তমান গঠনতন্ত্র-বিরোধী বিপ্লব এখনই আসন্ন,—কোন বাম দলই বোধ হয় স্বপ্নেও এই কল্পনা করেন না। এই গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে জন-আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্ম কাজ করার উদ্দেশ্য প্রায় সমস্ত বাম দলই নিজেদের মত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং বিধান সভায় গণ-অভিযানকে এক সাধারণ ব্যাপার করে তুলে কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়াকে দাম্ভিকতার বর্মে আরো আচ্ছাদিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া সমাজবাদী আন্দোলনের ভূমিকা রচনার পক্ষে ক্ষতিকর বলেই আমরা মনে করি।"

—জনমত।

গর্দ্দভী বা মর্কটী হইয়া যাইবে

"আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার ভারতের শিক্ষা ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন-রক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় এক সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধোক্ত সিদ্ধান্ত লইয়া বহু সমালোচনা ও প্রতি-সমালোচনা হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। সম্প্রতি দিল্লী মহানগরীর এক শিক্ষা-প্রতিনিধি-সম্মেলনেই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজীর স্থান লইয়া বিশেষ বিতর্ক ও আলোচনা হয় ও একটা কমিশনের উপর তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্তের ভারার্পণ করা হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় রায় পিথৌরা তাঁর যোগ্য লেখনী লইয়া এই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তজ্জন্ম তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁর দ্বিতীয় সন্দর্ভে তিনি আচার্য্য সরকারের কথার যথাযোগ্য সম্ভ্রমের সহিত যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তজ্জন্ম তাঁহাকে আমরা আরও অভিনন্দিত করিতেছি। আচার্য্য যদুনাথ আমাদেরও প্রণম্য। তাঁহার ন্যায় বর্ত্তমান বিশ্বভাষা ইংরাজীর গুণ-গরিমায় আমরাও বিশ্বাসী। ইহার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার্য্য। কিন্তু এই প্রয়োজন আমাদের মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ-স্বপ্নকে অন্তরে রাখিয়াও সিদ্ধ হইতে পারে। আচার্য্য যদুনাথ জর্ম্মণীর দৃষ্টান্ত দিয়া লিখিয়াছিলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ-সম্রাট্ দেশের সকল মাধ্যমিক স্কুলে ইংরাজীকে বাধ্যতামূলক 'ভাষারূপে পাঠ্য করিয়াছিলেন—বৃটিশ জাতির দাসত্বের ভাব লইয়া নিশ্চয়ই নহে, পরন্তু ইহাই জর্ম্মণীর পক্ষে বিশ্ব-বাজারে শ্রেষ্ঠ স্থান

মা ও ছেলে

—বিজনবিহারী চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয় খণ্ড] [ষষ্ঠ সংখ্যা

চৈত্র

১৩৫৯

৩১শ বর্ষ

কথামৃত
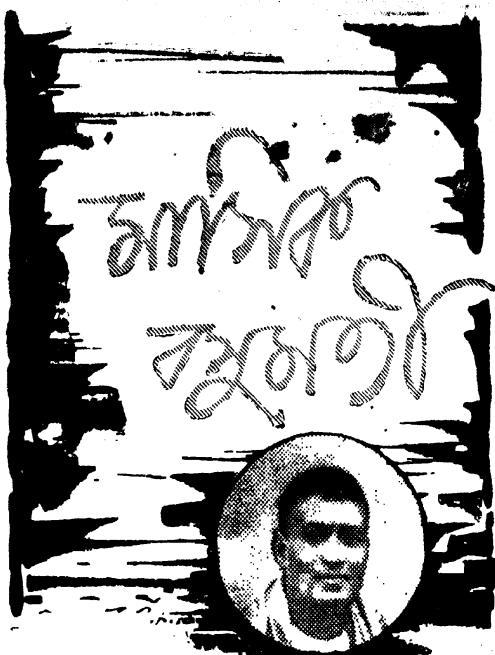
ভক্ত। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আচ্ছা, তিনি সাকার না নিরাকার ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দাঁড়াও, আগে কলকাতায় যাও, তবে ত জানবে, কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এসিয়াটিক সোসাইটি, কোথায় বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নানা শাস্ত্রেরও কিছু প্রয়োজন নাই। যদি বিবেক না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। ষট্‌শাস্ত্র পড়লেও কিছু হয় না। নির্জ্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক, তিনিই সব ক'রে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যা কিছু দেখছ, শুনছ, চিন্তা করছ, সবই মায়া। এক কথায় বলতে গেলে, কামিনীকাঞ্চনই মায়ার আবরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যখন হরি নামে, কালী নামে, চক্ষে জল আসে তখনই সন্ধ্যা কবচাদির কিছুই প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়। কর্ম্মের ফল তার কাছে যায় না।

তান্ত্রিক ভক্ত। তবে কর্ম্মফল আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাও আছে। ভাল কর্ম্ম করলে সুফল, মন্দ কর্ম্ম করলে কুফল ; লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে না ? এ সব তাঁর লীলা খেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাজলের ঘরে যতই সেয়ানা হও না কেন, থাকলে একটু না একটু দাগ গায়ে লাগবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে ; বেহুলার গানের কাছে জাত-সাপ স্থির হয়ে শুনে ; কিন্তু কেউটে নয়। আর একটি লক্ষণ ; ঠিক ভক্তের ধারণা শক্তি হয়। শুধু কাচের উপর ছবির দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি মাখানো কাচের উপর ছবি উঠে ; যেমন ফটোগ্রাফ ; ভক্তি-রূপ কালি। আর একটি লক্ষণ ; ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয়, কামজয়ী হয়। গোপীদের কাম হ'তো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা অজ্ঞান, তারা যেন মাটির দেওয়ালের ঘরের ভিতর রয়েছে। ভিতরে তেমন আলো নাই, আবার বাহিরের কোন জিনিষ দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞান লাভ করে যে সংসারে থাকে সে যেন কাচের ঘরের ভিতর আছে। ভিতরে আলো বাহিরেও আলো। ভিতরের জিনিষও দেখতে পায়, আর বাহিরের জিনিষও দেখতে পায়।

আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব

অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ সংঘ পৃথিবীর অনেক দেশেই আশ্রম স্থাপন করেছে। কিন্তু আমেরিকায় তার যে রকম প্রভাব-প্রতিষ্ঠা, অন্য কোন বিদেশে সে রকম নয়! এ থেকে আমেরিকান-চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা হ'ল তাদের প্রশস্ত মন। তারা নতুন কিছুকে সরাসরি অগ্রাহ্য না ক'রে তাকে দেখতে-শুনতে প্রস্তুত। আমেরিকান জাতটা অন্যান্য জাতের মত পুরোনো নয় ব'লে, তাদের মনও একটা বিশেষ ভাবরাজিতে সংবদ্ধ নয়। এই কারণেই বোধ হয় রামকৃষ্ণ সংঘ অন্যান্য জাতের তুলনায় আমেরিকানদের মধ্যে বেশী দাগ দিয়েছে।

আমেরিকার বিভিন্ন সহরে অনুমান পনংটি রামকৃষ্ণ কেন্দ্র আছে। প্রত্যেক কেন্দ্রটি স্বয়ংনির্ভরশীল। এই সব কেন্দ্রের নামও বিভিন্ন। উদাহরণ—হলিউড কেন্দ্রের নাম বেদান্ত সোসাইটি অফ সাদার্ণ ক্যালিফোর্নিয়া। আবার নিউইয়র্ক কেন্দ্রের নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার। নাম বিভিন্ন হ'লেও, নামকরণে 'রামকৃষ্ণ' বা 'বেদান্ত' কথাটি সাধারণতঃ আছে। তবে, কেন্দ্রগুলির সব এক নাম হ'লেই ভাল হ'ত।

আমি ছিলাম লস্ এঞ্জেলিস্-এ। তাই রামকৃষ্ণ সংঘের হলিউড কেন্দ্রের সংগে পরিচিত হবার সুযোগ হ'য়েছিল। হলিউড আমেরিকার বিলাস-নগর, আর সেইখানেই রামকৃষ্ণ সংঘের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠা—এটা বিস্ময়ের বস্তু এবং সংঘের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক।

হলিউডের এক পাহাড়ী উঁচু রাস্তা আইভার এভিন্যু। এই রাস্তার ওপর রামকৃষ্ণ কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন। গম্বুজনির্মিত এই মন্দির

হলিউড শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ

প্রথম দর্শনেই মনে ভারতীয় পরিবেশ জাগিয়ে তোলে। পূর্ণিমার রাতে এর সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি, দেশের স্মৃতি মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে দেয়।

যে সব আমেরিকান রামকৃষ্ণ মন্দিরে যায়, তারা সত্যি ভক্তিমান। তাদের শ্রদ্ধা দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। এখানে অনেক মহিলাকে দেখেছি গেরুয়া রংয়ের গাউন অথবা গেরুয়া রংয়ের স্কার্ট ও ব্লাউজ প'রে আসতে। বক্তৃতা-ঘরের স্থান সীমাবদ্ধ থাকাতে (শ' দুয়েক আসন) অনেকে রবিবারের নির্দ্ধারিত সময় বেলা এগারটার অনেক আগেই এসে উপস্থিত হয়। পৌনে এগারটার মধ্যেই বক্তৃতা-ঘর ভর্ত্তি হ'য়ে যায়। এর পরে যারা আসে, তাদের বাইরে বা কক্ষান্তরে ব'সে স্পীকার মারফৎ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে হয়। এগারটা নাগাদ আইভার এভিন্যু-এ গেলে দেখা যাবে, রাস্তার দু'পাশে মোটরের সারি দাঁড়িয়ে আছে। যাদের দেরী হ'য়ে যায়, তারা মন্দিরের কাছাকাছি মোটর রাখবার জায়গা পায় না। কিছু দূরে গিয়ে গাড়ী রেখে হেঁটে আসতে হয় তাদের। বক্তৃতা-ঘরে অসম্ভব নীরবতা। বক্তৃতা আরম্ভ হবার আগে অনেককে দেখেছি চোখ বুজে প্রার্থনা করতে। স্বামীজীর বক্তৃতার সময় এরা অতি মনোযোগের সংগে তা শোনে। অনেকে চোখ বন্ধ ক'রে কথাগুলোর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে। বক্তৃতা শেষে অর্থ সংগ্রহের জন্য অভ্যাগতদের মধ্যে বাস্কেট্ (ছোট চুপড়ি) 'পাশ' করা হয় (এক জনের হাত থেকে আর এক জনের হাতে দেওয়া হয়)। এটা ওদেশের চার্চ-এর ব্যবস্থা মত। প্রত্যেকেই অর্থ দেয় দেখেছি—সাধারণতঃ এক ডলার। বেশী বা কমও দেয় কেউ-কেউ। এর পর স্বামীজী শান্তি বচন ব'লে সভা ভঙ্গ করেন। সভার শেষে অনেকে রামকৃষ্ণদেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে। অনেক মহিলাকে দেখেছি সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম করতে। ঘাড়ে আঁচলের বদলে একটা স্কার্ফ জড়িয়ে নেয়। কেউ-কেউ আবার ছবির সামনে বসে ধ্যান করে।

প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রি আটটায় স্বামীজী গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি বিষয়ে ক্লাশ নেন। এতেও জন পঞ্চাশ আমেরিকান যোগদান করে। প্রথমে স্বামীজী ব্যাখ্যা ক'রে যান। শেষে শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরতি হয়। আরতি করে আশ্রমের আমেরিকান শিষ্যারা। আরতি শেষে সকলে 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করে অনেক বার। আমেরিকান মেয়ের হাতে আরতি-প্রদক্ষিণ দেখতে অবাক লেগেছিল সত্যি। শুনেছি, এদের মধ্যে দু'এক জন সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শিনী।

আশ্রমে ৪।৫ জন শিষ্য এবং ১২।১৩ জন শিষ্যা আছে। সবাই আমেরিকান। শিষ্যাদের বেশীর ভাগই থাকে হলিউড থেকে একশ' মাইল দূরে সাণ্টা বারবারা কেন্দ্রে। স্বামীজী (স্বামী প্রভবানন্দ) প্রতি রবিবার যান সেখানে আর ফেরেন বুধবার। শিষ্য এবং শিষ্যাদের অনেকের সংগে আমার পরিচিত হবার সুযোগ হ'য়েছিল। স্বামীজী তাদের সব ভারতীয় নাম দিয়েছেন এবং সেই নামেই তারা পরিচিত। অমিয়া, উজ্জ্বলা, যমুনা, অঞ্জলি, সারদা, বরদা, আনন্দা, সরস্বতী, প্রভা, শ্রদ্ধা, মৈত্রেয়ী, যোগিনী—এই সব মেয়েদের নাম। একটি মেয়ের নাম আবার খুকী। এক জন শিষ্যের নাম গঙ্গা, এক জনের নাম সোহম্, আর এক জনের নাম ব্রহ্মচারী কৃষ্ণচৈতন্য।

হলিউডে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির
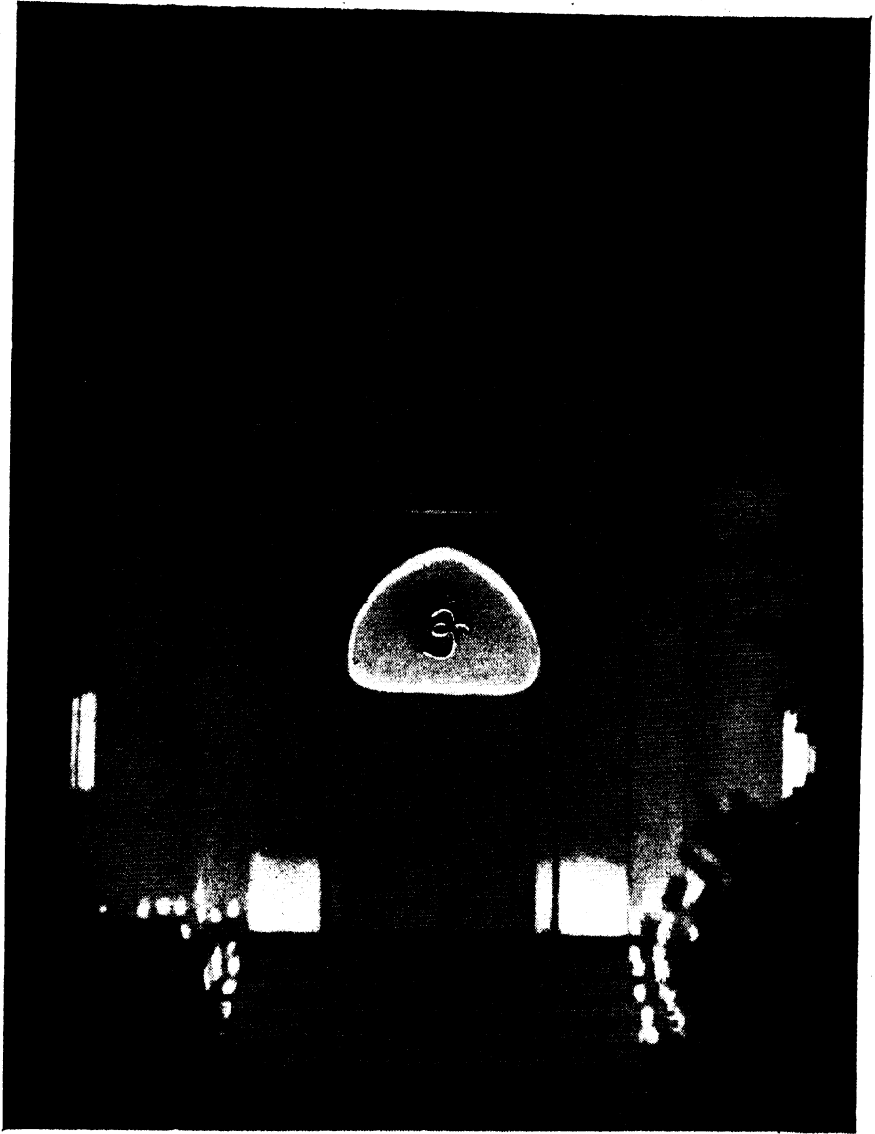
আমেরিকায় রামকৃষ্ণ সংঘের স্বামীজীরা যে বক্তৃতা দেন, তার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাতে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বলা হয় বটে, কিন্তু এ কথা বলা হয় না যে তোমরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ কর। বরং এ কথাই স্বামীজীরা বিশেষ ক'রে ব'লে দেন যে তাঁরা তাঁদের বলছেন না—খৃষ্টধর্ম ত্যাগ ক'রে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে। তাঁরা কেবল বলছেন—যে হিন্দু, সে আরো ভাল হিন্দু হোক্; যে খৃষ্টান, সে হোক্ আরো ভালো খৃষ্টান। এ জিনিষটা খৃষ্টান চার্চ-এ দেখা যায় না। সেখানে মূল বক্তব্য হ'ল—যিশুই একমাত্র পরিত্রাণের পথ। হলিউড রামকৃষ্ণ কেন্দ্রের এক ভক্ত-দম্পতি আমাকে বলেছিলেন, হিন্দুধর্মের উদারতাই তাদের এখানে আকৃষ্ট করেছে। প্রতি রবিবার ৫৫ মাইল দূর থেকে এঁরা আসেন স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে।

আমেরিকার ভূমি স্পর্শ করতেই আমি এই রামকৃষ্ণ-ভক্তির

হলিউড শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে পূজা হচ্ছে

পরিচয় পেয়েছিলাম। আমাদের জাহাজ তখন সবে সান্ ফ্রান্সিস্কো বন্দরে পৌঁছেছে। এক জন আমেরিকান মহিলা তীর থেকে জাহাজে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। মহিলাটি একবার ভারতে এসেছিলেন এবং সে সময়ে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মন্দির দেখতে যান। মন্দিরে ঢুকে তাঁর যে অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল, সে কথাই আমাদের বলছিলেন। তিনি বললেন, বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মন্দিরে তিনি গিয়েছিলেন, ওটা একটা দর্শনীয় স্থান ব'লে। কিন্তু মন্দিরে ঢুক্তেই তাঁর মনে এমন একটা শান্তির অনুভূতি এল যা তিনি আগে কখনও অনুভব করেননি। যত তিনি ঠাকুরের মূর্ত্তির কাছে এগুতে লাগলেন, ততই মনে হতে লাগল যেন বাইরের জ্ঞানটা লুপ্ত হ'য়ে মনটা অন্তঃস্থলে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সেই দিন থেকে তিনি রামকৃষ্ণ-দেবের ভক্ত। এই জাহাজে ভারতীয় ছাত্ররা আসছে শুনে তিনি আমাদের সংগে দেখা করতে এসেছেন।

দুঃখের কথা, এই সব রামকৃষ্ণ আশ্রম থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে খুব কম-জনই এখানে যাতায়াত রাখে। উদাহরণ-স্বরূপ লস্ এঞ্জেলিস্-এর কথা বলতে পারি। লস্ এঞ্জেলিস্ ও তার আশে-পাশে শতাধিক ভারতীয় ছাত্র আছে। কিন্তু মাত্র দু'-তিন জন আছে যারা রামকৃষ্ণ আশ্রমে যায় নিয়মিত। এমন ছাত্র আছে, যারা একবারও যায়নি। আমেরিকায় দেখেছি, অনেক আমেরিকান ছাত্র বিদেশী বন্ধুদের নিয়ে যায় ওদের চার্চ-এ। আমাদের ছেলেরা, আমেরিকান বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, নিজেরাই যায় না সেখানে হিন্দুধর্ম-প্রতিষ্ঠান থাকতে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা ব'লে এই প্রবন্ধের উপসংহার করব।

বিবেকানন্দের শিকাগো-বক্তৃতার কথা ছেলেবেলা থেকে আমাদের মনে গাঁথা আছে। আমার তাই একটা বিশেষ ইচ্ছা ছিল, শিকাগোতে গিয়ে দেখতে হবে কোথায় বিবেকানন্দ বক্তৃতা করেছিলেন। ফিরবার পথে শিকাগোতে রইলাম এক সপ্তাহ। ঐ সময় শিকাগোর রামকৃষ্ণ কেন্দ্র বন্ধ ছিল। তাই কোন করে কাউকে পেলাম না যে জিজ্ঞাসা ক'রে নোব—বিবেকানন্দ কোথায় বক্তৃতা করেছিলেন। ভাবলাম, শিকাগোতে তো অনেক ভারতীয় ছাত্র আছে, জিজ্ঞাসা করলে তারাই যে-কেউ বলে দেবে। তার পর যখনই শিকাগোয় কোন ভারতীয় ছাত্রের সংগে দেখা হয়, জিজ্ঞাসা করি সে কথা। কিন্তু আশ্চর্য্য, সবাই বলে—কি জানি, জানি না। আমি অবাক্ হলাম যে এরা এত দিন আছে এ শহরে, এ কৌতূহলও কি একবার এদের জাগেনি? পরে একদিন ইণ্টারন্যাশনাল হাউস্-এ গেলাম। সেখানে অনেকগুলি ভারতীয় ছাত্র থাকে। দেখাও হ'ল অনেকের সংগে। ভাবলাম তাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় জানবে। কিন্তু দেখলাম কেউ জানে না—এক জন বাদে। সে দাক্ষিণাত্যের খৃষ্টান যুবক লুইস্। অবাঙালী এবং অহিন্দু।

খেয়ালের খরচ

আগ্রার তাজমহল তৈরী করতে খরচা হয়েছিল তিন কোটি সতেরো লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চব্বিশ টাকা।

মিশরের পিরামিড তৈরীর জন্ত পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছিল।

[illegible] Park
Calcutta 20.
[illegible] April, [illegible].

My dear Ramgati Babu,

Your letter of the [illegible] instant [illegible] enclosure to hand. How can you take any action? [illegible] should completely ignore such articles.

With all good wishes,

Yours affectionately,
[illegible]
(SARAT CHANDRA BOSE)

Mr. Ramgati Ganguly,
54 Bhuteswar,
Benares.

শরৎচন্দ্র বসুর প্রত্যুত্তর
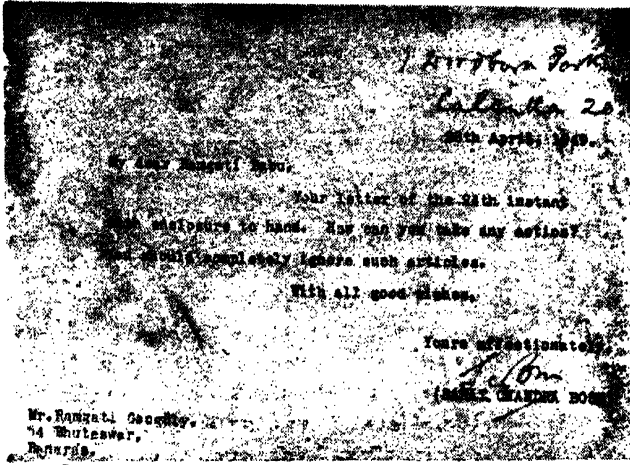
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিবাহ কি সত্য?

শ্রীশিবপ্রসাদ নাগ

নেতাজী জীবিত আছেন, কি নাই—ইহা লইয়া ১৯৪৫ হইতে ভারতবর্ষে বহু বাদানুবাদ হইতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার, উপযুক্ত প্রমাণ না দিয়াই উহার উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন। জাপানের রেঙ্কোজী মন্দির হইতে তাঁহার চিতাভস্মও ভারতে আনিবার জন্ম চেষ্টা হইতেছে। আমরা এই অসাধু প্রচেষ্টার মধ্যে যেমন ষড়যন্ত্রের আভাষ পাইতেছি, নেতাজীর বিবাহ-তথ্য প্রচারের মধ্যেও তেমনি অশোভন ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতেছি।

১৯৪৭ হইতেই নেতাজীর বিবাহ-সংবাদ লইয়া ভারতীয় কোনও উচ্চ রাজপুরুষ মহলে প্রথম কাণাঘুষা সুরু হয় এবং ১৯৪৯-এর ২২শে এপ্রিলের 'সন্মার্গ' (কাশী হইতে প্রকাশিত) পত্রিকায় "নেতাজীকা-পত্নী" শীর্ষক এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদের তারিখনামা—"নয়া দিল্লী, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৯"। উহাতে প্রকাশ যে, নেতাজী জনৈক জার্মাণ মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি অষ্টমবর্ষীয় পুত্র (১৯৪৯-এ) আছে। স্বর্গীয় শরৎ বাবুর ইউরোপ গমনের অন্যতম উদ্দেশ্যই নাকি ছিল তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সহোদর নেতাজীর পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করা। জার্মাণ মহিলাটি সাক্ষাৎকালে নাকি শরৎ বাবুকে সলজ্জ মুখে বলিয়াছিলেন যে, পুত্ররত্নটি নেতাজীই তাঁহাকে দিয়াছিলেন। মুখাবয়ব, দেহের বর্ণ ইত্যাদি দেখিয়া শরৎ বাবু উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। নেতাজীর পত্নী নাকি ফটো, চিঠি-পত্র এবং বিবাহ-সম্বন্ধীয় নানাবিধ তথ্যাদি শরৎ বাবুকে দেখাইয়াছিলেন। পুত্র সহ সসম্মানে তাঁহাকে ভারতে আনিয়া "বসু-পরিবারে" স্থান দেওয়াও নাকি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ['সন্মার্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত সংবাদের মুদ্রিত আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য]

ফরোয়ার্ড ব্লকের "যুক্তপ্রদেশ" শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীরামগতি গাঙ্গুলী মহাশয় ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৯-এ স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে এক পত্র লিখিয়া জানিতে চাহেন যে, 'সন্মার্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি সত্য কি না। ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৯-এ শরৎ বাবু উত্তরে তাঁহাকে জানান—

১নং উডবার্ণ পার্ক
কলিকাতা-২০

"প্রিয় রামগতি বাবু,

আপনার ২৪ তারিখের পত্র পাইয়াছি। কি করিয়া উহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন? আপনার উচিত এই ধরণের প্রবন্ধকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা।

আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন।

আপনার স্নেহধন্য
শরৎচন্দ্র বসু"

মিঃ রামগতি গাঙ্গুলী, ৫৪, ভূতেশ্বর, বেনারস।

[শরৎ বাবুর পত্রের মুদ্রিত আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য]

শরৎ বাবুর উত্তর সংক্ষিপ্ত হইলেও মাত্র একটি ছত্রেই তিনি চরম ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে কেহই সাহস করে নাই সাড়ম্বরে এই সংবাদ প্রচার করিতে। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে কোনও বিবৃতি তিনি দেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে, কণ্টক দূর হওয়ায় বোধ করি, এক শ্রেণীর মীরজাফর কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন নেতাজীর বিবাহ প্রমাণ করিবার জন্ম।

আমরা সাধারণ লোক ভাবিতেছি—বিবাহ ত ধর্মের অঙ্গ। নেতাজী যদি বিবাহই করিয়া থাকেন, তাহা লইয়া এত মাতামাতি কেন? বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—কে বিবাহ করেন নাই? কিন্তু তাঁহারা কেহই বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করেন নাই। বুদ্ধ ও চৈতন্ত পত্নীত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পত্নীকে মাতৃরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। নেতাজীকে আমরা—সাধারণ ব্যক্তিরা শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরাট পুরুষরূপে দেখি নাই, চরিত্রবলে তাঁহাকে আমরা ভীষ্মদেবের মতই ভাবিয়াছি। জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া বহু সুশিক্ষিতা এবং রূপবতী মহিলার
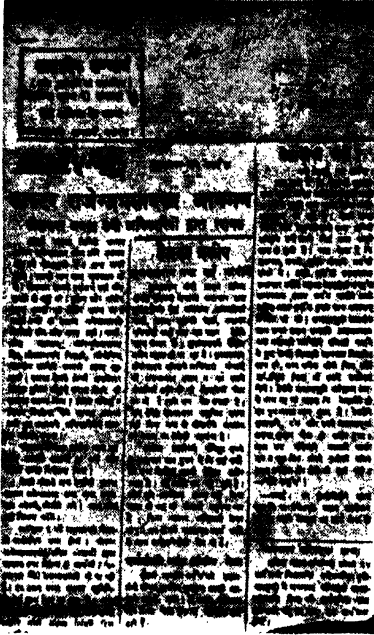
"সন্মার্গ" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মুদ্রিত আলোকচিত্র

সান্নিধ্যে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু কোনও দিন নারীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করিতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। শুনিয়াছি, বহু কাল পর্য্যন্ত তিনি নিজ মাতৃসমা বৌদিদিগণের সহিত কথোপকথনের সময় নতমস্তক হইয়া কথা বলিতেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে, সংবাদদাতাগণের 'নেতাজী বিবাহ করিবেন কি না' এই প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন যে, বিবাহ ত তিনি করিয়াছেন—ভারতমাতার মুক্তি-সাধনাকেই ত বিবাহ করিয়াছেন!

ভারতের বাহিরে ইউরোপে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়করূপে তাঁহার যে কীর্ত্তি-কাহিনীর কথা ভারতবর্ষে প্রচার হইয়াছে তাহা হইতেও আমরা এই সিদ্ধান্ত না করিয়া পারি না যে, কর্ম্মযোগী নেতাজীর মনে সাধারণ জনসুলভ নারীর প্রতি দুর্ব্বলতার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। হিটলার, মুসোলিনী, তোজোর ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্ব যাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন তাঁহার চরিত্র যে বজ্রকঠোর হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি! মিঃ এন্থনী এলেক্সেমিওস্ লিখিত "হিরো অব হিন্দুস্থান" নামক পুস্তক (প্রকাশক—ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স) নেতাজীর ইটালীতে থাকাকালীন এক চমৎকার ঘটনার কথা আছে। নেতাজী তখন ইউরোপে—"সেনর অরল্যাণ্ডো", "সেনর মোজাটা", "মিঃ এক্স"—এই তিন ছদ্মনামে পরিচিত। "জেন্টেল্ ফ্রিয়ের ইণ্ডিয়েন্" (Zentale Friere Indienne) নামে জার্ম্মাণীতে প্রথম আজাদ্ হিন্দ ফৌজের সৃষ্টি হইয়াছে। ইটালীতে "হোটেল এক্সেলসিওরে" নেতাজী থাকেন। ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া ইউরোপে আগমনের কয়েক মাস পরের ঘটনা। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের কোনও ইটালীয় ছাত্রী তাহার বান্ধবীগণের নিকট সাড়ম্বরে ঘোষণা করিল যে, নেতাজীকে সে প্রেমাবদ্ধ করিবেই। এই উদ্দেশ্যে "হোটেল এক্সেলসিওরে" তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহু ব্যর্থ আয়াস স্বীকারও করিল। অবশেষে একদিন অপরাহ্ণে যখন নেতাজী হোটেলের পশ্চাদ্দিকের উদ্যানে পদচারণা করিতেছিলেন চিন্তিত মুখে, সেই সময় উক্ত ভদ্রমহিলাটি উপস্থিত হইয়া বৃক্ষান্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ কোনও গুরু দ্রব্যের পতনে নেতাজীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, একটি মহিলা অদূরে বৃক্ষনিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে, যেন আহত হইয়াছে মনে হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট গিয়া তাহাকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া অফিসের দিকে অগ্রসর হইলেন। মহিলাটি বিশেষ কথা বলে নাই। প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিয়াছিল, পায়ে কি যেন ফুটিয়াছে! উহা ছলনা মাত্র! হঠাৎ মহিলাটি নেতাজীর গলা জড়াইয়া বলিয়া উঠিল,—"প্রিয়তম!" অমনি নেতাজী তাহাকে নামাইয়া দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভগিনি, ও-কথা উচ্চারণ করিও না। ও-সব ভাবিবার সময় আমার নাই। ভারতের মুক্তিই আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, তুমি আমার ভগিনী।" মহিলাটি উঠিয়া নেতাজীর প্রতি ক্ষণিক তাকাইয়া রহিল। অজস্র ধারায় তাহার গণ্ডদেশ প্লাবিয়া নামিয়া আসিল অশ্রুধারা। নতমস্তকে সে দোষ স্বীকার করিল এবং ভগিনীরূপে নেতাজীর সেবা করিবার অধিকার চাহিল। নেতাজী সানন্দে তাহাকে সে অধিকার দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি হইতে নেতাজীর চরিত্রের যে বজ্রকঠোর দিক উদ্ঘাটিত হইল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভীষ্মের মতই ভীষণ পণ যাঁহার, তাঁহার বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিবার সময় কোথায়? ক্ষণিক দুর্ব্বলতা? যাঁহারা ভাবেন, ক্ষণিক দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া নেতাজী জার্ম্মাণ মহিলাটিকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নেতাজীকে আদৌ বোঝেন নাই। এ চরিত্রে ক্ষণিক দুর্ব্বলতার স্থান নাই। যৌবনে যাহা ঘটে নাই, পরিণত বয়সে তাহা ঘটিবে কেন? সমগ্র ইউরোপ যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে, সেই সময় মুক্তিসাধক নেতাজী হঠাৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া নারীর প্রেমাসক্ত হইবেন—এ ধারণা সুস্থ মস্তিষ্কের নহে। কেহ কেহ বলেন যে, কূটনৈতিক প্রয়োজনে বিবাহ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বিবাহের উদ্দেশ্য—শত্রুপক্ষের গোপন তথ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা ইত্যাদি। জার্ম্মাণী তাঁহার মিত্র, সেই জার্ম্মাণীর মহিলা বিবাহ করায় তাঁহার কূটনৈতিক লাভের সম্ভাবনা কোথায়? আর এই ধরণের বিবাহে সন্তান উৎপাদনের প্রশ্নই উঠে না।

সুতরাং বিবাহ সংবাদ প্রচারের কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে কি না দেখা যাক্। নেতাজীর যিনি পত্নী বলিয়া প্রচার কথা হইতেছে, তাঁহার নাম শ্রীমতী এমিলী শেঙ্কি, তাঁহার কন্যার নাম অনীতা ব্রিগট্। শ্রীমতী নাকি জার্ম্মাণীতে নেতাজীর সেক্রেটারী ছিলেন। ভারতবাসী যাঁহারাই নেতাজীর তথাকথিত পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাঁহারাই বলিয়াছেন যে, শ্রীমতী—"এমিলী শেঙ্কী" নামে এবং কন্যা "অনীতা ব্রিগট্" নামে পরিচিতা। আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য এই—নেতাজীর পত্নী "এমিলী বসু" নামে এবং কন্যা "অনীতা বসু" নামে পরিচিতা হইতে চাহিলেন না কেন? তাঁহারা যদি নেতাজীরই আপন জন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে

তাঁহার ন্যায় বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তির পদবী গ্রহণে আপত্তি কেন? আমাদের দেশের রামা-শ্যামাও মেম বিবাহ করিলে তাঁহারা স্বামীর পদবী গ্রহণ করিয়া থাকেন। নেতাজীর বেলায় এ নিয়ম-ভঙ্গ কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—'সন্মার্গে'র ১৯৪৯-এর ২২শে এপ্রিলের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, নেতাজীর অষ্টমবর্ষীয় একটি পুত্র আছে। পুত্রটি পরে কন্যা হইল কি করিয়া? ১৯৫১ অব্দের সংবাদেও দেখি, কন্যার বয়স—১৯৪৯এর মতই আট বৎসর! রেশন কার্ডের বয়সের মতই বয়স দুই বৎসর পরেও বাড়ে নাই! এই অসঙ্গতির কারণ কি?

তৃতীয় প্রশ্ন—নেতাজীর পত্নীর প্রথম আলোকচিত্র যখন 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হয়, তখন দেখিয়াছি—তিনি বেশ সুন্দরী, দীর্ঘাকৃতি, উন্নতনাসিকা, আয়তচক্ষু, ঋজুদেহ—মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আজাদ্ হিন্দ সরকারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এবং বর্ত্তমানে ভারতীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের বোম্বাইস্থ রিজিওন্যাল অফিসার—শ্রীএস্, এ, আয়ারের পুস্তকে—"আন্টু হিম্ এ উইট্নেস"-এও এই চিত্র আছে, তবে উপবিষ্ট অবস্থায়। উক্ত চিত্র প্রকাশের পর যে সকল চিত্র এদেশে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনটিতেই এমিলী শেঙ্কীর পূর্ব্বোক্ত আকৃতি নাই। যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে দীর্ঘ দেহ হইয়াছে খর্ব্বাকৃতি, দীর্ঘ নাসিকা হইয়াছে ক্ষুদ্র, দীর্ঘ কেশ হইয়াছে ক্ষুদ্রাকার আর শাড়ীর স্থান গ্রহণ করিয়াছে মেমের ফ্রকে! এই অসম্ভব সম্ভব হইল কি করিয়া?

ঢাক-ঢোল সহযোগে নেতাজীর বিবাহ-তথ্য প্রচারের পশ্চাতে বোধ হয় উদ্দেশ্য আছে—তাঁহাকে সাধারণের ন্যায় দুর্ব্বল প্রমাণ করা। নেতাজী ভুল করিতে পারেন না—তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় জনকল্যাণ আসিতে বাধ্য—ইত্যাকার ধারণাই ভারতীয় সাধারণের আছে। এই ধারণার মূলে সুকৌশলে আঘাত হানিবার জন্যই বোধ হয় এই মিথ্যা প্রচার!

নেতাজী যে বিবাহ করেন নাই এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন তিন জন জার্ম্মাণ ভদ্রলোক। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জগৎকান্ত শীল মহাশয় ওলিম্পিক খেলাধূলায় ভারতীয় বক্সিং টীমের ম্যানেজাররূপে হেলসিঙ্কি গিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে আগষ্ট মাসে ফিরিবার সময় তিনি অষ্ট্রীয়া এবং জার্ম্মাণী হইয়া আসেন। সেখানে তিন জন জার্ম্মাণ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। "নেতাজীর বিবাহ সত্য কি না?"—এ প্রশ্নের উত্তরে জলিয়া উঠিয়া তাঁহারা বলেন, "আপনারা কি ভাবেন, হিট্লার ও নেতাজী আপনার আমার মত সাধারণ মানুষ? তাঁহারা ঐশীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। নেতাজী ও হিট্লার কেহই বিবাহ করেন নাই।" শীল মহাশয় আমাদের বলেন যে, প্রশ্ন করিয়া তিনি রীতিমত লজ্জিত বোধ করেন, কারণ জার্ম্মাণ ভদ্রলোক তিনটি যে জলিয়া উঠিবেন, ইহা তিনি ভাবেন নাই। উক্ত তিন জন জার্ম্মাণ ভদ্রলোকের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। ডাঃ টাগুলার হেনোভার,
কীরক্রুডার ষ্ট্রীট—১৪, জার্ম্মাণী।

২। জি, ডিয়েলরীখ
ফ্রাঙ্কফার্ট, এফ্., এম; কার্ল মার্ক্স ষ্ট্রেপ—১১, জার্ম্মাণী।

৩। ডব্লিউ সুলকে (W. Schullke)
উর্জবুর্গ, এরথেল্‌ষ্ট্রার—১৮ (Erthalstr—18) জার্ম্মাণী।

বিবাহ-তথ্য যাঁহারা প্রচার করিতেছেন তাঁহারা যে নেতাজীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার দুঃসাহস করিয়াছেন—তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ১৯৪৫-এর শেষে জাপানের পরাজয়ের ফলে জাপান ত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি শিশুদের প্রতি এক চিঠি লেখেন। চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিয়াছেন যে, তাহার কোনও সন্তান নাই অথচ কন্যা "অনীতা" আসিল কোথা হইতে? চিঠিটি এই—

"আমার প্রিয় কিশোর বন্ধুগণ, জাপান ত্যাগের পূর্ব্বে তোমাদের কর্ম্মসাফল্যের জন্য আমি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা তোমাদের জানাচ্ছি। আমার নিজের কোনও সন্তান নাই, কিন্তু তোমরা নিজের সন্তানের চেয়েও আমার নিকট প্রিয়। কেন না, তোমরা এমন একটি কর্ম্মে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছ যাহা আমার নিজের জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র লক্ষ্য এবং সেই কর্ম্মটি হইতেছে "ভারতমাতার স্বাধীনতা"। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমরা এই কার্য্যে একনিষ্ঠ থাকিবে এবং ভারতমাতার প্রতি অনুরাগী থাকিবে।

যাইবার পূর্ব্বে তোমাদের সহিত দেখা করিতে না পারায় আমি দুঃখিত। তবে জানিও যে, আমি সর্ব্বদাই তোমাদের প্রেরণায় জাগিয়া রহিব।

ভগবান তোমাদের সফল করুন। ইতি—

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।"

উপরিউক্ত তথ্যগুলি হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, নেতাজী বিবাহ করেন নাই। "ভস্ম"-তথ্যের ন্যায় "বিবাহ-সংবাদ"ও কাল্পনিক—আদর্শ পুরুষকে অতি-সাধারণ প্রমাণ করিবার অপচেষ্টা মাত্র।

ভারতবাসীর হৃদয়ে নেতাজীর যে স্থান, অন্য কোনও নেতার তাহা নাই। তাঁহার চরিত্র ও অপূর্ব্ব ত্যাগের জন্য তাঁহার কর্ম্মসাধনার বিরুদ্ধে সমালোচনা সহজ নহে। সেই জন্যই তৃতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় অতি সুকৌশলে ধীরে ধীরে প্রথমে জনসাধারণের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া, পরে তাঁহাকে দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার পরের ধাপ কি, কে জানে? পাঠকগণকে বিচার করিয়া নেতাজী-সংবাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি—কারণ দেশের সাধারণ মানুষের উপরই নির্ভর করিতেছে শুধু নেতাজীর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা নহে—তাঁহার ত্যাগ-মন্ত্রে নূতন ভারত গড়িয়া তোলা।

সংস্কৃত থেকে আরবীতে

আরবদেশীয় ভাষায় প্রচারিত সিরক, সর্সদ ও বেদান নামক গ্রন্থ তিনখানি সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চুরানব্বই

কেশবের খুব অসুখ। দেখতে এসেছেন ঠাকুর। আগের বার যখন অসুখ হয় তখন কালীর কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলেন। বলেছিলেন, মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তাহলে কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব?

এবার অসুখ কিছু বাড়াবাড়ি। এমনিতে কত বার গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। শেষ দিকে, একেবারে শুধু-গায়ে। ফল হাতে করে। এখন একেবারে বিছানা নিয়েছে।

'দেখ কেশব কত পণ্ডিত। ইংরিজিতে লেকচার দেয়, কত লোক তাকে মানে, স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে।' বলছেন ঠাকুর ভক্তদের। 'কিন্তু এখানে যখন আসে, শুধু-গায়ে। সাধুদর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসে। একেবারে অভিমানশূন্য।'

একদিন এসে কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে গিয়েছে। প্রতাপ মজুমদার বললে, আজ সব থেকে যাব এখানে। বাড়ি ফিরে আর কাজ নেই।

'না না আমার কাজ আছে। আমাকে যেতে হবে।' কেশব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'এই যে সেই মেছুনীর মত করলে।' ঠাকুর হেসে উঠলেন: 'আঁস-চুপড়ির গন্ধ না হলে বুঝি আর ঘুম হয় না? এক মেছুনী মালিনীর বাড়িতে অতিথি হয়েছে। মাছ বিক্রি করে আসছে, তাই হাতে চুপড়ি। মালিনী তাকে ফুলের ঘরে শুতে দিয়েছে। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেল, কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। কি গো, ছটফট করছ কেন? জিগগেস করলে মালিনী। কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম আসছে না। মেছুনী মিনতি করল, আমার আঁস-চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পারো? তাই আনিয়ে দিল মালিনী। তখন আঁস-চুপড়িতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে মেছুনী ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল।'

গল্প শুনে কেশব আর তার দলের লোকের হাসি আর থামে না।

'রোগটি হচ্ছে বিকার। যে ঘরে বিকারী রুগী সেই ঘরেই আবার আচার-তেঁতুল। সেই ঘরেই আবার জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার-তেঁতুল—এই দেখ,' ঠাকুর তাকালেন সবাইয়ের দিকে, 'বলতে-বলতে আমার মুখে জল এসেছে। সামনে থাকলে কি হয় কে বলবে! মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার-তেঁতুল। ভোগবাসনা জলের জালা। আর সব কিনা এই রুগীর ঘরে।'

দিন কতক ঠাঁই-নাড়া হয়ে থাকো। ক দিন এমন জায়গা ঘুরে এস সেখানে আচার-তেঁতুল নেই, জলের জালা নেই। চলে যাও নির্জনে। নীলের নিলয়ে। হয় নীল সমুদ্রে, নীল অরণ্যে, নয় নীল আকাশের নিঃসীমায়। নীল হচ্ছে অনন্তের রঙ, অবিনশ্বরতার রঙ। তোমার নির্জনতার রঙও হচ্ছে নীল। নির্জনে থাকতে-থাকতেই নীরোগ হবে। নীরোগ হয়ে ঘরে ফিরে এলে আর ভয় নেই।

'অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে তখনই চারদিকে বেড়া লাগে। পাছে ছাগল-গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে বেড়ার আর দরকার থাকে না। তখন হাতী বেঁধে দিলেও কিছুই হয় না গাছের। যদি নির্জনে সাধন করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করে বল বাড়িয়ে বাড়ি গিয়ে সংসারী করো, কামিনী-কাঞ্চন তোমার কিছু করতে পারবে না।'

দলের মধ্যে ছিলেন একজন সদরওয়ালা। বললেন, 'সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নেই, বাড়িতে থেকেও যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় এ জেনে মনে বড় শান্তি হল।'

'যা আছে হোথায় তা আছে হেথায়।' রামকৃষ্ণ বললেন দীপ্তস্বরে: 'ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভালো। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সঙ্গে যুদ্ধ তো করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসারে থেকেই সুবিধে। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে—রোগ হলে সেবা পর্যন্ত।'

দেখছ না আমাকে! সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ হয়ে সংসারীর শিরোমণি।

'আমার তো মাগ আছে। ঘরে-ঘরে ঘটি-বাটি আছে। হরে-প্যালাদের খাইয়ে দিই। আবার হাবির মা এলেও ভাবি।'

পিঁপড়ের মত সংসারে থাকো। বালিতে-চিনিতে, নিত্যে-অনিত্যে, মিশেল হয়ে আছে। বালি ছেড়ে চিনিটুকু নাও। থাকো পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে কিন্তু গা ঝকঝক করছে। থাকো পানকৌটির মত। পঞ্চাশ বার ডুবে, ঝাঁকি দিয়ে গায়ের জল ঝেড়ে ফেল। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো।

'একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল, আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম। স্ত্রীটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বললে, কেন মিছে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্যে দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। আর তাই যদি হয় এই এক ঘরই ভালো।'

তার মানে জ্ঞানলাভ করে সংসারে থাকো।

'জ্ঞান হয়েছে তা কেমন করে জানব?' জিগগেস করলেন সদরালা।

'জ্ঞান হলে ঈশ্বরকে আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তখন তিনি নন। তিনি তখন ইনি। হৃদয়মধ্যে বসে আছেন।'

অন্তরের মধ্যেই সেই স্থিরধাম। কেউ চলেছে দ্বারকানাথ, কেউ মথুরায়, কেউ বা কাশীতে। কিন্তু প্রভু রয়েছেন অন্তরের নিরালায়। পিপাসিত হয়ে কোথায় যাচ্ছ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীতে, মানস-সরোবরেই সঞ্চিত আছে জলপুঞ্জ। সেই মন-সরসীতে এবার স্নান করো।

অনেক রুদ্ধ ঘরে কান পেতেছ। এবার নিজের অন্তরে এসে কান পাতো। এবার শুনতে পাবে সে দুয়ার খোলার শব্দ।

সদরালার তবু সংশয় যায় না। বললেন, 'মশায়, আমি পাপী, কেমন করে বলি যে তিনি আমার ভিতরে আছেন?'

একটু যেন বিরক্ত হলেন ঠাকুর। বললেন, 'ঐ তোমাদের পাপ আর পাপ। এ সব বুঝি খৃষ্টানি মত? সে দিন একটু বাইবেল পড়া শুনলাম। তাতে কেবল ঐ এক কথা। পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি, রাম কি হরি বলেছি, আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। দৃপ্ত বিশ্বাস। তপ্ত বিশ্বাস।'

'মশায়, কেমন করে অমন বিশ্বাস হবে?'

'তাঁতে অনুরাগ করো। তাঁকে ভালোবাসো। ডাকো। তাঁর জন্যে কাঁদো—'

'কেমন করে ডাকবো?'

ডাক দেখি মন ডাকের মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে। কেমন করে ডাকবো! তাও আমায় শিখিয়ে দিতে হবে?

'আমি মা বলে এইভাবে ডাকতাম—মা আনন্দময়ী, দেখা দিতে যে হবে! আবার কখনো বলতাম, ওহে দীননাথ জগন্নাথ, আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ। আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন—আমি কিছুই যে জানি না—দয়া করে দেখা দিতে যে হবে—'

ঠাকুরের করুণ স্বরে সকলের হৃদয় গলে গেল। মহিমাচরণ তো কেঁদে আকুল।

ওরে বিশ্বাস কর, তাঁর নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস? অন্ধ বিশ্বাস?

ওরে, অন্ধ হওয়াই সুবিধে। যার চোখ আছে সে তো নিজের অহঙ্কারে ঘুরে বেড়ায়। যার চোখ নেই তার হাত একজনকে এসে ধরতে হয়। ওরে তুই হাত-ধরা লোক কোথায় পাবি? প্রভুই এসে তোর হাত ধরবেন।

কিন্তু কেশবের এমন অসুখ হল কেন? শুধু খাটতে-খাটতে দেহপাত হল। শুধু লেখা আর লেখা। বক্তৃতা আর বক্তৃতা।

যোগীন যখন প্রথম ঠাকুরের ঘরে এসে প্রণাম করে দাঁড়ায়, তার হাতে একখানা খবরের কাগজ।

'কোত্থেকে আসছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'এই দক্ষিণেশ্বর থেকেই। আমি নবীন চৌধুরীর ছেলে।'

চিনতে পারলেন। দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ

চৌধুরীদের নাম কে শোনেনি? এদের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খেত সেকালে। যেমন অন্যের জাত নিতে পারতেন তেমনি জাত দিতেও পারতেন অকাতরে। কিন্তু ঠাকুর আশ্চর্য হলেন, দক্ষিণেশ্বরের লোক তাঁকে চিনল কি করে? প্রদীপের নিচেই তো অন্ধকার। মন্দিরের যত কাছে, ঈশ্বরের তত দূরে। সামনের মাঠকে হলদে লাগে, দূরের মাঠই সবুজ।

দক্ষিণেশ্বরের লোক বেশি পাত্তা দেয় না ঠাকুরকে। গেঁয়ো যুগীরই ভিখ মেলে না। তাই তিনি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এখানকার কথা কি করে জানলে?'

'খবরের কাগজ থেকে।'

'কোথাকার কাগজ?'

'কেশব সেনের। কেশব সেন আপনার সম্বন্ধে লিখেছেন কাগজে।'

কি লিখেছে, পড়িয়ে শোনাও তো? এমন কথা জিগগেসও করলেন না ঠাকুর। ডাকিয়ে আনালেন কেশববাবুকে। বাহবা দিলেন না। বরং ধমকিয়ে বললেন, 'আমি কি মান-ভিখারী? আমি কি ইদানীং-সাধু?'

কেশব হাত জোড় করে বসে রইল।

'যা করেছ করেছ, আর লিখো না।'

কিন্তু কেশবের কথা কে লেখে! একটা লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—চেয়ে দেখ কত বড় শক্তি! কিন্তু আজ ব্যাধির কবলে পড়ে কী নিঃসহায়!

শীতকাল। ঠাকুর দেখতে এসেছেন কেশবকে। গায়ে সবুজ রঙের বনাতের গরম জামা। জামার উপর আবার একখানি বনাত। সন্ধ্যা হয়-হয়।

কেশবের বাড়ির লোকেরা ঠাকুরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন উপরে। বৈঠকখানার দক্ষিণে বারান্দা। সেখানে তক্তপোষ পাতা। তার উপরে বসাল ঠাকুরকে।

বসে আছেন তো বসেই আছেন। কেউ নিয়ে যাচ্ছে না ভিতরে। তাঁর কেশবের পাশটিতে। বসে-বসে তার কষ্ট-ভরা কাশির আওয়াজ শুনছেন।

কত কীর্তন করেছে কেশব। ঠাকুরকে মাঝখানে রেখে কত নেচেছে। কেশবকে বেশি দিন না দেখতে পেলেই অধীর হয়েছেন। সেবার যেন বড় বেশি ছটফট করছেন। রাজেন মিত্তির পাশে বসা, তাকে বলছেন বার-বার, ছাখো দিকিন কেশব আসছে কিনা। রাজেন মিত্তির একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসে। কই, কোথায় কেশব! আবার কোথাও একটু শব্দ হল। ছাখো আবার ছাখো। আবার ফিরে এল রাজেন। কেশবের কেশাগ্রেরও দেখা নেই। ঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন, 'পাতের উপর পড়ে পাত। বাই বলে, ওই এল বুঝি প্রাণনাথ।' তার পরে স্বরে অনুযোগ মেশালেন: 'হ্যাঁ, ছাখো, কেশবের চিরকালই কি এই রীত? আসে আসে আসে না!'

কিন্তু সেদিন না এসে আর পারল না কেশব। কিন্তু সঙ্গে সেই দলবল।

'রাজ্যের কলকাতার লোক জুটিয়ে এনেছেন! আমি কিনা বক্তৃতা করব! তা আমি পারবো-টারবো নি। করতে হয় তুমি করো। আমি তোমার খাব দাবো থাকবো—'

তবে তুমি যদি একা-একা আস, বেশ হয়। দু জনে মিলে মনের সুখে কথা কই সঙ্গোপনে। ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে, আমিও একবার টানলাম।

'কেশব তুমি আমায় চাও, কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের সেদিন বলছিলুম, এখন আমরা খচমচ করি, তার পর গোবিন্দ আসবেন। তারপর তুমি যখন এলে, বললুম, ঐ গো তোমাদের গোবিন্দ আসছেন। আমি এতক্ষণ খচমচ করছিলুম, জমবে কেন?

ঐ দল-দল করেই গেল। পাকা আমি কি দল করতে পারে? আমি দলপতি, আমি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি, এ আমি কাঁচা আমি।

কিন্তু, তোমরা এত দেরি করছ কেন? কতক্ষণ বাইরে বসে থাকব? আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।

'তিনি এখন এই একটু বিশ্রাম করছেন। একটু পরেই আসছেন এখানে।'

'হ্যাঁ গা, তার এখানে আসবার কি দরকার? আমিই যাই না কেন ভিতরে!'

ডাক্তার বলে গেছে বিশ্রামে রাখতে। তাই কেশবের শিষ্যরা খুব হুঁসিয়ার। এই একটু চুপচাপ আছে কেশব। এখুনি যদি আবার তাকে ব্যস্ত করা হয়—

কিন্তু ঠাকুরের ধৈর্য মানছে না। যাই-যাই করছেন।

'আজ্ঞে এই একটু পরেই আসছেন তিনি।'

'যাও, তোমরাই অমন করছ। না, আমিই ভিতরে যাই—'

প্রসন্ন ভুলোতে এল ঠাকুরকে। কেশবের কথা ছাড়া আর কথা কোথায় মনভুলানো! প্রসন্ন বললে, 'তাঁর অবস্থা আরেক রকম হয়ে গেছে। আপনারই মত মার সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শুনে কাঁদেন-হাসেন।'

এত দূর! সেবার কেশবকে বললেন, বলো ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব তো বললেই, তার শিষ্যরাও বললে। আবার বললেন, বলো, গুরুকৃষ্ণ-বৈষ্ণব। তখন কেশব বললে, 'মশায়, এখন এত দূর নয়। তা হলে লোকে গোঁড়া বলবে।'

কালী শুধু মানা নয়, কালীর সঙ্গে কথা বলা! শুনেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন।

বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হয়েছে। সমাধি-ভঙ্গের পর ঠাকুরকে সবাই নিয়ে এল সে ঘরে। আসবাবে ঠাসা, চেয়ার, কৌচ, আলনা, গ্যাসের আলো। ঠাকুর বসলেন একটা কৌচে। তখনো যেন ভাবাবেশ কাটেনি সম্পূর্ণ। ঘরের জিনিসপত্র লক্ষ্য করে বললেন, 'আগে এ সব দরকার ছিল। এখন আর কী দরকার!'

বলতে-বলতেই আবার আবেশ উপস্থিত। বলছেন, 'এই যে মা এসেছ! এসো। আবার বারানসী শাড়ি পরে কী দেখাও! হাঙ্গামা করো না। বোসো গো বোসো।'

এই কেশবের বাড়িতেই আগে একবার বলেছিলেন ঠাকুর, 'মা গো, এখানে তুই আসিসনি। এরা তোর রূপ-টুপ মানে না। কেবল নিরাকার নিরাকার করে।'

আজ একেবারে সটান এসে পড়েছেন। তায় আবার সেজে-গুজে এসেছেন।

হরীশ ঠিকই বলে। ঠাকুরকে দেখিয়ে বলে, 'এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে। তবে ব্যাঙ্কে টাকা দেবে। নইলে টাকা নয়, ফাঁকা।'

ঠাকুর বলছেন আপন মনে, 'দেহ হয়েছে আবার যাবে। দেহ আর আত্মা। কিন্তু আত্মা যাবে না। যেমন শুপুরি। কাঁচা বেলায় ফলে আর ছালে লেগে থাকে, আলাদা করা যায় না। কিন্তু পাকলে শুপুরি আলাদা হয়ে যায় ছাল থেকে। কিন্তু পাকবে কখন? যখন তাঁর দর্শন মিলবে। তখন দেহ আলাদা আত্মা আলাদা হয়ে যাবে।'

কেশব আসছেন। পূব দিকের দরজা দিয়ে আসছেন। আসছেন দেয়াল ধরে-ধরে। কী হয়ে গিয়েছে চেহারা! কঙ্কালের উপর শুধু একটা চামড়ার প্রলেপ! চোখ মেলে তাকানো যায় না। বুক ফেটে যায়!

পঁচানব্বই

এই সেই বীর-বিদ্রোহী ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্র।

কেশবের সমস্ত ধর্মসাধনার মূলে হচ্ছে তার মা, সারদাসুন্দরী। কেশব প্রাচীন ধর্মকর্ম মানছে না এই তাঁর বিষম চিন্তা। অভিভাবকরা ঠিক করেছেন কুলগুরুর মন্ত্র দিতে হবে তাকে। দিন ঠিক হয়েছে। গুরুদেব উপস্থিত। সব উপকরণ সাজিয়ে মা বসে আছেন। অভ্যাগত-নিমন্ত্রিতের ভিড় বাড়ছে। কিন্তু যাকে উপলক্ষ্য করে এই আয়োজন তার দেখা নেই।

কেশব চলে এসেছে দেবেন ঠাকুরের আশ্রয়ে। বলে পাঠিয়েছে পৌত্তলিক গুরুমন্ত্র আমি নেব না।

বাড়ীর আর সবাই ঘোরতর বিরক্ত, পারে তো ছিঁড়ে খায় কেশবকে, কিন্তু সারদাসুন্দরী নিজের দুঃখকে ছেলের সত্যের চেয়ে বড় করে দেখতে পেলেন না। ছেলে যদি সত্যভ্রষ্ট হয় সে দুঃখ যে দ্বিগুণ হয়ে বাজবে।

ব্রাহ্মসমাজের কখানা বই মার হাতে দিয়ে গেল কেশব। বললে, পড়ে দেখ।

সুন্দর-সুন্দর কথা। কেশব ব্রহ্মজ্ঞানী হবে, গুরুর থেকে মন্ত্র নেবে না—কি এর তাৎপর্য ভালো বুঝতে পারেননি সারদা। কোথায় সে ব্রাহ্মসমাজ কে জানে। কিন্তু এ বইয়ে যা লেখা আছে তা যদি ওদের ধর্ম হয় তো মন্দ কি।

গুরুঠাকুরকে দেখালেন বই। বললেন, 'কেশব কি ধর্ম পেয়েছে দেখুন।'

গুরুঠাকুর পড়লেন যত্ন করে। বললেন, 'এ তো খুব ভালো ধর্ম। তুমি ভেবো না, তোমার কেশব যে পথ ধরেছে তাতেই তার মঙ্গল হবে।'

সুন্দর অক্ষরে মাকে কটি প্রার্থনা লিখে দিল

কেশব। রোজ তাই পড়েন সারদাসুন্দরী। নির্মল একটা তৃপ্তির স্পর্শে অন্তর-বাহির জুড়িয়ে যায়। হরিমোহন সেন, কেশবের জ্যাঠামশাই, একদিন দেখে ফেললেন। কী পড়ছ দেখি?

নাটক-নভেল কিছু নয়। ঈশ্বরের কথা। ঈশ্বরকে প্রার্থনা।

'কে লিখে দিয়েছে? কার হাতের লেখা?' গর্জে উঠলেন হরিমোহন।

চোখ নত করলেন সারদাসুন্দরী। কথা কইলেন না।

'বুঝতে পেরেছি কার। কেশবের।' বলেই হরিমোহন কাগজ কখানা ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো-টুকরো করে।

ছেলেকে গিয়ে আবার ধরলেন সারদাসুন্দরী। বললেন, আমাকে আরেকবার লিখে দে।

কেশব বললে, লিখে লাভ নেই, আবার ছিঁড়ে ফেলবে।

বিশ বছরের ছেলে, বিজ্ঞ অভিভাবকদের কথা রাখে না, এ অসহ্য। কিন্তু যে হরিমন্ত্র দিয়ে জগজ্জনকে নববিধানে দীক্ষিত করতে এসেছে, তার কাছে কিসের গুরুমন্ত্র! যে নিজে জগদগুরু তার কাছে আবার কিসের গুরুজন!

হিন্দু পরিবারে থেকে গুরুমন্ত্রে দীক্ষা না নেওয়া গুরুতর পরীক্ষা। কি হল জানবার জন্যে ছেলে সত্যেনকে পাঠিয়ে দিলেন দেবেন ঠাকুর। সত্যেন গিয়ে খবর দিল, জিতেছে কেশব। দেবেন ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন।

বক্তৃতা করে ফিরতে লাগল কেশব। একেকটা বক্তৃতা তিন চার ঘণ্টা ধরে। যতক্ষণ স্বরভঙ্গ না হয় ততক্ষণ উচ্চগ্রামে বলে যাও হরিনাম। অগ্রসর হও, ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যাও। যিনি আমাদের আলোক আর শক্তি, পিতা আর বন্ধু, তাঁর দিকে স্থির চোখে ভিখারীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকো। তিনি তোমার অন্তরে দেবেন জ্ঞান হৃদয়ে প্রেম আত্মায় পবিত্রতা. আর দু হাত ভরে দেবেন শৌর্যে আর সাহসে। এগিয়ে যাও।

'হ্যাঁ গা, ছেলেকে একটু দাবতে পারো না?' বললে কে এক হিতৈষিণী। 'রাত্রে ঘুমোয় না, মারা যাবে যে।'

ছেলে আমার অসাধ্যসাধন করবে। গর্ব না করে প্রার্থনা করেন সারদাসুন্দরী। ছেলেবেলা থেকেই সে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে। ছেলেবেলা থেকেই গরদের চেলি পরে নাকে তিলক গায়ে ছাপ এঁকে গলায় মালা দিয়ে ভক্ত সাজতে সে ভালোবাসে। সে যে একটা কাণ্ড-কারখানা করবে এ আর বিচিত্র কি।

দেবেন ঠাকুরের সঙ্গে সিংহল গেলেন কেশব সেন। আর কিছুর জন্যে নয়, জাহাজে চড়া ম্লেচ্ছাচার—এ কুসংস্কার অমান্য করবার জন্যে। কলুটোলা সেনপরিবারে এ এক নিদারুণ ঘটনা। কিন্তু কেশব ছাড়া আর কার হবে এ দুঃসাহস!

সারদাসুন্দরী ভয় পেলেন পরিণাম ভেবে। আর কেশবের বালিকা-বধূ কান্নার রোল তুললে। সমুদ্রের ঢেউয়ে সে কান্না আর শোনা গেল না।

দিগ্বিজয় করে ফিরল কেশব। খৃষ্টানির সংস্পর্শে যত কুরীতি-দুর্নীতি এসেছিল সমাজে তার বিরুদ্ধে লড়তে লাগল। লড়তে লাগল যত অন্ধ সংস্কার ও যত বন্ধ দরজার বিরুদ্ধে। মেয়েদের অবরোধ ঘুচে গেল, নতুন ব্রাহ্মিকার সাজে পরদার বাইরে আসতে লাগল একে-একে। ব্রাহ্মণ যুবকেরা ছিঁড়ে ফেলল পৈতে। দেবেন ঠাকুরও উপবীত ত্যাগ করলেন।

এ দিকে রণে ভঙ্গ দিতে লাগল পাদরিরা। যে খৃষ্টধর্ম তারা প্রচার করছে, সেটা যে মেকি তাই বাইবেল দেখিয়ে প্রমাণ করল কেশব। পাদরির উপর পাদরিগিরি চালালো। কেশবের সভায় লোক ধরে না, আর পাদরির সভায় ঠনঠন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য পদে বরণ করা হবে কেশবকে। সেই উপলক্ষ্যে দেবেন ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিরাট উৎসব। পত্রপুষ্প-পতাকা আর দীপমালার শোভা। সে শোভার সভাপতি কেশব!

কেশব ঠিক করল স্ত্রীকে নিয়ে যাবে সে সভায়। মার কাছে অনুমতি চাইল আগের রাত্রে। বীর-বিপ্লবীর মা সারদাসুন্দরী, অনুমতি দিলেন। স্ত্রী তো শয্যাসঙ্গিনী নয়, স্ত্রী সহধর্মিনী। স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গে যাবে ঠিক সীতার মত।

কিন্তু বাড়ির আর সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মেয়ের দল ধমকালো সারদাসুন্দরীকে। 'বউকে ঘেরখানার মধ্যে বন্ধ করে রাখো। নইলে জাত-কুল সব যাবে।'

সে কথা কানে নিলেন না মা। কিন্তু গৃহস্বামী

হরিমোহনের আদেশ আরো দুর্দান্ত। ফটকের দরজায় তালা লাগিয়ে দাও। সর্বক্ষণ মোতায়েন রাখো দারোয়ান।

স্ত্রীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল কেশব। বললে, হয় আমার সঙ্গে চলো, নয় পরিবারের গুরুজনদের সঙ্গে থাকো। এই শুভমুহূর্ত—দ্বিধা করবার দেরি করবার সময় নেই।'

পঞ্চদশী কিশোরী বধূ স্বামীর সহগামিনী হল।

পরিচিত প্রাচীন চাকর, সেও পর্যন্ত শাসন করে উঠল: 'আরে, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে তুমি কোথা যাও?'

বন্ধ ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। স্ত্রীকে পাশে পেয়ে কেশবের শক্তি দ্বিগুণ দুর্জয় হয়ে উঠল। রূঢ় ধমক দিল দারোয়ানকে: 'খোলো দরজা।' সম্মূঢ়ের মত দরজা খুলে দিল দারোয়ান।

বাড়ির কাছেই পালকির আড্ডা। একটা পালকি ভাড়া করে স্ত্রীকে বসিয়ে দিলে। নিজে চলল পায়ে হেঁটে।

শুধু বন্ধনমোচনেই নয় যোগসাধনের সহধর্মিনী। নৈনিতালের নির্জন পর্বতে সস্ত্রীক শিলাসনে বসে ধ্যান করছে কেশব। কেশবের পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, আর স্ত্রীর পরনে গৈরিক। মহাদেবের পাশে অর্পণা।

উৎসবগৃহে বিচিত্র আমিষ-ভোজ্যের আয়োজন হয়েছে। অশাস্ত্রীয় মাংস। কেশব ইংরিজি শিখে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে, আহারব্যাপারে নিশ্চয়ই তার কুসংস্কার নেই। কিন্তু যে আমিষবস্তুই কাছে আনে কেশব বলে, খাই না। ক্ষুব্ধ হলেন দেবেন ঠাকুর। কিন্তু উপায় কি! বাড়ির ভিতর রুগীর জন্যে তৈরী কিছু নিরামিষ রান্না ছিল তাই দেওয়া হল কেশবকে। তাতেই কেশবের অখণ্ড তৃপ্তি।

তার তো আহার নয়, তার আহুতি। সে যে কর্মজ্ঞানমার্গ থেকে চলে আসবে ভক্তিমার্গে। সে তো শুধু ভাঙবার জন্যে নয় বাঁধবার জন্যে নয়, কাঁদবার জন্যে।

ব্রাহ্মসমাজে খোল করতাল ঢোকাল কেশব। নিন্দা কুৎসা উপহাস করতে লাগল সকলে। কিন্তু স্বদেশের ধর্মপ্রকৃতির নিগূঢ় মর্মটি ঠিক বুঝতে পেরেছে কেশব। হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে হবে, ভক্তিকে প্রগাঢ় করতে হবে ভালোবাসায়। ছাড়তে যেমন বিদ্রোহী ধরতেও তেমনি। কীর্তনরসে কঠোর ব্রাহ্মধর্মকে রসসিক্তিত করলেন। আগে ছিলেন যীশুখৃষ্ট এখন "প্রেমত্ত মাতঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ।"

হেসেছে কেঁদেছে নেচেছে! জগজ্জনকে মাতিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরনেশায় বিভোর করেছে!

হায় হায় সে-কেশবের এই দশা! কোথায় সেই কনককান্তি, সেই বিদ্যুৎ-উন্মেষ-দৃষ্টি! সেই বাগবজ্রে বংশীধ্বনি!

দল—দলই ওকে দ'লে দিয়েছে। লাট করে ফেলেছে।

ভগবানে যোগ করতে গিয়ে ও দলের সঙ্গে যোগ দিলে! ওরে যোগ মানে সমষ্টিকরণ নয়, ইষ্টিকরণ। যোগাড় করা বা জোগান দেওয়া নয়, শুধু ভগবানে মনোযোগ।

'ওরে, আমি উলুবনে মুক্তো ছড়াই না।' নব্য-বাঙলার মাতব্বর ছোকরাদের বলছেন ঠাকুর: 'কালে সব বুঝতে পারবি। ওই যে কথায় আছে না—যাঁরে ধ্যানে না পায় মুনি, তাকে ঝাঁটায় ঝেঁটোয় নন্দরাণী। তো শালারা আমাকে লাট করে ফেললি। আমাকে সেই এক বুঝেছিল কেশব সেন।'

কেশব সেন বলেছিল বলরামকে, 'তোমরা বুঝতে পারছ না উনি কে। তাই অত ঘাঁটাঘাঁটি করছ। ওঁকে মখমলে মুড়ে ভালো একটি গেলাসকেসের মধ্যে রাখবে, দু চারটি ফুল দেবে, আর দূর হতে প্রণাম করবে—'

তাতে আবার একজন রাগ করল। ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললে, 'আমরা তো আর কেশববাবু নই যে তাঁর মত আপনাকে দেখব। না হয় কাল থেকে আপনাকে আর বিরক্ত করতে আসব না।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'বা গো সখী! ঠোঁটের আগায় রাগটুকুও আছে।'

কেশব দেয়াল ধরে-ধরে টলতে-টলতে আসছে। দাঁড়াতে পারছে না।

কখন ইতিমধ্যে কৌচ ছেড়ে নিচে নেমে বসেছেন ঠাকুর। কেশবও তাঁর পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে।

ঠাকুরের ভাবাবস্থা। মার সঙ্গে কি কথা কইছেন আপন মনে।

'আমি এসেছি। আমি এসেছি।' চেঁচিয়ে বলতে লাগল কেশব। ঠাকুরের বাঁ হাতখানি তুলে নিল নিজের হাতে। হাত বুলুতে লাগল।

ঠাকুর তখন মাতোয়ারা। বলছেন ভাবারূঢ় হয়ে : 'যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এই সব। পূর্ণজ্ঞান হলেই এক চৈতন্য। ভাবসমুদ্র উথলালেই ডাঙায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসতে হত, এক রাজ্যের পথ। বন্যে এলে একাকার। তখন সোজা নৌকো চালিয়ে দিলেই হল।'

চোখ চাইলেন ঠাকুর।

বললেন, 'তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রির শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কলকাতায় এলে ডাব-চিনি দিয়েছিলুম সিদ্ধেশ্বরীকে। মার কাছে মেনেছিলুম, যাতে অসুখ সেরে যায়।'

কিন্তু এবার, এবার কি মানেন নি? [ক্রমশঃ।

ফরাক্কার বাঁধ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ফরাক্কার এই বন্ধন দৃঢ় করো,
ভক্তি-বাঁধনে মুক্তির পথ গড়ো।
বহুক প্রবাহ, ভগীরথ-আনা খাতে,
লয়ে প্রাচুর্য্য পবিত্রতার সাথে।
গোমুখীর সনে সুগভীর সংযোগ—
করে দাও—যাবে পাপ-তাপ রোগ-শোক;

দ্রবময়ী দয়া, সলিল পুণ্যশ্লোক,
অগাধ অবাধ অবিচ্ছিন্ন হোক।
মাঝিরা বৃহৎ পণ্যের তরী বাহি,
বারো মাস যাক পুনঃ সারী-গীতি গাহি।
নীরে অবগাহি, চরণেতে করি নতি,
প্রসন্ন হোন আমাদের ভাগীরথী।
হও মা গঙ্গা-মাটির বাঙলা তুমি,
এবার আবার সোনার বঙ্গভূমি।

শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর পত্র

মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে লেখা পত্র

শ্রীরাম

Postal date—21st April, 1897

৫ই বৈশাখ

মা নিকুঞ্জ

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আর তোমার অদ্যাবধিও অসুখ সারে নাই শুনে বড় দুঃখীত আছি। অতএব যাহাতে অসুখ সারে তাহার চেষ্টায় থাকিবে। আর মা তুমি অসুখ থাকিতে আগুনের কাছে যাইও নাই। কারণ সারিতে পারিবে না। আর তোমার এখানে আসিবার কথা শুনিলাম। কিন্তু মা এ সময় বড় গরম কিছু সুস্থ হও তাহার পর আসিবে।

তোমার মাতা
সারদা

মাষ্টার মহাশয় আপনি বধূমাতাকে বেশ করে চিকিৎসাদি করাইবে। এবং বৌমাকে ঔষধাদি খাইতে কহিবেন। ইতি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ভাল আছি।

মাষ্টার মহাশয়কে লিখিত পত্র

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

Postal date—17th Jan, 1890

৪ঠা মাঘ

চিরঞ্জীবেষু,

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ বিশেষ পরে—তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমার বর্ত্তমান মাসে যাইবার কথা ছিল বোধ হয় যাওয়া ঘটিল নাই। কারণ এই সময় জমি বিক্রির সময় ও প্রজাবিলির সময়। আর অন্য মাসে হইলে—আর হইবে নাই—এ জন্য যাওয়া হইল নাই। আমার শরীর বড় ভাল নাই। মধ্যে মধ্যে একটু একটু মাথা ধরে, তাহাতে স্নান আহার চলে। তুমি কেমন আছ তাহা লিখিবে আর আমার জন্য চিন্তা করিবে নাই। বলরাম বাবু কেমন আছেন তাহার সংবাদ লিখিবে। যোগেন বাবুর পত্র পাইয়াছি শুনিলাম শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন। আর ৫৲ টাকা পাইয়াছি।

আশীর্ব্বাদিকা
মা

ভাই নটী

তুমি আর এক ক্লাসে উঠিয়াছ শুনিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আর তুমি কেমন আছ তাহা তুমি নিজে লিখিবে। লক্ষ্মী এখানে নাই। কায়িক মঙ্গল ইতি

শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

Postal date—27 Dec, 1890

১১ই পৌষ

চিরঞ্জীবেষু,

পরম শুভাশীর্ব্বাদ

আপনার কয়েকখানি পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। আর আপনাকে পত্র লিখা হয় নাই—তাহার কারণ ঠিকানা জানি না। আপনার ঠিকানা পাওয়াতে এই পত্র লিখিলাম। আপনি যে রেজেষ্টরী করিয়া যে ১০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাইয়াছি জানিবেন। আমি তোমাদের গুরুদেবের কাছে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। ভগবানকে ডাকিতে হইলে মাথার ঠিক রাখিতে হয়। সাংসারিক মায়িক সম্বন্ধের যা ঈশ্বরের জীব বলিয়া মনে করিতে হয়। তাহাদিগকেও ঈশ্বরই তো পাঠাইয়াছেন। আর তিনি বলিয়াছিলেন যে আমার কাছে যে আসে সে কখনও পাগল হয় নাই। যাতে তোমার মনের শান্তি হয় আমি সদা সর্ব্বদা শ্রীশ্রীগুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করিতেছি। আর বধূমাতার আসিবার কথা ছিল কিন্তু তোমাদের যখন সুবিধা হইবে তখন পাঠাইয়া দিবেন। এখানকার কায়িক মঙ্গল তথাকার কুশলাদি লিখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মা

ওঁ রাম

Postal date—5th April, 1897

২৩শে চৈত্র

চিরঞ্জীবেষু,

পরে বাবাজীবন তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আর আমার পায়ের ঘা সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে,

তাহার জন্ত কোন চিন্তা করিবে না। আর অভয় এতদিন এখানে ছিল নাই সেই কারণ পত্র দিতে দেরী হইল। আর এখন বাড়ী ভাড়া করিবার দরকার নাই। আর এখন আমি কাঁচা জলে স্নান করিতেছি, এতদিন গরম জলে স্নান করিতেছিলাম। আর অভয়ের মুখে শুনিলাম যে বৌমার অসুখ হইয়াছিল, এখন শারিরীক কিরূপ আছেন লিখিবে। আর এতদিন আমি কামারপুকুরে যাই নাই, অসুখে ব্যাস্ত ছিলাম, ইহার পর তথায় যাইব। এরূপ মানস আছে। আর মধ্যে মধ্যে আপনার চাকর দ্বারায় প্রসন্নর খপর লইবেন কারণ সে একাকী আছে। আর সারদার ফোড়ার কথা শুনে বড় কষ্ট হইলাম। কারণ বড় যাতনা। আর শশী ডাক্তার যে ঔষধ দিয়াছেন তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে আরাম হইয়াছে। আর যোগেনকে ইহার সমাচার দিবেন। উপস্থিত কুশল।

তোমার মাতা

৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে লেখা সুধী ব্যক্তিগণের চিঠি

স্বামী জীবানন্দের চিঠি

ওঁ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ,
বেলুড়
১২ই জুন, '২০।

শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়,

আমার শ্রদ্ধাসহকৃত ভালবাসাদি জানিবেন। এই পত্রবাহক স্বামী প্রণবানন্দ আমাদের বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী। ইনি ইহার আত্মীয় একটি দরিদ্র যুবকের কলিকাতায় পড়াশুনা করিবার সুবিধার জন্ত সাহায্য চান। ইহার নিকট সবিশেষ শুনিয়া যদি আপনি ঐ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারেন, তবে বিশেষ সুখী হইব। আশা করি, আপনি ভাল আছেন। ইতি

ভবদীয় জীবানন্দ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চিঠি

ইং ৫।১।২৭

আমি তো নিখিল ভারতীয় কায়স্থ সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি। আমাকে এখন বাংলার কায়স্থদের সম্বন্ধে কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে আপনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। নইলে আমি নাচার।

বিনীত
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

ইং ১১।৬।২৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আরও কিছু খবর দরকার হইয়াছে। টি বিউটোরী ষ্টেটসএ লোক সংখ্যা কত? আর উড়িষ্যায় ব্রিটিশ টেরিটোরীতেই বা লোক কত? বাংলার কত উড়িয়া অধিবাসী আছে? অর্থাৎ যাহারা এখানে আসিয়া কুলী, মজুরী, বামুন ও বেহারা ইত্যাদির কাজ করে?

পি. সি. রায়

বীরভূমের ৺শিবরতন মিত্রকে লেখা বিভিন্ন সাহিত্যিকের চিঠি

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের চিঠি

"সঙ্কল্প" কার্য্যালয়।
৬৬ নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ৩রা ভাদ্র, ১৩২১

প্রিয় শিবরতন বাবু,

আপনার পত্র পাইয়া উত্তর স্বয়ং দিতে পারি নাই বলিয়া বড়ই দুঃখিত। আমি শয্যাগত ছিলাম। মাত্র কয়দিন উঠিয়াছি। আপনি যে দয়া করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবেন তাহাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আপনার নামে "সঙ্কল্প" পাঠাইলাম। যাহা কর্ত্তব্য করিবেন। আশা করি ভাল আছেন। কলিকাতায় কবে আসিবেন? ইতি

ভবদীয়
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

জলধর সেনের চিঠি

রোজ ব্যাঙ্ক, দার্জিলিং
১১ই জুন

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার শুভ-কামনাপূর্ণ পত্র পাইলাম। এ সম্মান আমাকে করা হয় নাই; আমার ন্যায় সামান্ত ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা সাহিত্যকে সম্মানিত করিয়াছেন; সুতরাং এ সম্মানের অধিকারী আপনারাই। এই ভাবে সম্মানটা গ্রহণ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। আপনার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। নিবেদন ইতি

শুভমুগ্ধ
শ্রীজলধর সেন

নগেন্দ্রনাথ বসুর চিঠি

দি বিশ্বকোষ অফিস ৮।১, বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা ১।৭।৩৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রানুসারে বিশ্বকোষের ২২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাঠান হইয়াছে পাইয়া থাকিবেন। বিশ্বকোষের প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প্রথম ভাগের মুখপত্রের পরপৃষ্ঠায় বিশেষ বিশেষ শব্দ ও তাহার লেখকগণের তালিকা প্রকাশিত হইবে। যিনি যে শব্দ লিখিতেছেন তাহার তালিকা আমার পুত্রের নিকট ছিল। তাহার অকাল মৃত্যুতে সেই তালিকা খুঁজিয়া পাইতেছি না। একারণ আপনাকে অনুরোধ করিতেছি আপনি যে ২ ব্যক্তির জীবনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন অবিলম্বে সেই ২ শব্দের তালিকা পাঠাইয়া কৃতার্থ করিবেন। বহুদিন আপনার লেখা পাওয়া যায় নাই। অদ্বৈতাচার্য্য পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। তাহার পরের শব্দ যাহা সত্বর পাঠান উচিত মনে করেন পাঠাইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন।

ভবদীয়
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

শান্তিনিকেতন
২২।৭।১৯৩৪

সবিনয় নিবেদন—

আপনার চিঠির মধ্যে একটি পুস্তকের পরিচয় পাইয়া বাধিত হইলাম। পুস্তকখানি আমাদের আফিসে পৌছিয়া থাকিলে পরিচয়ও ছাপা হইতে পারিবে।

বিনীত নিবেদক
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

দীনেশ সেনের চিঠি

শ্রীহরি

১৭নং, শ্যামপুকুর লেন, কলিকাতা।
২০শে এপ্রিল, ১৯০৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম, আমি কিছুদিন হইতে চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাইতেছি, এজন্য অনেক সময়ই পত্রাদির উত্তর যথাসময়ে দিতে পারি না। মহাশয়ের পূর্ব্ব পত্রের উত্তর না দেওয়ার অপরাধ অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

সাহিত্যই আমার একমাত্র উপজীবিকা। সুতরাং মহাশয়ের পত্রিকায় পারিশ্রমিক পাইয়া লিখিতে আমার কোন আপত্তির কারণ নাই। তবে নূতন পত্রিকায় লিখিয়া কোন কোন স্থলে প্রতিশ্রুতি সত্বেও পারিশ্রমিক পাই নাই এবং ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া গোলযোগ করাও উচিত মনে করি নাই। বিশেষ আমার প্রবন্ধাদিও বেশী মজুত থাকে না, যাহা লিখি তাহাই বঙ্গদর্শন, ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি আমার দীর্ঘকাল পরিচিত পত্রিকার সম্পাদকগণ আমার নিকট হইতে লইয়া যান। আমার শরীর অপটু হওয়ার দরুণ অবস্থার সচ্ছলতা কিছু মাত্র নাই, সুতরাং অনেক সময়ই পারিশ্রমিক প্রবন্ধ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া থাকি। "অশোক বনে সীতা" নামক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আমার লিখিত আছে, তাহা অন্যত্র যেখানে দিব তাহাতেই ১০৲ টাকা পাইব—তদ্ভিন্নে আমি কোন রচনা পত্রিকাতে দিতে প্রস্তুত নহি,—অনেক সময়ই ১৫৲ টাকায় আমার প্রবন্ধ সম্পাদকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি অনুগ্রহ করিয়া ১০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন, তবে যে তারিখে লোক পাঠাইবেন তাহার অন্তত দুই দিন পূর্ব্বে আমাকে একখানি পোষ্ট কার্ড লিখিয়া জানাইবেন, আমি প্রবন্ধটি fair করিয়া রাখিব।

ঠিক বৈষয়িক ভাবে শুষ্ক ভাষায় পত্রখানি লিখিলাম, এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি অন্যত্র যে সুবিধা সর্ব্বদা পাইয়া থাকি, আপনার পত্রিকায় লিখিতে যাইয়া সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হওয়া আমার পক্ষে অভিলষনীয় নহে, এই জন্যই এ ভাবে পত্র লিখিলাম। আপনার পত্রিকার যেরূপ ঘোষণা দেখিতেছি, তাহাতে ইহা যে অচিরে বঙ্গীয় মাসিক সমাজের একটি শিরোরত্ন হইবে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বিনীত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

রাজকৃষ্ণ রায়ের চিঠি

পরম মাননীয় আদর্শচরিত্র
শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর
মহোদয় ধার্ম্মিকবরেষু।

রাজোচিত সম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন—

রাজন্!

আপনার নিকট স্বপ্নেরও অতীত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। সে অনুগ্রহ কি? না আপনি বঙ্গভূমির অন্যতম বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজা হইয়াও কলিকাতায় অবস্থানকালে কতবার অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট স্বয়ং আসিয়া আমাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও অকপট উৎসাহ দান করিয়াছেন। আমি চির-দরিদ্র সাহিত্য-জীবী, আপনি চিরৈশ্বর্য্যের অধিকারী। আমি সাহায্যপ্রার্থী, আপনি সাহায্য-দাতা, আমি দীনগ্রন্থকার, আপনি ধনীগ্রন্থকার। কোথায় আমি আপনার নিকট স্বয়ং গিয়া আপনার দর্শনলাভ করিব, না কোথায় আপনি এই দরিদ্রের কুটীরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আমাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছেন। এ আমার পক্ষে নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। দারিদ্রের চিরসহচর কবিগণের প্রতিনিধির চিরসহচর ধনিগণের এরূপ অকপট সহানুভূতি না থাকিলে দরিদ্র কবি উৎসাহ পায় কৈ? আপনি এ বিষয়ে আদর্শ। এইজন্য আমি হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমার এই তৃতীয়ভাগ গ্রন্থাবলী আপনার সুপ্রসিদ্ধ নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

কলিকাতা, আপনার চিরানুগৃহীত ও বিনয়াবনত
৩২শে শ্রাবণ, ১২৯৫। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

পরম প্রেমাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
মহাশয় মদনুকূলবরেষু।

প্রিয় মিত্র!

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার উপায়ন-স্বরূপ পদ্মিনী-উপাখ্যান এক সদাশয়ের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এইক্ষণে প্রণয়-ঋণের কুসীদ-বৃদ্ধি-স্বরূপে কর্ম্মদেবীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিলাম; আপনি সাধু উত্তমর্ণ; সুতরাং অবশ্যই প্রসন্নচিত্তে এই কুসীদবৃদ্ধি স্বীকার করিবেন, এমত ভরসা হইতেছে।

দাযুবহুদা ভবদেকপ্রণয়ানুরাগী
৩০শে আষাঢ়, ১২৬১ বঙ্গাব্দ। শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্রনাথ বসুর চিঠি

পরম পূজনীয় ৺কালীনাথ বসু পিতামহ মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু।

দাদা মহাশয়, আপনার শ্রীচরণ দর্শন আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। আপনার স্বর্গারোহণের পর আমার জন্ম হয়। কিন্তু আপনার অপূর্ব্ব ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা আমি শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি। আপনার কনিষ্ঠ পুত্র আমার ৺পিতাঠাকুর মহাশয়ের মুখেও শুনিয়াছি। অতএব আশা হয় যে, এই গ্রন্থখানি আপনার প্রীতিকর হইতে পারে। ইতি—

সেবক
শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

হিন্দু মেলা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মেলা ভারতবর্ষে বহু দিনের প্রচলিত প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর পর্ব্বাদি উপলক্ষ করিয়া কোন কোন স্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হইত এবং সেই মেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সার্থকতা অসাধারণ ছিল; কারণ, সে সকলে নানা স্থানের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হইত এবং নানা স্থানের লোকের সমাগমে সামাজিক নানা বিষয়ের আলোচনা ও মতের আদান-প্রদান হইত—এক স্থানের পণ্য অন্য স্থানে প্রচলিত হইত, এক স্থানের আচার-ব্যবহারে পরিবর্তনাদি অন্য স্থানে প্রচারিত হইত। আবার কতকগুলি বিশেষ বিরাট মেলা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে কয় বৎসরের পরে পরে হইত। যথা কুম্ভমেলা (পূর্ণ ও অর্দ্ধকুম্ভ) কোন বৎসর হরিদ্বারে, কোন বৎসর প্রয়াগে (এলাহাবাদে), কোন বৎসর নাসিকে—নির্দ্দিষ্ট নিয়মে হইয়া আসিতেছে। আর একটি বৃহৎ মেলার উপলক্ষ—অর্দ্ধোদয় যোগ। তাহা বহু বৎসর অন্তর হয়। এই সকল বৃহৎ মেলায় বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত—এখনও হয়; এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানা আলোচনা সে সকলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু দেশের বর্ত্তমান কালোপযোগী—সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণকল্পে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মেলা—হিন্দু মেলা; প্রতি চৈত্র মাসের শেষ ভাগে হইত। তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠা—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সিপাহী বিপ্লবের দশ বৎসর পরে।

পলাসীর যুদ্ধে যে রাজনীতিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহার ফলে এ দেশে মুসলমান শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের আরম্ভ। যখন এক শাসনের পতন ও অপরের উত্থান হয়, তখন দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া দেশে অপেক্ষাকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতে বাঙ্গালায় প্রতিভা-পুনঃপ্রদীপ্তি লক্ষিত হয়। চৈতন্যের সময়ে যে মানসিক উদ্দীপ্তি হইয়াছিল, তাহার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল?" ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে যে উদ্দীপ্তি হইয়াছিল—যাঁহারা তাহাতে মশাল ধরিয়া আলোক বিতরণ করিয়াছিলেন—রামমোহন রায় তাঁহাদিগের অন্যতম, কিন্তু তিনি একক নহেন। সেই উদ্দীপ্তির ফলে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার আদর আর ইংরেজ শাসনে দেশের লোকের দুর্দ্দশার অনুভূতি। সেই সময় যখন ইংরেজ সরকার বাঙ্গালার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, তখন ছয় জন বাঙ্গালী তাহার প্রতিবাদে ইংরেজের আদালতে আবেদন করিয়া বিফলকাম হইয়াছিলেন। সে ছয় জন—

চন্দ্রকুমার ঠাকুর
দ্বারকানাথ ঠাকুর
রামমোহন রায়

হরচন্দ্র ঘোষ
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

সে ঘটনার সময় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ। রামমোহন ইংলণ্ডে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তথায় জর্জ্জ টমসন নামক এক জন ইংরেজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দ্বারকানাথের আগ্রহাতিশয্যে টমসন কলিকাতায় আসিলে (১৮১২ খৃষ্টাব্দ) যে সকল বাঙ্গালী তরুণ তাঁহার নিকট ইংরেজী ভাবে রাজনীতির আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন—তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন—রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি। তাঁহাদিগের রাজনীতিক মত যে ইংরেজদিগের প্রীতিপদ ছিল না, তাহার প্রমাণ—হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডশন, তাঁহাদিগের বক্তৃতা বন্ধ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, তিনি কলেজকে রাজদ্রোহের কেন্দ্র হইতে দিবেন না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিপ্লব—আগ্নেয়গিরির অতর্কিত অগ্ন্যুদ্গমের মত দেখা দেয়। ইংরেজ পরোপকার করিতে ভারতে আইসে নাই—স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসিয়াছিল এবং সেজন্য সবই করিতে প্রস্তুত ছিল। ক্লাইবের জাল দলিলে এ দেশে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। ইংরেজ সিপাহী বিদ্রোহ দমনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে জাতীয় ভাবের উদ্ভব অসম্ভব করিবার প্রয়াস করিয়াছিল। ফলে কিছু দিনের জন্য প্রকাশ্য ভাবে রাজনীতিচর্চ্চা বন্ধ হইয়া যায়। অথচ ভারতবাসী—বিশেষ বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন উপলব্ধি করিয়াছে—দেশের রাজনীতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ব্যতীত জাতির অন্য সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

সেই জন্য ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "হিন্দু মেলা" প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার প্রধান সহায়—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের নানা কার্য্যের মধ্যে দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার কার্য্য তাহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ও কর্ম্মজীবনের সহচর রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—

"কুমারী মেরী কার্পেণ্টার যখন কলিকাতায় আসেন, তখন দেবেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে অভিলাষের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার জমীদারির নিকটস্থ কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্র বাবু স্বভাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের

রাজনারায়ণ বসু
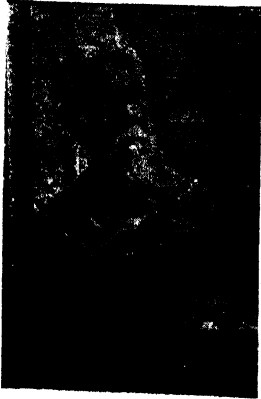
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মতানুমোদন করিয়া চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজদিগের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য আদবে ব্যগ্র নহেন।"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কোন কুটুম্ব ইংরেজীতে পত্র লিখিলে দেবেন্দ্রনাথ তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

সে সময়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে জাতীয় ভাবের বিস্তার সাধিত হইতেছিল, তাহা সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন কালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়াছিল, তাহা অল্প দিনের মধ্যেই ব্যস্তিতবেগ হইয়া আসিয়াছিল এবং জাতির প্রচলিত সংস্কার মাত্রই যে কুসংস্কার নহে—সে সকল যে সমাজের প্রয়োজনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং হয়ত প্রয়োজন শেষ হয় নাই, এমন বিশ্বাসও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে হইতেছিল। সেই জন্যই তাঁহাদিগের কেহ কেহ দেশের পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতির মধ্যে সার সত্যের সন্ধান করিতেছিলেন। ফলে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিপ্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা—এই পরিবর্ত্তিত মনোভাবের পরিচায়ক।

সভার প্রথম বৎসর শেষ হইলে যে কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হয় (চৈত্র-সংক্রান্তি শনিবার, ১৭৮১ শক) তাহার আরম্ভ এইরূপ:—

"গত বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই মেলা প্রথম সংস্থাপিত হয়, দেশীয় লোকমধ্যে সদ্ভাব স্থাপন এবং দেশীয় লোক দ্বারা স্বদেশীয় সংকার্য্য সাধন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই বৎসরের মেলার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য কলিকাতাস্থ ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যায় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়।

"১৭৮১ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সম্পাদন করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি এই জাতীয় মেলার উৎসাহ কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত হয় এবং অস্মদেশীয়দিগের মধ্যে সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের এই বিষয়ে একটি অটল উৎসাহ ও যত্ন স্থাপনের উপায় না করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইবার ব্যতিক্রম ঘটিবে। এই অভিপ্রায়ে আমাদিগের দেশীয় কতিপয় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্‌যোগী হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং স্বদেশের বিশেষ বিশেষ উন্নতিসাধক কর্ম্মসংসাধন জন্য বিশেষ বিশেষ মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া সাধারণ কার্য্যের প্রতি যত্ন করিবেন। যেরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"১। এই শ্রেণীভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা সমুদায় হিন্দু জাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্যসকল সংসাধন জন্য অভিভূক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করত এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

"২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কত দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্র-সংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

"৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

"৪। প্রতি জেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

"৫। প্রতি জেলার স্বদেশীয় সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইবে।

"৬। যাঁহারা মল্ল-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক ও সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোকমধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।

"এই সকল কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত টাকা সংগৃহীত হইতেছে। যাঁহারা এই সকল কার্য্যকে স্বদেশের হিতকর বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা অর্থসাহায্য করিয়া আমাদিগকে যথোচিত সাহায্য করিলে বাধিত হইব।"

উদ্ধৃত অংশে যে ভাবের পূর্ণ পরিচয় প্রকট হইয়াছে, তাহাই আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় পাই:—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসী জনে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

মেলার এই অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। তাঁহার বিবৃতি হইতে কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:—

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা, এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাই। এক দিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরি জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়-সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে—ইহা ভারত-ভূমির জন্য।

"ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা সেই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি। ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি, এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।

"এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমাদের স্বদেশীয় কতিপয় ভদ্র মান্য ব্যক্তি এই মেলার কোন না কোন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। একতানিবন্ধন, স্বদেশানুরাগবর্দ্ধন ও স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দ্দেশ জন্য মণ্ডলীসকল সংস্থাপিত হইয়াছে; কেহ কেহ দেশের প্রকৃত উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন, কেহ কেহ যাহাতে ভারতের যুবক-যুবতী বিদ্যাভূষণে ভূষিত হয় তাহার জন্য যত্নশীল হইয়া সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন;

শিবনাথ শাস্ত্রী
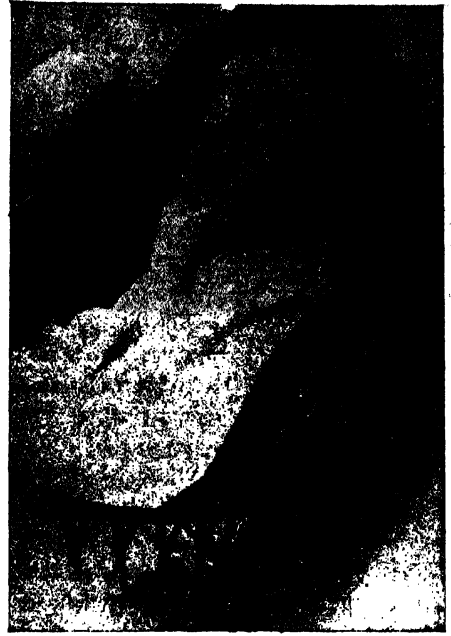
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যা এবং জ্ঞান আমরা যেখান হইতে পাই তাহা লইতে কুণ্ঠিত হইব না; কেহ কেহ এই বিদ্যার ফল-স্বরূপ শিল্পজাত নানাবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকগণের তৎ তৎ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহার প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কেহ কেহ হৃদয়ের প্রকৃত স্বর যে সংগীত—সেই সংগীত-বিদ্যার উন্নতি সাধনে ঐকান্তিক যত্ন করিতেছেন, কেহ কেহ বা আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা বিমোচন জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, কেহ কেহ বা এই মেলার জন্য সংগৃহীত অর্থ যাহাতে এই মেলারি নিমিত্ত ব্যয় হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন। যখন আমাদের সকলেরি এরূপ যত্ন, তখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে এই কর্ম্ম এই উদ্দেশ্য সফল হইবেই হইবে, কিন্তু নিরুৎসাহের কর্ম্ম নহে এবং সেই উৎসাহের জন্যই সিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।"

এই মেলার উদ্দেশ্য-বিবৃতির সহিত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-বিবৃতির তুলনা করিলে মেলার উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে তাহার উদ্দেশ্য ছিল:—

(১) ভারত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে দেশের কর্ম্মীদিগের মধ্যে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব সংস্থাপন।

(২) প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার দ্বারা দেশ-প্রেমিকদিগের মধ্যে জাতিগত, ধর্ম্মগত বা প্রাদেশিক বৈষম্যভাব দূরীকরণ এবং প্রিয় শাসক লর্ড রিপনের শাসনকালে যে জাতীয় ঐক্যের ভাব উদ্ভূত হইয়াছে তাহার সংরক্ষণ ও বর্দ্ধন।

(৩) ভারতের বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে যেগুলি

গুরুত্বসম্পন্ন সেগুলি সম্বন্ধে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আলোচনালব্ধ মত প্রদান।

(৪) পরবর্ত্তী বৎসরে ভারতীয় রাজনীতিকগণ দেশের লোকের কল্যাণ জন্য কি কাজ করিবেন তাহা নির্দ্ধারণ।

সুতরাং মেলার উদ্দেশ্য যে অধিক ব্যাপক ও গুরুত্বসম্পন্ন তাহাতে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। বিশেষ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-বিবৃতিতে স্বাবলম্বনের ও দেশের আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণের কোনরূপ উল্লেখ নাই। কংগ্রেস বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত বিদেশীর দ্বারা পরিকল্পিত এবং তাহার প্রথম অধিবেশনের শেষে যে ভাবে বিদেশী সম্রাজ্ঞীর জয়ধ্বনি সোৎসাহে করা হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে আজ লজ্জানুভব করিতে হয়। কার্য্যশেষে হিউম বলেন—তিনি প্রস্তাব করেন—

"The giving of cheers, and that not only three, but three times three, and if possible thrice that, for one the latchet of whose shoes he was unworthy to loose, one to whom they were all dear, to whom they were all as children—need he say Her Most Gracious Majesty, the Queen-Empress"—ইত্যাদি। হিউমের এই জয়ধ্বনিতে উপস্থিত ভারতীয়গণ সাগ্রহে ও আনন্দে যোগদান করিয়া যে দাস-মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাতৃগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা কালে দেশে ইংরেজ শাসনের শোষণের ফল অনুভূত হইতেছিল, কিন্তু কংগ্রেসের উদ্দেশ্য-বিবৃতিতে তাহার প্রতীকারের কোন কথা ছিল না।

বিদেশী পণ্যের প্রতি ভারতবাসীর অস্বাভাবিক অনুরাগের নিন্দা করিয়া বাঙ্গালী ভোলানাথ চন্দ্র যখন বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের সমর্থন করিয়াছিলেন, তখনও "বয়কট" কথার সৃষ্টি হয় নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

দৈহিক বল প্রয়োগ না করিয়া, রাজশক্তির বিরোধিতা না করিয়া, (বিদেশী রাজার) আইনের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া ভারতের প্রণষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের দ্বারা সম্ভব। আমরা ইংলণ্ডের পণ্য ব্যবহার করিব না—এই সঙ্কল্প করিতে পারি—"Let us make use of this potent weapon (moral hostility) by resolving to non-consume the goods of England."

মনোমোহন বসুর যে গান—

"দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন
অন্নাভাবে শীর্ণ　　চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ
অপমানে তনু ক্ষীণ"

পরে দেশে সুপরিচিত হয়, তাহার প্রথম বিকাশ হিন্দু মেলার এক পরবর্ত্তী অধিবেশনে (১২৮০ বঙ্গাব্দে) হইয়াছিল।

মেলায় দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনের সঙ্কল্প ঘোষিতও হইয়াছিল। দেশে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা-বিস্তারের কোন কথা কংগ্রেসে ছিল না; অথচ অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীকরণ ব্যতীত দেশের জনগণের উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। মেলার অনুষ্ঠাতারা সেজন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন।

কংগ্রেস সর্ব্বতোভাবে বিদেশী সরকারের মুখাপেক্ষী ছিলেন, মেলার প্রতিষ্ঠাতৃগণ সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, সকল কাজে রাজপুরুষদিগের সাহায্য প্রার্থনা করা "লজ্জার বিষয়।" সেই জন্যই কংগ্রেস প্রবর্ত্তিত রাজনৈতিক আলোচনা রবীন্দ্রনাথ—

"নিবেদন আর আবেদনের থালা
বহে বহে নতশির"—

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগের চেষ্টাতেও কংগ্রেসের পক্ষে আবেদনের পথ বর্জ্জন করা সম্ভব হয় নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা "স্বদেশী আন্দোলন" নামে অভিহিত ও পরিচিত। তাহার প্রকাশ্য ও গোপন দুই রূপ ছিল। বিদেশী পণ্য বর্জ্জন, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন, প্রভৃতি তাহার অংশ। সে সকল সম্বন্ধে যে প্রস্তাব কংগ্রেস, বাধ্য হইয়া, কলিকাতার অধিবেশনে (১৯০৬ খৃষ্টাব্দ) বহুমতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সকল ক্ষুণ্ণ করার যে চেষ্টা কংগ্রেসে পুরাতন আন্দোলন-পদ্ধতির সমর্থকরা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দু মেলার নবগোপাল মিত্রের মত আর এক জনের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি—রাজনারায়ণ বসু।

হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য-বিবৃতিতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের উল্লেখ ছিল না বটে, কিন্তু স্বাধীনতার দিকে যে অনুষ্ঠাতৃগণের দৃষ্টি ছিল, তাহা দ্বিতীয় বৎসরের আরম্ভে মনোমোহন বসুর বক্তৃতায় সপ্রকাশ। মনোমোহন বাবু বলিয়াছিলেন :—

"স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দ বাজারে উপনীত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহতাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতিগৌরবরূপ তাহার নব-পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে "স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলন-সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্যস্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

উদ্‌ধৃত অংশে কৌশলে স্বাধীনতার উল্লেখ করা হইয়াছিল। স্বাবলম্বন যে স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত সাধন, তাহাও উহাতে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

সুতরাং মেলার উদ্দেশ্যের মধ্যে স্বাধীনতালাভ-চেষ্টার স্থান সহজেই লক্ষ্য করা যায়। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্য-বিবৃতিতে যে বলা হইয়াছিল—

(১) "আমাদের সকল কর্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি—ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয় ? কেন—আমরা কি মনুষ্য নহি ?"

(২) "স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি, এই ইহার (মেলার) প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।"

—বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোন সম্প্রদায় যখন মনে করে, যদি দেশ বিদেশীয়দিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে অপরে আক্রমণকারীদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে ; যদি দেশে অশান্তির উদ্ভব হয়, তবে অপরে তাহার প্রতীকার করিবে ; যদি দেশের লোকের কোন অভাব অনুভূত হয়, তবে অপরে তাহা দূর করিবে—তখন বুঝিতে হয়, সেই সম্প্রদায় অবনতির নিম্নতম স্তরে গমন করিয়াছে, জাতি হিসাবে মনুষ্যত্ববিবর্জ্জিত হইয়াছে। জাতির সেরূপ মনোভাব তাহার পঙ্গুত্বের লক্ষণ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজ দাদা (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাতে যোগদান করায় তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হ'ল। কলিকাতার প্রান্তবর্ত্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন-চারি দিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হ'ত। সেই মেলা উপলক্ষে মেজ দাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন, আর সেই মেলাই আমার 'ভারত সঙ্গীতের' জন্মদাতা—

'মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু কল্যাণকর কার্য্যের মূলে থাকিলেও স্বভাবতঃ বিনয়হেতু আত্মপ্রকাশ করিতে বিরত থাকিতেন। সেই জন্যই তিনি মেলার সূত্রপাত করিলেও স্বয়ং কখন পুরোবর্ত্তী হ'ন নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বোম্বাই প্রদেশে চাকরী করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মেলা সম্বন্ধে উৎসাহ যে গানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা দীর্ঘকাল—বাঙ্গালায় যেমন বাঙ্গালার বাহিরেও তেমনই—জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হইত। "স্বদেশী আন্দোলনের" সময় "বন্দে মাতরম্"—জাতীয় সঙ্গীতের আসন অধিকার করে।

মেলার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে যাঁহাদিগের রচিত দেশাত্মবোধদ্যোতক কবিতা পঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের নাম—

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিবনাথ শর্ম্মণ : (শাস্ত্রী)

রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, নবগোপাল মিত্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—তাঁহার (বসু মহাশয়ের) রচিত "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার" অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করায় হিন্দু মেলার ভাব প্রথম মিত্র মহাশয়ের মনে উদিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবু মেলার প্রথম অধিবেশন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"প্রথম যে বৎসর (১৮৬৭ সাল) হিন্দু মেলা হয়, আমি মস্তকের পীড়া জন্য মেদিনীপুর হইতে ছুটী লইয়া বোড়ালে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমি এবং আমার বোড়ালবাসী কতকগুলি বন্ধু একত্রিত হইয়া বঙ্গের পূর্ব্ব মহিমা বিষয়ে এক কবিতা রচনা করিয়া মেলায় পাঠার্থ প্রেরণ করি।"

এই কবিতার প্রতিলিপি রাজনারায়ণ বাবুর "আত্মচরিতে" প্রকাশিত হয়।

প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে যে সকল যুবক কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালাসাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—

(১) অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কবি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ে এটর্নী হইলেও কবিতাই তাঁহার আদর লাভ করিয়াছিল। তিনি 'উদাসিনী' রচনা করেন এবং তাঁহার 'ভারত-গাথা' নামক বালক-বালিকা-পাঠ্য কবিতায় লিখিত ভারতের ইতিহাস তাঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার পত্নী শরৎকুমারীও বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত।

(২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন।

(৩) শিবনাথ শাস্ত্রী সংস্কৃতে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

যশঃলাভ করেন এবং মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট বাঙ্গালা সাংবাদিকের ও সাহিত্যিকের কাজ শিখিয়া ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম হ'ন। ভারত সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত-প্রমুখ কয় জন বাঙ্গালী যখন বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত হ'ন, তখন সরকারের সেই কার্য্যের প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে যে সভা হয়, তাহাতে অনেক রাজনীতিক নেতা সভাপতিত্ব করিতে ভয় পাইলে শাস্ত্রী মহাশয় তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

"হিন্দু মেলা" সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"তখনকার কালে নবগোপাল ন্যাশনাল দলের দলপতি ছিলেন। তাঁরি নেতৃত্বে জাতীয় মেলা সফলতা লাভ করেছিল। দুঃখের বিষয়, সে উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হইল না, শীঘ্রই নিবে গেল।" আরম্ভের উৎসাহ স্থায়ী হয় না। নদী যখন প্রথম জলপ্রপাতরূপে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করে, তখন তাহার জলধারার বেগ অসাধারণ থাকে—তাহা ফেনপুঞ্জ সৃষ্টি করে—জলবিন্দু ছড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাহা যত অগ্রসর হয়, ততই তাহা গভীরতা লাভ করে এবং তাহার কল্যাণপ্রদ শক্তি চারিদিক স্নিগ্ধ ও সরস করে। তেমনই "হিন্দু মেলা" আমাদিগের রাজনীতিক জীবনে অসাধারণ ফল দিয়া গিয়াছে। তাহা অল্প দিনে বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "হিন্দু মেলার" অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহিত পরিচিত হ'ন। সে সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"স্মরণ হয়, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে 'নেশনাল মেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার বৎসরেক পূর্ব্বে আমার 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এক জন সদ্য-পরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে, একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণায় এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম, সেখানে সাদা টিলা ইজার-চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯ ; শান্ত, স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন,—'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র—রবীন্দ্রনাথ।' তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম, সেই রূপ, সেই পোষাক।..."

রবীন্দ্রনাথ ঐ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নবীন বাবুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"হিন্দু মেলায় যখন আপনাকে প্রথম দেখি, তখন আমি অখ্যাত, অজ্ঞাত এবং আকারে, আয়তনে ও বয়সে নিতান্তই ক্ষুদ্র..."

এই ঘটনা "হিন্দু মেলা" প্রতিষ্ঠার দশ বৎসর পরবর্ত্তী। তখনও মেলা বাঙ্গালী সংস্কৃতির অনুরাগী ব্যক্তিদিগের বার্ষিক মিলন-কেন্দ্র।

ইহার ৯ বৎসর পরে—ইলবার্ট বিল লইয়া যে আন্দোলন হয় তাহারই প্রত্যক্ষ ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ)। সাগর-মন্থনে যেমন বিষ ও সুধা উভয়ই উদ্ভূত হইয়াছিল, তেমনই সেই আন্দোলনে এক দিকে য়ুরোপীয়ে ভারতীয়ে বিদ্বেষ দেখা দেয়—আর এক দিকে দেশাত্মবোধের আরম্ভ দেখা দেয়। এক হিসাবে কংগ্রেস জাতীয় আত্মসম্মানে আঘাতের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু "হিন্দু মেলা" সেরূপ কোন অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জাতীয়তার অনুভূতি-ভিত্তির উপর "মেলা" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রভেদ যে অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

যখন লর্ড কার্জ্জনের প্রস্তাবানুসারে বাঙ্গালা বিভক্ত হইয়াছিল, তখন লালা লজপত রায় বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভারতে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করিয়াছে—তাহার গৌরব বাঙ্গালার প্রাপ্য। আর বঙ্গ-বিভাগজনিত বিক্ষোভের উল্লেখ করিয়া গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালা তুষ্ট না হইলে ভারতে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

এ দেশে মুসলমান শাসনের অবসানের পরে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে বাঙ্গালীরাই রাজনীতিক আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের কয় বৎসর মাত্র পরে বাঙ্গালা প্রথম সত্যাগ্রহ করিয়া এ দেশে নীলকর-দিগের অত্যাচারের ও অনাচারের অবসান ঘটাইয়াছিল।

আর তাহার মাত্র কয় বৎসর পরে বাঙ্গালায় "হিন্দু মেলা"র প্রতিষ্ঠা। মেলার উদ্দেশ্য-বিবৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায়—স্বাবলম্বী হইতে জাতিকে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বাবলম্বন ব্যতীত কোন পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না।

সুতরাং বলিতে হয়, "হিন্দু মেলাই" এ দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন। সে হিসাবে ভারতের যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা অশ্রুতে সিক্ত ও রক্তে রঞ্জিত—তাহার প্রবর্ত্তক—"হিন্দু মেলার" প্রতিষ্ঠাতৃগণ। সে সংগ্রামের প্রতিষ্ঠা-গৌরব তাঁহাদিগের ললাটে উজ্জ্বল টীকার মত শোভা পাইতেছে।

গণিত-বিদ্যায় প্রথম ভারতবর্ষ

বীজগণিতবিদ্যা প্রথমে ভারতবর্ষেই প্রবর্ত্তিত হয়। ডিয়োফেন্টস্ নামে একজন গ্রীক গণিতবেত্তা গ্রীস দেশে ঐ বিদ্যা প্রথম প্রচার করেন ; তিনি নিজ পুস্তকে ভারতবর্ষীয় বীজগণিত শাস্ত্রের বিষয় বারম্বার উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

শব—মৃতদেহ, মৃতশরীর, মরা।
শবদাহ—মরার পোড়ন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।
শবর—ম্লেচ্ছজাতি, কিরাত, চুয়াড়।
শবসাধন—শবারোহণ পূর্ব্বক তপস্যা।
শব্দ—ধ্বনি, নিনাদ, স্বর, বিশেষ্যপদ, রব।
শব্দকোষ—শব্দসংগ্রহ, অভিধান।
শব্দগ্রহ—শব্দজ্ঞান, শব্দবোধ, কর্ণ।
শব্দচোর—পদহর, কুকবি বিশেষ।
শব্দযোনি—শব্দাকর, শব্দের প্রকৃতি।
শব্দাতীত—বাক্যাগম্য, পরমেশ্বর।
শব্দার্থ—বাচ্য, অভিধেয়, অভিপ্রায়।
শব্দশাস্ত্র—ব্যাকরণাদি শাস্ত্র।
শম—বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, কামাদিনাশ।
শমতা—শান্তি, ধৈর্য্য, উপশম, প্রতীকার।
শমন—মনের ধীরতা, যজ্ঞার্থ পশুহনন।
শমী—শিম, শিম্বী, ছিমড়া, শুঁটী।
শম্বল—পাথেয়, পুঁজি।
শম্বুক—শামুক, শুক্তি, ঝিনুক, গুগলী।
শয়তান—দুষ্ট, প্রতারক, ভূতরাজ।
শয়ন—নিদ্রা যাওন, ঘুমন, নিদ্রা, তন্দ্রা।
শয়ালু—নিদ্রালু, ঘুমগড়্যা, তন্দ্রালু।
শয্যা—যাহাতে শয়ন করা হয়।
শর—তীর, বাণ, নল-বিশেষ।
শরট—কাকলাস, কৃকলাস, বহুরূপী।
শরণ—আশ্রয়, প্রতিপালক, রক্ষাকর্ত্তা।
শরণং—অবলম্বনীয়, আশ্রয়, রক্ষক।
শরণাগত—শরণাপন্ন, আশ্রিত।
শরণ্য—আশ্রয়, রক্ষাকরণে পারগ।
শরৎকাল—আশ্বিন কার্ত্তিক মাস।
শরব্য—লক্ষ্য, বাণের উদ্দেশ্য।
শরা—শরাব, মৃৎপাত্রবিশেষ।
শরাসন—বাণাসন, ধনুঃ, গাণ্ডীব, কার্ম্মুক।
শরীর—কায়, গাত্র, দেহ, প্রাণাধার।
শরীরজ—দেহজ, দেহোৎপন্ন, দেহজাত।
শরীরপতন—দেহপাত, দেহনাশ, মরণ।
শরীরী—দেহী, প্রাণী, প্রাপঞ্চিক, জীব।
শর্করা—চিনি, ভুরা, উথাড়, দলুয়া।
শর্করোদক—চিনির পানা, চিনির জল।
শর্ব্বরী—(রাত্রি দেখ)।
শর্ম্মা—ব্রাহ্মণ জাতির উপপদ।
শলভ—পতঙ্গ, পঙ্গপাল, ফড়িঙ্গ, ফড়িং।
শলা—শলাকা, শেল, তীর, বাণ, গোঁজ।
শলি—বিংশতি সের পরিমাণ।
শলিতা—পলিতা, বর্ত্তিকা, বাতী।
শল্ক—মাছের আঁইশ, ছাল, ত্বক্।
শল্য—শেল, বাণ, শাবল, হাড়, ক্লেশ।
শল্লকী—শজারু, পঞ্চনখী, শল্ল, কুন্দুরু।
শশ—শশক, শশারু, খরগোশ।
শশধর—(চাঁদ দেখ)।
শশবিষাণ—অতি অসম্ভব বিষয়।
শশিশেখর—মহাদেব, শিব, শম্ভু।
শষ্কুলি—কর্ণের কুহর, কর্ণের ছিদ্র।
শস্তা—সুমূল্য, সুলভ, আর্জ্জা।
শস্ত্র—খড়্গাদি, অস্ত্র, আয়ুধ।
শস্ত্রজীবী—শস্ত্রভৃৎ, অস্ত্রপাণি, সশস্ত্র।
শস্ত্রাভ্যাস—অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা।
শষ্প—নূতন ঘাস, বালতৃণ।
শস্য—ধান্যাদি, তৃণাদির ফল, শাস।
শস্যশালী—শস্যবিশিষ্ট, ধান্যাদিময়।
শাঁখ—শঙ্খ, কম্বু, মুখবাদ্য যন্ত্র।
শাঁখা—শঙ্খ, সধবাদের করভূষণ।
শাঁখারী—শঙ্খবণিক, শঙ্খব্যবসায়ী।
শাক—ভক্ষ্যণীয় তৃণপত্র, শকাব্দা, শাল।
শাক্ত—শক্তির আরাধক, কালীর উপাসক।
শাখা—বৃক্ষের ডাল, বেদের পরিচ্ছেদ।
শাখানগর—উপনগর, অন্তঃপাতি নগর।
শাখামৃগ—বানর, কপি, মর্কট, চণ্ডু।
শাখী—বৃক্ষ, বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।
শাটী—শাড়ী, সধবার পরিধেয় বস্ত্র।
শাঠ্য—শঠতা, ছল, ধূর্ত্ততা, চতুরতা।
শাণ—শিলা, পশমি বস্ত্রবিশেষ।
শাদা—শ্বেতবর্ণ, শুক্লবর্ণ, শুভ্রবর্ণ।
শাণ—অস্ত্রাদির তীক্ষ্ণকরণ প্রস্তর।
শানা—বস্ত্রবুননের কাষ্ঠ, তাঁতীর মাকু।
শানক—মৃন্ময় ভোজনপাত্র-বিশেষ।
শাণিত—তীক্ষ্ণীকৃত, ধারাল, সুধার।
শান্ত—নিবৃত্ত, ক্ষমাবান, ক্ষান্ত, ধীর।
শান্তি—শমতা, প্রতীকার, স্থিরতা, ধৈর্য্য।
শাপ—অভিশাপ, অভিসম্পাত, মন্যু।
শাবক—পক্ষি প্রভৃতির শিশু।
শাবল—শল্য, গাঁতি, লৌহময় খননাস্ত্র।
শাব্দ—বাচনিক, বাক্যসম্বন্ধীয়, ধ্বনিকারী।
শাব্দিক—শব্দ, শাস্ত্রবেত্তা, বাচনিক।
শামা—ঘাসবিশেষ, পক্ষিবিশেষ।
শারঙ্গ—চাতক, হরিণ, মৃগবিশেষ।
শারদীয়—শরৎকালীন, শরৎকালজাত।
শারীরিক—দৈহিক, প্রাপঞ্চিক, কায়িক।
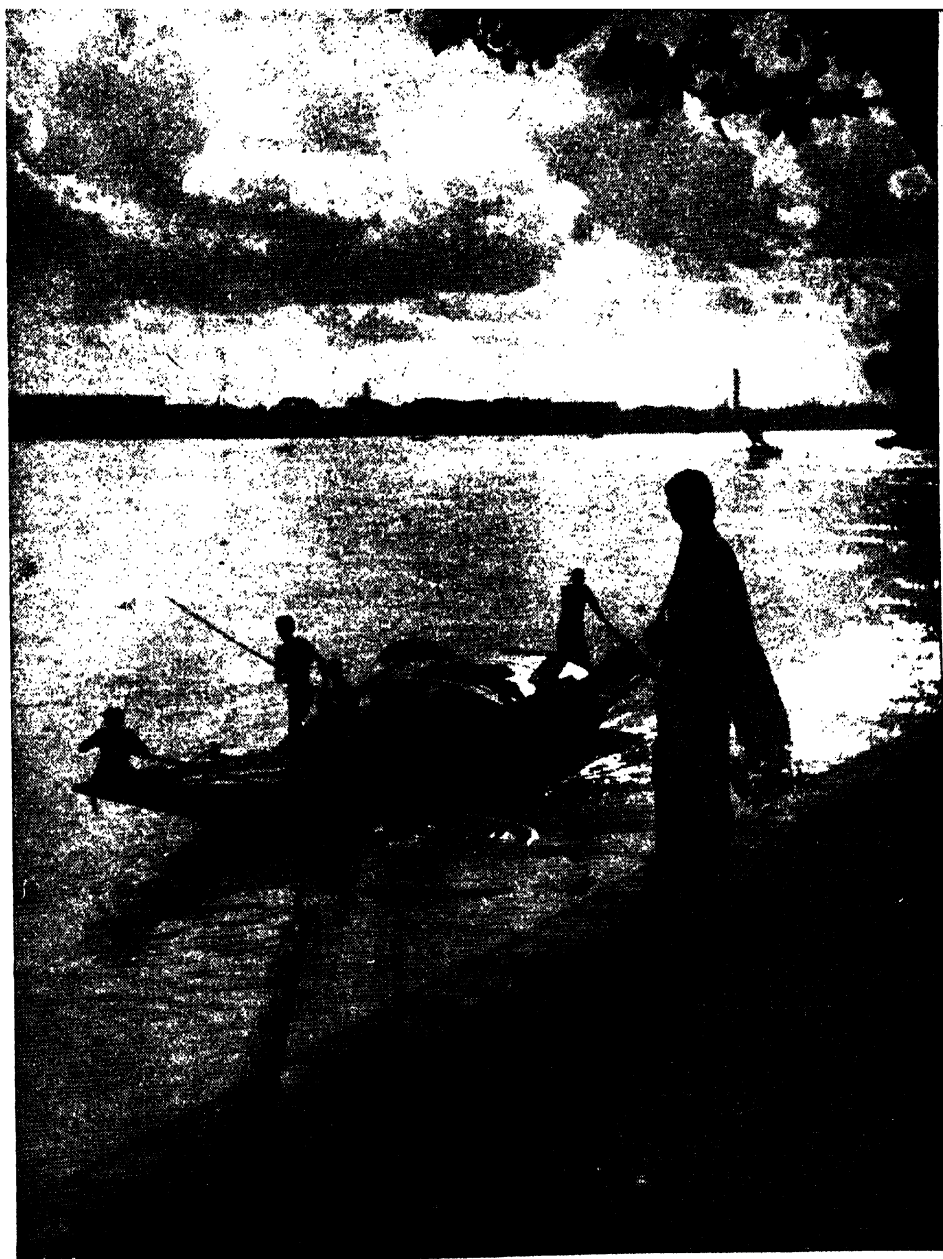
স্নবাবস্তামিতে

—খগেন মুখোপাধ্যায়

(প্রথম পুরস্কার)

জল

—হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

শুধু জল

—মনীষি ভট্টাচার্য্য
(তৃতীয় পুরস্কার)

—সুধাংশুভূষণ দাশগুপ্ত

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

সেঁজুতি

—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

—প্রতিযোগিতা—

বিষয়

ফুল
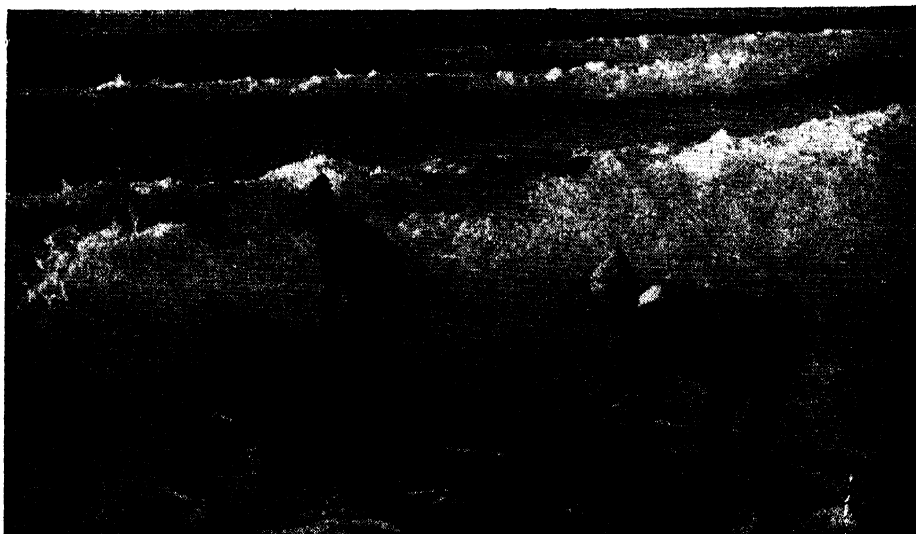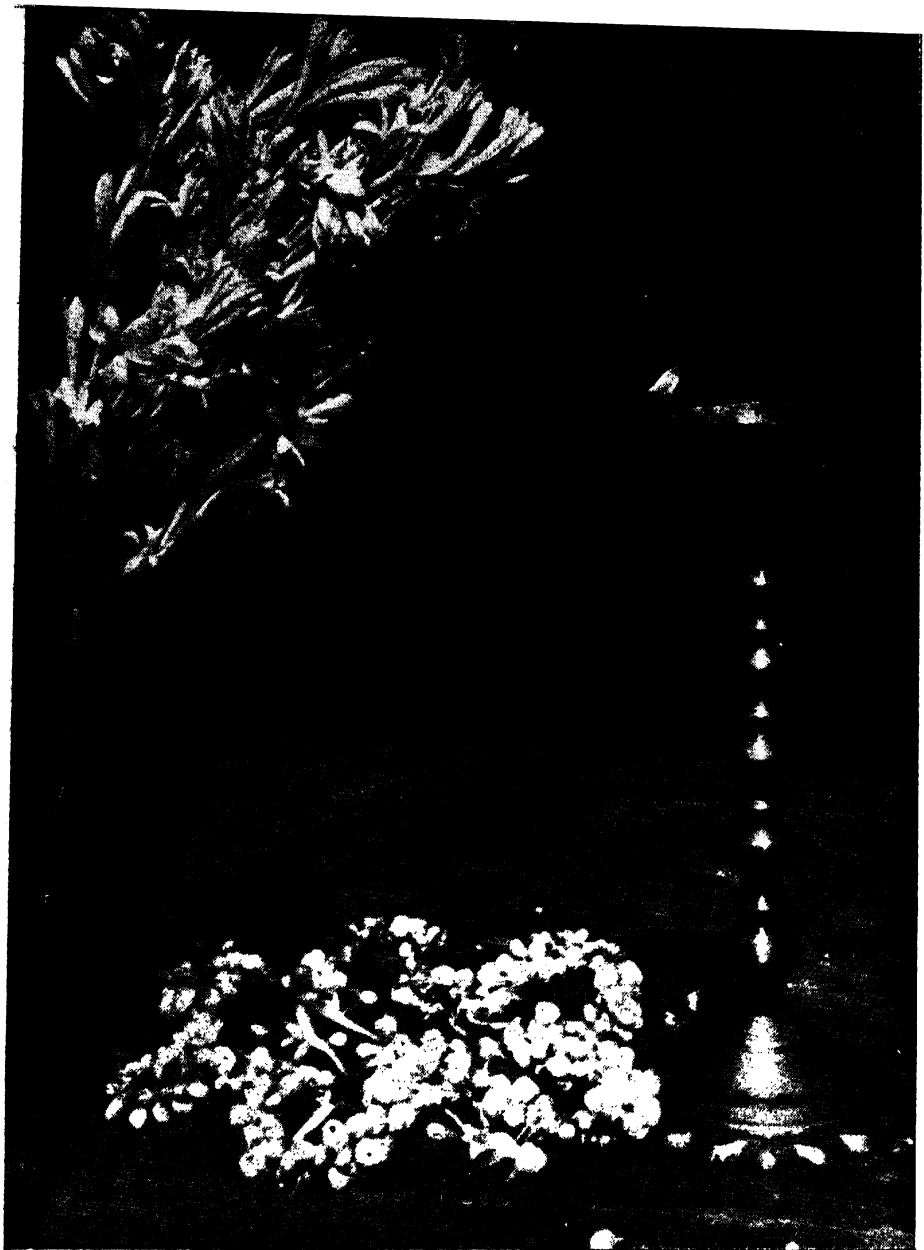
প্রথম পুরস্কার—১৫৲ ; দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲ ; তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২৫শে বৈশাখ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দ্বিতীয় প্রবাহ

চতুর্থ তরঙ্গ

অলৌকিক

রান্না করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া জলন্ত উনুনের উপর পড়িয়া মা বিশ্রীভাবে পুড়িয়া গিয়াছিলেন, মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন ; বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমি যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন বাবা অস্থিরচিত্তে বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন, দাদারা, বৌদিরা ও ছোট ভাই মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন।

মায়ের এই মূর্ছারোগের একটা অলৌকিক ইতিহাস আছে। আমার জীবনে আমি বহু বিচিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বহু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়া আমাকে আসিতে হইয়াছে ; আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা আমাকে একজন বিচিত্র-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন মানুষ বলিয়া জানেন। আমার সেই সকল অভিজ্ঞতা আমার সাহিত্যিক আত্ম-স্মৃতির পর্যায়ভুক্ত নহে। তাঁহারা অনেকেই আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করিয়া থাকেন, আমি কখনও অলৌকিক কোনও ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কি না ? আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ; আচারে-ব্যবহারে, ভ্রমণে-পর্যটনে, খাদ্যে-পানীয়ে কালাপাহাড় বলিয়া পরিচিত মহলে আমার অখ্যাতি আছে। তবু আজ অস্বীকার করিতে পারি না অলৌকিক শ্রেণীর দুইটি ঘটনার আমি সাক্ষী হইয়া আছি। দুইটি ঘটনাই আমার মনের উপর এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে আমার ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সাহিত্যবুদ্ধি ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ঘটনা দুইটির উল্লেখ আমার সাহিত্যজীবনে অবান্তর নহে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ-ইংরেজবাজার শহরের কালীতলা পল্লীতে আমার মেজদাদা নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আমরা পালা করিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলাম। সেদিন সকালে বাবা আমাকে ঘুম হইতে তুলিয়া মেজদার শয্যাপার্শে বসাইয়া একতলা বাড়ির ছাদে চলিয়া গেলেন। নিদ্রাবিজড়িত চোখে পাখা করিতে করিতে ঠিক মাথার উপরে বাবার ভারি পায়ের শব্দ শুনিতেছিলাম। মেজদা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। হঠাৎ বাবার পায়ের শব্দ থামিয়া গেল। প্রতিবেশী বন্ধু যতীনকাকা প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া মেজদার সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। বাবার দৃঢ়কণ্ঠ কানে আসিল, আজই শেষ হয়ে যাবে। আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। ঘুমজড়ান চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল। "সে কি ?" বলিতে বলিতে যতীনকাকা বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন, বাবাও ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। আমি আড়ালে থাকিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিলাম। বাবা যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য এই : মা তাঁহার পালা শেষ করিয়া পাশের ঘরে একটু গড়াইয়া লইতে গিয়াছেন, বাবা একা পুত্রের শিয়রে বসিয়া রাত্রির শেষ প্রহর জাগিতেছেন। সহসা একটা অস্বাভাবিক লাল আলোতে সমস্ত ঘরটা উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত চমকিত হইয়া কারণ অনুসন্ধানের জন্য ইতস্তত চাহিলেন, কোথাও কিছু নাই। মুমূর্ষু মেজদা হঠাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া যেন অভ্যাগত কাহাকেও সম্বর্ধনা করিয়া বলিলেন, এই যে আমি যাচ্ছি। বলিয়া তিনি আবার বালিসে মাথা রাখিলেন, লাল আলো মিলাইয়া গেল। বাবা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। সর্বশেষে বাবা বলিলেন, দাদার (অর্থাৎ আমার জ্যাঠামহাশয়ের) মৃত্যুশয্যায় বসিয়া ঠিক এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। দাদা সেদিন মৃতা পত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, আজ অজুর কাছে কে আসিয়াছিল জানি না।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত না হইতেই সত্যই সব শেষ হইল। আমাদের ক্ষুদ্র সুখী সংসারে সেই প্রথম মৃত্যু প্রবেশ করিল। আমার জন্মের পূর্বে আমার

দ্রষ্টব্য : গত সংখ্যায় কাব্যাংশে দুইটি মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে, তাহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক। ৭১৬ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে "তব স্নেহের সুধাধারে" "তব স্নেহরসসুধাধারে" হইবে এবং ৭১৭ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে "বিরহিণী রূপে ব'সে" "বিরহিণী জপে ব'সে" হইবে।

এক দিদি নিতান্ত শিশু অবস্থায় বিদায় লইয়াছিলেন, সে বিরহ-বেদনা আমাকে স্পর্শ করে নাই। মেজদার মৃত্যুতে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বাবা খুবই বিচলিত হইলেন। মা কিন্তু ধীর স্থির ছিলেন। মৃত্যুর পরদিন দ্বিপ্রহরের ঠিক পূর্বে বাবা ও ভাইবোন সকলে আমরা মায়ের শয়নঘর অর্থাৎ বড় ঘরের মেঝেতে-চৌকিতে বসিয়া মেজদারই প্রসঙ্গ আলাপ করিতেছিলাম। মা দুধ গরম করিতে সামনেই রান্নাঘরে ঢুকিয়াছিলেন। হঠাৎ বাবা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মেজদার নাম ধরিয়া ডাকিতেই আমরা সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দেখিলাম, মেঝের ঠিক মাঝখানে রক্ষিত একটা খালি চেয়ারে একটা লাল আলোয়ান গায়ে জীর্ণ শীর্ণ মেজদাদা আসিয়া বসিয়াছেন। বাবা চীৎকার করিয়া মাকে ডাকিলেন, ওগো, কে এসেছে দেখে যাও। মা গরম দুধের বাটি আঁচলে ধরিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে শোওয়ার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আসিয়া মেজদাকে দেখিয়াই "বাবা আমার" বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুধের বাটি ছিটকাইয়া ঝনঝন্ শব্দ করিতে করিতে মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। আমার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। পরক্ষণেই ফিরিয়া দেখি মেজদা অন্তর্ধান হইয়াছেন। মায়ের মূর্ছার সেই সূত্রপাত। তাহার পর ঘন ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল। মা কোথাও স্তব্ধ হইয়া বসিলেই বুঝিতে পারিতাম, বিপদ আসিতেছে। তিনি, কি যেন, সম্ভবত মেজদাকে দেখিতে পাইতেন এবং একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন।

মৃত মেজদাকে আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম। বাবা মেজদার নাম ধরিয়া ডাকাতেই আমরা হিপ্‌নাটাইজ্‌ড হইয়াছিলাম, ঘটনাটিকে কখনই সেই ভাবে উড়াইয়া দিতে পারি নাই। পরে এই বিষয়ে বহু বই পড়িয়াছি, বড় বড় নামকরা পথভ্রষ্ট (?) বৈজ্ঞানিকদের আলোচনাও দেখিয়াছি এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে অনেক তত্ত্ব জানিয়াছি। বিভূতিকে বাহিরে কখনই আমল দিই নাই, ঠাট্টা করিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাসকে উড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফল্গুধারার মত মৃত্যু-পরপারের এই টুকরা রহস্যটি আমাকে বরাবরই প্রভাবিত করিয়াছে। সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গেই মানুষের আরম্ভ নয় এবং চিতায় দগ্ধ হইয়াও যে তাহার শেষ নয়—এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়মূল। যাঁহারা এই ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার মেজদাদা, আমার মা, আমার বাবা, আমার বড়দাদা তাঁহারা প্রত্যেকেই বর্তমান আছেন, আমি যেমন গতজন্মে বর্তমান ছিলাম এবং পরজন্মে থাকিব। এই বিশ্বাস আমার কাব্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে। যথা:

"মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে।
মৃত-জীবিতের মাঝে হে বন্ধু, কিসের ব্যবধান,
মৃত্যুরে কে জানিয়াছে, কে পেয়েছে জীবন-সন্ধান?
মরণ-তীর্থের যাত্রী, মায়ের কোলের শিশু
একাকার নির্মম বিচারে!
মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে।
কে জেনেছে সবখানি আকাশে?
অনন্ত জীবনে মোর খণ্ড খণ্ড তার পরিচয়,
অসম্পূর্ণ প্রাণ-মৃত্যু, কান্না-হাসি, সম্ভব-বিলয়,
রহস্যের যবনিকা আজো উঠিল না মোর,
যাহা বুঝি, বুঝি শুধু আভাসে।'
কে জেনেছে সবখানি আকাশে?"

'রাজহংসে'র উৎসর্গ-পত্রে মাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলাম:

"জননী, কঠোর মৃত্যু তোমারে ঢেকেছে অন্ধকারে,
হ'ল সে অনেক দিন—
দেখিতে পাই না দেহ-ক্ষয়-করা সেই করুণার ধারা।
ওপার হইতে এপারে আমারে তুমি এনেছিলে মাতা,
হারাইয়া আজ গিয়াছ আমার জ্ঞান-বুদ্ধির পারে;
বুঝিতেও নাহি পারি,
যে পথে চলেছি সেই পথে মোর ক্লান্ত দিনের শেষে
রেখেছ কি পেতে স্নেহ-কোলখানি তব?
বুঝিতে পারি না, তবু আছে আশ্বাস।

জননী, আমার জন্মদিবসে তুমি রচেছিলে সেতু
আমার আঁধারে আলোকে, আমার অতীতে বর্তমানে।
তুমি নাই তাই এত ব্যবধান আলোকে অন্ধকারে,
ব্যবধান-মুখে তড়িৎ-তীব্রজ্বালা!
যেখানেই থাকো জননী, আবার সেতু কর নির্মাণ,
সহজ-ব্যথায় আমারে প্রসব কর তুমি পরপারে।"

এবং সেদিন একটি গানে এই কথাটাই স্পষ্টতর করিয়াছি:

"জনম-মরণ পা-ফেলা আর পা-তোলা তোর ওরে পথিক,
স্মরণ যদি রাখিস্ তবে পদে পদে ভুল্‌বি না দিক।
নয়কো শুরু আঁতুড় ঘরে
শেষ নয়কো চিতার 'পরে
আগেও আছে পরেও আছে এই কথাটা বুঝে নে ঠিক।"

এই বিশ্বাসের সমর্থন আমি পাশ্চাত্য আধুনিক বিজ্ঞানেও পাইয়াছি; সার্ অলিভার লজ প্রমুখ স্পিরিচুয়ালিষ্টদের কথা বলিতেছি না; অ্যালেক্সিস ক্যারেল, জে. বি. রাইন. কেনেথ ওয়াকার, জে. ডব্লিউ. এন. সালিভান প্রমুখ খাঁটি বৈজ্ঞানিকেরা নিছক বিজ্ঞানের পথে মানুষের হদিস না পাইয়া "আন্‌নোন্" বা অজ্ঞাতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ক্যারেল বলিয়াছেন, মানুষ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে স্বশরীরে প্রিয়-সমাগমে আসিতে পারে, স্বাভাবিক ভাবে কথা-বার্তাও বলিতে পারে।* আধুনিক পাশ্চাত্য উচ্চ বিজ্ঞান মানুষের আত্মার রহস্যসন্ধানে পরাজিত হইয়া চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকদের মনে অজ্ঞাতের যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত জাগাইয়া তুলিতেছে, মানুষের আদিমতম ছন্দোবদ্ধ চিন্তাধারায় সেই অজ্ঞাতই আশ্চর্য রকম স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ঋগ্বেদের কথা বলিতেছি। এই বিচিত্র ব্যাপার কি করিয়া সম্ভব হইল আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা সাধারণ বুদ্ধি তাহা নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ঘটিয়াছে যে তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে ঋষি বামদেব রচিত সূক্তে আছে। বামদেব আমাদের ভৌতিক ইহজীবনকে বলিয়াছেন—গর্ভবাস। মৃত্যুতে আমরা যেখানে ভূমিষ্ঠ হই সেখানে আমরা পূর্ণ পরমাত্মাকে অবগত হইব, এই প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিয়া বামদেব বলিতেছেন—"ভাই সকল। তোমরা কি বলিতেছ? দ্যুতিমান স্বর্গে জন্মলাভ করিয়া পরমাত্মাকে অবগত হইবে? আমি বলি যে, তাদৃশ জন্মলাভের পূর্বে এই গর্ভবাসকালেই (মাংসময় দেহে বর্তমান থাকিয়াই) আমি পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছি।"†

বামদেবের আত্মকাহিনী বড়ই বিচিত্র। জীবনে অশেষ দুঃখ নির্যাতন ভোগ করিয়া তিনি একদিন মনে মনে স্থির করিলেন, "সকল লোকে যে দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, আমি সে দ্বার দিয়া বাহির হইব না। আমি মাতার উদর বিদীর্ণ করিয়া (অর্থাৎ আত্মহত্যা করিয়া) বাহির হই (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করি)।" এই কথা মনে উদিত হইবামাত্র তাঁহার অন্তর্যামী ইন্দ্র বলিলেন, "ঋষি, তুমি যে দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করিতেছ না, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ বিধাতৃবিহিত জন্মলাভের পথ। যত মনুষ্য স্বর্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবত্বলাভ করিয়াছেন, সকলকেই এই দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে হইয়াছে। এখনও তোমার অবয়ব সকল পূর্ণ হয় নাই, তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ধিত হইলে তুমিও এই পথেই ভূমিষ্ঠ হইবে। বিদীর্ণ হইয়া বাহির হইব বলিয়া যে পথের চিন্তা করিতেছ, এই পথের অনুসরণ করিয়া তোমার মাতার (দেহের) পতন সাধন করিও না। উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির করিলে কি সন্তান বাঁচে?"†

বামদেবের চৈতন্য হইল। তিনি দুঃখ দারিদ্র্য যন্ত্রণার মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই দৈহিক মর্ত্যজীবনের কঠোরতার মধ্যে এই পরম সত্য উপলব্ধি করিলেন যে, "যেমন গর্ভযন্ত্রণার মধ্যে শিশুর অবয়ব পুষ্টি হয়, তেমনিই সাংসারিক ক্লেশপুঞ্জের মধ্যে মানুষের আত্মা দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া স্বর্গে জন্মলাভের উপযুক্ত হয়।" এই মহাজ্ঞান লাভ করিয়া ঋষি বামদেব ভবিষ্যতের মানবসমাজের জন্য যে আশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন চারি সহস্র বৎসরের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া তাহা আজিও আমাদের বরাভয় দান করিতেছে:

"আমি উদরান্নের অভাবে কুকুরের অন্ত্র পাক করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি, দেবতার উপাসনা করিয়া ধনলাভ করিতে পারি নাই। প্রাণসমা পত্নীকে জন-সমাজে লাঘব প্রাপ্ত হইতে দেখিলাম। (সে যাহা হউক) প্রভু পরমেশ্বর শ্যেন পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে আমাকে মধু আনিয়া দিয়াছেন।"† ৪।১৮।১৩

জড়বিজ্ঞানও আজ উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়া জড়ত্বের জটিলতা ত্যাগ করিয়া সেই মধু-সন্ধানী হইতেছে—আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ইহাই সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ সংবাদ।

প্রথম সংসার পত্তনে যে বন্ধু সহসা আবির্ভূত হইয়া নীরবে আমার সঙ্গ লইয়াছিল আমার জীবনের দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা সেই কিরণচন্দ্র দত্তকে লইয়া। তখন বাঁকুড়া হষ্টেলে থাকি, আই-এ, আই-এস-সির টেষ্ট পরীক্ষা আসন্ন। সকলেই পরীক্ষা-প্রস্তুতির জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। কিরণ

* Alexis Carrel: 'Man, the Unknown'—"Mental Activities" অধ্যায়।

† স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের অনুবাদ।

একটু বেশি রকম। সে প্রায় দিবারাত্রি বইয়ে-মুখে বসিয়া থাকে, উচ্চৈঃস্বরে লজিক অথবা ইংরেজী পাঠ্য মেকলের 'হিষ্ট্রি অব ইংলণ্ড' প্রথম ভাগ আওড়ায়। পাঠে অতি-নিষ্ঠার জন্য সে আমাদের হিংসা ও পরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিল। একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠিক পূর্বে এইভাবে পড়িতে পড়িতে সে হঠাৎ গোঁ-গোঁ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গেল। এক নাগাড়ে সাত দিন মুহূর্তের জন্য তাহার জ্ঞান ফিরিল না। হষ্টেলের ডাক্তার, শহরের সেরা ডাক্তার সকলেই পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ও ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন, আমরা কয়েকজন—কিরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিবারাত্র পালা করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলাম। পড়াশুনায় আমার একেবারেই মন ছিল না। আমার ভালই লাগিল এবং এই সেবাদলের নেতৃত্বভার আমিই গ্রহণ করিলাম। অসুখের গোড়ায় রোগীর কাছে বসিয়া আমরা শুধু "ওয়াচ" বা পর্যবেক্ষণ করিতাম, সম্পূর্ণ অজ্ঞান রোগীকে লইয়া আর কিছু করিবার ছিল না। দ্বিতীয় দিনে অজ্ঞান অবস্থাতেই কিরণের মুখে কথার খই ফুটিতে লাগিল। শুরু হইল মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস লইয়া। বইটির প্রথম লাইন হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে শেষ লাইন পর্যন্ত সে অনর্গল মুখস্থ বলিয়া গেল। বইটি আমারও পাঠ্য, সুতরাং কিরণের কেরামতি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। হলফ করিয়া বলিতে পারি, সজ্ঞানে কিরণ বইটির দশ লাইনও একসঙ্গে মুখস্থ বলিতে পারিত না। ভাবিতে লাগিলাম, এই অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সে কোথায় পাইল! বেশিক্ষণ ভাবিবার সুযোগ মিলিল না। কিরণ আমাদের আরও চমকিত করিয়া তাহার সুবিস্তৃত জীবন-নাট্যের হুবহু পুনরভিনয় করিয়া যাইতে লাগিল। অর্থাৎ সুদূর শৈশব হইতে আধুনিকতম বর্তমান পর্যন্ত এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছে সেগুলিতে তাহার নিজের ভূমিকা সে নিজেই যথাযথ পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল, ভাবভঙ্গি কণ্ঠের উঁচুনীচু পর্দা সমেত। অনেকগুলি ঘটনায় আমরাও জড়িত ছিলাম, মনে মনে মিলাইয়া দেখিলাম এক চুল এদিক ওদিক হইতেছে না। কিরণ বাল্য ও শৈশব মেমারিতে তাহার ভগিনীপতির নিকট কাটাইয়াছিল, আমাদের সহপাঠী নিতাই দাঁ সেখানে তাহার সঙ্গী ও সহপাঠী ছিল। মেমারির ঘটনায় নিখুঁতত্বে নিতাই সাক্ষ্য দিল। এমন সব গূঢ় গোপনীয় কথাবার্তাও রোগী বলিতে লাগিল যে, আমাদের দুই-তিন জন ছাড়া আর কাহাকেও তাহার কাছে রাখা সমীচীন বোধ করিলাম না। কথাবার্তা অবশ্য কেবল তাহার একেলার। যেন টেলিফোনের একদিকের কথাই আমরা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। যাহা ঘটিয়াছিল অর্থাৎ যে যে শব্দ কিরণ যেভাবে প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিল পুনরাবৃত্তিতে তাহার কোথাও এতটুকু ভুল হইল না। মনে হইল যেন কেহ কিরণের জীবননাট্য রচনা করিয়া তাহার অংশ তাহাকে "পার্টে"র মত লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেই লেখাটি হাতে পাইয়া সে আবার তাহা অভিনয়োপযোগী স্বেদকম্পসহকারে পাঠ করিয়া চলিয়াছে, কমা-সেমিকোলোনেরও কোথাও অদলবদল হইতেছে না। আমাদের জ্ঞাত ঘটনার সহিত মিলাইয়া লইয়া এই উক্তি আমি জোরের সঙ্গে করিতেছি। ব্যাপার দেখিয়া আমরা দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। কিরণের তদানীন্তন অভিভাবক তাহার ভগিনীপতি শিববাবুকে তার করিলাম। কিন্তু রোগীর দায়িত্ব আমাদের হাতেই রহিল।

বাঁকুড়ার কোনও ডাক্তার কূলকিনারা করিতে পারিলেন না। পরম্পরায় সংবাদ পাওয়া গেল একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ডাক্তারকে যুদ্ধব্যপদেশে বাঁকুড়ায় "ইনটার্নড্" রাখা হইয়াছে, তিনি রেল-লাইনের পরপারে একটি গৃহে নজরবন্দী অবস্থায় আছেন। আমরা একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া লইয়া আসিলাম। তিনি আসিয়াই অজ্ঞান রোগীর আকণ্ঠ গরম জলে চুবাইয়া মাথায় বরফ প্রয়োগ করিতে করিতে জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন। এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে কিরণ তাহার কিছুই জানে না। সে সুখনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াই প্রথম কথা বলিল, আমার বই! তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম।

কিন্তু অনন্ত জীবনের যে আশ্বাস সে আমাকে দিল তাহার তুলনা হয় না। গ্রীক ডাক্তারকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি সংক্ষেপে জবাব দিয়াছিলেন, মানুষের মস্তিষ্ক-কোটরে সমস্তই সঞ্চিত থাকে, সে কোটর সকলের পক্ষেই চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়,

কাহারও কাহারও পক্ষে যদি পুনরায় খোলে তখনই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।

জড়বাদী ডাক্তারের এই জবাবে আমি সন্তুষ্ট হই নাই। ভারতীয় যোগ সম্পর্কে দেশী ও বিলাতী অনেক বই পড়িয়া ঘটনাটির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ অতীতস্মর হইতে পারে, কিরণ তাহার প্রমাণ। মানুষ চেষ্টা ও সাধনা করিলে শুধু অতীতস্মর নয়, জাতিস্মরও হইতে পারে। জন্মজন্মান্তরে সে কি ছিল, কি করিয়াছে সে তাহা হুবহু স্মরণ করিতে পারে, অনেকে স্মরণ করিয়াছেন। মস্তিষ্কের কোনও কোটরে নয়, কারণ দেহের সঙ্গে সঙ্গে সে কোটরও ধ্বংস হয়, আত্মার সঙ্গেই এই জন্মান্তর-স্মৃতি জড়িত থাকে, যোগবলে বলীয়ান্ মানুষ অথবা ভাগ্যবান অবতারকল্প পুরুষ সেই স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন। কিরণের ঘটনায় এই "অলৌকিকে"র প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি পাইয়াছি, ইহা জড়বিজ্ঞান বা ডাক্তারী শাস্ত্রের আয়ত্তে নয়।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মা ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিলেন, মায়ের কাছে বসিয়াই "হসন্ত তরফদার" ব্যঙ্গচিত্রটি রচনা করিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। ইচ্ছা ছিল আরও কিছুদিন মায়ের কাছে কাটাইয়া কলিকাতা ফিরিব। কিন্তু অক্টোবর মাসের শেষ তারিখে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি পাইলাম। চিঠিটি ইংরেজিতে লেখা কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বভাব ও স্বাভাবিক ভঙ্গির পরিচয় আছে বলিয়া এখানে পুনর্মুদ্রিত করিলাম :

'15 Rammohan Roy Road
Calcutta 29. 10. 25

My dear Sajani,

I am very sorry to hear about your mother's condition. I shall do the needful. As to your scribbling I have not yet received any thing. I shall do what I can with [হসন্ত] when I can lay my hands on it. Kalida [Kalidas Nag] has gone to Gidney in Chhota Nagpur to keep company with the wild animals there. When he gets back (about 1. 11. 25) I shall send you all about Karl Spitteler. I am going to be branded on the 23rd Nov. Try to come before that. I have got your Vol. of Kalidas.

yours affly
Khududa.'

এই সময়ে আমি ডক্টর কালিদাস নাগের সাহায্যে রমঁ্যা রলঁ্যা, কার্ল স্পিট্‌লার প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমিক ও সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্তদের সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম, রলঁ্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজী প্রশস্তিরও (রলাঁর ষষ্টিতম জন্মদিবসে প্রদত্ত) অনুবাদ করিয়াছিলাম, অনুবাদকের নাম দিই নাই। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমার অনুবাদটিকে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা হিসাবে তাঁহার জীবনীভুক্ত করিয়াছেন। বলাই বাহুল্য, ইহাতে আমি গৌরব বোধ করিয়াছি। ক্ষুদুদার পত্রে মনস্বী কার্ল স্পিটলার সম্পর্কিত উপকরণ আমার নিকট প্রেরণের কথা আছে। আমি ততদিন পর্যন্ত দিনাজপুরে অপেক্ষা করিলাম না, নবেম্বরের গোড়াতেই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম এবং আসিয়াই "কার্ল স্পিটলার—বিংশ শতাব্দীর এপিক্ প্রতিভা" লিখিয়া ফেলিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অগ্রহায়ণের (১৩৩২) 'প্রবাসী'তে সেই তের-পাতার সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি বাহির হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষুদুদার বিবাহ; আমাদের 'শনিবারের চিঠি'র দলের সেই প্রথম আনন্দোৎসব। ইতিপূর্বে কালিদাসদার বিবাহে ক্ষুদুদা, হেমন্ত ও আমি দীর্ঘ দীর্ঘ উপহার-কবিতা লিখিয়া কম্পোজ করিয়া লম্বা লম্বা প্রুফের কাগজে তুলিয়া আলপিন আঁটিয়া বিলি করিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন অভিনব বিবাহোপহার আর কুত্রাপি বিলি হয় নাই। ক্ষুদুদা গোড়া হইতেই সাবধান হইলেন, তিনিই ছাপাখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, খিড়কিপথে আমাদের অভিযান সহজেই রোধ করিতে পারিলেন। এই বিবাহে আমি সর্বপ্রথম সামাজিক ব্যাপারে টেবিল-চেয়ার ও নিউজ-পেপারবোলের ব্যবহার দেখিয়াছিলাম।

শ্বশুরালয়ে অবস্থান আমার স্বাধীনতা সাংঘাতিক ভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। মনমরা হইয়া একদিন দ্বিপ্রহরে বৈঠকখানায় আমারই হস্টেল-মেস-জীবনের দীর্ঘকালের শয্যাসঙ্গী ছারপোকা-শোণিত-লাঞ্ছিত ফসিলায়িত তুলার তোষকটিকে বালিশ করিয়া চিৎ হইয়া কড়িকাঠ গনিতেছিলাম সহসা সদর দরজায় তিনজোড়া পায়ের শব্দে চকিত হইয়া উঠিলাম। হল্লা করিতে করিতে কিরণ ও রতন প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমার আই-এস-সি সহপাঠী বাঁকুড়া হস্টেলের বন্ধু গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়—

তাহারা ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে একটি বাসা ঠিক করিয়া এক মাসের ভাড়া আগাম জমা দিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া সেখানে স্থানান্তরিত করিতে আসিয়াছে। শ্বশুর মহাশয় গৃহে ছিলেন না, হাঁ-না কি বলিব ভাবিতেছি, কিরণ আমার সেই বহুমূল্যবান তোষকটিকে কুক্ষিগত করিয়া হুকুম দিল, আয়। আমি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে তাহাদের অনুসরণ করিলাম, সেই দিনই আমার অসার সংসারে সার শ্বশুরমন্দিরবাস খতম হইল।

সাহিত্যচর্চার দিক দিয়া ভালই হইল সন্দেহ নাই। তিন বোহেমিয়ানে মিলিয়া ১।১ই ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের মধ্য ব্লকের দ্বিতল ফ্ল্যাটে রীতিমত ল্যাটিন কোয়ার্টার ফাঁদিয়া বসিলাম, গৌরীশঙ্কর ফাউ। রতন পিতৃদত্ত মাসোহারার সাহায্যে এবং কিরণ জমিদারীর আয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ওকালতির তকমা লইবে, বাহিরে তাহাই প্রকাশ থাকিল—কিন্তু আসলে তাহারা অল্প মূলধনে কলিকাতা শহরে বৃহৎ ব্যবসায় ফাঁদিবারই মতলব করিয়াছিল। রতন বোম্বাইয়ের সিডেনহাম কলেজ ফেরতা, কিরণের বুদ্ধি সর্ববিষয়েই প্রখর ও চৌকস। আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ততদিনে একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে, আমার কাজ-কারবার সকলই মা সরস্বতীর এলাকাভুক্ত হইয়াছে। তিন বন্ধুর তিনখানি ঘর, রান্নাঘর স্বতন্ত্র, মাসিক ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা। যে সামান্য আসবাব আমার ছিল তাহাই সকলের আসবাব। দীর্ঘকাল মাটিতে খবরের কাগজ বিছাইয়া শয়ন করিতাম, একটিমাত্র মগে শৌচক্রিয়া ও রন্ধনক্রিয়া চলিত, তিনখানি ভাঙা সান্কি সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহাতেই আহার করিতাম। এই অবস্থায় গৌরীশঙ্করকে লইয়া বিব্রত হওয়া স্বাভাবিক। সে বিবাহিত, বাড়িতে ঝগড়া করিয়া ভাগ্যান্বেষণে পথে বাহির হইয়াছে—একটা হেস্তনেস্ত না করিয়া ফিরিবে না। আমাদের আড্ডাটাই তখন পথ অথবা পান্থশালা। গৌরীকে রান্নাঘর আশ্রয় করিতে হইল। সে পাড়াগাঁয়ের ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমাদের হেঁসেলের ভার সম্পূর্ণ তাহার উপর বর্তাইল। সে লেখাপড়ায় ভাল ছেলে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় জিলা-স্কলারসিপ পাইয়াছিল, আই-এস-সিতেও ফার্স্ট ডিভিসনে উপরের দিকে নাম ছিল; কিন্তু সহায়সম্পদহীন অবস্থায় আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আমরা শুধু তাহারই আশ্রয় নয়, পরে আরও কয়েকজন ভাগ্যান্বেষীর অবলম্বন হইয়াছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত রীতিমত একটা "এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো" খুলিয়া বসিয়াছিলাম। বেকার গৌরীশঙ্করকে ক্রমশ আরামপ্রিয় হইয়া যাইতে দেখিয়া সেই বৎসরেই বড়দিনের দিন আমরা এই বলিয়া বাড়ি হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলাম, একটা যাহা হউক কিছু চাকুরি না জুটাইয়া সে ফিরিতে পারিবে না। সে প্রথমে হগ্ সাহেবের বাজারে কুলিগিরির চেষ্টায় লাইসেন্স অভাবে বিফলমনোরথ হইয়া খিদিরপুর অঞ্চলে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা-নির্মাণ-ক্ষেত্রে ইট বহিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে চায়; সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ ষ্টোরস্-এর বাড়ি, একজন খাস বিলাতী সাহেব তদারক করিতেছিলেন। আসল গৌরীশঙ্করকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই, তিনি সেই দিনই তাঁহার সহকারী হিসাবরক্ষকরূপে তাহাকে বহাল করিয়াছিলেন। গৌরী যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া আজ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বড়বাবুর পদ অলঙ্কৃত করিতেছে। গৌরীর গৌরব আমাদের হিসাবে সর্বপ্রথম জমা, পরে আরও অনেক আছে।

ডিসেম্বর মাসে নূতন সংসার পাতিয়াছিলাম। ওই মাসেই কানপুরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন, সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী। রামানন্দ-বাবু মাঘ মাসের 'প্রবাসী'র জন্য সরোজিনী নাইডুর জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিবার আদেশ দিলেন। আমি অনন্যচিত্ত হইয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটি জীবনী রচনা করিলাম, তাঁহার কয়েকটি কবিতারও কবিতায় অনুবাদ দিলাম। নূতন বাড়িতে ইহাই আমার প্রথম সাহিত্যকীর্তি। পরে স্বয়ং সরোজিনী দেবীকে সেই প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইতে হইয়াছিল। তিনি কবিতা-অনুবাদের বিশেষ তারিফ করিয়া স্বহস্তলিখিত একটি ইংরেজী কবিতা উপহার দিয়া আমাকে পুরস্কৃত করেন। আমার সাহিত্যিক-জীবনে ইহা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

নূতন একান্নবর্তী বাড়ি আমাকে যেমন নানা ভাবে অসুবিধায় ফেলিয়াছিল তেমনই ব্যাপক অবিচ্ছিন্ন আড্ডার মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'-পুনঃপ্রবর্তনের উৎসাহ ও উপকরণ এখানেই সংগৃহীত হইতেছিল। এই আড্ডায় জীবনদা ও সুহৃদা প্রায়ই আসিতেন,

আমাদের অগৃহস্থসুলভ হল্লা ও চীৎকার সংলগ্ন গৃহস্থ-বাড়িগুলির ঈর্ষা ও বিরক্তিরও কারণ হইতেছিল। কিরণ তখনও অবিবাহিত; একদিন কিরণ ও আমি বাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের কন্যাকে পাত্রী হিসাবে দেখিয়া আসিলাম। কথাবার্তা পাকা হইতেই আমরা ঘটা করিয়া কিরণকে আইবুড়ো ভাত দিলাম—আমরা অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র দল; আহারের পরিমাণ যাহাই হউক, উল্লাসের পরিমাণ এত বেশি হইল যে আমাদের ঠিক নিম্নতলস্থ মাদ্রাজী পরিবারের কর্তা থানায় ডাইরি পর্যন্ত করিয়া আসিলেন; ক্ষুতুদা কেম্‌ব্রিজী আদিরসাত্মক গল্পে আসর মাত করিয়া রাখিলেন, সঙ্গে জীবনদার অনুপ্রাস। তখন আরও তিনজন বেকার আমাদের আশ্রয়ভুক্ত, বাঁকুড়া হষ্টেলের ও পরে ওগিলভি হষ্টেলের দাদা ও বন্ধু গিরিধর চক্রবর্তী, বাঁকুড়া হষ্টেলে দাদার সহপাঠী শৈলেশ্বর সিংহ রায় ও ওগিলভি হষ্টেলে আমার রুম-প্রতিবেশী ও সহপাঠী বিমলাকান্ত সরকার। গিরিধর চক্রবর্তী ইকনমিক্‌সে ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ, তিনি বাংলাদেশে ও বাংলার বাহিরের কলেজগুলিতে দরখাস্তের উপর দরখাস্ত করিতে লাগিলেন, শৈলেশ্বরদা ও বিমলাকান্ত সরকারী চাকুরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। আজ গিরিধরদা বিহারের বেগুসরাই কলেজের প্রিন্সিপাল, শৈলেশ্বরদা সাব ডেপুটি কালেক্টর হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং বিমলাকান্ত সাব ডেপুটিগিরি ত্যাগ করিয়া অর্থনীতির নামকরা লেখক; ইঁহারাও আজ আমাদের সেই পুরাতন বেকার-অ্যাসাইলামের গৌরব।

গুরুতর অসুবিধা আপিস-যাতায়াত লইয়া; তখনও সার্কুলার রোডের ট্রাম হয় নাই, ট্রাম কোম্পানীর বাসও খুব আরামপ্রদ ছিল না। প্রায় হাঁটিয়া কয়েকটি ভীতিসঙ্কুল ঘাঁটি পার হইয়া আসিতে হইত। এই অবস্থায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল ঠিক গুডফ্রাইডের দিন কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পৈশাচিক তাণ্ডব শুরু হইল; ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে যে ভয়াবহ "ক্যালকাটা কিলিং" আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা তাহারই বর্ণপরিচয়। আমি প্রথম দিনেই দুর্ভাগ্যক্রমে এই পৈশাচিক তাণ্ডবের ঠিক মাঝখানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। সে কাহিনী বিস্তারিত ভাবে লিখিবার যোগ্য, কারণ 'শনিবারের চিঠি'র পুনর্জাগরণ এই দাঙ্গার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লইয়া উল্লেখযোগ্য সাহিত্যও রচনা করিয়াছিল একমাত্র 'শনিবারের চিঠি'। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'শনিবারের চিঠি'র নবজাগরণের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

*

বিবাহ

(বিদেশী মতে)

"বিবাহ একটি আপোষ ব্যতীত কিছুই নয়, যার দ্বারা নারীজাতি পুরুষের কাছে স্ত্রীরূপে সামাজিক সম্মানলাভের জন্য নিজেকে বিক্রী করে এবং বার্দ্ধক্যে ভাতা পাওয়ার জন্যেও বটে।" —জর্জ বার্ণার্ড শ'।

*

"বিবাহ অজ্ঞ কুমারীদের শেষকৃত্য ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।"
—গ্যা দে মোপাসাঁ।

*

"কোন' নাবিকই আজ পর্য্যন্ত বৈবাহিক-সমুদ্রের অক্ষ-রেখা এবং দ্রাগিমার সীমা খুঁজে পায়নি।" —বালজ্যাক।

*

"প্রাচীরের মতই স্বামী, যে বালিকাদের সকল দোষ ঢেকে দেয়।"
—মলিয়ের।

মদনভস্ম

মহম্মদ শহীদুল্লাহ

গ্রীকপুরাণের রূপকের চমৎকারিত্বে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু হিন্দুপুরাণেও যে সুন্দর রূপক আছে, তাহা কয়জন অনুসন্ধান করিয়াছেন ?

শিবপার্ব্বতীর বিরহাদি বর্ণনচ্ছলে প্রাচীন কবিগণ ছয় ঋতুর কি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন !

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন। সতী-শোকে পশুপতি প্রমথগণের সহিত যজ্ঞভঙ্গ করিতেছেন। চারিদিকে ভূতগণের তাণ্ডব নৃত্য ! হেমন্তের কি স্বরূপ বর্ণনা ! প্রকৃতিতে আর শরতের সেই সজীবতা নাই। সরোবরে এখনও কমল শোভা পাইতেছে। কিন্তু উত্তরের কনকনে বাতাস আর তুষারপাত শীঘ্রই শরতের শেষ চিত্রগুলি লোপ করিতে বসিয়াছে। প্রথমেই হেমন্তের বর্ণনা কেন ? অগ্রহায়ণ। হায়ন বৎসর। শব্দেই তাহা প্রকাশ। পূর্ব্বে হেমন্ত ঋতুতে বৎসর আরম্ভ হইত। তাই কবি বৎসরের আরম্ভ হইতেই ঋতু বর্ণনা করিয়াছেন।

হেমন্ত গেল। শীত আসিল। হেমন্তেই প্রকৃতির শোভার দক্ষযজ্ঞ বিনাশ ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছিল। এখন তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। বৃক্ষগুলি নেড়া-মুড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের ধান কাটা হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে ক্ষেত্র ধূ-ধূ করিতেছে। যেন সমস্ত প্রকৃতির উপর কি এক ভীষণ অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। এখন যেন জগৎ নয়ন মুদিয়া যোগাসনে বসিয়াছে। কবি রূপকচ্ছলে বলিলেন, সতীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হইল দেখিয়া মহাদেব তপস্যায় বসিলেন।

বসন্ত আসিল। মলয় ও নবমঞ্জরী দেখা দিল। প্রকৃতি পুনর্জ্জীবিতা হইল, আর সতীও পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করিলেন। কোকিল পঞ্চমে গাহিতে লাগিল। অলিগণ গুঞ্জন আরম্ভ করিল। চারিদিকে ফুলে ফুলময়। এইবার জগতের জড়ভাব গেল। এখন সকলই আনন্দময়। কবি বলিলেন, মহাদেবের তপস্যা ভাঙ্গিয়া পার্ব্বতীর সহিত মিলন সংঘটন করিতে মদন আসিয়া উপস্থিত, হাতে তাঁর ফুলবাণ, বসন্ত আর রতি (প্রীতি) তাঁর সহচর। মধুমাসের কি কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা !

তারপর শিবের ক্রোধে মদন ভস্ম হইয়া গেলেন আর পার্ব্বতীও পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থা হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। গদ্যের ভাষায় বলিতে গেলে, গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। চারিদিকে যেন আগুনের হল্কা বহিতে লাগিল।

পার্ব্বতীর উগ্র তপস্যা শেষ হইল যখন গ্রীষ্ম গেল। শিবপার্ব্বতীর মিলন হইল অর্থাৎ বর্ষা আসিল, মদন পুনর্জ্জীবিত হইলেন। বর্ষায় যে বিরহীদের মদনব্যথা জাগিয়া উঠে তা ত প্রসিদ্ধই আছে যথা,—মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা বৃত্তিচেতঃ, কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনী জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।

তারপর হরগৌরী মনঃসুখে মিলন উপভোগ করিতে লাগিলেন। হরিৎশস্যতৃণাবৃত, কুমুদকহ্লার-বিভূষিত, শুভ্রজ্যোৎস্নাবিধৌত শরতে প্রকৃতি স্বামি-সোহাগিনী নারীর ন্যায় ধরাতলে প্রকাশিতা হন। তাই শিবদুর্গার মিলন সম্ভোগচ্ছলে কবি ধরাতলে সুষমাময়ী প্রকৃতির প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রচ্ছদপট

ঠাকুর ব'লেছিলেন, 'আমার ছবি থাকবে ঘরে ঘরে, এমন দিন আসবে।' সেই শুভক্ষণ কি সমাগত ? বেলুড় মঠের একজন বিশিষ্ট সাধু বললেন, 'প্রতি শনি রবিবারে প্রায় দশ হাজার দর্শক আসে, যারা ঠাকুরের ভক্ত। আর যারা আসে, তাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক জাতির মানুষকে দেখতে পাই। আগে কিন্তু এমনটি ছিল না।'

মানুষের ঠাকুর-ঘরে শুধু এখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নেই, বাঙালীর প্রত্যেকটি ব্যবসা-কেন্দ্রেও তাঁর প্রতিকৃতি রাখতে দেখা যায়।

বাঙালী তো ছার, সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত আমেরিকানবাসী ঠাকুরকে প্রতিনিয়ত পূজা করে। প্রচ্ছদচিত্রে আমেরিকার অন্যতম একজন বিশিষ্ট মহিলাকে মাথায় ঠাকুরের ছবি ধ'রে প্রণাম করতে দেখা যাচ্ছে। এই সংখ্যায় 'আমেরিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' রচনা দ্রষ্টব্য।

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

পিকিনের সেই প্রথম সন্ধ্যা। শ্যাম রাখি না কুল রাখি—অর্থাৎ সাততলার উপর বিলাতি মতে অথবা একতলায় চীনা পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণ করব, সে সমস্যা আজকের দিনটা নয়। নতুন এসেছি, অতএব নিয়মমাফিক ভোজ খেতে হল। ভোজ-পর্ব সমাধা করে বেরিয়ে পড়লাম ক'জনে।

হোটেলের প্রাঙ্গণে কত যে মোটর, তার সীমাসংখ্যা নেই। মোটরের সংখ্যা কমই এখানে। একজনে রসিকতা করে বললেন, যে ক'টা আছে সব বুঝি অতিথি-পরিচর্যায় এনে মজুত করেছে।

জন চার-পাঁচ হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল।

যাবেন কোথাও?

উঁহু, এই সামনের দিকে একটুখানি পায়চারি করছি।

এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে ফাঁক বুঝে একসময় রাস্তায় নেমে পড়লাম। হাঁটতে চাই। কিন্তু টের পেলে রক্ষা নেই, মোটরের ব্যূহে ঘিরে ফেলবে।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা। খান তিন-চার বাড়ির পরে অপেরা-হাউস। উঁকিঝুঁকি দিচ্ছি সেখানে। কর্মচারী একজন দরজা আটকে কি বলল।

জানি রে বাপু, টিকিট না হলে ঢোকা যায় না। ঢুকে বসবার মন-মেজাজ এখন নেই। রাতের পিকিন দেখব।

এক ভদ্রলোক, দেখি, তাড়া করেছেন আমাদের। নতুন জায়গা, গতিক বুঝি নে—কোন রকম দোষ-ঘাট হল নাকি? ইংরেজি বলেন তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার মতো। আমাদেরই সমগোত্রীয়, শুনে অতএব উল্লাস বোধ করি।

টিকিট চেয়েছিল আপনাদের কাছে। ঐটে নিয়ম কি না! তা আসুন আপনারা—টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

আজকে দেখব না—

সকরুণ মিনতি করে তিনি বলেন, বিলক্ষণ! আমাদের দোর-গোড়া অবধি এলেন—সে কি হয় কখনো?

মাপ করুন, আর হবে না এমনটি। কেও-কেটা ব্যক্তি এখন—চলাফেরা অতঃপর মাপজোপ করে হবে।

অনেক কষ্টে হাত ছাড়ানো গেল। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু দরজা খোলা। ১লা অক্টোবর জাতীয় উৎসব—তিন বছর আগে মাও-সে-তুং ঐ দিন মুক্তির পতাকা তুলেছিলেন, নিপীড়িত চীন সকল কালিমা মুছে পাঁচ-তারার আলোয় মাথা তুলে দাঁড়াল। সেই আয়োজনের ধুম লেগেছে। মানুষজন মহাব্যস্ত। আমাদের অবোধ্য চীনা-অক্ষরে কত কি লিখছে কাপড়ের উপর, পিচবোর্ড কেটে তার উপর রং করে হাজার হাজার শান্তির কপোত বানাচ্ছে। নানা রঙের কাগজ কেটে স্তূপীকৃত করছে, ফুল হবে নানান রকমের। উৎসব-দিনের অনেক বাকি, কিন্তু মানুষ মেতে উঠেছে এখন থেকেই।

এক ঘরে তিন জন আমরা—আমি, ক্ষিতীশ আর মীরাটের এক জাঁদরেল উকিল ব্রজরাজ কিশোর। উকিল বাবুটি ফর্শা লম্বা, মাথায় টাক—চোস্ত ইংরেজি বলেন। দু-জনের ঘরে কিছু অতিরিক্ত

কৃষক-চীনের যৌথ খামার (Mutual-aid team)

দীর্ঘায়ু ও দয়ার হল

আসবাব ঢুকিয়ে তিনের জায়গা হয়েছে। কি করবে, নতুন তৈরি শান্তি-হোটেলও ভরাট হয়ে গেছে—এত অতিথির জায়গা কোথা? জানলার কাছে নিরিবিলি দিকটা আমি দখল করে নিলাম। জানলা হলেও—ওদিকে ঘরে আটকা—আলো বড়-একটা আসে না। হোটেলের সব চেয়ে খারাপ ঘর—সেইটেই আমাদের কপালে পড়ে গেল।

তা হোক, ঘাবড়াবার কি আছে, ঘরে থাকি আর কতটুকু? ওখানে চলো, এটা দেখ, ঐ কনফারেন্সে যাও—লেগেই আছে একটা-না-একটা। আমি এসেছি নতুন-চীন দেখতে—এই কম সময়ের মধ্যে দেখে-শুনে যথাসম্ভব আলাপ পরিচয় করে যাবো। হাত-পা মেলে জিরোতে এবং খেতে যাঁরা এসেছেন, উৎকৃষ্ট ঘরে বহাল-তবিয়তে শুয়ে শুয়ে তাঁরা আরাম করুন গে।

ঘরের সুখটা শুনুন এবারে। শয্যার পাশে ফোন। শুয়ে-শুয়েই তামাম পিকিন শহরের সঙ্গে মোলাকাত করুন। শিয়রে সুইচ—শীতের দেশে পাখার চল নেই—এন্তার আলো জ্বালুন আর আলো নেবান। আর আছে বোতাম সুইচের পাশে। বোতামে

স্বর্গীয় মেঘের দরজা

আঙুল ছোঁয়ানো মাত্র দরজায় টোকা পড়বে; মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন, আসতে পারি?

তার পরে যা খুশি লোকটাকে ফরমাশ করুন আকাশের চাঁদ, বাঘের দুধ—এই জাতীয় কয়েকটা বস্তু বাদ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এনে হাজির করবে। সুচ-সুতা-বোতাম আঠা-খাম-কাগজ ইস্তক সাণ্ডুইচ-কফি-আইসক্রিম—রাত দুপুরে মুরগির কাটলেট অবধি। সোফা ও নিচু-টেবিল ঘরের কেন্দ্রদেশে। সেই টেবিলে অহরহ, দেখবেন, ফলের গাদা নানা জাতীয় কেক চকোলেট সিগারেট ইত্যাদি। অব্যবহারে বাসি হয়ে গেল তো বদল করে আবার টাটকা এনে দিচ্ছে। এক রকম আঙুর—রক্তাভ রং, সুমিষ্ট ও চমৎকার গন্ধ, টকের লেশমাত্র নেই। উত্তর-চীনের কোন কোন অংশে ফলে। ঐ আঙুর এক চালান এসেছিল হোটেলে। তার পরে আর কোন আঙুর মুখে রোচে না। ঐ লাল আঙুর যদি আনতে পারো বাপু, তা হলে গোটা কয়েক দাঁতে কাটতে পারি।

শোনা মাত্র শশব্যস্তে বেরিয়ে যায়। সে কালের বর্ষীয়সীরা গুরুঠাকুর সম্পর্কে এমনি তটস্থ হতেন জানি—গুরু চটলে পরকালের দরজায় তালা পড়বে। এখানেও প্রায় তাই। অতিথি আমরা, শান্তি-সৈনিক—সর্বোপরি ভারতীয়। ব্রাহ্মস্পর্শ ঘটেছে। খুঁজে খুঁজে অতএব থোলো দুই লাল আঙুর জোগাড় করে আনল। কাতর হয়ে বলে, আর মিলছে না এখন। কালকে দিনমানে···

কত যেন অপরাধ করে বসেছে, লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই—মুখচোখের ভাব এমনিধারা। অতএব ক্ষমা করে ফেলে ঐ দু-থোলো অর্থাৎ আধসের খানেক আঙুরে মুখশুদ্ধি করে নেওয়া যাক, কি বলেন? রাগ করে থাকাটা কিছু নয়।

হোটেলের এই কর্মীদের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে, সত্যি, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। চাকর বলতে সরম লাগে—নবীন-চীন পরিগঠনে তারাও মহাকর্মী। আর বাড়িয়ে বলছি নে—আপনার আমার চেয়ে ঢের ঢের উঁচু দরের মানুষ। নানা দেশবাসী ও নানান মেজাজের অতগুলো মানুষের কি সেবাই করেছে! হাসি ছাড়া মুখ দেখিনি কখনো। যেন ওরা আঁধার মুখ করতে জানে না।

সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর অতিক্রম করে লিফ্‌টে যাচ্ছি। হাসিমুখের অভিবাদন আসছে এদিক-ওদিক থেকে। লিফটম্যান প্রসন্ন হাস্যে বলে, গুডমর্নিং। দূর-আকাশে সূর্য হাসছে, এদের মুখে সেই ঝিকিমিকি।

ঐ যে বললাম—বিশ্রাম ছিল না একটুও। সারা দিনমান এবং রাত দুপুর অবধি এটা-ওটা লেগেই আছে। ঠাসা প্রোগ্রাম—তুরকি-নাচন নাচিয়ে ছাড়ছে। বঙ্গদেশের কিঞ্চিৎ আয়েশি মানুষ আমরা, হতভাগারা বুঝবে না তা কিছুতে। চল্লিশটা দিনে চল্লিশ মাসের দেখা দেখিয়ে দিয়েছে। ছিমছাম থাকা বরদাস্ত করতে পারিনে—কেমন যেন পালিশ-করা কাঠের পুতুলের মতো মনে হয় নিজেকে। জামা-কাপড় বই-কাগজ বিছানা-পত্র মহানন্দে হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করব, নইলে জীবন-ধারণের সুখ কি? ঘর ছেড়ে যখন বাইরে চলে যাই, মনে হবে—গজ-কচ্ছপের লড়াই হয়ে গেছে এইখানে একটু আগে। মনিব্যাগ এবং বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ হাজারের নোটও ছড়িয়ে রয়েছে অনেকদিন। ফিরে এসে অবাক হয়ে

যেতাম। যেন পাল্লা চলেছে—আমরা কত ছড়াতে পারি, আর ওরা কত গোছাতে পারে! কত যে ফুলের তোড়া পেতাম—একটা ছাগল থাকলে খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে স্বচ্ছন্দে মোষ হতে পারত। অবহেলায় সেই সব ফুলের তোড়া, ওরা করত কি—কোত্থেকে ফুলদানি জোগাড় করে টেবিলের উপর পরম যত্নে সাজিয়ে রেখে দিত। বিছানায় সগু-পাটভাঙা চাদর, বাথরুমে নতুন সাবান, নতুন একদফা তোয়ালে। কতক্ষণ ছিলাম না—সমস্ত পরিমার্জনায় ঘরের যেন নতুন রূপ খুলে দিয়েছে।

বিদেশি মানুষগুলা কয়েকটা দিন ছিল তোমাদের আশ্রয়ে। আর কোনদিন দেখা হবে না জীবনে। এমন করে আপন করে নিলে, এত দূরে বসে আজ নিশিরাত্রে এই কাহিনী লিখতে লিখতে মন স্নেহসিক্ত হয়ে উঠছে···

যেদিন পিকিন-হোটেল ছেড়ে চলে যাব, সকলে উসখুস করছি—কি দেওয়া যায় ওদের? কয়েক লক্ষ ইয়ুয়ান কিম্বা ভারত থেকে নিয়ে-যাওয়া কোন জিনিষ? উঁহু—কিছুই নয়, ওতে নাকি নীতিহীনতা দেখা দিতে পারে, প্রাপ্তির লোভে সেবার হয়তো মানুষ বিশেষে কম-বেশি হবে ভবিষ্যতে। আর ওরাও প্রত্যাশা করে না। দিয়ে দেখুন, স্পর্শ করবে না উপহারের জিনিষ—কথায় বোঝাতে পারে না তো, এক অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসবে।

অথচ—পিছিয়ে যান দিকি কয়েকটা বছর—ঐ চীনেরই রণক্ষেত্রে সৈন্স আহত হয়ে আর্তনাদ করছে, বিনা বখশিসে কেউ তাকে ছোঁবে না। ছুটছে—যে-লোকের কাছে মোটারকম প্রত্যাশা আছে। এ আমার মনগড়া কথা নয়—শতেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, ছাপা বইয়েও রয়েছে এবম্বিধ বিস্তর কাহিনী। আর পশ্চিমে ইউরোপীয় অঞ্চলে একটু দৃষ্টিপাত করুন—এবং তাদের তল্পিবাহক আমাদের দেশি হোটেলগুলার দিকেও। এক টাকা খাওয়ার চার্জ ধরল তো টিপস লাগবে অন্যূন অষ্টগণ্ডা।

না—নতুন-চীনে এ সমস্ত একেবারে নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু ভালবাসা, হাতে-হাতে স্নেহস্পর্শ, আলিঙ্গন? তাদের এক-একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে আমরা ঋণ স্বীকার করে এসেছি।

প্রাতরাশের পর চিঠিপত্র লেখা শেষ করতে দশটা। আমাদের জন্ত আলাদা পোষ্টাপিস বসিয়েছে নিচের তলায় ড্রয়িং-রুমের এক পাশে। গাদা গাদা কাগজ-খাম ঘরের টেবিলে, তাতে না কুলায় পোষ্টাপিসে এসে হাত পাতলে যত খুশি পেয়ে যাবে। দেদার লিখে যাও—যদৃচ্ছা লিখে দিয়ে দাও পোষ্টাপিসওয়ালাদের কাছে, মালপত্রও পাঠাতে পারো ছ-সেরি পাঁচ-সেরি প্যাকেট বেঁধে বেঁধে। হিজিবিজি লেখা একটা স্লিপ ওঁরা এগিয়ে দেবেন, খানাঘরের মতন এখানেও স্লিপের উপর সই মেরে ছুটি। তারও করা যায়—খরচ পড়ে শুনলাম কথা প্রতি টাকা পাঁচেক (ভারতীয় টাকা, ওঁদের ইয়ুয়ান নয়)। তা সে যা-ই লাগুক, সে টাকাও গৌরী সেনের—অতএব আমাদের কি ভাবনা? কেবল (cable) করছেনও অনেকে, খবরাখবর পাঠাচ্ছেন। প্রেমপত্রাদি ছাড়ছেন না বোধ হয়। ছাড়লেও ও-তরফ থেকে আপত্তি হবে না, চক্ষু বুজে পাঠিয়ে দেবেন! কিন্তু অতিথিদের আক্কেল-বিবেচনা আছে তো!

দশটা বেজে গেল। বেরুনো হবে এবার। বাস অপেক্ষমান। দোভাষি ছেলেমেয়েরা ভাগ করে নিয়েছে কারা সামলাবে কোন্ দলকে। নতুন বয়স—অফুরন্ত তাদের অধ্যবসায়, সময় মতো ঠিক নিয়ে বের করবে। সময় মেপে প্রতিটি কাজ—প্রোগ্রামের একটু এদিক-ওদিক হতে দেবে না। সাগর-পাহাড় পার-হয়ে-আসা অবোধ মানুষগুলোর গার্জেন হয়ে পড়ে স্ফূর্তির আর অবধি নেই। এটা দেখায়, ওটা বোঝায়—নিজেরা যা বোঝে না, তা-ও বোঝাতে ছাড়ে না।

এ কোথায়—তোমাদের কেমনধারা য়্যুনিভার্সিটি গো?

সঙ্কীর্ণ লোহার গেট পার হয়ে এসে বাস ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢুকল—যেন জেলের মধ্যে এনে পুরেছে। ব্যাপার তাই বটে। চিয়াং-কাই-শেকের আমলে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ থাকত এখানে, আর তার প্রধান দলবল। তাই এত উঁচু পাঁচিল—এমন উদ্ধত লোহার দরজা। বড় এক পুকুর—বরফ-পড়া রাত্রে কত কম্যুনিষ্টকে ঐ পুকুরে চুবিয়ে চুবিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে!

হেসে হেসে দেখাচ্ছে আমায় সুই-ইঞা-মিঁ। নতুন গ্রাজুয়েট হয়েছে মেয়েটা—গোলাকো মুখ, চোখে নিকেলের চশমা, মিষ্টি হাসে কথায় কথায়। আজকে নবীন কালের ছেলেমেয়ের হাস্তোল্লাসে পুরানো কলঙ্ক ধুয়ে মুছে গেছে। এ যেন আর এক জায়গা, এরা সব আর এক মানুষ।

পিপল্‌স্ য়্যুনিভার্সিটি। শুধু কেতাবি বিদ্যা নয়, দেশ গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। আনকোরা প্রতিষ্ঠান—১৯৫০ অব্দে তৈরি। কলকাতা পুরানো ইলিসিয়াম রো'র বাড়িটায় গান্ধী-আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে যা হয়—সেই ব্যাপার আর কি! ইস্কুল, নার্সারি-ইস্কুল, কলেজ, য়্যুনিভার্সিটিতে সারা দেশ ছেয়ে দিচ্ছে এরা এই নতুন আমলে। এক পিকিন শহরেই গোটা চারেক য়্যুনিভার্সিটির খবর পেলাম।

লম্বা টেবিলের এদিকে-ওদিকে সকলে বসেছি। য়্যুনিভার্সিটির

ছাতে-ঢাকা পথ

কর্তারা আছেন। আছেন কয়েক জন শ্রমিক-বীর—ফ্যাক্টরির কাজে দেশের ধনোৎপাদনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতির সমতুল্য আসন ঐ বীরবর্গের। চা ইত্যাদি যথারীতি সম্মুখ ভাগে। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক-একজন উঠে দাঁড়াই, সেক্রেটারি নাম-ধাম ও ক্রিয়াকর্ম শুনিয়ে দেন। আর হাততালি।

একটি ভারতীয় মেয়ে—চক্রেশ জৈন। আমাদের দলের সে নয়, পিকিনে থাকে। বাপ জগদীশ জৈন পিকিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দির অধ্যাপক। ভারত থেকে অধ্যাপক মশায়কে নিয়ে গেছে। মেয়ে গেছে বাপের সঙ্গে। সে-ও হিন্দি পড়ায়। আর বাপের খবরদারি করে, দূর বিদেশে অধ্যাপক জৈনের মা হয়ে বসেছে।

জৈনকে চিনলেন তো? সে-আমলে কাগজে পড়েছিলেন, বেশ খানিকটা হৈ-চৈ হয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে। গান্ধিজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র দৈবক্রমে ইনি কিছু জানতে পারেন। পুলিশকে জানিয়েওছিলেন সে কথা। পুলিশ তেমন আমলের মধ্যে আনেনি, এত বড় সর্বনাশ ঘটে গেল তাই। এই নিয়ে অধ্যাপক জৈন বই লিখেছিলেন, আই কুড নট সেভ বাপুজি—বাপুকে বাঁচাতে পারলাম না।

এতগুলো দেশের মানুষ পেয়ে বর্তে গেছে চক্রেশ। চোখে-মুখে কথা বলে মেয়েটা—কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছে। মাস ছয়েক ধরে জমে-ওঠা সমস্ত কথা একসঙ্গে বলে ফেলতে চায়। ইংরেজি বলছে সুপ্রচুর, চীনা বলে, হিন্দিও বলছে। আর ছটফটে এমন—একটা মিনিট স্থির হয়ে বসা তার কুষ্ঠিতে লেখে না।

নিয়মমাফিক বক্তৃতা দিয়ে শুরু। চ্যান্সেলার সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক—লিখিত-বক্তৃতায় ঢালাও ধন্যবাদ দিলেন সকলকে। বললেন নতুন য়ুনিভার্সিটি-স্থাপনার যাবতীয় ইতিহাস ও কাজকর্মের কথা। তার পরে ভাইস-চ্যান্সেলার। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমাদের তরফ থেকে। কত ছাত্র, কতগুলো ক্লাস, শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? তাবৎ ব্যবস্থা বুঝে নিতে চাই ঐ এক চেয়ারে বসে বসে।

এবারে নিয়ে চললেন একজিবিসন-ঘরে। নতুন-চীনের কর্মোৎসাহের পরিচয় থরে থরে সাজানো। একটা ঘরে চীন-বিপ্লবের অনন্ত ও সুবিস্তৃত ইতিহাস। দরজা দিয়ে ঢুকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছি, এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়। কত ছবি, কাহিনী, কত রকমের কাগজপত্র। মুক্তি-ফৌজ ঝোড়ো রাতে নিঃসীম নদী পার হয়ে যাচ্ছে—তার ভয়াবহ ছবি। যে শহীদেরা প্রাণ দিল তাদের কতজনের ছবি, টুকিটাকি তাদের ব্যবহারের জিনিষপত্র। এ সমস্ত অভিভূত করে আমাকে, আমাদের সর্বত্যাগী ছেলেমেয়েদের কথা পাশাপাশি মনে পড়ে যায়।

ভারতীয় দলের পরামর্শ-সভা বিকালবেলা। এ-সভা লেগেই আছে—পথের কষ্টে কাল বড় ক্লান্ত ছিলাম, আমাদের ক'জনকে রেহাই দিয়েছিল তাই। হোটেলের প্রশস্ত একটা ঘরে একসঙ্গে মিলেছি।

শান্তি-সম্মেলন পঁচিশে অর্থাৎ আগামী কাল থেকে বসবার কথা। ক'দিন চলবার পরে ১লা অক্টোবর বন্ধ থাকত ওদের জাতীয় উৎসবের দরুন। উৎসব অন্তে আবার চলত।

বানচাল হচ্ছে এই ব্যবস্থা। কত দেশের কত মানুষ একত্র জমবে—বহু জনে এখনো পথে পড়ে, এসে পৌঁছতে পারে নি। আসছে তারা অনেক কষ্ট করে। কাছাকাছি এই জাপানের কথা ধরুন। ছাড়পত্র অনেকেরই ভাগ্যে হয়নি, কয়েক জনে শুধু পেয়েছে। মানুষগুলোও নাছোড়বান্দা—সমুদ্রটুকুর ও-পারে অপরূপ আনন্দ-সমাবেশ—ছাড়পত্র দিলে না, তা বলে কি পড়ে থাকবে দ্বীপের চৌহদ্দির মধ্যে? সমুদ্র সাঁতরে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়—কি কৌশলে বন্দুক-বেয়নেটের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে এ-তটে এসে পৌঁছবে—খোদায় মালুম। গবর্নমেণ্ট খুব নাকি তড়পাচ্ছে—দেশে ফিরতে হবে না? দেখে নেবে একবার ওদের খপ্পরের মধ্যে পেলে।

আরও আসছে—বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েটনাম, দখিন-পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চল থেকে। আগে তো ভাবা যায়নি, শান্তি-সম্মেলনের মতো এমন নিরীহ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও কর্তাদের এতখানি দ্বিধা-সন্দেহ। পথ তবু কিছুতে রুখতে পারল না—আসছে তারা, এসে পড়ল বলে। নদী-সমুদ্র পাহাড়-জঙ্গল পার হয়ে পায়ে হেঁটে আসছে—তারিখ মতো তাই এসে পৌঁছতে পারল না। ছাড়পত্রধারী ভাগ্যবানদের মারফতে খবর পাঠিয়েছে—যাচ্ছি গো, সবুর করো কয়েকটা দিন ভাই। এত কষ্টে হাজির হয়ে শেষটা না দেখতে হয়, শলা-পরামর্শ অন্তে যে যার কোটে ফিরে গেছে।

তাই তারিখ পেছুল। জাতীয় উৎসব চুকে যাক, সম্মেলন তার পরের দিন থেকে চলবে। অবিচ্ছেদ আট-দশ দিন ধরে চলতে পারবে, মাঝে কোন বিরতির দরকার পড়বে না। ২রা অক্টোবর তারিখটা ভারতীয় পঞ্জিকার নির্ঘণ্টমতে পরম শুভও বটে—মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন। অধুনাতম পৃথিবীতে শান্তির সাধনায় প্রাণপাত করেছেন অমন আর কে? এই ভাল হল—গান্ধিজী ধরায় এলেন, সেই পুণ্য দিনে শান্তি-সম্মেলনের আরম্ভ।

আবার এক মতলব হচ্ছে—

কার্তিক কানে কানে খবরটা দিল। এত দেশের এত মানুষ জুটেছে—বলুন দিকি, আমাদেরই কি মাথা মোটা সকলের চেয়ে? তারা তো রা কাড়ে না, নোটের বাণ্ডিলে পকেট মোটা করে দিব্যি গোঁফে তা দিয়ে বেড়াচ্ছে!

সাব্যস্ত হয়েছে, দশ লক্ষ করে ঐ যে হাতখরচা দিয়েছে, ভারতীয় দল ও-টাকা নেবে না। অন্তর্যামীর মতো মনের কথা বুঝে নিয়ে অবিরত জিনিষপত্রের যোগান দিচ্ছে, হাত-খরচের ফাঁক রেখেছে কোথা?

শুনে ও-পক্ষ তো হাঁ-হাঁ করে ওঠেন।

আমাদের চিরকালের প্রথা—অতিথি এলে খাওয়া-দাওয়া শুধু নয়, সম্মান-দক্ষিণা দিতে হয়। হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। ভারতেও আছে নিশ্চয় এমনি-কিছু। থাকতেই হবে। প্রাচ্য আতিথ্যের রীতি এই।

কুয়োমিনটাং আমলে ছিল না—ছেড়ে দিন মশায়, সে কথা। সকল পাট উঠে গিয়েছিল সে দুর্দিনে। যখন দিন পেয়েছি, রীতপর্ব একে একে সমস্ত বহাল হবে। নতুন চীনে দেশে-বিদেশের মানুষ প্রথম এই একসঙ্গে পায়ের ধুলো দিলেন, কিছুই তো করা হল না—অতি-সামান্য এইটুকুও যদি গ্রহণ না করেন, আমরা মরমে মরে যাবো।

এর উপর তর্ক চলে না। নেওয়া হল টাকা, বাটোয়ারা হল। চুপিচুপি ঠিক রইল, হজম করা হবে না—ফেরত দিতে হবে কয়েকটা দিন পরে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে।

হল তাই। সকলে অবশ্য পুরোপুরি দিতে পারেন নি, খরচ হয়ে গিয়েছিল কিছু কিছু। সমস্ত একত্র করে দান করা হল শিশুমঙ্গল সমিতিতে। কেমন! তোমাদের নিয়েছি যখন, আমাদের এ দানও নিতে হবে। নইলে মর্মাহত হতে জানি আমরাও।

হাতখরচের টাকা ফেরত দেওয়া হল এমনি ভাবে। সাঁইত্রিশটা দেশের মধ্যে ভারতীয়েরাই দিল শুধু। ঐ যেমন কার্তিক বলল—অন্ত সবাই উচ্চবাচ্য না করে পকেটস্থ করলেন।

পরের দিন, অর্থাৎ পঁচিশে। সম্মেলন যখন হচ্ছে না, দেখাশুনো করে বেড়াও। ঘরে পড়ে থাকবে কেন—চীনকে দেখে বুঝে নাও, প্রাচীন সম্পর্কটা ঝালিয়ে নাও পরস্পরের মধ্যে। এটাও কাজ সকলের—

আমি বলি, সকলের বড় কাজ।

গ্রীষ্ম-প্রাসাদে (Summer Palace) যাচ্ছি। বরাবর ওখানে রাজরাজড়ারা গিয়েছেন সান-ইয়াৎ-সেনের অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত। তাঁরা যেতেন ঘোড়ায় পালকিতে, আমরা বাসে। চারখানা ঝকঝকে নতুন বাসে মিছিল করে চলেছি। চানটান সেরে নিয়েছি, মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া ওখানে। আটশ' বছর ধরে যে ঘরে কেবল রাজা-রাণীরা খেয়ে এসেছেন, সেইখানে আজ আমাদের পাত পড়বে। বুঝুন। সারা দিনমান কাটবে ওখানে—সারাদিন ঘুরেও নাকি নমো-নমো করে দেখা হবে, এমনি বৃহৎ জায়গা।

শহরের বাইরে—বেশ খানিকটা দূর। বাসে ঘণ্টাখানেক লাগল। সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে উঠলেন, দেখছেন—একটা পাখী নেই কোনদিকে।

সত্যিই তো! এত পথ এলাম, এত গাছগাছালি—পাখী উড়তে দেখিনি কোথাও। আমার বাংলা দেশের মতো পাখীর ডাক ভেসে আসে না অলক্ষ্য থেকে।

সুবোধ বন্দ্যো—ব্যক্তিটিকে মালুম হচ্ছে তো? বিধান-সভার সভ্য—খবরের কাগজে হামেশাই যাঁর নাম পাচ্ছেন। এখানে যেমন—চীনেও দেখলাম তেমনি, কাউকে ছেড়ে কথা বলবার মানুষ তিনি নন। চোখ ও মন খোলা—প্রতিটি জিনিষ জেনে বুঝে নিতে অসীম চেষ্টাপর।

বেলা সওয়া-দশটা। বাস থেকে প্রাসাদদ্বারে নামলাম। ব্রোঞ্জের বিশাল সিংহ পাহারা দিচ্ছে। অদূরে 'দীর্ঘায়ু ও দয়ার হল'। ঘর-বাড়ি পথ-পাহাড়, অলিন্দ, দরজা, দ্বীপ—সকল বস্তুরই এক একটা বিচিত্র নাম। কয়েকটা ধাপ উঠে ভিতরে পৌঁছতে হবে। রাজবাড়ি কি না—সিঁড়ি থেকেই অভিনবত্ব শুরু। ধাপ দু-পাশে—মাঝখানটা ঢালু হয়ে উঠেছে, বিশাল ড্রাগন খোদাই-করা সেখানে।

দু-পাশের সিঁড়ি দিয়ে সকলে উঠছেন। আমরা কয়েক জন মাঝের ঢালু পথে ড্রাগন-দেহের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে। নতুন কায়দায় উঠে যাওয়ার বাহাদুরি আর কি!

চক্রেশ এসেছে দলের সঙ্গে। সে বলল, আরে সর্বনাশ—মুণ্ডু কাটা যাবে যে!

স্তম্ভিত হলাম। আর যাই হোক, কন্ধকাটা হয়ে দেশে ফিরব কোন্ লজ্জায়?

খিল-খিল করে তরঙ্গিত হাসি হাসতে লাগল চক্রেশ।

বলে, হাসছি বটে আজ। হাসি বেরিয়ে যেত সেই আমলের কেউ দেখতে পেলে। মাঝখানের ঐ জায়গা দিয়ে যাবে শুধু রাজশিবিকা। শিবিকায় রাজা থাকবেন—অপর কেউ নয়। অপরে পা ছোঁয়ালে তক্ষুণি গরদান। রাজার পথে চলবে, এত বড় অস্পর্ধা!

বাজে লোকের পথ হল দু-পাশের ঐ ধাপগুলো। বাজে মানে কি আপনি-আমি? রাণী, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি—ওঁরাই সব। ভারি দরের মানুষ ছাড়া এখানে ঢুকবার জো ছিল না। কুয়োমিনটাং আমলেও—এই সেদিন অবধি। এখন খোলা দরজা। যে-কেউ এসে দেখ, শোন, ঘুরে বেড়াও।

মহারাণীর অফিসঘর। প্রাঙ্গণ ও অলিন্দে নানা জীব-জানোয়ার—ব্রোঞ্জ ও নানা ধাতুতে গড়া। ড্রাগন, ময়ূর, সু-নি নামক অবাস্তব পৌরাণিক জীব। বড় বড় পাত্র অগ্নি-ভয়ে জল রাখবার জন্য। ঘরের মাঝখানে সিংহাসন। দু-পাশে দুই হাঁসের মাথায় বাতিদান, ধূপদান। দশম শতাব্দীর তৈরি সিল্কের বিচিত্র কারুকর্ম। শান্ত সমাহিত প্রভু বুদ্ধের মূর্তি একটি প্রান্ত জুড়ে···

এই গ্রীষ্মপ্রাসাদ বাইরে থেকে সামান্য, প্রায়-সাধারণ—বোঝা যায় না, এত বস্তু আছে ভিতরে। পাথর-কাটা পথ অতিক্রম করে এসে হঠাৎ দেখি সুবিশাল লেক। জল সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল—চোখ জুড়িয়ে যায়। তিন ভাগই জল এখানে, এক ভাগ মাত্র ডাঙা। লেক ঐ তো হল—তা ছাড়া পদ্ম-ভরা কত পুকুর! খালও আছে—জেড-প্রস্রবণের জল লেকে নিয়ে আসা হয়েছে পাহাড়ের গোড়া থেকে খাল খুঁড়ে। উঁহু, খাল কেন হবে—নদী। নামটা শুনবেন?—সোনালি জলের নদী।

যত এগোই, বিস্ময়ের পর বিস্ময় উন্মোচিত হতে থাকে। এত বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য ধারণায় আসে না। দূর-পাহাড়ের উপর ঘর-বাড়ি দেখা যায়—ওগুলোও এই গ্রীষ্মপ্রাসাদ এলাকার মধ্যে। নেই যে কোনটা! পাহাড়, দ্বীপ, সেতু, মণ্ডপ, জয়স্তম্ভ, কক্ষ, অলিন্দ, পার্ক, ছাতে-ঢাকা রাস্তা—এবং পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু জায়গায় বিশাল বুদ্ধ-মন্দির। না জানি কোন কবির নামকরণ! গোটা জায়গাটায়ই এক সময়ে নাম হয়েছিল—'স্বচ্ছ ঢেউয়ের পার্ক'; এক ফটকের নাম 'রঙীন মেঘের দরজা'; লেকের মধ্যে রয়েছে 'পরী-দেশের দ্বীপ'; পাহাড়ের উপরে 'ভালবাসার শিখর'। একটা ঘর 'সুবাসের বাস'—লতায় পাতায় ফুলে অপরূপ সাজানো; নাকে শুঁকতে হয় না—চোখের দৃষ্টিতেই বুঝি সুবাসের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। লেকের কিনারায় পদ্মবনের পাশে 'বাসন্তী-মণ্ডপ' হাতছানি দিয়ে ডাকে বসন্তরাত্রে অলস বিশ্রামের জন্য।

পৃথিবীখ্যাত অপরূপ এই প্রমোদনগরী। আটশ' বছরে কত রাজা কত রাজবংশের বিলয় ঘটেছে, নগরী-রচনা অব্যাহত চলেছে তবু। আগুনে পুড়িয়েছে ইংরেজ আর ফরাসি, ভেঙে চুরমার করেছে আটটা দুশমন জাত একত্র হয়ে—আবার নতুন ইমারত গড়ে উঠেছে ভগ্নস্তূপের উপর।

পদ্ম আর বাঁশবন দেখে ক্যান্টনের পথের কথা মনে পড়ে যায়। ব্যাপারও তাই! সেকালের এক দুঃসাহসী রাজা (চে-লুং) ইয়াংসি পার হয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ-চীনে। সেখানকার নিসর্গ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দক্ষিণের গাছপালা আমদানি করে এই উদ্যান সাজিয়েছেন। নানা জাতীয় বামনগাছ—পাঁচ-সাত শ' বছরের বাড়বৃদ্ধি ফুল্যে হাত খানেক। পৃথিবীর আর কোথাও হেন বস্তু দেখা যায় না, এই গাছ-লালনের কৌশল এরাই শুধু জানে।

লেকের আগে অন্য নাম ছিল, এখন কুয়েনমিন লেক। ছোট ছিল, কেটে বড় করেছে। সেই মাটি পাহাড়ের গায়ে পড়ে পাহাড়েরও আয়তন বেড়েছে। জলের মাঝখানে 'পরীদেশের দ্বীপ'—ঘরবাড়ি ও গাছগাছালি মেশামেশি হয়ে আছে। মার্বেল পাথরের তৈরি সতের খিলানের সেতু—হুড়োহুড়ি করে সেতুর উপর দিয়ে ছুটলাম সকলে দ্বীপের দিকে। চার সিংহ সেতুমুখ পাহারা দিচ্ছে—ভয় কি! পাথরের সিংহ।

লেকের উপর পাহাড়ের গায়ে মার্বেলের নৌকা। দু'শ' বছর আগে তৈরি—তখন ছিল শুধুই নৌকা—বাড়িয়ে ও ঘষামাজা করে দোতলা জাহাজের রূপ দিয়েছে ১৮৯২ অব্দে। অযত্নে অবহেলায় পড়ে ছিল, নতুন আমলে পরিপাটি হয়েছে আবার।

পাহাড়ে উঠছি এবার—বুদ্ধমন্দিরে। উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। পথ সংকীর্ণ। খানিকটা জায়গায় সিঁড়ির মতো—ফাঁক-ফাঁক টেরা-বাঁকা সিঁড়ি। মন্দিরের পথ বলেই বোধ হয় এমনি—অনায়াস-প্রাপ্তিতে পুণ্য নেই। আরে, আরে—হাত ধরতে আসে যে মেয়েগুলো! এক এক ফোঁটা কলেজের মেয়ে—পাহাড়ের এই দুরারোহ পথ—ভারি আস্পর্ধা বাপু তোমাদের! রাগ করে জোর পায়ে ওদের আগে গিয়ে উঠি। এই তো সেদিন অবধি পায়ে ছোট লোহার জুতো পরিয়ে রাখত, এতটুকু পা নিয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয় যাতে। মেয়েমানুষ খোঁড়া হয়ে বেশ নাচের ঠমকে চলবে, সেই তো শোভা! সান-ইয়াত-সেন প্রাচীন বনেদি রীতি রহিত করে চিরকালের বামনদের চাঁদ ছোঁয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে দিলেন মনে মনে। তাই দেখুন, দুর্গম গিরিপথে দাপাদাপি করছে উল্লাসিনী সাহসিকা-দল। আর কিনা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, হাত ধরে গিরিশীর্ষে নিয়ে তুলবে বলে!

উপরের মন্দিরের নিম্নদেশে আর এক মন্দির। নয় তলা ছিল—ইংরেজ ও ফরাসি ভেঙে দেয়। এখন চার তলা মাত্র। কপিলবাস্তুর রাজপুত্র—সন্ন্যাসী বহু সহস্র ক্রোশ দূরে অটল মহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন—দুই প্রধান শিষ্য দু-পাশে। মণিমাণিক্য হীরা-জহরতে সাজানো ছিল বিগ্রহ, ঠিক সামনে ঐখানটায় ছিল অতি-বৃহৎ আয়না—দেখুন, চেয়ে দেখুন, নিদর্শন রয়েছে তার—তিক্তকণ্ঠে দোভাষী মেয়েটা বলে, সেই লুঠেরারা ভেঙে ফেলেছে আয়না; মণিমাণিক্য ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। সারা দেশ জুড়ে বার বার এমনি অত্যাচারের ঢেউ বয়ে গেছে। বলতে পারেন কেন এমন হয়?

বললাম, নির্লোভ নির্বিরোধী যে তোমরা! জানে যে, মরে গেলেও ওদের দেশে পালটা হানা দিতে পারবে না। আমাদেরও ঠিক ঐ অপরাধ। চীন ভারত দু-দেশেরই এক ইতিহাস, একই রকমের দুঃখভোগ।

বেলা গড়িয়ে আসে। দেখার শেষ নেই। পা টলমল করছে, তবু বসতে মন চায় না। দু-চোখ ভরে দেখে নিই আর যেটুকু সময় আছে। চিরজন্মের এই দেখা···

রাজার জন্মদিনে উৎসব হত এই ঘরটায়। ঐ চেয়ার আর ঐ টেবিল কাঠে তৈরি, আয়তনও এমন-কিছু বড় নয়। নিয়ে যাও দিকি সরিয়ে। হেঁ-হেঁ, দশ-বিশের কর্ম নয়—সাত শ' মানুষ লাগাতে হবে, তবে নড়বে।

লুঠপাট হয়ে গিয়েও যা এখনো আছে, স্বদেশি বিদেশি সকলের চোখ ঠিকরে যায়। হাতির দাঁতের তৈরি একটা মাছ দেখুন কত বড়! দেখুন, প্রাচীন শিল্পী ক্যান-আন-ইয়া'র অপরূপ চিত্রমালা। আর ওদিকে মাটির কাজ, গালার কাজ, চন্দনকাঠের কাজ। কারু-শোভিত আসবাবপত্র, অলঙ্কার, ছাত থেকে ঝুলানো রকমারি বাতিদান···কত আর লিখব! লিখতে গেলে দেখা হয় না, পেছিয়ে পড়ি। এই সব কক্ষ-অলিন্দ মণ্ডপ-চত্বরের গোলকধাঁধার মধ্যে রাজারাণী রাজমাতা রাজকন্যারা কোথায় যেন বেড়াতে বেরিয়েছেন—এক্ষুণি আসবেন ফিরে—তেমনি ভাবে চারিদিক পরিপাটি করে সাজানো। তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাড়াতাড়ি চোখের দেখা নিচ্ছি আমরা।

শেষ রাণীর পোশাক বদলানোর ঘর। কত পোশাক রে বাপু—দেয়ালে দেয়ালে কত রকমের আয়না! চন্দনকাঠের অতিকায় পেঁটরা; মাছ রাখত, ফল রাখত, চন্দন পোড়াত—সেই সব নানা-ধরনের পাত্র। ফূর্তির চূড়ান্ত করে গেছে বটে, সব দেশের রাজ-রাজড়ার ঐ এক রীতি। আট-আটটা রান্নাবাড়ি রাণী সাহেবার—গুণে দেখলাম। মহারাণী যখন, তার কমে কুলাবে কেন? অমন দেড়-শ দু-শ রাঁধুনি ছিল—তাই সামাল দিয়ে উঠতে পারত না। মারাঠি মেয়ে সরলা গুপ্তা হেসে বললেন, পোড়া কপাল আমাদের, একটা রাঁধুনি জোটে না—হাত পুড়িয়ে খেতে হয়।

রাণী হতে হবে, তবে তো শ'-দুই রাঁধুনী! কেরাণী, চাকরাণী—এই তো সকলে। শুধু রাণী আর ক'টা!

অপেরা-ঘর—তেতলা মঞ্চ। নাটকের পরী ও দৈত্যদানো স্বর্গ অর্থাৎ উপরতলা থেকে এবং পাতাল অর্থাৎ নিচের তলা থেকে আবির্ভূত হত মাঝের মঞ্চে। রাজ-পরিবার অভিনয় দেখতেন ঐ ঘরের ভিতর কাঠের ঝিলিমিলির অন্তরাল থেকে। এখন মিউজিয়াম—পুরানো শিল্পবস্তু সাজানো রয়েছে। এক ধারে বিশ্রামকক্ষ সারি সারি। আর বাজনা বাজে না, নাটক হয় না—গহনার শিঞ্জন নেই প্রেক্ষাকক্ষে। সিঁড়ির ধারে ছোট ঐ গাছটিতে অজস্র লাল ডালিম ফলে নির্জন গৃহাঙ্গণ আলো করে রয়েছে।

না গো, নির্জন হবে কেন, সাড়াশব্দ পাই যে ভিতরে! বিছানা, কাপড়-চোপড়, থালাবাটি—উঁকি দিয়ে দেখি, মানুষও রয়েছে শুয়ে বসে। একজন দু'জন নয়—বিশ্রাম-ঘরগুলো সমস্ত ভর্তি! আমাদের দেখে বেরিয়ে এলো। হাততালি দিচ্ছে। সমকণ্ঠে গলা মিলিয়ে বলছে—চীন-ভারত এক হও, হোপিন ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক।

এরাই রাজা একালের। সর্বাঙ্গে দুঃখ সংগ্রামের অগণিত ক্ষতচিহ্ন—মুখের প্রসন্ন হাসির সঙ্গে দেহের চেহারা একেবারে বেমানান। শ্রমিক-বীর এরা। কৃতিত্বের পুরস্কার—রাজকীয় প্রমোদ-নগরীতে দশটা দিন ফূর্তি করে যাবে। অতুল সম্মান—আবার যখন কাজে ফিরবে সম্ভ্রমদৃষ্টিতে তাকাবে সকলে। আট শতাব্দী ধরে, গড়ে-তোলা গ্রীষ্ম-প্রাসাদের সেই অপরাহ্নে নবীন কালের রাজা-মহারাজারা গভীর উল্লাসে হাত ঝাঁকিয়ে বিদেশি আগন্তুকদের সম্বর্ধনা জানাল···

কিন্তু আর নয়। দূতাবাসে যেতে হবে এখন! লেকের জলে নৌকো চড়া হল না···উপায় কি, দূতাবাসে হাজিরা দিতে হবে আজকের মধ্যেই।

ছুটল বাস। বেশ লাগে, এই সুদূর শহরে একটি বাড়ির মাথায় বিশাল ত্রিবর্ণ ভারতীয় পতাকা উড়ছে। কক্ষে কক্ষে মহাত্মা গান্ধীর ছবি। নাম সই করতে হল ওঁদের খাতায়, তারপর গল্পগুজব চলল। সরবত খাওয়ালেন ওঁরা। পরাঞ্জপে কোথায় কাজে বেরিয়েছেন, দেখা হল না তাঁর সঙ্গে। [ক্রমশঃ।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

৫

অবশেষে সংবাদ এল, পারস্যের রাষ্ট্রদূত হিন্দুস্থানের সীমান্তে পৌঁছেছেন। মোগল দরবারের পারসী ওমরাহরা সংবাদ শোনা মাত্রই রটিয়ে দিলেন যে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপারের জন্য পারস্যের রাষ্ট্রদূত হিন্দুস্থানে এসেছেন। বুদ্ধিমান লোকরা অবশ্য তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। কারণ, পারসীদের এমন একটা হামবড়াই ভাব আছে যে নিজেদের জাতের কোন ব্যাপার নিয়ে তিলকে তাল করতে তারা অভ্যস্ত। প্রচার করা হ'ল যে পারস্যের রাষ্ট্রদূতকে রাজদরবারে নিয়ে আসার আগে যেন তাঁকে ভারতীয় রীতিতে সেলাম করতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা না হ'লে হঠাৎ তাঁকে সেলাম করানো যাবে না। পারসীরা এমনিতে খুব উদ্ধতস্বভাব, তার উপর তিনি রাজপ্রতিনিধি। সুতরাং হঠাৎ ঘাড় হেঁট ক'রে সেলাম করতে হয়ত তিনি রাজী নাও হতে পারেন। কিন্তু এসব কথা গালগল্প ছাড়া কিছু নয়। ঔরঙ্গজীবের এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসৎ ছিল না।

পারস্যের রাষ্ট্রদূত যখন রাজধানীতে প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করা হ'ল। বাজারের ভিতর দিয়ে তাঁর যাবার পথ সুসজ্জিত করা হ'ল এবং কয়েক মাইল জুড়ে পথের দুই পাশে অশ্বারোহী সৈন্যরা সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল। ওমরাহরা অনেকে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দিলেন। দুর্গদ্বারে রাষ্ট্রদূত যখন পৌঁছলেন তখন তোপধ্বনি ক'রে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হ'ল। ঔরঙ্গজীব তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। পারসী কায়দাতে সেলাম জানানো সত্ত্বেও তিনি বিরক্ত হলেন না এবং সোজাসুজি রাজদূতের হাত থেকেই তাঁর পরিচয়পত্রখানি তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করলেন। একজন খোজা তাঁর চিঠিখানি খুলে দিতে তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে পড়তে লাগলেন। রাজপ্রতিনিধিকে যথারীতি কোর্তা, পাগড়ি, সোনারূপোর জরির কাজ করা শিরোপা ইত্যাদি উপঢৌকন দিতে আদেশ দেওয়া হ'ল। তারপর যথাসময়ে পারস্যের দূতকে জানানো হল যে এইবার তিনি তাঁর উপহারাদি দেখাতে পারেন।

পারস্যের রাষ্ট্রদূত যে উপহার দিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল পঁচিশটি সুন্দর ঘোড়া, বিশটি উট, দেখতে ঠিক ছোট হাতির মতন, চমৎকার গোলাপজল, পাঁচ-ছ'খানি গালচে ইত্যাদি। ঔরঙ্গজীব উপহার দেখে না কি খুব খুশী হয়েছিলেন। প্রত্যেকটি জিনিস তিনি নিজে যত্ন ক'রে দেখলেন এবং পারস্যের রাজার উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। রাজদূতকে তিনি ওম্‌রাহদের মধ্যে বসতে বললেন এবং তাঁর পথের ক্লান্তির কথা বারবার উল্লেখ ক'রে, প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে, তাঁকে বিদায় দিলেন। রাজদূত প্রায় চারপাঁচ মাস দিল্লীতে রইলেন ঔরঙ্গজীবের খরচে এবং ওমরাহদের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগলেন। যখন তাঁকে স্বদেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হ'ল তখন বাদ্‌শাহ আবার তাঁকে ডেকে নানারকমের উপহার দিলেন।

পারস্যের রাষ্ট্রদূতকে ঔরঙ্গজীব যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও পারসী ওম্‌রাহরা প্রচার করলেন যে পারস্যের সম্রাট দূত মারফৎ যে পত্র পাঠিয়েছেন তাতে তিনি ভারতসম্রাটকে নিন্দা করেছেন ভ্রাতৃহত্যার জন্য এবং বৃদ্ধ পিতা শাজাহানকে বন্দী করার জন্য। পারস্যের সম্রাট নাকি তাঁর "আলমগীর" বা "বিশ্ববিজয়ী" নামের জন্যও উপহাস করেছেন। ওম্‌রাহরা চিঠির জবান পর্যন্ত মুখে মুখে রটনা ক'রে দিলেন। তাতে নাকি লেখা ছিল: "আপনি যখন আলমগীর, তখন আল্লার নামে আপনাকে এই তলোয়ার ও ঘোড়াগুলি পাঠালাম। সম্মুখযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।" কিন্তু এসব কথা এত অতিরঞ্জিত যে একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। পারসীদের কথায় রঙচড়ানো অভ্যাস আছে, আগে বলেছি। খোশমেজাজী গালগল্প করতে তারা ওস্তাদ। এ-সম্বন্ধে, অর্থাৎ পারস্যের সম্রাটের পত্রাদি সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি তা বলছি। তিনি উদ্ধত কোন ভাষা চিঠির মধ্যে প্রকাশ করেননি। আমার নিজের ধারণা, হিন্দুস্থানের মতন বিরাট দেশের বিরুদ্ধে পারস্যের সম্রাট অকারণে যুদ্ধবিগ্রহ করতে চাইবেন না। তিনি তাঁর নিজের রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। সাহ আব্বাসের(১) মতন সম্রাটও পারস্যে সুলভ নয়। তাঁর মতন দূরদর্শিতা, বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি খুব কম সম্রাটের

১ সাহ আব্বাস ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সম্রাট হন। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দ থেকে ১৬২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনিই ইস্পাহানে পারস্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং পারস্যকে বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁর সংগঠনশক্তি, কূটনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার কথা জনপ্রবাদে পরিণত হয়। তাঁর নাম 'সাহ আব্বাস' থেকেই নাকি ভারতবর্ষে "সাবাস্" কথাটি লোকসমাজে প্রচলিত হয়েছে। কোন প্রশংসনীয় কাজ কেউ করলে আমরা তাকে 'সাবাস্' ব'লে অভিনন্দন জানিয়ে থাকি। ওভিংটন্ (Ovington) তাঁর "Voyage to Suratt in the year 1689" নামক গ্রন্থে (London, 1696) লিখেছেন: "পারস্যের সম্রাট সাহ আব্বাসের নাম তাঁর মহৎ কীর্তি ও খ্যাতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে আজও কোন উল্লেখযোগ্য কীর্তিকে আমরা ঐ নামে সম্বর্ধনা জানিয়ে থাকি। ভারতীয়দের প্রশংসা-সূচক কথাই হ'ল 'সাবাস্'।"

আছে। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করাই যদি পারস্যের রাজার উদ্দেশ্য হবে, সম্রাট শাজাহান বা ইসলামধর্মের প্রতি যদি তাঁর এত দরদ থাকবে, তাহ'লে বাস্তবিকই যখন দীর্ঘকালব্যাপী হিন্দুস্থানের মধ্যে ঘরোয়া চক্রান্ত ও গৃহযুদ্ধ চলছিল, তখন তিনি উদাসীন নিরপেক্ষ দর্শকের মতন দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন কেন? হিন্দুস্থান জয় করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হবে, তাহ'লে তখন তো স্বচ্ছন্দেই তিনি তা করতে পারতেন। দারা, শাজাহান, সুলতান সুজা কারও কাকুতি-মিনতিতে তিনি কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেননি, এমনকি কাবুলের শাসনকর্তার কথাতেও না। তা যদি পারতেন, তাহ'লে সামান্য সেনাবাহিনী নিয়ে, অল্প খরচে তিনি অতি সহজে, বিনা বাধায় হিন্দুস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূখণ্ডের অধীশ্বর হ'তে পারতেন, অন্ততঃ কাবুল থেকে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলের তো নিশ্চয়ই। তখন তাঁর আদেশেই হিন্দুস্থানের রাজা উঠতেন-বসতেন এবং আত্মকলহ বা দ্বন্দ্ব, সবই তিনি মিটিয়ে দিতে পারতেন।

পারস্য-সম্রাটের পত্রের মধ্যে হয়ত কোন আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছিল, অথবা রাষ্ট্রদূতের কথাবার্তায় ঔরঙ্গজীব হয়ত খুশী হননি। কারণ পারস্যের রাষ্ট্রদূত দিল্লী ছেড়ে যাবার দু'তিনদিন পর তিনি অভিযোগ করলেন যে পারস্যের সম্রাটকে তিনি যে ঘোড়াগুলি উপহার দিয়েছিলেন, সেগুলি রাষ্ট্রদূতের আদেশে রজ্জুবদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়েছে। ঔরঙ্গজীব তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, যে-কোন উপায়ে ভারত-সীমান্তে রাষ্ট্রদূতকে আটকাতে এবং তাঁর কাছ থেকে সমস্ত ভারতীয় ক্রীতদাস কেড়ে নিয়ে আসতে। পারসী দূত ভারতে ক্রীতদাসের বাজার খুব সস্তা দেখে, একদল ক্রীতদাস কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ভারতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের জন্য ক্রীতদাস তখন বাজারে প্রচুর পাওয়া যেত, এবং দামও তাই সস্তা হয়েছিল। শুধু পারসী রাষ্ট্রদূত যে ক্রীতদাস নিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন তা নয়, তাঁর অনুচরবর্গও নাকি অনেকে শিশুসন্তান নিয়ে পালাচ্ছিলেন।

পারস্যের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সম্রাট ঔরঙ্গজীব অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্ট আচরণ করেছিলেন। সম্রাট সাহ আব্বাসের রাজত্বকালে তাঁর প্রতিনিধির সঙ্গে শাজাহান যেরকম উদ্ধত আচরণ করেছিলেন, ঔরঙ্গজীব সেরকম কিছু করেননি। সম্রাট শাজাহানের উদ্ধত আচরণ সম্পর্কে পারসীরা প্রায় নানারকমের গল্প ব'লে থাকেন। তার মধ্যে দু'একটি গল্প আমি এখানে বলছি:

সম্রাট শাজাহান যখন দেখলেন যে কিছুতেই পারস্যের রাষ্ট্রদূতকে ভারতীয় কায়দায় সেলাম করতে বাধ্য করানো যায় না, এবং আত্মমর্যাদাবোধ তাঁর এত উগ্র যে তাকে নোয়ানো পর্যন্ত মুশকিল, তখন তিনি মাথা থেকে এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি হুকুম দিলেন যে আমখাসের দিকে দরবারের যে প্রবেশপথ, সেটা বন্ধ ক'রে দিতে। শুধু সামান্য একটু ফাঁক থাকবে একজায়গায় এবং সেই ফাঁকটুকু এমন নীচু হবে যে তার ভিতর দিয়ে ঢুকতে গেলেই রাষ্ট্রদূতকে মাথা হেঁট করতে হবে সেলাম করার ভঙ্গীতে। সম্রাট শাজাহান সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এবং তাতে গর্বোদ্ধত পারসী রাষ্ট্রদূতের ভারতীয় পদ্ধতিতে সেলাম না করার অহঙ্কারও চূর্ণ হবে। শাজাহান ভেবেছিলেন যে তিনি তখন রাষ্ট্রদূতকে বরং বলবেন যে, অতটা মাথা হেঁট ক'রে সেলাম করাটাও ভারতীয় রীতি নয়। কিন্তু গর্বিত ও বুদ্ধিমান পারসী দূত আগে থেকে সম্রাটের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে প্রবেশপথের কাছে এসে, সম্রাটের দিকে পিছন ফিরে নীচু হয়ে প্রবেশ করলেন। শাজাহান পারসী শঠতার কাছে হার মেনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: "হা আল্লা! আপনি কি মনে করলেন যে এখানে আপনার মতন গর্দভের আস্তাবল আছে যে ঐভাবে ঢুকলেন?" পারস্যের দূত উত্তর দিলেন: "অবশ্য ঠিকই বলেছেন, আমি গর্দভই বটে। আমার চেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি পারস্যের রাজদরবারে আরও অনেকে আছেন কিন্তু যিনি যেমন সম্রাট তাঁর কাছে তেমনি দূত পাঠানো উচিত বলে আমাকেই তিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

আর একবার আহারের নিমন্ত্রণ ক'রে একত্রে খানা খেতে ব'সে সম্রাট সাজাহান পারস্যের দূতকে অপমান করেছিলেন। পারস্যের দূত খুব বেশী হাড় চিবুচ্ছেন দেখে শাজাহান বললেন: "কুকুরগুলোর জন্য কিছু রাখুন?" পারস্যের দূত তার উত্তরে খিচুড়ী বা পোলাওয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন: "ঐ তো রেখেছি।" শাজাহান পোলাও খেতে খুব ভালবাসতেন এবং তখন খাচ্ছিলেনও। সুতরাং রাজদূতের উত্তরে তিনি খুব জব্দ হয়েছিলেন।

সম্রাট শাজাহান তখন নতুন রাজধানী দিল্লী তৈরী করছেন। তিনি পারস্যের দূতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "ইস্পাহান ভাল, না দিল্লী ভাল?" উত্তরে পারস্যের দূত "বিল্লা, বিল্লা" (বি-ইল্লাহি) ব'লে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন: "ইস্পাহানকে দিল্লীর ধুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।" শাজাহান উত্তর শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন রাষ্ট্রদূত বোধ হয় তাঁর রাজধানীর প্রশংসাই করলেন। দিল্লীর ধুলোর সঙ্গেও ইস্পাহানের তুলনা হয় না, শাজাহান এই অর্থ বুঝেছিলেন। কিন্তু অর্থ তা নয়। অর্থ হ'ল, দিল্লীতে এত ধুলো যে তার সঙ্গে ইস্পাহান নগরীর তুলনা করতে যাওয়াই অন্যায়।

শাজাহান নাকি আর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে হিন্দুস্থান বড়ো, না পারস্য বড়ো? উত্তরে পারস্যের দূত বলেছিলেন—

হিন্দুস্থান পূর্ণচন্দ্রের মতন, আর পারস্য হ'ল দ্বিতীয়ার চাঁদ। কথাটা শুনে প্রথমে সম্রাট শাজাহান খুব প্রীত হয়েছিলেন। পূর্ণিমার চাঁদের মতন হিন্দুস্থান বলতে তিনি তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র মনে করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর কাছে অর্থ পরিষ্কার হয়। পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তুলনা করার অর্থ হ'ল, রাষ্ট্র হিসাবে হিন্দুস্থানের শ্রীবৃদ্ধির দিন শেষ হয়েছে, এবারে কৃষ্ণপক্ষে তার ক্রমিক ক্ষয় শুরু হবে। কিন্তু পারস্য হ'ল দ্বিতীয়ার চাঁদ—অর্থাৎ তার ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি হবে। পারস্যের দূত যা বলতে চেয়েছিলেন তা সহজ কথায় হ'ল: হিন্দুস্থান বৃদ্ধ, পারস্য নওজোয়ান।

পারসীদের চতুরতার এই হ'ল কয়েকটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু চতুর হলেই যে বুদ্ধিমান হতে হবে তার কোন মানে নেই। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। যিনি রাজপ্রতিনিধি হবেন, আমার মতে, তাঁর একটা নিজস্ব চারিত্রিক গাম্ভীর্য থাকা উচিত। হালকা রঙ্গতামাসা বা হেঁয়ালির অবতারণা করা তাঁর শোভা পায় না। পারস্যের দূত শাজাহানের মতন স্বেচ্ছাচারী খেয়ালী সম্রাটকে ঐভাবে পদে পদে চালাকি বুদ্ধির জোরে বিব্রত ও ক্রুদ্ধ ক'রে, খুব বুদ্ধির পরিচয় দেননি। শাজাহান শেষ পর্যন্ত এতদূর বিরক্ত হয়েছিলেন

যে পারস্যের দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই তিনি অত্যন্ত কটুবাক্যে তাঁকে সম্বোধন করতেন। শুধু তাই নয়। তিনি পারস্যের দূতকে সরু কোন অলিগলির মধ্যে পথচলার সময় পাগলা হাতি লেলিয়ে দিতে বলেছিলেন। একদিন লেলিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। পালকী চ'ড়ে পারস্যের দূত রাজধানীর এক সরু গলির ভিতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন, সেই সময় পাগলা হাতি তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। অন্য কোন স্বল্প তৎপর বা সাহসী ব্যক্তি হ'লে নিশ্চয় মারা পড়তেন। পারস্যের দূত পাল্‌কি থেকে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে পড়ে এত তাড়াতাড়ি হাতির শুঁড় লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়তে লাগলেন যে হাতি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

পারস্যের দূত বিদায় নেবার পর ঔরঙ্গজীব তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক মোল্লা শাহকে (২) সম্বর্ধনা জানান। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। কাহিনীটি এখানে বিবৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। এই বৃদ্ধ লোকটিকে শাজাহান কিছু সম্পত্তি দান করেছিলেন এবং তিনি বৃদ্ধবয়সে কাবুলের কাছে কোন স্থানে অবসর-জীবন যাপন করছিলেন। সেখান থেকেই তিনি হিন্দুস্থানের গৃহযুদ্ধের খবর পান এবং জানতে পারেন যে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ঔরঙ্গজীব হিন্দুস্থানের সম্রাট হয়েছেন। খবর পেয়ে মোল্লা সাহেব তাড়াতাড়ি দিল্লী চ'লে আসেন। তাঁর বাসনা ছিল, হয়ত তাঁর শিষ্য তাঁকে ওমরাহের মর্যাদা দিয়ে গুরুদক্ষিণা দেবে। তার জন্য দরবারের সকলকেই তিনি অনুনয়-বিনয় করেছিলেন। রৌশনআরা বেগম পর্যন্ত তাঁর দাবী সমর্থন করেছিলেন। তিনমাস তিনি দিল্লীতে থাকার পর ঔরঙ্গজীব জানতে পারেন যে তিনি কোন কাজের জন্য তাঁর কাছে এসেছেন এবং তাঁর কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু প্রতিদিন তাঁকে দরবারে উপস্থিত থাকতে দেখে তিনি শেষে বললেন তাঁকে নির্জনে দেখা করার জন্য। স্বতন্ত্র ভাবে মোল্লা শাহের সঙ্গে ঔরঙ্গজীব সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন যে হাকিম-উল্‌-মুলক দানেশমন্দ খাঁ এবং আর তিনচারজন আমীর ছাড়া আর কেউ সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত থাকবেন না। সাক্ষাৎকালে তিনি যা বলেছিলেন তার সঠিক বিবরণ আমি যা মোটামুটি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা বলছি। ঔরঙ্গজীব বলেন:

"তারপর মোল্লাজী, আপনার মনোবাঞ্ছা কি? আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করার কি উদ্দেশ্য আপনার? আপনি কি চান যে আমি আপনাকে আমীরের পদমর্যাদা দিয়ে আমার গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করব? আমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করতেও কুণ্ঠিত হতাম না, যদি বুঝতাম যে বাল্যকালে আপনি আমাকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যা আজ আমার জীবনে মূল্যবান সম্পদ হয়েছে। হে গুরুদেব! বলতে পারেন, আপনার কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা পেয়েছি? আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন যে 'ফিরিঙ্গিস্থান' সামান্য একটা দ্বীপ ভিন্ন কিছু নয় এবং সেই দ্বীপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা হলেন পর্তুগালের রাজা, তারপর হল্যাণ্ডের রাজা এবং শেষে ইংলণ্ডের রাজা। ফিরিঙ্গিস্থানের অন্যান্য রাজাদের সম্বন্ধে (যেমন ফ্রান্স ইত্যাদির) আপনি বলেছিলেন যে তাঁরা আমাদের হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতিদের মতন এবং হিন্দুস্থানের শক্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে অন্য কোন দেশের তুলনাই হয় না। হিন্দুস্থানের সম্রাটরাও তাঁদের তুলনায় এত বড় যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান—এঁদের সমতুল্য কোন রাজা ফিরিঙ্গিস্থানে নেই। হে ভৌগোলিক! হে ইতিহাসবিশারদ! আপনি কি আমাকে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন? আপনি কি বলেছিলেন আমাকে তাদের অর্থ-সামর্থ্য, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম, যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে কোন কথা? আপনি কি আমাকে জানিয়েছিলেন, কোন রাষ্ট্রের উন্নতি ও অবনতি হয় কেন, কেন দেশে দেশে, যুগে যুগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীক বিদ্রোহ ও বিপ্লব হয়? আপনি আমাকে কিছুই বলেননি, কিছুই শিক্ষা দেননি। এসব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আপনি তো আমার পূর্বপুরুষ, যাঁরা এই বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁদের নাম পর্যন্ত বলেননি। আমি কিছুই জানতাম না তাঁদের সম্বন্ধে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ভাষাও কিছু কিছু প্রত্যেক সম্রাটের জানা কর্তব্য। আপনি আমাকে আরবী লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছেন, আর কোন ভাষা শেখাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমন একটি ভাষা (আরবী) আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন, যা সামান্য আয়ত্ত করতেও যে কোন বুদ্ধিমান লোকের অন্ততঃ দশবারো বছর সময় লাগবে। এইভাবে শুধু একটা জরদ্গব ভাষা শিখিয়ে আপনি আমার মূল্যবান কৈশোর ও যৌবনকাল নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। আরবী লিখতে পড়তে শিখেছি, আরবী ব্যাকরণ শিখেছি, জীবনে আর কিছু শিখিনি আপনার কাছে।"

এই ভাষায় সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাঁর গুরুকে সম্বোধন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে সম্রাট এখানেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আরও অনেক কথা বলেছিলেন। সম্রাট বলেছিলেন:

"আপনি কি জানেন না, মোল্লাজী, যে বাল্যকালই হ'ল জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। শিক্ষা দেবার সুবর্ণ সুযোগ ছিল তখন আপনার। আপনি আমাকে আরবীর মাধ্যমে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, আইনশাস্ত্র, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখিয়েছেন। নিজের মাতৃভাষায় যে কোন বিষয় কি আরও সহজে, আরও অনেক ভালভাবে শেখানো যায় না, মোল্লাজী? আপনি আমার পিতা শাজাহানকে বলেছিলেন যে আমাকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু আমি তো জানি, কি শিখিয়েছেন আপনি আমাকে? কতকগুলি দুর্জ্ঞেয় সূত্র, তার চেয়েও দুর্বোধ্য ভাষায়

২· মোল্লা সাহ বাদকশানের বাসিন্দা। তিনি দারাশিকোর 'মুর্শিদ' বা দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং সম্রাট শাজাহান তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ঔরঙ্গজীবকেও তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

(আরবীতে) আপনি আমার মগজে জোর ক'রে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কি মূল্য আছে তার জীবনে ?"

মোল্লাজী চুপ ক'রে কথাগুলি শুনছিলেন। ঔরঙ্গজীব এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে, অত্যন্ত ধীর, শান্ত ও সংযতভাবে কথাগুলি বলছিলেন :

"আপনি আমাকে রাজকর্তব্যও শিক্ষা দেননি। রাজপুত্র যে একদিন রাজসিংহাসনে বসতে পারে, একথা আপনার খেয়াল হয়নি। হিন্দুস্থানের রাজাদের এটা একটা চরম দুর্ভাগ্য। তাঁরা কোনদিনই সত্যকার গুরুর কাছে উপযুক্ত শিক্ষা পাননি এবং পান না। আপনি আমাকে যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা দেননি। যাই হোক, আমার ভাগ্য ভাল যে আপনার মতন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়াও আমি আরও কয়েকজনের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম। তা না হ'লে আমার পরিণাম যে কি হ'ত তা ভাবতেও ভয় হয় আমার। অতএব, হে সুধীপ্রধান! আপনি স্বগ্রামে অনুগ্রহ ক'রে ফিরে যান। আপনি কে, এবং আপনি কেমন আছেন, তা কারও জানবার দরকার নেই।"

২৫শে বৈশাখ

শ্রীকরুণাময় বসু

আমাদের সব গেছে, তবু আছে পঁচিশে বৈশাখ,
একটি নির্মল সত্য, জ্যোতির্ময় দেবতার ডাক,
আমি আছি।
তাই ফুল ফোটে, চাঁদ ওঠে, বনে বনে বেড়ায় মৌমাছি।
দিগন্তরে সূর্য ওঠে, অকস্মাৎ ঘন ঘন বেজে ওঠে শাঁখ,
কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত : ভয় নেই, এলো ওই পঁচিশে বৈশাখ,
মর্তে এল অমর্ত দেবতা ;
পথের ধূলির পরে লিখে গেল মৃত্যুহীন কথা।
দিন যায়, বর্ষ যায়, এলো ফিরে পঁচিশে বৈশাখ ;
বিক্ষুব্ধ বেদনা-বাণী কোটি কণ্ঠে ভাষা আজি পাক।
আমাদের সব গেছে, অর্ঘ্য দেই ম্লান অশ্রুজলে,
মানুষ লাঞ্ছিত আজো হেথা হোথা ইন্দোচীনে,
আফ্রিকার বনে ও জঙ্গলে।
বিস্তীর্ণ চক্রান্তজাল পৃথিবীরে গ্রাস করে বুঝি,
সভ্যতার এ সঙ্কটে জ্যোতির্ময় বাণী তব কোথা পাব খুঁজি ?
রক্তের সমুদ্র-ঢেউয়ে সূর্য যাবে ডুবে,
সভ্যতার পূর্ণচ্ছেদ : রক্তস্নাত সূর্য্যদেব আর বুঝি উঠিবে না পুবে।

তবু জানি ভয় নেই, আসে ফিরে পঁচিশে বৈশাখ ;
উতলা দক্ষিণা বায়ু, লাল মেঘ, বনান্তরে অজস্র মৌচাক,
ফুলে ফুলে উড়ে-আসা সবুজ মৌমাছি ;
মানুষের মুগ্ধ প্রেমে, অশ্রুজলে তুমি কবি এলে কাছাকাছি।
কোটি কণ্ঠে আজি তাই হ'ল উচ্চারিত :
সভ্যতার এ সঙ্কটে মানুষের শুভবুদ্ধি হোক জাগরিত।
হিংসার কলুষ বাষ্প দূরে চলে যাক,—
এই বাণী নিয়ে আসে বর্ষে বর্ষে পঁচিশে বৈশাখ,
দূর হ'তে জ্যোতির্ময় দেবতার ডাক।
ভারতের ইতিহাসে আরো কতো আছে জন্মদিন ;
মানুষের ইতিহাসে রবীন্দ্রের জন্মতিথি চিরকাল সবুজ, নবীন।

দেশে দেশে

"বিক্রমাদিত্য"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ট্রেণ যখন দিল্লী শাহাদরায় পৌঁছলো তখনো প্রভাত হয়নি। তবু অন্ধকারের ঝাপসা আলোয় দিল্লীর হাঙ্গামার পেলাম ক্ষীণ আভাষ। প্ল্যাটফর্ম্মে জনতার কোলাহল নেই, নেই কুলীর হাঁক-ডাক বা চা-গ্রামের কণ্ঠস্বর। এই নির্জ্জনতা ভয়াবহ, এই আবহাওয়া স্মরণ করিয়ে দেয় যেন এদিকের জগৎ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

দিল্লীর ষ্টেশনে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন গম্ভীর। নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল, অমৃত কাউরের মুখ যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে তাঁদের চিন্তার ধারা।

এবার গান্ধীজি আতিথ্য গ্রহণ করলেন আলবুকর রোডে শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লার বাড়ীতে।

ভাংগী কলোনী ছিলো মহাত্মাজীর প্রিয় স্থান। এটাই ছিলো তাঁর দিল্লীর পান্থশালা। কিন্তু এবারের স্থান-পরিবর্ত্তনের মুখ্য কারণ যে দিল্লীর আবহাওয়া বদলে গেছে। রাস্তার অলিতে-গলিতে চলেছে মৃত্যুর হোলী খেলা। ভাংগী কলোনীতেও শান্তি আর নেই, তাই প্রয়োজন হয়েছে স্থান-পরিবর্ত্তনের। যখন গান্ধীজি ভাংগী কলোনীতে থাকতেন তখন সেটাই হতো ভারতের রাজনীতির কেন্দ্র। তাঁর আগমনের বহু আগে থেকেই চলতো আয়োজন। জঞ্জাল, আবর্জ্জনা দূর হয়ে যেতো মুহূর্ত্তে। আসতো ইলেকট্রীক লাইট, টেলীফোন—রাস্তার দুধারে দাঁড়াতো নতুন মডেলের মোটর গাড়ী।

তাঁর থাকাকালীন সময় অবধি কলোনীকে সাজিয়ে রাখা হতো। অর্থব্যয় হতো প্রচুর। তাই একবার সরোজিনী নাইডু বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'ইফ বাপু অনলি নিউ দি কস্ট্ অফ সেটিং হিম্ ইন পোভার্টি'। সেদিন বিকেলের প্রার্থনা-সভা তেমন জমলো না। শ্রোতার ছিলো অভাব কিন্তু যাঁরা শুনলেন তাঁদের মনে দাগ কাটলো গান্ধীজির কথা। এর আগে সারা দিন চলেছে নেতাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা—নেহেরু-প্যাটেল গান্ধীজিকে দিল্লীর পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করলেন। এই মিটিংএ যোগ দিলেন মাউণ্টব্যাটেন।

দিল্লীর সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়া তখন তীব্র হয়ে উঠেছে। এ সাম্প্রদায়িকতা কেন হয়েছে সে নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, দেশ ভাগই এ হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে, হাঙ্গামার জন্ত দেশ ভাগ হয়নি। এ বিবাদ অনেকটা পাত্রাধারে তৈল বা তৈলাধারের পাত্রের ন্যায়। কিন্তু এ হাঙ্গামা যে অবশ্যম্ভাবী এর আভাষ বহু পূর্ব্বেই দিয়েছিলেন লীগের প্রেসিডেন্ট কায়েদ-ই-আজম জিন্না। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতে তিনি এর ইঙ্গিত করেছিলেন। তিনি সতর্ক করেছিলেন ভাইসরয়কে, যদি ভারতের সমস্যা সমাধান লীগের আশানুযায়ী না হয় তবে দেশের গোলমালের জন্ত তিনি কোন দায়িত্ব নেবেন না। সমস্যা সমাধান লীগের মনোমত হয়েছিলো সত্য কিন্তু জিন্না হাঙ্গামাকারীদের রোধ করার কোন চেষ্টা করেছিলেন কি না, এ কথা জানা যায়নি।

পনেরোই আগষ্টের কয়েক দিন বাদেই সুরু হলো পাঞ্জাব থেকে শরণার্থীর মিছিল। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে র‍্যাডক্লিফের ঘোষণা। এই ঘোষণা কোন দলকেই করেনি সন্তুষ্ট। গুরুদাসপুর হাতছাড়া হওয়াতে লিয়াকৎ হয়েছেন মনঃক্ষুণ্ণ। দু'পক্ষের জনগণই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

দেশের গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম উদ্বিগ্নতা জানিয়েছিলেন পাঞ্জাবের গভর্ণর ইভান জেঙ্কিস। জেঙ্কিস্ ছিলেন ঝানু লোক, প্রতি শিরা-উপশিরায় কনভারভেটিং। তাই একবার সতর্ক করেছিলেন ভাইসরয়কে এ সম্বন্ধে। কিন্তু এ দাঙ্গা নির্ম্মূলে দমন করার কোন চেষ্টাই করেননি। হয়তো সে আগ্রহও তাঁর ছিলো না, কাজেই যখন পাঞ্জাবে শুরু হলো হত্যার তাণ্ডবলীলা তখন দেশের সবাই চিন্তিত বা বিস্মিত হলেও ইংরেজ সরকার বিচলিত হ'ননি।

স্বাধীনতার কিছু দিন বাদে দিল্লীর রাজপথে সুরু হলো নরহত্যার তাণ্ডবলীলা। অলিতে-গলিতে পড়ে রইলো অজানা পথিকের মৃতদেহ। তাদের দেহ থেকে বেরিয়ে আসছে উৎকট গন্ধ। ওদিকে পাঞ্জাব থেকে রোজই আসছে জনস্রোত। নিঃসম্বল, আশ্রয়হীন, তারা রাজধানীর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। উচ্ছেদ হয়েছে তারা তাদের পৈতৃক ভিটা থেকে—এ শোক তারা সহজে মুছে ফেলতে পারেনি। তাই যখন সুবিধে পেলো তখন তারা নিতে চাইলো প্রতিশোধ। এরা অতি অল্প দিনের মধ্যে দিল্লীর শাসনভার পঙ্গু করে দিলো। বেপরোয়া,—এদের মনে নেই একটু পুলিশের ভয়। তাই ডাকতে হলো শেষ পর্য্যন্ত মিলিটারীকে। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই এতে হলো না। বিদেশের কাগজগুলোতে বহু রং-বেরং দিয়ে এ কাহিনী প্রকাশ হলো। দোষ অবশ্য দেয়া হলো নেহেরু গভর্ণমেণ্টকে।

গোলমাল বন্ধ করার উদ্দেশে মাউণ্টব্যাটেন গঠন করলেন এক এমারজেন্সী কমিটি। এতে রইলেন নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল ও বলদেব সিং, মাথাই প্রভৃতি। শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনাই এঁদের উদ্দেশ্য নয়, যারা গৃহহীন, আশ্রয়হীন, শহরের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের একটা পাকা বন্দোবস্ত করাও ছিলো এঁদের কাজ। এঁদের তত্ত্বাবধান করার জন্তে তৈরী হলো নতুন দপ্তর, মন্ত্রী হলেন ক্ষিতীশ নিয়োগী।

ইতিমধ্যে অমৃতসহরের অবস্থা আরো ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ালো। শুরু হলো কলেরা, রাস্তার আশে-পাশে মৃতদেহ ছড়িয়ে রইলো। বাড়ী ছেড়ে পালাতে যেয়ে অনেক মুসলমান প্রাণ দিলো। খবর

এলো রোজই ট্রেণ বন্ধ করে এদের আক্রমণ করার। প্রতিদিন বসতে সুরু করলো ক্যাবিনেট ও এমার্জেন্সী কমিটির বৈঠক। সভাপতিত্ব করতেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। এখানে আলোচনা হতো সরকারের কর্ম্মপন্থা। কি করে থামানো যায় এ দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

বিচলিত হয়ে প্রথমে সরকার সংকল্প করলেন যে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে শরণার্থীদের আর দিল্লী শহরে আসতে দে'য়া হবে না। এদের সরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত হলো অন্য জায়গায়। এমার্জেন্সী কমিটির এক মিটিংএ প্যাটেল প্রস্তাব করলেন, যে-সমস্ত ট্রেণে শরণার্থীরা আসছে সেগুলো চালু রাখতে হবে যাতে ক্যাম্পে শরণার্থীর চাপ অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। বহু দিনের ঝানু সরকারী কর্ম্মচারী যাঁরা ছিলেন তাঁরা এ বিপদে বিচলিত হ'ননি। বরং কাজ করে গেছেন অম্লান বদনে। যাঁরা নতুন, শুধু তাঁদের মধ্যে এসে গেছে নৈরাশ্যের ভাব। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও মাঝে-মাঝে এসেছে এদের সম্বন্ধে। তাই মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন যে নেহেরু-জিন্না কর্ম্মচারীদের উদ্দেশে এক বিবৃতি দেবেন। নেহেরু রাজী হলেন কিন্তু অস্বীকার করলেন জিন্না। জিন্না নতুন করে কিছু বলতে রাজী হলেন না—শুধু বললেন যে তিনি এর আগে করাচীতে সরকারী কর্ম্মচারীদের যে উপদেশ দিয়েছেন ওটাই যথেষ্ট।

ইতিমধ্যে ইংরেজ কর্ম্মচারী, বিশেষ করে ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে, অভিযোগ করলেন উদারনৈতিক নেতা পণ্ডিত কুঞ্জরু। কুঞ্জরু অভিযোগ দিলেন যে, ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারী ও সৈন্যরা এ হাঙ্গামার জন্যে অনেকটা দায়ী। যদি তাঁরা ইচ্ছে করতেন তবে তাঁরা অনেক সহজেই এই দাঙ্গা থামিয়ে দিতে পারতেন। বিশেষ করে তিনি দোষী করলেন জনৈক ব্রিটিশ সরকারী কর্ম্মচারীকে শেখপুরার হাঙ্গামার জন্যে। কুঞ্জরুর এই বিবৃতি ইংরেজ মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। মাউণ্টব্যাটেন আপত্তি করলেন। গান্ধীজি প্রস্তাব করলেন যে কুঞ্জরু তার বিবৃতির প্রতিবাদ করবে। লর্ড ইস্‌মে এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তাই বাধ্য হয়ে নেহেরু এক জবাব দিলেন। এতে ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর কাজের তারিফ করা হলো কিছুটা।

• • • •

এই হাঙ্গামার দরুণ বিড়লার বাড়ীতে প্রার্থনা-সভায় কম লোক আসতো। তাই মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীজির কাছে প্রস্তাব করলেন যে প্রার্থনা-সভার বক্তৃতা প্রতিদিন অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর মারফৎ প্রচার করা হবে।

পন্থা অতি অভিনব। কারণ, ব্রিটিশ আমলে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো গান্ধীজির কুৎসা প্রচার করা ছাড়া কিছুই করতো না। শুধু তাই নয়, গান্ধীজির নামের আগে মহাত্মা নাম প্রচার করাতেও তাদের আপত্তি ছিলো। বহুদিন আগে বোম্বাই ষ্টেশন থেকে প্রচারের জন্য এক বিখ্যাত লেখক এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার এক জায়গায় ছিলো বোম্বের প্রসিদ্ধ রাস্তা মহাত্মা গান্ধী রোডের উল্লেখ। কিন্তু ষ্টেশন ডাইরেক্টর আপত্তি তুললেন 'মহাত্মা' নামের উপর। কেটে দে'য়া হলো এই নামটা। রেডিয়োর মারফৎ বক্তৃতা প্রচারে গান্ধীজির আপত্তি ছিলো। বিশেষ করে ষ্টুডিয়োতে যেয়ে বক্তৃতা দেয়া। এটা হবে থিয়েটার করার সামিল, তিনি মন্তব্য করলেন। এ ছাড়া কোন বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে তিনি বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত ন'ন। মাউণ্টব্যাটেনের এই প্রস্তাবে গান্ধীজি সহজে মত দিতে পারলেন না। তাই সময় নিলেন ভেবে দেখবার জন্যে।

এদিকে দিল্লী ও পাঞ্জাবের তাণ্ডবলীলা গান্ধীজিকে বিশেষ ব্যথিত করে তুলেছিলো। ডাক্তারদের তিনি মানা করলেন যে তাঁর ব্লাড-প্রেসার পরীক্ষা করার কোন দরকার নেই। গান্ধীজির ব্লাড-প্রেসার পরীক্ষা করা ছিলো ডাক্তারদের দৈনন্দিন কাজ। তিনি বাইরের জগতকে প্রায় একদম ভুলে গেলেন। সমস্ত মন-প্রাণ দিলেন দিল্লীতে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে। দিল্লীতে প্রথমে এসেই গান্ধীজি গেলেন ওখাওখলায় জামিয়া-মিলিয়ায় জাকির হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে। জামিয়া-মিলিয়াতে জড়ো হয়েছে দিল্লীর সমস্ত মুসলমান। ভয়ে তারা আতঙ্কিত হয়ে আছে। ক্যাম্পে পালা করে পাহারা দিচ্ছে জামিয়া-মিলিয়ার শিক্ষকগণ। নেহেরু নিজে এসে এদের দেখাশোনা করলেন। একদিন রাত্রে নিজে মোটর হাঁকিয়ে এসে উপস্থিত হলেন জামিয়া-মিলিয়াতে রাত্রিবাস করার জন্যে।

গান্ধীজিও মুসলমানদের আতঙ্ক দূর করলেন অনেকটা। শুধু তাই নয়, তিনি শহরের চারদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নিজে তত্ত্বাবধান করলেন শরণার্থীদের শিবির। প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজি সমবেদনা জানালেন এই সব গৃহহীনদের প্রতি। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর মারফৎ সেটা প্রচার করা হলো। তিনি বললেন, শরণার্থীদের এই বিরাট মিছিল আমার কল্পনার বাইরে।

সরকারের শিবির পড়লো দিল্লীর বাইরে। সেইখানেই শরণার্থীদের তত্ত্বাবধান করা সুরু হলো, বোঝানো হলো দিল্লীর বাইরে থাকবার জন্যে। প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজি বার বার বলতে লাগলেন হিংসার শোধ প্রতিহিংসা দিয়ে পাওয়া যাবে না। তিনি বললেন ভারতীয় মুসলমানদের মনে শান্তি ফিরিয়ে আনাই তার এখন প্রধান কর্ত্তব্য।

একদিন গান্ধীজি গেলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক-সঙ্ঘের এক সভায় বক্তৃতা দিতে। সভা শেষে এক জন গান্ধীজিকে প্রশ্ন করলে 'হিন্দুশাস্ত্র অপরাধীকে ক্ষমা করে কি না?'

জবাব দিলেন গান্ধীজি—'যে নিজে অপরাধী সে অন্যকে সাজা দিতে পারে না। দোষীকে সাজা দেবার অধিকার দেশের সরকারের, জনসাধারণের নয়।'

• • • •

সেই প্রার্থনা-সভায় লোক হয়েছিলো প্রচুর। অনেক কষ্টে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু ট্যাক্সী-বাস মিললো না, তাই হেঁটেই রওনা হ'লাম নিজের দপ্তরের পানে। উইলিংডন এয়ারপোর্টের কাছে এসে দেখতে পেলাম একটা এয়ার কোম্পানীর বাস জনাকয়েক পাইলট নিয়ে বেরিয়ে আসছে এয়ারপোর্ট থেকে। গাড়ী থামিয়ে নিজের দুরবস্থার কথা বললাম। ভেতরে ছিলেন এক বৃদ্ধ পাইলট। তিনি সানন্দে আহ্বান করলেন।

গাড়ী চলার পর হঠাৎ পেছন থেকে স্পষ্ট বাংলায় শুনতে পেলাম—নিজের নাম। তাকিয়ে দেখি অজয়। অজয়ের সঙ্গে এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হবে সেটা ছিলো কল্পনার বাইরে। তাই অবাক হয়ে বললাম, 'তুই এখানে কি করে এলি?'

'বাঃ রে, এ তো আমার কোম্পানীর বাস। প্লেন নিয়ে গিয়েছিলাম কাশ্মীর, এই মাত্র ফিরে আসছি।'

অজয় আলাপ করিয়ে দিলো তার বন্ধুদের সঙ্গে। বৃদ্ধ পাইলট তার সিনিয়র অফিসার। আজ ক'দিন হলো এরা যাতায়াত করছে দিল্লী—কাশ্মীর।

ওয়েষ্টার্ণ কোর্টের কাছে আমরা নেমে গেলাম। অজয় আমায় নিয়ে এলো আল্লসে। বিয়রের বোতল খুলে বললো—'তোর কথা শুনেছি অলোকার কাছে। চার দিন আগে প্লেন নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম। অলোকা তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

হেসে জবাব দিলাম, 'যারা গুণী তারা তো সবার কাছ থেকে প্রশংসা পায় রে। তার পর এয়ার-ফোর্স ছেড়ে দিল্লি কবে?'

"সে বিরাট কাহিনী। বর্ম্মা থেকে ফিরে এসে বদলী হ'লাম কোহাটে। স্কোয়াড্রনের বন্ধু-বান্ধবেরা সব এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়লো। কোহাটে মন বসলো না, তাই ছেড়ে দিলাম এয়ার-ফোর্স। চাকুরীও মিলে গেলো একটা এয়ার কোম্পানীতে। সেকেণ্ড পাইলট।'

দু'বোতল গিলে অজয়ের মন খুলে গেলো। বলতে লাগলো তার সৈনিক-জীবনের কাহিনী। সে ছিলো তার স্কোয়াড্রনেরই বাস্থ পাইলট। শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়তে গিয়ে জখম হয় বার কয়েক। তার চিহ্নও রয়েছে দেহের নানা জায়গায়।

অলোকার কথা তুললে অজয়। বললে ওর পরিচয়ের কাহিনী। সে পরিচয় আজ প্রেমে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে অনুসন্ধিৎসা জাগলো। তাই প্রশ্ন করলাম যে, বিয়ের কোন সম্ভাবনা আছে কি না?

অজয় একটু থতমত খেয়ে গেলো। তার পর বললে, 'অলোকাকে আমি ভালোবাসি। বহু বার বিয়ের কথা অলোকা আমায় বলেছে কিন্তু নিজের মনকে সায় দিতে পারিনি। নিজের মনের দুর্ব্বলতাকে কাটিয়ে নিয়ে বহু বার চেষ্টা করেছি বিয়ে করার, কিন্তু পারিনি।'

বললাম, 'এ তোর অন্যায়। যদি সত্যিই তুই ওকে ভালোবাসিস তা হলে বিয়ে করা উচিত।'

'বিয়েতে কোন বাধা ছিলো না,' অজয় বলতে লাগলো। 'কিন্তু জানিস্ কি হলো। এয়ার-ফোর্স ছাড়ার কিছু দিন আগে এক ঘটনা ঘটলো যা আজ পর্য্যন্ত ভুলতে পারিনি। সে ঘটনা আমার মনে দাগ কেটেছে। যখনই ও-কথা মনে হয় তখনই আমি বিয়ে করতে ভয় পাই।'

অজয় বললো সে কাহিনী।

বর্ম্মা যুদ্ধ শেষ হবার কিছু দিন আগে। স্কোয়াড্রনে তার প্রিয়বন্ধু ছিল তেলাঙ্গ। জাতে মহারাষ্ট্রীয়। তেলাঙ্গ ছিলো বেজায় আমুদে লোক। অফিসারস্ মেসে সবাই তাকে ভালবাসতো। লড়াই শেষ হবার ঠিক কিছু দিন আগে তেলাঙ্গ বিয়ে করলে। সমস্ত মেসে খুব হৈ-চৈ হলো। কিন্তু এ আনন্দ রইলো ক্ষণস্থায়ী। একদিন অজয় আর তেলাঙ্গ চলে এলো লাহোরে। এয়ার-ফোর্স এক একজিবিশনের আয়োজন করেছে। শূন্য আকাশে খেলা দেখানো হবে নানান্ রকমের। তেলাঙ্গ আর অজয় এতে অংশ নেবে। একজিবিশনের দিন ভোর বেলা ব্রেকফাষ্ট টেবিলে বসে তেলাঙ্গ অজয়কে বললো তার স্ত্রীর কথা। বললে একজিবিশন হয়ে গেলেই ও ছুটি নিয়ে হনিমুনে যাবে। একজিবিশন সুরু হলো—তেলাঙ্গ আর অজয় প্লেন নিয়ে দেখালো নানান রকম কসরৎ। শেষের দিকে তেলাঙ্গ একাই নিয়ে গেলো প্লেন। প্রায় দশ হাজার ফিট উঁচুতে। হঠাৎ উপরে মেসিন বিগড়ে গেলো। প্লেন দ্রুতগতিতে নীচে নেমে এলো ডিগবাজী খেতে-খেতে। যারা দর্শক তারা ভাবলে যে এটাও একটা কসরৎ, কিন্তু বুঝতে পারলে অজয় আর এয়ার-ফোর্সের লোকেরা যে মেসিন বিগড়ে গেছে। রেডিয়োতে বলা হলো তেলাঙ্গকে বেল আউট করতে। কিন্তু জবাব পাওয়া গেলো না। আম্বুলেন্স প্রস্তুত রইলো—কিন্তু য়্যাক্সিডেণ্ট বাঁচানো গেলো না।

য়্যাকসিডেণ্টের পরও কিছুক্ষণ তেলাঙ্গ জীবিত ছিলো। হঠাৎ একটু জ্ঞান হয়েছিলো। ডাক্তার কথা বলতে দেননি কিন্তু অজয় বুঝতে পেরেছিলো যে ওর স্ত্রীর কথা বলতে চায়। কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না।

কাহিনীটা বলতে বলতে অজয়ের চোখে জল এসে পড়লো। বললে, 'জীবনে অনেক ছেলে দেখেছি কিন্তু কখনো তেলাঙ্গের মতো কাউকে পাইনি। ওর সাহস দেখেছি অদ্ভুত! বর্ম্মায় জেনারেল উইংগেটকে খাবার সরবরাহ করতে যেয়ে একবার জাপানীদের খপ্পরে পড়ে। কিন্তু পালিয়ে আসে। তেলাঙ্গ কোন দিন মৃত্যুকে ভয় পায়নি। কিন্তু মৃত্যু তার এলো যখন সে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলো। এর পরে বহু দিন সে মনে করেছে তেলাঙ্গের স্ত্রীর কথা। ওদের মিলন হয়েছিলো মাত্র দু'দিনের জন্যে। বিবাহিত জীবন কি তার কোন স্বাদই ওরা পায়নি। মনে ছিলো ওদের নানা রঙীন কল্পনা। কিন্তু সে কল্পনা কোন দিনই তাদের বাস্তবে পূর্ণ হয়নি।'

অজয় বললো, 'নিজের বিয়ের কথা যখনই ভেবে দেখেছি তখনই আমার তেলাঙ্গের কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে সদ্য-পরিণীতা স্ত্রীর কথা। জীবনের সমস্ত সুখ থেকেই আজ সে হয়েছে বঞ্চিত। কেন? এমনি ভাবে আমারও হয়তো একদিন জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন হয়তো অলোকার জীবন হবে এমনি দুঃখময়। তাই দ্বিধা হয় নিজের জীবনের সঙ্গে অন্যকে জড়িয়ে রাখতে। যদি আমি থাকি ছন্নছাড়া তবে আমার মৃত্যু এ জগতে কোন পার্থক্য এনে দেবে না।'

অজয় বলে চললো, 'মরতে আমি ভয় পাই নে। আর মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করতে পারতাম বলেই এয়ার-ফোর্সে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন দেখতে পাই নিজের জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখনই মরতে সংকোচ হয়।'

কথা বলতে বলতে বেশ রাত্রি হয়ে গিয়েছিলো। আল্লস থেকে বেরিয়ে দু'জনে কনাট সার্কাসে এলাম। অজয় বললে যে তার পরদিন ভোর বেলাই আবার প্লেন নিয়ে বেরুতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলো আবার দেখা করবার।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিলো। পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীট ধরে অফিসে চলে এলাম। প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো অজয়ের কথা। মনে হলো, মৃত্যু তাকে আজ আতঙ্কিত করে তুলেছে। তাই যেন সে দ্বিধা বোধ করছে কোন বন্ধনে আটকা পড়তে।

সত্যিই কি এটাই একমাত্র কারণ?

• • • •

কিছু দিন বাদে গান্ধী-আশ্রমে জোর গুজব উঠলো যে, গান্ধীজি পাঞ্জাবে যাবেন। এ গুজবের সত্যতার কোন যাচাই হলো না। একদিন বিকেল বেলা গান্ধীজি দিল্লী সেন্‌ট্রাল জেলে গেলেন তাঁর প্রার্থনা-সভা করতে। কয়েদীরা সবাই এলো প্রার্থনা-সভায়। তাদের হেসে গান্ধীজি বললেন, আমি হচ্ছি পুরোনো কয়েদী। তার পর তিনি বিশ্লেষণ করলেন যে স্বাধীন ভারতে কয়েদখানা থাকবে হাসপাতালের মতো। যেমনি রুগীর চিকিৎসা করা হয় তেমনি করা হবে কয়েদীদের চিকিৎসা।

একদিন শরণার্থীর দল লেডী মাউণ্টব্যাটেনের মারফৎ খবর পাঠালো যে তারা গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। কিন্তু সময়ের ছিল অভাব, কারণ তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলছিলো। তাই গান্ধীজি রেডিয়োর মারফং তাদের বাণী পাঠালেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সেবক মাত্র। সেই হিসাবে আমার কর্তব্য তোমাদের দোষ-ত্রুটী ধরিয়ে দেওয়া। যদি তোমরা তোমাদের দোষ-ত্রুটীকে শুধরে নিতে পারো, তাহলে তোমরা শুধু নিজেদেরই উপকার করবে তাই নয়, সমস্ত দেশেরই উপকার করবে।

* * *

পনেরোই নভেম্বর, গান্ধী-ক্যাম্পে চাঞ্চল্য উঠলো। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য কৃপালনী পদত্যাগ করেছেন। নেহেরু-প্যাটেলের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করলেন। কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট হিসাবে এঁরা তাঁর কোন পরামর্শই নেননি। কৃপালনী গান্ধীজির পূর্ণ সমর্থন পেলেন। তিনি বললেন যে এই অবস্থায় কৃপালনীর পদত্যাগই শ্রেয়ঃ।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক্ বসলো নতুন প্রেসিডেণ্ট ঠিক করার জন্যে। এ দিনটা ছিলো গান্ধীজির মৌন দিবস। তাই ছোট একটি কাগজে তিনি তাঁর মনোনীত প্রার্থীর নাম লিখে পণ্ডিত নেহেরুর হাতে দিলেন। পণ্ডিতজী সভায় পড়লেন সেই নামটি। গান্ধীজি সোস্যালিষ্ট নেতা আচার্য্য নরেন্দ্র দেওর নাম প্রস্তাব করেছেন। নেহেরু এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন কিন্তু আপত্তি করলেন অন্যান্য মেম্বারেরা। দুপুর বেলা নেহেরু-প্যাটেলে এক ঘরোয়া বৈঠক্ বসলো। তাঁরা অনুরোধ করলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেস সভাপতি হবার জন্যে। গান্ধীজির কোন মত নেওয়া হলো না।

বিকেলের দিকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি জানালেন নেহেরু-প্যাটেলের সিদ্ধান্তের কথা। স্পষ্ট ভাষায় গান্ধীজি বললেন যে, এ প্রস্তাব তার পছন্দসই নয়। বেগতিক দেখে রাজেন্দ্রপ্রসাদ অস্বীকার করলেন কংগ্রেস সভাপতি হতে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি মত পাল্‌টালেন, কংগ্রেস সভাপতি তিনি হলেন গান্ধীজির ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

গান্ধীজি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে আবার হার স্বীকার করলেন।

* * * *

প্রেস রিপোর্টারদের কাছে তখন সব চাইতে টাটকা খবর ছিল, কাশ্মীর।

মাত্র কিছু দিন আগে দিল্লীতে খবর পৌঁছেচে যে নর্থ-ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্টিয়ারের আফ্রিদীরা কাশ্মীর আক্রমণ করেছে। পাকিস্তানের কাগজে বেরিয়েছে এক ছড়া। 'হস্‌ হস্‌ কে লিয়া পাকিস্থান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।' প্রবাদ ছিলো যে আফ্রিদিদের বলা হয়েছে যে 'জমিন হ্যায় পাকিস্থানকা আউর আউরাৎ ও জায়দাদ হোগী তুমহারী।'

কাশ্মীর আক্রমণের খবর দিল্লীতে একটু দেরীতে পৌঁছলো। এতে একটু বুদ্ধির খেলা খেললেন পাকিস্থান সরকার। লাহোর এসোসিয়েটেড প্রেসের ম্যানেজার তাজউদ্দীন খবর পেয়েছিলেন অনেক দিন আগেই। কিন্তু খবরটা তিনি চেপে গেলেন পাকিস্থান সরকারের অনুরোধে, কারণ শঙ্কা হলো যে খবরটা পাকিস্থান থেকে প্রচার হলে সবাই পাকিস্থানকে দোষী করবে।

দিল্লীতে এক ব্যুফে ডিনারে পণ্ডিত নেহেরু সর্ব্বপ্রথম কাশ্মীর আক্রমণের কথা জানালেন। দু'দিন বাদে ডিফেন্স কমিটির বৈঠকে জেনারেল লকহার্ট এক টেলীগ্রাম পড়লেন। টেলীগ্রামটা পাঠিয়েছে পাকিস্থান আর্মি হেড কোয়ার্টার, এতে বলা হয়েছে যে প্রায় পাঁচ হাজার আফ্রিদি কাশ্মীর আক্রমণ করেছে।

কাশ্মীর আক্রমণ নেহেরু-প্যাটেলকে চিন্তিত করে তুললো। কিন্তু পরামর্শ দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। যদি কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে ইচ্ছে করে যোগ না দেয় তবে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সমীচীন হবে না, এই তাঁর মত। প্যাটেল পাঠালেন ভি. পি মেননকে কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। কিন্তু প্রথমে আফ্রিদিদের আক্রমণে কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং গৌর একটু মাত্র বিচলিত হ'ননি। দিনের শেষে যখন খবর পাওয়া গেলো যে আফ্রিদিরা শ্রীনগরের দ্বারপ্রান্তে এসেছে তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সাহায্য চাইলেন ভারত সরকারের। সঙ্গে-সঙ্গে শেখ আবদুল্লাকে কারামুক্ত করে দিলেন। প্রধান মন্ত্রীর গদীতে বসালেন তাঁকে।

কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো সুরু হলো পরদিন থেকে।

* * * *

কাশ্মীরে গোলমাল সুরু হবার দু'দিন বাদে অজয় এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললে, ও কাশ্মীর যাচ্ছে রোজই প্লেন নিয়ে। সরকার সৈন্য ও রসদ পাঠাবার জন্যে সমস্ত কোম্পানীর প্লেন চার্টার করেছেন। তারই একটা প্লেনের ভার ওকে দে'য়া হয়েছে।

কাশ্মীর দেখার সুযোগ মিলে গেলো। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে অজয়ের সঙ্গে রওনা হ'লাম শ্রীনগরের উদ্দেশে। যুদ্ধের চিহ্ন দেখতে পেলাম শ্রীনগরের প্রতি অলি-গলিতে। যুদ্ধের বেশে ঘুরছে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ভলাণ্টিয়ারেরা। দেশ রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে ছেলে-বুড়ো সবাই।

এদিকে দিল্লীতে বৈঠক বসেছে নেহেরু-লিয়াকতের। দুই পক্ষ থেকেই অভিযোগ হলো কিন্তু নেহেরুর যুক্তির কাছে লিয়াকতের হার স্বীকার করতে হলো। মধ্যস্থ হলেন লর্ড ইস্‌মে।

কনফারেন্সে প্রস্তাব করা হলো যে পাকিস্থান আজাদ কাশ্মীর ফৌজদের নিয়ন্ত্র করবে। ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীর থেকে তুলে নেয়া হবে—আর ইউনাইটেড নেশনের মধ্যস্থতায় কাশ্মীরে "প্লিবিসাইট" হবে। কিন্তু এ প্রস্তাবে প্রথম বাধা এলো সর্দ্দার প্যাটেলের কাছ থেকে। ওয়াকিবহাল সূত্রে তাঁর কাছে খবর এসেছে যে পাকিস্থান তার সীমান্তে অনেক সৈন্য-সামন্ত জড়ো করেছে আক্রমণের উদ্দেশে।

লাহোরে আবার নেহেরু-লিয়াকত বৈঠক সুরু হলো।

মাউন্ট-ব্যাটেন প্রস্তাব করলেন যে এই সমস্যা ইউনাইটেড নেশন্‌সে পাঠানো হোক। এতে সায় দিলেন লিয়াকত।

কিছু দিন বাদে ভারত সরকার ঠিক করলেন কাশ্মীর-সমস্যা ইউনাইটেড নেশনসে পাঠানো হবে। ইতিমধ্যে মাউন্টব্যাটেন 'তার' পাঠালেন এটেলীকে। অনুরোধ করলেন ভারত ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। সেই সঙ্গে নেহেরুও 'তার' পাঠালেন এটেলীর কাছে। কিন্তু এটেলী এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না, বরং সায় দিলেন যে কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের জন্যে ইউনাইটেড নেশনসেই যাবার। কাশ্মীর সমস্যা ইউনাইটেড নেশনসে পাঠানো হলো কিন্তু এবারও গান্ধীজি এ প্রস্তাবে আপত্তি করলেন। সাংবাদিক মহলে এক গুজব রটলো যে গান্ধীজি নেহেরুর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এর সত্যতা প্রমাণ হলো না কিন্তু এর একটু আভাষ পাওয়া গেলো হোরেস আলেকজাণ্ডারের কাছে। তাঁর কাছে গান্ধীজি বললেন, যদি দুই দল মীমাংসা না করতে পারে এই সমস্যা, তবে সালিশী মানা হোক কোন ইংরেজকে। তিনি প্রস্তাব করলেন পিলিক্‌, নোয়েল বেকারের নাম।

*   *   *   *

একদিন মেইডুর হোটেলে পরিচয় হলো এক বঙ্গবাসীর সঙ্গে। ভদ্রলোক অজয়ের পরিচিত। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ছিলেন ইম্ফলে কনট্রাক্টর, আলাপ সেইখানেই হয়েছিলো। ব্রিজ তৈরী না করে অনেক ব্রিজের টাকা সরকার থেকে তিনি আদায় করেছিলেন। সঙ্কোচ যেমনি হয়নি সে পয়সা নিতে তেমনি অকুণ্ঠায় সেই পয়সা ব্যয় করেছেন। গর্ব্ব করে রেশমের শাড়ীর পাড় কেটে তাকে লুঙ্গি বানিয়ে পরেছেন। যুদ্ধের সময় দ্বারে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকতো গাড়ী। কিন্তু যুদ্ধের শেষে তাঁর স্বচ্ছলতায় ভাটা এলো—যে ব্যাঙ্ক তাঁকে ওভার-ড্রাফট্‌ দিতো তাকে পটল তুলতে হলো।

বন্ধু-বান্ধবেরা সায় দিলেন দিল্লীতে আসার জন্যে। বললেন 'চাকুরীর বাজার গরম, নসিব থাকলে সহজেই একটা মিলে যাবে। ভদ্রলোকের নাম আচার্য্য। চেহারা সুদর্শন, আদব-কায়দায় বলা যেতে পারে স্মার্ট। কাজেই সহজে একটা উপায় বের করে নিলেন নিজের সংস্থানের। পারমিট বার করা, সেইটে হলো তাঁর প্রধান পেশা। সেই সূত্রে পরিচয় হলো দিল্লীর অনেক মহারথীর সঙ্গে। দু'দিনের মধ্যে তিনি হলেন দিল্লীর বিগ গাইদের মোসাহেব। চেম্‌সফোর্ড ক্লাবের হলেন এক জন মহারথী, ককটেলের হলেন এক্সপার্ট। নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো প্রচুর।' নিজের কাহিনী বলতে বলতে আচার্য্য একটু দম্ভভরে বললেন, 'বুঝলেন ম'শায়, ক্যানটিনের ব্যবসা যখন করেছি তখন এই শর্ম্মার তৈরী ককটেল ছিলো সুপ্রসিদ্ধ। আমার তৈরী করা ককটেল যেতো বর্ম্মায়। স্বাদ এতোই মধুর ছিলো যে সবাই যুদ্ধের কথা ভুলে যেতো। আর্ম্মি কম্যাণ্ডের জেনারেল টের পেয়ে অর্ডার দিলেন যে আমার তৈরী ককটেল শুধু তাঁকেই দে'য়া হবে, আর কাউকে নয়। এই ককটেল উপরওয়ালাদের খাইয়ে জেনারেল ব্যাটাও প্রমোশন পেয়ে গেলো। আচার্য্য বললো, দিল্লীতে আমার অবস্থা যখন বেশ সঙ্গীন হয়ে এসেছে তখন আলাপ হলো সরকারের দপ্তরের এক বড়কর্ত্তার সঙ্গে। আলাপ হয়েছিলো এক পার্টিতে। আমার টাইয়ের নট্‌ দেখে বেজায় খুশী হলেন। তার পর ককটেল খেয়ে তো একদম কুপোকাৎ। বললেন, ব্রাভো, ব্রাভো!'

'ইউ আর এ ব্রাইট গাই। কী করা হয়!'

আচার্য্য তার সঙ্গীন অবস্থা জানালে। করুণা হলো বড়কর্ত্তার। আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই। একটা কিছু হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে দেখা করো কাল অফিসে।'

বড়কর্ত্তার সঙ্গে পরদিন অফিসে আচার্য্য দেখা করলে। ঘরে ঢোকা মাত্র বড়কর্ত্তা চেয়ার থেকে উঠে অভিবাদন করলেন। আলাপ সুরু হলো। কথাবার্ত্তায় তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে আলাপে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এবার আসল কথা সুরু হলো। বললেন, 'আই লাইক ইউ, আচারিয়া! কি ধরনের চাকুরী তোমার পছন্দ?'

আচার্য্য যে কোন চাকুরী পেলেই বর্ত্তে যায়। কাজেই বললে, 'চাকুরীর ব্যাপারে আমার পছন্দ নেই। কিংবা যা তুমি দেবে তাই নেবো।'

বড়কর্ত্তা জবাব শুনে খুশী হলেন, বললেন, 'ব্রাইট বয়! আমার মতলব আছে যে আমার অফিসের জন্যে একটা জার্নাল খুলবো। তুমি তার এডিটার হয়ে যাও। মাইনে অবশ্য বেশী নয়, বর্ত্তমানে সাতশো পাবে।'

বিস্মিত হলো আচার্য্য। এই অফারটা বেশ অপ্রত্যাশিত কিন্তু বললে, 'কলম যে কোন দিন ধরিনি, এডিটার হবো কি করে?'

হাসতে থাকেন বড়কর্ত্তা। বলেন, 'যারা কখনও কলম ধরতে জানে তারা কি কখনও এডিটার হয়? তারা হবে সব-এডিটার। লিখবে ওরা, শুধু কাগজে তোমার নাম থাকবে। তোমার কাজ হবে সুপারভাইজারী। যদি ওরা ভালো লেখে তবে তোমার যশঃ বাড়বে, যদি খারাপ লেখে তবে 'স্যাক' করবে ওদের।'

ধন্যবাদ জানালে আচার্য্য, চাকুরী সম্বন্ধে আরো দু-চারটা উপদেশ তিনি দিলেন।

আচার্য্যর চাকুরী পাবার এই হলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আচার্য্য বললো, 'জীবনকে কখনো সিরিয়াস্‌লি নিইনি, ম'শায়! যে অন্তঃসারশূন্য তাকেই হ'তে হবে সিরিয়াস। আর তারই দেখেছি জীবনটা শেষ হয়েছে ট্রাজেডীতে। তাই যখন যে ভাবে পেয়েছি তেমনি ভাবে নিয়েছি জীবন। কখনো ঠকিনি বা নিরাশ হইনি। নগদের আশাই সব সময়ে করেছি, কখনো দূরের বাক্সের প্রত্যাশায় থাকিনি।'

বাধা দেয় অজয়, 'জীবনটা ছেলেখেলা নয়। আনন্দের মাঝে নিজেকে ভাসিয়ে দে'য়া উচিত নয়।'

'হ্যাঁ, ওটাই হচ্ছে আমাদের বিশেষত্ব। আত্মা বার্দ্ধক্যে জন্মায় বটে কিন্তু ক্রমেই হয়ে আসে নবীন। এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের কমিডি। কিন্তু জন্মের সময় আমাদের দেহ থাকে নবীন, জীবনের শেষে ওটা এসে দাঁড়ায় বার্দ্ধক্যে। এটাই আমাদের জীবনের ট্রাজেডি।'

জবাব দিই আমি। বলি, 'আচার্য্য সাহেব, আপনি সিনিক্‌, হয়ে গেছেন দেখতে পাচ্ছি।'

'ভুল বললেন, আমি সিনিক্‌ নই। যারা সিনিক্‌ তারা জীবনের মূল্য যাচাই করতে পারে কিন্তু উপভোগ করতে পারে না। আমি

উপভোগ করতে পারি বলেই জীবনের দাম যাচাই করতে পারি না। সিনিক যদি কাউকে বলতে চান তবে সে হচ্ছে অজয়।'

প্রতিবাদ করে অজয়। বলে, 'সিনিক হওয়া অনেকটা জন্মগত ব্যাপার। দুঃখ পেলেই সিনিক হওয়া যায়, কারণ তাহলে দুঃখকে ভোলা যায় অতি সহজে।'

আচার্য্য বলেন, 'যখন দুঃখকে সহজে ভোলা যায় অজয় বাবু, তখনই সিনিকদের হয় মৃত্যু। যাক্, আপনার বান্ধবীর খবর কী? বিয়ে কবে করছেন?'

অজয় গম্ভীর হয়ে পড়ে। আমি জবাব দিই। বলি, 'আচার্য্য সাহেব, আমরা বিয়ে তখনই করি যখন প্রেম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।- কিন্তু অজয়ের প্রেমে এখনও অবসাদ আসেনি।'

'ঠিক বলেছেন', উৎসাহিত হ'ন আচার্য্য, 'যতো দিন আমরা প্রেমে মগ্ন থাকি ততো দিন আমরা বিয়ের কথা চিন্তা করি না।-এর পরে যখন প্রেমে ভাঁটা সুরু হয়, তখন আরম্ভ হয় প্রেমিক-প্রেমিকাদের মনোমালিন্য। এর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা 'একে অন্যের আশ্রয় নিই।'

'হ্যাঁ, তাই যখন আমরা প্রেম করি তখন আমরা প্রবঞ্চনা করি নিজেকে। কিন্তু যখন আমাদের প্রেমের শেষ হয় তখন প্রবঞ্চনা করি অন্যকে।' আমি বলি।

হেসে জবাব দেন আচার্য্য, 'দুঃখের ব্যাপার কী জানেন, পুরুষেরা বিয়ে করে তাদের ক্লান্তি মেটাবার জন্যে। মেয়েরা বিয়ে করে তাদের কৌতূহল মেটাবার জন্যে। কিন্তু সুখী আমরা কেউই হতে পারি না।'

* * * *

কিছু দিন বাদে আমি কাশ্মীর থেকে গান্ধী-ক্যাম্পে ফিরে এলাম। যুদ্ধের রসদ সরবরাহ করার জন্যে অজয় শ্রীনগরে রয়ে গেলো। জোজিলা উপত্যকার কাছে একটা এয়ার-পোর্ট করা হবে, সেইখানে মাল নিয়ে যেতে হবে তাকে। আচার্য্যও সেই সঙ্গে রয়ে গেলো। ['ক্রমশঃ।

আপনি কি জানেন?

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' কে রেখেছিলেন?

২। শ্রীরামপুরের মিশনারি মুদ্রাযন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কোন্ সময়ে মুদ্রিত হয়?

৩। বাঙলায় প্রথম সচিত্র সাময়িক পত্রিকা কি? কোন্ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

৪। বাঙলা দেশে কোথায় সর্ব্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হয়? রঙ্গালয়ের নাম কি? কোন্ সময়ে স্থাপিত হয়?

৫। বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস কি? লেখক বা লেখিকা কে?

৬। বাঙলা ভাষায় প্রথম বাঙলা অভিধানের নাম কি? সঙ্কলন-কর্ত্তা কে?

৭। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ও সহকারী সভাপতি কে কে ছিলেন?

৮। "একটি জাতির হিসাবে দেখা যায় তিনটি ধাপ। প্রথম—কৃতকার্য্যতা; দ্বিতীয়—কৃতকার্য্য হওয়ার ফলে ক্রোধ এবং অবিচার; এবং তৃতীয়—এই সকল কিছুর ফলে পতন।" কে বলেছিলেন?

[উত্তর ৭৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

—'চা হাজির।' কমলা প্রবেশ করল চা হাতে।

—'শুধু চা নয়—কমলাও হাজির।' আধ-শোয়া অবস্থায় এক হাতে মাথা রেখে, অপর হাতে চা ধরল শমিত।

'চা আর কমলা একসঙ্গে মোটেই উপাদেয় নয়। কমলা তাই বিদায় নিচ্ছে। নিমগ্ন হয়ে ধ্যান করছিলে যার, তার কথাই ভাব।'

'ডালমুট বাদামভাজার ধ্যান করছিলাম নাকি রে যে তা চায়ের সঙ্গে মুখরোচক হবে।'

'মনমত তো হবে।'

শমিত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললে,—'তা বটে। আচ্ছা, বোস্ না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

কমলা বসল। বললো—'হঠাৎ এত খাতির-যত্ন?'

অন্যমনস্ক শমিত সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা, তুই যে এখানে থাকতেই ভালবাসিস—যেতে চাস না, খারাপ লাগে না তোর? অসিত কি লিখেছে জানিস্? লিখেছে, এবার না গেলে ডাইভোর্স করবে তোকে।'

'তাই নাকি? তুমিও লিখে দিও, রোজকার চিঠির একটা বাদ গেলে আমিই আগে ডাইভোর্স করব ওঁকে।'

'তা বেশ, চিঠিতেই চলে যখন তোর, তখন অসিতকে আমি জানিয়ে দেব—ডাইভোর্স করুক আপত্তি নেই—বিয়ে করুক তাতেও কিছু আসে-যাবে না; কিন্তু সপ্তাহের চিঠিতে গোল হলে—ক্ষমা নেই।'

হেসে উঠল কমলা।

'আচ্ছা, সত্যি তোর মন খারাপ লাগে না?'

'বাঃ, করে না—ভী-ষ-ণ করে।'—ভ্রূভঙ্গি করে টেনে টেনে বললো কমলা।

'তবে ঘুরে-ঘুরেই চলে আসিস্ কেন?'

—'সে জন্যই তো আসি।'

—'সে জন্যই আসিস্?'—বিস্মিত সুরে জিজ্ঞাসা করল শমিত।

'হ্যাঁ, সেই জন্য। কাছে থাকলে সম্পর্কটা বড্ড পানসে হয়ে ওঠে। দু'দিন বাদেই বিষাদ, তার পর শুধু বিবাদ। তার চাইতে চিঠি পড়ে, মন উদাস-করা গান গেয়ে 'বহুৎ প্রেমসে' থাকা যায়। রাত দুপুরে হঠাৎ ঘুম-ভাঙ্গা চোখ মেলে পড়া চিঠি পড়ব সবুজ বাতি জ্বালিয়ে। গাইব গান বেহাগ সুরে—তুমিও একাকী, আমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে। নিদ নাহি আঁখি পাতে…গানের সঙ্গে হৃদয়-মন এক হয়ে বাদল নামবে নয়নে—একেবারে জমজমাট।'

'আর কাছে থাকলে?'—সকৌতুকে জানতে চাইল শমিত।

'কাছে? সব মাটি। যেই গান ধরা—'তুমিও একাকী, আমিও একাকী'—বসলেন এসে একেবারে চেয়ার টেনে মুখোমুখি! রাতে ঘরে এসে মৃদু আলোর সুইচ টিপে দিতে গিয়ে হাত কেঁপে গেল গভীর নাক ডাকার শব্দে—একেবারে বাজে, বিতিকিচ্ছি!'—ঠোঁট, হাত উল্টে বিরাগ প্রকাশ করল কমলা।

কমলার উল্টানো ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে এবার সশব্দে হাসে শমিত। এমন শব্দ করে বড় হাসে না ও। বেশ লাগছে। সন্ধ্যায় যেন দম-বন্ধ ভাব এসে গিয়েছিল।

'এই ধর'—কমলা সোজা হয়ে বসে বললো—'কি অপূর্বই না লাগবে তোমার, যদি কেউ এখন গেয়ে ওঠে'—চট্ করে উঠে গিয়ে অর্গানে টিপ দিয়ে কমল গেয়ে উঠল—

'যদি আমার দিবারাতি
কাটি যাবে বিনা সাথী
তবে কেন বঁধু লাগি
পথ পানে মিছে চাওয়া।
কত গান……'

কমলা হেসে গান থামিয়ে উঠে আসতে যাচ্ছিল—বাধা দিল শমিত—'এই থামবি নে, গেয়ে যা!'

কমলা গাইল—

'বড় ব্যথা তোমার চাওয়া…
আর ব্যথা ভুলে যাওয়া…'

গান শেষ করে উঠে দাঁড়ালো কমলা।

শমিত তারিফ করল—'না, গুরু গর্ব করতে পারে বটে!'

'বাঃ, গান গাইলাম আমি—আর প্রশংসা হলো নিজের।'

শমিত হাসল। বললো, 'এখন যদি ম্যাট্রিকটা দিয়ে দিতে পারিস্, তবে কিন্তু তোর থাকা নিয়ে আর একটুও নালিশ থাকবে না অসিতের।'

—'বেশ, ছোট বৌদি আর আমি—রাজী?'

—'রাজী।'

কমলার তৈরী চা কোন মতে গলায় ঢেলে ঘরে এলো মিত্রা। ছেলে-মেয়ের খাওয়া সম্বন্ধে মনটি ওর বড্ড বেশী খুঁতখুতে, বাধ্য হয়ে সে ভার দিয়ে এলো মেজ জা' রাণীর উপর—অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ যেন ওর বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। এসপ্রো দুটো কোন কাজে এলো না। দেরাজ টেনে এবার খেল একসঙ্গে দু'-দুটো সারিডন। তার পর শুয়ে পড়ল গা-মাথা ঢেকে। ঘুম যখন ভাঙ্গল, রাত তখন গভীর। বাতি নিবে গেছে ঘরে-ঘরে। শুধু নীচের রান্না-দালান হতে ভেসে আসছে জল আর ঝাঁটার শব্দ। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মিত্রা। দারুণ তেষ্টা পেয়েছে। এই শীতের রাতে ফ্রিজিডিয়ার থেকে বের করে জল খেল এক নিশ্বাসে এক গ্লাস। বুকটা ধক্‌ধক্ করছে। কেন? ওঃ, এতগুলো এসপ্রো সারিডন যাবে কোথায়? বড্ড খিদে পেয়েছে, কি খাওয়া যায়? কিন্তু উঠে যেতে ইচ্ছে হলো না। বসে রইল নরম কৌচে ডুবে। এ ভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া—এর চাইতে অপমান-অসম্মান আর কি হতে পারে? কপালের শিরা দুটো আবার যেন উঠতে চায় দপদপ করে। কেন ও মরতে শমিতের ঘরে গিয়েছিল!… কিন্তু যা ভেবে গিয়েছিল, হলো যে তার উল্টো! ভেবেছিল

ওকে দেখে লজ্জিত হয়ে উঠবে শমিত। বলবে—'আমার জন্ত তোমার পড়া বন্ধ হবে—সত্যি কি আর এ হতে দেব?' আর তখন সে আসবে উপেক্ষা ভরে প্রত্যাখ্যান করে— বলবে অনিচ্ছুক ব্যক্তির কাছে মিত্রা হাত বাড়ায় না।···

টুক্ টুক্ করে দরজার কড়া নড়ে উঠল অতি সন্তর্পণে।

—'কে?' চমকে উঠল মিত্রা।

—'আমি রাণী। দরজাটা খোল।'

—'ও, রাণী!' মিত্রা উঠে দরজা খুলে দিল।

—কি ভয়ঙ্কর রকম চমকে উঠেছিলে তুমি! আমি তো আসি এ রকম। কোন দিন তো এত চমকাও না?'

'চিন্তামগ্না ছিলাম। কিন্তু এত রাতে ব্যাপার কি? দাম্পত্য কলহ?'

'হ্যাঁ, দাম্পত্য কলহ।···খাওয়া হয়েছে তোমার? মাথা-ধরা একদম সেরে গেছে?'

—'তা গেছে কিন্তু পেয়েছে ক্ষিদে। কি খাওয়া যায়?'

—'আমারও কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে। খাওয়ায় রুচি ছিল না বলে রাতের খাওয়াই হয়নি। কি আছে তোমার ঘরে মিত্রা?'

'আছে বাচ্চাদের বিস্কিট আর চা - খাবার উপযুক্ত সরঞ্জাম—'

'মন্দ কি চা-বিস্কিট। তোমার ডালিমকে ডেকে কাজ নেই। চা আমিই বানাচ্ছি। কুমার, মুন্নী জেগে উঠতে পারে, মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নেই?'—রাণী মাঝের দরজাটা দিল বন্ধ করে। কেটলীটা এনে কুঁজো থেকে জল ভরতে ভরতে বললে, 'এইমাত্র বাড়ী এলেন শমিত বাবু। বারান্দায় দেখা। বললো, সারিডন, এসপ্রো, এনাসিন্, এ জাতীয় বস্তু যা থাকে ঘরে, দেও তো গোটা কয়েক এনে। দোকানগুলো সব বন্ধ হয়ে গেল। রাত একটায় যেন দোকান খোলা থাকবার কথা! চোখ দুটো টকটকে লাল আর মুখের গন্ধে ভূত পালায়। ঘর থেকে সারিডন নিয়ে এলাম। জিজ্ঞাসা করল—এত রাতে ও-ঘরে কি?'

মিত্রা উঠে দাঁড়ালো—'আসছি হাতে-মুখে জল দিয়ে। এত ঘুমিয়েছি—চোখ যেন আর খুলতে পাচ্ছি নে।' স্নানের ঘরে থেকে চোখে-মুখে জল দিয়ে বসল এসে চিরুণী নিয়ে চুল বাঁধতে। আজ আর সন্ধ্যায় মাথায় চিরুণী ছোঁয়ানোও হয়নি।···'তোমার হল রাণী?'

রাণী ভিজে হাত মুছবার জন্ত এদিক-ওদিক তাকালো তোয়ালের অনুসন্ধানে। বললো—'তোমার সৌন্দর্য্য-বোধের জ্বালায় যদি হাত বাড়িয়ে কিছু পাওয়ার জো থাকে। তোয়ালে, গামছাগুলোকেও কি রাখ বাক্সবন্দী করে?' অাঁচলেই হাত মুছতে মুছতে এসে বসল রাণী মিত্রার পাশে।

দাঁত দিয়ে ফিতে চেপে ধরে মিত্রা বললো, 'এবার শুনি তোমাদের স্বামি-স্ত্রীর কলহের কারণ?'

'একেবারে চা নিয়ে এসে, তার পর। সপ্তকাণ্ড মহাভারত প্রায়-তো হবে। জল চাপিয়েছি চার কাপ। ঘণ্টা দু'-তিন জিব-গলা ভিজিয়ে কথা বলা চলবে।' পট-ভর্তি চা, টিন-ভর্তি বিস্কিট, দুটো কাপ ইত্যাদি একটা ট্রেতে গুছিয়ে এনে রাখল রাণী মিত্রার সামনের নিচু গোল টেবিলটার উপর।

মিত্রা বললো—'আমার ঘরে—কোথায় আতিথেয়তা করব আমি—'

'তুমি অসুস্থ।'

'অসুস্থ আমি?'

'হ্যাঁ, তোমার মাথা ধরেছিল।'

'ওঃ' মিত্রা হেসে ফেল্লো।

'যাই বল, ঘরটা তোমার বড় চমৎকার কোণ-ঘেঁষা নিরালা। নইলে এত রাতে কেউ আমাদের এ চায়ের আসর দেখে ফেললে—অবাক্ হয়ে থাকত, না?'

'তা হত! কিন্তু আমি ভাবছি কি জান? ভাবছি একটু অদল-বদল চেহারা দিয়ে নিলে সব কিছুই কেমন নতুন ভাবে ভালো লাগে। রোজকার ঘর, নিত্য দিনের চা—কিন্তু বেশ মজা লাগছে নতুন রকম।'

চা ঢালতে ঢালতে রাণী বললো—'আরো ভালো জমত কমলি থাকলে। এমন জমাতে পারে! আশ্চর্য্য গুণ আছে একটা—মনের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে ঝপ করে এমন সব গান ধরবে—শুনে বিস্ময় লাগে। এটা ওর শমি মামার কাছে পাওয়া, কি বল? এমন একটা আয়োজনে ওকে ডাকা হল না কাল এ নিয়ে অনুযোগ শুনতে হবে—মুখ গোমড়া করে অভিমান দেখাবে—কিন্তু ওর কাছে তো আর ওর ভ্রাতৃ-আলোচনা চলবে না। ডাকি কি করে!'

কথার ঠাটার সুরটা শেষ পর্য্যন্ত আর রইল না। রাণীর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে ঘরের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের হাল্কা ভাবটা পর্য্যবসিত হলো ম্লান বিষণ্ণতায়।

আজকের ঘটনায় স্বামীর উপর রাগ-বিরাগ, মান-অভিমানের স্পৃহাটুকুও যেন আর রাণীর অবশিষ্ট নাই। সমস্ত মন জুড়ে আছে শুধু দুঃখ আর উপায়হীনতা।

মিত্রার হাতে একটা কাপ ধরে দিয়ে নিজেরটা নিয়ে বসল এসে রাণী কৌচে। বললো—'শোন বলছি। দিন তিন-চার হবে ছোট বোনটির একটা চিঠি পেয়েছি।···সে লিখেছে, দিন আর তাদের চলে না—এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সে সব না-চলা দিনের কাঁদুনি গাইতে কিম্বা দিন চলায় সাহায্য করবার জন্ত সে দিদিকে চিঠি লিখছে না'—রাণী আর একবার আগে একবার থামল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসা ভাবটা সামলে নিতে। শাড়ীর অাঁচল তুলে চোখ রগড়াবার ছলে নিল দু'চোখ ভরা ছল্ছলিয়ে ওঠা জলটা পরিষ্কার করে। তার পর আবার বলতে আরম্ভ করল—'লিখেছে, খাবার নাই—এক বেলা খাব। পরার নাই—থাকব ঘরে বসে, চালাব বাইরের কাজ একখানাতে। কিন্তু লেখাপড়া যে বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে—তার উপায় কি? অবৈতনিক শিক্ষা—প্রগতি যুগে, ঠিকমত মাইনে দিতে না পারলে আমাদের ক্লাশ থেকে বের করে দেওয়া হয়—তার পর দেয় নাম কেটে। আমার তাই দিয়েছে। ঘরে বসে আছি—তাই থাকতেও হবে, যদি তুমি আমার পড়ার ব্যবস্থাটার ভার না নেও।'

মিত্রা শুনে চলে নীরবে।

—'সে চিঠিখানা ভাই সাহস করে আর দেখিয়ে উঠতে পারি না। কিন্তু না দেখালে টাকা পাব কোথায়—ও বেচারাকেই বা লিখব কি? দিদির মুখ চেয়ে বসে আছে, কিন্তু দিদি যে মুখের পানে চাইবে—চিঠি পড়ে মুহূর্ত্তে চেহারাখানা যা হয়ে উঠলো তার—দেখে ভাবলাম, আর দরকার নেই শোনা-শুনির। সরে পড়ি মানে

সম্মানে। যাচ্ছিলামও—কিন্তু ডেকে বললেন—বাঃ, চলে যাচ্ছ যে? শুনে যাও। দাঁড়িয়ে গেলাম—না, যাব কেন? বল। বললেন—ক'দিন ধরে তাই হাসি-ঠাট্টায় অপ্রবৃত্তি, মুখ কালো—খাওয়া-পরায় নেই রুচি।···কিন্তু আমার আর ভালো লাগে না এ-সব। কিছু দিন বাদে-বাদেই একটা নয় আর একটা লেগেই তো আছে। ইচ্ছে হলো বলি—অভাবের পরিবার, লেগে হয়ত থাকে একটা নয়ত আরটা কিন্তু তোমার হাত দিয়ে পায় কি কিছু? শুধু কানে আসবার এত ত্যক্ততা! কিন্তু চুপ করেই রইলাম। কথা বলব কি, আগেই কান্না পেয়ে যায়, আর গলাটি থাকে ভেঙ্গে-চুরে এক হয়ে। কিন্তু চোখে জল দেখে গেলেন আরও ক্ষেপে। বাপের বাড়ী বাড়ী করে, ঘরের শান্তি নষ্ট করতে নাকি আমার জুড়ি নেই! যে মেয়েরা বিয়ের পরও এমনি করে বাপের বাড়ীর টান টানে, তাদের অদৃষ্টে সুখ নাকি জীবনেও ঘটে না। আদর্শ টানা হলো বড়দি'র। এই তো বৌদি, চিঠিপত্র দেয়, নেয় কুশল সংবাদ এক-বারের বায়গায় পাঁচ বার, কিন্তু বাস্ এই পর্য্যন্ত। তোমার মত কাঁধ বাড়িয়ে থাকে না—কতক্ষণ ধৈর্য্য থাকে বল?'

'অনেকক্ষণ ধরে তো থাকছে দেখছি।' মিত্রা বললে ভ্রূ কুঁচকে।

'কিন্তু আর রইল না। বললাম—বড়দির আদর্শ মাথায় তোলা থাক—ও সবার জন্য নয়। কিন্তু তোমরা চাইবে তোমাদের পরিবারের জন্য সর্বদাই আমাদের প্রাণ কাঁদবে—চোখ-কান ব্যস্ত, সজাগ থাকবে। কিন্তু আমাদের মা-বোনের জন্য আমরা না হয় নাই চাইলাম—তোমাদের কাঁদুক—আমাদের ও আকুল হবে না এ কি অসহ্য জুলুম? প্রশংসার ছিল বুঝি চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে, খুশী মনে মাংস-পোলাও রাঁধতে বসে যাওয়া? না তা কেন, তোমার বাপের বাড়ীতে যত দিন মাংস-পোলাওএর হাঁড়ি না চাপছে, তত দিন আমার বাড়ীতেও বন্ধ থাক ওসব। এমন মুখ করে কথাগুলো বললেন, ক্ষোভে দুঃখে—মরে যেতে ইচ্ছে করল। বললাম—তোমাদের মুখ বন্ধ থাকবে এ কি আমি বলেছি—না, সে আশাই আমি মনে রাখি। কিন্তু আমার গলা দিয়ে যদি না নামে, তার জন্যও গালমন্দ শুনতে হবে?—দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর নিয়ে ঘর করছি!'

এতক্ষণে যেন হাত বাড়িয়ে ধরবার মতো কথা পেলো মিত্রা। ফুরিয়ে-যাওয়া কাপে চা নিতে নিতে বললো—'না, ঈশ্বরচন্দ্রের মতো অত বড় হৃদয় স্বয়ং ভগবানও হামেশাই তৈরী করে উঠতে পারেন না। কিন্তু তাঁর হাতে আত্মপরায়ণ অমানুষের দলই শুধু সৃষ্ট হচ্ছে—তাও নিশ্চয়ই নয়। পথের লোকের দুঃখ-দুর্ভোগে কাতর না হোক, আত্মীয়-বন্ধুর দুঃখ-বেদনায় ব্যথিত হয়, ব্যাকুল হয়—তাদের উপোসী দেখলে খাওয়া মুখে রুচতে চায় না—এমন মানুষ বিশ্বকর্মার হাতে সৃষ্টি হয় বৈ কি। শুধু আপন প্রিয়জনদের নিয়ে প্রীত, নিজ গণ্ডি-বেষ্টিত 'সুখী পরিবার' হয়ে ঘর করাটা পশু-স্তরের কাছাকাছি—এ জ্ঞান কিছু মানুষের আছে।'

'আছে, তবে সংখ্যায় মুষ্টি পরিমিত।'···তারপর হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে বন্ধ জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে—'সবগুলো জানালা বন্ধ দেখছি তোমার? একটা খুলে দেও মিত্রা! ভাপ লাগছে।'

মিত্রা উঠে গিয়ে একটা জানালা খুলে দিতেই এক ঝলক শীতের ভারী হাওয়া লাগল এসে গায়। বন্ধ ঘর, বিক্ষুব্ধ মনের আলোড়ন, একটানা কথা—সব মিলিয়ে বেশ একটা গরম ভাব ভেতর-আমায় ঘাম জমিয়ে তুলছিল,—আরাম দিয়ে গেল ত্যতে। তারাহীন শীতের ঘোলাটে আকাশ। বাইরে বুঝি বৃষ্টি নেবেছে—টিপ-টিপ।

মিত্রা বিছানাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করল,—ছেলেমেয়ের গরম জামা এনে রাখল গুছিয়ে—ভোরে যেগুলো ওরা পরবে। নইলে ডালিম শেষ রাতে ভারি বিরক্ত করে। এমনি টুকিটাকি রাতের অসমাপ্ত কাজ করতে করতে মিত্রা বললো—'তোমার বোনের সব খরচা আজ থেকে আমার হলো। বুঝলে?'

'সে কি! না, না, ছিঃ ছিঃ! তুমি কেন দিতে যাবে'—দারুণ অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ালো রাণী। যেন মিত্রার হাত ধরে এখনি না আটকালে ও দিয়ে ফেললো।

মিত্রা এক দৃষ্টি রাণীর প্রতি চোখ পেতে হাতের কাজে মন দিল। বললো—'কেন? ভীষণ অসম্মান হবে?'

সঙ্কোচে ঘেমে উঠল রাণী—'কি যে বল—অপমান হতে যাবে কেন?' এর বেশী কথা যুগিয়ে আনা রাণীর পক্ষে অসম্ভব।

'তবে? লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালে, এখনি বোধ হয় দৌড়ে পালাবে—এমন কি মারাত্মক কথা বলে ফেলেছি?'

মিত্রার দিকে তাকিয়ে ভালমানুষ গোছের মুখখানা কাঁচুমাচু করে চুপ করে রইল রাণী।

মিত্রা বললে, 'শুধু মাত্র ভাল শ্রোতা বলেই যদি আমার প্রয়োজন বোধ করে থাক—তবে রাতের ঘুম নষ্ট করে তোমার সে প্রয়োজন মেটাবার সাধ আমার নেই রাণী! আর যদি বন্ধু ভাবে এসে থাক—তাহলে সত্যিকারের বন্ধুর মত পাশে দাঁড়াতে দেও। কারু কাছে চাইতে বা অনুমতি নিতে যেতে হবে না—এত বড় সুবিধের কথাটা বিস্মৃত হচ্ছ কেন?'

এমন একটা অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়ে রাণী নির্বাক্ হতবুদ্ধি। মিত্রার মনের ঔদার্যের পরিচয় বহু দেখেছে কিন্তু এ যে কল্পনাও ছিল না! এখন ওর সাধ্য কি মিত্রার আগ্রহে অসম্মতি বা অনিচ্ছা জানায়! কিন্তু সম্মতই বা হয় কি করে—

দু'মনা রাণীর দিকে তাকিয়ে, ট্রে-শুদ্ধ টেবিলটা একধার ঘেঁষে সরিয়ে রাখতে রাখতে মিত্রা বললো—'দেখ রাণী, প্রতি দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের স্পৃহণীয় ইচ্ছা, আগ্রহ, ভাল-লাগা না-লাগার জলাঞ্জলি চলেছে সংস্কারের হাড়িকাঠে। প্রায় ক্ষেপে যাবার অবস্থা। কিন্তু অসহ্য মনে হয়, যখন দেখি, স্নেহ-ভালবাসা মায়া-মমতার পেছনেও হৃদয় নেই—আছে ঐ সংস্কার! তাই তোমার এমন একটা প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অনুদার অমার্জিত ব্যবহার আর নির্দয়তা ছাড়া স্ত্রীকে হাত বাড়িয়ে আর কিছুই দেওয়ার পেলেন না তোমার স্বামী? আর তুমি—মৌখিক সহানুভূতির চাইতে বেশী কিছু করতে চাই শুনে, দাঁড়িয়ে রয়েছ—যেন বাজপড়া। স্ত্রীর বোন—অতএব স্বামীর হৃদয়ে দোলা তোলেনি। জা'র বোন—অতএব আমারও তুলতে পারে না—এই তো? কিন্তু সবার হৃদয়ই সংস্কারের দাস আর বেঁচে থাকার যন্ত্র মাত্র নয়।—অর্থ বা মন দুয়েরই আমার প্রাচুর্য্যের অভাব নেই—তাই আমি কারু দাস নই—না মানুষের, না সংস্কারের। বাস্, হলো তো? আজ রাত্রের মত এই পর্য্যন্ত—ক'টা বেজেছে একবার দেখেছ?'

'না, আমি দেখিনি। তুমিই বা দেখলে কখন—চেয়ে আছ তো আমার দিকে। তাও এমন দৃষ্টিতে যে, অজগরের সম্মোহিত চোখের আকর্ষণে হরিণের আত্মসমর্পণের মত অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার।'

হেসে ফেলল মিত্রা—'তাই নাকি—বেশ, তবে আত্মসমর্পণই করে ফেল। করলে? আচ্ছা, এসো এখন ঘুমোনো যাক্।'

দুজনেই গিয়ে উঠে বসল বিছানার উপর। দামী ক্যামেল র‍্যাগটা পায়ের কাছ থেকে গায় টেনে শুয়ে পড়ল রাণী। সামান্য হেসে বললো—'তোমার এ কম্বলখানা আমার এত পছন্দ—দেখো, নিয়ে যাও' বলে বোস না যেন—'

'জান, পৃথিবীতে যে সর্বপ্রথম 'আমার' শব্দটি উচ্চারণ করেছিল সেই নাকি সমাজের প্রধানতম অপরাধী।'

—'বেশ বলেছ মিত্রা।'

—'মিত্রা বেশ বলেনি। বলেছেন মনীষী গর্গ।'

—'তা যেই বলুক কথাটা যখন বলা হয়েই গেছে তখন তুমি আর আমায় নিয়ে যাও বলে বোসো না ভাই।'

—'না, তা বসব না। বলব, একখানা কিনে ফেল। এর জোড়ার খানা হয়ত এখনও আছে।'

'তাই তো সেদিন তোমাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম গো! কিন্তু চিঠিখানা হাতে পড়ল রওনা হবার মুখে। তার পর মার্কেটে গিয়ে যা কিছু কিনতে হাত বাড়াই অপ্রয়োজন বোধে কেবলি হাত গুটিয়ে আসে। তোমাদের কেনা-কাটাগুলো মনে হলো—নিছক জলে ফেলা। কেনা হলো না ক্যামেল র‍্যাগ আর কাশ্মীরী বেড-কভার!'

বেড সুইচটা টিপে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে মিত্রা বললো—'এবার যে 'নিয়ে যাও' বলতে ইচ্ছে করছে—উপায় করি কি?'

'রক্ষে কর—' গলা জড়িয়ে ধরল রাণী মিত্রার। তোমার অনুপায়ের পথ তুমি বের করতে পারবে। কিন্তু আমায় যদি আগের মত একটা ছোটখাট ভাষণ দিয়ে নিতে বল—মাথা খুঁড়েও না নেওয়ার পথ বের করতে পারব না ভাই!'

রাণীর গলা জড়িয়ে ধরা বিব্রত ছেলেমানুষি আচরণে, হেসে জিজ্ঞাসা করে মিত্রা—'আচ্ছা' আমি যখন থাকব না তখন দু'জনে ঝগড়া হলে—ছুটে আসবে কার কাছে?'

—'থাকবে না তো যাবে কোথায় তাই শুনি?'

'কেন, তুমিই তো বল, দুঃখের দিনে মেয়েদের বাপের ঘরই সম্বল? শ্বশুর-ঘরের আত্মীয়-পরিজন শুধু মাত্র সুখ-ঐশ্বর্য্যের দিনের।'

রাণী মাথা নাড়ল—'হ্যাঁ, এ সত্য। একেবারে নির্ভেজাল সত্য। তা আমি তোমার বাড়ীই যাব। ট্রামের পথ—ট্রেণ-ষ্টীমারের পথ তো নয়।'

কথায় কথায় রাত বেড়ে চলে। মিত্রার চোখে ঘুম নেই। সন্ধ্যারাত থেকে একটানা ঘুমিয়েছে সে বারোটা-একটা পর্য্যন্ত। কিন্তু মন পাতলা হয়ে ঘুম নেবে এসেছে রাণীর চোখে। খানিক বাদেই রাণীর গভীর নিশ্বাসে মিত্রা বুঝতে পারল রাণী এবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোটখাটো সুন্দর পুতুলটির মত রাণী। সব সময়ই থাকতে চায় যেন কারু আশ্রয়ের ছায়ায় পাখীটির মত গা ঢেকে। শিশুকালে নিশ্চয়ই ও মা-ঠাকুমার আঁচল আঁকড়ে বড় হয়েছে আব্দারে, অভিমান—জেদ বা একরোখামী করে নয়।···খোলা জানালাটা দিয়ে ভিজে বাতাস এসে বেশ এক ঝটকা ঠাণ্ডা রেখে গেল ঘরে। উঠে বন্ধ করে দেবে নাকি জানালাটা! রীতিমত বৃষ্টি নেবেছে। হঠাৎ ভিজে যায়গায় হাত পড়ে কনকনিয়ে উঠল হাতটা—ভিজে কেন এখানটা? আলোটা জ্বাললো মিত্রা। ওঃ, রাণীর শাড়ীর আঁচল চোখের জলে ভিজে! এতখানি চোখের জল রাণীর কেন ঝরল? ক'টা টাকার জন্ত। স্বামীর অর্থ আছে, তাই স্ত্রীর অভাব থাকতে পারে না—এ নির্ভেজাল মিথ্যে। স্বামীর ইচ্ছা আর প্রয়োজন-বোধের সঙ্গে স্ত্রীর ইচ্ছা বা প্রয়োজনের মিল না হলে—স্বামীর যতই অর্থ থাক—স্ত্রীকে অভাব বোধ করতে হয়। এক জনেরটাতে আর এক জনের সমান অধিকার—এ হয় না। এমন কি, স্বামি-স্ত্রীর ভেতরও হয় না। সন্তান, সংসার সবই দু'জনার এক, তাই গরমিল বড় হয় না—হলে স্বামীর টাকা যে তার নয়—এ সত্য স্ত্রীকে ঠেকে শিখতে হয় বৈ কী। তবু দিন-রাত্রির 'সব তোমার' আর 'তোমার জন্যই সব' নিছক মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছাড়া যে কিছুই নয়, এ সত্য মেয়েরা বিস্মৃত হয় কি করে!

···নাঃ, উঠতে হলো। নড়াচড়ার শব্দ এলো যেন কুমার, মুন্নীর নিশ্চয়ই গায়ের লেপ গেছে সরে আর শীতে এমন করছে। যে ঘুম ডালিমের! টর্চ্চের আলো ফেলে উঠে গেল মিত্রা। ঠিক, লেপের এক হাত দূরে কুঁকড়ে আছে কুমার, মুন্নী আছে লেপের উপর আদ্দেক শরীর তুলে। দুজনকে শোয়াল এনে ভাল করে। দিল গায়ে লেপ জড়িয়ে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো ঘুমন্ত সন্তানের পানে—ঘুমের শিশু দেখতে কি আশ্চর্য্য সুন্দর! চুমু খেল মুখ নামিয়ে। তার পর এসে শুয়ে পড়ল নিজ জায়গায়। এবার নিশ্চয়ই ও ঘুমোবে।

[ক্রমশঃ।

উত্তর

১। ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল। ২। ইং ১৮০২ অব্দে। ৩। পাক্ষিক 'অরুণোদয়'; ইং ১৮৪৬ অব্দে। ৪। ঢাকায়; পূর্ব্ব-বঙ্গ-রঙ্গভূমি; ইং ১৮৬১ অব্দে। ৫। "ফুলমণি ও করুণা"; শ্রীমতী মুলেন্স। ৬। শব্দসিন্ধু (অমরকোষের তর্জ্জমা); ৺পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়। ৭। যথাক্রমে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত এবং ৺নবীনচন্দ্র সেন। ৮। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস।

ছোটদের আসর

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

২৩শে মার্চ তারিখে ঝাঁসী থেকে চৌদ্দ মাইল তফাতে এসে জেনারেল হিউরোজ শিবির পাতলেন। রাণী এ সংবাদ পেয়েই নিজের নারীসত্তা ভুলে গিয়ে পুরুষের মত অদম্য শক্তিতে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুর্গপ্রান্তরে সেনাদের সমবেত করে রাণী তাঁদের সামনে এসে বললেন—'ঝাঁসীর বীর সন্তানগণ! আমি তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব; যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—জয় বা মৃত্যু। হয় আমি তোমাদের জয়ে, না হয় মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাব। প্রতিজ্ঞা কর তোমরা—জীবন থাকতে ঝাঁসীর পতাকা শত্রুর হাতে সমর্পণ করবে না!'

অসংখ্য কণ্ঠ থেকে ধ্বনি উঠল—'জীবন থাকতে আমরা ঝাঁসীর পতাকা শত্রুর হাতে দেব না।'

এর পর রাণী সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ইংরেজ সেনাপতির অভ্যর্থনার যে আয়োজন করলেন, ভারতে তা অপূর্ব। ওদিকে জেনারেল রোজ শিবির তুলে ঝাঁসী অভিমুখে অগ্রসর হয়েই বুঝলেন, তিনি এক অসাধারণ প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করতে চলেছেন। এই প্রতিপক্ষকে প্রথমে নারী ভেবে তিনি অবজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু এখন বুঝলেন, তাঁর ভুল হয়েছিল। স্যার হিউরোজ যতই অগ্রসর হন, দেখেন—চার দিকে আগুনের শিখা লক্‌লক্‌ করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, শস্যক্ষেত্র, প্রান্তর, অরণ্য—প্রজ্বলিত হচ্ছে! রোজ বুঝলেন, ঝাঁসীর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল অগ্নিসাৎ করে রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজ সেনার রসদ সংগ্রহের উপায় ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সেই দারুণ উত্তাপের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া ইংরেজ সেনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। এদিকে সঙ্গে যে রসদ ছিল, তাঁবু ফেলে বিশ্রাম কালেই শেষ হয়ে গেছে। তখন রসদের জন্যে সেনাদল অস্থির হয়ে উঠেছে। রোজ স্থির করতে পারলেন না, এ অবস্থায় কি করবেন? বিনা রসদে আরো এগিয়ে যাওয়া কি সঙ্গত হবে! কিন্তু এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন তেহরীর রাজা সাহেব। এই তেহরীরাজ ইংরেজের পক্ষপাতী, রাণী তা জানতেন। সেই জন্যই ঝাঁসীর বিপ্লবের সময় স্কীন সাহেবকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন তেহরীরাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেবার জন্য। এখন ইংরেজের এই বিপত্তি দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রচুর রসদ পাঠিয়ে তিনি রাণীর প্রথম সামরিক কৌশলকে ব্যর্থ করে দিলেন।

এর পর ঝাঁসীর দ্বারে এসেই রোজ দুর্গ আক্রমণ করলেন। রাণীও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তাঁর ঘনগর্জ কামান অগ্ন্যুদ্গার করে ইংরেজের কামানের প্রত্যুত্তর দিল। ২৩শে মার্চ থেকে ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত আট দিন ইংরেজ-সেনা ঝাঁসী অবরোধ করে রাণীর সৈন্যের সঙ্গে অহোরাত্রি যুদ্ধ চালালেন। কিন্তু রাণী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে অভিজ্ঞ সেনাপতির মত অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে যে ভাবে সমর পরিচালনা করতে লাগলেন, তার ফলে জেনারেল রোজের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, অবিশ্রান্ত ভাবে ভীষণ সংগ্রামে ইংরেজদের যুদ্ধোপকরণ সব নিঃশেষ হয়ে গেল। নানা সাহেব এ সময় ইংরেজ সেনাপতি স্যার ক্যাম্পবেলের গতিরোধের জন্য বিপ্লবী কেন্দ্রগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে ব্যস্ত। একান্ত আগ্রহ ও ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ঝাঁসীতে এসে রাণীর সঙ্গে মিলিত হতে পারলেন না। কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি বিশ হাজার সৈন্য সহ তাত্তিয়া তোপিকে ঝাঁসীতে পাঠালেন। জেনারেল রোজও ইতিমধ্যে তেহরীর রাজার কাছে সৈন্য, রসদ ও গোলা-বারুদ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন সাহায্যের আশায়। হঠাৎ গুপ্তচর রোজ সাহেবের কাছে খবর আনল—তাত্তিয়া তোপি বিশ হাজার ফৌজ নিয়ে ঝাঁসীর উদ্ধারে আসছেন; কিন্তু সৈন্যদল এত দ্রুত এগিয়ে এসেছে যে, সঙ্গের তোপখানা পিছিয়ে পড়েছে অনেক দূরে। রোজ যেমন শঙ্কিত হলেন, তেমনি একটা আশার পথও দেখলেন। তিনি মনে মনে একটা সঙ্কল্প এঁটে রিজার্ভ রাখা গোলা-বারুদ সমস্ত সংগ্রহ করে দূর-পাল্লার বড় বড় কামানগুলো সাজিয়ে ফেলবার হুকুম দিলেন। ইংরেজের গুপ্তচর নানা বেশে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর খবর এলো, ঝাঁসী থেকে ১৪ মাইল তফাতে রোজ সাহেব প্রথম যেখানে তাঁবু ফেলেছিলেন, তাত্তিয়া তাঁর অগ্রগামী অশ্বারোহী সেনাদল নিয়ে সেই ময়দানে এসে জমায়েত হয়েছেন: তাঁর ফৌজ খুব শ্রান্ত; তোপখানা এসে পড়লেই ঝাঁসীর দিকে কুচ করবেন। রোজ সাহেব বুঝলেন, তাহলেই সর্বনাশ—সামনে ঝাঁসীর কেল্লা, পিছনে ফৌজ নিয়ে দুর্দ্ধর্ষ তাত্তিয়া তোপি! তিনি আর কালবিলম্ব না করে তোপখানা ও তার পিছনে সঙ্গীনধারী পল্টন নিয়ে তাত্তিয়া তোপিকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করতে ছুটলেন। তোপির পরিশ্রান্ত বাহিনী নৈশ ভোজনে রত, এমনি সময় রোজের

গোলন্দাজগণ বৃষ্টিধারাবৎ গোলাবর্ষণ করে তাদের অভ্যর্থনা করল—আক্রান্ত সিপাহীরা অস্ত্রধারণেরও অবসর পেল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বিশাল বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং রোজের বিজয়োন্মত্ত সেনাবাহিনী অগ্রবর্তী হয়ে কয়েক ক্রোশ পশ্চাতে অবস্থিত তোপীর তোপখানা বিস্তর রণসম্ভার সহ দখল করে নিল।

রাণীর রণবাহিনী সাগ্রহে তাত্যিয়ার প্রতীক্ষা করছিলেন, এই দুঃসংবাদে তাঁরা ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু রাণী কিছুমাত্র নিরাশ না হয়ে স্বয়ং সেনাদলের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে উৎসাহ দিয়ে এবং দুর্গ-প্রাচীরের উপরে উঠে ইতস্তত পরিভ্রমণ করে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে নির্দেশ দিয়ে ফিরতে লাগলেন। রাণীর পক্ষে এ ভাবে আশাভঙ্গ এবং ইংরেজের পক্ষে পরম শুভযোগ সত্ত্বেও ঝাঁসীর বীর-বাহিনীর তুমুল বিক্রমে ইংরেজ সেনা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল; শেষে ইংরেজের অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল যে, জেনারেল রোজ অবরোধ তুলে তফাতে সরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলেন। কিন্তু ইংরেজ শুধু অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে না, সেই সঙ্গে কূটবুদ্ধি ও যত রকমের ছল-চাতুরী আছে—সেগুলিও অতি সন্তর্পণে প্রয়োজনে লাগাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যে তেহরী-রাজ যুদ্ধের প্রারম্ভে রসদ দিয়ে ইংরেজকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি এই সময় ইংরেজের প্ররোচনায় প্রচুর রণবল পাঠালেন ইংরেজ-শিবিরে এবং রাণীর দুর্গের যে অংশের রক্ষা-ভার ছিল দুলারী ঠাকুর নামে এক অভিজ্ঞ বুন্দেলা সরদারের উপর—সেই বিশ্বাসঘাতক প্রচুর টাকা ঘুষ খেয়ে দুর্গের দক্ষিণ দ্বার খুলে দিয়ে ঝাঁসীর সঙ্গে রাণীর পতনের রাস্তা করে দিল। দুর্গের অপরাংশে যুদ্ধরত সেনাদল স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখল যে, দুলারী-রক্ষিত দক্ষিণ দ্বার দিয়ে পিল-পিল করে গোরা সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করছে। রাণীও নির্বাক্ দৃষ্টিতে দেখলেন এ দৃশ্য, তাঁর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। যেদিকে তিনি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ ছিলেন, সেই দিক দিয়েই পরাজয় নিদারুণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর রক্ষীবাহিনী নিয়ে বাধা দিতে ছুটলেন, প্রথম অভিযাত্রী গোরা দলকে আক্রমণ করে নির্মূলও করলেন; কিন্তু পিছন থেকে তখন স্রোতের মত অসংখ্য সেনাদল দুর্গে প্রবেশ করছিল। রাণীর সেনাপতিরা অতি কষ্টে তাঁকে দুর্গের এক নিরাপদ অংশে নিয়ে গেলেন। রাণী তখন নিজেও আহতা হয়েছেন; কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে সেই অবস্থাতেই সেইখানে মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করে কর্তব্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হলেন রাণী। কর্ত্তব্য স্থির করেই রাণী পুরুষ-বেশে সজ্জিত হলেন; দত্তকপুত্র দামোদর তখন অষ্টমবর্ষীয় বালক; রাণী তাকে একখানি শালে জড়িয়ে নিজের পিঠে বেঁধে নিলেন—যোদ্ধারা যে ভাবে সামরিক উপকরণ পিঠে বেঁধে নেয়—সেই অবস্থায় রাণী কাশী, মন্দার প্রভৃতি তাঁর বীরাঙ্গনা সহচরী এবং বাছা-বাছা কতকগুলি শক্তিশালী নিপুণ যোদ্ধাদের নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে অসম সাহসে শত্রুশিবির ভেদ করে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ঝাঁসী থেকে বেরিয়ে রাণী সদলবলে কাল্পী অভিমুখে ছুটলেন। সুসময়ে একদা এই পথে রাণী স্বামীর সঙ্গে কাল্পীর জঙ্গলে সখের শিকার খেলতে গিয়েছিলেন—সেই সুখস্মৃতি মনে পড়তেই চোখ দুটি তাঁর অশ্রুময় হয়ে ওঠে। কাল্পীর জঙ্গলে রাণী আগে থেকেই অনেক অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাত্যিয়ার ছত্রভঙ্গ সেনাদলও এই সময় কাল্পীতে এসে সমবেত হয়েছিল। বীর তাত্যিয়া তাদের সমবেত করছিলেন; রাণীকে দেখেই তাত্যিয়ার উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, অতর্কিতে আক্রমণজনিত পরাজয়ের গ্লানি তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, সে অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি এখন অধীর হয়ে উঠলেন; মহিমময়ী রাণীর নেতৃত্ব তাঁর অন্তরে নূতন শক্তি সঞ্চারিত করল।

তাত্যিয়া খবর পেয়েছিলেন, হায়দ্রাবাদের নিজামের দেখাদেখি গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়াও জেনারেল রোজের রণবাহিনীকে সাহায্য করবার জন্য উসখুস করছেন, কিন্তু গোয়ালিয়রের সৈনিকরা ইংরাজবিরোধী এবং সিপাহীদের পক্ষপাতী। রাণী এ কাহিনী শুনেই বললেন: তাহলে আমাদের উচিত গোয়ালিয়র দুর্গ সর্বাগ্রে দখল করে তার পর আরও শক্তি সঞ্চয় করে ঝাঁসীর উদ্ধারে ফিরে আসা···রাণীর এই যুক্তি তাত্যিয়াও সঙ্গত জেনে সমর্থন করলেন। এর পর সসৈন্য গোয়ালিয়র অভিমুখে রাণী ধাবিত হলেন; বীর তাত্যিয়াও তাঁর সেনাদলকে সংগঠিত করে চালিত করতে লাগলেন।

সিন্ধিয়া রাণীর আগমন-বার্তা পেয়ে বাধা দেবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন, সেই সঙ্গে জেনারেল রোজের কাছেও খবর পাঠালেন। রোজ সাহেব তখন ঝাঁসীর সর্বত্র তন্ন-তন্ন করে রাণীর সন্ধান করছিলেন; সেই রাণী বিদ্যুদ্বেগে তাঁর অবরোধ ভেদ করে যাদুকরীর মত গোয়ালিয়র আক্রমণ করেছেন শুনে তিনি স্তম্ভিত হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে গোয়ালিয়র অভিমুখে কুচ করলেন। এদিকে সিন্ধিয়ার সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-প্রতিরোধ চূর্ণ করে রাণী যখন গোয়ালিয়র দুর্গের উপর ঝাঁসীর বিজয়-কেতন স্থাপিত করেছেন, সেই সময়ে অসংখ্য তোপের শব্দে চতুর্দিক্ প্রকম্পিত করে জেনারেল রোজের বাহিনী গোয়ালিয়রে আগমন-বার্তা ঘোষণা করল। আবার আরম্ভ হলো নূতন করে হাতাহাতি যুদ্ধ—গোয়ালিয়রের সকল স্থান জুড়ে চলতে লাগল ভীষণ রণতাণ্ডব। ১৮ই জুন তারিখে সারা দিনব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধে রাণীর সেনাদল বিধ্বস্তপ্রায় হলে, রাণী রামচন্দ্ররাও দেশমুখ নামক এক বিশ্বস্ত সরদারের হাতে দামোদরকে অর্পণ করে কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর ও সহচরীদের নিয়ে শত্রু-ব্যূহ ভেদ করে অরণ্য অভিমুখে ধাবিত হলেন। কতিপয় গোরা সৈনিকও রাণীকে বন্দিনী করবার জন্য তাঁর অনুসরণ করল। সেই অবস্থায় রাণী সহসা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সন্নিহিত গোরা সৈনিককে আক্রমণ করে খড়্গাঘাতে শমনসদনে পাঠিয়ে পুনরায় অগ্রবর্তিনী হলেন। খানিক পরে গুলীর শব্দের সঙ্গে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে রাণী পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, তিন জন গোরা একসঙ্গে তাঁর দুই সহচরী কাশী ও মন্দারকে আক্রমণ করেছে—দুরাত্মাদের গুলীতে তাঁরা আহতা হয়ে আর্তনাদ তুলেছেন। রাণী তৎক্ষণাৎ ঘোড়াকে ঘুরিয়ে সেই তিন জন গোরার সম্মুখীন হলেন। জনৈক গোরার সঙ্গীনে রাণীর কমনীয় আননের একাংশ একটি চোখের সঙ্গে ছিন্ন হলো; সেই রক্তাপ্লুত অবস্থায় আহতা ব্যাঘ্রীর মত রাণী একে একে তিন আততায়ীকে নিহত করে পুনরায় অরণ্যাভিমুখী হলেন। এদিকে বনপথে অতি সন্তর্পণে রামচন্দ্ররাও দেশমুখ দামোদরকে কোলে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই সময় তিনি আহতা রাণীকে গঙ্গাদাস বাবাজী নামে এক সাধুর কুটীরে নিয়ে গেলেন! সেখানে রাণীকে প্রচুর পরিমাণে গঙ্গাজল পান করান হলো। সুশীতল পবিত্র গঙ্গাজল

পান করে রাণী কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে স্নেহপূর্ণলোচনে রামচন্দ্রের ক্রোড়স্থিত দামোদরের দিকে একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত করলেন; পরক্ষণে তাঁর চোখ চিরদিনের মত দীপ্তিহীন হলো—মহীয়সী রাণীর অমর আত্মা সূর্যমণ্ডল ভেদ করে অমরধামে চলে গেল। রণমৃত্যুর পর দেহমুক্ত আত্মার দিব্যগতি সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে:

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাট্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হত:।

[আগামী সংখ্যায় পরিশিষ্ট]

বন্দে মাতরম্

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পৃথিবীর আবির্ভাব

ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের গোড়াকার ভূতে দুটি
অর্থাৎ মাটি আর জলে এই পৃথিবী উঠেছে ফুটি।
তিন ভাগ এর শুধু জল আর এক ভাগ শুধু মাটি,
পৃথিবী বলিতে আমরা কিন্তু মাটিকেই ভাবি খাঁটি।
কারণ আমরা ভূচর সকলে, ভূমিতেই চলাচল;
সেহেতু আমরা পৃথিবীর নাম দিয়াছি ভূমণ্ডল।
পাঁচটি ভূতের কোন্ ভূত আগে, কোন্‌টি বা পরে আর,
তা নিয়ে মোদের ঋষি পুরুষেরা ভেবেছে বারম্বার।
তাঁরা বলেছেন আদিতে সৃষ্টি জল—এই কথা ঠিক;
জল থেকে মাটি—সে কথাও আজ বলিছে বৈজ্ঞানিক।
জল থেকে লভি জন্ম যেদিন মাটি ধরে রূপ নানা,
সেই দিন তা যে জ্ঞানের বিষয় হলো তা সবার জানা।

মহাদেশ

দ্বীপ তারে বলি চারি দিকে যার জল, মাঝখানে স্থল,
যার তটে আসি হানিছে আঘাত তরল জলাঞ্চল।
প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেছে মেদিনী সপ্তদ্বীপ
যদিও জলধি ধরিয়াছে ভালে অনেক মাটির টিপ।
মোট কথা এটা ধরে নিতে হবে আকার মহান্ যার
তারে মহাদ্বীপ বলিবে কিংবা মহাদেশ নাম তার।

মহাদেশের সংখ্যা

যদি বলো মহাদেশ ক'টি আছে সারা এই পৃথিবীতে,
তা হলে বলিব প্রধানত চার, আর সব ছেড়ে দিতে।
ইউরোপ আর এসিয়া ছাড়াও আফ্রিকা, আমেরিকা
চার নামে চার ভাগে থাকিলেও তিনেতে তিনাত্মিকা।
অষ্ট্রেলিয়া সে জাতে ওঠেনিকো লোকে তাই তারে কহে
মহাদ্বীপ শুধু, মহাদেশ বলি আজো পরিচিত নহে।
ইউরোপ আর এশিয়া মিলিয়া হয়েছে ইউরেশিয়া;
এরা দু'য়ে মিলি হ'য়ে গেছে এক যেন বা একটি হিয়া।
গোলকের মানচিত্রের দিকে চাহ, নহে অনুমান,
এ দু'য়ের মাঝে নাহি কোন নাহি সলিলের ব্যবধান।
এই আদি মহাদেশের মাথায় জলধি আর্কটিক;
ভারত মহাসাগরের জল ব্যাপি দক্ষিণ দিক;
পশ্চিমে আছে আটলান্টিক পুবে প্রশান্ত স্থির;
চারি দিকে আছে এমনি করিয়া চারি সাগরের-নীর।
উত্তরে পশ্চিমে আফ্রিকা আটলান্টিকে শুয়ে;
ভারত মহান্ বারিধি পা দেয় দক্ষিণে পুবে ধুয়ে।
প্রশান্ত মহাসাগর পশ্চিমে আমেরিকা ধরি রয়,
পূর্বে তাহার আটলান্টিক জলময় জলাশয়;
উত্তরে আর দখিণে তাহার উত্তর দক্ষিণ
আর্কটিকের দু'টি বিশেষণ, দুইটি সাগর ভিন।
অপর দুইটি মহাদেশ যদি ইউরেশিয়ার সাথ
তুলনা করিতে চাও তবে ভেদ পেয়ে যাবে নির্ঘাত।
ইউরেশিয়া সে পুব হ'তে ক্রমে পশ্চিম দিকে ধায়;
অপর দুইটি উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে যায়।
ইউরেশিয়া সে লম্বার চেয়ে বেশি হলো চওড়ায়;
আর দু'টি রোগা সরু গড়নেতে যদিও দীর্ঘকায়।
আকার ভেদের দরুণ হয়েছে দেশের প্রকার-ভেদ,
সেই কথা ভুলে গেলে পরে হবে ভাবের মূলোচ্ছেদ।
ইউরেশিয়া ও আফ্রিকা হলো পৃথিবীর আদিভূমি,
প্রকৃতির মুখে ফুটেছিল হাসি সে মুখ প্রথম চুমি।
আমেরিকা এলো এই তো সেদিন প্রকৃতির অনুরাগে,
কে জানিত বলো আমেরিকা নাম পাঁচশো বছর আগে?
প্রাচীনের সাথে নয়া পৃথিবীর বহু আছে গরমিল,
এখানে যখন বর্ষা নেমেছে ওখানে আকাশ নীল;
হেথায় যবে দিন-দুপুরের বেলা রোদ ঝরে খরতর,
ওখানে তখন ঘুমায় সকলে, রাত্রি দ্বিপ্রহর।
কেন হেন হয় সে কথা বুঝিতে যদি চাহ সবে ঠিক,
বুঝিবে তখন হইবে যখন সকলে বৈজ্ঞানিক।
কারণ সূর্য-চন্দ্রকে ধরি টানাটানি করা চাই,
বুড়াকালে ভাই, সেই প্রবৃত্তি আদৌ আমার নাই।

ক্রমশঃ।

মান্ধাতার মুল্লুকে

হেমেন্দ্রকুমার রায়

তৃতীয় পর্ব্ব

রোলাঁর কাহিনী

"সেই অদ্ভুত, বিভীষণ মূর্ত্তিটার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম খানিকক্ষণ।

"বিমলবাবু, কুমারবাবু, Anthropology, Biology আর Zoologyকে আপনাদের ভাষায় বলে নৃবিদ্যা, জীববিদ্যা আর প্রাণীবিদ্যা। সংসারচিন্তা বা অর্থের অভাব নেই, কাজেই সময় কাটাবার জন্যে সখের খাতিরেই ঐ সব বিষয় নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। চিকিৎসাবিদ্যা নিয়েও অল্পবিস্তর নাড়াচাড়া করতে ছাড়িনি।"

কুমার বললে, "আপনি দেখছি আমাদের বিনয়বাবুর দলে।"

রোলাঁ হেসে বললেন, "আপনাদের দেশের প্রবাদে বলে না—

রতনেই রতন চেনে? হয়তো সেই জন্তেই বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়েছে। কিন্তু থাক্ ও-কথা। খানিকক্ষণ মন দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করবার পর আন্দাজ করলুম, 'কাগারা' বিছুটির ঝোপের ভিতরে এই যে আশ্চর্য্য মূর্ত্তিটা প'ড়ে আছে, রোডেসিয়ার ইতিহাসপূর্ব্ব যুগের আদিম মানুষদের সঙ্গে এর একটা দূর-সম্পর্ক থাকতে পারে। আগেই বলেছি, আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌রা আফ্রিকার রোডেসিয়া প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক শ্রেণীর মানুষের কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। আমরা এখন কঙ্গো প্রদেশের কিভু হ্রদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি বটে, কিন্তু এরই অনতিদূরে পাওয়া যায় সমুদ্রের মত বিশাল টাঙ্গানিকা হ্রদ। তারই দক্ষিণ প্রান্তে আছে রোডেসিয়া প্রদেশ। সুতরাং স্মরণাতীত প্রাচীনকালে সেখানকার আদিম বাসিন্দাদের কোন দল যে এ অঞ্চলে এসে আস্তানা গাড়েনি, এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না।

"তারপর এই কঙ্গো হচ্ছে আফ্রিকার এক রহস্যময় প্রদেশ। আধুনিক সভ্যতা এখানকার অনেক রোম্যান্স নষ্ট করে দিলেও, বহু স্থলেই আজও তার পদচিহ্ন পড়েনি। পর্য্যটকদের মুখে সময়ে সময়ে যে সব কাহিনী শোনা যায়, তা যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্ময়কর। আপনারা কেউ ডবলিউ বাক্‌লে সাহেবের "Big Game Hunting in Central Africa" নামে পুস্তক পাঠ করেছেন?

"পড়েন নি? বেশ তা হ'লে আমার মুখ থেকে সংক্ষেপে দুটো কাহিনী শুনুন। বাক্‌লে নিজেও হচ্ছেন একজন বিখ্যাত শিকারী, আর অন্যান্য শিকারীরা তাঁর কথা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ব'লে মনে করেন। একবার তিনি কঙ্গো প্রদেশের ম'বোমা নদীপথে নৌকাযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। এক জায়গায় গিয়ে শুনলেন, জলপথের সেই অংশটাকে স্থানীয় লোকেরা ভীষণ ভয় করে। সেখানে আছে নাকি এক অতিকায় জলদানব। যখন তার অভিরুচি হয়, সে এক গ্রাসে সমস্ত যাত্রীকে গিলে ফেলে—নৌকা-কে-নৌকা শুদ্ধ! সেখান দিয়ে যাবার সময়ে নৌকার লোকেরা কথাবার্ত্তা বন্ধ ক'রে দেয়, কারণ গোলমাল হলেই জলদানব দারুণ ক্ষেপে যায়। কিন্তু মৃদুস্বরে গান গাইলে সে নাকি খুসি হয়! প্রত্যেক নৌকার মাঝি নদীর জলে টাকা-পয়সা নিক্ষেপ ক'রে প্রণামী দিয়ে জলদানবের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করে। এ গল্প বিশ্বাস করেন সেখানকার য়ুরোপীয় কর্ত্তৃপক্ষও। আপাততঃ জলদানবকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই, কারণ ম'বোমা নদীর দিকে কেউ আমরা যেতে চাই না। কিন্তু এইবারে দ্বিতীয় যে গল্পটি বলব, সেটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

"বাক্‌লে বলছেন, 'কঙ্গোর জঙ্গলে বেরিয়েছিলুম হাতী-শিকারে একদিন। মদ্দা একটা হাতীর সন্ধানও পাওয়া গেল। কিন্তু হাতীটা বেজায় চালাক। লোকলস্করের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে কখনো জঙ্গল ভেঙে, কখনো জলাভূমি পেরিয়ে হাতীটার পিছনে পিছনে অনুসরণ করলুম, কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল ধরতে পারলুম না। অবশেষে বেলা গড়িয়ে এল বৈকালের দিকে।

"হাতীটা যে পথ ধরে গিয়েছে, হঠাৎ দেখি সেই পথ ধ'রে এগিয়ে আসছে কি একটা কালো রঙের জানোয়ার। ঘন জঙ্গলের ছায়ায় ভালো ক'রে নজর চলছিল না, তাই প্রথমটায় মনে হ'ল, সেটা হচ্ছে একটা বাচ্চা হাতী। আরো কাছে এলে বোঝা গেল, সেটা অন্ত কোন জানোয়ার।

"ক্রমেই সে আরো কাছে এসে পড়ল। সে মাথা নামিয়ে হেঁট মুখে আসছিল। তারপর আমার কাছ থেকে হাত চারেক তফাতে এসে টপ ক'রে সে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলে। আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম, কারণ দেখতে তাকে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা মানুষের মত! কয়েক সেকেণ্ড ধ'রে সে তাকিয়ে রইল আমার পানে। তারপর "ওয়া!" ব'লে চেঁচিয়ে, কিছুমাত্র ভয়ের ভাব না দেখিয়ে আবার ফিরে গেল বনের দিকে। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম হতভম্বের মত, নরহত্যার ভয়ে বন্দুক ছুঁড়তে হাত উঠল না।

"আমার সঙ্গের দেশীয় অনুচররা বললে, 'বোয়ানা (কর্ত্তা), ও হচ্ছে কামা মন্‌টু। মানুষ নয়, কিন্তু মানুষের মত দেখতে।'

"আমি শিম্পাঞ্জী-গরিলা দেখেছি, এ কিন্তু দেখতে অন্য রকম—প্রাগৈতিহাসিক যুগের অজানা কোন জীবের মত। পরে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলুম, এক সময়ে এখানকার অরণ্য থেকে বানরজাতীয় হিংস্র জীবরা বেরিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের আক্রমণ করত, তারপর তাদের বধ ক'রে মৃতদেহগুলো নিয়ে বনের ভিতরে গিয়ে খেয়ে ফেলত।

"বানররা মাংসাশী হয় না, সুতরাং তারা যে বানর নয়, এটুকু সহজেই বোঝা যায়। তবে বাক্‌লে যে জীবটা দেখেছিলেন, আসলে সেটা কি? আজ মিকেনো পাহাড়ের এই 'কাগারা' ঝোপের ভিতরে যে কিম্ভূতকিমাকার জীবটাকে দেখছি, এও কি সেই 'কামা মন্‌টু'দের নতুন কোন নমুনা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কথা ভাবছি, হঠাৎ দূর থেকে বন্ধুর সাড়া পেলুম—'রোলাঁ, রোলাঁ, সন্ধ্যার আর দেরি নেই। তুমি এখনো না এলে আমরা তোমাকে ফেলেই চ'লে যেতে বাধ্য হব।' আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'তোমরাও বনের ভেতরে এসে একটা আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখে যাও!'

"বন্ধু সদলবলে 'কাগারা'-ঝোপের কাছে এসে সচমকে ব'লে উঠলেন, 'কি এটা? গরিলা?' আমি বললুম, 'না, মানুষের এক আদি-পুরুষ।' বন্ধু বললেন, 'ও-সব বাজে কথায় আমি বিশ্বাস করি না।'

"এর পরেই আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দিলে আমাদের সঙ্গী "আস্কারি"র (দেশীয় সৈনিক বা পাহারাওয়ালা) দল। তারা মূর্ত্তিটাকে দেখেই একবাক্যে চেঁচিয়ে উঠল—'কামা মুন্‌টু, কামা মুন্‌টু! অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের কাছ থেকে কেবল এইটুকু জানা গেল, কামা মুন্‌টুরা এই অঞ্চলে বাস করে। তারা কিভুর জঙ্গলের ভিতরে কি মিকেনো পাহাড়ের উপরে থাকে, সে কথা ঠিক ক'রে কেউ বলতে পারে না। তাদের ঠিকানা জানবার জন্তে কারুর কোনই আগ্রহ নেই, কারণ তারা অতিশয় হিংস্র প্রকৃতির, স্থানীয় বাসিন্দাদের দেখলেই মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে।

"বন্ধু বললেন, 'জানোয়ারটা দেখছি অত্যন্ত জখম হয়েছে ব'লে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। এর এমন দশা কে করলে?' আমি বললুম, 'খুব সম্ভব কোন পাগলা হাতী। এখানে বাঁশের (এদেশী ভাষায় 'মীগ্যানো') বনে কচি কচি পাতা খাবার লোভে পাহাড়ের উপরে উঠে আসে দলে দলে হাতী।' বন্ধু বললেন, 'চুলোয় যাক্ যত বাজে কথা। এখন তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে পড়বে চল, নইলে অন্ধকারে অন্ধ হ'তে হবে।' আমি বললুম, 'তা যাচ্ছি। কিন্তু

আমাদের সঙ্গে এই মূর্ত্তিটাকেও নিয়ে যেতে চাই।' বন্ধু সবিস্ময়ে বললেন, 'সে কি? এই মূর্ত্তিটা নিয়ে আমাদের কি লাভ হবে?' আমি বললুম, 'তোমাদের নয়, লাভ হবে কেবল আমারই। আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের পরিধি আরো একটু বাড়াতে চাই।' কিন্তু বন্ধু অত্যন্ত নারাজ. আমিও একেবারেই নাছোড়বান্দা। শেষ পর্য্যন্ত সাব্যস্ত হ'ল, আপাততঃ আহত ও অচৈতন্ত মূর্ত্তিটাকে নিয়ে আমরা একসঙ্গেই ক্যাম্পে ফিরে যাব বটে, কিন্তু তারপরেই হবে আমাদের ছাড়াছাড়ি। যদিও তথাকথিত আদিম মানুষটার জন্তে আমাকে বন্ধু ত্যাগ করতে হ'ল, তবু প্রাগৈতিহাসিক যুগের রহস্ত আমাকে এমন ভাবে পেয়ে বসেছিল যে, বন্ধুকে হারিয়েও আমি কিছুমাত্র দুঃখ অনুভব করলুম না।

"আর এক কারণে জাগ্রত হয়েছিল আমার বিশেষ কৌতূহল। মূর্ত্তিটার কণ্ঠদেশে শুক্নো চামড়ার বন্ধনীতে সংযুক্ত ছিল একটা জিনিষ, প্রথম দৃষ্টিতে তাকে একখণ্ড কাচ ব'লেই সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু আসলে তা হচ্ছে মস্ত একখণ্ড হীরক! খনির ভিতরে এমনি আকাটা হীরা পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি নামক স্থানে বেড়াতে গিয়ে এই রকম অকর্ত্তিত খনিজ হীরা আমি স্বচক্ষে দর্শন করেছি, সুতরাং আমার ভুল হবার সম্ভাবনা ছিল না। হীরাখানা আকারে মস্ত, এমন অসাধারণ রত্ন যে অত্যন্ত মূল্যবান, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন দুর্ল'ভ জিনিস এই অসভ্য বন্য জীবটার দখলে এল কেমন ক'রে? তবে কি তাদের আস্তানার কাছাকাছি কোথাও হীরার খনির অস্তিত্ব আছে? কিন্তু বন্ধুর আবির্ভাবে এ সব কথা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার সময় আমি পাই নি। বলা বাহুল্য, অন্ত'কেউ দেখতে পাবার আগেই হীরাখানা আমি নিজের পকেটের ভিতরে লুকিয়ে ফেলেছিলুম।

"তার পরের কথা সবিস্তারে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, সুতরাং মোদ্দা কথা আমি খুব সংক্ষেপেই বলতে চাই। আমার 'আদিম মানুষ'কে নিয়ে আমি উগাণ্ডা প্রদেশের বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া হ্রদের কাছে গিয়ে পড়লুম। স্থলপথে বেশী দূর যাত্রা করলে পাছে যার-তার কাছে প্রচুর জবাবদিহি করতে হয়, সেই ভয়ে আমি অবলম্বন করলুম জলপথ। মিশর নৌকায় নীলনদ দিয়ে যাত্রা করলুম আবার সভ্য-জগতের দিকে।

"এই জাতের আদিম মানুষকে এখানকার লোকে "কামা মুনটু" ব'লে ডাকে। আমি সংক্ষেপে তার নাম রাখলুম, মুনটু। কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে তার স্বরূপ লুকোবার জন্তে আমাকে কম বেগ পেতে হয় নি! তবে সে অত্যন্ত আহত ছিল ব'লে আমি সেই সুবিধা গ্রহণ করতে ছাড়লুম না। সব চেয়ে বীভৎস ছিল তার মুখখানা, তা একেবারেই অমানুষিক। কেবল চোখ দুটো ছাড়া তার মুখমণ্ডলের সবটাই আমি ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখলুম। প্রথম দশ দিনের ভিতরে মুনটুর জ্ঞান ফিরে আসেনি; কিন্তু চেতনা লাভ করবার পরেই আমাকে দেখে তার দুই চক্ষের মধ্যে যে ভয়াল ও জিঘাংসু দৃষ্টি ফুটে উঠল, তা অবর্ণনীয় বলা চলে। তৎক্ষণাৎ সে তার মুখের ও দেহের ব্যাণ্ডেজ খুলে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেললে। আমরা কয়জনে মিলে তার হাতে পরিয়ে দিলুম হাতকড়ি। কিন্তু এমনি তার আসুরিক শক্তি যে, সেই আহত, পঙ্গু অবস্থাতেও সে হাতকড়ি ভেঙে ফেললে অবলীলা-ক্রমে। তখন শক্ত, মোটা দড়ি দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে রাখতে হ'ল।

"ফ্রান্সে ফিরে তাকে মেলুন গ্রামে নিজের বাগানবাড়ীতে এনে রাখলুম। এবং তার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলুম নিজেই। মুনটুর দেহের তিনখানা হাড় ভেঙে গিয়েছিল, মাথাতেও সে বিষম চোট খেয়েছিল। আমাদের মত সাধারণ মানুষ হ'লে নিশ্চয়ই সে বাঁচত না, কিন্তু মুনটুর অসাধারণ শক্তিশালী দেহ ও বন্য স্বাস্থ্যই তাকে খুব তাড়াতাড়ি আবার আরোগ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। কিছুকালের মধ্যেই সে আবার শক্তসমর্থ হয়ে উঠল।

"বনের ভিতরে তার দেহ ছিল প্রায় উলঙ্গ, কেবল তার কোমরে লম্বমান ছিল এক টুকরো চামড়ার আচ্ছাদন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার ভিতরে তো তাকে সেই অবস্থায় রাখা চলে না, তাই আমরা জোরজার ক'রে তাকে পরিয়ে দিয়েছিলুম জামা, ইজের জুতো।

"মুনটু যখন বুঝলে আমাদের বিরুদ্ধে তার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ নিষ্ফল, তখন সে দায়ে প'ড়ে আর কোন বাধা দেবার চেষ্টা করলে না। সর্বক্ষণই সে মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে থাকত, তাকে কথা কওয়াবার কোন চেষ্টাই আমাদের সফল হয়নি, এমন কি সে উচ্চারণ করেনি একটা টুঁ-শব্দও। অবাক হয়ে ভাবতুম সে কি বোবা, না তার কোন ভাষা নেই?

"বনের দুর্দ্দান্ত সিংহও অবশেষে মানুষের পোষ মানতে বাধ্য হয়। আমিও ভাবলুম, এতদিনে নিশ্চয় মুনটুরও আক্কেল হয়েছে। প্রথমে তার পায়ের, তারপর তার হাতের বাঁধন খুলে দিলুম। বন্ধনমুক্ত হয়েও সে কোন রকম বেচাল করলে না, গুম্ হয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল, সে খুসি হয়েছে কিনা তাও বোঝা গেল না।

"কিন্তু পরদিন প্রভাতেই আবিষ্কার করলুম, গত রাত্রে জানলা ভেঙে মুনটু দিয়েছে চম্পট! তারপর খবরের কাগজে পলাতক মুনটুর কাহিনী প্রকাশিত হ'তে লাগল। আপনারা এদেশে ব'সেও তার খবর পেয়েছেন। ফ্রান্সের নানা জায়গায় বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল—জামা-ইজের জুতো পরা গরিলার মত ভয়াবহ জন্তু, এ আবার কি ব্যাপার! আমি কিন্তু সাত-পাঁচ কিছুই ভাঙলুম না। মুনটুর শেষ দেখা পাওয়া যায় ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে আল্পস্ গিরিমালার ব্ল্যাঙ্ক পাহাড়ের কাছে। তারপর থেকেই সে একেবারে নিরুদ্দেশ।"

[ক্রমশঃ।

তিনটি বোন

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

ইনটি, মিনটি, বিনটি
বোন তারা তিনটি,
একটি বোন হোঁতকা,
কাঁধে নিয়ে কোঁতকা
কাটায় কোথায় দিনটি।
একটি বোন খিঙ্গী,
আকার যেন ভৃঙ্গী
কাটলে গায়ে চিমটি।
একটি রোগা পট্‌কা
মাথায় কেবল খট্‌কা,
বুদ্ধি ঘোড়ার ডিমটি।

মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়র রচিত

ম্যাকবেথ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনূদিত

১ম অংক

১ম দৃশ্য

[ঊষর জনহীন প্রান্তর ; বজ্র ও বিদ্যুৎ ; তিন জন ডাকিনীর প্রবেশ]

১ম ডা। বল্ কবে ফের মোরা মিলব তিনে
বাজহানা বিজলি না বাদলা দিনে ?

২য় ডা। হুড়োমুড়ি হুটোপাটি চুকে-বুকে যাবে যবে,
যেই সেই লড়াইটা হেরে জিতে ফতে হবে।

৩য় ডা। সে ত হবে সূয্যিটা ডুববার পূর্বেই।

১ম ডা। ঠাঁইটা কোথায় ভাই ?

২য় ডা। পোড়ো ঝাড়া জলা সেই।

৩য় ডা। সেইখানে হয় যেতে দেখতে সে ম্যাকবেথে।

১ম ডা। যাচ্ছি লো, ধূসোবেড়ালী !

২য় ডা। কোলা ব্যাং ডাকে ওই,

৩য় ডা। যাচ্ছি, যাচ্ছি।

সকলে। সু মোদের কু আর কু মোদের সু ভাই,
খোলা হাওয়া কুয়াশায় ডানা ঝেড়ে উড়ে যাই।

[প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

[ফরেসের নিকটস্থ শিবির : ম্যালকম্, ডানকান, ডোনালবেন, লেনক্স ও সহচরগণের প্রবেশ]

ডান। কে আসিছে রুধিরাক্ত দেহ ? দেখে মনে হয় বিদ্রোহের
শেষ বার্তা পারিবে সে দিতে।

ম্যাল্। এই সে সৈনিক, যুঝিল যে বীর্য্যভরে আমারে রক্ষিতে।
এস এস বীর, কহ রাজার সমীপে
তব আগমন কালে যুদ্ধের সংবাদ।

সৈনিক। তখনও তা অনিশ্চিত সংশয়-সংকুল ;
দুজন সাঁতারু যেন আঁকড়ি ধরেছে দুইজনে
ব্যর্থ করি পরস্পরে। নিষ্করুণ রাজদ্রোহী ম্যাকডোনাল্ড
উর্বর অন্তরে যার জন্মিছে সতত
ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র শয়তানি,
আনিল সে পশ্চিমের দ্বীপপুঞ্জ হ'তে
দলে দলে নানা সাজে সজ্জিত সৈনিক।
ভাগ্যলক্ষ্মী বারাঙ্গনা সম প্রসন্ন হইয়া তারে—
দিল যেন কোল। হায় রে ছলনা !
সার্থনামা বীর ম্যাকবেথ, পৌরুষ সহায়,
তুচ্ছ করি ভাগ্যের বঞ্চনা চলিল ছুটিয়া,
রক্তাক্ত হত্যার ধূমে ধূমায়িত অসি ল'য়ে করে
রণাঙ্গনে পথ কাটি হৈল আগুয়ান
বৈরথে ভেটিতে নরাধমে ;
না ফিরিল, না মানিল ক্ষান্তি,
নাভি হ'তে কণ্ঠ ফাড়ি অসির ফলকে
মূখ্য বিদ্রোহীর মুণ্ড ছিন্ন করি ত্বরা।
তুলিয়া ধরিল দুর্গশিরে।

ডান্। ধন্য ধন্য বীর ভ্রাতা, পুরুষ-প্রবর !

সৈ। যে পূর্বাশা সমুজ্জ্বল তপন-কিরণে,
সেই যথা জন্ম দেয় কালবৈশাখীরে
ঝঞ্ঝার প্রমত্ত নৃত্যে ডুবাতে তরণী,
তেমনি আশার উৎসে নবদুঃখ উঠিল উৎসারি, প্রভু !
শুনুন স্কট্‌ল্যাণ্ড-পতি, করুন শ্রবণ,
শৌর্য্যরথে ন্যায়ে হেরি বিমুখ বিভ্রান্ত রিপুসেনা
ভাবে যবে পলায়নই শ্রেয়ঃ,
চতুর নরোয়ে-পতি সুযোগ বুঝিয়া
নবোদ্যমে নব অস্ত্রে নব সৈন্য ল'য়ে
আরম্ভিল নব আক্রমণ।

ডান্। বিহ্বল কি হোল মোর সেনাপতিদ্বয়
ম্যাকবেথ, ব্যাংকো ?

সৈ। গরুড় যেমন হয় চটকে দেখিয়া ;
শশ হেরি সিংহ যথা। সত্য কহি দেব
প্রজ্বলিল আগুন যেন দ্বিগুণ ইন্ধনে ;
দুইজনে চতুর্গুণ হানিছে আঘাত শত্রুসৈন্য 'পরে,
না জানি তাহারা প্রধূমিত ক্ষতকুণ্ডে
চাহিছে কি রক্তস্নান ! অথবা রচিতে চাহে
করোটি-প্রান্তর ! কিন্তু প্রভু,
হতবল মূর্চ্ছাতুর আমি, নিদারুণ অস্ত্রক্ষত
ফুকারিয়া মাগিছে শুশ্রূষা।

ডান্। বাক্য তব ক্ষত সম গৌরবমণ্ডিত।
নিয়ে যাও চিকিৎসক পাশে।

[সেবকের সহ সৈনিকের প্রস্থান।

কে আসে এখানে ?

ম্যাল। সুযোগ্য সর্দার রস্।

লেনক্স। ওকি ত্বরত্বরা ঠিকরে নয়নে তার !
দেখে মনে হয়, অদ্ভুত কাহিনী কিছু বলিবে এখনি।

রস্। রাজার কল্যাণ মাগি ঈশ্বর সমীপে।

ডান্। কোথা হ'তে এলে তুমি সুযোগ্য সর্দার ?

রস্। ফাইপ হইতে প্রভু, নরোয়ের পতাকা যেথায়
স্পর্দ্ধাভরে উড়ে নীলাকাশে, জাগাতে মোদের চিত্তে
শীত-শিহরণ পতপত শীতল ব্যজনে।
স্বয়ং নরোয়েপতি সেথা, বিপুল বাহিনী ল'য়ে
আরম্ভিল দারুণ সমর ; সহায় হইল তার
কডোর-সর্দার রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক।
হেনকালে ম্যাকবেথ পশিল আহবে,
বর্মধারী বীর রণে কার্তিকেয় সম,
অস্ত্রে অস্ত্রে বীর্য্যে বীর্য্যে নিবারি অরাতিবরে—
সমানে সমান। অবশেষে প্রভু,—
জয়লক্ষ্মী আমাদেরি হোল অংকগত।

ডান্। লভিনু পরম স্বস্তি।

রস্। নরোয়ে-ভূপতি এবে সন্ধির ভিখারী ;
অযুত সুবর্ণ মুদ্রা বিতরি মোদের সৈন্যগণে
মাগি নিল অনুমতি নিহত সৈনিকগণে
করিতে সৎকার।

ড্যান্। অবিশ্বাসী কডোর সর্দার, আর না করিবে কভু
রাজ্যের অনিষ্টকর দুষ্ট প্রবঞ্চনা।
যাও, তার প্রাণদণ্ড করহ ঘোষণা।
সেই সম্মানিত পদ দিনু ম্যাকবেথে।

রস্। যথা আজ্ঞা।

ড্যান। সে যাহা হারাল
লভিল তা প্রিয় ম্যাকবেথ।

[প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য

[জলাভূমি : বজ্রনাদ : ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ]

১ম ডা। কোনখানে তুই ছিলি বুন ?

২য় ডা। করতেছিলাম শূয়োর খুন।

৩য় ডা। তুমি কোথায় ছিলে বোন ?

১ম ডা। সেই কাহিনী বলছি শোন ;
কোঁচড় পুরে কাঁচা বাদাম চিবুচ্ছিল মাঝির বৌ
কচমচিয়ে কচমচিয়ে কচমচিয়ে ভাই,
আমি বলি—'দে না আমায়', তাই—
মুটকি মাগী বলে কিনা,
'দূর হ'য়ে যা ডাইনি'!
সোয়ামী তার দূর দরিয়ায়
জাহাজ চেপে আলেপ্পো যায়,—
খবর বুঝি পাই নি ?
চালুনিটার ডিঙি চ'ড়ে—
পিছু নেব ফেসব ধোরে,
হ'ব ইঁদুর ল্যাজকাটা,
যা করবার কুটুর কুটুর কর্ব আমি কর্ব তা।

২য় ডা। আমার বাতাস দেব তোকে ভাই।

১ম ডা। তোমার মত দয়ার শরীর নাই।

৩য় ডা। আমিও ভাই যোগান দিতে চাই।

১ম ডা। বাকি যা তা আছে ত মোর সব জানা,
যে সব ঘাটে বয় হাওয়া
যে সব দেশে যায় যাওয়া
মিলিয়ে নিয়ে সারেং বুড়োর ছক্‌খানা।
চুষে চুষে করব তাকে খড়কুটো,
থাকবে না ঘুম দিনে-রেতে
বুঁজবে না তার চোখের পাতার ঝাঁপ দুটো।
থাকবে বেঁচে মরার বাড়া,
জাতে ঠেলা ছন্নছাড়া,
গুণে গুণে ন'বার নয়
তক্কলো হপ্তা হয়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ড্যানকান	...	স্কটল্যাণ্ডের রাজা
ম্যালকম্, ম্যাকডোনাল্ড	...	ঐ পুত্রদ্বয়
ম্যাকবেথ, ব্যাংকো	...	ঐ সেনাপতিদ্বয়
ম্যাকডফ, লেনক্স, রস্, মেন্‌টিথ্, এ্যাংগস্	...	স্কটল্যাণ্ডের সামন্তগণ
ফ্লিয়েন্স,	...	ব্যাংকোর পুত্র
সিওয়ার্ড	...	নর্দাম্বর্ল্যাণ্ডের আর্ল (ইংরাজ সেনাপতি)
কুমার সিওয়ার্ড	...	ঐ পুত্র
সেটন্	...	ম্যাকবেথের দেহরক্ষী
লেডি ম্যাকবেথ		
লেডি ম্যাকডফ		
ডাকিনীত্রয়		

ম্যাকডফের পুত্র, ডাক্তার, দরোয়ান, অনুচরগণ ইত্যাদি।

স্থান : ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড

চিমড়ে রোগা শুঁটকো হ'য়ে
দিনে দিনে পাবে ক্ষয়।
জাহাজখানা ভাসবে বটে,
ওলট পালট ঝড়-ঝাপটে।
আমার কাছে কি চিজ, আছে—ঢাখ না।

২য় ডা। ঢাখা না ভাই, ঢাখা না।

১ম ডা। জাহাজডুবো ঘরমুখো এক কাপ্তেনের
বুড়ো আঙুল আধখানা। [ভিতরে ডংকাধ্বনি]

৩য় ডা। ডংকা পড়ে ডংকা পড়ে !
ম্যাকবেথ ওই আসছে ওরে।

সকলে। ভাগ্যেরা তিন ভগ্নী,
হাতে হাতে লগ্নী,
চলতি পায়ে ডাইনি চলে
শুকনো ডাঙা অথই জলে
ঘুর ঘুরা ঘুর নাচন চলে।
তোর পায়ে তিন মোর পায়ে তিন
ওর পায়ে তিন,—নয়।
কুস্মন্তর গণ্ডীটানা এইখানে শেষ হয়।

(ম্যাকবেথ ও ব্যাংকোর প্রবেশ)

ম্যাক। কুদিন সুদিন হেন দেখিনি কখনো।

ব্যাংকো। হেথা হ'তে কত দূর ফরেস নগরী ?
ওকি, ওরা কারা ? শীর্ণদেহে অমানুষী বেশে
ভ্রমে কি পৃথিবীপৃষ্ঠে অপার্থিব জীব ?
জীবিত তোমরা ? নহ ত অপর কিছু
মানুষের ভাষার অতীত ? মনে হয়
বুঝেছ আমার কথা। একই কালে তুলিলে সবাই
চর্ম্সার ওষ্ঠাধরে গ্রন্থিল অঙ্গুলি।
রমণী বলিয়া অনুমানি, শ্মশ্রুভরা গণ্ড তবু
জাগায় সংশয়।
ম্যাক। কহিতে পার ত কহ কথা। কি তোমরা ?
১ম ডা। জয় ম্যাকবেথ, জয় গ্লামিশ সর্দার!
২য় ডা। জয় ম্যাকবেথ, জয় কডোর সর্দার!
৩য় ডা। জয় ম্যাকবেথ, জয় ভবিষ্যৎ রাজা!
ব্যাংকো। একি বন্ধু, চমকিলে কেন ?
শুনি আনন্দের কথা আতংক কিসের ?
তোমরা কহ ত সত্য, তোমরা কি মায়া ?
অথবা যা হেরিতেছি তাই ?
সসম্মানে সম্বোধিলে সুযোগ্য সঙ্গীরে মম,
দিলে বর্ত্তমান মান, ভবিষ্য সম্পদ, আর
রাজত্ব-আশ্বাস ; করি তাঁরে নির্ব্বাক বিহ্বল।
আমারে ত বলিলে না কিছু।
কি আছে কালের বীজে থাকে যদি জানা,
জান যদি কোন বীজ হবে অংকুরিত,
কে বা ধ্বংস পাবে, কহ মোরে কেহ।
জেনো আমি তোমাদের তুষ্টির ভিখারী নহি,
রুষ্টিরে না ডরি।
১ম ডা। জয়!
২য় ডা। জয়!
৩য় ডা। জয়!
১ম ডা। ম্যাকবেথ হ'তে ছোট তবু তার বড়।
২য় ডা। তত সুখ নাহি ভাগ্যে তবু সুখীতর।
৩য় ডা। রাজার জনক তুমি, নিজে নহ রাজা,
জয় জয় তোমাদের ম্যাকবেথ, ব্যাংকো!
১ম ডা। জয় জয় ব্যাংকো, ম্যাকবেথ!
ম্যাক। দাঁড়াও অস্পষ্টভাষী, স্পষ্ট কহ আরও ;
জানি আমি গ্লামিস-সর্দার পিতার মৃত্যুর পরে ;
কিন্তু, কডোর-সর্দার ? আজও সে জীবিত আর
ভাগ্যবলে বলী ; তার পরে রাজ্যলাভ!
এ কথাও প্রত্যয়-অতীত কডোর-পতিত্ব লাভ সম।
বল, কোথা হ'তে পেলে সব অসম্ভাব্য কথা ?
কেন বা রুধিলে পথ অভিশপ্ত এই জলাভূমে ?
কথা কও, নির্ব্বন্ধ আমার।

[ডাকিনীদের অন্তর্ধান।

ব্যাংকো। মাটিরও বুদ্‌বুদ্‌ আছে জলের মতন,
এরা বুঝি তাই। কোথায় মিলাল সব ?

ম্যাক। বাতাসে, কায়াময় ভাবিনু যাদের
নাসার নিশ্বাস সম মিশাল বাতাসে।
আরও যদি কিছুক্ষণ থাকিত তাহারা!
ব্যাংকো। কহি যাহাদের কথা, তারা কি সত্যই ছিল হেথা ?
অথবা সেবিনু মোরা মাদক-ওষধি
বুদ্ধিরে যা বাঁধে মোহ-ডোরে ?
ম্যাক। তোমার সন্তান হবে রাজা।
ব্যাংকো। তুমি ত স্বয়ং রাজা হবে।
ম্যাক্। কডোর-সর্দারও হব ; তাই না বলিল ?
ব্যাংকো। ঠিক তাই ; কে আসিছে ?

[রস্‌ ও এ্যাংগসের প্রবেশ)

রস্‌। ম্যাকবেথ, তোমার বিজয়বার্ত্তা শুনেছেন রাজা
সানন্দ হৃদয়ে ; বিদ্রোহীর সহ তব অদ্ভুত সময়
তুচ্ছ করি নিজ প্রাণ, শুনেছেন তাহা।
তোমার প্রশংসা আর বিস্ময় তাঁহার
দুয়ে মিলি হতবাক্‌ করিয়াছে তাঁরে।
দুর্দ্ধর্ষ নরোয়ে সনে রণে দিকে দিকে মরণ ছড়ায়ে
তোমার নির্ভীক বিচরণ, বার বার আলোচিত
হয়েছে সেদিন। ঘন ঘন দূতগণ
আনিয়াছে সংবাদ-সম্ভার, নিবেদন
কোরেছে তাঁহারে রাজ্যের রক্ষণ তরে
তব কীর্ত্তিকথা।
এ্যাংগস্‌। রাজাদেশে আসিয়াছি মোরা
জানাতে তোমার 'পরে রাজার সন্তোষ,
আর, সসম্মানে নিয়ে যেতে রাজ-সন্নিধানে।
রস্‌। আজ্ঞা তাঁর, বহুমান করি প্রদর্শন
কডোর-সর্দার বলি সম্বোধিতে তোমা।
সেই নামে সম্ভাষি তোমায়,
জয় কডোর-সর্দার, ধর এ সম্মান।
ব্যাংকো। এ কি, শয়তানেও সত্য কহে তবে!
ম্যাক। কডোর-সর্দার নিজে আজও ত জীবিত,
কেন সাজাইছ মোরে পর-পরিচ্ছদে ?
এ্যাংগস্‌। ছিল যেই কডোর-সর্দার, সে জীবিত বটে ;
কিন্তু, গুরুদণ্ডে অযোগ্য সে প্রাণ আজি
হয়েছে দণ্ডিত। জানি না, নরোয়ে সাথে
ছিল কিনা যোগ, জানি না, বিদ্রোহী দলে
দিল কিনা গোপন সুযোগ সহায়তা,
অথবা উভয় অপরাধে জড়িত সে দেশদ্রোহে ;
পদচ্যুতি ঘটিয়াছে তার
স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য সহ সূক্ষ্ম সুবিচারে।
ম্যাক। (স্বগত) গ্লামিস-সর্দার, পরে কডোর-সর্দার,
শ্রেষ্ঠ যা তা আসিছে পশ্চাতে।—
মোর তরে যা কোরেছ লহ ধন্যবাদ—
তুমি কি কর না আশা সন্তানেরা তব
পাবে রাজপদ ? কডোর-পতিত্ব লাভ
যাদের কথায়, সে কথাও দিল ত তাহারা।

ব্যাংকো। সম্পূর্ণ প্রত্যয় যদি কর সব কথা
জ্বলিবে তোমারও চিত্তে মুকুট-প্রত্যাশা
কডোর-পতিত্ব লাভ করি। কী আশ্চর্য্য,
মাঝে মাঝে শয়তানেও কহে সত্য কথা,
স্বল্প সততার ভানে ডেকে আনে
সুগভীর পাপ পরিণাম।—
বন্ধুগণ, আছে কিছু কথা।
ম্যাক। (স্বগত) কোন্ মহানাটকের পূর্ণাঙ্গ অংকের
শুভ নান্দীসম, যুগ্ম সত্য হ'ল উচ্চারিত।
ধন্যবাদ বন্ধুগণ!
(স্বগত) অপার্থিব এই যে প্রেরণা
এ কভু অশুভ নহে, শুভও ত নহে।
যদ্যপি অশুভ, কেন তাহা দিল মোরে—
সাফল্য-গৌরব এ পথে প্রথম পদক্ষেপে ?
কডোর-সর্দার আমি। আর যদি শুভ,
কেন চিত্ত মত্ত হয় সে দুরাকাংখায়
যাহার ভৈরব মূর্তি কল্পনায় হেরি
শিহরিয়া উঠে কেশ, কঠিন হৃদয়
হানে পঞ্জরের দ্বারে অপ্রাকৃত নির্মম আঘাত ?
সম্মুখীন ভয়, শ্রেয়ঃ তার বীভৎস কল্পনা হ'তে।
যে হত্যা এখনো মনোলোকে,
সকল শাসনযন্ত্র করে তা বিকল
দুর্বল এ দেহরাজ্যে, চূর্ণ করে কর্মের প্রেরণা
অলীক চিন্তায় ; নাস্তি যাহা
ঢাকে তাহা অস্তিত্ব আমার।
ব্যাংকো। বন্ধু আমাদের চিন্তায় আচ্ছন্ন হেরি।
ম্যাক। (স্বগত) ভাগ্যে যদি রাজত্বই থাকে
ভাগ্যই মুকুট দিবে বিনা প্রয়াসেতে।
ব্যাংকো। নূতন সম্মানে বন্ধু মম
অনভ্যস্ত পরিচ্ছদে স্বস্তিহীন কলেবর সম।
ম্যাক। (স্বগত) যা হবার হবে তা তখন,
দুর্দিনই বহিয়া আনে নিজ কাল ক্ষণ।
ব্যাংকো। ভ্রাতঃ ম্যাকবেথ, আছি মোরা অপেক্ষিয়া—
তব অবসর।
ম্যাক। ক্ষমা কর মোরে। মন্থর মস্তিষ্কে মোর
জাগিল সহসা যত বিস্মৃত বিষয়—
হে সুধী সজ্জনবৃন্দ, মোর তরে যা করিলে শ্রম—
মুদ্রিত রহিল সবই স্মৃতির পাতায়
দৈনিক পাঠের তরে। চল যাই রাজার সমীপে।—
যা ঘটিল ভেবে দেখো ;
পূর্বাপর পরীক্ষিয়া পরে
মোদের মনের কথা হবে বিনিময়।
ব্যাংকো। সানন্দে সম্মত আমি।
ম্যাক। এখন ও কথা থাক্। চল বন্ধুগণ। [প্রস্থান]

৪র্থ দৃশ্য

[ফরেস রাজপ্রাসাদ। ডান্‌কান, ম্যালকম, ডোনালবেন্, লেনক্স ও পরিচারকগণ]

ডান্। কডোরের প্রতি মোর প্রাণদণ্ডাদেশ হ'ল কি পালিত ?
সে কাজে গিয়েছে যারা ফিরে নি এখনও ?

ম্যাল। ফিরে নি এখনও তারা। তবে
দেখা হ'ল জনেকের সাথে, যে দেখেছে
মৃত্যু তার। সে বলিল,
অকপটে রাজদ্রোহ করিয়া স্বীকার
সুগভীর অনুতাপে গেল সে মাগিয়া
রাজার মার্জনা। মৃত্যুকালে দেখা গেল
কী পরিবর্তন। মনে হ'ল
সাধনা সে কোরেছিল মরণে বরিতে
জীবনের কাম্যতমে করিয়া বর্জন
অতি তুচ্ছ জ্ঞানে।

রাজা। হেন বিদ্যা নাই যাহে মনের গঠন
হেরি মুখের মুকুরে। সজ্জন জানিয়া তারে
কোরেছিনু তারই 'পরে নিশ্চিন্ত নির্ভর।

(ম্যাকবেথ, ব্যাংকো, রস্ ও এ্যাংগসের প্রবেশ)

এস এস যোগ্যতম ভ্রাতা মম !
অকৃতজ্ঞ হৃদয় আমার এখনও রয়েছে ভারাতুর
আপনার অপরাধে। এত উর্দ্ধে তুমি,
দ্রুতপক্ষ প্রতিদান পারে না ধরিতে তোমা।
যোগ্যতায় আরও কিছু কনিষ্ঠ হইলে
উপযুক্ত প্রতিদান হয়ত হ'ত না সাধ্যাতীত।
শুধু বলিবারে চাই, তব পাশে ঋণ মোর
সর্বস্ব দানেও নাহি হয় পরিশোধ।

ম্যাক। রাজভক্ত সেবকের কাছে
সেবাই সেবার পুরস্কার। পুত্রের কর্তব্য
আর প্রজার দায়িত্ব উভয়ই ত প্রাপ্য আপনার।
রাজসিংহাসন রক্ষা কর্তব্য মোদের।
আপনারে অর্ঘ্য দিব শ্রদ্ধা ও সম্মান,
সেও কর্তব্যেরই অঙ্গ।

ডান্। জানাই স্বাগত ; রোপণ কোরেছি তোমা
প্রযত্নে রহিবে চিরদিন লভ যাহে
পূর্ণ পরিণতি। সুমহান্ ব্যাংকো,
যোগ্যতায় ন্যূন নহ তুমি, তোমারেও
করি পুরস্কৃত ; এস বক্ষে, লহ আলিঙ্গন।

ব্যাংকো। যদি ফলবান হই এই বক্ষোপরে
ফলে হবে তব অধিকার।

ডান্। বিপুল আনন্দ মম প্রবল প্রাচুর্য্য হেতু
হইয়া উচ্ছল, আপনা গোপন করে
অশ্রুবিন্দু আড়ে। আত্মীয় অপত্য আর
সামন্তমণ্ডলী, অন্তরের অন্তরঙ্গ যারা,
শোন সবে, জ্যেষ্ঠপুত্র ম্যালকমে
যৌবরাজ্যে বরি', দিতে চাহি রাজ্য-অধিকার ;
সাথে সাথে সম্মানিত করিব সকল যোগ্যজনে।
চল যাই ইন্‌ভার্ণেস্ অভিমুখে,
তোমার আতিথ্যবদ্ধ হইব সেথায়।

ম্যাক। যে বিশ্রাম তব কার্যে না হয় ব্যয়িত
সে ত পণ্ডশ্রম। এ আনন্দ-সংবাদের
বাহক হইয়া যেতে চাই সর্ব অগ্রে
জানাইতে রাজকীয় শুভ আগমন
গৃহিণীরে মোর। সবিনয়ে মাগি যে বিদায়।

ডান্। যথা ইচ্ছা, সুযোগ্য কডোর।

ম্যাক। (স্বগত) যুবরাজ ! আমার পতন ধ্রুব
যদি এ পথের বাধা না পারি লংঘিতে।
ঢাক' ঢাক' নিজ জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,
অন্তরের গূঢ় কৃষ্ণ দুরভিসন্ধির
সন্ধান না পায় যেন বাহিরের কোন রশ্মিরেখা।
ত্রস্ত আঁখি, রাখিও না হস্তের সংবাদ ;
তাই হোক্, হইবার পরে
যে দৃশ্য দেখিয়া ডরে নয়ন শিহরে।

[প্রস্থান।

ডান্। সত্য ব্যাংকো, শূরশ্রেষ্ঠ ম্যাকবেথ ;
অন্তর ভরিল মোর তার প্রশংসায় ;
ভোজনের আয়োজন আপ্যায়ন লাগি
যে মোদের হ'ল অগ্রগামী, চল যাই পশ্চাতে তাহার
পরম আত্মীয় ও যে তুলনাবিহীন।

[প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

গীত

ওরে রাম রহিম জুদা করিস্ নে রে ভাই,
ঐ যে—কাশী মক্কার একি গুণ বিচারে দেখ্‌তে পাই।
মন্দিরে কালীর ঘর, এলাহি থাকে মুসিদ পর,
সন্ধ্যা-আহ্নিক নমাজ-রোজায় কিছু ভেদ নাই।
তাইতে গান জয়চাঁদ কয়, আর হিন্দু মুছলি আয়,
যেতে হবে এক জায়গায় সে জন আছে সব ঠাঁই।

—জয়চাঁদ গাঁয়েন গীত।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

"সোনেচকা", ডাক্তারের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হোয়ে এলো, "আমি ভেবেছিলাম তুমি আর এলেই না। ইভান ইগরিচ, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই—আর সোনেচকা ইনি হোলেন 'ইভান ইগরিচ দানিলভ···বুঝলে কিনা, এই দানিলভ না থাকলে আমার যে কী অবস্থা হোতো জানি না—"

মহিলাটি দানিলভের দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন—আর একটি হাতে ঝুলছে মস্ত এক থলি নানান জিনিষপত্রে বোঝাই।

"এসো, তোমাকে আমার কামরাটা দেখিয়ে আনি", খুসীতে ডাক্তারের মুখে কথাই আটকে যাচ্ছে, "তুমি একা···মানে একেবারেই একা···দাও, দাও, থলেটা আমার হাতে দাও···সত্যিই ভারী একলা পড়েছো তুমি···সব সময় একা, সব সময়···"

"ইগর ট্রেঞ্চ খুঁড়তে গেছে", মহিলাটি পিছনে যেতে যেতে খবরগুলি দিতে সুরু করলেন, "···আর লায়লা তো এখনও ছুটিই পায়নি—হ্যাঁ, আমি তোমার জিনিষগুলো এনেছি, তুমি তো আসবার সময় ওগুলো আনতেই ভুলে গেলে···"

ডাক্তার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে নিজের কামরার দিকে চলে গেলেন, আর সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দানিলভ ভাবলো, 'ছাখো একবার কাণ্ডখানা, এখনও যেন ছেলেমানুষ আছে ওরা!'

সোফার উপর পাশাপাশি দু'জনে বসে—পরস্পরের হাত দুটি ধরে, আর টেবিলময় ছড়ানো থলের ভিতরকার জিনিষপত্র।

"সোনেচকা, মনে আছে তোমার—যেদিন আমি চলে এলাম তার আগের সন্ধ্যায় ঠিক এমনি ভাবে আমরা বসেছিলাম?···আর মনে আছে, আমি বলেছিলাম—এমন করে বসে থাকা এই শেষ? কিন্তু দেখো, আবার আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি···এঁ্যা···? আর মোটে দশ দিন আগে আমি বলেছিলাম। জানো, এখন কি ভাবছি? ভাবছি যে···আমরা পাশাপাশি এমনি করে আরো অনেক—অনেক বার বসবো—তুমি কি বলো?"

মহিলাটি ডাক্তারের ঘামে-ভেজা কপালের উপর ধীরে ধীরে চুমো খেয়ে কোমল স্বরে বললেন, "আমারও তাই বিশ্বাস।···কিন্তু, শোনো,···আমায় একটু খাবার জল দিতে পারো—খুব ঠাণ্ডা আর অনেকটা—"

ডাক্তার লাফিয়ে উঠে কপাল চাপড়িয়ে বলে উঠলেন,—"ছি, ছি, কি কাণ্ড ছাখো তো! ক্ষমা কর, যেমন বুদ্ধি আমার! একবার মনেও হোলো না এত ক্লান্ত হোয়ে পড়েছো তুমি? এই ট্রেনের জঙ্গলে আমাকে ঘুরে ঘুরে খুঁজে! হায় ভগবান!···এই যে একটা বোতোল, না, না, একটু দাঁড়াও, এটার জলটা তেমন ঠাণ্ডা নয়—বিশ্রী লাগবে···"

আয়না-লাগানো দরজার উপর টোকার শব্দ হোলো। সাদা পোষাক পরে ঢুকলো ফিমা, মোটাসোটা, টুকটুকে রঙ, মুখে কৌতুকের হাসি, আর হাতে একটি ট্রের উপর কফি, বিস্কুট, আর বরফের টুকরো ভাসানো পুরো এক জাগ ফলের রস। ফিমার কাঁধের পাশ থেকে আরও একটা মুখ উঁকি দিচ্ছে দেখা গেলো—কমাণ্ডান্টের স্ত্রীকে দেখতে সবাই উৎসুক।

ডাক্তারের মুখ খুসীতে, আর হাসিতে উপচে উঠলো।

"সোনেচকা, এ নিশ্চয়ই দানিলভের কাজ? আমি তোমাকে নিশ্চয়ই করে বলতে পারি, এ কাজ দানিলভ ছাড়া কারো নয়—একটা মানুষের মত মানুষ···বুঝলে কিনা! ফিমা, কে পাঠালে এ সব?"···

কফি ঢালতে ঢালতে ফিমা বেশ কায়দা-দুরস্ত ভাবে জানালে,—"রসদ-পরিচালক বলে দিলেন যে, মিনিট দশেকের মধ্যেই পর্ক-কাটলেট তৈরী হোয়ে আসছে···"

"সোনেচকা, কফিটা তাহলে এখন খেও না, আগে কাটলেট খাও। এ ঠিক দানিলভ—এ সব ঐ রসদ-পরিচালকের কর্ম্ম নয়!···হুঁঃ, স্রেফ পরিজ ছাড়া ওর হাতে দিয়ে একটা জিনিষ বেরোয়?···আরে, আমি তো জানতামই না যে আমাদের কাছে শূয়োরের মাংস আছে! এ ঠিক দানিলভ···বুঝলে কিনা··· তোমাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিতে চায়।···ফিমা! যাও, যাও, কাটলেট নিয়ে এসো, চটপট যাও···"

স্ত্রী স্বামীকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে কিছু কিছু খেতে। জানালেন ভয়ানক গরম লাগছে—সদ্য-ভাজা কাটলেট—গরম চর্ব্বিতে মুখে লাগছে। শেষ অবধি তিনি বিশেষ কিছুই খেতে পারলেন না, অবশ্য ডাক্তার জানেন যে ওঁর স্ত্রী কোনো দিনই বেশী খেতে পারেন না। তবুও প্রথমটা নিজে খেতে অস্বীকার করলেন কিন্তু যেই না সোনেচকা কাঁটায় বিঁধিয়ে এক টুকরো কাটলেট মুখের সামনে ধরলেন, অমনি এক গাল হেসে টুপ করে সেটি খেয়ে নিলেন।

"নাঃ, সত্যিই চমৎকার! ভাগ্যটা ভালো, ভাগ্যিস সোনেচকা খুঁজে খুঁজে বার করেছে!"

—"কিন্তু কেমন ক'রে তুমি আমাকে খুঁজে বার করলে বলো তো? আমি হলে তো কিছুতেই পারতাম না···কি যে বাজে বক্‌ছি, দেখছো তো···কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মীটি! বুঝলে

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

কিনা···যা বলতে চাই মানে···ওঃ, হ্যাঁ, তোমাকে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে পাঠায়নি ?"

"না, আমাকে ওরা পাঠায়নি।"

"কিন্তু—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই···একে তো এই স্বাস্থ্য···"

"কেউ আমাকে পাঠাচ্ছে না। আমি যাবো আমার নিজের খুসীতে"—বলার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য উত্তেজনায় ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো—"ওরা কি অত্যাচার করছে আমাদের উপর, উঃ, ভাবতে পারা যায় না কী অসহ্য নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচার করছে··· নিকোলাই···"

ডাক্তার একটু হকচকিয়ে গেলেন—"হ্যাঁ, কিন্তু ওদের এই অত্যাচার বেশী দিন টিকবে না—"

—"তা জানি, এ সবই দুদিনের ব্যাপার···কিন্তু···ইশ! ভিল্‌না-ফেরত একটা আহত লোককে দেখলাম,···কি বীভৎস হোয়ে গেছে···আমি আর এই নিয়ে কথা বলতে পারছি না—ইচ্ছেও করছে না অন্য কথা, অন্য কিছু বলো—একটু আগে আমায় কি যেন জিজ্ঞাসা করছিলে ?"

"লায়লা আর ইগরের কথা—"

"লায়লা তো ওর কাজে আছে। শুনছি সবাই বলছে, যে ওদের নাকি ক'দিনের মধ্যেই পাঠানো হবে। আর ইগর তো প্রথম বারেই চলে গেছে—"

"কোথায়!—"

"ফ্রোভ-এতে—" বলার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের স্ত্রী একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

হাতের মধ্যে ধরে রাখা হাত দুটি ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার ভীত-চকিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—মায়ের গোপন ব্যথার এই বুক-ফাটা প্রকাশের একমাত্র সাক্ষী হয়ে। ডাক্তার এর আগে—এত দিনের বিবাহিত জীবনের দিনগুলিতে সোনেচকাকে কখনও কাঁদতে দেখেননি। এখন মনে পড়লো ডাক্তারের—সাবেক কালের দিনগুলিতে কত দিন তিনি অবচেতনায় হিংসার জ্বালাও অনুভব করেছেন—ছেলের প্রতি মায়ের আপন-ভোলা নিবিড় মমতার উচ্ছ্বাসে। তবুও তো ছেলেকে নিয়ে গর্ব্ব করবার কিছুই ছিলো না—ছেলেটা ছিলো এক নম্বর কুঁড়ে, বদমেজাজী, বাউণ্ডুলে, কোন চুলোয় ঘুরে বেড়াতো ভগবানই জানেন! তবুও ছেলের কোনো দোষই মায়ের চোখে পড়তো না। ডাক্তার মনে মনে রীতিমত ক্ষুব্ধ হোতেন সেই জন্য। শুধুই কি তাই? যা-কিছু ভালো-মন্দ থাকবে, তার সেরা ভাগটুকু থাকতো ছেলের জন্যে, তার পর আসতো মেয়ের কথা। কিন্তু এখন ডাক্তারের মনে হোলো—মায়ের মন তো! নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের একটা অজানা বিপদের আশঙ্কা আগেই নাড়া দিয়েছিলো···মায়ের মন সব জানতে পারে, নিশ্চয়ই সোনেচকা বুঝেছিলো, ভবিষ্যতে ছেলের ভাগ্যে কিছু একটা অপেক্ষা করছে···তাই বুঝি বলতো: 'আগে স্কুলের পড়া শেষ হোক্ না—সময় হোলে ও ফৌজে যাবে বৈ কি···সব ঠিকই হবে গো, হবে···এত তাড়াহুড়ো করে ভাবনা-চিন্তার কি আছে···?' মা কি জেনেছিলো আগেই যে সীমান্তের প্রথম ফৌজ দলেই যেতে হবে ছেলেকে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে? তাই কি মায়ের সবটুকু আদর ওকেই দিয়েছিলো, আর···আর নষ্টও করেছিলো ছেলের মাথাটি!

—"সোনেচকা, কেঁদ না"—ডাক্তার সান্ত্বনা দিতে গেলেন, "কেন কাঁদছো বলো তো? সে তো যুদ্ধে এখনও মারা পড়েনি, কিছুই হয়নি, তবে অত কাঁদছো কেন? লক্ষ্মীটি, চুপ কর, কেঁদ না!"

—"না, না আমি ওর জন্যে কাঁদছি না। আমার কাজের জন্যেই তো সব, তা' না হলে আমি নিজেই যেতাম। কাঁদছি কেন জানো, ওই খবরগুলো যে কানে আসছে, আমি যে আর শুনতে পাচ্ছি না, সহ্য হোচ্ছে না"—

হ্যাঁ, ওর কাজ তো আছে। সত্যিই ডাক্তার এতক্ষণ সে সম্বন্ধে একেবারেই ভুলেছিলেন।

—"কাজেতে সবই সমান। কখনও কখনও আমাকে প্রায় ক্ষেপিয়ে তোলে—কি রকম সময় যাচ্ছে এখন, আর লোকগুলো কিনা নকল দাঁত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। এক জন একেবারে বুদ্ধি-শুদ্ধিহীন মহিলা এসেছিলো। ব্যাপারটা কি, না, তার কি এক সাদা রঙের ধাতুতে দাঁত বাঁধানো আছে, সেটা বদলে সোনা বাঁধানো করে দিতে হবে। আমি আর থাকতে না পেরে মুখের উপরই বললাম যে, দাঁত বাঁধানোর সৌখীনতা করবার জন্যে খুব সময়ই বেছেছো যা হোক'। মেয়েটা অপমানিত হোয়ে রেগে অন্য দাঁতের ডাক্তারের কাছে চলে গেলো। যত সব বোকার দল, যাক্ গে!"

"যাক্ গে"—কলের মত প্রতিধ্বনি করলেন ডাক্তার।

তার পর আর কোনো কথাই কারো মনে এলো না। সমস্ত কামরাটা নিস্তব্ধ হোয়ে রইলো—শুধু ওঁরা দু'জনে পরস্পরের দিকে চেয়ে স্থির হোয়ে বসে রইলেন—দু'জনার চোখের পাতাই ভেজা। টেবিলে কাপের ভিতর কফি ঠাণ্ডা হোয়ে হোয়ে উপরে সাদা সর পড়ে গেলো—সে কথা কারো মনেই পড়লো না—মনেই পড়লো না তৃষ্ণা নিবারণের প্রতীক্ষায় কাচের জাগে ভরা বরফের টুকরো দেওয়া ফলের রস।

দরজায় আবার টোকার শব্দ। দানিলভ ঘরে ঢুকলো, বিনীত ভাবে ক্ষমা চাইলো বিরক্ত করার জন্য। তার পর ডাক্তারকে জানালে, এঞ্জিন এসে গেছে, ট্রেনের সঙ্গে লাগানো হচ্ছে।

—"সে কি!" ডাক্তার প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, "এরি মধ্যে? তার মানে আমরা যাচ্ছি? সোনেচকা···"

দানিলভ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। পরস্পরের বিদায়ের ক্ষণটুকু নিরুপদ্রবেই কাটুক। চলে গেলেন কমাণ্ডান্টের স্ত্রী। দেখা গেলো একটার পর একটা লাইন পার হোয়ে চলেছে দীর্ঘ, একহারা দেহ, সামনের দিকে ঈষৎ নুয়ে-পড়া ভঙ্গীতে, মস্ত কালো টুপীটার তলা থেকে দেখা যাচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ ধূসর রঙের চুল। পাশে পাশে চলেছেন ডাক্তার, ক্ষুদ্রকায় মানুষটি, কিন্তু সামরিক পোষাকের গুণে ফুটে উঠেছে বলিষ্ঠ পৌরুষ ভঙ্গী। চলেছেন স্ত্রীকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে—বিদায় সম্ভাষণের শেষে।

যুদ্ধের আগে ডাক্তারের অভ্যাস ছিলো ডায়েরী লেখার। চিরদিনই ওঁর আন্তরিক বিশ্বাস যে ওঁর মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভা আছে। কারণও আছে তার—অনেক ডাক্তারকেই তো সাহিত্যিক-খ্যাতি লাভ করতে দেখা গেছে—যেমন শেকভ, ভেরিশিয়েভ। বেশ তো, ঔপন্যাসিক না-ই বা হোলেন, প্রকাশক তো হোতে পারেন, যেমন—"মারাট"। সোনেচকাই অবশ্য এই পরামর্শটা দিয়েছিলো, ডাক্তারের এই সব খেয়ালের কথা শুনে। ডাক্তার কিন্তু প্রথমটা স্ত্রীর এই
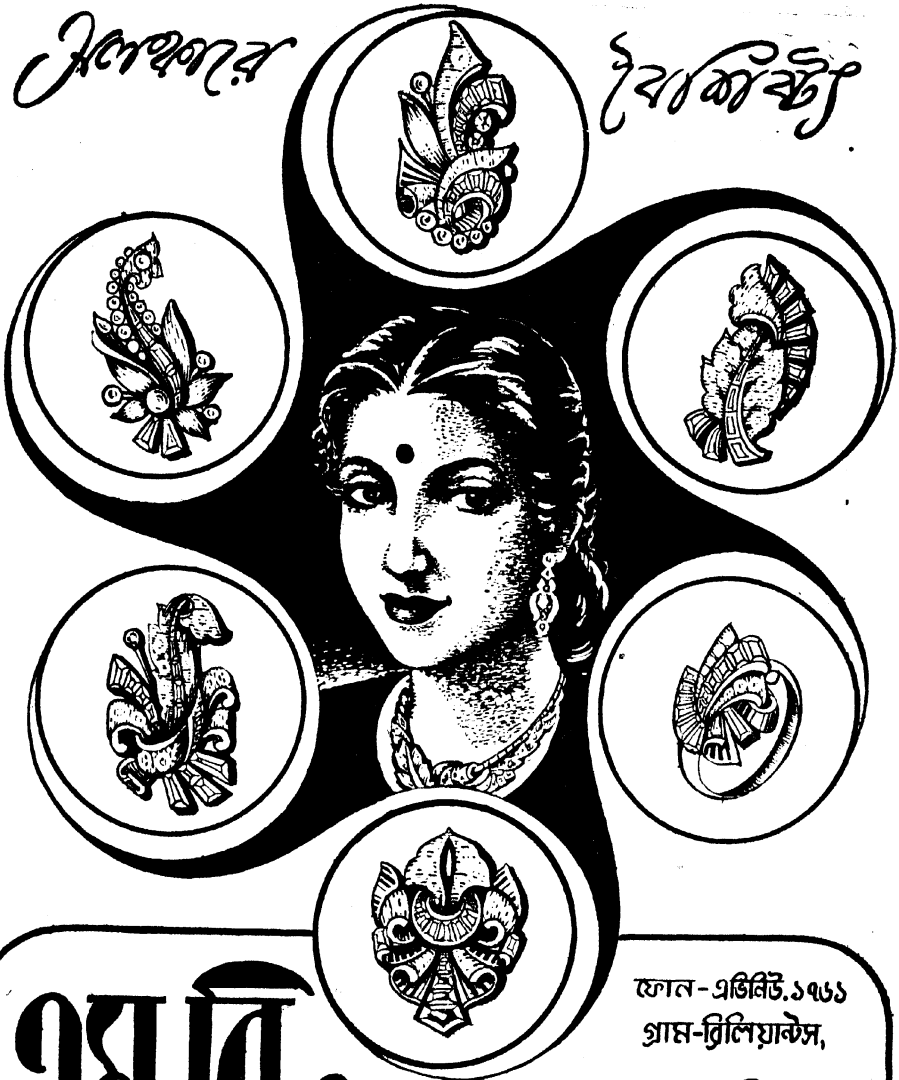
অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য
ফোন-এভিনিউ.১৭৬১
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,
এম.বি,সরকার এণ্ড সন্স
প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ সি,১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।(আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও
বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে) আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীত দিকে
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ:১৫৯/১বি,রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা : ফোন পি.কে. ৪৪৬৬

বিবেচনাহীন লঘুতায় চটে গিয়েছিলেন, তাই ডায়েরী লেখার কথাটা আর প্রকাশ করেননি, সম্পূর্ণই চেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু গোপনে লেখার অভ্যাস বরাবরই রেখেছিলেন। মনে মনে খুবই ভয় ছিলো ছেলে-মেয়েদের জন্ত, কোন দিন তারা না আবার দেখে ফেলে! হায় রে, ডাক্তার তো আর জানতেন না, স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবতে পারেননি যে, তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে ড্রয়ার খুলে সেটি রোজই পড়ে।

লেখার মধ্যে সব চেয়ে আনন্দের ব্যাপার ছিলো যে, তুচ্ছ জিনিষটাও বিশেষ একটা মর্য্যাদা নিয়ে ফুটে উঠতো, সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলে ছোটো জিনিষগুলি বড় হোয়ে ফুটে উঠতো। ডাক্তার কোনো পরিচিত লোকের সম্বন্ধে অপ্রিয় কিছু বলতে হোলেই, কয়েকটি অক্ষর নামের বদলে ব্যবহার করতেন, যেমন—'এন, এন', 'এক্স' কিম্বা 'জেড'। কারণ তিনি একটুও চাইতেন না যে তাঁর মৃত্যুর পর যখন ডায়েরীটা আবিষ্কার করে প্রকাশিত করা হবে তখন তাঁর তাসের আড্ডার বন্ধুদের মর্ম্মান্তিক ভাবে ক্ষুব্ধ করতে।

বাড়ী থেকে চলে আসার সময় তাই ডায়েরীটাকে একটা ভাঁজ-করা কেসের মধ্যে বেশ ভাল করে বেঁধে মোম দিয়ে শীল করে রাখলেন।

—"সোনেচকা"—অতি সন্তর্পণে দুই হাতে প্যাকেটটা ধরে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন,—"আমার একান্ত অনুরোধ যে তুমি এটি যত্ন করে রাখবে, আর শুধু সেই সময় খুলবে যখন···মানে বুঝলে কিনা, যখন আমার···মানে···"

ট্রেনেতে সোনেচকা এসে দেখা করে যাওয়াতে, ডাক্তারের আবার সেই সুপ্ত লেখার ইচ্ছাটা চাড়া দিয়ে উঠলো। একটা মোটা খাতা টেনে বার করলেন, শুঁকে নিলেন একবার তার অয়েলক্লথের মলাটটা। বেশ লাগলো, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিখতে সুরু করলেন—'২রা জুলাই। ১৯৪১ সাল। সোনেচকা এসেছিলো।'

হঠাৎ লেখবার সমস্ত ইচ্ছাটা অন্তর্হিত হোলো। ট্রেনটা তখন ছুটে চলেছে। কামরার ভিতরটা বেশী ঠাণ্ডা। শুধু কানে আসতে লাগলো ভেণ্টিলেটরের একটানা গুঞ্জন···এইখানটায় ঠিক এই কোণটায় একটু আগেই সে বসেছিলো···আচ্ছা, এতক্ষণে কি ও একটাও ট্রাম ধরতে পেরেছে···কে জানে এখনও অপেক্ষা করছে কিনা। খোলা খাতাটার উপর ডাক্তারের মাথাটা ঝুঁকে পড়লো, কতক্ষণ—কতক্ষণ যে এমন নিঃশব্দে কাটলো তার খেয়ালই নেই।

পরদিন ডাক্তার আবার সুরু করলেন ডায়েরী লেখা। এতক্ষণে সেই ক্ষণিকের অবসাদ গেছে কেটে। ডাক্তার লিখলেন, "আশ্চর্য্য লোক এই 'এন· এন'। আমি দানিলভকে বেশ বুঝতে পারি, বুঝতে পারি আমাদের থিয়েটার সিষ্টারকে, বেশ মহিলাটি, একটু বা গম্ভীর প্রকৃতির। তা ছাড়া ওই যে সাদা লেসের জামা পরা মেয়েটি, ওকে কি বুঝতে একটুও কষ্ট হয়?···টেবিলে সুন্দর করে সাজানো ন্যাপকিনগুলো দেখে আমি একটু প্রশংসা করলেই কি খুসীই না হোয়ে ওঠে। শুধু তাই বা কেন, মাডান 'জেড' থেকে সুরু করে ট্রেনের প্রত্যেকটা লোককেই বেশ বুঝি—শুধু একটুও বুঝে ওঠে না ওই 'এন· এন'কে। অথচ ওই লোকটার সঙ্গেই এখানে আমার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—অন্ততঃ ঘনিষ্ঠতা থাকা উচিত। একই কাজ আমাদের দুজনারই। দু'জনে মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করার প্রচুর বিষয়ই তো আছে, কিন্তু ওকে দেখলেই আমার কথাই বলতে ইচ্ছা করে না। যদিও লোকটা মাঝে মাঝে সিগারেট দেয়—আর ব্যবহারটাও তার নম্র ও বিনয়ী। কিন্তু মনে হয় যেন ওর ওই বিনয়ের আড়ালে রয়েছে বিরাট ফাঁক। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি নিয়ে আমি কত বার ওর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি, কিন্তু খবরের কাগজের খবরই ওর একমাত্র বাঁধা বুলি—তার বাইরে ওর নিজস্ব কোনো ধারণাই নেই। নিজেদের কাজ নিয়ে কথা বলে দেখেছি—আমি যা বলি তাইতেই ও সায় দিয়ে যায়। এমন কি, কত সময় ইচ্ছে করে আমি বোকার মত কিছু বললেও সায় দিয়ে যায়। ওর পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—নিজে বিয়ে করেনি, বাড়ীতে আছেন শুধু বৃদ্ধা মা। লোকটাকে দেখলে মনে হয় বইএর পোকা, নিজের কামরাটাকে তো একটা লাইব্রেরী করে তুলেছে। কিন্তু একবার আমি একটা বই চাইতে গেলাম, তাইতে যেন কি রকম অপ্রস্তুতের মত থতমত খেয়ে, শেষে আমৃতা আমৃতা করে বললে, নিশ্চয়ই দেবে—কিন্তু শেষ অবধি আর দিলেই না। অথচ লোকটাকে 'মানুষ-বিদ্বেষী' বলা যায় না, সবার সঙ্গেই তো বেশ মেশে। তবে নিজে কথা না বলে অন্তদের কথাই শোনে আর সবেতেই সায় দিয়ে যায়। আমি এটাও লক্ষ্য করেছি যে, ইভান ইগরিচও ওকে পছন্দ করে না—"

এত দূর লিখে ডাক্তার কলমটায় কালি ভরে নিয়ে ভাবতে লাগলেন, বড় বড় উপন্যাসগুলোর নায়কদের বর্ণনা ঠিক কেমন রীতিতে লেখা হয়—বেশ খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে সুরু করলেন উপসংহার লিখতে—"ওর মধ্যে যেন রহস্যময় অথচ অপ্রীতিকর কি একটা লুকিয়ে আছে—"

প্রধানা সিষ্টার ফাইনার ও সুপ্রাগভকে খানিকটা রহস্যময় লাগতো। কিন্তু একটুও অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর লাগতো না তাই বলে, বরং সুপ্রাগভের ওই রহস্যময় দিকটাই ওকে আকর্ষণ করতো।

নরম উষ্ণ কাঁধের ঝাঁকুনিতে ঠেলা মেরে ফাইনা জিজ্ঞাসা করতো সুপ্রাগভকে,—"ডাক্তার, সারা দিন তুমি কি ভাবো বলো তো? আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে, বলো না?"

ফাইনা সুপ্রাগভের চেয়ে মাথায় কিছুটা বড়, ওর সারা দেহে লাবণ্যের উচ্ছ্বাস ফোটা ফুলের মত উজ্জ্বল আর উচ্ছল ফাইনা! অন্য সময় হোলে সুপ্রাগভ এটাকে অনুরাগ বলেই মনে করতো, কিন্তু এখন ওর সে সব নিয়ে মাথা ঘামানোর মত মনের অবস্থাই নেই।

আসলে সুপ্রাগভ ভয় পেয়েছে। ভীষণ ভাবে ভয় পেয়েছে। সেটাই হোলো একমাত্র গোপন তথ্য।

ডাক্তার সুপ্রাগভ প্রধানতঃ নাক, কান, গলা এই সবেরই বিশেষজ্ঞ ছিলো—কোনো ঝামেলাই নেই এতে। ওর রোগীরা বেশীর ভাগই বাচ্চা ছেলেমেয়ে কিম্বা কানে খাটো বুড়োর দল। কিন্তু সুপ্রাগভ নিজের গুরুত্বটা সব সময় বজায় রাখতো। গলায়, কানে তুলি করে অষুধ লাগাতো, পরিষ্কার করতো, ঘা পুড়িয়ে দিতো, কিন্তু মনে জানতো যে কানে কালা হওয়াটা বেঁচে থাকার পথে কোনো বাধারই সৃষ্টি করে না। মানুষের অসহ্য রোগ-যন্ত্রণার প্রতি ওর কোনো অনুভূতি কিম্বা দরদ ছিল না। কিন্তু যে কোনো সার্জন থেকে সুরু করে গ্রাম্য ডাক্তারেরও সে অনুভূতি সে দরদের অভাব

হয় না। কোনো সংক্রামক ব্যাধি কিম্বা মৃত্যু-যন্ত্রণা ইত্যাদি দেখায় ও কোনো দিনই অভ্যস্ত ছিল না। ওর রোগীদের তো আর দুঃসহ রোগ যন্ত্রণা থাকতো না, তাদের থাকতো অসোয়াস্তি—অসহ্য কষ্ট নয়—আর তারা যখন মারা যেতো তখন অন্য সব রোগের কারণেই মারা যেতো, যা সুপ্রাগভের ডাক্তারি এলাকার বাইরে।

এই সহজ ঝামেলাহীন ডাক্তারিতে সুপ্রাগভ বেশ শান্তিতেই ছিলো। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ও ভীষণ সজাগ, সাধারণ অতি তুচ্ছ ব্যাপারও কখনও অবহেলা করতো না। একবার ওর আঙুলে ঘা হোয়েছিলো; যখনি সে কথা মনে পড়ে ওর সারা দেহ শিউরে ওঠে—উঃ, কি ভীষণ যন্ত্রণা! ওর মা পর্য্যন্ত অবাক্ হোয়ে গিয়েছিলেন ওর কাতরাণি শুনে।

—"সত্যি সত্যিই কি অত লাগছে?···"

মহিলাটি বৃদ্ধা হোলেও বেশ একটু বেপরোয়া গোছের। সাতটি সন্তানের মা তিনি, তার মধ্যে ছয়টিকে হারিয়ে এখন ওই সুপ্রাগভই একমাত্র আছে। দুঃখ, যন্ত্রণার অনেক ঝাপটাই ওঁর উপর দিয়ে বয়ে গেছে—কিন্তু এই সত্তর বছর বয়সেও কি উজ্জ্বল দৃষ্টি! সুপ্রাগভের ম্লান জ্যোতিহীন চোখের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একটু ভীমরতিও এসেছে, তাই এই বয়সেও সার্কাস দেখবার সখ পুরোমাত্রায়, আর তাসখেলার নামে তো পাগল হবার জোগাড়। ঘর-সংসার আর দেখাশোনা করতে পারেন না বটে। কিন্তু তাহলেও মায়েতে ছেলেতে বেশ মিল।

সুপ্রাগভের বাতিক ছিলো বই, মূর্ত্তি.. নানা রকম চীনামাটির জিনিষ, সৌখীন জিনিষ ইত্যাদি সংগ্রহ করবে। ওর পড়বার ঘরের ছোটো ছোটো কাচের আলমারীতে ভর্ত্তি থাকতো চীনা পোর্সিলেনের, ভেনিসের কাচের নানান রকমারী জিনিষ। অবশ্য তার মানেই যে পোর্সিলেন আর ভেনিসের কাচের শিল্প সম্বন্ধে সুপ্রাগভের গভীর জ্ঞান ছিলো তা' নয়—আসল হোলো সুন্দর সুন্দর জিনিষের সখ, আর তাই দিয়ে ঘর সাজানোর খেয়াল। তাছাড়া যত মিটিংএই ওকে ডাকা হোতো, ও কোনোটাই বাদ দিতো না—একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সময় গিয়ে হাজির হোতো, নতুন থিয়েটার এলেই দেখতো, রেডিও শুনতো, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী বেড়াতে যেতো, নতুন ধরণের কোনো বই বেরোলেই কিনতো—কিন্তু সব চেয়ে ভালোবাসতো নিজের ঘরটিতে আরামে বসে ধূমপান করতে করতে নিজের সংগ্রহের দিকে তন্ময় হোয়ে তাকিয়ে থাকতে।

—"পাভ্‌লিক, তুমি যদি বিয়েটা করতে কত ভালো হোতো—" একদিন রাতে বাড়ী ফিরে মা বললেন ছেলেকে,—"তুমি সব সময়ই একা—সারা দিন চুপচাপ ঐখানেই একলা বসে থাকো—"

কিন্তু বিয়ের ইচ্ছে ওর কোনো দিন ছিলো না। মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনো দরকার নেই। অসুখী দাম্পত্য-জীবন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি এ সব কত যে শুনেছে তার ইয়ত্তা নেই, আবার তার উপর···যৌন ব্যাধি? ঈশ্বর রক্ষা করুন! আচ্ছা, ও কি এতই একা? বেশীর ভাগ সময়ই তো পাঁচ জনের সঙ্গে কেটে যায়···হ্যাঁ, অনেক কাল আগে একবার প্রেমে পড়েছিলো বটে, বয়স তখন বেশী নয়। একবার তো নয়, দু'-দু'বার—কিন্তু তা'তে কি? দু'বারই অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ভাবেই প্রেমের সমাধি ঘটলো···যথেষ্ট, আর দরকার নেই প্রেমে।

—"না, শুধু তোমাকে নিয়েই আমি খুশী থাকতে পারছি না—" মা স্পষ্টই জানালেন, ছেলের দিকে সন্দিগ্ধ ভাবে চেয়ে। সুপ্রাগভ মায়ের নরম সাদা গালে হাসতে হাসতে চুমা খেলো। বয়সের সঙ্গে মা যেন ছেলেমানুষ হোয়ে যাচ্ছে!" যার এমন ছেলে রয়েছে, তার কিনা মনে সুখ নেই! যখন যা' ইচ্ছে হয়, ছেলে তাই এনে দেয়—সার্কাসের টিকিট অবধি। আগের দুর্দ্দিন থেকে আজকের স্বচ্ছল দিন এসেছে তো ওরই জন্যে! বাবা ছিলেন সামান্য জুতোর দোকানের কর্ম্মচারী—আর ছেলে কিনা ডাক্তার প্যাভেল সুপ্রাগভ, এক জন বুদ্ধিজীবী আবার শিল্প-সংগ্রাহক। লোকে বলে সোভিয়েট রাজ্য সবার কাছেই সব দরজা খুলে দিয়েছে···কিন্তু যাই বলুক না কেন, আসলে চাই মাথা—বুদ্ধি।

নিজের জীবনে পূর্ণ সন্তোষ ছিলো সুপ্রাগভের। কিন্তু নিজেকে নিয়েই কি তৃপ্ত ও? সব চেয়ে কঠিন লাগে ওর এই প্রশ্নের উত্তর। কিসের একটা অভাব আছে ওর, কি একটা 'জোরের' অভাব—তাই হুকুম করতেও পারে না, পারে শুধু অনুনয় জানাতে। অন্যেরা যখন হুকুম করে সেটা তামিল হয় বিনয়াবনত বাধ্যতায়। কেমন করে ওরা সহজে আদেশ করে, ওই বা কেন শুধু আদেশ পালনই করে চলে? নিজের ক্ষমতা নেই কেন হুকুম করার? যদিই বা হুকুম করে তবে তা' মানবার জন্যে লোক লাফিয়ে না উঠে শুধু অবাক হোয়ে চেয়ে থাকবে!···অন্যেরা কত জোরের সঙ্গে তর্ক করে। অথচ হাজার মতবিরোধী হোলেও, ইচ্ছা না থাকলেও অন্যের কথা মেনে না নিয়ে থাকতে পারে না। নেহাৎ যখন উত্তেজনায় অধীর হোয়ে পড়ে তখনি প্রতিবাদের শক্তি আসে ওর, তাও যতক্ষণ না অন্যের প্রবলতর প্রতিবাদ না শোনা যায়। তাছাড়া সাধারণ খুঁটিনাটি নিয়ে কেউ-ই তো মাথা ঘামায় না, কিন্তু সব ছোটোখাটো জিনিষকেই মস্ত করে দেখা ওর স্বভাব।

ওর স্বভাব সব রকম ঝামেলা ঝগড়াঝাঁটি থেকে দূরে থাকা—ওর স্বভাব সুযোগ পেলেই সিগারেট ইত্যাদি দিয়ে একটু লোকের খোশামোদ করা। অন্য সবার কাছেই যখন 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' তখন ওই শুধু জীবনের প্রবেশ-তোরণে রবাহূত অতিথির মত দ্বিধায়, ভয়ে, সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে কেন?···

সুপ্রাগভ নিজেই জানে না তার কারণ। এমনি ধরতে গেলে ওর জীবনটা নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ। যা কিছু চেয়েছে সবই মিলেছে—ভালো আয়ের কাজ, নিশ্চিত পদমর্য্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—কি নয়? তাছাড়া ওর য-কিছু নেশা বা বাতিক সেগুলি জীবনের গুণের দিকটাই অলঙ্কৃত করেছে—মানুষ জীবনে আর কি বেশী চায়?

মহাযুদ্ধের রণহুঙ্কার প্রথম থেকেই সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রলয় এনে দিলে। কোথায় গেলো মানুষের নিশ্চিন্ত দিনযাত্রা—কোথায় মিলিয়ে গেলো শান্তি, ভবিষ্যৎ। এই যে লোকটি সুপ্রাগভ—দূর থেকে ভেসে আসা বেহালার মিষ্টি সুরের মতোই জীবনটাকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলো—সেই মধুর সুর এখন ওর কানে জয়ঢাকের মত বিকট হোয়ে বাজতে লাগলো।

কেন? ওকেও যুদ্ধে ডাকা হয়েছে! ঐ তো ভগ্ন-স্বাস্থ্য বেচারার!—তা'তে কি—এক কথায় একটা 'হস্‌পিটাল ট্রেনে'র

কাজে তাকে নেওয়া হোয়ে গেলো। কিন্তু ও কি সার্জন! ও কি ক্ষত থেকে বুলেট বার করতে পারবে, না আহত অঙ্গ প্লাষ্টার করতে পারবে?...সে সব ওর কর্ম নয়! ও পারে রোগীর সঙ্গে থাকতে, অসুখ বাড়ছে না কমছে দেখতে—নেহাৎ যদি প্রয়োজন হয় বুলেট বার করাটাও না হয় শিখতে পারে...কিন্তু পারবে না, নিজে বিকলাঙ্গ হোয়ে পড়তে কিছুতেই পারবে না! বোমা! ওর একমাত্র আতঙ্ক বোমা। একমাত্র ভয় আহত অবস্থার নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ।...

—"কিন্তু যুদ্ধে তোমায় যেতেই হবে পাভ্‌লিক, না, আর কোনো কথাই শুনতে চাই না"—ওর জিনিষপত্র গোছাতে গোছাতে মা বলে ওঠেন মাথা ঝাঁকিয়ে। মাকে জানায়নি ওর ভয়ের কথা। ঐ সময় মনে হচ্ছিল মাকেও যেন ও ঘৃণা করে। শুধু মা? সবাইকেই ঘৃণা করে। কেন সবাই অমন ভয় না পাবার ভান করে? সবাই তো জানে বিষাক্ত গ্যাস, প্রচণ্ড বিস্ফোরকযুক্ত বোমা, দমদম্ বুলেট—আর শত্রুপক্ষের অমানুষিক অত্যাচারের কথা? তবু কি করে ওরা হাসে, গায়, গল্প করে, থিয়েটার যাওয়া, আইসক্রীম খাওয়াও বাদ দেয় না!

সবাই যেন যুক্তি করে অমন ভান করে। ওদের ওই ভানে সুপ্রোগভও কি ভোলেনি? তাই তো যাকে-তাকে সিগারেট খাওয়াতো, বাজে গল্প-গুজব করতো, সবই করতো—কিন্তু রাতের অন্ধকারে চোখে আসতো না এতটুকু ঘুম। ট্রেন ছুটে চলে সীমান্তের দিকে—আর সুপ্রোগভের মুখে জ্বলতে থাকে সিগারেটের অনির্ব্বাণ আগুন। চেহারা হোলো শুকনো ফ্যাকাশে। ডাক্তার বেলভ সাবেক কালের জটিল কেসের গল্প করেন, ফাইনা যন্ত্রনিষ্ট করে—সুপ্রোগভ সবার সঙ্গেই শান্ত ভাবে কথা বলে—কিন্তু ওর সমস্ত মনটা একটা ভয়-খাওয়া জন্তুর মত বোবা যন্ত্রণায় সারাক্ষণ আর্ত্তনাদ করে।

[ক্রমশঃ।

মা হওয়ার আগে ও পরে

ডাঃ গুপ্ত

আজ শর্মিলার জন্মদিন। চৌদ্দটা বছর উত্তীর্ণ হ'য়ে আজ ও পনেরোয় পা দিয়েছে। প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে এই দিনটি আসে এবং ওকে জানিয়ে দিয়ে যায় জীবনের আরো একটি বৎসর পার হ'য়ে এলে তুমি, এগিয়ে গেলে আর একটি বৎসরে।

বাবা দিয়েছেন চমৎকার একটি লাল সাড়ী; কালো ভেলভেটের মত তার চওড়া পাড়। কালো জমিনের উপর শাদা চুমকী দেওয়া ব্লাউজ।

খুব ভোরে উঠে ও আজ স্নান করেছে: বৌদি শ্বেত ও রক্তচন্দন দিয়ে কপালের 'পরে জন্ম-প্রশস্তি এঁকে দিয়েছেন।

প্রণাম করেছে ও পুজনীয় প্রণম্যদের।

আশীর্বাদও পেয়েছে: দীর্ঘজীবী হও। চির লক্ষ্মীস্বরূপা হও।

হেমন্তর সকালটিও আজ ভারি চমৎকার।

সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে শয়ন-কক্ষের জানালাটি এসে খুলে দাঁড়াতেই চোখে পড়েছিল হেমন্ত-শিশিরে ভেজা সামনের মাঠের সবুজ ঘাসগুলো ভোরের আলোয় চিক্‌-চিক্ করছে। হঠাৎ নজরে পড়ে গেল সামনের ছোট মাঠটার অপর দিকের দোতলা বাড়ীটার খোলা জানালার দিকে।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ।

ওরই থেকে সামান্ত বছর তিনেকের হয়ত বড় হবে। ছোট বেলাকার খেলার সাথী। বছর তিনেক হলো ওর সঙ্গে আর খেলে না শর্মিলা। মায়ের বারণ, তা ছাড়া কেমন যেন একটা লজ্জা ও সংকোচও ভিতরে ভিতরে ও অনুভব করে আজ-কাল।

দু'জনে দেখা হয়। হয়ত এক-আধটা কথাও হয়।

শর্মিলার ডাক নাম টুনী।

সিদ্ধার্থ হয়ত প্রশ্ন করে: 'কেমন আছো টুনী?'

'ভাল।—' চোখ দু'টো নামিয়ে নেয় টুনী।

'আজ-কাল যে আর আমাদের বাসায় আসো না?—'

শর্মিলা কোন জবাব দেয় না। কেবল ঈষৎ একটু হাসির আভাষ ওর চিকণ ওষ্ঠপ্রান্তে বঙ্কিম চাঁদের মত জেগে উঠেই মিলিয়ে যায়। অকারণেই কপাল ও কপোল বোধ হয় একটু রাঙা হয়ে ওঠে।

সিদ্ধার্থকে দেখতে ওর ভাল লাগে কিন্তু চাইতে পারে না ওর দিকে। অথচ আশ্চর্য, ক্লাশের সহপাঠিনীদের মধ্যে ও এতটুকু সংকোচও অনুভব করে না।

আজও সকালে দূর হ'তে জানালায় সিদ্ধার্থকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর ভালই লেগেছিল। জন্মদিনে অনেকে অনেক উপহারই দিয়েছে শর্মিলাকে কিন্তু সব চাইতে ভাল লেগেছে ওর বিদেশ থেকে লেখা দিদি প্রমিলার চিঠিটা।

উচ্চতর ডাক্তারী বিদ্যা অর্জ্জনের জন্ত দিদি প্রমিলা আজ বছর দেড়েক হলো লণ্ডনে আছে। দিদি লিখেছে:

'অসলো গার্ডেন
লণ্ডন

শমি!

তোমার জীবনের চোদ্দটা বৎসর পার হ'য়ে তুমি এবারে পনেরোয় পড়লে। পঞ্চদশী কিশোরী হলে তুমি। তোমার জীবন সুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত হোক। নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে বহু বার তোমাকে আমি বলেছি আদ্যাশক্তি মহামায়া জননীর অংশোদ্ভূতা তুমি। অনাগত সন্তানের মা তুমি। প্রকৃতপক্ষে এখন হতেই বিবাহিত জীবনে মা না হওয়ার আগে পর্যন্ত চলবে তোমার মা হবার আগের দুস্তর সাধনা। মনে রেখো একটা কথা, আমাদের ইউনিভারসিটির পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত পাঠ্য-বিষয়ই আমাদের শিক্ষার শেষ নয়। শিক্ষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে বড় গলদটা আমাদের থেকে যায় সেটা হচ্ছে যৌন-ব্যাপার সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা। যৌন-জীবনের পৃষ্ঠাগুলো আমাদের চোখের সামনে কেউ কোন দিন মেলেই ধরে না। আমাদের জীবনের একটি বিশেষ ও প্রধান অংশই জুড়ে থাকে আমাদের যৌন-ব্যাপার। এত কাল ঐ যৌন-জীবনকে আমরা অন্যায়, নোংরামি ও লজ্জার একটা আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে নিজেরা ত অন্যায় করেছিই, এমন কি যৌন-ব্যাপার সম্পর্কে কৌতূহলী আমাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরও শাসন করে চোখ রাঙিয়ে অজ্ঞ করে রেখেছি। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীরই ১৪ থেকে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে একটা যৌন-শিক্ষা হওয়া যে একান্ত ভাবেই প্রয়োজন এই সত্যটিই আজ এদেশের সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করতে হলে এবং জীবনে সুখ ও শান্তি অব্যাহত রাখতে হলে যৌন-জীবনকে যে আমাদের প্রতিপদেই প্রায় স্বীকার করে নিতে হবে, এ কথা কে না আজ বোঝে? তবু আশ্চর্য, মুখ ফুটে কেউ কোন কথাই বলবে না।

যৌন-চেতনা সম্পর্কে অপরিণতবয়স্ক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শাসন করতে গিয়ে একটা বড় কথাই আমরা ভুলে যাই সেটা হচ্ছে বালক-বালিকাদের কৌতূহলী মনকে শাসনের ও নিষেধের নিগড়ে বাঁধতে গিয়ে আমরা তাদের আরো বেশী কৌতূহলী তো করে তুলিই, সেই সঙ্গে তাদের চিত্তকে গোপনপ্রয়াসী করে তুলি।

শিশু যখন তার যৌনাঙ্গে হাত দিয়ে কৌতুক উপভোগ করে সেই সময় রাগ করে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বা তার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে তার ঐ অভ্যাসটিকে আমরা তো শুধরাতে পারিই না বরং তাকে আরো ঐ ব্যাপারে জঘন্য ভাবে সক্রিয় করে তুলি। যেই সে বুঝতে পারবে যৌনাঙ্গ নিয়ে নাড়াচড়া করা তোমার সামনে অনুচিত—সে মার খাবে, অমনি সে শুরু করে লুকোচুরি।

কিন্তু কথা হচ্ছে এখন ছোটদের যৌন-শিক্ষা কে দেবে।—

মায়ের দল বলবে, 'কেমন করে দেবো। আমরা কি ছোট বেলায় সে শিক্ষা পেয়েছি!—'

সত্যিই ত।

তাই তোমরা যারা ভাবী মায়ের দল তোমাদেরই আগামী কালের জন্য তৈরী হ'তে হবে।

আমার মনে হয়, সন্তানকে যৌন-শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে মা-বাপই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। এবং যৌন-শিক্ষার স্থান সকলের সঙ্গে স্কুলে না হ'য়ে গৃহেই হওয়া উচিত।

সন্তানকে যৌন-শিক্ষা দিতে হবে ভাবী মায়ের এও একটা কর্তব্য বা শিক্ষণীয়।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখো, শিশুদের একটা চিরন্তন কৌতূহল হচ্ছে তারা কেমন করে জন্মাল। এই পৃথিবীতে কেমন করে কোথা দিয়ে এল! জন্ম-রহস্যটা একটা প্রচণ্ড কৌতূহল ওদের কাছে। প্রকৃতি-পাঠের ভিতর দিয়ে তাদের ঐ প্রথম শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

প্রকৃতি হ'তে গল্প দিয়ে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে জন্ম-রহস্যের মূল কথাটা। পশু-পাখীর জন্ম-বৃত্তান্ত—কেমন করে ডিম পাড়ছে পাখী, ফুল থেকে ফল, পোকা-মাকড়, পশুর জন্মকথা ঐ সব হ'তেই ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে মানুষের জন্ম-বৃত্তান্তে।

আমার কি মনে হয় জান, জীবনের দৈনন্দিন অন্যান্য আলাপ-আলোচনায় মধ্যে যৌন-সংক্রান্ত আলোচনা থাকলেও বোধ হয় ভালই হয়। যাতে করে মিথ্যা সংকোচটা ক্রমে দূর হ'য়ে যেতে পারে যৌন-সংক্রান্ত আলাপের। আর একটা কথা। যৌনাঙ্গ বলতে যে 'গোপন অঙ্গ', 'গোপন স্থান' প্রভৃতি আমরা সর্বদা আখ্যা দিয়ে থাকি ঐ কথাগুলো একেবারে আমাদের ভুলে যাওয়াই উচিত। তাতে করে মিথ্যা সংকোচ ও লজ্জার হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি। হাত-পা চোখ-মুখ যেমন একটা দেহের অঙ্গ, যৌনাঙ্গ তেমনি অঙ্গবিশেষ মাত্র দেহের, অতএব তাতে লজ্জার ও সংকোচেরই বা কি থাকতে পারে? তথাপি যৌনাঙ্গ যে আমরা বস্ত্রের সাহায্যে ঢেকে রাখি সেটা দেহ-সৌন্দর্য ও শালীনতা সৃষ্টির জন্যই, লজ্জার জন্য নয়—এ কথাটা কেন ভাবতে পারবো না আমরা? যৌনাঙ্গ বলতে আমাদের দেশে যে সব প্রচলিত নামকরণ করা হয়েছে সেগুলোও ঠিক যেন রুচিসংগত বা সঠিক নয়, আরো সঠিক নমকরণের আবশ্যক। এ জন্য ভাববার প্রয়োজন।

আহার-নিদ্রা, মল-মূত্র ত্যাগের মত রতিক্রিয়াও শারীরিক একটি প্রক্রিয়া, জৈবিক প্রয়োজন। তবে সেই প্রশ্ন উঠলে কেন আমরা বিব্রত বোধ করবো, লজ্জায় সংকুচিত হবো। এদের দেশের মনস্বীরা এ সম্পর্কে কত ভেবেছেন ও ভাবছেন, পরের পত্রে আরো বিশদ ভাবে তোমাকে জানাবো।

আজ কেবল শিশুদের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে কয়েকটা কৌতূহল কেমন সহজেই মেটান যায় সেই সম্পর্কে একটা সত্য ঘটনা বলবো। আমি যাঁদের বাড়ীতে আছি গেষ্ট হ'য়ে—ভদ্রমহিলা এক জন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। তাঁর এগার বছরের ছেলে জোন্স সেদিন হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করলে: 'মামি, বাচ্চা কেমন করে হয়?'

মা—'সব বাচ্চারাই মার শরীর থেকে জন্ম নেয়।'

'ওঃ, কিন্তু বাচ্চা মার শরীরের মধ্যে কেমন করে যায়?—'

'ছোট একটা কোষ (Cell)এর থেকে জন্ম নেয় যাকে ডিম্ব-কোষ বলতে পারো। ফুলের মধ্যে যেমন বীজ জন্মায় মায়ের শরীরের মধ্যেও তেমনি সন্তান-বীজ বা ডিম্ব-কোষ জন্ম নেয়।'

'কত দিন থাকে মার পেটের মধ্যে বাচ্চা?—'

'প্রায় নয় মাস! কখনো সামান্য বেশী বা কম সময়ও থাকতে পারে।'

'মার শরীরের মধ্যে বাচ্চাটা কোথায় থাকে মামি?—'

'জন্ম-থলি বলে মায়ের পেটের মধ্যে বাচ্চাদের জন্য একটা থলি থাকে তার মধ্যে। ক্রমে তার মধ্যেই সে বেড়ে ওঠে!—'

'তার পর কেমন করে বাচ্চাটা ঐ থলি থেকে বের হয়ে আসে?—'

'থলির মুখটা খুলে যায় এক সময় আর বাচ্চাটা তার সামনে যে রাস্তা যাকে আমরা জন্ম-পথ (Vagina) বলি, সেই রাস্তা দিয়ে বাইরে চলে আসে।—ঐ ভাবেই বাচ্চা জন্মায়!—'

'আমারও পেটে জন্ম-থলি আছে মা?—'

'না। তোমার নেই!—'

'আমার নেই তবে আমার বাচ্চা হবে কি করে?—'

'তুমি যে ছেলে। তাই তোমার পেটে জন্ম-থলি নেই। জন্ম-থলি কেবল মেয়েদের পেটেই থাকে। যারা পরে বড় হলে মা হবে। মেয়েরাই চিরকাল মা হয় আর পুরুষরা হয় বাপ বাচ্চাদের। তুমি মা না হ'য়ে বাবা হবে তোমার বাচ্চার।—যেমন তোমার বাবা ড্যাডি।—'

একবার ভেবে দেখ কেমন সরল সুন্দর ভাবে মা তার ছেলের জন্ম-রহস্যের কৌতূহল মিটিয়ে দিলেন।

এর মধ্যে কি কোন নোংরামি বা লজ্জার কথা আছে?

যাক্ চিঠি অনেক বড় হ'য়ে গেল, আজকের মত এইখানেই শেষ করি।

তোমার জন্ম-তারিখটি বার বার ফিরে ফিরে আসুক সুখ ও শান্তির মধ্যে, এই কামনা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

তোমার দিদি প্রমিলা।'

চিঠিটা একবার দু'বার তিনবার পড়েছে শর্মিলা।

দিদির সঙ্গে বয়সের ওর অনেক তফাৎ হলেও দিদিকে যেন বরাবর ও নিকটতম সাথী বা বন্ধু হিসাবেই পেয়েছে।

আর এত সহজে দিদির কাছে মনের সব কথা খুলে বলা যায় তাই আরো ভালো লাগে দিদিকে ওর।

একটি কিশোরী মেয়ের দেহে ও জীবনে ক্রমে যখন যৌবনের তুলি রং বুলাতে শুরু করে, প্রজাপতির রঙিন ডানার মত মনও ডানা মেলতে চায়। ঋতুস্নানে দেহ ও মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, সেই যে তার মা হবার আগেকার লগ্ন এই কথাটাই তাকে স্মরণ রাখতে হবে।

নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ সন্তান ধারণ—মাতৃত্বে উপনীত হওয়া, তাই ঐ সময়টায় হতে হবে প্রত্যেকটি মেয়েকেই নিষ্ঠাবতী, স্বাস্থ্যবতী ও সংযমের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রত্যেক মেয়েকেই মনে রাখতে হবে পরবর্তী জীবনে সে কেবল কোন এক পুরুষের স্ত্রীই হবে না—হবে তার ও স্বামীর সন্তানের মা, জননী।

সুস্থ সবল বুদ্ধিদীপ্ত সন্তান পেতে হলে মাকেও হ'তে হবে সুস্থ সবল ধৈর্যশীলা।

সুসন্তানই জাতির ঐশ্বর্য।

বহু ক্লেশে বহু রক্তপাতে বহু প্রাণদানে আজ জাতির যে স্বাধীনতা মিলেছে সে স্বাধীনতাকে শ্রীমণ্ডিত করতে হলে চাই নতুন ছেলে-মেয়ের দল।

সুস্থ সবল ছেলে-মেয়ে। বুদ্ধিতে দীপ্ত, সংযমে দৃঢ়, চরিত্রে উদার।

সেই সন্তান দেবে মায়েরা।

জন্ম দিয়ে পালন করে মায়েরা জাতিকে দেবে সেই সন্তানের গৌরব।

বিবাহের কথা না হলেও বিবাহের রঙীন কল্পনা কিশোরী শর্মিলার মনের মধ্যে রঙ ধরায় বৈ কি।

দু'-এক জন বান্ধবীর ইতিমধ্যে বিবাহও হয়ে গিয়েছে।

ভারী ভালো লাগে কল্পনা করতে সেই দিনটি। বাড়ীময় আলো যেন চারিদিক ঝলমল করছে। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভরে গিয়েছে। বাইরে বাজছে সানাই।

লাল রক্তের মত চেলী পরে কপালে চন্দনের তিলক এঁকে এক গা ঝলমলে গহনা একটি ঘরের মধ্যে পিঁড়ির উপর চুপটি করে বসে আছে ও।

মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা কেমন দুরু-দুরু করে ওঠে অকারণেই। থেকে থেকে কানে এসে বাজছে শঙ্খের আওয়াজ, পুরনারীদের উলুধ্বনি।

হঠাৎ বাইরে কিসের গোলমাল : বর। বর আসছে।

আসছে তার প্রিয়তম। তার দয়িত।

এসো প্রিয়তম! শর্মিলা তোমার জন্যই যে বুকে তার আসন বিছিয়ে রেখেছে এত কাল।

তোমার পদধ্বনি শোনবার আশাতেই কান পেতে ছিল এত কাল অপেক্ষায় অপেক্ষায়।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু!

তোমার হৃদয় আমার, আমার হৃদয় তোমার।

এক বৃন্তে দু'টি ফুল যোরা।

এ তো শুধু কিশোরী শর্মিলারই স্বপ্ন নয়। কত কিশোরীরই যে স্বপ্ন! কিন্তু কোথায় মিলিয়ে যায় ঐ স্বপ্ন! ঐ ভাবমদির বিহ্বলতা!

আবেশে থর-থর তনু শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়।

কেন? [ক্রমশঃ।

জলযাত্রা

শান্তা দেবী

রোম

ফ্লোরেন্সে তিন-চার দিন বাস করে ১২ই অগষ্ট রোম যাত্রা করলাম। একটা আধ-মেরামতী পাথর-ছড়ানো রাস্তার উপরের দোতলা হোটেলে ফ্লোরেন্সে থাকতাম, রোজ হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা দোকানে রুটি, মাখন ইত্যাদি কিনতে যেতাম। ওই কয় দিনেই জায়গাটা বেশ নিজের ঘর-বাড়ী মনে হত।

আমেরিকান এক্সপ্রেসের (American Express) লোক এসে বেলা ১১টায় আমাদের ট্রেণ ধরিয়ে দিল। বার্থ রিসার্ভ করবার কথা ছিল, কিন্তু করেনি। ট্রেণে একটুও বসবার জায়গাও নেই, কেউ একটু জায়গা দিল না, বা পাশে বসতেও বলল না। কি আর করি, খানিকক্ষণ সবাই মিলে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পর রেল কোম্পানীর ইউনিফরম্-পরা এক জন লোক এসে বলল, 'তোমরা প্রথম শ্রেণীতে বসবে চল।' আমরা ভাবলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে অন্য জায়গায় না যাওয়াই ভাল, কি আবার বিপদে পড়ব! তাই রাজি হলাম না। সে কিন্তু আবার এসে আমাদের জোর করেই নিয়ে গেল। মনে হল কিছু বকশিশ পাবার ইচ্ছা ছিল। আমাদের দেশের লোকের মত এরাও বকশিশের খুব ভক্ত। তবে আমাদের দেশের Railway কর্ম্মচারী এই রকম কাজে বকশিশ নেন কি না, আমি জানি না। লোকটি বলল, 'তোমরা যেন বসে কিছু খাচ্ছ এই ভাবে ওখানে গিয়ে বস।' গিয়ে বসলাম, তবে কিছু খেলাম না, সামান্য যা খাদ্য চেয়েছিলাম তা কেউ এনে দিল না, খানসামারা বড়লোকদের খানা দিতেই ব্যস্ত। আমাদের পাশেই এক জন খুব হোমরা-চোমরা লোক বসেছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে নাগ মশায় চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে জবাব দিল না। হয় ইংরিজী বোঝে না, নয় বেশ অহঙ্কারী!

ফোরেন্স ছাড়বার পর থেকে কতকটা পার্ব্বত্য দেশ এবং কয়েকটা নদী পার হয়ে একটা পাহাড়-ঘেরা নীল হ্রদের ধারে এলাম। তার পর রোম। এটা রাজধানী, কাজেই এখানে জিনিষ নামাতে পোর্টাররা আরোও বেশী ভাড়া নিল এবং যে ব্যক্তি আমাদের উঁচু ক্লাসে বসিয়েছিল তাকে ৫০০ লিরা (lira) দিয়েই নমস্কার করে অম্লান বদনে নিয়ে নিল। এখানেও ইটালীয়ানরা বাঙালী মেয়েদের দেখে হাঁ করে তাকাচ্ছিল এবং নিজেদের মধ্যে নানা মন্তব্য করছিল। আমাদের সেটা দেখতে একটুও ভাল লাগছিল না।

আমাদের সঙ্গেই ট্রেণ থেকে এক জন শাড়ী-পরা ভারতীয় মহিলা নামলেন। তাঁকে কেউ কিছু সাহায্য করছিল না বলে তিনি বড়ই বিব্রত বোধ করছিলেন। আমাদের নিজে আমেরিকান

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

এক্সপ্রেসের যে লোক এসেছিলেন তাঁকে তিনি এসে অনুযোগ করলেন। কিন্তু তারা টাকার বদলে'কাজ করে, তারাও কোন সাহায্য করল না। বলল, 'তুমি এনকোয়ারি অফিসে খোঁজ কর।'

ষ্টেশনের কাছেই বিরাট একটা চত্বর ও চৌমাথার সাম্‌নে খুব বড় একটা হোটেলে আমাদের নিয়ে গেল। জায়গাটা বেশ জমকালো দেখতে। কত শতাব্দীর পুরানো বিখ্যাত রোম নগরী! ঢুকেই তা অনুভব করা যায়। হোটেলের কিছু দূরে এক পাশে ভাঙা রোম্যান দেয়াল, অন্য দিকে একটা গির্জ্জার উচ্চ চূড়ার উপর সোনালী রঙকরা যীশুর বা কোন সেন্টের বিরাট মূর্ত্তি রোমের প্রাচীন সাম্রাজ্য ও খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। আমরা রোম বলতে প্রাচীন ইতিহাসের কত ছবি ভাবছিলাম, কিন্তু আধুনিক যুগের রোম্যানরা সে সব কবে ভুলে গিয়েছে। তারা হোটেলের সামনে দিয়ে কাজে যাবার সময় পথে ফলের দোকানে দাঁড়িয়ে কাটা তরমুজ খেয়ে খোসাটা ফেলে দিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা রাস্তা-ধোওয়া পাইপে মুখ লাগিয়ে সেই পবিত্র জল খেয়ে যাচ্ছে। অনেকে গির্জ্জার দিকে পিছন ফিরে চত্বরে ফুল গাছের ধারে বেঞ্চে বসে অকারণ সময় কাটাচ্ছে। ওইখানেই অনেক ট্রাম-বাসের পথ, লোকে পরস্পরকে ধাক্কাধাক্কি করে বাসে উঠছে। বাসগুলো অনন্ত কাল যেন যাত্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে, তার পর হঠাৎ এক সময় বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। এখানে কোন কোন মেয়ে আমাদের দেশের মেয়ের মত মাথায় পুঁটলি নিয়ে চলেছে। হোটেলের চার ধারে বড় বড় দোকান, মদ ও খাদ্যের বিপণিতে লোক-জন আসা-যাওয়া করছে। খুব বড় বড় চওড়া রাস্তা, মস্ত ফুটপাথ, কোথাও বা সিঁড়ি উঠে হাঁটতে হয়। রোম সত্যিই কল্পনার রোমের মত দেখতে। তবে বাঁদর লোকের বাঁদরামি যখন চোখে পড়ে তখন কল্পনার ছবি ম্লান হয়ে যায়। হোটেলে নানা রকম রাজ্যে লোক আসে, এসেই টের পেলাম।

এখানে খুব রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ও সন্ন্যাসিনী দেখা যায়। পাদ্রীদের অনেকের মাথার মাঝখানটা কামান। সন্ন্যাসিনীদের অনেকের মিষ্টি কচি মুখ, অনেকের অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ের মত চেহারা, ঠিক যেন আমাদের দেশের কাশী বা বৃন্দাবনের বিধবা মেয়ে। আমাদের দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকছে, আবার দু'জনে মিলে আমাদের বিষয় খুব উৎসাহে গল্প করছে, মনে হচ্ছে না যে ধর্ম্ম-কর্ম্মের ভাবনায় সদা ব্যস্ত। মাঝে মাঝে সুশিক্ষিতা সুমার্জ্জিতা ধরণের সন্ন্যাসিনীও দেখা যায়। অনেক পুরুষ দেখলাম গলায় সরু চেনে একটা করে গোল মাদুলি পরে বেড়াচ্ছে, তারা গৃহস্থ লোক।

রাত্রে সহরে খুব আলোর ঘটা। দেখেই মনে হয় মস্ত একটা কোথাও এসেছি বটে। সারা রাত এই রকম আলো জ্বলে। এত বড় বড় চত্বর এবং এমন চওড়া চওড়া রাস্তা কোথাও দেখিনি, চার দিকে যখন আলো জ্বলে তখন তার বিস্তৃতি যেন আরো চোখে পড়ে।

পরদিন সকালে আমরা ঘুরতে বেরোলাম। চার ধারেই প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপ, রাস্তা পাথর দিয়ে বাঁধানো, তার উপর বেশ রোদ। বোধ হয় রোদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রত্যেক দোকানের সামনেই রাস্তার ধারে একটু ঘোমটার মত ঢাকা দেওয়া আছে। কোন কোন দোকানের বাড়ী গাড়ীর রাস্তার চেয়ে অনেক উপরে, সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে বড় বড় দালানের মত পথ দিয়ে সেখানে যেতে হয়। ফ্লোরেন্সের মত সুন্দর সুন্দর শিল্পকার্য্যের ঘটা দোকানে দেখলাম না, তবে মোটামুটি বেশ সাজানো। এই সব দোকানের সামনের ফুটপাথ বা দালান পাকা ছাদ দিয়ে ঢাকা, কাজেই এখানে সামনে ঘোমটা টাঙাবার দরকার নেই। পাথরের দেশ, তাই নিরেট মস্ত মস্ত বাড়ীর ছড়াছড়ি।

বিকেলে এখানেও আমরা ঘোড়ার গাড়ী চড়ে বেড়াতে বেরোলাম। কিছু দ্রষ্টব্য জিনিষের নাম করে বেড়াতে না বেরিয়ে শুধু রাস্তায় বেরোলেই চক্ষু সার্থক মনে হয় এখানে। রাস্তা-ঘাটই দেখবার মত। কত শিল্পী কত সম্রাট মাথা ঘামিয়েছে এই রোম গড়তে! দিল্লীর যেমন যতখানি দাঁড়িয়ে আছে তার চেয়ে ধ্বংসস্তূপ বেশী, এও খানিকটা সেই রকম। কত যুগের পর যুগ গড়েছে আর ভেঙেছে কত মানুষ এখানে। নাম-না-জানা ধ্বংসস্তূপের সারির মধ্য দিয়ে বিখ্যাত কলোসিয়াম দেখতে গেলাম। কি বিরাট ধ্বংসস্তূপ! কতটুকুই বা দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখেই চোখ ঠিকরে আসে, যখন সবটা দাঁড়িয়েছিল না জানি মানুষ কত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখত! ইতিহাসের কত বিলাস-ব্যসনের নাট্য এই রঙ্গভূমিতে হয়ে গেছে। কত সম্রাট-সম্রাজ্ঞী তাঁদের ঐশ্বর্য্য-বিলাসের খেলা এখানে খেলে গিয়েছেন! হায়! আজ কোথায় তাঁরা? খিলানে চত্বরে সিঁড়িতে মঞ্চে ধূলি-ধূসরিত পথে কোথাও তাঁদের ছায়া নেই। দর্শকদের বসবার গ্যালারি অনেক তলা, তাতে ওঠবার কত চওড়া চওড়া সিঁড়ি। পাথরের বড় বড় থাম ভেঙে ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাঁদের নক্সা-কাটা মাথাগুলো মানুষের পায়ের ধূলায় ধূসরিত। কোথাও মানুষের মুখ, কোথাও সাপ খোদাই করা।

এই কলোসিয়ম রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে ফ্রান্স প্রভৃতিতে কত থিয়েটার গড়েছে। দেখতে খুবই সুন্দর। কিন্তু এর তুলনায় কত ছোট সে সব।

খৃষ্টীয় যুগের পরে কলোসিয়মের অনেক জায়গায় ক্রশ বসিয়ে এবং এঁকে দিয়েছে। যারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়েছিল তাদের স্মরণ করেই বোধ হয়। নীচে এরিনাতে (arena) যেখানে খৃষ্টান হত্যার তামাসা (!) হত, তার তলায় অনেক ঘর ও পথ। হয়ত এখানে মানুষ বন্দী থাকৃত। কত অহঙ্কার দেখিয়ে গিয়েছে সেই উৎপীড়করা আজ ধূলায় মলিন পথে দাঁড়িয়ে সেই ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাটদের কালো ছায়া যেন ভেসে বেড়াচ্ছে মনে হচ্ছিল। মনে পড়ছিল কবির কথা—

"এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর সাজাহান।
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।

এর পর আমরা জুলিয়াস সীজারের পার্লামেণ্ট ও তাঁর হত্যা-স্থান ও শনি দেবতার ধ্বংসস্তূপ ইত্যাদি দেখতে গেলাম। বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে বড় বড় সাদা থাম কয়েকটা শুধু দাঁড়িয়ে আছে। বাকী জায়গাটায় বাড়ীগুলির ভিতের নক্সা ও পথ বোঝা যায়, কিন্তু আর কিছু নেই। অসংখ্য ভাঙা বাড়ীর ভিত। এক পার থেকে আর এক পারে হেঁটে দেখতে অনেক সময় লাগে; তাই আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়েই দেখলাম। বর্ত্তমান রাস্তার চেয়ে ঐ ভিত্তিগুলি অনেক নীচে, উপর থেকে দেখা তাই বেশ সহজ। এখানে

কয়েক জন সন্ন্যাসিনী আমাদের দেখে উৎসুক হয়ে গাড়ীর কোচম্যানকে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন।

এখান থেকেই একটু দূরে একটা গির্জ্জায় সেন্ট পিটাররা লুকিয়েছিলেন, সেটা দেখবার জন্তে সবাই বার বার বলে। আমরা বাইরে থেকেই দেখলাম। বেশী সময় ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি গেলাম যে গির্জ্জায় মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া Moses (মুশা) এর মূর্ত্তি আছে সেখানে। মহামানবের মূর্ত্তি বটে! হাত দুটি যেন একেবারে জীবন্ত! মনে পড়ে গেল আমাদের অতি প্রিয়জনের এমনি হাত দেখেছি। মাইকেল এঞ্জেলো কি কল্পনায় এ মূর্ত্তি গড়েছিলেন? হয়ত তাঁর কোন প্রিয়জন এমনি ছিলেন। তবে হাতে পায়ে মুখে যে প্রাণ ও যে শক্তি মূর্ত্তিমান হয়ে ফুটে উঠেছে, তাতে কল্পনা অনেক খোরাকই দিয়েছে। এতখানি একত্রে একটা মানুষে পাওয়া শক্ত। দাড়ির জটা বুকে লুটিয়ে পড়ছে। হাতের পায়ের আঙ্গুলগুলি যেন এখনি নড়ে উঠবে মনে হল।

এই মন্দিরে বিখ্যাত এক জন ভারতবর্ষীয় ফোটোগ্রাফারের··· সঙ্গে দেখা হল। তাঁর আত্মীয়-আত্মীয়াদের সঙ্গে এসেছেন। আর এক দল পর্য্যটক তখন গাইডদের সঙ্গে এখানে ঘুরছিলেন। তাঁদের মধ্যে হঠাৎ দেখলাম শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ। কোথায় যে কখন কার সঙ্গে দেখা হয়! পৃথিবীটা বড়ই ছোট।

সন্ধ্যায় আমরা একটা নূতন জিনিষ দেখলাম। ইটালীয় মুক্ত প্রাঙ্গণের থিয়েটার। Verde লিখিত Aida নামক অপেরা। একটা বিরাট রোমান বাথকে রঙ্গমঞ্চ করেছে আর দর্শকরা বসেছে খোলা মাঠে কাঠের মাচায়। তিন হাজার লোক মিলে অভিনয় করল, তার মধ্যে দুই শত জন শুধু বাজাল। ষ্টেজে গরু ঘোড়া মানুষ গাড়ী কি যে না এল, জানি না। পোষাকে-পরিচ্ছদে রঙে অলঙ্কারে আসবাবে সাজানোতে প্রাচীন ইজিপ্ট (মিশর) যেন বেঁচে উঠল। ভুলেই গেলাম যে বিংশ শতাব্দীতে বসে থিয়েটার দেখছি। গায়ক-গায়িকাদের যে গলা—অমন গলার জোর কখনও হয় জানতাম না। মাঠ যেন ভেঙে পড়ছিল। পিছনে রোমান বাথের বিরাট বাড়ী অন্ধকারে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। সামনে মিশর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নেচে-গেয়ে সুখ-দুঃখের নানা খেলা খেলে চলেছে। দূর থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে আর মাথার উপর বিরাট আকাশের চাঁদোয়া। এ রকম অনুভূতি জীবনে কখনও হয়নি। সবই অপূর্ব্ব! কেবল খারাপ লেগেছিল ইথিওপিয়ানদের সাজানো। ও রকম কালির মত কালো রং করে না দিলে পারত।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে নারী

শিখা দেবী

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের প্রতি বলেছেন—সাধনার পথে কামিনী-কাঞ্চন এ দুটাই বিঘ্ন। মেয়েমানুষে আসক্তি ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে দেয়। কিসে পতন হয় পুরুষ জানতেও পারে না। যখন কেল্লায় যায় গাড়ী তখন একটুও বোঝা যায় না যে গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেল্লায় ভেতর গাড়ী পৌঁছুলে বোঝা যায় কতটা নীচে এসেছে। তেমনি কামিনী-কাঞ্চনের মোহ বুঝতে দেয় না পুরুষদের। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) এক জায়গায় বলেছেন—"নির্লিপ্ত সংসার বলুন আর যাই বলুন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। স্ত্রী সঙ্গে সহবাস করতে ঘৃণা করে না? যেখানে কৃমি, কফ, মেদ, দুর্গন্ধ—

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ।"

একটি স্ত্রীলোক পরম ভক্ত। ঠাকুরের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। তাঁর বয়স ৩১।৩২ বৎসর। তিনি নিত্যগোপাল নামে ঠাকুরের এক ভক্তের অদ্ভুত ভাবাবস্থা দেখে তাঁকে সন্তানের মত স্নেহ করেন ও তাঁকে প্রায় নিজের বাড়ী নিয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তটির প্রতি)—সেখানে তুই যাস্?

নিত্যগোপাল (বালকের ন্যায়)—হ্যাঁ, যাই। নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওরে, সাধু সাবধান! এক-আধ বার যাবি। বেশী যাস্ নে—পড়ে যাবি। কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। সাধুর মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। ওখানে সকলে ডুবে যায়। ওখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প'ড়ে খাচ্ছে খাবি।"

"এই ভক্তটির পরমহংস অবস্থা"—ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন। স্ত্রীলোকটিও ভক্তিমতী। এই উচ্চ অবস্থা সত্ত্বেও কি তাঁর বিপদের সম্ভাবনা! সাধুর পক্ষে কি কঠিন নিয়মই করলেন। মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করলে সাধুর পতনের সম্ভাবনা। এই উচ্চ আদর্শ না থাকলে জীবের উদ্ধারই বা কি করে হবে? মহাপ্রভুর বারণ সত্ত্বেও ছোট হরিদাস এক ভক্ত বিধবার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। কিন্তু হরিদাস যে সন্ন্যাসী; তাই মহাপ্রভু তাঁকে ত্যাগ করলেন। শ্রীচৈতন্য ছোট হরিদাসের উপর কেন এই কঠোর শাসন করেছিলেন? কি শাসন! কি কঠোর নিয়ম সন্ন্যাসীর জন্য। আর এই ভক্তটির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের কি অপার ভালবাসা! পাছে উত্তরকালে তাঁর কোন বিপদ হয় তাই পূর্ব্বেই সাবধান করলেন—"ওরে, সাধু সাবধান!"

অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের প্রত্যেক স্ত্রীমূর্ত্তিকেই জগন্মাতার অংশ বলে মনে করতেন। এমন কি, মথুর বাবু তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য পতিতাদের কাছে নিয়ে গেলেও তিনি তাদের মা ভিন্ন অন্য কিছু মনে করতে পারেননি। "মা মা" বলে তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন। "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই তিনি জগজ্জননী। সারদামণিকেও তিনি ঠিক সেই ভাবে দেখতেন। তিনি তাঁকে মাতৃজ্ঞানে ষোড়শী পূজা করেছিলেন। জগতের ইতিহাসে এ একেবারে নূতন। মাতৃ-জাতির প্রতি তাঁর ভক্তি যে কত বেশী ছিল, তা এই একটা জিনিস থেকেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর সাধন-কালে এক জন মা-ই তাঁর প্রথম গুরুর আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেই গুরুর নাম যোগেশ্বরী—এক জন কিনা স্ত্রীলোক। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন ঠাকুর অথচ এক জন নারী তাঁর গুরু! তিনি নিজেও প্রথম শিষ্যা করেন মাতৃজাতির এক জনকে—এঁর নাম গৌরীপুরী মাতাজি। তার মানে, নারীর মধ্যে যে তামসী তাকে ত্যাগ করবে। যে যোগিনী, যে মহিমময়ী, মাতৃস্বরূপিণী তাকেই গ্রহণ করবে, অভিনন্দন করবে।

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন, তুই ভাখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি
রমণীরে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে।"

জনক রাজা নির্লিপ্ত, তাঁর দেহে দেহ-বুদ্ধি নেই, তাই তাঁর আর এক নাম বিদেহ। সেই রাজার সভায় একদিন এসেছিল এক ভৈরবী। তাঁকে দেখে রাজা মাথা হেঁট করে চোখ নীচু করে রইলেন। ভৈরবী তাই দেখে বললেন—"তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়। তোমার তবে এখনও পূর্ণজ্ঞান হয়নি। পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষে ভেদজ্ঞান থাকে না।" শ্রীরামকৃষ্ণও সেই পাঁচ বছরের ছেলে। স্ত্রীলোক মাত্রই তাঁর মা'র প্রতিমা।

"আপনারা যদ্দূর পারো স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকো। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে ঈশ্বর-চিন্তা করো। ঈশ্বরে ভক্তি এলেই অনেকটা অনাসক্ত হতে পারবে। দু'-একটা ছেলেপুলে হলে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনে ভাই-বোন হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে যাতে ইন্দ্রিয়-সুখে মন না যায়, ছেলেপুলে আর না হয়।"

"অবিদ্যার সংসারে মেয়েমানুষের কি মোহিনী শক্তি! পুরুষগুলোকে বোকা অপদার্থ করে রেখে দিয়েছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে নিয়ে যায়, আর অবিদ্যারূপিণী স্ত্রী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে রাখে। বিদ্যার সংসারে স্বামি-স্ত্রী উভয়েই ঈশ্বরভক্ত। ঈশ্বরই তাদের একমাত্র আপনার লোক। অনন্ত কালের আপনার। সুখ হোক, দুঃখ হোক কখনও তাঁকে ভোলে না।"

নিজের জীবনেও রামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন তারই অভিব্যক্তি। স্ত্রীকে দেশের বাড়ীতে রেখে তিনি দেখাননি কামজয়ের চেষ্টা। সারদা-মণিকে নিয়ে তিনি এক ঘরে এক শয্যায় রাত কাটিয়েছেন। রাতের পর রাত চলেছে রতিহীন বিরতির পরীক্ষা। এই বিরতি দিয়ে ঈশ্বরের আরতি। আট মাস এক শয্যায় শুয়েছেন দু'জনে। রামকৃষ্ণ উত্তীর্ণ হলেন সেই বীর্য্যের পরীক্ষায়, উত্তীর্ণ হলেন স্থৈর্য্যের পরীক্ষায়। এই সজীব সাধনা! শব-সাধনার চেয়ে কঠিনতর, ভীষণতর। সে এক বিচিত্র সাধনা! কিন্তু নারী যদি কামময়ী হয় তবে নরের সব সাধনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তাই আকুল হয়ে প্রার্থনা করেন রামকৃষ্ণ—"ও যদি কামময়ী হয়ে ওঠে, তা হলে কে জানে আমার এই তেজ, বীর্য্য ধুয়ে যাবে কিনা। কে জানে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে জাগবে কিনা দেহ-বুদ্ধি। সারদাকে তুই সারভূতা করে দে। আমি যদি মা প্রেম, সারদা পবিত্রতা।"

সংসারে রঙ্গমঞ্চে এ এক অদ্ভুত প্রার্থনা। এক সুস্থ-সবল যুবক প্রার্থনা জানাচ্ছেন—"আমার স্ত্রীকে কামমোহিনী করিস্ নে, কালমোহিনী করে দে।" ১২৮০ সালে ফলহারিণী কালীপূজার দিন তিনি পূজা করলেন ষোড়শী-রূপিণী সারদার। পূজা করলেন গোপনে। কালীর যে "গুপ্তভাবে আপ্তলীলা।" ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন—"যত জপ-তপ, সাধন-ভজন, যত আচার-বিচার, যত কর্ম্মকাণ্ডের মালা সব তোমার দুটি পায়ে অর্পণ করলাম। এ পূজাতেই আমার সমস্ত পূজার ইতি হ'ল।"—বলে তাঁকে প্রণাম করলেন তিনি। সারদা শঙ্খ-কঙ্কণধারিণী লোকমাতা।

"হে সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপা সর্ব্বার্থসাধিকা, হে শরণদায়িনী ত্রিনয়নী, সনাতনী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।" ঠাকুর আত্ম-নিবেদন করে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

একদিন রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন সারদাকে, "তুমি কি আমাকে সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ?"

"না—তোমাকে ইষ্ট-পথে সাহায্য করতে এসেছি।"

"খৈ ভাজবার সময় যে খৈটি খোলার ভেতর থেকে ঠিকরে বাইরে পড়ে তাতে কোন দাগ লাগে না। কিন্তু গরম বালির খোলায় থাকলে কোন না কোন জায়গায় কালো দাগ লাগবেই।" "যা ঈশ্বর-পথে বিঘ্ন হবে তাকে ত্যাগ করতেই হবে—তিনি মা হোন আর স্ত্রী হোন। ঈশ্বরের মতন আপন কেউ নেই।" কিন্তু সারদামণি—"তুমি আমার বিদ্যা, তুমি সারদা, সরস্বতী। তুমি রূপ নিয়ে আসনি, বিদ্যা নিয়ে এসেছ। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছ। এসেছ বিদ্যার আলো জালিয়ে। তুমি জ্ঞানদাত্রী।" "তুমি আমার আনন্দময়ী। যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। তিনিই সম্প্রতি আছেন নবতে আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। তুমি কি শুধু এই ঘরের মধ্যে আছ? তুমি আছ আমার বিশ্বব্যাপিনী হয়ে।" বিয়ে করলেন অথচ সংসার ভোগ করলেন না। বিয়ের কত বড় আদর্শ হতে পারে তাই দেখালেন সংসারকে। স্বামি-স্ত্রী ভোগাসনে না বসে বসলেন যোগাসনে। যে কামিনী হতে পারত সে হয়ে দাঁড়াল জ্যোতিষ্মতী জগদ্ধাত্রী। রতির পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন মূর্ত্তিমতী বিরতিকে—অতৃপ্তির জগতে সন্তোষময়ীকে। নারীর সব চেয়ে যে বৃহত্তম মহিমা তাই অর্পণ করলেন নারীকে।

আলবীরুণী কে ছিলেন?

আলবীরুণী নামক আরবীয় পণ্ডিত ৯৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকযাত্রা করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

অদ্বিতীয়

লিভার টনিক

"কুমারেশ" লিভার ও পেটের পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে। অধিকন্তু রক্তকণিকা গঠন, খাদ্য পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন কার্য্যেও সহায়তা করে। "কুমারেশ" লিভার ও পেটের পীড়ার অমোঘ ঔষধমাত্র নহে **—ইহা একটি অদ্বিতীয় লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।**

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

সালকিয়া • হাওড়া

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

যোগেশচন্দ্র বাগল—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩১০ বঙ্গ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বরিশাল জেলার কুমীরমাড়া গ্রামে (মাতুলালয়ে)। পিতা—জগবন্ধু বাগল। পৈতৃক নিবাস—বরিশাল চলিশা গ্রাম। শিক্ষা—গ্রামের পাঠশালা, প্রবেশিকা (কদমতলা হাই স্কুল, ১৯২২), আই.এ (বাগেরহাট কলেজ, ১৯২৪), বি.এ (সিটি কলেজ, ১৯২৪), এম.এ (ইংরেজি) পর্যন্ত পাঠ। কর্ম—প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় বিভাগে (১৯২৯—১৯৩৫ ; ১৯৪১), দেশ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকরূপে (১৯৩৫—১৯৩৯)। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে গবেষণামূলক প্রবন্ধ-রচনা। প্রথম রচনা 'রুস্তমজী' (ভারতবর্ষ, ১৩৩৮, চৈত্র, ১৩৩৯, জ্যৈষ্ঠ)। গ্রন্থ—সাহসীর জয়যাত্রা (১৩৪৫), জগৎ কোন্ পথে (১৩৪৬), মুক্তির সন্ধানে ভারত (১৩৪৭), উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (১৩৪৯), জাতির বরণীয় যারা (ঐ), মহাসমরের মুখে (১৩৪৮), রাধাকান্ত দেব (১৩৪৯), বীরত্বের রাজটীকা (১৩৫০), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫০), মার্কিণ জাতির কর্মবীর (১৩৫০), জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত (১৩৫২), রাজনারায়ণ বসু (ঐ), জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (১৩৫৩), ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৩৫৪), ভারতের মুক্তিসন্ধানে (১৩৫৫), 'রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়' (ঐ), বিদ্রোহ ও বৈরিতা (১৩৫৬), সঙ্কল্প ও সাধনা (ঐ), বাংলার জনশিক্ষা (ঐ), বাংলার স্ত্রীশিক্ষা (১৩৫৭), Beginning of Modern Education in Bengal : Women's Education (১৯৪৪), Bethune School & College Centenary Volume (১-১২৫, ২১২-২২৪, ২২৮-২৩৫ পৃঃ, ১৯৫১), History of Indian Association (১৯৫৩)।

যোগেশচন্দ্র মিত্র—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সাহিত্য ও বিজ্ঞান (মাসিক, ১৮৯৯)।

যোগেশচন্দ্র মিত্র—অর্থনীতিবিদ্। জন্ম—১২৮২ বঙ্গ (আনু)। মৃত্যু—১৩৪৪ বঙ্গ মাঘ। কর্ম—অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ, বীমা ও ব্যবসায় সংক্রান্ত সুপণ্ডিত। গোরক্ষপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অর্থনীতি শাখার সভাপতি (১০৩৩)। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়। গ্রন্থ—জীবন-বীমাতত্ত্ব।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৯ খৃঃ ২০এ অক্টোবর হুগলী জেলায় আরামবাগের অন্তর্গত দিগড়া গ্রামে। শিক্ষা—বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়, প্রবেশিকা (বর্ধমান মহারাজা স্কুল), এফ.এ (হুগলী কলেজ), এম. এ। কর্ম—লেকচারার, কটন কলেজ (১৮৩০), কলিকাতা মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম কলেজ (দেড় মাস), প্রেসিডেন্সী কলেজ, পুনরায় কটক কলেজ (১৮৮৯—১৯১৯)। অবসর গ্রহণের পর বাঁকুড়ায় আগমন (১৯২০)। এখানে বিজ্ঞান সাধনা। বিদ্যানিধি (পুরীর পণ্ডিতসভা কর্তৃক ১৯১০), বিজ্ঞানভূষণ, রায় বাহাদুর উপাধি লাভ। ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠাতা। ইনি একাধারে সাহিত্যিক, জ্যোতির্বিদ্ ও কলাবিদ্। প্রথম রচনা—নব্যভারতে। গ্রন্থ—সরল পদার্থবিজ্ঞান (১৮৮৬), সরল প্রাকৃত ভূগোল (১২৯৫), সরল রসায়ন (১৮৯৮) আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ (১৯০৩), রত্নপরীক্ষা (১৯০৩), পত্রাবলী (ঐ), শঙ্কুনির্মাণ (১৯০৮) বাঙ্গালাভাষা ১ম (১৯১২), ২য় (১৯১৩), ক্ষুদ্র ও বৃহৎ (১৯২০), রাণী বিশ্বেশ্বরী (১৩৩৩), শিক্ষাপ্রকাশ (১৩৫৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার (১৩৫৭), বিজ্ঞান কালিকা, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা শব্দকোষ, পূজাপার্বণ (১৩৩৮), A Primer of Physiography (১৮৯৯), Practical chemistry for beginner (১৯১০), The First point of Aswini (১৯৩৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ—সিদ্ধান্তদর্পণ (১৮৯৯), চণ্ডীদাসচরিত (১৩৪৪)।

যোগেশচন্দ্র সিংহ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৭ খৃঃ। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পাঁচথুপী গ্রাম। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ। গ্রন্থ—কালের স্রোত (দার্শনিক গ্রন্থ—১৩১৮, ১৫ই আষাঢ়), হিন্দু আইন (১২৯৮, ১লা বৈশাখ), মুসলমান আইন (ঐ)।

রওসন আলি—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—কোহিনূর (মাসিক, কুমারখালি, ১৩০৫)।

রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। পিতা—রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ইঁহার টীকাগুলি 'রঘুদেবী' নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থ—গূঢ়ার্থতত্ত্বদীপিকা (চিন্তামণির ভাষ্য), বৈশেষিক সূত্রের ব্যাখ্যা, নানার্থবাদ আখ্যাতবাদ দীধিতির টিপ্পনী, হেতুখণ্ডন, ধর্মতাবচ্ছেদক, প্রত্যয়াসত্তিনিরূপণ, ঈশ্বরবাদ, সামগ্রীবাদ, নিরুক্তি-প্রকাশ, বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য বোধবিচার, অনুমিতি পরামর্শবাদ বিচার।

রঘুনন্দন গোস্বামী—বৈষ্ণব কবি। জন্ম—১১৯৩ বঙ্গ বর্ধমানের অন্তর্গত মাড়োগ্রামে। পিতা—কিশোরীলাল গোস্বামী (নিত্যানন্দ-বংশ)। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীরাধামাধবোদয় (১২৯৭), শ্রীরামরসায়ন (১৩০৮), গীতমালা (১৩০৯), ভাগবত-সিদ্ধান্ত।

রঘুনন্দন গোস্বামী—গ্রন্থকার। জন্ম—খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। গ্রন্থ—শক্তিসঙ্কয়।

রঘুনন্দন দাস—ভক্ত বৈষ্ণব কবি। জন্ম—১৪১৯ শকাব্দে সপ্তগ্রামে। মৃত্যু—১৫০৪ শকাব্দে বৃন্দাবনে। পিতা—গোবর্ধন দাস। গৌড়াধিপতি সৈয়দ হুসেনশাহের কর-সংগ্রাহক। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট উপদেশ লাভ করিয়া ইনি সংসারে নির্লিপ্ত থাকেন ও পরে বৃন্দাবনে বাস করেন। গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্য-স্তবকল্পবৃক্ষ, গুণলেশশেখর, মনঃশিক্ষা।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য—স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম—১৬শ শতাব্দী (আনু) ১৫০৭ খৃঃ নবদ্বীপে। পিতা—হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য। স্মৃতিশাস্ত্রের অসাধারণ পণ্ডিত। মুসলমান শাসনাধীনে হিন্দু সমাজের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে সমাজের শৃঙ্খলার জন্য স্মৃতির অনুশাসন দেন। গ্রন্থ—নব্যস্মৃতি, জ্যোতিস্তত্ত্ব (১৫৬৭), অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব, রাসযাত্রা-পদ্ধতি, সংকল্প-চন্দ্রিকা, ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব, দ্বাদশচন্দ্র প্রমাণতত্ত্ব, হরিস্মৃতি-সুধাকর।

রঘুনাথ চক্রবর্তী—টীকাকার। জন্ম—ফরিদপুরের সামন্তসার গ্রামে। গ্রন্থ—অমরকোষের টীকা।

রঘুনাথ মাইতি—দেশকর্মী ও গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার মাণিকজোড় গ্রামে। পিতা—রামচন্দ্র মাইতি। কাব্যতীর্থ, বিদ্যাশাস্ত্রী উপাধি লাভ। কর্ম—কবিরাজ। গ্রন্থ—হোমশিখা (১৩৪৩), গান্ধীকথা (১৩৪৫), গান্ধীজীর স্বদেশ (১৩৫১)।

রঘুনাথ শিরোমণি—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ সমকালে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। পূর্ব নিবাস শ্রীহট্টে। নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন ও শ্রীচৈতন্যদেবের সহপাঠী। ন্যায়শাস্ত্রে উপাধির জন্য মিথিলায় গমন ও শিরোমণি উপাধি লাভ। নবদ্বীপ হইতে ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি দানের অধিকার ইনিই সর্বপ্রথম প্রাপ্ত হন। গ্রন্থ—চিন্তামণি-দীধিতি (নব্যন্যায়), পদার্থ খণ্ডন, আত্মতত্ত্ব-বিবেক, গুণকিরণাবলী, (টীকা), প্রকাশ (ঐ), লীলাবতী টীকা, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, নঞর্থবাদ, প্রামাণ্যবাদ, নানার্থবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ, আখ্যাতবাদ, মলিম্লুচবিবেক।

রঘুনাথ শুকুল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মেঘদূত (১৮৯৭), বর্ষচক্র (কবিতা, ১৩০৩)।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৮২৭ খৃঃ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার কালনার নিকট বাকুলিয়া গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৮৮৭ খৃঃ ১৩ই মে! পিতা—রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা—হরসুন্দরী দেবী। নিবাস—রামেশ্বরপুর। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় মাতুলগৃহে বাস। শিক্ষা—বাকুলিয়া পাঠশালার মিশনারী স্কুল, মহম্মদ মহসিন কলেজ—(—১৮৪৩)। কর্ম—অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৬০), ইন্‌কাম ট্যাক্স এসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর (১৮৬০), ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর (১৮৬৪—১৮৮২)। তরুণ বয়সে বহু কবিতা ও ইংরেজি রচনা বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশ। প্রতিষ্ঠাতা—উৎকল-দর্পণ (উড়িষ্যা—ওড়িয়া সংবাদপত্র)। ইঁহার স্বাদেশিকতা কাব্যের মধ্যেই উন্মেষিত হয়। ইঁহার কবিতার এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে ইহা বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। গ্রন্থ—ঋতুসংহার (পদ্যানুবাদ, ১৮৫১), বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (১২৫৯), ভেক-মূষিকের যুদ্ধ (১৮৫৮), পদ্মিনী উপাখ্যান (১২৬৫), শরীর-সাধনীবিদ্যার গুণকীর্তন (১৮৬০), কর্মদেবী (১৮৬২), শূরসুন্দরী (১৮৬৮), ইউরোপ ও এশিয়া খণ্ডস্থ প্রবাদমালা (১৮৬৯), কুমারসম্ভব (১২৭১), কবিকঙ্কণচণ্ডী (১২৮২), কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)। সম্পাদক—সংবাদ-সাগর (প্রথমে সংবাদ রসসাগর—১৮৫২, এপ্রিল পরিবর্তিত হয়); এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ ১৮৬০-১৮৬২)।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—কবি ও সাহিত্যসেবী। জন্ম—১২৫০ বঙ্গ ১৪ই আষাঢ় ২৪ পরগনার রাহুতা গ্রামে। মৃত্যু—? পিতা—বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। মাতা—ভবসুন্দরী। শিক্ষা—রাহুতাগ্রাম ও পুরুলিয়ায়। কর্ম—শিক্ষক, বলুটিগ্রাম ইংরেজি-বাঙ্গালা বিদ্যালয়, চন্দননগর স্কুল, কলিকাতা ট্যাকশাল, প্রধান শিক্ষক, ভাড়কা স্কুল। কাব্যরত্নাকর উপাধি লাভ। গ্রন্থ—শরৎশশী, বৈরাগ্যবিপিনবিহার, হরিদাস সাধু, বিজ্ঞানদর্শক, চিত্তচৈতন্যোদয় (১২৭৪), সঙ্গীত উপদেশ (১৮৭৪)। সম্পাদক—বিশ্বকোষ (১ম ও ২য় ভাগ)।

রঙ্গিলনারায়ণ কুমার—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—কোচবিহার মাসিকপত্র (কুচবিহার, ১২৮৪)।

রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—অরুন্ধতী (বরাহনগর, মাসিক, ১৩০২)।

রজনীকান্ত গুপ্ত—ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫৬ বঙ্গ ২১এ ভাদ্র ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ সবডিভিশনের মওগ্রামে (মাতুলালয়ে)। পৈতৃক নিবাস—ঢাকা জেলায় তেওতা গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৭ বঙ্গ ৩০এ জ্যৈষ্ঠ। পিতা—কমলাকান্ত গুপ্ত। ছাত্রজীবনে কবিতা রচনা। সাহিত্য-সাধনা ইঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। গ্রন্থ—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ৫ ভাগ (১১১০-১১), আর্যকীর্তি (১৩১১), ভারত প্রসঙ্গ, নবভারত, কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের জীবনচরিত, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়, আমাদের জাতীয় ভাব, জয়দেবচরিত, প্রতিভা, ভারতকাহিনী (১১২৩), বীরমহিমা, নবচরিত, পাণিনিবিচার। সম্পাদক—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, ১৩০১-৩)।

রজনীকান্ত গুহ—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭৩ (আনু) বঙ্গ। মৃত্যু—১৩৫২ বঙ্গ ২৭এ অগ্রহায়ণ। এম. এ। অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যক্ষ, সিটি কলেজ। গ্রীক, লাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। গ্রন্থ—মেগাস্থিনিসের ভারতবিবরণ, মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা, সক্রেটিশ (মূল গ্রীক হইতে—প্রামাণ্যগ্রন্থ)।

রজনীকান্ত ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভূগোলবিদ্যাসার (১৮৭১), ভারতকুটীর (১২২৩ সংবত)।

রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভারতে উষা (১২১১)।

রজনীকান্ত রায় দস্তিদার—গ্রন্থকার। জন্ম—শিবসাগর, আসাম। এম. এ। গ্রন্থ—মাংসভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যৎকিঞ্চিৎ, স্বাস্থ্য, সুখ ও চিরযৌবনলাভের উপায়, কোষ্ঠবদ্ধতা ও প্রতীকার।

রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—চিকিৎসা-দর্শন (নদীয়া মোল্লাবেনিয়া, মাসিক, ১২৯৪), জগদ্ধাত্রী (মাসিক, ১৩০০)।

রজনীকান্ত সেন—কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম—১২৭২ বঙ্গ ১২ই শ্রাবণ পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৭ বঙ্গ ২৮এ ভাদ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ কটেজ ইয়ার্ডে। পিতা—গুরুপ্রসাদ সেন। মাতা—মনোমোহিনী দেবী। শিক্ষা—রাজসাহী জেলা স্কুল, এফ. এ (রাজসাহী কলেজ, ১৮৮৫), বি. এ (সিটি কলেজ, ১৮৮৯), বি. এল (বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ১৮৯১)। কর্ম—আইন ব্যবসায়, রাজসাহী, মুন্সেফ। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত সাধনা ও রচনা। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'আশা' (আশালতা, মাসিক, ১২৯৭)। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইনি 'কান্ত কবি' নামে বিখ্যাত। হাসির গান রচনায় সিদ্ধহস্ত। 'দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ইনি কণ্ঠহারা হন। গ্রন্থ—বাণী (১৯০২), কল্যাণী (১৯০৫), সদ্ভাবকুসুম, অভয়া, অমৃত (শিশুপাঠ্য), বিশ্রাম (শিশুপাঠ্য), শেষদান।

রজনীনাথ দাশগুপ্ত—কবি। কাব্যগ্রন্থ—অশ্রুপ্রবাহ (১৯০৩)।

[ক্রমশঃ।

কবি-কথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

বিশ্বভারতীকে সাহায্যের আবেদন নিয়ে স্বয়ং শ্রীনেহেরু জনসাধারণের নিকট অগ্রসর হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি এখন জনসাধারণের। নিজের জিনিসকে নিজের সাহায্য করার কথা ওঠে না। কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনের কথাই আমাদের মনে করে নিতে হবে। বিশ্বভারতীর স্রষ্টা ভিতরে-ভিতরে এতদিন সে দায়িত্ব কী ভাবে পালন করে এসেছেন, কোথায় ছিল তাঁর শক্তি-কেন্দ্র, এ বিষয়ে জানা থাকলে বর্তমান দায়িত্বপালনে প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও জনসাধারণের সকলেরই পক্ষে পথ সুগম হবে।

আপন-আপন সৃষ্টিকে সকলেই ভালোবাসে। নানাভাবে সে ভালোবাসা প্রকাশ পায়। সৃষ্টির পিছনে কে কত ত্যাগ করেছেন, কে কত তার জন্য দুঃখকষ্ট অপমান স্বীকার করেছেন, অন্যেরা যখন বিমুখ, নানা দিক দিকে যখন বিরুদ্ধতা, তখনো কে তার প্রতি কত বিশ্বাসে ও অনুরাগে নিজ বক্ষের আশ্রয়ে তাকে রক্ষা করে চলেছেন, এক মনে ও অশ্রান্ত চেষ্টায় তার উন্নতি ও কল্যাণের নানা পথে তাকে প্রবর্তনা যুগিয়েছেন,—এই সব দিক বিচার করেই দায়িত্বপালনের মান নির্ণীত হয়ে থাকে। কিন্তু, সকল উদ্যমের ইতিহাস কোন্ পরম সার্থকতার লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে উন্মুখ,—ভবিতব্যের গর্ভে অপেক্ষমান সেই ধ্যান-আদর্শটির উপরেই নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের মানের তারতম্য।

রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সৃষ্টি বিশ্বভারতী। তারও গড়ে-ওঠার দিনগুলির প্রতি চোখ ফেরালে দেখা যাবে, প্রতিটি কথাই সেখানে প্রযোজ্য। কবি তাঁর সৃষ্টিকে কী ঐকান্তিক যত্নেই না গড়ে তুলেছেন! তাঁর দায়িত্বনিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর পরিচালনা-প্রণালীর গুরুত্ব সমভাবে সম্বদ্ধ। তিনি আমাদের জন্য এ বিষয়ে যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন, সেইটিই আজ আলোচ্য!

তাঁর এই সৃষ্টির যজ্ঞে আশ্রমের অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে পত্নী মৃণালিনী দেবীর অলংকারও আহুতি পড়েছিল। বিশ্বভারতীর উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক সমাবর্তন-ভাষণে সম্বন্ধে সে-কথার উল্লেখ করেছেন। সূচনাকালে আয়ের উপায় ছিল মাত্র জমিদারি থেকে পিতার ব্যবস্থায় কবির নিজের জন্য নির্দিষ্ট মাসোহারা। এর সঙ্গে চলতে থাকে নানা লোকের কাছ থেকে দানসংগ্রহের কাজ। ক্রমে গ্রন্থস্বত্ব এবং পরে নোবেল-পুরস্কারের অর্থও এসে জোটে। প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শানুযায়ী ছাত্রগণকে বিনাবেতনে আবাসিক শিক্ষা বিতরণ করতে শুরু করেছিলেন। আশ্রম থেকে তাদের খাওয়া-থাকা ইত্যাদি যাবতীয় খরচও নির্বাহিত হত। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বিবরণ-স্থলে রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখেছেন,—"রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনের 'বোর্ডিং স্কুল' পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা এই গুরুভার গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিল না।...সুতরাং যথেষ্ট ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে এই কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার এই অদ্ভুত খেয়ালের কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইলেন না, সকলেই বিরূপ।...প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণে বিদ্যাদান করিয়া অর্থ লইত না, অপ্রতিগ্রহ ছিল তাহার আদর্শ। শান্তিনিকেতনে সেইরূপ করিবার চেষ্টা হইল, অর্থাৎ ছাত্রদের নিকট হইতে টাকা লওয়া হইবে না। কিন্তু অধ্যাপকদের টাকা যোগাইতে হইল রবীন্দ্রনাথকে।"—(রবীন্দ্র-জীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃ ২৮-২৯)

এর পরে যখন থেকে ছাত্রবেতন ধার্য হয়, তখনও কাজের প্রসারের আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে চলে এবং সে সঙ্গে অর্থকষ্টের তীব্রতাও লেগে থাকে বরাবর সেই পরিমাণেই। অর্থসংগ্রহের কাজটা শ্রমসাধ্য তো নিশ্চয়ই, মানসিক উদ্বেগের চাপে অশান্তিকর আরো বেশি। শান্তি-অশান্তি সবই কবি সঁপে দিয়ে রেখেছিলেন তাঁর আশ্রমের পায়ে।

কবি লিখেছেন,—"অল্প অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকষ্টে আর্থিক দুরবস্থা ও দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে যেভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রক্ষিত হয়নি। কঠিন চেষ্টার দ্বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ গভীর সত্য ছিল এই দৈন্যদশার অন্তরালে। যাক, এ আলোচনা বৃথা। কর্মের যে ফল তা বাইরের বিধানে দেখানো যায় না, প্রাণশক্তির যে রসসঞ্চার তা গোপন গূঢ়, তা ডেকে দেখাবার জিনিস নয়। সেই গভীর কাজ সকলপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও এখানে চলেছিল।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১২৬-২৭) এ হল কাজের বাইরের দিকের কথা। বাইরের দিক দিয়ে আরো কতকগুলি বাধাবন্ধও ছিল।

মরুপ্রান্তরসদৃশ প্রাকৃতিক পরিবেশ। তার রুক্ষতা ও অনুর্বরতা ছিল শিশুদের প্রাণস্ফূর্তির ও সাধারণভাবে সকলেরই জীবনধারা বিকাশের প্রবল অন্তরায়। বন্ধুরতা দূর ক'রে জমিকে সমতলও করতে হয়েছে অনেক স্থলে। তাকে তৃণে লতায় পত্রে পুষ্পে আচ্ছাদিত সুশোভিত ক'রে তুলতে কেটেছে কত কাল। মানুষের বাসযোগ্য ক'রেই কাজ শেষ হয়নি, ক্ষয়িষ্ণু পোড়ো জমিকে পথে-ঘাটে পল্লীতে-প্রাঙ্গণে-ভবনে তোরণে কুঞ্জে-বীথিতে সুগম ও নয়নাভিরাম করা হয়েছে; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় যখন তৃষ্ণায় হানছে, তখন এই প্রান্তরে একখানি হাতপাখার আশ্রয়ে থেকে কবি ঠেকিয়েছেন দুপুরের হল্‌কা, তারপরে মিলেছে সুযোগ; যখন পেয়েছেন—"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা শ্যামগম্ভীর সরসা।" বাইরের সজলতার অভাবের মধ্যে কবি খুলেছেন প্রাণসত্রের বিচিত্র আয়োজন। নিজের প্রাণপ্রবাহের অনেকখানি ঢালতে হয়েছে এর পথে-পথে। তবেই না এখানে এমন দিকে-দিকে 'মরুবিজয়ের কেতন' শূন্যে শূন্যে উড়তে পেরেছে! তা, যেমন উড়েছে মাটির প্রকৃতিতে, তেমনি মানুষের প্রকৃতিতেও। শান্তিনিকেতনের দিকে চাইলে প্রথমেই দেখতে পাওয়া যাবে সবটাতে মিশিয়ে রয়েছে মানুষের এই বাণী:—"বাধা নাহি মানি।"—('বাণী',—বীথিকা)

বিচিত্র সৃষ্টির কাজ উপলক্ষ্য করে কবি যে মানুষকে মেলাতে চেয়েছিলেন পরম ঐক্যে, তাতেও বাধা ছিল নানাদিকে। কতবার সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় উঠেছে চারদিককার মানবসমাজকে মথিত ক'রে,—কবি শান্তিনিকেতনকে কোনো দিকে হেলে পড়তে দেননি। অথচ, যেখানে দুঃখ, যেখানে নির্যাতন,—অন্তর্গূঢ় বেদনার ধারা নিরুদ্ধ হয়ে ছুটেছে সেইদিকে। দেশের আর্তত্রাণের সঙ্গে বিদেশের দুর্গতসাহায্যেও শান্তিনিকেতনের হিতব্রতের আয়োজন দেখা দিয়েছে নানাসময়ে। রাশিয়াকে

একদিন কবি এরূপ সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন। সেদিন আবহাওয়া ছিল নিরুদ্ধ। আন্তর্জাতিকতার মান তার মধ্যেও তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন বিদেশের বেলায়ও। তাতে অপ্রিয়তার সম্মুখীন হতে হয়েছে বারংবার। তখনো কোনো সম্মান, সৌহার্দ্য বা কোনো সাহায্যপ্রত্যাশা—কোনো কিছুতেই তাঁর সত্যঘোষণায় বাধা জন্মাতে পারেনি। ইটালি থেকে যে-সাহায্য অভাবিতভাবে সুলভ হয়ে উঠেছিল, মুসোলিনীর এক-কর্তৃত্ববাদের প্রতিবাদ না করলে, হয়তো অত আকস্মিক তা হারাতে হত না। তা ছাড়াও আরো দৃষ্টান্ত আছে। ইংরেজের রাজত্বে থেকে ইংরেজের দেওয়া রাজকীয় 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করা কিংবা শেষদিকে পাশ্চাত্যের 'সভ্যতার সংকট' ঘোষণা করা বিষয়বুদ্ধির দিক দিয়ে বিদেশে তো লাভজনক ছিল না মোটেই, দেশেও শান্তিনিকেতনের নিরাপত্তা তাতে বিঘ্নিত হবারই কথা ছিল প্রতিকূল সরকারী প্রতিবন্ধতায়। কিন্তু তবু কবি তাঁর বাণী-উচ্চারণে নিরস্ত হননি। এই কার্যরীতির দ্বারা একভাগ যদি তিনি বিত্তভাণ্ডারের ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে থাকেন, তার শতগুণ লাভের শক্তি জমা রেখে গেছেন শান্তিনিকেতনের চিত্তভাণ্ডারে। সে শক্তি সত্য বলার শক্তি; এই শক্তি সেখানকারই সম্পদ—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির"…।

সমস্ত ব্যক্তিত্ব, সমস্ত কর্ম ও ভাবনা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন কবি আশ্রম-আদর্শের প্রদীপটিকে বিরুদ্ধ সব বাত্যাঘাত থেকে। সরকারী-নীতির পোষকতা করলে লাভের সে-ও একটি বড়ো সম্ভাবনাই ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই নজির অন্যরূপ। বিত্তালয়ের ভার ন্যস্ত হল বিখ্যাত স্বাদেশিক 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের হাতে।

কবি লিখেছেন, "তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল,… পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক…। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু-কিছু সওদা করে অসাধ্য সাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয়নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি তখনও রাজনীতিক্ষেত্রে নামেননি। তাঁর কাছে আমার এই সংকল্প খুব ভালো লাগল, তিনি এখানে এলেন।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ২৬-২৭)

বিত্তালয় নিয়ে কবি যখন 'বিশেষ ব্যস্ত', সে সময় তিনি একবার সাক্ষীর সপিনা পান। যেতে হয় খুলনায় আদালতে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি একজন স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীর সংশ্রবে। রাজরোষে সেই কর্মীটির জীবিকার পথ,—জাতীয় বিত্তালয়ের কাজ,—বন্ধ হয়। কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক করে নেন। সে বিষয়েও যখন সরকারী বাধা প্রবল হল, তখন তাঁকে নিজের জমিদারির কাজে নিয়ে শিলাইদহে নিযুক্ত করেন। অসহায় অনেক ছাত্র ও কর্মীকে এভাবে তিনি আশ্রয় ও জীবিকা দিয়ে রক্ষা করেছেন। বাংলার প্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেতার পুত্রদ্বয় এককালে এই আশ্রয় লাভ করেছেন। তা ছাড়াও, অভিভাবক অন্তরীণে আবদ্ধ পড়ে আছেন। দেখাশোনার কেউ নেই। আশ্রমের এমন দুটি অবাঙালী শিশু ছাত্রের জন্য কবির মর্মবেদনা একদা কী মর্মস্পর্শভাবেই না পত্রের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। একদিকে ছিলেন বজ্রকঠোর, একদিকে ছিলেন আবার কুসুমকোমল। যারা একবার তাঁর সান্নিধ্যে এসে পড়েছে, তাদের জন্য তাঁর স্নেহ ছিল সুগভীর। তারা যত অসুবিধেরই সৃষ্টি করুক, পারৎপক্ষে তিনি তাদের দূরে সরাতেন না। ভাষণে রয়েছে—"মনে পড়ে, যে সব বালক দুরন্তপনায় দুঃখ দিয়েছে .তাদের বিদায় দিই নি, বা অন্যভাবে পীড়া দিই নি। যতদিন আমার নিজের হাতে এর ভার ছিল ততদিন বারবার তাদের ক্ষমা করেছি; অধ্যাপকদের ক্ষমা করেছি। সেই সকল ছাত্র পরে কৃতিত্ব-লাভ করেছে।

তখন বাহ্যিক ফল-লাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা ক'রে দেবার ব্যস্ততা ছিল না, সকল ছাত্রকে আপন করবার চেষ্টা করেছি। তখন বিত্তালয় বিশ্ববিত্তালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নির্লিপ্ত ছিল। তখনকার ছাত্রদের মনে এই অনুষ্ঠানের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১২৫)

কবির আশ্রয়স্থল ছিল তাঁর সাধনার সত্য। সত্যের নির্দেশ অপেক্ষা করে থাকতেন তিনি যুক্তিবোধ ও অভিজ্ঞতার কাছ থেকে। শান্তিনিকেতনকেও প্রতিষ্ঠিত করে এসেছিলেন সেই আত্মবলের ভিত্তিতেই।

জনসাধারণের যোগও তিনি চেয়েছেন, তবে সে যোগের পথ সাধারণ স্বাদেশিকতার আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র রকমের। সেটুকু বুঝে নিলে সকলেরই মন শান্তিনিকেতনের প্রতি সহজে অনুরক্ত হতে পারে, কবির জীবদ্দশাতে তাই হয়ে উঠেছিল। তিনি তা শেষ-জীবনে লক্ষ্য করে এক ভাষণে বলেছেন: "আমরা জনসাধারণকে আপন সংকল্পের অন্তর্গত করতে পেরেছি—এই প্রতিষ্ঠান তার অভিমুখে চলেছে। অল্প পরিমাণে এক জায়গাতেই আমরা ভারতের সমস্যার সমাধান করব। রাজনীতির ঔদ্ধত্যে নয়, সহজভাবে দেশবাসীদের আত্মীয়রূপে বরণ করে তাদের নিয়ে এখানে কাজ করব। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী হতে না পারি, তাদের সঙ্গে চিত্তের আদানপ্রদান হবে, তাদের সেবায় নিযুক্ত হব। তারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১৩০)

অথচ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বৈদেশিক বৃটিশ প্রভুত্বের বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়ে যেমন সরকারী সহযোগের সৌভাগ্য বর্জনে দ্বিধা করেননি, তেমনি তাঁর যুক্তি ও অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ ভিন্ন পথের স্বাদেশিকতাকেও তিনি অবলম্বন করেননি কোনো সুবিধে বা সাহায্যপ্রত্যাশায়। বলছেন, "এক সময়ে আমার কাছে প্রশ্ন আসে, তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে কেন যোগ দিচ্ছি না। আমি বলি, সকলের মধ্যে যে উত্তেজনা আমার কাজকে তা অগ্রসর করবে না। শুধু একটি বিশেষ প্রণালীর দ্বারাই যে সত্য সাধনা হয় আমি তা মনে করি না। তাই আমি বলি যে, এই প্রশ্নের উত্তর যখন এখানে পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন একদিন তা সকলের গোচর হবে। যা আমি সত্য বলে মনে করেছি সে উত্তরের জোগান হয়তো এখান থেকেই হবে।

সেই অপেক্ষায় ছিলুম। সত্যের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই—সকল বিভাগে মনুষ্যত্বের সাধনা প্রসারিত। দল বাড়াবার সংকীর্ণ চেষ্টার মধ্যে সেই সত্যের খর্বতা হয়।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১৩০-৩১)

ইদানীং বিগত নির্বাচনের সময় জনৈক মাঝারি শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মী শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ভোটসংগ্রহে। তিনি তাঁর শ্রেণীকে ভোট দিতে বললেন। যুক্তির মধ্যে এই

কথাটাই শোনালেন যে, বিশ্বভারতীকে দাঁড়াতে হলে রাষ্ট্র-আশ্রয় চাই একান্তই। রাষ্ট্রের কর্ণধার হবে যখন তাঁদেরই দল, তখন সে দলের সাহায্য পিছনে না থাকলে কে বাঁচাবে শান্তিনিকেতনকে? কথার সুরে ঝাঁজ ছিল প্রচ্ছন্ন। অগত্যা তাঁকেও মনে করাবার দরকার হল যে, সূর্য অস্ত যায় না যার রাজত্বে এমন বৃটিশসিংহের আমল পেরিয়ে এসেছিলো শান্তিনিকেতন রাষ্ট্রসাহায্য-নিরপেক্ষরূপেই। আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের আওতায় পরাধীনতার এই মন্ত্রে যদি দীক্ষা নিতে হয় নূতন করে, তবে শান্তিনিকেতনের চেয়ে আগে আশঙ্কার কারণ ঘটবে স্বাধীন রাষ্ট্রের নিজেরি। শান্তিনিকেতন সরকারী আশ্রয়ে গিয়ে রক্ষা পেয়েছে, এই ধারণার প্রশ্রয় মারাত্মক। হয়তো, সেই দুর্দৈব থেকে রক্ষা করতেই রাষ্ট্রপ্রধান শ্রীনেহেরু সাহায্যের সর্বজনীন আবেদনপত্র বারবার এমন সর্বসাধারণের উদ্দেশে প্রচার করছেন, রাষ্ট্র-সাহায্যকে প্রাধান্য না দিয়ে। গুরুদেবের সাধনার সত্য এবং তাঁর আজীবন সাধনানিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন মহাত্মাজি। জাতির পক্ষ থেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির গুরু দায়িত্ব বহন করবার অবশ্যকর্তব্যতা তিনি মুহূর্তমাত্র বিস্মরিত হননি। তাঁর উত্তরাধিকারী শ্রীনেহেরুকে তিনি এই দায়িত্বই ন্যস্ত করে গেছেন চলে যাবার আগে। টেনেবুনে কায়ক্লেশে যেমন করেই দিন চলে থাকুক, রবীন্দ্রনাথের কাজই রবীন্দ্রনাথের কাজকে সচল রাখবে, এই দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেছে দেশের রাষ্ট্র-দপ্তরে। আচার্য নেহেরুর আবেদনেও দেখা যায়, বিশ্বমানবের যোগযুক্ত বহুমুখী কাজের কথাই স্থান পেয়েছে তার মুখ্য যুক্তি হয়ে। শান্তিনিকেতনের আদর্শে ও কাজে শ্রদ্ধানিবেদনের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এই সাহায্য দান বা জাতীয় কর্তব্য উদ্‌যাপন করা। সকলের সঙ্গে রাষ্ট্রও তার সাহায্যহস্ত প্রসারিত ক'রে সেই মহৎ ব্রতেরই সুযোগ পাবে মাত্র। যখন যে এই শ্রদ্ধা থেকে শান্তিনিকেতনের সহযোগে যুক্ত হতে এসেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই নিয়ে গেছেন পূজাপ্রাঙ্গণে। কারো দয়াদাক্ষিণ্য বা অনুগ্রহের দানে বেদির মর্যাদা লাঘব হতে দেননি। তিনি বলেছেন,—"শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ যেমন, তেমনি শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে।"—(বিশ্বভারতী পৃঃ ১৫৩) তবে একথাও সত্য, তিনি কাউকে তুচ্ছ করেননি। সকলের কাছেই তিনি গেছেন তাঁর সত্যের বাণী নিয়ে। সাধনার অধিকারে সকলের যোগকে তাঁর দিক থেকে তিনি সহজ করতেই চেষ্টা করেছেন। যারা অন্য বিষয়-রাজ্যের লোক, তাদেরও শ্রদ্ধা উদ্রেক করবার জন্য এবং সাহায্য আকর্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁর যে কৃচ্ছ্রতাবরণ, সে সব ঘটনা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর মমত্ব পরীক্ষার নিদর্শন হয়ে আছে।

বাইরের দিকে প্রধানত তিনি নির্ভর করেছিলেন বেশি শান্তিনিকেতনের কাজের উপর এবং সে সঙ্গে সেখানকার মানুষের উপরেও। সেইজন্যই মানুষ সংগ্রহ করে তাদের কাজে লাগিয়ে গেছেন। আবার কাজ এবং মানুষের মধ্যে যোগসূত্ররূপে স্থাপিত রেখেছিলেন কেবল প্রেরণামূলক বাণীকেই নয়, কর্মপদ্ধতিকেও নয়, তার সঙ্গে বড় করে দেখেছিলেন মানুষের ব্যক্তিগত সম্বন্ধকেও। সেই সম্বন্ধ যাতে গড়ে ওঠে, এজন্য বিদ্যালয়কে ছোটর-বড়োর মিলে একসঙ্গে থাকার ঘরোয়া রূপ দিয়েছিলেন; কারখানা বা অফিস-আদালতের শ্রেণীবাছাইকরা কামরায় বিভক্ত পোশাকী রূপ দেননি। গুরুপল্লী-শ্রীপল্লীতে অধ্যক্ষ এবং কেরাণী একরকমের বাসাবাড়িতেই পাশাপাশি বাস করেছেন। ছাত্রদের নিয়ে বনভোজন তো ছিলই, মাঝে মাঝে এক এক বাসায় এক এক বর্গকে খাওয়ানোর ব্যবস্থাও হত। এতে ঘরের ছেলের মতো করে শিক্ষকেরা ছাত্রদের দেখতে পেয়েছেন; ছাত্ররাও শিশুসুলভ নানা উপদ্রব করতে করতে শিক্ষকদের আপন বাড়ির লোকের মতোই অনুভব করেছে। সান্ধ্যবিনোদনে-গল্পে গুজবে, গানে-অভিনয়ে অলক্ষ্যে যে সূত্র গড়ে উঠত, সেটি ছাত্রেরা আরো বেশি স্পষ্ট ক'রে নিবিড় ক'রে বুঝতে পেত বাইরে গিয়ে। এক-একজন অধ্যাপক গভীরভাবে ছাত্রদের মন আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী সার্থক হয়ে উঠেছে তাঁদের জীবনের দানে। জীবনে জীবনে বৃহত্তর শান্তিনিকেতনের বীজ বপন করে দিয়েছেন তাঁরাই। ছেলেরা গেয়েছে—

> "আমরা যতই মরি ঘুরে
> সে যে যায় না কভু দূরে,
> মোদের প্রাণের মাঝে প্রেমের সেতার
> বাঁধা যে তার সুরে।"

শান্তিনিকেতনের এই গানের মধ্যে ধরিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের রক্ষামন্ত্র। গুরুদেবের এই মন্ত্র অধ্যাপকেরা আবার ছাত্রদের জীবনের রক্ষাকবচে ভ'রে দিয়েছেন। সময়-সময় প্রাক্তন ছাত্রদের এক একখানি চিঠিতে নিগূঢ় এই ইতিহাসটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। কোনো প্রাচীন অধ্যাপককে জনৈক ছাত্র বিলেত থেকে লিখছেন;

11 George Square.
Edinburgh,
6/8/14.

শ্রীচরণেষু

মাষ্টার মহাশয়

অনেক দিন মনে করিয়াছি আপনাকে চিঠি লিখিব কিন্তু আজ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠে নাই, কেন হয় নাই তার ঠিক উত্তরও দিতে পারি না। আপনি হয়ত ভাবিয়াছেন আমি আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু আপনি জানেন না যে আপনার কথা প্রায়ই আমার মনে হয়। আশ্রমের ভিতর কেবল আপনার কথাই আমার বেশি মনে পড়ে। কবে আপনাকে কি যন্ত্রণা দিয়াছি কবে আপনি কি কথা বলিয়াছেন সব মনে পড়ে। যদিও আপনার বহুমূল্য উপদেশ সকল আমার কাছে প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে তথাপি আপনার উপদেশ এখনো আমার মনের ভিতর আছে। আপনার সে সব কথা আমার মনে আছে। কোন দিন নিশ্চয়ই সাধিত হইবে। আপনার এ ঋণ শোধ দেবার মত নয় এবং কোন দিনও শোধ দিতে পারিব না। যখন অনেকেই আমার আশা ছাড়িয়া আমার বিপক্ষে ছিলেন তখন কেবল আপনি আমাকে স্নেহের সহিত কথা বলিয়াছেন, ডাকিয়া কাছে নিয়াছেন, গান শুনিয়াছেন, গায়ে হাত বুলাইয়াছেন। সে সকল কথা ভাবিলে চোখে এখনো জল আসে। যেথানে অন্য সকলে বকেন, গালি দেন এবং ভয় প্রদর্শন করেন সেখানে আপনি স্নেহ দেখান কাছে ডাকেন শান্তভাবে বুঝাইয়া দেন দোষ কোথায় এবং ইহা হইতে মুক্তি পাইবার

কি উপায়। ঐ যে বুঝাইয়া দেন তাহাতে সহস্র বেত হইতে বেশি শিক্ষা হয়, সেখানে আপনি চোখে জল দেখা দেয়। যদিও আমরা আপনার স্নেহের যোগ্য ছিলাম না যদিও আমরা আপনাকে মানিতে চাহিতাম না—আপনাকে কষ্ট দিতাম, তথাপি আপনি আমাদের স্নেহ করিতেন। আপনি জানিতেন 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো' এবং আপনি ইহা আমাদের অনেক বার বলিয়াছেন। আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন যে আমি গত মার্চ মাসে এখানকার Matric পাশ করিয়াছি। আমার এই সফলতার দিনে আপনাকে মনে পড়িয়াছে।

আমরা এখানে বেশ ভালই আছি। চণ্ডীদার সঙ্গে দেখা হইয়াছে সে Glasgowতে থাকে সেও বেশ আছে। আপনার মঙ্গল সংবাদ সহ পত্রের প্রত্যাশা করি। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি।

সেবক
সু······

কবি নিজের ছেলেদেরও রেখে দিয়েছিলেন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে। একত্র খেলে বেড়িয়ে একরকম খাওয়াদাওয়ার মধ্যে একই বাসস্থানে একই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে থেকে এঁরা অন্যান্য ছাত্রদেরই মতো দিনাতিপাত করেছেন। এজন্য তাঁকে একদা দুর্দৈবের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তিনি তা গায় মাখেননি। বরং তিনি লিখেছেন,—"উঁচুদরের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় খুলি নাই।···এমন জায়গায় সুখী লোকের ছেলের স্থান নাই।···রথীও এখানকার মোটা রুটি খাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে।···মেয়ে ইস্কুলে মীরাও সকলের সঙ্গে একত্র খায় থাকে। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাহিরের লোকের কোনো পার্থক্য রাখি নাই।"—(স্মৃতি পৃঃ ৭৮। পত্র ৪ঠা ভাদ্র ১৩১৬) অধ্যাপকদের প্রতি কবির কতখানি নির্ভর ছিল এবং অধ্যাপকেরাও কবির সন্তানদের কী স্নেহে দেখেছেন ও তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন, কবির কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় শমীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র থেকে তা জানা যায়। পত্রগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। জনৈক অধ্যাপককে সে একখানিতে লিখছে :

ওঁ

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
২১এ আশ্বিন ১৩১৪
মঙ্গলবার।

শ্রীচরণেষু,

মাষ্টার মহাশয়,

সব ছেলেরাই চলে গেছে—কেবল আমি আর প···দাদা আছি। আমি উপরে বাবার ঘরে শুই এবং পড়াশোনা করি। খাতা বই প্রভৃতিও এইখানেই থাকে। পটলদা, নীচের ঘরে থাকে। তারও বই প্রভৃতি ঐখানেই থাকে। শ্যামদা, মন্মথ প্রভৃতি মালদহের ছেলেরা ছিল—কাল তারা চলে গেছে।···

পর্শু আমরা চণ্ডীদাসের ভিটা দেখতে গিয়েছিলাম সেটা এখান থেকে ১২ মাইল দূরে। ৩টা গরুর গাড়ী এসেছিল।

ভূপেন বাবু, জগদানন্দ বাবু, তারিণী বাবু, শাস্ত্রী মহাশয়, ভূপেন বাবুর একজন বন্ধু, পূর্ণ বাবু, শ্যামদা, মন্মথ, পটলদা, হিমাংশু, ভবানীদা, আমি তাতে চড়ে ৫।৬ মাইল একটু রৌদ্র পড়লে হেঁটে আরও ৫।৬ মাইল গিয়ে নান্নুর গ্রামে পৌঁছলাম। নান্নুরেই চণ্ডীদাসের ভিটে। গ্রামটি মন্দিরে পূর্ণ। এক জায়গাতেই প্রায় ১৪।১৫টি মন্দির রয়েছে। সেই মন্দিরগুলোর পাশে একটা একতলা সমান ঢিপি। তাতে অনেক ইট প্রভৃতি পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হয়, বহুকাল পূর্ব্বে এখানে কোন বাড়ী ছিল। লোকে বলে সেইখানে বিশুলা দেবীর মন্দির ছিল আর সেইখানটাকেই চণ্ডীদাসের ভিটা বলে। চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছাতনা। কিন্তু তিনি ভ্রমণ করতে করতে এই গ্রামে এসে নির্জ্জন দেখে বিশুলা দেবীর মন্দিরে অবস্থান করেন। বিশুলা দেবীর মন্দির এখন সেই ভিটার পাশেই। সেই গ্রামটি বেশ নির্জ্জন। যখন সেখান থেকে বাড়ী ফিরি, তখন রাত্রি সাড়ে তিনটা। সেখানে কিছু মুড়ি কিনিয়া খাইয়াছিলাম।

কাল ভোরে জগদানন্দ বাবুর সঙ্গে আমি আর পটলদা বাহাদুরওয়া যাব। আপনি কেমন আছেন? ভোলা কেমন আছে? জ্যাঠামহাশয়, জ্যাঠাইমা প্রভৃতি কেমন আছেন? আমরা সকলে ভাল আছি। ইতি

প্রঃ শ্রীশমীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ মামাকে চিঠি লেখা হয়নি। ২।১ দিনের মধ্যে লিখব। তাঁদের ঠিকানাটা লিখে পাঠাবেন। আপনি কি সমস্ত ছুটি ওখানে থাকবেন? ইতি

প্রঃ শমীন্দ্র

এই পত্রের মধ্যে শমীন্দ্রনাথ তাঁর একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেটি বাবার কাছে না লিখে লিখেছেন অধ্যাপকের কাছে। অধ্যাপক কবির গোচরে তা নিবেদন করেন। কবি তখন পুত্রকে অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দেন মুঙ্গেরে; সেখানে শমীন্দ্রের বন্ধু ছিল, তারই একজন সঙ্গী। বন্ধুর কাছে কিছুদিন ছুটিটা বাইরে কাটিয়ে আসা হবে, তাতে শরীর মন সব দিক থেকেই ভালো হবার কথা। এই বন্ধু-ছেলেটি ছিল গুরুদেবেরই পরম বন্ধু শ্রীশ মজুমদার মহাশয়ের ছেলে। সুতরাং তাদের বাসা একরূপ আপন গৃহ বললেই হয়, নির্ভাবনার বিষয়ই ছিল। নিয়তির চক্র,—সেই যাত্রাই কাল হল, জগদানন্দ বাবু সেখানে সুস্থ রেখে এলেন, কিন্তু দুদিন বাদেই (মাত্র ১২ বৎসর বয়সে) আকস্মিক কলেরার আক্রমণে শমীন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করলেন। শমীন্দ্রকে মুঙ্গেরে পাঠাবার প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপকের নিকট কবি যে পত্রখানি লিখেছিলেন, তা এই:

ওঁ পোষ্টমার্ক ১৪ অক্টোবর ১৯০৭

কল্যাণীয়েষু

শমীকে মুঙ্গেরে পাঠানই স্থির করিয়াছি। তোমার আসিবার দেরি আছে এইজন্য জগদানন্দ তাহাকে পৌঁছাইয়া রাখিয়া আসিবে। পরে তুমি যদি ইচ্ছা কর ও অবকাশ পাও ত মুঙ্গেরে যাইতে পার। ইতি সোমবার

(স্বা:) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পু: আগামী কল্য আমি বোলপুরে যাইব।

স্বাধীন স্ফূর্তির আবহাওয়ায় অধ্যাপকদের কবি গড়ে নিয়েছেন, উদ্বোধিত করেছেন কী ভাবে, তার পরিচয় জানতে হলে একএকটি কর্ম বিভাগের ইতিহাস জানতে হয়। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের কাজের পথ প্রশস্ত হল বিদ্যাভবনে; কবি লিখছেন, "পরম সুহৃদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তার সাধন করা দরকার।...এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান;...তারপর নানা বাধায় তিনি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তাঁর ইচ্ছাসাধন এখানেই হবে, এই স্থানই তাঁর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনি ভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।"—(বিশ্বভারতী পৃ: ২২-২৩)

এ ছাড়া আরো যে সব অধ্যাপক আশ্রমে এসে মিলেছিলেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই পেয়েছিলেন যোগ্য আসন। তাঁদের যোগ্যতর করে তুলতে কবির চেষ্টার বিরাম ছিল না। কবি বিশ্বভারতীর সূচনাকালের একটি আলেখ্য এঁকে ভাষণে বলছেন, "আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃত ভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে আছেন সিংহলের মহা-স্থবির; ক্ষিতিমোহন বাবু সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। ওদিকে এণ্ডুজের চারি দিকে ইংরেজি-সাহিত্যপিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটেছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহন বাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।"—(বিশ্বভারতী পৃ: ১৮)

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

মরিতে চাহি না আমি

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

আমারও তোমার মতো ইচ্ছা করে উচ্চে উঠি গেয়ে
বারংবার—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে;
দুরন্ত দুরাশা জাগে আমারও সমস্ত প্রাণ ছেয়ে—
আমার মনের ছোঁয়া রেখে যাই সকলের মনে।

রূপ-রস-গন্ধ-ভরা মোহিনী এ ধরণীর পানে
বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যতো বার মুখ তুলে চাই,
আরও কিছুদিন বেঁচে যতো ভালোবাসা আছে প্রাণে
নির্ভয়ে নিঃশেষ করে, মনে হয়, ভালোবেসে যাই।

বহু বাসনার অণুকণিকার বিচিত্র বিন্যাসে
তিলে তিলে গড়ে-ওঠা তিলোত্তমা সম এ জীবন;
কখনো প্রকাশ তার উচ্ছ্বাসে, কখনো দীর্ঘশ্বাসে,
বাসনার লীলাখেলা থেমে গেলে সেই তো মরণ।

ফুলে যতো মধু আছে, নারী-মনে আছে যে মাধুরী,
যে-সুধা-মদিরা ঢালে চৈত্র-রাতে কোকিলের গান,
মাটিতে যা' কিছু খাঁটি—মনে হয় সব করি চুরি,
বিদায় নেবার আগে কণ্ঠ ভরে করে যাই পান।

'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' মনোরথ ছন্নছাড়াদের,
অন্নচিন্তা চমৎকারা—উদয়াস্ত প্রাণান্ত সংগ্রাম;
ঘরে এসে দেখি যেই বাসি মুখ আপন জনের
লজ্জায় লুকায় মুখ জীবনের বাসনা উদ্দাম।

তখন কবির কণ্ঠে দার্শনিক কয়ে ওঠে কথা,
মরণেরে মনে করি জীবনের সোদর সমান;
সজোর যুক্তির জালে ঢেকে ফেলি যা কিছু ব্যর্থতা;
ধন্য ধন্য করে লোকে, আমি পাই মহা পরিত্রাণ।
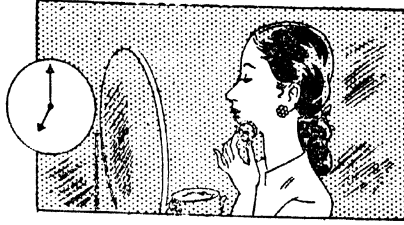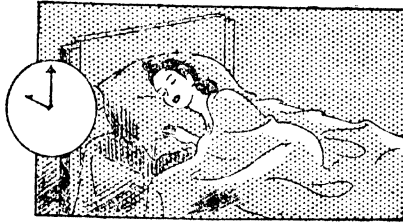
একটি চাষীর মেয়ে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

বাড়ীর লোকেরা মনে-প্রাণে চেয়েছিল ঘটনাটা চাপা পড়ে যাক, মানুষ একেবারে ভুলে যাক ঘটনাটা।

মেয়েটার ধিঙ্গিপনার নিন্দা কেউ কেউ করেছে কিছুটা। কিন্তু প্রশংসাই রটেছে বেশী। এতে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেও তারা কামনা করেছে ব্যাপারটা পুরানো হয়ে বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাক—কেউ যেন এ ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে।

তাই হয়তো যেত।

কিন্তু দিনকাল কিনা গিয়েছে বদলে। গরীব চাষীর ঘরের তুচ্ছ একটা মেয়ের বীরত্বের কাহিনী মানুষ যেন আর কিছুতেই তুচ্ছ করতে রাজী হয় না।

মাস দেড়েক পরে গোবিন্দদের কারখানায় হল ছোটখাট একটা গোলমাল। ভদ্রাভদ্র গরীবদের পক্ষের একটা কাগজ থেকে খবর জানতে এল একেলে একজন কাঠখোট্টা তরুণ রিপোর্টার। গোবিন্দের সাপে কাটার কাহিনী শুনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করে সেইদিনই হাজির হল অঘোরের ভাঙ্গা বেড়া ঘেরা খড়ো বাড়ীর দরজায়।

খবরের কাগজের লোক! রেবতীর ঢংকরা ধিঙ্গিপনার সব বিবরণ জানতে চায়! পরে এসে রেবতীর ছবি তুলে নিয়ে যাবার কথা বলে!

হায় সর্বোনাশ!

কাঠখোট্টা তরুণ রিপোর্টার কি মিষ্টি হাসিই যে হাসতে পারে। তার ইচ্ছায় যেন জগৎ চলে এমনিভাবে অনায়াসে এমন অভয় দিতে পারে। আর হতে পারে যেমন চালাক তেমনি নরম এবং নাছোড়বান্দা।

কিছুতেই যেন পারা যায় না তার সঙ্গে।

রাগ করে ভয় দেখিয়ে লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দেবার কথা বলে, গাল দিয়ে!

অগত্যা অঘোর কাকুতি মিনতি করে। জাতে সে ব্রাহ্মণ শুনে পায়ে ধরে আবেদন জানাতে যায়, মেয়ের কেচ্ছা কাগজে ছাপিয়ে যেন তার সর্বনাশ না করা হয়।

পা থেকে হাত ছাড়িয়ে দু'হাতে তার সেই হাত দু'টি বুকে জড়িয়ে ছলছল চোখে বলে, শোন ভাই বলি। আমি আবার আসব, খবর নিয়ে যাব।—সত্যি তোমাদের ক্ষতি হল নাকি। তোমায় আজ বাপ বললাম। আমার জন্যে তোমার যদি ক্ষতি হয়, বিষ খেয়ে মরে প্রায়শ্চিত্ত করব।

একটু হাসে, সবল তেজী হাসি,—সাপ তো জুটবে না, সে অনেক হাঙ্গামা। এমনি বিষ কিনে খেয়ে মরব। বলো তো খত লিখে দিচ্ছি।

কুঞ্জ আবার রেগে ওঠে, গালাগালি দেয়। বেরিয়ে না গেলে দা' দিয়ে গলা দু'ফাঁক করবে বলে।

সে নিশ্বাস ফেলে বলে, দা আনো, গলা কাটো। পারবে কি ভাই? পারবে জানলে কি একলা আসতে সাহস পেতাম? কেউ জানে না এ গাঁয়ে এসেছি। মেরে বাঁশ বনে গর্ত্ত করে পুতে দাও। কেউ টের পাবে না।

একটু হেসে বলে, শালা হারামজাদা বজ্জাত নচ্ছার,—সব কিছু বলতে পার। তোমার অধিকার আছে। তোমাদের যারা নিকেশ করেছে আমার বাপদাদাও তাদের পক্ষে ছিল বৈকি। তোমরা বাপ তুলে গাল দিলে সইতে হবে।

এরকম মানুষের সঙ্গে পারা যায়? এরকম একটা তুমুল হটগোল বাধিয়ে কত ঘরোয়া কথাই যে বার করে নেয় খবরের কাগজের ছোকরাটা।

তবে রেবতীকে কিছুতেই তারা বার করে না তার সম্মুখে।

কান পেতে দাওয়ার কথাবার্তা শুনতে শুনতে এক সময় হঠাৎ যেন সঞ্জীবিত হয়ে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে রেবতী বাইরে যেতে উদ্যত হয়েছিল, গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসানো সশব্দ এক থাপ্পড়ে রাজু তাকে থামিয়ে দেয়।

সাপের বিষে ফোলা গালটা সবে মাত্র স্বাভাবিক হয়েছিল।

পরেশ, অর্জুন, দিগম্বর আর খ্যাদা এসে জোটে একে একে। আলাপ আলোচোনার আওয়াজ শুনে তারা আসেনি। সড়ক দিয়ে কত মানুষ এসেছে গিয়েছে, কেউ তারা টেরও পায়নি যে অঘোরের দাওয়ায় চলছে একটা প্রচণ্ড সংঘাত! কি অসাধারণ প্রতিভা খবরের কাগজের রিপোর্টার ছোকরাটার। কুঞ্জ তাকে গালাগালি দিয়ে হম্বিতম্বি করেছে—পথ দিয়ে গাঁয়ের মানুষ যেতে যেতে শুনে ভেবেছে এ তার নিত্যকারের বৌ ছেলে বাপ মা ভাই বোনের উপর হম্বিতম্বি!

অর্জুনেরা ক'জন আওয়াজ শুনে আসেনি, এসেছে বাচ্চাদের কাছে খবর শুনে যে অজানা একজন লোক এসেছে, একটা গোলমাল চলেছে অঘোরের দাওয়ায়।

তারা এসে দল ভারি করায় অঘোর বা কুঞ্জ বিশেষ খুশী হয়েছে মনে হয় না। খবরের কাগজে রেবতীর নাম ছাপা হবার আগেই এবার গাঁয়ে রটে যাবে খবরের কাগজের লোক আসার খবরটা!

নাঃ, মুখপুড়ী মেয়ের কেচ্ছা ঠেকানো অসম্ভব।

পরেশ শুধায়, ব্যাপার কি খুড়ো?

জবাব দেয় আগন্তুক।

বলে, আমার নাম কুমারেশ ধর। খবরের কাগজ থেকে আসছি।

কুঞ্জ গোমড়া মুখে বলে, রেবতীর নাম কাগজে ছাপিয়ে বলছে।

অর্জুন গর্জন করে ওঠে, খবর্দার, ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি।

কুমারেশ হেসে বলে, ও বাবা, তোমার মেজাজ দেখছি আরও গরম!

ধীরে ধীরে সে গা তোলে, অঘোরকে বলে, ভেবো না। সে দিনকাল কি আছে? দেখো, সবাই ধন্য ধন্য করবে তোমার মেয়েকে!

অর্জুন তার পথ আটকায়।

বলে, না, ওসব ছাপতে পারবে না।

কুমারেশ বলে, কি করে ঠেকাবে? হয় আমাকে গুম করতে হয়, নয় খুন করতে হয়। মারধোর করতে চাও, বলব যে ছাপব না। তারপর গিয়ে ছেপে দিলে আমার কি করবে?

অঘোর সখেদে বলে, যেতে দে অর্জুন। যা হবার হবে, করব কি। মেয়েটাকেই খেদিয়ে দেব ঘর থেকে।

কি কাণ্ড যে এবার হবে ভেবে তার মাথা ঘুরে যায়।

হয় অনেক কিছুই।

সেটা এমন কিছু যে গাঁয়ের লোকেরও তাক লেগে যায়। রেবতী প্রায় হয়ে যায় দিশেহারা।

আরও অনেকের মতই কাগজে রেবতীর কাহিনী চোখে পড়ে খগেন রায়ের। পড়েই তার মনে হয় এ মেয়েটিকে প্রকাশ্য সভায় সম্মান ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

চাষীদের সঙ্গে তার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা। কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েকবার জেলও খেটেছে। সদরে বাস করে, পেশা ওকালতি। এমনিতে সাদাসিদে শান্ত প্রকৃতির মানুষ, তাই সময় বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে তার তেজ আর মেজাজ দেখে লোকে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। এ এলাকার চাষী মহলে তার প্রভাব খুব জোরালো।

খগেন বলে, ফসল ভাগের লড়ায়ে চাষীর মেয়ে বৌ অনেকে নেমেছে, জেলে গেছে, প্রাণ দিয়েছে। তাদের জন্য সভা করেছি। একেও তুলে ধরতে হবে সবার সামনে। অনেকে মানতে পারে না খাঁটি গেরস্ত মেয়ে বৌ লড়ায়ে নেমেছে, মোটে তারা পেশাদার নয়। ভাবে, কি করে হবে? এদেশের ভীরু লাজুক গেঁয়ো মেয়ে বৌয়ের পক্ষে তা কি সম্ভব? দেশের অবলাদের কত সাহস খবর রাখে না তাই বুলি কপচায়। নিজে থেকে বুদ্ধি করে সাহস করে এইটুকু কচি মেয়ে যদি একটা মানুষকে বাঁচাতে সাপের বিষ গিলতে পারে সুযোগ পেলে এ না পারে কি? এরা ধরে রেখেছে, এদেশে মহাদেবরাই শুধু নীলকণ্ঠ হতে পারেন, মেয়েরা শুধু হতে পারেন মোহিনীর নকল। এ মেয়েটি নীলকণ্ঠী হয়ে তার জবাব দিয়েছে।

সঙ্গী সাথী আত্মীয় বন্ধুদের কাছে কয়েকদিন মোটামুটি এমনি-ভাবে কথা বলে তেজপুরের সভাতে প্রায় এইভাবেই খগেন বক্তৃতা দেয়। এ সভার বেশীর ভাগ গেঁয়ো চাষাভুষো মানুষ। হাততালি দিতে জানে না। বসে দাঁড়িয়ে তারা অভিভূত হয়ে শোনে।

নীলকণ্ঠ মহাদেবের সঙ্গে তুলনীয় নীলকণ্ঠী রেবতী!

তাদের গাঁয়ের রেবতী!

তাদের কেন খেয়াল হয়নি এটা?

এতক্ষণ অভিভূত হয়ে শোনে কিন্তু এবার গুঞ্জনধ্বনি ওঠে সারা সভায় ছড়িয়ে।

বটতলার ফাঁকা মাঠে সভা। চাষের যোগ্য পতিত জমির প্রকাণ্ড মাঠে শ' চারেক মোটে লোক। আত্মীয়বন্ধু ঘনিষ্ঠতমদের ছোট ছোট ভাগেই জমাট হয়েছে সভাটা। সভা সুরু হবার অনেক আগে থেকেই গায়ে গায়ে ঘেঁসা ভাগগুলি বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি আলোচনা চালিয়ে সমগ্রভাবে গুঞ্জরিত করে তুলেছিল সমাবেশটা।

সভা সুরু হবার পর চুপ হয়ে গিয়েছিল সকলে।

এখন আবার সভা গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। সভা চলার সময়, স্বয়ং খগেনের বক্তৃতা চলার সময়।

যে বক্তৃতা শুনে তারা আধঘণ্টা মুগ্ধ অভিভূত হয়েছিল।

এই সভার ব্যবস্থা করতে কুমারেশ পুরো দুটো দিন আদা-নুন খেয়ে কাছাখোলা খাটুনি খেটেছে।

সভার এই ভাব দেখে সে যায় চটে। ভাবে, জোরে একটা ধমক দিলে সবাই ধাতস্থ হবে, অভিভূত হয়ে বক্তৃতা শুনবে।

বাঁশের গড়া মঞ্চ। তক্তপোষও জোটেনি।

বাঁশও আজকাল সস্তা নয়। সহরে অসম্ভব ইটের বাড়ী উঠছে। ইটের বাড়ী তুলতে কত যে বাঁশের দরকার হয় আশেপাশের চার-পাঁচটা গাঁয়ের একমাত্র বংশীধর যেন সেটা টের পেয়েছিল সকলের আগে।

কুঞ্জর সে শ্বশুর হয়। তিন-চার দিন অন্তর চারিদিক থেকে সংগ্রহ করা বাঁশ গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে সে থানার পেটা ঘড়ি অনুসারে প্রায় রাত আড়াইটে-তিনটের সময় রওনা হয়।

সদরের দিকে নয়।

সোজা কলকাতার দিকে।

গেঁয়ো চাষা শ্রোতাদের সভাস্থ ধাতস্থ করার জন্য কুমারেশ উঠে দাঁড়াতেই খগেন তাকে যেন গায়ের জোরেই পিছু হটিয়ে দেয়।

নীচু-গলায় ধমক দিয়ে বলে, বাহাদুরি কোরো না। নেতাগিরি ফলিও না। জানো না বোঝে না, কর্ত্তালি কোরো না। ওরা হৈ-চৈ করছে, করতে দাও। আমি যা বলেছি তাই নিয়ে ওরা হৈ-চৈ করছে—আমাকে ছুট্ করার জন্য নয়।' এটুকু টের পাও না? আমি যেটুকু বলেছি সেটুকু ওরা বুঝতে চায়। ওদের চেয়ে অনেষ্ট মানুষ জগতে নেই। ওরা যেটুকু শুনেছে সেটুকু বুঝে তবে আমার পরের কথা শুনবে। যা বোঝে না তা নিয়ে ওরা কারবার করে না। চাষাভুষো মানুষ তো।

: এরকম হৈ-চৈ করবে?

: করুক না হৈ-চৈ।

: মিটিং পণ্ড করে দেবে?

: করুক না মিটিং পণ্ড। মিটিং তো ওদের।

কুমারেশ ভীষণ চটে যায়। খগেনকে প্রায় আড়াল করে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে, হট্টগোল কোরো না, সবাই শোনো। প্রচণ্ড চীৎকারে জারি করা তার হুকুমে সভা গুঞ্জন থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বলেই কুমারেশের রক্ত টগবগিয়ে ফুটে ওঠে। সে পেরেছে। চার-পাঁচশো চাষী মেয়ে-পুরুষকে সে এক ধমকে দমিয়ে দিতে পেরেছে।

মঞ্চে মা আর মাসী সঙ্গে ছিল রেবতী—

তার জন্য এত লোকের সভা।

পরে সদরে আরেকটা সভা হবে।

কি ভাববে কি অনুভব করবে রেবতী ঠিক পায় না। অর্থাৎ যেমন এলোমেলো হয়ে থাকে তার চিন্তা তেমনি খিচুড়ি পাকিয়ে থাকে অনুভূতি।

সভা হবে জানার পর ক'দিন কৌতূহল আর ভয়টাই বড় হয়ে ছিল। না জানি কি হবে? কি করবে সবাই তাকে নিয়ে এক মাঠ লোকের সম্মুখে? মূর্চ্ছাটুর্চ্ছা গেলে কেলেঙ্কারীর সীমা থাকবে না।

খগেন বাবুর মত লোক পিছনে আছে, অনন্ত বহু মণ্ডল বেশী ঘোষেরাও আছে—অনেকে বার বার অঘোরকে অভয় ও উৎসাহ দিয়েছে কিন্তু একটা আশঙ্কা কেউ তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

যদি উল্টো হয়? সভা থেকে লোকে যদি টিটকারী দেয়, অপমান করে?

এমনিতে বিব্রত হয়ে থেকেছে ভয় আর দুর্ভাবনায়, তার উপরে কত রকমের কত মানুষ যে বাড়ীতে এসে তাদের একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কত কথা, কত জিজ্ঞাসা, কত রকমের খোঁচা আর কোঁড়ন কাটা!

গোকুলের পিসী এসে তো যা মুখে এসেছে বলে গালাগালি করে গেছে একঘণ্টা ধরে।

ঘোর কলি! ঘোর কলি! বলে কপাল চাপড়ে হা-হুতাশ করে গেছে বামুনদিদি।

অল্পবয়সী মেয়ে বৌ যারা অনুমতি পেয়ে আর যারা লুকিয়ে এসেছে, তারা প্রায় পাগল করে তুলেছে রেবতীকে।

এমনভাবে হাঁ করে শুধু তাকিয়ে থেকেছে কেউ কেউ! তাদের সেই রেবতী, তাকে নিয়ে হবে দশটা গাঁয়ের সভা—চোখ মেলে রেবতীকে গিলতে চেয়ে তারা যেন বুঝতে চেয়েছে, এমন অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সম্ভব হয়।

তবু, ভয় ভাবনা কৌতূহল উত্তেজনায় ক'টা দিন যেন কেটে গিয়েছে খাপছাড়া একটা স্বপ্নের মত। আজ সে সত্য সত্যই মঞ্চে সম্মানের আসনে বসে আছে।

এ যেন অন্য রকম আরেকটা স্বপ্ন।

কেউ টিটকারী দেয় না, কোন প্রশ্ন বা প্রতিবাদ জানায় না, সকলে একমনে তার প্রশংসা শোনে, বার বার জোড়া জোড়া চোখ বক্তার দিক থেকে তার দিকে ফিরে আসে।

ওই রকম অভিভূত বিচলিত অবস্থাতেও একটা বিষয় খেয়াল করে রেবতী। শুধু তার প্রশংসাকীর্তন নয়, তাকে বড় করা নয়—তার কথা থেকে আসছে দেশের গরীব চাষাভুষো ঘরের মেয়েদের কথা, চাষীদের দুরবস্থার কথা, চাষীর লড়ায়ে মেয়েদের অংশ নেবার কথা। এই জন্যই বুঝি কেউ টিটকারী দিচ্ছে না তাকে।

সভায় গুঞ্জন ওঠার সময়টুকু রেবতী পাশে নিজের মা ও গোবিন্দের মার কথা শোনে।

গোবিন্দের মা গভীর আবেগের সঙ্গে বলে, তবে তো বাছা মেয়ে তোমার সোজা মেয়ে না। মোরা উল্টা বুঝলাম। যা ভাবলাম দোষ, তাই গুণ হয়ে দাঁড়াল তোমার মেয়ের!

রাজু বলে, কি জানি দিদি কি দিনকাল। ফল ভাল হয় তবেই ভাল। আইবুড়োনী মেয়ের ব্যাপার, এই হৈ চৈ কি ভাল? দু'দিন বাদে হুজুগ থামবে, লোকে তখন কি বলবে ভগবান জানে।

গোবিন্দের মা ভরসা দিয়ে বলে, না না, সে ভয় কোরো না। মেয়ে বৌ দোষ করলে পাঁচজনা বিচার করে, লোকে মানে তো সেটা? এত লোক মিলে মেয়ের তোমার গুণ মেনে নিলে, দোষ গাইবার সাধ্যি কি আর হবে কারো? ছেলেকে মোর পেরাণ দেছে, মেয়ে তোমার কলির বেউলা!

বুড়ো ক্ষেত্রকে ঠেলেঠুলে তুলে দেওয়া হয় কিছু বলার জন্ম।

মানুষটা হাড়ে-মাসে ক্ষেতহীন হদ্দ চাষী, তাতে বয়স গেছে ষাটের কাছে। পাঁচ-দশ জন চাষীর বৈঠকে তার গলা এখনো খুব চড়ে বটে, চাষাড়ে ভাষায় মনের কথা বলতেও পারে স্পষ্ট করে কিন্তু এত লোকের সভায় দাঁড়িয়ে গলাবাজি করা কি তার ক্ষমতায় কুলোয়?

রেবতীর মত মেয়ে হয় না, সে তাদের কিনে রেখেছে, তার ছেলের প্রাণ দিয়েছে—এইটুকু বলতে বলতে বুড়ো কেঁদে ফেলে।

তার দিকে চেয়ে রেবতীর চোখও ছল-ছল হয়ে আসে। বুকের মধ্যে কি একটা ঠেলে উঠতে চায়।

গোবিন্দের কাছে সে শুনেছিল, কাজ নেওয়ার জন্ম তার উপর বাড়ীর লোকে তেমন সন্তুষ্ট নয়। কারণ, লাভ কিছুই হয়নি, ওদিকে চাষের রোজগার গেছে কমে। আগে চাষের সময় ক্ষেতে খাটত, অন্য সময় ঠিকে কাজ খুঁজত। এখানে পাকা কাজ পাওয়ায় হয়েছে মুস্কিল—হয় চাষ ছাড়তে হয়, নয় তো সারা বছরের পাকা কাজটা ছাড়তে হয়।

আয়ের দিকে লাভ হয়নি কিন্তু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে অনেক কিছু।

তার বাপের সেটা বড়ই অপছন্দ। ক্ষেত্রকে কেঁদে ফেলতে দেখে রেবতী ভাবে, তাই কখনো হয়! বাপ কখনো ছেলের উপর বিরূপ হতে পারে! [ক্রমশঃ।

কুমীর—কুমীর

শ্রীবাণী রায়

মাথার বেতের হাতে-বোনা টুপীটা ঠেলে আর একটু নামিয়ে দিতে দিতে সে নাটকীয় ভাবে বলে উঠল, "উঃ, কি তেষ্টা! Thirst, thirst! জল! জল!" কাঁধের ঝোলানো ফ্ল্যাস্কখানা তুলে অত্যন্ত অশোভন ভাবে ঢকঢক করে জল খেল সে। শাদা অ্যালুমিনিয়াম রোদে চমকে উঠল।

শীলা পাশাপাশিই চলছিল। একধারে সমুদ্র, অন্যধারে বালির ঢিপি। মনে সাধ ছিল শীলার কিঞ্চিৎ ভাববিনিময় হয়। কিন্তু, যে দেবে সুযোগ, সেই সরে গেল!

শীলার ছোট বোন বিনু আগে আগে চলছিল। তারও মাথায় অমনি একটা বেতের টুপী রোদের হাত থেকে রক্ষার আশায়। শীলা কখনই অমন গেঁয়ো মাথাল সহ্য করবে না। একখানি ফুল-ছাপা রেশমী রুমালে গোলাপী মুখটি আধো আবৃত শীলার। রোদের ভয়ে চোখে আধুনিক কাল চশমাও নেই। কুৎসিত কিছু শীলা সহ্য করতে পারে না, ফ্যাসান হ'লেও না। সৌন্দর্য্যের অনুশীলন, শালীনতার সাধনা শীলার প্যাশন।

সে ব্যক্তি কিন্তু বিনুর লম্বা শাঁখের মত গলার পশ্চাৎভাগে সতৃষ্ণ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলল মন্ত্রমুগ্ধের মত। বিনু একমনে পথের সামনে সমুদ্রের জল দেখে চলছিল। সে বিনুর পেছনে চলে এল। পায়ে ছিল ক্রেপ-সোলের জুতো। শব্দ উঠল না বালিতে।

শীলা হতাশ হয়েছিল। শীলুর থেকে বিনু তাহ'লে কাম্য নাকি? হঠাৎ নদীর মোহানায় উচ্চ রোল উঠল। একটা ধরা পাখীর পালক দিয়ে বিনুর কম্বুকণ্ঠে সুড়সুড়ি দিয়ে চমকিয়ে

দিয়েছে সে। বিনু বিরক্ত হয়ে তর্জ্জন করছে, "ভাল হবে না কিন্তু, কুমীরদা!"

হ্যাঁ, ওই পাক্কা সাহেব সুপুরুষটির নাম সত্যই কুমীর। বিনুর ক্রোধোক্তি তাকে জলের ধারে কুমীর পদে অভিষেক করেনি। ইয়ার-বন্ধু ও-নাম দেয়নি তার খেলাচ্ছলে, প্রেয়সী তো কখনই ও-নামে ডাকতে পারে না। পিতারই নাম দেওয়া হচ্ছে 'কুমীর'। বেচারী ও-নামটা যে ঢেকে-চেপে অন্য নামের বাহার দেবে, তা-ও তো পারে না। সে নামটিও তথৈব চ, 'গোবর্দ্ধন'। দুটোর মধ্যে পাশ্চাত্যভাবালম্বী প্রথমটা অপেক্ষাকৃত নিরীহ মনে করেছিল। অবশ্য, বন্ধু-মহল তার প্রায়শঃ বিদেশী। 'জি. সানিয়াল'কে তারা 'সানিয়াল' বলেই ডাকে।

হ্যাঁ, সত্যই সেই কর্ডেড ভেলভেটের বাদামী ট্রাউজার-মণ্ডিত, সিল্কের শার্টে টাই-খচিত, অধর-চুরোটিকা-চুম্বিত যুবকটি 'কুমীর' ও 'গোবর্দ্ধন সান্যাল' নামে ভারাক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনও তুলনায় হয়তো লঘু ছিল। বেচারী, বেচারী!

কিন্তু, তারও চেয়ে বেচারী হচ্ছে শীলা—রূপ দেখে মন দিয়ে এখন ভাবের অভাবে মারা যাচ্ছে। হাল্কা প্রকৃতির প্রেমিকা আর শিশুস্বভাব স্বামী—দুই-ই মারাত্মক।

কিন্তু, ইঙ্গবঙ্গ যুবকটির নাম কুমীর হ'ল কেন? বেশ তো, পাতা ভরে গল্প লিখতেই তো বসেছি। চলুন, এরা ডায়মণ্ড হারবারের পিক্‌নিকের খাওয়াটা সেরে নিতে নিতে ঝপ করে গল্পটা বলে নিয়ে খপ করে ফিরে আসি। ওই যে বালির ওপর সতরঞ্চ বিছিয়ে ওরা সেদ্ধ ডিমের খোলা ভাঙছে। চলুন, একটু বেহারে যাই।

কুমীরের বাবা ছিলেন বেহার-প্রবাসী সরকারী হেডমাষ্টার। অত্যনস্ক প্রকৃতির শিক্ষাবিদ্। আসন্ন-প্রসবা পত্নীর হেতু বাড়ী বসে আছেন সন্ধ্যা বেলা পড়ার ঘরে। ওধারে জন্মপ্রয়াস হচ্ছে। ইতিমধ্যে স্কুল থেকে খবর এল যে বোর্ডিংএর দীঘির ধারে একটা জন্তু দেখা গিয়েছে। গোসাপ হয়তো নয়, কুমীরই হবে। ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। হেডমাষ্টার মশাই ব্যস্ত হয়ে দারোয়ানকে পাঠালেন সঠিক সংবাদ আনার উদ্দেশে। এধারে কাগজে খসড়া করতে লাগলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে ডাকা হ'বে কুমীর নিধনে।

দরজা ঠেলে মিন্‌মিনে গলায় মহারাজ খবর দিল, "বাবু, হয়ে গেছে।" 'হয়ে গেছে' নানা অর্থে ধর্ত্তব্য। 'ইহলীলা সংবরণ' অর্থ গ্রহণ করে বাবু বললেন, "হয়ে গেছে কুমীরটা?" ততক্ষণে পত্নীর বর্ত্তমান অবস্থা তিনি বিস্মরণে ফেলেছিলেন।

আদরিণী ভগিনী কোট ধরল, "ছেলের বাবার মুখে অজানিতে খোকার নাম এসেছে। বাচ্চাটাকে কুমীর বলেই ডাকা হ'বে। কি মজা!"

পুণ্যবতী ঠাকুরমা বললেন, "ছি ছি, খোট্টার দেশে পড়ে আছি বলে নাতির নাম সেই হ'বে নাকি? গোবর্দ্ধন নাম থাক।"

শেষ হয়ে গেল নামায়ণ। আর কোন অজুহাতেই কাহিনীর এ অংশ ফেনিয়ে তোলা যায় না। সুতরাং, পিকনিকের রুটীর ছিবড়ে, ডিমের খোলায় ধামে খুশি [illegible] বলে। পাঁচিশের তরুণ, একূলের তরুণী। সম্মুখে নদী সমুদ্রে পড়েছে। জলে কাঁপছে ডুবন্ত সূর্য্য। মা-বাবা ওদিকে গেছেন। বিনু এক নৌকারোহী কিশোরের ইসারা পেয়ে পায়ে পায়ে তীরে এগোচ্ছে। এরা দু'জনে আহারাদি সেরে বালির ঢিবির ওপর পা ছড়িয়ে বসল।

প্রথমে কথা বলল শীলা, "খুব খেলে তো? খাওয়া ছাড়া যেন জগতে তোমার কোন আকর্ষণ নেই। তুমি বড়ই স্থূল প্রকৃতি।"

"বা রে!" কুমীর অবাক হ'ল, "খাবার জন্তেই তো এত আয়োজন? না খেলে ফেলা যেত না? আর, খাবোই না বা কেন? একটায় রওনা হয়েছি, এখন ছ'টা বাজে। ক্ষিধে পায় না? তুমি আচ্ছা মেয়ে, শীলা?"

"আহা, আমি কি তাই বলেছি?"

শীলা নিরুপায় হয়ে চুপ করল। একটু পরে নীল মেঘের প্রতি শিবনেত্র হয়ে শীলা যেন নিজের মনেই একটা ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করল—

> "Come, dig a grave—
> Let us join together
> And bury our love here"—

কুমীরের দিকে হাতখানার পেলব নখর দিয়ে শীলা একটু বালিও খুঁড়ে দিল।

ইচ্ছা ছিল, আঘাত দিয়ে জাগানো সুপ্ত প্রণয়ীকে। এমন নির্ম্মম কাব্য শীলার মুখে শুনলে কুমীর অবশ্যই বিচলিত হয়ে পড়বে। হয়তো বা অনুনয় করবে। কেন শীলা প্রেমের সমাধি চায়?

কুমীর একটু উস্‌খুস্ করে উঠল। শীলার হাতের ওপর এসে পড়ল পৌরুষ হাতখানা তার। বালির গর্ত্তে দু'টি সংযুক্ত হাত ডুবে রইল।

নিরালায় এই প্রথম কুমীরের স্পর্শ। শীলা রোমাঞ্চিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মুখর খ্যাতি কোন দিনই কুমীরের ছিল না, আজ সে আরও মৌন।

অগত্যা শীলার আবার ইনিসিয়েটিভ নিতে হ'ল। যেন ঘটনাটি এই প্রথম চোখে পড়ল, এমনি ব্রীড়াজড়িত ভঙ্গিতে শীলা বলল, "হাত ধরেছ কেন?"

উত্তর এল, "আরে, আমি কেন ধরব? বালির মধ্যে কাঁকড়া আছে না? ওরই কাজ। হা, হা!"

বাড়ী ফিরে বসন-ভূষণ ছাড়তে ছাড়তে শীলা ভাবল, বৃথা চেষ্টা। দেখতে তো মনোমোহন, উচ্চপদে চাকুরি করে, স্বাধীন ছেলে। মা-বাবার মত আছে। বাবা তো খুব পছন্দ করেন ওই ছোট ছেলের মত হাব-ভাব আর লাফিয়ে চলা।

ও নিত্য আসে, সুতরাং মন আছে। কিন্তু, কি নির্বোধ? যেই কোন গভীর মুহূর্ত্ত আসে, খেলনার মত করে ভেঙে ফেলে দেয় চঞ্চল হাতে। বারো বছরের খুকী এমন প্রণয়ী পেলে ধন্য হ'তো। ছেলেমানুষিরও সীমা আছে? বুদ্ধি আছে পিতার, বেছে-বেছে কুমীর নাম রেখে ছিলেন। আজ জলের ধারে বালির বুকে কুমীরের মতই ব্যবহার করেছে ও। কুমীরের মত গোগ্রাসে গিলে হাস্‌ফাঁস্ করছিল।

না, একেবারে অচল মাল, মাকাল ফল। ছি, ছি! ও নাম যেমন অনুরাগেও অচল তেমনি রোমান্সেও অচল ক্যাণ্ডিডেট। কত

আশা করে শীলা গিয়েছিল আজ ডায়মণ্ড হারবারে? নৈরাশ্যে চোখে জল এল। বিছানায় শুয়ে পড়ল শীলা।

হায় ভগবান, ছ'মাস আগে কে জানত শীলা কুমীর নামের কোন লোককে ভালবাসতে পারে? মিসেস্‌ গোবর্দ্ধন সান্ন্যাল? মিসেস্‌ কুমীর? শীলা ঘৃণায় শিউরে উঠল।

তবু, কুমীরকেই চাই, কুমীর বিহনে চিরকুমারী থাকবে শীলা। যা দেখা যাচ্ছে, কোন ভরসা নেই। কুমীর না চাইলে, আর কাউকে বিবাহ ঘটে উঠবে না শীলার পক্ষে। মাষ্টারী করে খেতে হ'বে যখন ভবিষ্যতে, তখন পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে লাভ কি?

এম. এ. ক্লাশের ছাত্রী বই খুলে বসল। আজকের দিনের সম্পূর্ণ ঘটনাবলী মনে অনুধাবন করে শীলা ভেবে দেখল, কুমীরের আচরণ বিরক্তিজনক হ'লেও মোটেই বিস্ময়জনক নয়। যেন শীলার জানাই আছে কুমীর এ রকম আচরণ করবে। যেন কুমীরের মত কোন চরিত্র শীলা আগে কোথাও দেখে রেখেছে? কুমীরের আচার-ব্যবহার সবই আর কাউকে মনে করিয়ে দেয়। কে সে? অতীত তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেল না শীলা কোন স্মৃতি। অথচ, আজ নয়, প্রত্যহ এমনি বোধ হয়েছে শীলার। বারে বারে কুমীর মনে পড়িয়ে দিয়েছে কাকে যেন। কুয়াশায় অস্পষ্ট, ঘুমে-জড়ানো মনের গুপ্ত সঞ্চয়। কোথায় বা লুকানো আছে কুমীরের প্রতিচ্ছবি।

আধ ঘণ্টা ধরে শীলা কুমীরকে আবিষ্কারের চেষ্টা পেল। অবশেষে হতাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নদীর তীরে, সমুদ্রের ধারে সন্ধানী মন তার ঘুমের বালুচরে 'কুমীর, কুমীর' খেলায় মেতে উঠল। ধরা না-ধরার খেলা। এই ধরা পড়ে, এই পড়ে না!

কুমীর ও শীলার প্রেম চলতে চলতে হঠাৎ চট করে ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হয়ে গেল। সুতরাং, উৎসবের দিন।

গালে হাত দিয়ে বসে বসে শীলা, দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ভাবছিল। মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ রে শীলু, আজ কুমীর আসবে না?"

এতক্ষণ শীলার মনে আড়ালে ফুটে উঠেছিল অনিন্দ্যসুন্দর এক মূর্ত্তি। দীর্ঘ নয়নে তার গভীরতার স্বপ্ন যেন, অধরে অর্থপূর্ণ হাসি। সে চেনা লোক হ'লেও মনের বাসনায় গড়া মূর্ত্তিই শীলার ধ্যানে। তাই বেমানান 'কুমীর' নামটা শীলাকে পাহাড় থেকে খাদে ফেলে দিল। কেঁপে উঠে শীলা বলল, "হ্যাঁ, কুমীর তো আসবেই। কেন?"

"তোর বাবা গাড়ী নিয়ে কাজে যাচ্ছেন। তাহ'লে কুমীরের গাড়ীতেই আমরা আলো-টালো দেখতে যাব'খন? কি বলিস?"

"বেশ তো। ওর আসবার সময়ও হয়ে গেছে।"

কন্যার বিরস মুখের দিকে চেয়ে মাতা বললেন, "আমি কাপড় ছাড়তে যাচ্ছি। তুই তৈরী হয়ে নে।"

বিনু সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল—"সব সুখ চ্যায়ন্‌ বরখা বরখে ভারতভাগ হায় জাগা"—গান গাইতে গাইতে।

"বিনু, আমরা কুমীরের গাড়ীতে যাচ্ছি। কাপড় পাল্টে নে।" মাতা নির্দ্দেশ দিলেন।

"না বাবা, আমি যাবো না। কুমীরদা যা বাজে বকে!"

শীলার সহ্য হ'ল না আর, ফেটে পড়ল সে—"তোমার সমীরদা একমাত্র কাজের কথা বলতে জানেন, না? ক্লাশে তো শেষ বেঞ্চে বসে থাকে।"

শীলার ভাগ্যে শীলার সহপাঠী সমীরের প্রেম হয়েছে শীলার সঙ্গে নয়, ছোট বোন বিনুর সঙ্গে। শীলার আশায় অবশ্য বাড়ী ধাওয়া করেছিল সমীর। কুমীরে অর্পিতচিত্তা শীলা ফিরেও দেখেনি। বি. এর ছাত্রী বিনুর পছন্দ হয়ে গেল। সহপাঠীর ওপর ঈর্ষ্যা স্বাভাবিক শীলার। বিনুর এ প্রশংসা শীলার ভাল লাগে না।

"হ্যাঁ, ঠিক কথাই তো? সমীরদার কালচারের এক কণা পেলে কুমীরদা কুমীর থাকতো না আর, মানুষ হয়ে যেত।" তীক্ষ্ণ সায়কে, বোনকে বিদ্ধ করে বিনু তেতলায় চলে গেল সিঁড়ি কাঁপিয়ে। দেহ অদৃশ্য হ'লেও স্বর ভেসে এল নির্ভুল লক্ষ্যে—"আজ আর স্বাধীনতা দিবসে আলো দেখব না। বাড়ীতেই কুমীর-কুমীর খেলা হোক। আমাদের দাবী মানতে হ'বে।"

মাথা নামিয়ে শীলা বেশ পরিবর্ত্তনে মন দিল। আজ একটু পৃথক সাজে সাজবে সে। আজকের দিনের সাজটি যেন অন্য দিনের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়। কুমীরের চোখে নিজের সত্তার পরিবর্ত্তন সাধিত করবে, দেখবে শীলা কি হয়। ভারতবর্ষের নূতন জীবনে নূতন শীলা দেখা দেবে।

বব-করা চুল টেনে রিং দিয়ে খোঁপা বাঁধল শীলা। চাকরকে দিয়ে আনাল বেলীর বেণী। কপালে সিঁদূরের টিপ দিয়ে কানে দিল মায়ের পুরনো ইহুদী মাকড়ি। লালপেড়ে শাদা গরদ পরে পায়ে দিল দিশী চটী। স্বদেশী শীলা দাঁড়াল জানালায় সহজ শাদা বেশে।
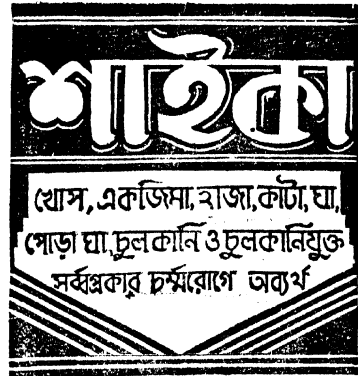
ওই তো, এল সে ? নিমেষে শীলার মন ভরে উঠল। গাড়ীর দরজা খুলে ড্রাইভারের আসন থেকে লাফিয়ে নেমে এল সে। সপ্রতিভ পাদক্ষেপ, সুন্দর তরুণ। বেশভূষা পরিপাটী। শীলার সংশয় অদৃশ্য হয়ে গেল। নামে কি হয় ? "Call a rose by any name, it will smell as sweet !"

ঘরের মধ্যে প্রতীক্ষমানা শীলা দাঁড়িয়ে রইল। আজ ও লক্ষ্য করবেই। আজই শীলার নব জীবন সুরু হয়ে যাবে। এম. এ পরীক্ষা দিয়ে মরতে হবে না শীলাকে।

কুমীর লাফিয়ে দোতলায় চলে এল, "হ্যালো শীলা, এই যে রেডি দেখছি। মাসীমা কই ?"

"আসছেন। তোমার গাড়ীতেই আমরা যাবো।"

"বেশ, বেশ! ততক্ষণে একটা সিগারেট ধরানো যাক।" কুমীর ধূমপান আরম্ভ করল। হতাশা শীলা চেপে থাকতে পারল না—"আমার আজকের সাজটাও কি তোমার চোখে পড়ে না ?"

"সাজ ? ও, এসেই তো দেখলাম ? অমনি একটা শাড়ী পরেই তো আমার মা কালীঘাটে যেতেন। নিশ্চিন্ত কুমীর জানিয়ে দিল।

জনস্রোত ঠেলে গাড়ী চালাচ্ছে কুমীর। বিনুও পেষাপেষি এসেছে। কুমীরের পাশে বসেছে শীলা। ধীরে ধীরে মন তার আবার ভাল হয়ে গেল। রাস্তার লোক এমন দিনেও ফিরে ফিরে কুমীরকে দেখেছে, শীলা লক্ষ্য করল। রূপখানা কি সহজ ? এত রূপে না হয় মস্তিষ্ক কমই থাক না।

গঙ্গার ধারে থামল গাড়ী। লোকের ভিড়ে আর চালানো যায় না। জাহাজে আলো দেওয়া হয়েছে। মা ও বিনু বেলুন কিনতে মন দিলেন। বাড়ী সাজানো হবে।

কি যে কাণ্ড ? কুমীরের সঙ্গে বেড়াতে বার হ'লেই জলের ধারে তারা এসে যায়, শীলা দেখেছে। নামের মিল রেখে কুমীর জল খুব ভালবাসে। তাছাড়া, বিধাতার পরিহাস!

চোখ ছলছল করে উঠল শীলার—গভীরতায় ভরে এল মন। "দেখ ভেবে, আমাদের জীবনে এমন দিন আর আসবে না।"

অন্তমনস্ক কুমীর দূরে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। এই তো, মনে ওর গভীরতা আছে ? এই তো, ও ভাবছে ? হাল্কা ছেলেমী ওর খোলস মাত্র।

শীলা আনন্দে স্ফীত হয়ে অনেক বড় বড় কথা বলে চলল তদগত কুমীর-কর্ণে। এমন শুভ লগ্ন বয়ে যেতে দেওয়া চলে না।

একটু পরে কুমীর কথা বলল, "দেখ শীলা, ওই কাল অষ্টিন গাড়ীর মালিকাকে ?" অতিস্থূলা এক প্রৌঢ়া বসে আছেন রং-চং মেখে সং সেজে। কুমীর এতক্ষণ তাঁকেই দেখে হাসির খোরাক যোগাড় করছিল।

এম. এ. পরীক্ষার পরে শীলার পিতা তার বিবাহ স্থির করলেন। মেয়ে কথা বলছে না, কুমীর কথা বলছে না। বুদ্ধিমান প্রবীণ সুপাত্র পেয়ে দেরী করতে চাইলেন না। পাত্র অতি যোগ্য। শুধু আক্ষেপ, বিদেশে থাকে সে।

শীলার প্রাণ চনমন্ করে উঠল। বিয়ে করতে হলে, কুমীর নয় কেন ? বিদেশে অপরিচিতের গলায় মালা দেওয়ার চেয়ে চেনা লোককে বরণ শ্রেয়ঃ। পাত্রকে দেখেছে শীলা—যোগ্যতায় কুমীরের থেকে অনেক উর্দ্ধে, সন্দেহ নেই। কিন্তু, কুমীর যে শীলার মানস-কুমার। হ্যাবলামিও অপরিচিতির ভীতি। চেয়ে বরণীয়। শীলা শেষ চেষ্টা করতে কৃতসংকল্প হ'ল। কুমীরকে চাই শীলার।

লাল ঢাকাই পরে চুলে গেঁথে নিল লাল গোলাপ। টেবল-ল্যাম্প জেলে বিছানায় শুয়ে রইল।

যথারীতি কুমীর এল। "এ কি, ঘর অন্ধকার কেন ?" আলোর সুইচে হাত রাখতেই ক্লিষ্ট স্বরে শীলা বলে উঠল, "না, না, আলো জেলো না। মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। একটু কাছে বোস না।"

কুমীর চেয়ারে বসল। কুমীর স্বাভাবিক ভাবে চুপ করে থাকে। শীলাই দু'জনের কথা একা চালায়। আজ সে-ও মৌন। অন্ধকার শুধু গোলাপগন্ধ-মথিত হয়ে দুলতে লাগল দু'জনের মধ্যে।

"ওঃ, মাথায় কি কষ্ট হচ্ছে! কেউ যদি টিপে দিত।" কুমীর লাফিয়ে উঠল, "ডেকে আনছি মাসীমাকে।"

"না, না, তুমিই দাও না। এখানে বিছানায় বোস।"

"আমি আবার নার্সিং পারি না। আচ্ছা, দিচ্ছি একটু।"

কুমীরের হাত পড়ল ললাটে আনাড়ি—ভীরু হাত, তাতে অনিচ্ছুক। তবু শীলা চেপে ধরল সেই হাত নিজের কপোলে, গাঢ় স্বরে বলল, "এখন যদি আমি মরতে পেতাম ? আঃ!"

"বল কি, শীলা ? এত বেড়েছে ? দাঁড়াও, মাসীমাকে ডাকি। ডাক্তার আনা দরকার।" ধড়ফড় করে কুমীর লাফিয়ে উঠল বিছানা থেকে। মরীয়া শীলা তার হাত টেনে রাখল, "না, না, তুমি যেয়ো না। তুমি থাকলেই হবে।"

"আমি কি ডাক্তার নাকি ?" কুমীর হাত টানল অসহিষ্ণু ভাবে। টানের চোটে শীলা বিছানা থেকে উঠে পড়ল। তবু হাত ছাড়ল না শীলা। কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল, "তুমি কি কিছুই বোঝ না ?"

"বুঝবার আবার কি আছে ? আঃ শীলা, হাত ধরে টানছ কেন ? লাগছে আমার। হাতে কাটা আছে।" রূঢ় স্বরে কুমীর ধমক দিল।

দপ্ করে আলো জলে উঠল ঘরে। শীলার মুখে-চোখে জলছে আগুন। চুলের গোলাপ পায়ের নীচে ফেলে পিষতে পিষতে দাঁত দাঁত চেপে চিরদিনের রুচিসম্পন্না প্রাকৃত ভাষায় মুখ খুলল, "আর, মাথায় আছে গোবর, না গোবর্দ্ধন ? হাঁদারাম, গাড়োল একটা ? অযথা সময় নষ্ট! বলিহারি যাই বুদ্ধি তাঁর, যিনি নাম রেখেছিলেন গোবর্দ্ধন।"

কুমীর চটে উঠল, "হ'ল কি তোমার ? যা-তা বলছ দেখি।"

"বলবো না ? অপদার্থ কোথাকার, আকাট মূর্খ! বুদ্ধি থাকলে, কালচার থাকলে নাম দুটোই বদলে নিতে নিজে। না হয়, মা-বাবা নামই রেখেছিলেন। অমন নাম নিয়ে চলবার অর্থ হয় না। তখনি আমার বোঝা উচিত ছিল। হতভম্ব, আহাম্মক। গোবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধন!"

কুমীর চোখ পাকিয়ে বলল, "দেখ শীলা, গোবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধন করো না বলছি।"

"ওঃ, আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে গোবরার ? কি বলে ভবে

দুটি উপায়ে পাবেন

ডাকব শুনি? ও কুমীর, তুই ধরতে পারলি না? এক পা জলে, কদম তলে। কুমীর, কুমীর! ধরতে পারলি না?"

রাগে থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে টেবিল থেকে টুপীটা তুলে নিয়ে তড়-তড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল কুমীর।

"গুডবাই, শীলা!"

যাই হোক, শীলার বিবাহ হয়ে গেল। কুমীর নেমন্তন্ন খেয়েও গিয়েছিল বিষণ্ণ ভাবে। তার পরে শীলা গেল সংসারে তলিয়ে। কুমীর গেল সমুদ্রের পারে। দেখাশোনায় আপনা থেকেই ছেদ পড়ে গেল।

বহু দিন পরে শীলা এসেছে পিত্রালয়ে। সঙ্গে মেয়ে মোথা। অত্যন্ত প্রেকসাস্ বলে দিদিমা আদরে ডাকেন 'পাকামোথা' থেকে 'মোথা' বলে। শীলা অবশ্য ডাকে 'বেবি'—প্রাকৃত নাম তার কোন কালেই পছন্দ নয়।

দুই-চার দিন পরে মা বললেন, "শীলা, তোর বন্ধু সেই কুমীর এখন কলকাতায় পোষ্ট পেয়েছে। বিয়ে-থা করেছে। তিনটি ছেলে-মেয়ে। বৌটিও বেশ হয়েছে। মাঝে মাঝে ওরা আসে। তোর কথা কুমীর খুব জিজ্ঞাসা করে। ঠিক আগের মতই আছে কুমীর। একটুও বদলায়নি।"

স্বামি-গৌরবে গরবিণী শীলার মনের কোণে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না, প্রসন্ন হাস্যে বলল, "ওকে খবর দাও আমি এসেছি।"

মা টেলিফোনে খবর জানালেন। সেদিনই কুমীর এসে গেল। শীলার মেয়ে বারান্দায় শিশুপাঠ্য ইংরাজি বইএর ছবি দেখছিল। বড়-বড় বুদ্ধি-ভরা চোখ মেলে চেয়ে রইল। লাফে-লাফে আগের মতই কুমীর উঠে এল দোতলায়। আগের মতই চাল-চলন তার, আগের মতই কথা-হাসি।

শুধু বয়সের ছাপ পড়েছে—মাথার চুল পাতলা, দেহ স্থূল। ক্রমাগত হাসি নাকের দু'পাশে রেখা রেখেছে। কেমন যেন বেখাপ্পা? ছোট একটি ছেলেকে যেন প্রৌঢ়ত্ব দেওয়া হয়েছে জোর করে। কোন পরিবর্ত্তন হয়নি মনের।

"দেখলে শীলা, খবর পেয়েই হাজির! হা-হা। অফিস থেকে আসছি সোজা। চা খাওয়াও।" মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে কুমীর বললো, "এটা কে রে? পুতুল না কি? নাম কি পুতুলটার?"

মেয়ে কিছু বলার আগেই শীলা জানিয়ে দিল, "ডাকি বেবী বলে, ভাল নাম তিলোত্তমা।"

বেবি মুচকে হেসে বলল, "আরও একটা নাম আছে—দিদিমা ডাকেন 'মোথা'। মা নামটা দেখতে পারে না কি না, তাই লোককে বলে না।"

বাড়ী কাঁপিয়ে হাসি উঠল কুমীরের—"কথা শোন এইটুকু মেয়ের? তোমার মা চিরকালই খুঁতখুঁতে। আমার নাম নিয়ে কম কথা শুনিয়েছে আমাকে? বাবা, বাবা!"

শীলা সযত্নে কুমীরকে খাওয়াল বসে বসে। কুমীরের ভাব কিন্তু জমে গেল বেশী মোথার সঙ্গে। উভয় উভয়কে পেয়ে যেন কৃতার্থ হয়ে গেল।

কুমীর সেদিনের মত চলে গেলে ছবির বইখানা নিয়ে মোথা এল মায়ের কাছে, "মামাবাবুটা কি মজার, না? দেখ মা, মামাবাবু ঠিক এই লোকটার মত। আমি দেখেই ধরে ফেলেছি। গল্পখানা পড়া আছে কি না! ঠিক তেমনি কথা, তেমনি হাসি।"

শীলা চমকে উঠল। ব্যারির অমর শিশুনাট্য 'পীটারপ্যানের গল্প'—পীটারপ্যানের ছবি। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত পরিবারে শিশুদের প্রাণের সামগ্রী। সেই পীটারপ্যান, যে কখনও বড় হয়নি, যার কোন বৃদ্ধি ছিল না। চিরশিশু পীটারপ্যান—নেভার-নেভার-ল্যাণ্ডের বাসিন্দা। সে দেশের বাস্তবে ভিত্তি নেই, মনের বাসা সে দেশ। চিরশিশু পীটারপ্যান, কাল তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সে কখনও বড় হয় না।

এই পীটারপ্যানের নাটক শৈশবে শীলাও মুগ্ধ হয়ে পড়েছে, শুনেছে। ছবিতে দেখেছে, সিনেমায় সন্ধান পেয়েছে। মূর্ত্তি গড়েছে। দেশের রূপকথার পাশে মনে সঞ্চয় ছিল পীটারপ্যান। শীলা ধরতে পারেনি।

মেয়ের চোখে শীলা খুঁজে পেল কুমীরের প্রতিচ্ছবি। তাই এত চেনা-চেনা লাগত কুমীরকে? খুঁজে মরেছে শীলা কুয়াশার মধ্যে। আজ সন্ধান পেল এত দিনে।

ঘুমের বালুচরে শেষ হয়ে গেল কুমীর-কুমীর খেলা। ধরা না-ধরার খেলা। অধরা ধরা পড়ে গেল যে তাকে চেনে, যে তারই মত, তেমনি এক শিশুর চোখে।

মেয়ের কোঁকড়া চুলে হাত রেখে শীলা বললো, "তুমি ঠিকই ধরেছ, মা!"

কথা কও

কৃষ্ণ ধর

এমন ভাবে দেখা হবে কোনো দিন ভাবিনি। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কে যেন দশ বছরের ঘুমন্ত স্মৃতিটাকে চমকে জাগিয়ে দিলে। আকস্মিক যোগাযোগে দেখা হয়ে গেল।

মনে পড়ল দশ বছর আগের কথা।

ছোট মফঃস্বল শহর। লাল সুরকির কাঁচা-পাকা সাড়ে সাত-খানা রাস্তা। বাকী রাস্তাগুলো একদম কাঁচা। স্কুল আছে, মেয়ে-স্কুল আছে; আছে একটা ইণ্টারমিডিয়েট কো-এডুকেশনের কলেজ। অবশ্য ফার্ষ্ট ইয়ারে প্রথম বারে পাঁচ জনের বেশি মেয়ে পাওয়া যায়নি। তবু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এই সংকীর্ণায়তন মফঃস্বল শহরের ঝিমিয়ে-পড়া স্তিমিত জীবনযাত্রায় এসেছিল নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য। নতুন পড়ুয়া কলেজ ষ্টুডেণ্টদের জন্য কলেজ-রোডের বটগাছটার তলায় একদিন আবির্ভূত হল লক্ষ্মণ সরকারের 'কাফে-ডি-ষ্টুডেণ্টস্'। যন্ত্রাসী প্রত্যয়াস্ত এই কাফের থাকবার মধ্যে ছিল দুটো কাঠের টুল, একটা টেবিল আর চা, টোষ্ট, ওমলেট তথা গরম সিঙ্গাড়ার আয়োজন। লাল সুরকির পথটা খানিক দূর গিয়েই আলিঙ্গন করেছে কাঁচা রাস্তাকে। শেষ হয়েছে শহর। তার পরেই গ্রাম। হোক

মফঃস্বলের, তবুও তো কলেজ। কৃষ্ণচূড়া আর শিরীষ গাছের ছাওয়ায় স্নিগ্ধ পরিবেশে জমে ওঠে নতুন সিভিক্স লজিক আর রোমান হিস্ট্রি পড়া তরুণ দলের কলগুঞ্জন। ঝিরঝির করে হাওয়া দেয়। শিরীষ গাছের বোঁটায় বোঁটায় ঝুমুরের মতো শব্দ হয়। একটা বহু প্রাচীন দীর্ঘরেখ যুকেলিপটাসকে সযত্নে রাখা হয়েছিল। সবাই বলতো, য়ুকেলিপটাসের হাওয়ায় রোগ সারে, এ গাছ জনস্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য। সামনেই অন্নদা হাই স্কুলের মাঠটাকে ভাগাভাগি করে কলেজের জন্যে নেওয়া হয়েছিল। স্পোর্টস্ আর গেমস্ না হলে শুধু লেখা-পড়ায় একটা নতুন জেনারেশন বাড়বে কী করে? বলতেন সেক্রেটারী প্রাণদা বাবু। বার-লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট। মফঃস্বল আদালতে ডাকসাঁই প্র্যাকটিস্; দেওয়ানীর চেয়ে ফৌজদারীতে হাঁক-ডাক বেশী। বদান্য ও ব্যক্তিত্বময় পুরুষ। তিনি প্রায়ই বলতেন:

অল ষ্টাডি এ্যাণ্ড নো গেম
মেকস্ এ নেশন উইক এ্যাণ্ড টেম।

এই শহরে সুমনারা এসেছিল চট্টগ্রাম থেকে জাপানী বোমাতঙ্কে পালিয়ে। বার্মা থেকে তখন জাপানীরা বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত চাটগাঁর দিকে থাবা বাড়াচ্ছিল। বম্বিং-এর ভয়। ইভাকুয়েশনের চাপে এই ক্ষুদ্র মফঃস্বল শহরের জনসংখ্যা রাতারাতি প্রায় দেড় গুণ হয়ে গেল। রাণীর দীঘির চার পাড়ে ভ্রমণ-বিলাসীদের ভীড় দেখা দিল। জেলা শহর আর ডিভিশন্যাল হেড-কোয়ার্টার্সের বাসিন্দারা অনেক নতুন 'কলচর' আমদানী করল ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের গৌরবে নূতন স্পর্দ্ধিত ছোট মফঃস্বল শহরে।

সুমনা ভর্তি হল এসে সেকেণ্ড ইয়ারে। চাটগাঁর উকীল রমাকান্ত হালদারের মেয়ে। সুমনা কিন্তু দু'দিনেই পরিচিত হয়ে উঠল সারা শহরে। কলেজের বার্ষিক সাঁতার প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হল। অনেকেই নাম দিল। এর মধ্যে একটি নাম পাওয়া গেল, সুমনা হালদার। ছেলেদের প্রতিযোগিতায় একটি মেয়ের নাম দেখে প্রৌঢ় ও পরমভাগবত প্রিন্সিপ্যাল রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

রক্ষিত মহোদয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের রস-ব্যাখ্যা করে কোন যুগে পি. এইচ. ডি পেয়েছিলেন। রস-ব্যাখ্যার সুযোগ তিনি আমাদের ওপর ভাল ভাবেই নিতেন। রসিক বলে খ্যাতিও ছিল তাঁর। এমন এক জন পরমরসিক ব্যক্তিও কিন্তু সুমনা হালদারের এই পুরুষোচিত এথলেটিক-প্রিয়তায় কোনো মাধুর্য-রস আবিষ্কার করতে পারলেন না।

সুমনা নির্ব্বিধ। খেলাধুলা ওর ভাল লাগে। স্পোর্টসের 'ব্লু' হবে সে। বাঙালী মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতা ওকে লজ্জা দেয়। এই রুগ্ন সৌন্দর্য্যের প্রশংসা সে করতে পারে না। সবলার সমর্থ কমনীয়তাই ওকে আকৃষ্ট করে।

: তুমি সুইমিং-এ যোগ দিতে চাও কি রকম? প্রিন্সিপ্যালের প্রশ্নে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা মিশ্রিত হয়ে গেছে তখন। সুমনা লজ্জা পেল না। ভয় পেল না। অকম্প্র কণ্ঠে সবিনয়ে সে জানালে: আমি বরাবরই সুইমিং-এ প্রাইজ পেয়ে আসছি স্যার! চিটাগাং সুইমিং...

কথাটা শেষ না হতেই প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় বাধা দিয়ে বললেন: চিটাগাং শহরে যেটা সম্ভব এই মফঃস্বলে তা আমি হতে দিতে পারি না। আমার কলেজের সুনাম নষ্ট হবে। যদি লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে! যদি বার-লাইব্রেরীতে এ নিয়ে কোনো কথা ওঠে! না—না, এ পার্মিশান আমি দিতে পারি না, কিছুতেই না।

এমন পজিটিভ উত্তরের পর রসশাস্ত্রে গুরুগম্ভীর পি. এইচ. ডি-র সঙ্গে আর কোনো কথা চলে না। এ কথা কলেজের সবাই জানত। সুমনাও। তাই আর কোনো কথা চলল না। যুক্তি-তর্ক তো নয়-ই।

এ পরিচয়ও সুমনার সবটুকু নয়। এমন আশ্চর্য মনের মেয়ে বলে কি ওর নাম দেওয়া হয়েছিল সুমনা! ওর চেহারায় পূর্ব-বাংলার মেঘনা-তীরবর্তী অঞ্চলের বন্য উদ্দামতা। সবলা, সমর্থা, বন্যায় যেন দেহ-মন উচ্ছল। শুধু স্পোর্টসে নয়, দেখা গেল রবীন্দ্রসঙ্গীতেও ওর কণ্ঠ অপূর্ব মনোজ্ঞ। পঁচিশে বৈশাখে কলেজের উৎসবানুষ্ঠানে সুমনার উপর গান গাইবার ভার পড়ল। গম-গম করছে সভা। এত লোক আর কোনো দিন হয়নি এমনি ধরণের উৎসবে। সুমনাই তার উদ্বোধন করল: হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ! —মফঃস্বল শহরের উকীল মোক্তার আর পোষ্ট অফিসের সনাতনপন্থী বড় বাবুরা কোনো দিন এমন মমতাময় কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া শোনেননি। সবারই দৃষ্টি পড়ল। বার-লাইব্রেরীতে সবাই রমাকান্ত বাবুকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানালেন; ট্যালেণ্টেড মেয়ে বটে আপনার!

রমাকান্ত বাবু আপ্যায়িতের হাসি হাসেন।

সুমনার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল কলেজের এক বিতর্ক-সভায়। আমি ছিলাম অপোজায়। সুমনা ছিল মুভার। বেষ্ট স্পীকারের প্রাইজ ওরই মিলল। ওর স্পষ্ট আর আবেগময়ী যুক্তি-বিশ্লেষণের তারিফ করলেন স্বয়ং ইংরেজীর অধ্যাপক সুনীত বাবু। যাঁদের ছাত্রজীবনে পড়া বার্ক আর কলকাতায় সুরেন বাঁড়ুজ্যের বক্তৃতা শোনার গল্প শুনে শুনে হদ্দ হয়ে পেছনের বেঞ্চ থেকে ছাত্রদের গুঞ্জন শোনা যেত।

সুমনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। প্রথম পরিচয়েই জেনেছিলাম সুমনার মনে এতটুকু সংস্কার নেই। সুস্থ আর সমর্থ জীবনের শিল্পী সে। এ মেয়ে একশো মিটার দৌড়ে যেমন ফার্ষ্ট হতে জানে, তেমনি তার অপূর্ব কণ্ঠে গাওয়া গান সহস্র শ্রোতার মনের দুয়ারে স্বপ্নলোকের চাবির সন্ধান এনে দিতে পারে।

পুজোর ছুটির দিন পিকনিকের ব্যবস্থা হয়েছিল কলেজ থেকে। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া তিতাস, তারই বুকে নয়নজলির চরে। বর্ষা শেষে তিতাসের তখন ক্লান্ত রূপ। পায়রার চোখের মতো ঘোলাটে তিতাসের জলে স্রোত নেই। শরতের টুকরো টুকরো নির্জলা মেঘের ছায়াকে পেঁজা তুলোর মতো মনে হয়। নদীর ধার-ঘেঁষা অজস্র পথ আর শাপলার বন। কালভৈরবের মন্দিরের কাছ ঘেঁষে একটা বুড়ো বটের বিলম্বিত ঝুরি নেমে এসে ছোঁয় তিতাসকে।

অথচ এ তিতাসের রূপ বর্ষায় ভয়ঙ্কর। তার ঘোলাটে জলের বেগ ক্রুদ্ধ বুনো মোষের মতো শিং দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে শহরের প্রান্তসীমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে যায়। গুরুগুরু মেঘডম্বরুর আওয়াজে কে যেন তিতাসের বুকে বিছিয়ে দেয় ঘনকৃষ্ণ নীলাম্বরী। এ নদীর স্বপ্ন এই মফঃস্বল শহরের সমস্ত মন জুড়ে। ভাদ্রের রোদে তখন চাঁপার রঙ ধরেছে। সেই পিকনিকে সুমনার নতুন রূপ দেখেছিলাম। তার সে কি উৎসাহ আর আন্তরিকতা। মনে হয়েছিল সে-ই যেন আমাদের 'হোষ্ট'। সেদিনের কথা ভোলবার নয়।

একদিন কী একটা দরকারে গিয়েছিলাম সুমনাদের বাড়ি। এর আগে কোনো দিন যাইনি। জেল রোডের শেষের দিকে ছোট্ট একটা ভাড়া বাড়ি। ইভাক্যুয়েশনের পর এখানেই এসে মাথা গুঁজেছেন রমাকান্ত বাবু। এর আগে বাড়িটা খালিই পড়েছিল। কিন্তু সুমনারা আসবার পর থেকে বাড়ির চেহারা গেল বদলে। সামনের একফালি আঙিনার মাধবীলতার কুঞ্জে তখন একরাশ ফুল ফুটেছে। তার বুনো গন্ধে ভরে গেছে বাড়িটা। ভারী ভাল লেগেছিল। সুমনা তো আমাকে দেখে মহা খুশী। ওর পড়বার ঘরে নিয়ে বসালো।

পরিচ্ছন্ন রুচিবোধে সমস্ত বাড়িটাই আমাকে বিস্মিত করছিল। ওর পড়বার ঘরে গিয়ে সে বিস্ময় প্রশংসায় কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। এতো গুণী সুমনা, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে ঐশ্বর্য্যের বিকৃত বিলাসের চেয়ে দৈন্যের রিক্ততাটা যেখানে অনেক সময়ে মনকে পীড়িত করে, সেখানে সুমনার পড়বার ঘরের দেয়ালে হাতে-আঁকা চমৎকার একটি রবীন্দ্রনাথের ছবি, টেবিলে নিখুঁত করে সাজানো সমান্তরাল পড়বার বইগুলো, ছটো চিনামাটির ফুলদানিতে সন্ত-ফোটা মাধবীর গুচ্ছ খুবই ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছিল। সুমনা আমার সপ্রশংস দৃষ্টিটা ওর কথায় দিক ফেরে দিয়ে বললে: দেখছেন কী, আমার লাগানো রজনীগন্ধায় সবে কুঁড়ি ধরেছে, এখনও ফুল ফোটেনি। তাই এই বুনো মাধবীকে ঘরে তুলে এনেছি। আর ক'দিন পরে এলে রজনীগন্ধাই দেখবেন।

আমি সপ্রতিভ হয়ে হেসে বললাম: আপনার এই নতুন রূপটা জানা ছিল না। ভাবছিলাম আপনার মতো আর ক'জন সুমনাই বা মিলবে এ শহরে।

সুমনা সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসল। হাসলে ওর চিবুকে টোল খায়। দেখতে ভারী সুন্দর লাগল।

আমাদের ফাইন্যাল পরীক্ষা তখন শেষ হয়ে গেছে। ক্রমে এসেছে বোমাতংকের ছূর্যোগটা। লম্বা ছুটীটা কাটাবার জন্যে কলকাতায় চলে এসেছি দাদার কাছে। হঠাৎ একদিন পরিচিত হাতের লেখায় একটি চিঠি পেলাম। সুমনা লিখেছে। ওরা ফিরে যাচ্ছে চাটগাঁয়ে। যুদ্ধের ভয় আর নেই। তাই ওর বাবা নিজের বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছেন। ওখানেই উনি প্র্যাক্‌টিস্ করবেন।

কেমন জানি অবিশ্বাস্য মনে হল চিঠিটা। সুমনার সঙ্গে কোনো দিনই হয়তো দেখা হবে না। একটি উজ্জ্বল প্রাণময়ী মেয়ের পরিচয় হঠাৎ ঝড়ের মতো এসে আবার মিলিয়ে গেল আমার পরিধি থেকে। ভাবতে কষ্ট হল।

এর পরের ইতিহাস বিপর্যয় আর মনোবেদনার অশ্রুতে টলমল। দেশভাগের ফলে সে ইতিহাস কারো আজ আর অজানা নেই। চাকরি নিয়েছি রিফ্যুজি রিহেবিলিটেশন বিভাগে। ইনভেষ্টিগেটিং অফিসার। নামটা ভারী, আসলে কেরাণী-ই। সাহায্যের আবেদন আসে। এনকোয়ারীতে যাই। এক-একটা ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের বেদনায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে এত দুঃখ জমা ছিল শুধু এদেরই জন্যে।

রোজই ভাবি আর ভাববো না। এই দুঃখ-দহনের জ্বালা সইবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার কাছে রিফ্যুজীরা শুধু নথিপত্রের হিসাব আর অঙ্ক, ক্যাশডোল আর ঋণপ্রার্থী কৃপার পাত্র। আমি ভেবে কী করবো? প্রতিদিন কাজে যাই আর মনটাকে বিষণ্ণতায় ক্লান্ত করে ঘরে ফিরি। এ বেদনা যেন ক্রমশঃই অসহ্য হয়ে উঠছিল।

সেদিন ছিল বৃষ্টি। অনেকগুলো লোন অ্যাপ্লিকেশনের এনকোয়ারী করবার কথা। ভাবলাম, কাছাকাছি যেগুলো আছে সেগুলোর কাজই আগে সেরে নেবো। মাণিকতলার পুলের কাছাকাছি এসে বাস থেকে নামলাম। বেশ একটু কষ্টই হল ছিদাম মিত্রের গলিটা বের করতে।

এক জন বললেন: কিছু দূর গিয়ে বাঁহাতি যে খাটালটা দেখবেন তার গা ঘেঁষেই গলিটা। যান, এগিয়ে যান।

কথা মতোই মিলল গলিটা। কয়েকটা বাড়ি পরেই বত্রিশের-এক নম্বরটাও পাওয়া গেল। বৃষ্টির জলে এক হাঁটু কাদা। খাটালে এক গাদা গোরু আর মোষ। গোবর আর চোনা। গলি তো নোংরাই। যে বাড়িটা খুঁজছিলাম সেটার বাইরের চেহারা দেখে তো ভেতরের কাউকে ডাকতেই সাহস হলো না।

ওপরে টিনের ছাউনি। দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা। ইটের গাঁথুনির ভিত,। কিছুটা ঘুরেই একটা বারোয়ারী জলের কল। তা থেকে অনবরত জল পড়ছে। এক গাদা গোবর জমে আছে
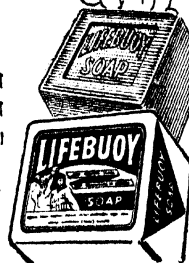
বাড়ির সামনেটাতেই। মাছি উড়ছে ভন-ভন করে। পাশেই একটা গর্ত। তাতে বৃষ্টির জল আর নোংরা জঞ্জাল জমে দুর্গন্ধে চার দিকটাতে দম বন্ধ করে দেবার যোগাড়।

: বাড়িতে কে আছেন ?

দু'বার ডাকতেই ভেতরের দিকের দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর দিকে নজর পড়তেই আমরা উভয়েই চমকে উঠলাম।

: সুমনা ! আপনি ?

: সুশান্ত বাবু !

এ আমি কাকে দেখছি ? দশ বছর আগের মফঃস্বল শহরের স্মৃতিটা কেন ভুলে গেলাম না ? কেন ওর সঙ্গে নূতন করে পরিচয় হল না ? কেনই বা ওর দরখাস্ত আমার হাতেই পড়ল ?

এক মুহূর্তে অনেকগুলো কথা মনটাকে তোলপাড় করে দিয়ে গেল। মনে ঘূর্ণীটা শান্ত হলে ওর দিকে স্পষ্ট করে তাকালাম।

দশ বছরে যেন কুড়ি বছর বয়স বেড়ে গেছে সুমনার। চোখ দুটোকে অসীম ক্লান্তির কাজল কে যেন লেপে দিয়ে গেছে ! পরনে কাল্চে পেড়ে আটপৌরে কাপড়। সাদাসিদে ধরণে পরা। আমি দশ বছর আগের স্পোর্টসের 'ব্লু' সুমনা হালদারকে মনে করতে চেষ্টা করছিলাম।

: ভেতরে আসুন সুশান্ত বাবু !

সুমনা ডাকল। ক্লান্ত আর নির্জীব সে কণ্ঠস্বর। সহস্র রাত্রি ধরে যেন ইনসোমনিয়ায় ভুগছে সুমনা। সুমনা আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো। একখানা ঘর। মাঝখানে একটা কোনো রকমে আড়াল দিয়ে দুটো করা হয়েছে। হয়তো খানিকটা আব্রু, খানিকটা স্বাতন্ত্র্যের জন্যেই। একটা চাটাই এনে দিল বসতে। ম্লান হেসে বললে : আর কিছু নেই বসতে দেবার। আমাদের সব গেছে। পাশের আড়ালে বাবা রয়েছেন। পুরনো এ্যাজমাতে ভুগছেন। আর এই বাদলার দিনে টান বাড়ে। সে কি অসহনীয় কষ্ট সুশান্ত বাবু !

: কবে এলেন ? প্রশ্ন করে নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হয়। আগে তো খোঁজ নিইনি।

: ছ'মাস। সুমনা জবাব দিল। ও ততক্ষণে আরেকটা চাটাই এনে পাশে বসেছে।

: হাওয়া করবো ?

অপরাধীর মতোই জবাব দিই : না, থাক। অফিসের কাজে পরনে প্যাণ্ট, নূতন পালিশ-করা জুতো আর ইস্ত্রি-করা সার্টের দিকে তাকিয়ে নিজেরই কেমন লজ্জা পেতে লাগলো। কেন এ বেশে এলাম ? এতো দৈন্য যেখানে সেখানে সামান্যতম পার্থক্যটাই মনকে আহত করে।

কেমন জানি চুপ হয়ে যাচ্ছিলাম। কথা বলবার যেন কিছু নেই। ছিদাম মিত্রের গলিতে ঢুকবার পরেই কে যেন সব কথার গলা টিপে শ্বাসরোধ করে ফেলেছে। সুমনাই স্তব্ধতার বরফ কাটলো। হিম হয়ে যাওয়া মন এবার গলতে সুরু করেছে।

: চাটগাঁয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে আর যোগাযোগ থাকেনি সুশান্ত বাবু ! কিন্তু কলেজের দিন কয়টা তো ভুলতে পারিনি ! স্টিভাসকেও না। সেই ছোট্ট আল্পনার মতো শহরটাকেও না। ভেবেছিলাম কলকাতাতেই পড়বো। কিন্তু বাবা একা। ওঁকে একা রেখে কোথাও আসতে পারি না। বাবা যে আমাকে ছেড়ে এক পাও চলতে পারে না। হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে অদ্ভুত একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব নিয়ে সুমনা বললে : জানেন সুশান্ত বাবু, বাবার অসুবিধে হবে বলে বিয়ে করিনি। জানেন তো আমার মা নেই। অন্য আর কেউ নেই। তা ছাড়া সোস্যাল ওয়ার্ক একটু-আধটু সব সময়েই করতাম। তাও নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার।

আমি নরম সুরে জবাব দিই : আপনাকে আমি ভাল ভাবেই জানি। তাই তো দশ বছর পরেও চিনতে ভুল হয়নি।

প্রসঙ্গান্তর হল। সুমনা বললে : হঠাৎ কী জানি কী হল ! দেশটা দু'টুকরো হয়ে গেল ! লোক-জন সব চলে আসতে লাগল। বাবা বলতেন : আর ক'দিন থাকবো রে সু—' শহরটা যে একদম খালি হয়ে গেল।

আমিই বাধা দিয়ে বাবাকে আগে আসতে দিইনি। কোথায় আসবো কলকাতায় ! এখানে যারা এসেছে তাদের দুর্দশার কথা তো আর জানতে বাকী ছিল না।

সুমনা বলছিল। একমনে শুনে যাচ্ছিলাম :

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কোর্টে আর যেতে পারেন না। বাড়িতে আর কেউ নেই। থাকতে আর সাহস হল না। তাই অজানায় পাড়ি দিয়ে ঠাঁই মিলল এই নতুন স্বর্গে, ছিদাম মিত্র লেনে। সবই ত' দেখলেন।

পাশের অন্তরাল থেকে তখন কাশির আওয়াজ হচ্ছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের একটা সাঁই-সাঁই আওয়াজ।

সুমনার বাবা।

একবার যেন অস্পষ্ট কণ্ঠে ডাকলেন।

উঠে গেল সুমনা।

তাকিয়ে দেখলাম সেই আন্তরিকতা, সেই একাগ্রতা, কথা বলবার সেই সুস্পষ্ট ভঙ্গি কোনো কিছুই একেবারে হারায়নি সুমনা। শুধু নেই সেই স্বাস্থ্য, সেই প্রাণ-চাঞ্চল্য। ওর সাধ ছিল প্রচুর, সাধ্যের সঞ্চয় এখন নিঃশেষিত।

কিছুক্ষণ পর সুমনা ফিরে এল। চিন্তায় যতি পড়ল। বললাম : লোনের জন্য দরখাস্ত কে করেছেন ? আপনার নামে তো নয় দেখছি ?

: না, আমি নয়। দূর সম্পর্কের এক পিস্‌তুতো ভাই। থাকে বেলেঘাটায়। ওকে দিয়েই করিয়েছি। ওকে বলেছি একটা ইস্কুল-মাষ্টারি যদি খুঁজে দিতে পারে। কিন্তু কী করেই বা বেরুবো বাবাকে একা ফেলে রেখে ?

: কী করে চলছে এখন ? প্রশ্ন করেই মনে হোল, প্রশ্নটা না করলেই পারতাম।

: কী করে চলছে ? সুমনার কণ্ঠে বিষণ্ণ ক্লান্তি যেন কথা কয়ে উঠলো।

ও বললে : জানেন সুশান্ত বাবু, দীর্ঘ ছ'মাসের মধ্যে দু'রাতও ঘুমুইনি। হাঁপানির টান বাড়লে বাবা ঘুমুতে পারেন না। তাই জেগে বসে থাকি। ধীরে ধীরে গলিটা নিঃঝুম হয়ে আসে। খাটালের গোরু আর মোষগুলো ক্লান্তিতে জাবর কাটে। লেজ দিয়ে মশা তাড়ায়। সব শুনতে পাই। বাবার বুকে তখন হাপরের মতো শব্দ হয়। সে কি প্রাণান্তকর কষ্ট !

: চলুন, আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলে আসি।

: এখন থাক, অনেক কষ্টের পর উনি ঘুমুচ্ছেন। এ দুর্লভ ঘুমটা ভাঙাতে চাই না।

: আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্‌, আরেক দিন আসবো।

: সেই ভাল, আরেক দিন আপনার আসাও হবে।

এবারে একটু সহজ হবার চেষ্টা করি: আমি তো ভাবতে পারি না, দশ বছর আগে যাকে দেখেছিলাম তার সঙ্গে এমনি ভাবে, এমনি পরিবেশে দেখা হবে?

সুমনা হাসল। শুকিয়ে-যাওয়া মুখ। কিন্তু চিবুকে এখনও আগেরই মতো টোল খায়। সেই স্বাস্থ্যবতী, লাবণ্যময়ী মেয়েটিকে আঁতি-পাতি করে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিলাম। আমার সে দৃষ্টির অর্থ সুমনার বুঝতে বাকী রইল না।

বললে: কাকে খুঁজছেন? দশ বছর আগে তিতাসের দেশে যাকে দেখেছিলেন সেই সুমনা হালদারের মৃত্যু হয়েছে। আজ আমি সদাশয় সরকারের কাছে ঋণপ্রার্থী আর আপনি তার সহায়ক। হাত যখন পেতেইছি, লজ্জা করে দীনতার সর্বগ্রাসী জন্তুটাকে আড়াল করেই বা লাভ কী? সে তো আর আমায় রেহাই দেবে না।

অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

সুমনা বললে: দুঃখ করছেন? ভাবছেন এদের দুঃখের অংশীদার হবার কেউ নেই? আছে, অনেকে আছে।

গলিটার ভেতরে আরও এগিয়ে যান। ঘরে ঘরে ডাক দেবেন। দেখবেন, কারা সাড়া দেয়। এদের মুখও আপনার অচেনা হবার কথা নয়। কিন্তু দুঃখ শুধু দারিদ্র্যের জন্যে নয়, আমার প্রাণসত্তারই যে আজ মৃত্যু ঘটেছে! কত দিন জেগে জেগে ভোর রাত্রে তন্দ্রা নেমে আসে। শব্দ শুনি, কর্ণফুলীতে জোয়ার এসেছে,…নয়নজুলির চরে শাদা শাদা কাশের গুচ্ছ,…মাছের আশায় হিরামন পাখিদের আনাগোনা,…আমার স্পোর্টসের প্রাইজ ডে,…রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। কিন্তু সব যেন তিতাসের স্রোতের টানে ভেসে যায়। শ্রাবণের তিতাসে তখন কী প্রবল স্রোতের কলকল ধ্বনি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। শুনি গলির বারোয়ারী কলটায় জল এসেছে। তাকে ঘিরেই ও-বাড়ির ঝগড়াটে অশিক্ষিত বউগুলো কোলাহল জমিয়ে তুলেছে। এ তারই শব্দ—তিতাস বহু দূরে, কর্ণফুলী তখন সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ স্রোত তো বাঁধ মানে না।

সুমনা বলে চলেছে। এ বলারও যেন শেষ নেই। আমি তখনও চুপ। ও কথা বলুক। কথা না বললে ওকে যে আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

জোটের মহল

[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

তের

এদিকে বিলগাঁর মত এত বড় গ্রাম আর নেই। তার চার পাশেও গ্রাম আছে অনেকগুলো। লোকেরও বসতি খুব ঘন। এতগুলি মানুষের মধ্যে দিবাকর সত্যই যেন দিবাকরের মত দীপ্ত ছিল। স্ত্রীলোকদের ভিতর কনক ও মুক্তা জলত নক্ষত্রের মত নিজেদের মানসিক ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে। তাই এদের তিন জনের মধ্যে দেখা যেত একটা ঐক্য। প্রত্যেকের জন্ত প্রত্যেকের আকর্ষণ ছিল, আবার বিকর্ষণও ছিল সৌরজগতের গ্রহের মত। তাই কি পুরুষ-মহলে, কি স্ত্রীলোক-মহলে, এদের নিয়ে আলোচনা হত সর্বত্র।

কনক মামাবাড়ী গিয়ে একটা অস্বাভাবিক আবর্তে পড়ল। তাকে দেখে মামার মুখভার, মামীর তো চক্ষুস্থির। অথচ এই মামা-মামী যত বার ভাগ্নেবাড়ী বেড়াতে এসেছে, আচ্ছা করে মাছ দুধ খেয়েছে আর দুঃখ করে বলেছে, 'তোরা তো যাও না তুচ্ছ কইর‍্যা—আমরা তো তা পারি না। একবার যাইয়াই না হয় দেখতিস দুই ভাই-বুইনে কত আর নৌকা ভাড়া, দেয় কিনা তোদের মামা-মামী।'

কয়েকটা বছর যেতে না যেতে কনক বেশ বড়-সড়ো হয়ে উঠল। মামা ও মামীর সংগে যুদ্ধ করেই তাকে বড় হতে হয়েছে। প্রচুর প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিল তার শিরা-উপশিরা—তাই দুটো বৃহৎ আগাছা চেপে রাখতে পারেনি তার শ্রী ও বৃদ্ধি।

হঠাৎ একদিন মামা ধর্মদাসের মুখভার কেটে গেল—সংগে সংগে মামীরও চোখের তারা দুটি স্বাভাবিক হয়ে এলো। কারণ কি? অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারল না কনক। পূর্বের চেয়ে তার এখন বরঞ্চ চাল লাগে বেশি, পরনের শাড়ীখানাও লাগে বড়—এমন সময় মামা-মামীর এ পরিবর্তন নিতান্ত বিস্ময়কর। মামী ওর বাড়ন্ত গড়নটার দিকে তাকায়, আর একা-একাই হাসে। কনকের কেমন জানি লজ্জা বোধ হয়।

কিছুদিন বাদে কনক টের পেল যে ধর্মদাস আর অধর্মের কাজ করবে না—তার পিতার ঋণ সে পরিশোধ করবে ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট না করে। অর্থাৎ বাড়ীর লগ্ন অত্যন্ত উর্বর জমিটুকু যা বন্ধক ছিল বৃদ্ধ ত্রিলোচনের কাছে তা ছাড়াবে। ত্রিলোচন শুধু বৃদ্ধ নয়, মেরুদণ্ডখানাও তার মনের মতই বক্র। কিন্তু এমন বাঁকা লোকও সহজে সোজা হয়ে গেল ধর্মদাসের প্রস্তাবে। প্রস্তাবটা অবশ্য মৌলিক। টাকা-পয়সা দেবে না, অথচ ছাড়িয়ে নেবে ধানি জমি।

একদিন মাঝ রাতে শাঁখ বাজতে সুরু করল। কনককে ঠেলে তুলল তার মামী। 'ওরে বর আইছে উঠানে—এখনও তুই ঘুমে?' কনকের হাত ধরে ছাঁদনাতলায় টেনে নিয়ে গেল।

ঘুমের ঘোরে কনক একটা না দুটো পাক ঘুরেই বেঁকে দাঁড়াল। ধর্মদাস মনে মনে প্রমাদ গণল ও মুখে-মুখে কন্যা সম্প্রদান করল। কিন্তু কনক জোর করে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল দোরে খিল দিয়ে। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। হাসাহাসি, শেয়াল-ডাকও শোনা গেল নানা দিকে। কেউ বলল, ওতেই হয়েছে, কেউ বলল, মোটেই

হয়নি বিয়ে। ত্রিলোচন শাসাল, কাল সে প্রমাণ করবে কি যে হয়েছে, এবং কি যে হয়নি, তা থানা-পুলিশ করে।

ভোর না হতেই সত্যি সত্যি পুলিশ এলো। কনককে কৌশলে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ত্রিলোচন। মামা ধর্মদাস হাসল চোখ টিপে। গাঁয়ের লোক অসন্তুষ্ট হয়ে রইল। মামী বলল, 'বাঁচলাম।'

ধর্মদাস বলল, 'এখন হিসাব কইর‍্যা দেখ লোকসান হয় নাই—তোমার জমির এক সনের ধানের চাউলও তো ও খায় নাই।'

কিছু দিনের মধ্যেই ত্রিলোচন মারা গেল।

গ্রামের মুরুব্বিরা আনন্দিত হয়ে উঠল। ধর্ম আছে।

কনক হবিষ্য করবে না, বা চলবে না আর পাঁচজন বিধবার মত। খবরটা মুরুব্বিরা শুনল। আর যায় কই, তারা খেঁকিয়ে এলো—এমন অনাচারী হতে পারে কখন হিন্দু-ঘরের মেয়ে! কনক হবিষ্য না করলে কি করে হবে পুত্রহীন ত্রিলোচনের শ্রাদ্ধ? এমন একটা নিমন্ত্রণ মাঠে মারা যাবে?

কারুর কথাই কনক কানে তুলল না। না তুললেও তার বৈধব্যের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

জীবন তেমন চালাক চতুর নয়, কিন্তু মধুর। মধুর ওর বয়সটা মধুর ওর স্বাস্থ্যটা। কথাবার্তায় কী সরল। 'বুইনঠাইরইন আমি অত মানি-গুনি না।' কি মানে না জীবন? সে কি এক শয্যায় শুতে চায়? বোকা ছাড়া এমন কথা কি কেউ বলতে পারে! অথচ জীবন ঠিক বোকাও নয়। এতদিন সে সহজ সরল ভাবে আচ্ছাদন দিয়ে রেখেছে কনককে। পিতা কিম্বা ভ্রাতার মতই সে কর্তব্যপরায়ণ। তবে দোষের মধ্যে এইটুকু তার দোষ যে সে কথায় কথায় প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা—সেই ছোটবেলায় রোগের কথা। নয় তো বলে, 'ধন্য তোমার যত্তন। ছোট কালে করে মা, আর বড় হইলে বৌ।' ঘেমে ওঠে কনক। ঘরে তো কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করে, 'তবে আমি কি তোর বৌ?' জীবন মহা লজ্জিত হয়ে জবাব দেয়, 'কি যে কও বুইনঠাইরইন! আমি কি তা কইতে পারি?' একা-একা কনক অনেক ভেবে দেখেছে, ঠায় একটা দুপুর চিন্তা করে সে স্থির করেছে—হ্যাঁ, নিশ্চয় জীবন এ কথা বলতে পারে। পুরুষ হিসাবে তার দাবী আছে। মানুষ হিসাবে তার গুণ আছে। সামাজিক জাতির হিসাব এখানে অবান্তর। জীবনের সারাটা জীবনই তো অপচয় হয়ে যাবে উপযুক্ত আধারের অভাবে।...

কনকের মন আবার রঙিন হয়ে ওঠে—ও যেন কুমোর-বাড়ীর একটা লক্ষ্মী কলসী। ওর চারদিক বেয়ে উপচে পড়বে তরলমতি জীবন। ও মেয়েমানুষ—তবু ওর গর্ব ও বুকে করে সামলে রাখবে তরলিত ফেনায়িত কতখানি উগ্র যৌবন। কিসের সমাজ, কিসের শাসন? ও কিছু মানবে না।

'কি হইছে রে জীবন?'

'ঠাকুর ভাই অনেক কিছু কইছে।'

'তুই জবাব দিস নাই?'

'দিছি, কিন্তু তেমন কিছু কইতে পারি নাই।'

'ক্যান রে?'

'তুমি নাই, আবার কিসে কি কই।'

কনকের হাসি পায়। 'আমি বুঝি তোর পিছে-পিছে, সংগে-সংগে থাকুম সারাক্ষণ?'

'তা না—আরে দুখে হয়ত মিশ্যা যাইবে—আমি আঠি যামু আদারে (জঙ্গলের গাদায়)। শত হইলেও তো ভাই বুইন!'

কনক একটু ব্যথা পায়। ভাবে, জীবন এখনও তাকে চিনতে পারল না।

চৌদ্দ

মানুষ সব ছাড়তে পারে, কিন্তু সহজে পারে না ছাড়তে সংস্কার। যদিও বা তা পারে, তার জন্য চাই সময়, রুচি ও যুক্তি। অন্যের প্রভাবেও অনেক সময় কাজ হয়—একেবারে বদলে যায় মনটা। কিন্তু তেমনি একটা প্রতিভার সংগে সাক্ষাৎ হওয়াও তো সহজ নয়। কনকের ব্যবহারে দিবাকরের মনে আঘাত লেগেছে, ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের চূড়া ভেঙে পড়েছে—সে সামলাতে পারছে না হৃদয়াবেগ। এককালে তো তারা সত্যি সত্যিই ব্রাহ্মণ ছিল—ছিল বর্ণশ্রেষ্ঠ তার বাপ-দাদা। সেই পবিত্র বংশে জন্মাল কনক! দৈত্যকুলে যেন প্রহ্লাদ। না, না, জহ্লাদ। এক আঘাতেই করবে আচার্য-বংশের মুণ্ডপাত। দিবাকর নিজের অজ্ঞাতেই মুক্তাদের বাড়ীর দিকে চলল। কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে তার জ্ঞান হলো। সে কোথায় চলেছে, কি কথা বলে সহানুভূতি কুড়াতে? হাজার আপন হলেও স্ত্রীলোকের কানে তুলবে এই কথা।

তার একটা গল্প মনে পড়ল। খুব ছোট্ট একটা ঘটনা। এক ডাকাত একদিন শেষ রাত্রে ঘরে ফিরে এসে বলল তার স্ত্রীকে, 'দেখ, আমি একটা খুন কইর‍্যা আইছি—কইস না কেওরডে।'

অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে ডাকাত-গিন্নী ঘাটে গেল। প্রিয়সখীদের ডেকে গোপনে নিষেধ করে দিল, 'দেখ, সোয়ামী আমার খুন কইর‍্যা আইছে কাইল রাত্রে, তোরা জানি ভাই কইস না কেওরডে।'

এও ঠিক তেমনি হবে। যা হয়ত কেউ জানে না, তা যাবে পাড়ায়-পাড়ায় ঢাকে-ঢোলে চলে।

জীবনকে দিবাকর যা বলেছে তা কম শক্ত নয়। নিশ্চয় সে কথা গেছে কনকের কানে। হয়ত একটা পরিবর্তন হতে পারে। দিবাকর আশ-পাশের দু'বাড়ী ঘুরে, স্নান সেরে বাড়ী ফিরল।

খেয়ে-দেয়ে উঠতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। চালের তেমন সংস্থান নেই, তাই রাত্রে আর হাঁড়ি চড়াবে না কনক। সে জ্যোৎস্নালোকে একখানা বঁটি টেনে এনে নারকেল পাতার শলা তোলাতে বসল। সের আষ্টেক হয়েছে, আর সের দুয়েক হলে হাটে পাঠাতে পারে। আনা দশেক পয়সা হলে অনেক কাজ হবে, এখন একজনের খরচ বাড়ল আবার। দুঃখের নয় বটে, তবে কতকটা চিন্তার। জীবনকেই চালাতে হবে। তারা যখন খেয়ে আছে তখন অভাবের কথাটা সত্য সত্য আর জানায় কি করে দিবাকরকে।

সন্ধ্যার পর জীবনকে আজ আর দেখা গেল না। নির্দিষ্ট স্থানে হোগলার বিছানাখানা খালি পড়ে আছে। কনক ভাবল, ও বুঝি রাগ করেছে—দিবাকর ভাবল, বেশ হয়েছে।

কিন্তু জীবন এ সব ভাবছে না এখন। সে একটা লম্ফ জ্বালিয়ে বিলের চরে হেউটি বনের ধারে ফড়িং ধরতে ব্যস্ত। আলো দেখে জংলা ফড়িং উড়ে উড়ে আসছে, জীবন তাদের ঠ্যাং ভেঙে একটা মেটে ঘটে পুরে রাখছে। কিছু বঁড়শি পাততে হবে, কেবল কৈ মাছ
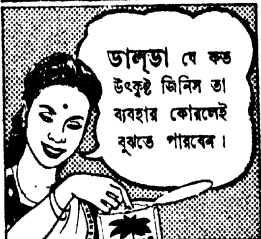
ধরা জালের ওপর নির্ভর করলে কাল আর হাঁড়ি চড়বে না। মহা দায়িত্ব পড়েছে তার মাথায়।

সারা রাত ধরে কি যে অমানুষিক পরিশ্রম করল জীবন তা কেউ চোখে না দেখলে বুঝবে না। জন-মানুষহীন নিঃসংগ বিলে সে ছোট্ট নায়ে বন-জংগলের দাম ঠেলে চলল লগি মেরে। স্থান বুঝে সে জাল পাতল জলে। বঁড়শি ফেলল ঘাস বনের কোলে। এখন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হবে একা-একা। শুধু জাল পাতা থাকলে সে চলে যেতে পারত, বঁড়শিতে মাছ গাঁথলে ছাড়াবে কে?

ফুটফুটে জোনাকের চাদর মুড়ি দিয়ে যেন বিলটা ঘুমাচ্ছে। চারিদিকে সাড়াশব্দ নেই। তবু যেন প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে পোকা-মাকড়ের ডাকে। শিকারী মাছ ঝাঁপিয়ে পড়ছে কলমীদলের ওপর। এই পোকা-মাকড় ও মাছ সকলেই আহারের জন্ত ব্যগ্র। ব্যগ্র নিজেকে নিয়ে। জীবনও ছুটে এসেছে সেই আহারের অন্বেষণে। তবে তার চিন্তা পরের জন্তই বেশী—অর্থাৎ দিবাকরের জন্ত। কনক আর সে যেন একই স্বার্থে একীভূত হয়ে গেছে। অতএব তার কথা সে পৃথক্ করে ভাবতে পারে না।

জীবন জ্যোৎস্নাময়ী বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে আপন-মনে গুঞ্জন করে,—

'হায় রে এ কেমন
ভাই যেখানে পর হইল,
বুইন সেখানে আপন।'

এর কারণ কি তা সে খোঁজ করে না, আর করতেও চায় না—শুধু অকারণ গুঞ্জন করে কালক্ষেপ করে চলে। ক্রমে এক-এক কলি ভুল ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কলিতে রূপান্তরিত হয়—

'বুইন ঠাইরইন তুমিই আমার আপন জন,...
তোমার মুখখান বুকে কইর‍্যা কাটামু জীবন।'

কিন্তু অন্তরায় দিবাকর। যে একদিন তাকে স্থান দিয়ে গিয়েছিল সে-ই চায় যে জীবন এখন স্থানচ্যুত হক। অথচ তার জন্তই রাত জাগছে জীবন। এমন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে জলে-কাদায়। এমনি আরও অনেক রাত্রিই তো নিষ্ফল হয়ে গেছে—জীবন রয়েছে দাওয়ায় ঘুমিয়ে, কনক ঘরে। কই, তার তো এমন করে আর কখনও কনকের কথা মনে পড়েনি, কাঁপেনি বুক এতটা দুরুদুরু করে, আসেনি মনে পাওয়-না-পাওয়ার প্রশ্ন। আমে-দুধে মিশে যাবে, কালই হয়ত ওরা বলে বসবে—'এখন তুমি যাইতে পার জীবন'—কিন্তু জীবন কি চলে যাবে? না, না, সে দাওয়ায় বসে তামাক সাজবে, হাবার মত ধুঁয়ো ছাড়বে, ভোর হলে চাল জোগাবে আবার। ও জেলের ছেলে, ওর ধৈর্য আছে অসাধারণ।

ভোর বেলা কনক রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠে। জীবন না এলে গতি হবে কি?

প্রেম নয়, তণ্ডুল।

সে এদিক-ওদিক, একবার ভিতর আবার বাহির করতে থাকে। দাদা তো তার ঐ সন্ধ্যার আগে দুটো মুখে দিয়েছে।

দিবাকর ভাবে এত দূর গড়িয়েছে। সে রুষ্ট হয়ে অন্ত বাড়ী চলে যায়।

সময় মত জীবন বাড়ী ফেরে। পথে দিবাকরের সংগে দেখা।

'কোথায় গেছিলি?'

মনে মনে বেশ খানিকটা ক্রুদ্ধ হয়ে জীবন জবাব দেয়, 'হাটে।'

'বেশ, বেশ।'

আরও টগ-বগ করে ওঠে জীবন।

'যাওয়ার সময় কয়েকটা কলমীর ডগা তুইল্যা লইয়া যাইস—অনেক দিন খাই নাই, বড় ভাল শাক রান্ধে কনক।'

সারা রাত্রি পরিশ্রম করে জীবন মাছ ধরেছে, হাটে গিয়ে তা আবার বেচে চাল খরিদ করেছে—তারপর আবার এই হুকুম। জলতে জলতে চলল জীবন। মুখে কিছু বলতে পারল না, কিন্তু মনে মনে যা কিছু বলার, তা বলল সহস্র বার।

দাওয়ার ওপর ঠাস করে চাল ও শাকের পোঁটলাটা রাখার শব্দ হলো।

'কে, জীবন?'

'আমারে আর ফরমাস কইর না এখন। তোমাগো জানা উচিত, গোয়ালের গরু হইলেও দুধ দিতে পারে না সারাক্ষণ।'

কনক রান্নাঘর থেকে আশ্চর্য হয়ে বেরিয়ে আসে। জীবনের পায়ের দু'তিন জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। জোঁকে ধরেছিল নিশ্চয়। কনক ঘরে ঢুকে নরম চুণ আনে। ধীরে ধীরে ক্ষত-স্থানে লাগিয়ে দেয়।

'ঠাকুর গোঁসাইর সাধের শাক ঐ, রাইন্ধো কিন্তু ভাল কইর‍্যা। পুরুষের সাধ শুনি নাই আর কখনও।'

কনক প্রলেপ দিয়ে উঠে যায়।

'খাড়াও খাড়াও—আবার তুমি দিলা পায়ে হাত, কি যে জ্বালাতন।' জীবন কনকের পায়ের ধূলা নেয় অতি সমীহ করে। 'আমি আজই ছাড়ুম এ সংসর্গ।'

সন্ধ্যা বেলা জীবন আবার প্রস্তুত হয় পরদিনের আহার্য সংগ্রহের জন্ত। সে মুখে যা-ই বলুক, তার প্রাণ কিছুতেই এ সংসর্গ ছাড়তে রাজি নয়।

আজও জ্যোৎস্না গলে পড়ছে গত রাত্রির মত। বিলটা তেমনি নিঃসংগ। জীবন দেখল 'বুইন ঠাইরইন' যেন দেবী প্রতিমার মত ভংগি করে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মপাতার ওপর। একটা পাতার ওপর নয়—যত দূর দৃষ্টি চলে সবগুলো পাতার ওপর। একি অপরূপ! জীবন ভাল করে চোখ মেলতেই তার তন্দ্রা ছুটে যায়। একটা ছিপ নড়ছে, মাছ গেঁথেছে, সে নাও ঠেলে এগিয়ে যায়।

ফেরার পথে সে আজও একটা পদ্মফুল দেখতে পায়। এখনও ফোটেনি ভাল করে—বলিষ্ঠ কোরক—ফোটার লগ্ন এসেছে। সে তুলে নেয় ঝটিতি।

ঘাটে সিক্তবসনা কনকের সাথে দেখা।

'কি তোর হাতে?'

'চেন না?'

'ফুল,—সেই অকালের পদ্ম! দিবি আমাকে জীবন?'

'বেশ, নেবা—নেও না।'

কনক এগিয়ে যায় অসংবৃত অঞ্চলে। জীবন তার হাতে ফুলটা দিয়ে চেয়ে থাকে তন্ময় হয়ে। জলে নেমে ওর আদুল দেহটা টেনে আনে পাগলের মত। খায় ঘন ঘন গোটা কয়েক চুমা। কনক

নড়ে না, ঠিক সরেও না, অথচ মাথা নুইয়ে থাকে পদ্মের ডাঁটার মত।

ক্ষণিকে জীবন বুঝতে পারে কনক আরও জানি কি চায়—ওর বুকের স্পন্দন, এলায়িত ভংগি, জীবনকে কি জানি বলে দেয় ইসারায়। ওকে হাল্কা শোলার মত বুকে করে জীবন কূলে ওঠে।

দুজনে যখন ফিরে আসে, কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারে না। কনক ভাবে, তার গায় যা লেগেছে তা ধূলো নয়—চন্দন। জীবন ভাবে, ছিঃ ছিঃ, তার এতও অসংযম? কনক আর কেউ নয়, তার যে বুইন ঠারইন!

ভোরের আকাশটা ফাগের মত লাল হয়ে ওঠে।

পনের

জীবন রাত জেগে মাছ ধরে, ভোর না হতেই হাটে যায়—আবার ঠিক সন্ধ্যা বেলাই তৈরী হয় পরদিনের অভিযানের জন্য। দিবাকর রীতিমত গর্ব বোধ করে। তার দৃঢ়তার দরুণই এমন পরিবর্ত্তন ঘটেছে। শাসন কড়া হলে বন্য পশুও বশ মানে—সময়ে চলে সময় বুঝে।

দিবাকর মনের আনন্দে দু'দিন কাটায়। দু'দিন বাদেই তার আবার সময় কাটতে চায় না। মনে জাগে নানা কথা—সব চেয়ে বেশী করে মুক্তার কথা। সে আর কেন আসে না? কবে যাবে, ক'দিনই বা এখানে থাকবে? তার ওপর রাগ করেই কি এদিক মাড়ায় না? ঘুরে-ফিরে দিবাকর যখনই বাড়ী আসে তখনই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হতো মুক্তার কথা। কিন্তু কার কাছে জিজ্ঞাসা করবে? কনকের কাছে—ঐ মুখরা মেয়েটার কাছে? তার ভয় হয়। অথচ বিষয়টা তেমন কিছুই নয়। এ ভয় বা সংকোচের হেতু কি? মুক্তা বিবাহিতা আর ও অবিবাহিত—এই সামান্য সংস্কার তো! নইলে আগে মুক্তা এ-বাড়ী আসত যখন-তখন। সোজা-বাঁকা নানান ছাঁদের কথা বলত—কাটিয়ে যেত অনেকক্ষণ। দিবাকরের অবচেতন মন তেমনি করেই মুক্তাকে পেতে চায়। আগ্রহ আরও উগ্র হয়েছে তার অভিনব যৌবন দেখে। ভাল করে দিবাকর এ সব বুঝতে পারে না। কিন্তু দারুণ ব্যাকুলতা অনুভব করে। তার বিচারক মন যখন বিবাহের সংস্কারকে অচল বলে উড়িয়ে দিতে চায়, তখন তার গেঁয়ো মন ভয়ে নুয়ে পড়ে—রীতিমত দ্বন্দ্ব করে।

হঠাৎ একদিন আবার দিবাকরের নজরে পড়ে, কনকের খোঁপায় শ্বেত পদ্ম। কালো চুলে যেন একটা শাদা বড় প্রজাপতি এসে বসেছে। সে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

সবে সন্ধ্যাকাল, প্রদীপ ধরিয়েছে কনক,—কনকের ডাক পড়ে।

'এ সব কি কনক?'

'কি সব দাদা?'

সঠিক জবাবটা না দিয়ে দিবাকর ভিন্ন প্রশ্নে যায়। 'জানিস তুই কোন ঘরের মাইয়া, কোন বংশে তোর জন্ম?'

কনক একটু থতমত খেয়েই রুখে দাঁড়ায়। 'ক্যান, হইছে কি?'

'তুই আবার খোঁপায় ফুল পরছ। আসুক হারামজাদা—আসুক আগে।'

'মুখ সামলাইয়া কথা কইও দাদা।'

'আর রূপ সামলাইয়া চইল্যো গোঁসাই।'···মুক্তা এসে উপস্থিত হয়। 'জীবন দেছে ফুল, তুমি যে খাইছ কুল;—চালুনী হইয়া সুঁইচেরে খোঁটা দেও?'

'চুপ কর মুক্তা, সব সময় ফাজলামি ভাল লাগে না।'

'আমি না হয় চুপ করলাম, কিন্তু তপ্ত তাওয়ায় চড়াইয়া তুমি জেন্ত কৈ মাছ ভাজ ক্যান?'

'কারে ভাজি আমি, কি যে সব আবোল-তাবোল কইস?'

মুক্তা চোখের ঠারে কনককে যেতে বলে। তারপর নিম্ন কণ্ঠে, তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দেয়, 'ভাজ কারে জান না? সত্য কইয়্যা কও তো গোঁসাই?' মুক্তা এগিয়ে আসে। 'কও তো আমার গা ছুঁইয়া।'

দিবাকর হেসে ফেলে।

'তুমি তো হাসো, কিন্তু তাওয়ার কই তো জ্বলে।' হুঁকোটা অজ্ঞ মুক্তার চোখে টলটল করে। 'যাউক গিয়া এ সব কথা, বুইনেরে বিয়া দেও।'

'বিধবারে!···

'দরকার হইলে সধবারই বা বিয়ায় দোষ কি?' মুক্তা ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্ত যুক্তির জোরে বলে, 'সব পুরুষ পুরুষ না, তুমি আবার পুরুষের মধ্যে সিংহ, তুমি ক্যান চলতে চাও ছাগলের মত একদলে—অবিচারের পথে? এখানে যে আইনের হইছে বে-আইনী প্রয়োগ।'

এতক্ষণে দিবাকর বুঝল মুক্তা এ-বাড়ী আসুক কিম্বা না-আসুক, খোঁজ রাখে সবই। কনকের সংগে ওর যে ভাব ছিল বাল্যে, এখন তার গভীর পরিণতি হয়েছে যৌবনে। মুক্তার যুক্তির বিরুদ্ধে হঠাৎ কোনও যুক্তি খুঁজে পায় না দিবাকর।

'কনকেরে তো শিকার করছিল এক বক্র ভাম আড়াইশ' টাকার জোরে—আর আমার কথা থাউক, তুমি তো খোঁজ লও না কিছু।··· অর্থ দিয়া বিত্ত কেনা যায়, কিন্তু আমরা বিত্ত না গোঁসাই, মানুষ। হুঁস হয়েছে আমাগো, চিত্তে জ্বলে চিতা, সেই আগুনে পোড়ামু যত কুল। এখন আর কালি দিমু না, কুলের মূল অগ্রধাবে পোড়ামু।' শেষের কথা কটি বলার সময় মুক্তার সুমুখের দাঁত চারটিতে একটা ঘর্ষণের শব্দ হয়।

চমকে দিবাকর চেয়ে দেখে যে মুক্তার প্রদীপোদ্ভাসিত দন্তে এ রূপের দ্যুতি নয়, খেলছে যেন হিংসার বাঁকা তলোয়ার।

দিবাকর ভীরু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'তবে সেদিন যে নাচাইলি ব্রজরে?'

'নাচামু কি? পয়সায়ালা মহাজন পাইলে বেশ্যায়ও তো নাচায়—আমি তো বিয়া-করা ইস্তিরি, খরিদা-বিত্ত!'

দিবাকরের জিভ আড়ষ্ট হয়ে থাকে। একটি কথাও জোগায় না তার মুখে।

মুক্তা বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। সে যেন কনককে কি বলে চলে যায়।

দিবাকর অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকে। জীবন এসে নিঃশব্দে তার হাতে হুঁকোটা দিয়ে যায়। একটু একটু করে রাত বেড়ে চলে। কখন যেন সস্নেহে দিবাকর ডাকে, 'কনক!'

'কি, ডাকো ক্যান দাদা?'

'ডাকি তো···'

কনক দাঁড়িয়ে থাকে।

'তোর তা হইলে বিয়া হয় নাই, কি কইস?' হুঁকোটা বেড়ার বাতার সংগে ঝুলিয়ে রেখে পুনরায় দিবাকর সখেদে বলে, 'ঠিকে ভুল আমরা এমনও করি! সত্য ঘটনাডা এখন ক'তো বুইন শুনি?'

কনক লজ্জা না করে বা অতিরিক্ত উত্তেজনা না দেখিয়ে স্পষ্টভাবে বিয়ের কাহিনীটা বলে যায়।

পরদিন মুক্তাকে ডেকে দিবাকর বলে, 'তোর কথাই রাখুম—এক পক্ষের মধ্যেই আমি কনকের বিয়া দিমু।'

'এক রক্তের বুইন, বেবস্থা তার নগদ-ছগদ—কিন্তু পরের অবস্থা যে আরও কাহিল, সেদিকে তো খেয়াল নাই গোঁসাইর।'

মুক্তার কথার জবাব না দিয়ে দিবাকর তার নিজের বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি করে, 'দোষ শুধু মামা-মামীরই না, আমারও আছে···'

'তার বুঝি প্রায়শ্চিত্ত করবা? করো গোঁসাই, যত শীগগির পার করো—জীবন যে এক জনের যায়।'

বাঁশ-বাগানের পথ—জনহীন। ভোরের উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে মুক্তার মুখে, চোখে ও কপোলে। ললাটে সিঁথিতে ঝলমল করছে রাঙা সিঁদুর। মুক্তা শুধু রূপসী নয়, আকর্ষণ ওর অদ্ভুত।

দিবাকরের হৃদয়ের হঠাৎ অর্গল মুক্ত হয়ে যায়। 'তুই কি চাইস্—যা চাও, তা কি বুইঝ্যা চাও, না মসকরা করো ক্যাবল? যাবি আমার সংগে যেদিকে দুই চোখ যায়?'

'এখনি চলো, আমি রাজি।'

'ভাইব্যা দেখছ অগ্র-পশ্চাৎ?'

'ভাল যে বাসে, সে তো ভাবে না। তবু আমি ভাবছি, ভাইব্যা দেখছি বিস্তর—তুমি ভিন্ন গতি নাই আমার।'

কথাগুলো ভাবপ্রবণ মনের উচ্ছ্বাস বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু এর একটি কথাও তো মিথ্যা নয়। এমন যা যথার্থ সত্য তাকে কি করে উপেক্ষা করবে দিবাকর? উপেক্ষা সে অনেক করেছে, তবু অপেক্ষা করে, দিনের পর দিন মাসের পর বর্ষ কাটিয়ে যৌবনের উগ্র সন্ধিক্ষণে এসেছে মুক্তা। সে দুর্বহ সামাজিক অনুশাসন মানবে না। ভাঙবে, সে শিকল ভাঙবে। কনকও তো মুক্তার আর একটি সংস্করণ। একজনের দাবী যখন দিবাকর মেনে নিচ্ছে অপরেরটা সে অগ্রাহ্য করবে কোন অজুহাতে? কি যুক্তির বলে সে মুক্তাকে মুক্তি দেবে না?

এমন দু'-একটা পৌরাণিক গল্প সে জানে। রাজকুমারী অথবা ঋষিকুমারী বিপ্লব এনেছে সমাজে। কেউ বা সুখী হয়েছে, যুদ্ধ করে স্বীকৃতি পেয়েছে, কেউ আবার তা পায়নি। না পেলেও তারা জীবন্ত ও জ্বলন্ত হয়ে রয়েছে আজও। দিবাকর দু'জনকেই সুবিধা দেবে। তার বিপ্লবী মন অন্যায়কে কখন সমর্থন করবে না। সে বিধবা বোনকে বিয়ে দেবে, সধবা মুক্তাকে গ্রহণ করবে শাস্ত্রমত, যুক্তি দেখিয়ে। সে ভীরুর মত পালিয়ে যাবে না ওকে নিয়ে ভিন্ন দেশে।

মুক্তা দিবাকরের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ায়। এই স্বর্ণাভ রৌদ্র কিরণে মনে হয় ও যেন একটা কস্তুরী মৃগী। এসেছে স্মরণের সময়—মরণের মহালগ্ন।

দিবাকরের বর্বর মন নির্দেশ দেয়, এগিয়ে যাও, জবাব দাও, ভুললে চলবে কেন—আসলে তুমি যে পুরুষ। বুঝতে পারছ না?

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP

সে মুক্তার একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে। ধরে, নিজেকে সামলায়। তার মার্জিত মন সহিষ্ণুতার আশ্রয় নেয়।

'চলো গোঁসাই, দেরী কর ক্যান?'

'সবুর মুক্তা, সবুর।'

'ক্যান, আবার সবুর ক্যান?'

'সবুরেই যে মেওয়া ফলে।'

'হাসাইলা গোঁসাই, ক্যাবল কথা, সংসাহস নাই—দেরীতে মেওয়া না ফইল্যা ডোয়াও তো ফলতে পারে। তা কিন্তু টক, অখাদ্য। ছাড় ছাড়, হাত ছাড়, তুমি আমার অযোগ্য।' মুক্তা ত্বরিত পদে চলে যায়। দিবাকর অপমানে এতটুকু হয়ে থাকে। ভোরের আলো ম্লান হয়ে আসে।

পরদিন আর মুক্তাকে দেখা যায় না।

'কনক···।'

'সে তো কাইল চইল্যা গেছে দাদা।' বুদ্ধিমতী কনক অনুমানের ওপর নির্ভর করে সঠিক জবাবটাই দেয়।

'কার সংগে?'

'একা, একা।'

'ব্রজ?'

'সে গেছে অনেক আগে—আইশ্তাই। কমু কি, অনেক দুঃখে হাস আসে। মুক্তা কয় কি জান দাদা—ওনার নাকি হাত নিসপিস করে একটা দিনও বাদ গেলে। হাটেও যাওয়া চাই, হাটুয়া কিল গুঁতা খাওয়া চাই—ওনার জন্ম নাকি চোরাঙ্গণে।'

'একেবারে অপদাথ!' মন্তব্যটা শুনে কনক বুঝতে পারে দিবাকরের অন্তঃস্থলটা পর্যন্ত যেন বিকৃত হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ রাগ করে যে মুক্তা চলে গেল, এর জন্ত কে দায়ী? মুক্তা। এতটুকু সহিষ্ণুতা নেই, ধৈর্য নেই ভিল প্রমাণ—শুধু মান আর অভিমান। দিবাকর তো সংকল্প করেছিল, রাজিও হয়েছিল ওকে সুখী করতে। কিন্তু মুক্তা তো ওকে সময় দিল না, নুড়ির মত পায় ঠেলে গেল অযোগ্য বলে। পুরুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় অপমান আর কি আছে? দোষ তো মুক্তারই।

কিন্তু দুঃখ হচ্ছে কেন, কেনই বা হচ্ছে আপশোষ? যাকে করল আঘাত, তারই হচ্ছে অনুশোচনা—এ তো মন্দ না? দিবাকরের হাসি পায়।

'দাদা, হাস যে একলা একলা?'

'অনেক দিন কাসন্দ খাই নাই, তুমি খাওয়াইতে পার বাইট্যা? ঢেঁকির শাক দিয়া সরষে বাটা এক চিজ—মুখে ঝাল লাগে না অথচ ঝাঁঝে পোড়ায় চক্ষু আর বুক।'

'সে ঝাঁঝ তো আমার হাতে ওঠে না—যার হাতে ওঠ্‌তো সে তো চইল্যা গেছে। এখন উপায়?'

কনক আর জবাবের জন্ত অপেক্ষা না করে রান্না-ঘরে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়। ভগিনী হয়েও সে সম্বরণ করতে পারে না এমন পরিহাসের লোভ। সে মনে মনে ভাবে, আর জল-কাসন্দ বেটে হবে কি, মন-কাসন্দের ঝাঁঝই আগে তার দাদা সামলাক।

দিবাকর স্বস্তিবোধ করতে পারে না, তার মনটা টাটায়? মুক্তা তো অপরাধী নয়, দোষ যে তারই। সে-ই তো সংকল্প করল যত সহজে, প্রস্তাব করল যত আগ্রহ দেখিয়ে—তত সহজে এবং সাগ্রহে তো তা কার্যকারী করে তুলতে সাহস পেল না। ধৈর্য ধারণ করা সুনীতি বটে, কিন্তু সর্বকালে সর্বস্থলে তা প্রযুজ্য নয়। অতএব মুক্তা নির্দোষী, ভুল করেছে ও।

[ক্রমশঃ।

নার্স মিত্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মেণ্টাল অবজারভেটরি। ছবির মত ঝকঝক করছে বাড়িটা। সামনে পিছনে বাগান। দু'দিকের রাস্তাগুলো যেন কালো বার্ণিশ করা। ভিতরে জনা চল্লিশেক রোগী। রোগী বলা ঠিক হবে না। রোগিণীও আছে চৌদ্দ-পনের জন। আলাদা আলাদা ঘর। মস্তিষ্ক-বিকৃতির কারণ সকলের এক নয়। চিকিৎসা ব্যবস্থাও বিভিন্ন।

অদূরে নার্স কোয়ার্টার্স। বাঙালী আর ফিরিঙ্গী মেয়ের জগা-খিচুড়ি। একে অপরের ইয়ারকি-ফাজলামোগুলো মক্স করে। দিশি মেয়ে মেম-সাহেবের বাংলা নকল করে মুখ ভেঙায়। মেম-সাহেব দিশি মেয়ের পিটে কিল বসিয়ে ছুটে পালায়। শিথিল অবকাশটুকু হাসি-ঠাট্টায় ভরাট থাকে।

তবু এরই মধ্যে এক জনকে যেন সমীহ করে চলে ওরা। বাইরে নয়, মনে মনে। ঈর্ষা বলা যেত, কিন্তু সে কথা ভাবতে নিজেরাই লজ্জা পাবে। রেখা মিত্র, সিষ্টার-ইন্‌চার্জ। কর্তামো করে এ অপবাদ তার শত্রুও দেবে না। আগের বুড়ি ইন-চার্জ যা ছিল, বাবা! নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছাড়ত। এ বরং ভালো, দরকার হলে উল্টে অকপে আসা যায়। তাছাড়া ছিল তো ওদেরই একজন, এখন না হয় মাথার ওপর উঠে বসেছে। চ্যারিটি মিশনের মেয়ে না হলে এতদিনে বাড়ি-গাড়িওয়ালা ঘরে বরে ভরে যেত কোন কালে এ সকলেই উপলব্ধি করতে পারে। সারা দেহে রূপ আর স্বাস্থ্য যেন একসঙ্গে মাথা খুঁড়ছে। কিন্তু এ নিয়েও কটাক্ষ করে না কেউ। কারণ নিজেই সে নিজেকে আগলে রাখতে ব্যস্ত। প্রাচুর্যের আভাসটুকু অবশ্য ঢেকে রাখা সম্ভব নয়।

হাসপাতালের বড় কর্তা মনস্তাত্বিক কর্ণেল পাকড়াশী। নামের মত মানুষটিও গুরুগম্ভীর। কাছে এলেই বুকের ভেতরটা গুর-গুর করে ওঠে। নার্স, এ্যাসিসট্যান্ট সকলেরই। তাঁরই দু'-দুটো উদ্ভট এক্সপেরিমেণ্ট সফল করেছে রেখা মিত্র। নির্দেশ মত নিখুঁত অভিনয় করেছে। এতটুকু ভুল হয়নি, এতটুকু ত্রুটি ঘটেনি। এক বছরের মধ্যে পর পর দু'জন মৃত্যুপথযাত্রী বিকৃত-মস্তিষ্ক মানুষ সুস্থ নিরাময় হয়ে ঘরে ফিরে গেল। কর্ণেল পাকড়াশী লিপিবদ্ধ করছেন তাঁর গবেষণার ইতিবৃত্ত। হয়ত রেখা মিত্রের নাম থাকবে তাতে। কিন্তু ইতিমধ্যে তৃতীয় রোগীর

আবির্ভাব ঘটল। একই রোগ, একই কারণে মস্তিষ্ক-বিকৃতি। কর্ণেলের আগ্রহ বাড়ে। রেখা মিত্রর ডাক পড়ে তৃতীয় বারও।

প্রথম সফলতার পরে সহকর্মিণীদের মনে হয়েছে' মেয়েটা যেন বদলেছে একটু। দ্বিতীয় বারের পরিবর্তন আরো সুস্পষ্ট। কথা বলা কমিয়েছে। অকারণ হাসি-খুশীটুকুও। চলনে-বলনে কেমন যেন একটু বিচ্ছিন্নতা। ফিবিজি মেয়েরা সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে তাকে। স্বজাতীয়াদের মধ্যে চাপা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে ফেলে কেউ কেউ, যশস্বিনী হয়ে পড়েছেন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে, মাটিতে পা পড়বে কেন!

কর্তব্য বোধে আর এক জন হয়ত থামাতে চেষ্টা করে তাকে, এই, শুনলে দেবে'খন।

—শুনুক, কর্ণেলের পকেট-ঘড়ি হয়ে থাকলে অমন বরাত সকলেরই খুলত।

—যাঃ, মেয়ের মত মানুষ করেছে, কি আবোল-তাবোল বকিস? বিরক্তি প্রকাশ করেছিল নার্স মহলের দ্বিতীয় তারকা বীণা সরকার। শিক্ষা এবং রুচিজ্ঞান আছে। বুড়ি সিষ্টার-ইন্‌চার্জের পর সেই হতে পারত সর্বেসর্বা। কিন্তু দু'বছর আগে কোথা থেকে ছুট করে বদলি হয়ে এলেন কর্ণেল, সঙ্গে এল রেখা মিত্র। তার দিন গেল।

এরই মুখ থেকে প্রতিবাদ শুনে পূর্বোক্ত সুশ্রূষাকারিণী চুপষে গেল যেন। প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল, সে কথা কে বলেছে, আমি বলছিলাম অমন জয়ঢাক বাজাবারও কোন মানে হয় না। আসলে পুরুষগুলিই সব ভেড়া-মার্কা, রূপসীর মুখে দু'টো নকল ভালবাসার কথা শুনেই গলে জল হয়ে গেল। পাগল না হাতী!

কিন্তু এও যে রাগের কথা সকলেই উপলব্ধি করতে পারে! দ্বিতীয় রোগীটির ভার কর্ণেল প্রথমে বীণা সরকারকেই দিয়েছিলেন। রেখা মিত্রর মতই সুনাম অর্জনের আশায় প্রাণপণ চেষ্টা করেছে কর্ণেলের নির্দেশ কলের মত মেনে চলতে। অভিনয়ে এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না তারও। তবু পারল না। তাকে সরিয়ে কর্ণেল রেখাকে নিয়ে এলেন আবার। এখনো ভেবে পায় না, সেই মুমূর্ষু উন্মাদকেও সে কি করে ছ'মাসের মধ্যে একটু একটু করে সম্পূর্ণ নীরোগ করে তুলল।

দুর্নিবার কৌতূহলে ঠাট্টার ছলেই সে রেখাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করে কি করলি রে?

নিজের ঘরের চৌকাঠের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল রেখা মিত্র। প্রশ্ন শুনে তার চোখে চোখ রেখে নীরবে চেয়েছিল কিছুক্ষণ। পরে তেমনি হাল্‌কা জবাবই দিয়েছে, গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, ভালবাসি প্রিয়তম, আগের সব কথা ভোলো—।

বীণা হেসে ফেলেছিল।—ভুলল?

শব্দ করে হেসে উঠেছিল রেখা মিত্রও।—ভুললই তো।

বীণার মনে হয়েছে, ইচ্ছে করেই সে তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল, যশের ডালি ভবিষ্যতেও আর কাউকে ভাগ করে দিতে রাজি নয় বোধ হয়। ভ্রূ কুঁচকে বলল, তা এমন অভিনয় করিস যদি থিয়েটার-বায়স্কোপে ঢুকে পড় গে যা না, হাসপাতালে পচে মরছিস্‌ কেন?

—পারি। হলিউড থেকে ডেকেও পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি গেলে তোর ছোট ডাক্তার হার্ট ফেল করবে, সেজন্যেই যেতে পারছি না।

হাসতে হাসতে মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। বীণা সরকার স্তব্ধ।...ছোট ডাক্তার নিখিল গুহ। রেখা মিত্র না এলে এতদিনে সত্যিই একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত। সে জ্বালা আছেই। কিন্তু তবু রাগতে পারেনি। কারণ, আজ পর্যন্ত ছোট ডাক্তার এই মেয়েটির কাছ থেকে শুধু নীরব অবহেলা ছাড়া আর কিছু পায়নি। কর্ণেলের হাতের মেয়ে না হলে এতদিন এখানে আর চাকরী করতে হত না ওকে।

কিন্তু পুরানো কথা থাক। তিন নম্বর রোগী এসেছে। তৃতীয় বার ডাক পড়েছে রেখা মিত্রর। নার্স কোয়ার্টারের আবহাওয়া চঞ্চল। কর্ণেলের তলব শুনলে পড়ি-মরি করে ছুটে যাওয়াই রীতি। কিন্তু ওর ঘরের দরজা বন্ধ এখনো। করছে কী? ঘুমুচ্ছে? না সাজছে?

কিন্তু রেখা মিত্র কিছুই করছে না। শিথিল আলস্যে স্রেফ শুয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে। বুকের ওপরের বইখানা দেখলেও সহকর্মিণীরা হাঁ করে ফেলত হয়ত। বিবেকানন্দের কর্ম-যোগ। তুলে নিল। উল্টে-পাল্টে দেখল একবার। হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ঘরের কোণে আলনার নীচে গিয়ে আশ্রয় নিল সেটা। উঠে বসল পা ঝুলিয়ে। পরনের বেশ-বাসের দিকে তাকালো একবার। চলে যাবে। ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। চোখের সামনে ভাসছে দু'টি মুখ। সমরেশ চক্রবর্তী আর মাধব সোম। সুপুরুষ দু'জনেই। কিন্তু পাগল হলে কি বীভৎসই না হয় মানুষ! প্রাণের জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে বলে গেছে। রেখা মিত্র নিজের মনেই হেসে উঠল।...তা থাকবে হয়ত।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। একটু প্রসাধন দরকার। বুড়ো কর্ণেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে আবার। চোখ নয় ত, যেন দু'খানা এক্স-রে'র কাচ। কিন্তু আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা নেমে এলো কেমন। চেয়েই আছে। দেখছে। কিন্তু কে দেখছে কাকে? কে রেখা মিত্র? ওই শুভ্রশ্রী নারীমূর্তি? কি আছে ওতে?...রক্ত, মাংস, নীল নীল কতগুলো শিরা-উপশিরা। গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে উঠল। তার পর?...শুকনো, কঠিন, কুৎসিত কঙ্কাল একটা। শিউরে উঠল আবারও। তাহলে কে দেখছে? আর বাকি থাকল কী?

দরজার গায়ে শব্দ হল ঠক্‌ ঠক্‌ করে। বিষম চমকে উঠল সে। আবার বেয়ারা পাঠিয়েছে নিশ্চয়। দরজা না খুলেই জবাব দিল, 'বলো গিয়ে এক্ষুনি যাচ্ছি—।' বুড়ো দেবে দফা সেরে। চটপট এপ্রণ পরে নিয়ে, হুডটা মাথায় চড়ালো। জুতো বদলাতে গিয়ে আলনার নীচে কর্মযোগের দুর্দশা দেখে জিব কাটল তিন আঙুল। তুলে নিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে একবার কপালে ছুঁইয়ে ড্রয়ারে রেখে দিল বইখানা।

নাকের ডগা থেকে চশমা কপালে তুলে দিলেন কর্ণেল।—বোসো। পেসেন্ট দেখেছ?

রেখা ঘাড় নাড়ল, দেখিনি।

—হাউ এ্যাবসার্ড!—এ থার্ড কন্‌সিকিউটিভ, সাকসেস্‌ উইল মেক ইউ এ ফিনিসড, এ্যাকট্রেস মাই ডিয়ার। হেসে কাজো

কথায় এলেন, সেইম্ কেস্, সেইম্ ট্রিটমেন্ট। কিন্তু একটু গণ্ডগোল আছে।···নাটক নভেল কি সব লিখত টিকত। ইউ স্টুড বি মোর এলার্ট, এমনিতেই আধ পাগল এসব লোক। টাইপ-করা কেস্-হিস্ট্রী বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে, দেখো—।

কাগজগুলো নিয়ে রেখা চোখ বুলোতে লাগল। এক অক্ষরও পড়ল না। কারণ, এবারে আর রোগী ভালো হবে না সে জানে। আর কিই বা হবে পড়ে। নিঃস্ব, রিক্ত, সর্ব্বগ্রাসী শূন্যতার মাশুল দিচ্ছে সেই ইতিহাসই তো! তাকে নতুন করে রোগে ফেলতে হবে আবার। ভালবাসার রোগ। যে নারীর অমোঘ স্মৃতি মানুষটাকে দেউলে করেছে, বিকল করেছে, তার মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। কিছুদিনের জন্য তার মানসপটে অধিষ্ঠাত্রিনী হবে রেখা মিত্র। এটুকুই চিকিৎসা। তারপর এই নতুন রোগ আর কাঁচা মোহ ছাড়াবার কলাকৌশল ভালই জানেন মনোবিজ্ঞানী কর্ণেল। বুড়োর গাম্ভীর্য্যের আড়ালে রেখা হাসছে মনে মনে। বুড়োর সকল আশায় ছাই পড়বে এবার।

কিন্তু রেখা মিত্রর সঙ্কল্পে ছেদ পড়ল বোধ করি প্রথম দিনই। দোতলায় কোণের দিকে ঘর। কান পেতেও কোন সাড়া-শব্দ পেল না। দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। স্প্রীং-বসানো দরজা আপনি আবজে যায় আবার।

বাহুতে চোখ ঢেকে শুয়ে আছে লোকটি। আধ ময়লা, রোগা, মুখে এক-আধটা বসন্তের দাগ। সুশ্রী বলা চলে না কোন রকমে। পায়ের শব্দে চোখের ওপর থেকে হাত সরালো সে। হাসল একটু, নমস্কার, বেশ ভালই আছি আমি।

আগের দু'জন রোগীর কাছে যাওয়াটাও নিরাপদ ছিল না প্রথম প্রথম। চোখে চোখ রেখে রেখা দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। সে আবার বলল, আপনাদের এই জায়গাটা ভালো, বেশ নিরিবিলি, কোন অসুবিধে হচ্ছে না আমার। চোখের ওপর হাত নেমে এলো, আচ্ছা, দরকার হলে খবর দেব'খন—।

রেখা এগিয়ে এসে রোগীর চার্ট দেখে নিল, ঠিক ঘরে এসেছে কি না। অমর দত্ত···। ঠিকই আছে। রকিং চেয়ারটায় এসে বসল। আধ ঘণ্টা কেটে গেল, টুঁ-শব্দটি নেই। স্থাণুর মত পড়ে আছে মানুষটা। তারপর এক সময় হাত সরে গেল আবার। সবিস্ময়ে তাকালো সে, কি আশ্চর্য! সেই থেকে বসে আছেন আপনি? মিথ্যে কষ্ট করছেন কেন, দরকার হলেই আমি ডাকব'খন, আপনি যান—।

বিস্মিত রেখাও কম হয়নি। —আপনি ভাবছেন কী?

অস্ফুট শব্দ করে হেসে উঠল সে।—একটা লাইন কিছুতে মনে করতে পারছি নে সেই থেকে। 'সব দিতে সব নিতে যে বাড়াল কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে···' তার পর ভুলে গেছি। রবি ঠাকুর চুরি করেছে।···চুরি ঠিক নয়, আগের ভাগেই লিখে বসে আছে। নইলে আমি লিখতুম। কিন্তু তার পরের কথাগুলো···

নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল রেখা মিত্র। স্থির নেত্রে চেয়ে রইল।

—আপনার জানা আছে? নেই, না? সুলেখা কিন্তু ফস্ করে বলে দিত।

নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে চমকে উঠল নিজেই। বিহ্বল, বিমূঢ়। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। কাঠের কঠিন কতগুলো রেখা সুস্পষ্ট হল সারা মুখে। চোখের দৃষ্টি গেল বদলে। দুই চোখে আগুনের হল্কা। ঝুঁকে এলো সামনের দিকে।

—আপনি, আপনিও তো মেয়েছেলে?

রেখা চেয়ার ছেড়ে এক পা অগ্রসর হতেই সে গর্জে উঠল আবার। —দাঁড়ান ওখানে। আমি জানতে চাই আপনি মেয়েছেলে কি না?

রেখা ঘাড় নাড়ল, মেয়েছেলেই বটে।

—যান আমার সমুখ থেকে। আর কখনো আসবেন না। মেয়েদের আমি আর দেখতে চাই নে কোন কালে। কোন দিন না। এত বড় অভিশাপ আর নেই। দাঁড়িয়ে আছেন কি? যাবেন না? যান, যান, বলছি—!

চোখে পলক পড়ে না রেখা মিত্রর। অদ্ভুত রূপান্তরটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে মানুষটা। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

দরজা খুলে রেখা বাইরে এসে দাঁড়াল। অমর দত্ত বিড়-বিড় করে বকে চলেছে তখনো। উত্তেজনা বাড়ছেই। একটা ইনজেকশান নিয়ে রেখা আবার ভিতরে এলো। কনুইয়ে ভর করে অমর দত্ত আধা-আধি উঠে বসল প্রায়।—আবার এসেছ? সুলেখা পাঠিয়েছে, কেমন? তোমাদের ভয়-ডর নেই? আমার কলমের ডগায় কত বিষ জানো?

—জানি, শুয়ে পড়ুন।

—ক্যাণ্ট, ইউ গেট্ আউট্!

ইনজেকশান আর আরকের তুলোটা এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে করে রেখা তাঁর কাঁধে আচমকা ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দিল। এ রকম একটা সবল নিষ্ঠুরতার জন্য রোগীও প্রস্তুত ছিল না। হকচকিয়ে গেল কেমন। ততক্ষণে তার সামনের বাহু উঠে এসেছে ওর শক্ত হাতের মুঠোয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ইনজেকশান শেষ।

···পাঁচ মিনিটও গেল না। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে রোগীর। তবু যতক্ষণ পারল চোখ টান করে সে দেখতে চেষ্টা করল এই নির্মম শুশ্রূষাকারিণীকে।

ইনজেকশান রেখে নীরবে অপেক্ষা করছিল রেখা। সে ঘুমিয়ে পড়তে কাছে এসে দাঁড়াল। বিছানাটা অবিন্যস্ত হয়ে আছে। টান করে দিল। চুলগুলো কপালের ওপর দিয়ে চোখে এসে পড়েছে। সরিয়ে দিল। গায়ের চাদরটা টেনে দিল বুক পর্য্যন্ত। নিঃশব্দে চেয়ে রইল তার পর। ঘুমন্ত মুখেও বহু দিনের একটা ক্লিষ্ট যাতনা সুপরিস্ফুট যেন। লোকটা ভালো কি মন্দ সে কথা এক বারও মনে আসছে না তো! তাদেরই এক জনের জন্য মানুষের সকল বৃত্তি হারাতে বসেছে। হঠাৎ মনস্তাত্ত্বিক কর্ণেলের ওপর ক্ষেপে আগুন হয়ে গেল রেখা মিত্র। তাঁর সকৌতুক কণ্ঠস্বর যেন গলানো শীষে ঢেলে দিতে লাগল কানে, এ থার্ড কন্‌সিকিউটিভ সাকসেস্···।

এর পরের দু'-তিন মাসের চিকিৎসা-পর্বে নতুন করে বর্ণনার কিছু নেই। এক নারীর স্মৃতি মনে এলেই অমর দত্ত চিৎকার-চেঁচামেচি করে ওঠে তেমনি, নিঃস্ব হিম-শীতল জীবনের হাহাকারে জলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। রেখা কখনো ঘর ছেড়ে চলে যায় তার কথা মত, কখনো বা উল্টে ধমকে ওঠে, দুষ্ট অভিভাবিকার মত, কখনো বা প্রণয়িনীর আকুলতায় কাছে এসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। শেষের দিকে একটু পরিবর্ত্তন যেন উপলব্ধি করতে পারে।

তর্জন-গর্জন তেমনি আছে, কিন্তু বেশীক্ষণ সে অনুপস্থিত থাকলে অসহিষ্ণুতাও বাড়ে।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

—বাইরে।

—কেন?

—আপনিই তো ঘর থেকে বার করে দিলেন।

—আপনি গেলেন কেন?

রেখা হেসে ফেলে, আচ্ছা, আর যাব না। কিন্তু আবারও তাকে যেতে হয়, আবারও আসতে হয়। তবু রেখা বোঝে, দিন বদলাবে। অনেক বদলাবে। কিন্তু বলে না কাউকে কিছু। কর্ণেলের নীরব প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। সহকর্মিণীদের কৌতূহলও দুর্নিবার। বিশেষ করে বীণা সরকার ছাড়বার পাত্রী নয়।

—নতুন নাগরটি কেমন?

—ভালো।

—তবু, নমুনাটা শুনিই না একটু?

—মর্কটের মত।

—আঁচড়ে কামড়ে দেয়?

—দেয়নি, দিতে পারে।

বীণা সরকার হেসে ওঠে, কিছুতে পোষ মানছে না বল্?

হেসে টিপ্পনী কাটে রেখা মিত্রও, ছোট ডাক্তারকে নিয়ে পড় গে যা না, আমাকে নিয়ে কেন—।

অমর দত্ত ভালো হবে। এবারও এই বিধিলিপি। আরও মাস দুই পরের সেই বিশেষ মুহূর্তটির অপেক্ষা শুধু। রেখা রকিং চেয়ারে বসে হাসছে মৃদু মৃদু। অল্প অল্প দুলছে চেয়ারটা। অমর দত্ত নির্নিমেষ নেত্রে তার দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখছে।

রেখা উঠে গায়ের এপ্রণটা খুলে চেয়ারের কাঁধে রাখল। মাথার ছড়টাও। খোঁপার আধখানা পিঠের ওপর ভেঙে পড়ল। বসল আবার। রকিং চেয়ার সজোরে দুলে উঠল।

—কি হল?

—গরম লাগছিল।

—হাসছেন যে?

—এমনি।

—এমনি কেউ হাসে?

—তাহলে আপনাকে দেখে।

—আমি তো কুৎসিত দেখতে।

—ছিলেন, এখন মোটামুটি মন্দ নয়।

অমর দত্তও হাসতে লাগল। একটু বাদে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনি আমার জন্য এতটা করেন কেন?

—কতটা করি?

—বলুন না শুনি?

—আপনি এক জন এত বড় লেখক, আপনার জন্য করব না তো কার জন্য করব। কত লোক কত কিছু আশা করে আপনার কাছে।

হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি খেল অমর দত্ত। সমস্ত রক্ত যেন উবে গেল মুখ থেকে। নিঃসাড়, পাণ্ডুবর্ণ। আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, এ তো সুলেখার কথা। সুলেখা বলত। আমার মত লেখক নেই, আমার জন্য সব পারা যায়, সব করা যায়—। এর পর তারই মত বলে বেড়াবেন তো, আমি গরীব, খেতে-পরতে পাই নে ভালো করে, মুখে বসন্তের দাগ, পাগল-ছাগলের মত লিখি যা মনে আসে, দুরাশা দেখে হাসি পায়—বলবেন? বলবেন তো?

স্থির, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল রেখা। উঠে কাছে এলো।—সুলেখা এসব বলেছে?

—হ্যাঁ বলেছে, সর্বত্র বলেছে, হেসে আটখানা হয়ে বলেছে। আপনিও বলবেন, হাত বাড়ালেই বলবেন—। আবার সে কাঁপতে শুরু করেছে, মুখে দুঃসহ যাতনার চিহ্ন।

কণ্ঠস্বর কান্নার মত শোনায় এবার।—আমি তো কোন অপরাধ করিনি। বুকের ভেতরটা জ্বলে-পুড়ে যেতে দেখলে আপনাদের এত আনন্দ হয় কেন? ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় হাড়-পাঁজর শুদ্ধ যখন ভেঙে দুমড়ে একাকার হয়ে যায়, সে যাতনা বোঝেন? আকণ্ঠ পিপাসায় যখন···

আর কথা বেরুল না। বাহুতে মুখ ঢেকে ফেলল সে। রেখা আস্তে আস্তে হাতখানি সরিয়ে দিল আবার। এক পা মাটিতে রেখে শয্যায় ঠেস দিয়ে বসেছে। শুভ্র, নিটোল দুই হাতে মুখখানা ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে। ঝুঁকে এলো আরো কাছে।

দু'-চার মুহূর্তের নিঃশব্দ দৃষ্টি-বিনিময়।

অমর দত্তর ঠোঁট দুটো আর একবার থর-থর করে কেঁপে উঠল শেষ বারের মত। তার পর এক বিস্মৃতিদায়িনী স্পর্শের মধ্যে নিবিড় করে আশ্রয় পেল তারা। এত কালের হাড়-কাঁপানো হিম-শীতল অনুভূতিটা যেন নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।···উষ্ণ।···নরম।··· তন্দ্রার মত।···ঘুমের মত।···ঘুমিয়েই পড়ল।

পরের ক'টা দিনের তুচ্ছতা বাদ দেওয়া যাক্। নির্দেশ মত তাকে নিয়ে বাইরে বেড়ানো, সিনেমা দেখা, থিয়েটার দেখা।

রেখা তাগিদ দিল কর্ণেলকে, এর পরে মুশকিলে পড়ব, তাড়ান শীগগির।

কর্ণেল হাসেন, ইউ প্রেটি উইচ!

রেখা প্রতিবাদ করে, ফিনিস্‌ড এ্যাক্ট্রেস্।

এর পর ক'দিন ধরে কর্ণেলের ঘরে বসে নিজের রোগজীর্ণ প্রতিচ্ছবিটি দেখেছে অমর দত্ত। বৈজ্ঞানিক রেকর্ডে নিজেরই দুই-একটা পাগলামীর নমুনা শুনে শিউরে উঠেছে। আগের দু'জন রোগীকে কি করে ভালো করেছে রেখা মিত্র তাও শুনল। সব শেষে, একই উপায়ে নিজের আরোগ্য লাভের ইতিবৃত্ত। নিপুণ মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ এবং সারগর্ভ উপদেশ শিরোধার্য করে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করল যখন, তখন মনটাই শুধু ভারাক্রান্ত হয়ে আছে ক্লান্তিকর বোঝার মত। এ ছাড়া আর কোন উপসর্গ নেই।

রেখার প্রতীক্ষা করছিল। সে এলো।

—খাবার সময় হলো, এই জন্যেই ডেকেছিলাম।···আপনাকে চিরকাল মনে থাকবে আমার।

সমরেশ চক্রবর্তী বলেছিল। মাধব সোমও বলেছিল। রেখা হাসল।—সেটা কি খুব ভালো কথা হবে?

দুই-একটা মৌন মুহূর্ত। অমর দত্ত হাত তুলে নমস্কার জানালো, আচ্ছা, চলি—।

হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করল, রেখাও—, হ্যাঁ, আসুন—।

অমর দত্তর কাহিনী শেষ হয়েছে। কিন্তু এ কাহিনী অমর দত্তর নয়। রেখা মিত্রর। অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছে বীণা সরকার, রেখা মিত্রর রোগী ভালো করবার রহস্যটুকু কি। অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছেন মনোবিজ্ঞানী কর্ণেল পাকড়াশী, কোন নির্দেশই তাঁর মেনে চলেনি রেখা মিত্র। অনেক, অনেক দেরীতে জেনেছে বাকি সকলে, রেখা মিত্র রোগী ভালো করেছে, ফাঁকি দিয়ে নয়, ভালবাসার অভিনয় করে নয়, সত্যিকারের ভালবেসে। পর-পর তিন জনকেই।

হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা আর এক জন বেড়েছে। রোগী নয়, রোগিণী। সে রেখা মিত্র।

জ্বরে

শ্রীঅরুণেন্দু দাস

একমুঠো রোদ ছড়িয়ে দিলেম তোমার মুখ
ছবির মতন কাঁপছে এখন কাঁপছে বুক
গভীর চাওয়ার নিবিড় পাওয়ার এই ত ক্ষণ
সামনে আরও—করবে আরও সম্মোহন।

টুকরো কথার ক্ষণিক ব্যথার তপ্ত ছাপ
পরিচয়ের গণ্ডী ছেড়েও আরেক ধাপ
আরও নামা অনেক নামা অনেক দূর
ঝরণা-ঝিলিক মনের কোণের সৃষ্টি সুর।

ক্লান্ত আমার ক্লান্ত সীমায় আর না নয়
ক্ষণিক মোহের বাঁধন সে ত অগাধ ক্ষয়—
একটু সবুজ একটু ছায়ার আঁচলা-জল
এইত চাওয়ার দোলায় কাঁপে এমন তল।

নীলের মায়ায় নীড়ের আশায় অনেক দিন
নিজের সাথেই নিজেই যুঝে অনেক ক্ষীণ
ভাবনা-ভেলায় দোদুল দোলায় আর না নয়
এবার অতল অগাধ মাঝে ডুবের লয়।

নীরব দুপুর একলা ঘরের এই প্রলাপ:
থর-থরোথর কাঁপছে দেহ বাড়ছে তাপ।

"সত্যিই...
লাক্স
টয়লেট্
সাবান
মেখে আপনি
আরও সুন্দর
হ'তে পারেন"
শ্যামা বলেন
"আমি দেখি যে লাক্সের ত্বক্-
পোষক ক্রিয়া আমার গায়ের
রঙের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন
এনে দেয়" শ্যামা বলেন।
"প্রত্যহ এই বিশুদ্ধ, সাদা
গায়ে-মাথার সাবান ব্যব-
হারের ফলে আমার ত্বক্ অত্যন্ত
কোমল ও মসৃণ্ থাকে।"
LUX
TOILET SOAP
যতো সাদা, ততো বিশুদ্ধ, তেমনি সুগন্ধ

[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সাত

'শতদল বাবু বাড়িতে ফিরে এসেছেন অবিনাশ?—' দ্বিতীয় প্রশ্ন করল কিরীটি অবিনাশের দিকে তাকিয়ে।

'আজ্ঞে, কই না। দাদাবাবু তো এখনো ফেরেননি বাবু।—' মৃদু কণ্ঠে অবিনাশ জবাব দিল।

'কখন ফিরবেন কিছু বলে গিয়েছেন?—' কিরীটি অবিনাশকেই পুনরায় জিজ্ঞাসা করে।

'আজ্ঞে না। তা ত কিছুই বলে যাননি—'

'কোথায় গিয়েছেন তুমি জান?—'

'না।—'

অতঃপর কিরীটি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'চল্ সু, ভিতরে গিয়ে বসা যাক। এখুনি হয়ত শতদল বাবু এসে পড়বেন—চলুন সীতা দেবী।—'

সকলে আমরা অন্দরের দিকে অগ্রসর হলাম। অন্ধকার বারান্দাটা। আগে আগে হ্যারিকেন বাতিটা হাতে ঝুলিয়ে চলেছে অবিনাশ, পশ্চাতে আমরা তিন জন। বেশী দূর অগ্রসর হইনি, একটা খস্‌খস্ শব্দ শুনে সামনের দিকে তাকাতেই অস্বচ্ছ আলোকিত বারান্দা-পথে নজর পড়ল ইনভ্যালিড চেয়ারটার 'পরে উপবিষ্ট পক্ষাঘাতে চলচ্ছক্তিহীন হিরণ্ময়ী দেবী দুই হাতে মন্থর গতিতে উপবিষ্ট চেয়ারটার দুই পাশের চাকা দু'টো দু'পাশের হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে ঘোরাতে ঘোরাতে ঐ দিকেই এগিয়ে আসছেন।

সকলের আগে ছিল হ্যারিকেন হাতে অবিনাশ, তাকেই প্রশ্ন করলেন উদ্বেগাকুল কণ্ঠে হিরণ্ময়ী দেবী: 'অবিনাশ। সীতা এলো?'

অবিনাশ জবাব দেবার আগেই সীতা জবাব দেয়, 'এই যে মা এসেছি আমি—' বলতে বলতে সামনের দিকে সে এগিয়ে যায়।

অন্ধকারে পশ্চাতে বোধ হয় আমাকে ও কিরীটিকে দেখতে পাননি প্রথমটায় হিরণ্ময়ী দেবী। তাঁর রুক্ষ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এত রাত করে কোথায় ছিলে শুনি?—' কিন্তু পরক্ষণেই কিরীটিকে সীতার পশ্চাতে দণ্ডায়মান দেখে হিরণ্ময়ী দেবীর কণ্ঠের ক্ষণপূর্বের সমস্ত বিরক্তি যেন নিমেষে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল এবং এবারে আর কন্যাকে নয়, কিরীটিকেই সম্বোধন করে প্রশান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন: 'এ কি! কিরীটি বাবু নাকি! আসুন, আসুন!—কোথায় দেখা হলো আপনাদের সঙ্গে ওর?'

'তুমি ওদের ভিতরে নিয়ে এসো মা! আমি চায়ের জল চাপাচ্ছি।—' কথাগুলো বলে সীতা সহসা অন্ধকারে বেশ যেন দ্রুত পদবিক্ষেপেই অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

'তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টি কন্যার গমন-পথের দিকে মুহূর্তের জন্য নিক্ষেপ করে হিরণ্ময়ী দেবী আমাদের দিকে আবার ফিরে তাকালেন। ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারটার হ্যাণ্ডেলের 'পরে রক্ষিত দুই হাতের মুষ্টি দু'টো মনে হলো যেন মুহূর্তের জন্য কঠিন হ'য়ে আবার শ্লথ হ'য়ে গেল। এবং এবারে অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে কিরীটিকেই লক্ষ্য করে বললেন, 'চলুন মিঃ রায়, শতদলের কাছেই বোধ হয় এসেছেন। সে বোধ হয়ত বাড়িতে নেই—' ক্ষণপূর্বের বিরক্তির লেশ মাত্রও কণ্ঠস্বরে নেই।

সকলে আবার ভিতরের দিকে অগ্রসর হলাম। অবিনাশ আগে আগে আলো দেখিয়ে চলল। সকলের আগে হিরণ্ময়ী দেবীর চলমান ইনভ্যালিড চেয়ারটার পাশাপাশি হেঁটে চলেছে কিরীটি। পশ্চাতে আমি।

'আপনাদের এদিকেই আসছিলাম। পথেই আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'তে তাঁরই মুখে শুনলাম শতদল বাবু বাড়িতে নেই।—' কিরীটি এতক্ষণে কথা বললে।

'গত রাত্রের ব্যাপার বোধ হয় তাহলে সীতার মুখেই সব শুনেছেন মিঃ রায়?—'

'হাঁ, শুনলাম!—' মৃদু স্বরে জবাব দেয় কিরীটি।

'এর পর আর এ-বাড়িতে বাস করা খুব বিবেচনার কাজ হবে না—আপনি কি বলেন কিরীটি বাবু?—'

'খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই?—'

'কি বলছেন আপনি মিঃ রায়? এই সেদিন রাত্রে শতদলের ঘরে কে বন্দুক ছুঁড়লো এবং শতদলের মুখেই কালকের রাত্রের ঘটনার পর আজ সকালে শুনলাম ইতিপূর্বেও নাকি তার উপরে আক্রমণ হয়েছিল—'

'সে তো তার জীবনের 'পরে attempt হয়েছিল—' জবাব দিলাম আমি।

'কিন্তু কাল রাত্রের ঘটনাটা! সীতার কুকুরটাকে গুলী করেছে। এক বাড়িতে যখন আছি ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘাড়েও বা বিপদ আসতে কতক্ষণ? আমিও ওকে আজ স্পষ্টই বলে দিয়েছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ-বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাবো। সুখের চাইতে স্বোয়াস্তি ভাল—কি বলেন মিঃ রায়?—'

'তা তো বটেই!—' কিরীটি জবাব দেয় মৃদু কণ্ঠে।

আমরা সকলে এসে হরবিলাস বাবুর ঘরেই ঢুকলাম। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই নজরে পড়ল হিরণ্ময়ী দেবীর পূর্বেকার ঘরের মত এ ঘরখানির মধ্যেও রুচিসম্মত পরিচ্ছন্নতা। দু'দিনের মধ্যেই ঘরখানি তিনি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন, তবে এ ঘরেও লক্ষ্য

করলাম জানালাগুলো প্রায় সবই ভিতর হতে বন্ধ। ঘরের মধ্যে একটা বদ্ধ বায়ু যেন থম্‌-থম্‌ করছে।

'বসুন মিঃ রায়! বসুন সুব্রত বাবু!—'

হিরণ্ময়ী দেবীর আহ্বানে আমরা দু'জনে দু'খানা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন করলুম।

ঘরের সিলিং থেকে একটা প্রকাণ্ড গোলাকৃতি শাদা ডুমের মধ্যে চারটে মোমবাতি জ্বলছে। এবং তাতেই ঘরটা বেশ পরিষ্কার ভাবেই যেন আলোকিত হ'য়ে উঠেছে।

ঘরে প্রবেশ করতেই দেওয়ালে টাঙ্গানো কয়েকখানা চিত্র দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তার মধ্যে গোটা দুই ল্যাণ্ডস্কেপ্ এবং বাকি দু'টো অল্পবয়সী দুই নারীর অয়েল পেনটিং।

দু'টি নারী-প্রতিকৃতি একটু নজর দিয়ে দেখলেই মনে হবে দু'টি যেন যমজ বোন। মুখের চেহারাও হুবহু বলতে গেলে প্রায় একই, এমন কি তাকাবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত যেন এক। কিরীটিকে কথাটা বলবো ভেবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি একদৃষ্টে সে ঐ ছবি দু'খানার দিকেই তাকিয়ে আছে। ছবি দু'টো তাহ'লে কিরীটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি। ট্রেতে করে টি-পট ও অন্যান্য চায়ের সরঞ্জাম হাতে এমন সময় সীতা এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যস্থিত টেবিলের 'পরে চায়ের সরঞ্জাম রেখে সীতা কাপে কাপে চা ঢালতে লাগল।

সহসা কিরীটি হিরণ্ময়ী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'ঐ দেওয়ালের অয়েল পেনটিং দু'টো কার মিসেস্ ঘোষ?—'

কিরীটির প্রশ্নে যেন চম্‌কে তাকালেন হিরণ্ময়ী দেবী দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো ছবি দু'টোর দিকে।

'দেখলে মনে হয় যেন একই জনের দু'টি প্রতিকৃতি—' কিরীটি আবার মন্তব্য করে।

'জানি না ও কার ছবি?—' মৃদু কণ্ঠে হিরণ্ময়ী দেবী জবাব দিলেন।

'শতদল বাবুর মা তো আপনার ভাইঝি, তাই না?—'

কিরীটির এবারকার প্রশ্নে কিরীটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করেই ইতিমধ্যে অর্ধসমাপ্ত যে উলের বুননটা কোলের মধ্যে ছিল সেটা তুলে নিয়ে অভ্যস্ত ক্ষিপ্র হস্তে বুনতে বুনতে মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন হিরণ্ময়ী দেবী, 'হাঁ!'

'তাঁকে মানে শতদল বাবুর মাকে আপনি দেখেননি?—'

'খুব ছোট—যখন তার তিন বছর বয়স হবে সেই সময়ই তাকে দেখি, তার পর আর দেখিনি। তার বিবাহের সময়ও আসতে পারিনি—পরে আর দেখা-সাক্ষাৎই হয়নি। শতদলের যখন বছর তিনেক বয়স তখুনি তো সে মারা যায়।—' কথাগুলো যেন একটানা সুরে কতকটা বলে গেলেন হিরণ্ময়ী দেবী।

'আপনার ভায়েরও ঐ একটি মাত্র মেয়েই ছিলেন, তাই না?—'

'না। দাদার দুই মেয়ে ছিল। বনলতা আর সোমলতা। সোমলতা বনলতার ৪।৫ বছরের ছোট, তাকে আমি কোন দিনও দেখিনি।—'

'তিনি মানে বনলতা দেবী—চৌধুরী মশাইয়ের ছোট মেয়ে বেঁচে আছেন কি?—'

'না।—' সহসা হিরণ্ময়ী দেবীর কণ্ঠস্বরটা কেমন ন রুক্ষ শোনাল।

'হিরণ্ময়ী দেবীর আকস্মিক কর্কশ কণ্ঠে আমি চম্‌কে ওঁর দিকে না তাকিয়ে পারলাম না।

পূর্বের মতই হিরণ্ময়ী দেবীর দৃষ্টি তাঁর হাতের বুননের উপরে নিবদ্ধ এবং তিনি ক্ষিপ্র হস্তে বুনন-কার্যে রত।

কিরীটির মুখের দিকে তাকালাম কিন্তু কিছু বোঝা গেল না সে মুখে, রা'গ দ্বেষ বা বিরক্তি কোন কিছুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শান্ত ও নির্বিকার। চায়ের কাপটা শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, নিঃশেষিত চায়ের কাপটা সামনের টেবিলের 'পরে নামিয়ে রাখতেই সীতা এগিয়ে এসে কিরীটিকে প্রশ্ন করল, 'আর চা দোবো মিঃ রায়?—'

'চা, না থাক, ধন্যবাদ!—'

বাইরের দালানে জুতোর মস্‌-মস্‌ শব্দ শোনা গেল।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই বোধ হয় ঘরের বাইরে সেই জুতোর শব্দ শুনতে পেয়েছিল। সীতা নিম্ন কণ্ঠে বললে, 'শতদল ভায়ে এলো বোধ হয়—'

সীতা কথাগুলো বলবার আগেই কিরীটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং খোলা দরজা-পথে অদৃশ্য হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'এই যে শতদল বাবু, কোথায় গিয়েছিলেন?'

'কে! কিরীটি বাবু নাকি? আপনি এখানে আর আমি যে আপনার খোঁজেই হোটেলে গিয়েছিলাম।'

কথা বলতে বলতে দু'জনে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

'সীতা, চা সব শেষ, না—এক কাপ মিলতে পারে?—' ঘরে প্রবেশ করেই শতদল সীতাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলে।

'না, না, আছে বৈ কি, দিচ্ছি বোস!—' সীতা জবাব দেয়।

হঠাৎ ঐ সময় আমার দৃষ্টিটা হিরণ্ময়ী দেবীর উপরে গিয়ে পড়তেই ইতিমধ্যে তাঁর ক্ষিপ্র বুননরত হস্ত দু'টি কখন থেমে গিয়েছে এবং তিনি বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে একবার শতদল ও একবার সীতার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু সীতা বা শতদল কারো সেদিকে দৃষ্টি নেই।

সীতা একটা কাপে ততক্ষণ চা ঢালতে শুরু করেছে।

কিরীটির মুখের দিকে তাকালাম। পুরাতন একটা সংবাদপত্র টেবিলের উপরে পড়েছিল, ইতিমধ্যে কখন এক সময় টেবিলের উপর থেকে সংবাদপত্রটা টেনে নিয়ে সে গভীর মনোযোগ সহকারে কি যেন পড়ছে। ঘরের মধ্যে যে আমরা আরও চারটি প্রাণী উপস্থিত আছি ঐ মুহূর্তে সে সম্পর্কে সে যেন সম্পূর্ণ অচেতন।

চিনি ও দুধ মিশিয়ে চায়ের কাপটা সীতা শতদলের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে: 'এই যে।'

সবে মাত্র শতদল সীতার প্রসারিত কর হতে চায়ের কাপটি হাতে তুলে নিয়েছে, আচম্‌কা কিরীটির কণ্ঠস্বরে আমি যেন চম্‌কে উঠলাম: 'আপনি একটু বেশী চিনি খান চায়ে না মিঃ বোস?'

চায়ের কাপটা আর ওষ্ঠের নিকটে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো না, শতদল বিস্মিত প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাল কিরীটির মুখের দিকে এবং বললে: 'চিনি বেশী খাই চায়ে?'

'হাঁ, দেখলাম যে সীতা দেবী তিন চামচ চিনি দিলেন চায়ে!—'

হাতে ধরা সংবাদপত্রটা ভাঁজ করতে করতে হাস্যোদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় কিরীটি: 'নিশ্চয়ই সীতা দেবীর ওটা deliberate mistake নয় কি বলেন সীতা দেবী?'

শতদলের মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম: কেমন একটা অসহায় অপ্রস্তুত ভাব শতদলের চোখে-মুখে। কিন্তু সীতার মুখে ঠিক যেন একটা বিপরীত ভাবের সুস্পষ্ট আভাষ। সমস্ত মুখখানা যে তার লজ্জার রক্তিম হ'য়ে উঠেছে ঐ মুহূর্তটিতে ঘরের স্বল্পালোকেও সেটা দৃষ্টিকে এড়ায় না।

'অবশ্য চিনি কেউ কেউ চায়ে একটু বেশীই খান এবং আস্বাদনের ব্যাপারটাও যখন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন, এ বিষয় নিয়ে কোন কথাই চলে না কি বলেন সীতা দেবী?—' কথাটা বলে নিজে সঙ্গে সঙ্গে হেসে ঘরের ঐ মুহূর্তে আবহাওয়াটাকে যেন কিরীটি লঘু করে দেবার চেষ্টা করল।

হিরণ্ময়ী দেবীর দিকে তাকিয়ে দেখি অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে তাঁর বুনন-কার্য চলেছে।

শতদলও নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে এবং ব্যাপারটা যেন আগাগোড়াই একটা কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়, এই ভাবে চায়ের কাপে একটা দীর্ঘ আরামসূচক চুমুক দিয়ে বললে: 'সত্যিই কি সীতা, তুমি আমার চায়ে তিন চামচ চিনি দিয়েছো নাকি!'

'কেন? এখনো বুঝতে পারেননি নাকি সেটা?—' হাসতে হাসতে কিরীটি বলে।

'হাঁ, সত্যি' বড্ড বেশী মিষ্টি হ'য়ে গেছে চা-টা—সীতা, আর একটু লিকার এর মধ্যে ঢেলে দাও—'

বলতে বলতে শতদল চায়ের কাপটা সীতার দিকে এগিয়ে দিল।

সীতাও টি-পট্ থেকে আরও খানিকটা লিকার ঢেলে মিল্ক-পট্ থেকে একটু দুধ ঢেলে চা-টা চামচ দিয়ে নেড়ে দিল।

'শুনলাম, কাল রাত্রে নাকি আবার এ-বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে শতদল বাবু?—' কিরীটি আচমকা প্রশ্নটা করে যেন প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

'হাঁ, সেই জন্যই তো আপনার ওখানে গিয়েছিলাম। এ-ও শুনেছেন বোধ হয়, এবারে সীতার কুকুরটার উপর দিয়েই ফাঁড়াটা আমার গেছে!—'

'শুনলাম!—' মৃদু কণ্ঠে কিরীটি জবাব দিল: 'সীতা দেবীর মুখে অবিশ্যি ব্যাপারটা শুনেছি, তাহলেও আপনার মুখ থেকে ব্যাপারটা আর একবার শুনতে চাই শতদল বাবু!'

'এবারের ঘটনাটাও অবিশ্যি extremely mysterious—রাত তখন প্রায় গোটা বার কি সাড়ে বার হবে, সে-রাত্রের ঐ ব্যাপারের পর থেকে সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি যেন একটু নার্ভাস হ'য়ে পড়েছি, রাত্রে ঠিক যেন আর sound sleep হয় না। বিছানায় শুয়েছিলাম বটে তবে ঠিক ঘুমাইনি, একটা তন্দ্রাগত ভাব। হঠাৎ সীতার কুকুরের ঘন ঘন ডাকে চমকে উঠে পড়লাম। জামাটা গায়ে চাপিয়ে জুতোটা পায়ে গলিয়ে দরজা খুলে সিঁড়িতে পৌঁছাবার আগেই দুড়ুম দুড়ুম দুটো গুলীর আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম আর ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিশ্রী করুণ ভাবে আর্তনাদ উঠলো সীতার কুকুরটা—'

'আপনি নিচে নেমে এলেন না?—' প্রশ্নটা এবারে আমিই শতদলকে করলাম।

'হাঁ, দু'-চার মিনিটের জন্য বোধ হয় কেমন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, তার পরই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসি—' জবাব দেয় শতদল।

'আপনি তখন কোথায় ছিলেন?—' আচম্কা কিরীটি প্রশ্নটা করল সীতার মুখের দিকে তাকিয়ে।

'আমি?—আমিও তখন টাইগারের চেঁচান শুনে ঘরের বাইরে বের হ'য়ে এসেছি—' জবাব দিল সীতা।

'আর আপনি মিসেস্ ঘোষ—?'

'আমি?'—হিরণ্ময়ী দেবী হাতের বুনন থামিয়ে তাকালেন কিরীটির মুখের দিকে।

'হাঁ, আপনি?—'

'আমি আর আমার স্বামী দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে বের হ'য়ে আসি ঘর থেকে!'—কতকটা যেন ইতস্ততঃ করেই কথাটা বললেন হিরণ্ময়ী দেবী।

'হুঁ! হরবিলাস বাবুকে দেখছি না, তিনি কোথায়—?'

'আমাকে খুঁজছিলেন বুঝি মিঃ রায়?—' কথাটা কেমন একটা ব্যঙ্গের সুরে উচ্চারণ করতে করতে ঠিক কিরীটির প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কতকটা যেন মাটি ফুঁড়ে বের হ'য়ে আসবার মতই ঐ মুহূর্তে হরবিলাস ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব ও প্রশ্নের জবাবে মনে হলো, কিরীটির মুহূর্ত আগেকার প্রশ্নটির জন্যই বুঝি এতক্ষণ হরবিলাস ঠিক ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

গায়ে কালো রংয়ের সেই গরম গলাবন্ধ, ফুল-কোট, গলায় ও মাথায় একটা উলেন কম্ফাটার জড়ান, মুখ-ভর্তি কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—মনে হয়, পাঁচ-ছয় দিন বুঝি ক্ষৌরকর্ম করেননি। হাতে একটা মোটা লাঠি।

ঘরের মধ্যে আমরা সকলেই নির্বাক্। কেবল কিরীটি যেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে হরবিলাসের দিকে তাকিয়ে। আচম্কা যেন ঘরের সমস্ত আবহাওয়াটা থম্‌থমে হয়ে উঠেছে।

অতঃপর ঘরের মধ্যে উপস্থিত নির্বাক্ সকলের মুখের দিকে নিঃশব্দে বারেকের জন্য নিজের দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু যেন কর্কশ কণ্ঠেই তাকে সম্বোধন করে হঠাৎ হরবিলাস বলে উঠলেন: 'তোমার ঐ অবিনাশকে সাবধান করে দিও শতদল বাবু!'

'কেন, অবিনাশ আবার তোমার কি করলো শুনি?—' প্রশ্নটা করলেন হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীকে। এবং চেয়ে দেখি পূর্ববৎ তিনি আবার তাঁর বুনন-কার্যে মনোনিবেশ করেছেন।

ক্ষিপ্রগতিতে হাত দু'টো বুনন করে চলেছে।

'কি করল মানে?—' হরবিলাসের কণ্ঠস্বরে বেশ একটা সুস্পষ্ট বিরক্তি: 'His very movements is suspecious। তোমার দাদার এ-বাড়ি তো নয়, যেন একটা কবরখানা আর ঐ বেটা কখন আচমকা কোন পথে যে এসে সামনে হঠাৎ হাজির হয়! রোজ সন্ধ্যার পরে একা-একা এ-বাড়ির পিছনে ঐ ভাঙ্গা গোলা-ঘরটায় অন্ধকারে ও কি করে বল তো? দেখ শতদল বাবু! I am defenite he is after something! নিশ্চয়ই ওর—'

হরবিলাসের মুখের কথাটা শেষ হলো না, হঠাৎ একটা ভারী কোন বস্তু পতনের দুম্ করে একটা শব্দ ও সেই সঙ্গে রাত্রির স্তব্ধতাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে একটা কাচভাঙার ঝন্‌ঝন্ শব্দ যেন খান্‌খান্ হয়ে চারি দিক সচকিত করে তুলল। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষ্কম্ভক

গ্রীষ্মের শেষে ছাড়াছাড়ির পালা। স্বামীজিই প্রথম সে-কথা তুললেন। এক-একজন এক-এক দিকে রওনা দিলেন—আমেরিকান মহিলা দুটি উত্তর-ভারতে ঘুরতে গেলেন, নিবেদিতা এলেন কলকাতায়। শ্রীনগরের শেষ ক'টা দিন তাঁর একেবারে অন্তর্মুখ অবস্থায় কেটেছে। ক্ষীরভবানী থেকে ফিরে এসে গুরু বলেছিলেন, 'সৌর-পুরাণকথা বা প্রকৃতিবাদ দিয়ে দেবপ্রতিমার ব্যাখ্যা করা যায় না। অকৃত্রিম ভক্তিতেই শুধু এ-সবের ধারণা সম্ভব। এ যে সত্যি জিনিস।' নিবেদিতা নিজেও এখন এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আপাতত এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেই থাকতে চান তিনি, ভবিষ্যতের ভাবনাকে আমল না দিয়ে। শুধু এইটুকু জানেন, গত নয় মাস ধরে বন্ধুদের সঙ্গে যে আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছেন, সে-সব ছেড়ে এবার হিন্দু-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চলেছেন। কেউ তাঁকে একটা মুখের কথা দিয়েও সাহায্য করবে না। পরিকল্পনা তৈরী করবার মত মনের যা বাঁধুনি, তিন-তিন বার গুরু তা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে একদিন কাটল। ভাব লাগে এই প্রথম স্বামী বিবেকানন্দ হঠাৎ বললেন, 'তুমি তো আর তোমার স্কুলের কথা তোল না, মাঝে-মাঝে ভুলে যাও নাকি? দেখছ তো, আমার মাথায় নানা চিন্তা ঘোরে। এক সময় মাদ্রাজের উপর নজর পড়েছিল—ভেবেছিলাম ওখানে কাজ হবে। আবার কখনও সবটা ঝোঁক পড়ছে আমেরিকা। ইংল্যাণ্ড কি সিংহল বা কলকাতার পরে। এখন তোমার কথা ভাবছি।'

যথাসম্ভব গুছিয়ে সরল ভাবে নিবেদিতা তাঁর মনের কথা বললেন। তাঁর ইচ্ছা সামান্য ভাবে কাজ শুরু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে হিন্দু-মেয়েদের কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, তারই একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান। স্বামীজি মন দিয়ে শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, 'প্রেরণা পাবার জন্যই একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব লালন করতে চাও, তাই না? সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ওঠবার জন্য একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়তে চাও! হাঁ, বুঝলাম তোমার মনের ভাব…'

এর পর, প্রথমেই যে-সব সমস্যা দেখা দিতে পারে তাই নিয়ে তিন মহিলার জোরালো আলোচনা চলল। নিবেদিতা বলতেন, স্বামীজির গুরুগিরি সম্বন্ধে একটা সঙ্কোচ ছিল। নিবেদিতা যাতে আত্মসচেতন হয়ে নিজের উপর কড়া নজর রাখেন, তাঁর 'গুরুগিরি'র মোহ যাতে ছুটে যায় সেই উদ্দেশ্যে স্বামীজি বললেন, 'আমাকে তোমার পরিকল্পনার সমালোচনা করতে বললে, কিন্তু তা আমি করব না। কারণ, আমি মনে করি তুমি দেবাবিষ্ট—ঠিক আমি যেমন, তেমনই। অন্য ধর্মের সঙ্গে আমাদের ধর্মের এই তফাৎ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের সম্প্রদায়-প্রবর্তককে দেবাবিষ্ট বলে বিশ্বাস করে, আমরাও তাই করি। কিন্তু আদিগুরু যেমন দেবাবিষ্ট, আমিও তাই, আর তুমিও আমার মত। তোমার পরে তোমার সহচরীরা তোমার মেয়েরাও তেমনি দেবাবিষ্ট হবে। কাজেই তুমি যা ভাল মনে করবে, আমি তাতে তোমায় সাহায্য করব এই মাত্র।' নিবেদিতা ইতস্তত করছেন। তিনি যে গুরুর দীক্ষিতা শিষ্যা, তাঁর আদেশ পালন করাই যে উচিত এই ভাবটা পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়েও তিনি ভুলতে পারছেন না। কিন্তু স্বামীজি চান মুক্ত বিহঙ্গীর মত আকাশে পাখা মেলবেন নিবেদিতা। বললেন, 'তোমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে জ্বলন্ত উদ্দীপনা তোমার মাঝে থাকা প্রয়োজন তা নাই। তাকে জাগাও, তাকে জ্বালাও! শিব! শিব!'
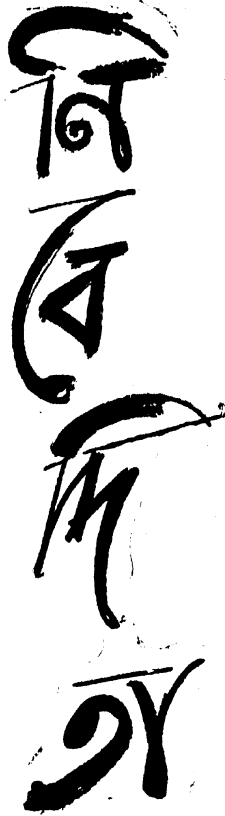
অমরনাথে যাওয়ার আগের দিনের ঘটনা। নিবেদিতার নিজের চেয়ে গুরু তাঁকে বেশী চিনতেন, কোন ধাতুতে নিবেদিতার চিত্ত গড়া সে তাঁর জানা ছিল। সেই জন্যই তো ধরা-বাঁধা উপাসনার দায় থেকে নিবেদিতাকে রেহাই দিতে চেয়েছিলেন। নিয়ে গেলেন অমরনাথে, প্রতীক যত দূর নিরলঙ্কার সরল হতে পারে তার নিদর্শন ঐ আঁধার গুহায় একটু বরফের চাই। কালকল্পনার ক্ষণভঙ্গে বাঁধা পড়ে যে রূপ, কি তার তত্ত্ব নিবেদিতা তা বুঝবেন এ দেখে। যে সরল রাখাল-বালকেরা হারানো মেষের সন্ধানে অমরনাথের গুহায় এসে প্রথম পা দেয়, তারা সাক্ষাৎ মহাদেবকেই সেখানে দেখেছিল—শুভ্র-জ্যোতির্ময় মহেশ্বর আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের আশ্বাস দিতে।…কিন্তু নিবেদিতা কি দেখলেন? যাতনায় তাঁর হৃদয় আর্তনাদ করে উঠল, মনের সেই ভাবটি একটা গাছের গায়ে লিখে রেখে এলেন, 'হে শিব, কর্মের মূলোচ্ছেদ করে কবে আমি হব তোমার মত মুক্তসঙ্গ, আশাপাশবিনির্মুক্ত প্রশান্ত…? সে কবে?…'

অমরনাথ থেকে ফিরে আসতে, দুদিন পরে আবার এই নিয়েই কথা উঠল। কাশ্মীরে তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—বিবেকানন্দের এখন একটা সঙ্কটকাল চলছে। কী তিনি করতে পারেন? ভারতবর্ষের অন্তর-লোকে যে বিপুল শক্তি সঞ্চিত আছে, ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাবে তাকে কোনও কাজেই লাগানো যাচ্ছে না। আসল কথা হচ্ছে, গোঁড়ামির বশে হিন্দুরা যে বিরাট অধ্যাত্মসম্পদ কৃপণের মত আগলে রেখেছে তা উদ্ধার করা। বিবেকানন্দের চোখে এর চাইতে বড় কাজ আর কিছু ঠেকে না। জগতে যেকোন ধর্ম প্রচারপন্থী তাদের যা-কিছু বৈশিষ্ট্য, হিন্দুধর্মকেও সে-সব অর্জন করতে হবে—যদি সে সক্রিয় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চায়। কিন্তু সেই সঙ্গে হিন্দুর অধ্যাত্মজীবনের যে-অন্তর্মুখীনতা তাকে একটুও ক্ষুণ্ণ করা

চলবে না। আর তার জন্তে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন দিয়ে যে-আদর্শ দেখিয়ে গেছেন, সে-আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া ছাড়া উপায় নাই। সমুদ্রের মত গভীর অথচ আকাশের মত উদার হবে অধ্যাত্মজীবন। 'তাঁকে ভজনা করে তাঁর নাম জপতে-জপতে আমাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে না কি?'

'মনে রেখো, সব রকম সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি ভাঙতে পারলেই সার্বভৌম শান্তির বাণী প্রচার করা সম্ভব হয়। আমার নিজের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় চালিত হচ্ছে, তিনি আমার দিশারী। কিন্তু আর সবাইকে নিজের গরজে বুঝে দেখতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ তাদের পক্ষে কতখানি সত্য। এক জন মানুষের কাছ থেকেই সারা জগৎ প্রেরণা পাবে এ তো হতে পারে না।' এই জন্তই বিবেকানন্দ সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে বলতেন। নৈনিতালে স্বামীজির এক মুসলমান শিষ্য ছিলেন, নিবেদিতা তাঁকে চিনতেন। স্বামীজি একটা চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন,···'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাস্তবধর্মী ইসলামের সাহায্য ছাড়া বেদান্ত-মত বিরাট মানব-গোষ্ঠীর অধিকাংশেরই কোনও কাজে লাগবে না—বলতে-শুনতে সে-মত যত চমৎকারই হ'ক না কেন। মানুষকে আমরা এমন ভূমির সন্ধান দিতে চাই, যেখানে বেদ, বাইবেল বা কোরান কিছুই নাই, অথচ বেদ, বাইবেল এবং কোরানের সমন্বয় দ্বারাই যেখানে পৌঁছন সম্ভব। মানুষকে দিতে হবে "একমেবাদ্বিতীয়মের" মন্ত্র। সমস্ত ধর্মই তাঁরই বিচিত্র প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যার যে-পথ উপযোগী সে তা বেছে নিক। আমাদের দেশেও চাই হিন্দু ও ইসলাম এই দুই প্রস্থানের সন্ধি। ইসলামের ধড়ে বেদান্তের মাথা যুক্ত না হলে এদেশের আশা নাই···'

কিন্তু গুরু যখন ক্ষীরভবানী থেকে ফিরে এলেন, তাঁকে দেখে নিবেদিতা ভয়ানক একটা ধাক্কা খেলেন। তাঁর কণ্ঠে শিশুর মত আধ-আধ ভাষা, মুখের ভাব আনন্দে ঝলমল, কথায় অকৃত্রিম স্নেহ উথলে পড়ছে। কর্মের স্পৃহা, মহৎ হৃদয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব সবই যেন ফিকে হয়ে গেছে। জননেতা, আচার্য, পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আর নাই। নিবেদিতা বুঝলেন, তাঁর একটা বড় দরের অভিজ্ঞতার পর্ব শেষ হয়ে গেল। 'স্বামীজির ইতি হয়েছে, তিনি চলে গেছেন চিরতরে। এখন তাঁর মধ্যে শুধু স্নেহ, শুধু ভালবাসা। অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকেও তিনি অসহিষ্ণু হয়ে একটা কথা বলেন না। শুধু শান্তি, শুধু আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া, শুধু আনন্দে আপন ভোলা। এখন যদি মৌনব্রত নিয়ে চিরদিনের জন্ত লোকালয় ছেড়ে যান, আমি আশ্চর্য হব না! তবে, এমনটা যদি করেন, সে হবে ওঁর আত্মবিলাস—শক্তির পরিচয় নয়। কাজেই আমার অনুমান, এ ভাব উনি কাটিয়ে উঠবেন। কেবল তাঁর বেপরোয়া চলন, তাঁর যুযুৎসা আর আমোদ-আহ্লাদ করবার খেয়াল চিরদিনের মতই চলে গেছে, তাঁর জীবনে আর ও-সব ফিরবে না···'—(১২ই আর ১৩ই অক্টোবরের চিঠি, ১৮৯৮)

মাঝে-মাঝে অসংলগ্ন দু-একটা কথা বলেন। মনটা যে তাঁর কতখানি এগিয়ে গেছে ভাবেই বোঝা যায়। 'সব কাজই ভুল, দেশপ্রেমও একটা ভুল। সবাই ভাল। দুঃখ এই, আমরা সবাইকে বুঝে উঠতে পারি না···আবারও লোককে শিক্ষা দেব? শিক্ষা দেবার আমি কে?'

পুরো একটি সপ্তাহ ধরে যতদূর পারেন তাঁর উপরে নজর রাখেন নিবেদিতা। স্বামীজি বেশির ভাগ সময় একটা হাউস বোটের ডেকে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু যখনই দেখা হয়, একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেন নিবেদিতার মনে। যে স্বাধীনতার স্বাদ তিনি পেয়েছেন, তা নিয়ে নিবেদিতা যেন কাজে লেগে যেতে পারেন! চলে যাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে স্বামীজি বললেন, 'তুমি আর আমি, আমরা একই ছন্দের অংশ, যদিও সে বিরাট ছন্দের সবখানি আমরা জানি না। আমরা যেখানকার উপযুক্ত, ভগবান সেখানকার করেই গড়েছেন আমাদের।'

তার পর এই গম্ভীর আশীর্বাণীটুকুকে হালকা করবার জন্তই যেন গান ধরেন,

'শ্যামা মা ওড়াচ্ছ ঘুড়ি,···
ঘুড়ি লক্ষে দুটো-একটা কাটে
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি!'

[ক্রমশঃ

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

ছড়া

এখনকার যে অলঙ্কার।
চরণের উপর চমৎকার।
নাম পায়েতে গুজরী পাতা।
উপর পায়েতে কলস্ কাটা।
কলস্ না থাকলে বলতে বা কি।
এত অলঙ্কার দিয়েছেন পতি।
দানা দানা কাড়লী
মরদানা, তেখরী, পঁচুটী।

গলার সাজ কতকগুলা·
চিক্, চৌদানী, মুড়কীমালা।
মাথার সাজ কতকগুলা।
স্বর্ণ সিঁথি, কপাটে পেড়া।
নাকের সাজ কতকগুলা।
ফুল ঝমকো পিপলপাতা।
এখনকার যে মত উঠেছে।

বিবিয়ানা ঝুমকো দেওয়া
স্বর্ণ সিঁথে এত আভরণ দিয়েছেন পতি।

—প্রাচীন বাঙলা ছড়া।

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মরাক্ষস তখন শুনতে চাইল দ্বিতীয় উপাখ্যান। "গোমিনী" বৃত্তান্ত তাকে শোনালুম। যথা :—

দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চী নামে এক নগরী ছিল। সেখানকার কোটিপতি একটি শ্রেষ্ঠীর পুত্র, নাম তার 'শক্তিকুমার'—যখন অষ্টাদশ বর্ষে পড়ব-পড়ব করছে তখন তাকে অভিভূত করল এক চিত্ররূপিণী চিন্তা—"যে পুরুষ অদার, অবিবাহিত, তার সুখ নেই জীবনে ; যে পুরুষ সদার অর্থাৎ বিবাহিত তার স্ত্রীর মধ্যে যদি স্বামীর হৃদয়ের অনুবর্ত্তনকারী গুণ না থাকে, তাহলে তারও সুখ নেই জীবনে। কেমন করে তবে বুঝতে পারা যায় গুণবতী ভার্য্যা কে ?"

পরের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আকস্মিক সম্পত্তির মত একটি স্ত্রীলোককে ভার্য্যারূপে গৃহে আহরণ করে আনায় কোনো মাধুর্য্য বা সমীচীনতা নেই,—এই বিচার করে শক্তিকুমার ঘর ছেড়ে একদা বেরিয়ে পড়ল মুক্ত-জগতে, এবং তার অনুসন্ধানের বিষয় হোলো কী হওয়া উচিত ভার্য্যার গুণ। সাজল গণৎকার, জ্যোতিষী ; এবং কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিল শালিপ্রস্থ ধান্যের সঞ্চয়। বেরিয়ে পড়ল।

"পাত্রটি লক্ষণজ্ঞ জ্যোতিষী" ;—কাজেই কন্যাবন্ত পিতারা শক্তিকুমারকে তাদের কন্যা প্রদর্শন করতে কুণ্ঠিত হতেন না। আবার ঘুরতে ঘুরতে যদি কোনো লক্ষণবতী সবর্ণা কন্যা চোখে পড়ত শক্তিকুমারের, তখন সেও কন্যার গুণাবলী পরীক্ষা করতে কুণ্ঠিত হোতো না। সে কেবলমাত্র একটি প্রশ্ন করত "কল্যাণি, এই শালিপ্রস্থ ধান দিয়ে বেশ ভাল করে রন্ধন করে আমাকে অন্নাহার করাতে পারবে ?"

কিন্তু অবধূতের এই-হেন প্রশ্ন শুনে সব কন্যাই হেঁসে উঠত, যেন প্রশ্নটিই একটি ঠাট্টা। শক্তিকুমারও গৃহ থেকে গৃহান্তরে চলে যেত। এমনি করে চলতে লাগল তার দিক্‌ভ্রমণ।

কিন্তু একদা শিবিরাজ্যের 'কাবেরীপত্তনে' যখন সে এসে পৌঁচেছে তখন সে দেখতে পেল একটি নিরাভরণা কুমারীকে। অতি সামান্য অলঙ্কার পরিয়ে কুমারীটিকে দেখাল তার ধাত্রী। পিতা এবং মাতার সঙ্গে কুমারীটি কাবেরীপত্তনে এসেছিল ; এককালে তাদের বিপুল সম্পৎ ছিল, এখন নেই, ঘর-বাড়ী যা ছিল সব নষ্ট হয়ে গেছে। শক্তিকুমার কুমারীটিকে, যাকে বলে সংসক্ত-চক্ষু হয়ে, দেখতে লাগল। ভাবতে লাগল। অনেক তর্ক উঠল মনে।

"এই মেয়েটির তো—সমস্ত অঙ্গ—অবয়বগুলিই দেখছি।—কৃশ নয়, স্থূল নয়, অতিহ্রস্ব নয়, অতিদীর্ঘ নয়। বিকট কিছু, তাও চোখে পড়ছে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মাজা-ঘসা গা। অঙ্গুলির তলদেশ আরক্ত, রয়েছে যবরেখা, মৎস্য-কমল-কলস প্রভৃতি অনেক পুণ্যলেখার লাঞ্ছনা। মাংসল অশিরাল চরণ দুটি গুল্‌ফসন্ধিতে মগ্ন হয়ে রয়েছে। জঙ্ঘা দুটি সুডোল। জানু দুটিকে গ্রাস করছে ঊরুর পীবরতা। চক্রবাকমিথুনের মত নিতম্বভাগের হয়েছে আকারে অবস্থিতি, শ্রোণীকূপ (ককুন্দর) দুটিরও বিভাগ শোভন, চতুরস্রকে যেন একবার মাত্রই বিভক্ত করা হয়েছে।

লক্ষণগুলি তো সব মিলে যাচ্ছে।—

নাভিমণ্ডল—তনুতর, ঈষৎ-নিম্ন, এবং গম্ভীর।

ত্রিবলীর অলঙ্কার যেন পরানো রয়েছে উদরে।

বক্ষদেশটিকে বিশিষ্টভাবে ভাগ করে দিয়েছে পয়োধরের রচনা ;

পয়োধরের আরম্ভদেশ বিশাল, এবং বৃন্ত দুটি উন্নম্র।

স্নিগ্ধ উদগ্র কোমল নখরমণিগুলিও বেদাগ ; অংসদেশ সন্নত ; বাহুলতার পর্ব্ব-সন্ধিগুলি নিমগ্না এবং সৌকুমার্য্যবতী ; বিরাজ করছে ধনধান্যপুত্রের প্রাচুর্য্য-লক্ষণ।

কন্ধরদেশেও দেখা যাচ্ছে তনুতা, অথচ কম্বুবৃত্তের মত বন্ধুরতা।

শাস্ত্রোক্ত রূপলক্ষণ কী যে না মিলছে এর আননের শ্রীতে তা বলা যায় না।

অধর—বিভক্তরাগ ;

চিবুক—চারু এবং সংক্ষিপ্ত ;

গণ্ডমণ্ডল—কঠিন এবং আপূর্ণ ;

ভ্রূলতা—জোড়া নয়, অনুবক্র, নীলস্নিগ্ধ ;

নাসিকা—অনতিপ্রৌঢ় তিলফুলের অনুরূপ ;

আয়ত চক্ষু দুটি—কৃষ্ণ, শুভ্র এবং রক্ত, এই ত্রিভাগে ভাস্বর ; অধীর সঞ্চরণ-মধুর তাদের মধুর বিলাস ;

ললাট—খণ্ডচাঁদের মত সুন্দর ;

অলকের পংক্তি—ইন্দ্রনীল মণির যেন শ্রেণীবদ্ধ শোভা ;

কর্ণপাশযুগল—দ্বিগুণ-কুণ্ডলিত অম্লান নালীকনালের লালিত্যে সুসন্নিত ;

এর গন্ধগ্রাহী কেশরাশিতে রয়েছে স্বভাবস্নিগ্ধ নীলিমা, অনতি-ভঙ্গুরতা, পর্য্যাপ্তি এবং রুচির বিস্তৃতি।

এই রকম আকৃতির কন্তারা কখনো ব্যভিচারিণী হয় না শীলের।

একে দেখছি, আর আমার হৃদয়ও যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে ঐ রূপলাবণ্যের মধ্যে। যাক্, এখন একে পরীক্ষা করে ব্যবস্থা করব বিবাহের। যারা অবিমৃশ্যকারী তাদের কেবল ঘাড়ে এসে পড়ে একটার পর একটা অনুশয়।"

সতর্ক চিন্তার অবসানে শক্তিকুমার প্রশ্ন করল—"কল্যাণি, এই শালিপ্রস্থ ধান্য ব্যবহার করে, আমাকে বেশ পরিপাটি আহার করাবার কৌশল, জানা আছে কি তোমার ?"

মেয়েটি প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধা-দাসীর দিকে চাইল, চোখে তার আকুতি। তার পরে শক্তিকুমারের হাত থেকে মাত্র এক প্রস্থ (দুই শরাব) ধান্য গ্রহণ করে অলিন্দের সুসিক্ত ও সম্মার্জ্জিত একটি প্রান্তে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে বসাল।

অল্প অল্প-পরিমাণে গন্ধশালী ধান্যগুলিকে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে, বার বার উলটিয়ে পালটিয়ে, সমান জমির উপর বিছিয়ে, নালীপৃষ্ঠ দিয়ে মৃদু মৃদু ঘর্ষণ করতে করতে তুষ থেকে পৃথক্ করে ফেলল চালগুলি। ক'রে,—ধাত্রীকে বললে—"মা, এই তুষগুলো নিয়ে তুমি স্বর্ণকারের কাছে যাও ; তুষ দিয়ে তারা গয়না মাজে, চিকণ করে। তারা দু-চার কুড়ি কড়ি দিয়ে (কাকিনীভিঃ) এই তুষ কিনে নেবে। সেই কড়ি দিয়ে কিছু ভাল কাঠ কিনে নিও। দেখো, যেন বেশী শুকনো বা বেশী ভিজে বা ফাঁপা না হয়। আর কিনো, (মিতং পচাং) মাটির একটি হাঁড়ি, আর দুটো (শরাব) সরা।"

এই আদেশ দিয়ে মেয়েটি চালগুলি নিয়ে গেল, যেখানে ককুভ কাঠের উদূখল ছিল সেইখানে। ঢেঁকির গড়টি ছিল অনতিনিম্ন, উত্তান এবং বিস্তীর্ণ। তার খদির কাঠের মুসলটি বেশ গোল ভারী, সমান-গা, মাঝখানটা সরু, এবং লোহার পাত দিয়ে মুখ-মোড়া (শুলো-মোড়া)। সেই উদূখলে ভুজ-লতাকে ক্লিষ্ট করে মেয়েটি চতুর-লালিত্যে তণ্ডুলগুলিকে কুটতে লাগল উৎক্ষেপ ও অবক্ষেপ করে। আঙুল দিয়ে বার বার তুলে তুলে, ঘা দিয়ে দিয়ে, কুলোতে ঝেড়ে নিয়ে, বেছে ফেলল কুঁড়ো, বালি, কণা ও কাঁকর।

চুল্লীটির পূজা সেরে ফুটন্ত পাঁচ গুণ জলে ছেড়ে দিল ধোয়া চাল। তণ্ডুলের দানাগুলি ফুর ফুর করে সিদ্ধ হতে লাগল। দানাগুলি যখন বেশ শিথিল হয়ে মুকুলের মত হোলো, তখন আগুনের আঁচ কমিয়ে দিয়ে হাঁড়ির মুখটি সরা দিয়ে ঢেকে নিয়ে, গেলে দিল অন্নমণ্ড (ভাত)। দর্ব্বী (হাতা) দিয়ে একটু-আধটু উলটিয়ে পালটিয়ে যখন দেখল, সমান সিদ্ধ হয়ে গেছে ভাত, তখন হাঁড়িটি অধোমুখী করে রেখে দিল। তার পরে জলের ছিটে দিয়ে আগুন কমিয়ে, বার করে নিল পোড়া কাঠগুলি।

কাঠকয়লা তৈরী হোল : এবং সেগুলিকে বেচতে দিল পাঠিয়ে। কয়লা বিক্রীর এক কুড়ি কড়ি দিয়ে আনিয়ে নিল—যেমন পাওয়া যায়—শাক, ঘৃত, দধি, তৈল, আমলক এবং চিঞ্চাফল (তেঁতুল)। শাকাদি দিয়ে দু-এক রকম ব্যঞ্জন রন্ধন করে বালির তৈরী নতুন শরাবে ভাত ঢেলে তালবৃন্তের বাতাস দিয়ে ধীরে ধীরে শীতল করে সম্ভার দিলে লবণ এবং ফোড়ন। মিহিন-পেশা আম্‌লা-চূর্ণ মিশিয়ে পদ্মগন্ধী করে দিল ব্যঞ্জন। তার পরে ধাত্রীমুখে শক্তিকুমারকে সংবাদ পাঠালো স্নান করে আসতে।

আমলার তৈল দিয়ে স্নান করে শুদ্ধ হোলো শক্তিকুমার। স্নান সেরে এসে দেখে,—ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে কুট্টিম ; পিঁড়ে পড়েছে ; পিঁড়ের সামনে রাখা রয়েছে আঙিনা থেকে কেটে আনা কোমল কদলীপলাশের এক-তৃতীয়াংশ ; এবং তার উপর চাপা রয়েছে আর্দ্র দু'খানি শরাব। শক্তিকুমার পিঁড়েতে বসে পড়ল। সেই মেয়েটি তখন প্রথমে তাকে দিল ভাতের মাড়ের পানীয়। পান করেই দূর হয়ে গেল পথশ্রম, [illegible] বোধ হতে লাগল। তার পর সেই ফিকে সবুজ কলাপাতার উপর পড়ল দু'হাতা শালীধানের অন্ন, একটু ঘৃত, সূপ এবং শাকাদি ব্যঞ্জন। সেগুলি খাওয়া হয়ে গেলে পুনর্বার পাতে পড়ল অবশিষ্ট অন্ন এবং তার সঙ্গে ত্রিজাতক-চূর্ণ (জৈত্রী, এলাচ ও দারুচিনির গুঁড়ো) দেওয়া দধি, ও সুরভিশীতল ঘোলের সরবৎ (ভাণ্ডিকা)। তৃপ্তির সঙ্গে আহার করে শক্তিকুমার জল চাইল। নতুন ভৃঙ্গারে ভ'রে কন্যা তখনি নিয়ে এল গন্ধবারি—অগুরুধূপে ধূপিত, পাটল ফুলে বাসিত, এবং পদ্মদলে গ্রথিত।

পরিচর্য্যা দেখে শক্তিকুমারের দোদুল্যমান হতে লাগল চিত্ত। শক্তিকুমারের হাতে ধারাকারে জল ঢেলে দিল কন্যা। মুখের কাছে ভাণ্ড নিয়ে শক্তিকুমার আকণ্ঠ পান করল সেই স্বচ্ছ জল। তুষারের মত সেই শীতল জলের হিম-কণা লেগেই কি অরুণায়মান হয়ে উঠল তার চোখের পাতা ? ধারা-ধ্বনিতে অভিনন্দন পেল কি শ্রবণ ? জলকণার স্পর্শ-সুখে উদ্ভিন্ন রোমাঞ্চ হোলো কি তার কর্কশ কপোল ? পরিমলের প্রবাহে কি উৎপীড়-ফুল্ল হয়ে উঠল ঘ্রাণরন্ধ্র ? নত হোলো রসনা—মাধুর্য্যের আকর্ষণে ? শক্তিকুমার মাথা কাঁপিয়ে নিবারণ করলে ধারাজলের দান। তার পর সুকন্যা আরেকটি পাত্রে নিয়ে এল আচমনীয় জল। আহারাদি সমাপ্ত হয়ে গেল। বৃদ্ধা উচ্ছিষ্টাদি মুক্ত করে নিয়ে হরিৎ গোময় দিয়ে উপলিপ্ত করে দিল কুট্টিম। শক্তিকুমার তখন সেই অলিন্দে নিজের উত্তরীয়খানি বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম করল ক্ষণকাল।

এই পরীক্ষার কী ফল আশা করা যেতে পারে ? যা আশা করা যায় তাই হোলো। পরিতুষ্টির মধ্যে বিধিবৎ প্রজাপতির নির্বন্ধ এবং পরে কন্যা গোমিনীর স্বামিগৃহে শুভ-গমন।

কিন্তু কপাল মন্দ ছিল গোমিনীর। সুখ সইল না। কিছুদিন যেতে না যেতেই উপেক্ষিত হোলো তার ভালবাসা, তার এত সেবা। যৌবনস্ফীত শক্তিকুমার নিজের গৃহাবরোধে বরণ করে নিয়ে এল একটি গণিকাকে। কিন্তু তাতেও বিচলিতা হোলো না গোমিনী। প্রিয়সখীর মত আচার-ব্যবহার করতে লাগল গণিকার সঙ্গে। তার সেবাকর্ম্মের মধ্যে ঘুম ছিল না। গৃহের সমস্ত কাজই সে সম্পন্ন করতো

লাগল অক্লান্ত নৈপুণ্যে। দয়া-দাক্ষিণ্যের অন্ত ছিল না; পরিজনেরা তার কথায় উঠতে-বসতে লাগল। ধীরে ধীরে তার গুণে বশীকৃত হোলো স্বামী, আয়ত্তের মধ্যে এল সমস্ত কুটুম্ব। একেরই কেবল অধীন ছিল তার জীবন এবং দেহ। গোমিনী লাভ করল ত্রিবর্গ—অর্থাৎ ধর্মার্থকাম। তাই বলেছিলুম—"সেই গৃহীই সুখী যার স্ত্রীর আছে প্রিয়কল্যাণ গুণ।"

ব্রহ্মরাক্ষসের পুনর্বার অনুরোধে তখন আমি বলতে লাগলুম "নিম্ববতীর" আখ্যান।

৩। 'সৌরাষ্ট্র'-দেশে একটি নগরী ছিল। তার নাম 'বলভী'। এখানকার নাবিকপতি—'গৃহগুপ্ত'—কুবেরের তুল্য যিনি ধনবান—তার ছিল একটি কন্যা। নাম 'রত্নবতী'। রত্নবতীকে বিবাহ করেছিল 'মধুমতী'র এক বণিক-পুত্র "বলভদ্র"। কিন্তু এই বিবাহ কল্যাণপ্রদ হোলো না। নববধূর সঙ্গে রতিমিলনের মধ্যে কেমন যেন রভসসুখ এল না, কিসের যেন বাধা ঘটতে লাগল। দেখতে দেখতে প্রেম পরিণত হোলো দ্বেষে। এমন হোলো যে, রত্নবতীকে আর চোখ মেলে দেখতে চাইত না বলভদ্র। বিকলে গেল সুহৃদদের হাজার সুবাক্য। লজ্জায় শ্বশুর-গৃহে খাওয়াটাও ছেড়ে দিল বলভদ্র। সেই থেকে বদলে গেল দুর্ভাগা রত্নবতীর নাম। এ রত্নবতী নয়, এ নিম্ববতী। পরিজনেরা 'নিম্ববতী' বলেই ডাকতে লাগল তাকে।

গভীর মনোবেদনা এবং অনুতাপের মধ্য দিয়ে কিছুকাল কেটে যায় রত্নবতীর। "কী হবে আমার গতি? ভগবান, এ কী করলে আমার!"—এই ছাড়া মুখে ও মনে যেন তার অন্য কথা নেই। এমন সময় একদিন সে দেখতে পেল—মাতৃস্থানীয়া একটি বৃদ্ধা প্রব্রাজিকা দেবপূজার নির্মাল্য নিয়ে এসেছেন। তাঁর কাছে গিয়ে বেচারী রত্নবতী কাঁদতে লাগল—তার গোপন সকরুণ কান্না। বৃদ্ধারও চোখে জল এসে গেল। কেন এই ক্রন্দন?—ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর, লজ্জার ভিতর দিয়ে, কার্যগৌরবের অনুবন্ধে, রত্নবতী কোনক্রমে বললে—

"মা, কি আর বলব। পোড়াকপাল, দৌর্ভাগ্যই হচ্ছে অঙ্গনাদের জীবন্মৃত্যু। বিশেষতঃ যারা কুলবধূ, তাদের। স্বামীর সোহাগ হারিয়েছি। এখন আমি তারি একটা উদাহরণের মত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দিকে সবাই আঙুল দিয়ে দেখায়। এমন কি, আমার মা, আমার জ্ঞাতিরা আমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। তাই আমার প্রার্থনা, আমাকে এমন করে দিন, যাতে সকলে আমাকে ভালো-চোখে দেখে। তা যদি না পারেন, তাহলে আজই আমি এই নিষ্প্রয়োজন প্রাণটাকে বিসর্জন দেব। বিরাম, শান্তি না পাওয়া পর্যন্ত অশ্রাব্য রইবে রহস্য।" এই বলে রত্নবতী পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল বৃদ্ধার। তিনি তাকে মাটি থেকে উঠিয়ে অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন—"বাছা, মৃত্যুর দিকে পা বাড়িও না, ওসব সাহস ভাল নয়। আচ্ছা বেশ, এই আমি রইলুম;—তোমার নির্দেশ-বর্তিনী হয়েই রইলুম। যতদিন না তোমার প্রয়োজনমত উপকার করতে পারি, ততদিন আমি তোমারই একমাত্র অধীন হয়ে থাকব। দুঃখের বিস্তারে, যখন এতই তুমি বিপন্ন হয়েছ তখন আমার মনে হয়, পারলৌকিক কল্যাণের জন্য তোমার প্রাক্তন একটা কিছু করা উচিত। তোমার এই বিপদ—নিশ্চয়ই তোমার কোনো প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফল। তা না হলে এমন যার চেহারা, এমন যার শীল, চরিত্র, এমন অনুকূল যার জাতি-কুল, সে কেমন করে তার অনুগত সতীত্ব নিয়ে স্বামীর কুদৃষ্টিতে পড়ে? প্রতিক্রিয়ার যদি কোনো পথ থাকে, স্বামীর বিরাগ নষ্ট করবার মত যদি কোনো উপায় তোমার জানা থাকে আমাকে সন্ধান দাও। নিশ্চয়ই তুমি সে বিষয়ে সুদক্ষা, পটীয়সী।"

রত্নবতী কিছুক্ষণ কোনো রকমে অধোমুখী হয়ে রইল। কী যেন ভাবতে লাগল। তার পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"ভগবতি, স্বামীই মেয়েদের দেবতা, বিশেষতঃ যারা ঘরের বৌ, তাদের। তাই বলছি, আপনার শোনবার মত কিছু বলতে পারি। সেই বৃত্তান্ত থেকে হয়ত বেরতে পারে কোনো সদুপায়। একটি বণিক্ রয়েছেন—তিনি আমাদের প্রতিবেশী। পুরবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর স্থান। তিনি অভিজাতবংশীয়, ঐশ্বর্যশালী এবং এখানকার রাজার বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ। তাঁর কন্যা 'কনকবতী' আমারি মত হুবহু দেখতে, সে আমার অতিস্নিগ্ধা সখী। দেখুন, তার চেয়েও দ্বিগুণ বিভূষিতা হয়ে তার সঙ্গে আমি বিহার-ক্রীড়া করব তাদেরই সপ্ততল বিমানহর্ম্যের শিখরে। 'তার মা ডেকেছেন'—এই সংবাদ দিয়ে সে আমার স্বামীকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে আসাবে। যখন তিনি গৃহের নিকটে আসবেন তখন, ক্রীড়ায় মত্ত থেকেই যেন আমি তাঁর গায়ে ফেলে দেব করভ্রষ্ট একটি কন্দুক। আপনি তখন আমার স্বামীর নিকটে উপস্থিত হয়ে ভ্রষ্ট কন্দুকটি তার হাতে আবার তুলে দিয়ে এই মর্মে বলবেন—'পুত্র, শ্রেষ্ঠিমুখ্য নিধিপতিদত্তের কন্যা কনকবতী তোমার ভার্য্যার সখী।' রত্নবতীর দুঃখের কথা তুলে তিনি তোমার অত্যন্ত নিন্দা করছিলেন, সাপমান অনুযোগ করে বলছিলেন—তুমি নাকি বড় অস্থির, ভালবাসায় বড় নির্দয়। এই কন্দুকটি তোমার বিপক্ষ ধন—তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়াই প্রয়োজন।' তিনি তখন নিশ্চয়ই উন্মুখ হয়ে বিমানহর্ম্যের শিখর-দেশের দিকে চাইবেন। আমাকে ভাববেন—প্রিয়সখী বলে। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করবেন। এবং শেষে আপনার হাতে সাভিলাষ ফিরিয়ে দেবেন সেই কন্দুক। এই ছলনায় বৃদ্ধপথে ধীরে ধীরে ঘটবে আমাদের মিথ্যা-মিলন, আলিঙ্গনসূত্রে আসবে অনুরাগের উজ্জ্বলতা, সঙ্কেতাভিসার। তার পরে আমাকে হঠাৎ সঙ্গে নিয়ে যাতে তিনি দেশান্তরে যান, সেই ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে।"

বৃদ্ধা পরিব্রাজিকা রত্নবতীর কথায় স্বীকৃত হলেন এবং সহর্ষে যথাকর্তব্য করতে দ্বিধা করলেন না।

বৃদ্ধা তাপসীর প্রতারণায় উপস্থিতবুদ্ধি হারাল বলভদ্র এবং কনকবতী-বনাম রত্নবতীও তার রত্নসার আভরণাদি সঙ্গে নিয়ে এক নিরন্ধ্র তামসী নিশিতে পলায়ন করল প্রবাসে। তাপসী সেই বার্তা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দিয়ে প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগল—"বলভদ্র আমাকে আগের দিন বলেছে—'হায় হায়, এ কি করেছি, রত্নবতীকে উপেক্ষা করেছি, শ্বশুর-শাশুড়ীকে অবমাননা করেছি, আমার মত একটা হতভাগ্য সুহৃদদেরও-কাজন করেছে বাক্য—অকারণে। যাই হোক, আমাকে সব শুধরে নিতে হবে। এখানে থেকে, এঁদের আতিথেই পুষ্ট হয়ে আমার পক্ষে জীবন-ধারণ করা একটা লজ্জার ব্যাপার।' তাই নিশ্চয়ই, নির্ঘাৎ, সেই-ই নিয়ে গেছে রত্নবতীকে। অচিরেই ভবিষ্যৎ প্রকাশ করে দেবে সত্য।"

তাপসীর কথা শুনে অনুবর্তী হোলো সকলের মনের ধারণা এবং অতএব, শিথিলপ্রযত্ন হয়ে গেল বান্ধবদের অন্বেষণ-প্রসঙ্গ। এদিকে রত্নবতী পথেই সংগ্রহ করল একটি পণ্যদাসী এবং তার কাঁধে পাথেয়াদি উপকরণ, সজ্জাসম্ভার ইত্যাদি চাপিয়ে পৌঁছল এসে খেটকপুরে। সেই খেটকপুরে ব্যবহার-কুশল বলভদ্র অল্প অর্থ খরচ করে কারবার করল এবং স্বল্পকালের মধ্যেই উপার্জ্জন করে ফেলল বিপুল ধনসম্পত্তি। দেখতে দেখতে পৌরজনদের অগ্রণী হোলো সে। অর্থ এলে পরিজনও আসে, বাড়ে। প্রথম দাসী তাদের নির্ধন দুরবস্থা দেখেছিল—এখন আর তাকে গৃহে রাখা সমীচীন নয়,—কী বলতে লোকসমাজে কোনদিন কী বলে ফেলবে—এই চিন্তা করে বলভদ্র একদা তাকে 'ও দাসীটা কোনো কর্ম্মের নয়, বেটী যা দেখে তাই চুরি করে, মুখে যা আসে তাই বলে'—ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে গৃহ থেকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দিলে দাসীটাকে। কিন্তু এর প্রতিশোধ নিতে ভুলল না প্রথম দাসী, রাগে অগ্নিবর্ণা হয়ে প্রভুর এবং প্রভুপত্নীর রহস্যবৃত্তান্ত হাটে ভেঙে দিল ;—বলে বেড়াতে লাগল—পরের মেয়ে চুরি করে পালিয়ে এসেছে ঐ সয়তান।

লুব্ধ দণ্ডবাহীরা (Police) বলভদ্রের পিছু নিলে। পৌরবৃদ্ধদের সান্নিধ্যে আবেদন জানাল, "দুর্ম্মতি বলভদ্র নিধিপতি দত্তের কন্যা কনকবতীকে চুরি করে এই খেটকপুরে এসে লুকিয়ে বসবাস করছে। এই অপরাধে ওর সর্ব্বস্বহরণ করার কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।" তাদের তর্জ্জন-গর্জ্জনে বিশেষ শঙ্কিত হয়ে উঠল বলভদ্র। কিন্তু রত্নবতী তাকে বললে—"দেখ, ভয় পেয়ো না। পৌরবৃদ্ধদের সামনে উপস্থিত হয়ে জানাও—'আমার ভার্য্যা নিধিপতি দত্তের কন্যা কনকবতী নয়। বলভী নগরীর গৃহগুপ্তের ইনি কন্যা,—রত্নবতী এঁর নাম। পিতৃদত্তা এবং শাস্ত্রমতে আমার বিবাহিতা ভার্য্যা। যদি বিশ্বাস না হয়, এঁর বান্ধবসমাজে দূত পাঠানো হো'ক্।" বলভদ্র এইভাবে প্রতিবাদ করে শ্রেণী-প্রাতিভাব্য (জামিন) হয়ে রইল। পুরবৃদ্ধদের নিকট থেকে লিখন লাভ করে এবং সমস্ত বৃত্তান্ত সম্যক্ অবগত হয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গৃহগুপ্ত। এবং বিলম্ব না করে খেটকপুরে করলেন পদার্পণ এবং অতিপ্রীত হয়ে মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন ঘরে।

'রত্নবতী'ই—'কনকবতী'?

বলভদ্রের মধ্যে ফিরে এল অতি-বলভদ্র।

সেই জন্যেই বলেছিলুম—

"কাম কি?—না—সঙ্কল্প।"

তারপরে ব্রহ্মরাক্ষসের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হোলো 'নিতম্ববতী' বৃত্তান্ত।

৪। শূরসেন দেশের 'মথুরা-নগরীতে বাস করতেন একটি কুলপুত্র। শিল্পকলা-সিদ্ধা গণিকাদের প্রতি তাঁর আসক্তির অন্ত ছিল না। তাঁর আরও একটি গুণ ছিল। মিত্র লাভের জন্য বা কলত্র লাভের জন্য মথুরায় যত কিছু কলহ ঘটত তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তিনি মিটিয়ে দিতেন নিজের বাহুর জোরে। কর্কশ লোকেরা তাই তাঁর উপাধি দিয়েছিল "কলহ-কণ্টক"। একদা সেই কুলপুত্র আগন্তুক কোনো চিত্রকরের হস্তে দেখতে পান কোনো যুবতীর একটি চিত্রপট। আলেখ্যের মধ্য থেকে সেই যুবতীটি দর্শন দিয়েই কামাতুর করে ফেলল কলহ-কণ্টকের চিত্ত। চিত্রকরটিকে তখন কলহ-কণ্টক বলেন—

"মশায়, আপনার আঁকা এই ছবিটির মধ্যে সবই যেন কেমন উল্টো-পাল্টা দেখছি—কেমন যেন বিরুদ্ধ। শরীরের এমন ধারা সংগঠন কুলজাদের মধ্যে তো দুর্ল্লভ। ঐ নম্রতার মধ্যে ফুটে উঠেছে আভিজাত্যের গর্ব্বিত ভাবা। মুখের রুচিতায় পাণ্ডুশ্রী। অতি-পরিভোগিনীদের মধ্যে দেখা যায় না এমন তন্বী শোভা। দৃষ্টিতে গ্রথিত রয়েছে প্রৌঢ়তা। এঁকে প্রোষিতভর্তৃকা বলেও মনে হয় না—কারণ চিত্রে তো দেখতে পাচ্ছি না প্রবাস-চিহ্ন বেণী। দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে পরা রয়েছে এয়োস্ত্রীর অঞ্চল। তাহলে ইনি নিশ্চিত কোনো বৃদ্ধ বণিকের পত্নী না হয়েই যান না। কোনো দুর্বল বণিক্-বৃদ্ধের সম্ভোগবিহীনা দুঃখিনী কোনো তরুণী গৃহিণীর এটি হতেই হবে ছবি। তাই কি নয়? বিশিষ্ট কৌশল ফুটে উঠেছে আপনার এই অঙ্কন-বিদ্যায়।" চিত্রকর কলহ-কণ্টকের এই চিত্র-বিচারের অত্যন্ত প্রশংসা করে বল্লেন—

"যা বলেছেন সব ঠিক। নির্ভুল। অবন্তীপুরীর উজ্জয়িনীতে 'অনন্তকীর্ত্তি' নামে যে সার্থবাহ রয়েছেন, ইনি তাঁরই ভার্য্যা। 'নিতম্ববতী' এঁর নাম। সার্থক নাম—সত্যিই তিনি নিতম্ববতী। তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্য্যে আমি বিস্মিত হয়ে এই চিত্রপটখানি এঁকে ফেলেছি।"

চিত্রকরের মুখে এই সংবাদ সংগ্রহ করে কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায় কলহ-কণ্টক। সৌন্দর্য্যদর্শনের তৃষিত আবেগ শেষ পর্যন্ত তাকে একদা পরিব্রাজক করে নিয়ে গেল উজ্জয়িনীতে। কলহ-কণ্টক নিজের নাম রাখে 'ভার্গব' এবং মিথ্যা-ভিক্ষার ছলনা করে প্রবেশ করল অনন্তকীর্ত্তির গৃহে। সেখানে নিতম্ববতীকে দর্শন করে সার্থক হোলো নয়ন। কিন্তু দুটো চোখের সেই শান্তিভেদন দর্শন—ভার্গবের ভিক্ষুক চিত্তের মধ্যে ক্রূর কণ্টকের মত বিঁধে রইল। কেবল রক্ত ঝরাতে লাগল মন্মথের ক্ষত।

অনন্তকীর্ত্তির গৃহ থেকে যখন সে বেরিয়ে এল, তখন তার মন—বিভ্রান্ত। কিছু কি করবার রয়েছে? নেই। শেষে একদিন পৌরমুখ্যদের সভায় সে উপস্থিত হয়ে গেল—ভিক্ষা চাইলে শ্মশান-রক্ষকের পদ। কপাল-গুণে পেয়েও গেল।

শ্মশানে শব আসে, দাহ হয়। ফেলে দিয়ে যায় গুণ্ঠন, পট ইত্যাদি। সেগুলিকে সংগ্রহ করে, একটি শ্রমণিকাকে দান দিয়ে তুষ্ট করে তুলতে, কলহ-কণ্টকের দেরী হোলো না। শ্রমণিকার নাম—'অর্হন্তিকা'। তাকেই মুখপাত করে সে নিতম্ববতীকে জানাল নিজের মনের আশা ও আবেগ। শ্রমণিকার মুখে সে ফিরে পেল রূঢ় উত্তর—"কুলস্ত্রীদের শীলভ্রংশ করা দুষ্কর।" হতাশা।

কিন্তু নৈরাশ্যের মধ্যেও কলহ-কণ্টক অকস্মাৎ দেখতে পেল একটি ভিন্ন পথ,—কণ্টকময় পথ। একটি দূতিকাকে সে নিযুক্ত করে ফেলল এবং পাখীপড়ানোর মত তাকে শিক্ষা দিল তার গোপন কার্য্য-বিবরণী। যে করেই হোক্, স্তব-স্তুতিতে না হয়, তাহলে সম্ভব-অসম্ভব যে কোনো উপায়ের মধ্য দিয়েও খুলতেই হবে বণিক-গৃহিণীর মানসমন্দিরের ঐ রুদ্ধদ্বার। দূতিকাকে বললে—

"তুমি যাও তাঁর কাছে। গিয়ে, চাতুরী-ছলনায় পূর্ণ অভিনয় করে এই মর্ম্মে গোপনে তাঁকে বোলো—

'আমাদের মত মানুষ—যারা সংসারের দোষ এবং কদর্য্যতা দেখে বীতরাগ হয়ে এখন সমাধি-রাজ্যে পৌঁছতে চলেছে, এবং মোক্ষ-ধাম করেছে লক্ষ্য, তারা কি কখনও কুলবধূদের উপদেশ দিতে পারে—'শীলভ্রষ্টা হও?' না, কখনও উপদেশ দেয়? না, তাও কখনো ঘটে। কিন্তু এই শীল-পাতনের বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দেয় সাধারণ নারীর জীবনে। অনেকেই সহ্য করতে পারে না এর মোহিনী ক্ষুধা, ভুলতে পারে না এর আপাত-মাধুর্য্য। তুমিও, তোমার উদার সমৃদ্ধি নিয়ে, অতিমানব রূপ নিয়ে, প্রথম যৌবনের স্পৃহা নিয়ে,—সাধারণের ব্যতিক্রম কি না, তাই আমি ইদানীং পরীক্ষা করে দেখছিলুম। তুষ্টভাবে যে তুমি ভাবান্বিতা নও, সেটির উপলব্ধিতে আমি তুষ্ট হয়েছি। এই সব প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আমার কিন্তু একটি অভিসন্ধি রয়েছে—তোমার কোলে একটি ছেলে দেখা। স্নেহের দুরভিসন্ধি! তোমার স্বামীর ভিতর নিশ্চয়ই কোনো দুষ্ট গ্রহের অধিষ্ঠান হয়েছে। তা না হলে, পাণ্ডু-রোগ, এমন দৌর্বল্য, ভোগের এমন অক্ষমতা, জৈবদেহে এমন অসারত্ববোধ—আসবেই বা কেন? এই সব ব্যাধি-বিঘ্নের প্রতীকার না করলে তোমার পক্ষে অপত্য-লাভও সম্ভবপর নয়। সেই জন্যেই বলি, আমার কথা প্রসন্ন-মনে শোনো। অকল্যাণের পথে কাঁটা পড়বে। আমি একটি মন্ত্রবাদীকে তোমার কাছে নিয়ে আসব। ঐ বৃক্ষবাটিকায় একাকিনী তার হস্তে স্বচ্ছন্দচিত্তে তোমায় তুলে দিতে হবে তোমার চরণখানি। সেই মন্ত্রবাদী কেবল মন্ত্র পড়ে দেবে তোমার চরণে। তার পরে দেখবে স্বামীপার্শ্বে এলেই, তুমি প্রণয়কুপিতা হয়ে পড়ছ, এবং তোমার ঐ অভিমন্ত্রিত চরণখানি দিয়ে তাঁর বক্ষঃদেশ করছ প্রহার। মন্ত্রৌষধির সঙ্গে এই অনুপান যোগ হলে বলবান্-পুত্রোৎপাদনক্ষম উত্তমধাতু-পুষ্টি লাভ করবে তোমার শান্তরোগ স্বামী। দেবতার মত ভজনা করবে ভার্য্যাকে। এ বিষয়ে শঙ্কিত হবার কিছু নেই!'

দেখো, এই রকমের বিধানে হয়ত রূপসী সম্মত হয়ে যাবে। তখন রাত্রে আমাকে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিয়ে দিও, এবং তাঁকেও প্রবেশ করিও। এইটুকু কাজ করলেই আমি অনুগৃহীত হব।"

দূতী অর্হন্তিকা যথোক্ত কার্য্যোদ্ধার করে একদিন নিশীথে কলহ-কণ্টককে প্রবেশ করিয়ে দিল বৃক্ষবাটিকায়। নিগ্রন্থিকার প্রযত্নে উপস্থিত হলেন নিতম্ববতী বৃক্ষবাটিকার বিজনতায়। কলহ-কণ্টক তখন তাঁর একখানি চরণ হাতের মধ্যে নিয়ে নাড়তে নাড়তে অকস্মাৎ টেনে খুলে ফেলল—স্বর্ণনূপুর, এবং ছোট্ট ছুরি দিয়ে কী যেন উল্লিখিত করে দিল ঊরুমূলে। তার পরে সোনার নূপুরখানি মুঠোর মধ্যে নিয়ে বাক্যহীন বাতাসের মত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

নিতম্ববতী ভয়ে ভাবনায় অভিভূত হয়ে গালাগাল দিতে লাগলেন নিজের দুর্নীতিকে। শ্রমণিকাকে হাতের কাছে পেলে এখনি হত্যা করেন এমনতর হোলো তাঁর ভাব। পা থেকে রক্ত ঝরছে,—ভবনদীর্ঘিকায় নেমে সেই ক্ষতটিকে ধুয়ে ফেললেন—কাপড় দিয়ে বাঁধলেন। তার পরে অন্য নূপুরটি খুলে রেখে অসুখের ভাণ করে গ্রহণ করলেন শয্যা। তিন-চার দিন কেটে গেল।

ধূর্ত্ত কলহ-কণ্টক দিনক্ষণ বুঝে—নূপুর বেচতে—উপস্থিত হোলো অনন্তকীর্ত্তির দ্বারে। নূপুর দেখেই চমকে উঠল বণিক, বললে,—"এ নূপুর তো আমার স্ত্রীর। কোথায় পেলে এই নূপুর? চুরি?"

নূপুরের প্রাপ্তিস্থান কিছুতেই ভাঙল না কলহ-কণ্টক। অনেক অনুরোধের পর বললে—"জেনে রাখুন, আমি চোর নই। বলতেই যদি হয়, তবে বণিকৃদের সভায় আমি বলব।"

অনন্তকীর্ত্তি তখন গৃহিণীর কাছে খবর পাঠাল—"সোনার নূপুর জোড়া একবার পাঠিয়ে দাও।"

লজ্জায় ও ভয়ে শুকিয়ে গেল নিতম্ববতী। শেষে দ্বিতীয় নূপুরখানি পাঠিয়ে দিয়ে বললে—"রাত্রিতে বিশ্রামের জন্যে বৃক্ষবাটিকায় গিয়েছিলুম। বাঁধন আলগা হয়ে সেইখানেই পা থেকে বোধ হয় খসে পড়ে যায় নূপুর। আজও সেই সকাল থেকে খোঁজা হচ্ছে কিন্তু পাওয়া যায়নি। তাই একখানি পাঠালুম।"

অনন্তকীর্ত্তি তখন নূপুরখানিকে হাতে নিয়ে বণিক-সমাজে গেল। বণিক-সমাজে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে ধূর্ত্ত কলহ-কণ্টক অত্যন্ত বিনয়নম্র হয়ে বললে—

"নিশ্চয় আপনারা জ্ঞাত আছেন—আমি আপনাদের আজ্ঞাতেই পিতৃবন ঐ শ্মশানটিতে পাহারা দিয়ে থাকি। ঐ আমার উপজীবিকা। শ্মশানের নিকটেই আমার বাসা। কিন্তু ধাপ্পাবাজেরা বা চোরেরা—যারা দিবালোকে আমাকে দেখে ডরায়, তারা রাত্রির অন্ধকারে এসে কখনও কখনও লুকিয়ে শব দাহ করে পালায়। তাই মাঝে মাঝে রাত্রিতেও আমি শ্মশানেই ঘুমোই। গতকাল গভীর রাত্রে হঠাৎ শ্মশানে আমার চোখে পড়ে একটা শব দাহ হচ্ছে। তার পরেই দেখি—কালো রংএর একটি মেয়ে চিতার ভিতর থেকে, বেশ গায়ের জোর ফলিয়ে, টেনে বের করছে একটা আধ-পোড়া মড়া। সত্য বলতে কি, মহাশয়েরা, আমার অর্থলোভ স্বাভাবিক। ভয় দেখিয়ে সেই কালো মেয়েটাকে ধরে ফেলি। ধরে ছোট্ট ছুরি দিয়ে তার ঊরুমূলে বেপরোয়া একটা দাগা মেরে দি। বেটীর পা থেকে এই নূপুরখানা ঝটকা লেগে খুলে পড়ে যায়। যেই সেটিকে নিতে যাব, অমনি দেখি, ফিরতে না ফিরতেই মেয়েটি খুর-পায়ে পালিয়েছে। এই হচ্ছে আমার হস্তে নূপুরটির আগম-কাহিনী, এখন বিচার বিষয়ে আপনারাই প্রমাণ।"

কলহ কণ্টকের বিবৃতি শুনে পৌরবর্গ একমত হয়ে সুচিন্তিত এক অভিমত দিলেন—"ঐ নারী যে শাকিনী এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।"

নিতম্ববতী এই সংবাদ পেয়ে স্থির করে ফেলে—মরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্বামী যাকে পরিত্যাগ করেছে, তার পক্ষে শ্মশানে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। নিতম্ববতী কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে যায় আর ধূর্ত্ত কলহ-কণ্টক তাকে নিথর রাত্রে বুকে জড়িয়ে ধরে। অনুনয়ের অন্ত থাকে না। বলে—"এই সমস্ত অসাধারণ ঘটনা না ঘটিয়ে কেমন করেই বা আমি আমার ভালবাসার মানুষকে পাই; সুন্দরি, তোমার রূপ আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছিল। জীবনের একমাত্র কামনা হোলো—তোমাকে আমার চাই-ই চাই। রত্নের মত তোমাকে অর্জ্জন করতে আমাকে কী যে না করতে হয়েছে জানি না। তোমার জন্তে আভিজাত্য ভুলেছি, ভিখারী সেজেছি, শ্মশানরক্ষী হয়েছি, জোগাড় করেছি ভিক্ষুকী, দূতী পাঠিয়েছি; যখন কিছুতেই কিছু হোলো না, অসিদ্ধ রইল প্রেমের নিবেদন, তখন জীবন পণ করে এই শেষ পথ আমাকে নিতে হয়েছে। সুন্দরি, প্রসন্ন হও, আমি তোমার অনন্যশরণ দাস।

সেই শ্মশানক্ষেত্রে মুহুর্মুহুঃ চরণপতন এবং শত শত সান্ত্বনের গত্যন্তরহীনতার মধ্য দিয়ে কলহ-কণ্টক লাভ করে তার ইষ্টসিদ্ধি—নিতম্ববতী।

তাই বলেছিলুম—

"যা কিছু দুষ্কর তার সাধন করে প্রজ্ঞা।"

রাজকুমার, আমার আখ্যানগুলি কর্ণগ্রাহ্য হওয়াতে ভক্তিমান হয়ে উঠল ব্রহ্মরাক্ষস। পূজা করল আমাকে। এমন সময়, সেইক্ষণে হঠাৎ আকাশ থেকে ঝরে পড়তে লাগল—সলিলবিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাফল;—অনতিপ্রৌঢ় পুন্নাগ-মুকুলের মত ফুল। "এ আবার কি?"—উচ্চচক্ষু হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, একটি রাক্ষস আকাশ-পথে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে একটি অঙ্গনাকে। অঙ্গনার অঙ্গে কোনো সাড় নেই, চেষ্টা নেই। 'স্মৃতি'র বেটা একটা রাক্ষস অকামা একটি স্ত্রীলোককে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে—অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না, গগন-গমনের শক্তি আমার নেই, অস্ত্র নেই শস্ত্র নেই,—আমার সমস্ত শরীর রী রী করতে লাগল। কিন্তু আমার ব্রহ্মরাক্ষসটি তখন—"ওরে, পাপ, দাঁড়া, দাঁড়া, কোথায় নিয়ে পালাবি—আমি থাকতে," এই বলে চীৎকার করতে করতে আকাশে লাফিয়ে উঠল এবং রাক্ষসকে করল আক্রমণ। রাক্ষস অপেক্ষা না কোরে রোষভরে পরিত্যাগ করল রমণীকে। অন্তরিক্ষ থেকে পারিজাতের মঞ্জরীর মত খসে পড়ল রমণী এবং আমিও ঊর্দ্ধমুখ দুবাহু প্রসারিত করে সদয়-গ্রহণ করলুম সেই রমণীকে। মুদিত-নেত্র বেপথুমতী সেই রমণী, আমার অঙ্গের স্পর্শসুখে লাভ করে অকস্মাৎ উদ্ভিন্ন-রোমাঞ্চ হয়ে উঠল। একটু বিস্মিত হয়ে গেলুম। কিন্তু তখন আকাশে চলেছে দুই মত্ত রাক্ষসের রণলীলা। বড় বড় বনস্পতি উন্মূলিত হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ। অবসানে দেখি দুটি রাক্ষসই টুকরো টুকরো হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আকাশে। আমি তখন অঙ্গনাটিকে তুলে নিয়ে চলে এলুম সরোবরের তীরে। পুষ্পলাবণ্য-লাঞ্ছিত তার তটদেশের কোমলতায় ললনাটিকে শুইয়ে দিয়ে ভাল করে দেখলুম। আশ্চর্য্য! কাকে দেখছি? আমার স্পৃহা কি জীবন্ত হয়ে আমার চোখের পাতায় নাচছে? ঐ না রাজকন্যা কন্দুকাবতী? আশ্বাস-মাজন্যে ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পেলেন রাজকন্যা, কটাক্ষ দিয়ে আমাকে দেখলেন, তার পরে চিনতে পেরে কেঁদে ফেললেন,—শেষে প্রিয় সম্ভাষণ করে বললেন—

"আপনারও হয়ত, আমারি মত, মনে আছে কন্দুকোৎসব, আর সেই উৎসব কেমন করে অনুরাগের রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছিল প্রার্থীদের প্রার্থনা। চন্দ্রসেনার সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই কথা হোতো, তারই মুখে শেষে শুনি ভীমধন্বা, আমার ঐ নিষ্ঠুর পাপ-সহোদর, কেমন করে আপনাকে সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে মেরেছে। তারপরে একাকিনী একদা ক্রীড়াবনে যাই। সখীরা জানত না, পরিজনেরা জানত না। জীবনটাকে বঞ্চনা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবন-বিসর্জ্জনের শেষক্ষণে আমাকে এসে চমকিয়ে দেয় কামরূপী এক রাক্ষস। ভীত প্রার্থনা ধূলোয় দলে দিয়ে, প্রলাপিনী আমাকে লুঠ করে নিয়ে উধাও হয়ে যায় অধমটা। এইখানেই সেই উধাও-যাত্রার হয়েছে অবসান। একরকম দৈববলেই আপনার ভদ্র-হস্তে এসে পড়েছি। আপনি আমার জীবনের ঈশান।"

আমরা দুজনে তখন ফিরে যাই আমাদের বহিত্রে। প্রতিকূল পবনে দমলিপ্তিতে এসে পৌঁছায় সুখী তরণী।

এসে শুনি তনয়-তনয়ার বিনষ্টিতে বিকল হয়ে সুহ্মপতি তুঙ্গধন্বা অনশনব্রত গ্রহণ করে কলুষনাশিনী গঙ্গার তটাভিমুখে স্বয়ং সকলত্র করেছেন প্রস্থান। উদ্দেশ্য—দেহরক্ষা। ক্রন্দন শুনলুম অশ্রুমুখী প্রজাদের। পৌরবৃদ্ধেরাও মহারাজের সঙ্গে মরতে চলে গেছে,—নগর কাঁদিয়ে।

আমি তখন যথাসম্ভব রাজসমীপে উপনীত হয়ে নিবেদন করলুম যা ঘটেছে; তাঁর হস্তে ফিরিয়ে দিলুম তাঁর অপত্য দুটিকে।

রাজকুমার, দামলিপ্তপতি—প্রীত হয়ে আমাকে জামাতা করেছেন এবং তাঁর পুত্র এখন আমার অনুজীবী। ভীমধন্বার কবল থেকে মুক্তি লাভ করে চন্দ্রসেনা বিবাহ করেছে কোশদাসকে। তারপরে রাজকুমার, সিংহবর্ম্মার সাহায্যার্থ এখানে এসে অনুভব করি দুর্ল্লভ-দর্শনোৎসবের সুখ।"

"দৈবের গতিপথ বড় বিচিত্র, সুসময় বুঝেই পুরুষকার লাভ করেছে পুষ্টির প্রাচুর্য্য।" এই বলে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে রাজবাহন এবার ফিরে চাইলেন মন্ত্রগুপ্তের হাস্য-ভরা ওষ্ঠের দিকে। মন্ত্রগুপ্ত তখনি করকমল দিয়ে, কিঞ্চিৎ আবৃত করল নিজের অধরমণি,—যে-অধরমণিটি বিহ্বল হয়েছিল ললিতা কোনো প্রেয়সীর রভস-দত্ত দন্ত-ক্ষতিতে। তারপরে ওষ্ঠ্যবর্ণহীন অদ্ভুত ভাষায় বলতে লাগল নিজের আত্মচরিত।

ইতি শ্রীদণ্ডীর দশকুমার চরিতে মিত্রগুপ্তচরিত নামক
ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস সমাপ্ত।

[ক্রমশঃ।

শুভারম্ভ ১৬ই এপ্রিল

উত্তরা — পূরবী — উজ্জ্বলা

ও সহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে

শ্রীরমেন চৌধুরী

টকির টুকিটাকি

নিউ থিয়েটার্স

এবার 'সংশয়ে'র ব্যবস্থা করছেন। সংশয় ভঞ্জনও করবেন তাঁরা 'সংশয়' বন্ধন করে সেলুলয়েডের ফিতেয়। সুলেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র লেখনীর সহায়তায় 'সংশয়'কে সমৃদ্ধ করছেন—খবরে প্রকাশ। 'সংশয়' দীর্ঘজীবী হোক!

[illegible] মঞ্জু দে

হরিলক্ষ্মী

লাভ হবে জনসাধারণের অবিলম্বে। ব্যবস্থা ত্বরিত করতে এম· বি প্রোডাক্সন উঠে-পড়ে লেগেছেন। লক্ষ্মীর প্রসাদ কামনা করেন সবাই—বিশেষত আজকের লক্ষ্মীহীন বাঙলায়! শরৎ লেখনীর সার্থক সৃষ্টি 'হরিলক্ষ্মী' বাঙলা ছবির এই আকালের সময় সকল করুণায় আবির্ভূতা হলেই মংগল! সুদিন পড়েছে বলে যেটুকু আশা অংকুরিত হয়েছিলো তা যে ঘুচে যেতে বসেছে। 'হরিলক্ষ্মী'র সেবাইৎ (পরিচালক) হচ্ছেন স্বনাম-খ্যাত চিত্র-সম্পাদক অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি।

সমাজের সেই মানুষেরা

যারা বারেকের ভুলের, সামান্ত খেয়ালের খেসারৎ দিয়ে যায় জীবন ভোর, তারা কি যুগ-যুগ ধরে এম্‌নি ভাবেই হবে নিগৃহীত? পিছল পথে চলতে গিয়ে পদস্খলন তো স্বাভাবিক, আর সেই ত্রুটি সংশোধনও সম্ভব; কিন্তু আমরা নীতির ধূয়ো ধরে ন্যায়ের রক্ত-চোখের আগুনে তিলে-তিলে এদের ভবিষ্যতের রঙ রূপ-রসকে দিই জ্বালিয়ে। সুপ্রভাত ফিল্মের 'রাখী' সমাজ-লাঞ্ছিত সেই সব মানুষের দগ্ধ প্রাণে সান্ত্বনার রাখী বাঁধতে আসছে। সন্ধ্যারাণী, শিপ্রা দেবী, অসিতবরণ প্রভৃতিকে রূপায়ণে দেখা যাবে। ব্যবস্থা করছেন মধু বোস।

অপরূপ কথাচিত্রের

প্রথম নিবেদন 'দুই মহল'-এর শুভ মহরৎ সারা হয়েছে। রচনা ও পরিচালনা: পরেশ মজুমদার। সুর-সংযোজনা: প্রণব দে।

ষোড়শী

মাধব ঘোষালের প্রযোজনায় নব রূপ-সজ্জায় গৃহীত হবার পথে! বংকিম এবং শরৎ—এই দুই দিকপালের একই রচনা বার বার নব কলেবর ধারণ করে থাকে শ্রীক্ষেত্রাধিপতির মতন! এ যেমন আনন্দের তেমনি তার বিপরীতও বটে! সাহিত্যের বন্ধ্যাত্বে খুশি হওয়ার দলে অন্তত আমরা নই। যাই হোক, এবারে 'ষোড়শী'র ভাগ্য-নিয়ন্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

মধুর সমন্বয়

শ্রী-হীন ও শ্রী-যুক্ত তারাশংকরে! সাহিত্য-জগতের একই নামধারী দুই ব্যক্তিকে এতো দিন পরে 'ভবানী কলামন্দিরে' একত্র পূজায় মগ্ন দেখা যাচ্ছে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ('কবি,' 'দুই পুরুষ' খ্যাত) অঞ্জলি দিচ্ছেন কাহিনী ও ভাষা, শ্রীতারাশংকরের পৌরোহিত্য। 'না'—মহাশক্তিধারিণী এই রাণীটির প্রত্যক্ষ কেরামতি এটি। খুলে বলাই ভালো: ভবানী কলামন্দির তাঁদের চতুর্থ ছবি করছেন 'না'! কাহিনী ও সংলাপ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা: শ্রীতারাশংকর। হিন্দিতেও চিত্রায়িত হবে আর তার জন্তে বোম্বায়ের নাম-করা কয়েকটি তারকাকে নেয়া হবে। কর্মসূচি 'ক্রম'-প্রকাণ্ড, অতএব ধীরো ভব!

ফাস্‌লা

দোভাষী ছবি। প্রযোজক ফ্রেণ্ডস প্রোডাক্‌সন। গল্প লিখেছেন এম, আব্বাস। চিত্রনাট্য সাগরপ্রেমী।

মুভিল্যাণ্ড

আর তাঁদের 'শ্রীশ্রীমা'র সমাচার শুভ। পরমাপ্রকৃতি দেবী সারদেশ্বরীর পুণ্য জীবন-কথার বাণীরূপ যথারীতি গৃহীত হয়ে চলেছে। শচীন সেন রায় ও শান্তি নন্দী কোনো রকম ত্রুটি না রাখতে বদ্ধপরিকর। মায়ের কৃপা লাভ হোক 'নীল-দর্পণ'-নির্মাতাদের।

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

একটি কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ন আসন্ন। এই শক্তিমান লেখক দীর্ঘ দিন পথে-প্রবাসে অজ্ঞাতবাসের পর আবার মুখর হয়ে উঠছেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা চিত্রজগতের কল্যাণে আসুক, কামনা জানাই। এঁর কাহিনীটি পরিচালনা করবেন বর্তমান কালের কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রয়োগ-শিল্পী।

কলা-কুশলী

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

'বেংগল ডানলপ' কোম্পানীর একটি উৎসাহী তরুণ কর্মীকে ম্যাডাম কোম্পানীতে জোর করে নিয়ে আসা হোলো। নিয়ে এলেন ম্যাডামের অন্যতম বাঙালী কর্মী (পরে স্বনামখ্যাত প্রযোজক পরিচালক) শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মশাই। দশের মনে যাঁর আসন হবে কালজয়ী, তাঁকে অখ্যাত-অজ্ঞাত জীবনের ঘূর্ণির মাঝে বুদ্‌বুদের মত চিহ্নহীন করে কার ক্ষমতা! সেই তরুণটি তো প্রথমে চেয়েছিলো চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হতে, করেছিলো সাহিত্যের সাধনা পরম আন্তরিকতায়। কিন্তু ভবিতব্য! কোন্ অ-দৃশ্য হাতের ইংগিতে বাঁধা সড়ক ত্যাগ করে বন্ধুর পথে চলা শুরু করলো তরুণের জীবন। খ্যাতি-অখ্যাতি নানা ফুল সঞ্চয় হয়েছে দু'হাতের অঙ্গুলিতে, সার্থক হয়েছে মনুষ্য নাম-ধারণ এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায়।

সেদিনের সেই তরুণের নাম কি জানেন? পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর পরিচালনায় গৃহীত নির্বাক্ যুগের ছবির মধ্যে 'নল-দময়ন্তী', 'ধ্রুব চরিত্র', 'বিল্বমংগল', 'মাতৃভক্তি', 'প্রফুল্ল', 'নর্তকী তারা', 'রত্নাবলী', 'ভ্রান্তি', 'শান্তি-কি-শান্তি', 'জয়দেব', 'চণ্ডীদাস', 'নবীন ভারত', 'জেলের মেয়ে', 'মাধবী-কংকণ', 'রাজসিংহ', 'মৃণালিনী', 'যুগলাংগুরীয়', 'ইন্দিরা', 'বিষবৃক্ষ', 'কেরাণীর মাসকাবার'—কতো নাম করবো? সংখ্যাতীত ছবি করেছেন সে সময়ে। তার পর ছবি যখন কথা শুরু করলো তখনও ইনি পূর্ণ পরাক্রমে কর্ম রথ পরিচালিত করেছেন। আজও সে প্রচেষ্টা মন্থর হয়নি।

১৮৮৭ সালের কোনো একটি দিনে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন বিহারের অন্তর্গত মতিহারিতে। পড়াশুনা করেন মজঃফরপুরের বিবি কলেজে। ডাক্তার হবার প্রচেষ্টা এঁর ছিলো, আর প্রায় হয়েও উঠেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হোলো না। সাহিত্যের সেবায় অবসর সময়টুকু অতিবাহিত করতে চাইলেন—'সিঁথির সিঁদুর', 'বউদিদি', 'রাঙা বৌ' প্রভৃতি পুস্তক মুদ্রিত হোলো। অবশেষে বাঙালী-জীবনের পরম সম্বল চাকুরীর হাতে দিলেন নিঃশেষে ধরা। সেখান থেকে বন্ধন মুক্ত করে বিরাট সম্ভাবনার সম্মুখীন করলেন এঁকে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী। একেই বলে অদৃষ্ট! কপালে থাকলে বঞ্চিত করার সাধ্য কারুর নেই! ওই ক্ষুদ্র স্থানটুকুর মাহাত্ম্য অতি বৃহৎ! ভাবতে বসলে কূল পাওয়া যায় না!

ম্যাডামে যোগ দিলেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। হাতে-কলমে সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হতে থাকলো। ভারতীয় ছায়াছবি নির্মাণের প্রত্যূষে আজকের মত সকলেই সব-কিছু হবার সুযোগ পেত না—যাঁরা এ পথে আসতেন—যথেষ্ট অভিজ্ঞতার মালিক হয়ে তবে কাজে অবতীর্ণ হতেন। জ্যোতিষ বাবুর শিক্ষা সমাপ্ত হোলো।

সে কথা ঘোষণা করলো নীরব-কণ্ঠে নির্বাক্ 'সতীলক্ষ্মী'। বর্তমান শ্রী চিত্রগৃহের তখন নাম ছিলো কর্ণোয়ালিশ থিয়েটার। এই কর্ণোয়ালিশেই 'সতীলক্ষ্মী' মুক্তি পেল, তারিখ ৭ই নভেম্বর ১৯২৫। পরশ্রীকাতর মুষ্টিমেয় সমালোচক নিন্দার ঢাক বাজাতে শুরু করলেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ ক্ষতি করতে পারলো না। 'সতীলক্ষ্মী'র চিত্রগ্রহণে জ্যোতিষ বাবু কতকগুলি নতুন পদ্ধতির প্রচলন করলেন—সেটা হোলো শট ডিভিশন। এ ছবির আগে একটানা চিত্রগ্রহণই রীতি ছিলো।

এর পর 'প্রেমাঞ্জলি', 'মিশর-রাণী', 'মাতৃস্নেহ', 'বিষবৃক্ষ', 'মা দুর্গা'র দেখা পাওয়া গেল। এই ছবিগুলির কল্যাণে জ্যোতিষ বাবু সাধারণ্যে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছেন। কিন্তু শত্রু-মিত্রনির্বিশেষে অভিনন্দন জানালো এর কিছু পরে 'জয়দেব' চিত্রের জন্যে। আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠলো—দর্শকসমাজ অকৃপণ হাতে দর্শনী দিতে থাকলো, ফলে প্রভূত বিত্তলাভ হোলো কর্তৃপক্ষের।

A Tale of Two Cities-এর বাঙলা সংস্করণ 'জেলের মেয়ে'

ভারতের শিল্পী-মেয়ে লতা মুঙ্গেশকর

রূপ-সজ্জার বাইরে ছবি রায়ের ছবি এবং আগের পাতার ছবি দুটিও কালীশ মুখোপাধ্যায় গৃহীত

অবশ্যি জয়দেবের আগে দেখা গিয়েছিলো—তাতে ৺দুর্গাদাস অভিনয় করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানী দৃষ্টির প্রত্যক্ষ দক্ষিণা পেয়েছি আমরা বহু শিল্পীর চিত্রাবতরণে। একের পর এক ইনি আহরণ করেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, কানন দেবী, নবাব, উমাশশী, মনোরমা প্রভৃতি বর্তমান কালের স্বনামধন্য রূপশিল্পীদের। রত্ন নির্বাচনের মাঝেই তো জহুরীর প্রকৃত পরিচয়!

ঋণ স্বীকারের কথায় পরিচালক বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কৃতজ্ঞতা-মন্থর কণ্ঠে দু'জনের নাম উচ্চারণ করলেন। ম্যাডান সাহেবের ছেলে ফ্রামজি ম্যাডান, অপর জন প্রসিদ্ধ নাট্যকার আগা হাসার কাশ্মীরি। এই দু'জনের কাছে ইনি বিশেষ ভাবে ঋণী। আগা সাহেবের পদতলে বসে নাট্যরচনার কূটকৌশল শিক্ষা করেছেন জ্যোতিষ বাবু মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। ফ্রামজী ম্যাডান অবসাদের সময় উৎসাহের ধারাসিঞ্চনে করেছেন এঁকে সঞ্জীবিত। আজ সে মানুষ নেই, কিন্তু তাই বলে স্বীকৃতির অভাব হয়নি দেখলুম। কৃতজ্ঞতা সফলতার অন্যতম সোপান।

নির্বাক যুগ শেষ হয়ে গেল—এলো মুখর ছবির দিন। নানা [illegible] পরিবর্তন সূচিত হোলো, ফলে অনেককেই পেছিয়ে পড়তে হয়েছিলো। কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যুগের হাওয়ায় খাপ খাইয়ে নিলেন সহজেই। ইতস্তত নির্বাচিত দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ শেষ করে প্রথম ছবি করলেন 'ঋষির প্রেম'। তার পর 'জোর বরাত', 'বিষ্ণুমায়া'। এই 'বিষ্ণুমায়া'র উমাশশীর প্রথম অংশ গ্রহণ।

'মানময়ী গার্লস স্কুলে'র কথা নিশ্চয়ই ভোলেননি? সে ছবির পরিচালক ইনিই—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই। দর্শক-হৃদয়ে এর ছাপ বহু দিন বিরাজ করেছে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য। তার পর ক্রমান্বয়ে তুললেন অগণিত ছবি—'দক্ষযজ্ঞ', 'রাঙা বৌ', 'কর্ণার্জুন', 'কণ্ঠহার', 'দেবর', 'কালো ঘোড়া', 'মিলন' এবং আরো অনেক ছবি। এঁর নাম প্রায় শতাধিক চিত্রে বিরাজমান, এ বড় কম সৌভাগ্যের পরিচয় নয়।

প্রৌঢ়ত্বের শেষে বার্ধক্যের তোরণদ্বারে উপস্থিত হয়েও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যুবজনোচিত উৎসাহের সংগে কাজ করে চলেছেন আজো। শেষ জীবনে একটা-কিছু গড়ে তোলার স্বপ্ন এখনো এঁর চোখে এবং সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বিশেষ ভাবে বদ্ধপরিকর। এই দীর্ঘ পথ চলায় বহু সহকারীই এঁর সহায়তায় ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে নিয়েছে—আজ ইনি সম্পূর্ণ একক—তবু চলেছেন বন্ধুর ধূসর পথে। কবিগুরুর অমর বাণী কানে বাজে: 'একলা চলো রে'। সকলে দুয়ার দিক, তবু চলতে হবে!...

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিলষিত লাভ হোল, সাধনা সফল হোক—শুভ কামনা জানাই।

নতুন হিন্দী চিত্রে বাঙলার সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অবক্ষয়-পাতাল

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

—বিদ্যাপতি প'ড়েছো? বিদ্যাপতির পদাবলী?

কণ্ঠে মাধুর্য্য ফুটিয়ে সহাস্য বদনে প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বিদগ্ধ-চিত্ত, মৃদুহাস্যময় মানুষটির বিশাল আঁখি দু'টিতে ক্ষণেকের জন্য যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায়। কবি বিদ্যাপতির মাত্র নামস্মরণেই বক্তার বিমুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছিল কথা বলার ভঙ্গীতে। প'রধানে মিহি লাল-পাড় গরদের ধু'তি। লোমশ বক্ষে দোদুল্যমান রুদ্রাক্ষের মালাটি ধ'রে শিশুর মত খেলা করতে করতে সেদিন কথা বলেছিলেন প্রশ্নকর্ত্তা। মানুষের হৃদয়াবেগ প্রকাশের অন্যতম বাহন কাব্য—বৈষ্ণবকাব্যের পার্থিব প্রেমের মাধ্যমে হয়তো ঈশ্বরানুভূতি হয়েছিল তাঁর। সমগ্র মুখমণ্ডল আর বক্ষদেশ রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। শরীরে হয়তো শিহরণ জেগেছিল। ডান বাহুর সোনার কবচটা চিক্-চিক করে উঠছিল থেকে-থেকে। অচেনা মানুষ তখন সহসা তাঁকে দেখলে নিশ্চয়ই ভীত হয়ে প'ড়তো।

—মিথিলার কবি বিদ্যাপতি?

অস্ফুট নারীকণ্ঠ বাতাসে ভাসতে থাকে। মধুকণ্ঠী কে একজন নারী কথা বলে সসম্ভ্রমে, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে। ভয়ে-ভয়ে।

—হাঁা, পঞ্চদশ শতকের মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।

চতুষ্কোণ ঘরটা যেন গুমরে গুমরে ওঠে। কোন্ এক সবল ও দৃঢ় পুরুষকণ্ঠস্বর। ঘরের মধ্যেই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সুদীর্ঘ এক শয়নকক্ষ। ঘরের দেওয়াল-গায়ে দশমহাবিদ্যার বিচিত্র রঙীন চিত্র। একান্ত দুষ্প্রাপ্য, অত্যন্ত দুর্লভ। কালীঘাটের পটুয়াদের হস্তশিল্প। বিশেষ ব্যবস্থায় দশখানি ছবিই আঁকানো হয়েছিল। প্রচুর অনুসন্ধানে শিল্পীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কক্ষস্বামী। অসামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে লাভ করেছিলেন এই দশমহাবিদ্যাকে—চিত্রাকারে। প্রতিটি ছবিতে মাল্যদান করা হয়েছে। রাঙা জবার মালা। দক্ষিণা-বাতাসে দুলছিল মালাগুলি।

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। শুধু বিদ্যাপতি?

পঞ্চদশ শতকের আর কে জন? বড়ু চণ্ডীদাস?

বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। মথুরার সেই কৃষ্ণ আর রাধার প্রণয়-লীলা ছিল যাঁদের পদাবলীর বিষয়-বস্তু—যাঁরা কানু বৈ অন্য কারেও জানতেন না, তাঁদের সঙ্গে অপরিচয়?

প্রশ্নকর্ত্তা পুনরায় বললেন,—বড়ু চণ্ডীদাসের পদ জানো? তুমি গান গাইতে জানো না?

—পদ জানি না। জানবার মত জ্ঞান আমার কোথায়? নাম শুনেছি চণ্ডীদাসের। আর গানও আমি জানি না। পদ গাইতে হ'লে যে একতারা চাই। কোথায় পাবো একতারা?

কিঞ্চিৎ সাহস সহকারে কথা বলে নারীকণ্ঠ। যেন রাশ আগলা ক'রে কথা বলে। একসঙ্গে সকল প্রশ্নের উত্তরদান।

গমগমে উনুনের আঁচ।

দেহটা দগ্ধ করে দেয় বুঝি। কড়াইয়ে ছানা। নরম পাকের মণ্ডা তৈরী হচ্ছে দন্তহীন বৃদ্ধার জন্যে। আরেকটা চুল্লীতে খাঁটি দুধ চাপানো হয়েছে। ফুটছে টগবগ। দু'দিক সামলাতে গিয়ে ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছেন পূর্ণশশী। পিঠের কাপড়টুকু ভিজে সপ-সপ করছে। পূর্ণশশীর শুভ্র রঙ ফুটে উঠেছে। গায়ে জামা নেই। কর্ম্মব্যস্ততায় লজ্জামোচনের জন্য আঁচলের পাড়ের একাংশ দাঁতে ধ'রে আছেন পূর্ণশশী। গুণ্ঠন খুলে গেছে। মাথায় সুগোল খোঁপা ঘন কৃষ্ণ-কেশের। তৈলাক্ত কেশ। খোঁপায় চিরুনী, স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে 'সাবিত্রী সমান হও'। রূপার কাঁটা। মাথার সম্মুখভাগে পাতা-কাটা চুলের বাঁকা-সীঁথি। টকটকে লাল সিঁদুর-রেখা সীমন্তে। কপালে সিঁদুর টিপ। উনুনের তপ্ত আগুনে ঘেমে উঠেছিলেন পূর্ণশশী। তাঁর প্রায়-আকর্ণবিস্তৃত আঁখিদ্বয়ে জলন্ত অগ্নিশিখা। উনুনের প্রতিবিম্ব। পূর্ণশশী ডাকলেন সুমিষ্ট কণ্ঠে,—বামুনদিদি! বামুনদিদি আছেন?

কাছাকাছ কোন' একটা ঘর থেকে সাড়া দেয় ব্রাহ্মণী। বলে,—আসছি গো আসছি।

উনুন থেকে শাড়ীর আঁচলের সাহায্যে সন্দেশের কড়াইটা নামিয়ে ফেললেন পূর্ণশশী। ব্রাহ্মণী বললে,—কিছু বলতেছিলে বৌ?

পূর্ণশশী বললেন,—হাঁা। সুগন্ধি একটা কিছু দাও। সন্দেশে দিই।

ব্রাহ্মণী বললে,—আমি দিতে পারবনি বৌ। তুমিই উঠে নাও। আছে ঐ তেকাটায়। ঐ যে গন্ধের শিশি। দেখো বৌ, বেশী দিওনি যেন। বিস্বাদ হয়ে যাবে। বড্ড কড়া কি না!

পূর্ণশশী কড়াইয়ে কাঠের খুন্তি চালাতে-চালাতে জিজ্ঞেস করলেন,—আপনার কাপড় ভাল নয় বুঝি?

ব্রাহ্মণী ঘরের বাইরে দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল। বললে,—হ্যাঁ বৌ। আমি যে আঁস রাঁধছি। রাতের খাওয়া তৈরী

করছি তোমাদের। যাই আমি, মাছের ঝালটা বুঝি পুড়ে যায়!

পোয়া দুয়েক ছানার সন্দেশ।

শুধু ছিটিয়ে দিলেই চলবে। নয়তো তিক্ত হয়ে যাবে বেশী আতর ছিটালে। তেকাটা থেকে সোনালী চিত্তির কাটা আতরের শিশিটা পাড়েন পূর্ণশশী। আঙুলের এক কোণে আতর নেন কি না নেন। ছিটিয়ে দেন গরম সন্দেশের নরম পাকে। ঘরটা পর্য্যন্ত গন্ধে ভরপুর হয়ে যায়। একটা শাদা পাথরের রেকাবীতে সন্দেশ তুলে চুপচাপ ব'সে থাকেন পূর্ণশশী। তাঁর মুখাকৃতিতে চিন্তার প্রলেপ পড়ে যেন। কি যেন ভাবেন তিনি। কপালের কয়েকটা রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

উনুনের আগুনের আভায় পূর্ণশশীর হলুদ শুভ্র সুপুষ্ট বাহু দুটি স্পষ্ট নজরে পড়ে। স্বর্ণালঙ্কার বাহুতে। বাজুবন্ধ আর বলয়। মিছরিদানা চুড়ি। কম্পমান অগ্নিশিখায় চিক-চিক করে অলঙ্কার। উনুনের আগুনে একদৃষ্টে তাকিয়ে পূর্ণশশী চলে-যাওয়া দিনগুলিকে ভাবছিলেন। হয়তো হ'তে পারতো এমন যে, পূর্ণশশীই হয়তো আসতেন এই গৃহের বধূরূপে। কে জানে, এই সংসারের সকল ভার আর দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে পড়তো কি না। বড় বৌ কুমুদিনী যেমন স্নেহ করতেন পূর্ণশশীকে তাতে এমনটি হওয়া বিচিত্র ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তকে যে পৃথিবীতে ধ'রে রাখা গেল না। সংসারের মায়া কাটিয়ে অতি অসময়ে চ'লে গেলেন তিনি। চোখ ফেটে জল আসে কি পূর্ণশশীর! কত চেষ্টাতেও পূর্ণশশী ভুলতে পারেন না কৃষ্ণকান্তকে। উনুনের প্রতি অপলক চোখ রেখে কত কথা ভাবতে থাকেন পূর্ণশশী।

—হ্যাঁ বৌ, হয়ে গেছে তোমার? ব্রাহ্মণী কথা বলে দরজার বাইরে থেকে।—ও মা, দেখছি তো হয়ে গেছে। তবে তুমি ব'সে কেন বৌ?

হঠাৎ ব্রাহ্মণীর কথা শুনে চমকে ওঠেন পূর্ণশশী। দু'-এক মুহূর্ত্ত চোখ দু'টি বন্ধ ক'রে থাকেন। না, না, এ কি ভাবছেন পূর্ণশশী! কেন এত দিন বাদে মনে জাগছে সেই পুরাতন দিনের স্মৃতি! নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় পূর্ণশশীর। মন কেন বাধা মানে না! কেন এত চেষ্টাতেও ভুলে যান না তিনি! এ সকল চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে যে। ভুলতেই হবে পূর্ণশশীকে। কত দিন আর কত রাত্রি এই চিন্তাজালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন তিনি! সকলের অলক্ষ্যে কষ্ট পেয়েছেন কত! কিন্তু আর নয়। একবার চলে গেলে লোকান্তরে, কেউ কি আর ফিরে আসে! যাদের পেছনে ফেলে যাওয়া, তাদের কি আর দেখতে আসে কেউ? না, না, আর একদিন কেন, এক মুহূর্ত্ত ভাববেন না পূর্ণশশী।

[illegible]ার জবাব না পেয়ে ব্রাহ্মণী বলে,—হ'ল কি বৌয়ের! কথা ক'স না কেন?

—বামুনদিদি? কথা বললেন পূর্ণশশী। কাঁপতে কাঁপতে। বললেন,—হয়ে গেছে দিদি। উনুনের তাতে ব'সে ঘেমে নেয়ে উঠেছি। দম আটকে আসছে যেন।

—উঠে পড়' না বৌ। হয়ে গেছে যখন, তখন আর মিথ্যে উনুন-তাতে ব'সে কেন? বললে ব্রাহ্মণী।—আর তাতও কি যেমন-তেমন! উনুন তো নয়, যেন আগুনের ভাঁটা।

উঠে পড়লেন পূর্ণশশী। আঁচলে ঘর্মাক্ত মুখ মুছে বললেন,—বামুনদিদি ভাই, বৌকে ব'লে পাঠান না। বলুন যে ঠাকুমার খাবার প্রস্তুত। কথা বলতে বলতে অন্য উনুন থেকে আঁচলের সাহায্যে ফুটন্ত দুধের আধারটা নামিয়ে ফেললেন।

ব্রাহ্মণী বললে সহানুভূতির সুরে,—তুমি ঘর থেকে বেইরে পড়' আগে। বাইরে হাওয়ায় এসো। গায়ের কাপড়খানা ভিজে গেছে যে ঘামে!

সত্যিই পূর্ণশশীর দেহের গরদখানা ভিজে সপ-সপ করছে। মুখটি তাঁর লাল হয়ে গেছে। পূর্ণশশী বাটিতে দুধ তুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। খোলা উঠানে। ওপরে রাত্রির আকাশ। জ্বল-জ্বল করছে অজস্র তারা। প্রেতাত্মার চোখের মত। মানুষের মৃত্যু হ'লে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত আকাশের নক্ষত্র হয় না? নক্ষত্র হয়ে আকাশ থেকে দেখে মানুষ—দেখে না কি যাদের পিছনে ছেড়ে গেছে তাদের?

ঠাগ্‌মা তখন নাতনীর সঙ্গে গল্পে মশগুল।

ঠাকুমার ঝুলি থেকে ঠাগ্‌মা অফুরন্ত গল্প শোনাচ্ছেন আর রাজেশ্বরী শুনছে মুগ্ধ নয়নে, বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে। ঠাগ্‌মা যা-যা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, রাজেশ্বরী উত্তর দিচ্ছে। বৃদ্ধার অত্যন্ত কাছ ঘেঁসে ব'সে। আবদারের ভঙ্গীতে বলছিল রাজেশ্বরী,—কিন্তুক, আমার যে ভীষণ মন কেমন করে তোমার জন্যে। কিচ্ছু ভাল লাগে না তখন। মনে হয়, ছুটে চ'লে যাই আমার সেই পুতুলটার কাছে। পুতুলটা কেমন আছে ঠাগ্‌মা?

বৃদ্ধা বললেন স্নেহসিক্ত কণ্ঠে,—ঠিক যেমনটি সাজিয়ে রেখে এসেছিলে ভাই ঠিক তেমনটি আছে। কেউ কি হাত দেয় তোমার পুতুলের আলমারীতে? তা তোদের তো ভাই ঘরের গাড়ী আছে, যেতে পারিস তো যখন-তখন।

রাজেশ্বরী ড্যাবা-ড্যাবা চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো ইদিক-সিদিক। দেখলো কে কোথায় শুনছে। কাকেও দেখতে না পেয়ে ফিস-ফিস করলো,—বললুম না তোমায় তখন? তুমি যে কান ক'রে শুনলে না।

—কি বললি তুই? কি শুনলুম না? অবাক হয়ে শুধোলেন বুড়ী।

আবার চোখ ফেরালো রাজেশ্বরী। দেখলো অন্য কেউ আছে না নেই। বললে,—বললাম না, আমাকে যে এখন যেতে নেই?

—কেন না? যেতে নেই কেন?

যখনই হোক... যেখানেই হোক...
ব্রুক
বণ্ড
চা
বাগান থেকে সদ্য আসে
তাই এত তাজা
BB/108

—আহা, তুমি যেন জানো না! জেনে-শুনে ন্যাকা সাজো কেন?

—বল্ না, শুনি আগে। সত্যি বলছি ভাই, আমি তো কিচ্ছুটি জানি না।

রাজেশ্বরী ফিক্-ফিক হাসে আর বলে,—আমি তোমার কাছে গেলে যদি কোথাও চ'লে যায়! যদি আর না আসে! যদি মদ খেয়ে—

কয়েকটা 'যদি' শুনে আশ্বস্ত হ'লেন বৃদ্ধা। দন্তহীন মুখবিবরে হাসির আনন্দোল্লাস তুলে বললেন,—তবে লা বেহায়া মেয়ে! দাঁড়া, আমি নাতজামাইকে সঙ্গে ক'রে ভাগলবা হচ্ছি। দেখি তুই যাস কি না। ওমা, কোথায় যাবো মা? মেয়ের কথা শোন'।

শেষের কথা কয়েকটি কোন্ মা'র উদ্দেশে বলেন, কে জানে! রাজেশ্বরী লজ্জানত মুখে ব'সে থাকে। সে যেন শুধু ব'লেই খালাস। রাজেশ্বরী যে বোঝে না, কোন্ কথা কাকে বলতে হয়। কোন্ কথা কাকে। রাজেশ্বরীর মুখে এমন দিলখোলা কথা শুনে ঠাকুমা বিস্ময়ের সঙ্গে খুশীও হন অপর্য্যাপ্ত। মনে মনে নিশ্চিন্ত হন এই ভেবে যে, তবু মনটা রাজোর বাঁধা পড়েছে বাঁধনে। বৃদ্ধা ভাবেন আর দর-দর বেগে অশ্রুপাত করেন।

রাজেশ্বরী বললে,—তুমি কাঁদছো ঠাগ্‌মা?

ঠাগ্‌মা বললেন,—যাঃ, কাঁদবো ক্যান্ লা? আমি তো হাসছি। দেখছিস্ না, আমি তো হাসছি।

—তোমার চোখে যে জল? শুধোয় রাজেশ্বরী। ঘরে এমন উজ্জ্বল লণ্ঠনের আলো, চোখে ভুল দেখবে রাজেশ্বরী! অন্দরের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় জোরালো বাতির আলো। মুঘল আমলের বেলোয়ারী কাচের ঝুলানো আলোর গোলাকার কাচের আবরণে কাচের নবরত্ন। পল্‌কি-তোলা রঙীন কাচের নক্ষত্র একেকটি। আলো জ্বালতেই নানা রঙ ঠিকরোচ্ছে।

ঠাগ্‌মা বললেন,—বয়েসটা কত হ'ল জানিস তুই? চোখ ব'লে কোন' পদার্থ আছে আমার শরীলে? চোখের মাথা যে খেয়ে ব'সে আছি। দিন রাত্তির জল পড়ছে চোখ বেয়ে-বেয়ে।

মিথ্যা কথা বললেন বৃদ্ধা। তিনি ব্যথাহত মনে কেঁদেছেন। রাজেশ্বরীর মুখের কথা শুনে। এমন কথা, যা কখনও তিনি কানে শুনবেন কল্পনা করেননি। যে অনাথাকে বুক দিয়ে প্রতিপালন করলেন শৈশব থেকে, সে এমন বেইমান হ'তে পারে! এমন অকৃতজ্ঞ! এমন লাজলজ্জাহীন! ভাবছিলেন বৃদ্ধা। রাজেশ্বরী মুখের কথা শুনে। পরম দুঃখে অশ্রুপাত করছিলেন।

বৃদ্ধা বললেন,—এখন ভাই একটা বিষয়-সংক্রান্ত কথা [illegible]য়ে নিই।

রাজেশ্বরী বললে,—কি আবার বিষয়-সংক্রান্ত কথা?

—শোন' ভাই, মন দিয়ে শোন'। তোমার বাড়ীটা এবার তুমি দখল নাও। ঠাগ্‌মা বিষয়ী কথা কাঁদেন।—আমাকেও ছুটি ক'রে দাও। আমি চ'লে যাই বিন্দাবনে। আমার খোরাকীর টাকাটা মাসান্তে একবার পেলেই থাকতে পারবো আমি।

—সে কি ঠাগ্‌মা? আকাশ থেকে প'ড়লো যেন রাজেশ্বরী।—তুমি আবার বিন্দাবনে যেতে যাবে কেন? সুখে থাকতে ভুতে কিলোচ্ছে তোমাকে?

ঠাগ্‌মা বললেন,—ঢের হয়েছে ভাই, আমার সুখের আর দরকার নেই। আমাকে ছুটি দাও।

—তুমি কি ব'লছো ঠাগ্‌মা? বললে রাজেশ্বরী।

—ঠিক বলেছি ভাই। আর নয়। বললেন বৃদ্ধা। দুঃখ-কাতর কণ্ঠে।

—বৌদিদি, ঠাকুমার দুধ-মিষ্টি তৈরী। ব'লে পাঠালেন শশীবৌদিদি।

ঘরের একটা দরজায় ব্রাহ্মণী এসে হাজির হয়। কথা বলে নাতিউচ্চ কণ্ঠে।

রাজেশ্বরী উঠে পড়লো তৎক্ষণাৎ। বললে,—আনতে বলুন দিদিকে। আমি একটা জায়গা ক'রে দিই। আমার ঘরের আলনায় একটা পশমের আসন আছে, নিয়ে আসুন না বামুনদি! আর দিদিকে গিয়ে বলবেন যে একঘটি গঙ্গাজল যেন নিয়ে আসে! তা নয়তো আবার যেতে হবে এতটা কষ্ট ক'রে।

কাছাকাছি ছিল রাজেশ্বরীর খাস-কামরা।

আলো, আসবাবপত্র আর শয়নের মহার্ঘ সরঞ্জাম। খাট-আলমারী আর ভেলভেটের বিছানা। ব্রাহ্মণী লক্ষ্য ক'রে দেখে বাইরে থেকে ঘরের মধ্যেটা। দেখে পালঙে কে শুয়ে আছে না! শুধু শুয়ে আছে, না ঘুমোচ্ছে!

ব্রাহ্মণী বাইরে থেকে মিহি কণ্ঠে কথা বললে। —বৌদিদি বললেন ঘরের আনলা থেকে আসন নে যেতে।

ঘরের মধ্যে কোন সাড়া-শব্দ নেই। নিদ্রায় অচেতন কৃষ্ণকিশোর পালঙে শুয়ে।

টেবিলের 'পরে টেবিল-আলোর শিখাটা শুধু কাঁপছে ধিকি-ধিকি। পূবালী বাতাসে। তবে কি ঘুমোচ্ছেন? শ্বাস রুদ্ধ ক'রে ঘরে সিঁদোয় ব্রাহ্মণী। ঘরটা তার খুব পরিচিত নয়, যেজন্য খুঁজতে হয় কোথায় আনলা। থতমত খেয়ে দেখে ব্রাহ্মণী, কোথায় আনলা।

খাস-কামরার কোলের দালানে আসন পেতে দেয় রাজেশ্বরী। ব্রাহ্মণী বলে,—এসো ঠাগ্‌মা! খাবে এসো।

—কি খাবো ভাই? খাওয়া-দাওয়া কি আর আছে? কি খাওয়াবে দিদি? ঠাগ্‌মা কথা বলেন, কেমন যেন দুঃখভার সুরে। কেমন যেন নিস্পৃহের মত।

—তুমি যা খাও। বলে রাজেশ্বরী। বলে—দুধ আর মিষ্টি। পোলাও-কালিয়া নয়।

বৃদ্ধাও অতি কষ্টে উঠলেন। আসনের দিকে এগোতে

এগোতে বললেন,—তা বেশ। তা বেশ। আর তো কিছু খাই না ভাই আমি। তোর কি আর অজানা আছে আমার খাওয়া? ঠাগ্‌মা কথার শেষে নিশ্বাস নিয়ে আবার কথা বলেন। বলেন,—বিষয়-সংক্রান্ত কথাটা তো ভাই বলা হ'ল না। তোর বাড়ীটা দখল নিয়ে আমাকে ভাই মুক্তি দে।

অভিমানের আমেজ মা'খিয়ে কথা বলে রাজেশ্বরী। বলে,—তা হ'লে আমি কাঁদবো ঠাগ্‌মা। যা-তা কথা বললে খিড়কির পুকুরে গিয়ে ডুব দেবো। অপঘাতে মরবো তাই চাও তুমি?

—বালাই ষাট! বালাই ষাট! বললেন ঠাগ্‌মা। —মুখের কি তোর কোন আখ্‌ঢাখ্ নেই? যা মুখে আসে বলবি?

এমন সময়ে দমকা হাওয়ার একটা বেগ উড়ে আসে কোথাও থেকে। গা-কাঁপানো, হিমবাহী হাওয়া। কোথায় কি একটা পড়ে ঝনন-ঝনন শব্দে। চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। শিউরে ওঠে। কাছে কোথায় শব্দটা হয়েছে। কাছের কোন' দালানে। কাচের একটা ঝুলন্ত লণ্ঠনের শিক্‌লি টুটে গেছে দমকা বাতাসে। বহুদিনের পুরানো লণ্ঠন। শিক্‌লি কেটে গেছে সহসা। কাচের লণ্ঠনটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে ভূমিস্পর্শে।

অপঘাতে মৃত্যুর কথাটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিকট ঝনৎকারের শব্দে বৃদ্ধা কেমন হতচকিত হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ নীরব থেকে বললেন,—ছাখ্, রাজো, কোথায় কি পড়লো! কি ভাঙলো কে, কে জানে!

বৃদ্ধা কথা বলেন, কিন্তু তার বক্ষ দুরু-দুরু করতে থাকে। থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে সর্ব্বাঙ্গ। বলেন,—কারও সর্ব্বনাশ হ'ল কিনা ছাখ্, রাজো! তুই যেমনকার তেমনি দাঁড়িয়ে থাকলি?

বৃদ্ধা কথা বলতে বলতে একটা জানলার গরাদ ধ'রে ফেললেন। হয়তো টলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় কম্পমান দেহটা। নিশ্বাস টানতে পারেন না যেন। বুকে যে তাঁর কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। রাজেশ্বরীর অপঘাতে মৃত্যুর কথা আর ঐ শব্দ শোনা পর্য্যন্ত বুড়ী সাড় হারিয়ে ফেলেছেন। বললেন,—রাজো, ওলো রাজো, তুই কোথায় যাচ্ছিস? তুই আমার কাছ থেকে যাস নে। তুই আমার কাছে আয়।

রাজেশ্বরী সাবধানী পদক্ষেপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল যেদিক থেকে শব্দ আসে সেই দিকে। রাজেশ্বরী বললে,—তুমি ভয় পাও কেন? আমি লোকজনকে ডাকাই। কি হ'ল দেখুক।

ঠাগ্‌মা বললেন,—তোমাকে ডাকাডাকি করতে যেতে হবে না ভাই! তোমার সোয়ামীকে ডেকে দাও না, সে দেখবে'খন। সোয়ামীটি কোথায়?

রাজেশ্বরী বললে বিনম্র কণ্ঠে,—ঘরে ঘুমোচ্ছে। কাঁচা ঘুম ভাঙালে যদি রাগ করেন!

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চোখ বড় ক'রে বললেন ঠাগ্‌মা;—সে কি কথা লা! ওলট-পালট হয়ে গেলেও উঠবে না ঘুম থেকে? এমন অসময়ে ঘুমই বা কেন?

ঘুম কেন অসময়ে? রাজেশ্বরী ভাবে দিনটার কথা।

কত শ্রান্ত এখন কৃষ্ণকিশোর! কত ক্লান্ত! কত পরিশ্রম গেছে সকাল থেকে দিনভোর! পরিপূর্ণ আহার পর্য্যন্ত হয়'নি কৃষ্ণকিশোরের। নাকে-মুখে গুঁজে গিয়েছিল উকীল-বাড়ীতে। যাওয়ার আগে—

—তা ব'লে তুই যেতে পাবি না রাজো। আমার মাথা খাস্। হিতে বিপরীত হবে শেষকালে? কাচ ফুটিয়ে খোঁড়া হয়ে বসে থাকবি? ঠাগ্‌মার কথায় যেন উষ্মা।

—তুমি ঘরকে যাওতো বৌদিদি!

হঠাৎ পুরুষ-কণ্ঠ শুনে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয় রাজেশ্বরী। বলে,—কখন ফিরলে অনন্ত?

অনন্তরাম শব্দ শুনে অন্দরে এসেছিল। বললে, খানিক আগে ফিরেছি। তুমি এখান থেকে যাও দেখি। তোমার ঠাকুমা ঠিক ব'লেছেন। শেষকালে কি একটা কাণ্ড করবে? একটা কাচের লণ্ঠন কড়া ছিঁড়ে প'ড়ে চুরমার হয়ে গেছে। একে বেলোয়ারী কাচ, পায়ে বিঁধলে আর রক্ষে আছে? বিষিয়ে যাবে না? দাঁড়াও, আমি আগে লোকজনাকে ডেকে সাফ করাই। তারপর তুমি ঘর থেকে বেরুবে।

রাজেশ্বরী বললে,—প্রজাদের সঙ্গে ক'রে কোথায় কোথায় গেলে অনন্ত?

অনন্তরাম বলে,—গেছি অনেক কোথায়। দেখিয়েছিও অনেক। অজ মুখ্যু তো একেকটা! বোঝাতেই আমার জান নিকলে গেছে। ফুরসৎ পেলে বিস্তারিত বলব। এখন তুমি যাও এখান থেকে।

রাজেশ্বরী কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবে। বলে,—আমি যাচ্ছি এখান থেকে, বিদেয় হচ্ছি। অনন্ত, শশীদিদি গেছেন ঠাগ্‌মার দুধ-মিষ্টি তৈরী করতে। কা'কেও পাঠাও না তাঁকে ডাকতে। ব'সে আছে ঠাগ্‌মা। রাত হচ্ছে কত! আর ব'লে দিও, যেন ঘোরানো-সিঁড়ি ধ'রে ওপরে ওঠেন। কাচ ফুটিয়ে শেষ পর্য্যন্ত—

পূর্ণশশী তখনও রান্না-বাড়ীর খোলা উঠানে। আকাশে চোখ তুলে অন্যমনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পূর্ণশশীর মুখটি কেন কে জানে ব্যথাভরা! চোখে শূন্যদৃষ্টি। ঘরে-ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে রান্না-বাড়ীতে। লণ্ঠনের অল্প অল্প আলোয় অন্য কিছু দেখা যায় না, শুধু পূর্ণশশীর ধবধবে ফর্সা মুখ আর বাহুযুগল। ঘন নীল রঙের জরিপাড় নীলাম্বরী অন্ধকারে বুঝি মিশে যায়। নীলাম্বরীর বেষ্টনে পূর্ণশশীর আঁটসাঁট নিটোল দেহ। দূর থেকে মনে হয় যেন একজন ষোড়শী, বিরহী যক্ষের পাঠানো সমাচার পড়ছেন আকাশের চলন্ত মেঘে। পূর্ণশশী ঊর্দ্ধমুখী হয়ে ছিলেন কতক্ষণ। ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

হাতক দরপণ, মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার
দেহক সরবস, গেহক সার ॥
পাখীক পাখ মীনক পানি
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি
তুহুঁ কৈসে মাধব কহ তুহুঁ মোয়
বিদ্যাপতি কহ—দুহুঁ দোহা হোয় ॥

জলদগম্ভীর কণ্ঠের আবৃত্তি শুনে পূর্ণশশী মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে গিয়েছিলেন। আবৃত্তি শেষ হওয়ার বহুক্ষণ পরে প্রশ্ন ক'রেছিলেন,—এ কবিতার অর্থ কি? আমি তো কিছুই বুঝলাম না।

পূর্ণশশীর কথা শুনে কৃষ্ণকান্ত অট্টহাস্য হেসেছিলেন। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন,—সে কি কথা, এমন সহজ সরল কথাগুলো পর্য্যন্ত বুঝলে না?

—না। আমি যে লেখাপড়া বেশী জানি না।

—মিথিলার কবি, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর কবি, কীর্ত্তিলতা-প্রণেতা মহাকবি বিদ্যাপতির রচনা যে এই কবিতা। মৈথিলী ভাষায় রচনা, বাঙলা ভাষায় নয়। লোমশ বক্ষ থেকে রুদ্রাক্ষের মালা তুলে ধ'রে শিশুর মত খেলা করতে করতে কথা বলতেন কৃষ্ণকান্ত। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু মৃদু হাসি।

পূর্ণশশী লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে প্রশ্ন ক'রেছিলেন,—কিছু অর্থ বুঝতে পারিনি। কবিতাটির অর্থ কি?

কৃষ্ণকান্ত শিশুর মতই সহাস্যে কথা বলেন,—অর্থ বুঝতে হ'লে ব্রাহ্মণের সেবায় কিছু দান করতে হয়।

—আমার সামর্থ্যে যা কুলায় আমি দেবো। পূর্ণশশী সহজ মনে কথার উত্তর দিয়েছিলেন।

—তথাস্তু। তুমি আত্মদানে প্রস্তুত? প্রশ্নকর্ত্তার কথায় গাম্ভীর্য্য।

প্রস্তাব শুনে চমকে চমকে উঠেছিলেন পূর্ণশশী। হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলতে পারেননি। পলকহীন চোখে তাকিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্তের পানে। সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছিল পূর্ণশশীর। এমন সময়ে ঘড়ি-ঘরে ঝনন ঝনন শব্দে ঘণ্টা পড়েছিল। সময় উত্তীর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত শুনে ভয়, লজ্জা আর সঙ্কোচ অধিকার করেছিল পূর্ণশশীর মন আর দেহ। ঘর থেকে চ'লে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি। বিদায় গ্রহণের জন্য উসখুস করতে দেখে কৃষ্ণকান্ত বললেন, —য়ুরোপের নারীজাতি জ্ঞানলাভের বিনিময়ে আত্মবিসর্জ্জন করতেও কুণ্ঠিত নয়। আর তুমি? ধিক্, ধিক্ তোমাকে।

কথার শেষে আর গম্ভীর থাকতে সক্ষম হননি কৃষ্ণকান্ত। হেসে ফেলেছিলেন লজ্জা-ভীরু পূর্ণশশীর অবস্থা দেখে। সত্যি ভয় আর আশঙ্কায় সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন পূর্ণশশী। যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—আত্ম বিসর্জ্জন মানে যদি মৃত্যুবরণ হয় তাতে আমি প্রস্তুত। আপনি কবিতাটির অর্থ আমাকে শীঘ্র শীঘ্র বলুন। সময় বেশী নাই।

কথাগুলি শুনে অট্টহাসি হেসেছিলেন কৃষ্ণকান্ত। পেশী-বহুল শরীরটা তাঁর হাসির সঙ্গে সঙ্গে নাচতে থাকে। হাসতে হাসতে ব'লেছিলেন,—তুমি কাপুরুষ। তুমি একটা পয়লা নম্বরের কাপুরুষ। আত্মদান অর্থে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া কাপুরুষতা। আমি অন্য অর্থে বলেছি। আত্ম-দান অর্থে দেহ-দান।

শেষ কথাটি কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠেন পূর্ণশশী। মাথা নত ক'রে ফেলেন তৎক্ষণাৎ। ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায়। পায়ের অঙ্গুলিস্পর্শে ঘরের মেঝেয় অদৃশ্য রেখাপাত করেন। মুখে তাঁর কথা যোগায় না। তবুও অতি কষ্টে বলেছিলেন,—না, না, না। আমি এখন যাই?

যাওয়ার প্রস্তাবে কৃষ্ণকান্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কি না কে জানে। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন ক'রে বললেন,—তোমাকে দেখছি তুমি অত্যন্ত ভীত হয়েছো। অন্য একদিন বলা যাবে কবিতাটির ভাবার্থ। আজকে এখন আসতে পারো তুমি।

যাত্রাকালে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিলেন পূর্ণশশী। কৃষ্ণকান্ত তাঁর শুধু মাথাটি স্পর্শ করেন। বলেন, —সতী সাবিত্রী হও। সীঁথির সিন্দুর অক্ষয় হোক্ তোমার। আমার কথাগুলি জানিও আন্তরিক নয়। তোমাকে শুধু পরীক্ষা করবার নিমিত্তই বলা।

—তবে! তবে? মিথ্যা কেন আমাকে উত্তেজিত করছেন? আমি আসি এখন। বাজলো কত! কত দেরী হয়ে গেছে! আমাকে এখন ঘরে ফিরতে হবে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি যাই।

—হাসিমুখে বিদায় লও তো অনুমতি দেব, নচেৎ নয়।

শুষ্ক হাসি হেসেছিলেন পূর্ণশশী। অন্তরের হাসি নয়। দুঃখের হাসি। রক্তাভ ওষ্ঠে হাসির মৃদু রেখা ফুটিয়ে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন ঘর থেকে।

তারপর আর সাক্ষাৎ হয়নি পরস্পরে।

কৃষ্ণকান্ত সহসা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছিলেন মরজগৎ থেকে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর। কবিতাটির অর্থ পূর্ণশশীর অশ্রুতেই থাকে। কৃষ্ণকান্তর মৃত্যুতে তাঁর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হয়।

—এই শশীবৌ? ভাবনা রাখো এখন। ঠাকুমার দুধ-মিষ্টি নিয়ে ডাকছে যে তোমাকে বৌমা।

—এঁ্যা! কে? এই যে যাই। কে? অনন্ত? অন্ধকারে থেকে কথা বলেন পূর্ণশশী।

—হাঁ গো হাঁ বৌদিদি। একলাটি দাঁড়িয়ে কেন এমন? অনন্তরামের কথায় কৌতূহল।

পূর্ণশশী উঠান থেকে দালানে উঠে বললেন,—দুধ-মিষ্টি প্রস্তুত। বামুনদি আঁস-রান্নাঘরে ঢুকেছেন। আমাকেই নিয়ে যেতে হবে। তাই দাঁড়িয়ে আছি। ডাক পড়লেই যাবো।

অনন্তরাম বললে,—ডাক পড়েছে। যাও। তবে ঘোরানো সিঁড়ি ধ'রে ওপরে যেও। ওদিকের সিঁড়ির সামনের দালানে

একটা কাচের লণ্ঠন হাওয়ায় পড়ে চুরমার হয়ে গেছে। ছড়ানো কাচ চতুর্দিকে।

দু'হাতে দু'টি পাত্র ধ'রে পূর্ণশশী চললেন। মুখে তাঁর বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায়! পূর্ণশশী ভাবছিলেন, এই গৃহে এলেই যত পুরানো দিনের স্মৃতি মনে জাগে। স্বগৃহে থাকলে কাজে-কর্মে বেশ ভুলে থাকেন তিনি। কেবল এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা দেখলে আর বিস্মৃত হয়ে থাকতে পারেন না তিনি। দুঃখভারাক্রান্ত মন তাঁর বিরক্ত হয়। কে জানে, পূর্ণশশীই হয়তো হ'তেন এই গৃহের কুলবধূ। তাঁকেই হয়তো এই সংসার দেখা-শুনা করতে হ'ত।

—কত কষ্ট দিলুম ভাই তোমাকে। ভাবছো না, যে রাজ্যের ঠাগ্‌মা এসে জ্বালাতন-পোড়াতন ক'রে গেল?

আসনে ব'সে কথা বলেন বৃদ্ধা। পূর্ণশশীকে আসতে দেখে বলেন। পাত্র দু'টি বৃদ্ধার সমুখে নামিয়ে রেখে বললেন পূর্ণশশী,—আপনি রাজ্যের ঠাকুমা, আমার কেউ নয় তো? আমারও যে ঠাকুমা আপনি।

বৃদ্ধা ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললেন,—তা বেশ। তা বেশ। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। শুধু গায়ে গরদ প'রে কি চমৎকার মানিয়েছে ভাই তোমাকে! যে বলে কুড়িতে মেয়েজাত বুড়ী হয়ে যায়? সে দেখে যাক আমার শশীদিদিভাইকে। দেখে চক্ষু সার্থক করুক।

পূর্ণশশীর লজ্জারাঙা মুখে হাস্যরেখা ফুটে ওঠে। হাতের পাত্র দু'টি নামিয়ে রাখতে গিয়ে ঊর্দ্ধাঙ্গের বাস বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। শাড়ীর আঁচল যথাস্থানে টানতে টানতে পূর্ণশশী সহাস্যে বললেন,—আপনি আর বাজে বকবেন না ঠাকুমা! আমার যে ইদিকে মরবার বয়েস হ'ল।

—আমাকে আর লজ্জা দিও না ভাই। তোমার যদি মরণের দিন ঘনিয়ে থাকে, আমার তবে এ্যাদ্দিনে ম'রে ভুত হয়ে থাকা উচিত ছিল। বৃদ্ধা হাসতে হাসতে বললেন।

রাজেশ্বরী এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছিল দু'জনের বাক্য-বিনিময়। শুনছিল আর হাসছিল ফিক-ফিক মুখে আঁচল চেপে। চন্দ্রালোকে যেন একটি লাল পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় ধীরে ধীরে রাজেশ্বরীর হাসিতে। এলোমেলো বাতাসে দুলছিল রাজেশ্বরীর টকটকে লাল শাড়ী।

কৌতুক সহকারে অস্ফুট হাসির সঙ্গে পূর্ণশশী বললেন,—আপনার ঠাকুমা একশো বছর পরমায়ু হোক, ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।

এক মুহূর্ত্ত নীরবে তাকিয়ে বললেন বৃদ্ধা,—আর জ্বালিও না দিদি! প্রার্থনা কর' তোমাদের এই বুড়ী ঠাগ্‌মা এক্ষুনি যাক্‌। আর বাঁচবার সাধ নেই। যেদিন আমার ব্যাটা আর বৌ গেছে সেদিন থেকে—

কথায় কথায় দুঃখের প্রসঙ্গের অবতারণা হ'তে দেখে পূর্ণশশী কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার প্রয়াস পান। পূর্ণশশী বলেন,—বলুন না ঠাগ্‌মা আপনার নাতনীকে, যাক্‌ বরের কাছে গিয়ে একটু বসুক। আহা ব্যাচারী, ফিরেছে সারা দিন বাদে। আমি আপনার খাওয়া দেখছি।

ঠাগ্‌মা যেন পেয়ে বসলেন। ওপরে নীচে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন,—ঠিক বলেছে আমার শশীদিদি ভাই। যা না লা, গিয়ে দু'দণ্ড থাক্‌ না কাছে। ঘুমোচ্ছে, তা কি হয়েছে? কপালে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেনা। তোর বরের যা ভাল লাগে করগে না। আমি তো আর জানি না বর কি চায় না চায়।

—ধোৎ ঠাগ্‌মা, তুমি যেন কি! গেছলাম তো আমি। দিদি, আপনি বুঝি চান যে আমি অপ্রস্তুত হই? বেশ লোক আপনি। সলজ্জ কণ্ঠে বললে রাজেশ্বরী। পত্রবহুল আয়ত চোখে তিরস্কার ফুটিয়ে। কথার শেষে আঁচলে মুখ ঢাকলো।

ঠাগ্‌মা হেসে ফেললেন রাজেশ্বরীর অপ্রস্তুতায়। পূর্ণশশীও হাসলেন। হাসতে হাসতে পূর্ণশশী দুটি চোখ মুদিত ক'রে ফেলেন। শব্দহীন হাসির সঙ্গে।

কথা বলতে বলতে আরও কতক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যায়। বৃদ্ধা যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ। বৃদ্ধাকে বিদায় দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে রাজেশ্বরী রান্না-বাড়ী যায়। ভয়ে ভয়ে, সন্ত্রাসে। রাত্রির গভীর অন্ধকার যে দিকে দু'চোখ যায়। ঘন কালো আকাশ। থেকে থেকে

বইছে শুধু এলোমেলো বাতাস। ত্রস্তপদে এগোয় রাজেশ্বরী। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন সাবধানের সঙ্গে।

শিবাকুল ডাকছে দল বেঁধে। নিমতলার শ্মশান-ঘাটে।

নিস্তব্ধ রাত্রির তমসা ভেদ ক'রে শিবাকুলের আর্ত্ত আর্ত্তনাদ দূরে, বহুদূরে ভেসে যায়। নিমতলার শ্মশানের কাছ একটা অর্দ্ধদগ্ধ বেওয়ারিশ শব গঙ্গাতীরে প'ড়েছিল, জলে পা ডুবিয়ে। হিংস্র-কুটিল শৃগালের পাল শবটির একটি পা থেকে এঁটেসেঁটে জড়ানো ব্যাণ্ডেজটা দাঁত আর নখরের সাহায্যে খোলাখুলি করে। আর ডাক ছাড়ে থেকে থেকে উর্দ্ধগগনে চোখ তুলে। তির্য্যক্ চোখ।

গঙ্গা-সাগর থেকে ফেরতা একটি সদাগরী জাহাজ, মাঝ-গঙ্গা ধ'রে চ'লেছিল। হঠাৎ সাণ্টিং করলো বিকট শব্দে। জাহাজী-ডাক শুনে শব ছেড়ে পালাতে উদ্যোগী হ'ল শিবাকুল।

গঙ্গাতীরের হাওয়ায় দগ্ধশব আর টিংচার আইওডিনের বিশ্রী মিশ্রগন্ধ।

আরেকটু হ'লে পা পিছলে আলুর দম হয়ে যেতো।

রান্না-বাড়ীতে একটা কলার খোসায় পা প'ড়ে গিয়েছিল রাজেশ্বরীর। দেওয়াল ধ'রে টাল সামলে নিয়েছিল। একটা সজোর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চললো রাজেশ্বরী। ডাকলে,—বামুনদিদি আছেন?

আঁস-রান্নার ঘর থেকে উঁকি মারলে ব্রাহ্মণী।

এঁটো হাত। হাতের কব্জির সাহায্যে মাথার ঘোমটা টানলে। কপালটা ঢাকলে। পোড়া-কপাল। সিঁদূরহীন সীঁথি। বললে,—ডাকছো বৌ?

—হ্যাঁ। আমাদের তিন জনের জায়গা করতে বলুন দাসীকে। বললে রাজেশ্বরী। বললে,—আমি, শশীদিদি আর—

কথা শেষ করতে পারলে না রাজেশ্বরী। লজ্জায় বাধা দেয়।

ব্রাহ্মণী বললে,—আমারও রান্না-বান্না প্রস্তুত। দাসী, ও দাসী!

প্রায়-অন্ধকারে ব'সে একজন স্থূলকায়া দাসী সুপারী কুঁচিয়ে রাখছিল বেতের একটা ছোট ধামায়। তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়লো দাসী। বললে,—বল' গো বল'। হেথায় আছি আমি।

ব্রাহ্মণী বললে,—হোথায় থাকলে চলবে না! দেখছো না, খেতে এসেছেন হুজুরনী? জায়গা কর'। জল আর আসন দাও।

—বল্ না ভাই, বল্। লজ্জা পাচ্ছিস কেন?

খিল-খিল হাসতে হাসতে কথা বলে কোন' নারীকণ্ঠ। ফাঁকা বাড়ী। রাত্রির আঁধারে চলতে-ফিরতেই ভয় পায় রাজেশ্বরী। প্রথমে ভীত হ'লেও ঐ কণ্ঠস্বর রাজেশ্বরীর পরিচিত। গ্রীবা বেঁকিয়ে দেখলো, পেছনে পেছনে এসে পূর্ণশশীও কখন হাজির হয়েছেন। দেখতে পায়নি বৌ। পূর্ণশশীকে দেখে হাসিমুখ করলে রাজেশ্বরী। জিভ কাটলে দাঁতে। লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে প'ড়লো যেন।

পূর্ণশশী তখন গরদ ছেড়ে পুনরায় জরিদার নীলাম্বরী চড়িয়েছেন। গায়ে মার্কিণ ছিটের জামা। বিচিত্র নক্সা-তোলা। পূর্ণশশী হাসির রেশ টেনে বললেন,—বামুনদি, তোমাদের বৌ কথাটা শেষ করতে পারলে না। বৌয়ের হয়ে আমিই ব'লে দিচ্ছি। বৌয়ের আজ স্বামীর পাশে ব'সে খেতে সাধ হয়েছে। ওদের জায়গা যেন পাশাপাশি হয়।

দু'হাতে আঁচল মুখে চাপে রাজেশ্বরী।

তড়িৎ গতিতে পালিয়ে যায় রান্না-বাড়ীর উঠোন থেকে ভাঁড়ার-ঘরে। ভাঁড়ার-ঘরে আত্মগোপন করে রাজেশ্বরী। লজ্জারক্ত মুখে আঁচলের পাড় দাঁতে কামড়াতে থাকে। কি ভাবলো কি বামুনদিদি?

—ও বৌ যাস কোথায়? শুনে যা, একটা কথা বলি। বললেন পূর্ণশশী।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! বৌ তখন ভাঁড়ারে। স্বয়ং অন্নপূর্ণা যেন ভুল করে মর্ত্ত্যে অবতরণ ক'রেছেন, রাজেশ্বরীর শ্বশুরকুলের এই ভিটেয়। একেই দেবীর মত রূপ, প্রতিমার মুখশ্রী পেয়েছে রাজেশ্বরী। তায় পরিধান ক'রেছে আবীর রঙের লাল-শাড়ী। অঙ্গে অঙ্গে ঝকঝকে স্বর্ণাভরণ। শুধু মুকুট নেই মাথায়। একটি শুধু চুনী-পান্নার মুকুট মাথায় থাকলেই আর কোন পার্থক্য থাকতো না। চোর-পুলিশ খেলার খেলুড়ের মতই লুকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী। খোলা দরজার পাল্লার ফাঁক থেকে দেখে উঠোনটা। শোনে, পূর্ণশশী থেমেছেন, না আরও লজ্জা দেওয়ার অভিপ্রায়ে আরও কিছু বলছেন। রাজেশ্বরীর ওষ্ঠপ্রান্তের হাসিতে শিশুর সারল্য ফুটেছে।

—আয় বৌ, আয়। একটা কথা বলি শোন্।

বাইরে থেকে ডাকলেন পূর্ণশশী। খিল-খিল হাসির মাঝে মাঝে। রাজেশ্বরী ত'ন নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু। পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে অচল-অনড় হয়ে। চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেখছে দরজার পাল্লার ফাঁক থেকে। দাঁতে আঁচল কামড়ে।

—কমনে গেলি বৌ? শোন্, জরুরী কথা আছে। মাইরী বলছি, শুনে যা।

কে কার কথা শোনে। রাজেশ্বরী যেন ধনুক-ভাঙা পণ করেছে, বেরুবে না ভাঁড়ার থেকে। থাকবে অন্নপূর্ণা হয়ে, অন্নপূর্ণার মত। অনন্যোপায় হয়ে পূর্ণশশী ফের ডাক দেন, —বামুনদি, ও বামুনদি! একবার বেরুন তো রান্না-ঘর থেকে।

কি একটা ব্যঞ্জনের পাত্রে গরম মশলা ছড়াতে ছড়াতে ব্রাহ্মণী সাড়া দেয়,—যাই গো যাই।

—আসতে হবে না। দাসীদের কাউকে বলুন আপনাদের হুজুরকে ডাকবে। বললেন পূর্ণশশী।

পূর্ণশশীর কথা শুনতে পেয়ে রাজেশ্বরীর শরীরে লজ্জার শিহরণ হয়।

ব্রাহ্মণী বললে,—দাসীরা গেল কমনে? বল' দিদি, আপনিই বল'। আমি ত্যাতক্ষণে থালা ক'টায় খাবার সাজিয়ে দিই।

যাতে রাজেশ্বরীর কর্ণকুহরে পৌঁছয় তত উচ্চকণ্ঠে পূর্ণশশী বললেন হাসতে হাসতে,—হুজুরকে ডাকতে হবে। আপনাদের বৌটির চোর-চোর খেলতে ইচ্ছে হয়েছে। দেখছেন না ভাঁড়ারের মাটির জালায় গিয়ে লুকিয়েছে। হুজুরকে ডাকা হোক, হুজুরই টেনে-হিঁচড়ে বের করবে বৌকে।

আর যায় কোথায়। তৎক্ষণাৎ ভাঁড়ার থেকে যা অন্নপূর্ণা সশরীরে লোকচক্ষে আবির্ভূত হন। আর হাসতে থাকেন পূর্ণশশী। খিল-খিল হাসির শব্দে রান্নাবাড়ীও হেসে ওঠে যেন। রাজেশ্বরী সত্যিকার ভয় আর ত্রাসে পূর্ণশশীর সন্নিকটে গিয়ে তাঁকে প্রায় জড়িয়েই ধরে। প্রায়-রুদ্ধ-কণ্ঠে বলল,—দু'টি পায়ে প'ড়ি দিদি! ডাকতে মানা করুন। আমি আর কক্ষনও লুকাবো না।

আরও কিছুক্ষণ হেসে বললেন পূর্ণশশী,—তবে লা বৌ? যা, শীগ্গির গিয়ে লুকিয়ে পড়্!

রাজেশ্বরী লুকাতে চেষ্টা করে পূর্ণশশীর আড়ালে। বলে, —দু'টি পায়ে প'ড়ি' আপনার।

হাসি থামিয়ে বলেন পূর্ণশশী,—ঠাগ্‌মা বললেন, তিনি ব'সে আমাদের খাওয়াবেন। নিজে ব'সে। বুড়ী মানুষ, নীচে নামতে পারবেন না। বললেন যে, দোতলার দালানে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

রাজেশ্বরী ভেবেছিল পূর্ণশশী বুঝি বা কৌতুক করছেন। বললে,—ঠাগ্‌মা বলেনি। আপনিই বলছেন।

—মাইরী বলছি, বিশ্বাস কর্। এই তোকে ছুঁয়ে বলছি! পূর্ণশশী কথা বললেন মুখ থেকে হাসি মুছে। সত্যিকার গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে।

—কি হবে দিদি? ভয়ে-ভয়ে শুধোয় রাজেশ্বরী।—কি করি আমি?

হেসে ফেললেন পূর্ণশশী। রাজেশ্বরীর মৌখিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে। বললেন,—কি আবার করবি! স্বামী তোকে খাইয়ে দেবে আর তুই স্বামীকে—

—না না না। রাগের সুরে বলতে বলতে ছুট দেয় রাজেশ্বরী। পায়ের অলঙ্কার ঝমঝমিয়ে বাজে। ভ্রম হয়, রান্নাবাড়ীতে এই নিশীথ রাতে কে নাচে বুঝি বা। নুপুর-নিক্কণের মতই শোনায়।

হেসে লুটিয়ে পড়েন পূর্ণশশী। অন্দরে প্রতিধ্বনি ভাসে হাসির। কিন্তু সত্যিই মিথ্যা বলেননি পূর্ণশশী। মাত্র ঐ বৃদ্ধার কথার পুনরুক্তি করেছেন। বৃদ্ধার সাধ হয়েছে মনে। নাতজামাই আর নাতনীকে পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়ানোর প্রবল বাসনা হয়েছে।

যুগলমিলন তো আর সত্যিই চোখে দেখা যায় না, চোখে দেখবারও নয়, তাই যা যতটুকু দেখতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধার অটুট সঙ্কল্প।

কিন্তু খেতে খেতে ঢুলুনি আসে রাজেশ্বরীর। চোখে নামে তন্দ্রার ঘোর।

অন্যান্য রাত্রি অপেক্ষা অনেক গভীর হয়েছে আজকের রাত। আহারে বসতেও যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে। খাটা-খাটনিও কি কম হয়েছে রাজেশ্বরীর আজ! ধকল গেছে কত। লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে মুখে গ্রাস তুলতে তুলতে ঢুলছে রাজেশ্বরী। কাজল-কালো চোখ দু'টো ফুলে উঠেছে কখন।

পাশাপাশি তিন জনের মধ্যে কথা বলছেন শুধু পূর্ণশশী।

তন্দ্রায় আচ্ছন্ন রাজেশ্বরীকে লক্ষ্য ক'রে তিনি শুধু সহাস্যে বললেন,—আহা!

শুনতে পায় না রাজেশ্বরী। কানে যায় না।

—কিছু খাচ্ছো না তো ভাই! বললেন বৃদ্ধা।

কৃষ্ণকিশোর সচকিতে বলে,—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ ভাই, তোমাকেই বলছি। আর কাকে বলব? বললেন বৃদ্ধা,—আমার নাতনী তো ঘুমে ঢুলছে। আর শশীদিদি আমার ঠিক খাচ্ছে। ওকে বলবার কিছু নেই।

রাজেশ্বরীর ঘুম ভেঙে গেল, ঠাগমার কথার শব্দে। দেখলো, সে শয্যার নেই। আহারের থালা সমুখে। আবার খেতে লাগলো রাজেশ্বরী। মুখের খাদ্যটুকু চর্ব্বণ করতে লাগলো। .

কৃষ্ণকিশোরও সত্যি কিছু খায় না। তাকে যেন মনে হয় ভাবালু। মনে হয়, নেই এ জগতে। বৃদ্ধা ঠিক লক্ষ্য ক'রেছেন, মুখে কিছু তুলছে না।

আগামী কালের প্রতীক্ষায় মনটা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে মধ্যে মধ্যে। একসঙ্গে অতগুলো টাকা—জমিদারীর বকেয়া খাজনা দেওয়ার অলীক প্রতিশ্রুতি—গহরজানের ডালিম—কুমুর খোরপোশের টাকাটা বাকী ফেলেছে কাছারী, কি লজ্জা—একসঙ্গে কত কত ভাবনা—জালের বুনন মনে মনে! রাতের আঁধারকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে আগামী কালের সূর্য্যোদয় হবে কখন?

অনন্তরাম দালানের প্রান্ত থেকে হঠাৎ কথা বললে,—তোমার নামে ডাক আছে।

—আমার নামে? থালা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

—হ্যাঁ, তোমার নামে।

—খাম না পোষ্টকার্ড?

—খাম। বললে অনন্ত।—খুলে, দেবো তোমাকে?

—হ্যাঁ।

এখনও ডাকে চিঠি আসলে কখনও কখনও ছাঁৎ ক'রে ওঠে কৃষ্ণকিশোরের বুকটা। কুমু যদি নরম হয়ে কখনও ফেরার কথা জানায়! বালিশে ঘেঁটে-যাওয়া এলোমেলো চুলে বাম হাতের আঙুল চালাতে চালাতে বললে,—কে লিখলে চিঠি।

অনন্তরাম ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে ফেললে খামের একদিক। বললে,—চিঠি এক টুকরো আর, আর—

কথা বলতে বলতে কেন থামলো অনন্তরাম?

সকলের চোখ প'ড়লো অনন্তরামের প্রতি। কৃষ্ণকিশোর বললে,—আর?

অনন্তরাম ক'বার পত্রগ্রহীতার মুখপানে তাকিয়ে বললে,—আর একটা ছবি।

ছবি? শুধু ছবি? শুধু পটে লিখা?

—কার ছবি অনন্ত? আগ্রহে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরাম তখন ভাবছিল বলবে কি বলবে না। যার ছবি তাকে এই বাড়ীতে কেবল মাত্র জানে অনন্তরাম। তাই ভাবছিল, বলবে কি বলবে না এই গেরস্থের সামনে।

—কথা ব'লছো না যে অনন্ত?

ছবির মানুষটির আসল পরিচয় ব্যক্ত করবার স্থান নয় অন্দরে। বিষয়টা লঘু ক'রে দেওয়ার জন্যই বলে অনন্তরাম,—এ সেই মরা মেয়েটার ছবি। তার বাপ পাঠিয়েছে।

পূর্ণশশীর আর রাজেশ্বরীর পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় হয়। রাজেশ্বরীর মুখটা কেন থম-থম করছে।

—কে মরা মেয়ে? কার বাপ পাঠালো ছবি?

মাদকতার গুণে স্মৃতিবিভ্রম হয়েছে নাকি কৃষ্ণকিশোরের!

অনন্তরাম বললে,—সেই যে হে, তোমার ফিরিঙ্গী বন্ধুটার বোনের ছবি। ম্যালোয়ারীতে ভুগে-ভুগেই কচি মেয়েটা সাবাড় হয়ে গেল! আহা!

—ও! বললে কৃষ্ণকিশোর।

চোখের সমুখ থেকে রঙ্গমঞ্চের পর্দ্দা উঠে অন্য এক দৃশ্য দেখা দেয় যেন। ঘরে মশাল জ্বলছে। পিয়ানো বেজে চলেছে। অপেল পাথরের গয়না আর সাদা রেশমের লেস্ দেওয়া গোলাপী ঘাগরা-পরা লিলিয়ান। মৃদু মৃদু হাসছে আর পিয়ানোর বাজিয়ে চ'লেছে চার্চ্চ-সঙ্গীত। রিপন ষ্ট্রীটের বাঙলো প্যাটার্ণের বাড়ীর একটি কামরায় কত রোমাঞ্চ!

—দেখি দাও। বললে কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরাম চিঠি আর ছবিটা নামিয়ে দেয় কাছাকাছি এক পাশে।

সেই ছবিটা না? যেটা ছিল ওদের ড্রইং রুমের ফায়ার-প্লেশের শীর্ষে? পরীর মত সেই মেয়েটা না? ছবি পাশে রেখে দিয়ে চিঠিটা পড়তে থাকে কৃষ্ণকিশোর। সব আগে দেখে কে লিখেছে? চিঠিতে লেখা—

প্রিয় বন্ধু

আমার পুত্র এবং কন্যার বিদায় গ্রহণের জন্যই যে আপনার সাক্ষাৎ পাই না তাহা আমি অনুমানে বুঝিয়াছি। আমার পুত্র এখন ফেরারী আসামী। সে আমার কলঙ্কস্বরূপ। কিন্তু আমার কন্যা? আমার সেই আদরের লিলির একটি প্রতিকৃতি পাঠাইতেছি। গ্রহণ করিবেন। আমার লিলির স্মৃতি আমি জনচিত্তে ব্যাপ্ত করিতে চাই। সেই আশায় এই প্রতিকৃতি পাঠাইলাম। ফরাসী দেশ হইতে চিত্রটি প্রস্তুত করাইয়া আনাইয়াছি। আমার বক্ষের অন্তস্তলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি

আশীর্ব্বাদক

নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র মুখার্জ্জী

চিঠিটা পড়া শেষ হ'লে কৃষ্ণকিশোর চুপচাপ ব'সে থাকে। দালানের প্রায় সকলেই গম্ভীর হয়ে যায়।

ঠাগ্‌মা আর থাকতে পারলেন না যেন। বললেন,—খাওয়ার পাতে ম্লেচ্ছদের ছবিটা ভাই স্পর্শ করলে? বাচ-বিচার করতে নেই?

রাজেশ্বরী ভেবে যেন কিছুর কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। ছবি! ফিরিঙ্গী বন্ধু! ফিরিঙ্গী বন্ধুর মরা-বোন কচি মেয়ে! কোন কিছুই যেন বোধগম্য হয় না রাজেশ্বরীর। চুপচাপ ব'সে কুল-কুল ঘামতে থাকে। যাক্, তবুও মেয়েটা যা হোক ম'রে গেছে।

—কাগজে দোষ হয় না ঠাকুমা। বললে কৃষ্ণকিশোর।

—তা ব'লে ভাই খাওয়ার পাতে ছোঁয়াছুঁয়ি? বৃদ্ধা

বললেন,—না ভাই, সেটা উচিত নয়। যতই হোক ব্রাহ্মণের ছেলে। নাও, নাও, তোমরা খাওয়া থামিও না। আমি দেখি, তোমরা দু'টিতে খাও আমার সামনে। দেখে হিদয় আমার জুড়ুক। আমার মনে যে কত সাধ, কেউ কি জানে?

পূর্ণশশী বললেন,—ঠাকুমা, আমার খাওয়া বুঝি দেখবেন না? নাতজামাই আর নাতনীর খাওয়া দেখলেই চলবে তো?

—ও আমার দিদিভাই, ম'রে যাই ম'রে যাই! বললেন বৃদ্ধা।—তোমার খাওয়া দেখবো না, তা কখনও হ'তে পারে? তুমি যে আমার দিদিভাই; আমার মায়ের পেটের বোন যে তুমি। আমার খাওয়া তুমি দেখবে। লক্ষ্মী মেয়ের মত কেমন আমার দুধ-মিষ্টি নিমেষের মধ্যে তৈরী করলে!

সদরের ফটকের কাছে ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে শুরু করলো। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—

কোথা দিয়ে যে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে যায় জানতে পারে না রাজেশ্বরী। কথা শুনে ধড়মড়িয়ে যখন ওঠে তখন জানলা থেকে শরৎকালের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে।

—বৌ ওঠ'। উঠবে না?

—উঁ?

—বেলা হয়েছে কত! বৌ, উঠে পড়'।

—উঁ?

—ঠাকুমা যে ফিরে যাবেন। আজ তাড়াতাড়ি ওঠ', লক্ষ্মীটি।

চোখ মেলে তাকালো রাজেশ্বরী। ঘুমে ঢুলু-ঢুলু পদ্মবৎ আয়ত আঁখি মেলে রাজেশ্বরী। যেন ধীরে ধীরে একটি পদ্মফুল পাপড়ি খুললো। চোখ খুলে দেখলো রাজেশ্বরী, পাশে ব'সে ডাকছে তাকে কৃষ্ণকিশোর। একটু মৃদু হেসে পুনরায় চোখ দু'টি বন্ধ ক'রলো।

—উঠবে না বৌ?

—হ্যাঁ, এই যে উঠছি। আরেকটু ঘুমোই। রাজেশ্বরী মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে। চোখ বন্ধ ক'রে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছে রাজেশ্বরীর কোঁকড়ানো চুলের কয়েকটি চূর্ণ কুন্তল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা আচমকা ভেঙ্গে গেছে কৃষ্ণকিশোরের। কত কাজ আজ! এই দিনটির প্রতীক্ষায় কাতর হয়েছিল গতরাত্রি থেকে। কৃষ্ণকিশোর কিছুতেই ভেবে পায় না, অতগুলো নগদ টাকা কেমন ভাবে পৌঁছে দেবে গহরজানের হেফাজতে। ঘুমন্ত রাজেশ্বরীর হাতের আঙুলগুলি ধ'রে নাড়াচাড়া করতে করতে কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল গহরজানকে।

গহরজানের রূপ। গহরজানের মুখ। গহরজানের—

[ক্রমশঃ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ষ্ট্যালিনের মৃত্যু ও বিশ্বশান্তি—

ষ্ট্যালিনের মৃত্যু এবং ম্যালেনকভের প্রধান মন্ত্রিত্বে গঠিত রাশিয়ার নূতন গবর্ণমেণ্ট পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে সুরুচি ও শালীনতার সীমা রক্ষা করিবার সামান্ত প্রয়াসও দেখা যায় নাই। মৃত্যু প্রত্যেক মানুষের জীবনেই অনিবার্য্য স্বাভাবিক ঘটনা। ষ্ট্যালিনের জীবনের এই অনিবার্য্য স্বাভাবিক ঘটনাকেই পশ্চিমী রাষ্ট্রনায়কগণ তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ সুযোগ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ষ্ট্যালিনের মৃত্যু-সংবাদে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর অশোভন নীরবতার মধ্যে, রুশ গবর্ণমেণ্ট এবং জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অতি শুষ্ক শোকজ্ঞাপক বার্ত্তা প্রেরণের মধ্যে এই চাপা আনন্দ বিচ্ছুরিত দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলিও এ ব্যাপারে কুরুচির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বিলাতের 'ডেইলী মিরর' পত্রিকা আনুষ্ঠানিক ভাবে কূটনৈতিক দুঃখ প্রকাশের জন্ত মিঃ চার্চ্চিলের সমালোচনা করিয়াছেন এবং ষ্ট্যালিনের প্রশংসা না করার জন্ত মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকা 'স্বর্গস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার পত্র' বলিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধে অশ্রুবর্ষণ-রত একটি কুম্ভীরের ছবি দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে, "All hell broke out here today when news was flashed that Stalin was on his way" অর্থাৎ 'ষ্ট্যালিন আসিতেছেন এই সংবাদ যখন এখানে (স্বর্গে) ঘোষিত হইল, তখন সমস্ত নরক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।' মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি প্রদেশের নক্সভাইলে বাস্কেট বল ম্যাচ খেলার সময় যখন ষ্ট্যালিনের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হইল, তখন দুই হাজার জনতার বিকট উল্লাস-ধ্বনিতে কর্ণপটহ বিদীর্ণ হওয়ার মতই অবস্থা হইয়াছিল। বৃটিশ কমন্স সভায় বিভানপন্থী শ্রমিক-সদস্ত টম ড্রিবার্গ দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে কতগুলি বৃটিশ ও ও মার্কিণ সংবাদপত্র অভূতপূর্ব হীনতা এবং উচ্ছ্বসিত আক্রোশে ফাটিয়া পড়িয়াছে (descended to unprecedented depths of Vulgarity and gloating spite)। ভারতীয়, পাকিস্থানী, ফরাসী, ইটালীয় এবং মিশরীয় গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কতক মার্কিণ ও বৃটিশ সংবাদপত্রের পছন্দ হয় নাই। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে হয় নাই তাহাও নয়।

ষ্ট্যালিনের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ফরাসী প্রধান মন্ত্রী Rene Mayer ঘোষণা করেন যে, ফরাসী সৈন্তবাহিনী শোক-জ্ঞাপক চিহ্ন ধারণ করিবে। ফরাসী জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেণ্ট বলেন যে, 'সমালোচনা করিবার সময় ইহা নয়। ষ্ট্যালিনগ্রাডের কথা আমাদের স্মরণ করা উচিত।' উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জেনারেল লর্ড ইজমে বলিয়াছেন, "হিটলার এবং মুসোলিনী যে অর্থে ডিক্টেটর তাহার কোন পরিচয় ষ্ট্যালিনের মধ্যে কখনও আমি দেখিতে পাই নাই।" বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা ষ্ট্যালিনকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিলাতের গোঁড়া রক্ষণশীল পত্রিকা 'টাইমস' পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ষ্ট্যালিনের দানকে লঘু করিবার চেষ্টা করেন নাই। 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশান' পত্রিকা এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রের বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থা কিছু মাত্র হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পোপ ষ্ট্যালিনের আত্মার জন্ত প্রার্থনা করিতে যাইয়া তাঁহাকে 'যে শ্রেষ্ঠ নিপীড়কের বর্ত্তমানে মৃত্যু হইয়াছে' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এখানে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট এবং সংবাদপত্রসমূহ যে-সকল মন্তব্য করিয়াছেন, সেগুলি উল্লেখ করিবার স্থান নাই। কিন্তু ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে রাশিয়ার শাসকশ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ির ফলে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার বিলোপ যদি না-ও হয়, তাহা হইলেও রাশিয়া খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকবর্গের মনে যে এই আশা প্রথমে খুব প্রবল হইয়াই জাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এ-সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার নিজে কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডুলেস তাহা গোপন রাখেন নাই।

গত ১ই মার্চ্চ (১৯৫৩) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হেড কোয়ার্টার্সে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ ডুলেস বলিয়াছেন, "I do not believe any succesor to Stalin could be as effective a damper as a Stalin had been." ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি উক্ত মন্তব্য করেন। তাঁহার এই উক্তির সার মর্ম্ম এই যে, ষ্ট্যালিনের স্থলাভিষিক্ত যিনিই হউন না কেন, তাঁহার পক্ষে ষ্ট্যালিনের মত কার্য্যকরী ভাবে শান্তিপ্রচেষ্টা বিনষ্টকারী হওয়া সম্ভব হইবে না। তাঁহার এই উক্তিতে ষ্ট্যালিনকে ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরের শান্তি-প্রচেষ্টা বিনষ্টকারী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না, ইহাই মিঃ ডুলেসের আশা। ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরের শান্তি প্রচেষ্টার স্বরূপ কি, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মিঃ ডুলেস

অন্যান্য উক্তিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলিয়াছেন, "The Eisenhower era begins as the Stalin era ends." অর্থাৎ 'ষ্ট্যালিনের যুগ শেষ হইয়াছে, আরম্ভ হইল আইসেনহাওয়ারের যুগ।' ষ্ট্যালিনের মৃত্যু তাঁহার দৃষ্টিতে পৃথিবীব্যাপী মার্কিণ প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। 'ষ্ট্যালিনের এখন মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তাঁহার মর্য্যাদা উইল করিয়া কাহাকেও দিতে পারেন না', মিঃ ডুলেসের এই উক্তির মধ্যে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে তাঁহার আনন্দের কারণ সুপ্রকাশ। এই আনন্দকে তিনি আরও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "As Stalin is dead, Gen, Eisenhower the man who liberated Western Europe, has become President of our great Republic, with a prestige unmatched in history." অর্থাৎ 'ষ্ট্যালিনের যখন মৃত্যু হইল তখন পশ্চিম-ইউরোপকে যিনি মুক্ত করিয়াছেন সেই জেঃ আইসেনহাওয়ার ইতিহাসে অতুলনীয় মর্য্যাদায় আমাদের বৃহৎ রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।' তাঁহার উক্তিতেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিনের মৃত্যু না হইলে মিঃ আইসেনহাওয়ার অতুলনীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। জেঃ আইসেনহাওয়ার পশ্চিম-ইউরোপকে মুক্ত করিয়াছেন বলিয়া মিঃ ডুলেস গর্ব্ব করিয়াছেন। ইহাতে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার লজ্জা বোধ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার নিজ মুখে পশ্চিম-ইউরোপকে মুক্ত করিবার গৌরব দাবী করিতে হয়ত লজ্জা বোধ না করিয়া পারিতেন না। বিশ্ববাসী সকলেই জানে, ষ্ট্যালিনের সামরিক নেতৃত্ব এবং সামরিক কৌশলের জন্যই জেঃ আইসেনহাওয়ার পশ্চিম-ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে লাল ফৌজের নিকট হিটলারের বাহিনী পরাজিত হওয়ার পূর্ব্বে জেঃ আইসেনহাওয়ার পশ্চিম-ইউরোপে সৈন্য অবতরণ করাইতে পারেন নাই, ইহা কাহারও অজানা নয়। পশ্চিম-ইউরোপকে মুক্ত করিবার যে-গৌরব জেঃ আইসেনহাওয়ার অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা ষ্ট্যালিনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে এবং এই গৌরবের জন্যই তিনি মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে জয়ী হইতে পারিয়াছেন।

ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে সোভিয়েট রাশিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, শুধু এই আশায় মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন নাই। এই কল্পিত দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। মার্কিণ গুপ্ত রেডিও হইতে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে বিদ্রোহ করিবার জন্য উস্কানী দেওয়া হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে 'ডেইলী মিরর' যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত পত্রিকার বিবরণে প্রকাশ যে, সমস্ত রকম উপায় এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য প্রেঃ আইসেনহাওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। লাল ফৌজকে ক্ষমতা দখল করিতে এবং পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলিকে টিটোর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে উৎসাহিত করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যুগোশ্লাভিয়া ৬ই মার্চ্চ (১৯৫৩) তারিখেই এক ডিভিসন সাঁজোয়া বাহিনী আলবেনিয়ার সীমান্তের দিকে প্রেরণ করিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে, ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমী শক্তিবর্গ কম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ, গণ্ডগোল এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার জন্য কার্য্যকরী ভাবে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহাদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইয়াছে।

ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যেই এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যেগুলি ঠাণ্ডা যুদ্ধ গরম হইয়া উঠিবার আশঙ্কা সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। এই ঘটনাবলীর সূত্রপাত হয় ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বদিন—যে-সময় বিশ্ববাসী সকলেই যে-কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার আশঙ্কা করিতেছিল। ৫ই মার্চ্চ (১৯৫৩) পোলিশ ল্যাফট্যানাণ্ট এফ, গারেকি (F. Garecki) পোল্যাণ্ডের জেট ফাইটার সোভিয়েট মিগ-১৫ বিমান পরিচালন করিয়া ডেনমার্কের বর্ণহোলম্ দ্বীপে অবতরণ করেন এবং রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হওয়ার প্রার্থনা জানান। এই বিমানখানি জাহাজে করিয়া কোপেনহেগেনের নিকটবর্ত্তী এক বিমান-ঘাঁটিতে লইয়া যাওয়া হয় এবং মার্কিণ ও বৃটিশ বিশেষজ্ঞগণ উহাকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এ-সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যাণ্ডের এক জন প্রাক্তন গবর্ণর এবং আরও কয়েক জন আমেরিকান পোল্যাণ্ডের জেট ফাইটার সোভিয়েট মিগ-১৫ বিমান অপসারণের জন্য এক পরিকল্পনা গঠন করেন। দশ মাস পূর্ব্বে এই পরিকল্পনা গঠন করা হয় এবং ইহার জন্য সাড়ে সাত হাজার ডলার ব্যয় করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, এই পরিকল্পনার সহিত মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের কোন সংশ্রব নাই। কিন্তু পরোক্ষ সমর্থন আছে কি নাই, সে-প্রশ্ন বাদ দিলেও যে-সময়ে ষ্ট্যালিন বাঁচিয়া আছেন কি নাই সকলেই এই আশঙ্কা করিতেছে, সেই মুহূর্ত্তটিকেই পোলিশ ল্যাফটানাণ্ট মিগ-১৫ বিমানখানা লইয়া পলাইয়া যাইবার উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করিল কেন? পোল্যাণ্ড অবশ্য তাহার মিগ ১৫ বিমান আটক রাখার প্রতিবাদে ডেনমার্কের ছয়খানি জাহাজ আটক করে। তন্মধ্যে একখানি জাহাজ পলাইয়া যাইতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ১০ই মার্চ্চ (১৯৫৩)। চেকোশ্লোভাকিয়া একখানি মার্কিণ থাণ্ডার জেট ফাইটার বিমানকে গুলীবর্ষণ করিয়া ভূপাতিত করে। চেকোশ্লোভাকিয়া পক্ষের কথা এই যে, উক্ত থাণ্ডার জেট ফাইটার পশ্চিম-জার্ম্মাণীর মার্কিণ এলাকা হইতে চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তাহার সার্ব্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য বলিতেছে যে, ঘটনাটি পশ্চিম-জার্ম্মাণীর মার্কিণ এলাকাতেই ঘটিয়াছে। কোন্ পক্ষ মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে, পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ উহা ধরিয়া লইয়াছিল এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্ররোচনাও দেওয়া হইতেছিল। ওদিকে নূতন রুশ কর্ণধারগণ ইহা জানাইতে ত্রুটি করেন নাই যে, তাঁহারা শান্তিতেই বাস করিতে চান। উক্ত ঘটনার পর অল্প সময়ের ব্যবধানে অনেকগুলি ঘটনা ঘটিয়া যায়। তন্মধ্যে বৃটিশ লিনকলন বোম্বার বিমান গুলী করিয়া অবতরণ করানো এবং ছয় জন বৃটিশারের জীবনান্ত হওয়ার ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাশিয়ার পক্ষের কথা এই যে, উক্ত বিমানখানি পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর ৭৫ মাইল ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার পর বৃটিশ ইউরোপীয়ান এয়ারওয়েজের একখানি বৃটিশ অসামরিক বিমানে গুলী নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

কিন্তু বিমানখানি অক্ষত অবস্থাতেই বার্লিনে পৌছে। ১৬ই মার্চ (১৯৫৩) তিন জন চেক বৈমানিক একখানি চেক্ সামরিক বিমান লইয়া অষ্ট্রিয়ার বৃটিশ-অধিকৃত এলাকাস্থিত গ্রাজ বিমান-ঘাঁটিতে অবতরণ করে এবং রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে। ইহার পরই দুই জন বৃটিশ বৈমানিক একখানি বৃটিশ সার্ভিস মোটর লইয়া পূর্ব্ব-জার্মাণীতে পলাইয়া যায়। ইহার প্রায় দশ দিন পরে গত ২৪শে মার্চ একখানি চেক যাত্রীবাহী বিমান ২৫ জন যাত্রী ও ৪ জন ক্রু সহ ফ্রাঙ্কফোর্টের বিমান-ঘাঁটিতে অবতরণ করে এবং তাহাদের কয়েক জন আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছে। এক সংবাদে প্রকাশ, ফ্লাইট ক্যাপ্টেন এবং কয়েক জন যাত্রী এই ভাবে পলায়নের চক্রান্ত পূর্ব্বেই করিয়াছিল। এই সকল ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর এই সকল স্বেচ্ছাকৃত আকস্মিক ঘটনাকে তাৎপর্য্যহীন বলিয়া মনে করা যায় না।

নূতন রুশ গবর্ণমেণ্টের সংগঠন এবং তাঁহাদের নীতির কথা উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরবর্ত্তী আরও কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ষ্ট্যালিনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিনের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ক্লিমেণ্ট গটওয়াল্ডের গুরুতর অসুখ হয় এবং ১৪ই মার্চ তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার এই মৃত্যুর সহিত কোন রহস্য জড়িত আছে কি না, অ-কম্যুনিষ্টদের মনে এই আশঙ্কা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যজনক ব্যাপার হাঙ্গেরীর প্রধান মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা রাকোসির আকস্মিক অন্তর্দ্ধান। তিনি ষ্ট্যালিনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগদানের জন্য মস্কো যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি বুডাপেষ্টে ফিরিয়া আসেন নাই। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর কি মস্কো রেডিওতে কি বুডাপেষ্ট রেডিওতে তাঁহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। রাকোসির সঙ্গে হাঙ্গেরীর সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি ইস্তভান ডোবি'ও মস্কো গিয়াছিলেন। তিনি বুডাপেষ্টে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তিনি এক জন ইহুদী। গত ১৭ই মার্চ লাটভিয়ার নিরাপত্তা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মঃ আলফন্স নোভিক্সকে পদচ্যুত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোন কারণ প্রদর্শন করা হয় নাই।

ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের পুনর্গঠন স্বাভাবিক নিয়মেই করিতে হইয়াছে। যে-ভাবে করা হইয়াছে তাহাই শুধু এখানে উল্লেখযোগ্য। মঃ জর্জ্জি ম্যালেনকভ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী বা মন্ত্রি-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনিই যে ষ্ট্যালিনের স্থলাভিষিক্ত হইবেন তাহা গত অক্টোবর মাসে রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেসের সময়েই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। মঃ ক্লিমেণ্ট ভরোশিলভকে ইউনাইটেড সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট পদে উন্নীত করা হইয়াছে। কিন্তু এই পদের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই, একথা বলাই বাহুল্য। আভ্যন্তরীণ বা স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং নিরাপত্তা দপ্তর এই উভয় দপ্তরকে সংযুক্ত করিয়া উহার ভার মঃ লাভরেণ্টি বেরিয়ার উপর অর্পিত হইয়াছে। মঃ মলোটভ পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার পাইয়াছেন এবং বুলগানিন হইয়াছেন সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। মঃ কাগানোভিচ হইয়াছেন অন্যতম সহকারী প্রধান মন্ত্রী। সোভিয়েট রাষ্ট্র পরিচালনে ম্যালেনকভ, মলোটভ, বেরিয়া, বুলগানিন এবং কাগানোভিচ এই পাঁচ জনের গুরুত্বই সর্ব্বাধিক। এই পাঁচ জনকে প্রকৃত পক্ষে সোভিয়েট রাষ্ট্রের 'ইনার কাউন্সিল' কিম্বা এক অর্থে মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রেসিডিয়াম বা সভাপতি-মণ্ডলী বলিলেও খুব বেশী ভুল হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মাণ আক্রমণের প্রাক্কালে ষ্ট্যালিন একটি মন্ত্রীদের প্রেসিডিয়াম গঠন করিয়াছিলেন। পাঁচ জনকে লইয়া এই প্রেসিডিয়াম গঠিত হইয়াছিল। ষ্ট্যালিন ব্যতীত এই প্রেসিডিয়ামে ছিলেন মলোটভ, ভরোশিলভ, বেরিয়া এবং ম্যালেনকভ। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কাগানোভিচকেও এই প্রেসিডিয়ামে গ্রহণ করা হয়। ষ্ট্যালিন যাঁহাদিগকে মন্ত্রীদের প্রেসিডিয়ামে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ষ্ট্যালিনের অভাবের পর তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়াছেন এবং একমাত্র বুলগানিনই নবাগত। নূতন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এই সংগঠন হইতে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নীতির কার্য্যতঃ কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু মঃ ম্যালেনকভ শাসন পরিচালন ব্যবস্থায় কতকগুলি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মন্ত্রীদের সংখ্যা ৫৩ জন হইতে কমাইয়া ২৫ জন করা হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা দপ্তরকে যে এক করা হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সৈন্যবিভাগ ও নৌবিভাগ একই মন্ত্রী মঃ বুলগানিনের অধীনস্থ করা হইয়াছে। মঃ ম্যালেনকভ রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারীর পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নূতন রুশ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পর প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, উল্লিখিত পরিবর্ত্তনের ফলে মঃ ম্যালেনকভের ক্ষমতা বা পদমর্য্যাদা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে কি না। উল্লিখিত পরিবর্ত্তনগুলি দ্বারা সোভিয়েট নীতির কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ষ্ট্যালিন জীবিত থাকিতেই এই সকল পরিবর্ত্তনের কথা আলোচিত হইয়াছিল এবং তিনি নাকি উহা অনুমোদনও করিয়াছিলেন। সে-কথা বাদ দিলেও বেরিয়া, মলোটভ এবং বুলগানিনকে ম্যালেনকভের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু যে-ভাবে তাঁহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ম্যালেনকভ রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করার গুরুত্ব একেবারেই নাই তাহা নয়। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার প্রতিপত্তির হ্রাস সূচিত হয় না। সুপ্রীম সোভিয়েটে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, পার্টির নীতি গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপেই কার্য্যকরী করিবেন।

ষ্ট্যালিনের 'মৃত্যুতে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ার আশা ঘোষণা করিয়া মিঃ ডুলেস সমস্ত দোষ ষ্ট্যালিনের উপরেই চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আইসেনহাওয়ার গবর্ণমেণ্টের নীতি কি? মিঃ ডুলেস মার্কিণ স্বরাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হইবার পরেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, রিপাবলিকান গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিজমকে শুধু নিরোধ করা অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিবে। এই অধিকতর বাস্তব পররাষ্ট্র-নীতি যে পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলি এবং চীনকে কম্যুনিষ্ট-শাসন হইতে মুক্ত করা, তাহা কাহারও

অজানা নাই। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেই মার্কিণ গুপ্ত রেডিও মারফৎ কি ভাবে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার সহিত ষ্ট্যালিনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া উপলক্ষে গত ৯ই মার্চ্চ এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের বিশেষ অধিবেশনে গত ১৫ই মার্চ্চ (১৯৫৩), নূতন রুশ প্রধান মন্ত্রী ম্যালেনকভ যে রুশ পররাষ্ট্র-নীতি ঘোষণা করেন, তাহার তুলনা করিলেই প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ষ্ট্যালিনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া উপলক্ষে তিনি ঘোষণা করেন, "ধনতন্ত্রবাদ এবং কম্যুনিজম এই দুইটি পৃথক্ ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতাই আমাদের নীতি।" তিনি অবশ্য ইহাও জানাইয়াছেন যে, "যে-কোন শত্রুকে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রস্তুত রাখিবার জন্য শক্তিশালী সোভিয়েট সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি অধ্যবসায়ের সহিত বৃদ্ধি করা আমাদের কর্ত্তব্য।" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে-ভাবে কম্যুনিষ্ট দেশগুলির চারি দিক্ সামরিক-ঘাঁটি দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়াছে, তাহাতে সোভিয়েট রাশিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে না, ইহা আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনে ম্যালেনকভ বলিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর যে-কোন দেশ অন্তরের সহিত শান্তি কামনা করে তাহারা সোভিয়েট ইউনিয়নের সুদৃঢ় শান্তি-নীতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে এমন বিতর্কিত কোন বাস্তব সমস্যা থাকিতে পারে না যাহার সমাধান শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব নয়।" ধনতন্ত্র এবং কম্যুনিজম পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে, ইহা নয়া রুশ গবর্ণমেণ্টই প্রথম ঘোষণা করেন নাই। ষ্ট্যালিন গত ২৮ বৎসর ধরিয়া এই নীতিও ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বশান্তির জন্য নয়া রুশ গবর্ণমেণ্টের এই আগ্রহ কোন নূতন নীতি নয়। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট শুধু এই ঘোষণায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা রাশিয়ার শান্তির অভিপ্রায়কে কার্য্যে প্রতিফলিত দেখিতে চান। কিন্তু মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের শান্তির অভিপ্রায় কি ভাবে কার্য্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

গত ১৪ই মার্চ্চের (১৯৫৩) এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট সুদূর প্রাচ্যে কম্যুনিষ্টদের উপর সামরিক চাপ বৃদ্ধির জন্য এক দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় কোরিয়া, ইন্দোচীন এবং মালয়কে এক সূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে এবং ফরমোসায় চিয়াংয়ের বাহিনীকে শক্তিশালী করিবার নীতিও গৃহীত হইয়াছে। মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে ওয়াশিংটনে ফরাসী ও মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে তিন দিনব্যাপী এক বৈঠকে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে কোরিয়া ও ইন্দোচীনের যুদ্ধকে পরস্পর নির্ভরশীল বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই বৈঠকের শেষে প্রকাশিত ইস্তাহারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ইন্দোচীনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবার জন্য কম্যুনিষ্টরা কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি চায়। কিন্তু নূতন রুশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের শান্তির আকাঙ্ক্ষা নানা ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। জেঃ চুকভ বিমান-পথে এবং জল-পথে বার্লিনে যাতায়াত নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে আলোচনা করিবার জন্য বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকাকে আহ্বান করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে কার্য্যবিধি সংক্রান্ত যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার অবসানের জন্য রাশিয়া নূতন প্রস্তাব করিয়াছে। সর্ব্বোপরি কোরিয়ায় পীড়িত ও আহত বন্দীদের বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেনাপতির আলোচনার প্রস্তাবই শুধু কম্যুনিষ্টরা গ্রহণ করে নাই, চীনের প্রধান মন্ত্রী এই উপলক্ষে সমস্ত বন্দী-মুক্তির জন্যও নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হয় নাই। ৩রা এপ্রিল (১৯৫৩) মিঃ ডুলেস তাঁহার সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, "সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্ববাসীর সম্মুখে যে মৌলিক বিপজ্জনক অবস্থা উপস্থিত করিয়াছে, কম্যুনিষ্টদের শান্তি-প্রচেষ্টা দ্বারা তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট মূলতঃই অবশিষ্ট পৃথিবীর প্রতি শত্রুতা মনোভাবসম্পন্ন। বিশ্বশান্তির প্রতিবন্ধক কোথায়, এইখানেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার নিজের সর্ত্তে শান্তি চায়। এই সর্ত্ত কম্যুনিজমের বিলোপ এবং কম্যুনিষ্ট দেশগুলি সহ সমস্ত পৃথিবীতে মার্কিণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। কোন ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের পক্ষেই এই সর্ত্ত একটুখানিও শিথিল করা সম্ভব নয়। কম্যুনিজমের অস্তিত্বই যে ধনতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক, মিঃ ডুলেস তাঁহার উল্লিখিত উক্তিতে তাহা গোপন রাখেন নাই।

যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের নয়া প্রস্তাব—

গত অক্টোবর মাসে (১৯৫২) কোরিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর গত ৬ই এপ্রিল (১৯৫৩) পানমুনজনে পীড়িত ও আহত বন্দীদের বিনিময়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের প্রশ্নেই ভাঙ্গিয়া যায়। কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ সমর-অধিনায়ক দাবী করেন যে, অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট বন্দী আর দেশে ফিরিয়া যাইতে চায় না এবং তিনি অনিচ্ছুক যুদ্ধবন্দীদিগকে দেশে ফেরৎ পাঠাইতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পক্ষ সকল যুদ্ধবন্দীকেই ফেরৎ পাওয়ার দাবী করেন। এই প্রশ্ন লইয়াই যুদ্ধবিরতি আলোচনায় যে-অচল অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার সমাধানের জন্য ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে এক পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। ৩রা ডিসেম্বর (১৯৫২) বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু রাশিয়া ও চীন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। অতঃপর আবার যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ হইবে, এ সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই দেখা যাইতেছিল না। নির্ব্বাচনের সময় প্রেঃ আইসেনহাওয়ার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তিনি নির্ব্বাচিত হইলে স্বয়ং কোরিয়ায় যাইয়া সম্মানজনক সর্ত্তে কোরিয়া যুদ্ধের অবসান করিতে চেষ্টা করিবেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, কোরিয়া যুদ্ধে আরও বেশী সংখ্যায় দক্ষিণ-কোরীয় সৈন্য নিয়োজিত করিতে হইবে এবং মার্কিণ সৈন্যদিগকে রিজার্ভ রাখিতে ও দেশে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কোরিয়া যুদ্ধে নিয়োজিত মার্কিণ সৈন্যদের জননী ও পত্নীরা এই প্রস্তাবে খুবই খুশী হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ এ-পর্য্যন্ত এ-সম্পর্কে কিছুই করা সম্ভব হয় নাই। কোরিয়া যুদ্ধ কবে শেষ হইবে তাহাও অনিশ্চিত। জেঃ মার্ক ক্লার্ক ইন্দো-চীন পরিদর্শন করিয়া জাপানে ফিরিবার পথে হংকং-এ সাংবাদিকদের নিকট গত ২৩শে মার্চ্চ বলিয়াছেন, 'I see no end to the War in Korea.' অর্থাৎ 'কোরিয়ার যুদ্ধের শেষ আমি দেখিতে পাইতেছি না।' এই অবস্থায় অন্ততঃ পীড়িত ও

আহত মার্কিণ বন্দীদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেও তাহাদের জননী ও পত্নীরা কতক পরিমাণে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবে। ইহাই যে পীড়িত ও আহত যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় করিবার জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের মূল, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি ?

কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ সমরাধিনায়ক জে: মার্ক ক্লার্ক ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) গুরুতররূপে পীড়িত ও আহত বন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং জেনেভা যুদ্ধবন্দী চুক্তির ১০৯ ধারা অনুযায়ী তাহাদের বিনিময়ের জন্ত সংযোগরক্ষাকারী অফিসারদের আলোচনা-বৈঠকের প্রস্তাব এক পত্র দ্বারা উত্তর-কোরিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীনের নিকট উত্থাপন করেন। কম্যুনিষ্ট চীন ও উত্তর-কোরিয়া এই প্রস্তাবে রাজী হইয়া জে: ক্লার্ককে গত ২৮শে মার্চ্চ এক পত্র দিয়াছেন। ইহার পর গত ৩০শে মার্চ্চ চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই এক বিবৃতিতে সমস্ত যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের জন্তও এক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁহার নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্ব্বে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আহত ও পীড়িত যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ব্যাপারেও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্ত্তনের প্রশ্ন রহিয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ সর্বাধিনায়কের দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র গত ২১শে মার্চ্চ বলিয়াছেন যে, পীড়িত ও আহত চীনা ও উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক। তাহাদের অনেকেই বলিতেছে যে, তাহাদিগকে যদি দেশে ফেরৎ পাঠান হয়, তবে তাহারা আত্মহত্যা করিবে। মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মি: ডুলেস জেনেভা চুক্তির ১০৯ ধারা সম্পর্কে ২৮শে মার্চ্চ বলিয়াছেন, "উক্ত ধারায় যে-সকল পীড়িত ও আহত যুদ্ধবন্দীর ভ্রমণ করিবার মত শক্তি আছে শুধু তাহাদিগকেই স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্ত্তনের ভিত্তিতে ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমি 'স্বেচ্ছায়' কথাটির উপর জোর দিতে চাই।" এইরূপ প্রস্তাবের তাৎপর্য্য অনুমান করা কঠিন নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা তাহাদের পক্ষের সকল যুদ্ধবন্দীই ফিরিয়া আসুক, কিন্তু কম্যুনিষ্ট যুদ্ধবন্দী যেন এক জন ফিরিয়া যাইতে না পারে, তবে দুই-এক জনকে ফেরৎ দেওয়া হইতে পারে ; উহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত দয়া। ইহাকে বন্দী-বিনিময় আখ্যা দেওয়া কিছুতেই চলে না। তথাপি কম্যুনিষ্ট চীন ও উত্তর-কোরিয়া এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। চীনের প্রধান মন্ত্রী যে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেও 'অনিচ্ছুক যুদ্ধবন্দীদিগকে জোর করিয়া ফেরৎ দেওয়া হইবে না,' এই নীতি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতের প্রস্তাবের সঙ্গে এই প্রস্তাবের বিশেষ পার্থক্য আছে।

ভারতের প্রস্তাবে দুই জন কম্যুনিষ্ট এবং দুই জন অ-কম্যুনিষ্ট লইয়া রিপ্যাট্রিয়েশন কমিটি গঠনের এবং তাহাদের মধ্যে মতভেদের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইলে আম্পায়ারের ভোট গৃহীত হওয়ার অর্থাৎ আমপায়ারের ভোট দ্বারাই চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রিপাট্রিয়েশন কমিটি প্রথমেই আম্পায়ার নিযুক্ত করিবেন। আমাপায়ার সম্বন্ধে কমিটিতে মতভেদ হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ আমপায়ার নিযুক্ত করিবেন। সুতরাং কোরিয়া যুদ্ধের এক পক্ষ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপরেই প্রকৃত পক্ষে কম্যুনিষ্ট বন্দীরা দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহে কি না, তাহা নির্দ্ধারণের ভার ভারতীয় প্রস্তাবে অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু চীনের প্রধান মন্ত্রী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে-সকল যুদ্ধবন্দী দেশে ফিরিতে অনিচ্ছুক তাহাদিগকে একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করিতে হইবে। ইহা খুবই সঙ্গত প্রস্তাব। কিন্তু কোন্ রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ? দ্বিতীয়তঃ, কম্যুনিষ্ট বন্দীদের মতামত স্বাধীন ভাবে নির্দ্ধারণের সুযোগ-সুবিধা এই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে দেওয়া হইবে কি না ? এই দুইটি প্রশ্নই চীনের প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাবকে বানচাল করিয়া দিতে পারিবে। ইতিমধ্যে পীড়িত ও আহত বন্দী বিনিময়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

কম্যুনিষ্ট পক্ষ জেনেভা চুক্তির ১০৯ ধারা অনুযায়ী পীড়িত ও আহত বন্দী বিনিময়ের আলোচনায় রাজী হইয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, জেনাভা চুক্তির ১১০ ধারার বিধানের মধ্যে যে সকল পীড়িত ও আহত বন্দীরা পড়ে, তাহাদিগকেও কোন নিরপেক্ষ দেশে তাহারা প্রেরণ করিতে সম্মত। এই প্রস্তাব দ্বারা বিনিময়ের ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত হইয়াছে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোরিয়া যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন। এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার সময় ১০ই এপ্রিলের (১৯৫৩) এক সংবাদ দেখা যায়, পানমুনজন বৈঠকে পীড়িত ও আহত বন্দী-বিনিময় সংক্রান্ত খসড়া চুক্তিটি উভয় পক্ষ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং উহার পরেই কম্যুনিষ্ট পক্ষ হইতে পূর্ণ শান্তি-চুক্তির আলোচনা পুনরায় আরম্ভ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট পক্ষে শান্তি আলোচনাকারী প্রতিনিধি দলের নেতা জে: নাম ইল ঘোষণা করিয়াছেন যে, শান্তি-চুক্তির অব্যবহিত পরেই যে-সকল বন্দী দেশে ফিরিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে স্বদেশে ও অন্তান্তদিগকে কোন নিরপেক্ষ দেশে তাঁহারা ফেরৎ পাঠাইতে রাজী আছেন। কিন্তু প্রে: আইসেনহাওয়ারের শাসন পরিচালন বিভাগ কোরিয়া ও ফরমোসা যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোরিয়ায় শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। উহাতে অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখার ১০ মাইল উত্তরে দক্ষিণ-কোরিয়ার সীমানা নির্দ্ধারণ এবং ফরমোসায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছিত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রস্তাব আছে। হোয়াইট হাউস হইতে উহার প্রতিবাদ করা হইলেও সুস্পষ্ট ভাবে কিছু বলা হয় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় সত্যই শান্তি চায়, উক্ত প্রস্তাবে তাহা বুঝা যায় না।

টিটো ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী—

মার্চ্চ মাসের (১৯৫৩) মধ্যভাগে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর পাঁচ দিনের জন্ত সরকারী ভাবে লণ্ডনে গমন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া গণ্য না হইতে পারে। কিন্তু উহাকে একেবারে তাৎপর্য্যহীন বলিয়াও মনে করা যায় না। মার্শাল টিটোর এই ভ্রমণ দ্বারা যুগোশ্লাভিয়া পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সমাজে উঠিল ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে কমিনফর্ম যুগোশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং টিটো সহ উহার নেতৃবর্গকে বহিষ্কৃত করিবার পর রাশিয়ার সহিত যুগোশ্লাভিয়ার সম্বন্ধও ছিন্ন হইয়া যায়। যদিও ১৯৪৮ সাল হইতে যুগোশ্লাভিয়াকে বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দিয়া আসিতেছে, তাহা হইলেও তাহাকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের জাতে তোলা

হয় নাই। উহার পক্ষে বাধাও বড় কম ছিল না। রাশিয়ার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইলেও, পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত যুগোস্লাভিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনেকখানি পরিবর্তন করা হইলেও টিটোর গায়ের কম্যুনিজমের গন্ধ দূর করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। যুগোস্লাভিয়া গ্রীক কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিত, এই অভিযোগ বিস্মৃত হওয়াও বড় সহজ কথা নয়। তেলাপোকা যেমন ধীরে ধীরে কাচপোকায় পরিণত হয়, তেমনি টিটোকে ধীরে ধীরে কম্যুনিজম হইতে ধনতন্ত্রবাদে আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কম্যুনিজমের প্রশ্ন ছাড়া অন্ত প্রশ্নও আছে। ত্রিয়েস্তকে যে ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহাতে ইটালীর আপত্তি আছে। যুগোস্লাভিয়া যখন রাশিয়ার মিত্র ছিল তখন বৃটিশ, ফ্রান্স এবং আমেরিকা গোটা ত্রিয়স্তই ইটালীকে দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিল। এখন যুগোস্লাভিয়া পশ্চিমী শিবিরে যোগদান করায় ত্রিয়েস্ত-সমস্তা কাঁটার মত হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই ধীরে ধীরে যুগোস্লাভিয়াকে জাতে তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫২) বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন যুগোস্লাভিয়া পরিদর্শনে যান। সেই সময়ই তিনি মার্শাল টিটোকে লণ্ডনে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। অতঃপর তুরস্ক, গ্রীস এবং যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে একটি বলকান-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট টিটোর প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় ইহাতেও সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি লণ্ডনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যুগোস্লাভিয়ায় ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদের নির্য্যাতন সম্পর্কে বৃটেনে আন্দোলন বড় কম হয় নাই। ডিউক অব নরফোক বৃটিশ ক্যাথলিকদের পক্ষ হইতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক স্মারক-লিপি প্রেরণ করেন। এই স্মারক-লিপিতে খৃষ্টান-নিপীড়ন নীতির জন্ত যুগোস্লাভিয়ার সুনাম কিরূপ নষ্ট হইয়াছে এবং এই নিপীড়ন-নীতি বন্ধ করিলে বৃটিশ ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব কিরূপ নিবিড় হইয়া উঠিবে, তাহা টিটোকে সমঝাইয়া দিবার জন্ত মিঃ চার্চ্চিলকে অনুরোধ করা হইয়াছে। টিটো লণ্ডনে যাওয়ায় ইটালীও সন্তুষ্ট হয় নাই। পাছে ত্রিয়েস্তের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন গণ্ডগোল সৃষ্টি হয় এই আশঙ্কায় টিটোর লণ্ডনে আগমনের সময় ত্রিয়েস্তে মিত্রপক্ষীয় সৈন্তবাহিনী সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল।

মার্শাল টিটোর লণ্ডন পরিদর্শনের পর তাঁহার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথাও উঠিয়াছে। হয়ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার নিমন্ত্রণও তিনি পাইবেন। উহার পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে পুরাপুরি পশ্চিমী শিবিরভুক্ত হওয়া সম্ভব হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। টিটো বোধ হয় এখন বুঝিতেছেন, কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে বৃহৎ রাষ্ট্রের তাঁবেদার হইয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। তাঁহার পক্ষে রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইতে দেওয়া যেমন ভুল হইয়াছে, রাশিয়াও তেমনি এই সম্পর্ক ছিন্ন হইতে দিয়া ভুল করিয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা। ষ্ট্যালিনের ভুল হইতে পারে না, একথা আমরা কোন দিনই স্বীকার করিতে পারি নাই। ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে কমিন্‌ফর্ম এক সময়ে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বের বিরোধী ছিল। পরে তাঁহাকে নির্দ্দেশ দিবার জন্ত উপদেষ্টা প্রেরণ করিতেও ত্রুটি করে নাই। এই উপদেষ্টার পরামর্শ অনুসারে চলিবার ফলেই ১৯৩৪ সালে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির গুরুতর সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ-চীনের ঘাঁটি হইতে তাহারা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহার পর আর কোন রুশ উপদেষ্টা মাও-সে-তুংকে নির্দ্দেশ দিতে চেষ্টা করে নাই। যদিও চীনের কতক অংশে কম্যুনিষ্টরা রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তথাপি চীনে কম্যুনিষ্টদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ষ্ট্যালিনেরও সন্দেহ ছিল। বোধ হয় এই জন্তই মাও-সে-তুং-এর সহিত ষ্ট্যালিনের টিটোর মত বিচ্ছেদ হয় নাই। মিঃ হপকিন্স ১৯৪৫ সালের মে মাসে ষ্ট্যালিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চীন সম্পর্কে তাঁহার যে অভিমত জানিতে পারেন, তাহা তিনি মার্কিণ রাষ্ট্রবিভাগের নিকটে প্রেরিত রিপোর্টে উল্লেখ করেন। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে:—"He (Stalin) made categorical statement that he would do everything he could to promote unification of China under the leadership of Chiang-Kai-Shek. ......He specifically stated that no communist leader was strong enough to unify China." ১৯৪৬ সালে চীনা কম্যুনিষ্টরা চিয়াংয়ের সহিত শেষ যুদ্ধ করিতে যখন সিদ্ধান্ত করে, তখন ষ্ট্যালিনের উপদেশের বিরুদ্ধেই এই সিদ্ধান্ত তাহারা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ১৯৪৮ সালের শেষ ভাগে সোভিয়েট রাশিয়া সিংকিয়াং সম্পর্কে চিয়াং কাইশেকের সহিত চুক্তি করিয়াছিল। ইহা চীনকে মুক্ত করিতে চীনা কম্যুনিষ্টদের শক্তির প্রতি সন্দেহের ফল কি না, তাহা কে বলিবে? টিটোর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়া হইতে সোভিয়েট রাশিয়া কোন শিক্ষা লাভ করিয়াছে কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে।

রুশ ডাক্তারদের জোর বরাত—

ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর এক মাস পার হওয়ার পূর্ব্বেই রাশিয়ার নূতন প্রধান মন্ত্রী ম্যালেনকভ রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ১৫ জন ডাক্তারকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন। ইহা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে নূতন যুগের সূচনা করিতেছে কি না, সে-সম্বন্ধে কোন অনুমান আমরা করিব না। এ সম্পর্কে প্রথমে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই ১৫ জন ডাক্তারের মধ্যে ৯ জনকে ঝানভের মৃত্যু ঘটান, সামরিক নেতাদের হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫৩) গ্রেফতার করা হয়। তাঁহারা অভিযোগগুলি স্বীকার করিয়া এক স্বীকার-উক্তিও করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ছয় জন ডাক্তারকে কেন গ্রেফতার করা হইয়াছিল সে-সম্বন্ধে সরকারী ঘোষণায় কিছুই বলা হয় নাই। ডাক্তারদিগকে মুক্তি দেওয়ার কারণ সম্পর্কে রুশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণায় প্রকাশ, পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, আনীত অভিযোগগুলি মিথ্যা এবং যে-প্রামাণ্য তথ্যের উপর তদন্তকারী অফিসারগণ নির্ভর করিয়াছিলেন তাহাও ভিত্তিহীন। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, আসামীদের স্বীকারোক্তি অন্যায় ও সোভিয়েট আইনে নিষিদ্ধ পদ্ধতি দ্বারা আদায় করা হইয়াছিল। সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে, রাশিয়ার এই কয় জন বিশিষ্ট ডাক্তার মঃ ঝানভকে খুন করেন নাই, মার্শাল ভ্যাসিলিভস্কি, কোনিয়েভ প্রভৃতিকে হত্যার চেষ্টাও তাঁহারা করেন নাই। তাঁহারা জিয়নিষ্ট গুপ্তচরও নহেন। অথচ তাঁহারা আরোপিত সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করিয়া স্বীকারোক্তিও করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের গ্রেফতারের মাসখানেক পরে তেল-আভিবন্থ রুশ দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণের পর এই সকল ষড়যন্ত্রকারী ডাক্তারের নেতা অধ্যাপক মোসেস ভবসি পুনরায় এক স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মার্কিণ ইহুদী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিয়াছেন। যখন তাঁহাদিগকে প্রথম গ্রেফতার করা হয় তখন এইরূপ গুরুতর অপরাধের সন্ধান পাইতে এত বিলম্ব হওয়ার জন্য নিরাপত্তা বিভাগের কঠোর সমালোচনাও করা হইয়াছিল এবং বেরিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া ইঙ্গিত করিতেও ত্রুটি হয় নাই। এখন দেখা যাইতেছে, 'সকলি গরল ভেল।' উল্টিয়া এখন সভ্য-বিলুপ্ত নিরাপত্তা বিভাগের উপরেই সমস্ত দোষ চাপান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে, এক সময়ে গুপ্তচর বিভাগের কর্তা য়াগোডা এবং ইয়েজোভকে অপসারিত করার সময়ও তাঁহারা ট্রটস্কীপন্থী এবং বিপ্লব-বিরোধী এই অভিযোগই শুধু করা হয় নাই, সহস্র সহস্র নির্দোষ লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার অভিযোগও তাহাদের বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল।

এই সকল অভিযুক্ত ডাক্তারকে নির্দোষ বলিয়া অব্যাহতি দেওয়ায় লোকের মনে স্বাভাবিকই এই প্রশ্ন জাগিবে, যদি ষ্ট্যালিনের মৃত্যু না হইত এবং ম্যালেনকভ প্রধান মন্ত্রী না হইতেন, তাহা হইলে ডাক্তারগণ অব্যাহতি পাইতেন কি? কম্যুনিষ্টরা হয়ত বলিবেন যে, এই প্রশ্ন বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তি-প্রসূত। কোন কম্যুনিষ্টের মনে এরূপ প্রশ্ন স্থান পাইতে পারে না। বস্তুতঃ শ্লানস্কি মামলায় যখন কথা উঠিয়াছিল যে, ষড়যন্ত্রকারীদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল কেন, তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার শিক্ষামন্ত্রী অনুরূপ উত্তরই দিয়াছিলেন। শ্লানস্কি মামলার আসামীরা স্বীকারোক্তি কেন করিয়াছিল সে-সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে এত বিপুল অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যে উহার চাপে তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। রুশ ডাক্তারগণ অকাট্য প্রমাণের চাপেই হয়ত স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণও কাটিয়া গেল। উল্লিখিত নয় জন ডাক্তার রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। ষ্ট্যালিন যাহাতে এই সকল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সুচিকিৎসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকেন, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এই সন্দেহ যদি কাহারও মনে জাগে, তাহা হইলে কম্যুনিষ্টরা উহাকে বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তিমূলভ সন্দেহ বলিয়া অভিহিত করিবেন কি?

ব্রহ্মদেশের অভিযোগ—

অবশেষে গত ২৫শে মার্চ (১৯৫৩) ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। এই অভিযোগের পরিণাম কি হইবে তাহা অনুমান করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। এই অভিযোগে যদিও স্পষ্ট করিয়া একথা বলা হয় নাই যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রহ্মদেশে অবস্থিত কুয়োমিণ্টাং বাহিনীকে সাহায্য করিতেছে, তথাপি একথা বলা হইয়াছে যে, এই সৈন্যবাহিনী যে-সকল নূতন অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিতেছে তাহা ব্রহ্মদেশের বাহির হইতে আসিতেছে। একটি সংবাদে প্রকাশ, সান ফ্রান্সিস্কোতে 'স্বাধীন এশিয়া কমিটি' (Free Asia Committee) নামে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটিই ব্রহ্মদেশস্থিত কুয়োমিণ্টাং বাহিনীকে সাহায্য করিতেছে। সশস্ত্র কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর ব্রহ্মদেশে অবস্থান এবং ব্রহ্মবাসীদের উপর নিপীড়ন ব্রহ্মদেশ আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই ব্যাপারে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন, না প্রাইভেট মার্কিণ ভাগ্যান্বেষী নাগরিকরা সাহায্য করিতেছে, এই প্রশ্ন অবান্তর বলিয়াই মনে হয়।

সম্প্রতি কুয়োমিণ্টাং গেরিলাদের সহিত তিন জন শ্বেতকায় লোকও নিহত হইয়াছে। রেঙ্গুনের কম্যুনিষ্ট-বিরোধী একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণে বলা হইয়াছে যে, এই শ্বেতকায় লোক তিন জন আমেরিকান! মার্কিণ দূতাবাস হইতে বলা হইয়াছে যে, এ সম্পর্কে কোনও প্রমাণ নাই। এক সংবাদে প্রকাশ, যে-সকল মার্কিণ নাগরিক কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিতেছে, তাহাদের নাম মার্কিণ গবর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে। উক্ত নিহত তিন জন শ্বেতকায় লোকের এক জনের দেহে একটি ডায়েরী পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, সান ফ্রান্সিসকো এবং কালিফোর্ণিয়ার ২০ জন আমেরিকানের ঠিকানা পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর কুয়োমিণ্টাং গেরিলাদের সহিত আরও একজন শ্বেতাঙ্গ নিহত হইয়াছে।

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন না বটে, কিন্তু মন্ত্রীদের প্রাইভেট আলোচনায় একথা বলা হইয়া থাকে যে, কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর কার্য্যকলাপের প্রতি মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ রহিয়াছে। মার্কিণ সাহায্য-চুক্তি ১৯৫৩ সালের ৩০শে জুনের পর অবসান করিবার জন্য সম্প্রতি ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে নোটিশ দিয়াছেন। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ বিব্রত বোধ না করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সমস্ত প্রমাণ যাহাতে উপস্থিত করিতে পারেন, সেই জন্যই এই নোটিশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ব্যাঙ্ককস্থিত কুয়োমিণ্টাং দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলিয়াছেন যে, কুয়োমিণ্টাং বাহিনী ব্রহ্মদেশের যে-অঞ্চলে অবস্থান করিতেছে তাহা কাহার রাজ্য, সে-সম্পর্কে সন্দেহ আছে এবং কোরিয়ায়, ইন্দোচীনে এবং মালয়ে কম্যুনিষ্ট নিরোধের যে-সংগ্রাম চলিতেছে ব্রহ্মদেশে কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর কার্য্যকলাপ উহারই সম্প্রসারণ মাত্র। এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আসামের কতক অংশও চীনের রাজ্য বলিয়া দাবী করা হইয়া থাকে।

"ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। সেই জন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর-পশ্চিমে পার্ব্বত্য-দ্বারে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক ভারতাধিকারে চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহ্লীক, শক, হূন, আরব্য, তুরকী, সকলেই আসিয়াছে এবং সিন্ধুপারে বা তদুভয় তীরে স্বল্পপ্রদেশ অত্যল্প দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে।"—বঙ্কিমচন্দ্র

লবকুমার বসু

ক্রিকেট

এদেশে রঞ্জী ট্রফির সমাপ্তির সঙ্গে ক্রিকেট মরসুমও শেষ হয়ে গেছে। ফুটবলের পর আজ এদেশে ক্রিকেট খেলাটিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এদেশে এই খেলাটির প্রচলনের বিষয়ে মোটামুটি দু'-এক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ইংলণ্ডের খেলার ইতিহাসে দেখা যায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সেখানে এই খেলাটির নিয়মিত প্রচলন ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতেও নাকি ওদেশে এই খেলাটি চলিত ছিল। আমাদের দেশে অবশ্য এই খেলাটি প্রথম শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ইংরেজরাই যে এখানে এটির প্রচলন করেন একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য C. E. Newham লিখেছেন,

"Post-war archaeological discoveries in Greece show that a variety of hockey-cum-cricket was played there in ancient days when the world was young, and there is no obvious rason why Alexander should not have brought stick and ball games to India."

কিন্তু এই মতের সমর্থনযোগ্য কোন প্রমাণ আজও আবিষ্কৃত হয়নি; তাই ইংরেজদিগকেই এদেশে এই খেলাটির প্রবর্তক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেন যে, ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বিদেশীরা ক্রিকেট খেলতেন এদেশে এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে নাকি কলকাতায় একটি ক্রিকেট ক্লাব গঠিত হয়। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে একটি ম্যাচ খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেলার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের ক্যালকাটা গেজেটে। গেজেটে লিখেছিল, "On the 18th and 19th instant was played a grand Match of Cricket between the Etonians, Civil Servants of the Company and all other Civil Servants of the Company resident in Calcutta; which was won by the former in one Innings by 152 runs." এই খেলায় Etonian দল প্রথম ইনিংসে ২০২ রাণ করে এবং অপর দলটি উভয় ইনিংসেই ৪০টি করে রাণ করতে সক্ষম হয়।

এর পর উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ নিয়মিত ভাবেই খেলাটি এদেশে প্রচলিত হয়; অবশ্য বিদেশীদের মধ্যে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় একটি সুন্দর ক্রিকেট ক্লাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"On the cricket arena stands two spacious tents, not, however, like the paltry affair, bearing that name in England, but lined with fancy chintz, furnished with looking-glasses, sofas and chairs, and each player's wants, whether it be a light for his cigar, tea, iced soda-water or champagne, supplied by his turbaned attendant."

বর্ণনা পড়লে মনে হয় যে এটি খুব উঁচু দরের ক্লাব ছিল। পুরনো নথিপত্রে কলকাতায় একটি ছাট-ট্রিকের খবর পাওয়া যায়, তবে সেটি ক্রিকেট খেলায় কিনা তা সঠিক জানা যায় না। শ্রীরামপুরের 'Englishman' সংবাদপত্রে সেদিন নিয়মিত ভাবেই ক্রিকেট খেলার খবর প্রকাশিত হত। দমদম, ব্যারাকপুর প্রভৃতি দল খেলাগুলিতে অংশ গ্রহণ করত।

এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম ক্রিকেট খেলার প্রচলন হয় পার্শীদের ভিতরে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁরা ওরিয়েণ্টাল ক্রিকেট ক্লাব গঠন করেন এবং ইংরেজ শিক্ষক নিযুক্ত করে ভাল ভাবে খেলাটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেন। হিন্দু ও মুসলমানদের ভিতর নানা সামাজিক কারণে এই খেলাটির প্রচলন হয় বহু পরে ও ধীরে ধীরে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বে জিমখানা একটি ভাল বোলারকে হারান, কারণ, "he had been warned that he would lose cast if he continue to play with Englishmen"

পার্শীরা কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এই খেলাটির অনুশীলন করেন এবং সেদিন তাঁরা বহু সাহায্যই পেয়েছিলেন বোম্বাই-এর গভর্ণর লর্ড হ্যারিসের কাছ থেকে। ১৮৮৬ এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁরা ইংলণ্ডে খেলবার জন্যে তাঁদের খেলোয়াড়দের পাঠিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁরা ভাল খেলা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। নানা দিক দিয়ে তাঁদের সাহায্য করার জন্যে ভারতীয় সংবাদপত্রের কাছে লর্ড হ্যারিসকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। এখানে এক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তিনি হলেন মিঃ জে. এম. ফ্র্যাম্জী প্যাটেল। পার্শীদের মধ্যে এই খেলাটি প্রচলনে তাঁর প্রচেষ্টা ও উৎসাহ ছিল অসাধারণ। এদেশে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর নাম। এর পর ধীরে ধীরে আগ্রা, অযোধ্যা, লাহোর, এলাহাবাদ আম্বালা প্রভৃতি বহু স্থানেই এদেশীয়দের মধ্যে ক্রিকেট খেলাটি প্রচলিত হয়।

ভারতে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসের কথা আলোচনা করতে গিয়ে এক জনের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তিনি হলেন নবানগরের প্রিন্স রঞ্জিৎসিংজী; "রঞ্জী" নামেই যিনি ক্রীড়া-জগতে বিখ্যাত। সে যুগের তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। ইংলণ্ডেই তিনি তাঁর ক্রিকেট-জীবনের অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করেছিলেন। এর পরবর্তী কালের ইতিহাস সকলের কাছেই সুবিদিত।

এবারে রঞ্জী ট্রফির ফাইনাল খেলার কথা কিছু বলা যাক। উপরোক্ত সুবিখ্যাত খেলোয়াড় রঞ্জিৎসিংজীর নামে স্থাপিত কলকাতার রঞ্জী ষ্টেডিয়ামে সেদিনে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হল পূর্বাঞ্চলের বাংলা এবং মধ্যাঞ্চলের হোলকার দলের মধ্যে। মার্চ মাসে কলকাতার এরূপ অসহ্য গরমের মধ্যে ভারতের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতাটির ফাইনাল খেলা হতে দেখে সকলকে খুবই আশ্চর্য্য করেছে। মাথার ওপর চাঁদোয়া থাকা সত্ত্বেও যেখানে দর্শকদের পক্ষে

খেলা দেখাও কষ্টকর হচ্ছিল, সেখানে কি করে খেলোয়াড়দের পক্ষে নিজের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখান সম্ভব তা বোধ হয় এদেশের ক্রিকেট খেলার কর্মকর্তারাই কেবল জানেন। যাই হোক, দর্শকদের প্রতিটি মুহূর্ত্তই সজাগ করে রেখেছিল এই খেলাটি এবং সকল দর্শকেরই মত এই যে, ইতিপূর্ব্বে তাঁরা এরূপ একটি কৌতূহলপূর্ণ খেলা কোন দিন প্রত্যক্ষ করেননি। বাংলা দল প্রথমে টসে জয়লাভ করে পি. বি. দত্ত, নির্ম্মল চ্যাটার্জি প্রভৃতির চেষ্টায় ৪৭১ রাণ তুলে খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে। কিন্তু হোলকার দলের নিম্বলকার, মুস্তাক আলী, রঙ্গনেকার এবং শেষ উইকেটে ধানবাদে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে হোলকার দলকে ১৭ রাণে অগ্রবর্ত্তী হতে সক্ষম করেন। এই সময় যখন সকলেই খেলাটির মীমাংসা হয়ে গেছে বলে আশা করছেন, তখন খেলার চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে বাংলার তরুণ খেলোয়াড়গণ দ্রুত রাণ তুলে পাঁচ উইকেটে ৩২০ রাণ করে ডিক্লেয়ার করে দেন এবং শেষ দিনে খেলা শেষ হবার ৭০ মিনিট পূর্ব্বে হোলকার দলের ন'টি উইকেট ফেলে দেন। কিন্তু শেষ উইকেটের জুটীতে গায়েকওয়াড় ও ধানবাদে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে খেলে সময় কাটিয়ে দেন; তার ফলে হোলকার প্রথম ইনিংসে অগ্রবর্ত্তী থাকার দরুণ খেলাটি জয়লাভ করল। ফলাফল :—

বাংলা—৪৭১ (পি. বি. দত্ত ১৪১, এন. চ্যাটার্জ্জি ৫২, শিবাজী বসু ৪৮, বেণু দাশগুপ্ত ৪০, গিরিধারী ৪৫ ; গায়েকওয়াড় ১২৮ রাণে ৪টি) এবং ৫ উইকেটে ৩২০ ও ডিঃ (ক্র্যাঙ্ক ৬২, গিরিধারী নট আউট ৫৮, বেণু দাশগুপ্ত নট আউট ৫৯, নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি ৫৪)

হোলকার—৪১৬ (বি, বি, নিম্বলকার ২১১, মুস্তাক আলি ৯৯, রঙ্গনেকার ৮৬ ; এস, সোম ১১৫ রাণে ৪টি) এবং ৯ উইকেটে ১৭৭ (মুস্তাক আলি ৪৬ ; গিরিধারী ১৭ রাণে ৩টি)

এবারে ভারতীয় দলের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলার পর সফরকারী ভারতীয় দলের পরবর্ত্তী খেলাটি হয় ব্রিটিশ গুয়ানাস্থিত ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধে। খেলাটি দুই দিনব্যাপী হবার কথা থাকলেও প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ একদিনের বেশী খেলা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় দলের অধিনায়ক টসে জয়লাভ করে ভারতীয় দলকে ব্যাট করতে পাঠালে তাঁরা রামচাঁদ, মঞ্জরেকার প্রভৃতির চেষ্টায় পাঁচ উইকেটে ১৬০ রাণ করলে মানকড় তাঁদের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অধিনায়ক হাজারে খেলাটিতে অনুপস্থিত ছিলেন। এর পর গুপ্তের বোলিং-নৈপুণ্যে স্থানীয় দল বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়; মাত্র ৪৭ রাণে তাঁদের ৭টি উইকেটের পতন ঘটে এবং ভারতীয় দলের পক্ষে জয়লাভের আশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এর পর আবদুল ও গানিম খাঁ জুটি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন এবং তাঁরা আপন দলের পরাজয়ের গ্লানি এড়াতে পারবে বলে মনে হয়। অবশেষে গুপ্তের বোলিং-চাতুরীর ফলে খেলা শেষ হবার মাত্র দশ মিনিট পূর্ব্বে ১১৭ রাণ করে তাঁদের ইনিংস শেষ হয় এবং ভারতীয় দল তাদের সফরের প্রথম জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। গুপ্তে তাঁর বোলিং-চাতুর্য্যে দ্বারা মাত্র ৪৮ রাণে ৬টি উইকেট লন। ফলাফল :—

ভারত—৫ উইকেটে ১৬০ ও ডিঃ (রামচাঁদ ৬৮, মঞ্জরেকার ৩৬)

ব্রিটিশ গুয়ানার ভারতীয় একাদশ—১১৭ (গানিম খাঁ ৩৭ ; গুপ্তে ৪৮ রাণে ৬টি, রামচাঁদ ৯ রাণে ৩টি)

এর পর ভারতীয় দলের সঙ্গে ব্রিটিশ গুয়ানা দলের খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে সম্পন্ন হয়। প্রথমে স্থানীয় দল ব্যাট করতে নামলে ১৬১ রাণে তাদের ৭টি উইকেট ফেলে দিয়ে ভারতীয় দল খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে। কিন্তু অষ্টম উইকেটের জুটিতে ট্রিম ও এন, ওয়াইট ৭৮ রাণ যোগ করে ভারতীয়দের প্রাধান্য নষ্ট করে দেন। ব্রিটিশ গুয়ানার ইনিংস শেষ পর্য্যন্ত ২৯০ রাণে শেষ হয়। গুপ্তে ১৩১ রাণে ৭টি উইকেট নিয়ে তাঁর বোলিং-নৈপুণ্যের আর একটি পরিচয় দেন। এর পর ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে মঞ্জরেকারের কৃতিত্বপূর্ণ শতাধিক রাণ এবং গাডকারীর আকর্ষণীয় ব্যাটিং সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সাফল্যের ফলে ভারতীয় দল ৩১৮ রাণ করতে সক্ষম হয়। প্রথম ইনিংসে অগ্রবর্ত্তী হয়ে ভারতীয় দলের পক্ষে জয়ের আশা দেখা দিলেও খেলার শেষ দিনে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় খেলা নিষ্পত্তির সকল সম্ভাবনাই দূর করে দিল। ফলাফল :—

ব্রিটিশ গুয়ানা—২৯০ (এন ওয়াইট ৭৯, ট্রিম ৭৮, গুপ্তে ১৩১ রাণে ৭টি) ; এবং ১ উইকেটে ১২ (পেরোদো নট আউট ৫৪)

ভারত—৩১৮ (মঞ্জরেকার ১৬০, গাডকারী ৪৬, আপ্তে ৩১, শোধন ৩২ : এন, ওয়াইট ৮০ রাণে ৪টি)

জর্জ্জ টাউনে অনুষ্ঠিত ভারত ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে চতুর্থ টেষ্ট খেলাটি এর পর অমীমাংসিত ভাবে সম্পন্ন হয়। এখানে একটি

কৌতূহলপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দলের অধিনায়কদ্বয় হাজারে এবং ষ্টলমেয়ার উভয়েই খেলার প্রথম দিনে অর্থাৎ ১১ই মার্চ একত্রে তাঁদের জন্মদিবস পালন করেন।

হাজারে প্রথমে টসে জয়লাভ করার পর ভারতীয় দল প্রথমে ব্যাট করতে নামলে আপ্তে ও পঙ্কজ রায় প্রথম উইকেটের জুটিতে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে বেশ ভাল ভাবেই খেলার সূচনা করলেও প্রথম উইকেটের পতন হলে ভারতীয় দল বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়। শেষ পর্য্যন্ত মানকড় হাজারে ও মানকড় কাদকার জুটি এবং পরে গাডকারী আকর্ষণীয় ভাবে খেলে ভারতীয় দলের রাণ-সংখ্যাকে সন্তোষজনক করতে সক্ষম হন। খেলার দ্বিতীয় দিনে অত্যধিক বৃষ্টির নিমিত্ত চা-পানের বিরতি পর্য্যন্ত খেলা সম্ভব হয়নি। এই সময় টেষ্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে। মাঠের দর্শকগণ মারমুখী হয়ে খেলা না হলে টাকা ফেরতের দাবী করে খেলার মাঠে প্রবেশ করে এবং প্যাভেলিয়নের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। মাঠের অবস্থা টেষ্ট খেলার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত হলেও অধিনায়ক হাজারে ভারতীয় দলকে ব্যাট করতে পাঠান। সমাপ্তির পূর্ব্বে মাত্র এক ঘণ্টা খেলা সম্ভবপর হয়েছিল এবং এর মধ্যেই ভারতীয় দলের মাত্র ৫৫ রাণে ৩টি উইকেটের পতন হয়। হাজারে খেলোয়াড়োচিত মনোভাব দেখিয়ে খেলতে রাজী হলেও তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুচিত হয়েছিল। ২৬২ রাণে ভারতীয় দলের ইনিংস সমাপ্ত হলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলে 'দি থ্রি ডাবলিউস্—উইকস্, ওরেল ও ওয়ালকট সাফল্যের সঙ্গে ব্যাট করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে ১০২ রাণে অগ্রবর্ত্তী হতে সাহায্য করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৩৬৪ রাণের মধ্যে তাঁদের তিন জনের ব্যক্তিগত রাণ-সংখ্যার সমষ্টি হল ২৬৭। এর পর ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১১০ রাণ করে। শেষ দিনে মধ্যাহ্ন-ভোজের পর বৃষ্টি নামলে খেলা নিষ্পত্তির সকল আশাই নিঃশেষ হয় এবং খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ছয় দিন-ব্যাপী এই খেলাটিতে মাত্র ১১ ঘণ্টা খেলা সম্ভবপর হয়েছিল।

ফলাফল :—

ভারত—২৬২ (মানকড় ৬৫, গাডকারী নট আউট ৫০, হাজারে ৩০, কাদকার ৩০, আপ্তে ৩০, ভ্যালেন্টাইন ১২৭ রাণে ৫টি); এবং ৫ উইকেটে ১১০ (পঙ্কজ রায় ৪৮, উম্রিগড় নট আউট ৪০ ; ভ্যালেন্টাইন ৭০ রাণে ৩টি)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—৩৬৪ (ওয়ালকট ১২৫, উইক্স্ ৮৬, ওরেল ৫৬, গুপ্তে ১২২ রাণে ৪টি)

ভারতীয় দল তাদের সফরের প্রথম শ্রেণীর খেলায় প্রথম সাফল্য লাভ করে জামাইকা দলের বিরুদ্ধে। এই খেলায় উভয় দলের বোলারদের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। তার মধ্যে ভারতীয় দলের গুপ্তেই সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন—উভয় ইনিংসে সর্ব্বসমেত ১২টি উইকেট গ্রহণ করেন মাত্র ১৩১ রাণ দিয়ে। জামাইকা দলকে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১৬ রাণে আউট করে দিলেও ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অকৃতকার্য্যতার ফলে তাঁদের বিপর্য্যয় ঘটে। মন্ত্রেকার ভিন্ন কোন খেলোয়াড়ই তাঁদের খেলতে না পারায় মাত্র ১৪০ রাণে ইনিংস শেষ হয়। এর পর ওরেলের দৃঢ়তার সঙ্গে খেলা সত্ত্বেও জামাইকা দল দ্বিতীয় ইনিংসে গুপ্তের বোলিংএর বিরুদ্ধে খেলতে না পারায় মাত্র ৮১ রাণে তাঁদের সকল উইকেটের পতন হয়। অতঃপর ভারতীয় দল প্রয়োজনীয় ১৪৭ রাণ করে মাত্র চারটি উইকেট হারিয়ে এবং ছয় উইকেটে খেলাটি জয়লাভ করে। ফলাফল :—

জামাইকা—১১৬ (বোনিটো ১৪, এ্যালেন রে ৪৪ ; গুপ্তে ৮৮ রাণে ৫টি, মানকড় ৫০ রাণে ৩টি); এবং ৮১ (ওরেল নট আউট ৪৭ ; গুপ্তে ৪৩ রাণে ৭টি)

ভারত—১৪০ (মন্ত্রেকার ৪১ ; গুড্রিজ ২৮ রাণে ৬টি, স্কট ৫০ রাণে ৩টি); এবং ৪ উইকেটে ১৪৭ (পঙ্কজ রায় ৫২ ; স্কট ৪৬ রাণে ৪টি)

হকী

কলকাতায় হকী লীগের খেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। এবারে লীগ পাবার জন্যে চারটি দল—কাষ্টমস্, ভবানীপুর, রাজস্থান ও ইষ্ট বেঙ্গলের মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, তা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। আজ সব থেকে কৌতূহলের বিষয় হল, এর মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত কোন্ দলটি লীগ জয়ের গৌরব লাভ করবে। গত দু'বছরের লীগ-বিজয়ী মোহনবাগান দল এবার তাদের কয়েক জন খেলোয়াড়ের খেলার মান পড়ে যাওয়ায় এবং আরো কয়েক জন আহত হওয়ায় অপ্রত্যাশিত ভাবে তারা কতকগুলি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করেছে; তাই তাদের লীগ জয়ের সম্ভাবনা খুব কম।

ইতিমধ্যে বোম্বাইএ ইন্ভিটেশান্ হকী প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। ফাইনালে করাচীর পাক্ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস্‌কে ১—০ গোলে পরাজিত করে মাদ্রাজ একাদশ দল বিজয়ীর গৌরব লাভ করেছে। বোম্বাইতে আগা খাঁ হকী কাপও শেষ হয়ে এল। কলকাতায় এখন বাইটন কাপ হকী প্রতিযোগিতার জন্যে তোড়জোড় চলেছে। বাইরে থেকে নাম করা দলগুলিকে আনবার চেষ্টা হচ্ছে।

টেবিল টেনিস

হংকংএর খেলোয়াড়দের ভারত সফর শেষ হয়ে গেছে। সেকেন্দ্রাবাদ, বোম্বাই ও কলকাতায় অনুষ্ঠিত শেষের তিনটি টেষ্ট ম্যাচেই তারা ভারতকে পরাজিত করে। টেষ্ট পর্য্যায় ভারতকে ৪—১ খেলায় পরাজিত ক'রে হংকং দল 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

সম্প্রতি বুখারেষ্টে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গত বছর এটি হয়েছিল বোম্বাইতে। এ বছর এশিয়ার কয়েকটি বিশেষ শক্তিশালী দল, হংকং, জাপান, ভারত প্রভৃতি এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। প্রাক্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান রিচার্ড বার্গম্যান, জনী লীচ প্রভৃতিকে নিয়ে গঠিত ইংলণ্ড দল ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী হাঙ্গারীকে ৫—৩ খেলায় পরাজিত করে এবারের পুরুষদের দলগত সোয়ার্থলিং কাপ প্রতিযোগিতা জয় করে। মহিলাদের দলগত করবিলিয়ন কাপ প্রতিযোগিতায় রুমানিয়া ৩—০ খেলায় ইংলণ্ডকে পরাজিত করে জয়ী হয়। পুরুষদের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় হাঙ্গারীর এফ., সিডো চেকোস্লোভাকিয়ার এণ্ড্রিয়া-ডিসকে পরাজিত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। নিয়ে বিশ

টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাগুলির ফলাফল উদ্ধৃত করা হল :—

পুরুষদের সিঙ্গলস্—এফ. সিডো (হাঙ্গারী) বিজয়ী এণ্ড্রিয়াডিস (চেকোস্লোভাকিয়া), ২১-১৬, ২৩-২১, ২১-১৮।

মহিলাদের সিঙ্গলস্—মিসেস্ রোজেনো (রুমানিয়া) বিজয়ী মিস্ ফার্কাস (হাঙ্গারী) ২১-১১, ২১-১১, ১১-২১, ২১-১৬।

পুরুষদের ডবলস্—সিডো এবং কফজিয়েন (হাঙ্গারী) বিজয়ী জনী লীচ এবং রিচার্ড বার্জম্যান (ইংলণ্ড), ২৩-২১, ১১-২১, ১২-২১, ২১-১৮, ২১-১১।

মহিলাদের ডবলস্—মিসেস্ রোজেনো এবং মিস্ ফার্কাস বিজয়ী ডিয়ানা এবং রোসালিণ্ড রোয়ি (ইংলণ্ড), ২১-৯, ২১-৯, ১৮-২১, ২১-১৮।

মিক্সড ডবলস্—সিডো এবং মিসেস্ রোজেনো বিজয়ী ওয়েটল্ (অষ্ট্রিয়া) এবং ডলিনর, ৯-২১, ২১-১১, ২১-১১, ২১-১১।

রেগেটা (বাইচ)

সম্প্রতি ঢাকুরিয়া লেকে এ্যামেচার রেগেটা এসোসিয়েশন অফ, ইষ্ট পরিচালিত বার্ষিক বাইচ প্রতিযোগিতা হল। অতি প্রাচীন কাল থেকেই ধনী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বাইচ খেলাটি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। এটি ছিল তাঁদের একটি মস্ত বড় সখ। খেলায় যারা জয়ী হত তাদের জন্যে মোটা পুরস্কারেরও ব্যবস্থা ছিল। বহু উপন্যাসেও এর উল্লেখ আছে। তাই এখনকার এই রেগেটা বা বাইচ খেলা আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তবে আজ এটি ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী খেলা হয়। যাই হোক্, এই খেলায় যেরূপ শরীরের শক্তিবৃদ্ধি হয় তা অন্য কোন খেলাতেই হয় না। এদেশের জনসাধারণের মধ্যে এই খেলার প্রতি যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে তা খুবই আনন্দদায়ক। লেকে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাটির ফলাফল নীচে দেওয়া হল :—

ম্যাক্লীন স্কাল—লেক ক্লাব (অমর বসু) আধ লেংথে বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবকে (অজয় কুণ্ডু) পরাজিত করেন।

ডেনারলস্ বাওল (পেয়ার ওর্স)—লেক ক্লাব (এম. সরকার ও সি. বসুমল্লিক) আড়াই লেংথে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব 'বি'কে (ডেনরি ও জে হল্টে) পরাজিত করেন।

উইলিংডন ট্রফি (কক্সড ফোর্স)—ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব (বো—বিয়ক্রফ্‌ট এণ্ডারসন, ডি. লিফিওডাম, ষ্ট্রোক—প্লাডষ্টোন, কক্স—ই. আষ্ট) এক ফুটের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবকে (বো—কেশা, জি সেসান, পি, মুখার্জ্জি, ষ্ট্রোক—পি. চক্রবর্ত্তী, কক্স—এস. সরকারকে) পরাজিত করেন।

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি স্বীকার)

মহাভারত—সার জে.সি. ঘোষ, শ্রীপি. কে. ঘোষ। ৪ সতোন দত্ত রোড, কলিকাতা ২৯। মূল্য এক টাকা।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ গ্রন্থাবলী—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য (উপন্যাস), ১ম খণ্ড ১৯০১—১৯৫২—শ্রীঅনিল বিশ্বাস। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

শিলাহার—শ্রীরমাপতি বসু। শ্রীসমীর মুখার্জ্জী, অধিনায়ক, পি ২৮, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। মূল্য দুই টাকা।

ভারত শিল্প (আদি পর্ব্ব)—শ্রীবিমলকুমার দত্ত এম. এ. ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটী, ২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। মূল্য চারি টাকা।

শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথের আত্মচরিত, ২য় খণ্ড—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২।১ কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা—২৬। মূল্য দুই টাকা।

মাটির মাধুরী—শ্রীসুধীর গুপ্ত। চয়নিকা, ১৪০।এ রাসবিহারী এ্যাভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

করে দেখ, ১ম খণ্ড—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ৯৩ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

নারীর প্রশ্ন—সর্ব্বহারা। প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিসার্স, ৮ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

অবিন্দমের আবির্ভাব—শ্রীস্বপনকুমার। লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ, ৩৭০ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা আট আনা।

সদ্গুরু, ১ম খণ্ড—শ্রীশিবকৃষ্ণ রায়। শ্রীমণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ১৬।১ বি মণিলাল ব্যানার্জ্জী রোড, খিদিরপুর, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে—স্বপন বুড়ো। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

বন্দি—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়, শ্রীবিষ্ণুপদ রায়। ২ পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

দুর্নীতির স্বপক্ষে

"সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের চিন্তাধারা যে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুবা লোকসভায় দাঁড়াইয়া া একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন যে, দুর্নীতির অভিযান আরম্ভ করিলে তাহাতে লোকের মনোবল একেবারে া পড়িবে। ডাঃ কাটজু শুধু যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের ে আপত্তি তুলিয়াছেন তাহাই নয়, অবস্থার গুরুত্বও যত দূর লঘু করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ারী বিভাগগুলিতে অবস্থা যত খারাপ বলিয়া চিত্রিত করা হু—অবস্থা আসলে তত খারাপ নয়।" ইহা শুধু আত্ম-াাই নয়—দেশের লোককেও প্রতারণা করার সামিল। সরকারী রিপোর্টেই ইতিমধ্যে শত শত দুর্নীতির কথা প্রকাশ াছে। সার কেলেঙ্কারী, জীপ কেলেঙ্কারী, হিরাকুঁদ ও দামোদর কেলেঙ্কারী, দেশরক্ষা দপ্তরের কেলেঙ্কারী, বিভিন্ন রাজ্যের া দপ্তরগুলির কেলেঙ্কারী যদি একজোট করা যায়, তবে তাহা অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতকেও ছাড়াইয়া যাইবে। কিন্তু তবু র সরকারী কর্ত্তারা বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন না। তাঁহারা সার ্বিয়া লইয়াছেন যে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাকিতে নয়। আমলে গভর্ণমেণ্ট জনমতের যেটুক মূল্য দিতেন, স্বাধীন র কংগ্রেস সরকার তাহাও দিতে নারাজ। কারণ তাঁহারা ার বিদেশী শাসক নহেন—তাঁহারা যে দেশেরই জাতীয়তাবাদী ।"

—দৈনিক বসুমতী।

বক্তৃতার উচ্ছ্বাস

পাশ্চাত্যে ঐ সকল দেশে বেকার, অসুস্থতা ও বার্দ্ধক্য বীমা, ্যের বাধ্যতামূলক শিক্ষা, সংসার খরচ ও মজুরীর মধ্যে সমতা প্রভৃতি সমাজকল্যাণকর ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা হইতে কোন বঞ্চিত হয় না। প্রত্যেক লোকের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ্যক্ষ কর আদায় করিয়া ইহার খরচ সংগৃহীত হয়। প্রত্যেক বিপন্ন ব্যক্তিই প্রয়োজন অনুসারে সরকারী সাহায্য থাকে। সহজ কথায় ঐ সকল দেশের নীতি হইল: নরনারীর জন্য শিক্ষার, চিকিৎসার, বার্দ্ধক্যে বৃত্তির ও বেকার অবস্থায় কাজের নতুবা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। যতই দরিদ্র হউক না কেন—ঐ সকল সুবিধা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। এই সকল ব্যাপারে সকল শ্রেণীর প্রতি সমান ব্যবহার করাই উপরোক্ত দেশগুলির নীতি। কিন্তু ভারত সরকার এযাবৎ যেটুকু সমাজকল্যাণকর ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, দেশের অধিকাংশ লোক তাহার কোন সুবিধাই পাইবে না। কৃষক ও সঙ্ঘশক্তিশূন্য শ্রমিক, দোকানদার, ঠিকামজুর প্রভৃতি পূর্বেও যেমন বঞ্চিত হইত, ভবিষ্যতেও তেমনই বঞ্চিত হইবে। এই সকল পরিকল্পনার মধ্যে যাহাদিগকে আনা হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজন ও দাবী সম্পর্কে দ্বিমত নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের অধিকাংশ লোককে বাদ দেওয়ারও কোন যুক্তি নাই। পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে সকল শ্রেণীর জন্য এই ব্যবস্থাগুলি বলবৎ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে সর্বসাধারণের সমর্থন দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধনের চেষ্টা দ্রুত ফলবতী হইবে। শ্রেণিহীন সমাজ গঠন করাই নাকি ভারত সরকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু এযাবৎ তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন. তাহা দ্বারা শ্রেণীগত বৈষম্য আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের উদার ধনতন্ত্রবাদ অনুসরণ করিলে সমস্যাগুলি অনেক সহজ হইত। কিন্তু সরকার সে নীতিও গ্রহণ করেন নাই। তৎপরিবর্তে কায়েমী স্বার্থ পোষণ ও নূতন নূতন শ্রেণীস্বার্থ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। বক্তৃতার উচ্ছ্বাস বাদ দিলে বৃটিশ আমলে সরকারী নীতির সহিত বর্তমান নীতির পার্থক্য অতি সামান্য।"

—যুগান্তর।

যেন বানচাল না হয়

"পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সাম্প্রতিক এক উক্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলসমূহে রেশন-গ্রহীতাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট চাউল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১লা মে হইতে অনুমান এক শত দোকান খোলা হইবে। খাদ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে ইহাও জানান যে, মাথা-পিছু এক সের পাঁচ ছটাক করিয়া উক্ত চাউল বাজার-দরে সরবরাহ করা হইবে এবং রেশন-গ্রহীতাগণ ইচ্ছা করিলে রেশনের চাউলের পরিবর্তে উক্ত সরু চাউল ঐ সকল দোকান হইতে ক্রয়

দুর্নীতির স্বপক্ষে

"সরকারী কর্মকর্তাদের চিন্তাধারা যে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুবা লোকসভায় দাঁড়াইয়া তাঁহারা একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিলে তাহাতে লোকের মনোবল একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে। ডাঃ কাটজু শুধু যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের প্রস্তাবে আপত্তি তুলিয়াছেন তাহাই নয়, অবস্থার গুরুত্বও যত দূর সম্ভব লঘু করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সরকারী বিভাগগুলিতে অবস্থা যত খারাপ বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে—অবস্থা আসলে তত খারাপ নয়।" ইহা শুধু আত্ম-প্রতারণাই নয়—দেশের লোককেও প্রতারণা করার সামিল। বিভিন্ন সরকারী রিপোর্টেই ইতিমধ্যে শত শত দুর্নীতির কথা প্রকাশ পাইয়াছে। সার কেলেঙ্কারী, জীপ কেলেঙ্কারী, হিরাকুঁদ ও দামোদর বাঁধের কেলেঙ্কারী, দেশরক্ষা দপ্তরের কেলেঙ্কারী, বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী দপ্তরগুলির কেলেঙ্কারী যদি একজোট করা যায়, তবে তাহা হয়ত অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতকেও ছাড়াইয়া যাইবে। কিন্তু তবু আমাদের সরকারী কর্তারা বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন না। তাঁহারা সার সত্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাকিতে নয়। বৃটিশ আমলে গভর্ণমেণ্ট জনমতের যেটুকু মূল্য দিতেন, স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার তাহাও দিতে নারাজ। কারণ তাঁহারা তো আর বিদেশী শাসক নহেন—তাঁহারা যে দেশেরই জাতীয়তাবাদী নেতা!"

—দৈনিক বসুমতী।

বক্তৃতার উচ্ছ্বাস

"পাশ্চাত্যে ঐ সকল দেশে বেকার, অসুস্থতা ও বার্দ্ধক্য বীমা, বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, সংসার খরচ ও মজুরীর মধ্যে সমতা বিধান প্রভৃতি সমাজকল্যাণকর ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা হইতে কোন শ্রেণীই বঞ্চিত হয় না। প্রত্যেক লোকের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কর আদায় করিয়া ইহার খরচ সংগৃহীত হয়। আবার প্রত্যেক বিপন্ন ব্যক্তিই প্রয়োজন অনুসারে সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে। সহজ কথায় ঐ সকল দেশের নীতি হইল: প্রত্যেক নরনারীর জন্য শিক্ষার, চিকিৎসার, বার্দ্ধক্যে বৃত্তির ও বেকার অবস্থায় কাজের নতুবা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। যতই দরিদ্র হউক না কেন—ঐ সকল সুবিধা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। এই সকল ব্যাপারে সকল শ্রেণীর প্রতি সমান ব্যবহার করাই উপরোক্ত দেশগুলির নীতি। কিন্তু ভারত সরকার এযাবৎ যেটুকু সমাজকল্যাণকর ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, দেশের অধিকাংশ লোক তাহার কোন সুবিধাই পাইবে না। কৃষক ও সজ্ঞশক্তিশূন্য শ্রমিক, দোকানদার, ঠিকামজুর প্রভৃতি পূর্বেও যেমন বঞ্চিত হইত, ভবিষ্যতেও তেমনই বঞ্চিত হইবে। এই সকল পরিকল্পনার মধ্যে যাহাদিগকে আনা হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজন ও দাবী সম্পর্কে দ্বিমত নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের অধিকাংশ লোককে বাদ দেওয়ারও কোন যুক্তি নাই। পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে সকল শ্রেণীর জন্য এই ব্যবস্থাগুলি বলবৎ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে সর্বসাধারণের সমর্থন দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধনের চেষ্টা দ্রুত ফলবতী হইবে। শ্রেণিহীন সমাজ গঠন করাই নাকি ভারত সরকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু এযাবৎ তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দ্বারা শ্রেণীগত বৈষম্য আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের উদার ধনতন্ত্রবাদ অনুসরণ করিলে সমস্যাগুলি অনেক সহজ হইত। কিন্তু সরকার সে নীতিও গ্রহণ করেন নাই। তৎপরিবর্তে কায়েমী স্বার্থ পোষণ ও নূতন নূতন শ্রেণীস্বার্থ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। বক্তৃতার উচ্ছ্বাস বাদ দিলে বৃটিশ আমলে সরকারী নীতির সহিত বর্তমান নীতির পার্থক্য অতি সামান্য।"

—যুগান্তর।

যেন বানচাল না হয়

"পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সাম্প্রতিক এক উক্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলসমূহে রেশন-গ্রহীতাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট চাউল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ১লা মে হইতে অনুমান এক শত দোকান খোলা হইবে। খাদ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে ইহাও জানান যে, মাথা-পিছু এক সের পাঁচ ছটাক করিয়া উক্ত চাউল বাজার-দরে সরবরাহ করা হইবে এবং রেশন-গ্রহীতাগণ ইচ্ছা করিলে রেশনের চাউলের পরিবর্তে উক্ত সরু চাউল ঐ সকল দোকান হইতে ক্রয়